প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

৩৩শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩৩৯

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

বৈশাখ—আশ্বিন

৩৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড—১৩৩৯

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ, ১ম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৩৯ | ১ম সংখ্যা

অগ্রদূত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে পথিক তুমি একা,
আপনার মনে জানি না কেমনে
অদেখার পেলে দেখা।
যে পথে পড়েনি পায়ের চিহ্ন
সে পথে চলিলে রাতে,
আকাশে দেখেছ কোন্ সঙ্কেত,
কারেও নিলে না সাথে
তুঙ্গ গিরির উঠিছ শিখরে
যেখানে ভোরের তারা
অসীম আলোকে করিছে আপন
আলোর যাত্রা সারা॥

প্রথম যেদিন ফাল্গুন তাপে
নব নির্ঝর জাগে,
মহা সুদূরের অপরূপ রূপ
দেখিতে সে পায় আগে।
আছে, আছে, আছে, এই বাণী তার
এক নিমেষেই ফুটে,
অচেনা পথের আহ্বান শুনে
অজানার পানে ছুটে।

সেই মতো এক অকথিত ভাষা
ধ্বনিল তোমার মাঝে,
আছে, আছে, আছে, এ মহামন্ত্র
প্রতি নিঃশ্বাসে বাজে ॥

রোধিয়াছে পথ বন্ধুর করি
অচল শিলার স্তূপ।
নহে, নহে, নহে, এ নিষেধ-বাণী
পাষাণে ধরেছে রূপ।
জড়ের সে নীতি করে গর্জ্জন
ভীরু জন মরে ভুলে,
জনহীন পথে সংশয় মোহ
রহে তর্জ্জনী তুলে।
অলস মনের আপনারি ছায়া
শঙ্কিল কায়া ধরে,
অতি নিরাপদ বিনাশের তলে,
বাঁচিতে চেয়ে সে মরে ॥

নব জীবনের সঙ্কটপথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম মাঝে পথ করি দিবে,—
জীবনের ব্রত তব।
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ
ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে
মহাবাণী—আছে আছে ॥

কুমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী,
অভিষেক তরে এনেছে তীর্থবারি।
সাজাবে অঙ্গ উজ্জ্বল বরবেশে,
জয়মাল্য-যে পরাবে তোমার কেশে,
বরণ করিবে তোমারে, সে উদ্দেশে
দাঁড়ায়েছে সারি সারি॥

দৈত্যের হাতে স্বর্গের পরাভবে
বারে বারে, বীর, জাগো ভয়ার্ত ভবে।
ভাই ব'লে তাই নারী করে আহ্বান,
তোমারে, রমণী পেতে চাহে সন্তান,
প্রিয় ব'লে গলে করিবে মাল্যদান
আনন্দে গৌরবে॥

হের, জাগে সে যে রাতের প্রহর গণি,
তোমার বিজয়-শঙ্খ উঠুক্ ধ্বনি।
গর্জ্জিত তব তর্জ্জন ধিক্কারে
লজ্জিত কর কুৎসিত ভীরুতারে,
মন্দ্রিত হোক্ বন্দীশালার দ্বারে
মুক্তির জাগরণী॥

তুমি এসে যদি পাশে নাহি দাও স্থান
হে কিশোর, তাহে নারীর অসম্মান।
তব কল্যাণে কুঙ্কুম তার ভালে,
তব প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে,
তব বন্দনে সাজায় পূজার থালে
প্রাণের শ্রেষ্ঠ দান॥

তুমি নাই, মিছে বসন্ত আসে বনে
বিরহ-বিকল চঞ্চল সমীরণে।
দুর্ব্বল মোহ কোন্ আয়োজন করে,
যেথা অরাজক হিয়া লজ্জায় মরে,
ঐ ডাকে, রাজা, এস এ শূন্য ঘরে
হৃদয় সিংহাসনে॥

চেয়ে আছে নারী, প্রদীপ হয়েছে জ্বালা,
বিফল ক'রো না বীরের বরণডালা।
মিলন লগ্ন বারে বারে ফিরে যায়
বরসজ্জার ব্যর্থতা-বেদনায়,
মনে মনে সদা ব্যথিত কল্পনায়
তোমারে পরায় মালা॥

রথ তব তারা স্বপ্নে দেখিছে জেগে,
ছুটিছে অশ্ব বিদ্যুৎ-কষা লেগে।
ঘুরিছে চক্র বহ্নি-বরণ সে যে,
উঠিছে শূন্যে ঘর্ঘর তার বেজে,
প্রোজ্জ্বল চূড়া প্রভাত সূর্য্যতেজে,
ধ্বজা রঞ্জিত রাঙা সন্ধ্যার মেঘে॥

চাহে নারী তব রথ-সঙ্গিনী হবে,
তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে।
অবারিত পথে আছে আগ্রহভরে
তব যাত্রায় আত্মদানের তরে,
গ্রহণ করিয়ো সম্মানে সমাদরে,
জাগ্রত করি রাখিয়ো শঙ্খরবে॥

প্রতাপাদিত্যের কথা

শ্রীনিখিলনাথ রায়

বাঙ্গালীর ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন। বাঙ্গলার সম্বন্ধে কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ থাকিলেও বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছুই নাই তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে, ঐতিহাসিক যুগেও বাঙ্গালীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। অবশ্য এ সময়ের কতক পুঁথিপত্র আছে বটে, কিন্তু তাহা যথাসময়ে লিখিত না হওয়ায় এবং কল্পনা ও অতিরঞ্জনে এরূপ পরিপূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত তথ্য বাহির করা সুকঠিন। সেই সকল পুঁথিপত্র আবার অধিকাংশ স্থলেই প্রবাদ-অবলম্বনে লিখিত। 'নষ্টমূলা জনশ্রুতিঃ' কথাটা মানিয়া লইলেও, যেখানে মূলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেখানে তাহার সার্থকতা কোথায়? প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আমরা তাঁহার অনেক কথারই মূল খুঁজিয়া পাই না। যদিও প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে সেকালে ও একালে অনেক পুঁথিপত্র ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তথাপি তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য বাহির করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। প্রকৃত ইতিহাস হইতে প্রতাপ-সম্বন্ধে কোন কোন কথা জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু আনুপূর্ব্বিক কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাই আমরা প্রতাপের সম্বন্ধে লিখিত ও কথিত বিবরণসমূহ আলোচনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে আমাদের মনে হয় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যে-সকল জেস্যুইট পাদরী এদেশে আসিয়া প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই প্রথম কথা। তাঁহাদের কথা লইয়া ডুজারিক, সামুয়েল পার্শা প্রভৃতি যে-সকল গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাই ক্রমে প্রচারিত হয়। কিন্তু এদেশে ইংরেজ-আগমনের পূর্ব্বে অবশ্য এ-সকল কথা লোকে জানিতে পারে নাই। ইহার পর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী ও মির্জ্জা নথন লিখিত বাহারিস্তান হইতে প্রতাপাদিত্যের কথা জানা যায়। তাঁহারা ভারতবাসী হওয়ায় তাঁহাদের লিখিত বিবরণ যে এদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। কোন কোন গ্রন্থ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়, রামরাম বসু-প্রণীত রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রই ইহার প্রমাণ। বসু-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, পারসিক ভাষায় প্রতাপাদিত্যের কিছু কিছু বিবরণ আছে, কিন্তু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ না থাকায় তিনি তাঁহার গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে বোধ হয় বসু-মহাশয় বাহারিস্তান প্রভৃতির কথা অবগত ছিলেন, বাহারিস্তানের কোন কোন কথা তাঁহার গ্রন্থেও দেখা যায়। রাজনামা নামে এক পারসিক গ্রন্থের কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এক্ষণে কিন্তু তাহার অস্তিত্বের কথা জানা যায় না। সে যাহা হউক আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী ও বাহারিস্তান প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছে এবং অধ্যাপক যদুনাথ সরকার সে-কথা জানাইয়া দিয়া প্রতাপাদিত্যের শেষ-জীবন সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রদান করিয়া যে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, সে কথা আমরা অবশ্যই বলিতে পারি। পাদরীগণ, আবদুল লতীফ ও মির্জ্জা নথন প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক, কাজেই তাঁহাদের বিবরণ হইতে প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত কথা অনেক পরিমাণেই জানিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ঐ সকল বিবরণ হইতে প্রতাপাদিত্যের এক এক সময়ের কথাই জানা যায়, তাঁহার আনুপূর্ব্বিক প্রকৃত বিবরণ কি তাহা জানিবার উপায় নাই।

এই সকল বিবরণের পর আমরা ক্ষিতীশ বংশাবলী-চরিত, ঘটককারিকা ও অন্নদামঙ্গল হইতে প্রতাপের কোন কোন বিবরণ জানিতে পারি। কিন্তু তাহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। এ-সকল প্রতাপের অনেক পরে লিখিত এবং প্রকৃত

ইতিহাসের সহিত তাহাদের যথেষ্ট অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে অন্নদামঙ্গলের কথাই সমস্ত বাঙ্গলায় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই রামরাম বসু মহাশয় তাঁহার রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রণয়ন করিয়া প্রতাপাদিত্যের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করেন। তিনি পিতৃ-পিতামহ-মুখশ্রুত বিবরণ ও কোন কোন পারসিক ভাষায় লিখিত বিবরণ দেখিয়াই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থে কিছু কিছু ইতিহাসের কথা থাকিলেও জনশ্রুতি যে তাহার প্রধান অবলম্বন তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই তাহাকে প্রতাপের প্রকৃত বিবরণ বলা যায় না। হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার বসু-মহাশয়ের ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার গ্রন্থের যে নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে নূতন কোন কথাই নাই। তাহার পর গবরমেণ্টের Gazetteer, Statistical Account প্রভৃতিতে ঐ সকল গ্রন্থ ও প্রবাদ অবলম্বন করিয়া প্রতাপাদিত্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামক উপন্যাস গ্রন্থেও কিছু কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ঔপন্যাসিক বিবরণই অধিক। অবশেষে পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন, দুঃখের বিষয় তাহাতেও অনেক স্থলে প্রবাদই স্থান পাইয়াছে। শাস্ত্রী-মহাশয়ের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কোন কোন উপন্যাস ও নাটকও রচিত হইয়াছে। ইহার পর আমরা প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে প্রাপ্ত সমস্ত বিবরণসমূহ হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া আমাদের 'প্রতাপাদিত্য' প্রকাশ করি। তাহার পর অধ্যাপক যদুনাথ সরকার 'প্রবাসী' পত্রে আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী ও বাহারিস্তান হইতে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ দিয়া নূতন তথ্য জানাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার যশোহর খুলনার ইতিহাসে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া প্রতাপাদিত্যের বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত প্রবাদ ও কল্পনা বিজড়িত করিয়া এরূপ করিয়া তুলিয়াছেন যে, কোন্‌টি প্রকৃত ইতিহাস, কোন্‌টি প্রবাদ বা কল্পনা তাহা স্থির করা কঠিন। আমরা এই সকল বিবরণ আলোচনা করিয়া প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে প্রকৃত কথা কি তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। সে-সময়ের প্রকৃত ইতিহাসের আলোচনা করিয়া প্রবাদ সকলের মূল কিরূপ তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিব। এ-প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপেই প্রতাপের জীবনী আলোচনা করিব।

বার-ভুঁইয়া

মোগল-আমলে বঙ্গদেশে বারজন ভুঁইয়ার কথা জানা যায়, ইঁহারাই বাঙ্গলার প্রকৃত মালিক ছিলেন। আকবর-নামা, ডুজ্জারিক ও পার্শার গ্রন্থ এবং রামরাম বসু প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে একথা জানা গিয়া থাকে। কাজেই মোগল-আমলের এই বার-ভুঁইয়ার কথা ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়। হিন্দু-আমল হইতে এই বার-ভুঁইয়া প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কোন কোন প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে হিন্দু রাজত্বকালে বার-ভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায়। প্রবাদ অবলম্বন করিয়া কোন কোন ইংরেজ লেখকও হিন্দু-আমলের বার-ভুঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও মোগল-আমলের বার-ভুঁইয়ার বিদ্যমানতা দেখিয়া, পূর্ব্ব হইতে যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। মোগল-আমলে যে-বারজন ভুঁইয়া ছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ আছে। ডুজ্জারিক, পার্শা প্রভৃতি উক্ত বারজনের মধ্যে তিনজনকে হিন্দু ও অবশিষ্ট নয়জনকে মুসলমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই হিন্দু তিনজন শ্রীপুর, বাকলা ও চ্যাণ্ডিকান বা চান্দেকানের রাজা। আমরা জানিতে পারি, চাঁদরায়-কেদাররায় শ্রীপুরের, কন্দর্পরায়-রামচন্দ্র রায় বাকলার ও প্রতাপাদিত্য চ্যাণ্ডিকানের রাজা। কাজেই প্রতাপাদিত্য যে বার-ভুঁইয়ার অন্যতম তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান ভুঁইয়াদের মধ্যে ইশা খাঁর নামই দেখা যায়, তিনি সকল ভুঁইয়ার প্রধান বলিয়া ঐ সকল গ্রন্থে এবং আকবরনামায়ও উল্লিখিত হইয়াছেন। কেহ কেহ অবশিষ্ট আটজনের মধ্যে কোন

হিন্দু ভূঁইয়ার নামোল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু সে-সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বংশ-পরিচয়

কুলগ্রন্থ, বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ ও বংশপরম্পরায় প্রচলিত বিবরণ হইতে প্রতাপাদিত্যের বংশ-পরিচয় জানিতে পারা যায়। এই বংশ-পরিচয়কে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কোন কোন ইতিহাসের দ্বারা তাহার কোন কোন কথা সমর্থিতও হইয়াছে। রামচন্দ্র গুহ যশোর রাজবংশের আদি-পুরুষ। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া সপ্তগ্রামের নিকট বাস করেন, তথায় বিবাহ করিয়া রামচন্দ্র সপ্তগ্রামের কাননগো-দপ্তরের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। শিবানন্দও কাননগো-দপ্তরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভবানন্দের শ্রীহরি ও গুণানন্দের জানকীবল্লভ নামে পুত্র জন্মে। এই শ্রীহরির পুত্রই প্রতাপাদিত্য। ইঁহারা সপ্তগ্রাম হইতে পরে গৌড়ে গমন করেন। সে-সময়ে সুলেমান কররাণী গৌড়ের মসনদে উপবিষ্ট। তিনি দিল্লীর বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেও, একরূপ স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র দায়ুদের সহিত শ্রীহরির পরিচয় ঘটে, দায়ুদের রাজত্বকালে শ্রীহরি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি লাভ করেন। সে সূত্রেই জানকীবল্লভও 'বসন্তরায়' উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। বিক্রমাদিত্য ও কতলু খাঁ দায়ুদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তবকাৎ-ই-আকবরী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এ কথা জানিতে পারা যায়। কতলু ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল।

যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

দায়ুদ বাঙ্গলার শেষ পাঠান নরপতি। ইনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আকবর বাদশাহের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলে, মোগলেরা তাঁহাকে অনেকবার পরাজিত করিয়া অবশেষে নিহত করে। মোগলদিগের সহিত সংঘর্ষকালে দায়ুদ গৌড় হইতে উড়িষ্যায় পলায়নকালে তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন বিক্রমাদিত্যের হস্তে অর্পণ করিলে, তিনি সে-সমস্ত নৌকা বোঝাই করিয়া দায়ুদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করেন। তবকাৎ-ই-আকবরী ও বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে একথা জানা যায়। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, তাঁহারা সুন্দরবনের যেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তাহা চাঁদ খাঁ নামে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের জায়গীর ছিল। তিনি নিঃসন্তান হওয়ায় বিক্রমাদিত্য দায়ুদের নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া তথাকার জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে আবাসস্থান স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ইঁহারই নিকটে যশোরেশ্বরী নামে পীঠদেবতার স্থান ছিল। তাহার পর দায়ুদের নিধন ঘটিলে, তাঁহার সেই সমস্ত ধনরত্ন লইয়া বিক্রমাদিত্য যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও যশোর-সমাজ গঠন করেন। তাঁহাদের রাজ্যের চিহ্ন ও যশোর-সমাজ আজও বিদ্যমান আছে। অবশেষে বাদশাহ-দরবার হইতে তাঁহারা তাঁহাদের জমিদারী মঞ্জুর করিয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে একজন ভূঁইয়া হইয়া উঠেন।

প্রতাপের বাল্যজীবন

গৌড়েই প্রতাপের বাল্যজীবন আরম্ভ হয় বলিয়া মনে হয়। তথায় তিনি পারসিকাদি ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকিবেন এবং অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষারও আরম্ভ হয়। পরে যশোরে আসিয়া বিশেষভাবে অস্ত্রপরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন। বসু-মহাশয় বলেন, একদিন একটি উড্ডীয়মান পক্ষীকে শরবিদ্ধ করিয়া নিপাতিত করায়, বিক্রমাদিত্য ক্ষুণ্ণিত ও ভীত হইয়া প্রতাপকে সভ্যভাবে শিক্ষিত করিবার জন্য আগরায় পাঠাইয়া দেন। বসন্তরায় প্রতাপকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তিনি ইহাতে আপত্তি করিলে বিক্রমাদিত্য তাহা শুনেন নাই। প্রতাপের কোষ্ঠীর ফলে তিনি নাকি পিতৃদ্রোহী হইবেন বলিয়া বিক্রমাদিত্য আশঙ্কা করিয়াছিলেন। প্রতাপ আগরায় গিয়া বাদশাহ আকবরকে সন্তুষ্ট করিয়া এবং যশোরের রাজস্ব যাহা তাঁহার দ্বারা দাখিল করা হইত, তাহা গোপন করিয়া, নিজ নামে যশোর-রাজ্যের সনন্দ লইয়া আসেন। এ-সকল কথার অবশ্য আমরা কোন ঐতিহাসিক সমর্থন পাই নাই।

সুতরাং ইহার সত্যতাসম্বন্ধে বলিতে পারি না। তবে প্রতাপ যে যশোর-রাজ্যের ভূঁইয়া হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্য মানিয়া লইতে হয় এবং তাহাও যে বাদশাহের অনুমোদিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যশোর-রাজ্য-বিভাগ

প্রতাপের একচ্ছত্রত্বলাভের আশা দিন-দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হওয়ায়, বিক্রমাদিত্য যশোর-রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়া প্রতাপকে দশ আনা ও বসন্তরায়কে ছয় আনা সম্পত্তি দিয়া যান। যশোর-রাজ্য ভাগীরথী হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্ব ভাগ প্রতাপের ও পশ্চিম ভাগ বসন্তরায়ের অংশে পড়ে। কিন্তু চাকসিরি বা চকশ্রী নামে একটি স্থান পূর্ব্বদিকে বসন্তরায়ের অধিকারে থাকায় প্রতাপাদিত্য তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন এবং বসন্তরায়ের প্রতি রুষ্ট হইয়া উঠেন। ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত না হইলেও ঘটনাপরম্পরায় এ সকল কথাকে মানিয়া লওয়া যায়। প্রতাপ অবশেষে বসন্তরায়কে হত্যা করিয়া সমস্ত যশোর-রাজ্যের ভূঁইয়া হইয়াছিলেন। যে-সময়ে পাদরীগণ এদেশে আসেন, তখন প্রতাপাদিত্য সমস্ত যশোর-রাজ্যেরই রাজা। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়।

প্রতাপের রাজধানী গঠন

যশোর নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ধূমঘাট নামক স্থানে প্রতাপ তাঁহার রাজধানী গঠন করেন। বসন্তরায় তাঁহাদের স্থাপিত যশোরেই অবস্থান করিতেন। এই দুই নগর পরে এক হইয়া যশোর বা ধূমঘাট নামেই অভিহিত হয়। প্রতাপ যশোরেশ্বরী পীঠদেবতার স্থান নির্ণয় করিয়া তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, বসু-মহাশয়ও তাহাই বলিয়াছেন। ধূমঘাটে দুর্গনির্ম্মাণ, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে জাহাজাদি রাখিবার এবং কামান, বন্দুক ও গোলাগুলি প্রস্তুতেরও স্থান হয়। প্রতাপের কামান, বন্দুক ও গোলাগুলি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপ সাগরদ্বীপে তাঁহার নৌবাহিনীর প্রধান আড্ডা করিয়াছিলেন। এই সাগরদ্বীপকে ইউরোপীয়েরা চ্যাণ্ডিকান বা চান্দেকান বলিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাদের নিকট প্রতাপাদিত্য সাগরদ্বীপের শেষ রাজা (Last King of Saugur Island) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। চ্যাণ্ডিকান সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

উড়িষ্যায় প্রতাপ

প্রতাপ মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেও মধ্যে মধ্যে স্বাধীনতা অবলম্বনের ইচ্ছা করিতেন। যখন মোগলেরা উড়িষ্যায় কতলু খাঁ প্রভৃতি পাঠানদিগকে দমন করিতে ব্যস্ত, সেই সময়ে প্রতাপাদিত্য একবার উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার আনীত গোবিন্দ-দেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ হইতে তাহা বুঝা যায়। উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের প্রস্তর-ফলকে উক্ত শিবলিঙ্গ উৎকল হইতে প্রতাপকর্ত্তৃক আনীত ও বসন্তরায় কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া লিখিত ছিল, অনেকে তাহা দেখিয়াছেন। প্রস্তর-ফলক, শিবলিঙ্গ ও তাহার মন্দিরের এখন আর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু গোবিন্দদেব আজও বিদ্যমান আছেন। উড়িষ্যায় প্রতাপ কোন্ পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বিশ্বকোষে এবং পরে সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনার ইতিহাসে প্রতাপ মোগলপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু আমরা মনে করি যে, তিনি পাঠানপক্ষেই যোগ দিয়াছিলেন। কারণ পাঠান-সর্দ্দার কতলু খাঁর সহিত তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমরা একথা আমাদের প্রতাপাদিত্য গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছি। মোগলেরা জমীদারদিগকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করায়, প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে কথা অপেক্ষা বিক্রমাদিত্যের সহিত কতলু খাঁর বন্ধুত্ব এবং কতলুর কনিষ্ঠ পুত্র জমাল খাঁকে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি-নিয়োগ করায়, প্রতাপাদিত্যের পাঠানপক্ষে যোগদানই যে অধিকতর সম্ভবপর ইহাই মনে হয়। আবার

আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার পরেই মোগলদিগের সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

মোগলদের সহিত সংঘর্ষারম্ভ

উড়িষ্যায় প্রতাপ পাঠানদিগের সহিত যোগ দেওয়ায় এবং স্বাধীনতার ভাব প্রকাশ করায়, মোগলেরা তাঁহার দমনে প্রবৃত্ত হয়। যে-সময়ে আজিম খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার ছিলেন, সেই সময়ে প্রথমে মোগলদের সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বসু-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রথমে আবরাম খাঁ নামে মোগল সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, ইব্রাহিম খাঁ নামে একজন সেনাপতি আজিম খাঁর সময়ে এদেশে ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রতাপের বিরুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বসু-মহাশয় তাঁহার নিপাতের যে কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। ইব্রাহিম খাঁ ইহার পর অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তবে তিনি পরাজিত হইতে পারেন, কারণ আমরা দেখিতেছি স্বয়ং আজিম খাঁর সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ হইয়াছিল। ঘটককারিকাতে যে আজিমের নিহত হওয়ার কথা আছে, তাহা একেবারে অবিশ্বাস্য, কারণ আজিম অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তবে যশোর-চাঁচড়ার রাজবংশের কাগজপত্রে ও অন্যান্য প্রমাণে জানা যায় যে, আজিম প্রতাপকে দমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধিকৃত কোন কোন স্থান চাঁচড়া রাজবংশের আদিপুরুষ ভবেশ্বর রায়কে প্রদান করা হইয়াছিল। ভবেশ্বর যুদ্ধে আজিমকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এখানে একটা কথা বলিবার আছে যে, ইব্রাহিম ও আজিমের যুদ্ধযাত্রা স্বতন্ত্র কি একই তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

বসন্তরায়ের হত্যা

ইহার পর প্রতাপ অনেক দিন পর্য্যন্ত নীরবে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি বলসঞ্চয় করিতে চেষ্টা করেন, সৈন্য, হস্তী, রণতরী, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি-নির্ম্মাণের বিপুল আয়োজন এ-সময়ে তিনি করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ পরে মোগলদিগের সহিত তাঁহার যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহার বিপুল আয়োজনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বলসঞ্চয় আরম্ভ করিয়া প্রতাপের একচ্ছত্র হলাভের প্রবৃত্তিও প্রবল হইয়া উঠে, কারণ তিনি পিতৃব্য বসন্ত-রায়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া সমস্ত যশোর-রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বসু-মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে, বসন্তরায়ের পিতৃশ্রাদ্ধ-তিথিতে তিনি যখন শ্রাদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত, তখন প্রতাপ কাপুরুষতাসহকারে শ্রাদ্ধস্থলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। বসন্তরায়ের কোন কোন পুত্রও প্রতাপের হস্তে নিহত হন। ইহা কোন ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত না হইলেও বসন্তরায়ের বংশীয়গণ পুরুষপরম্পরাক্রমে একথা বলিয়া আসিতেছেন। রামরাম বসু-মহাশয়ও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতাপের রাজ্যে পাদরীগণ

প্রতাপ যে-সময়ে যশোর-রাজ্যে একাধিপত্য করিতেছিলেন, সেই সময় ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে গোয়ার জেস্থইট সম্প্রদায়ের প্রধান পাদরী নিকোলাস পাইমেণ্টা বঙ্গদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ফ্রান্সিস ফার্ণাণ্ডেজ ও ডমিনিক সোসা নামে দুই জন পাদরীকে পাঠাইয়া দেন। তাহার পর ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে মেলসিওর ফনসেকা ও এণ্ড্রু বাউয়েস আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। ইঁহারা বাঙ্গলার নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। সোসা বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পাদরীরা প্রধান প্রধান ভূঁইয়াদের সহিত সাক্ষাৎও করেন। বাকলার রামচন্দ্র রায় ও চ্যাণ্ডিকানের প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাতের কথা তাঁহারা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। চ্যাণ্ডিকান কোথায় সে-কথা আমরা পরে বলিব। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে প্রথমে সোসা ও ৯৯ খৃঃ অব্দে ফার্ণাণ্ডেজ ও ফনসেকা চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হন। সোসা বরাবরই সেখানে থাকিতেন। রাজা তাঁহাদিগকে খুবই সম্মান করিতেন। এইখানে ৯৯ খৃঃ অব্দের শেষভাগে তাঁহারা একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন, তাহাই বাঙ্গলার প্রথম গির্জ্জা বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু ব্যাণ্ডেল ও

চট্টগ্রামে একই বৎসরে গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। চ্যাণ্ডিকানের গির্জ্জানির্ম্মাণে রাজা ও যুবরাজ পাদরীদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন।

কার্ভালোর হত্যা

পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে কার্ভালো নামে একজন সর্দ্দার জলযুদ্ধে বিশেষরূপ দক্ষ ছিল। কার্ভালো শ্রীপুরের ভূঁইয়া কেদাররায়ের অধীনে সন্দ্বীপে অবস্থিতি করিত। আরাকান-রাজ সন্দ্বীপ অধিকারের চেষ্টা করিলে কার্ভালো সেখান হইতে চলিয়া আসে, ক্রমে ক্রমে সে চ্যাণ্ডিকান উপস্থিত হয়। চ্যাণ্ডিকানের রাজা তাহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আরাকানের রাজা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। তিনি কার্ভালোর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এইরূপ কথিত হয় যে, প্রতাপাদিত্য আরাকান-রাজকে ভয় করিতেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি কার্ভালোকে হত্যা করিতে মনস্থ করেন। কাভালো চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হইলে, রাজা প্রথমে তাহার যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন এবং তাহাকে লইয়া আরাকান-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে তাঁহার ঔদাসীন্য দেখিয়া পাদরী ও অন্যান্য পর্ত্তুগীজগণ কার্ভালোর হত্যা আশঙ্কা করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে উপদেশ দেন। কার্ভালো কিন্তু চ্যাণ্ডিকান হইতে যশোরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। তিন দিন পরে রাজা তাহাকে ও তাহার অনুচর-দিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে তাহাদের হত্যাসম্পাদন হয় বলিয়া সকলে অনুমান করিয়াছিল। প্রতাপকর্ত্তৃক কার্ভালোর হত্যা সতীশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ইহার অনেক পরে কাশীম খাঁর সুবেদারী সময়ে আরাকান-রাজের একজন পর্ত্তুগীজ সর্দ্দার কাপ্তেন ডোরমশ কাভালো তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মোগলপক্ষে যোগ দিয়াছিল বলিয়া বাহারিস্তানে উল্লেখ আছে। এই ডোরমশ্ বা ডো-আমো পর্ত্তুগীজ ডোমিঙ্গস (Domingos) শব্দের ফারসী অপভ্রংশ। প্রতাপকর্ত্তৃক হত কার্ভালোরও ডোমিঙ্গ নামই ছিল। সুতরাং এই দু-জনই এক ব্যক্তি। কিন্তু এক নামের কি দুই ব্যক্তি হইতে পারে না? আর ডোরমশ ও ডোমিঙ্গকে একই প্রমাণ করিতে চেষ্টা যে কষ্টকল্পনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ডুজারিকের গ্রন্থে প্রথমোক্ত কার্ভালোকে ডোমিনিক (Dominique) নামে উল্লিখিত দেখা যায়। কার্ভালোর মৃত্যু-সংবাদ পরদিন মধ্যরাত্রিতে চ্যাণ্ডিকানে পৌছিয়াছিল বলিয়া পাদরীগণ উল্লেখ করিয়াছেন। পাদরী ও অন্যান্য পর্ত্তুগীজগণ চ্যাণ্ডিকান হইতে পলায়ন করেন। তাঁহাদের গির্জ্জা ভূমিসাৎ হয়। এখানে আমরা একটা কথা বলিয়া রাখি যে, দুই কার্ভালো একই ব্যক্তি হইলে, যশোরের ঘটনার দীর্ঘকাল পরে কার্ভালোর কোনও সংবাদ না পাওয়ার কারণ বুঝা যায় না। গঞ্জালেশ ফিরিঙ্গীর নামই সে-সময়ে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। আরাকান-রাজ ও কার্ভালো দুই শত্রুর মিলনও অসম্ভব। সতীশবাবু এ সম্বন্ধে আর যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রবাদ বা তাঁহার কল্পনাপ্রসূত।

চ্যাণ্ডিকান কোথায় ?

চ্যাণ্ডিকান কোথায় এ-সম্বন্ধে আমরা আমাদের প্রতাপাদিত্যে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমরা নানা প্রমাণে দেখাইয়াছিলাম যে, সাগরদ্বীপই চ্যাণ্ডিকান। সার টমাস রোর মানচিত্রে এঞ্জিলি বা হিজলীর পরপারে চ্যাণ্ডিকান দ্বীপ (Ile de Chundican) অঙ্কিত আছে। এই মানচিত্র সার টমাস রোর সহচর বেসিনকর্ত্তৃক অঙ্কিত। সামুয়েল পার্শাও লিখিয়াছেন যে, চ্যাণ্ডিকান গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত (Chandican which lyeth at the mouth of the Ganges)। আর বহুস্থলে প্রতাপাদিত্যকে সাগরদ্বীপের শেষ রাজা (The last King of Saugur Island) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বেভারিজ সাহেব ও সতীশচন্দ্র মিত্র ধূমঘাটকে চ্যাণ্ডিকান প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেভারিজ সাহেব চ্যাণ্ডিকান প্রদেশকে চাঁদ খাঁর জায়গীর বলিয়া চাঁদখা হইতে চ্যাণ্ডিকান কথার উৎপত্তি মনে করেন এবং ধূমঘাটকেই চাঁদখা জায়গীরের প্রধান স্থান

মনে করিয়া তাহাকেই চ্যাণ্ডিকান নগর বলিতে চাহেন। বেভারিজ সাহেব কোন মানচিত্রে চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ দেখেন নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি অবশ্য সার টমাস রোর মানচিত্র দেখেন নাই। সতীশবাবুও ধূমঘাটকেই চ্যাণ্ডিকান বলিতে চাহেন। তিনি সার টমাস রোর মানচিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। ঢাকার নিকট সাতগাঁ অঙ্কিত থাকার কথা বলিয়া উহা অবিশ্বাস্য মনে করেন। অবশ্য উক্ত মানচিত্র স্বরূপ করিয়া অঙ্কিত নহে, উহাতে কেবল প্রধান প্রধান স্থানের অবস্থানই দেখান হইয়াছে। কাজেই কোন্ স্থান কোন্‌দিকে তাহা উহা হইতে বুঝিয়া লওয়া যায়। আর ঢাকার পার্শ্বেই সাতগাঁ অঙ্কিত নাই, উভয়ের মধ্যে দূরত্বও দেখান হইয়াছে। গঙ্গার মোহনায় যে চ্যাণ্ডিকান অবস্থিত, আমরা পার্শার এ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সতীশবাবু সে-সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। অবশ্য ধূমঘাট কদাচ গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত নহে। আর ধূমঘাট ও যশোর যে পরস্পর সংলগ্ন ও একই নগর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। সতীশবাবুও তাহা স্বীকার করেন। তাহা হইলে কাভালোর মৃত্যু-সংবাদ যশোর হইতে পরদিন মধ্যরাত্রিতে চ্যাণ্ডিকানে পৌঁছিলে, উভয় স্থানের মধ্যে যে দূরত্ব আছে, তাহা কি বোধ হয় না? বেভারিজ সাহেবও তাহা মনে করিয়াছিলেন। সতীশবাবু এই বিলম্বের কারণ কাভালোর মৃত্যু-সংবাদ গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল বলিতে চাহেন। এরূপ বলিবার কারণ তাঁহার মত বজায় রাখা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর তিনি বা ফকনার সাহেব ঈশ্বরীপুরে পূর্ব্ব-পশ্চিমে স্থিত কয়েকটি সমাধি দেখিয়া তাহা মুসলমানদিগের কবর নহে এবং খৃষ্টানদিগেরই সম্ভব বলিয়া সেইখানেই পাদরীদিগের গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল, অতএব ঐ স্থানেই চ্যাণ্ডিকান বলিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, উক্ত কবরগুলি খৃষ্টানদিগের হইলেও বহু পর্ত্তুগীজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে কার্য্য করিত। তাহাদের কবর হওয়া কি সম্ভব নহে? সুতরাং এরূপ যুক্তির কোনই মূল্য নাই। ফলতঃ সাগরদ্বীপই যে চ্যাণ্ডিকান তাহাতে সন্দেহ নাই। চাঁদখা জায়গীর হইতে তাহার উক্ত নাম হইলেও হইতে পারে। সতীশবাবু প্রতাপের রাজধানী সাগরদ্বীপে ছিল বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। আমরা ধূমঘাট-যশোরকেই প্রতাপের রাজধানী বলিয়াছি। আমাদের প্রতাপাদিত্য দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

জামাতৃ-বিদ্বেষ

বাকলার রাজা কন্দর্প রায়ের পুত্র রামচন্দ্র রায়ের সহিত প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতী বা বিমলার বিবাহ হইয়াছিল। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, প্রতাপ চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা রাজ্য ও সমাজের আধিপত্যের জন্য বিবাহরাত্রিতেই জামাতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হন। ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বসু-মহাশয় বলেন যে, বিবাহ-সময়েই ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এক সময়ে রামচন্দ্র যে অধিক দিন নিজরাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র ছিলেন এবং আরাকান-রাজ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন তাহা জানা যায়। রামচন্দ্রের বিবাহসময়ে তাহা হইলেও হইতে পারে। ফলতঃ এবিষয়ে কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে এ-কথাটা যশোর ও বাকলা উভয়ত্রই চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। রামচন্দ্র নিজ পত্নী ও শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে যশোর হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

প্রতাপ ও মানসিংহ

আমরা বলিয়াছি যে, প্রতাপ অনেক দিন নীরব থাকিয়া বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্যের গৌরবও দিন-দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। পণ্ডিত, কবি ও অন্যান্য গুণিগণ তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া পুরস্কৃত হইতেন। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস তাঁহার গানে প্রতাপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতাপের দানও অসীম ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সকল দিক্ হইতে তাঁহার গৌরব বৰ্দ্ধিত হওয়ায় ক্রমে তাঁহার আবার স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। তিনি সে-ভাব প্রকাশ করিতেও আরম্ভ করেন। বসন্তরায়ের হত্যার

পর তাঁহার এক পুত্র রাঘব রায় বা কচু রায় প্রথমে উড়িষ্যার ইশা খাঁ লোহানীর নিকট পরে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রতাপাদিত্যের সমস্ত কথা জানাইলে এবং সে-সময়ে পাঠানেরাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর রাজা মানসিংহকে ১৬০৬ খৃঃ অব্দে আবার বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে মানসিংহ ১৬০৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় সুবেদারী করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমবার সুবেদারী সময়ে কতলু খাঁ প্রভৃতি পাঠানগণ, ইশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি ভূঁইয়া তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। দ্বিতীয়বারে তাঁহার প্রতাপাদিত্যের সহিত সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মানসিংহ রাজধানী রাজমহল হইতে যশোর অভিমুখে যাত্রা করিলে, হুগলীর কাননগো দপ্তরের মোহরের ও কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কয়েকটি পরগণার জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত পরগণাগুলির জমিদারী সনন্দের তারিখ ১০১৫ হিজরী (১৬০৬ খৃঃ অব্দ) লিখিত আছে, সুতরাং এই সময়েই মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইসলাম খাঁ চিস্তির সময়ে ভবানন্দ 'মজুমদার' উপাধিলাভ করেন। সম্ভবতঃ তিনি সে-সময়েও মোগল সেনাপতিদিগকে সাহায্য করিয়া থাকিবেন। ভবানন্দ যে পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্যের সরকারে কাজ করিতেন, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তিনি মোগল সেনাপতিদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া যে দেশদ্রোহী তাহাও বলা যায় না। কারণ তিনি সরকারের কর্ম্মচারী আর প্রতাপাদিত্য সরকারের বিদ্রোহী। নিমকহারামী দোষটাও কম নহে। মানসিংহ যশোর অভিমুখে যাত্রা করিয়া কোন কোন স্থানে নূতন পথ নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত সে পথকে আজিও গৌড়-বঙ্গের রাস্তা বলিয়া থাকে। যশোর-দুর্গের নিকটে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের ঘোরতর যুদ্ধ হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কয়েক দিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলে। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষের কোনও ঐতিহাসিক সমর্থন নাই, তবে ভবানন্দের সনন্দ, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, অন্নদামঙ্গল, ঘটককারিকা, বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ এবং রাজপুতানা-জয়পুরের বংশাবলী পুঁথি হইতে জানা যায় যে, প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল। বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, মানসিংহ প্রতাপের গড় দখল করিয়াছিলেন। উক্ত বংশাবলীতে কেদাররায়ের সহিত মানসিংহের যুদ্ধের কথাও আছে এবং তিনি তাঁহার নিকট হইতে 'শিলাদেবী' নামে প্রতিমা অম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী লইয়া যান বলিয়া যে একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহা সত্য নহে। আমাদের প্রতাপাদিত্যে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, অন্নদামঙ্গল, ঘটককারিকা এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহে মানসিংহ যে প্রতাপাদিত্যকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে, একথা যে সত্য নহে তাহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বংশাবলী ও বসু-মহাশয়ের গ্রন্থেও একথা নাই। বাহারিস্তান তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। নানাদিক্ দিয়া আলোচনা করিলে মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের মধ্যে যে একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহা মানিয়া লওয়া যায়। সংঘর্ষে অবশ্য প্রতাপই পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কচু রায় মানসিংহকে লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার সঙ্গে বাইশ জন আমীরও আসেন। এই বাইশ জন আমীর হত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ঈশ্বরীপুরে বার ওমরার গোর বলিয়া কতকগুলি সমাধি আমীরদিগের গোর বলিয়া কথিত হয়। যুদ্ধে হতাহত হওয়া অসম্ভব নহে। কচু রায় যে মানসিংহের নিকট হইতে 'যশোরজিৎ' উপাধি পাইয়া পিতৃরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একথাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

শেষ সংঘর্ষ

ইসলাম খাঁ চিস্তি ১৬০৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া আসেন। ইনি ফতেপুর শিকরীর প্রসিদ্ধ ফকীর শেখ সেলিম চিস্তির পৌত্র, যাঁহার নামানুসারে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সেলিম নাম হয়। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ ইসলাম খাঁর দেওয়ান হইয়া আসেন। ইহার

অনুচর আবদুল লতীফ খাঁর ভ্রমণ-কাহিনী ও ইসলাম খাঁর অন্যতম সেনাপতি মির্জ্জা সহনের প্রণীত বাহারিস্তান হইতে প্রতাপাদিত্যের সে-সময়ের কথা জানিতে পারা যায়। ইসলাম খাঁ রাজমহলে আসিলে, প্রতাপের দূত শেখ বদী তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে লইয়া নানা উপহার-সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুবেদার রাজকুমারের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া প্রতাপাদিত্যকে সাক্ষাৎ করিতে বলেন। লতীফ লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থ বলে বলী রাজা বঙ্গদেশে আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার যুদ্ধসামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা ও বিশ হাজার পাইক এবং পনর লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য ছিল। ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকায় যান ও তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। পথিমধ্যে অনেক জমিদার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য শেখ বদীর সহিত উপহার লইয়া উপস্থিত হন। সুবেদার প্রতাপাদিত্যের সম্মান করিয়া তাঁহাকে ভাটির জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত যোগদানের কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেন। প্রতাপ কিন্তু যথাসময়ে সুবেদারের সহিত যোগ দেন নাই। ইহাতে সুবেদার যারপরনাই ক্রুদ্ধ হন। শেষে যখন সংগ্রামাদিত্যকে কতকগুলি রণপোত সহ পাঠাইয়া সুবেদারের নিকট ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন সুবেদার ক্রোধে অন্ধ হইয়া সেই সকল রণপোত এমারতের জিনিষপত্র বহিয়া ভাঙিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন এবং সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ ও মির্জ্জা সহনকে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য দখল করার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইনায়েৎ খাঁ প্রধান সেনাপতি হইয়া স্থলসৈন্যের এবং সহন রণতরী ও তোপ লইয়া যাত্রা করিলেন। এই সহনই তাঁহার বাহারিস্তান গ্রন্থে এই সকল বিবরণ নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঢাকা হইতে নানা নদনদী অতিক্রম করিয়া ক্রমে ইচ্ছামতী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে সালিখা থানায় প্রতাপের সৈন্যের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। প্রতাপ অবশ্য আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য রণতরী, হস্তী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন। কমল খোজা ও কতলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁ তাঁহার সহকারি-স্বরূপে গমন করেন। কমল খোজা নৌসেনার ও জমাল খাঁ স্থলসৈন্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধ বাধিলে ক্রমে মোগলেরা জয়লাভ করিতে আরম্ভ করে। কমল খোজা নিহত হন। উদয় ও জমাল ক্রমে হটিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। অবশেষে মোগলেরা ধূমঘাটে গিয়া উপস্থিত হয়। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইয়া হকীম খাঁকে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ধৃত হইয়া ঢাকায় নজরবন্দী রূপে অবস্থান করিতে বাধ্য হন। হকীম খাঁ তাহার পর যশোরে আসিয়া মোগল-সৈন্যের সহিত যোগ দেন। প্রতাপের সেনাপতি জমাল খাঁও তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মোগলদিগের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে মোগলদিগের বলবৃদ্ধি হইয়া উঠে। মোগলেরা দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে, কিছুক্ষণ উভয় পক্ষের গোলাবৃষ্টির পর প্রতাপ অনন্যোপায় হইয়া ইনায়েতের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। ইনায়েৎ তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া গেলে ইসলাম খাঁ প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এদিকে মির্জ্জা সহন যশোরে থাকিয়া নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্যের কি হইল জানা যায় না, তিনি যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। প্রতাপেরও পরিণাম কি হইয়াছিল তাহাও জানা যায় না। তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া আগরায় পাঠাইতে তাঁহার যে বারাণসীতে দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল, ইহার কোন ঐতিহাসিক সমর্থন নাই। ইসলাম খাঁর সময়েই যে প্রতাপের পতন ইহা বাহারিস্তান সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। বসু-মহাশয়ও সেই কথা বলিয়াছেন।

শোধ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ষ্টেশনের বাহিরে বটতলায় একখানি ছোট ময়রার দোকান। কিন্তু তাহাতে পান-তামাকও বিক্রয় হয়। কানাই দ্বিপ্রহরের ট্রেন হইতে নামিয়াই দোকানের সম্মুখে গিয়া মাথার গাঁঠ্‌রিটা নামাইল। একগাল হাসিয়া দোকানীকে কহিল, "ময়রার পো, ভাল ত ?"

ময়রার পো তখন মাথা নীচু করিয়া একমনে বাতাসা কাটিতেছিল, তাহার আগমন জানিতে পারে নাই। আহ্বানে চোখ তুলিয়া স্মিতমুখে কহিল, "কে ? কানাই যে ? এই বাড়ি আসা হচ্ছে বুঝি ?"

কানাই উত্তর অঞ্চলে কোন্ একটা বড় রেল ষ্টেশনে চাক্‌রি করে ; ময়রার পো'র কাছে তাহার একটু খাতির আছে।

ময়রার পো'র প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া মাথা নাড়িল। ময়রার পো তৈলাক্ত বেঞ্চিখানা দেখাইয়া কহিল, "তা বসা হ'ক।"

"বস্‌তে পার্‌ব না, বেলা পড়িয়ে যায়। তিন ক্রোশ পথ পার হ'তে হবে।"

"কতদিন থাকা হবে ?"

"সাতদিন" বলিয়াই গম্ভীর মুখে পাশের লোকটির হাত হইতে কল্কিটা লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কয়েকটা টান দিল। ময়রার পো'র চোখ দু'টি গিয়া পড়িল কানাইয়ের গাঁঠ্‌রির গায়ে। জিজ্ঞাসা করিল, "গাঁঠ্‌রির গায়ে ওটা কি ?"

নাক-মুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কানাই কহিল, "ঠেঙা।"

"আরে না। ঐ যে সাপের লেজের মত—"

"শাঙস্ মাছের লেজ—"

ময়রার পো বাহির ছাড়িয়া গাঁঠ্‌রির ভিতরটাও অনুসন্ধান করিবার পূর্বেই কানাই কল্কিটা লোকটির হাতে ফিরাইয়া দিয়া গাঁঠ্‌রিটা মাথায় তুলিতে তুলিতে কহিল, "চল্‌লাম ময়রার পো। ফির্‌বার পথে আবার দেখা হবে।" তারপর "ঠেঙা" গাছটি ঠক্ ঠক্ শব্দে মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে পথের উপর গিয়া পড়িল।

মেঠো পথ। শস্য-সবুজ ক্ষেতখামারের মধ্য দিয়া দক্ষিণে-বামে ঘুরিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই উত্তরে, দিলগঞ্জের দিকে। গোযানের যাতায়াতের পথটির মাঝে হাতখানেক গভীর দু'টি খাল ;—বর্ষায় জলেকাদায় ভরিয়া উঠে। এখন শুষ্ক ও ধূলি ভরা। দুই পাশে প্রকাণ্ড আম, জাম, কাঁটাল ও সজনে গাছের সারি। মাঝে মাঝে দুই চারিটা জিউলি ও বাবলা গাছও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও কোথাও চারা-খেজুরের চারিধার ঘিরিয়া ভাঁটি, কালকাশুন্দি, শেয়াল-কাঁটা, আশ্‌শেওড়া প্রভৃতির ঘন ঝোপ। ভিতরটা অন্ধকার ; কিছু দেখা যায় না। বুলবুল, চড়ুই ও টুনটুনি তাহার আওতায় ছোট নীড় রচনায় ব্যস্ত। ঝোপকে শতপাকে জড়াইয়া, বাঁধিয়া আলোকলতা, ঝুম্‌কোলতা, বন-কলমী ও আরও যেন কি। সময়টা তখন মাঘের মাঝামাঝি। ও-অঞ্চলে শীত আছে। সব গাছে ভাল করিয়া ফুলও ফোটে নাই, ডালে ডালে নব পল্লব ও কলিকার ভারে শিহরণ জাগিতেছে মাত্র। কিন্তু দূরে ও কাছে কোকিলের একটানা স্বরের বিরাম নাই। দক্ষিণ হাওয়া ফসল-ভারের উপর দিয়া দূর হইতে বম্ বম্ শব্দে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পথের ধূলা উড়াইয়া, গাছের ডালে দোলা দিয়া বহিয়া যাইতেছে, সেই উত্তরে দিলগঞ্জের দিকে। কিন্তু গ্রামখানাকে দেখা যায় না ; তাহার আগে আর একখানা গ্রাম চণ্ডীপুর—কালো প্রাচীরের মত আকাশের কোলে দাঁড়াইয়া আছে। দূরে এক দল রাখাল বাঁশী বাজাইতেছিল, একটি ঘুঘু শিমুলগাছের মাথায় বসিয়া কেবলি বলিতেছে, "বউ ভিজ খুদি, ভিজ খুদি ?"

নিকফিটা বধূর উঁকেতে তাহার অলস সুর ক্ষেতের উপর দিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে।

কিছুদূরে আগে আগে ছইয়ে ঢাকা একখানি গোযান যাইতেছিল ধূলা উড়াইয়া। কানাই হাঁক দিল, "কোথাকার গাড়ী গো?" চালকও উত্তর দিল, কিন্তু কথা বোঝা গেল না। তাহার হাঁকে ছইয়ের নীচে পর্দাখানা একটু সরাইয়া ফুটিয়া উঠিল একখানি কমনীয় মুখের একটি ধার ও কৌতূহলী একটি চোখ। রংটা ফর্সা। কানাইয়ের মনে হইল, মুখখানি বেশ। কিন্তু তাহার লক্ষ্মীর মুখখানি আরও মিষ্ট। সে দীর্ঘপদক্ষেপণে গাড়ীখানাকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গেল।

দেড় ক্রোশ পথ পার হইলেই দক্ষিণে ক্ষেতের পারে গড়াই নদীর বিরাট চর। উদাস হাওয়ায় আকাশ পানে বালুর ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছে। ঐ যে ভাঙনের ফাঁকে ফাঁকে জলের একটু দেখা যায়—নীল, রৌদ্রালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। নদীপারেই লক্ষ্মীর বাপের বাড়ী; দিলগঞ্জের ঠিক পশ্চিমে। লক্ষ্মী যেদিন প্রথম তাহার ঘরে আসে, নদীপারে মেঘ করিয়াছিল, কালো; চারিদিকে থম-থমে ভাব। লক্ষ্মীটা নদীর দিকে তাকাইয়া কি কান্নাই কাঁদিয়াছিল!

পথের দক্ষিণে বাঁশবনের মাথায় তখন সূর্য্য ঢলিয়া পড়িয়াছে, কানাই চণ্ডীপুরে পৌঁছিল। ছোট গ্রাম। খানকয়েক খড় ও টিনের ঘর। পশ্চিমে একটা প্রকাণ্ড দীঘি। পথটা গিয়াছে তাহারই তীর ঘেঁষিয়া। দু'টি বধূ তখনও ঘাটে একরাশি কাপড় কাচিতেছে। লক্ষ্মীরও এই রোগ। পুষ্করিণীতে একরাশি সিদ্ধ কাপড় লইয়া কাচিতে বসিবে, তা বর্ষাই বা কি, শীতই বা কি। বারণ মানে না। সেবার তো মরিতে মরিতে সারিয়া উঠিয়াছে। কানাইয়ের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। লক্ষ্মী এখন ভাল আছে ত? দীঘিটা পার হইতেই দক্ষিণ দিক হইতে কে যেন হাঁকিল, "আরে কে ও? কানাই যায় না কি?"

কানাই ফিরিয়া দেখে, ঘরের পাশে গদাই দাস রৌদ্রে বসিয়া পাটের দড়ি পাকাইতেছে। গদাই কহিল, "এই আসা হচ্ছে? [illegible]কাটাও এই সাজলাম—" বলিয়াই হাঁক দিল, "ওরে হারাণি, কল্কেটায় একটুকরা আগুন দিয়ে যা।"

তাম্রকূটের ধূমের অভাবে কানাইয়ের পা দুইখানা ক্রমেই ভারি হইয়া উঠিতেছিল, মনটাও যেন মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বেলাও বেশী নাই, সম্মুখে দেড় ক্রোশ মাঠের শেষে দিলগঞ্জের কালো রেখাটি তাহাকে টানিতেছে চুম্বকের মত। এদিকে-ওদিকে তাকাইয়া সে পরিশেষে গদাইয়ের কাছে গিয়াই পাঁঠ্রি নামাইয়া বসিল। হারাণীও ততক্ষণে একখানি জলন্ত কাঠ আনিয়া কল্কিটার মুখে রাখিয়া একটু চাড় দিয়া খানকয়েক কয়লা ভাঙিয়া দিয়া গেল।

কানাই কহিল, "বনমালীর খবর কি খুড়ো?"

"খবর আর কি? গত সনে সে ত মারা গেছে। বিষয়-আশয় ত সবই বেঁচে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—"

"খুড়ো, এ ধর্ম্মের মার। মাথার উপর এখনও ভগবান আছেন। শোয়াশো টাকার জন্তে আমার অমন সোনাফলা খামারখানা নীলেমে তুললে। সেখানা থাকলে আজ আমি চাকরিতে বার হই? তার সেই ছেলেটা?—"

"ছোঁড়াটার কথা আর ব'ল না—ভারি বদ্। আমাদের ঐ উত্তর দিকে রাধাকান্তর বাড়ি থাকত। একদিন কি যেন নষ্টামি করেছিল। রেখো তাই মারধোর করে। ছোঁড়াটা সেই থেকে পালিয়ে যায়—এ সব তুমি যাবার পরই হয়েছিল। শুনছি না কি সে তোমাদের গাঁয়েই কোথায় আছে। তুমি ত বছর পরে বাড়ি আসছ?'

কানাই মাথা নাড়িয়া কহিল, "হাঁ।"

"উত্তর অঞ্চলের হাল-চাল কি রকম?"

"এই রকমই। আমাদের মত গরীব-দুঃখীদের বড় কষ্ট।" তারপর কল্কিটায় একটা শুকটান দিয়া গদাইয়ের হাতে তুলিয়া দিতে দিতে কহিল, "যাই খুড়ো। একদিন যেও —আমি সাত দিন থাকব—"

গদাই একবার কানাইয়ের নীল পিরাণটার দিকে, একবার মাথার উপর ভারকার পাঁঠ্রিটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইল। কানাই তাহার কাছ হইতে উঠিয়া চলিতে লাগিল সোজা।

সম্মুখেই গ্রাম দেখা যাইতেছে। চলিতে চলিতে ক্রমে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু স্পষ্টতর হইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যার ছায়ায় মিশিয়া মিলাইয়া গেল। ফুটিয়া রহিল কেবল গ্রামের দু-একটি আলো।

২

অন্ধকারের গায়ে গায়ে খদ্যোতের দল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একখানি বাড়ির আঙিনার মাঝখানে আগুন দেখা গেল। গৃহস্থের ছেলে-মেয়েগুলি তাহার চারিধার ঘিরিয়া কলরোল তুলিয়াছে। গোয়াল হইতে সাঁজালের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগিতেছে। কানাই পুষ্করিণীর তীর দিয়া চলিতে চলিতে জলে ছলাৎ করিয়া শব্দ হইল। সে জলের দিকে তাকাইয়া দেখে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে তারার ছায়া দুলিতেছে যেন নানা রঙের উজ্জ্বল ফুলের রাশি। সম্মুখের ঘরখানির পরেই তাহার ঘর। পার হইতে হইতে হাঁক দিল, "সৈরভি! ও ছুরো!"

বহুদিনের পরিচিত কণ্ঠ। "সৈরভী" গোয়াল হইতে হাম্বা রবে সাড়া দিল।

লক্ষ্মী তখন আঙিনার এক প্রান্তে প্রদীপ রাখিয়া মাথা কুটিতেছে, প্রবাসী কানাইয়ের জন্য, "ঠাকুর ভালে ভাল রেখো।" কিন্তু কানাইয়ের স্বরটা কানে লাগিতেই প্রার্থনার মাঝে চম্‌কাইয়া উঠিল। কানাই আবার ডাকিল, "সৈরভি!" না ভুল নয়। সত্যই কানাই আসিয়াছে। কিন্তু এমন হঠাৎ যে? গোয়ালের সম্মুখ দিয়াই ভিতর-বাহিরের পথ। লক্ষ্মী ছুটিয়া গিয়া ঘরের বারান্দা হইতে কেরোসিনের ডিপীটা হাতে করিয়া গোয়ালের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথার ঘোমটাটি একটু দীর্ঘ। তাহার ফাঁকে সুন্দর মুখখানির নিম্নভাগ ও স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল চোখদু'টির আধখানা দেখা যাইতেছে। সৈরভীও ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল; আলোয় তাহার চোখ দু'টি চক্ চক্ করিতে লাগিল।

দুয়িয়াজনে পা দিয়াই কানাই দেখে সম্মুখে আলো হাতে লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া। লক্ষ্মী কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া হাতের আলোটি আঙিনায় রাখিয়া গলবস্ত্রে কানাইয়ের পায়ের [illegible] লইতে গেলে কানাই একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "কি যে কর। চল, ঘরে চল—"

লক্ষ্মীর হাতখানি তবুও তাহার পা-দু'টি স্পর্শ করিয়া মাথায় উঠিল। তারপর হাত দু'খানি বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "দাও, বোঝাটা আমার হাতে।"

"এত ভারী তুমি টান্‌তে পার্‌বে না—কেমন আছ লক্ষ্মি?"

"ভালই। তুমি কেমন আছ?"

"ভাল।"

"হঠাৎ এলে যে—?"

"ছুটি পেলাম।"

আলো হাতে লক্ষ্মী আগে আগে চলিল। গোয়ালে "সৈরভী" ছট্‌ফট্ করিতেছে। কানাই হাসিতে হাসিতে কহিল, "আস্‌ছি রে, আস্‌ছি।"

ভিতরে গিয়া ঘরের বারান্দায় উঠিতে উঠিতে লক্ষ্মী ডাকিল, "ওরে ধনা, ধনু—"

রাখালের নব নামকরণে কানাই কৌতুক অনুভব করিল। কহিল, "মধো আবার ধনু হ'ল কবে থেকে?"

লক্ষ্মী কানাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিল না; কহিল, "কই রে? এলি?"

ধনা ঘরের বাহির হইয়া আসিল। কৃশ ছেলেটি, ফর্সা রং, বৎসর আটেক বয়স। মুখখানি অতি ম্লান। কানাই তাহার দিকে তাকাইয়া অবাক্। ধনাও তাহাকে দেখিয়া দরজার কাছটিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

মাদুরখানা বারান্দায় বিছাইতে বিছাইতে লক্ষ্মী কহিল, "হাঁদা ছেলে, দোর ধরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মেসোর পায়ের ধূলো নাও—"

কানাইয়ের বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল। মেসো? লক্ষ্মীর কোনো ভগ্নী ছিল বলিয়া ত এতদিন তাহার জানা ছিল না। তবুও ভাবিল, হয়ত লক্ষ্মীর কোন দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নীর ছেলে; মাদুরের উপর বসিতে বসিতে ধনাকে অভয় দিয়া ডাকিল, "আয় এদিকে। শোন্, তোর নাম কি রে?"

ধনা এক পা, এক পা করিয়া সরিয়া আসিয়া কানাইয়ের পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। কানাই কহিল, "এ তোমার কোন্ বোনের ছেলে গো?"

"ওর কাছেই জিজ্ঞেস কর, কার ছেলে ও—"

"কি রে ধন্, তোর বাপের নাম কি ?"

"বনমালী বিশাল।"

"কোন্ বনমালী ? বাড়ি কোথায় ?" কানাই ধনার মুখের দিকে তাকাইল !

"চণ্ডীপুর।"

কথাটা শুনিয়াই কানাইয়ের মুখখানা কঠিন হইয়া চোখ দুটি হিংস্রতায় জ্বলিয়া উঠিল। ধনা সে মুখের দিকে তাকাইয়া আড়ষ্ট। লক্ষ্মী তখন কানাইয়ের জন্ত ঝারিতে জল ভরিতে আঙিনায় নামিয়াছে। কানাই তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "এটা এ বাড়িতে কেন ? বনমালী আমার কি সর্ব্বনাশটা করেছে জান না ?"

জলভরা ঝারিটা কানাইয়ের পাশে রাখিতে রাখিতে লক্ষ্মী কহিল, "সবই জানি। আগে হাত-মুখ ধুয়ে মুখে কিছু দাও। ঠাণ্ডা হয়ে সব শুনো'খন।

কানাই ফিরিয়া দেখে ধনা নাই। কোন্ ফাঁকে উঠিয়া গিয়াছে। কোথায় গেল জানিতে ইচ্ছা হইল না। কানাইয়ের হাতমুখ ধোয়া শেষ হইলে পাকশালা হইতে লক্ষ্মী একটি মাজা কাঁসার বাটিতে চারটি নাড়ু ও একটি ছোট ঘটিতে জল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

আহার শেষে লক্ষ্মী কানাইয়ের হাতে দুটি পান আনিয়া দিলে সে পাঁঠ্রি খুলিয়া নিজেই তাম্রকূটের ব্যবস্থা করিতে করিতে কহিল, "এইখানে বস লক্ষ্মি।"

"বস্ব কি এখন ? রান্নার জোগাড় আগে করি।"

"সে হবে'খন" বলিয়া "লক্ষ্মীর একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া পাশে বসাইল। তারপর কহিল, "সাতদিনের ছুটি দেখ্তে দেখতে কেটে যাবে—"

লক্ষ্মী বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলিল।

কানাই কহিল, "বড় একলা ঠেকে, না লক্ষ্মি ?"

উত্তরে লক্ষ্মী একটু হাসিল মাত্র।

"ঐ দেখ, আমি ভুলেই গেছি। পাঁঠ্রি থেকে সব বার কর।"

মুখে উৎকণ্ঠার আবরণ টানিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল "কি আছে ওতে ?"

চোখ টিপিয়া কানাই কহিল, "দেখই", কণ্ঠটাও রহস্যভরা।

লক্ষ্মী পাঁঠ্রি হইতে বাহির করিতে লাগিল,—নূতন দু-জোড়া শাড়ী, লাল টক্টকে চওড়া পাড় যেন রক্তের ধারা ; একখানি ঘন নীল রঙের আলোয়ান, ধারে ধারে সাদা ফুল, লতা, পাতা ; একখানি কালো রঙের মোটা চিরুণী ; একশিশি আল্তা, আধসেরটাক চুন, সুপারী, খয়ের, পানের আরও নানা রকম মশলা ও ছোট একখানি আয়না। এগুলির নীচে ছিল কম্বল, একজোড়া খড়ম, কানাইয়ের ব্যবহৃত কাপড়, জামা প্রভৃতি। আলোয়ানখানার ভাঁজ খুলিতে খুলিতে লক্ষ্মী কহিল, "ভালই হয়েছে। ছোঁড়াটা শীতে কষ্ট পায়।"

"ও কি আমার বাড়িতেই থাকে ?"

"কোথায় আর যাবে ?"

"খবরদার বল্ছি, এ বাড়িতে ওর জায়গা নেই ! আমার মাণিক যখন রোগে ভুগ্‌ছে, ওর বাপ তখন জমিখানা নীলেম করে নিলে। তারই ছেলেকে—" বলিতে বলিতে লক্ষ্মীর হাত হইতে আলোয়ানখানা টানিয়া লইয়া গায়ে জড়াইয়া দিল। নীল আলোয়ানের উপর লক্ষ্মীর সুন্দর মুখখানি ফুটিয়া রহিল যেন একটি পদ্ম।

লক্ষ্মী তখন আপত্তি করিল না ; কানাইয়ের পাশ ঘেঁষিয়া বসিয়া কহিল, "সেই ও বছর তুমি যাবার পরই একদিন রাতে কি ঝড়-জল। সারারাত ঘুমোতে পারি না। গোয়ালে সৈরভী ছট্‌ফট্ করছে। মনে হ'ল, ঘরের দাওয়ায় কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে। একবার ভাবলাম, দরজা খুলে দেখি ; কিন্তু ভয়ে পার্লাম না। রাখাল ছোঁড়াটাও জরের জন্তে আস্তে পারে নি। ভোরের দিকে ঝড়-জল থাম্‌লে বেরিয়ে দেখি, বারান্দার এক কোণে ছোঁড়াটা কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। সারারাতের জলের ঝাপ্‌টায় সব ভিজে, চোখ দু'টো লাল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, কথা কইতে পারে না। কে জানে কার বাছা। মনে হ'ল, আমার মাণিক থাক্‌লে আজ এত বড়ই হ'ত। গায়ে হাত দিয়ে দেখি, আগুন। কোলে ক'রে ঘরে শুইয়ে দিলাম। সাতদিন পরে জ্বরটা ছাড়্‌ল, চোখ মেলে তাকাল। আমার বড় ভালবাসে। আহা !

ওর মা নেই, বাপও নেই। সংসারে আর তবে থাক্‌ত কে বলত? তাই ভাবি আমার মাণিকের বদলে ঠাকুর ওকেই আমার কোলে ফেলে দিলেন।" লক্ষ্মীর চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল।

একখানি শস্য-শূন্য ক্ষেতের ওধারে জলা; তাহার ধারে গোটা দুই নিমগাছের তলায় শ্মশান। অন্ধকার রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ঘরের চালে পেচক ডাকিয়া উঠিল। কানাই দূরে শ্মশানের পানে তাকাইয়া অন্তরে অন্তরে ডাকিতে লাগিল, "আমার মাণিক, মাণিক রে—"

কিন্তু রাত্রে ধনা আর আসিল কি না এবং কখন আহার করিল, তাহা সে জানিতে চাহিল না। কেবল লক্ষ্মীর মুখে শুনিল, ঘোষেদের ঘরে তাহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভোরে উঠিয়াই কানাই দেখে, লক্ষ্মী আঙিনায় জল ছিটাইতেছে। শীতের হাওয়ায় তাহার হাত দুটি ও মুখখানি নীল। গায়ে আঁচলখানি মাত্র জড়ানো। কহিল, "লক্ষ্মি, আলোয়ানখানা তোলা রইল আর এই ঠাণ্ডায়—"

লক্ষ্মী কহিল, "ঠাণ্ডা কোথায়?" কানাই কিন্তু ঘর হইতে আলোয়ানখানি আনিয়া তাহার গায়ে জড়াইয়া দিল। তারপর গোয়ালে গিয়া সৈরভীকে আদর করিল এবং মাঠে রৌদ্র নামিলে গ্রামের পথে বাহির হইল।

গ্রামের চারিধারে ঝোপ-ঝাড়, বেত বন। পূর্ব্বেও পশ্চিমে খান দুই বাগান, গোটাকয়েক নারিকেল ও খেজুর গাছ, বাঁশ বন। উত্তরে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। ইহাদেরই মাঝে মাঝে গৃহস্থের ঘরবাড়ি ও পথ। গ্রামের পরেই বিশাল ক্ষেত, প্রান্তর, জলা। পথের ধারে একটা গাব গাছের ডালে বসিয়া একটি "বসন্ত বউরী" কেবলই করিতেছে "টিউ, টিউ, টিউ—"; ঝোপের নীচে একদল ছাতারে নিজেদের মধ্যে বিষম গোলমাল বাধাইয়া জুড়িয়াছে' আর বাগানের শেষ দিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে "চোখ্ গেল, চোখ্ গেল হায়।" বাতাসে ক্ষীণ পুষ্প গন্ধ। কানাইয়ের ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু সম্মুখে গ্রামের গোষ্ঠতার দর্শন পাইয়া, চিন্তাধারা সহসা অন্যপথে মোড় ঘুরিল।

বেলা তখন অনেক। ফিরিয়া আসিয়া কানাই দেখে পাকশালার বারান্দায় উচ্ছিষ্ট সমেত একখানি কাঁসি;—ধনাই আহার শেষ করিয়াছে। লক্ষ্মী তখনও পাকশালায় কি কাজে যেন ব্যস্ত। বাসন নাড়া-চাড়ার শব্দ আসিতেছে। কানাই তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে শয়নঘরে গিয়াই তাহার চোখ পড়িল শয্যার উপর। দেখে শয্যার এক প্রান্তে নূতন আয়নাখানি পড়িয়া; পাশে তাহার চিরুণীখানি। আয়নাখানি ভাঙিয়া চৌচির; চিরুণীরও দুটি দাঁত ভাঙা। সেদুটি হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মি, এ দুটো ভাঙ্‌ল কি ক'রে?"

লক্ষ্মী তখন সৈরভীকে ফেন দিতে যাইতেছিল। প্রথমে কানাইয়ের কথার কোন উত্তর দিল না।

কানাই আবার জিজ্ঞাসা করিল। লক্ষ্মী কহিল, "কি হবে ও আয়না চিরুণীতে? সেই দু'টোই আছে ত?"

"বাল ভাঙল কি ক'রে?"

"হাত ফস্কে চৌকাঠের ওপর পড়ে।"

ব্যাপারটা পূর্ব্ব হইতে বুঝিলেও কানাই কহিল, "কার হাত থেকে?" বলিতে বলিতে সে সৈরভীকে জাব-দেওয়া মাটির নাদাটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নাদাটাও ফাটিয়া দু' আধখানা। জিজ্ঞাসা করিল, "এটা ফাট্‌ল কি ক'রে?"

"কি ক'রে আবার!"

"কোথায় গেল সে হতভাগা?"

বলিয়া কানাই সরোষে পথের দিকে যাইতেই লক্ষ্মী তাহার পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ছেলেমানুষে এমন করেই, আজ তোমার ছেলেটা এসব কর্‌লে কি কর্‌তে শুনি?"

"সে জানিনে। ও আমার ছেলে নয়। ওর বাপ—"

বলিতে বলিতে লক্ষ্মীর মুখের পানে তাকাইয়াই কানাই সহসা চুপ করিয়া গেল। কিন্তু ধনার প্রতি মনের মাঝে কেমন একটা বিদ্বেষ জমিয়া ভার হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী তাহাকে আড়াল করে, ভালবাসে, তাহার মনের একটী ধার জুড়িয়া ধনা বিরাজ করিতেছে। ইহা কানাই কিছুতেই যেন সহ্য করিতে পারে না। অথচ তাহার প্রতি লক্ষ্মীর মনোযোগের একটুকু ত্রুটি নাই। এই সত্যটী দিব-

নাথিকে এই নারীটি পরিপূর্ণরূপে অন্তরপুটে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে ব্যাকুল।

ইহার পর কয়দিন ধনারও দর্শন পাওয়া গেল না। কোন্ ফাঁকে বাড়ি আসে আহার সারিয়া চলিয়া যায়, কানাই জানিতেও পারে না।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যার পরে বারান্দায় বসিয়া কানাই তাম্রকূট সেবন করিতেছে, লক্ষ্মী পাকশালায় ব্যস্ত। ধনা ঘোষেদেরই ঘরে হয়ত ছিল। কানাইয়ের নজর পড়িল ভিতরে বাঁশের আল্‌নাটায়। দেখিল, লক্ষ্মীর আলোয়ান খানি সেখানে ঝুলিতেছে। কিন্তু তাহার একটি পাশ যেন দগ্ধ! সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া, আলোয়ানখানি টানিয়া হাতে লইয়া দেখে, প্রায় হাতখানেক অংশ পুড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীরই অসাবধানতায় হয়ত তাহা হইয়া থাকিবে ভাবিয়া সেখানি হাতে লইয়া সে পাকশালায় গিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ধনা অন্ধকারে চোরের মত চুপে চুপে লক্ষ্মীর পিছনে গিয়া চাপা গলায় ডাকিল, "মাসি—?"

লক্ষ্মী ঘাড় ফিরাইয়া ধনাকে দেখিয়াই হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তুই কি কনে বউ?"

ধনা হাসিয়া তাহার পাশে বসিতেই কানাই সেখানে উপস্থিত হইল। এবং কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া ধনার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাইয়া লক্ষ্মীকেই জিজ্ঞাসা করিল, "এখানা পোড়ালে কে লক্ষ্মি?"

কিন্তু লক্ষ্মী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ধনা সত্বরে কহিল, "আমি।"

কানাই খপ্ করিয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। তারপর তাহাকে শূন্যে তুলিয়া কহিল, "চল্, আজ সব শোধ তুলব।" তাহার গলার স্বর বিকৃত; মুখে কাঠিন্য, চোখে জ্বালা। দেখিয়া লক্ষ্মীরও বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। তথাপি সেখান হইতে সে উঠিতে পারিল না।

ধনাকে আঙিনার মাঝে ফেলিয়া কানাই ছুটিয়া গিয়া ঘরের বেড়া হইতে শঙ্খমাছের চাবুকখানি টানিয়া লইয়া নামিয়া আসিল। চাবুকখানি এক গার্ড সাহেব বোঁকের মাথায় তাহাকে বখশিস্ দিয়া যায়। তারপর ধনার হাতে, পায়ে, পৃষ্ঠে নির্দ্দয়ভাবে সেখানি চালাইতে লাগিল। প্রহারের জ্বালায় ধনা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা গো, বাবা গো।"

কানাইও সগর্জ্জনে চীৎকার করিতে লাগিল, "বেরো আমার বাড়ি থেকে।" চাবুকটা ধনার দেহের স্থানে স্থানে কাটিয়া বসিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিতে লাগিল।

লক্ষ্মী আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া আসিয়া ধনাকে দু-হাতে বুকে জড়াইয়া সরাইয়া লইল। গোলমালে আশপাশের অনেকেই ততক্ষণে আসিয়া উপস্থিত। কানাইয়ের দুই চারিটি কথা হইতে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া ঘোষগিন্নী কহিল, "বউকে আমি সেইকালেই মানা করেছি। পেটের নয়, যেটের নয় তবে ওর জন্যে এত কেন? এ দৌরাত্ম্য কে সহ্য করে বাপু? ছোঁড়াটা বছর পরে বাড়ি এল; কোথায় একটু আমোদ-আহ্লাদে থাকবে তা নয়, মাঝখানে এক ধনা জুটেছিস। পরের ছাপা নিস্ নে, এই বেলা বিদায় ক'রে দে,—বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া গেল, আর যাহারা আসিয়াছিল তাহারাও দাঁড়াইল না।

সে রাত্রে কাহারও মুখে অন্ন রুচিল না, লক্ষ্মী ধনাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া শুইয়া রহিল।

পরদিন ব্যথার টাড়সে ধনার জ্বর দেখা দিল। পর পর দু'টি দিন তাহা ছাড়িল না। লক্ষ্মীর মুখে উদ্বেগের ছায়া; কানাইও কিছুতে স্ফূর্তি পায় না। তাহার ও লক্ষ্মীর মাঝখানে একটি কিসের যেন কালো ছায়া নামিয়া পড়িল।

৩

যাইবার দিন সকালে ধনার জ্বর নাই; কানাইয়ের মন অপেক্ষাকৃত হাল্কা, লক্ষ্মীর মুখেও হাসি ফুটিয়াছে।

শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া কানাই দেখে, লক্ষ্মী কাজের পাকে আঙিনায় ঘোরা-ফেরা করিতেছে। ধনা বারান্দার এক কোণে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়া বসিয়া। তাহার গায়ে নিজেরই কাপড়ের একটি প্রান্ত জড়ানো— মুখ শুষ্ক; চোখ দুটি নিষ্প্রভ। কানাইকে দেখিয়া তাহার মুখখানি আরও শুষ্ক হইয়া গেল। সে সত্বরে উঠিবার উপক্রম করিতেই কানাই কহিল, "বোস, বোস। ভয় কিসের?" তারপর নিজের গা হইতে গায়ের কাপড়খানি খুলিয়া তাহার গায়ে বেশটি ঢাকিয়া দিল।

আঙিনার মাঝে দাঁড়াইয়া এই বৃদ্ধে লক্ষ্মী স্মিতমুখে কহিল, "তুমি এমনি মাথাপাগ্‌লা!"

"মাথাপাগ্‌লা নয়, লক্ষ্মি। আমার মাণিক থাকলে আজ এত বড়টাই হ'ত।" বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিল।

"তা, ঘর থেকে আমার আলোয়ানখানা এনে গায়ে দাও—"

"আর আমার শীত করছে না," বলিয়া কানাই পুষ্করিণীর পথে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর কানাইয়ের গাড়ী। দ্বিপ্রহরে না বাহির হইলে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া ধরা যায় না। কানাই সকালে পাড়াটা একবার ঘুরিয়া আসিয়া ধনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিল,—রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, হাওয়া-গাড়ী ও সাহেবমেমের। তারপর পাকশালায় লক্ষ্মীর কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল।

পরিশেষে আহারাদি সারিয়া বিশ্রামান্তে দ্বিপ্রহরে যাত্রা করিল। হাতে কাপড়চোপড়ের ছোট একটি পোঁটলা ও "ঠেঙা" গাছটি। আঙিনায় নামিতেই লক্ষ্মী তাহার পায়ের ধূলা লইল; তারপর ধনা।

কানাই লক্ষ্মীর মুখের পানে সতৃষ্ণনয়নে একবার তাকাইল। কহিল, "সাবধানে থেক লক্ষ্মি। সাম্‌নের পুজোতেই আবার আসব।"

লক্ষ্মী কহিল, "তুমি শরীরকে কষ্ট দিও না। এ দুঃখ ঠাকুর কবে যে ঘুচাবেন।" তাহার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

কানাই চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরে অগ্রসর হইল। পিছনে লক্ষ্মী, তাহার পার্শ্বে ধনা। চলিতে চলিতে গোয়ালের পানে তাকাইয়া কানাই কহিল, "নৈরতীটার সঙ্গে দেখা হ'ল না।"

বহিরাঙ্গন ও গ্রামের পথটা যেখানে মিশিয়াছে লক্ষ্মী ধনাকে লইয়া সেখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত। কানাই চলিতে চলিতে ফিরিয়া দেখে, তাহারা দুটিতে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া তাহারই পানে তাকাইয়া আছে। সে পুষ্করিণীর তীরে পৌঁছিতেই ধনা সহসা পিছন ফিরিয়া ঘরের দিকে ছুট দিল। তারপর বেড়ার গা হইতে শঙ্খমাছের চাবুকখানি খুলিয়া লইয়া ছুটিতে ছুটিতে কানাইয়ের পার্শ্বে গিয়া কহিল, "মেসো, এটা ফেলে যাচ্ছ।"

কানাই ধনার হাতে চাবুকখানা দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। । মনে হইল, সহসা তাহার পৃষ্ঠে কে যেন ঐ চাবুক দিয়া নির্মমভাবে আঘাত করিল। অন্তরের ঠিক মধ্যখানে সে আঘাতের গভীর একটা দাগ পড়িয়া গিয়াছে। কি দুর্বিষহ তাহার জ্বালা! সে পোঁটলা ও "ঠেঙা" গাছটি পথের উপর ফেলিয়া ধনার হাত হইতে চাবুকখানা ছিনাইয়া লইয়া পুষ্করিণীর জলে ছুঁড়িয়া ফেলিল। তারপর ধনাকে বুকে তুলিয়া পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "সেদিন বড় লেগেছিল, না রে ধনু?" বলিতে বলিতে তাহার স্বরটা গাঢ় হইয়া চোখ দুটি অশ্রু সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ধনাও তাহার স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া সহসা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্যথিত কণ্ঠে কানাই কহিল, "চুপ কর্, চুপ্ কর্, মাণিক। তোর মাসীকে ছেড়ে আর কোথাও যাস্‌নে—"

তারপর তাহাকে বুক হইতে ধীরে নামাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে আবার চলিতে লাগিল সেই দূরের পথে।

সাহিত্যসৃষ্টি

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

চিত্রকর যখন চিত্রপটে রেখাপাত করেন, তখন চিত্রণীয় বিষয়টি তাঁহার মানসপটে স্পষ্ট হইয়া থাকে। যাহা তাঁহার মানসপটে থাকে তাহাই তিনি চিত্রপটে নানা রেখাপাতে ফুটাইয়া তুলিয়া স্বয়ং দর্শন করেন, এবং অন্যকেও তাহা দর্শন করিবার সুযোগ প্রদান করেন। দর্পণের প্রতিবিম্বে মানুষ যেমন নিজেকেই দর্শন করে, চিত্রকরও সেইরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়া তাঁহার নিজেরই ভিতরের মূর্ত্তিটিকে বাহিরে দর্শন করেন। এবং তাহার আনন্দে নিজেও তিনি মুগ্ধ হন, এবং অন্যকেও মুগ্ধ করেন। চিত্রে অঙ্কনীয় বস্তুটি তাঁহার অন্তঃকরণে স্পষ্ট হইয়া থাকে বলিয়াই তাঁহার চিত্রের প্রত্যেকটি রেখার একটা নিয়ম, একটা শৃঙ্খলা ও অপর রেখার সহিত তাহার একটা সুসামঞ্জস্য থাকে, এবং ইহাতেই ঐ রেখাগুলির সমগ্রতায় একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবের ব্যঞ্জনা হয়, একটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, চিত্রকরের অন্তঃকরণের ভাবটি বহির্ভাগে একটি আকার পরিগ্রহ করে। তাঁহার মানসপটে পূর্ব্বে যদি ঐ ভাব বা মূর্ত্তি না থাকিত তাহা হইলে তাঁহার চিত্রপটের রেখাপাতগুলি কোনো কিছু উপাদেয় বস্তু সৃষ্টি করিতে পারিত না, একটা কি এক কিম্ভূত-কিমাকার হিজি-বিজি হইয়া থাকিত। কবির সম্বন্ধেও এইরূপ। মানস-সরোবরে কোনো এক ভাবলহরীর উদয় হইলে কবি তাহাকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া একটির পর একটি, তারপর আর একটি, এইরূপে শব্দবিন্যাস করিয়া তাহাকে একটা বাহিরের রূপ প্রদান করেন, এবং তাহাই কর্ণবিবরের দ্বারা শ্রোতার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া সেখানেও সেই ভাবলহরীকে অভিব্যক্ত করে। কাব্যের কর্ত্তা ও শ্রোতা উভয়েই তাহাতে পরম আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু পূর্ব্বে যদি কবির হৃদয়ে ভাব না থাকে, তবে তাঁহার কতকগুলি শব্দের বিন্যাস করা হইলেও কাব্য সৃষ্টি হয় না, তাহাতে কোনো রসের উদ্রেক হয় না। অথচ রসস্ফূর্ত্তিরই জন্য কবি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন।

চিত্রকরই হউন, সাহিত্যিকই হউন, অথবা আমাদের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তিই হউন, প্রত্যেকেই স্রষ্টা; কেহ বড় আর কেহ ছোট, এই মাত্র ভেদ। আমরা প্রত্যেকেই, এবং প্রতিদিনই আমাদের কর্ম্মের দ্বারা কিছু-না-কিছু সৃষ্টি করিতেছি, এবং সেই সৃষ্টির মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করিতেছি—ঠিক যেমন সূর্য্য নিজের আলোক দিয়া, প্রকাশ দিয়া, তাপ দিয়া প্রতিদিনই নব নব সৃষ্টির অবতারণা করে, আর তাহারই মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। ঐ সৃষ্টিকে বাদ দিলে সূর্য্য আর সূর্য্য থাকে না। সূর্য্যের অন্য কাজ আর কিছুই নাই, তাহার নিজের মধ্যে যাহা আছে কেবল তাহাই সে বাহিরে প্রকাশ করে। কিন্তু তাহার ক্রিয়া হয় সমগ্র জগতে, তা কোথাও ভালই হউক, আর মন্দই হউক, ও কথা স্বতন্ত্র। চিত্রকর, সাহিত্যিক সকলেই এইরূপ নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা, সৃষ্টির দ্বারা নিজের মধ্যে যাহা থাকে তাহাই বাহিরে আনয়ন করেন, অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করেন; এবং ইহার ক্রিয়া হয় তাঁহার মধ্যে যিনি ঐ চিত্র, বা সাহিত্য আলোচনা করেন।

সৃষ্টি দ্বিবিধ, দৈবী ও আসুরী। যেমন কোন্ ঔষধটি ভাল আর কোন্ ঔষধটি মন্দ ইহা ঐ ঔষধের রোগীর প্রতি গুণাগুণ বা ফলাফল দেখিয়া স্থির করা হয়; সেইরূপ সৃষ্টির সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ তাহাদের ঐ সৃষ্টিতে শুভাশুভ ভাল-মন্দ কিরূপ কি হয় না-হয়, তাহা বিচার করিয়া তাহাকে দৈবী বা আসুরী বলা হয়। বলাই বাহুল্য, যে সৃষ্টি সম্পদের জন্য, শান্তির জন্য, তাহা দৈবী; অপর পক্ষে, যাহা বিপদের জন্য, অশান্তির জন্য তাহা আসুরী; অন্য কথায়, দৈবী সৃষ্টি আমাদিগকে পরমানন্দময় মুক্তির দিকে, আর আসুরী সৃষ্টি পরম দুঃখময় বন্ধের দিকে লইয়া চলে। আসুরী সৃষ্টি অতিসহজেই হইতে পারে, পলকে তাহা প্রলয়ও আনিতে পারে; কিন্তু দৈবী সৃষ্টির পশ্চাতে বহু তপস্যার প্রয়োজন হয়, বহু ধৈর্য্য, বহু চিন্তা আবশ্যক

হয়। উপনিষদে পুনঃপুনঃ দেখা যাইবে যেখানেই সৃষ্টির কথা, সেইখানেই তাহার পূর্ব্বে তপস্যার কথা। বিনা তপস্যায় সৃষ্টি, অর্থাৎ কল্যাণ সৃষ্টি, একথা উপনিষদে পাওয়া যাইবে না। সেইজন্যই দৈবী সৃষ্টি আসুরী সৃষ্টির মত সহজ নহে।

এই দুই সৃষ্টির অনুসারে স্রষ্টাও দুই প্রকার; প্রেয়কাম ও শ্রেয়কাম। আসুরী সৃষ্টির কর্ত্তা প্রেয়কাম, তিনি তাঁহার সৃষ্টির দ্বারা প্রথমত নিজের, তারপর অন্যের ইন্দ্রিয়-প্রীতিমাত্র চাহেন। তাহার পর কতদূর কি দেখিবার আছে, কি না-আছে, ঐ প্রীতির পরিণাম কি, তিনি তাহা তলাইয়া দেখিতে পারেন না। কিন্তু শ্রেয়কাম স্রষ্টা অন্যরূপ। তিনি নিজের সৃষ্টির দ্বারা নিজের ও অন্যের, সকলেরই শ্রেয়, অর্থাৎ কল্যাণ কামনা করেন; তিনি এমন একটি বস্তুকে পাইতে ইচ্ছা করেন যাহা আশ্রয় করিয়া কেহ বস্তুত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার সত্তাটা থাকে; এবং তিনি জানেন, যদি তাহা হয় তবে যথার্থ প্রীতি বা আনন্দ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে—যদিও সেই প্রীতি বা আনন্দের আকারটা অন্য হয়।

সৃষ্টিশক্তি ঠিক সমান থাকিলেও, দেখা যায়, দুই স্রষ্টার ঠিক একই বস্তুর সৃষ্টিতে বহু ভেদ হইয়া পড়ে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, যদিও উভয় স্রষ্টারই সৃষ্টির বাহ্য অংশ নির্ম্মাণে শক্তি সমান, তথাপি তাহার আন্তর অংশের জ্ঞানে তাঁহারা উভয়ে সমান নহেন। চিত্রের রেখাঙ্কন বা বর্ণবিন্যাস প্রভৃতিতে দুই চিত্রকরই সমান-সমান হইতে পারেন, কিন্তু চিত্রের ভাব ও কল্পনায় উভয়ের মধ্যে বহু ভেদ থাকে। তাই চিত্রণীয় বস্তু এক হইলেও দুই চিত্রকরের দুই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়।

দেখা যায়, যে বস্তু সামাজিকের চক্ষুতে স্বভাবত লজ্জা বা জুগুপ্সার উদ্রেক করে, চিত্রকরের তুলিকার টানে তাহাও তাহার কোথায় উড়িয়া যায়। নারীর নগ্নমূর্ত্তির দিকে তাকাইতে পারা যায় না, কিন্তু গ্রীক ভাস্করগণের নির্ম্মিত এমন অনেক ঐরূপ নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার নগ্নতা নগ্নতা বলিয়াই মনে হয় না। বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের [illegible] আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও সহকর্মী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় বিভিন্ন দেশের এক-একখানি চিত্রের প্রতিলিপি অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একখানি মিশর দেশের। এই চিত্রের ভিতরে বাদ্যযন্ত্র হস্তে তিনটি নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত। মধ্যকার মূর্ত্তিটি একেবারে নগ্ন। কিন্তু ঐ নগ্ন মূর্ত্তিটি নগ্ন বলিয়া মোটেই মনে হয় না; ইহা দেখিয়া বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জার উদ্রেক হয় না। চিত্রকরের কি অদ্ভুত প্রতিভা, কি অদ্ভুত কুশলতা! অপর পক্ষে, কোনো কোনো চিত্রকরের হস্তে যাহা প্রকৃতি-সুন্দর তাহাও নিতান্ত বিকৃত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার কারণ সব সময়ে ইহা নয় যে, এই চিত্রকরেরা কেমন করিয়া তুলি ধরিতে হয়, কেমন করিয়া রং দিতে হয়, ইত্যাদি জানেন না; এ বিষয়ে তাঁহারা খুবই দক্ষ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের ত্রুটি এই যে, তাঁহারা অঙ্কনীয় বস্তুর কেবল দেহই দেখিতে পান, তাদের প্রাণের কোনই সন্ধান করিতে পারেন না।

বলাই বাহুল্য, সাহিত্যের প্রয়োজন আছে, খুবই আছে; ঠিক খাদ্যের মত, খাদ্য না পাইলে আমাদের চলে না। কিন্তু খাদ্য কি? যাহা খাইতে ভাল লাগে তাহাই খাদ্য নহে। কারণ, এমন বহু সুস্বাদু দ্রব্য আছে, যাহা খাইলে উপকার তো হয়ই না, বরং বিশেষ অপকারই হয়। তাহাই খাদ্য, যাহা শরীরের নানা কাজকর্ম্মে ও শ্রমে স্বভাবতই যে ক্ষয় হয় তাহা দূর করিয়া ঐ ক্ষতির পূরণ করে, তাহার পুষ্টিসাধন করে, যদি শরীরের বৃদ্ধির বয়স থাকে, তবে সেই বৃদ্ধিরও সাধন করে, আর তাহা দ্বারা শরীর ও মন উভয়েরই স্বাস্থ্য বিধান করে। এরূপ খাদ্য যে সুস্বাদু হয় না তাহা কে বলিবেন? কিন্তু খাদ্যের ঐ তত্ত্বটি ভুলিয়া গিয়া যিনি কেবল রসনার তৃপ্তিকেই খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়ের উপায় মনে করেন, তাঁহার যে নিতান্ত ভুল করা হয় তাহা না বলিলেও চলে। অনেকগুলি উত্তেজক মশলা প্রচুর পরিমাণে দিলেও রান্না ভাল হয় না, আবার সেরূপ না করিলেও তাহা ভাল হয়। যে পাক করে তাহারই দক্ষতার উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে। এইরূপই দক্ষ চিত্রকর অত্যল্প অত্যাবশ্যক রেখাপাতে যে-চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন, বা সুকবি কতিপয় মাত্র শব্দের যোজনায় যে-কাব্য রচনা করিতে পারেন কুচিত্রকর বা কুকবি বহু রেখাপাতেও বা বহু শব্দবিন্যাসেও সেরূপ

ভিন্ন অন্য করিতে, বা সেইরূপ কাব্য রচনা করিতে পারেন না। সাহিত্যিকের সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ কথা।

সাহিত্যিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই তাহাতে তাঁহার কোনো প্রয়োজন থাকে, না থাকিলে তিনি তাহার সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। দেশ-বিদেশের নানা পণ্ডিতে এই সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্যের নানা প্রয়োজন দেখিয়াছেন। কিন্তু যত প্রয়োজনই থাকুক, আমাদের দেশের সাহিত্যের মর্মজ্ঞেরা বলেন যে, সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে যে পরমানন্দের উদয় হয় তাহাই সমস্ত প্রয়োজনের শ্রেষ্ঠ ("সকল-প্রয়োজনমৌলিভূত")। আমাদেরই দেশের আর একজন সাহিত্যের মর্মবিদ্ 'চিরন্তন'দের অর্থাৎ প্রাচীনদের নাম করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাদের মতে সাহিত্য বা কাব্যের ইহাই প্রয়োজন যে, তাহা রসাস্বাদরূপ নিবিড় আনন্দ প্রদান করে; আর তাহা দ্বারা 'রামের মত চলিতে হয়, রাবণের মত নহে' এইরূপে কর্তব্যে প্রবৃত্তি আর অকর্তব্য হইতে নিবৃত্তির উপদেশ দেয়। বলিয়াছি, ইহা চিরন্তনদের কথা। পুরাতন হইলেই অনেক স্থলে তাহার প্রতি একটা গৌরব-বুদ্ধি হয়, এবং তাহা হইলেই যথাযথরূপে বিচার না করিয়াই তাহাকে ঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু পুরাতন হইলেই ভাল হইবে, আর নূতন হইলেই তাহা খারাপ হইবে; অথবা নূতন হইলেই ভাল হইবে, আর পুরাতন হইলেই খারাপ হইবে,ইহা বলা যায় না। পুরাতনই হউক, আর নূতনই হউক, তাহার গুণাগুণ সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া ভাল-মন্দ স্থির করিতে হয়। পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে, 'চিরন্তনেরা' সাহিত্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে উল্লিখিত যে দুইটি কথা বলিয়াছেন তাহার একটিকেও বর্জন করা যায় না। অর্থোপার্জন আবশ্যক। ইহা না হইলে চলে না। এই অর্থোপার্জন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চুরি, ডাকাতী ইত্যাদি নানা উপায়ে হইতে পারে। সেখানে নিয়ম করা হয়—

"অকৃত্বা পরসন্তাপম্ অগত্বা নীচসঙ্গতিম্।
অনুৎসৃজ্য সতাং বর্ত্ম যৎ স্বল্পমপি তদ্ বহু ॥"

'পরকে পীড়ন না করিয়া, নীচজনের সহিত সংস্পর্শ না করিয়া, ও সজ্জনগণের পথ পরিত্যাগ না করিয়া, যদি অল্পও কিছু পাওয়া যায় সেও তাহাই অনেক।'

আহার করিতে হইবে, না করিলে চলে না। যে-কেহ যে-কোন বস্তু আহার করিতে পারে। সেখানে নিয়ম করা হয়, যাহা দেহের ও মনের, উভয়েরই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে, তাহাই আহার করিবে। আনন্দ পাইতে হইবে, না পাইলে আমরা বাঁচি না। যে-কোন উপায়ে আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে; মন্দ উপায়েও আনন্দ হইতে পারে। সেখানেও নিয়ম করা হয়; না, ঐ জাতীয় উপায়ে নহে, অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই যে নিয়ম ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ঐ যে অর্থোপার্জন, ঐ যে আহার-গ্রহণ, ঐ যে আনন্দানুভব তাহা যাহাতে ঐ ঐ ব্যক্তির নিজের এবং তাহারা যাহাদের সঙ্গে বাস করে তাহাদের সকলেরই যথাসম্ভব কল্যাণের জন্য বা অকল্যাণ নিবৃত্তির জন্য হয় তাহারই ব্যবস্থা করা; কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা মোটেই তাহার উদ্দেশ্য নহে।

আমার যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে আমি আনন্দ অনুভব করিব, আমি নিয়ম কানুন মানিতে যাইব কেন? আমি স্বাধীন।—একথা বলিবার অধিকার কোনো সামাজিক ব্যক্তির নাই, এবং উহাই স্বাধীনতার অভিপ্রেত অর্থও নহে। উহা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। আমার গৃহের আমিই স্বামী, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু এই বলিয়া আমি ঐ গৃহে এমন কিছু করিতে পারি না, যাহা আমার চারিদিকের আর সমস্ত লোকের অনিষ্টের জন্য হয়। আমি আমার নিজেরও ঘরে আগুন লাগাইতে পারি না, কেন-না তাহাতে চারিদিকের আর সমস্ত ঘরের বিপদ্ সম্ভাবনা আছে। আমি মদ্যপান করিতে পারি না, উহাতে আমার অধিকার নাই, কারণ মত্ততায় আমার ব্যক্তিগত অপকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার প্রতিবেশীদের নানাদিকে ও নানারূপে তাহাতে বহু ক্ষতি হয়। ইংলণ্ডের লোক স্বাধীন, তাই বলিয়া কাহাকেও হত্যা করিবার অধিকার তাহারও নাই। আমি নিজে নিজেকেও হত্যা করিতে পারি না। আত্মহত্যার অপরাধে সরকার বাহাদুর আমাকে দণ্ড দিবেন। এই সব অধিকার না থাকাতে যদি স্বাধীনতা না থাকে তো সেই স্বাধীনতা না থাকুক, তাহাতে কাজ নাই। যাহাতে নিজের ও অন্যের কল্যাণ না হয়, বরং অকল্যাণই হয়, সেই স্বাধীনতা যেন

কখনও কাহারও না হয়। যে সাহিত্যের সৃষ্টিতে অন্তত পাঠকবর্গের কল্যাণের ইঙ্গিত না থাকে, বা কল্যাণে প্রবৃত্তি ও অকল্যাণ হইতে নিবৃত্তির ইঙ্গিত না করা হয়, বরং ইহার বিপরীতই হয় তাহার প্রয়োজন কি ?

এক শ্রেণীর ভাবুক ও সাহিত্যিকের উদয় হইয়াছে, তা যেমন বিদেশে তেমনি স্বদেশে। স্বদেশ এ সম্বন্ধে বিদেশকে অনুসরণ করিয়াছে মাত্র। ইহাদের চিন্তা সমাজে বিপ্লব আনয়ন করিতেছে। যাহা পূর্ব্বে ছিল তাহাই এখনও থাকিবে, আর যাহা পূর্ব্বে ছিল না এখনও তাহা হইবে না, এ কথা ঠিক নহে, ইহা হইতে পারে না। যদি কল্যাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহাও এখন করিতে হইবে, এবং আবশ্যক হইলে যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহাও বর্জন করিতে হইবে। কারণ, আমরা আছি এই কালে, এই যুগে ; পূর্ব্ব কালে, পূর্ব্ব যুগে নহে। যতদূর পারি আমরা বাঁচিতে চাই, সুখে বাঁচিতে চাই, মরণ আমরা কেহই চাই না। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে এই সুখে বাঁচিবারই জন্ত সমাজে নানারূপ নিয়ম ও সংযম আবশ্যক হইয়াছে। যদি কখন কোনো নিয়ম-সংযমের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতেছে না দেখা গিয়াছে, তখনই তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নিয়ম-সংযমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবশ্যক হইলে আবার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বরাবরই এইরূপ চলিয়াছে, চলিবে—তা একটু পূর্ব্বে আর পরে, তাহা স্বতন্ত্র কথা। পূর্ব্বে—অতিপূর্ব্বে বর্ত্তমানের ন্যায় বিবাহ-পদ্ধতি ছিল না। নারীরই হউক, বা পুরুষেরই হউক, পরস্পরের সম্বন্ধে একনিষ্ঠতা ছিল না। পরবর্ত্তী সমাজের লোকেরা দেখিলেন, উহার ফল ভাল হয় নাই, তাহাতে বহু অনর্থ হইত, তাই কল্যাণ হইবে ভাবিয়া তাঁহারা নরনারীর সম্মেলনের একটা নিয়ম করিলেন। বিবাহ-বিধির উদ্ভব হইল। এই নিয়মের ফল কল্যাণ হইয়াছে।

কিন্তু বিদেশে এক নূতন উচ্ছৃঙ্খলতার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। তাঁহা অনেকে আবার অপেক্ষা বেশী ও অনেক পাকা হইয়াছেন। ইহা ভাবিলে মনে হয়, পাশ্চাত্ত্য সমাজের একাংশ আবার নিজের আদিম অবস্থার দিকে ফিরিয়াছে বা যাত্রাই আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, যদিও ইহার বাহ্য আকার কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু তা যাহাই হউক, ইহা হাসিবার বা উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে, ইহা আমাদিগকে ধীর ও শান্তভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইয়াছে—বিশেষত যখন ইহা ঐ পশ্চিম দেশ হইতে 'সাত সমুদ্র তের নদী পার' হইয়া আমাদেরও দেশে উপস্থিত হইয়াছে। কেবল যে উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে, এক বা অন্য আকারে তাহার ক্রিয়াও আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহা এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা নিজেকে 'ভদ্র' ও 'সুশিক্ষিত' মনে করেন, এবং সমাজের উচ্চস্তরে বিহরণ করেন।

এই ভাব দেশের মধ্যে প্রধানত দুই প্রকারে উপস্থিত হইয়াছে, দেশের কতকগুলি 'শিক্ষিত' ব্যক্তির পাশ্চাত্ত্য সমাজের সহিত সাক্ষাৎ সংসর্গে, আর তরুণগণের অথবা তরুণোচিতবুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের ঐ ভাবে অনুপ্রাণিত কতকগুলি বৈদেশিক পুস্তকের পাঠে। ইহার প্রচারের অগ্রদূত হইতেছে আমাদের 'তরুণ' সাহিত্য।

তরুণ সাহিত্যিকগণ যদি দেখাইয়া দিতে পারেন যে, তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যের দ্বারা, যাহাদের জন্ত ঐ সাহিত্য অভিপ্রেত তাহাদের কোনো কল্যাণ না হইলেও, অন্তত কোনো অকল্যাণ হইতেছে না, তবে তাঁহাদিগকে ঐ সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত কেহ কিছু বলিতে পারে না। অপর পক্ষে, যদি ইহা দেখাইয়া দিতে পারা যায় যে, উহা দ্বারা অকল্যাণ হইতেছে তবে তাঁহাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

সামাজিক ব্যবস্থাই হউক, আর যে-কোনো কাজই হউক, নিয়ম ও সংযম তাহার মূলে। যদি কেহ না বলিয়া না কহিয়া যখন-তখন যাহার-তাহার জিনিস-পত্র লইয়া যায়, অপর কথায় চুরি করে, তবে তাহাতে স্পষ্টতই নানা দিকে নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। তাই সেখানে নিয়ম করা হয়, 'ও রকম করিবে না,' 'চুরি করিবে না'। কিন্তু উহাও পর্য্যাপ্ত নহে। নিয়ম করিলেও যদি তাহা প্রতিপালিত না হয়, তবে সে নিয়ম করা না-করা উভয়ই সমান।

আই যাহাতে সে নিয়ম-প্রতিপালন করিতে পারা যায় তাহার জন্ত সংযম আবশ্যক, ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দমন করা আবশ্যক, ইহাতে হয় চুরি করিবার ইচ্ছাই হয় না, অথবা হইলেও লোকে তাহা দমন করিয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে। চুরি করিতে হইবে না, তাহা ভাল নহে, একথা চোরও জানে, তবুও সে তাহা করে, কারণ তাহার সংযম নাই। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত হয় না ; কারণ তাহার সংযম নাই, সে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দমন করিতে পারে না। তাহা করিতে না পারায় তাহার মোহ উৎপন্ন হয়, মোহ তাহার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, সে তাহাতে বস্তুতত্ত্ব দেখিতে পায় না, কর্তব্যাকর্তব্য ভুলিয়া যায়। আবার যাহা কর্তব্য তাহাকে অকর্তব্য মনে করে, আর যাহা অকর্তব্য তাহাও কর্তব্য বলিয়া ভাবে ; এবং তাহাই অনুসরণ করিয়া সে নিজে অধঃপতিত হয় এবং অন্যকেও অধঃপতিত করায়।

জগতে রাজায়-রাজায়, রাজায়-প্রজায়, জাতিতে-জাতিতে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এত যে মারা-মারি কাটা-কাটি হানাহানি হইতেছে ; এত যে দুঃখের উপর দুঃখের ভার ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে, ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে তাহারও মূলে এই অসংযম। উদ্দাম ইন্দ্রিয়বৃত্তি অতিপ্রবল বিষয়সুখলালসা মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে। সে তখন নিজের সীমা লঙ্ঘন করে, আর সঙ্গে সঙ্গে গভীর গর্তের মধ্যে পতিত হয়। বিষয়লালসার তৃপ্তি হইবে অথচ কোনো উপদ্রবই হইবে না, শোক দুঃখ আসিবে না, সে ইহার উপায় অন্বেষণ করে, খুবই করে। সে গুলি-গোলা কামান-বন্দুক ইত্যাদি যত রকমের যত কিছু সম্ভব সবই সংগ্রহ করিয়া রাখে। কিন্তু দেখা যায় তাহাতে অভিলষিত ফল হয় না, যে ফল হয় তাহা বিপরীত। তাহার দুঃখ কমে না, বাড়িয়াই যায়। রোগের নিদান না জানিয়া চিকিৎসা করিতে গেলে যাহা হইবার তাহাই হয়। সে জানে না যে, তাহার ঐ রোগের মূল তাহার ভিতরে রহিয়াছে, বাহিরের প্রলেপে তাহার প্রশমন হইবে কেন ? ঐ মূলটি হইতেছে অত্যধিক বিষয়-সুখসম্ভোগের লালসা, যাহার অপর নাম আসক্তি, তৃষ্ণা, কাম।

যতক্ষণ তৃষ্ণা থাকে ততক্ষণ শান্তি পাওয়া যায় না। তাহা যত-যত বাড়ে অশান্তিও তত-তত বাড়িতে থাকে। অতি উপাদেয়, অতি দুর্লভ খাদ্য সামগ্রী আনিলেও তাহা ঐ অবস্থায় মানুষকে রোচে না ; দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা থাকিলেও তাহাতে তাহার ঘুম হয় না, দিবারাত্রি সে ছটফট করিতে থাকে। পরে যখন সে তাহার অভিলষিত বিষয়টি পায় তখন আর তাহাতে তাহার তৃষ্ণা থাকে না, সে সুখী হয়, শান্তি পায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যতক্ষণ তাহার তৃষ্ণা থাকে ততক্ষণ সে সুখ-শান্তি পায় না, কিন্তু যখনই ঐ তৃষ্ণা যায় তখনই তাহা আসে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তৃষ্ণাই দুঃখ ও অশান্তির কারণ, আর তৃষ্ণারই অভাব সুখ ও শান্তির কারণ।

এই তৃষ্ণার অভাব দুই প্রকারে হয়। তৃষ্ণার বিষয় বা বস্তুটি পাইলে, আর মোটেই তৃষ্ণা না জন্মিলে, কাহারও রোগ হইয়া তাহা ভাল হইলে, স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়া আসিলে তাহাকে বেশ ভাল লাগে ; আবার যাহার রোগ হয় নাই এবং এই জন্যই স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, তাহাকেও বেশ ভাল লাগে। উভয়েরই ভাল লাগার মধ্যে ঐ রোগের অভাবটি আছে।

তৃষ্ণার জ্বালা উপস্থিত হইলে সেই সেই অভীষ্ট বস্তুকেই পাইয়া তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা সাধারণত সকলেই করে। কিন্তু অভীষ্ট ফল তাহাতে পাওয়া যায় না। সকলেরই নিকটে ইহা প্রত্যক্ষ, এবং তাহাই বেদের একটি পঙক্তিতে বলা হইয়াছে যে, "কামঃ সমুদ্রমাবিবেশ।" বেদজ্ঞেরা ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, সমুদ্রের যেমন অন্ত নাই, কামেরও তেমনি অন্ত নাই। বিষয়ভোগের দ্বারা তৃষ্ণার নিবৃত্তি বড় দুরাশা। কাহারও কোনো দিন ইহা হয় নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে এ বিষয়ে একটি বড় চমৎকার গল্প আছে। অনবতপ্ত নামে এক খুব বড় রাজা ছিলেন। তিনি স্বর্গে গিয়া কিছু দিন পরে সেখান হইতে ভ্রষ্ট হন। পরে তাঁহার মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন তাঁহার রাজ্যের পৌরজানপদবর্গ ও সামন্ত রাজগণ সেখানে উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে রাজা প্রিয়কর অনবতপ্তের নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ,

লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করিবে যে, মহারাজ অনত্তযশের সুভাষিত কি, তিনি কোন্ ভাল কথা বলিয়া গিয়াছেন? তখন আমরা কি বলিব?' তিনি বলিলেন 'এই কথা বলিতে হইবে—মহারাজ অনত্তযশ চারিটি মহাদ্বীপের রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোনো মনোরথ ব্যর্থ হয় নাই। সমস্ত বিষয় উপভোগ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তৃষ্ণা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। কামোপভোগে অতৃপ্ত থাকিয়াই তিনি মৃত্যু লাভ করিয়াছেন।' ঘৃতধারা দিয়া অগ্নিকে শান্ত করিতে গেলে তাহা শান্ত না হইয়া আরও প্রবল হইয়া উঠে। তেমনি বিষয়ভোগের দ্বারা বিষয়তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করিতে গেলে তাহা নিবৃত্ত না হইয়া বরং আরও বাড়িয়াই চলে। এবং ইহা যতই বাড়ে দুঃখ অশান্তিও ততই বাড়ে।

এই তৃষ্ণা এত অনর্থ করে বলিয়াই ইহাকে রিপু বা শত্রু, মহাশত্রু বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কেবল তাহাই নহে, ইহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুই বলা হয়। মৃত্যুর অপর নাম মার। মৃত্যু ও মার শব্দের কেবল আকারে ভেদ, অর্থে কোনো ভেদ নাই। বুদ্ধদেব যতক্ষণ এই মারকে বিজয় করিতে পারেন নাই। ততক্ষণ তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ হয় নাই। এই মারের সহিত তাঁহাকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তিনি তাহাকে পরাভূত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, এবং ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, সমস্ত দুঃখের মূল ঐ মার। মারকে সংহার করিতেই হইবে। তিনি তাহাতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুদ্ধের এই মার-বিজয় তাঁহার জীবনের বা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব, পরম তত্ত্ব। তাই তাঁহার জীবনচরিতে এই ঘটনাটিকে অতি প্রাধান্য স্থান দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং তাহা খুবই ঠিক করা হইয়াছে।

কঠোপনিষদে সাক্ষাৎ যমের সহিত নচিকেতার সংবাদে এই তত্ত্বটি বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন আকারে বলা হইয়াছে। ভোগেচ্ছার ক্ষয় না হইলে শিবকে পাওয়া যায় না। তাই মদনভস্ম হওয়ার পূর্ব্বে পার্ব্বতীর শিবের [illegible] যোগ হয় নাই। এ কথা কুমারসম্ভবের পাঠকেরা [illegible]। মারকে মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়াই [illegible] মৃত্যুঞ্জয়। [illegible] মারজিৎ একই, তাই বুদ্ধদেবকে যখন মারজিৎ বলা হয় তখন বুঝিতে হয় যে তিনি মৃত্যুঞ্জয়। মদনভস্ম না হইলে যে, মঙ্গল হয় না কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া গিয়াছেন। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা প্রথমে মদনের প্রেরণায় মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কল্যাণের জন্য হয় নাই বরং তাহাতে অকল্যাণই দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পরে যখন উভয়েরই হৃদয় মদনের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, তখন তাঁহাদের শুভসংযোগ দেখা গিয়াছিল।

হৃদয় হইতে তৃষ্ণার ক্ষয় হইলেই মুক্তি, ভারতের সাধনার আগাগোড়া সর্ব্বত্রই পুনঃপুন এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন সমস্ত নদীর একমাত্র সমুদ্রেরই দিকে গতি, তেমনি দেখা যায় ভারতীয় সমস্ত সাধনার গতি একমাত্র এই দিকে—তা সে সাধনা বৈদিকই হউক আর অবৈদিকই হউক। বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিয়াছি তাহারই উল্লেখমাত্র করিলাম।

যাহাই হউক, এই তৃষ্ণার ক্ষয়ের কথা শুনিলেই অধিকাংশ লোকের মনে একটা আতঙ্কের ভাব হয়, মনে হয় তবে তো সবই গেল, কিছু ভোগ করা হইল না, অথচ মন চায় ভোগ করিতে, তবে তো চারিদিকের এই ঘর-বাড়ী, লোক-জন, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, ধন-ধান্য সবই ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া বনের মধ্যে গিয়া বাস করিতে হয়! তাহাতে সুখ কোথায়?

অপর পক্ষে, যাঁহারা তত্ত্ববিদ্, যাঁহারা সাধনা করিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিয়া-শুনিয়া বস্তুতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা বারবার বলিতেছেন, আসক্তচিত্তে বিষয়-সম্ভোগ করিয়া যত রকমের যত সুখই পাওয়া যায়, বা স্বর্গে যত রকম যত সুখ হয়, ঐ উভয় প্রকারই সুখ তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে। গুড়, চিনি, মধু, সন্দেশ সবই মধুর, কিন্তু সবই একরূপ মধুর নহে, প্রত্যেকেরই মাধুর্য্য ভিন্ন-ভিন্ন। এখানে যদি সরস্বতীকেও প্রশ্ন করা যায় যে, ঐ জিনিস-গুলি কেমন মধুর, আর উত্তর দিবার জন্য তাঁহাকে সহস্র বৎসরও সময় দেওয়া হয়, তবে তিনিও পৃথক পৃথক করিয়া বলিয়া দিতে পারিবেন না, তত্ত্ব এইরূপ মধুর,

তিনি এইরূপ মধুর, মধু-সন্দেশ এইরূপ মধুর। জিজ্ঞাসুকে ঐ সব নিজে আস্বাদ করিয়া তাহাদের মাধুর্য্যের প্রকার বা তারতম্য বুঝিতে হয়। তৃষ্ণাক্ষয়ের সুখ সম্বন্ধেও সেই কথা। নিজের অনুভব ভিন্ন ইহা সম্যক্‌রূপে জানা যায় না। তবে যুক্তির দ্বারা ইহার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারা যায়, একটা পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। আর কতকটা ঐরূপ জ্ঞান হইতে পারে যাঁহারা তাহা অনুভব করিয়াছেন বা অনেকটা তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া-শুনিয়া। জগতের সৌভাগ্য, ভারতবর্ষের অতি সৌভাগ্য আর আমাদের আরও অতিমহৎ পরমমহৎ সৌভাগ্য যে, এমন এক ব্যক্তি আমাদের এই জীবদ্দশায় এ দেশে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়াও বলিতে পারেন "I am the richest man in the world!" তিনি নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ সমস্ত অবস্থার মধ্যে পতিত হইলেও নির্ব্বিকার ও স্থির থাকিয়া বলিতে পারেন "I am not capable of being unhappy."

তৃষ্ণাক্ষয়ের কথা শুনিয়া ভয় পাইবার কারণ নাই। যাহারা ভয় পায় তাহারা "অভয়ে ভয়দর্শিনঃ"—অর্থাৎ যেখানে বস্তুত ভয় নাই সেখানে ভয় দেখে। তৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য যে বিষয়ভোগ ছাড়িয়া দিতে হইবে বা সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইতেই হইবে তাহা নহে। বিষয়ভোগ একেবারে ছাড়িয়া দিলে যে জীবনই থাকে না। আর সন্ন্যাসী হইয়া বনে যাওয়া? কারণান্তরে কেহ ইহা করিতেও পারেন। তাহা না হইলে তৃষ্ণাক্ষয় হয় না, ইহাও নহে। গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম, এ কথা আমাদের দেশের ভাবুকেরা এক বাক্যে দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং ইহাই যে ঠিক, যুক্তি তাহা প্রতিপাদন করিতে পারে যাঁহারা গৃহস্থ হইবার অযোগ্য তা যে কোনো কারণেই হউক, তাঁহারা গৃহস্থ না হইয়া একবারে সন্ন্যাসী হন। বীর না হইলে কেহ যথার্থ গৃহস্থ হইতে পারে না। দুর্বলের আশ্রয় সন্ন্যাস। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। কি উপদেশ দিয়াছেন? যুদ্ধ করিতে। অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। অর্জুন শেষে বলিয়াছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ, আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, সব বুঝিয়াছি, তোমার কথা আমি পালন করিব'—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা করিষ্যে বচনং তব।"

কি ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, যুদ্ধ হিংসাশ্রিত হইলেও কিরূপে তাহাতে পাপ হইবে না, শ্রীকৃষ্ণ ইহাও ভাবত করিয়া অর্জুনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার সার কথাটি এই যে, আসক্তিকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। আসক্তি-ত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, এ সবই এক, কেবল শব্দের ভেদ। অর্জুন ছিলেন গৃহস্থ, যুদ্ধ পর্য্যন্ত তিনি করিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বনে গমন করেন নাই—যদিও আসক্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদের যদি কোন ঐতিহাসিকতা না থাকে, না-ই থাকুক, উহা বেদব্যাসের লেখা হউক বা না-ই হউক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে বলা হইয়াছিল, বা না-ই হইয়াছিল, কিন্তু ঐ একটা সংবাদ যে আছে, ইহা না মানিয়া উপায় নাই। ইচ্ছা হয়, শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন শব্দ দুইটি বাদ দিয়া দুইটি অপর কোনো শব্দ সেখানে যোগ করা হউক। উহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এই সংবাদ হইতে যে ভাবটি পাওয়া যাইতেছে, তাহারই সহিত আমাদের সম্বন্ধ। এই ভাবকে জীবনে মোটেই পালন করা যায় না, অন্তত ইহার সহ নিকটেও যাওয়া যায় না, ইহা কি করিয়া বলিব, যখন ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ ঐ কৌপীনধারীকে দেখিতেছি, আর বলিতেও শুনিতেছি 'আমি ঊনচল্লিশ বৎসর যাবৎ গীতার উপদেশকে নিজের জীবনে পালন করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেছি।'

বিষয় ভোগ করিতে হইবে না ইহা কখনও নহে; ভাল করিয়াই ভোগ করিতে হইবে, এবং আসক্তি ত্যাগ করিলেই তাহা ভাল করিয়াই করিতে পারা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির ইহা একটি বিশেষ কথা। কালিদাস রঘুবংশে একটি খুবই সুন্দর পঙ্‌ক্তিতে নিজের পাঠকগণের সম্মুখে ইহা ধরিয়া দিয়াছেন—

"অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ"

অর্থাৎ তিনি (রাজা দিলীপ) অনাসক্ত হইয়া সুখভোগ করিয়াছিলেন।

যে সরাগ অর্থাৎ যাহার রাগ অর্থাৎ তৃষ্ণা, আসক্তি আছে, ও যে বীতরাগ অর্থাৎ যাহার রাগ নাই, উভয়েই যদি বিষয় ভোগ করে তবে তাহাদের মধ্যে ভেদ কি? রাজা মিলিন্দের মনেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এই সম্বন্ধে ভিক্ষু নাগসেনের সহিত তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা এইরূপ :—

রাজা বলিলেন—'ভগবন্ নাগসেন সরাগ ও বীতরাগের ভেদ কিসে?'

'মহারাজ, একজন আসক্ত, আর একজন অনাসক্ত।'

'ভগবন্ নাগসেন, আসক্ত ও অনাসক্ত ইহার মানে কি?'

'মহারাজ, একজন অর্থী আর একজন অর্থী নহে।'

'ভগবন্ নাগসেন, আমি তো এইরূপ দেখিতে পাই যে সরাগ ও যে বীতরাগ উভয়েই উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য ইচ্ছা করে নিকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য ইচ্ছা করে না।'

'মহারাজ, যে সরাগ সে ভোজ্য বস্তুর স্বাদ, আর ঐ স্বাদে একটা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়া ভোজ্য বস্তু ভোজন করে, কিন্তু যে বীতরাগ সে ভোজ্যবস্তুর স্বাদমাত্র অনুভব করিয়া তাহা ভোজন করে সে ঐ স্বাদে কোনো আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে না।'

আসক্তিই যখন দুঃখের, অশান্তির, অকল্যাণের মূল, আর আসক্তির ত্যাগই সুখ-শান্তি-কল্যাণের মূল, তখন কোন্ পথ দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে তাহা স্থির করা মোটেই শক্ত নহে। তখন সাহিত্যিক নিজের সাহিত্য-সঙ্গীতকে কোন্ সুরে বাঁধিবেন তাহাও জানা কঠিন নহে। পাঠকের চিত্তে যাহাতে আসক্তির তরঙ্গ উত্তরোত্তর অধিক অধিকতর ভাবে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে তিনি তাহাই করিবেন, অথবা পাঠকের চিত্তে পূর্ব্বে আসক্তি থাকিলেও যাহাতে তাহা ক্রমশ কম হইয়া তিরোহিত হইয়া যায় তাহাই তিনি করিবেন? সেই চিরন্তনের কথা মনে করিয়া প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কি নিজের সাহিত্য-রচনার দ্বারা পাঠকগণকে এমন ইঙ্গিত প্রদান করিবেন যে, সীতার প্রতি রাবণের যে ভাব ছিল তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে, অথবা তাঁহার রচনার ইঙ্গিত এরূপ হইবে যে, সেই ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে?

একটি শ্লোক বলিতে চাই। আজকালকার ইস্কুলের ছেলেদের অনেকে ইহা জানে। শ্লোকটি পুরাতন, কিন্তু তা বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা নষ্ট হয় নাই। সূর্য্য কত [illegible] বলা যায় না, তবুও ইহা এখনও অকেজো হয় নাই ([illegible] বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের ভয় দেখাইয়াছেন যে [illegible] নাকি তাহাও হইবে)। শ্লোকটি এই :—

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

'ইন্দ্রিয়ের অসংযম বিপদের পথ, আর ইন্দ্রিয়ের জয় সম্পদের পথ যে পথে ইচ্ছা হয় সেই পথেই চল।'

কাহারও ভাল করিতে পারা গেলে তাহা খুবই ভাল, পরম সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু তাহা যদি সম্ভব না-ই হয়, অন্তত এইটুকু দেখা দরকার যে, কাহারো মন্দ না হয়। এক একটি কার্য্যের ফল এত বিস্তৃত যে, অনেক সময়ে, অনেকের পক্ষে তাহা ভাবিয়া দেখা সম্ভব হয় না। কেহ কাহারও ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়, ইহাতে তাহার বেশী সময় বা বেশী শ্রম আবশ্যক হয় না; কিন্তু তাহার ফলটা অপর লোকের নিকটে কিরূপ ভীষণ হয়, তাহ সহজেই ভাবিয়া দেখিতে পারা যায়। ক্রিয়ার ফলটি যদি সেই ক্রিয়ার কর্ত্তাতেই আবদ্ধ থাকে তো কিছু বলিবার প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু যখন তাহার সঙ্গে অনেকের সম্বন্ধ থাকে, তখন তাহা করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তাকে অগ্র-পশ্চাৎ সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হয়।

ধ্বংস সহজেই হইতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি তেমন সহজ নহে। কোনো সেতুকে এক নিমিষে ভাঙিয়া চুরিয়া শেষ করিয়া দিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা বন্ধন করিতে বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক হয়। ঘরখানা ভাঙিয়া ফেলাই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা করিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য স্থির করিবার পূর্ব্বে থাকিবার ব্যবস্থাটা কি তাহাও ভাবা দরকার। সংস্কারের খুবই প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাহার নামে যদি মূলেরই উচ্ছেদ হয় তবে সে বড় ভয়ের ও ভাবনার কথা। সংস্কারের উদ্দেশ্য ভাল করা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে বস্তুত ভাল হইবে কি না, সংস্কার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহা শান্ত ও গভীর ভাবে বহুবার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

সাহিত্যিকগণ নিজ নিজ সাহিত্য সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

"। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"
'তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দান করুন!'
"। স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য।"
বিশ্বের কল্যাণ হউক।*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মেদিনীপুর শাখার উনবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ, আষাঢ়, ১৩৩৮।

অরণ্য-কাণ্ড

শ্রীমনোজ বসু

মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরীপ চলিতেছে, খানাপুরী শেষ হইল এতদিনে। হিঙ্গে-কল্মীর দামে আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।

শঙ্কর-ডেপুটী সদর ক্যাম্প হইতে আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উপলক্ষ্য একটা জটিল রকমের মোকর্দ্দমা। ছোকরা মানুষ, ভারী চটপটে—পত্নীবিয়োগের পর হইতে চাঞ্চল্য যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আসিয়াই আমিনের তলব পড়িল।

আমিনকে ডাকিতে পাঠাইয়া একটা চুরুট বাহির করিল। চুরুটের কৌটায় সেই সাত মাস আগেকার শুকনো বেলের পাতা ক'টি এখনও রহিয়াছে।

সাত মাস আগে একদিন বিকালবেলা তাহাদের দেশের বাড়িতে দোতলার ঘরে ঢুকিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—সুধারাণী, কালকে কি বার?

সুধা বলিয়াছিল—পাঁজি দেখগে যাও, আমি জানিনে—তারপর হাসিয়া চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়াছিল—চলে যাবেন তাই ভয় দেখান হচ্ছে, তারী কিনা ইয়ে—

শঙ্করও খুব হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল—যদি মানা কর তবে না হয় যাইনে—

—থাক্।

—তার মানে? এই যে আমি চলে যাব আমার জন্যেই কেন কষ্ট হচ্ছে না—না?

কোন জবাব না দিয়া সুধারাণী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় কোঁচাইয়া পাট করিতে লাগিল। শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া কাছে আনিল।

—শোন সুধারাণী, উত্তর দাও—

—বা-রে পরের মনের কথা আমি জানি বুঝি—

—নিজের ত জান—। তবু কথা কহে না দেখিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিল—আমি চলে যাব ব'লে তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা সেই কথাটা বল আমায়—না বললে শুনছি নে কিছুতে—।

—না—

—সত্যি বলছ?

—না—না—না—বলিয়া হাত ছাড়াইয়া সুধা বাহির হইয়া যাইতেছিল। শঙ্কর পলায়নপরার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

—মিছে কথা। দেখি, আমার দিকে চাও—কই, চাও দিকি সুধারাণী—

সুধা তখন দুই চক্ষু প্রাণপণে বুজিয়া আছে। মুখ ফিরাইয়া ধরিতেই ঝর-ঝর করিয়া গাল বহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া বধূ পলাইল।...

শেষ রাতে বৃষ্টি নামিয়াছে। লক্ষণ বাহির হইতে ডাকিল—ছোটবাবু, ঘাটে ষ্টীমার সিটি দিয়েছে।

সুধারাণী গলায় আঁচল বেড়িয়া প্রণাম করিল। কহিল—দাঁড়াও একটু। তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গীর কোণ হইতে সন্ধ্যাকালে গোছাইয়া-রাখা বিল্বপত্র আনিয়া হাতে দিল। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা—হপ্তায় একখানা ক'রে চিঠি দিও, যখন যেখানে থাক, বুঝলে?...

আরও একটা দিনের কথা মনে পড়ে, এমনি এক বিকাল বেলা মামুদপুর ক্যাম্পে সে জরীপের কাজ করিতেছে, এমন সময় চিঠি আসিল, সুধারাণী নাই।

ইতিমধ্যে নক্সা ও কাগজপত্র লইয়া তজহরি আমিন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

—দু'শ দশ—এগার—তার উত্তরে এই দ'জলে দু'শ বারো নম্বর প্লট—বলিয়া তজহরি নক্সার উপর আঙ্গুলটা

চিহ্নিত করিল। বলিতে লাগিল—অনাবাদি বন-জঙ্গল একটা, মানুষ-জন কেউ যায় না ওদিকে—তবু এই নিয়ে মস্ত মামলা—

হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখিল—সেই কেবল বকিয়া মরিতেছে, শঙ্কর বোধ করি একবারও কাগজপত্রের দিকে তাকায় নাই—সামনের উত্তরের মাঠের দিকে এক নজরে তাকাইয়া আপনমনে দিব্য শিষ দিতে শুরু করিয়াছে, চুরুটের আগুন নিভিয়া গিয়াছে—

বলিল—হ্যাঁ, ঐ যে তালগাছ ক'টার ওধারে কালো কালো দেখা যাচ্ছে—জঙ্গলের আরম্ভ ঐখানে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ওর মধ্যে জমি অনেক এইবারে রেকর্ড একবার দেখবেন হুজুর, ভারী গোলমেলে ব্যাপার—

হাঁ হাঁ না—এই রকম বলিতে বলিতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া শঙ্কর কাগজপত্রে মন দিল। পড়িয়া দেখিল, ছ'শ বারোর খতিয়ানে মালিকের নাম লেখা হইয়াছে—শ্রীধনঞ্জয় চাকলাদার।

ভজহরি বলিতে লাগিল—আগে ঐ একটা নাম শুধু লিখেছিলাম। তারপর দেখুন ওর নীচে নীচে উড পেন্সিল দিয়ে আরও সাতটা নাম লিখতে হয়েছে। রোজই এইরকম নতুন নতুন মালিকের উদয় হচ্ছে। আজ অবধি একুনে আটজন ত হলেন—যে রেটে ওঁরা আসতে লেগেছেন দু-একদিনের মধ্যে কুড়ি পুরে যাবে বোধ হচ্ছে—এই পাতায় কুলোবে না—

শঙ্কর কহিল—কুড়ি পুরে যাবে—যাওয়াচ্ছি আমি, রোসো না—আজই খতম করে দেব সব। তুমি ওদের আসতে বল্লে কখন?

—সন্ধ্যের সময়। গেরস্ত লোক সারাদিন কাজ কর্মে থাকে—একটু রাত হয় হবে, জ্যোৎস্না রাত আছে—তার আর কি?

আরও খানিকটা কাজকর্ম দেখিয়া শঙ্কর সহিসকে ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিল। বলিল—মাঠের দিক দিয়ে [illegible] দিয়ে আসা যাক একটা—এ রকম হাত-পা কোলে [illegible] তাঁবুর মধ্যে কাঁহাতক বসে থাকা যায়?…এ জায়গাটা [illegible] তোমরা বেশ [illegible] রয়েছ, আমির বনাই—ওগুলো তাঁবুল, না? কিন্তু গাছের দশা দেখে হাসি না কাদি—

বলিতে বলিতে আবার কি ভাবিল। বলিল—ঘোড়া থাকগে, এক কাজ করলে হয় বরং—চল না কেন দু'জনে পায়ে পায়ে জঙ্গলটা ঘুরে আসি; মাইলখানেক হবে—কি বল? বিকেলে ফাঁকায় বেড়ালে শরীর ভাল থাকে—চলো—চলো—

মাঠের ফসল উঠিয়া গিয়াছে। কোনদিকে লোক চলাচল নাই, শঙ্কর আগে আগে যাইতেছিল, ভজহরি পিছনে। জঙ্গলের সামনেটা খাতের মত,—অনেকখানি চওড়া, খুব নাবাল। সেখানে ধান হইয়া থাকে, ধানের গোড়াগুলা রহিয়াছে। পাশ দিয়া উঁচু আল বাঁধা।

সেখানে আসিয়া শঙ্কর কহিল—গাঙের বড় খাল-টাল ছিল এখানে?

ভজহরি কহিল—না হুজুর, খাল নয়—এটা গড়খাই, সামনের জঙ্গলটা ছিল গড়—

—গড়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ রাজারামের গড়। রাজারাম ব'লে নাকি কে-একজন কোনকালে এখানে গড় তৈরি করেছিলেন। এখন তার কিছু নেই, জঙ্গল হয়ে গেছে সব—

তারপর দু'জনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

মাঝে একবার শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—বাঘ-টাঘ নেই ত হে!

ভজহরি তাচ্ছিল্যের সহিত জবাব দিল—বাঘ? চারিদিকে ধূ ধূ করছে ফাঁকা মাঠ, এখানে কি আর—তবে হ্যাঁ। অত্যান্তবার শুনলাম কেঁদো গোবাঘা দু-একটা আসত, এবারে আমাদের জ্বালায়—বলিয়া হাসিল। বলিতে লাগিল—উৎপাতটা আমরা কি কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—কম্পাস নিয়ে চেন মাপে করে' করে' নকশাটা দিল। ঐ পথ যা দেখছেন, জঙ্গল কেটে আমরাই বের করেছি, আগে পথঘাট কিছু ছিল না—এ অঞ্চলের কেউ এ বনে আসে না—

বনে ঢুকিয়া খানিকটা যাইতেই [illegible] হইল, এই মিনিট-দুয়েক মধ্যেই বেলা ডুবিয়া রাত্রি হইয়া গেল। বন

শাখাজাল-নিবদ্ধ গাছপালা, আম আর কাঁটাল গাছের সংখ্যাই বেশী, গুঁড় বাকল ফাটিয়া চৌচির হইয়া গুঁড়িগুলি পড়িয়া আছে যেন এক-একটা অতিকায় কুমীর, ছাতাধরা সবুজ···ফাঁকে ফাঁকে পরগাছা ··একদা মানুষেই যে ইহাদের পুঁতিয়া লালন করিয়াছিল আজ আর তাহা বিশ্বাস হয় না। কত শতাব্দীর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তলার আঁধারে এইসব গাছপালা আদিমকালের কত সব রহস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে, কোনদিন কাহাকে উঁকি মারিয়া কিছু দেখিতে দেয় নাই।

এই রকম একটানা কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

—ওখানটায় ত ফাঁকা বেশ! জল চকচক করছে—না?

আমিন বলিল—ওর নাম পদ্মদীঘি—

—খুব পাঁক বুঝি?

—তা হবে, কেউ কেউ আবার বলে পদ্মা-দীঘির থেকে পদ্মদীঘি হয়েছে—

বলিয়া ভজহরি গল্প আরম্ভ করিল।

সেকালে এই দীঘির কালো জলে নাকি অতি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী ভাসিত। আকারেও সেটি প্রকাণ্ড, দুই কামরা ছয়খানি দাঁড়। এত বড় ভারী নৌকা, কিন্তু তলায় ছোট্ট একখানা পাটা একটুখানি ঘুরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে সমস্ত ডুবাইয়া ফেলা যাইত। দেশে সে সময় শাসন ছিল না, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগেরা আসিয়া লুটতরাজ করিত, জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি লাগিয়াই ছিল। প্রত্যেক বড়লোকের প্রাসাদে গুপ্তদ্বার ও গুপ্তভাণ্ডার থাকিত, মান-সম্ভ্রম লইয়া পলাইয়া যাইবার অন্ততঃপক্ষে মরিবার অনেক সব উপায় সম্রান্ত লোকেরা হাতের কাছে ঠিক করিয়া রাখিতেন। কিন্তু নৌকার বহিরঙ্গ দেখিয়া এসব কিছু ধরিবার জো ছিল না। চমৎকার ময়ূরকণ্ঠী রঙে অবিকল ময়ূরের মত করিয়া গলুইটি তুলিয়া তোলা—শোনা যায় এক-একদিন নিষুতি রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে রাজারামের বড় ছেলে জানকীরাম তাঁর তরুণী পত্নী মালতীমালাকে লইয়া চিত্রবিচিত্র ময়ূরের পেখমের মত পাল তুলিয়া মৃদু বাতাসে ঐ নৌকায় দীঘির উপর বেড়াইতেন। এই মালতীমালাকে লইয়া এ অঞ্চলের চাষারা অনেক ছড়া বাঁধিয়াছে, পৌষসংক্রান্তির আগের দিন তাহারা বাড়ি বাড়ি সেই সব ছড়া গাহিয়া নূতন চাউল ও গুড় সংগ্রহ করে, পরদিন দল বাঁধিয়া সেই গুড়-চাউলে আমোদ করিয়া পিঠা খায়।

গল্প করিতে করিতে তখন তাহারা সেই দীঘির পাড়ের কাছে আসিয়াছে। ঠিক কিনারা অবধি পথ নাই, কিন্তু নাছোড়বান্দা শঙ্কর ঝোপঝাড় ভাঙিয়া আগাইতে লাগিল। ভজহরি কিছুদূরে একটা নীচু ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নল-খাগড়ার বন দীঘির অনেক উপর হইতে আরম্ভ হইয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে, তারপর কুচো শেওলা শাপলার ঝাড়। ঝুঁকিয়া-পড়া গাছের ডাল হইতে গুলঞ্চ-লতা ঝুলিতেছে। একটু দূরের দিকে কিন্তু কাকচক্ষুর মত কালো জল। সাড়া পাইয়া কাঁটা ডাকপাখী নলবনে ঢুকিল। অল্প খানিকটা ডাইনে বিড়ালআঁচড়ার কাঁটা ঝোপের নীচে এককালে যে বাঁধানো ঘাট ছিল এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেই ভাঙাঘাটের অনতিদূরে পাতলা পাতলা সেকেলে ইটের পাহাড়। কতদিন পূর্বে বিস্মৃত শতাব্দীর কত কত নিভৃত সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে জানকীরাম হয়ত প্রিয়তমাকে লইয়া ওখান হইতে টিপিটিপি এই পথ বাহিয়া এই সোপান বাহিয়া দীঘির ঘাটে ময়ূরপঙ্খীতে চড়িতেন। গভীর অরণ্যছায়ে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের সমস্ত সম্বিৎ হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

—ধোৎ, আমার ভয় করে—কেউ যদি দেখে ফেলে?

—কে দেখবে আবার? কেউ কোথাও জেগে নেই, চল মালতীমালা—লক্ষ্মীটি, চল যাই—

—আজ থাক, না না—তোমার পায়ে পড়ি আজকের দিনটে থাক শুধু—

ঐ যেখানে আজ পুরাণো ইটের সমাধিস্তূপ ওখানে বড় বড় কক্ষ অলিন্দ বাতায়ন ছিল, উহারই কোনখানে হয়ত একদা তারা-খচিত রাত্রে ময়ূরপঙ্খীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিতে শুনিতে এক তরুণী রূপসী রাজবধূর চোখের তারা লোভে ও কৌতুকে নাচিয়া উঠিতেছিল, শব্দ হইবে বলিয়া স্বামী স্নেহ বধূর পায়ের নূপুর খুলিয়া দিল, কিন্তু [illegible]

খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দুইটি চোর স্বপ্নপুরী হইতে বাহির হইয়া ঘাটের উপর নৌকায় উঠিল, রাজবাড়ির কেউ তা জানিল না। কিন্তু ভাদ্‌ কথাবার্ত্তা শুভ্র মেঘের আড়ালে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল ·শব্দ হইবার ভয়ে দাঁড়ও নামায় নাই এমনি বাতাসে বাতাসে ময়ূরপঙ্খী মাঝদরিয়া অবধি ভাসিয়া চলিল ·

ভাসিতে ভাসিতে দূরে—বহুদূরে—শতাব্দীর আড়ালে কোথায় তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে।

ভাবিতে শঙ্করের ভাবিতে কেমন ভয় করিতে লাগিল। গভীর নির্জ্জনতার একটি ভাষা আছে, এমন জায়গায় এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তাহা স্পষ্ট অনুভব হয়। চারিপাশের বনজঙ্গল অবধি ঝিম-ঝিম করিয়া যেন এক অপূর্ব্ব ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয় হইল, আরও কিছুক্ষণ সে যদি এখানে এমনি ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে জমিয়া নিশ্চয় গাছের গুঁড়ির মত হইয়া এই বনরাজ্যের একজন হইয়া যাইবে, আর নড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না।···সহসা সচেতন হইয়া বারবার সে নিজের স্বরূপ ভাবিতে লাগিল, সে সরকারী কর্ম্মচারী তার পসার-প্রতিপত্তি ভবিষ্যতের আশা মনকে ঝাঁকা দিয়া দিয়া সমস্ত কথা স্মরণ করিতে লাগিল। ডাকিল—আমিন মশাই।—

ভজহরি কহিল—সন্ধ্যে হয়ে গেল হজুর—

—যাচ্ছি—

ক্যাম্পের কাছাকাছি হইয়া শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। কহিল—ডাকাত পড়েছে নাকি আমাদের তাঁবুতে? বাপ্‌রে বাপ্‌—এবং হাসির সহিত ক্ষণপূর্ব্বের অনুভূতিটা সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিল—চুরুট টেনে টেনে ত আর চলে না—হুঁকো-কলকের ব্যবস্থা করতে পার আমিন মশাই, খাঁটি স্বদেশী মতে বসে বসে টানা যায়—

আমিনও হাসিয়া বলিল—অভাব কি? মুখের কথা [illegible] গাঁ'র থেকে বিশটা রূপোবাঁধা হুঁকো এসে [illegible], দেখুন না—

[illegible] ইতর-ভদ্র অনেকেই আসিয়াছিল, উঁহাদের [illegible] একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

মিনিট-দশেক পরে শঙ্কর তাঁবুর বাহিরে আসিয়া মামলার বিচারে বসিল। বলিল—মুখের কথায় হবে না কিছু, আপনাদের দলিলপত্তোর কার কি আছে দেখান একে একে—ধনঞ্জয় চাকলাদার আগে আসুন—

ধনঞ্জয় সামনে আসিল। কোষ্ঠির মত জড়ানো একখানা লম্বা হলদে রঙের কাগজ, কালো ছাপ-মারা, পোকায় কাটা, সেকেলে বাংলা হরপে লেখা। শঙ্কর বিশেষ কিছু পড়িতে পারিল না, ভজহরি কিন্তু হেরিকেনটা তুলিয়া ধরিয়া অবাধে আগাগোড়া পড়িয়া গেল। কে একজন দয়ালকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামজাদা রাজারামের গড় একশ' বারো বিঘা নিষ্কর জায়গা-জমি মায় বাগিচা পুষ্করিণী তারণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের নিকট সুস্থ শরীরে সরল মনে খোস-কোবলায় বিক্রয় করিতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—ঐ তারণচন্দ্র চাকলাদার আপনার কেউ হবেন বুঝি, ধনঞ্জয় বাবু?

ধনঞ্জয় সোৎসাহে কহিতে লাগিল—ঠিক ধরেছেন হজুর, তারণচন্দোর আমার প্রপিতামহ, পিতামহ হ'লেন কৈলেসচন্দোর—তাঁর বাবা। তিরাশী সন থেকে এই সব নিষ্করের সেস গুণে আসছি কালেক্টরীতে—ডভিড সাহেবের জরীপের চিঠে রয়েছে। কবলার তারিখটে একবার লক্ষ্য ক'রে দেখবেন হজুর—

আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উপস্থিত অনেকে না না—করিয়া উঠিল। তাহারাও রাজারামের গড়ের মালিক বলিয়া নাম লেখাইয়াছে, এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না।

ধমক খাইয়া সকলে চুপ করিল। শঙ্কর ভজহরিকে চুপিচুপি কহিল—তুমি ঠিকই লিখেছ, চাকলাদার আসল মালিক, আপত্তিগুলো ভুয়ো—ডিসমিস করে দেব—

ভজহরি কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আসল মালিক ধরা বড় শক্ত হবে' দাঁড়াচ্ছে হজুর—

—বারো-শ উনিশ সনের পুরাণো দলিল দেখাচ্ছে যে—

ভজহরি কহিতে লাগিল—এখানে আটঘরা গ্রামে একজন লোক রয়েছে, ও-দিকে কবুল করব তার কাছে

[illegible]—উনিশ সন ত কালকের কথা, হুবহু আকবর বাদশার দলিল বানিয়ে দেবে, আসল নকল চেনা যায় না—

বস্তুতঃ ধনঞ্জয়ের পর অন্যান্য সাতজনের কাগজপত্র তলব করিয়া দেখা গেল, ভজহরি মিথ্যা বলে নাই—ঐ রকম পুরাণো দলিল সকলেরই আছে। এবং বাঁধুনীও প্রত্যেকটির এমনি নিখুঁত যে যখনই যাহার কাগজ দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ বুঝিয়া যায় রাজারামের গড়ের মালিক একমাত্র সেই লোকটাই। এ যেন গোলক ধাঁধায় পড়িয়া গেল। বিস্তর ভাবিয়া-চিন্তিয়াও সাব্যস্ত হইল না কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখা যায়।

হাল ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে শঙ্কর বলিল—দেখুন গোঁসাইরা, আপনারা ভদ্রসন্তান—

হাঁ—হাঁ—করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

এই একটা প্লট একসঙ্গে ঐরকম ভাবে আটজনের ত হ'তে পারে না?

সকলেই ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ—নয়ই ত—

—আপনারা হলপ করে' বলুন এর সত্যি মালিক কে—

ভদ্রসন্তানেরা তাহাতে পিছপাও নহেন। একে একে সামনে আসিয়া ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিল—ছ'শ' বারোর প্লট একমাত্র তাহারই, অপর সকলে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছে।

লোকজন বিদায় হইয়া গেলে শঙ্কর বলিল—না এরা পাটোয়ারী বটে—দেখে শুনে সম্ভ্রম হচ্ছে—

ভজহরি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এরকম সে অনেক দেখিয়াছে।

শঙ্কর বলিতে লাগিল—তোমার কথাই মেনে নিলাম যে পুরো দলিলগুলো জাল। কিন্তু যে গুলো রেজেষ্ট্রী? দেখ, এদের দূরদৃষ্টি কত দেখ একবার—কবে কি হবে বহুকাল আগে থেকে তাই তৈরী হয়ে আসছে। চুলোয় যাক্‌গে দলিল-পত্তোর—তুমি গাঁয়ে খোঁজ খবর করে' কি পেলে বল? যা হোক একরকম রেকর্ড করে' যাই—পরে যোঝাবুঝি হবে আদালতে—

ভজহরি বলিল—কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আগমনী আসরের আসল কত নাকীসুর তলব করেছি, সে আরও মজা—এক একজনে এক এক রকম বলে—বলিয়া সহসা প্রচুর হাসিতে হাসিতে বলিল—ভদ্রলোকে আকারা হ'ল না, এখন একবার হুমায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে' জিজ্ঞাসা করতে পারলে হয়—

শঙ্কর কথাটা বুঝিতে পারিল না।

ভজহরি বলিতে লাগিল—হুমায় বাহাদুর মানে জানকীরাম। সেই যে তখন ময়ূরপঙ্খীর কথা বলছিলাম, গাঁয়ের লোকেরা বলে আশপাশের গ্রাম নিশুতি হয়ে গেলে জানকীরাম নাকি আসেন—উত্তর মাঠের ঐ মাঝকাটার খাল পেরিয়ে তেঘরা-বকচরের দিক থেকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রোজ রাত্তিরে মালতীমালার সঙ্গে দেখা করে' যান—সে ভারী অদ্ভুত গল্প,—কাজ কর্ম নেইত এখন?

* * *

তারপর রাত্রি অনেক হইল। তিনটি তাঁবুরই আলো নিভিয়াছে, কোনদিকে সাড়াশব্দ নাই। শঙ্করের ঘুম আসিতেছিল না। একটা চুরুট ধরাইয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া মাঠে খানিক পায়চারী করিতে লাগিল।

ভজহরি বলিয়াছিল—কেবল জঙ্গল নয় হুজুর, এই মাঠেও সন্ধ্যের পর একলা একলা কেউ আসে না। এই মাঠ সেই যুদ্ধক্ষেত্র, নদীপথে শত্রুরা এসেছিল। বেলা না ডুবতে রাজারামের পাঁচ শ' ঢালী খারেজ হয়ে' গেল, সেই পাঁচশ' মড়ার পা ধরে টেনে টেনে পরদিন ঐ নদীতে ফেলে দিয়েছিল…

উলুঘাসের উপর পা ছড়াইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া শঙ্কর আনমনে ক্রমাগত চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

চার শ' বছর আগে আর একদিন সন্ধ্যায় প্রাসাদবতী-ফুলবতী এই মাঠের উপর এমনি চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়া সমস্ত মাঠে অসাবড় শান্তি থম-থম করিতেছে। চাঁদের আলোয় ভরা রণভূমির প্রান্তে জানকীরামের জ্ঞান ফিরিল। দূরে গড়ের প্রাকারে সহস্র সহস্র মশালের আলো…আকাশ চিরিয়া শত্রুর উল্লাস

অরোজান···দুই হাতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে জানকীরাম উঠিয়া বসিয়া তাঁহারই অনেক আশা ও ভালবাসার নীড় ঐ গড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে অকস্মাৎ দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। ললাটের রক্তধারা ডান হাতে মুছিয়া ফেলিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকটি শিয়াল নিঃশব্দে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোন দিকে কেহ নাই

সেই সময়ে ওদিকে অন্দরের বাতায়ন পথে তাকাইয়া মালতীমালাও চমকিয়া উঠিলেন, তবে কি একেবারেই—? অবমানিত রাজপুরীর উপরেও গাঢ় নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে। দাসী বিবর্ণমুখে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতীমালা আয়ত কালো চোখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—শেষ ?—

খবর আসিল, গুপ্তদ্বার খোলা হইয়াছে, পরিজনেরা সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দাসী বলিল—বউমা, উঠুন—

বধূ বলিলেন—নৌকা সাজানো হোক্—

কেহ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। নদীর ঘাটে শত্রুর বহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে সন্ধানী-দৃষ্টি ভেদ করিয়া জলপথে পলাইবার সাধ্য কি!

মালতীমালা বলিলেন—নদীর ঘাটে নয় রে, দীঘির ময়ূরপঙ্খীখানা সাজাতে হুকুম দিয়েছি। খবর নিয়ে আয় হ'ল কি না—

সেদিন সন্ধ্যায় বাজোদ্যানে কনকচাঁপা গাছে যে কয়টি ফুল ফুটিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া আনা হইল, মালতীমালা লোটন খোঁপা ঘিরিয়া তার কতগুলি বসাইলেন, বাকীগুলি আঁচল ভরিয়া লইলেন। সাধের মুক্তাফল দু'টি কাণে পরিলেন, পায়ে আলতা দিলেন, মাথায় উজ্জ্বল সিঁদুর পরিয়া কত মনোরম রাত্রির ভালবাসার স্মৃতিমণ্ডিত ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে গিয়া বসিলেন।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে অনেকদূর গেল। তখন শত্রুসৈন্যরা গড়ে ঢুকিয়াছে, দীঘির পাড় দিয়া দলে দলে রক্ত পতাকা উড়াইয়া জনমানবশূন্য প্রাসাদে ঢুকিতে আসিল। সমস্ত পুরবাসী গুপ্তপথে পলাইয়াছে।

বিশ পঁচিশটি মশালের আলো দীঘির জলে পড়িল।

—ধর, ধর নৌকো—

মালতীমালা তলীর পাটাখানি খুলিয়া দিলেন দেখিতে দেখিতে দীর্ঘমাস্তুলটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নৌকা কেহ ধরিতে পারিল না, কেবল কেমন করিয়া কোন ফাঁক দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল আঁচলের চাঁপাফুল কয়েকটি—

তারপর ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হইয়া গড়ের উঁচু চূড়ার আড়ালে চাঁদ ডুবিল। আকাশে কেবল উজ্জ্বল তারা কয়েকটি পরাজিত বিগত-গৌরব ভাগ্যাহত জানকীরামের ধূলিশয্যার উপর নির্নিমেষ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া ছিল। সেই সময়ে কে-একজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিল।

—চলুন, প্রভু—

—কোথা ?

—বটতলায়। ওখানে ঘোড়া রেখেছি, ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে যাব—

—গড়ের আর-আর সব ?

বিশ্বস্ত পরিচারক গড়ের ঘটনা কহিল। বলিল—কোন চিহ্ন নেই আর, জলের উপরে কনকচাঁপা ছাড়া—

কই ? বলিয়া জানকীরাম হাত বাড়াইলেন। বলিলেন—আন্‌তে পার নি ? ঘোড়ায় তুলে' দিতে পার আমায় ? দাও না আমায় তুলে দয়া করে'—আমি একটা ফুল আন্‌ব শুধু—

নিষেধ মানিলেন না। খট-খট করিয়া সেই অন্ধকারে উত্তরমুখো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিল। সকালে দেখা গেল, পরিখার মধ্যে যেখানে আজকাল ধান হইয়া থাকে জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া আছেন, ঘোড়ার কোন সন্ধান নাই।

সেই হইতে নাকি প্রতিরাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। রাজপুরে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মধ্য-আকাশে আসিয়া পৌঁছায়, আশপাশের গ্রামগুলিতে ঝিঁঝিঁ ক্রমশঃ গাঢ়তম হইয়া ওঠে, সেই সময়ে রাতের পর রাত ঐ গভীর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে চার শ' বছর আগেকার সেই রাজবধূ পদ্মদীঘির হিমশীতল অতল জলশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া

দাঁড়ান। তাড়া ঘাটের সোপান বহিয়া বিড়ালআঁচড়ার গভীর কাঁটাবন দুইহাতে ফাঁক করিয়া সাবধানে লঘুচরণ ফেলিয়া তিনি ক্রমশঃ আগাইতে থাকেন। তবু বনের একটানা ঝিঁঝির আওয়াজের সঙ্গে পায়ের নূপুর ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া ওঠে···কুঙ্কুমে-মাজা মুখ···গায়ে শ্বেতচন্দন আঁকা···সিঁথায় সেই চার শতাব্দী আগেকার সিঁদুর লাগানো···পায়ে রক্তবরণ আলতা, অঙ্গের চিত্র-বিচিত্র কাঁচলী ও মেঘডম্বুর সাড়ী হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া বনভূমি সিক্ত করে···বনের প্রান্তে আমের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দক্ষিণের মাঠে তিনি তাকাইয়া থাকেন···

আবার বর্ষায় যখন ঐ গড়খাই কানায় কানায় একেবারে ভরিয়া যায়, ঘোড়া তখন জল পার হইয়া বনের সামনে পৌঁছিতে পারে না, মালতীমালা সেই কয়েকটা মাস আগাইয়া ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। দুধ-সর ধানের সুগন্ধি ক্ষেতের পাশে পাশে ভিজা আলের উপর হিম-রাত্রির শিশিরে পায়ের আলতার অস্পষ্ট ছোপ লাগে, চাষারা সকাল বেলা দেখিতে পায় কিন্তু রোদ উঠিতে না উঠিতে সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায়।

চুরুটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মাঠের ওদিকে মুচিপাড়ায় পোয়ালগাদা, খোড়োঘর, নূতন-বাঁধা গোলাগুলি কেমন বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈত্রমাসের শুভ্র জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা আবছা বনের দিকে চাহিতে চাহিতে চারিদিক-কার সুপ্তিরাজ্যের মাঝখানে বিকালের দেখা সেই সাধারণ বন হঠাৎ অপূর্ব রহস্যময় বলিয়া ঠেকিল। ঐ খানে এমনি সময়ে বিস্মৃত যুগের বধূ তাকাইয়া আছে, নায়ক তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই দিকে যাইতেছে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয় সন্ধ্যাকালে ওখানে সে যে অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ জঙ্গলের সে রূপ বদলাইয়া গিয়াছে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আজও যাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই তাহারই কোন একটা অপূর্ব সুর-সঙ্গীতময় গুপ্তরহস্য এতক্ষণ ওখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

শঙ্করের আবার সুধারাণীর কথা মনে পড়িল···সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনদিন সে আর আসিবে না।

ক্রমশঃ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল—সে দিনের সেই সুধারাণী, তার হাসি চাহনী, তার ক্ষুদ্রহৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্য্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনখানে সজীব হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। ঐ সব জনহীন বনে জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা সুধারাণী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসি-কান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। তদ্‌গত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপি টিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারাণী এমনি কোনখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, আদর করিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিলাইয়া পলাইয়া গিয়াছে।···

বটতলায় বটের ঝুরির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঐখানে আপততঃ আস্তাবলের কাজ চলিতেছে, পৃথক ঘর আর বাঁধা হয় নাই। নিজে নিজেই জিন কষিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শঙ্কর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া ছুটিল। সুপ্ত গ্রামের দিকে চাহিয়া অনুকম্পা হইতে লাগিল—মূর্খ তোমরা, জঙ্গলের বড় বড় কাঁঠাল গাছগুলাই তোমাদের কেবল নজরে পড়িল এবং গাছ মারিয়া জঙ্গল কাটাইয়া দু'পয়সা পাইবার লোভে এত মোকর্দ্দমা-মামলা করিয়া মরিতেছ, গভীর নিঝুম রাত্রে ছায়াময় সেই আম-কাঁঠাল-গিত্তিরাজের বন, সমস্ত ঝোপ ঝাড় জঙ্গল, পদ্মদীঘির এপার-ওপার যাদের রূপের আলোয় আলো হইয়া যায়, এতকাল পাশাপাশি বাস করিলে একটা দিন তাঁদের খবর লইতে পারিলে না।

গড়খাই পার হইয়া বনের সামনে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। একটা গাছের ডালে লাগাম বাঁধিয়া শঙ্কর আমিনদের সেই জঙ্গল-কাটা সঙ্কীর্ণ পথের উপর আসিল। প্রবেশ-মুখের দুইধারে দুইটি অতিবৃহৎ শিরীষ গাছ, বিকালে ভজহরির সঙ্গে কথায় কথায় এসব নজরে পড়ে নাই, এখন বোধ হইল মায়াপুরীর সিংহদ্বার উহারা! সেইখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে সেই ছায়াময় নৈশ বনভূমি দেখিতে লাগিল। আর তাহার অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না, মৃত্যু-পারের গুপ্ত রহস্য আজি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে ঐখান হইতে নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে পারিবে। আমাদের জন্মের বহুকাল আগে এই সুন্দরী পৃথিবীকে যারা ভোগ করিত বর্ত্তমান কালের দুঃসহ আলো হইতে তারা সব তাদের অদ্ভুত রীতি-নীতি বাঁধা ঐশ্বর্য্য প্রেম লইয়া সৌরালোকবিহীন ঐ বন-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। আজ জনহীন মধ্য-রাত্রে যদি এই সিংহ-দ্বারে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাক দেওয়া যায় শতাব্দী-পারের বিচিত্র মানুষেরা অন্ধকারের যবনিকা তুলিয়া নিশ্চয় চাহিয়া দেখিবে।

কয়েক পা আগাইতে অসাবধান পায়ের নীচে শুকনা ডালপালা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যেন মর্ম্মস্থানে বড় ব্যথা পাইয়া বনভূমি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। স্থির গম্ভীর অন্ধকারে নির্নিরীক্ষ সান্ত্রীগণ তাহাকে বাক্যহীন আদেশ করিল—জুতা খুলিয়া এস—

শুকনা পাতা খসখস করিতেছে, চারিপাশে কত লোকের আনাগোনা···জ্যোৎস্নার আলো হইতে আঁধারে আসিয়া শঙ্করের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যেন কিছু দেখিতে পাইতেছে না। মনের ঔৎসুক্যে উদ্বেগাকুল আনন্দে কম্পিতহস্তে পকেট হইতে তাড়াতাড়ি সে টর্চ্চ বাহির করিয়া জ্বালিল।

জ্বালিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—শূন্য বন। বিশ্বাস হইল না, বারম্বার দেখিতে লাগিল।···আর একটা দিনের ব্যাপার শঙ্করের মনে পড়ে। দুপুরবেলা, বিয়ের কয়েকটা দিন পরেই সুধারাণী ও আর কে-কে তার নূতন দামী তাসজোড়া লইয়া চুরি করিয়া খেলিতেছিল। তখন তার আর এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা, সন্ধ্যার আগে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কি গতিকে যাওয়া হইল না। বাহির হইতে খেলুড়েদের খুব হৈ-চৈ শোনা যাইতেছিল; কিন্তু ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে সকলে কোন দিক দিয়া কি করিয়া যে পলাইয়া গেল—শঙ্কর দেখিয়াছিল, কেবল তাসগুলি বিছানার উপর ছড়ানো···

টর্চ্চের আলোয় কাঁটাবনের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে দীঘির সোপানের কাছে গিয়া সে বসিল। জলে জ্যোৎস্না চিক্‌চিক্ করিতেছে। আলো নিভাইয়া চুপটি করিয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল।

ক্রমে চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। কোন দিকে কোন শব্দ নাই, তবু অনুভব হয়—তার চারিপাশের বনবাসীরা ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন এই সময়ে তাহারা একটি অতি দরকারী নিত্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, শঙ্কর যতক্ষণ এখানে থাকিবে ততক্ষণ তা' হইবে না—কিন্তু তাড়া বড্ড বেশী। নিঃশব্দে ইহারা তার চলিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে।

হঠাৎ কোনদিক হইতে হুহু করিয়া হাওয়া বহিল, এক মুহূর্ত্তে মর্ম্মরিত বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা এইবার যেন আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ এদিকে কোন কিছুর জোগাড় নাই। চারিদিকে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। অন্ধকার রাত্রির পদধ্বনির মত সহস্রে সহস্রে ছুটাছুটি করিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে কম্পমান ক্ষীণ জ্যোৎস্না, সে যেন মহামহিমার্ণব যাহারা সব আসিয়াছে তাহাদের সঙ্গের সিপাহীসৈন্যের বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলা। নিঃশব্দচারীরা অঙ্গুলিসঙ্কেতে শঙ্করকে দেখাইয়া দেখাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল—এ কে? এ কোথাকার কে—চিনি না ত!

উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রবণশক্তি দিয়া শঙ্কর আরও যেন শুনিতে লাগিল, কিছুদূরে সর্ব্বশেষ সোপানের নীচে কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। কণ্ঠ অনতিস্ফুট, কিন্তু চাপা কান্নার মধ্য দিয়া গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত ব্যথা বনভূমির বাতাসের সঙ্গে চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারলিপ্ত প্রেতের মত গাছেরা মুখে আঙুল দিয়া তাহাকে বারম্বার থামিতে ইসারা করিতেছে—

সর্ব্বনাশ করিল, সব জানাজানি হইয়া গেল!…কিন্তু কান্না থামিল না। নিঃশ্বাস রোধ করিয়া ঐ অতল জলতলে চারশ' বছরের জরাজীর্ণ ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে যে মাধুরীমতী রাজবধূ সারাদিনমান অপেক্ষা করে, গভীর রাতে এইবার সে ঘোমটা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া নিত্যকার মত উৎসবে যোগ দিতে চায়। যেখানে শঙ্কর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল, তাহার কিছু নীচে জলে-ডোবা সিঁড়ির ধাপে মাথা কুটিয়া কুটিয়া বোবার মত সে বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল।

তারপর কখন চাঁদ ডুবিয়া দীঘিজল আঁধার হইল, বাতাসও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, গাছের পাতাটিরও কম্পন নাই—কান্না তখনও চলিতেছে। অতিষ্ঠ হইয়া কাহারা দ্রুতহাতে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো পর্দ্দা খাটাইয়া দিতে লাগিল—শঙ্কর বসিয়া থাকে, থাকুক—তাহাকে কিছুই উহারা দেখিতে দিবে না।

আবার টর্চ্চ টিপিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। আলো জ্বালিতে না জ্বালিতে গাছের আড়ালে কি কোথায় সব যেন পলাইয়া গেল, কোনদিকে কিছু নাই।

তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে কহিতে লাগিল—আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি আর কাঁদিও না হে লজ্জারুণা রাজবধূ, মৃণালের মত দেহখানি তুমি দীঘির তল হইতে তুলিয়া ধর, আমি তাহা দেখিব না। অন্ধকার রাত্রি, অনাবিষ্কৃত দেশ, অজ্ঞানিত গিরিগুহা, গভীর অরণ্যভূমি এ'সব তোমাদের। অনধিকারের রাজ্যে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের ব্যাঘাত ঘটাইয়া কাঁদাইয়া গেলাম, ক্ষমা করিও—

যাইতে যাইতে আবার ভাবিল, কেবল এই সময়টুকুর জন্ম কাঁদাইয়া বিদায় লইয়া গেলেও না হয় হইত। তাহা ত নয়। সে যে ইহাদের একেবারে উদ্বাস্ত করিতে এখানে আসিয়াছে। জরীপ শেষ হইয়া একজনের দখল দিয়া গেলে বন কাটিয়া লোকে এখানে টাকা ফলাইবে। এত নগর-গ্রাম মাঠ-ঘাটেও মানুষের জায়গায় কুলায় না, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে পৃথিবীতে বন-জঙ্গল এক কাঠা পড়িয়া থাকিতে দিবে না, তাই শঙ্করকে সেনাপতি করিয়া জমিনের দলবল যন্ত্রপাতি নক্সা কাগজ পত্র দিয়া ইহাদের এই শত শত বৎসরের শান্ত নিরিবিলি বাসভূমি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াছে। শাণিত খড়্গের মত ভজহরির সেই সাদা সাদা দাঁত মেলিয়া হাসি—উৎপাত কি আমরা কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে' করে'…

কিন্তু মাথার উপরে প্রাচীন বনস্পতিরা ভ্রূকুটি করিয়া যেন কহিতে লাগিল—তাই পারিবে নাকি কোন দিন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাল ঠুকিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে সামনে ত আগাইতেছ আদিকাল হইতে, পিছনে পিছনে আমরাও তেমনি তোমাদের তাড়াইয়া চলিয়াছি। বন-কাটা রাজ্যে নূতন ঘর তোমরা বাঁধিতে থাক, পুরাণো ঘর-বাড়ী আমরা ততক্ষণ দখল করিয়া বসিব।…

হা-হা-হা হা-হা তাহাদেরই হাসির মত আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে কালো কালো এক ঝাঁক বাদুড় বনের উপর দিয়া মাঠের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।…

বনের বাহির হইয়া শঙ্কর ঘোড়ায় চাপিল। ঘোড়া আস্তে আস্তে হাঁটাইয়া ফিরিয়া চলিল। পিছনের বনে ডালে ডালে ঝাঁক-বাঁধা জোনাকী, আমের গুটি ঝরিতেছে তার টুপটাপ শব্দ, অজানা ফুলের গন্ধ…বারবার পিছন দিকে সে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল। অনেক দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে, কাহাদের বাড়ীতে আকাশ-প্রদীপ আকাশের তারার সহিত পাল্লা দিয়া দপদপ করিতেছে; এইবার গিয়া সেই নিরালা তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্প খাটটির উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুম দিতে হইবে! যদি এই সময় মাঠের এই অন্ধকারের মধ্যে সুধারাণী আসিয়া দাঁড়ায়…কপালে জলজলে সিঁদুর, একপিঠ চুল এলাইয়া টিপিটিপি দুষ্টামীর হাসি হাসিতে হাসিতে যদি সুধারাণী ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, দাঁড়াইয়া দুই চোখ ভরিয়া তার দিকে তাকাইয়া থাকে…মাথার উপর তারাভরা আকাশ, কোন দিকে কেউ নাই—ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া

শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিবে, হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে শুনাইয়া দিবে—কি শুনাইবে সে? শুধু তাহাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে—কি করেছি আমি তোমার ?…

এই সময়ে হঠাৎ লাফ দিয়া ঘোড়া একটা আ'ল পার হইল। শঙ্করের হুঁশ হইল, এতক্ষণের মধ্যে এখনও গড়খাই পার হয় নাই—জঙ্গল বেড়িয়া ঘোড়া ক্রমাগত ধান-ক্ষেতের উপর দিয়াই চলিয়াছে। জুতা পায়ে জোরে ঠোক্কর দিল, আচমকা আঘাত পাইয়া ঘোড়া ছুটিল। গড়খাইয়ের যেন শেষ নাই, যত চলে ততই ধানবন, দিক ভুল হইয়া গিয়াছে, মাঠে না উঠিয়া ধানবন ঘুরিয়া মরিতেছে। শঙ্করের মনে হইতে লাগিল, যেমন এখানে সে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, ঘোড়াসুদ্ধ তাহাকে ঐ বনের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত রাত ছুটিলেও কেবল বন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—নিষ্কৃতি নাই—গড়খাই পার হইয়া মাঠে পৌছানো রাত পোহাইবার আগে ঘটিবে না। জেদ চাপিয়া গেল, ঘোড়া জোরে—আরও জোরে—বিদ্যুতের বেগে ছুটাইল, ভাবিল এমনি করিয়া সেই অদৃশ্য ভয়ানক বাঁধন ছিঁড়িবে। আর একটা উঁচু আ'ল, অন্ধকারে ঠাহর হইল না, ছুটিতে ছুটিতে হুমড়ি খাইয়া ঘোড়া সমেত তাহার উপর পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, ঘোড়ার পিঠ হইতে ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া আ'লের উপর কে তাহাকে জোরে আছাড় মারিল। তীব্র আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সে নীচে গড়াইয়া পড়িল। ঘোড়াও ভয় পাইয়া গেল, শঙ্করকে মাড়াইয়া ফেলিয়া ঝড়ের মত মাঠে গিয়া উঠিল, শুকনা মাঠের উপর দ্রুতবেগে ক্ষুর বাজিতে লাগিল—খট্‌পট্‌ খটখট। রাত্রির শেষ প্রহর, আকাশে শুকতারা জ্বলিতেছে। চারশ' বছর আগে যেখানে একদা জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া ছিলেন সেইখানে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, সেই জানকীরাম কোন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া উত্তর মাঠের ওপারে তেঘরা-বকচরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ আঁধার মাঠে ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

বেড়ার ধারের ফুল

শ্রীক্ষিতীশ রায়

বেড়ার ধারের ছোট্ট কাঁটাফুল,
অদেখা সে—না জানে কেউ তারে,
অন্তরালে গোপন-প্রিয়ার মত
জন্ম নিল ছায়ার অন্ধকারে।
আলোর হাসির সঞ্জীবনী
পাবে না ক ফুল
ঝরবে জানি কণ্টকেরি ঘায়
বিফল প্রেমের বেদনাতে
অজানিতা প্রিয়া,
গুমরি' মরে মৃত্যু—তমসায়!*

* ইটালিয়ান হইতে

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

৭

গীতায় বিভিন্ন মার্গ

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই অবতারবাদের কথা আসিয়াছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সংন্যাস ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগ-মার্গ আলোচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়-সমূহে অন্যান্য বিবিধ মার্গ ও নানা প্রকারের ধর্ম্মবিশ্বাসের উল্লেখ আছে। এই সকল বিভিন্ন নিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত স্মরণ না রাখিলে গীতার উপদেশের তাৎপর্য্য সুগম হইবে না। এজন্য চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা আরম্ভ করার পূর্ব্বেই সংক্ষেপে গীতোক্ত বিভিন্ন মার্গের আলোচনা করিব।

শিক্ষা দীক্ষা ও প্রবৃত্তিভেদে মনুষ্যের নানারূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে আগ্রহ জন্মে। সকল ব্যক্তির পক্ষে একই মার্গের ব্যবস্থা কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। অধিকারভেদে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত। হিন্দুধর্ম্মের উদার উপদেশ এই যে, তুমি যে-কোন মার্গই অবলম্বন কর না কেন, উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সকল মার্গেই কিছু-না-কিছু দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকারভেদ বিচার করিলে কোন মার্গকেই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা যায় না। গীতার বিশেষত্ব এই যে, কোন একটি বিশেষ মার্গ অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গীতাকারের মতে বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিলে সকল মার্গই অন্তিমে পরব্রহ্মে পৌছাইয়া দিবে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এই উদারতা অতুলনীয়। আধুনিক সমাজ-সংস্কারকগণ কোথাও কিছু দূষণীয় দেখিলে সেই প্রথার সমূল উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, মানুষ যে ভ্রান্ত আচরণ করে তাহার মূলে কোন-না-কোন দুর্লজ্ঘ্য প্রেরণা আছে। এইজন্যই কুপ্রথার উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইলে উপদেশের দ্বারা বা বলপূর্ব্বক নিরোধের দ্বারা সম্যক্ ফললাভ হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস—তাহা অন্ধবিশ্বাসই হউক বা যুক্তিযুক্তই হউক—মানিয়া লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক মার্গের আলোচনা শ্রীকৃষ্ণ এমনই সুনিপুণভাবে করিয়াছেন যে, সেই মার্গের দোষ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহাই সাধকের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইয়া উঠিয়াছে; তন্মার্গাবলম্বীর আপত্তি করিবারও কিছুই রাখেন নাই। এইজন্যই গীতা সকল মার্গের উপাসকদিগের পক্ষেই আদরণীয়। প্রত্যেক অন্ধবিশ্বাসের যে মূল্য আছে এবং তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত থাকে তাহার দ্বারাই মানুষ উন্নত হইতে পারে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারমর্ম্ম। কোন ধর্ম্মমতের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আত্যন্তিক বিরোধ নাই। এভাবে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা আর কুত্রাপি দেখা যায় না, এবং শ্রীকৃষ্ণের মত উদারচেতা সংস্কারকও আর কেহই জন্মেন নাই।

গীতাকার তৎকাল-প্রচলিত প্রায় সকল মার্গেরই অল্পস্বল্প আলোচনা করিয়াছেন। এইজন্য গীতার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তৎকালে যে-সকল মার্গ প্রচলিত ছিল সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ও পরে প্রত্যেক মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামতের উল্লেখ করিব। ইহা পাঠ করিলে, পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহার মর্ম্ম পরিস্ফুট হইবে। আধুনিক যুগে জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ খ্রীষ্টধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আলোচনা করিতেন। এমন কি সহজিয়াবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম তাঁহার আলোচনায় বাদ যাইত না। কেন একথা বলিতেছি পরে তাহা পরিস্ফুট হইবে। অনুমান করা যায় যে, তৎকাল-প্রচলিত কোন বিশিষ্ট মার্গই গীতায় বাদ পড়ে নাই।

গীতায় নিম্নলিখিত মার্গ ও ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।—সাংখ্যযোগ, সংন্যাস, কর্ম্মযোগ, যোগ, যজ্ঞ, বুদ্ধিযোগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, ইন্দ্রিয়-নিরোধ, ব্রহ্মচর্য্য, কর্ম্ম-সংযম, তপ, বেদপাঠ, প্রাণায়াম, উপবাস, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, দান, অন্তকালে ব্রহ্মস্মরণ, অবতারবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ, ওঙ্কারের

ধ্যান, অহোরাত্রবিদ্যা, অধ্যাত্ম-অধিদৈব-অধিযজ্ঞবাদ, দেবতাপূজা, পিতৃপূজা, ভূতপূজা, যক্ষপূজা, পত্রপুষ্পফলজল ইত্যাদি উপচারে পূজা, মন্ত্র, ঔষধ, রাজবিদ্যা।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিসমূহ বিচার করিলে অনুমান হয় যে, তখনকার দিনে যজ্ঞেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলন ছিল এবং যজ্ঞকার্য্যে নানা রাজসিকতা ও তামসিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। এইজন্যই কি করিয়া নিষ্কামচিত্তে যজ্ঞ আচরণ করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ বার-বার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। দান ও তপস্যারও অপব্যবহার লক্ষিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ, দান, তপকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়াছেন ও দোষ পরিহারের জন্য সাত্ত্বিকভাবে আচরণের উপদেশ দিয়াছেন। যাগ যজ্ঞ দান ধ্যানের আচরণ প্রধান সাধনা হিসাবে তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এইজন্য এই কয়টি কথার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। পূজা অর্চনা সমধিক প্রচলিত ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ মাত্র এক শ্লোকে তাঁহার কথা শেষ করিয়াছেন। হঠযোগ প্রাণায়াম ইত্যাদিরও বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। এখনকার মত তখনও কেহ কেহ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন। তখনকার দিনে এমন কতকগুলি মার্গের প্রচলন ছিল যাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, যথা অহোরাত্র বিদ্যা। তখনও লোকে ভূতপ্রেতের পূজা করিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই কথা গীতায় নাই। জৈন ও বৌদ্ধবাদ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। যে-গীতাকার ভূতপ্রেত পূজাও বাদ দেন নাই, তিনি যে লোকপ্রচলিত থাকিলে এত বড় একটা কথা বাদ দিবেন, তাহা মনে হয় না। ১৬।২ শ্লোকে অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগের পর পর উল্লেখ আছে এবং ইহাদিগকে শান্তি, পরনিন্দা—বর্জ্জন ইত্যাদি গুণের সহিত দৈবী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ উপদেশের মধ্যেও অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগের পর পর উল্লেখ দেখা যায়। গীতাকারের মনে এই সম্পর্কে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা উঠিয়াছিল কি না বলা যায় না। তিলক বলেন, বৌদ্ধগ্রন্থের এই সব কথা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভজন নামগান ইত্যাদির বহুল প্রচার হইয়াছে। গীতায় এ সকলের উল্লেখ নাই।

ব্রহ্মলাভের দুই উপায়।—ব্রহ্মলাভের দুই প্রকার উপায় প্রচলিত আছে। এক সাংখ্য ও অপরটি যোগ। সাংখ্যযোগ বা সংক্ষেপে সাংখ্য, কর্ম্মযোগ বা সংক্ষেপে যোগ—এই দুই শব্দের উল্লেখ গীতার বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, বুদ্ধিযোগ ইত্যাদিতে যে "যোগ" শব্দ আছে তাহার অর্থ উপায় বা প্রয়োগ। ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভক্তি যেখানে সাধনের উপায়, ইত্যাদি। এই হিসাবে হঠযোগ ইত্যাদি যোগরূপ বিশেষ মার্গকে যোগ-যোগ বলা যাইতে পারে, যদিও একথার প্রচলন নাই। গীতাকার সাংখ্য এবং যোগ শব্দে ঠিক কোন্ কোন্ মার্গ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিচার্য্য। অধুনা সাংখ্য বলিলে লোকে চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমন্বিত কাপিল সাংখ্য-শাস্ত্রই বুঝেন, এবং যোগ বলিলে পাতঞ্জল যোগ বা হঠযোগ বুঝায়। গীতায় ১০।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে কপিলের নাম করিয়াছেন এবং ১৩।৫ শ্লোকে কাপিল সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে; কাপিল সাংখ্যের নিজস্ব ত্রিগুণবাদ শ্রীকৃষ্ণ মানিয়া লইয়াছেন। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে, কাপিল সাংখ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কৃষ্ণের সাংখ্য কাপিল সাংখ্য—এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্য কথার দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখা যায়, যথা—জ্ঞাতব্য পদার্থের যে শাস্ত্রে "সংখ্যা" বিচার হয় তাহাই সাংখ্য, এই অর্থে কাপিল সাংখ্যের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। আর এক ব্যুৎপত্তি, যাহাতে বস্তুতত্ত্ব বা পরমার্থতত্ত্ব "সম্যক্ খ্যায়তে" অর্থাৎ সম্যকরূপে প্রকাশিত হয়, সেই শাস্ত্রই সাংখ্য। এই ব্যুৎপত্তিতে সংখ্যা-গণনার উপর জোর দেওয়া হয় নাই। যে-কোন দার্শনিক আলোচনাই এই হিসাবে সাংখ্যশাস্ত্র। এই ব্যুৎপত্তি মানিলে সাংখ্যযোগ ও জ্ঞানযোগের একই অর্থ হয়। কাপিল শাস্ত্রও জ্ঞানযোগের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাই একমাত্র সাংখ্যশাস্ত্র নহে। শঙ্করাচার্য্য ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ সুবিধামত কোথাও প্রথম অর্থ

গিয়ে—উনিশ সন ত কালকের কথা, হুবহু আকবর বাদশার দলিল বানিয়ে দেবে, আসল নকল চেনা যায় না—

বস্তুতঃ ধনঞ্জয়ের পর অন্যান্য সাতজনের কাগজপত্র তলব করিয়া দেখা গেল, ভজহরি মিথ্যা বলে নাই—ঐ রকম পুরাণো দলিল সকলেরই আছে। এবং বাঁধুনীও প্রত্যেকটির এমনি নিখুঁত যে যখনই যাহার কাগজ দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ বুঝিয়া যায় রাজারামের গড়ের মালিক একমাত্র সেই লোকটাই। এ যেন গোলক ধাঁধায় পড়িয়া গেল। বিস্তর ভাবিয়া-চিন্তিয়াও সাব্যস্ত হইল না কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখা যায়।

হাল ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে শঙ্কর বলিল—দেখুন মশাইরা, আপনারা ভদ্রসন্তান—

হাঁ—হাঁ—করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

এই একটা প্লট একসঙ্গে ঐরকম ভাবে আটজনের ত হ'তে পারে না?

সকলেই ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ—নয়ই ত—

—আপনারা হলপ করে' বলুন এর সত্যি মালিক কে—

ভদ্রসন্তানেরা তাহাতে পিছপাও নহেন। একে একে সামনে আসিয়া ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিল—দু'শ' বারোর প্লট একমাত্র তাহারই, অপর সকলে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছে।

লোকজন বিদায় হইয়া গেলে শঙ্কর বলিল—না এরা পাটোয়ারী বটে—দেখে শুনে সম্ভ্রম হচ্ছে—

ভজহরি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এরকম সে অনেক দেখিয়াছে।

শঙ্কর বলিতে লাগিল—তোমার কথাই মেনে নিলাম যে কাঁচা দলিলগুলো জাল। কিন্তু যে গুলো রেজেষ্ট্রী? দেখ, এদের দূরদৃষ্টি কত দেখ একবার—কবে কি হবে দুপুরুষ আগে থেকে তাই তৈরী হয়ে আসছে। চুলোয় যাকগে দলিল-পত্তোর—তুমি গাঁয়ে খোঁজ খবর করে' কি পেলে বল? যা হোক একরকম রেকর্ড করে' যাই—পরে যেমন হয় হোকগে—

ভজহরি বলিল—কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আসবার আগে কত সাক্ষীসাবুদ তলব করেছি, সে আরও মজা—এক একজনে এক এক রকম বলে—বলিয়া সহসা প্রচুর হাসিতে হাসিতে বলিল—নরলোকে আস্কারা হ'ল না, এখন একবার কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে' জিজ্ঞাসা করতে পারলে হয়—

শঙ্কর কথাটা বুঝিতে পারিল না।

ভজহরি বলিতে লাগিল—কুমার বাহাদুর মানে জানকীরাম। সেই যে তখন ময়ূরপঙ্খীর কথা বলছিলাম, গাঁয়ের লোকেরা বলে আশপাশের গ্রাম নিশুতি হয়ে গেলে জানকীরাম নাকি আসেন—উত্তর মাঠের ঐ নাককাটার খাল পেরিয়ে তেঘরা-বকচরের দিক থেকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রোজ রাত্তিরে মালতীমালার সঙ্গে দেখা করে' যান—সে ভারী অদ্ভুত গল্প,—কাজ কর্ম নেইত এখন?

* * *

তারপর রাত্রি অনেক হইল। তিনটি তাঁবুরই আলো নিভিয়াছে, কোনদিকে সাড়াশব্দ নাই। শঙ্করের ঘুম আসিতেছিল না। একটা চুরুট ধরাইয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া মাঠে খানিক পায়চারী করিতে লাগিল।

ভজহরি বলিয়াছিল—কেবল জঙ্গল নয় হুজুর, এই মাঠেও সন্ধ্যের পর একলা একলা কেউ আসে না। এই মাঠ সেই যুদ্ধক্ষেত্র, নদীপথে শত্রুরা এসেছিল। বেলা না ডুবতে রাজারামের পাঁচ শ' ঢালী ঘায়েল হয়ে' গেল, সেই পাঁচশ' মড়ার পা ধরে টেনে টেনে পরদিন ঐ নদীতে ফেলে দিয়েছিল···

উলুঘাসের উপর পা ছড়াইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া শঙ্কর আনমনে ক্রমাগত চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

চার শ' বছর আগে আর একদিন সন্ধ্যায় গ্রামনদী-কূলবর্ত্তী এই মাঠের উপর এমনি চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়া সমস্ত মাঠে ভয়াবহ শান্তি থম-থম করিতেছে। চাঁদের আলোয় স্তব্ধ রণভূমির প্রান্তে জানকীরামের জ্ঞান ফিরিল। দূরে গড়ের প্রাকারে সহস্র সহস্র মশালের আলো···আকাশ চিরিয়া শত্রুর অশ্রান্ত

জয়োল্লাস···দুই হাতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে জানকীরাম উঠিয়া বসিয়া তাঁহারই অনেক আশা ও ভালবাসার নীড় ঐ গড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে অকস্মাৎ দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। ললাটের রক্তধারা ডান হাতে মুছিয়া ফেলিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকটি শিয়াল নিঃশব্দে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোন দিকে কেহ নাই···

সেই সময়ে ওদিকে অন্দরের বাতায়ন পথে তাকাইয়া মালতীমালাও চমকিয়া উঠিলেন, তবে কি একেবারেই—? অবমানিত রাজপুরীর উপরেও গাঢ় নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে! দাসী বিবর্ণমুখে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতীমালা আয়ত কালো চোখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—শেষ ?—

খবর আসিল, গুপ্তদ্বার খোলা হইয়াছে, পরিজনেরা সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দাসী বলিল—বউমা, উঠুন—

বধূ বলিলেন—নৌকা সাজানো হোক্—

কেহ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। নদীর ঘাটে শত্রুর বহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে সন্ধানী-দৃষ্টি ভেদ করিয়া জলপথে পলাইবার সাধ্য কি!

মালতীমালা বলিলেন—নদীর ঘাটে নয় রে, দীঘির ময়ূরপঙ্খীখানা সাজাতে হুকুম দিয়েছি। খবর নিয়ে আয় হ'ল কি না—

সেদিন সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে কনকচাঁপা গাছে যে কয়টি ফুল ফুটিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া আনা হইল, মালতীমালা লোটন খোপা ঘিরিয়া তার কতগুলি বসাইলেন, বাকীগুলি আঁচল ভরিয়া লইলেন। সাধের মুক্তাফল দু'টি কাণে পরিলেন, পায়ে আলতা দিলেন, মাথায় উজ্জ্বল সিঁদুর পরিয়া কত মনোরম রাত্রির ভালবাসার স্মৃতিমণ্ডিত ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে গিয়া বসিলেন।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে অনেকদূর গেল। তখন বিজয়ীরা গড়ে ঢুকিয়াছে, দীঘির পাড় দিয়া দলে দলে রক্ত পতাকা উড়াইয়া জনমানবশূন্য প্রাসাদে ঢুকিতে লাগিল। সমস্ত পুরবাসী গুপ্তপথে পলাইয়াছে।

বিশ পঁচিশটি মশালের আলো দীঘির জলে পড়িল।

—ধর, ধর নৌকো—

মালতীমালা তলীর পাটাখানি খুলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দীর্ঘমাস্তলটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নৌকা কেহ ধরিতে পারিল না, কেবল কেমন করিয়া কোন ফাঁক দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল আঁচলের চাঁপাফুল কয়েকটি—

তারপর ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হইয়া গড়ের উঁচু চূড়ার আড়ালে চাঁদ ডুবিল। আকাশে কেবল উজ্জ্বল তারা কয়েকটি পরাজিত বিগত-গৌরব ভগ্নজানু জানকীরামের ধূলিশয্যার উপর নির্নিমেষ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া ছিল। সেই সময়ে কে-একজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিল।

—চলুন, প্রভু—

—কোথা ?

—বটতলায়। ওখানে ঘোড়া রেখেছি, ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে যাব—

—গড়ের আর-আর সব ?

বিশ্বস্ত পরিচারক গড়ের ঘটনা কহিল। বলিল—কোন চিহ্ন নেই আর, জলের উপরে কনকচাঁপা ছাড়া—

কই ? বলিয়া জানকীরাম হাত বাড়াইলেন। বলিলেন—আন্তে পার নি ? ঘোড়ায় তুলে' দিতে পার আমায় ? দাও না আমায় তুলে দয়া করে'—আমি একটা ফুল আনব শুধু—

নিষেধ মানিলেন না। খট-খট করিয়া সেই অন্ধকারে উত্তরমুখো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিল। সকালে দেখা গেল, পরিখার মধ্যে যেখানে আজকাল ধান হইয়া থাকে জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া আছেন, ঘোড়ার কোন সন্ধান নাই।

সেই হইতে নাকি প্রতিরাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। রাতদুপুরে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মধ্য-আকাশে আসিয়া পৌছায়, আশপাশের গ্রামগুলিতে নিষুপ্তি ক্রমশঃ গাঢ়তম হইয়া ওঠে, সেই সময়ে রাতের পর রাত ঐ গভীর নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে চার শ' বছর আগেকার সেই রাজবধূ পদ্মদীঘির হিমশীতল অতল জলশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া

দাঁড়ান। ভাঙা ঘাটের সোপান বহিয়া বিড়ালআঁচড়ার গভীর কাঁটাবন দুইহাতে ফাঁক করিয়া সাবধানে লঘুচরণ ফেলিয়া তিনি ক্রমশঃ আগাইতে থাকেন। তবু বনের একটানা ঝিঁঝির আওয়াজের সঙ্গে পায়ের নূপুর ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া ওঠে কুঙ্কুমে-মাজা মুখ, গায়ে শ্বেতচন্দন আঁকা, সিঁথায় সেই চার শতাব্দী আগেকার সিঁদুর লাগানো, পায়ে রক্তবরণ আলতা, অঙ্গের চিত্র-বিচিত্র কাঁচলী ও মেঘডম্বুর সাড়ী হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া বনভূমি সিক্ত করে। বনের প্রান্তে আমের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দক্ষিণের মাঠে তিনি তাকাইয়া থাকেন···

আবার বর্ষায় যখন ঐ গড়খাই কানায় কানায় একেবারে ভরিয়া যায়, ঘোড়া তখন জল পার হইয়া বনের সামনে পৌঁছিতে পারে না, মালতীমালা সেই কয়েকটা মাস আগাইয়া ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। দূর সব ধানের সুগন্ধি ক্ষেতের পাশে পাশে ভিজা আলের উপর হিম-রাত্রির শিশিরে পায়ের আলতার অস্পষ্ট ছোপ লাগে, চাষারা সকাল বেলা দেখিতে পায় কিন্তু রোদ উঠিতে না উঠিতে সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায়।

চুরুটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মাঠের ওদিকে মুচিপাড়ায় গোয়ালগাদা, খোড়োঘর, নূতন-বাঁধা গোলাগুলি কেমন বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈত্রমাসের সুশুভ্র জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা আবছা বনের দিকে চাহিতে চাহিতে চারিদিককার সুপ্তিরাজ্যের মাঝখানে বিকালের দেখা সেই সাধারণ বন হঠাৎ অপূর্ব্ব রহস্যময় বলিয়া ঠেকিল। ঐ খানে এমনি সময়ে বিস্মৃত যুগের বধূ তাকাইয়া আছে, নায়ক তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই দিকে যাইতেছে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয় সন্ধ্যাকালে ওখানে সে যে অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ জঙ্গলের সে রূপ বদলাইয়া গিয়াছে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আজও যাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই তাহারই কোন একটা অপূর্ব্ব ছন্দ-সঙ্গীতময় গুপ্তরহস্য এতক্ষণ ওখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সুধারাণীর কথা মনে পড়িল···সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনদিন সে আর আসিবে না!

ক্রমশঃ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল—সে দিনের সেই সুধারাণী, তার হাসি চাহনী, তার ক্ষুদ্রহৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্য্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনখানে সজীব হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। এ সব জনহীন বনে জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা সুধারাণী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসি-কান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। উদ্‌গত হইয়া সেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপি টিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারাণী এমনি কোনখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, আদর করিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিলাইয়া পলাইয়া গিয়াছে।

বটতলায় বটের ঝুরির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঐখানে আপততঃ আস্তাবলের কাজ চলিতেছে, পৃথক ঘর আর বাঁধা হয় নাই। নিজে নিজেই জিন কষিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শঙ্কর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া ছুটিল। সুপ্ত গ্রামের দিকে চাহিয়া অনুকম্পা হইতে লাগিল—মূর্খ তোমরা, জঙ্গলের বড় বড় কাঁঠাল গাছগুলাই তোমাদের কেবল নজরে পড়িল এবং গাছ মারিয়া তক্তা কাটাইয়া দু'পয়সা পাইবার লোভে এত মোকদ্দমা-মামলা করিয়া মরিতেছ, গভীর নিঝুম রাত্রে ছায়ামগ্ন সেই আম-কাঁঠাল-পিপ্পিরাজের বন, সমস্ত ঝোপ ঝাড় জঙ্গল, পঙ্কদীঘির এপার-ওপার যাঁদের রূপের আলোয় আলো হইয়া যায়, এতকাল পাশাপাশি বাস করিলে একটা দিন তাঁদের খবর লইতে পারিলে না!

জয়োল্লাস···দুই হাতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে জানকীরাম উঠিয়া বসিয়া তাঁহারই অনেক আশা ও ভালবাসার নীড় ঐ গড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে অকস্মাৎ দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। ললাটের রক্তধারা ডান হাতে মুছিয়া ফেলিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকটি শিয়াল নিঃশব্দে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোন দিকে কেহ নাই···

সেই সময়ে ওদিকে অন্দরের বাতায়ন পথে তাকাইয়া মালতীমালাও চমকিয়া উঠিলেন, তবে কি একেবারেই—? অবমানিত রাজপুরীর উপরেও গাঢ় নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে! দাসী বিবর্ণমুখে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতীমালা আয়ত কালো চোখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—শেষ?—

খবর আসিল, গুপ্তদ্বার খোলা হইয়াছে, পরিজনেরা সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দাসী বলিল—বউমা, উঠুন—

বধূ বলিলেন—নৌকা সাজানো হোক্—

কেহ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। নদীর ঘাটে শত্রুর বহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে সন্ধানী-দৃষ্টি ভেদ করিয়া জলপথে পলাইবার সাধ্য কি!

মালতীমালা বলিলেন—নদীর ঘাটে নয় রে, দীঘির ময়ূরপঙ্খীখানা সাজাতে হুকুম দিয়েছি। খবর নিয়ে আয় হ'ল কি না—

সেদিন সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে কনকচাঁপা গাছে যে কয়টি ফুল ফুটিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া আনা হইল, মালতীমালা লোটন খোঁপা ঘিরিয়া তার কতগুলি বসাইলেন, বাকীগুলি আঁচল ভরিয়া লইলেন। সাধের মুক্তাফল দু'টি কাণে পরিলেন, পায়ে আলতা দিলেন, মাথায় উজ্জ্বল সিঁদুর পরিয়া কত মনোরম রাত্রির ভালবাসার স্মৃতিমণ্ডিত ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে গিয়া বসিলেন।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে অনেকদূর গেল। তখন বিজয়ীরা গড়ে ঢুকিয়াছে, দীঘির পাড় দিয়া দলে দলে রক্ত পতাকা উড়াইয়া জনমানবশূন্য প্রাসাদে ঢুকিতে লাগিল। সমস্ত পুরবাসী গুপ্তপথে পলাইয়াছে। বিশ পঁচিশটি মশালের আলো দীঘির জলে পড়িল।

—ধর, ধর নৌকো—

মালতীমালা তলীর পাটাখানি খুলিয়া দিলেন' দেখিতে দেখিতে দীর্ঘমাস্তলটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নৌকা কেহ ধরিতে পারিল না, কেবল কেমন করিয়া কোন ফাঁক দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল আঁচলের চাঁপাফুল কয়েকটি—

তারপর ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হইয়া গড়ের উঁচু চূড়ার আড়ালে চাঁদ ডুবিল। আকাশে কেবল উজ্জ্বল তারা কয়েকটি পরাজিত বিগত-গৌরব ভগ্নজানু জানকীরামের ধূলিশয্যার উপর নির্নিমেষ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া ছিল। সেই সময়ে কে-একজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিল।

—চলুন, প্রভু—

—কোথা?

—বটতলায়। ওখানে ঘোড়া রেখেছি, ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে যাব—

—গড়ের আর-আর সব?

বিশ্বস্ত পরিচারক গড়ের ঘটনা কহিল। বলিল—কোন চিহ্ন নেই আর, জলের উপরে কনকচাঁপা ছাড়া—

কই? বলিয়া জানকীরাম হাত বাড়াইলেন। বলিলেন—আন্‌তে পার নি? ঘোড়ায় তুলে' দিতে পার আমায়? দাও না আমায় তুলে দয়া করে'—আমি একটা ফুল আন্‌ব শুধু—

নিষেধ মানিলেন না। খট-খট করিয়া সেই অন্ধকারে উত্তরমুখো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিল। সকালে দেখা গেল, পরিখার মধ্যে যেখানে আজকাল ধান হইয়া থাকে জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া আছেন, ঘোড়ার কোন সন্ধান নাই।

সেই হইতে নাকি প্রতিরাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। রাতদুপুরে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মধ্য-আকাশে আসিয়া পৌঁছায়, আশপাশের গ্রামগুলিতে নিষুপ্তি ক্রমশঃ গাঢ়তম হইয়া ওঠে, সেই সময়ে রাতের পর রাত ঐ গভীর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে চার শ' বছর আগেকার সেই রাজবধূ পদ্মদীঘির হিমশীতল অতল জলশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া

দাঁড়ান। ভাঙা ঘাটের সোপান বহিয়া বিড়ালআঁচড়ার গভীর কাঁটাবন দুইহাতে ফাঁক করিয়া সাবধানে লঘুচরণ ফেলিয়া তিনি ক্রমশঃ আগাইতে থাকেন। তবু বনের একটানা ঝিঁঝির আওয়াজের সঙ্গে পায়ের নূপুর ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া ওঠে…কুঙ্কুমে-মাজা মুখ…গায়ে শ্বেতচন্দন আঁকা…সিঁথায় সেই চার শতাব্দী আগেকার সিঁদুর লাগানো…পায়ে রক্তবরণ আলতা, অঙ্গের চিত্র-বিচিত্র কাঁচলী ও মেঘডম্বুর সাড়ী হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া বনভূমি সিক্ত করে…বনের প্রান্তে আমের গুড়ি ঠেস দিয়া দক্ষিণের মাঠে তিনি তাকাইয়া থাকেন…

আবার বর্ষায় যখন ঐ গড়খাই কানায় কানায় একেবারে ভরিয়া যায়, ঘোড়া তখন জল পার হইয়া বনের সামনে পৌছিতে পারে না, মালতীমালা সেই কয়েকটা মাস আগাইয়া ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। দুধ-সর ধানের সুগন্ধি ক্ষেতের পাশে পাশে ভিজা আলের উপর হিম-রাত্রির শিশিরে পায়ের আলতার অস্পষ্ট ছোপ লাগে, চাষারা সকাল বেলা দেখিতে পায় কিন্তু রোদ উঠিতে না উঠিতে সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায় …

চুরুটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মাঠের ওদিকে মুচিপাড়ায় পোয়ালগাদা, গোড়োঘর, নূতন-বাঁধা গোলাগুলি কেমন বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈত্রমাসের সুশুভ্র জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা আবছা বনের দিকে চাহিতে চাহিতে চারিদিক-কার সুপ্তিরাজ্যের মাঝখানে বিকালের দেখা সেই সাধারণ বন হঠাৎ অপূর্ব্ব রহস্যময় বলিয়া ঠেকিল। ঐ খানে এমনি সময়ে বিস্মৃত যুগের বধূ তাকাইয়া আছে, নায়ক তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই দিকে যাইতেছে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয় সন্ধ্যাকালে ওখানে সে যে অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ জঙ্গলের সে রূপ বদলাইয়া গিয়াছে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আজও যাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই তাহারই কোন একটা অপূর্ব্ব ছন্দ-সঙ্গীতময় গুপ্তরহস্য এতক্ষণ ওখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সুধারাণীর কথা মনে পড়িল…সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনদিন সে আর আসিবে না!

…ক্রমশঃ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল—সে দিনের সেই সুধারাণী, তার হাসি চাহনী, তার ক্ষুদ্রহৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্য্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনখানে সজীব হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। ঐ সব জনহীন বনে জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা সুধারাণী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসি-কান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। তদ্গত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপি টিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারাণী এমনি কোনখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, আদর করিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিলাইয়া পলাইয়া গিয়াছে।…

বটতলায় বটের ঝুরির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঐখানে আপততঃ আস্তাবলের কাজ চলিতেছে, পৃথক ঘর আর বাঁধা হয় নাই। নিজে নিজেই জিন কষিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শঙ্কর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া ছুটিল। সুপ্ত গ্রামের দিকে চাহিয়া অনুকম্পা হইতে লাগিল—মূর্খ তোমরা, জঙ্গলের বড় বড় কাঁঠাল গাছগুলাই তোমাদের কেবল নজরে পড়িল এবং গাছ মারিয়া তক্তা কাটাইয়া দু'পয়সা পাইবার লোভে এত মোকদ্দমা-মামলা করিয়া মরিতেছ, গভীর নিঝুম রাত্রে ছায়ামগ্ন সেই আম-কাঁঠাল-পিত্তিরাজের বন, সমস্ত ঝোপ ঝাড় জঙ্গল, পদ্মদীঘির এপার-ওপার যাঁদের রূপের আলোয় আলো হইয়া যায়, এতকাল পাশাপাশি বাস করিলে একটা দিন তাঁদের খবর লইতে পারিলে না!

গড়খাই পার হইয়া বনের সামনে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। একটা গাছের ডালে লাগাম বাঁধিয়া শঙ্কর আমিনদের সেই জঙ্গল-কাটা সঙ্কীর্ণ পথের উপর আসিল। প্রবেশ-মুখের দুইধারে দুইটি অতিবৃহৎ শিরীষ গাছ, বিকালে ভজহরির সঙ্গে কথায় কথায় এসব নজরে পড়ে নাই, এখন বোধ হইল মায়াপুরীর সিংহদ্বার উহারা! সেইখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে সেই ছায়াময় নৈশ বনভূমি দেখিতে লাগিল। আর তাহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না, মৃত্যু-পারের গুপ্ত রহস্য আজি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে ঐখান হইতে নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে পারিবে। আমাদের জন্মের বহুকাল আগে এই সুন্দরী পৃথিবীকে যারা ভোগ করিত বর্ত্তমান কালের দুঃসহ আলো হইতে তারা সব তাদের অদ্ভুত রীতি-নীতি বীর্য্য ঐশ্বর্য্য প্রেম লইয়া সৌরালোকবিহীন ঐ বন-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। আজ জনহীন মধ্য-রাত্রে যদি এই সিংহ-দ্বারে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাক দেওয়া যায় শতাব্দী-পারের বিচিত্র মানুষেরা অন্ধকারের যবনিকা তুলিয়া নিশ্চয় চাহিয়া দেখিবে।

কয়েক পা আগাইতে অসাবধান পায়ের নীচে শুকনা ডালপালা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যেন মর্ম্মস্থানে বড় ব্যথা পাইয়া বনভূমি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। স্থির গম্ভীর অন্ধকারে নির্নিরীক্ষ সান্ত্রীগণ তাহাকে বাক্যহীন আদেশ করিল—জুতা খুলিয়া এস—

শুকনা পাতা খসখস করিতেছে, চারিপাশে কত লোকের আনাগোনা···জ্যোৎস্নার আলো হইতে আঁধারে আসিয়া শঙ্করের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যেন কিছু দেখিতে পাইতেছে না। মনের ঔৎসুক্যে উদ্বেগাকুল আনন্দে কম্পিতহস্তে পকেট হইতে তাড়াতাড়ি সে টর্চ্চ বাহির করিয়া জ্বালিল।

জ্বালিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—শূন্য বন। বিশ্বাস হইল না, বারম্বার দেখিতে লাগিল।···আর একটা দিনের ব্যাপার শঙ্করের মনে পড়ে। দুপুরবেলা, বিয়ের কয়েকটা দিন পরেই সুধারাণী ও আর কে-কে তার নূতন দামী তাসজোড়া লইয়া চুরি করিয়া খেলিতেছিল। তখন তার আর এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা, সন্ধ্যার আগে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কি গতিকে যাওয়া হইল না। বাহির হইতে খেলুড়েদের খুব হৈ-চৈ শোনা যাইতেছিল; কিন্তু ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে সকলে কোন দিক দিয়া কি করিয়া যে পলাইয়া গেল—শঙ্কর দেখিয়াছিল, কেবল তাসগুলি বিছানার উপর ছড়ানো···

টর্চ্চের আলোয় কাঁটাবনের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে দীঘির সোপানের কাছে গিয়া সে বসিল। জলে জ্যোৎস্না চিক্‌চিক্ করিতেছে। আলো নিভাইয়া চুপটি করিয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল।

ক্রমে চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। কোন দিকে কোন শব্দ নাই, তবু অনুভব হয়—তার চারিপাশের বনবাসীরা ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন এই সময়ে তাহারা একটি অতি দরকারী নিত্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, শঙ্কর যতক্ষণ এখানে থাকিবে ততক্ষণ তা' হইবে না—কিন্তু তাড়া বড্ড বেশী। নিঃশব্দে ইহারা তার চলিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে।

হঠাৎ কোনদিক হইতে হুহু করিয়া হাওয়া বহিল, এক মুহূর্ত্তে মর্ম্মরিত বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা এইবার যেন আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ এদিকে কোন কিছুর জোগাড় নাই। চারিদিকে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। অন্ধকার রাত্রির পদধ্বনির মত সহস্রে সহস্রে ছুটাছুটি করিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে কম্পমান ক্ষীণ জ্যোৎস্না, সে যেন মহামহিমার্ণব যাহারা সব আসিয়াছে তাহাদের সঙ্গের সিপাহীসৈন্যের বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলা। নিঃশব্দচারীরা অঙ্গুলিসঙ্কেতে শঙ্করকে দেখাইয়া দেখাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল—এ কে? এ কোথাকার কে—চিনি না ত!

উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রবণশক্তি দিয়া শঙ্কর আরও যেন শুনিতে লাগিল, কিছুদূরে সর্ব্বশেষ সোপানের নীচে কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। কণ্ঠ অনতিস্ফুট, কিন্তু চাপা কান্নার মধ্য দিয়া গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত ব্যথা বনভূমির বাতাসের সঙ্গে চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারলিপ্ত প্রেতের মত গাছেরা মুখে আঙুল দিয়া তাহাকে বারম্বার থামিতে ইসারা করিতেছে—

সর্ব্বনাশ করিল, সব জানাজানি হইয়া গেল!···কিন্তু কান্না থামিল না। নিঃশ্বাস রোধ করিয়া ঐ অতল জলতলে চারশ' বছরের জরাজীর্ণ ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে যে মাধুরীমতী রাজবধূ সারাদিনমান অপেক্ষা করে, গভীর রাতে এইবার সে ঘোমটা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া নিত্যকার মত উৎসবে যোগ দিতে চায়। যেখানে শঙ্কর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল, তাহার কিছু নীচে জলে-ডোবা সিঁড়ির ধাপে মাথা কুটিয়া কুটিয়া বোবার মত সে বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল।

তারপর কখন চাঁদ ডুবিয়া দীঘিজল আঁধার হইল, বাতাসও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, গাছের পাতাটিরও কম্পন নাই—কান্না তখনও চলিতেছে। অতিষ্ঠ হইয়া কাহারা দ্রুতহাতে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো পর্দ্দা খাটাইয়া দিতে লাগিল—শঙ্কর বসিয়া থাকে, থাকুক—তাহাকে কিছুই উহারা দেখিতে দিবে না।

আবার টর্চ্চ টিপিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। আলো জ্বালিতে না জ্বালিতে গাছের আড়ালে কি কোথায় সব যেন পলাইয়া গেল, কোনদিকে কিছু নাই।

তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে কহিতে লাগিল—আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি আর কাঁদিও না হে লজ্জারুণা রাজবধূ, মৃণালের মত দেহখানি তুমি দীঘির তল হইতে তুলিয়া ধর, আমি তাহা দেখিব না। অন্ধকার রাত্রি, অনাবিষ্কৃত দেশ, অজ্ঞানিত গিরিগুহা, গভীর অরণ্যভূমি এ'সব তোমাদের। অনধিকারের রাজ্যে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের ব্যাঘাত ঘটাইয়া কাঁদাইয়া গেলাম, ক্ষমা করিও—

যাইতে যাইতে আবার ভাবিল, কেবল এই সময়টুকুর জন্য কাঁদাইয়া বিদায় লইয়া গেলেও না হয় হইত। তাহা ত নয়। সে যে ইহাদের একেবারে উদ্বাস্তু করিতে এখানে আসিয়াছে। জরীপ শেষ হইয়া একজনের দখল দিয়া গেলে বন কাটিয়া লোকে এখানে টাকা ফলাইবে। এত নগর-গ্রাম মাঠ-ঘাটেও মানুষের জায়গায় কুলায় না, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে পৃথিবীতে বন-জঙ্গল এক কাঠা পড়িয়া থাকিতে দিবে না, তাই শঙ্করকে সেনাপতি করিয়া জামিনের দলবল যন্ত্রপাতি নক্সা কাগজ পত্র দিয়া ইহাদের এই শত শত বৎসরের শান্ত নিরিবিলি বাসভূমি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াছে। শাণিত খড়্গের মত ভজহরির সেই সাদা সাদা দাঁত মেলিয়া হাসি—উৎপাত কি আমরা কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে' করে'···

কিন্তু মাথার উপরে প্রাচীন বনস্পতিরা ভ্রূকুটি করিয়া যেন কহিতে লাগিল—তাই পারিবে নাকি কোন দিন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাল ঠুকিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে সামনে ত আগাইতেছ আদিকাল হইতে, পিছনে পিছনে আমরাও তেমনি তোমাদের তাড়াইয়া চলিয়াছি। বন-কাটা রাজ্যে নূতন ঘর তোমরা বাঁধিতে থাক, পুরাণো ঘর-বাড়ী, আমরা ততক্ষণ দখল করিয়া বসিব।···

হা-হা-হা হা-হা তাহাদেরই হাসির মত আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে কালো কালো এক ঝাঁক বাদুড় বনের উপর দিয়া মাঠের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।···

বনের বাহির হইয়া শঙ্কর ঘোড়ায় চাপিল। ঘোড়া আস্তে আস্তে হাঁটাইয়া ফিরিয়া চলিল। পিছনের বনে ডালে ডালে ঝাঁক-বাঁধা জোনাকী, আমের গুটি ঝরিতেছে তার টুপটাপ শব্দ, অজানা ফুলের গন্ধ···বারবার পিছন দিকে সে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল। অনেক দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে, কাহাদের বাড়ীতে আকাশ-প্রদীপ আকাশের তারার সহিত পাল্লা দিয়া দপদপ করিতেছে; এইবার গিয়া সেই নিরালা তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্প খাটটির উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুম দিতে হইবে! যদি এই সময় মাঠের এই অন্ধকারের মধ্যে সুধারাণী আসিয়া দাঁড়ায়···কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, একপিঠে চুল এলাইয়া টিপিটিপি দুষ্টামীর হাসি হাসিতে হাসিতে যদি সুধারাণী ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, দাঁড়াইয়া দুই চোখ ভরিয়া তার দিকে তাকাইয়া থাকে···মাথার উপর তারাভরা আকাশ, কোন দিকে কেউ নাই—ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া

শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিবে, হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে শুনাইয়া দিবে—কি শুনাইবে সে? শুধু তাহাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে—কি করেছি আমি তোমার?…

এই সময়ে হঠাৎ লাফ দিয়া ঘোড়া একটা আ'ল পার হইল। শঙ্করের হুঁশ হইল, এতক্ষণের মধ্যে এখনও গড়খাই পার হয় নাই—জঙ্গল বেড়িয়া ঘোড়া ক্রমাগত ধান-ক্ষেতের উপর দিয়াই চলিয়াছে। জুতা পায়ে জোরে ঠোক্কর দিল, আচমকা আঘাত পাইয়া ঘোড়া ছুটিল। গড়খাইয়ের যেন শেষ নাই, যত চলে ততই ধানবন, দিক ভুল হইয়া গিয়াছে, মাঠে না উঠিয়া ধানবন ঘুরিয়া মরিতেছে। শঙ্করের মনে হইতে লাগিল, যেমন এখানে সে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, ঘোড়াসুদ্ধ তাহাকে ঐ বনের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত রাত ছুটিলেও কেবল বন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—নিষ্কৃতি নাই—গড়খাই পার হইয়া মাঠে পৌছানো রাত পোহাইবার আগে ঘটিবে না। জেদ চাপিয়া গেল, ঘোড়া জোরে—আরও জোরে—বিদ্যুতের বেগে ছুটাইল, ভাবিল এমনি করিয়া সেই অদৃশ্য ভয়ানক বাঁধন ছিঁড়িবে। আর একটা উঁচু আ'ল, অন্ধকারে ঠাহর হইল না, ছুটিতে ছুটিতে হুমড়ি খাইয়া ঘোড়া সমেত তাহার উপর পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, ঘোড়ার পিঠ হইতে ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া আ'লের উপর কে তাহাকে জোরে আছাড় মারিল। তীব্র আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সে নীচে গড়াইয়া পড়িল। ঘোড়াও ভয় পাইয়া গেল, শঙ্করকে মাড়াইয়া ফেলিয়া ঝড়ের মত মাঠে গিয়া উঠিল, শুকনা মাঠের উপর দ্রুতবেগে ক্ষুর বাজিতে লাগিল—খট্‌খট্ খটখট। রাত্রির শেষ প্রহর, আকাশে শুকতারা জলিতেছে। চারশ' বছর আগে যেখানে একদা জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া ছিলেন সেইখানে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, সেই জানকীরাম কোন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া উত্তর মাঠের ওপারে তেঘরা-বকচরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ আঁধার মাঠে ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

বেড়ার ধারের ফুল

শ্রীক্ষিতীশ রায়

বেড়ার ধারের ছোট্ট কাঁটাফুল,
অদেখা সে—না জানে কেউ তারে,
অন্তরালে গোপন-প্রিয়ার মত
জন্ম নিল ছায়ার অন্ধকারে।
আলোর হাসির সঞ্জীবনী
পাবে না ক ফুল
ঝরবে জানি কণ্টকেরি ঘায়
বিফল প্রেমের বেদনাতে
অজানিতা প্রিয়া,
গুমরি' মরে মৃত্যু—তমসায়!*

* ইটালিয়ান হইতে

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

৭

গীতায় বিভিন্ন মার্গ

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই অবতারবাদের কথা আসিয়াছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সংন্যাস ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগমার্গ আলোচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়-সমূহে অন্যান্য বিবিধ মার্গ ও নানা প্রকারের ধর্ম্মবিশ্বাসের উল্লেখ আছে। এই সকল বিভিন্ন নিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত স্মরণ না রাখিলে গীতার উপদেশের তাৎপর্য্য সুগম হইবে না। এজন্য চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা আরম্ভ করার পূর্ব্বেই সংক্ষেপে গীতোক্ত বিভিন্ন মার্গের আলোচনা করিব।

শিক্ষা দীক্ষা ও প্রবৃত্তিভেদে মনুষ্যের নানারূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে আগ্রহ জন্মে। সকল ব্যক্তির পক্ষে একই মার্গের ব্যবস্থা কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। অধিকারভেদে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত। হিন্দুধর্ম্মের উদার উপদেশ এই যে, তুমি যে-কোন মার্গই অবলম্বন কর না কেন, উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সকল মার্গেই কিছু-না-কিছু দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকারভেদ বিচার করিলে কোন মার্গকেই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা যায় না। গীতার বিশেষত্ব এই যে, কোন একটি বিশেষ মার্গ অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গীতাকারের মতে বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিলে সকল মার্গই অন্তিমে পরব্রহ্মে পৌছাইয়া দিবে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এই উদারতা অতুলনীয়। আধুনিক সমাজ-সংস্কারকগণ কোথাও কিছু দূষণীয় দেখিলে সেই প্রথার সমূল উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, মানুষ যে ভ্রান্ত আচরণ করে তাহার মূলে কোন-না-কোন দুর্লঙ্ঘ্য প্রেরণা আছে। এইজন্যই কুপ্রথার উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইলে উপদেশের দ্বারা বা বলপূর্ব্বক নিরোধের দ্বারা সম্যক্ ফললাভ হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস—তাহা অন্ধবিশ্বাসই হউক বা যুক্তিযুক্তই হউক—মানিয়া লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক মার্গের আলোচনা শ্রীকৃষ্ণ এমনই সুনিপুণভাবে করিয়াছেন যে, সেই মার্গের দোষ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহাই সাধকের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইয়া উঠিয়াছে; তন্মার্গাবলম্বীর আপত্তি করিবারও কিছুই রাখেন নাই। এইজন্যই গীতা সকল মার্গের উপাসকদিগের পক্ষেই আদরণীয়। প্রত্যেক অন্ধবিশ্বাসের যে মূল্য আছে এবং তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত থাকে তাহার দ্বারাই মানুষ উন্নত হইতে পারে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারমর্ম্ম। কোন ধর্ম্মমতের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আত্যন্তিক বিরোধ নাই। এভাবে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা আর কুত্রাপি দেখা যায় না, এবং শ্রীকৃষ্ণের মত উদারচেতা সংস্কারকও আর কেহই জন্মেন নাই।

গীতাকার তৎকাল-প্রচলিত প্রায় সকল মার্গেরই অল্পস্বল্প আলোচনা করিয়াছেন। এইজন্য গীতার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তৎকালে যে-সকল মার্গ প্রচলিত ছিল সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ও পরে প্রত্যেক মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামতের উল্লেখ করিব। ইহা পাঠ করিলে, পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহার মর্ম্ম পরিস্ফুট হইবে। আধুনিক যুগে জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ খ্রীষ্টধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আলোচনা করিতেন। এমন কি সহজিয়াবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম তাঁহার আলোচনায় বাদ যাইত না। কেন একথা বলিতেছি পরে তাহা পরিস্ফুট হইবে। অনুমান করা যায় যে, তৎকাল-প্রচলিত কোন বিশিষ্ট মার্গই গীতায় বাদ পড়ে নাই।

গীতায় নিম্নলিখিত মার্গ ও ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।—সাংখ্যযোগ, সংন্যাস, কর্ম্মযোগ, যোগ, যজ্ঞ, বুদ্ধিযোগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, ইন্দ্রিয়-নিরোধ, ব্রহ্মচর্য্য, কর্ম্ম সংযম, তপ, বেদপাঠ, প্রাণায়াম, উপবাস, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, দান, অন্তকালে ব্রহ্মস্মরণ, অবতারবাদ, পুনর্জন্মবাদ, ওঙ্কারের

ধ্যান, অহোরাত্রবিদ্যা, অধ্যাত্ম-অধিদৈব-অধিযজ্ঞবাদ, দেবতাপূজা, পিতৃপূজা, ভূতপূজা, যক্ষপূজা, পত্রপুষ্পফলজল ইত্যাদি উপচারে পূজা, মন্ত্র, ঔষধ, রাজবিদ্যা।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিসমূহ বিচার করিলে অনুমান হয় যে, তখনকার দিনে যজ্ঞেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলন ছিল এবং যজ্ঞকার্য্যে নানা রাজসিকতা ও তামসিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। এইজন্যই কি করিয়া নিষ্কামচিত্তে যজ্ঞ আচরণ করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ বার-বার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। দান ও তপস্যারও অপব্যবহার লক্ষিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ, দান, তপকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়াছেন ও দোষ পরিহারের জন্য সাত্বিকভাবে আচরণের উপদেশ দিয়াছেন। যাগ যজ্ঞ দান ধ্যানের আচরণ প্রধান সাধনা হিসাবে তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এইজন্য এই কয়টি কথার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। পূজা অর্চ্চনা সমধিক প্রচলিত ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ মাত্র এক শ্লোকে তাঁহার কথা শেষ করিয়াছেন। হঠযোগ প্রাণায়াম ইত্যাদিরও বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। এখনকার মত তখনও কেহ কেহ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন। তখনকার দিনে এমন কতকগুলি মার্গের প্রচলন ছিল যাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, যথা অহোরাত্র বিদ্যা। তখনও লোকে ভূতপ্রেতের পূজা করিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই কথা গীতায় নাই। জৈন ও বৌদ্ধবাদ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। যে-গীতাকার ভূতপ্রেত পূজাও বাদ দেন নাই, তিনি যে লোকপ্রচলিত থাকিলে এত বড় একটা কথা বাদ দিবেন, তাহা মনে হয় না। ১৬।২ শ্লোকে অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগের পর পর উল্লেখ আছে এবং ইহাদিগকে শান্তি, পরনিন্দা—বর্জ্জন ইত্যাদি গুণের সহিত দৈবী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ উপদেশের মধ্যেও অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগের পর পর উল্লেখ দেখা যায়। গীতাকারের মনে এই সম্পর্কে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা উঠিয়াছিল কি না বলা যায় না। তিলক বলেন, বৌদ্ধগ্রন্থের এই সব কথা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভজন নামগান ইত্যাদির বহুল প্রচার হইয়াছে। গীতায় এ সকলের উল্লেখ নাই।

ব্রহ্মলাভের দুই উপায়।—ব্রহ্মলাভের দুই প্রকার উপায় প্রচলিত আছে। এক সাংখ্য ও অপরটি যোগ। সাংখ্যযোগ বা সংক্ষেপে সাংখ্য, কর্ম্মযোগ বা সংক্ষেপে যোগ—এই দুই শব্দের উল্লেখ গীতার বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, বুদ্ধিযোগ ইত্যাদিতে যে "যোগ" শব্দ আছে তাহার অর্থ উপায় বা প্রয়োগ। ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভক্তি যেখানে সাধনের উপায়, ইত্যাদি। এই হিসাবে হঠযোগ ইত্যাদি যোগরূপ বিশেষ মার্গকে যোগ-যোগ বলা যাইতে পারে, যদিও একথার প্রচলন নাই। গীতাকার সাংখ্য এবং যোগ শব্দে ঠিক কোন্ কোন্ মার্গ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিচার্য্য। অধুনা সাংখ্য বলিলে লোকে চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমন্বিত কাপিল সাংখ্য-শাস্ত্রই বুঝেন, এবং যোগ বলিলে পাতঞ্জল যোগ বা হঠযোগ বুঝায়। গীতায় ১০।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে কপিলের নাম করিয়াছেন এবং ১৩।৫ শ্লোকে কাপিল সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে; কাপিল সাংখ্যের নিজস্ব ত্রিগুণবাদ শ্রীকৃষ্ণ মানিয়া লইয়াছেন। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে, কাপিল সাংখ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কৃষ্ণের সাংখ্য কাপিল সাংখ্য—এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্য কথার দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখা যায়, যথা—জ্ঞাতব্য পদার্থের যে শাস্ত্রে "সংখ্যা" বিচার হয় তাহাই সাংখ্য, এই অর্থে কাপিল সাংখ্যের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। আর এক ব্যুৎপত্তি, যাহাতে বস্তুতত্ত্ব বা পরমার্থতত্ত্ব "সম্যক্ খ্যায়তে" অর্থাৎ সম্যকরূপে প্রকাশিত হয়, সেই শাস্ত্রই সাংখ্য। এই ব্যুৎপত্তিতে সংখ্যা-গণনার উপর জোর দেওয়া হয় নাই। যে-কোন দার্শনিক আলোচনাই এই হিসাবে সাংখ্যশাস্ত্র। এই ব্যুৎপত্তি মানিলে সাংখ্যযোগ ও জ্ঞানযোগের একই অর্থ হয়। কাপিল শাস্ত্রও জ্ঞানযোগের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাই একমাত্র সাংখ্যশাস্ত্র নহে। শঙ্করাচার্য্য ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ সুবিধামত কোথাও প্রথম অর্থ

কোথাও দ্বিতীয় অর্থ ধরিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যযোগ জ্ঞানযোগ ও সংন্যাসযোগের একই অর্থ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাস সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রজ্যা অবলম্বন। তৃতীয় অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিতেছেন, সাংখ্যানাং অর্থাৎ "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদেব কৃত সংন্যাসানাং বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংস পরিব্রাজকানাং"—যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই বিবাহ না করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা বেদান্ত শাস্ত্রাদির দ্বারা পরমার্থ তত্ত্বের সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমহংস পরিব্রাজকদিগকে সাংখ্য বলা হয়।

২।৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি যে, সাধারণ জ্ঞানিগণের উপদেশকেও শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়াছেন। গীতায় যে-যে শ্লোকে সাংখ্য কথার উল্লেখ ও আলোচনা আছে, সংক্ষেপে তাহার বিচার করিতেছি। ২।৩৯ শ্লোকে আছে, এতক্ষণ তোমাকে সাংখ্যশাস্ত্রানুযায়ী বুদ্ধির কথা বলিতেছিলাম, এইবার যোগানুযায়ী বুদ্ধির কথা শুন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শঙ্করাচার্য্যের অর্থ না মানিয়া সাংখ্য শব্দে সাধারণ জ্ঞানী বুঝিলে তবে পূর্ব্ব শ্লোকগুলির সহিত সঙ্গতি থাকে। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলিতে সাধারণ জ্ঞানীদের উপদিষ্ট স্বর্গাদিলাভ ও ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রভৃতির কথা আছে। ৩।৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, সাংখ্য ও যোগ নামক দুই প্রকার নিষ্ঠা লোকে প্রচলিত আছে। তিনি মাত্র দুই প্রকার নিষ্ঠার কথাই বলিলেন, অতএব বুঝিতে হইবে যে তাবৎ মার্গই এই দুইয়ের মধ্যে কোন-না-কোনটির অন্তর্গত। সাংখ্যকে কেবল কাপিল সাংখ্য বলিয়া ধরিলে অন্যান্য জ্ঞানমার্গের স্থান কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন, "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং" অর্থাৎ সাংখ্যদিগের জ্ঞানই সাধনা, যোগীদিগের কর্ম্মই সাধনা, এখানে জ্ঞান কথায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান সূচিত হইতেছে, কেবল সংখ্যা-সূচক কাপিল শাস্ত্রই বুঝাইতেছে না। এই শ্লোক সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা পরে করিতেছি।

৫।৪,৫।৫ শ্লোকে বলিতেছেন যে, দুই মার্গের একই ফল। এখানেও কাপিল সাংখ্য মাত্রই সূচিত হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। পরবর্ত্তী শ্লোকেই সন্ন্যাসের সহিত যোগের তুলনা আছে, কিন্তু এখানে সন্ন্যাসকে সাংখ্যান্তর্গত একটি বিশেষ মার্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে মনে হয়।

১৩।২৫ শ্লোকে আছে, কেহ ধ্যানের দ্বারা, কেহ সাংখ্যের দ্বারা ও কেহ কর্ম্মযোগের দ্বারা আত্মার দর্শনলাভ করে। সাংখ্যকে কাপিল সাংখ্য বলিলে বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্র বাদ যায়। অতএব সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানশাস্ত্রই সাংখ্যের অন্তর্গত। এই শ্লোকে ধ্যানকে জ্ঞান বা কর্ম্ম মার্গের অন্তর্গত করা হয় নাই, তাহার পৃথক উল্লেখ আছে। কোনও বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শন যেমন জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় বিভাগেই ফেলা যায়, সেইরূপ ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শনও উভয় মার্গেরই অন্তর্ভুক্ত। ধ্যানকে ক্রিয়া বলিয়া ধরিলে ধ্যান কর্ম্মমার্গেরই একটি বিশিষ্ট পন্থা। কিন্তু আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া আত্মদর্শন করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞানেই আসিয়া পৌছিতে হয়। গীতাতে বহুস্থলে আছে যে, বুদ্ধিযোগসমন্বিত কর্ম্মের দ্বারা আত্মোপলব্ধির উপযুক্ত জ্ঞানলাভ হয়। ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় মার্গের চরম অবস্থা। একথা স্বীকার্য্য যে, তাবৎ নিষ্ঠাকে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুই মার্গের মধ্যে ফেলিলে যুক্তিবাদীর কাছে জ্ঞানকে স্বতন্ত্র মার্গ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

১৮।১৩ শ্লোকে আছে যে। "সাংখ্যে কৃতান্তে" কর্ম্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৮।১৯ শ্লোকে আছে, "গুণসংখ্যানে" গুণভেদ হিসাবে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার—তিন তিন বিভাগ করা হয়। এই দুই শ্লোকের 'সাংখ্য কৃতান্ত' ও 'গুণসংখ্যান' কথার অর্থ অধিকাংশ ভাষ্যকার কাপিল সাংখ্য বলিয়া মনে করেন। কাপিল সাংখ্যে যে কোথাও কর্ম্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণের উল্লেখ আছে বা ত্রিবিধ কর্ত্তা ইত্যাদির বর্ণনা আছে আমার তাহা জানা নাই। এই সকল কথা যদি কাপিল শাস্ত্রে না থাকে তবে সাংখ্য অর্থে সাধারণ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। কোন্ কার্য্যের কতগুলি কারণ আছে বা কোন বিশেষ পদার্থকে কয়ভাগে বিভাগ করা যায়, তাহা আমরা সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাই বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারি, ইহার জন্য কাপিল সাংখ্যের সাহায্যের

আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মসিদ্ধির যে পাঁচটি কারণ আছে তাহা সাধারণ বিচারবুদ্ধিতেই বুঝা যাইবে। ২।৪৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায়—১৩।২৫ শ্লোকেরও ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা দ্রষ্টব্য। এই কয়টি শ্লোক ব্যতীত গীতায় আর কোথাও সাংখ্য শব্দের উল্লেখ নাই।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, সাংখ্য মার্গকে জ্ঞানমার্গ বলাই যুক্তিসঙ্গত। কাপিল সাংখ্য এই জ্ঞানমার্গেরই অন্তর্গত। সাংখ্য ও যোগ অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ সাধন গীতারও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতে ব্রহ্মলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৬।১৩ শ্লোকে আছে—

নিত্যোঽ নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

অর্থাৎ, যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনাশীলদের মধ্যে চেতনা, এক হইয়াও যিনি অনেকের কামাবস্তুসমূহ বিধান করেন, সাংখ্য ও যোগাধিগম্য সেই কারণরূপা দেবকে জানিলে সর্ব্বপাশের মোচন হয়। কারণরূপী দেব ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিবার সাংখ্য ও যোগ এই দুই প্রকার সাধনের কথা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মলাভের সাধন কেন দুই প্রকার বলা হইল তাহা বিচার্য্য। জীব যতক্ষণ বহির্জ্জগতের মায়ায় আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ ব্রহ্মদর্শন হয় না। বহির্জ্জগতের স্বরূপ উপলব্ধ হইলে তাহা জীবকে আকৃষ্ট করে না ও তখনই ব্রহ্মদর্শনের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বহির্জ্জগতের সহিত মনুষ্যের দুই প্রকার সম্বন্ধ বর্ত্তমান—এক আদান ও অপরটি প্রদান। একটির দ্বার জ্ঞানেন্দ্রিয়, অপরটির দ্বার কর্ম্মেন্দ্রিয়। বহির্জ্জগৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই প্রতিভাত হয়, এবং আমরা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বহির্জ্জগতকে নিজ আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করি। জ্ঞানেন্দ্রিয় যদি আমাদের বহির্জ্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করাইতে পারে তবে মন অন্তর্মুখ হইয়া ব্রহ্মদর্শন করায়। এইজন্য জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মদর্শন সম্ভব। অপর পক্ষে যদি আমরা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের স্বরূপ জানিতে পারি তাহা হইলেও বহির্জ্জগতের সহিত সম্পর্কের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ও তখন ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয়। যে-সমস্ত মার্গে জ্ঞানের প্রাধান্য আছে সে-সমস্তই সাংখ্যের অন্তর্গত। আর যাহাতে কর্ম্মের প্রাধান্য আছে তাহাই যোগের অন্তর্গত। কর্ম্মের দ্বারা আমাদের বহির্জ্জগতের সহিত বস্তুগত সংযোগ হয় বলিয়াই এই মার্গকে যোগ বলা হয়। কাপিল সাংখ্য যেমন সাংখ্য মার্গের অন্তর্গত, সেইরূপ পাতঞ্জল যোগও যোগমার্গের অন্তর্গত। গীতায় পাতঞ্জলযোগ, বুদ্ধিযোগ ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মপ্রধান ব্রহ্মলাভের উপায়কে যোগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বহির্জ্জগতের সহিত আদান-প্রদানের যেমন দুই ভিন্ন তিন মার্গ নাই, তেমনি ব্রহ্মলাভেরও দুই ভিন্ন তিন মার্গ নাই। এইজন্য শ্বেতাশ্বতরে ব্রহ্মকে সাংখ্যযোগাধিগম্য বলা হইয়াছে।

গীতায় যে-সকল নিষ্ঠা বা সাধনের উল্লেখ আছে তাহা জ্ঞান বা কর্ম্মের প্রাধান্য হিসাবে এই দুই বিভাগে ফেলা যায়।

সাংখ্যমার্গ:—সংন্যাস, কাপিল সাংখ্য, অন্তকালে ব্রহ্মস্মরণ, ওঁকারের ধ্যান, ধ্যান বা আত্মার স্বরূপ চিন্তন, অবতারবাদ, অহোরাত্র বিদ্যা, অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞবাদ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবাদ।

যোগমার্গ:—পাতঞ্জল যোগ, প্রাণায়াম, যজ্ঞ, ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, তপ, বেদপাঠ, উপবাস, দান, দেবতাপূজা, পিতৃপূজা, ভূতপ্রেত পূজা, পত্রপুষ্প ইত্যাদি উপচারে পূজা, মন্ত্র, ঔষধ, রাজবিদ্যা।

সাংখ্য ও যোগ মার্গান্তর্গত সাধনপদ্ধতিগুলির যে-বিভাগ উপরে দেখান হইল তাহা নির্দ্দোষ নহে। এমন অনেক মার্গ আছে—যথা ইন্দ্রিয়সংযম বা ইন্দ্রিয়প্রত্যাহার—যাহা দুই মার্গের মধ্যেই পড়িতে পারে; ধ্যান সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে। সাংখ্য ও যোগমার্গকে সাধারণ ভাবেই পৃথক বলা যাইতে পারে; শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন, অর্ব্বাচীনগণই এই দুই মার্গের পার্থক্য দেখে; জ্ঞানিগণের নিকট এই দুই মার্গই এক (৫।৪-৫)। কৃষ্ণের মতে উপযুক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে যে জ্ঞান জন্মে তাহাতেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞানেই মুক্তি অর্থাৎ মুক্তি সাংখ্যলভ্য, কিন্তু জ্ঞান কর্ম্মলভ্য, অতএব এই দুই মার্গকে পৃথক করা যায় না। কর্ম্ম নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়া কেবল জ্ঞানের চর্চ্চা সম্ভব নহে; জ্ঞানমার্গেও কর্ম্মত্যাগ হয় না।

গীতোক্ত প্রত্যেক মার্গের পৃথক আলোচনার পূর্ব্বে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের অধিকাংশই অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর। উভয়ের কথোপকথনে পর পর অর্জ্জুনের মনে যে-সব প্রশ্ন উঠিতেছে তাহাতে অস্বাভাবিকতা এবং অসংলগ্নতা কিছুই নাই; একাগ্রমনে গীতা পাঠ করিলে সাধারণ পাঠকের মনেও এই সব প্রশ্নই যথাক্রমে উঠিবে। আমি বিভিন্ন অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় এই সকল প্রশ্নের পারম্পর্য্যের ধারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। গীতাকার এত নিপুণভাবে এই প্রশ্নোত্তরমালা সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে, হঠাৎ মনেই হয় না যে অর্জ্জুনের সমস্যাপূরণ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের উত্তরে অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যাইবে যে প্রশ্নোত্তর ছলে গীতাকার তৎকালপ্রচলিত সাধনমার্গগুলির আলোচনা করিতেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে জ্ঞানীদের উপদেশ, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ ও সমাজধর্ম্মের আলোচনা আছে; শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত বুদ্ধিযোগও এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞকথা ও স্বধর্ম্মের বিবরণ আছে। সমাজধর্ম্মের আচরণে ক্রূর কর্ম্ম করিতে হয়; তাহা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি ভাল কাজই কেন না করি এই প্রশ্নের উত্তরে যজ্ঞকথা ও স্বধর্ম্মের বিচার স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে। স্বধর্ম্মপালনে ক্রূর কর্ম্ম করিতে হইলে দোষ হয় কি না ইহার আলোচনায় কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, বিকর্ম্ম কি ইত্যাদি প্রশ্ন চতুর্থ অধ্যায়ে আসিয়াছে; দুষ্কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা পায় তাহার ব্যাখ্যায় অবতারবাদ আসিয়াছে এবং পূর্ব্বাধ্যায়ের যজ্ঞ-কথারও বিশদ আলোচনা আছে; কৃষ্ণ দেখাইলেন স্বধর্ম্মানু-মোদিত হইলে ক্রূর কর্ম্মেও দোষ হয় না, অপর পক্ষে উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে যজ্ঞরূপ ভাল কাজেও দোষ হয়। কি করিয়া এই দোষ কাটাইতে হয় কৃষ্ণ তাহা নির্দ্দেশ করিলেন। ভাল, মন্দ ইত্যাদি সকল রকম কর্ম্মেই যখন বন্ধন আসিতে পারে তখন কর্ম্মের হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাসী হই না কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চম অধ্যায়ের অবতারণা। পঞ্চম অধ্যায়ে সংন্যাস মার্গ আলোচিত হইয়াছে ও সেই সূত্রে জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের কথা উঠিয়াছে। সংন্যাসীদের কথা হইতে যতিদের কথা ও যতিদের কথা হইতে যোগীদের কথা পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে সহজভাবে উঠিয়াই ষষ্ঠ অধ্যায়ের বক্তব্যের সূচনা করিয়াছে। কৃষ্ণ দেখাইলেন প্রকৃত সংন্যাসী যোগীই হন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের (ইহাকে কর্ম্মযোগান্তর্গত পাতঞ্জল মার্গ বলা যাইতে পারে) আলোচনায় আসন ইত্যাদি শারীরিক যোগ ও ধ্যান চিত্তবৃত্তি-নিরোধ রূপ মানসিক যোগের বিবরণ আসিয়াছে। যোগীর তাবৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় ও আত্মদর্শন হয় ও তখন তিনি সৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। এই সম্পর্কেই সপ্তম অধ্যায়ের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা। কাপিল সাংখ্যোক্ত সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; কৃষ্ণ যেমন যজ্ঞ, সংন্যাস, যোগ ইত্যাদি প্রচলিত মার্গ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত পরিবর্জ্জিত আকারে অনুমোদন করিয়াছেন, কাপিল সাংখ্যও সেইরূপ ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাপিল সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, জীব ও তৎসহ কৃষ্ণের যোজিত ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞবাদ আসিয়াছে। তখনকার দিনে অধিভূতবাদ ইত্যাদি যে এক বিশেষ সাধনমার্গের অঙ্গ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৭।৩০ ও ৮।২ শ্লোক দেখিয়া মনে হয় মৃত্যুকালে ব্রহ্মস্মরণ এই মার্গেরই এক অঙ্গ। মনে যে চিন্তা লইয়া মানুষের মৃত্যু হয় পরজন্মের গতি সেই অনুসারে হইয়া থাকে, এই বিশ্বাসও এই মার্গান্তর্গত। অন্তকালে যোগাসন আশ্রয় করিয়া ওঁকারের ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগের উল্লেখ ইহার পরেই আসিয়াছে। এই উপায়ে দেহত্যাগের চেষ্টা এখনও যোগীদের মধ্যে দেখা যায়। অধিযজ্ঞবাদের বিচার ও ওঁকারের ধ্যান অষ্টম অধ্যায় ভুক্ত। ওঁকারের ধ্যানে পুনর্জন্ম হয় না ও সমস্ত জগৎ পুনরাবর্ত্তনশীল এই কথায় (৮।১৫-১৬) পরবর্ত্তী শ্লোকের অহোরাত্র বিদ্যার উল্লেখের সুবিধা হইল। শুক্লকৃষ্ণগতি দেবযান পিতৃযান পথ ইত্যাদির কথা এই মার্গের পরেই উল্লিখিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত তৎকালপ্রচলিত বিভিন্ন মার্গের উল্লেখ করিয়া নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনোনীত

মার্গের উপদেশ দিয়াছেন। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজের মত পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি কোন বিশেষ মার্গকে একমাত্র মার্গ বলিয়া মনে করেন না। যে সে-মার্গের সাধক হউক শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত সাধনা করিলে তাহার মুক্তি হইবে। কোন মার্গই পরিত্যাজ্য নহে। এইজন্যই নবম অধ্যায়ে সমস্ত মার্গের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমাতেই সমস্ত আশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণ নিজ নির্দ্দিষ্ট উপায়কে রাজগুহ্য রাজবিদ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; ইহা পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষবোধগম্য, ধর্ম্মপ্রদ, সুখে প্রযোজ্য, অব্যয় ও স্ত্রী শূদ্র, পাপী পুণ্যাত্মা নির্ব্বিশেষে সকলের উপযোগী। নবম অধ্যায়ে যে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সাধনমার্গের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হঠাৎ বুঝা যায় না। ৯।৭ শ্লোকে অহোরাত্রবাদের কথার আভাস আছে ; ৯।৮-১০ শ্লোকে পরিবর্ত্তিত কাপিল সাংখ্যবাদ, ৯।১১ শ্লোকে অবতার-বাদ, ৯।১২ শ্লোকে অধ্যাত্ম, অধিভূতবাদ, ৯।১৫-১৬ শ্লোকে বিবিধ যজ্ঞ, মন্ত্র, ঔষধ (রসসাস্ত্রের সাহায্যে মোক্ষলাভ), ৯।১৭ শ্লোকে ওঁকারবাদ, ৯।১৯-২১ শ্লোকে বেদোক্ত দেবতাগণ, যজ্ঞ, স্বর্গ ইত্যাদি, ৯।২২ শ্লোকে ধ্যান, ৯।২৩-২৫ অন্য দেবতা, পিতৃপূজা, ভূতপূজা ইত্যাদি, ৯।২৬ শ্লোকে ফল পুষ্পাদি উপচারের দ্বারা পূজা, ৯।২৭-২৮ শ্লোকে সংন্যাস মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে সমস্ত মার্গগুলির আলোচনা শেষ না হওয়ায় ১০ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,'তোমাকে আরও বলিতেছি শোন'। ১০।৪-৮ শ্লোকে বিবিধ মানসিক সাধনা, যথা ক্ষমা, সত্য, অহিংসা ইত্যাদির কথা বলা হইয়াছে এবং ১০।৯-১০ শ্লোকে ভক্তিবাদের কথা আছে। যে যে ভাবে বা যে যে বস্তুতে মানুষের ভগবদুপাসনার ভাব উদ্দীপিত হয় ১০।২০ শ্লোক হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত তাহার বিবরণ আছে। উপনিষদোক্ত আত্মা, রুদ্রাদিত্য প্রভৃতি বেদোক্ত এবং ইন্দ্রিয়াদি উপনিষদোক্ত দেবতা বৃহস্পতি, স্কন্দ, ভৃগু প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তিগণ, হিমালয়, গঙ্গা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু, নানাবিধ গুণাবলী এই অধ্যায়ে উপাস্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এই যে, তাবৎ উপাস্য পদার্থ সহিত সমগ্র বিশ্ব আত্মাতে অবস্থিত। একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন এই সমস্তই কৃষ্ণের দেহে অবস্থিত দেখিতেছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন আত্মাই যখন বিশ্বজগতের আধার তখন আত্মাতেই মনোনিবেশ কর। বিশ্বে আত্মদর্শন বা আত্মার বিশ্বদর্শন উভয় উপায়েই মুক্তি সম্ভব। আত্মপ্রীতি বা আত্মরতিই প্রকৃত ভক্তি। কৃষ্ণভক্তি আত্মরতি একই কথা। কোথায় এই আত্মার সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আত্মা শরীরবাসী, এজন্য আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মিলে আত্মদর্শন হয়। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধ-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের দ্বারা এই জ্ঞান আবৃত, এইজন্য চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজ, তমের আলোচনা। পঞ্চদশ অধ্যায়ে কি করিয়া নির্গুণ আত্মা মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া বিষয়ভোগ করে এবং কি করিয়া আত্মজ্ঞানের দ্বারা তাহার বন্ধন মোচন হইতে পারে, তাহা আলোচিত হইয়াছে। কোনও ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য বিচার করিলে তাহার মোক্ষের সম্ভাবনা কতটা বলা যায়। এই সম্পর্কেই ১৬ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের আলোচনা। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণভেদে মানুষের একই কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিশেষত্বে বিভিন্ন ফল হইতে পারে ; তাহা ১৭ অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠানের বিশেষত্বে বন্ধন বা মোক্ষ উভয়েরই হেতু হইতে পারে। ১৮শ অধ্যায়েও ত্যাগ জ্ঞান কর্ম্ম ইত্যাদির ত্রিবিধ ভেদ দেখানো হইয়াছে এবং মানুষের পক্ষে কি প্রকার আচার কর্ত্তব্য তাহা স্বধর্ম্মের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। গীতার সার ধর্ম্মোপদেশ ১৮ অধ্যায়ের ৬৫-৬৬ শ্লোকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনুমোদিত নবম অধ্যায়ে আরব্ধ রাজগুহ্য রাজবিদ্যার ব্যাখ্যা শেষ করিলেন। এইখানেই গীতার সমাপ্তি।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাটক সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত একথা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং ইহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় নাট্যের কোনরূপ যোগসম্বন্ধ আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কিরূপ, তাহা আলোচনা তেমন ভাবে কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাটকের উপর ইউরোপীয় নাটকের যে অবিসংবাদিত প্রভাব বর্ত্তমান তাহার অন্তরালে সংস্কৃত রীতির ছায়া প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। বাঙ্গালা নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসনের অনুবর্ত্তন করেন নাই সত্য, তবে তাঁহারা অনেকস্থলে ইউরোপীয় আদর্শে রচিত নাটককে নানা ভাবে সংস্কৃত আকার দিবার চেষ্টা করিয়াছেন—সংস্কৃত রূপ দিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। ফলে, তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে—ইউরোপীয় শব্দের আক্ষরিক অনুবাদের দ্বারা তাঁহারা এস্থলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। অবশ্য সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দের প্রচলিত অর্থ রক্ষিত হয় নাই—অর্থ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা বিকৃত হইয়াছে। অর্থতত্ত্বের (Semantics) আলোচনাকারীদের নিকট ইহা উপেক্ষার বিষয় নহে। বস্তুতঃ, অনেকস্থলে বাঙ্গালা নাটকের প্রাণ ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত এবং ইহার বাহ্যিক আকার ভারতীয় রীতিতে গঠিত। আর অনেক স্থলে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত বস্তুর উপর প্রাচ্যবর্ণের অনুলেপন। সম্প্রতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গালা নাটকের উপর ভাব প্রভৃতির দিক দিয়া সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভূত প্রভাবের আভাস দিয়াছেন।* বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বাঙ্গালা নাটকে ব্যবহৃত সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের কতকগুলি শব্দের ব্যবহার-প্রণালী লইয়া সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। প্রসঙ্গক্রমে, বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে ব্যবহৃত কতকগুলি নূতন শব্দের কথাও উল্লিখিত হইবে।

প্রথমে নাট্যসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের কথা। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে সংস্কৃত রীতি আদৌ অনুসৃত হয় নাই। কতকগুলি সংজ্ঞা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে সত্য—কিন্তু শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য মোটেই রক্ষিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, নাট্যসাহিত্যের প্রকারভেদ নিরূপণে অনেক স্থলে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকরণ করা হইয়াছে।

বাঙ্গালায় নাট্যসাহিত্যের সাধারণ নাম নাট্য বা নাটক। ইহার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে মিলনান্ত নাটক, বিয়োগান্ত-নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক, গীতিনাটক, গীতিনাট্য বা নাট্যগীতি, গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য, পারিবারিক নাটক, ভাবরসাত্মক নাটক, প্রভৃতি নামগুলি উল্লেখযোগ্য।† এই নামগুলির আকর সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র নহে—অনেক স্থলে ইউরোপীয় সাহিত্য, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কোন কোন স্থলে অনুবাদ না করিয়া খাঁটি ইউরোপীয় নামটি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়' 'প্যারডি নাটিকা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

সংস্কৃত কোন্ কোন্ সংজ্ঞা নাট্য-সাহিত্যের প্রকার-নির্দ্দেশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাউক। সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য বা রূপক নাট্য-সাহিত্যের সাধারণ নাম। ঠিক এই অর্থে না হইলেও এই দুইটি নাম

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃ. ৪৮; *The Calcutta Review*, October, 1931.

† সম্প্রতি বায়স্কোপের এক বিজ্ঞাপনে 'চিত্রনাট্য' এই নূতন নাম দেখিলাম।

বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে অজ্ঞাত নহে। যে নাট্যগ্রন্থে শ্রব্যকাব্যোচিত বর্ণনাদির আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গালায় কোথাও কোথাও তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে দৃশ্যকাব্য। অবশ্য এই নাম সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'অভিমন্যুবধ'কে দৃশ্যকাব্য আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'লক্ষ্মণবর্জ্জন' প্রভৃতি এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থকে তিনি নাটক বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। যে-অর্থে দৃশ্যকাব্য শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে কোন কোন স্থলে অভিনয়কাব্য এই শব্দের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে নাট্যকাব্য শব্দটিরই সমধিক প্রচার।

বাঙ্গালা সাহিত্যে রূপক শব্দের অর্থ শুধু নাট্যগ্রন্থ নহে। যে গ্রন্থে রূপক বা allegory-র আশ্রয় লওয়া হইয়াছে—বাঙ্গালায় তাহারই নাম রূপক। সংস্কৃতে রূপক, উপরূপক এই দুইভাগে নাট্য-সাহিত্যকে বিভক্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গালায় রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত নাটকের উৎপত্তিবিষয়ক গ্রন্থ 'নাট্যসম্ভবের' নাম উপরূপক দেওয়া হইয়াছে। এই নামকরণের হেতু অজ্ঞাত।

বাঙ্গালায় নাটিকা শব্দ ক্ষুদ্র নাটক এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালা নাটিকার রস ও অঙ্কাদি বিষয়ে তেমন কোনও বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রহসন বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে প্রায় অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে সংস্কৃত নিয়মানুসারে প্রহসনের অঙ্ক-সংখ্যা এক। বাঙ্গালায় কিন্তু প্রহসনের একাধিক অঙ্কও দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ রামনারায়ণ তর্করত্ন কৃত তিন অঙ্কের প্রহসন 'চক্ষুদান'-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বাঙ্গালা কোন প্রকার নাট্যভেদেই সংস্কৃতের ন্যায় অঙ্ক-সংখ্যার নিয়ম নাই। সংস্কৃত নাটকের সাধারণ নিয়মানুসারে অঙ্ক-সংখ্যা পাঁচ হইতে দশ।* বাঙ্গালায় কিন্তু এরূপ কোনও নিয়ম নাই। বাঙ্গালায় নাটকের অঙ্ক-সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচ, কিন্তু ইহার বেশী বা কম সংখ্যাও অনেক সময় দেখা যায়। হাস্যরসবহুল নাট্যগ্রন্থ বাঙ্গালায় কেবল প্রহসন এই সংজ্ঞা দ্বারাই যে নির্দ্দিষ্ট হয় এমন নহে। এই অর্থে বহু সংজ্ঞার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—হাসক, পঞ্চরং বা পঞ্চরঙ্গ, রঙ্গনাট্য, নাট্যরঙ্গ, কৌতুকনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য প্রভৃতি।

অমৃতলাল বসু তাঁহার 'অবতার'-এর আখ্যা দিয়াছিলেন—'প্র-পরা-অপ-সং-হসন'; প্র-হসন এই ক্ষুদ্র নামে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

নাট্যরাসকের প্রকৃত স্বরূপবিষয়ে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে প্রচুর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত সাহিত্যদর্পণের মতে—নাট্যরাসক একাঙ্ক, বহুতাললয়-বিশিষ্ট, উদাত্তনায়ক ও পীঠমর্দ্দ উপনায়কযুক্ত, শৃঙ্গার-রসান্বিত, হাস্যরসবহুল ও রাসকসজ্জিকা নাম্নী নায়িকা-যুক্ত।

আর নাট্যদর্পণকারের মতে যে-গ্রন্থে রমণীগণ সংগ্রহে নৃত্য দ্বারা বসন্তকালে নরপতির কার্য্যাবলী প্রকাশ করে তাহারই নাম নাট্যরাসক।

রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার 'পতিব্রতা' নাট্যগীতির ভূমিকায় নাট্যরাসকের এক অতি স্পষ্ট লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'নাট্যরাসক বা নাট্যগীতির প্রকৃত অর্থ আদ্যন্ত স্বরনিবদ্ধ সঙ্গীতময় অভিনেয় গ্রন্থ।'

অমৃতলালের 'সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্কভঞ্জন' ও গিরিশচন্দ্রের 'অকাল বোধন' নাট্যরাসক নামে অভিহিত হইয়াছে।

কয়েকটি নূতন নাম বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—আলঙ্কারিক নাটক (হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—যোগা, ১২৯৭ সাল)। প্রেমের মধ্য দিয়াও মুক্তিলাভ করা যায় ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

নবনাটক নামে একটি ভেদও কেহ কেহ অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ, রামনারায়ণ তর্করত্নের একখানি নাটকের নামই ধরা হয় নবনাটক। তবে, ইহা নাটকখানির নিজ সংজ্ঞা অথবা জাতিসংজ্ঞা, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও আখ্যাপত্রে 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক

---

* অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সংস্কৃতেও একাঙ্ক, দ্ব্যঙ্ক, ত্র্যঙ্ক ও চতুরঙ্ক নাটক দেখিতে পাওয়া যায় (Keith – *Sanskrit Drama*, পৃ. ৩৪৫)।

নবনাটক।' এইরূপ লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। নবনাটক কথাটি বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে সত্য তবে সমগ্র পঙ্ক্তিটির দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাকে জাতিসংজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। গ্রন্থের প্রস্তাবনার দুইটি স্থল হইতেও এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হয়। গ্রন্থকার লিখিতেছেন,—'এই নবনাটকে দেশে নব নাটকের অভাব নাই,' 'এ সমাজে একখানি নবনাটকের অভিনয় করি'। তাহা ছাড়া, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ১২৮২ সালে প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর' নামক নাটককেও আখ্যাপত্রে নবনাটক এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নবনাটক যে নাটকের এক স্বতন্ত্র প্রকারভেদের নাম ছিল এই নামকরণকে তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে নবনাটকের লক্ষণ কি—ইহার বৈশিষ্ট্য কি, সে-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

পরলোকগত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'রসাবিষ্কার' নামক এক অভিনব নাট্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন—'বৃন্দক'।* শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ প্রভৃতি পরস্পর নিরপেক্ষ এক-একটি বিষয় এই গ্রন্থের এক-একটি দৃশ্যে নাট্যাকারে চিত্রিত হইয়াছে। পরস্পরনিরপেক্ষ বহু বিষয়ের অবতারণাই বৃন্দকের বৈশিষ্ট্য বলিয়া গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'যে নাট্যে বহু বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকে, যাতে নানা জাতীয় কার্য্য এককালে প্রদর্শিত হয় এবং যার অঙ্ক-সংখ্যার নিয়ম নাই তাহাকেই বৃন্দক বলে।' (পৃঃ ২)

গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'বুদ্ধদেব চরিত'-এর নাম দিয়াছেন 'দেবনাটক।' ঔপন্যাসিক নাটক, নাট্যোপন্যাস, নাট্যগীলা প্রভৃতি আরও নানা নাম নাটকের প্রকারভেদ সূচনার জন্য বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতেছে।

বাহ্য নামকরণের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া আভ্যন্তরিক বিষয়বিন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের প্রস্তাবনা ও ভরতবাক্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাট্যে একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের সূত্রপাতে যে-সমস্ত নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে প্রাচীন রীতি অনুসারে নান্দী ও প্রস্তাবনা ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সকল স্থলে সংস্কৃত রীতি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নাই। হরচন্দ্র ঘোষ কৃত 'কৌরববিয়োগ' নাটকের নান্দী গদ্যে বিরচিত। কিন্তু গদ্যে নান্দী রচনার প্রথা সংস্কৃতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরবর্ত্তী কালে কোন কোন গ্রন্থে প্রস্তাবনা এই নাম দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তবে তাহার সহিত সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার কোনও সম্বন্ধ নাই। তবে সকলে এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবনা এই নাম ব্যবহার করেন নাই। অমৃতলাল বসু তাঁহার নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যের বিবিধ নামকরণ করিয়াছেন। পূর্ব্বরূপ, সূচনা, পূর্ব্বদৃশ্য প্রভৃতি নানারূপ নাম তাঁহার নানা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'মনীষা' নামক নাটকে এইরূপ স্থলে 'উদ্বোধন' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত নাটকে নটী ও সূত্রধারের যে কার্য্য নির্দিষ্ট হইয়াছে বাঙ্গালা নাটকে তাহা হইতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গালা নাটকে অনেক সময় সূত্রধারকে প্রাচীন ধরণের যাত্রার অধিকারীর অনুরূপ কার্য্য করিতে হয়।* বর্ত্তমান যুগের প্রথম সময়ের বাঙ্গালা নাটকের বিবরণ দিতে গিয়া কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছিলেন—'অভিনয়ের প্রথমে নট-নটী (সূত্রধার নহে) নৃত্যগীতের দ্বারা দর্শকদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া পাত্রপরিচয় করাইয়া দেয়। অভিনয়ে নাটকের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়া কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহারা তাহারও বিবরণ প্রদান করে।'†

রামনারায়ণের নবনাটকে নটী ও সূত্রধার নাটকের অবসানে রঙ্গভূমিতে আসিয়া গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়

---

* শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার 'গিরিশ-প্রতিভা' গ্রন্থে (পৃঃ ৫৭২) ভ্রমক্রমে এই গ্রন্থকে 'রসাবিষ্কারবোধক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত 'ডমরুক' নামক রূপকখানি (Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Oriental Library, Madras—Vol. XXI, No. 12519) অনেকটা এইরূপ বলিয়া মনে হয়। ইহা দশ 'অলঙ্কারে' সম্পূর্ণ। সূত্রধার এখানে নির্ব্বাহক নামে পরিচিত।

* প্রাচীন আসামী নাটকেও সূত্রধারের এইরূপ কার্য্য ছিল। শঙ্করদেবের 'পারিজাত-হরণ' নাটকে সূত্রধার সকল সময় রঙ্গস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন।

† *Calcutta Review*, 1873, Vol. 57—পৃঃ ২৪৮।

ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। অমৃতলাল বসুর প্রহসন 'বৌমা'তে অভিনেত্রীগণ দ্বারা নাটকের উপসংহারে এইরূপ কার্য্য করান হইয়াছে।

সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালা নাটকেও পরিচ্ছেদবিভাগ সাধারণতঃ 'অঙ্ক' এই প্রাচীন নামেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।* তবে কোথাও কোথাও অন্য নামও ব্যবহার করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষ প্রণীত সংস্কৃত রত্নাবলীর অনুবাদ হইলেও রামনারায়ণ তাঁহার 'রত্নাবলী' নাটকে অঙ্কের পরিবর্ত্তে 'প্রকরণ' এই নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'মালতীমাধব-এ অঙ্কের নাম দিয়াছেন কাণ্ড। বর্দ্ধমানাধীশ্বর মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে বিরচিত বর্দ্ধমান হইতে শকাব্দা ১৭৯৬-তে প্রকাশিত 'কাপালিক' নাটকেও অঙ্কের নাম প্রকরণ।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে অঙ্কের কোন উপবিভাগ করা হয় নাই। 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৩) প্রভৃতি প্রথম যুগের বাঙ্গালা নাটকেও এইরূপ উপবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। কালক্রমে ইউরোপীয় আদর্শে এই উপবিভাগ বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হয়। এই উপবিভাগের নামকরণ সম্বন্ধে কিন্তু একটু অসুবিধা হইয়াছিল—তাহার কারণ সংস্কৃতে এ জাতীয় বিভাগ ও তৎসূচক শব্দের অভাব। তাই এক-এক জনে এক-এক নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তারাচরণ সিকদার তাঁহার 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকে (১৮৫২) 'সংযোগস্থল' এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। শেক্‌স্‌পীয়রের Merchant of Venice-এর বঙ্গানুবাদ 'ভানুমতীচিত্তবিলাস' (১৮৫৩) ও 'কৌরববিয়োগ' নাটকে হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইহার নাম দিয়াছেন 'অঙ্ক'। তিনি তাঁহার 'রজতগিরি-নন্দিনী'তে কিন্তু বর্ত্তমান রীতি অনুসারে 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'সাবিত্রীসত্যবান্' ও 'মালতীমাধব' নাটকে ইহাকে 'অঙ্ক' আখ্যা দিয়াছেন। আর যাহা সংস্কৃত-সাহিত্যে চিরদিন অঙ্ক নামে প্রসিদ্ধ তাহাকে তিনি 'কাণ্ড' নামে অভিহিত করিয়াছেন।১ কোন কোন স্থলে নাটকের শেষ দৃশ্য ক্রোড়াঙ্ক বা উজ্জ্বল দৃশ্য নামে অভিহিত হয় এবং তাহার পূর্ব্বে পটপরিবর্ত্তন এই নির্দ্দেশ দেখা যায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের নবনাটকের তৃতীয়াঙ্কে এই উপবিভাগ অর্থে প্রস্তাব শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে (১৮৫৮?) ইহার নাম প্রস্তাবনা।২ বর্ত্তমানে এই বিভাগনির্দ্দেশের জন্য সাধারণতঃ দুইটি নাম ব্যবহৃত হয়—(১) দৃশ্য, (২) গর্ভাঙ্ক। দৃশ্য কথাটি ইংরেজী scene-এরই অনুবাদ। গর্ভাঙ্ক শব্দটি সংস্কৃত বটে—তবে ইহা সংস্কৃতে 'নাটকান্তর্গত নাটক' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দৃশ্য অর্থে নহে।৩

আশ্চর্য্যের বিষয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ও দৃশ্য অর্থে গর্ভাঙ্ক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন ('মালতীমাধব', 'রুক্মিণীহরণ' ও 'নবনাটক'-এর প্রথম এবং চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য)।৪

ভারতীয় নাট্যরহস্য (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১২৮৪) নামক 'সংস্কৃত সঙ্গীত ও অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী নাট্যপ্রকরণ' গ্রন্থে (পৃ. ৫) গ্রন্থকার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ও গর্ভাঙ্ক শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

* কৃষ্ণকমলের গ্রন্থে অঙ্কবিভাগ নাই। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমণী নাটক' (সন ১২৫৪ সাল—শকাব্দাঃ ১৭৬৯, ইং ১৮৪৮ সাল) নাটক নামে অভিহিত হইলেও অঙ্ক বা কোনরূপ পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয় নাই।

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃ. ৩৬, পাদটীকা।

২ ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে। এই সংস্করণ ঈশ্বরচন্দ্র বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশকের নিবেদন হইতে জানা যায় যে সাত বৎসর পূর্ব্বে কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোক কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহাদেরই ব্যবহারার্থ ইহার একশত খণ্ড মাত্র মুদ্রিত করান। বোধ হয় এই গ্রন্থকেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (সুশীলকুমার দে—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৮শ খণ্ড, পৃ. ৪১)।

৩ সংস্কৃতেও গর্ভাঙ্ক শব্দটি কেবল বিশ্বনাথই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 'উত্তরচরিতে' সপ্তম অঙ্কে রাম প্রভৃতির সম্মুখে রামচরিতবিষয়ক যে নূতন নাটকের অভিনয় দেখান হইয়াছে টীকাকারদের মতে তাহার নাম গর্ভাঙ্ক নহে, অন্তর্নাট্য বা অন্তর্নাটক।

৪ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন— '... গর্ভাঙ্কগুলি ইংরেজী নাটকের Act ও Scene-এর অনুকরণে অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং এক-একটি অঙ্ক শেষ হইলে এক-একটি গর্ভাঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে গর্ভাঙ্ক বিরল হইলেও সংস্কৃত গর্ভাঙ্ক শব্দের ইহাই বোধ হয় তাৎপর্য্য।' (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৮শ ভাগ, পৃ. ৩৬)। এরূপ উক্তির ভিত্তি কি বুঝা গেল না।

গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের গ্রন্থাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা এই দুইটি শব্দের ব্যবহারে কিছু পার্থক্য করিয়াছেন। নাটক নামে অভিহিত গ্রন্থেই সাধারণতঃ গর্ভাঙ্ক শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রহসনাদি স্থলে দৃশ্য শব্দটি দেখা যায়।*

আজকাল বাঙ্গালা নাটকে যবনিকাপতন এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি অঙ্কের শেষেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত নাটকে এইরূপ প্রয়োগ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার সিনের বদলে তখন একটি পর্দ্দামাত্র ব্যবহৃত হইত। পর্দ্দা ঠেলিয়া সত্বর প্রবেশ করিলে বলা হইত 'অপটাক্ষেপে প্রবেশ।' প্রথম যুগের বাঙ্গালা নাটকে অনেক স্থলে বর্ত্তমান কালের যবনিকা পতনের অর্থে—পটক্ষেপ শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানাধিপতি আফ্‌তাব চন্দ মহতাব্‌ বাহাদুরের আদেশানুসারে শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক প্রণীত শকাব্দা ১৭০৪ (?), বঙ্গাব্দ ১২৮৯ তে বর্দ্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত 'সতী-বিয়োগ' নাটকের প্রথমে আছে অপটাক্ষেপ। প্রতি অঙ্কের শেষে পটক্ষেপ এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত 'কাপালিক নাটকে'ও প্রতি প্রকরণের শেষে এই শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছে।

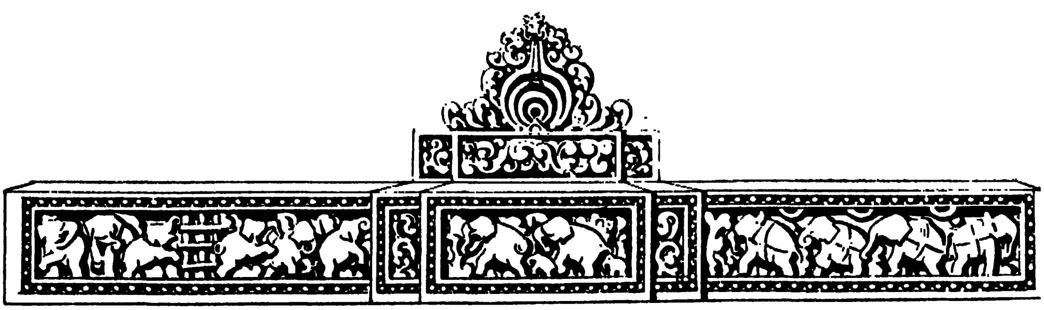
* এই নিয়মের ব্যতিক্রমের মধ্যে অমৃতলালের প্রহসন 'কৃপণের ধন' এবং গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক অনূদিত শেক্‌সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক উল্লেখযোগ্য। কৃপণের ধনে গর্ভাঙ্ক এবং ম্যাক্‌বেথে দৃশ্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাক্যহারা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ভেবেছিনু কেঁদে কেঁদে তোমারে ডাকিয়া
করিব চরণে তব আত্ম-নিবেদন;
ঢালিয়া প্রাণের দাহ তব পদতলে—
করিব গো চিরশান্ত অনন্ত বেদন।
আর্ত্তের ব্যাকুল-ডাকে হইয়া কাতর,
হে দয়াল, তুমি যবে হবে মূর্ত্তিমান;
ধন্য করি অভাগায় স্নেহ-দিঠি দিয়া
হেসে যবে দিবে মোরে বরাভয় দান।

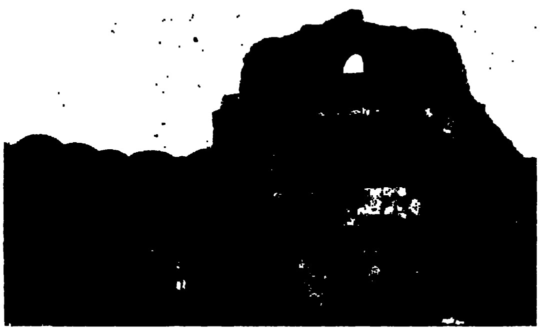
ভেবেছিনু চাহিব গো কাঁদিয়া তখন,
তোমার চরণ-তলে রত্ন-হেম-ধনে;
তুমি কিন্তু সত্য ক'রি মূর্ত্ত হ'লে যবে
রহিনু চাহিয়া শুধু এ মুগ্ধ-নয়নে।
ভুলে গেনু সব ভিক্ষা—ভুলিনু আপন,
জাগে শুধু স্বেদ-কম্প-লাজ-শিহরণ।



পাণ্ডুয়া

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার, বি-এ

পাণ্ডুয়া মালদহ জেলার অতি প্রাচীন নগর। নগরের অনেক ধ্বংসাবশেষ এখনও উক্ত দেশের নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকের অনুমান, এখানে বিরাট রাজার রাজধানী ছিল, এবং আপামরসাধারণের ধারণা যে, ইহা পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের স্থান ছিল বলিয়া ইহার নাম পাণ্ডুয়া হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, আদিনা ডাক বাংলার সম্মুখে যে বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, ইহাই তৎকালীন রাজন্যগণের দরবার-গৃহ ছিল; এবং এই স্থানেই অজ্ঞাতবাসের নির্দ্দিষ্টকাল অন্ত হইলে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।



আদিনা মস্‌জিদ
বাহির হইতে একাংশের দৃশ্য; ইহাতে বুদ্ধদেব ও গণেশের মূর্ত্তি আছে

আদিনার বৃহৎ গম্বুজ-বিশিষ্ট চতুষ্কোণ অট্টালিকা বিরাট-রাজের নাট্যশালা ছিল বলিয়া অনুমান। এই স্থানে বৃহন্নলা বিরাট-কন্যাগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন এবং এই স্থানেই ভীম কর্ত্তৃক কীচক বধ হইয়াছিল।

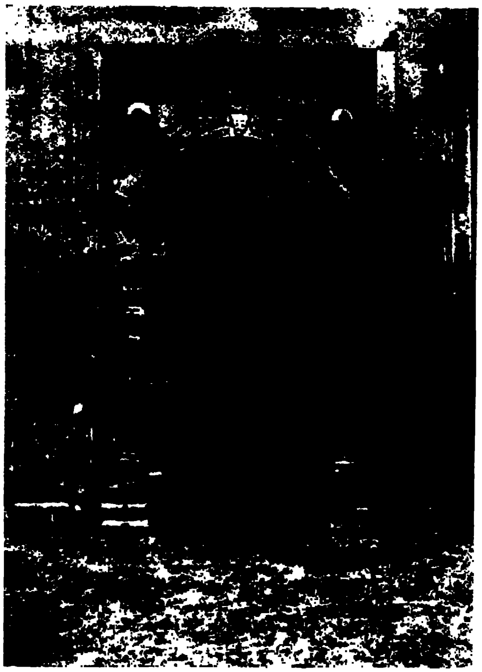
আদিনা ডাকবাংলার সম্মুখস্থ অট্টালিকা আদিনা মস্‌জিদ বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ হিঃ ৭৬৩ সালে শেকন্দর শাহ কর্ত্তৃক এই অট্টালিকা মস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত হইলেও ইহা যে হিন্দু আমলের রাজসভা অথবা তদনুরূপ অন্য কোন দরবার-গৃহ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ এখনও উক্ত অট্টালিকার তিন চারিটি দরজার উপর গণেশমূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অস্ত্রের আঘাতে ঐ সকল মূর্ত্তির অবয়ব বিকৃত হইলেও নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। একটি প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিও আছে। দেবমন্দিরের উপকরণাদি আনিয়া নূতনভাবে মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইলে অপৌত্তলিক মুসলমানগণ কর্ত্তৃক কখনও প্রতি দ্বারদেশের উপরিভাগে এরূপ মূর্ত্তি খোদিত হইত না। এতদ্ব্যতীত যেরূপ মস্‌জিদ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই



আদিনা মস্‌জিদ
ভিতর হইতে একাংশের দৃশ্য

তাহার সহিত ইহার আকৃতিগত যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে। কোন বৃহৎ দরবার-গৃহকে মস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত করিলে যেরূপ দেখিতে হয় ইহাও তদ্রূপ। এই অট্টালিকার দৈর্ঘ্য পাঁচ শত সাত ফিট, প্রস্থ দুই শত পঁচিশ ফিট এবং দেওয়ালের উচ্চতা এখনও প্রায় তেইশ ফিট হইবে। তন্মধ্যে প্রায় এগার ফিট কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত। পশ্চিম দেওয়ালে আরবী ভাষায় কোরাণের বচন লিখিত আছে। মধ্যস্থলে নয়টি গম্বুজবিশিষ্ট বৃহৎ কক্ষ, এই

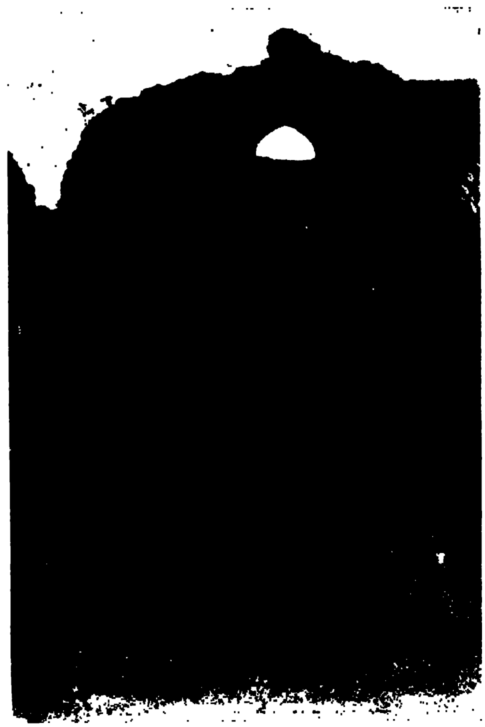
কক্ষেই বোধ হয় পূর্ব্বাস্য হইয়া উচ্চ বেদীর উপর রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। পশ্চাতে মসৃণ কৃষ্ণ-প্রস্তরের কক্ষ প্রাচীর—এমন মসৃণ যে তাহাতে মুখ দেখা চলে। তাহার উপর স্থানে স্থানে নানাপ্রকার ফুল, ফল, লতা পাতা খোদিত। সিংহাসনের উপরিভাগে প্রাচীরগাত্রে একটি গোলাকৃতি স্থান অস্ত্র দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া আছে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে লতাপাতার কারুকার্য্য—যাহা কেবল স্বর্ণরৌপ্যেই সম্ভবে। সেই গোলাকৃতি অস্ত্র-বিধ্বস্ত স্থানের একখণ্ড মহার্ঘ মণির আলোকে সিংহাসন-কক্ষ আলোকিত হইত বলিয়া লোকে অনুমান করিয়া থাকে। মণি অপহৃত হইয়াছে বটে,কিন্তু শূন্য আধার বর্ত্তমান রহিয়াছে। সিংহাসন-বেদীতে উঠিবার প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান এখনও বর্ত্তমান



রাজসিংহাসন

আছে। ইহাতে কেহ আরোহণ করে না এবং কেহ আরোহণ করিতে গেলেও স্থানীয় লোক পূর্ব্বস্মৃতির সম্মান-স্বরূপ বারণ করিয়া থাকে। দক্ষিণে বামে অমাত্য সভাসদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের বসিবার স্থান। সম্মুখে বৃহৎ মণ্ডপে সাধারণ লোক সহস্রে সহস্রে দাঁড়াইবার স্থান। এই সবই হিন্দুকীর্ত্তি। বিধিনির্ব্বন্ধে রূপান্তর ও নামান্তর হইয়াছে মাত্র। এখানে বর্ত্তমানে একটি কবর আছে। লোকে ইহাকে সেকন্দর শাহের সমাধি বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে আইন দ্বারা সংরক্ষিত হইলেও পূর্ব্বে এই

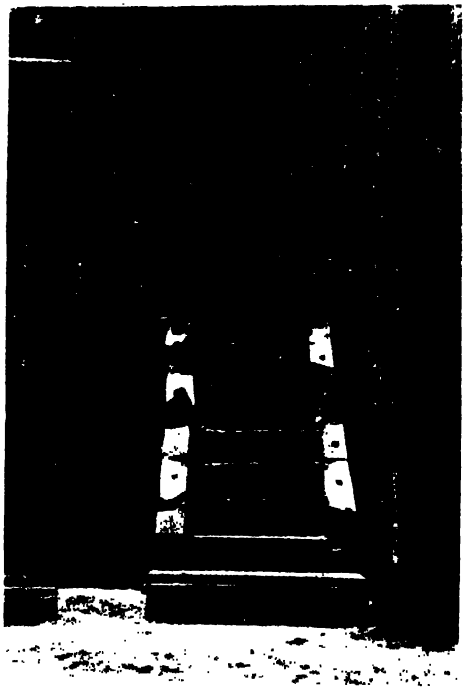


মণি-অপহৃত শূন্য আধার সম্বলিত সিংহাসন-কক্ষ

অট্টালিকার পাথরে আদিনায় কত সমাধি কত গৃহের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সোনা মস্‌জিদের অনেক পাথর এই অট্টালিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

যাহাকে বিরাটের নৃত্যশালা বলিয়া অনুমান করা হয় তাহা একলক্ষী মস্‌জিদ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইহাতে মস্‌জিদের কোন আকৃতি নাই। সোনা মস্‌জিদের এত নিকটে অন্য মস্‌জিদের কোন আবশ্যকতাও দেখা যায় না। ইহা বৃহৎ গম্বুজবিশিষ্ট একটি চতুষ্কোণ অট্টালিকা। গম্বুজের ব্যাস ৪৮—৬"; এবং দেওয়াল ১৩ ফিট পুরু। চারিদিকে চারিটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার উপরে গণেশমূর্ত্তি ধ্বংসাবস্থায় এখনও বর্ত্তমান আছে। আমার মনে হয় ইহা রাজা গণেশের রাজত্বকালে নগরের

নাট্যশালা ছিল। চারিদিকে দরজাযুক্ত চতুষ্কোণ আকৃতি বিশিষ্ট এই গৃহের গঠন-বৈচিত্র্যে ইহা নাট্যশালা ব্যতীত অন্য কিছু ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না। বর্ত্তমানে ইহার ভিতরে তিনটি সমাধি দৃষ্ট হয়। এইগুলি অনেকে



সিংহাসন-বেদীতে উঠিবার প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান

যদু জালালউদ্দিন, তাঁহার পত্নী এবং পুত্রের সমাধি বলিয়া অনুমান করেন।

পাণ্ডুয়া যে এক প্রাচীন নগর এবং গৌড় হইতে প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ অনুমান করেন (জেনারেল কনিংহাম) চীন পর্য্যটক হিউএনসাং লিখিত পৌণ্ড্রনগর বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে অবস্থিত ছিল; কেহ-বা বর্দ্ধনকোটকে পৌণ্ড্রনগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উভয়স্থানেই অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এই সকল স্থানে পূর্ব্বে কোন-না-কোন রাজবাড়ি ছিল। মহাস্থান গড় করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে বর্ত্তমানে একটি ক্ষুদ্র তোরণ এবং একটি বৃহৎ কূপ আছে; আর সমস্তই ধ্বংস হইয়া ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে। মহাস্থান গড়কে দুর্গ বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং দেখিলে ইহা দুর্গ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইহার অনতিদূরে চাঁদ সওদাগরের বাড়ি এবং লক্ষীন্দরের বাসরঘরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। একটি বৃহৎ উচ্চ চতুষ্কোণ ঢিপির ভিতর লক্ষীন্দরের বাসরগৃহ ছিল বলিয়া স্থানীয় লোক অনুমান করিয়া থাকে। স্থানটি সর্পসঙ্কুল। যা হউক মহাস্থান গড় বা বর্দ্ধনকোট যে পৌণ্ড্রনগর হইতে পারে না, তাহা তাহাদের ভৌগোলিক অবস্থান হইতে প্রমাণ হয়। এতদ্ব্যতীত চীনপর্য্যটক হিউএনসাং-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে পৌণ্ড্রনগরের যে-বিবরণ পাওয়া যায় তদ্দ্বারাও পৌণ্ড্রনগরের স্থান-নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহা হইতে বুঝা যায় পৌণ্ড্রনগর হইতে পূর্ব্বদিকে কামরূপ রাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কর্ণসুবর্ণ রাজ্য—উভয় রাজ্যই সমান দূরে



সেকেন্দর শাহের সমাধি

অবস্থিত:—তাহার পরিমাণ ৯০০ লি। মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের অনতিদূরে রাঙামাটি কর্ণসুবর্ণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পৌণ্ড্ররাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় করতোয়া নদীর অপর তীরে কামরূপ রাজ্য অবস্থিত। তাহা হইলে বৌদ্ধ পরিব্রাজকের উল্লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত

অনুসারে মহাস্থান গড় বা বর্দ্ধনকোট, পৌণ্ড্রনগর হইতে পারে না। মহাস্থান গড় বা বর্দ্ধনকোট, কামরূপ রাজ্য, কর্ণসুবর্ণ ও পাণ্ডুয়ার প্রাকৃতিক অবস্থান এবং বৌদ্ধ পরিব্রাজকের জীবনকাহিনী ও ভ্রমণবৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিয়া মহানন্দার তীরেই পৌণ্ড্ররাজ্যের রাজধানীর অবস্থান সম্ভবপর বলিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সুচিন্তিত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন।* ইহা ছাড়া পাণ্ডুয়াকে তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিলে ভ্রমণকারী লিখিত পৌণ্ড্ররাজ্যের রাজধানীর অনেক দৃশ্য এখনও পাওয়া যায়। হিউএনসাং-এর বৃত্তান্ত অনুসারে :—

"পুণ্ড্ররাজ্যের বেষ্টন ৪০০০ লি, রাজধানীর বেষ্টন ৩০ লি। রাজ্যটি ধনবসতিসম্পন্ন। রাজধানীতে জলাশয়, রাজকার্য্যালয় ও পুষ্পোদ্যান সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। রাজ্যের ভূমি সমতল, বালুকা ও কঙ্করময়, রাজধানীতে ১০০ হিন্দু দেবালয় আছে। রাজধানীর ২০ লি অন্তরে রাশিভা সঙ্ঘারাম, তাহার অদূরে অশোকস্তূপ।"

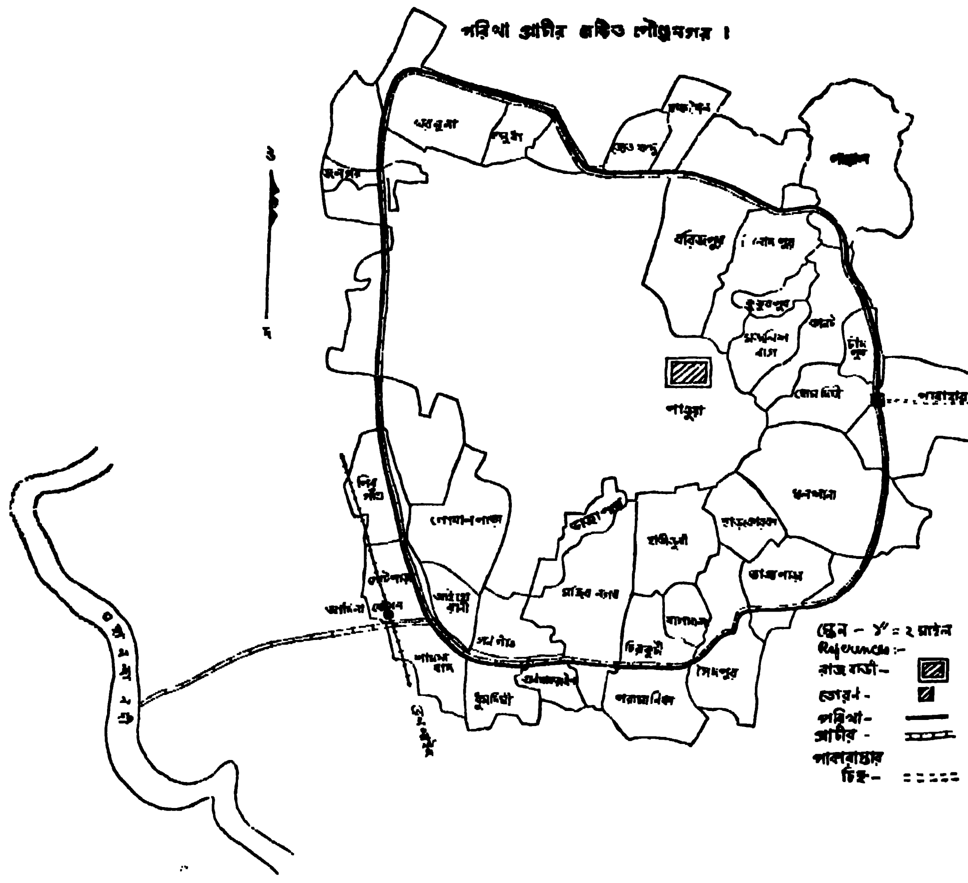
মহানন্দাতীরস্থ ধনামনার টিলাকে অশোক স্তূপ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন; তাহা ছাড়া অধুনা পাণ্ডুয়ার নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রাচীন নগরের চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত একটি বৃহৎ বাঁধ পাওয়া গিয়াছে। ইহা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষার দুর্লঙ্ঘ্য গড়, তৎপর উচ্চ প্রাচীর। গড় এখন ভরাট হইয়া আবাদোপযোগী হইয়াছে; কিন্তু তথাপি ইহা দেখিলেই একটি খালের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বাঁধ বরিজপুর প্রভৃতি গ্রাম এখনও অত্যুচ্চ কিন্তু শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহা কতকটা সমতল করিয়া লোকে রবিশস্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। দুই একটি স্থানে সাঁওতালের বাসস্থানও হইয়াছে। পরিখাটি ভরাট হইলেও এই বাঁধের উপর দাঁড়াইলে স্পষ্ট চেনা যায়। ঘুরিতে ঘুরিতে পারাহার গ্রামের একস্থানে এই পরিখা সমতল এবং প্রাচীরটিও ভগ্ন অবস্থায় দেখিলাম। অনুসন্ধিৎসুচক্ষে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহাই নগরের একমাত্র প্রবেশ দ্বার ছিল বলিয়া দৃঢ় ধারণা জন্মিল। তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষ উচ্চ ইষ্টক-স্তূপ সে ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিল। এই তোরণ হইতে পূর্ব্ব দিকে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত একটি ইষ্টকনির্ম্মিত রাজবর্ত্ম বরাবর চলিয়া গিয়াছে।



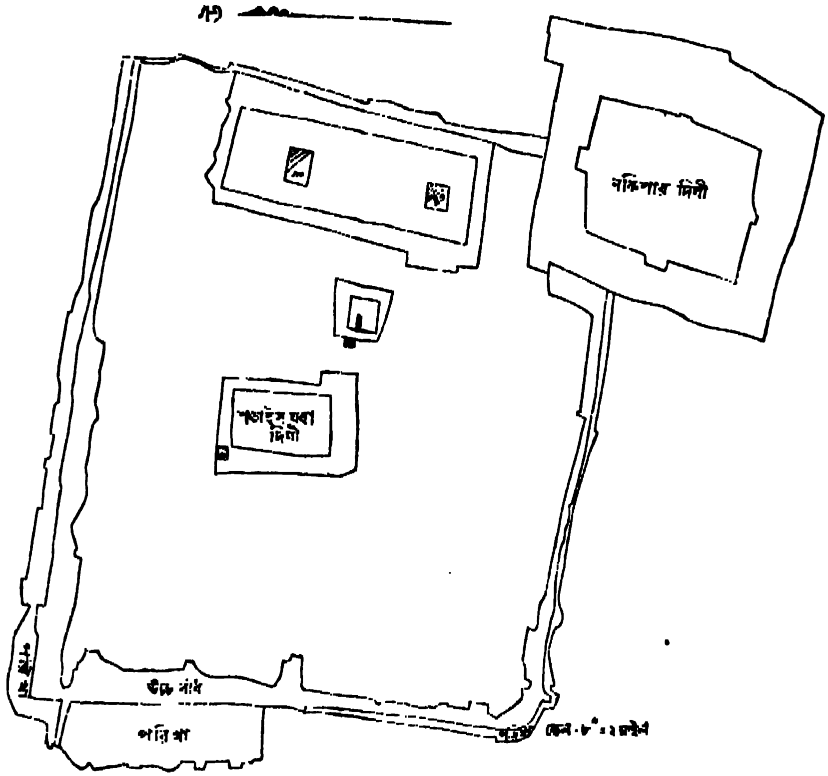
একলক্ষী মসজিদ

পারাহার, ছুটীকান্দর, ছয়ঘাটী এবং তাঁতিবাড়ি প্রভৃতি গ্রামের মধ্যে উক্ত পাকা রাস্তার চিহ্ন পাওয়া যায়। এই ফটকের সোজাসুজি পশ্চিমে নগরের প্রাচীরের প্রায় মধ্যস্থলে বৃহৎ পরিখা এবং অত্যুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। রাজপ্রাসাদ হইতে নগর প্রাচীর উত্তরে দুই মাইল, দক্ষিণে তিন মাইল, পূর্ব্বে দুই মাইল এবং পশ্চিমে তিন মাইল দূর হইবে। রাজবাড়ির চতুষ্পার্শ্বের পরিখা এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু স্থানে স্থানে উহা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরিখার পর উচ্চ বাঁধ তার পর সমতলক্ষেত্র তৎপরে উচ্চ সমতল ক্ষেত্রের উপর রাজ-প্রাসাদ। প্রাসাদের চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত তিন-চার হাত প্রশস্ত প্রাচীর। তাহা স্থানে স্থানে ভগ্নাবস্থায় আছে এবং স্থানে স্থানে ভিত্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কালচক্রে এই স্থান এখন ক্রমে সাঁওতালের বসতি হইতে চলিয়াছে। রাজবাড়িতে তিনটি বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে, দুইটি প্রাসাদ প্রাচীরের অভ্যন্তরে, অপরটি পরিখা প্রাচীরসংলগ্ন। শেষোক্ত দীর্ঘিকা 'নকিশার দীঘি' বলিয়া পরিচিত। উত্তর দক্ষিণের দৈর্ঘ্য অনুসারে এই দীর্ঘিকাগুলি হিন্দু কর্ত্তৃক খনিত

* "ভারতবর্ষ" ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।



বলিয়াই মনে হয়; পরবর্ত্তী মুসলমান রাজত্বকালে ইহাদের নামান্তর হইয়া থাকিবে। এই দীর্ঘিকার উত্তর পাড়ে সোপানাবলীশোভিত বাঁধা ঘাটের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহা বোধ হয় রাজপরিবারের পুরুষদিগের ব্যবহারের জন্য ছিল। বৃহৎ দীর্ঘিকা, উচ্চ পাড়—তদুপরি বহুতর বৃক্ষশ্রেণী পরস্পর শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় সম্বদ্ধ হইয়া পাহাড়ের ন্যায় দেখাইতেছিল। স্বচ্ছ নীলজলে এ সকল প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আশেপাশে জনমানবের সাড়া নাই। এ অবস্থায় দীর্ঘিকার ভগ্ন ঘাটে দাঁড়াইয়া ভীতির সঞ্চার হইতেছিল, তাই অন্যান্য পাড় দেখিবার সুযোগ হয় নাই। এই দীঘির মোট পরিমাণ ৬২ একর ৫০ ডেঃ অর্থাৎ ১৮৯ বিঘা এক কাঠা। পরিখাবেষ্টিত রাজবাড়ি সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৭ একর ৫০ ডেঃ অর্থাৎ ৯০০ বিঘা ১ কাঠা জমির উপর অবস্থিত। ইহার মধ্যে একটি দীঘি অতি বৃহৎ। দীঘির মধ্যে দ্বীপের ন্যায় দুইটি স্থলভাগ আছে—তাহাতে ইষ্টক-স্তূপ ও জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নাই। রাজবাড়ির নক্সায় স্থান দুইটি দীর্ঘিকার ভিতর দেখান হইয়াছে। এই সকল স্থানে হয় ত রাজপ্রমোদভবন অথবা নির্জ্জন আরাধনা গৃহ ছিল। সাতাইশ ঘরা নামে পরিচিত দীঘি অন্দরমহলের মহিলাদিগের ব্যবহারের পুষ্করিণী ছিল বলিয়া মনে হয়। এই দীঘির ধারে অন্তঃপুরিকাদিগের স্নানের জন্য সাতাইশটি স্নানাগার ছিল। তাহা হইতে ইহার সাতাইশ ঘরা নাম হইয়াছে। উত্তর পাড়ে এখনও কয়েকটি স্নানাগার বর্ত্তমান। পাড়ের উপরে



রাজ বাড়ীর জরিপী নক্সা।

যাতায়াতের একটি দরজা আছে, তাহা দিয়া স্নানাগারে এখনও যাতায়াত করা যায়। দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি দালান আছে। তাহার পরিধি চব্বিশ ফিট। প্রত্যেক কোণের পাশে একটি করিয়া ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। দেওয়ালে মৃত্তিকানির্ম্মিত নল ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। রাজবাড়ির নক্সায় সাতাইশ ঘরা দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে এই স্নানাগারের স্থান দেখান হইয়াছে। অন্দরমহলে আর একটি পুকুরের পশ্চিম পাড়েও কয়েকটি কক্ষবেষ্টিত দালান আছে এবং তৎসঙ্গে প্রস্তরনির্ম্মিত একটি বৃহৎ কূপ। ইহার দেওয়ালেও মৃৎ পাইপ—তদ্দ্বারা ইহাও অন্তঃপুরচারিণীদিগের স্নানাগার বলিয়া ধারণা করা যায়।

পাণ্ডুয়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে পুষ্করিণী অসংখ্য। প্রত্যেকটিতেই এক, দুই বা ততোধিক বাঁধা ঘাট। কোথাও ইষ্টক-নির্ম্মিত রাজবর্ত্ম, স্থানে স্থানে ভগ্ন অট্টালিকা, ইষ্টক স্তূপ, ভগ্ন প্রাচীর এবং দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এক স্থানে একটি জঙ্গলাকীর্ণ মন্দিরের মধ্যে ভগ্ন শিবলিঙ্গও দেখিয়াছি। ইহা যে কোনও সময়ে অত্যন্ত সুশোভিত, সমৃদ্ধিশালিনী ও জনাকীর্ণ নগরী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

পত্রধারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার যে মত,চিন্তাপ্রণালী দিয়ে তার সঙ্গে তোমার মিল হয়ত হবে না, কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে মিল হবে তোমার হৃদয় যে-গন্ধে আনন্দ পেল, হয়ত ঠিক জানল না সে-গন্ধ রজনীগন্ধার বন থেকে আসচে, কিন্তু আনন্দটি সত্য। যদি ঐখানেই শেষ হ'ত তাহ'লে কথা ছিল না, আনন্দ যদি একান্ত নিজের মধ্যে এসে অবসান হ'ত তাহ'লে চুকে যেত। ওকে যে আবার কোনো-না-কোনো একটা আকারে ফিরিয়ে দিতে হয়, পূজায়, সেবায়। কিন্তু ঠিকানা ভুল হ'লে আপশোষের কথা। আনন্দ যখন পাই তখন সেটা কোথা থেকে পাই স্পষ্ট নাই-বা জানলুম, পেলেই হ'ল। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে সেবা যখন দিই তখন কোথায় গেল না জানলে লোকসান। পোষ্টবাক্সে চিঠি ফেলে দিলুম সেটা যথাস্থানে গিয়ে পৌছল এটা কি সেই রকম ব্যাপার? ঠাকুরকে কাপড় পরালুম, সে কাপড় কি পৌছবে বস্ত্রহীনের কাছে, ঠাকুরকে স্নান করালুম সেই স্নানের জল কি পাবে যে-মানুষ জলের অভাবে তৃষিত তাপিত? তা যদি না হ'ল তাহ'লে এ সেবা কোন্ কাজে লাগল? কেবল নিজেকে ভোলাবার কাজে? নিজের ছেলেকে যখন কাপড় পরাই তখন তার মধ্যে দুটো কথা থাকে, এক হচ্চে সে কাপড় যথার্থই ছেলের প্রয়োজনের কাপড়, দুই হচ্চে ছেলের প্রতি আমার স্নেহ সেই প্রয়োজন সিদ্ধ ক'রে নিজেকে সার্থক করে। খেলার সামগ্রীকে যখন কাপড় পরাই তখন কেবলমাত্র আমারই তৃপ্তি হ'ল, বাকিটুকু ব্যর্থ।

তুমি লিখেচ ঠাকুরের সেবা এবং জীবের সেবা দুইই আমাদের পূজার অঙ্গ, কিন্তু দুর্ম্মতিবশত যে-সেবাটা জগতের দুঃখ-নিবারণের জন্ম সত্যকার কাজে লাগে বর্ত্তমানকালে সেটা আমরা উপেক্ষা করেচি। ভাল ক'রে ভেবে দেখো কালক্রমে এ মোহ এল কেন? তার কারণ, এই বিশ্বাস মনে মনে আছে যে, ঠাকুরকে অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে একটা সত্যকার কাজ করা হ'ল। তা ছাড়া ঠাকুরের স্থান সর্ব্বাগ্রে, জীবের স্থান তার পরে, অতএব বড় কর্ত্তব্যটাকে সস্তায় সেরে বড় পুণ্যটাকে লাভ করা হয়ে গেলে বাকিটা বাদ দিতে ভয় হয় না, দুঃখ হয় না—বিশেষত বাকিটাই যেখানে দুষ্কর। জাতকুল দেখে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করা সহজ, লোকে তাই করে,—সে ভক্তি অধিকাংশ স্থলে অস্থানে প'ড়ে নিষ্ফল হয়; যথার্থ ব্রহ্মণ্যগুণে যিনি ব্রাহ্মণ তিনি যে জাতেরই হ'ন্, তাঁকে ভক্তির দ্বারা সত্য ফল পাওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু সেটা সহজ নয় এই জন্যই অস্থানে ভক্তির দ্বারা কর্ত্তব্যপালনের তৃপ্তিভোগ করা প্রচলিত হয়েচে।

আমাদের দেশে মানুষ সর্ব্বত্রই বঞ্চিত, উপেক্ষিত, মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য যদি বা শাস্ত্রের শ্লোকে থাকে আচারে নেই; তার প্রধান কারণ ধর্ম্মসাধনায় মানুষ গৌণ। সস্তায় পাপ-মোচনের ও পুণ্যফল পাবার হাজার হাজার কৃত্রিম উপায় যে-দেশের পঞ্জিকায় ও স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধানে অজস্র মেলে সে-দেশে বীর্য্যসাধ্য সত্যসাধ্য ত্যাগসাধ্য বুদ্ধিসাধ্য ধর্ম্মসাধনা বিকৃত না হয়ে থাকতেই পারে না। যেটা অন্তরের জিনিষ, যেটা চৈতন্যের জিনিষ সেটাকে জড়ের অনুগত ক'রে যদি নিয়ত তার অসম্মান করা হয় তবে আমাদের অন্তর-প্রকৃতি জড়ত্বে ভারগ্রস্ত হ'তে বাধ্য।

দেবপ্রতিমার কাছে পাঠা বলিদানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যখন করি তখন ব'লে থাকি পাঠাটা প্রতীকমাত্র, আসল জিনিষটা হচ্চে মনের পাপ, কিন্তু ব্যাখ্যাটা মুখের কথা, কর্ম্মটাই বাস্তব, তাই পাপটা যেখানকার সেখানেই থেকে যায় বরঞ্চ কিছু বেড়ে ওঠে। মাঝের থেকে হতভাগা প্রতীকটা পায় দুঃখ। প্রতীকেরই

উপর দিয়েই যত ফাঁকি চালিয়ে দিয়ে মানুষ আপন বুদ্ধিকে আপন মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করে ; আপন সাধনাকে দুর্ব্বল ও লঘু ক'রে দেয়। পুনশ্চ ব্যাখ্যা করবার সময় বলা হয়, যারা অজ্ঞান তাদের পক্ষেই এই বিধি। কিন্তু যারা অজ্ঞান তাদের অজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিয়ে চিরস্থায়ী করার দ্বারাই মুক্তির পন্থা সুগম করা হয় এ কথা মানতে পারিনে। চিরজীবন পাঁঠা বলি দিয়ে এবং বলির সংখ্যা ভীষণভাবে বাড়িয়ে তোলার রক্তসিক্ত পথ দিয়ে কয়জন পূজক অবশেষে বাহিরের ঐ পাঁঠা থেকে অন্তরের পাপের ঠিকানায় পৌঁছেচে ?

যারা জ্ঞানী তাদের ত কোনো ভাবনাই নেই, তারা সকল ক্ষেত্রেই স্বতই ঠিক পথ বেয়ে চলে, যারা অজ্ঞান তাদের মুগ্ধ ক'রে রাখলে মোহের অন্ত তারা পাবে না। এই কারণেই এদেশে বহু যুগ থেকেই পুণ্যলুব্ধ মানুষ পাণ্ডার পায়ে মোহর ঢেলে আসচে, দেশের লোকের গভীর দুঃখ যেখানে সেখানকার জন্যে, না মন, না ধন, কিছুই রইল বাকি। এ সম্বন্ধে দোষ দেবার বেলা আমরা আর এক প্রতীক পাক্‌ড়াও করেচি, সে হচ্চে ঐ বিদেশী। সন্দেহ নেই বিদেশীর হাত দিয়ে মার খেয়ে থাকি, কিন্তু সেই বিদেশীদের দিয়ে আমাদের আঘাত করাচ্চে কে ? আমাদের ভিতরকার সেই পাপ সেই কলি যে চিরদিন দেশের মানুষকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত ক'রে এসেচে—তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার মত কৌতূহলও যার নেই। যে-মারের জমি বহুকাল থেকে আমরা নিজের হাতে তৈরি করেচি সেইখানেই আজ বহুকাল ধরে বিদেশী মারের ফসল বুনে আসচে। আমাদের ধর্ম্মকে যদি সত্য করতে পারতুম, পূজার মধ্যে যথার্থ বীর্য্য, সেবার মধ্যে যথার্থ ত্যাগ থাকত, আমাদের সাধনা যদি যথার্থ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষকে সম্পূর্ণ আত্মীয়তার সঙ্গে স্বীকার করতে পারত তাহ'লে কখনই দেশকে এত যুগ ধরে এত দৈন্য এত অপমান সইতে হ'ত না, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এত দুর্ভর অজ্ঞানের চাপে সমস্ত দেশের লোক এমন অসহায় ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে মরত না।

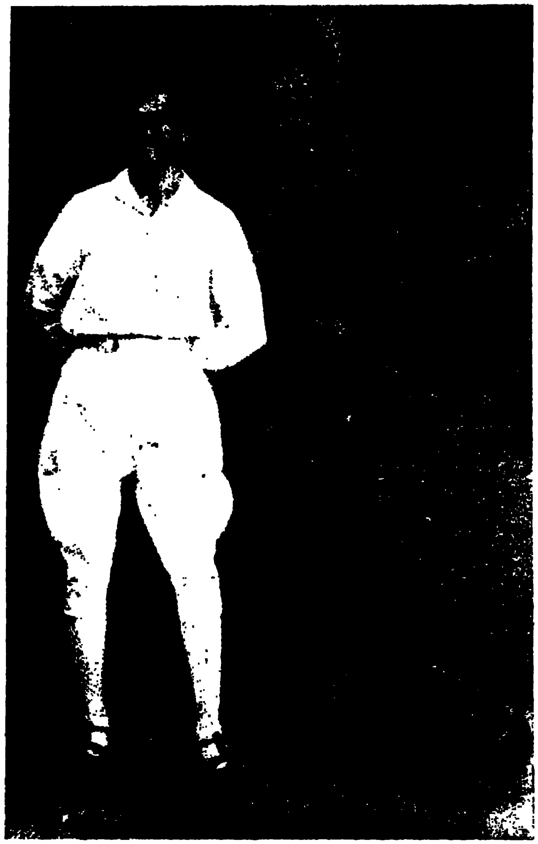
তুমি মনে ক'রো না, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মানুষ আমার সাধনার লক্ষ্য। চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আমার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি—নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিতে চাই তাঁর মধ্যে, অনুভব করতে চাই, আমার মধ্যে সত্য যা-কিছু, জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমি আমার ছোট-আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড় আমি, মহান আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি। সেই উপলব্ধির যোগে আমার পূজা আমার সেবা সত্য হয় আত্মাভিমানের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়। কর্ম্মই বন্ধন হয়ে ওঠে এই উপলব্ধির সঙ্গে যদি যুক্ত না হয়। য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দ্বারা তাঁদের কর্ম্মকে মহৎ ক'রে তোলেন,—তাঁরা দূর কালের জন্য প্রাণপণ করেন, সর্ব্বদেশের জন্যে। তাঁরা যথার্থ ভক্ত। যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে সারাজীবন অত্যন্ত শুচি হয়ে কাটালেন ভাবরসে মগ্ন হয়ে রইলেন, তাঁরা তো নিজেরই পূজা করলেন—তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার, তাঁদের রসসম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত, আর মুক্তি ব'লে যদি কিছু তাঁরা পান তবে সেটা তো তাঁদেরই পারলৌকিক কোম্পানির কাগজ।

ইতি ১২ আষাঢ়, ১৩৩৮

[শ্রীযুক্ত মণি ধর চুল ও দাঁতের জোর দেখাইবার জন্য নানা প্রকার কৌশল দেখাইয়া থাকেন। নিম্নে তাঁহার কয়েকটি কৌশলের চিত্র দেওয়া গেল।]



শ্রীযুক্ত মণি ধর



ব্যায়ামের পোষাকে শ্রীযুক্ত মণি ধর



মণিবাবু চুলে দড়ি বাঁধিয়া মোটর-কার আটকাইতেছেন



চুলের দ্বারা গাড়ী টানা



মণিবাবু চুলের দ্বারা দুইটি মানুষের ভার বহন করিতেছেন



মণিবাবুর চুল ধরিয়া একটি মানুষ ঝুলিয়া আছে



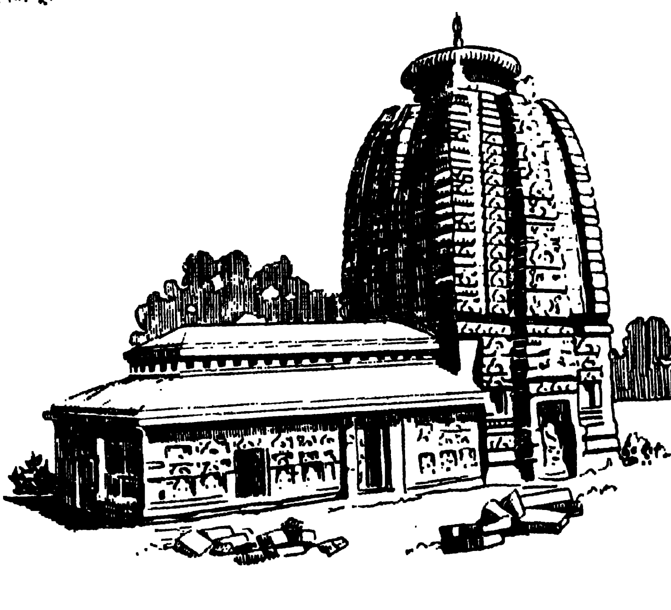
মণিবাবু চুলে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতেছেন



মণিবাবু দাঁতে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতেছেন



দাঁতে দড়ি আটকাইয়া মানুষের ভার বহন



কামরূপরাজমালা*

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালার পার্শ্ববর্ত্তী কামরূপ, মিথিলা, মগধ, উৎকল, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদের প্রাচীন কালের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস না থাকিলেও ইতিহাসের উপাদানের অভাব নাই। এই সকল উপাদান ইংরেজী ভাষার যোগে নানা পত্রে প্রকাশিত হইয়া বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। যাঁহারা ইংরেজী জানেন এমন অনেক লোকের পক্ষেও এই সকল পত্র সুলভ নহে। অথচ ইতিহাসের উপাদানগুলি সুলভ না হইলে জনসমাজে ইতিহাসের যথোচিত অনুশীলন সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্য বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির উদ্যোগীরা বাঙ্গালার ইতিহাসের নানা শাখার মূল উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার যোগে কয়েকখানি আকরগ্রন্থ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই পর্য্যায়ের একখানি মাত্র গ্রন্থ, ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সঙ্কলিত "গৌড়লেখমালা", প্রথম খণ্ড, বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এত কাল পরে এই শ্রেণীর আর একখানি গ্রন্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "কামরূপ-শাসনাবলী" পাইয়া বঙ্গসাহিত্যানুরাগী এবং ইতিহাসানুরাগী বাঙ্গালী মাত্রই মাথায় তুলিয়া লইবেন। বাঙ্গালার যে ভাগ করতোয়া নদীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত তাহা প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত ছিল। কামরূপের ইতিহাস না বুঝিলে বাঙ্গালার ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝা যাইতে পারে না।

প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকের উপাদান আহরণ করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্ঠার ফলে সূচনা হইতেই ভাগ্যবিধাতাও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। পূর্ব্বপ্রকাশিত বলবর্ম্মার মূল তাম্রশাসন লইয়া তাঁহার হাতেখড়ি। সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রকাশিত ধর্ম্মপালের (পুষ্পভদ্রা) শাসন তাঁহার হস্তগত হয়। ভাস্করবর্ম্মার সুদীর্ঘ শাসনের ছয়খানি ফলকের আবিষ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তি। হর্জ্জরবর্ম্মার তাম্রশাসনের একখানি ফলক লাভও কম সৌভাগ্যসূচক নহে। ভরসা করি এই শাসনের অপর দুইখানি ফলক আর বেশী দিন তাঁহার আকর্ষণ এড়াইতে পারিবে না, এবং তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া আরও অনেক শাসন আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত করিয়া যাইবেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি (ধর্ম্মপালের শুভঙ্কর পাটক শাসন) ছাড়া আর সকল শাসনই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। "কামরূপরাজাবলী" নামক ভূমিকাটিও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল প্রবন্ধ সংশোধিত হইয়া গ্রন্থাকারে একত্র প্রকাশিত হওয়ায় ইহাদের মূল্য অনেক বাড়িয়াছে। যাহা বাড়ির সকলে, পাড়ার সকলে, পড়িতে উৎসুক এমনতর বাঙ্গালা মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্র সঞ্চয় করিয়া রাখা সহজ নহে। সুতরাং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না করিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তাম্রশাসন সম্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ অনেক পাঠকের অগোচর থাকিয়া যাইত।

"কামরূপশাসনাবলী"তে গ্রন্থকার পদে পদে লিপি-পাঠে দক্ষতা, পাণ্ডিত্য, এবং বিচারকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। এই শ্রেণীর নিবন্ধ সহজপাঠ্য হইতে পারে না। যিনি একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই পুস্তকখানি আগাগোড়া পাঠ করিবেন তিনি ইতিহাসের জ্ঞান ছাড়াও নানা প্রকারে উপকার লাভ করিবেন। এই পুস্তকে সংগৃহীত শাসনগুলির মধ্যে কয়েকখানি গদ্যপদ্যময় সুন্দর সংস্কৃত কাব্য। স্ত্রী-পুরুষের নদ-নদীর এবং গ্রাম-নগরের নামের মধ্যে ভাষাতত্ত্ববিদেরা অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইবেন। অধিকাংশ কামরূপশাসনাবলীর মধ্যে রাজবংশের প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে শাসন গৃহীতা ব্রাহ্মণের বংশের প্রশস্তিও আছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, এই উপাদেয় পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। আশা করি স্বদেশের সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। একবার মাত্র পাঠ করিলে এইরূপ পুস্তকের পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া যায় না। ইহা পুনঃপুনঃ পাঠ করা আবশ্যক। বিশেষবিদেরা এই পুস্তকে নানা শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে পুনর্বিচারের অনেক উপাদান পাইবেন। আমি এই প্রস্তাবে কামরূপের ইতিহাস-সম্পর্কীয় দুইটি বিষয়ের পুনরালোচনা করিব। আমার আলোচ্য একটি বিষয়, মহাভারতোক্ত প্রাগজ্যোতিষ এবং কামরূপ ভিন্ন দেশ না অভিন্ন দেশ; দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়, কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা কখনও স্থায়িভাবে কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন কি না।

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, এই বর্ম্মণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভাস্করবর্ম্মার ঊর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ পুষ্যবর্ম্মা। পুষ্যবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে—

"সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধরণেচ্ছু কপট বরাহরূপী চক্রপাণির (বিষ্ণুর) নরক (নামক) রাজশ্রেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। সেই অদৃষ্টনরক (অর্থাৎ নরকের সহিত অপরিচিত) নরক হইতে ইন্দ্রের সখা ভগদত্ত জাত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুনকেও তিনি যুদ্ধে (স্পর্দ্ধা-সহকারে) আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই শত্রুহন্তা রাজার বজ্রগতি (অর্থাৎ বিদ্যুৎগতি) বজ্রদত্ত নামা পুত্র ছিলেন; তাঁহার সৈন্যগতি অপ্রতিহত ছিল; তিনি সর্ব্বদা যুদ্ধে ইন্দ্রকেও সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয় নৃপতিগণ তিন হাজার বৎসর রাজপদ অধিকার করিয়া দেবসাযুজ্য লাভ করিলে পুষ্যবর্ম্মা ক্ষিতিপতি হইয়াছিলেন" (কামরূপ শাসনাবলী, ২৮ পৃঃ)।

বাণভট্টের হর্ষচরিতে (সপ্তম উচ্ছ্বাসে)ও আছে পুরাকল্পে বরাহের সংসর্গে নরকে গর্ভবতী পৃথিবীর নরক নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত লোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার বংশীয় ভগদত্ত পুষ্পদত্ত বজ্রদত্ত প্রভৃতি মেরুপর্ব্বতের তুল্য মহান্ বহুতর মহীপাল রাজত্ব করিবার পর ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহারাজ

---

* কামরূপশাসনাবলী ভূমিকা কামরূপরাজাবলী সমন্বিত। শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। ১৩৩৮ সাল। মূল্য ছয় টাকা।

ভূতিবর্ম্মা অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। শাসনোক্ত পুষ্যবর্ম্মা ভূতিবর্ম্মার ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ। বাণের এবং ভাস্করবর্ম্মার সমসময়ের চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ্গ নরকের আখ্যান শুনিয়াছিলেন, এবং তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন, কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মা নারায়ণ দেবের বংশধর।

ভাস্করবর্ম্মার প্রশস্তিকায় যে মহাভারত হইতে নরক-ভগদত্ত-বজ্রদত্তের আখ্যান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ অজ্জুনের উল্লেখ। বাণ এবং য়ুয়ান চোয়াঙ্গ কামরূপী পুরাবৃত্তবেত্তাদিগের কথাই আবৃত্তি করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, নরক এবং ভগদত্তকে কামরূপে টানিয়া আনা কি প্রাচীন প্রমাণসঙ্গত, না রাজবংশপ্রশস্তিকারের স্বকপোলকল্পিত? বাল্মিকীর রামায়ণের ভৌগোলিক বিবরণ সম্ভবতঃ মহাভারতের ভৌগোলিক বিবরণ অপেক্ষা কতকটা প্রাচীনতর। রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ৪০ হইতে ৪৩ অধ্যায়ে সীতার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে বানরগণকে পাঠাইতে উদ্যত সুগ্রীবের মুখে চতুর্ভাগের ভূবিবরণ দেওয়া হইয়াছে।* সুগ্রীব (৪০শ সর্গে) পূর্ব্বদিকে এই সকল প্রাচ্যদেশের নাম করিয়াছেন—

> "ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোসলান্।
> মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্ত্বঙ্গাংস্তথৈব চ॥"

এখানে কামরূপ বা প্রাগ্জ্যোতিষের নাম নাই এবং বঙ্গেরও নাম নাই। পশ্চিম দিকের বর্ণনায় পশ্চিম সমুদ্রের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ৪২।৩০-৩২):—

> যোজনানি চতুঃষষ্টি বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
> সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥
> তত্র প্রাগ্জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
> তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥

"অগাধ সমুদ্রে ৬৪ যোজন বিস্তৃত সুবর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট বরাহ নামক সুমহান্ পর্ব্বত আছে। তথায় প্রাগ্জ্যোতিষ নামক সুবর্ণময় নগর আছে। এই নগরে নরক নামক দুষ্ট দানব বাস করে।"

রামায়ণের এই প্রাগ্জ্যোতিষপুর এবং নরক কবি কল্পনার সৃষ্টি। মহাভারতের সভাপর্ব্বে পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে চতুর্ভাগের জনপদ-সকলের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই দিগ্বিজয় ব্যাপারে চতুর্ভাগের মধ্যে উত্তরভাগ জয়ের ভার পড়িয়াছিল অজ্জুনের উপর এবং পূর্ব্বভাগ জয়ের ভার পড়িয়াছিল ভীমের উপর। ভীমের বিজয় বৃত্তান্তে, অঙ্গরাজ কর্ণের এবং মোদাগিরির (মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরের ?) রাজার পরাজয় বৃত্তান্তের পরে, বলা হইয়াছে (২৯, ১০৯৫-১১০০)† :—

> ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলং।
> কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসং॥
> উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
> নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
> সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
> তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
> সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগর-বাসিনঃ।
> সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ॥
> এবং বহুবিধান্ দেশান্ বিজিত্য পবনাত্মজঃ।
> বসু তেভ্য উপাদায় লৌহিত্যমগদ্বলী॥
> স সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছ নৃপতীন সাগরানূপবাসিনঃ।
> করমাহরয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ॥

অর্থাৎ ভীম পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেবকে এবং কৌশিকীকচ্ছ নিবাসী রাজাকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তারপর ভীম সমুদ্রসেন, রাজা চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্তরাজ, কর্ব্বটরাজ, সুহ্মরাজ, সাগরতীরের অধিবাসিগণ এবং ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে বহুদেশ জয় করিয়া এবং তাহাদের নিকট হইতে ধন লইয়া পবননন্দন (ভীম) লৌহিত্য (নদীর তীর পর্যান্ত) গমন করিয়াছিলেন। তিনি সাগরতীরবাসী ম্লেচ্ছনৃপতিগণের নিকট হইতে কর এবং নানাবিধ রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বভাগের এই লৌহিত্য অবশ্যই লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ। এখানে লৌহিত্যনদের তীরবর্ত্তী প্রাগ্জ্যোতিষের বা কামরূপের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং মনে করিতে হইবে, সেখানে যে তৎকালে এইরূপ নামধেয় জনপদ বা পুর ছিল তাহা মহাভারতকারের জানা ছিল না। কিন্তু অজ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরভাগ দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে (সভাপর্ব্ব, ২৫) মহাভারতকার প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্য এবং প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা ভগদত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রাগ্জ্যোতিষের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে অজ্জুনের উত্তরভাগ বিজয়ের বিবরণ স্মরণ করা আবশ্যক। কুলিন্দবিষয় জয় করিয়া অজ্জুন উত্তর দিগ্বিজয় আরম্ভ করিয়াছিলেন। তার পর আনর্ত্ত, কালকূট এবং কুলিন্দ জনপদ এবং সুমণ্ডল নামক রাজাকে জয় করিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া—

> বিজিগ্যে শাকলং দ্বীপং প্রতিবিন্ধ্যঞ্চ পার্থিবং॥
> শাকলদ্বীপবাসাশ্চ সপ্তদ্বীপেষু যে নৃপাঃ।
> অজ্জুনস্য চ সৈন্যৈস্তৈর্বিগ্রহস্তুমুলোঽভবৎ॥
> স তানপি মহেষ্বাসান্ বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ।
> তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈঃ প্রাগ্জ্যোতিষমুপাদ্রবৎ॥
> তত্ররাজা মহানাসীদ্ ভগদত্তো বিশাম্পতে।
> তেনাসীৎ সুমহদ্যুদ্ধং পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ॥
> স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চবৃতঃ প্রাগ্জ্যোতিষোঽভবৎ।
> অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ॥
>
> (২৫।৯৯৮-১০০২)

"শাকলদ্বীপ এবং রাজা প্রতিবিন্ধ্যকে জয় করিয়াছিলেন। সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত শাকলদ্বীপে যে সকল নরপতি বাস করিতেন তাঁহাদের সহিত অজ্জুনের সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ অজ্জুন সেই মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া প্রাগ্জ্যোতিষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্, প্রাগ্জ্যোতিষে ভগদত্ত নামক মহান্ রাজা ছিলেন। তাহার সহিত মহাত্মা অজ্জুনের খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। কিরাতগণ, চীনগণ এবং সাগরতীরবাসী অন্য অনেক যোদ্ধৃগণে প্রাগ্জ্যোতিষপতি পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন।"

ভগদত্তকে বশীভূত করিয়া অর্জ্জুন উত্তর দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং অন্তর্গিরি, বহির্গিরি এবং উপগিরি জয় করিয়াছিলেন। তারপর যথাক্রমে উলূক রাজ্য, রাজা সেনাবিন্দুর রাজ্য, দেবপ্রস্থ-নগর, মোদাপুর, বামদেব, সুদামন্, সুসঙ্কুল, উত্তরউলূক, পুরুবংশীয় রাজা বিশ্বগশ্বের রাজ্য জয় করিয়া এবং পর্ব্বতবাসী দস্যুগণকে দমন করিয়া—

* হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সংশোধিত সটীক রামায়ণ, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড হইতে (শকাব্দ ১৭৯৬) বচন প্রমাণ তোলা হইল।

† কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি মহাভারতের যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করেন তাহা হইতে বচন প্রমাণ তোলা হইল।

গণানুৎ সবসঙ্কেতানজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ।
ততঃ কাশ্মীরকান্‌বীরান্‌ ক্ষত্রিয়ান ক্ষত্রিয়র্ষভঃ॥ (২৬।১০২৫)

"পাণ্ডুপুত্র (অর্জ্জুন) উৎসবসঙ্কেত নামক সপ্ত গণকে জয় করিয়াছিলেন; তারপর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ (অর্জ্জুন) কাশ্মীর দেশীয় বীর ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়াছিলেন।"

কাশ্মীরের পর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যে সকল জনপদ জয়ের কথা আছে তন্মধ্যে ত্রিগর্ত্ত, বাহ্লীক, দরদ, কাম্বোজ উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরদিকে বিজিত দেশের মধ্যে যে শাকলদ্বীপ বা শাকদ্বীপের কথা আছে তাহার যদি কোন ভৌগোলিক ভিত্তি থাকে তবে তাহা মধ্য-এশিয়ার মালভূমির পশ্চিম ভাগ, যেখানে স্মরণাতীতকাল হইতে শকজাতি বাস করিত এবং যে দেশ গ্রীকদিগের নিকট সিথীয় নামে পরিচিত ছিল। শাকলদ্বীপের নৃপতিগণকে লইয়া অর্জ্জুনের যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ আক্রমণের কথা আছে সে দেশ কোথায়? মাত্র একশত শ্লোকের পরে মহাভারতকার ভীমের পূর্ব্ব দিগ্‌বিজয়প্রসঙ্গে পুণ্ড্র-বঙ্গ-সুহ্মের পরে যে লৌহিত্য নদের উল্লেখ করিয়াছেন অর্জ্জুনের আক্রান্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ তাহার তীরবর্ত্তী দেশ হইতে পারে না। সিথিয়ার বা শকভূমির পূর্ব্বদিকে মধ্য-এশিয়ায় এই প্রাগ্‌জ্যোতিষের স্থান নির্দ্দেশ না করিলে মহাভারতের সভাপর্ব্বের অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়ের বিবরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

কালিদাসের রঘুবংশকাব্যের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়ের বিবরণে লৌহিত্যনদের তীরে প্রাগ্‌জ্যোতিষের স্থান নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। এই বিবরণে কথিত হইয়াছে, রঘু দিগ্বিজয়ার্থ প্রথম পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিয়া ("স যযৌ প্রথমং প্রাচীং") সুহ্ম এবং বঙ্গ জয় করিয়া "উৎকলাদর্শিত পথে" দক্ষিণে কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ দিকের জনপদের মধ্যে কালিদাস কেবল পাণ্ড্যের ও কেরলের নাম করিয়াছেন।

দক্ষিণ দিক্‌ জয় করিয়া রঘু পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। পশ্চিমভাগের জনপদের মধ্যে কালিদাস পারসীকগণের এবং যবনগণের নাম করিয়াছেন। তারপর রঘু উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া হূণ এবং কাম্বোজ দেশ জয় করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে ("গৌরীগুরুশৈল") আরোহণ করিয়াছিলেন। হিমালয় প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে কালিদাস কিরাতগণের নাম করিয়াছেন এবং তারপর—

"শরৈর্‌=উৎসবসংকেতান্‌ স কৃত্বা বিরতোৎসবান্‌" (৪।৭৮)

"শর নিক্ষেপ করিয়া উৎসবসংকেত নামক জনগণকে উৎসবশূন্য করিয়া"

অর্থাৎ উৎসবসঙ্কেতগণকে জয় করিয়া—

"চকম্পে তীর্ণ লৌহিত্যে তস্মিন্‌ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর।" (৪।৮১)

"রঘু লৌহিত্যনদ পার হওয়ায় প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা কম্পিত হইয়াছিলেন।"

এক শ্লোক পরেই কালিদাস "প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরকে" "ঈশ কামরূপাণাম্‌", এবং তার পরের শ্লোকে "কামরূপেশ্বর" বলিয়াছেন। উপরে মহাভারতের সভাপর্ব্ব হইতে অর্জ্জুনের উত্তর দিগ্বিজয়ের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইবে অর্জ্জুন প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্তকে পরাজিত করিবার পর অনেক জনপদ অতিক্রম করিয়া তবে সপ্ত উৎসবসঙ্কেতগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কালিদাস উৎসবসঙ্কেতগণের পরাজয়ের পর রঘুর প্রাগ্‌জ্যোতিষ-আক্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যতিক্রমের, প্রাগ্‌জ্যোতিষকে লৌহিত্যের তীরে কামরূপে টানিয়া আনিবার কারণ, কালিদাসের সময় কামরূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে পরিচিত হইয়াছিল। কালিকাপুরাণেও আছে, বিষ্ণু নরককে এবং পৃথিবীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং—

"নিমগ্ন ক্ষণমাত্রেণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং গতঃ।
মধ্যগং কামরূপস্থ কামাখ্যা যত্র নায়িকা॥" (৩৮।৯৫)*

"ডুব দিয়া ক্ষণমাত্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর) কামরূপের অন্তর্গত এবং কামাখ্যা দেবী সেখানকার নায়িকা।"

বর্ত্তমানে প্রাগ্‌জ্যোতিষের এবং কামরূপের অভিন্নতা সম্বন্ধীয় সংস্কার আমাদের মনে এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আমাদের সহজে মনে হয় রামায়ণে এবং মহাভারতে যেখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষের গণ্ডরূপ সংস্থান সূচিত হইয়াছে সেখানে ভুল আছে, কিন্তু এই প্রকার সংস্কার ত্যাগ করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, যেখানে কামরূপের নাম নাই সেখানেই প্রাগ্‌জ্যোতিষের সংস্থান অন্যরূপ। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয়, যাঁহারা কামরূপের সহিত অপরিচিত ছিলেন তাঁহাদের প্রাগ্‌জ্যোতিষ স্বতন্ত্র জনপদ ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের নরক পৌরাণিক কল্পনার সৃষ্টি। সমসময়ের বিবরণমূলক স্বতন্ত্র প্রমাণ ব্যতিরেকে নরকের পুত্র এবং ইন্দ্রের সখা ভগদত্তের ঐতিহাসিকতাও স্বীকার করা কঠিন। মহাভারত অবশ্য ইতিহাস নামে কথিত হয়। কিন্তু এই ইতিহাস শব্দের অর্থ লোকপরম্পরাগত উপদেশপ্রদ আখ্যায়িকা। এরূপ আখ্যায়িকায় হিষ্ট্রি-বাচক ইতিহাস থাকিতেও পারে, নাও পারে। মহাভারতে পঞ্চপ্রকার গল্প ও "অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্‌" বলিয়া সূচিত হইয়াছে। সুতরাং স্বতন্ত্র প্রমাণের সহায়তায় বিচার না করিয়া মহাভারতের কোন লৌকিক আখ্যানকেও হিষ্ট্রির বাচক ইতিহাস বলা যায় না। আমার অনুমান হয়, পুষ্যবর্ম্মা-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের বংশাবলী প্রস্তুত করিবার সময় এই বংশের মহিমা-বৃদ্ধির জন্য বংশপ্রশস্তিকার বংশলতার মূলকে পৌরাণিক প্রাগ্‌জ্যোতিষের নরক-ভগদত্ত-বজ্রদত্তের বংশের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এই সূত্রে কামরূপের এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষের অভিন্নতা সম্পাদিত হইয়াছিল।

ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে শাসনদানের এই প্রকার ইতিহাস আছে—

"(সদৃশ) মহারাজাধিরাজ কুশলী শ্রীভাস্করবর্ম্মদেব চন্দ্রপুরি বিষয়ে (স্থিত) বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়পতিগণ ও বিচারালয়সমূহ প্রতি আদেশ করিতেছেন, আপনারা বিদিত হউন, এই বিষয়াভ্যন্তরে ময়ূর শাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র যাহা নরপতি ভূতিবর্ম্মা কর্ত্তৃক তাম্রপট্টদ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা এই তাম্রপট্টের অভাব বশতঃ করদ হইয়া পড়ায় মহারাজ জ্যেষ্ঠ ভদ্রদিগকে জ্ঞাপন করিয়া পুনশ্চ পট্ট করণার্থে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবীর সমকাল কোনও কিছু (কর) গ্রহণ যাহাতে না হয় সেই ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়ানুসারে পূর্ব্বে ভোগকারী ব্রাহ্মণদিগকে (পূর্ব্বোক্ত অগ্রহার ক্ষেত্র) প্রদান করিলেন" (৩৩ পৃঃ)।

এই শাসনের রাজবংশ প্রশস্তিতে দেখা যায় মহাভূতবর্ম্মা ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন। বাণের "হর্ষচরিতে" (৭ম উচ্ছ্বাস) ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহকে ভূতিবর্ম্মাই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাম-

* পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত (বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিত) "কালিকাপুরাণ" হইতে এই বচন উদ্ধৃত হইল।

শাসনের দানের বিবরণের উল্লিখিত ভূতিবর্ম্মা এবং রাজবংশপ্রশস্তিতে উক্ত মহাভূতবর্ম্মা যে অভিন্ন এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের রাজবংশ প্রশস্তিতে পুষ্যবর্ম্মা হইতে ভাস্কর-বর্ম্মার অগ্রজ সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মা পর্য্যন্ত এই বার জন রাজার যে বিবরণ আছে তাহাতে বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নাই। শাসনদাতা ভাস্করবর্ম্মার সুদীর্ঘ প্রশস্তি হইতেও কোন ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা অসাধ্য। সৌভাগ্যক্রমে বাণভট্টের "হর্ষচরিতে" এবং য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং জীবনচরিতে ভাস্করবর্ম্মার ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান পাওয়া যায়। ভাস্করবর্ম্মা সম্বন্ধে ভট্টাচার্য্য-মহাশয় লিখিয়াছেন—

"হর্ষচরিতে আছে, হর্ষবর্দ্ধন, তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন গৌড়াধিপ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়াই গৌড় অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন; কিয়দ্দূর যাইতে-না-যাইতেই ভাস্কর-বর্ম্মার দূত হংসবেগ আসিয়া উপহার প্রদান পূর্ব্বক হর্ষের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের প্রস্তাব করিলেন।···ভাস্করবর্ম্মা তাঁহার (গৌড়াধিপ শশাঙ্কের)ই ভয়ে অভিভূত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে অভিযানকারী হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে ঐরূপ মূল্যবান উপহারাদি প্রদান পূর্ব্বক মৈত্রীস্থাপন করিবার জন্য হংসবেগকে প্রেরণ করেন।···যাহা হউক, হর্ষবর্দ্ধন মৈত্রী স্বীকার করিয়া প্রত্যুপঢৌকন সহ নিজের প্রধান দূত পাঠাইয়া ভাস্কর-বর্ম্মাকে সম্মানিত করিলেন। অতঃপর ভাস্করের তাম্রশাসনে দেখিতে পাই—ভাস্কর "মহানৌহস্ত্যশ্বপত্তিসম্পত্তুপাত্ত জয়শব্দাম্বর্থস্কন্ধাবারাৎ কর্ণসুবর্ণবাসকাৎ" শাসনাদেশ করিয়াছেন। এই শাসনপ্রদান সময়ে কর্ণসুবর্ণ যে ভাস্করের অধীন ছিল এ কথা ঠিক বলিতে পারা যায় না; সম্ভবতঃ যখন দুই মিত্রে মিলিয়া প্রবল অমিত্র গৌড়াধিপ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণ হইতে তাড়াইয়া দিয়া বিজিত রাজধানীতে থাকিয়া শত্রুবিজয়ে উৎসবানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন—তখন এই তাম্রশাসন আদিষ্ট হইয়াছিল।" (১৪-১৬ পৃঃ)

পাদটীকায় ভট্টাচার্য্য-মহাশয় লিখিয়াছেন—

"অপিচ, ঐ আলোচনায় (৯ম পৃঃ) বলা হইয়াছে, এই শাসন ভাস্করের রাজত্বের প্রথম ভাগেই প্রদত্ত হইয়াছিল। এদিকে গুপ্ত ৩০০ (খৃঃ ৬১৯-২০) অব্দে সম্পাদিত গঞ্জামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে (*Epigraphia Indica*, vol. VI. p. 140 etc.) শশাঙ্ক মহারাজাধিরাজ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন; তাহাতে ইহাই প্রতীত হয় যে, তদানীং হর্ষ ও ভাস্কর কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণের বিজয় স্থায়ী হয় নাই; শশাঙ্ক ইহা পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। বোধ হয় শশাঙ্কের মৃত্যু (আনুমানিক ৬২৫ খৃঃ) হইলে পর ইহা হর্ষের সম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।" (১৬ পৃঃ পাদটীকা ২)

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা হর্ষের এবং শশাঙ্কের বিরোধের ইতিহাস যে আকারে গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে গিয়া ভট্টাচার্য্য-মহাশয় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মূল প্রমাণ অবলম্বনে পূর্ব্বাপর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাক এই সিদ্ধান্ত কতদূর বিচারসহ।

প্রভাকরবর্দ্ধন শ্রীকণ্ঠ নামক জনপদের রাজা ছিলেন। সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানীশ্বর (বর্ত্তমান আম্বালা জেলার অন্তর্গত থানেশ্বর নগর) এই জনপদের রাজধানী ছিল। প্রভাকরবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন হূণগণের সহিত যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্দ্ধন যখন স্থানীশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন তখন সংবাদ পাইলেন, "যেদিন প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে সেইদিনই দুরাত্মা মালবরাজ গ্রহবর্ম্মাকে বধ করিয়া তাঁহার পত্নী (রাজ্যবর্দ্ধনের ভগ্নী) রাজ্যশ্রীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কান্যকুব্জের কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে।" এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্দ্ধন দশ হাজার অশ্বারোহী লইয়া মালব-রাজের দণ্ডবিধান করিতে যাত্রা করিলেন।

রাজ্যবর্দ্ধনের কান্যকুব্জ অভিযানের কিছুকাল পরে তাঁহার অশ্বারোহী সেনাপতি কুন্তল আসিয়া তাঁহার অনুজ হর্ষবর্দ্ধনকে সংবাদ দিল, রাজ্যবর্দ্ধন অতি সহজে মালবসেনা পরাজিত করিয়া থাকিলেও বিশ্বাসঘাতক গৌড়াধিপের দ্বারা তিনি নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়াই অবশ্য হর্ষ গৌড়াধিপাধম চণ্ডালকে "ধ্বংস করিবার," "গৌড়াধমের চিতাধূম" দেখিবার, মেদিনী 'নির্গৌড়া' করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং হস্তীসেনার অধিনায়ককে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তারপর কিছুদিন অতীত হইলে (ব্যতীতেষ চ কেষুচিদ্দিবসেষু) শুভদিনে হর্ষ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথে শিবিরে আসিয়া কামরূপরাজদূত হংসবেগ হর্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তারপর পরাজিত মালবরাজের সেনাবল লইয়া ভণ্ডি আসিয়া হর্ষবর্দ্ধনের সহিত মিলিত হইল। হর্ষ ভণ্ডির নিকট শুনিতে পাইলেন, রাজ্য-বর্দ্ধনের হত্যার পর গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি কান্যকুব্জ অধিকার করিলে হর্ষের ভগ্নী রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বিন্ধ্যারণ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। হর্ষ ভণ্ডিকে বলিলেন, "আমি স্বয়ং রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানে যাইতেছি; আপনিও সেনা লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করুন।" অষ্টম উচ্ছ্বাসে হর্ষ কর্ত্তৃক রাজ্যশ্রীর উদ্ধার এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী শিবিরে পুনরাগমন বর্ণিত হইয়াছে; এবং এইখানেই হর্ষচরিত সমাপ্ত হইয়াছে।

হর্ষচরিতে গৌড় শব্দ জনপদ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, গৌড়াধিপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই যুদ্ধযাত্রার ফলে হর্ষ যে গৌড়দেশ (বাঙ্গালা) পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। শশাঙ্ক রাজ্য-বর্দ্ধনকে কান্যকুব্জে বা কান্যকুব্জের নিকটে কোথাও হত্যা করিয়াছিলেন, এবং তারপর গুপ্ত নামক যে ব্যক্তি কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন তিনি নিশ্চয়ই গৌড়াধিপের অনুগত ছিলেন: রাজ্য-বর্দ্ধনের হত্যার পর হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিয়াই যে শশাঙ্ক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া কর্ণসুবর্ণে আসিয়া হর্ষের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক এত দুর্ব্বল হইলে হূণবিজয়ী রাজ্যবর্দ্ধন কখনই তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেন না। শশাঙ্ক অবশ্য তীর্থ-দর্শনের জন্য গিয়া রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করেন নাই, তাঁহার সঙ্গে কান্যকুব্জ-বিজয়ের উপযোগী সেনাবল ছিল। রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার পর হর্ষের সহিত গৌড়াধিপের যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা খুব সম্ভব কান্যকুব্জ রাজ্য লইয়া। বাণভট্ট এই যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব্ব পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

হর্ষবর্দ্ধনের দিগ্বিজয়ের ইতিহাসের আকর য়ুয়ান চোয়াঙ্গের বিবরণ। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের বিবরণের গোড়ায় একটা মস্ত গলদ আছে। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, কান্যকুব্জ হর্ষবর্দ্ধনের পৈত্রিক রাজ্যের রাজধানী ছিল, এবং রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার পরই হর্ষ কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"Hereupon the statesmen of Kanauj, on the advice of their leading man Bani, invited Harshavardhana, the younger brother of the murdered king, to become their sovereign." (Watters)

"হর্ষচরিত" পাঠে জানা যায়, রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার সময় হর্ষ স্থানীশ্বরে ছিলেন এবং তাঁহার পিতার মিত্র বৃদ্ধ সেনাপতি সিংহনাদ তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ হর্ষের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"As soon as Siladitya (Harsha) became ruler got together a great army, and set out to avenge his brother's murder and to reduce the neighbouring countries to subjection. Proceeding eastwards he invaded the states which had refused allegiance, and waged incessant warfare until in six years he had *fought* the five Indias, (or brought the Five Indias under allegiance)" (Watters).

৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পহুঁছিয়া পশ্চিম দিকের অন্যান্য জনপদ পর্য্যটন করিয়া য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ যখন কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহার অনেক পূর্ব্বেই সেইখানে হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন ক্ষুদ্র রাজা শ্রীকণ্ঠের কথা এবং স্থানীশ্বরে রাজধানীর কথা হয়ত সাধারণ লোকে এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে থানেশ্বরের যে বিবরণ আছে তাহাতে থানেশ্বর যে বর্দ্ধন-বংশের আদি রাজধানী ছিল এ কথার কোন উল্লেখ নাই। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের জীবনচরিতে থানেশ্বরের নাম মাত্র আছে, আর কোন কথা নাই। ইহাতে মনে হয় পরিব্রাজক নিজে থানেশ্বরে যান নাই, অথবা গেলেও সেখানকার আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে কোন খবর জানিতে পারেন নাই।

হর্ষবর্দ্ধনের কান্যকুব্জ অধিকারের পূর্ব্ব সময়ের ইতিহাসের কোন বিবরণই যে য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ পান নাই তাহার অন্য প্রমাণও আছে। য়ুয়ান চোয়াঙ্গ কান্যকুব্জ-বিবরণে লিখিয়াছেন, হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ছয় বৎসর দিগ্বিজয়ে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর ত্রিশ বৎসর কাল অস্ত্রধারণ না করিয়া শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানে হর্ষবর্দ্ধনের ছত্রিশ বর্ষব্যাপী রাজত্বের হিসাব মাত্র পাওয়া যায়। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে, এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-রচনা সাঙ্গ করিয়াছিলেন ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে। চীনদেশের ইতিহাসের মতে হর্ষবর্দ্ধন ঐ সালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মাত্র ৩৬ বৎসর তাঁহার রাজত্বকাল ধরিলে ৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যলাভ দাঁড়ায়। আর একদিকে হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যলাভ হইতে গণিত হর্ষসম্বৎ আরম্ভ হইয়াছে ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ ৬০৬ হইতে ৬১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের হর্ষবর্দ্ধনের কার্য্যকলাপের কোন খবরই দিতে পারেন নাই। অনুমান হয় গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সহিত এই ছয় বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের ফলে হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জ এবং মধ্যদেশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন এবং ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন কখন?

কঙ্গোদের রাজা শৈলোদ্ভব বংশীয় দ্বিতীয় মাধবরাজের ৩০০ শত গুপ্তাব্দের (৬১৯ খৃষ্টাব্দের) তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের উল্লেখ আছে। গঞ্জাম জেলা কঙ্গোদ-রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করেন ৬১৯ খৃষ্টাব্দে যিনি কঙ্গোদের অধিরাজ ছিলেন এই শশাঙ্ক এবং গৌড়াধিপ শশাঙ্ক অভিন্ন ব্যক্তি। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভাট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখিয়া গিয়াছেন, এই ৬১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন।* শশাঙ্কের পক্ষে ৬০৬ হইতে ৬১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মূল রাজ্য এবং রাজধানীভ্রষ্ট হইয়াও ৬১৯ খৃষ্টাব্দে সুদূর কঙ্গোদ পর্য্যন্ত অধিরাজ্য রক্ষা একেবারে অসম্ভব না হইলেও এরূপ ঘটনা সামান্যতঃ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বলবৎ প্রমাণের অভাবে এইরূপ অনুমান করা অসাধ্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে বলেন, "তদানীং (ভাস্করের রাজত্বের প্রথম ভাগে) হর্ষ ও ভাস্কর কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণের বিজয় স্থায়ী হয় নাই; শশাঙ্ক ইহা পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন", এই অনুমানও সঙ্গত মনে হয় না। শশাঙ্কের পক্ষে কর্ণসুবর্ণ ভ্রষ্ট হওয়ার অর্থ তাঁহার মূল রাজ্য গৌড়ভ্রষ্ট হওয়া। গৌড়রাজ্য একবার অপ্রতিহত প্রভাব হর্ষবর্দ্ধনের পদানত হইলে আবার যে অস্তমিতপ্রভাব শশাঙ্ক তাহা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা কঠিন। যদি মনে করা যায়, ৬১২ খৃষ্টাব্দের পর ছয় বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে রত থাকিয়া হর্ষবর্দ্ধন দিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এবং ৬১৯ খৃষ্টাব্দে বা তাহার অব্যবহিত পরে গৌড় জয় করিয়াছিলেন, তাহা হইলে য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের বিবরণের সহিত কঙ্গোদ-রাজের ৬১৯ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসনের প্রমাণের অনেকটা সামঞ্জস্য হইতে পারে।

হর্ষবর্দ্ধন যে সময়েই স্থায়িভাবে গৌড় অধিকার করিয়া থাকুন, এ ব্যাপারে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা যে তাঁহার সহকারী ছিলেন এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যদি তাই হয়, তবে স্থানীশ্বর হইতে হর্ষের রাজধানী যেমন কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, সেইরূপ কামরূপ হইতে ভাস্করবর্ম্মার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে স্থানান্তরিত হওয়া অসম্ভব নহে। হর্ষের এবং ভাস্করের মিত্রতার মূল উভয়ের লক্ষ্যের ঐক্য, গৌড়াধিপ শশাঙ্কের ধ্বংসসাধন। উভয়ের চেষ্টায় সেই উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হইয়াছিল তখন শশাঙ্কের বিস্তীর্ণ রাজ্যের পূর্ব্বাংশ ভাস্করবর্ম্মার ভাগে পড়া অসম্ভব নহে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের জীবনচরিতের পঞ্চম অধ্যায়ের এক স্থানে ভাস্করবর্ম্মাকে Kumar-raja of Eastern India, প্রাচ্য ভারতের কুমার রাজা, বলা হইয়াছে। আনুমানিক ৬৪২ খৃষ্টাব্দে ভাস্করবর্ম্মার অনুরোধমত নালন্দার বিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র যখন য়ুয়ান-চোয়াঙ্গকে ভাস্করবর্ম্মার নিকট পাঠাইতে অসম্মত হইয়াছিলেন তখন ভাস্করবর্ম্মা ভয় দেখাইয়া লিখিয়াছিলেন, "প্রয়োজন হইলে আমি সৈন্য এবং হাতী লইয়া গিয়া নালন্দার মঠ ধূলিসাৎ করিব।" ভাস্করবর্ম্মা যখন য়ুয়ান-চোয়াঙ্গকে লইয়া হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন তখন ৩০,০০০ নৌকা প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্গের জীবনচরিতে আছে—

"Then embarking with the Master of the Law (য়ুয়ান-চোয়াঙ্গ) they passed up the Ganges togther in order to reach the place where Siladitya-raja (হর্ষবর্দ্ধন) was residing." (Beal.)

হর্ষবর্দ্ধন তখন শশাঙ্কের সাম্রাজ্যাবশেষ কঙ্গোদ বশীভূত করিয়া কান্যকুব্জে ফিরিবার পথে বাঙ্গালায় অবস্থান করিতেছিলেন। ভাস্করবর্ম্মা যদি কামরূপের খাস রাজধানী হইতে নৌকা যাত্রা করিতেন তবে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া নৌকায় উঠিতে হইত। ভাস্করবর্ম্মা যখন চীনদেশীয় পরিব্রাজককে লইয়া গঙ্গার ঘাটে নৌকায় উঠিয়াছিলেন তখন মনে করিতে হইবে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী কোন নগর হইতে, খুব সম্ভবত কর্ণসুবর্ণ হইতে, তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন অবশ্য সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন এবং ভাস্করবর্ম্মা অনুগত মিত্ররাজা ছিলেন। ভাস্করবর্ম্মার কর্ণসুবর্ণ রাজ্যলাভ

* R. D. Banerji, *History of Orissa*, Vol. I, Calcutta, 1930, p. 129.

হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য গড়ন বিধির বিরোধী নহে। কান্যকুব্জে যখন হর্ষবর্দ্ধনের আহূত বৌদ্ধ মহাসভা মিলিত হইয়াছিল, তখন ভাস্করবর্ম্মা ছাড়া সেখানে হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের আরও আঠারজন নরপতি উপস্থিত ছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য, হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত জনপদগুলির শাসনভার তাঁহার নিজের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত ছিল না, যথাসম্ভব পূর্ব্ব রাজাদের হস্তেই ছিল। কালিদাস রঘুবংশে (৪।৩৭) রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই ভাষায় বলা যাইতে পারে, হর্ষ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জনপদের নরপতিগণকে "উৎখাত প্রতিরোপিত" করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রথম রাজ্যচ্যুত করিয়া, পরে অধীনতা স্বীকার করিলে, পুনঃ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সম্বন্ধে অবশ্য এই রীতির অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ভাস্করবর্ম্মার সহায়তায় কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া হর্ষ খুব সম্ভব তাঁহাকেই সেই রাজ্য দান করিয়াছিলেন। এই সূত্রে স্কন্ধাবার কর্ণসুবর্ণবাসক হইতে ভাস্করবর্ম্মার ভূমিদানের সুযোগ ঘটিয়াছিল। সুতরাং ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে পাওয়া যায় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের দ্বিতীয় পাদে গৌড়দেশ কামরূপ-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল।

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটি মহামূল্য তথ্য পাওয়া যায়। কুলজ্ঞগণের সংগৃহীত রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বংশাবলীর গোড়ায় গল্প আছে, রাজা বল্লালসেনের কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে আদিশূর নামক রাজা বাঙ্গালার মোট ৭০০ ঘর ব্রাহ্মণের মধ্যে যাগযজ্ঞ করিবার উপযুক্ত লোক না পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালের সমস্ত রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই পাঁচজনের বংশধর বলিয়া পরিচিত। "গৌড়রাজমালা"য় মত প্রকাশ করা হইয়াছিল, কুলগ্রন্থের এই গল্পের ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মতের মূলে যে বিচাররীতি আছে তাহা এ দেশের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এখনও সম্যক্ সমাদর লাভ করে নাই। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রকাশিত কর্ণসুবর্ণে সম্পাদিত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে দুই শতের অধিক প্রতিগ্রহকারী ব্রাহ্মণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, আদিশূর যদি ভাস্করবর্ম্মার অথবা শাসনের মূলদাতা ভূতিবর্ম্মার পরে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন তবে তাঁহার যজ্ঞ করিবার জন্য সুদূর কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আমদানি করিবার কোন দরকার ছিল না। করতোয়ার পূর্ব্ব পারে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অনেক ছিলেন এবং পশ্চিম পারেও নিশ্চয়ই উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাব তখন ছিল না। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় লিখিয়াছেন—

"কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আমদানী ব্যাপারটা এখন অমূলক বলিয়াই খ্যাপিত হইতেছে। যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব ভারতের এই পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে তখন যে ছিল না, এবং রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায় যে পঞ্চগোত্রের কথা আছে ঐ সকল গোত্রের ব্রাহ্মণও যে এতদঞ্চলে ছিল, তাহা এই ভাস্করের শাসন হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে।" (৯ পৃঃ, টীকা ২)

ভাস্করবর্ম্মার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই বোধ হয় এই প্রথম বর্ম্মণ-বংশ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং শালস্তম্ভ নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শালস্তম্ভের উত্তরাধিকারীরাও আপনাদিগকে নরক ভগদত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত পাল-বংশের রাজাদিগের বংশপ্রশস্তিতে শালস্তম্ভকে বলা হইয়াছে "ম্লেচ্ছাধিপতি", এবং পাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম্মপালকে বলা হইয়াছে নরক-ভগদত্তের বংশধর। নেপালের ৭৫৯ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপিতে ভগদত্ত-বংশীয় হর্ষ নামক রাজাকে "গৌড়োড্র-কলিঙ্গকোশলপতি" বলা হইয়াছে। এই হর্ষ সম্ভবতঃ শালস্তম্ভ-বংশীয় হর্ষবর্ম্মা (২৩ পৃঃ)। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দে উড়িষ্যায় ভৌম অর্থাৎ নরক-বংশীয় ক্ষেমঙ্করদেব, শিবকারদেব, শুভকরদেব এবং দ্বিতীয় শিবকরদেব নামক চারিজন রাজার সন্ধান পাওয়া যায়।* ক্ষেমঙ্কর দেব বোধ হয় কামরূপরাজ ওড়বিজয়ী হর্ষবর্ম্মার জ্ঞাতি এবং অনুচর ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা উড়িষ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে গোপাল দেব কর্ত্তৃক গৌড়ে পরাক্রান্ত পাল-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তারপর কামরূপাধিপতিদিগের পক্ষে করতোয়া পার হইয়া গৌড় আক্রমণ বা দিগ্বিজয় সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে বোধ হয় গৌড়ের পালনর-পালগণের অনুগত থাকিতে হইয়াছিল।

এই যে কয়টি বিষয় এই প্রস্তাবে আলোচিত হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে "কামরূপশাসনাবলী" ইতিহাসসেবকের হিসাবে অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার। এই পুস্তক বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনায় নবশক্তি সঞ্চারিত করিবে। আশা করি, অন্যান্য পণ্ডিতেরা পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মহৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মাতৃভাষার যোগ্য ইতিহাসের আকরগ্রন্থ সঙ্কলনে ব্রতী হইবেন।

---

* *Epigraphia Indica*, Vol. XV pp. 1–6; R. D. Banerji, *History of Orissa*, Vol. I., p. 147.

রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ শৈশবকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সেকালে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার বিশেষ সমাদর ছিল না। চৈতন্যের যুগে ও তাহার পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণব কবিতার যে কিরূপ অপ্রতিহত প্রভাব ছিল সে-কথা অধিকাংশ লোকে বিস্মৃত হইয়াছিল। এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্যতীত সাহিত্যে বা অন্য সমাজে বৈষ্ণব কবিতার চর্চ্চা হইত না। বাঙালী কবিদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল ভারতচন্দ্র রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ঘরে ঘরে, দোকানে হাটে পঠিত হইত। বৈষ্ণব কবিতা শুনিতে পাওয়া যাইত কেবল সংকীর্ত্তনে, হরিবাসরে ও বৈষ্ণব সভায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কাব্য রচনায় বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব লক্ষিত হয় না। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সর্ব্বত্র পঠিত ও গীত হইত, কিন্তু তাঁহার রচনা সংস্কৃত ভাষায় এবং ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দ বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত নয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইতে বাংলা সাহিত্যে আর এক যুগের আরম্ভ। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বৈষ্ণব কবিতার কোন আভাস নাই। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে কাশীরাম দাস, কীর্ত্তিবাস (কৃত্তিবাসের রূপান্তরিত নাম), জয়দেব, কালিদাস ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু জয়দেব ব্যতীত আর কোন বৈষ্ণব কবির নাম করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে শিক্ষানবিশি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে; প্রথম প্রথম তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে কবিতা লিখিতেন। বৈষ্ণব কবিতা যে তিনি পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার রচিত দুই চারিটি গান হইতে বুঝিতে পারা যায়।

> ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরিনু বহু দেশ।
> কাঁহা মোরে কান্ত বরণ কাঁহা রাজবেশ॥

ইহা বৈষ্ণব কবিতার ব্রজবুলির অনুকরণ। বঙ্গদর্শনে বহুমুখী সাহিত্যের অবতারণা হয়। কাব্য ও সাহিত্য সমালোচনা বঙ্গদর্শনের একটি প্রধান অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক, তাঁহার তুল্য সমালোচক এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় আর কেহ হয় নাই। কিন্তু তিনি অথবা বঙ্গদর্শনের আর কোন লেখক কোন বৈষ্ণব কবির রচনা সমালোচন করেন নাই। তথাপি বঙ্গদর্শনে একজন প্রধান বৈষ্ণব কবি সম্বন্ধে সংশয় নিরাকৃত হইয়াছিল। বিদ্যাপতিকে সকলে বঙ্গবাসী বলিয়া জানিত, কোন কোন পুস্তকে তাঁহার উপাধি ভট্টাচার্য্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গ্রিয়ার্সনের সহায়তায় ও স্বতন্ত্র প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী ও তাঁহার পদাবলী মৈথিল ভাষায় রচিত।

যে-বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন সে-কালে বটতলা ছাড়া বৈষ্ণব কবিতা আর কোথাও পাওয়া যাইত না। বটতলার ছাপা ভুলে ভরা, কিন্তু কেবল বটতলার প্রসাদে পদকল্পতরুর ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ লুপ্ত হয় নাই। অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস নামধারী সকল কবি ও বিদ্যাপতির রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, অপর কোন বৈষ্ণব কবির পদাবলী সন্নিবেশিত হয় নাই। বঙ্গদর্শনের যুগে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিগণের মধ্যে কে মিল্টন, কে বায়রণ সেই কথার আলোচনা হইত। সমসাময়িক সকল শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবির গ্রন্থাদি সমালোচিত হইত না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরচিত স্বপ্নপ্রয়াণের ন্যায় অতুলনীয় গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়াছিল এরূপ স্মরণ হয় না। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কোন কবিতা কখনও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় নাই, কেবল ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইত।

বৈষ্ণব কবিতার যে শুধু সমাদর ছিল না এমন নহে তাচ্ছিল্য ভাবও লক্ষিত হইত। একজন খ্যাতনামা কবি,

ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "মহাজন পদাবলী, রাধাকৃষ্ণ ঢলাঢলি। ললিত লবঙ্গ লতা, গোস্বামী খুড়োর মাথা।" বৈষ্ণব কবিতার ন্যায় গীতিকবিতা যে জগতে বিরল এ কথা কেহ মনে করিত না। বটতলার নিকৃষ্ট পুস্তকালয়ে, বৈষ্ণব ভিক্ষুকের কণ্ঠে ও ভাবুক ভক্ত বৈষ্ণবের গৃহে বৈষ্ণব কাব্য আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। বাঙালী কবিদের মধ্যে একা রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার গূঢ় মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিশোর বয়সে, তাঁহার প্রতিভার উন্মেষের প্রথম অবস্থাতেই তিনি বৈষ্ণব কবিতার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। বটতলার পুঁথি লইয়াই তিনি পদকল্পতরু পড়িতে আরম্ভ করেন। মধুসূদন দত্ত "মাতৃ-ভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে" পাইয়া ইংরেজী রচনার "ভিক্ষাবৃত্তি" পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের জহুরি। তিনি চিনিয়াছিলেন খনির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি বৈষ্ণব কবিতা।

বৈষ্ণব কবিতা দুইটি স্বতন্ত্র ভাষায় রচিত। এক মৈথিল, দ্বিতীয় বাংলা। বিদ্যাপতির পূর্ব্বে মিথিলায় কেহ কখনও মৈথিল ভাষায় কিছু রচনা করেন নাই। মিথিলার পণ্ডিতেরা মৈথিল ভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন; বাংলা দেশেও পণ্ডিতেরা "ভাষা"কে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয় নাই। বিদ্যাপতি যেমন মিথিলার আদি কবি, চণ্ডীদাসও সেইরূপ বাংলার আদি কবি। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে দুই জন মিথিলাবাসী, বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাস ঝা, যাঁহাকে আমরা কবিরাজ গোবিন্দ দাস বলিয়া জানি। ইঁহাদের কবিতা বিশুদ্ধ মৈথিল ভাষায় রচিত। লিপিকরের অজ্ঞতায় বিকৃত হইয়াছে। ইঁহাদের অনুকরণে মিশ্র ভাষায় যে-সকল পদ রচিত হইয়াছে তাহাই ব্রজবুলি।

গীতিকবিতার সকল শ্রেষ্ঠ লক্ষণ মহাজন পদাবলীতে বিদ্যমান। ভাষায়, ভাবে, ভঙ্গীতে, শব্দের কোমলতায়, ছন্দের তরলতায়, আনন্দের উচ্ছ্বাসে, মর্ম্মবেদনার তীব্রতায়, হৃদয়ের আবেগে বৈষ্ণব কবিতার তুলনা নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার পূর্ণবিকাশ গীতিকবিতায়। বৈষ্ণব কবিতা তিনি কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিরচিত ভানুসিংহের পদাবলী হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল কবিতা তাঁহার কিশোর বয়সের রচনা। বৈষ্ণব কাব্যযুগের পর কোন বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্রজবুলির মধুমাখা ভাষা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার শৈশব ও কিশোর বয়সের রচনায় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কিছু প্রভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব অনেক অধিক। রবীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দমাধুর্য্য একমাত্র বৈষ্ণব কবিতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কালে তাঁহার প্রতিভা শতদল পদ্মের ন্যায় বিকশিত হইয়া চারিদিকে পরিমল বিকীর্ণ করে। সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছিলেন জ্ঞানদাসও একজন শ্রেষ্ঠ কবি। জ্ঞানদাসের বিরচিত পদের এক পংক্তি অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতায় স্থানলাভ করিয়াছে। জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন, "প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর"। রবীন্দ্রনাথের লেখা, "প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।" ইহাতে কবির যশঃ ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং গৌরবান্বিত হয়।

বঙ্গদর্শনের যুগে বাঙালী কবিকে ইংরেজ কবির সহিত তুলনা করা হইত বলিয়াছি। আর একটা বিশ্বাস ছিল মহাকবি হইতে হইলে মহাকাব্য লিখিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ করিতেন, সুকবি বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন। সমবেত সভার মধ্যে নিজের কণ্ঠ হইতে মালা খুলিয়া তরুণ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে মহাকাব্য লিখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে গীতিকবিতার অধিষ্ঠাত্রী বাণীকে সম্বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেক্‌ল কখন্ তোমার কাঁকন—
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।
পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন খড়্গ।
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী কেলে
কীর্ত্তি-কলাপ।

বাংলার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বৈষ্ণব কবিতাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য উদ্ধৃত করি।

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,—একি শুধু দেবতার?
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা?

* * *

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্য পথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি' কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার।

মহাকাব্য রচনা করা রবীন্দ্রনাথের ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু তিনি মহাকবি কি না জগতের সকল সাহিত্যে, সকল ভাষায় তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

শিল্পী

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পাল

তোমরা মুছিয়া যাও একে একে রৌদ্র দিনগুলি
সাথে সাথে এঁকে যাও ঝিলিমিলি অনন্ত বিজুলী
মৃত্যুর তিমির নভে। শরতের প্রভাতের মত
তোমরা খসায়ে যাও শুভ্র মুগ্ধ পুষ্প শত শত
সাথে সাথে এঁকে দাও দুগ্ধ আলিপনা
মরণের শ্যামতৃণে। জীবনের যা কিছু বেদনা
সেথায় ফুটায়ে তোল জীবনের দীপ্ততম ছবি!
মরণের কেহ নহ তোমরা জীবন, শিল্পী, কবি।

আমরা হারাই শুধু। মুছে যাই ধুয়ে যাই সব
জীবনের রক্ত, নীল, শুভ্র, পীত, অনন্ত বৈভব
শিথিল মলিন হাতে। মরণের কণাগুলি লয়ে
আমরা গড়েছি হায় মরণের জয় যাত্রা বয়ে
জীবনের অঙ্কে অঙ্কে। জীবনেও মরণের ডোর
জড়াযে জড়ায়ে রচে রৌদ্রহীন কুহেলীর ঘোর।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

১

শরতের প্রভাত। মৃদুস্নিগ্ধ বাতাসে রহিয়া রহিয়া শস্যসমৃদ্ধ প্রান্তরের সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে।

বহু কণ্ঠের সমবেত গুঞ্জন।

নিরামিষ রন্ধনশালার প্রশস্ত বারান্দায় এক ঝলক রোদ আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নীলাকাশের নিজস্ব যে নির্ম্মল নীল আলো তাহা আজ কোনও দিকে কোনও বারণ মানিতেছে না।

ভিতরে মুগডাল সিদ্ধ হইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া তাহার সুগন্ধ পল্লীলক্ষ্মীর অদৃশ্য অঞ্চল গন্ধের সঙ্গে মিশিতেছে। নিস্তার বড় বড় চারিটি ঝুড়ি হইতে তরকারী বাছিয়া নামাইতেছে। নিস্তার কৃশকায়া শ্যামাঙ্গী রূপসী। ক্ষেন্তি রূপসী নহে, চটুলা, তাহারও গায়ের বর্ণ শ্যাম, সে পরিপূর্ণদেহা। বাছা তরকারী-গুলিকে সে ভাগে ভাগে তিনটি বঁটির মুখে আগাইয়া দিতেছে। বেগুন, পেঁপে, বাঁধাকপি, শসা, ডাঁটা, লাউ-ডগা, জলপাই;—হালকা গভীর নানাস্তরের সবুজ, ফিকে এবং গাঢ় লাল, বেগুনী, হলদে, সাদা, নানারঙের কোটা তরকারী থাক্ থাক্ হইয়া ভাগে ভাগে জমিতেছে। বাবুদের জন্য এক ভাগ, কাছারীবাড়ির আমলাদের জন্য এক ভাগ, ঝি-চাকরদের জন্য এক ভাগ, এই তিন ভাগে রান্না, ইহার উপর রাধা-গোবিন্দজীর ভোগের এক ভাগ আছে। ভোর না হইতে সুরু হইয়াছে, এক প্রহর বেলা বহিয়া গেল, তবু বঁটি চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখও চলিতেছে।

অন্যদিন ডাকহাঁক করিয়া কথা চলে, উপস্থিত অনুপস্থিত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোককে লইয়া সোৎসাহ আলোচনা। আজ মুখ চলিতেছে, কিন্তু গলা তেমন করিয়া খুলিতেছে না। শানবাঁধানো প্রকাণ্ড উঠান পার হইয়া তবে ভিতরের মহলের দেউড়ি, উপরের সমস্তগুলি জানালার সার্সি খড়খড়ি বন্ধ, তবু সকলেরই মুখেচোখে কেমন একটু সন্ত্রস্ত ভাব; এদিক্ ওদিক্ সচকিত চাওয়া-চাওয়ি, ইসারা-ইঙ্গিতের আদানপ্রদান চলিতেছে। বঁটি লইয়া যাহারা বসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুক্তোর-পিসি সেকেলে মানুষ; ক্ষেন্তি যখনই একটু বেসামাল হইবার উপক্রম করিতেছে, বৃদ্ধা তাহাকে চাপাগলায় শাসন করিয়া থামাইয়া দিতেছে। তারপর ক্ষেন্তিরই কথার ধুয়া ধরিয়া গলার স্বর যথাসম্ভব মৃদু করিয়া নিজেই বারবার বলিতেছে, "মুখে ঝাড়, মারতে হয় বৈকি, মুড়ো ঝাঁটা, মুড়ো ঝাঁটা, পোড়া কপাল আবাগীর—"

একরাশ তরকারির খোসা জমিয়াছিল। শ্রোত্রীদেরও ঔৎসুক্য অপেক্ষা উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া, কালো কস্তাপাড় শাড়ীর আঁচলটি কোমরে জড়াইতে জড়াইতে ক্ষেন্তি উঠিয়া পড়িল। খোসাগুলিকে স্তূপাকার করিয়া চাপিয়া একটা বারকোসে উঠাইয়া লইয়া সেটাকে বাঁ হাতের তেলোয় চাপাইয়া সে অন্দরের দীঘির ওপারে গোয়ালঘরের দিকে চলিল। খিড়কির কাছে একটা কুকুর খাবারের থালা মনে করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, সেটাকে লক্ষ্য করিয়া একটা লাথি ছুঁড়িয়া তারপর দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পশ্চিমের ঘাটে সরকারদের একটি বউ জল লইতে আসিয়াছে, ক্ষেন্তিকে দেখিয়া দু-হাত ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইল। এ-গ্রামে ক্ষেন্তির সম্মানিত স্থান প্রায় কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর পরেই। ক্ষেন্তি দাঁড়াইল না, বউটির দিকে একবার মাত্র চাহিয়া "এত বেলা করে জল নিতে এসেছ কেন গা," বলিতে বলিতে দীঘির কোণ পার হইয়া গেল।

মূলতানী ও দো-আঁসলা মন্থর রোমন্থনরত গুটি ছয়েক গাই আর ছটফটে তেজীয়ান দুইটি ষাঁড় ঘরের দুই দিকে দুই সার করিয়া বাঁধা। এক কোণে বাঁশের তৈয়ারী খোঁয়াড়ের মধ্যে ছোটবড় নানা রঙের কতকগুলি বাছুরের

ভিড়। উদ্‌গ্রীব হইয়া সেগুলি বেড়ার উপর মাথা জাগাইয়া আছে। একটি খয়ের রঙের বাছুর বাহিরে; বংশীধর এক হাতে তার গলার দড়ি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছে এবং অপর হাতে গামছা নাড়িয়া ডাঁশ তাড়াইতেছে। দুই হাঁটুর মধ্যে বাল্‌তি চাপিয়া বসিয়া অপর্ত্ত কালো চাঁদকপালে গাইটাকে দুহিতেছে। বাছুরটা মাঝে মাঝে আচমকা দড়ি ছাড়াইবার জন্য হুড়াহুড়ি বাধাইতেছে, বংশীধর নানা প্রকার আত্মীয়-সম্ভাষণে তাহাকে আপ্যায়িত করিতেছে, কখনও বা কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থাও করিতেছে। গাইটা হুম্ হুম্ শব্দে আপত্তি জানাইতেছে।

চাঁদকপালে গাইটাকে ক্ষেন্তি দু-চক্ষে দেখিতে পারিত না। এই গাইটা দুধ দিত আর-সব গাই হইতে বেশী, কিন্তু ফাঁক পাইলেই তেঁতুল-তলার ছোট মাঠটি পার হইয়া ক্ষেন্তির বড় আদরের তরকারীর বাগানে গিয়া ঢুকিত, তারপর নির্দ্দয়ভাবে লাউমাচা ভাঙিয়া, কপির চারা মাড়াইয়া, ডাঁটা-ক্ষেত নির্ম্মূল করিয়া রাখিয়া আসিত। তদুপরি ক্ষেন্তিকে সে ভয় ত করিতই না, দেখিতে পাইলেই উল্টিয়া শিঙ বাগাইয়া গুঁতাইতে আসিত। তাই তরকারীর খোসা, বাড়তি ভাত, ভাতের ফেন প্রভৃতি উপরি খাবারগুলি অন্ততঃ ক্ষেন্তির হাতে চাঁদকপালীর চাঁদকপালে বড় একটা জুটিত না। আজ বারকোস-সুদ্ধ সমস্তগুলি সুখাদ্য তাহারই উৎসুক মুখের সম্মুখে ধপ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া ক্ষেন্তি বলিল, "শুনেছিস ?"

বংশীধর বাছুরটাকে টানিয়া লইয়া একটু কাছে ঘেঁষিয়া আসিল, অপর্ত্ত দুধ দোয়া না বন্ধ করিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "শুনলাম ত, কিন্তু কি ব্যাপার বল দেখিনি।"

ক্ষেন্তি বলিল, "সে কি আর এককথায় বলা যায় ? রাধাগোবিন্দজীর মনে যে এও ছিল কে জানত ?"

বংশীধর যে-হাতে গামছা নাড়িয়া ডাঁশ খেদাইতেছিল, সেই হাতে চট করিয়া একটা খালি বালতি উল্টাইয়া ক্ষেন্তির বসিবার ঠাঁই করিয়া দিল। আড়চোখে একবার বাহিরের দিকে দেখিয়া লইয়া ক্ষেন্তি কাপড়-চোপড় টানিয়া গুছাইয়া বসিল। কিন্তু সবে সে কথা সুরু করিতে যাইবে এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। আহারের সময় ক্ষেন্তির এত নিকট সান্নিধ্যে চাঁদকপালে গাইটার স্বস্থ বোধ না করিবার যথেষ্ট কারণ ত বিদ্যমান ছিলই, হঠাৎ ক্ষেন্তি অপর্ত্তের কানের কাছে মুখ লইয়া ঝুঁকিয়া বসিতেই সেটা মহা ভড়কাইয়া ঘাড় নীচু করিয়া ক্ষেন্তিকে ঢুঁ মারিতে গেল। বংশীধর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া যেই ক্ষেন্তিকে আড়াল করিতে যাইবে তাহার অসতর্ক হাত হইতে ছাড়া পাইয়া খয়ের রঙের বাছুরটা এক গোঁত্তায় অপর্ত্তের দুই হাঁটুর মধ্য হইতে দুধের বাল্‌তিটাকে উল্টাইয়া দিল। দুধে প্রায় স্নান করিয়া অপর্ত্ত উঠিয়া দাঁড়াইল; পাচ-ছ'সের দুধ, এখনই কোথাও হইতে জোগাড় না হইলে হয়ত রাধাগোবিন্দজীর ভোগ দেওয়াতেই বাধা ঘটিয়া যাইবে। খুব একটা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। অপর্ত্ত বলিল, "বাছুর ত নয়, নরপিচেশ। দেব না কি শালাকে এক ঘা ?" বলিয়া লাথি মারিতে পা উঠাইয়া চট্ করিয়া পা নামাইয়া লইল। মনে পড়িল, বাছুর হইলেও সে গরুরই জাত, দেবী ভগবতীর অংশ, দেবতা। কহিল, "দেখেছিস্ কি দশা হয়েছে আমার কাপড়টার, এ্যাঃ।"

ক্ষেন্তি কহিল, "দুধ যা নষ্ট করেছিস্ তাতে অমন দশ জোড়া কাপড় হয়, চুপ কর্ দেখি তুই।"

বকাবকি, চেঁচামেচি, পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ চলিতেছে, এমন সময় নিস্তার আসিয়া ক্ষেন্তিকে ডাক দিল। কহিল, "এতক্ষণ তোকে খুঁজতে পাইক-বরকন্দাজ বেরোল বোধ হয়। যা ওপরে, মা তোকে ডাকছেন।"

খালি বারকোসটা টান মারিয়া উঠাইয়া লইয়া শশব্যস্তে ক্ষেন্তি সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। ভিতরের কাণ্ড দেখিয়া নিস্তার সেইখানে দাঁড়াইয়াই আর-এক পালা বকাবকি সুরু করিয়া দিল।

সরকার-বউ জল লইয়া কলসী-কাঁখে ফিরিয়া চলিয়াছিল। রৌদ্রপ্লাবিত বাঁধা-ঘাটের কাছে তারিণী-খুড়ো হুঁকা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে ক্ষেন্তি, সত্যি ?"

ক্ষেন্তি না থামিয়াই বলিল, "দাঁড়াও বাপু, আমার এখন এত কথা বল্‌বার সময় নেই। মা কি জন্যে ডাকছেন দেখি আগে, তারপর যদি নিরামিষ বাড়িতে এসো ত সব শুনবে এখন।"

তারিণীখুড়ো কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ-না একটা ব'লে যা না ?"

ক্ষেন্তি যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া বলিল, "দেশ ছেড়ে ত আর পালিয়ে যাচ্ছি না, মানে মানে ফিরে আসি আগে, তারপর শুনো।"

কিন্তু দেখা গেল, দেশ ছাড়িয়া যাওয়াই এখনকার মত তাহার ললাটের লিখন। গোবিন্দর-মা দোতলার সিঁড়ি বাহিয়া তর্‌তর্ করিয়া নামিয়া আসিতেছিল, ক্ষেন্তিকে দেখিবামাত্র বলিল, "এই যে ক্ষ্যান্ত, তোমাকে খুঁজে খুঁজে সব হায়রাণ। মার সঙ্গে কলকেতায় যাবে, শীগ্‌গির করে তৈরী হয়ে নাও গে।" তারপর ক্ষেন্তির কানের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "এ সংসারের অন্ন আর নয়, রাধাগোবিন্দজীর ভোগের প্রসাদ পেয়ে নৌকোয় উঠবেন, ঠাকুরকে তাড়া দিতে যাচ্ছি।"

এমন যে ক্ষেন্তি সেও নীরবেই কপালে হাত ঠেকাইল, তারপর দ্বিরুক্তি না করিয়া ত্রস্তপদে সিঁড়ি উঠিতে লাগিল।

হেমবালার মুখ দেখিয়া কিছু বুঝিবার উপায় নাই। ঠোঁটের কোণদুটা একটু শক্ত হইয়া আছে, তাও ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলে ধরা শক্ত। একটিমাত্র খোলা জানলায় যে-রোদটুকু ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে সেটুকুকে পিঠে করিয়া একটা জলচৌকি লইয়া বসিয়া তিনি স্নানান্তে আর্দ্র চুলের রাশ শুকাইতেছিলেন। ক্ষেন্তি দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই চকিতে তাহার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন, "ভেতরে আয়।"

ক্ষেন্তি ভিতরে ঢুকিল মাত্রই; চৌকাঠের এপাশে কপাট ঘেঁষিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল। হেমবালা তাহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, "তুই আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় যেতে পারবি ত ?"

ক্ষেন্তি কহিল, "কেন পারব না মা ? অবিশ্যি পারব। আপনার হুকুমের গোলাম। যেখানে যেতে বলবেন, যাব। সংসারে আমার আর কেই বা আছে, আপনার পা-দুটি আশ্রয় করেই বেঁচে আছি।"

হেমবালা আঙুল চালাইয়া ভিজা চুলের জট ভাঙিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তাহলে তোর জিনিষপত্র চট ক'রে সব গুছিয়ে নিগে যা। খাওয়া দাওয়া সেরেই নৌকোয় উঠব।"

ক্ষেন্তি পায়ের নখে পাথর-বাঁধানো মেঝে খুঁড়িবার চেষ্টা করিতে করিতে অনভ্যস্ত মৃদু গলায় বলিতে লাগিল, "সেই কথাই ত বলছি মা, জিনিষপত্র কিই বা আমার আছে যে গোছাব ? দুটি বই কাপড় নেই। সেবারে কলকেতা থেকে ফিরে এসে সব ঝিদের একটা ক'রে কামিজ দিয়েছিলেন, সে ত কোন্‌কালে ছিঁড়ে গিয়েছে। শীত এসে পড়ল, একখানা গরম গায়ের-কাপড় নেই। হাজার হোক আমরা রাজবাড়ির ঝি চাকর, লোকের কাছে আমাদের মুখ রেখে চল্‌তে হয়ত মা ?"

হেমবালা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "নে-নে, সে-সব কল্‌কাতায় গিয়ে হবে এখন। তুই যা ত, শীগ্‌গির ক'রে গিয়ে তৈরী হ।...আর দেখ, দেওয়ান্‌জীকে আগে একটু ডেকে দিয়ে যা।"

"আচ্ছা মা" বলিয়া ক্ষেন্তি বাহির হইয়া গেল।

পথে আবার তারিণীখুড়ো, গোবিন্দর-মা, মোক্ষদা, চাঁপা, নিস্তার, সরকারগিন্নি, মুক্তোর-পিসি। ক্ষেন্তি এবার আর তাহাদের হাত এড়াইবার কোনো চেষ্টাই করিল না। নীচে ভিতর-বারান্দার একপাশে সকলকে ডাকিয়া ভিড় জমাইয়া সবে বক্তৃতা সুরু করিবে এমন সময় উপরে সিঁড়ির মুখ হইতে হাঁক আসিল, "ক্ষ্যান্ত !"

আলগোছে সিঁড়ির কাছে সরিয়া গিয়া ক্ষেন্তি বলিল, "মা !"

"কি করছিস তুই ওখানে, যা শীগ্‌গির দেওয়ানজীর কাছে।"

"যাচ্ছি মা" বলিয়া ইসারায় অন্যদের কাছ হইতে ছুটি লইয়া ক্ষেন্তি এবার প্রায় ছুটিয়াই চলিয়া গেল।

কাছারীবাড়ির দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে ময়লা মসী-চিহ্নিত একটা ফরাসের উপরে স্তূপাকার খাতাপত্র লইয়া দেওয়ানজী বসিয়াছিলেন, ক্ষেন্তি আসিয়া একপাশে দাঁড়াইলে প্রথমে তাহার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর ক্রমান্বয়ে সে যে মানুষ, সে যে ক্ষেন্তি, সে যে মনিববাড়ীর খাস চাকরাণী, এবং তাহার যে কিছু বক্তব্য থাকা সম্ভব এই উপলব্ধিগুলি রাশি রাশি ইজা-জের-



আদায়-ওয়াশীল-বকেয়া-বাকির কড়া পাহারা কাটাইয়া তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করিল। সহসা সচকিত হইয়া চোখ হইতে নিকেলের চশমাটি খুলিতে খুলিতে কহিলেন, "কি ক্ষ্যান্ত ?"

ক্ষেন্তি বলিল, "রাণীমা কি বলতে চান, আপনি একবার আসুন।"

দেওয়ানজী বিপুল দেহভার লইয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া-পড়িলেন, ত্রস্তে চটিজুতায় পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে কহিলেন, "আমি যাচ্ছি যাচ্ছি, তুমি তাঁকে বলগে যাও।"

ভিতর-বারান্দার দিকের দরজার এপাশ হইতে দেওয়ানজী গলা খাঁকারী দিলে ওপাশ হইতে পরিষ্কার কণ্ঠে শোনা গেল, "আমার যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক হয়েছে ?"

"হাঁ মা, ব্যবস্থা সব করা হয়ে গিয়েছে। মাঝিরা কাল রাত্রেই রাণী-বজরা ধুয়ে মুছে ঠিক ক'রে রেখেছে, পাল-দুটো দু-একজায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছিল, সারিয়ে নিতে বলেছি, এতক্ষণ হয়ে গিয়ে থাকবে।"

হেমবালা কহিলেন, "বজরায় গেলে কাল রাত্রের আগে নাসিরগঞ্জে পৌঁছন যাবে না। আমি ভোরের ষ্টীমার ধরতে চাই, জমিদারী চালের চাইতে তাড়াতাড়ির চালটা আমার এখন বেশী দরকার।"

দেওয়ানজী একলা ঘরেই ঘামিয়া উঠিলেন, কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, "তাহলে কি করব মা ?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর আসিল, "সেও কি আমায় ব'লে দিতে হবে ? ঘাসি, ডিঙি, যাহোক একটা হলেই হবে, দু-একটা মাল্লা বেশী নিতে বলবেন।"

"আচ্ছা, আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করছি। খাওয়া-দাওয়ার পরেই কি বেরবেন ?"

"হাঁ, কিন্তু তার ত বেশী দেরী নেই ? আপনি নিজে তৈরী হয়ে নিয়েছেন ?"

"আমি ত তৈরীই, কেবল এই সদর খাজনার বাকী হিসাবটা বাবুকে বুঝিয়ে—"

"কল্‌কাতা থেকে ফিরে এসে বোঝাবেন।"

দেওয়ানজী নীরবে নতমস্তকে তাঁহার বিরল কেশে অঙ্গুলিচালনা করিতে লাগিলেন। হেমবালা একটু পরে কহিলেন, "আমি উপরে যাচ্ছি, নৌকো এবং পাল্‌কির ব্যবস্থা হয়ে গেলেই আমাকে খবর পাঠাবেন।"

এতক্ষণ হেমবালা অপরদের তাড়া দিয়াছেন, এবার মনে পড়িল, তাঁহার নিজেরই যাবার জোগাড় বিশেষ-কিছু এখনও করা হইয়া উঠে নাই। এ বাড়ি হইতে এক-কাপড়েই বাহির হইয়া যাইবেন, কাল সন্ধ্যা অবধি তাহাই ঠিক ছিল। কিন্তু রাত্রির স্তব্ধতায় নিজের মনের সঙ্গে নূতন করিয়া তাঁহার বোঝাপড়া হইয়াছে। অনাবশ্যক রূঢ়তা-প্রকাশের দ্বারা নিজের দুর্ব্বলতাই প্রমাণ করা হইবে। মূল্যবান কিছুই লইবেন না, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদা ব্যবহারের যাহা-কিছু সামগ্রী তাহা সঙ্গে লইতে কোনও দোষ নাই। তেইশ বৎসর আগে এ সংসারে যখন প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন শূন্যহাতে আসেন নাই;. তারপর এই দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সংসারের কাছ হইতে গ্রাসাচ্ছাদন হিসাবে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, নিজের কর্ম্মনিষ্ঠায় কর্ম্মিষ্ঠতায় তাহার বহুগুণ মূল্য তিনি ফিরাইয়া দিয়াছেন; আজ যখন স্বেচ্ছায় এই গৃহের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবেন তখনই বা শূন্যহাতে তাঁহাকে কেন যাইতে হইবে? লোক-জানাজানি যাহা হইবার তাহা হইবেই, কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার দেবোপম ভ্রাতার নিকট হইতে কথাটা যতদিন গোপন রাখা যায় রাখিবার চেষ্টা তিনি করিবেন, এ-সঙ্কল্পও তাঁহার মনে ছিল। তাঁহার বয়স্থা কন্যা ঐন্দ্রিলা কলিকাতায় মামার কাছে থাকিয়া পড়াশোনা করে, মামী নাই, মেয়ের অভিভাবিকারূপে এখন কিছুদিন তাঁহারই সেখানে থাকা আবশ্যক, সেজন্যই তিনি আসিয়াছেন, কলিকাতায় ভাইকে এবং অন্যান্য সকলকে ইহাই তিনি বুঝিতে দিবেন স্থির করিয়াছেন।

দূরে ঠাকুরদালানের পাশে আম্‌লকি গাছের নীচে খাস বৈঠকখানার বারান্দার কতকটা চোখে পড়িল। সবগুলি দরজা বন্ধ, মনে হইল সকাল হইতে বন্ধই আছে, চাকরবাকরদেরও কেহ সেদিক্ মাড়াইতেছে না। চকিতে চোখদুটাকে ফিরাইয়া লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে শানবাধানো উঠানটা পার হইলেন। ঐন্দ্রিলা কি করিতেছে দেখা প্রয়োজন; ভোরে মায়ের ডাকে দরজা খুলিয়া দিয়া সেই

যে ফিরিয়া গিয়া নিজের বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া সে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল, হেমবালা তাহাকে বাধা দেন নাই, কিন্তু তারপর মেয়ের কাছে একবারও আর তাঁহার যাওয়াও হয় নাই।

অন্দরের উঠান পার হইয়াই তাঁহার মনে হইল, উপরে তাঁহার শয়নঘরের পূবদিক্‌কার জানালাটা কে যেন বন্ধ করিয়া দিল। ভাবিলেন ঐন্দ্রিলা হইবে। কিন্তু সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে মন কেমন যেন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। যেন উপরে জুতার শব্দ অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল। ভাবিলেন ফিরিয়া যাইবেন, এক মুহূর্ত্ত থামিলেনও, কিন্তু পরক্ষণেই মন স্থির করিয়া লইয়া দ্রুতগতিতে এবং দৃঢ়পদে উপরে গিয়া উঠিলেন।

ভিতরে খাটের একপাশে চিরাভ্যস্ত স্থানটিতে নতমস্তকে নরেন্দ্রনারায়ণ বসিয়াছিলেন। হেমবালার বুকটা এক মুহূর্ত্ত দুরদুর্ করিয়া উঠিল।

প্রশস্ত কক্ষের দূরতম কোণে মেহগনির বিশাল ড্রেসিং টেবিল। হেমবালা ছোট দেরাজ হইতে চাবির গোছা বাহির করিলেন। একদিক্‌কার দেরাজে কেশরচনার সরঞ্জাম, অপরদিকে নিজের এবং ঐন্দ্রিলার নানাপ্রকারের প্রসাধন-দ্রব্য; ব্রোচ দুল ইত্যাদি ছোটজাতীয় গহনা। নীচের দেরাজদুটিতে সর্ব্বদা ব্যবহারের কাপড়-চোপড়। এক এক করিয়া সেগুলি বাহির করিয়া একপাশে গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

স্বামীর দিকে তিনি দৃক্‌পাত-মাত্র করেন নাই, নরেন্দ্রনারায়ণও বহুক্ষণ স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন না। তারপর অকস্মাৎ এক সময় কম্পিতপদে উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আসিলেন। হেমবালার অমনোযোগে বাধা পড়িল। পশ্চাৎ হইতে আয়নায় নরেন্দ্রের ছায়াপাত হইবামাত্র চকিতে নিজের মুখ তিনি নামাইয়া লইলেন। ফিরিয়া চাহিলেন না, কিন্তু তাঁহার জিনিস-গোছোনো বন্ধ হইয়া গেল।

নরেন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "আমি এই শেষবার তোমাকে বলতে এসেছি।"

হেমবালার ঠোঁটের কাছটা একটু কাঁপিয়া গেল। ঘরে ঢুকিবার সময় কিছু চিন্তা করিয়া আসেন নাই, এক মুহূর্ত্ত থামিয়া একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "বেশ. শেষবারই বল।"

"কিছুতেই কি আমার অপরাধের ক্ষমা নেই?"

"যে-সংসার থেকে তুমি আমাকে এনেছিলে সেখানে এ-ধরণের অপরাধ ক্ষমা করতে কেউ আমায় শেখায়নি।"

কিছুক্ষণ একটা অস্বস্তিভরা নীরবতা, তারপর নরেন্দ্র আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, "মেয়ের দিক্‌টাই না-হয় ভাব, আমাদের ঐ একমাত্র—"

হেমবালা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমি যা কর্‌ছি, একমাত্র তার কথা ভেবেই কর্‌ছি। এখানকার আব-হাওয়া তার গায়ে কিছুতেই আমি আর লাগতে দিতে পারব না। নিজের কাছে কখনও তার মাথা হেঁট না হয় তাও অবশ্য আমি দেখব।"

নরেন্দ্র কেবল বলিলেন, "ও!" গভীর বেদনার ছায়ার সঙ্গে তাঁহার মুখে অস্ফুট করুণ একটু হাসি খেলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, তারপর হঠাৎ একসময় মুখ তুলিয়া আবেগভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "যদি কথা দিই, জীবনে কখনও আর কোনো অপরাধ তোমার কাছে করব না?"

এবারে হেমবালা একটু হাসিলেন, তারপর কহিলেন, "তাতে লাভ হবে, কথা রাখতে না-পারার আরও একটা অপরাধ তোমার বাড়বে। কথা যে রাখতে পারে সে এমন অপরাধ করে না।"

নরেন্দ্র নতমস্তকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। বুঝিলেন একথা সত্য। কথা যে রাখিতেই পারিবেন জোর করিয়া তাহা বলিতে পারা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এ-জীবনে নিজেকে কতবার এ ধরণের কত কথা দিয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনি কথা রাখিতে পারেন নাই। তবু একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে কহিলেন, "যদি কথা রাখতে পারি, তুমি ফিরে আস্‌বে ব'লে যাও।"

হেমবালা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মেয়েমানুষ যখন যায়, ফেরবার পথ আর রেখে যায় না।"

কথাটা যুক্তির মত শুনাইল, কিন্তু কার্য্যকারণ-সম্পর্কের মধ্যে কোথায় কেমন যেন একটা অস্পষ্টতার শৈথিল্য রহিয়া গেল। অন্ততঃ বলিয়া হেমবালার মন খুশী হইল না।

চূড়ান্ত যুক্তি কিছু যেন আরও ছিল। নরেন্দ্রের গলা কাঁপিয়া গেল। বলিলেন, "কিন্তু ফিরে আস্‌বার কথা যদি কখনও তোমার মনে হয়, এ বাড়ির দরজা চিরদিন তোমার জন্যে খোলাই থাকবে।"

হেমবালা অত্যন্ত মৃদুস্বরে কি বলিলেন তাহা শোনা গেল না।

"এই তাহলে শেষ?"

"তুমি জান। আমি অনেক আগেই শেষ করেছি।"

"ঐন্দ্রিলা?"

"সে আমার কাছেই থাকবে।"

"সে যদি আমাকে ক্ষমা করে?"

"আমি বাধা দেব না, কিন্তু তার ওপর আমার শাসন যতদিন চল্‌বে, আমার কাছেই তাকে রাখব।"

"বাপকে দেখতে আসাও তার বারণ?"

"আমি বারণই করব।"

নরেন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন, ফিরিয়া গিয়া খাটের একদিকটায় বসিলেন। হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "তুমি জান এইখানটায় আমার জবরদস্তি চলে?"

হেমবালা এবার চকিতে একবার স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তারপর কহিলেন, "জবরদস্তি আরও অনেক জায়গায় তোমার হয়ত চলে, কিন্তু খুব একটা লোক-জানা-জানি হলে তাতে তোমার কিছু লাভ হবে? ইলু এখন অবধি কিছু জানে না, যখন জান্‌বে তোমার প্রতি তা'র প্রীতি কিছুমাত্র বাড়বে না।"

মুদ্রিতচক্ষে নরেন্দ্র দুই ভ্রুর মাঝখানটা আঙুলে চাপিতে লাগিলেন। বলিবার বা শুনিবার আর কোনো কথাই অবশিষ্ট নাই। বাহির হইয়া যাইবার আগে নিত্যকার মত স্বাভাবিক গলা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক হয়েছে?"

"দেওয়ানজীকে বলেছি, এতক্ষণ হয়ে গিয়ে থাকবে।"

"টাকাকড়ি—"

"আমার হাতে যা আছে তাই যথেষ্ট। ইলুকে পড়াখরচ ব'লে কলকাতায় যা পাঠানো হত সেটা অবশ্য যাবে।"

"নাসিরগঞ্জ অবধি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব?"

"দরকার হবে না।"

ধীরপদে নতমস্তকে নরেন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। কঠিন পরীক্ষায় এত সহজে উত্তীর্ণ হইবেন, হেমবালা বুঝিতে পারেন নাই। মনে মনে অনেক কঠিন কথার মহড়া দিয়া রাখিয়াছিলেন, তেমন করিয়া কিছু বলা হইল না বলিয়া কোথায় যেন একটু ক্ষোভও রহিয়া গেল। উত্তেজিত হইয়াছিলেন, জিনিস গোছানোর কাজ অসমাপ্ত ফেলিয়া রাখিয়া ঐন্দ্রিলার সংবাদ লইতে প্রস্থান করিলেন।

নিজের ঘরে গোটা-দুই খোলা স্যুটকেসের সামনে মাদুরের উপর ঐন্দ্রিলা বসিয়াছিল। মায়ের সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া তাকাইল।

ছুটির পর বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে ঐন্দ্রিলা চিরকালই অত্যন্ত দুঃখ পায়,কিন্তু কান্নাকাটি করা তাহার স্বভাবে নাই। নিজের কোনও দুর্ব্বলতাকে কোথাও প্রকাশ হইতে দিতে অতি শৈশব হইতে তাহার ঘোরতর আপত্তি। আজ তাই তাহার অশ্রুপ্লাবিত চোখের দিকে চাহিয়া হেমবালার মনে হঠাৎ একটা বড়রকম দোলা লাগিল।···হেমবালার সহসা মনে পড়িল, মনে মনে এতদিন ঐন্দ্রিলাকে অকারণেই তিনি অপরিণতবুদ্ধি বালিকা কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন। বাল্যের সীমা বহুকাল তার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বালিকা বয়সেই কলিকাতায় মামার কাছে থাকিয়া সে পড়িতে গিয়াছিল। তাহাদের একমাত্র সন্তান বলিয়া, দেশাচার-বিরুদ্ধ হইলেও তাহাকে পুত্রস্থানীয় করিয়া মানুষ করিবার এই ব্যবস্থাতে নরেন্দ্রনারায়ণ বাধা দেন নাই, উৎসাহের সঙ্গেই রাজি হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর কখনও দুইবার, কখনও বা তিনবার দেশে পিতামাতার কাছে ঐন্দ্রিলা ছুটি কাটাইতে আসিয়াছে; স্বল্পস্থায়ী সেই মিলনোৎসবের দিনগুলিতে তাহার গভীরতর মনের কোনও পরিচয় লইবার সুযোগ হেমবালার হয় নাই। যে-বয়সে সে মায়ের কোল ছাড়িয়া দূরে গিয়াছিল, মায়ের স্নেহান্ধ দৃষ্টিতে সেই বয়সটাই তাহার চিরন্তন হইয়া রহিয়া গিয়াছে। আজ ঐন্দ্রিলার চোখের দৃষ্টির মধ্যে তাকাইয়া হেমবালা হঠাৎ অনুভব করিলেন, কত বড় ভুল এতদিন তিনি করিয়াছেন। বুঝিলেন, এ আর বালিকা নহে, ইহার পরিণত মনের নিকট হইতে কোনও কথা লুকাইবার চেষ্টা করা

হয়ত বৃথা, হয়ত কেহ না বলিতেই সহজে সে সব বুঝিয়াছে।

বলিলেন, "তোর জিনিস গোছানো শেষ হয়ে গিয়েছে ইলু?"

"এই হয়ে গেল মা," বলিয়া ঐন্দ্রিলা পাট করা শাড়ী-জামাগুলি ক্ষিপ্রহস্তে সুটকেসের মধ্যে ঠাসিয়া রাখিতে লাগিল। বাসন্তী-রঙের বেনারসীটি গত পূজায় তাহার বাবা তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সেটিকে এক মুহূর্ত্ত কোলে লইয়া রহিল। এই কাশ্মীরী শালটি এবার জন্মদিনে তাঁহার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পাওয়া, অন্যমনেই তাহার উপর সস্নেহে সে হাত বুলাইল। এই মুক্তার কণ্ঠী ম্যাট্রিকে বৃত্তি পাওয়ার পর পিতার পাঠানো পারিতোষিক। এই গোল্ডটিস্যুর শাড়ীটি সে যতবার পরে তাহার বাবা তাহাকে রাণী-মা বলিয়া ছাড়া সম্বোধন করেন না। এগুলিকে এতদিন যে স্নেহ-গর্ব্বিত আনন্দের চোখে সে দেখিয়াছে অতঃপর আর তাহা দেখিতে পাইবে না। ভাবিতে ভাবিতে আবার ঐন্দ্রিলার চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিল। ঠোঁটের কোণ-দুটা অবাধ্য হইয়া কাঁপিতে লাগিল, গলার কাছটা কিসে যেন চাপিয়া ধরিতেছে। হেমবালা দাঁড়াইয়াছিলেন, কন্যার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তাহার জিনিস গোছানোতে সাহায্য করিবার ছলে নিজেও একটা সুটকেস টানিয়া লইয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলেন। যেন কিছুই হয় নাই, এমনইভাবে কথা পাড়িলেন।

বলিলেন, "হ্যাঁরে, কলকাতায় কি এখনই শীত প'ড়ে গিয়েছে?"

ঐন্দ্রিলা নিজেকে অনেকখানি সম্বরণ করিয়াছিল, মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

"পূজোর পরেও গরম থাকে?"

ঐন্দ্রিলা মাথা দুলাইয়া জানাইল, হ্যাঁ।

"কখন থেকে তা হ'লে শীত সুরু হয়?"

ঐন্দ্রিলা এ কথার কোনও জবাব দিল না। হেমবালা বলিলেন, "কথা বলছিস না কেন? কি হয়েছে তোর?"

একটা ঢোঁক গিলিয়া ঐন্দ্রিলা কষ্টে উচ্চারণ করিল, "কই কিছু ত হয়নি।"

"বীণা এখন আর কলেজে যায় না?"

"না।"

"মেয়েকে নিয়ে সময় পায় না বুঝি?"

"না।"

"কে মেয়েকে দেখে, ও নিজেই?"

"হুঁ, আয়াও আছে।"

"কি ব'লে ডাকে মেয়েটিকে? কতবার যে তুই বলেছিস্, কিন্তু কেমন ভুলে যাই।"

"মন্দিরা।"

"মন্দিরা, ঐটেই ওর আসল নাম ত নয়? ভাল নামটা যেন কি? অ—"

"অপর্ণা।"

"বীণা আবার কেন বিয়ে করে না? ওদের সমাজে ত বাধা নেই।"

ঐন্দ্রিলা নীরব রহিল।

"তোর মামা ওর বিয়ের কথা কিছু বলেন না?"

"কখনও ত শুনিনি কিছু বলতে।"

"ওর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা কেউ আসে-টাসে? খোঁজ-খবর নেয়?"

"উঁহু।"

"বীণা যদি আবার বিয়ে করে, ওরা কেউ আপত্তি করবে না বোধ হয়?"

"ওরা কেন আপত্তি করতে যাবে?"

এমনই করিয়া ঐন্দ্রিলার সুটকেস গোছানো শেষ হইতে হইতে অনেক কথাই হইল। শেষ অবধি ঐন্দ্রিলার মনের ভারটা অনেকটাই লঘু হইয়া গেল। তাহার কথার জড়তা কাটিয়া গেল, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নিজেও দুএকটা কথা সে বলিয়া ফেলিল। ইহাতে হেমবালা যতটা খুশী হইলেন সে নিজে তাহা হইতে কিছুমাত্র কম খুশী হইল না। কোনো জিনিস লইয়াই বাড়াবাড়ি করাটাকে সে আশৈশব অপছন্দ করে। আজ শেষ-অবধি অবাধ্য অশ্রুকে সে যে শাসন করিতে পারিল ইহাতে মনে মনে আরাম অনুভব না করিয়া পারিল না। হেমবালা কহিলেন, "আমি দেখছি ওদিকে কতদূর হ'ল, তুই চট ক'রে স্নানটা সেরে নে।"

ঐন্দ্রিলার স্নান শেষ না-হইতেই বড় বড় দুইটি রূপার

থালায় সারি সারি জয়পুরী বাটী ভরিয়া রাধাগোবিন্দজীর ভোগের প্রসাদ আসিল। হেমবালা পায়সের বাটি হইতে দু-আঙুলের ডগায় করিয়া একটু পায়স লইয়া কপালের কাছে তুলিয়া জিভে ঠেকাইলেন, অসুখের ছল করিয়া কিছুই খাইলেন না। ঐন্দ্রিলাও আসনে আসিয়া বসিল মাত্রই, অন্ন তাহার গলায় বাধিয়া যাইতে লাগিল। শেষ অবধি সেও কিছুই প্রায় না-খাইয়া উঠিয়া-পড়িল। বাহিরের দেউড়িতে দেওয়ানজী অপেক্ষা করিতেছেন। জিনিসপত্র নদীর ঘাটে পাঠানো হইতেছে, ক্ষেন্তিও খাইয়া-দাইয়া তৈরী হইয়াছে। নীচে সিঁড়ির কাছে গ্রামের বর্ষীয়সী এবং অবিবাহিতা নারীদের ভিড়। উঠানের একপাশে দুইটি পাল্‌কি এবং একটি ডুলি অপেক্ষা করিতেছে। লাট্টু এবং লাটাই হাতে পাড়ার ছেলের দল সেখানে আসিয়া জড় হইয়াছে। কেহ কেহ পাল্‌কির ভারা কাঁধে করিতে গিয়া বেহারাদের কাছে তাড়া খাইতেছে। অন্যেরা তাহাতে আমোদ পাইয়া হৈ-হৈ করিয়া উঠিতেছে।

ঐন্দ্রিলা নীচে নামিয়াই একবার চকিতের মত চারিপাশটা দেখিয়া লইল। আর ত সময় নাই। প্রতিবেশিনীরা তাহার মায়ের সিঁথিতে কপালে সিঁদুর, পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছে। পাল্‌কির মধ্যে বিছানা পাতা হইতেছে। হেমবালা ডাকিলেন, "ইলু, তোর কাতু-পিসিমাকে প্রণাম করেছিস্?"

জ্ঞাতিসম্পর্কে পিসি, খুড়ী, জ্যেঠী আরও কেহ কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন; সকলকে প্রণাম করিয়া, সম্পর্কে যাহারা ছোট তাহাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া ঐন্দ্রিলা দেখিল অবগুণ্ঠিতা হেমবালা একদল প্রতিবেশিনীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। লুকাইয়া ছুটিয়া গিয়া সে একবার উপরের সব-ক'টা ঘর দেখিয়া আসিল। নীচে নামিয়া অভ্যাগতদের কৌতুকদৃষ্টি বাঁচাইয়া একতলার ঘর-ক'টাও দেখিল। দ্রুতপদে উঠান অতিক্রম করিয়া কাছারীবাড়ির কাছাকাছি আসিতেই শুনিতে পাইল, পাল্‌কির খোলাদরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া হেমবালা ডাকিতেছেন, "ইলু, কি কর্‌ছিস্ তুই?"

কলিকাতায় মামার সঙ্গে পরিচয় হইয়া অবধি ঐন্দ্রিলা রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের দিকে পারতপক্ষে যাইত না, আজ ঘটা করিয়া পূজা-দেউলের ভিত্তিগাত্রে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তারপর ফিরিবার পথে নরেন্দ্রের বসিবার ঘরটায় একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া স্থিরপদে হেমবালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাল্‌কি-দুটির দরজা খুলিল, বন্ধ হইল। ক্ষেন্তির ডুলির উপর মশারির কানাত পড়িল। বেহারারা পাল্‌কি ডুলি কাঁধে করিয়া দাঁড়াইতেই স্ত্রীকণ্ঠে হুলুধ্বনি হইল, ছেলের দল কোলাহল করিয়া উঠিল।

এমন সময় আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকারে সমস্ত কোলাহলকে অতিক্রম করিয়া এক বৃদ্ধা ঘর্ম্মাক্ত দেহে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাল্‌কির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল "রাণীমা গো, আমার ক্ষেতের এই আনাজ-ক'টি তোমায় নিতে হবে। আমি এই রোদ্দুরে তিনকোশ পথ হেঁটে এসেছি তোমার পায়ে নিবেদন ক'রে যাব ব'লে। তুমি 'না' বল্‌লে চলবে না।" বেহারারা থামিল না দেখিয়া সে আনাজের ঝুড়িটা উঠানে নামাইয়া রাখিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহারই পায়ে ধরিয়া বলিতে লাগিল, "পায়ে পড়ি বাছা, পায়ে পড়ি। আমার এই আনাজ-ক'টি ওঁকে নিতে বল। মা আমার মুখ তুলে চেয়েছিল ব'লে আমার ছেলেটা সেবার কয়েদ হ'তে হ'তে ছাড়া পেল, আমি বড় সাধ ক'রে আমার জগদ্ধাত্রী মাকে দেব ব'লে নিয়ে এসেছি। সদরে শুন্‌লাম মা আমার রাজরাজত্ব ফেলে বনবাসে যাচ্ছেন, পড়ি কি মরি ছুটে এসেছি। আমাকে পায়ে ঠেলে গেলে এ-জায়গা ছেড়ে নড়ব না, ধর্না দিয়ে প'ড়ে থাকব।" পাল্‌কি ততক্ষণ খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, বুড়ির শোক দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, স্বেদজলের সঙ্গে অশ্রুজল মিশিয়া তাহার বিশীর্ণ গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যাহারা উপস্থিত ছিল সকলেই তাহাকে সাহায্য করার পরিবর্ত্তে তিরস্কার করিল। অতঃপর সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া দুজন চাকর মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিতে যাইবে এমন সময় কাছারীবাড়ির ভিতর-

বারান্দা হইতে নরেন্দ্রনারায়ণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "না—না, ছেড়ে দে ওকে।" তারপর ত্বরিতে উঠানে নামিয়া আসিয়া কহিলেন, "ডুলিবেহারাদের থাম্‌তে বল, এ আনাজ নিয়ে যেতে হবে। তারপর এ তা'রা পথে ফেলে দিয়ে যাক্‌ বা আর-কিছু করুক সে তা'রা ভাববে।" চাকরদের একজন আনাজের ঝুড়িটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে খিড়কির দরজার দিকে ছুটিল। বুড়ী সেইখানেই নরেন্দ্রনারায়ণের পায়ের কাছে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, "বাবা গো, দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমাকে রাজা করেছেন, আর কি আশীর্ব্বাদ তোমায় করব বাবা? আমি বড় সাধ ক'রে আমার ক্ষেতের পয়লা-প্রথম বেগুন যে-ক'টা পেয়েছি তুলে এনেছি। কলমী শাক, কুমড়ার-ফুল। লাউ একটা ছিল, বইতে পারব না বলে আর আনিনি। হ্যাঁ বাবা, তোমার জন্যে চারটি বেগুন ওরা তুলে রাখলে না?……"

নরেন্দ্রনারায়ণ ত্বরিত পদেই আবার উঠান অতিক্রম করিয়া কাছারীবাড়ির দরজা ঠেলিয়া ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

বাড়ী হইতে নদীর ঘাট দেড়মাইল-টাক দূরে। খানিকটা পথ আসিয়া ঐন্দ্রিলা একবার পাল্‌কির দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া পিছনে চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই বিশেষ দেখিতে পাইল না। জেলেপাড়ার মধ্য দিয়া পাল্‌কি চলিতেছে, ঘরবাড়ী গাছপালার ভিড়ে পিছনের পথ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এক প্রৌঢ়া জেলেনী মলিন শতছিন্ন একখানি কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিয়া বসিয়া আকসী-বাড়ি হাতে রোদে-ঝুলানো মাছ পাহারা দিতেছিল, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া পথের পাশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পথের এক পাশে দুটি ছোট ছোট মেয়ে, পরনে গামছা, নাকে নোলক, একজনের কাঁখে প্রায় তার নিজেরই সমান ওজনের একটা উলঙ্গ ছেলে, ভয়কৌতুকভরা দৃষ্টি লইয়া গলাগলি জড়সড় তামাসা দেখিবার লোভে দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাৎ হইতে কে-একজন চীৎকার করিয়া বলিল, গড় কর্‌, হতভাগীরা গড় কর্‌। মেয়ে দুটি থতমত খাইয়া কথাটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, ততক্ষণে ঐন্দ্রিলার পাল্‌কি তাহাদের অতিক্রম করিয়া গেল।

নদীর ঘাটে আসিয়া পাল্‌কি নামিলে ঐন্দ্রিলা বাহির হইয়া প্রথমেই পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, ছোট মাঠটির ওপারে আম-জাম-কাঁটাল-জলপাই-লিচুগাছের নিবিড় যবনিকার ঊর্দ্ধে তাহাদের ভিতর মহলের দুতলার একটি দিক্‌ চোখে পড়িতেছে। শাদা চুণকামের উপর দুপুরের রোদ পড়িয়া জ্বলিতেছে, হঠাৎ চাহিলে চোখ ফিরাইয়া লইতে হয়, তবু আগ্রহভরা দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়াই সে দাঁড়াইয়া রহিল। মা যখন ডাকিলেন তখন তাহার চমক ভাঙিল। তবু নৌকায় উঠিতে গিয়াও বারবার পশ্চাতে তাকাইল, পা ধুইতে অকারণেই ইচ্ছা করিয়া দেরি করিল; অবশেষে যখন উঠিল, অবাধ্য অশ্রু কিছুতেই আর বারণ মানিতেছে না। নিজের দুর্ব্বলতা পাছে কাহারও চোখে পড়ে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে ছইয়ের মধ্যে ঢুকিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বুকের ভার একটু লঘু হইলে অনুভব করিল, হেমবালা নীরবে আসিয়া পাশে বসিয়া তাহার গায়ে একটি হাত রাখিলেন। সে প্রাণপণে ক্রন্দনবেগ রোধ করিল, কিন্তু উঠিল না, মুখ তুলিয়া হেমবালার মুখের দিকে দেখিলও না। পাল তোলা হইতেছে, মাঝিমাল্লাদের কোলাহল। দেওয়ানজী চাকরবাকর লইয়া অপর একটি নৌকায় উঠিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। গম্ভীর গলায় মাঝিদের তিনি প্রতি পদে উপদেশ দিতেছেন, তাহাদের প্রত্যেকটি কাজের সমালোচনা করিতেছেন। কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহার উপদেশ অবহেলিত হইতেছে বলিয়া তাহারা মাঝে মাঝে তাড়া খাইতেছে। কিন্তু নিজেদের কাজ তাহারা দেওয়ানজী অপেক্ষা বেশী বোঝে, তাঁহার কোনও কোনও উপদেশ অমান্য না করিয়া তাহাদের উপায় নাই।

নীচে সহসা জলস্রোত অধীর উচ্ছ্বাসে কলকল করিয়া উঠিল। নৌকার মুখ ঘুরিয়া যাইতেছে, তীব্র গতিতে ঘুরিতেছে। ঠিক কতটা ঘুরিল ঐন্দ্রিলা অনুভব করিতে পারিল না, একবার মনে হইল মুখটা ঘুরিয়া ঠিক যেন

আবার আগেরই জায়গায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু থরথর গতিবেগের স্পন্দন সমস্ত দেহ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

থাকিয়া থাকিয়া সলিলস্পৃষ্ট স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে লাগিতেছে, নীচে নৌকার বাতায় প্রতিহত স্রোতোজলের একটানা কলকল শব্দ, অশ্রুভারাক্রান্ত মনের চিন্তায় নিস্পৃহতা, সমস্ত মিলিয়া ঐন্দ্রিলার চেতনার উপর একটি আর্দ্র করুণ তন্দ্রার যবনিকা রচনা করিয়া দিল।

যখন ঘুম ভাঙিল দেখিল হেমবালা একটা চাদর মুড়ি দিয়া বিছানার একপাশে জড়সড় হইয়া শুইয়া আছেন। বাহুর আড়ালে মুখটা ঢাকা পড়িয়াছে, তবু ঐন্দ্রিলার বোধ হইল তিনি জাগিয়া আছেন। মাকে ডাকিয়া সন্দেহের নিরসন করিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। ধীরে ঝাপ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। আধখানা ঝাপকে আড় করিয়া বসাইয়া মাল্লাদের কৌতূহল-দৃষ্টি হইতে নিজেকে সে আড়াল করিল, তারপর সম্মুখে পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

বাতাস পড়িয়া আসিয়াছে। পালে নামানো হয় নাই, কিন্তু দাঁড়ের টানে দমকে দমকে নৌকা অগ্রসর হইতেছে। দাঁড়ের ফলার আঘাতে আলোড়িত জলের আবর্ত্ত ঐন্দ্রিলার শূন্যতানিবদ্ধ অলস দৃষ্টির সম্মুখে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিয়া অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। মনে মনে কখন সে একটি আবর্ত্তের সঙ্গে আর-একটির তুলনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা সে জানে না। ক্রমে যেন সেই সূত্র ধরিয়াই চিন্তার আবর্ত্ত তাহার মনে ঘনাইয়া আসিল।

যাহা অপরিহার্য্য নির্বিরোধে তাহাকে জীবনে স্বীকার করিয়া লওয়াই তাহার চিরকালের স্বভাব ছিল, আজও সে তাহাই করিয়াছে। নচেৎ যদি ইচ্ছা করিত, বিরোধ করিয়া, গোল বাধাইয়া পিতাকে শেষ একবার দেখিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া আসা তাহার পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্তু বিরোধ করিয়া অপ্রীতিকর অবস্থাটাকে আরও অপ্রীতিকর করিয়া তুলিতে তাহার ইচ্ছা করে নাই। এই শেষ মুহূর্ত্তের অদর্শনের বেদনা কোনোদিন হয়ত সে ভুলিতে পারিবে না, কিন্তু এমন আরও কত বেদনাই ত তাহার হৃদয়ের গোপনে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, নিজ হাতে তাহাদের প্রতিকার-চেষ্টা কোনোদিন সে করে নাই। নিজেকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে তাহার কিছুমাত্র ভাল লাগে না। তাছাড়া পিতাকে দেখিতে বা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতে কোনও বাধা আছে এমন কথা হেমবালা একবারও তাহাকে বলেন নাই। বিরোধ কাহার সঙ্গে সে করিবে? মায়ের ইচ্ছা মন দিয়া অনুভব করিয়া সে জানিয়াছে; বুঝিয়াছে, বাধা আছে, অতি দুস্তর বাধাই কিছু আছে। কেন বাধা, কিসের বাধা তাহা সে জানে না। মাকে জিজ্ঞাসা করিতে কেন যেন তাহার ইচ্ছা হয় নাই। নিজের মনেও এ-রহস্যের সমাধানের চেষ্টা বেশীদূর অবধি সে করে নাই, অকারণেই তাঁহার অত্যন্ত ভয় ভয় করিয়াছে। সে কেবল ইহা বুঝিয়াছে, নরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং এবিষয়ে হেমবালার নির্দ্ধারণকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, গত দুই দিন তাঁহার পলাইয়া বেড়ানোর আর-কিছু অর্থ হয় না। একাকী পিতামাতার সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সে কি করিবে?...শেষ মুহূর্ত্তে দৈবগতিকে পিতার সঙ্গে যে তাহার সাক্ষাৎ হইয়া যায় নাই ইহাতে তাহার খুশী হওয়া উচিত কি-না সে ভাবিতে লাগিল।

সহসা সম্মুখে একটি ছবি। একটি ধূসর বালুচর ঘেরিয়া নদীটি বাঁক ঘুরিয়া গিয়াছে। স্থির নীলজলের উপর চকিত ছায়া ফেলিয়া এক ঝাঁক গাঙচিল উড়িতেছে। যেন রূপালী আগুনের ফুল্‌কি। উপরে দিনের আলো ক্রমশঃ স্বর্ণময় হইয়া আসিতেছে। কেমন যেন করুণ ভারাতুর, যেন সোনার ভার বহিতে পারিতেছে না। দূরে তীরবনের ছায়াস্তরাল হইতে ঘুঘুর ডাক শোনা যাইতেছে। ঐন্দ্রিলা ছবি আঁকিত, সব-কিছু ভুলিয়া এই সৌন্দর্য্যের রসসমুদ্রে ক্রমে তাহার মন নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর গঞ্জের হাটে নৌকা ভিড়াইয়া আহারাদি করা হইল। পথে জেলে-নৌকা ধরিয়া মাছ আদায় হইয়াছিল, বুড়ির দেওয়া বেগুন, চালডাল সঙ্গে ছিল।—দেওয়ানজীর নৌকায় রান্না হইয়াছিল, ক্ষেন্তি দুজনের জন্যই খাবার আনিল। এবার স্বামীর সংসারের অন্ন ঠিক নয়, ক্ষেন্তিও অনেক সাধাসাধি করিল, তবু হেমবালা খাইতে

পারিলেন না। ঐন্দ্রিলার একটু ক্ষুধাবোধ হইয়াছিল, নীরবে বসিয়া সামান্য-কিছু আহার করিল। আহারের পর মাঝিরা ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিল, গুয়াপান এবং এক ছিলিম তামাক খাইল, তারপর আর-এক ছিলিম খাইল। বাতাস একেবারে পড়িয়া গিয়াছে, তাছাড়া গঞ্জের পাশেই বড় নদী, স্রোত কম, এবার দাঁড়ের টানের উপরই একমাত্র ভরসা। সমস্ত রাত আর বিশ্রাম মিলিবে না, সকলে প্রস্তুত হইয়া হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় আঁটিয়া পরিয়া যে-যাহার স্থানে গেল। নৌকা বড় নদীতে পড়িবার মুখে গলুইয়ে জল দিয়া সকলে সমস্বরে বদর বদর করিয়া উঠিল।

পরের দিন ভোরে নাসিরগঞ্জ ষ্টীমারের ঘাট। দেওয়ানজীর নৌকা পিছনে পড়িয়াছিল, দণ্ডদুই অপেক্ষা করিবার পর তিনিও আসিয়া পড়িলেন। তখন তাড়াহুড়া করিয়া সকলে ডাঙায় উঠিল। ষ্টীমার আসিতে আর দেরী নাই, মাঝিরা যাত্রীদের কাছে খবর লইয়া জানিয়াছে, দূরে বহুক্ষণ আগেই ধোঁয়া দেখা গিয়াছে। ষ্টেশনের বারান্দার এক পাশে যেখানে মাঝিরা তাহাদের জিনিসপত্র স্তূপাকার করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে, সেখানে একটা সুটকেসের উপর জায়গা করিয়া বসিতে গিয়া ঐন্দ্রিলা দেখিল, একটু দূরে একটা লিচু গাছের নীচে ঘোড়ার লাগাম হাতে করিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ দাঁড়াইয়া আছেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণের আর পথশ্রমের ক্লান্তি তাঁহার মুখে চোখে সুপরিস্ফুট। ঐন্দ্রিলাকে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তাহার দিকে চাহিতেছেন না, এই অভিমানটুকুর অধিকার তিনি ছাড়িতে পারেন নাই।

উদ্গত অশ্রু প্রাণপণে সম্বরণ করিয়া ধীরপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া ঐন্দ্রিলা তাঁহাকে প্রণাম করিল, নরেন্দ্র নীরবে তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নরেন্দ্রের বলিবার মত কথা কিছুই ছিল না, পাছে অশ্রুর স্রোত বাধা না মানে এই ভয়ে ঐন্দ্রিলাও কোনো কথা কহিল না, নীরবে পিতার বুকের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হেমবালা আসিতে আসিতে সেদিকে একবারমাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া ত্রস্তপদে অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন। ষ্টেশনঘর হইতে একটি মোড়া সংগ্রহ করিয়া সঙ্গের চাকরদের একজন তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটিয়া গেল। আর-একজন নরেন্দ্রের হাত হইতে সসম্ভ্রমে ঘোড়ার লাগামটা চাহিয়া লইল।

দেওয়ানজী পূর্ব্বেই নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। টিকিট করিয়া লিচুগাছতলায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন। পথে কি কি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন, কলিকাতায় কতদিন থাকিবেন, হেমবালাদের পৌঁছাইয়া দেওয়া ছাড়া সেখানে আরও কি কি কাজ তাঁহার করিবার আছে, এই-সব বিষয়ে নরেন্দ্র তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে জাহাজ আসিয়া পড়িল।

আবার হাঁকডাক হুল্লোড় তাড়াহুড়ার পালা। জাহাজ বেশীক্ষণ দাঁড়াইবে না, চাকরবাকর ও মাঝি-মাল্লা মিলিয়া হাতাহাতি সব জিনিসপত্র উঠাইয়া ফেলিল। নরেন্দ্র এতক্ষণ ঐন্দ্রিলার সঙ্গে একটিও কথা কহেন নাই, বিদায়-মুহূর্ত্তেও কি কথা বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। "চিঠি লিখিও" এই চিরাভ্যস্ত কথাটি মুখের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া বাধিয়া গেল; কন্যার সঙ্গে পত্রব্যবহার চলিবে কি-না পত্নীর সঙ্গে সে-বিষয়ে বোঝাপড়া করা হয় নাই। পিতাকে দ্বিতীয়বার প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ঐন্দ্রিলার মাথাটার কেবলই দেরি হইতে লাগিল।

জাহাজের সিঁড়ি তুলিবার সময় হইয়াছে। সারেঙ দুতলার ছাতের পুল হইতে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া "পাসিন্দার"-দের তাড়াতাড়ি করিতে বলিতেছে।

ঐন্দ্রিলার জন্য অপেক্ষা না করিয়া অবগুণ্ঠিতা হেমবালা জোড়াতক্তার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। দেওয়ানজী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত নরেন্দ্রের মন এই বিদায়কে একবারও শেষ বিদায় বলিয়া গ্রহণ করে নাই, তবু এই ক'দিনেই তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছিল। আজ তাঁহার এই বিরলভাষিণী কন্যার নিগূঢ়তর বেদনা তাঁহার নিজের বেদনা হইতে বড় হইল। হেমবালার দিকে শেষ মুহূর্ত্তটিতে তিনি চাহিতে ভুলিলেন, কন্যাকে দুই হাতে করিয়া উঠাইলেন, বুকে টানিয়া নীরবে সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হইল।

কেন্তির সঙ্গে ঐন্দ্রিলাও উঠিয়া পড়িয়াছে। নীচে কলঘরে টুং টুং করিয়া সারেঙের ঘণ্টা বাজিতেছে। গম্ভীর সিটির শব্দের স্পন্দনে কাঠের ডেক থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ডেকের রেলিঙের উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া ঐন্দ্রিলা একদৃষ্টে পিতার দিকে চাহিয়া আছে।

অন্ধকার কেবিনটার মাঝখানে একাকী দাঁড়াইয়া সহসা হেমবালা উপলব্ধি করিলেন, এই শেষ! এ জীবনেই আর কখনও দেখা হইবে কি-না, কে জানে? চকিতের মত তাঁহার বিবাহিত-জীবনের বিগত তেইশটা বৎসর ছোটবড় সহস্র আনন্দবেদনা জয়-পরাজয় বিরহমিলনের স্মৃতি লইয়া তাঁহার মনের চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া আসিল। নিজেকে লইয়া পলাইবার পথ একমুহূর্ত্তের জন্য রুদ্ধ হইল। দুইহাতে কেবিনের জানালা মেলিয়া ধরিয়া সাগ্রহ সোৎসুক দৃষ্টিকে তীরের দিকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, উদ্বেলিত অশ্রু আসিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিল

জাহাজ দ্রুতবেগে ঘুরিয়া যাইতেছে।

ক্রমশঃ

'পদ্মাবত' কাব্য এবং পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ

বর্ত্তমান শতাব্দীর ঐতিহাসিক গবেষণায় কাব্য-নাটকের নায়িকাগুলির উপর যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। আধুনিকেরা বলেন—ইহারা কাল্পনিক, ইতিহাসে তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই; প্রাচীনেরা বলেন, ইহারা খাঁটি ঐতিহাসিক—কল্পনাপ্রসূত নহেন। ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় "পদ্মিনী-উপাখ্যান ও তাহার ঐতিহাসিকতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আমি পদ্মিনা-উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। গত চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রায়-মহাশয় প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, 'পদ্মাবত' একখানা ঐতিহাসিক কাব্য; পদ্মিনী, গোরা, বাদল, ডুলী-বেহারা, আলাউদ্দীনের কারাগার সবই ঐতিহাসিক। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের যুক্তি-গুলির পুনরায় বিচার করা প্রয়োজন। নিখিলবাবু কবি আলাওলের "পদ্যাবতি পুথি" অবলম্বন করিয়া মূল হিন্দী পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া-ছেন; তিনি "পদ্মাবতের" কোন হিন্দী সংস্করণ পড়িয়াছেন কি-না, প্রবন্ধ পাঠে বুঝা যায় না। তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশে মূল ও অনুবাদে যে ভুলগুলি দেখা যায়, রামচন্দ্র শুকুল সম্পাদিত ও নাগরীপ্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত 'পদ্মাবতে'র (জ্যায়সী গ্রন্থাবলী) সাহায্যে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। দ্বিতীয়তঃ, নিখিলবাবু বর্ত্তমান সময়ে রাজপুত ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ মহা-মহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার 'রাজপুতানেকা ইতিহাসে'র উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি শুধু টডের রাজস্থান, তারিখ-ই-ফিরিশতা, এবং পাথরে লেখা কল্পিত ঘটনা পূর্ণ 'রাজপ্রশস্তি' কাব্যের সাহায্যে "পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতা"র কথা লিখিয়াছেন। পদ্মিনী-উপাখ্যান-সম্পর্কে এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু তাহাও আমরা গৌরীশঙ্করজীর গবেষণামূলক হিন্দী ইতিহাস অবলম্বনে আলোচনা করিব। কোন অর্ব্বাচীন লেখকের কলমের এক খোঁচায় পদ্মিনীর মত নায়িকা ইতিহাস হইতে সরিয়া পড়িবেন, ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। এ-সম্বন্ধে যত বিচার হয় ততই ভাল।

"পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা" প্রবন্ধে নিখিলবাবু ভূমিকায় বলিয়াছেন, পদ্মাবত ঐতিহাসিক কাব্য বটে কেন-না ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা, ব্যক্তি ও স্থান

লইয়াই লিখিত (পৃ. ৮১১)। উক্ত সংজ্ঞানুসারে কাব্য, উপন্যাস, কিংবা নাটকের 'ঐতিহাসিকতা' স্থির করিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, কিংবা ক্ষীরোদ-বাবুর অধিকাংশ পুস্তককে 'ঐতিহাসিক' বলিয়া মানিয়া লইতে হয় না কি? ইতিহাসের নায়িকার অভাবই কবি এবং উপন্যাস-লেখক পূরণ করিয়া থাকেন। তবে কি ঐতিহাসিক উপন্যাস কিংবা কাব্যের এ নায়িকাগুলিকে ঐতিহাসিক 'ফাউ' হিসাবে গ্রহণ করিবেন?

নিতান্ত সমসাময়িক না হইলে কোন কাব্যকে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা বড়ই বিপজ্জনক। মারাঠী 'শিবভারত'; সংস্কৃত 'রামচরিতম্', 'পৃথ্বিরাজ দিগ্বিজয়ম্', হিন্দী' সুজান-চরিত'(জাঠরাজা সুরজ মলের জীবনচরিত), 'রাজবিলাস' ইত্যাদি ঐতিহাসিক কাব্য—কেন-না এগুলি দরবারী কবিরা রাজার আদেশে লিখিয়াছিলেন—চাটুবাদ-গুলি বাদ দিলে এইগুলি হইতে সত্য ইতিহাস বাহির হইয়া পড়ে। ঘটনার বহু বর্ষ পরে রচিত 'পদ্মাবতের' মত দার্শনিক allegory-র কথা দূরে থাকুক, সমসাময়িক কবির বংশধরেরা লিখিয়াছেন, এমন প্রামাণ্য 'পৃথ্বিরাজ-রাসো' হইতে ইতিহাস উদ্ধার করা যায় না। মেবার-পতি সমরসিংহ বীর পৃথ্বিরাজের ভগিনী পৃথা বাঈকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শিয়াবুদ্দীন ঘোরীর সহিত তিরোরীর দ্বিতীয় যুদ্ধে ইনি প্রাণত্যাগ করেন—ইহা 'পৃথ্বিরাজ-রাসোর' প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং মহারাণা রাজসিংহের সময় রচিত 'রাজপ্রশস্তি'* কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে। অথচ অজমের-চৌহানবংশে তিন জন পৃথ্বিরাজ ছিলেন; কোন্ পৃথ্বিরাজের ভগিনীকে সমরসিংহ বিবাহ করিয়াছিলেন? শিয়াবুদ্দীন ঘোরীর প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক রাজা ছিলেন সামন্ত সিংহ, সমরসিংহ নহেন। মেবার-রাজ রাজর্ষি সমরসিংহ ছিলেন পদ্মাবতের নায়ক রতনসিংহের পিতা। সমরসিংহের রাজত্বের একটি শিলালিপি চিতোরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার দ্বারা প্রমাণ হয়, সমরসিংহ

* "ততঃ সমর সিংহাখ্যঃ পৃথ্বীরাজস্য ভূপতেঃ।
পৃথাখ্যায়া ভগিন্যাস্তু পতিরিত্যাতিহার্দতঃ॥
ভাষারাসা পুস্তকেস্য যুদ্ধস্যোক্তোত্তি বিস্তরঃ॥
রাজপ্রশস্তি, সর্গ ৩)

অন্ততঃ বি. সং ১৩৫৮,* অর্থাৎ ১৩০২ ইংরেজীর জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তিরোরীর যুদ্ধে সমরসিংহের মৃত্যু কেমন করিয়া সম্ভব? ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত সমসাময়িক ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত না হইলে কোন কাব্যের নায়ক, বিশেষতঃ নায়িকাদিগকে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এইবার আমরা "পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা" প্রবন্ধের কয়েকটি সিদ্ধান্তের আলোচনা করিব।

পদ্মাবতের রচনাকাল

নিখিলবাবু 'পদ্মাবতে'র রচনাকাল সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন এবং গ্রিয়ার্‌সন্ সাহেবের মত-সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য এক অদ্ভুত 'থিওরী' খাড়া করিয়াছেন; তিনি বলেন, ৯২৭ হিজরীতে কাব্য-রচনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইঙ্গিত করিয়াছেন ৯৪৭ হিজরীতে বোধ হয় গ্রন্থ শেষ হইয়াছিল। হিন্দী কাব্যের মুখবন্ধে "রাজস্তুতি" একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। কাব্য আরম্ভের সময় যিনি রাজা থাকেন তাঁহার যশই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাঁহার সিংহাসনে বসিবার বৎসরেই কাব্য সমাপ্ত হইল তাঁহাকেই কাব্যে বন্দনা করা হইয়াছে,—প্রবন্ধ-লেখক এমন আর একটি উদাহরণ হিন্দী কাব্যে দেখাইতে পারেন কি? তাঁহার উদ্ধৃত হিন্দী দোঁহার শেষ চরণ "কথা-আরম্ভ যেন কবি কহৈ" বাংলা না হিন্দী? নাগরী-প্রচারিণী-সভা পদ্মাবতের অনেক পুঁথির সাহায্যে এই কাব্য সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে ৯৪৭ হিজরীতে কাব্য আরম্ভ করা হইয়াছিল :—

সন নব সৈ সৈঁতালিস অহা।
কথা-আরম্ভ বৈন কবি কহা॥
সিংঘল দীপ পদমিনী রাণী।
রতন সেন চিতউর গঢ় আনী॥
অলউদীন দেহলী সুলতানু।
রাঘৌ চেতন কীহ্ন বখানু॥
সুনা সাহি গঢ় ছেঁকা আই।
হিন্দু-তুরুকহ্ন ভই লরাই॥
আদি অন্ত জস গাথা অহৈ।
লিখি ভাখা চোপাই কহৈ।

* ওঝা-কৃত 'রাজপুতানেকা ইতিহাস,' ২য় ভাগ, পৃ. ৪৫০-৪৫৮।

সন ৯৪৭ হিজরীতে কবি কথা-আরম্ভের "বাণী" (foreword) লিখিয়াছেন। সিংহল-দ্বীপের পদ্মিনী রাণীকে রতন সেন চিতোর-গড়ে আনিয়াছিলেন। রাঘবচেতন দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মিনীর রূপের বাখান করাতে শাহ গড় আক্রমণ করিতে আসিলেন, হিন্দু ও মুসলমানের যুদ্ধ হইল। আদ্যন্ত "গাথা" বা কাহিনীর ন্যায় "ভাষা" [হিন্দী ভাষা]তে চৌপদী ছন্দে কবি বলিতেছেন।

মালিক মহম্মদ জ্যায়সী শের শা'র যে প্রশংসা করিয়াছেন উহা আব্বাস সরবানী-কৃত 'তারিখ-ই শেরশাহী' (আকবরের রাজত্বকালে লিখিত) গ্রন্থে উক্ত সম্রাটের গুণাবলী বর্ণনার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। অথচ 'পদ্মাবত' 'তারিখ-ই-শেরশাহী'র অনেক পূর্ব্বে লিখিত। এই হিসাবে এই অংশের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ৯২৭ হিজরীতে (১৫২০ খৃঃ) কাব্য আরম্ভ করিলে জ্যায়সী ইব্রাহিম লোদীর প্রশংসা করিতেন— অজ্ঞাতনামা ফরিদের খ্যাতি তখনও গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করে নাই। সে-কালে গ্রন্থকারগণ নিজেদের পুস্তকের ভূমিকা আজকালকার লেখকদের মত সকলের শেষে লিখিতেন না। শ্রীহরি কিংবা বিসমিল্লা লেখার মত দেবস্তুতি, রসুল-বন্দনা ও চারি খলিফার গুণবর্ণন, রাজ-প্রশংসা ইত্যাদি গ্রন্থারম্ভে না লেখা অশুভ বিবেচিত হইত। নিম্নলিখিত দোঁহা হইতে বুঝা যায় তিনি শের শা'র কার্য্য ও চরিত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

সের সাহি দেহলী সুলতানু।
　　চারিউ খণ্ড তপা জস ভানু ॥
ঔহী ছাজ ছাত ঔ পাটা।
　　সব রাজৈ ধরা লিলাটা ॥
জাতি সুর ঔ খাঁড়ে সুরা।
　　ঔ বুধিবন্ত সবৈ গুন পুরা ॥

...　　...　　...

অদল কহৌ পুহুমী জস হোই।
　　চাটা চলত ন দুখবৈ কোই ॥
নৌসেরবাঁ জো আদিল কহা।
　　সাহি আদল সরি সৌউ ন অহা ॥
অদল জো কীন্হ উমর কে নাই।
　　ভই 'অহা' সকল দুনিয়াই ॥
পরী নাথ কোই ছুবৈ না পারা।
　　মারগ মানুষ সোন উছারা ॥
গউ সিংহ রেগহি এক বাটা।
　　দুনৌহি পানি পিয় এক ঘাটা ॥
নীর খীর ছানৈ দরবারা।
　　দুধ পানি সব কঢ়ৈ নিয়ারা ॥
ধরম নিয়াউ চলৈ, সত ভাখা।
　　দুবর বলী এক সম রাখা ॥

...　　...　　...

পুনি দাতার দই জগ কীন্হা।
　　অস জগ দান ন কাহু দীন্হা ॥
বলি বিক্রম দানী বড় কহে।
　　হাতিম করন তিয়াগী অহে ॥
সের সাহি সরি পুজ ন কোউ
　　সমুদ্র সুমের ভণ্ডারা দোউ ॥

...　　...　　...

এস দানি জগ উপজা সেরসাহি সুলতান।
না অস ভয়েউ ন হোইহি না কোই দেই অস দান।

(পৃ. ৪-৬)

—দিল্লীশ্বর শের শাহ সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপে চারিদিক তাপিত করিতেছেন। রাজছত্র ও পাট তাঁহারই শোভা পায়। সমস্ত রাজারা তাঁহার কাছে আভূমি নত-ললাট। জাতিতে তিনি সুর এবং তাঁহার তরবারি ও শূরোচিত (পরাক্রমী)। তিনি ধীমান; সমস্ত গুণ পূর্ণভাবে তাঁহাতে বিরাজ করিতেছে।...এইরূপ আদিল, অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ রাজা পৃথিবীতে কোথায়? তাঁহার রাজ্যে পিপীলিকাকেও কেহ দুঃখ দিতে সাহসী হয় না। খসরু "আদিল" (ন্যায়পরায়ণ) বলিয়া পরিচিত হইলেও ন্যায়নিষ্ঠায় তিনিও শের শার সমকক্ষ নহেন। তিনি খলিফা ওমরের তুল্য ন্যায়বিচার করেন। সারা দুনিয়ায় তাঁহার "বাহবা" (প্রশংসা) হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের নাকের নথ ছুঁইতে (অর্থাৎ গায়ে হাত দিতে) কিংবা রাস্তায় সোনা ছড়াইয়া রাখিলেও কাহারও উঠাইবার সাধ্য নাই। গরু ও সিংহ এক রাস্তায় ধূলি উড়াইয়া চলে; একঘাটে জল খায়। তাঁহার দরবারীরা দুধ হইতে জল আলাদা (অতি সূক্ষ্মভাবে সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারণ) করিতে পারে। তিনি ধর্ম্মপথগামী এবং প্রিয়ভাষী; তিনি সবল দুর্ব্বলকে সমানভাবে (শাসনে) রাখিয়াছেন।... তিনি দাতা; জগতে তাঁহার ন্যায় দান কেহ দেয় নাই। বলিরাজ ও বিক্রমাদিত্য বড় দানী ছিলেন

বলিয়া লোকে বলে। হাতিম তাই (আরব দেশের) এবং কর্ণও ত্যাগী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শের শার সমান কেহ নয়; সমুদ্র ও সুমেরু তাঁহার ভাণ্ডার। ...জগতে এমন দানী সুলতান শের শাহ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার তুল্য কেহ হয় নাই এবং হইবে না, এবং এমন দানও কেহ দিবে না।"

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কবি শের শার রাজত্বে তাঁহার 'পদ্মাবত' রচনা আরম্ভ * করিয়াছিলেন—ইহার বিশ বৎসর পূর্ব্বে নয়।

পদ্মাবতী পুঁথির শ্রীজা ব্রাহ্মণ

শ্রীজা নামক ব্রাহ্মণের কোন উল্লেখ জায়সীর পদ্মাবতে নাই। সুলতান আলাউদ্দীনের পত্র লইয়া সরজা নামে এক বীরপুরুষ চিতোরে গিয়াছিলেন। মূল পদ্মাবতে আছে—

সরজা বীরপুরুষ বরিয়ারু।
তাজন নাগ সিংহ অসবারু॥
দীন্হ পত্র লিখি, বেগি চলাবা।
চিতউর-গঢ় রাজা পহঁ আবা॥ (পৃ. ২৪১)

বীরপুরুষের অগ্রণী সরজা সিংহের উপর চড়িলেন। তাঁহার হাতে সাপের চাবুক। তাঁহার হাতে পত্র দিয়া সুলতান আদেশ করিলেন যেন দ্রুত চলিয়া চিতোর-গড়ের রাজার কাছে পৌঁছে।

সরজা যে তুর্ক, অর্থাৎ মুসলমান, ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত দোঁহাতে পাওয়া যায়। রাজা রতন সেন দূতের ঘৃণ্য প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন—

তুরুক। জাই কহু মরে না ধাই।
হোইহি ইসকন্দর কে নাই॥
(পৃ. ২৪৩)

আলাউদ্দীন চিতোর অবরোধ করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায় সরজাকে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া রাজা রতনসেনের কাছে পাঠাইলেন। সরজা সিংহে চড়িয়া আবার রতনসেনের কাছে গেলেন।

"সরজা পলটি সিংহ চঢ়ি গাজা।
অজ্ঞা যাই কহো জঁহ রাজা॥
(পৃ. ২৬৪)

রতনসিংহকে উদ্ধার করিয়া বাদল চিতোর যাইতেছেন। গোরা মুসলমান সেনাকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে বন্দী করিবার সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়ায় তুর্কী বীরগণ যুদ্ধে নামিলেন। কবি লিখিতেছেন—

"সরজা বীর সিংহ চঢ়ি গাজা।
আই সোঁহ গোরা সোঁ বাজা॥
পহলবান সো বখানা বলী।
মদদ মীর হমজা ও অলী॥
লংধউর ধরা দেব জস আদী।
ঔর কো বর বাঁধৈ কো বাদী?
মদদ অয়ুব সীস চঢ়ি কোপে।
মহা মাল জেই নাঁব অলোপে॥
ঔ তায়া সালার সো আএ
জেই কৌরব পাণ্ডব পিড পাএ॥ (পৃ. ৩২২)

বীর সরজা সিংহে চড়িয়া শপথ গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ গোরার দিকে চলিলেন। তিনি বিখ্যাত পালোয়ান বীর—তাঁহার উপর মীর হামজা ও আলীর বর (মদদ) ছিল। তিনি পূর্ব্বে লংধউরের ন্যায় রাজাকে বন্দী করিয়াছিলেন। আর কে তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া সম্মুখীন হওয়ার শক্তি রাখে? তাঁহার সাহায্যার্থ আয়ুবও গর্ব্বিতভাবে যুদ্ধে চলিলেন। তিনি (আয়ুব) 'মহামালে'র নাম লোপ করিয়াছিলেন।

কৌরব-পাণ্ডবের ন্যায় (অর্থাৎ দুর্য্যোধনের ন্যায়) অভিমানী (পিড়—ফার্সি 'পিন্দার' শব্দের ঠেট্ হিন্দী অপভ্রংশ) তায়া সালারও (Salar of Tai tribe) আসরে নামিলেন। আমীর খসরু হইতে ফিরিশ্‌তা পর্য্যন্ত বরাঙ্গলের (Warangal) রাজার নাম Laddar Deo লেখা হইয়াছে। ইহা রুদ্রদেব নামের অপভ্রংশ। আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর সর্ব্বপ্রথমে ইহাকে পরাজিত করেন। ইতিহাসে আলাউদ্দীনের সেনাপতিদের মধ্যে সরজা, আয়ুব কিংবা সালার তায়া নাম দেখা যায় না। ইতিহাসের মালিক কাফুরই উদ্ভট কবি-কল্পনায় সিংহের উপর সওয়ার, হাতে সাপের চাবুক বীর সরজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শহীদুল্লা বাংলা পদ্মাবতী পুঁথির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত করিবার জন্য হিন্দী, উর্দ্দু, ও আরবী অক্ষরে লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। অধিকাংশ পুঁথিতে ৯৪৭ হিজরী কাব্যারম্ভের তারিখ দেওয়া আছে।

গোরা ও "বাদিলা"

কবি আলাওলের বটতলার ছাপা 'পদ্যাবতী পুথি' আগাগোড়া পড়িলেও নিখিলবাবু 'বাদিলা'র পরিবর্ত্তে বাদল লিখিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "পদ্মাবতীতে তাঁহারা দুই ভ্রাতা" (প্রবাসী, পৃ. ৮১৭)। জ্যায়সীর পদ্মাবতে গোরা বদলকে দুই ভাই কিংবা খুড়ো-ভাইপে (যেমন টড্ লিখিয়াছেন) বলা হয় নাই। কবি বলিতেছেন—

> "গোরা বাদল রাজা পাহাঁ।
> রাবত দুবৌ দুবৌ জনু বাহাঁ॥

রাজার কাছে গোরা ও বাদল ছিলেন। তাঁহারা দু-জনই "রাবত" (সামন্ত), এবং উভয়েই রাজার ডান-হাত বাঁ-হাত।

গোরা ও বাদল রাজাকে আলাউদ্দীনের কারাগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া চিতোর যাইতেছেন। পথিমধ্যে মুসলমান-সেনাকর্ত্তৃক তাঁহারা আক্রান্ত হইলেন। যুদ্ধ ও মৃত্যু অনিবার্য্য দেখিয়া গোরা বাদলকে বলিতেছেন—

> তব অগমন হোই গোরা মিলা।
> তুই রাজহ লেই চলু বাদ্‌লা!
> পিতা মরৈ জো স`করে সাথা।
> মীচু ন দেই পূতকে মাথা॥

বাদ্‌লা! তুই রাজাকে নিয়ে যা। সঙ্কট-সময়ে বাপ বৃথা ছেলের মাথা কাটায় না।

সুতরাং জ্যায়সীর মূল পুস্তকে গোরা-বাদলের পিতা-পুত্র সম্বন্ধই পাওয়া যায়। জ্যায়সীর পদ্মাবতের ভূমিকায় সম্পাদক রামচন্দ্র শুক্ল মহাশয় বাদলকে গোরার পুত্রই বলিয়াছেন (পৃ. ২৩)।

তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা

মহম্মদ আবুল কাসেম ফিরিশ্‌তা দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর-দরবারের আশ্রিত ঐতিহাসিক। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি তাঁহার ইতিহাস রচনা করেন। ফিরিশ্‌তা অনেক দেশ বেড়াইয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি যেখানে যাহার কাছে কিছু শুনিতেন, বিনা-বিচারে নিজের পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। এগুলি অধিকাংশই প্রমাণহীন মিথ্যাগুজব, কিংবা কাল্পনিক কাহিনী। জ্ঞানের প্রসার কম থাকায় তিনি ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করিতে না পারিয়া নিজের পুস্তকে এমন অনেকগুলি কথা লিখিয়াছেন যাহার জন্য প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দাই তাঁহার ভাগ্যে বেশী মিলিয়াছে। যাঁহারা মুসলমান-যুগের ইতিহাসের আধুনিক গবেষণার সহিত সাধারণভাবেও পরিচিত, তাঁহারাই জানেন, অধিকাংশ স্থলে ফিরিশ্‌তার নাম উল্লেখ করা হয়—তাঁহার ভুল সংশোধনের জন্য। ফিরিশ্‌তাকে অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক গবেষণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাপ্ত হইয়াছে। উত্তর-ভারতের ইতিহাস হিসাবে ফিরিশ্‌তার গ্রন্থের বিশেষ মূল্য নাই। হিন্দুস্থানের কথা দূরে থাক্, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসেরও তিনি সঠিক খবর রাখিতেন না; মিথ্যা জনশ্রুতিগুলিকে প্রামাণ্য ইতিহাসের ছাপ দিয়া তিনি অনেক ঐতিহাসিককে ফাঁপরে ফেলিয়াছেন। বাহ্‌মনী-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ফিরিশ্‌তার মাহাত্ম্যেই ব্রাহ্মণ গঙ্গুর ভৃত্য বলিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত পরিচিত ছিলেন। (Briggs, vol. II, pp. 284-285.)

মেবারের রাজা রতনসেন সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তা যাহা লিখিয়াছেন তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এক্ষণে বিচার করা প্রয়োজন। ৭০৩ হিজরীতে আলাউদ্দীনের চিতোর-জয়-সম্পর্কে ফিরিশ্‌তা মেবারের কোন রাজার নাম করেন নাই, কিংবা সুলতান রাজা রতনসিংহকে বন্দী করিয়া দিল্লী আনিয়াছিলেন এ-কথাও লেখেন নাই। (Brigg's Ferishta, i. 353.) কিন্তু ৭০৪ হিজরীর ঘটনাবলীর মধ্যে তিনি ডুলীর গল্প ও রত্নসিংহের পলায়নের কথা যোগ করিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছেন, অথচ কখন এবং কি ভাবে রত্নসিংহ বন্দী হইলেন, এ-কথা ফিরিশ্‌তা লেখেন নাই। নিম্নলিখিত কারণে ফিরিশ্‌তার গল্প অবিশ্বাস্য :—

১। প্রসিদ্ধ কবি ও ঐতিহাসিক আমীর খস্রু চিতোর-অবরোধের সময় আলাউদ্দীনের সঙ্গে বরাবর ছিলেন। তিনি রত্নসেন, পদ্মিনী, গোরা, বাদল কাহারও নাম শোনেন নাই। স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত কোন ব্যাপার লইয়া যে এই যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও তিনি লেখেন নাই।

২। ফিরিশ্‌তার ইতিহাস-রচনার ২৫০ বৎসর

পূর্ব্বে জীয়াউদ্দীন বারণী 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' লিখিয়াছিলেন। তিনি আলাউদ্দীনের রাজত্বের অনেক গল্প তাঁহার পিতৃব্য আলাওল মূলুকের (আলাউদ্দীনের সময়ে ইনি দিল্লীর কোতোয়াল ছিলেন) নিকট হইতে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি আলাউদ্দীনের প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দাই বেশী করিয়াছেন। কিন্তু চিতোর-বিজয়-সম্পর্কে আমীর খসরুর চেয়ে বেশী কিছু বলেন নাই। ইহাতেও পদ্মিনী-উপাখ্যানের নামগন্ধ নাই।

৩। ফিরিশ্‌তার ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাণা কুম্ভকর্ণের রাজত্বকালে লিখিত 'একলিঙ্গমাহাত্ম্যম্' গ্রন্থের রাজবর্ণন অধ্যায়ে লিখিত আছে—

স (=সমর সিংহঃ) রত্নসেনং তনয়ং নিযুজ্য
স্বচিত্রকূটাচলরক্ষণায়।
মহেশপূজাহতকল্মষৌঘঃ
ইলাপতিস্বর্গপতির্বভূব :
খুঁ [পুঁ] মাণ বংশঃ [বংশ্যঃ] খলু লক্ষসিংহ---
তস্মিন্ গতে দুর্গবরং ররক্ষ।
কুলস্থিতিং কাপুরুষৈর্বিমুক্তাং
ন জাতু ধীরাঃ পুরুষাস্ত্যজন্তি॥ *

রতনসিংহের পিতা সমরসিংহ সম্বৎ ১৩৫৮ বিক্রম শতাব্দীর মাঘ মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৩৫৯ সম্বতের মাঘ মাসের তারিখ-যুক্ত রত্নসিংহের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছয় মাস অবরোধের পর সোমবার, ১১ই মহরম, ৭০৩ হিঃ (বি. সং ১৩৬০ ভাদ্র শুক্লা-চতুর্দ্দশী = ২৬এ আগষ্ট, ১৩০৩ খৃঃ) আলাউদ্দীন চিতোর অধিকার করেন। সুতরাং রাবল রতনসিংহ এক বৎসর কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। যাঁহারা "পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতা" প্রমাণে উৎসাহী, তাঁহারা এত অল্প সময়ের মধ্যে রতনসেনের সিংহল-যাত্রা, আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ, কারাবাস, মুক্তি ইত্যাদির সমাবেশ হয় কি-না বিবেচনা করিবেন। একলিঙ্গ-মাহাত্ম্যের শ্লোক হইতে বুঝা যায়, রতনসেন-পদ্মিনী-বিষয়ক উপাখ্যান তখন পর্য্যন্ত মেবারের মাটিতে গজায় নাই।

৪। ফিরিশ্‌তা লিখিয়াছেন রাজা রতনসেন কারামুক্ত হইয়া আলাউদ্দীনের রাজ্য লুটপাট করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহাকে দমন করিতে না পারিয়া চিতোর-দুর্গ তাঁহার ভাগিনেয়কে দিয়াছিলেন। অথচ 'একলিঙ্গ-মাহাত্ম্যম্' হইতে প্রমাণ হয়, চিতোর-দুর্গ-পতনের পূর্ব্বে রতনসিংহ মারা গিয়াছিলেন। রতনসিংহের মৃত্যুতে গহ্‌লোত-বংশের "রাবল" শাখা নির্ম্মূল হওয়ায় শিশোদে-সামন্ত রাণা উপাধিধারী অপর শাখা মেবারের গদী পাইলেন। লক্ষসিংহের পৌত্র হমীরই মুসলমানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করাতে জালোর ভূতপূর্ব্ব অধিকারী মালদেব সোনগরাকে সুলতান চিতোর-দুর্গ দিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মেবার-ইতিহাস সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তার সাধারণ জ্ঞানও ছিল না।

'পদ্মাবত', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', এবং টডের রাজস্থানোক্ত পদ্মিনী-উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজীর মতামত ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'প্রবাসী'তে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছিল। এস্থলে সংক্ষেপে উহার পুনরুক্তি করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"কর্ণেল টড এই কথা [পদ্মিনী-উপাখ্যান] মেবারের ভাটদের উপর নির্ভর করিয়া [আধার পর] লিখিয়াছেন এবং ভাটেরা উহা 'পদ্মাবত' হইতে লইয়াছে।... ... ... 'পদ্মাবত', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', এবং টডের রাজস্থানের বর্ণনায় যদি কোন মূল থাকে তবে তাহা এ-টুকু—আলাউদ্দীন ছয় মাস অবরোধের পর চিতোর-দুর্গ দখল করেন। চিতোরের রাজা রতনসিংহ লক্ষ্মণসিংহ প্রভৃতি অনেক সামন্তের সহিত এ যুদ্ধে মারা যান। তাঁহার রাণী পদ্মিনী বহু স্ত্রীগণের সহিত অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। এই প্রকারে চিতোর-দুর্গে অল্প দিনের জন্য মুসলমান-অধিকার স্থাপিত হয়—বাকী সমস্ত কথা বহুধা কল্পনামূলক।" ('প্রবাসী', পৃ. ৮১৪-৮১৫)

এখন যে 'রাজপ্রশস্তি' কাব্যকে নিখিলবাবু পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাক্।

আওরংজেবের সমসাময়িক মহারাণা রাজসিংহের "রাজসমুদ্র" সরোবরের বাঁধে পচিশখানি শিলাখণ্ডের উপর এই প্রশস্তি খোদিত হইয়াছিল। ইহার রচয়িতা পুরোহিত গরীবদাসের পুত্র রণছোড়দাস এবং রচনাকাল বি.

* মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা-কৃত "রাজপুতানেকা ইতিহাস', ২য় ভাগ, ৪৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

সম্বত ১৭৩২ (জানুয়ারি, ১৬৭৬ খৃ.)। নিখিলবাবু বলিয়াছেন, "রাণা-বংশের অনুমতিক্রমে লিখিত হওয়ায় তাহারই কথা বিশ্বাসযোগ্য" (পৃ. ৮১৬)। এটি শুধু অনুমান। গৌরীশঙ্করজী এই প্রশস্তি সম্পাদন করিয়াছেন এবং তাঁহার চেয়ে এই প্রশস্তির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কাহারও আছে কি-না সন্দেহ। ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলে তিনি ইহা উদ্ধৃত করিয়া নিশ্চয় বিচার করিতেন। কিন্তু পদ্মিনী-উপাখ্যান-সম্পর্কে ইনি কোথাও রাজপ্রশস্তির উল্লেখও আবশ্যক মনে করেন নাই। ইহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে গৌরীশঙ্করজী লিখিয়াছেন—"প্রারম্ভের কয়েকটি সর্গে মেবারের যে প্রাচীন ইতিহাস লেখা হইয়াছে উহা ভাটদের খ্যাত ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হওয়ায় অধিক বিশ্বাসযোগ্য নয়…" (ঐ, ৩য় ভাগ, পৃ. ৮৮৭)।

মেবারের সকল প্রশস্তি ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া লিখিত হইত না। তিন শত সত্তর বৎসর পরে রচিত একটি কাব্যকে আমীর খসরু-কৃত সমসাময়িক ইতিহাস 'তারিখ-ই-আলাই', এবং জিয়াউদ্দীন বারণীর 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী'র চেয়ে অধিকতর প্রমাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত কি-না সুধীমণ্ডলী বিচার করিবেন। আলাউদ্দীনের সময়ের কথা দূরে থাক, আকবরের সমকালীন মহারাণা প্রতাপের ইতিহাস সম্বন্ধেও রাজপ্রশস্তিকার ভুল করিয়াছেন। প্রশস্তি-রচনার এক শত বৎসর পূর্ব্বে হলদীঘাটের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধ-বর্ণনায় প্রতাপের পলায়ন, খোরাসানী ও মুলতানী সৈনিকের পশ্চাৎ অনুসরণ, "খোরাসানী মুলতানীকা অর্গল" শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষার কথা লিখিত হইয়াছে। অথচ শক্তসিংহ হলদীঘাটের যুদ্ধে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না, এবং বদায়ুনী—যিনি স্বয়ং মোগলপক্ষে লড়াই করিয়াছিলেন—লিখিয়া গিয়াছেন, যুদ্ধশেষে সারাদিন মোগলেরা রাণার গুপ্ত আক্রমণের ভয়ে আড়ষ্ট ছিল; রাণাকে অনুসরণ করিবার মত শক্তি মোগলদের ছিল না। ইহার চেয়ে অমার্জ্জনীয় ভুল—রাজপ্রশস্তিকার লিখিয়াছেন, প্রতাপ "সেখু" অর্থাৎ কুমার সেলিমকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, অথচ মোগল-দরবারের ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণ হয় কুমার সেলিম প্রতাপের বিরুদ্ধে কোন অভিযান করেন নাই; প্রতাপের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে কুমার সেলিম মহারাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পদ্মাবত-উপাখ্যানের জন্য রাজপ্রশস্তির প্রামাণিকতা কতটুকু ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়।

টডের 'রাজস্থান' (১৮২৯)

মহামতি টড সাহেব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজস্থানের ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন রাজপুতানার ইতিহাস অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভাট-চারণেরা ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা কল্পনা-মূলক "খ্যাত" ইত্যাদি গান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এই খ্যাতগুলিতে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির উপন্যাস-নাটকের চেয়েও প্রকৃত ইতিহাসের ভাগ কম ছিল। টড সাহেব আঁধারে হাতড়াইয়া যাহা কিছু পাইয়াছেন কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নিজ হইতে মনগড়া কিছু লিখেন নাই; কিন্তু ভাট ও কবিদের মনগড়া কথায় তাঁহার ইতিহাস ভর্ত্তি করিয়াছেন। এটা ঐতিহাসিকের আপদ্ধর্ম্ম—"মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" ব্যবস্থা। ধরুন আজ হইতে দুই শত বৎসর পরে কোন রাজনৈতিক কিংবা প্রাকৃতিক বিপ্লবে আমাদের দেশ হইতে আকবর, আওরঙ্গজেব প্রভৃতির সমসাময়িক ফার্সি ইতিহাস এবং স্যর যদুনাথ ইত্যাদির গবেষণামূলক ইতিহাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে—শুধু বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলালের উপন্যাস ও নাটকগুলি রহিয়া গেল। এ অবস্থায় আমেরিকার কোন পণ্ডিত যদি এদেশের ইতিহাস-উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন এবং উপন্যাস ও নাটকগুলির চুম্বক-কথা ইতিহাসের আকারে লিখিয়া যান, উহা যেরূপ ইতিহাস দাঁড়াইবে টডের ইতিহাসও প্রায় সেই রকম দাঁড়াইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মহাশয় চল্লিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজপুতানার ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া টডের রাজস্থানের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ-কাজে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সম্প্রতি ছাড়িয়া দিয়াছেন; কারণ তিনি দেখিলেন,

শুদ্ধ করিতে গেলে খোল-নলিচা দুই-ই বদলাইতে হয়। সেইজন্য তিনি হিন্দীতে "রাজপুতানেকা ইতিহাস" লিখিয়া মহামতি টডকে উৎসর্গ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল ইহার তিন খণ্ড ছাপা হইয়া গিয়াছে।

টডের রাজস্থানের ভুল সংশোধন এবং নূতন আলোক-পাত করিয়া এই শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত যেমন গবেষণা চলিয়াছে, ভবিষ্যতে সেরূপ গৌরীশঙ্করজীর ইতিহাসকে আধার করিয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান চলিবে। এ-সম্বন্ধে আমরা গৌরীশঙ্করজীর মত উদ্ধৃত করিতেছি— "রাজপুতানার অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় উদয়পুর-রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসও এখন পর্য্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। কর্ণেল টড প্রমুখ পণ্ডিতেরা গুহিল হইতে সমরসিংহ কিংবা রত্নসিংহ পর্য্যন্ত রাজাদের যে-কিছু বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন উহা প্রায় কিছু না-লেখার মত [নহী'-সা] এবং বিশেষতঃ, ভাটদের খ্যাত অবলম্বন করিয়া লিখিত হওয়ার দরুণ অধিক প্রামাণ্য নহে।" (রাজপুতানেকা ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃ. ৫১৫)

আমাদের মনে হয়, পদ্মিনী-উপাখ্যানের উৎপত্তিস্থান মেবারভূমি নয়, অযোধ্যা প্রদেশ—যেখানে কবি মালিক মহম্মদ জ্যায়সী এই কাব্য রচনা করেন। 'জ্যায়সী গ্রন্থাবলী'র সম্পাদক মহাশয় বলেন, পদ্মাবতের পূর্ব্বার্দ্ধ জ্যায়সী অযোধ্যায় প্রচলিত কাহিনী হইতে লইয়া মনোরম কল্পনা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ অযোধ্যায়, "পদ্মিনীরাণী এবং হীরামন তোতা"র গল্প আজ পর্য্যন্ত প্রায় ঐ রকমই বলা হয় যেমন জ্যায়সী উহার বর্ণনা করিয়াছেন। জ্যায়সী ইতিহাসবিজ্ঞ ছিলেন; এই জন্য উনি রতনসেন, আলাউদ্দীন প্রভৃতির নাম দিয়াছেন; কিন্তু কাহিনী-কথকেরা বলে, "এক রাজা ছিল" "দিল্লীর এক পাদ্‌শা ছিলেন" ইত্যাদি। মাঝে মাঝে দু-এক পদ গাহিয়া গাহিয়া ইহারা গল্প বলে।…এই প্রকার "বালা-লখন দেব" ইত্যাদি আরও রসাত্মক কাহিনী প্রচলিত আছে।" (পৃ. ৩০)

ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে নেপালের সেন-রাজগণের এক বংশাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃতে লিখিত; রচয়িতা ভবদত্ত; পুঁথির নাম "রত্নসেন-কুলবংশাবলী"; রচনাকাল আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। ইহাতে লেখা আছে

রত্নসেন

নাগ সেন — কমল সেন — মনোহর সেন — জালিম সেন

নাগ সেন: তোখারায় সেন

কুলপ্রতিষ্ঠাতা রত্নসেন অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বংশের আদিস্থান ছিল "চিতউর"। তাঁহার পুত্র নাগ-সেন (?) এলাহাবাদে রাজা হইয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র তোখারায় সেন মধ্যদেশ বিপদসঙ্কুল মনে করিয়া উত্তরাপথের পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋদ্ধি-কোটায় রাজ্যস্থাপন করেন। (Indian Historical Records Commission Proceedings, vol. XII, p. 64.)। এই চিতোর কি রাজপুতানার চিতোর? রাবল রতনসীর কোন সন্তানাদির উল্লেখ রাজপুত-ইতিহাসে নাই। তবে গৌরীশঙ্করজী লিখিয়াছেন, রতন সিংহের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ হইতে নেপাল-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ বলে। (রাজপুতানেকা ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃ. ৪৮৩)

আমাদের মনে হয়, মধ্যদেশের রতনসেন নামে কোন রাজার পদ্মিনী-স্ত্রীবিষয়ক কোন কাহিনী অযোধ্যায় প্রচলিত ছিল। মুসলমান কবি উহাকে মুসলমান ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদের কাঠামো নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। তবে জ্যায়সী "ঐতিহাসিক কাব্য" লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। যদি তাহাই হইত, হীরামন তোতা, রাঘবচেতন, সাত সমুদ্রের পারে সোনার সিংহল, সিংহের উপর সওয়ার 'সরজা' বীর ইত্যাদি ইহাতে স্থান পাইত না। পাছে লোকে তাঁহার কাব্যকে ইতিহাস বলিয়া ভ্রম করে সেজন্য তিনি উপসংহারে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন, 'পদ্মাবত' একটি allegorical poem; রতন-সেন মন-স্বরূপ—আমাদের দেহরূপী চিতোরের রাজা, ইনি মেবার-রাজ সমরসিংহের পুত্র নহেন। হৃদয়-রূপ সিংহল দ্বীপে 'বুদ্ধি'-রূপা পদ্মিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইতিহাসে পদ্মিনী রাণীকে খোঁজা বৃথা।

কষ্টিপাথর

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের বাড়ী গুপ্তিপাড়া। গুপ্তিপাড়া কাল্‌নার একটু দক্ষিণে গঙ্গার ধারে, শান্তিপুরের প্রায় আরপার। এখানে বহুদিন ধরিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস।...

বাণেশ্বর শোভাকরের সন্তান। শোভাকর দেবীবর ঘটকের গুরু ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১৪৮২ সালে দেবীবর রাঢ়ীশ্রেণীর বড় বড় কুলীনকে একত্র করিয়া তাহাদের মেলবন্ধন করেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও দেবীবর মাসতুতো ভাই ছিলেন। যোগেশ্বর বড় কুলীন, দেবীবর শ্রোত্রিয়, সেই জন্য যোগেশ্বর পণ্ডিত মাসীর বাড়ী ভাত খান নাই। তাহাতে দেবীবর অত্যন্ত চটিয়া যান, এবং কুলীনের যত দোষ আছে, সেগুলি প্রচার করিয়া দিবার জন্য সব কুলীনদের লইয়া সভা করেন। সভায় সব বড় বড় কুলীন উপস্থিত ছিলেন। সভা হয় গুরু শোভাকরের বাড়ীতে। গুরুর বাড়ী ছিল আয়দায়। কাল্‌না হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম। এই সভায় যত কুলীনের এক রকম দোষ ছিল, তাহাদের এক একটি মেল করিয়া দেওয়া হয়, তাহারা সেই মেলের মধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, এদিক্ ওদিক্ করিতে পারিবে না। সে সকল দোষ নানা রকম। সে সব পুরাণো কাসুন্দি আর ঘাঁটিয়া কাজ নাই। এইরূপে ছত্রিশটি মেলের উৎপত্তি হয়। বড় দোষে বড় মেল হয়।...

শোভাকরের বংশ আয়দার চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল।...

শোভাকরের বংশে গুপ্তিপাড়ায় রাম নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নৈয়ায়িক ছিলেন। বিচারে তাঁহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। বিচারকালে তাঁহাকে সিংহের মত বলিয়া মনে হইত; অথচ তিনি বেশ কবিও ছিলেন, তাঁহার কবিতায় অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র রাঘবেন্দ্র; তাঁহার খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র বিষ্ণু সিদ্ধান্তবাগীশ; ইনি পিতার নিকট মন্ত্র পাইয়া সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার কাব্যে পাথরও গলিয়া যায়, বজ্রও শিরীষফুলের মতন নরম হইয়া যায়। তাঁহার বিদ্যায় যশঃ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পুত্র রামদেব তর্কবাগীশ। রামদেবের পুত্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

বাণেশ্বর ছেলেবেলায় খুব চালাক-চতুর ছিলেন, এবং বোধ হয়, বড় দুষ্টও ছিলেন। পিতা রামদেব বাণেশ্বরের আকার-প্রকার দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—কালে বানুও পণ্ডিত হবে। হইয়াছিলও তাই। বাণেশ্বর গুপ্তিপাড়ার লোকের মত সাহসী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। টোলের পড়া শেষ করিয়া তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু একদিন কি রসিকতা করিয়া তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কোপে পড়েন। তাই তিনি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে যান এবং সেখানে রাজা চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত হন। খ্রীষ্টীয় ১৬৯৬ সালে বরদা পরগণার রাজা শোভাসিংহ যখন উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত মিলিয়া রাঢ়দেশে মহা উৎপাত আরম্ভ করেন তখন রাজা কৃষ্ণরাম বর্দ্ধমানের রাজা। তাঁহার কন্যাকে আক্রমণ করিয়া কিরূপে শোভাসিংহ সেই কন্যার হাতে প্রাণ হারান, সে কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায়। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র। কীর্ত্তিচন্দ্রের খুব নাম হইয়াছিল। তাঁহার পর চিত্রসেন রাজা হন। চিত্রসেন রাজার সময় রাঢ়ে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। রাজা চিত্রসেন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে গুপ্তিপাড়া হইতে আনাইয়া আপনার সভাপণ্ডিত করেন এবং তাঁহাকে চিত্রচম্পূ নামে আপনার এক জীবনচরিত লিখিতে বলেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে যখন বর্গীর হাঙ্গামা খুব চলিতেছে, সেই সময়ে চিত্রচম্পূ লেখা হয়। গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত হইয়া যে কাব্য হয়, তাহার নাম চম্পূ। বাণেশ্বরের এই চম্পূ বাঙ্গালার এক অপূর্ব্ব কাব্য। এখন ইহার পুথি বড় পাওয়া যায় না। কোলব্রুক সাহেব একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিসে দিয়াছেন। আর একখানি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানায় আছে। ইহা হইতে আমরা বর্গীর হাঙ্গামার অনেক কথা জানিতে পারি।...

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহারাজ চিত্রসেনের মৃত্যুর পর বর্দ্ধমান ছাড়িয়া আবার কৃষ্ণনগরে আসেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত হন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পুরাণ পড়িয়া শুনাইতেন। এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজের রাজত্ব আরম্ভ হয়। বাণেশ্বর সকল সময়েই ইংরাজদের সহায়তা করিতেন। ইংরাজেরা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা লইতে হইলে তাঁহারই কাছে লইতেন। কিন্তু অল্পদিন পরে তাঁহার একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। তিনি ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

বাণেশ্বর অতি সাহসী পুরুষ ছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা চাকরী করিতেন না মাইনে লইতেন না, কাহারও হুকুমের তাঁবে থাকিতেন না। তবে কথাই আছে—'অনাশ্রিতা ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ'; সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয়েরা একজন না একজনকে ধরিয়া থাকিতেন। পঠন-পাঠন তখন ব্যবসায় ছিল। যে যেমন পড়াইতে পারিত, তাহার তেমনি বিদায়-আদায় বেশী হইত। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়া রাজা চিত্রসেনকে আশ্রয় করেন, আবার বর্দ্ধমানের আশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে আসেন, আবার কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া মহারাজা নবকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসেন এবং তাঁহার দেওয়া জমীতে কলিকাতায় বাড়ী তৈয়ারী করেন।

তিনি সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। প্রতিদিন অরুণোদয় কালে অবগাহন স্নান করিয়া, তান্ত্রিক এবং বৈদিক সন্ধ্যা সমাপন করিয়া তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। সেখানে সোনা ও রূপার পাত্রে নানাবিধ পূজার উপকরণ সাজান থাকিত। পুষ্পপাত্রে বকুল, বঞ্জুল, কেতক, কেতকী, কমল, কৈরব, চম্পক, কুরুবক, বক, কোটা, মুচুকুন্দ, কুন্দ, করবীর, কাঞ্চন, পলাশ, কদম্ব, কহ্লার, রক্তপদ্ম, কঙ্কেলি, মালতী, মহুয়া, মাধবী, পুন্নাগ, নাগকেশর, যূথী, জাতী প্রভৃতি পুষ্প রাশি রাশি থাকিত; মন্দিরটি তাহাদের গন্ধে আমোদিত হইত। সেখানে কুঙ্কুম, মৃগনাভি, চন্দন, বেণা, গুগ্‌গুলু এবং নানা রকম ধূপের গন্ধ তাহার সহিত মিশিয়া যাইত। পানিশঙ্খের উপর অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য সাজান থাকিত। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরা ক্ষীর, ননী, দধি, চিনি, নানারূপ মোদক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পিঠে, লাড়ু এবং তিলান্ন ব্যঞ্জন দিয়া ভোগ উপস্থিত করিয়া দিতেন। রাজা তাহা দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিতেন।

সই সকল ভোজ্য বস্তু যাহা পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। রাজা সোনার াসনে বসিয়া, সোনার অলঙ্কার পরিয়া, দুইখানি উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবমতে আচমন করিতেন। তাহার পর সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, দ্বারদেবতা ও গুরুপরম্পরাকে নমস্কার করিয়া ভূতশুদ্ধি করিতেন। পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভিতর ও বাহিরে সংহারমাতৃকান্যাস করিতেন। পরে আটত্রিশ ও পঞ্চাশ কলা কেশবাদিমাতৃকা, শ্রীকণ্ঠ, কেশব, কীর্ত্তি প্রভৃতি ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিতেন। তার পর পীঠমন্ত্র, কল্পাদিমন্ত্র পড়িয়া ও র্বাঙ্গে ছাপা দিয়া 'মুদ্রারচিতমূর্ত্তিপঙ্করকিরীটৈস্ত্রিয়বাপকস্তাসো ধ্যাত্বা' বশেষার্ঘ্যস্থাপন করিয়া জলের ভিতর জপ আরম্ভ করিতেন।...

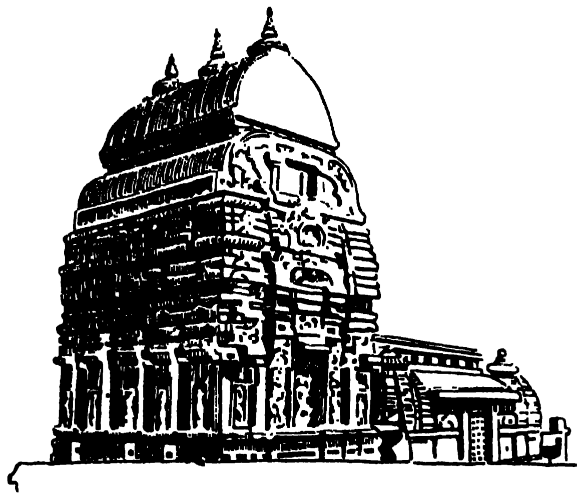
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজরা একরকম বাঙ্গালার ালিক হইয়া উঠিলেন। সে সময়ের কৃষ্ণনগরের রাজা ইংরাজদের একজন প্রধান সহায়। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত। তরাং বাণেশ্বরও ইংরাজদের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজরা দেশের কর্ত্তা হইলেন।...১৭৭২ অব্দে য়ারেন্ হেষ্টিংস্ গবর্ণর হইয়া আসিয়া বলিলেন,—আমি দাওয়ান হইয়া াড়াইতে চাই। সুতরাং নায়েব দেওয়ানদের চাকরী গেল। কাম্পানী দেওয়ানী লইলেন। কিন্তু দেওয়ানী লইলে দেওয়ানী াকদ্দমা ত করিতে হইবে। মুসলমানদের দেওয়ানী আইন ছিল, সই মতে কাজ চলিতে লাগিল। হিন্দুদের বেলায় কি হইবে? দেওয়ান াকদ্দমার ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতেন, তাহার পর আইন বা ধর্ম্ম ক জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ ণ্ডিতেরা প্রশ্ন পাইয়া তাহার উত্তর লিখিয়া দিতেন ও তজ্জন্য তোলবট াইতেন। মুসলমান আমলে এই ভাবেই দেওয়ানী চলিয়া আসিত। হেষ্টিংস উহা পছন্দ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—কোড চাই, ংহিতা চাই। তখন ইংরাজদের মধ্যে কেহই সংস্কৃত জানেন না; মুসলমানদের মধ্যে অতি অল্প লোকে জানে। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দুদিগের সহযোগে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস এগার জন বড় বড় পণ্ডিত সংগ্রহ করিলেন। এই এগার জনের প্রথমেরই নাম হইতেছে—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাহার পর পশপুরের কৃপারাম; তাহার পর নবদ্বীপের জোড়াবাড়ীর দুই পণ্ডিত—একজনের নাম রামগোপাল তর্কপঞ্চানন, আর একজনের নাম কালীকিঙ্কর। আর সাত জনের কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার ভিতর একজন ছিলেন—তাঁহার নাম সীতারাম ভাট। ইঁহারা এগার জনে একত্র হইয়া, দেওয়ানী আদালতের বহু দিনের নজীর দেখিয়া একখানি বই প্রস্তুত করিয়া দেন; সেখানির নাম—বিবাদার্ণবসেতু। হেষ্টিংস একজন সংস্কৃত-জানা মৌলবীকে দিয়া উহা পারসীতে তর্জ্জমা করাইয়া লন এবং হালহেড নামক একজন ইংরাজকে দিয়া সেই পারসী হইতে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করাইয়া ১৭৭৬ সালে ছাপাইয়া দেন। উহার নাম হয়—হালহেড্‌স্ জেন্টু ল। পণ্ডিত মহাশয়েরা যত দিন এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তত দিন তাঁহাদের টোল খরচের জন্য রোজ একটি করিয়া টাকা পাইতেন। কার্য্য শেষ হইয়া গেলেও তাঁহারা সকলেই যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, একটি করিয়া টাকা রোজ পাইতেন। কেহ বা তাঁহাদের বাড়ীতে টোল থাকা পর্য্যন্ত সে টাকা পাইয়াছিলেন।

এই পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। সুতরাং এ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং তিনিই যে সকলকে চালাইয়া লইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর এই কোডই সুপ্রীম কোর্টের ভরসা ছিল। তার পর সার উইলিয়ম জোন্‌স্ আসেন। তিনি নিজে সংস্কৃত জানিতেন এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে দিয়া বিবাদভঙ্গার্ণব নামে একটি নূতন কোড তৈয়ারী করিয়া লন।

সুতরাং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার যে শুধুই কবিতা লিখিয়া, চম্পূ লিখিয়া বেড়াইতেন, তাহা নহে, স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরাজের হাতে হিন্দু ল'এর ব্যবস্থা দিবার ভার তুলিয়া দিবার তিনিই একজন প্রধান হেতু। এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নিজেদের প্রাধান্য হারাইতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে এখন সব হারাইয়া বসিয়া আছেন।

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮)



পুস্তক পরিচয়

ভাদুড়ী-মশাই—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ক্রাউন ১৬ পেজী, ৩২১ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য আড়াই টাকা।

হাস্যরস আর করুণরস সহজে মিশ খায় না, যেমন তেল আর জল। কিন্তু কেদারবাবু এই দুই বিভিন্নধর্মী রস মন্থন করিয়া উপাদেয় অবলেহ বানাইয়াছেন। সামান্য নর-নারীর দোষ গুণ সুখ দুঃখের কথা স্নিগ্ধ কৌতুকের যোগে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, বিদ্বেষ নাই, অতিকারুণ্য নাই, অরুচিকর মিষ্টতাও নাই। মধুপুর-নিবাসী snob-বৃন্দ, জামাই ধরিবার জন্য খেলোয়াড় গৃহিণীর জাল-বিস্তার, শান্ত দিবার উপর দুরন্ত ভগিনীর কৌতুককর উপদ্রব এবং মাতার বাক্যবাণ হইতে পিতাকে রক্ষা করিবার নিরন্তর চেষ্টা—ইত্যাদি চিত্র অতি উপভোগ্য।

রা. ব.

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, পঞ্চম খণ্ড—সতীশচন্দ্র রায়, এম্-এ সম্পাদিত এবং কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন আট পেজী ৮+৫৮+২৫৬+১১৮ পৃষ্ঠা, দাম সাধারণের পক্ষে ১।০।

পদকল্পতরু ক্ষণদা-গীত চিন্তামণি, গীত-চন্দ্রোদয়, পদামৃত-সমুদ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের অন্যতম পুঁথি। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতকের মাঝামাঝি বৈষ্ণব দাস (গোকুলানন্দ সেন) উহার সঙ্কলন সম্পূর্ণ করেন বলা হয়। পদের সংখ্যা তিন হাজারের কিছু উপর। পদকল্পতরু ব্যতীত বৈষ্ণব পদাবলীর এত বড় পুস্তক এ যাবৎ মুদ্রিত হয় নাই। উৎকৃষ্ট পদের সমাবেশ হেতু বইখানার আদরও যথেষ্ট। বিগত ১৩২২ বঙ্গাব্দ হইতে সতীশ বাবুর সম্পাদকতায় পদকল্পতরু খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। চারি খণ্ডে মূলাংশ শেষ হয়। মূলে প্রতি পদের নীচে পাঠান্তরাদি এবং আবশ্যক টীকা সংযোজিত হইয়াছে। পাঠ-নির্ণয়াদি ব্যাপারে সম্পাদক মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতাই সূচিত করে। পদকল্পতরুর ৫ম খণ্ড উল্লিখিত চারি খণ্ডের পরিশিষ্ট আকারে রচিত। ইহাতে পদ-সূচী, পদকর্ত্তৃ-সূচী, সুদীর্ঘ ভূমিকা এবং একটি শব্দার্থসূচী আছে। ভূমিকাভাগে পদ-সংগ্রহ পুঁথির পরিচয়, ন্যূনাধিক দেড় শত পদকর্ত্তার বিবরণ ও তৎসহ পদ-নির্ব্বাচন সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার-কবিত্ব ও বিশেষত্ব ইত্যাদির বিবিধ বিষয় যথাসম্ভব আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে পদাবলী ও পদ-কর্ত্তা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিবার আছে। রায় মহাশয় গত ৪০ বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের গভীরভাবে অনুশীলন করিয়া আসিতেছিলেন। এবং তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার ফল আমাদিগকে পদকল্পতরু উপলক্ষ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এক্ষেত্রে সতীশ বাবুর অভিপ্রায় সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেও সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, আমরা সর্ব্বত্র তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। অবশ্য এতটা আশাও করিতে নাই।

পদকল্পতরু বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটা সংস্করণের নাম করা যাইতে পারে; (১) স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত সংস্করণ, (২) ভারত-গ্রন্থ-প্রচার-সমিতির সংস্করণ (১৩০৪)। কিন্তু পদকল্পতরুর এরূপ সুন্দর সংস্করণ ইহার পূর্ব্বে আর হয় নাই, তাহা অসঙ্কোচে বলা চলে। মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

আপন-পর—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বীণা লাইব্রেরী, ২নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। ৩২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

এই উপন্যাসখানি 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বইখানি এত না বাড়াইয়া দুই শত পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিলে তাঁর বক্তব্যটি অধিকতর স্পষ্ট ভাবে ফুটিত—বইখানি শেষ করিয়া এই কথাই মনে হয়। যে illusionটুকু সৃষ্টি করার উপর উপন্যাসের রসবস্তু জমাট বাঁধিয়া ওঠে, লেখক তাহা করিতে পারেন নাই। কারখানার কথা ও ইব্রাহিম মিস্ত্রিকে অনাবশ্যকরূপে আনিয়া ফেলিবার হেতু কি বুঝিতে পারিলাম না। Side characterগুলি ভাল করিয়া ফুটাইতে না পারিলে উপন্যাসের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে লেখক একথা নিশ্চয়ই জানেন, তবু তিনি কেন এই সকল অনাবশ্যক চরিত্রের ভারে গল্পাংশকে ভারাক্রান্ত করিয়াছেন, বোঝা কঠিন। তিনি চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন তাহার প্রমাণ আছে অণিমার চরিত্রে। বেশ সবল ও স্বাভাবিক অঙ্কন। কিন্তু সুরবালার চরিত্র আমাদের মনে কোনো রেখাপাত করে না। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাভারত—কাশীরাম দাস কর্ত্তৃক রচিত; শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত; প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা; মূল্য পাঁচ টাকা।

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান', কিন্তু এইরূপ পুণ্যবান্ এই যুগে অনেক আছেন যাঁহারা কাশীরাম দাসের কথা শোনেন নাই ও শুনিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। বাংলা দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিতে বৃদ্ধ কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের স্থান নাই; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহাদের আসন স্থায়ী, বাঙালীর চিত্তলোকে তাঁহাদের প্রেরণা এখনও কাজ করিতেছে, এবং বাঙালীর চিন্তাজগৎ যতই প্রসারিত হোক তাঁহাদের সত্যকারের প্রভাব তাহার উপর চিরদিনই থাকিবে। তথাপি ইঁহাদের সঙ্গে পরিচয় না রাখিয়াও আধুনিক বাঙালী শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত এই মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতে দেখিয়া তাই একটু বিস্মিত হইতে হয়। এই সংস্করণে পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষাও চিত্র বেশী সংযোজিত হইয়াছে। মোট চিত্র-সংখ্যা ৬৬, বহুচিত্রই রঙীন, প্রায় সবগুলিই প্রাচীন বা আধুনিক শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অঙ্কিত। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ও বাংলা মহাভারত সম্বন্ধে যে একটি তথ্যপূর্ণ ভূমিকা ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'যবদ্বীপে মহাভারত' নামক যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক

নিবন্ধ এইবার সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে সর্ব্ববিধ পাঠকের নিকটেই গ্রন্থখানার গৌরববৃদ্ধি হইবার কথা। আশা করা যায়, মহাভারতের এই সংস্করণটি যথাযোগ্য আদৃত হইবে।

চট্কল—শ্রীনীহারকুমার পাল চৌধুরী। গুপ্ত ফ্রেণ্ড্স্ এণ্ড কোং, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষ লইয়া লিখিত একখানি তিন অঙ্কের নাটক।—চাহি বা না চাহি, এ কঠিন সমস্যা অন্য দেশের মত আমাদের দেশেও দেখা দিতেছে, অন্য দেশের মত আমাদের দেশেও তাই উহা লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছে। এই শ্রেণীর লেখা রসোদ্বোধন অপেক্ষা প্রচারকেই বড় করিয়া ফেলে। সে দোষ হইতে এই নাটকখানাও মুক্ত নয়;—ইহাতে এই সমস্যামূলক নাটকের সাধারণ ফাঁকি বা ক্রেপ-ট্রেপ আছে; কথা-বার্ত্তায়ও ঝাঁঝ আছে; চরিত্রগুলিও যেন বড়ই ফ্রেমে বাঁধা। কিন্তু—এই কিন্তুটিই আশার কথা;—এই সব দোষ ও শেষদিককার পশুগন্ধী উৎকটতা সত্ত্বেও নাট্যকারের নাটক রচনার হাত আছে, তাহা বুঝা যায়। অবশ্যই ইহার প্রমাণস্থল রঙ্গমঞ্চ; কিন্তু মিঃ রয় ও দীপ্তি-বিদ্যুতের সংঘাত-মূলক দৃশ্যটি ও নাটকের পরিসমাপ্তি পাঠকের চিত্তকে চঞ্চল করে; এবং এই শ্রেণীর লেখার স্বাভাবিক ঝাঁঝ ও লেখকের উৎকট বীভৎসতা অঙ্কনের অস্বাভাবিক ঝোঁক সত্ত্বেও নাটকখানা পাঠকের মনকে বেশ নাড়া দেয়।

শ্রীগোপাল হালদার

প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়—ডাক্তার শ্রীশচীকান্ত সেন। ৪৯।১।এ, হরিশ মুখুজ্যে রোড, কলিকাতা। মূল্য ৵১০।

এই ছোট বইখানি সোজা ভাষায় একজন যোগ্য ডাক্তারের লেখা। প্রসূতিদের কাজে লাগিবে।

চ.

চিকিৎসা সোপান—শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী, এম্-এ প্রণীত। মিহিজাম পোঃ, ই-আই-আর হইতে মেসার্স আর, সি, দধি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২২ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

এখানি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা পুস্তক। লেখক চিকিৎসক নহেন, তবে তাঁহার মাতুল একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁহার সহিত সাত বৎসর বহু রোগী দেখিয়া লেখক ঔষধ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের এ পুস্তকে বিশেষ সাহায্য হইবে না। তবে যেখানে চিকিৎসকের অভাব, সেখানকার লোকেরা এই পুস্তক দেখিয়া অল্পস্বল্প রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেন। সাধারণ রোগসমূহের লক্ষণ ও কোন্ অবস্থায় কি ঔষধ দিতে হয়, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। বায়োকেমিক চিকিৎসার বিবরণও এক অধ্যায়ে দেওয়া আছে। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

রস চিকিৎসা—প্রথম খণ্ড, রাজবৈদ্য শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম্-এ. প্রণীত ও প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ১৬৫। মূল্য পাঁচসিকা।

পুস্তকখানিতে বিভিন্ন রসগ্রন্থ হইতে রসাদি ধাতুর জারণ-মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা আরও সরল হওয়া উচিত ছিল। শুধু অনুবাদ না করিয়া রাজবৈদ্য মহাশয় যদি স্বাধীনভাবে নিজ গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতেন তাহা হইলে পুস্তকের গৌরব বাড়িত। নূতন শিক্ষার্থীরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন এরূপ আশা করা যায়।

জীবন-বৈচিত্র্য—উপন্যাস, শ্রীনিস্তারিণী দেবী সরস্বতী প্রণীত। পত্রাঙ্ক ১৬৯, মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক রায়-সাহেব সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সান্যাল, বেনারস সিটি।

গল্পাংশ মন্দ নহে। চরিত্রাঙ্কনের অনেক দোষ ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও লেখিকার বর্ণনাভঙ্গি ভাল। উপন্যাস লিখিয়া ভবিষ্যতে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

শান্তি সমাধি—উপন্যাস, শ্রীতরুলতা ঘোষ প্রণীত ও মেসর্স বসু ব্রাদার্স, ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ১১৬, মূল্য এক টাকা।

ভূমিকায় লেখা আছে দেবরকে আশ্চর্য্য করিতে লেখিকা কলম ধরিয়াছিলেন। সেদিকে হয়ত তিনি সফলতা লাভ করিয়া থাকিতে পারেন। লেখিকার প্রথম উদ্যম হিসাবে বইখানি মন্দ হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ভারতীয় নারী—স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য ৷৵০ মাত্র। পৌষ, ১৩৩৮।

ভারতীয় নারী সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন উক্তি তাঁহার বাংলা ও ইংরেজী পত্র, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কথা হইতে সংগ্রহ করিয়া একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। নারী সম্বন্ধে স্বামীজী যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও তাহাদের মূল্য কমে নাই, ভারতের সাধনার পথে আজও সে সমস্ত উক্তি মন্ত্রের মত কাজ করিবে। প্রকৃত পথের সন্ধান বলিয়া দিবে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং এই গ্রন্থের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

তবে গ্রন্থের সম্পাদন বিষয়ে কয়েকটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বামীজীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ সুষ্ঠ হইবে, ইহাই আমরা বরাবর দেখিয়াও আসিয়াছি এবং আশাও করি। আলোচ্য পুস্তকে 'মিশনরী বাংলার' মত কিছু কিছু ত্রুটি আছে; না থাকিলেই ভাল হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ "ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ ও সমস্যা সমাধান"এর উল্লেখ করি। "আমি বারংবার পৃষ্ট হইয়াছি" (৭৯ পৃঃ), "তুমি কি ভগবান নাকি? তফাৎ!" এবং "আভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও" (৭৫ পৃঃ)। যিনি অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহাকে এ-কথাও মনে করাইয়া দিতে হয় যে 'নিষ্ঠুর রাক্ষসী(?) ভাব' (১০৩ পৃঃ) আমাদের কোনও বন্ধুর 'রাগাত্মিকা পদে'র মতই অচল। ইহা ছাড়া মুদ্রাকর-প্রমাদও আছে, এবং পাদটীকায়, একটি স্থলে অন্ততঃ, প্রকৃত অর্থের ইঙ্গিত দেওয়া হয় নাই; ৭৮ পৃঃ পাদটীকায় princess সম্বন্ধে যে মন্তব্য দেওয়া আছে তাহা নিতান্ত অর্দ্ধসমাপ্ত এবং তাহাতে নারীসমস্যায় টেনিসনের মত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা।

আশা করি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লিখিত ত্রুটি আর থাকিবে না। স্বামীজীর উক্তিগুলি কোথা হইতে গৃহীত হইল ভূমিকায় তাহার আরও বিস্তারিত উল্লেখ থাকিলে সুবিধা হইত।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

৭

নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়িতে চাকরবাকর হইতে মিহির পর্য্যন্ত সকলকেই ভোরে উঠিতে হয়। গ্রীষ্মকালে ইহাতে কেহ আপত্তি করে না, তবে শীতকালে মিহিরকে রোদ উঠিবার আগে বিছানা হইতে তোলা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞানদা ভিন্ন কেহ এ কাজে অগ্রসর হইতেও সাহস করে না। যামিনী বলে, "ও বাঁদরের সঙ্গে কে পারবে? যত বাজে কথা শুনবার জন্যে আমি যেতে পারব না।" ঝি চাকর কেহ গিয়া কিছুই করিতে পারিবে না, তাহা জানা কথা, সেইজন্য তাহাদের পাঠানও হয় না। একমাত্র জ্ঞানদার কাছেই মিহির হার মানে, সুতরাং সকালে তিনিই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

আজ কিন্তু সকালের রোদ জানালার ভিতর দিয়া ঢুকিয়া মিহিরের ঘরের মেঝেতে প্লাবন বাধাইয়া দিয়াছে, তবু জ্ঞানদার দেখা নাই। অভ্যাসমত মিহিরের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ, কিন্তু লেপের মায়া ত্যাগ করিয়া উঠিবার সে কোনোই চেষ্টা করে নাই। মা আসিয়া শাণিত বকুনি ঝাড়িবেন, কান ধরিয়া তুলিতে চাহিবেন, তবে সে উঠিবে। আজ এতক্ষণ কেন যে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তাহার কোনো কারণই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। রবিবার সারাদিন ছুটি উপভোগ করে বলিয়া, সোমবারে বরং বেশী কড়াকড়ি হয়, আজ তাহার উল্টা ব্যবস্থা কেন?

নীচে চায়ের ঘণ্টাও বাজিয়া উঠিল। আর শুইয়া থাকা চলে না, তাহা হইলে চা খাওয়াটাই বাদ যাইবে। জ্ঞানদার নিয়ম, সময়মত খাওয়ার ঘরে উপস্থিত হইতে না পারিলে, পরে আর কিছু পাইবার উপায় থাকে না। একমাত্র কর্ত্তার সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। মিহির অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে লেপটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া, খাটের উপর উঠিয়া বসিল। জুতার একপাটি টানিয়া লইয়া তাহাতে পা ঢুকাইয়া খানিকক্ষণ আলস্য উপভোগ করিল। তাহার পর মনস্থির করিয়া, কাপড় এবং জুতা পরা শেষ করিয়া, হাতমুখ ধুইয়া, লাফাইতে লাফাইতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

খাবার ঘরে শুধু বাবা আর দিদি, মা নাই। বাবা খবরের কাগজ পড়িতেছেন, দিদি পাউরুটির টোষ্টে মাখন মাখাইতেছে। মিহির ঘরে ঢুকিয়া স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ের কি হ'ল আবার?"

যামিনী বলিল, "গলা ত নয় যেন কাঁসর।"

মিহির বলিল, "থাক, আমার গলা আমারই আছে, তোমায় তার ভাবনা ভাবতে হবে না।" যামিনীর গলা সম্বন্ধেও একটা তীব্র মন্তব্য করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পিতা নিকটে বসিয়া থাকায় সুবিধা হইল না।

নৃপেন্দ্রবাবু খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তোমার মায়ের মাথা ধরেছে ব'লে তিনি উঠ্‌তে পারছেন না। ভাই বোনে ঝগড়া ক'রে তাঁকে মোটে বিরক্ত করবে না। আমি ত একঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে যাব।"

যামিনীর সুগঠিত নাসিকাটি একটু কুঞ্চিত হইল, তবে বাপ-মায়ের কোনো কথার উত্তর করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে কোনো কথা বলিল না। নীরবে সকলকে ডিম, রুটি, চা পরিবেশন করিতে লাগিল। আয়া মাঝে আসিয়া গৃহিণীর প্রাতরাশ উপরে লইয়া গেল। যামিনীও তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। খাবার ঘরে বসিয়া নৃপেন্দ্রবাবু একমনে কাগজ পড়িতে লাগিলেন এবং মিহির বসিয়া প্লেটের উপর ছুরি কাঁটা বাজাইতে লাগিল। জ্ঞানদা থাকিলে তখনই বকুনি খাইত, নৃপেন্দ্রবাবু এ সব দিকে মোটে খেয়াল করেন না, কাজেই সে কোনো বাধা পাইল না।

যামিনী মায়ের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তিনি তখনও

বিছানা ছাড়িয়া উঠেন নাই। খাটের পাশে টিপয়ের উপর খাবার সাজান, চায়ের পেয়ালাটা শুধু খালি, আর কিছু তিনি স্পর্শও করেন নাই। আয়া মাথার কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার কপাল টিপিয়া দিতেছে। যামিনী ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তোমার মাথা বেশী ধরেছে না কি?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "বড় কষ্ট হচ্ছে। মাথাটায় কে যেন একতাল সীসে ঢুকিয়ে দিয়েছে, এমন ভার মনে হচ্ছে। চোখগুলোও কেমন যেন করছে। কিছু ত মুখেও দিতে পারলাম না। এগুলো ডুলিতে বন্ধ ক'রে রেখে এস।"

যামিনী ডুলির চাবি লইয়া ডিম, রুটি তুলিয়া রাখিতে চলিল। জ্ঞানদা বলিলেন, "চাকরদের চায়ের চিনি আর দুধ বার ক'রে দিস্।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ভাঁড়ার কি বার করতে হবে?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "না, সে আমি কাল সন্ধ্যাতেই দিয়ে রেখেছি। তুমি চিনি দুধ দিয়ে গিয়ে পিয়ানো প্র্যাক্‌টিস্ কর গে। আমি শুয়েছি ব'লে যেন ঘরের সব কাজ বিশৃঙ্খল না হয়। ও রকম কাণ্ড আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। খোকাটা কি করছে? উঠেছে, না এখনও নাক ডাকাচ্ছে?"

যামিনী বলিল, "না, উঠে খেয়েছে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তাকেও পড়তে বসিয়ে দিগে যা। এ বেলা উঠতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু স্কুলে যেন ঠিক সময়ে যায়। ভজুকে তাড়া দিয়ে রাখ। মাছ যদি ঠিক সময় মত না আসে, খোকাকে যেন একটা ডিম ভেজে দেয়।"

যামিনীর গৃহিণীপনা করিতে মন্দ লাগিত না, তবে তাহার অবসর তাহার ভাগ্যে কমই জুটিত। পড়াশুনা, গানবাজনা, চিত্রাঙ্কন শিক্ষা প্রভৃতির ফাঁকে যেটুকু সময় সে পাইত, নিজের প্রিয় বইগুলি লইয়া বসিত। ঘরের কাজ একটু-আধটু না শিখিলে চলে না, তাহা জ্ঞানদা মুখে স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু যামিনীকে সে-সব শিখাইবার কোনো ব্যবস্থা তিনি কোনো দিন করেন নাই। কবে কোন্ দিন আলু কুটিয়া যামিনীর চম্পকাঙ্গুলিতে কি একটা বাহির হইয়াছিল, ইহাতে তিনি ভয় পাইয়া তরকারী কোটা তাহার একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। রান্না-বান্না একটু-আধটু সে মাঝে মাঝে করিত বটে, তবে এত সাবধানে যে, কেহ সে-দৃশ্য দেখিলে চমৎকৃত হইত। চামচ দিয়া মশলা নুন তোলা, হাতায় করিয়া কড়ায় কোটা তরকারি ঢালা প্রভৃতি ব্যাপারে তাহার ক্লান্তি ধরিয়া যাইত, কিন্তু মায়ের কাছে নিষ্কৃতি ছিল না। যামিনীর বড় ইচ্ছা করিত, পাশের গলির রায়দের বাড়ির বউয়ের মত সে খালি পায়ে আল্‌তা পরিয়া ঘুর-ঘুর করিয়া বেড়ায়, বঁটি পাতিয়া বসিয়া তরকারী কোটে, মাছ কোটে। এমন কি মশলা বাঁটা, কয়লা ভাঙা প্রভৃতিও তাহার বৈচিত্র্যের খাতিরে মাঝে মাঝে করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইত। মেয়েটির কোমল আঙুলে হলুদের দাগ, চুন-খয়েরের দাগসুদ্ধ তাহার ভাল লাগিত। কিন্তু জ্ঞানদার কাছে এ সবের নাম করিবার জো ছিল না। প্রথম জীবনে, সংসারচক্রের নিষ্পেষণে তাহার মনে যে বিরাগ জমা হইয়াছিল, কালের প্রভাবে তাহা কিছুমাত্র কমে নাই। যামিনীকে সকল দিক দিয়া নিজের আদর্শমতে গড়িয়া তুলিয়া, তিনি নিজের বাল্য ও যৌবনের সকল ক্ষোভ মিটাইতে চাহিতেন। নিজে বিশেষ সুন্দরী কোনো দিনই ছিলেন না, কন্যা কপালগুণে রূপসীও হইয়াছে। সুতরাং সে যাহাতে পরকেও সুখী করে, এবং নিজেও সকল দিক দিয়া সুখে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে যামিনীর মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

যামিনী ভাঁড়ারের কাজ সারিয়া, ড্রয়িং-রুমে গিয়া ঢুকিল। পিয়ানোটি চাবি বন্ধ থাকে, না-হইলে মিহির তাহার উপর যে তাণ্ডবের সৃষ্টি করে, তাহাতে বাড়ির লোকের কান এবং পিয়ানো দুইই অত্যন্ত বেশী রকম জখম হয়। চাবি খুলিয়া যামিনী বাজাইতে বসিয়া গেল। গান-বাজনায় তাহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল, বাজাইতে বাজাইতে সে যেন নিজের সৃষ্ট সুর-সাগরে নিজেই ডুবিয়া গেল। একেবারে আত্মহারা হইয়া বাজাইতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার কানের কাছে কে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমার শার্টের বোতাম কে লাগিয়ে দেবে শুনি? যা ত চমৎকার ধোপা জুটিয়েছ, কাপড় পরিষ্কার যত করুক

বা নাই করুক, কোট শার্টের সব ক'টা বোতাম বেশ নিয়ম-মত ভেঙে রেখে দেয়।"

যামিনী বাজনা থামাইয়া বলিল, "ধোপাটা আমি জুটাইনি। তোমার ষাঁড়ের মত গলা জাহির করবার আর কি জায়গা ছিল না ?"

মিহির বলিল, "কোথায় যাব শুনি ? মায়ের ঘরে ত প্রবেশ নিষেধ, তাঁর পেত্নীর মত আয়াটি পথ আগ্‌লে বসে আছে। আর তুমি এদিকে এমন বিকট আওয়াজ করছ যে, আকাশ ফাটিয়ে না চেঁচালে কোনো কথা শোনানই যায় না। স্কুলে যেতে হ'লে শার্টগুলোর বোতাম ত লাগান দরকার ?"

যামিনী বিরক্তভাবে বাজনা বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। নিজের ঘর হইতে সূচ সুতা আনিয়া মিহিরের শার্ট কোলে করিয়া বোতাম লাগাইতে বসিল। একটা বোতামও নাই। সমস্ত কৃতিত্বটা ধোপার বলিয়া তাহার মনে হইল না, কিন্তু মিহিরের সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি ; একটা কথা বলিতে গেলে একশ'টা আসিয়া পড়িবে। সুতরাং নীরবে কাজ শেষ করিয়া মিহিরের শার্ট মিহিরকে ফিরাইয়া দিয়া, সে আবার পিয়ানোর কাছে আসিয়া বসিল। কিন্তু মন হইতে সঙ্গীতের আবেগ তাহার একেবারে বিদায় হইয়া গিয়াছিল, কিছুতেই আর বাজাইতে ইচ্ছা করিল না। সে উঠিয়া পড়িয়া রান্নাঘরে চলিল। বাবার এবং মিহিরের খাবার জোগাড় ঠিক মত হইয়াছে কি না দেখিয়া, সে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। মায়ের ঘরের কাছে আসিয়া আধখোলা দরজার পথে একবার ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিল। মা পিছন ফিরিয়া শুইয়া আছেন, একেবারে নিশ্চল ভাবে। হয়ত ঘুমাইতেছেন, মনে করিয়া যামিনী আর ঘরে ঢুকিল না। নিজের ঘরে গিয়া, চুল খুলিয়া, স্নানের আয়োজন করিতে লাগিল। দোতলার স্নানের ঘরে দশটা বাজিবার আগেই জল বন্ধ হইয়া যায়। তোলা জলে স্নান করিতে যামিনীর মোটেই ভাল লাগে না। সুতরাং শীতগ্রীষ্ম-নির্ব্বিশেষে সে স্নানটা দশটার মধ্যেই সারিয়া রাখিতে চেষ্টা করে।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল। যামিনী বুঝিল পিতা কার্য্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিতেছেন। তাঁহার খাবার সময় একবার কাছে বসিতে হইত, পত্নী বা কন্যা একজন কেহ কাছে বসিয়া না থাকিলে নৃপেন্দ্রবাবুর খাওয়াই ভাল করিয়া হয় না। তিনি এ সকল বিষয়ে এত অন্যমনস্ক যে চাকরবাকর শুধু নুন ভাত দিয়া গেলেও, বিনা আপত্তিতে খাইয়া চলিয়া যান। কিন্তু যামিনী তখন তেল মাখিয়া ফেলিয়াছে, নীচে যাইবার মত অবস্থায় আর নাই, সুতরাং তোয়ালে, সাবান প্রভৃতি গুছাইয়া লইয়া সে স্নানের ঘরেই চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া বাহিরে আসিয়াই নীচের খাবার ঘরে মিহিরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কিছু একটা গোলমাল ঘটিয়াছে, তাহাই লইয়া সে পাচক এবং ছোট্টুর উপর মহা তর্জ্জন-গর্জ্জন সুরু করিয়াছে। পাছে মা জাগিয়া ওঠেন এই ভয়ে যামিনী আবার তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়াই মিহির আবার চেঁচাইয়া উঠিল, "একটা পচা ডিমকে এত ঘটা ক'রে ভাজবার কি দরকার ছিল শুনি ? এই দিয়ে মানুষ কখনও খেতে পারে ?" যামিনী দেখিল ডিমটার চেহারা সত্যই সুবিধাজনক নহে। অন্য কিছু তৈয়ারি করিয়া দিবার সময়ও আর নাই। অগত্যা বলিল, "কি আর করা যাবে বল ? এখন ত সময়ও নেই যে আর কিছু ক'রে দেবে ? মায়ের অসুখ হয়ে সবই গোলমাল হয়ে গেল।"

যামিনী নরম হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মিহির ঝগড়া বাধাইবার বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। স্কুলের সময়ও হইয়া যাইতেছে। হাঁড়ি-মুখ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "কি যে কাজের মানুষই তুমি তৈরি হচ্ছ ! একদিন মায়ের অসুখ হ'লে বুঝি বাড়িসুদ্ধ খেতে পাবে না ?"

যামিনী উত্তর দিল না। মিহিরও বাহির হইয়া চলিয়া গেল। খাইবার লোক একমাত্র সে-ই বাকী আছে, মা সম্ভবতঃ আজ কিছুই খাইবেন না। রান্নার চাকরটাকে ডাকিয়া বলিল, "আমাকেও যা হয়েছে দিয়ে দাও, শুধু শুধু একগাদা আর কার জন্যে রাঁধছ ? আমাকে ডেকে মায়ের ভাত উপরে পাঠিয়ে দিও। মাছটাছ যা বাজার থেকে আসবে, ভেজে ওবেলার জন্যে রেখে দিও।"

চাকরের কোন আপত্তি ছিল না। গৃহিণী সচরাচর একটা বাজিবার পর তাহাদের ছাড়েন, আজ দশটার মধ্যেই কাজ চুকিয়া গেল দেখিয়া, সে খুশী বই দুঃখিত হইল না।

যামিনী খাওয়া সারিয়া মায়ের ঘরের কাছে গিয়া আয়াকে ডাকিল। আয়ার কাছে খবর পাইল জ্ঞানদা তখনও ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহাকে জাগাইতে মানা করিয়া এবং তাঁহার ভাত উপরে আনিয়া ঢাকা দিয়া রাখিতে বলিয়া যামিনী নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সবুজ সতেজ পত্রগুচ্ছের ভিতর অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপের মত এই সুসজ্জিত ঘরখানিতে যামিনীকে যেন অধিকতর সুন্দর লাগিত। একখানা বই হাতে করিয়া সে খাটের উপর একটু বিশ্রামের চেষ্টায় গিয়া বসিল। একটু শীত শীত করিতে লাগিল বলিয়া তাড়াতাড়ি একটা ধূসর রঙের শাল টানিয়া পা দুখানা চাপা দিল। বই পড়িতে পড়িতে কখন যে ঘুমের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল, তাহা নিজেই জানিতে পারিল না।

জাগিয়া দেখিল বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে। একটু হাসিয়া বলিল, "ওমা, খুব এক ঘুম দিলাম যা হোক, আজ আর রাত্রে আমাকে ঘুমতে হবে না। মা খেলেন কি না কে জানে।"

কিন্তু মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ, কাজেই সে ফিরিয়া আসিল। ল্যাণ্ডিঙে কিস্‌মতিয়া বিপুল নাসিকা গর্জ্জন সহকারে ঘুমাইতেছে। মিহির আর আধঘণ্টা খানিক পরে আসিয়া জুটিবে, তখন আর বুড়ীকে ঘুমাইতে হইবে না। আয়ার পিছনে লাগা মিহিরের বড় প্রিয় কাজ।

যামিনী ছোট্টুকে ডাকিয়া মিহিরের জলখাবারের জোগাড় করিতে বলিল। সকালে ভাল করিয়া খাইয়া যায় নাই, বিকালেও যদি খাইতে না পায় তাহা হইলে সে আর কাহাকেও টিকিতে দিবে না। মা যদি তাহার গোলমাল শুনিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার বিরক্তির সীমা থাকিবে না। বাড়ির আর সকলের মত যামিনীও মায়ের বিরক্তির ভাবনাটা সবার আগে ভাবিত।

সূর্য্য আর একটু পশ্চিমে হেলিয়া পড়িতে-না-পড়িতেই মিহির স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর বইয়ের গাদা সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "শীগ্‌গির খেতে দাও, এক্ষুনি ত মাষ্টার এসে হাজির হবে।"

যামিনী বলিল, "মাষ্টার কি তোমার দরোয়ান যে ওরকম ক'রে কথা বলছ?"

মিহির বলিল, "আচ্ছা, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। মায়ের হয়ে অন্য কাজগুলো করতে পার বা নাই পার, তাঁর হয়ে লেকচার বেশ দিতে পার।"

ছোট্টু এই সময় খাবার আনিয়া হাজির করাতে, মিহিরের লেক্‌চারও থামিয়া গেল। তাহার প্রিয় খাবার দুই-চার রকম প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া তাহার মনটাও একটু খুশী হইল। সে বসিয়া বসিয়া আরাম করিয়া খাইতে লাগিল। যামিনী আবার উপরে চলিয়া গেল। তাহার তখনও চুলবাঁধা, গা-ধোওয়া কিছু হয় নাই। গরম জলের জন্য একবার ভৃত্যকে তাগিদ দিয়া গেল।

প্রতাপের কোনোদিন পড়াইতে আসিতে দেরি হইত না। আজ বরং সে দু-তিন মিনিট আগেই আসিয়া পড়িয়াছিল। ছোট্টু তাহাকে বসাইয়া, তাড়াতাড়ি গিয়া মিহিরকে খবর দিল, "খোকাবাবু, মাষ্টারবাবু ত আ গিয়া।"

মিহির তাহাকে মুখ ভ্যাঙচাইয়া বিদায় করিয়া দিল। তাহার প্লেটে তখনও বড় এক টুকরা পুডিং সশরীরে বিরাজ করিতেছে, সেটার সদ্গতি না করিয়া সে যায় কি করিয়া? কিন্তু জ্ঞানদার বক্তৃতা উদ্যান্ত শুনিয়া তাহার কোনোই উপকার হয় নাই, তাহা বলা যায় না। একমুখ খাবার লইয়াই সে ছুটিয়া গিয়া একবার প্রতাপকে দেখা দিয়া আসিল। বলিল, "আমার এখনি হয়ে যাবে স্যার, দু-মিনিটের মধ্যে আসছি।"

প্রতাপ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, ধীরে সুস্থে খাও কোনো তাড়া নেই।" মিহির আবার খাবার ঘরে চলিয়া গেল।

প্রতাপ বসিয়া একখানা পুরাতন ম্যাগাজিন্ উল্টাইতে লাগিল। বাড়িতে চারিদিকে পদধ্বনি উঠিতেছে, নামিতেছে, ঘোরাঘুরি করিতেছে। ইহার ভিতর কোনটি

তাহার? অহর্নিশি নিজের হৃদয়ের ভিতর যাহা সে শুনিতে পাইতেছে, বাহিরের ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া তাহা শুনিবার সৌভাগ্য কি তাহার হইবে না? যামিনীকে সেই একবার মাত্র সে দেখিয়াছে, তাহাতেই তাহার মূর্ত্তি প্রতাপের জীবনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, স্বপ্নে, জাগরণে প্রতাপ কোনো সময়েই যামিনীর সম্বন্ধে অচেতন থাকে না। কোনো আশা তাহার মনে রূপ ধরিয়া উঠিতে সাহস করে না, কিন্তু আশা নাই ইহা ভাবিবার সাহসও তাহার নাই।

কেমন একটা সুমধুর তন্দ্রা তাহাকে ঘেরিয়া ধরিতেছিল। চোখের সম্মুখে নাই, তবু এই বাড়িতেই সে আছে। এই বাতাসে সেও নিঃশ্বাস লইতেছে, এই আলোকে তাহার দৃষ্টিও নিমজ্জিত হইয়াছে। আড়ালে থাকিয়াও সে যে একান্তই নিকটে আছে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত প্রতাপ শিহরিয়া উঠিল। একটা তীব্র চীৎকার তাহার কর্ণকুহরকে এবং হৃদয়কেও যেন বিদীর্ণ করিয়া মিলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িময় সাড়া পড়িয়া গেল। মিহির খাবার ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল, চাকর দুই জন দৌড়িয়া উপরে গেল। উপর হইতে হিন্দি বাংলা মেশান ভাষায় কোন একজন স্ত্রীলোক ক্রমাগত বিলাপ করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে বোধ হইতে লাগিল। কি ব্যাপার?

প্রতাপ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়ির গোড়ায় মিহিরকে দেখিয়া সে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছে এমন সময় নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া যামিনী তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। মিহিরের কাঁধ ধরিয়া একটা নাড়া দিয়া ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও খোকা, মায়ের কি হ'ল? মা কি আর নেই?"

মিহির ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দিদির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কেন কি হয়েছে?"

যামিনী বলিল, "বাথরুমের সামনে কেমন ক'রে পড়ে আছেন, দেখ গিয়ে। ওমা গো, এ কি হ'ল?" বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। একজন অপরিচিত যুবক সামনে দাঁড়াইয়া আছে, সে জ্ঞান আর তাহার তখন ছিল না।

প্রতাপ দেখিল বাড়ির সকলেরই এমন অবস্থা যে কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। গৃহস্বামী এখনও ঘণ্টা-দু'য়ের মধ্যে বাড়ি আসিবেন না। সে যখন উপস্থিত আছে তখন তাহার উচিত যথাসাধ্য সাহায্য করা। তাহার আচরণ হয়ত সাহেবী নিয়মানুযায়ী হইবে না, কিন্তু সে কথা ভাবিবার এখন সময় নাই। যামিনীকেই উদ্দেশ করিয়া, তবে মিহিরের মুখের দিকে তাকাইয়া সে বলিল, "অত ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? আমি এখনই ডাক্তার নিয়ে আস্‌ছি। কাছেই একজন ভাল ডাক্তার আছেন। তোমার মাকে নাড়ানাড়ি করবার চেষ্টা ক'রো না, যেখানে শুয়ে আছেন, তেমনি থাকুন।"

প্রতাপের জীবনে এত অল্প সময়ে এতখানি পথ বোধ হয় সে কখনও অতিক্রম করে নাই। কপাল-গুণে ডাক্তারকে সে বাড়িতেই পাইল। ইহার সঙ্গে কস্মিনকালে তাহার আলাপ নাই। তার যাওয়া-আসার পথে তাহার লাল রঙের বাড়িটা সর্ব্বদাই প্রতাপের চোখে পড়ে, তাঁহার ডিগ্রীর অক্ষরগুলি তাহার চোখের উপর নাচিয়া যায়।

ডাক্তার নন্দী নীচের ঘরেই ছিলেন। প্রতাপের দারুণ ব্যস্তভাব দেখিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে? আপনি যে একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছেন।"

প্রতাপ যতটা জানে, ততটা বলিল। ডাক্তার আর দেরি না করিয়া যাইবার জন্য উঠিলেন। তিনি বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই নীচে নামিয়াছিলেন, গাড়ী বাহিরে অপেক্ষা করিয়াই ছিল।

কয়েক মিনিটের ভিতরই তাহারা নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। নীচের তলায় কেহ নাই; সবাই বোধ হয় উপরে গিয়া ভীড় জমাইয়াছে। প্রতাপ ভাবিল, "এদের কাণ্ডই এক রকম। এদিকে ডাকাতি হয়ে গেলেও কেউ দেখবে না।"

কিন্তু ডাক্তারকে লইয়া নীচে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ত চলে না? প্রতাপ তাঁহাকে লইয়া উপরেই চলিল। উত্তেজনার প্রাবল্যে তাহার পা কাঁপিতে লাগিল। এ যে দেবীমন্দিরে অনধিকারপ্রবেশ! এত পুণ্যফল তাহার নাই যে নিজের অধিকারে এতদূর সে আসিতে পারে।

নিয়তির হাতে ক্রীড়নকের মত সে অগ্রসর হইতেছে, আবার তাঁহারই নির্দ্দয় লীলায় যখন তাহাকে বিদায় হইতে হইবে, তখন নিজের কিছু বলিবার থাকিবে না।

উপরের তলায় আসিয়া পৌঁছিতেই যামিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মা এইখানে আছেন।" তাহার বিশাল চোখ দুটি জলে ভাসিয়া যাইতেছে, অবাধ্য অধর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। এমন দুঃসময়েও প্রতাপ না ভাবিয়া পারিল না যে, কি আশ্চর্য্য সুন্দর এই তরুণী। ডাক্তারও যে একবার এই আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুসজলনেত্রা মেয়েটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তাহাও প্রতাপের চোখ এড়াইল না। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে হইল, "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।"

জ্ঞানদা শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া স্নানের ঘরের দিকে যাইতেছিলেন, বোধ হয় মাঝপথেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। প্রতাপের কথামত তাঁহাকে সেখান হইতে সরাইবার চেষ্টা কেহ করে নাই। আয়া তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া বিলাপ করিতেছে, মিহির পায়ের কাছে বসিয়া হতবুদ্ধির মত বসিয়া আছে। চাকরবাকর-গুলিও সব এধারে-ওধারে দাঁড়াইয়া আছে।

ডাক্তার মাটিতেই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জ্ঞানদাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যামিনীর ভয়ব্যাকুল দৃষ্টি প্রতাপের বুকে ছুরির খোঁচার মত বিঁধিতে লাগিল। কোনো উপায়ে কি ইহাকে একটু আশ্বাস দেওয়া যায় না। সে ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "বেশী ভয় পাবেন না। তেমন কিছু হয়নি বোধ হয়।"

যামিনী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল, কোনো কথা বলিল না।

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "একে ঘরে নিয়ে গেলে ভাল হয়, এরকম ক'রে থাকতে ওঁর নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে।" যামিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খুব বেশী ব্যস্ত হবেন না, সামলে উঠবেন বলেই বোধ হচ্ছে।"

যামিনী মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। আয়া, প্রতাপ, মিহির এবং ডাক্তার ধরাধরি করিয়া গৃহিণীকে ঘরে লইয়া গিয়া শয়ন করাইল। ডাক্তার চেয়ার টানিয়া লইয়া ব্যবস্থা-পত্র লিখিতে বসিলেন। তাঁহার উপদেশ-মত জ্ঞানদার মাথায় বরফ দিবার ব্যবস্থা করা হইল।

তখনকার মত কি কি করিতে হইবে, সব বলিয়া, এবং দরকার হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ খবর দিতে বলিয়া ডাক্তার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিলেন। যামিনী মিহিরের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "ডাক্তারকে ত ফীস্ দেওয়া হ'ল না খোকা?"

মিহির প্রতাপের কাছে ছুটিল। প্রতাপ হাসিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "ভাবনা নেই, উনি এই পাড়ারই লোক, পরে দিলেই চল্‌বে।" ডাক্তারকে বিদায় করিয়া প্রতাপ আবার উপরে উঠিয়া আসিল। হয়ত না আসিলেও চলিত, কিন্তু লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।

মিহির একটু কাতরভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজকেও কি আমাকে পড়াবেন স্যার?"

প্রতাপ বলিল, "না। আমি ভাবছি, তোমার বাবাকে গিয়ে খবর দিয়ে আসব। তাঁর আপিসের ঠিকানাটা কি?"

মিহির ঠিকানা বলিয়া দিয়া, মায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিল। প্রতাপ একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কোথাও সে আছে কি না। তাহার অনুসন্ধান বিফল হইল না, নিজের শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে যামিনী দাঁড়াইয়া ছিল। প্রতাপকে নীচে যাইতে উদ্যত দেখিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "বাবা আপিসে না থাকলেও আপনি খোঁজ ক'রে তাঁকে একেবারে নিয়ে আসবেন। আমাদের বড় ভয় করছে।"

প্রতাপ যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। যামিনী যদি দুরন্ত ভাষায় তাহাকে ধন্যবাদ জানাইত, সেটাকে এতখানি মূল্য প্রতাপ দিত না। সে ত শুধু ভদ্রতা মাত্র। কিন্তু এইটুকু অনুরোধ করিয়া যামিনী যেন তাহাকে পরিচিতের দলে, এমন কি আত্মীয়ের দলে টানিয়া লইল। এতখানি সৌভাগ্য যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহা কি হতভাগ্য প্রতাপ আজ ঘুম ভাঙিয়া কল্পনাও করিয়াছিল?

জ্ঞানদার পীড়াতে দুঃখিত হওয়াই উচিত। কিন্তু প্রেমিকের মন সর্ব্বদা দয়াধর্ম্মকে মানিয়া চলে না। প্রতাপ

নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হইল, তবু হৃদয়ের ভাবকে পরিবর্তিত করিতে পারিল না। জ্ঞানদা সে যাত্রা অনেক কষ্টে সাম্‌লাইয়া গেলেন। দিন-কয়েক তাঁহার নিজের এবং বাড়ির সকলের দুর্ভোগের সীমা রহিল না, কিন্তু ক্রমে অবস্থা ভালর দিকে গড়াইতে লাগিল, আত্মীয়-স্বজন সকলে একটু হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইল। রোগিণীর সেবা করিতে করিতে সকলেরই শরীর মনের ক্লান্তি একেবারে চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, আর কিছু দিন চালাইতে হইলে, কাহারও আর সাধ্যে কুলাইত না।

নৃপেন্দ্রবাবুর বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না, কিন্তু আত্মীয় বলিতে কলিকাতায় কেহ ছিল না। দেশেও যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা আত্মীয়তার সুবিধাটুকু প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিতে চাহিতেন, কিন্তু আত্মীয়তার কোনো দায় ঘাড়ে করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন। জ্ঞানদার আত্মীয়দের সঙ্গে কোন যোগই ছিল না, দ্বিতীয় বার বিবাহ করার অপরাধে কেহ আর তাঁহার নামই মুখে আনিত না, সুতরাং তাহাদের নিকটে কেহ কিছু প্রত্যাশা করিত না। অথচ সাহায্যের এখন একান্ত প্রয়োজন। নৃপেন্দ্রবাবুর পক্ষে একলা পারিয়া ওঠা অসম্ভব। যামিনী এ সকল কার্য্যে একেবারে অনভ্যস্ত, একলা রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেও তাহার ভয় ভয় করে, আর মিহির ত সকল কাজের বাহির। আয়া কিসমতিয়া খাটিতে খুব পারে, রাত জাগিতেও তাহার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে একজনকে থাকিতে হয়, কারণ সে ঔষধপত্রের নাম পড়িতে পারে না, ঘড়িও নির্ভুল ভাবে দেখিতে পারে না।

প্রথম দু-একদিনের মধ্যেই নৃপেন্দ্রবাবু হায়রান হইয়া পড়িলেন। প্রতাপ বিকালে পড়াইতে আসিত, সম্ভব হইলে সকালেও একবার আসিয়া গৃহিণীর খোঁজ লইয়া যাইত। যামিনীকে দেখিতে পাইত, তবে কথা বলিবার সুযোগ ঘটিত না। কিন্তু এই চোখে দেখিতে পাওয়াটুকুর অপার আনন্দ কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাহার হইল না। হয়ত ভাষায় ইহা বুঝাইয়া দিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে ইহা অনুভব করিয়াছে, সেই শুধু বুঝিতে পারিবে, প্রথম যৌবনে প্রথম ভালবাসার পাত্রীকে শুধু চোখে দেখিতে পাওয়াই কতখানি। ঐটুকুর ভিতর দিয়া কি অপূর্ব্ব সার্থকতা যে জীবনকে প্লাবিত করিয়া দেয়, আকাশ বাতাস আলোককে কি মধুময় করিয়া তোলে, তুচ্ছতম মানুষের জীবনকেও কি মহিমময় বলিয়া বোধ করায়, তাহা বুঝাইবার ভাষা আজও কি সৃষ্ট হইয়াছে? প্রতাপ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিত, শিরায় শিরায় তাহার আনন্দের প্লাবন বহিয়া যাইত।

জ্ঞানদার অসুখের তৃতীয় দিনে সকালে আসিয়া দেখিল, নীচের খাইবার ঘরে নৃপেন্দ্রবাবু চা খাইতেছেন, যামিনী পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে চা ঢালিয়া দিতেছে। বেলা তখন সাড়ে আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

ছোট্টুর পিছন পিছন প্রতাপকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই যে আসুন, বসুন।"

প্রতাপ চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "উনি কেমন ছিলেন রাত্রে?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "মন্দ না, আস্তে আস্তে প্রোগ্রেস্ করছেন, তবে শুশ্রূষা ঠিক-মত হওয়া একান্ত দরকার, পান থেকে চুন খসলেই মহা বিপদ। আমার ত তিন দিন রাত জেগে যা অবস্থা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন। বাড়িতে দ্বিতীয় একটি এমন মানুষ নেই যার উপর এ রেস্‌পন্‌সিবিলিটি আমি দিতে পারি।"

যামিনীর গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। মায়ের সেবা যে তাহাকে দিয়া বিশেষ কিছু হইতেছে না ইহাতে সে অত্যন্তই লজ্জিত ছিল, কিন্তু এ ত্রুটির সংশোধন তাহার নিজের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ভয়ে সত্যই তাহার হাত-পা কাঁপিত, জ্ঞানদার মুখের দিকে তাকাইতে-সুদ্ধ তাহার ভরসা হইত না। কেবলই মনে হইত এখনই কি একটা বিপদ তাহার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে। সে নীরবে চা ঢালিয়াই চলিল, নৃপেন্দ্রবাবুর পেয়ালা দ্বিতীয়বার ভরিয়া দিয়া আর এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া নীরবেই প্রতাপের দিকে ঠেলিয়া দিল।

প্রতাপ চম্‌কাইয়া উঠিল। সৌভাগ্যক্রমে পিতাপুত্রী কেহই তাহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন না, না-হইলে

তাহাকে ধরা পড়িতে হইত। যামিনীকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কি না সে ভাবিয়াই পাইল না। এমন অবস্থায় কি করা উচিত, কিছুই তাহার জানা ছিল না, সুতরাং পেয়ালাটি টানিয়া লইয়া সে নতমস্তকে পান করিতে লাগিল। মনের ভিতর তাহার যে-সঙ্গীত বাজিতে লাগিল বাহিরের চেহারায় তাহা বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাইল না।

নৃপেন্দ্রবাবু চা খাইতে খাইতে বলিলেন, "অবশেষে নর্স্ই আন্‌তে হবে। তারাও সব সময়ে যে খুব রিলায়েবল্ হয় তা নয়, যদিও খরচান্ত হয়। হয়ত আমরা ঘুমচ্ছি দেখে, সেও দিব্যি ঘুম দেবে। এসব কেসে এতটা 'রীস্ক্' নেওয়াও শক্ত।" প্রতাপ বলিল, "সে ত ঠিক। নিজের আত্মীয়া কেউ হলেই সব চেয়ে ভাল হয়।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা আর পাচ্ছি কই? বিপদের সময় সাহায্য করবে এমন আত্মীয় আমার কেউই নেই।"

প্রতাপ একটুক্ষণ কি যেন ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "আমাকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে করতে রাজী আছি। রাত্রে হলেই আমার পক্ষে ভাল, কারণ দিনে আমার অনেক কাজ থাকে।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনি সারাদিন এত খাটেন, কতটুকু মাত্র আপনার বিশ্রামের সময়, সেটাও কেড়ে নিলে আপনার উপর বড় অবিচার করা হবে।"

প্রতাপ বলিল, "কিছুমাত্র না। রাত-জাগা অভ্যাস আমার খুব বেশীরকমই আছে। দু-ঘণ্টা ঘুমুতে পেলেই আমার ঢের হবে।"

নৃপেন্দ্রবাবু একটু থামিয়া বলিলেন, "যদি আপনার বেশী কষ্ট না হয়, তাহ'লে আসবেন আজকেই। খোকাকে পড়াতে আসবার সময়ই বাড়িতে ব'লে আসবেন যে, রাত্রে এখানে খাবেন আর থাকবেন। বাড়ির ওঁদের কোনো অসুবিধা হবে না ত?"

কাহাদের কথা মনে করিয়া ভদ্রলোক এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, প্রতাপ তাহা আন্দাজ করিয়াই শীতের দিনেও ঘামিয়া উঠিল। নতমস্তকে বলিল, "আমি কলকাতায় একলাই থাকি, আমার পিসিমার বাড়িতে। আমার মা ভাই, বোন, সকলে দেশে থাকেন।"

এত কথা বলিবার তাহার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যামিনীও যদি নৃপেন্দ্রবাবু যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিয়া থাকে? সর্ব্বনাশ! কিন্তু এ কথা প্রতাপের মনে আসিল না যে যামিনী যাহাই ভাবুক, প্রতাপের ভাগ্যের তাহাতে কিছু পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ জগতে আশা অবিনাশী, বিশেষ করিয়া প্রেমিকের মনে।

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তবে আজ রাত্রে আপনাকে একটু খাটাব। একটু রেস্‌ট্ না নিয়ে আর পারছি না। আয়া থাকবে আপনার সঙ্গে। ও বেশ চালাক চতুর, সব কাজই করতে পারে, খালি একজন চালিয়ে নেবার লোক থাকা দরকার।"

প্রতাপ বলিল, "বেশ। আজ শুধু কেন, যে-ক'দিন দরকার আমি আসতে পারব।"

নৃপেন্দ্রবাবু চা খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন "খুকি, মনে রাখিস্ প্রতাপবাবু আজ রাত্রে এখানে খাবেন। দেখিস্, ভুলে যাস্‌নে যেন। তোর যা ভোলা মন।"

যামিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না বাবা, ভুলব কেন? কাজের কথা আমি কবে ভুলি?"

প্রতাপকেও বাধ্য হইয়া উঠিতে হইল। নৃপেন্দ্রবাবু উঠিয়া পড়িয়াছেন, সে আর কি করিয়া বসিয়া থাকে? তাহা ছাড়া স্কুলেরও তাহার বেলা হইয়া যাইতেছিল।

রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে প্রতাপ ভাবিতে লাগিল, এই কয়টা দিনের ভিতরে তাহার জীবনের কি আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। যাহারা আগে তাহার জগৎ জুড়িয়া ছিল, তাহারা কেমন করিয়া, কখন যে তাহার নিজেরই অগোচরে পিছনে সরিয়া গিয়াছে, তাহা প্রতাপ বুঝিতেই পারে নাই। নবাগতা মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীকে যেন সকলে সভয়ে আসন ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রতাপের মনোজগতে যামিনী ভিন্ন এখন আর কাহারও স্থান নাই, তাহার চিন্তা ভিন্ন আর কোনো চিন্তা নাই। এই যে অতি মধুর ধ্যান তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কয়েকটামাত্র দিন আগে ইহার সম্বন্ধে সে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। যাহা কিছুর জন্য সে এতদিন সংগ্রাম করিয়াছে, সে-সব এখন চেষ্টা করিয়া তাহাকে মনে আনিতে

হয়। নিজের ভবিষ্যৎটাও একেবারে ভিন্নমূর্ত্তিতে তাহার কাছে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ভিতর আর সে দরিদ্র পল্লীর মৃৎকুটীর নাই, মাঠ ঘাট বনের অজস্র শ্যামশোভা নাই। মলিনবসনা মাতা, শীর্ণ শুষ্ক মুখ ভ্রাতা ভগিনীগুলির ভাবনা এখন গৌণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি অপূর্ব্ব ইন্দ্রলোকের স্বপ্নে এখন তাহার সমস্ত চৈতন্য মগ্ন হইয়া থাকে! সে জানে ইহা মূর্খতা, ইহা বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র, কিন্তু তবু কিছুতেই সে নিজেকে সংযত করিতে পারে না। মনে হয় এই আশা যদি তাহাকে ছাড়িতে হয়, তাহার আর বাঁচিয়া থাকিবার কোনো উদ্দেশ্য, কোনো অবলম্বন থাকিবে না। যে-মায়া-অঞ্জনমাখা দৃষ্টিতে এখন সে জগতের দিকে তাকাইতেছে, সে-দৃষ্টি যদি হারায় তাহা হইলে আর কি চাহিয়া দেখিবার ক্ষমতা তাহার থাকিবে? জগতের কি মূর্ত্তি তখন তাহার চোখে পড়িবে কে জানে? তলার কঙ্কালটাই হয়ত বিকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে, উপরের সকল শোভা, সকল সৌন্দর্য্য নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে। উঃ, এই সুখস্বপ্ন হইতে, সে কি ভীষণ, কি নিদারুণ জাগরণ! তাহাই কি বিধাতা প্রতাপের অদৃষ্টে লিখিয়াছেন। সে ত শুকাইয়া মরিতেই ছিল, হঠাৎ এই মায়া-মরীচিকা কেনই বা তাহার দৃষ্টিকে অবরোধ করিতে আবির্ভূত হইল।

বাড়ি আসিয়া আর ভাবনার অবকাশ রহিল না, তাড়াতাড়ি খাইয়া স্কুলে দৌড়িল। আজ আর তাহার মন কিছুতেই কাজে বসিল না, কতক্ষণে ক্লাস শেষ হইবে তাহারই আশায় প্রতাপ ঘন ঘন ঘড়ি দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। বাড়ি পৌছিয়া, সামান্য একটু জলযোগ করিতেও যেন তাহার আর তর সহিতেছিল না। পিসীমাকে বলিল, "পিসীমা, আজরাত্রে আমি বাড়িতে খাবো না।"

বৌদিদি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় নেমন্তন্ন হ'ল ঠাকুরপো?"

প্রতাপ একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "নেমন্তন্ন ঠিক নয়। আজ ওদের ওখানেই থাকতে হবে, মিহিরের মায়ের শুশ্রূষার জন্যে, তাই সেখানেই খেতে বলেছেন।"

পিসীমা বিরক্তভাবে বলিলেন, "বড়লোকের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। নিয়ে গেল ছেলে পড়াতে, এখন জুতো-সেলাই চণ্ডীপাঠ সব করিয়ে নিক্।"

প্রতাপের কানে কথাটা বড়ই রূঢ় শুনাইল, সে আর কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

বাংলার রসকলা-সম্পদ

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

"আত্মানং বিদ্ধি"—"আপনার আত্মাকে চিনিয়া লও"—এই সারগর্ভ অনুশাসনের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যটি ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের পক্ষেই সমান ভাবে প্রযোজ্য; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন এক একটি স্বতন্ত্র আত্মা আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও আপনার একটি স্বতন্ত্র আত্মা আছে। যে-ব্যক্তি নিজের আত্মার প্রকৃতির সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় স্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে সমন্বয় রাখিয়া জীবন গঠন না করে, সে জীবনে কখনও চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। তেমনি আবার যে-জাতি আপনার নিজস্ব আত্মার সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় স্থাপন করিয়া ও তাহার সহিত অবিরত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বজায় রাখিয়া চলিতে না পারে, সেই জাতির জীবন যে কেবল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং বিশ্ব-মানবের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে সেই জাতি যে বিশেষ কোন মূল্যবান দান করিতে পারে না তাহা নহে, সেই দুর্ভাগ্য জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের জীবনও মানুষের আত্মার চরম পরিণতির দিক দিয়া ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং তাহারা শুধু অন্য কোন সুসংস্কৃত জাতির আধ্যাত্মিক দাস-মাত্র হইয়া কালাতিপাত করে।

ব্যক্তির এবং জাতির তাহাদের স্বকীয় আত্মার সঙ্গে

এই যে পরিচয় ও সমন্বয়ের কথা বলা হইল, ইহা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানসিক যুক্তির প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া সম্ভব হয় না। জাতীয় দর্শন-শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিতর দিয়া ইহা কতকটা সম্ভবপর হয় বটে; কিন্তু ইহার প্রকৃষ্ট পথ জাতীয় রসকলার ভিতর দিয়া। ব্যক্তির ও জাতির আত্মা আত্মপ্রকাশ করে সব চেয়ে সহজ, সরল ও স্পষ্টভাবে—তাহার রসকলা (art)-পদ্ধতির ভিতর দিয়া। প্রত্যেক জাতির রসকলা সেই জাতির আত্মার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের ভাষাস্বরূপ।

জাতীয় রসকলা একদিকে যেমন জাতির আত্মার অভিব্যক্তি-স্বরূপ, তেমনি আবার ইহা জাতির প্রতিভা এবং শক্তির প্রতিনিয়ত পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণবিকাশের প্রেরণা জাগাইয়া দেয়। নানা যুগে যে-সকল ব্যক্তি মহাপুরুষের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অমরতা লাভ করিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্বমানবের প্রাণে নব-প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা তাহা করিতে পারিয়াছেন—তাঁহাদের আপন আপন জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ধারার সহায়তায় আত্মার বিকাশ ও শক্তি বর্দ্ধন করিয়া। বিশ্বের নানা দেশ হইতে প্রেরণার আহরণ যে জীবনের পূর্ণ-বিকাশের বিশেষ সহায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহ যে, বৃক্ষ যেমন আপন উৎপত্তি-ভূমির সুগভীর তলদেশে শিকড় প্রোথিত করিয়া তথা হইতে প্রতিনিয়ত জীবনী-রস আহরণ ব্যতীত স্বাস্থ্যবান্, শক্তিমান ও ফুলে-ফলে সুশোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত হইতে পারে না, তেমনি যে-ব্যক্তির বা জাতির চরিত্র ও মনোবৃত্তি আপন দেশের ও জাতির আত্মার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, অথবা সেই বৈশিষ্ট্যধারা কর্তৃক অনুপ্রাণিত নয়, সেই ব্যক্তি ও জাতি কখনও জীবনে চরম উৎকর্ষ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে না; পরন্তু তাহারা অন্যান্য জাতির আধ্যাত্মিক দাস হইয়া আত্মনিকৃষ্টতা-বিশ্বাসের গভীর লজ্জায় অবনত-মস্তক ও বিশ্বমানবের কৃপার পাত্র স্বরূপ হইয়া থাকে।

মানুষের পরিকল্পিত যাবতীয় রসকলায়, প্রতিভা-গৌরবে বাঙালী জাতির স্থান যে বিশ্বমানবের আসরে কত দূর উচ্চে, তাহার উপলব্ধি বাংলার বাহিরের লোকের কথা দূরে থাকুক, আধুনিক শিক্ষিত ও অৰ্দ্ধশিক্ষিত শহুরে বাঙালীরও নাই।

এই ত গেল আধুনিক শহুরে ও শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব ও অবস্থা। অপরদিকে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, যাহারা প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতিপ্রসূত সমুজ্জ্বল রসকলা-প্রতিভার ধারা যুগের পর যুগ সন্তর্পণে চর্চা করিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহারা আধুনিক শহুরে শিক্ষিত ও অৰ্দ্ধশিক্ষিত বাঙালীর কাছে অবজ্ঞাত, নির্যাতিত ও পদ-দলিত হইয়া এত কষ্টে অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করিতেছে, অথবা অনশনে প্রতি বৎসর এত দ্রুত গতিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে যে, বাংলার যে গৌরবময় অমূল্য জাতীয় সম্পদের তাহারা বাহক, তাহার সহিত যদি আধুনিক ভ্রান্তশিক্ষা-বিমূঢ় বাঙালী অবিলম্বে শ্রদ্ধানত মস্তকে পরিচয় স্থাপন না করিয়াও এই সম্পদের বাহক অপূর্ব্ব প্রতিভাবান জাতীয় রসশিল্পীদের সামাজিক ও আর্থিক দুঃখদৈন্য দূর করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষকের আসনে বরণ করিয়া জাতির আত্মার সঙ্গে পুনরায় ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন না করে, তাহা হইলে বাঙালী জাতিকে তাহার আপন আত্মার সহিত চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনযাপন করিতে হইবে।

কাব্যরসকলার ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস ও বৈষ্ণবকবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিভাশালী রসশিল্পীদের গৌরবের বলে বাঙালী আজ কতকটা মাথা তুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কি স্থপতিকলায়, কি ভাস্কর্য্যে, কি চিত্রকলায়, কি সঙ্গীতে, বাংলার নিজস্ব প্রতিভা-প্রসূত রসসম্পদ কিছু আছে বলিয়া শিক্ষিত বাঙালী আজকাল স্বপ্নেও ভাবে না।

অথচ ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সকল ক্ষেত্রে, বাঙালী প্রাচীন যুগে যে কেবল উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী যাঁহাদের নিকট হইতে 'ভারতীয় রসকলা' অথবা 'প্রাচ্য-রসকলা' শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের অনেকেই প্রাচীন যুগে বাঙালীর কাছে এই সকল রসকলার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বহু শত বৎসরের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্তও এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের দীনদরিদ্র পল্লীশিল্পিগণ সেই গৌরবময় জাতীয় প্রতিভার ধারা অব্যাহিতভাবে বহন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অবশেষে আজ তাহা বর্ত্তমান বাংলার শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালীর কাছে উপযুক্ত আদর ও উৎসাহের অভাবে অনেকস্থলেই নির্ম্মূলপ্রায় হইয়া যাইতেছে।

আধুনিক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী যদি আপন জাতির আত্মার সহিত চিরদিনের জন্য বিযুক্ত হইয়া বেড়াইতে না চায়, তবে এখন এই জাতীয় প্রতিভা-সম্পদকে ও তাহার দীনদরিদ্র বাহকদিগকে অবিলম্বে চিনিয়া লইয়া সামাজিক ও আর্থিক লাঞ্ছনা হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান করুক ও জাতির শিল্পশিক্ষার পদে বরণ করুক। নতুবা চিরদিনের জন্য বাঙালীর আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা ও আত্মবৈশিষ্ট্য-হীনতা স্থির নিশ্চয়।

বাঙালীকে ইহা বুঝিতে হইবে যে, যদিও বাংলা দেশ ভারতবর্ষের অন্যতম একটি অঙ্গ এবং যদিও বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতের যুক্ত সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি অংশ স্বরূপ এবং অন্যতম উপাদান ও শাখা স্বরূপ, তথাপি ইহা নিঃসন্দেহ যে, বাংলার একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যাহা সে ভারতের যুক্ত সংস্কৃতিতে দান করিয়াছে ও করিতেছে, যাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অথচ তাহাদের থেকে পৃথক এবং যাহা বাংলার জাতীয় আত্মার প্রকৃতির বিশিষ্ট অভিব্যক্তি স্বরূপ ও পরিচায়ক এবং ইহাও নিঃসন্দেহ যে, বাংলার নিজের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের, চরিত্রের ও জীবনের বিকাশের দিক হইতে এবং ভারতের সংস্কৃতি পূর্ণবিকাশের দিক হইতে বাংলাকে তাহার স্বকীয় আত্মার এই নিজস্ব প্রতিভা-বৈশিষ্ট্যকে সাদরে এবং সগর্ব্বে মানিয়া ও চিনিয়া লইতে হইবে এবং বাঙালীকে ইহা হইতে তাহার প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনা আহরণ করিতে হইবে। তবেই বাঙালীর আপন সৃজনী-শক্তির বিকাশ হইবে। তবেই বাঙালী আপন জীবনের ও চরিত্রের পূর্ণবিকাশ সাধন করিতে পারিবে এবং ভারতের উদার যুক্ত সংস্কৃতিতে এবং বিশ্বমানবের বিপুল সংস্কৃতিতে আপনার বিশিষ্ট দান দিয়া সার্থক ও ধন্য হইতে পারিবে।

প্রথমে স্থপতিকলার কথা ধরা যাউক।

অশোক-যুগের সাঁচি ও ভারহুতের, মুসলমান-যুগে দক্ষিণ-ভারতে বিজয়নগরের ও উত্তর-ভারতে দিল্লী ও আগরার মোগল-প্রাসাদশ্রেণীর এবং বর্ত্তমান যুগে সুদূর রাজপুতানার বাস্তুগৃহের স্থপতিগণের যে সৌন্দর্য্যময় নির্ম্মাণ-কলা আজ আমাদের প্রশংসা অর্জ্জন করে, সেই স্থপতিগণ যে প্রাচীন যুগে আমাদের বাংলারই কুটীর-শিল্পের উদ্ভাবিত, সুমধুর স্থপতিকলা হইতে প্রচুর অনুপ্রাণনা ও নির্ম্মাণক্ষেত্রে রূপকল্পনার আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে।* তথাপি আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ফলে আজ বাংলার বনিয়াদী কুটীর-নির্ম্মাণ-পদ্ধতিকুশল স্থপতিগণ ও তাহাদের অপূর্ব্ব শিল্প-নিপুণতা বাংলা দেশ হইতে দ্রুত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা কি দেখিতে পাই? যে-রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের অনুপম প্রতিভা-গৌরবে ও সৌন্দর্য্যে আজ জগৎবাসী ও বঙ্গবাসী মুগ্ধ তাঁহার সেই গীতিকাব্যের অনুপ্রাণনার মূল উৎস যে আমাদের বাংলার শতসহস্র লোক-সঙ্গীত-বিশারদ পল্লীবাসিগণ, তাহাদিগের কাছে শিক্ষিত বাঙালী তাহার অনুপ্রাণনা গ্রহণ করিতে যাওয়া লজ্জাজনক ও হেয় জ্ঞান করে, তাহাদের অনুপম লোক-সঙ্গীত-কলা প্রতিভা রীতিমত ভাবে শিক্ষা করিবার ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কোন চেষ্টা অথবা তাহাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার দীনতা দূর করিবার জন্য কোন চেষ্টা শিক্ষিত বাঙালী করে না, এবং ইহার ফলে এই অনুপম জাতীয় সম্পদও দেশ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে।

বৎসরেক কাল পূর্ব্বে বাংলার প্রাচীন গৌরবময় রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বংশধরগণের উন্মাদনাময় রণতাণ্ডব রায়বেঁশে-নৃত্যের আবিষ্কার না-হওয়া পর্য্যন্ত শিক্ষিত

---

* *Indian Architecture* by E. B. Havell, pp. 92, 121; *Handbook of Indian Art*, by Havell. 136.



মাহুত ও হাতী
বাংলার দারুশিল্প

বাঙালী বিশ্বাস করিত যে, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে বাংলার নিজস্ব কোন পদ্ধতি বা দান নাই।

বিগত বৎসরেক কালমধ্যে আমাদের ইহা প্রমাণ করিবার সুযোগ হইয়াছে যে, বাংলার নিজস্ব রায়বেঁশে বীর-নৃত্য, কাঠি-নৃত্য, জারি-নৃত্য, বাউল-নৃত্য, কীর্ত্তন-নৃত্য, ও ধূপ-নৃত্য ইত্যাদিতে তাণ্ডব ও মধুর উভয় প্রকার নৃত্যের আদর্শেরই এমন সুন্দর ভাণ্ডার রহিয়াছে যে, নৃত্যকলা ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনার জন্য বাঙালীর আর অন্যত্র যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। মেয়েলী ব্রত-নৃত্য ও লাস্য-নৃত্যেরও নানাবিধ সুন্দর এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতি বাংলা দেশের পল্লীতে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে। সুতরাং কি পুরুষদের কি মেয়েদের নৃত্য বিষয়ে প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনার জন্য বাঙালীর বাংলার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন ত নাই-ই; পরন্তু ইহাদিগের বিশুদ্ধ ও সুন্দর পদ্ধতিগুলি অন্যত্র হইতে আমদানী নৃত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভেজাল হইয়া না দাঁড়ায় এবং তাহাদের নিজস্ব সরল সুন্দর ও বিশুদ্ধ প্রকৃতি না হারায়, তৎসম্বন্ধে সকল বাঙালীর সবিশেষ সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ভাস্কর্য্য কলায় বাংলার পল্লীভাস্করদের স্থান যে অতি উচ্চে তাহা মাত্র কয়েকটি উদাহরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারিব। এখানে প্রথমে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। বাংলা দেশের নৈসর্গিক অবস্থানমূলক কারণ বশতঃ পাথরের অপেক্ষাকৃত অভাবে বাংলার ভাস্করগণ যে বেশীর ভাগ পাথরের পরিবর্ত্তে কাঠের ও মাটির উপরে

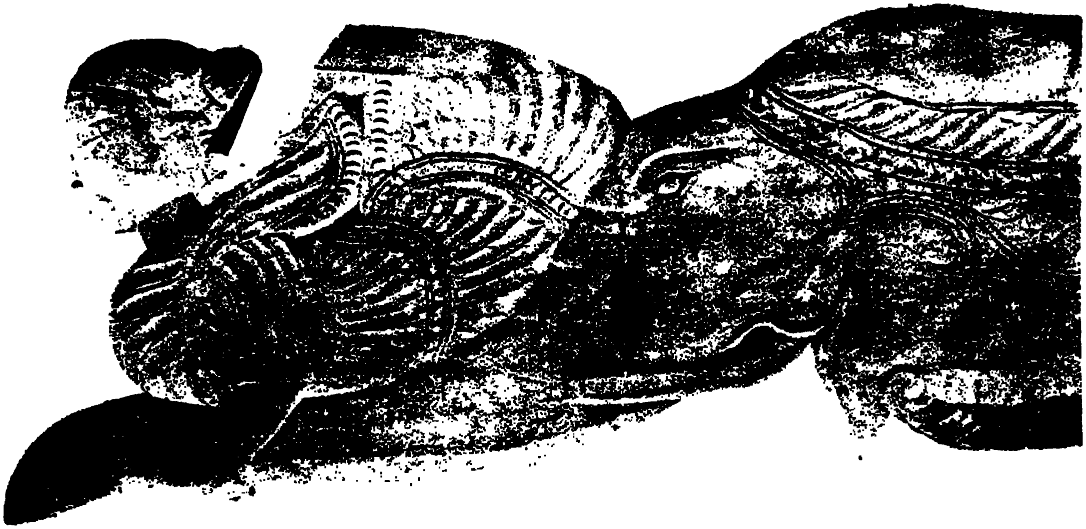


দোলনায়
বাংলার দারুশিল্প

তাঁহাদের শিল্পকৌশল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের ভাস্কর্য্য কলা-কৌশলের বিন্দুমাত্রও



বাঘ ও হাতী
বাংলার দারুশিল্প



পরী ও হাতী
বাংলার দারুশিল্প

গৌরবহানি বর্ত্তায় না। পরন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্যে সুনিপুণ ভাস্কর যদি পাথরের কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন তাহা হইলে তাহাতেও তিনি তাঁহার শিল্পকৌশল ষোল আনা মাত্রায় প্রদর্শন করিতে পারেন এবং ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে,সুদূর অতীতে অশোক-যুগে সাঁচি ও ভারহুতের ভাস্কর্য্য শিল্পিগণ প্রথমে কাঠের কাজেই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।* পাথরের কাজেও বাংলার ভাস্করগণ পাল-যুগের সুবিখ্যাত ভাস্কর্য্যে অনুপম কলা-কোশল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে শহুরে ও সমৃদ্ধ বাঙালীর কাছে উৎসাহের

* *Introduction to Indian Art* by Ananda K. Coomarswamy' p. 24.



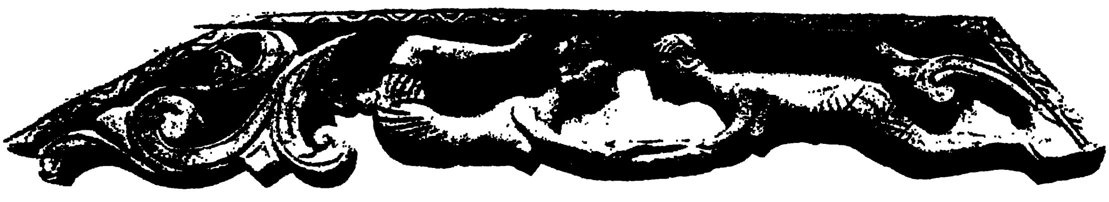
নাপিত ও নাপিতানী
বাংলার দারুশিল্প

অভাবে বাংলার জাতীয় ভাস্করগণ পল্লীর কুটীরে স্থপতি-কলার আনুষঙ্গিক কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্যেই প্রধানতঃ তাহাদের শিল্পকৌশল প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। শহরে, শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ আধুনিক বাঙালীর কাছে এ-সব কাজ প্রায়ই অজ্ঞাত থাকিলেও পশ্চিম-বাংলার পল্লীগ্রামে বনিয়াদী কুটীরগুলিতে ইহাদের অনিন্দ্যসুন্দর ও সুনিপুণ কলা-কৌশলের যথেষ্ট নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়, এবং আমার (বেশীর ভাগ ব্র্যাকেটগুলি হাতীর শুঁড়ের পরিকল্পনায় নির্ম্মিত বলিয়া এইগুলিকে সাধারণতঃ "শুঁড়ো" বলিয়া অভিহিত করা হয়);

(২) চালার বরগা ইত্যাদির উপর "বোঠে" নামক আলঙ্কারিক কাষ্ঠনির্ম্মিত আকৃতিগুলিতে; এবং

(৩) দরজার চৌকাঠের পাটায়।

ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর অনেকগুলি চমৎকার



ব্যায়ামরতা নারী
বাংলার দারুশিল্প

বিশ্বাস যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভাস্কর্য্যনিপুণতাও, বাংলার প্রাচীন যুগের স্থপতিদের স্থাপত্যশিল্প-নিপুণতার ন্যায়, অশোক-যুগে সাঁচি ও ভারহুতের ভাস্করদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

বাংলার এই বর্ত্তমান পল্লীভাস্কর্য্য-কলা বাংলার সাধারণ পল্লীজীবনের সঙ্গে রসকলার ঘনিষ্ঠ সংযোগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহার উদাহরণ প্রধানতঃ পাওয়া যায় তিন প্রকার কাজে :—

(১) কার্ণিশের ব্র্যাকেট বা "শুঁড়ো"গুলিতে; উদাহরণ আমি বীরভূম জেলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এইগুলির শিল্পকৌশল এত সুনিপুণ ও মনোমুগ্ধকর যে, পৃথিবীর কোন দেশের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে নিপুণতার তুলনায় ইহাদের হার হইবে না বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই উদাহরণগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যে-সকল চীন-দেশীয় মিস্ত্রীর দল আজকাল কলিকাতা শহরে কাঠের কাজে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে ও যাহারা আমাদের দেশের ধনকুবেরদের কাছে লম্বা লম্বা মাহিনা পাইতেছে, তাহাদের চেয়ে আমাদের বাংলার পল্লী-



রাধার প্রসাধন
প্রাচীন পট

ভাস্করগণ শিল্পনিপুণতার দিক দিয়া এবং ভাস্কর্য্য-রসকলায় প্রতিভার দিক দিয়া কোন অংশে ন্যূন ত নহেই, বরং শ্রেষ্ঠ। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি কাঠের 'গুঁড়ো'র, কয়েকটি কাঠের 'পরী' প্রতিকৃতি যুক্ত ব্র্যাকেটের, এবং কয়েকটি আলঙ্কারিক 'বোঠের' ছবি এখানে দেওয়া হইল। পরিকল্পনা'র নিখুঁত নির্ম্মলতায় ও গৌরবে, ভাবের ও রসের নিবিড় অভিব্যঞ্জনায়, কারুকার্য্যের সুনিপুণ ছন্দে, এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য ও লালিত্যের রূপসৃষ্টিতে এইগুলি জগতের ভাস্কর্য্য-শিল্পে যে অতি উচ্চ স্থান অর্জ্জন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রাম্য নাপিত কর্ত্তৃক ভুঁড়িওয়ালা পণ্ডিত-মহাশয়ের ক্ষৌরকর্ম্ম, ও নাপিতানী কর্ত্তৃক শুচিবাইগ্রস্তা পণ্ডিত-জায়ার পায়ে আলতা-পরানোর ভাস্কর্য্যটি অনুপম রসাভিব্যঞ্জনায় ও শিল্পনিপুণতায় পৃথিবীর মধ্যে একটি অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। প্রয়োজনীয় অংশগুলির কারুকার্য্য সম্পূর্ণরূপে করিবার ও নিষ্প্রয়োজনীয় গুটিকয়েক অংশ ইচ্ছাপূর্ব্বক অসম্পূর্ণ রাখিবার যে প্রণালী রদ্যাঁ (Rodin) প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্করের নিপুণতার চূড়ান্ত লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, বাংলার দীনদরিদ্র পল্লীভাস্করগণের কাজে-এই উচ্চ-প্রতিভা-মূলক লক্ষণের স্বভাবজাত অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই অনুপম কৌশলসম্পন্ন পল্লীভাস্করগণ ও তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ কলাকৌশল বাঙালীর একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ। কিন্তু বর্ত্তমানকালে উৎসাহের অভাবে ইহারা এবং ইহাদের শিল্পকৌশল অতি শীঘ্রই বাংলা দেশ হইতে



রামচন্দ্র ও গুহক
যতীন্দ্র পটুয়ার অঙ্কিত পটের এক অংশ

সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এখনও চেষ্টা করিলে ইহাদিগকে অবলুপ্তি হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু আর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করিলে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

সর্ব্বশেষে এখন চিত্রশিল্পের কথা বলি। বাংলার নিভৃত পল্লীগ্রামের দৈনন্দিন জীবনে চিত্রকলার যে-সকল ব্যবহার সাধারণতঃ পাওয়া যায়, তাহা তিন-ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—প্রথমতঃ, 'পটুয়া'-জাতীয় লোকের পুরুষানুক্রমিক প্রথানুসারে অঙ্কিত লম্বা লম্বা চিত্রপট; দ্বিতীয়তঃ, পল্লীগ্রামের মেয়েদের অঙ্কিত আল্পনা ও প্রাচীরচিত্র; এবং তৃতীয়তঃ, মাটির ঘোড়া ও পুতুল এবং কাঠের পুতুল ইত্যাদির উপর চিত্রাঙ্কন।

এই তিন প্রকার চিত্রের দৈনন্দিন অজস্র ব্যবহারে বাংলার পল্লীজীবন এককালে কি অতুল সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, এবং বর্ত্তমান বাংলার শহরের ভ্রান্তশিক্ষা-প্রসূত কৃত্রিম ও প্রাণহীন আদর্শ এখনও যে-সকল সুদূর পল্লীতে পৌঁছিতে পারে নাই, সেখানে পল্লীজীবন এখনও যে কি অতুল সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ আছে, তাহা শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত শহুরে বাঙালীর অভিজ্ঞতা ও ধারণার অতীত। বাংলার নিরক্ষর সরল পল্লীবাসী স্ত্রীপুরুষগণের অন্তরে বিশ্বের সৃষ্টির আনন্দরসের নিবিড় দৈনন্দিন অনুভূতি ও তাহাদের অন্তরে অনুভূত পরব্রহ্মের সেই সহজ নির্ম্মল আনন্দের সহজ সরল অভিব্যক্তি এই বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ বর্ণ-সন্নিবেশরূপে বাংলার সুদূর নিভৃত পল্লীতে পল্লীতে এখনও যে-পরিমাণে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে সেরূপটি নাই বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। 'বর্ণ-সঙ্গীতে'র (colour music) এই অসাধারণ প্রতিভা বাংলার পল্লীর স্ত্রীপুরুষের চরিত্রকে যুগের পর যুগ সুমার্জ্জিত করিয়া বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিকে একটি অতুলনীয় মধুর ও গৌরবময় রূপ দিতে



দশরথের মৃত্যু
প্রাচীন পট



গোষ্ঠলীলা
প্রাচীন পট

সহায়তা করিয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান শহরের ভাস্ত-শিক্ষা ও বর্ব্বরতামূলক আদর্শের প্রাণহীন প্রভাবের ক্রম-বিস্তারের ফলে বাঙালীর এই অতুল ও অবলীলাময় রসানুভূতির এবং রসাভিব্যক্তির স্বভাব-জাত প্রতিভাস্বরূপ অমূল্য জাতীয় সম্পদ একেবারে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

মাটিতে ও পিঁড়ি ইত্যাদিতে হাতের আঙুল দিয়া আলিম্পন দিবার যে সুন্দর প্রথা বাংলার পল্লীগ্রামের মেয়েদের মধ্যে এখনও আছে, তাহার কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু পশ্চিম-বাংলার মেয়েদের তূলিকার লীলাময় ব্যবহার দ্বারা নানাবর্ণে শোভিত প্রাচীর-চিত্র অঙ্কিত করিয়া



শ্রীকৃষ্ণ ও বড়াই বুড়ি
প্রাচীন পট

আপন আপন বাড়ি-ঘরকে প্রতি বৎসর সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া রাখিবার যে অতুলনীয় প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য এক বৎসরকাল পূর্ব্বে আমার হইয়াছিল। ঘরে ঘরে মেয়েদের হস্তাঙ্কিত এই প্রাচীর চিত্রকলার সৌন্দর্য্যের গৌরবের ফলে পশ্চিম-বাংলার সুদূর নিভৃত প্রদেশের এক একটি গ্রামকে এখনও এক একটি ছোটখাটো রকমের 'জীবন্ত অজন্তা' বলিয়া অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বাংলার পল্লীচিত্র-শিল্পের যে তিন প্রকার পদ্ধতির কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে গ্রাম্য 'পটুয়া'দের অঙ্কিত লম্বা চিত্রপটগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের চিত্র-রসকলা। বাংলার সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রীতিনীতির পরিবর্ত্তনে এবং বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে ইহা এখন বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায়ও ইহা যে এখনও বাংলার জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম ও গৌরবময় সম্পদ, তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানকালে বাংলা দেশে কলিকাতার কালীঘাট অঞ্চলের পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রকলা সাধারণের কাছে পরিচিত। কালীঘাটের পটুয়াগণ শহুরে ও বিজাতীয় আবহাওয়ায় পড়িয়া তাহাদের প্রাচীন বিশুদ্ধ ও সুন্দর পটাঙ্কন-কৌশল প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বাংলার সুদূর পল্লীতে পল্লীতে দীনদরিদ্র গ্রাম্য ও পটুয়া শ্রেণীর মধ্যে এখনও সেই প্রাচীন ধারা ন্যূনাধিকভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অঙ্কিত পটের যে-কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে তাহাতে বাংলার এই পল্লীবাসী পটুয়া শ্রেণীর চিত্রশিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়। বিশ-পচিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারা এই সকল পট

বাড়িতে বাড়িতে দেখাইয়া এবং তৎসঙ্গে রামলীলাপটের, কৃষ্ণলীলাপটের, শক্তি পটের ও যমপটের কাহিনী স্বরচিত গীতি-কবিতায় সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিয়া এবং সুললিত সুরে তাহা আবৃত্তি করিয়া গাহিয়া গাহিয়া বিস্তর রোজগার করিয়া বেড়াইত। সম্প্রতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ও শহুরে শিক্ষার প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা এবং ইহার গুণগ্রাহিতা বাংলার গ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম শিল্পকলা-নিপুণ এই গ্রাম্য পটুয়াদের অন্নসংস্থান হওয়াও দায় হইয়া পড়িয়াছে। চাহিদার অভাবে বাধ্য হইয়া ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোককেই পট-আঁকা ও পট-দেখান ব্যবসা ছাড়িয়া জনমজুরের ব্যবসা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারত-ইতিহাসের ও বাংলার ইতিহাসের প্রহেলিকাময় আবর্ত্তনে হিন্দুর শিল্প-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন এই সুনিপুণ চিত্রকরগণ এখনও হিন্দুদের পূজার জন্য দেবদেবীর ছবি আঁকার ও মাটির প্রতিমা গড়িবার কাজ করায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং এই দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সীমান্তপ্রদেশে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে অতি দুর্ভাগ্যময় ও দীনতাময় জীবন যাপন করিতেছে।

সামাজিক নিদারুণ নিপীড়ন সত্ত্বেও ইহারা ইহাদের যে পুরুষানুক্রমিক রসকলা-সম্পদ সযত্নে চর্চ্চা ও বহন করিয়া আনিয়া বর্ত্তমান বাংলাকে দান করিয়াছে, তাহা অমূল্য ও অতুলনীয় এবং জগতের রসকলার আসরে ইহা যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাও নিঃসন্দেহ যে, ইহাদের রসকলা-পদ্ধতি অতি প্রাচীন ভারতের প্রাগ-বৌদ্ধ-যুগের - আদিম রসকলা-পদ্ধতির অবিকল-প্রবাহিত বিশুদ্ধ পরম্পরার অভ্রষ্ট ও অপরিবর্ত্তিত রূপ-ধারা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সেই অতি প্রাচীন প্রাগ-বৌদ্ধযুগের চিত্রকলা-পরম্পরা তাহার আদিম ধারার বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখনও বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বাংলার প্রতিভা যে সেই অসাধ্য-সাধনে সক্ষম হইয়াছে, বাংলার দীন-দুঃখী পটুয়াগণের চিত্রকলা তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যে 'চিত্রলেখা' গুলির ও যমপট ইত্যাদি চিত্রপটের ও তাহাদিগের 'চিত্রকর' ও প্রদর্শকদিগের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই চিত্রকরগণ যে ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন এবং সেই সকল চিত্রলেখা ও চিত্রপট যে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদেরই তুলিকাসৃষ্ট অতুল রূপ-সমৃদ্ধিতে বিভূষিত ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না এবং পাল-যুগে বিখ্যাত 'নাগ'-পদ্ধতি-পন্থী চিত্রকর ধীমান ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া অনুমান যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কারণ এখনও ইহারা পটে নাগচিত্র-সুশোভিত মনসাদেবীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতে অভ্যস্ত। আজ-কাল সাধারণ লোকে ইহাদিগকে "পটুয়া" নামে অভিহিত করিলেও ইহারা আপনাদিগকে প্রাচীন সংস্কৃত 'চিত্রকর' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে এবং ইহারা যে প্রাচীন ভারতের 'চিত্রলেখা' অঙ্কনকারী চিত্রকরদের বংশসম্ভূত, ইহার একটি আশ্চর্য্য প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও চিত্র আঁকার প্রক্রিয়াকে 'লেখা' নামে অভিহিত করিবার প্রথা যদিও সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া গিয়াছে তথাপি এই চিত্রকরগণ এই সূত্রে কখনও 'অঙ্কন' অথবা 'আঁকা' কথা ব্যবহার করে না। পরন্তু সর্ব্বদাই সেই অতি প্রাচীন 'লেখা' কথাটিই আজ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। চিত্রশিল্পকুশলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ব্যবহৃত পরিভাষাগুলিও ইহারা যুগের পর যুগ সযত্নে বহন করিয়া আসিতেছে।

এতদিন আমরা অজন্তার সুবিখ্যাত চিত্রকলা-পদ্ধতি-কেই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতির একমাত্র অবশিষ্ট উদাহরণ বলিয়া ধরিয়া লইতাম; কিন্তু এখন হইতে বাংলার এই নিজস্ব চিত্রকলাই সেই গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে। ইহা ছাড়া বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতির আরও যে-কয়েকটি গৌরবময় বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাকে বিশ্বের চিত্রকলার সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

দেশবিদেশের অন্যান্য বিখ্যাত অতিমার্জ্জিত চিত্র-পদ্ধতির ন্যায় বাংলার এই নিজস্ব চিত্রপদ্ধতি বিশ্বমানবের

আদিম যুগের সহজ সরল ভাব, পৌরুষের ভাব, অকৃত্রিমতার ভাব এবং সজীবতা, সরলতা ও তেজস্বিতার ভাব হারায় নাই। একদিকে যেমন এই সকল গুণ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তেমনি আবার এই মুক্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অন্যান্য আধুনিক মার্জ্জিত চিত্রকলা-পদ্ধতির সমতুল অথবা ততোধিক ভাবে লাবণ্য ও লালিত্য যোজনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতে অতি-বিলাসিতার, অতি-আলঙ্কারিকতার ও অতি-সাম্প্রদায়িকতার মুদ্রাদোষের অথবা কোনরূপ আড়ষ্টতা দোষের ছাপ পড়ে নাই। বাংলার এই অপূর্ব্ব চিত্রকলা একদিকে যেমন চিরপ্রাচীন তেমনি অপরদিকে আবার ইহা চিরনূতন। এই চিত্রকলার ভাষার অক্ষর-প্রকরণ অতি স্বল্প ও সহজ। ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাবব্যঞ্জক প্রয়োগ এবং অল্প কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র ব্যবহারের উপর নির্ভর স্থাপন করে। ইহার ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ ও অতি প্রাঞ্জল। পরিপ্রেক্ষিতের মাপকাঠির খুঁটিনাটি ও আলো-ছায়ার খেলাধূলার চতুরতা ও বাহুল্য মিশাইয়া ইহা কখনও আপনার ব্যাকরণকে অযথা জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে নাই। ইহার আকার-বিন্যাস ও বর্ণসমাবেশ ও সমন্বয় অতি শোভন ও অনিন্দ্যসুন্দর। আলঙ্কারিকতার চূড়ান্ত কৌশলও যে এই চিত্রকরগণ প্রদর্শন করিতে পারে তাহারও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন পট হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলায় কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে রূপ-কল্পনার বিলাসিতার অযথা বাড়াবাড়ি নাই, অথচ ইহা রস-প্রাচুর্য্যে ভরপুর। ইহাতে অঙ্কিত মনুষ্যগণের আকৃতি হাবভাব সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতা ও মুদ্রাদোষবিহীন এবং সাধারণ মানুষের সহজ ও জীবন্ত ভাব পরিপূর্ণ। একদিকে বাংলার এই পল্লী-শিল্পীদের জীবজন্তু-অঙ্কনের ক্ষমতা যেমন অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তেমনি অপরদিকে মানুষের অন্তরতম মনোভাবের অবিকল ব্যঞ্জনা একমাত্র তুলির অবলীলাময় টানে ফুটাইয়া তুলিতে ইহাদের ক্ষমতাও জগতে অদ্বিতীয়। বৃক্ষলতাদি পত্রের অঙ্কনের অতি চমৎকার ও মনোহর আলঙ্কারিক রীতিও এই চিত্রপটগুলির ও এই চিত্রকরদের একটি অন্যতম বিশেষ আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিন্যাসের ও ভাব-ব্যঞ্জনার আদর্শে যে অস্বাভাবিকতা, দুর্ব্বলতা, কৃত্রিমতা ও অতি-কবিভাব লক্ষিত হয়, বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতিতে সেই সকল দুর্ব্বলতা ও দোষ নাই। এই সকল চিত্রপটে একদিকে পুরুষদেহের বীরোচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও ভাব-ভঙ্গীর অঙ্কন-প্রণালী ও অপরদিকে নারীদেহের লীলায়িত রূপলাবণ্য-মাধুরীর বিচিত্র অঙ্কন-কৌশলের স্বভাবজাত সমাবেশ দেখিয়া অবাক হইতে হয়। অনুকরণমূলক অঙ্কনবাহুল্য বর্জ্জন করিয়া ইঙ্গিতে ভাবের ও রসের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাশক্তি এই সকল চিত্রপটের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার একটি চিত্রেও কোন রকম ভাবের অপরিস্ফুটতা অথবা ধোঁয়াটে ধরণ নাই। চিত্রে অতি-পরিস্ফুটভাবে কাহিনী বিবৃত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই চিত্রকলা-পদ্ধতি ভারতের আদিম যুগ হইতে পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে। রামপটে অঙ্কিত কর্ম্মযোগমূলক পৌরুষকাহিনীর ইতি-হাস ও প্রাচীন ভারতের পারিবারিক জীবন-প্রণালী শক্তি-পটে অঙ্কিত গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানমূলক দার্শনিকের সত্য এবং কৃষ্ণপটের আধ্যাত্মিক প্রেমমূলক 'রমাণ্টিকতা' (romanticism)র ভাব-তরঙ্গ বাংলার এই সকল প্রাচীন শিল্পিগণ অতি সরল ও সহজভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া চিত্রপটে তাহাদিগকে অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক ও অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রদান করিয়া তাহাদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি বাংলার পল্লীগ্রামের সরল প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষগণের চরিত্রের একটি অনির্ব্বচনীয় ও অতুলনীয় নিজস্ব মাধুর্য্য-রসে এই সকল চিত্রপটের রেখা, বর্ণ ও রূপকল্পনা ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত।

বাংলার এই প্রাচীন চিত্রশিল্পিগণ রসকলার সঙ্গে ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ ও অটুট সম্বন্ধ তাহা কখনও ভুলিয়া যান নাই এবং তাহা মানুষের মনে অবিরত জাগাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক চিত্রপটের শেষভাগে যমরাজার সভায় চিত্র-গুপ্তের অভ্রান্ত খাতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া এবং যম-রাজার অনুশাসনে ধর্ম্মের অন্তিম জয় ও অধর্ম্মের অন্তিম

পরাজয়ের কাহিনী অতি জলন্তভাবে বিবৃত করিয়া সমাজে ধর্ম্মভাবের প্রচলন বজায় রাখিবার অমূল্য সহায়তা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জগতের চিত্রকলা-রূপসীর আত্মা আজ তাহার বহু যুগের পুঞ্জীভূত বিলাসবেশভূষার জটিলতার ভারে প্রপীড়িত হইয়া পরিপ্রেক্ষিতের ভেল্কিবাজী ও আলোছায়াপাতের মরীচিকাময় বেড়াজালের আবেষ্টনের পীড়নে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া সহজ সরল আত্মপ্রকাশের আগ্রহে তাহার বিলাস হর্ম্ম্যরাজি পরিত্যাগ করিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার বনজঙ্গলে মানবজাতির আদিম লালিত্যহীন সরলতার মধ্যে সহজ সরল আত্মপ্রকাশের উপযোগী যে-চিত্রভাষার অনুসন্ধানে ব্যর্থপ্রয়াসে উন্মাদের ন্যায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, বাংলার পল্লীর সুমধুর চিত্রলেখা-লক্ষ্মী আজ তাঁহার সলজ্জ অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া সেই অতি-বাঞ্ছিত অনুপম ও একাধারে প্রাঞ্জল অথচ শক্তিময়, লাবণ্যময়, প্রাণময়, কৃত্রিমতাবিহীন এবং ভাবব্যঞ্জনায় ও রসব্যঞ্জনায় ভরপূর চিত্রভাষার সন্ধান বিশ্বমানবকে মিলাইয়া দিবে।

ট্রেনে এক রাত্রি

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত

পূজোর ছুটিতে রাঁচি থেকে কলকাতা চলেছি—থার্ডক্লাস গাড়ীতে। ইচ্ছে ছিল আর একটু উপরের কোঠায় উঠি, কিন্তু টাকার থলিটা অনেক ঝেড়েঝুড়েও ইণ্টারমিডিয়েটের পয়সা বেরুল না।

মুরী জংসনে ছোট গাড়ী থেকে বড় গাড়ীতে বদল করতে হয়, সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে গাড়ীর ভিতর খানিকটা জায়গা দখল করা গেল—বসবার মত নয়, কোনও রকমে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার মত।

গাড়ী চড়া নয় ত যেন একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করা। ভিতরের নিরীহ যাত্রীরা ছাতি, লাঠি, হুঁকোর নল ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র জানালা দিয়ে বার ক'রে বসে আছে, যেন এক একটি মেশিন-গান্ মুখ বার ক'রে রয়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা শিখ ও একটা মাড়োয়ারী দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত। ঝাঁকে ঝাঁকে যাত্রী এসে দরজার ওপর আঘাত করছে—'এই যানে দেও'। তারা কিন্তু নির্ব্বিকার। নেহাৎ বিরক্ত করলে অনিচ্ছাসত্ত্বে ঠোঁট দুটি নেড়ে বলে,—আরে ভাগো, দুসরা গাড়ীমে যাও। যেন প্লাটফরমের এই যাত্রীতরঙ্গের যাওয়া-আসার সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই। তাদের পৌঁছে দেওয়া ছাড়া এই এত বড় এঞ্জিনসুদ্ধ গাড়ীটারও যেন আর কোন প্রয়োজনই নেই।

আমরা যখন পাঁচ ছয়জন মিলে গাড়ীটাকে আক্রমণ করলুম তখন কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াল। শিখ ও মাড়োয়ারী দুজনের শক্তিতে কুলোল না। আরও দু-এক জন তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। বাকী লোকগুলো বিভিন্ন ভাষায় অথচ একস্বরে আমাদের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করলে। যতগুলি লোক স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় গাড়ীর ভিতর স্থানলাভ করেছে তারা যেন সব এখন একদেশের লোক অন্যদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে।

কিন্তু জয় আমাদেরই হ'ল। সজোরে দরজা ঠেলে হুড়মুড় ক'রে ভিতরে ঢুকে পড়লাম, ভিতরের অধিবাসীবৃন্দ আমাদের মোটেই ভালভাবে অভ্যর্থনা করলে না। একটি মাড়োয়ারী স্ত্রীলোক—বোধ হয় দ্বাররক্ষক মাড়োয়ারী প্রভুটির স্ত্রী হবেন—বেঞ্চির উপরে স্থানাভাবে দুটো বেঞ্চির মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বিছানা পেতে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে বেশ দৃঢ়ভাবে জায়গাটা দখল

ক'রে বসে আছেন। লজ্জাধিক্যবশতঃ মুখ ছাড়িয়েও অনেকখানি অবধি ঘোমটা টানা। হাতের মোটা বালা দুটোর ওজন বোধ হয় সাধারণ দাঁড়িপাল্লায় করা যায় না।

তিনি তারস্বরে এই মৎস্যাহারী, দুর্দ্দান্ত 'বাঙ্গালী' ছেলেদের সম্বন্ধে নানারূপ কটূক্তি করতে লাগলেন। ঘোমটাটা কিন্তু টানাই আছে, শুধু প্রচণ্ডবেগে এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্য্যন্ত দুলছে।

মাছের ওপর মাড়োয়ারীদের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার কারণ আমি ভেবে পেয়েছি। গরু, শূয়োর, ঘোড়া, গাধা, সাপ, ব্যাঙ্ সব জন্তুর চর্ব্বিই ঘিয়ের সঙ্গে মেশান যায়। কিন্তু মাছের মত এমন একটা সহজলভ্য জীব যে ঘি-প্রস্তুতের কোনও কাজেই লাগে না এইটেই বোধ হয় ওদের সব চেয়ে বিক্ষোভের কারণ।

কিন্তু এই মৎস্যভুক্ জীবগুলি তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না। ঠেলে-ঠুলে আমরা খানিকটা দাঁড়াবার জায়গা করে নিলুম।

গাড়ীর দেয়ালে একটা ফ্রেমে আঁটা বাংলা অক্ষরে লেখা আছে,—'মাত্র ১৮ জন বসিবেক'। স্বভাবতঃ আমার কৌতূহল হ'ল। গুণে দেখলাম আমাকে নিয়ে সর্ব্বসুদ্ধ একচল্লিশটি নরনারী গাড়ীর মধ্যে অধিষ্ঠান করছেন। কোম্পানীর প্রভুরা যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন তা আজ নিঃসংশয়ে অনুভব করলুম। আরও একটা বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করলুম যে, ঘরে পয়সা এলে তাঁদেরই তৈরি করা আইন যাত্রীরা লঙ্ঘন করলেও তাঁরা অসন্তুষ্টই হন না।

মনে পড়ে গেল কলকাতার রাস্তার ধারে সার্জ্জেন্টরা কি রকম ভাবে বাজের মত তীব্র দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে—কোথায় বাসে নির্দ্দিষ্টের চেয়ে একটা বেশী লোক যাচ্ছে তাই ধরবার জন্য। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায়, একই নিয়মের শাসন-পদ্ধতির কি অদ্ভুত পার্থক্য তা মনে ক'রে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল।

গাড়ীটা বেশী বড় নয়। যাত্রীরা বেশীর ভাগই দাঁড়িয়ে আছে। যারা বসে আছে তাদেরও পা-দুটি ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ গাড়ীতে ঢোকাবার উপায় নেই। বেঞ্চের শ্রেণীর মাঝখানকার জায়গাগুলি সবই বিছানায় ভরা দরজার সামনে দুটো বড় বড় ট্রাঙ্ক দ্বীপের মত মাথা উঁচু করে পড়ে আছে। দুজন লোক তার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে। একটি মেয়ে আবক্ষ ঘোমটা টেনে এককোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বস্ত্রাবাসের ভিতরে যে একটা সত্যিকার জীবন্ত মানুষ অবস্থান করছে, বাইরে থেকে তা কারুর বুঝবার জো নেই। উপরের বাক্সগুলি বিচিত্র আসবাবে ভর্ত্তি। স্থানাভাবে একটার উপর একটা, তার উপর আর একটা এই রকম ভাবে রাখা হয়েছে। গাড়ীর দোলায় তারা যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য নীচের দিকে নেমে আসে, তবে গভীর রাতে আধঘুমন্ত যাত্রীরা যে প্রীত হবে না তা বলাই বাহুল্য। বাঙ্কের সেই অদ্ভুত স্থানাভাবের মধ্যেও একটি ভদ্রলোক অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর বিশাল ভুঁড়ি ও সুবৃহৎ গুম্ফরাজি নিয়ে উপরে একটি বিছানা ক'রে দিব্যি সটান শুয়ে আছেন, আর মাঝে মাঝে অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণার সহিত নীচের স্তূপাকার যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখছেন।

গাড়ী ছাড়তে তখনও দেরি আছে। ভেবে দেখলুম যে একবার যখন গাড়ীর উপর চড়া গেছে তখন এই কামরাতেই ভ্রমণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এখন নেমে প্লাটফরমের ওপর খানিকটা বেড়িয়ে বেড়ালে বোধ হয় ক্ষতি হবে না। নেমে পড়লুম। ষ্টেশনের গলায় আলোর মালা দুলছে। নানাদেশের নানাজাতির কালো সাদা লোক উন্মত্ত হয়ে ছুটছে। দূরে সীমাহীন প্রান্তর অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে,—আর তারই বুকের ওপর সুদীর্ঘ পাহাড়ের শ্রেণী অস্পষ্ট মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যেন জমাট বাঁধা অন্ধকারের এক একটা বিরাট স্তূপ।

একটা ফার্ষ্টক্লাস কামরার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ছোট্ট কুঠ্‌রিটি,—বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় ঘরের উড্ডনশীল জিনিষগুলি চঞ্চল। জানালার দিকে বেঞ্চে একটি শ্বেতচর্ম্মা তরুণী, দেখে আমেরিকান বলে বোধ হ'ল—রূপে চারিদিক আলো ক'রে বসে আছেন। তাঁর তিন দিক ঘিরে তাঁর সমবর্ণ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের

পুরুষ গুঞ্জ ধ্বনি করছে। তিনিও সকলের ওপর নিরপেক্ষ ভাবে হাস্যে, স্পর্শে, কটাক্ষে মধুবর্ষণ করছেন।

তন্ময় হয়ে দেখছিলাম,—এমন সময় বাধা পড়ল। একটা খাবারের গাড়ী পিছন দিক থেকে ঘড় ঘড় ক'রে এসে আমার কাছেই থাম্‌ল। গাড়ীটার কাচের জানলা ভেদ ক'রে লুচিগুলির রুক্ষ কঠিন চেহারা চোখে পড়ছে,—যেন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের মত। মনে হচ্ছে কত যুগ যুগান্তর ধ'রে ওরা ওখানে অপেক্ষা করছে। বাইরে আসবার জন্যে যেন ওদের আকুলতার অবধি নেই। এই খাবারওয়ালারা কোম্পানীর লাইসেন্স পাওয়া লোক, সুতরাং ওরা যা-কিছু বিক্রী করে সবই অতি উৎকৃষ্ট এবং আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর।

আবার চল্‌তে আরম্ভ করলুম। এটা ইণ্টার ক্লাস, নাগরা-পরা একটি একুশ বাইশ বছরের মেয়ে স্বামীর সঙ্গে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে চলেছে। কুলীদের ধমক দিয়ে জিনিষ-পত্রগুলি গাড়ীতে তুল্‌তে সে-ই যেন বেশী তৎপর। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুটি লোক আরোহণ-উৎসুক দরিদ্র যাত্রীদের দেড়া ভাড়ার সম্বন্ধে সচেতন করছে।

আর একটি ছোট্ট গাড়ী,—থার্ডক্লাস। দরজায় লেখা আছে—'সার্ভেণ্টস্'। দুটি মাত্র লোক হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে, আরামে, নির্ব্বিবাদে। প্রভুর পরিচয় তারা সগৌরবে বহন করছে পেটের ওপর বাঁধা ক্ষুদ্র একখণ্ড পিতলের চাক্তিতে।

তারপর একখানা গরাদ দেওয়া গাড়ী। মাত্র একটি কুক্কুর-দম্পতি এই কুঠ্‌রীটির যাত্রী। কুকুরটি অতি আদরে তার সঙ্গিনীর মুখ চেটে দিচ্ছে। এত জনসমাগমেও ওদের মিলনের সঙ্কোচ নেই। ওরা যেন ও-দেশের প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মনে হ'ল দরিদ্র দেশের তৃতীয় শ্রেণীর ভদ্র যাত্রীদের চেয়ে সাহেবের খানসামা ও জীব বিশেষ অনেক সুখী।

গাড়ী ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা বাজল। যাত্রীসঙ্ঘ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চা-ওয়ালারা যাদের ধারে চা দিতেছে তাদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করবার জন্য ছুটোছুটি করছে। এক ভদ্রলোক খাবারওয়ালার কাছ থেকে লুচি মিষ্টি খেয়েছেন, পয়সা দেবার সময় তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গাড়ীর শেষ ঘণ্টা পড়ল। দলে দলে যাত্রী ব্যাকুল হ'য়ে দরজায় দরজায় ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু প্রবেশ-পথ অত্যন্ত দুর্গম। ও-পাশ থেকে একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক একটি ঘোমটা-টানা জড়পদার্থের হাত ধরে ছুটতে ছুটতে আসছেন।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। এঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায় আকাশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ক্রমে গাড়ী প্লাটফরম্ ছাড়িয়ে গেল। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি ভদ্রলোক এখনও পাগলের মত ছুটছেন।

গাড়ী ছুটে চলেছে—উল্কার মত। এঞ্জিনের সামনের সার্চ্চলাইট্‌টা অন্ধকারের পাহাড়গুলোকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে আমরা যেন মহাশূন্যে মৃত্যুর অভিসারে ছুটে চলেছি। বাইরের দিগন্তবিস্তৃত, নিরাবরণ প্রান্তর ও তমসাচ্ছন্ন বৃক্ষশ্রেণী তন্ময় হয়ে আমাদের এ নৈশ অভিযানের দিকে চেয়ে আছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে ঘুমোবার অভ্যাস আমার আছে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ দেখলুম দূরে আকাশের বুকে যেন আগুনের হোলিখেলা চলেছে। বুঝলুম টাটানগরের কাছে এসে পৌছেচি। গাড়ী আরও এগিয়ে চল্‌ল। কারখানার ব্লাষ্ট-ফার্ণেসের গহ্বর থেকে অগ্নির লক্ষ লক্ষ ফণা বাতাসে ছোবল মারছে। ষ্টেশনে যেন দীপালির উৎসব চলেছে।

গাড়ী প্লাটফরমে এসে থামল। ওঠা-নামায় যাত্রীদের মধ্যে রীতিমত একটা সংঘর্ষ বেধে গেল। আমাদের দরজার কাছে বেজায় ভিড়। বাক্সের ওপরের গজোদর, বৃহৎগুম্ফ ভদ্রলোকটি এতক্ষণে অনেক চেষ্টার পর গাড়ীর মেঝেতে পদার্পণ করলেন। তারপর তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে দরজা আটক ক'রে দাঁড়ালেন।

গাড়ী যখন প্রায় ছাড়ে তখন একটি কুড়ি একুশ বছরের ফর্সা ছেলে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা খাকী সার্ট ও একটা হাফপ্যাণ্ট পরা,

হাতে শুধু একটা চামড়ার ব্যাগ, ছেলেটি দরজায় ধাক্কা দিয়ে বল্‌ল,—যেতে দিন।

ভদ্রলোক মুখ বিকৃত ক'রে বল্‌লেন,—যাও যাও, অন্য গাড়ী দেখগে। এখানে জায়গা নেই।

ছেলেটি শান্ত স্বরে বল্‌লে,—সে সম্বন্ধে ত আপনার কাছে কোনও উপদেশ চাইনি। জায়গা থাক্ বা না থাক্ আমি এই গাড়ীতেই যাব।

ভদ্রলোক রাগে লাফিয়ে, ভুঁড়ি দুলিয়ে চীৎকার ক'রে বল্‌লেন,—ওঃ, লাটসাহেব আর কি! এই গাড়ীতেই যাব। যাও ত তোমার ঘাড়ে কটা মাথা দেখি। বলে তিনি দরজাটা আরও জুড়ে দাঁড়ালেন।

ব্যাপার দেখে আমরা ছেলেটির সাহায্যের জন্য ভিড় ঠেলে এগুচ্ছি এমন সময় সে বললে,—আচ্ছা, never mind. গাড়ীর মধ্যে ঢুকবার আরও অনেক রাস্তা আছে। দেখি আপনি কি করে আটকান। বলে ছেলেটি মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা জানালার কাছে এগিয়ে এল। তারপর ব্যাগটা ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, জানালায় দুহাত লাগিয়ে, অদ্ভুত কৌশলে ভিতরে এসে ঢুকল। কেউ কোনও রকম বাধা দেবার পর্য্যন্ত অবসর পেল না। গাড়ী তখন চল্‌তে সুরু করেছে। ভদ্রলোক তাঁর ব্যর্থ কৌশল ও বৃথা দর্পের কথা স্মরণ ক'রে নিস্ফল আক্রোশে ফুলছেন।

গাড়ীর বেগ বাড়ছে,—ভদ্রলোক এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেটি এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের হাতখানা ধরে ফেললে। বললে,—রাগ করতে আছে কি দাদা? আমি আপনার ছোট ভাইটির মত। গাড়ীতে যদি উঠতে না পেতাম আপনিই পরে দুঃখ পেতেন।

ভদ্রলোক এ কথাগুলিকে বিদ্রূপ মনে করে আরও বেশী জলতে লাগলেন। কথার কোনও উত্তর দিলেন না, কিন্তু চোখ দিয়ে যেন অগ্নিবৃষ্টি হ'তে লাগল।

ছেলেটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললে,—আপনাকে এমন রাগ ক'রে থাক্‌তে আমি কিছুতেই দিতে পারি না। আসুন কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্, নইলে আপনার মাথা ঠাণ্ডা হবে না। মার হাতের তৈরি চমৎকার ফুলকো লুচি, ডিমভাজা, মিহিদানা বলতে বলতে তাঁকে এক রকম জোর করে টেনে এনে, মেঝেতে পাতা একটা বিছানার ওপর বসিয়ে দিলে। তারপর তাঁর পাশে বসে এমন করে গল্প সুরু করে দিলে যেন কতকালের পরিচিত বন্ধু। বিছানাটা যে অপরের এবং এর মালিকের যে এ রকম অনধিকার উপবেশনের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকতে পারে তা যেন তার ভাববার প্রয়োজনই নেই। ভদ্রলোক ক্রমে নরম হয়ে এলেন।

ক্রমে সেই চামড়ার ব্যাগটা খুলে গেল ও তার ভিতরের একটা পিতলের চৌকো কৌটা থেকে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। ভদ্রলোক প্রসারিত খাদ্যদ্রব্যের দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমরা?

ছেলেটি ঈষৎ হাসলে। তারপর সার্টের ভেতর থেকে শুভ্র যজ্ঞোপবীতের গোছাটি টেনে নিয়ে দেখাল। ভদ্রলোক লুচিসুদ্ধ হাতখানা মাথায় ঠেকিয়ে শশব্যস্তে বল্‌লেন,—'ব্রাহ্মণ'! তারপর বিনা দ্বিধায় লুচির সঙ্গে ডিমভাজা সংযোগ ক'রে চর্ব্বণ করতে আরম্ভ করলেন।

ভোজন-পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল। গাড়ী তখন পুরো বেগে ছুটছে। বেশীর ভাগ যাত্রীই ঘুমের ঘোরে নানা ছন্দে ঢুলছে। শুধু গাড়ীর এক প্রান্তে অপর একজনের বিছানা অধিকার করে, এক প্রৌঢ় সগুম্ফ ভদ্রলোকের সঙ্গে এক গুম্ফশ্মশ্রুহীন যুবকের সুখদুঃখের আলোচনা নিবিড় হয়ে উঠেছে।

খানিকক্ষণ পরে বোধ হয় ভদ্রলোকটিরও নিদ্রাকর্ষণ হ'ল; যুবকটির উদ্দেশ্যে বল্‌লেন,—আচ্ছা ভায়া, এবারে একটু শোবার যোগাড় করা যাক। আমি ত বাঙ্কের ওপর একটু জায়গা করে নিয়েছি, কিন্তু তোমারও ত একটু গড়িয়ে নিতে পারলে ভাল হত।

ছেলেটি হেসে বল্‌লে—বিলক্ষণ, আমার আবার ঘুম। সেই সাত বছর বয়স থেকে ট্রাভেল্ করছি কিন্তু গাড়ীতে কখন ঘুমোতে পারি না। এই ধরুণ না কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে কালকা গেলুম, কটা রাত ঠায় বসে, চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত বুজিনি।

বিস্ময়ের আবেগে ভদ্রলোকের চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল, বল্‌লেন—তা ভায়া, তোমরা ছেলেমানুষ।

তোমাদের কথাই আলাদা। কিন্তু আমাদের বয়সটাও ত অনেকটা গড়িয়ে এল। তাহলে তুমি বস, আমি একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিই।

ভদ্রলোক বাঙ্কের ওপর চড়বার পথ খুঁজতে লাগলেন। বেঞ্চের ওপরে ঘেঁষাঘেষি ভাবে সার বেঁধে যাত্রীরা ঘুমের ঘোরে গাড়ী চলার তালে তালে মাথা নাড়ছে। কোথায় একটু চরণস্থাপন করে ওপরে ওঠবার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। আরোহণকালে লোকগুলির শ্রীঅঙ্গে পাদস্পর্শ হলে তারা তাঁকে কি ভাবে যে আপ্যায়িত করবে, সে কথা মনে করে তিনি অতি সন্তর্পণে ওপরে উঠবার জন্যে নানারকম কসরৎ করতে লাগলেন। অনেক কষ্টে খানিকটা উঠেছে এমন সময় একটা অস্ফুট কাতরধ্বনি শুনতে পেলুম, দেখলুম ছেলেটি মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে দুই হাতে বুক চেপে ধরে আর্ত্তনাদ করছে, ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম, কি হয়েছে দেখবার জন্যে। ভদ্রলোকটির বিশাল পদযুগলের একটি তখন অনেক কষ্টে ওপরে স্থান লাভ করেচে এবং আর একটি তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তিনি ছেলেটার অবস্থা দেখে উঠবেন কি নেমে আসবেন, এই ভাবতেই ভাবতেই বোধ হয় সেই অবস্থায় ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলতে লাগলেন?

আমি ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কি হয়েছে।

সে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে বললে—বুকে হঠাৎ কি রকম একটা pain হচ্ছে।

ভদ্রলোক তখনও ঝুলছেন, বললেন—ফিক ব্যথা, না কলিক?

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বিরক্তস্বরে বলে উঠল,—নেমে দেখুন না মশায় কি হয়েছে। খাবার বেলায় ওর মুখের জিনিষ নিয়ে খুব ত বাগিয়ে খেলেন।

অগত্যা ভদ্রলোককে নামতে হ'ল। নামা কি সোজা? অনেক কষ্টে যখন অবতরণ কার্য্য সমাপ্ত হ'ল তখন পরিশ্রমের আতিশয্যে তিনি হাঁপাচ্ছেন। সকলের চেষ্টায় ছেলেটি যখন একটু সামলে উঠল তখন আমরা প্রস্তাব করলাম যে, ওকে একটু শোবার জায়গা করে দেওয়া হোক। এ রকম অসুস্থ শরীর নিয়ে ত আর বসে যাওয়া চলে না।

কিন্তু শোবার জায়গা কোথায়? মেঝেতে যারা বিছানা পেতে শুয়েছিল, তারা আত্মত্যাগের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাবার সুযোগ পেয়েও রাজী হ'ল না, অবশেষে স্থির হ'ল যে, ভদ্রলোকের বিছানাতেই ওকে তুলে দেওয়া হোক।

এ-রকমটা যে ঘটতে পারে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। যাত্রার প্রারম্ভে অনেক কৌশলে তিনি সুনিদ্রার আয়োজন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দৈবের পরিহাস দেখে তিনি সত্যিই আতঙ্কে বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু উপায় নেই। কিছু আগেই ওই অসুস্থ মানুষটির অনেক ভালমন্দ দ্রব্য উদরসাৎ করেছেন। চক্ষুলজ্জাও ত আছে। তিনি কেবল নিরুপায়ের মত মাথা চুলকে বলতে লাগলেন, তাই ত আমি মোটা মানুষ, কিন্তু তাঁর মৃদু আপত্তিতে কেউ কান দিলে না। ধরাধরি করে ছেলেটিকে বাঙ্কের ওপরে তুলে দেওয়া হ'ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আবার যে যার জায়গা অধিকার ক'রে ঢুলুনির পুনরভিনয় আরম্ভ করলে—গাড়ী চলেছে একটানা অশ্রান্ত। বাঙ্কের শিকলগুলি ঝন্ ঝন্ করে তার চলার ছন্দে তাল দিচ্ছে। বাইরের অন্ধকার, রাত ক'রে ওঠা একফালি চাঁদের আলোয় ফিকে হয়ে এসেছে, আর ভেতরের বৈদ্যুতিক আলোটা মাতালের চক্ষুর মত স্তিমিত দেখাচ্ছে।

সারারাত ধ'রে গাড়ী চলল, মাঝে মাঝে ষ্টেশন,—যেন তন্দ্রাঘোরে ঝিমুচ্ছে। ক্বচিৎ দু-একটা লোক নেমে যাচ্ছিল। ছেলেটি বোধ হয় এখন ভাল আছে, বেশ শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, ভদ্রলোকের কিন্তু সত্যই বড় কষ্ট হয়েছে, দেখলে দুঃখও হয়। শরীরের অপরিমিত মাংসস্তুপগুলিকে রাখবার জায়গা যেন বেচারা পাচ্ছে না।

ভোরের আলোয় রাতের অন্ধকার যখন গলে যেতে সুরু হয়েছে, তখন গাড়ী এসে সাঁতরাগাছিতে পৌছল। এখানে টিকিট কালেক্ট করে, সুতরাং গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।

একটি বাবুগোছের লোক বোধ হয় টিকিটের হাঙ্গামা করেন নি,তিনি গাড়ীর ছোট ঘরটায় ঢুকে দোর দিয়েছেন।

সুবৃহৎ ষ্টেশনের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এই নিস্তেজ আলোয় এখনও ঠিক চেনা যাচ্ছে না। ক্রমে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্য অন্য লাইনে আরও কয়েকটা ট্রেন নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় যেন কাকেদের কনফারেন্স বসেছে, তাদের কলধ্বনিতে তার আভাস পাচ্ছি।

বাঙ্কের উপরে ছেলেটি এতক্ষণে উঠে বসল। তার মুখের উপরে সুনিদ্রার তৃপ্তির চিহ্ন। নীচে নেমে সে ব্যাগটি তুলে নিলে, তারপর ভদ্রলোকটিকে একটি ছোট্ট নমস্কার করে বললে,—আচ্ছা দাদা, তাহলে আসি। আমাকে এইখানেই নামতে হবে, বলে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। ভদ্রলোক যেন একটু মুখভারী ক'রে বললেন, তোমার বুকের ব্যথা সারল ?

ছেলেটি ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হেসে ফেললে। বললে দেখুন ইয়ে—কি বলে বুকের ব্যথা আমার কোনওদিনই নেই, কালও হয় নি। কিন্তু আপনার দয়ায় কাল দিব্যি ঘুমোনো গেছে, সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

আমরা যেন সব আকাশ থেকে পড়লুম, ভদ্রলোক লুচির স্বাদ ভুলে গেলেন। তার জাগরণক্লান্ত চিত্ত যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেললে। তিনি চীৎকার ক'রে বললেন,—তবে রে ছোটলোক চামার, ক্রোধের অতিশয্যে বাকি কথাগুলি তাঁর মুখ দিয়ে আর বেরুল না।

ছেলেটি কিন্তু রাগ করলে না। বললে—নেহাৎ মিথ্যে বলেন-নি দাদা। চামার না হলেও তার কাছাকাছি বটে, আমি জাতে নমঃশূদ্র।

ভদ্রলোক যেন আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার মুখ ছায়ের মত সাদা হয়ে গেল।

ছেলেটি আবার একটু হাসলে। বললে কিছু মনে করবেন না, পৈতেটা সঙ্গে সঙ্গে রাখি—সময়ে অনেক কাজ দেয়, বলে সে উত্তরের অপেক্ষা না করে ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করলে, দেখতে দেখতে গেটের ভিতর দিয়ে তার দীর্ঘ দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাড়ীময় তখন হাসির রোল উঠেছে। কিন্তু ভদ্রলোক নির্ব্বাক হয়ে বসেই রইলেন। গাড়ী আবার চলতে সুরু করল।

নারী সমবায় ভাণ্ডার

শ্রীঅবলা বসু

চৈত্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্তা শান্তাদেবী তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে বোম্বাইয়ের নারীগণ প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী দোকানের সহিত কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে প্রতিষ্ঠিত নারী সমবায় ভাণ্ডারের তুলনা করিয়াছেন। তিনি যে নিন্দাচ্ছলে লেখেন নাই তাহা জানি, তথাপি প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য নারী সমবায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যের সফলতার বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয়।

তিন বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বোম্বাইয়ে উক্ত স্বদেশী দোকান দেখিবার সুযোগ পাই। ইয়োরোপে থাকিতেই খবর পাই যে, বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্ত মহিলারা এমন কি পার্শী মহিলারাও খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার পরিচিত ধনী বংশের একটি বাঙালী মহিলা ইয়োরোপে আমাকে বলিলেন যে বোম্বাই হইতে তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে উপহারের জন্য ইয়োরোপ হইতে বস্ত্রাদি লইতে বারণ করিয়াছেন, কারণ বোম্বাইয়ে কেহ আর বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করেন না। বোম্বাই পৌঁছিয়া শুনিলাম যে, পার্শী গুজরাটী মারহাট্টী মহিলারা পালা করিয়া উক্ত দোকানে বিক্রেতার কার্য্য করিতেছেন, যে-গৃহে দোকানটি অবস্থিত তাহার মাসিক ভাড়া ২০০০৲। গৃহের মালিক নাকি এক বৎসরের জন্য উক্ত গৃহ স্বদেশী প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনা ভাড়াতে দিয়াছেন। বস্ত্রব্যবসায়ীরা বিনা-সর্ত্তে বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়াছেন এবং দোকানের ব্যবসায়ের দিক্‌টা বস্ত্রব্যবসায়ীদের দ্বারাই পরিচালিত। বলিতে গেলে স্বদেশী দোকানটি বস্ত্রব্যবসায়ীদের উৎসাহে মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হইতে-ছিল, ইহাতে মহিলাদের লাভ-লোকসান ছিল না, তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি ও শ্রম দিয়া সাহায্য করিতেছিলেন; ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের মেয়েরাই গৃহকর্ম্ম সমাধান করিয়া পালা

করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসিমুখে বিক্রেতার কাজ করিতেছিলেন, কাপড় মাপিতেছেন, পার্সেল বাঁধিতেছেন এবং মূল্য লইতেছেন। বোম্বাই শহরে পর্দ্দা নাই তাহা সকলেই জানেন, সেখানে মেয়েরা অবাধে ট্রামে ও পদব্রজে যাতায়াত করেন। তথাপি এই অভিনব দৃশ্য দেখিবার জন্য দোকানে ক্রেতার খুব ভিড় ছিল, সেজন্য মেয়েদের পরিশ্রমেরও শেষ ছিল না। আমি যখন দোকানে যাই তখন নানা রকমের কাপড় ছাড়া দোকানে অন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল না। শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী দেখিয়া আসিয়াছেন বোম্বাইয়ের মিলে কত রকমের কত রঙ্গের বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় এবং সেখানে অবস্থাপন্ন ধনী লোকেরাও স্বদেশী ছাড়া বিদেশী ব্যবহার করেন না।

বাঙালা দেশে অর্থসাহায্য পাওয়া কঠিন, এখানকার যে দু-একটি দেশীয় মিল আছে তাহাদের আবার উদ্ভাবনী শক্তি কম। উত্তর-কলিকাতাবাসী কয়েকটি মহিলার এক স্থানে স্বদেশে উৎপন্ন সমুদয় জিনিষ সংগ্রহ করিয়া নারীদের জন্য একটি দোকান খুলিবার আগ্রহ হইল। ১৯৩০ সালে আমার ইয়োরোপে যাইবার প্রাক্কালে নারী-শিক্ষা সমিতি হইতে নারী সমবায় মণ্ডলী বলিয়া একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান রেজিষ্টারী করা হইয়াছিল। উহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সকল অভাবগ্রস্তা নারী নারী-শিক্ষা-সমিতিতে শিক্ষা পাইয়া গৃহে বসিয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে চান, তাঁহারা মণ্ডলীর অংশীদার হইয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ পাঠাইতে পারিবেন।

আমরা স্থির করিলাম, দু-এক জনের মুখাপেক্ষা না করিয়া নারী শিক্ষা সমবায় মণ্ডলীর শেয়ার বিক্রী করিয়া একটি স্বদেশী দোকান খোলা যাউক যাহাতে মহিলাদের প্রস্তুত জিনিষও থাকিবে এবং কাপড় প্রভৃতি নানা রকম স্বদেশী নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যও থাকিবে। নারীশিক্ষা-সমিতির বার্ষিক চাঁদা ৫৲। কিন্তু মণ্ডলীর সভ্যদের জন্য আমরা বার্ষিক চাঁদা ১৲ এবং প্রতিশেয়ার ৫৲ করিয়া স্থির করিলাম।

এইরূপ একটি দোকানের বিশেষ অভাব আছে দেখিয়া আমাদের কয়েকজন উৎসাহী মহিলা সভ্য উৎসাহের সহিত শেয়ার বিক্রী করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের এই প্রথম উদ্যম, আমরা কখনও এরূপ কঠিন কার্য্যে অগ্রসর হই নাই সেজন্য যাঁহাদের নিকট আমরা শেয়ার বিক্রী করিয়াছি তাঁহাদের বলা হইয়াছে যে, কৃতকার্য্য হই বা না হই তাঁহারা যেন মেয়েদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া শেয়ার ক্রয়ের টাকা দান-স্বরূপ মনে করেন। কিছু অর্থ সংগ্রহ হইলে ৭২ বি কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে নারী সমবায় ভাণ্ডার নাম দিয়া দোকানটি খোলা হইল।

এই দোকানটি যে আজ পর্যান্ত চলিতেছে তাহা শ্রীযুক্তা কিরণময়ী বসুর (স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পুত্রবধূর) অক্লান্ত পরিশ্রমে। তিনি প্রাণমন দিয়া ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার সময় ও অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, শ্রীযুক্তা চারুবালা মিত্র, শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন, শ্রীযুক্তা ব্রহ্মকুমারী রায়, শ্রীযুক্তা সুপ্রীতি বসু, শ্রীযুক্তা সুরমা সেন, শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেনগুপ্ত এই কয়টি মহিলা পরিশ্রম করিয়া ভাণ্ডারটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কোথায় মাসিক দুই হাজার টাকা ভাড়া, কোথায় আমাদের মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়া; কোথায় বস্ত্রব্যবসায়ীদের সহযোগিতা ও সাহায্য, কোথায় আমাদের ব্যবসায়ীদের কথা দূরে থাকুক বঙ্গীয় জনসাধারণের উদাসীনতা!

আমাদের মধ্যে একতা নাই। মেয়েদের অনুষ্ঠান, সুতরাং মেয়েরা এখানে ক্রয় করিয়া দোকানের সাহায্য করিবে সে ভাব আমাদের নাই। কিন্তু যদি বা কখনও অন্য দোকান হইতে দু-এক আনা দামের পার্থক্য হয়, তাহা হইলে নিন্দার শেষ নাই। ভাণ্ডারটি কোন ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে—ইহা লোকে মনে রাখেন না, যদি লাভ হয় তবে অংশীদাররাই তাহা পাইবেন• এবং মেয়েরাই ইহার অংশীদার। দোকানে প্রত্যেক জিনিষ বিক্রয়ের কমিশন একমাত্র লাভ, দোকানের নিজস্ব জিনিষও নাই যাহা বেশী দামে বিক্রয় হইতে পারে, তবে ইহা হইতে পারে, যে, বাজার-দর সর্ব্বদা বদলায়, সেজন্য দু-এক সময় দামের তারতম্য হইয়াছে, কিন্তু মাত্র এক বৎসর দোকানটি প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিকাদিগকে ব্যবসায় শিখিতেও সময় লাগে। অন্ততঃ নারীগণ যদি নারীদের প্রতিষ্ঠিত দোকান বলিয়া সেখান হইতে তাঁহাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয় করেন তাহা হইলে দোকানটি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে নিশ্চয়। বোম্বাইয়ের সহিত আমাদের কোন বিষয়েই তুলনা করা যায় না তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু গৌরবের সহিত মুক্তকণ্ঠে ইহা ঘোষণা করিব, যে, কয়েকটি মহিলা প্রাণপণে এই দোকানটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নারীশক্তির জয় হইবেই। বঙ্গদেশের নারীরা কলিকাতায় বেড়াইতে আসিলে একবার ভাণ্ডারটি দেখিয়া পরিচালিকাগণকে উৎসাহিত করেন এই তাঁহাদের নিকট নিবেদন। এখানে আমার বলা উচিত যে, বিদেশপ্রত্যাগত বাঙালী পুরুষকর্ম্মীদের নিকট আমরা সব সময়ে উৎসাহ পাইয়াছি। তাঁহারা যেন পত্নীদের সহিত ভাণ্ডারে আগমন করিয়া আমাদের সাহায্য করেন।



ভারতবর্ষ

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, ফেব্রুয়ারী মাসের হিসাব—

ব্রিটিশ ভারতের ফেব্রুয়ারী মাসের আমদানী রপ্তানির হিসাবে দেখা যায় যে, জানুয়ারী মাসের তুলনায় আমদানী ও রপ্তানি উভয়ই হ্রাস পাইয়াছে।

ফেব্রুয়ারী মাসে ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে, অর্থাৎ জানুয়ারী মাসের তুলনায় ৯৮ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। রপ্তানির পরিমাণ ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ জানুয়ারীর তুলনায় ৮২ লক্ষ টাকা কম।

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারীর তুলনায় এ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে খাদ্যদ্রব্য, পানীয় এবং তামাকের আমদানী ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কারখানাজাত পণ্যের আমদানী ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার এবং কাঁচা মালের আমদানী ১৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

চিনি, খাদ্য, শস্য, ময়দা, মদ্য এবং সিগারেট প্রভৃতির আমদানী হ্রাস পাওয়ার ফলেই খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির খাতে আমদানী এত কম হইয়াছে।

গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় ৯৬ হাজার টন জাভা চিনি আসিয়াছিল। এ বৎসর আসিয়াছে ৪৯ লক্ষ টাকায় ৬৮ হাজার টন। বীট চিনিও মূল্য হিসাবে ২৫ লক্ষ টাকা এবং ওজনে ২২ হাজার টন হ্রাস পাইয়াছে।

সিগারেটের আমদানী ওজনে ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার পাউণ্ড হইতে হ্রাস পাইয়া ৪৯ হাজার পাউণ্ডে এবং মূল্যে ১৩ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া মাত্র ২ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

মদ্যের আমদানী পরিমাণে ৮ লক্ষ ১২ হাজার গ্যালন হইতে ৪ লক্ষ ১৪ হাজার গ্যালনে এবং মূল্য হিসাবে ৪২ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৭ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

কাঁচা মালের মধ্যে কেরোসিনের আমদানী ৪০ লক্ষ টাকা হইতে ৬৭ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে।

কারখানাজাত মালের মধ্যে সূতা ও সূতী জিনিষের আমদানী ২২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটর গাড়ীর আমদানী ২৬ লক্ষ টাকা এবং মোটর-বাসের আমদানী ১৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চাউলের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টন হইতে ২ লক্ষ ৪১ হাজার টনে—মূল্য হিসাবে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। গম ও চায়ের রপ্তানি বহুল পরিমাণে কমিয়াছে।

তুলার রপ্তানি পরিমাণে ৪৮ হাজার টন এবং মূল্যে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

পাটের রপ্তানি ৪৮ লক্ষ টাকায় ৫০ হাজার টন হইতে ৪৪ লক্ষ টাকায় ২১ হাজার টনে নামিয়াছে।

ভারতবাসীর দৈনিক আয়—

জনপ্রতি দৈনিক আয়—ভারতবর্ষে ৵১০, জার্ম্মানীতে ২৲, ইংলণ্ডে ২/৪ পাই, আমেরিকায় ৩৲ টাকা।

—

বাংলা

চিনির কারখানা ও ইক্ষুর চাষ—

ইদানীং বিদেশী বস্ত্রের ন্যায় বিদেশী চিনিও বর্জ্জন করিতে লোকেরা বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বহু স্থানে চা'য়ে পর্য্যন্ত চিনির পরিবর্ত্তে গুড় ব্যবহৃত হইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ চিনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইত। এখন পুনরায় চেষ্টা করিলে চিনি যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন হইতে পারে। সহযোগী '২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ' বলেন—

ভারতের ৪৪টা চিনির কারখানা হইতে ৩০ লক্ষ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ৪৪টা চিনির কারখানার মধ্যে ৩০টা কারখানায় ইক্ষু রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই চিনির কারখানা আছে। কারখানা ব্যতীতও দেশী উপায়ে সমগ্র ভারতে প্রায় ৫৪ লক্ষ মণ চিনি হয়। মোট ৮৪ লক্ষ মণ চিনি ভারতে উৎপন্ন হয়। বিদেশে চিনি আমদানী হয় ২৭০ লক্ষ মণ। দেশীয় প্রথায় চিনি উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে কেন-না তাহা ব্যয় সাধ্য।

আগামী ৭ বৎসরের জন্য চিনির উপর শতকরা ৭০ টাকা শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বাংলা দেশে অনেকগুলি ছোট কারখানা স্থাপন করা সম্ভব। আমরা আশা করি বাঙালী যুবকগণ চিনিরসায়নজ্ঞ লোকের সাহায্য লইয়া ও ব্যবসায়ীর সহিত সহযোগিতা করিয়া চিনির কারখানা স্থাপন করিবেন।

কর-প্রদানে হিন্দু-মুসলমান—

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়হিসাবে কতজন ও কি পরিমাণে কর সরকারকে প্রদান করেন নিম্নের হিসাব হইতে তাহা বুঝা যাইবে। হিসাবটি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনৈক সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

গ্রামের বিবরণ

	মুসলমান	অমুসলমান	মোট
ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্সদাতা	৩৩৭১৬০৭	২২০২২৬৬	৫৫৭৩৮৭৩
ইউনিয়ন কমিটিতে ট্যাক্স-দাতার সংখ্যা	১৩৮১	১৮১২৭	২৯৫০৮
চৌকিদারী ট্যাক্স দেয়	৩৮১৭৩৮৲	৬৫৩৪৯৫৲	১০৩৫২৩৩৲



ইন্দ্রের রাজ্যাভিষেক

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কলিকাতা ব্যতীত সদর			
কলিকাতা, হাওড়া ও দার্জ্জিলিং ব্যতীত মিউনিসিপ্যালিটী-সমূহের ট্যাক্সদাতা	৯৩১৮৩	২৬২৭২৭	৩৫৫৯১০

কৃতী শ্রীযুক্ত অবনীমোহন রায়—

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত নরোত্তমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অবনীমোহন রায় দ্বাদশ বৎসর কাল বিলাতে থাকিয়া হিসাব পরীক্ষা কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সংপ্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। স্কটল্যাণ্ডের হিসাব-পরীক্ষক বোর্ড (Scottish Board) হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম। অবনী-বাবু ষোল বৎসর ব্রহ্ম-সরকারের অধীন কর্ম্ম করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে শিক্ষালাভার্থ বিলাতে গমন করেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও উৎসাহ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতী ছাত্রী—

শ্রীমতী কমলরাণী সিংহ ১৯৩১ সনে এম্-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত বিষয়ের ডি গ্রুপে অর্থাৎ বেদান্তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং সকল পাঠ্যসমষ্টির ফলের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছেন। কমলরাণী সোণামণি ও হেমচন্দ্র গোস্বামী পদকও লাভ করিয়াছেন।

অমৃত সমাজ—

যুগে যুগে সমাজে নানারূপ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়া থাকে। যাহারা নূতনকে অভিনন্দন করিয়া লইতে অক্ষম তাহারা মৃতপ্রায়। হিন্দুর সমাজ নূতনকে গ্রহণ করিবার শক্তি হারাইয়াছে বলিয়াই আজ তাহার এই দুর্গতি। এই দুরবস্থায় যুগধর্ম্মের শিক্ষানুযায়ী যাঁহারা ইহার সংস্কারেচ্ছু তাঁহারা বাস্তবিকই সমগ্র হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হ। অমৃত সমাজ এইরূপ একটি প্রচেষ্টা। ইহা হিন্দুর চিরন্তন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সমাজদেহের বিবিধ কলঙ্ক ও ক্ষত অপনোদন করিয়া ইহাকে সুষ্ঠু করিতে বদ্ধপরিকর। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন এবং অস্পৃশ্যগণের শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ, বাল্যবিবাহ বর্জ্জন, বিধবাবিবাহ সমর্থন ও প্রচলন, স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সৎশিক্ষা প্রদান অমৃত সমাজের কর্ম্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সেন প্রমুখ কর্ম্মিগণের চেষ্টায় কয়েকটি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত ৫।১৩ওলাইচণ্ডী রোডস্থ পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে সাধারণ বিদ্যা ছাড়া বিবিধ কারুশিল্পও ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১০ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীটেও কলিকাতা হিন্দু একাডেমি নামে আর একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমাজের আনুকূল্যে এ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে। অনাথা ও নিরাশ্রয়াদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠারও সঙ্কল্প সমাজের আছে। ৬ নং মুরলীধর সেন লেন, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা অথবা পি২১৬, বালিগঞ্জ এভিনিউ, কলিকাতা—ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে অমৃত সমাজ সম্বন্ধে সম্যক অবগত হওয়া যাইবে।

—

বিদেশ

আয়ার্লণ্ডের স্বাতন্ত্র্য-প্রচেষ্টা—

আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা বহুমুখী ও বহু শতাব্দী ব্যাপী। বহু শতাব্দীর জীবনান্তকর চেষ্টার পর ১৯২১ সনের ৬ই ডিসেম্বর আয়ার্লণ্ডের ও ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিগণের মধ্যে যে বোঝাপড়া হইয়া যায় তাহার ফলে আয়ার্লণ্ড-বাসীরা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ক্যানাডার মত আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছেদ প্রয়াসী আয়ার্লণ্ডের অত্যগ্রসর দল ও তাঁহাদের নেতা শ্রীযুক্ত ডি ভ্যালেরা এইটুকু আত্মকর্ত্তৃত্বলাভে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত আয়ার্লণ্ড-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই স্বরাজের আমলেও ডি ভ্যালেরা একবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। সাধারণতন্ত্র স্থাপনপ্রয়াসী সেনারাও দলে দলে কারাগার পূর্ণ করিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে ডি ভ্যালেরা বুঝিতে পারিলেন যে স্বদেশীয়গণ পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ইহার সংশোধনার্থ নিয়মানুগ আন্দোলন চালানই শ্রেয়, কারণ তাহা অধিকতর ও আশু কার্য্যকরী। এই হেতু ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্রীদল আয়ার্লণ্ডের পার্লামেণ্টে স্বাধিকার বিস্তার করিতে মনস্থ করিলেন। বিগত কয়েক বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে এ-বৎসর সাধারণতন্ত্রীরা পার্লামেণ্টে সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছেন এবং নেতা ডি ভ্যালেরা সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সন্ধির সর্ত্তের যে-যে দফায় সাধারণতন্ত্রীদের ঘোর আপত্তি ছিল ডি ভ্যালেরা সভাপতি পদে বৃত হইয়াই তাহা বর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বংশপরম্পরায় আয়ার্লণ্ড কর্ত্তৃক ইংরেজ রাজের আনুগত্য স্বীকার সন্ধিপত্রের এরূপ একটি আপত্তিজনক দফা। দফাটি ইংরেজীতে এইরূপ,—

I...do solemnly swear true faith and allegiance to the constitution of the Irish Free State as by law established and that I will be faithful to H. M. King George V., his heirs and successors by law, in virtue of the common citizenthip of Ireland with Great Britain and her adherence to and membership of the group of nations forming the British commonwealth of nations.

শপথের তিনটি অংশ,—(১) আয়ার্লণ্ড-সরকারকে মানিয়া চলা, (২) ইংলণ্ডেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করা, এবং (৩) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া থাকা।

ডি ভ্যালেরা আরও একটি বিষয় রদ করিতে মানস করিয়াছেন। সন্ধির সর্ত্তের মধ্যে স্থান না পাইলেও ইংরেজ-সরকারকে আয়ার্লণ্ডের বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট হারে সেলামী দেওয়া তখন স্থির হইয়াছিল। ডি ভ্যালেরা এই অপমানকর প্রথাটিও তুলিয়া দিতে বদ্ধপরিকর।

আইরিশ নেতার এই স্পষ্ট উক্তিতে ইংরেজ-সরকারের টনক নড়িয়াছে। বিলাতে একদল লোক ডি ভ্যালেরার প্রস্তাবের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লোপের বীজ উপ্ত দেখিয়া সাজ সাজ রবে দেশবাসী তথা সরকারকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, আয়ার্লণ্ডকে আশু প্রকৃতিস্থ করিতে না পারিলে ভারতবাসীরাও ক্ষেপিয়া উঠিয়া ভীষণ অনর্থ ঘটাইবে। আয়ার্লণ্ডকে সায়েস্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও 'লৌহ শাসন' চালানো তাহাদের সুচিন্তিত অভিমত।

আয়ার্লণ্ডের শান্তিপূর্ণ এই স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় পরাধীন দেশের সহানুভূতি প্রকাশের ক্ষমতা না থাকিলেও আজ স্বাধীন এবং স্বাধীনতাকামী লোকেরা তাহার এই সাধু প্রচেষ্টার সাফল্যলাভ সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছে।

আলোচনা

"দেশের পথে"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের 'দেশের পথে' গল্পটিতে অসহায় উৎকলীয় মজুরের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা পরিস্ফুট। কিন্তু গল্পটির উদ্দেশ্য, সমবেদনা প্রকাশ করা কি একটা সমগ্র জাতি বা সমাজকে ব্যঙ্গ করা বোঝা কঠিন।

শ্রীভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী।

গল্পটিতে এরূপ কোন অসৎ অভিপ্রায় নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।

বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসংঘ

মাঘ মাসের প্রবাসীর ৬০৪ পৃষ্ঠায় আপনি লিখিয়াছেন, "বর্ণাশ্রমীদের কন্‌ফারেন্সও হইয়াছিল। ... ইঁহারা বর্ণাশ্রমবিহিত স্বরাজ চান। ...। বর্ণাশ্রমবিহিত স্বরাজটি কি প্রকার চীজ হইবে তাহা বোধাতীত।"

এই কন্‌ফারেন্স যে "বর্ণাশ্রম বিহিত স্বরাজ" চান, এই তথ্য আপনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ?* এই শব্দগুলি কন্‌ফারেন্সের কোন মন্তব্য বা প্রচারপত্রে ব্যবহৃত হয় নাই। আমি এই পত্রের সহিত ঐ কন্‌ফারেন্সের স্বাগতকারিণী সভার ছাপা বিবৃতি * একখণ্ড পাঠাইলাম। ইহার তৃতীয় প্যারাগ্রাফে দেখিতে পাইবেন।

"এই বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসংঘের মূল উদ্দেশ্য,—শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রতিপাদিত চিরন্তন সদাচারসম্মত সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ-সাধন, এবং সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ের সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ্যলাভ ও তদনুকূল ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করণ।"

আপনি নিজ-কল্পিত* কয়েকটি শব্দকে এই সভার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু সভার উদ্যোগিগণ যাহাকে সভার উদ্দেশ্য বলিয়াছেন তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। *

আপনি লিখিয়াছেন, "ইঁহারা বংশাৎ ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি চান। সুতরাং ইঁহাদের এ যুগের পরিবর্ত্তে অতীত কোনও একটা সময় বাছিয়া লইয়া তাহাতে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল।"

কিন্তু কোনও বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণ করা কি ইঁহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে ? ভগবানের ইচ্ছায় ইঁহারা এ যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে ভগবানের এই কার্য্য আপনার মনঃপূত হয় নাই। †

আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু আপনার শ্লেষবাক্যের কি ইহাই অর্থ নহে যে, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রতিপাদিত হিন্দুধর্মে যাঁহারা আস্থাবান্,—যথা রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ,—যথা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺বালগঙ্গাধর তিলক,—তাঁহারা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী, অতএব এখনকার এই সভ্যযুগে বাঁচিয়া থাকিবার তাঁহারা অধিকারী নহেন ? সনাতন পন্থীদিগকে আপনি ভ্রান্ত বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা যে-মত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা প্রচার করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে, এ কথা যদি আপনি অস্বীকার করেন তাহা হইলে আপনার বিরুদ্ধে অন্ধ গোঁড়ামীর অভিযোগ আনা যায় না কি ?‡

আপনি বলিয়াছেন, "বংশাৎ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য" এই সভার উদ্দেশ্য। ইহাও আপনার কল্পিত। * সভায় উদ্যোগিগণ কোথাও এ-কথা বলেন নাই। এই সভা মনুর স্মৃতির সমর্থক, কিন্তু ইঁহাদের মতে মনু ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারাও ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তথাপি সকল ব্রাহ্মণ ইঁহাদিগকে ভগবান্-জ্ঞানে পূজা করেন। অধিকন্তু এই সভা কেবল ব্রাহ্মণদের সভা নহে। সকল বর্ণের হিন্দু ইহাতে যোগদান করিয়াছেন।‡‡

আপনি বাল্যবিবাহের কথা বলিয়াছেন। আপনার মতে বাল্য-বিবাহের বহু দোষ, শাস্ত্রকারগণের মতে বালিকার অল্পবয়সে বিবাহ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, বিলম্বে বিবাহের বহু দোষ। এ বিষয়ে মতভেদ থাকিবে, কিন্তু অসহিষ্ণুতা কেন ?** ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক একত্র থাকে, তাহাদের সামাজিক আচার বিভিন্ন, এখানে পরমত সহিষ্ণুতা না থাকিলে সকলের একত্র শান্তিতে বাস করা কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই সহজ সত্যের উল্লেখ করিতে আমি লজ্জিত হইতেছি।

আমি এরূপ আশা করি না যে, আপনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা বাল্যবিবাহ সমর্থন করিবেন। কিন্তু আমি কি ইহা আশা করিতে পারি না যে, আপনি এই সকল বিষয় সহিষ্ণুভাবে আলোচনা করিবেন ?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

---

* কোন কোন দৈনিক কাগজে প্রকাশিত বৃত্তান্ত হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সভার বিবৃতি সভার উদ্যোক্তারা আমাকে পাঠান নাই। কল্পনা করিয়া কিছু লেখা আমার অভ্যাসবিরুদ্ধ। পুরাকালে যেরূপ বর্ণাশ্রম ছিল এখন তাহা নাই, উহা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব, এবং বর্ণাশ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বরাজ্য স্থাপন অসম্ভব—ইহা এখনও আমার মত।—প্রবাসীর সম্পাদক।

† লেখক পরিহাসের গম্ভীর প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভগবান্ যাঁহাদিগকে যে যুগে পাঠান, তাঁহাদের সেই যুগের উপযোগী কাজ করা উচিত।—প্রবাসীর সম্পাদক।

‡ এই সকল প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। লেখক যাঁহাদের নাম করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বর্ণাশ্রমের সমর্থক ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহাদের জীবিতকালে "বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসঙ্ঘ" নামক খিচুড়ীর সৃষ্টি না-হওয়ায় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মতপ্রকাশের সুযোগ হয় নাই।

কাহারও বিশ্বাসানুযায়ী মতপ্রকাশে আমি কখনও বাধা দিতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করি নাই। কিন্তু সকলের মতের আলোচনা করিবার অধিকার আমার আছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

* কল্পনা নহে, অনুমান।—প্রবাসীর সম্পাদক।

‡‡ যত হিন্দুই ইহাতে যোগদান করুন, তাঁহারা বর্ণাশ্রম মানিলে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্যও মানিতে হইবে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

** অসহিষ্ণুতা নাই; যাহা অনেক প্রাচীনতম শাস্ত্রের মতেও অনিষ্টকর তাহাকে অনিষ্টকর বলিবার অধিকার আমার আছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

তারা

চৈত্রের 'প্রবাসী'তে "তারা" শীর্ষক প্রস্তাবের শেষভাগে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়ে তারা যে মদ্যপান করিয়াছিলেন এবং রাম যে সীতাকে আদর করিয়া মৈরেয়ক মদ্য পান করাইয়াছিলেন তাহা কোন ব্যক্তি কর্তৃক তারা এবং সীতার চরিত্রকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। রজনীবাবুর এই মন্তব্যে আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভারতবর্ষে এমন লোক কখনই ছিল না যে সীতার চরিত্র হেয় করিতে ইচ্ছা করিতে পারে। আর দেশের প্রথা অনুসারে রাম যদি একটু মদ্যপান করিতেনই এবং সীতাকেও একটু পান করাইতেন অথচ যখন তাঁহারা মত্ত হইতেন না তখন তাঁহাদের চরিত্র হেয়ই বা কেন হইবে? মদ্যপান করা যে সেকালে অত্যধিকরূপে প্রচলিত ছিল তাহা রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ এবং কালিদাসের কাব্য পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়। রাম যে সীতাকে মদ্য পান করাইয়াছিলেন ইহা ঐতিহাসিক হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কিন্তু ইহা যে তদানীন্তন দেশ-প্রচলিত প্রথার প্রতীক ইহা মনে করা যাইতে পারে। যে-কার্য্যে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, যাহাতে স্বাস্থ্য হানি হয় না, যাহাতে কাহারও অনিষ্ট হয় না এমন কার্য্যে দোষ ধরা উচিত নহে।*

তারার প্রতি এই অভিমত আরও অধিকরূপে প্রযোজ্য। তিনি ছিলেন একটি অনার্য্য-জাতীয় নারী। তাঁহার সমাজে মদ্যপান ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তিনি নূতন স্বামী সুগ্রীবের সহিত মদ্যপান প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহারা রামলক্ষ্মণের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে লক্ষ্মণ অতিমাত্রায় কুপিত হইয়া সশস্ত্র হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তারাই বিলাস ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। লক্ষ্মণকে প্রসন্ন বা বশ করাই অবশ্য তারার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যে ভাবে সজ্জিত হইয়াছিলেন বলিয়া রামায়ণে বর্ণনা আছে তাহাতে রামায়ণকারের মনুষ্য-চরিত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে। এমন আচরণে বিশেষতঃ একজন অনার্য্য-জাতীয় নারীর হেয় হইবার কি থাকিতে পারে?

ভালমন্দ নির্ণয় করিবার মানদণ্ড সকল সমাজের এবং সকল মানুষের একরূপ নহে। আমি যে, কার্য্য দূষ্য বলিয়া মনে করি এবং ঐতিহাসিক কোন ভক্তিভাজন ব্যক্তির চরিত্রে যদি সেই কার্য্যের আরোপ দেখি, তাহা হইলে সেই আরোপ মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু সেই ভক্তিভাজন ব্যক্তির মানদণ্ডে হয়ত সেই কার্য্য মোটেই দোষাবহ ছিল না।

শ্রীবীরেশ্বর সেন

* মদ্যপানে স্বাস্থ্যহানি বা কাহারও অনিষ্ট হয় না, ইহা সত্য নহে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

তিনশো পঁয়ষট্টির এক

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

কয়েক দিন যাবৎ বিষম গুমট পড়িয়াছে। রাত্রিতে ঘুমাইবার উপায় নাই, সারারাত্রি পাখা-হাতে এপাশ-ওপাশ করিয়া কাটাইতে হয়; তন্দ্রাঘোরে পাখাটা হাত হইতে পড়িয়া গেলে ঘামে সারা গা ভিজিয়া যায়, তন্দ্রাও ভাঙিয়া যায়। এর উপর মশার উপদ্রবও বাড়িয়া গিয়াছে। রাত্রি এইভাবে কাটাইয়া ভোরে উঠিয়া রাইচরণ দাওয়ার উপরে হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিল। স্ত্রী নিত্যকালী সম্মার্জ্জনীর কাজ শেষ করিয়া এঁটো বাসন লইয়া ঘাটে গিয়াছে; ছেলেমেয়েরা সারারাত্রি উপদ্রব করিয়া ভোরের বাতাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঝিমাইতে ঝিমাইতে রাইচরণ স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন তাহার বাড়িটা তিনতলা-দালান হইয়া গিয়াছে, ছাদের উপর নিত্যকালী ছেলে-মেয়েদের লইয়া ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়া একথালা পান্তা খাইতেছে, আর সে যেন মরিয়া চিল হইয়া বাঁশের ডগায় বসিয়া সব দেখিতেছে। তিনকড়ি চক্কোত্তি টাকার তাগাদায় আসিয়া হতভম্ব হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে, বাঁশের উপর তাহাকে দেখিয়া ঢিল ছুড়িতেছে, কিন্তু ঢিল অতদূর পৌঁছিতেছে না। অশ্বিনী শীল তামাক খাইতে খাইতে আসিয়া তিনকড়ি চক্কোত্তিকে হুঁকা বাড়াইয়া দিয়া বলিতেছে, খুড়ো তামাক খাও। রাইচরণের বিষম ভাবনা হইল, চক্কোত্তি-মশায় অশ্বিনী শীলের হুঁকায় তামাক খাইবে কি করিয়া? এমন সময় অশ্বিনী আবার বলিল, খুড়ো তামাক খাও। চরণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, দেখিল অশ্বিনী শীল তাহাকেই বলিতেছে, খুড়ো আগুনটা যে গেল, টেনে খাও।

চরণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, বলিল, অশ্বিনী যে, এত সকালে যাচ্ছ কোথায়?

অশ্বিনী চরণের হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া টানিতে

টানিতে কহিল, আর খুড়ো আমার কি একদণ্ড বসে থাকবার উপায় আছে? আজ হাট-বার, চলেছি ও-পাড়ায় তাগাদায়; বেটারা বাপু-বাছা ব'লে নেবার সময় ত নেয়, তারপর আর চিৎহাত উপুড় করবার নাম করে না। তা খুড়ো, তোমার পয়সা ক'টা আজ দিয়ে ফেল না? কালত শুনলাম ঘোষেদের ওখানে কিছু পেয়েছ।

—আর ভাই সে কথা বল কেন? ধনীই বল আর গরিবই বল্ কারু হাত দিয়ে আজকাল কিছু গলে না। তোমার পয়সাটার জন্যই ঘোষেদের ওখানে গায়ে জর নিয়েও খাটলাম, তা আজ-কাল ব'লে কেবল ভাঁড়াচ্ছে। আর কটা দিন সবুর কর, হাতে পয়সা হ'লে আমি নিজেই দিয়ে আসব, তোমার আসতে হবে না।

—হা, তা না আর কিছু। তিন বেলা হেঁটেই যা পাচ্ছি! তা পয়সা দিতে পারবে না অত খাওয়ার সখ যায় কেন? মঙ্গলবারের মধ্যে আমার পয়সা চাই-ই, কোন ওজর শুনব না। হুঁ খুড়ো,—এও দিন দিন নয়, মনে থাকে যেন।—অশ্বিনী রাগিতে রাগিতে চলিয়া গেল।

চরণ তামাকটা শেষ করিয়া কাপড়ের খুঁট খুলিয়া একটাকা সওয়া-ন-আনা পয়সা গণিয়া কাছায় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিল; তারপর গা মোড়ামুড়ি দিয়া উঠিয়া পড়িল। গোয়াল হইতে গরু কয়টা বাহির করিয়া তাদের জাব দিল, পরে গাড়ু লইয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

নিত্যকালী বাসন কয়খানা ধুইয়া এক ঘড়া জল লইয়া ঘাট হইতে আসিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে মেজ ছেলে হারু উঠিয়া পড়িয়াছে। তাহার আজ দেড়মাস যাবৎ জর হইতেছে, পিলেও বাড়িয়া গিয়াছে। ছোট মেয়েটা কয়েক দিন হইল এই রোগেই মারা গিয়াছে। তাহাকে তবু যদু কবরেজের দুইটা বড়ি খাওয়ান হইয়াছিল। সেই পয়সাই কবরেজকে দেওয়া হয় নাই, সে কি আর অষুধ দিবে? দুই দিন হইল ছেলেটার জরের বড় বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে। আজ শনিবার, শমসের কবরেজকে ডাকিয়া একটা ঝাড়া দেওয়াতে পারলে ভাল হয়।

জলের ঘড়া রাখিয়া দিয়া নিত্যকালী ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েদের জাগাইয়া দিল, পরে বিছানার মাদুরখানা উঠাইয়া ঘরটা ঝাঁট দিয়া ফেলিল। রোগা ছেলেটা ক্ষুধায় কাঁদিতেছিল, ঘুম হইতে উঠিয়া আর দুটিও তাহার সঙ্গে যোগ দিল; বড় মেয়েটি গোবর-জল আর মাটি লইয়া রান্নাঘর লেপিতে লাগিয়া গেল।

চরণ মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিল। হাত মুখ ধুইয়া রোগা ছেলেটার গায়ে হাত দিয়া দেখিল জর আছে কি না। জর খুবই আছে, ভোরের দিকে বোধ হয় একটু বেশী হইয়া আসিয়াছে। সোয়া-পাঁচ আনার গান্ধী-মাদুলীতে দেখা যাইতেছে কোন ফলই হইল না। ছেলে-গুলিকে কাঁদিতে দেখিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, ও পেঁচীর মা, ওদের কিছু পেতে দাও না, দুটো মুড়ি থাকে ত হারুকে দাও। পেঁচীর মা ওরফে নিত্যকালী বিড়বিড় করিয়া আপন মনে বকিতেছিল, এইবার মুখ ছুটাইবার একটা সুযোগ পাইল। ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "আছে বাসি· আকার ছাই, তাই খাও অখন। তিন দিন ধরে বল্‌ছি চাল বাড়ন্ত, তা মিনসের কানেই ওঠে না। কেবল রাতদিন বসে বসে তামাক গাঁজা খাওয়া। ছেলেটা এদিকে বাঁচে না। আমার মরণ নাই, মড়ার যম আমাকে দেখে না।

চরণ আজ ছয় দিন হইল একটান গাঁজাও টানিতে পারে নাই, গাঁজার দোকানে জোর পিকেটিং চলিতেছে। গাঁজার অভাবে তাহার পেট ফুলিয়া গিয়াছে, অনিদ্রার তাহাও একটি কারণ। গাঁজা খাওয়ার উল্লেখ মাত্র আগুনে ঘি পড়িল, "কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, সকাল-বেলা উঠেই গাল মন্দ। চৌদ্দ হাত কাপড়ে কাছা নাই তাদের আবার জোর গলায় কথা।" নিত্যকালীর চুলের মুঠি ধরিয়া চরণ পিঠে বেশ দু-ঘা বসাইয়া দিল, সে সুর করিয়া কাঁদিতে লাগিল, ছেলে তিনটার কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

চরণ মেয়েকে ডাকিয়া বলিল, কি রে পেঁচী, কিছু আছে? পেঁচী বলিল, আছে বাবা, তুমি ওদের নিয়ে বস, আমি দিচ্ছি। চরণ ছেলেদের লইয়া দাওয়ায় বসিয়া পড়িল। পেঁচীর ঘরলেপা হইয়া গিয়াছিল, সে হাত ধুইয়া একটা থালায় কিছু পান্তা ভাত ও তার তিনগুণ

কচুর শাক লইয়া আসিয়া বাপের সম্মুখে রাখিয়া দিল। চরণ কহিল, তোদের আছে? পেঁচী বলিল, কিছু শাক আছে, ভাত আর নাই। চরণ কিছু ভাত উঠাইয়া লইতে বলিল, পেঁচী সম্মত হইল না, যে চারিটি ভাত, বাবার এবং ভাইদের উহাতেই কিছু হইবে না অগত্যা চরণ কিছু শাক উঠাইয়া পেঁচার হাতে দিল। অসুস্থ ছেলেটাকে শাক এবং পান্তার জল দেওয়া যায় না, তাহাকে শুধু চারিটি ভাত জল ছাড়াইয়া নুন দিয়া দেওয়া হইল, সে শাকের জন্য কিছু কান্নাকাটি করিয়া অগত্যা তাহাই খাইতে লাগিল।

খাওয়ার পর চরণ রোগা ছেলেটার হাত ধুইয়া দিল, পেঁচী আর দুটি ভাইকে আঁচাইয়া দিয়া এঁটো লইয়া ঘাটে চলিয়া গেল। চরণ দাওয়ায় উঠিয়া আর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইল। নিত্যকালীর কান্না সমানেই চলিতেছিল। একখানা দা হাতে নীলু মণ্ডল আসিয়া ডাক দিল, "কি হে চরণ, কাজে যাবে না, বড় যে তামাক খাচ্ছ? চরণ হুঁকা বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে কহিল, না দাদা, আজ সকাল সকাল একটু হাটে যাব ভাবছি। ও-পাড়ায় কটা পয়সা পাব, দেখি আদায় করতে পারি কি না।

তামাক খাইয়া নীলু চলিয়া গেল, চরণও একখানা গামছা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পেঁচী বলিল, বাবা, চাল বাড়ন্ত, চাল আনবে তবে ভাত হবে। চরণ কহিল, আচ্ছা, এ বেলার মত চাল কিনে আনব, তার পর হাট থেকে ধানই আনব এক টাকার। চরণ চলিয়া গেলে পেঁচী মাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া আনিল। দুইজনে সেই শাকটুকু খাইয়া জল খাইল, তারপর মিত্রদের বাড়ি হইতে দুই কাঠা ধান লইয়া আসিল, চাল করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে কিছু পাওয়া যাইবে।

চরণ হন-হন করিয়া চলিতেছিল, সকালে না গেলে বেণী কামারকে ধরা যাইবে না, পয়সাও আদায় হইবে না। কালীতলা পার হইয়া যেই মাঠে পড়িবে অমনি দেখে রহমৎ কাবুলী সেইদিকে আসিতেছে। সে ধাঁ করিয়া বাঁ-দিকের বটগাছটার আড়ালে গা ঢাকা দিল; ভাগ্যে রহমৎ দেখিয়া ফেলে নাই। গত বৎসর তাহার নিকট হইতে চরণ তের টাকায় নিজের একখান আলোয়ান ও দশ টাকায় ছেলেদের দুইটা কোট কিনিয়াছিল। সেদিন টাকার জন্যে বিশেষ তম্বি করিয়া গিয়াছে, আজ দেবার তারিখ, দেখিতে পাইলে আর রক্ষা নাই। যাহা হউক রহমৎ পাশ দিয়া চলিয়া গেল, চরণ বলির পাঁঠার মত কাঁপিতেছিল ও দুর্গানাম জপিতেছিল। কাবুলী চলিয়া গেলে সে বাহির হইয়া এক রকম দৌড়াইয়াই মাঠ পার হইয়া গেল।

বেণীকে বাড়ি পাওয়া গেল না। দু-সের চাল কিনিয়া গামছায় বাঁধিয়া চরণ নিলু মণ্ডলের বাড়ি গিয়া বসিয়া রহিল, কি জানি রহমৎ হয়ত এখনও বসিয়াই আছে। বাস্তবিক রহমৎ বসিয়াই ছিল। অন্যান্য কয়েক বাড়ি টাকার তাগিদ দিয়া রহমৎ চরণের বাড়ি আসিয়া সে বাড়ি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল, পেঁচী জানাইল বাড়ি নাই। কোথায় গেছে জিজ্ঞাসা করাতে পেঁচী বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার মা চোখ টিপিয়া নিষেধ করিল। তখন পেঁচী বলিল, কোথায় গিয়াছে তাহা তাহারা জানে না, শীঘ্র ফিরিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। তথাপি রহমৎ বাহিরে আমগাছতলায় বসিয়া রহিল। বেলা পড়িয়া গেল, চরণের দেখা নাই। তখন রহমৎ উঠিয়া চরণের সহিত নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া চলিয়া গেল, সে বলিয়া গেল আগামী শনিবার আসিবে, টাকা যেন পায়, নাহ'লে সে চরণকে খুন করিবে এবং বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিবে।

এদিকে ধানভানা হইয়া গেল। চাল নাই, চরণেরও দেখা নাই, রান্নার উপায় কি? আর একটু পরেই ছেলেরা খাইতে চাহিবে, নিজেদেরও যথেষ্ট ক্ষুধা পাইয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া মিত্রদের চাল হইতে দেড় সের লইয়া পেঁচী রাঁধিতে বসিল, নিত্যকালী চাল লইয়া মিত্রদের বাড়ি গেল। সেখানে ইঁদুরের উপদ্রব এবং এখনকার ধানে চাল কত কম হয় ইত্যাদি বলিয়া মিত্রদের বউকে চাল বুঝাইয়া দিয়া আসিল, ভাগ্যে গিন্নী বাড়ি ছিলেন না।

পেঁচী রান্না করিতেছিল, এদিক-ওদিক চাহিয়া চরণ বাড়ি আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল রহমৎ এইমাত্র চলিয়া গিয়াছে, শাসাইয়া গিয়াছে শনিবারে

টাকা না পাইলে চরণকে খুন করিবে। যাহা হউক, উপস্থিত বিপদ ত কাটিয়া গিয়াছে, খুন করিলেই হইল, মগের মুল্লুক কিনা, হুঁ। স্নান করিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া চরণ হাটে চলিয়া গেল; তামাকটুকু খাওয়ার অবসর পাইল না, বেলা পড়িয়া গিয়াছে।

হারুর জ্বর খুব বাড়িয়া গিয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। হারুর কাছে পেঁচীকে বসাইয়া নিত্যকালী ছেলে দুটিকে খাওয়াইল। পরে নিজে ছেলের কাছে বসিল, পেঁচী ভাত লইয়া খাইল। ভাত বেশী ছিল না, যাহা ছিল পেঁচী কিছু খাইয়া কিছু মার জন্য রাখিল। পেঁচী খাইয়া যাই ঘাটে গিয়াছে অমনি হারুর ফিট হইল। নিত্যকালী একটু অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ চাহিয়া দেখে ছেলের এই অবস্থা। সে চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পাড়ার অনেকে আসিয়া পড়িল। হাট-বার, পুরুষ মানুষ কেউ বাড়ি ছিল না, মেয়েরা আসিয়া কেবল কোলাহল করিতে লাগিল। নিত্যকালী উঠানে গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। একজন দৌড়িয়া গিয়া মহেশের মাকে ডাকিয়া আনিল। মহেশের মা ঝাড়ায়, জলপড়ায় টোটকা ঔষধে সিদ্ধহস্ত, কত রোগী সে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। সে আসিয়া প্রথমে একটা 'ঝাড়া' দিল, তাহাতে উপকার না হওয়ায় কিছু জলপড়িয়া হারুর মুখে চোখে ঝাপটা দিল, ক্রমে হারুর চোখ নামিল ও দাঁত ছাড়িল, তাহার ফিট ছাড়িয়া গেল। নিত্যকালী উঠিয়া তাহাকে কোলে লইল। রমণীবৃন্দ যে যাহার মত নিত্যকালীকে উপদেশ দিয়া মহেশের মার প্রশংসা করিতে করিতে ক্রমে প্রস্থান করিল। নিত্যকালী ছেলেকে আর কোল হইতে নামাইতে সাহস করিল না, তাহার খাওয়াও আর হইল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, পেঁচী উঠিয়া ঘরে, তুলসী তলায়, প্রদীপ দেখাইল। রন্ধন করিবার কিছু নাই, যে-কয়টা ভাত ছিল তাহা ভাইদের খাওয়াইয়া তাহাদিগকে শোয়াইল; তারপর মায়ের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাইচরণ জোর পা চালাইয়া হাটের দিকে যাইতে-ছিল, রাস্তায় নেপাল ঢুলেকে তামাক খাইতে দেখিয়া তাহার কল্কেতে কয়েকটা টান দিয়া লইল। পাশের বাড়ির মালী-বৌ পথে দেখিয়া চরণকে ডাকিয়া একটা টাকা দিয়া দিল তাহার জন্য এক টাকার ধান কিনিয়া আনিতে।

হাটে পৌঁছিয়া চরণ প্রথমেই গাঁজার দোকানের ওদিকে গেল, যদি কোন রকমে কিছু কিনিতে পারা যায়। দেখিল কয়েক জন ভলাণ্টিয়ার সার বাঁধিয়া শুইয়া আছে, গাঁজা পাইবার কোন উপায় নাই। অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। দুই এক জন ভলাণ্টিয়ারদের মাড়াইয়াই যাইতে চেষ্টা করিয়াছে, আর সকলে তাহাদের থামাইয়া দিতেছে, চরণ দেখিল গাঁজা পাইবার কোন উপায় নাই। সে অন্য দিকে যাইতে পা বাড়াইয়াছে এমন সময় হাটের উত্তর দিকে ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। মাঝে মাঝে হাট লুট হইতেছিল; ভলাণ্টিয়ারগণ উঠিয়া সেই দিকে ছুটিল, অনেক লোকও সেই দিকে ছুটিল, অনেকে আবার পৈতৃক প্রাণ লইয়া উল্টা দিকে ছুট দিল। চরণ এবং তাহারই মত বুদ্ধিমান অন্য কয়েক জন লোক ভাবিল এই ত সুযোগ; তাহারা গাঁজার দোকানের জানালায় উপস্থিত হইল। চরণ ভাবিল গাঁজা কিনিবার এমন সুযোগ আর মিলিবে না। ধান ত সব সময়েই পাওয়া যাইবে, সে এক টাকার গাঁজা কিনিয়া ফেলিল।

তাড়াতাড়ি গাঁজা কিনিয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে এমন সময় এক যণ্ডামর্ক-গোছের লোক দরজা ভাঙিয়া দোকানে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া দোকানদার বাধা দিতে চেষ্টা করিতেই তাহাকে এক পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়া যতটুকু গাঁজা ছিল সব কোঁচড়ে লইয়া লোকটা দুই লাফে বাহির হইয়া গেল। সকলে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দাঙ্গা নিবারণের জন্য হাটে পুলিস মোতায়েন ছিল। গুণ্ডা পলাইবার পর যখন চরণের দল বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন পুলিস আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। কয়েক জন দৌড়িয়া পলাইয়া গেল, চরণেরা সাত জন ধরা পড়িল, সকলের নিকট হইতেই কিছু কিছু গাঁজা বাহির হইয়া পড়ায় তাহারাই যে অপরাধী এ-বিষয়ে পুলিসের আর সন্দেহ রহিল না। দোকান-

দারের সাক্ষ্যেও প্রকাশ পাইল তাহারা কয়েক জনে দরজা ভাঙিয়া দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকানদারকে মারধোর করিয়া গাঁজা ছিনাইয়া লইয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয়, হালদার সাহেব ছিলেন খুব দয়ালু লোক, গাঁজার মর্য্যাদাও বিশেষ বুঝিতেন। বিস্তর কান্নাকাটি করিয়া এক টাকার গাঁজা ও এক টাকা সওয়া-ন-আনা পয়সা তাঁহাকে পান খাইতে দিয়া রাত্রি প্রায় ১০টার সময় রাইচরণ অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বাড়ির দিকে চলিল। ভাগ্যে মালী-বউ ধান কিনিতে টাকাটা দিয়াছিল!

শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের প্রদর্শনী

শ্রীশান্তা দেবী

গত জানুয়ারী মাসে চিত্রকর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের গৃহে চিত্রপ্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। এই প্রদর্শনী তাহারও মাসাধিক পূর্ব্বে ডিসেম্বর মাসে খোলা হইয়াছিল। সামান্য তিনখানি ঘর শিল্পীর তুলিকাস্পর্শে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। দুইখানি ঘরে দেওয়ালের উপরদিকে যামিনী-বাবুর নিজ অঙ্কিত নানাবর্ণের সুদীর্ঘ পটগুলি ফ্রেস্কোর মত চারিধার জুড়িয়া লম্বা করিয়া বসানো হইয়াছিল। তাহার নীচে এক একখানি স্বতন্ত্র বড় ছবি। ছবির নীচে ছোট ছোট কাঠের পিঁড়িতে মাটির পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছে ও ধুনুচিতে ধুনা। মেঝেগুলিতে আলিপনার চিত্র; বসিবার আসনও চেয়ার নয়, একেবারে স্বদেশী আসন। চিত্রগুলির অঙ্কন-পদ্ধতি বাংলার পট-অঙ্কনের পদ্ধতির মত। তাই এই সম্পূর্ণ বাংলা গৃহসজ্জা। তাহার সহিত মিলিয়া কলিকাতা শহরের পুরাতন পাড়ার বাংলার পল্লীর স্নিগ্ধরূপ ও প্রাকৃতিক বর্ণসুষমা ঘরের কোণেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কোন্ জাতীয় চিত্র-প্রদর্শনী কি করিয়া সাজাইতে হয়, শিল্পী তাহা অধিকাংশের অপেক্ষাও ভাল দেখাইয়াছেন।

যামিনীবাবু পুরাতন শিল্পী। দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টে তাঁহার পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকা অনেক ছবি দেখিয়াছি। তিনি তৈলচিত্রে বড় বড় প্রতিকৃতি আঁকিতেন। তাহার পর তাঁহার আঁকা বাঙালা



একখানি পুরাতন পট
সম্ভ্রান্ত বাঙালী ভদ্রলোক



একখানি পুরাতন পট
জমিদার-গৃহিণী

ইহার সাদৃশ্য আছে। পাশাপাশি উপবিষ্টা দুই সখীর একটি চিত্র অনেকটা এই রকম। বালক কৃষ্ণ-বলরামের সুন্দর চিত্রটি ঠিক এই রকম না হইলেও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষার পরিচয় ইহাতেও পাওয়া যায়। তবু এই চিত্র-গুলির ভিতর শিল্পীর বাঙালী প্রাণ আপনাকে অনেকখানি প্রকাশ করিয়াছে। বাঙালী পুরাতন পটুয়াদের ছবির নকল তিনি করেন নাই। নিজের শক্তির স্বাভাবিক বিকাশে যে রীতিতে তিনি পৌছিয়াছেন, তাহার সহিত পটের সাদৃশ্য আছে মাত্র।

ঘরোয়া ছবিও দেখিয়াছি। তবে সেগুলির অঙ্কন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বদেশী ছিল না।

গত পাচ ছয় বৎসর হইতে তিনি পুরাতন পাশ্চাত্য পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া নূতন নূতন পদ্ধতিতে আঁকার পরীক্ষা করিতেছেন।

তিনি বলেন, তৈলচিত্র আঁকিতে আঁকিতে তাঁহার মনে হয়, রঙের বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া শুধু রেখার ভাষার সাহায্যেই চিত্রকরের মনের ভাব ব্যক্ত হওয়া উচিত। তাই রং ছাড়িয়া শুধু সাদা পটের উপর কালো তুলির রেখার সাহায্যেই তিনি কিছুদিন ছবি আঁকেন। এই ছবিগুলি সম্পূর্ণ বাংলা ধরণের নয়, খানিকটা আধুনিক পাশ্চাত্য ইম্প্রেসনিষ্ট রেখাচিত্রের সহিত



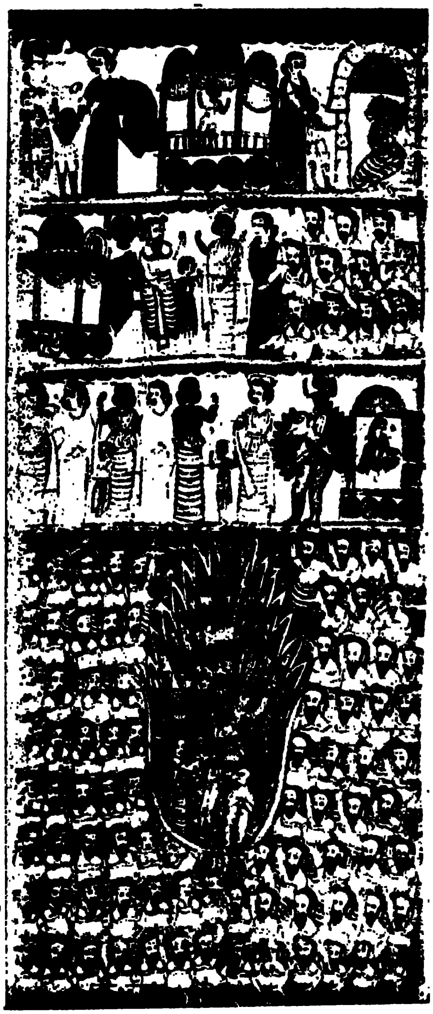
একখানি পুরাতন পট
এই পটে বিশ্রামরত একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালীকে চিত্রিত করা হইয়াছে। তিনি মালাজপ করিতেছেন।



প্রাচীন পট
সম্ভ্রান্ত বাঙালী ও তাঁহার পত্নী—দুইজনেরই হাতে একটি করিয়া পানের খিলি।

তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে বাংলা চিত্র সংগ্রহ করিবার জন্য ঘুরিয়াছেন। কালীঘাট হইতে সুরু করিয়া মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় প্রভৃতি নানা গ্রামে তিনি যে-সকল পুরাতন পট সংগ্রহ করেন তাহাও তাঁহার প্রদর্শনীর একটি ঘরে সজ্জিত দেখিলাম। তিনি দেখিলেন বাঙালী পটুয়ারাও প্রধানতঃ রেখার সাহায্যেই তাহাদের মনের কথা আশ্চর্য্য নিপুণ ভঙ্গীতে বলিয়া গিয়াছে। ইহারা শুধু যে শিবপার্ব্বতী, দশানন, বালী-সুগ্রীব, লক্ষ্মী-সরস্বতীর ছবিই আঁকিয়াছে তাহা নয়, তাহাদের চোখে-দেখা এই বাংলা দেশের নানা ছবিও তাহারা এই তুলির কালো রেখার স্বচ্ছন্দ ও শক্তিশালী ভাষায় বলিয়া গিয়াছে। প্রসাধনশেষে সুন্দরী কবরীতে স্বহস্তে ফুল পরাইয়া দিতেছেন, তাঁহার আনত মুখ, দেহযষ্টিতে বেষ্টিত বস্ত্রাঞ্চল, ঊর্দ্ধে উত্থিত বাহুলতা, আঙুলের ডগায় সযত্ন স্পর্শে ফুলধরার ভঙ্গী—সব যেন পটুয়া একটি রেখারই বহুমুখী গতির সাহায্যে আঁকিয়া গিয়াছে। বৃষ্টির জলধারা যেমন মাটির উপর দিয়া ডালপালার ভঙ্গীতে স্বাভাবিক ভাবে গড়াইয়া চলিয়া যায়, পটুয়াদের এই রেখাগুলিও যেন তুলির মুখ হইতে তেমনি সহজে বাহির হইয়া ছবির রূপ ধরিয়া উঠিয়াছে। বাঙালী ধনী হুঁকা-হাতে তামাক খাইতে বসিয়াছেন, প্রণয়ীযুগল পরস্পরকে সপ্রেম-স্পর্শে প্রেম নিবেদন করিতেছে, তরুণী দীর্ঘকেশ রোদে শুখাইতেছে, বিড়াল প্রকাণ্ড চিংড়ি মাছ ধরিয়া খাইতেছে—এইরূপ নানা বিষয়ই দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙালী পটুয়ারা তুলির বাঁকা টানে আঁকিয়া গিয়াছে। বাংলার গ্রামের ঘর হইতে এই রেখাচিত্রগুলি এবং রঙীন পটগুলি সংগ্রহ করিতে করিতে যামিনীবাবুর মনে হয়, বাংলার চিত্রশিল্পকে পুনর্জ্জীবন দান করিতে হইলে অজন্তা রাজপুত কিংবা মোগল-পদ্ধতি অনুকরণ করিয়া চলিলেই হইবে না। এগুলি ভারতীয় চিত্রপদ্ধতি সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা ভাষা যেমন বাঙালীর নিজস্ব ভাষা, তেমনি বাংলার পট বাঙালীর একান্ত নিজস্ব চিত্র। বাঙালী শিল্পীকে এই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে এবং সেই

পথে তিনি আপনা হইতেই, বিনা অনুকরণে, অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙালী শিল্পী রাজপুত কি অজন্টা চিত্রপদ্ধতির সাহায্যে চিত্তকমলের সকল দলগুলি মেলিয়া ধরিতে

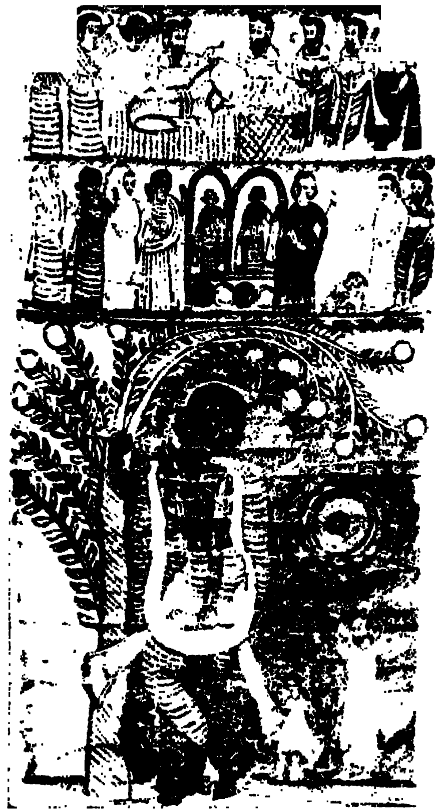


পুরাতন পট

নরমেধ যজ্ঞ (উর্দ্ধাংশ)

পারিবেন না। যে ভাষা নিজের ভাষা নয় তাহা আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে বলিয়া তাহাকে সৃষ্টির উপায় করিয়া তোলা যায় না।

যামিনীবাবুর রঙীন পটগুলির অধিকাংশই মণ্ডন-শিল্পের ধরণের। বিশেষ কোনো বিষয় লইয়া আঁকা একক চিত্র অথবা কাহিনীর চিত্রাবলী সেগুলি নয়। কৃষ্ণ ও গোপিনীদের চিত্রটি মণ্ডনশিল্পের মত হইলেও বিশেষ একটি বিষয় লইয়া আঁকা। বাল্মীকি ও কুশ লব, সীতা ও লবকুশ ইত্যাদি ছোট ছোট কয়েকটি কাহিনীমূলক ছবি আছে। বাকী বড় চিত্রগুলি নানাভঙ্গীতে উপবিষ্টা, অর্ঘ্যহস্তে দাঁড়াইয়া অথবা পূজা-নিবেদন-ভঙ্গীতে আনতা রমণী মূর্ত্তিগুলিকে মোটিফ হিসাবে ব্যবহার করিয়া নানা



নরমেধ যজ্ঞ (নিম্নাংশ)

[রবীন্দ্র-জয়ন্তী চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত একটি পুরাতন পট। এই চিত্রটির সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত যামিনী রায়। বর্ত্তমানে উঁহার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্তা স্টেলা ক্রামরিশ। এই চিত্রটি বেশী দীর্ঘ বলিয়া দুই ভাগ করিয়া মুদ্রিত করিতে হইয়াছে]

রঙে পটগুলি সাজানো হইয়াছে। এই ছবিগুলির বর্ণ-সুষমা ও স্বচ্ছন্দ রেখাপাত দেখিয়া মন স্নিগ্ধতায় ভরিয়া যায়। রংগুলি সবই বাংলা পটের সকল রকম মাটির রং। তবে আমরা আজকালকার চিত্রপ্রদর্শনীতে যে পটগুলি দেখিতে পাই তাহা অপেক্ষা যামিনীবাবুর নিজের আঁকা চিত্রের বর্ণসুষমা চক্ষুকে বেশী আনন্দ দেয়।

যামিনীবাবু মাতৃমূর্ত্তি এবং আরও দুই একটি নারী-চিত্রে



কৃষ্ণ রাজা
শ্রীযামিনী রায়

রং ও রেখা দুইয়েরই বাহুল্য যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া বড় সাদা জমির উপর দুই চারিটি রঙের মোটা টান দিয়া ছবির বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। অলঙ্কারবাহুল্যবর্জ্জিত এই প্রকার রিক্ত ছবির সাহায্যে ভাবপ্রকাশের সাধনা এখন তিনি করিতেছেন। এই ছবিগুলির মধ্যে সামান্য যা অঙ্কন-রীতির প্রকাশ আছে তাহা বাংলারই। তবে যামিনীবাবু নিজের ইচ্ছামত সেগুলিকে আরও সাদাসিধা করিয়া তুলিয়াছেন।

যামিনীবাবু নানাপদ্ধতিতে বহুদিন ছবি আঁকিয়া একের পর একেকটিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সুতরাং চিত্রাঙ্কনের নানা নিয়মই তাঁহার জানা আছে। কোন্ পদ্ধতি বাঙালী শিল্পীর আত্মপ্রকাশের পথ, তাহা বলিবার অধিকার তাঁহার আছে। বাংলার চিত্র-পদ্ধতির ভিতর নানা শক্তির ও প্রকাশ-ভঙ্গিমার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ইহা যদি অজন্টা কি রাজপুতনার মত ঐশ্বর্য্যশালী না হয়, তাই বলিয়া ইহাকে পিছনে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঙালীর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা, ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে। বাঙালী শিল্পীর দানে এই চিত্রাঙ্কন-রীতিকে যদি সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে তাহা বাংলার প্রতিভারই পরিচয় হইবে।

বহুকাল পূর্ব্বে শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু মহাশয় বাংলা পুঁথির পাটার চিত্রের পদ্ধতিতে দশরথ ও রামচন্দ্র, কৌশল্যা ও রামচন্দ্র, অহল্যা ও রামচন্দ্র, শবরী ও রামচন্দ্র, প্রভৃতি কতকগুলি ছবি আঁকিয়াছিলেন। প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত রামায়ণে তাহা আছে। ছবিগুলিতে অজন্টার প্রভাব আছে। তবু ইহাতে বাংলার ঐতিহ্যের প্রভাবও যথেষ্ট। মায়ামৃগবধ ও সীতার ছবিতে শিল্পীর বাঙালীত্ব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। আরও কয়েক বৎসর পরে নন্দলালবাবুর 'নবকুমার' নামে একটি মা ও শিশুর ছবি বাংলা পটের ধরণে আঁকা দেখিয়াছি মনে হইতেছে। সম্প্রতি কয়েকটি ঋতুর চিত্রও এই জাতীয় মনে হইয়াছিল। ছবিগুলি একটিও আমার কাছে নাই। আমার মনে যেটুকু ছাপ আছে তাহা হইতেই লিখিতেছি, তবে নন্দলালবাবুর সৃজনীশক্তি অদ্ভুত, সুতরাং তাঁহার কোনো ছবিকে নির্দ্দিষ্ট একটা পদ্ধতির গণ্ডীর ভিতর ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা আমাদের মত সামান্যজ্ঞান লইয়া না করাই উচিত। তাঁহার প্রতিভা-বলে তিনি নিজস্ব নানা পদ্ধতিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের মা-যশোদার গোদোহন প্রভৃতি দুই একটি পটের ধরণের ছবি দেখিয়াছি মনে হইতেছে। শ্রীযুক্তা সুনয়নী দেবীর চিত্রেও বাংলার নিজস্ব চিত্রকলা-পদ্ধতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

যাহা হউক বাংলার চিত্রপদ্ধতি লইয়া আলোচনা এবং ইহাকেই বাংলার প্রকাশভঙ্গী করিবার চেষ্টা যামিনীবাবু অনেকদিন হইতে চিত্রপ্রদর্শনাদি দ্বারা এবং একান্ত ইহারই সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া করিতেছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এইরূপ প্রদর্শনী একটি করিয়া-



বাল্মীকি ও লবকুশ
শ্রীযামিনী রায়

ছিলেন; তাহার পর ১৩৩৭ সালের চৈত্র মাসে করিয়াছিলেন; আবার সম্প্রতি গত পৌষে এইটি করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় গতমাসে এইরূপ একটি প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। তাহাতে বঙ্গীয় পুরাতন দারুশিল্পও প্রদর্শিত হইয়াছিল। দত্ত-মহাশয়ের প্রদর্শনীতে দেবদেবীরও পৌরাণিক চিত্র বিস্তর ছিল। রায়-মহাশয়ের প্রদর্শনীতে নানা সামাজিক, সাংসারিক ও ঘরোয়া ছবিও ছিল। পুরাতন রেখা-চিত্র রায়-মহাশয়ের সংগ্রহে অনেক ছিল, দত্ত-মহাশয়ের সংগ্রহে রঙীন দীঘ চিত্রাবলীতে পৌরাণিক গল্প বলার ছবিই অধিকাংশ। প্রদর্শনীগুলি দেখিয়া যাহা মনে আছে, তাহাই লিখিলাম। তালিকা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। এই প্রকার প্রদর্শনী দ্বারা বাংলার শিল্পসংগ্রহ সমৃদ্ধ এবং শিল্পীদের দৃষ্টি বাংলা অঙ্কন-পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হইলে উদ্যোক্তাদের চেষ্টা সার্থক হইবে। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত কোন কোন ছবি পরে প্রকাশিত হইতে পারে।

মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার এমন একদিন ছিল যখন বঙ্গবাসী মুসলমান বাংলা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে গিয়া খাটি বাংলা ভাষাই ব্যবহার করিতেন। "ও-ভাষা হিন্দুদের, অতএব বর্জ্জনীয়",—এ-রকম বিদ্বেষবুদ্ধি তখনও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই। তখন এ-দেশের রাজা আরব কি কি তুর্কী বংশজাত মুসলমান; তথাপি পরাগল খাঁর মহাভারত, কি দরাফ খাঁর গঙ্গা-স্তোত্রে জোর করিয়া বঙ্গভাষা ও সংস্কৃত ভাষার অঙ্গে আরবীর ছাপ দেওয়ার কষ্টকৃত ও হাস্যকর চেষ্টা দেখা যায় নাই। সে চেষ্টা হইতেছে এখন, অর্থাৎ মুসলমানগণ এদেশে প্রায় হাজার বৎসর বাস করিবার পর। যে-মনোবৃত্তি মক্তব-মাদ্রাসা হইতে ভারতের অতীত ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তাহারই ফলে হিন্দু-বিদ্বেষের বহ্নিতে পরোক্ষভাবে ইন্ধন যোগাইবার জন্য ঐ সকল বিদ্যালয়ে এক অদ্ভুত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজ সরকার ও তদনুগত এক শ্রেণীর মুসলমান ইহার নাম রাখিয়াছেন—"মুসলমানী বাংলা"। ভাষার ঐক্য জাতীয়তার জন্য অপরিহার্য্য। যে-জাতির মাতৃভাষাকেও সাম্প্রদায়িকতার খাতিরে বিভক্ত করার চেষ্টা সম্ভব হয়, সে-জাতির রাষ্ট্রীয় একতা সুদূরপরাহত। বাংলা দেশ এই বিষয়ে ভারতের অন্য প্রদেশগুলির চেয়ে সৌভাগ্যবান্ ছিল। অন্য প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের বর্ণমালা ও ভাষা হিন্দুদের বর্ণমালা ও ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু বাংলায় এ পার্থক্য, হিন্দু ও মুসলমান সাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না। বঙ্গবিভাগের সময় হইতে এই কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া উহাকে চিরস্থায়িত্ব দান করিবার প্রবল প্রয়াস চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গ-বিভাগ রহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাঙালীর মাতৃ-ভাষা-বিভাগ ইংরেজ সরকার ও এক শ্রেণীর মুসলমান পূর্ণ উদ্যমে চালাইতেছেন। দেশহিতকামী বাঙালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, এই জাতীয়তাবিরোধী চেষ্টায় বাধা দেওয়া। নতুবা বাংলার কৃষ্টি রক্ষা করা পরিণামে একেবারে অসম্ভব হইতে পারে।

আরবী-পদাশ্রিত "মুসলমানী বাংলা" নামক ভাষার বিস্তৃত এবং নিয়মিত প্রচার হইতেছে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মক্তব-মাদ্রাসার মধ্য দিয়া। যদিও সাধারণ মুসলমানগণের জন্য লিখিত এমন অনেক "কিতাব" দেখা যায় যাহাদের অন্ধ আরবী অনুকরণের ফলে ঐগুলি এমন করিয়া ছাপা, যে পড়িতে গেলে শেষ দিক হইতে "আরম্ভ" করিতে হয়, এবং গোড়ায় আসিয়া "শেষ" করিতে হয়। যাহা হউক, বঙ্গদেশের প্রায় সাতাইশ হাজার মক্তব-মাদ্রাসায়, সরকারী পাঠ্যপুস্তক সভার অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা কি প্রকারের "বঙ্গ-ভাষা"র পঠনপাঠন হইতেছে তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকখানি পুস্তক হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য অ-মুসলমানের বাংলা পুস্তক মক্তব-মাদ্রাসায় অপাঠ্য।

"মোহাম্মদ মোবারক আলি প্রণীত মক্তব মাদ্রাসা সাহিত্য, প্রথম ভাগ" প্রথম শ্রেণীর বালকদের পাঠ্য। প্রকাশক এই গ্রন্থকারের রচিত মক্তব পাঠ্য পুস্তকগুলি সম্বন্ধে "১৯৩১ সালের নতন পাঠ্য তালিকা"য় বলিতেছেন :—

> "বাজারে প্রকাশিত এই শ্রেণীর পুস্তকগুলিতে জাতীয় শব্দ, জাতীয় ভাব ও জাতীয় বিষয়ের অভাব দেখিয়া আমরা তাহা দূর করিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি।"

পুস্তকে ২২টি গল্প আছে। প্রথমেই "মোনাজাত" (=প্রার্থনা) নামক পদ্য। "খোরাক", ও "পানি"র সঙ্গে সঙ্গে "শিশুর প্রার্থনা" "শিশুর সাধনা" এবং "বিদ্যা"ও আছে। "শিশুর অর্চনা" কবিতার শেষ ৪ লাইন এই :—

"পালিব খোদার আজ্ঞা সদা প্রাণপণে,
সেবিব ওস্তাদ আর যত গুরুজনে।"

"ফেরেস্তা, জিন, বেহেস্ত, দোজখ, আসমান, জমীন, চন্দ্রসূর্য্য, আগুন, পানি, মানুষ, গরু,—সবই তিনি পয়দা করিয়াছেন।" (৩ পৃঃ)

"যে মেহেরবান আল্লাহ্‌তালার দয়ায় আমরা পাইয়াছি,—একমাত্র তাঁহাকেই সেজদা (= সাষ্টাঙ্গ প্রণাম) করিবে এবং তাঁহারই এবাদৎ (= আরাধনা) করিবে।" (৪ পৃঃ)

পূর্ব্বোদ্ধৃত রূপ মুসলমানী "বাংলা" শব্দ মক্তব-মাদ্রাসায় যে-শিশুরা পড়ে তাহাদের পক্ষেও অসহ্য মনে করিয়াই বোধ হয় লেখক ঐ গল্পের শেষে "শব্দার্থ" দিয়াছেন :—

পয়দা সৃষ্টি, দোজখ নরক, বেহেস্ত-স্বর্গ, আসমান আকাশ।

"যাহারা খোদাতালাকে এক জানিয়া তাঁহার এবাদৎ(= আরাধনা) না করিবে, তাহারা গোনাহগার [= পাপী] হইবে এবং আখেরে খোদার গজবে [= ক্রোধে] পড়িয়া দোজখের আগুনে জ্বলিতে থাকিবে।(১৩ পৃঃ)

"পাক [= পবিত্র] কোরাণের ধর্ম্মই একমাত্র সত্যধর্ম্ম।...কোরাণ শরীফ পড়িলে সওয়াব [= পুণ্য] হয়, মন পবিত্র থাকে ও প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়। বাটীতে কোর-আন শরীফ পাঠ করিলে শয়তান পলাইয়া যায় এবং বালা মসিবত [= আপদ-বিপদ] কাটিয়া যায়। প্রত্যহ পাক সাফ [= পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন] হইয়া কোরাণ শরীফ পাঠ করা উচিত।" [১৩ পৃঃ]

"হজরত মুসা এলেমে কিমিয়া [= রসায়নবিদ্যা] জানিতেন।" [৪৪পৃঃ]

"তুমি মালদার [= ধনী] হইয়াছ" [ঐ]। আবার—"সে খুব ধনী হইল।" [ঐ]

"কিন্তু সে বড়ই কৃপণ ছিল। এতিম [= পিতৃহীন] মিস্‌কিন [= ভিক্ষুক], গরীব, ফকীর কাহাকেও এক পয়সা খয়রাত [= দান] করিত না।" [৪৪ পৃঃ]

"বখীলের [= কৃপণের] মাল [= ধন] কোন কাজে লাগে না।" [৪০ পৃঃ]

"তাপ [= সূর্য্য] উঠিবার পূর্ব্বে নিয়েত [= সংকল্প] করিয়া তাপ ডুবিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত উপবাস করাকে রোজা বলে।"

উদ্ধৃত বাক্যগুলি দেখিয়া পাঠক স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, উহা কি বাংলা ভাষা, না বাংলা অক্ষরের সাহায্যে আরবী শিক্ষার চেষ্টা? "পাক কোরাণ" না বলিয়া "পবিত্র কোরাণ" বলিলে, অথবা "সওয়াব হয়" এর পরিবর্ত্তে "পুণ্য হয়"। অথবা "পাকসাফ" না বলিয়া "পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন" বলিলে বোধ হয় ভাষাটা "হিঁদুর বাংলা", অতএব মুসলমানের অপাঠ্য, হইয়া পড়িবে। অথচ শিক্ষিত মুসলমানেরা "হিঁদুর বাংলা" সম্বন্ধ একেবারে অজ্ঞ, এ-কথা যে সত্য নহে তাহার প্রমাণ এই পুস্তকেই অনেক আছে। "খোরাক" প্রবন্ধে—"আমরা যাহা আহার করি", "রোগীর খাদ্য", "ভাল খাদ্য", "সুখাদ্য", "পরিপাক হয়" ইত্যাদি আছে। অথচ প্রবন্ধের নাম "খোরাক"। দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধের মধ্যে "খোরাক" কথাটি মাত্র দুইবার এবং "খাদ্য" পাচ বার ব্যবহার করা হইয়াছে। ঐরূপ :—"তিনি ফজরে উঠিয়া" (৩৫ পৃঃ); আবার "সকালে উঠিয়া আমি" (৩৪ পৃঃ), এবং "এই ভাবিয়া তিনি ...প্রাতে" (৩৬ পৃঃ)। "এইরূপ খাব দেখিলেন" (৩৫ পৃঃ), তিন লাইন পরে- "আবার স্বপ্ন হইল"। "কাবা শরীফ" প্রবন্ধে—"**তীর্থস্থান**", "**পবিত্র** কাবাগৃহ", "**পবিত্র** জমজম", "খোদাতায়ালার **দয়ায়**।" বড় অক্ষরে ছাপা শব্দগুলি আরবী ভাষায় না দেওয়ায় ভাষা নিশ্চয়ই অশুদ্ধ কি অনিষ্টকর হয় নাই। জোর করিয়া অনাবশ্যক পরিমাণে আরবী শব্দ ঢুকাইবার চেষ্টার ফলে বহু স্থানে সংস্কৃতমূলক শব্দের সহিত আরবী ফার্সী শব্দের হাস্যকর সমাবেশ হইয়াছে। যথা :—

"পানির নাম জীবন হইল কেন ?" [৪১ পৃঃ]
"এই পানি পান করিলে রোগ জন্মিবে।" [৪২ পৃঃ]
"মেহেরবান্ আল্লাহ্‌তায়ালার দয়ায়।" [৪ পৃঃ]

"কোরাণ শরীফ" প্রবন্ধে :—"পবিত্র কেতাব কোরাণ শরীফ" এবং "পাক (= পবিত্র) কোরাণ, "পাপ পুণ্য" ও "শেরেক বেদাৎ (= ভালমন্দ) এবং "সওয়াব" (= পুণ্য) হয়। ১১ পৃষ্ঠায় "খুনজখম করিয়া কাটাইত" বাক্যে "খুন-জখম' কথাটি প্রচলিত বাংলা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ১৭ পৃঃ "শব্দার্থে"—"রক্ত—খুন", এইরূপ আছে। আর এক স্থানে :—"ছেলের একটি পশমও কাটে নাই।" (৩৭ পৃঃ)। আমাদের ভাষায় মানুষের চুলকে পশম বলে না—কোন কোন পশুর লোমকে পশম বলে।

মক্তব-মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণীর বাঙালী শিশুগণকে বাঙালীর বাংলা সম্বন্ধে যথাসম্ভব অজ্ঞ রাখিয়া বাংলা অক্ষরের সাহায্যে আরবী-ফার্সীতে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার প্রবল প্রয়াস সম্বন্ধে যাঁহারা ইহার পরও সন্দিহান, তাঁহারা নিম্নলিখিত "শব্দার্থ"গুলি লক্ষ্য করুন :—

"প্রদীপ—চেরাগ [৯পৃঃ]; অন্ধকারে—দেমাকে [১০ পৃঃ]; মাংস—গোস্ত [২২ পৃঃ]; গুরুজন—মুরুব্বিগণ [৩৪ পৃঃ]; ধার্ম্মিক—দীনদার [৩৮ পৃঃ]; স্বপ্ন—খাব [ঐ]; বিদ্যা—এলেম [৩৯ পৃঃ]; স্নান—গোসল [৪৩পৃঃ]; কৃপণ—বখীল [৪৬পৃঃ]; ধনী - মালদার।"

এইরূপ অ-স্বাভাবিক উপায়ে অ-বাঙালা শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করাইবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—কেবল সরকারী চাকুরী, কাউন্সিলের সভ্যসংখ্যা,

বিদ্যালয়ে সরকারী অর্থসাহায্য ইত্যাদি বিষয়ে "মুসলমানদের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থার" ন্যায়, বাংলা ভাষার সম্বন্ধেও "একটা পৃথক্ ব্যবস্থা" পাকা করা। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের বগী বিন্দি যেমন স্বামীকে বঁটি দিয়া কাটিয়া ভাগ করিয়া লইতে গিয়াছিল, মাতৃভাষাকে ভাগ করিয়া লওয়ার এই মনোবৃত্তিও কি সেইরূপ নহে? স্বাভাবিক নিয়মে জনসাধারণ কর্তৃক বহুকাল ব্যবহারে যে-সকল বিদেশী শব্দ সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, উদার বাংলা ভাষার অঙ্কে তাহারা সাদরে স্থান পাইয়াছে। যে সকল বিদেশী শব্দের বাংলা হয় না, তাহাতেও আপত্তি নাই। "আমি এক কাপ চা খাইব" চলিতে পারে; কিন্তু "আমি ওয়ান্ কাপ চা ড্রিঙ্ক করি" ইহা অসহ্য। তেমনি পূর্ব্বোক্ত কষ্টপ্রয়াস দ্বারা আনীত বিদেশী (আরবী-ফার্সী) শব্দগুলি যেন নিমন্ত্রণ-সভায় অনাহূতের মত অ-শোভন, ভাতের মধ্যে কাঁকরের মত পীড়াদায়ক।

অথচ সুশিক্ষিত শিষ্টভাষাপটু মুসলমান লেখককেও হিন্দুবিদ্বেষ ও আরবী অনুকরণেচ্ছা রূপ সমাজের দূষিত মনোবৃত্তির সন্তোষসাধনার্থ ঐ "খিঁচুড়ি" ভাষাই ব্যবহার করিতে হইয়াছে; স্বভাবতঃ ও সহজেই যে-ভাষা আসিয়া পড়ে, অকারণ মাঝে মাঝে দু-একটা বিকট আরবী ফার্সী কথা মিশাইয়া, সেই ভাষাকে একটু কুৎসিত করিয়া, তবে একশ্রেণীর লোকের আদরণীয় করিতে হইয়াছে। "ডক্টর পণ্ডিত" মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত "মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা ২য় ভাগ" তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

ঐ পুস্তকের প্রথম গল্প "প্রভাত" (ফজর নহে); "রাত্রি প্রভাত হইয়াছে" বেশ কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে "পূর্ব্বদিকে আসমানের লম্বা লম্বা শাদা রেখা দেখা যাইতেছে।" তবু ভাগ্য, যে "সফেদ রেখা" না বলিয়া "শাদা রেখা" বলা হইয়াছে। কিন্তু "আসমানের" পরিবর্ত্তে "আকাশের" কি মুসলমান বালকগণের পক্ষে একেবারে দুর্বোধ্য হইত? "ঈমান" গল্পে—"তিনি সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে সৃষ্টি করে নাই। তিনি দয়াময়"—নিখুঁত বাংলা। কিন্তু "তাহারা নিষ্পাপ" লিখিয়া বোধ হয় পরেই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ "তাহারা সকলে বে-গোনাহ" (নিষ্পাপ) লেখা হইয়াছে। "মহম্মদের উপর কুর্-আন অবতীর্ণ হইয়াছে।" কিন্তু "অন্যান্য পয়গম্বরগণের উপরও কিতাব নাযেল (অবতীর্ণ) হইয়াছিল"। "পরলোকের উপর ঈমান আনিবে" (বিশ্বাস করিবে) আবার "তক্দীরে"র (ভাগ্যের) উপর "ঈমান" আনিবে, "আখেরাতের (পরকালের) উপর ঈমান আনিবে।"

"পানি" গল্পে:—"জলকে মুসলমানেরা পানি বলে, পানির কোন আকৃতি, রং, গন্ধ অথবা আস্বাদ নাই। পানি তরল পদার্থ (চীজ নহে?)। পানি না হইলে আমরা বাঁচিতে পারি না। এইজন্য সাধুভাষায় পানির এক নাম জীবন।" এই গল্পে "পানি" ও "সাফ" এই দুইটি কথার বদলে "জল" ও "পরিষ্কার" বসাইলে কোন হিন্দু লেখকের রচনার সহিত ইহার পার্থক্য থাকে না। উচ্চশিক্ষিত মুসলমান লেখক বোধ হয় ঐ ভয়েই দুইটি খুত ইচ্ছা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।

"বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজনীয়তা", "পিওর ওয়াটারের প্রয়োজনীয়তা"র মতই কতকটা শুনায় না কি? এই গল্পে—"আমাদের শরীরে জলীয় ("পানীয়", বলিলেই বা ঠেকায় কে?) অংশ আছে", "শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের দরকার, সেইরূপ পানিরও দরকার"; "গোসল করে" লিখিয়া আবার "স্নানাদি কার্য্য সারিবে", "খাওয়ার পানির" মত "পানীয় (কোন্ শব্দের বিশেষণ?) জলও" আছে।

"হজরতের অতিথি সেবা" গল্পে—"মেহমানদারী" (=অতিথি সেবা) ১ বার, ও "অতিথি সেবা" ২ বার, "মেহমান্" (=অতিথি) ১ বার, "অতিথি" ২ বার ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই লেখকের "মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা" (তৃতীয় ভাগ নামক পুস্তকেও ঐরূপ ভাষা। "মদিনাতেই তিনি এন্তেকাল করেন" (=মৃত্যু হয়) আবার "আল্লাহ তা আলার উপাসনা (এবাদত নহে?) করিতেছিলেন।" (প্রথম গল্প)। "মহাসাগরের পানি" এবং "নীলবারি-রাশি" দুইই আছে। "দয়াস্বরূপ", "করুণাময়" (মেহেরবান নহে!) এ সব শব্দ ব্যবহারে মাদ্রাসার ছাত্রগণের

ক্ষতি হইবে বলিয়া ত মনে হয় না। ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় "গরমীকালে ফল খেতে কত মজা", আবার অন্যত্র মজা—আস্বাদ। "হজরত ইয়ুসুফ" গল্পে পিতা পুত্রকে হিন্দুর মতই "বাছা" বলিতেছেন, কিন্তু পুত্র পিতাকে "আব্বাজান" বলিতেছে, "স্বপ্ন" আছে, "খাব" নাই। কিন্তু পাছে মুসলমান পাঠকেরা মনে করেন লেখকের আরবী-ফার্সীর প্রতি "দরদ" কম, বোধ হয় সেই আশঙ্কা এড়াইবার জন্য নিম্নলিখিত রূপে বাংলা শব্দের "অর্থ" দেওয়া হইয়াছে:—কৃতজ্ঞতা—শোকরগুযারি (২৯ পৃঃ), মাহাত্ম্য—বোযর্গী (৩৮ পৃঃ), মহাপাপ—কবীরাহ, গোনাহ (৫৭ পৃঃ)। একস্থানে হত্যা—খুন, অন্যত্র, খুন—রক্ত (৬ পৃঃ)। ঐ পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে যে "শব্দার্থ" দেওয়া আছে তাহার কয়েকটি এই:—কড়ি—পয়সা, নিষ্পাপ=বে-গুনাহ (৬ পৃঃ), পাপপুণ্য—নেকিবদি (৭ পৃঃ), আশ্রয়—পানাহ (৮ পৃঃ), আস্বাদ—মজা (১১ পৃঃ), মৃদু—আহেস্তা (২০পৃঃ), স্বপ্নাদেশ—খাবের হুকুম (২৫পৃঃ) দুরাত্মা—গরীব (২৫পৃঃ) (অতএব দরিদ্রেরাও "দুরাত্মা" !), ইতরপ্রাণী—মানুষ ভিন্ন অন্য জানোয়ার (৬৮ পৃঃ)—তাহা হইলে, মানুষও একরকম "জানোয়ার" !) পূজা—মাবুদ (৭৬ পৃঃ)।

একটু উচ্চ শ্রেণীর বাংলা লিখিতে গিয়া "মক্তব-মাদ্রাসা সাহিত্য" (চতুর্থভাগ) পুস্তকের রচয়িতাও বহুস্থানে হাস্যকর শব্দ-সমাবেশ করিয়াছেন। যথা:—"জননীও জান্নাৎবাসিনী হয়েন (=পরলোক গমন করেন", "মেহেরবান্ খোদাতায়ালার অপার করুণায়"; "তুমি রহমান, সর্ব্বশক্তিমান"; "অর্ণবপোতাদির আবিষ্কার হওয়াতে **পানিপথে** বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে"—ইত্যাদি। (ইহা যুদ্ধের পানিপথ নহে) অথচ। এই পুস্তকেই মধুসূদনের বিখ্যাত কবিতা "বঙ্গভাষা"ও স্থান পাইয়াছে। মাতৃভাষার প্রতি অনাবিল ভক্তিপূর্ণ এই কবিতাকে বিদ্রূপ করা সঙ্কলনকারীর উদ্দেশ্য নহে ত? এই শ্রেণীর মুসলমান লেখক যদি মধুসূদনের মত নিজেদের বদ্ধমূল বিজাতীয়তার মোহ একেবারে এড়াইতে পারিতেন তবে বাংলার অনেক দুঃখ দূর হইত।

যে-যুগে বীর তুর্কীজাতি কোরাণ এবং নমাজ পাঠ পর্য্যন্ত আরবীতে না করিয়া মাতৃভাষায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে যুগে ভারতীয় পরাধীন মুসলমানদের অন্ধ বিজাতীয় অনুকরণ নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তা ও পৌরুষের বিষয় নহে।

সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়াও এ-কথা বিবেচনা করা উচিত। অনুকরণ দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না, সাহিত্য রচনা ত নিশ্চয়ই না। শিক্ষিত হিন্দু ও শিক্ষিত মুসলমানের লেখা বাংলা কেন এক রকম হইবে না, হিন্দুবিদ্বেষ ও প্যান্-ইস্‌লামিজম্ ভিন্ন তাহার অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। প্রথমে যখন এ দেশীয় লোকেরা খৃষ্টিয়ান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তাহাদের অনেকেই মনে করিত তাহারা "রাজার জাতি"। গ্রাম্য প্রবাদানুসারে তেলাপোকা যেমন কাঁচপোকার কথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁচপোকা হইয়া যায়, তেমনই হিন্দু খৃষ্টিয়ান হইয়া ভাবিত ক্রমে ক্রমে সে ইংরেজ হইয়া যাইবে। দেশীয় খৃষ্টান সমাজের সে মোহ এখন গিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমান সমাজে সেই "কাঁচপোকা" হইবার আশা এখনও খুব প্রবল। ইংরাজ সরকারের ইঙ্গিতে এবং প্যান্-ইস্‌লামিজমের "খাবের" ঘোরে তাঁহাদের অনেকে মনে করেন তাঁহারা প্রচ্ছন্ন আরব কি তাতার। খৃষ্টপ্রচারসমিতির চেষ্টায় এখন বিশুদ্ধ বাংলায় খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচার হইতেছে, ইংরাজি ভাষার অ-স্বাভাবিক প্রেম ত্যাগ করিয়া ভূতপূর্ব্ব "নকল ইংরেজ"গণ এখন আসল ভারতীয় হইয়া খাঁটি ভারতীয় ভাষাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন। অপরপক্ষে, এক শ্রেণীর মুসলমান খাঁটি বাংলাকে বিকৃত করিয়া লিখিয়া মনে করিতেছেন যে, তাঁহারা আরব ও পারস্যের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন।

মুসলমান সমাজে সু-লেখকের অভাব নাই। যে-সমাজে "বিষাদসিন্ধু", "মহর্ষি মনসুর" প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ রচনা হইতে পারে, যে-সমাজে মিঃ ওয়াজেদ আলি, কাজি নজরুল, কাজি আবুল হোসেন, মৌলানা আক্রম খাঁ প্রভৃতি লেখক এবং শ্রীমতী ফাতেমা খানম্, শ্রীমতী বেগম সুফিয়া হোসেন, শ্রীমতী সুফিয়া খাতুন প্রভৃতি লেখিকা বর্ত্তমান, সে-সমাজে খাঁটি বাংলা রচনায় যশস্বী হিন্দু-

লেখকগণের সহিত সুস্থ সবল প্রতিযোগিতা ক্রমে বৃদ্ধি না পাইবার কোন কারণই নাই। সাম্প্রদায়িকতা ও প্যান্-ইস্লামিজম্-এর ধাঁধা কাটিয়া গেলে, হিন্দুর বাংলা ও মুসলমানের বাংলায় কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন আপত্তি যুক্তিসহ নহে; গোঁড়া হিন্দুর সঙ্গে ধর্ম্মমতের প্রভেদ সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন। মুসলমানকর্ত্তৃক যে সকল সাময়িক পত্রিকা হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্যই প্রকাশিত, তাহাতেও সুন্দর সুন্দর বিশুদ্ধ বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে—"মাসিক মোহাম্মদী", "সওগাত", "সাপ্তাহিক মোহাম্মদী", "হানাফি", "আল-মুস্লিম" প্রভৃতি পত্রিকা তাহার প্রমাণ। তথাপি মক্তব-মাদ্রাসায় পূর্ব্বোক্তরূপ অনর্থ চেষ্টা কেন?

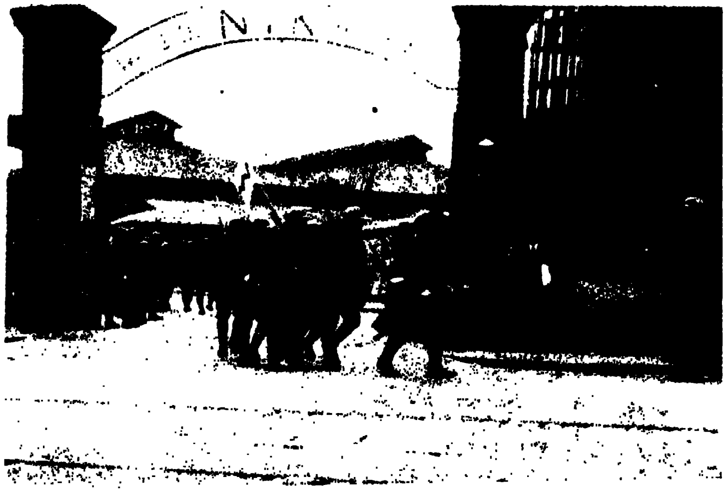
শুনা যায়, ঢাকা সেকেণ্ডারী বোর্ড "মুসলমানী বাংলা"য় লিখিত পুস্তকসকল হিন্দু-মুসলমান সকল ছাত্রের জন্যই অবশ্যপাঠ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙালী সাবধান!

চীন-জাপান যুদ্ধ

[নিম্নে চীন-জাপান যুদ্ধের যে চিত্র-গুলি প্রকাশিত হইল, সে-গুলি আমাদের সাংহাইস্থিত সংবাদদাতার প্রেরিত নিজস্ব চিত্র।]

জাপানী সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা

সাংহাই আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশ হইতে জাপানী বাহিনীর যুদ্ধাভিযান। চিত্রটির ডানদিকে সাংহাইএর ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত দুইটি শিখ পুলিশ লক্ষ্য করিবার বিষয়।





বিদ্ধস্ত সাংহাই

গোলাবর্ষণের পর সাংহাই-এর এক অংশ। এই অংশে চীনারা বাস করিত।

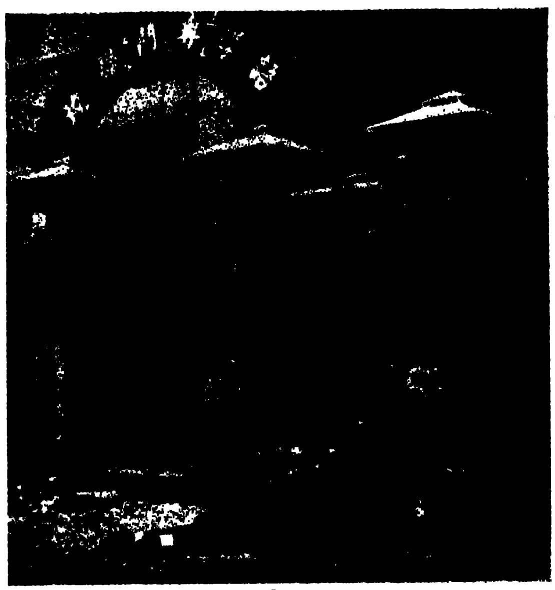
চীনের হল্‌দিঘাট



সাংহাই-এর যুদ্ধে যে চীন বাহিনী মৃত্যুপণ করিয়া জাপানী আক্রমণকে বাধা দেয়, সেই ১৯ নং বাহিনীর কয়েকটি সৈন্য। জাপানী সৈন্যদের তুলনায় ইহাদের অস্ত্র-শস্ত্র, সাজসজ্জা ও শিক্ষা যে অনেক নিকৃষ্ট তাহা এই চিত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়



১৯ নং চীনবাহিনার প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার সহকারীগণ।



জাপানীদের দ্বারা নিহত একটি চীনা। এ-ব্যক্তি সৈন্য নহে ও জাপানীদের কোন শত্রুতাচরণ করে নাই। এরূপ দৃশ্য সাংহাই-এর রাজপথে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাঠশালা

পশ্চিম-আফ্রিকার 'অ্যামাজন' নিগ্রো রমণী—



নিগ্রো নর্ত্তকী—পশ্চিম-আফ্রিকার অ্যামাজন নর্ত্তকী। উহার শিরোভূষণটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। একমাত্র পুরুষ যোদ্ধারাই উহা পরিতে পায়।

সম্প্রতি একটি জার্ম্মান অভিযান পশ্চিম-আফ্রিকায় নৃতত্ত্বের তথ্য আবিষ্কার করিতে গিয়াছিল। উহা সে-অঞ্চলের নিগ্রোদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে। এই অভিযানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি



দুইটি নিগ্রো বালক তাহাদের ছোট ভাইদের পিঠে বাঁধিয়া লইয়াছে। এই জাতীয় নিগ্রোদের মধ্যে শিশুকে বহন করিবার প্রথা এইরূপ। আমাদের দেশেও পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে এইরূপে শিশু বহন করিবার রেওয়াজ আছে।

জার্ম্মান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই নিগ্রোদের দুইটি ছবি দেওয়া গেল।

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান শিশু—



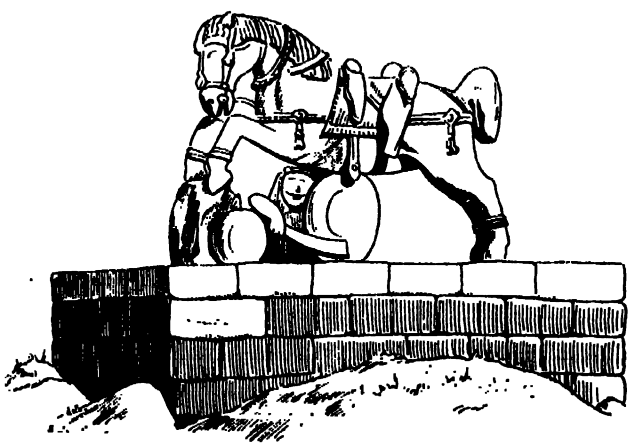
একটি পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ান বালক

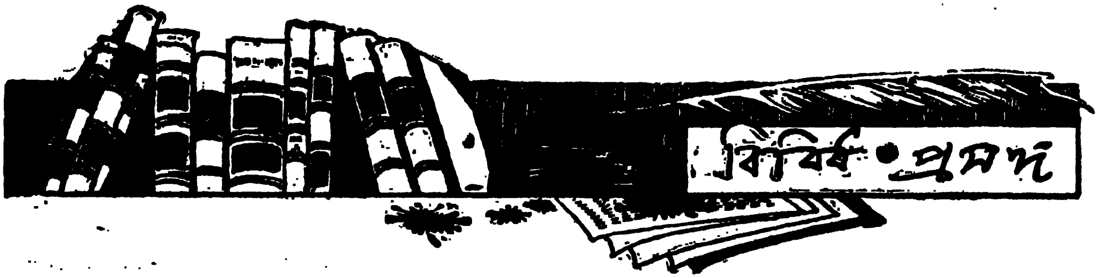
আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা সম্পূর্ণ অসভ্য ও ভীষণদর্শন বলিয়া আমাদের ধারণা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি জাতি সভ্যতায় বেশ উন্নত ছিল এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ ভাল। পেরু ও মেক্সিকোর আদিম সভ্যতার কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে



তিনটি পুয়েব্লো শিশু

যে সকল জাতি বেশ উন্নত ছিল, পুয়েব্লোরা তাহাদের একটি। এই সঙ্গে পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ান শিশুর দুইটি চিত্র দেওয়া গেল। ইহা হইতে তাহাদের চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদ কি রূপ ছিল, তাহার ধারণা করা যাইতে পারিবে।





ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা অদূরে

ব্রিটেনের ব্যবস্থাপক সভার নাম যেমন পার্লেমেণ্ট, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রমণ্ডলের ব্যবস্থাপক সভার নাম তেমনি কংগ্রেস। এই কংগ্রেস দুই চেম্বার বা কক্ষে বিভক্ত ;—প্রতিনিধি-সভা (House of Representatives) এবং সেনেট। কোন বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে কংগ্রেসের দুই চেম্বারে পাস হইবার পর প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ দেশনায়কের দ্বারা অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পূর্ব্বে স্পেনের অধীন ছিল। তেত্রিশ বৎসর হইল উহা আমেরিকার দখলে আসিয়াছে। আমেরিকার শাসন আরম্ভ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিলিপিনোরা স্বাধীনতার দাবি করিয়া আসিতেছে। রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ও বেসরকারী কোন কোন আমেরিকান নেতা তাহাদের এই দাবির সমর্থনও করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিবার জন্য আইন-প্রণয়ন ইতিপূর্ব্বে বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। গত ৪ঠা এপ্রিল ২২শে চৈত্র তারিখে কংগ্রেসের প্রতিনিধি-সভায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে আট বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা দিবার অঙ্গীকার আইন পাস হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুসংবাদ। কারণ, যদিও এখনও বিলটির সেনেটে পাস হইয়া প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষর পাইতে বাকী আছে, তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন যে প্রারম্ভিক পরীক্ষা, তাহাতে উহা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা ইহা ধরিয়া লইয়া এই সব মন্তব্য করিতেছি, যে, খাঁটি স্বাধীনতা ফিলিপিনেরা পাইবে। কারণ ফিলিপিনো নেতা ডাঃ হিলারিও সি মোন্‌কাডো নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে লিখিয়াছিলেন, আইনে সর্ত্ত থাকিবে, যে, আমেরিকা ফিলিপাইন্সে আপন সৈন্যদল ও রণতরীর ঘাঁটি বা আড্‌ডা রাখিতে পারিবে, এবং ফিলিপাইন্‌ সাধারণতন্ত্রের মূল রাষ্ট্রবিধি আমেরিকার কংগ্রেস ও প্রেসিডেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। এরূপ সর্ত্ত-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে স্বাধীনতার কোন মূল্য থাকিবে না।

আমেরিকার কৃষকেরা ফিলিপাইন-স্বাধীনতা অঙ্গীকারে খুশী হইয়াছে। এখন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকারই অংশ বলিয়া ফিলিপাইন্সে উৎপন্ন শস্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য বিনাশুল্কে আমেরিকায় আমদানী হইয়া তথাকার শস্যাদির সহিত প্রতিযোগিতা করে। ফিলিপাইন্স স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া গেলে আমেরিকা অন্যান্য স্বাধীন বিদেশের জিনিষের উপর যেমন তেমনি ফিলিপাইন্সে উৎপন্ন দ্রব্যজাতের উপরও শুল্ক বসাইয়া আমেরিকার বাজারে তৎসমুদয়কে আমেরিকার জিনিষপত্রের চেয়ে দুর্ম্মূল্য করিতে পারিবে। কিছুকাল হইতে অনেক ফিলিপিনো আমেরিকায় গিয়া স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে তথায় বসবাস করিতেছে। তাহাতে আমেরিকার শ্বেতকায়দের সামাজিক অসুবিধা ও অনিষ্ট হইতেছে এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছে। অথচ ফিলিপাইন্স আমেরিকার শাসনাধীন থাকিতে অন্যান্য এশিয়াবাসীদের মত ফিলিপিনোদেরও আমেরিকায় বসবাসে বাধা দেওয়া চলে না। ফিলিপাইন্স স্বাধীন হইয়া গেলে বাধা দেওয়া চলিবে।

আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সেক্রেটারী মিঃ ষ্টিমসন একটা চিঠিতে লিখিয়াছেন, ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীন করিয়া দিলে সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ চীন-জাপান প্রভৃতি দেশে আমেরিকার প্রেস্‌টিজ্‌ বা প্রতিপত্তি গুরুতর রকমে কমিয়া যাইবে, এবং তাহাদের স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইবে যে,

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ কোন বিদেশী শক্তির—সম্ভবতঃ জাপানের কিংবা চীনের—প্রভুত্বের অধীন হইয়া পড়িবে।

আমেরিকার প্রতিপত্তি কমিবার আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যদি ফিলিপিনোরা স্বাধীনতার যুদ্ধে আমেরিকাকে হারাইয়া দিয়া আমেরিকার অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিত, তাহা হইলে এ-কথা উঠিতে পারিত বটে, যে, আমেরিকার সামরিক শক্তি কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাবের কারণ যুদ্ধে আমেরিকার পরাজয় নহে। তাহাদিগকে স্বাধীনতাদান ন্যায়সঙ্গত এবং আমেরিকার পক্ষেও হিতকর ও সুবিধাজনক বুঝিয়া আমেরিকার বর্ত্তমানে প্রবল রাজনৈতিক দল আলোচ্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে ঐ বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি হ্রাস না পাইয়া বরং বাড়িবে।

ফিলিপিনোরা স্বাধীন হইলে, পরে তাহাদের দেশ জাপান বা চীনের দ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রবল দেশের দ্বারা কবলিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক না হইলেও পরদেশ-জয়ের প্রথাটা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া আসিতেছে, ইহা সত্য—জাপানকর্ত্তৃক চীন জয় করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও ইহা সত্য। সুতরাং আমেরিকা ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা দিলেও আর কেহ তাহাদের দেশ দখল করিবেই, ইহা অবশ্যম্ভাবী বলা যায় না। তদ্ভিন্ন, "যেহেতু কোন-না-কোন জাতি ফিলিপিনোদের উপর দস্যুতা করিয়া তাহাদের দেশ দখল করিবেই, অতএব আমরা দস্যুতালব্ধ পরদেশ ফিলিপাইন্স ছাড়িয়া দিব না," ইহা চোরডাকাতের মুখে শোভা পাইতে পারে, সভ্যতাভিমানী জাতির মুখে শোভা পায় না। ন্যায়সঙ্গত যাহা তাহা তোমরা কর, অন্যেরা ভবিষ্যতে কি করিবে তাহার জন্য তোমাদের অতিরিক্ত মাথাব্যথা ভণ্ডতার লক্ষণ। পাছে ফিলিপিনোরা অন্য কোন জাতির অধীন হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহাদের প্রতি দয়াবশতঃ এই আশঙ্কায় আমেরিকা ফিলিপাইন্সের উপর আধিপত্য রক্ষা করিতেছে, ইহা নিছক মিথ্যা কথা। সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে প্রবল আমেরিকান রাজনৈতিক দল পরোক্ষভাবেও এরূপ কোন মিথ্যা কথার প্রশ্রয় দিতে চান না।

ভারতবর্ষ ও ফিলিপাইন্স

ফিলিপিনোরা স্বাধীন হইলে তাহাতে পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষেরও হিত হইবে।

অনেক ইংরেজ আছে—যেমন ভূতপূর্ব্ব রেভারেণ্ড ও বর্ত্তমানে মিস্টার এডোয়ার্ড টমসন—যাহারা বলে, ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের সমালোচনা করিবার অধিকার আমেরিকানদের নাই, কেন-না তাহারাও পরদেশ নিজেদের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। ফিলিপাইন্স স্বাধীন হইয়া গেলে এই ইংরেজদের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে।

কিন্তু ফিলিপিনোরা আমেরিকার অধীন থাকিতে কেন যে রেভারেণ্ড ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের মত আমেরিকান ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে দু-কথা বলিতে পারিবেন না, তাহা বুঝা কঠিন। আমেরিকান গবর্ন্মেণ্ট বা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট অন্যায়কারী হইলে ব্যক্তিগত ভাবে একজন আমেরিকান বা একজন ইংরেজ ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতে কেন অনধিকারী হইবেন? ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেব ফিলিপিনোদিগকে আমেরিকার অধীন রাখার বিরুদ্ধেও লিখিয়াছেন।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ তেত্রিশ বৎসর হইল আমেরিকার অধীন হইয়াছে, ভারতবর্ষের কোন-না-কোন অংশ ইংরেজদের অধীন হইয়াছে প্রায় দুই শত বৎসর। সিপাহী-বিদ্রোহকে যদি কোন ইংরেজ স্বাধীনতার যুদ্ধ মনে করে এবং সেই যুদ্ধে ইংরেজদের জয় ও মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তির শেষ দৃঢ় গাঁথুনী মনে করে, তাহা হইলে তাহাও চুরাশি বৎসরেরও অধিক দিনের কথা। যেদিক দিয়াই দেখা যাক, ফিলিপিনোরা যতদিন আমেরিকানদের অধীন আছে, ভারতীয়েরা তার চেয়ে অনেক বেশী দিন ইংরেজদের অধীন আছে। কিন্তু অল্পতর সময়ের মধ্যে আমেরিকানরা ফিলিপিনোদিগকে ভারতীয়দের চেয়ে বেশী রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ক্ষমতা দিয়াছে, এবং তাহাদের দেশে ভারতবর্ষ অপেক্ষা শিক্ষার অধিকতর বিস্তার সাধন করিয়াছে। অতএব ইহা

বিবেচনা করিলেও আমেরিকানরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের সমালোচনা করিতে অধিকারী।



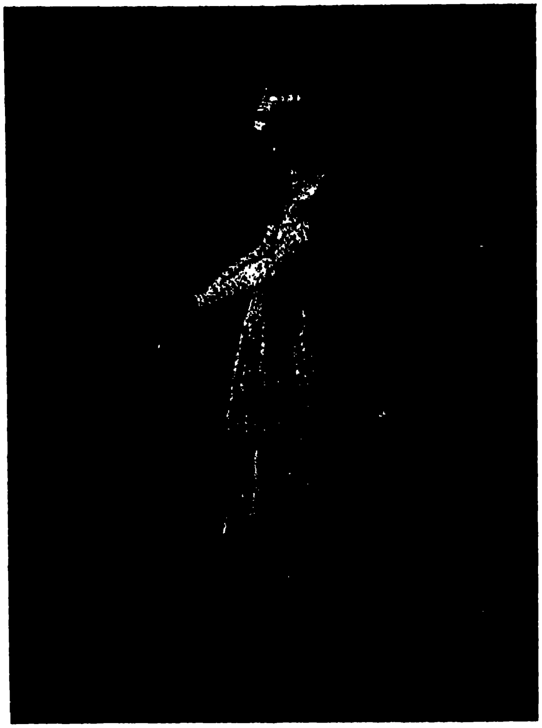
শ্রীসারদাচরণ উকিল

লণ্ডনে প্রদর্শিত বাঙালী চিত্রকরের ছবি

গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে আমরা লণ্ডনে দিল্লী-প্রবাসী বাঙালী চিত্রকর সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের কতকগুলি ছবির প্রদর্শনীর বিষয় লিখিয়াছিলাম। ছবিগুলি বিলাতী চিত্রসমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছিলাম। চিত্রকর মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা তাঁহার প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে তিনটির ফোটোগ্রাফ প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার ভ্রাতা বরদাচরণ উকীলের উপর প্রদর্শনীর ভার ছিল। আর এক ভাই রণদাচরণ উকীলও চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী। তাঁহাদের ও



ঝান্সীর রাণী



আলমগীর



বুদ্ধ, জননী ও মৃত শিশু

বিলাতে প্রশংসাপ্রাপ্ত অন্য কয়েকজন বাঙালী চিত্রকরের ফোটোগ্রাফ পরে প্রকাশিত হইবে।

—

অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু

বিহারের বিহার-শরীফ নামক ছোট শহরে স্থিত নালন্দা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ বসুর অকালমৃত্যুতে বিহার প্রদেশ ও ভারতবর্ষ একজন সুশিক্ষকের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক-জ্ঞানবিস্তারকল্পে তিনি যে মূল্যবান্ কাজ করিতেছিলেন, তাহার অবসানও দুঃখের বিষয় হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পূর্ণ ছত্রিশ বৎসরও হয় নাই। এই অল্প বয়সে তিনি অধ্যাপকের কাজে যশ এবং তাঁহার ছাত্রদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পীড়ার সময় তাঁহার ছাত্রেরা দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল। তিনি প্রথমে বিশ্বভারতীতে পাচ ছয় বৎসর ইতিহাসের অধ্যাপকতা করেন। সেখানে থাকিতে তিনি পণ্ডিত বিধুশেখর



পরলোকগত ফণীন্দ্রনাথ বসু

শাস্ত্রী, অধ্যাপক সিল্‌ভাঁ লেভি, অধ্যাপক ভিণ্টারনিজ্ প্রভৃতি বিদ্বান্ লোকদের সংস্পর্শে আসেন এবং তিব্বতী ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি অল্পভাষী, মিতভাষী, মিষ্টভাষী, শান্ত ও ধীরস্বভাব এবং পরিশ্রমী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে অল্প বা দীর্ঘ-কালের জন্য আমরা গেলে দেখিতাম, তিনি প্রায়ই পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর সহিত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেন। ইহা ছাড়া জাগ্রত অবস্থায় প্রায় সব সময়েই তিনি কোন-না-কোন কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। এইরূপ শ্রমশীলতার অভ্যাসবশতঃ অল্প বয়সেই তিনি অনেক বাংলা ও ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ ব্যতিরেকে অনেকগুলি বহি লিখিতে পারিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। কতক এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কয়েকখানি অসম্পূর্ণ আছে। তাঁহার মুদ্রিত পুস্তকগুলির নাম—

Indian Teachers of Buddhist Universities. Indian Teachers in China. The Indian Colony of Champa. The Indian Colony of Siam. The Hindu Colony of Cambodia. The Principles of Indian Silpa-Sastra. Lives of Sir Asutosh Mukerji and Sir P. C. Roy. An English Translation of Bankim Chandra's "The Twin Rings". English Translation of the Itinerary of the Chinese Pilgrim U-Kong (in the Press). A Hundred Years of the Bengali Press.

প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রতিমা-মান-লক্ষণের একটি সংস্করণ তিনি প্রস্তুত করেন। ইহা তিব্বতীয় অনুবাদের সহিত মিলাইয়া প্রস্তুত করা হয়। নালন্দা সম্বন্ধে তিনি একটি বহি প্রায় সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহা কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিকের দ্বারা সম্পূর্ণ করাইয়া মুদ্রিত করিলে ঐতিহাসিক সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে। নালন্দা সম্বন্ধে তাঁহার একটি ছোট বহি আগেই প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলায় তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দুটি জীবনচরিত, কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাসের বহি, এবং নালন্দা ও বিক্রমশিলা সম্বন্ধে দুটি ছোট বহি লিখিয়াছেন। মীরাবাঈ সম্বন্ধে একখানি বহি এবং রবীন্দ্রনাথের একখানি জীবনচরিতও তিনি লিখিতেছিলেন। স্বর্গীয় মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের সংগৃহীত উপকরণের সাহায্যে ও মেজর মহোদয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে ফণীবাবু ও অন্য এক জন অধ্যাপক সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের একটি বিস্তারিত ইংরেজী ইতিহাস লেখেন। তাহা প্রবাসী প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। মেজর বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণবের ইংরেজী জীবন-চরিতও ফণীবাবু লিখিয়াছেন। তাহাও মুদ্রিত হইবে।

তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, তাহার মত ব্যায়াম ও বিশ্রাম করিতেন না। আহারও যেমন হওয়া উচিত, তাহা করিতেন না—অনেকটা তপস্বীর মত থাকিতেন। তাঁহার অকালমৃত্যু পীড়ার পর হইয়াছে বটে কিন্তু সে পীড়া সাংঘাতিক নহে। এই জন্য মনে হয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম, বিশ্রামের অল্পতা এবং পুষ্টিকর যথেষ্ট খাদ্য আহার না করা তাঁহার অল্পায়ু হওয়ার কারণ।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি একটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া ব্রসেল্‌সের একটি বিদ্যাপীঠের (Universite' Philotechnique-এর) নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত বিদ্যাপীঠ তাঁহাকে পিএইচ-ডি উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার মত ইতিহাস ও শিল্পশাস্ত্রাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির এরূপ উপাধি লাভ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু তিনি এরূপ নম্রস্বভাব ছিলেন, যে, নিজের উপাধির কথা সুপরিচিত লোক-দিগকেও জানিতে দেন নাই। বস্তুতঃ তিনি নিজের ঢাক নিজে পিটাইতে পারিতেন না বলিয়া এবং তাঁহার মুরুব্বির জোর ছিল না বলিয়া তিনি তাঁহার গুণের ও জ্ঞানের উপযুক্ত কোন প্রথম শ্রেণীর কলেজের বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা লাভ করিতে পারেন নাই। দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত অনুমান করিতে হইতেছে, সম্ভবতঃ এই কারণে কঠোর জীবন-সংগ্রাম তাঁহার আয়ুহ্রাসের কারণ হইয়া থাকিবে। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে না পারিলেও জ্ঞান অর্জ্জন ও জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন, ইহাই তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের একমাত্র সান্ত্বনা।

—

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

উনষাট বৎসর দুই মাস বয়সে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি প্রায় এক বৎসর কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন, কিন্তু আরোগ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে ছোট গল্প লিখিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন।

আমরা যতদূর জানি, মাসিকপত্রে তাঁহার লেখা প্রবাসী-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "দাসী" পত্রিকায় প্রথমে বাহির হইয়াছিল। তাহা প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। তখন তাহার লেখা দিলদারনগর হইতে আসিত। তাঁহার সেকালের একটি লেখার কথা এখন মনে পড়িতেছে। উহা "একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত," ১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের "দাসী" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তাহার পর প্রবাসীর সম্পাদক কর্ত্তৃক যখন "প্রদীপ" প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাতেও প্রভাতবাবু লিখিতেন। প্রবাসী-সম্পাদকের সম্পাদিত "প্রদীপে" তাঁহার অনেকগুলি কবিতা (সেকালে তিনি কবিতা লিখিতেন) এবং সিমলা শৈলের একটি সচিত্র বর্ণনা বাহির হইয়াছিল। তাঁহার একটি কবিতার নাম এখনও মনে আছে—"আকাশ কেন নীল?" উহা প্রদীপে বা প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল, মনে নাই। উহা শেলীর একটি কবিতার অনুবাদ বলিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, এই রূপ মনে পড়িতেছে। প্রবাসী বাহির হইবার পর প্রভাতবাবু তাহাতে অনেক ছোট গল্প এবং একটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। আমাদের ধারণা, উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্প রচনাতেই তাঁহার কৃতিত্ব বেশী। তিনি ইংরেজীতেও গল্পের অনুবাদ উত্তমরূপে করিতে পারিতেন। মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিস্তর গদ্য ও পদ্য রচনার ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। সকলের আগে যে অনুবাদটি ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে উক্ত পত্রিকায় বাহির হয় তাহা প্রভাতবাবুর কৃত। উহা রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট গল্পের অনুবাদ, নাম "দি রিড্‌ল্ সল্‌ভ্‌ড্।" প্রভাতবাবুর নিজের দু-একটি ছোট গল্পের অনুবাদও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, ও প্রবন্ধ রচনা ভিন্ন তিনি অনেক বৎসর নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সহিত "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সম্পাদকতা



পরলোকগত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর তিনি গয়া ও অন্য দু-এক জায়গায় ব্যবহারাজীবের কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কাজে তাঁহার মন বসিত না। সেই জন্য তিনি উহা ছাড়িয়া দেন। কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার সহিত আইনের এই সম্পর্ক ছিল, যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি অধ্যাপক ছিলেন, যদিও পীড়াবশতঃ দীর্ঘকাল ছুটিতে ছিলেন।

প্রভাতবাবু সাধারণ যে-সব চিঠিপত্র লিখিতেন, তাহাতেও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত।

—

মোহেন্‌জো-দাড়ো ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহেন্‌জো-দাড়ো এবং তাহার প্রাচীনত্ব আবিষ্কার সম্বন্ধে পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা যথাসম্ভব চাপা দিয়া তাঁহার কৃতিত্ব-গৌরব কমাইবার চেষ্টা তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরও হইয়াছে। এখন সেই চেষ্টার অবসান হওয়া উচিত। কয়েক মাস হইল, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর-জেনার‍্যাল স্যর জন মার্শ্যাল সাহেবের দ্বারা সম্পাদিত ও অংশতঃ লিখিত মোহেন্‌জো-দাড়ো সম্বন্ধে বৃহৎ সচিত্র ও বহুমূল্য পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহাতে রাখালবাবুর কাজ সম্বন্ধে মার্শ্যাল সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে রাখালবাবুর প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মার্শ্যাল সাহেবের নিজের লেখা কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

The site [of Mohenjo-daro] had long been known to district officials in Sind, and had been visited more than once by local archaeological officers, but it was not until 1922, when Mr. R. D. Banerji started to dig there, that the prehistoric character of its remains was revealed—Mr. Banerji himself was quick to appreciate the value of his discovery and lost no time in following it up......The few structural remains of that [Indus] civilization which he unearthed were built of bricks identical with those used in the Buddhist Stupa and Monastery, and bore so close a resemblance to the latter that even now it is not always easy to discriminate between them. Nevertheless, Mr. Banerji divined, and rightly divined, that these earlier remains must have antidated the Buddhist structures, which were only a foot or two above them, by some two or three thousand years. That was no small achievement !" *Mohenjo-daro and the Indus Civilization*, vol. I, pp. 10-11.

মার্শ্যাল সাহেব অন্যত্র লিখিয়াছেন :—

"Three other scholars whose names I cannot pass over in silence, are the late Mr. R. D. Banerji, to whom belongs the credit of having discovered, if not Mohenjo-daro itself, at any rate its high antiquity...."—*Ibid.*, vol i, page x.

মার্শ্যাল সাহেবের পুস্তকখানির প্রকাশক—আর্থার প্রবস্থেন লণ্ডন; মূল্য বার গিনি—১৬৮৲ টাকা। আমরা উহা সমালোচনার্থ প্রকাশকের নিকট হইতে পাইয়াছি বলিয়া উহা হইতে পরে নানা তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব—ক্রয় করা সহজ হইত না।

—

চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক দিন হইল চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে ছবি আঁকিতেন। "শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ," "রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন", প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি ছবির রঙীন প্রতিলিপির বাজারে কাটতি আছে। তিনি দীর্ঘকাল বাংলা দেশের বাহিরে বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের বৃত্তান্তে তাঁহার সম্বন্ধেও কিছু লিখিয়াছেন।

—

জাপানী কুসংস্কার

সভ্য অসভ্য সকল দেশের লোকেরই কতকগুলা কুসংস্কার আছে। জাপানীদের একটা কুসংস্কার এই, যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকার বৎসর ১৯৩২ এবং জাপানী পঞ্জিকার বৎসর ২৫৯২ বর্ত্তমান নানা উপদ্রব ও বিপদাপদের জন্য দায়ী। জাপানী ভাষায় ১৯৩২কে "ই কু সা নী" বলা হয়। তাহার মানে "যুদ্ধের অভিমুখে"। জাপানী বৎসর ২৫৯২কে "জি গো কু নী" অর্থাৎ "নরকের দিকে" বলা হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধ জাপানীদিগকে নরকের দিকে লইয়া যাইতেছে বটে।

—

বর্ত্তমান প্রেস অর্ডিন্যান্সের দৌড়

বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান্ ডেলী মেল এক খানি মডারেট দৈনিক। অর্ডিনান্সগুলি অনুসারে কাজ সরকার পক্ষ হইতে কি ভাবে করা হইতেছে, সেই বিষয়ে উহাতে কিছু মন্তব্য প্রকাশিত হয়। সেই মন্তব্য বোম্বাই গবন্মেণ্ট আপত্তিকর মনে করিয়া ঐ কাগজটির নিকট হইতে কয়েক হাজার টাকা জামীন চান। তাহার বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল হাইকোর্টে আপীল করেন। তিন জন জজের কাছে বিচার হয়, তাহার মধ্যে প্রধান বিচারপতি এক জন। তাঁহারা আপীল নামঞ্জুর করেন। প্রধান বিচারপতি রায় ও অন্য দু-জন জজ তাহাতে

সায় দেন। রায় হইতে বুঝা যায়, যে, বর্ত্তমান প্রেস অর্ডিন্যান্স ইণ্ডিয়ান পীন্যাল কোডের (ফৌজদারী দণ্ড-বিধির) চেয়ে এবং ১৯১০ সালের যে প্রেস-আইন অনেক চেষ্টার পর ১৯২২ সালে রদ হয়, তাহা অপেক্ষা খুব কঠোর, ব্যাপক ও স্থিতিস্থাপক।

ইণ্ডিয়ান ডেলী মেলে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কি না, সরকারী এ্যাডভোকেট-জেনারালের মতে, তাহা বিচার্য্য নহে; বিচার্য্য এই, যে, লিখিত মন্তব্য দ্বারা পাঠকদের মনে গবর্ন্মেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা জন্মিয়াছে কি না বা তাহাতে উহা জন্মিবার টেণ্ডেন্সি অর্থাৎ প্রবণতা আছে কি না। টেণ্ডেন্সি নাই প্রমাণ করা দুঃসাধ্য—অসাধ্য বলিলেও চলে।

মৌলানা মোহাম্মদ আলীর পরিচালিত কমরেড কাগজ সম্পর্কে বহু বৎসর পূর্ব্বে একটি মোকদ্দমা হয়, যে, তাঁহার লিখিত একটি পুস্তিকা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা জন্মিতে পারে। এই মোকদ্দমার আপীলের রায়ে কলিকাতা হাইকোর্টের স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স বলিয়াছিলেন, যে, পুস্তিকাটির লেখা দ্বারা কোন শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা উৎপন্ন হয় নাই, হইতে পারে না—এই "না" প্রমাণ করা অসম্ভব। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি,

And what is this negative? It is not enough for the applicant to show that the words of the pamphlet are not likely to bring into hatred or contempt any class or section of His Majesty's subjects in British India, or that they have not a tendency in fact to bring about that result. But he must go further and show that it is impossible for them to have that tendency either directly or indirectly, and whether by way of inference, suggestion, allusion, metaphor or implication. Nor is that all; for we find that the Legislature has added to this that all-embracing phrase 'or otherwise'.

আলোচ্য বোম্বাইয়ের মোকদ্দমাটি সম্বন্ধে তথাকার চীফ জষ্টিসের রায়ে আছে :—

It really comes to this, that there is no check on the Government as to the persons they may regard as suspects, that orders may be passed affecting drastically the conduct of such persons, that heavy punishments may be imposed for breach of any such order, that the right of appeal or applicaton in revision, which can normally be enjoyed by such persons, is largely curtailed.

তাৎপর্য্য। বাস্তবিক মোদ্দা কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই, যে, গবর্ন্মেণ্টের যে-কোন লোককে সন্দেহভাজন মনে করতে কোনই বাধা নাই, সন্দেহভাজন লোকদের সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্ট খুব কড়া ও ব্যাপক হুকুম জারি করতে পারেন, এ রকম হুকুম না মানলে গুরুতর শাস্তি হ'তে পারে, এবং এরূপে দণ্ডিত লোকদের সাধারণতঃ আপীল করবার যে অধিকার আছে, তা খুব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রায়ের আর এক জায়গায় আছে :—

We have no evidence whether the facts asserted in the articles on which the charges or some of them are based are true or false. The Advocate-General has argued the case on the basis that truth is immaterial. I think that contention right. There is no exception in Section 4 of the Press Act as amended by the Ordinance, making truth and public policy an answer to a charge under that section. As in the case of excepton 1 to section 499, I. P. C., this Court is not concerned with the wisdom or lack of wisdom of the criticism of unlawful or unjust acts of the Government. We merely apply the law as we find it. The effect of the Ordinance seems to me to bring within section 4 of the Press Act every charge of misconduct of the Government, whether such a charge is well-founded or ill-founded.

বোম্বাই হাইকোর্টের মতে বর্ত্তমান প্রেস আইন ও অর্ডিন্যান্স অনুসারে গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে যাহা লেখা হয়, তাহা সত্য কি না বিচার করা অনাবশ্যক; গবর্ন্মেণ্টের অসদাচরণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লিখিত প্রত্যেক অভিযোগ, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, বর্ত্তমান প্রেস আইনের চতুর্থধারা অনুসারে দণ্ডনীয়।

বোম্বাই হাইকোর্ট প্রেস আইন ও অর্ডিন্যান্সের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা কি না বলিতে পারি না। উহা ঠিক হইলে, তাহা হইতে ইহাই অনুমান করিতে হয়, যে, গবর্ন্মেণ্ট বা গবর্ন্মেণ্টের কোন কর্ম্মচারী কোন অন্যায় কাজ করিলে তাহা গবর্ন্মেণ্টকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার পাত্র করে না, কিন্তু যে খবরের কাগজ ঐ অন্যায় কাজের বিবরণ বা তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করে, সেই কাগজ গবর্ন্মেণ্টকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার পাত্র করে। বোম্বাই হাইকোর্টের ব্যাখ্যা ঠিক হইলে গবর্ন্মেণ্টের কোন সমালোচনাই করা চলে না। অথচ গত ১লা মার্চ্চ ভারতসচিব স্যর সামুয়েল হোর পার্লেমেণ্টে বলিয়াছেন,

"The action taken against the Indian Press had been taken for one purpose only, namely, to stop incentives to disorder and terrorism and not to stifle expression of public opinion."

"ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র শান্তিভঙ্গের ও

সরকারী লোকদের ভয়োৎপাদক কাজের প্ররোচনা বা উত্তেজনা বন্ধ করা—জনমতপ্রকাশ বন্ধ করা উহার উদ্দেশ্য নহে।

—

মুস্লিম সাহিত্যসমাজ

মুস্লিম সাহিত্যসমাজের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে খান বাহাদুর কমরুদ্দিন আহ্‌মদ যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার একস্থলে লিখিত হইয়াছে :—

কবি বলিয়াছেন—

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—"যে যোগী সমত্ববুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন।" তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, এই সেবা দ্বারাই জীবনসমস্যা সমাধান করিতে হইবে এবং এই সেবার আদর্শে ভাবনাদ্বারাই মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেবার অর্থ ইহা নহে যে, একজনকে দুইটি পয়সা দিয়া তাহার কর্ম্মশক্তিকে বিনাশ করিয়া দিতে হইবে। সেবার প্রকৃত অর্থ মানুষের বিবিধমত অভাবমোচন। সেবার প্রেরণায়ই মানব আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে ব্যক্তি যত উন্নত সে তত বেশী লোকের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করিতে পারিয়াছে; সেই জাতিই উন্নতিশীল যে আপনার সেবার মহিমায় অন্যের অভাব অভিযোগের সমাধানে সমর্থ হইয়াছে। বেতারবার্ত্তা, উড়ো জাহাজ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজ যাহা জগদ্বাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে তাহা সকলই কি এই সেবার প্রেরণার ফল নয়? এই বৈজ্ঞানিক উন্নতি কোরানবিশ্বাসীগণের করা উচিত ছিল, এবং বাস্তবিকই একদিন কোরানবিশ্বাসীগণ জ্ঞানগরিমায় সমস্ত জগতের বরণীয় ছিলেন।

মুসলমান সমাজে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সেবার—ন্যূনকল্পে কেবল মুসলমানদের সেবার—প্রবৃত্তি জাগিলে প্রভূত কল্যাণ হইবে। তাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলেও উপকৃত হইবেন।

—

মুসলমান বাঙালীর অতীত গৌরব

বঙ্গীয় মুস্লিম তরুণসংঘের বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মৌলবী সেরাজ উল হক্ যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে অনেক খাঁটি কথা আছে। তাঁহার মুসলমান শ্রোতারাও যে তাহাতে সায় দিয়াছিলেন, ইহা আশাপ্রদ। তাঁহার বক্তৃতার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সমবেত তরুণ বন্ধুবর্গ! নিখিলের কেন্দ্রে জাগরণ ভেরী নিনাদিত হওয়ায় সমস্ত দেশের সমগ্র জাতি রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মত্ত, প্রমত্ত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্রই সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলার মুসলমানগণ আজ নিজেদের অদূরদর্শিতা, গোঁড়ামী এবং অজ্ঞতার ফলে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ভ্রাতৃগণ! আজ তুরস্ক, ইরান, পারস্য প্রভৃতি নিজ নিজ দেশের প্রাচীন স্মৃতি স্মরণপূর্ব্বক পূর্ব্বগৌরবের 'সংবোধ' ও 'সংবেদ' লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। আরব আরবের ভাবে, পারস্য পারস্যের ভাবে, তুরস্ক তুরস্কের ভাবেই জাগিতেছে। পারস্য, তুরস্ক, আফগানীস্থান, আরব-গৌরবের কানাকড়িও গ্রহণ না করিয়া স্বকীয় অমুসলমান পূর্ব্বপুরুষদের অতীত যুগের কীর্ত্তিকাহিনীর, গৌরবকাহিনীর, স্মৃতির প্রদীপ জালিয়া আধুনিক দুনিয়ার দেশ কম্পাস হাতে পলিটিক্স ও পলিসির মারপেঁচ দেখিয়া নবরূপে তাহাদের নূতন রাষ্ট্রজীবন গঠন করিতেছে।

মহোদয়গণ! পারস্য আরবীয় যুগের বিলাসিতায় গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের জামশেদ, জোহাক, ফরিদুন, কায়কোবাদ, রুস্তম, এবং জাল ও রোস্তমের নামেই মাতিয়া উঠিতেছে। প্রাচীন জেন্দাবেস্তার ধর্ম্ম বা আধুনিক কোরানের ধর্ম্ম এই জাতীয় গৌরবের আলোকপুঞ্জের পথে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তুরস্কও তাহার বৌদ্ধ পূর্ব্বপুরুষ চেঙ্গীস, হালাকু, তৈমুর ও তরগুল প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী বীরেন্দ্রবর্গের ছবি বা আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই জাগিয়া উঠিতেছে। মোস্তফা কামাল পাশা আরবীয় পর্দা ও বোরকা ছাড়িয়া ফেলিয়াছ আধুনিক তুর্ক রমণীদিগকে প্রাচীন তুর্ক রমণীদিগের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে ও গিরিশৃঙ্গে ধাবিত এবং সামরিক তরঙ্গে দোলায়িত হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। কারণ এই প্রকার স্বাধীনচেতা তেজস্বিনী রমণী হইতেই অরিন্দম বীর সন্তান লাভ করা সম্ভব।—কিন্তু ভারতের মুসলমানগণই তাহাদের প্রাচীন গৌরবময় মহিমাকে একবারেই অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। (শুনুন শুনুন)।

অতঃপর বক্তা বলিতেছেন—

বন্ধুগণ! যে সকল মুসলমানের রক্তে এখনও হিন্দু পূর্ব্বের রক্ত ধারা আছে, তাহারা পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষদের অনাবিল ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা এবং অতুলনীয় ক্ষাত্রবীর্য্যমহিমার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন এবং সেই ভুলিয়া যাওয়াটাকেই গৌরবকর বোধ করেন। (বিস্ময়কোলাহল)। মহোদয়গণ! যে মহাবীর ভীষ্ম, মহাবীর রামচন্দ্র, মহাদাতা রাজা শুরবংশ্য কর্ণ প্রভৃতি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিবংশীয়গণের অনাবিল বীর্য্যমহিমার জন্য কোন গৌরবই বোধ করে না এবং তাহাদিগকেও কলঙ্কজনক মনে করে, অন্যদিকে সে আরব বা পারস্যের বীরপুরুষদিগের গৌরবের বড়াই করিলেও তাহাতে মনে কোন জোর পায় না, কারণ সে জানে যে তাহাদের সঙ্গে রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই। (করতালি-ধ্বনি)।

ইহার ফলও মৌলবী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—

ভ্রাতৃগণ! বিগত দশ বৎসর কাল প্রচারকার্য্যের জন্য বাংলার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু সভাসমিতিতে যোগদানকরতঃ অনেক সময় বিশাল জনশ্রেণীকে উত্তেজিত করিবার ও গৌরবে মাতাইবার জন্য মুসলিম গৌরবগাথার প্রাণময়ী উদ্বোধিনী বাণী শুনাইয়াছি। তাহার ফলে মূর্খ লোকদের চেহারায় কোন প্রকার আনন্দ ফুটিয়া উঠিতে দেখি নাই। বরং লজ্জায় অনেকের মুখ মলিন হইতেই দেখিয়াছি। (শোন! শোন!!) কারণ মিথ্যা গৌরবকে বরণ করিয়া লইতে মন বেচারা কোন প্রকারেই প্রস্তুত নহে। মহোদয়বৃন্দ! এই জন্য দেখিতে পাই—বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সামান্য-

সংখ্যক মোগল, পাঠান ও খাঁটী সৈয়দের সন্তান ব্যতীত আর কাহারও মনে স্বাধীনতার ভাব, আত্মমর্য্যাদা, আত্মগৌরব, আত্মবিশ্বাস, আত্মানুভূতি ও আত্মসম্ভ্রমশীলতা নাই। (ঠিক ঠিক)। ইহার ফলে অধুনা আমাদের শত শত যুবা গ্র্যাজুয়েট, আণ্ডারগ্রাজুয়েট হইলেও আত্মানুভূতি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্ভ্রমশীলতার অভাবে শ্রেষ্ঠবংশসম্ভূত উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানগরিমা ও গুণমহিমা তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে না। অথচ বাংলার এই লক্ষ লক্ষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের ভিতরে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জাঠ, রাজপুতের জ্যোতিঃ ও তেজঃপূর্ণ রক্তপ্রবাহ বিদ্যমান আছে। (শোন শোন) কিন্তু তাহারা কেহই সেই গৌরবের স্মৃতি সম্মুখে ধরিতে না পারায় নীচতা ও অন্ধকারেই মরপাক খাইতেছে। কেহ কেহ কৃত্রিমভাবে আপনাদিগকে মোগল, পাঠান, শেখ, সৈয়দ বলিয়া দাবি করিলেও মন তাহাতে মোটেই জোর পাইতেছে না। তার মানে, মনের কাছে কোন চালাকিই খাটিতে পারে না। বাংলার মুসলমানদের দুর্গতির ইহাই এক কারণ! (নিশ্চয় নিশ্চয়—বিস্ময়ধ্বনি)।

ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর মধ্যে প্রভেদ কি হইয়াছে, বক্তা তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বন্ধুগণ! আজ যেখানে অতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও আর্য্য গৌরব গরিমা কাহিনীতে মাতিয়া উঠিতেছে এবং বুকের পাটা উঁচু করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পতাকা লক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে বাংলার অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান যুবক গৌরব ও মহিমার পথে কিছুই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। (শোন শোন)। যখন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভীম, পার্থ, কর্ণ, প্রভৃতি বীরপুরুষগণ, কিম্বা কপিল, কণাদ, পতঞ্জলি, গৌতম, জৈমিনী প্রভৃতি জগৎগুরু দার্শনিকগণ, অথবা ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস, ভারবী, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভাস প্রভৃতি কবিগণ, বা চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ভিষকগণ, এবং ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী অথবা সতীকুলশিরোমণি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, প্রভৃতি মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীবৃন্দের গৌরবের কথায় হিন্দু ছাত্র বা যুবকের বুক ফুলিয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে হিন্দুকুলসম্ভূত মুসলমান ছাত্র ও যুবকদের মন দমিয়া যায়। তাহারা চারিদিক হাতড়াইয়া গৌরবের কিছুই দেখিতে পায় না। কি ভীষণ অবস্থা! (শোন শোন)। অথচ হিন্দু ছাত্র এবং সেই হিন্দুকুলসম্ভূত মুসলমান ছাত্রের পক্ষে প্রাচীন ভারতের গৌরবের অধিকার সম্পূর্ণ তুল্য। (শোন শোন। করতালিধ্বনি)।

বক্তা মুসলমান বাঙালীদিগকে তাঁহার অনুরোধ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন।

তরুণমণ্ডলি! আজ বিশ্বের জাগরণ-দিনে আমাদের জাতীয় জীবনের গভীর দুর্দিনে তরুণ ছাত্রবর্গকে মুসলমান নেতৃবৃন্দের আদেশ ও অনুরোধ, তাঁহারা যেন প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্ময় গৌরবের জন্য মুসলমানদিগকেও দাবীদার করিতে চেষ্টা করেন। অন্যথায় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় জীবনের অভ্যুত্থান সুদূরপরাহত হইয়াই থাকিবে।

তিনি বলেন,

মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জাঠ, রাজপুত, ও শিখ ছিল। সুতরাং তাহাদের সম্মুখে প্রাচীন হিন্দুর বেদ বেদান্ত উপনিষদ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, কাব্য, মহাকাব্য ও দর্শন এবং বিজ্ঞান রচনায় জ্ঞানের যে গৌরব—সে গৌরবের কাছে প্রাচীন গ্রীক ব্যতীত প্রাচীন ফিনিসিয়া, মিডিয়া, জুডিয়া, বাকট্রিয়া, কার্থেজ, রোম, মিশর, কালডিয়া, টুয়, ব্যাবিলোনিয়া ও পার্থিয়া প্রভৃতি সকলেরই মাথা নত। অথচ সেই প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের মহাজ্যোতিঃ হইতে ভারতীয় মুসলমানদিগকে বঞ্চিত রাখিলে মুসলমানেরা কখনও ভারত-বঙ্গে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। এজন্য হিন্দুকে শুধু আপনার মনে করিলে চলিবে না, তাহার সমস্ত গৌরবকেই হিন্দুর ন্যায় কুক্ষিগত করিয়া লইতে হইবে। (বিস্ময়, আনন্দ ও করতালিধ্বনি)

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি!

ভারতসচিব স্যর সামুয়েল হোর ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছেন, এদেশে রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইয়া আসিতেছে। অথচ গ্রেপ্তার, লাঠিপ্রয়োগ, সভার পর সভাকে বেআইনী ঘোষণা, স্থানে স্থানে গুলি-চালান এবং নূতন নূতন জেল নির্ম্মাণ চলিতেছে। দমদমায় দুটি জেল ছিল, রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য আর একটি ১০ই এপ্রিল হইতে খুলিবার কথা। তাহা প্রস্তুত হইয়া আছে!

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের স্বাজাতিকতা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গত অধিবেশনে সভাপতি মৌলবী মুজিবর রহমানের বক্তৃতা এবং সম্পাদক ডাক্তার রাফিদীন আহমদের বক্তৃতায় ন্যাশন্যালিজম্ অর্থাৎ স্বাজাতিকতার প্রেরণা ছিল। তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বিপথচালিত হন নাই। এই অধিবেশনে অনুমোদিত প্রস্তাবগুলিও স্বাজাতিক-দিগের সমর্থনযোগ্য। মুস্লিম লীগের বঙ্গীয় সভ্যেরা মিশ্র নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা আলাদা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন চান না। তাঁহারা ইহাও চান না, যে, মুসলমানেরা বঙ্গের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বলিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য অধিকাংশ সভ্যের পদ আইন দ্বারা রক্ষিত থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গের মুসলমান ও হিন্দু এই দুই বিষয়ে এক-মত। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই সকলের চেয়ে বেশী মুসলমানের বাস। সুতরাং মুসলমান বাঙালীদের মত অগ্রাহ্য করিয়া কিছু করিলে গবন্মেণ্ট বলিতে পারিবেন না, যে, মুসলমান জনমত অনুসারে তাহা করা হইয়াছে। লীগ সমুদয় সাবালক ব্যক্তির জন্য ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার চান।

তাহা না হইলে আপাতত ভোটদানের যোগ্যতা তাঁহারা এরূপ করিতে বলেন, যাহাতে বঙ্গের সমুদয় অধিবাসীর শতকরা ২০ জন এই অধিকার পায়। ইহাতেও হিন্দুদের আপত্তি নাই। ত্রিপুরা জেলার হাসানাবাদে পুলিস গুলি ছোঁড়ায় এপর্য্যন্ত ছয় জনের মৃত্যু হইয়াছে। অন্যান্য উপদ্রবেরও সংবাদ ছড়াইয়াছে। লীগ হাসানাবাদের সব ঘটনা সম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্তের দাবি করিয়া ঠিকই করিয়াছেন।

—

শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে প্রহার

শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ "নিউ ইরা" নামক সাপ্তাহিক কাগজ চালাইতেন। মুন্সীগঞ্জে তাঁহার দু-বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হওয়ায় তাঁহাকে হাতকড়ি দিয়া সেখান হইতে ঢাকা জেলে লইয়া আসা হইতেছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ প্রেন্টিস্ স্বীকার করেন, যে, ধীরেশ বাবুকে যখন রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন পথের পার্শ্বস্থিত থানা হইতে একজন ইউরোপীয় পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহার বাম চক্ষের উপর আঘাত করে, এবং তাহাতে তাঁহার চশমা ভাঙিয়া যায়। মিঃ প্রেন্টিস্ বলেন, গবন্মেণ্ট এরূপ প্রহার অনুমোদন করেন না এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ ঘটনা (যাহা সরকারী-মতে বিরল) না-ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

সরকার পক্ষ হইতে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। ধীরেশবাবু উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, সম্ভ্রান্ত ও অতি ভদ্র লোক, দাগী বদমায়েস নহেন। তাঁহার হাতে কড়া লাগান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক লাঞ্ছনা। তাঁহাকে প্রহার করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। মিঃ প্রেন্টিস্ বলিয়াছেন, যে, প্রহারকর্ত্তা ইংরেজ কর্ম্মচারীর উত্তেজিত হইবার কারণ ছিল, কিন্তু সে কারণটা কি তাহা তিনি জানেন না। সম্ভবতঃ সেই তুচ্ছ বিষয়ে কোন খবর লওয়া তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। ধীরেশবাবু মান্দ্রাজের ডাঃ প্যাটনের মত ইংরেজ হইলে ভারতসচিব পর্য্যন্ত ক্ষমা চাহিতেন। ইউরোপীয় পুলিস কর্ম্মচারীকে ধীরেশ-বাবু উত্তেজিত করিয়াছিলেন, না আর কেহ করিয়াছিল তাহাও জানা গেল না। পুলিস কর্ম্মচারী যে ধীরেশ বাবুর হাতে হাতকড়ি ছিল জানিত না এখবরটা তাহার সাফাইয়ের জন্য মিঃ প্রেন্টিস লইতে পারিয়াছেন, কিন্তু উত্তেজনাটা কি প্রকার ও কে উত্তেজিত করিল তাহা তিনি জানিতে চেষ্টা করেন নাই! এই ব্যাপারের সরকারী গোপন তদন্তটা একতরফা হইয়াছিল; কারণ মিঃ প্রেন্টিস্ স্বীকার করিয়াছেন, যে, ধীরেশবাবুর নিকট হইতে ঘটনাটার বৃত্তান্ত লওয়া হয় নাই। সুতরাং বুঝা যায়, মিঃ প্রেন্টিস্ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে যে বৃত্তান্ত পাইয়াছেন তাহার সত্যতা পরীক্ষিত হয় নাই। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। যে-কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সম্ভবতঃ তাহার কথা অনুযায়ী বৃত্তান্তই পাঠাইয়াছেন। মিঃ প্রেন্টিস্ বলিয়াছেন, ঐ কর্ম্মচারী এখনও সরকারী চাকরি করিতেছে; তদন্ত চলিবার সময় তাহাকে সস্পেণ্ড করা হইয়াছে কি না এবং তাহার নাম ও পদ কি, তাহা বলিতে মিঃ প্রেন্টিস্ প্রস্তুত নহেন বলিয়াছেন। প্রশ্ন উঠে, যে, সরকারী সভ্যেরা প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিতে পারেন কি না। সভাপতি রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী বলেন, তিনি সরকারী সভ্যদিগকে উত্তর দিতে বাধ্য করিতে পারেন না। কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া-না-দেওয়া যদি সম্পূর্ণ রূপে সরকারী সভ্যদের মর্জ্জিসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন করিবার অধিকারটা তুলিয়া দেওয়াই ভাল। অবশ্য, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর না-দিবার অধিকার পার্লেমেণ্টেও সরকার পক্ষের আছে। কিন্তু একজন পুলিস কর্ম্মচারীকে সস্পেণ্ড করা হইয়াছে কিনা, এটা ইংলণ্ড ও আমেরিকা বা অন্য কোন দেশের সহিত সন্ধি বিগ্রহ আদির মত গুরুতর ব্যাপার নহে। পার্লেমেণ্টে উত্তর না-দেওয়া ও এদেশের ব্যবস্থাপক সভায় উত্তর না-দেওয়ার মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়া দেন। পার্লেমেণ্টে সরকারী কোন লোক অযথেষ্ট কারণে প্রশ্নের উত্তর না-দিলে সভ্যেরা তাহাকে ও তাহার দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার চেষ্টা

করিতে পারেন, এখানে সেরূপ চেষ্টার কোন অবসর নাই। ঐ কর্ম্মচারীর নাম ও পদ সম্ভবতঃ মিঃ প্রেন্টিস এই আশঙ্কায় বলেন নাই, যে, তাহা হইলে সে হয়ত কাহারও প্রতিহিংসাভাজন হইয়া পড়িতে পারে। সুতরাং এই প্রশ্নটির উত্তর না-দেওয়ার সমালোচনা আমরা করিতেছি না।

জেলের বাহিরে ও ভিতরে অত্যাচারের অভিযোগ

লাহোরে অনেক দিন হইল কতকগুলা পুলিসের লোক দয়ানন্দ এংলোবৈদিক কলেজে ঢুকিয়া একটি শ্রেণীর অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে প্রহার করে। অধ্যাপক দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের নালিশ করেন। সম্প্রতি তিনি একজন ইংরেজ পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পাইয়াছেন। কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাট থানার একজন হেড কনষ্টেবল ও চারিজন কনষ্টেবল কতকগুলি সত্যাগ্রহী মহিলার উপর দুর্ব্যবহার করায় সংবাদপত্রে এবং প্রকাশ্য সভায় তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। পুলিসের ঐ পাঁচজন লোকের বিচার হইবে। উৎপীড়িতা মহিলারা প্রকাশ করিয়াছেন, যে, তাঁহারা সত্যাগ্রহী, প্রতিশোধ চান না। ইহা তাঁহাদের যোগ্য কাজ হইয়াছে।

অল্পসংখ্যক এইরূপ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হয়, কিন্তু অধিকাংশ অভিযোগের হয় না। কোন কোনটি সম্বন্ধে সরকারী কম্যুনিকে বা জ্ঞাপনীতে বলা হয়, ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিংবা তাহার একটা কিছু ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ প্রেন্টিস বলিয়াছেন, লোকে এইরূপ জ্ঞাপনী বিশ্বাস করে না। কেন করে না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, লোকদের মেণ্ট্যালিটি বা মনের ভাবগতিকই ঐ রকম। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে অন্য সব দৃশ্য পদার্থের মত এদেশের মানুষদের মনের ভাবগতিকেরও একটা কারণ আছে। সেই কারণটা স্থির করা মিঃ প্রেন্টিসের মত লোকদের উচিত। দু-একটা কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি। বিস্তর লোকে দেখে, অনেক ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষদর্শী বিশেষ শ্রদ্ধেয় লোকদের নিকট হইতে লব্ধ জ্ঞান সরকারী রিপোর্টের সঙ্গে মিলে না। অথচ সরকারী লোকদিগকে অভ্রান্ত এবং বেসরকারী নিজেদের ও শ্রদ্ধেয় লোকদের চোখ-কানকে ভ্রান্ত মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। তাহার পর লোকে দেখিয়াছে, হিজলীর কাণ্ড সম্বন্ধে প্রথমে সরকারী যে-সব বৃত্তান্ত বাহির হয়, তাহা পরে সরকারী তদন্তেরই রিপোর্টে প্রধানতঃ অসত্য বলিয়া দৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামের অরাজকতা সম্বন্ধে বেসরকারী লোকেরা যাহা বলিয়াছেন, শ্রদ্ধেয় নেতারা অনুসন্ধানের পর যাহা বলিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে সরকারী অনুসন্ধান কমিটির কাজ অনেক দিন শেষ হইয়া গিয়া থাকিলেও এবং রিপোর্টও দাখিল হইয়া থাকিলেও তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

দমনমূলক কার্য্যের সংবাদ বিলাত পৌঁছা

এদেশে সরকারী লোকদের দ্বারা যে-সব কাজ হইতেছে বলিয়া প্রকাশ্য খবরের কাগজে বা অপ্রকাশ্য কাগজে যে-সব সংবাদ বাহির হয়, কিংবা যে-সব গুজব রটে, তাহার সবগুলিই সত্য, বলিতে আমরা অসমর্থ। কিন্তু ভারতবর্ষে সাধারণতঃ কোন সরকারী লোক কোন বেআইনী কাজ বা অত্যাচার করিতেছে না, যত কিছু উপদ্রব সব কংগ্রেসওয়ালারা করিতেছে—বিলাতে এই রকম একটা বিশ্বাস, ভারতবর্ষ হইতে সত্য সংবাদসংগ্রহের চেষ্টা বিলাতী কাগজগুলা না-করায়, সত্য সংবাদ প্রেরণে বাধা থাকায়, এবং বিলাতী কাগজগুলার নিকট সত্য সংবাদ পৌঁছাইয়া দিলেও অধিকাংশস্থলে তাহা মুদ্রিত না-হওয়ায়, নির্ব্বিবাদে লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। আগে মধ্যে মধ্যে সংবাদ আসিত, অমুক বিলাতী কাগজে সত্য কথা বাহির হইয়াছে বা হইবে, অমুক ভারতবন্ধু সভায় অমুক অমুক বিখ্যাত লোক সত্য কথা বলিয়াছেন, সম্প্রতিও এরূপ খবর আসিয়াছে। যাঁহারা সত্য জানিয়াছেন, ছাপিয়াছেন, বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ হইবে, আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু বিলাতে ঐসব সংবাদ প্রচারের ফলে কেবল সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে এদেশে রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার

পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এরূপ কোন মিথ্যা আশা আমরা পোষণ করি না, স্বদেশবাসীদিগকেও পোষণ করিতে বলি না।

—

ভারত-সম্বন্ধীয় বিলাতী খবর

পীটার ফ্রীম্যান নামক একজন ভূতপূর্ব্ব পার্লেমেণ্ট-সভ্য ভারতভ্রমণানন্তর লণ্ডনে এক সভায় একটা লাঠি ও একটি ভারতবর্ষীয় জাতীয় পতাকা সহযোগে নিজ ভারতীয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, ভারতবর্ষে যে-সব অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন তাহার সম্মুখীন হইবার জন্ম এখনও সত্যাগ্রহীর অবিরাম স্রোত আগুয়ান হইয়া আসিতেছে। তিনি বক্তৃতায় বলেন, তিনি যাহা দেখিয়াছেন বড়লাট লর্ড উইলিংডনকে তাহা বলায় বড়লাট বলেন, "ভারতবর্ষে কঠোর ব্যবস্থার দরকার।" বক্তার মতে ভারতবর্ষকে অনেক বৎসর আগে স্বরাজ দেওয়া উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন এই সভায় সভাপতি ছিলেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে সংবাদের উপর সেন্সরগিরি আছে, কিন্তু ইংলণ্ডে ভারতীয় সংবাদকে বয়কট করা হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন, যদিও সমুদয় সংবাদসরবরাহক এজেন্সীগুলিকে এবং প্রধান প্রধান প্রাদেশিক কাগজকে সভায় আসিতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তথাপি কেবল ভারতীয় খবরের কাগজের প্রতিনিধিরাই উপস্থিত ছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, ভারতবর্ষের খবর জানিতে পর্য্যন্ত ইংরেজরা কৌতূহলী নয়।

জেনিভার অধ্যাপক এডমণ্ড প্রিভা সস্ত্রীক মহাত্মাজীর সঙ্গে আসিয়া দুই মাস ভারত ভ্রমণ করেন। বিলাতে গিয়া তিনি এক সভায় যাহা বলিয়াছেন, রয়টারের তারের খবরে তাহার এইরূপ চুম্বক দেওয়া হইয়াছে :—"ইংলণ্ডে খুব কম লোকই প্রকৃত ভারতীয় অবস্থা জানে, কিন্তু ভারতে বর্ত্তমান ব্রিটিশ-শাসনের জন্ম প্রত্যেক ইংরেজের লজ্জিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, বড়লাটের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন, যে, নিরুপদ্রব অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিসের লাঠি চালানর কথা বড়লাট জানেন না। এইপ্রকার অজ্ঞতা বাস্তবিক কৃপার উদ্দীপক।" বড়লাট কি দেশী সম্পাদকদের পরিচালিত দু-একখানা ইংরেজী কাগজও দেখেন না ?

অধ্যাপক প্রিভা আরও বলিয়াছেন, যে, অন্তর্জাতিক রেড্‌ক্রস এসোসিয়েশ্যন ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক কংগ্রেসের হাঁসপাতাল বন্ধ করা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং তিনি নিজে দুটি হাঁসপাতাল বন্ধ করা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। পার্লেমেণ্টের সভ্যদের সম্মুখে একটি বক্তৃতায় অধ্যাপক মহাশয় ভারতীয় অবস্থা এমন জীবন্ত ভাবে বর্ণনা করেন যেন ছবি দেখাইতেছেন। অধিকাংশ সভ্য ছিলেন রক্ষণশীল দলের। তাঁহারা তাঁহার উপর প্রশ্নরাশি বর্ষণ করেন এবং তিনি যথাসাধ্য উত্তর দেন। মিঃ বার্লে নামক একজন যুবা উদারনৈতিক জিজ্ঞাসা করেন, অধ্যাপক মহাশয় ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে আগামী মূল রাষ্ট্রীয় বিধি (constitution) সমর্থন করিবার ইচ্ছুকতা দেখিয়াছেন কিনা। তিনি উত্তর করেন, কি প্রকাশ্য সভায় কি অপ্রকাশ্য কথাবার্ত্তায় তিনি এরূপ ইচ্ছার লেশ মাত্রও দেখিতে পান নাই। অপ্রকাশ্য কথাবার্ত্তায় লোকে অবশ্য মনের ভাব বেশী খুলিয়া প্রকাশ করিত।

বিলাতী টাইম্‌স্ কাগজের এখানকার সংবাদদাতা উহাতে খবর পাঠাইয়াছিলেন, যে, এখানে গবর্মেণ্ট ভারতীয় উদারনৈতিকদের সমর্থন পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। তাহার উত্তরে পোলাক সাহেব ঐ কাগজে লিখিয়াছেন, ভারতীয় উদারনৈতিকদেরও স্বাধীন মত ভারত-গবর্মেণ্ট সদ্ভাবে গ্রহণ করেন না। নেতৃস্থানীয় উদারনৈতিকরা কংগ্রেস ও গবর্মেণ্টের বিরোধ উভয় পক্ষের সম্মান রক্ষা করিয়া থামাইবার যে সদভিপ্রায়প্রণোদিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, সরকারী মহলে তাহা ভাল ভাবে গৃহীত হয় নাই। মিঃ পোলাক বলেন, ভারতীয় মডারেটরাও সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে, গবর্মেণ্ট বাস্তবিক ভারতীয় রাষ্ট্র-সংঘবিষয়ক প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে চান কিনা। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে মডারেটদের সন্দেহ গবর্মেণ্ট অনবগত নহেন।

পোলাক সাহেব এক সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্ম

গান্ধীর চেলা ছিলেন এবং তথাকার ভারতীয় সত্যাগ্রহের সংস্রবে জেলে গিয়াছিলেন। স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রুর সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা আছে।

৮ই এপ্রিলের বিলাতী "নিউ ষ্টেট্স্‌ম্যান্ এণ্ড নেশ্যন" লিখিয়াছেন, যে, সেন্সরি সতর্কতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত দমনপ্রণালীর প্রামাণিক রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। ঐ কাগজ বলেন, "রিপোর্টগুলি এরূপ প্রমাণের সমষ্টি যে তাহার অস্তিত্ব উপেক্ষা করা চলিবে না। মিঃ ম্যাকডন্যাল্ড যদি ভারতবর্ষে নিজের কোন প্রভাব বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে, দরকার হইলে, মন্ত্রীপরিষদে তাঁহার সঙ্গীদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াও, অবিলম্বে এবিষয়ে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিয়া তাহাতে দৃঢ় থাকিতে হইবে।" বিলাতী কাগজটির এই কথাগুলি পড়িয়া মনে হয়, উহার সম্পাদক মনে করেন ভারতবর্ষে এখনও মিঃ ম্যাকডন্যাল্ডের কিছু প্রভাব অবশিষ্ট আছে, এবং তিনি ভারতবর্ষের লোকদের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার মুল্য বুঝেন ও তাহা গ্রাহ্য করেন, অধিকন্তু তিনি প্রধান মন্ত্রী থাকা অপেক্ষা ভারতবর্ষে স্বীয় প্রভাব রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এই তিনটি বিষয়েই আমাদের সন্দেহ আছে।

খালাসের পর আবার গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের মোকদ্দমায় ১৯ মাসব্যাপী বিচারের ফলে ১৬ জন আসামী বেকসুর খালাস পায়, কিন্তু পুলিস তাহাদিগকে আবার গ্রেপ্তার করে। তাহারা বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কাল বন্দী থাকিবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে মিঃ প্রেন্টিস বলেন, গত ২৩শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৪২ জন লোককে আদালতের বিচারে খালাস পাইবার পর আইন বা অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ৭১৭ জন লোক বিনা বিচারে বন্দী হইয়া আছে। ৮ই এপ্রিল তারিখে, বেআইনী ভাবে গোপনে অস্ত্র আমদানী করার মোকদ্দমায়, কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণাভাবে ১৬ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন। তাহাদের মধ্যে এগার জনকে পুলিস আবার গ্রেপ্তার করে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে বহুশত বাঙালী পুরুষ ও মহিলাকে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ যে দোষী তাহা প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। সুতরাং তাহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। পঞ্চাশ জনের বেশী লোকের বিচার হইয়াছে। তাহারা দোষী প্রমাণ না-হওয়ায় বা নির্দ্দোষ প্রমাণ হওয়ায় খালাস পাইয়াছে। অথচ তাহাদিগকেও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে!

—

বিনা-বিচারে বন্দীদের নির্ব্বাসন আইন

যাহাদিগকে বিনা বিচারে বন্দী করা হইয়াছে, তাহাদের দোষের বা নির্দ্দোষিতার প্রমাণ ঐরূপ! অথচ এই প্রকার লোকদিগকে শুধু বন্দী রাখিয়াই গবর্মেণ্ট সন্তুষ্ট নহেন। তাহাদিগকে বাংলা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আজমীর প্রদেশে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৭০ মাইল দূরে স্থিত বিশেষ করিয়া তাহাদের জন্য নির্ম্মিত একটা জেলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত একটা আইন পাস হইয়াছে। সরকার বাহাদুর এই প্রকারে বঙ্গীয় ত্রাসোৎপাদক দলের উচ্ছেদ সাধন করিবার আশা রাখেন। কিন্তু গোড়ায় গলদ এই, যে, লোকগুলি যে ত্রাসোৎপাদক বা বিপ্লবাত্মক কোন অপরাধ করিয়াছে বা করিতে চায়, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। এই আইন সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বলেন—

> বিনা বিচারে আটক রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, এই নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা দ্বারাও হইবে না। জুলুম হইতে প্রতিশোধের ইচ্ছা জন্মে এবং তাহা হইতে আবার জুলুমের প্রবৃত্তি আসে। এই গোলকধাঁধার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ও বিপ্লবীরা ঘুরপাক খাইতেছেন। আমরা বিপ্লববাদের তীব্র নিন্দা করি। কিন্তু তাই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিভীষিকা উৎপাদনের সমর্থন করিতে পারি না। আমি এই সভাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যে, ১৯২৫ সালে স্যর হিউ ষ্টিফেনসন স্বীকার করিয়াছিলেন, ১৯০৮ সালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতিকে বিপ্লববাদের জন্য আটক করা হয় নাই—তাঁহারা বয়কটের প্রচার কার্য্য ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছিল। এইরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই গবর্ণমেণ্ট কাজ করিয়া থাকেন।

দেওয়ান বাহাদুর এ রঙ্গস্বামী মুদালিয়ার অনেক বিজ্ঞজনোচিত কথা বলেন। যথা—

"যাঁহারা বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও ধীরবুদ্ধি, গবর্মেণ্ট তাঁহাদের পর্য্যন্ত সহানুভূতি হারাইতেছেন।" "নৈতিক সমর্থনের পোষকতা না থাকিলে কোন আইন কার্য্যকর হয় না; বোধ করি সেই জন্য বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ধারা এত দিনেও বঙ্গের বিপ্লবপ্রয়াস লয় পায় নাই।"

শ্রীযুক্ত সি এস রঙ্গ আইয়ার বলেন—

আমি ধরিয়া লইতে বাধ্য যে, রাজবন্দীরা সকলেই নির্দ্দোষ। বিপ্লববাদ দ্বারা যদি এদেশে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে, গবর্ণমেণ্ট বন্দীদিগকে আজমীরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাহা অপেক্ষাও সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি করিতেছেন।

স্যর কাওয়াস্জী জাহাঙ্গীর বলেন, "আমি গবর্মেণ্টকে সাবধান করিয়া দিতেছি এই উপায়ে ভারতবর্ষ শাসন করা চলিবে না।"

মিঃ আর্থার মূর এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। নিয়োগী-মহাশয় তাহার মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, মিঃ আর্থার মূরের শ্রেণীর লোকেরা যে, চট্টগ্রামে আয়ার্লাণ্ডের "ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান"দের মত অত্যাচার করিয়াছিল (যাহা নিয়োগী-মহাশয় প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন বলেন), সে বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য কি? মিঃ মূর তাহার জবাব না দিয়া কথাটা উন্টাইয়া দিবার বা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলেন, "মাননীয় সদস্য মহাশয় অন্য কথা তুলিতেছেন।"

এই আইনের কতকগুলি ধারা সংশোধনের এবং নূতন কোন কোন ধারা বসাইবার প্রস্তাব হয়। সবগুলিই না-মঞ্জুর হয়। কেবল, আইনটা যে তিন বৎসর মাত্র বলবৎ থাকিবে, এই সংশোধন গৃহীত হয়। তাহা কোন কাজের নয়। কারণ, তিন বৎসরের পর গবর্মেণ্ট আবার এইরূপ আইন বা অর্ডিন্যান্স করিতে পারিবেন। এই একটা মাত্র সংশোধন গ্রহণ করিয়া কেবল দেখাইবার চেষ্টা হইল, যে, গবর্মেণ্ট সম্পূর্ণ অবুঝ নহেন।

বন্দীদের সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের দেখা করা বহুব্যয়সাধ্য এবং অনেকের সাধ্যবহির্ভূত হইবে। এই জন্য প্রস্তাব হয়, যে, সাক্ষাৎকারপ্রার্থী আত্মীয়দের রাহাখরচ যেন গবর্মেণ্ট দেন। ইহা অগ্রাহ্য হয়। নির্ব্বাসিত বাঙালী বন্দীদের জন্য বাঙালী পাচক ও বাঙালীর খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়।

এই বিলের ৪র্থ ধারাটি তুলিয়া দেওয়ার জন্য আর এক প্রস্তাব করা হয়। চতুর্থ ধারাতে বলা হইয়াছে, যে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৯১ ধারা অনুসারে বিনা-বিচারে আটক বন্দীদের আবেদন শুনিবার যে ক্ষমতা হাইকোর্টের আছে তাহা রহিত করিতে হইবে, অর্থাৎ বাংলার অর্ডিন্যান্স-বন্দীদের অভিযোগ সম্পর্কে হাইকোর্ট কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সদস্যকে আজমীরের আটকখানার বে-সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করা হউক। এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়।

মিঃ সীতারাম রাজু প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কাজ যদি করা হয়, তাহা হইলে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৯১ ধারা অনুসারে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। ইহাও না-মঞ্জুর হয়!

বিলটার বিরুদ্ধে ৩৭ এবং সপক্ষে ৫৪ ভোট হওয়ায় উহা পাস হয়। তাহার পর উহা কৌন্সিল অব্ ষ্টেটেও পাস হইয়াছে।

অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত লোকদের উপযুক্ত শাস্তিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু বিনা বিচারে নির্দ্দোষ লোকদের শাস্তি নিন্দনীয় ত বটেই, নিষ্ফলও বটে; এবং উত্তেজনার ও অপরাধের উৎপাদকও হইতে পারে। ২৫ বৎসর ধরিয়া গবর্মেণ্ট বঙ্গের শত শত লোককে এই প্রকারে শাস্তি দিয়াছেন। তাহাতে অনেকে চিররুগ্ন হইয়াছে, অল্পায়ু হইয়াছে, কঠিন পীড়ায় মারা গিয়াছে, বিস্তর পরিবার বিপন্ন ও মর্ম্মাহত হইয়াছে; কিন্তু বিপ্লববাদ ও বিপ্লবপ্রয়াস নির্মূল হয় নাই। নির্ব্বাসনটা গোদের উপর বিষফোড়া মাত্র, বিপ্লববাদের ঔষধ নহে। কত জন মেরুদণ্ডহীন তোষামোদকারী অদূরদর্শী ভারতীয় সভ্য এই আইনের পক্ষে ভোট দিয়াছে, এখনও জানিতে পারি নাই।

—

নুন, কাগজ, চিনি

বাংলা দেশের জন্ত আবশ্বক নুন, কাগজ ও চিনি যে বঙ্গে প্রস্তুত করা উচিত, তাহা বলিবামাত্রই সকল বাঙালী স্বীকার করিবেন। তাহার অল্পাধিক সুযোগও হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই সুযোগ এমন সময়ে হইয়াছে, যখন বঙ্গের অন্যতম সঙ্গতিপন্ন শ্রেণী জমিদারদের অর্থাভাব বশতঃ বহুশত মহল নীলামে বিক্রী হইয়া যাইতেছে ও তাহার কোন কোনটি গবর্ণমেণ্ট এক এক টাকা মূল্যে ডাকিয়া লইতেছেন। যখন বঙ্গের এরূপ দুর্দ্দশা থাকে না, তখনও অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার বেশী উৎসাহ আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বর্ত্তমান সুযোগ ছাড়া উচিত হইবে না। নগদ টাকা অনেক ফেলিতে পারেন, এরূপ হাজার হাজার লোক বাঙালীদের মধ্যে এখনও আছেন। তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। কিন্তু আশা করি তাঁহারা ব্যবসা-বুদ্ধিসম্পন্ন, অভিজ্ঞ এবং সৎ বিশেষজ্ঞ নির্ব্বাচন করিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন।

—

বিস্তর মহল নীলাম

অনেক জেলায় যে বহু শত মহল খাজনার দায়ে নীলাম হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, যে, ঐসব মহলের মালিকদের আর্থিক অবস্থা বরাবর "অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ" ছিল, সঞ্চয়ের উপায় ছিল না, তাই প্রজারা এক বা দুই বৎসর খাজনা না-দেওয়ায় তাঁহারাও সরকারকে খাজনা দিতে পারেন নাই। অথবা এমনও হইতে পারে, যে, তাঁহাদের যাহা আয় ছিল তাহাতে সঞ্চয় হইতে পারিত, কিন্তু অমিতব্যয়িতা বশতঃ সঞ্চয় হয় নাই। সত্য কারণ যাহাই হউক, এত মহল বিক্রীতে বেকার সমস্যা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে।

তাহার উপর গবর্ন্মেণ্টের হাতে অনেক মহল গিয়া পড়িয়া খাসমহল বাড়িতেছে এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর প্রতি সরকারী পক্ষপাতিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে।

—

কংগ্রেসের অধিবেশনের চেষ্টা

কিছুদিন হইল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকারী জবাব পাওয়া যায়, যে, কংগ্রেস বেআইনী সভা নহে। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গবর্ন্মেণ্ট ভাঙিয়া দিয়াছেন, উহার সব সভ্য (শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ছাড়া) কারারুদ্ধ হইয়াছেন। প্রাদেশিক, জেলা, ও গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটি সব ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের আপিস বন্ধ ও জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। এলাহাবাদে কংগ্রেসের সম্পত্তি স্বরাজভবন পুলিস দখল করিয়াছে, কংগ্রেসের বা কোন প্রাদেশিক বা জেলা বা গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটির টাকাকড়ির সন্ধান পাইবা মাত্র তাহা বাজেয়াপ্ত বা কংগ্রেসের কাজে তাহার ব্যয় নিষিদ্ধ হইতেছে, এবং কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট সত্যাগ্রহ পদ্ধতির অনুসরণ করায় অনেক হাজার লোক প্রহৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও যে কংগ্রেস বেআইনী নহে, এই সরকারী ফতোয়া বুঝিতে হইলে চুলচেরা যুক্তির আবশ্যক।

যাহা হউক সরকারী উক্ত মত প্রকাশিত হইবার কিছু কাল পরে হঠাৎ খবর বাহির হইল, দিল্লীতে বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেসের ৪৭শ অধিবেশন হইবে এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাহার সভাপতি হইবেন। সম্পাদক প্রভৃতির নামও বাহির হইল। কংগ্রেসের মণ্ডপাদি নির্ম্মাণের জন্য গবর্ন্মেণ্টের নিকট জমী চাওয়া হইল। তখন দিল্লীর চীফ্ কমিশনার জবাব দিলেন, কংগ্রেস আইন অমান্য করিবার প্রচেষ্টা চালাইতেছেন ইত্যাকার কারণে কংগ্রেসের অধিবেশন করিতে দেওয়া হইবে না, জমী দেওয়া হইবে না, ইত্যাদি। পরে আরও সরকারী উক্তি বাহির হইয়াছে, যে, যাহারা কংগ্রেসের অধিবেশনের যোগাড় করিবে বা করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে কড়া ব্যবস্থা হইবে, কংগ্রেস ভাঙিয়া দেওয়া হইবে, ইত্যাদি।

এদিকে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলিতেছেন, বাধা সত্ত্বেও কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। এখন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। তিনিও বলিতেছেন, কংগ্রেস বসিবে। ১০ই এপ্রিলের (২৮শে চৈত্রের) সকাল পর্য্যন্ত কলিকাতায় এইরূপ খবর

পৌঁছিয়াছে। পরে কি ঘটে, তাহা দৈনিক কাগজে দ্রষ্টব্য।

কংগ্রেস বসিবার সংবাদ কাগজে বাহির হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে সরোজিনী দেবী কাশী গিয়া মালবীয়-জীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহেন, ও দিল্লী ফিরিয়া যান। পরে মালবীয়জীও দিল্লী যান। এখন এই সব চলাফিরা ও কথাবার্ত্তার কারণ ও উদ্দেশ্য অনুমিত হইতেছে।

কংগ্রেস বসিবার সংবাদ বাহির হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খবর বাহির হয়, যে, সরোজিনী দেবী বলিয়াছেন, যে, এই অধিবেশন সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন, এবং তাহা বসাইবার বা আহ্বান করিবার দায়িত্ব একমাত্র তাঁহারই। মালবীয় মহাশয়ও, তাঁহার উপর জাতির আস্থা ও বিশ্বাস আছে বলিয়া, ভারতীয় জাতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পণ্ডিতজী অবশ্য "সর্ব্বসাধারণের" বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা দূরে থাক্, তাঁহার কৃতজ্ঞতাপ্রকাশসূচক "বাণী" বাহির হইবার পূর্ব্বে "সর্ব্বসাধারণ" কংগ্রেস বসিবে বলিয়া স্বপ্নও দেখে নাই। সুতরাং এই ধন্যবাদপ্রদানাদি ব্যাপারের মধ্যে একটু হাস্যরস আছে তাহা পণ্ডিতও স্বীকার করিবেন। বস্তুতঃ ধন্যবাদ কাহারও প্রাপ্য থাকিলে তাহা সরোজিনী দেবীর এবং পণ্ডিতজীরও!

কংগ্রেসের বৈঠক হইবে, এমন একটা খবর বিলাত পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। একদিনের মধ্যেই এদেশে এই সংবাদ সম্বন্ধে বিলাতী কতকগুলা কাগজের মত তার-যোগে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার সার কথাটা এই, যে, এখনও মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার দলের লোকেরা জেলে, এই অবসরে কংগ্রেসের নরম দলের লোকেরা গান্ধীকে দলপতির আসন হইতে সরাইয়া আপনাদের নেতা মালবীয়জীকে সেই আসনে বসাইবে এবং কংগ্রেসের আইনলঙ্ঘনাদি চরম প্রচেষ্টার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত নরম ও "বিজ্ঞোচিত" নীতির প্রবর্ত্তন করিবে, ও গবন্মেণ্টের সহিত রফা করিবে। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি নাই বলা যায় না; আছে। গান্ধীর নেতৃত্ব কাহারও ঈর্ষ্যার বিষয় হইতে পারে না, কেহই তাঁহাকে সরাইয়া নিজে দলপতি হইতে চাহিতে পারেন না, ইহাও সত্য নহে। কিন্তু কংগ্রেসের প্রস্তাবিত বৈঠকের উদ্দেশ্য যদি বাস্তবিক গান্ধীর দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং চরম পন্থার পরিবর্ত্তে নরম পন্থা প্রবর্ত্তন হইত, তাহা হইলে তাহা গবন্মেণ্টের অভিলষিত জিনিষই হইত এবং এরূপ বৈঠকে গবন্মেণ্ট কোন বাধা না দিয়া বরং তাহার সহায়তাই করিতেন। কিন্তু বৈঠকের প্রতি সরকারী ভাবভঙ্গী ত সেরূপ নয়। সুতরাং বিলাতী কাগজ-গুলার মন্তব্য ঠিক বলিয়া মানিতে পারা যায় না। তবে, ব্যাপারটার মধ্যে গভীর চা'ল থাকাও অসম্ভব নহে।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস ডিক্টেটার বা অন্য প্রধান কংগ্রেসকর্ম্মীকে যে চিঠি পাঠান এবং যাহা ইংরাজী দৈনিক কাগজসমূহে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে ছিল—

> এখন এইরূপ স্থির আছে, যে, কংগ্রেসের আগামী বৈঠকে সভাপতির অভিভাষণ হইবে এবং তিনটি প্রস্তাব ধার্য্য করা হইবে। যথা, (১) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্যস্থল বলিয়া পুনর্ব্বার নিশ্চিতরূপে বলা, (২) নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন কোন কোন অবস্থায় অধীন ভাবে পুনঃপ্রবর্ত্তনকল্পে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শেষ অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করা, এবং (৩) নিশ্চিত করিয়া বলা যে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি, এবং তিনিই উহার মুখপাত্র।

যে বৈঠকে এইরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত হইবার কথা, গবন্মেণ্ট তাহাতে বাধা দিবেন না, এরূপ আশা সরোজিনী দেবী ও মালবীয়জী করিয়াছিলেন কিনা জানি না; কিন্তু উহা দুরাশা। হইতে পারে, যে, কংগ্রেস-বৈঠক করিবার প্রস্তাব এবং তাহাতে করণীয় কাজের তালিকা সম্বলিত শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর চিঠি, ইংরেজীতে যাহাকে কাইট-ফ্লাইং বলে, তাহাই; অর্থাৎ উহা ঐ সব বিষয়ে জনমত ও গবন্মেণ্টের মত জানিবার একটা কৌশল। গবন্মেণ্টও সম্ভবতঃ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন কখনই বৈঠক হইতে দিবেন না, এই অভিপ্রায়ে ও আশায়, যে, তাহা হইলে উহার উদ্যোক্তারা যদি নরম হইয়া কংগ্রেসের লক্ষ্য কিছু নীচু করিয়া গবন্মেণ্টের সঙ্গে রফা করেন।

বিলাতী ডেলী মেল গবন্মেণ্টের দৃঢ়তায় খুশী হইয়া বলিয়াছে, দুই-তিন বছর আগে এই রকম দৃঢ়তা দেখাইলে ভারতবর্ষের অবস্থাটা এত খারাপ হইত না।

আমরা কংগ্রেসের বর্ত্তমান উদ্যোক্তাদের পরামর্শের বাহিরে; সরকারী চা'লেরও কোন খবর রাখি না—কংগ্রেস বেআইনী নয় অথচ তাহার অধিবেশন হইতে পারিবে না, এ হেঁয়ালীর রহস্য উদ্ভেদও করিতে পারি নাই। শেষ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিবে, তাহা হইতে আমাদের জ্ঞান জন্মিবে। সুতরাং সংস্কৃত প্রবচন অনুসারে আমরা "বর্ব্বরাঃ"। প্রমাণ, যথা—

রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং, ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ। পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন, ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ॥ রাজা চরের কথা কাণে শুনিয়া, পণ্ডিত বুদ্ধিদ্বারা এবং পশু গন্ধদ্বারা বুঝিতে পারে; কিন্তু বর্ব্বরেরা অর্থাৎ মূর্খেরা ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর পরিণাম দেখিয়া বুঝে।

—

জাপানে সেন্সরের কর্ম্ম

ভারতবর্ষের সব প্রদেশে এক এক জন সরকারী কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাকে সেন্সর বলা হয়। খবরের কাগজে কিরূপ খবর ও মন্তব্য ছাপা নিষিদ্ধ তাহা জানান এবং কোন কাগজ সেরূপ কিছু ছাপিলে তাহাকে ধমক সহ সতর্ক করিয়া দেওয়া সেন্সরের কাজ। জাপানেও আজকাল এরূপ রীতি আছে—বরাবর ছিল কি না জানি না। তবে এখানে ও সেখানে একটু প্রভেদ আছে। এখানে দেশী সম্পাদকেরা অভিযোগ করেন, সেন্সরের জারিজুরি ও ধমক ইংরেজ সম্পাদকদের উপর খাটে না, দেশীদের উপরই খাটে। জাপানে ইংরেজ সম্পাদকেরা বলেন, উপদ্রব তাঁহাদের উপরই হয়, জাপানী সম্পাদকদের উপর হয় না। কোবে শহরের জাপান ক্রনিক্ল নামক ইংরেজী কাগজের ৩রা মার্চ্চের সাপ্তাহিক সংস্করণে সম্পাদক বলিতেছেন :—

২৪শে ফেব্রুয়ারীর জাপানী কাগজগুলিতে কিছু এরূপ সংবাদ ছিল যাহা দিনের বেলায় আমাদিগকে টেলিফোনে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যেন আমরা নিশ্চয়ই না-ছাপি। হুকুম হুকুমই, সুতরাং আমরা ঐ সব খবর ছাপিতে পারিলাম না। একবার আমরা কোবে আদালতের কর্ত্তৃপক্ষকে জাপানী সম্পাদক ও বিদেশী সম্পাদকদের প্রতি এই প্রকার ব্যবহার-পার্থক্যের কথা জানাইলে উত্তরে তিনি বলেন, "বাস্তবিক কোন পার্থক্যই নাই। জাপানী কাগজগুলি যখন তাহাদের পাঠকদিগকে ঐসব খবর দিতে চায় তখন খবর দেয়, এবং তাহার ফলস্বরূপ জরিমানাও দেয়।" ক্রনিক্লের পক্ষে সংবাদ ছাপিয়া জরিমানা দিবার এই প্রকার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া সুসাধ্য নহে; সুতরাং আমরা খুব দরকারী একটা বিষয়ে আমাদের পাঠকদিগকে অনবগত রাখিতে বাধ্য হইলাম। হয়ত ইহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, কারণ ঐ বিষয়ের খবর সাধারণতঃ সুবিদিত।

জাপানী সম্পাদকের শেষ বাক্যটি অভিনিবেশযোগ্য। জাপানে যেমন এখানেও তেমনি, গবর্ন্মেণ্ট কোন কোন বিষয়ে যে-সব সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশ করিতে দেন না, তাহা খুবই ছড়াইয়া পড়ে। প্রভেদ এই, যে, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ছাপিতে দিলে অত্যুক্তি, আংশিক বা পূর্ণ মিথ্যাভাষণ প্রভৃতির প্রতিকার করা গবর্ন্মেণ্টের সাধ্যায়ত্ত থাকে, কিন্তু নিষিদ্ধ সংবাদ ও মন্তব্য যে-ভাবে ছড়ায় তাহার উপর খুব জবরদস্ত হাকিমেরও হুকুম চলে না। গুজব একেবারে নিরঙ্কুশ—কবিদের চেয়েও নিরঙ্কুশ।

টেলিফোন যোগে হুকুম দেওয়া এদেশেও চলিত আছে। ইহার সুবিধা এই, যে, হুকুম যদি তুমি না মান, তাহা হইলে তোমার শাস্তি হইবে; অন্যদিকে ওরূপ হুকুম সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উঠিলে সরকারী সভ্যবিশেষ বলিতে পারিবেন, ওরূপ হুকুমের কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে আমি প্রশ্নকর্ত্তাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি। এরূপ চ্যালেঞ্জ খুব নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদে করা যায়। কারণ টেলিফোনের কথাবার্ত্তার কোন স্বতোলিখিত দলিল (automatic record) থাকে না এবং এরূপ কথাবার্ত্তার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষীসাবুদও থাকে না বা হাজির করা অসম্ভব।

জাপানে ও এদেশে সেন্সরের কাজ ঘটিত আরও কিছু পার্থক্য আছে। তাহার কারণ জাপান স্বাধীন দেশ। সেখানে জাপানী সম্পাদকেরা যাহা ছাপিতে পারে, বিদেশী সম্পাদকেরা তাহা পারে না; এদেশে বিদেশী ইংরেজদের কাগজ যাহা ছাপিতে পারে আমরা তাহা পারি না। আরও একটা প্রভেদ এই, যে, জাপানী সম্পাদকেরা নিষিদ্ধ খবর ছাপিলে তাহাদিগকে জরিমানা দিতে হয়; এদেশে ইংরেজদের কাগজে (দেশীদের জন্য) নিষিদ্ধ কিছু মুদ্রিত হইলে ইংরেজদের কাগজের কোন শাস্তি হয় না।

—

নিখিলভারতীয় মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্স

নিখিল ভারতীয় মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁহার অভিভাষণে চিকিৎসকদের সম্মুখে তাঁহাদের কার্য্যের যে আদর্শ ধরিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ। তাঁহার মতে, ভাবে

চিন্তায় ও বাক্যে এক হইয়া সমগ্র জাতির প্রীতিপূর্ণ সেবায় প্রবৃত্ত হওয়াই চিকিৎসকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় হওয়া উচিত। তাঁহার এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অভিভাষণে চিকিৎসকদের শিক্ষা এবং শিক্ষাপ্রাপ্তির পর কর্ত্তব্যসম্পাদনের সুবিধার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সকল বিষয়েরই উল্লেখ ও আলোচনা আছে। এই কন্‌ফারেন্সের সদ্য সদ্য এই ফল দেখা গিয়াছে, যে, সরকারী মেডিক্যাল কৌন্সিল বিলের তাঁহাদের কড়া সমালোচনার এবং তৎসম্বন্ধে কন্‌ফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবের ফলে গবন্মেণ্ট আপাততঃ ব্যবস্থাপক সভায় ঐ বিলের বিবেচনা ও আলোচনা স্থগিত রাখিয়াছেন।

—

রয়্যালিষ্টদের কীর্ত্তি

কলিকাতার ইউরোপীয়দের একটা দল বা সমিতি আছে, তাহাদের নাম "রয়্যালিষ্ট্‌স্"। উহার সভ্যদের অবগতির জন্য একটা গোপনীয় চিঠি বা সার্কুলার প্রচারিত হয়। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতবর্ষের ইউরোপীয়দের অন্যতম প্রতিনিধি মিঃ বেন্থলের বিবৃতি অনুসারে ঐ দলিলটাতে লেখা ছিল, লণ্ডনে এখানকার ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য, গান্ধীজীকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত, এবং গোলটেবিল বৈঠক (ভারতীয়দের মতে) পণ্ড করিবার জন্য, কি কি কাজ করিয়াছিল ও চা'ল চালিয়াছিল। ঐ দলিলটা কলিকাতার 'য়্যাডভান্স' এবং লাহোরের 'ট্রিবিউন' ছাপিয়া দেন। তাহার পর উহা লইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নানা প্রশ্ন হয়। তাহার সন্তোষজনক জবাব সরকারী উত্তরদাতা দিতে পারেন নাই। ঐ দলিলটা হইতে মনে হয়, মহাত্মা গান্ধীকে বন্দী করিবার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ গান্ধীজী ভারতবর্ষে আসিবার আগেই আঁটা হইয়াছিল।

এখন মিঃ বেন্থল ও রয়্যালিষ্টরা বলিতেছেন, দলিলটা মোটেই গোপনীয় নহে। 'য়্যাডভান্স' কিন্তু লিখিয়া দিয়াছেন, যে, উহা "খুব গোপনীয়" ("Very Confidential") এবং "কোন প্রকারেই প্রকাশিতব্য নহে" ("Not for publication in any way") বলিয়া চিহ্নিত ছিল!

—

অটোয়া কন্‌ফারেন্স ও ভারতবর্ষ

কানাডার অটোয়া শহরে আগামী জুলাই মাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের এক বাণিজ্যাদি-বিষয়ক কন্‌ফারেন্স বসিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে-সকল দেশ স্বশাসক, তাহারা নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাইয়া নিজনিজ স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিবে। ভারতবর্ষ আপন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারিবে না, তাহার নামে এখানকার ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট জনকয়েক লোককে পাঠাইতেছেন। তাঁহাদের নাম—(দলপতি) স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; (সদস্য) শ্রীযুক্ত ষন্মুখম্ চেট্টি, স্যর পদুমজি জিনওয়ালা, হাজি আব্দুল হারুন, সাহেবজাদা আব্দুস্ সমদ খাঁ, এবং স্যর জর্জ রেণী। ব্যক্তিগত সমালোচনা অপ্রীতিকর, কিন্তু দু-একটা কথা না-বলিলে কর্ত্তব্য করা হইবে না। স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব যোগ্য লোক। কিন্তু তিনি বরাবর গবন্মেণ্টের চাকরি করায় তাঁহার মনের ভাবগতিক, হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতসারেই, ব্রিটিশানুকূল হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের স্বার্থে বিরোধ ঘটিলে ভারতবর্ষের কল্যাণার্থ যাহা আবশ্যক তাহা কি তিনি ঠিক করিতে ও সমর্থন করিতে পারিবেন? স্যর জর্জ রেণী ইংরেজ ও সরকারী চাকর। স্যর পদুমজি জিনওয়ালা ভারতবর্ষের দেশী দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলির অনিষ্টকারী এংলো-সুইডিশ দিয়াশলাই কোম্পানীর চাকর, তাঁহার আপিস ষ্টক্‌হল্মে। ইহাদের দ্বারা ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষা হইবে না। বাকী সদস্যদের সম্বন্ধে কিছু জানি না। তবে, তাঁহারা একান্ত ভারত-কল্যাণকামী হইলে গবন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে মনোনীত করিতেন কিনা সন্দেহ। অটোয়া কন্‌ফারেন্সের আলোচ্য বিষয়গুলিও ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের পরস্পরের জিনিষকে সুবিধা দেওয়ার (imperial preferenceর) আলোচনা হইবে এবং ভারতবর্ষে অন্য বিদেশী জিনিষের উপর যে শুল্ক আছে, বিলাতী জিনিষের উপর তত উচ্চ শুল্ক বসান উচিত কিনা, তাহারও আলোচনা হইবে। ব্যবস্থাপক সভাকে ডিঙাইয়া

এইসব আলোচনা হইবে। এগুলি ভারতবর্ষে বিলাতী পণ্যদ্রব্যের কাট্‌তি বাড়াইবার ফিকির।

যশোহর জেলায় ও অন্যত্র নারীহরণ

বর্ত্তমান সংখ্যায় অনেক পৃষ্ঠা বেশী দিয়াও বিস্তর প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিছু লিখিবার জায়গা পাইলাম না। কিন্তু নারীহরণের প্রাদুর্ভাবের এবং গুণ্ডাদের দুষ্কর্ম্মের যথোচিত প্রতিকারের চেষ্টা গবর্মেণ্ট, মুসলমান সমাজ ও হিন্দুসমাজ করিতেছেন না, কেবল এই কথাটি লিখিতেছি। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে চারি জায়গায় নারীরা স্বয়ং বা তাহাদের অভিভাবক যে অস্ত্র চালাইয়া দুর্বৃত্তদিগকে শাস্তি দিয়াছেন, সর্ব্বত্র সেই উপায় অবলম্বিত হইলে এই পৈশাচিকতার প্রতিকার হইত।

প্রবেশিকার একটি প্রশ্নপত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারকার ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষায় ছাত্রীরা বাংলা যে প্রশ্নপত্রটির উত্তর দিতে বাধ্য, তাহার সব দোষ দেখাইবার স্থান নাই; কয়েকটির উল্লেখ করিব। যে-সব ভুল সংশোধন করিতে বলা হইয়াছে, তা ছাড়া উহাতে গুটি সাত আট ছাপার ভুল আছে। সপ্তম প্রশ্নে লেখা হইয়াছে "Translate any two of the following extracts," কিন্তু কোন্ ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে, বলা হয় নাই। সকলের চেয়ে গুরুতর দোষ হইয়াছে প্রথম প্রশ্নটিতে। তাহাতে যে-তিনটি বাক্যসমষ্টি ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছে, তাহার প্রথমটি কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। বানানভুলগুলি প্রশ্নপত্রের।

যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামীসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে, উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখভোগ করে, এবং বিপদ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে নানাদোষে দূষিত, অধিক কি, পরিত্যাগও করিয়া থাকে। এই সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত; উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন-ভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতঘ্ন হয়, ধর্ম্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে।

উদ্ধৃত বাক্যগুলির অপকৃষ্ট বাংলা সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক। আমরা কেবল প্রশ্নকর্ত্তার অমার্জ্জিত রুচি এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনতার উল্লেখ করিতে চাই। কোন কোন পুরুষের চরিত্রের মত কোন কোন নারীর চরিত্রেরও একটা মলিন ঘৃণ্য দিক্ আছে। মানুষ বয়োবৃদ্ধিসহকারে ইহা জানিতে পারে। বিবেচক জ্ঞানী লোকেরা তাহা বালকবালিকাদিগকে তাড়াতাড়ি জানাইতে ব্যগ্র হন না। সে-রকম জিনিষ প্রশ্নপত্রে পর্য্যন্ত বালিকাদের সম্মুখে ধরিবার কী একান্তপ্রয়োজন ঘটিয়াছিল? "বসন-ভূষণে বশীভূত" হওয়াটা কি নারীচরিত্রের উচ্চ আদর্শ? না, সতীত্বের একটা লক্ষণ? কোন নারীকে অসতী বলিলে তাহার চরিত্রে অপকৃষ্টতম দোষ আরোপ করা হয়। উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যে-সব দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সবগুলিই কি এইরূপ অপকৃষ্টতম দোষ? নীচে মুদ্রিত অদ্ভুত বাংলায় লেখা বাক্যগুলিও ছাত্রীদিগকে ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ১৫।১৬ বৎসরের মেয়ে বা ছেলের পক্ষে এগুলি অনুবাদ করা দুঃসাধ্য।

মনের মলা দূর না করিলে ভক্তি ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের শান্তি পাওয়া যাইবে না। তিনি হৃদয়ের ধন, অনেক কষ্ট সহিয়া একাগ্র হইয়া তাঁহাকে পাইতে হয়, নিজের ভোগসুখের পথে সংযমের কাঁটার বেড়া দিয়া তাঁহাকে পাইতে হয়। মন একাগ্র না হইলে তাঁহার পায়ের নূপুরের শব্দশোনা যায় না। কিন্তু তিনি রোজই আসেন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আসেন, তাঁহার স্নেহের শিশুরা কি করিতেছে তাহা দেখিতে আসেন। তাহারা যদি নিজ সুখের ও স্বার্থের ঠুলি পরিয়া চক্ষু আঁধার করিয়া রাখে, তবে তাঁহার পাদপদ্ম দেখিবে কিরূপে?

যাঁহার পাদপদ্মের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাতে পিতৃত্ব না মাতৃত্ব আরোপ করা হইয়াছে, জানি না। পিতা নূপুর পরেন না। ছোট মেয়েরা নূপুর পরে। যিনি বহু সন্তানের জননী হইয়াছেন এরূপ মহিলা সচরাচর নূপুর পরেন কি?

প্রশ্নপত্রটির পূরা নম্বর ১০০। তাহার মধ্যে বাংলা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য ৪৩ রাখা হইয়াছে। প্রশ্নপত্রটির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছাত্রীদের বাংলা-জ্ঞান পরীক্ষা করা। কিন্তু এই প্রশ্নপত্রের অনুবাদগুলি করিতে বেশ ভাল রকম ইংরেজীজ্ঞান থাকা চাই। তাহা না-থাকিলে, যে ছাত্রী বেশ ভাল বাংলা জানেন তিনিও ৪৩ বা প্রায় ৪৩ নম্বর হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইহা ন্যায়সঙ্গত হইবে না।

অনুবাদের জন্য প্রদত্ত একটি বাক্য এইরূপ:— "পরিশ্রমের অগ্নি হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিলে অন্য সকল কুপ্রবৃত্তি ভস্মে পরিণত হয়।" "পরিশ্রমের অগ্নি"ও তাহা হইলে একটা কুপ্রবৃত্তি?

১২০।২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



দুয়ারে

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ, ১ম খণ্ড — জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ — ২য় সংখ্যা

শান্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্রূপবাণ উদ্যত করি
এসেছিল সংসার,
নাগাল পেল না তার
আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।
শান্ত মনের স্তব্ধ গহনে
ধ্যানের বীণার সুরে
রেখেছে তাহারে ঘিরি।
হৃদয়ে তাহার উচ্চ উদয়গিরি।
সেথা অন্তরলোকে
সিন্ধুপারের প্রভাত আলোক
জ্বলিছে তাহার চোখে।
সে আলোকে এই বিশ্বের রূপ
অপরূপ হয়ে জাগে।
তার দৃষ্টির আগে
বিরূপ বিকল খণ্ডিত যত কিছু
বিদ্রোহ ছেড়ে বিরাটের পায়ে
করে এসে মাথা নীচু॥

সিন্ধুতীরের শৈলতটের 'পরে
হিংসা-মুখর তরঙ্গদল
যতই আঘাত করে
কঠোর বিরোধ রচি তুলে তত
অতলের মহা লীলা,
ফেনিল নৃত্যে দামামা বাজায় শিলা।
হে শান্ত, তুমি অশান্তিরেই
মহিমা করিছ দান
গর্জ্জন এসে তোমার মাঝারে
হ'ল ভৈরব গান।
তোমার চোখের গভীর আলোকে
অপমান হ'ল গত
সন্ধ্যা-মেঘের তিমির-রন্ধ্রে
দীপ্ত রবির মত॥

১৪ই চৈত্র
১৩৩৮

পত্রধারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষুদে জ্বরে পেয়ে বসেছিল, তার বহর নিরনব্বইয়ের বেশী নয়, কিন্তু সেই জন্তেই খুঁটি ধরে তাকে বিদায় করা শক্ত হয়ে উঠেছিল। সংসারের সমস্ত ক্ষুদে শত্রুদের জোর ঐখানেই—চেপে ধরতে গেলেই এড়িয়ে যায়। কিছুই নয় ব'লে যতই অবজ্ঞা করতে চেষ্টা করেছি ততই সে পাকা ক'রে বাসা বাঁধতে লেগে গেল। অবশেষে দেবতাত্মা নগাধিরাজের শরণ নিয়েছি। নিরনব্বইয়ের ধাক্কাটা এখানে এসে কেটেচে। আমার শরীরের জন্তে মনে কোনো উদ্বেগ রেখো না। ঘোরতর কুঁড়েমিতে পেয়ে বসেচে—কুঁড়েমির দুর্গে আছি বললেই হয়—এমন কি ছবি আঁকার দুর্নিবার নেশাও আমাকে নাগাল পাচ্চে না।

২

হিমালয়-শিখরে অধিষ্ঠিত নির্ম্মল অবকাশ থেকে নেমে এসেছি শহরে—এখানে নিরন্তর লোকের ভিড়, কাজের ভিড়—চিত্তবিক্ষেপের হাওয়া এলোমেলো হয়ে বইচে চারিদিকে। এখানে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—অতএব কাজ সারা হলেই যত শীঘ্র পারি পালাব শান্তিনিকেতনে। এখন থেকে আমার পত্র শীতকালের রিক্ত অরণ্যের মত বিরল হবে। এখন থেকে নানা লোকের নানা দাবি মেটাবার কাজে আমার সময়টাকে টুকরো টুকরো ক'রে বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। কাল এসেচি—কিন্তু সময় পাইনি—আজও সময়ের দৈন্য ঘোচেনি। ইতি ২১শে আষাঢ়, ১৩৩৮।

৬

আমার সাধনা সম্বন্ধে তোমার সুন্দর ভাষায় যা লিখেচ সেটি সত্য। মানবের পরিপূর্ণতার শাশ্বত আদর্শ শাশ্বত মানবের মধ্যে আছে,—যে-অংশে সেই পরিপূর্ণতা আমরা লাভ করি সেই অংশে পরিপূর্ণের সঙ্গে আমাদের মিলন হয়। সেই মিলনে এত গভীর আনন্দ যে তার জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে পারে। এমনি করেই যুগে যুগে কত সাধকের ত্যাগের উপরেই মানবসভ্যতা প্রশস্ততর প্রতিষ্ঠা লাভ করচে। পূর্ণ মানুষের ডাক না শুনতে পেলে মানুষ বর্ব্বরতার অন্ধকূপে চিরদিনই পশুর মত পড়ে থাকত। আজও অনেক বধির আছে, কিন্তু যাদের মর্ম্মের মধ্যে পূর্ণের দাবি প্রবেশ করে এমন অল্পসংখ্যক লোকও যদি থাকে তা হলেই যথেষ্ট। বস্তুত তারাই অতি কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেচে। আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের সমস্ত ইতিহাসই হচ্চে সেই অভিসার। নক্ষত্রের আলোকে অন্ধকার রাত্রের এই অভিসারে মানুষ বারে-বারেই পথ হারিয়েছে, পিছিয়ে গেছে, কিন্তু একথাটা কখনই সে ভুলতে পারেনি যে তাকে চলতেই হবে, যেখানে আছে সেইখানেই তার চরম আশ্রয় এমন কথা বললেই মানুষ মরে, এমন কি যখন সে পিছিয়ে চলে তখনও চলার উপরে তার শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

আমি যাকে মানুষের সাধনার বিষয় বলি তার একটা বিশেষ দিক হয়ত তোমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি। মানুষের পূর্ণতা শতদলপদ্মের মত, তার বিকাশে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব্ব করে কেবল একটিমাত্র ভাবাবেগের বা মননচর্চ্চার প্রবল উৎকর্ষ সাধনকেই আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ ব'লে আমি স্বীকার করিনে। অনেক সময় দেখা যায় দৃষ্টি যখন অন্ধ হয় তখন স্পর্শশক্তি অদ্ভুত রকম বেড়ে যায়। কিন্তু তবুও বলতে হবে, দৃষ্টি ও স্পর্শের যোগেই আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণ সার্থকতা। মানুষের চিত্ত যত কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, সাধনার লক্ষ্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তার মধ্যে যেটাকেই বাদ দেব সেটাই সমগ্রকে পঙ্গু করবে। পৃথিবীতে যাঁরা বিজ্ঞানের সাধনা করেন তাঁরাও মোহমুক্তির দিকে মানুষের একটা জানলা খুলে দিচ্চেন। কিন্তু যদি তাঁরা বলেন অন্য জানলাগুলি বুজিয়ে দাও দেওয়াল গেঁথে, তাহলে সেই এক জানলার পথে বিজ্ঞানের অতিতীব্র উপলব্ধি জন্মাতে পারে, তবু পূর্ণতার ঐশ্বর্য্যে মানুষ বঞ্চিত হবে। পেটুক বলতে পারে জল খেয়ে কেন পেট ভরাব, জঠরের সমস্ত গহ্বর সন্দেশ দিয়ে ঠাসাই ভোজের চরম আনন্দ, তেমনি মাতাল বলে খাবার খেতে শক্তির যে অপচয় হয় সেটা বন্ধ ক'রে একমাত্র মদ খেয়েই তৃপ্তির পূর্ণতা ঘটানো চাই। আপাতত যাই হোক পরিণামে উভয়েই বঞ্চিত হয়। সাধারণত যাকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলা হয় তাকে যখন আমরা লোভের সামগ্রী ক'রে তুলি তখন আলো পাবার জন্যে একটি জানলা ছাড়া অন্য সব জানলায় দেওয়াল গাঁথবার উৎসাহ জাগে। এই রকম গুহাবাসের সন্ন্যাসকে আমি মানিনে; গুহার বাইরে বিরাট জগতকে আমি গুহার চেয়ে বেশী সত্য বলেই জানি। সেইজন্যেই, কোনো আধ্যাত্মিক নামধারী গুহার মধ্যে ঢুকলেই আমার পরমার্থ লাভ হবে এমন লোভ যদি কোনো খেয়ালে আমাকে পেয়ে বসে তবে ক্ষণকালের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে তার থেকে বেরিয়ে আসব সন্দেহ নেই। যদি বলো অনেকে তো নিজেকে অবরুদ্ধ করার সাধনায় শেষ পর্য্যন্ত টি঳কে যায়। আমার উত্তর এই, মাড়োয়ারি মহাজন তো রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত আড়তের গদিতে রুদ্ধ থাকে, মুনফাও জমে। কোনো একটি জাতের মুনফাকেই একান্ত করে সেইটেকেই চরম লাভ বলা লোভের কথা। চলমান জগতে যা-কিছু চলচে সমস্তকেই অধিকার ক'রে পূর্ণস্বরূপ আছেন অতএব মা গৃধঃ, লোভ ক'রো না, এই হ'ল ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক। পূর্ণকে উপলব্ধি করতে যদি চাই তবে কোনো একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ করাই লোভ এবং ব্যর্থতা, তাকে বিষয়-সুখই বলি আর আধ্যাত্মিক আনন্দই বলি। এই হ'ল আমার নিজের কথা। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান দর্শন লোকসেবা সব দিকেই নিজেকে মুক্তি দেওয়ার দ্বারাই পূর্ণকে উপলব্ধি করা চাই,—চিত্তে তাঁর বিচিত্র প্রকাশের পথকে সব জানলার যোগেই খুলে রেখে দিলে তবেই মনুষ্যত্ব সার্থক হবে। য়ুরোপের সাধকেরা যে মুক্তির পথে অসীম অধ্যবসায়ে মানুষের সহায়তা

করচে তাকে আমি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেচি, আবার ভারতীয় সাধকেরা আপনার মধ্যে আত্মজ্যোতি দর্শনের যে সাধনাকে গ্রহণ করেচেন তাকেও আমি প্রণাম ক'রে মেনে নিই। এই উভয়ের মধ্যে জাতি-ভেদ ঘটিয়ে যদি পংক্তি-বিভাগ করি, এবং এক পাশ ঘেঁষে সমস্ত জীবন কেবল শুচিবায়ুর চর্চ্চা করি তাহ'লে কৃপণের গতি লাভ করব।

কিন্তু একটি কথা মনে রেখো, চতুষ্পথে আমার চলা ;— সম্প্রদায়ের দুর্গে রুদ্ধদ্বারের মধ্যে আমি বাঁচিনে। এই জন্যে যদিও আমি নিজের মত গোপন করিনে, তবু কাউকে ডাকাডাকি ক'রে কোনদিন বলিনে আমার মত গ্রহণ করো। তুমি নিজের পথে নিজের মতে চললে তোমার প্রতি আমার স্নেহ কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হবে এমন শঙ্কা কোন দিন ক'রো না। স্বভাবতই তোমার চিত্তশক্তির একটি প্রসার আছে, এই রকম বেগবান চিত্তকে খোঁটায় বেঁধে বাঁধা খোরাকে পরিতৃপ্ত করা সহজ নয়। তোমার কঠিন দুঃখ হচ্চে দ্বিধা নিয়ে। তোমার সংস্কার এই যে, চিত্তকে পীড়িত ক'রে খর্ব্ব ক'রে তাকে বিশ্বের অধিকার থেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত ক'রে তবে সার্থকতা, অথচ তোমার প্রকৃতিতে যে-বুদ্ধিশক্তি ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য আছে, সে অবারিত আকাশে আলো চায় হাওয়া চায় গতি চায়। সেই চাওয়াটাকে তুমি অপরাধ ব'লে ভয় পাও। পাখীকে খাঁচায় বন্দী ক'রে তাকে আকাশভীরু ক'রে তোলা হয়েচে। কিন্তু এই আকাশভীরুতা তার স্বভাব নয়, সে তার ডানা দেখেই টের পাওয়া যায়।

যাই হোক্, আমাকে তোমার গুরু ব'লে গণ্য ক'রো না, আপনার লোক বলেই জেনো। বাইরের দিক থেকে তোমার পরিচয় অল্পই পেয়েচি তবুও তোমাকে স্নেহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েচে। তার কারণ তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে কোনোরকমের সংস্কারের বাধায় তাকে ছায়াবৃত করতে পারেনি, তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি সকল রকম বাধার মধ্যেও তোমাকে মুক্ত রেখেচে। আমার সম্বন্ধে কঠোর বিরুদ্ধতা থাকাই তোমার পক্ষে স্বভাবসঙ্গত ছিল, আমার দেশের লোকের অনেকেরই তাই আছে। কিন্তু অভ্যাসের আচারের মতের নানাপ্রকার বাধা সত্ত্বেও সে-সমস্ত পার হয়েও তুমি আমার কাছে আসতে পেরেচ সে তোমার বুদ্ধির অসামান্য উদারতা-বশত। প্রকৃত আত্মীয়তার মিলনক্ষেত্র এই উদারতায়, মতের মিল প্রভৃতিতে নয়। চিঠিতে তোমাদের সাধনের কথা তুমি যেরূপ ক'রে প্রকাশ করেচ তাতে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি, তোমার নিজেকে সুনিপুণ ভাষায় সুস্পষ্ট ক'রে আমার গোচর করতে পেরেচ। মানুষের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য সেইখানেই যেখানে সে আমাদের কাছে অস্পষ্ট। যে হয়েচে সুপ্রত্যক্ষ তাকে আমরা অন্তরের মধ্যে অনায়াসে গ্রহণ করি। তুমি যে-পথেই চলো না কেন, সে-পথ আমার অধিকৃত না হলেও আমি লেশমাত্র ক্ষোভ ক'রব না, এ কথা নিশ্চিত জেনো। কিন্তু সে-পথ তোমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ না হয়, সে-পথে তোমার সম্যক চরিতার্থতা ঘটে, তুমি শান্তি পাও, এই আশা করি। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে সহজে নিজের জীবনকে গ্রন্থিমুক্ত ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হও এই ইচ্ছামাত্র আমার মনে রইল।

ইতি ১১ শ্রাবণ ১৩৩৭

চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সংগ্রহ ও প্রচার

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, বিশেষতঃ প্রাচীন বাংলা কাব্য বটতলার নিন্দিত ঘৃণিত মুদ্রাযন্ত্রসমূহ হইতে প্রথমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। যে-সময়কার কথা হইতেছে সে-সময় শিক্ষিত বাঙালী বলিতে ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য অথবা অকৃতবিদ্য বাঙালীকে বুঝাইত। তাঁহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে হয় উদাসীন না-হয় একেবারে অজ্ঞ। বটতলার পুস্তকসমূহ তাঁহারা কিনিতেন না, পড়িতেনও না। সে-সকল পুস্তক মুদি-পসারি, দোকানিরা পাঠ করিত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এই সকল পুস্তক মুদ্রিত হইত। ছাপায় অসংখ্য ভুল, কাগজ সস্তা ও খারাপ, অতিসুলভ মূল্যে এই সকল পুস্তক বিক্রীত হইত। বৈষ্ণব কবিতার পুথি বৈষ্ণবদের ঘরে থাকিত, তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিতেন ও সেই সকল গীত গান করিতেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাংলা ভাষার আদি কবি এ-কথা অনেকের জানা ছিল, কিন্তু বিদ্যাপতি যে আদৌ বাঙালী ছিলেন না, আর এক দেশের লোক, সে-কথা সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। হাতে লেখা পুঁথির বহুল প্রচার অসম্ভব, বটতলার পুস্তকাদিও অল্পশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

যে-সকল ভক্ত, কবি ও শ্রদ্ধাবান বৈষ্ণবেরা এই সকল গীতি-কবিতা যত্নপূর্ব্বক বহু পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট বাংলা সাহিত্যের ঋণের ইয়ত্তা নাই। প্রাচীন কবিদিগের স্বহস্তলিখিত কোন পুঁথি কোথাও পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া 'গীতকল্পতরু' অথবা 'পদকল্পতরু' নামক বিশাল-গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা বৈষ্ণব দাসের হস্তাক্ষর বা নিজের লেখা পুঁথি বর্ত্তমান নাই। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অপেক্ষাও প্রাচীন, কিন্তু তাঁহার স্বহস্তলিখিত বৃহৎ ভাগবত গ্রন্থ তালপত্রের পুঁথির আকারে আজ পর্য্যন্ত মিথিলায় বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন পুঁথিসকল নকল করিবার সময় নানা পরিবর্ত্তন হইত। সকল লিপিকরেরা ভাল লেখাপড়া জানিতেন না, লিখিবার সময় অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটিত, যদৃষ্টং তল্লিখিতম্ সকল সময় হইত না। ভিন্ন ভিন্ন পুঁথিতে যাহা পাঠান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হয় লিপিপ্রমাদ কিংবা লেখকের স্বেচ্ছাকৃত পরিবর্ত্তিত রচনা।

বাঙালীর উচ্চারণ

বাঙালী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। বাঙালী অতি প্রাচীন অথবা আধুনিক জাতি, সে-বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু বাঙালীর শব্দোচ্চারণ-প্রণালী যে ভারতবর্ষের আর সকল জাতি হইতে বিভিন্ন তাহাতে কোন সংশয় নাই। এরূপ কেন হইল, সে-প্রশ্ন এখন উত্থাপন করিব না। অন্য সকল জাতি তিনটি 'শ'য়ের (শ, ষ, স) ভিন্ন ভিন্ন রূপ উচ্চারণ করে, কেবল বিহার ও অযোধ্যা অঞ্চলে 'ষ'য়ের উচ্চারণ 'খ'য়ের মত। বাঙালীর মুখে 'শ' ছাড়া আর কোন 'শ'য়ের উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায় না। মৃচ্ছকটিক নাটকে বহুগুণধর রাজশ্যালক এক তালব্য 'শ' ছাড়া আর কোন 'শ' উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, এই জন্য তাঁহার নাম ছিল শকার। তাঁহার ভাষাতে ও প্রাচীন কাব্য ও ইতিবৃত্তের বিদ্যায় গলদ ছিল অনেক রকম। তাঁহার মুখ দিয়া মূর্দ্ধন্য 'ষ' ও দন্ত্য 'স' বাহির হইত না। বাঙালীরও সেই অবস্থা। বাংলা অথবা সংস্কৃত পাঠ করিবার সময়, মুখে কথা কহিবার সময় একমাত্র তালব্য 'শ' শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল কয়েকটি যুক্তঅক্ষরে 'স'য়ের উচ্চারণ হয়, যেমন আস্তে, স্থান, নচেৎ স্বতন্ত্র আকারে 'স' সর্ব্বত্র তালব্য 'শ'য়ের মত উচ্চারিত হয়। এইরূপ বর্গীয় ও

অন্তঃস্থ 'জ' ও 'য'য়ের একই উচ্চারণ। মূৰ্দ্ধন্য ও দন্ত্য 'ন'য়ের উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই। প-বর্গের 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' উচ্চারণের সময় একই অক্ষর। যদি উচ্চারণের অনুসারে বাংলা বর্ণমালা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে মূৰ্দ্ধন্য 'ণ', অন্তঃস্থ 'য' ও 'ব' এবং মূৰ্দ্ধন্য ও দন্ত্য 'স'য়ের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। সংস্কৃত ও ও প্রাকৃত শব্দের উচ্চারণে অনেক প্রভেদ ছিল, মাগধী, পালি ও প্রাকৃতের উচ্চারণ স্বতন্ত্র। ইহা ব্যতীত আদিম অনাৰ্য্য ভাষা ভারতের অনেক স্থানে প্রচলিত ছিল। বাঙালীর অক্ষর ও শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতি অনুসন্ধানের বিষয়।

লিপি-প্রণালী

বাংলা দেশের মূল শিক্ষা সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষা অথবা সংক্ষেপে ভাষাকে অবহেলা করিতেন। তাহার পর যাঁহারা ইংরেজী শিখিলেন তাঁহারাও বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত লিখিবার সময় বর্ণাশুদ্ধি করিতেন না, কিন্তু নিতান্ত পক্ষে বাংলা অথবা ভাষা লিখিতে হইলে, তাঁহারা কোনরূপ নিয়ম মানিতেন না। ইকার উকার যাহার যেমন ইচ্ছা লিখিত, দুই রকম 'জ'য়ের, দুই রকম 'ন'য়ের, দুই রকম 'ব'য়ের, তিন রকম 'শ'য়ের কোন বিচার ছিল না। লিখন-প্রণালীতে সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচার চলিত। শব্দের বানান যে যেমন ইচ্ছা করিত। একই পুঁথি ভিন্ন ভিন্ন লিপিকরেরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ছিল না, বাংলা শব্দ বানান করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। মৈথিল ভাষায় লিপি-প্রণালীর এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। মৈথিল কবি ও লিপিকরেরা শব্দের বানানে একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন ও সেই কারণে সকল মৈথিল পুঁথিতে সকল শব্দের বানান একই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সে লিপি-প্রণালী অনেকটা প্রাকৃতের অনুযায়ী।

এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতার পরিবর্ত্তে বাংলা শব্দ-সমূহকে সংস্কৃত শব্দের অনুযায়ী বানান করিবার প্রথা প্রচলিত হইল। এই পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিল তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু এক প্রকার অনুমান করা যায়। কোন পুস্তক ছাপিবার সময় মুদ্রাযন্ত্রের ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করা হইত। এখনও অনেক স্থানে সেইরূপ করা হয়। এই সকল পণ্ডিতেরা বাংলা শব্দের বানান সংস্কৃতের অনুযায়ী করিয়া দিতেন। ইদানীং বাঙালী লেখকেরাও সেইরূপ বানান আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লিখিত বর্ণপরিচয় প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকাদি পড়িয়া যাঁহারা বাংলা শিখিতেন তাঁহারাও শুদ্ধ বানান লিখিতে শিখিলেন। এইরূপে সমস্ত প্রাচীন বাংলা কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থের সকল শব্দের বানান আগাগোড়া সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ক্ষতি হইয়াছে, লাভ হয় নাই। যেমন প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দসমূহ প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিবার কালে শিক্ষা করা উচিত, সেইরূপ সে-কালের শব্দ ও বানানের পদ্ধতি আমাদের জানা উচিত। ভাষা ও শব্দের ইতিহাস জানিতে হইলে বিবর্ত্তনের ক্রম উত্তমরূপে শিখিতে হয়। বাংলা ভাষায় তাহার উপায় নাই।

চণ্ডীদাসের পদাবলী এখন যে আকারে দেখা যায় তাহাতে মূলের সম্পূর্ণ বিকৃতি ঘটিয়াছে। কতকগুলি হিন্দী, মৈথিল ও অপ্রচলিত শব্দ ছাড়া পদাবলীর আকার একেবারে আধুনিক, প্রাচীনত্ব কিছু নাই। তাহার উপর অপর দোষও ঘটিয়াছে। প্রাচীন লেখাতে এক দাঁড়ী ছাড়া আর কোন ছেদ কিংবা বিরামচিহ্ন ছিল না। কবিতা লিখিতে হইলে প্রথম শ্লোকার্দ্ধে এক দাঁড়ী, দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধে দুই দাঁড়ী। পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া সংস্কৃত লেখায় আর কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হইত না, প্রাচীন বাংলাতেও তাহাই। প্রাচীন রচনা যদি পূর্ব্বের আকারে না পাওয়া যায় তাহা হইলে নিরুপায়, কিন্তু তাহার উপর কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ইংরেজী চিহ্ন যোগ করিয়া দিতে হইবে কেন? চণ্ডীদাসের কবিতাতে সঙ্কলনকারেরা তাহাও করিয়াছেন। প্রাচীন লেখার যেটুকু প্রাচীনত্ব রক্ষা করিতে পারা যায়, তাঁহারা তাহাও বিনষ্ট করিয়াছেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী পণ্ডিত মিলিয়া প্রাচীনকে নবীন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে পদাবলী রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু ভাবান্তরিত হওয়া অসম্ভব। শব্দের বানানে, আকারে

অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনেক স্থলে প্রাচীন শব্দের স্থানে আধুনিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু মৌলিক ভাব যে কবির নিজের সে-বিষয়ে দ্বিধা করিতে পারা যায় না। যে-আকারে এই সকল পদ প্রথমে রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু যে ভাবে এই সকল কবিতা অনুপ্রাণিত তাহা কবি ব্যতীত আর কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে না।

পদাবলীর সঙ্কলন

কাঙ্গালীদের মুখে চণ্ডীদাসের গান শুনিতে পাওয়া যাইত। তাহাদের কাছে ও বৈষ্ণবদের ঘরে বৈষ্ণবগানের ছোটখাট পুঁথি ছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বাহিরে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নাম বড়-একটা কেহ জানিত না। বৈষ্ণব গ্রন্থ বটতলা ছাড়া আর কোথাও ছাপা হইত না। যাঁহারা অল্পস্বল্প বা অধিক ইংরেজী জানিতেন, তাঁহাদের স্থির ধারণা ছিল যে, প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্য সকল অশ্লীল, অপাঠ্য রচনা। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার 'অবকাশরঞ্জিনী' নামক কাব্যগ্রন্থে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া অথবা যে-কোন ভাবেই হউক লিখিয়াছিলেন,

> মহাজন পদাবলী
> রাধাকৃষ্ণ ঢলাঢলি।
> ললিত লবঙ্গলতা
> গোস্বামী খুড়োর মাথা;

মহাজন পদাবলী তিনি নিজে পড়িয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। বটতলার পুস্তক শিক্ষিত লোকে পড়িত না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত শ্রুতিমধুর ও ভাবমধুর ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করেন, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি জয়দেব, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, বিদ্যাপতি অথবা চণ্ডীদাসের উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে তিনি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা পাঠ করিয়াছিলেন কি-না সে-বিষয়ে সংশয় হয়। করিলে ঈশ্বর গুপ্তের অপেক্ষা চণ্ডীদাস যে কত বড় কবি তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেন।

মহাজন পদাবলীর প্রধান ও অমূল্য সঙ্কলন কবি বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু'। কত পরিশ্রম করিয়া, কত অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত তিনি এই বিপুল মহাগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই গ্রন্থ না থাকিলে অনেক বৈষ্ণব কবির নাম কেহ জানিত না, অনেক বৈষ্ণব কবিতা লুপ্ত হইত। সে কালে নৌকা ও পদব্রজে গমন ছাড়া যাতায়াতের অন্য উপায় ছিল না। বৈষ্ণব দাস নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, প্রধান প্রধান বৈষ্ণবদের ঘরে গিয়া, উত্তম উত্তম পুঁথি বাছিয়া লইয়া স্বহস্তে সমস্ত পদ নকল করিয়া লইতেন। 'পদকল্পতরু'র প্রচার প্রথমে বটতলা হইতে হয়, কিন্তু নব্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের লোকেরা সে পথ মাড়াইত না। যে-কালে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অমিত্রাক্ষর ছন্দ লোকে আবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিত ও ঐ গ্রন্থের অনুকরণে চারিদিক হইতে নানাবিধ প্রাণিবধ মহাকাব্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল, যে-কালে হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' ইত্যাদি কবিতা লোকে চীৎকার করিয়া আওড়াইত, তখন বৈষ্ণব কাব্যের কথা শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে কয়জন জানিত? অন্ধকার খনির মধ্যে যেমন অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত থাকে সেইরূপ এই সকল মহামূল্য গীতিকবিতা বটতলার পুস্তকালয়ে ও হস্তলিখিত পুঁথিতে প্রচ্ছন্ন ছিল। বৈষ্ণব কাব্য যে যথার্থ গীতিকাব্যের আকর ও তাহাতে অক্ষয় অমৃতরাশি সঞ্চিত আছে এ-কথা সাধারণ সাহিত্যসমাজে প্রচার হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কালে ইংরেজী সাহিত্য ও কাব্যের প্রভাব প্রবল, কাব্য-রচনায় ইংরেজী কাব্যের প্রতিধ্বনি শ্রুত হইত। বৈষ্ণব কাব্যের অতুলনীয় ভাষা, শব্দের বিচিত্র কমনীয় কোমলতা, ভাবের নিবিড় প্রগাঢ়তা ইংরেজী-শিক্ষিত লেখক ও পাঠকের অবিদিত ছিল। বৈষ্ণব কাব্যের সুধারসের আস্বাদনে অনেক বাঙালী বঞ্চিত ছিল।

বটতলা হইতেই চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রথমে স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হয়। এই সঙ্কলনের প্রধান অবলম্বন 'পদকল্পতরু'। কিন্তু ইহাতেও শিক্ষিত সমাজে চণ্ডীদাসের কবিতার সমাদর হইল না। যে-শ্রেণীর লোকেরা বটতলা হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর গ্রাহক ও পাঠক তাহারাই পাঠ করিত। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত,

প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তরুণ বয়সে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাসের পদাবলী, রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডী সঙ্কলিত হয়। এখন এই মূল্যবান গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হওয়া উচিত, কিন্তু সে-বিষয়ে কাহারও কোন চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৩২১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে নীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যে কয়টি সংস্করণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অক্ষয়-চন্দ্র সরকারের সংস্করণই উৎকৃষ্ট।

পদ-সংখ্যা

'পদকল্পতরু'তে চণ্ডীদাসের বিরচিত অনুমান ১১০টি পদ আছে। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্কলনে ২০০, সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত সংস্করণে ৮৩০। এই সকল সংখ্যা হইতে সহজ সিদ্ধান্ত এই যে, কবির রচিত অপ্রকাশিত পদাবলী অন্বেষণ করিয়া যিনি যত পাইয়াছেন প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা বলিলেই সমস্ত কথা বলা হয় না। বিচারের অনেক বিষয় আছে, সঙ্কলনকারদিগের যোগ্যতা ও বিবেচনাশক্তির বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হয়। কোন কবির অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশিত হইলে তাহা কত দূর প্রামাণিক তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। নূতন প্রকাশিত কবিতায় কবির প্রতিভার বিশিষ্টতার নিদর্শন পাওয়া যায় কি-না, তাহার মধ্যে উত্তম কবিতা আছে কি-না বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়।

সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান সঙ্কলন গ্রন্থ 'পদকল্পতরু'। এই গ্রন্থ না থাকিলে হয়ত বিচিত্র বৈষ্ণব কাব্য বিলুপ্ত হইত। এ-কথা কি কেহ কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি চণ্ডীদাসের পদাবলীর স্বতন্ত্র প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার অপেক্ষা অনেক আধুনিক অপর বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে পাওয়া যায় না কেন? বাঙালী কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস সকলের অপেক্ষা প্রাচীন, তিনিই আদি কবি। তাঁহার তুলনায় অপর বৈষ্ণব কবিগণকে বিশেষ প্রাচীন বলিতে পারা যায় না। ইঁহাদের কাহারও পদাবলীর স্বতন্ত্র পুঁথি কেহ কোথাও পাইয়াছেন? ইঁহাদের কাহারও রচনা কি অপ্রকাশিত নাই? যদি থাকে সেগুলি প্রকাশিত হয় না কেন? বিদ্যাপতি প্রায় চণ্ডীদাসের সমসাময়িক, বিদ্যাপতির পদাবলীর হস্তলিখিত পুঁথি বঙ্গদেশে কখনও কোথাও স্বতন্ত্র আকারে পাওয়া গিয়াছে? গোবিন্দদাস নামে কয়জন কবি ছিলেন তাহাই কেহ জানে না। কবিরাজ গোবিন্দদাস অত বড় কবি তাঁহার পদাবলীর পুঁথি কখনও কেহ দেখিয়াছে? রায় শেখর, কৃষ্ণকান্ত, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, জ্ঞানদাস, যত্নুনন্দন, বংশীবদন, ইঁহারা সকলেই উত্তম কবি, ইঁহাদের মধ্যে কাহারও পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে কোথাও পাওয়া গিয়াছে? বৈষ্ণব দাস যদি 'পদকল্পতরু' সঙ্কলন করিয়া না রাখিয়া যাইতেন তাহা হইলে এই সকল কবিদিগের রচনা কেহ দেখিতে পাইত না।

'পদকল্পতরু'ই সকল সঙ্কলন গ্রন্থের অপেক্ষা প্রামাণিক। ইহার পূর্ব্বে বৈষ্ণব-কবি রাধামোহন ঠাকুর স্বরচিত সংস্কৃত টীকাসম্বলিত 'পদসমুদ্র' নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু উহাতে পদ-সংখ্যা অধিক নয়, সকল বৈষ্ণব কবিদিগের রচনাও উহাতে সংগৃহীত হয় নাই। একমাত্র 'পদকল্পতরু'ই বৈষ্ণব কবিদিগের যশের ভিত্তি। যে-কবির যতগুলি পদ ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায় সেইগুলি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 'পদকল্পতরু'র তিন সহস্র পদ বৈষ্ণব দাস কেমন করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থশেষে তিনি নিজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব দাস স্বয়ং কবি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে সাক্ষাৎ তাঁহারই কল্পনা, এবং সে-সম্বন্ধে পদগুলি তাঁহারই রচনা। প্রকৃতপক্ষে, এই দুই কবিতে কোনকালে সাক্ষাৎ হয় নাই। বিদ্যাপতি বাংলা জানিতেন না, চণ্ডীদাসের যশ তাঁহার জীবিত অবস্থায় প্রচারিত হয় নাই। বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন 'পদামৃতসমুদ্রে'র গীত গান করিয়া ঐরূপ গীত সংগ্রহ করিবার তাঁহার লোভ জন্মিল। নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া প্রাচীন প্রাচীন পদ যত পাইলেন সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের নাম 'গীতকল্পতরু' রাখিলেন। এই 'গীতকল্পতরু'

এখন 'পদকল্পতরু' নামে পরিচিত। বৈষ্ণব দাস সকল বৈষ্ণব কবির সমস্ত পদ যে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা না হইতে পারে, কিন্তু সাধ্যমত যে তিনি উৎকৃষ্ট পদসমূহ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সংশয় নাই।

কবিতার সংখ্যায় অথবা রচনার প্রাচুর্য্যে কোন কবি অথবা লেখকের যশ হয় না। শত শত কবি রাশিরাশি কবিতা রচনা করিতেন, এখনও করেন, তাহার অধিকাংশই বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যায়। কত লেখকেরা ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করেন তাহার কয়টি থাকে? একটিমাত্র কবিতায় যদি অমৃতকণা থাকে, তাহা হইলে তাহাই অমর হয়, নহিলে স্তূপাকারে যেমন তেমন কবিতা সাজাইলে তাহা ভস্মরাশি মাত্র। 'গীতগোবিন্দে' জয়দেবের মোটে তেইশটি পদ আছে, কিন্তু এই অল্পসংখ্যক কবিতা হইতেই তাঁহার দেশদেশান্তরব্যাপী অক্ষয় যশ। 'গীতগোবিন্দে'র প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহার ভাষা ও শব্দ এবং ছন্দের ঝঙ্কার একেবারে অননুকরণীয়, যিনি অনুকরণের প্রয়াস করিয়াছেন তিনিই ব্যর্থচেষ্ট হইয়াছেন। অপর পক্ষে, চণ্ডীদাসের ন্যায় কবির ভাষা, ছন্দ ও রচনা অনুকরণ করা অত্যন্ত সহজ, সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা না করিলে অনুকরণের কৃত্রিমতা বুঝিতে পারা যায় না। 'পদকল্পতরু'তে যে-কয়টি পদ আছে, সেইগুলি হইতেই তাঁহার যশ, সেই কয়টি কবিতা হইতেই তিনি বাংলা ভাষার গীতিকাব্যে শীর্ষস্থানীয়। যদি আর একটিও কবিতা না পাওয়া যাইত তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের যশ যেমন তেমনি থাকিত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'পদকল্পতরু' ছাড়া অপর প্রাচীন পুঁথি হইতে আর কিছু পদ সংগ্রহ করেন। এগুলিও প্রামাণিক। হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। টীকা অনেক না থাকিলেও যাহা আছে তাহা উত্তম। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নিকট যেমন আশা করা যাইতে পারে তাঁহার সংস্করণ সেইরূপ হইয়াছে। এই দুইটি সঙ্কলন ছাড়া বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্ত্তৃক সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশিত হয়। ইহাতে একচল্লিশ জন পদকর্ত্তার পদ স্বতন্ত্রভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সঙ্কলনে চণ্ডীদাসের আরও কতকগুলি উত্তম পদ আছে। চণ্ডীদাসের পদাবলী বলিতে এই পদগুলিই বুঝায়। সাহিত্য পরিষদের সংস্করণে যে-সকল নূতন ও অপ্রকাশিত পদ সঙ্কলিত হইয়াছে সেগুলি ইতিপূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক যে গ্রন্থ কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পদাবলী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

নিরুদ্দেশ

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

যদিও চটকলের ধোঁয়ার কালিমা আমাদের গ্রামের আকাশ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছায়, তবুও আমাদের গঙ্গার দুই তীর ইষ্টকে প্রস্তরে বন্দী হয়ে পড়েনি। পর্ব্বত-দুহিতার স্বচ্ছন্দ সচল মূর্ত্তি সেখান পর্য্যন্তই বেশ সহজ ছিল। তার পরেই স্বচ্ছ সলিল শহরের পঙ্কিলতায় মলিন, তার পরেই দু-কূলের সবুজ শস্পাস্তরণ শহরের বিষস্পর্শে বিবর্ণ।

সেটা ছিল শিবরাত্রি। সে রাতের কথা ভোলবার নয়। আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলে ঠিক করেছি রাত জাগতে হবে। প্রথম প্রহরটা গান করেই কাটছিল বেশ। সুরতাল জ্ঞানহীনের এবং বায়সবিনিন্দিত কণ্ঠের গান আসলে জমে ভাল। একজন গাইবে অপর সকলে হাসির হুল্লোড় ছোটাবে তবে না গানের আসর! পাকা গাইয়ের নিখুঁত সঙ্গীতে শ্রোতারা নিঝুম হয়ে থাকে—বেঁচে আছে কি মরেই গেল তা বোঝবার জো থাকে না।

দ্বিতীয় প্রহরের নিশুতি রাতের সঙ্গে কিন্তু আমাদের বে-পরোয়া গানের ছন্দটা যেন বড় বেমানান ঠেকৃতে লাগল। বিশেষতঃ সন্ধ্যারাত্রে যে খানিক মেঘ জমেছিল, এখন একটু একটু ঝরৃতে সুরু করেছে। অমাবস্যা রাত্রের টিপ টিপ্ বৃষ্টি মনের মধ্যে একটা বিমর্ষতা এনে দেয়। প্রবল কোলাহল যেন এই মৃদু সজল ভাষণের তিরস্কারে লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

গদাই বললে—নেও এখন গাওনা ছাড় দিকিনি! কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তার চেয়ে কেউ একটা গল্প বল শোনা যাক্।

নিতাই উৎসাহিত হয়ে বললে—হ্যাঁ, একটা ভূতের গল্প!

স্বয়ম্ভু গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ ক'রে বললে—না হে না, আজ এই শিবরাতের মুহূর্ত্তে শিবচরদের নিয়ে তামাসা করা ঠিক হবে না।

স্বয়ম্ভুর এই গাম্ভীর্য্যটা কপট, না, সত্যিই তার মনে একটা আশঙ্কা জাগছিল তা নির্ণয় করবার পূর্ব্বেই দেখা গেল তাহু দুখানি পা দিব্যি ইজিচেয়ারের পাথার উপর তুলে দিয়ে নাক ডাকাচ্চে। তৎক্ষণাৎ কানে কোঁচার খোঁটের আর নাকে নস্যির টিপের দৌরাত্ম্যে তার সুখনিদ্রা নাক-কান দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে বেরিয়ে গেল। আবার হাসির ধূম্!

হাসির ঢেউটা তখনও থিতিয়ে যায়নি—অকস্মাৎ বেণুগোপাল কোথা হ'তে ঝড়ের মত ছুটে ঘরে প্রবেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—"প্রাস্তকে তোরা কেউ দেখেছিস্?"

নিতাই বলে উঠল—"কই না! প্রান্ত ফিরেছে না কি?"

বেণুগোপাল সে কথার কোন জবাব না দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল। আজকের আড্ডায় সে অনুপস্থিত ছিল।

স্বয়ম্ভু জিজ্ঞাসা করলে,—"প্রাস্ত কি কারু নাম না কি?"

নিতাই বললে,—"তুমিই শুধু প্রাস্তকে চেন না। সে ছিল আমাদের আড্ডার পাণ্ডা। তুমি তখনও আসনি। ওর আদত নাম হচ্চে 'প্রাণবন্ত'। আমরা বললাম অত বড় নাম ধরে ডাকার ধৈর্য্য হবে না। আর শুধু 'প্রাণ' ব'লে ডাকাটাও নিরাপদ নয়। তাই আগা-মাথা জুড়ে দিয়ে 'প্রাস্ত' নামকরণ করা গেল। কিন্তু 'প্রাণবন্তই' ওর ঠিক নাম,—প্রতি কাজেই প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। সেই হাবড়া ষ্টেশনের কাণ্ডটার কথা মনে আছে?"

নিতাই আমার দিকে তাকালে। আমি হাসতে হাসতে বললাম—"তা আর মনে নেই!"

স্বয়ম্ভু বললে "কি, কি, বল না ভাই।"

নিতাই বলতে লাগল—সে ভারি মজা। আমরা যাচ্ছিলাম শিমূলতলায় পূজোর ছুটিতে বেড়াতে। ঝাঁ ঝাঁ

স্পেশাল্ দিয়েছে। ষ্টেশনে পৌছেই দেখি সময় বেশী নেই। প্রান্ত কিন্তু সময়-সংক্ষেপের জন্তে কিছুমাত্র ভাবছিল না। তার অসন্তুষ্টির কারণ হচ্ছিল—খাবার কিছু নেওয়া হ'ল না সঙ্গে। আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটে চলেছি, সে সকলকে মাঝপথে আটকে টেনে নিয়ে গেল একেবারে আপিসে। সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করলে কি—"মশাই, গরম কচুরি কোথায় পাওয়া যায়? গরম, গরম?"

আপিসের বাবু অবাক হয়ে প্রান্তর দিকে একবার, আমাদের দিকে আর একবার তাকিয়ে মেঠাইয়ের দোকানের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করলেন শুধু। বোধ হয় কথা কইতে বিশেষ ভরসা পাচ্ছিলেন না।

ওদিকে সময় সঙ্কীর্ণ। আমরা ছুটলাম আবার প্ল্যাটফর্মের দিকে। প্রান্ত ছুটল মেঠাইয়ের দোকানপানে। আমাদের বলে গেল, "তোরা যা, আমি এই এলাম বলে।"

প্রথম ঘণ্টা, দ্বিতীয় ঘণ্টা—প্রান্তের দেখা নেই! স্পেশালের গার্ডসাহেব সগর্ব্বে সবুজ নিশান দুলিয়ে দিলেন। ট্রেনও মোশন্ দিয়েছে প্রান্তও প্ল্যাটফর্মপ্রান্তে দেখা দিয়েছে—ছুটতে ছুটতে আসছে। এক হাত খাবারের ঠোঙায় আঠার মত আটকে রয়েছে, অপর হস্ত দাঁড় বাইবার ভঙ্গীতে ঘন ঘন শূন্যে প্রক্ষিপ্ত হচ্চে। আমরা জোড়া জোড়া হাত নেড়ে চীৎকার করে প্রান্তকে ডাকতে লেগে গেলাম—সমস্ত প্ল্যাটফর্মকে সরগরম ক'রে। কিন্তু বোধ হয় হিত করতে বিপরীত হ'ল। আমাদের চীৎকারে গার্ডের দৃষ্টি আমাদের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রান্তর দিকেও আকৃষ্ট হ'ল। প্রান্ত সবে খাবারের ঠোঙাটা আমাদের বিস্তৃত হাতের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে—নিজে যেই চলন্ত গাড়ীর পা-দানে পদপ্রদান করতে যাবে অমনি পেছন হ'তে গার্ডের প্রচণ্ড আকর্ষণে তাকে নিরস্ত হ'তে হ'ল। বেচারি থম্‌কে দাঁড়িয়ে গার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। গার্ড তখন নিজের গাড়ী ধরবার জন্তে পেছনের দিকে চলেছে। প্রান্তও তার পিছে গুটি গুটি চলতে লাগল। এবার পাল্টার পালা। গার্ড যেই যাবে ধরতে তার গাড়ীর হাতল, বিদ্যুৎ-বেগে প্রান্ত লাফিয়ে গিয়ে ধরলে গার্ডের কোমর জাপ্‌টে! তার পর দুইজনে ঝুটোপুটি।

গার্ড বলে—খবরদার!

প্রান্ত বলে—তোম্ খবরদার। চলন্ত গাড়ীতে ওঠবার নিয়ম আমার যেমন নেই তোমারও নেই। রেলের লোক হয়ে রেলের নিয়ম অমান্য কর!

ওদিকে ট্রেন এগিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গার্ডের গাড়ী হ'তে নিশান নাড়া দেখতে না পেয়ে গেল থেমে। গার্ড তখন প্রান্তর হাত হ'তে ছাড়া পেয়ে দৌড়ে গেল গাড়ী ধরতে, প্রান্তও উঠে পড়ল আমাদের কামরায়।

গদাই হাসতে হাসতে বললে—"তারপর সেই বিশাল-বপু লিঙ্কি সাহেবের ভুঁড়িতে হাত বুলোবার গল্পটাও শুনিয়ে দাও না স্বয়ম্ভুকে।"

নিতাই আবার সুরু করতে যাবে এমন সময় বেণু-গোপাল হঠাৎ আবার এসে পড়ল। চোখ-দুটো দেখে মনে হচ্চে—এ কি, ছেলেটা কি পাগল হয়ে ফিরল?

নিতাই ব'লে উঠ্‌ল—"কি হে বেণু, ব্যাপার কি? প্রান্ত ফিরেছে?"

বেণু জবাব দিলে—"না সে আড্ডায়ও নেই, তার আস্তানাতেও ফেরেনি, কিন্তু—"

—"কিন্তু কি? বল না ব্যাপার কি।"

তার দিকে অবাক হয়ে আমরা সকলে তাকিয়ে রইলাম।

বেণু আস্তে আস্তে বলতে লাগল—"আজ সন্ধ্যাটা যখন সবে ঘোর হয়ে আসছে, আমি আমাদের রকটাতে বসে আছি, এমন সময় আমার পাশে এসে বস্‌ল প্রান্ত। তাকে দেখেই মনে হ'ল যেন তার কথাটাই সেই মুহূর্ত্তে ভাবছিলুম। সত্যি, তার কথা এই দু-মাস ধরে আমাদের মধ্যে কে না প্রায় সব সময়ই ভাব্‌ছে বল। সেই যে গেল সে গঙ্গাসাগরের মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হয়ে আর ত ফেরেনি।"

"তাকে দেখেই মনটা আনন্দে চম্‌কে কি রকম বিহ্বল হয়ে গেল তা বুঝতেই পার। চোখে তার শান্ত মৃদু মৃদু হাসি। আমি মুগ্ধনেত্রে স্থির হয়ে সেই মধুর হাসিই দেখতে লাগলাম।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"এতদিন ছিলে কোথায় ?"

বললে—"এই বেড়িয়ে এলাম একটু। দেখে এলাম নবকুমারের পথবিভ্রমের জায়গাটা, দেখলাম কাপালিকের নরকঙ্কালাকীর্ণ আশ্রম। সেই ভীষণ, সেই মধুর !"

আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় কানে শব্দ এল—"রাম নাম সৎ হ্যায়।"

তাকিয়ে দেখি এক অভিনব ব্যাপার। দুইটিমাত্র লোক একটি মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চলেছে। তারা খাট কাঁধে না ক'রে বাধ্য হয়ে মাথায় করেছে—একজন আগে অন্যে পেছনে। সঙ্গে অপর লোক নেই।

আমরা অবাক্ হয়ে দেখ্‌তে লাগলাম। তারা যেই আমাদের কাছ হ'তে একটু দূরে গিয়েছে অমনি প্রান্ত বললে—"যাবি ওদের সাহায্য করতে ?"

প্রান্তের সেই প্রশ্নে হঠাৎ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শ্মশানে যাবার আমন্ত্রণ আচম্‌কা এলে চম্‌কে উঠ্‌তেই হয়। বিশেষ ক'রে শ্মশানযাত্রীর সংখ্যা যদি বিরল হয়, উৎসাহও সবল হ'তে চায় না।

কিন্তু প্রান্তের প্রশ্ন ত সে নয়, সে যেন আদেশ! তার কথা, জানিস্ ত ভাই, ফেলা বড় শক্ত। যেতেই হ'ল। দৌড়ে গিয়ে শববাহীদ্বয়ের কাছে নিজেদের সাহায্য দিতে চাইলাম। তারা সাগ্রহে আমাদের দু-জনকে তাদের কাজে বাহাল ক'রে নিলে। খাটকে তখন চার জনে কাঁধে করা গেল।

রামের ভক্তদ্বয় এবার পরম উৎসাহে হাঁকতে লাগ্‌ল "রাম নাম সৎ হ্যায়"। কিন্তু সেই রামনাম-ধ্বনিতে আমরা যোগ না দেওয়াতে তারা বললে "বলিয়ে বাবুজী—রাম নাম সৎ হ্যায়।"

আমি ভাবছি তাদের সঙ্গে যোগ দিই, কিন্তু প্রান্তকে দেখে মনে হ'ল রাম-নামে সায় দিতে কোন উৎসাহ তার নেই। হিন্দুস্থানবাসীদ্বয় আবার চীৎকার ক'রে অনুরোধ করলে। প্রান্ত উত্তরে একটা হরিধ্বনি করলে। তারা তাতে সন্তুষ্ট নয়। এবার বিষম বিরক্ত ও উৎকণ্ঠার কর্কশ স্বরে বললে—"নেহি, নেহি—রাম নাম লিজিয়ে জল্‌দি।"

তাদের "জল্‌দির" তাৎপর্যটা যে কি, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রান্ত পুনর্ব্বার হরিধ্বনি করলে। এবার আমিও তাতে যোগ দিলাম। তখন তারা বললে—"খাটিয়া জারা উতারিয়ে জী।"

খাট নামানো হ'ল। তখন হিজলীতলার ঝোপে এসেছি। তারা দুই জনে ঝোপেরই দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আমরা তাকিয়ে দেখতে লাগলাম—যায় কোথা! দশ-বারো পা এগিয়েই হঠাৎ দিল দৌড়! যেন প্রাণ নিয়ে পালাচ্চে। তাদের এই কাণ্ড দেখে মহা আশ্চর্য্য ও বিরক্ত বোধ হ'ল। প্রান্তকে বললাম—"দেখলে ত! যেচে পরের উপকার করতে যাওয়ার কি পুরস্কার!"

বস্তুতঃ, প্রান্তের উপরেই যেন আমার সব রাগটা এসে ভর ক'রে দাঁড়াল। প্রান্ত কিন্তু হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, "এখন আর রাগ ক'রে কি করবে বল। ওরা দুজনে যেমন ক'রে আগে বয়ে আনছিল এখন আমাদেরও তাই করতে হবে।"

দু-জনে মাথায় খাট বয়ে নিয়ে চললাম। প্রান্ত আগে রইল, আমি পেছনে। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন আমি বলতে লাগলাম—"কার মড়া কে বয়—রামচন্দ্র!"

প্রান্ত হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠে বললে,—"এই নামটা তুমি এতক্ষণে করলে! তারা যখন চাইছিল তখন যদি ঐ নাম শোনাতে তাহ'লে ত এত কাণ্ড হ'ত না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কি, রাম-নাম ?"

প্রান্ত বলল—"হ্যাঁ, ওরা কেন পালাল তা বুঝতে পারিস নি ? ওরা আমাদের কি মানুষ ভেবেছে, না আর কিছু ?"

আমার মাথায় এতক্ষণে বুদ্ধি যেন সুস্পষ্ট হয়ে এল। আমি ভয়ে বললাম, "ভূত ভেবেছে না কি ?—ওঃ, তাই বুঝি আমাদের মুখ দিয়ে 'রামনাম' বলিয়ে পরখ করতে চাচ্ছিল ?"

প্রান্ত বললে—"ঠিক তাই। অনাহূতভাবে মড়া বইতে প্রেতাত্মারাই এত চট ক'রে আসে।"

কথাটা ব'লে সে হাঃ হাঃ ক'রে হাসতে লাগল। আমার কিন্তু গা-টা ছম ছম ক'রে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে—"আচ্ছা বেণুগোপাল! তোর মনে একবারও আমার ওপর সন্দেহ হয় নি ?"

কথাটা শুনে আমার কণ্ঠরোধ হবার জোগাড় হ'ল। অতি কষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে বললাম—"কিসের সন্দেহ?"

উত্তর পেলাম—"এই আমি সত্যিই—"

"এই অবধি শুনেছিলাম ভাই, তার পর আর কিছু জানি না।"

বেণুগোপাল হাঁপাতে লাগল। আমি বললাম—"জানিস্ না কি? জ্ঞান হারিয়েছিলি না কি? এখানে ত দিব্যি সজ্ঞানেই এলি!"

বেণু আমার কাঁধে একটু ভর ক'রে বললে—"দাঁড়া একটু জিরিয়ে নি।"

আমরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার সে বলতে লাগল—"প্রান্তর ঐ কথাটা পর্য্যন্ত শুনেই আমি খাটের পেছনের দিকটা দড়াম্ ক'রে দিলুম ছেড়ে। আর অমনি পেছন ফিরে দিলাম ছুট। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমার মাথার পেছনটাতে এমন একটা আঘাত পেলাম কি আর বলব। সে কি খাটিয়ার পায়াটাই উল্টে লাগল, না মড়ার ঠ্যাংই ঠিকরে এসে ঠেকল, না প্রান্তের প্রেতাত্মাটাই মারলে মাথায় চাঁটি, কে জানে!"

গদাই মহা ক্ষাপ্পা হয়ে বললে—"যাঃ যাঃ, প্রেতাত্মা! কি যে বলিস্। তুই যে এত বড় কাওয়ার্ড তা জানতাম না। প্রান্তকে সেই তেপান্তরের মাঠে একলাটি ফেলে দিব্যি চলে এলি! খোট্টারা তবু খাট নামিয়ে তবে পালিয়েছে, আর তুই কি-না মড়াসুদ্ধ খাটটা দড়াম্ ক'রে উল্টে দিয়ে এলি! প্রান্ত হয়ত একলাই মৃতের সৎকার করছে। সে ত আর যেমন তেমন ছেলে নয়। চল্ আমরা যাই!"

আমরা অনেকেই "চল্ চল্" ব'লে উঠে পড়লাম। স্বয়ম্ভু গম্ভীর হয়ে বললে—'অত হঠকারী হয়ো না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা—"

"আরে ধ্যাৎ, অগ্রপশ্চাৎ—"

সকলেই ছুটলাম। বেণুকে ও স্বয়ম্ভুকে সকলের মাঝে রাখলাম। শ্মশান বলতে পাড়াগাঁয়ের শ্মশান। যাবার পথটা পর্য্যন্ত আতঙ্কে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শিবতলার পথ বাঁয়ে রেখে, হাড়গিলে খালের ধার দিয়ে দয়ে খানিকটা গিয়ে হিজলীতলার ঝোপ ডাইনে ফেলে পড়ল গিয়ে হল্‌দি মাঠে। সেখান থেকে পশ্চিম পানে তাকালে দৈত্যদীঘির তালগাছের উচ্চ শিরের সারি এই অমাবস্যা রাতেও দেখা যায়! তালের দৈত্যেরা এই শ্মশানের পথে তাকিয়ে দেখে—আবার কে যায়। তারপর মাঠের রাস্তা অজগর সাপের মত প্রবেশ করেছে গিয়ে শেওড়া বনে। বনের মাঝে গাছের ডাল কোথাও হেলে, কোথাও বাতাসে নুয়ে প'ড়ে খাটের মড়ার কানে কানে কি যেন কথা কয়, আবার হরিধ্বনি দিতেই খাড়া হয়ে উঠে পড়ে। কোথাও পেচার গুরুগম্ভীর ধ্বনি।

বন পেরিয়েই ভাগীরথী-তীরে শিমুলতলায় শ্মশান-ঘাট। আমরা তাকিয়ে দেখলাম একটি মাত্র চিতা। তাতে আগুন সবে দাউ দাউ ধরে উঠ্‌ছে। লোকজন কোথাও কেউ নেই!

গদাই ব'লে উঠ্‌ল—"দেখলি, সেই হিজলী তলা থেকে প্রান্ত একলাই এতটা পথ মড়া বয়ে এনেছে, তার পর চিতা সাজিয়ে আগুন ধরিয়েছে।"

স্বয়ম্ভু ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে—"তোরা কি পাগল হয়েছিস? হিজলীতলা থেকে মড়া বয়ে এনে আগুন দেওয়া কি মানুষের কাজ? ঐ বেণু যা সন্দেহ করেছে, বুঝলি না—"

গদাই বললে—"ধ্যাৎ!"

তারপর সকলে মিলে "প্রান্ত—প্রান্ত" ব'লে চীৎকার করে ডাকতে লাগলাম। সে ডাক বনের প্রান্ত হ'তে ফিরে এসে ভাগীরথীর স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে গেল। কোন সাড়া এল না। যখন উপলব্ধি হ'ল সত্যিই জনহীন শ্মশানেই এই চিতা জ্বলছে তখন মনের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে উঠল। আমরা সকলেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। মনে হ'ল আমরা এই মাত্র যে কণ্ঠস্বরের দূত পাঠালাম প্রান্তকে খুঁজবার জন্যে, সে যেন ঐ নিবিড় বনের অন্ধকারে, ঐ বিজনপ্রান্তরের বিস্তীর্ণতায় কাউকে হাতড়ে না পেয়ে হঠাৎ ভয়ে দিশেহারা বিহ্বল হয়ে গঙ্গা পেরিয়ে চলে গেল।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় বয়ে সমস্তটা পথ গিয়েছি—সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছিল। অন্তরের রক্তও যেন

এখন জল হয়ে আসতে চাইল। হাত-পাগুলো আগুনে সেঁকে নিতে চিতাটার কাছে সকলে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ বেণু চম্‌কে মুখ ফিরিয়ে বললে—'সর্ব্বনাশ !"

আমরা বললাম—"কি ?"

বেণু কাঁপতে কাঁপতে বললে—"চিতায় শুয়ে পুড়ছে কে ও ? প্রান্ত না ?"

আগুনের শিখার ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টিপাত ক'রে আমরা বললাম—"ধ্যাৎ।"

বেণুগোপালের দিকে ফিরে আমি বললুম—"তোর কি মাথা খারাপ হ'ল ?"

কিন্তু স্বয়ম্ভূ একটা রহস্যের সমাধানের সুরে বললে—"হুঁ, বেতালপঞ্চবিংশতির বিধানে নিজের বিপন্ন মৃতদেহ নিজে বইতে পারে।"

গদাই আবার বললে—"ধ্যাৎ !"

শাল্মলীর উচ্চ শাখা হ'তে গম্ভীর প্রতিবাদ এল—"ভূৎভূতুম—ভূৎভূতুম !!"

বাল্মীকি-রামায়ণের ভূমিকা

শ্রীদীননাথ সান্যাল

কাব্যারম্ভেই বাল্মীকি-নারদ-সংবাদ। ইহাই রামায়ণের ভূমিকা। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ভূমিকাটি এইরূপ ;—আদর্শ-মানব-চরিত্র অবলম্বনে কাব্য-রচনা-প্রয়াসী বাল্মীকি মুনি নারদের মুখে রাম চরিত্রাখ্যান শুনিয়া স্নানার্থ সশিষ্য তমসাভিমুখে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সেই পবিত্র তীরে এক ব্যাধ-কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চবধ-রূপ নৃশংস ব্যাপার দর্শনে এবং ক্রৌঞ্চীর কাতর বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণে তাঁহার হৃদয় করুণ-রসে আপ্লুত হওয়ায় অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হইতে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের আকারে ঐ ব্যাধের প্রতি অভিশাপ-বাণী নির্গত হইল ;—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কাম-মোহিতম্‌॥"

রে নিষাদ ! যেহেতু তুই কামমোহিত ক্রৌঞ্চটিকে বধ করিলি, তোর প্রতিষ্ঠা চিরকাল অর্থাৎ বহুকাল থাকিবে না।

এই ক্রৌঞ্চবধ-ঘটনাটিকে একটি আকস্মিক ঘটনা-মাত্র বলিয়া ধরিলে, উহা দেখিয়া করুণার্দ্রচিত্ত বাল্মীকির মুখ হইতে ছন্দোনিবদ্ধ "প্রথম-শ্লোক"-নিঃসৃতির একটা ঘটনা-মূলক উপলক্ষ পাওয়া যায় বটে, এবং তাহা ঐ শ্লোকের স্পষ্টার্থ হইলেও, আদি-কবি-রচিত একখানি প্রকাণ্ড মহাকাব্যের ভূমিকায় ঐরূপ একটা ঘটনা—(বিশেষ, যখন বাল্মীকির মন নারদোক্ত অত্যাশ্চর্য্যজনক রাম-চরিতাখ্যান চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল)—এমন সময়ে তাঁহার সমক্ষে সংঘটিত ঐ ক্রৌঞ্চবধ-ব্যাপার এবং তদ্দর্শনে ব্যাধের প্রতি মুনির অভিশাপ-বাণী—এরূপ একটা ঘটনার সংঘটন—ভাবগ্রাহীর মন উহার স্পষ্টার্থ ছাড়া, উহার ভিতরে একটি গূঢ়ার্থের সন্ধান করিতে চায়, অর্থাৎ কাব্যাংশে ঐ ঘটনাটির মধ্যে যেন রামায়ণের নিষ্পীড়িত মর্ম্মটি নিহিত আছে, তাহারই সন্ধান করিতে চায়। সেই সন্ধানই এখানে আমার আলোচ্য বিষয়।

বাল্মীকি-রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিত রামানুজও উক্ত ব্যাপারের কেবলমাত্র স্পষ্টার্থেই তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনিও ক্রৌঞ্চবধ-ব্যাপারে নিষাদের প্রতি বাল্মীকির অভিশাপ-বাণীর গূঢ়ার্থ নিষ্কাষণের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এখানে প্রথমে তাঁহার ব্যাখ্যার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি ঐ একই অভিশাপ-বাণীর দুই পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—একটি ব্যাখ্যা রামপক্ষে; অপরটি রাবণ-পক্ষে।

রাম-পক্ষে,—হে মানিষাদ রাম ! তুমি মন্দোদরী-রাবণ-রূপ ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে কাম-মোহিত রাবণকে

নিহত করিয়াছ ; এই হেতু বহুকাল অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ কর। *

পক্ষান্তরে অর্থাৎ রাবণ-পক্ষে,—(সর্ব্বদা দেবর্ষিগণ-সমেত ত্রিলোকের উৎপীড়ক) হে নিষাদ-রূপী রাবণ! + (রাজ্যক্ষয় ও বনবাস নিবন্ধন ক্ষুদ্রত্বপ্রাপ্ত) রাম-সীতা-রূপ ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে সীতাকে তুমি বধাধিক দুঃখ দিয়াছ, সেই হেতু তুমি (ব্রহ্মার নিকট লঙ্কা-রাজ্য ভোগ করিবার) যে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছ, তাহা অধিক দিন থাকিবে না।

টীকাকার মহাশয় নিজেকে বাল্মীকি-স্থানীয় করিয়া কেবলমাত্র ক্রৌঞ্চবধ-ব্যাপারের উপরেই দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং উহা হইতে রামায়ণের মর্ম্ম-কথা নিষ্কাশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়াই উপরি-উক্তরূপে তাঁহাকে বৈয়াকরণিক ও অন্যরূপ কৌশল করিতে হইয়াছে ; কিন্তু তাহা করিয়াও সমগ্র রামায়ণের পিণ্ডিত মর্ম্মটি ধরা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ, রামায়ণের মত সুবিস্তৃত ও ঘটনাবহুল মহাকাব্যের দুই-একটি অবান্তর ঘটনার ভিতরে সমগ্র কাব্যখানির উদ্দিষ্ট মর্ম্মকথার সন্ধান পাওয়াও যেমন অসম্ভব, আবার ভূমিকায় কাব্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন-উদ্দেশ্যে সেই অবান্তর ঘটনার সঙ্কেত তেমনই অসঙ্গত ও অশোভন। রামানুজের মত সুপণ্ডিতও ইহা বিলক্ষণ রূপে অনুভব করিয়াছেন ; তাই শ্লোকটির গূঢ়ার্থের সন্ধানে একবার রাম-পক্ষে জয়গান, আবার রাবণ-পক্ষে অভিশাপ—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহাকে বিষম বিব্রত হইতে হইয়াছে। রাম-পক্ষের ব্যাখ্যায় বাল্মীকি-প্রত্যক্ষ "নিষাদ"কে একেবারে উড়াইয়া দিয়া ব্যাকরণের সাহায্যে তাহার স্থলে রামকে "মানিষাদ" করিতে হইয়াছে ; কাজেই মন্দোদরী-রাবণ হইলেন "ক্রৌঞ্চমিথুন"।‡ এরূপ ব্যাখ্যার ফলে বুঝায় যেন ক্রৌঞ্চীরূপিণী মন্দোদরীর বিলাপই রামায়ণের গূঢ়ার্থ। বলা বাহুল্য, প্রত্যক্ষ ক্রৌঞ্চবধ-ব্যাপারের সহিত ক্রৌঞ্চীর সকরুণ বিলাপই বাল্মীকির চিত্তকে করুণার্দ্র করিয়াছিল। আবার রাবণ-পক্ষে ব্যাখ্যায় রাম-সীতাকে করিতে হইয়াছে 'ক্রৌঞ্চমিথুন' ; তন্মধ্যে সীতা হইয়াছেন "ক্রৌঞ্চ" (!) ; কাজেই রাম "ক্রৌঞ্চী" (!)। * এ ব্যাখ্যায় রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণ ও তজ্জনিত রামের সাময়িক ও স্বাভাবিক বিলাপই যেন রামায়ণের মূল কথা, যাহা ভূমিকায় সমগ্র কাব্যখানির প্রতীক-রূপে প্রতিফলিত হইবার যোগ্য !

বস্তুতঃ বাল্মীকির দৃষ্টিতে নিষাদ কর্তৃক ক্রৌঞ্চবধ-মাত্র ঘটনাটিকে প্রতীকস্বরূপ রামায়ণে প্রয়োগ করিতে গেলে পণ্ডিতজীর পন্থা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহা সত্য। আবার, ইহাও সত্য যে, রাবণ-বধে মন্দোদরীর বিলাপ বা সীতার হরণে রামের বিলাপ অথবা রামায়ণের অন্য কোন ঘটনা বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মধ্যে নায়কের সমগ্র কার্য্যাবলীর প্রেরণা অর্থাৎ রামায়ণের বীজবস্তু বা মূলকথার সন্ধান পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এখন প্রশ্ন এই যে, তবে রামায়ণে ভূমিকোক্ত তমসা-তীরের ঘটনাটির গূঢ়ার্থ কি ?

এই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, বাল্মীকি-রামায়ণ অন্ততঃ রামায়ণের ভূমিকাংশ প্রথম পুরুষের উক্তি-রূপে রচিত—উত্তম পুরুষের অর্থাৎ স্বয়ং বাল্মীকির উক্তি-রূপে নহে। +

এই প্রথম পুরুষ সম্ভবতঃ বাল্মীকিরই শিষ্য। রামায়ণের ভূমিকাতেই আছে, নারদের সহিত কথোপকথনের পরে বাল্মীকি স্নানার্থে সশিষ্যই তমসা-তীরে যাইতেছিলেন এবং সেখানে এক নিষাদের নৃশংস আচরণে ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতি শাসনবাক্য প্রয়োগ করেন। এই স্থলে বাল্মীকির সম্মুখে দৃশ্যটি—নিষাদ ও তৎকৃত নৃশংস আচরণ (ক্রৌঞ্চবধ) এই মাত্র। কিন্তু সেই স্থলেই শিষ্যের সম্মুখে দৃশ্যটি শুধু তাহাই নহে ;—নিষাদের প্রতি

* মা লক্ষ্মীঃ নিষিদত্যস্মিন্ তৎসম্বোধনং মা নিষাদ।

\+ নিতরাং সদেবর্ষিগণং ত্রৈলোক্যমবসাদয়তি পীড়য়তীতি-নিষাদঃ।

"ক্রৌঞ্চ মিথুনাৎ মন্দোদরী-রাবণ-রূপাদ্ একং কামমোহিতং রাবণং।"

* "রাজ্যক্ষয়-বনবাসাদিদুঃখেন অত্যল্পীভূতং পরম কার্শ্যং গতং যৎ মিথুনং সীতারাম-রূপং তস্মাদ্ একং সীতারূপং যস্মাদ্ অবধীঃ বধাদধিকপীড়াং প্রাপিতবানসি।"

\+ রামায়ণের আরম্ভ এইরূপ :—

"তপস্বাধ্যায় নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্।
নারদং পরিপ্রপচ্ছ বাল্মীকিমুনি পুঙ্গবম্।"

মুনির শাসনও শিষ্যের পক্ষে প্রত্যক্ষ ব্যাপার। সুতরাং প্রথম-পুরুষোক্ত (সম্ভবতঃ ঐ শিষ্যোক্ত) ভূমিকায় তমসা-তীরের ঘটনাটি কেবলমাত্র মুনিদৃষ্ট ক্রৌঞ্চবধ-ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইতে পারে না; উহার সহিত নিষাদের প্রতি মুনির তীব্র শাসন-বাক্য সমেত ঐ ঘটনাটি বা কাব্যের ভাষায় বলিতে গেলে, ঐ চিত্রটি সম্পূর্ণ। এই নিমিত্তই তমসা-তীরে মুনির সহিত একজন শিষ্য থাকার কাব্যগত সুন্দর সার্থকতা।

এদিকে, রামায়ণে বিশাল ভারতভূমি ও সমুদ্রপারে লঙ্কা পর্য্যন্ত রামের ভ্রমণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্য্যাবলীর ভিতর আদ্যন্ত যে একমাত্র অখণ্ড সূত্র লক্ষিত হয়, তাহা রাক্ষস-দমন। সেকালে আর্য্যাবর্ত্তে রাক্ষসদিগের বিষম, অকথ্য অত্যাচারে তপোবনস্থ মুনি-ঋষিগণ সবিশেষ উৎপীড়িত হইতেন; যাগযজ্ঞ করা তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। রামায়ণেও সে-কথা পাওয়া যায়। এমন কি, পঞ্চদশবর্ষীয় বালকদ্বয় রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্র যে তাহাদের বৃদ্ধ পিতার বক্ষ হইতে এক প্রকার ছিন্ন করিয়াই লইয়া গেলেন, তাহা রাক্ষসদিগের উৎপাত হইতে তাঁহার যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্যই। বিশ্বামিত্রের কাছেই রাম লক্ষ্মণ নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ বিষয়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন এবং বিশ্বামিত্র তাঁহাদের পরীক্ষা করিলেন ভীষণা তাড়কা-রাক্ষসীকে দিয়া।

রাম অনায়াসে তাড়কাকে বধ করিয়া বিশ্বামিত্রের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। ইহার পরে বিশ্বামিত্র স্বীয় যজ্ঞস্থলে, ঐ দুই বালককে রাক্ষসদের উৎপাত নিবারণার্থ প্রহরীস্বরূপে রাখায়, সেখানেও রাম রাক্ষসদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজের বীর্য্যপটুতা ও গুরুর শিক্ষা সপ্রমাণ করিলেন। এই হইল রামায়ণে রাক্ষস-দমনের প্রথম বা উদ্যোগপর্ব্ব।

ইহার পরে চারি ভ্রাতা বিবাহিত হইয়া অযোধ্যায় আসিবার কিছুকাল পরে বৃদ্ধ পিতার ইচ্ছা হইল জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন; অযোধ্যার প্রজাবর্গের ইচ্ছাও তাহাই। মহাসমারোহে অভিষেকের আয়োজন হইলে কি হয়?—কবির ইচ্ছা অন্যরূপ। কবি রামকে দিয়া রাক্ষসদিগের অত্যাচার দমন করাইবেন। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি সেই বিপুল আয়োজনের মধ্যে লক্ষ্মণ-সমেত সস্ত্রীক রামের বনবাস ঘটাইয়া কাব্য-রাজ্যে করুণ রসের এমন একটা অমর প্রস্রবণ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার তুলনা জগতে আর আছে বলিয়া আমার জানা নাই। সেই উদ্দেশ্যেই কবি কাব্যোচিত উপায়ে রামের যুবরাজত্ব নষ্ট করিলেন; তাঁহার সহায়তার জন্য বীর লক্ষ্মণ সঙ্গে থাকিলেন এবং রাক্ষসদের মূলোৎপাটন পক্ষে কবির পরিকল্পনায় সীতারও প্রয়োজন—এইজন্য সতীত্ব-বিবেকের বিদ্যুত্তাপিত লৌহবেষ্টনী দ্বারা সীতাকে সংরক্ষিত করিয়া কবি তাঁহাকেও রামের অনুগমন করাইলেন। অযোধ্যা কাঁদিতে থাকিল; কিন্তু কবি নির্ব্বিকারচিত্তে ঐ তিনজনকে বনপথে লইয়া চলিলেন।

পথিমধ্যে রাত্রিবাসের জন্য রাম যে-আশ্রমেই আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইখানেই আশ্রম-মুনির মুখ দিয়া কবি রামকে রাক্ষসদিগের অত্যাচার কথা শুনাইতে-শুনাইতে তাঁহাকে দক্ষিণ-মুখে লইয়া যাইতে থাকিলেন। এইরূপ শুনিতে-শুনিতে রাক্ষস-দমন-কার্য্য যেন রামের মনে বনবাসের একমাত্র "মিশন্" হইয়া উঠিল। সীতাও ইহা লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সীতার কথায় অস্ত্রত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া বনবাস-কাল কাটাইতে হইলে কবি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হয় না। তাই কবি রামের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, আর্ত্ত ঋষিদিগের বিপদে অস্ত্রধারণ ক্ষাত্রধর্ম্ম। তবে তিনি সীতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, বৈর ভিন্ন তিনি রাক্ষস-হিংসা করিবেন না।

ক্রমে দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসদিগের এক বিরাট্ বাহিনী আছে শুনিয়া রাম ত্রিকূটস্থ পঞ্চবটী-বনে আশ্রম করিয়া সুখে তপোবন-বাস-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকে কবি সে-সুখ ভোগ করাইতে অযোধ্যার রাজত্ব ছাড়াইয়া বনে আনেন নাই। পঞ্চবটী বাস-কালে বৈর-সূত্রে রামকে জনস্থানের চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিতে হইল। ইহার পরে রাম নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন; কিন্তু কবি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। খর-দূষণের সৈনাপত্যে জনস্থানের চতুর্দ্দশ সহস্র সেনাবাহিনী ত রাবণ-মহাদ্রুমের একটি শাখা মাত্র। তাহা ছিন্নভিন্ন হইলেও লঙ্কায় সে মহাদ্রুম শির উচ্চ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিল। সমূলে তাহা উৎপাটিত না হইলে

রাক্ষস-দমন-কার্য্য শেষ হইল কই? কবিকে তখন লোক-চক্ষুতে এক প্রকার নির্ম্মম হইয়াই, কিন্তু কাব্য-চক্ষুতে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে রাবণকে দিয়া গুপ্তভাবে রামের আশ্রম-লক্ষ্মীকে হরণ করাইতে হইল। এই সীতা-হরণ ব্যাপার দ্বারাই কবি রামের অয়ন-পথের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং তাহাতেই রামায়ণের ঈপ্সিত কার্য্যের সম্পূর্ণরূপে সমাধান। এখন রাবণের শাস্তি ও সীতার উদ্ধার রামের একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। এই কর্ত্তব্যবোধের ভিতরই কবির উদ্দেশ্যসিদ্ধি নিহিত। ঐ কর্ত্তব্যবশেই কিষ্কিন্ধ্যায় গমনপূর্ব্বক অসংখ্য সেনা-সংগ্রহ, আরও দক্ষিণ মুখে সেই বিরাট কিষ্কিন্ধ্যা-বাহিনীর অভিযান, সাগরে সেতুবন্ধন; এই সকল উদ্যোগের পরে লঙ্কায় উপস্থিতি এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে সবংশে রাবণকে সংহার। এইখানেই রামের অয়ন শেষ। ইহার পরে, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্যভার-গ্রহণ। এই হইল রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বিস্তৃত ও কবি-নির্দ্দিষ্ট অয়ন (adventures)।

অতি সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতভাবে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত রামের কার্য্যাবলী যাহা বর্ণিত হইল, সে-সকলের প্রতি সমগ্র দৃষ্টিপাত (ইংরেজীতে যাহাকে বলে bird's-eye view বা পক্ষী-দৃষ্টিপাত) করিলে অতি সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সব কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া রেখার মত যে একমাত্র প্রেরণা অযোধ্যা হইতে সুদূর লঙ্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা রাক্ষস-দমন। পবিত্র আর্য্যভূমে অনার্য্য রাক্ষসদিগের নৃশংস অত্যাচার উপদ্রব নিবারণই রামায়ণ-কাব্যের অন্তর্নিহিত বীজ, মজ্জা, মূল, বা মর্ম্ম-কথা এবং সবংশে রাবণবধে ঐ কার্য্য ও রামের অয়ন সমাপ্ত। রামায়ণের ভূমিকাতেও দেখা যায়, এই মহাকাব্যখানির নামান্তর রাবণ-বধ ;—

> "রঘুবর-চরিতং মুনি-প্রণীতং।
> দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্‌।

এখন রামের কার্য্যাবলী আদ্যন্ত মনে করিয়া তমসা-তীরের ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র সহজেই প্রতীতি হইবে যে, সমগ্র রামায়ণের মূলকথাটি তমসা-তীরের ঘটনা-রূপ সঙ্কেতে সুন্দর প্রতিফলিত। আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্র তপোবনাদিতে অনার্য্য রাক্ষসদিগের নৃশংস অত্যাচার এবং আর্য্য রাম কর্ত্তৃক তাহার দমন—রামায়ণের এই মূলকথাটি ভূমিকার সাঙ্কেতিক চিত্রে চমৎকার চিত্রিত হইয়াছে, পবিত্র তমসা-তীরে নিষাদ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চবধরূপ নৃশংস ব্যাপার সংঘটনে এবং তজ্জনিত আর্য্য বাল্মীকি কর্ত্তৃক নিষাদের প্রতি তীব্র ও ক্রুদ্ধ শাসনে। ইহাই তমসা-তীরের ঘটনার ও বাল্মীকির মুখ-নিঃসৃত অভিশাপ-বাণীর গূঢ়ার্থ, অর্থাৎ একটা ঘটনা দ্বারা কাব্যের মর্ম্ম-নির্দ্দেশ।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহার নাম সূক্ষ্মালঙ্কার, অর্থাৎ কোন-রূপ সঙ্কেত দ্বারা ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত করা। এখন দেখা গেল, তমসা-তীরে শিষ্য-দৃষ্ট ঘটনাটিকে রামায়ণের প্রতীক বা সঙ্কেত-স্বরূপে গ্রহণ করিলে, মুনির শাসন-বাক্যের ব্যাখ্যা সহজ ও সরল হইয়া পড়ে; উহার গূঢ়ার্থ নিষ্কাষণে নানাবিধ কৌশলের কিছুই করিতে হয় না; অথচ রামের সমগ্র কার্য্যাবলীর মর্ম্ম ঐ শ্লোকটির মধ্যে জাজ্বল্যমান্‌ রূপে ধরা পড়ে।

রাক্ষসদমনরূপ সূত্র ধরিয়া মুনিবর মুক্তাধিক সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট রত্নাদির যথাযথ সমাবেশেই এই অপূর্ব্ব মহাকাব্যখানি গ্রন্থন করিয়াছেন। ইহার ঘটনাবলী এমন কাব্যোচিত নিপুণ ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ইহার পাত্রপাত্রীগণ এমন কালজয়ী আদর্শ স্বরূপ যে, যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া এই মহাকাব্যখানি ভারতের অমূল্যনিধি-রূপে সমাদৃত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। রামায়ণের আদর্শ গুণেই ভারতের সর্ব্বত্র যুগে-যুগে কত কবিই যে উহার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। কাব্যে, নাটকে, গানে, ভজনে, কথায়, গাথায়, গদ্যে পদ্যে এক রামায়ণ-অবলম্বনে ভারতময় যে কি সুবিপুল সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে হিন্দুজাতির লোক-শিক্ষায় যে কি অসীম উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে অবাক্‌ হইতে হয়—বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই তাহার তুলনা মিলে না। ক্ষুদ্রমতি আমি সেই আদি কবির রামায়ণ-কাব্যের ভূমিকাংশের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পণ্ডিত রামানুজের ভাষায় কবি-গুরুকে বন্দনা করিতেছি ;—

> "কূজন্তং রাম-রামেতি মধুরম্‌ মধুরাক্ষরম্‌।
> আরূঢ়-কবিতা-শাখং বন্দে বাল্মীকি-কোকিলং॥"

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলায় বক্তৃতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুইখানি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট জীবন-চরিত আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিলে এখনও মাইকেল সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যাইতে পারে। গত ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র পুরাতন ফাইল হইতে আমি ঢাকায় মাইকেলের সম্বর্দ্ধনার কথা আলোচনা করিয়াছি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন।* মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্ম ১৮৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এক প্রকাশ্ম সভার আয়োজন করেন। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্ম মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্ম ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিবার মত। তিনি লিখিয়াছিলেন:—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at nine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P. M.

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.†

সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল। এই সভায় কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান সুদৃশ্য রজত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন।

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে আছে:—

"You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prasanna Singh of Jorosanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy! I was expected to speechify in Bengali!"

কিন্তু এই বাংলা বক্তৃতাটি তাঁহার চরিতকারদের কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—

"কালীপ্রসন্ন বাবুর অভ্যর্থনা মধুসূদনের প্রতিভার অতি গৌরবজনক পুরস্কার। সে দিনের ঘটনা চিত্রে প্রতিবিম্বিত করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম।" *

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোমও লিখিয়াছেন—

"আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও সংবাদপত্রে মুদ্রিত এই অভিনন্দন-পত্র ও মধুসূদনের উত্তর সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" †

মাইকেলের বাংলা বক্তৃতাটি না পাইবার কারণ পুরাতন সংবাদপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ১৮৬১ সনের কতকগুলি 'সোমপ্রকাশ' আছে। সুখের বিষয়, যে-সংখ্যায় মাইকেলের বক্তৃতাটি মুদ্রিত

* ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত আমার লিখিত "কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† লিথোগ্রাফে মুদ্রিত এইরূপ একখানি পত্র গৌরদাস বসাক মহাশয়ের বাটীতে ছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম তাহার নকল সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

* "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত," ৩য় সং, পৃ. ৪২৪ পাদটীকা।

† 'মধুস্মৃতি, পৃ. ১৫৬।

হয় সেখানে সেই সংখ্যাটি আছে। আমার অনুরোধে শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাস-গুপ্ত বক্তৃতাটি বিলাত হইতে নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন। সমগ্র বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

"স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে, এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

"বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

"আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সমাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি।" ('সোমপ্রকাশ', ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১)

পুনা ও ভোর

শ্রীশান্তা দেবী

বোম্বাই হইতে অনেক রাত্রে পুনার একটা ট্রেন ছাড়ে। সেইটে সকালে পুনা পৌছিব মনে করিয়া আরামে ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিলাম। ঘুম ভাঙিল অনেক লোকের ডাকাডাকিতে—পুনা আসিয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক বেলভালকার আমাদের নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বোম্বাই গিয়াছিলেন। সকালে দেখিলাম তাঁহার পুত্রকন্যারা গাড়ী লইয়া হাজির। অধ্যাপকের বাড়ি অতিথি হইতে হইবে।

বোম্বাই ও পুনায় আকাশপাতাল প্রভেদ। বোম্বাই একেবারে পাশ্চাত্য ধরণের শহর, পুনা খাঁটি মহারাষ্ট্র। মানুষের ব্যবহারে, পোষাকে, ঘরগৃহস্থালীতে, পথেঘাটে কোনো বিদেশী ভাব আমাদের চোখে পড়ে নাই। ভোর বেলা দুই দিক্ খোলা উঁচুনীচু পথের উপর দিয়া ছোট একটি নদীর সেতু পার হইয়া মোটরে চলিলাম। নদীর অল্পজলে পাল পাল মহিষ গা ভাসাইয়া পড়িয়া আছে। অনেক মানুষও সেইখানেই জল লইতেছে, কাপড় কাচিতেছে, স্নানও বোধ হয় করিতেছে। স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া এই প্রথাটি বিপজ্জনক সন্দেহ নাই, তবে চোখে দেখিতে মন্দ লাগে না।

শহরের বাহিরে উন্মুক্ত একটি প্রান্তরের মধ্যে অধ্যাপক বেলভালকার ও অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোকের বাড়ি। ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিট্যুটও তাহারই পাশে। বাড়ির কাছেই ছোট ছোট পাহাড়। ভোরবেলা স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা অনেকে বেড়াইতে আসিয়াছিল। বাঙালীরা অধিকাংশই এই ভাবে বেড়াইতে অভ্যস্ত নহেন। তাই বাঙালীর চোখে জিনিসটা নূতন লাগে, মনে হয় বুঝি কিছু একটা উৎসব এখানে আছে।

অধ্যাপক মহাশয় বিলাত প্রত্যাগত, কিন্তু তাঁহার বাড়ির ব্যবস্থা সবই দেশীয় ধরণের। দেখিতে বড় ভাল লাগিল। বাড়ির বারান্দায় মস্ত দোলনা ঝুলিতেছে,

তাহাতে বাড়ির মেয়েরা ও অভ্যাগতারা বসিয়া গল্প করেন। গৃহিণীর রান্নাঘর ও পূজার ঘর পাশাপাশি। তিনি আমাকে লইয়া সব দেখাইলেন। উঠানে তরিতরকারী ও ফুলগাছ গৃহিণী নিজ হাতে করিয়াছেন। ইহাদের খাওয়া দাওয়া সব নিরামিষ। মেঝের উপর ছুটি পিঁড়ি পাতিয়া এবং একটি পিঁড়ি দেয়ালে ঠেসাইয়া আহারের স্থান হয়। প্রথম পিঁড়িটিতে রূপার থালায় ও ছোট ছোট রূপার বাটিতে ভাত ডাল, তরকারী, দই ইত্যাদি, মাঝেরটি বসিবার; পিছনে ঠেস দিবার একটি। গৃহিণী নিজের হাতে সরের ঘি করিয়া রাখেন, বাড়ির লোক এবং অতিথিদের ভাত ডাল লুচি ও তরকারিতে সেই ঘি প্রচুর ঢালিয়া দেওয়া হইল। মৎস্যভোজী বাঙালীরা এত ঘি কখনও খায় না। জলের জন্য প্রত্যেককে একটি গেলাস ছাড়া একটি করিয়া ঢাকনা দেওয়া স্বতন্ত্র ঘটি দেওয়া হইল।

বাড়ির মেয়েরা কলেজে পড়েন। কিন্তু তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ নম্রতা, ভদ্রতা, আতিথ্য সবই স্বদেশী ধরণের। বোম্বাইয়ে মেয়েদের আতিথ্য, ভদ্রতা ইত্যাদি অনেকটা পাশ্চাত্য রকমের।

ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট দেখিতে গেলাম। মস্ত বড় বাড়িতে ঘরে ঘরে অসংখ্য মহাভারতের পুঁথি। বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া নানা হরফে লেখা পুঁথি। বাংলা পুঁথি ছুই একখানি দেখিলাম। সকলের অপেক্ষা প্রাচীন পুঁথিখানি বোধ হয় কাশ্মীরের সারদা লিপিতে ভূর্জ্জপত্রে লেখা। ঘরে ঘরে পণ্ডিতরা পুঁথি লইয়া গবেষণার কাজে ব্যস্ত। পুঁথি ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত অনেক গ্রন্থও এখানে রহিয়াছে। সেগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ইঁহাদের অনেক খরচ চলে। মহাভারতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিষ্ণু সুখতাঙ্কর মহাশয়ের সহিত এখানে পরিচয় হইল। নানাদেশীয় পণ্ডিতদের লইয়া ইনি সম্পাদন কার্য্যে ব্যস্ত।

অনেক দিন হইতে কার্ভের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার সখ ছিল। কিন্তু যখন পুনায় আসিলাম তখন দেওয়ালির ছুটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরবাড়ি দেখা যাইতে পারে, কিন্তু সেখানে মানুষ নাই। অগত্যা তাহাই দেখিতে গেলাম। একটি উঁচু টিলার উপর লোকালয় হইতে দূরে প্রকৃতির কোলে উদ্যানের ভিতর কলেজের মস্তবড় একতালা বাড়ি, তাহার পাশে ছাত্রীদের দুতলা বাসভবন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কার্ভে যে ক্ষুদ্রকুটীরে তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা-ব্রত আরম্ভ করেন, সেই কুটীরটি পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম। মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার বাড়ি ছুইটি ছুইলক্ষ টাকা খরচ করিয়া তৈরি করা হইয়াছে। কলেজভবন দাতার ইচ্ছামত করিয়া তৈয়ারী। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্যর বিঠলদাস ঠাকুরসি মহিলাবিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা দান করেন। বৎসরে ইহার সুদ ৫২,৫০০৲ টাকা। তখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হয় শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর ঠাকারসি "ইণ্ডিয়ান উইমেন্স্ ইউনিভারসিটী।" বিদ্যালয়ভবনে এই নামটি লিখিত আছে। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার জন্য ইতিপূর্ব্বে কেহ এত টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। মাতার নামে স্যর বিঠলদাস এই বিপুল সম্পদ স্ত্রীশিক্ষায় ব্যয় করিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রচার যাহাতে অতি সহজে অথচ ব্যাপক ভাবে হয় তাই ইঁহারা ভারতীয় ভাষায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দান কার্য্য করেন। এখানে কোন একটি ভারতীয় ভাষা ছাড়া ইংরেজী, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, শরীর-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, শিশুমনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় অবশ্য পাঠ্য। অঙ্ক, বিজ্ঞান, শিক্ষকতা, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা এগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে ইহার ভিতর ছাত্রীরা ইচ্ছামত বিষয় বাছিয়া লন। আমরা দেখিলাম শরীর-বিজ্ঞান শিখাইবার ঘরে বহু চিত্র, মূর্ত্তি এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির ছাঁচ, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি রহিয়াছে। চিত্রকলার ঘরে অনেক ছবি দেখিলাম। তবে চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ কিসে ছাত্রীদের জ্ঞান তাহাতে হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। চিত্রবিদ্যায় বাংলাদেশের, বিশেষত শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ভারতের অন্যান্য শিক্ষা নিকেতন হইতে শ্রেষ্ঠ। আজকাল অনেক স্থলে শান্তিনিকেতনের এবং কলিকাতার শিল্পীরা শিক্ষকতার ভার লওয়াতে সে-সব স্থলেও এই দেশের আদর্শ চলিতেছে। একটি ঘরে ছাত্রীদের নির্ম্মিত বেতার যন্ত্রসমূহ দেখিলাম। যন্ত্রগুলি অতিসূক্ষ্ম, কিন্তু অতি

নিপুণতার সহিত তৈয়ারী। এগুলি উচ্চ মূল্যে (৭০।৮০ ১০০৲) বিক্রীত হয়। বাংলা দেশে মেয়েদের দিয়া যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কাজ করাইলে ভাল হয়। কারণ মেয়েরা সচরাচর পুরুষ অপেক্ষা ধীরতার সহিত ও অধিক যত্নে কাজ করে।

এখানকার অধিবাসিনী ছাত্রীরা রন্ধনাদি সব কাজ স্বহস্তে করেন। ছাত্রীরা আসবাবপত্রের আড়ম্বরেও একেবারে বঞ্চিত। যাহা না হইলে নয় এমন দুই একটি জিনিষ মাত্র আছে। এই ছাত্রী আবাসটির জন্য বোম্বাইয়ের শেঠমূলরাজ খাটব ৩৫,০০০৲ টাকা দান করেন। এই-সব বড় বড় দান পাইবার পূর্ব্বে কার্ভে মহাশয়ের সহকর্ম্মী মিঃ গ্যাডগিল হিন্দু বিধবাশ্রমের (অধুনা বিশ্ব-বিদ্যালয়) জন্য সর্ব্ব প্রথম প্রতিবৎসর ১০০০৲ টাকা করিয়া দান করিতেন। ডাঃ লাণ্ডে নামক আর একজন মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার সাউথ আফ্রিকার সমস্ত সম্পত্তি (৪০,০০০৲) কার্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়া যান। এই ভদ্রলোক ধনী ছিলেন না, বহু পরিশ্রমে এই সম্পত্তি গড়িয়াছিলেন। দশবৎসর ধরিয়া আরও ষাটজন শিক্ষানুরাগী বৎসরে ১০০০৲ টাকা করিয়া এখানে দান করিয়া আসিয়াছেন। ছোটবড় আরও অনেক দান আছে, শুনিলে বিস্ময় ও আনন্দ হয়। বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য এমন বহু দাতার আবির্ভাব যেদিন হইবে সেদিনের আশায় আমরা উন্মুখ হইয়া আছি। অবশ্য দাতার আগে আরও বহু কর্ম্মীর আবির্ভাবের প্রয়োজন বেশী।

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত স্কুল ইত্যাদি গুজরাট ও মহারাষ্ট্র উভয় স্থানেই আছে। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর উদ্যানবেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া আমরা আবার শহরের অপরিসর ও অপরিচ্ছন্ন রাস্তায় ঢুকিলাম। এইখানে শহরের মাঝখানে পুনার পুরাতন সেবাসদনের সারি সারি ছোট ছোট বাড়ি। ঘরগুলি অত্যন্ত ছোট এবং নীচু। একটির গায়ে আর একটি বাড়ি এলোমেলোভাবে লাগানো, কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নাই। দেখিয়া মনে হয় পাশাপাশি এই বাড়িগুলি পুরাকালে সম্পূর্ণ বিভিন্ন লোকের অর্থেও রুচিতে তৈয়ারী হইয়াছিল; তারপর হয়ত সেবাসদন এক এক করিয়া এগুলিকে কিনিয়া নিজেদের এলাকাভুক্ত করিয়াছেন। রাস্তার অনেক দূর পর্য্যন্ত সেবাদনেরই এই ছোট ছোট নীচু বাড়িগুলি। কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছি হঠাৎ ঠাহর করা যায় না। সেবাসদনও মহিলাদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত। এখানে সর্ব্বজাতি ও ধর্ম্মের মেয়েদের বিশেষত দরিদ্র ও বিধবা মেয়েদের নর্স, ধাত্রী, লেডি ডাক্তার, শিক্ষয়িত্রী, ইত্যাদির কার্য্যে তৈয়ারী করা হয়। ইহা ছাড়া মেয়েদের অর্থকরী আরও বহু কাজ শিখান হয়। মেয়েরা গান ও সেলাই শিখাইয়া উপার্জ্জন করিতে যেন পারে সেরূপ শিক্ষাও দেওয়া হয়।

কয়েকটি সদ্যপ্রসূত শিশু ও প্রসূতিদের সেবাশুশ্রূষা ও যত্ন আমাদের দেখান হইল। শিশুদের আহার ওজন ইত্যাদির যথার্থ মূল্য শিখাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। শিশুপালন শিখাইবার অন্যান্য আয়োজনও দেখিলাম।

সেবাসদনে অস্পৃশ্য মেয়েদের জন্য একটি ছোট ছাপাখানা দেখিলাম। মেয়েরা কম্পোজ ইত্যাদি ত করেই, উপরন্তু হাতে করিয়া ছাপিবার কল চালায়। অতি অল্পপরিসর স্থানেই এই সব কাজ চলিতেছে।

মেয়েরা ধোপার কাজ করে, তাঁত বোনে, কলে সেলাই ইত্যাদি করে। তবে তাঁতের কাজের বেশী ভাগর বোধ হয় বাহিরের তাঁতি মাহিনা লইয়া কাজ করিয়া যায়। জিনিষগুলি বিক্রী করিয়া সেবাসদনের লাভ হয়। মেয়েদের তৈয়ারী কাপড়ের খেলনা, সেলাই, শাড়ীর পাড়, টুপি, মোজা জামা ইত্যাদি দেখিলাম। কাপড়ের খেলনা ও হাতের সেলাই বাঙালী মেয়েদের শিল্পভবনে ইহা অপেক্ষা ভাল দেখা যায়। মূল্যও বাংলা দেশের জিনিসেরই কম।

পুনা সেবাসদনের বাড়িগুলি সমস্ত তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি। এগুলির কত মূল্য জানি না কিন্তু বাৎসরিক আয়-ব্যয় হিসাব দেখিলে মনে হয় ইহাদের প্রায় লক্ষ টাকার কাজ চলে। বাংলা দেশের বিধবা আশ্রমগুলির কোনটির এত বড় সম্পত্তি নাই।

সেবাসদনের জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্য ইহাদের একটি ছোট নিজস্ব দোকান আছে। সেখানে যে কোন লোকই জিনিষ কিনিতে পারে। মেয়েদের হষ্টেলও কয়েকটি আছে।

নর্স ও চিকিৎসক তৈয়ারীর জন্ম এখানে বড় বড় চিকিৎসকেরা আসিয়া নিয়মিত শিক্ষা দিয়া ও বক্তৃতা করিয়া যান। 'সূতিকা-গৃহ'গুলির তত্ত্বাবধানের জন্ম শিক্ষিত নর্স ও লেডি ডাক্তার আছেন। এখানে শিক্ষার্থিনী নর্স ও ধাত্রীদের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র নারীদের প্রসবের সময় সাহায্য করাও হয়। এখানকার প্রসূতি-মঙ্গল কার্য্য যে-সব লেডি ডাক্তার ও নর্সের সাহায্যে চলে তাঁহারা এইখানেই থাকেন। শহরের মাঝখানে বলিয়া মেয়েরা এখানে আসিয়া অনায়াসে নানা কাজ শিখিয়া যাইতে পারে। ইঁহারা বৎসরে ১২,৮২২৲ টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট পান।

পুনা সেবাসদনের শাখা বরমতী, শোলাপুর, আমেদনগর, আলিবেগ, নাসিক, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে আছে।

ইঁহাদের স্বাস্থ্যশিক্ষালয়ে (Public Health School) অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শিশু মনস্তত্ত্ব, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হয়। স্যর বিঠল দাস এই প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে মিসেস রাণাডে ছিলেন ইহার পৃষ্ঠপোষক।

সেবাসদনের অন্য বাড়িগুলি যেমন দরিদ্রের কুটীরের মত দেখিতে একটি বাড়ি তাহার সম্পূর্ণ উল্টা। এই বাড়িটি দোতালা চকমিলানো। ইহার থামগুলি কালো কাঠে কারুকার্য্যখচিত, দরজাগুলিও কালো কাঠের আগাগোড়া কারুকার্য্য খচিত। একতলার চারিদিকে বারাণ্ডা, মাঝখানে উঠান। মেয়েরা এখানে স্বপাকে রান্নাখাওয়া করেন। শুনিলাম কিছুদিন আগে ইহা ক্রয় করা হইয়াছে। ঠিক এই রকম গড়নের এবং এই জাতীয় কারুকার্য্যখচিত থাম ভোরের রাজপ্রাসাদে দেখিয়াছি। পুনাতেও দুই একটি পুরানো বাড়িতে কিছু কিছু এই প্রকার কাজ চোখে পড়িল। কাঠের কারুকার্য্যখচিত এই বাড়িগুলি পেশওয়া যুগের প্রথায় রচিত বলিয়া শুনিলাম।

সেবাসদনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জি, কে দেবধর মহাশয়ের সহিত এইখানে দেখা হইল। তিনি তাঁহার আপিস গৃহে আমাদের বসাইয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। ঘরখানিতে রবিবর্ম্মার কয়েকটি ছবির প্রতিলিপি আছে। সেবাসদনে কিম্বা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও ভারতীয় প্রথায় আঁকা ছবি চোখে পড়ে নাই।

পুনা শহরের বাড়িগুলি অধিকাংশই দেখিতে ভাল নয়। শহরের বাহিরে কতকগুলি চলনসই রকম ভাল বাড়ি আছে। ঐ দেশীয় প্রথায় ওখানে আজকাল আর কেহ বাড়ি করে না মনে হইল। পাশ্চাত্য সস্তা ধরণের বাড়ির উপরই মানুষের টান। বোম্বাইয়ের মত বড় বড় প্রাসাদ তুল্য বাড়ি এখানে চোখে পড়িল না। পথঘাটও বোম্বাইয়ের তুলনায় অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। তবে বোম্বাই ধন ও বাহ্য আড়ম্বরে বড় হইলেও পুনা মস্তিষ্ক ও হৃদয় সম্পদে বড়। প্রার্থনা সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ ও দেশহিতৈষী গোখলে রানাডে ভাণ্ডারকরের কর্ম্মভূমি পুনা। এখনও সেবাসদন, মহিলাবিশ্ববিদ্যালয়, সার্ভেণ্টেস্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডল, ভাণ্ডারকর রিসার্চ্চ ইনষ্টিট্যুট, ফার্গুসন কলেজ ইত্যাদিতে পুনা অলঙ্কৃত।

অধ্যাপক বেলভালকারের বাড়ির কাছেই মহামতি গোখলে প্রতিষ্ঠিত সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি। বাড়ি হইতে হাঁটিয়াই সেখানে গেলাম। পার্ব্বত্য দৃশ্যমালার নিকট সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে ইঁহাদের বাড়িগুলি। প্রায় সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভারত ভৃত্যদের ত্যাগের ইতিহাস ভারতহিতৈষী মাত্রই জানেন। ইঁহারা আজীবন এই কাজের ব্রত লইয়া সামান্য অর্থে আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতেন। সম্প্রতি ছাব্বিশ জন সভ্য এখানে ভারত সেবার কার্য্যে নিযুক্ত। বড় বাড়িটির দোতালায় ইঁহাদের লাইব্রেরী। এখানে অনেক অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান গ্রন্থ আছে। ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সঙ্কলনের উপযোগী এত দলিলপত্র এবং পুস্তকাদি আর কোনও লাইব্রেরীতে নাই।

এই লাইব্রেরীতে ভারতের প্রায় সকল সুপরিচিত পত্রিকার পুরাতন ও চলতি সংখ্যার ফাইল আছে।

শ্রীযুক্ত দেবধর এই সভার সভাপতি। ইঁহাদের পরিচালিত ইংরেজী ও ভারতীয় পত্রিকাদি পরিচালন ছাড়া দেশের আরও অনেক সদনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সহিত

ইহারা যুক্ত। ইহাদের সভ্যেরা ঐ প্রদেশের অনেক শ্রমজীবী সঙ্ঘ গঠন ও পরিচালন করেন, ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সহিতও ইহারা যুক্ত। পুনা সেবা-সদন, বোম্বাই ভগিনী সমাজ, ভগিনী সেবা সঙ্ঘ, লাহোর সেবা সদন, গুজরাটের ভীল সেবামণ্ডল, অন্ত্যজ সেবামণ্ডল, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও গ্রামের উন্নতি ইত্যাদি নানা রকম কাজ ভারত-ভৃত্য-সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ দেবধর এবং অন্যান্য সভ্যেরা করিয়া থাকেন।

সাতারার রাও বাহাদুর, আর. আর. কালে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া এই সমিতির অধীনে Gokhale Institute of Politics and Economics প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছেন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রেরা এখানে গবেষণা করিতে পারে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের এম-এ পরীক্ষা দিবার অধিকার আছে। কোনো কোনো ছাত্র সমিতির বাড়িতেই থাকিতে পান। অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এখানকার পুস্তকসম্পদে সম্পন্ন লাইব্রেরীটি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে পান। মিঃ ডি, আর গ্যাডগিল ইহার প্রিন্সিপ্যাল। ইনি আমাদের সযত্নে লাইব্রেরী দেখাইলেন।

দেশপূজ্য গোখলে মহাশয়ের আবাসগৃহ এই হাতার ভিতর। দেখিলাম ক্ষুদ্র দুই তিনখানি ঘর ও একটি বারান্দা। বিদেশীয় ও ভারতীয় বহু ভারতহিতৈষীর প্রতিকৃতি গোখলে মহাশয় ঘরের দেয়ালে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখনও সেইরূপ সাজানো আছে। এই বাড়িতে এখন শ্রীযুক্ত দেবধর কাজকর্ম্ম করেন।

পুনা হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি ছোট দেশীয় ষ্টেট আছে, তাহার নাম ভোর। ভারত ভৃত্যসমিতি দেখিতে দেখিতে শুনিলাম ভোর হইতে আমাদের লইবার জন্য চীফসাহেব (রাজা) গাড়ী পাঠাইয়াছেন। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, এখনই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভোর পুনা হইতে অনেকটা উঁচুতে পাহাড়ের উপর একটি সমতলক্ষেত্রে। আমরা একজন রাজকর্ম্মচারী ও অধ্যাপক বেলভালকারের সহিত গাড়ীতে চলিলাম। গাড়ী উপরে উঠিতে থাকিলে দূর হইতে পুনা সহর ও তাহার চারিপাশের পাহাড়গুলি সুন্দর দেখায়। পথে দলে দলে মেয়েরা বোঝা মাথায় কাজে চলিয়াছে। কুলি মজুর, তবু তাদের শাড়ীগুলি সুন্দর রঙীন, হাঁটাচলা সহজ শ্রীমণ্ডিত। পুনার পথে এক এক জায়গায় এত স্ত্রীলোক চলিয়াছে যে পুরুষ প্রায় চোখেই পড়ে না। পাহাড়ের উপরের পথে অসংখ্য বাঁক, ক্রমাগতই দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে। গাড়ী বাঁশি বাজাইয়া মিনিটে মিনিটে পথিকদের সাবধান করিতে করিতে চলিল। পার্ব্বত্য দৃশ্যগুলি সুন্দর, কোথাও সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, কোথাও ঘন বন জঙ্গল, কোথাও বা ছোট গ্রাম। পাহাড়গুলি খুব উঁচু নয়, কিন্তু অসংখ্য আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার প্রাচীরের মত। অধ্যাপক মহাশয় শিবাজীর যুদ্ধক্ষেত্রের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নানা স্থান দেখাইতে দেখাইতে চলিলেন। যুদ্ধের উপযুক্ত দেশ বটে, লুকাইয়া থাকিলে খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত, অকস্মাৎ আক্রমণ করিলে নিস্তার পাওয়াও কঠিন। এক একটা পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট দুর্গের মত এখনও আছে। এই সব দুর্গ দখল করিয়া যে একবার বসিত তাহাকে সহজে কাবু করা যাইত না।

পথে এক জায়গায় একটি পুরাতন মন্দির আছে, বনেশ্বর মহাদেবের। ঘন পত্রবহুল বনানীর মধ্যে মন্দিরটি ভারী সুন্দর মানাইয়াছে, নামটিও ঠিক উপযুক্ত। একটি ছোট ঝরণা ঘিরিয়া মন্দিরটি গঠিত। বাহিরে কোথাও জল দেখা যায় না, কিন্তু মহাদেবের আসনের নীচ দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে পূজারী দেখাইল। এইখানে পথিকেরা পূজা দিয়া যায়। মন্দিরের গঠন বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতির মন্দিরের মত নহে।

সন্ধ্যায় রাজ অতিথিশালায় পৌঁছিলাম। যুবরাজ অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন! তিনি আমাদের থাকিবার সব ব্যবস্থা করিবার পর পন্ত সচিব মহাশয় (চীফ সাহেব) দেখা করিয়া গেলেন।

এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যটিতে ১৩০,৪২০ মানুষের বাস। কিন্তু ইহাতে চুয়ান্নটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুইটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। বালিকা বিদ্যালয় একটি আছে, আরও একটি

বেশী থাকিলে ভাল হইত। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বেতন লাগে না। প্রতি বৎসর এই রাজ্যের চারিটি ছাত্র পুনায় কলেজে বিনা বেতনে পড়িতে পায়—এই উদ্দেশ্যে পন্তসচিব মহাশয় ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ভোরের পুস্তকালয়ের জন্য ইনি কুড়ি হাজার টাকা দিয়াছেন। এই রাজ্যের মোট রাজস্ব (gross revenue) সাত লক্ষ টাকা।

ভোর রাজ্যটি পার্ব্বত্য প্রদেশে, রেল পথ হইতে বহু দূরে। তাই ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শহরের ছায়া পড়িয়া ভেজাল হইয়া উঠে নাই। ভোর সহরটি নীরা নদীর উপত্যকায়। ইহার চারিদিকে ঘনসবুজ বনাকীর্ণ পর্ব্বত-শ্রেণী, ছোট ছোট ঝরণা ও পার্ব্বত্য নদী, বন্ধুর অনুর্ব্বর পর্ব্বতমালা। শীতের সময় নানা ফলেফলে শস্যে পর্ব্বত-গাত্র বিচিত্র হইয়া উঠে। আমরা শীতের আরম্ভেই গিয়াছিলাম, তাই দেশটির স্বাভাবিক বর্ণসুষমা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

পরদিন ঘুম ভাঙিতেই দেখি কাচের জানালার ভিতর দিয়া বাগানের গাছপালা ও ভোরের স্নিগ্ধ আলো চোখে পড়িতেছে। বাড়িটি মস্ত বাগানের ভিতর, ইহার সমস্ত বন্দোবস্ত যথাসাধ্য পাশ্চাত্য প্রথায় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শুনা যায় প্রাসাদে এতখানি পাশ্চাত্য ব্যবস্থা নাই।

খানিক পরে যুবরাজ তাঁহার পত্নীকে লইয়া দেখা করিতে আসিলেন। যুবরাণীর বয়স বেশী নয়, কিন্তু বেশভূষার বিশেষ আড়ম্বর নাই। দু-একটি মুক্তার গহনা ভিন্ন রাজবধূর মত আর কোনো মূল্যবান জিনিষ তাঁহার অঙ্গে নাই। ব্যবহার ভারি শান্ত ভদ্র ও নম্র, কিন্তু মহারাষ্ট্র-দুহিতার অকুণ্ঠিত নিঃসঙ্কোচ গতিবিধিতে তাহার রাজশ্রীটুকুও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষের মেয়েরা পরস্পরকে দেখিলে পুত্রকন্যা স্বামী পিতা মাতা সকলের কুশলাদির আদান প্রদান করেন, এবং সকলের বিষয় ছোটখাট খোঁজ খবরও লন। যুবরাণী আমার পিতা মাতা ও কন্যাদের খবর লইয়া তাঁহারও দুইটি কন্যা আছে এবং পিতা পুনায় থাকেন বলিলেন। তাহার পর আমাদের আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সখীর মত তাঁহার নানাবিষয়ে কৌতূহল দেখিয়া আনন্দ হইল।

সেদিনে ভোরের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করজী নারায়ণের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসব ছিল। তাই যুবরাজ ও যুবরাণী আমাদের সঙ্গে প্রাতরাশ করিয়া উৎসবে যোগ দিতে চলিয়া গেলেন। কিছু পরে সমাধিস্থানে সকলে মিছিল করিয়া যাইবে। আমরাও দেখিতে যাইব স্থির হইল। সে স্থানটি আরও নয় দশ মাইল দূরে। আমরা ভোর পৌঁছিবার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত সেণ্ট নেহাল সিং এবং তাঁহার পত্নীও সেখানে অতিথি হইয়া আসিলেন। বহুকাল পরে তাঁহাদের দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

শিবাজীর মৃত্যুর পর মোগলেরা মহারাষ্ট্ররাজ্য প্রায় ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলে ছত্রপতি রাজারামের মন্ত্রীস্থানীয় শঙ্করজী নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকজন যোদ্ধা রাজ্য-রক্ষার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে শঙ্করজীকে পন্তসচিব নিযুক্ত করিয়া রাজসম্মান ও জায়গীর দেওয়া হয়। পন্তসচিবের স্থান পেশওয়ার পরেই। শঙ্করজী যখন দ্বিতীয়বার শিবাজীর মাতা তারাবাঈ-এর অধীনে সচিবত্ব করিতেছিলেন তখন শিবাজীর পৌত্র সাহু তাঁহাকে তাঁহার দলে যোগ দিতে বলিলেন। শঙ্করজী তারাবাঈ-এর নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন, কি প্রভুস্থানীয় সাহুর সঙ্গে যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী হইয়া পঞ্চগঙ্গাতীর্থের নিকট একটি প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের তলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া মিথ্যাচার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন। ইহাতে সাহু ও তারাবাঈ উভয়েই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শঙ্করজীর বংশধরগণ তখন হইতে সেই জায়গীর ভোগ করিয়া ও পন্তসচিব পদবী ধারণ করিয়া আসিতেছেন। এই ইতিহাস ভোররাজ্যের একটি মুদ্রিত পুস্তিকা হইতে সংগৃহীত।

মোটরে করিয়া পর্ব্বতগাত্রের শস্যক্ষেত্র, গ্রাম, ছোট ছোট পার্ব্বত্য নদী, দূরের পর্ব্বতমালা ও ঘন বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে দেখিতে আমরা পঞ্চগঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলাম। এক জায়গায় ঝরণার জল সজোরে পড়িয়া নদীর মত বহিয়া চলিয়াছে। সেখানে গাড়ী চলে না। নামিয়া পাথরের উপর পাতা তক্তা দিয়া চলিলাম। একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় সমাধিমন্দির, তাহার কিছুদূরে পঞ্চগঙ্গার কুণ্ড, মন্দির ও অতিথিশালা। আজ সেখানে খুব লোকের

ভিড়। সাধারণ লোক ছাড়া যুবরাজ যুবরাণী, ছোট তিনটি রাজকুমার ও কুমারী এবং যুবরাজের তুই শিশুকন্যা সকলে তীর্থস্থানে স্নানাদি করিয়া পূজা দিতে আসিয়াছেন। মন্দিরটি দেখিয়া বেশ প্রাচীন মনে হইল। তাহার পাশে সম্ভবত বহু প্রাচীন আর একটি মন্দির ছিল, এখন তাহার দেবমূর্তিখোদিত পাথরগুলি ইতস্তত পড়িয়া আছে। কোনোটি সিঁড়ির ধাপ, কোনোটি পাঁচিলের অংশ, কোনোটি পথিকের বিশ্রামের আসন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেলভালকার কুলির সাহায্যে এইরূপ একটি সুন্দর পাথরকে উদ্ধার করিয়া মন্দিরের কাছে রাখিলেন।

আজ স্নান পূজা ও দর্শনের খুব ভিড়। সকলে উৎসব-সজ্জায় সাজিয়াছে। হরিদ্রা ও কমলা রঙের রেশম বস্ত্রের উপর রোদ লাগিয়া বনশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এক জায়গায় ভূমি-আসনে সারি সারি মানুষ পাতা পাতিয়া খাইতে বসিয়াছে। রাজ-অতিথিদের জন্য তাঁবু খাটানো ও চায়ের ব্যবস্থা ইহারই মধ্যে কোনো রকমে করা হইল, যদিও তাহার প্রয়োজন ছিল না। সেণ্ট নেহাল সিংহ মহাশয় মন্দির, কুণ্ড ও যাত্রীদের কয়েকখানি ছবি তুলিলেন। যুবরাণীর এবং আমাদেরও মন্দিরের সিঁড়িতে বসিয়া ছবি তোলা হইল। সমাধিস্থানটির অনেক নীচে পঞ্চগঙ্গাতীর্থ। তীর্থ দেখিয়া আমরা আবার অতিথিশালায় ফিরিলাম। ফিরিবার পথে শহরের ভিতর দিয়া গেলাম। ভিতরের পথগুলি গলির মত সরু সরু। এখানে বৈদ্যুতিক আলো এবং জল সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা আছে শুনিলাম।

ভোরের তুই তিন মাইল দূরে Lloyd Dam নামক একটি প্রকাণ্ড বাঁধ আছে। নীরা প্রভৃতি তুই তিনটি নদীর জলকে বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া জল সরবরাহের জন্য একটি বিরাট হ্রদ করা হইয়াছে। আমরা বাঁধটি দেখিতে গিয়া লোহার শিক, কাঠের টুকরা প্রভৃতির অতি ক্ষণভঙ্গুর সেতু পার হইয়া কোনো রকমে বাঁধের কাছাকাছি আসিলাম। সেই সেতু হইতে জলে পড়িতে বেশী অসাবধান হইতে হয় না। বাঁধটি পাহাড়ের মত উঁচু, ঘাড় ফিরাইয়া উপর পর্য্যন্ত দেখা শক্ত। তাহার গা বাহিয়া অল্প অল্প জল ঝরিতেছে, উপরে ছোট রেল লাইন আছে। পাদদেশে বসিয়া উপরে যাইবার সখ মিটিয়া গেল। কেহই যাইতে রাজি হইলেন না। সেইখানেই ঘাসের উপর শুইয়া বিশ্রাম আরম্ভ করিলেন। অগত্যা এতদূর আসিয়া হ্রদ দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম পৃথিবীতে এত বড় বাঁধ বেশী নাই। ইহা সেখানকার লোকদের মত।

আজ সন্ধ্যায় রাজদরবার। এখানে চারণদের গান, শঙ্করজীর কথা, বক্তৃতা ইত্যাদি হইবে। পুনা হইতে বহু গণ্যমান্য ঐতিহাসিক ইত্যাদি আসিয়াছেন। আমার সভায় যাইতে একটু দেরী হইয়াছিল। দ্বিতলে অন্তঃপুরের ভিতর দিয়া চলিলাম। বড় বড় হলের পর হল। একটি প্রকাণ্ড ঘরে দেখিয়া রাখিতে সারি সারি কালো কাঠের কারুকার্যখচিত থাম, তাহার গায়ে খন্দ সচিবদের এবং ইউরোপীয় রাজপ্রতিনিধিদের চিত্র। সেগুলি পার হইয়া যুবরাণীর মহলের নিকট গেলাম। বাঙালী মহিলাকে দেখিয়া অন্তঃপুরিকাদের ভিড় লাগিয়া গেল, ছোট ছোট বারান্দা, জানালা, দরজা সর্ব্বত্র মানুষের মুখ। যুবরাণী তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইবার আগেই বিদায় করিয়া দিলেন। এই মহলে ছোট একটি বারান্দায় লেসের পরদার আড়ালে আমাদের বসিবার জায়গা। মিসেস সিংকেও এইখানে বসানো হইল। যুবরাণী মাথায় ঘোমটা দেন না এবং এদেশে পর্দা প্রথা নাই, তবু বোধ হয় রাজসম্মানের জন্য বারান্দায় পর্দা দেওয়া হইয়াছিল। নীচে প্রকাণ্ড দরবারপ্রাঙ্গণে চাঁদ-লহনের নীচে সভা বসিয়াছে। মাটির উপর গদি ও জরির আস্তরণ পাতিয়া চীফ সাহেব ও তাঁহার তিন পুত্র, পাশেই বিদেশীয় অতিথিরা। সভায় কাহারও উচ্চাসন নাই, ধনী দরিদ্র সকলেই সমান। তুই চারিজন অধ্যাপক পণ্ডিত ছাড়া সকলের মাথায় রঙীন মারাঠা জরিদার টুপি। টুপিগুলি বেশীর ভাগ লাল ও জরি দিয়া তৈয়ারী, তুই চারিটা হলুদ কি কমলা রঙের আছে। বেশভূষা অনেকের দীনজনোচিত, তবু তাহার উপর উজ্জ্বল লাল ও জরি দেওয়া টুপি পরায় সভাস্থ সকলেরই প্রায় শিরোভূষণ রাজোচিত দেখাইতেছিল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় সকলেরই এক পোষাক। রাজপরিবারের সকলের মাথায় বড় বড় পাগ্ড়ি। সভার কাজ বেশ হইল।

পরদিন আমাদের বিদায়ের পালা। সকালে বিদায়

সম্ভাষণাদির পর যুবরাণী সোনার থালায় সোনার হংস-গর্ভ কৌটায় সিন্দুর এবং অন্য স্বর্ণ পাত্রে চন্দন, খি, পান সুপারি মশলা ও সুগন্ধি ফুল দিয়া বরণ করার মত করিয়া আমাকে শুভ ইচ্ছা জানাইলেন, চন্দন সিন্দুর পরাইয়া হাতে একটি জরির চেলির কাপড় দিলেন, আতর দানে করিয়া আতর ছিটাইয়া দিলেন। এই দেশীয় প্রথাটি মনোরম লাগিল। সকল অতিথিকেই মশলা ও সুগন্ধি ফুল দেওয়া হইল। তারপর বাগানে আমাদের অনেকগুলি ছবি তোলা হইল।

দ্বিপ্রহরে পুনায় আসিয়া বেলভালকার মহাশয়ের বাড়ি আহারাদি হইল। পুরণপুরী নামক পুর দেওয়া লুচি আশ্চর্য্য সুস্বাদু।

তারপর বাজারে শাড়ী, গহনা, খেলনা ইত্যাদির দোকান দেখিতে গেলাম। দোকানগুলি সাদাসিধা, এখানে সব শাড়ীই সুন্দর রঙীন এবং আঠারো হাত লম্বা। শাড়ীর দাম খুব সস্তা, গহনা বেশীর ভাগ বিলাতী ধরণের, কিছু কিছু দেশীও আছে। শাড়ীগুলি একেবারে স্বদেশী রীতির। দেশী খেলনা সবই প্রায় কাশীর।

পথে শিবাজীর প্রকাণ্ড স্মৃতিসৌধ দেখিলাম, বাগানের মধ্যে ঘোড়ার পিঠে শিবাজীর সুন্দর মূর্ত্তি।

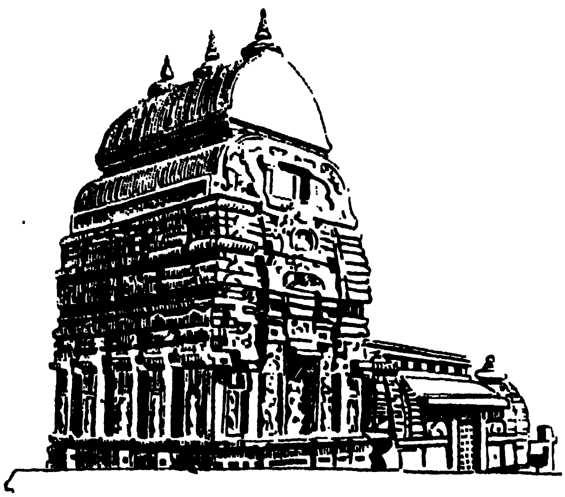
সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিদায় লইয়া বোম্বাই ফিরিতে হইবে। অধ্যাপক-গৃহিণীও দেশীয় প্রথায় সিন্দুর চন্দন বস্ত্রাদি উপহার দিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

বৈদ্যুতিক ট্রেনে বোম্বাই চলিলাম। পুনা হইতে বোম্বাইয়ের পথ আশ্চর্য্য সুন্দর। পাহাড়ের ভিতর দিয়া কত বিরাট গম্ভীর অপূর্ব্ব পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। উন্নত গম্ভীর পর্ব্বতশিখরের পিছনে সূর্য্যাস্তের রক্তচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িল, আঁধারে আলোয় কোলাকুলি। অনেক পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা বলেন, বোম্বে পুনার মধ্যবর্ত্তী পথের মত সুমহান পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য জগতে কোথাও দেখা যায় না। নিবিড় অন্ধকারের স্তূপের মত পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে যখন বহু দূরব্যাপী উদার আকাশের স্বচ্ছতা দেখা যায় তখন সে আশ্চর্য্য রূপের বর্ণনা করিবার ভাষা পাওয়া যায় না।

ট্রেন ঝড়ের মত ছুটিতে লাগিল, স্থির হইয়া বসা যায় না। পাহাড়গুলির ভিতর এত সুড়ঙ্গ যে একটা দৃশ্য দেখিয়া শেষ করিতে না করিতে আর একটা সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া পড়িতে হয়।

আমাদের সঙ্গে অনেকগুলি পার্শী সহযাত্রী ছিলেন। অনেকগুলি মেয়েই আশ্চর্য্য সুন্দরী। বাঙালীর দৈহিক সৌন্দর্য্যের বড়ই অভাব।

এদিককার সব মন্দিরই পঞ্চগঙ্গার মন্দিরের মত দেখিতে। বোধ হয় পেশোয়ারীতিতে এইরূপ মন্দির হইত। রাত্রি ৯টায় বোম্বাই ছাড়িয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। আঠার দিনের পক্ষে ভারত ভ্রমণ নিতান্ত কম হয় নাই। অবশ্য দেখা খুবই ভাসা ভাসা হইল।



জৈন জল-মন্দির

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় ও প্রাচ্য স্থাপত্যের ঐতিহাসিক ফার্গুসন্ লিখিয়াছিলেন, তিনি বৃন্দাবনের উপকণ্ঠে গোবর্দ্ধনে একটি মন্দির-নির্ম্মাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই মন্দিরের ভারতীয় স্থপতির নিকট মধ্যযুগের শিল্প সম্বন্ধে যত রহস্য জানিতে পারিয়াছিলেন, নানা (য়ুরোপীয়) পুস্তক পাঠ করিয়াও তাহা জানিতে পারেন নাই। এদেশে ইংরেজশাসন প্রবর্ত্তনাবধি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা সহ্য করিয়াও যে ভারতীয় স্থপতিবিদ্যা তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাহার মৌলিকতা ও সজীবতা এবং জাতির সভ্যতার সহিত তাহার স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই তাহার কারণ।

বিহারে পাওয়াপুরীতে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের সমাধিস্থানে সংস্কৃত জল-মন্দির দেখিলেও ইহাই মনে হয়। বারাণসীতে যেমন নদীর জলকূল হইতে ভিত্তি নির্ম্মিত করিয়া সৌধ নির্ম্মিত, তেমনই ভারতের নানা স্থানে কৃত্রিম জলাশয়-মধ্যে মন্দির বা সমাধিসৌধাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে অমৃতসরের শিখ মন্দির, উদয়পুরের প্রাসাদ ও সাসারামে শের শাহের সমাধি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অতঃপর পাওয়াপুরীর জল-মন্দিরও যে সেইরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

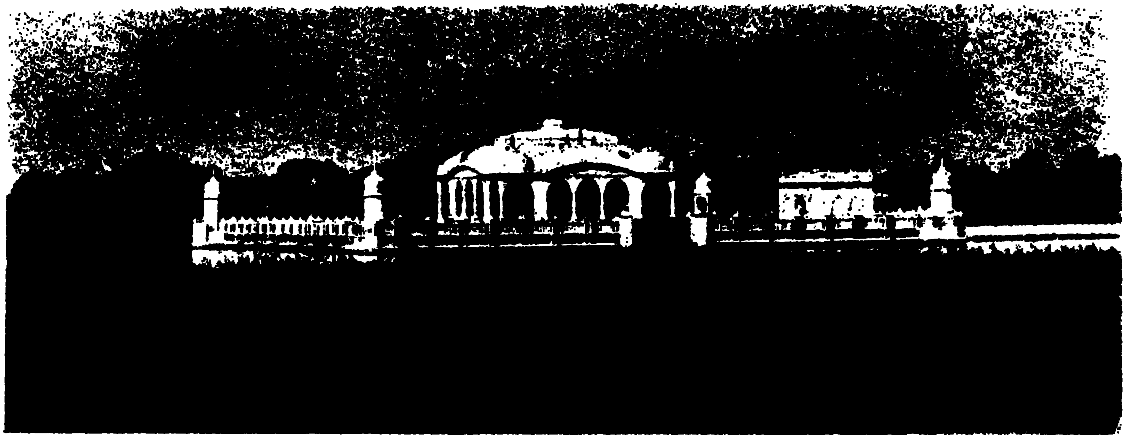
বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে জৈনধর্ম্মমতাবলম্বীরা সংখ্যায় অল্প হইলেও ভারতের দর্শনে ও শিল্পে জৈন-প্রভাব বড় অল্প নহে। এক সময় এই ধর্ম্মমত বৌদ্ধমতের উপর প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করিয়াছিল এবং জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পাওয়াপুরীতে তিনি নির্ব্বাণলাভ করেন এবং যে স্থানে জল-মন্দির প্রতিষ্ঠিত তথায় তাঁহার দেহ ভস্মাবশেষ হইয়াছিল।

সমগ্র ভারতে জৈনদিগের তীর্থস্থানের সংখ্যা অল্প নহে। ইলোরায় ও ভুবনেশ্বরের নিকটে হিন্দু ও বুদ্ধ গুহামন্দিরের সঙ্গে জৈনদিগের গুহামন্দির বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন গোয়ালিয়রে, 'পরেশনাথে' ও অন্যান্য স্থানে জৈনদিগের কারুকার্য্যবহুল মন্দির আছে।



শ্রীযুক্ত পুনানচাঁদ শেঠিয়া

রাজপুতানায় আবুপর্ব্বতে ও পলিতানায় শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে মন্দিরগুলির অনিন্দ্যসুন্দর কারুকার্য্য দর্শকের বিস্ময়



জৈন জল-মন্দির

আকৃষ্ট করে। বহু শিল্পসমালোচক এই সকল মন্দিরে প্রস্তরে খোদিত কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। আবু পর্ব্বতের মন্দির সম্বন্ধে লর্ড রোণাল্ডশে বলিয়াছেন, "মন্দিরের প্রস্তরগাত্রে খোদিত কারুকার্য্য দেখিলে স্বতঃই ভারতীয় কাননের লতাবেষ্টিত তরুকাণ্ড ও পত্ররচিত চন্দ্রাতপের কথা মনে হয়।"

পালিতানায় শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের জৈনমন্দিরগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে ফার্গুসন্ লিখিয়াছিলেন—এক এক স্থানে বহু মন্দির নির্ম্মাণে জৈনগণ হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে পরাভূত করিয়াছেন।

উত্তর-ভারতে জৈনতীর্থগুলির মধ্যে পাওয়াপুরী বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেও এবং প্রতি বৎসর সর্ব্ব-সময়ে—বিশেষ দীপালীর সময় তথায় সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হইলেও পাওয়াপুরীর মন্দির এতদিন শিল্পপ্রিয় ব্যক্তিদিগের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। তাহার কারণ, তথায় যে পুরাতন মন্দির ছিল, তাহার অবস্থান-স্থান সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইলেও মন্দিরটির শিল্পকার্য্য মনোরম ছিল না।

মহাবীরের জীবনান্ত-স্থান বলিয়া এই গ্রামটি অপাপপুরী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে তাহাই পাওয়া বা পাওয়াপুরী নামে পরিচিত। গ্রামের প্রান্তে সমবাহু চতুর্ভুজের আকারে কৃত্রিম হ্রদ দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে এক মাইলের প্রায় এক-চতুর্থভাগ। তাহারই মধ্যভাগে একশত চার বর্গ-ফিট দ্বীপের উপর মন্দির। ইহা জল-মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। উত্তর দিক হইতে সেতুপথে দ্বীপে গমন করা যায়।

হ্রদের জলে দলে দলে মৎস্য বিচরণ করে। জৈনরা জীবনাশের বিরোধী। যখন হ্রদের জলে কোন মৎস্য মরিয়া যায়, তখন তাহাকে তুলিয়া আনিয়া কূলে সমাহিত করা হয়।

জৈন ইতিহাসে দেখা যায়, মহাবীর ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বে দেহরক্ষা করেন। দ্বীপে প্রথমে যে মন্দির ছিল, তাহা ক্ষুদ্র। জৈন কিংবদন্তী এই যে, মহাবীরের জীবনান্তের পাচ বৎসর পরে ইহা নন্দাবর্দ্ধন কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নালন্দায় যে সব পুরাতন ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে, পাওয়া-পুরীর পুরাতন মন্দির সেইরূপ ইষ্টকে রচিত।

এই পুরাতন মন্দিরে কৃষ্ণ প্রস্তরে দুইখানি চরণচিহ্ন খোদিত আছে। প্রস্তর-ফলক মন্দির-প্রাচীরে নিবদ্ধ। মন্দিরটি শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের দ্বারা রচিত; কিন্তু ইহাকে দিগম্বর সম্প্রদায়েরও পূজা করিবার অধিকার আছে। সেই অধিকার লইয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পাটনা আদালতে মামলা আরম্ভ হয় এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তাহা শেষ হয়।

প্রসিদ্ধ ধনী জগৎশেঠগণ পুরাতন মন্দিরে নূতন অংশ যোগ করিয়াছিলেন।

যদি হিন্দুদিগের কোন মন্দির বা মুসলমানদিগের কোন মস্‌জিদ সংস্কারাভাবে জীর্ণ হয়, তবে আর কেহ তাহার

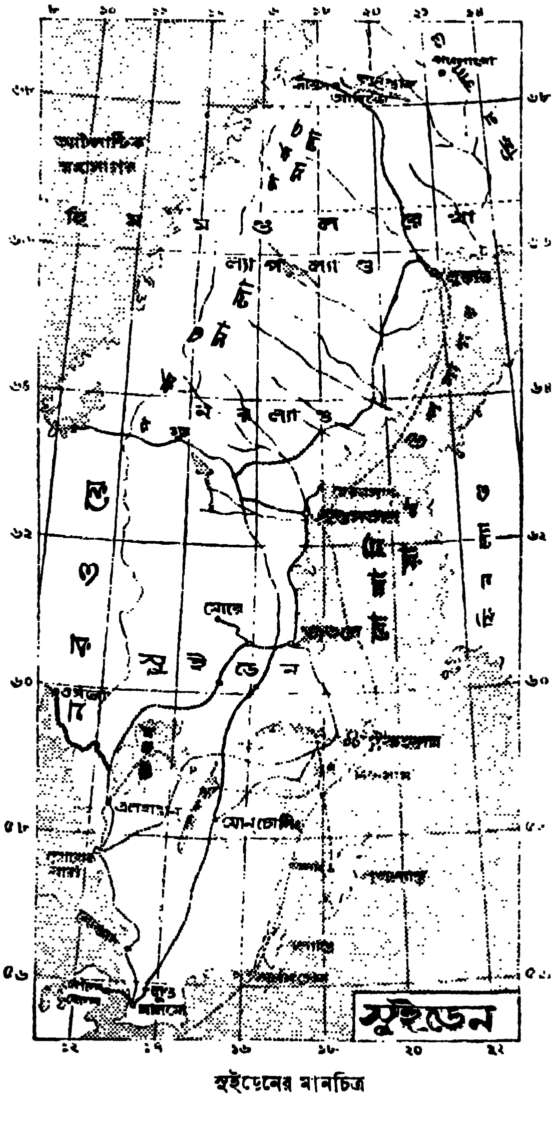
সংস্কারসাধনে আগ্রহ প্রকাশ করেন না; পরন্তু তাহার উপকরণ লইয়া মন্দির বা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। এ বিষয়ে জৈনগণ খৃষ্টানদিগের প্রথাবলম্বী—কোন জৈন যদি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে না পারেন, তিনি পুরাতন মন্দির-সংস্কার পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত পুনামচাঁদ শেঠিয়াও তাহাই করিয়াছেন। তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া জল-মন্দির মর্ম্মরাবৃত করিয়া ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। তিনি এই কার্য্যে ভারতীয় মর্ম্মর প্রস্তর ব্যবহার করিয়াছেন। হ্রদমধ্যে অবস্থিত অমল ধবল মর্ম্মরাবৃত এই মন্দির এখন শিল্পকার্য্যে ও সৌন্দর্য্যে অন্যান্য জৈন মন্দিরেরই মত প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।

সুইডেন

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিং

ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান সুইডেন শিক্ষা ও সভ্যতায় আজ এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সুইডেনবাসীদের প্রাচীন ইতিহাস নানা যুদ্ধবিগ্রহ ও বীরত্বকাহিনীতে পূর্ণ। এক সময় তাহাদের প্রতাপে সমস্ত ইউরোপবাসী ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত। কিন্তু সেই সুইডেনবাসী গত এক শত বৎসরের উপর অর্থাৎ ১৮১৪ সনের পর হইতে আর কোনও যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান করে নাই। ইহার ফলে সুইডেনবাসীদের সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক দিক খুব একটা স্বাভাবিক ক্রমঅনুযায়ী গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং এই কারণেই বোধ হয় সুইডেন আজ অনেক বিষয়েই খুব অগ্রণী। এই দেশটি আয়তনে ইউরোপের অন্য অনেক দেশ অপেক্ষা বড় হইলেও ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ষাট লক্ষের কিছু বেশী।



সুইডেনের মানচিত্র

বর্ত্তমানে আমরা যে-সুইডেন দেখিতেছি ইহা বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা—এক কথায় মানবসভ্যতার সকল ক্ষেত্রেই অনেক প্রতিভাবান মনীষী ও কৃতী সন্তানের জন্মদান করিয়াছে। তাহা ছাড়া শান্তি-আন্দোলনেও সুইডেনের আন্তরিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যখনই অন্য কোন দেশের সঙ্গে কোনো প্রকার স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে তখনই সুইডেন সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া অন্য উপায়ে তাহার মীমাংসার পথ খুঁজিয়াছে। ১৯০৫ সনে সুইডেন এবং নরওয়ের মধ্যে যে-কলহের সৃষ্টি হয় বিনা রক্তপাতে তাহার মীমাংসা হইয়াছিল;

এই জাতীয় অন্য ঘটনার কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অনেকেই ডিনামাইটের আবিষ্কার-কর্তা সুইডেনবাসী নোবেল সাহেবের নাম শুনিয়া থাকিবেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তি-আন্দোলনে অগ্রণী ও প্রতিষ্ঠাবান



সেফটি ম্যাচের আবিষ্কারক ও দেশলাইয়ের কারখানার প্রতিষ্ঠাতা লুণ্ডষ্ট্রম্

লোকদিগকে জাতিনির্ব্বিশেষে প্রতি বৎসর সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্যে মহামতি নোবেল স্বীয় ধন সম্পত্তি উইল করিয়া রাখিয়া যান এবং ইহাই নবেল প্রাইজ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের কাছে পরিচিত।

সুইডেন দেশটি তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিবার ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। ইউরোপের অন্য দেশবাসীদের তুলনায় যে সেখানকার জনসাধারণ অধিক পরিমাণে উন্নত ও সুখী একথা বোধ হয় জোর করিয়া বলা চলে। যে-সব বিদেশী অন্য দেশ ও জাতির সম্বন্ধে জানিবার অনুসন্ধিৎসা লইয়া একবার সুইডেনে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তথাকার অধিবাসীদের আধুনিকতা, সভ্যতা ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন। সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক বিভেদ নাই বলিলেও চলে। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার দ্বার সকলের কাছেই সমান ভাবে খোলা ও



সুইডেনের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় আগষ্ট ষ্ট্রিণ্ডবের্গের প্রতিমূর্ত্তি

অবৈতনিক। জনতন্ত্র সেখানে নামে না থাকিলেও কার্য্যতঃ সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া স্বাভাবিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই গরিবদের যে অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর ঘরবাড়ি দৃষ্ট হয় সুইডেনে তাহা মোটেই নাই। লৌহ, তামা, গাছপালা, পাথর ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ সে দেশে যথেষ্ট পরিমাণ আছে বটে, কিন্তু সকলকেই যথেষ্ট খাটিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। সেখানে জীবনযাত্রায় শীতের কঠোরতাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে, সুইডেনের অধীনে অন্য কোনো দেশ বা উপনিবেশ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে প্রাকৃতিক সম্পদে এবং একমাত্র দেশবাসীরই

কর্ম্মনিপুণতায় সুইডেন বর্ত্তমান শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইউরোপের অন্য দেশ ভ্রমণ করিবার কালে প্রায় সর্ব্বত্রই আমাকে নিজের জিনিষপত্র যাহাতে হারানো বা চুরি না-যায় সেজন্য সতর্ক থাকিতে হইত। সুইডেন



সুইডেনের বিখ্যাত লেখিকা শ্রীযুক্তা সেলমা লাগেরলফ। ইনিও নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন

দেশটিতে আমি অল্পাধিক প্রায় বারো হাজার কিলোমিটার ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু নিজের অসাবধানতায় জিনিষপত্র হারাইয়াও অনেকবার ফেরত পাইয়াছি। ঘোরাফেরার সময়েও বাক্সে কোন দিন চাবি না দিয়াই জিনিষপত্র "বুক" করিয়াছি, কোন সময়েই বাক্সে চাবি দেওয়ার কারণ ঘটে নাই। সুইডেনবাসীদের নৈতিকজীবন যে কত উন্নত সে-সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তিন বৎসরের মধ্যে কোনদিনই উল্লেখযোগ্য মারাত্মক অপরাধমূলক কোনো ব্যাপার ঘটিতে শুনি নাই। কি কারণে সুইডেন বিবদমান প্রতিবেশীদের প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়া নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে,—তাহার উত্তর পাইতে হইলে এই দেশের ও জাতির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান উপদ্বীপের পশ্চিমভাগে নরওয়ে, উত্তর ও পূর্ব্ব ভাগের কতক অংশ ফিন্‌ল্যাণ্ড ও কতক বোথানিয়ান্ উপসাগর; এতদুভয়ের মধ্যে সুইডেন অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক বাল্টিক সাগর দ্বারা বিধৌত। উত্তর দিকের কতকটা অংশ হিম-মণ্ডল রেখার ভিতর পড়িয়াছে।

দেশটি আকৃতিতে মোটামুটি চতুষ্কোণ। উত্তর-দক্ষিণে ১,১০০ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে



সুইডেনের কবি স্বর্গীয় গুস্তাভ ফ্রয়েডিং। সেলমা এবং অন্য অনেক খ্যাতনামা সুইডেনবাসীর ন্যায় তিনিও ভ্যার্মল্যাণ্ড প্রদেশের লোক

বড় জোর ৩০০ মাইল প্রশস্ত। অর্থাৎ দেশটি আয়তনে গ্রেট্ ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড হইতে দেড়গুণ বড়। ইউরোপের ৪·৭ অংশ সুইডেনের ভাগে পড়িয়াছে।

গ্রীনিউইচের হিসাবে ইহার ভৌগোলিক অবস্থিতি এইরূপ,—দেশটি ৫৫°২০´ হইতে ৬৯°৪ অক্ষরেখা এবং ১০°৫৮ হইতে ২৪°১০´ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। প্রায়



নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত সুইডেনের প্রসিদ্ধ কারলিনা গল্পের লেখক স্বর্গীয় হাইডেনষ্টাম

সমস্ত দেশটাই পাহাড় পর্ব্বত এবং পাথরে আবৃত। এই দেশের প্রাচীন ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বিবরণ-পাঠে জানা যায়, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান্ উপদ্বীপ ও ফিনল্যাণ্ডের প্রথম ভূমিখণ্ড বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্থিতি লাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম আগ্নেয়গিরির উদ্গার সংজনিত এবং তুষার চাপা ভূমির সঙ্গে সুইডেনের প্রস্তরময় ভূমির সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট। এই প্রস্তরের মধ্যে Gneiss Granulites-এর সংখ্যা খুব বেশী। কেম্ব্রিয়ান-সিল্যুরিয়ান্ যুগে বর্ত্তমান ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম ভাগের অধিকাংশ সমুদ্রের নীচে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ঐ সব ভাগ কালে জলের উপর উঠিয়া যায়। ইহার ফলে সুইডেনের যে-অংশ সমুদ্রের নীচে ছিল সেই ভূমির ভাগ আজ খুব উর্ব্বরা। এই ভাবে সর্ব্বপ্রথমে দেশটি ক্রমশঃ আকার ধারণ করিতে থাকে। সিল্যুরিয়ান্ যুগের পরে পশ্চিম স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান্ পর্ব্বত-প্রদেশের সৃষ্টি হয় এবং উক্ত পর্ব্বতমালা উত্তর-পশ্চিম দিকের প্রায় ৬০ মাইল চওড়া স্থান জুড়িয়া সুইডেন ও নরওয়ের মাঝখানে সীমান্ত প্রাচীররূপে দাঁড়াইয়া আছে।

বালটিক সাগরের জলপ্রদেশ এবং সুইডেনের অনেক জলভাগ,—মধ্য সুইডেনের বৃহৎ হ্রদগুলি এক সময় একত্র সংযোজিত ছিল। এ কথা মনে করিতে আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, সেই অতীত যুগে দেশটি গ্রীষ্মপ্রধান ছিল।



অধ্যাপক স্বোয়েদবের্গ রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন

তারপরে কোন এক অজানা কারণে সেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উত্তাপ দ্রুত কমিয়া শীতল হইতে থাকে; ফলে কয়েক শত বৎসরের জন্য দেশটি একেবারে তুষারাবৃত

হইয়া যায়। সেই যুগকে 'তুষার-যুগ' বলা হইয়া থাকে। এই বিপুল তুষার-পর্ব্বত সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, রাশিয়ার অংশ-বিশেষ, জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার উপর এই তুষার-পর্ব্বত আনুমানিক ৩,২০০ ফিট পুরু হইয়াছিল। কিন্তু এই বরফের পাহাড়ও পরে গলিতে থাকে। ফলে, ৫০০০ পূর্ব্ব হইতে ১৫০০০ বৎসরের মধ্যে বরফ উত্তর দিকে পর্ব্বতমালাকারে নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং পিছনে বড় বড় পাথরের সমষ্টি (moraine) রাখিয়া যায়। এই বরফ গলিয়া নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সুইডেনের অনেক ভূমির অংশ এক দক্ষিণ ভাগ ছাড়া সমুদ্রের নীচে নামিয়া পড়ে।

উত্তর-পশ্চিমের পর্ব্বতমালা হইতে বোথানিয়ান্ উপসাগর পর্য্যন্ত ভূমি ক্রমশঃ ঢালুভাবে নামিয়া আসিয়াছে। সেই প্রদেশের এখানে-ওখানে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই পাহাড়শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চশিখর প্রায় ৭০০ ফিট উঁচু। উত্তর-পশ্চিম দিকের পর্ব্বতমালা হইতে অনেকগুলি ছোটবড় নদী ঐ প্রদেশকে নানাভাবে বিভক্ত করিয়া



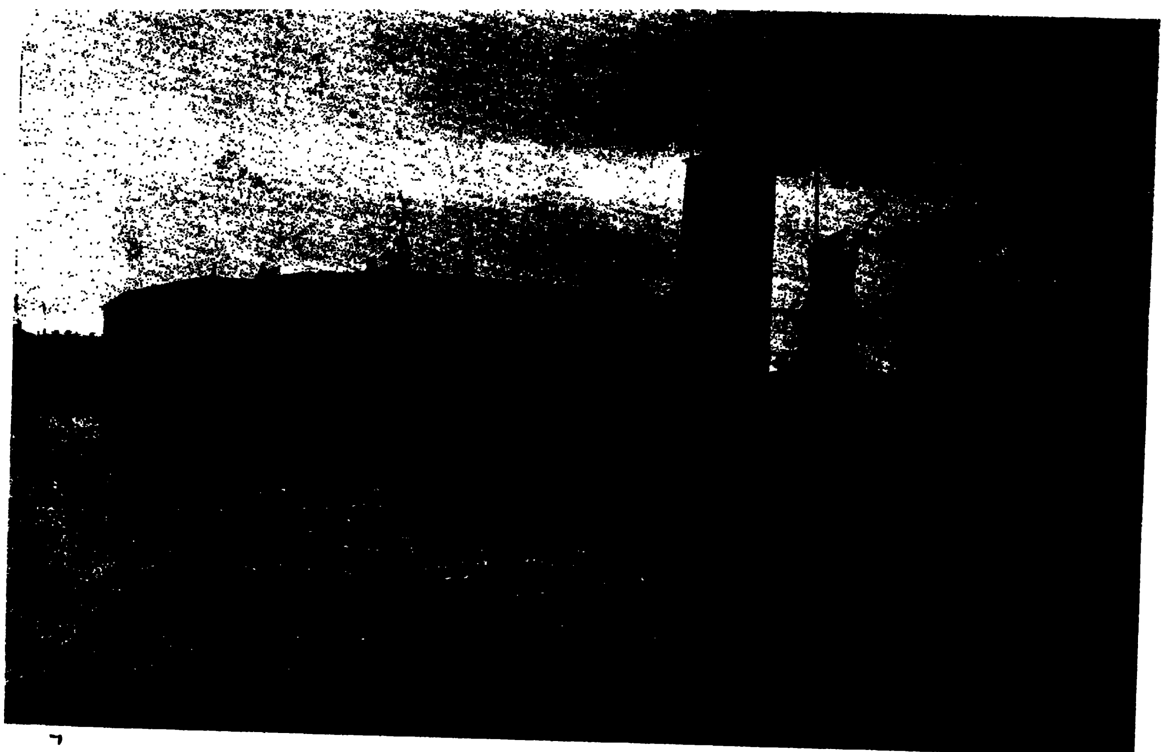
নোবেল একেডেমির সেক্রেটারী ও কবি কার্লফেল্ড। মৃত্যুর অল্পদিন পরে এই বৎসর তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে। মৃত কবিকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া এই প্রথম



সুইডেনের প্রধান নগর ষ্টক্হল্মের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যানের এক অংশ



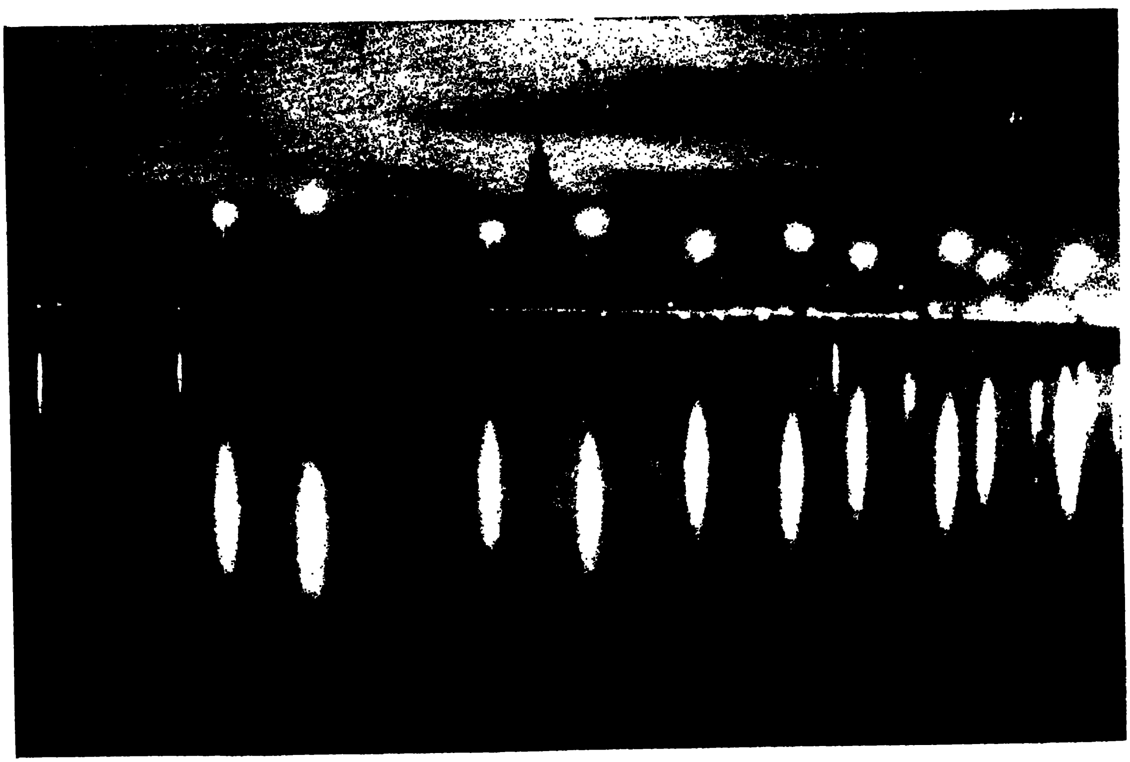
এরোপ্লেন হইতে তোলা ষ্টকহলমের দৃশ্য। মধ্যভাগে রাজপ্রাসা



ষ্টক্‌হল্‌মের টাউন হল। স্থপতি-বিজ্ঞানের দিক দিয়া নির্ম্মাণ সৌষ্ঠবের জন্য ইহা ইউরোপে বিশেষ বিখ্যাত



ষ্টকহলমের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপোদ্যান



ষ্টক্‌হল্‌মের নৈশ-দৃশ্য



বিখ্যাত 'সম প্রপাত'। তুষার-যুগের পর পাথরের পর্ব্বত এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে



সুইডেনের উত্তরে ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড প্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত পর্ব্বত 'কেব্‌নেকাইসের শিখর ভাগ। এখানে তুষারমালা এখনও বিরাজ করিতেছে



উত্তর প্রদেশের বৃহৎ জলপ্রপাত স্তোরা সোকালেৎ



তব্‌নে ট্রাস্কের নিকটবর্ত্তী তুষারমালা

বোথানিয়ান্ উপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। বোথানিয়ান্ উপসাগরের তীরভাগ কতকটা সমতল এবং নীচু। সুইডেন শীতপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও এই উপকূলভাগ স্যাঁৎসেঁতে বলিয়া যথেষ্ট মশার উপদ্রব হয়। ঐ প্রদেশে গ্রীষ্মকালে ঘুরিবার সময় এরূপ মশার কামড় সর্ব্বপ্রথমে খুব আশ্চর্য্যজনক মনে হইয়াছিল। কিন্তু চামড়ার উপর ক্ষত করা ভিন্ন ঐ জাতীয় মশার কামড়ে অন্য কোনো রোগ জন্মায় না। সুইডেনের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত "কেব্‌নেকাইসে" (Kebnekaise) উত্তর দিকে অবস্থিত,



শীতকালে বরফ পড়িয়া গাছপালা এইরূপ আকার ধারণ করে

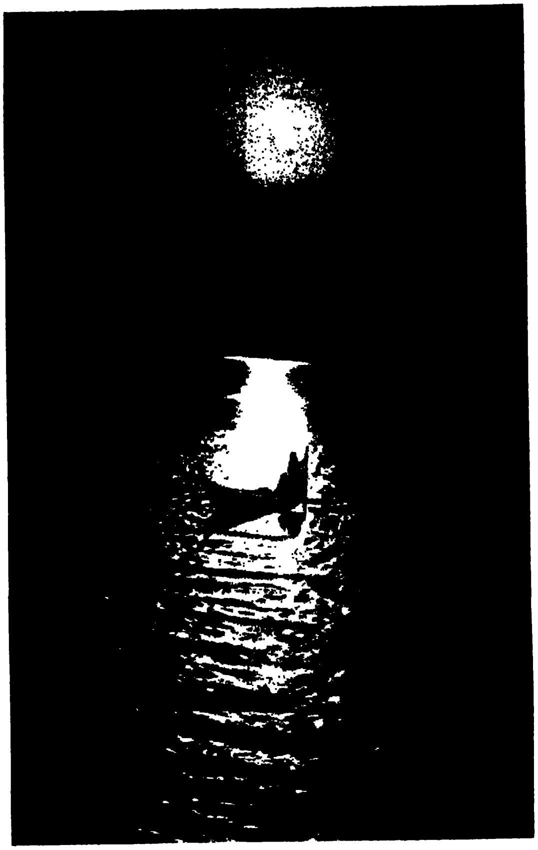
এবং ইহার চূড়া ৭০০০ ফিট উচ্চ। একই প্রদেশে সুইডেনের বৃহৎ জলপ্রপাত "স্তোরা সোফালেৎ" (Stora Sjofallet) অবস্থিত। এই জলপ্রপাত প্রস্থে ২২০০ ফিট্‌ এবং ইহার জলধারার উচ্চতা ১৩০ ফিট। একই প্রদেশে ছোটবড় আরও অনেকগুলি জলপ্রপাত রহিয়াছে। এই কঠোর শীতপ্রধান দেশে উক্ত জলপ্রপাত হইতে সুইডেনবাসীরা বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া অনেক কাজ চালাইয়া থাকে। একই প্রদেশে পাহাড়-পর্ব্বতের উপরে যে-সকল হ্রদ রহিয়াছে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও বৃহত্তম হ্রদের নাম "তরনে ত্রাস্ক" (Torne Trask); ইহার পরিধি ৮২ বর্গ-মাইল। সেই প্রদেশে ২০০ খণ্ড গ্লেসিয়ারস্‌ রহিয়াছে।

তুষার-যুগের পরে যে বিপর্য্যয় ঘটে তাহাতে মধ্য-সুইডেনের আকৃতি একেবারে বদলাইয়া যায়। এখানে-সেখানে অসংখ্য পর্ব্বত-বক্ষে গাছপালা বিরাজ করিতেছে; এবং ইহাদের উচ্চতা ১৬০ ফিট্‌ হইতে ৩০০ ফিট্‌ পর্য্যন্ত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়ের যুগে এই মধ্যপ্রদেশের অনেক অংশ সামুদ্রিক 'লেভেলে'র নীচে পড়িয়া যায়; ফলে সেখানে বহুসংখ্যক হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি হ্রদ বিশেষভাবে বিখ্যাত। যথা—ভোনের্ণ্‌ (Vanern) ২,১৫০ বর্গ-মাইল, ভোত্তের্ণ্‌ (Vattern) ৭৩০ বর্গ-মাইল এবং মেলারেন্‌ (Malaren) ৪৪০ বর্গ-মাইল বিস্তৃত। এই হ্রদসমূহের মধ্যে ভোনের্ণ্‌ হ্রদের জল ইউরোপে খুব প্রসিদ্ধ। এই হ্রদের সঙ্গে জলমুখে ক্লারেলভেন্‌ হ্রদ যুক্ত হইয়া সুইডেনের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ শহর গোথেন্‌বার্গের কাছে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

সুইডেনের দক্ষিণ অংশ, একেবারে দক্ষিণ প্রান্ত প্রদেশ ছাড়া বেশ উঁচু এবং উত্তর প্রদেশের বিশাল পর্ব্বত-

মালার সঙ্গে সংযুক্ত। শুধু মধ্যভাগে স্থানে স্থানে সমতলভূমি ও হ্রদগুলি এই পর্ব্বতমালাকে বিচ্ছিন্ন আকার দান করিয়াছে।

দক্ষিণ প্রান্ত প্রদেশকে "স্কোনে" (Skane) বা



মধ্যরাত্রির সূর্য্য। ২৮এ মে হইতে ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত সূর্য্যালোকে সকল সময়েই আবিস্কো শহর হইতে দৃষ্ট হয়

ইংরেজীতে স্কানিয়া বলা হইয়া থাকে। ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় একেবারে বিভিন্ন, এমন কি সেই প্রদেশবাসীদের ভাষার উচ্চারণেও যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে।

জলমুখস্থিত সুইডেনের তীরভাগ অতি বিভিন্ন ধরণের এবং এই প্রকৃতির বিভিন্নতা সুইডেনকে এক অদ্ভুত রূপ দিয়াছে। কোন কোন স্থানে জলভাগ উপসাগরের আকার ধারণ করিয়াছে এবং ইহাই Fjord বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল জলভাগ ছোটবড় অসংখ্য দ্বীপমালায় শোভিত এবং এই দ্বীপগুলিকে সুইডিস্ ভাষায় স্কারগোর্ড বলা হইয়া থাকে। (স্কার=দ্বীপ; গোর্ড–বাগান)। বিখ্যাত দ্বীপোদ্যান সমূহের মধ্যে সুইডেনের প্রধান নগর ষ্টক্হল্মের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে সকলকেই আকৃষ্ট করে। সুইডেনের দ্বিতীয় শহর গোথেনবার্গের কাছে এরূপ দ্বীপোদ্যান রহিয়াছে। এই দ্বীপোদ্যানসমূহ সাধারণতঃ পাথরের সমষ্টি;



অরোরাবরিয়ালিস। মেরুপ্রদেশের আলোর নৃত্য

কদাচিৎ কোনো কোনোটায় বালি ও মাটির ভাগ দেখা যায়। তাহা সত্ত্বেও এই প্রস্তরময় ভূমির উপর নানা জাতীয় গাছপালা, বিশেষ করিয়া পাইন ও স্প্রুসের বন শোভা পাইতেছে। সুইডেনের তীরভাগের কোন কোন অংশ সমতল ও বালুকাময়—বিশেষ করিয়া স্কোনে প্রদেশে।

তাহা ছাড়াও সুইডেনের চারিদিকে অনেক দ্বীপপুঞ্জ রহিয়াছে। এগুলি আকৃতিতে অনেকটা দ্বীপোদ্যানের মত। কিন্তু দুইটি দ্বীপ—গথ্ল্যাণ্ড এবং ওল্যাণ্ড—সুইডেন হইতে একেবারে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং ইহাদের ইতিহাসও ঘটনাবহুল। প্রথমটি আকৃতিতে বেশ বড়, এবং ইহার



শীতকালে হ্রদের জল জমাট বাঁধিয়া যায়। তাহারই উপর স্কেটিং খেলা হয়। [illegible] সাহাগো বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা স্কেটিং করিতেছে

পরিধি ১১৪০ বর্গ-মাইল।* ষ্টক্‌হল্‌ম্ হইতে জাহাজে করিয়া সেখানে যাইতে প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। দ্বিতীয়টির পরিধি ৭৭০ বর্গ-মাইল। ইহাই সুইডেনের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক অবস্থিতির মোটামুটি বিবরণ।

পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে অবস্থিত এই দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের অনেক অসামঞ্জস্য আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক প্রভেদ যাহা সুইডেন ও প্রতিবেশী নরওয়েকে বিশেষ রূপ ও খ্যাতি দান করিয়াছে তাহা হইল সেখানকার দিনরাত্রির প্রভেদ এবং দৃশ্যমান মধ্য-রাত্রির সূর্য্য। বৎসরে প্রায় নয় মাস শীত এবং সূর্য্যের আলোকের অভাব, আবার গ্রীষ্মের তিন মাসে দিনরাত্রি সকল সময়ই কম বেশী সূর্য্য ও সন্ধ্যালোক,—প্রকৃতির এই লীলা ও সেই দেশবাসীদের জীবনে ইহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বর্ণনার আয়ত্তাধীন নহে। ইহা অনুভব করিবার জিনিষ।

* ইউরোপের সকল আশ্চর্য্য বস্তুর মধ্যে গথল্যাণ্ড একটি। ইহাকে সাধারণতঃ 'ভগ্নাবশেষ ও গোলাপ ফুলের' দেশ বলা হইয়া থাকে।

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

৮

বিভিন্ন মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত

গীতায় যে-সকল সাধন-মার্গ বা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উল্লেখ আছে, সেগুলি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

যজ্ঞ—শ্রীকৃষ্ণের সময়ে যজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যজ্ঞকার্য্যে নানারূপ তামসিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ যজ্ঞকার্য্যে দোষ ও তাহা নিবারণের উপায় বলিয়াছেন। ৩, ৪, ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ৩য় অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় যজ্ঞের বিশদ বিবরণ দিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তখনকার লোকে যজ্ঞকে সৃষ্টিচক্রের অঙ্গ বলিয়া মনে করিত ও যজ্ঞ অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে যজ্ঞের বিশেষ ভক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি ১৮।৫ শ্লোকে বলিতেছেন, যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়। ইহার অধিক যজ্ঞফল শ্রীকৃষ্ণ মানেন নাই। যজ্ঞের উপর তৎকালপ্রচলিত আসক্তি নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের একটা ব্যাপক অর্থ দিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকার কার্য্যকে (২৩-৩৩ শ্লোক) যজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেছেন। যজ্ঞের এই লক্ষণ মানিলে সাধারণে যজ্ঞকে অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়াও নিঃসঙ্কোচে বৈদিক যজ্ঞ পরিহার করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণ দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞের প্রাধান্য দিয়াছেন। তামসিকতা নিবারণের জন্য ১৭শ অধ্যায়ে যজ্ঞের শ্রেণী-বিভাগ দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞকে বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে করিতেন এবং তজ্জন্যই বার-বার মুক্তসঙ্গ হইয়া যজ্ঞের আচরণ করিতে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ সম্বন্ধে তৎকালপ্রচলিত মত পূর্ণভাবে মানেন নাই, পরিবর্ত্তিত আকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

সংন্যাস—গীতায় বহুস্থলে সংন্যাস-মার্গের বা কর্ম্ম-ত্যাগের উল্লেখ আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সংন্যাস-মার্গের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। সংন্যাসী বলিলে সাধারণতঃ বুঝায় যিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন ও যিনি সর্ব্বপ্রকার সামাজিক কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। কর্ম্ম বন্ধনমূলক ও তাহা মোক্ষলাভের অন্তরায় এই ধারণার বশেই সাধক সংন্যাস-মার্গ অবলম্বন করেন। শরীরধারণের জন্য যেটুকু কর্ম্ম নিতান্ত আবশ্যক সংন্যাসী কেবল তাহারই আচরণ করেন। জ্ঞানচর্চ্চাই তাঁহার একমাত্র সাধনা। শ্রুতি, মনুস্মৃতি, শ্রীভাগবত ও পুরাণাদি নানা হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানোদয়ে সংন্যাস-মার্গ অবলম্বন করিবার উপদেশ আছে সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন পূর্ণ কর্ম্মসংন্যাস অসম্ভব। ইচ্ছা-করি আর না-করি শরীরযাত্রা সম্পর্কে নানাবিধ কর্ম্ম আমাদের করিতেই হয়, অতএব কর্ম্মত্যাগের বৃথা চেষ্টা না করিয়া কর্ম্মে আসক্তি ও কর্ম্মের ফলত্যাগই শ্রেয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণের মতে আসক্তি ও ফলত্যাগে কর্ম্মের বন্ধন হয় না; এই অবস্থায় শরীরই প্রকৃতির বশে কর্ম্ম করিতেছে এবং আত্মা নির্লিপ্তই আছে এই ধারণা জন্মে। জনকাদি কর্ম্ম করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কাহারও স্বধর্ম্মত্যাগের আবশ্যতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম-সংন্যাসকে স্পষ্ট নিন্দা করেন নাই, কারণ তিনি কোনো মার্গের প্রতিই দ্বেষযুক্ত নহেন, কিন্তু তিনি কর্ম্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সংন্যাসের এক অভিনব নিবচন দিয়া তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। কর্ম্মত্যাগ করিলেই সংন্যাসী হয় না; যে কর্ম্মের আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ চিত্তে কর্ম্ম করে সে-ই প্রকৃত সংন্যাসী। এইরূপ সংন্যাসই শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত।

বুদ্ধিযোগ—বুদ্ধিযোগ কোন একটি বিশেষ মার্গ নহে। কর্ম্মপ্রধান সকল মার্গেই বুদ্ধিযোগ প্রযোজ্য। যে-

বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না তাহাই বুদ্ধিযোগ। কর্ম্মের ফল যখন আয়ত্ত নহে তখন ফলাফলে সমবুদ্ধি হইয়া অসঙ্গ চিত্তে কর্ম্ম করার নাম বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগ শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যাত রাজবিদ্যার অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের মতে যে কাজই কর না কেন বুদ্ধিযুক্ত হইয়া করা উচিত। মানুষ সাধারণত যে-কাজ করে তাহা ফললাভের আশায় করিয়া থাকে। ফললাভের অনিশ্চয়তা তাহার মনে উঠে না। যে-কাজে ফললাভ হইতেও পারে না-ও পারে এরূপ মনে হয় সেখানে কর্ম্মে অনেকটা নির্লিপ্ত ভাব আসে; মানুষ কর্ত্তব্যবোধেই এরূপ কাজে সাধারণতঃ প্রবৃত্ত হয়। এ ক্ষেত্রে নিরাশাজনিত কষ্ট ইত্যাদি মানুষকে পীড়িত করে না। কোন ব্যবসায়ীর বিল-সরকার টাকা-আদায়ের জন্য তাগিদ করিয়া বিফলমনোরথ হইলে নিরাশ হয় না; তাহার কর্ত্তব্য সে করিয়াছে, ফললাভ হয় নাই তাহাতে তাহার কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। বিল-সরকার কষ্ট না পাইলেও টাকা আদায় না হইলে তাহার ব্যবসায়ী মনিব কষ্ট পাইয়া থাকে, কারণ টাকা তাহার পাওয়া উচিত এবং সে তাহা পাইবেই এই ধারণার বশে সে তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। টাকার উপর আসক্তিই তাহার মনে এই প্রকার ধারণা জন্মাইয়াছে। আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা বিল-সরকারের মত প্রকৃতির দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছি এই বুদ্ধিতে ও কেবল কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিতে পারি তবে আমাদের কর্ম্মের বন্ধন হয় না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিযোগ। আধুনিক সম্ভাব্য গণিতের (theory of probability) সূত্র এই উপদেশই দেয়। কোন কার্য্যেই পূর্ণ নিশ্চয়তা নাই; কাল সূর্য্য উঠিবে ইহাও স্থিরনিশ্চয় বলিতে পারা যায় না, কেন-না কোন ব্যাপারেরই সমস্ত কারণগুলি আমরা জানিতে পারি না; কতকগুলি কারণ অদৃষ্ট (unknown factors) থাকিয়াই যায়। গীতায় ১৮।১৪ শ্লোকে এইরূপ কারণসমষ্টিকে দৈব বলা হইয়াছে। সম্ভাব্য গণিত বলিতে পারে কোন্ কার্য্যের ফললাভের সম্ভাবনা বেশী, কোন্ কার্য্যের কম। ফলাফলের নিশ্চয় জ্ঞান সম্ভব নহে, কারণ কার্য্যের সকল কারণ আমাদের আয়ত্ত নহে। যে বিদ্বান সম্ভাব্য গণিতের সিদ্ধান্ত স্মরণ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনি বুদ্ধিযোগই অবলম্বন করেন। এরূপ ব্যক্তির কর্ম্মে নির্লিপ্তি বা অসঙ্গ জন্মে ও ফলাফল সম্বন্ধে তিনি ক্রমে উদাসীন হন।

প্রাণায়াম ও অন্যান্য যৌগিক সাধনা—মহাভারতের যুগে যোগসাধনা বহু অনুষ্ঠিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই সাধনার বিচার করিয়াছেন। পাতঞ্জলযোগ এই মার্গের অন্তর্গত। গীতায় দুই প্রকার যোগের উল্লেখ আছে, এক শারীরিক ও অপরটি মানসিক। শ্রীকৃষ্ণের মতে এই দুই যোগের ফল একই প্রকার; তিনি আরও বলেন যে যাহা সংন্যাস বস্তুতঃ তাহাই যোগ। শারীরিক যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, যোগী নির্ম্মল স্থানে স্থির অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশ, পশুচর্ম্ম ও বস্ত্র উপরি উপরি বিছাইয়া আপনার আসন স্থাপন করিবেন। সেই আসনে উপবেশন করিয়া দেহ মস্তক গ্রীবা ঋজু ও স্থির রাখিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন না করিয়া স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযম করিয়া একাগ্রমনে আত্মবিশুদ্ধির জন্য যোগযুক্ত হইবেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যোগসাধনার অনুরূপ পদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে। গীতায় কোন কষ্টকর যোগাসনের উল্লেখ নাই। অনেক যোগী বহু আয়াস-লব্ধ কষ্টকর আসনে যোগ অভ্যাস করেন ও নানা প্রকার কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকার কঠোরতার বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন অতিভোজী এবং একান্ত অনাহারীর যোগ সিদ্ধ হয় না, অতি-নিদ্রাশীল ও অতি-জাগ্রতেরও নয়। উপযুক্ত আহার-বিহারশীল, কর্ম্মে উপযুক্ত চেষ্টাসম্পন্ন ও উপযুক্ত নিদ্রা-জাগরণশীল পুরুষের যোগ দুঃখনাশক হয়। শ্রীকৃষ্ণ যোগের যে-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সকলেরই আয়ত্ত। মানসিক যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, কামনা পরিত্যাগ করিয়া ধৃতিযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মস্থ করিবে; যে-যে বিষয়ে মন ধাবিত হইবে সেই সেই বিষয় হইতে মনকে সংযত করিয়া আপনার বশে আনিবে। এই উপায়ে সিদ্ধি হইবে। মানসিক যোগই ধ্যান। মানসিক যোগে কোন আসনের উল্লেখ নাই। এখনকার মত পুরাকালেও সাধারণের ধারণা ছিল যে,

একবার যোগসাধনা আরম্ভ করিয়া তাহা হইতে বিচলিত হইলে বা সাধনায় ত্রুটি থাকিলে সাধকের নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট যোগপদ্ধতিতে এরূপ কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য সাধন-মার্গের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ যোগের দোষ বর্জ্জন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ কঠোরতা পরিত্যক্ত হওয়ায় অনিষ্টের সম্ভাবনাও লুপ্ত হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যৌগিক মার্গের আলোচনা করিলেও প্রাণায়ামের কোন উল্লেখ করেন নাই। ৪র্থ অধ্যায়ে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নানারূপ সাধনাকে যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেইখানে প্রাণায়ামের প্রথমোল্লেখ দেখা যায়। ৫ম অধ্যায়ের শেষে যেখানে সন্ন্যাসীদের কথা হইতে যতিদের কথা আসিয়াছে, সেইখানে তাঁহাদের সাধনা হিসাবে প্রাণায়ামের পুনরুল্লেখ হইয়াছে। ৪র্থ অধ্যায়েও যতিদের কথার পরেই প্রাণায়ামের উল্লেখ আছে। যতিদের পরেই ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যোগীদের কথা আসিয়াছে। সেজন্য মনে হয় যে, প্রাণায়াম যতি নামক সাধকদিগের বিশেষ সাধনা-পদ্ধতি। যতি ও যোগী এক বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের পার্থক্য কি আমি তাহা জানি না। প্রাচীনতর কালে বৈদিক সময়ে যতি নামক এক পৃথক সম্প্রদায় ছিল। বেদে তাহার উল্লেখ আছে। যতিগণকে স্থানে স্থানে 'ব্রাত্য' ও 'অসংস্কৃত' বলা হইয়াছে। যতিগণের সাধনা সকলে অনুমোদন করিতেন বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু তাঁহারা যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। প্রাণায়াম যতিদের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়া থাকিলে, পরবর্ত্তীকালে তাহা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে বেদাভিজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা সঠিক সংবাদ বলিতে পারিবেন।

তপ বা তপস্যা—কোন বস্তু বা বরপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃচ্ছ্রসাধনের নাম তপ বা তপস্যা। ভারতবর্ষে বহু পুরাকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত তপস্যার প্রচলন আছে। এখনও জৈন সাধুগণ নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনকে তপস্যা বলিয়াই অভিহিত করেন। গীতায় 'যজ্ঞ তপ ও দানে'র একত্র উল্লেখ বহুস্থানে আছে, যে-যে কর্ম্মে অনাচার ও তামসিকতা প্রবেশ করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ ১৭ অধ্যায়ে তাহাদের সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক শ্রেণিবিভাগ করিয়াছেন। যজ্ঞ তপ ও দান এই তিনেরই শ্রেণি-বিভাগ দেখানো হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শরীরকে কষ্ট দিয়া উৎকট তপের পক্ষপাতী নহেন। শরীর উৎপীড়নপূর্ব্বক যে তপ অনুষ্ঠিত হয় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অসৎ বলিয়াছেন।

গীতায় যেখানে যেখানে তপের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই অন্য মার্গের তুলনায় তপকে ছোট করিয়া দেখানো হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ তপ দান—এই তিন কর্ম্মকে একই চক্ষে দেখিতেন বলিয়া মনে হয়। তিনি যজ্ঞ দান তপ পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই সত্য, কিন্তু এই তিনেরই ত্রিবিধ ভেদ দেখাইয়া আচরণের দোষ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মতে, উপযুক্ত-ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে এই তিন কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির হেতু। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের ন্যায় তপেরও নূতন নির্বচন দিয়াছেন এবং ইহার শারীরিক বাচসিক ও মানসিক শ্রেণি-বিভাগ করিয়াছেন। এই তিন বিভাগের কোনটিতেই শরীর ও মনের কষ্টদায়ক কোন পদ্ধতির কোন উল্লেখ করেন নাই। দেবতা ব্রাহ্মণ গুরুভক্তি, শরীরের শুদ্ধি, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, শ্রুতিমধুর বাক্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন, অন্তঃকরণের পবিত্রতা ইত্যাদিকে শ্রীকৃষ্ণ তপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দান—গীতায় যজ্ঞ, তপ ও দানের একত্র উল্লেখ বার-বার পাওয়া যায় একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দানের একটা বিশেষ পুণ্যফল মানা হইত এবং এখনও হয়। পুণ্যকর্ম্ম হিসাবে এখনও বহুলোক দান করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্রই যে দান সৎপাত্রে পড়ে তাহা নহে। অসৎপাত্রে দানে সামাজিক অনিষ্টের সম্ভাবনা এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ ও তপের ন্যায় দানেরও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রেণি-বিভাগ দেখাইয়াছেন। সাত্ত্বিক দানে চিত্তশুদ্ধি হয়।

অবতারবাদ—সময় সময় স্বয়ং ভগবান জীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধর্ম্মরক্ষাকল্পে জন্মগ্রহণ করেন এই বিশ্বাস বহু পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। যে

জীবরূপে ভগবান আবির্ভূত হন তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলা হয়। ভগবানের অবতার সাধারণের পূজা পাইয়া থাকেন। রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার মানিয়া সাধারণে এখন পর্য্যন্ত তাঁহার পূজা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকেও অবতার বা পূর্ণব্রহ্ম বলা হয়। তিনি স্বয়ং অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভগবান নিজে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব তিনি কি করিয়া বদ্ধ জীবের আকার ধরিয়া নিজেকে বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে পারেন এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—"তিনি মায়াপ্রভাবে যেন দেহবান হন, যেন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, যেন তিনি লোকনিবহের প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন এইরূপে লোকে তাঁহাকে বুঝিয়া থাকে" (প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক অনূদিত)। শঙ্কর-ব্যাখ্যাই অবতার-বাদের সাধারণ প্রচলিত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা মানিলে বলিতে হয় তুমি আমি যেভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ সেভাবে জন্মেন নাই। বাস্তবিক তাঁহার জন্মই হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কেহই ছিলেন না। ভগবানের বৈষ্ণবীমায়ার প্রভাবে মহাভারতের যুগের ব্যক্তি-গণের মনে হইত যেন বা শ্রীকৃষ্ণ আছেন যেন বা তিনি অর্জ্জুনের রথ চালাইতেছেন, যেন বা তিনি গীতার উপদেশ দিতেছেন ইত্যাদি। এরূপ ব্যাখ্যায় কতকগুলি সন্দেহ মনে উঠিবে। অদ্বৈতবাদীর মতে পরব্রহ্মই একমাত্র সত্তা,তাঁহারই মায়াপ্রভাবে জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীয়মান হয়। যখন জীবের মায়ানিবৃত্তি হয় তখন এক ও অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মে চরাচর লীন হইয়া যায়। জীবের জন্মগ্রহণ মায়িক ব্যাপার মাত্র। সাধারণ জীবের জন্মগ্রহণে ও অবতারের জন্মগ্রহণে মায়িক পার্থক্য কোথায় শঙ্করের ব্যাখ্যায় তাহা পরিস্ফুট নহে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্মব্যাপার যে অন্য জীবের জন্মব্যাপার হইতে ভিন্ন এমন বলেন নাই। ৪।৬ শ্লোকে বলিতেছেন "আমি অজ শাশ্বত ও ভূতসমূহের ঈশ্বর হইলেও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজমায়া অবলম্বনে জন্মগ্রহণ করি।' ১৩।২ শ্লোকে বলিয়াছেন আমাকেই সমুদয় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; অতএব সকল ক্ষেত্রেই ভগবানই জন্মগ্রহণ করেন। ১৩।২১, ২২, ২৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে প্রকৃতিতে অবস্থিত বলিয়া পুরুষ পদার্থ-নচয় ভোগ করেন ও জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এই দেহে থাকিলেও তিনি দেহ হইতে ভিন্ন। তিনি অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তিনিই পরমাত্মা। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ৪।৯ শ্লোকে বলিয়াছেন যিনি আমার দিব্য জন্মকর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হন তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না, তিনি আমাকেই পান। ১৩ ও ৪ অধ্যায়ের এই শ্লোকগুলির আলোচনায় বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্মব্যাপার ও অন্য জীবের জন্মব্যাপার একই ভাবে দেখিয়াছেন। ৪।৫ শ্লোকে বলিতেছেন, "হে অর্জ্জুন, তোমার ও আমার অনেকবার জন্ম হইয়াছে, কেবল পার্থক্য এই যে, তোমার তাহা মনে নাই আমার আছে। অবতার না হইলেও জাতিস্মরতা সম্ভব, কাজেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অর্জ্জুনের জন্মের অনুরূপ নহে প্রমাণিত হয় না বরং উভয়ের জন্মই একই প্রকারের ইহাই মনে হয়। গীতা-আলোচনায় মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ অবতারতত্ত্ব মানিতেন না। যিনি সমাজ-ধর্ম্ম রক্ষা করেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই অবতার বলিয়াছেন। ৪ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে ইহা পরিস্ফুট হইবে। অবতার তত্ত্বও তপ, যজ্ঞ ইত্যাদির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন।

কাপিল সাংখ্য—কাপিল সাংখ্যবাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অধুনা দার্শনিক তত্ত্ব বলিলে আমরা যাহা বুঝি গীতার বিজ্ঞান শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত বিজ্ঞান মূলতঃ কাপিল সাংখ্যবাদ, কেবল প্রভেদ এই যে কৃষ্ণ পুরুষ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে ব্রহ্মের অন্তর্গত স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম উপনিষদের ব্রহ্ম। প্রকৃতি ও পুরুষ সমুদায় ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই মায়াশক্তি এবং প্রতিদেহস্থিত পুরুষ মূলতঃ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন।

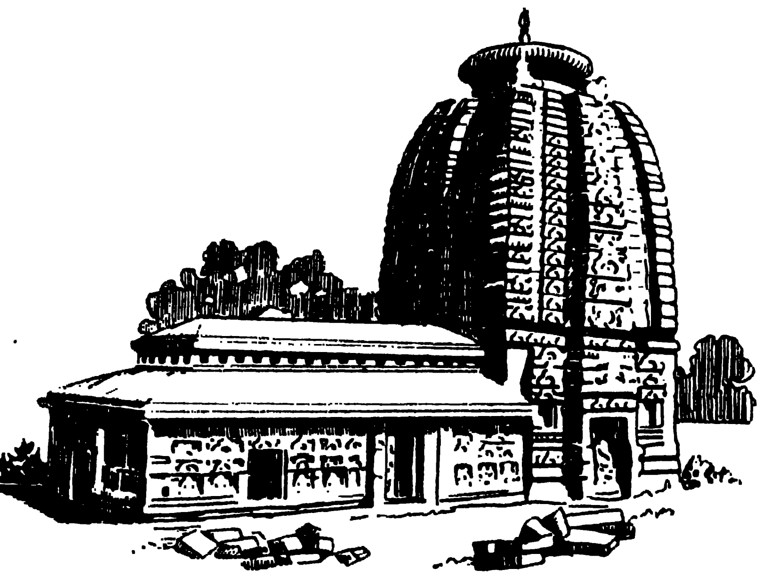
মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ শ্বেতাশ্বতর, ৪।১০

অর্থাৎ, মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ী অর্থাৎ যাহা হইতে মায়ার উৎপত্তি, তিনিই পরমেশ্বর। তাঁহার অবয়ব দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

কাপিল সাংখ্যবাদকে এই প্রকার পরিবর্ত্তিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তের সহিত তাহার সমন্বয় করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে গীতার দার্শনিক তত্ত্ব বা বিজ্ঞানের আলোচনা আছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ব্রহ্মোৎপন্ন প্রকৃতির এই অষ্ট বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাই ব্রহ্মের অপরা প্রকৃতি। জীবাত্মা বা কাপিল সাংখ্যের পুরুষ সমষ্টি ব্রহ্মের পরাপ্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতিই পরম ব্রহ্মের মায়া-সম্ভূত। প্রকৃতির যে অষ্ট বিভাগ দেখান হইয়াছে সমস্ত বহির্জগৎ ও মানসিক ব্যাপারসমূহ তাহাদের অন্তর্গত। এই সমুদায় জড়পদার্থ। মন সূক্ষ্ম জড়বস্তুমাত্র, পুরুষই কেবল চেতনাশীল এবং তাঁহারই চেতনায় এই সমস্ত উদ্ভাসিত হয়। তিলক মনে করেন, মূলপ্রকৃতির ভেদ দেখাইতে গেলে মূল প্রকৃতিকে ছাড়িয়া তাহার অন্তর্গত পদার্থগুলি দেখাইতে হইবে এজন্য মহান, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি মাত্র ভেদ হয়, "কিন্তু এরূপ করিলে পরমেশ্বরের কনিষ্ঠস্বরূপ বা মূল প্রকৃতি সাত প্রকার বলিতে হয়। অষ্টধা প্রকৃতির বর্ণনাকেই বজায় রাখা গীতার অভীষ্ট। তাই মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতের মধ্যেই অষ্টম তত্ত্ব মনকে পুরিয়া দিয়া পরমেশ্বরের কনিষ্ঠস্বরূপ অর্থাৎ মূল প্রকৃতিকে অষ্টধা করিয়াই গীতায় বর্ণিত হইয়াছে (তিলক বাংলা অনুবাদ, ১৮৪ পৃঃ)। আমার মতে গীতায় ৭।৪ শ্লোকে এই যে অষ্ট বিভাগ দেখান হইয়াছে তাহা সাংখ্য বা বেদান্তানুযায়ী বর্গীকরণ নহে; প্রকৃতিজাত জড় জগতের বিভাগ মাত্র। এখানে পঞ্চ স্থূল ভূত ও মন, বুদ্ধি, অহংকার রূপ সূক্ষ্ম জড়পদার্থের কথাই বলা হইয়াছে, শঙ্কর ও তিলক প্রভৃতি টীকাকার উদ্দিষ্ট তন্মাত্রাদির কথা নহে। কেন একথা বলিতেছি সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে তাহার বিচার করিব। সাংখ্যোক্ত বর্গীকরণের কথা ১৩।৫ শ্লোকে আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই বর্গীকরণ মানিয়া লইয়াছেন।

গুণত্রয় বিভাগ কাপিল সাংখ্যের নিজস্ব। সত্ত্ব, রজঃ ও তমের বিস্তারিত আলোচনা গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আছে। এই গুণত্রয়কে ভিত্তি করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপারের ভালমন্দ বিচার করিয়াছেন। ত্রিগুণ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের কষ্টিপাথর। শ্রীকৃষ্ণ কাপিল সাংখ্যের দ্বারা যে সমধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।



মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

৮

পথে চলিতে চলিতে প্রতাপ কত কথাই যে ভাবিয়া লইল, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। চিন্তাকে লাগাম ছাড়িয়া দিতে তাহার নিজেরই ভয় করিত, কিন্তু যৌবনধর্ম্ম তাহাকে এই পথে নিত্যই লইয়া যাইত। অনেক কথা মনের দ্বারে আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিত, প্রতাপ জোর করিয়া তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিত, আবার মাঝে মাঝে সুমধুর কল্পনার স্রোতে নিজেকে একেবারে ভাসাইয়া দিত। নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইত, নির্ব্বোধ, মূর্খ বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিত, কিন্তু কল্পনাকে সংযত করিতে পারিত না।

নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, মিহির সামনের রাস্তায় হকিষ্টিক্ হাতে ঘোরাঘুরি করিতেছে, ইটের টুকরার উপর দিয়া হাত পাকাইয়া, ঘরে বন্ধ থাকার দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল, "কি, রাত্তির বেলা হঠাৎ হকি খেলার সখ হ'ল যে?"

মিহির ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "কি করব? ঘরের ভিতর আর টিকবার জো নেই। একটা আরশোলা উড়ে গেলেও সবাই হৈ হৈ ক'রে তেড়ে আসে, তাতেই নাকি মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে।"

প্রতাপ হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। নৃপেন্দ্রবাবু আপিস-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, প্রতাপকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিলেন, "আজ অনেকটা ভালই আছেন, আর কিছু করতে হবে না, শুধু ঠিক সময়ে আয়া যাতে ওষুধ-বিষুদ দেয়, সেইটুকু চোখ রাখলেই হবে।"

নৃপেন্দ্রবাবু আবার নিজের কাজে ডুব দিলেন। প্রতাপ বসিয়া বসিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, কাঁহাতক এই রকম হাঁ করিয়া বসিয়া থাকা যায়? উঠিয়া গিয়া মিহিরের হকি খেলায় যোগ দিবে কি-না ভাবিতেছে, এমন সময় টুং টুং করিয়া একটা ঘণ্টা নীচেই কোথায় বাজিয়া উঠিল। নৃপেন্দ্রবাবু চশমাটা চোখ হইতে খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "চলুন, খাবার দিয়েছে। আপনার অনেক দেরি হয়ে গেল বোধ হয়। গিন্নি পড়ে অবধি সব কাজেরই বড় বিশৃঙ্খলা হয়েছে। মেয়েটারও পরীক্ষা, সে ভাল ক'রে কিছু দেখাশোনা করতে পারে না।"

প্রতাপ নিরুত্তর অবস্থাতেই তাঁহার পিছন পিছন খাবার-ঘরে উপস্থিত হইল। যামিনী তাহাদেরই সঙ্গে খাইতে বসিবে কি-না সেই চিন্তাতেই সে ব্যস্ত ছিল।

টেবিলে শুভ্র আচ্ছাদন, প্লেট, ছুরি, কাঁটা, চামচ সব ইংরেজী কায়দায় সজ্জিত। প্রতাপ একটু ঘাব্ড়াইয়া গেল। এভাবে খাইতে সে কোনদিন অভ্যস্ত নয়, শেষে কি জিবটিব কাটিয়া একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড করিবে? সর্ব্বনাশ, যামিনীর সম্মুখে এই রকম একটি ব্যাপার ঘটিলেই হইয়াছে আর কি? সে তাহা হইলে প্রতাপকে একটি আস্ত জানোয়ার ঠাওরাইবে। ভাবিতেই শীতের দিনে প্রতাপের কপাল ঘামিয়া উঠিল।

একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে নৃপেন্দ্রবাবুকে বলিল, "আমার কাঁটা চামচেয় খাওয়া কোনদিন অভ্যেস নেই। আমি হাতেই খাব।"

নৃপেন্দ্রবাবু টেবিলেও একখানা বই হাতে করিয়া হাজির হইয়াছিলেন। বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত, বেশ ত, আমার কোন আপত্তি নেই। আমিও যে হাতে খাই না, সেটা নিতান্ত দায়ে পড়েই। অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার পেটই ভরত না।"

এমন সময় যামিনী আর মিহির আসিয়া ঘরে ঢুকিল। প্রতাপ একবার দরজার দিকে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল। ভদ্রমহিলার দিকে চোখ পড়িলে, অন্য দিকে তাকানটা তাহার বাঙালী ভদ্রতার নিয়মানুসারে অভ্যাস

হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা করিতে এতখানি চেষ্টা তাহাকে ইতিপূর্ব্বে করিতে হয় নাই। চোখ দুইটা যেন বন্যমৃগের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কোন শাসন না মানিয়া নিজের ইচ্ছা-মত ছুটিয়া যাইতে চায়। অধিকক্ষণ ভদ্রতারক্ষা করিতে সে পারিলও না, আর একবার যামিনীর দিকে চাহিয়া দেখিল। যামিনী ঠিক তাহার সামনা-সামনি বসিয়াছে, চাকররা খাবার আনিতে আরম্ভ করিয়াছে, মৃদুকণ্ঠে তাহাদের কি সব উপদেশ দিতেছে।

মেয়েদের সাজসজ্জাও ইহার আগে প্রতাপ কোনদিন লক্ষ্য করে নাই। ইহা লইয়া মেসে অনেক সময় তাহাকে ঠাট্টা সহ্য করিতে হইত। কিন্তু সকল দিকেই তাহার পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছিল। আজ সে বিশেষ করিয়াই দেখিল, যামিনী পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, এমন সুন্দর কবরী-রচনা প্রতাপ আগে যেন কোথাও দেখে নাই। একটি কচিপাতার রঙের ঢাকাই শাড়ী তাহার কোমল সুন্দর দেহটিকে যেন গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, গলায় একটি প্রবালের মালা দুলিতেছে। কানে বিলম্বিত দুইটি মুক্তার দুল যেন জলদেবীর অশ্রুবিন্দুর মত টল্‌টল্‌ করিতেছে। যামিনী এত সুসজ্জিতা কেন? নিজের ঘরে, নিত্যকার খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে এত সযত্ন সজ্জা কি সচরাচর কেহ করে? তাহার কান গরম হইয়া উঠিল, সে আসিবে জানিয়াই কি যামিনী এতটা করিয়াছে, ভাবিতেই যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকের শিহরণ খেলিয়া গেল।

মূর্খ প্রতাপ জানিত না যে, ইহা এ বাড়ির নিত্য নিয়ম। দিনের বেলাতেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইয়া খাইতে আসিলে জ্ঞানদার কাছে বকুনি খাইতে হইত। কিন্তু রাত্রির খাওয়াটার নাকি মর্য্যাদা বেশী, তাই এ সময়ে ফিট্‌ফাট্‌ হইয়া না আসিলে, জ্ঞানদা রাগ করিয়া ছেলেমেয়েকে টেবিল হইতে তুলিয়া দিতেন, তাহাদের আবার গিয়া সাজসজ্জা ঠিক-মত করিয়া আসিতে হইত। কর্ত্তাও নিষ্কৃতি পাইতেন না, কাজেই এ সময়ে খানিকটা বেশভূষা করা সকলেরই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

মাছের 'ফ্রাই'টা এক টুকরা মুখে দিয়াই মিহির চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি বালি মাখিয়ে ভেজে নিয়ে এসেছে? এ যে গেলা যায় না।"

যামিনী বলিল, "এমন কিছু খারাপ হয় নি।"

মিহির বলিল, "তোমার মুখে ত কিছুই খারাপ লাগে না। নিজে কিছু দেখ না কি না?"

নৃপেন্দ্রবাবু ছেলেমেয়ের ঝগড়া থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "থাক থাক, যা হয়েছে তাই খাও। তোমার মা কিছু এখন দেখতে পারছেন না, একটু খারাপ ত হতেই পারে।"

প্রতাপ কি যে খাইতেছিল, সে বিষয়ে তাহার নিজের কোনো চেতনা ছিল না। মিহিরের কথায় তাহার জ্ঞান হইল যে সে মাছই খাইতেছে। এমন কি মন্দ হইয়াছে? মিহিরের উপর অকস্মাৎ সে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ছেলেটার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে। একটু খাওয়ার গোলমাল হইলে এমন কি চণ্ডী অশুদ্ধ হইল যে, তাহা লইয়া এত গোলমাল করিতে হইবে? নিজে বাল্যে ও কৈশোরে যে এই অপরাধ কতবার করিয়াছে, তাহা প্রতাপ একেবারেই ভুলিয়া গেল।

খাওয়াটা তাহার নামমাত্রই হইত বোধ হয়, যদি না নৃপেন্দ্রবাবু উপস্থিত থাকিতেন। প্রতাপের অবাধ্য চক্ষু ও মন কিছুতেই খাবারের দিকে যাইতে চাহে না। সম্মুখে এমন মনোহারিণী একটি ছবি তাহার সমস্ত চিত্তকে ক্রমাগতই সেই দিকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার মত এমন একটা নিতান্ত স্থূল জিনিষ, তাহাও ইহাকে কি চমৎকার মানাইতেছে। তাহার পাশে বসিয়া মিহিরটা গিলিতেছে ঠিক যেন জানোয়ারের মত। মাষ্টার-মহাশয়ের মনে আজ ছাত্রের জন্ম বিন্দুমাত্রও মমতা অবশিষ্ট ছিল না। নিজের খাইতেও তাহার লজ্জা বোধ হইতেছিল, যামিনীর সামনে বসিয়া সে গরুর মত মুখ নাড়িয়া খাইবে কেমন করিয়া? না-জানি তাহাকে কি কুৎসিতই দেখাইবে।

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনি ত কিছুই খাচ্ছেন না দেখি। রান্নাটা আজ সত্যিই ভাল হয়নি।"

প্রতাপ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "না রান্না বেশ ভালই হয়েছে। এত সকাল সকাল খাওয়া আমার অভ্যেস নেই কি না। আমি সচরাচর অনেক পরে খাই।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "না না, ঐ অভ্যেসটি করবেন না। অনেক রাত্রে এক পেট খেয়েই ঝুপ্ ক'রে শুয়ে পড়া মানে ডিস্‌পেপসিয়া নেমন্তন্ন ক'রে আনা। এই নিয়ে আমি ভুগেছি কি কম? থাকতাম মেসে, আড্ডা ছেড়ে উঠতে মন যেত না, কাজেই খেতে দেরি হয়ে যেত, তারপর যা ভোগ সুরু হ'ল।"

নৃপেন্দ্রবাবু তাঁহার অজীর্ণ রোগের দীর্ঘ ইতিহাস অতি বিশদভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। মিহির একমনে খাইতে লাগিল, যামিনী এক টুকরা পুডিং লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং প্রতাপ লজ্জায় ও বিরক্তিতে অস্থির হইয়া উঠিল। নৃপেন্দ্রবাবুরই বা কি আক্কেল? এই সব কথা এখন বলা কেন? যামিনী না জানি কত বিরক্ত হইতেছে। প্রতাপ এক জন অনাত্মীয় যুবক, প্রায় অপরিচিত বলিলেই হয়, তাহার সম্মুখে কেন এ সব আলোচনা? যামিনী যে একটা কথাও শোনে নাই, সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবিতেছে, তাহা বেচারা প্রতাপকে কেহ তখন দয়া করিয়া জানাইয়া দিলে তাহার অনেকখানি অকারণ মর্ম্মপীড়া বাঁচিয়া যাইত।

খাওয়া অবশেষে চুকিয়া গেল। যামিনী সর্ব্বাগ্রে টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল। প্রতাপের চোখের উপর ঘরটা যেন আঁধার হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত চিত্ত আকুল আগ্রহে ঐ অপস্রিয়মাণা তরুণীর সঙ্গে ছুটিয়া যাইতে চাহিতে লাগিল। নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া সে নৃপেন্দ্রবাবুর পিছন পিছন তাঁহাদের বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরটি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রথায় সজ্জিত। জান্‌লার পরদা হইতে মেঝের কার্পেটটি পর্য্যন্তও বিদেশী। অন্য সময় হইলে প্রতাপের মনটা বিদ্রোহ করিত, সে এ সকল সাহেবীয়ানার অত্যন্ত বিরোধী ছিল, এবং এ বিষয়ে কথা উঠিলে সে সর্ব্বদাই নির্ম্মম সমালোচনা করিত, কিন্তু আজ সে এ সব দেখিয়াও দেখিল না। কোণের দিকে একটি জরির কাজ করা সবুজ আচ্ছাদনে আবৃত বড় পিয়ানো। এইখানে তাহার চক্ষু সর্ব্বাগ্রে আকৃষ্ট হইল। মনে হইল এই প্রাণহীন বাদ্যযন্ত্রটা কি অসীম, কি আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের অধিকারী। নিত্য ইহার বক্ষে যে আলোকশিখার মত অঙ্গুলিগুলি নৃত্য করিয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ধ্বনি সৃষ্টি করে, তাহার কোন মূল্যই ত ইহার কাছে নাই? এই বিস্ময়কর মানবজীবনের পরিবর্ত্তে কয়েক মিনিটের জন্যও যদি প্রতাপকে কেহ রূপান্তরিত করিয়া বাদ্যযন্ত্রে পরিণত করিত, তাহা হইলে সে নিজের সৃষ্টি-কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিত। কবে কোথায় গান শুনিয়াছিল,

"আমারে কর তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন আঙুলে।"

সেই গানের সুর আর কথা এতকাল পরে তাহার মনের ভিতর ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

মিহির হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টার-মশায়, আপনি বাজাতে পারেন?"

প্রতাপ চম্‌কাইয়া উঠিল যদিও প্রশ্নটা নিতান্তই সাধারণ। নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "না ও সব শিখবার আর সময় হ'ল কখন? পড়াশুনো নিয়েই সব সময় কেটে গেছে।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমাদের দেশে গানবাজনাটা আর কেই-বা বেটাছেলেকে কষ্ট ক'রে শেখায়? ওটা যেন মেয়েদেরই একচেটে হয়ে উঠেছে। অথচ আমাদের দেশে কত বড় বড় ওস্তাদ জন্মগ্রহণ করে গেছেন, এখনও তাঁদের নামে লোকে নমস্কার করে। এটা একটা ফেলে দেবার জিনিষ নয়, কিন্তু মানুষে বোঝে না। আমার ছেলের গলা থাকলে, আমি তাকে শেখাতাম, কিন্তু ওর মোটে মিউজিকে টেষ্ট নেই।"

প্রতাপ দেখিল এখন গৃহস্বামীর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা না-বলিয়া উপায় নাই। তিনি আরাম করিয়া একটা বড় চেয়ারে বসিয়া, সবে পান চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং এখনই চট করিয়া উঠিবেন না। অগত্যা সেও একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "এ সব শেখান ব্যয়-সাপেক্ষও বটে, সেই জন্যেও অনেককে পিছিয়ে যেতে হয়। যেটুকু না শেখালে ছেলে ক'রে খেতে পারবে না, নিতান্ত ততটুকুই লোকে কোনমতে শেখায়।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা বটে, আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। কোনমতে মাথাগুঁজে থাকা, আর দুবেলা দুমুঠো খেতে

পাওয়া, এর বেশী আর কোন আকাঙ্ক্ষা তাদের নেই। তার উপর যদি দু-একটি মেয়ে রইল, তাহ'লে আর ভাবনা কি? একেবারে আহার-নিদ্রা ঘুচে যাবে মেয়ের বিয়ের ভাবনায়। সমাজ হয়েছে অতি অপকৃষ্ট। অন্য দেশের ভাল কিছু নেবে না, নিজের দেশের ভাল যা-কিছু ছিল, তা ভুলে গেছে, বাকি কতকগুলো কুপ্রথা আঁকড়ে খালি পড়ে আছে।"

প্রতাপ ভাবিল নৃপেন্দ্রবাবুর এ নিতান্তই অকারণ বলা কথা, কন্যাদায় কি জিনিষ তাহা তিনি জানেনও না এবং ইহজীবনে তাহা জানিবারও কোন সম্ভাবনা তাঁহার নাই। তাঁহার কন্যার জন্য কত মানুষে বরং আসিয়া তাঁহারই সাধ্যসাধনা করিবে। কাহার অদৃষ্টে সে অপূর্ব্ব রত্ন জুটিবে কে জানে? প্রতাপের বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা যেন সশব্দে আছাড় খাইতে লাগিল। পাগলের মত এ সব যা-তা ভাবিয়া তাহার লাভ কি? তবু নিজেকে কিছুতেই সে সংযত করিতে পারে না।

মিহির খানিকক্ষণ এধার-ওধার অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি করিয়া, কখন এক সময় চট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নৃপেন্দ্রবাবু নীরবে বসিয়া পান চিবাইতে লাগিলেন এবং প্রতাপ বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। পাশের ঘরে চাকরেরা সশব্দে বাসনকোসন সরান, টেবিল পরিষ্কার করা প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মগুলি করিয়া যাইতে লাগিল।

ছোট্টু আসিয়া খবর দিল, আয়া খাইবার জন্য নীচে আসিবে, এখন বাবুর একবার উপরে যাওয়া দরকার। নৃপেন্দ্রবাবু হাই তুলিয়া উঠিয়া পড়িয়া প্রতাপকে বলিলেন, "চলুন, যাওয়া যাক। আজ রাত্রে আপনার একটু দুঃখভোগ আছে। সারা রাত জাগতে হবে না, শেষের দিকে আমি এসে আপনাকে রিলিভ করব-এখন।"

প্রতাপ বলিল, "তার কিছু দরকার নেই। একরাত জাগা আমার পক্ষে মোটেই বেশী কিছু নয়। মেসে, হোটেলে যখন থেকেছি তখন কারও অসুখ-বিসুখ হ'লে আমি অন্যের পালাতে ইচ্ছে ক'রে নিজে জেগেছি। রাতে ঘুমই আমার কম। গরমকালে ত রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনার ছাত্রটিকে যদি কম ঘুমনোর বিদ্যাটা একটু শিখিয়ে দেন ত মন্দ হয় না। বেশী ঘুমনোর জন্যে সে তার মায়ের কাছে প্রায়ই বকুনি খায়।"

উপরতলায় দুজনে উঠিয়া আসিলেন। গৃহিণীর ঘরের দরজা খোলা, তবে রঙীন মোটা পর্দ্দায় আবৃত। আয়া কিস্‌মতিয়া পরদাটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, নৃপেন্দ্রবাবুকে দেখিয়াই পরদা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

ল্যাণ্ডিঙে একটি ছোট টেবিল এবং তাহার সামনে একটি ইজিচেয়ার। নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এইখানে বসে বিশ্রাম করুন, আয়া আধঘণ্টার মধ্যেই আসবে। এই কাগজটায় কখন কি দিতে হবে সব লেখা আছে, তাকে ব'লে ব'লে দিলেই সে সব ঠিক ক'রে যাবে। ঘুমিয়ে পড়ার উৎপাত ওর নেই, ভগবান ওকে ঘুম জিনিষটা দিতে একেবারেই ভুলে গেছেন। আপনাকে বই-টই কিছু পাঠিয়ে দেব?"

প্রতাপ তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, কিছু দরকার নেই। পড়তে গেলেই বরং আমার বেশী ক'রে ঘুম পাবে।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আমি খোকার ঘরে একটু শুয়ে পড়ি গে। দরকার হ'লেই আমাকে ডাকবেন।" তিনি মিহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

প্রতাপ ইজিচেয়ারে বসিয়া এধার-ওধার তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। আর একদিন সে উপরে উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সেদিনকার দারুণ উদ্বেগ ও উত্তেজনায় কোনদিকে আর তাকাইয়া দেখে নাই। তাহার পাশেই বড় ঘরখানি গৃহিণীর ঘর বুঝাই গেল, সামনে যেখানে নৃপেন্দ্রবাবু ঢুকিয়া গেলেন, তাহা মিহিরের ঘর। আর বাম দিকের ঐ যে ঘরখানি, যাহার রেশমী পরদার ভিতর দিয়া আলোর ধারা রঙীন হইয়া ল্যাণ্ডিঙে ছড়াইয়া পড়িতেছে, উহাই কি যামিনীর ঘর? কোন সাড়াশব্দ নাই, যামিনী কি জাগিয়া আছে না ঘুমাইতেছে? জাগিয়াই আছে বোধ হয়, না হইলে



কীর্ত্তন

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

তাহার ঘরের দরজা খোলা থাকিবে কেন? কিন্তু এত নীরবে সে কি করিতেছে? প্রতাপেরই মত বসিয়া নানা কথা ভাবিতেছে হয়ত। বিশেষ কাহারও কথা সে ভাবিতেছে কি? এত সুন্দরী, এমন মনোহারিণী সুশিক্ষিতা তরুণী, এতদিন কি কেহ তাহার কাছে প্রণয়-নিবেদন করে নাই? যামিনীদের সমাজে পূর্ব্বরাগের চলনই আছে, সুতরাং করিয়া থাকাই সম্ভব। কে তাহারা? প্রতাপের মাথা দপ দপ করিতে লাগিল। না, না, এ সব ভাবিয়া হইবে কি? সে কি জানে না যে, যামিনীর মনোজগতে কোনদিনই তাহার স্থান হইবে না? কিন্তু হায়, বুদ্ধি দিয়া সে যাহা বোঝে, হৃদয় দিয়া তাহা বুঝিতে পারে কই? যত চোখ ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করে ততই যেন-তাহা চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডের মত ঐ আলোকোদ্ভাসিত কক্ষদ্বারের দিকে ছুটিয়া যায়, মন যত অন্য দিকে লইয়া যাইতে চায়, ততই তাহা মধুমত্ত মধুকরের মত একটি অতিপ্রিয় নামের চারিদিকে গুঞ্জন করিয়া ফেরে। প্রতাপ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অতি লঘুপদক্ষেপে সিঁড়ির মুখের কাছটাতে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

(৯)

শীতের সকালে ঘুম সহজে কাহারও ভাঙিতে চাহে না, কিন্তু গৃহস্থের ঘরের বৌ-ঝির সে অধিকার নাই যে একটুখানি মধুর আলস্যচর্চ্চা করিবে। পিসিমা বৃদ্ধা তাঁহার আজন্মের অভ্যাস ছাড়িতে পারেন না, কাক-কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া বসেন। অগত্যা বধূকেও তাহাই করিতে হয়, বুড়ী শাশুড়ী উঠিয়া পাট সুরু করিয়া দিবেন, আর সে আরাম করিয়া শুইয়া থাকিবে, তাহা ত হয় না? যদিও ইহার জন্য বিরক্তিও তাহার মনে অনেকখানি সঞ্চিত হইয়া আছে।

বধূ সবেমাত্র উঠিয়া মুখেচোখে জল দিতেছে, এমন সময় সদর দরজায় ঠুক্ ঠুক্ করিয়া শব্দ হইল। কে আবার এখনই মরিতে আসিল? নীচের ভাড়াটেদের কেহ নাকি? তাহারা ত দিব্য নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছে, এখন তাহাদেরও দরোয়ানী বেচারী ভদ্রলোকের মেয়ে তাহাকেই করিতে হইবে নাকি? অত্যন্ত বিরক্ত-ভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়া বধূ হড়াৎ করিয়া দরজাটা একটান দিয়া খুলিয়াই দেখিল বাহিরে প্রতাপ দাঁড়াইয়া আছে। একটু অবাক হইয়া বলিল,"ওমা, ঠাকুরপো যে,এত সাততাড়াতাড়ি হাজির? সারারাত জেগে একেবারে হয়রাণ হয়ে গেছ নাকি? সত্যি এ তাদের অন্যায় বাপু, এমন ক'রে মানুষকে পেয়ে বসতে নেই। ছেলে পড়াতে রেখেছে ব'লে ত মাথা কিনে নেয়নি?"

প্রতাপ অত্যন্ত ম্লানভাবে হাসিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বলিল, "না, হয়রাণ হইনি, আমাকে বিশেষ কিছু করতে হয়নি, বসেই ছিলাম। তবে বাড়ির সকলেই উঠে পড়েছে, এখন আর আমার বসে থাকা ভাল দেখায় না, তাই চলে এলাম।" বলিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, রাজুর তখনও মাঝরাত্রি, আপাদমস্তক মোটা লেপে ঢাকা,নাকের ডগাটুকু মাত্র দেখা যাইতেছে। প্রতাপ একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিজের বিছানাটা টানিয়া পাতিয়া শুইয়া পড়িল। শরীর ত সর্ব্বদা মনের বশ নয়, ক্লান্তি তাহার খানিকটা হইয়াই ছিল। ঘুমাইবার তাহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই সে মিনিট-দুইয়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিল তাহার কানুর চীৎকারে। সকালে প্রায়ই দুধ খাওয়া লইয়া বাড়িতে একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়। কানু ষাঁড়ের মত গলা করিয়া চীৎকার করে, কানুর মা তাহার পৃষ্ঠে চড়চাপড় নির্ব্বিচারে বর্ষণ করেন এবং পিসিমা তাঁহাকে ক্রমাগত বকিয়া যান। কানু চেঁচাইতে গিয়াই কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে, চীৎকারের ফাঁকে ফাঁকে অনেকখানি দুধই তাহার পেটের ভিতর চলিয়া যায়।

প্রতাপ উঠিয়া পড়িল। বউদিদি চা আনিয়া দিয়া, ফিশ ফিশ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বড়লোকের বাড়ি কেমন নেমন্তন্ন খেলে, ঠাকুরপো?"

প্রতাপ বলিল, "মন্দ নয়, তবে চাকরবাকর কি আর তোমার মত রাঁধতে পারে?" বউদিদি মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজুর খবরের কাগজের বাতিক আছে। সকালে

কাগজখানা লইয়া আগে দুইভায়ে টানা-হেঁচড়া চলিত, এখন প্রতাপ তৃতীয় ভাগীদার জুটিয়াছে। আজ কিন্তু খবরের কাগজে তাহার মন ছিল না, কাগজখানা সামনে ধরিয়া সে গভীর চিন্তায় ডুবিয়া ছিল। গত রাত্রির মুহূর্ত্তগুলি আবার সে মানসপথে অতিক্রম করিতেছিল, তাহাদের সকল রস আবার পরিপূর্ণ করিয়া উপভোগ করিতেছিল। দেখিতে গেলে, রাত্রিটাতে কিছুই ঘটে নাই, কিন্তু প্রতাপের মনে হইতেছিল এমন রাত্রি তাহার জীবনে কখনও আসে নাই, আসিবেও না আর। যামিনীর এত কাছে আর কি সে কোনদিনও আসিতে পারিবে? সারারাত সে যেন প্রহরীর মত এই দেবী নিকেতনে জাগিয়া, তাহাকে সকল অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা করিতেছিল। যে-কাজে সে আসিয়াছিল, তাহার কথা বহুচেষ্টায় তাহার মনে করিতে হইতেছিল। নিতান্ত আয়া অতিশয় সাবধান, না হইলে জ্ঞানদার সেবা-শুশ্রূষা কেমন যে হইত, তাহা বলিবার নয়।

যতক্ষণ যামিনীর ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, ততক্ষণ প্রতাপের চোখে পলক পড়ে নাই। আলো যখন নিবিয়া গেল, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রতাপ বসিয়া পড়িল। সম্মুখের দীর্ঘ রাত্রি কেমন করিয়া তাহার কাটিবে? এত দূরে এত কাছে থাকিয়াও? যামিনী একরকম প্রতাপের অপরিচিতা বলিলেও হয়, কয়টা কথা মাত্র সে দায়ে পড়িয়া একদিন তাহার সহিত বলিয়াছে। কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে তাহার চেয়ে অন্তরতম আত্মীয়া কেহ নাই। তাহার সমগ্র জীবনের সঙ্গে যামিনীর সত্তা যেন মিশিয়া গিয়াছে। নিজেকে অনুভব করিবার ক্ষমতা যতদিন প্রতাপের থাকিবে, ততদিন যামিনী এমনিভাবেই তাহার মধ্যে জাগিয়া থাকিবে। অথচ বাহিরের জগতে তাহারা হয়ত চিরদিন এমনি অপরিচিতই থাকিয়া যাইবে।

আয়া থাকিয়া থাকিয়া বাহিরে আসিয়া প্রতাপকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সচেতন করিয়া যাইতেছিল। রাত্রি প্রায় একটা যখন, তখন সে প্রতাপকে ঘণ্টা-দুই ঘুমাইতে অনুরোধ করিয়া গেল। "আপ্ থোড়া শো যাইয়ে বাবু, আভি কুছ কাম নেহি হ্যায়।"

প্রতাপ ঘুমাইবে কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। নৃপেন্দ্রবাবুর কাছে সে সারারাত জাগিয়া থাকিবার কথা দিয়াছে, এভাবে ঘুমান তাহার উচিত হইবে না, যদিই কোন প্রয়োজন হয়? কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই মাথাটা তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

একেবারে ঘুমাইয়া না পড়িলেও, খানিকটা তন্দ্রা তাহার আসিয়াইছিল। হঠাৎ ভয়ানক চমকিয়া সে সোজা হইয়া বসিল। স্বপ্নই দেখিল, না সত্য? মৃদু লঘু পদক্ষেপে কে ঐ তাহার সম্মুখ দিয়া শরতের লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডের মত ভাসিয়া চলিয়া গেল? যামিনীই কি, না প্রতাপের আকুল আগ্রহই এমন করিয়া তাহার দৃষ্টিকে ছলনা করিল? কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার সংশয় ভঞ্জন হইল, ঘরের ভিতর ঐ ত যামিনীরই কণ্ঠ-স্বর, অতি মৃদুকণ্ঠে সে আয়ার সঙ্গে কথা বলিতেছে। জ্ঞানদার অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই ত? তাহা হইলে প্রতাপের অসাবধানতা কি অমার্জ্জনীয় হইবে না? যামিনী কি বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য প্রতাপ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, কিন্তু স্পষ্ট কোন কথা তাহার কানে আসিল না।

যামিনী আর আয়া বাহির হইয়া আসিল। প্রতাপ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপ শোয়া নেহি বাবু?"

প্রতাপ একটু হাসিয়া মাথা নাড়িল। হিন্দী বলা তাহার অভ্যাস ছিল না, যামিনীর সামনে ভুল হিন্দী বলিয়া বোকা বনিবার মারাত্মক একটা আতঙ্ক তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। যামিনী বলিল, "আপনি একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতেন, মা ভালই ছিলেন, এখন একটু নড়ছেন দেখলাম।"

যামিনী আবার যে তাহার সঙ্গে কথা বলিবে, ততটা আশা করিতে প্রতাপের ভরসা হয় নাই। মনে মনে সে নিজের অদৃষ্টকে সাধুবাদ করিতে লাগিল, ভাগ্যে সে ঘুমাইয়া পড়ে নাই। এমন স্বর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইলে, এ জীবনে সে-দুঃখ আর সে ভুলিতে পারিত না। যামিনীর কথার উত্তরে বলিল, "না, না জাগতে আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না, রাত-জাগা আমার অভ্যাস আছে।"

যামিনী আয়াকে মৃদু কণ্ঠে কি একটা বলিয়া, নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আয়াও তাহার সঙ্গে গেল। প্রতাপ আবার চেয়ারে বসিয়া নৃপেন্দ্রবাবুর দেওয়া কাগজখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। আরও ঘণ্টা-চার তাহাকে জাগিয়া থাকিতে হইবে। একখানা বই কি মাসিক পত্র থাকিলে মন্দ হইত না, মাঝে মাঝে উল্টাইয়া দেখা যাইত। মিহিরের ঘরের দরজা খোলা, সেখানে গিয়া খোঁজ করা যায়, তবে নৃপেন্দ্রবাবুর ঘুম ভাঙিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

আয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতে ধূমায়িত পেয়ালা। বিস্মিত প্রতাপের সামনে পেয়ালা পিরীচ নামাইয়া রাখিয়া সে বলিল, "মিস্ বাবা কফি ভেজ দিয়া" বলিয়া সে ফিরিয়া গৃহিণীর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

প্রতাপের তখনকার মনোভাব অবর্ণনীয়। স্বয়ং ইন্দ্রাণী অমৃতের পাত্রহস্তে আবির্ভূতা হইলেও সে এতখানি অভিভূত হইত কিনা সন্দেহ। পেয়ালাটি স্পর্শ করিতেও তাহার মন উঠিতেছিল না, চিরকাল যদি উহা রাখা যাইত, তাহা হইলে প্রতাপ উহা সযত্নে লুকাইয়া রাখিত। কিন্তু তাহাও হইবার নয়। যামিনীর দানের অমর্যাদা করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং কফি খাইতে একেবারেই অনভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সে পেয়ালাটি তুলিয়া আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগিল। কফি তাহার মুখে তিক্ত ও বিস্বাদ লাগিতে লাগিল, কিন্তু নিজের কাছেও নিজে সে তাহা স্বীকার করিল না। যামিনী তাহার কথা এতটুকুও যে স্মরণ করিয়াছে, তাহার কষ্ট লাঘব করিবার জন্য নিজে পরিশ্রম করিয়া কফি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছে, এই চিন্তাই তাহার সমস্ত দেহমনকে যেন অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। কি শুভক্ষণেই সে আজ রাত্রি জাগিতে আসিয়াছিল। কফির পেয়ালাটি শেষ করিতেই তাহার আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এখনও যেন উহাতে কাহার চম্পকাঙ্গুলির সুঘ্রাণ লাগিয়া আছে। প্রতাপের ইচ্ছা করিতে লাগিল, উহা বুকপকেটে লুকাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু জগতে ক'টা ইচ্ছাই বা পূর্ণ হয়? অগত্যা পেয়ালাটা নামাইয়া টেবিলেই রাখিয়া দিতে হইল।

বাকি রাত্রিটুকু আয়া ভিন্ন আর কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ সময় নৃপেন্দ্রবাবু সশব্দে গলা পরিষ্কার করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রতাপকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিলেন, "বসুন, বসুন, সারারাতটা ত ঠায় বসেই কাটিয়ে দিয়েছেন বোধ হয়? আপনাকে তাড়াতাড়ি একটু চা-টা করে দিক?"

প্রতাপ বলিল, "আজ্ঞে না, আমি বাড়িই যাই, একটু গড়াগড়ি দিয়ে উঠে তারপর চা-টা খাব। এত সকালে চা কোনদিনই ত খাই না।"

নৃপেন্দ্রবাবুকে আর ভদ্রতা করিবার অবসর না দিয়া সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পড়িল। যামিনীর ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, দ্বার তখনও বন্ধ। খবরের কাগজ হাতে প্রতাপের ধ্যান আর কতক্ষণ চলিত, তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু রাজু কাগজখানায় একটান দিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দিল। বলিল, "একটা কলমের দিকে ঠিক আধঘণ্টা তাকিয়ে আছ যে দেখি? বসে বসেই ঘুমচ্ছ নাকি?"

প্রতাপ চমকিয়া উঠিয়া কাগজখানা রাজুর হাতে ছাড়িয়া দিল। বলিল, "সারারাত জেগে এখনও মাথাটা ভার হয়ে আছে, কিছু কি আর চোখে দেখতে পাচ্ছি? যাই, সকাল সকাল স্নানটা করে নিই।"

রাজু বলিল, "এই ঠাণ্ডায় স্নান? তোমার মাথাই খারাপ দেখছি। নিতান্তই যদি স্নান কর, তাহ'লে বউদিকে বল একটু গরম জল করে দিতে।"

বউদিদির উপর অতখানি আবদার করিবার ভরসা প্রতাপের হইল না, সে নীচে নামিয়া গিয়া চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা কনকনে জলই টিনে করিয়া মাথায় ঢালিতে লাগিল। ঠাণ্ডায় তাহার মস্তিষ্কটা যেন জমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু মাথার ভারটা যেন কিছু কমিয়া গেল, তন্দ্রার ঘোরটাও ছুটিয়া গেল।

স্নান করিয়া বাহিরে আসিয়াই পড়িল পিসিমার সামনে। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ও কিরে এই শীতের দিনে এত ভোরে চান করলি? অসুখ করবে যে?"

প্রতাপ বলিল, "না-ঘুমিয়ে কেমন মাথা ভার হয়েছিল, তাই ধুয়ে ফেললাম।"

পিসিমা বলিলেন, "হবে না? যত সব অনাছিষ্টি। কার-না-কার অসুখ, ছেলে চল্‌ল রাত জাগতে।"

প্রতাপ ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। উত্তর দিলে পিসিমা হয়ত আরও অনেকগুলি অপ্রিয় সত্য কথা বলিবেন, যা শুনিতে প্রতাপের মোটেই ভাল লাগিবে না।

খাইয়া-দাইয়া সে তাড়াতাড়ি স্কুলে চলিয়া গেল। বাড়ি হইতে দিনকয়েক চিঠি পায় নাই, সে জন্য একটু চিন্তা ছিল, কিন্তু সে-চিন্তাকে পিছনে ঠেলিয়া গতরাত্রির কথাগুলিই তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া রহিল।

বিকালে মিহিরকে পড়াইতে গিয়া সে একবার গৃহিণীর খবর লইল। মিহির বলিল, "ভালই ত আছেন।" মায়ের অসুখের উপর সে মর্ম্মান্তিক চটিয়া গিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সকল দিকেই গোলযোগ, তাহার জোরে হাঁটা, জোরে কথা বলা প্রভৃতি সবই বারণ।

প্রতাপ একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, "যদি রাত্রে থাকবার আবার দরকার হয়, আমাকে বলো।"

মিহির অতি সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা।" প্রতাপের মনটা একটু দমিয়া গেল। মিহির অমন ভাবে উত্তর দিল কেন? সে কি কিছু সন্দেহ করিতেছে? এতটুকু ছেলের পক্ষে প্রতাপের মনোভাব বুঝিতে পারা কি সম্ভব? হইতেও পারে।

সেদিন আর পড়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সে ছাত্রের সঙ্গে কথাই বলিল না। নৃপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরের কয়েকদিন দেখাই হইল না, সুতরাং গৃহিণীর বিশেষ কোনো খবরই সে পাইল না এবং যামিনীকেও একটিবারও দেখিতে পাইল না।

ব্যর্থ আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠায় সে যখন প্রায় আবার মিহিরেরই শরণ লইতে উদ্যত, এমন সময় একদিন মিহির নিজে হইতেই বলিয়া বসিল, "জানেন মাষ্টার-মশায়, মা বোধ হয় চেঞ্জে চলে যাবেন, এখানে তাঁর শরীর কিছুতেই সারছে না।"

প্রতাপের হৃৎপিণ্ডটা লাফাইয়া উঠিয়া হঠাৎ যেন নীরব হইয়া গেল। একটু পরে সে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে যাবেন এখন? এই শরীরে একলা যাওয়া ত অসম্ভব।"

মিহির বলিল, "কি জানি, বাবাই যাবেন হয়ত," বলিয়াই সে অন্য একটা কথা পাড়িয়া বসিল।

মিহিরের পড়া সেদিন যা চমৎকার হইল, তাহা আর বলিবার নয়। প্রতাপের মনে তখন যেন প্রলয় আসিয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানদা একলা যাইতে পারিবেন না, শুশ্রূষার জন্য একজন কেহ সঙ্গে যাইবেই। যামিনীই যাইবে সম্ভবতঃ। আর প্রতাপকে থাকিতে হইবে পিছনে পড়িয়া। নিত্য এই বাড়িটাকে তাহাকে চোখে দেখিতে হইবে। প্রিয়ের প্রাণহীন দেহের মত, ইহা কি নিদারুণই তাহার দৃষ্টিতে ঠেকিবে। প্রতাপ পাঁচ-দশ মিনিট আগেই পড়ান শেষ করিয়া সেদিন উঠিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

মহারাণা প্রতাপসিংহ

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ

পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জাতির মধ্যে আবহমানকাল হইতে বীরপূজা চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা অতিমানব, শৌর্য্য ত্যাগ ভক্তি প্রেম কিংবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রাকৃত মানবের বহু ঊর্দ্ধে যাঁহাদের স্থান, মানস-মন্দিরে স্মৃতির অর্ঘ্যে মানুষ চিরকাল তাঁহাদের পূজা করিয়া আসিয়াছে এবং করিবেও; কেন-না ইহাতে মানুষের আত্মতৃপ্তি হয়, কর্ম্মে প্রেরণা আসে, ভাবোন্মাদনা দ্বারা ইহা তাহার অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির উৎস খুলিয়া দেয়। যতদিন ভারতবর্ষে বীরপূজা শাস্ত্রের বিধানে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল, ততদিন ভারত-মাতা সত্যই বীর-প্রসবিনী ছিলেন। পৌত্তলিক হিন্দু শুধু ইট-পাথরের পূজা করিয়া প্রাচীন কালে অর্থ ও পরমার্থ লাভ করে নাই; সেকালে বীরপূজাই ছিল হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ। অন্য কোন জাতির তুলনায় বীরের মাহাত্ম্য হিন্দু কম বুঝে নাই। যিনি বীর তিনি নিত্যমুক্ত; দেশ, ধর্ম্ম ও জাতির কল্যাণের জন্য শস্ত্রপূত হইয়া যিনি দেহত্যাগ করেন তাঁহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি নিষ্প্রয়োজন, তিনি অপুত্রক হইলেও তাঁহার পুন্নাম নরকের ভয় নাই; তর্পণাদি লোপের আশঙ্কা নাই। তবে শাণিত তরবারিতে যাহারা পৃথিবীর বক্ষে রক্ত-গঙ্গা বহাইয়া শুধু নিজেদের বিজিগীষা ও সাম্রাজ্যতৃষ্ণা মিটাইয়াছে, হিন্দুর চক্ষে তাহারা বীর নহে,—দানব কিংবা রাক্ষস; হিন্দুধর্ম্মে তাহাদের পূজার বিধান নাই; থাকিলে আমরা রাবণ কিংবা জরাসন্ধের পূজা করিতাম। শান্তনু-পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যোদ্ধগণের অগ্রণী ছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার পূজা করি না, অঙ্কগত রাজলক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান ও আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া ত্যাগ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আদর্শ রাজভক্তির দ্বারা তিনি সমগ্র জাতির হৃদয় জয় করিয়াছিলেন; এজন্যই হিন্দুর তর্পণ-বারিতে তাঁহার প্রথম অধিকার। কার্লাইলের সংজ্ঞানুসারে বীর-রাজ হিসাবে (hero as king) হিন্দুরা দশরথ-নন্দন রামের পূজা করে। মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য ইত্যাদি ত্রিকাল-দর্শী, মন্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্রবেত্তা ঋষিগণ আমাদের 'প্রফেট' বা পয়গম্বর-স্থানীয় বীর—এজন্য শাস্ত্রানুসারে তাঁহারাও পূজ্য। নরমুণ্ডস্তূপ, অখণ্ড দিগ্বিজয় কিংবা সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকার ভারতবর্ষে বীরত্বের পরিমাপক নহে—মহান্ ত্যাগই বীরত্বের মাপকাঠি। যোদ্ধা, রাজা, ঋষি, কিংবা নীতিবিৎ—যিনিই হউন না কেন, যাঁহার ত্যাগ যত বড়, বীর-পর্য্যায়ে তাঁহার স্থান তত উচ্চে।

নব্য ভারত বীরপূজায় ব্রতী. সেকাল ও একালের পূজার বিধান এক নহে। এজন্য বীরগণের সাম্বৎসরিক জয়ন্তী ভারতবর্ষের নানা স্থানে কয়েক বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে. প্রতাপ-জয়ন্তী ইহারই অন্যতম। কিন্তু যাঁহারা ভাবের প্রেরণায় প্রতাপ-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাটক, উপন্যাস অথবা উপন্যাসমূলক ইতিহাসের ভিতর দিয়া মহারাণা প্রতাপকে দেখিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় মহামতি টডের 'রাজস্থান'—যাহা এতদিন আমরা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া মনে করিয়াছি—উহার অধিকাংশ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা বাল্যকাল হইতে যে-সমস্ত কথা অবিসংবাদী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি—যথা, প্রতাপ ও শক্তসিংহের বিরোধ, শক্তসিংহের নির্ব্বাসন, কুমার মানসিংহের অপমান, 'খোরাসানী মুলতানীকা অগ্‌গল', বীর শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষা, ভীলদের আশ্রয়ে সপরিবারে প্রতাপের গিরিগুহায় বাস, দারিদ্র্য-পীড়িত ভগ্নহৃদয় প্রতাপের মেবার-ত্যাগের সঙ্কল্প, চিতোর-উদ্ধারের জন্য প্রতাপের সন্ন্যাসব্রত ও শপথ ইত্যাদি—সেকালের ভাট চারণের কল্পনামূলক কাব্য নাটকের মনোরম শাখাপল্লব বলিয়া এখন আমাদের সন্দেহ হয়। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ অশুদ্ধ হইলেও

মিথ্যা হইতে পারে না; মহাভারত কাব্য হইলেও ৃ হয়ত কাল্পনিক নহেন। মহামতি টডের 'রাজস্থান' ৰ্ণ হইতে পারে; কিন্তু মহারাণা প্রতাপের বীরত্ব, াভিমান ও স্বাধীনতার উপাসনা সীমাহীন কল্পনা-রের সুদূর আলেয়া-ভ্রান্তি নহে। সমস্ত ভারতবর্ষ দন মিথ্যার উপাসনা করে নাই; স্তাবকের ছন্দে ার বাতাসে মহারাণা প্রতাপের মিথ্যা খ্যাতি কথায় ৷ পল্লবিত উঠে নাই—ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের পাদ্য বিষয়।

এই প্রবন্ধের অনেক স্থলে মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর চাঁদ ওঝার মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কারণ এ যুগে ্ত-ইতিহাসে তিনিই গুরুস্থানীয়। তাঁহার ণাপূর্ণ 'রাজপুতানেকা ইতিহাস' বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা ণ্য গ্রন্থ। তবে কোন কোন স্থলে গৌরীশঙ্করজীর ; আমাদের কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। মুসলমান-পক্ষের যত সাক্ষ্য প্রমাণ মহারাণা প্রতাপের অকীর্ত্তিজনক া পণ্ডিতজীর ধারণা জন্মিয়াছে, তিনি সেগুলি সঙ্গত । ছাড়া অবিশ্বাস করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

আকবর ও তাঁহার সমসাময়িক ভারতবর্ষের ইতিহাস বে ঐতিহাসিক আবুল-ফজল রচিত 'আকবরনামা'] গ্রন্থ। মহারাণা প্রতাপ সম্বন্ধে ইহাতে ৃ লিখিত আছে তাহাই ইতিহাস। একমাত্র ুত-কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়া টড্ ব পদে পদে ভুল করিয়াছেন। আবুল-ফজলের বরনামা'য় সকল ঘটনার সঠিক বর্ণনা নাই বলিয়া া আবুল-ফজলকেই মিথ্যাবাদী বলিয়া থাকি। তপক্ষে দোষ আবুল-ফজলের নহে; তিনি মিথ্যাকথা া ভুলেন নাই। 'আইন-ই-আকবরী' পাঠে জানা মোগল-দরবারের ঘটনা, বিভিন্ন কর্ম্মচারী ও বদারগণের মৌখিক বিবৃতি ইত্যাদি কেরাণীরা যাহা ত কিংবা শুনিত তাহার একবর্ণ ব্যতিক্রম না করিয়া ায়া রাখিত। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অন্য কর্ম্মচারীরা লেখাগুলির সারাংশের কয়েকটি প্রতিলিপি তৈয়ার া উজীরের দপ্তরে দাখিল করিত। মোগল-দরবারের হাস—'আকবরনামা','বাদশানামা' ইত্যাদি—এই সমস্ত সংবাদলিপি (news sheets)-অবলম্বনে লিখিত। এখন যদি কুমার মানসিংহ প্রতাপসিংহের কাছে অপমানিত হইয়া সম্রাটের প্রকাশ্য দরবারে বলেন, 'জাঁহাপনা! প্রতাপসিংহ আমাকে খুব খাতির করিয়াছেন এবং হুজুরের খেলাৎ পরিধান করিয়া শাহানশার তাজিম করিয়াছেন,' তাহা হইলে এই ঘটনার দশ-পনের বৎসর পরে ঐ তারিখের দরবারী সংবাদলিপি পড়িয়া ইহা অবিশ্বাস করা কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব কি?—বিশেষতঃ ইহার সত্যতা যাচাই করিবার যখন অন্য কোন উপায় থাকে না। কিন্তু পূর্ব্বসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আবুল ফজলকে কিংবা দরবারী সংবাদলিপিগুলিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়।

দ্বিতীয় কথা, মহারাণা প্রতাপের সমসাময়িক মোগল-দরবারের একাধিক ইতিহাস আছে; কিন্তু মেবারের কোন ইতিহাস নাই, আছে শুধু ভাটের কাহিনী ও কবিতা। কাব্যকে যদি ইতিহাস-রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে মহারাণা প্রতাপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ইতিহাস প্রতাপের পুত্র অমরসিংহের সময়ে লিখিত 'অমর-কাব্য'। দুঃখের বিষয়, উহার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এক্ষেত্রে মুসলমান-লেখকেরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার মত উপযুক্ত প্রমাণ না থাকিলে উহাই গ্রহণ করা বিচারসম্মত; যেমন, আমরা বহুদিন হইতে টডের 'রাজস্থানে' পড়িয়া আসিতেছি যে, হলদীঘাটের যুদ্ধে মহারাণা প্রতাপের ঘোড়া "চৈতক [চেটক] মানসিংহের হাতীর মাথায় পা তুলিয়া দিয়াছিল"; অথচ ইহা টড সাহেব চাক্ষুষ দেখেন নাই, কিংবা কোন প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত কোনও বিবরণও সম্ভবতঃ তিনি দেখেন নাই। আকবরের দরবারী ইমাম-মুল্লা আব্দুল কাদের বদায়ূনী হলদীঘাটে প্রতাপের প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক-পাঠে মনে হয় হলদীঘাটে রাণা প্রতাপ এবং মানসিংহ —উভয়েরই মধ্যে আদৌ দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই; প্রতাপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন মানসিংহের বড় ভাই মাধোসিংহের সঙ্গে! এস্থলে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তাহা পাঠক বিচার করিবেন।

সম্রাট আকবর কর্তৃক চিতোর-দুর্গ অধিকারের পর মহারাণা উদয়সিংহ চার বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের ২৮-এ ফেব্রুয়ারি গোগুন্দা গ্রামে তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার বিশ জন রাণী এবং তাঁহাদের গর্ভজাত পচিশটি পুত্র ও বিশটি কন্যা ছিল; তাঁহার সন্তানদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন কুমার প্রতাপ সিংহ। পলাতক উদয় সিংহ কুম্ভলমীর বা কমলমীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে, মাড়বার-রাজ্যের অন্তর্গত পালির সামন্ত চৌহান্ অখৈরাজ সোন্‌গরার কন্যার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। বিবাহের তিন বৎসর পরে চৌহান কুমারীর গর্ভে—সম্ভবতঃ কুম্ভলমীর-দুর্গে প্রতাপসিংহের জন্ম হয়। প্রতাপের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।



মহারাণা প্রতাপসিংহ

মেবারের অপ্রকাশিত ইতিহাস 'বীর-বিনোদ'-প্রণেতা শ্যামলদাসজী প্রতাপের জন্ম ১৫৯৬ বিক্রম সম্বৎ, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-ত্রয়োদশী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল অক্লান্তকর্ম্মা ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা আজমেরের চণ্ডু নামক এক জ্যোতিষীর কাছে রাণা প্রতাপের জন্ম-কোষ্ঠী আবিষ্কার করিয়াছেন। গৌরীশঙ্করজী ছাড়া অন্য কেহ একথা বলিলে আমরা ইহাকে 'ভৃগু-সংহিতা'র গণনার মত সন্দেহ করিতাম। এই কোষ্ঠী অনুসারে ১৫৯৭ বিঃ সঃ জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-তৃতীয়া রবিবার (৯ই মে, ১৫৪০ খৃঃ) সূর্য্যোদয়ের ৪৭ দণ্ড ১৩ পল গতে কুমার প্রতাপসিংহ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, মহারাণা উদয়সিংহের রাজত্বকাল ঘটনাবহুল হইলেও তিনি বাঁচিয়া থাকিতে কুমার প্রতাপ-সিংহ বত্রিশ বৎসরের মধ্যে বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়ার কোন সুযোগ লাভ করেন নাই। বস্তুতঃ প্রতাপের পঞ্চজীবনে এই বত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইডরের রাও নারায়ণদাস রাঠোরের কন্যার সহিত বিবাহ এবং এই স্ত্রীর গর্ভে প্রথম পুত্র অমর-সিংহের জন্ম (১৬ই মার্চ্চ, ১৫৫৯ খৃঃ) ব্যতীত কোন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। মহারাণা উদয়-সিংহ কনিষ্ঠা ভটিরাণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এই জন্য তিনি এই রাণীর গর্ভজাত জগ-মালকে তাঁহার উত্তরাধি-কারী নির্ব্বাচন করিয়া-ছিলেন। শিবাজী ও শের শার মত রাণা প্রতাপও বোধ হয় পূর্ব্বজীবনে পিতার অবিচার ও তাচ্ছিল্য এবং বিমাতার ঈর্ষায় অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলেন। মহারাণা উদয়সিংহের প্রতি অন্যান্য পুত্রগণ বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। পিতার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া অমর্ষপরায়ণ শক্তসিংহ মেবার ত্যাগ করিয়া সম্রাট আকবরের নিকট চলিয়া গেলেন (১৫৬০ খৃঃ); ইহাই আকবর-কর্তৃক চিতোর-আক্রমণের অন্যতম কারণ।

মহারাণা উদয়সিংহের চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত না হওয়া

পর্য্যন্ত তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী জগমাল কয়েক ঘণ্টা গদীতে বসিয়াছিলেন। মহারাণার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জগমালকে অনুপস্থিত দেখিয়া গোয়ালিয়র-রাজ রাম শাহ্ উঁবর কুমার সগরজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জাগমাল কোথায়?'

সগরজী বলিলেন, "কেন? আপনি কি জানেন না স্বর্গীয় মহারাণা তাঁহাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত * করিয়া গিয়াছেন।"

ইহাতে প্রতাপের মাতামহ অখৈরাজ সোনগরা সলুঁবর (সালুম্বা)-পতি রাবত কিষণদাস ও রাবত সাঁগাকে বলিলেন, "আপনারা চুণ্ডার বংশধর, অতএব এ কাজ আপনাদের সম্মতিক্রমে হওয়া উচিত ছিল। শিয়রে আকবরের মত প্রবল শত্রু; চিতোর হস্তচ্যুত; মেবার-রাজ্য ছারখার; এ অবস্থায় যদি ঘরোয়া বিবাদ বাড়িয়া যায় তবে রাজ্য-নাশ সুনিশ্চিত।"

রাবত কিষণদাস এবং সাঁগা বলিলেন, "জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রতাপসিংহ,—যিনি সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য, তিনি-ই মহারাণা হইবেন।" উদয়সিংহের দাহক্রিয়া হইতে ফিরিয়া গিয়া জগমালকে বলিলেন, "কুমার! আপনার আসন গদীর সম্মুখে; ঐখানেই বসা আপনার উচিত।" এ-কথা শুনিয়া জগমাল সপরিবারে মেবার ত্যাগ করিলেন। সর্দ্দারেরা ঐ দিনই প্রতাপকে গদীতে বসাইয়া নজরানা দিলেন। (২৮-এ ফেব্রুয়ারি, ১৫৭২ খৃঃ)।

মহারাণা প্রতাপের রাজ্যারোহণের এই বর্ণনা অনেকটা নাটকীয় ব্যাপারের মত মনে হয়। শুধু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এ-ভাবে একটা ওলট্-পালট্ হওয়া সম্ভব নয়, যদি ইহার পশ্চাতে কোন পূর্ব্ব ষড়যন্ত্র না থাকে। প্রথম হইতেই বোধ হয়, প্রতাপের মাতামহ মেবারের গদীতে নিজের দৌহিত্রের জন্মগত অধিকার রক্ষা করিবার জন্ত মেবার-সামন্তগণের মধ্যে একটা দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এবং ইহারা যে বেশ প্রস্তুত হইয়া মহারাণা উদয়সিংহের মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক প্রতাপ স্বয়ং কখনও তাঁহার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। জগমালের সপক্ষে বোধ হয় বিশেষ

* রাজার উত্তরাধিকারীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় না যাওয়া মেবারের চির-প্রচলিত প্রথা (রাজপুতানেকা ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩৫, পাদটীকা ৩)

কেহ ছিল না। তিনি স্বেচ্ছায় মেবার ত্যাগ করিয়া আকবরের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ দেশদ্রোহী জগমালকে মোগলবিজিত মেবারের জাহাজপুর পরগণা জাগীর প্রদান করিয়া কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিলেন। গোগুন্দায় গদীতে বসিবার কয়েক মাস পরে কুম্ভলমীর-দুর্গে প্রতাপের অভিষেকোৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইল। প্রবল মোগলশক্তির সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য, কিন্তু বলসঞ্চয় করিবার জন্য মেবারের পক্ষে কিঞ্চিৎ অবসর নিতান্ত প্রয়োজন। আকবর যাহাতে সহসা মেবারের বিরুদ্ধে অভিযান না করেন, সেজন্য প্রতাপ তাঁহার সমস্ত শক্তি ও নীতি প্রয়োগ করিলেন।

মহারাণা প্রতাপের রাজ্যাভিষেকের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত সম্রাট্ আকবর গুজরাট ও সুরাট-বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট রাজধানী ফতেপুর সিক্রী প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় সিদ্ধপুর হইতে (আমেদাবাদের চৌষট্টি মাইল উত্তরে অবস্থিত) কুমার মানসিংহকে * কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান মনসবদারের সহিত ইডরের পথে ডুঙ্গরপুরের দিকে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষগণের প্রতি আদেশ ছিল যেন রাণা (প্রতাপ সিংহ) এবং নিকটস্থ ভূস্বামিগণকে রাজোচিত ব্যবহার ও অনুগ্রহে বশীভূত করিয়া বাদশাহী দরবারে কুর্ণিশ করিবার জন্য সঙ্গে আনে এবং যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিবে না তাহাদিগকে যেন দণ্ড দেওয়া হয়। (*Akbarnama*, Eng. trans. Beveridge, iii. 48.)

ইডরের রাও নারায়ণ রাঠোর মহারাণা প্রতাপের

* রাজা মানসিংহ ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও 'আকবরনামা'র ইংরেজী অনুবাদক বেভারিজ সাহেবের অনবধানতায় তাঁহার বাপের নাম কোথাও ভগবান দাস, আবার কোথাও বা ভগবন্ত দাস লেখা হইয়াছে। বেভারিজ সাহেব দুজনকে একই ব্যক্তির নামের রূপান্তর মনে করিয়া বাপের পিণ্ড খুড়োকে দেওয়ার মত কাজ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ দাস ও ভগবন্ত দাস রাজা ভারমল বা বিহারীমলের দুই ছেলের নাম; রাজা ভারমলের উত্তরাধিকারী ভগবান দাস অপুত্রক হওয়ায় ভগবন্ত দাসের দ্বিতীয় পুত্র মানসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। ভগবন্ত দাসও মোগলদরবারে চাকরি করিতেন এবং লোকের কাছে 'বাঁকা রাজা' (obstinate prince) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। (মুন্সী দেবীপ্রসাদ রচিত প্রাচীন চিত্রাবলী: রাজা ভারমল চরিত দ্রষ্টব্য)

শ্বশুর ; পরমবৈষ্ণব এবং তেজস্বী বীরপুরুষ। কথিত আছে, তিনি স্বহস্তে গো-সেবা করিয়া গোবরের সহিত যে ধান্যাদি বাহির হইত তাহার তণ্ডুল দ্বারা প্রাণধারণ করিতেন। তিনিও বহুদিন আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ডুঙ্গরপুর-রাজ্যে (মেবারের দক্ষিণ-পূর্ব্বে আরাবল্লীর উপত্যকাভূমিতে অবস্থিত) গহ্লোৎ প্রধান শাখার বংশধর মহারাবল অস্করণও এ যাবৎ নিজের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মালব ও হাড়াবতী, উত্তরে আজমের মেরওয়াড়া, দক্ষিণে সৌরাষ্ট্র, পশ্চিমে মারবাড় ও গুজরাট প্রদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আরাবল্লীর দুর্গম অরণ্য ও পর্ব্বতশিখর হিন্দু-স্বাধীনতার শেষ আশ্রয় হইয়া উঠিল।

আকবর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি জানিতেন হাড়া, কচ্ছবাহ, রাঠোর শুধু বেতস-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মোগলশক্তির কাছে অবনত হইয়া আছে ; সুযোগ পাইলেই আবার মাথা তুলিবে ; সুতরাং জাতির মানসপট হইতে স্বাধীনতার আদর্শ মুছিয়া না ফেলিলে, রাজপুত-গৌরব ও স্বাধীনতার শেষ অগ্নিকণা না নিবিলে তাঁহার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য নিরাপদ নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যতদিন মেবারের মুকুটমণি মোগল-সিংহাসনের পাদপীঠ স্পর্শ না করিবে ততদিন অন্যান্য রাজপুতের মস্তক নত হইলেও মন নুইয়া পড়িবে না ; রাজপুত জাতির মেরুদণ্ড অনমনীয়ই থাকিবে। এজন্যই ক্ষুদ্র মেবার-জয়ের জন্য মোগল-সম্রাটের এত বলবতী ইচ্ছা—এত আয়োজনের ঘটা।

কুমার মানসিংহ সিদ্ধপুর হইতে ইডরে আসিয়া রাও নারায়ণ দাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মোগল-সম্রাটের সঙ্গে সহসা যুদ্ধ করা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া তিনি মানসিংহকে আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন এবং ভবিষ্যতে সুবিধামত বাদশার দরবারে হাজির হওয়ার মৌখিক ইচ্ছাও জানাইলেন। মোগল-সৈন্য সেখান হইতে ডুঙ্গরপুর পৌঁছিল। ডুঙ্গরপুরের মহারাবল অস্করণ মানসিংহের হস্তে পরাজিত হইয়া আরাবল্লী পর্ব্বতে পলাইয়া গেলেন। কুমার মানসিংহ ডুঙ্গরপুর (টড্-কথিত দাক্ষিণাত্যের শোলাপুর নয়) বিজয় করিয়া ঐ বৎসর (১৫৭৩ খৃঃ) আষাঢ় মাসে উদয়পুরে যাত্রা করিলেন। মহারাণা প্রতাপ কুম্ভলমীর হইতে উদয়পুর আসিয়া বিশিষ্ট অতিথিভাবে তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ইহার পর কি ঘটিয়াছিল এই সম্বন্ধে রাজপুত ও মোগল পক্ষের বিবরণে ঘোরতর অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

টড-কথিত বর্ণনা অর্থাৎ উদয়-সাগর-তীরে কুমারের সম্মানার্থ ভোজের আয়োজন, মানসিংহের সহিত পংক্তি-ভোজনে রাণার অস্বীকৃতি, বিনাভোজনে মানসিংহের প্রস্থান ; গমনকালে কুমারকে গালাগালি, এবং আবার মেবারে আসিবার সময় তাঁহার পিসা আকবরকে সঙ্গে আনিবার বিদ্রূপ ইত্যাদি রাজপুতানার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্যামলদাসজী এবং গৌরীশঙ্করজী মোটামুটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তবে গৌরীশঙ্করজী বলেন, ভোজনের সময় রাণার অজুহাত ছিল মাথাধরা নয়—অগ্নিমান্দ্য, যেহেতু রামকবি-প্রণীত জয়সিংহ-চরিত্রে আছে :—

> কহী গরাণী কী কুঁবর জই গরাণী তোহি।
> অটক নহী কর দেউংগো তুরণ চুরণ তোহি॥
> দিয়ো ঠেল কাংসো কুঁবর উঠে সহিত নিজ সাথ।
> চুলু আঁন ভরি হোঁ কহে৷ পোঁছ রুমালন হাথ॥

অর্থাৎ, কুমার বলিলেন 'গরাণা' যাহাই হউক না কেন আমি শীঘ্রই আপনাকে হজমী চূর্ণ দিতেছি। পশ্চাৎ কুমার কাঁসার থাল ঠেলিয়া ফেলিয়া সহযাত্রীগণের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রুমালে হাত মুছিয়া বলিলেন—আচমনের গণ্ডুষ আর একবার আসিয়া করিব।

ইহা ছাড়া 'রাজপ্রশস্তি'-কাব্যেও এই আখ্যানের ইঙ্গিত আছে—

> প্রতাপ সিংহোঽথ নৃপ কচ্ছবাহেন মানিনা।
> মানসিংহেন তত্রাসীদ্বৈমনস্যং ভুজেবিধৌ॥
> অকবরপ্রভোঃ পার্শ্বে মানসিংহস্ততো গতঃ

(রাজপ্রশস্তি-কাব্য, সর্গ ৪)।

অর্থাৎ, মানী কচ্ছবাহ মানসিংহের সহিত ভোজনবিধি ব্যাপারে প্রতাপসিংহের সহিত বৈমনস্য ছিল। সে স্থান হইতে তিনি প্রভু আকবরের কাছে গমন করিলেন।

কিন্তু কুমার মানসিংহ উদয়পুর হইতে ফিরিয়া গিয়া

সম্রাট আকবরের কাছে মহারাণা প্রতাপের আচরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্তরূপই বলিয়াছিলেন ; যথা :

"From there the army went...to Udaipur which is the native country of the Rana. The Rana came to welcome them, and received him with respect and put on the royal khilat. He brought Man Singh to his house as guest, but owing to his evil nature he proceeded to make excuses * (about going to court), alleging that 'his well-wishers would not suffer him to go.' He made promises about going to the sublime court, but raised objections, and gave Man Singh leave to depart, while he himself stayed and procrastinated." (*Akbarnama*. iii. 57).

গৌরীশঙ্করজী বলেন, প্রতাপসিংহ বাদশাহী খেলাৎ পরিধান করার কথা দূরে থাক আকবরকে বাদশাহ বলিতেন না, বলিতেন তুর্ক ; উক্ত বর্ণনা চাটুকার আবুল-ফজল বাদশাহর মহত্ত্ব বাড়াইবার জন্য মিথ্যা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পণ্ডিতজীর নিরপেক্ষ বিচার অপেক্ষা উষ্মাই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বিচারের প্রয়োজন। প্রথম প্রশ্ন, রাজপুত ও মোগল বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টি বিশ্বাসযোগ্য ? প্রথম কথা, আবুল-ফজল একান্ত সমসাময়িক ঐতিহাসিক ; রাম কবির রচনা এবং রাজপ্রশস্তি-কাব্য নিতান্ত কমপক্ষে এই ঘটনার আশি-নব্বই বৎসর পরে লিখিত ; অধিকন্তু এই রচনাগুলি ইতিহাস নহে—কাব্য মাত্র। ঐতিহাসিক বিচারে হিন্দুরচিত কাব্যকে মুসলমান-লিখিত প্রামাণ্য ইতিহাসের উপরে স্থান দেওয়া নিঃসন্দেহ অবিচার। দ্বিতীয়তঃ, "শক্তসিংহ কর্তৃক খোরাসানী মুলতানীকে বধ করিয়া প্রতাপের জীবনরক্ষার কথা" রাজপ্রশস্তি-কাব্যে থাকিলেও গৌরীশঙ্করজী বলেন উহা বিশ্বাস্য নয়,—মিথ্যা জনশ্রুতিই ছন্দোবদ্ধ হইয়া রাজপ্রশস্তি-কাব্যে স্থান পাইয়াছে। মানসিংহের অপমান এবং হলদীঘাটের যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র তিন বৎসর, সুতরাং "খোরাসানী মুলতানীকা অগ্‌গল" মিথ্যা হওয়া সম্ভব হইলে, প্রতাপের পেটব্যথা বা মাথাধরাও মিথ্যা হওয়া বিচিত্র নয়। যদি বলা হয়, মেবারের লোকেরা না-হয় কচ্ছবাহদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য এ গল্প সৃষ্টি করিয়াছে ; কিন্তু কচ্ছবাহ-কবির মানসিংহের অপমানের কথা চিরস্মরণীয় করিবার কি কারণ থাকিতে পারে ? রাম কবির বর্ণনায় মানসিংহের অপমান অপেক্ষা তেজ ও আত্মসম্মানই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে ; নিন্দা মানসিংহের নহে, নিন্দা মহারাণা প্রতাপের। টড সাহেব ইহা বুঝিয়াও বোঝেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,

"Rajah Man was unwise to have risked this disgrace; and if the invitation went from Pratap, the insult was ungenerous as well as impolitic: but of this he is acquitted."

আমরা বুঝি না কেমন করিয়া প্রতাপ নিন্দার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। মোট কথা, গৃহাগত অতিথিকে অপমানিত করিবার জন্য ভোজের আয়োজন, এবং প্রস্থানকালে মানসিংহ ও আকবরকে দু-দশটা গালাগালি দেওয়া নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা,—উপন্যাস মাত্র। যে চারণ এই মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়াছিল সে স্তাবক হইয়াও বুদ্ধির দোষে মহারাণা প্রতাপের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে বৃথা কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। তাহা মুছিতে হইলে ঐতিহাসিকগণকে বেগ পাইতে হইবে।

আমরা মনে করি, মানসিংহের নিমন্ত্রণ ও অপমানের ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা ; ইহাতে মানসিংহ ও প্রতাপের সাক্ষাৎকার ছাড়া অন্য একবর্ণও সত্য নয়। টড্ সাহেব হইতে গৌরীশঙ্করজী পর্য্যন্ত যে গল্পটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, নিম্নলিখিত কারণে তাহা আমরা ভিত্তিহীন কবিকল্পনা বলিয়া মনে করি।

১। মানসিংহ প্রতাপের সাক্ষাৎকারের মাত্র তিন মাস পরে রাজা ভগবান দাস (ভগবন্ত নয়) ইডরের পথে সম্রাটের আদেশে আবার মেবারে গিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপ গোগুন্দায় আসিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। মানসিংহ সত্যই যদি ঐ ভাবে অপমানিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতার পক্ষে তিন মাসের

* এ স্থলে uzr শব্দকে ghadr পড়াতে এই ঘটনাটি ইলিয়টের (vol. VI. 42) অনুবাদে বিরূপ হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যেন প্রতাপ মানসিংহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বা দাগাবাজী করিতে চাহিয়াছিলেন। এ স্থলে গৌরীশঙ্করজী বেভারিজের 'আকবরনামা'র অনুবাদ ও পাদটীকা বোধ হয় বিশেষভাবে বিচার করেন নাই।

মধ্যে আবার মিত্রভাবে প্রতাপের সহিত দেখা করা কি সম্ভবপর ?*

পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী 'আকবরনামা' হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন ; কিন্তু উপরে বর্ণিত কথাগুলি ইচ্ছাক্রমে কিংবা অনবধানতাবশতঃ তিনি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই। মহারাণা প্রতাপ যুবরাজ অমরসিংহকে রাজা ভগবান দাসের সহিত আকবরের দরবারে পাঠাইয়াছিলেন এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় ; কেন-না, আবুল-ফজলের সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক নিজাম-উদ্দীন আহমদ, কিংবা বদায়ুনী এ-কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহা যদি সত্য হইত, তবে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনী বা 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে মেবার-বিজয় প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই ইহার উল্লেখ করিতেন ; এবং কুমার কর্ণসিংহের মোগল-দরবারে আগমনে বিজয়ের আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন না। স্বয়ং আবুল-ফজলও তাঁহার পুস্তকের আর কোন স্থানে অমরসিংহের মোগল-দরবারে আগমনের কথা লেখেন নাই। সুতরাং প্রতাপসিংহ পুত্রকে মোগল-দরবারে পাঠাইয়াছিলেন এ কথাটি মিথ্যা। তাহা হইলে হয়ত সকলে বলিবেন, উপরি উক্ত সব কথাই মিথ্যা—আবুল-ফজলের চাটুবাদ মাত্র।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, একজন রাজকুমার রাজা ভগবান দাসের সঙ্গে সত্যই আকবরের দরবারে কুর্নিশ করিতে আসিয়াছিলেন ; রাজপুত্রের নাম অমরসিংহ হইতেও পারে ; কিন্তু এ অমরসিংহ মহারাণা প্রতাপের পুত্র নহেন,—শ্যালক—ইডরের রাও নারায়ণ দাস রাঠোরের উত্তরাধিকারী। 'আকবরনামা'-অনুবাদক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেবের বিচার-বিভ্রাটে এই ভুলটি হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে অনুবাদের পাদটীকায় অমর-সিংহ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"The Lucknow edition [of *Akbarnama*] has 'the son of the Zamindar', and Blochmann (333), calls him Amar, son of the Zamindar or Rana of Idar, but it seems that he really was the son of Rana Kika.—See Jarret, (269) where he is described as Pertab's successor" (*ibid.*, p. 92. foot-note).

লক্ষ্ণৌ সংস্করণের পাঠই এস্থলে শুদ্ধ ছিল ; ওখানে অমরসিংহ নাম নাই। ব্লকম্যান 'আইন্-ই-আকবরী'র অনুবাদের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় যাহা বলিয়াছেন, উহা হয়ত 'আকবরনামা'র অন্য কোন হস্তলিখিত পুঁথি কিংবা অন্য ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। কিন্তু যে অমরসিংহকে ব্লকম্যান্ সাহেব ইডরের রাজকুমার বলিয়াছেন তাহাকেই বেভারিজ সাহেব প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ সাজাইয়াছেন। ব্লকম্যান্ সাহেবের ভুল সংশোধন করিতে গিয়া বেভারিজ নিজেই মহাভুল করিয়াছেন। উপরি উদ্ধৃত 'আকবরনামা'র অনুবাদে

"He sent along with him his son and heir…he too would soon come and do homage in person."

এই কথাগুলি ইডরের রাও নারায়ণ দাস রাঠোর সম্পর্কে বলা হইয়াছে ; অনুবাদে এগুলি যথাস্থানে রাখা হয় নাই। এগুলি আসিবে "He presented suitable presents" এই পদের ঠিক পূর্ব্বে—পরে নয়।

যাহা হউক, কুমার মানসিংহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন

---

* বেভারিজ-কৃত 'আকবরনামা'র অনুবাদে নিম্নলিখিত কথা-গুলি পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী আদৌ আলোচনা করেন নাই। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই প্রতাপের উত্তরাধিকারী (অমরসিংহ) রাজা ভগবান দাসের সঙ্গে আকবরের দরবারে গিয়াছিলেন—যথা :

"The brief account of the campaign of this victorious army is··· then proceeded towards Idar. The Zamindar thereof, Narain Das Rathor recognized the arrival of the imperial officers as a great honour and went forward to welcome them. He presented suitable gifts, and when the victorious army reached Goganda, which is the Rana's residence, Rana Kika expressed shame and repentance for his past conduct and prolonged deficiency in service, and by way of submission came and visited Rajah Bhagwant (? Bhagwan) Das. He also took to his house and treated him with respect and hospitality. He sent along with him his son and heir, and represented that by ill-fortune a feeling of desolation had taken possession of him, and that now he was presenting his petition through the Rajah and was sending his son as a mark of obedience. When his desolate (or savage) heart should become soothed by lapse of time, he too would come and do homage in person. After a little time Rajah Todar Mal also arrived from Gujrat and did homage...The Rana visited him on his way and displayed flattery and submissiveness." (*Akbarnama*, iii. 92-93).

করিবার তিন চার মাস পরেই রাজা ভগবান দাস গোগুন্দায় মহারাণা প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন —এটুকু অস্বীকার করিবার জো নাই। তাহা হইলেই প্রমাণিত হয় প্রতাপের মানসিংহকে অপমানিত করিবার কথাটা কাল্পনিক।

২। দ্বিতীয় কথা—হলদীঘাটের যুদ্ধের মাত্র চারি মাস পরে মানসিংহ দরবারে ফিরিয়া আসিবার পর প্রতাপের হিতৈষী বলিয়া সম্রাট তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। আবুল-ফজল বলেন,—

"Tricksters and time-servers suggested to the royal ear that there had been slackness in extirpating the wretch, and officers [among whom Man Singh was one] were nearly incurring the king's displeasure" [*Akbarnama*, iii. 260.]

বদায়ুনী লিখিয়াছেন,—

"And at this time, when news arrived of the distressed state of the army at Gogunda [not Kokandah] the Emperor sent for Man Singh, Asaf Khan, and Qazi Khan to come alone from that place, and on account of certain faults which they had committed, he *excluded* Man Singh and Asaf Khan (who were associatated in *treachery*) *for some time from the Court*..."—Lowe's translation of *Muntakhab-ut-tawarikh*, p. 247.

নিজাম-উদ্দীন বলেন, মানসিংহ এবং আসফ খাঁ রাণার রাজ্যে লুটতরাজ করিতে না দেওয়ায় মোগল-সৈন্যদের কষ্ট ও অসুবিধা হইয়াছিল—এজন্যই সম্রাট তাঁহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্গবিজেতা মানসিংহ ঘরে বাহিরে লাথি খাওয়ার পাত্র ছিলেন না। যদি মহারাণা প্রতাপ সত্যই তাঁহাকে ভোজন-ব্যাপারে অপমানিত করিতেন তাহা হইলে মেবার-রাজ্যের উপর এতখানি দরদ মানসিংহের থাকিত কি ?

৩। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কুমার মানসিংহ ও রাজা ভগবান দাসের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার না হওয়ায় ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সুচতুর সেনাপতি শাহ বাজ খাঁকে মহারাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শাহ্‌বাজ খাঁ সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াই রাজা ভগবন্ত দাস (ভগবান দাস) ও কুমার মানসিংহকে সম্রাটের দরবারে পাঠাইয়া দিলেন, পাছে প্রতাপের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক সহানুভূতি কার্য্যে বিঘ্ন ঘটায়

"...lest from their feelings as landholders there might be delay in inflicting retribution on that vain disturber."

৪। উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে মনে হয় না মানসিংহ প্রতাপের অপমানিত শত্রু; বরং ব্যাপারটা আমূল আলোচনা করিলে মনে হয় তাঁহারা রাণার হিতৈষী ছিলেন। প্রতাপের খেলাৎ-গ্রহণ, বশ্যতাস্বীকার, স্তোক-বাক্য ইত্যাদি সত্য না হইতে পারে। কিন্তু বাদশাহের দরবারে এগুলি না লিখিলে নিজেদের মুখ রক্ষা হয় না, প্রতাপকেও সম্রাটের কোপ হইতে বাঁচান যায় না, এই জন্য রাজা ভগবান দাস ও কুমার মানসিংহ এ সমস্ত কথা মোগল-দরবারে বলিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য দ্বারা এই গল্পের কাল্পনিকতা প্রমাণিত হয়,—

১। 'বংশভাস্করে' লিখিত আছে, রাজা ভগবন্ত দাস (ভগবান দাস) মহারাণা উদয়সিংহের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ভোজন করিবার সময় কচ্ছবাহ-পতি মহারাণাকে বলিলেন—আপনিও আসুন। মহারাণা বলিলেন, আজ আমার একশণা ব্রত; আপনি অন্নগ্রহণ করুন। তবুও ভগবন্ত দাস মহারাণাকে ভোজন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন দেখিয়া নিজ কুলের দর্পাভিমানী শিশোদিয়া সামন্তেরা বলিয়া উঠিলেন,

তুম সংগ ভোজন হমহু ন করহিঁ দূর রাণ উদন্ত।
দিল্লীস কোঁ দুহিতা বিবাহ হো বড়ে কুল হন্ত।

অর্থাৎ,—তুমি বড়ই কুলঘ্ন; দিল্লীশ্বরকে কন্যাদান করিয়াছ তুমি; রাণা উদয়সিংহের কথা দূরে থাক আমরাও তোমার সহিত ভোজন করি না। (বংশভাস্কর, পৃ. ১২৪১)

সুতরাং দেখা যাইতেছে এই বিষয়টি মামুলী গল্প।

২। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে ভাটেরা এই গল্প সৃষ্টি করিয়া মোগলদের মেবার-আক্রমণের কারণ-স্বরূপ ইহা কখনও উদয়সিংহের নামে, কখনও-বা প্রতাপের নামে চালাইয়া দিয়াছে। মহারাণা উদয়সিংহের বিরুদ্ধে আকবরের অভিযানের কারণগুলি—অর্থাৎ মালবপতি বাজ বাহাদুরের মেবারে আশ্রয়গ্রহণ, কুমার শক্ত-

সিংহের সহিত আকবরের সাক্ষাৎকার ও মোগল-শিবির হইতে কুমার শক্তসিংহের পলায়ন ইত্যাদি ঘটনা ভাটদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল—স্বয়ং টড সাহেবও এ সমস্ত ঘটনার সহিত পরিচিত ছিলেন না। সেইজন্ত রাজশ্যালক ভগবন্ত দাসের অপমানের গল্পটাই আকবর কর্তৃক চিতোর আক্রমণের কারণ-স্বরূপ প্রথমতঃ সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে ইহা আরও পল্লবিত হইয়া মহারাণা প্রতাপের নামে প্রচলিত হইল। হলদীঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ ও মানসিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, প্রতাপের ঘোড়া 'চেটকে'র (চৈতক নয়) পা মানসিংহের হাতীর মাথায় তুলিয়া দেওয়া ইত্যাদি এই গল্পের উপসংহার এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৩। যে-সময়ে এ গল্পটি সৃষ্ট হইয়াছিল সে-সময়ে সগরজী ও তাঁহার তথাকথিত ধর্মত্যাগী পুত্র মহাবৎ খাঁ রাজপুতানায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; নতুবা মহাবৎ খাঁকে হলদীঘাটে টানিয়া আনিবার কোন কারণ দেখা যায় না। মহাবৎ খাঁ নিজের বিশ্বস্ত রাজপুত সৈনিকদের সাহায্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে বন্দী করিয়াছিলেন; সুতরাং মহাবৎ খাঁর* দেহে রাজপুত রক্ত থাকাই সম্ভব; এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাসজ্ঞানহীন চারণ-কবি তাঁহাকে সগরজীর পুত্র বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের মনে হয় সম্রাট শাহ্‌জাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগেই বোধ হয় উল্লিখিত গল্পটি সৃষ্ট হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, টড ও 'বীর-বিনোদ'-প্রণেতা শ্যামলদাসজীর ন্যায় মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্করজীর মত ঐতিহাসিকও প্রতাপ ও মানসিংহ সম্বন্ধীয় অনৈতিহাসিক গল্পটি মানসিংহের মেবার-অভিযানের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ এই ব্যাপার ও হলদীঘাটের যুদ্ধের মধ্যে পূর্ণ তিন বৎসরের ব্যবধান। উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রত্যেকেই বিবেচনা করিবেন।

* মহাবৎ খাঁর জীবনী, 'তুজুক্-ই-জাহাঙ্গীরী' এবং 'মাসির-উল্-উমারা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য; তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল জমানা বেগ; তিনি কাবুলবাসী ঘেউর বেগের পুত্র। মহাবৎ খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার পর তিনি আশ্রিত মোল্লাদের দ্বারা কেতাব লেখাইয়া সৈয়দ হইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যোগাযোগ *

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকাটি না জান্‌লে এর মধ্যে যে-সব সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে, এবং সেগুলি মীমাংসার দিকে কতখানি অগ্রসর হয়েছে তা বোঝা যাবে না। তাই আমরা সংক্ষেপে গল্পের প্লটটি বল্‌তে বল্‌তে প্রসঙ্গত সমস্যা মীমাংসা ও চরিত্রগুলির বিশেষত্ব আলোচনা ক'রে যাব। আমার এই আলোচনা সমালোচনা নয়, কবিগুরুর অসংখ্য শ্রদ্ধান্বিত পাঠকের মধ্যে একজনের মনে এই উপন্যাসখানি কেমন লেগেছে, তারই পরিচয় 'প্রবাসী'র পাঠকপাঠিকাদের সম্মুখে এনে উপস্থিত করছি। তাঁরা অনেকেই এই বই পড়েছেন। কারণ এ বই ছাপা হয়েছে ১৩৩৮ সালের আষাঢ় মাসে, তার পর সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর অতীত হয়ে গেছে। যাঁরা পড়েছেন তাঁদের মনে এর একরকম ছাপ পড়েছে, তাঁরা মিলিয়ে দেখতে পারবেন যে, একই বই ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে কি রকম ভিন্ন ভিন্ন ছাপ ফেলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন—"কাব্যের একটা প্রধান গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজন-শক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য্য, কেহবা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব, সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতস-বাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতস-বাজি।" (পঞ্চভূত, কাব্যের তাৎপর্য্য)। আর যাঁরা এ বই এখনও পড়েন নি, তাঁরা আমার আলোচনা প'ড়ে যদি বইখানি পড়তে আগ্রহান্বিত হন তাহ'লে তাতেও আমার শ্রম সফল হবে।

এক গ্রামে দুই জমিদারের বাস ছিল, ঘোষাল-বংশ আর চাটুজ্জে-বংশ। উভয় বংশে রেষারেষি ছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা নিয়ে। "ঘোষালরা স্পর্দ্ধা ক'রে চাটুজ্জেদের চেয়ে দু-হাত উঁচু প্রতিমা গড়িয়েছিল।" ঘোষালেরা রাতারাতি বিসর্জ্জনের রাস্তা জুড়ে তুল্‌লে এক তোরণ, তাতে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা গলে না। তার ফলে দু-পক্ষের অনেক লোকের মাথা ভাঙ্‌ল। কাজেই মামলা-মোকদ্দমা থেকে উভয় পক্ষই জেরবার হ'য়ে গেল, বিশেষ ক'রে ঘোষালেরা। শেষকালে তাদের বংশমর্য্যাদা উচ্চ নয় ব'লে তাদের সমাজেও হেয় করা হ'ল। তখন ঘোষালেরা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে দেশ ছেড়ে অন্য গ্রামে চ'লে গেল। সেই ঘোষাল-বংশের আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়তদারদের

* যোগাযোগ—কবিসার্বভৌম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপাদ্ত উপন্যাস। ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত। পাইকা টাইপে পরিষ্কার ছাপা। ডবলক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা আকারে ৪৭১ পৃষ্ঠা। মূল্য ২।০; বাঁধাই ২৸০।

মুহুরী হ'ল। তার ছেলে মধুসূদন ছেলে-বেলা থেকেই আড়তে মানুষ হ'য়ে ব্যবসার হাটহদ্দ জেনে নিলে, আর লেখাপড়া ছেড়ে ব্যবসায়ে ঢুকে ক্রমে মহারাজ হয়ে উঠ্ল। মধুসূদন ছেলেবেলা থেকে হিসাবে দক্ষ, দৃঢ়স্বভাব, এক কথার মানুষ, যা ধরে বা বলে তা করে। সে অর্থসঞ্চয়ে এমন মন দিলে যে তার মা পুত্রবধূর মুখদর্শনের আশা ত্যাগ ক'রেই পরলোকে প্রস্থান কর্‌লেন। যখন মধুসূদন কারবার খুব ফলাও ক'রে তুলে রাজা মহারাজা খেতাব পেয়ে সমাজে লোকমান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন সে বল্‌লে এইবার বিবাহের ফুরসৎ হয়েছে।

নানা জায়গা থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আস্‌তে লাগ্‌ল। মধুসূদন চোখ পাকিয়ে বল্‌লে—ঐ চাটুজ্জেদের মেয়ে চাই। মধুসূদন তার পূর্ব্বপুরুষের লাঞ্ছনার কথা এক দিনও ভোলেনি। যারা তাদের কুলের খোঁটা দিয়ে দেশছাড়া করেছিল, চাই তাদেরই ঘরের মেয়ে। মধুসূদন পণ করেছিল—টাকার জোরে সে চাটুজ্জেদের কুলগর্ব্ব খর্ব্ব ক'রে ছাড়বে।

নুরনগরের চাটুজ্জেদের অবস্থাও এখন ভাল নয়, তাদের জমিদারী দেনায় জড়িয়েছে। তাদের পরিবারের মধ্যেও ভাগাভাগি হয়ে গেছে। এক ভাগে আছে দুই ভাই বিপ্রদাস আর সুবোধ, আর পাঁচ বোন; চার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে,—তাদের বাপ মা বেঁচে থাকতেই তাঁরাই অনেক পণ দিয়ে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গেছেন; ছোট বোন কুমুদিনীর বিবাহ হবার আগেই তার বাবার অসচ্চরিত্রতার জন্য তার মা রাগ ক'রে বৃন্দাবনে চ'লে যান, সেই শোকে কুমুদিনীর বাবা অল্প দিনের মধ্যেই মারা যান, এবং তার অল্প দিন পরেই তার মাও স্বামীর সহগমন করেন। তখন তার রক্ষণ ও শিক্ষার ভার পড়ে তার বড়দাদা বিপ্রদাসের উপর। বিপ্রদাস বোনকে লেখাপড়া গান-বাজনা বন্দুক-ছোঁড়া প্রভৃতি বহু বিষয়ে সুশিক্ষিতা ক'রে তোলেন। কুমুদিনীর বয়স হয়েছে উনিশ। এখন তার বিয়ে দিতে হবে। অথচ চাটুজ্জে-বংশের মেয়ের বিবাহের উপযুক্ত পণের টাকার সঙ্গতি তখন বিপ্রদাসের নেই। এই সময় হঠাৎ বিপ্রদাসের মাড়োয়ারী মহাজন বিপ্রদাসকে টাকার তাগাদা দিয়ে বস্‌ল, এবং সেই সময়েই একজন বন্ধু অনেক দিন পরে হঠাৎ এসে বিপ্রদাসকে পরামর্শ দিলে যে, মহারাজা মধুসূদনের কাছ থেকে এক থোকে এগার লাখ টাকা ধার নিয়ে সে-সব খুচরা দেনা মিটিয়ে ফেলুক। বিপ্রদাস তাই কর্‌লে। ছোটভাই সুবোধ বল্‌লে এখন উপার্জ্জনের পথ দেখতে হবে, সে বিলাত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে আস্‌বে। সে গেল বিলাত। মাড়োয়ারীর তাগাদা আর বিপ্রদাসের বন্ধুর অকস্মাৎ আবির্ভাব হয়ত কৌশলী মধুসূদনের কৌটিল্যনীতিরই ফল।

কুমুদিনীর বিবাহের পণ জোটানো আর পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা কর্‌তেই তার দাদা বিপ্রদাসের আতঙ্ক হয়। তাই কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সঙ্কুচিত। তার বিশ্বাস সে অপয়া। সে মনে মনে কেবল ভাবে—"কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাত রাজার ধন মাণিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।"

কুমুদিনী "বংশের দুর্গতির জন্যে নিজেকে যতই অপরাধী করে, ততই হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় ক'রে ভাইদের ওর ভালবাসা দেয়,—কঠিন দুঃখে নেঙড়ানো ওর ভালবাসা। কুমুর 'পরে তাদের কর্ত্তব্য করতে পারছে না ব'লে ওর ভাইরাও বড় ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে।"

বিপ্রদাস সাবেক চাল বজায় রাখা কঠিন দেখে কুমুদিনীকে নিয়ে কল্‌কাতায় এলেন। দেশ ছেড়ে কুমুদিনীর মন খাঁ খাঁ করে। বিপ্রদাস বেশী ক'রে বোনকে সাহিত্য এসরাজ বন্দুক-ছোঁড়া শেখান, একসঙ্গে দাবা খেলেন। এখানে এসে ভাইবোন পরস্পরের সঙ্গী হ'ল। কিন্তু কুমুদিনীর মনটা জন্ম-একলা। বিপ্রদাসও নানা চিন্তায় গম্ভীর প্রশান্ত।

কুমুদিনী "দেখ্‌তে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপ্‌ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড় না হোক একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপ্‌ড়ি দিয়ে তৈরি। রং শাঁখের মতন চিকণ গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ কর্‌তে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনার সকরুণ ধৈর্য্যের ভাব। এক রকমের সৌন্দর্য্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশী।...কুমুদিনী ঘরে লেখাপড়া করেছে। বাইরের পরিচয় নেই বল্‌লেই হয়। পুরানো নূতন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস।" তার দাদা তাকে দেখে ভাবেন "ও যে চাঁদের আলোর টুক্‌রো, দেশের অন্ধকারকে একা মধুর ক'রে রেখেছে।"

আর "বিপ্রদাসের দেবতার মত রূপ, বীরের মত তেজস্বী মূর্ত্তি, তাপসের মত শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। তাঁর মুখে সেই বিষাদ তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের ছায়া, ধৈর্য্যের আশ্চর্য্য গভীরতা। তখনকার কালে শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত পজিটিভিজ্‌ম্ তাঁর ধর্ম্ম ছিল, দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা তাঁর অভ্যাস ছিল না, অথচ দেবতা আপনিই তাঁর জীবন পূর্ণ ক'রে আবির্ভূত ছিলেন।" অতি ক্রোধের সময়েও তাঁর শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পেত না।

বিপ্রদাসের ভাই সুবোধ বিলাতে গিয়ে অপব্যয় কর্‌ছে, আর ক্রমাগত দাদার কাছে টাকা চেয়ে পাঠাচ্ছে। বিপ্রদাস ভাইয়ের অবিবেচনায় বিব্রত ও ব্যথিত হয়, কিন্তু কষ্ট ক'রে টাকা পাঠায়। একবার সুবোধ একথোকে দেড়-শ পাউণ্ড চেয়ে পাঠালে। দাদাকে চিন্তিত দেখে কুমুদিনী ব্যাপার জান্‌তে পারলে, এবং তার মায়ের গহনা বেচে ছোটদাদাকে টাকা পাঠাতে অনুরোধ কর্‌লে। কিন্তু সে-গহনা বিপ্রদাস কুমুদিনীর বিবাহের জন্য সম্বল ক'রে রেখেছিল। বিপ্রদাস টাকা পাঠাতে পার্‌বেন না লেখাতে সুবোধ লিখ্‌লে তার অংশের জমিদারী বিক্রি ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিতে। সুবোধের এই প্রস্তাব বিপ্রদাস আর কুমুদিনীর বুকে বাজ্‌ল। বিপ্রদাস নিজের তালুক পত্তনী দিয়ে টাকা পাঠালেন।

এমন সময় এল মধুসূদনের ঘটক। বিপ্রদাস বেশী বয়সী পাত্রে বোন সম্প্রদান কর্‌তে নারাজ হলেন। কুমুদিনী ভাবে তার দিদিদের কথা তারা তো তাদের স্বামী বেছে নেয় নি, মেনে নিয়েছে, যেমন ক'রে মা মেনে নেয় ছেলেকে। কুমুদিনী ভাবে সতীসাধ্বীদের কথা যারা নির্ব্বিচারে স্বামীর সব আচরণ সহ্য করে। সে ক'দিন ভেবে ভেবে অচেনা অদেখা মধুসূদনকেই পতিত্বে বরণ ক'রে ফেল্‌লে। সে দেবতার কাছে সঙ্কেত মানত ক'রে মনে কর্‌লে সে দৈবসঙ্কেতে তার মনোনয়নের সমর্থনই পেয়েছে। তার দাদা তার মত জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে জোর দিয়ে বল্‌লে—সে মধুসূদনকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে কর্‌বে না।

সম্বন্ধ অগত্যা পাকা হ'ল। কুমুদিনী খুশী। তার অন্তরে বাহিরে যেন একটা নূতন প্রাণের রঙ লাগ্‌ল।

কিন্তু মধুসূদন মহাসমারোহে নিজের লোকজন দিয়ে এক মধুপুরী নির্ম্মাণ করিয়ে ঐশ্বর্য্যের রাজসিক আড়ম্বরে চাটুজ্জেদের উপর টেক্কা দিতে লেগে গেল। সে বিপ্রদাসকে খাটো ক'রে নিজের বাহাদুরী নেবার যত রকম চেষ্টা করে তাতে কুমুদিনীর কষ্ট হয়। চাটুজ্জেরা যখন মধুসূদনের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠ্‌তে পারছিল না, তখন তারা মধুসূদনের বংশমর্য্যাদার হীনতা নিয়ে তাকে খোঁটা দিতে লাগ্‌ল, তবু কি পরাজয়ের গ্লানি মিটুতে চায়? মধুসূদনের জাতকুলের কথাটাকে কুমুদিনী তার ভক্তি দিয়ে চাপা দিয়েছিল। কিন্তু মধুসূদনের ধনের বড়াই ক'রে শ্বশুরকুলকে খাটো করার নীচতা দেখে তার মন বিষাদে ভ'রে উঠ্‌ল। ঘোষালদের লজ্জায় আজ যেন ওরই সব চেয়ে বেশী লজ্জা।

কুমুদিনী দাদার সাম্‌নে এসেই কেঁদে ফেল্‌লে, বিপ্রদাস বল্‌লেন—"কুমুদিনীর মনে যদি কোনও খট্‌কা থাকে, তবে তিনি বিয়ে এখনও ভেঙে দিতে পারেন।" কুমুদিনী বল্‌লে—"ছি ছি সে কি হয়!" এখন থেকে কুমুদিনী মনে মনে জোরের সঙ্গে জপ্‌তে লাগ্‌ল, তিনি ভালই হোন মন্দই হোন তিনি আমার পরম পতি।

কিন্তু মধুসূদনের ব্যবহার ক্রমশঃই অভদ্র উদ্ধত হয়ে উঠতে লাগ্‌ল। কুমুদিনীর ভাবে আর বাস্তবে দ্বন্দ্ব বেধে গেল। বাল্যকালে যখন সে পতিকামনায় শিবের পূজা করেছে, তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী শিবকেই দেখেছে। সাধ্বী নারীর আদর্শ রূপে সে আপন মাকেই জান্‌ত—কি স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য্য, যদিও তার স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি ছিল, চরিত্রের স্খলন ছিল। দময়ন্তীর মতন তারও মনের মধ্যে কি নিশ্চিত বার্ত্তা এসে পৌঁছেনি যে মধুসূদনকেই তার বরণ করতে হবে? বরণের আয়োজন সব প্রস্তুতই ছিল, রাজাও এলেন, কিন্তু মনের মানুষের সঙ্গে বাহিরের মানুষের মিল হ'ল কই? রূপেতেও বাধে না, বয়সেও বাধে না, কিন্তু সত্যকার রাজা কোথায়?

বিবাহ হয়ে গেল। বিপ্রদাস অসুখে শয্যাগত, তিনি মধুসূদনের অভদ্র ব্যবহারের কোনও খবরই পেলেন না। কুমুদিনী শুভদৃষ্টির সময় ভাল ক'রে বরের দিকে চাইতেই পারলে না, মধুসূদনের ব্যবহারে তার কেমন ভয় ধ'রে গিয়েছে।

মধুসূদন দেখ্‌তে কুশ্রী নয়, কিন্তু বড় কঠিন। কালো মুখের মধ্যে মস্ত বড় বাঁকা নাক। প্রশস্ত কপাল, ঘন ভ্রূ। গোঁপদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারী, কড়া চুল কাফ্রিদের মত কোঁকড়া, মাথার তেলো ঘেঁসে ছাঁটা। খুব আঁটসাট শরীর, কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে। বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটো রোমশ, দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই কি একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাগ্রভাবে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখলেই বোঝা যায় বাজে কথা, বাজে বিষয়, বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই। মধুসূদনের সাজটা ছিল বিচিত্র, বাড়ির চাকরদাসীরা অভিভূত হবে এমনতর বেশ—ডোরাকাটা বিলিতি শার্টের উপর একটা রঙীন ফুলকাটা সিল্কের ওয়েষ্ট-কোট, কাঁধের উপর পাটকরা চাদর, যত্নেকোঁচানো কালাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি, বার্ণিশ-করা কালো দরবারী জুতো, বড় বড় হীরেপান্নাওয়ালা আঙটিতে আঙুল ঝলমল করছে। প্রশস্ত উদরের পরিধি বেষ্টন ক'রে মোটা সোনার ঘড়ির শিকল, হাতে একটি সৌখীন লাঠি, তার সোনার হাতলটি হাতীর মুণ্ডের আকারে নানা জহরতে খচিত।

প্রথম মিলনেই বরবধূর বিচ্ছেদ সুরু হ'ল। ফুলশয্যার রাত্রে কুমুদিনী লজ্জাকম্পিত কণ্ঠে স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানালে তার দাদার অসুখ, আর দুটো দিন সে বাপের বাড়িতে থেকে যেতে চায়। তার প্রার্থনা না-মঞ্জুর হ'ল। কল্‌কাতায় নেমেই এক গাড়ীতে যেতে যেতে মধুসূদন দেখ্‌লে কুমুদিনীর হাতে একটা নীলার আংটি। অমনি সে হুকুম করলে এ আংটি তার আর পরা চল্‌বে না। মধুসূদন কেবল কুমুদিনীর আংটি খুলিয়েই নিরস্ত হ'ল না, তার দাদার দেওয়া আংটিটাকে সে কেড়ে নিলে।

কুমুদিনী স্বামীর কাছে কেবলই হুকুম শোনে, প্রীতির পরিচয় পায় না। আর সে ভাবে—"যেমন ক'রে অভিসারে বেরোয় তেমনি ক'রেই বেরিয়েছি, অন্ধকার রাত্রিকে অন্ধকার ব'লেই মনে হয় নি। আজ আলোতে চোখ মেলে অন্তরেই বা কি দেখলুম, বাইরেই বা কী দেখ্‌ছি? এখন বছরের পর বছর, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটবে কি ক'রে?" এতদিন কুমু স্বামীর বয়স বা রূপ নিয়ে কোনও চিন্তাই করে নি। সাধারণতঃ যে-ভালবাসা নিয়ে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যার মধ্যে রূপগুণ দেহমন সমস্তই মিলে আছে, তার যে প্রয়োজন আছে একথা কুমুদিনী ভাবেও নি। এখন সে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারছে না তা মনে হচ্ছে মহাপাপ, কিন্তু সে পাপেও তার তেমন্ ভয় হচ্ছে না যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে ক'রে!

মধুসূদনের বাড়ির মেয়েদের কাছ থেকেও কুমুদিনী বিশেষ কোনও মমতা পেলে না, তারা সবাই তার কেবল সমালোচনাই করে। এই মেয়েলী সমালোচনার বিবরণটি চমৎকার, তা আর উদ্ধার করলাম না। সেই বাড়িতে কেবল মধুসূদনের ছোটভাই নবীন আর তার স্ত্রী মোতির মা কুমুদিনীর প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝে তাকে শ্রদ্ধা সত্ন করতে লাগ্‌ল।

মোতির মা কিন্তু এইটুকু বুঝ্‌তে পারে না স্ত্রী হয়ে স্বামীর কাছে আত্মোৎসর্গ করার মধ্যে বাধা কোথায় থাকতে পারে। সে তো সেকেলে ধারণার বশীভূতা গৃহস্থ-বধূ।

মধুসূদনের পক্ষে কুমু হ'ল একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ পর্য্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বউ-ঝিদের মধ্যে। ওর স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে কর্ত্তাদের কটাক্ষ-চালিত মেয়েলী জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করবে, এর বেশী সে কিছুই ভাবে নি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে তার, মধ্যেও যে একটা পাওয়া বা হারাবার কঠিন সমস্যা থাকতে পারে, এ কথা তার হিসাব-দক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের কোণে স্থান পায় নি। মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুদিনীকে একরকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করতে লাগ্‌ল। কিন্তু মধুসূদনও স্বামীগিরির সেকেলে ধারণাই মনে পুষে এসেছে, আর তার উপরে আবার সে সকলের উপর প্রভুত্ব ক'রে অভ্যস্ত, সে স্বামী, সকলের উপরে, এ বোধ তার অস্থিমজ্জাগত হয়ে আছে। তাই সে ভাব্‌লে—আমিই যে ওর একমাত্র, একথাটা যত শীঘ্র হোক কুমুদিনীকে জানান দেওয়া চাই।

স্বামীর ব্যবহারে কুমুদিনীর যে-পরিমাণ কষ্ট না হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশী কষ্ট বোধ হচ্ছিল তার নিজের কাছে নিজের অপমানে। এই কষ্টটা বুঝতে পেরেছিল মোতির মা। সে ভাবলে—আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমরা তো কচি খুকী ছিলুম, মন ব'লে একটা বালাই ছিল না। কিন্তু কুমুদিনী বেশী বয়সে লেখাপড়া শিখে স্বামীর ঘর

করতে এসেছে, এ মেয়ের পক্ষে অপরিচিত একজন পুরুষকে অকস্মাৎ স্বামী ব'লে মেনে নেওয়া বিড়ম্বনা। বড়ঠাকুর এখনও ওর পর, আপন হ'তে অনেক সময় লাগে। ধন পেতে বড়ঠাকুরের কতকাল লাগ্‌ল, আর মন পেতে দু-দিন সবুর সইবে না? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাটাহাঁটি ক'রে মরতে হয়েছে, আর এই লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাত্‌তে হবে না?

কুমুদিনী স্বামীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে মনে করলে এ বাড়িতে আমার যদি বধূর অধিকার না-ই থাকে, তবে আমি এ বাড়িতে থাকি কিসের সম্পর্কে? তাই সে বাড়ির দাসীপনা করতে নিযুক্ত হ'ল। সে আলো বাতি রাখার ময়লা ঘরের এক কোণে নিজের বাসস্থান ক'রে নিলে।

মধুসূদন কিন্তু মনে মনে কুমুদিনীর জন্য প্রতীক্ষা করে। রাত্রে উঠে চুপিচুপি যায় কুমুদিনীর ঘরে সে কি করছে দেখ্‌তে। সে গিয়ে একদিন দেখ্‌লে কুমুদিনী দিব্য নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। মধুসূদনের মনে হ'ল যে তার যেমন ঘুম নেই কুমুদিনীরও তেমনি ঘুম না থাকাই উচিত ছিল। কুমুদিনীর মুখের উপর লণ্ঠনের আলো পড়্‌তেই সে একটু নড়্‌ল। গৃহস্থের জাগার লক্ষণ দেখে চোর যেমন ক'রে পালায়, মধুসূদন তেমনি তাড়াতাড়ি পালাল। তার ভয় হ'ল পাছে কুমুদিনী ওর পরাভব দেখে মনে মনে হাসে। মধুসূদন বুঝ্‌তে লাগ্‌ল যে, তার দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ ঘট্‌ছে. এই রাত্রি দুটোর সময় চারিদিকে লোকের দৃষ্টি ব'লে যখন কিছুই নেই, তখন কুমুদিনীর কাছে মনে মনে হারমানা তার কাছে অস্বীকৃত রইল না। কুমুদিনীকে কঠিনভাবে শাসন করার শক্তি মধুসূদন হারিয়ে ফেলেছে, এখন তার নিজের তরফে যে অপূর্ণতা তাই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে। চাটুজ্জেদের ঘরের মেয়েকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল চাটুজ্জেদের পরাজিত করবে ব'লে, কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাবে বিধাতা আগে থাক্‌তেই যার কাছে হার মানিয়ে রেখে দিয়েছেন, এ সে মনেও ভাবে নি। অথচ এখন সে এ কথা বল্‌বারও জোর মনে পাচ্ছে না যে তার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হ'লেই ভাল হ'ত যার উপর তার শাসন খাটত। একদিন সে কুমুদিনীর সামনে নবীন আর মোতির মাকে ডেকে ব'লে দিলে—"কাল থেকে বড়বৌয়ের সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত করলুম।" মধুসূদন কুমুকে বুঝিয়ে দিলে তোমার কাছে আমি অসঙ্কোচে হার মান্‌ছি।

এইবার আবার কুমুদিনীর পালা আরম্ভ হ'ল। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এর বদলে কি আছে তার দেবার? বাইরে থেকে জীবনে যখন বাধা আসে তখন লড়াই করবার জোর পাওয়া যায়, তখন স্বয়ং দেবতাই হন সহায়। হঠাৎ সেই বাইরের বিরুদ্ধতা একেবারে নিরস্ত হ'লে যুদ্ধ থামে কিন্তু সন্ধি হ'তে চায় না।

মধুসূদন যে-দিন কুমুদিনীর আংটি হরণ করেছিল সেদিন ওর সাহস ছিল, সে মনে করেছিল কুমুদিনী সাধারণ মেয়েরই মতন সহজেই শাসনের অধীন হবে, কিন্তু সে এখন দেখ্‌ছে কুমুদিনী সহজ মেয়ে মোটেই নয়। এখন মধুসূদনের মনে হ'তে লাগ্‌ল—কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই এখন ওর মন ব্যগ্র।

কুমুদিনী যাকে ভালবাসেনি তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে সঙ্কোচ বোধ করে, হোক না সে তার বিবাহের মন্ত্রপড়া স্বামী। কুমু করে বিদ্রোহ, আর দোষ পড়ে মোতির মার ঘাড়ে, কারণ মধুসূদন মনে করে মোতির মা যেহেতু কুমুদিনীকে আদর-যত্ন করে সেই হেতু কুমুদিনীকে বশ মানানো যাচ্ছে না, তার শাসন প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসছে। তাই সে মোতির মাকে বাড়ি থেকে বিদায় ক'রে দেবার কল্পনা করে, কিন্তু মনের মধ্যে জোর বাঁধ্‌তে পারে না। সে জানে যে তার সংসারে মোতির মার গৃহিণীপনা নিতান্ত অপরিহার্য্য। অথচ যে-বিবাহিত স্ত্রীর দেহ-মনের উপর তার সম্পূর্ণ দাবি সেও তার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম হয়ে থাকে এও তার সহ্য হচ্ছিল না। মধুসূদনের সকল কাজে শৈথিল্য আর অবহেলা দেখা দিতে লাগ্‌ল এবং সে নিজে আর অপর সকলে এই দেখে আশ্চর্য্য হ'তে লাগ্‌ল।

কুমুদিনী নিরন্তর তার অন্তরের ঠাকুরের কাছে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের নির্দ্দেশ চায়। মধুসূদন যেদিন ভাব্‌লে আমি নিজের মান খর্ব্ব ক'রে কুমুর মান ভাঙব, এবং তার হাতে ধ'রে মিনতি করলে, সেই দিন কুমুদিনী পড়ল মুস্কিলে। মধুসূদন যখন রুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা সহ্য করা কুমুদিনীর পক্ষে তত কঠিন নয়। কিন্তু আজ মধুসূদনের এই নম্রতা, এই তার নিজেকে খর্ব্ব করা সম্বন্ধে কুমু যে কি করবে তা সে স্থির করতে পারে না। হৃদয়ের যে-দান নিয়ে সে এসেছিল তা তো স্খলিত হয়ে ধূলায় প'ড়ে গেছে। তথাপি কুমু স্বামীর হুকুম মানে, কিন্তু তার আন্তরিক সতীত্ব তাকে ধিক্কার দেয়, সে তার ঠাকুরের কাছে নালিশ করে তার ঠাকুরেরই বিরুদ্ধে, কেন তিনি তাকে এই অশুচিতা থেকে বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন না। তার মনে হচ্ছে একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জন্তু বাহির থেকে তাকে যেন গ্রাস করছে। যে-পরিণত বয়স শান্ত স্নিগ্ধ সুগম্ভীর, মধুসূদনের তা নয়; যা লালায়িত, যার প্রেম বিষয়াসক্তিরই সজাতীয়, তারই ক্লেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এত বিতৃষ্ণা। কুমুদিনী এই অশুচিতা থেকে পালাবার একমাত্র উপায় দেখে শিশু মোতির সংসর্গে। এই শিশু মোতি তার জেঠিমাকে পরিপূর্ণ ভাবে ভালবাসে।

কুমুদিনী মোতির সাহচর্য্যে নিজের অশুচিতা শোধন ক'রে নিতে চায় ব'লে মধুসূদন বালকটির উপরও রূঢ় ব্যবহার করে, আর তার সকল আঘাত গিয়ে লাগে কুমুদিনীকে, আর সে হয়ে উঠে আরও আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ। মধুসূদন বুঝ্‌তে পারে না যে সে যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই একটা মস্ত বাধা রয়েছে।

মধু যখন হুকুম ক'রে কুমুদিনীর প্রেম আদায় করতে চায়, তখন একদিন কুমুদিনী দেখ্‌লে নবীন আর মোতির মার মধ্যে প্রেমলীলা। তাদের সেই প্রেমলীলা কেমন সহজ আর সুশ্রী, আর তার পাশে মধুসূদনের ব্যবহার কি বিশ্রী কুৎসিত বীভৎস।

মধুসূদন দেখেছে কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নেই, আছে একটা দূরত্ব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে খাটো হয়ে থাকে, তাইতে তার রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরেও মধুসূদন জোর করতে পারছে না—আপন সংসারে যেখানে সব চেয়ে তার কর্ত্তৃত্ব করবার অধিকার সেইখানেই সে যেন সব চেয়ে হ'টে গিয়েছে। এবং সেই জন্যেই কুমুর প্রতি তার রাগের বদলে আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে প্রবল হয়ে উঠছে, আর রাগ বাড়ছে কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের উপর, কারণ মধুসূদনের সন্দেহ যে বিপ্রদাসের আদর্শ আর শিক্ষাতেই কুমুদিনী এমন ভাবে গঠিত হয়ে উঠেছে। তার সন্দেহ অমূলকও নয়।

মধুসূদন হিংস্র হয়ে বিপ্রদাসকে পীড়ন করতে লাগ্‌ল, তার মনে মনে এও ছিল যে, বিপ্রদাসকে শাস্তি দিলে কুমুদিনীকেও শাস্তি দেওয়া হবে। বিপ্রদাস শান্তভাবে মধুর সব কুব্যবহার সহ্য ক'রতে লাগলেন। বিপ্রদাস বনেদী ঘরের অভিজাত ভদ্রলোক, তাঁর কাছে হীনতা

কপটতার লেশ মাত্র ছিল না। তাঁর চরিত্র ঔদার্য্যে মহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তাঁর ছিল নিজেদের ক্ষতি ক'রেও অক্ষত সম্মানের গৌরব রক্ষা, অক্ষত সঞ্চয়ের অহঙ্কার প্রচার নয়।

মধুসূদনের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহ ভাবেই গরিব ছিল, সেই জন্যে পয়সার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করত সেই গর্ব্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বার-বার তুলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যে। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষায় কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহ-মনের ও ওর সংসারের অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর মনকে সঙ্কুচিত ক'রে তুলছে। স্বামীপূজার কর্ত্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু তার কত বড় হার হয়েছে তা এর আগে এমন ক'রে সে বোঝে নি।

মধুসূদন যখন কুমুদিনীর সঙ্গে মিলনটাকে সহজ ক'রে তুলতে কিছুতেই পারলে না, তখন সে মন দিলে অন্য দিকে। মধুসূদনের বাড়িতে তার দাদার এক বিধবা বৌ থাকত তার নাম শ্যামাসুন্দরী। শ্যামা ধনী ঠাকুরপোকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সদাই ব্যগ্র, কায়মনোবাক্যে সে তাকে সেবা করতে প্রস্তুত। মধুসূদন এতদিন তাকে আমল দেয়নি, প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু এখন কুমুকে শাস্তি দেবার জন্য মধু তার দারস্থ হ'ল। শ্যামা কৃতার্থ হয়ে গেল।

এই শ্যামাসুন্দরী পরিণত বয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা, মোটা নয় কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে যেন বেশ একটু ঘোষণা করছে। একখানি সাদা শাড়ীর বেশী গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সর্ব্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু এখনও জরা আক্রমণ করেনি। তার ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টস্‌টসে ঠোঁট দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশী কিছু রস দেয় নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী ব'লেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘতা ব্যবহারে লাগল না ব'লে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহঙ্কৃত অশ্রদ্ধা। যৌবনের যাদুমন্ত্রে সে মধুসূদনকে বশ ক'রে নেবে এমন দুরাশা তার অনেক দিন থেকেই ছিল, কিন্তু এতদিন মধুসূদনের মন মাঝে মাঝে টল্‌লেও হার মানে নি। শ্যামাও মধুর মনের ঝোঁকটা ধরতে পেরেছিল, কিন্তু কোনোদিন তার মনের ভয় আর ঘুচছিল না। শ্যামাসুন্দরী মনে মনে মধুসূদনকে ভালও বেসেছিল। তাই মধুসূদনের বিবাহের পর থেকে সে আর থাকতে পারছিল না। মধু যদি কুমুকে অন্য সাধারণ মেয়েরই মত অবজ্ঞা করত, তবেও বা সেটা একরকম সহ্য হ'ত। কিন্তু শ্যামা যখন দেখ্‌লে যে এতদিন যে-মধু তাকে অবহেলা ক'রে এসেছে সে-ই এখন কুমুদিনীর মন পাবার জন্য তপস্যা করছে, তখন আর সে সহ্য করতে পারলে না। সে সাহস ক'রে এগিয়ে এসে দেখ্‌লে মধুসূদন তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

কিন্তু যখন মধু শ্যামার কাছে থাকে তখনও তার মনের মধ্যে জাগে কুমুদিনীর কথা। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত, সেইখানেই তার অসীম জোর; আর শ্যামা তার এত বেশী আয়ত্তের মধ্যে যে তার ব্যবহার আছে কিন্তু মূল্য নেই। তাই ঈর্ষার পীড়নে শ্যামার মনে একটুও শান্তি নেই। সে মধুর পথ আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়ায়, তার মনে সদাই আশঙ্কা কবে কুমু আপন সিংহাসনে ফিরে আসে।

কুমুদিনী যেদিন প্রথম শ্যামাকে দেখেছিল সেইদিনই তার মনে হয়েছিল শ্যামা আর মধু যেন একই মাটিতে গড়া একই কুমারের চাকে। যখন শ্যামার আর মধুর আচরণে আর কোনও অপ্রকাশ্যতা থাক্‌ল না, তখন কুমুদিনী তার পীড়িত দাদার কাছে চ'লে গেছে, এবং সে খবর সেখানে তাদের কাছেও গিয়ে পৌচেছে।

শান্ত গম্ভীর বিপ্রদাস শ্যামার আর মধুর আচরণের সংবাদ পেয়ে ক্রোধে উগ্র হয়ে উঠ্‌লেন। তিনি কুমুদিনীকে বল্‌লেন—"কুমু, অপমান সহ্য হয়ে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমার নিজের সম্মান তোমাকে দাবি করতে হবে, এতে সমাজে তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।" মোতির মা আর নবীন এলো কুমুদিনীকে নিয়ে যেতে, সে না গেলে যে তার স্বামী ঘরসংসার সব বেদখল হয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু বিপ্রদাস তাঁর বোনকে ঐ অশুচি বাড়িতে পাঠাতে অস্বীকার করলেন, কুমুদিনীও যেতে চাইলে না। বিপ্রদাস মোতির মাকেও বল্‌লেন—"স্ত্রী যদি সে অপমান মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে ক'রে অন্যায় করা হবে। এমনি ক'রে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে।"

এর পর মধু এল নিজে কুমুকে নিয়ে যেতে। সে যে শ্যামাকে হুকুম করে, শাসন করে, প্রহার করে, কিন্তু তাকে তো একদিনও সম্মান করতে পারে নি, সে তাকে চাকর দিয়ে নিজের শোবার ঘরে ডেকে পাঠাতেও দ্বিধা করে নি। কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যেই মধুর মনে জেগেছে কুমুদিনীর দৃপ্ত নারীত্বের অসামান্য মহিমা। তাই সে তার কাছে পরাভব স্বীকার ক'রে নিজে তাকে নিতে এল। কিন্তু কুমু কিছুতেই যেতে সম্মত হ'ল না। তখন সে ক্রোধান্ধ হয়ে কুমুদিনীকে বল্‌লে—"জানো, তোমাকে আমি পুলিস দিয়ে ঘাড়ে ধ'রে নিয়ে যেতে পারি।" এখানেও তার সেই প্রভুত্বের ক্ষমতার দম্ভ।

কুমুদিনী স্বামীর কাছে যেতে অস্বীকার করেছে জেনে বিপ্রদাসের পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী কালু বিষম ভীত হয়ে যখন বল্‌লে—সর্ব্বনাশ! তখন বিপ্রদাস বল্‌লেন—সর্ব্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করিনে, ভয় করি অসম্মানকে।

মধুসূদন মনে করলে নবীন আর মোতির মার কাছে প্রশ্রয় পেয়েই কুমুদিনী তার বিরুদ্ধতা করতে সাহস করেছে। তাই সে তার ছোটভাই আর ভাইবৌকে বাড়ি থেকে তাড়াবে। তারা এল কুমুদিনীর কাছ থেকে বিদায় নিতে। সেই সময় মোতির মা দেখ্‌লে যে কুমুদিনী গর্ভবতী। তারা বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

যখন কুমুদিনীর গর্ভ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না, তখন বিপ্রদাস আর মধু দুজনেই শুনলেন। বিপ্রদাস কুমুদিনীকে ডেকে বল্‌লেন—"এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে?" কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করলে তবে কি আমাকে যেতে হবে দাদা? বিপ্রদাস কুমুকে বল্‌লেন, "তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার ঘরছাড়া করব কোন স্পর্দ্ধায়?"

কুমুদিনী বিনা আহ্বানে এবার নিজে যেচে স্বামীর বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় সে তার দাদাকে ব'লে গেল—কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি, কোনদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌বে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন তোমাকে না দেখ্‌তে হয়। সে আমি সইতে পারব না।

তার পর কুমুদিনী আরও বল্‌লে যে যেদিন সে সন্তান প্রসব ক'রে মুক্ত হবে সেদিন সে স্বাধীন হয়ে তার দাদার কাছেই চলে আসবে,

কারণ মানুষের জীবনে এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোয়ানো যায় না।

কুমুদিনীকে বিদায় দিয়ে বিপ্রদাস নিতান্ত একাকী নিঃস্ব অসহায়। আর কুমু? কে জানে তার এর পরে কি ঘটেছিল। লেখক এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

এই উপন্যাসখানির মধ্যে তিনটি প্রধান আর তিনটি অপ্রধান চরিত্র আঁকা হয়েছে, আর কয়েকটি আছে আনুষঙ্গিক চরিত্র। সব কয়টিই জীবন্ত মানুষ হয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে ফুটেছে মধুসূদন, বিপ্রদাস, আর কুমুদিনী। নবীন, মোতির মা, শ্যামাও অল্পের মধ্যে স্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। আনুষঙ্গিক চরিত্রের মধ্যে আমাদের মনে ছাপ রাখে হাবলু বা মোতি, আর কালুদাদা।

মধুসূদনের চেহারা আর চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পূর্ব্বে দিয়েছি। কুমুদিনীরও পরিচয় আমরা পেয়েছি। এদের দুজনের চরিত্রের বৈপরীত্য লেখক অতি চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন, প্রতিদিন যে হুকুম ক'রে লোককে অবিশ্বাস ক'রে অভ্যস্ত, সেই মধুসূদনের কাছে কুমুর সহজ অথচ অনমনীয় আত্মমর্য্যাদাবোধ অবোধ্য হয়ে যত বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। বিপ্রদাস আর নবীন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী অথচ খাঁটি মানুষ। কুমুদিনী তার এই দাদার হাতে তৈরি। বিদায়ের দিন সে তার দাদাকে বলেছিল—"সমস্ত গিয়েও তবু বাকী থাকে, সেই আমার অফুরানো সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম তাহ'লে সেই গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ ব'লেই তবে এ কথা আমি বুঝতে পেরেছি।" অতএব বিপ্রদাস ঠিক নাস্তিক ছিলেন বলা যায় না। তাঁর ধর্ম্ম মনুষ্যত্বের ও ন্যায়নিষ্ঠার, আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই উপন্যাসে হঠাৎ-ধনী আর বনিয়াদী অভিজাত ব্যক্তির চরিত্রের তারতম্য অতি সুন্দর ক'রে দেখানো হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে গত উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ধনীগৃহের ছবি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে আঁকা হয়েছে।

সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকার, গৃহে তার স্থান আর মর্য্যাদা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রভৃতি বহু সমস্যার সমাধান এর মধ্যে পাওয়া যাবে। একদিকে জোর ক'রে শ্রদ্ধা প্রীতি আদায় করবার চেষ্টা, আর তার পাশেই অনায়াসে উৎসারিত শ্রদ্ধাভক্তির চিত্র চমৎকার হয়েছে।

বিপ্রদাস যেন গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধ উপন্যাস গোরার পরেশবাবুরই একটি প্রতিচ্ছবি। শান্ত, সমাহিত, অথচ দৃঢ়, বলিষ্ঠ প্রকৃতি, তাঁকে জানলেই শ্রদ্ধা করতে হয়, তাঁর কাছে মাথা আপনি নত হয়।

এই উপন্যাসের মূল কথাটি হচ্ছে যে লোকের হার-জিৎ বাইরে থেকে দেখা যায় না, তার ক্ষেত্রটা লোকচক্ষুর অগোচরে। জগতে যাঁরা 'মার্টার', যাঁরা বাস্তবিক বড়লোক, তাঁরা কালে কালে অযোগ্যের হাতে মার খেয়েই নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ ক'রে গেছেন। যারা সামান্য সাময়িক পশুশক্তিতে বলবান তারা ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে জানে বাইরে তাকেই মারে। এই জন্যে মধুসূদনের হাতে কুমুদিনীর লাঞ্ছনা, আর বিপ্রদাসের অপমান।

এই বইখানিকে অসমাপ্ত বলতে হবে। কুমুদিনী স্বামীর বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর তার অভ্যর্থনা সেখানে কি রকম হয়েছিল, তার সন্তান হওয়ার পর সে কি করেছিল, আর সুবোধ—বিপ্রদাসের ছোট ভাই, কুমুদিনীর ছোটদাদা বিলাত থেকে ফিরে এলেই বা তাদের পরিবারে কি পরিবর্ত্তন ঘটল, এসব খবর লেখক আমাদের দেন নি। তা ছাড়া বইখানির আরম্ভ হয়েছে কুমুদিনীর পুত্র অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন উপলক্ষ্য ক'রে। তখন তার বয়স হয়েছে বত্রিশ। এই বত্রিশ বৎসরের ছেলে অবিনাশ পিতামাতার মাঝখানে থেকে তাদের জটপাকানো জীবনের জট কতখানি খুলেছে বা আরও পাকিয়ে তুলেছে তারও খবর আমরা কিছু জানতে পারি নি। আরম্ভেরও পূর্ব্বে যে আরম্ভ আছে তার কথাতেই এই বই সমাপ্ত হয়েছে, আসল গল্পের উপসংহার বাকী থেকে গেছে, অবিনাশের বয়সের বত্রিশ বৎসরের ইতিহাস ব্যক্ত হয় নি। সেই অপ্রকাশিত ইতিহাস জানবার জন্য মনের মধ্যে একটা আগ্রহ থেকে যায়, আর বইখানিকে অসমাপ্ত মনে হয়। আশা করি লেখক এর একটা উপসংহার লিখে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করবেন।

এই উপন্যাসের বিষয় হচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা। সেই জন্য এর মধ্যে নরনারীর সম্পর্কের আর অধিকারের অনেক ব্যাপার উপস্থিত করা হয়েছে, এবং সেগুলির নিপুণ বিশ্লেষণ ও সমাধান করা হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই আমাদের বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, এবং এই কর্ম্মে তাঁর অনন্য-সাধারণ দক্ষতা সর্ব্বজনবিদিত।

নরনারীর আকর্ষণবিকর্ষণের তত্ত্ব সমাধানের জন্য এই উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীকে অবতারণ করতে হয়েছে, এবং সে যেন কুমুদিনীর চরিত্রের পটভূমিকা হয়ে কুমুর চরিত্র ও শুচিতা আরও ফুটিয়ে তুলেছে, এবং মধুসূদনেরও চরিত্রকে স্পষ্টতর করেছে। কিন্তু শ্যামার আচরণ এমন লালসাময় এবং কুশ্রী যে তার কথা পড়তে গেলে মনে জুগুপ্সা উদিত হয়। এইটি সমস্যার অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'লেও মনে হয় এই দৃশ্যটা না থাকলেই ভাল হ'ত।

উপন্যাসের আগাগোড়াই ঘাতপ্রতিঘাত আর সংঘাত, কাজেই মন ক্লান্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু লেখকের স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছ অনাবিল হাস্যরস প্রায় সকল কথোপকথনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থেকে উপাখ্যানের কঠোরতাকে সরস করেছে। আর স্বার্থ মান অভিমান মর্য্যাদা সম্মান বৈষয়িকতা অবনিবনাও আর ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে বালক হাবলু বা মোতির সরল একাগ্র প্রীতি আর ভালবাসা সমস্ত বইখানিকে বিশুদ্ধ ক'রে রেখেছে। সর্ব্বোপরি বিরাজ করছে বিপ্রদাসের বলিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বিপ্রদাসের চরিত্র যেন মধুসূদনের সকল কলুষতা আর ক্ষুদ্রতা ডুবিয়ে দিয়ে সমস্ত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বিশুদ্ধ ক'রে তুলেছে।

শেষের খেয়া

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

১

ঐ ত বাঁশ-ঝাড়ের লক্ষ লক্ষ সরু বহু-বিস্তৃত শিকড়গুলা ঘন জালেরই মত যেন দামোদরের পাড় ভাঙিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। সকলে বলে, অত বড় বাঁশ-ঝাড়টি এইবারেই নাকি দামোদরের কুক্ষিগত হইবে। অথচ, এই সে-বছর ঐখান দিয়াই গোলাঘাট যাইবার রাস্তা ছিল। বেশ মনে পড়ে,—অধুনালুপ্ত সেই পথের ধারে, পাড়ের দিকে একটা নোনা-গাছের মোটা ডালে দড়ি বাঁধিয়া কতদিন সে আর মল্লিকদের রাজলক্ষ্মী আসিয়া দুলিয়াছে। আজ সে-গাছের চিহ্নমাত্রও নাই। বর্ষাকাল—আজ সেখানে জলের স্রোত।

আরও কতই-কি-না তাহার মনে পড়ে।

মনে পড়ে—আর একটু ঐদিকে—ঐ, ঐখানটিতেই হইবে বোধ হয়—সেবারে বর্দ্ধমান না কোথা হইতে একটা মহাজনী নৌকা আসিয়া নোঙর ফেলিয়াছিল। রতন-জেলের দিগম্বর ছেলেটা—কি বেশ তাহার নামটি!—এক পা নৌকার ধারে আর এক পা নদের পাড়ের উপর রাখিয়া তাহারই সমবয়সী একটি ছেলের 'বন্দেমাতরম্'-উক্তির প্রত্যুত্তরস্বরূপ, নাচিবার ভঙ্গীতে তালে তালে হাঁটু মুড়িয়া সুর করিয়া বলিতেছিল—

"রোঁদে খেয়ে খেয়ে মাথা গরম —"

হঠাৎ মাটি ভাঙিয়া একটা পা তাহার স্থানচ্যুত হইতেই নৌকার ধারে জলকাদার উপর ছেলেটা ঝপাং করিয়া পড়িয়া যাইতেই সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। আজও সে-কথা মনে করিতে তাহার হাসি পায়।

ঐ, ও-পারে—দূরে—ঘন-সন্নিবদ্ধ তালগাছগুলার নীচেই গুরে-কাল্নার শ্মশান। গুরে-কাল্নার সব মড়া ঐখানেই পোড়ানো হয়। তাহার দিদি ও ঠাকুমার সঙ্গে ঘাট সারিতে আসিয়া কতদিন সে মড়া পুড়িতে দেখিয়াছে। আগুন দেখা যায় না, শুধু ধূঁয়া—কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশের দিকে উঠিয়া যায়। কতকগুলা লোক বড় এক-একখণ্ড কাঁচা বাঁশ হাতে লইয়া আগুনের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি-সব করে। খুব স্পষ্ট দেখিতে না পাওয়া গেলেও বেশ বুঝিতে পারা যায়—কেউ-বা গাছের ছায়ায় আড় হইয়া শুইয়া থাকে আর কেউ-কেউ বা হুঁকায় করিয়া তামাক খায়।

সে শুনিয়াছে—তখন নদীতে জল ছিল না, মৃত্যুর পর তাহার মা'কেও নাকি ঐখানেই লইয়া গিয়া দাহ করা হইয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা, তাহার তেমন মনেই পড়ে না।

শুধু মনে পড়ে—সুদূর বিদেশের এক কর্ম্মস্থল হইতে ঘরে আসিয়া তাহার বাবা প্রথমেই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া অঝোর-ধারায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিলেন।

মনে পড়ে বটে, তাও খুব স্পষ্ট নয়।

গ্রামের পোষ্ট-আপিস। আপিস-ঘরের দক্ষিণ-চালায় আপার-প্রাইমারি স্কুল—ছেলেরা পড়ে, আর উত্তর চালায় বালিকা-বিদ্যালয়। পোষ্টমাষ্টারী আর এই উভয় স্কুলের স্কুল-মাষ্টারী একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। গ্রামের নাম—জ্যোৎশ্রীরাম।

দুর্ম্মদ দামোদর এই পোষ্ট্-আপিসের কোল ঘেঁষিয়া ছুটিয়া চলে।

দুই-একটা কালো পাখী 'চিক্ চিক্' করিয়া নদের উপর দিয়া উড়িয়া যায়, দামোদরের গেরুয়া-জল আবিল সমারোহে ছলাৎ ছলাৎ করিয়া পাড়ে পাড়ে আসিয়া লাগে, আর বালিকা-বিদ্যালয়ের জানালার ধারে বসিয়া একটি বালিকা দূরদিগন্তে দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া আত্ম-সমাহিত চিত্তে কতই-কি-না ভাবে।

ভাবিতে ভাবিতে দৃষ্টি তাহার বহির্জ্জগৎ ছাড়িয়া মনোজগতে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়।

তাহার বাবার জন্ম তাহার বড়ই মন কেমন করে। সেই কবে ও-বছর দুর্গাপূজার সময় একবার তিনি বাড়ি আসিয়াছিলেন, তাহার পর আজ দুই বৎসর ঘুরিতে চলিল আসিবার আর নামই করেন না। অথচ আসিবার জন্ম সে তাঁহাকে কতবারই-না তবু পত্র লিখিয়াছে। লিখিয়াছে—

আপনি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবেন। নিশ্চয়ই আসিবেন। আপনি না আসিলে আমার বড় মন কেমন করে। বড় কান্না পায়।…আরও কত-কি।

সে পত্র দিয়াছে আর প্রতিবারেই ভাবিয়াছে—এইবার তাহার বাবা নিশ্চয়ই আসিবেন। কিন্তু তিনি আসেন নাই।

একবার লিখিয়াছিলেন—কাজের ভিড়, সাহেবের নিকট ছুটি পাওয়া যায় না…

সাহেবকেও সে তাহার বাবার পত্রের ভিতর একবার পত্র লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল, যেন তিনি দয়া করিয়া তাহার বাবাকে অন্ততঃ দুই-তিন দিনের জন্তেও ছুটি দিয়া দেশে পাঠাইয়া দেন; তাহার বাবার জন্ম তাহার বড্ড মন কেমন করে।…এই সব।

ইহা সত্ত্বেও তাহার বাবা আসেন নাই।

নির্ঝরিণীর মত চঞ্চল, স্বচ্ছন্দ-গতি ফুটফুটে মেয়েটি এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতেই হঠাৎ দেখিতে পায়, ঐ দামোদরের বুকে খেয়া নৌকাখানা ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করিতে করিতে স্রোতের অনুকূলে অতি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসিতেছে। এ খেয়া ডাকের খেয়া। ডাক-আপিসের পিয়ন কালীচরণ একটা লাঠিতে বাঁধা থলিতে করিয়া জামালপুর হইতে এই সময়ে চিঠিপত্র লইয়া আসে। ঐ ত, সে হালটার কাছে বসিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছে—বেশ চেনা যায়, স্পষ্ট!

একটু পরেই সে থলিটা আনিয়া ঝপ্ করিয়া আপিস্-ঘরের সম্মুখের মেঝেয় ফেলিবে। মাষ্টার মহাশয় তাহাদিগকে ছুটি দিয়া আপিস-ঘর খুলিবার পর কালীচরণ ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ছুরিতে করিয়া গালা-মোহর ভাঙিয়া থলিটা উপুড় করিয়া ধরিতেই ঝর্-ঝর্ করিয়া চারিদিকে চিঠিপত্র ছড়াইয়া পড়িবে। তাহার পর মাষ্টার মহাশয় বাক্স খুলিয়া খাতাপত্র বাহির করিয়া কি-সব লিখিতে থাকিবেন আর কালীচরণ কতকগুলা চিঠি গুছাইয়া লইয়া ঝপাঝপ করিয়া মোহরের ছাপ দিতে থাকিবে।

সে কতদিন কালীচরণের একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে চিঠিপত্রে মোহরের ছাপ দিতে দেখিয়াছে।

২

কালীচরণ আসিয়া ডাকের থলি নামাইয়াছে।

মাষ্টার মহাশয় তাহাদিগকে ছুটি দিতেই মেয়েটি তাহার পুঁথিপত্র এবং পেন্সিল, সুচ, সুতা ইত্যাদি সম্বলিত সাবানের বাক্সটি একত্র করিয়া বাঁধিয়া নদের ধারে পিটুলী গাছটার তলায় আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

সে প্রতিদিন ছুটির পর এই স্থানটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ডাকঘর হইতে কালীচরণ চিঠির তাড়া লইয়া বাহির হইলেই তাহার নিকট গিয়া সে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে—'চরণ-কা, চিঠি নেই?' কালীচরণ একবার মাত্র ঘাড় নাড়িয়া বলে—'না'।

প্রতিদিন সে জিজ্ঞাসা করে আর প্রতিদিনই কালীচরণ 'না' বলে এবং এই 'না' শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই তাহার কর্ণমূল কেমন যেন লজ্জায় রাঙা হইয়া ওঠে। তথাপি সে জিজ্ঞাসা করে এবং প্রতিকূল উত্তর সংগ্রহ করিয়া প্রতিদিনই ম্লানমুখে সে বাড়ি ফিরিয়া যায়।

চিঠি যে কোনোদিনই থাকে না তা নয়, কখনও-সখনও হয়ত কালীচরণ তাহার হাতে একটি পোষ্ট কার্ড কিংবা খাম বাহির করিয়া দেয়, সে উপরের আঁকাবাঁকা বাংলা লেখা দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে, মেজদি লিখিয়াছেন পলাশম হইতে।

পলাশমে তাহার দিদির বাড়ি। বেশ গাঁ-টি! তেঁতুল-তলায় উন্মুক্ত একটা গেড়ের পারেই তাহার দিদিদের 'টেঁশকেল'। গেড়ের পরপারেই বড় বড়

অর্জ্জুন গাছগুলায় হনুমানেরা লাফালাফি করে, দক্ষিণ দিকে কদ্‌বেল-গাছটার ওদিকেই খুব বড় পদ্মপুকুর—জল দেখা যায় না, শুধু সবুজ বৃত্তাকার বড় বড় পাতাগুলাকে পাশ কাটাইয়া হাজার হাজার লাল পদ্ম আকাশের দিকে আপনাকে মেলিয়া ধরিয়াছে।

ভাল লাগিলেও সে সেখানে বেশী দিন থাকিতে পারে না। তাহার কেবলই মনে হয়, যদি তাহার বাবা ইতিমধ্যে দেশে আসিয়া ফিরিয়া যান!

তাহার বাবার পত্রও সে বেশ চিনিতে পারে। খামের উপর ইংরেজীতে ঠিকানা লেখা, তাহারও আগে পরিষ্কার বাংলা অক্ষর—'পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী, শ্রীচরণকমলেষু'—পড়িলেই বুক ঢিপ্ ঢিপ করিয়া ওঠে, বাবা তাহার পত্র দিয়াছেন।

কিন্তু কখনও-সখনও। দিতে তিনি পারেন চিঠি রোজই; রোজ না হউক চার-পাঁচ দিন পরে পরেও,—তা তিনি দেন না। লেখেন—কাজের চাপ, সময় অল্প, চিঠি লিখিতে আলস্য ধরে।

আর চিঠি দেন ও-বাড়ির দাদামশায়কে, জমিজমার সম্বন্ধে। দাদামশায় অর্থাৎ সইয়ের বাবা, দূর সুবাদে দাদামশায়; ভারী ভাল লাগে তাঁকে। কিন্তু তাঁহাকে ত আর জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই,—না জিজ্ঞাসা করিয়াই রক্ষা নাই বলে! অমনি তিনি যখন-তখন তাহাকে ডাকিয়া বলেন—'ও শ', তোমার বাবা যে ভাই আমায় চিঠি দিয়েছেন আজ!'

নাম তাহার শৈলবালা। তাহার নামের আদ্যক্ষর ধরিয়াই দাদামশায় তাহাকে ডাকিয়া থাকেন।

প্রথমটা সরল বিশ্বাসে সে হয়ত জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে—'কি লিখেছেন বলুন না ভাই!' পরক্ষণে দাদামশায়ের কৌতুকোজ্জ্বল মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই শশব্যস্তে—'না, দরকার নেই, আমি শুনতে—চাইনে—' বলিতে বলিতে কখনও-বা হাত দিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিতে যায়, আর কখনও-বা নিজের কানে আঙুল টিপিয়া ধরে!

কিন্তু তা করিলে কি হয়, দাদামশায় ততক্ষণে প্রবল হাসিতে ঘর ফাটাইবার উপক্রম করিয়া পাড়াসুদ্ধ লোককে শুনাইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়া দেন,—'খবর যে দিয়েছেন ভাই, সে এক চমৎকার!…একটি চুষিকাটি, একটি লাল টুকটুকে বর…'

—অসভ্য!

সে ছুটিয়া বাড়ি পলাইয়া যায়।

কালীচরণ বাহিরে আসিয়াছে।

চকিতে মেয়েটি একটু অগ্রসর হইয়া আসে—"চরণ-কা', আছে?" একটি মধুর ভঙ্গীতে ঘাড় হেলাইয়া সে জিজ্ঞাসা করে।

কালীচরণ দাঁড়াইয়া চিঠির গোছা নাড়িতে থাকে, আর শৈলবালার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া ওঠে—যদি তাহার বাবার চিঠি হয়? আর যদি তাহাতে লেখা থাকে, যে, শীঘ্রই—

নাঃ, অত আশা করিতে নাই। একটি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব উদাসীনের ভাব বজায় রাখিয়া সে হাত পাতিয়া দাঁড়ায়।

আশা বা নিরাশা মানুষের মনে। বাস্তব সেখানে পিছন ফিরিয়া থাকে। তাই সে তাহার হস্তস্থিত পত্রটির উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিতেই একটি আনন্দোচ্ছ্বসিত অস্ফুট শব্দ করিয়া ওঠে…

তাহার বাবাই পত্র দিয়াছেন, এবং যাহা সে কিছুক্ষণ আগে আশা করিতেও ভয় পাইয়াছিল, পোষ্টকার্ডখানির বিষয়-পৃষ্ঠায় কয়েক ছত্র সুপরিচ্ছন্ন লেখার ভিতর দিয়া আশাতীত সম্ভাবনায় তাহাই মধুর ও প্রোজ্জ্বল সত্যে স্পষ্ট হইয়া ওঠে—

আপিসের কি এক কাজে আগামী শুক্রবার তিনি কলিকাতায় যাইবেন, ফিরিবার পথে শনিবার বৈকালে একবার বাড়ি ঘুরিয়া আসিবেন ইচ্ছা আছে। ছেলে-মেয়েদের জন্য কাপড়চোপড়ের প্রয়োজন থাকিলে পত্রপাঠ যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়।

দুই-তিন ছত্রই ত লেখা! কিন্তু তাহার মনে হয়, দুই-তিন বৎসর ধরিয়াও সে যেন তাহা পড়িয়া যাইতে পারে।

তাহার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়, তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া ওঠে, সে চিঠিখানি তাহার পুঁথিপত্রের সাথে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বাড়ির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়।

ছুটিতে তাহার বড় ইচ্ছা করে, কিন্তু সম্প্রতি তাহাকে পথেঘাটে ছুটিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া তাহারও কেমন যেন ছুটিতে আজকাল লজ্জা লজ্জা বোধ হয়।

সে এখন বাড়ি যাইবে, পথে কোথাও দাঁড়াইবে না—মরিয়া গেলেও না। বরাবর বাড়ি গিয়া তাহার বইপত্র যথাস্থানে রাখিয়াই গঙ্গাদের বাড়ি যাবার নাম করিয়া সে কুঠরী ঘরে গিয়া পত্রখানি পড়িতে বসিবে।

তাহারও আগে হয়ত ঠাকুমা তাহাকে জল খাইতে ডাকিবেন—দুইখানি রুটি আর একটু গুড়, কিংবা হয়ত মুড়ি।

মুড়ি চিবাইতে আরও দেরি হইয়া যায় — সে অসুস্থ হইবারই ভাণ করিবে।

ও-বাড়ির রোয়াক, সম্মুখেই একটু তৃণাচ্ছাদিত সব্‌জী, তাহার পরেই পথ। পথের ঠিক ও-দিকেই তাহাদের কুঠরী ঘর। ময়রা গেড়ের ধার দিয়া একটু ঘুরিয়া গেলেই তাহাদের বাড়ির নাচ-দুয়ার।

ও-বাড়ির রোয়াক ঘিরিয়া নারিকেল গাছের সারি, তাহারই ও-ধার হইতে হঠাৎ দাদামশায়ের গলা শুনিতে পাওয়া যায়—'ও ভাই শ, মূর্দ্ধন্য ষ, দন্ত্য স, হ —'

তাহার আনন্দ-চঞ্চল গতি সহসা থামে, সে রোয়াকের দিকে চকিতে ঘাড় ফিরায়, ফিরাইয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে—

'শনিবার দিন বাবা আসবেন দাদামশায়! এই চিঠি!'

দাদামশায় উৎসাহিত হইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"সত্যি ভাই, তাই নাকি ভাই, কি লিখেছেন ভাই, কাকে ভাই?—'

'আমাকে ভাই!'

কথাটা মিথ্যা। পত্র দিয়াছেন তিনি তাঁহার মাকে—শৈলর ঠাকুমা।

তা, হউক মিথ্যা—ও মিথ্যাটুকু বলিতে আনন্দে ও গর্ব্বে যেন তাহার বুক ভরিয়া ওঠে—তাহার বাবা তাহাকে পত্র দিয়াছেন!

'কি লিখেছেন দেখাবে না ভাই?'

'না ভাই।'

এইবার সে সত্যই ছুটিয়া দৃষ্টির অন্তরালবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

৩

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাড়ার সকলেই কথাটা জানিতে পারে। জানিতে পারে, যে, আগামী শনিবার বৈকালে শৈলর বাবা আসিবেন।

সে কিন্তু মর্ম্মাহত হইয়া লক্ষ্য করে যে, যত উচ্ছ্বসিত হইয়া কথাটা সে সকলকে বলিয়া বেড়ায় সকলে যেন তাহা শুনিবার জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। কেউ বলিলেন—'বেশ!' কেউ বলিলেন—'কবে?' কেউ বলিলেন শুধু—'ও'।'

কেউ-বা আবার তাহার কথার কোন উত্তরই দিলেন না, কতকগুলি পেঁয়াজ আগাইয়া দিয়া হয়ত বলিলেন—'এ-গুলো ছাড়িয়ে দিয়ে যা ত রে!'

তাহার বাবার আগমন-সম্বন্ধে সকলের এই অখণ্ড ঔদাসীন্য তাহার কোমল বালিকাচিত্তে কেমন যেন বেদনা বহিয়া আনে। তাহার গলায় কি যেন আট্‌কাইয়া যায়, চোখে-জল ভরিয়া আসে…সে বাড়ি না গিয়া দাদামশায়ের নিকট গিয়াই উপস্থিত হয়।

সেখানে দাদামশায়ের সঙ্গে নানা গল্প-কথার ভিতর দিয়া আবার কখন তাহার মন ফিরিয়া আসে, সে আবার হাসে, আবার তাহার চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, দাদামশায়ের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া সে নিবিষ্ট চিত্তে সে-সকল গল্প-কথার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দেয়।

'তা হ'লে ভাই, এ-সুযোগ আর কোন মতেই ছাড়া উচিত নয়, কি বল?' দাদামশায় বলিতেছিলেন।

পরম বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া সে বলিল, 'যান্ ও-সব বাজে কথার আমি কোন উত্তর দিইনে।'

কথাটা তাহার বিবাহের, আর সুযোগটা তাহার পিতার আগমন ও কলিকাতা হইতে আগত দিদিমার এক ভাইয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

দাদামশায় বলিলেন—'বলি শোন ভাই, বাজে কথা

নয়। তোমাকে ত ওর খুবই পছন্দ হয়েছে, শুধু তুমিই তাকে পছন্দ কর কি-না এতটুকু জানলেই······দাঁড়াও, ডাকাই যাক তাকে···অমল!'

অমলকে সে দেখিয়াছে। একটি সুন্দর-মত ছেলে; তাহার কথা কহিবার, দাঁড়াইবার, জামাকাপড় পরিবার ভঙ্গী—কেহ তাহার সহিত কথা কহিলেই তাহার বিনয়-পূর্ণ সস্মিত মুখভাব—অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা—সবই যেন কেমন নূতন-নূতন! গাঁয়ের কোন ছেলেরই সহিত তাহার কোনখানটিতেই যেন মিল নাই। কেমন যেন মিল নাই। কেমন যেন—সে ঠিক গুছাইয়া ভাবিতে পারে না—ভারী অদ্ভুত লাগে, কিন্তু ভারী ভাল লাগে সত্যি!

সে তাহাকে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু বড় শুভ মুহূর্ত্তে নয়। সে-দিন সন্ধ্যায়—ভাবিতেও তাহার লজ্জা লাগে—গলা ছাড়িয়া অসভ্যের মত গান গাহিতে গাহিতে সে দাদামশায়ের নিকট আসিতেছিল। সদর-ঘরে ঢুকিয়াই সে দেখিতে পায়—একটি ছেলে তক্তপোষের উপর বিছান একটি ধপধপে চাদরের উপর বসিয়া কি পড়িতেছিল। পিছনে একটা সুটকেস পাশে একরাশ বই-কাগজ, গায়ে একটি অদ্ভুত ধরণের গেঞ্জী······

সদর-ঘরে একজন নূতন মানুষকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে খানিকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর সে মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতেই সে মাঝের ঘরে পলাইয়া যায়।

না ছুটিলেই কিন্তু ভাল হইত—কিন্তু—যা হইবার তা···দাদামশায়ের ডাক শুনিয়া সে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।

—'কি বলছেন?'

সে পলাইতে পারিল না, দাদামশায় তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন।

বলিলেন—'এই দেখ ভাই আমাদের শ অর্থাৎ শৈল, মানে শৈলবালা। এর বড় ইচ্ছে, যে, তুমি এর বর হও, শুধু তোমার একে পছন্দ হয়েছে কি-না জানতে পারলেই···'

শৈলবালা লজ্জাজড়িতকণ্ঠে বলিয়া ওঠে—'যাঃ আমি··· তাই বুঝি! নিজেই···ভারী ইয়ে—ছাড়ুন—'

লজ্জায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া ওঠে।

দিদিমার ভাই কোনো কথা না কহিয়া মুখ নীচু করিয়া চলিয়া গেলেন, আর সে হাস্যনিরত দাদামশায়ের কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া রান্নাঘরে দিদিমার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল—

'কি লজ্জার কথা বলুন দিকি ভাই?'

'কি লজ্জার কথা, ভাই?' দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে বলে-"দাদামশায় আপনার ভাইকে ডেকে বললেন কি না, যে,—আমি—ইয়ে—'শ তোমাকে বিয়ে করবে বলেছে'—আমি বলেছি ও-কথা? বলতে পারি তা কখনও?"

'তাও কি বলতে পারা যায় ভাই? একটুও যদি আক্কেল আছে ওর!'

হাসি লুকাইবার জন্য দিদিমা মুখ ফিরাইলেন সে তাহা বুঝিতে পারিল না। আপন মনেই কত কি কহিয়া সে বাড়ি যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

সদর-ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সে শুনিতে পাইল—দাদামশায় দিদিমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন; সম্ভবতঃ তাহারই সম্বন্ধে। তাহার কানে ভাসিয়া আসিল—

"···ফুলের মত এতটুকু কচি মেয়ে ভাই, যখন ওর মা মারা যায়—"

দিদিমার ভাইয়ের উত্তরটুকু এবার সে কিন্তু কান পাতিয়া শুনিল—

"সত্যি! ভারী সুন্দর, ভারী লক্ষ্মী মেয়েটি!—"

আনন্দ ও গৌরবে তাহার বুক ফুলিয়া উঠিল। অনেকেই তাহাকে ও-কথা বলে বটে, কিন্তু সে যে শুধু তাহাকে ঠাট্টা করিয়া রাগাইবার জন্য তাহা সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে। কিন্তু ইনি ত ঠাট্টা করিয়া ও-কথা বলেন নাই!

নিশ্চয়ই সে লক্ষ্মী মেয়ে! দুষ্টু বলিলেই যদি মানুষ দুষ্টু হইয়া যাইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না!

বাবা আসিলে তাহার লক্ষ্মীপনার প্রমাণস্বরূপ কি-ভাবে যে দিদিমার ভাইয়ের এই কথাগুলি সে তাঁহাকে

গুছাইয়া বলিবে, তাহারই মুসাবিদা করিতে-করিতে সে বাড়ি আসিয়া পৌছায়।

৪

দামোদর।

আয়তন তাহার গঙ্গার মত বিশাল নয় বটে, কিন্তু ভয়ঙ্কর! গঙ্গা ধীর, স্থির, আত্মসমাহিতা; দামোদর দুর্দ্দম ও চঞ্চল। স্বভাবে গঙ্গা গম্ভীরা, দামোদর ক্রূর ও অবিশ্বাসী। গ্রীষ্মের রুদ্র-শুষ্কতায় নদ-বক্ষের তপ্ত বালুরেখায় আপনাকে কবে সে হারাইয়া ফেলে, বর্ষায় ক্ষণে ক্ষীণকায় ক্ষণে অতি স্ফীত হইয়া আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত রচিয়া ফেনিল উচ্ছ্বাসে সে গর্জ্জন করিয়া ছোটে! তাহার সে গর্জ্জায়মান ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির দিকে চাহিলে সত্যই মনে কেমন যেন এক আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

গভীর রাত্রে বিছানায় শুইয়া শৈলবালা সেই গর্জ্জন-শব্দে কান পাতিয়া দিল। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমান্ত বেড়িয়া সে বিশ্রব্ধ গর্জ্জন যেন হু হু শব্দে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে...

ঠিক যেন গ্রামে বৃষ্টি আসিতেছে! প্রথমে দূরে, পরে নিকটে, তাহার পর গ্রামের সীমান্তে আসিয়া বৃষ্টির সে-শব্দ যেন স্থির হইয়া দাঁড়ায়।

এই দামোদর পার হইয়াই তাহার বাবা আসিবেন। তখন নদীতে কত জল থাকিবে কে জানে! ধরা যাক্—জল কমই থাকিবে। বাবা তাহার নৌকায় উঠিবেন, নৌকা মাঝ-নদীতে আসিবে—এমন সময়—হঠাৎ যদি নদীতে 'হড়্কা' আসিয়া পড়ে!

হাজারিবাগ না কোথা হইতে, সে ঠিক বলিতে পারে না, ও-পারে টেলিগ্রাম আসে, ও-পারের লোকেরা চীৎকার করিয়া এ-পারের লোকেদের তাহা জানাইয়া দেয়—নদে এত ফুট জল নামিয়াছে।

অম্‌নি সকলে সাবধান হইয়া যায়। বুঝিতে পারে—অচিরে নদীতে হড়্কা পড়িবে। হড়্কা পড়িবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নদের দিকে চাহিয়া মাঝিরাও সে-কথা, কে জানে কেমন করিয়া বুঝিতে পারে।

কখনও-বা নদের প্রতিকূল দিকের বহুদূর হইতে কে বা কাহারা 'হড়্কা, হড়্কা' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে আর অম্‌নি গ্রামের নদীতীর হইতে নদীর অনুকূল দিক উদ্দেশ করিয়া গ্রামের লোকেরাও 'হড়্কা, হড়্কা' বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে। এমনি করিয়া স্রোতেরও আগে লোকের মুখে-মুখে সে-সংবাদ তীরবাসিগণকে সাবধান করিয়া দিয়া দামোদরের বুক বহিয়া যায়।

তাহার পর দেখিতে দেখিতে প্রলয়-গর্জ্জনে নদ-বক্ষ স্ফীত হইয়া ওঠে, কত গাছ ভাঙিয়া, পাড় ভাঙিয়া অকস্মাৎ কোথা হইতে দামোদরের দুই কূল ভরিয়া গেরুয়া-জলের পর্য্যাপ্ত সমারোহ লাগিয়া যায়।

ভয়ে ভয়ে সে তাহার চিন্তাধারাকে ভিন্ন গতিগত করে।

কতদিন পরে আজ তাহার বাবা আসিতেছেন, কত না গল্প-কথা তাহার সারা চিত্ত ভরিয়া ভিড় লাগাইয়া দিতেছে। বাবা হয়ত তাহার একটি কি দুইটি দিন মাত্র থাকিবেন, হয়ত তাহার সব কথা বলা হইবে না, হয়ত-বা দরকারী কথাগুলি বলিতে সে ভুলিয়াই যাইবে... অতএব, একটি দীর্ঘতর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে তাহার মনোমত কথা ও ঘটনার নির্ব্বাচন করিতে বসে।

কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে একটি কৌতুক-কল্পনা আসিয়া তাহার চিত্ত অধিকার করে।

বাবা যখন তাহার বাড়িতে আসিবেন তখন সে চুপিচুপি দাদামশায়ের বাড়িতে গিয়া লুকাইয়া থাকিলে বেশ হয়,—সে এক ভারী মজা হয় কিন্তু! তাহার খোঁজ হইতে থাকিবে, বাবা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবেন, এমন সময় সে ছুটিয়া আসিয়া বাবার কণ্ঠলগ্ন হইয়া হাসিয়া উঠিবে।

বাবা আদর করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিবেন হয়ত—পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া আগেকার দিনের মত বলিবেন হয়ত—'দুষ্টু মা আমার, পাজি মা আমার, চঞ্চলা লক্ষ্মী আমার!'

ভবিষ্য পুলকের পরিকল্পনায় তাহার বুক গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল।

একদিন—তাহার মনে পড়িয়া গেল—সে তাহার

বাবার চোখে একখণ্ড কাপড় বাঁধিয়া তাঁহাকে 'কানামাছি' সাজাইয়াছিল। তাহার পিছনে-পিছনে ছুটিতে গিয়া বাবা তাহার হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। চঞ্চলা-দি বলিয়াছিলেন—'ধন্যি সোয়াগী মেয়েই হয়েছ মা তুমি! বুড়ো বাপকে পর্য্যন্ত নাচিয়ে নিয়ে ফিরচ—'

আর একদিন তাহারই 'গলার হার' আশালতা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বলিয়াছিল—'হাঁ করত!' তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল—সে-ও একদিন এক মুঠো কিস্‌মিস লইয়া গিয়া 'গলার হার'কে হাঁ করিতে বলিয়াছিল। মনে পড়িতেই সে নিশ্চিন্ত মনে চোখ মুদিয়া হাঁ করিতে 'গলার হার' কি একটা ফল তাহার মুখের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। সে তাহা চিবাইতেই অতি কটু-বিস্বাদে মুখ বিকৃত করিয়া ফলটা বাহির করিয়া ফেলিতেই দেখে—সেটা পিটুলি ফল!

সখীর কৌতুক-হাস্য সেদিন, চঞ্চলাদি'র কথারই মত তীব্র বিদ্রূপের জটিল ইঙ্গিত লইয়া তাহার মর্ম্মে আসিয়া বাজিয়াছিল।

গভীর রাত্রে চক্ষে তাহার ঘুম নামিয়া আসিল, চিন্তার খেই হারাইয়া গেল।

৫

অবশেষে প্রতীক্ষার অন্তহীন দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত হইয়া আসিল, শনিবারও আসিয়া দেখা দিল—শৈলবালার বাবার আসিবার দিন।

সকালে উঠিয়াই সে স্নান সারিয়া লইল, কোথা হইতে একরাশ ধুতুরা ফুল তুলিয়া আনিয়া নিত্যদিনকার নিয়মানুযায়ী সে শিবপূজা করিতে বসিল, বসিয়া প্রথমেই সে প্রার্থনা করিল, হে ভগবান, বাবা যেন তাহার ভালয় ভালয় বাড়িতে আসিয়া পৌঁছান।

তাহার পর সে ও-বাড়ির দিদিমার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। রান্নাঘরে দাদামশায় ও দিদিমার ভাই তখন জলখাবার খাইতে বসিয়াছেন। সে দরজার পাশে গিয়া দাঁড়ায়।

দিদিমা দরজার গোড়াতেই বসিয়াছিলেন, অপাঙ্গে তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—এলো চুল, মাথার বামে সিঁথি, তাহারও বামে একগোছা শ্বেত অপরাজিতা চুলের ফাঁসে আত্মদান করিয়া লজ্জাবনতমুখী হইয়াছে, মুখখানি শরৎপ্রাতের শিশিরস্নাত ভিজা ফুলেরই মত সুন্দর! সুকুমার অঙ্গ বেড়িয়া পরিষ্কার একখানি শাড়ী, পরিধান করিবার ভঙ্গীতেও আজ যেন বিশেষত্ব আছে। হাসিয়া কহিলেন—'আজ এত সজ্জা কেন ভাই?'

দাদামশায় বিজ্ঞের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া কহিয়া উঠিলেন—'বিদেশীর মন ভোলাতে!'

দিদিমার ভাই থালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, লজ্জায় শৈল'র মুখ আরক্তিম হইল। সে রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াতেই দিদিমা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন;—উঠিয়া লজ্জানতাননা শৈলবালার চিবুক ধরিয়া বড় স্নেহময় কণ্ঠে আদর করিয়া কহিলেন—'এত যার রূপ হয় ভাই, তার অদৃষ্টে কিন্তু কালো বর জোটে।'

সারাদিন তাহার অধীর প্রতীক্ষায় দীর্ঘতর হইয়া উঠিল। বেলা থাকিতে সে একটি লণ্ঠন পরিষ্কার করিয়া তেল ঢালিয়া, তাহার দাদার হাতে দিয়া দাদাকে ওপারে পাঠাইয়া দিল। পাঠাইয়া দিয়া সে বাহিরে আসে, আসিয়া তাহাদেরই বাড়ির সদর-দরজার সম্মুখে নারিকেল গাছটার গোড়ায় সে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল।

দাদাকে লণ্ঠন হাতে করিয়া ময়রা গেড়ের ধার দিয়া চলিতে দেখিয়া ও-বাড়ির রোয়াক হইতে দাদামশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'ও, বিরিঞ্চি! বলি এই বেলা দুটোর সময় হ্যারিকেন আর লাঠি নিয়ে কোথায় চললে হে?'

দাদার পরিবর্ত্তে শৈলবালাই তাহার উত্তর দিল—'আ—হা, ন্যাকা!—জানেন না যেন কিছু!'

দাদামশায় উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া ওঠেন, সে অন্যদিকে মুখ ফিরায়।

৬

ঘনায়মান সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে শৈলবালার মনেও শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। পোষ্ট-আপিসের ঘাট হইতে দাদা

মশায় কয়েকবারই খোঁজ লইয়া আসিলেন,—তাহার বাবা এখনও ওপারের ঘাটে আসিয়া পৌঁছান নাই। তাহার দাদা ঘোরাঘুরি করিয়া অবশেষে ওপারে নদীর ধারে একা আসিয়া বসিয়া আছে। একে ত সন্ধ্যার আগে খেয়াই বন্ধ করিয়া দেওয়া নিয়ম, তাহার উপর মাঝিরা এখন হইতেই সুর ধরিয়াছে—নদীর অবস্থা ভাল নয়, তাহারা নৌকা খুলিতে পারিবে না।

দাদামশায় কহিলেন—'দাঁড়াও ভাই, দেখি গিয়ে, বাপু বাছা ক'রে যদি ব্যাটাদের রাজী করতে পারি।'

শৈলবালা দাদামশায়ের হাত ধরিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষেরই মত মিনতিমাখানো কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'দাদামশায়, আমিও যাব!'

পথে কালু ময়রার দুইটি ছেলেকে মাছ ধরিবার ঘুনি আর সাবল লইয়া চলিতে দেখিয়া দাদামশায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মানার নীচে বুঝি ঘুনি পাততে চললি রে তোরা?'

একজনই উত্তর দিল, বলিল—'না গো কত্তা জল গড়িয়েচে গাঁয়ে।' অর্থাৎ গ্রামে জল ঢুকিতেছে।

শৈলবালার বুক ঢিপ করিয়া উঠিল, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদামশায়, এই যে কিছুক্ষণ আগে দেখে গেলুম, নদী তিন-পো বইচে?'

দাদামশায় বলিলেন—'হড়কা পড়েচে ভাই।' সত্যই তিনি চিন্তিত হইয়া ওঠেন, চলিতে চলিতেই বলেন—'তাই ত ভাই শ, এ-অবস্থায় ওপারে নৌকা পাঠানো ঠিক হবে না কিন্তু—'

এই ভাবে মল্লিকদের ধানভানা কলের নিকট আসিতে আসিতেই দুর্মদ নদের গর্জ্জনোচ্ছ্বাস শ্রবণ-পথে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, খানিক অগ্রসর হইয়া সদর-পথের উপর আসিয়া পড়িতেই—

চমৎকার!

পোষ্ট-আপিসের সমুখ দিয়া জল সদর-রাস্তা ধরিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিয়া প্রচণ্ড শব্দে কাঁটাল গেড়েয় ঘুরিয়া পড়িতেছে,—সে-কলগর্জ্জনে কান পাতা দায়! সদর-রাস্তার উপর প্রায় একহাঁটু জল, নদ ও পথ একাকার! ডান দিকে আম-কাঁটালের বন। পোষ্ট-আপিসের সম্মুখে একখণ্ড দ্বীপভূমিরই মত যেন আসন্ন অন্ধকারে ছায়াময় হইয়া গিয়াছে।

দাদামশায় তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, সে ফিরিয়া গেল না। দাদামশায়ের সঙ্গে জল ভাঙিয়াই পোষ্ট-আপিসের সম্মুখে রেশের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, মাষ্টার মহাশয়, পাঁচু-খুড়া, মল্লিক-বাড়ির সর্ব্বজয় বাবু এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ওপারে নদের ধারে কাহারা যেন বসিয়া আছে—অন্ধকারে খুব অস্পষ্ট দেখা যায়।

সে শুনিল, ওপারে তাহার বাবা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি শুধু একা আসেন নাই, মল্লিক-বাড়ির সেজবাবুও বধূ ও তাঁহার এক নবজাতা কন্যাকে লইয়া কলিকাতা হইতে আসিতেছেন। মাঝিদিগকে অনেক টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাহারা নৌকা খুলিতে রাজী হয় নাই; দুইজন মাঝি না-কি ইতিমধ্যেই পলায়ন করিয়াছে।

যাহাই হউক, অবশেষে রাজী তাহারা হইলই। কোথা হইতে আট-নয় জন কালো বণ্ডাগোছের লোক আসিয়া নৌকার ধারে ধারে খণ্ড খণ্ড বাঁশ লাগাইয়া দাঁড় বাঁধিতে লাগিয়া গেল। দাদামশায় এবং সর্ব্বজয়-বাবু কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া বড় মাঝির হাতে দিলেন। গ্রামে সে-সময়ে জোর পিকেটীং চলা সত্ত্বেও কয়েক বোতল ধেনো মদ আসিয়া নৌকার খোলে আশ্রয় লইল।

দাদামশায় আর অপেক্ষা করিলেন না, নৌকা ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে। সর্ব্বজয়বাবুর হাতে লণ্ঠন ছিল, তাঁহারই পিছনে পিছনে জল ভাঙিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। এবারে কিন্তু জল ভাঙিতে গিয়া শৈলর কাপড় ভিজিয়া গেল। জল খুব দ্রুত বাড়িতেছে।

যথাসময়ে নৌকা আরোহী লইয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। সে-ধ্বনি নিস্তব্ধ রাত্রির বক্ষ ভেদ করিয়া দামোদরের উচ্ছল কল-গর্জ্জনের উপর দিয়া শৈলবালার কানে ভাসিয়া আসিল—'বল হরি হরি বোল।' বহু কণ্ঠের সমবেত ধ্বনি।

প্রথম কথা তিনটি শুনিতে পাওয়া যায় না, শেষের কথাটিই সে এক বিচিত্র সুরে নদের এপার-ওপার প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে।

তাহার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।—হে মা কালী, হে বাবা রাজরাজেশ্বর, বাবা যেন তাহার ভালয় ভালয় গ্রামে আসিয়া পৌঁছান।

৭

অবশেষে তাহার বাবা আসিয়া পৌঁছিলেন।

এ-আগমন কিন্তু শৈলবালার চঞ্চল মধুজীবনের চারিপাশে আর আনন্দ পুঞ্জীকৃত করিতে পারিল না, সে কেমন-যেন এক অননুভূতপূর্ব্ব লজ্জা-সঙ্কোচের গুরু-ভারাবনত শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে আসিয়া শৈলবালার মধুশৈশবের শেষের দিকে বড় বেদনার ছেদ টানিয়া দিল।

যে-তুচ্ছ ঘটনাকয়টিকে অবলম্বন করিয়া বালিকাটির মধুজীবনে এত বড় একটি বিয়োগ নামিয়া আসিল তাহার বর্ণনাটিই বক্ষ্যমান আখ্যায়িকার পরিশেষ কথা।

কতই না সামান্য তাহা। কিন্তু অর্থ তাহার যেমনই গভীর তেমনি বৈচিত্র্যময়।

রাত্রির প্রথম প্রহর তখন উত্তীর্ণপ্রায়। গ্রামের নালা, ডোবা, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে তখন বন্যার জল আসিয়া ঢুকিতেছে; রাত্রির ঝিল্লীরবমুখরিত গাঢ় অন্ধকারের চারিদিকে তখন কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দ। সেই শব্দকেও ছাপাইয়া যথাসময়ে ও-ঘরের দাওয়ায় তাহার বাবার কণ্ঠস্বর জাগিয়া উঠিল, 'কই গো।'

জলভরা গাড়ুর উপর একখানি পাট-করা ভিজা গামছা, একজোড়া হ্যারিকেন এবং তাহারই আলোয় সম্মুখের আসনের উপর আসীন তাহার বাবার সেই চিরপরিচিত শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি।

সে স্পন্দিতবক্ষে ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইল। আগের মত পরিপূর্ণ স্বচ্ছন্দ মন লইয়া ছুটিয়া গিয়া আর বাবার কণ্ঠলগ্না হইতে পারিল না—কোথা হইতে কারণহীন লজ্জা আসিয়া তাহার সকল চিত্ত অধিকার করিয়া বসে।

সে নিকটে গিয়া দাঁড়াইতে তাহার বাবাও মুখ তুলিয়া চাহেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সে যেন কেমন এক বিস্ময়ভরা অপরিচয়ের দৃষ্টি! সে-দৃষ্টির সম্মুখে শৈলবালা আরও কেমন যেন জড়সড় হইয়া পড়ে—কোনও মতে বাবার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়ায়।

আগের সে-সকল দিনের মত তাহার বাবা আর তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন না, মুখচুম্বন করিয়া মাথায় হাত দিয়া আগের দিনের মত আর প্রসন্ন আশীর্ব্বাদও বর্ষণ করিলেন না; পরন্তু সে উঠিয়া যাইবার সময় ব্যথিত-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া লক্ষ্য করিল—বাবা তাহার মাথায় আঙুলের ডগা ঠেকাইয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া তাহাকে বিরত করিলেন।

তাহার যেন ঠোঁট ফুলিয়া কান্না আসিল—সে ঘরে গিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিল,—বন্যার জল যেন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া গেছে। তৃণাচ্ছাদিত সবুজ ভূমির উপর গেরুয়া পলিমাটির স্তর, গাছে পাতায় সর্ব্বত্রই যেন গেরুয়া কাদার ছোপ্, সজিতলায় সজিনাগাছের ডালে দুইটা জল-মেটুলী সাপ পরস্পরকে জড়াইয়া যেন কেবল দোল খাইতেছে···

সে ভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, ঠাকুমা নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে শ্রীহরি দুর্গা, শ্রীহরি দুর্গা, বলিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

সকাল বেলায় বাবা কোথায় বাহির হইয়া গেলেন, দ্বিপ্রহরে বাড়ি ফিরিয়াই স্নানাহার করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এখনই খেয়া ধরিতে না পারিলে ওপারে আবার মশাগ্রাম ষ্টেশন যাইবার বাস ধরিতে পারিবেন না।

বিদায়-বেলায় শৈলবালা পুনরায় আসিয়া তাহার বাবার পদতলে মাথা রাখিল, কিন্তু আর যেন তাহা উঠাইতে পারিল না। বুক-ভরা কত কথা তার কিছুই বাবাকে বলা হইল না, বাবা তাহাকে আর আগের দিনগুলির মত বুকে তুলিয়া লইলেন না, তাহার কেবলই কেমন-যেন মনে হইতে লাগিল—কি যেন তাহার এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ

সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে, জীবনে আর যাহা সে ফিরিয়া পাইবে না। বুক ফাটিয়া যেন কান্না আসে, কেবলই ভয় হয়—বাবার পা হইতে মাথা তুলিতে গেলেই হয়ত সে এখনই কাঁদিয়া ফেলিবে।

বাবা তাহার তখন নিতান্ত সংসারী মানুষটিরই মত ঠাকুমার প্রতি গৃহ-রক্ষাসম্বন্ধীয় গুটিকতক প্রয়োজনীয় উপদেশের কাজ সারিয়া লইতেছিলেন—

বিচালিগুলা উঠান হইতে সজিনা-তলায় যেন দেরি না করিয়া সরানো হয়—মেজ ছেলেটি তাঁহার জন্মান্ধ, তাহাকে যেন-না যখন-তখন ওপার পাঠান হয়—বিরিঞ্চির স্কুলের মাহিনা কিছু ধান বিক্রয় করিয়া দিলেই উপস্থিত চলিয়া যাইবে—এবং শৈলও ত বেশ বড়সড় হইয়া উঠিয়াছে, মেয়েছেলে নাই-বা বেশী লেখাপড়া করিল, অতএব স্কুলে পড়িতে তাহার আর না-যাওয়াই ভাল। আর—ইয়ে—পথেঘাটে যখন-তখন ঘুরিয়া বেড়ানোটাও…

সমস্বরে তাহার সমগ্র ব্যথিত চিত্ত যেন বারংবার বলিয়া উঠিল, তাহাই হইবে, তাহাই হইবে। সে আর স্কুল যাইবে না—সে আর লেখাপড়া করিবে না—সে আর ঘরের বাহির হইবে না—সে আর কাহারও সহিত কথা কহিবে না। সন্ধ্যায় সখীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দাদামশায়কে প্রণাম করিয়া নিশ্চয়ই বলিয়া আসিবে—তাঁহার শ' মরিয়া গিয়াছে।

বড় বেদনায়, বড় অভিমানে তাহার বড়বড় দু-চোখ ভরিয়া এইবার সত্যসত্যই জল গড়াইয়া পড়িল।

মেঝেরি

শ্রীগোপাললাল দে

মাঝের হিড়,
দুই পাশে ক্ষেত দু-হাজার বিঘে,
মাঝেতে একাকী তরুর শির,
উত্তরে গ্রাম 'কাকটিয়া' নাম
দখিনে 'পদ্মা' মাঠের শেষে,
দু'য়ে পাশাপাশি যেন প্রতিবেশী
এ উহারে হেরে প্রভাতে হেসে;
বৈশাখে যবে দু-পহর রোদে
ঘূর্ণী হাওয়ায় আগুন ভাসে,
ধেনুদল লয়ে রাখাল পলায়
ক্ষীরতরুছায় সলিল পাশে,
সে দাবদাহনে ক্লান্ত পথিক
ধুধু মাঠে পড়ি কর্ম্মফলে,
অনেক ভাগ্যে প্রাণ পেয়ে যায়
এই 'মেঝেরি'র খেজুরতলে।

বারি ঝর ঝরে প্রবল বেগে,
ঘন কালিমায় মাঠ ছেয়ে যায়
পশ্চিমাকাশে সরস মেঘে,
নীল হয়ে আসে দূরের বনানী
কাছে তরুবীথি আঁধিয়া-মাখা,
অশথ বটের পাতার আড়ালে
ঢেকে বসে পাখী সজল পাখা,
বিজলী কশায় দেয়া গরজায়
দিকে দিকে ভীত প্রতিধ্বনি,
খেজুর তালের পাতায় পাতায়
ঘুঙুর বাজায় রিনিক ঝিনি,
আধ-বাতায়নে কৌতুকী চোখে
চেয়ে থাকি যদি দূরের পানে,
এই 'মেঝেরি'র বনমন্দির
নব যৌবন স্বপন আনে।

*   *   *

কাছে 'কাঁদরে'র বিল,
বর্ষার শেষে এক হয়ে মেশে
অদূরে খালের নীল সলিল ;
ঘাসে ফোটে ফুল অযুত অতুল
জলে ফোটে শুঁদি শালুক ফুল,
'কৈ মাগুরের' মাছ ঘুরে ফিরে
'শোল'-শিশু নব জীবনাকুল।

আশ্বিনে ধানে ভর ভর মাঠে
হেথা দু-গাঁয়ের ছেলেরা আসে,
ছিপ ফেলে জলে দিন কেটে যায়
ছল করা মাছ ধরার আশে,
তারা দেখে ধানে আকাশের ছায়া,
বুনো হাঁস, বক, সারস মেলা,
ঘাসে ফেরে বোড়া শিওর চাঁদারা,
কাদা জলে করে ভেকেরা খেলা,
রাখালের বাঁশী কৃষকের হাসি,
ঘুঘু কপোতের কূজন শেষে,
দুপুর গড়ায় শুধু হাতে যায়
তবু ফিরে চায় মধুর হেসে।

আবার একদা সরিষা ফুলে,
ভরামাঠখানি আয়নার মত
সুখ-পরশন আলোয় দোলে,
মটরের ফুলে আঁখি মেলে থাকে
যব গম শীষে হরষ দোলা,
দুখমাঠে চায় চিরদুখী চাষা
জীবনের শত বেদনা ভোলা ;
বিকালের দিকে বধূদের মেলা,
ঘোমটা কোথায় খসিয়া পড়ে,
হেরি মেঝেরির সরু তরুটির
পুলক শিহরে শীর্ষ নড়ে।
দখিনা বায়,
রিক্ত ভূষণ খোলা মাঠখানি
থাকে যেন আধ-চেতনে হায় ;
তখন বিজন নিবিড় দুপুরে
ভরাসন্ধ্যায় নিশীথ ছায়,
কত প্রণয়ীর প্রেম নিবেদন
শুনেছে এ তরু প্রিয়ার পায়।
কত এর জানা শোনা,
দুইখানা গাঁয়ে কত ভাব আড়ি
নেওয়া দেওয়া আনাগোনা,
কত ওঠাপড়া দুখানা গাঁয়ের
কত অতীতের কান্নাহাসি,
কত শোকাবহ স্বজন-বিরহ
কত বিবাহের মিলন বাঁশি,
কত লুণ্ঠন খুন সুগোপন
অকালে মড়কে জীবন-হানি,
নীরবে দেখিয়া আঁখি মুছিয়াছে
এই খর্জ্জুর বিটপীখানি।
আজও সেথা এক ঠাঁই,
উঁচু হয়ে আছে কোন্‌কালে
বুঝি হাঙ্গামা বাধে তাই,
রাজাদের সাথে জলকাটা
নিয়ে প্রাণ দিল অবহেলে,
বিশ বছরের ছোকরা জোয়ান,
বিধবার এক ছেলে ;
এইখানে তার গোপন সমাধি ;
জননী মরিল কেঁদে,
মেঝেরির মাটি সে স্মৃতি
রেখেছে আজিও বুকেতে বেঁধে।

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮১৬—১৮২২

১। বাঙ্গাল গেজেট

ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। ১৮১৬ সালের পূর্ব্বে এদেশে কোন বাংলা সংবাদ-পত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।...

১৮১৬ সালে প্রকাশিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেট' বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র।...

বাঙ্গাল গেজেট অল্পদিনই জীবিত ছিল। এই কারণেই বোধ হয় ইহার নাম সাধারণের মধ্যে তেমন প্রচলিত ছিল না।...

২। সমাচার দর্পণ

সমাচার দর্পণ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র। জে. সি. ম্যার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮, ২৩এ মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। প্রথম তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া হইয়াছিল। সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত।...

প্রথমাবস্থায় পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারই প্রধানতঃ 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন।...

শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সন হইতে সমাচার দর্পণকে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) করিবার ব্যবস্থা করিলেন।...

১৮৩২ সনে সমাচার দর্পণ দ্বিসাপ্তাহিকে পরিণত হয়।...সমাচার দর্পণের দ্বিসাপ্তাহিক সংস্করণ বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।...১৮৩৪, ৮ই নভেম্বর হইতে পুনরায় প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইতে লাগিল।

১৮৪১, ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামপুর মিশন হাল ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীদের চেষ্টায় সমাচার দর্পণ শীঘ্রই পুনর্জ্জীবিত হইল।...

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ বাহির করিয়াছিলেন ১২৪৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'জ্ঞানদীপিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ভগবতী-চরণ চট্টোপাধ্যায়।

১৮৫১, ৩ মে শনিবার (২১ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখে তৃতীয় পর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ "১ বালম, ১ সংখ্যা" প্রকাশিত হইল।...

'সমাচার দর্পণ' দেড় বৎসর চলিয়া ১২৫৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে একেবারে লুপ্ত হয়।

৩। সম্বাদ কৌমুদী

কলুটোলা-নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন। প্রথম সংখ্যায় বঙ্গীয় জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া এই মর্ম্মে লেখা হইয়াছিল :—"লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র-প্রচারের প্রধান লক্ষ্য...দেশবাসীর অভাব-অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে।"

১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর (২০ অগ্রহায়ণ ১২২৮) সম্বাদ কৌমুদীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।...

সম্বাদ কৌমুদী প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইত। রাজা রামমোহন রায় ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে প্রবন্ধদানে সাহায্য করিতেন। তিনি সম্বাদ কৌমুদীতে সহগমনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে ধর্ম্মহানি এবং সমাজে মানহানির আশঙ্কা করিয়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ইহার প্রথম ১৩ সংখ্যা পরিচালন করিয়াছিলেন মাত্র।

৪। সমাচার চন্দ্রিকা

সতীদাহ প্রথাকে উৎখাত করিবার জন্য রামমোহন রায়কে বদ্ধ-পরিকর দেখিয়া রক্ষণশীল হিন্দুর দল চটিলেন। প্রধানতঃ এই প্রথার সপক্ষে আন্দোলন চালাইবার জন্যই তাঁহাদের পক্ষ হইতে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের আবির্ভাব হইল। সেখানি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা'। ১৮২২ সালের ৫ই মার্চ (২৩ ফাল্গুন ১২২৮) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।...

বাংলা মাসিকপত্র

১। দিগ্দর্শন।—১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীরা "দিগ্দর্শন অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ছাপার অক্ষরে ইহাই প্রথম বাংলা মাসিকপত্র।

২। গস্‌পেল মাগাজীন।—এই মাসিক পত্রখানি দ্বিভাষিক ছিল। প্রত্যেক পাতার বাঁদিকে ইংরেজী, ডানদিকে তাহার বঙ্গানুবাদ। 'গস্‌পেল মাগাজীন'-এর প্রথম সংখ্যার তারিখ—ডিসেম্বর, ১৮১৯। ...এই কাগজখানিতে কেবল খৃষ্ট-তত্ত্ব আলোচিত হইত।

৩। ব্রাহ্মণ সেবধি।—রামমোহন রায় 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' এই নাম দিয়া ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'Brahmunical Magazine ও ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে একখানি কাগজ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাহারই সাহায্যে মিশনরীদের প্রচারিত হিন্দুশাস্ত্র-সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইত।

৪। পশ্বাবলী।—কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক এই বাংলা মাসিক পুস্তকখানিপ্রকাশিত হয়। এক এক সংখ্যায় এক-একটি জন্তুর বিবরণ এবং পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় সেই সেই জন্তুর ছবি থাকিত। 'পশ্বাবলী'র প্রথম সংখ্যার তারিখ—ফেব্রুয়ারি, ১৮২২।...

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলি' পরিচালন করেন—শ্রীরামচন্দ্র মিত্র। ইহা ১৮৩২ সনে প্রকাশিত হয়।

'পশ্বাবলী'র "Part II No. 1. Compiled and Translated

by Ramchunder Mitter" প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ সালের শেষাশেষি।

উর্দ্দু সংবাদপত্র

সেকালে আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই ইংরেজী জানিত, আর হিন্দী বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষাগুলি তখন পর্য্যন্ত এত সংস্কৃত-ঘেঁষা ও কঠিন ছিল যে সে-ভাষা সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হইলে তাহা কেহই সহজে পড়িতে পারিত না। অন্যান্য ভাষার তুলনায় তখন ভারতবর্ষে উর্দ্দু ভাষার—অবশ্য চলিত কথাবার্ত্তায়—বহুল প্রচলন ছিল।

১। জাম-ই-জাহান-নুমা

প্রথম হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু সংবাদপত্রের নাম—জাম-ই-জাহান-নুমা, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যরাজ জমশেদ যে-পেয়ালাতে সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেন। ইহা ১৮২২, ২৮এ মার্চ তারিখে কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ফার্সী সংবাদপত্র

চলিত কথাবার্ত্তায় উর্দ্দু ভাষার বহুল প্রচলন থাকিলেও লেখা ভাষা হিসাবে ইহার তেমন চলন ছিল না। তখনকার দিনে দেশী সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা ছিল কম। যাঁহারা সংবাদপত্র পড়িতেন তাঁহারা দেশের সম্ভ্রান্ত লোক। এই শ্রেণীর লোকেরা আবার ফার্সী ভাষায় শিক্ষালাভ করিতেন, কাজেই তাঁহাদের নিকট উর্দ্দু সংবাদপত্রের আদর ছিল না। সভ্যসমাজের ভাষাই ছিল ফার্সী। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে প্রায় ১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালতের রায়, নিম্ন রাজকর্ম্মচারীদের রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পত্রাদি ফার্সী ভাষায় লিখিত হইত। কাজেই ফার্সী সংবাদপত্র পড়িবার ও পয়সা দিয়া কিনিবার মত গ্রাহক তখন এদেশের বড় বড় শহরে যথেষ্ট ছিল।

মীরাৎ-উল্-আখ্বার।—ফার্সী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব রামমোহন রায়ের। ইহার নাম—'মীরাৎ-উল-আখ্বার,' বা সংবাদ-দর্পণ। কলিকাতার ধর্ম্মতলা হইতে মুদ্রিত হইয়া, ১৮২২ সনের ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২২৯) শুক্রবার এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয়।

অতীব কৃতিত্বের সহিত এক বৎসর কাগজখানি চালাইয়া রামমোহন ইহার প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩য় সংখ্যা)

প্রাচীন সাহিত্যে মহিলা-কবি ও বিদুষী

শ্রীমৃণাল দাশ-গুপ্তা

বৈদিক যুগে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে কেহ উদাসীন ছিলেন না। কারণ দেখা যায় বহু স্ত্রী-কবি ঋগ্বেদের বহু মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের উপর লিখিত সৌনকাচার্য্যের বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থে সাতাশ জন স্ত্রী-ঋষির উল্লেখ আছে—কিন্তু ইহাদের ভিতর উর্ব্বশী, যমী, অদিতি প্রভৃতি কতকগুলি কল্পিত দেব-চরিত্র ছাড়িয়া দিলে, ঋক্-রচনাকারী মানবী স্ত্রী-কবি নয়জনের নাম পাওয়া যায়। এই নয়জনের নাম ঘোষা কাক্ষীবতী, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, অগস্ত্যভগিনী, লোপামুদ্রা, শশ্বতী, রোমশা এবং বাক্‌দেবী। এই সকল স্ত্রী-কবি রচিত মন্ত্রগুলি অন্যান্য ঋক্ মন্ত্রের মত শ্রুতি বলিয়া সমাদৃত হইত। সুতরাং বৈদিক যুগের অনেক নারীই যে উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন, তাহা তাঁহাদের ঋক্ বা মন্ত্র রচনার পারদর্শিতা হইতে স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

ঋগ্বেদের সময়ের স্ত্রীলোকদিগের বিষয়ে জানিতে হইলে তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত মন্ত্র রচনাগুলির সাহায্য ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই, কারণ প্রাচীনকালে জীবন-চরিত লিখিবার পদ্ধতি ছিল না বলিয়া কেহ ধারাবাহিক জীবনী লিখিয়া রাখা আবশ্যক মনে করেন নাই।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ এবং ৪০ সূক্তের (এক একটি সূক্তে কতকগুলি করিয়া ঋক্ বা মন্ত্র থাকে) সমস্ত ঋক্‌গুলিই ঘোষানাম্নী স্ত্রী-কবির রচিত। যে কয়টি নারী-ঋষির ঋক্ ঋগ্বেদে রক্ষিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ঘোষার ন্যায় এতগুলি ঋক্ কেহই রচনা করেন নাই। ঘোষা উচ্চ বংশোদ্ভবা, বহু ঋক্ রচয়িতা দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কাক্ষীবৎ ঋষির কন্যা ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ঋষিবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, ঘোষার সর্ব্বশরীর শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল বলিয়া বয়স্থা হইয়াও পিতৃগৃহে অবিবাহিত-অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। পিতৃ পিতামহ-আরাধিত দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিলে, পরে তিনি বিবাহিতা হইয়া সন্তানের জননী হন। তাঁহার প্রতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এতাদৃশী অনুকম্পা দর্শনে ঘোষা তাঁহাদের বন্দনা করিয়া মন্ত্রগুলি রচনা করেন। মন্ত্রগুলিতে তিনি সরলভাবে নিজের মনের নিগূঢ়তম আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা অশ্বিনীদের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। ঘোষা বলিতেছেন—'হে অশ্বিদ্বয়, যে সকল ব্যক্তি তোমাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আহ্বান করে, তোমরা তাহাদের নিকটই গমন করিয়া তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ কর। কুমারী ঘোষা আমি, তোমাদের কাছে আমার এই কামনা জানাইতেছি যে, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত এরূপ একটি বলিষ্ঠ স্বামী আমাকে দান কর। আমি সেই স্বামীর প্রিয়া হইয়া ধন, পরিজন সহ সুখে তাঁহার গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।' অশ্বিদ্বয় ঘোষার এ আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদিগের কৃপায় কুষ্ঠরোগ মুক্ত হইয়া ঘোষা বলিতেছেন 'আমি ঘোষা, আমি নারী লক্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছি এবং সৌভাগ্যবতী হইয়াছি, আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত বর আসিয়াছে।' বলা বাহুল্য ঘোষা এক বিপত্নীক ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়া সুহস্ত নামক পুত্রের জননী হন। ঘোষার পুত্র সুহস্ত ৪১ সূক্তের তিনটি ঋকেরই রচয়িতা ছিলেন।

নারী ঋক্-রচয়িতা গোধা মাত্র দেড়খানি ঋক্ বা মন্ত্র রচনা করেন, সুতরাং ইহা হইতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

বিশ্ববারা অত্রিগোত্রজাতা নারীঋষি ছিলেন। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলটি সম্পূর্ণই এই অত্রিবংশের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বিশ্ববারা অষ্টাবিংশ সূক্তের সর্ব্বশুদ্ধ ৬টি ঋক্ রচনা করেন এবং সে সমস্তই অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে রচিত। বিশ্ববারা যে কেবলমাত্র মন্ত্রই রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে তিনি একজন ঋত্বিক্ও ছিলেন, তিনি স্বয়ং যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন। ঋগ্বেদের সময়ে যজ্ঞেতেও স্ত্রীলোকের সমান অধিকার ছিল, এবং তাঁহারা একাকী যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন। প্রথম ঋক্‌টিতেই দেখিতে পাই দেবগণের স্তবোচ্চারণ পূর্ব্বক হব্যপাত্র লইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তিনি প্রজ্জ্বলিত অগ্নির নিকট গমন করিতেছেন। তিনি বিবাহিতা ছিলেন, কারণ পরবর্ত্তী ঋক্‌গুলিতে তিনি দাম্পত্য-সম্পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—'হে অগ্নি! তুমি সম্যক্‌রূপে প্রজ্জ্বলিত হও। হে অগ্নি! আমাদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত শত্রুগণকে দমন কর, তোমার দীপ্তি সকল উৎকর্ষ লাভ করুক, তুমি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর এবং শত্রুগণের পরাক্রম আক্রমণ কর।'

আত্রেয়ী বিশ্ববারা রচিত মন্ত্রগুলিতে ঋগ্বেদের সময়ে স্ত্রীলোকগণ গৃহে ও সমাজে কিরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেন তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ঋক্‌গুলিতে আরও জানা যায় যে, বিশ্ববারা বাহিরে উচ্চপদধারী মহীয়সী মহিলা ছিলেন সত্য ; কিন্তু গৃহে তিনি পতিপ্রাণা প্রেমময়ী নারীই ছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনী অপালা ঋষি অত্রিমুনির কন্যা ছিলেন। তিনি ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের ৭টি ঋক্ রচনা করিয়া ইন্দ্রের গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। ঋষি অপালা ত্বক্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন। সোমরস ইন্দ্রের প্রিয় ও রুচিকর জানিতে পারিয়া অপালা সোমরস দান করিবার জন্য ইন্দ্রের স্তব করেন। পরে সোমপানে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বর দান করিতে সম্মত হন, এবং বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাহাতে অপালা কহিতেছেন—'হে ইন্দ্র, তুমি আমার পিতার মস্তক, তাঁহার ক্ষেত্র এবং ত্বক্‌রোগ-জনিত রোগমুক্ত আমার অঙ্গ—ইহাদের সকলকেই উৎপাদনশীল কর, এই আমার প্রার্থনা।' তখন ইন্দ্র প্রথম দুইটি প্রার্থনা পূরণ করিলেন এবং অপালার দেহ তাঁহার রথচক্রের নেমির অন্তরালে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে তিনবার আকর্ষণ করিলেন। এইরূপে রোগমুক্ত করিয়া তাঁহার তিনটি প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন। অপালা রোগমুক্ত হইয়া অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে বলিতেছেন, 'হে শতক্রতু! তুমি তিনবার শোধন করিয়া অপালাকে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল চর্ম্মবিশিষ্ট করিয়াছিলে।'

দশম মণ্ডলের ৬০ সূক্তের ১২টি ঋকের মধ্যে ষষ্ঠ ঋক্‌টি নারী-ঋষি অগস্ত্য-ভগিনীর রচিত। ইঁহার চারিপুত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অসমাতির গৃহ-পুরোহিত ছিলেন। কোনও কারণে রাজা অসমাতি সেই পুত্র-দিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহাদের স্থলে অন্য পুরোহিত নিযুক্ত করেন। নবনিযুক্ত পুরোহিতগণ সুবন্ধু নামক অগস্ত্যভগিনীর এক পুত্রকে নিহত করিলে, অন্য তিন পুত্র শত্রুদমন করিবার জন্য রাজা অসমাতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। ষষ্ঠ ঋকে দেখিতে পাই, অগস্ত্যভগিনী নিজ পুত্রের মঙ্গলার্থে রাজা অসমাতির সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন—'হে রাজন্! অগস্ত্যের নপ্তাদিগের (দৌহিত্রদিগের) জন্য রথে লোহিত অশ্ব যোজনা করিয়া তাহাদের শত্রুবিনাশে অগ্রসর হও।' ইহার পরবর্ত্তী ঋক্‌গুলিতে সুবন্ধুর পুনর্জীবনের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।—'এই অগ্নি মাতাস্বরূপ, পিতাস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ। হে সুবন্ধু, এই অগ্নি তোমার মনকে ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তুমি জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হইবে, তোমার মৃত্যু অবস্থা অপগত হইবে।'

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের প্রথম দুইটি ঋক্ অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা কর্ত্তৃক কামদেবতা রতিদেবীর উদ্দেশে রচিত। যোগী, সংযমী, সম্ভোগস্পৃহাশূন্য ঋষি অগস্ত্য দিবারাত্রি যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সাধ্বী স্ত্রীর নিকট হইতে সর্ব্বদা নিজেকে দূরেই রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তপস্বী স্বামীর সান্নিধ্য কামনা করিয়া লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে কঠোর সংযম ত্যাগ করিয়া রতিদেবীর সেবা করিতে অনুরোধ করিতেছেন—'হে অগস্ত্য, বহুবৎসরাবধি দিবারাত্রি তোমার সেবা করিয়া এখন আমি জরাপ্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন, সত্যবাদী, সংযমী বহু ঋষি যজ্ঞাদি কর্ম্মে রত থাকিয়াও গৃহ-ধর্ম্ম পালন করিতেন—সুতরাং হে তপস্বী, তুমি আমার নিকট আগমন কর।' এই সূক্তেরই তৃতীয় ঋক্ দুইটি স্বয়ং অগস্ত্য ঋষির রচিত এবং তাহা হইতে জানা যায় যে পত্নীর বিনীত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সক্ষম না হওয়াতে তিনি গৃহধর্ম্ম এবং যজ্ঞ-ধ্যানাদি একই সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অগস্ত্য বলিতেছেন—'যদিও আমি তপস্যা ও সংযমে নিযুক্ত তথাপি আমরা সমস্ত ভোগই উপভোগ করিতে পারি। লোপামুদ্রা মহাপ্রাণ পুরুষকে উপভোগ করুক।'

অঙ্গিরা ঋষির কন্যা এবং যাদব অসঙ্গের পত্নী শশ্বতী নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের শেষ ঋক্‌টি রচনা করেন। রাজপুত্র অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হইয়া পুরুষত্ব বর্জ্জিত হন। স্বামীকে শাপমুক্ত করিবার জন্য শশ্বতী বহুবৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা করেন। অসঙ্গ স্ত্রীর তপস্যার ফলে এবং মেধাতিথির প্রভাবে পুনরায় পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইলে শশ্বতী হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন—'আর্য্য! তুমি শাপমুক্ত হইয়া, এক্ষণে জীবন উপভোগ করিতে সক্ষম হইলে।' ঋগ্বেদে শশ্বতীকে প্রকৃত নারী বলা হইয়াছে। তিনি স্বামীর দুঃখে দুঃখিতা, এবং তাঁহার আনন্দে আনন্দিতা হইতেন।

বৃহস্পতির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী রোমশা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋকের রচয়িত্রী। অসীম প্রতাপশালী রাজা ভাব্যস্বনয় ইঁহার স্বামী ছিলেন। রাজা ভাব্যস্বনয় অল্পবয়স্কা ও নিজের তুলনায় নিতান্ত অনুপযোগী বিবেচনায় পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। এই মন্ত্রটিতে রোমশা নিজ অঙ্গে প্রথমযৌবনের আগমন অনুভব করিয়া যুবতিসুলভ আনন্দে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—'নিকটে আসিয়া দেখ, এক্ষণে আমি তোমার উপযুক্ত পত্নী হইয়াছি।' বলা বাহুল্য, রাজা ভাব্যস্বনয় স্ত্রী রোমশাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া ভোগসুখে লিপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্‌টি ভাব্যস্বনয়ের রচনা—তিনি পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'এই রমণী আমার সহিত পুনরায় সুখে মিলিত হইয়াছে।'

দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের ৮টি ঋক্ অম্ভৃণ ঋষির দুহিতা বাক্ নাম্নী স্ত্রীকবি-রচিত। এই মন্ত্রগুলি 'দেবীসূক্ত' নামে প্রচলিত। ইঁহার রচিত ঋক্‌গুলিতে বক্তা বিশ্বের সহিত নিজের একাত্মভাব উপলব্ধি করিয়া আপনাকে সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বনির্ম্মাতা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

এই সকল স্ত্রী-ঋক্‌রচয়িতাদিগের ঋক্ রচনা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, সে যুগে স্ত্রীলোকেরাও মন্ত্র লিখিতেন এবং সেই মন্ত্র বেদমন্ত্র বলিয়া সমাদৃত হইত, সে সমাজে নারীর স্থান যে অতি উচ্চে ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

(জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৩৯)



নক্ষত্র-চেনা—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

ইহার পৃষ্ঠাগুলি প্রবাসীর পৃষ্ঠার চেয়ে চৌড়ায় দু-আঙুল লম্বায় এক আঙুল বড়। পৃষ্ঠার সংখ্যা ৮০। ইহাতে বার মাসে আকাশে নক্ষত্রগুলির অবস্থিতি জানাইবার জন্য বারখানি বড় রঙীন পট বা ছবি দেওয়া হইয়াছে। তা ছাড়া লেখার সঙ্গে ছাপা ১৫টি ছবি আছে। এতগুলি রঙীন ছবি নির্ভুল করিয়া আঁকাইতে এবং তাহার ব্লক প্রস্তুত করিয়া আর্টপেপারে ছাপিতে অনেক ব্যয় হইয়াছে। পুস্তকের মূল্য ২॥০ টাকা হইবার ইহাই প্রধান কারণ। দাম বেশী নয়। মলাটের উপরও একটি রঙীন ছবি আছে।

অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয় বাংলা ভাষায় অনেক বৈজ্ঞানিক বহি লিখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্য সোজা ভাষায় সোজা করিয়া বুঝাইতে তিনি সুদক্ষ। আলোচ্য পুস্তকখানিতেও তাঁহার এই ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা তিনি বালক-বালিকাদের জন্য লিখিয়াছেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধেরাও ইহা হইতে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবেন।

প্রারম্ভিক কিছু বলিয়া তিনি পরে নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্র ও নক্ষত্র-মণ্ডলের উদয়-অস্ত, আকাশ-পট, ধ্রুব তারা, সপ্তর্ষি ও লঘু সপ্তর্ষি-মণ্ডল, এবং নক্ষত্র-পটের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের দেশে ও প্রাচীন গ্রীসে যে-সব গল্প প্রচলিত ছিল তাহাও তাঁহার বহিতে স্থান পাইয়াছে। ইহার পর লেখক বার মাসের নক্ষত্র-পটের আলাদা আলাদা বর্ণনা করিয়াছেন। শেষে আমাদের জ্যোতিষ, বৎসর ও মাস গণনা, চান্দ্র-মাস ও চান্দ্র-বৎসর, তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহ-চেনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার অনেক তথ্য ও সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আমাদের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বই পড়ে। কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য তা ছাড়া আরও অনেক বহি পড়া এবং বহির নির্দ্দেশ অনুসারে ও পরে স্বাধীন ভাবে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। জগদানন্দবাবুর বহিখানি অনুসারে ছেলেমেয়েরা রাত্রে নক্ষত্র চিনিতে শিখিলে আনন্দিত হইবে এবং তাহাদের জ্ঞান বাড়িবে। সমুদয় বিদ্যালয় ও পাঠশালায় ইহা রাখা উচিত, এবং যে-সব পিতামাতা ও অভিভাবকের সামর্থ্য আছে তাঁহাদের বাড়িতেও ইহা থাকা উচিত। ইহার ছাপা ও কাগজ ভাল, বাঁধাই মজবুত।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চঞ্চরীকা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। চিত্রকর শ্রীচঞ্চল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা। ফুলস্ক্যাপ ৮ পেজী, ১৯১ পৃষ্ঠা। কাপড়ের বাঁধাই। মূল্য দুই টাকা।

আটটি ব্যঙ্গচিত্রের সমষ্টি, প্রবীণ লেখকের পাকা হাতের নিপুণ রচনা। লেখক তাঁহার পাত্র-পাত্রীর উপর অপক্ষপাতে ব্যঙ্গের রঙ্গ লেপ করিয়াছেন, কিন্তু রচনার গুণে অস্বাভাবিকও স্বাভাবিক হইয়াছে। 'ঘোড়ের কিস্তি' গল্পটি সকলের সেরা। গোয়ালার ছেলে পাঁচু-ধনের তুলনা নাই, তাহার অজ্ঞানকৃত বজ্জাতিতে দুই জুয়াচোর নাজেহাল হইয়াছে। মামুলী ও অমামুলী প্রেমকাহিনীর অভাব আমাদের নাই, তাহার ফাঁকে ফাঁকে যদি দেবেন্দ্রবাবুর লঘু রচনা পাই তবে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারি।

রা. ব.

সন্ধান—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকান, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৬২+৮ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ১৸০।

গ্রন্থকার প্রবীণ, অভিজ্ঞ পণ্ডিত। জীবনের প্রতিদিন তিনি যে-যে বিষয় অধ্যয়ন করেন, যে-যে বিষয় চিন্তা করেন, যে-যে লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাদের সম্বন্ধে নিজের অভিমত তিনি ডায়ারিতে লিখে রাখেন। এই রকম লেখার সমষ্টি এর আগে একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তার নাম যুগমানব; এখানিও সেই রকম নানা বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনার সম্বন্ধে লিখিত অভিমতের সমষ্টি। এতে ইউরোপের বহু লেখক ও সামাজিক রাষ্ট্রিক ব্যাপারের আলোচনা আছে, আর সেই সব অভিজ্ঞতার দ্বারা আমাদের দেশের লেখক ও অবস্থার তুলনায় সমালোচনা আছে। বহুবিধ বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করা হয়েছে ব'লে বইখানি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে। অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাও যায়। এতে কি কি বিষয় আলোচিত হয়েছে তার একটি নির্ঘণ্ট পরিশিষ্টে দেওয়াতে পাঠকের বিশেষ বিষয় খুঁজে বাহির ক'রে নেবার সুবিধা হয়েছে। অনেক উচ্চ ভাব ও চিন্তা এর মধ্যে সংগৃহীত ও আলোচিত হয়েছে। শিক্ষার উপাদান পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পুঞ্জীভূত আছে। সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবার সময় তিনি রুষ লেখক টুর্গেনিভের রচনা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, এবং তার কথা লিখেই তাঁর রোজনামচা শেষ করেছেন। নিরীশ্বর ও অনাত্মবাদী ধর্ম্মমত আলোচনার ফলে কি না জানি না, তবে দেখি লেখকও নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক ও অনাত্মবাদী হয়ে উঠেছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শয়তানের সুমতি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম্-এ। শ্রীআশুতোষ ধর, প্রকাশক। ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু শিশু-সাহিত্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিও একখানা ছেলেদের গল্পের বই। ছেলেদের জন্য লেখা হইলেও বয়োবৃদ্ধগণ ইহা হইতে যথেষ্ট রস পাইবেন। নিমাইয়ের মত সবল, সুস্থমন পল্লীবালকের ছবি সচরাচর শিশু-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনাতেও তাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমে গ্রন্থকার তাঁহার শিশুপুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যে-উৎসর্গ-লিপি লিখিয়াছেন, সেটি পড়িতে পড়িতে মানবতার

সহজ সৌন্দর্য্য মনকে রসসিক্ত করিয়া তোলে। পুস্তকের ছাপা, ছবি ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয়; মূল্য ১৲ টাকা, পৃ. ৯৪।

বাঙালীর জাতীয়তা বিকাশে বাঙালীর কবির দান কি পরিমাণ ও কি রূপের, সে-সম্বন্ধে একখানি তৃপ্তিদায়ক গ্রন্থ বাংলা দেশে আজও লিখিত হয় নাই। এ বিষয়ে যে এক-আধখানা আলোচনা গ্রন্থ আছে তাহা পড়িলে হতাশ হইতে হয়। বর্ত্তমান লেখকের বইখানি ছোট; নিজের বক্তৃতায় ও টীকায় উহার কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া কবির কথাই উদ্ধৃত করিয়া লেখক কবির বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। তিনি নিজে শুধু এই সকল উদ্ধৃতির মধ্যে যোগসূত্রটুকু জুড়িয়াছেন—ইহা তাঁহার সুবিবেচনার ও সুরুচির নিদর্শন। ইহা ছাড়াও তিনি আর একটি উৎকৃষ্ট কাজ করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের যে-সকল পুরাতন প্রবন্ধ জাতীয় ভাবের ও জাতীয় চিন্তার পরিচায়ক—এতদিন মাসিক পত্রের পাতাতেই প্রায় আত্মগোপন করিয়া ছিল, তিনি অনুসন্ধান করিয়া তাহা বাহির করিয়াছেন; এবং তাহার উদ্ধৃতাংশ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, এই ভাবধারা কত পূর্ব্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে তাহার বিশেষ রূপটি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আরও আনন্দের কথা এই যে, কর্ম্ম-কোলাহলের নানা বাধা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন রবীন্দ্রনাথের অভীষ্ট ও কল্পিত মূর্ত্তিই ধারণ করিতে চাহিয়াছে। ইহাও মনে পড়ে যে, ফাঁকি হয়ত আজ বাড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের জাতীয়তা আর সেদিনকার 'এজিটেশন'-পন্থী পেট্রিয়টিজম-এর মত অত ফাঁকা নয়। লেখক জাতীয় চেতনা, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, জাতীয় শিক্ষা ও ধন-বৈষম্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত যথাযথ সাজাইয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব সুস্পষ্ট। বিষয়বিন্যাস আরও ধারাবাহিক ও গ্রন্থখানি আরও বিশদ হইলে বোধ হয় পাঠক সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতেন; কারণ এ বিষয়ে পাঠকের দাবি ও ক্ষুধা একটু বেশী। আর একটি কথা—বইখানা যেরূপ উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট, এবং উহার বিষয়টি যেমন বাঙালী মাত্রেরই প্রিয় এবং আয়তন ও মুদ্রণে যখন ব্যয়বাহুল্য সূচিত হইতেছে না, তখন মূল্য আর একটু কম করিলে ভাল হইত।

শ্রীগোপাল হালদার

কাশ্মীর ভ্রমণ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২৫ নং চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, টালা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃ. ১৩৬; মূল্য এক টাকা।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কাশ্মীরকে অনেক স্থলে ভূস্বর্গ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সৌন্দর্য্যানুরাগী মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একজন বিশিষ্ট উপাসক ছিলেন। দুইটি অমর ছত্রে তিনি কাশ্মীরের অতুল ঐশ্বর্য্য ও রূপের বর্ণনা দিয়াছেন:—

আগর্ ফিরদৌস বাররূয়ে জমিন্ আস্ত্।
হামিন্ আস্ত্ ও হামিন্ আস্ত্ ও হামিন্ আস্ত্।

এ পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তাহা এইখানে, তাহা এইখানে, তাহা এইখানে। গ্রন্থকার একাধিকবার কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়াছেন; তাই তিনি কাশ্মীর প্রদেশের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু, কাহিনী প্রভৃতির যথাযথ বিবরণ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। রাওলপিণ্ডি, বরামূলা, ডাল্ ও উলার হ্রদ, হরিপর্বত, ক্ষীর ভবানী, জুম্মা মস্জিদ্, নাসিম্ বাগ, নিসাত্ বাগ, শালিমার, চশ্মা শাহী, পরীমহল, গুলমার্গ, জম্মু প্রভৃতি স্থানের ও তদ্দেশের সামাজিক আচার-ব্যবহার, বাণিজ্য, শিক্ষা, জলবায়ু, পাল-পার্ব্বণের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কাশ্মীর-দর্শন অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; এই পুস্তক পাঠে ঘরে বসিয়া কাশ্মীরের স্বরূপ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

চিত্রালী—শ্রীজ্যোৎস্না মিত্র। সান্যাল বুক ষ্টোর। মূল্য আট আনা।

সূচীশিল্প বাংলার একটি নিজস্ব প্রাচীন শিল্প। সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিজাতীয় মোহে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেও পল্লীর গৃহলক্ষ্মীরা এই শিল্প এতকাল জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনপ্রচেষ্টায় সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ও সম্পন্ন সমাজের দৃষ্টি পুনরায় এদিকে পতিত হইয়াছে। শিক্ষিতা নারীরা স্বদেশী ও বিদেশী নানারূপ ডিজাইন সম্বলিত সূচী শিল্পের পুস্তকাদি রচনা করিয়া ইহার উন্নতি সাধনে তৎপর হইয়াছেন। "চিত্রালী" এইরূপ একটি প্রচেষ্টা। শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র "চিত্রালী" দ্বারা সত্যই সূচীশিল্প সাধনার সাহায্য করিয়াছেন। সূচীশিল্পের চিত্রগুলি মনোরম।

দেশের কথা—শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত; প্রকাশক—স্বদেশী শিল্প প্রচার সমিতি। ১, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা।

প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সকল জিনিষের জন্যই পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া এতকাল যেন আমরা মোহাবিষ্টের মত আলেয়ার পিছনে ছুটিয়াছি। রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি অন্তর্মুখীন হইয়াছে। আমরা স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারে তৎপর হওয়ায় ইদানীং নানা কল-কারখানার উদ্ভব হইতেছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে প্রধানতঃ বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত দেশী কারখানায় প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রকাশে একটা বিশেষ অভাব দূরীভূত হইল। গ্রন্থখানির ৩৬ পৃষ্ঠায় একটি ভুল নজরে পড়িল। কলিকাতা হর্ণ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ঠিকানা—১৮ বি, আনন্দ পালিত রোড। দেশী ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী প্রভৃতিরও তালিকা দিয়া ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার অবকাশ আছে। গ্রন্থখানির আর স্বদেশী দ্রব্য প্রচারে ব্যাপৃত হইবে। প্রত্যেক নর-নারীর কাছে 'গাইড' বহি হিসাবে ইহার এক একখানি থাকা উচিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কাব্য-পরিমিতি—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত, এবং ১-সি, লেক রোড, কালীঘাট, রসচক্র সাহিত্য-সংসদ হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

শুধু ইংরেজীতে নয়, ফরাসী জার্ম্মান প্রভৃতি নানা প্রতীচ্য ভাষায় যে বিচিত্র সমালোচনা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা যেমনি বিপুল তেমনি উপভোগ্য। পাশ্চাত্য পাঠকেরা কাব্যের সহিত কাব্যালোচনাও যে সমানভাবে উপভোগ করে, ইহা তাহারই প্রমাণ। বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠায় পূর্ব্বে সাহিত্যালোচনার চেষ্টা যে মাঝে

মাঝে দেখিতে পাওয়া যাইত না—এমন নয়, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই সহজপ্রাপ্য ইংরেজী পুস্তকের প্রতিধ্বনি মাত্র। সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর বাংলা মাসিক পত্রে কখনও কখনও যে দু-একটি সাহিত্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার সুর শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি সস্তা বিলাতী সমালোচনার নিকৃষ্ট নকল নয়। বিগত দুই বৎসরের মধ্যে বাংলার কাব্য সম্পর্কিত দুইখানি উৎকৃষ্ট এবং পরম-উপভোগ্য আলোচনা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সমালোচনার দৃষ্টি যে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের দিকে ফিরিয়াছে, এই দুইখানি গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথমখানি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্য-জিজ্ঞাসা', দ্বিতীয়খানি আমাদের আলোচ্য 'কাব্য-পরিমিতি'। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবি। কাব্যের সম্বন্ধে কবির আলোচনা সকল সময়েই কৌতূহলোদ্দীপক। 'কাব্য-পরিমিতি'তে দেখা যায় গ্রন্থকার রসজ্ঞ সমালোচকও বটেন। তিনি বলিয়াছেন, 'যে অলৌকিক শক্তি সাধারণ মানবচিত্তধারা হইতে কবিচিত্তকে পৃথক করিয়া ভাব হইতে তাহাকে রসে উঠিবার জন্য নিরন্তর উত্তেজিত করে, তাহাই কবি-প্রতিভা।' শুধু লেখায় নয়, রেখায় আঁকিয়া তিনি এই কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। সত্যকথা বলিতে গেলে যে সকল পরম অনুভূতি কবির মনে প্রকাশবেদনায় ব্যাকুল হইয়া কাব্যচ্ছন্দে অভিব্যক্ত হয়, সহৃদয়জনের সহকর্মিতা না থাকিলে তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। গ্রন্থের শেষার্দ্ধে গ্রন্থকার বাংলা কাব্য ও কবিতার দৃষ্টান্ত সাহায্যে সূত্রের প্রয়োগ ও তত্ত্বের ব্যাখ্যাকে সুগম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সংস্কৃতে কাব্যের রসকে ব্রহ্মস্বাদের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। আলঙ্কারিকেরা রসতত্ত্বে মানবমনের মূলদেশে পৌঁছিয়াছিল। তাই অলঙ্কার শাস্ত্রে রসবিচারের মত গভীর তত্ত্বালোচনা সকল দেশের সকল সাহিত্যেই সুদুর্লভ। গ্রন্থকারের প্রকাশ ক্ষমতায় এই দুর্গম রসতত্ত্ব পাঠকের কাছে বহুল পরিমাণে সরল হইয়া উঠিয়াছে। 'কাব্য-পরিমিতি'র নামকরণ সার্থক হইয়াছে মনে করি। বইখানি রসজ্ঞ পাঠকের আদরের বস্তু হইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নবমেঘদূত—শ্রীসুবোধ বসু। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুখবন্ধে বলা হইয়াছে—"বইটি একটি বর্ষার উপন্যাস"। এর নিবিড় ভাব-ব্যাকুলতার জন্য আমরা বইখানিকে একটি গদ্য-কাব্য বলিব। বর্ষার মধ্যে একটি চিরবিরহের সুর আছে। গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যেও কেমন একটি ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া সে দুইটি হৃদয়ের মধ্যে ক্রন্দনের ব্যথা বহন করিয়া ফিরে। এই জন্য "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ"। যেখানে "মানুষের গড়া বিধানে" চিরকালের জন্য এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া গেল সেখানে বর্ষা যে কি ব্যথা আনে কে বুঝিবে?

এই বেদনাই বইখানিতে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার "মেঘৈর্মেদুর" মুহূর্ত্তগুলিতে দুইটি তরুণ-তরুণীর চিত্তের সুরের অঞ্জলি লইয়া পরস্পরের পানে নিত্যঅভিসার—যা ক্ষণিক ভ্রমের জন্য আর কখনই মিলনের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিতে পারিল না, পরন্তু দূরত্বকে চিরজন্মের মত অনতিক্রমণীয় করিয়াই রাখিল—এ তাহারই একটি অশ্রুসজল কাহিনী।

বইখানি নিজের উদ্দেশ্যে সফল হইয়াছে। এর পাতায় পাতায় বর্ষার পটভূমিকায় দুইটি মিলন-পিয়াসী-চিত্তের ব্যাকুলতা বেশ নিবিড়-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর সমস্ত চরিত্রগুলি,—এমন কি শিশু "রুণু" পর্য্যন্ত এই সুরটিকে ফুটাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে "বীণা"কে বড়ই ভাল লাগিল। সে তাহার চঞ্চলতা, মুখরতা আর সহজ বেপরোয়াগিরি লইয়া বিজলীর মতই বইয়ের মেঘলা ভাবটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। পড়িবার সময় তাহাকে আর একটু বেশী করিয়া পাইতে ইচ্ছা হয়।

এই রকম বই একঘেয়ে হইয়া পড়িবার ভয় থাকে; কিন্তু লেখক এ বিষয়ে বেশ সতর্কতা দেখাইয়াছেন। কয়েক পাতা অন্তরই—কখনও কখনও আরও নিকটে নিকটে বর্ষার বর্ণনা করিতে হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক বর্ণনাটিই ভাষায়, ভাবে রক্ষা করিয়া লেখাটিকে বরাবর সতেজ রাখিয়া গিয়াছে।

আমরা বর্ষার দেশে, বর্ষা-কবিদের দেশে বইখানি সাদরে অভিনন্দিত করিয়া লইলাম।

দুঃখের মধ্যে প্রকাশক বইখানির উপর তেমন সুবিচার করেন নাই। বিশেষ করিয়া মুদ্রাকরপ্রমাদ বড় বেশী থাকিয়া গিয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শোক-সংবাদ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

দেশবিশ্রুত ব্যবহারজীবী স্তর এস্. এন্. গুপ্টা মৃত্যু-শয্যায়; সারা দেশে একটা উৎকণ্ঠা পড়িয়া গিয়াছে। এই বয়সে ডবল নিউমোনিয়া—আশা ত একেবারেই নাই। ডাক্তারদের এখন আর বিশেষ কাজ নাই; আর কতক্ষণ, শুধু এই লইয়াই তাঁহাদের মধ্যে বচসা চলিতেছে। স্তর শচীনের ক্রোরপতি মক্কেল দৌলতরাম গিরিধারী, মারোয়াড়ি মহলের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার রায় সাহেব গৌরহরি বসাককে অষ্ট প্রহরের জন্য মোতায়েন করিয়া দিয়াছেন। রায় সাহেব বলিয়াছেন—ভোর পাঁচটার পরে যদি রোগী বাঁচিয়া থাকে ত বুঝিবেন তাঁহার চল্লিশ বৎসরের চিকিৎসাই বৃথা গিয়াছে……

'সত্যপ্রকাশ'-এর সম্পাদক হলধরবাবু নিজের আপিসের চেয়ারটিতে বসিয়া এক-একবার উদ্বিগ্নভাবে ঘড়ির পানে চাহিতেছেন এবং এক-একবার টেলিফোনের মাউথপিসে মুখ লাগাইয়া প্রশ্ন করিতেছেন—"কি খবর সিদ্ধুবাবু? আর কতক্ষণ মশাই?"

ব্যাপারটা এই। মৃত্যুর খবরটা সর্ব্বপ্রথমে বাজারে বাহির করিয়া 'সত্যপ্রকাশ' কিছু করিয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া সমস্ত রাত ধরিয়া স্তর শচীন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবনী এবং ততোধিক দীর্ঘ মৃত্যুবিবরণী কম্পোজ করা হইয়াছে—মায় ব্লক সমেত। কাগজের অন্যান্য পত্র ছাপা হইয়া গিয়াছে, এখন মৃত্যুসংবাদটি পাইলেই এ-সেটটাও প্রেসে চড়াইয়া দেওয়া হয়। হকারদের খুব সকাল সকাল আসিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিবা মাত্রই ইংরেজী বাংলা আর সব কাগজের পূর্ব্বেই যেন 'সত্যপ্রকাশ'-এর মারফৎ কলিকাতা এই জমকাল মৃত্যু-সংবাদটি পায়।

হলধরবাবু সবাইকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মরার সুবিধাটা আমরা শুধু গড়িমসি করিয়া হেলায় নষ্ট করেছি,—এবারে সে লোকসানটুকু পর্য্যন্ত তুলে নিতে হবে।…অমন জাঁদরেল লোক ত আর দেশে এবেলা-ওবেলা ম'রচে না—একটা সুযোগ গেল ত আবার হাঁ ক'রে ব'সে থাক…"

তাই নিজেও সমস্ত রাত জাগিয়া উদ্যোগী রহিয়াছেন।

গুপ্টা সাহেবের বাড়ির পাশেই একটি ডিস্‌পেন্‌সারির টেলিফোনযন্ত্রটি 'সত্যপ্রকাশ' আজ সমস্ত রাতের জন্য ভাড়া করিয়া লইয়াছে। যন্ত্রটির সামনে ষ্টাফের একজন-না-একজন কোন লোক বসিয়াই আছে। ঘটনাটি ঘটা কি খবরটি আপিসে পৌঁছাইয়া দেওয়া—সঙ্গে সঙ্গে ছাপা সুরু এবং হলধরবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে—"কাককোকিল টের পাওয়ার আগেই 'সত্যপ্রকাশ'-এর হৈ হৈ রৈ রৈ ক'রে বাজার ছেয়ে ফেলা…দেখি কে এগোয় আমাদের সামনে এবারে…"

মোটা কাল বর্ডার দেওয়া এক ইঞ্চি পরিমাণ টাইপের বিজ্ঞাপনপত্রী ছাপা হইয়া গিয়াছে—

"বিনামেঘে বজ্রাঘাত—দেশব্যাপী হাহাকার—দেশবিখ্যাত মহাকর্ম্মী স্তর এস্. এন্. গুপ্টা, বার-এট্‌-ল-র বৈকুণ্ঠযাত্রা—তাঁহার দুর্ভেদ্যরহস্যজনক উইল—সত্যপ্রকাশের তিনপৃষ্ঠাব্যাপী শোকাঞ্জলি—কিনুন—পড়ুন—জাতীয় শোকে অশ্রু তর্পণ করুন!!"

রাত্রি একটা থেকে সহকারী সম্পাদক সিদ্ধেশ্বরবাবুই ওদিকার টেলিফোনে বসিয়া আছেন; এখন সাড়ে তিনটা কি চারটা হইবে। সমস্ত দিন আর রাত প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত গুপ্টা সাহেবের জীবনী ও "মরণী" লেখা, প্রুফ্ দেখা এই সবে কাটিয়াছে; দুই ঘণ্টার মধ্যে আহারাদি ও নিদ্রা সারিয়া বসিয়াছেন। চায়ের চাড়া দিয়া ঘুম আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু সেকি মানে? আমেজে ঢুলিতে ঢুলিতে প্রায় যন্ত্রটির উপর মাথাটি লাগ-লাগ হইয়াছে এমন সময় 'কিরৃ-কিরৃ-ক্রিং-ক্রিং' করিয়া আওয়াজ হইল।

সিদ্ধবাবু চকিত হইয়া উঠিলেন, আড়ামোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে বলিলেন—"আঃ, লোকটা এ-রকম ধুকপুকুনির মধ্যে ফেলে আর কত জ্বালাবে ?"

টেলিফোন ধরিলেন—"হ্যালো !"

"আর কত দেরি মশাই ? পনেরটি হাজার কপি ছাপতে হবে, তার খোঁজ রাখেন ? এদিকে রাত যে ফুরিয়ে এল !"

সিদ্ধেশ্বরবাবু উত্তর করিলেন—"কি করি বলুন ? এখনও রয়েচে টেঁকে। ঠেঙিয়ে ত মারতে পারি না। মাঝে একটু বাইরে গিয়েছিলাম—হঠাৎ কান্না উঠল। এসে তাড়াতাড়ি টেলিফোনটি ধরতে যাব—হঠাৎ সব একেবারে চুপচাপ! এরা যেন দিব্যি এক খেলা পেয়ে গেছে…"

"তাই বটে, আর আমাদের এদিকে প্রাণ যায়। তা হ'লে একটা টাল গেচে বলুন ? আমি ত বলি—দিই না চড়িয়ে, আর টেকবে না ; আমাদের ছাপা হ'তে হ'তে সাবড়ে যাবে।"

"আর একটু দেখুন—একেবারে দৈব ব্যাপার কি না—না আঁচালে বিশ্বাস নেই।"

"—দুর্দৈব! এ রকম তীর্থের কাকের মত. আশায় আশায় ব'সে থাকা চাড্ডিখানি কথা মশাই ?"

"নয়ই ত। কিন্তু কে শুনচে বলুন ?"

"এ যেন সেই মাখন ভট্‌চাযের গঙ্গাযাত্রার মতন হ'ল। সাতটি দিন মাঘের শীতে গঙ্গার ধারে বসিয়ে রেখেছিল মশাই! না পারি ফিরতে, না পারি…"

"থামুন, থামুন—ঐঃ, আবার কান্না উঠল !"

"সত্যি না কি ? জয় সিদ্ধিদাতা—তাহ'লে দি চড়িয়ে ?"

সিদ্ধবাবু ত্বরিত ভাবে বলিলেন—"একটু সবুর করুন, দেখে আসি আসল কি মেকী" বলিয়া রিসিভারটা রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘস্বরে, নিরুৎসাহভাবে ডাকিলেন—"হ্যা—লো !"

"কি সংবাদ ?"

"নাঃ, ভুয়ো। মুসৌরী থেকে এক মেয়ে এইমাত্র এসে পৌছল। 'বাবা গো! কোথায় গেলে গো!' করতে করতে হুড়মুড়িয়ে ওপরে উঠে গেল।…সব সয়, নেকামি সইতে পারিনে মশাই…ঐ ত বাবা জলজ্যান্ত রয়েছে রে বাপু!"

"আর এ-রকম ছিঁচকাঁদুনে ক'টি মেয়ে বাইরে রয়েছে খোঁজ নিলেন ? যত্তো সব…"

খুট্‌খুট্ করিয়া দুই তিনটা বিরক্তির আওয়াজ হইল। সিদ্ধবাবুও রিসিভারটা টাঙাইয়া রাখিলেন। ডাকিলেন—"দাদা !—ও দাদা !"

'দাদা' বলিতে ডিস্‌পেন্সারির কম্পাউণ্ডার বাবু। এই ঘরটিতেই এক কোণে ক্যাম্প খাটে নিদ্রিত আছেন। ভালমানুষ গোবেচারী গোছের লোক। একটু বয়স হইয়াছে। কাজে অত্যন্ত নারাজ—গল্পে খুব দড়। কখনও হুঁকা আর চায়ে এলেন না। এই-সব মজলিসী গুণের সমাবেশে সরকারী দাদা হইয়া বসিয়াছেন।

আরও ছ-সাত বার ডাকাডাকির পর জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"এই যে জেগেই রয়েচি। যমের দোরে ধন্না দেওয়া এখনও শেষ হ'ল না ?—কি খবর ওদিকে ?"

"খবর সেই একঘেয়ে—মাঝে মাঝে শুধু দ্যায়লা হচ্ছে।…আমি ত আর ঠায় ব'সে থাকতে পারিনে দাদা, চোখ জুড়ে আসচে।"

"এক এক কাপ হয়ে যাক্ না, ক্ষতি কি ?"

"সেই জন্তেই ত আপনাকে কষ্ট দেওয়া—আর স্পিরিট আছে ?"

"না। কেন, বোতলে ত অনেকখানিকটা ছিল—কি হ'ল ?"

"এর মধ্যে যে চারবার ষ্টোভ জ্বালা হয়ে গেছে ; আর বোতলগুলোর একটা দোষ লক্ষ্য করেচেন ? যতক্ষণ বেশ সাবধানে 'বাপু বাছা' ব'লে আস্তে আস্তে ঢালবার চেষ্টা করবেন—কিছুতেই পড়বে না।…তখন ভয়ানক রাগ ধরে—ধরে কি না বলুন না ?…স্পিরিট ত ছিল অনেকখানিই—এখন ত বোতলটা খালি !"

"তাহ'লে ?…দোকানের ষ্টক্ খালি, ব'লেই দিয়েছিলাম ; কাল না আনলে…"

"তবেই ত !—এক কাজ ক'রব না হয় ?"

"কি শুনি ?"

"মনে করছি একটু না হয় বাসায় চলে যাই। চা-

খাওয়া-কে চা-খাওয়া হবে—একটু বেড়ানও হবে; রাত্তিরটুকুর জন্যে তাহ'লে একরকম নিশ্চিন্দি।"

ইহার মানে এই যে তাঁহাকে গিয়া টেলিফোন্ ধরিতে হইবে। দাদা কোন উত্তর দিলেন না।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"আর এই ফ্ল্যাস্ক্‌টাও নিয়ে যাচ্চি, আপনার জন্যেও কাপ্ দু-এক নিয়ে আসা যাবে'খন।"

"হ্যাঃ, ঘাড়ে ক'রে আবার চা ব'য়ে আনা। আর দু-কাপ কি হবে? সে ব'লতে গেলে ত ওতে চার কাপ এঁটে যায়—তাই ব'লে চার কাপ ভ'রে নিয়ে আসতে হবে?···মোদ্দা শীগগির আসা চাই—ঘুমকাতুরে লোক, জানই ত।"

"এই আধঘণ্টা লাগবে, তার বেশী নয়। অতবড় একটা ভাবনা লেগে রয়েচে, বুঝছেন না?"

"ভাবনা একটুখানি?—বলে—'যার বিয়ে তা'র মন নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই।' আর কেন? সরে পড়্‌না বাপু। তিন দিন থেকে একটানা শ্বাস টেনে যাচ্চিস্। কি আরাম পাচ্চিস্ এতে?—একটা সখ না কি?"

"সে কথা কে বলে বলুন?"

"তা আধ ঘণ্টা কোন রকমে চোখকান বুজে রয়েচি—মোদ্দা ঐ কথা, দেরি যেন না হয়"—বলিয়া দাদা বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন।

"চোখকান একটু সজাগ হয়েই বুজবেন তাহ'লে দাদা—আমি বলছিলাম একটা বই-টই কি কাগজ-টাগজ নিয়ে বসুন না, না হয়।"

"আরে না, না,—অত হালকা নয়। একটি ছিলিমের ওয়াস্তা,—সেই জোগাড়ই হচ্চে, দেখ না।··· নাও বেরিয়ে পড়।"

২

দাদা তামাক সাজিলেন। কলিকার আগুনে টোকা দিতে দিতে নিজের মনে বিড়্‌বিড় করিতে লাগিলেন—"দিলে না বাঁচতে—নিশ্বেসে নিশ্বেসে মেরে ফেল্লে—আ-হা-হা-হা।···তোর শোক-সংবাদের নিকুচি ক'রেচে···"

হুঁকার মুখটি মুছিয়া সাদরে মুখে লাগাইবেন, এমন সময় শব্দ হইল—"কির্-কির্-ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং···"

"তা জানি; বামনের কপাল কি না"—বলিয়া হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া রিসিভারটি তুলিয়া লইলেন, ডাকিলেন—"হ্যালো!"

"কি খবর, আছেন না গেছেন?"

"না, গেছেন। বোধ হয় আধঘণ্টাটাক···"

অত্যন্ত বিস্ময়ের কণ্ঠে উত্তর হইল—"আধঘণ্টা! অথচ আমায় বলেন নি? আধঘণ্টায় কতটা কাজ···"

"না, আধ ঘণ্টা হয়নি এখনও; গেছেন ত এইমাত্র। বলছিলাম আধ···"

শেষ হইবার পূর্ব্বেই উত্তর হইল—"তাই বলুন। সময়ের আন্দাজটা আপনার যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্চে। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন না কি? গলাটা ভারী ভারী ঠেকৃচে।"

দাদা যে কখনও ঘুমান এটা বাহিরে স্বীকার করিতে চান না। বলিলেন—"নাঃ, এই ত আমরা দু'জনে দিব্যি গল্প করছিলাম—একটা সঙ্গী পেলে কি ঘুম আসে?"

সহাস্যে উত্তর হইল—"তা বটে; আপনার সাথীটি খুব গল্পপ্রিয়, না?"

দাদা এদিকে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আমারও ওপরে যান।"

উত্তরস্বরূপ তারযোগে আবার একটু হাসি ভাসিয়া আসিল। প্রশ্ন হইল—"যাক, তাহ'লে কখন ও সুমতিটা হ'ল?"

দাদা আবার হাসিয়া বলিলেন—"সুমতি হওয়াই বটে, যা অবস্থা হয়ে এসেছিল মশাই! মানুষের শরীর ত, কতটা সয় বলুন?"

"তা বই কি। যাক্, আর বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার ফুরসৎ নেই; কখন আসচেন তাহ'লে?"

"ঐ যে গোড়াতেই ব'ললাম—আর জোর আধঘণ্টাটাক লাগবে।"

"হ্যাঁ, সেই ভাল, আর যা-যা সব জ্ঞাতব্য বিষয় আছে একটু জেনে নিয়ে আসাই ভাল, আবার যেন যেতে না হয়। বড্ড ভিড় কাজের এদিকে।"

দাদা ভাবিলেন—আবার জ্ঞাতব্য বিষয় কিরে বাবা! আছে বোধ হয় কিছু, মরুক্ গে। বলিলেন—"নাঃ, মেলা যাওয়া-আসা করবার দরকার কি?"

"তাহ'লে নির্ভাবনায় দিলাম চড়িয়ে—কতক্ষণ সাজা পড়ে রয়েচে···"

দাদা গনগনে কলিকাটির পানে সকরুণ নেত্রে চাহিয়া রিসিভারটি টাঙাইয়া দিতে দিতে নিজের মনেই বলিলেন, "ওদিকে তাহ'লে দেখচি তাওয়া-দার কলকে—গড়গড়ার ব্যবস্থা···যাক, আমার গরিবের এই-ই মেওয়া"—বলিয়া হুঁকাটি তুলিয়া লইলেন।

ওদিকে প্রেসের কাজ সতেজে আরম্ভ হইয়া গেল। আর সব তৈয়ারই ছিল, শুধু মৃত্যুর সময়ের জন্ত সেটুকু স্পেস্ খালি রাখা হইয়াছিল। সেটুকুতেই টাইপ বসাইয়া দেওয়া হইল। কালো বর্ডার এবং ললাটে বড় বড় টাইপের আর্ত্তনাদ লইয়া কাগজগুলা প্রেস হইতে একে একে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। সারাংশেরও সারাংশ এইরূপ—

বাংলার হাহাকার!—পরলোকে স্যর এস্. এন্. গুপ্টা!! বাংলার ভাগ্যাকাশ হইতে আর একটি নক্ষত্র খসিল। বঙ্গজননীর অঙ্ক শূন্ত হইল; মার নয়নাশ্রুর বন্তায় আবার প্রলয়ের প্লাবন নামিল।... সন্তানহারা অভাগিনী মা আমার, আজ কি বলিয়া তোকে সান্ত্বনা দিব? কোথায় পাব সান্ত্বনার স্নিগ্ধবাণী?...সান্ত্বনা ত দিতে চাই; কিন্তু আজ শোকজীর্ণ লেখনী দিয়া যে প্রবল ধারে অশ্রুর ধারাই নামিয়া আসিতেছে...এ নিদারুণ শোকে জড়ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, আবার প্রাণ জড়বৎ নিশ্চয়...

বাংলার সুসন্তান, লক্ষ্মীর দুলাল, বাণীর বরপুত্র, কুবেরের কীর্ত্তিস্তম্ভ, কর্ম্মে অক্লান্ত, বাগ্মিতার বার্ক, করুণায় দাতাকর্ণ, সত্যে যুধিষ্ঠির, দেশবিশ্রুত ব্যবহারজীবী স্যর শচীন্দ্রনাথ গুপ্টা আর ইহজগতে নাই। গতকল্য বুধবার রাত্রি চারি ঘটিকার সময় সমস্ত দেশকে হাহাকারে নিমগ্ন করিয়া এবং আত্মীয়-স্বজনের বক্ষে নিদারুণ শেল হানিয়া স্যর শচীন্দ্র ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন।...হায়, কি কঠিন কর্ত্তব্য আমাদের! দুই মাসও অতীত হয় নাই, বাংলার ঘরে ঘরে আমাদের স্বনামধন্ত মহাপুরুষ রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ পৌঁছাইয়া দিতে হইয়াছিল। দেশবাসীর কপোলে সে-অশ্রুধারা শুকাইবার পূর্ব্বেই আবার এই মর্ম্মভেদী দুঃসংবাদ...স্যর শচীন কয়েকদিন হইতে জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন; হঠাৎ বিগত সোমবার রাত্রি প্রথম প্রহর হইতেই নিউমোনিয়ার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়।...শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ সমবেত হ'ন.... মহাসমারোহে চিকিৎসা-যজ্ঞ আরব্ধ হয়... হায়, কে জানিত সে-মহাযজ্ঞে সে-হোমানল প্রজ্বলিত হইল তাহা এই মহাপ্রাণের আহুতি না লইয়া নির্ব্বাপিত হইবে না...চিকিৎসা-সাগর মথিত হইল; কিন্তু হে বৈরাগী, তোমার অঞ্জলি সুধার পরিবর্ত্তে গরলেই পূর্ণ হইবে তাহা কে জানিত?...

নিউমোনিয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই আমরা অতিমাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া স্যর শচীন্দ্রের ভবনে উপস্থিত হই...বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে এক 'সত্যপ্রকাশ'-এরই সত্যনিষ্ঠায় অগাধ বিশ্বাস থাকায় আমরা বরাবরই এই পুরুষ-সিংহের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া আসিতেছি... তাঁহার প্রাসাদতুল্য আলয়ে অবাধ গতিবিধি থাকায় আমরা এ-কয় দিবস পাঠকবর্গকে প্রতিদিনের অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে সক্ষম হইয়াছিলাম...বড় আশা ছিল অচিরেই আরোগ্যের শুভসংবাদ দিয়া দেশবাসীর অশান্ত চিত্তে শান্তির সুশীতল সুধাসিঞ্চনে সমর্থ হইব; কিন্তু হায় 'কালস্য কুটিলা গতি'—আমাদের সে আশা সমূলেই নির্ম্মূল হইল..."

ইহার পরে সংক্ষিপ্ত জীবনী। জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত খবর জানিবার কোন রকম সুবিধা হয় নাই বলিয়া এই অংশে, সব কৃতী পুরুষের বেলাই মোটামুটি খাটে এমন কতকগুলি ভাসা-ভাসা কথার অবতারণা করা হইয়াছে। গুপ্টা সাহেবের অতি শৈশবের কয়েকটি রোমাঞ্চকর উদাহরণ দিয়া বাল্যে গুরুভক্তি, কৈশোরে জ্ঞানতৃষ্ণা, যৌবনে দেশাত্মবোধের উন্মেষ, প্রৌঢ়ত্বে ত্যাগমহিমা এবং অবশেষে বার্দ্ধক্যে এই সমস্ত গুণরাজি একটা সহজ পরিণতি লাভ করিয়া কেমন ঈশ্বরানুমুখী ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল তাহা অতি নিপুণতার সহিত বিশদ ভাবে দেখান হইয়াছে। তথ্যের দৈন্ত ভাষার সমৃদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

সর্ব্বশেষে আছে—

"আজ ভারত একজন অক্লান্ত কর্ম্মী এবং অকপট সেবক হারাইল—বঙ্গভূমি তাহার শ্রেষ্ঠ নিধি হারাইল—আর 'সত্যপ্রকাশ'? সত্যপ্রকাশ যাহা হারাইল তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না...আজ সমস্ত দেশ শোকে মুহ্যমান, কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে?...আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি...ঈশ্বর তাঁহাদের এই গুরু শোকভার বহন করিবার শক্তি দান করুন...

স্যর শচীন্দ্রের বিশাল সম্পত্তি সম্বন্ধে উইল এখনও রহস্যাবৃতই রহিয়াছে।"

বেলা ছয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই ছাপার কাজ শেষ হইয়া গেল। আপিসের বাহিরে দলে দলে হকাররা আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে; অন্ত লোকদেরও ভিড় ভয়ানক—হাতে হাতে অনেক কাগজ বিক্রী হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতার এ-পল্লীটাতে মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল। দু-এক জন, যাহাদের প্রকৃত সংবাদ জানা আছে বলিয়া বিশ্বাস ছিল, সন্দেহ প্রকাশ করিতে গিয়া এমন টিট্কারির ঝাপটা খাইল যে, তাহাদের আর মুখব্যাদান করিতে হইল না।

হকাররা অন্যদিনের ডবল, তিনগুণ কাগজ লইয়া নিজ নিজ এলাকার পানে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে বেলা সাতটা পর্য্যন্ত কলিকাতা শহরে খবরটা বেশ ভাল করিয়া ছড়াইয়া পড়িল।

ততক্ষণে অন্য দু-একখানা ইংরেজী বাংলা মর্ণিং পেপারও আসরে নামিয়াছে।

৩

বেলা ছয়টা হইলে সিদ্ধেশ্বরবাবু হাতে থার্মোফ্ল্যাস্কটা ঝুলাইয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে প্রবেশ করিলেন। টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "আপনার চা।···তারপর খবর কি?"

"হ'ল তোমার আধ ঘণ্টা?···খবর ভাল নয়; বুঝি এ যাত্রাটা টিকেই গেল।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"না, না;—বেঁচে যান সেই ভাল, অতবড় লোকটা।···বেড়ান-টুকুতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল দাদা; সারারাত ঘুম হয়নি, তার ওপর শেষ রাত্তিরের মিঠে হাওয়া, বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে চোখের পাতা পাহাড়ের মত ভারী হ'য়ে এল। বিছানায় এলিয়ে পড়ে বললাম—'নাও, শীগ্‌গীর পাঁচ কাপ চা,—এক্ষুনি বেরুতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। আপনার ভাদ্দর বউও আর প্রাণ ধরে তুলে দিতে পারে নি—হাজার হোক, মেয়েমানুষের জাত ত?···দেড়টি ঘণ্টা কোথায় দিয়ে যে কেটে গেল।···তারপরে হঠাৎ সেই সর্ব্বনেশে—ক্রিং-ক্রিং ক্রিং···"

"সেখানেও টেলিফোন আছে নাকি?"

"টেলিফোন নয়। আপনার ভাদ্দর বউ চা তোয়ের করচে—বাসনের ঠোকাঠুকি, চুড়ির আওয়াজ;—তাতে ত ঘুমই আসে মশাই। কিন্তু ন্যাবা হ'লে সবই হলদে দেখে কি না?—আমার কানে বাজল—ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। মনে যে একটা ভয়ঙ্কর ধুক্‌পুকুনি রয়েচে এদিকে—বুঝলেন না কথাটা?···

তখন একটু রাগও হ'ল;—কাজের সামনে পতিভক্তি-টক্তি বুঝি না বাবা,—একটা বুড়ো লোককে জাগিয়ে সেখানে বসিয়ে এসেচি।···একটু বকাবকি হ'য়ে গেল; মেয়েমানুষ, সহজে হটতে চায় না, জানেনই ত।··· তারপরে, এদিকে আপিসের খবর কি? ডাকটাক পড়েছিল?"

"গোড়ায় প্রায় তুমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পড়েছিল। লোকটি বেশ রসিক হে। অনেকক্ষণ কথা চলল, তারপর তামাক পুড়ে যাচ্ছে ব'লে বন্ধ করলেন। ভাল কথা, বাড়িতে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে গিয়েছিলে না কি? জিগ্যেস করতে আমি বললাম 'কি না—তুমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরবে; তাইতে বললেন—জ্ঞাতব্য বিষয় সব জেনে-শুনে আসাই ভাল।···যাক্, সে আমার শোনবার দরকার নেই; তবে কথাটা ভাল বুঝলাম না।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু একবার ওপর দিকে চাহিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন—"কই, জ্ঞাতব্য আর কি?···এক ত এই 'জ্ঞাতব্যের' ফেরে পড়েছি,—দাঁড়ান, দেখি কি ব্যাপারটা।"

"হুঁ, বুঝুন একবার, আমি ততক্ষণ হয়ে আসি।"

দাদা বাহির হইয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু মাউথ-পিস্‌টা তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন —"০০০৯ বড়বাজার!"

এক্সচেঞ্জ হইতে জবাব আসিল—"এন্‌গেজ্‌ড।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু টেবিলের উপর একটু তবলা বাজাইলেন, ফ্ল্যাস্কের দিকে চাহিয়া দাদা চার কাপই একা সাবাড় করিয়া দিবে, কি একটু আক্কেল করিবে চিন্তা করিলেন; তাহার পর আবার যন্ত্রটা উঠাইয়া লইলেন।

কনেক্‌শন পাওয়া গেল; মন্থর ভাবে ডাকিলেন— "হ্যালো!—আমি সিদ্ধেশ্বর। কি খবর?—কি করবেন স্থির করলেন? এদিকে এখনও···"

"খবর ত খুব ভাল; পনের হাজার কাপির মধ্যে আর হদ্দ হাজার দু-এক প'ড়ে আছে—রেকর্ড ডিমাণ্ড। আপনার ফুরসৎ হ'ল? এ ঝোঁকে কত ছাপতে হবে একটা পরামর্শ করতে হবে যে। আর নতুন মালমসলা কি পেলেন? আধঘণ্টার জায়গায় ত দু-ঘণ্টা হয়ে গেল; খাঁটি খবরের জোগাড়ে আছেন ব'লে আর রিং-আপ-ও করিনি।"

কথাগুলো সিদ্ধেশ্বরবাবুর কানে যেন খাপছাড়া

খাপছাড়া বোধ হইল; চিন্তিতভাবে ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—"কি বলচেন ঠিক বুঝতে পারচি না, আর একটু স্পষ্ট ক'রে···"

"আর টেলিফোনে স্পষ্ট ক'রে বুঝতে হবে না, আপনি চ'লে আসুন। টেলিফোনে ব'কে ব'কে সারা হয়ে গেছি। এই এক্ষুনি তিনটি লোকের সঙ্গে ত প্রায় ঝগড়াই হয়ে গেল। বলে—'আপনারা ঠিক জানেন? বেশ ভাল ক'রে খবর নিয়েচেন? খবরটা কন্‌ফারম করিয়ে নিয়েচেন যে তিনি মারা গেছেন?' বললাম—'হ্যা—হ্যা—হ্যা মশাই,—আমাদের নিজের লোক স্বয়ং সাব-এডিটার প্রায় শিয়রে ব'সে···না ম'লে তিনি উঠতেই পারেন না···"

শেষ করবার পূর্ব্বেই হলধরবাবুর কানে চীৎকারের স্বরে বিস্মিত আওয়াজ হইল—"সে কি!!"

হলধরবাবু একটু থমকিয়া গেলেন; তাহার পর ভীত কণ্ঠে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেকি মানে?"

"সেকি' মানে—তিনি মারা গেছেন আপনাকে কে ব'ললে?"

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ, পরে উত্তর আসিল—"আপনার কি রাতজেগে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, সিধুবাবু? তখন সময় নিয়েও একটা গোলমেলে কথা বললেন—একবার বললেন 'আধঘণ্টাটেক হবে'—শুধ্‌রে বললেন 'এক্ষুনি'। এখন আবার ব'লচেন—"আপনি খবর দেন নি!"

"সময় নিয়ে ত কোন কথাই হয় নি আপনার সঙ্গে!"

দাদা আসিয়া প্রবেশ করিলেন, বলিলেন—"আমার সঙ্গে একটু হয়েছিল বইকি; তোমায় বললাম না?" জিজ্ঞাসা করলেন—"কখন স্বমতিটা হ'ল—তোমার বাড়ি যাওয়ার স্বমতিটা আর কি।···আমি বললাম···"

সিদ্ধেশ্বরবাবু মাউথ্‌পিস্‌টা মুখ থেকে একটু সরাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, কি কি কথা হয়েছিল, এক এক করে বলুন ত—বোধ হয় সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে।"

দাদা তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা যেমন যেমন হইয়াছিল বিবৃতি করিয়া যাইতে লাগিলেন···

ওদিকে টেবিলে রাখা মাউথপিসের ভিতর হইতে ঝলকে ঝলকে আগুনের হলকার মত বাহির হইতে লাগিল—"কথা কন না কেন?···জেরবার, শীগ্‌গীর চলে আসুন···সর্ব্বনাশ···ড্যামেজ···সব জেলে···"

সিদ্ধেশ্বরবাবু প্রায় পাগলের মতই হইয়া গিয়াছিলেন; সব কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন—"এর একটা কথাও যে আমার সম্বন্ধে নয় দাদা! উনি যে বরাবর রোগীর সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হচ্চে এইরকম বুঝে গেছেন।···আগেই কেন ব'লে দিলেন না যে আমি কথা কইছি না—গেল—সব গেল!"

—হন্তদন্ত হইয়া বাহিরের পানে চলিলেন। দাদা পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে প্রশ্ন করিলেন—"তবে যে বল্‌লেন—'সাজা র'য়েচে, নিশ্চিন্দি হয়ে চড়িয়ে দেওয়া যাক?"

"সাজা যা রয়েচে তা ক'লকে নয়—ম্যাটার, অর্থাৎ সেট করা টাইপ প্রেসে চড়িয়ে দেওয়ার কথা বলছিলেন। রসিকতা ক'রতে গিয়েই যে সর্ব্বনাশটি ক'রে বসেচেন সব।"

ফুটপাথে গিয়া ডাকিলেন—"এই ট্যাক্সি·· জল্‌দি।"

হঠাৎ একটা কথা মনে আসিল—সঙ্গে সঙ্গে একটু আশা···

গুপ্টা-সাহেবের বাড়ির দিকে প্রায় ছুটিলেন একরকম। সামনেই একজন ডাক্তারকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কত দেরি বুঝছেন?"

কথাটা নিজের কানেই বেয়াড়া শুনাইল।···ডাক্তার একবার মুখের দিকে চাহিয়া আশান্বিত ভাবেই বলিলেন—"না, একটা বেশ ফেবারেবল্‌ টারন্‌ নিয়েছে—এ যাত্রা বোধ হয় বেঁচে গেলেন।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু মুখের ভাবটা আর দেখিতে না দিয়া সরাসরি মোটরে গিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময় বগলে একতাড়া কাগজ লইয়া একটা বাচ্চা হিন্দুস্থানী কাগজ-ফেরিওয়ালা চলতি ট্রাম হইতে টুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া ট্যাক্সির দরজার কাছে আসিয়া হাঁকিল—"সত্য-প্রকাশ" লিন্ বাবু—সর্ব্বনেশে খবোর—সার শচীন্দর···"

সিদ্ধেশ্বরবাবু ড্রাইভারকে ঠিকানা দিয়া বলিলেন—"হাকাও—ফুলস্পিডে···"

৪

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে। হলধরবাবু, সিদ্ধেশ্বরবাবু, দু-একজন কেরাণী আপিসে বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন। কচিৎ দু-একটা কথাবার্ত্তা হইতেছে। সিদ্ধেশ্বরবাবুর হাতে একটি কলম আছে; মাঝে মাঝে ঝুঁকিয়া একখানি কাগজে কি লিখিতেছেন।

দিনটা যেন একটা দুরন্ত ঝড়ের মধ্য দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। সারা শহরে সত্যপ্রকাশের একার খবর আর একদিকে ইংরাজি বাংলা সমস্ত কাগজের খবর, দুইটি বিরুদ্ধ খবরের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ বাধিয়া গিয়াছিল। আপিসের বাহিরে কানপাতা যায় না,—ইতর-ভদ্রের মিশ্রিত জনতার অবিমিশ্র গালাগালি। কান লইয়া ভিতরে বসিয়া থাকাও নিরাপদ নয়,—টেলিফোনটা অবিচ্ছিন্ন ভাবে ক্রিং ক্রিং করিয়া সমস্ত দিন যেন 'যুদ্ধং দেহি' 'যুদ্ধং দেহি' হাঁকিয়া গিয়াছে; যদি-বা অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া রিসিভারটা তুলিয়া লওয়া হইল ত কেবল—উৎকট বিদ্রূপ, কদর্য্য হিন্দীভাষা, কিংবা তীব্র হুমকীর উদ্গার!

তাহা ভিন্ন চিঠি যে কত আসিয়াছে তাহার আর লেখা-জোখা নাই। তাহার মধ্যে দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একখানি স্বয়ং গুপ্টা-সাহেবের বাড়ি হইতে—উকিলের সংযত ভাষায় প্রশ্ন—দেখান হোক, কেন অন্ততঃ পনের হাজার টাকার ড্যামেজ স্যুট্ 'সত্যপ্রকাশ'-এর বিরুদ্ধে আনা হইবে না।

আর একখানির নীচে, গুপ্টা-সাহেবকে দেখিতেছে এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তারদের নাম-সহি। তাহাতে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাষায় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—'সত্যপ্রকাশ'-এর সোমবার ১৩ই অক্টোবর ১৯২৭এর টাউন এডিশনে রোগশয্যাগত **ইহলোকবাসী** স্যর শচীন্দ্রনাথ গুপ্টার মৃত্যুবিবরণে পত্রসংখ্যা দুইয়ের ষষ্ঠ প্যারায়—"কে জানিত মহাযজ্ঞে যে হোমানল প্রজ্জ্বলিত করা হইল তাহা এই মহাপ্রাণের আহুতি না গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে না" আবার পত্রসংখ্যা তিনের দ্বিতীয় প্যারায়—"চিকিৎসা-সাগর মথিত হইল, কিন্তু হে বৈরাগী,—তোমার অঞ্জলি সুধার পরিবর্ত্তে গরলেই পূর্ণ হইবে তাহা কে জানিত?" এইরূপ যে লেখা হইয়াছে তাহার প্রকৃত অর্থ কি? এই দুইটি বাক্যের দ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদিগের পেশা এবং আত্মসম্মানে যে গুরুতর আঘাত করা হয় নাই, প্রয়োজন হইলে উক্ত 'সত্যপ্রকাশ'-এর এডিটার এবং প্রিণ্টার বিচারালয়ে এরূপ সপ্রমাণ করিতে রাজি আছেন কি না—ইত্যাদি

এই দুইখানা চিঠি লইয়া গুপ্টা-সাহেবের বাড়িতে গিয়া ধন্না দেওয়া, ডাক্তারদের বাড়ি বাড়ি গিয়া হাজিরা দেওয়া, এই করিয়া সমস্ত দিনটা পালা করিয়া এডিটার, সাব-এডিটার আর প্রিণ্টারের কাটিয়াছে। কাগজ-বিক্রয়ের লাভ ট্যাক্সি ভাড়ায় একরকম নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন টানা-পোড়েনের ফল এক জায়গায় একটু পাওয়া গিয়াছে—গুপ্টা-সাহেবের বাড়িতে; গুপ্টা-সাহেবের অবস্থার একটু পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের মনটা অনেকটা প্রসন্ন থাকার দরুণই এইটুকু সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা রোগীর কল্যাণ কামনায় ক্ষমা করিতে রাজি আছেন যদি অন্যকার কাগজে সুদীর্ঘ এপলজি চাওয়া হয় এবং অঙ্গীকার করা হয় যে 'সত্যপ্রকাশ' কখনও কোনও ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিবে না, অন্ততঃ ঘটনার পরে একমাস না-যাওয়া পর্য্যন্ত; ইচ্ছা হয় ইহার পরে করিতে পারে।

ডাক্তাররা এখনও রাগিয়া আছে।

হলধরবাবু মনের ভাবটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; অনেকক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তাও যদি আজকের সকাল কিংবা দুপুর নাগাদ ম'রে যেত ত অনেকটা সামলে নেওয়া যেত।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু কাগজ হইতে কলমটা তুলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মরবে, ওর ব'য়ে গেছে। ডাক্তার গৌরহরি বসাক বলেছে 'যদি এ-যাত্রা না বাঁচে ত ডিগ্রি ছেড়ে দেব।"

হলধরবাবু ঝাঁঝিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"আরে ছেড়ে দাও ওটার কথা; এই না বলেছিল পাঁচটার পরে না মরলে, ওর চল্লিশ বছরের চিকিৎসাই বৃথা?...ওরাই ত এই কাণ্ডটা বাধালে—যত সব বোগাস্...এক্তিয়ার থাকলে আমিই ত ডিগ্রি কেড়ে নিতাম— আজই।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু আরও দুই তিন লাইন লিখিয়া লেখাটি সমাপ্ত করিলেন। কাগজটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"এই হ'ল, শুনুন—"

"আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গতকল্য 'সত্যপ্রকাশে' স্যর শচীন্দ্রনাথ গুপ্টার যে মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভুল।"

হলধরবাবু—"বেশ ত হয়েছে। হ্যাঁ, তারপর ?"

"এ সংসারে দুর্নিরীক্ষ্য একটি জীবাণুর দ্বারাও মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হয়; সুতরাং কেমন করিয়া একটি অতি তুচ্ছ কারণে এই ভ্রমাত্মক সংবাদটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে সে বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা না করিলেও আশা করি পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মার্জ্জনায় প্রয়োজন স্যর এস্. এন্. গুপ্টার সেই আত্মীয়-স্বজনের নিকট যাঁহাদের এই সংবাদটি সকলের চেয়ে রূঢ় ভাবে আঘাত করিয়াছে। সান্ত্বনার কথা শুধু এই যে তাঁহারা বরাবরই খবরটি ভুল জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন।

কল্য প্রত্যূষ হইতে রোগ আরোগ্যের দিকে চলিয়াছে এবং আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার মারফৎ জানা গেল যে, সমস্ত দিন অপ্রতিহত ভাবে উপশান্ত হইয়া আসিয়াছে।

কেরাণী বামাচরণবাবু সিদ্ধেশ্বরবাবুর পানে মুখ তুলিয়া একটু চাহিলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, বিশেষ সংবাদদাতা ওদিকে পা বাড়ালে হয় একবার; তার ঠ্যাঙের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে ছাড়বে।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু আবার পড়িতে লাগিলেন—

"চিকিৎসার জন্য যেরূপ ধন্বন্তরীদের সমাবেশ হইয়াছে তাহাতে..."

হলধরবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"না, না, ও ধন্বন্তরী-ফন্বন্তরী কাটুন—ভাববে ঠাট্টা করছে; ঐ নিয়ে আবার এক লম্বা চিঠি এসে হাজির হবে।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু কথাটা কাটিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লেখা যায় ?—'বিচক্ষণ চিকিৎসক ?"

হলধরবাবু মুখটা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"দি—ন লিখে।...বিচক্ষণ না হাতী।"

তাহাই লেখা হইল। পড়া চলিল—

"—চিকিৎসার জন্য যেরূপ বিচক্ষণ চিকিৎসকদিগের সমাবেশ হইয়াছে তাহাতে আমরা বরাবরই এইরূপ আশু উপশমের আশা করিয়া আসিতেছি এবং পাঠকবর্গকেও সেইরূপ ভরসা দিয়া আসিতেছি। ভগবান আমাদের আশা, এবং সেই আশার দ্বারা প্রণোদিত ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল করিলেন ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। চিকিৎসকেরা সমবেতকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রোগী সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ববিধ বিপদের গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া পড়িবেন।"

বামাচরণবাবু বলিলেন—"মানে ?"

"মানে—ঐ যাকে বলে ডেঞ্জার জোন (danger zone) পেরিয়ে যাওয়া আর কি।"

"ও!—আবার উল্টো মানেও হ'তে পারে কি না, তাই বলছিলাম।"

হলধরবাবু বলিলেন—"না—যখন বেঁচেই গেল, কেউ অত টেনে মানে করতে যাবে না।...পড়ুন।"

"—সুতরাং এ বিষয়ে আর চিন্তার কিছুই নাই। কারণ তাঁহাদের এই বাণীকে আমরা বেদবাণীর মতই অপ্রান্ত এবং অমোঘ বলিয়া মনে করি।

আজ এই মহাপুরুষকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়ায় আমরা যে স্বর্গীয় আনন্দ উপলব্ধি করিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি আমাদের সে ক্ষমতা নাই। যিনি আমাদের এই হতভাগ্য দেশের প্রতি এই চরম কৃপা প্রকাশ করিলেন সেই পরম কারুণিক ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে তিনি স্যর শচীন্দ্রনাথ গুপ্টাকে এই নবজীবনের সহিত দীর্ঘ পরমায়ু দান করিয়া তাঁহার কল্যাণ ব্রতকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন।"

বামাচরণ বাবু বলিলেন—"বেশ হয়েছে। ডাক্তার-গুলোকেও ত খুব আকাশে তুলে দেওয়া হ'ল।"

হলধরবাবু—"হ'ল না ?—এখন সেখান থেকে ওদের এক একটিকে ধ'রে কেউ আছাড় দিতে পারে, ত গায়ের রাগ মেটে..."

৫

কাগজ বাহির হইল।

আজও অসম্ভব কাটতি। লোকে সঠিক খবরের চেয়ে কৌতূহলেরই বেশী প্রিয়; 'সত্যপ্রকাশ' আজ আবার কি লেখে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল। আজও খুব সকাল সকাল কাগজ বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে অতি অল্প সময়েই—অন্য কোন কাগজ বাহির হইবার পূর্ব্বেই 'সত্যপ্রকাশ' স্যর শচীনের 'নবজীবনের' সংবাদ ও 'পরমায়ুর' প্রার্থনা লইয়া শহরে বেশ চাড়াইয়া পড়িল।

তাহার পর যথাসময়ে দু-একখানা করিয়া ইংরেজী দৈনিক বাহির হইল। Stop Press স্তম্ভে সংক্ষিপ্ত ভাবে এসোসিয়েটেড প্রেসের খবর লেখা আছে।—

মঙ্গলবার ১৪ই অক্টোবর

অদ্য সকাল ছয় ঘটিকার সময় প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও দেশসেবক স্যর এস. এন. গুপ্টা, বার-এট-ল'র নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যু হইয়াছে। স্যর শচীন আট দিন হইল সামান্য ভাবে জ্বরাক্রান্ত হন; ক্রমে জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তিন দিন হইল নিউমোনিয়ায় পরিণত হয়। আক্রমণ এরূপ সাংঘাতিক হয় যে চিকিৎসকগণ বরাবরই

আশাযুক্ত ছিলেন। অতি অল্প কালের মধ্যে ডবল নিউমোনিয়ায় দাঁড়ায় এবং মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

সমস্ত দিন মহানগরীর মুখখানি বিষাদে মলিন হইয়া রহিল। 'সত্যপ্রকাশ' কিন্তু তাহারই কথায় বরাবর একটু কৌতুকের হাসি ফুটাইয়া রাখিল—বাদলা মেঘের অস্পষ্ট রামধনুর মত।

* * *

...ঘাছে। অস্নাত এবং অভুক্ত হলধর- ...চরণবাবু এবং কয়েকজন

*

দুপুর হইয়া ...

... সিদ্ধেশ্বরবাবু, বা...

কম্পোজিটার বিষণ্ণ ভাবে আপিসে বসিয়া আছেন। কদাচিৎ দু-একটা কথাবার্ত্তা হইতেছে।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বলিলেন—"না হয় একটা অতিরিক্ত সংখ্যা তাড়াতাড়ি বের ক'রে দেওয়া যাক্ না। পাঁচটা পর্য্যন্ত ত বেশই ছিল; হঠাৎ এ রকম ডিগবাজি খেয়ে ব'সবে কে জানত?"

হলধরবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন—"হ্যাঃ, ব'সে ব'সে ঐ করি আর কি। লোকটা সেই গেল তবে আমাদের সঙ্গে এরকম দুর্ব্যবহার ক'রে গেল কেন বল দিকিন?"

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা

গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ...বীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা' শীর্ষক যে-প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার ...ইটি উক্তি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির পূর্ব্বে মিথিলায় কেহ কখনও মৈথিল ভাষায় কিছু রচনা করেন নাই।"

এ-কথা কি সত্য? খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথমভাগে বিদ্যাপতির প্রায় ৭৫ কি ১০০ বৎসর আগে কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর তাঁহার 'বর্ণরত্নাকর' প্রণয়ন করেন: এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীর সরকারী সংগ্রহে গুপ্ত-মহাশয় 'বর্ণরত্নাকরে'র পাণ্ডুলিপি দেখিতে পাইবেন। 'বর্ণরত্নাকর' সম্বন্ধে প্রখ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সে যে নিবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে নগেন্দ্রবাবু কবিশেখরাচার্য্যের গ্রন্থরাজী, তাঁহার সময় ও 'বর্ণরত্নাকরে'র ভাষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

গুপ্ত-মহাশয় আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে দুইজন মিথিলাবাসী, বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাস ঝা, যাঁহাকে আমরা কবিরাজ গোবিন্দ দাস বলিয়া জানি।"

মিথিলায় গোবিন্দ ঝা বলিয়া কবি যে না থাকিতে পারেন তাহা নহে, কিন্তু কবিরাজ গোবিন্দদাস বলিয়া আমরা যাঁহাকে জানি তিনি যে খাঁটি বাঙালী সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বাঙালী গোবিন্দদাস-কবিরাজ সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস', 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থে পাইয়া থাকি। গোবিন্দদাস-কবিরাজ তাঁহার স্বরচিত 'সঙ্গীত-মাধব' ...নিজের ও তাঁহার ভ্রাতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

... ...ত্যাগ্রহ কবি

'ভক্তিরত্নাকরে' গোবিন্দদাসের কবিরাজ উপাধি প্রাপ্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
...র্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা কবি সবে প্রশংসয়॥
...কনাথ-আদি বৃন্দাবনে।
... গীতামৃত পানে॥
শ্রীজীব ... ...লেন তথাই।
পরমানন্দিত হ... ...গোসাঞি॥"
কবিরাজ খ্যাতি সবে ...
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ ...

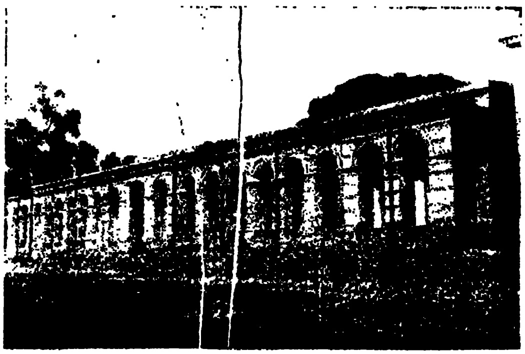
...গুপ্ত-মহা...

সে-পুঁথিতে গোবিন্দ ঝার পদাবলী পাওয়া গিয়া... সে-পুঁথির কিংবা কবির বংশপরিচয় কিছুই দেন নাই। গোবি... কোথায়, কোন পণ্ডিতসমাজ হইতে কবিরাজ উপাধি পাইয়াছিলেন তাহাও প্রকাশ করা প্রয়োজন। গুপ্ত-মহাশয় ১৩৩১ সালে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রথম গোবিন্দদাস-কবিরাজকে মৈথিল করিয়া তুলিতে চাহেন। কিন্তু পদাবলীসাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩৩২ সালের 'ভারতী'র আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় তাহার যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেন। পরে নগেন্দ্রবাবু সেই প্রতিবাদ সত্ত্বেও 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র পঞ্চত্রিংশ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় ও ১৩৩৬ সালের 'প্রবাসী'র জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় সে-কথারই পুনরাবৃত্তি করেন। ইহার পরে প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ষট্‌ত্রিংশ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় গুপ্ত-মহাশয়ের এ-মতের খণ্ডন করিয়া যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন আমরা ভাবিয়াছিলাম গুপ্ত-মহাশয় বোধ হয় সেই প্রতিবাদের যুক্তিনিরসন করিবেন। ১৩৩৬ সালের শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'তেও নগেন্দ্রবাবুর বহু প্রমাদের কথা প্রকাশিত হয়। সেই বৎসরই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে গুপ্ত-মহাশয় 'Govinda Jha—the Maithil Poet' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তাঁহার মতের পুনরাবৃত্তি করিলে সেখানেই তাঁহার সমস্ত যুক্তি বর্ত্তমান প্রতিবাদকারী কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীরঙীন হালদার

বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল

কলিকাতায় গত মার্চ্চ মাসে নিখিলভারতীয় মেডিক্যাল কন্ফারেন্সের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে উহার সভাপতি ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার মহাশয় বলেন, যে, খুব কম করিয়া ধরিলেও ভারতবর্ষের জন্য এক লক্ষ শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন। তাহার সিকিসংখ্যক চিকিৎসক এখন আছেন। ডাঃ সরকার এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের



বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল গৃহ

কথাই বলিয়াছেন। শিক্ষিত চিকিৎসকদের অভাব অনেক দিন হইতেই অনুভূত হইতেছে। মফস্বলের পল্লীগ্রাম অঞ্চলেই এই অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। বঙ্গের সব জেলায় চিকিৎসাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এবং প্রয়োজনমত সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধসরঞ্জামবিশিষ্ট সুপরিচালিত হাসপাতাল স্থাপন করিলে এই অভাব ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে।

ইহা অনুভব করিয়া বাঁকুড়া জেলার হিতসাধনকল্পে প্রতিষ্ঠিত সমিতি বাঁকুড়া সম্মিলনী দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২২ সালে বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন। ইহার প্রত্যেক বিভাগ—বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল—এখন শহরের বাহিরে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী উচ্চ খোলা বিস্তৃত স্বতন্ত্র হাতার মধ্যে অবস্থিত। এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে সহজে যাওয়া যায়।

প্রথম প্রথম যে বাড়িগুলিতে স্কুল ও হাসপাতাল উভয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলি কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলকে দান করেন। এইগুলি ৭৮ (আটাত্তর) বিঘা জমীর উপর অবস্থিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের নামে এগুলির নাম নীলাম্বর ভবন রাখা হইয়াছে। হাতার মধ্যে পুকুর ও কূপ আছে। হাসপাতালে জলের কল স্থাপন করা হইয়াছে। সাবেক বাড়ি যত ছিল, তাহা ভিন্ন নূতন বাড়িও অনেকগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাদের কয়েকটির ছোট ছোট ছবি প্রকাশিত হইল। স্কুলের হাসপাতালে এখন ৮৩ (তিরাশি) জন রোগীর স্থান হয়। তা ছাড়া, বাঁকুড়ার সদর হাসপাতাল ও স্কুল হাসপাতালের মধ্যে সহযোগিতা থাকায় ছাত্রেরা সদর হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা ও চিকিৎসাপর্য্যবেক্ষণ হইতেও শিক্ষার সুযোগ পায়।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলের হাসপাতালটিতে প্রধানতঃ বাঁকুড়া জেলার রোগীরাই চিকিৎসার জন্য আসে; কারণ তাহারাই



নীলাম্বর ভবন
নীচে আউটডোর বিভাগ ও উপরে পুরুষদের চিকিৎসার ওয়ার্ড

উহার নিকটতম বাসিন্দা। কিন্তু ইহাতে অন্যান্য জেলার রোগীর চিকিৎসিত হইতে কোন বাধা নাই। এই জন্য দেখা যায়, বর্দ্ধমান, মানভূম ও মেদিনীপুরের রোগীও এখানে

আসে। স্কুলের অধ্যাপকদের মধ্যে সুদক্ষ চিকিৎসক ও সার্জ্জন থাকায় হাসপাতালে কঠিন রোগের চিকিৎসা এবং কঠিন অস্ত্রোপচার হইয়া থাকে। যে-সমুদয় প্রসূতির শিশু ভূমিষ্ঠ হইতে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে, তাঁহারা এই হাসপাতালে গেলে ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ডাক্তারের সাহায্য পাইয়া উপকৃত হন। এখানে কঠিন অস্ত্রোপচার ১৯৩১ সালেই ২৬৫টি হইয়াছিল; প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত



প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী

মোট প্রায় ৯৬০টি। যে যে রকম অস্ত্রোপচার হইয়াছে, তাহার বাংলা নাম রচনার চেষ্টা না করিয়া ইংরেজী নাম দিতেছি :—Caesarian section, Hysterectomy, Intestinal obstruction, Cataract, Lithotomy,



হাসপাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জনের আবাসগৃহ

Removal of Gasserian Ganglion, Ovary Grafting, Amputations, Strangulated Hernia, Tracheotomy, Scrotal Tumour, ইত্যাদি।

১৯৩১ সালে হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে ২২,৩০৬ জন রোগী। বাহির হইতে আসিয়া ব্যবস্থা ও ঔষধ লইয়া গিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে ১৯,৪২১ জন। হাসপাতালের একটি বাড়িতে এক একটি কামরা লইয়া রোগীরা থাকিতে পারেন। প্রত্যেক কামরার পশ্চাতে ছোট উঠান ও তাহার পর রান্নাঘর আছে। সম্মুখে বারাণ্ডা। আত্মীয়রা আসিয়া সেখানে



পুরুষদের অস্ত্রোপচার-গৃহ

থাকিয়া রোগীর আহারাদির ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতে পারেন। দৈনিক ভাড়া বার আনা মাত্র।



স্ত্রীলোকদের অস্ত্রোপচার-গৃহ

বিদ্যালয়টি এখন যে-সকল অট্টালিকায় স্থাপিত, তাহাতে পূর্ব্বে সরকারী সেট্‌লমেণ্ট আপিস ছিল। সেট্‌লমেণ্ট হইয়া যাইবার পর সেগুলি পড়িয়া থাকিত।

গবর্ন্মেণ্ট তাহা বিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। ইহার জন্ত গবর্ন্মেণ্ট প্রশংসাভাজন। সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্ত ও কূপটি গভীর করিবার জন্ত বাঁকুড়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ন্মেণ্টকে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কমিশনার



সাধারণ অস্ত্রোপচার-গৃহ

সাহেব জবাব দিয়াছেন তিনি স্কুল বা হাসপাতালকে কোন প্রকারেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন।

স্কুলের ছাত্রেরা বরাবরই স্থানীয় ওয়েসলিয়ান কলেজে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নী বিদ্যা শিক্ষা করে। কলেজের



স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা-গৃহ

কর্ত্তৃপক্ষ ও বিজ্ঞানাধ্যাপকগণ এই সদাশয়তার জন্ত কৃতজ্ঞতাভাজন। উহার প্রিন্সিপ্যাল ব্রাউন সাহেব (এখন ছুটিতে) দীর্ঘকাল স্কুলের অবৈতনিক স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিয়া ও অনেক চাঁদা তুলিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্তবাদার্হ হইয়াছেন। উক্ত দুটি বিষয় ছাড়া আর সমস্ত বিষয় স্কুলেই শিখান হয়। ইহার অ্যানাটমি, মেটারিয়া মেডিকা, ফিজিয়লজি এবং প্যাথলজির মিউজিয়ম ও ল্যাবরেটরীগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সরঞ্জাম ও আসবাবে সজ্জিত। শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষা দিবার হলটি ফাঁকা জায়গায় নদীর ধারে লোকালয় হইতে দূরে নির্ম্মিত হইয়াছে।



প্রসব করাইবার গৃহ

ছাত্রাবাস সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা একটি বাগানের মধ্যে স্থিত। ছাত্রদের ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন ও টেনিস খেলিবার এবং কুস্তি করিবার



সংক্রামকরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র রাখিবার গৃহ

প্রশস্ত জায়গা আছে। একজন অধ্যাপক ছাত্রাবাসের হাতাতেই থাকেন। ছাত্রদের জন্ত সাধারণ পাঠাগার আছে।

স্কুলে গড়পড়তা মোট ২০০ ছাত্র পড়াইবার অনুমতি আছে। এখন ২০১ জন ছাত্র আছে। তাহার মধ্যে এবার প্রায় ৫০টি ছাত্র ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাণ্টির শেষ

পরীক্ষা দিতেছে। হাসপাতালে রোগীর শয্যা (beds) বাড়াইতে পারিলে আরও ছাত্র লওয়া চলিবে। সদাশয় সঙ্গতিপন্ন লোকেরা বেড্ বাড়াইবার ব্যয়ে নিজের বা কোন আত্মীয়-আত্মীয়ার স্মৃতিরক্ষা এবং দেশহিতসাধন করিতে পারেন। আমরা বাঙালী মাত্রকেই এই অনুরোধ জানাইতেছি। কারণ বঙ্গের সকল অংশ হইতে আগত ছাত্রেরা এখানে শিক্ষা পায়। তবে, অবশ্য যাঁহাদের জন্ম ও পৈত্রিক বাসভূমি এবং কর্ম্মস্থান ও রোজগারের জায়গা বাঁকড়া জেলায়, তাঁহাদের উপর বিদ্যালয়ের দাবি বেশী।

মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয় শিখাইবার



ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেনদের বাসগৃহ

জন্য যোগ্য অধ্যাপক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নিজ নিজ বিষয়ে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত।

স্কুল ও হাসপাতালের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে কখনও কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ও রেড ক্রস ফণ্ড হইতে কিছু টাকা পাওয়া যায়। ১৯৩০-৩১ সালে তাহার পরিমাণ যথাক্রমে বার্ষিক ১৫০০,৬০০ ও ২০০ টাকা ছিল। আর সমস্ত ব্যয়ই ছাত্রদের বেতনাদি ফী, দান, চাঁদা ইত্যাদি হইতে নির্ব্বাহ করিতে হয়। ছাত্রদের বেতন হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় হয়। মোট ব্যয় ১৯২৮-২৯,১৯২৯-৩০ এবং ১৯৩০-৩১ সালে যথাক্রমে ৫৮২২৪৮/১,৫৫৯৭১৷৶২ এবং ৫৩৮০৪৷৷১১ হইয়াছিল। প্রতিবৎসর দশ বার হাজার টাকা ঘাটৃতি পড়িবার আশঙ্কা থাকে। কার্য্য-নির্ব্বাহকগণ কোন প্রকারে এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া তুলিতেছেন ও চালাইতেছেন। সর্ব্বসাধারণের আর্থিক ও অন্য সকল প্রকারের সাহায্য প্রার্থনীয়।



নূতন কুটিরসমূহ

এই প্রতিষ্ঠানটির কমিটির সভাপতি শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। উপসভাপতি ওয়েস্লিয়ান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ব্রাউন সাহেব, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ কেদারনাথ দাস, অবসরপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ার শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরকারী উকীল রায় বাহাদুর বসন্তকুমার নিয়োগী, রায়সাহেব রামনাথ মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত স্যাডিশ্যনাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায়-বাহাদুর রাসদন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঋষিবর মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত ডাকবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনার‍্যাল রায় বাহাদুর হেমন্তকুমার রাহা, এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলাম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীব্রজদুর্লভ হাজরা।



প্রাইভেট্ ওয়ার্ড

আলিপুরের উকীল শ্রীকেদারনাথ আশ ইহার কোষাধ্যক্ষ, হাইকোর্টের স্যাডভোকেট শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার সেক্রেটারী, আলিপুরের উকীল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় সহকারী সম্পাদক ও সহকারী কোষাধ্যক্ষ, এবং শ্রীঅবনীকান্ত মণ্ডল ও শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক। মিঃ এন্ সরকার এম্-এ, হিসাবপরীক্ষক। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, অধ্যাপক প্রমোদকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।



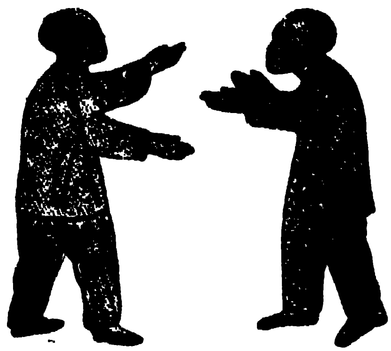
গাছের তলায়

শ্রীসুধাংশু রায়

চীনদেশের ছেলেদের খেলা

শ্রীসংগ্রাহক

সবদেশেই ছেলেমেয়েরা খেলা করে। চীনদেশও বাদ যায় না। আমাদের দেশের মত সেখানকারও অনেক পুরাতন খেলা অপ্রচলিত হইয়া যাইতেছে। আমরা



হাততালি

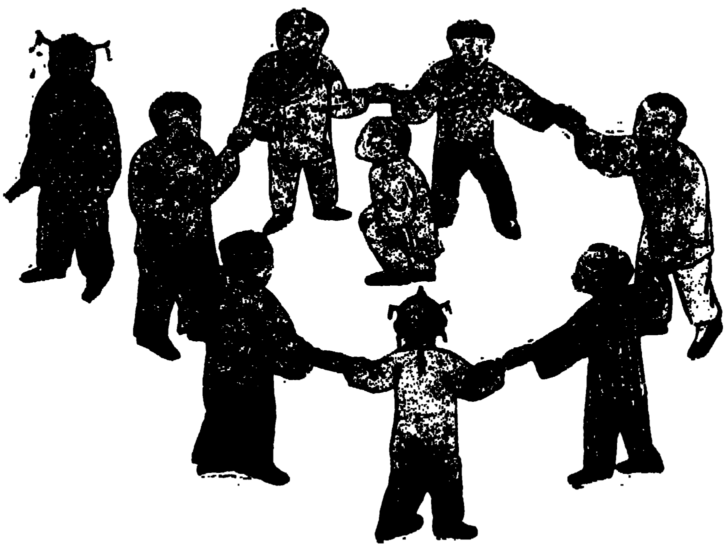
ছেলেবেলা, পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে, যে-সব খেলা প্রচলিত দেখিয়াছি ও খেলিয়াছি, তার অনেকগুলিই লোপ পাইয়াছে বা পাইতে বসিয়াছে। তার জায়গায় অনেক বিলাতী খেলা চলিত হইয়াছে। চীন দেশেরও অনেক সাবেক খেলা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। তার জায়গায় কোন্ দেশী খেলা চলিতেছে জানি না। আসল চীনা খেলা এখনও যেগুলি চলিত আছে, তার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি।

১। হাততালি। এই খেলায় দুটি ছেলে সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়াইয়া আড়াআড়ি ভাবে পরস্পরের হাতে তালি দেয়; অর্থাৎ একজন খেলোয়াড় নিজের বাঁ হাত দিয়া অন্যের বাম হাতে ও নিজের ডান হাত দিয়া অন্যের ডান হাতে তালি দেয়; এবং তার পরই দুজনেই নিজের নিজের দুই হাতে তালি দেয়। এই রকম পরস্পরের এবং নিজের হাতে তালি খুব দ্রুত চলিতে থাকে। হাততালি দিতে দিতে তাহারা একটি ছড়া গান করে। তাহার প্রথম পদ দুটির অনুবাদ এইরূপ—

"প্রতিপদের দিনে আমাদের বুড়ী পুষ্পচিত্রিত লণ্ঠন-গুলির মধ্যে বেড়ায়, এবং কয়েকটি ধূপ জ্বালিয়া বুদ্ধদেবের পূজা করে। দ্বিতীয়ার দিনে আমাদের বুড়ী মোরব্বা খায় এবং কয়েকটি ধূপকাঠি জ্বালিয়া বুদ্ধদেবের পূজা করে।"

২। বিড়ালের ইঁদুর ধরা। এই খেলাতে এক জন ইঁদুর ও একজন বিড়াল হয়। বাকী সবাই ইঁদুরকে ঘিরিয়া ও বিড়ালকে বাহিরে রাখিয়া চক্রাকারে দাঁড়ায়। তাহার পর এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে—

বিড়াল। ক'টা বেজেছে?



বিড়ালের ইঁদুর ধরা

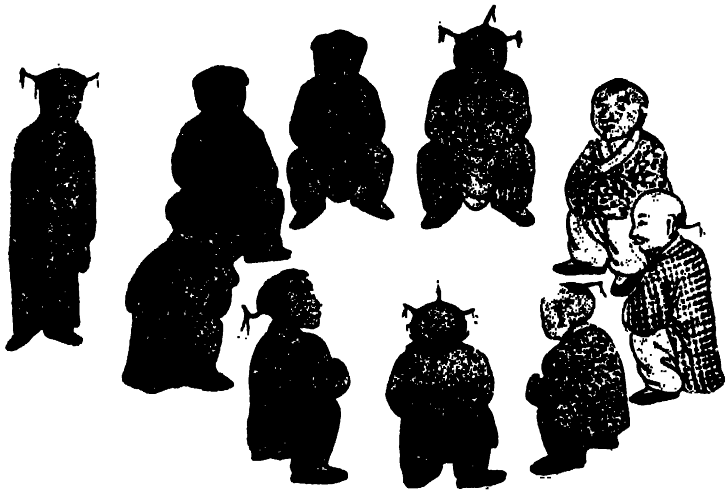
খেলোয়াড় দল। ন'টা।

বিড়াল। আমার বড় দাদা বাড়ি আছেন কি?

খেলোয়াড়রা। আছেন (যদি সে প্রস্তুত থাকে); নাই (যদি সে প্রস্তুত না থাকে)।

বিড়াল। খাবার সময় হয়নি কি ?

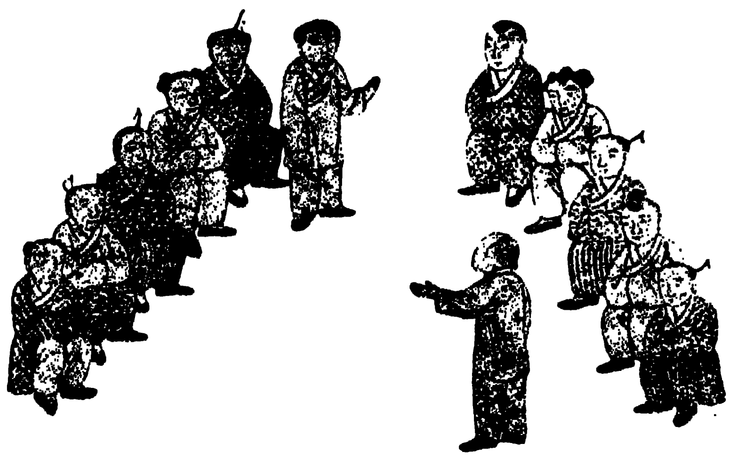
এইরূপ প্রশ্নোত্তরের সময় চক্রের ছেলেরা পাঁচবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবর্ত্তন করে। তাহার পর তাহারা থামে। বিড়াল চক্রের বাহিরে যেদিকে থাকে, ইঁদুর চক্রের ভিতরে তাহা হইতে দূরবর্ত্তী দিকে থাকে। বিড়াল এই দিকে চক্রের ভিতর লাফ দিয়া ঢুকে এবং ইঁদুর অন্য দিক দিয়া পলাইয়া যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিড়াল ইঁদুরকে ধরিয়া "খায়", ততক্ষণ খেলা চলিতে থাকে। এই "খাওয়াটা"তে ছেলেরা খুব আমোদ পায়।



রুমাল লুকানো

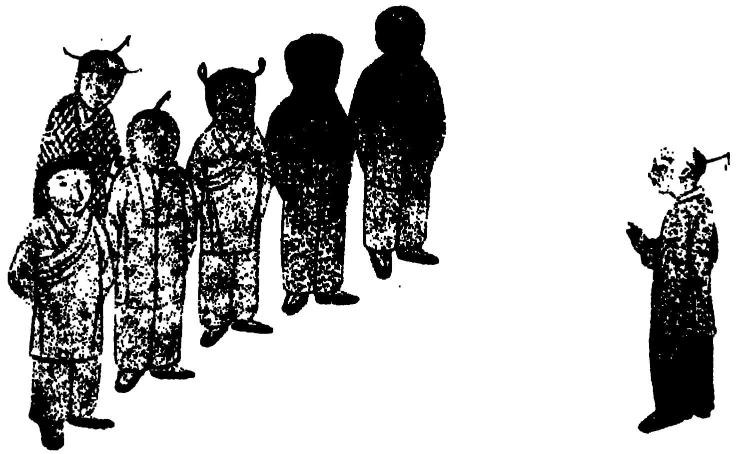
৩। রুমাল লুকানো। এই খেলাটির বর্ণনা চায়না জর্ন্যালে দেওয়া হয় নাই। বলা হইয়াছে যে, ইহা ঐ প্রকারের বিলাতী খেলার মত। তাহা কাহারও জানা থাকিলে লিখিবেন। ছবি হইতেও কেহ কেহ হয়ত অনুমান করিতে পারিবেন।

। অনুমানের খেলা। এই খেলায় ছেলেরা বা মেয়েরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া সাম্‌না-সামনি বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকে। প্রত্যেক দলের এক এক জন কাপ্তেন বা নেতা থাকে। সে বসে না। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এক একটি ফুল বা ফলের নাম দেওয়া হয়। এক দলের কাপ্তেন তাঁহার দলের এক জনের চোখ হাত দিয়া বন্ধ করিয়া দেন। অন্য দলের এক জন আস্তে আস্তে আসিয়া এই চোখ-ঢাকা খেলোয়াড়টির মাথায় টোকা দিয়া চলিয়া যায় এবং তাহার পর নিজের দলে গিয়া নিজের জায়গায় বা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য কাহারও জায়গায় বসে। অতঃপর চোখ-ঢাকা ছেলেটির চোখ খুলিয়া দেওয়া হয়। তাহাকে অনুমান করিতে হয়, কে তাহার মাথায় টোকা মারিয়াছে। সে অন্য দলে গিয়া প্রত্যেকের মুখ পর্য্যবেক্ষণ করে, প্রত্যেকের বসিবার ভঙ্গী লক্ষ্য করে, এবং অন্যান্য অনেক বিষয় মন দিয়া দেখে—এইরূপে যে টোকা মারিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। সে মুখ ভ্যাংচাইয়া নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া "অপরাধী" ব্যক্তিকে হাসাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্যেরা সবাই নির্ব্বিকার উদাসীন ভাব অবলম্বন করে, কিংবা

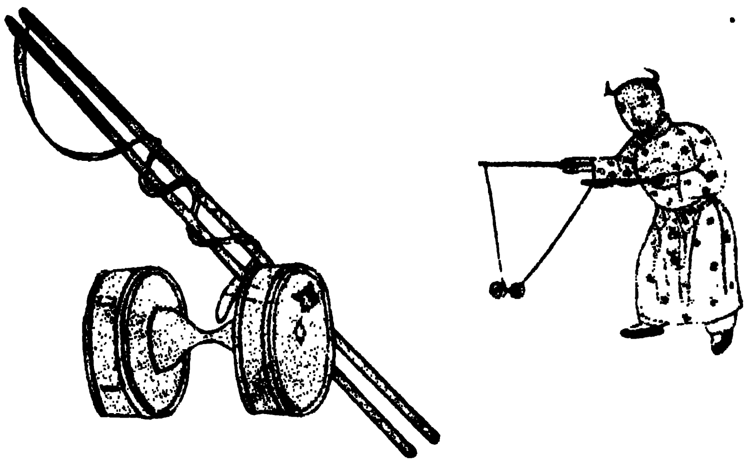


অনুমানের খেলা

সবাই হাসে, যাহাতে "অপরাধী" ধরা না পড়ে। অনেক সময় তাহার মুখ ভ্যাংচান বা অন্য ভাঁড়ামিতে "অপরাধী" ধরা পড়ে। কিন্তু তাহা না হইলে, শেষে সে অনুমান করিয়া কাহারও নাম করে। যদি অনুমান ঠিক হয়, তাহা হইলে "অপরাধী"কে নিজের দলে লইয়া যায়, অনুমান ঠিক না হইলে নামিত খেলোয়াড় আপন দলেই থাকিয়া যায়। সেই দলের কাপ্তেন তখন নিজেদের এক জনের চোখ ঢাকা দেয়, অন্য দলের এক জন



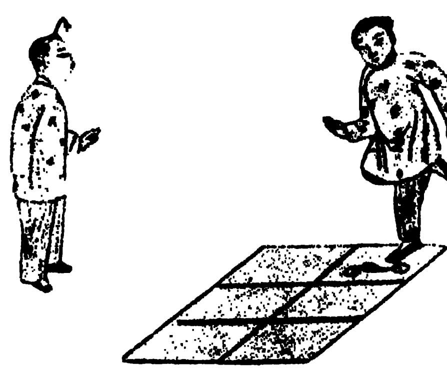
ইট চালান



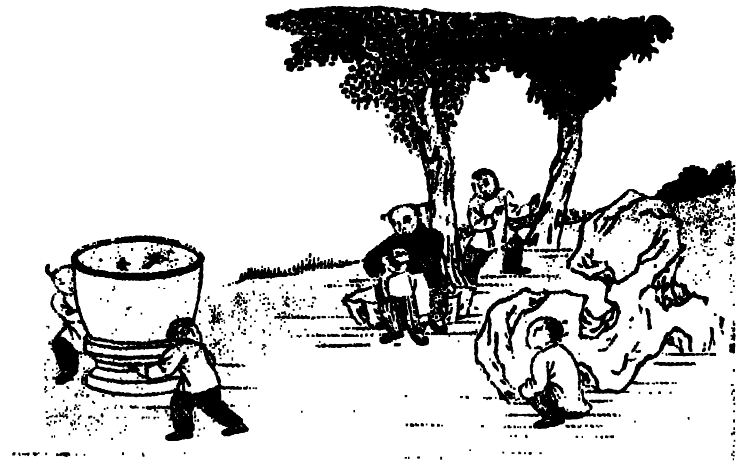
ডুগডুগির আকারের দু-মাথা লাটিমের খেলা

আসিয়া তাহার মাথায় টোকা দেয়, এবং এই "অপরাধী"কে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে; ইত্যাদি। যখন কোন দল এই প্রকারে নিজেদের সব খেলোয়াড় হারায় তখন খেলা শেষ হয়।

৫। ইট চালান। এক দল ছেলে নিজেদের দুটি হাত পিছনে রাখিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায়। সারির সামনে ও পিছনে এক এক জন দাঁড়ায়। পিছনের ছেলেটির হাতে এক টুকরা ইট থাকে। সে "ইট কোথায়, ইট কোথায়" বলিতে বলিতে সারির পিছন দিয়া যাইতে থাকে এবং এক জনের হাতে অলক্ষিতে ইটের টুকরাটি রাখিয়া দিয়া বলে, "এখানে একটি পীচ ফল আছে, এখানে একটি খুবানী ফল আছে।" যার হাতে ইটের টুকরাটি রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে সে এমন নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, যেন কোন মতেই কেহ অনুমান করিতে না পারে যে, উহা তাহার কাছে আছে। এখন সামনের খেলোয়াড়কে অনুমান করিতে হইবে ইটের টুকরাটি কাহার নিকট আছে। "মোরগের মাথা কোথায়, কোথায় মুরগীর মাথা" সুর করিয়া ইহা বলিতে বলিতে সে সারির সম্মুখ দিয়া যাইতে থাকে, এবং এক এক বার থামিয়া নিজের মুঠা দিয়া নিজের হাঁটুতে টোকা মারে।



ঘর ডিঙ্গান



লুকারিতের অন্বেষণ

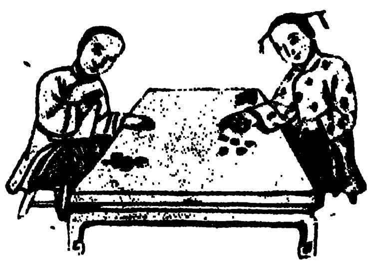
আকাশে ছুঁড়িয়া দিয়া ঘূর্ণিত অবস্থাতেই উহাকে দড়ির উপর ধরিয়া ঘুরাইতে পারিলে তাহার দ্বারা খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য প্রমাণিত হয়। এক এক জন ওস্তাদ এক ঘণ্টা বা তাহার অধিক সময় লাটিমটিকে ঘুরাইতে এবং মাথা ও ঘাড় বেষ্টন করাইতে এবং দুই পায়ের ফাঁক দিয়া চালাইতে পারে। আগেকার কালে ইহারা এই খেলা দেখাইয়া বেড়াইত এবং দর্শকদের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিত।

যখন তাহার মনে হয় সে ইট-ধারীকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, তখন তাহাকে বলে, "এই দিকে এস।" তাহার অনুমান ঠিক হইলে ইট-ধারী তাহার স্থান অধিকার করে; ঠিক না হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইট-ধারী আবিষ্কৃত না হয়, ততক্ষণ অনুমান চলিতে থাকে।

৪নং খেলার মত এই খেলাতেও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বাড়ে।



খোঁড়া পা



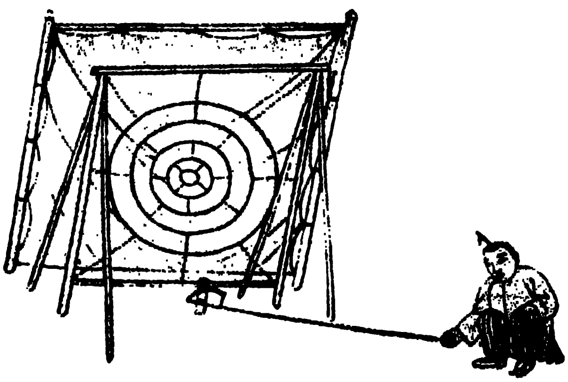
উৎক্ষিপ্ত জিনিষ হাতের পিঠে ধরা

৬। ডুগডুগির আকারের দু-মাথা লাটিমের খেলা। ইংরেজীতে ইহাকে ডায়াবোলো (diabolo) বলে। ইহা ছড়ি ও দু-মাথা লাটিম দিয়া খেলিতে হয়। দড়ির উপর লাটিমটি ঘূর্ণিত রাখিতে পারিলে এবং মধ্যে মধ্যে উহাকে

৭। ঘর ডিঙ্গান। খড়ি দিয়া মেজেতে ছয়টি বা তাহার বেশী ঘর আঁকা হয়। এক টুকরা ইট বা পাথর এক পায়ে দাঁড়াইয়া লাথি মারিয়া এক ঘর হইতে আর এক ঘরে লইয়া যাইতে হয় এবং এক পায়ে লাফাইয়া ঐ ঘরে যাইতে হয়। ইট বা পাথর কিংবা পা ঘরের রেখায় লাগিলে চলিবে না কিংবা ঘরের বাহিরে গিয়া পড়িলেও চলিবে না। যতক্ষণ খেলা চলিবে, ততক্ষণ এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। তোলা পা মাটিতে ঠেকিলে খেলোয়াড়ের হার। যে যত বেশী ঘর দখল করিতে পারে, তাহার জিত হয়।

৮। লুকায়িতের অন্বেষণ। ইহা কতকটা আমাদের লুকোচুরি খেলার মত।

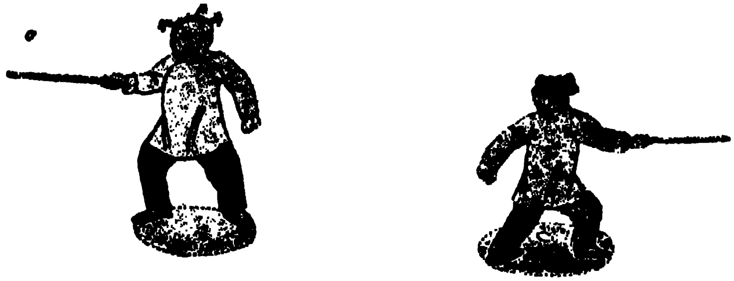
৯। খোঁড়া পা। একজন ছেলে বা মেয়ের একটা পায়ের নীচে দিয়া এক টুকরা কাপড় চালাইয়া তাহা তাহার ঘাড়ের উপর বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে এই প্রকারে এক পায়ে লাফাইয়া অন্য কোন খেলোয়াড়কে ধরিতে বলা হয়। সে যদি কাহাকেও ধরিতে পারে, তাহা হইলে ধৃত খেলোয়াড়কে এইরূপ এক পায়ে লাফাইয়া লাফাইয়া আর কাহাকেও ধরিতে হয়; অধিকন্তু তাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়ায় তাহাকে হাতড়াইতে হয়। যে প্রথমে খেলে তাহার চোখ বাঁধা হয় না। কাজেই দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষে খেলাটা কঠিনতর। সে কাহাকেও ধরিতে পারিলে ধৃত ব্যক্তির ঐরূপ দশা ঘটে;



তুষার-হংসরূপ লক্ষ্যভেদ

কিন্তু ধরিতে না পারিলে সবাই তাহার মাথায় টোকা মারিতে থাকে—যতক্ষণ না তাহার চোখের বাঁধন খুলিয়া যায়।

১০। উৎক্ষিপ্ত জিনিষ হাতের পিঠে ধরা। এই খেলাটি বালিকাদের খুব প্রিয়। দুটি বালিকা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শিমের বীজ, ছোট ছোট ইট বা পাথরের টুকরা দুই হাতের মুঠায় লইয়া হাত দুটি পিছনে রাখিয়া সাম্‌নাসামনি বসে। একজন চট করিয়া এক হাতের মুঠায় কয়েকটি ঐরূপ জিনিষ—ধরুন শিমের বীজ—লইয়া মুষ্টিবদ্ধ হাত সাম্‌নে ধরে। তাহার সঙ্গিনী অনুমান করে তাহার মুঠায় কয়টি বীজ আছে। ধরুন, অনুমান হইল অপর পক্ষের হাতে চারিটি বীজ আছে। তখন



এক প্রকারের গুলিডাণ্ডা

সঙ্গিনী নিজের মুঠা খোলে। তাহাতে যদি চারিটির বেশী বীজ থাকে, তাহা হইলে তাহারই জিত হয়, এবং খেলার পরবর্ত্তী অংশ সেই প্রথমে খেলে। এখন উভয়ে সব বীজগুলি সামনে ছড়াইয়া রাখে। যে জিতিয়াছে সে একটি একটি করিয়া তুলিয়া লইয়া উপরদিকে ছুঁড়ে এবং হাতের পাতার উল্টা পিঠে ধরে। এইরূপে সব বীজগুলি উৎক্ষেপ করিয়া হাতের পিঠে ধরা হইলে খেলা শেষ হয়। হাতের পিঠে ধরিতে না পারিলে হা'র হয়।



১১। এক প্রকারের গুলিডাণ্ডা। গুলিটি উভয় দিকে সরু কাঠের টুকরা। খেলোয়াড় দুজন এক একটি বৃত্তের পরিধিতে পা রাখিয়া দাঁড়ায়। একটি বৃত্তের মাঝখানে গুলিটি রাখিয়া তাহা ডাণ্ডার এক দুই বা তিন ঘা দ্বারা ২০ ফুট দূরে ফেলিতে হয়। তাহার পর অন্য খেলোয়াড় তাহা কুড়াইয়া লইয়া উহা অপর পক্ষের বৃত্তের মধ্যে ফেলিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে অপর পক্ষ উহা কুড়াইয়া লইয়া উৎক্ষিপ্ত করে এবং ডাণ্ডার ঘায়ে উহা প্রতিপক্ষের দিকে চালাইয়া দেয় এবং প্রতিপক্ষ আবার উহা অপর খেলোয়াড়ের দিকে ছুঁড়িয়া দেয়।

১২। তুষার-হংসরূপ লক্ষ্যভেদ। কয়েকটি চক্রাকার মোটা তারের কাঠামোর মাঝখানে যে ছোট বৃত্তটি দেখা যাইতেছে, তাহাই তুষার-হংস। পশ্চাতের কাপড়ের পর্দ্দাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি আটক করিবার জন্য। তারের কাঠামোর সম্মুখে একটি খুঁটি পোঁতা থাকে। তাহাতে বাঁশের একটি ছোট ধনু সংলগ্ন থাকে। ধনুর বাঁকান দুটি দিক এক টুকরা চামড়া দিয়া পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। চামড়াটির সঙ্গে একগাছি সরু দড়ি বাঁধা থাকে। ঐ দড়িটির একদিক একটি ফাঁপা পিতলের গুলির ভিতর দিয়া চালাইয়া খেলোয়াড় উহা টানিয়া ছাড়িয়া দেয়। আকর্ষণে ধনুটি আরও বাঁকিয়া যায়। সুতরাং দড়িটি ছাড়িয়া দিলে ধনুটি অপেক্ষাকৃত সোজা হওয়ার শক্তিতে গুলিটি নিক্ষিপ্ত হয়। তারের কাঠামোর মধ্যস্থিত ছোট বৃত্তটিতে গুলিটি লাগিলেই তুষার-হংস রূপ লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে মনে করা হয়।

মুদী

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

সরকারী পাকা রাস্তাটা উত্তর থেকে দক্ষিণে এঁকেবেঁকে কোথায় চলে গেছে—একথা গাঁয়ের প্রবীণরা ভাল ক'রেই জানে। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েরা বহুবার শুনেও আজ পর্য্যন্ত ধারণা ক'রে উঠতে পারেনি যে, ঠিক কোথায় এর শেষ, আর সে কোথায়টা কেমন! কত গরুর গাড়ী ধীরে ধীরে ঐদিকে চলে গেছে, কত মানুষ গেছে! গাঁয়ের পথটা যেখানে পাকা রাস্তায় এসে মিশেছে সেইখানে মুদীর দোকানের দাওয়ায় ব'সে ছেলেরা মুড়িমুড়কী খেতে খেতে এই-সব ভাবে, আর জিজ্ঞাসা করে। মুদী ইচ্ছামত উত্তর দেয়।

মুদীর দোকানঘরের মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড বাদামগাছ; লালচে পাতার ছাতা ধ'রে সে বহুদিন থেকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

চালাখানা একেবারে বুক পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, নীচু হয়ে ঢুকতে হয়। ভিতরে এলে প্রথমটায় কিছুই চোখে দেখা যায় না, এমনি অন্ধকার। প্রকাণ্ড ঘরটার অন্ত কোথাও ফাঁক নেই, শুধু দু'খানা ঝাঁপ, আর চালের মটকার কাছে একটা ফুটো—তাই দিয়ে পয়সার আকারে একটা গোল আলো ঘরের মেঝের উপর থরথর ক'রে কাঁপছে। ক্রমশ সবই চোখ-সওয়া হয়ে আসে। এ-পাশটায় ঝাঁপগুলো দেওয়ালে ঠেস দেওয়া রয়েছে। একটা বাঁশের মাচা, তার উপর থলে-ভর্ত্তি চালডাল প্রভৃতি। আড়কাঠ থেকে ঝুলছে পাট, নারকেল দড়ি, পাটের দড়ি, কি কতকগুলো শুকনো লতাগাছ, খানকতক ছেঁড়া চট। এককোণে একতাড়া পাঁকাটি দাঁড় করানো রয়েছে। এসব জিনিষ, পাড়া গাঁ হ'লেও অসময়ে চড়া দামে বিক্রী ক'রে মুদী বেশ দু-পয়সা লাভ করে। এ-পাশে আর একটা বাঁশের মাচা, এর উপর ওর দোকান। মাচার মধ্যেখানে ছিদ্রযুক্ত চৌকি। ছিদ্রের তলায় বেতের বোনা ছোট্ট একটা ধামা পাতা। ছিদ্র দিয়ে এই পাত্রটায় পয়সা এসে পড়ে, বাইরে থেকে কেউ দেখতে পায় না রোজ কত বিক্রী হ'ল। লোকের নজরটাকে ওর বড় ভয়। ঐ চৌকিটার চারিদিক ঘিরে ছোট ছোট মাটির গামলা আর ধামা। চাল ডাল সুজি চিনি আটা ময়দা পোস্ত, এমনি সব কত কি ওতে রয়েছে। ছোলার ডালের গামলার ভিতরকার উপুড়-করা সরাখানা দেখা যাচ্ছে। সরা উপুড় ক'রে তার উপর অল্প জিনিষেই চূড়াকারে সাজাবার ভারি সুবিধে। এমন ক'রে চূড়ো বানিয়ে দোকান সাজালে দেখতেও বেশ পরিষ্কার হয়, খদ্দেরও সন্তুষ্ট হয়, তাই। চৌকির বাঁ-দিকটায় তেলের আয়োজন।

ছোট ছোট ভাঁড়গুলোয় সরষের, নারকেল, আর রেড়ির তেল। সব ভাঁড়গুলোই গায়ে গায়ে ঠেসিয়ে একখানা বারকোষের উপর বসানো। তেল কেনার সময় যা দু-এক ফোঁটা ভাঁড়ের গা বেয়ে কিংবা ফোঁদেলের ছিদ্র বেয়ে কাঠের থালাটায় পড়ে, তা নষ্ট হ'তে পায় না। সাত আটদিন অন্তর, ভাঁড়মোছা কাপড় দিয়ে বারকোষের তেল শুখিয়ে নিয়ে নিংড়ে ভাঁড়ের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। সরষে, নারকেল—দুটোই অতি প্রসিদ্ধ এবং হিতকর খাদ্যবস্তু; আর গাব, সে ত ওষুধের শিরোমণি, কাটা ছেঁচা পোড়া, যাতেই দাও না। এই তিন তেলের সংমিশ্রণটা কাজেই মানুষের পক্ষে চরম উপকারী—অন্তত মুদীর এই মত। যা হোক্, এই সংমিশ্রণটা কোন্ তেলের ভাঁড়ে নিংড়াবে, এসম্বন্ধেও যথেষ্ট ভেবেছে।—রেড়ির তেলের ভাঁড়ে যদি দেয়, তাহ'লে পিদ্দিম যদিও বা কোনো রকমে জ্বলে কিন্তু কাটা ছেঁচা পোড়ার পক্ষে ও-তেল তখন আর কোনো কাজেই লাগবে না। উপরন্তু ও-তেলে জোলাপের কাজ চলবেই না। তারপর যদি নারকেল তেলের ভাঁড়ে দেয় ত, ও-তেলে আর লুচি ভাজা চলবে না। মাথায় মাখলে মাথা চট্‌চটে আঠার মত হয়, দুর্গন্ধ হয়; ঝড়ঝাপটের দিন আর রক্ষে নেই, ধুলোয় মাথা ভর্ত্তি, যতই ধোয়ামোছা কর, যাবে না সহজে। চুলে চুলে জটা পাকিয়ে যায়। কত অসুবিধে। কিন্তু সরষের তেলের ভাঁড়ে দিলে—ও তার একটা মাত্র উত্তর দেয়,—ও-তেল ত অগ্নিশুদ্ধি ক'রে তবে খাবে, কোন দোষ নেই। তবে সত্যিকথাটা সে সবাইকে বলে না। সে হ'ল এই,—সরষের তেলটার ঝাঁঝ অন্য তেলের চেয়ে বেশী, কাজেই কেউ সহজে ধরতে পারে না। অন্য তেলে মিশালে ধরা পড়বার আশঙ্কা বেশী। আর তা ছাড়া, ওটা মিশালে সরষের তেলটা বেশ গাঢ় হয়, ওজনে বাড়ে, কাজেই খুব লাভ।

কাছে ও দূরের গামলা ও ধামার সামগ্রী ওজন করবার জন্যে আনুতে হয়। তাই একটা আধখানা নারকেল মালার কাণায় দুটো ছিদ্র ক'রে তাতে বাঁখারির আগাটা সরু ক'রে পরিয়ে নিয়েছে। ঠিক একখানা হাতার মত হয়েছে; লম্বা হাতল। একই জায়গায় ব'সে দূরের নাগাল পায়, ভারি সুবিধে। এদিকে হাতের কাছে কেরোসিন কাঠের অনেকগুলো থাক করেছে। তাতে সব মণিহারী জিনিষ।—পেন্সিল, খাতা, দোয়াত, কালি, আরসি, চিরুণী, মাথার কাঁটা, ফিতে, ঘুন্সী, গুলিসুতো, সুচ, ঘুড়ি, তরল আলতা, প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, বোধোদয়, ধারাপাত, শ্রুতিলিখন, হাতা, খুন্তি, কড়া, চাটু, কাঁচের এবং গালার চুড়ি, শাখা নোয়া, গায়েমাখা ও কাপড়কাচা সাবান। ওদিকে পুঁটুলি-বাঁধা কাপড় গামছা। লাল চুড়িপাড়, দাঁতপাড়, পাছাপেড়ে, রং বেরঙের ডুরে, নীলাম্বরী, কাঁচকলাপাত রঙের কাপড়ে লাল পাড়, এমনি সব কত রকমের কাপড়। মাচার নীচে আলু ঢালা আছে। অনেকে সেই অন্ধকারের মধ্যে মুখ গুঁজে ভাল আলু বেছে নিচ্ছে।

মুদী উপর থেকে বলছে, বাছলে দু-আনা, সাপ্টা নিলে ছ-পয়সা। ওরা বলে, হুঁ এই গুঁড়িআলু দু-আনা। চুপ কর বলছি মুদীর পো, নইলে তোমার দোকান লুট হয়ে যাবে, তা ব'লে দিচ্ছি।

এ-অঞ্চলে আর দোকান নেই। কাজেই মুদীর এই যথেচ্ছাচার ওরা মুখ বুজে সহ্য করে।

মুদী হেঁকে জিজ্ঞেসা করে, দোকানখানা কারুর বাপ-ঠাকুদ্দার কিনা? আরও কত কি, যা মুখে আসে তাই বলে ও গায়ের ঝাল মেটায়। নিজের কাজে মন দিতে ওর বেশী সময় লাগে না।

শীর্ণ মুখখানার উপর ধনুকের মত বাঁকা পিতলের চশমা। দুটো হাতলই তার ভেঙে গেছে। কিন্তু তাতে ওর যায়-আসে না, সুতো বেঁধে নিয়েছে। সুতোটা কানের উপর দিয়ে মাথার পিছন দিকে বাঁধা। কেবল কাজের সময় সে চশমা নামিয়ে নাকের ডগায় আনে, নইলে ওটা হয় কপালে আর না-হয় মাথার উপর তোলা থাকে।

মুদী অকস্মাৎ একটা ধমক দিয়ে বল্লে,—ঝোড়ো, পয়সা-কড়ি দিবি, না আমার সর্ব্বনাশ করবি, তাই বল্ দেখি।

একখানা খাতা কোথা থেকে টেনে বার করলে। বালির কাগজ, খেরোর মলাট, মুদীর পো নিজের হাতে আটা দিয়ে জুড়ে নিয়েচে। খাতাখানার একটা কোণ ইঁদুরে সেবা ক'রে গেছে—মুদীর একটা চোখ যেন কে

উপ্ড়ে নিয়ে গেছে,—এমনি তার দুঃখ। ধারের অনেকগুলো টাকার হিসেবটাতেই হতভাগা ইঁদুর পেট ভরিয়েছে। কাজেই ও বাকী টাকাটার উপর মনপ্রাণ বসিয়ে রেখেছে।

ঝোড়ো উত্তর দিলে,—খুড়ো, তোমার অন্নেই পিবৃত্তি-পালন, আর দুটো দিন সবুর কর না, তোমার বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে যা লিচু জামরুল গোলাপজাম ধরেছে গাছ-ক'টায়, উঃ কি ব'লব। তোমার পয়সা আগে দিয়ে তবে ফল-বেচার পয়সা ঘরে তুলব, দেখো। তুমি না থাক্‌লে ঝড়ু মোড়লকে এদ্দিন ভাগাড়ে পচে মরতে হ'ত। শেয়াল শকুনীতে মাংস খুব্‌লে খেত।

মুদী সশব্দে হরিধ্বনি ক'রে জিব কেটে বল্‌লে,—দ্যাখ্‌ লক্ষ্মীছাড়া, ক'টা টাকার জন্যে হিঁদুর সন্তান হয়ে অমন দুর্ব্বাক্য খবদ্দার উচ্চারণ করিসনি বলছি, নরকেও স্থান হবে না তাহ'লে। কি তোর চাই বল্‌ত? সেই সকাল থেকে ত এসে ব'সে আছিস্‌, দেখ্‌ছি?

ঝোড়ো তাড়াতাড়ি তার গামছার গ্রন্থিটা দেখিয়ে বললে,—এই নিয়ে রেখেচি, খুড়ো, সেরটাক আলু।

খাতায় মন দিয়ে মুদী বললে,—আচ্ছা যা, কিন্তু এই শেষবার যেন মনে থাকে। সব পয়সা মিটিয়ে না দিলে আর এক তিল সামগ্রী পাবে না, তা ব'লে দিচ্ছি।

মুদী খাতায় এক সেরের জায়গায় পাচপোর দাম লিখলে। ধারে জিনিষ নিলে ও কিছু চড়া দাম আদায় করে। খদ্দের দাম দিতে এসে বিস্মিত হ'লে মুদী চ'টে গিয়ে হিসাবের খাতাখানা খুলে ধরে। বলে,—দ্যাখ না, এই ত লেখা রয়েচে, আমি কি মিথ্যে বলছি।

নিরক্ষর খদ্দের লেখার পানে চেয়ে থাকে। শেষে মনে করে হবে হয়ত, লেখাপড়ার হিসেব কখনও মিথ্যে হয় না। কিন্তু মুদীর সঙ্গে ঝগড়া করতে ছাড়ে না।

ছোট এক টুকরো মিস্রির ডেলা একটা ছেলে মুখে পুরে দিলে, তাও মুদীর দৃষ্টি এড়ালো না। মুদী অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে হাতের নড়ি আছড়ে ওকে গঙ্গার ঘাটে থুয়ে আস্‌তে লাগল। অন্য যারা দাঁড়িয়েছিল তারা মুখে মুখে মুদীকে খুব উৎসাহ দিয়ে উত্তেজিত ক'রে তুললে। মুদী বেচারী একবার মাচার এ-কোণ আবার ও-কোণ ছুটোছুটি ক'রে ছেলেটাকে নাগালে পায় না। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে যত উৎসাহ দিলে হাতে তত কাজ সারলে। কেউ এক মুঠো সুজি, কেউ এক ডেলা মিস্রি, এমনি সব, খয়ের সুপুরী ডাল, যে যার গামছার খুঁটে বেঁধে কোমরের সঙ্গে সেখানা চটপট এমন জড়িয়ে নিলে যে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। দৌড়োদৌড়ি ক'রে মুদীর হাঁফ ধরে গেল। চৌকিটার উপর উঠে ব'সে ও ফোঁস ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। শেষে কেনাবেচায় মন দিতে হয়। যে চার পয়সার জিনিষ নিলে সে দিলে একটা পয়সা। কারণ মুদীর হুকুম—ওর অনেক বাকী পড়ে গেছে, আর শুধু হাতে জিনিষ নেওয়া চলবে না। নেপেন চাটুজ্জের মেয়ে তেল নিতে এসেছে। ওর বাবা সদরের মুহুরী, দু-পয়সা পায়।

মেয়ে বল্‌লে,—মুদীজ্যাঠা, আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, বাবা টাকা দিয়েছে জমা ক'রে নাও শিগ্‌গীর, আর আমায় রসিদ দাও।

মুহুরীর মেয়ে সে, ভারি চালাকচতুর।

মুদী লাফিয়ে এসে তার আঁচলের গ্রন্থি খুলে টাকা ক'টা গুণে বাজিয়ে নিল। দু-মুঠো বাতাসা তার কাপড়ের খুটে বেঁধে দিয়ে বললে,—কি করব মা, দেখছিস ত বুড়ো হয়েছি, একটু চলাফেরা করলেই হাঁফিয়ে যাই, তার ওপর ঐ আবাগের ব্যাটা বেজোর ছাবালটা একেবারে চরকিপাক ঘুরোলে, দেখলে ত মা।

মুদীর একান্ত বিশ্বাস এই নেপেন চক্কোত্তির উপর। সে একটা পয়সাও কোনদিন মারবার চেষ্টা করে না।

তেলের বোতলটায় তেল ভর্ত্তি ক'রে দিতে গিয়ে ওর হাতে গড়িয়ে পড়ল। মুদী সেটা গায়ে মাথায় মেখে নিলে। স্নানের সময় ওর আর নতুন ক'রে তেল মাখতে হয় না। সন্ধ্যার পরেও যদি হাতে তেল লেগে যায়, তক্ষুনি সেটা গায়ে মেখে ফেলে,—তাতে মশা কামড়াতে পারে না। কারণ মশা গায়ে বস্‌বামাত্র তেলে পা আটকে যায়। তখন সে হুল ফুটোবার চেয়ে নিজের মুক্তির জন্যে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রক্তশোষণ আর

হয় না, প্রাণপণে পাখা নেড়ে যুঁ-যুঁ-যুঁ ক'রে কাঁদে। মুদী হাসিমুখে মজা দেখে।

অনেকটা বেলা হ'লে ও দোকানের বাইরে এসে আকাশের পানে তাকিয়ে বেলা অনুমান করে। সূর্য্যের দিকে একবার মাত্র চেয়ে নিয়ে ও যা সময় বলে, ঘড়ির সঙ্গে তার ঠিক মিল হ'য়ে যায়। বেলা একটায় ও দোকানে ধুনো গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে দোকান বন্ধ করে। গামছাটা কাঁধে ফেলে, নারকেল তেলের ভাঁড় থেকে একটু তেল নিয়ে মাথায় ঘসতে ঘসতে, ঝাঁপে চাবি লাগিয়ে চলে যায়। একেবারে মিত্তিরদের পুকুরে স্নান সেরে ঘরে খেতে আসে।

মুদী-বউ মুখ ভার ক'রে ভাত বেড়ে দেয়। মুদী গ্রাসের পর গ্রাস মুখে তুলে দিতে দিতে ভাবে দোকানের সত্যি উন্নতি হচ্ছে কি না। মনে মনে গত সন আর এ সনের বিক্রি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। কার কার কাছে কি কি পাওনা আছে, তার হিসেব করে। এই সব ভাবতে ভাবতে এত অন্যমনস্কভাবে খায় যে ভাত তরকারী পাতে প'ড়ে থাকে, কম ক'রে দিলেও আর চায় না। যা পায় নির্ব্বিবাদে তাই খেয়ে উঠে পড়ে। তরকারীতে বেশী ঝাল দিলেও কথা কয় না, নুন কম হ'লেও চায় না। মুদী-বউ প্রাণপণে তরি-তর-কারী ভাল ক'রে রাঁধে, কিন্তু এক দিনের জন্যেও মুদীর মুখ থেকে একটা তৃপ্তির কথা শোনে নি। বউয়ের সঙ্গে কোন কথাই ওর কওয়া হয় না। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে মুদী-বউ ঠিক করেছে যে, গায়ে প'ড়ে কথা কইবার দরকার নেই। ছেলে মেয়ে বউ যেন ওর শত্রু। কেন যে, তাও মুদী-বউয়ের মাথায় আসে না—কোনদিনই ত একখানা গয়না কি কাপড়ের জন্যে আব্দার জানায় নি, না সে নিজে, না তার ছেলেমেয়ে। মুদী যা হাতে তুলে দিচ্ছে, তাই ত ওরা হাসিমুখে নিয়ে আসছে। লোকটার উপর ওর মাঝে মাঝে রাগও হয়, আবার ভয়ও করে। তাই হঠাৎ কিছু বলতেও সাহস হয় না।

ডিবে থেকে দু'টো পান তুলে নিয়ে মুদী তখুনি গামছা কাঁধে ফেলে তাগাদায় বেরোয়। বিশ্রাম করবার ওর সময় নেই। ছেঁড়া ছাতাটা আর একখানা হিসেবের খাতা বগলে চেপে ও গোয়াল-ঘরের দিকে এগোয়। গাধার আকারের একটা লালচে বেতো ঘোড়ার পিঠে চট ও কাঁথার গদি বেঁধে ও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘোরে ঋণের তাগাদায়।

মুদী-বউ দাওয়ার খুঁটি ধ'রে চেয়ে থাকে। কখনও বা একটা দীর্ঘশ্বাস আর কখনও বা বড় বড় ফোঁটার জল ওর চোখ ছাপিয়ে ঝরে পড়ে। এসব কথা ও কাউকে জানায় না। নিজের বেদনা বুকে চেপে রাখে। এমনি ক'রে বউয়ের দিন যায়।

বেলা তিনটেয় মুদী তাগাদা শেষ ক'রে ফেরে। আর বাড়ি যায় না, সোজা একেবারে দোকানে। তাগাদা থেকে ও পায় ধান চাল, চিঁড়ে গুড়, শাকসব্জী, এমনি সব জিনিষ। চাল চিঁড়ে গুড় এ সব মুদী দোকানে রাখে বিক্রি করবার জন্যে। বাকী সব মুদীর মেয়ে বিকেলে এসে ঘোড়া-সুদ্ধ নিয়ে যায়, ঘরখরচের কাজে লাগে। তাগাদায় মুদী পয়সা বড় একটা পায় না। কাজেই হিসেবের খাতায় ত আর থোড় মোচা জমা হ'তে পারে না, কাজেই যে-ঋণ সে-ঋণই থেকে যায়, লাভের মধ্যে মুদীর খাইখরচটা বেঁচে যায়। তবে যে-ব্যাটারা নেহাৎ চামার তারা মুদীর সঙ্গে ঝগড়া করে। বলে,—কেন খুড়ো, ঐ মোচাটা বাজারে বেচলি পরে নিছক দুডো পয়সা হোতুনি। তাই জমা করে নাও!

মুদী চোখ কপালে তুলে বলে,—বলিস্ কি রে; ঐ মোচাটা দু-পয়সায় বিকোতো! ভাল, তোর মোচা আমি ফেরত দেব। আধ পয়সা দিলেও কেউ নেয় না যে রে! চাষা হেসে বলে,—খুড়ো, মোচা ফিরোবে কেমনে, সে ত খেয়ে ফেলেচো। না না আধলা-টাধলা নয় তুমি একডা পয়সা জমা করে নিও। আর একডা পয়সা তোমায় না হয় খাতি দিলুম।

এমনি ক'রে মুদী আদায়ও করে যত অপরের ঋণও ততই কমে না; মুদীর খাতা ভর্ত্তি হয়। পুরোনো খাতা ছেড়ে নূতনে হিসেব ওঠে, হালখাতার দিনে।

সন্ধ্যার সময় মুদী চৌকো একটা কাঁচের লণ্ঠনের মধ্যে কেরোসিনের আলো জ্বালে। তারপর ধুনো গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে ধুনুচি হাতে একটা তক্তার উপর গণেশের

মূর্ত্তির সুমুখে এসে দাঁড়ায়। ধুনুচিটা সেখানে নামিয়ে রেখে ও দু-হাত এক ক'রে চোখ বুজে গণেশের সুমুখে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে। তারপর এসে চৌকিতে ব'সে এক ছিলিম তামাক খায়। এই সময়টা ওর একটু তাড়া-হুড়োয় কাটে। সন্ধ্যার সময়ে কাজ থেকে ঘরে ফেরবার পথে সকলেই কেনা-কাটা ক'রে নিয়ে যায় তাই। মাত্র ঘণ্টা-খানেক, তারপর সব ঠাণ্ডা। মুদী শ্রান্ত হয়ে পড়ে। জিনিষ ওজন করা, পয়সার হিসেব, ধারের হিসেব লেখা একহাতে সব ক'রে উঠতে ওর দম বেরিয়ে আসে। উঠে ঘটির জলে মুখ হাত পা ধুয়ে, হাঁড়ির ঢাকা খুলে খানকয়েক বাতাসা আলগোছা মুখে ফেলে দেয়। তারপর একঘটি জল পান করে তবে যেন বুকে জোর পায়। দু-টুকরো কাটা সুপারি গামলা থেকে তুলে মুখে দিয়ে তামাক সাজতে বসে। তামাকের হাতটা ধুতে-না-ধুতেই সব একে একে আসতে আরম্ভ করে। এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে নানা সঙ্গীরা সব এই সময়টুকু একটু গল্প-গাছা করবার জন্যে মুদী-খুড়োর ঝাঁপের পাশে এসে বসে। দিনান্তে পাঁচজনের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা না কইতে পেলে মুদীরও প্রাণ বাঁচে না। তাই এই সময়ের তামাকের খরচটা অন্যায় ব'লে ও কোন দিন মনে করে না। খরচও খুব বেশী নয়। দা-কাটা তামাক ও নিজে হাতেই তৈরি ক'রে নেয়। এই সময়টা ওদের কোন দিন গীতাপাঠ হয়, নইলে রামায়ণ মহাভারত, কি বটতলার উপন্যাস, আর তা নইলে দেশ-বিদেশের গল্প। ওদের মধ্যে মুদীই হ'ল জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে এবং অভিজ্ঞতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কাজেই ওর কথা সকলে বেদবাক্যের মত শ্রদ্ধা ক'রে শোনে।

গীতা নিয়ে মুদী অনেক ভেবেছে,—এইভাবে ও তার ব্যাখ্যা করে।—

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, না সঞ্জয়?

ওরা বলে,—শ্রীকৃষ্ণ।

কিন্তু মুদীর কাছে ধমক খেয়ে জিজ্ঞেসা করে,—তবে কে?

মুদী বলে,—এই যে, তোর মধ্যে দিয়ে ভগবান কাজ করাচ্ছেন ত? নানা রকম কাজ,—রায়েদের কাঁদি-সুদ্ধ কলাগাছগুলো তুই সেবারে কাটলি ত? তারপর মিথ্যে সাক্ষ্যি দিয়ে গেলি জেলে! তারপর দেখ, চাষ-আবাদ করছিস, ভাল মানুষ হয়ে গেছিস, বিয়ে-থা করেছিস—দিনরাত্তির হে হরি হে হরি করছিস্ ত?—কিন্তু এসব এতদিন ধ'রে তোকে সেই জগদীশ্বর করাচ্ছেন, তা বুঝতে পারিস্? তেমনি সঞ্জয় হ'লেন দেবতা। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে দেখ না যুদ্ধ করিয়ে ছারখার করিয়ে দিলেন, আবার ষোল হাজার গোপিনীর সঙ্গে বিয়ে পর্য্যন্ত দিয়ে দিলেন। অথচ দেখ, সেই শ্রীকৃষ্ণই কিনা সমস্ত গীতা বইখানা ভর্ত্তি ক'রে কেবল, হে সঞ্জয়, হে সঞ্জয় ক'রেই গেলেন। মিলিয়ে দেখ, তুই ঠিক তেমনি ক'রে হে হরি, হে মধুসূদন করিস কি না! ভাল ক'রে মন দিয়ে মিলিয়ে দেখ,—তোর যত কীর্ত্তিকলাপ, সবই আমরা জানি ত, কিন্তু যে-ভগবানকে তুই ডাকিস্ তাঁর কোন খবর তুই জেনেছিস্? তা কেউ পারে না! ঠিক তেমনি, শ্রীকৃষ্ণের যত কিছু লীলা সবই আমরা জানি ত, কিন্তু সঞ্জয়ের কিছু জানি কি? বল তোরা!

ওরা সবাই সভয়ে মাথা নেড়ে বলে,—না জানিনে।

মুদী আত্মগর্ব্বে স্ফীত হয়ে বলে,—কি ক'রে আর জানবি বল,—চিরটা কালই মুক্খু হয়ে রইলি বইত নয়!

ওরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, শ্রীকৃষ্ণ যদি ঠাকুর না হবে তাহ'লে সবাই পূজো ক'রে কেন?

মুদী বলে,—নয় কে বললে? ঠাকুর বইকি।

উদ্দেশ্যে একটা নমস্কার ক'রে বলে,—কিন্তু ছোট ঠাকুর, বড় হ'লেন সঞ্জয়। কেষ্টোর পূজো আমার শেষ হয়ে গেছে, এখন আমি সঞ্জয়ের পূজো করি। তেত্রিশ কোটি দেবতা, সকলকেই ত একে একে মানতে হবে, তোদের মত শুধু দু-দশ ঠাকুর আঁকড়ে সারা জীবনটা পড়ে থাকলে ত চলবে না।—এটাকে মুদীর একটা গবেষণা বলা যেতে পারে।

যে-দিন রামায়ণ পড়া হয় সে ত মুদীর পক্ষে একটা শুভদিন। রামায়ণ পড়তে পড়তে সমুদ্রের এবং সেতুবন্ধের জন্যে যে-সব পাথর এখনও সেখানে জমা করা পড়ে আছে তার বর্ণনা দেয়। ও স্বচক্ষে দেখে এসেচে কি না!—ছেলেবেলায় ও একবার

বাপের তহবিল ভেঙে নথা দিয়েছিল। অনেক ঘুরতে ঘুরতে ও গিয়ে পড়েছিল ওয়ালটেয়ার। ও এখানে পৌঁছে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কাঁড়ি কাঁড়ি পাথরের ঢিবি, সমুদ্রের নীল জল তার উপর মানুষগুলো এবং তাদের ভাষা। বহু পর্য্যালোচনা ক'রে ও স্থির করেছে, এরা নিশ্চয়ই তখনকার লোক এবং শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় সবই জানে। এদের সঙ্গে ওর আলাপ করবার বিশেষ আগ্রহ জন্মাল। কতভাবে কত প্রশ্ন ক'রে পাথর আর নীল জলের খবর পাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুর্ব্বোধ্য কড়্মড়ে ভাষায় ওর ধারণা নিশ্চিত হ'ল যে, এইখান থেকেই সেতুবন্ধ আরম্ভ হয়েছিল, কালে কালে ভেঙে চুরে এইমাত্র অবশিষ্ট আছে।—এই কথাটা যতই পুরনো হ'ত ততবার একটু ক'রে রঙ লাগিয়ে নিত। এমনি বহুদিন রঙ লাগাবার পর শোনা গেল যে, যে-মানুষদের ও সমুদ্রের ধারে দেখে এসেছে তারা কিচ্‌মিচ্‌ করে আর তাদের বিঘৎখানেক লেজও বর্ত্তমান। শ্রোতারা ভাবে গদগদ হয়ে মুদীকেই বার-বার প্রণাম ক'রে ফেলে। এমনি ক'রে রাত ন'টার গাড়ী যাওয়ার শব্দ শুন্‌তে না-পাওয়া পর্য্যন্ত ওদের আসর ভাঙ্‌ত না।

মুদী-বউ ছেলেমেয়েকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে, সে অনেকক্ষণ হ'ল। দাওয়ার অন্ধকারে পা ছড়িয়ে ব'সে সে ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি পায়ের উপর পেতে স'লতে পাকাচ্ছে। আর কত কি ভাবছে অন্ধকারের পানে চেয়ে। সলতে পাকানো ওর শেষ হয়ে যায় তবুও মুদী ফেরে না। বউ দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আকাশের তারাগুলোর পানে চেয়ে রইল। তারও কতক্ষণ পরে মুদী এল। বউ ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে জলের ঘটি এগিয়ে দিলে, গামছা হাতে তুলে দিলে, পিঁড়ে পেতে তার সুমুখে জল ছিটোলে; তারপর ভাত বেড়ে আনলে।

মুদী ভাত খেতে খেতেও ভাবছে, কত পয়সা জমল! কোন্ কোন্ জমি কিন্‌বে, কটা গরু কিন্‌বে। মনে মনে হিসেব করলে মেয়েটার বিয়েতে কত অবধি খরচ করবে, তাকে গৌরীদান করবে, না বেশী বয়সে বিয়ে দেবে। এমনি সব কত কি। কাজেই খাওয়ার সময়টা সম্পূর্ণ নিঃশব্দ।

বউও মুদীর এই রকম ভাবগতিক দেখে মনে মনে কষ্ট পেয়ে চুপ হয়ে গেছে। কোন কথাই সে নিজে থেকে কয় না।

খাওয়ার পরও মুদী তেমনি যন্ত্রের মত দুটো পান তুলে মুখে দিলে। তারপর ভুষোমাখা লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে, লাঠিটা বগলে চেপে ও আবার বেরিয়ে পড়ল। রাত্তিরটা ওকে দোকানেই শুতে হয়, নইলে জিনিসপত্র চুরি যাবার ভয়।

বউ পিছনে পিছনে এল, দরজা বন্ধ করতে। দরজার গায়ে গা রেখে ও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখলে মুদী চলে যাচ্ছে। এক একবার মনে হয়, ডাকি। কিন্তু ডাক আর কিছুতেই গলা দিয়ে বার হয় না। গাছের আড়াল থেকে আড়ালে যেতে যেতে শেষে মুদীর আলো আর দেখা যায় না। তবুও বউ ওইদিকে চেয়ে রইল। চোখ দিয়ে জলের ফোঁটা নাম্‌ল, কিন্তু ঝরে পড়ল না। গণ্ডের উপর স্থির হয়ে রইল, তাতে তারার আলো ঝিক্‌মিক্ করতে লাগল।

দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

জলধর সম্বর্দ্ধনা—

বাঁটরা পারিজাত সমাজের সাহিত্য সংসদের সংক্রান্তি মিলনের ১১৯ ও ১২০ সংখ্যক বৈঠকে সমাজের অন্যতম সম্মানিত সভ্য ও প্রবীণ সাহিত্যিক রায় জলধর সেন বাহাদুরের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ৩১এ চৈত্র, ১৩৩৮ (১৩ এপ্রেল) হাওড়া পঞ্চাননতলা রোডস্থ "দত্ত-ভিলায়" (সমাজ ভবনে) অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় "জলধর



জলধর-সম্বর্দ্ধনা

জয়ন্তী" উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই উৎসবের পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। হাওড়া ও কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজের পক্ষ হইতে সেন-মহাশয়কে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও গিরিজাকুমার বসু জলধর-প্রশস্তি পাঠ করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে জলধর-বাবু যথোচিত বিনয় সহকারে নিজের বক্তব্য বলেন। তার মধ্যে সকলের চেয়ে বড় কথা এই—

"এতদিন আমি সাহিত্যিকদের দাস-গিরি করিতেছি—তার জন্যে আমি খুব বড় উপাধি পেয়েছি—সেই উপাধি হ'চ্ছে "দাদা" উপাধি—এই স্নেহের উপাধি বহন ক'রে যাবার চাইতে কোন বড় সম্বর্দ্ধনা আছে কি-না আমি জানি না। তবে পারিজাত সমাজের এই ভালবাসা, এই অনুগ্রহ, যা' তাঁরা আমার ৭২ বৎসর পূর্ণ হওয়ার জন্য দেখালেন—সে সকল আমি পরপারে যাবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় ব'লেই মনে ক'রব।"

ইহার পর ভূপাল বাবুর আবৃত্তি, কালিপদ পাঠক মহাশয়ের সঙ্গীত, মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসকৌতুক, ও ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বেহালা-বাদ্য উৎসবটিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সর্ব্বশেষে রামানন্দ-বাবু অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

"সেন-মহাশয় অনেকদিন সাহিত্য চর্চ্চা ক'রছেন। যদিও আমার সম্পাদকী ৪০ বৎসরের উপর—আমি দেখতে প্রবীণ তথাপি সেন-মহাশয়ের চাইতে আমি ৫।৬ বছরের ছোট। উনি যখন লিখছেন তখন আমরা পাঠক। প্রথম 'হিমালয়' ভ্রমণে ওঁর চড়াই উতরাই দেখে আমাদেরও ঐ রকম adventure করবার ইচ্ছা হ'য়ে ছিল কিন্তু কার্য্যতঃ হ'য়ে ওঠে নি। সাহিত্যের আসরে নেমে উনি অনেক কিছু লিখেছেন। সেন-মহাশয় যা করেছেন সাহিত্যিক হিসাবে অনেকেই তাঁর মত কিছুই ক'রতে পারেন নি। আমার লেখার মধ্যে সকলেই জানেন, ঐ জীর্ণ সচিত্র প্রথম আর দ্বিতীয় ভাগ। আজ এই উৎসবে রসকৌতুকে প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগের পালাগান হ'য়ে গেছে। কালে হয়ত আমার ঐ সচিত্র প্রথম আর দ্বিতীয়ভাগের পালা গান রচনা হবে। সেন-মহাশয় তাঁর সরল হৃদয়ের পরিচয় গুণে "দাদা" ব'লে পরিচিত হ'য়ে আছেন—এই রকম সম্মান লাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? তিনি এই দাদা উপাধির জন্য যেরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন সেটি তাঁর হৃদয়ের পরিচয়। এই শ্রেষ্ঠ জিনিষ তিনি লাভ ক'রেছেন হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের জোরে—যা অনেক মানুষের ভেতর নেই। এই বিশেষত্বের জন্য তিনি সকলের প্রীতি ও সম্বর্দ্ধনার পাত্র। আমি যেমন পূর্ব্বে শিক্ষক ছিলেম সেন-মহাশয়ও তদ্রূপ ছিলেন। উনি কাগজ চালনা করছেন, আমিও ক'রছি, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির বিষয়ে তাঁর মত আমি কিছুই ক'রে উঠতে পারি নি।"

অসবর্ণ বিবাহ সভা—

গত ২৫এ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যার সময় কলিকাতা আর্য্য-সমাজ

মন্দিরে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা"। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বহু গণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ এম-এ, এবং শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আলোচনায় যোগদান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ জীবনের বহু অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁহার উত্থাপিত নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়—

১। "শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দু জাতিকে হ্রাস ও বিলোপ হইতে রক্ষা করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই সভা হিন্দুসমাজের মধ্যে নির্বাধায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের জন্য সমগ্র হিন্দু সমাজকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।"

২। "হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিবার জন্য একটি অস্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "প্রবাসী" সম্পাদক; সহ-সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, "সঞ্জীবনী" সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বসু, এম, এস, সি; সম্পাদক—ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বসু এম, বি; সহ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল।

এই অসবর্ণ বিবাহ সমিতির কার্য্যালয়, ৩৮ নং বিডন রো, কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে।

বোধনা সমিতি—

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কলিকাতা ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট-মহাশয় একটি সমিতি গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অপরিণত মনোবৃত্তিবিশিষ্ট বালক-বালিকাগণকে উপযুক্ত শিক্ষক, সেবিকা ও শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে আশ্রমে রাখিয়া ইঁহাদের মানসিক ও দৈহিক সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার 'বোধনা-সমিতি' নামকরণ করিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের সুপ্ত চেতনার উদ্বোধনই বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় এই নামটি সার্থক হইয়াছে। বোধনা-সমিতি ১৮৬০ সনের ২১শ আইন অনুযায়ী রেজিষ্টারি করা হইবে। সমিতির আপিস ভবানীপুর ৬।৫, বিজয় মুখার্জ্জী লেনে স্থিত। গিরিজাবাবু ইহার সম্পাদক। তাঁহার সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিলে ইহার সম্বন্ধে সম্যক জানা যাইবে। নিম্নের ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ লইয়া পরিচালক সমিতি গঠিত হইয়াছে,—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; সহঃ সভাপতি—ডাঃ এ্ডিন ঘোষ, এম্-বি, ডাঃ কে-এস্ রায়, এম্-এ, বি-এস্‌সি, এম্-বি, পি-এইচ-ডি (এডিন), এবং ডাঃ বি-সি ঘোষ, এম্-এ, এম্ এ, বি-সি (কাণ্টাব); সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত অটলচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ—মূক ও বধির বিদ্যালয়, শ্রীমতী সীতা দেবী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)।

সুনীতি সঙ্ঘ—

অসৎ সাহিত্য, এবং মনের বৈকল্য উপস্থিত হইতে পারে এরূপ নৃত্য, অভিনয়, বায়স্কোপাদির প্রচার বন্ধ করিবার জন্য কলিকাতার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সুনীতি সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলা লইয়া এই সঙ্ঘের একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়াছে,—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; সহঃ সভাপতি—শ্রীমতী কামিনী রায়, রায় বাহাদুর জলধর সেন, মৌলবী মুজিবর রহমান, শ্রীযুক্ত জে-কে বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র; শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ইহার যুগ্ম সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সহঃ সম্পাদক। সঙ্ঘের ঠিকানা—৬ রামকৃষ্ণ দাস লেন, কলিকাতা।

সুনীতি সঙ্ঘের এই সাধু প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক ইহাই একান্ত কামনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা পরীক্ষায় মহিলাগণের কৃতিত্ব—

ইডেন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হইতে এ বৎসর ১৩ জন ছাত্রী পাশ করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, পরীক্ষায় ৪ জন ছাত্রী এ বৎসর পাশ করিয়াছেন।

কুমারী করুণাকণা গুপ্তা ইতিহাসের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কুমারী অশোকা সেন সংস্কৃত অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান লাভ করিয়াছেন।

কুমারী সুলেখা সেন এবং শ্রীযুক্ত সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী সাধারণ ভাবে বি-এ, পাশ করিয়াছেন।

বাঙালী মেয়ের কৃতিত্ব—

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কুমারী রমলা দে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বিধবা-বিবাহ—

ঢাকার দিঘলী-নিবাসী শ্রীযুত জানকীনাথ বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শিবপ্রসাদের কন্যা শ্রীযুত যদুনাথ বসুর সহিত কোতলী-নিবাসী শ্রীযুত শ্যামলাল পালের বিধবা কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যের শুভবিবাহ গত ১৯এ বৈশাখ সোমবার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিবাহ তাজপুর (বিক্রমপুর) নিবাসী শ্রীযুত রজনীমোহন ও রাধাপ্রভু সরকার মহাশয়দের বাড়িতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে; শ্রীযুত শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় পুরোহিতের কাজ করিয়াছিলেন। আবিরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ নন্দী মহাশয় কন্যা সম্প্রদান করেন। বিবাহে স্থানীয় এবং লৌহজঙ্গের অনেক বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন। লৌহজঙ্গের তিনি সমাজে বিধবাবিবাহ এই প্রথম।

বাঙালীর কারাবরণ—

প্রকাশ, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গত জানুয়ারি হইতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বাংলা দেশে ৯,৫৩৩ জন নরনারী কারাবরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী আছেন ৫,৩২২ জন। কলিকাতায় ৮৫২ জন ছাত্র-ছাত্রী ধৃত হইয়াছেন।

বিদেশ

লণ্ডন বাংলা সাহিত্য সম্মিলনী—

গত ১৯২১ সনে লণ্ডনে বাংলা সাহিত্য সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কিছুকাল পরে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার অভাবে উহা লুপ্ত হইয়া যায়। পরে ১৯২৮ ইংরেজীর ১৮ই মার্চ্চ গাওয়ার ষ্ট্রীট ছাত্রাবাসে



লণ্ডনে বাংলা সাহিত্য সম্মিলনের সভ্যবৃন্দ

শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল গুপ্ত মহাশয়কে সভাপতি করিয়া বাংলা সাহিত্য সম্মিলনীকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

সম্মিলনীর উদ্দেশ্য বঙ্গভাষাভাষী ভারতীয়দের জন্য বাংলায় বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার এবং প্রাঞ্জল ভাবে কথা বলিবার উৎসাহ দান এবং সুযোগ বিধান। এই সম্মিলনীতে প্রাদেশিকতা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

গোড়ায় সম্মিলনীর প্রায় অধিবেশনই ১১২নং গাওয়ার ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত হইত। নানা কারণে সম্মিলনী সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্টস্ সেন্ট্রাল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার পর সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ একটি স্থায়ী জায়গা পায়। সেখানে ইহার প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৩০ সনের ২৯এ জুন।

উৎসাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে সম্মিলনীর কার্য্য বিস্তার লাভ করিয়াছে। সম্মিলনীর অন্তর্ভুক্ত দুইটি শাখা সমিতি আছে—পরিভ্রমণ সমিতি ও উৎসব সমিতি। বাংলা সমিতির উদ্যোগে একটি বাংলা পুস্তকের গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে—ইতিমধ্যে প্রায় এক শত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

সম্মিলনী এই পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। গত চার বৎসর ইহার উদ্যোগে নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। পরিভ্রমণ সমিতির উদ্যোগে নানা জায়গায় ভ্রমণের ব্যবস্থা ও উৎসব সমিতির উদ্যোগে মুক্তধারা, বিরিঞ্চিবাবা, আনন্দমঠ ও বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয় ও কয়েকবার প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা হয়।

প্রতি বৎসর অন্তে সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়।

গত জুন মাসে সম্মিলনীর উদ্যোগে আনন্দমঠ ও বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হয়। অক্টোবর মাসে মহা সমারোহে বিজয়ার প্রীতি মিলনোৎসব সম্পন্ন হয়। গত ডিসেম্বরে বাংলার নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়কে লইয়া একটি প্রীতি ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

গত বৎসরে সম্মিলনীর উদ্যোগে পনরটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে নানা বিষয়ে আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ, সদ্যবক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়।

সম্মিলনীর চতুর্থ জন্মোৎসবে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভ্যগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা রায়, শ্রীযুক্তা চৌধুরাণী পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া, শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ সরকার ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল শিকদার বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া এবং শ্রীযুক্ত রণজিৎ সেন গানের ব্যবস্থা করিয়া উৎসবের অঙ্গ পূর্ণ করিয়াছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা অংশে ভারতবাসীর সংখ্যা—

	লোকসংখ্যা সেন্সাসের	বৎসর
সিংহল	৯৫৯০০০	১৯২৯
বৃটিশ মালয়	৭০০০০০	১৯২৯
হংকং	২৫৫৫	১৯১১
মরিসাস্	২৮১০২৫	১৯২৮
সিসিলিস্	৩৩২	১৯১১
জিব্রাল্টার	৫০	১৯২০
নাইগেরিয়া	১০০	১৯২০
কেনিয়া	২৬৭৫৯	১৯২০
উগণ্ডা	১ ৬১৩	১৯২৬
নিয়াসাল্যাণ্ড	৫১৫	১৯২১
জাঞ্জিবার	১২৮৪১	১৯২১
টাঙ্গানিইকা	১৮৪৮৩	১৯২৭
জামাইকা	১৭৬৭১	১৯২৮
ট্রিনিডাড	১৩০০৪২	১৯২৯
বৃটিশ গায়ানা	১২৮২০৯	১৯২৯
ফিজিদ্বীপপুঞ্জ	৬৮৭৩৩১	১৯২১
বাসুটোল্যাণ্ড	১৮৬	১৯১১
রোডেসিয়া	১৩০৬ (এসিয়াবাসী)	১৯২১
ক্যানাডা	১২০০	১৯২১
অষ্ট্রেলেসিয়া	২৬০৬	১৯২১
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৬১৩৩৯	১৯২১
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৩১৭৫ (এসিয়াবাসী*)	১৯১৬
ম্যাডাগাস্কার	৫০৭২	১৯১৭
রিইউনিয়ন	২১৯৪	১৯২১
ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া	৩০,০০০	১৯২০
সুরিনাম	৩৪৯৫৭	১৯২০
মোজাম্বিক্	১১০০ (এসিয়াবাসী)	১৯২২
পারস্য	৩৮২৭	১৯২২

* এই অঙ্ক ঠিক নহে, কারণ ভারতীয় গদর দলেই ৩০০০ জন সভ্য আছে।

ভারতবর্ষ

দান—

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী সার দোরাব টাটা তিন কোটি টাকার সম্পত্তি দাতব্য কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ, পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সকল লোক দৈব-দুর্ব্বিপাকে পতিত হইবে, তাহাদিগকে এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-সমূহকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল প্রকারে সাহায্য করা এই দানের উদ্দেশ্য। আরও প্রকাশ যে ঐ তিন কোটি টাকা ব্যতীত সার দোরাব পৃথিবীর যে-কোন স্থানে অনারোগ্য ব্যাধিসমূহ সম্পর্কে গবেষণাবৃত্তির জন্য আরও পঁচিশ লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন।

ডাক-বিভাগে সরকারের ক্ষতি—

ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের ১৯৩০-৩১ সনের রিপোর্টে প্রকাশ, এই বৎসর এই বিভাগে গবর্ণমেণ্টের মোট ৬২ লক্ষ ৯ হাজার ৫১২ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনে এই বিভাগে গবর্ণমেণ্টের ৫১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩১১ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল।

ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন—

বিগত জানুয়ারী হইতে ২০এ এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারত সরকার ৮০ হাজারের উপর লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৫,৩২৫ জন মহিলা আছেন। বর্ত্তমান আন্দোলনে এই পর্য্যন্ত মোট ১৬৩টি সংবাদ পত্র ও ছাপাখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

২

অজয় পলাইতেছে।

জীবনে আরও অনেকবার সে পলাইয়াছে, কিন্তু আজিকার যে ভয়াবহতা সে-রকম কিছুর সঙ্গে এই চতুর্ব্বিংশ বৎসরের জীবনে ইতিপূর্ব্বে তাহার আর পরিচয় হয় নাই।

সে পলাইতেছে, কিন্তু তাহার অন্তরে মাধুর্য্যের স্পর্শ। নিশান্ধকার, মেঘহীন আকাশে অগণিত নক্ষত্রের স্পন্দন, নদীতীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ নির্জ্জন প্রান্তরের কুয়াসা-মণ্ডিত নিস্তব্ধতা, সবকিছু যেন কোন্ জন্মান্তর-পরিচয়ের ভাষায় তাহার সঙ্গে আজ কথা কহিতেছে। সে-ভাষা সে বুঝিতেছে না, কিন্তু তাহার হৃদয় সাড়া দিতেছে।

আজিকার এই মধুর ভয়াবহতার পশ্চাতে এক রূপসী অজ্ঞাতকুলশীলা তরুণী। সে যে সত্যই রূপসী অজয় তাহা নিশ্চয় করিয়া জানে না, কেন-না রাত্রির অন্ধকারেই তাহার সঙ্গে অজয়ের আজ অস্ফুট দৃষ্টিবিনিময় হইয়াছে এবং তারপর হইতে অন্ধকার ভাল করিয়া আর কাটে নাই। কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তর বলিতেছে, তরুণীর রূপের তুলনা নাই। শেষরাত্রির দিকে চাঁদ উঠিলে জ্যোৎস্নালোকে চাহিয়া অপরিচিতার মুখখানি

কেমন তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে, এই আশা প্রথম হইতেই তাহার মনে ছিল, কিন্তু চাঁদ উঠিতে বহু বিলম্ব আছে বুঝিতে পারিয়া সে আর ততক্ষণ অপেক্ষা করে নাই। একসার তোরঙ্গ স্টকেস খাবারের-টিন ও হাঁড়িপুঁটুলির প্রাচীরের ও-পারে অপরিচিতা অস্পষ্টতার পায়ে তাহার তরুণ-মনের পূজা-নিবেদন প্রায় উজাড় করিয়াই ঢালিয়া দিয়াছে।

জাহাজে যতক্ষণ আসিতেছিল, একবার ভুলেও ভাবে নাই যে, মাধুর্য্যের অবলম্বন তাহার এত কাছাকাছি কোথাও কিছু আছে। বাড়ী ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব্বে বিলাত যাওয়া সম্পর্কে দুই দিন ধরিয়া বাবার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করিয়া তাহার মন তিক্তবিরক্ত হইয়াছিল, এমন অবস্থা তাহার ছিল না যে চতুষ্পার্শে বিস্তৃত পল্লীপ্রকৃতির অজস্র অকুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্য হইতে কণামাত্র নিজের মনের জন্য আহরণ করিতে পারে। কিন্তু কোন্ অপরিচিত রহস্যলোক হইতে এই যে সৌন্দর্য্যের-দূত আজ তাহার হৃদয়ে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, এ ত বাহিরে দাঁড়াইয়া অনুমতির অপেক্ষা করে নাই, নিজের অধিকারকে প্রচার করিবার সঙ্গেসঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে।

আর-কিছু ভাবিতে ইচ্ছা করিতেছে না, তবু বিগত-সন্ধ্যার সেই মহা-উত্তেজনার মুহূর্ত্ত-ক'টা পলায়নপর অজয়ের মনে পড়িয়া গেল।...জাহাজের গতিবেগের স্পন্দনের সঙ্গে শিরায় শোণিত-স্রোতের স্পন্দন অলক্ষ্যে কখন সমতালে মিশিয়া গিয়াছে।...সহসা কোথাও-কিছু-নাই, প্রচণ্ড একটা ধাক্কা, সেইসঙ্গে জাহাজের গতি এবং শিরাতে রক্তগতি সমস্বরে একটা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া যেন আছড়াইয়া পড়িয়া থামিয়া গেল। তারপর বহুকণ্ঠের চীৎকার-চেঁচামেচি, "দুর্গে দুর্গতিনাশিনি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনি,"...শিশুদের ক্রন্দন, নারীদের কোলাহল। ভয়ার্ত্ত যাত্রীদের ক্ষিপ্ত চাঞ্চল্যকে কতকটা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে দোতলার ডেক হইতে একতলায় নামিবার সব-ক'টা সিঁড়িকে খালাসীরা কাছি জড়াইয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তারপর নিজেরা সারেঙের উচ্চকণ্ঠের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কখনও একতলায় কখনও দোতলায়, কখনও বা দোতলার ছাতে, কাছি-রেলিং-রেলিঙের-থাম বাহিয়া, লাফাইয়া, ঝুলিয়া, দ্রুতগতিতে ছুটিয়া ছিটকাইয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে স্ত্রীপুরুষ-শিশুবৃদ্ধ যে-ই পড়িতেছে তাহাকে কঠোরহস্তে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিতেছে।

অজয়ের গলার কাছটা শুকাইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সহজেই সমস্তকিছু হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া নির্লিপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্কেত ছেলেবেলা হইতে তাহার আয়ত্ত ছিল বলিয়া কিছুই তাহার চোখ এড়াইয়া যাইতেছিল না। যে স্থূলদেহ প্রৌঢ়টিকে পরে সে তরুণীর সহযাত্রী বলিয়া বুঝিয়াছে তিনি অতি কাতরস্বরে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে সারেঙের পিছন পিছন ঘুরিতেছিলেন, বারবার তাহার পথে পড়িয়া তাহার কাছে তাড়া খাইতেছিলেন, তবু তাহার সঙ্গ ছাড়িতেছিলেন না। তরুণীর সহযাত্রিণী রূপবতী মহিলাটিকে সে পলকের মত একবার প্রথমশ্রেণীর ডেকের রেলিঙের কাছে দেখিয়াছিল, মনে পড়িতেছে। তরুণী তখন কি করিতেছিল, কে জানে? এমন আকস্মিক একটা দুর্ঘটনাও কি এক মুহূর্ত্ত তাহাকে চঞ্চল করে নাই? কি ঘটিয়াছে সংবাদ লইবার জন্যও ত সে একবার বাহিরে আসিতে পারিত। তখন প্রচুর আলো ছিল, তাহার মুখখানি কেমন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ততার মধ্যেও পলকের মত অজয় তাহা হইলে দেখিয়া লইতে পারিত।

মজ্জিত বালুচরে ঠেকিয়া জাহাজ প্রায় উল্‌টিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। যাত্রীদের বহুভাগ্যবলে মারাত্মক ক্ষতি কিছু হয় নাই, কেবল বিপরীত পথযাত্রী আর-একটা জাহাজের কয়েকঘণ্টাব্যাপী টানাটানির ফলে বালুচর ছাড়িয়া সে যখন গভীরতর জলে নামিয়া আসিল তখন দেখা গেল একদিক্‌কার চাকা দুমড়াইয়া ভাঙিয়া সে-যাত্রার মত সে প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া কলকব্জাও কোথাও কোথাও বিগ্‌ড়াইয়াছে। নিকটতম ষ্টেশন পর্য্যন্ত কোনোগতিকে জল কাটিয়া আসিয়া যাত্রীদের সে নামাইয়া দিয়া গেল, তারপর কাৎ-হইয়া-পড়া বিপুলাকার দেহটাকে টানিয়া

লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অতি সন্তর্পণে খিদিরপুরের দিকে প্রস্থান করিল।

নদীতীরে খোলা আকাশের নীচে বিচিত্রবর্ণের সতরঞ্চের উপর শাদা ধবধবে চাদর বিছাইয়া উত্তেজনা-ক্লান্ত দেহমনকে বিশ্রাম দিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় অদূরবর্ত্তিনী সেই সুন্দরী অপরিচিতা অষ্টাদশী প্রথম অজয়ের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। মাঝখানে মাত্র কয়েক-হাত জমি এবং কতকগুলি স্তূপাকার জিনিষপত্রের প্রাচীরের ব্যবধান। অজয়ের দুর্ব্বল অপরিণত দেহে সে সাধ্য ছিল না যে, গুরুভার ট্রাঙ্ক্-স্যুটকেস্ ইত্যাদি টানাটানি করিয়া সেখান হইতে সরিয়া যাইতে পারে। অত রাত্রিতে সেই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটিতে মুটের সাহায্যও মিলিত না। অগত্যা খালাসীরা যেখানে তাহার স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে অদৃষ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সেইখানেই সে রহিয়া গেল। জিনিষপত্র সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া বিছানাটা লইয়া সরিয়া যাওয়া যাইত, কিন্তু কি-কারণে সে-কথা তখন তাহার মনে হয় নাই।

ঘুমাইবার চেষ্টা সে সত্যসত্যই করিয়াছিল; কিন্তু অপরিচিত স্থানে অনভ্যস্ত আবেষ্টনের মধ্যে সহজে চোখে ঘুম আসে না। তাহার শিয়রের দিকে কয়েক গজ দূরে অপরিচিতার সহযাত্রী স্থূলদেহ সেই প্রৌঢ় নিশ্চিন্ত আরামে নাসিকাধ্বনি করিতে করিতে নিদ্রা যাইতে-ছিলেন। সেদিক্‌কার বহুক্রোশব্যাপী সমতলতার মধ্যে তাঁহার শরীরের স্তূপটি যেন একটি বিশিষ্ট বিপুলতা অর্জ্জন করিয়াছিল। কেন যে অনেকক্ষণ সেদিক্ হইতে সে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না, জানে না।—অপরদিকে তরুণীর সহযাত্রিণী গায়ে মাথায় কাপড় চাপা দিয়া তরুণীর পাশেই জড়সড় হইয়া পড়িয়া ছিলেন। আশেপাশে অন্য যাত্রীরা দলে দলে নিদ্রা যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে নারীও অনেক ছিলেন। কেবল সেই তরুণী একাকী দুই জানুর মাঝখানে মাথা গুঁজিয়া নিঃস্পন্দ হইয়া জাগিয়া বসিয়া ছিল। সেদিকে চাহিতে অজয়ের সঙ্কোচের অবধি ছিল না, কিন্তু ভাল করিয়া না চাহিয়াও সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, অবারিত আকাশের নীচে অপরিচিত-সমাবেশের মধ্যে নিদ্রার অতি-অন্তরঙ্গতার আরাধনা করিতে তরুণীর লজ্জায় বাধিতেছে। এমন অবস্থায় পড়িলে বাংলার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরাই পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্রের আশ্রয়ে সম্ভ্রমরক্ষা করিয়া অকাতরে নিদ্রা গিয়া থাকেন, তাই অপরিচিতার আজিকার এই বিশিষ্ট আচরণ তাহার প্রতি অজয়ের মনে অনেকখানি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিল। তরুণী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিবে আর সে পাশে পড়িয়া ঘুমাইবে ইহা তাহার কেমন যেন সম্ভব মনে হইল না। সে না-ঘুমাইলে তরুণীর নিশাজাগরণের ক্লেশের কিছুমাত্র লাঘব হইবে না জানিয়াও সে সমস্ত রাত জাগিয়াই কাটাইবে স্থির করিল। পাছে অনবধানতায় নিদ্রাকর্ষণ হয় এই ভয়ে একবার বালিশের ভর ছাড়িয়া বিছানার উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তরুণী অকস্মাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইলে না-জানি কি মনে করিবে ইহা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আবার শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

তন্দ্রাঘন নিশান্ধকারে কি জাদু আছে, তাহার স্পর্শ দুঃসাহসের গায় আসিয়া লাগে, তারপর তাহাকে আর দুঃসাহস বলিয়া চেনা যায় না। অন্ধকার রাত্রির আশ্রয়ে অজয়েরও ক্রমে সাহস বাড়িয়া চলিল। বালিশে মাথা রাখিয়া তরুণীকে সে দেখিতেছে। একটি চোখের অপলক দৃষ্টি ভরিয়া দেখিতেছে।

তারকাখচিত অসীম আকাশের গায়ে অন্ধকারের রঙে আঁকা একখানি কবরী। তরুণীর দুইখানি ক্ষীণ হস্তের সযত্ন কেশ-রচনা। আকাশ যেন অপরিসীম আদরে ইহাকে আজ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই কবরীটিরই শোভাবর্দ্ধনের জন্য সে যেন আজ ইহাকে নক্ষত্রের মণি গাঁথিয়া ঘিরিয়াছে। একটি শুভ্র পেলব হস্তের একগাছি কঙ্কণের উপর পড়িয়া অস্ফুট একটু তারার আলো পরম কৃতার্থতার গৌরবে হাসিয়া উঠিতেছিল; অজয়ের মনে হইতেছিল, তাহার জানা ও অজানা পৃথিবীতে এ মাধুর্য্যের কোথাও যেন আর তুলনা নাই। যেন একাধারে স্বর্গিমসুধা, জ্যোতিঃ এবং ঝঙ্কার। অজয়ের পক্ষ হইয়া বলা আবশ্যক যে সে লুকাইয়া কবিতা

লিখিয়া থাকে। তদুপরি তাহার এই চতুর্ব্বিংশ বৎসরের জীবনে কোনও নিঃসম্পর্কিতা তরুণীর এতখানি নিকট সান্নিধ্য ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সে লাভ করে নাই। আশৈশব যে-সমাজে সে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা শোভা-সম্পদহীন পুরুষের সমাজ, লক্ষ্মীস্বরূপিণী নারীরা সেখানে অন্তরালবর্ত্তিনী ; সে শৈশবে মাতৃহীন, বৃদ্ধ পিতার একমাত্র পুত্র। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইবার পর নিজের দূর ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গিনীরূপে সে একটি বিদ্যুৎবর্ণা যূথিকাপেলবা ক্ষীণাঙ্গিনী বালিকামূর্ত্তি কল্পনা করিত মাত্র ; কখনও তাহার অপরিমিত কেশরাজি বেণীবদ্ধ হইয়া পিঠে দুলিত, কখনও বা বর্ষার মেঘাড়ম্বরের মত গ্রীবামূল ছাইয়া অসম্বদ্ধ ভাবে বিরাজ করিত। আজ সহসা অদৃষ্টপূর্ব্বা অষ্টাদশীর বিশিষ্ট কবরীরচনা তাহার পূর্ব্বেকার সেই সৌন্দর্য্যস্বপ্নগুলির জগতে বিষম একটা বিপ্লব বাধাইয়া দিল। যে বিপ্লবের আরম্ভ এমন মোহময় তাহার শেষ কোথায় জানিবার জন্য তাহার আগ্রহের আর সীমা রহিল না।

কিন্তু রাত্রি যতই বহিয়া চলিল সুপ্তিব্যাপ্ত রহস্যময় অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে এই অপরিচিতার এমন একান্ত সান্নিধ্যে ক্রমেই বেশী করিয়া সে নিজেকে বিপন্নও বোধ করিতে লাগিল। অকারণেই ক্রমাগত তাহার মনে হইতে লাগিল, তরুণী যদিও একবারও মুখ তুলিয়া চাহে নাই, অজয় যে জাগিয়া আছে তাহা সে নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিতেছে ; কি সে মনে করিতেছে? ইংরেজীতে যে বস্তুকে শিভাল্‌রি বলা হয়, বাংলা দেশের কোনও তরুণী কোনও অপরিচিত তরুণের নিকট হইতে তাহা প্রত্যাশা করে না, প্রত্যাশা যে করিতে হয় তাহাও জানে না। অজয় যে তাহার প্রতি একমাত্র সহানুভূতি বশতঃই ঘুমাইতে পারে নাই, ইহা কি একবারও তাহার মনে হইবে? সেই সঙ্গে ইহাও সে ভাবিল যে, এতক্ষণ ধরিয়া এই মেয়েটির সম্বন্ধে মনে মনে সে যাহা অনুভব করিয়াছে তাহা সহানুভূতিই ত কেবল নহে। কিন্তু সে যে কিছু অপরাধ করিতেছে কোনও অচিন্তিত কারণে ইহাও সে মনে করিতে পারিল না। বাহিরে যাহাকে অপরাধ বলিয়া জানি, মনের মধ্যে সে যখন মনোহরণ রূপ লইয়া দেখা দেয় তখন তাহার মার্জ্জনাপত্র সে সঙ্গে লইয়াই আসে। অজয়ের আবাল্য-সঞ্চিত সমস্ত সংস্কারের শাসনকে হার মানাইয়া দিতে পারে তরুণীর সম্বন্ধে তাহার মনোভাবের মধ্যে সেই অপরিমেয় মোহময়তা ছিল।

কিন্তু যাহা অননুশোচনায় করা যায় তাহাই অসঙ্কোচে করিবার সামর্থ্য সকলের থাকে না। তরুণী কিছুই বুঝিতেছে না, বারবার নিজেকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও অজয় ক্রমেই বেশী করিয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না উঠিবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অস্বস্তি ততই বাড়িয়া চলিল। এতক্ষণ যে-মুহূর্ত্তটিকে মনের সমস্ত শক্তি দিয়া সে কামনা করিতেছিল এখন তাহারই আসন্নতা তাহাকে ভয়াতুর করিয়া তুলিল। কেন ভয় তাহা সে জানে না, কেবল অস্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল, যেন অন্ধকারের মধ্যে এতক্ষণ তাহার আত্মরক্ষা করিবার অবকাশ ছিল, এবার কোথাও কিছু আর রাখা-ঢাকা থাকিবে না। যে-কথাকে মনের গোপনতায় নিজেও নিজের কাছে এতক্ষণ স্বীকার করে নাই, জ্যোৎস্নালোকে তাহা একেবারে অনাবৃত হইয়া এবার ধরা পড়িয়া যাইবে! পূর্ব্বাকাশে অস্ফুট জ্যোতির্দ্দীপ্তির বিকাশ হইবা-মাত্রই সে আর দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। স্থির করিল, সরিষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, অশ্বত্থ গাছের তলা বাহিয়া, দূরে বক্রদেহ ক্রুদ্ধ মার্জ্জারের মত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কালো ঐ কাঠের পুলটা পার হইয়া, বহুদূরের তরুবন-সমাচ্ছন্ন গ্রামপ্রান্ত ছুঁইয়া ঘুরিয়া আসিবে। ততক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে, ফিরিয়া আসিয়া দিবসের আলোতে কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে বহু লোকের ভিড়ে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া অজ্ঞাতকুলশীলার মুখখানিকে নিজের স্বপ্নচারিণী মানসীর মুখটির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া লইবে।

শেষরাত্রির দিকে একটু শীত পড়িয়া আসিতেছিল, একটা চাদরকে ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে নদীতীরের সেই নিভৃত মাধুর্য্যলোক হইতে পলাইল।

নদীর দিক্ হইতে তখন জলকরস্মরভিত ঝিরঝিরে

একটুখানি বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার স্পর্শে জাগরণের ক্লান্তি অতি সহজেই দূর হইয়া গেল। নদী হইতে একটা ছোট খাঁড়ির মত আসিয়া অশ্বত্থগাছটির তলার কাছে শেষ হইয়া গিয়াছে, বাতাসে তাহার জল তরতর করিয়া কাঁপিতেছে। নামিয়া গিয়া অশ্বত্থগাছটার জলতলচুম্বী একটা শিকড়ের উপর বসিয়া সে ভাল করিয়া মুখ হাত ধুইল, তারপর কোঁচার কাপড়ে মুখ মুছিতে মুছিতে উপরে উঠিয়া আসিয়া অপরিসীম তৃপ্তিতে বুক ভরিয়া একটা নিঃশ্বাস লইল।

পথ চলিতে চলিতে অনুভব করিল, আজিকার এই নিরুদ্দেশযাত্রা কি অপরূপ রূপ লইয়াই তাহাকে দেখা দিয়াছে। একদিকে অননুভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কুণ্ঠিত দুঃসহ গুরুভার সান্নিধ্য আর নাই; অপরদিকে, যে অস্ফুট আনন্দের গ্রন্থিবন্ধনকে সে সঙ্গে করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার সব ভার সেই গ্রন্থিসূত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া পরিপূর্ণ নির্লক্ষ্যতায় যতদূর খুশী সে চলিয়া যাইতে পারে। সব মিলাইয়া নিজেকে সে সহসা অত্যন্ত বিস্ময়কর রকমের মুক্ত বলিয়া বোধ করিল।

পুল বাহিয়া খাল পার হইবে স্থির ছিল, কিন্তু পুলের কাছাকাছি আসিয়া-পড়িয়া অকারণেই তাহার মতের বদল হইল। কাপড় গুটাইয়া পুলের নীচেকার, অগভীর জল ভাঙিয়া সে খাল অতিক্রম করিল। ওপারে গিয়া তাহার চলার ছন্দে অলক্ষ্যে নৃত্যের তাল লাগিয়া গেল। মনের মধ্যে সেই তালের সঙ্গে তাল মিলাইয়া কোন্ একটা অত্যন্ত পরিচিত গানের সুর গুঞ্জরিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সেই গানের একটা কথাও তাহার মনে আসিল না।

কিছুক্ষণ পরে ক্রমাগত একই পথ বাহিয়া চলায় অরুচি ধরিয়া যাওয়াতে অত্যন্ত অসংশয়িতরূপ অপথগুলি বাছিয়া বাছিয়া চলিতে লাগিল। শিশিরসিক্ত জুতা-দুইটির তলা মরা ঘাসের টুকরা আর আর্দ্র বালির আস্তরণে ভার হইয়া উঠিতে লাগিল। পথে গুটি-দুইতিন শৃগাল এবং একটি সজারুর সঙ্গে দেখা হইল, তাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া সে ভালবাসিল। একটা এলাইয়া-পড়া কুর্চির ঝাড়কে আবার তাহার সহকার-সাথীর আশ্রয় ধরাইয়া দিয়া গেল।

প্রান্তর পার হইয়া যখন গ্রামের কাছাকাছি পৌছিল তখন পূর্ব্বদিগন্তে অস্ফুট রঙের আভাস চোখে পড়িতেছে। আমজাম-কাঁটাল-নারিকেলের বন ভরিয়া পাখীর কূজন সুরু হইয়াছে। বাতাসে উগ্র-মধুর নানাপ্রকারের পরিচিত-অপরিচিত গন্ধের সঞ্চার। যে-পথ এতক্ষণ কোমল ধূলিময় ছিল, তাহা ক্রমেই বেশী করিয়া শানের টুক্‌রা এবং মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষে আকীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বহুদূরে, পূর্ব্বদিগন্তের প্রায় কাছাকাছি জায়গায়, অশ্বত্থগাছটার আড়ালে করুগেটেড-টিনে ছাওয়া ক্ষুদ্র ষ্টেশনঘরটার দিকে সে চাহিয়া দেখিল। অতি সন্তর্পণে সমস্তকিছুর উপরে প্রত্যূষের আলো নামিয়া আসিতেছে। এতদূর হইতে কিছুই বোঝা গেল না, কিন্তু তাহার মনে হইল, সেখানেও যেন দু-একটি করিয়া মানুষের নড়াচড়া সুরু হইয়াছে। কল্পনা প্রখর হইয়া উঠিল, তাহার আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একটি সুন্দর মুখ নদীর জলে প্রক্ষালিত ও উষার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে মাজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। আজিকার প্রভাত যে চোখ মেলিয়াই সেই মুখটিকে দেখিতে পাইবে তাহা যেন সামান্য ঘটনা নহে, অসীমতা যেন তাহার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। লজ্জা-বিপন্নতার স্মৃতি ম্লান হইয়া আসিতেছিল, মনে হইল কেন অনেক আগেই ফিরিয়া যায় নাই, একটি পরিপূর্ণ সূর্য্যোদয় তাহার জীবনে ব্যর্থ হইল। মনে করিল, গ্রামের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া গিয়া ভিন্নপথে ষ্টেশনে ফিরিবে, কতকগুলি ফুল কোথাও চোখে দেখিয়া যাওয়া চাই। তাহার জীবনে অলক্ষ্যে যে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহার দুইখানি পায়ে সেইগুলির অর্ঘ্য মনে মনে সে বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

নানাজাতি গাছে ছাওয়া কতকগুলি উঁচু মাটির ঢিবি, একটু দূরে গাছের ভিড়ে প্রায় ঢাকাপড়া একটি বাড়ী। তারপর বেড়া-দেওয়া একটা ফলের বাগান, ছোট ডোবা, তারপর আবার একটি বাড়ী। নাটমন্দির, দোলের ভিটা,

গোশালা, ধানের মরাই, খানিকটা পড়ো জায়গা, তারপর আমজাম নারিকেল সুপারি বনে ঘেরা আবার একটি বাড়ী। শৃঙ্খলাহীন, কিন্তু পরিচ্ছন্ন পল্লী। হালের গরুগুলি রাত্রিশেষে ছাড়া পাইয়া বাহির হইতেছে। গাভীদের মুক্তিলাভে এখনও বিলম্ব আছে, যদিও দুগ্ধ-দোহনের শব্দ কোথাও কোথাও শোনা যাইতেছে। একদল হাঁস কলরব করিতে করিতে হেলিতে দুলিতে চলিয়াছে। গ্রামের মধ্যেকার পথ কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও পরিসর, কোথাও বা অতি সঙ্কীর্ণ। স্থানে স্থানে গোপাট ছাড়িয়া কাহারও বাড়ীর আঙিনায় উঠিয়া পড়িতে হয়, কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠে। কাজলজলের দীঘি। গ্রামের বধূরা তত সকালেই স্নান সারিয়া কলসীতে জল লইয়া ভিজা কাপড়ে ঘোম্‌টা টানিয়া বাড়ি ফিরিতেছে, কেহ বা দীঘির ধারে বসিয়া উবু হইয়া বাসন মাজিতেছে, অপরেরা ঘোমটা মাথায় ডুব দিতেছে। অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন একটা ধারে নামিয়া গিয়া অজয় ক্লান্ত পা-দুইটাকে ধুইয়া লইল। জল দেখিলেই কোন অজুহাতে তাহা স্পর্শ করা তাহার স্বভাব ছিল। উঠিয়া আসিয়া রুমালে পা মুছিল, জুতার তলার আবর্জ্জনা ঘাসের উপর ঘসিয়া ছাড়াইল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এইখানে তৃণতটের উপর কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিয়া যায়, কিন্তু স্নানার্থিনীরা লজ্জিত হইবে ভাবিয়া আবার সে পথ চলিতে লাগিল।

ফুলের গন্ধ পাইতেছিল, কিন্তু ফুল কোথাও দেখিতে পাইল না। কাহারও বাড়ীর পশ্চাতে অযত্নবৰ্দ্ধিত বনের মধ্যে ফুটিয়া থাকিবে, ফুলের বাগান কোথাও চোখে পড়িল না। একটি ফুলকে শতটুকরা করিয়া শাস্ত্রমতে শতবার দেবতাকে অর্ঘ্য দেওয়া চলে, সুতরাং ফুলের এই অপ্রাচুর্য্যে সে বিস্মিত হইল না।

উন্মুক্তদেহে জলপাত্র হস্তে গৌরকান্তি প্রৌঢ় এক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের শতনাম জপ করিতে করিতে আসিতেছিলেন. অজয় তাঁহার পাশ কাটাইয়া যাওয়ার পর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে আপাদ-মস্তক চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইলেন। অজয় যখন বেশ খানিকটা দূরে চলিয়া গিয়াছে তখন হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, "মশায়ের নিবাস ?"

এতদূর হইতে কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিতে অজয় অভ্যস্ত ছিল না, মনে মনে বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলরামপুর।"

"কীর্ত্তিখলা-বলরামপুর না, উত্তর-বলরামপুর ?"

"উত্তর-বলরামপুর।"

"মশায়ের নাম ?"

"শ্রীঅজয় রায়।"

"কি করা হয় ?"

"আজ্ঞে, ছাত্র, পড়ি।"

"কলেজে পড়েন ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কল্‌কাতায় ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আমার ছেলেটিও কলকাতায় পড়ে, এম-এ দিচ্ছে এবারে।"

অজয়ের ঠোঁটের কোণে গভীর অবজ্ঞার অস্ফুট একটু হাসি খেলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন বোধ হয়, সুভদ্র—সুভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ?"

অজয়ের এবারে ক্লান্তি ধরিয়াছিল, অনাবশ্যক অনেকটা অতিশয়োক্তি করিয়া কহিল, "কল্‌কাতায় সব মিলিয়ে দু-হাজার ছেলে এম-এ পড়ছে, সবাইকে চিন্‌তে হ'লে আর-সব ফেলে তাই নিয়ে থাকতে হয়।"

অমনি হঠাৎ রাগিয়া ওঠা তাহার স্বভাব। কথাটা বলিয়াই কিন্তু তাহার অনুশোচনা বোধ হইল, মোলায়েম কিছু বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণ আবার প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা ?"

মুহূর্ত্তে আবার সব ঘোলাইয়া গেল, অজয় কহিল, "কায়স্থ। দক্ষিণ-রাঢ়ী, দক্ষিণ কর্ণ।"

"আপনার পিতার নামটি কি জিজ্ঞেস করা হয়নি।"

"শ্রীবিজয় রায়, পিতামহ দুর্জ্জয় রায়, তাঁর পিতা—"

ব্রাহ্মণ এবার এমন বিস্মিত এবং ব্যথিত মুখ করিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন, যে, অজয়কে কথার মাঝখানে থামিয়া যাইতে হইল। ঠিক অনুশোচনা করিবার মত মনের অবস্থা তখন আর তাহার রহিল না, যেন অনুশোচনা

হইতেই পলাইতেছে এমনই ভাবে দ্রুত সেস্থান পরিত্যাগ করিল। অপর একব্যক্তি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ একাধারে গ্রামের পোষ্টমাষ্টার এবং পিওন, হাতে একতাড়া চিঠি এবং কয়েকটা বাংলা-ইংরেজী খবরের কাগজের মোড়ক, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়ের নিবাস ?"

অজয়ের মাথায় গতকল্যকার সেই মহা-উত্তেজনার মুহূর্ত্ত-কয়টি ভিড় করিয়া আসিল। দুর্গে দুর্গতিনাশিনি··· দুর্গে দুর্গতিনাশিনি···শিশুদের চীৎকার, মেয়েদের কোলাহল।···থপ থপ করিয়া পা ফেলিয়া এক স্থূলদেহ ভয়ার্ত্ত প্রৌঢ় ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছে ; কি দারুণ অস্বস্তিভরা তাহার গতি।···কোনও উত্তর না দিয়া হন্ হন্ করিয়া অজয় পথ চলিল। হোঁচট না খাইয়া গ্রামের মধ্যের পথটুকু উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সে বাঁচে।

গ্রামের শেষ প্রান্তে ছোট একটি নদীর ধারে বাজার, ঘাটে সারি সারি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। নৌকার গায়ের আল্‌কাতরা ধুইয়া জল তৈলাক্ত হইয়া বহিতেছে, ঘোলাটে জলের গায়ে অস্ফুট সবুজ ও লাল রঙের নানা বিচিত্র নক্সা আঁকা হইতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে। এক সঙ্গে শুকনা লঙ্কা, তামাক এবং গুড়ের গন্ধের ঝাঁজ অজয়ের নাকে আসিয়া লাগিল। বিষে বিষক্ষয় হইল। সেই গন্ধ-ভারাক্রান্ত বাতাসে টানিয়া টানিয়া নিঃশ্বাস লইয়া তাহার মাথাটা আবার অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গেল। শৈশবের বহু রহস্যময় অভিযানের অস্পষ্ট স্মৃতি জড়ানো এই গন্ধটি অজয়ের ভালও লাগিত।

তখন ধুনা জ্বালাইয়া দোকানপাট সবে খোলা হইতেছে, বাজার বসে নাই। ভোরের হাওয়ায় অনেকখানি বেড়াইয়া ক্ষুধাবোধ হইতেছিল। ষ্টেশনে বিছানার পাশে খাবারের চাঙারিতে বাড়ী-হইতে-আনা লুচি মাংস প্রভৃতি আছে, কিন্তু সেই অপরিচিতা অষ্টাদশীর সম্মুখে বসিয়া সে সেইগুলি গিলিতেছে মনে করিতেই তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। খাবারের দোকান একটা রহিয়াছে দেখিয়া সে তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

একখানা কাঁসার রেকাবীতে খান-কয়েক বাসি কচুরী এবং গোটা-দুই সন্দেশ লইয়া সে সবে আহারে প্রবৃত্ত হইবে এমন সময় বাহির হইতে হঠাৎ কে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "খাবেন না, খাবেন না, ফে'লে দিন্, ফে'লে দিন্!"

এ আবার কি অভিনব স্পর্দ্ধিত অভব্যতা ভাবিয়া অজয় বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ফিরিয়া তাকাইল। যাহাকে দেখিতে পাইল সে যে পল্লী-সমাজের কেহ এমন মনে হইল না। গৌরবর্ণ দীর্ঘায়ত দেহ, মার্জ্জিতশ্রী উজ্জ্বলকান্তি যুবা, তাহার বেশ সাধারণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি, তাহার মুখভাবে চোখের দৃষ্টিতে বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিগর্ব্বিত সভ্যতাদীপ্ত আভিজাত্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। করজোড়ে অভিবাদন করিয়া সে সহাস্যে কহিল, "ক্ষমা কর্‌বেন, আপনাকে বিরক্ত কর্‌লাম। কিন্তু এ অঞ্চলে কিছুদিন থেকে একটু-আধটু ওলাউঠা হচ্ছে, বাজারের খাবার কিছুতেই খাওয়া চল্‌তে পারে না।"

অজয় খাবার ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। আগন্তুককে প্রত্যভিবাদন করিল, তারপর ভয় লুকাইয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিল, "ভাগ্যে আপনি এসে পড়েছিলেন, তা না হ'লে খুবই বিপদ্ হতে পার্‌ত।"

যুবক বলিল, "আমি ওপারের চেরিটেব্‌ল্ ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে কয়েকটা দরকারী ওষুদ নিয়ে এইদিক্ দিয়ে ফির্‌ছিলাম, আপনাকে খাবারের দোকানে ঢুক্‌তে দে'খে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পড়েছি।"

দোকানীর খাবারের দাম চুকাইয়া দিয়া দুজনে বাহির হইয়া আসিল। অজয় কহিল, "ধন্যবাদ।"

যুবক কহিল, "ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। আপনি খেতে বসেছিলেন, বাধা দিলাম, এবারে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে দিন্।"

"বাধা দেওয়াটা কি আপনার বিবেচনায় অপরাধ হয়েছে ?"

"এই অবস্থাতেই যদি আপনাকে ছেড়ে দিই তাহ'লে অপরাধ হবে। আমার বাড়ী এই কাছেই। মাখন

জুটবে, রুটি জুটবে না। ডিম, কলা আর চা দিতে পারব। আসুন দয়া ক'রে।"

অজয় প্রচণ্ড আপত্তি তুলিল, কিন্তু যুবক কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, কহিল, "শুনুন, আমাকে একেবারে অপরিচিত ভাববেন না। আপনি অজয়বাবু ত? স্কটিশচার্চ থেকে আমরা একসঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট দিয়েছিলাম, আমি তারপর সিটিতে চ'লে যাই। ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে আপনার গান অনেকবার আমি শুনেছি। আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি।"

আপনাকে বিলক্ষণ চিনি। অজয়ের মনে আবার কোন্ অলক্ষ্য সূত্র ধরিয়া মাধুর্য্যের স্পর্শ লাগিয়া গেল। নিবিড় বনান্তরাল হইতে বৌ-কথা-কও ডাকিতেছে, পাশে রৌদ্রপ্লাবিত তৃণতটে যেন অযুত মরকতমণির ছড়াছড়ি। দুইখানি ক্ষীণ হস্তের নিপুণ একটি কবরী-রচনা মনে পড়িয়া তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। যুবককে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছে কিনা মনে আনিবার কোনও চেষ্টা সে করিল না, দেখে নাই কিন্তু যুবক তাহাকে চেনে ইহা ভাবিতেই তাহার ভাল লাগিল। তাহার আমন্ত্রণকে ইহার পর সে আর প্রত্যাখ্যান করিল না।

দীঘির পাড় ঘুরিয়া গিয়া একটি ছোট মাঠ। তারপর বেত এবং বাঁশ-ঝাড়ের মধ্য দিয়া শীতস্তব্ধ ছায়াচ্ছন্ন পথ। একটা ভাঙা মন্দির বাঁয়ে রাখিয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া ঘনবিন্যস্ত সুপারিবনের মধ্যে কয়েকটি পরিপাটি খড়ে-ছাওয়া ঘরের সমষ্টি। যুবক কহিল, "এই আমাদের বাড়ী!"

বাহিরে আটচালা প্রকাণ্ড চতুষ্পাঠী। ভিতরের সরঞ্জাম দেখিয়া বুঝা গেল, বৈঠকখানা হিসাবেই সেটির এখন বেশী ব্যবহার। চতুষ্পাঠীর পর সদরের উঠান। একপাশে ঠাকুরঘর। অজয়কে লইয়া বিপরীত দিকের ঘরটিতে ঢুকিতে গিয়া যুবক কহিল, "চলুন, আগে বাবার সঙ্গে আপনার পরিচয় ক'রে দিই।"

কিন্তু ঠাকুরঘরের দরজার নীচে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াই অজয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল, যেদিকে দুচোখ যায় ছুটিয়া পলায়ন করে। যুবকের পিতা সেই ব্রাহ্মণ যাঁহাকে একটু আগে নিজের স্পর্দ্ধিত নাগরিক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া সে পথের মাঝখানে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

যুবক ডাকিল, "বাবা!"

ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, "কি, ভদ্র?"

"তুমি একটুখানি বাইরে এস, আমার এই বন্ধুটি তোমায় প্রণাম করবেন।"

প্রৌঢ় ত্রস্তে বাহির হইয়া আসিলেন, অজয়কে দেখিয়াই কহিলেন, "এস, বাবা এস। তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল তুমি সুভদ্রের পরিচিত কেউ হবে। ওকেই তুমি খুঁজছিলে ত?"

লজ্জায় ধিক্কারে অজয়ের মাথার মধ্যেটা তখন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, তাড়াতাড়ি প্রৌঢ়ের পায়ের কাছে সেটাকে নামাইয়া সে রক্ষা পাইল। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া দেখিল একটি স্নিগ্ধ সৌজন্যের প্রসন্ন অমায়িক হাসিতে তাঁহার মুখটি প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উঠান অতিক্রম করিয়া সুভদ্রের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল, ব্রাহ্মণ পূজা শেষ না-করিয়াই বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়িতে জুতা না-ছাড়িয়াই সে তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছে। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ ফিরিয়া ঠাকুরঘরে ঢোকেন নাই, স্মিতহাস্যে মুখ ভরিয়া বারান্দা হইতে স্নানের ঘটিটি উঠাইয়া লইতেছেন।

অজয়কে নিজের ঘরে খাটের উপর বসাইয়া সুভদ্র চায়ের ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। ওষুদগুলিকেও সব যথাস্থানে পৌঁছিয়া দেওয়া চাই। বাড়ী বাড়ী গিয়া নিজে হাতে করিয়া দিয়া আসিবে ইহাই স্থির ছিল, কিন্তু অতিথি জুটিয়া যাওয়াতে চাকরদের শরণাপন্ন হইতে হইল।

অজয় দেখিল, সুভদ্রের ঘরটি ঠাকুরঘরেরই মত পরিপাটি এবং পরিচ্ছন্ন। ধবধবে বিছানাটিতে কেহ যে কখনও শুইয়াছে এমন মনে হয় না। বেড়ার গায়ে ঝুলান একটি মাঝারি-গোছের আয়নার সামনে একটুকরা শাটিনে ঢাকা একটি কাঠের তাকের উপর সুভদ্রের দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম, নখ কাটিবার যন্ত্র, চুলের তেল, চিরুণী,

বুরুশ, সাবানের বাক্স, একটি য়্যাল্‌কোহলের শিশি। এ-গুলিকে কেহ যেন কখনও ব্যবহার করে নাই। ঘরে খাট ছাড়া আর কোনও আসবাব নাই। জানালার গা ঘেঁষিয়া কয়েকটা ট্রাঙ্ক ও সুটকেসকে উপরি উপরি সাজাইয়া তাহার উপর একটা ছিটের কাপড় ঢাকা দেওয়া হইয়াছে। সেই-খানে ছোট একটি পিরামিডের আকারে ছোটবড় কতক-গুলি বই, সেগুলিকে কখনও যে কেহ নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অজয় মনে মনে কলিকাতায় নিজের মেসের ঘরটিকে এই ঘরটির পাশে ধরিয়া দেখিয়া লইল। পরিচ্ছন্নতা তাহারও ভাল লাগে, তাহার ঘরটিতে আসবাবপত্র সাজসরঞ্জামের অভাব নাই, ক্রমে ক্রমে সুদৃশ্য ছোটবড় বইও তাহার প্রচুর জমিয়াছে, কিন্তু কি নিদারুণ অবহেলায় আবর্জনার মত স্তূপাকার হইয়া সেগুলি সেখানে পড়িয়া আছে। কতবার কোমর বাঁধিয়া সেগুলিকে সে গুছাইয়াছে, কিন্তু দুইদিনের বেশী গুছানো অবস্থায় একবারও সেগুলি থাকে নাই।

সুভদ্র ফিরিয়া আসিলে চা-ও আসিয়া পড়িল। একখানা বড় পিতলের রেকাবীতে ধূমায়িত চা দুধ, চিনি, দুইটি পেয়ালা, কয়েকটা ডিম, কিছু ফলমূল, গঙ্গাজলী লাড়ু, ভাজা চিঁড়া ও বাতাসা। বিছানার উপরেই গোটাদুই খবরের কাগজ বিছাইয়া সুভদ্র সেগুলির জন্য জায়গা করিয়া দিল।

চাকর চলিয়া গেলে অজয়কে এক পেয়ালা চা ঢালিয়া দিয়া এবং নিজে এক পেয়ালা লইয়া সুভদ্র কহিল, "তারপর আমাদের এলাকায় কি ক'রে এসে পড়লেন বলুন আগে।"

অজয় চায়ের চিনিটাকে চামচে করিয়া নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "বাড়ীতে ছুটি কাটিয়ে কল্‌কাতায় ফিরছিলাম, জাহাজ বিগ্‌ড়ে রাস্তার মাঝখানে আট্‌কা পড়েছি। সন্ধ্যার আগে আর ষ্টীমার নেই বোধ হয়?"

সুভদ্র কহিল, "সন্ধ্যার আগে ত নেইই, কোনো-কোনোদিন বেশ রাত করেও আসে। আপনাদের জাহাজ বিগড়াবার খবর আমরা কাল রাত্রেই ষ্টেশনমাষ্টার ভুবনবাবুর কাছে পেয়েছিলাম, গিয়ে খোঁজ নেব একবার ভেবেওছিলাম, কিন্তু একটি রোগীর নার্স করতে যেতে হ'ল ব'লে ওদিকে আর গিয়ে উঠতে পারিনি। রাত্রে খুব কষ্ট হয়নি ত?"

"কিছু না, নদীর ধারের খোলা হাওয়ায় বেশ আরামেই কাটিয়েছি।"

"বৃষ্টি-বাদল হ'লে খুব মুস্কিলে পড়তে হ'ত। ঐ ত ছোট্ট একটি ঘর, তারপর আর দুক্রোশের মধ্যে কোনো দিকে কোথাও মাথা গুঁজবার জায়গা নেই।"

অজয় চকিতে একবার খোলা জানালায় বাহিরে আকাশটাকে দেখিয়া লইল। বৃষ্টি-বাদলের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অকারণেই তবু তাহার কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। যদি বৃষ্টি হয়? তাহার পথসঙ্গিনী সেই অপরিচিতা দৃপ্তা মেয়েটি তাহা হইলে খোলা মাঠের মধ্যে হাটুতে মাথা গুঁজিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া ধারাজলে স্নান করিবে, কিছুতেই বহুলোকের ভিড়ে স্বল্পপরিসর ষ্টেশন ঘরটির মধ্যে ঢুকিতে রাজি হইবে না। সে অবস্থায় সেখানে উপস্থিত থাকিলেও সে মেয়েটির কোনও কাজে লাগিবে না, তবু ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার মন চঞ্চল হইল।

গুলাউঠার নাম শোনা অবধি আহারে অজয়ের রুচি ছিল না। সে খাবার প্রায় কিছুই ছুঁইতেছিল না। তাহাকে খাইতে তাড়া দিয়া তারপর সে খাইতেছে কিনা না দেখিয়াই সুভদ্র বলিল, "তা ভালই হয়েছে। আমিও আর কয়েকদিনের মধ্যেই কল্‌কাতায় ফিরতাম। আপনাকে সঙ্গী পাওয়া গেল, আর ভাবনা নেই। আমিও আপনার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব।"

অজয়ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "তাহলে ত খুব ভালই হয়।" কিন্তু চট্‌ করিয়া কি একটা কথা ভাবিয়া লইয়া সুভদ্র যখন কহিল, "তাহ'লে এক কাজ করা যাক্; কলেজ খুলতে এখনও ত বেশ দেরি আছে, ছ'সাতটা দিন আপনি এখানে থেকে যান্; আপনার সঙ্গে আর কেউ নেই নিশ্চয়ই?" তখন তাহার সে উৎসাহের কণামাত্র অবশিষ্ট রহিল না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কহিল, "তা নেই অবশ্য, কিন্তু আমাকে মাপ করবেন, আমাকে আজ যেতেই হবে।"

সুভদ্র নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিল, অজয়

সেগুলিকে খণ্ডন করিবার বিশেষ কোনও চেষ্টা করিল না, ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্পকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রহিল। নিজে বুঝিতে পারিল, ভিতরে ভিতরে তাহার মেজাজ উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, পাছে এই আতিথ্য-পরায়ণ সহৃদয় যুবকটির কাছে তাহা ধরা পড়ে এই ভয়ে প্রাণপণে নিজেকে সে সংবরণ করিতে লাগিল। সুভদ্রের শেষ কয়েকটা কথার কোনও উত্তরই সে দিল না, তাড়াতাড়ি চায়ের দ্বিতীয় পেয়ালা শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল, হাতের ঘড়িটার দিকে অকারণেই একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, "এবার তাহলে যাওয়া যাক্ কি বলেন? জিনিষগুলো কারও জিম্মা ক'রে দিয়ে আসা হয়নি।"

সুভদ্র কহিল, "এই ব্যাপার? বসুন, বসুন, সে ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছে। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠিয়েছি, আপনি ফিরে না-যাওয়া পর্য্যন্ত বসবে। তাছাড়া ভুবন মাষ্টার আছে, তাকেও খবর পাঠিয়েছি। আপনার জিনিষ হারাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, আপনি বসুন।"

অজয় বসিল, কিন্তু ইহার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটিল। অজয় বুঝিল, গল্প জমাইবার চেষ্টা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবে। তাহার মাথা ভরিয়া বিরক্তি পিপীলিকার সারির মত অস্থির গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, শিরদাঁড়া বাহিয়া নামিতেছে, আবার উঠিতেছে, প্রকাশের অবকাশ পাইলে এখনই দলে দলে ভিড় করিয়া বাহির হইয়া আসিবে। সকালের একবারকার অপরাধের অনুশোচনার স্মৃতি এখনও তাহার মন হইতে লুপ্ত হয় নাই, প্রাণপণে জিহ্বার রাশ টানিতে গিয়া সে একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গেল। সুভদ্র অবস্থাটাকে ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছিল না, কিন্তু ঘরের বাতাসটা যে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে ইহা অনুভব করা তাহার পক্ষেও কঠিন হইল না। সেও বসিয়া বসিয়া নীরবেই অজয়কে দেখিতে লাগিল।

এই স্তব্ধতার অবকাশে উঠিয়া পলায়ন করিলে সুভদ্রের হয়ত চট করিয়া প্রতিবাদ করিবার মত কথা জোগাইবে না ভাবিয়া অজয় আবারও খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। নমস্কার করিয়া কহিল, "বসা ত হ'ল, এবার যাওয়া যাক্। আপনি ত আর ক'দিন পরেই ফিরছেন, তখন একদিন গিয়ে আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করব।"

সুভদ্র প্রতিনমস্কার করিল না, খাট ছাড়িয়া উঠিলও না, কহিল, "এবারে আপনি বাড়াবাড়ি করছেন। আমার কথা না, হয় ছেড়েই দিন, বাবাকে খুব ভালমানুষ ভেবেছেন, কিন্তু ভালমানুষিতেই ওঁর মত একরোখা মানুষ আর দুটি নেই। তারপর আমার মা আছেন, প্রভা আছে, আমি ছাড়লেও তাঁরা আপনাকে ছাড়বেন না। আপনি আজ অভুক্ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে এঁরা হয়ত সকলে অনাহারে থাকবেন, জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করবেন না।"

অজয় কহিল, "তবু বলবেন বাড়াবাড়িটা আমি করছি? ডিম, কলা, প্রায় আধখানা পেপে, আনারস, দুপেয়ালা চা, এত-সব খেয়ে গেলাম, এর নাম হল অভুক্ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া? আপনিও কি অতিথির চেয়ে আতিথ্যকে বড় করবেন?"

সুভদ্র সত্যই একটু দমিয়া গেল, আস্তে কহিল, "অতিথির চেয়ে আতিথ্য বড় হ'লে সেটা অত্যাচার হয় জানি; কিন্তু আপনার উপর কোনো অত্যাচার করা আমার অভিপ্রায় নয়। দুপুরের রোদে খোলা মাঠের মাঝখানে অপনার সত্যিই খুব কষ্ট হবে, আপনি বুঝতে পারছেন না।"

এমন সময় ষোল-সতেরো বছর বয়সের একটি মেয়ে পিছনের দরজা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রায় ছুটিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াই তৎক্ষণাৎ "ও মাগো" বলিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। সুভদ্র ছুটিয়া গিয়া দরজাটাকে ফাঁক করিয়া ধরিয়া ডাকিল, "প্রভা, প্রভা, পালাচ্ছিস্ কেন? কি চাস্ ব'লে যা-না?"

অনেকখানি দূর হইতেই উত্তর আসিল, "সে হবে এখন অন্য সময়।"

সুভদ্র ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইল অজয় একখানা বই টানিয়া লইয়া একমনে তাহার পাতা উল্টাইতেছে।

ইহার পর যথারীতি অতিথি সৎকারের পালা। সুভদ্রের পিতা পূজা সমাপন করিয়া আসিয়া বিছানার

একটা ধার অকারণেই একটু ঝাড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "বস বাবা বস, কাপড়-চোপড় ছাড়নি যে? আজ আবার যা গরম পড়েছে, খোলা গায়ে হাওয়া লাগ্‌লে তবু একটু আরাম পাবে। ভদ্র কি কর্‌ছিলে এতক্ষণ? ওরে শশী, শশী! ও নিমাই! এদিকে আয় তোরা একজন, বাবুর চাদর-জামাগুলো তুলে রাখ্, হাত-পা ধোবার জল দে।"

বাড়ীশুদ্ধ মানুষের সম্মুখে প্রৌঢ় হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যে তাহাকে অর্দ্ধনগ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিবেন, এই সম্ভাবনামাত্রে ভয়ে অজয়ের নাড়ী ছাড়িবার উপক্রম হইল। যুগসভ্যতার প্রভাবে দৈহিক লজ্জা যতটুকু থাকিবার তাহা ত তাহার ছিলই; তদুপরি সে নিজে তাহার শরীরের অপরিণতি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। তাড়াতাড়ি কহিল, "না, না, আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই, নতুন জায়গার হাওয়াটা আর গায়ে লাগ্‌তে দিতে চাই না।"

শরীর কেন ভাল নাই, ম্যালেরিয়ার ধাত আছে কি না, কলিকাতায় কোথায় কাহার কাছে থাকে, সেখানে খাওয়া-দাওয়া কি-প্রকারের হয়, মাথা ঠিক রাখিয়া এই-রকমের আরও অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে অজয় হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় সাত-আট বৎসর বয়সের ফুটফুটে সুন্দর একটি ছেলে একহাতে একটা আনারসের টুকরা লইয়া লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারেই তাহার কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সঙ্গে ভাব জমাইল। কহিল, "আমরা একবার কল্‌কাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে বাঘ আছে।"

অজয় একটু ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ, কলকাতায় বাঘ আছে বটে। তুমি সুভদ্র-বাবুর ভাই?"

ছেলেটি ঘাড় হেলাইয়া জানাইল, হাঁ।

"কি নাম তোমার?"

ছেলেটি মুখভরা আনারস লইয়া কষ্টে উচ্চারণ করিল, "সু-দ-র্শ-ন।"

সুভদ্র পূর্ব্বেই কি একটা কাজে অন্দরে গিয়াছিল, অজয়ের সঙ্গে সুদর্শনের দিব্য কথা জমিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধও উঠিয়া খড়মের শব্দ করিতে করিতে বৈঠক-খানার দিকে প্রস্থান করিলেন। একটু পরে দশ-এগারো বৎসরের আর-একটি ছেলে আসিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত মুখ করিয়া সুদর্শনকে কহিল, "তুই এখানে ব'সে বেশ ত আড্ডা দিচ্ছিস দেখছি! কি বলেছিল তোকে বড়দা?"

সুদর্শন অত্যন্ত অপরাধীর মত মুখ করিয়া একবার অভিযোক্তার দিকে এবং একবার অজয়ের দিকে চাহিতে লাগিল। বড়ছেলেটি কহিল, "মা আপনাকে একটু দেখতে চান্, বড়দা আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে ওকে পাঠিয়েছিলেন। আপনি আসুন।"

অজয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুদর্শনের হাত ধরিয়া উঠিয়া পড়িল। এই দুটি কিশোর বালকের কাছে নিজের কোনও দুর্ব্বলতাকে প্রকাশ হইতে দিতে তাহার ইচ্ছা করিল না।

অন্দরের বড়ঘরের বারান্দায় আসন পাতিয়া অজয়কে বসিতে দিয়া সুভদ্রের মাতা তাহার প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তাহার মাথায় ধানদূর্ব্বা দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। চোখের উপর অবধি ঘোমটা টানিয়া নিজে একটু দূরে বসিয়া সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে, তোর বন্ধুটি এত রোগা কেন?"

অজয় নীরবে একটু হাসিল। সুভদ্র কহিল, "এক-বেলার বেশী উনি থাক্‌বেন না, তা না-হলে খাইয়ে-দাইয়ে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারতে মোটা করতে পার কি-না।"

তাহার মা বলিলেন, "তুই নিজে যা-না পালোয়ান; তাছাড়া কি যে যা-তা বলিস, ওর মা বুঝি ওকে খাওয়াতে কিছু ত্রুটি করেন?"

অজয় নতমস্তকে বসিয়াছিল, কহিল, "খুব ছেলেবেলা থেকেই আমার মা নেই, খেতে অবিশ্যি আমি সমানই পেয়েছি।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুভদ্রের মা কহিলেন, "বেচারা! মা নেই, তাই ত এমন দশা!"

অজয় বিব্রত বোধ করিতেছে বুঝিতে পারিয়া সুভদ্র তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় বহুক্ষণ তাহাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল।

কোথাও কেহ ওলাউঠায় ভুগিতেছে, কাহারও ম্যালেরিয়া, কেহ বা জমিদারের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত। কোথাও একদল অনাথ শিশুকে দেখিবার কেহ নাই। কাহারও বা পৃথিবীর সর্ব্বশেষ সম্বল একখানি খড়ের ঘর দুইদিন হইল আগুনে পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে। কাহারও জন্য কিছুই তৎক্ষণাৎ করিতে পারিল না, কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুভদ্র সকলের সংবাদ লইল। যে মেয়েটি ওলাউঠায় ভুগিতেছিল তাহার স্বামী কিছুতেই সুভদ্রের সঙ্গ ছাড়িতে চাহিতেছিল না, সুভদ্র তাড়া দিয়া তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইল। তারপর অজয়কে ইস্কুল দেখাইল, ছেলেদের খেলিবার মাঠ, ধ্বসিয়া-পড়া বহুপ্রাচীন দেবমন্দির, রথতলা। কিন্তু অজয় সে-সমস্ত কিছুই দেখিল না, তাহার সমস্ত চৈতন্য জুড়িয়া চতুর্দ্দিক্‌কার নগ্নতা, নিঃস্বতা, ব্যাধিজীর্ণতা কি এক আসন্ন অকল্যাণের আভাসের মত নিদারুণ অবসাদের সুরে বাজিতে লাগিল। অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, স্বল্প পরিচয়েই সুভদ্রকেও তাহার ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু এই পীড়িত পল্লীর বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। যত শীঘ্র সম্ভব খাওয়া-দাওয়া সারিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে স্থির করিয়া সুভদ্রকে তাড়া দিয়া সে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া আসিল।

দীঘির ঘাটে জনসমাবেশের মধ্যে গা খুলিতে পারিবে না, এজন্য সেদিন আর স্নান করিল না। ছুটিতে যতদিন দেশের বাড়ীতে থাকে, তোলা জলে স্নান করা তাহার অভ্যাস।

খাইতে বসিয়া মনের অন্ধকার অচিন্তিত উপায়ে অনেকখানি কাটিয়া গেল। লক্ষ্য করিল, যে-দুইখানি হাত অন্ন পরিবেষণ করিতেছে তাহাদের মধ্যে স্নিগ্ধতা যেন আর ধরিতেছে না। পা-দুইখানি সুগঠিত সুন্দর সুডৌল, আর তাহাদের মধ্যে এমন একটি জিনিষের প্রকাশ আছে যাহাতে মাথা আপনা হইতেই সেই কুসুম-কোরকের মত অঙ্গুলিরাজির উপর লুণ্ঠিত হইতে চায়। মাথা নীচু করিয়াই যতটুকু সে দেখিতে পাইল, তাহাতেই তাহার মনে হইল, কি এক অপরিসীম স্নিগ্ধতার তপস্যা সেই দেহটিকে আপনার শ্যামল দীপ্তিতে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার অন্নে চক্ষের নিমিষে অমৃতের স্বাদ কোথা হইতে আসিয়া লাগিল। সুভদ্র সকালে প্রভা প্রভা বলিয়া ডাকিয়াছিল, নিজের মনে নামটা সে কয়েকবার উচ্চারণ করিল।

হঠাৎ শুনিল, সুভদ্র বলিতেছে, "আমিও আজকেই যাব ঠিক করেছি, বাবা।"

তাহার পিতা হাতের গ্রাস মুখের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকেই ? কিন্তু ভাইফোঁটার ত আর দেরী নেই ?"

বাড়ীতে সুভদ্রের প্রতিপত্তি সাধারণ ছিল না। সুদর্শন ছাড়া তাহার কথার উপর সহজে আর-কেহ কথা কহিত না। কিন্তু তখন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আর পাঁচ-ছয় দিন মাত্র বাকী, প্রভা তখন হইতেই নানাভাবে সেজন্য প্রস্তুত হইতেছে, ছুটি ফুরাইতেও বেশ কিছুদিন দেরি। তাছাড়া কলিকাতায় সুভদ্রের পড়াশোনা নামে মাত্রই, রোগী দেখা এবং রোগ সম্বন্ধে গবেষণায় সে সময় কাটায় তাহার দশগুণ। এ-সমস্ত জড়াইয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার প্রস্তাবটা সুভদ্রের নিজের কানেও অত্যন্ত দুরূহ শোনাইল। কিন্তু হৃদয়ের শাসন মানিয়া চলা কোনও কালে তাহার স্বভাব নহে, সে কখন কেন যে কি করে হৃদয়বান্ লোকে সেইজন্যই তাহার অর্থ খুঁজিয়া পায় না।

হাতের গ্রাসটা নামাইয়া রাখিয়া তাহার পিতা আবার কহিলেন, "প্রভাকে বলেছ ?"

সুভদ্র কহিল, "প্রভা জানে, মাকেও বলেছি।"

তাহার পিতা কহিলেন, "আচ্ছা।" কিন্তু বেশ বোঝা গেল, ইহার পর আর তাঁহার আহারে রুচি রহিল না।

খাওয়ার পর সুভদ্র নিজের ঘরে প্রভাকে ডাকিয়া অজয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিল। পিতা দেখিতে না পান সে-বিষয়ে বিধিমত সতর্কতা অবলম্বন করিল। প্রভা কহিল, "দাদা বৃথাই পুরুষ-মানুষ, অল্পেতেই এত ভয় পায়।"

অজয় সঙ্কোচ কাটাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই একটি শ্যামল গভীর দৃষ্টির স্নিগ্ধতা তাহার দৃষ্টিকে অভিনন্দিত করিল। সে বুঝিল না, সেই মুখটিতে, সেই দৃষ্টির মধ্যে

কি আছে। বুঝিবার চেষ্টামাত্রও করিল না। লক্ষ্য করিল না, একটুখানি গোপন অশ্রুর অবশেষ এখনও একটি চোখের কোণে লিপ্ত হইয়া আছে। কেবল এইটুকু মাত্র অনুভব করিল, এই মানুষটির মধ্যে বিধাতা নিজের কোনও বিশেষ একটি রূপকে এমন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, যে, তাহা হইতেও বেশী আর-কিছু আশা করিবার কথা কল্পনাতে আসে না। মুখখানিকে সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি লইয়া বিচার করিলে নিঃসন্দেহ কতকগুলি ত্রুটি বাহির হইবে। দেহের বর্ণ শ্যাম, নাসিকা সমস্ত মুখটির তুলনায় যেন ঈষৎ একটু ছোট; কিন্তু দেখিবামাত্র ইহাকে অকারণেই চিরপরিচিত বলিয়া মনে হয়, মাথা নত হইয়া আসে, আর মন বলিতে থাকে, তুমি সুন্দর হয়ত নও, হয়ত নওই, কিন্তু তুমি মনোরম, তুমি মনোরম, তুমি মনোরম!

একটু চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনার ভয় করে না?"

প্রভাও হাসিয়াই বলিল, "বাবাকে তাই ব'লে ভয় পাই না।"

অজয় বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিল, "বাইরের পৃথিবীটাকে ত জানেন না, সেখানে ভয় করবার মত অনেক-কিছুই আছে।"

প্রভা কহিল, "জানি না, দেখলে বলতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় না, দাদা যেখানে ভয় পায় না আমি ভয় পাব।"

সুভদ্র কহিল, "অজয়বাবুকে তোর ভয় করছে না?"

প্রভা অজয়ের দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আঁচলে মুখ চাপিয়া একটু হাসিল, কহিল, "উঁহু।"

"সকালে তাহলে পালিয়েছিলি কেন?"

"পালাব না ত কি? ভয় পেয়ে ত আর পালাই নি।"

সুভদ্র কহিল, "আচ্ছা, তুই ত খাস্‌নি এখনও, খেগে যা, এবারে ফির্‌বার সময় তোর জন্যে একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস জোগাড় করে আন্‌ব।"

কাপড়ের ঢাকাটা খুলিয়া ফেলিয়া প্রভা সুভদ্রের একটা সুটকেস খুলিল, সেটার মধ্যে তার বইগুলি সাজাইয়া রাখিয়া "তোমার ক্ষুর-টুর রাখবার ছোট চাম্‌ড়ার বাক্সটা ভুলুর কাছে আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া বাহির হইয়া গেল। অজয় নমস্কার করিয়াছিল, প্রতিনমস্কার করার বদলে সে হাসিয়া ফেলিল।

দেখিতে দেখিতে যাত্রার সময় আসিয়া পড়িল। এতক্ষণ অবধি সকলে অজয়কে লইয়াই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ এই সময় সে একেবারে দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেল। সুভদ্র কি কি খাইতে ভালবাসে, আচার, মোরব্বা, বড়ি, সরুধানের চিঁড়া, মুগের লাড়ু, সে-সমস্তের জোগাড় হইতে লাগিল। তাহার ছোট ছোট ভাইবোন্‌রা দীর্ঘকালের মত দাদাকে বিদায় দিবার আগে তাহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া লইতে লাগিল। সুদর্শন সংবাদ দিল, দিদি কাঁদিতেছে। চাকরেরা কলরব করিয়া সুভদ্রের জিনিষ বাঁধাছাঁদা করিতে লাগিল। গুছাইবার যাহা তাহার সমস্ত গোছগাছ করিয়া তবেই প্রভার কাঁদিবার অবসর জুটিয়াছে। সুভদ্রের মাতা চোখ মুছিতে মুছিতে সব-কিছুর তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাহার পিতার মুখ ছায়াচ্ছন্ন গম্ভীর। পাড়াপ্রতিবাসীরা অনেকে আসিয়াছে, অজয় সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া কেবলই তাহাদের পথে বাধা হইতে লাগিল। তাহার দিকে ইহার পর আর কেহ ফিরিয়াও দেখিল না।

সেই পীড়িতা মেয়েটির স্বামী সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভয়ার্ত্ত কাতর মুখে কহিল, "দুপুর অবধি ত বেশ ভালই ছিল দাদাবাবু, ঘণ্টাখানেক হ'ল আবার বাড়াবাড়ি সুরু হয়েছে। সেই ওষুদটা আধঘণ্টা পর পর দিচ্ছি। কম্‌ছে বলে মনে ত হচ্ছে না।"

কখন্ কোন্ অবস্থায় কি করিতে হইবে সে-বিষয়ে বিশদ ভাবে উপদেশ দিয়া সুভদ্র প্রায় জোর করিয়াই তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইল। অজয়কে কহিল, "চ'লে যেতে হচ্ছে, কিন্তু কি করব বলুন। যেখানে যাব সেখানেই ত এই অবস্থা, তাই মায়া কাটাবার সময় হ'লেই কাটিয়ে ফেলি। যখন যেখানে থাকি, যতটুকু করতে পারি করি, দূরে গেলে আর মনে রাখি না।"

সেদিন সকাল-সকাল ষ্টীমারের শিটি শুনিতে পাওয়া গেল। সুভদ্রের সঙ্গে অজয় যখন ষ্টেশনের পথে বাহির

হইল, তখন তাহার মন কি একটা অপরিচিত বেদনায় ভার হইয়া আছে। কোথায় কি একটা আনন্দের সূত্র বাঁধা হইতে হইতে যেন তাহার নিজেরই অসাবধানতায় হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল, কোন্ একটা করুণ সুরের রেশকে নিজে অকারণ কোলাহল করিয়া ডুবাইয়া দিল, পরমাত্মীয় কাহাদের ভাল করিয়া চিনিবার আগেই ছাড়িয়া আসিতেছে, এমনইধারা আরও কত কি, কিন্তু কিছুই তার মনের উপলব্ধিতে খুব স্পষ্ট নয়। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত করিল, সুভদ্রকে যে সে ভালবাসিতেছে ইহাই তাহার এই বেদনাবোধের মূলে। স্বজনবিচ্ছেদে সুভদ্রের বেদনা কোনও অলক্ষিত উপায়ে তাহার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিতেছে এবং তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই তাহারা দূরে ধোঁয়া দেখিতে পাইয়াছিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কালো সেই পুলটার উপর যখন আসিল, তখন শিটি দিয়া জাহাজ ঘাটে ভিড়িবার উপক্রম করিতেছে। প্রাণপণ দ্রুত পথ চলিতে চলিতে অজয় নিজের মনকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। ষ্টীমার ধরা হয়ত যাইবে না, তখন পশ্চাতে ঐ বনরেখার পারে নিভৃত একটি ছায়ানীড়ের মধ্যে আবার কিছুকালের জন্ম ফিরিয়া যাইতে হইতে পারে, এই সম্ভাবনাতেই কেন তাহার বুকে এমন করিয়া দোলা লাগিতেছে? মনের গোপনে সেই ইচ্ছাকেই কি নিজেরও অজ্ঞাতে সারা পথ সে বহন করিতেছে? অথচ অল্প কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত সেই নীড়টিরই আশ্রয় ছাড়িয়া যাইবার জন্ম তাহার ব্যাকুলতার অবধি ছিল না!

ক্রমশঃ

আষাঢ় সংখ্যায় রহস্যপূর্ণ উপন্যাস আরম্ভ

আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত একটি রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের মুদ্রণ আরম্ভ হইবে। তাহার প্রথম পরিচ্ছেদের গোড়াটি এইরূপ :—

আমি কে?

প্রশস্ত রাজপথ। মাঠের উপর দিয়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়া, গ্রামের পার্শ্ব দিয়া, কখন সোজা, কখন বাঁকা, ধরণীর অঙ্গে সাদা শিরার ন্যায় পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথ দিয়া একখানা মোটর গাড়ী চলিয়া যাইতেছিল। গাড়ীতে তিনজন লোক। যাহার গাড়ী—হরিনাথ—সে নিজে গাড়ী চালাইতেছিল.তাহার পাশে বসিয়া তাহার বন্ধু গঙ্গাধর। গাড়ীর ভিতর বসিয়া মোটর-চালক। গাড়ীর পিছনে জিনিষ-পত্র বাঁধা, মোটর করিয়া দুই বন্ধু দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

হরিনাথের বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে। গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ। গঙ্গাধর তাহার অপেক্ষা কিছু বড়, শ্যামবর্ণ, মধ্যাকৃতি, দোহারা গড়ন। চক্ষু উজ্জ্বল, দেখিলেই বুদ্ধিমান মনে হয়।

হরিনাথ ধনী। যথেষ্ট সম্পত্তি, বেশ বড় জমিদারী। পিতার এক সন্তান, দুই বৎসর পূর্ব্বে পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। হরিনাথ কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র, বিলাসিতায় রুচি নাই। ধনীর পুত্র বলিয়া অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক মাস পরেই স্ত্রীবিয়োগ হয়। এপর্য্যন্ত হরিনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নাই।

গঙ্গাধর হরিনাথের বাল্যবন্ধু, এক গ্রামে নিবাস। পাঠ্যাবস্থায় মেধাবী ছাত্র বলিয়া সকল পরীক্ষায় যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। অবস্থা সচ্ছল, সেইজন্য কর্ম্মকাজের বিশেষ চেষ্টা ছিল না। কিছু দিন অধ্যাপনা কর্ম্ম করিয়াছিল, কিছুদিন এক রাজার সেক্রেটারী ছিল, কিন্তু ওকালতী পাশ করিয়াও উকীল হইতে স্বীকার করে নাই। এখন কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিত না। বাড়ীতে বৃদ্ধা বিধবা মাতা ও স্ত্রী। সন্তানাদি হয় নাই। ছোট সংসার, ব্যয়বাহুল্য ছিল না. সুতরাং চিন্তারও বিশেষ কোন কারণ ছিল না। হরিনাথ তাহাকে নিজের জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে চাহিতেছিল, কিন্তু গঙ্গাধর এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই।

সময় অপরাহ্ণ। মোটর ছুটিতেছিল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য আকাশপ্রান্তে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতেছিল, ক্রমে অস্তমিত হইল, আকাশে গোধূলি রাগ ছাইয়া আসিল।

গঙ্গাধর বলিল, ওখানে গাছপালার মধ্যে আগুন লেগেচে, দেখেচ?

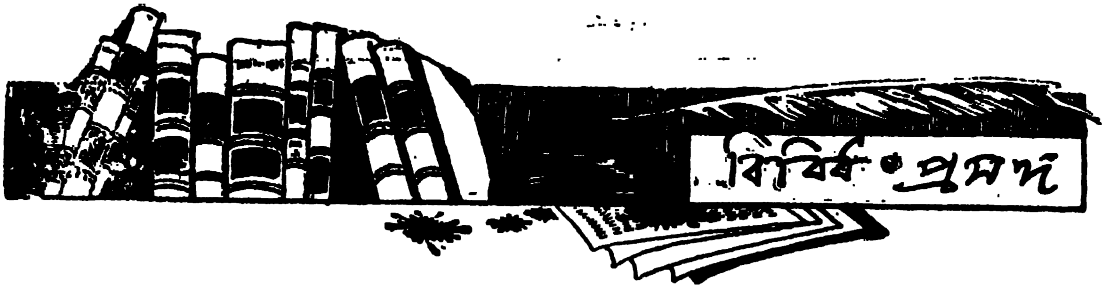
হরিনাথ দেখিতেছিল। সম্মুখে অনেক দূরে পথের বাম দিকে একটা ছোট বন। তাহার ভিতর দিয়া গাঢ়ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত হইতেছিল, মাঝে মাঝে আগুনের হল্কা উঠিতেছিল। গ্রাম বা কোন গৃহের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না। হরিনাথ মোটরের বেগ বাড়াইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেইস্থানে উপনীত হইল। মোটর থামাইয়া তিন জনেই অগ্নির অভিমুখে ছুটিয়া গেল।

পথের ধারে কয়েক বিঘা জমি জুড়িয়া শালবন। স্থানে স্থানে বন ঘন, অপর স্থানে বিরল। বনের ভিতর খানিকটা মুক্ত পথ। সেই পথে গিয়া হরিনাথেরা দেখিল একখানা মোটর গাড়ী গাছে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আগুন লাগিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। উত্তাপ এত অধিক যে নিকটে যাওয়া অসম্ভব। অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার কোন উপায় নাই, নিকটে কোথাও জলাশয় নাই। হরিনাথ ও গঙ্গাধরের মনে হইল মোটরের নীচে একটা মানুষ চাপা পড়িয়া পুড়িতেছে। মৃত্যু অনেক পূর্ব্বেই হইয়া থাকিবে, কিন্তু এক পায়ের জুতা দেখিয়া তাহাকে পুরুষ মনে হইল।

মোটর-চালক বলিল, ও ব্যক্তি আরোহী মনে হচ্চে। চালক কোথায় গেল?

গঙ্গাধর এদিক ওদিক দেখিতেছিল। হঠাৎ এক দিকে ছুটিয়া গিয়া বলিল, এ দিকে এ কে পড়ে রয়েচে?

তিন জনেই সেই দিকে গেল। একটা ছোট ঝোপের পাশে, খুব পুরু ঘাসের উপর একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া রহিয়াছে। মৃতা না মূর্চ্ছিতা?



আবার রাজকর্ম্মচারী হত্যা

কয়েক দিন হইল মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডাগলাস নিহত হইয়াছেন। এইরূপ খবর বাহির হইয়াছে, যে, যাহাকে হত্যাকারী বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহার পকেটে একটুকরা কাগজে এই মর্ম্মের কথা ছিল, যে, এই হত্যা হিজলীর কাণ্ডের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিশোধ।

এখন অবস্থা এই রূপ দাঁড়াইয়াছে, যে, এই রূপ হত্যাকাণ্ডের পর যে-সব খবরের কাগজ ও সভা তাহার নিন্দা করে ও তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, ইংরেজরা (এবং অনেক স্থলে অনেক অবাঙালীও) তাহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতে পারে, এবং যদি কোন সভা বা খবরের কাগজ এই রকম হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা না-করে ও তৎপ্রতি সাতিশয় ঘৃণা প্রকাশ না-করে, তাহা হইলে তাহারা রাজকর্ম্মচারীহত্যা নীতির সমর্থক বিবেচিত হইতে পারে। এই রূপ ধারণা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তৃতার ফলে কতকটা স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে মনে হয়। যেমন, সেই বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া মান্দ্রাজের একটি কাগজ, জাস্‌টিস্, লিখিয়াছে :—

A prominent member of the Bengal Legislative Council speaking in the Chamber on the assassination of Mr. Douglas (*sic*) last year, frankly avowed that, though there might be the most severe condemnation in public by leaders, there is quite a different kind of feeling in the hearts of most of them. It is highly imperative that this feeling should go, and that as early as possible. A strong antagonistic public opinion would result in the weeding out of terrorism wherever it has taken root. In Bengal particularly the long series of outrages lead one to the irresistible conclusion that on the whole, that province is not so wholly alive to the evil effects of terrorism as it should be.

এই রকম, লাহোরের ডেলী হেরাল্ড প্রস্তাব করিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশের নেতারা বঙ্গে গিয়া বিভীষিকাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন, তাহা হইলে বাঙালীদের সুমতি হইবে।

জিতেনবাবু যাহা বলিয়াছেন এবং তাহা হইতে জাস্‌টিস্ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, তাহার সত্যতা ও ন্যায্যতার বিচার করিবার আবশ্যক নাই, তাহা করিবার মত দেশের লোকমত সম্বন্ধে জ্ঞানও আমাদের নাই। আমরা কেবল নিজের মত জানি। এক দিকে সরকার কড়াকড়া আইন অর্ডিন্যান্স নিয়ম করিতে থাকুন, সরকারী বেতনভোগী এক দল লোক তদনুসারে দমন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকুক, এবং অন্যদিকে দলবদ্ধ বা অদলবদ্ধ কতকগুলি লোক কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে হত্যা করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকুক—দেশের এরূপ অবস্থা আর অল্পকালও স্থায়ী হয়, ইহা আমরা চাই না। ইহাতে দেশের কল্যাণকর কাজে বাধা পড়িতেছে, বিস্তর নিরপরাধ লোক অত্যাচরিত হইতেছে, এবং ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, অসদ্ভাব ও বিদ্বেষ বাড়িয়া চলিতেছে। আমরা দুই পক্ষের উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান অবস্থার জন্য কোন্ পক্ষ প্রথমতঃ দায়ী, তাহা স্থির করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা নহে; কিন্তু আমরা এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। আমরা বাঙালী বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের এবং অনেক অবাঙালীরও মনঃপূত না হইতে পারে। সেই জন্য আমরা রাজকর্ম্মচারী হত্যা সম্বন্ধে মান্দ্রাজের নিউ ইণ্ডিয়া কাগজের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। এই কাগজ শ্রীযুক্তা এনী বেসাণ্ট ও শ্রীযুক্ত শিবরাও দ্বারা সম্পাদিত। ইঁহারা কেহই বাঙালী নহেন, কেহ কখনও অসহযোগ আন্দোলন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করেন নাই, টেরারিষ্ট বা আতঙ্কোৎপাদকদের কার্য্যের ও নীতির বরাবর নিন্দা করিয়াছেন, এবং

বাঙালীদের পক্ষপাতী বলিয়া পরিচিত নহেন। ইঁহারা ৫ই মে তারিখের নিউ ইণ্ডিয়ায় লিখিয়াছেন :—

The natural effect of such deeds is to produce bitter feeling and resentment against India in the minds of the friends, relatives and acquaintances of the victims and of the peoples of their country, and thus increase the tension already existing in the relations between Britain and India. Violence on the part of representatives of either, provokes violence on the part of the other. Thus it remains as true now as when the words were uttered, that "hatred ceaseth not by hatred, hatred ceaseth by love." The remedy for the entire distemper, of which these outrages are symptoms, is Swaraj. Until that comes, repression on the one side and violence on the other will go on intensifying each other, we are afraid.

এই মন্তব্যে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা সত্য—যদিও সমগ্র সত্য ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। শেষ বাক্যটিতে যাহা লেখা হইয়াছে, সেরূপ অনুমান অনেক আগে হইতেই আমাদের মনে উদিত হইয়াছিল। সেরূপ অনুমানের কারণ বলি।

আমরা গবন্মেণ্টনামধেয় মনুষ্যসমষ্টির মনের কথা জানি না, যদিও এক এক সময়কার এই সমষ্টির মানুষগুলির নাম জানিলেও জানিতে পারি। অন্য দিকে, যাহারা রাজকর্ম্মচারী হত্যা বা হত্যার চেষ্টা করে, তাহাদের নামধামাদি জানিবার উপায় নাই, তাহারা দলবদ্ধ কি অদলবদ্ধ তাহাও জানি না, এবং তাহাদের মনের কথা ত জানা নাই-ই। কেবলমাত্র উভয় পক্ষের আচরণ হইতে এই রূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে, যে, যেন তাহাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছে। আতঙ্কোৎপাদকদের একটা কোন উপদ্রবের পর তাহাদিগকে বন্দী, বলহীন বা নির্ম্মূল করিবার জন্য গবন্মেণ্ট নূতন কোন আইন বা নিয়ম অবলম্বন করিলেন। তাহার অল্প দিনের মধ্যেই কোন নূতন হত্যাকাণ্ড বা হত্যাচেষ্টা করিয়া আতঙ্কোৎপাদকেরা যেন গবন্মেণ্টকে জানাইয়া দিল, যে, তাহারা মরে নাই। তাহার পর গবন্মেণ্ট কঠোরতর আরও কিছু উপায় অবলম্বন করিলেন। তদনন্তর আবার এমন একটা কিছু ঘটিল যাহা হইতে বুঝা গেল, সমুদয় আতঙ্কোৎপাদক ধৃত ও বন্দীকৃত বা নিহত হয় নাই। বিনা বিচারে বন্দীকৃত লোকদিগকে বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষের অন্যত্র আটক করিয়া রাখিবার জন্য আইন প্রণয়নের, এবং এই রাজবন্দীদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশের বাধ্য করিবার নিমিত্ত "যে কোনও এবং প্রত্যেক উপায়" ("any and every means") অবলম্বিত হইতে পারিবে বলিয়া সরকারী কলিকাতা গেজেটে নিয়ম প্রকাশের পরই মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডাগলাসের হত্যা এই ভীষণ "চক্রনৃত্যের" শেষ দৃষ্টান্ত।

উভয় পক্ষের এই যে রোখ চাপা অনুমিত বা কল্পিত হইতেছে বা হইতে পারে, তাহার পরিণাম ও অবসান কোথায় কখন হইবে কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু রোখের অবসান প্রার্থনীয়, এবং এই "চক্রনৃত্য" থামিলে দেশের কল্যাণ হইবে। কিন্তু কে আগে থামিবে? এবিষয়ে বোধ করি মতভেদ হইবে না, যে, উভয় পক্ষের মধ্যে গবন্মেণ্টের শক্তি খুব বেশী। যে-পক্ষ বলবত্তর, শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সুশোভন। আমেরিকার যে-সকল ব্রিটিশ উপনিবেশ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হয়, তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও বক্তা এড্‌মাণ্ড বার্ক তাহাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিবার জন্য ব্রিটিশ গবন্মেণ্টকে অনুরোধ করেন। তাঁহার এতদ্বিষয়ক বক্তৃতায় তিনি বলেন—

"I mean to give peace. Peace implies reconciliation; and where there has been a material dispute, reconciliation does in a manner always imply concession on the one part or the other. In this state of things I make no difficulty in affirming that the proposal ought to originate from us. Great and an acknowledged force is not impaired, either in effect or in opinion, by an unwillingness to exert itself. The superior power may offer peace with honour and with safety. Such an offer from such a power will be attributed to magnanimity."

বার্কের পরামর্শ ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট গ্রহণীয় মনে করেন নাই। ফলে যুদ্ধ বাধে এবং আমেরিকা স্বাধীন হয়। আমেরিকার উপনিবেশগুলির যে শক্তি ছিল, ভারতবর্ষের জনকতক আতঙ্কোৎপাদকের শক্তি তাহা অপেক্ষা খুবই কম। সেই জন্য অনেকের মনে হইতে পারে, যাহারা এত তুচ্ছ তাহাদের কথা ভাবিয়া শাসননীতি পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপনও হাস্যকর। কিন্তু গবন্মেণ্টের ও আতঙ্কোৎপাদকদের শক্তি তুলনীয় নহে বলিয়াই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট শান্তির পথে

অগ্রসর হইলে তাহার চেষ্টার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হইবার সম্ভাবনা কম। তাহা হইলেও আমরা স্বীকার করি, এমন অনেক লোক আছে গবর্ন্মেণ্ট নূতন নূতন দমনোপায় অবলম্বনের পথে একটা দাঁড়ি টানিয়া ক্ষান্ত হইলে যাহারা ভাবিবে এই বিরতি ভয়প্রসূত। কিন্তু এরূপ লোকদের মতকে অগ্রাহ্য করাই গবর্ন্মেণ্টের উচিত। অগামী জুলাই মাসে অর্ডিন্যান্সগুলার মিয়াদ ফুরাইবে। তখন নূতন দমনমূলক অর্ডিন্যান্স বা আইন জারি না করিলেই চলিবে। এই রূপ আচরণে গবর্ন্মেণ্টের প্রকৃত প্রতিপত্তি হ্রাস পাইবে না, বরং সদাশয়তা ও সুবুদ্ধি প্রমাণিত হইতে পারে।

চক্রনৃত্যে গবর্ন্মেণ্টের পালা থামান এই কারণেই প্রধানতঃ দরকার, যে, অহিংসাপন্থী স্বাধীনতালিপ্সুদের শক্তি তুচ্ছ নহে, তাহা বিনষ্ট করা যাইবে না।

গবর্ন্মেণ্টকে যেমন শান্তি স্থাপনের পথে চলিতে হইবে, আতঙ্কোৎপাদকদিগকেও তাহা করিতে হইবে। আমাদের প্রস্তাবের মানে এ নয়, যে, কেহ হত্যা, হত্যাচেষ্টা বা বলপ্রয়োগসাপেক্ষ অন্যবিধ কোন উপদ্রব করিলে তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে না। বিচারের পর শাস্তি অবশ্যই দিতে হইবে। কিন্তু বিনা বিচারে বন্দীকরণ ও শাস্তি-প্রদান বন্ধ করিতে হইবে। সরকারী লোকদের দ্বারা গ্রামে ও নগরে, পথেঘাটে, সভাসমিতিতে, জেলে হাজতে, আটকখানায় ও থানায় যে-সকল অত্যাচার হয় বলিয়া শুনা যায় অথচ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় না, তৎ-সমুদয় সংবাদরূপে আইনসঙ্গত আকারে সাধারণ খবরের কাগজে ছাপিতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তৎসমুদয় কর্ত্তৃপক্ষের নজরে পড়িবে, নজরে পড়িবার পর সেগুলার সম্বন্ধে খুব তলাইয়া তদন্ত করিয়া অত্যাচারীদের দমন ও প্রতিকারের অন্যান্য উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত। বেসরকারী আতঙ্কোৎপাদকদের যেরূপ কাজের জন্য শাস্তি হয়, সরকারী কোন লোকের বিরুদ্ধে সেরূপ কাজের প্রমাণ পাইলে তাহারও সেইরূপ শাস্তি হওয়া উচিত। যে-সব সত্য সংবাদ কিংবা অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা গুজব সাধারণ খবরের কাগজে স্থান পায় না, তাহা দেশমধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত না ছড়াইলেও উৎপত্তি-স্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রামে ও শহরে ছড়ায় এবং তৎসম্বন্ধে কোন তদন্ত বা প্রতিবাদ না হওয়ায় সেই সেই জায়গার লোকেরা তাহাতে বিশ্বাস করে। তাহাতে উত্তেজনার ও প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়। আতঙ্কোৎপাদক উপদ্রব অন্ততঃ কোন কোন স্থলে এইরূপ উত্তেজনার ও প্রতিহিংসাস্পৃহারই ফল, অনুমান করা যাইতে পারে। আতঙ্কোৎপাদক হত্যাদির দ্বারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাইবে এরূপ বিশ্বাস, এই সব কাজ যাহারা করে তাহাদেরও সকলের আছে কি না সন্দেহস্থল।

যে-সব খবর আমরা হয়ত বিকৃত আকারে শুনি কিন্তু আমাদের সহযোগীরা ছাপেন না এবং আমরাও ছাপি না, তাহার কোনটিই যে ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়া যায় না তাহা নহে। কতকগুলি খবর যে ইউরোপে ও আমেরিকায় পৌছে, তাহা হইতে অনুমান হয় সেগুলি ভারতবর্ষেও খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্রপাঠকেরা পড়িয়াছেন, জেনিভার অধ্যাপক প্রিভা ভারতবর্ষ হইতে দেশে ফিরিয়া গিয়া বিলাত যান এবং সেখানকার লোকদিগকে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অনেক সত্য সংবাদ সভাসমিতিতে ও কথাবার্ত্তায় সাহায্যে জানাইতে চেষ্টা করেন। তাঁহার এই চেষ্টায় বিলাতে ব্যাপকভাবে লোকমতের কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকিলেও এবং তজ্জন্য তাঁহার মনে নিরাশার উদ্রেক হইয়া থাকিলেও খবরগুলা সেখানে পৌছিয়াছে। সুতরাং টেলিগ্রাফ ও চিঠির দ্বারা খবর পাঠান সম্বন্ধে অনেক বাধা সৃষ্ট হইয়া থাকিলেও বাধাগুলা কর্ত্তৃপক্ষের অভিলষিত ফল উৎপাদন করে নাই। অধ্যাপক প্রিভা তাঁহার পত্নীর সহিত যখন আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তখন বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সত্য প্রচারের চেষ্টা করিবেন। তিনি সুইজার্ল্যাণ্ডের লোক, ফরাসী তাঁহার মাতৃভাষা, কিন্তু যাহারা ইংরেজ নহে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্য সংবাদ কেবল যে তাহাদের নিকটই পৌছিতেছে বা তাহাদের দ্বারাই ভারতবর্ষের বাহিরে প্রচারিত হইতেছে তাহা নহে। ইংলণ্ডের ইংরেজরাও সাক্ষাৎভাবে এরূপ খবর পাইতেছে।

"দি নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান এণ্ড নেশ্যন" বিলাতের একটি

প্রধান সাপ্তাহিক কাগজ। গত এপ্রিল মাসের একটি সংখ্যায় তাহাতে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

Side by side with the decision to ban the annual session of the Indian Congress come terrible reports of the "irregularities" now occurring in India under the rule of the Ordinances. Very few of these reports appear in the daily Press in this country. The American public are more fully informed and the accounts given by visitors to India and by private letters from Indians and Englishmen in India form altogether a body of evidence which cannot be ignored. One practice, bitterly complained of by Englishmen and women who have seen it in operation, is the use of a "cat-and-mouse" system. Political prisoners—often respectable persons of moderate views—are released on condition that they report at frequent intervals to the police. In many cases they are told to report within a few hours of their release. Conscious of no offence, they refuse to give their word, do not report and are then re-arrested and given long sentences, not as political prisoners but as ordinary criminals. Savage *lathi* beatings are reported daily and there are well-authenticated instances of prisoners being marched about in heavy chains. An inquiry might prove that some of the more shocking stories—we shall await with interest the inquiry into the alleged stripping and flogging of women reported by the *Daily Herald* correspondent in Bombay—are exaggerated, but exaggerations are as inevitable under a system of censorship as "irregularities" and brutalities are certain under a system which leaves a whole population at the mercy of an irresponsible police.

আমেরিকায় কিরূপ খবর পৌঁছিতেছে, তাহারও একটি নমুনা দিতেছি। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রধান শহর নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত "নিউ রিপাব্লিক" নামক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হইয়াছে :—

The censorship is as complete as it can be made, both of the mails and of newspapers—so complete, indeed, that even a report to the Labour Party in Great Britain was taken out of the mail. British soldiers and Indian troops which are loyal to the government are daily practising the most horrible cruelties upon prisoners whose only crime consists in wanting their country to be free. *The New Republic* has seen well authenticated statements describing a number of cases of torture and humiliation of an unprintable character. It is probably true that the followers of the Indian National Congress are hard to deal with; but if they are, much of the blame must be assessed against their English rulers who descend to such tactics.

নিউ রিপাব্লিক যে-সকল খবরের কথা লিখিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের কোন ভাষায় লেখা নয়, ইংরেজীতে লেখা। এবং ইহাও নিশ্চিত, যে, ঐ সব সংবাদ ভারতবর্ষে ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত কোন কাগজে বাহির হয় নাই। ইংরেজী ভাষায় দেশী লোকদের দ্বারা পরিচালিত প্রায় সমুদয় কাগজ আমরা পাইয়া থাকি। যাহা সাতিশয় ভয়ঙ্কর অথবা এরূপ অশ্লীল যে অমুদ্রণীয়, এরূপ কোন অত্যাচারের বা অবমাননার সংবাদ আমরা এই সব প্রকাশ্য সংবাদপত্রে দেখি নাই, সুতরাং তাহার সত্যতা অসত্যতা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। অথচ আমেরিকার এই কাগজটি সেরূপ সংবাদ পাইয়াছেন এবং বলিতেছেন, যে, সেগুলি "ওয়েল অথেন্টিকেটেড" অর্থাৎ এরূপ যাহার সত্যতার প্রমাণ প্রয়োগ উত্তমরূপে করা হইয়াছে। কি প্রমাণ, আমরা তাহা না জানায় তদ্বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, ইউরোপ ও আমেরিকায় যে-সব সংবাদ পৌঁছিতেছে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা এখন আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা কেবল ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছি, যে, সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার সম্বন্ধে যে-সকল অর্ডিন্যান্স ও নিয়ম করা হইয়াছে তাহা ফলপ্রদ হয় নাই, হইতে পারে না। সেগুলা রদ করিলে বরং গবন্মেণ্ট অত্যাচার বা অত্যাচার-সম্বন্ধীয় গুজব জানিতে পারিয়া প্রতিকার করিতে পারিবেন।

দিল্লীতে কংগ্রেসের গত অধিবেশন হইবার অল্প দিন পূর্ব্বে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কাশী হইতে বিলাতে একটি দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠাইবার চেষ্টা করেন। কি প্রকারে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করা হয়, খবরের কাগজে তাহা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু ভারতসচিব স্তর সামুয়েল হোর পার্লেমেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মালবীয় মহাশয়ের টেলিগ্রামটিতে ভুল সংবাদ থাকায় তাহার প্রেরণ বন্ধ করা হয়! তাহা হইলে ভারতসচিবের মতে বিলাতী কাগজ-গুলাতে তাহাদের সংবাদদাতাদের প্রেরিত ভারতীয় সংবাদ-গুলা ধ্রুব সত্য! তাহাই না হয় হইল; কিন্তু তাহা হইলে স্তর সামুয়েল হোরকে হয়ত ইহাও মানিতে হইবে, যে, বিলাতী ডেলী হেরাল্ড ও নিউ ষ্টেটসম্যান এবং আমেরিকার নিউ রিপাব্লিক যে-সব খবর পাইয়াছেন এবং যাহা ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় পৌঁছিতে দেওয়া হইয়াছে (অন্ততঃ যাহার প্রেরণ ও প্রাপ্তি গবন্মেণ্ট বন্ধ করিতে পারেন নাই) সেই সমস্ত সংবাদও সত্য। তিনি হয়ত

বলিবেন, এগুলা সত্য নহে; ভারতীয় গবন্মেণ্ট এগুলার প্রেরণের খবর পাইলে প্রেরণ বন্ধ করিতেন, খবর পান নাই বলিয়া বন্ধ করিতে পারেন নাই। ইহাতে আমাদের এই কথাই প্রমাণ হইতেছে, যে, গবন্মেণ্ট সত্য বা মিথ্যা বিস্তর সংবাদের প্রচার বন্ধ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এবং গবন্মেণ্টের মতে যে-রকম সংবাদ বেশী বিপজ্জনক তাহাও অতি দূরদেশেও পৌঁছিতেছে। অথচ তাহা আইনসঙ্গত আকারে ও ভাষায় ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইতে দিলে প্রতিকারের উপায় গবন্মেণ্টের হাতে থাকে।

—

হিংসা ও অহিংসার বিরুদ্ধে একই অস্ত্র প্রয়োগ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টকে দুই ভিন্নপন্থী লোকদের সঙ্গে লড়িতে হইতেছে। কংগ্রেস অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কংগ্রেসের অসহযোগ ও নিরুপদ্রব ভাবে আইন অমান্য করিবার পন্থা দেশের সর্ব্বত্র এত বেশী লোকে অবলম্বন করিয়াছে, যে, তাহাদের মধ্যে একজনও অহিংসার পথ হইতে চ্যুত হয় নাই বলা কঠিন—বিশেষতঃ যখন সরকারী কঠোর দমননীতির অনুমোদিত লাঠি-প্রয়োগাদি দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজনা জন্মিবার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই রহিয়াছে; কিন্তু মোটের উপর ইহা সত্য, যে, কংগ্রেসওয়ালারা অহিংসার পথে প্রতিষ্ঠিত আছে।

আর কতকগুলি লোকের বিরুদ্ধেও গবন্মেণ্টকে লড়িতে হইতেছে যাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে টেরারিষ্ট অর্থাৎ যাহারা হত্যাকাণ্ড প্রভৃতির দ্বারা আতঙ্ক উৎপাদন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে চায়। ইহাদের সংখ্যা কত কেহ বলিতে পারে না। তবে ইহাদের কাজ দেখিয়া মনে হয় ইহাদের সংখ্যা বেশী নয়।

গবন্মেণ্টের প্রতিপক্ষ একদল মারিতে চায় না, কিন্তু মরিতে প্রস্তুত; অন্যদল মারিতে চায়, মরিতেও প্রস্তুত। সরকার বাহাদুর উভয় দলকেই একবিধ উপায়ে, নানা প্রকার রেগুলেশ্যন অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া, কাবু করিতে ও পিষিয়া ফেলিতে চান। ইহা সমীচীন নহে। যদিও হিংসা দ্বারা হিংসাকে নাশ করা যায় না, তথাপি যে মারিতে চায় ও মারে তাহাকে মারিয়া ফেলা আদিম মানবপ্রকৃতি ন্যায়সঙ্গত মনে করিতে পারে। কিন্তু যে আঘাত করিতে চায় না, আঘাত করে না, তাহাকে আঘাত করিলে তাহার প্রতি দর্শক ও শ্রোতাদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক হয় এবং তাহার দল বাড়িতে থাকে—এমন কি এই কারণে হিংসাবাদীদের দলও বাড়িয়া যাইতে পারে।

এই সব কারণে আমরা মনে করি গবন্মেণ্ট শান্তির পথে চলিলে সুফল উৎপন্ন হইবে।

—

টেরারিস্টদের সম্বন্ধে বঙ্গের সাবেক লাট

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার ষ্টানলী জ্যাক্সন বাড়ি পৌঁছিয়া বঙ্গের আতঙ্কোৎপাদকদের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই মত মিঃ ডাগলাসের হত্যার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"Terrorism in Bengal is still rather serious, but, during the past two months, there has been a very marked change in public opinion, on which you must depend if you want to deal satisfactorily with terrorism You must depend also on Indian assistance. If you can get Indians to say that they will not have terrorism, they will help you to secure possibly those responsible for terrorism. It is most difficult to get any information regarding terrorists, though, I suppose, we have the finest C. I. D. service in India Some terrorists are actuated by strong patriotic feeling and others by strong race hatred, which is most carefully sown amongst the people of Bengal by clever propagandists and also by the vernacular press.

টেরারিজম্ অর্থাৎ আতঙ্কোৎপাদনবাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে লোকমতের উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং এই লোকমত জ্যাক্সন সাহেবের মতপ্রকাশের পূর্ব্বের দুই মাসে বিভীষিকাবাদের অধিকতর বিরোধী হইয়াছে, তিনি এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কাহাকে লোকমত বলিয়াছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। কারণ, দ্বিতীয় বাক্যে তিনি বলিতেছেন, "ভারতীয়দের সাহায্যের উপরও ("also on Indian assistance") নির্ভর করিতে হইবে।" এই যে "অল্‌সো" কথাটির প্রয়োগ, ইহা হইতে ব্যাকরণ এবং তর্কশাস্ত্র অনুসারে এই বুঝায়, যে, লোকমত এবং ভারতীয়দের সাহায্য দুটি আলাদা জিনিষ। তাহা হইলে কি জ্যাক্সন সাহেব ইংরেজদের মতকেই লোকমত

বলিয়াছেন এবং ভারতীয়দের সাহায্য অধিকন্তু আর একটা জিনিষ মনে করেন? ইংরেজদের মত ত বরাবরই চূড়ান্ত রকমে বিভীষিকাবাদের বিরুদ্ধে ছিল; তাহার আর বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? যাহা হউক, ভূতপূর্ব্ব বঙ্গের লাটের বাক্য-বিন্যাসের দোষে কিছু সন্দেহ জন্মিলেও আমরা ধরিয়া লইতেছি তিনি দেশী লোকদের মতকেও লোকমত বলিয়াছেন।

বিভীষিকাবাদের উচ্ছেদসাধনে আন্তরিক লোকমতের কার্য্যকারিতা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে এই কার্য্যকারিতা এই একটি সর্ত্তের উপর নির্ভর করে, যে, গবন্মেণ্টকে সকল বিষয়েই লোকমতকে শ্রদ্ধেয় মনে করিতে হইবে। যখন লোকমত বলিবে, "বিভীষিকাবাদ সাতিশয় গর্হিত, জঘন্য, অনিষ্টকর ও ঘৃণ্য," তখন গবন্মেণ্ট বলিবেন, "এদেশের লোকেরা বড় বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও সত্যভাষী"; কিন্তু যখন লোকমত বলিবে, "বিনা বিচারে বন্দীকরণ, লাঠিপ্রয়োগ, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের ন্যায্য স্বাধীনতার লোপ নিন্দনীয় ও অহিতকর, অতএব এই সমস্ত রহিত করিয়া অচিরে ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপন আবশ্যক" তখন গবন্মেণ্ট বলিবেন, "তোমরা অতি নির্ব্বোধ এবং ভারতের হিতাহিত বুঝ না, আমরা তাহা খুব ভাল করিয়া বুঝি", — এরূপ হইলে কোন ফল হইবার কথা নয়, ফল হইতেছেও না; যদিও সভাসমিতিতে ও সমুদয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত লোকমত একবাক্যে বরাবর বিভীষিকাবাদকে মন্দ বলিয়াছে। গবন্মেণ্ট যদি বিভীষিকাবাদীদিগকে বুঝাইতে চান, যে, লোকমতের অনুসরণ করা তাহাদের কর্ত্তব্য, কারণ উহা শ্রদ্ধেয় ও মূল্যবান, তাহা হইলে গবন্মেণ্টের নিজের ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ করা চাই, যে, সরকার সত্যসত্যই লোকমতকে মূল্যবান্ ও শ্রদ্ধেয় মনে করেন।

ভূতপূর্ব্ব লাটসাহেব বলিতেছেন, অনেক বিভীষিকাবাদী প্রবল স্বদেশপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত, অন্যেরা প্রবল জাতিগত বিদ্বেষ দ্বারা প্রণোদিত, এবং এই জাতিগত বিদ্বেষ চতুর প্রচারকদের এবং দেশভাষার সংবাদপত্রসমূহেরও দ্বারা সযত্নে বাঙালীদের মধ্যে বপন করা হয়। এখানে জাতিগত বিদ্বেষ বলিতে অবশ্য বক্তা ইংরেজ-বিদ্বেষ বুঝাইতে চান। ইহা সত্য কথা, যে, ভারতবর্ষের ও বাংলা দেশের লোকেরা ইংরেজ কিংবা অন্য কোন বিদেশীর অধীন থাকিতে চায় না এবং ইহাও চায় না, যে, বাণিজ্য বা অন্য সূত্রে ভারতবর্ষের ধন বাহিরে যায়। কিন্তু মনের এই রকম ভাবকে জাতিগত বিদ্বেষ মনে করা ও বলা ভুল। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই মনের ভাব এই রকম; কোন জাতিই অন্য জাতি কর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত ও শোষিত হইতে চায় না। যে-সব সরকারী বা বেসরকারী ইংরেজ বিভীষিকাবাদ সম্পর্কে জাতিগত বিদ্বেষের কথা তুলেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, ভারতবর্ষে ও বঙ্গে যত ইংরেজ বাস করে, তাহাদের অতি অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া সবাই নির্ভয়ে দেহরক্ষীর সাহায্য না লইয়া বাস করে ও চলাফিরা করে, খুব কচিৎ দু-একজন হয়। তাহারাও, মিঃ ভিলিয়ার্স এবং টেগার্ট ভ্রমে হত অন্য একজন ভদ্রলোক ছাড়া, সবাই রাজকর্ম্মচারী। সুতরাং সমুদয় ভারতপ্রবাসী ইংরেজের প্রাণ বধ করিবার জন্য এক দল লোক ব্যগ্র, এরূপ মনে করা ভুল। বাংলা দেশের খবরের কাগজগুলা এই অর্থে জাতিবিদ্বেষ প্রচার করে বলা নিতান্ত মিথ্যাবাদিতা।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ও বিদ্রোহীদের প্রভাবাধীন দুই একটা স্থান ছাড়া প্রত্যেক ইংরেজের প্রাণসংশয় ভারতে কোথাও হয় নাই; এখন শান্তির সময়ে ত কোথাও প্রত্যেক ইংরেজ বিপন্ন নহে। প্রত্যেক ইংরেজের প্রাণসংশয় এক সময়ে গ্রেটব্রিটেনেরই অন্তর্গত ওয়েলসে হইয়াছিল। সেই বিষয়ে বার্ক্ তাঁহার আমেরিকার সহিত সদ্ভাব স্থাপন বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—

"The people [of Wales] were ferocious, restive, savage, and uncultivated; sometimes composed never pacified. Wales, within itself, was in perpetual disorder; and it kept the frontier of England in perpetual alarm."

"... an Englishman travelling in that country could not go six yards from the high road without being murdered."

ইংরেজরা স্বদেশে বিদেশে এই ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছেন, যে, এদেশে তাঁহারা বড়ই বিপন্ন, বেজায় বীর সাহসী ও সতর্ক বলিয়া তাঁহারা কোনমতে টিকিয়া আছেন। কিন্তু বার্ক যেমন ওয়েলসের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা কি বাংলা দেশ সম্বন্ধে তেমনি বলিতে

পারেন, "এদেশে ভ্রমণকারী ইংরেজ নিহত না হইয়া সরকারী রাস্তা হইতে ছয় গজ যাইতে পারে না ?"

ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও এখানে বার্কের অন্য কতকগুলি কথার তাৎপর্য্য জানাইতে চাই। তিনি বলিয়াছেন, ওয়েলসকে সায়েস্তা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার কঠোর আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। তথায় অস্ত্রের আমদানী বন্ধ করা হইয়াছিল, ওয়েল্শ্‌দিগকে নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। তাহাদের ব্যবসায়ে বাধা জন্মান হইয়াছিল, তাহাদিগকে বাজার ও মেলার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। পনর পনরটা কঠোর দমনমূলক আইন ওয়েলসের বিরুদ্ধে প্রণীত ও প্রযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহার পর যখন রাজা অষ্টম হেনরী তাহাদিগকে ইংরেজ প্রজাদের সমুদয় অধিকার দিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে যেন জাদু দ্বারা সব গোলমাল উপদ্রব থামিয়া গেল ; আইনানুগত্য পুনঃস্থাপিত হইল এবং স্বাধীনতার পশ্চাতে পশ্চাতে শান্তি শৃঙ্খলা ও সভ্যতার আবির্ভাব হইল (When Henry VIII "gave to the Welsh all the rights and privileges of English subjects," "from that moment, as by a charm, the tumults subsided ; obedience was restored, peace, order, and civilization followed in the train of liberty")।

—

বিভীষিকাবাদ সম্বন্ধে চিন্তা আবশ্যক

ইংরেজরা ও অনেক অবাঙালী (এমন কি কোন কোন বাঙালীও) এমন কথা বলেন, যাহাতে মনে হয় যেন বিভীষিকাবাদ বঙ্গেরই একটা নিজস্ব ব্যাধি। কিন্তু শুধু বাংলা দেশের কথা ভাবিলে ইহার প্রতিকারের উপায় আবিষ্কৃত হইবে না। বাংলা দেশ হইতে অনেক দূরবর্ত্তী ভারতীয় অনেক স্থানে হিংসাবাদীদের কাজের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। তাহার পর, ইউরোপের ফ্রান্স ও অন্য কোন কোন দেশে, আফ্রিকার মিশরে, এশিয়ার জাপান ও চীনে, আমেরিকার কয়েকটা দেশে বিভীষিকাবাদীদের উপদ্রবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল দেশে কি কারণে এই প্রকার উপদ্রব ঘটিতেছে, সে বিষয়ে সন্ধান লইলে বঙ্গের বিভীষিকাবাদেরও নিদান আবিষ্কারে সাহায্য হইবে। কোথাও রাষ্ট্রীয় দুরবস্থাজাত অসন্তোষ, কোথাও সত্য বা কল্পিত অত্যাচারের প্রতিশোধ ইচ্ছা, কোথাও সামাজিক অবজ্ঞা লাঞ্ছনা উৎপীড়ন, কোথাও বা আর্থিক বিষয়ে অবিচার ও বৈষম্য ইহার মূলীভূত। এই সমুদয় কারণের উচ্ছেদসাধন একদিনে হইবার নহে। কিন্তু যদি অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত লোকেরা দেখে, যে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ, সমাজনেতৃবর্গ, এবং পণ্যশিল্প ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যক্তিগণ নিঃস্বার্থ অকপট ভাবে প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তাহাদের উত্তেজনা প্রশমিত হইতে পারে।

ইংলণ্ডের চেয়ে কোন দেশের লোকদের স্বাধীনতা অধিক নহে এবং সেখানে বেকার লোকদের জন্য ব্যবস্থা আছে এবং চিন্তা করিবার লোকও আছে। সেখানে বিভীষিকাবাদ স্থান না পাইবার সম্ভবতঃ ইহা একটি কারণ।

আজকাল অতীত সকল যুগ অপেক্ষা পৃথিবীর সকল দেশের সহিত সকল দেশের সংস্পর্শ বাড়িয়াছে। এই জন্য অন্যান্য ব্যাধির মত কোথাও বিভীষিকাবাদের প্রাদুর্ভাব হইলে ভারতবর্ষে তাহা সংক্রামিত হইতে পারে। এই জন্য ভারতবর্ষে উহা বিনষ্ট করিতে হইলে বিদেশেও উহা বিনষ্ট হওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীর ইতিহাসে, নানা দেশের ইতিহাসে, দেখা যায়, যাহারা যুদ্ধে হাজার হাজার লোক মারিয়া জয়ী হইয়াছে, তাহারা দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়াছে। এখনও যে-দেশের যুদ্ধে মানুষ মারিবার আয়োজন ও শক্তি যত বেশী জগতে তাহার মানসম্ভ্রম তত বেশী। এবং স্বাধীন অস্বাধীন সমুদয় দেশের গবর্ন্মেণ্টসমূহ অস্ত্রবলকেই নিজেদের শক্তির শেষ ভিত্তি এবং তাহা রক্ষার চরম উপায় মনে করেন। বিভীষিকাবাদ কেন উদ্ভূত হইয়াছে এবং সহজে কেন তাহার উচ্ছেদ সাধিত হইতেছে না, তাহা বুঝিতে হইলে এই সব কথাও মনে রাখিতে হইবে।

গভীর চিন্তায় অনভ্যস্ত এবং অদূরদর্শী ইংরেজরা মহাত্মা গান্ধীকে ও কংগ্রেসকে বিভীষিকাবাদের জন্য

দায়ী করে। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত, বিভীষিকাবাদের প্রবলতম শত্রু ও বিনাশকর্ত্তা কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি চরম শান্তিবাদী (pacificist) এবং বিভীষিকাবাদের বিরোধী যুদ্ধেরও বিরোধী। বিভীষিকাবাদের ও শান্তিবাদের বিরোধিতা একই মানুষ করিলে তাহার চিন্তাপ্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি দোষ আছে বুঝিতে হইবে।

—

নিরস্ত্রীভবন কন্ফারেন্সে

পৃথিবীর স্বাধীন জাতিদের নিরস্ত্রীভবন বা নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব ও তাহার আলোচনা অনেক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রবল জাতিরা কেহ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হইতে ত চাই-ই না, যুদ্ধসজ্জা কমাইতেও চায় না;—সকলেরই ভয় পাছে আর কোন জাতির যুদ্ধসজ্জাটা বেশী রকম হইয়া বা থাকিয়া যায়। এই জন্য নিরস্ত্রীকরণ বা নিরস্ত্রীভবনের প্রস্তাবটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যুদ্ধের সাজসজ্জার লোপে নহে, তাহার হ্রাসে। জলে স্থলে আকাশে তাহা কে কত কমাইবে, এখন তাহারই তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। জেনিভাতে এতদ্বিষয়ক কনফারেন্সের অনেক বৈঠকও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সকলের সাজসজ্জা কিছু কমিলেও কোন কোন জাতি কোন কোন জাতি অপেক্ষা প্রবল থাকিবে, যে-সব জাতি অন্য কোন জাতির দেশ দখল করিয়া আছে তাহাদের তাহা দখল করিয়া থাকিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইবে না, পরাধীন জাতিরা স্বাধীন হইতে পারিবে না, এবং বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ ও যুদ্ধসজ্জা বিষয়ে অনুন্নত স্বাধীন জাতিদের স্বাধীনতা হরণ অপেক্ষাকৃত কম যুদ্ধসজ্জা লইয়াও অনেক জাতি করিতে পারিবে এবং সেইজন্য সেইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রলুব্ধ হইবে। অতএব কেবল হারাহারি সব স্বাধীন জাতির যুদ্ধসজ্জা-হ্রাস দ্বারা পৃথিবী হইতে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ লুপ্ত করিতে ও শান্তি স্থাপিত করিতে পারা যাইবে না। জগদ্ব্যাপী শান্তি স্থাপন করিতে হইলে প্রত্যেক জাতিকে অস্ত্রের সহিত যুদ্ধের সব সরঞ্জাম বর্জ্জন করিতে হইবে। অবশ্য কেবল নিজের নিজের দেশে চোর ডাকাত গুণ্ডা প্রভৃতিকে নিয়মাধীন রাখিবার জন্য যেরূপ অস্ত্রশস্ত্র ও সিপাহী-শান্ত্রীর প্রয়োজন, তাহা রাখিতে হইবে; যেমন ডেন্মার্কে আছে।

সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীভবনের প্রস্তাব জেনিভার কনফারেন্সে হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত ইউরোপের অন্য সব দেশের লোক রুশিয়ার বলশেভিকদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞা করে, এবং আপনাদের ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যীশুখ্রীষ্টকে প্রিন্স অব্ পীস্ অর্থাৎ শান্তিরাজ বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু সকল জাতির নিরস্ত্রীভবনের এবং তদ্দ্বারা সকলের যুদ্ধবল সমীকরণের প্রস্তাব খ্রীষ্টীয় বলিয়া অভিহিত কোন জাতির প্রতিনিধির দ্বারা উপস্থাপিত হয় নাই—উপস্থাপিত হইয়াছিল ধর্ম্মদ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞাত সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিনিধি লিটভিনফের দ্বারা। তিনি প্রস্তাব করেন, যে, কন্ফারেন্সের কার্য্যের ভিত্তি সকল জাতির সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ নীতির উপর স্থাপিত হউক। তিনি তাঁহার প্রস্তাবের সপক্ষে যে যুক্তি দেখান তাহা এই, যে, যুদ্ধ হইতে নিরাপত্তা কেবল মাত্র অস্ত্রাদি যুদ্ধসজ্জা সম্পূর্ণ রহিত করিলে লব্ধ হইতে পারে, এবং সকল জাতি নিরাপদ হইতে পারে যদি সকলের নিরস্ত্র অবস্থার সাম্য জন্মে অর্থাৎ যদি সকলের যুদ্ধসজ্জা কমাইয়া শূন্যে পরিণত করা হয়। লিটভিনফ বক্তৃতা শেষ করিয়া বসিবার পর সভাপতি সকল প্রতিনিধির মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন—যেন কে অতঃপর কিছু বলিবেন তাহার প্রতীক্ষায়। তখন তুরস্কের (কোনও খ্রীষ্টীয় জাতির নহে) প্রতিনিধি টিউফিক্ দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি এই প্রস্তাবের পক্ষে, যদি ইহার মানে সাম্য হয়।" তাহার পর পারস্যের প্রতিনিধি বলিলেন, "এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে আমি সুখী হইব।" অতঃপর জার্মেনীর প্রতিনিধি বলিলেন, "আমার সহানুভূতি আছে।" গ্রীসের প্রতিনিধি "ঠাণ্ডা জল ঢালিতে" অর্থাৎ নিরুৎসাহ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "আগে পরস্পরে বিশ্বাস চাই। এই প্রস্তাব অস্ত্রসজ্জা-হ্রাসের ও নিরস্ত্রীকরণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বাধা জন্মাইবে।" তদনন্তর স্পেনের প্রতিনিধি ইংরেজ সাইমন ও রুশ লিটভিনফের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তার পর মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য

বৈঠক দু-ঘণ্টা স্থগিত রহিল। আহারের পর সকলে ফিরিয়া আসিলে ভোট লওয়া হইল। কেবল মাত্র দুই জন প্রতিনিধি সকল জাতির সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীভবনে মত দিলেন। তাঁহারা নিরীশ্বর ("Godless") রুশিয়ার লিটভিনফ এবং "অকথ্য তুর্ক" ("the unspeakable Turk") প্রতিনিধি টিউফিক্‌।

আমেরিকার "ইউনিটি" কাগজের জেনিভাস্থ সংবাদদাতা বলেন, নিরস্ত্রীকরণ ব্যর্থ হওয়ার জন্য প্রধানতঃ ইংরেজীভাষী আমেরিকা, ব্রিটেন এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা, কানাডা ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ দায়ী। কারণ কন্‌ফারেন্সের সভাপতি, সেক্রেটারিয়েট, দুটি প্রধান নৌ-শক্তি, ধনীতম দুটি জাতি, বৃহত্তম সাম্রাজ্য দুটি, শান্তির সপক্ষে খবরের কাগজ গির্জ্জার উপদেশ ও বক্তৃতাদি দ্বারা প্রচার কার্য্য চালাইবার সুশৃঙ্খলতম ব্যবস্থা—এই সমস্তই ইংরেজীভাষী জাতিদের। কন্‌ফারেন্সের ব্যর্থতার জন্য দায়ী ইহাদের পরে ফ্রান্স জাপান পোলাণ্ড প্রভৃতি। "ইউনিটির" সংবাদদাতা মিঃ সিডনী ষ্ট্রং নিজের দেশ আমেরিকাকে বাদ দেন নাই, দোষীদের সকলের নামের আগে আমেরিকার নাম বসাইয়াছেন।

—

চীনজাপান যুদ্ধ ও কয়েকটি সভ্য জাতি

একদিকে জগতে শান্তিস্থাপনের জন্য জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্সের বৈঠক বসিতেছে, অন্যদিকে চীনে জাপানে যুদ্ধ চলিতেছে এবং জাপান জাতিসংঘের মুখের উপর তুড়ি মারিতেছে—এদৃশ্য একটি শোচনীয় ঐতিহাসিক প্রহসন। কেন এরূপ ঘটিয়াছে তাহার অনেক কারণ অনুমিত হইয়াছে এবং প্রকৃত কারণের কিছু আভাসও আগে পাওয়া গিয়াছিল।

আমেরিকার "ইউনিটি" বলিতেছেন, ইউরোপের অনেক দেশ—ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া—চীন ও জাপান হইতে বিস্তর যুদ্ধোপকরণ ও যুদ্ধসজ্জার, তোপ-গোলা-গুলি বারুদ এরোপ্লেন সৈনিকদের পোষাকের কাপড় ইত্যাদির, ফরমাইস পাওয়ায় তাহাদের ব্যবসার "বাজার মন্দা" অবস্থা কাটিয়া গিয়া বাণিজ্য খুব জোরে চলিতেছে। পাউণ্ডের দাম কম হওয়ায় ইংলণ্ডেরই সুবিধা সকলের চেয়ে বেশী হইয়াছে। বিশেষ বৃত্তান্ত 'ইউনিটি'র নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিতে পাওয়া যাইবে।

A lot of light is shed on the reluctance of the western powers to interfere with the Sino-Japanese conflict by the reports of the business boom this conflict has brought to Europe. For the first time in years, business is looking up, thanks to huge orders for military supplies from both China and Japan. Britain, aided by the low cost of the pound sterling, is feeling the quickest and largest measure of prosperity. Her airplane factories for example, are working overtime for the Mikado. In France, the Japanese are buying machine-guns, and light and heavy artillery units. Germany is manufacturing munitions and explosives in huge quantities. But this is not all! For both the Japanese and the Chinese, according to well authenticated reports, are placing large orders for textiles and woolen cloth in Czechoslovakia and in Poland. The artillery division of the Skoda works in Czechoslovakia has orders from the East for artillery parts. It is well known, of course, that the French Schneider Creusot Company has a fifty per cent interest in the Skoda works. All of which means that for the moment at least, Europe is being kept alive commercially and financially by the Asiatic embroilment! Indeed, if the Sino-Japanese war could only be turned into a really first class conflict and thus kept raging some three or four years or more, like the World War, Europe would find therein the solution of all her economic difficulties, at least for the time being. War, in other words, is initially profitable to those, at least, outside the area of conflict. It creates business by opening an enormous market for arms, munitions and machinery, and by destroying incalculable totals of wealth which must be promptly replaced if the world is to survive. What wonder that the European powers didn't want to stop the Asiatic conflict too soon! How obvious that every nation, east and west, is beset by interests which regard war, and preparedness for war, as a condition of prosperity, and peace as an economic disaster of the first magnitude.

অতঃপর অবশ্য ইউনিটি বলিতেছেন, যুদ্ধকে সম্পদের কারণ এবং শান্তিকে আর্থিক মহাবিপদ মনে করা অগভীর বিচারের ফল, ইংরেজ লেখক নর্ম্যান এঞ্জেল প্রমাণ করিয়াছেন বর্ত্তমান অতিজটিল যুগে যুদ্ধ সকল দেশেরই ধ্বংসের কারণ হইবে। কিন্তু সদ্য সদ্য লাভ ও ঐশ্বর্য্যের আপাতমধুর মোহ ভেদ করিয়া কোন্ জাতির চক্ষু পরিণামের মহতী বিনষ্টি দেখিতে পায়?

—

ফিলিপাইন্সের স্বাধীনতালাভে বিলম্ব

বৈশাখের প্রবাসীতে "ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা অদূরে" শীর্ষক নিবন্ধিকায় আমরা লিখিয়াছিলাম,

"গত ৪ঠা এপ্রিল ২২শে চৈত্র তারিখে [আমেরিকার] কংগ্রেসের প্রতিনিধিসভায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে আট বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা দিবার অঙ্গীকার আইন পাস হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সকলের চেয়ে সুসংবাদ। কারণ, যদিও এখনও বিলটির সেনেটে পাস হইয়া প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষর পাইতে বাকী আছে তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন যে প্রারম্ভিক পরীক্ষা, তাহাতে উহা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা ইহা ধরিয়া লইয়া এই সব মন্তব্য করিতেছি, যে, খাঁটি স্বাধীনতা ফিলিপিনোরা পাইবে।"

গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে রয়টার আমেরিকা হইতে যে টেলিগ্রাম এদেশে পাঠায়, তাহাতে ছিল, "গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমেরিকার কংগ্রেসে যাহা তর্কবিতর্কের বিষয় ছিল তাহার শেষ মীমাংসা হইল।" রয়টার এরূপ লেখা সত্ত্বেও আমরা অনুমান করিয়াছিলাম, শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই, ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা দান বিষয়ক আইন এখনও সেনেটে পাস হয় নাই, এবং উহা আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইতেও এখনও বাকী আছে। এই অনুমান ঠিক্। ১৩ই এপ্রিল তারিখের নিউইয়র্কের নিউ রিপাব্লিকে দেখিতেছি, ফিলিপিনো স্বাধীনতা বিল প্রতিনিধি-সভায় ৪৭ ভোটের বিরুদ্ধে ৩০৬ ভোটে পাশ হইয়াছে। উহার সপক্ষে এত বেশী ভোট হওয়া সত্ত্বেও নিউ রিপাব্লিক মনে করেন, কার্য্যতঃ অবিলম্বে উহা ফলপ্রদ হইবে না; সেনেট যদি স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয় তাহা হইলেও আটের পরিবর্ত্তে পনর বৎসর পরে স্বাধীনতা দিতে চাহিবে, যদি আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভা কংগ্রেসের উভয় কক্ষই একমত হয়, তাহা হইলেও প্রেসিডেণ্ট হুভার সম্ভবতঃ বিলটি নামঞ্জুর করিবেন। তাঁহার না-মঞ্জুরী সত্ত্বেও উহাকে আইনে পরিণত করিতে হইলে উভয় কক্ষের যে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের অনুমোদন আবশ্যক তাহা পাওয়া কঠিন হইবে।

আমেরিকান কাগজখানির এই মন্তব্য, শ্রেয়ের পথে যে বিঘ্ন অনেক, এই সংস্কৃত প্রবাদবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করে। যাহা হউক, নিউ রিপাব্লিকের অন্য এই কথা হইতে কতকটা আশ্বাস পাওয়া যায়, যে, "প্রতিনিধি-সভার এত সভ্যের অনুকূল ভোট অভিদ্যোতক (significant)—তাহা হইতে এই আশা ন্যায্য মনে হয়, যে, অদূর ভবিষ্যতে, যে-পথ স্বাধীনতার দিকে লইয়া যায়, ফিলিপিনোদের চরণ সেই পথে স্থাপিত হইবে।"

—

"সাবিত্রী"র ও "দেবী"র ভাগ্য

একটি আইরিশ স্ত্রীলোক, এখন বয়স ৫০, মিস্টার জাফর আলী নামক একজন মুসলমানকে বিবাহ করিয়া মিসেস জাফর আলী হন। তিনি এলাহাবাদে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় বিচারাধীন আছেন। মোকদ্দমার এক দিনের শুনানীর বিবরণে দেখিলাম, তিনি ফিকা বেগুনী রঙের শাড়ী এবং কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরিয়া আদালতে হাজির হইয়াছিলেন। ভারতীয় মুসলমানের ইউরোপীয় পত্নীকে হালফ্যাশন-দুরস্ত হইতে হইলে সিঁদুর পরিতে হয় কিনা জানি না। কিন্তু দেখিতেছি, এই স্ত্রীলোকটির হিন্দুনারীদের অন্য দুটি জিনিষেও লোভ আছে। তিনি নাম লইয়াছেন "সাবিত্রী" এবং পদবী লইয়াছেন "দেবী"। এই নাম ও এই পদবী উভয়ই বেওয়ারিস্! সাবিত্রীর পিতামাতা যখন এই নাম রাখিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভাবেন নাই, তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যার নামের এমন অংশীদার জুটিবে এবং যাঁহারা প্রথমে নিজেদের মহিলাদিগকে "দেবী" আখ্যা দিয়াছিলেন তাঁহারাও ভাবেন নাই সিনেমায় ও অন্যত্র উহার নানা রকমের এত দাবিদার খাড়া হইবে।

—

বাংলাকে বরাবর কম প্রতিনিধি দান

ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রধানতঃ বাংলা দেশের রাজস্ব হইতেই ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজ্যবিস্তার হইয়াছে এবং অন্য অনেক প্রদেশের শাসন-ব্যয়ের ঘাটতি বঙ্গের রাজস্ব হইতে পূরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি দেখা যায়, বাংলা দেশের লোকসংখ্যা, এখান হইতে সংগৃহীত রাজস্ব, শিক্ষা সভ্যতা ও কৃষ্টি বিষয়ে বঙ্গের অবস্থা ইত্যাদি যে-কোন মাপকাঠি অনুসারে বাংলা দেশকে ব্যবস্থাপক সভায়

যত প্রতিনিধি দেওয়া উচিত তাহা দেওয়া হয় নাই। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার-বিধি অনুসারে দশ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের যত প্রতিনিধি আছে তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল। তাহাতে দেখা যাইবে, অন্য কোন কোন প্রদেশ লোক-সংখ্যার যে অনুপাতে যত প্রতিনিধি পাইয়াছে, বঙ্গদেশ সে অনুপাতে তত পায় নাই।

প্রদেশ।	১৯২১ সালে লোকসংখ্যা।	প্রাতানাং।
মাদ্রাজ	৪২,৩১৮,৯৮৫	১৭
বোম্বাই	১৯,৩৪৮,২১৯	১৮
বাংলা	৪৬,৬৯৫,৫৩৬	২০
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৫,৩৭৫,৭৮৭	১৭
পঞ্জাব	২০,৬৮৫,০২৪	১২
বিহার-উড়িষ্যা	৩৪,০০২,১৮৯	১২
মধ্য-প্রদেশ	১৩,৯১২,৭৬০	১৬
আসাম	৭,৬০৬,২৩০	৫
দিল্লী	৪৮৮,১৮৮	১
ব্রহ্মদেশ	১৩,২১২,১৯২	৫
আজমেড়-মারওয়াড়া	৪৯৫,২৭১	১

ভারতবর্ষকে নূতন শাসনবিধি দিবার নিমিত্ত তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক দুইবার বসিয়াছে। দ্বিতীয় বারের বৈঠকের পর যে ফেডারেল ষ্ট্রাক্‌চার কমিটি নিযুক্ত হয়, তাঁহারা ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ কত প্রতিনিধি পাইবে, তাহার একটা আভাস দিয়াছেন। অবশ্য বলা হইয়াছে, যে, ইহা চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ নহে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ গোড়ায় যে-রকম মতলব লইয়া কাজ আরম্ভ করেন, শেষ পর্য্যন্ত মোটের উপর তাহাই স্থির থাকে। এই জন্য ফেডার‍্যাল ষ্ট্রাকচ্যর কমিটির ফর্দ্দটাতে বঙ্গের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহা আলোচিত হওয়া দরকার। লোকসংখ্যা সমেত ফর্দ্দটি এইরূপ।—

প্রদেশ	১৯৩১ সালে লোকসংখ্যা	উপরিতন কক্ষে প্রতিনিধি-সংখ্যা	নিম্ন কক্ষে প্রতিনিধি-সংখ্যা
মাদ্রাজ	৪৬৭৪৮৬৪৪	১৭	৩২
বোম্বাই	২২২৫৯৯৭৭	১৭	২৬
বাংলা	৫০১২২৫৫০	১৭	৩২
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৮৪০৮৭৬৩	১৭	৩২
পঞ্জাব	২৩৫৮০৮৫১	১৭	২৬
বিহার-উড়িষ্যা	৩৭৫৯০৩৫৬	১৭	২৬
মধ্য-প্রদেশ	১৫৪৭২৬২৮	৭	১২
আসাম	৮৬২২২৫১	৫	৭
উ. প. সীমান্ত	২৪২৫০৭৬	২	৩
দিল্লী	৬৩৬২৪৬	১	১
আজমীর	৫৬০২৯২	১	১
কুর্গ	১৬৩০৮৯	১	১
ব্রিটিশ বালুচীস্তান	৪৬৩৫০৮	১	১

বাংলা দেশের প্রতি এই অবিচার, যে, ১০।১২ বৎসর আগে হইতেই হইতেছে, তাহা নহে। তাহার পূর্ব্বেও ছিল। অন্যান্য প্রদেশের জন্য যাহা বরাদ্দ হইত, সকল স্থলে বাংলা দেশের জন্য তাহা বরাদ্দ হইত না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। লর্ড ল্যান্সডাউনের আমলে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি কিছু বড় করা হয়। অতিরিক্ত সভ্যদের সংখ্যা মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে করা হয় ২১ পর্য্যন্ত। কিন্তু বঙ্গে করা হয় ২০ পর্য্যন্ত। এখনও, বাংলা দেশকে ছোট করিয়া ফেলাতেও, উহার লোকসংখ্যা মাদ্রাজ ও বোম্বাই অপেক্ষা বেশী আছে; তখন আরও বেশী ছিল—৭ কোটি ছিল—কারণ ভৌগোলিক বাংলা ছাড়া উহার সঙ্গে বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা যুক্ত ছিল। তথাপি বাংলাকে তখন মাদ্রাজ ও বোম্বাই অপেক্ষা কম প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছিল। শুধু তাই নয়। নিয়ম করা হয়, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের অতিরিক্ত সভ্যদের অর্দ্ধেক বেসরকারী লোক হওয়া চাই, কিন্তু বঙ্গের বেলা নিয়ম হয়, যে, এক-তৃতীয়াংশ বেসরকারী হওয়া চাই।

—

রবীন্দ্রনাথের পারস্য-গমন

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের নানা স্বাধীন দেশে গিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্র আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ চীনের, জাপানের ও শ্যামের সম্বর্দ্ধনা তিনি পাইয়াছিলেন। জাভা ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রধানতঃ মুসলমান হইলেও সেখানেও তাঁহার অভ্যর্থনা বিশিষ্ট রকম হইয়াছিল। প্রাচীনহিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিদ্বীপে তিনি সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছিলেন। এবার তিনি পারস্য-নৃপতির নিমন্ত্রণে পারস্য-দেশে গিয়া সেখানে রাজা-প্রজার সম্মিলিত বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। অন্য একটি মুসলমান দেশ ইরাকের নৃপতির নিমন্ত্রণে এই

জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার ইরাক যাইবার কথা। পরে তুরস্ক যাইবারও কথা হইয়াছে, কিন্তু এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নানা দেশে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা তুচ্ছ ব্যাপার নহে। কিন্তু তাঁহার মারফতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ভারতবর্ষের আদর্শ ভাব চিন্তা ও সভ্যতার যে সংস্পর্শ ও যোগ স্থাপিত হইতেছে তাহাকেই তিনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

—

পূর্ব্ববঙ্গে ঝড়

বাংলা দেশের দুঃখের অন্ত নাই। আগেকার নানা দুঃখের অবসান হইতে-না-হইতেই ভীষণ ঝড়ে পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে। সম্পত্তিনাশ ত হইয়াছেই, মানুষের মৃত্যু এবং পশুর মৃত্যুও অনেক হইয়াছে। সকলের চেয়ে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে মৈমনসিংহের জেলের উপর দিয়া। তাহাতে বিস্তর কয়েদী মরিয়াছে, এবং আহত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী। বিস্তর লোককে পাওয়া যাইতেছে না।

নানা স্থানে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে। যাঁহারা কার্য্য দ্বারা এইরূপ সহানুভূতি দেখাইতেছেন, তাঁহাদের সমবেদনা মূল্যবান্।

—

বঙ্গে চুরি ডাকাতি খুন

বঙ্গের নানা জেলায় চুরি ডাকাতি ও খুনের খুব প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহার একটি কারণ দেশের আর্থিক দুরবস্থা। অন্য কারণ, শান্তি শৃঙ্খলা ও আইনের মর্য্যাদা রক্ষার ভার যাঁহাদের উপর তাঁহারা প্রধানতঃ রাজনৈতিক বেয়াদবীর উচ্ছেদসাধনে নিযুক্ত আছেন, দুর্বৃত্ততা নিবারণ করিবার সময় ও শক্তি তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের কৈফিয়ৎ কোন কোন প্রদেশের পুলিসের বার্ষিক রিপোর্টে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, কংগ্রেস লোককে আইন অমান্য করিতে শিখাইয়াছে, এই জন্য লোকে চুরি ডাকাতি প্রভৃতির নিষেধক আইন মানিতেছে না। কিন্তু কংগ্রেস ত কস্মিন্ কালেও দুর্নীতিনিবারক দুর্নীতি-নিষেধক আইন লঙ্ঘন করিতে কাহাকেও বলে নাই। বাঘে মহিষে লড়াইয়ে উলুবন যেমন বিধ্বস্ত হয়, তেমনি কর্ত্তৃপক্ষ ও পত্রিকা-সম্পাদকদের এতদ্বিষয়ক তর্কযুদ্ধের সুযোগে চোরডাকাতরা নিজেদের কাজ হাসিল করিতে অধিকতর মনোযোগী ও উদ্যমশীল না-হইলে সুখের বিষয় হইবে।

কংগ্রেস বিশেষ বিশেষ রকম আইন ও হুকুম অমান্য করিতে বলিয়াছে, সব নিয়ম লঙ্ঘন করিতে বলে নাই। কিন্তু সরকারী কোন কোন লোকের যুক্তির দৌড় দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন, দেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইতেছে এই জন্য, যে, লোকে কংগ্রেস দ্বারা বিপথচালিত হইয়া স্বাস্থ্যের নিয়মের সহিত অসহযোগ আরম্ভ করিয়াছে!

—

ডাকবাক্সে চিঠি-পোড়ান

কংগ্রেস এই প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছিল শুনিতে পাই, যে, চিঠিপত্র কম লিখিলে বা না লিখিলে এবং লিখিত চিঠি ডাকে না পাঠাইয়া অন্য উপায়ে পাঠাইলে সরকারী রাজস্ব কিছু কমিতে পারে। এই ইঙ্গিতের সহিত ডাকবাক্সের চিঠি-পোড়ানর সম্পর্ক অচিন্তনীয় না হইলেও, উহা নিশ্চয়ই চিঠি-পোড়ানর কারণ এবং তদ্রূপ দুর্বৃত্ততার জন্য কংগ্রেস দায়ী, মনে করা উচিত নহে। কংগ্রেসপন্থীরা এইরূপ অপকর্ম্ম করিতেছে, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। ইহা যে গুপ্তচরদের কাজ নয়, তাহার প্রমাণ কি?

—

প্রবর্ত্তক-সংঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

চন্দননগরের প্রবর্ত্তক-সংঘ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে তের দিন উৎসব করেন। এ বৎসরও করিতেছেন। তাহা শুধু আমোদ-প্রমোদ নহে। উৎসবের সহিত নানা হিতকর অনুষ্ঠান জড়িত থাকে। সকলগুলির সহিত আধ্যাত্মিকতার যোগ রাখিবার চেষ্টা আছে। প্রথম দিন মেলা ও প্রদর্শনীর প্রারম্ভিক সভা হয়। এবার প্রবাসীর সম্পাদককে তাহার সভাপতি করা হইয়াছিল। উৎসবের সহিত মেলা একটি সর্ব্বদেশীয় অতি প্রাচীন প্রথা। আমাদের দেশে স্বদেশী জিনিষের মেলা যত উৎসবে যত জায়গায় হয়, ততই ভাল। প্রবর্ত্তক-সংঘের প্রদর্শনীতে

শুধু যে স্বদেশী জিনিষ দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা নহে। কতকগুলি মাটির মূর্ত্তিসমষ্টি কালের অনুক্রমে পরে পরে বর্ণনাসমেত সাজাইয়া ভারতবর্ষে হিন্দুত্বের রক্ষা ও বিকাশ দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। যাঁহারা এই কাজটির পরিচালক তাঁহাদের কোন কোন ঐতিহাসিক মতের সহিত অনেক বিশেষজ্ঞের মত মিলিবে না। কিন্তু এরূপ চেষ্টা ব্যর্থ নহে, এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন কোন যুগের কেন্দ্রগত সত্য পরিচালকগণ ঠিক ধরিয়াছেন মনে হয়।

গত ১৩৩৮ সালের প্রধান প্রধান ঘটনা ও উক্তি তারিখ অনুসারে এবং চিত্র ও বর্ণনা সহকারে যে দেখান হইয়াছে, তাহাও বেশ হইয়াছে। কোন ব্যক্তিরই ঘটনা-নির্ব্বাচন বা নির্ব্বাচিত প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অপর সাধারণের মনঃপূত হইবে আশা করা উচিত নয়। এই জন্য মোটের উপর জিনিষটি কিরূপ হইয়াছে দর্শকদিগকে তাহাই বিবেচনা করিয়া উপভোগ করিতে ও উপকৃত হইতে হইবে।

হুগলী জেলার সাহিত্যসংগ্রহ আর একটি উপদেশপ্রদ ও দর্শনীয় জিনিষ।

সমালোচনার কথা আমরা কেবল একটি বলিব। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা অভ্রান্ত নহেন। তাঁহাদের অনেকের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে—সমুদয় প্রাচ্য দেশ সম্বন্ধে—কোন কোন প্রতিকূল ভাব ও সংস্কার আছে। কিন্তু আমাদেরও, অন্য সব জাতির মত, নিজের দেশ সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব আছে। প্রতিকূল ভাব ও পক্ষপাতিত্ব উভয়ই বর্জ্জন করিয়া কোন দেশের ইতিহাস বা অন্যবিধ কোন বিবরণ-পুস্তক লেখা অতি কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা করিতে পারিয়াছেন, বলিতেছি না। কিন্তু একথা অবশ্যস্বীকার্য্য, যে, তাঁহারা খুব বেশী পরিশ্রম করেন, যাহা আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেই করিয়া থাকেন। ইহাও স্বীকার্য্য, যে, আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত জিনিষের বড়াই করি, তাহার অধিকাংশ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের আবিষ্কার। অতএব তাঁহাদের সমালোচনা করিতে হইলে পরিশ্রম করিয়া তদনন্তর শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহা করা দরকার। তাঁহাদিগকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। প্রবর্ত্তক-সংঘের মেলা ও প্রদর্শনীর বর্ণনা উপলক্ষ্যে যিনি একটি মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন, তাঁহার স্বদেশপ্রীতি প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহার পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের প্রতি কটাক্ষে ও তাহার ভঙ্গীতে আমরা প্রীত হই নাই। পাশ্চাত্য লেখকদিগের নিকট আমাদের ঋণের একটি দৃষ্টান্ত উক্ত অভিভাষণটি হইতেই দিতেছি। লেখক অহঙ্কার করেন, যে মোহেন্‌জো-দাড়ো হইতে প্রমাণ হইয়াছে, শৈবধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম। সম্ভবতঃ ইহা লেখকের আবিষ্কার নহে; মার্শ্যাল সাহেব তাঁহার তিন ভল্যুমে সম্পূর্ণ মোহেন্‌জো-দাড়ো পুস্তকের প্রথম ভল্যুমের উপক্রমণিকার ৬ ও ৭ পৃষ্ঠায় ইহা লিখিয়াছেন এবং তাহা হইতে এপ্রিল মাসের মডার্ণ রিভিউতে (৩৬৭ পৃষ্ঠায়) ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ লেখক ইহা ঐ পত্রিকায় দেখিয়াছেন। অভিভাষণটির সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্যবহির্ভূত, নতুবা আরও অনেক কথা বলা যাইত।

প্রবর্ত্তক-সংঘ যে খদ্দর প্রস্তুত করেন, তাহার সম্পর্কে অনেক মুসলমান কারিগরের অন্নসংস্থান হয়। বাঙালী মুসলমানেরা ইহা যেন মনে রাখেন।

—

বঙ্গের প্রতি অবিচারের উপর অপমান

ভারতবর্ষে যতগুলি প্রদেশ আছে, বাংলা দেশ হইতে তাহার কোনটির চেয়ে কম সরকারী আয় হয় না। অথচ, বাংলা দেশের ৫ কোটি লোকের জন্য বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে যত টাকা দেওয়া হয়, বোম্বাই মান্দ্রাজ পঞ্জাব প্রভৃতিকে তাহাদের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে কম হওয়া সত্ত্বেও, বেশী টাকা দেওয়া হয়। একটা কৌশল দ্বারা বাংলা দেশকে বঞ্চিত করা হইয়া আসিতেছে। সরকারী আয়ের যে-যে উপায়গুলি হইতে বেশী বেশী ও ক্রমবর্দ্ধনশীল অর্থ আসে, সেগুলি ভারত-গবর্ন্মেণ্ট নিজের বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন; যেমন পাটের শুল্ক, ইন্‌কাম্ ট্যাক্স, বাণিজ্য-শুল্ক (customs) ইত্যাদি। ইহাতে যে বাংলা দেশের প্রতি অবিচার হইয়া আসিতেছে, বাংলা দেশের কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতি

হইতে পারিতেছে না, তাহা আমরা অনেকবার দেখাইয়াছি। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থাতে এই অবিচারকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা হইতেছে। ফেডার‍্যাল ফিন্যান্স কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টের পঞ্চম পৃষ্ঠায় একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের অনুমানে ভবিষ্যতে কোন্ প্রদেশে আয় অপেক্ষা ব্যয় কত কম বা বেশী হইবে, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি কত হইবে তাহা তাঁহারা দেখাইয়াছেন। তালিকাটি নীচে দিলাম।

প্রদেশ	উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি
মান্দ্রাজ	২০ লক্ষ ঘাটতি
বোম্বাই	৬৫ ,, ,,
বাংলা	দুই কোটি ,,
আগ্রা-অযোধ্যা	২৫ লক্ষ উদ্বৃত্ত
পঞ্জাব	৩০ ,, ,,
বিহার-উড়িষ্যা	৭০ ,, ঘাটতি
মধ্যপ্রদেশ	১৭ ,, ,,
আসাম	৬৫ ,, ,,

কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টের সপ্তম পৃষ্ঠায় অবিচারের উপর বঙ্গের পক্ষে অপমানজনক বাক্যও প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, বঙ্গের এইরূপ ঘাটতি হইবে যদি অন্য কোন কোন প্রদেশের ব্যয়ে তাহার প্রতি বিশেষ ব্যবহার না-করা হয় ("except by special treatment at the expense of other Provinces"), অর্থাৎ অন্য কোন কোন প্রদেশ দয়া করিয়া বাংলা দেশকে কিছু ভিক্ষা দিলে বঙ্গের আয়ব্যয় সমান হইতে পারে। বাংলার টাকা যথাসাধ্য কাড়িয়া লইয়া, এমন কি তাহার একচেটিয়া পাট হইতে প্রাপ্ত চারি কোটি টাকার আধপয়সাও তাহাকে না দিয়া, তাহাকে ভিক্ষুক সাজান হইতেছে!

অথচ প্রধানতঃ এই "ভিক্ষুক" বাংলার রাজস্ব হইতেই ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম বহুবৎসর রাজ্যবৃদ্ধি ও অন্য অনেক প্রদেশের ঘাটতিপূরণ করা হইত ও চলিত। তখনকার চেয়ে এখন বঙ্গে নানা রকমে সরকারী আয় অনেক বেশী হয়। তখন যে-বাংলা অন্য অনেককে টাকা দিতে পারিত, আজ তাহার অনেক ধন "আইনসঙ্গত" বন্দোবস্তে অন্যত্র ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিয়া বলা হইতেছে, যে, অন্যে দয়া না-করিলে তাহার আয়ব্যয় সমান হইবে না। তাহা যদি নাই হয়, তাহা হইলে কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাংলা দেশ হইতে যত রাজস্ব অন্যত্র চালান হইয়াছে, আগে তাহা ফিরাইয়া দিয়া তবে দয়া ও ভিক্ষার কথা বলিলে তবু তাহা কিঞ্চিৎ সঙ্গত হয়। বাংলা দেশের রাজস্ব যে নিজ ব্যয়নির্ব্বাহের পর অন্যান্য কার্য্যের জন্য যথেষ্ট ছিল, তাহার কিছু প্রমাণ সরকারী ও বেসরকারী বৈদেশিকদের উক্তি হইতে নীচে দিতেছি।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতি স্যর আয়ার কূট সকৌন্সিল গবর্ণর জেনার‍্যালকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, যে, "মান্দ্রাজের খাজনাখানায় টাকাকড়ি নাই, এবং মান্দ্রাজের তখনই তখনই মাসে সাত লক্ষ টাকার উপর দরকার যাহার প্রত্যেকটি কড়ি বাংলা হইতে আসা চাই; কারণ তিনি দেখিতেছেন অর্থাগমের এমন কোন উপায় নাই যাহা হইতে একটি মুদ্রাও পাইবার আশা করা যাইতে পারে।" ১৭৯২ সালে প্রধান সেনাপতি লণ্ডনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেন্দ্রীয় আপিস ইণ্ডিয়া হৌসে প্রেরিত একটি চিঠিতে জানান, যে, "দেশের তাৎকালিক অবস্থায় সৈন্যদলকে ও অধিবাসীদিগকে বাংলা হইতে আনীত অর্থের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিতে হইতেছে।"

১৭৬৫ সালে ক্লাইব শাহ্ আলম বাদশার নিকট হইতে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। তাহার পরবর্ত্তী প্রথম ছয় বৎসরে বাংলা প্রেসিডেন্সীর গড় বার্ষিক আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ২,২০,২২,০৭০ টাকা ও ১,৫০,৪৯,৩৪০ টাকা ছিল। ঐ সময়ে মান্দ্রাজের আয়-ব্যয় ছিল ৪০,৫১,৯১০ ও ৫৯,৫৯,২০০ টাকা এবং বোম্বাইয়ের আয় ৭,৬০,৫৭০ ও ব্যয় ৩০,৬৩,১৯০ ছিল। এই দুই প্রদেশের ঘাটতি বাংলার রাজস্ব হইতে পূরণ করিতে হইত।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর বঙ্গে ভীষণতম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঐ সালের পরবর্ত্তী আট বৎসরেও বাংলার গড় বার্ষিক আয় ছিল ২,৬২,৬৫,১৯০ টাকা এবং ব্যয় ছিল ১,৪৩,৫৭,৮৯০ টাকা। ঐ আট বৎসরে শুধু বোম্বাইয়েরই ঘাটতি ১,৮১,৪৮,৯০০ টাকা হইয়াছিল এবং বাংলা হইতে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইকে ১,৮৫,২৫,২৭০

টাকা পাঠাইতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, সে যুগে ইংরেজরা ভারতবর্ষে যে বহুব্যয়সাধ্য দেশজয় দ্বারা রাজ্য-বিস্তারে প্রবৃত্ত ছিল তাহার খরচ বাংলাই জোগাইত। অনেক ইংরেজের লেখা বহিতে এই তথ্যের উল্লেখ আছে। এফ. এইচ. স্ক্রাইন্ সাহেব বাংলার একজন সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি "ইণ্ডিয়াজ হোপ" ("ভারতের আশা") নামক বহিতে এই কথা বলিয়াছেন।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, সেকালে বাংলা প্রেসিডেন্সী বলিতে খাস্ বাংলা এবং বিহার উড়িষ্যাও বুঝাইত। কিন্তু এখনকার ন্যায় তখনও খাস্ বাংলাই সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল এবং রাজস্ব-সংগ্রহের প্রধান স্থান ছিল।

ইংরেজদের দ্বারা সম্পাদিত ও লিখিত ১৮৪৫ সালের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার জানুয়ারী সংখ্যায় (*The Calcutta Review*, vol. iii, January 1845, pp.167-168) লিখিত হইয়াছিল :—

"সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে বাংলা বিহার উড়িষ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী ও রাজস্বপ্রাপ্তির উপায়। গঙ্গার উপত্যকা হইতেই গবর্ন্মেণ্টের উদ্বৃত্ত থাকে; এখান হইতেই যুদ্ধের টাকা সংগৃহীত হয় এবং গবর্ন্মেণ্ট স্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয়। এই গাঙ্গেয় উপত্যকার উপর ও নিম্ন অংশের মধ্যে নিম্ন অংশই রাজকীয় কোষাগারের প্রধান অবলম্বন। ইহা যদিও ভারতবর্ষের ইংরেজদের অধিকৃত ভূখণ্ডের এক-দশমাংশ অপেক্ষা বেশী নহে, তথাপি এখান হইতে ঐ সমগ্র ভূখণ্ডের মোট রাজস্বের দুই-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ রকম ছয় আনার উপর আদায় হয়।"

যে-বাংলা দেশ গবর্ন্মেণ্টকে এত টাকা জোগাইত, সেই বাংলা দেশে প্রভূত রেলের আয়, কলকারখানার আয়, বাণিজ্যের আয়, বন্দরের আয়, ইন্‌কাম ট্যাক্স ইত্যাদি তখনকার চেয়ে খুব বাড়া সত্ত্বেও, এখন কিনা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন দ্বারা বাংলাকে দেউলিয়া ও ভিক্ষুক সাজান হইতেছে! এবং বাংলা দেশের লোকেরা এবং সংবাদপত্র-সমূহ ও নেতৃবর্গ এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন করিতেছেন না। ভবিষ্যতে যাহাতে, আবশ্যক হইলে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের লোকসংখ্যার অনুপাতে বহুসংখ্যক বাঙালী প্রতিনিধি এই অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ প্রতিবাদ চালাইতে পারেন, সেরূপ ন্যায্যসংখ্যক প্রতিনিধি পাইবার জন্যও বঙ্গের পক্ষ হইতে প্রবল আন্দোলন হইতেছে না।

ভাক্তোর্ ঝাক্‌মং (Victor Jacquemont) নামক প্রসিদ্ধ ফরাসী পর্য্যটক ও বৈজ্ঞানিক রামমোহন রায়ের সমকালে কিছু দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি তখন লিখিয়াছিলেন :—

"ইংরেজরা গত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলা ও বিহার ছাড়াইয়া, কর্ণেল ক্লাইবের স্থাপিত সাম্রাজ্য ছাড়াইয়া, তাহাদের রাজ্যে যাহা যোগ করিয়াছে, তাহাতে কেবল তাহাদের রাজস্ব কমিয়াছে। নূতন অধিকৃত একটি প্রদেশও তাহার গবর্ন্মেণ্টের এবং তথায় ইংরেজ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য আবশ্যক সৈন্যদলের খরচ দিতে পারে না। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সব জায়গা-গুলির আয়ের ও ব্যয়ের সমষ্টি ধরিলে প্রতিবৎসরই তথায় ঘাটতি পড়ে; বোম্বাইয়ের নিজের খরচ চালাইবার সামর্থ্য আরও কম। সম্প্রতি কলিকাতা প্রেসিডেন্সীর সহিত যুক্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (এক্ষণে এলাহাবাদ) এবং বুন্দেলখণ্ড, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতির ঘাটতি পূরণ করিয়া বাংলা ও বিহারের, প্রধানতঃ বাংলার, রাজস্বই উক্ত দুটি অপ্রধান ("secondary") রাষ্ট্রের (অর্থাৎ মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের) রাজস্ব-বিভাগকে ঋণমুক্ত রাখে।"

কলিকাতায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ স্বত্বাধিকারীর ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস্ নামক একটি দৈনিক কাগজ ছিল। ইহা উঠিয়া গেলে ইহার প্রেস কিনিয়া লইয়া ফর্‌ওয়ার্ড স্থাপিত হয়। ১৯১২ সালে ইহার একটি সংখ্যায় ভারত-সরকারের এক বৎসরের হিসাব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল—

"ভারত-গবর্ন্মেণ্টের ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত বাংলা দেশ বোম্বাই ও মান্দ্রাজের দ্বিগুণ টাকা দিয়াছে, এবং পূর্ব্ববঙ্গ, আগ্রা-অযোধ্যা, পঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ ও মধ্যপ্রদেশ সকলে মিলিয়া যত দিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী দিয়াছে।"

একথা এখনও সত্য, যে, বঙ্গদেশে সংগৃহীত যে পরিমাণ রাজস্ব ভারত-গবর্ন্মেণ্ট পান, অন্য কোন প্রদেশে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে তাহা অপেক্ষা বেশী পান না।

সেকালে বঙ্গের ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা বাংলা প্রেসিডেন্সীকে এই প্রকারে শোষণ করার প্রতিবাদ করিতেন। ১৭৬৮ সালে গবর্ণর ভেরেল্‌ষ্ট লিখিয়াছিলেন :—

"প্রত্যেক তরফ হইতে এই প্রেসিডেন্সীর উপর যে টাকার দাবি করা হইয়াছে, তাহাতে ইহার খাজানাখানার টাকা বড় কমিয়া গিয়াছে, এবং এই অঞ্চল হইতে এত বেশী অর্থ রপ্তানীর অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদিগকে ভীত করিয়াছে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোম্পানীর আমলে প্রথম প্রথম বাংলা প্রেসিডেন্সী বলিতে বিহার-উড়িষ্যাও বুঝাইত, এবং পরে ১৮৩৫ পর্য্যন্ত এলাহাবাদ প্রদেশও বুঝাইত। কিন্তু বরাবর খাস্ বাংলা হইতেই বেশী রাজস্ব আদায় হইত। ১৮৬১ সালেও বঙ্গের রাজস্ব শোষণ চলিতেছিল। বাংলার তাৎকালিক ছোটলাট জন পীটার গ্র্যাণ্ট লেখেন :—

"ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের আরম্ভ হইতে এই রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে, যে, বাংলাকে সাম্রাজ্যিক রাজস্বের তাহার ন্যায্য অংশ অপেক্ষা বেশী দিতে হয়, এবং সৈন্যদলদ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ, পুলিস্, রাস্তা ও অন্যান্য পূর্ত্ত-কার্য্য, ইত্যাদি বাবতে তাহাকে সাম্রাজ্যিক তহবিল হইতে তাহার ন্যায্য পাওনার সিকিও প্রতিদান করা হয় না। তিনি এই অবশ্যম্ভাবী রীতি তখনও প্রচলিত দেখিতেছেন, এবং যে-প্রদেশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তাহার পক্ষে অনিষ্টকর প্রণালীবদ্ধ ("systematic") এই সকল বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।"

বঙ্গের প্রতি অবিচারের কথা লর্ড কারমাইকেল প্রভৃতি গবর্ণরেরাও বলিয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা এই অবিচারের প্রতিকার-চেষ্টায় আমাদের সহিত যোগ দিবে, এরূপ আশা নাই বলিলেই চলে। বাঙালীকেই ইহার জন্য লড়িতে হইবে। সমগ্রভারতের স্বাধীনতা-লাভ প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়া রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে অবশ্য বাঙালীর প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। রাজস্ব বিষয়ে এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় যথেষ্ট প্রতিনিধির সম্বন্ধে বাংলার প্রতি ন্যায্য ব্যবহার পাইবার চেষ্টা করা কেবল ঐ প্রধান কর্ত্তব্যেরই নিম্নস্থানীয়।

"যে-কোন এবং প্রত্যেক উপায় অবলম্বন"

বাংলা গবন্মেণ্টের সরকারী গেজেট কলিকাতা গেজেটে গত ২৮এ এপ্রিল নিম্নমুদ্রিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Bengal Criminal Law Amendment Act, 1930, the Governor-in-Council is pleased to make the following rule:

If any detenu under the Bengal Criminal Law Amendment Act, 1930, disobeys or neglects to comply with any order made, direction given or condition prescribed by virtue of any rule made under Section 13 of the said Act, the authority which made the order, gave the direction or prescribed the condition, may use any and every means necessary to enforce compliance with such order."

বিনা বিচারে যাহাদিগকে জেলে বা অন্যত্র আটক করিয়া রাখা হয় তাহাদিগকে "ডেটেনু" বলা হয়। এই ডেটেনুদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম, নির্দ্দেশ, ও নিয়ম পালন করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত সকৌন্সিল গবর্ণর বাহাদুর এই নিয়ম জারি করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ডেটেনুদিগকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিবার নিমিত্ত তাহাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকেই তাহার স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার এরূপ অনির্দ্দিষ্ট পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া উচিত হয় নাই। এরূপ ক্ষমতা দেওয়া না থাকা সত্ত্বেও হিজলীতে যেরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা সরকারী অনুসন্ধান-কমিটীর রিপোর্ট অনুসারেই অতি ভীষণ—তদ্বিষয়ক বেসরকারী সংবাদ ও গুজব না-ই ধরা গেল। গবন্মেণ্ট যেরূপ পূর্ণ ক্ষমতা দিলেন, তাহার ফলে হিজলীর কাণ্ড অপেক্ষাও গুরুতর কিছু ঘটিতে পারে না কি?

সার্কাসের বন্য ও হিংস্র পশুদিগকে হুকুম মানাইবার জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারে বটে; কিন্তু পশু ও অন্য ইতরপ্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য যে-আইন আছে, সার্কাসের পশুশিক্ষাদাতারা তাহা লঙ্ঘন করিলে তাহাদের দণ্ড হয়। সুতরাং গবন্মেণ্ট যদি প্রপূরক আর একটি নিয়ম জারি করেন, যে, ডেটেনু-দের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত "কর্ত্তৃপক্ষ" পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের আইন মানিতে বাধ্য থাকিবেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

কারণ, ডেটেন্যুদিগকে যেরূপ অপরাধে অপরাধী বলিয়াই সন্দেহ করা হউক না কেন, তাহারা হিংস্র বা অহিংস্র পশু নয়, তাহারা মানুষ; পৃথিবীর বড় বড় শাসনকর্ত্তা ও সম্রাটেরা যেমন মনুষ্যজাতির অন্তর্গত, তাহারাও সেইরূপ মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণ হয় নাই। বস্তুতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের প্রমাণ থাকিলে তাহাদিগকে বিচারার্থ কোন আদালতে হাজির করাই সঙ্গত হইত। মাসাধিক পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে মিঃ প্রেণ্টিস বলেন, যে, বিয়াল্লিশটি মানুষকে আদালতের বিচারে খালাস পাইবার পরেই গ্রেপ্তার করিয়া এবং পুনর্ব্বার বিচার না করিয়া ডেটেন্যু হিসাবে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি এই উত্তর দিবার পর আরও কয়েক জনকে বিচারে খালাস পাইবার অব্যবহিত পরেই ডেটেন্যু করা হইয়াছে। বাকী সাত আট শত পুরুষ ও মহিলা ডেটেন্যুর বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্য অভিযোগ করা হয় নাই, তাহাদের কোন বিচারও হয় নাই। সুতরাং তাহাদিগকেও নির্দ্দোষ মনে করা আইনসঙ্গত। কোন মানুষের সম্বন্ধেই অন্য কোন মানুষের যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার থাকা উচিত নয়, নির্দ্দোষ মানুষদের সম্বন্ধে ত নহেই।

কর্ত্তৃপক্ষ যে কে কখন্ হইতে না-পারেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। স্থানবিশেষে ও সময়বিশেষে একজন কনষ্টেবলও কর্ত্তৃপক্ষ হইতে পারে। হিজলীর সরকারী অনুসন্ধান-কমিটির সম্মুখে এই রকম একটি লোক সাক্ষ্য দিয়াছিল, যে, তাহার মতে কোন ডেটেন্যুর প্রাণের চেয়ে সরকারী বন্দুকটার মূল্য বেশী।

কর্ত্তৃপক্ষ ১৩ ধারা অনুযায়ী যে-যে নিয়ম অনুসারে হুকুম আদি দিতে পারেন, সেরূপ নিয়মাবলীর পূরা তালিকা আছে কি? সেই সব নিয়ম অনুসারে যত প্রকার হুকুম আদি হওয়া ন্যায়সঙ্গত, নীতিসঙ্গত, মানবিকতাসঙ্গত ও আইনসঙ্গত, তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

এবম্বিধ নানা কারণে, আমরা যতটুকু জানি তাহাতে মনে হয়, বাংলা গবন্মেণ্টের আলোচ্য নিয়মটির নজীর আধুনিক সভ্য ও স্বাধীন দেশসমূহে পাওয়া যাইবে না—অন্ততঃ পাওয়া সুকঠিন হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসক দেশগুলিতে ইহার কোন নজীর থাকিলে তাহা কোন পাঠক আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

আমাদের বক্তব্য আরও বিশদ করিয়া বলিতেছি। সকল দেশেরই কোন-না-কোন রাজকর্ম্মচারী যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, স্বাধীনতম এবং সভ্যতম দেশেও এ রকম কর্ম্মচারী থাকিতে পারে; কোথাও কোথাও যে আছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ সংবাদও বিদেশী খবরের কাগজে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই। সুতরাং আমরা সভ্য ও স্বাধীন দেশে রাজকর্ম্মচারীদের যথেচ্ছ ব্যবহারের নজীর চাহিতেছি না। শ্রেণীবিশেষের রাজকর্ম্মচারীদিগকে সরকারী নিয়মের দ্বারা স্বেচ্ছামত এরূপ কাজ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা কোনও দেশে দেওয়া হইয়াছে কিনা যাহার বলে, তাহারা যাহা খুশী তাহাই করিলেও, তাহা নিয়মসঙ্গত বলিয়া গণিত হইবে, তাহাই আমরা জানিতে চাহিতেছি। ডেটেন্যুদের "কর্ত্তৃপক্ষ"কে স্বেচ্ছাচারী বানাইয়া তোলা বাংলা গবন্মেণ্টের উদ্দেশ্য না-হইতে পারে; কিন্তু যদি তাহারা ডেটেন্যুদের সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারী হয়, এবং গবন্মেণ্ট তখন তাহাদের কৈফিয়ৎ চাহিলে তাহারা যদি আত্মপক্ষসমর্থনার্থ বলে, "গবন্মেণ্ট আমাদিগকে যাহা খুশী তাই করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন," উত্তরে গবন্মেণ্ট কি বলিবেন জানিতে কৌতূহল হয়। গবন্মেণ্ট অবশ্য বলিতে পারেন, "তোমরা যতটা করিয়াছ, ডেটেন্যুদিগকে আজ্ঞাধীন করিবার জন্য ততটা করা আবশ্যক ছিল না।" প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিতে পারে, "আমরা ঘটনাস্থলের মানুষ (men on the spot); কি করা দরকার তাহা আমরা যেমন বুঝিয়াছিলাম, আপনারা কলিকাতায় বা দার্জ্জিলিঙে বসিয়া তাহা কেমন করিয়া বুঝিবেন?" যাহা হউক, কোন আটকখানার কর্ত্তৃপক্ষ বাড়াবাড়ি করিলে তাহা ডেটেন্যুদিগকে বাধ্য করিবার জন্য আবশ্যক ছিল কিনা গবন্মেণ্ট তাহার প্রকাশ্য তদন্ত করিবেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের দোষ হইয়া থাকিলে তাহার শাস্তি দিবেন, এইরূপ নিয়ম

করা উচিত। আটকখানা হইতে ডেটেন্যূদের পলায়ন নিবারণ করিবার নিমিত্ত ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও প্রহরীরা তাহাদের উপর বন্দুক আদি অস্ত্র প্রয়োগও করিতে পারিবে, এরূপ নিয়ম আগেই হইয়াছিল। এখন তাহাদিগকে আজ্ঞাধীন করিবার নিমিত্ত "কর্তৃপক্ষকে" সমতুল্য ক্ষমতা দেওয়া হইল।

—

বিভীষিকাবাদ ও বাঙালীর ভীরুতা অপবাদ

মেকলের সময় হইতে অনেক ইংরেজের দ্বারা বাঙালীর ভীরুতা ও কাপুরুষতা ঘোষিত হইয়াছে ; কারণ, বাঙালীরা বেতনভোগী সিপাহী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া মানুষ মারিবার সামর্থ্যের পরিচয় দেয় নাই। এই অপবাদ পরোক্ষ ভাবে কোন কোন বাঙালী যুবককে হিংসার পথে চালিত করিয়াছে, আমাদের কখন কখন এরূপ সন্দেহ হইয়াছে। বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মারের প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কামাক্ষি নটরাজন্ এই অপবাদ বঙ্গে আতঙ্কোৎপাদকদের প্রাদুর্ভাবের একটা কারণ বলেন। ইহা সত্য কি-না বিচার্য্য। সত্য হইলে, কাহারও এই অপবাদের পুনরুল্লেখ করা অনুচিত। কিন্তু কোন অবিবেচক লোক তাহা করিলেও, আমরা মনে করি, বাঙালী ছেলেমেয়ে ও অধিকবয়স্ক লোকদের সাহসের যথেষ্ট প্রমাণ থাকায়, সাহসিকতা প্রমাণ করিবার জন্য মানুষ মারা অনাবশ্যক এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। সাত্ত্বিক সাহস প্রদর্শনের যথেষ্ট কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

—

ডায়ারের পক্ষ সমর্থন

বঙ্গসাহিত্যে এবং বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যে পারদর্শিতার দাবিদার প্রাক্তন-রেভারেণ্ড মিঃ টম্‌সন্ জালিয়ানওয়ালা বাগের বীর ডায়ারের দোষ ক্ষালনার্থ এত বৎসর পরে কলম ধরিয়াছেন। তিনি বলেন, ডায়ার জানিতেন না, যে, ঐ বাগের নির্গমন-পথ নাই। সুতরাং যখন তাঁহার হুকুমে সিপাহীরা বাগে সমাবিষ্ট জনতার উপর গুলি ছোঁড়ার পর জনতা পলাইল না, তখন ডায়ার ভাবিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সুতরাং পুনঃপুনঃ গুলিনিক্ষেপ চলিতে থাকে। কিন্তু ডায়ার কি অন্ধ ছিলেন? তিনি কি দেখেন নাই, যে, জনতা অস্ত্রহীন, এবং তাহারা আক্রমণের কোন চেষ্টাই করিতেছে না? গুলি ত একবার নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সিপাহীদের পুঁজি ফুরায় নাই ততক্ষণ চলিয়াছিল। ততক্ষণেও জনতার না পলাইবার কারণ ডায়ার বুঝিতে পারেন নাই? যোদ্ধার অদ্ভুত পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বটে! মিঃ টম্‌সন বলিতেছেন, ডায়ার যখন জানিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্গমন-পথ ছিল না তখন তিনি ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহার দুই ইংরেজ বন্ধুর কাছে সে কথা বলিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, যে, তিনি রোজ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ছবি ঠিক যেন চোখে দেখেন। এই বন্ধুদের কাছেই মিঃ টম্‌সন এই সব কথা শুনিয়াছেন বলিতেছেন। ভাল কথা। কিন্তু ডায়ার তাঁহার কাজের তদন্তের জন্য নিযুক্ত হাণ্টার কমিশনের কাছে এ রকম কথা না বলিয়া নিজের কাজের সমর্থন করিয়াছিলেন, "বিদ্রোহীদিগকে" শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াছিলেন। কেন এরূপ করিয়াছিলেন? তাঁহার বন্ধুরাই বা কমিশনের কাছে কেন সত্য সাক্ষ্য দেন নাই? তাহার মনস্তত্ত্ব মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দের ষ্টাডির অর্থাৎ চর্চ্চার বিষয়, মিঃ টম্‌সন্ ইহা বলিয়াই সকলকে স্তম্ভিত করিতে চাহিয়াছেন। যখন পার্লেমেণ্টে, কাগজে পত্রে, এই হত্যাকাণ্ডের আলোচনা হয়, তখন ডায়ার ও তাঁহার দুই বন্ধু কেন সত্য গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন? এত বৎসর পরে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ টম্‌সনের ভারতবর্ষে শুভ পুনরাগমনে বন্ধুদের চৈতন্য হইয়াছে! ডায়ার তাঁহার দুই বন্ধুকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার যে রকম ভগ্ন দশা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এখন বলিতেছেন, সেই সব কথা ও সেই ভগ্ন দশা (সত্য হইলে) ডায়ারের পত্নীর নিশ্চয়ই অজানা থাকিত না। তাঁহার জানা থাকিলে ডায়ারের জীবনচরিত-গ্রন্থের লেখক তাহা অবশ্যই সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু মিঃ টম্‌সন সেই গ্রন্থ হইতে এই নূতন আলোক আমদানী করেন নাই।

মিঃ টম্‌সনের নিজের কথাও কতটা নির্ভরযোগ্য, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তিনি "An Indian Day" নামক একটি উপন্যাস লিখিয়াছেন।

ঘটনাবলীর স্থানটির নাম দিয়াছেন বিষ্ণুগ্রাম। বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন শহর বিষ্ণুপুরের নাম একটু বদলাইয়া বিষ্ণুগ্রাম নামে বাঁকুড়া জেলার দৃশ্য, বিষ্ণুপুরের কেল্লা ইত্যাদির বর্ণনা ইহাতে আছে। এই বহির পূর্ব্বভাষে লেখক বলিতেছেন, "No living person is sketched in this story, and if anyone in India finds his name in it he must please accept my assurance that it is because I never heard of him." যে-সব উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া বিদিত তাহাতেও ঐতিহাসিক নরনারীর হুবহু ছবি থাকে না, ঔপন্যাসিকের কল্পনা বাস্তব চিত্রে কিছু যোগবিয়োগ করে। সুতরাং ইহা সত্য, যে, মিঃ টম্‌সন্‌ কোন জীবিত ব্যক্তির বাস্তব ঠিক্‌ চিত্র এই বহিতে আঁকেন নাই। কিন্তু আমরা বাঁকুড়ার মানুষ। সেখানকার ও বর্দ্ধমান ডিবিজনের কয়েক বৎসর আগেকার কোন কোন উচ্চপদস্থ বাঙালী রাজকর্ম্মচারীকে চিনি, উক্ত কোনও রাজকর্ম্মচারীর আত্মীয়ের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার বিষয় জানি, বাঁকুড়ার মিশনরী কলেজের এক প্রিন্সিপ্যাল দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য খুব খাটিয়াছিলেন জানি, ঐ কলেজের হাতার পুকুর লইয়া মোকদ্দমা হইয়াছিল জানি, এবং আরও অনেক কথা জানি। মিঃ টমসন্‌ কি বলিতে চান, ঐ প্রকারের ব্যক্তি-সকল ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁহার বহিতে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ তাঁহার কল্পনাপ্রসূত এবং বাস্তবের সহিত তাহার যতটুকু সাদৃশ্য বা মিল আছে তাহা আকস্মিক? তিনি কি বলিতে চান, তিনি ঐ সকল ব্যক্তির নাম কখনও শুনেন নাই? মিঃ টম্‌সনের একটা ভুল ধারণা আছে, যে, তিনি এতই চালাক, যে, সবাইকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করাইতে পারিবেন।

—

মহাত্মা গান্ধীর বর্ণাশ্রম

মহাত্মা গান্ধী অনেকবার বলিয়াছেন, তিনি বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস করেন। কি অর্থে উহাতে বিশ্বাস করেন, সে-বিষয়ে তাঁহার সহিত কখনও আলোচনা হয় নাই, তাঁহার কোন লেখাতেও উহার বিশদ ব্যাখ্যা পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। যাহা হউক, সাধারণতঃ লোকে বর্ণাশ্রম বলিতে যাহা বুঝে, তাঁহার বর্ণাশ্রম ঠিক তাহা নহে। কারণ, তিনি বৈশ্য হইয়াও এবং সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন (অবশ্য অন্যায় কিছুই করেন না), মেথরজাতীয়া একটি বালিকাকে পোষ্য-কন্যা লইয়া তাহার সঙ্গে ভোজন করেন, আন্দাস তৈয়বজীর সহিত পুনঃপুনঃ ভোজন করিয়াছেন, নিজের এক পুত্রের সহিত ব্রাহ্মণ রাজগোপালাচার্য্য মহাশয়ের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ইত্যাদি। তিনি তাঁহার নিজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বর্ণাশ্রমে যেমন বিশ্বাস করেন, আমরাও সাধারণ মনুষ্য হইলেও আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে বর্ণাশ্রম মানি। তাহার আলোচনা পরে কোন সময়ে করিব।

—

আল্‌বেয়ার্‌ টোমা

ফরাসী সোশ্যালিষ্ট আল্‌বেয়ার্‌ টোমা মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি জেনিভায় ইণ্টারন্যাশ্যন্যাল লেবার আপিস ১৯১৯ সালে স্থাপিত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত উহার ডিরেক্টর বা প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি সব দেশের শ্রমিকদের অকপট বন্ধু বলিয়া বিদিত। কলকারখানার শ্রমিকদের কল্যাণার্থ যে-সব আন্তর্জাতিক চুক্তি হইত, তাহা যাহাতে সকল জাতি গ্রহণ করে, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেনিভায় তাঁহার আপিসে তাঁহার সহিত যখন আমার কথাবার্ত্তার সুযোগ হয়, তখন তাঁহাকে সুস্থ সবল দেখিয়াছিলাম। তিনি অকালবৃদ্ধ এরূপ মনে হয় নাই। অবশ্য তাঁহাকে খুব পরিশ্রম করিতে হইত। তাঁহার জায়গায় কে ডিরেক্টর নিযুক্ত হন, দেখা যাক্‌। লীগ অব নেশ্যন্সের প্রধান পদগুলি প্রায় ইংরেজ ও ফরাসীরা দখল করিয়া থাকে।

—

নিজামের পর্দ্দাবিরোধিতা

অল্পকাল পূর্ব্বে হায়দরাবাদের নিজাম লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলেন। পশ্চিমে লক্ষ্ণৌ মুসলমানদের একটি প্রধান কেন্দ্র। নিজাম যখন সেখানকার মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে যান, তখন সেদিনকার মত তাঁহার সম্মানার্থ ঐ বিদ্যালয়ে পর্দ্দা অনুষ্ঠিত হয় নাই। নিজাম বাহাদুর তাহাতে খুব সন্তুষ্ট হইয়া বালিকাদিগকে বলেন, "তোমরা দেখিতেছ আমার পরিবারের মহিলারা পর্দ্দা-নশীন নহেন, তাঁহারা বোরখা বা অবগুণ্ঠন ব্যবহার করেন না। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে তোমরাও পর্দ্দা বর্জ্জন করিও।" নিজামের সম্বর্দ্ধনার্থ লক্ষ্ণৌতে যত সভার অধিবেশন ও ভোজ হইয়াছিল, তাহাতে রাজকুমারীরা অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় যোগ দিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়। ইউরোপীয় ভোজে একটি রীতি আছে, যে, প্রত্যেক মহিলাকে এক এক জন ভদ্রলোক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনের নিকট লইয়া যান। নিজাম এই রীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহার মনোনীত এক এক জন মুসলমান ভদ্রলোককে রাজকুমারীদিগকে তাঁহাদের আসনের সমীপে লইয়া যাইতে অনুমতি দেন ও অনুরোধ করেন। লক্ষ্ণৌয়ের উলেমা ও মুজতাহিদ্‌রা নিজামের এই সব পর্দ্দাবিরোধী কাজের কোন প্রতিবাদ বা সমালোচনা করেন নাই।

[বৈশাখের প্রবাসীর উদ্ধৃত]

ভদ্রলোকের স্বহস্তে হলচালন

সিকি শতাব্দী পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে "ভদ্রলোক" শ্রেণীর মধ্যে স্বহস্তে জমীতে লাঙ্গল দেওয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং তাহা সামান্য পরিমাণে সফল হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে আবার সেই রকম চেষ্টা হইতেছে। মাণিকগঞ্জ মহকুমার আটিপাড়া গ্রামে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এক সভায় স্থির হয়, যে, বেকার যুবকেরা কৃষি, গোপালন ও মৎস্যপালন ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। তদনুসারে স্থানীয় ডাঃ পরেশচন্দ্র লাহা নিজের জমীতে স্বয়ং হল চালান। অনেক যুবকও তাহা করেন। গোপালন ও দুধের ব্যবসাও তথায় হইয়াছে। কোন সৎ বৃত্তিকেই ভদ্রলোকদের হেয় বা অকরণীয় মনে করা উচিত নয়। সুতরাং তাঁহারা এই সব কাজে প্রবৃত্ত হইয়া ভালই করিতেছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। এই সব কাজ সাধারণ কৃষক, গোয়ালা ও ধীবরেরাও করিয়া থাকে। তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কেবল কতকগুলি লোক বাড়িলে তাহা দেশের কল্যাণ ও উন্নতির কারণ না হইতেও পারে। এই সকল কাজে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও যন্ত্রাদির ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে, গবাদি পশুর খাদ্য তৃণ ও শস্যাদি উৎপন্ন করিতে পারিলে, গোচারণের মাঠ না কমাইয়া পতিত বা অনাবাদী জমী চাষ করিতে পারিলে, দুধ ও দুধ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য দীর্ঘকাল রক্ষা করিবার উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক যে-যে স্থানে উহা দুর্ম্মূল্য সেখানেও উহা যোগাইতে পারিলে, এবং মৎস্যপালন ও মৎস্যবিক্রয় সম্বন্ধেও ঐ প্রকার নানা উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে, দেশের কল্যাণ ও উন্নতি হইতে পারে। [বৈশাখের প্রবাসীর উদ্ধৃত]

উন্মত্ত ও অনুন্মত্ত হাতীর উপদ্রব

অনেক খবরের কাগজে দেখিলাম, ত্রিপুরা-রাজ্যের খোয়াই অঞ্চলে একটা পাগলা হাতী পাঁচজন মানুষের প্রাণবধ করিয়াছে এবং তা ছাড়া ঘরবাড়ি ও শস্যও নষ্ট করিয়াছে। ইহা শোচনীয় সংবাদ। আর এক শোচনীয় সংবাদ রটিয়াছে, যে, ত্রিপুরা জেলার হাসানাবাদ গ্রামে অনুন্মত্ত হাতী মানুষের ঘর ভাঙিয়াছে। এই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। ইহা সত্য হইলে ইহার প্রতিকার হওয়া উচিত। [বৈশাখের প্রবাসীর উদ্ধৃত]

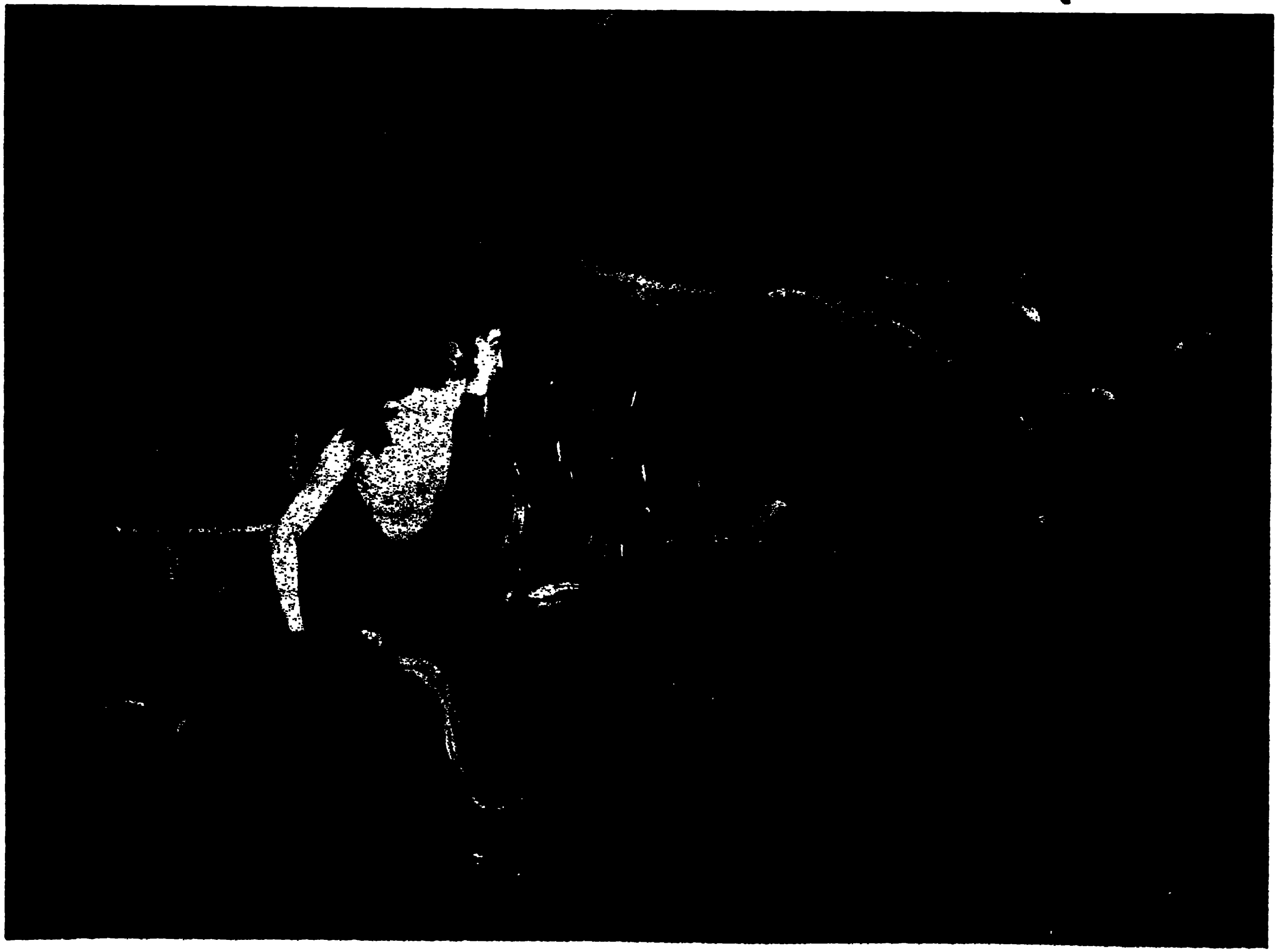
বাঙালী মুদ্রাবিজ্ঞানবিদের সম্মান

মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে একটি পুস্তক লিখিয়া ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব-সভার নেল্‌সন্-রাইট্ পুরস্কার পাইয়াছেন। [বৈশাখের প্রবাসীর উদ্ধৃত]

বিজ্ঞপ্তি

গত মাসের প্রবাসীতে (পৃঃ ১২০) প্রকাশিত "ইন্দ্রের রাজ্যাভিষেক" চিত্রটি শ্রীঅসিতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বিরহী যক্ষ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'

৩২শ ভাগ, ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৩৯ | ৩য় সংখ্যা

সাংখ্য ও যবন দর্শন

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

পালি দীর্ঘনিকায়ের প্রথম সূত্র ব্রহ্মজাল সুত্তে গৌতমবুদ্ধ বলিতেছেন, কতক শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা 'পুব্বন্তকপ্পিক,' পূর্ব্বান্তকল্পিক, সৃষ্টির প্রথম কল্পে বা যুগে যাহা ছিল তাহার আলোচনা করেন, 'পুব্বন্তানুদিট্‌ঠিনো', পূর্ব্বান্তানুদৃষ্টিন্, কি প্রকারে সৃষ্টি হইল তাহার চিন্তা করেন। এই সকল শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ দুই উপায়ে তত্ত্বনিরূপণের চেষ্টা করেন। প্রথম উপায়, সমাধি (যোগ); সমাধিদ্বারা জানিতে চেষ্টা করেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ইঁহারা কি ছিলেন, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়া ইঁহারা সৃষ্টির আদি পর্য্যন্ত পৌছিতে চেষ্টা করেন। তত্ত্বনিরূপণের দ্বিতীয় উপায়, তক্ক (তর্ক) এবং বীমংস (বিমর্স) বা চিন্তা।

ইধ ভিক্খবে একচ্চো সমণো বা ব্রাহ্মণো তক্কী হোতি বীমংসী।
"হে ভিক্ষুগণ, কতক শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তার্কিক এবং চিন্তাশীল।"

এইরূপ তার্কিক শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণগণ তর্ক করিয়া, বিচার করিয়া, আত্মার এবং জগতের আদি অন্ত সম্বন্ধে যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ব্রহ্মজাল সুত্তে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তর্কের এবং চিন্তার বলে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের স্বরূপনিরূপণের চেষ্টার ফলে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি।

প্রাচীনকালে হিন্দুর এবং যবনদিগের (Ionians) মধ্যে এই চেষ্টা এবং দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন নিবদ্ধ ছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে কবে যে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা কঠিন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হইতে জানা যায়, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে যবনদেশে দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল। যে অবধি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুদর্শনের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, সেই অবধি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলিয়া আসিতেছেন, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা হিন্দু দর্শনের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন। অনেকে আবার এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দে হিন্দুর এবং গ্রীকের মধ্যে বিদ্যার আদান-প্রদান সম্ভব ছিল কি না বিগত ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে (৩১ ভাগ, ২য় খণ্ড) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিচার্য্য, গ্রীক দর্শনের প্রথম পর্ব্বে, যবন (Ionian) দর্শনে, হিন্দু প্রভাব আছে কিনা।

এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী যবন (Ionia) দেশের অন্তর্গত মিলেটাস নগরে আনুমানিক ৬২৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে যবনদর্শনের জনক থালেস * (Thales) জন্মগ্রহণ

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে গ্রীক নামগুলি অক্ষরান্তরিত হইল।

করিয়াছিলেন এবং ৫৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, থালেস ইজিপ্টে গিয়া জ্যামিতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তৎকালে বেবিলনে যতটা জ্যোতিষ জানা ছিল তাহা তিনি জানিতেন। এই জ্যোতিষের জ্ঞানের বলে ৫৮৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মে মাসে যে সূর্য্যগ্রহণ হয় তাহা থালেস পূর্ব্বেই গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। থালেস গণিত ও জ্যোতিষের ন্যায় যবন দেশে দার্শনিক চিন্তারও প্রবর্ত্তক এবং গুরু। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, জল জগতের বীজ পদার্থ; জল হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং জলেই উহার লয়। থালেস যে দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখিয়া গিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং পরবর্ত্তী কালে আর যে-সকল দার্শনিক মত থালেসের নামের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে তাহা তাঁহার প্রবর্ত্তিত কি না বলা কঠিন।

থালেসের সহযোগী মিলেটাসবাসী আনাক্সিমান্দর (Anaximander) আনুমানিক ৬১১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৫৪৬ খৃঃ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। আনাক্সিমান্দরের রচিত একখানি দার্শনিক গ্রন্থ এক সময় প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থের কতক অংশের সার কথা পরবর্ত্তী গ্রন্থে পাওয়া যায়। আনাক্সিমান্দর সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি বচনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—

> Anaximander of Miletos, son of Praxiades, a fellow-citizen and associate of Thales, said that the material cause and first element of things was the Infinite, he being the first to introduce this name of the material cause. He says it is neither water nor any other of the so-called elements, but a substance different from them which is infinite, from which arise all the heavens and the worlds within them.
>
> He says this is "eternal and ageless," and that it "encompasses all the worlds."
>
> And into that from which things take their rise they pass away once more "as is meet ;...
>
> And besides this, there was an eternal motion, in which was brought about the origin of the worlds.
>
> He did not ascribe the origin of things to any alteration in matter, but said that the oppositions in the substratum, which was a boundless body were separated out.*

অর্থাৎ জগতের যাহা উপাদান কারণ তাহা জল নয়, বায়ু নয়, অথবা অন্য কোন ভূত (element) নয়, তাহা অসীম, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, অবিনাশী। সমস্ত পদার্থ এই অসীম হইতে উৎপন্ন হইয়া উহাতেই পুনরায় লয়প্রাপ্ত হয়। এই অসীমের মধ্যে নিত্য আবর্ত্তন (eternal motion) আছে, তাহারই ফলে সৃষ্টি হয়। অসীমে এবং সৃষ্ট সসীম পদার্থনিচয়ে বস্তুগত্যা কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু অসীমের অন্তরে পরস্পরবিরোধী যে গুণ (oppositions)-সমূহ আছে তাহারা সৃষ্টির সময় বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন হয় (separated out)। পরে উদ্ধৃত একটি বচনে দেখা যাইবে, আনাক্সিমান্দর এই মূল পদার্থকে অব্যক্ত (indeterminate) বলিয়াছেন।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, আনাক্সিমান্দরের অসীম জল, বায়ু প্রভৃতির মত স্থূল পদার্থ নহে, কিন্তু সাংখ্যের প্রধানের মত সূক্ষ্ম, নিত্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, স্বতন্ত্র পদার্থ। সাংখ্যোক্ত জগৎকারণ প্রধান এবং প্রধানের কার্য্য সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যেমন ভেদ ও অভেদ দুইই আছে, আনাক্সিমান্দরের জগৎকারণ অসীম এবং অসীমের কার্য্য সৃষ্ট পদার্থের মধ্যেও ভেদাভেদ দুই-ই আছে। প্রধান ত্রিগুণময়। আনাক্সিমান্দরের 'অসীমে' ত্রিগুণ নাই, কিন্তু ত্রিগুণের স্থানে আছে পরস্পরবিরোধী কতকগুলি গুণ (oppositions in the substratum)। সাংখ্য দর্শনের মতে অচেতন প্রধানকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করে নিষ্ক্রিয় পুরুষের সামীপ্য; আনাক্সিমান্দরের অসীমকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করে অনন্ত আবর্ত্তন(eternal motion)। সাংখ্যের প্রধানে এবং আনাক্সিমান্দরের অসীমে এতটা সাদৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, আনাক্সিমান্দর হিন্দুর সাংখ্যের নিকট অনেকটা ঋণী। এই অনুমানের বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

প্রথম আপত্তি—সাংখ্যের প্রধানে এবং আনাক্সিমান্দরের অসীমে সাদৃশ্য অল্প, তফাৎ বেশী; এতটুকু সাদৃশ্য লইয়া

---

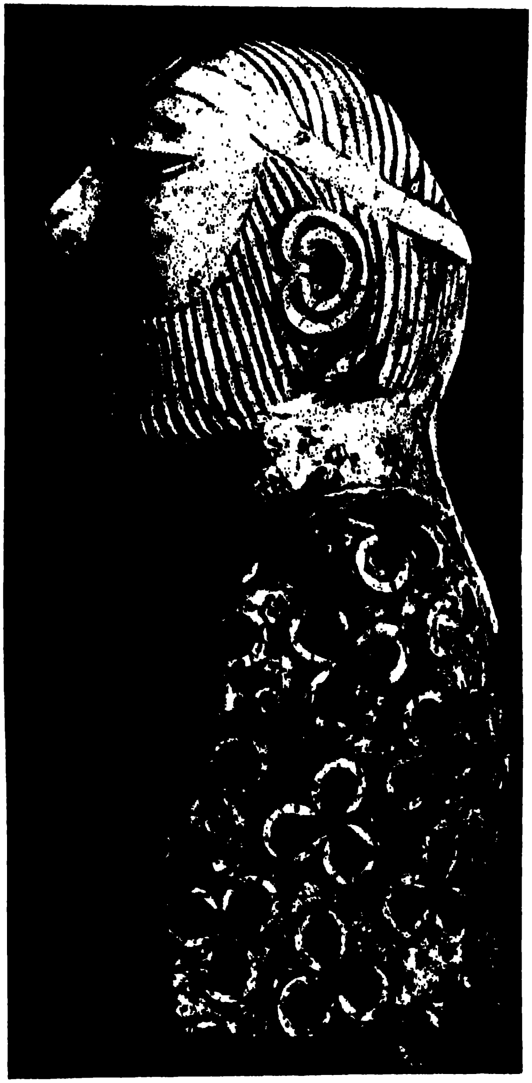
* John Burnet, *Early Greek Philosophy*, Fourth edition, London. 1930, p. 52.

এত বড় অনুমান করা যায় না। আনাক্সিমান্দরের দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের অনেক বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও, সাংখ্যের প্রধানে এবং আনাক্সিমান্দরের অসীমে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আনাক্সিমান্দর অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন দার্শনিক ছিলেন এবং থালেসের মতও তিনি জানিতেন। এরূপ পণ্ডিতের নিকট কোন পরমতের অবিকল নকল আশা করা যায় না। আনাক্সিমান্দরের অসীম কারণ-বাদ যে সাংখ্য প্রভাব পরিপুষ্ট এরূপ মনে করিবার আর এক কারণ, যবন দেশের স্বাভাবিক দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত এই মতের কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না; এই মত যবন দেশের আর কোন দার্শনিক গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। আনাক্সিমান্দরের গুরুস্থানীয় থালেস যে জলকে জগতের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আনাক্সিমান্দরের সহযোগী এবং শিষ্য স্থানীয় ছিলেন আনাক্সিমেনেস। ইনিও মিলেটস্‌নগরবাসী ছিলেন। ইনি আনুমানিক ৫৮৮ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৫২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। আনাক্সিমেনেসের রচিত একখানি দার্শনিক গ্রন্থ অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচন প্রমাণ পরবর্ত্তী গ্রন্থে পাওয়া যায়। আনাক্সিমেনেসের মত সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

Anaximenes of Miletes, son of Eurystratos, who had been an associate of Anaximander, said, like him, that the underlying substance was one and infinite. He did not, however, say it was indeterminate, like Anaximander, but determinate; for he said it was air.

From it, he said, the things that are, and have been, and shall be, the gods and things divine, took their rise, while other things come from its offspring.*

আনাক্সিমান্দরের সহিত তাঁহার শিষ্য আনাক্সিমেনেসের মতের মুখ্য প্রভেদ এই, আনাক্সিমান্দরের মূলাধার পদার্থ সূক্ষ্ম, অব্যক্ত (indeterminate); আনাক্সিমেনেসের মূলাধার পদার্থ স্থূল, ব্যক্ত (determinate) বায়ু। থালেস, আনাক্সিমান্দর এবং আনাক্সিমেনেস যবন দার্শনিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই তিন জন ছাড়া এই শাখার আর যে-সকল দার্শনিক অভ্যুদিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ থালেসের অনুসরণ করিয়া জলকে জগতের মূল কারণ বলিয়াছেন, কেহ বা আনাক্সিমেনেসের অনুসরণ করিয়া অনন্ত বায়ু-মণ্ডলকে জগতের মূল কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। *



(১নং ক) মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি যোগীর মূর্ত্তি (পার্শ্বচিত্র)

আনাক্সিমান্দর হয়ত লিডীয়ার রাজা ক্রীসাসের রাজধানী সার্ডিস নগরে কোন হিন্দু আগন্তুকের নিকট প্রধান

---

*John Burnet, *Early Greek Philosophy*, p. 73

* W. T. Stace, *A Critical History of Greek Philosophy*, London, 1920, p. 30.

কারণ-বাদের আভাস পাইয়াছিলেন। এই প্রকার মতবাদের পুনঃ পুনঃ উদ্ভাবন অসম্ভব।

আনাক্ষিমান্দরের দর্শনে সাংখ্যের প্রভাবের অস্বীকৃতির আর এক কারণ, সাংখ্য যে এত প্রাচীন, অথবা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে সাংখ্যমত যে এত প্রচার লাভ করিয়াছিল, এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'। 'সাংখ্যকারিকা' খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর রচনা। অনেকে মনে করেন, যে-দর্শনের প্রধান পাঠ্য গ্রন্থ এত আধুনিক, সেই দর্শন আর কত দূর প্রাচীন হইতে পারে। কিন্তু সাংখ্যকারিকা অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং অধিকতর বিস্তৃত সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় বাদরায়ণের 'বেদান্তসূত্রে'।

বেদান্তের বা উপনিষদ্‌বাক্যের অর্থ নির্দ্ধারণ বেদান্ত-সূত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে-সকল বেদান্তবাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম জগৎকারণ, বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে তাহাদের অর্থের বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ের ১৩৪ সূত্রের মধ্যে ১৩০টি সূত্রেই কার্য্যত দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যে-সকল উপনিষদ্‌বাক্য সাংখ্যের অচেতন প্রধানের বা প্রকৃতির জগৎ কারণত্ব সমর্থন করে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ বা সাংখ্যপন্থী প্রচার করেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই সকল বচন প্রধানকারণবাদ সমর্থন করে না, ব্রহ্মকারণবাদই প্রতিপাদন করে। সভাষ্য এই সকল সূত্র পাঠ করিলে মনে হয়, বেদান্ত সূত্র রচনার পূর্ব্বে এমন কোন প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ ছিল যাহাতে উপনিষদের সাংখ্যাদর্শনানুসারী ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের শেষ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—

> দেবল প্রভৃতিভিশ্চ কৈশ্চিদ্ধর্ম্মসূত্রকারৈঃ স্বগ্রন্থেষ্বাশ্রিতঃ।
>
> "দেবল প্রভৃতি কয়েকজন ধর্ম্মসূত্রকার নিজ নিজ গ্রন্থে (প্রধান কারণবাদ) স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।"

দেবলের ধর্ম্মসূত্র এখনও পাওয়া যায় নাই। ধর্ম্মসূত্র শ্রৌত গৃহ্য এবং ধর্ম্ম এই তিন খণ্ডে নিবদ্ধ কল্পসূত্রের অন্তর্গত এবং আদৌ বিভিন্ন বৈদিক শাখার বা চরণের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যগণের সঙ্কলিত। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে যাহা সূত্রযুগ দেবলাদির ধর্ম্মসূত্র সেই যুগেই আদৌ সঙ্কলিত হইয়াছিল। সূত্রযুগের পূর্ব্বে বেদের ব্রাহ্মণখণ্ডের আরণ্যক ভাগের অন্তর্গত উপনিষদ্‌গুলি রচিত হইয়াছিল। এই উপনিষৎ রচনার যুগে বিশেষ প্রচার লাভ না করিয়া থাকিলে অবশ্য প্রধানকারণবাদ কোন ধর্ম্মসূত্রে স্থান লাভ করিতে পারিত না।

প্রাচীন সাংখ্য গ্রন্থ যখন বিলুপ্ত হইয়াছে তখন দার্শনিক সাহিত্যের ইতিহাস ধরিয়া সাংখ্যের প্রাচীনতা নিরূপণ করা অসম্ভব। কিন্তু মতামতের পৌর্ব্বাপর্য্য হিসাব করিয়া আপেক্ষিক প্রাচীনতা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। সাংখ্যের ভিত্তি প্রধানকারণবাদ, উপনিষদের দার্শনিক মতের ভিত্তি ব্রহ্মকারণবাদ। এখন বিচার্য্য, মতামতের উৎপত্তির ক্রমানুসারে এই দুইটি মতের মধ্যে কোন মতের উৎপত্তি আগে এবং কোন মতের উৎপত্তি পরে হওয়ার সম্ভব। সাংখ্য অনাত্মার বা বাহ্য জগতের মূলে নিত্য প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সুতরাং এই মতকে বলা যায় অস্তিবাদ (realism)। সাংখ্য অনাত্মা সম্বন্ধে অস্তিবাদী। আবার সাংখ্য প্রধান বা প্রকৃতি এবং পুরুষ বা আত্মার এই দুইয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সুতরাং সাংখ্য দ্বৈতবাদী। উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; আর যাহা কিছু আছে তাহা আত্মাতেই অবস্থিত। সুতরাং উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বিজ্ঞানবাদ (idealism), এবং অদ্বৈতবাদ (monism)। এখন জিজ্ঞাস্য, মতামতের পৌর্ব্বাপর্য্য হিসাবে অস্তিবাদ (realism) আগেকার, না বিজ্ঞানবাদ (idealism) আগেকার; এবং সাংখ্যের দ্বৈতবাদ (dualism) আগেকার, না বেদান্তের অদ্বৈতবাদ (monism) আগেকার। অধ্যাপক ডয়সনের মতে উপ-নিষদের বিজ্ঞানবাদ (idealism) জমাট বাঁধিয়া অস্তিবাদে (realism) পরিণত হইয়াছে; উপনিষদের অদ্বৈতবাদ ভাঙ্গিয়া প্রথম সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ, এবং তার পর প্রকৃতি পুরুষাত্মক দ্বৈতবাদ গঠিত হইয়াছে; অর্থাৎ মতামতের ক্রমোৎপত্তির হিসাবে আগে বেদান্ত (উপনিষৎ), তারপর

সাংখ্য।* সুপরিচিত গ্রীকদর্শনের ইতিহাসে মতামতের ক্রমোৎপত্তির কিন্তু ঠিক বিপরীত ধারা দেখা যায়। থালেস, আনাক্সিমান্দর, আনাক্সিমেনেস অস্তিবাদী ছিলেন; ইঁহারা প্রত্যেকেই, ব্যক্ত হউক অব্যক্ত হউক, একটা বাহ্য পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে বিজ্ঞানবাদের প্রথম আভাস পাওয়া যায় পার্মেনিদেসের দর্শনে এবং পূর্ণবিকাশ দেখা যায় প্লাতোর দর্শনে। হিন্দুদর্শনের ইতিহাসে যে এই ক্রমের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে যেমন সাংখ্যের দ্বৈতের উৎপত্তি অনুমান করা যাইতে পারে, পক্ষান্তরে সাংখ্যের দ্বৈতবাদের পরিণামে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি, এরূপ অনুমান অসম্ভব নহে। শ্বেতাশ্বর উপনিষদে (৪।১০) কথিত হইয়াছে—

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
"মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া, এবং মায়ার বা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া, জানিবে।"

সাংখ্যকারিকার ১৭ কারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ 'ষষ্টিতন্ত্র' নামক অতি প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

পুরুষাধিষ্ঠিতং প্রধানং প্রবর্ত্ততে
"পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া প্রধান (সৃষ্টি কার্য্যে) প্রবৃত্ত হয়।"

সাংখ্যের বহুপুরুষ বেদান্তের একে (পরমাত্মায়) পরিণত হইয়াছে, এবং সাংখ্যের প্রধান মায়াতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমানের কোন অন্তরায় নাই; বরং এইরূপ অনুমানই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। মানুষের চিন্তা মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া একমূলে পৌছিতে পারিলেই অধিকতর তৃপ্তিলাভ করে। এই হিসাবে সাংখ্যের দ্বৈতবাদ এবং বহু আত্মাবাদ উপনিষদের অদ্বৈতবাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে হয়।

বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি প্রাচীনতম উপনিষদে যে-সকল আখ্যায়িকা আছে তাহা হইতে জানা যায়, অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা এক সময় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এই সকল আখ্যায়িকা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু কোন ভিত্তি না থাকিলে নিজেদের বর্ণের গ্লানিকর এমন সকল আখ্যায়িকা যে ব্রাহ্মণেরা কল্পনা করিতে যাইতেন ইহা মনে হয় না। আর একটি আধুনিক ভুল সংস্কার, জাতিভেদের মূল আর্য্য-অনার্য্যের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ফলে পরাজিত অনার্য্যেরা শূদ্রবর্ণে পরিণত হইয়াছে, এবং আর্য্যেরা বৃত্তি অনুসারে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ



(১নং খ) মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি যোগীর মূর্ত্তি (সম্মুখ)

ছাড়া অন্যান্য দেশেও তথাকথিত আর্য্য-অনার্য্যের মধ্যে, সভ্যতর আক্রমণকারী জাতির এবং হীন আদিম অধিবাসীর মধ্যে, আবহমান কাল এইরূপ দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছে, এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিজিত আদিম অধিবাসীরা শূদ্রত্ব বা দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু বিজয়ী আগন্তুকগণের মধ্যে আর কোথাও ত স্বতন্ত্র তিন বর্ণের অভ্যুদয় দেখা যায় না। যদি বৃত্তিভেদই কেবল জাতিভেদের কারণ হইত, তবে সমস্ত সভ্য দেশেই জাতিভেদ দেখা যাইত। সুতরাং অনুমান হয়,

* Deussen, *The Philosophy of the Upanishads* (English Translation), Edinburgh, 1906, pp. 244-246.

আদৌ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের ভেদ শরীরের চর্ম্মের বর্ণভেদ (racial differencc) মূলক হউক আর না হউক, খুব সম্ভব আচার-বিচারের বিশেষ ভেদ (cultural difference) মূলক ছিল।* যদি ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয়বিদ্যা হয়, তবে তাহার মূলও স্বতন্ত্রভাবে ক্ষত্রিয় সমাজে বর্ত্তমান থাকা স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাকে ক্ষত্রিয়বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহারা বলেন ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রে উহার বীজ দেখা যায়। ঋগ্বেদের এই সকল মন্ত্রে যে ক্ষত্রিয়প্রভাব নাই তাই বা কে বলিতে পারে। এই ক্ষেত্রে সম্প্রদায়-গত শ্রুতি-স্মৃতি (tradition) উপেক্ষা করিয়া কল্পনার আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য নহে।

মোক্ষসাধন ব্রহ্মবিদ্যা যে ক্ষত্রিয়বিদ্যা একথা শুধু উপনিষদে বলা হয় নাই, ভগবদ্গীতায়ও বলা হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে (৩৬) অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন, কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপ করে? বাসুদেব উত্তর করিয়াছেন, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম বা তৃষ্ণা এবং কাম হইতে উৎপন্ন ক্রোধের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ পাপ করে। এই কামকে পরাজিত করিবার উপায় সম্বন্ধে বাসুদেব বলিতেছেন:—

"এই প্রকারে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া, এবং মনকে আত্মায় সমাহিত করিয়া, হে মহাবাহো, তুমি কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে বিনাশ কর।"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই, যোগ বা সমাধিবলে আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করিতে পারিলে কাম ধ্বংস হয়। তারপর চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনায় বাসুদেব বলিতেছেন:—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবে২ব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ॥
স এবায়ং ময়া তে২দ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।

অর্থাৎ এই যোগ আমি বিবস্বৎ (সূর্য্য)কে উপদেশ দিয়াছিলাম; বিবস্বান্ উপদেশ দিয়াছিলেন মনুকে, এবং মনু উপদেশ দিয়াছিলেন ইক্ষাকুকে। গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ জানিতেন। কালক্রমে এই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমি আজ তোমাকে এই পুরাতন যোগ উপদেশ দিলাম।

এখানে যোগ শব্দের অর্থ যোগসাধনলভ্য ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান। সুতরাং উপনিষদের ন্যায় গীতায়ও ব্রহ্ম-বিদ্যাকে রাজর্ষিবিদ্যা বা ক্ষত্রিয়বিদ্যা বলা হইয়াছে।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মকে বলা হয় প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, এবং জ্ঞানকাণ্ডকে বলা হয় নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। গীতা-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন:—

ভগবান নারায়ণ এই জগৎসৃষ্টি করিয়া তাহার স্থিতির ইচ্ছা করতঃ অগ্রে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণ (যাগযজ্ঞাদি) গ্রহণ করাইয়াছিলেন; তারপর সনক-সনন্দনাদি অন্য প্রজাপতিগণকে উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান-বৈরাগ্য লক্ষণ নিবৃত্তি ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি লক্ষণ এবং নিবৃত্তি লক্ষণ (এই) দুই প্রকার।

শঙ্করাচার্য্য এখানে যে-কথার আভাস দিয়াছেন তাহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (৩৪২ অধ্যায়, ১৩০৭৫-১৩০৮০) বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়।—

মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সাতজন (ঋষি ব্রহ্মার) মন হইতে উৎপন্ন। ইঁহারা বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য, বেদের আচার্য্য, প্রবৃত্তি লক্ষণ (সর্গ কামনায় অনুষ্ঠিত) ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রজাপতি রূপে সৃষ্ট হইয়াছিলেন।...সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল এবং সনাতন এই সাতজন স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী, নিবৃত্তিলক্ষণ (জ্ঞান-বৈরাগ্য) ধর্ম্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া কথিত হয়েন। ইঁহারা যোগবিদ্গণের অগ্রগণ্য, সাংখ্যতত্ত্ববিশারদ, ধর্ম্মশাস্ত্রের আচার্য্য এবং মোক্ষপথের প্রবর্ত্তক।

এখানে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের সকল প্রবর্ত্তককেই 'সাংখ্য-তত্ত্ববিশারদ' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সাংখ্যতত্ত্বকে নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের মূলে স্থাপন করা হইয়াছে। মহাভারতকারের সাংখ্য বিশুদ্ধ সাংখ্য নয়, বেদান্তের এবং পাঞ্চরাত্রের সহিত মিশ্রিত। বর্ত্তমানে বিশুদ্ধ সাংখ্যমতের আকর ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা। সাংখ্যকারিকার প্রাচীনতম ভাষ্যকার গৌড়পাদ ভাষ্যের সূচনায় লিখিয়াছেন,—

ইহ ভগবান ব্রহ্মসুতঃ কপিলো নাম, তদ্ যথা—
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তামহর্ষয়ঃ॥

মহাভারতের পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের সন, সনৎসুজাত এবং সনৎকুমারের স্থানে এই বচনে আসুরি, পঞ্চশিখ এবং বোঢ়ুর নাম আছে। সাংখ্যকারিকার ৭০ কারিকায় আসুরিকে বলা হইয়াছে কপিলের শিষ্য এবং পঞ্চশিখকে

* ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের মূলতঃ আচারভেদ সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণ বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 41-এ আলোচিত হইয়াছে।

বলা হইয়াছে আসুরির শিষ্য। এই সকল বচন সপ্রমাণ করিতেছে, ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কপিলের সাংখ্য সৃষ্টির আদি হইতে আছে, অর্থাৎ যতদূর সম্ভব প্রাচীন। মহাভারতের অন্যত্র (শান্তিপর্ব্ব, ৩৫১ অধ্যায়, ১৩৭১১) বলা হইয়াছে—

সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ সনাতনে দ্বে
বেদাশ্চ সর্ব্বে নিখিলেন রাজন্।

"হে রাজন সাংখ্য, যোগ এবং সমস্ত বেদ (এই তিনই) সনাতন, অর্থাৎ চিরদিন আছে।"

মহাভারতকারের এই প্রকার উক্তি উড়াইয়া দেওয়া যায় না; এই উক্তি সাংখ্যের এবং যোগের প্রাচীনতা এবং বেদ হইতে স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধীয় লোকমত সূচিত করে। অবশ্যই স্বতন্ত্র প্রমাণের সহায়তা ব্যতীত এইরূপ লৌকিক-বিশ্বাসের ঐতিহাসিক মূল্য স্থির করা যায় না। সৌভাগ্য-ক্রমে যোগ সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যোগের সম্বন্ধে প্রধান পাঠ্য পুস্তক, পতঞ্জলির যোগসূত্র। অনেকে মনে করেন যোগসূত্রও সাংখ্যকারিকা অপেক্ষা বেশী প্রাচীন হইবে না। যোগসূত্রে যোগ বা সমাধি প্রধান দুই ভাগে বা স্তরে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগ 'সম্প্রজ্ঞাত' যোগ, দ্বিতীয় ভাগ 'অসম্প্রজ্ঞাত' যোগ বা সমাধি। 'সম্প্রজ্ঞাত' যোগের চারি স্তর—

(১) বিতর্ক—স্থূল বস্তুতে চিত্ত সমাধান।
(২) বিচার—সূক্ষ্ম বস্তুতে (তন্মাত্রে) চিত্ত সমাধান।
(৩) আনন্দ।
(৪) অস্মিতা (অহঙ্কার)।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হইলে যখন সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

পালি এবং সংস্কৃত ভাষায় গৌতম বুদ্ধের জীবন-কথা লইয়া যত সূত্র বা গ্রন্থ আছে তাহাদের সকলের মধ্যেই কথিত হইয়াছে, গৌতম ক্রমে চারি প্রকার ধ্যান করিয়া সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন। পতঞ্জলির যোগ-সূত্রানুসারে ধ্যান যোগের একতম অন্তরঙ্গ। অনেক স্থলে ধ্যান এবং সমাধি যোগের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পালি এবং সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থে বিবৃত গৌতম বুদ্ধের অনুষ্ঠিত এবং উপদিষ্ট চারি প্রকার ধ্যান সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অনুরূপ। ললিতবিস্তরে প্রথম ধ্যানের বিবরণ এইরূপ—

বিবিক্তং কামৈর্বিবিক্তং পাপৈরকুশলৈর্ধর্ম্মৈঃ সবিতর্কং সবিচারং বিবেকজং প্রীতিসুখং প্রথমং ধ্যানমুপসম্পাদ্য বিহরতি স্ম। (২২ অধ্যায়)



(২নং) মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মুদ্রায় যোগাসনস্থ পশুপতির চিত্র

সবিতর্ক এবং সবিচার একত্র থাকায় পতঞ্জলির সম্প্রজ্ঞাত যোগের যাহা প্রথম (সবিতর্ক) এবং দ্বিতীয় (সবিচার) স্তর তাহা এখানে একস্তরে নিবদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির তৃতীয় স্তরের লক্ষণ আনন্দ, বৌদ্ধমতে দ্বিতীয় ধ্যানের প্রধান লক্ষণ অধ্যাত্ম সংপ্রসাদ; সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চতুর্থ স্তরের লক্ষণ অস্মিতা, বৌদ্ধমতে তৃতীয় ধ্যানের লক্ষণ স্মৃতিমত্তা। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সহিত চতুর্থ ধ্যানের ঐক্য অবশ্যই আছে। ভদ্রবাহুর কল্প-সূত্রের টীকায় তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের অনুষ্ঠিত শুক্ল ধ্যানও এইরূপ চতুর্ধা বিভক্ত হইয়াছে,* এবং প্রথম ধ্যানকে বলা হইয়াছে 'পৃথক্তবিতর্কং সবিচারম্', এবং দ্বিতীয় ধ্যানকে বলা হইয়াছে 'একত্ববিতর্কমবিচারম্'। এখানেও সম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রথম দুই স্তরকে প্রথম ধ্যানের সামিল করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, যোগের অন্তরঙ্গ ধ্যানের বা সমাধির স্তরভেদ সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মোটামুটি ঐক্য আছে। পতঞ্জলির যোগসূত্রের সময় যাহাই হউক, যোগের অন্তরঙ্গ ধ্যান যে প্রাচীন বৌদ্ধ পালি সূত্র তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন সাক্ষ্য

The Kalpasutra of Bhadhrabahu edited by H. Jacobi, Leipzig, 1879, p. 112.

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২।৪।৫ যেখানে আত্মাকে 'শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য' বলা হইয়াছে। নিদিধ্যাসন অর্থ ধ্যান।

যোগের ধ্যান ধারণা সমাধি যেমন অন্তরঙ্গ, আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি তেমন বাহ্য অঙ্গ। এই সকল বাহ্য অঙ্গের মধ্যে আসন অর্থাৎ বসিবার ভঙ্গী প্রধান। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আছে, 'স্থিরসুখমাসনম্' (২।৪৬), 'নিশ্চল অথচ আরামজনক আসন' হইবে। যোগসূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে অনেক




(৩নং) মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মুদ্রার যোগীর পূজার চিত্র

আসনের নাম আছে, এবং বাচস্পতিমিশ্র এই সকল আসন বর্ণনা করিয়াছেন। বাদরায়ণের বেদান্তসূত্রে আছে (৪।১।৭-৯), অচল ভাবে বসিয়া ধ্যান করিবে। ভগবদ্গীতায় (৬।১৩) যোগাসনের এই সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥
সমং কায় শিরো গ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥

"শরীর, গ্রীবা এবং মস্তক সমসূত্রে অচল ভাবে রাখিয়া, স্থির হইয়া, নিজের নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া এবং অন্যান্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া আত্মবিশুদ্ধির জন্য যোগানুষ্ঠান করিবে।"

এখানে দেহের উপরিভাগের এবং চক্ষুর ভঙ্গী সম্বন্ধে উপদেশ আছে, কিন্তু কি প্রকারে হস্তপদ বিন্যস্ত করিয়া বসিতে হইবে সে-সম্বন্ধে কোন উপদেশ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২।৮) যোগাসনের এই পর্য্যন্ত লক্ষণই দেখা যায়—

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং

"শরীরের তিন ভাগ (কায়, গ্রীবা এবং মস্তক) উন্নত করিয়া এবং সমসূত্রে রাখিয়া।"

প্রাচীন শাস্ত্রে যোগাসন সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত ব্যবস্থা থাকায় অনুমান হয়, কি ভাবে হস্তপদ রাখিয়া ধ্যানে বসিতে হইবে এই বিষয়ে সাধকের স্বাধীনতা ছিল। এই নিমিত্তই পরবর্ত্তী যোগশাস্ত্রে অনেক আসনের ব্যবস্থা দেখা যায়। যোগীর আসনের প্রধান লক্ষণ, শরীরের উপরার্দ্ধ লম্বভাবে স্থাপন এবং নাসাগ্রবদ্ধ-দৃষ্টি। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের 'আয়ারংগসুত্তে' (আচারাঙ্গ-সূত্রে) কথিত হইয়াছে (২।১৫।২৫), তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান (মহাবীর) যখন শুক্লধ্যান করিয়া "কেবল" জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তখন ঊর্দ্ধদিকে জানুদ্বয় এবং অধোদিকে মস্তক রাখিয়া বসিয়াছিলেন (উড্ঢং জানু অহো শিরসা)। পাতঞ্জল সূত্রের (২।৪৬) ব্যাস-ভাষ্যে ক্রৌঞ্চনিষদন, হস্তিনিষদন, উষ্ট্রনিষদন প্রভৃতি নানাবিধ আসনের নাম আছে। এইরূপ কোন আসনই বোধ হয় আচারাঙ্গ সূত্রকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ যাবৎ জৈন তীর্থঙ্করগণের যত আসনবদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে সকলগুলিই পর্য্যঙ্ক-বন্ধাসনস্থ। সকল বৌদ্ধগ্রন্থেই আছে গৌতম বুদ্ধ পর্য্যঙ্ক-বন্ধাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেন। ধ্যানমুদ্রাবদ্ধ যত বুদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সকলগুলিই পর্য্যঙ্কবন্ধাসনে আসীন। অন্যান্য মুদ্রাযুক্ত বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির যত প্রাচীন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সকলেরই নাসা-বদ্ধদৃষ্টি দেখা যায়। এই লক্ষণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুর উপাস্য পুরুষ বা দেবতামাত্রই যোগীরূপে কল্পিত। এই যোগাসন এবং যোগাসনবদ্ধ উপাস্যের কল্পনা কত প্রাচীন?




(৪নং) মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মুদ্রার যোগীর পূজার অঙ্কিত চিত্র

এই পর্য্যন্ত যত যোগাসনস্থ বা ধ্যানমুদ্রাবদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে মথুরায় প্রাপ্ত দুই-তিনখানি তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু এই কয়খানি মূর্ত্তিও খৃষ্টাব্দের আরম্ভকালের অপেক্ষা প্রাচীনতর হইবে না। ইহারও অন্ততঃ চারি-পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার



তেহারানে ২৫শে বৈশাখ তারিখে কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে অজস্র গোলাপফুলের
দ্বারা সজ্জিত গৃহে গৃহীত কবির আলোকচিত্র



তেহারানে আরমেনিয়ান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কবিকে অভ্যর্থনা



তেহারানের আমেরিকান কলেজ উদ্যানে কবির বক্তৃতা উপলক্ষ্যে সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ও বন্ধুবর্গের সম্মিলন
ছবির মধ্যস্থলে শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী দণ্ডায়মান



পারস্য-সীমান্ত হইতে বগদাদ ষ্টেশনে কবির ট্রেন উপস্থিত হইলে সেখানকার শিক্ষকবর্গ, সাহিত্যিকবর্গ, ব্যবসায়ীবর্গ, মহিলামণ্ডলী, আরমেনিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ, ভারতীয়গণের প্রতিনিধিবর্গ ও সরকারী প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে সম্মিলিত অভ্যর্থনা



বগদাদ হইতে ১৫।১৬ মাইল দূরে মরুভূমির মধ্যে একটি বেদুইন তাঁবু, রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে উপবিষ্ট বেদুইন শেখ



বুশেয়ারে পুরী রেজার বাসভবনে কবির সান্ধ্যভোজন
ডান দিকে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী উপবিষ্ট

পালি বৌদ্ধসূত্রে নিয়মিতরূপে পর্য্যঙ্কাসনে ধ্যানানুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যে নিদিধ্যাসনের বিধি আছে তাহাও এই নিয়মানুসারী। এখন জিজ্ঞাস্য, এই নিয়ম হইল কবে এবং কোথায়? বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যজ্ঞ দান (ইষ্টাপূর্ত্ত) তপস্যার বিধি আছে, নিদিধ্যাসনের বিধি নাই। এই বিধি কি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ রচনার সময় সহসা উদ্ভাবিত হইয়াছিল? অভিনব মতামতের উদ্ভাবন প্রতিভাশালী পুরুষের কার্য্য, তাহা সহসা ঘটিতে পারে। কিন্তু যোগের মত অনুষ্ঠান সহসা প্রচারলাভ করিতে পারে না। সুতরাং যোগকে অবৈদিক এবং প্রাগ্‌বৈদিক মনে করাই কর্ত্তব্য। মোহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রত্নবস্তু এই অনুমানের সমর্থন করে।

মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত প্রস্তরের একটি উপবিষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তির ভগ্নাংশে * (১নং ক-খ চিত্র) নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি এবং কায়-শিরো-গ্রীবা সমসূত্রে বিন্যস্ত দেখিয়া এই প্রস্তাবের লেখক অনুমান করিয়াছিল এইটি যোগীর মূর্ত্তি।† এই মতের সমালোচনা করিতে গিয়া একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, এই মূর্ত্তির দৃষ্টি নাসাগ্রবদ্ধ নয়, ইহার চক্ষু টেরা (squint); আর একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন এই প্রকার চক্ষু সিন্ধুদেশবাসীর স্বাভাবিক লক্ষণ। সার জন্ মার্শেল কর্ত্তৃক প্রকাশিত মোহেঞ্জোদড়ো সম্বন্ধীয় পুস্তকে চিত্রিত দুইটি মুদ্রায় বা সিলমোহরে যোগানুষ্ঠানরত মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যায়। ইহার মধ্যে একটি মুদ্রায় আছে, তিন মুখবিশিষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি পর্য্যঙ্কবদ্ধ ভঙ্গীতে সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। এই মূর্ত্তির বাহুদ্বয় বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা জানু স্পর্শ করিয়া দুইপার্শ্বে বিস্তৃত। এত ক্ষুদ্র চিত্রে নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি দেখাইবার উপায় নাই। কিন্তু ইহার অন্য সমস্ত লক্ষণই যোগীর নিশ্চলতা এবং স্থিরতা সূচিত করে। মূর্ত্তির মস্তকের উপরে ত্রিশূল চিহ্ন; সিংহাসনের নীচে দুইটি হরিণ ঘাড় বাঁকাইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া আছে। চারিদিকে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার এবং মহিষ এই চারিটি পশু অঙ্কিত রহিয়াছে; এবং ব্যাঘ্রের ও হস্তীর অন্তরালে একটি মনুষ্য দণ্ডায়মান আছে। সার জন্ মার্শেল মনে করেন এইটি মহাযোগী পশুপতি শিবের মূর্ত্তি (২ নং চিত্র)। এখানে অন্য প্রকার অনুমানের অবকাশ নাই। পশুপতি সেকালে হয়ত অন্য কোন ভাষার অন্য কোন নামে পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় মুদ্রার সিংহাসনের উপর ঠিক এই ভঙ্গীতে সাধারণ (একমুখ) মনুষ্য মূর্ত্তি উপবিষ্ট। দুই দিকে দুইজন উপাসক জানু পাতিয়া করজোড়ে বসিয়া আছেন। প্রত্যেক উপাসকের মস্তকের উপর একটি সর্প ফণাবিস্তার করিয়া রহিয়াছে (৩ নং চিত্র)। এই মুদ্রার অঙ্কিত চিত্রে মূর্ত্তি কয়টি পরিষ্কার দেখা যায় (৪নং চিত্র)। শুনিয়াছি হরপ্পায়ও এইরূপ চিত্রযুক্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে উপাস্যরূপে অঙ্কিত এই সকল যোগীর মূর্ত্তির তাৎপর্য্য কি? এই ভঙ্গীতে নির্ম্মিত বুদ্ধ, জৈন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদির মূর্ত্তি তত্ত্বজ্ঞানের বিগ্রহরূপে কল্পিত। মোহেঞ্জোদড়োর মুদ্রায় অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলিও কি বুদ্ধের বা জিনের মত তত্ত্বদর্শীর মূর্ত্তি? যোগের সঙ্গে বেশী সম্বন্ধ সাংখ্যদর্শনের। সাংখ্য-দর্শন যোগের মূল দার্শনিক ভিত্তি। সাংখ্য-মতের খণ্ডনের পর বেদান্তসূত্রে উক্ত হইয়াছে (২।১।৩)—

এতেন যোগ প্রোক্তঃ।
"এই সকল যুক্তির দ্বারা যোগমতও খণ্ডিত হইল।"

যোগের সহিত সাংখ্যের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য এই, সাংখ্যজ্ঞানীরাই প্রথম যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং পরে বৌদ্ধ, জৈন, বৈদান্তিক, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় ঐ অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোহেঞ্জোদড়োর মুদ্রায় চিত্রিত যোগীর মূর্ত্তি সাংখ্যজ্ঞানীর মূর্ত্তি এতদূর কথা বলা যাইতে পারে কি? যতদিন না এই সকল মুদ্রার চিত্রাকার লিপি পঠিত এবং ব্যাখ্যাত হয় ততদিন এমন কোন কথা বলা যাইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানলাভ যোগসাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। ঋদ্ধি সিদ্ধি বা অলৌকিক শক্তিলাভের

---

*Sir John Marshall, Mohenjo-daro and the Indus Civilization, London, 1931, Vol. III, pl. XCVIII.

†Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 41, p. 25, pl. 1, figs. 6.

উপায়রূপেও যোগ বিহিত হইয়াছে। মোহেঞ্জোদড়োর মুদ্রার যোগীর চিত্র তত্ত্বজ্ঞানের বিগ্রহ না হইয়া সিদ্ধের চিত্রও হইতে পারে। মোহেঞ্জোদড়োতে এবং হরপ্পায় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই যুগে ভারতবর্ষে দর্শনচর্চা ছিল কি না তাহা নিরূপণ করা এখন অসম্ভব। কিন্তু এই সকল নিদর্শন দেখিয়া, সাংখ্য-যোগ উপনিষদ মূলক এই জাতীয় সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যোগাভ্যাস ছিল বলিয়াই যে সাংখ্যদর্শনও উদ্ভাবিত হইয়াছিল এমন কথা বলিবার উপায় নাই সত্য, কিন্তু এত প্রাচীন যোগীর মূর্ত্তি থাকিতে যোগের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিকে তাহার আড়াই হাজার বৎসর পরে, যবন দর্শনের অভ্যুদয়ের সমসময়ে, টানিয়া আনা যাইতে পারে না। যোগের উদ্দেশ্য একাগ্রচিত্তে কোন বিষয়ের চিন্তন। মোহেঞ্জোদড়োর মূর্ত্তি কয়েকটি সপ্রমাণ করিতেছে, আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ সালে, সিন্ধু দেশে এইরূপ মনন বা চিন্তন আরম্ভ হইয়াছিল, এবং উপাস্য দেবতাও এইরূপ চিন্তনকারীর ছাঁচে গঠিত হইতেছিল। এইরূপ চিন্তন একবার আরম্ভ হইলে তত্ত্বনির্দ্ধারণে বেশী বিলম্ব হইতে পারে না। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ সালের এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ সালের মধ্যবর্ত্তী প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময়ে প্রধান কারণবাদ উদ্ভাবিত হইয়া থাকিতে পারে, এবং যদি তাহাই হয়, তবে যে আনক্সিমান্দর খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দে মিলেটাসে বসিয়া একেবারে নূতন করিয়া অনুরূপ অসীমকারণবাদ উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন এমন মনে করা সঙ্গত হয় না। গ্রীক-বিজ্ঞানের এবং গ্রীক-শিল্পের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, গ্রীকেরা সর্ব্বদাই পরের নিকট হইতে নূতন বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন।

দেব-শিশু

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মধ্যদিন-সূর্য্য আজি প্রখর, নীলাকাশে,
তৃষ্ণাহতা ধরণী শুধু দহন-বিষে কাঁপে :
রুদ্র যেন কুটিল-চোখে ভ্রুকুটি করি' হাসে—
পরাণ-পাখী সংজ্ঞাহারা ভীষণ অভিশাপে !

*

মানস-সরোবরের তীরে মরালী পথ-হারা,—
গোধূলি নামে কপালে পরি ঘন-শোণিত-লেখা !
ধূলি ও ধূমে ঢেকেছে আঁখি সপ্ত ঋষি তারা—
পীড়িত নর-দেবতা চোখে লুপ্ত জল-রেখা !

*

গভীর ঘুমে শুনেছ তুমি দারুণ হাহাকার—
হে দেব-শিশু, নেমেছ তুমি তোমার অপমানে—
মন্থ-শেষ-বিষের মত ঘনালো আঁধিয়ার,—
তোমারি রথ-চক্রে শুনি, প্রণব-ধ্বনি কানে !

*

শুভ্র ধূলি-উড়ানো পথে, হে নব নট-নাথ
তৃণ-কুসুম উঠেছে ফুটি করুণ মনোরম !
কৃপাণ-হানা আননে তুমি ধরেছ সে-আঘাত—
মধুর করি হেসেছ তুমি কৃপাণ-পাণি সম !

*

(আজি) মাঘেরই বায়ু ভেঙেছে কারা, কহিছে কানে তব,
'মরণ আলো-তীর্থ পানে পথিক যত চলে—
অশোক-ফুলে তাদেরই প্রাণ, ফুটেছে অভিনব :—
সাগর-পারে 'কুমারী' কাঁপে ;—গিরিশেখর জ্বলে।'

*

ধূসর হর-জটার তলে উছল জল-ধারা—
'গঙ্গোত্রী'-প্রপাতে শুনি শঙ্খ,—অভিরাম !
প্রখর স্রোতে ঝলকি' উঠে অযুত মণি-তারা,—
হে দেব-শিশু, সেখানে দেখি লিখেছ তব নাম !

হাফেজ

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম. এ

যাহারা অনুবাদের সাহায্যে অন্য ভাষার,—বিদেশী ভাষার কাব্যসাহিত্য আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের বিচার ও মতের মূল্য এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা আদৌ দিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন যে সাহিত্য, বিশেষ করিয়া কাব্য-সাহিত্য, শব্দচয়ন ও বাক্যসন্নিবেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে; অনুবাদে এই-সব শব্দের বৈশিষ্ট্য রক্ষা হয় না, পূর্ব্বের বাক্যরচনারীতির বিস্তর বিপর্য্যয় ঘটে, সুতরাং অনুবাদে ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিল্পচাতুর্য্য ও রস—যাহা সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ—তাহার কোনই নিদর্শন থাকে না। সুতরাং অনুবাদে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, অনুবাদের সাহায্যে এরূপ সাহিত্য বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। আবার এ-কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, মানুষের আয়ু স্বল্প, বিঘ্ন বহু, সুতরাং অনুবাদকে উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। জার্ম্মান ভাষা না শিখিয়া গেটে পড়িব না, রাষিয়ান ভাষা না শিখিয়া লেনিনের কি টলষ্টয়ের গ্রন্থে হাত দিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিলে গেটে-লেনিন-টলষ্টয় অজানাই থাকিয়া যাইবে, তাঁহাদের সহিত পরিচয়লাভের সৌভাগ্য ঘটিবে না। তাই ফার্সিতে অনভিজ্ঞ হইয়াও হাফেজের কাব্যসুধা পান করিবার ও তাঁহার কথা আলোচনা করিবার স্পর্দ্ধা যদি করিয়াই থাকি তবে সে দুঃসাহস ক্ষমার যোগ্য। নহিলে আমাদের মত হীনশক্তি সাধারণ মানুষ যে একেবারে নিরুপায়।

আমাদের দেশের ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে অন্য দেশের যোগসূত্র যাঁহারা অনুসন্ধান করিতে চাহেন পারস্য কবি-কুলপতি হাফেজের কথা নিঃসন্দেহ তাঁহাদের মনে পড়িবে, এ-কথা বলা যাইতে পারে। হাফেজ ছিলেন কবি। তিনি দার্শনিক ছিলেন না, অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে, জাগতিক সমস্যা সম্বন্ধে, জীবনমৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান, যে ধারণা, তাহা যুক্তি দিয়া বিশ্লেষণ দ্বারা সত্যান্বেষী দার্শনিকের মত বিধিবদ্ধ ভাবে লিখিয়া যান নাই,—অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, ভক্তিরসে রসিক ভারতীয় কবিদেরই মত তাহা কবির অমর সঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে কথা রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে বলিয়াছেন,—

> গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
> বাহির মনে
> চিরদিবস মোর জীবনে।
> ... .
> গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই
> এই ভুবনে।

ভগবৎপ্রীতি হাফেজের মহাসঙ্গীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল; সুরের হাওয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল; সে সুর এখনও একেবারে থামে নাই, এখনও তাহার তরঙ্গ থামিয়া থামিয়া দেখা দেয়, ভারতীয় সঙ্গীতে, বাউলের গানে, কবির কাব্যে তাহার আমেজ পাওয়া যায়।

হাফেজ নাম নয়, উপাধি; কবির প্রকৃত নাম, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ। 'কালিদাস', 'হাফেজ'—বাগ্‌দেবীর এই-সব বরপুত্রের উপাধি বা লোকদত্ত নামই টিঁকিয়া আছে; পূর্ব্বাশ্রমের নাম বেঙাচির লেজের মত খসিয়া গিয়াছে; শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ লোকে জানে শুধু হাফেজ, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ শুধু ঐতিহাসিকের বা জীবনীকারের মগজে বা কলমের ডগায়। সমগ্র কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া এই উপাধি তাঁহাকে দেওয়া হয়; কোরাণ সব সময় তাঁর বুকে থাকিত। পিতা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। ইস্পাহান হইতে শিরাজে আসিয়া বসবাস করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই শিরাজেই কবির জন্ম। শিরাজ! কবির কল্পনা ভরা শিরাজ! নৃত্যগীতমুখর চিরউৎসবময় শিরাজ! শিরাজেই তাঁহার সমস্ত জীবন কাটিল। মুসল্লার ঝিরঝিরে বাতাস, রুকনাবাদের নদী,—এ-সব ছাড়িয়া তিনি কোথাও যাইতে পারিতেন না, বোগ্‌দাদের সাদর আমন্ত্রণ সত্ত্বেও

তাঁহার পা চলিতে চাহিত না। কিন্তু স্থানবৈচিত্র্য না ঘটিলেও অন্তরের এক মহা পরিবর্ত্তনের কথা তাঁর চরিতকার লিখিয়া গিয়াছেন :—যৌবনে সুরা ও বিলাস তাঁহার সাথী ছিল ; কবি ত স্পষ্টতঃই সুরাদেবীর বন্দনা করিয়া গিয়াছেন, মরিলেও যাহাতে সুরাপূত (?) করিয়া তাঁহাকে শেষ শয়ানে সমাহিত করা হয় সেজন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

সুরাপানে মরণ হোলে তেমনি কবর দিও,
মাতাল বেশে সাজিয়ে আমায় তোমরা বহে নিও,
দ্রাক্ষালতায় আমার তরে সমাধি রচিও,
সরাইখানার পথের পাশে কবর আমার দিও।
দেহটাকে করায়ো স্নান সরাইখানার জলে,
কবরপানে আনবে বহি সুরাপায়ীর দলে,
লাল পেয়ালার ছিটায় মরুক ধূলা আমার মত,
বেহালাতেই শোকের গীত বাজুক অবিরত।
মরণকালে রইবে লেখা, এই-ই দানপত্র,
হাফেজ তরে করিবে শোক নট, চারণ, মাত্র ;
কিন্তু কবি, সুরায় তব বিরাগ নাহি চাই,
—মাতাল যারা তাদের উপর রাজার দাবী নাই।

কিন্তু পরে তিনি সুফীবাদের আশ্রয় লইলেন, বিলাস-স্পৃহা ভগবন্মুখী হইল, ভোগ সংসারকে ছাড়িয়া আনন্দময়কে আশ্রয় করিল। তাঁহার অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি কি করিয়া লাভ হইল সে-সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে। শিরাজের উপকণ্ঠে "পীরসব্জ" নামে এক স্থানের খ্যাতি ছিল ; পর পর চল্লিশ রাত্র সেখানে জাগিলে কাব্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিত ; হাফেজ জাগিতে আরম্ভ করিলেন,—নিকটেই প্রণয়িনীর আবাসভবন, সেদিকে দৃষ্টি দিতেন না। চল্লিশ দিনের দিন সকালে প্রলোভন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে কবি অপূর্ব্ব সংযমের পরিচয় দেন ; তাই সে রাত্রি প্রভাত হইলে হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রপরিহিত এক বৃদ্ধ (ইনিই নাকি ইমাম আলী) আসিয়া সাধককে এক পাত্র অমৃত উপহার দেন। এই অমৃত পানে কবির কবিত্ব শক্তি অদ্ভুত ভাবে ফুটিয়া উঠে।

হাফেজের কাব্যামৃত যাঁহারা আস্বাদ করিয়াছেন তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছেন,—আঃ কি আনন্দ, কি সুন্দর, কি মনোরম ! পারস্যের কবিদের মধ্যে তাঁহার আর তুলনা নাই। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার ভাষার পারিপাট্য, তাঁহার কল্পনাসৌন্দর্য্য তাঁহাকে কবিজগতে শীর্ষস্থান দিয়াছে। প্রসিদ্ধ পারসিক কবি জামী তাঁহাকে বলিয়াছেন — অদৃশ্য জিহ্বা — "লিসান-আল্-ঘাএব্" — তর্জ্জমান্-আল্-আস্রার্—রহস্যভেদী ; গোপন যিনি তাঁহাকে তিনি জানিয়াছিলেন, অদৃশ্য জগতের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই যুগে যুগে রহস্যলোকের সন্ধানী মানুষ তাঁহার বাক্যসুধায় নিজ নিজ অন্তরের ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিয়াছে, সান্ত্বনা পাইয়াছে, সন্ধান জানিয়াছে ; তাই তিনি দেশবিদেশের রাজা বাদশাহের সমাদর ও প্রসাদ লাভ করিয়া ছিলেন, শাহ্ আবু ইশাকের সভায় পঞ্চরত্নের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন ছিলেন, আর অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডারের চাবী তাঁহার কাছে ছিল বলিয়া দেশব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবের করাল ছায়া তাঁহার কাব্যের সরসতাকে একটুও ম্লান করিতে পারে নাই। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও মনীষী এমার্সন কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টির কথা বলিয়া গিয়াছেন, জার্ম্মান কবি গেটে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য কাব্যের রস পাইতে চাহে তাহাকে হাফেজের কাব্য পড়িতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে, জানিতে হইবে, কারণ প্রাচ্যকে না জানিলে পাশ্চাত্যকে ঠিক বোঝা যায় না, প্রকৃত জ্ঞানের পথ বিশ্লেষণ নহে, সম্মেলন ; অথবা, জ্ঞানের আরম্ভ বিশ্লেষণের পথে, কিন্তু শেষ তাহার সম্মেলনে।

Over the Mediterranean Sea
Bright the Orient sun has sprung :
Only he who Hafiz knows and loves
Knows what Calderon has sung.

হাফেজের জন্মতারিখ জানা না গেলেও মৃত্যুতারিখ কিন্তু জানা যায়, প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ লইয়া বিরোধ বাধিল, যে-ব্যক্তি যৌবনে সুরা ও নারীর উপাসনা করিয়াছে এবং বিলাসতরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিয়াছে বলিয়া জনাপবাদ, ত স্বী মনসুরের 'আনল্ হক্'-ধর্ম্মে যাহার আস্থা, তাহার আবার শুদ্ধভাবে কবরে স্থান পাইবার দাবি ! বিরোধের মীমাংসার এক উপায় স্থির হইল—কবির শ্লোকগুলি পৃথক পৃথক ভাবে রাখা হইবে, তাহ



'হাফেজিয়া' (হাফেজের সমাধি-উদ্যান)

হইতে প্রথম যে শ্লোক হাতে উঠিবে, তাহাই কর্ত্তব্য সূচিত করিবে এবং সে ইঙ্গিত গ্রাহ্য হইবে। তখন এই শ্লোক উঠিল :—

হাফেজের দেহের কাছে যেতে ভয় কিবা বল ?
পাপে মলিন হোক না সে গে, আছে বাঁধা স্বর্গতল।

সুতরাং বিরোধীদলের কোনও আপত্তি আর টিঁকিল না, পরম সমারোহে মৃতদেহের সমাধি হইল ; তাঁর সমাধির উপর তাঁহারই রচিত কবিতা খোদাই করা আছে ; তাহার অনুবাদ নীচে দেওয়া গেল।

কোথায় তোমার মিলন-বার্ত্তা ? মুগ্ধচিত্ত, উঠ্‌তে চাই :
বাঁধা আছে নানান্ ফাঁদে, পুণ্যপাখী, উড়্‌তে চাই :
সেবার তরে ডাকো মোরে,—প্রেমের ডাকে উঠ্‌বো আমি,
দেশ ও কালের প্রভুত্ব লোভ একেবারেই যাবে থামি।
পথ-দেখানো মেঘের থেকে ঝরুক্ তোমার প্রসাদ-বারি,
তাহার পরে উঠ্‌তে বোলো মানুষের রাজ্য ছাড়ি ;
ডাকো চারণ, পেয়ালা আনো, নৈলে হেথায় থাক্‌বো না ;
ভরে যাক্ সৌরভে দিক্—কবরে আর রৈবো না ;
বৃদ্ধ আমি, এক রাত্রিরও নিবিড় তব আলিঙ্গনে
আস্‌বে ফিরে নব যৌবন, উঠ্‌বো প্রভাত সমীরণে--
জাগো জাগো ! দীর্ঘদেহে, সকল লোক উচ্ছ্বসি ;
প্রাণ হারা এই হাফেজেরো সকল বাঁধন যাক্ খসি'।

নানাদেশ হইতে সমৃদ্ধ ভক্তবৃন্দ এই সমাধি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, শিরাজের অনতিদূরে একটি সুন্দর বাগানের মাঝখানে এই সমাধি, কবির নাম অনুসারে বাগানের নাম হইয়াছে হাফেজিয়া। চারিদিকে, বাগানের মধ্যে বিস্তর ভক্তের সমাধিস্থান, মহানিদ্রার অন্ধকারেও তাঁহারা কবির সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহেন নাই। যাহারা পারস্যে ভ্রমণ করিতে যান তাঁহারা সকলেই এই সমাধিস্থান একবার দেখিয়া যান।

হাফেজের বন্ধু মুহম্মদ গুলন্দাম তাঁহার কবিতাগুলি একত্র করিয়া প্রকাশিত করিবার সময় যে জীবন পরিচয় দেন সে প্রসঙ্গ ক্রমে বলেন যে কবি কোরাণ পাঠ, অন্যান্য গ্রন্থ চর্চ্চা ও রাজকার্য্যে এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে নিজের রচনা সংগ্রহ করিয়া সাজাইবার দিকে তাঁহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না ; বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার এক উত্তর ছিল – 'দরদীর অভাব' ; তাঁহার সমসাময়িক জগৎ তাঁহাকে বুঝিল না, এই অভিযোগ। "যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্"—ভবভূতির এ গর্ব্বোক্তির পিছনে যে অনাদরের আভাস ইঙ্গিত এখানেও যেন তাহারই অনুরূপ

দেখিতে পাই ; কিন্তু কেন ? জীবনে তিনি ত যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার সরস কাব্য শ্রবণে কাশ্মীরের রূপসীদের কৃষ্ণতার চক্ষুর মধ্যে একটা হর্ষের দীপ্তি দেখা যাইত, সমরখন্দের তুর্কেরা হাফেজের কাব্যের তালে তালে নাচিত ও গাহিত ; দেশাধিপতির অনুগ্রহও তাঁহার শিরে বাগ্‌দেবীর আশীর্ব্বাদের মতই আসিয়া ক্রমাগত পড়িয়াছিল। হাফেজের সবচেয়ে যোগ্য সমালোচক ও কবিতার সংগ্রাহক ছিলেন সুদী, তাঁহার জন্ম বোস্‌নিয়ায় ; সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি টীকা-টিপ্পনী সহ হাফেজের কাব্য প্রকাশ করেন।

কবির লেখাবলী খুলিয়া কত লোকে সমস্যার উত্তর পাইয়াছেন তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। প্রাচীন রোমানেরা ভার্জ্জিলের কাব্য গ্রন্থ খুলিয়া তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর পাইতেন, আধুনিক পারসিকেরা সমগ্র কোরাণ ও হাফেজের দীওয়ান খুলিয়া দেখেন, জীবনের নানা বিচিত্র সমস্যার ভিতরে তাঁহাদের প্রশ্নের সদুত্তর কবির কাব্যে ও জাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্র খুঁজিয়া পান কি না। এই উদ্দেশ্যে দীওয়ান খুলিবার পূর্ব্বে কেহ কেহ কবি-প্রণয়িনী 'শাখে নবাত্' (বা ইক্ষুলতার) দিব্য দিয়া কবিকে সদুত্তর দিতে অনুরোধ করেন। নাদির শাহ্ পারস্য ও ইরাক জয় করিয়া কবির সমাধি দেখিবার পথে এক পক্ষ কর্ত্তৃক গৃহে ফিরিবার জন্য ও অন্য পক্ষ হইতে আবদুর বৈজন হইতে তুর্কদিগকে বিদায় দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন, তখন কি করা উচিত স্থির করিতে না পারিয়া হাফেজের কাব্য খুলিয়া দেখেন—"সুধাময় সঙ্গীত দ্বারা তুমি ইরাক ও পারস্য জয় করিয়াছ ; এখন বোগদাদ ও তব্রীজ জয় কর।" এই সঙ্কেত হইতেই তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন।

কবি শুধু গোলাপ, বুলবুল, প্রেম ও বীণার কথাই বলেন নাই, নানা ভাবের আবেগ তাঁহার লেখনীকে চালিত করিয়াছিল ; একটি গজলের অনুবাদ নীচে দিতেছি।

মুসড়ে পোড়ো না ভাই, সুন্দরের সৌন্দর্য্য তোমাকে তার আমোদে উৎফুল্ল কোরবে ; একদিন তোমার দুখের কাঁটা গোলাপ হোয়ে ফুটবে।

ওহে কাতর হৃদয়, মুসড়ে পোড়ো না, তোমার অশুভ শুভ হোয়ে দাঁড়াবে, যা তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে তা তোমাকে থামাতে পারবে না, যে ভাব এখন অস্থিরতার সৃষ্টি কোরছে তা হোয়ে যাবে শান্ত।

কাতর হোয়ো না, যে উদ্যানে তুমি এখন আছ সেখানে আরো একবার প্রাণের স্পন্দন দেখা দেবে ; তোমার সামনে যে গোলাপের অবগুণ্ঠন আছে, হে রাত্রির গায়ক, তা কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

এ জীবনের রহস্য যদি না-ই জেনে থাকো, তা হলেও মুসড়ে পোড়ো না, অবগুণ্ঠনের মধ্যে প্রচুর আনন্দ লুকানো রয়েছে।

ঐ তারকিত নভ যদি তোমার ইচ্ছামত না ঘোরে, কালচক্র যদি সর্ব্বদা একই দিকে না চলে, তবে মুসড়ে পোড়ো না।

আশ্রয়ের সন্ধানে এগিয়ে যদি মরুভূমিতে পৌঁছাও, কাঁটার হার যদি তোমার পুরস্কার হয়, তা হলেও দুঃখে মুহ্যমান হোয়ো না।

প্রাণ আমার, দিনের ঘূর্ণীবায়ু যদি তোমার এই ক্ষণভঙ্গুর ঘরখানি ধূলিসাৎ কোরে দেয়, তা হলেও দুঃখ কোরো না, কারণ প্রলয় হোতে তোমাকে বাঁচাবার জন্য প্রেম সঞ্চিত আছে।

পথ ভীষণ, লক্ষ্য অদৃষ্ট ; তাতে কি ? সব পথেই যে এক লক্ষ্যে পৌঁছান যায়।

দীনহীনের মত এক কোণে পড়ে আছ, দারিদ্র্য তোমার সহচর, নির্জ্জন রাত্রির গভীর অন্ধকারে তুমি একা,—এ সবের জন্য দুঃখ কোরো না হাফেজ, দুঃখ কোরো না ; তোমার ভালবাসা, তোমার গান - যে তোমারই।

সঙ্গীতের মধ্যেই যে তিনি পরম সান্ত্বনার সন্ধান পাইয়া-ছিলেন সে কথা জগৎকে তিনি বড় গলায় বলিয়া গিয়াছেন, আর বলিয়াছেন গোলাপের রহস্যকথা,—

সুন্দর কবিতার মধ্যে বিরস হৃদয় সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায়। এই গীত সংগ্রহের মধ্যে তুমিও হয়তো একাধিক প্রতিকারের সন্ধান পাইবে।

তোমার চুম্বনের একটিমাত্র স্পর্শ যদি আমার ওষ্ঠে পাইতাম, তাহা হইলে আমার প্রাণে তাহার চিহ্ন থাকিয়া যাইত, লোকোত্তর মুদ্রায় -যাহা কিনা সলোমনের মুদ্রার চেয়েও দৃঢ়, সেইরূপ অদ্ভুত মুদ্রায় সীলমোহর করিয়া আমি সাত রাজার ধনকে নিরাপদে রাখিতাম।

এমন ভাবে কাঁদিও না, ভাগ্যদেবী তোমার হৃদয়ে যে শর বিদ্ধ করিয়াছেন, নির্ভয়ে তাহা দেখ। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে হয়ত দেখিবে যে তাহা সুন্দর।

ভগবানের করুণা আশীর্ব্বাদের মত শিরে আসিয়া পড়ে নাই, এরূপ লোকই নাই। এই আঘাত আসিল, আবার ওই আসিল প্রেম।

গোলাপের, তার সৌরভের, রহস্য এইখানেই ; বাজারে অনেক গোলাপ দেখা যায় বটে, কিন্তু গোলাপের যাহা সার তাহা যে আবরণের পশ্চাতে।

ভারত চিরদিনই হাফেজের কবিতার আদর করিয়া আসিয়াছে। ভারতের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত (শুধু কবিতাগত নয়) সম্বন্ধ ঘটিবারও আশা ছিল। দক্ষিণ ভারতের বাহ্‌মণী রাজ্যাধিপতি গুণগ্রাহী মামুদ শা বাহ্‌মণীর সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ বহুবার প্রত্যাখ্যানের পর অবশেষে একবার কবি তাহা স্বীকার করেন। আসিবার ব্যয় জন্য বহু অর্থ লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই

শিরাজে দানাদিকর্ম্মে ব্যাপৃত হয়; পারস্যোপসাগরে আসিবার পথে এক নিঃস্ব বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহাকে অবশিষ্ট যাহা কিছু সঙ্গে ছিল সব দিয়া দেন। তখন দুইজন পারসিক সম্ভ্রান্ত বণিক ভারতে আসিতেছিলেন। কবির সঙ্গসুখের আশায় তাঁহারা তাঁহার সকল ব্যয়ভার দিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু হোরমুজে আসিয়া অর্ণবপোতে আরোহণ করিবার সময় এক প্রচণ্ড ঝটিকা দেখা দিল, তিনি আর সাগর পাড়ি দিতে ভরসা করিলেন না; পোতাধ্যক্ষ তাঁহাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন, যে স্থান হইতে পোত যাত্রা করিয়াছিল পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া ভিড়িল। কবি দেহে প্রাণ পাইলেন, তীরে নামিয়াই নিজের অক্ষমতা অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিলেন, বাহ্মণীরাজের নিকট হাফেজের আর যাওয়া হইল না বটে কিন্তু তাঁহার শ্লোকটি গিয়া পৌঁছিল। কবিতার শেষাংশ এইরূপ :—

না চলে চোখের দৃষ্টি, রত্নপ্রভা সমুজ্জ্বল,
উপজে পরাণে ত্রাস, শুধু গর্জ্জে সিন্ধুজল।
অসঙ্কোচে ভাবি, ভুল কোরেছিনু অতিশয়,
স্বভাব প্রবল অতি, এই শুধু মনে লয়!

হাফেজ নিজে না আসিলেও তাঁহার এক পুত্র কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, বুর্হানপুরে প্রাণত্যাগ করেন। অসীরগড়ে তাঁর সমাধি আছে।

কবির নামে আর একটি কাহিনী চলিত আছে,—দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুরলঙের সহিত সাক্ষাতের কথা। কবি এক সময়ে প্রণয়িনীর গণ্ডে তিলের জন্য সমরকন্দ ও বোখারার রাজকোষ (অবশ্য কাব্যে) তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। সেই অবহেলা-ব্যঞ্জক পঙ্‌ক্তি দুইটি এখনও বিদ্যামোদীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে শুনা যায়। দিগ্বিজয়ী বীর, উত্তর ভারত জয় করিয়া ধনরত্ন প্রচুর লইয়া গিয়াছিলেন; তাহার পূর্ব্বে যখন তিনি শিরাজ বিজয় করেন তখন দেশে দেশে বিশ্রুত-কীর্ত্তি হাফেজকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন—

সমরকন্দ, বোখারার, আর ধনভাণ্ডার যত,
কষ্ট করিয়া তুলিতেছি আমি দিগ্বিজয়ের ফলে,
নারীর গণ্ডে তিলটির লাগি তাহাও তুচ্ছ মান,
হীন কবি—কোন্ মদগর্ব্বের বলে?

কবি তখন অত্যন্ত বিনয় ও সম্মানের সহিত কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন,—

এ গর্ব্বের মূলে প্রভু সেই তো কারণ,
—রমণীর রূপমুগ্ধ আমি অভাজন।

অর্থাৎ নারীর গণ্ডের তিলটিই তাঁহাকে জীবনের নূতন



শিরাজের মসজিদ

অর্থ দেখাইয়াছে, অন্যের কাছে যাহা মূল্যবান্ তাঁহার কাছে তাহা নয়—সমাজে আদৃত ধনরত্ন ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর উপেক্ষা করিয়া তিনি প্রেমের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, revaluation of accepted values, ইহা তাঁহাকে অন্য হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিত। সাধারণ লোকে ইহা উন্মাদ বা মূর্খের লক্ষণ মনে করিবে। কিন্তু যে সন্ধানী, যে দরদী, সে বুঝিবে অন্যরূপ।

ভারতের সঙ্গে জীবনকালে কবির এই যে সম্পর্ক, ভাবজগতের তুলনায় তাহা কত সামান্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের চিন্তার সহিত তাঁহার ভাবের ঐক্য দেখা যায়, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁহার কাব্যসুধায় ডুবিয়া থাকিতেন। 'সদ্ভাবশতক' দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, কৃষ্ণচন্দ্রের উপর হাফেজের প্রভাব কত বেশী ছিল। সাহিত্য-পরিষদে 'সদ্ভাবশতকে'র যে কপিখানি আছে তাহা দ্বাদশ সংস্করণের, তারিখ দেওয়া আছে সন ১২৯০ সাল। প্রথম সংস্করণ হইয়াছিল ১২৭১ সালে; প্রথম কয়েকটি কবিতায় হাফেজের প্রভাব যথেষ্ট পড়িয়াছে। প্রথম কবিতার নাম 'দুরাশা'; ইহার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করি—

প্রেম নাই, প্রিয়লাভ আশা করি মনে !
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভবভবনে ?

দ্বিতীয় কবিতা—'উদ্বোধন'; তারও শেষ দুই পঙক্তিতে হাফেজের কথা আছে; তৃতীয় কবিতায়ও সেইরূপ। এই ভাবে চলিয়াছে। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন,—

'পারসীক মহাকবি হাফেজ প্রবর,
যাঁহার জনমে ধন্য শিরাজনগর' ইত্যাদি (১০৫ পৃঃ)

বিশ্বের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া 'মরি কিবা শোভাময় এ ভবভবন' কবিতার শেষে কবি বলিতেছেন,—

"এ সব স্বভাবশোভা রচিত যাঁহার,
হাফেজ ! মজ না কেন প্রেমরসে তাঁর ?"

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে' বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে এখনও স্থান পায়, কিন্তু তার যে দুই পঙ্‌ক্তি দেখা যায় না তাহারা এই—

মনে ভেবে বিষম বিরহ-রিপু-ভয়,
হাফেজ ! বিমুখ কেন করিতে প্রণয় ?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হাফেজের কাব্যামৃত পান করিয়া নবজন্ম লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে আত্মহারা হইয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে নৃত্য করিয়াছিলেন, সঙ্গীরা অনেক কষ্টে তাঁহাকে খুঁজিয়া পায়। আমাদের সে যুগ আর এ যুগ—কত ব্যবধান ! তবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথের পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে মূল পারসীক ভাষায় হাফেজের কাব্যমালা আর কষ্টেলো প্রণীত The Rose Garden of Persia দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত নয় যে, আধুনিক যুগের সত্যেন্দ্রনাথও হাফেজের ভক্ত ছিলেন। গত বৎসরের মধ্যে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে হাফেজের কাব্যালোচনা ও কাব্যানুবাদ কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল; মদীয় স্নেহাস্পদ ছাত্র অজয়চন্দ্রের অনুবাদও পাঠকসমাজে আদর লাভ করিয়াছে শুনিয়াছি। অতীতের ভাবধারা হইতে বর্ত্তমানকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, যিনি আমাদের দেশের সাহিত্যে ও সাধনায় হাফেজের স্থান কোথায় তাহা দেখাইয়া দিবেন, তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই। আশা করা যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের সায়ং সন্ধ্যায় পারস্যের সেই অতীত কবিপ্রাণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া গৌড়জনের জন্য অভিনব সুধাভাণ্ড পুনরায় বিতরণ করিতে থাকিবেন।

হাফেজ ও তাঁহার সহধর্ম্মীরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা বিষম কথা, সহজ নহে। তন্ত্রসাধনায় যেমন একটা symbolism-এর ব্যবস্থা আছে, একটা সন্ধা ভাষা আছে, প্রকাশের একটা কৃত্রিম ভঙ্গী বা রীতি আছে, হাফেজ ও তাঁহার সহধর্ম্মী অন্যান্য সুফীদেরও সম্বন্ধে সেইরূপ বলা যাইতে পারে। সুরা সুরা নহে, তরুণী মূর্ত্তিমতী নহে, গোলাপ, কাঁটা, চুম্বন, আলিঙ্গন,—কোনও কথাই সোজাসুজি নিতে পারিব না, মনোজগতে, সাধনাজগতে ইহাদের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক, সমাজে প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিলে কবির এবং সাধনার অপমানই করা হইবে, অর্থগ্রহ হইবে না, আমাদের মত সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহা যে দুরত্যয় বাধা। তন্ত্রের পঞ্চম-কারের স্থূলরূপের আবরণে মহাযোগী সন্ন্যাসী অতি উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিবৃত করিতেছেন; নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, আকুমার ব্রহ্মচারী, রাধাকৃষ্ণের মিলনগাথায় কোমলকান্ত পদাবলীর মাঝে নানা প্রকার সম্ভোগবর্ণনায় আত্মহারা, দরবিগলিতাশ্রু; পার্শ্বে প্রেমাতুরা তরুণী রূপসী, হস্তে বীণা, নিকটে সুগন্ধি মদ্য পাত্র, অথচ ভগবৎপ্রেমে বিভোর সুফী; স্থূলকে আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্মকে লক্ষ্য করা, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের বন্ধনের মধ্যে অতীন্দ্রিয়কে পাইবার জন্য এই যে আকুলিব্যাকুলি,—এ সবই ত রুচির ভেদ অনুসারে নানা পথ, কিন্তু ধারা এক। সদ্‌গুরুর হাতে পড়িলে বুঝি এই কঠোরতম এবং প্রকৃত সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ হয়, নতুবা যে জানে সে-ই জানে, আমাদের মত জড়বুদ্ধির স্থূল হস্তাবলেপে মোহগর্ত্তের চিরান্ধকারে পড়িয়া মরিতে হয়।*

---

* প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য পাইয়াছি :

১। Browne—*Persian Literature under Tartar Dominion.*

২। *Poems of Shamsuddin Mohammed Hafiz of Shiraz.* Ed. by John Payne, London, 1901.

৩। রহস্য-সন্দর্ভ। ৩য় খণ্ড। সম্বৎ ১৯২২।

৪। Charles Devillers—*Les Ghazels de Hafiz.* Paris. 1922.

৫। A. K. Shirazi—*Hafiz.* "Calcutta Review."

স্বাগতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি কে ?

প্রশস্ত রাজপথ। মাঠের উপর দিয়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়া, গ্রামের পার্শ্ব দিয়া, কখন সোজা, কখন বাঁকা, ধরণীর অঙ্গে সাদা শিরার ন্যায় পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথ দিয়া একখানা মোটর গাড়ী চলিয়া যাইতেছিল। গাড়ীতে তিন জন লোক। যাহার গাড়ী—হরিনাথ—সে নিজে গাড়ী চালাইতেছিল, তাহার পাশে বসিয়া তাহার বন্ধু গঙ্গাধর। গাড়ীর ভিতর বসিয়া মোটরচালক। গাড়ীর পিছনে জিনিষপত্র বাঁধা। মোটরে করিয়া দুই বন্ধু দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

হরিনাথের বয়স পচিশ বৎসর হইবে। গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ। গঙ্গাধর তাহার অপেক্ষা কিছু বড়, শ্যামবর্ণ, মধ্যাকৃতি, দোহারা গড়ন। চক্ষু উজ্জ্বল, দেখিলেই বুদ্ধিমান মনে হয়।

হরিনাথ ধনী। যথেষ্ট সম্পত্তি, বেশ বড় জমিদারী। পিতার এক সন্তান, দুই বৎসর পূর্ব্বে পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। হরিনাথ কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র, বিলাসিতায় রুচি নাই। ধনীর পুত্র বলিয়া অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক মাস পরেই স্ত্রীবিয়োগ হয়। এ পর্য্যন্ত হরিনাথ দ্বিতীয় বার বিবাহ করে নাই।

গঙ্গাধর হরিনাথের বাল্যবন্ধু, এক গ্রামে নিবাস। পাঠ্যাবস্থায় মেধাবী ছাত্র বলিয়া সকল পরীক্ষায় যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। অবস্থা সচ্ছল সেই জন্য কর্ম্ম-কাজের বিশেষ চেষ্টা ছিল না। কিছু দিন অধ্যাপনা কর্ম্ম করিয়াছিল, কিছু দিন এক রাজার সেক্রেটারী ছিল, কিন্তু ওকালতী পাস করিয়াও উকীল হইতে স্বীকার করে নাই। এখন কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিত না। বাড়িতে বৃদ্ধা বিধবা মাতা ও স্ত্রী। সন্তানাদি হয় নাই। ছোট সংসার, ব্যয়বাহুল্য ছিল না, সুতরাং চিন্তারও বিশেষ কোন কারণ ছিল না। হরিনাথ তাহাকে নিজের জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে চাহিতেছিল, কিন্তু গঙ্গাধর এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই।

সময় অপরাহ্ণ। মোটর ছুটিতেছিল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য আকাশপ্রান্তে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতেছিল, ক্রমে অস্তমিত হইল, আকাশে গোধূলি রাগ ছাইয়া আসিল।

গঙ্গাধর বলিল,—ওখানে গাছপালার মধ্যে আগুন লেগেচে, দেখেচ ?

হরিনাথ দেখিতেছিল। সম্মুখে অনেক দূরে পথের বাম দিকে একটা ছোট বন। তাহার ভিতর দিয়া গাঢ় ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত হইতেছিল, মাঝে মাঝে আগুনের হল্কা উঠিতেছিল। গ্রাম বা কোন গৃহের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না। হরিনাথ মোটরের বেগ বাড়াইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে উপনীত হইল। মোটর থামাইয়া তিন জনেই অগ্নির অভিমুখে ছুটিয়া গেল।

পথের ধারে কয়েক বিঘা জমি জুড়িয়া শালবন। স্থানে স্থানে বন ঘন, অপর স্থানে বিরল। বনের ভিতর খানিকটা মুক্ত পথ। সেই পথে গিয়া হরিনাথেরা দেখিল একখানা মোটর গাড়ী গাছে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই আগুন লাগিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। উত্তাপ এত অধিক যে নিকটে যাওয়া অসম্ভব। অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার কোন উপায় নাই, নিকটে কোথাও জলাশয় নাই। হরিনাথ ও গঙ্গাধরের মনে হইল মোটরের নীচে একটা মানুষ চাপা পড়িয়া পুড়িতেছে। মৃত্যু অনেক পূর্ব্বেই হইয়া থাকিবে, কিন্তু এক পায়ের জুতা দেখিয়া তাহাকে পুরুষ মনে হইল।

মোটরচালক বলিল,—ও ব্যক্তি আরোহী মনে হচ্চে, চালক কোথায় গেল ?

গঙ্গাধর এদিক ওদিক দেখিতেছিল। হঠাৎ এক দিকে ছুটিয়া গিয়া বলিল,—এ দিকে এ কে পড়ে রয়েচে ?

তিন জনেই সেই দিকে গেল। একটা ছোট ঝোপের পাশে, খুব পুরু ঘাসের উপর একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া রহিয়াছে। মৃতা না মূর্চ্ছিতা ?

হরিনাথ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। রমণী যুবতী, অপূর্ব্ব রূপবতী। চক্ষু মুদ্রিত, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। গঙ্গাধর হাত দেখিয়া বলিল,—এখনও বেঁচে আছে। একে শীঘ্র মোটরে নিয়া চল।

গঙ্গাধর ও হরিনাথ দুইজনে ধরাধরি করিয়া রমণীকে তুলিয়া নিজেদের মোটরে লইয়া গেল। মোটরে একটা বাক্সে কতকগুলা ঔষধ ছিল, তাহার মধ্যে এক শিশি ব্রাণ্ডি ছিল। গঙ্গাধর কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি রমণীর মুখে দিল। তাহাতে নাড়ীতে একটু বল হইল, কিন্তু মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। হরিনাথ দেখিতে পাইল রমণীর মাথার পশ্চাৎ দিকে আঘাত লাগিয়াছে, অল্প রক্ত পড়িতেছে। রক্ত বন্ধ করিবার ঔষধও ছিল, ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিয়া বস্ত্রখণ্ড দিয়া হরিনাথ বাঁধিয়া দিল।

মোটরের ভিতর রমণীকে শয়ন করাইয়া হরিনাথ ও গঙ্গাধর তাহার নিকটে বসিল। হরিনাথ মোটরচালককে আদেশ করিল,—শীঘ্র একটা গ্রামে চল। কোন ডাক্তারকে দেখাতে হবে।

আধ ঘণ্টা পরে একটা গ্রাম দেখা গেল। গ্রামে একখানা বড় বাড়ি দেখিয়া তাহার সম্মুখে মোটর দাঁড়াইল। মোটর দেখিয়া বাড়ির পুরুষেরা বাহির হইয়া আসিল।

বাড়ির কর্ত্তার বয়স হইয়াছে। তাঁহাকে গঙ্গাধর দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত বলিয়া বলিল,—আমাদের আজ রাত্রের মত আশ্রয় দিন। যদি কোন ডাক্তার গ্রামে থাকে তাঁকে ডাকিয়ে পাঠান।

কর্ত্তার এক পুত্র তখনই ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেল। কর্ত্তার নির্দ্দেশমত হরিনাথ ও গঙ্গাধর রমণীকে তুলিয়া বাড়ির ভিতর একটা ঘরে শয্যায় শয়ন করাইল, বাড়ির স্ত্রলোকেরা উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। বাহিরে গ্রামের লোক জড় হইল। বাড়ির একজন বিধবা বৃদ্ধা আসিয়া রমণীকে দেখিয়া বলিলেন,—মেয়ে ত নয় যেন দুর্গা ঠাকরুণ। কাদের বাড়ির বউ গা ?

গঙ্গাধর সংক্ষেপে সকল কথা বলিল। বলিল,—আমরা কিছুই জানিনে। একখানা মোটরে ইনি কারুর সঙ্গে আসছিলেন। মোটর পুড়ে গিয়েচে, সে লোকটিও মরেচে। ইনি খানিক দূরে এই অবস্থায় পড়েছিলেন দেখে আমরা তুলে এনেচি।

ডাক্তার আসিলেন। ইনিও বর্ষীয়ান লোক। রমণীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—কোন হাড় ভাঙেনি, মাথায় জখম হয়ে অজ্ঞান হয়েচে। মস্তিষ্কের ভিতর লেগেচে কি না বুঝতে পারচিনে।

ডাক্তার সঙ্গে করিয়া কিছু ঔষধ আনিয়াছিলেন, রমণীর মুখ খুলিয়া তাহাকে পান করাইলেন। ক্রমে তাহার চক্ষের পাতা নড়িল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, মাথার ও অঙ্গের বস্ত্র সংযত করিয়া উঠিয়া বসিল। চারিদিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের অঙ্গের প্রতি চাহিয়া দেখিল। অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী ছিল, ঘুরাইয়া দেখিল, শাড়ীর পাড় ধরিয়া দেখিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—আমি কে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্মৃতিলোপ

এমন প্রশ্ন কেহ কখন কোন যুবক অথবা যুবতীর মুখে শুনিয়াছে ? আমি কে ? আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তি নিজেকে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঋষিযোগীরা আত্মজ্ঞানের অনুধ্যানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতেন। অহমিকা সাধারণ লোকের দুর্ব্বলতা, কিন্তু নিজের পরিচয় সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় থাকে না।

রমণীর প্রশ্ন শুনিয়া সকলে মনে করিল হয় আঘাত লাগিয়া তাহার মস্তিষ্কের কোন বিকার ঘটিয়া থাকিবে, না হয় তাহার মাথার কোন দোষ আছে। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, ডাক্তার মাথা নাড়িলেন। মুখ নীচু করিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ মা, তোমার বাড়ি কোথায় ?

রমণী আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ডাক্তারের মুখের দিকে

ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া কহিল,—আমার বাড়ি? কেন, এই কি আমার বাড়ি নয়?

—তোমারই ত বাড়ি। তোমার নাম কি?

খানিক ভাবিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিয়া, হাত উল্টাইয়া যুবতী বলিল,—আমার নাম? কই, আমি জানি নে।

—তোমার মাথায় লেগেচে। কোথায় লেগেছিল মনে পড়ে?

যুবতী মাথায় হাত দিয়া বলিল,—তাই ত, মাথায় বড় ব্যথা। কখন লেগেছিল মনে পড়ে না।

ডাক্তার ঘরের বাহিরে আসিলেন। হরিনাথ ও গদাধরও সেই সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল।

ডাক্তার বলিলেন,—মস্তিষ্কে কোনরূপ আঘাত লেগে স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয়েচে। এ রকম হয় পড়েচি কিন্তু কখন দেখি নি। আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।

হরিনাথ বলিল,—কাল কলকেতায় নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাব। কোথায় বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছে তারও সন্ধান নেব।

হরিনাথ ডাক্তারকে টাকা দিতে চাহিল, ডাক্তার গ্রহণ করিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ত্রিলোচন

এক গ্রামে—নাম এখন নাই বা বলিলাম—এক ঘর বড় জমিদার ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল জমিদারবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। পুত্রসন্তান কেহ ছিল না, একমাত্র কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। জমিদারের সম্পর্কে এক বড় ভাই ছিলেন, তিনিই সংসারের কর্ত্তা, কিন্তু বিষয়-পরিচালনের ভার তাঁহার হাতে ছিল না। ম্যানেজার ত্রিলোচন সর্ব্বেসর্ব্বা, আদায়পত্র তাঁহার হাতে, লোকজন তিনিই নিযুক্ত করিতেন, আয়ব্যয়ের হিসাব তাঁহার হাতে। জমিদার-কন্যা বাল্যাবস্থায় বিধবা হইয়াছিলেন, কিছু দিন হইল জ্যাঠা মহাশয়ের সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।

ত্রিলোচন কাছারি-বাড়িতে বসিয়া জমিদারীর কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন। বয়স চল্লিশ হইবে, মাথার মাঝখানে টাক পড়িয়াছে, দেহ স্থূল, গোলগাল মুখ, গোল চক্ষু দুইটি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। মানুষটা দেখিতে হাবাগোবা ভালমানুষের মতন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে হাবাও নয়, ভালও নয়।

ত্রিলোচন আলাদা ঘরে বসিতেন, সেখানে আর কেহ থাকিত না। তিনি বসিয়া আছেন এমন সময় আর এক ব্যক্তি সে ঘরে প্রবেশ করিল। ভদ্রলোকের বেশ হইলেও তাহাকে ভদ্র মনে হয় না। বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে, চোয়াড়ের মত গড়ন, পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া ত্রিলোচনের সম্মুখে দাঁড়াইল।

ত্রিলোচন বলিলেন,—কি হ'ল?

নবাগত ব্যক্তি কঠোর হাস্য করিয়া কহিল,—যা হবার কথা ছিল তাই হয়েচে।

—অল্প কথায় সব খুলে বল।

সে ব্যক্তি গলা নীচু করিয়া ত্রিলোচনকে কতকগুলা কথা বলিল। সকল কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া ত্রিলোচন বলিলেন,—কেউ কিছু টের পায় নি?

—কে আবার টের পাবে? সেখানে জনমনুষ্য ছিল না।

—তা যেন হ'ল কিন্তু একটা খবর আসা চাই। তুমি বনবিহারীর সঙ্গে দেখা করেছিলে?

—হাঁ, করেছিলুম, খবর শীঘ্র আসবে।

—এ গ্রামের কারুর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি ত?

—না, আমি খেয়ানৌকায় পার হয়ে সোজা চলে এসেচি। আবার অমনি ফিরে যাব।

—দেখ, শ্যামাচরণ, আর একটা কথা আছে। এখানে তুমি বড় বেশী যাওয়া-আসা ক'রো না, লোকের মনে একটা সন্দেহ হ'তে পারে।

—আপনার সঙ্গে কথা ছিল আমাকে একটা ভাল কাজ দেবেন।

—সে পরে দেখা যাবে।

—আর এখন?

—এখন এই দু-শো টাকা নিয়ে যাও। এর আগেও টাকা পেয়েচ।

—তা ত পেয়েচি। আমার একটা বাঁধা আয়ের দরকার।

—কার দরকার নেই? কিন্তু এখন তুমি যাও, অন্য কথা আর কোন সময় হবে।

শ্যামাচরণ গোঁফ পাকাইতে পাকাইতে, মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বাগতা

লুপ্তস্মৃতি, অজ্ঞাতনাম্নী যুবতীকে হরিনাথ ও গঙ্গাধর কলিকাতায় লইয়া আসিল। দেশে হরিনাথের বাড়িতে তাহার একজন বিধবা খুড়ীমা থাকিতেন। হরিনাথ তাঁহাকে আনাইল। তাহার অনুরোধে গঙ্গাধর তাহার মাতা ও স্ত্রীকে দেশ হইতে ডাকাইয়া পাঠাইল।

যুবতীকে দেখিলে কি মনে হইত?—অতুলনীয় রূপ, কিন্তু সে রূপে যেন কিসের অভাব। সব আছে, অথচ পূর্ণতা নাই। সজ্জিত আলোকিত মন্দির, তাহাতে সমস্তই আছে কেবল চৈতন্যরূপিণী প্রতিমা নাই। কলিকাতায় আনিবার সময় রমণী কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই, কোন আপত্তি করে নাই। হরিনাথ ও গঙ্গাধরের পরিচয় পর্য্যন্ত জানিতে চায় নাই। কলের মত চলিত ফিরিত, কিংবা একা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। চক্ষে সেই শূন্য দৃষ্টি, নিজের সম্বন্ধে অথবা অপরের সম্বন্ধে কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশ করিত না। বড়-একটা কথাও কহিত না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে দুই চারি কথায় উত্তর দিত।

হরিনাথের খুড়ীমা ও গঙ্গাধরের মা আসিয়া রমণীকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাহার অসাক্ষাতে তাঁহারা হরিনাথ ও গঙ্গাধরকে বলিলেন,—ও কি পাগল?

গঙ্গাধর বলিল,—না, পাগল ও-রকম হয় না। মোটর থেকে পড়ে যাবার সময় মাথার ভিতর কোন রকম লেগে থাকবে, সব ভুলে গিয়েচে।

হরিনাথের খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সধবা না বিধবা?

—তা কেমন ক'রে জানব?

মূর্চ্ছিতাবস্থায় রমণীকে যখন হরিনাথ ও গঙ্গাধর তুলিয়া আনিয়াছিল সে-সময় তাহার পরিধানে সরু কালাপেড়ে শাড়ী, হাতে দু-গাছি সরু সোনার চুড়ী, মাথায় সিঁদুর ছিল না। সিঁদুর মুছিয়া গিয়া থাকিতে পারে, অল্প বয়সে কন্যা বিধবা হইলে বাপ-মা কখন কখন তাহাকে থান কাপড় পরিতে দেন না, আবার ব্রাহ্মদের মধ্যে বিবাহিতা রমণীরাও কেহ কেহ মাথায় সিন্দুর দেন না। অতএব রমণী সধবা কি বিধবা তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই জানিবার উপায় নাই, কারণ তাহার পূর্ব্বের স্মৃতিশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে।

হরিনাথ কয়েক জন বড় ডাক্তার ডাকিয়া রমণীকে দেখাইল। তাঁহারা কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। মস্তিষ্কে আঘাত লাগিয়া এরূপ হইতে পারে তাঁহারা স্বীকার করিলেন, কিন্তু মাথার ভিতর অস্ত্র করা বড় কঠিন ব্যাপার, কোথায় অস্ত্র করিতে হইবে তাহাও তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতে যদি রমণীর মস্তিষ্কের বিকার কিংবা দুর্ব্বলতা থাকে তাহা হইলে অস্ত্র করিলেও কোন ফল না হইতে পারে, আর আশঙ্কা ত আছেই। ডাক্তারেরা মস্তিষ্কে বল হইবার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু অস্ত্র করিতে সম্মত হইলেন না।

ডাক্তারদের দেখা হইলে পর হরিনাথের খুড়ীমা বলিলেন,—কাদের মেয়ে, কাদের বউ, আমরা কিছু জানি নে, আমাদের কাছে কত দিন রাখব?

হরিনাথ বলিল,—তাই যদি জানা যাবে তাহ'লে আর ভাবনা কি? এখনই আমরা ওঁকে পাঠিয়ে দি। কিন্তু যখন কিছুই জানা যাচ্চে না এমন অবস্থায় আমরা কি করব? অনাথ-আশ্রমে ত আর পাঠাতে পারি নে। সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে না হ'লে কি মোটরে চ'ড়ে বেড়ায়? আমরা দেখতে না পেলে হয়ত মারা যেতেন। আমাদের বাড়িতে রাখা ছাড়া এখন আর উপায় কি? এখন কিছু দিন তুমি এখানে থাক তার পর ওঁকে নিয়ে দেশে যেও।

এমন কথার কোন উত্তর দেওয়া যায় না। কলিকাতায় গড়ের মাঠের কাছে হরিনাথের নিজের বাড়ি। রমণীর

জন্য স্বতন্ত্র দাসী নিযুক্ত হইল। লেখাপড়া শিখাইবার জন্য হরিনাথ একজন উত্তম শিক্ষয়িত্রী রাখিল। সন্ধ্যার সময় খুড়ীমা রমণীকে সঙ্গে করিয়া মোটরে বেড়াইতে যাইতেন।

বাড়িতে কেহ থাকিলে তাহাকে ত চিরকাল ওগো হাঁগো বলিয়া ডাকিতে পারা যায় না। মানুষের একটা নাম ত চাই। এই রমণী নিজের নাম, আত্মপরিচয় সব ভুলিয়া গিয়াছে, অথচ ঘরে থাকিলে সময় সময় ডাকিতেই হয়। হরিনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া খুড়ীমাকে বলিল,—ওঁর নাম আমরা ত জানি নে, ওঁকে স্বাগতা ব'লে ডেকো।

—ও আবার কোন্ দেশী নাম?

—আমাদের বাড়িতে ওঁর শুভাগমন হয়েচে এই জন্য উনি শুভাগতা।

খুড়ীমা রমণীকে ডাকিয়া বলিলেন,—হাঁগা মেয়ে, তোমার নাম স্বাগতা। মনে থাকবে ত?

রমণী একবার খুড়ীমার মুখের দিকে চাহিল, আর একবার হরিনাথের দিকে চাহিল। কহিল,—আমার নাম স্বাগতা? তা ত জানতাম না। মনে থাকবে বই কি।

পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হইলেও শিক্ষয়িত্রী দেখিলেন স্বাগতার অসাধারণ স্মরণশক্তি ও শিক্ষা করিবার বিশেষ আগ্রহ। অপরের শিখিতে যাহা ছয় মাস লাগে স্বাগতা তাহা এক মাসের মধ্যে শিখিয়া ফেলিত। অল্পদিনের মধ্যে হাতের লেখাও বেশ পরিষ্কার হইল। আবার কতক বিষয়ে স্বাগতা একেবারে অনভিজ্ঞা। শিক্ষয়িত্রী লক্ষ্য করিতেন, কোন আখ্যায়িকা পড়িবার সময় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উদ্বাহ-সম্বন্ধীয় কোন কথা স্বাগতা একেবারেই বুঝিতে পারিত না। বয়সে ও আকৃতিতে যুবতী হইলেও ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। যেমন খুড়ীমা ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে কথা কহিত হরিনাথ ও গদাধরের সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ সরল ভাবে কথা কহিত। তাহার প্রকৃতি কোমল, মধুর, শান্ত, সহজ লজ্জাশীলা, কিন্তু যুবা পুরুষের সাক্ষাতে যুবতীর যে রকম সঙ্কোচ হয় তাহা ছিল না। শিক্ষয়িত্রীও স্ত্রীপুরুষের বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন কথা তাহাকে বলিতেন না।

স্বাগতার মাথার ভিতর যেন দুইটি কক্ষ, একটি আলোক-উজ্জ্বল, অপরটি অন্ধকার। পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে মুছিয়া গিয়াছে, অভিনব স্মৃতির প্রত্যেক অক্ষর স্পষ্ট ফুটিয়া রহিয়াছে। অজানা এই রূপসীর শুভাগমন কোথা হইতে হইল?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুর্ঘটনা

ত্রিলোচনের বাড়িতে তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা বড়, বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই। পুত্রও নিতান্ত ছোট নয়, বয়স বাইশ বৎসর, লেখাপড়া তেমন অধিক হয় নাই, বাপের কাছে জমিদারী শেরেস্তায় কর্ম্ম করিত। নাম কার্ত্তিক কিন্তু দেখিতে মোটেই কার্ত্তিকের মত নয়। চেহারা কতক বাপের সঙ্গে মিলে, দেহ বাপের অপেক্ষাও স্থূল, বুদ্ধিও তদনুরূপ। তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। কন্যা বিধুমুখী দেখিতে তাহার মায়ের মতন। ত্রিলোচনের স্ত্রী বিশেষ সুন্দরী না হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী, মেয়েও দেখিতে ভাল। বিধুমুখীর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা তেমন ভাল নয়, ত্রিলোচন জামাইয়েরও একটা কর্ম্মকাজের চেষ্টায় ছিলেন।

ত্রিলোচনের পত্নী রমা খুব সেয়ানা, সংসার বেশ গুছাইয়া করিতেন, তবে স্বামীর মনের সকল কথা তিনি জানিতেন না। সকল কথা ত্রিলোচনের পক্ষে বলা সম্ভবও ছিল না।

জমিদারী সম্পত্তির মালিক করুণাময়ী দেবী তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। সঙ্গে অধিক লোকজন ছিল না। প্রবোধচন্দ্রের নিকট হইতে নিয়মিত পত্র আসিত। হঠাৎ এক দিন পত্র আসিল—একজন কর্ম্মচারীর লেখা—যে প্রবোধচন্দ্র ও করুণাময়ী আর কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া কোথায় দূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, দুই তিন দিন অতীত হইল তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কতক পথ নৌকায় যাইবার কথা, তাহার পর গাড়ী মোটর পাওয়া যায়। তাঁহাদের সন্ধান লইবার জন্য চারিদিকে

লোক ফিরিতেছে, কিন্তু কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

জমিদার-বাড়িতে, কাছারিতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ত্রিলোচন নিজে কয়েকজন লোক লইয়া সন্ধান করিতে গেলেন। সে-স্থান অনেক দূর, সাধারণতঃ সেদিকে অধিক লোকের যাতায়াত নাই। সন্ধান পাওয়া গেল যেদিন প্রবোধচন্দ্র ও করুণাময়ী চলিয়া যান তাহার পর দিবস কয়েক ক্রোশ দূরে নৌকাডুবি হয়, সে নৌকায় ভদ্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক কয়েকজন ছিলেন, সকলের মৃত দেহ পাওয়া যায় নাই। নদীতে অনেক কুমীর, খাইয়া ফেলিয়া থাকিবে। মহাজাল ফেলিয়া কয়েক স্থানে নদী দেখা হইল, কোথাও কোন শব পাওয়া গেল না। অবশেষে সিদ্ধান্ত হইল প্রবোধচন্দ্র ও করুণাময়ীর জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহাদের শব কুমীরে খাইয়া ফেলিয়াছে।

ত্রিলোচন ও তাঁহার সঙ্গের লোকেরা শোকার্ত্ত চিত্তে গ্রামে ফিরিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নূতন উত্তরাধিকারিণী

করুণাময়ীর অপমৃত্যুর পরে তাঁহার এক খুড়তুতা ভগিনী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। ইঁহারও ভাই ভগিনী কেহ ছিল না। ইনিও বিধবা, নাম শৈলবালা, বয়সে করুণাময়ী অপেক্ষা বড়, কোলে একমাত্র কন্যা লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন। কন্যাটির বয়স এখন দশ বার বৎসর হইবে, নাম সুবালা, দেখিতে খাঁদাখোঁদা। করুণাময়ী ইহাদের ভরণপোষণ করিতেন, মেয়ে আর একটু বড় হইলে বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন।

ত্রিলোচনের ক্ষমতা পূর্ব্বের অপেক্ষাও বাড়িয়া গেল। পূর্ব্বেও তাঁহারই হাতে সব ছিল, কিন্তু করুণাময়ী ছিলেন বুদ্ধিমতী, জমিদারীর টাকাকড়ির খবর রাখিতেন। ত্রিলোচন তাঁহাকে একটু ভয় করিতেন। শৈলবালা কখনও মনে করেন নাই যে, সম্পত্তি তাঁহার হাতে আসিবে। করুণাময়ী তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট, নীরোগ সুস্থ শরীর, তাঁহার একটি পোষ্যপুত্র লইবার কথা হইতেছিল। হঠাৎ একটা অভাবনীয় দুর্ঘটনায় বিষয় শৈলবালার হাতে আসিল। সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য যে-কোন নূতন বন্দোবস্ত হইতে পারে এ কথা একবারও তাঁহার মনে হইল না। ত্রিলোচন না থাকিলে কে বিষয় দেখিবে?

ত্রিলোচন শৈলবালার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে কহিলেন,—এখন বিষয় আপনার। আপনার বোন-ঠাকরুণ যেমন আমার হাতে সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন আপনারও কি সেই মত?

শৈলবালা হাত তুলিয়া বলিলেন,—তার আবার কথা! করুণা ত তবু জানত শুনত; আমি কিছুই জানি নে। আপনি যা করবেন তাই হবে।

—তা হ'লে আপনি আপনার বোনের মতন আমাকে একখানা আমমোক্তারনামা লিখে দিন, জমিদারীর আদায়পত্রের জন্য মামলা-মোকদ্দমা আছে, আপনি ত আর আদালতে উপস্থিত হ'তে পারবেন না।

—আমি মেয়েমানুষ, আমি ও-সব কি জানি? আর আদালতেই বা যেতে গেলাম কেন? আপনি ওই যে কি বললেন তাই লিখিয়ে নেবেন।

—আর দেখুন, বাড়ির কাজকর্ম্মেও আপনার বোন আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এখনও সেই রকম থাকলে ভাল হয় না?

—সেই রকম থাকবে না ত কি আবার নতুন রকম হবে? আপনাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে কোন কাজ হবে না।

—এই দেখুন না, সুবালা রাণীর বিয়ের কথাও আপনার বোন আমার কাছে পাড়তেন।

—কি কথা হয়েছিল? ভাল পাত্র কোথাও আছে?

—সে কথা এর পর হবে। তার ত কোন তাড়া নেই, আর এই সেদিন অত বড় বিপদ গেল।

—সে কথাও বটে।

—এখন এই হাতখরচের জন্য পাঁচ-শো টাকা নিন। আপনার নিজের যখন যা আবশ্যক আমাকে বললেই হবে। আপনার মামার বাড়ি কিছু টানাটানি, বলেন ত তাঁদেরও কিছু পাঠিয়ে দিই।

শৈলবালা আগ্রহের সহিত বলিলেন,—মাসে মাসে তাঁদের একশো টাকা ক'রে দিলে তাদের বড় উপকার হয়।

—বেশ ত, এই মাস থেকেই দেওয়া হবে।

ত্রিলোচন চলিয়া গেলেন। শৈলবালা পাঁচশো টাকা কখনও হাতে করেন নাই, তিনি টাকাটা বাক্সে পুরিলেন।

ত্রিলোচন বাড়িতে স্নান আহার করিতে গেলেন। ঘরে বসিয়া রূপা-বাঁধান হুঁকায় তামাক খাইতেছেন এমন সময় রমাসুন্দরী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—আজ যে মেজাজ ভাল দেখচি।

ত্রিলোচনের ফুলো গালে, ড্যাবডেবে চোখের কোণে হাসি ভরা, মুখের ধুঁয়া বাহির করিয়া বলিলেন,—মেজাজ খারাপ কবে দেখলে? বদমেজাজ হ'লে কি আমার কাজ চলে?

—আমি বলচি কি যে তোমাকে বেশ খুশী-খুশী দেখচি, যেন কোন ভাল খবর এসেচে।

—নতুন খবর আবার কি আসবে? আমি কি ভাবছিলাম জান? এই কার্ত্তিকের বিয়ের কথা।

—সে ত বেশ কথা। বিয়ে দিলেই হয়।

—তা ত হয়। তবে কোথায় বিয়ে হবে তার খবর রাখ?

—কোন ভাল সম্বন্ধ এয়েচে বুঝি?

—সম্বন্ধ যদি এখানেই হয়! সুবালা রাণীর সঙ্গে যদি বিয়ে হয়!

রমাসুন্দরী ত্রিলোচনের কাঁধে হাত দিয়া, গলা খাটো করিয়া কহিলেন,—তাও কি কখনও হয়? আমার সঙ্গে তামাশা করচ বুঝি?

—তামাশারই কথা বটে। কথাটা মনে এল তাই ভাবচি। তুমি ঢাক পিটিয়ে বেড়াও তা হ'লে সব ফেঁসে যাবে, শেষে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।

—আমাকে কি তেমনি অসেয়ানা পেয়েচ? এমন কথা প্রকাশ হ'লে আমাদেরই বিপদ, তা কি আমি বুঝতে পারিনে?

—তা হ'লে ও-কথা এখন চাপা থাক। ও-বাড়িতে যে রকম বিপদ হয়ে গিয়েচে তাতে এখন বিয়ে-থাওয়ার কথা কেউ তুলবে না। আমাকে ভেবে-চিন্তে দেখতে হবে, সময় বুঝে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে।

কথা ঐ পর্য্যন্ত রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রূপোন্মাদ

স্বাগতা লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। অতি সহজে শিখিতে পারে দেখিয়া হরিনাথ নিজে তাহাকে ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করিল। স্বাগতাকে হরিনাথ ও বাড়ির আর সকলে বুঝাইয়াছিল যে, সে তাহাদেরই আত্মীয়া, বাপ-মা নাই বলিয়া তাহাদের কাছে থাকে। স্বাগতার কৌতূহলও বড় ছিল না, তবে একা থাকিলে মাঝে মাঝে সেই রকম ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিত আগেকার কোন কথা তাহার মনে পড়ে না কেন? বাপ-মাকে কি কখন দেখে নাই? কই, তাঁহাদের কাহাকেও ত মনে পড়ে না। তাহার বাল্যস্মৃতি কি হইল? কাহারা তাহার শৈশবসঙ্গিনী ছিল, এখন তাহারা কোথায়? যাঁহাদের কাছে রহিয়াছে তাঁহারা নিশ্চয় তাহার আত্মীয়, নহিলে তাহাকে এত যত্ন করিবেন কেন?

এ কি রকম জীবন? সেই যে কোন্ গ্রামে কাহাদের বাড়িতে বসিয়া স্বাগতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আমি কে তাহার আগেকার ত কোন কথাই তাহার মনে পড়ে না। মাথায় যে বেদনা হইয়াছিল কোথায় কি রকম করিয়া আঘাত লাগিয়াছিল তাহাও ত স্মরণ নাই। এ রকম কি আর কাহারও হয়? যেন কোন পুস্তকের গোড়ার কয়েক পৃষ্ঠা নাই, একেবারে মাঝখান হইতে আরম্ভ। তাহা হইলে আনুপূর্ব্বিক কেমন করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে?

একবার কয়েক দিনের জন্য হরিনাথ বাড়ির সকলকে একটা বাগানবাড়িতে লইয়া গিয়াছিল। হরিনাথ ও গঙ্গাধর মোটরে করিয়া বেড়াইত, স্বাগতা গঙ্গাধরের স্ত্রী প্রভাবতীর সঙ্গে বাগানে ও গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন বৈকালে দুইজনে বাঁধান ঘাটে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

সাগরগামিনী তরঙ্গচঞ্চল ভাগীরথী বহিয়া যাইতেছে। গঙ্গাবক্ষে পান্সি, নৌকা, ছোট ষ্টীমার। ওপারে গাছের

ভিতর দিয়া অস্তমান সূর্য্যের লোহিত আভা জলে পড়িয়াছে। কোথাও গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড বটগাছ, জলের উপর কালো ছায়া দুলিতেছে। অবিশ্রান্ত অনিবার্য্য স্রোত, লহরীলীলায় নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ।

স্বাগতা হাতের তেলোয় চিবুক রাখিয়া শুভ্রোর্ম্মি মুকুটধারিণী জাহ্নবীর অক্লিষ্ট গতি দেখিতেছিল। কিছু আপনার মনে, কতক প্রভাবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—আমার কি মনে হয় জান?

প্রভাবতী স্বাগতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। স্বাগতার দৃষ্টি অন্তর্মুখী, ললাট নির্ম্মল। প্রভাবতী বলিল,—কি?

—এই যে গঙ্গার স্রোত দেখচ, আমার জীবন যেন ঠিক সেই রকম। যেটুকু আমরা দেখতে পাচ্চি সেই-টুকু জানি, কোথা থেকে আসচে কোথায় যাবে আমরা কিছুই জানি নে। সে কথা যেন আমরাও নিজের সম্বন্ধে জানি নে, কিন্তু আমি ত ছয় মাস আগের কোন কথাই জানি নে, কিছুই মনে নেই। এই সামনের স্রোতটুকুর মতন আমার জীবনের ইতিহাস।

প্রভাবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—ও-সব কথা কিছু বুঝতে পারি নে। তুমি কত বই পড়, তোমার মনে ত কত রকম কথা আসবেই।

—এ ত কেতাবের কথা নয়, মনে থাকার কথা। ছেলেবেলাকার কথা কি তোমার মনে পড়ে না?

—তা পড়বে না কেন? খুব ছেলেবেলাকার কথা মনে থাকে না, কিন্তু পাঁচ ছয় বছর বয়স থেকে সব কথা মনে আছে।

—তা হ'লে আমার নেই কেন? ছেলেবেলাকার কথা দূরে থাকুক এই মাসকতক আগেকার কথা কিছুই মনে পড়ে না। আমার কি মাথায় কোন দোষ হয়েচে?

—তোমার যেমন কথা! বলিয়া প্রভাবতী অন্য কথা পাড়িল।

হরিনাথের মনে একটা অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সর্ব্বদা স্বাগতাকে দেখিতে ইচ্ছা হইত, তাহাকে দেখিয়া কখন তৃপ্তি হইত না। যখন তাহাকে পড়াইত সমস্তক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যদি কখন হাতে হাত ঠেকিত তাহা হইলে হরিনাথের রোমাঞ্চ হইত, হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত। স্বাগতা সম্মুখে না থাকিলেও হরিনাথ যেন সকল সময় তাহার মুখখানি দেখিতে পাইত। ক্রমে তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। যেমন পর্ব্বত হইতে বর্ষার জল নামিলে সে-স্রোতের মুখে কিছু তিষ্ঠিতে পারে না, সব ভাসিয়া যায়, সেইরূপ হরিনাথের মনের বল, চিত্তসংযম সমস্ত ভাসিয়া গেল। মনকে দমন করিবার শক্তি রহিল না, সে চেষ্টাও করিল না। অজ্ঞাতকুলসম্ভবা, অপরিচিতা, লুপ্তপূর্ব্বস্মৃতি এই অপূর্ব্ব সুন্দরীর হরিনাথের গৃহে শুভাগমন হইয়াছিল, শাপগ্রস্ত দেবকন্যার ন্যায় তাহাকে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছিল, কিন্তু এই স্নিগ্ধ শান্ত মূর্ত্তি রমণী ঝটিকার ন্যায় হরিনাথের হৃদয়মন্দিরের অর্গল ভগ্ন করিয়া তাহার নিভৃত অন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার রূপ বহ্নিশিখার ন্যায় হরিনাথের আত্মসংযম দগ্ধ করিয়া ফেলিল। স্বাগতা! স্বাগতা! স্বাগতা! জাগরণে, স্বপনে সেই রূপ হরিনাথের মানস চক্ষে জাগিতে লাগিল।

গঙ্গাধরেরা দেশে ফিরিয়া গিয়াছিল। হরিনাথের খুড়ীমাও ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। হরিনাথও স্বীকার করিয়াছিল তাঁহাকে ও স্বাগতাকে শীঘ্র দেশে লইয়া যাইবে।

একদিন হরিনাথ স্বাগতাকে পড়াইতেছিল। সেখানে আর কেহ ছিল না। হরিনাথ বলিল,—স্বাগতা!

টেবিলের উপর পুস্তক ছিল, খোলা পুস্তকের উপর স্বাগতার হাত ছিল। সে হরিনাথের মুখের দিকে সরল শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—কি?

—তোমার আগেকার কোন কথা মনে পড়ে না?

—কিছু না।

—তুমি কি কখন কাউকে ভালবাসতে না?

স্বাগতা কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল,—কেন, তোমাদের সকলকেই ত ভালবাসি।

—এ রকম ভালবাসা নয়। আমি আর এক রকম ভালবাসার কথা বলচি। যেমন স্বামীতে স্ত্রীতে ভালবাসা।

—সে কি আর এক রকম?

হরিনাথ অধীর হইয়া স্বাগতার হস্ত ধারণ করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। স্বাগতার কোনরূপ বিকার নাই, হস্ত কোমল শীতল, চক্ষের দৃষ্টি স্নিগ্ধ নির্ব্বিকার।

স্বাগতা বলিল,—তোমার হাত কাঁপচে কেন? কোন অসুখ করেচে?

হরিনাথ বেগে কহিল,—অসুখ? তোমার জন্যই অসুখ। তুমি আমার ঘরে এসেচ, এবার আমার হৃদয়ে এস। তুমি বললেই আমি তোমাকে বিয়ে করি।

স্বাগতা বলিল,—বিয়ে ত আমি জানি নে, তুমি যদি আবশ্যক মনে কর ত কোরো। তোমরা যা বলবে আমি তাই করব।

স্বাগতা ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। হরিনাথ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া হরিনাথ গঙ্গাধরকে দেশ হইতে ডাকাইয়া পাঠাইল। গঙ্গাধর আসিলে পর হরিনাথ তাহাকে নিভৃত কক্ষে লইয়া গিয়া বলিল,—তোমাকে একটা কথা বলব ব'লে ডেকেচি। আমি স্থির করেচি স্বাগতাকে বিয়ে করব।

গঙ্গাধর বলিল,—আমারও মনে হচ্ছিল তুমি ঐ রকম কোন একটা কথা বলবে। আর কাউকে এ কথা বলেচ?

—না, এখনও বলিনি। তোমার সঙ্গে প্রথমে পরামর্শ করচি।

স্বাগতা এ কথা জানে?

—তাকে বলেচি, সে কোন আপত্তি করে নি, তবে আমার মনে হয় বিয়ের বিষয় সে কিছু বোঝে না।

—বোঝবার কোন সম্ভাবনাও নেই। স্বাগতার সহজ অবস্থা নয়। আগেকার কোন কথাই ওর মনে নেই। বয়সে যুবতী হ'লেও অনেক বিষয়ে নিতান্ত শিশুর মতন, ওকে যা করতে বলবে তাই করবে। আর এক জন যদি ওকে বিয়ে করতে চায় তা হ'লেও রাজী হ'তে পারে, কেন-না, ও বিষয়ে ও কিছু জানে না, কোন মতামতও নেই।

—আমারও তাই মনে হয়।

—তারপর তুমি ওর বিষয় কি জান? কি জাতি, কোথাকার মেয়ে কিছু জান?

—তাতে কিছু এসে যায় না, অন্য জাতি হ'লেও অন্য মতে বিয়ে হ'তে পারে।

—যদি স্বজাতি স্বগোত্র হয়?

—তা হ'লই বা! আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

—ভাল, তাই যেন হ'ল, কিন্তু সধবা কি বিধবা তাও তুমি জান না।

—বিধবা বিয়ে করতে আমার কোন আপত্তি নেই।

—বেশ, তুমি যেন সমাজসংস্কারক হ'লে। আর এর পর যদি জানতে পারা যায় যে ও সধবা, ওর স্বামী জীবিত আছে? মনে কর যদি ওর লুপ্তস্মৃতি কখন ফিরে আসে, যদি ওর স্বামী ও সন্তান বেঁচে থাকে তখন ওর মনের অবস্থা কি হবে, আর তুমি যে মহাপাতকে লিপ্ত হয়েচ মনে ক'রে তোমারই বা কি দশা হবে?

এ কথা একবারও হরিনাথের মনে হয় নাই। রূপের লালসা তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, স্বাগতার সম্বন্ধে কোন কথা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার তাহার শক্তি ছিল না। প্রথমে গঙ্গাধরের কথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পায় না, পরে কহিল,—ওর স্বামী থাকলে কি সে এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে আছে?

—তুমি কেমন ক'রে জানলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে? স্বাগতা যে তোমার বাড়িতে রয়েচে খবরের কাগজে তার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি, সব জেলায় পুলিসকেও খবর দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া স্বাগতার একজন সঙ্গী মারা পড়েচে আমরা জানি। যদি ওর আত্মীয়রা মিথ্যা খবর পেয়ে থাকে যে স্বাগতাও মারা গিয়েচে তা হ'লে তারা খোঁজ ক'রে কি করবে? আমার এ অনুমান তোমার কি অসম্ভব মনে হচ্চে?

—না, অসম্ভব কেন হবে?

—তার পর তোমার নিজের মনের অবস্থা। স্বাগতার

রূপে মুগ্ধ হয়ে তুমি ওকে বিয়ে করতে চাইচ, আর কোন দিকে ভাববার তোমার ক্ষমতা নেই। স্বাগতা প্রকৃতিস্থ নয়, এ অবস্থায় যে কখন স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ বুঝতে পারবে তা বলতে পারা যায় না। তা হ'লেও যদি তুমি ওকে বিয়ে কর সে তোমার অভিরুচি, কিন্তু ওর পূর্ব্ব-পরিচয় না জেনে, ওর স্বামী বর্ত্তমান কি না নিশ্চিত না জেনে তুমি ওকে বিয়ে করতে পার না। তাতে আশঙ্কাও আছে, পাপও আছে।

হরিনাথ কি উত্তর দিবে? অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, অবশেষ কহিল,—গঙ্গাধর, আমার মনের স্থিরতা নেই, আমাকে কি করতে বল?

—এ স্বাগতা কে তার সন্ধান কর। যদি জানতে পারা যায় ও বিধবা তা হ'লে ওকে বিয়ে ক'রো।

—এ সন্ধানে তুমি আমার সহায়তা করবে?

—করব। স্বাগতার কয়েকখানা ভাল ফোটোগ্রাফ আমাদের নিতে হবে, যদি কেউ কোথাও চিনতে পারে। তোমার ওর কাছে আর থাকা উচিত নয়, আর ওকে দেশেও এখন নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, সেখানে কত লোকে কত কথা বলবে। যিনি ওকে পড়ান তাঁকে এই বাড়িতে রেখে যাও, তিনি স্বাগতার তত্ত্বাবধান করবেন।

সেই রকম ব্যবস্থা করিয়া হরিনাথ ও গঙ্গাধর চলিয়া গেল, বলিয়া গেল আবার দেশভ্রমণে যাইতেছে।

ক্রমশঃ

মনের পদ্ম

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

তুলিনু যূথিকাপুঞ্জ একদা সে পুষ্প-বীথি হ'তে,
ঘরে আসি ঘ্রাণে ঘ্রাণে ক'রে দিল আকুল পরাণ;
ক্ষুদ্র শিশুকন্যা মোর হেসে যবে দাঁড়াইল পাশে,
যূথিকা কাঁদিল লাজে শুকায়ে ঝরিল ম্রিয়মান।
আনন্দের ছন্দ-শিশু মধুভরা সংসার-রতন,
মৃত্যুর নিঃশ্বাসে চলি' যবে হায় মাগিল বিদায়;
হেরিনু কাঁদিয়া ওরে এই বিশ্বে যে যত সুন্দর,
সে যে তত নিঃস্ব ওরে, পুষ্প ফোটে—পুষ্প ঝরে যায়!
গগনে জ্যোছনাভরা, গোলাপ করেছে কুঞ্জ আলো,
রাজ সভা মুখরিছে মধুকণ্ঠ-গায়কের গান;
ফুটে আছে পদ্মবন আনন্দের শয্যা বিছাইয়া,
বিকাশের মন্ত্রে মন্ত্রে কেঁদে ওঠে ঝরিবার ত্রাণ!
ঝরে সংসারের ভোগ, ফুল ঝরে—গন্ধ ঝরে বনে,
ভকতির পদ্ম শুধু ফুটে রয় নিত্য মনে মনে।

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

১

বিভিন্ন মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত—অনুবৃত্তি অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞবাদ ও ওঙ্কারোপাসনা:—গীতা, মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব ৩১৪ অধ্যায়, অশ্বমেধপর্ব্ব ৪২ অধ্যায়, বৃহদারণ্যক উপনিষদ তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য প্রথম অধ্যায় ১ম-২য় খণ্ড ও তৃতীয় অধ্যায় ১৮ খণ্ড, তৈত্তিরীয় প্রথম বল্লী, কৌষীতকি চতুর্থ অধ্যায়, তত্ত্বসমাস সপ্তম সূত্র ইত্যাদি বহু স্থানে অধিভূত, অধিদৈবাদির আলোচনা আছে। অধিভূতাদি সাধনমার্গকে আমি সংক্ষেপে অধিবাদ বলিব। ওঙ্কারোপাসনা এই সাধনমার্গের অন্তর্গত। প্রাকৃতিক মহৎ বস্তুসমুদয়কে পূজা করার প্রবৃত্তি আদিম মনুষ্যের স্বভাবজ। অনুমান করা যায় সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, আকাশ ইত্যাদির পূজা এই প্রবৃত্তি হইতেই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে যখন ঋষিদের মনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু কি তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিল তখন কেহ বায়ু কেহ আকশ কেহ আদিত্য কেহ কালকে ব্রহ্ম বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম শব্দের ধাতুগত অর্থ বৃহৎ। যে বস্তু অন্য সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান, বা যাহাতে সমস্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত তাহাই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায় অষ্টম খণ্ডে ঋষিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু কি তাহার অনুসন্ধানের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। সামের প্রতিষ্ঠা কি, এই লইয়া প্রশ্ন আরম্ভ হইল। সামের প্রতিষ্ঠা স্বর, স্বরের গতি প্রাণ, প্রাণের গতি অন্ন, অন্নের জল, জলের স্বর্গলোক (পর্ব্বত)। অতএব স্বর্গই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সত্তা, স্বর্গকেই পূজা করিবে। প্রথম ঋষি এই পর্য্যন্তই জানিতেন। দ্বিতীয় ঋষি বলিলেন, পৃথিবীই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা, অতএব পৃথিবীকেই পূজা কর। তৃতীয় বলিলেন, পৃথিবী আকাশে অবস্থিত অতএব আকাশই পরমা গতি। ঋষিরা ক্রমে বুঝিলেন যে আকাশ, বায়ু, কাল ইত্যাদি বহির্বস্তু—বৃহত্তম সত্তা নহে। মানুষের আত্মাই এই সমুদায় ধারণ করিয়া আছে। তখন আত্মার সন্ধান চলিল। কেহ বলিলেন দেহই আত্মা, কেহ বলিলেন প্রাণ, কেহ মন, কেহ বুদ্ধি, অপরে বলিলেন ইহার কোনটাই আত্মা নহে; এই সকলের আশ্রয় যে সত্তা তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম। তাহা হইতেই সমস্ত চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে।* বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন—"যিনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিকসমূহ, চন্দ্রতারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ ইত্যাদি দেবতায় অবস্থিত অথচ এই সমূহ হইতে পৃথক; এই সমুদায় যাঁহাকে জানে না কিন্তু এই সমুদায় যাঁহার শরীর এবং যিনি ইহাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া ইহাদের সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনিই মনুষ্যের আত্মা, তিনিই অন্তর্য্যামী ও অমৃত।" বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইত। দেবতা কথার অর্থ যাহা জ্যোতিষ্মান, অর্থাৎ যাহা প্রকাশবান। যে-গুণের জন্য পৃথিবী বা সূর্য্যের প্রকাশ আমরা বুঝিতে পারি সেই গুণই পৃথিবী বা সূর্য্যের অভিমানী দেবতা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকাশগুণ আছে বলিয়া তাহা-দিগকেও উপনিষদের স্থানে স্থানে দেবতা বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য যাহার কথা বলিলেন তাহাকে 'অধিদৈবতম' বলা হইয়াছে। অনন্তর অধিভূত বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা। তিনি অন্তর্য্যামী ও অমৃত।"

সমস্ত জড়পদার্থ অধিভূত কথার দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

---

* *Modern Review*, Jan. 1931. The Psychological Outlook in Hindu Philosophy নামক মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীকে সমষ্টিরূপে তাহার প্রকাশকত্ব গুণের জন্য দেবতা বলা হইলেও পৃথিবীর অন্তর্গত মৃত্তিকাদি সমস্ত জড়পদার্থ ভূত শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। সমস্ত জীবশরীরও ভূত-বর্গের অন্তর্গত। অনন্তর অধ্যাত্ম বিষয়ে বলিতেছেন —"যিনি প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, শ্রোত্রে, মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে বা বুদ্ধিতে, জীব বীজে বা শুক্রে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন অথচ যিনি এই সকল হইতে পৃথক তিনিই তোমার আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। তাঁহাকে কেহ জানে না, কিন্তু তিনি সকলকে জানেন।" অধ্যাত্ম পদের অন্তর্গত আত্মা শব্দের অর্থ শরীর। উপনিষদে ও বেদে অনেকস্থলে শরীরকে আত্মা বলা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ প্রাণযুক্ত শরীর সম্বন্ধীয়। গীতায় সর্ব্বত্রই এই অর্থে অধ্যাত্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অধুনা আধ্যাত্মিক শব্দ আত্মা-সম্বন্ধীয় বা spiritual এই অর্থে প্রয়োগ হয়। গীতায় বা উপনিষদসমূহে এই অর্থ উদ্দিষ্ট হয় নাই, একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকারেরা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে মানুষের দুঃখ ত্রিবিধ বলিয়াছেন। জড়বস্তু ও অপরাপর জীবশরীর হইতে যে কষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা আধিভৌতিক; অগ্নি, বায়ু, জল, বিদ্যুত ইত্যাদি জনিত কষ্ট আধিদৈবিক, এবং শারীরিক ও মানসিক রোগের কষ্ট আধ্যাত্মিক।

যাজ্ঞবল্ক্য দেখাইলেন প্রাকৃতিক তাবৎ পদার্থের মধ্যেই আত্মার বা ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। অধিবাদের বিশেষত্ব এই যে দেবতা, ভূতগ্রাম, দেহাদির উপাসনা আদিম মনুষ্যের মনোবৃত্তির অনুকূল হইলেও জ্ঞানী তাহারই মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিতে পারেন।

অধিবাদের 'অধি' কথার অর্থ বিচার্য্য। অধিরাজ বলিলে যেমন আমরা বুঝি যাহার অধীন অন্যান্য রাজারা আছেন, সেইরূপ অধিদৈব বলিলে বুঝিতে হইবে যাহার অধীন দেবতারা আছেন। গীতার ৮।৪,৫ শ্লোকে অধ্যাত্মকে স্বভাব বলা হইয়াছে। আত্মা অর্থাৎ প্রাণবান শরীর যাহার অধীন বা যাহার বশে চলে তাহাই অধ্যাত্ম। প্রকৃতিজাত স্বভাবই শরীরকে চালায়, একথা গীতার বহুস্থানে আছে। এজন্য স্বভাবই অধ্যাত্ম। ভূতগ্রাম সমস্ত বিনাশশীল, এজন্য তাহারা ক্ষর ভাবের অধীন। ক্ষর ভাবই অধিভূত। আদিত্য, পৃথিবী ইত্যাদি দেবতার প্রকাশগুণ শেষ পর্য্যন্ত মানুষের মনের সত্ত্ব গুণের উপর নির্ভর করে। অন্তঃকরণের চিৎশক্তি তদাকারকারিত হইয়া তাবৎ বস্তু প্রকাশিত করে। এজন্য পুরুষই অধিদৈবত। ৮।৩ শ্লোকে 'কর্ম্ম' কথা আছে এবং তাহারই অধিষ্ঠান হিসাবে অধিযজ্ঞ কথা আসিয়াছে। এখানে সকল প্রকার কর্ম্মকে যজ্ঞ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং সমস্ত ব্যাপারের যাহা হইতে উৎপত্তি তিনিই অধিযজ্ঞ। এই অধিযজ্ঞই যাজ্ঞবল্ক্যের অধিবাদের আত্মা। বাস্তবিক অধিদেবতাদিকে ইনিই নিয়মিত করিতেছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ১ম বল্লী ৭ম অনুবাকে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। ৮ম অনুবাকে এই সমস্ত উপাসনার বিষয়ীভূত ওঙ্কার-উপাসনার বিধান আছে এবং ৯ম অনুবাকে নানাবিধ কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও যজ্ঞ উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতাতেও ওঙ্কার-উপাসনা ও কর্ম্মরূপ যজ্ঞের কথা অধিবাদের সহিত জড়িত আছে (৮।৩,৪,১৩)। উপনিষদে উল্লেখ না থাকিলেও গীতাপাঠে বুঝা যায় যে, তৎকালীন অধিবাদীরা বিশ্বাস করিতেন যে মরণকালে ওঙ্কারের স্মরণ করিলেই মুক্তি হয়। মৃত্যুকালে যে-চিন্তা লইয়া মনুষ্য ইহলোক পরিত্যাগ করে পরলোকে তাহার তদনুযায়ী গতি হয়। অর্থাৎ সারাজীবন পাপ করিয়া মরণকালে ওঙ্কার ধ্যান করিলেই মুক্তি। কিংবা সারাজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুকালে যদি কোন পাপ-চিন্তা মনে উদিত হয় তবে জীব অধমগতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের এই অদ্ভুত মত সুকৌশলে এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি ৮।৫,৬ শ্লোকে অধিবাদের এই মত উদ্ধৃত করিয়াই ৭ম শ্লোকে বলিলেন, অতএব 'সর্ব্বেষু কালেষু' অর্থাৎ সব সময়েই আমার প্রতি মন নিবিষ্ট কর, মন যাহাতে অন্যদিকে না যায় তাহার অভ্যাস কর (৮।৮)। এখনও মৃত্যুকালে 'তারকব্রহ্ম' নাম শুনাইবার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা এই অধিবাদ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সাধকের পক্ষে সমস্ত চরাচর তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁহার নিজ শরীর তাঁহার নিকট অতি বিশিষ্ট সত্তা। তাঁহার নিজের মন, তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ,

তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রত্যেকটিতে 'আমার নিজস্ব' এই ভাব জড়িত থাকায় তিনি নিজেকে জগতের অন্য সমুদায় বস্তু হইতে পৃথক ভাবেন। অপরাপর জীবশরীর, বৃক্ষ লতা, মৃত্তিকা, প্রস্তরাদি সাধারণ বস্তু সমুদায় তাঁহার মনে কোন বিশেষ ভাবের উদ্রেক করে না, কিন্তু আকাশ, বায়ু, বিদ্যুত, পর্ব্বত, সাগর, সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তু তাঁহার মনে শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপিত করে। হিমালয়, সমুদ্র বা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মানুষ ইহাদিগকে এক এক মহৎ সত্তা বলিয়া অনুভব করে ও তুলনায় নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য দেখে। উপরি উক্ত এই তিন বর্গের পদার্থ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবের অন্তর্গত। ইহাদের লইয়াই সাধকের সমস্ত কর্ম্ম। সাধকের নিকট ব্যক্ত চরাচর যে-ভাবে প্রকটিত হয় অধিবাদ তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যক্ত চরাচরকে কাপিল সাংখ্য-বাদীরা আর একভাবে দেখিয়াছেন। অধিবাদ ও সাংখ্যবাদে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। গীতায় কাপিল সাংখ্যবাদের পরই শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের আলোচনা করিয়াছেন।

অধিবাদে যজ্ঞ বা কর্ম্মের কথা কেন আসিয়াছে তাহা উপরের আলোচনায় বুঝা যাইবে। অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ইত্যাদি সমস্তই অধিযজ্ঞ বা আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মাকে ওঙ্কাররূপে ধ্যানের উপদেশ আছে। এত অক্ষর থাকিতে পরমাত্মাকে কেন ওঙ্কাররূপে ধ্যান করিতে বলা হইল তাহা বিচার্য্য।

গীতার ৮।১২ শ্লোক ব্যাখ্যাকালে শঙ্কর বলিতেছেন, "ওঁকার পরমব্রহ্মের বাচক এবং প্রতিমাদির ন্যায় ওঁকার পরব্রহ্মের ধ্যেয় মূর্ত্তি। যাহারা মন্দবুদ্ধি অথবা মধ্যম বুদ্ধি তাহাদের পক্ষে এইভাবে ওঁকারের উপাসনা কালান্তরে মুক্তিরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে।" উত্তম অধিকারীর পক্ষে ওঙ্কারের ধ্যান শঙ্কর অনুমোদন করেন না। প্রশ্নোপনিষদে আছে যিনি এক মাত্রা ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, যিনি দুই মাত্রা ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাকেও পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যিনি তিন মাত্রা ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি প্রথমে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হন ও পাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ও পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করেন। প্রশ্নোপনিষদের উপদেশের মর্ম্ম এই যে, সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হইলে তবে ওঁকারের উপাসনায় ব্রহ্মদর্শন হয়, নচেৎ নহে। ওঁকার দ্বারা পর ও অপর ব্রহ্ম উভয়কেই পাওয়া যায়। শঙ্কর-মতে পরব্রহ্মকে ওঁকার দ্বারা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় মাত্র।

কঠোপনিষদের দ্বিতীয়া বল্লী ১৫, ১৬ এবং ১৭ শ্লোকে আছে—"সকল বেদ যে-পদের কীর্ত্তন করে, সকল প্রকার তপ যাঁহার কথা বলে, যাঁহাকে পাইবার জন্য লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি—তাহা এই ওঁ। এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরম পদার্থ; এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা কামনা করে সে তাহাই পায়। এই অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই পরম। এই অবলম্বনকে জানিলে মনুষ্য ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হয়।" প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে বলা হইয়াছে, যাহা শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় ও পরম বিদ্বান ওঙ্কাররূপ সাধনের দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হন। সমগ্র মাণ্ডুক্য উপনিষদে ওঙ্কারের মহিমাই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ইত্যাদি উপনিষদসমূহেও ওঙ্কার সম্বন্ধে অনুরূপ বাক্য আছে, বাহুল্য বিবেচনায় তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

অনুমান করা যায়, বেদে ও উপনিষদে ওঁকারকে শ্রেষ্ঠ সাধন হিসাবে ধরা হইলেও পরবর্ত্তীকালে সেই সকল উপদেশের মর্ম্ম সম্যক উপলব্ধি না হওয়ায় ওঁকার-সাধন মধ্যম ও নিম্ন অধিকারীর উপযুক্ত মনে করা হইয়াছিল। আজকাল আমরা 'হাঁ' বলিলে যাহা বুঝি, বৈদিক যুগে 'ওঁ' বলিলে তাহাই বুঝাইত। 'ওঁ' শব্দ হইতেই 'হাঁ' শব্দের উৎপত্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে ওঁ এর এই অর্থ পাওয়া যাইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।১।৮) বলা হইয়াছে "ওঁ এই অক্ষর অনুমতিজ্ঞাপক। যখন কোন বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয় তখনই বলা হয় ওঁ। যিনি এই প্রকার জানিয়া ইহার উপাসনা করেন তিনি কাম্যবস্তুসমূহ প্রাপ্ত হন।"

ওঁকারের ধ্যান বলিলে কেবলমাত্র ওঁকার-রূপ অক্ষরের মূর্ত্তি ধ্যান বা প্রতিমারূপে ওঁকারের ধ্যান উদ্দিষ্ট হয় নাই। এই প্রকার ধ্যানে চিত্তশুদ্ধি হইবে সত্য, কিন্তু যে-কোন অক্ষরের ধ্যানেও সেই ফলই পাওয়া যাইবে। এই হিসাবে ওঁকার-ধ্যান নিম্নাধিকারীর উপযুক্ত বলিতে পারা যায়। ওঁকারের দ্বারা যে-ভাব প্রকাশিত হয় তাহারই ধ্যান কর্ত্তব্য। বাংলা 'হাঁ' কথার ধ্যান বা কার্লাইলের everlasting yeaএর ধ্যানও ঋষিদের ওঁকার উপাসনা। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাঁহার 'বেদপ্রবেশিকা' গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :—

"আহাব সংজ্ঞক বেদমন্ত্র অতি প্রাচীন, সন্দেহ নাই; নিবিদ অপেক্ষাও প্রাচীন। যেমন বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, তেমনি স্তুতি পাঠকালে সমুদায় বেদমন্ত্রের মধ্যে আহাবের প্রাধান্য। কেন-না, এই আহাবের মধ্যে 'ওঁ' এই শব্দ বিদ্যমান। এই শব্দটি স্বয়ং একটি মন্ত্র। একটি একাক্ষর মন্ত্র, ইহার পারিভাষিক নাম 'প্রণব।' ওঁ শব্দের আদিম অর্থ—হাঁ বা বটে। ইহাতে 'ভাব' এই অস্তিত্বের ধ্বনি পাওয়া যায়, অভাব নিরাকৃত হয়। আস্তিক ব্রহ্মবাদীগণ আপনাদের মৌলিক বিশ্বাস সকল এই একাক্ষর প্রণবের দ্বারা প্রকাশিত করিতেন। পরমেশ্বর আছেন কি নাই? নাস্তিক বলিবেন 'ন'—আস্তিক ব্রহ্মবাদী বলিবেন 'ওঁ'। মানুষের মৃত্যু দেখিয়া লোকে যে তর্কবিতর্ক করে, জিজ্ঞাসা করে পরলোক আছে কি নাই? তদুত্তরে নাস্তিক বলেন 'ন'—আস্তিক ব্রহ্মবাদী বলেন, 'ওঁ'। এক্ষণে পাঠকবৃন্দ বুঝিবেন 'ওঁ' এই শব্দটি বেদের সার কি না। অবশেষে 'ওঁ' এই শব্দ রূপনাম-বিবর্জ্জিত সত্তামাত্রজ্ঞেয় পরমাত্মার উৎকৃষ্ট নাম বলিয়া ঋষিসমাজে পরিগৃহীত হয়। 'ওঁ' অর্থাৎ 'হাঁ আছেন বটে।' পরমাত্মা সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কি বলা যাইতে পারে?"

ওঁকারের ধ্যান সচ্চিদানন্দের সৎরূপের ধ্যান। ঋষিবাদীগণ জগতের সর্ব্ব পদার্থের সত্তার মধ্যে এই অবিনাশী ওঁকারের সন্ধান পাইয়াছিলেন ও তাহারই ধ্যানের উপদেশ দিয়াছেন। 'অস্তিত্ব' বা 'অনুমতি' বা 'স্বীকৃতি' এই ভাবগুলির ধ্যানে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি হইবে, ইহাই ঋষিদের উপদেশ। কঠঋষি ওঁকার সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন—"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্" অর্থাৎ "এই অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই পরম।"

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বাদ—গীতার ১৩ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বাদের বিবরণ আছে। সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও জীবাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ স্মরণ রাখিলে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার বুঝা যাইবে। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান এবং আত্মা জীবদেহেই অবস্থিত। জীবাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হয় এবং এই জীবদেহই ক্ষেত্র, অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং এই জ্ঞানেই মুক্তি। প্রাণবান শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে অধ্যাত্ম বলা হয়। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান একই। ক্ষেত্র বা শরীর সম্বন্ধে জ্ঞান নানা প্রকারের হইতে পারে; যথা, শারীর-বিদ্যা (physiology), স্বাস্থ্যতত্ত্ব (hygiene), চিকিৎসা-বিজ্ঞান (medicine), ইত্যাদি কিন্তু এই সকল জ্ঞান অপেক্ষা যে-জ্ঞানের দ্বারা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধ বুঝা যায় সেই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মত। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

ক্ষর-অক্ষর বাদ—গীতার ১৪ অধ্যায়ে প্রকৃতিজ সত্ত্ব, রজ ও তমঃ গুণের বিচার আছে এবং তাহারই বিস্তার হিসাবে ১৫ অধ্যায়ে ক্ষর-অক্ষর বাদ আসিয়াছে। প্রকৃতিজ গুণত্রয় হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বুঝা চাই যে, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থই বিনাশশীল অর্থাৎ ক্ষরভাবাপন্ন। অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ (গীতা ৮।৪), 'ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি' (গীতা ১৫।১৬), 'ক্ষরম্ প্রধানম' (শ্বেতাশ্বতর ১।১০) অর্থাৎ প্রকৃতিজাত সর্ব্ববস্তুকে ক্ষর বলা হয়। পুংলিঙ্গ ক্ষর শব্দ বা ক্ষর পুরুষ বলিলে জড়জীবদেহ বুঝায়। জড়বস্তু অভিমানী দেবতারাও ক্ষর পুরুষ; ব্রহ্মাও ক্ষর পুরুষ। ক্লীবলিঙ্গ ক্ষর শব্দে সমস্ত জড়বস্তু বুঝায়। জড়জীবদেহকে উপনিষদাদি শাস্ত্রে অনেকস্থলে আত্মা বলা হইয়াছে। অধ্যাত্ম কথার আত্মা শব্দেরও এই অর্থ। মনুও শরীরকে ভূতাত্মা (১২।১২) বলিয়াছেন। এজন্য গীতাতে ত্রিবিধ পুরুষ উক্ত হইয়াছে; যথা, (১) ক্ষর পুরুষ বা জড়দেহ যাহাকে সাধারণে 'আমি' বা আত্মা বলিয়া মনে করে; এই পুরুষ বিনাশশীল। (২) জীবাত্মা বা অক্ষর পুরুষ; ইনি মায়ার দ্বারা দেহেতে আবদ্ধ এবং (৩) পরম অক্ষর বা পুরুষোত্তম যিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় ধারণ করিয়া আছেন ও সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই তিন সত্তার কথা ঈষৎ ভিন্ন ভাবে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের ১।৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্তা ত্রয়ং যদাবিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ।

অর্থাৎ দুই অজ বা জন্মরহিত সত্তা আছেন; ইহাদের জ্ঞ ও অজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী এবং ঈশ ও

অনীশ অর্থাৎ শক্তিশালী পরমেশ্বর ও শক্তিহীন মায়াবদ্ধ বলা হয়। আর এক অজা বা জন্মরহিতা সত্তা আছেন ইনি ভোক্তার অর্থাৎ জীবের ভোগ্য বিষয় প্রদায়িনী (প্রকৃতি)। অনন্ত আত্মা (ঈশ) বিশ্বরূপ হইয়াও অকর্তা। এই তিনের (জ্ঞ, অজ্ঞ ও অজা) উপলব্ধিতে ব্রহ্মলাভ হয়।

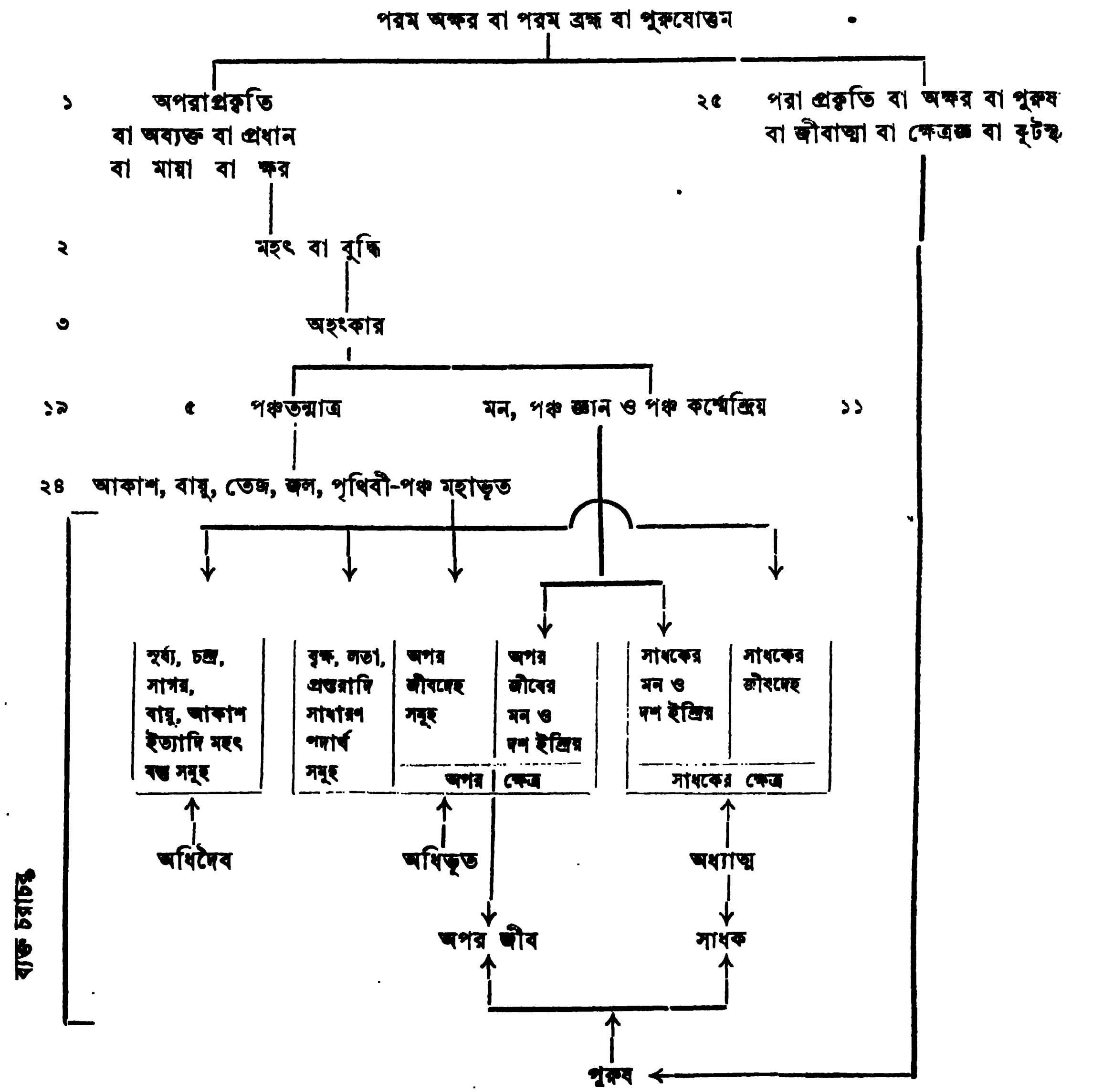
পুনশ্চ শ্বেতাশ্বতর ১।১২ শ্লোকে আছে—

“ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ”

অর্থাৎ ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা বা নিয়ন্তা এই তিনকে জানিলে ব্রহ্মলাভ হয়।

গীতোক্ত বিভিন্ন পারিভাষিক তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ-প্রকাশক একটি নির্দেশ (chart) দিলাম। এই ক্রমণী হইতে পূর্ব্বালোচিত তত্ত্বগুলি সহজে বুঝা যাইবে।

গীতানুযায়ী সৃষ্টি ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ক্রমণী



সন্তান-স্নেহ

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি শিকার ক'রে বাড়ি ফিরছিলাম। তরুবীথিকার ছায়ায় ছায়ায় আসছিলাম। আমার কুকুরটা আমারই আগে আগে দৌড়ে দৌড়ে চলেছিল।

অকস্মাৎ কুকুরটা তার গতি মন্দ ক'রে গুড়ি মেরে মেরে চলতে লাগল, সে যেন কোন শিকারের সন্ধান পেয়েছে।

আমি তরুবীথিকার ভিতর দিয়ে বরাবর নজর ফেললাম, দেখলাম অদূরে মাটির উপর একটা চড়াই পাখীর বাচ্চা পড়ে রয়েছে, তার ঠোঁটের দুটি কিনারে দুটি হলদে আঁজি টানা, আর তার মাথার উপরে কোমল পালক। সেটি গাছের উপর তার বাসা থেকে মাটিতে পড়ে গেছে, তখনও জোরে বাতাস বইছিল, আর পথ-বীথিকার গাছগুলিকে ঝুঁটি ধরে ক'ষে নাড়া দিচ্ছিল। সেই পাখীর ছানাটি মাটিতে পড়ে গিয়ে চোট খেয়ে চুপ ক'রে বসে ছিল, একটুও নড়ছিল না, কেবল তার আধফোটা অক্ষম কোমল ডানা দুটি মেলে ধরে অসহায় আতঙ্কে কাঁপাচ্ছিল।

আমার কুকুর ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার মাথার উপরের গাছ থেকে এক টুকরা পাথরের ডেলার মতন আছড়ে এসে পড়ল তার নাকের ডগার কাছে একটা ধাড়ী চড়াই, তার গলায় কালো পালকের কণ্ঠি আঁকা। আর সে মাটিতে আছড়ে পড়েই বারংবার কুকুরের করাতের মতন দাঁতের পাটি মেলা হিংস্র মুখের সামনে ঝাপ্‌টা মারতে লাগল একবার, দুবার, তিনবার,—সে ব্যাকুল হয়ে ভয়ে একবার সঙ্কুচিত হচ্ছিল, আর আবার উত্তেজিত হয়ে আপনাকে কুকুরের মুখের সমুখে ছড়িয়ে ধরছিল।

ধাড়ী চড়াই তার বাচ্চাটিকে বাঁচাতে চায়। সে তার নিজের দেহ দিয়ে বাচ্চাটিকে আড়াল ক'রে রাখতে চাইছে। তার ছোট্ট শরীরটুকু ভয়ে ভাবনায় থরথর ক'রে কাঁপ্‌ছিল, তার ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ বিহ্বল আর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তার অস্ফুট কণ্ঠস্বর ক্রমে গাঢ় গদ্‌গদ হয়ে এল, সে এলিয়ে পড়ল ক্লান্ত হয়ে, তবু তার ভয়-ভাবনায় বিহ্বল শিথিল শরীরটুকু কুকুরের বিকশিত দন্তপংক্তির সম্মুখে একবার অন্তিম প্রতিবাদ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল, তার পর সে মরে গেল।

সে আপনাকে সন্তানের রক্ষার জন্ত বলি দিলে।

তার কাছে এই কুকুরটা না-জানি কত বড় আর কত ভীষণ হিংস্র জন্তু ব'লে বোধ হয়েছিল। তবু সে ত তার নিরাপদ উঁচু ডালের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে নি। তার নিজের প্রাণরক্ষার আর ভয়ের চেয়েও কি একটা প্রবল শক্তি তাকে তার উচ্চ আশ্রয় থেকে টেনে ছিঁড়ে নামিয়ে ফেলেছিল।

আমার কুকুর এই ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে পরাজিতের মতন পলায়ন করল। সেও সেই এতটুকু চটকের অচিন্ত্য ও প্রাণের ভয়ের চেয়েও প্রবল শক্তির প্রতাপ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

আমি কুকুরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এগিয়ে চললাম। সেই চড়াই পাখীর পাশ দিয়ে চ'লে যাবার সময় আমার মনে কেমন একটা ভক্তি আর শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক হ'ল।

হ্যাঁ, হাসির কথা নয়, শ্রদ্ধা ত বটেই, ভক্তিও অনুভব করেছিলাম। সেই বীর পাখীর আশ্চর্য্য আত্ম-ত্যাগ আর তার স্নেহ-বাৎসল্যের প্রগাঢ় প্রকাশ দেখে আমার মনে শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্রেক হয়েছিল।

আমার মনে হ'ল, মৃত্যুভয় আর মৃত্যুর চেয়েও ভালবাসা ঢের বেশী শক্তিশালী। ভালবাসাতেই, কেবল এক ভালবাসাতেই জীবন সম্ভব হয়, রক্ষা হয়, জীবনযাত্রা সঞ্চারিত হয়, আর জীবন ধন্য হয়। *

* তুর্গেনিভের গল্প অবলম্বনে।

বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষি সমিতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে "ভদ্রলোকের স্বহস্তে হলচালন" সম্বন্ধে যে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা ঠিক্‌। কিন্তু উহাতে যে যে অসুবিধা ও বিপদের আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা এড়াইয়া অন্য যে-যে উপায়ে দেশের কৃষিসম্পদ বাড়ান ও ভদ্রলোকের দৈনন্দিন আহার্য্য সমস্যা সমাধান করা যাইতে পারে, তাহার প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

বাংলার ও বাঙালীর প্রধান শত্রু ম্যালেরিয়া। এই ম্যালেরিয়া দেশ হইতে কিরূপে তাড়াইতে পারা যায় তাহার জন্য দেশের মনীষীবৃন্দ চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌. বি. মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে-কোন স্থানের অধিকাংশ লোক সমবেত চেষ্টার দ্বারা নিজের নিজের বাসস্থানের চারিদিকের জায়গা-জমির আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার না করিলে, নিজের নিজের বাটীর নিকটস্থ পুকুর ও ডোবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখিলে এবং যাহাতে মশক উৎপন্ন না হয় তাহার ব্যবস্থা না করিলে, আশপাশের জায়গা-জমিতে খানা-খন্দ গর্ত্ত ইত্যাদি ভরাট না করিলে সেখানকার ম্যালেরিয়ার মূল উৎপাটিত হইবে না। কেবল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কুইনাইন সেবন করিলেই চলিবে না—কুইনাইন সেবন দরকার, কিন্তু সে কেবল রোগের সময়। যাহাতে রোগ না আসিতে পারে তাহার প্রতিষেধক ব্যবস্থা করাই হইতেছে আসল ও প্রধান কার্য্য। অন্যান্য আরও ছোট ছোট প্রতিষেধক ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জঙ্গল সাফ, পুকুর পরিষ্কার ও খানা-খন্দ ভরাট করাই হইতেছে আসল ও মূল প্রতিষেধক ব্যবস্থা। গোপালবাবু এই উপায়ে সমগ্র বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রায় দুই হাজার ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াছেন এবং দেশের ম্যালেরিয়া নিবারণে কিয়ৎ পরিমাণে সফলকামও হইয়াছেন। বাংলা দেশে ৮৫ হাজার গ্রাম, তাহার মধ্যে দুই হাজার গ্রামে সমিতি-স্থাপিত হইলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল না। সমিতি-স্থাপনের প্রধান বাধা—দেশের লোকের আলস্য ও অর্থাভাব। লোকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা মহাশয়! আজ পয়সা খরচ করিয়া বা নিজ হাতে কোদাল ধরিয়া জঙ্গল সাফ করিলাম, কাল আবার বর্ষার বৃষ্টি আরম্ভ হইতে-না-হইতে ব্যাঙের ছাতার মত চারিদিক হইতে আগাছা সব মাথা তুলিবে; আজ পয়সা খরচ করিয়া পুকুর পরিষ্কার করিলাম, কাল আবার পানা দামে ভরিয়া যাইবে; কি করিয়া অত সাফই বা করি, আর কি করিয়াই বা অত কেরোসিন তৈল ছড়াইয়া মশক মারি।" যদি বলি পুকুরে কেরোসিন তৈল না দিয়া মাছের চাষ করিতে পারা যায় তাহা হইলে মশাও মরে এবং মাছও হয়—লোকে উত্তর দেয়, "মহাশয় ত বল্‌লেন! একবার হাতে-কলমে করিয়া দেখান দেখি।"

লোককে যদি দেখাইয়া দিতে পারা যায় যে, বাটীর চারিধারের জায়গা-জমির আগাছা ও জঙ্গল সাফ করিয়া রাখিতে হইলে প্রত্যেক বৎসরেই বেশী কিছু খরচ করিতে হইবে না, অল্পব্যয়ে বা সামান্য পরিশ্রমে ঐ পরিষ্কৃত জমি হইতে ফসলের দ্বারা যে আয় হইবে, যদি দেখাইয়া দিতে পারা যায় যে, পুকুর ডোবা পরিষ্কার করিতে যে খরচ পড়ে, তাহার চতুর্গুণ লাভ হয় সামান্য ব্যয়ে বা অল্প আয়াসে মাছের চাষ করিলে, যদি দেখাইয়া দিতে পারা যায় যে-সময় তাস দাবা পাশা খেলিয়া বা পল্লীগ্রামের অতিমুখরোচক পরচর্চ্চা, পরনিন্দা বা দলাদলি সৃষ্টি করিয়া নষ্ট হয় সেই সময়ে বিনাব্যয়ে নিজের আহার্য্যের সংস্থান করিতে পারা যায়, তাহা হইলে একাধারে দেশের শত্রু ম্যালেরিয়া দমন, কৃষিজাত সম্পদের সৃষ্টি ও সময়ের সুব্যবহার হয়। এ বিষয়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দায়িত্ব সমধিক—তাঁহারা সকলেই লেখাপড়া জানেন, সকলেরই কিছু-না-কিছু জমিজায়গা আছে এবং সকলেই অবসর

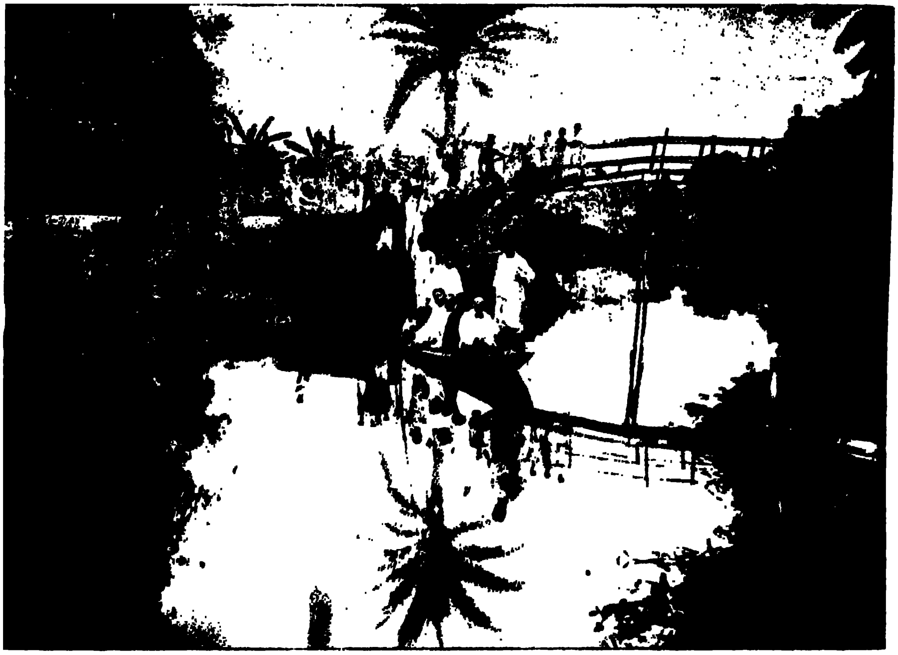


কচুরি পানা পূর্ণ খাল

সময় কিছু-না-কিছু বাজে কাজে নষ্ট করেন। যাহাদিগকে আমরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা চাষা বা জেলিয়া বলিয়া তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি, তাহারা উদরান্নের সংস্থানের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক আমাদের মত সময়ের এত অপব্যবহার করে না।

এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া গোপালবাবু কলিকাতার দশ মাইল উত্তরে বারাকপুরে যাইবার বড় রাস্তার ধারে উদ্যান-কৃষি-সমিতির সাফল্য হাতে-কলমে দেখাইবার জন্য একটি demonstration farm স্থাপন করিয়াছেন। লোককে, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোককে, যাঁহাদের দু-দশ বিঘা জমি বাড়ির নিকটে আছে, তাঁহাদের অবসর সময়ে বিনা খরচায় বা অল্প খরচায় সামান্য পরিশ্রমে কি করিয়া বাড়ীর চারিধার পরিষ্কার রাখিতে ও তাহাতে আহার্য্য উৎপাদন করিতে পারা যায় তাহাই দেখান এই বাগান স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য।

কতকগুলি উপায় বা প্রথা কেবলমাত্র কৃষিজীবীদের বেলায় খাটে; যেমন বাড়ির সংলগ্ন আম-বাগানে লাঙ্গল দিয়া চাষ করান যায় না—এরূপ জমি কোদাল দিয়া পরিষ্কার করা ব্যতীত উপায় নাই। আবার কতকগুলি উপায় কেবলমাত্র large scale agricultural production-এর বেলায় খাটে। বাষ্পীয় লাঙ্গল একশ দেড়শ বিঘার কম জমিতে চালাইয়া লাভবান হওয়া যায় না এবং তাহাতে প্রচুর মূলধন ও নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ চাই। অপর কতকগুলি উপায় অন্যদিক্ দিয়া দেখিতে খুব ভাল, কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য ম্যালেরিয়া-নাশ ও সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ আহার্য্য উৎপাদনের দিক দিয়া, একেবারেই অশোভন ও অ-কাজের; যেমন প্রদর্শনীতে দেখাইয়া পুরস্কার পাইবার আশায় নানারূপ রাসায়নিক সার দিয়া ও নানারূপ কারকিৎ করিয়া একটি তিন সের বীচিবিহীন পেঁপে ফলাইলাম। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে বা সাধারণের চক্ষে এরূপ পেঁপের আদর খুব; কিন্তু আমার দৈনন্দিন সংসার চালাইবার



পানা পরিষ্কারের পরে খালের দৃশ্য

পক্ষে বা আমার নিজ ব্যবহারের জন্য একরূপ পেঁপের প্রয়োজনীয়তা খুবই অল্প। ইহার পরিবর্ত্তে যদি আমি আমার পেঁপে গাছে আধ সের করিয়া আড়াইশ-তিনশ পেঁপে ফলাইতে পারি, তাহা বিক্রয় করিয়া সংসারের আয় বাড়াইতে পারি বা নিজ পরিবারবর্গকে খাইতে দিয়া পেটের অসুখের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি।

এমন উপায় আবিষ্কার করা দরকার বা পরীক্ষা দ্বারা ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক যাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে খাপ খায় এবং মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হয়। যেমন, আমি কলিকাতায় আপিসে চাকুরি করি, রোজ নিজ গ্রাম হইতে ট্রেনে ডেলী-প্যাসেঞ্জারি করি—সকাল বেলায় সময় অল্প, ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। নিজ হাতে গোবর সার সংগ্রহ করা বা ছড়ানোর সুবিধা নাই। অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসে চিলিয়ান নাইট্রেট সার দিয়া কাজ সারিতে পারা যায়। জানিয়া লইলাম ফুলকপির চাষ করিতে কি পরিমাণ জমিতে কি পরিমাণ সার লাগে। এই সার কিনিয়া লইলাম—সার কিনিতে পয়সা লাগিল বটে, কিন্তু গোবর সংগ্রহ করিয়া তাহা পচাইয়া মালী লোকজনের দ্বারা জমিতে সার দেওয়াইতে যে খরচ পড়ে—আমি নিজ হাতে সমস্ত কার্য্য করি বলিয়া তাহার চেয়েও কম খরচ পড়িল। দুই বা আড়াই কাঠা জমিতে আড়াই-শ ফুলকপি হইল—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইলাম ও পাড়ায় বিলি করিলাম। নিজ কায়িক পরিশ্রমের ফল বলিয়া আনন্দও হইল। মোট খরচ যাহা হইয়াছিল তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখিয়াছিলাম, খতাইয়া দেখিলাম স্থানীয় বাজার-দর অপেক্ষা সিকি দাম পড়িয়াছে। অবশ্য খতাইবার সময় আমার নিজের বা পরিবারবর্গের পরিশ্রমের কোন মূল্য ধরি নাই।

বাড়িতে গরু-বাছুরে ছয়-সাতটি—ইহাদের গোবর, চোনা, আবর্জ্জনা, খড়ের কুচি ইত্যাদি নিত্য সাফ করান একটি ব্যাপার। পাড়ার গোয়ালা-বউ যদি একদিন না আসিলেন বা ভাল সাফ করিলেন, গোয়াল হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। তারপর প্রশ্ন,—গোয়াল সাফ করিয়া আবর্জ্জনা ফেলি কোথা? পূর্ব্বে রাস্তার ধারে ফেলিয়া দিতাম, এখন দেশের নূতন কমিশনার অমৃত-বাবুকে ভোট দিই নাই বলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি হইতে

আপত্তি হইতে লাগিল। একবার নোংরা করিয়াছি বলিয়া বেঞ্চকোর্টে পাঁচ টাকা জরিমানা দিলাম। ভাবিতেছি, করি কি? গোপালবাবুর সুখচরের-বাগানে দেখিলাম সুবিধামত এক এক জায়গায় পাঁচ-ছয় হাত লম্বা, ঐ পরিমাণ চওড়া ও প্রায় আড়াই-তিন হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাতে বাগানের যত আগাছা প্রভৃতি প্রথমে একস্তর এক হাত গভীর করিয়া ফেলা হয়। তাহার পর চোনার সঙ্গে বিচালী, গোবর, পাতা, কলার বাখলা, আনাজের খোসা প্রভৃতি এক হাত বা দেড় হাত গভীর করিয়া ফেলা হয়, উপরে আবার একস্তর আগাছা ইত্যাদি এবং আবার চোনার সঙ্গে বিচালী প্রভৃতি আবর্জ্জনা ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ এক স্তরের পর অপর এক স্তর করিয়া পালা করিয়া গোয়ালের আবর্জ্জনা ও আগাছা ফেলা হইয়াছে। দেখিলাম, বেশ সার প্রস্তুত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, জমির উপর গাদা দিয়া সার প্রস্তুত করা অপেক্ষা জমিতে গর্ত্ত করিয়া সার প্রস্তুত করায় ফল বেশী পাওয়া যায়। কারণ জমির উপর সার প্রস্তুত করিতে গেলে সারের আসল অংশ অনেক পরিমাণে রৌদ্রে ও হাওয়ায় বাষ্প হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে সার পচিতে অনেক দেরি হয় ও মধ্যে মধ্যে গাদা ভাঙিয়া ওলট-পালট করিয়া দিতে অনেক মজুরী লাগে। গর্ত্তের ভিতর হইলে চাপে চাপে উহাতে ভরা-ভর্ত্তি করিয়া দিলে—বিশেষ করিয়া উপরে মাটি চাপা দিলে সারও শীঘ্র শীঘ্র পচে এবং মজুরীও কম পড়ে। গর্ত্তের তলায় এক সারি ইট সাজাইয়া দিতে পারিলে না-কি আরও ভাল হয়—কেন না মাটি একটুও রস শুষিতে পারে না, সব রসটাই সারে থাকিয়া যায়।

সুখচরের বাগান দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য করিলাম যে, খামারের গোয়াল-ঘরকেও কাজে লাগান হইয়াছে। এখানে চোনা ধরিবার জন্য গোয়াল-ঘরের পিছনে একটি সিমেণ্টের চৌবাচ্চা গাঁথা হইয়াছে। তাহাতে চোনা ও গোয়াল-ধোয়া জল আসিয়া পড়ে। প্রথমে ঐ সঞ্চিত জল তুলিয়া সার গর্ত্তের উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু চৌবাচ্চার 'শেষানি' জলটুকু হইতে মশা মাছি জন্মিয়া গোয়াল-ঘরের ও নিকটবর্ত্তী খোঁয়াড়ে দিনে মাছি ও রাতে মশার উপদ্রব যাহাতে না হয় তজ্জন্য এক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গোয়ালে ঝাঁট দেওয়া শুক্‌না বিচালি ও বাগানের শুক্‌না পাতা ঐ চৌবাচ্চায় দেওয়া হইয়াছে। শুক্‌না পাতা ও বিচালি জল টানিয়া শুষিয়া লইতেছে, মশামাছি জন্মাইবার পথ বন্ধ হইয়াছে। যখন শুক্‌না পাতা পচিয়া যায় তখন তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত সার গর্ত্তে আবার ফেলা হয়। এই প্রথায় মশা-মাছির হাত হইতে অব্যাহতি ও গোয়াল-ধোয়া জলের ও সমস্ত চোনার আদায়—দুই কাজই হয়। দেখিয়া আসিয়া বাড়িতে ঐরূপ চৌবাচ্চা করিলাম এবং ঐ প্রথায় সার প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। প্রস্তুত সার নিজ ব্যবহারে লাগাইয়া প্রচুর ফল পাইয়াছি।

সব জিনিষ সকলে জানে না বা জানিতে পারে না; বিশেষ করিয়া এইরূপ কৃষিবিদ্যা একটি practical art. আমার অভিজ্ঞতার ফল আপনি লউন, আপনার অভিজ্ঞতার ফল আমি লই—ইহার জন্য মধ্যে মধ্যে বৈঠক বসা দরকার। এইরূপ বৈঠক বসাইবার উদ্দেশ্যেই Bengal Home Crofters Association-এর সৃষ্টি। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা এ-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা গোপালবাবুকে ১।২এ প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কিংবা বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষি-সমিতির বাগান, সুখচর পোঃ আঃ—এই ঠিকানায় সমিতির ডিমনষ্ট্রেটর শ্রীমদনমোহন দত্তকে পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

আজব রোগ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্টোবর মাসের প্রত্যূষ। দারুণ দুর্য্যোগ। পাহাড়ের ওপার থেকে এক ঘোড়-সওয়ার সমুদ্রতীরবর্ত্তী গ্রামে এসে পৌছল। লোকটির মুখময় তামাটে দাড়ি—যাজক মহাশয়ের সন্ধানে তার আগমন। যাজকাবাসে গিয়ে সে হাঁক দিয়ে বল্‌লে, প্রোকৃলাই গাঁয়ের এক কুঁড়ে ঘরে এক ব্যক্তি অজানা রোগে মরতে বসেছে। ডাক্তার অনুপস্থিত, নার্স বলে ব্যাধিটা টাইফয়েড, জ্বরবিকার বা হামবসন্ত কিছুই নয়—অতএব ধর্ম্মযাজককে ডাকা দরকার। রোগীর নাম লাইডন্। যুবক পাঁচ দিন আগে পর্য্যন্ত দিব্য সুস্থ সবল ছিল, কিন্তু এখন মুখ থুবড়ে প'ড়ে প'ড়ে কেবলই ককাচ্ছে, খাদ্যপানীয় স্পর্শ করছে না।

প্রধানযাজক মহাশয়ের ঘুম ভাঙান হ'ল—তিনি চ'টেই আগুন, খ্যাক্ করে উঠে দাসীকে বল্‌লেন, ছোট-যাজকের বাড়ি পাঠিয়ে দাও না! সুতরাং তাঁকেই জাগানো হ'ল। যথাকালে তিনি সংবাদবাহীর সেই সাদা পাহাড়ী ঘোড়ায় চেপে বসলেন। তখন তামাটে দাড়ির মালিক আবার হেঁকে হেঁকে বল্‌তে লাগল, বাতাস থাকবে আপনার পিছনে, অতএব সোজা ককূরে পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে নেমে একটা গিরিসঙ্কট পার হ'লেই আমাদের গাঁয়ে গিয়ে পৌছবেন। ঘোড়াটা ভালই, কেবল তার ডান পাশে চাবুক দেবেন, বাঁ পাশে নয়!

ছোটযাজক সাদা ঘোড়া ছুট করিয়ে চ'লে গেলেন। তামাটে দাড়ির মালিক তখন সরাইখানার মালিককে ডেকে তুল্‌লে। লম্বা দাড়িতে ঝাড়া দিয়ে দিয়ে বৃষ্টির জল ঝরিয়ে ফেল্‌লে, তারপর ঘরের মেঝের উপর গিয়ে দাঁড়াল। ঘর কাঁপিয়ে বাজখাঁই সুরে সে সকলকে শোনাতে লাগল যে তার গাঁয়ের এক ছোকরা এক আজব রোগে শয্যাগত। দিব্যি সুস্থ সবল যুবক, তার নাম লাইডন্। সে-ই এখন উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে, খাদ্য পানীয় স্পর্শ করছে না। কি যে তার রোগ কেউ বোঝে না, ভয়ে সকলের প্রাণ উড়ে গেছে!

ছোটযাজক পাহাড়ে চড়াইয়ের পথে উঠে ঘোড়াকে চাবুক দিলেন। পিছনের সমুদ্র থেকে ঝড়বৃষ্টি তাঁর পিঠ যেন ছেঁদা ক'রে ফেলতে লাগল—সকাল না হতেই ভ্যালা এক বিপদ—এতে কার না বিরক্তি হয়! যাজক মধ্যবয়সী, বিশ বছর ধ'রে সেই বুনো দেশটার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরলেও এখনও মানুষগুলোকে ভয় ক'রে চলেন, তাদেরকে আফ্রিকার অসভ্য বুনোদের চেয়ে এক তিল সভ্য ব'লে ভাবতে পারেন না। বিশেষ ক'রে প্রোকৃলাইয়ের লোকগুলোকে—যেখানে তিনি এই দুর্য্যোগে যাত্রা করেছেন। তার উপর এই নতুন নাম-না-জানা রোগ!

কি হতে পারে রোগটা?—তিনি ভাবতে লাগলেন।

বৃষ্টি তাঁর কালো বর্ষাতি ও কানের কাছে ঝুঁকে-পড়া টুপির উপর চটপট শব্দে আঘাত করতে লাগল। প্রকৃতির আক্রোশ দর্শনে আর পাহাড়ের মাঝে অভব্য কুঁড়ে ঘরে অজানা রোগের চিন্তায় ভয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন।

চড়াইয়ের পথ যখন আরও খাড়া হয়ে উঠল, তখন সাদা ঘোড়াটা সলম্ফ ধাবন ছেড়ে হামা দিয়ে ওঠার মত ক'রে পাহাড়িয়া ঘোড়ার অভ্যস্ত চাল সুরু করলে। পিছনের পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে গলা বাড়িয়ে সে উঠতে লাগল যেন একটা ভারি পদার্থ টেনে নিয়ে চলেছে, খুরের ঘায়ে এবড়ো-খেবড়ো পথ থেকে আলগা নুড়িপাথর ছিটকে পড়তে লাগল। এখানে গাছগুলো উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে। একটা পাহাড়ের কাঁধের পিছনে বাতাস থেমে গেল। বৃষ্টি ঘনতর হয়ে উঠল, কোমল করুণ ঝম্‌ঝম্ শব্দে। গাছের ডাল থেকে ভিজে পাতা বাতাসে ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে, একটা অজানা পাখী আশ্রয় ছেড়ে ঝোড়ো ভিজে ডানা ফট্‌ফটিয়ে আরও দূর

বনের মধ্যে উড়ে গেল। জলের ধারা গিরিমাটির স্পর্শে লাল হ'য়ে পথের ফাটলের মাঝ দিয়ে কুলকুল ক'রে ছুটে চলেছে, ঘোড়ার সাদা গায়ে আর যাজকের কালো কোর্ত্তায় ঝাপটা দিয়ে দিয়ে। গাছগুলো অতিক্রম ক'রে শিলাময় সুঁড়িপথের মাঝ দিয়ে মেষপালকের কুঁড়ে পেরিয়ে ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার প্রশস্ত প্রান্তরে এসে পড়ল—স্থানটা গুল্মবহুল আর কালো কাদায় ভরা। চতুর্দ্দিকে আকাশ নীচু হয়ে নেমে এল, দিগন্ত কুয়াশার ঢালু পাড়ের মত সন্নিকটে এসে পৌছল। তীব্র বাতাস শিস্ দিয়ে উঠল, তারই তাড়নে বৃষ্টি হু হু করে' কাত হয়ে পড়তে লাগল।

যাজকের হাড় পর্য্যন্ত ভিজে উঠেছে। ভগবানের রাজ্যে চক্ষুশূল এক নোংরা অভব্য কুঁড়ের মধ্যে অজানা রোগগ্রস্ত সেই অচেনা লোকটার উপর তিনি দারুণ চ'টে গেলেন। কোথাকার কে একটা বর্ব্বর আজব ব্যাধির কবলে পড়েছে—জগতে তার কোন্ প্রয়োজন থাকৃতে পারে? তারই জন্য ভোর না হতে সুখশয্যা থেকে তাঁকে টেনে বার ক'রে এই বিষম জলঝড়ে তাঁর রক্ত হিম করা কেন? কল্পনায় তিনি দেখতে লাগলেন সেই জনমানবহীন ভয়ঙ্কর স্থান ভূতপ্রেত ও অপদেবতায় ভরে উঠেছে। ঘোড়ার উপর তিনি ঘন ঘন চাবুক বর্ষণ করতে লাগলেন।

চাবুকের জ্বালায় অস্থির হয়ে জলেভেজা ঘোড়া জলাপথের উপর দিয়ে সুদীর্ঘ লাফে লাফে ছুটে চলে, শেষে খাড়াই পার হয়ে অপ্রশস্ত গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করলে। এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়গুলো দু-পাশে নতমাথা মৃত্যুমূর্ত্তির মত ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে থরে থরে আঁকাবাঁকা, তারই মাঝ দিয়া সরুপথটি বিসর্পিত গতিতে ক্রমশ নামতে নামতে বাহির হয়ে খাড়া নেমে গেছে বড় বড় গোলাকার শৈলপ্রাচীরবেষ্টিত এক অন্ধকার উপত্যকায়। সেই উপত্যকার তলদেশে কুয়াশার মেঘ ও বৃষ্টির মাঝ দিয়া ছোট গ্রাম প্রোকূলাই দৃষ্টিগোচর হ'ল—নির্জ্জন নিরানন্দ, পাহাড় ও দেবদারুর মধ্যে জড়ামড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে জলাবাহিনী এক জলধারার পাশে। দেখতে পেয়ে ঘোড়াটা আনন্দে হ্রেষাধ্বনি ক'রে মরিয়া হয়ে ছুটল—যেন উড়ে চলেছে। দু-হাতে ঘোড়ার ঝুঁটি চেপে ধরে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কোনো গতিকে যাজক-মশাই ঘোড়ার পিঠে লগ্ন রইলেন, পিঠের দিক দিয়ে হাওয়ার চোটে তাঁর কোর্ত্তা উড়ে তাঁর দুই কান ঢেকে ফেল্‌লে।

গাঁয়ের পথে পৌছে ঘোড়াটা থামল। দেখতে দেখতে চারিদিকে ভিড় জ'মে গেল। লোকগুলো পরস্পরে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি সুরু ক'রে দিলে। জনকয় এসে যাজক-মহাশয়কে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিলে। দারুণ বিরক্তিভরে চারিদিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে তিনি তাদের লক্ষ্য করতে লাগলেন।

এদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অতি সামান্য, কারণ সে অঞ্চলের যাজকেরা ঐ গ্রাম যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। তাঁহাদের মতে লোকগুলোর উদ্ধারের কোনো আশা নাই। কুসংস্কারে ভরা, বন্যপ্রকৃতি—তাদের পোষ মানানো অসম্ভব; খৃষ্টধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা করা তাদের কর্ম্ম নয়। ভেড়া চুরি করা তাদের পেশা, কিন্তু পরস্পরের ভেড়া চুরি করার জন্য সে ব্যবসায়েও বিশেষ লাভ হয় না। পাহাড়গুলো তাদের চারিদিকে জেলখানার মত দেওয়াল তুলেছে, আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের ফলে তাদের মধ্যে পাগলামো আর ধ্বংসের বীজ এসে পৌছেচে। বাস করে তারা কুঁড়ে ঘরে, কারও কাছ থেকে যাজকের দক্ষিণা আদায় হওয়া অসম্ভব, অথচ হতভাগারা নিয়তই যাজকাবাসে ভিক্ষা করতে আসে।

তাদের সম্বন্ধে ধর্ম্মযাজকদের এই ধারণা, বিশেষ ক'রে এই যাজকের। তিনি মনে মনে তাদের ঘৃণা করতেন, এবং সংসারে তারা একান্ত অনাবশ্যক ব'লে ভাবতেন; বেদীর উপর থেকে অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য হতেন যে, তাদের আত্মাও অবিনশ্বর, অতএব পরলোকে তারা অপ্রয়োজনীয় নয়।

এই ক্ষণে তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক সিক্ত, শীতে অবশ ও অভুক্ত অবস্থায় তিনি কামনা করছিলেন পদতলে ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে পাষণ্ডগুলোকে গ্রাস করুক; বিশেষ ক'রে সেই বেটাকে যাকে অজানা রোগে ধরেচে!

রাগতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—কোথায় সেই ব্যারামী লোকটা?

লোকগুলো এতক্ষণ কলরব করছিল। তাঁর কথা

শুনে বিদেশীকে দেখার কৌতূহল ও আনন্দ উবে গিয়ে মুহূর্তে তাদের মধ্যে সেই অজানা রোগের ভয় এসে ঢুকল। কলরব থেমে গেল। একটি স্ত্রীলোক এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে নমস্কার ক'রে বল্‌লে, সে-ই রোগীর মা। অতিরিক্ত বিনয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে সে যাজককে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌ল জীর্ণ একটা খোড়ো ঘরে। ঘরের সামনের দেওয়ালে একটিও জানালা নাই, দ্বারপথে ধোঁয়া বার হচ্ছিল। একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে রাণীর মত মধুর ভঙ্গীতে নমস্কার ক'রে রোগীর মা যাজককে আহ্বান করলে "তার সামান্য কুটীরে পদার্পণ ক'রে তাকে ধন্য করতে।" যাজকমহাশয় রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন, স্ত্রীলোকটি তাঁর অনুগমন করলে। দ্বারের ধারে সমস্ত গ্রাম ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ালো।

প্রথমটা যাজক ঘরের মধ্যে কিছুই দেখতে পেলেন না। উনানে ঘাসের চাপড়ার আগুন, তা থেকে বার হচ্ছে অসম্ভব রকম ধোঁয়া—আগুনের জৌলুস নয়। সম্ভবত বহু কাল চিম্‌নি পরিষ্কৃত হয় নি, তাই সে ধোঁয়া বার হবারও উপায় নাই—রান্নাঘর ধোঁয়ায় ভর্ত্তি। যাজক খক্ খক্ ক'রে কাশতে সুরু করলেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল বার হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রোধও বেড়ে চল্‌ল।

বল্‌লেন,—তোদের কি একটা আলোও জোটে না?

রোগীর মা তাড়াতাড়ি একটি মোমবাতি নিয়ে এল। বাত্তির মুখটা আগুনের মধ্যে গুঁজে বার ক'রে আনলে—হলদে ছাই আর গলিত মোমে ঢাকা একটি মিটমিটে আলোর সৃষ্টি হ'ল। নোংরা মোমবাতিটা মাথার উপর তুলে ধ'রে সে ঘরে একটা কোণের দিকে ইঙ্গিত করলে।

বল্‌লে, ওই দেখুন।

ঘরের কোণে গিয়ে যাজক নীচুদিকে তাকালেন। মাটির মেঝের উপর একখানা খড়ের গদি, তারই উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে পুরোদস্তুর পোষাক-পরা এক যুবক।

যাজক বল্‌লেন,—এই? এরই অসুখ?

স্ত্রীলোকটি বল্‌লে,—হ্যাঁ বাবা।

যাজক মোমবাতি নিয়ে গদির পাশে পাতা একখানা খেলো চেয়ারের উপর রাখলেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে শায়িত মূর্ত্তিকে স্পর্শ করলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুমুচ্ছে না কি?

পীড়িত লোকটি শোকার্ত্ত অথচ দিব্য সুস্থ সবল কণ্ঠে উত্তর দিলে, না বাবা ঘুমুই নি!

যাজক চট্ করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। কুপিত কণ্ঠে বল্‌লেন,—অ্যাঁ? কথা শুনে ত রোগ হয়েছে ব'লে মনে হয় না!

রোগী বিছানায় উঠে বসে যাজকের পানে তাকালে। তার মুখ মিটমিটে মোমবাতির নিকটেই ছিল। সে-মুখ বিষম বিবর্ণ—উন্মাদের মত। বড় বড় নীল চোখ ও পুরু ঠোঁট। গায়ের নীল পশমী কোর্ত্তা তার সবল গ্রীবাকে আবৃত করতে পারে নি। সেই সুপুষ্ট গ্রীবা পিরামিডের মত উঠে তার সুন্দর মাথার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মাথাটি চমৎকার, তার সামনে তার বোকাটে বিবর্ণ মুখ ভারি বেমানান আর বিসদৃশ। অস্পষ্ট আলোয় তার দেহাবয়ব প্রকাণ্ড ও কোমল প্রতিভাত হ'ল।

ঘ্যানঘেনে সুরে সে বল্‌লে,—ঘর থেকে ওদের যেতে ব'লে দিন। আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই।

যাজক বল্‌লেন, যাও, বেরোও সকলে এখান থেকে।

সকলে বিদায় হবার পর তিনি বল্‌লেন, বল্ কি বলবি!

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর স্তব্ধতা! রোগী কিছু বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার ঠোঁট নড়লেও তা থেকে কোনো শব্দ বার হচ্ছে না। ছোট ক'রে ছাঁটা চুলের উপর দ্বিধাভরে সে তার নরম বড় হাত বুলোতে লাগল।

যাজকের বিরক্তি ধ'রে গেল। বল্‌লেন,—আচ্ছা বল্, এবার। তোর নাম কি?

"আজ্ঞে, প্যাট্রিক লাইডন্।"

"বয়স?"

"আজ্ঞে, বাইশ।"

"হুঁ! তারপর···বেদনা আছে? নে চটপট খুলে বল্।"

"উ···উ···" লোকটা তোৎলাতে লাগলো। "দয়া ক'রে বাতিটা নিবিয়ে দেবেন কি বাবা?"

"কি বলছিস্?"

লোকটা কম্পিত উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল,—কি আর বলি বাবা, বলতে ভারি লজ্জা করে! বাতিটা নিবিয়ে

দিলে অন্ধকারে বলা সহজ হবে। বেঁচে থেকে আর সুখ নেই বাবা, জীবনে ধিক্কার জন্মেছে!

"কি হয়েছে ছাই··· ?"

"ওঃ, বা—আ—বা···"

"আচ্ছা, আচ্ছা, দিচ্ছি নিবিয়ে!"

যাজক বাতিটা নিবিয়ে দিলেন। রোগী কম্পিত হাতে বাতিটা ধ'রে চেয়ার থেকে তুলে নিলে।

"বসবেন কি বাবা ?" সে অস্ফুট স্বরে বললে। "আমার পাশে আপনি ব'সে থাকলে বলা সহজে হবে। জীবনে ধিক্কার জন্মেছে বাবা, বেঁচে থেকে আর সুখ নেই!"

"কি বললি ?"—যাজক প্রশ্ন করলেন।

চেয়ারের উপর ব'সে বললেন, নে বল্ এবার।

লোকটা যাজকের হাঁটু চেপে ধ'রে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে সুরু ক'রে দিলে।

"উঃ বা—আ—বা, জীবনে ধিক্কার জন্মেছে! আমি···আমি···"

"কি ?"

"আমি···আমি···আমি···"

"মোলো যা, গর্দ্দভ কোথাকার! হয়েছে কি ?"

"আমি···আমি···এই প্রে—এ—মে পড়েছি বাবা!" ব'লেই গদির উপর ধুপ ক'রে প'ড়ে সে গোঙাতে লাগল।

ঢোক গিলে যাজক বললেন,—অ্যাঁ ? তুই···তুই··· প্রেমে হা ভগবান! আমি তোকে···একেবারে···

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে লোকটা বলতে লাগল শাপ দেবেন না বাবা! বলছি সব কথা। মেয়েটির নাম নোরা, কামারের বউ, তার পানে চাইতে আমার ভয় করে, কিন্তু তার মুখখানা যেন আমায় ডাকতে থাকে, দেখে দম বন্ধ হয়ে আসে। আশীর্ব্বাদ করুন বাবা, আমি মরতে চাই! কিন্তু দোহাই আপনার শাপ দেবেন না, শাপ দেবেন না!

যাজক দাঁড়িয়ে উঠলেন, ঠোঁটে ঠোঁটে একটা অস্পষ্ট শব্দ করলেন, তারপর মুখের উপর হাত তুললেন। তাঁর ক্রোধ ফেটে বার হ'ল। মুষলধারে বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্যে ঘোড়ার পিঠে আপন দুর্গতির কথা নিমেষে মনে প'ড়ে গেল, আর মনে পড়ল হতচ্ছাড়াদের নোংরা জীবন যাত্রা। তিনি ছুটে দ্বারের কাছে গেলেন।

চীৎকার ক'রে বললেন, নিয়ে আয় ত চাবুকগাছা!

চাবুক তারা নিয়ে এল। দেখে রোগী তারস্বরে চেঁচাতে সুরু ক'রে দিলে,—শাপ দেবেন না বাবা, শাপ দেবেন না বাবা!

আর যায় কোথা, যাজক সপাসপ চাবুক হাঁকড়াতে লাগলেন। চাবুকের ঠেলায় অসভ্যটা লাফিয়ে উঠে ষাঁড়ের মত চেঁচাতে চেঁচাতে দ্বারপানে ছুটল—স্বাস্থ্য খুব ভাল না থাকলে তেমন ক'রে কেউ চেঁচাতে পারে না। গাঁয়ের পথ দিয়ে একেবারে ভোঁ দৌড়, তারপর একটা পাথরের দেওয়াল টপকে জলাভূমিতে অবতরণ। তারপর বিকট চীৎকার করতে করতে আবার ছুট্।

কে একজন বললে, ভগবানের অপার দয়া! ওর রোগ সেরে গেছে! ব্যারামটা হয়েছিল কি ?

অ্যাঁ ? ব'লে যাজক চোখ ঘুরিয়ে চাবুক আস্ফালন করলেন। 'ঘোড়া নিয়ে আয়!'

ঘোড়ায় চেপে তিনি চ'লে গেলেন, গেঁয়ো লোকগুলো ভয়ে ভক্তিতে নিঃশব্দে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কি যে ঘটল সে কথা যাজককে জিজ্ঞাসা করতে কারও সাহস হল না।

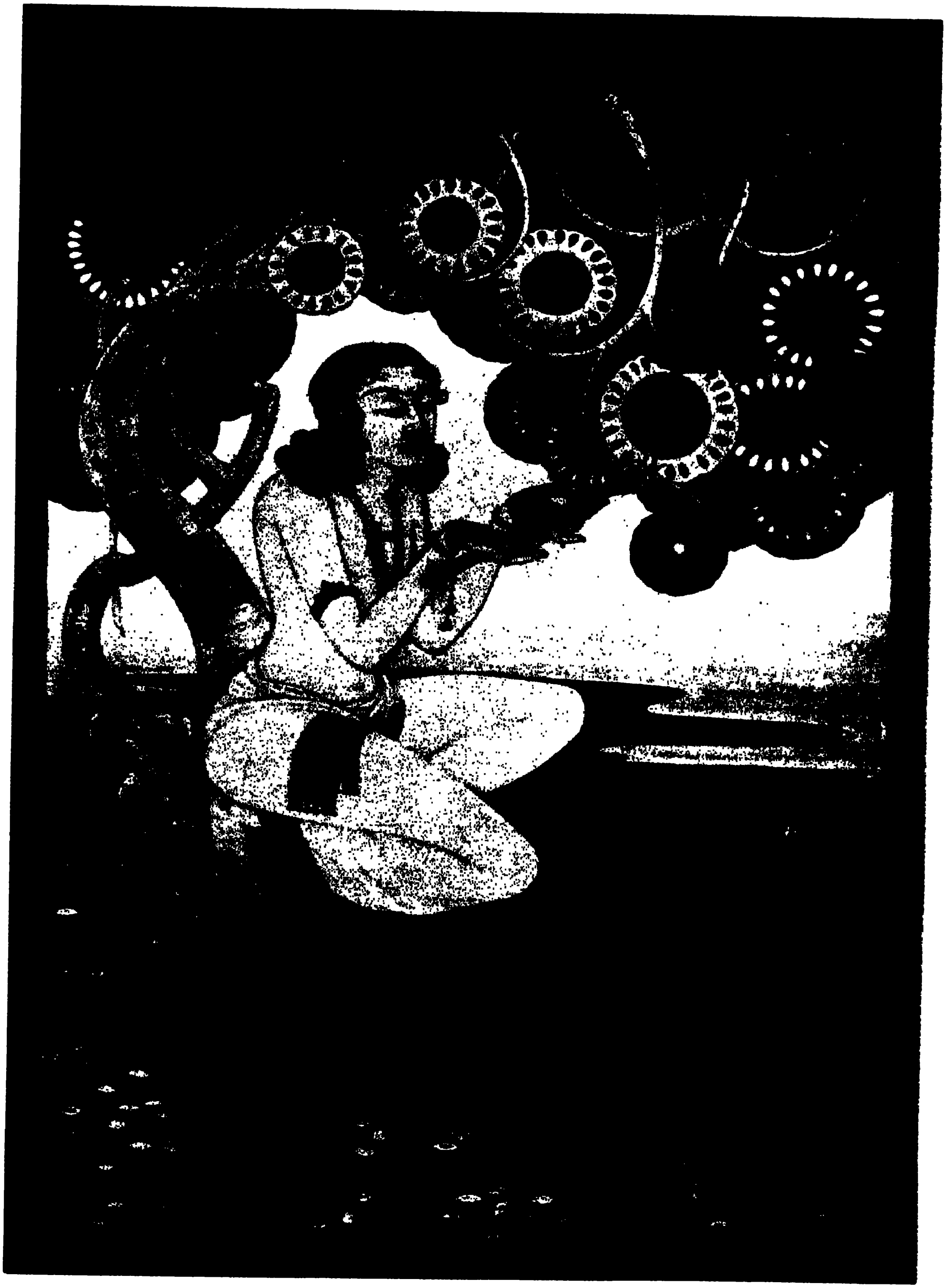
ঘোড়ার পিঠে চড়াই-পথে উঠতে উঠতে যাজক শীতে আর রাগে কাঁপতে লাগলেন। দুঃখে ও ক্রোধে তাঁর চোখে জল এল। আকাট মূর্খগুলোর উপর রাগ করার চেষ্টাও নিষ্ফল ভেবে তাঁর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

অবশেষে তিনি একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে তাঁর ক্রোধ সেই বেল্লিকের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন যে এই সমস্ত অনর্থের মূলে।

অবনত মেঘপুঞ্জের পানে ঘুসি উচিয়ে তিনি হাঁকতে লাগলেন—

প্রেমে পড়া! প্রেমে পড়া!···কুৎসিত কদর্য্য কাণ্ড। দারুণ পাপ! দারুণ পাপ! *

* বিদেশী গল্পের অনুবাদ।



বাঁশরী

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ল্যাপল্যাণ্ড ও ল্যাপ জাতি

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

সুইডেনের উত্তর ভাগে প্রায় অর্দ্ধেক অংশে শীতের কঠোরতা ও প্রস্তরময় পার্ব্বতীয় ভূমির অনুর্ব্বরতাবশতঃ লোকজনের বাস খুব কম। এই উত্তর ভাগকে সাধারণতঃ নরল্যাণ্ড বা উত্তর দেশ বলা হইয়া থাকে। এই প্রদেশের কতক অংশ সুমেরু বৃত্তে পড়িয়াছে। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। উত্তর অংশকে ল্যাপল্যাণ্ড এবং পাশ্ববর্ত্তী দক্ষিণ অংশকে জ্যাম্পল্যাণ্ড বলা হইয়া থাকে। এই উত্তর দেশেই বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী সুইডেন ও নরওয়ের মাঝখানে প্রায় ষাট মাইল জুড়িয়া সীমান্ত প্রাচীর



প্রবন্ধ-লেখক শীতকালে 'ওরে' নামক পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছেন

হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই উপর ল্যাপ জাতি বাস করে। এই কঠোর শীতের প্রদেশে ল্যাপ জাতিদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে অনেক সুইডিস বন্ধুর সঙ্গে নরল্যাণ্ডে রওনা হই। শীতের কঠোরতাবশতঃ জ্যাম্পল্যাণ্ডের পরে আর অগ্রসর হইতে সাহস হয় নাই। এই জ্যাম্পল্যাণ্ডের বিখ্যাত ওরে নামক পার্ব্বতীয় স্থানে শীতপ্রধান দেশীয় স্লেজ ও 'স্কী' খেলার বিপুল আয়োজন আছে। পরের বৎসর



আপন বিশ্বস্ত কুকুর সঙ্গে ল্যাপ শিশু

গ্রীষ্মকালে (যদিও তখন শীতের মাত্রা সেন্টিগ্রেড 0° ডিগ্রির নীচে ছিল) ল্যাপ জাতি ও সেই প্রদেশের সঙ্গে পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে ল্যাপ ল্যাণ্ডের শেষ সীমানা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করি। নিম্নে তাহারই বিবরণ দিতেছি।

গাড়ীতে সেই দেশ ভ্রমণ করিবার খুব সুবিধা—যদিও জনমানবের সংখ্যা খুব কম। পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিতর দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ী চলিতে থাকে, কিন্তু এখানে-সেখানে তুষারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য ভূমির উপর সেই দেশীয় হরিণের পাল, স্থানে-স্থানে হ্রদ ও গহ্বর, ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিন চারি ঘণ্টা পর-পর যখন গাড়ী কোন ষ্টেশনে আসে তখন মাত্র কয়েকটি

আবাস-গৃহ ছাড়া জনমানবের সাড়া নাই বলিলেও চলে। এই দারুণ নিস্তব্ধতার মধ্যে জনমানবের কোলাহল হইতে আসিয়া পড়িলে প্রথমটা বড় অদ্ভুত লাগে। কিন্তু এই স্থানেই ল্যাপরা সাধারণতঃ সপরিবারে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই ল্যাপ জাতি কখন কি ভাবে আসিয়া এই মেরু-



শীতবস্ত্রে লেখক

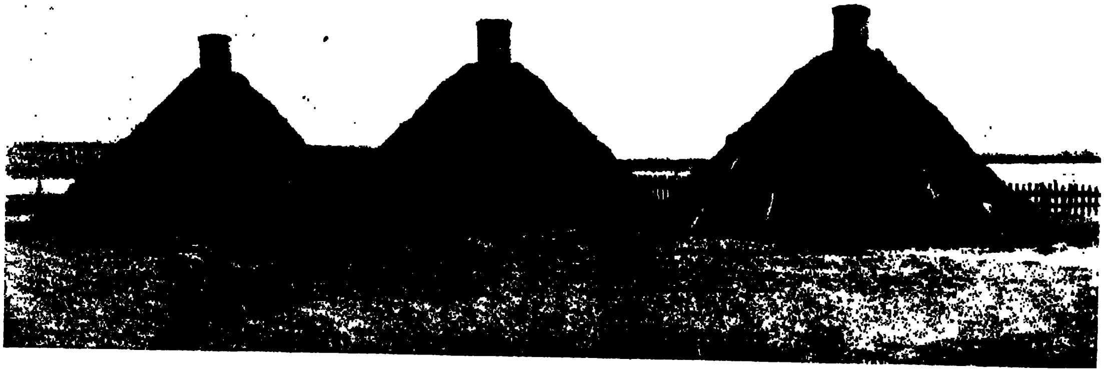
প্রদেশে আশ্রয় লয়, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই জানা যায় না। কিন্তু একথা ঠিক যে তাহারাই সুইডেনের উত্তর সীমান্ত প্রদেশের প্রথম অধিবাসী। জাতিতে তাহারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত। অনেকে মনে করেন যে, মধ্য-এশিয়া হইতে প্রথমে ইহারা এই উত্তরমেরু-প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু সে-সম্বন্ধেও আজ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। সুইডিস সভ্যতা উত্তর দিকে বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাপ জাতি সভ্যতার সংস্পর্শে আসে এবং তাহা খুব বেশী দিনের কথা নহে। ল্যাপল্যাণ্ড এবং ল্যাপ জাতি ১২৯০ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের সর্ব্বপ্রথম রাজা ম্যাগনস্ লাডুওসের রাজত্বকালে সুইডেনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এখানে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে, নরওয়ে, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও রাশিয়ার উত্তরাংশে অনেক ল্যাপ বাস করে এবং এই ল্যাপেরা এক সময়ে প্রতিবেশীদের হাতে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করিয়াছিল। এখানে সুইডেনের অন্তর্ভুক্ত ল্যাপল্যাণ্ডের ল্যাপদের কথাই বলা যাইতেছে।

সুইডেনে এই ল্যাপদের সংখ্যা মাত্র সাত হাজারের অল্প উপর; এবং তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল সংখ্যায় অতি নগণ্য,—তাহারা আজকাল তীরভূমিতে আসিয়া ঘরবাড়ির আশ্রয় লইয়াছে। আর এক দল পুরুষানুক্রমে এখনও ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় জীবনযাপন করে। সুইডিস্ গভর্ণমেণ্ট ল্যাপদের শিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং তাহাদের স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সচেষ্ট। এই ল্যাপ শব্দের উৎপত্তি কি ভাবে হইয়াছে সে-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।



জাতীয় পোষাকে ল্যাপ যুবক বল্‌গা হরিণ সঙ্গে। হরিণের শৃঙ্গটি দেখিবার মত

ল্যাপেরা এই শব্দটিকে অবজ্ঞাসূচক বলিয়া মনে করে এবং আপনাদিগকে 'সেইম' (Sameh) বলে। সুইডিস্‌রা কিন্তু ইহাদিগকে পাহাড়ী জাতি (fjallfolket) আখ্যা দেয়।



ল্যাপ বিদ্যালয়

আকৃতিতে সুইড্‌দের সঙ্গে ইহাদের কোন সাদৃশ্য নাই। ইহারা খর্ব্বাকৃতি। কিন্তু সময়-সময় উঁচু লম্বা ল্যাপও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সব ক্ষেত্রে ইহাদিগকে মিশ্রিত বলিয়া সন্দেহ করা হয়। ইহাদের শরীরের গঠন চমৎকার। পুরুষদের রং সাধারণতঃ বেশ গাঢ়, যেন সূর্য্যের তাপে পোড়া। ইহাদের মাথা সাধারণতঃ গোলাকৃতি; ঘাড়ের দিকটা চওড়া, কপালটা ক্রমশঃ সরু হইয়া মাথার দিকে উঠিয়াছে। হনু দুইটি মঙ্গোলীয়দের মত প্রশস্ত, চোখ ছোট ছোট; নাকের উপরিভাগটা সোজা হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। ঠোঁট দুইটি পাতলা, কিন্তু মুখ বেশ প্রশস্ত, চুল কালো। সময় সময় পুরুষদিগকে দাড়ী রাখিতে দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গোলীয়দের মত এদের দাড়ী খুব পাতলা, লম্বায়ও খুব বেশী বড় হয় না।

মেয়েরা প্রথম বয়সে খুব সুন্দরী থাকে, কিন্তু অল্প বয়সেই মেয়েপুরুষ সকলের মুখেই প্রৌঢ়তার ছায়া ফুটিয়া উঠে। চল্লিশ বৎসর বয়সে সকলেরই মুখের চামড়া কুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। কঠোর শীতের প্রভাবই বোধ হয় এরূপ হইবার কারণ।

সুইডেনের উত্তর সীমান্ত প্রদেশে অপেক্ষাকৃত নূতন তৈরি শহরের নাম—কিরোনা। সেই জায়গায় সুইডেনের বৃহৎ লৌহখনি-সম্পদ রহিয়াছে। এই লৌহ-পাহাড় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। লৌহ-সংগ্রহের জন্যই সেই বিচ্ছিন্ন জনমানবহীন প্রদেশে এই শহরের সৃষ্টি হয়। সেখান হইতে প্রতি পাঁচ মিনিটে চল্লিশ গাড়ী বোঝাই লৌহ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের



আপন কুটিরের সম্মুখে জাতীয় পোষাকে ল্যাপ মাতা ও কন্যা

সাহায্যে বিপুল তুষারমালা ভেদ করিয়া পর্ব্বতের গায়ে ঘেঁসিয়া স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া নরুইজিয়ান সামুদ্রিক বন্দর নাভিক নামক স্থানে চালান দেওয়া হয়। এই নাভিক আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত, এবং

সুইড আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় এত ঘুরিয়া বেড়ায় না। সুইডিস্ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের শিক্ষার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।



পার্ব্বত্য প্রদেশে হরিণের যাত্রা

সুইডিস্ শিক্ষকরা এরোপ্লেনে যাইয়া তাহাদিগকে পড়াইয়া আসে। তাহা ছাড়া সুইডেনের রেড্‌ক্রস্ সোসাইটী তাহাদিগকে দৈবদুর্ব্বিপাকে ও অসুখ-বিসুখের সময়



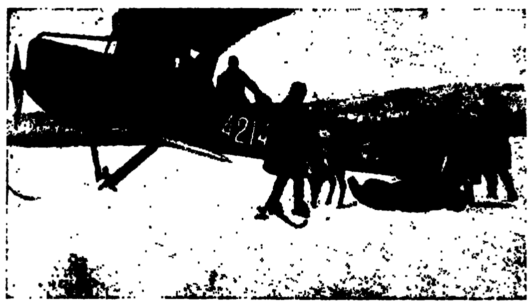
'স্লেজ' নৌকায় ল্যাপ শিশু—বলগা হরিণ তাহা টানিয়া লইয়া যাইতেছে

সাহায্য করিবার জন্য এরোপ্লেন মোতায়েন করিয়াছেন। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের উপর এরোপ্লেন ঘুরিয়া বেড়ায়। দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িলে সেই প্রদেশের অধিবাসীরা আগুন জ্বালিয়া এরোপ্লেনের কাছে সঙ্কেত পাঠায়। মোটের উপর এই কথা বলা চলে যে, ল্যাপদের মত একটি জাতির উপর সুইডিসদের মায়ামমতা আজকালকার দিনে অতিশয় আশ্চর্য্য জিনিষ। অন্ততঃ যে-সব ইউরোপীয় জাতির অধীনে অন্য দেশ আছে তাহাদের নিকট হইতে ঐরূপ ন্যায়সঙ্গত ও সহৃদয় ব্যবহার অধীন জাতিরা কখনও পাইয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়। এই বিষয়ের তুলনায় সুইডিস্‌দের সহিত অপর ইউরোপীয়দের পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট এবং ইহার কারণ ভাবিবার বিষয়।



বরফের উপর অগ্নিশিখা প্রস্তুত করিয়া রেড্ ক্রস্ এরোপ্লেনকে বিপদ সঙ্কেত জানাইয়া নামিয়া আনা হইয়াছে

বলগা হরিণ (Reindeer) ভ্রাম্যমাণ ল্যাপদের একমাত্র সম্পত্তি। এই হরিণ-পালের জন্য কোন ঘর নাই। পাহাড়পর্ব্বতের উপর হরিণের দল স্বাধীনভাবে চরিয়া



অসুস্থ ল্যাপকে এরোপ্লেনে করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছে

বেড়ায়। কিন্তু কোন ল্যাপদের হরিণ যাহাতে হারাইয়া না যায়, সে-সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। হরিণমাতা শিশুসন্তান প্রসব করিবার পরেই ল্যাপরা নিজেদের বিশেষ চিহ্ন ইহাদের কানে কাটিয়া দেয়। ঐ সকল চিহ্ন নানা প্রকারের। প্রত্যেক ল্যাপ পরিবারকেই তাহাদের এই সকল চিহ্নের প্রতিচিহ্ন স্থানীয় বিচারালয়ে রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখিতে হয়—যাহাতে কোন গোলমাল না ঘটে এবং আইন যাহাতে তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিতে পারে। ল্যাপদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী। কোন কোন ল্যাপ-

পরিবার এক হাজার বা তাহারও উপর হরিণ-সম্পত্তির অধিকারী এবং উক্তসংখ্যক হরিণের মূল্য নিতান্ত কম পক্ষেও নব্বই হাজার টাকার সমান হইবে। সাধারণতঃ তিন শত হরিণ থাকিলেই এক মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। কিন্তু ছোটখাট পরিবার প্রতিপালনের জন্য অন্ততঃ একশটি হরিণ না থাকিলে চলে না।

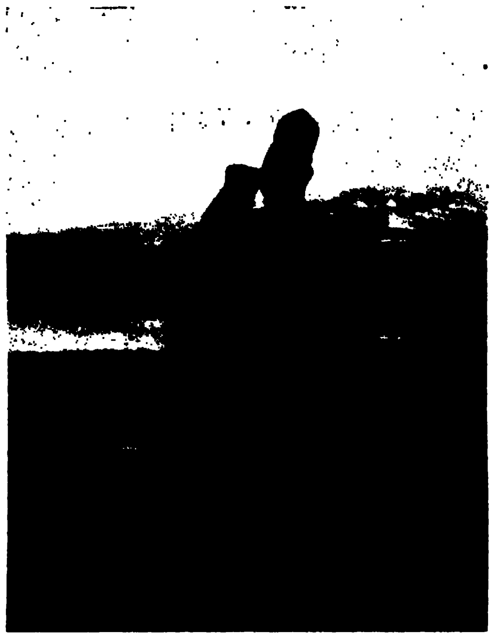
ল্যাপদের মধ্যে যাহাদের হরিণ-সম্পত্তি নাই বা হারাইয়া গিয়াছে, তাহারা তীরভাগে আসিয়া মাছ ধরিয়া



ভ্রাম্যমাণ ল্যাপদের চিরাচরিত জীবন-যাপন

জীবিকার্জ্জন করে। তাহাদের অনেকেই সমতলভূমিতে আশ্রয় লইয়া ক্ষেত চাষ করে এবং হরিণ কিনিয়া হরিণের ব্যবসাও করে। সুইডিস্ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে নামমাত্র খাজনা লইয়া বা একেবারে তাহা না লইয়াও কৃষিকর্ম্মে তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু এই সকল ল্যাপও নিজেদের তাঁবুঘরে থাকিতে ভালবাসে।

ভ্রাম্যমাণ খাঁটি ল্যাপদের প্রকৃতিতে কিন্তু এক জায়গায় স্থায়িভাবে বাস করা সম্ভব হয় না। তাহারা বৃক্ষলতাহীন উচ্চ পর্ব্বতভূমি ও বনপ্রদেশের মধ্যে আপন আপন হরিণ-দল লইয়া ঘুরিতে ভালবাসে। বসন্তের হাওয়া বহিলে হরিণ আপনা হইতে উচ্চ পর্ব্বতভূমিতে যাইতে সুরু করে। আবার শরৎ আসিলেই বনপ্রদেশে নামিয়া আসে। সেই স্থানে এক জাতীয় শৈবাল জন্মায় এবং ইহাই হরিণের



দূরবীক্ষণ সাহায্যে বনভূমিতে চরন্ত হরিণ পালের উপর দৃষ্টি রাখা হইতেছে

একমাত্র খাদ্য। এই শৈবালের উপর বরফের যে পুরু পর্দ্দা পড়ে, হরিণদল খুরের সাহায্যে তাহা ভাঙিয়া মুখ



দুইটি ল্যাপ শিশু পুস্তকের ছবি দেখিতেছে

দিয়া সরাইয়া খাবার খুঁজিয়া লয়। আমি যে বৎসর সেখানে গিয়াছিলাম, সেই বৎসরের শীতকালে শীতের মাত্রা খুব বেশী ছিল বলিয়া অনেক হরিণ খাবার না

পাইয়া মারা গিয়াছিল। অত্যধিক শীতে বরফ জমাট বাঁধিয়া পাথরের মত শক্ত হয় এবং তাহা ভাঙিয়া খাবার খোঁজা সহজ ব্যাপার নয়। হরিণদল আপন ইচ্ছামত চরিয়া খায় বটে, কিন্তু ল্যাপরা সর্ব্বদাই ইহাদের উপর চোখ রাখে—যাহাতে হরিণরা একেবারে ছড়াইয়া না যায় এবং নেক্‌ড়ে বাঘের গ্রাসে না পড়ে। প্রতি বৎসর এই ভাবে ল্যাপরা গড়ে প্রায় তিন শত মাইল ঘুরিয়া বেড়ায়।

প্রত্যেক ল্যাপ-পরিবারের আপন হরিণদলের জন্ত নির্দ্দিষ্ট করা চারণভূমি আছে এবং পাহাড়পর্ব্বতে ঘুরিবার কালেও নিজেদের স্বতন্ত্র পথ থাকে। সকল ল্যাপকেই বিপথে না গিয়া আপন পথে চলাফেরা করার জন্ত যথেষ্ট সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ তুষার-ঝড়ে রাস্তাঘাট পাহাড়-পর্ব্বত—সবকেই এমনভাবে ঢাকিয়া দেয় যে, সহজে পথ চিনিয়া লওয়া মোটেই সোজা ব্যাপার নহে। কিন্তু এই ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্ত ল্যাপদের কুকুর থাকে। হরিণদলকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে কুকুরেরা যথেষ্ট সহায়তা করে।

শেষের কবিতা*

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই উপন্তাসখানি প্রথমে প্রবাসীতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, পরে এটি পুস্তক আকারে ছাপা হয়েছে, সেও ১৩৩৬ সালে। এই বই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। গত বৎসরের মাঘ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীমান্ নীহাররঞ্জন রায় একটি সুনিপুণ রসগ্রাহী সমালোচনা করেছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু বলা অনেকের কাছে অনাবশ্যক বোধ হবে, নূতন কিছু বলাও হয়ত সম্ভব হবে না, অনেক কথারই পুনরুক্তি করতে হবে। কিন্তু প্রবাসীর পক্ষ থেকে কবীন্দ্রের এই শেষ উপন্তাসের সম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রকাশ করা হয় নি ব'লে আমাকে আবার এর আলোচনাতে প্রবৃত্ত হ'তে হচ্ছে।

এই উপন্তাসখানি নিছক উপন্তাস নয়, এটি কবিবরের শেষের কবিতাও বটে, এটি গদ্য-পদ্যময় চম্পূ কাব্য, এর গদ্যও কবিতার সমধর্ম্মী, এবং এর মধ্যে অনেকগুলি কবিতা প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই হিসাবে এই উপন্তাসখানি একটু নূতন ধরণের। এর পূর্ব্বে বাংলাতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভানুমতী উপন্তাস এইরূপ গদ্যপদ্যসমন্বিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তা ছাড়া আর কোন উপন্তাস এই ধরণের আছে কি না তা আমার এখন মনে পড়ছে না।

উপাখ্যানের পাত্র-পাত্রীগুলি বিলাতীভাবাপন্ন ধনী বাঙালী সমাজের এক একটি টাইপ, মূর্ত্তিমান্ অবতার, বই পড়তে পড়তে মনে হয় তারা যেন আমাদের চোখে-দেখা চেনা লোক, যেমন এর আগে গোরা উপন্তাসে পানুবাবু বরদাসুন্দরী লাবণ্য ললিতা সুচরিতা আমাদের চেনাশোনা লোকেদেরই ছবি ব'লে মনে হয়েছিল। এরা সবাই সজীব, সংসারের মানুষ।

নায়ক হচ্ছে অমিত রায়, কিন্তু তাদের সমাজের বিলাতী কায়দার আর অনুকরণের উচ্চারণে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে অমিট্রায়ে। সে ধনী ব্যারিষ্টারের ছেলে, নিজে ব্যারিষ্টার। সে মানবজীবনে ষ্টাইলের ভক্ত, কাজেই নিজেও বেজায় ষ্টাইলিশ, বাক্যবাগীশ, কথার তুবড়ী। তার দুই বোন সিসি আর লিসি, তারাও মূর্ত্তিমতী ফ্যাশান। অমিতর কথায় লোকের চমক লাগে, তাতে বুদ্ধির প্রাচুর্য্য এত বেশী যে মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, সে কবিত্বে আর দার্শনিকত্বে মিলিয়ে যে খিচুড়ি বানায় তা যেমন মুখরোচক তেমনি গুরুপাক। সে বহু মেয়ের সঙ্গে একটু বেশী ঘনিষ্ঠ রকমেই মেশে, ভাল লাগার আভাস দেয়, কিন্তু কাউকে সে ভালবাসতে পারে না; সে কথা লিলি গাঙুলী একদিন তার মুখের উপর স্পষ্টই শুনিয়ে দিয়েছিল যখন সে লিলিকে একটু বিশেষ পক্ষপাত দেখাতে উদ্যত হয়েছিল। সে রবি-ঠাকুরের লেখার বিরোধী, কারণ রবি-ঠাকুর অনেক দিন বেঁচে অন্ত কবিদের পথরোধ ক'রে রেখেছেন। সকল সভা সমিতিতে কেবল নিছক রবি-ঠাকুরের কবিতা আর লেখারই আলোচনা হয়, এতে সে আপত্তি উত্থাপন করে, তাঁকে লেখা থামিয়ে দিয়ে অপরের আসর অধিকার করবার সুযোগ ক'রে দিতে বলে, আর মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসা করে নিবারণ চক্রবর্ত্তী নামক এক অজ্ঞাত অখ্যাত কবিকে, অর্থাৎ নিজেরই বেনামদারকে। নিবারণ চক্রবর্ত্তী যে সে নিজে তার পরিচয় পরে ধরা প'ড়ে গিয়েছে, সে স্বীকার কবুল করেছে যে "ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী।"—১০৩ পৃষ্ঠা। আর তার জীবনের গিল্‌টি যার কাছে সম্পূর্ণ ধরা প'ড়ে খ'সে মুছে গিয়েছিল, সেই তার বন্ধু বলেছে—"তুমি কি ভাব্‌চ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতেন্

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষের উপন্তাস। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত। ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ষোল তাঁজের ২৩২ পৃষ্ঠা। পাইকা অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা। কাপড়ে বাঁধাই বইয়ের মূল্য ২৲ টাকা, আর কাগজের মলাটের বইয়ের দাম ১৷৹ টাকা মাত্র।

পারি নি যে তুমিই নিবারণ চক্রবর্ত্তী ?" অমিত কিন্তু অসামান্ত, কথায় বার্ত্তায়, বেশে ভূষায়, চাল-চলনে, মতে-ধারণায় ; সাধারণের মত ধারণা ও আচরণের বিপরীত কিছু করাতেই তার মৌলিকত্বের আনন্দ। কেবল যাকে সে নিন্দা করে সেই রবি-ঠাকুরের কবিতারই মতন তার কবিতা, সেই সাদৃশ্য থাকাতেই সে বোধ হয় তা লুকাবার জন্ম অত কোমর বেঁধে নিন্দা করে।

অমিত গেছে শিলং পাহাড়ে বেড়াতে। মোটর-ধাক্কা লাগ্‌ল লাবণ্যলতার মোটরের সঙ্গে। গোরা উপন্যাসে যেমন গাড়ীর অপঘাতে বিনয়ের সঙ্গে পরেশবাবু আর সুচরিতার পরিচয় হবার সুযোগ ঘটেছিল, এখানেও তেমনি মোটর-সংঘাতে অমিতর সঙ্গে ঘট্‌ল পরিচয় লাবণ্যলতার, যে শীঘ্রই অমিতর কাছে হয়ে উঠ্‌ল বন্যা, আর অমিতও তার কাছে হয়ে গেল মিতা। মোটর-সংঘাতে দুজনেই জখম হ'ল, দেহে নয়, মনে, মনোভবের আবির্ভাবে। যে অমিত এতদিন প্রণয় নিয়ে কেবল ভাববিলাসিতা করেছে, সেই এখন প্রণয়কে জীবনের জীবনরূপে অনুভব করলে। আর লাবণ্যলতাও স্বীকার করলে "এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি নিতান্তই শুক্‌নো,—কেবল বই পড়্‌ব, আর পাস করব, এমনি ক'রেই আমার জীবন কাট্‌বে। আজ হঠাৎ দেখলাম, আমিও ভালবাস্‌তে পারি।...মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি।" ১১৫ পৃষ্ঠা।

লাবণ্যর একটু পুরাবৃত্ত আছে। সে ধনী অধ্যাপকের এক মাত্র কন্তা। তার বাবা তাকে এমন ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন যাতে তার মনের আর সকল দরজার দিকে নজর দেবার অবসরই হয় নি। সেই অধ্যাপকেরই ছাত্র ছিল শোভনলাল। বেচারা মুগ্ধ কুণ্ঠিত পূজারীর মত সকলের অগোচরে লাবণ্যকে ভালবাস্‌ত, আর যেমন ক'রে একলব্য একান্ত মনে দ্রোণাচার্য্যের মূর্ত্তিকে গুরুর আসনে বসিয়ে সাধনা করেছিল, তেমনি শোভনলাল লাবণ্যর একখানি ছবি আঁকিয়ে তাকেই ফুল দিয়ে ঢেকে নিজের গোপন হৃদয়ের প্রণয় নিবেদন করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার সেই গোপন পূজা ধরা প'ড়ে গেল, আর লাবণ্য তাকে কঠোর তিরস্কার ক'রে তাদের বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিলে। শোভনলাল একটি কথাও না ব'লে অপরাধীর মতন মাথা নত ক'রে চলে গেল। বিপত্নীক অধ্যাপক এতদিন কন্তার প্রণয় ও পরিণয় অনাবশ্যক মনে ক'রে তাকে গঠন ক'রে এসেছেন, এখন নিজেই এক বিধবার প্রণয়ে প'ড়ে তাকে পরিণয়ে নিজের করবার জন্ম একটু উৎসুক হলেন, অথচ কন্তার বিবাহ না হ'লে ত তিনি পুনরায় বিবাহ করতে পারেন না। লাবণ্য বাবার মনের ভাব টের পেলে, এবং নিজে উদ্‌যোগী হয়ে পিতার বিবাহ দিলে, আর তার পর পিতার সকল সম্পত্তি ও সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে সে নিজে উপার্জ্জন করতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সে হল বিধবা যোগমায়ার কন্তা সুরমার শিক্ষয়িত্রী। যোগমায়ারও একটি ছোট পুরাবৃত্ত আছে, কিন্তু সেটুকু না জানলেও আমাদের বইখানির উপাখ্যান বুঝ্‌তে বেশী অসুবিধা হবে না। অমিত লাবণ্যর বাসায় গিয়ে যোগমায়ার সঙ্গেও পরিচিত হল, আর সে সহজেই তাঁর সঙ্গে মাসি-বোন্‌পো সম্বন্ধ পাতিয়ে তাঁর স্নেহভাজন হয়ে উঠ্‌ল। সে যখন তাঁর কাছে লাবণ্যর পাণিপ্রার্থী হয়ে তাঁর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলে, তখন যোগমায়া তাকে বল্‌লেন—"ধ'রেই নাও লাবণ্যকে তুমি পেয়েইচ। তার পরেও হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছা প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝবো লাবণ্যের মত মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।" অমিত বল্‌লে—"ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে ক'রে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে ব'লেই অমিত রায় মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ।"

যোগমায়ার মনে যে ভয় জেগেছিল অমিতের স্বভাব দেখে, লাবণ্য তা জেনেও ভয় পায় নি। সে বলেছিল—"মিতা, তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপর। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চল্‌তে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়্‌ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাক্‌বে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেবো না।..." ৯৯ পৃষ্ঠা। লাবণ্যকে অমিতর ভাল লাগছে সে তার বুদ্ধির আর চিন্তার যেন শাণযন্ত্র হয়েছে ব'লে। তার বুদ্ধিতে শাণ লাগাবার জন্তেই লাবণ্যকে তার প্রয়োজন, আর কিছুর জন্তে নয়; ঘরসংসার পেতে বন্দী হবার মানুষ অমিত নয়, এ কথা লাবণ্য বুঝতে পেরে অমিতকে বলেছিল—"আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে করো না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল, সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্তে শাজাহান খুশী হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্তে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব চেয়ে বড় প্রেমের দান। তাজমহলে সাজাহানের শোক প্রকাশ পায়নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।"

লাবণ্য জানে যে অমিত চিরপলাতক। তাই লাবণ্য স্থির করলে তারা চাইবে না বিবাহের বন্ধন, চাইবে প্রেমের মুক্তি; এদের প্রেম সুখের দাবি করবে না, প্রিয়ের ইচ্ছাকে মুক্ত রেখে দিতে-পারার আনন্দ চাইবে।

বিবাহের বন্ধনে স্বত্ব-স্বামিত্ব-বোধের স্থূলতায় তারা পরস্পরের কাছে অতিপরিচয়ে তুচ্ছ খেলো হয়ে যেতে পারে এ ভয় অমিতর মনেও ছিল। এই জন্তে বিয়ের রাতে জীবনে যে বাঁশী বাজে সংসারে প্রবেশ করলে সে সুর আর শুনতে পাওয়া যায় না। তাই মনে প্রশ্ন ওঠে—"বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশির দৈববাণীতে এ সব বার্ত্তার আভাস কোথায়?"—(রবীন্দ্রনাথ, বাঁশি।) যদিও সে লাবণ্যকে বিবাহে সম্মত করবার জন্তে অনুনয়-বিনয় করছিল, তবু তার ভবিষ্যৎ সংসারের যে-চিত্র এঁকে সে লাবণ্যকে মুগ্ধ করতে চাইছে তাতে তার ব্যবস্থা হবে চখাচখির মত, একটা বাগানবাড়ির মধ্যে কাটা খালের এপারে ওপারে দুটি বাড়িতে হবে দুজনার বাস, কেউ কারও কাছে বিনা এত্তালায় হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত হবে না। তাই অমিত লাবণ্যকে বল্‌ছে—"ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায় দামী জিনিষকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেন-না, শক্ত ক'রে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড় কম নয়!" তাদের সাক্ষাৎ হবে তাদের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টিক মনভুলানো অবস্থায়। নতুবা হঠাৎ কারও ত্রুটি চোখে পড়্‌লে মনের আর্টিষ্টিক অনুভবে আঘাত লাগতে পারে, আর তাতে মন বিগড়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কা ক'রেই বহু বহু শতাব্দী আগে মনু বিধান দিয়ে গিয়েছিলেন যে—'ভার্য্যার সহিত একত্রে ভোজন করিবে না, ভোজন করিতেছে এমন সময় ভার্য্যাকে অবলোকন করিবে না। হাঁচিতেছে, হাই তুলিতেছে বা যথাসুখে অসংযতভাবে বসিয়া আছে—এমন সময়েও ভার্য্যাকে দেখিবে না। নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে, অনাবৃত হইয়া তৈলম্রক্ষণ করিতেছে, ...এমন সময়েও ভার্য্যাকে অবলোকন করিবে না।' (চতুর্থ অধ্যায়)। এই আশঙ্কাতেই ভিকৃতর হুগো তাঁর প্রণয়িনীকে নিজের আবাসস্থল

থেকে চার মাইল দূরে রেখে দিয়েছিলেন, উভয়ের বহু দিনের বিচ্ছেদের পর মাঝে মাঝে কারও আহ্বানে কেউ নির্দ্দিষ্ট সময়ে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, পাছে কেউ অপরের অপ্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে সৌন্দর্য্য-পিপাসু মনকে বিরক্ত করে তোলেন। এই আশঙ্কা ক'রেই থিয়োফিল্ গতিয়ের মানস-সৃষ্টি মাদ্‌মোয়াজেল মোপাঁ যে প্রিয়তম তাকে পাবার জন্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বেড়িয়ে তবে সন্ধান পেয়েছে তাকে কেবল মাত্র একটি রাত্রে দেখা দিয়ে চিরদিনের জন্য পালিয়ে গিয়েছিল, পাছে সে অতি-পরিচয়ে পুরাতন অবহেলিত হয়ে যায়। একজন বিখ্যাত বাঙালীও তাঁর প্রণয়িণীর নিদ্রাবস্থায় নাক ডাকে শুনে তার প্রতি বীতরাগ হয়েছিলেন শোনা যায়।

এই রকম যখন কবিত্বময় কল্পনায় অমিত তার বন্যাকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবার নেশায় মশ্‌গুল হয়ে আছে, আর অল্প দিন পরেই তাদের বিবাহ হবে স্থির হয়েছে, এমন সময় এল লাবণ্যলতার কাছে তার বহু দিন আগে বিতাড়িত অপমানিত অনুরক্ত ভক্ত শোভনলালের একটি কুণ্ঠিত প্রশ্ন—"তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কি অপরাধ করেছি আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌তে পারিনি। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোন্‌বার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাইনে। ভয় ক'র না। আমার আর কোন প্রর্থনা নেই।"

এর অল্পদিন আগেই লাবণ্যকে অমিত বলেছিল—"হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদওয়ালা।...এক সময়ে সে ক্ষেপেছিল আফ্‌গানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আবিষ্কার করবে।...তারপর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কখন কাশ্মীরে, কখন কুমায়ুনে।...প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানিনে, কিন্তু...বুঝতে পারলুম ওর জীবনের কোন্‌খানে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চলতে চলতে ও ক্ষইয়ে দিতে চায়।"

লাবণ্য এখন অমিতকে ভালবাসে আর অমিতর সরব আর সাহসী ভালবাসার পরিচয় পেয়ে ভীরু শোভনলালের ভালবাসার মর্য্যাদা আর ব্যথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে। "যে-অঙ্কুরটা বড় হয়ে উঠ্‌তে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়তে দেয়নি, তার সেই কচি বেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার ক'রে তাকে সফল করতে পারত। কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব্ব; বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালবাসাকে দুর্ব্বলতা ব'লে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে। ভালবাসা আজ তার শোধ নিলো, অভিমান হল ধূলিসাৎ।...সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। মনে পড়্‌ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত মূর্ত্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।"

যখন লাবণ্যর মনের এই অবস্থা তখন অমিতর অজ্ঞাতবাস ও অজ্ঞাতবাসের কারণ আবিষ্কার করবার জন্যে তার বোন সিসি এল শিলং পাহাড়ে। কাজে কাজেই তার সঙ্গে এল তার অনুরক্ত নরেন মিটার আর নরেনের বোন ও সিসির সখী কেটি মিটার। কেটি মিটারের এই অভিযানের মধ্যে একটু স্বার্থের আমেজ ছিল, যখন সে আর অমিত বিলাতে ছিল তখন একদিন অমিত তার হাতে একটি আংটি পরিয়ে দিয়েছিল, সে আজ সাত বৎসরের আগেকার কথা। কেটি কিন্তু সেই দিনটিকে আর অমিতকে কিছুতেই ভোলে নি। সে অমিতর চঞ্চল মনকে চিরবন্দী করতে পারে নি, তাই সে এর মধ্যে আর কারও মনোরঞ্জন করা যায় কি-না দেখ্‌বার জন্য তাদের সমাজের উপযুক্ত মেমের নকল হয়ে ওঠ্‌বার জন্যে সাধনা করেছে, তার চালচলন এখন "বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্‌স্," তার কেশ বেশ সবই এখন "অনুকরণের উল্লম্ফনশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা।" তারা তিনজনে মিলে আবিষ্কার করলে অমিতর অজ্ঞাতবাসের কারণ, আর অভিযান ক'রে ক'সে অপমান ক'রে দিলে লাবণ্যকে আর সেই সঙ্গে যোগমায়াকেও।" নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব্ব আছে।"

এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল অমিত, আর সে ওদের ব্যবহার দেখে বিদ্রোহ ক'রেই লাবণ্যর হাতে আংটি পরিয়ে দিলে। এবং কেটিকে উপেক্ষা ক'রেই নিজের বোনকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, "সিসি, এঁরই নাম লাবণ্য।...এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, কল্‌কাতায় অঘ্রাণ মাসে।"

কেটি মুখে হাসি টেনে যদিও প্রথমটায় বল্‌লে—"আই কন্‌গ্র্যাচুলেট্!" কিন্তু অবশেষে তাকে বল্‌তে হ'ল, স্বীকার করতেই হ'ল যে "এ আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত্ত হাত থেকে খুলিনি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলং পাহাড়ে কি এ'কে বাজিতে খোয়াতে হবে?...মনে মনে নিজের উপর অহঙ্কার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহঙ্কার ভাঙ্‌ল,...আমারি হার।...বাজিতে যদিই হার্‌লুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক, অমিট। আমার হাতে রেখে এ'কে আমি মিথ্যে কথা বল্‌তে দেবো না।"

"কেটি আংটি খুলে রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর ধারে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল।" পঙ্কর্দেস্ লাবণ্যর হাত থেকে অভিজাত অমিটকে উদ্ধার করার আশা তাকে ছেড়ে দিতে হ'ল।

লাবণ্য নিজের হৃদয়ের প্রেমের বেদনা দিয়ে কেটির বেদনা বুঝ্‌তে পারলে। লাবণ্য আস্তে আস্তে অমিতকে বল্‌লে, "একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিলে আমাকে দিয়ে আজ সে আংটি খোলালে কেন?"

অমিত বল্‌লে, "সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে, তারা দুজনে কি একই মানুষ?"

লাবণ্য বল্‌লে, "তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।...মিতা, একদিন যে নিজেকে সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল, তাকে তুমি আপনার ক'রে রাখ্‌লে না কেন? যে কারণেই হোক আগে তোমার মুঠো আল্‌গা হয়েছে, তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্ত্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে ব'লেই দশের মনের মত ক'রে নিজেকে সাজাতে বসল।...তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ ক'রে বলছি না, আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়েই বল্‌ছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ো না, কোন চিহ্ন রাখ্‌বার কোন দরকার নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।"

"এই ব'লে সে নিজের আঙুল থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে পরিয়ে দিলে, অমিত কোন বাধা দিলে না।"

অমিত আর লাবণ্য দুজনেই তাদের পরস্পরের ভালবাসার আলোকে অপরের ভালবাসার মর্ম্ম সহজে বোঝবার ক্ষমতা লাভ করেছিল। তাই অমিত কেটির ভালবাসার মান রক্ষা করতে আর লাবণ্য-শোভনলালের ভালবাসার মান রক্ষা করতে সঙ্কল্প স্থির করলে। কেটি মিটার অমিতর ভালবাসা ফিরে পেয়ে আবার হ'ল কেতকী মিত্র। তার পর লাবণ্যর সঙ্গে শোভনলালের আর কেতকীর সঙ্গে অমিতর বিবাহ হবে সবাই জানলে। কিন্তু লাবণ্যর আর অমিতের ভালবাসার হ্রাস হ'ল না, তারা তাদের প্রণয় দিয়েই তাদের পুরাতন প্রণয় খুঁজে ফিরে পেয়েছে।

অমিত আর লাবণ্য যে কেমন ক'রে একসঙ্গে দুজনকে ভালবাসতে পারে তাই নিয়ে যোগমায়ার ছেলে যতির মনে সন্দেহ উদয় হ'লে অমিত তাকে বলেছিল—"অক্‌সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হ'লে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর-একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বল্‌তে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার,—দুটোর কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না।...যে ভালবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।...একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ, আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ার তোলা জল, প্রতিদিন তুল্‌ব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালবাসা, সে রইল দীঘি, সে ঘরে আন্‌বার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।...কেতকী সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বল্‌তে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাবো যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।"

উপন্যাসের উপাখ্যান অতাল্প। কিন্তু এর মধ্যে নরনারীর হৃদয়ের একটি গভীর সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে এবং আমাদের মনে হয়, তার মীমাংসাও করা হয়েছে। এই বইয়ের ভাষার প্রশংসা অনেকে মুক্তকণ্ঠে করেছেন। বাস্তবিক এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলা কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর কথাবার্ত্তায় আর দেখা যায় নি। কথায় কথায় রূপক আর উপমা, খুঁটিনাটি বর্ণনার কারিগরী আর বাহাদুরী সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে উপভোগ করবার জিনিষ হয়েছে। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব আর মানসিক দ্বন্দ্ব, প্রেমতত্ত্বের একটা রহস্য ও তার মীমাংসা, একটি বিশেষ সমাজের নরনারীর চরিত্রচিত্রণ যুবক-যুবতীদের হাব-ভাবে বেশ-ভূষা সম্বন্ধে নিপুণ ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ, কথায় কথায় হাস্যরসের আভাস পাঠক-পাঠিকাকে অভিভূত, আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ ক'রে তোলে। অমিতর কথা শুনে লাবণ্য হাস্‌ছে দেখে অমিত বলেছিল—"হাস্‌ছেন! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য্য রাখতে পারিনে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ। ঐ গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর সর্ব্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচ্‌কে না হেসে মরতেও জানে না।" যাঁরা রবি-ঠাকুরের কোষ্ঠীর খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে তাঁর জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, আর অমিতর বেনামী কথাটা তাঁরই নিজের কথা, তাঁর বেলাই সেটি খুব খাটে। নিবারণ চক্রবর্ত্তীর বেনামী স্বয়ং রবি-ঠাকুরই যে-সব কবিতা লিখেছেন সেগুলিও তাঁর আগের কবিতার থেকে আলাদা ধরণের, বড় গভীর অর্থভরা; এইজন্যেই এই বইয়ের নাম রাখা হয়েছে শেষের কবিতা। কিন্তু আমরা আশা করি ও পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে এই কবিতাই যেন কবির শেষের কবিতা না হয়।

ভূমিকম্প

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝরাত্রে বাসুকী একবার মাথা নাড়িলেন।

প্রসন্ন অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কাল গরমে তাহার ভাল ঘুম হয় নাই, আজ ন'টা বাজিতে-না-বাজিতে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। খাইয়া উঠিয়া দশ মিনিট কালও সে আজ বসিতে পারে নাই। অমন চাঁদ উঠিয়াছিল আজ, টুক্‌রা টুক্‌রা গতিশীল মেঘে অমন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল আকাশ, ওদিকে তাকাইবার অবসরও তাহার ছিল না। চোখে ঘুম লইয়া সে শুইয়াছিল এবং শোয়ামাত্র ঘুমাইয়াছিল।

তারপর মাঝরাত্রে প্রকৃতির এই কাণ্ড।

প্রসন্নের ঘুম ভাঙিল আতঙ্কে। তখন চাঁদ অস্ত গিয়াছে, ঘরের ভিতর অন্ধকার এমন গাঢ় যে চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না। চৌকীটা বেতালে দুলিতেছে, টিনের চালে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠিয়াছে, বাহিরের আকাশ শঙ্খের আর্ত্তনাদে মুখর। কোণ ছিঁড়িয়া মশারির একটা দিক্ গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া বুঝিবার জো নাই যে এই কোমল অবাধ্য আলিঙ্গন মশারিরই, একটা নাম-না-জানা ভয়ানক কোন কিছুর নয়।

প্রসন্নের মনে হইল, সে মরিয়া গিয়াছে। ভয়ের এতগুলি সমন্বয় মানুষের জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে ঘটে না।

হঠাৎ প্রসন্ন সচেতন হইয়া উঠিল, কে যেন উঠানে তারস্বরে হাঁকিতেছে, 'প্রসন্ন ওঠ্ শিগগির, ভূমিকম্প হচ্ছে। ওরে প্রসন্ন, প্রসন্ন?'

ভয়ের মধ্যে পলায়নের প্রেরণা থাকে, কত যুগযুগান্ত ধরিয়া যে ভয়ের আগে আগে সে পলাইয়া বেড়াইতেছিল তাহার ঠিকানা নাই, কিছু না-জানিয়া কিছু না-বুঝিয়া ওভাবে পলানোর মত ভয়ানক আর কিছু নাই, এবার প্রসন্ন বাঁচিল। মশারির আলিঙ্গন ছাড়াইয়া সে চৌকির নীচে নামিয়া পড়িল।

কিন্তু পলাইতে আরম্ভ করার মধ্যে যে পরিত্রাণ নাই সে কথা বোঝা গেল মুহূর্ত্তের মধ্যেই। প্রসন্ন দরজা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার ধারণা মত যেখানে দরজা থাকার কথা সেখানটা হাতড়াইয়া শুধু দরমার বেড়াই তাহার হাতে ঠেকিল। আজ এই একান্ত অসময়ে সে দরজার অবস্থান ভুলিয়া গিয়াছে। এ কি অসহায় অবস্থা!

ভূমিকম্পের চেয়ে হৃদ্‌কম্পই এবার তাহার বড় বিপদ হইয়া উঠিল। মাটির সঙ্গে কাঁপিতে গিয়া সাজানো ইটের বাড়ি যেভাবে ভাঙিতে থাকে প্রসন্ন তেমনি ভাবে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। নাড়া খাইয়া তাহার মগ্ন চেতনা হইতে যে কত দুঃখ ভয় ও উত্তেজনার তলানি উঠিয়া আসিয়া তাহার বর্ত্তমান আতঙ্কের সঙ্গে মিশিয়া গেল তাহার হিসাব হয় না।

বাহিরে শঙ্খের শব্দ, হুলুধ্বনি ও আত্মীয়স্বজনের ব্যাকুল ডাকাডাকির বিরাম নাই। পৃথিবীর যেখানে যত মমতা আছে সব যেন তাহার বিপদে একসঙ্গে আপশোষ জুড়িয়া দিয়াছে, সে বাহির হইতে না পারিলে শেষ পর্য্যন্ত ওদের বুকও তাহার বুকের মতই ভাঙিয়া যাইবে।

'দরজা কই, দরজা?'

'এইখানে দরজা, এইখানে—' মার হাতের বালা ঠকাঠক শব্দে দরজায় মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

প্রসন্ন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাঁচিবার অনন্ত অবকাশ লইয়া উঠানের কোণে ভাঙা চৌকীটাতে সে বসিয়া পড়িল। এই রুক্ষ কঠোর মাটির পৃথিবীর সঙ্গে অসমান যুদ্ধে সে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে দারুণ আহত। এই কয়টি মুহূর্ত্তের অনন্ত ভয়ের আঘাতে তাহার অবস্থা হইয়াছে বুনিয়াদ-নড়া বাড়ির মত।

সেই ভূমিকম্পের পর প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত প্রসন্নের মস্তিষ্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে, অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ কেহ জোরে নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহার মাথার মধ্যে একটা কালো পর্দ্দা দুলিতে আরম্ভ করে। পর্দ্দাটির প্রান্তগুলি পরল পরল অন্ধকার দিয়া দরমার বেড়ার মত করিয়া বোনা এবং ঝাপসা অন্ধকারের দেয়ালে আটকানো। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া জোরে জোরে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়া পর্দ্দা সরানো যায় না, অতীত জীবনের চেনা অথচ অজানা রহস্যের মত দুলিতে থাকে। চেষ্টা স্থগিত করিলে হঠাৎ এক সময় পর্দ্দাটা অন্তর্হিত হইয়া যায়। আশ্চর্য্য এই, তখন আর পর্দ্দাটির ভূতপূর্ব্ব অস্তিত্বে প্রসন্ন বিশ্বাস করে না। মাথার মধ্যে যে মাঝে মাঝে তাহার অমন খাপছাড়া অভিনয় হয় সে কথাটাও সে বেশ ভুলিয়া থাকে।

বছর দুই পরে চাকরির চেষ্টায় একবার মাদ্রাজ ঘুরিয়া আসিয়া পর্দ্দাটা তাহার মাথা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাখিয়া গেল অন্য উপসর্গ।

মাদ্রাজ যাওয়ার সময় তাহার সঙ্গে একটি স্যুটকেসে খান-দুই ধুতি ও একটি জামা ছিল, ওই সামান্য জিনিষ চুরি যাওয়ার ভয়ে সমস্ত পথ সে চোখ বুজিতে পারে নাই। রূপান্তর লইয়া এই ভয় তাহার মনে কায়েমী হইয়া রহিল। প্রত্যেক রাত্রে সমস্ত রাত্রির জন্য নিজের অচেতন অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার ঘুম টুটিয়া যাইতে লাগিল। কৌতূহলের ছোট বড় সমস্ত বিষয় ঘুমের রহস্যের মতই তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। যাহা গোপন, যাহা সে বোঝে না তাহাই ভয়ানক, তাহাই নিষ্ঠুর। একদিন ছেলেদের পুরাণো মাসিকে একটা সামান্য ধাঁধাঁর জবাব বাহির করিতে না পারিয়া ক্রোধে ক্ষোভে সে এমন বিচলিত হইয়া পড়িল যে, পরে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তাহার দুঃখ ও লজ্জার সীমা রহিল না।

তখন দিনের আলো নিবিয়া আসিয়াছে, চারিদিকে আনন্দের দীনতা। কপালের ঘাম বাতাসেই শুকাইয়াছে, তথাপি কাপড় দিয়া কপাল মুছিয়া প্রসন্ন ভাবিতে লাগিল, সে যে পাগল নয় তার প্রমাণের সংখ্যাগুলি যদি এমনি ভাবে কমিয়া আসে তাহা হইলে উপায় হইবে কি?

অথচ প্রতিকার নাই। সে সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু নিজেকে কিছুই বুঝাইতে পারে না। রাত্রে মশারি গুঁজিয়া শুইয়া তাহার মনে হয় ভাল করিয়া বুঝি গোঁজা হয় নাই, কোথায় ফাঁক রহিয়াছে, মশা ঢুকিবে। এ যে ভুল বুঝিতে পারিলেও তিন চার বার সন্তর্পণে তোষকের চারিপ্রান্ত না হাতড়াইলে তাহার স্বস্তি থাকে না। বসিবার ঘরে তালা দিয়া বার-বার টানিয়া দেখিয়া আসিলেও তাহাকে আবার ফিরিয়া গিয়া তালা ঠিকমত লাগানো সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। চৌকীর নীচে রোজই সে চোর খোঁজে।

এমনি সব অন্তহীন পাগলামী। মাঝে মাঝে সে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাহাতে ফল আরও খারাপ হয়। যুদ্ধ করিয়া হার মানিতে জ্বালা যেন বাড়িয়া যায়। নিজের কাছে নিজের সে কি নির্মম অপমান!

প্রসন্নের হৃদয়বৃত্তিগুলি ক্রমে তীক্ষ্ণ ও সতেজ হইয়া উঠিল, অনুভবশক্তি আশ্চর্য্যরকম বাড়িয়া গেল ;—তাহার মধ্যে ভাবপ্রবণতা দেখা দিল। ছোট দুঃখ তাহার কাছে এখন আর ছোট নয়, প্রাত্যহিক জীবনের যে-সব সূক্ষ্ম ও কোমল সুর তাহার মত অকবির কানে পশিবার কথা নয় এখন সেগুলি সে বেশ ধরিতে পারে। কল্পনাকে, —অবাস্তব কল্পনাকে, আমল দিতে তাহার ভাল লাগে।

সময় সময় সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়ে। জীবনের দেনা-পাওনার কড়া হিসাবী সে নয়, তবু সে টের পায় জীবনটা অর্থহীন। বাঁচিয়া থাকার কোন মানেই সে খুঁজিয়া পায় না।

জীবনের যে মানে সে খোঁজে তাহা যে অসাধারণ বৈচিত্র্য, উত্তেজনা, ভূমিকম্প, রোগশোক ও আতঙ্কের সমারোহ ভিন্ন আর কিছু নয়। মদের তৃষ্ণা জলে মিটিবে কেন? নিত্য পাত্র ভরিয়া তীব্র সুরা সম্মুখে ধরিবে মানুষের জীবন তেমন সাকীও নয়।

রাত্রে প্রসন্ন আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখে।

একটা খাড়া উঁচু পাহাড়। তার উপরে প্রসন্নের স্কুল। অনেক বয়সে স্কুলে পড়িতেছে বলিয়া প্রসন্নের বড় লজ্জা, টিফিনের ছুটির সময় স্কুলের সামনে পাহাড়ের একেবারে ধারে সে চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ একটা ছেলে তাহাকে এমন ধাক্কাই দিল যে পাহাড়ের নীচে আছড়াইয়া না পড়িয়া প্রসন্নের আর উপায় নাই ; কারণ আজ শাড়ী পরিয়া স্কুলে আসিয়াছে বলিয়া উড়িবার প্রক্রিয়াটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের ঠিক নীচে একটা ইঁদারা, শূন্যে পড়িতে পড়িতে প্রসন্ন বিবেচনা করিয়া দেখিল ইচ্ছা করিলে ইঁদারার মধ্যেও পড়া যায় অথবা একটু বাঁকিয়া ইঁদারার পাকা বাঁধানো পাড়ের উপরেও আছড়ানো চলে। কি করা উচিত?

আধাআধি পড়িয়া সে মন স্থির করিয়া ফেলিল। ইঁদারার জলে পড়িলে লাগিবে না বটে, কিন্তু ওর মধ্যে আবছা অন্ধকার, ওর মধ্যে অজানা রহস্য। তাছাড়া নিজের চেষ্টায় উঠিয়া আসিতে না পারিলে ওর মধ্যেই তাহাকে বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে। হেড মাষ্টার নিয়ম করিয়াছেন কোন ছেলে ইঁদারায় পড়িলে তাহাকে আর তোলা হইবে না।

নৌকার হালের মত হাতের পাতায় বাতাস কাটিয়া প্রসন্ন ইঁদারার পাড়ে আছড়াইয়া পড়িল।

হাত পা ভাঙিল না বটে, কিন্তু আঘাত লাগিল, সত্যিকারের আছাড় খাওয়ার সমানই। স্বপ্নে আর বাস্তবে ও ছাড়া আর তফাৎ আছে কি? ভালবাসিয়া যাহাকে পাই নাই, স্বপ্নে সে পাশে আসিয়া বসিলে এই স্বপ্নে পাওয়ার মধ্যে শুধু বাস্তবতার ফাঁকিটুকুই থাকে বলিয়া বাঁচা সম্ভব হইয়াছে। স্বপ্নকে তাহার ন্যায্য মূল্য দিতেই হইবে।

প্রসন্ন উঠিয়া আলো জ্বালিল। জল খাইয়া গায়ে একটা চাদর জড়াইয়া চুপচাপ বিছানায় বসিয়া রহিল। শুধু বাড়ি নয়, সমস্ত পাড়াটা নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে। আলোটা ভয়ে ভয়ে মিটিমিটি জ্বলিতেছে, রাস্তার আলো এতখানি অন্তরালে যে অস্তিত্বের মৃদু প্রমাণটাই বিস্ময়কর।

এ যেন রাত্রি নয়, শঙ্কার কুয়াশা।

প্রসন্ন ভাবিতে লাগিল, একটা বউ থাকিলে এসময়ে কাজ দিত। প্রেমালাপ নয়, মানুষের সঙ্গে দুটি সাধারণ কথা বলিবার এত বড় প্রয়োজন কি সচরাচর আসে? বউ নিশ্চয় তাহার ভয়ের ভাগ লইত, দু-চোখ বড় বড়

করিয়া ভীত কণ্ঠে বলিত 'কি গো? কি?' সে বলিত 'কিছু না, বড্ড মশা লাগ্‌ছে। উঠে মশারিটা একবার ঝাড় না?'—'আলোটা বাড়িয়ে দাও, আমার বড় ভয় করছে।' 'আমি রয়েছি ভয় কি?' বলিয়া সে হাসিত। বউ তথাপি বলিত, 'না, না, আলোটা তুমি বাড়িয়ে দাও।'

মা কেমন করিয়া টের পাইয়াছিলেন, উঠিয়া আসিয়া জানালা দিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'রাতদুপুরে আলো জ্বেলে বসে রয়েছিস যে?'

'একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম, মা।'

'তা দেখবি না? যে অনাচারটাই তুই করিস্‌। কাপড়ে ভাত পড়ল, পই পই করে বারণ করলাম কানে তুললি না, সেই কাপড়ে এসে শুলি। নে, মা দুর্গাকে ডেকে আলো নিবিয়ে ঘুমো।'

পরদিন সকালে মা বলিলেন, 'এবার একটা বিয়ে কর্‌ বাবা, মাথা খাস। রোজগার-পাতি করছিস্‌—'

সকালে বউয়ের প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে, খবরের কাগজটা নামাইয়া প্রসন্ন বলিল, 'কাণপুরে কি ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে জান মা? একটা আপিসের ছাদ ভেঙে সাতজন কেরাণী মারা গেছে, পনের জন জখম হয়েছে।'

মোটা হেডিংটা দেখাইয়া মা বলিলেন, 'ওই লিখেছে বুঝি?'

'না, ওটা যুদ্ধের খবর।'

'পড়্‌ ত, শুনি।'

'যুদ্ধের খবর আর কি শুনবে মা? কানপুরের কাণ্ডটা কি ভয়ানক বল ত! আপন মনে সবাই কাজ করছে, কেউ কিছু জানে না, হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে ছাদ ভেঙে সাতজনের কবর হয়ে গেল, পনের জন জখম হ'ল। ভাবলে গা শিউরে ওঠে।'

বলিয়া প্রসন্ন উপরের দিকে তাকাইল। এ বাড়ির কড়িবরগা সমস্তই লোহার। ছাদ ভাঙিবার সম্ভাবনা তেমন নাই। সে মৃদু মৃদু হাসিল। ভাবিল, খবরের কাগজের খবরগুলিও ওষুদের বিজ্ঞাপনের মত এমন হিপ্‌নটিক! ষ্টোভ-দুর্ঘটনার বিবরণ পড়া অবধি আজকাল সে কত ভয়ে ভয়ে ষ্টোভ জ্বালায়, মাকে জ্বালাইতে দেয় না, চাকরকেও না।

চাকরি পিতৃবন্ধুর কল্যাণে। পিতৃবন্ধু আপিসের বড়বাবু। ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় প্রসন্নকে তিনি ভালবাসেন। দোষ করিলে ধমকান না, মাঝে মাঝে ডাকিয়া উপদেশাদি দেন এবং কামানো চিবুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কি যেন ভাবেন।

ঠিক যেন ভাবেন না, দুশ্চিন্তা করেন।

সুতরাং অল্পকালের মধ্যে প্রসন্নর প্রমোশন হইল। সবদিক দিয়াই সে উপরে উঠিল, তাহার মাহিনা যেমন বাড়িল সত্তর হইতে আশী টাকায়, তাহাকে কাজ করিতে হইল একতালা হইতে একেবারে চারতলায় উঠিয়া গিয়া। বড়বাবুর পক্ষপাত-ভরা দরদ প্রসন্নকে এমন বিচলিত করিল বলিবার নয়।

বড়বাবু ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমার বয়স কত হ'ল হে প্রসন্ন?'

'আজ্ঞে, সাতাশ।'

'বল কি, সাতাশ! বিয়েটিয়ে ক'রে এবার সংসারী হও? না, ও-সব ইচ্ছা নেই?'

প্রসন্ন চোখ নামাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে সামান্য আয়—'

বড়বাবু কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি যখন বিবাহ করেন তাঁহার এক পয়সা আয় ছিল না। স্ত্রী কি তাঁহার খাইতে পায় নাই? প্রসন্ন আশী টাকা বেতন পায়, দেশে বাড়িঘর জমিজায়গা আছে, বিবাহ করিতে হইলে কি রাজা হইতে হয় নাকি? তারপর—

'আমি যদ্দিন এখানে বড়বাবু আছি, মাইনে বাড়ার ভাবনাটা তোমার ভাবতে হবে না বাপু।' বলিয়া বড়বাবু হাসিলেন।

এ ত শুধু চুম্বক, কথা তিনি কম বলেন নাই। দুর্ভাবনায় ঘামে হাতের তেলো ভিজাইয়া প্রসন্ন নীরবে আগাগোড়া সবটাই শুনিল। বড়বাবুর কন্যাটিকে সে দেখিয়াছে। লোভ করা যায় এমন সে মেয়ে, তাছাড়া বাপ তার বড়বাবু। হইলে সব দিক দিয়া ভালই হয়। প্রসন্ন কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ পাইতেছিল না। অমন একরাশি কালো চুল পিঠে ছড়াইয়া অল্প বিরক্তিতে ভ্রূদুটি অমন ভাবে একটুখানি কুঁচকাইয়া যে মেয়ে ও রকম আশ্চর্য্য-কণ্ঠে বলিতে পারে 'বাবা বাড়ি নেই' তাহাকে বিবাহ

করা কি ভয়ের কথা? ও মেয়ের সঙ্গে একা একঘরে বসিয়া আছে কল্পনা করিলেও তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে থাকে। ওকে বিপদ বলিয়া ভাবা যায়, বউ বলিয়া কোন মতেই যেন ভাবা যায় না।

এদিকে বড়বাবুকে না বলিবার সাহসই বা সে কোথায় পায়?

বড়বাবুর বুদ্ধি-বিবেচনার উপর প্রসন্নর শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া সে ভাবিতে লাগিল, নিজের মেয়ের উপরেও কি লোকটার কিছুমাত্র মমতা নাই? অমন মেয়েকে কি বলিয়া তাহার মত লোকের হাতে সঁপিয়া দিতে চায়? দেশে কি সুপাত্রের অভাব ঘটিয়াছে?

যেখানে বসিয়া প্রসন্ন কাজ করে তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা জানালা। পাঁচ সাতজন মানুষ একসঙ্গে গলিয়া যাইতে পারে জানালাটা এত বড়। শিক নাই। তা, তিনতলার জানালায় শিকের কি প্রয়োজন? গলিয়া পড়া সহজ বলিয়াই কে আর তিনতলার জানালা দিয়া গলিয়া নীচে পড়িতেছে? মানুষ ত পাগল নয়!

কাজ করিতে করিতে প্রসন্ন বার-বার জানালায় উঠিয়া যায়। শহরটা ইটেরই বটে। পথ দিয়া গাড়ী ঘোড়ার আর মানুষের স্রোত বহিয়া যায়, পথটা যেন নদী। নীচু ফুটপাথটার দিকে চাহিয়া প্রসন্নর গা একটু ছম্ ছম্ করে।

লিফটে উঠিবার সময় যেমন হয় তেমনি একটা অনুভূতি, কেবল তীব্রতা কম। গভীর কিন্তু তীব্র নয়।

আজ বিচলিত মন লইয়া খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া প্রসন্ন প্রথম অনুভব করিল যে, ফুটপাথটা আসলে বেশী নীচু নয়, তিনতলার মানুষের অনায়াস মরণ বিছানো আছে বলিয়াই অত নীচু মনে হয়। ফুটপাথের চৌকা পাথরের প্রান্তগুলি সে বেশ দেখিতে পাইতেছে, একটা কলার খোসা পড়িয়া আছে ইহাও তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই। প্রসন্ন একদৃষ্টিতে কলার খোসাটার দিকে চাহিয়া রহিল। তিনতলা হইতে লাফাইয়া পড়িলে মানুষ বাঁচে কি না এই কৌতুককর সমস্যাটা তাহাকে হঠাৎ আজ বিব্রত করিয়াছে।

মরিবেই যে এমন কোন মানে নাই। বাড়িতে আগুন লাগিলে ইহার চেয়ে উঁচু হইতে লাফাইয়া মানুষ প্রাণ বাঁচাইয়াছে, আর এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িলে বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিবে না? বাড়িতে আগুন লাগিয়া হোক্, ছাদটা ধসিয়া পড়ার উপক্রমেই হোক্, প্রাণ বাঁচাইবার জন্ম তাহাকেই যদি এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে হয়, তাহাকে মরিতেই হইবে?

প্রথমটা ক্ষুব্ধ হইয়া শেষে প্রসন্ন শান্ত হইল। মরেও যদি, মন্দ হয় না। তাহাকে ঘিরিয়া রাস্তায় ভিড় জমে, আপিসসুদ্ধ সকলে ছুটিয়া নীচে নামে, চকিতের জন্ম বড়বাবুর মনে কন্যার বৈধব্য সংঘটিত হয়, য়্যাম্বুলেন্স আসে, সমারোহের আর সীমা থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে রোগশয্যায় শুইয়া মরার চেয়ে এ মৃত্যুতে বেশ খানিকটা অভিনবত্ব থাকে।

সেদিন কাজে আর তাহার মন বসিল না। বার-বার উঠিয়া গিয়া সে দেখিয়া আসিতে লাগিল, কলার খোসাটা তখনও পড়িয়া আছে কি না। তাহার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, তাহার চোখের সামনে একজন খোসাটায় পা দিয়া পিছলাইয়া পড়ে, দেখিয়া মনের আনন্দে সে খানিক হাস্য করে। এত লোক চলিতেছে পথে, কারও পা কি খোসাটায় পড়ে না? এমনি সব সাবধানী পথিক যে পা পিছলাইয়া পড়াটাও সকলে সাবধানে বাঁচাইয়া চলে?

কলার খোসাটার সদ্গতিই হইল। প্রসন্নর চোখের সামনে একটা গরু সেটা খাইয়া গেল। ক্ষুন্নমনে সে টেবিলে ফিরিয়া গেল। সেদিন আর জানালায় উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা তাহার হইল না। কলার খোসার অপচয়কে উপলক্ষ্য করিয়া জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে না পারার দুঃখ তাহার মনে মৃদু বিষের মত প্রভাব বিস্তার করিল, আকাশের রহস্যভরা সুনীল রূপ দিগন্তবিস্তৃত ইটের স্তূপের গভীর মহিমা, আর জানালার ঠিক নীচে পাথর-বাঁধানো ফুটপাথ প্রসন্নের কাছে সমস্ত আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিল। কাহার উপর অভিমান করা উচিত সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল কে যেন তাহাকে ঠকাইতেছে, ক্রমাগতই ঠকাইতেছে।

প্রসন্ন চমকাইয়া উঠিল। বড়বাবু কাঁধে হাত রাখিয়াছেন।

'মাকে ব'লো হে, রবিবার দেখা করতে যাব।'

'আজ্ঞে, বলব।'

তিনতলায় কাজ আরম্ভ করা অবধি প্রসন্ন নানা ছলে লিফ্‌টে ওঠানামা করিয়াছে। একটা ছোটখাট ঘর, মেঝে আছে, দেয়াল আছে, ছাদ আছে, তার মধ্যে মিনিট-খানেক বন্দী থাকিয়া সোঁ করিয়া উপরে ওঠা নীচে নামা কি রোমাঞ্চকর রোমান্স! আজ সে সিঁড়ি দিয়াই নীচে নামিল। লিফটের মোহ আজ তাহার নাই। যার এমন বিপদ ঘটিতে বসিয়াছে অত সখে তাহার কাজ কি? জীবনে সহসা যে সমস্যা দেখা দিয়াছে এখন গভীর ভাবে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। মেয়েটাকে আর একবার দেখিতে পারিলে ভাল হইত। একবার মাত্র দেখিয়া ওকে যেন বেশী রহস্যময়ী মনে হইতেছে। অল্প বিরক্তিতে ঠিক কি ভাবে সে ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত করে আর একবার না দেখিয়া ও মেয়েকে বিবাহ করা বোধ হয় সুবিবেচনার কাজ হইবে না।

অন্যমনে বাসে উঠিতে গিয়া প্রসন্ন পড়িতে পড়িতে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল। ভিতরে বসিয়া লজ্জায় সে কাহারও দিকে চাহিতে পারিল না। অপরাধ সে কারও কাছে করে নাই, কিন্তু সেজন্য শাস্তি আটকায় না, এমনি মন্দ তাহার কপাল। রাত্রে ঘুমাইতে সে যে কষ্টটা পাইল তাহার তুলনা হয় না। বড়বাবুর মেয়েটি যেন কড়া নেশা, তাহার কল্পনা সেই নেশারই অবসাদ; নিস্তেজ অথচ নির্ম্মম। তাহার বেশ ঘুম আসিতে থাকে, শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া চিন্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে জট পাকাইয়া যায়, ঘুমাইয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই,—সহসা সে পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হইয়া ওঠে। জাগরণ এমন আকস্মিক হয় যেন চমক্ লাগে। সার্কাসের তাঁবুতে পাঁচ ছয়টা উঁচু দোলনার একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিবার কসরৎ করিতে করিতে একি ঘুম ভাঙা!

এমনি ভাবে তাহার রাত্রি প্রভাত হইল। সকালে সে মাকে বলিল, 'তাড়াহুড়ো ক'রে রাঁধবার দরকার নেই মা। আজ আপিস যাব না।

মা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রসন্ন বলিল, 'রাত্রে তাহার জ্বর আসিয়াছিল।' মা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, 'ওষুদপত্তর কিছু খা বাবা তুই। বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোর চেহারা।'

প্রসন্ন মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ওষুদপত্রের ব্যবস্থাই হচ্ছে মা।'

বিবাহের প্রক্রিয়াটা প্রসন্ন সাহসী পুরুষের মতই সহ্য করিল। বিশেষ কঠিন নয়, কারণ নিজের তাহার কিছুই করিবার নাই, যাহা দরকার অন্যে করাইয়া লয়। তাহার ভয় ছিল বাসরে। একগাদা মেয়ে যখন তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিবে হালভাঙা নৌকার মত টলমল করিলে চলিবে না, নিজেকেই তাহার চারিদিক সামলাইয়া চলিতে হইবে। ঘর নির্জ্জন হইলে বউয়ের সঙ্গে ভাবও করিতে হইবে তাহাকেই।

বাসর বসিতে রাত বারোটা বাজিয়া গেল। মেয়েরা হাসিল, ফাজলামি করিল, গান গাহিল, রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত। তবু কি তাহারা উঠিতে চায়—এই যে আরম্ভ এ যাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, কারণে অকারণে স্বামী এখন যার বকে, অসুস্থ শিশু যার দিবারাত্র ককায়, পরের জীবনে এই আরম্ভকে সেও ঘাঁটিতে চায়, ইহাকে প্রকাশ্য ও সাধারণ করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম নয়। বাসরে বিবাহিতা মেয়েরাই ভিড় করে বেশী। বিবাহোৎসবে সধবা নারী অপরিহার্য্য এবং সে নিয়ম তাহাদেরই তৈরি।

প্রসন্ন ইহাদের চিনিতে পারিল না। সংসারের সংস্রবে সে এত বড় হইয়াছে, ইহাদের জীবনী তাহার অজানা নয়, এত উল্লাস ইহাদের আসে কোথা হইতে? অবাধে ইহারা আনন্দ করিতেছে, হাসি ইহাদের আন্তরিক, দেখিয়া মনে হয় না জীবনে ইহাদের কোনদিন দুঃখের ছায়াপাতও হইয়াছিল। একে একে প্রসন্ন উপস্থিত প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, কারও চোখ দুটিতে পর্য্যন্ত বিষণ্ণতার আভাসটুকু নাই, খুব যে নিরীহ সেও হাসিমুখে অন্যের পরিহাস উপভোগ করিতেছে, দু-চোখ খুশীতে চপল। প্রসন্ন সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, সংসারে শোক-

তাপ নাই একথা সত্য নয়, তার বড় ভাগটা মেয়েরাই গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ব্যক্তি-গত জীবনকে কিছুকালের জন্ত অতিক্রম করিয়া যাওয়ার প্রক্রিয়াটা ইহাদের বোধ হয় জানা আছে।

ভাবিয়া প্রসন্ন খুশী হইল। খানিক পরে যে-স্ত্রীর সঙ্গে তাহার আলাপ করিতে হইবে সে ইহাদের স্বজাতীয়া। যে প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার দরুণ ইহারা কান্নার সময় প্রাণ দিয়া কাঁদিয়া হাসিবার সময় নির্ব্বিকার চিত্তে হাসিতে পারে বড়বাবুর মেয়ের মধ্যেও সে দুর্ব্বলতা নিশ্চয় আছে। সকল নারীর মত তার বউও জীবনকে যাচাই করিবে না, হাসিকান্না যাহাই আসুক বিনা প্রতিবাদে দ্বিধামাত্র না করিয়া গ্রহণ করিবে এমনি একটা সান্ত্বনা প্রসন্নকে খানিক আশ্বস্ত করিল। আড়চোখে সে একবার চেলি-পরা বউকে দেখিয়া লইল। বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিলেও সে বিশ্বাস করিল দুঃখ এবং আনন্দের মত স্বামীকেও সমগ্র সত্তা দিয়া গ্রহণ করিবার শিক্ষা এ মেয়ের হইয়াছে, স্বামীকে ভালবাসা হাসাকাঁদার মতই ইহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক।

ইহার অস্থিমজ্জায় নিঃসন্দেহ স্বামিপ্রেম আছে এবং সে প্রেমে শ্রদ্ধা-ভক্তির অংশটা অন্ত মেয়ের চেয়ে কম নয়।

ক্রমে মেয়েরা বিদায় লইল। বাহির হইতে কে যেন দরজায় শিকল তুলিয়া দিল।

প্রসন্ন মুহূর্ত্তে পাংশু হইয়া গেল।

যে-মেয়েটি শিকল দিয়াছিল বাহির হইতে সে পরিহাস করিয়া বলিল, 'কই গো বর, খিল চড়াবার শব্দটা পাচ্ছি না যে? আমাদের ভদ্রতায় এতখানি বিশ্বাস ক'রো না, ঠকে যাবে।'

প্রসন্ন ততক্ষণে উঠিয়া গিয়া বারান্দার দিকের বন্ধ জানালাটা খুলিয়া ফেলিয়াছে। তাহার হৃদ্‌পিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল, "শিকল দিলেন কেন? খুলে দিন্।'

বউ ঘোমটা ফাঁক করিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এ কি রকম বর?

বারান্দার মেয়েটি চলিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিয়া গেল, 'কাল সকালে খুলব।'

কাল সকাল! সমস্ত রাত তাহাকে এই ঘরে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে, ইচ্ছা করিলেও বাহিরে যাইতে পারিবে না? কি ভয়ানক। প্রসন্ন মিনতি করিয়া বলিল, 'না না, এখুনি খুলে দিন। আমি একবার বাইরে যাব। দেখুন ত কি করছেন আপনি!'

ছোট একটি কিল দেখাইয়া মেয়েটি হাসিমুখে চলিয়া গেল।

প্রসন্ন খাটে গিয়া বসিল। তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইয়াছে। ঘরের বাতাস তাহার নিঃশ্বাস লওয়ার পক্ষে অপ্রচুর।

কত জল্পনাকল্পনাই সে করিয়া রাখিয়াছিল! সে-সব কিছুই হইল না। বিপন্ন হইয়া প্রসন্ন এই বলিয়া স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপ আরম্ভ করিল—

'তোমার ভাইটাই কাউকে ডেকে বল না শিকলটা খুলে দিক!'

বউ মৃদুস্বরে বলিল, 'একটু পরেই খুলে দেবে।'

প্রসন্ন তাহা জানে। এ যে কৌতুক, দশপনের মিনিট পরে মেয়েটি যে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া শিকল খুলিয়া দিয়া যাইবে ইহাতে তাহার একটুও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বস্তি মেলে না। বন্ধ ঘরে এক মুহূর্ত্ত থাকাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার দম আটকাইয়া আসে। যদি এখনি একটা অঘটন ঘটিয়া বসে সে কি করিয়া ঘরের বাহির হইবে? অপঘাত হইতে রক্ষা পাইবে কি করিয়া? অবশেষে আবার সেই বন্ধ দরজা!— 'না, এখুনি খুলে দিতে বল। এসব কি? এসব আমি ভালবাসি না।'

নিরুপায় বউ চুপ করিয়া গভীর বিস্ময়ে প্রসন্নের ভীত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আলোচনা

চণ্ডীদাসের পদাবলী

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত "চণ্ডীদাসের পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেছি।

গুপ্ত-মহাশয় লিখিয়াছেন—"এ কথাটি কে ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে যদি চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্র প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা অনেক আধুনিক অপর বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে পাওয়া যায় না কেন?...কবিরাজ গোবিন্দদাস অতবড় কবি, তাঁহার পদাবলীর পুঁথি, কেহ কি কখনও দেখিয়াছে? রায়শেখর কৃষ্ণকান্ত, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, জ্ঞানদাস, যদুনন্দন, বংশীবদন, ইঁহারা সকলেই উত্তম কবি, ইঁহাদের মধ্যে কাহারও পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে কোথাও পাওয়া গিয়াছে?"

উত্তরে আমরা নিবেদন করিতে চাই—হাঁ, আমরা দেখিয়াছি, পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা আমাদের রতন-লাইব্রেরীতে (বীরভূমে) অপরাপর পাঁচ হাজার প্রাচীন পুঁথির সহিত রক্ষিত আছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক স্থানেই আছে।

আমাদের লাইব্রেরীতে গোবিন্দদাসের স্বতন্ত্র পদাবলীর পনের-ষোলখানি প্রাচীন পুঁথি আছে। এই সকল পুঁথিতে গোবিন্দদাসের একুশ পদ হইতে তিনশতাধিক পদাবলী একত্র সংগৃহীত আছে। অপরাপর বহু কবিরও এইভাবে সংগৃহীত পদাবলীর সঙ্কল-গ্রন্থ পুঁথির আকারে লিপিবদ্ধ আছে।

রায়শেখরের নিজের সঙ্কলিত "দণ্ডাত্মিকা" পদাবলীর কথা সকলেই জানেন। "দণ্ডাত্মিকা" পদাবলীর ছাপা পুঁথিও পাওয়া যায়। আমাদের লাইব্রেরীতেও এই গ্রন্থের করেকখানি প্রাচীন পুঁথি আছে। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানদাস, বলরামদাস, জগদানন্দ, কৃষ্ণপ্রসাদ প্রভৃতি বহু প্রাচীন পদকর্ত্তার পদাবলীর স্বতন্ত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কোন-কোনটির সঙ্কলনকাল "পদকল্পতরু"রও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে

পূর্ব্বোল্লিখিত রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাসের "রসমঞ্জরী" খানিকে প্রকারান্তরে পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ বলা যাইতে পারে পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখর ও শশীশেখরের "নায়িকা রত্নাবলী" নামে স্বতন্ত্র পদের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

গুপ্ত-মহাশয় রাধামোহন ঠাকুরের গ্রন্থের নাম লিখিয়াছেন "পদসমুদ্র," কিন্তু গ্রন্থের নাম "পদসমুদ্র" নহে—"পদামৃত সমুদ্র"। "পদসমুদ্র" আউলিয়া মনোহর দাস রচিত বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি। স্বর্গীয় হারাধন ভক্তিনিধি মহাশয় এই পুঁথির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ পুঁথি আজও পাওয়া যায় নাই।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন", পদাবলী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। ইহাতে যে-সমস্ত কবিতা আছে, তাহার প্রত্যেকটি কবিতাই রাগরাগিণী সম্বলিত পদ।

সিউড়ি, বীরভূম শ্রীগৌরীহর মিত্র

—

প্রতাপাদিত্যের কথা

বৈশাখের প্রবাসীতে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। বাহারিস্তানের গ্রন্থকর্ত্তার নাম মির্জ্জা সহন নহে, মির্জ্জা নথন। যদুবাবু ভুল করিয়া সহন পড়িয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদীয় Mughal North-East Frontier Policy নামক গ্রন্থে এই ভ্রম-সংশোধন করিয়াছেন। পুরাতন আসামী বুরঞ্জিগুলিতে এই নথনের নাম অনেকবার কথা হইয়াছে।

২। বঙ্গের 'বারভূঞা' নাম যে আসামের বারভূঞার অনুকরণ তাহা আমার এক প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'বার' কথাটা কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাবাচক নহে। যে-আমলে দেশে কোন অধিরাজ ছিল না, ছোটবড় অনেকগুলি জমিদারের অধীনে দেশ ছিল, সেই আমলকেই বারভূঞার আমল বলিত। Bengal: Past and Present, Vol. XXXV, p. 30. "How the number of the Chiefs came to be fixed at 'twelve.'" দ্রষ্টব্য।

৩। প্রতাপের বংশ-পরিচয়ের জন্ত রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত'-এর উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

৪। প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য দায়ুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াই যে যশোর-রাজ্য মোগলের নিকট হইতে বকশিস্ পাইয়াছিলেন, ইহা আমার প্রবন্ধে বেশ পরিষ্কাররূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। Bengal: Past and Present. Vol. XXXVI. p. 16. দ্রষ্টব্য। হতভাগ্য দায়ুদের প্রধান অন্তরঙ্গ ছিল দুইজন দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি,—কতলু খাঁ ও শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য। এই দুইজনই দায়ুদের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছিল। কতলু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মোগলের হাতে উড়িষ্যা-রাজ্য ইনাম পায়, আর শ্রীহরি পায় যশোর-রাজ্য। কতলুর সহিত মোগলের আবার অল্প দিনের মধ্যেই সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু যশোর-রাজ্য চিরদিন মোগলের অনুগত ছিল। প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা একেবারে মিথ্যা কথা এক পতনকালের সঙ্ঘর্ষ ভিন্ন তাঁহার সহিত মোগলের কোন দিন আর কোন সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়া বিন্দুমাত্রও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

৫। নিখিলবাবু লিখিয়াছেন—"যে সময় আজিম খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন সেই সময়ে প্রথম মোগলদের সহিত প্রতাপের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়।" আজিম খাঁর সহিত প্রতাপের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। তিনি এক রকম বিহার সীমান্ত ছাড়াইয়া বাংলায় ঢোকেন-ই নাই। প্রতাপাদিত্যের সহিত সঙ্ঘর্ষ ত অনেক দূরের কথা। নিখিলবাবু চাঁচড়া রাজবংশের কাগজপত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাগজপত্রের কোনটায় যদি আজিম খাঁ-প্রতাপ সঙ্ঘর্ষ সমর্থিত হয় তবে তাহা সর্ব্বসাধারণ্যে চিত্রাদি সহ প্রকাশিত হওয়া উচিত। সতীশবাবুর 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে'

দেখা যায় (পৃ. ৪৭৯) এই বংশের ভবেশ্বর সিংহ আজিম খাঁর সুবাদারীর কালে চারিটি পরগণার সনন্দ প্রাপ্ত হন। মোগলপক্ষে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই নাকি এই সনন্দ-প্রাপ্তির কারণ। এই মূল্যবান দলিলখানি থাকিলে চিত্রসহ উহার পাঠ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

৬। কার্ভালো সত্যই প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। কাশিম খাঁর সুবাদারীর আমলের কার্ভালো সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। Bengal: Past and Present, Vol. XXXV, p. 28, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৭। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের কোন সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, ইহা জোর করিয়াই বলা যায়। বসু-মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য-চরিতেও দেখা যায়, মানসিংহ যশোরে অতি বন্ধুভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন (নিখিলবাবুর সংস্করণ, ৬২ পৃষ্ঠা)। মানসিংহের বঙ্গীয় ভৌমিকদমনের ইতিহাস 'আকবরনামা' হইতে বেশ বিস্তৃতরূপেই জানা যায়। প্রতাপের সহিত সঙ্ঘর্ষের কোন কথা কোথাও নাই। প্রতাপ আগাগোড়া মোগলপক্ষে ছিলেন। একটা নিতান্ত মিথ্যা কথা ভারতচন্দ্রের প্রসাদে বাংলায় কুখ্যাত হইয়া আছে যে, কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযানে মানসিংহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার প্রতাপাদিত্য নাটকে ইহা লইয়া কত রঙ্গই না করিয়াছেন। এইরূপ সাহায্য করার জন্যই নাকি মানসিংহ তাঁহাকে কয়েকটি পরগণা বকশিস্ দিয়া সনন্দ দিয়াছিলেন। বোর্ড-অব-রেভেনিউর অনুমতি ও আনুকূল্যের বলে আমি নিজে কৃষ্ণনগর গিয়া কৃষ্ণনগর জমীদারীর মূল সনন্দগুলির ফটোগ্রাফ তুলিয়া আনিয়াছি এবং পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যাদি করিয়া তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি। জাহাঙ্গীরের আমলের বাদসাহী সনন্দ দুইখানা আছে। প্রথমখানার তারিখ ১৩ শাবান, ১০১৫ হিজরি= ৪ই ডিসেম্বর, ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয়খানা ১০২২ হিজরির—প্রথমখানার ৭ বছরের পরবর্ত্তী। দ্বিতীয়খানার বর্ত্তমানে আমাদের প্রয়োজন নাই। এই সনন্দদ্বয় চিত্রাদি সহ যথাসময়ে যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

প্রথমখানার মর্ম্ম এই যে ভবানন্দ বাঙালীর দুই ভ্রাতা বসন্ত ও দুর্গাদাস দিল্লীতে যাইয়া বাদশাহী দরবারে আরজী পেশ করিয়াছেন যে সুবা বাংলার সরকার সাতগাঁর অধীন তিনটি পরগণার চৌধুরাই এবং কানুনগুই পুরুষানুক্রমে উক্ত ভবানন্দ ভোগ করিতেছেন এবং সম্প্রতি নদীয়া পরগণার কতকগুলি জনশূন্য গ্রামে জনবসতি করাইয়া এবং মহদ্‌পুর নামকরণ করাইয়া সুবাদার রাজা মানসিংহ এই পরগণারও চৌধুরাই ও কানুনগুই ভবানন্দ বাঙালীকে প্রদান করিয়াছেন। মহদ্‌পুরের আয় ১২,০০০৲ টাকা। মানসিংহ মহদপুরের চৌধুরাই ও কানুনগুই ভবানন্দকে প্রদানের সনন্দ বাদশাহী শেরেস্তায় দাখিল করিয়াছেন। বাদশাহ আদেশ দিলেন পুরুষানুক্রমে উপভুক্ত তিন পরগণার চৌধুরাই ও কানুনগুই ভবানন্দের অব্যাহত থাকিবে। নূতন পরগণা মহদপুর 'জাহাঙ্গীরপুর' নাম প্রাপ্ত হইবে এবং উহার চৌধুরাই ও কানুনগুইও ভবানন্দে সমর্পিত হইল ও এই সমর্পণ বাদশাহের অনুমোদন লাভ করিল। সুবাদার কুতবউদ্দিন আদেশ পাইলেন, জাহাঙ্গীরপুরের আয় যদি খালসা-বিভাগে লওয়ার উপযুক্ত হয় তবে উহা খালসা-বিভাগে যাইবে, নচেৎ উহা জাগীরদারের বেতন-স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।

পুরাতন তিন মহালের নাম বাগোয়ান, মজারি, নদীয়া। নূতন মহালের নাম জাহাঙ্গীরপুর ওরফে মহদপুর।

প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করিবার পুরস্কার-স্বরূপ ভবানন্দ মানসিংহের নিকট হইতে এই সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন কিনা, উপরের সংক্ষিপ্তসার হইতে ঐতিহাসিকগণ এখন তাহা বিচার করিতে পারিবেন।

বস্তুতঃ, এই আমলের ইতিহাসের মালমশলা যাহা পাওয়া যায় তাহা যথাসম্ভব ঘাঁটিয়া যশোহর-রাজ্য সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই যে পাঠানরাজের বিশ্বাস-হননের পুরস্কার-স্বরূপ শ্রীহরি যশোর-রাজ্য মোগলের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য চিরদিন মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতার চেষ্টা, স্বাধীনতা-সমর ইত্যাদি নিছক মিথ্যা কথা। স্বাধীনতার জন্য লড়িয়াছিলেন কতলু খাঁ, ঈশা খাঁ, মাসুম খাঁ কাবুলী, ঈশা খাঁর পুত্রগণ, ওসমান খাঁ, এবং হিন্দু ভূঞার মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায়।

জবরদস্ত সুবাদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় আসিয়া প্রবলপ্রতাপে ভূঞা দমন আরম্ভ করিলে প্রতাপ তাহাকে যথোচিত সাহায্য না করায় ইসলাম খাঁ প্রতাপের দমনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। আত্মরক্ষার্থ অবশেষে প্রতাপ মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধের ফলেই তাঁহার পতন।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

মাতৃঋণ

শ্রীসীতা দেবী

১০

জ্ঞানদা রোগশয্যা হইতে উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর সারিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আজ এটা, কাল সেটা লাগিয়াই আছে। খাদ্যে রুচি নাই, ঘুম হয় না, সারাদিন একটা অস্বস্তি লাগিয়াই থাকে। ডাক্তার তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে বলিয়াছেন, কিন্তু চোখের উপর কাজকর্ম্মে ত্রুটি অবহেলা দেখিলে চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী জ্ঞানদা নন। বকাবকি চেঁচামেচি লাগিয়াই থাকে। কয়েক দিন মাত্র শুইয়াছিলেন, ইহারই ভিতর চাকরবাকর এমন অসম্ভব বেয়াড়া হইয়া উঠিয়াছে যে, কিছুতেই আর তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা যাইতেছে না। বাড়ি-ঘরদোর হইয়াছে যেন ভূতের বাথান। এটা অবশ্য জ্ঞানদা ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিত না। যামিনী এবং যামিনীর বাবা, দু-জনের উপরেই জ্ঞানদার বিরক্তির সীমা ছিল না, ক'টা দিন দেখিয়া-শুনিয়া সংসারটা চালাইবার যোগ্যতাও কি ইহাদের নাই?

সেদিন সকালে উঠিয়াই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গিয়াছিল। জ্ঞানদা চা খাওয়া শেষ করিয়া ড্রয়িং-রুমে আসিয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল, পিয়ানোর পিছনে ছেঁড়া কাগজের মত কি সব দেখা যাইতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া তদারক করিতে গেলেন। ছেঁড়া কাগজই ত বটে, তাহার সঙ্গে আরও কত জঞ্জাল, তাহার ঠিকঠিকানা নাই। শুধু পিয়ানোর পিছনে নয়, চেয়ার সোফা সবগুলির নীচেই নোংরা, ভাল করিয়া ঝাঁট দেওয়া ও মোছা হয় নাই। এই ঘরখানি জ্ঞানদার অত্যন্ত গর্ব্বের জিনিষ ছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "সাহেব বাড়ির চেয়ে আমার বাড়ি একচুল কম নয়। কই এ ঘরখানাতে এক কণা ময়লা বা ধুলো তোমরা দেখাও দেখি?" সেই ঘরের এই অবস্থা? রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল।

ছোট্টুর ডাক পড়িল। গৃহিণীর বকুনি ও ছোট্টুর আত্মসমর্থনের চেষ্টার শব্দে বাড়ির যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিয়া জুটিল। যামিনীর কিছু বলিতে সাহস হইল না, তাহা হইলে বকুনিটা এখনই তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। মিহিরের কোনো অবস্থায় চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব, সে বলিল, "যত দোষ ছোট্টুর, কেউই ত কিছু কাজ করে না, খালি ওকে বকৃছ কেন? তোমার অসুখের সময় যা রান্না হ'ত তা যদি দেখতে!"

জ্ঞানদা কিছু বলিবার আগেই পাচক ভজহরি বলিয়া উঠিল, "কেন খোকাবাবু, কি খারাপ রান্না হয়েছিল? এই ত দিদিমণি রয়েছেন, বলুন না?"

জ্ঞানদা তাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমায় আগে থেকে সাফাই গাইবার জন্যে কে ডেকেছে? তুমি যাও এখান থেকে। তোমরা যে কে কত কাজের তা আমার জানা আছে, একবার আমি পিছন ফিরলেই হয়।" বকুনির স্রোত আরও বহুক্ষণ একটানা চলিত, কিন্তু গৃহিণী হাঁপাইয়া গেলেন। রক্তবর্ণ মুখে সোফায় বসিয়া খালি রাগে আপন মনে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

নৃপেন্দ্রবাবু চশমাজোড়া কপালের উপর ঠেলিয়া তুলিয়া, আপিস-ঘর হইতে ড্রয়িং-রুমে আসিয়া ঢুকিলেন। স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই রকম কাণ্ড যদি কর, ত কালকেই আবার পড়বে। এর নাম বিশ্রাম করা?"

জ্ঞানদা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার বাজে কথা রাখ দিকিন্। ঘর-সংসার সব চুলোয় যাক, আর আমি বসে বসে খালি বিশ্রাম করি। তোমরা যদি মানুষের মত হ'তে, তাহ'লে আমায় এই শরীরে এত চেঁচাতেই বা হবে কেন?"

কর্ত্তা বলিলেন, "আচ্ছা তা হলামই না হয় আমরা অমানুষ। তাই ব'লে দুচার দিন সবুর কি করা যায় না? এখন চেঁচিয়ে-মেচিয়ে আবার যদি পড়, তাহ'লে তুমি

আর উঠবে মনে করেছ? ডাক্তাররা ত উপন্যাস শোনাতে আসে না, তারা সত্যি কথাই বলে। তারপর? চিরদিনের মত ঘরকন্না অচল হওয়ার চেয়ে দুদিন যদি খারাপ ভাবেই চলে তাতে কি এমন ক্ষতি?"

গৃহিণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিলেন, "তাহ'লে আমাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেল বাপু। চোখের উপর এই সব অনাছিষ্টি কাণ্ড দেখে আমি কিছুতেই চুপ ক'রে থাকতে পারব না। তার চেয়ে আমার দূরে থাকাই ভাল।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা বেশ। চেঞ্জে যেতে ত তোমায় ডাক্তার বলছেনই, তারই ব্যবস্থা কর না হয়।"

জ্ঞানদা চটিয়া বলিলেন, "ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে! এর পর মরলে পরে, বইবার খাটটিসুদ্ধ আগে কিনে দিয়ে যেতে বলবে। গায়ে পড়ে সব কাজ নিজে সর্ব্বদা করেছি কি না, তাই এখন এই দশা।"

যামিনী আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গেল। তাহার মনটা ছিল আশ্চর্য্য নরম এবং ভাবপ্রবণ। অন্য দুইজন মানুষকে ঝগড়া করিতে দেখিলেও তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িত। বিবাদ-বিসম্বাদ, কলহ, সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না।

কর্ত্তা বলিলেন, "না গো না, তোমায় খাট-কুশি কিছু আমি কিনতে বলছি না। কোথায় যাবে সেইটাই বল, বাকী ব্যবস্থা আমিই করব। অন্যের পছন্দে তোমার কোনো কাজ ত হয় না, তা তোমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে উপায় কি? আমি হয়ত এক জায়গায় সব ঠিক করলাম, তারপর তুমি বললে সেখানে তুমি কিছুতেই যাবে না। তার চেয়ে গোড়ার থেকে সব সোজাসুজি হওয়া ভাল।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "এই দারুণ শীতে কোথায় বা যাব? এখন ত আর পাহাড়ে যাওয়া যাবে না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "পাহাড় ত নয়ই। সেখানে তুমি ভালও থাকবে না। পুরী, কি ওয়াল্‌টেয়ার, এই ধরণের জায়গা হ'লে তোমার পক্ষে ভাল এখন।"

গৃহিণী তখন বলিলেন, "তুমি ত 'যাও' বলে নিশ্চিন্দি, আমি এখন হুট্‌ ক'রে যাই কোথায়? তুমি কিছু এখন ছুটি পাবে না দু-মাসের। খুকীরও পরীক্ষা আসছে, তাকেও কিছু আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। তাকে আগলাতে তোমাকে ত থাকতেই হবে। একলা আমি এই শরীরে কোথায় কার ভরসায় যাব শুনি?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা বললে কি হয়? প্রাণের বাড়া কিছু নেই, যেমন ক'রে হোক ব্যবস্থা করতে হবে। আয়া তোমার সঙ্গে গেলে সেবা-শুশ্রূষা সবই করতে পারবে, তবে দেখাশোনার জন্যে একজন লোক দরকার। দেখি ভেবে কি করা যায়?"

গৃহিণী উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ভাব যত পার, ভাবলেই ত আর মানুষ সৃষ্টি হবে না। 'টাকা দাও, টাকা দাও' করবার বেলা সাতগুষ্টি ঢের আছে, কিন্তু কাজের বেলা কেউ নেই। তা কাকেই বা বলব? আমার নিজের গুষ্টিই বা কেমন? মরলেও কেউ এসে পুঁছবে না গা," বকিতে বকিতে তিনিও উপরে উঠিয়া গেলেন।

কর্ত্তা আবার আপিস-ঘরে ফিরিয়া গেলেন। বাস্তবিকই ভাবনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। গৃহিণীকে এখানে থাকিতে দিলে বকাবকি করিয়া, এবং উপর নীচে করিয়া তিনি অবিলম্বে আবার শয্যাগ্রহণ করিবেন। কিছুতেই তাঁহাকে চাকর-শাসন হইতে নিরস্ত করা যাইবে না। কিন্তু কোথায়ই বা তাঁহাকে পাঠানো যায়? কাহার ভরসায়ই বা পাঠানো যায়? আত্মীয়-স্বজন দু-চার জন এদিক-ওদিক আছে বটে, কিন্তু কাহারও সঙ্গে জ্ঞানদার বনিবনাও নাই। অনুরোধ করিলে তাহারা অস্বীকার করিতে পারিবে না, কারণ সকলেই নৃপেন্দ্রবাবুর কাছে অনেক উপকার পাইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানদাই সে-সব জায়গায় স্বস্তিতে থাকিতে পারিবেন না, আর তাঁহার মন ভাল না থাকিলে, শরীরও কিছুতেই সারিবে না। পুরী জায়গাটা ভাল, সেখানে বাড়ি ভাড়া করিয়া, ঝি-চাকর সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে কি রাখা যায় না? কিন্তু আত্মীয় একজন কেহ সঙ্গে থাকা দরকার। হঠাৎ অসুখ-বিসুখ হইয়া পড়িলে ঝি-চাকরে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে, সাম্‌লাইতে পারিবে না। কাহাকে পাঠানো যায়? তিনি নিজে ত ছুটিই পাইবেন না। আর পাইলেও

যাইবার উপায় নাই। পুত্রকন্যাকে কাহার জিম্মায় রাখিয়া যাইবেন?

আপিসের সময় হইয়া আসাতে, নৃপেন্দ্রবাবু ভাবনা রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন। জ্ঞানদা নিজে কিন্তু ভাবিতে সুরু করিয়াছিলেন। সত্যই তাঁহার এখন সারিয়া উঠা দরকার, কিন্তু এখানে থাকিলে সারা কঠিন। না-হয় সংসারে কিছুদিনের জন্য বিশৃঙ্খলাই হইবে। কিন্তু এখন যদি জ্ঞানদার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কি কাণ্ড যে হইবে, তাহা ভাবিতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এক ত মরিবার ইচ্ছা কোনো মানুষেরই পক্ষে স্বাভাবিক নয়, তাহার উপর জ্ঞানদার বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছাটা একটু অতিরিক্ত রকম প্রবল ছিল। বাল্য ও যৌবনে তাঁহার জীবনে সংগ্রামের অন্ত ছিল না। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এখন তিনি সে-সব কাটাইয়া উঠিয়াছেন। ঠিক যে-সময় তাঁহার মনের মত করিয়া সব গুছাইয়া আনিয়াছেন, পরিশ্রমের অবসানে যখন শান্তি ও বিশ্রাম এবং ফল উপভোগের সময়, তখনই পরপারের ডাক আসিয়া পৌঁছান অতিশয় হৃদয়বিদারক ব্যাপার। তাঁহার সাজান সংসার এক নিমেষে ভাঙিয়া পড়িবে, কর্ত্তা কিছুই সামলাইতে পারিবেন না, যা তাঁহার অসংসারী মন। ছেলেমেয়ের কি হইবে, তাহারই বা ঠিকানা কি? মেয়েটাকে হয়ত কোন হা-ঘরের হাতে তুলিয়া দিবেন, চিরজীবন নাকের জলে চোখের জলে তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে। ছেলে পাড়ার যত ছোটলোকের সঙ্গে টো টো করিয়া ঘুরিবে, শিক্ষা সহবৎ কিছুই তাহার হইবে না। বিশ বৎসরের একান্ত চেষ্টায় যাহা তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, দুই দিনে সব ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। স্বামীর হতভাগা আত্মীয়গুলা আসিয়া সব জুড়িয়া বসিবে, কল্পনার চক্ষে সে-দৃশ্য দেখিয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

পুরীতে যাওয়াই তিনি স্থির করিলেন। সঙ্গে আয়া এবং একজন চাকর লইবেন। অভিভাবকত্ব করিবার লোকের অবশ্য তাঁহার কিছু প্রয়োজন নাই, তবে পুরুষ মানুষ একজন সঙ্গে থাকা দরকার। তিনি নিজে অসুস্থ, না হইলে তাও প্রয়োজন হইত না। অনেক ভাবিয়া ঠিক করিলেন, পরেশকে চিঠি লিখিয়া আনাইবেন, এবং সঙ্গে করিয়া পুরী লইয়া যাইবেন। পরেশ নৃপেন্দ্রবাবুর অতি দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয়। পিতামাতা নাই, অথচ পড়িবার সখ তাহার অত্যন্ত, সেইজন্য অনেক কষ্টে বছর-দুই আগে সে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও, জ্ঞানদা বাধ্য হইয়া তাহাকে বাড়িতে স্থান দিয়াছিলেন।

কিন্তু পরেশ প্রথম হইতেই যামিনীর এমন ভক্ত হইয়া উঠিল যে, জ্ঞানদা বেশী দিন তাহাকে বাড়িতে রাখিতে সাহস করিলেন না। নানা ছুতা করিয়া মফঃস্বলের এক কলেজে চালান করিয়া দিলেন। সেইখানেই পড়াশুনা করিতেছিল, খরচ অবশ্য বেশীর ভাগ নৃপেন্দ্রবাবুই দিতেন। কিন্তু পূজার সময় দেশে গিয়া পরেশ টাইফয়েড ফিভারে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। অনেক কষ্টে প্রাণে বাঁচিয়াছে বটে, কিন্তু কলেজে আবার যোগ দিবার মত স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় নাই। বাড়িতেই এখন বেকার অবস্থায় বসিয়া আছে। পুরীতে গেলে তাহার নিজেরও যথেষ্ট উপকার হইবে, সুতরাং যাইতে আপত্তি সে কখনও করিবে না। মাস-দুই থাকিলেই হইবে, তাহার বেশী থাকিবার সম্ভবতঃ প্রয়োজন হইবে না।

কর্ত্তা আপিসে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে কিছু এই ব্যবস্থার বিষয়ে বলা গেল না। গৃহিণী যামিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে সবে স্নান সারিয়া চুল আঁচড়াইতেছিল, মায়ের ডাকে চিরুণী হাতে করিয়াই তাঁহার ঘরে হাজির হইল। জ্ঞানদা তখন খাটে বসিয়া খোঁপা খুলিতেছিলেন, স্নান করিতে গেলেই হয়। মেয়েকে দেখিয়া বলিলেন, "তোর চুল উঠে যাচ্ছে নাকি খুকি? কেমন যেন কম কম দেখাচ্ছে।"

যামিনী বলিল, "না, চুল ওঠেনি, আজ একটু বেশী ক'রে তেল দিয়েছিলাম, তাই ও রকম দেখাচ্ছে। আমাকে ডাকছিলে কেন মা?"

মা বলিলেন, "আমি মনে করছি আসচে রবিবারেই পুরী যাব। শরীর ত এখানে কিছুতেই ভাল থাকছে না। তোদের কাউকে নিয়ে যাওয়া ত সম্ভব হবে না, পড়াশুনো রয়েছে।"

যামিনী একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"তুমি কি একলাই যাবে নাকি মা? তোমাকে দেখবে কে?"

গৃহিণী বলিলেন, "একেবারে একলা কি আর যাব? আয়া সঙ্গে যাবে, আর একজন চাকরও যাবে। পরেশকে চিঠি লিখে আনিয়ে নেব ভাবছি, উপরি উপরি দেখাশোনা-গুলো করতে পারবে।"

পরেশের নামে যামিনীর গালটা একটু লাল হইয়া উঠিল। স্পষ্ট করিয়া কোনো কথা তাহাকে বলা হয় নাই, তবু পরেশের বিদায় হইবার কারণ সে বুঝিতেই পারিয়াছিল। কিন্তু পরেশের কথা বেশী মনে করিবার মত তাহার তখন অবস্থা ছিল না। মা চলিয়া যাইবেন শুনিয়াই তাহার মন ভার হইয়া উঠিতেছিল। যৌবনে পদার্পণ করিয়াও এখনও সে মায়ের প্রতি শিশুরই মত নির্ভরপরায়ণা ছিল। বছর-দুই আগে পর্য্যন্ত সে নিজে গুছাইয়া কাপড় পরিতে বা চুল বাঁধিতে পারিত না। কোথাও যাইতে হইলে মা তাহাকে নিজের হাতে সাজাইয়া দিতেন। এখনও বাড়ির বাহির হইতে হইলে, কি কাপড় জামা পরিবে, তাহা মা স্থির করিয়া দেন, না হইলে যামিনী একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে। তাহার বয়সই বাড়িয়াছিল, কিন্তু জগৎসংসারকে সে এখনও চিনিতে বুঝিতে শিখে নাই। জ্ঞানদার ভিতর দিয়াই সংসারের সঙ্গে তাহার যত লেনদেন চলিত।

এমন মেয়ের পক্ষে মা চলিয়া যাওয়ার সংবাদ কিছুই সুসংবাদ নয়। যামিনী কি বলিবে কিছু ভাবিয়া পাইল না, খালি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অনেক দেরি হবে মা?"

জ্ঞানদা বলিলেন, অনেক দেরি করবার জো কি আমার? মাস দুই নিতান্ত না থাকলে নয়, তাই থেকে আসব। পড়াশুনোর যেন কোনো ত্রুটি না হয়। বাড়ির কাজ না-হয় একটু বিশৃঙ্খলই হবে, তার আর উপায় কি? আর দেখ, খুব বুঝেসুঝে সাবধান হয়ে চলবে। কোনোমতে কোনো কথা না ওঠে। যা ত আমাদের সমাজ, একখানা হ'লে শতখানা ক'রে গুজব রটিয়ে বেড়াবে। অবিবাহিত মেয়ের নামে গুজব ওঠা ভারি খারাপ।"

যামিনী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমি একলা একলা কোথায়ই বা যাব মা যে আমার নামে গুজব রটবে? থাকব ত ঘরের কোণে বসে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তাতেই কি আর আটকায়? বাড়িতেও ত লোক আসতে পারে? এই ত আমার অসুখের সময় খোকার মাষ্টার একটু উপরে যাওয়া-আসা করেছে, তুইও তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেছিস্ দরকারে পড়ে, অমনি সেদিন মিসেস্ ঘোষাল একেবারে কত কথা পেড়ে বসল। ছেলেটি কে? কোথায় থাকে, অবস্থা কেমন, বিয়ে হয়েছে নাকি, হেন তেন কত কি! আমার কাছে অবিশ্যি সুবিধে হ'ল না, তা তুই ত যা মেয়ে তোকে কেউ ও-রকম কথা বললে কেঁদেই ফেল্‌বি।"

যামিনী এমনিতেই কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "কি বিচ্ছিরি, ছি ছি! আমি প্রতাপবাবুর সঙ্গে মাত্র দু-তিনবার কথা বলেছি, নিতান্ত দায়ে পড়ে। তাইতেই অমনি কিনা—" আর তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না, নাক-চোখ মুছিতে মুছিতে সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু মায়ের কথাটা ভুলিতে পারিল না। এই রকম কথাও তাহা হইলে উঠিয়াছে? প্রতাপবাবু বেচারা নিতান্ত ভালমানুষ, তাঁহার মাথায় কখনই এ সব বাজে খেয়াল আসে নাই? কিন্তু কি জানি?

যামিনীর বাস্তব সংসারের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলেও কাব্য ও উপন্যাস জগতের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। প্রেমের মহিমাকে সে বিশ্বব্যাপী এবং জীবনের সর্ব্বোত্তম সম্পদ বলিয়া মনে করিত। যে-কল্পলোকে এই নিঃসঙ্গ তরুণীর চিন্তা ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহা প্রেমের আলোকে রঙীন, প্রেমের সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত। সেখানে ধনী-দরিদ্রের ভেদ নাই, সমাজের গণ্ডী নাই, আত্মীয়স্বজনের বাধা নাই। ভালবাসার পথই সেখানকার একমাত্র পথ।

গল্প করিতে গিয়া জ্ঞানদা যে কি অনর্থের সূত্রপাত করিলেন, তাহা তিনি নিজেও জানিলেন না। যামিনীর মনে যে-বীজ তিনি রোপণ করিলেন, সে তাহাতে নিরন্তর বারি সিঞ্চন করিয়া সেটিকে সজীব ও সতেজ রাখিয়া দিল।

১১

পরেশ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জ্ঞানদা ঠিক অনুমান করিয়াছিলেন। নৃপেন্দ্রবাবুর টেলিগ্রাফ পাইবামাত্র সে আসিয়া উপস্থিত হইল, একদিনও আর বিলম্ব করিল না।

আজ রবিবার। আজই সন্ধ্যার ট্রেনে জ্ঞানদা যাত্রা করিবেন। সারাদিন তিনি ব্যস্ত, আয়ার সাহায্যে জিনিষ-পত্র সব গুছাইয়া রাখিতেছেন, কি সঙ্গে লইবেন, কি রাখিয়া যাইবেন তাহা পৃথক করিতেছেন। মিহির সব জিনিষে হাত দিয়া তাড়া খাইতেছে, যামিনী সজল চক্ষে ঘর-বাহির করিতেছে। পরেশ এক-একবার দরজার কাছে আসিয়া উঁকি মারিয়া যাইতেছে। তাহার খুব ইচ্ছা ভিতরে আসে, কিন্তু অবাধ প্রবেশাধিকার তাহার নাই, তাহা সে ভাল করিয়াই জানে।

বিকাল হইয়া আসিল। আজ চা খাওয়াটা তাড়াতাড়ি করিয়া চুকিয়া গেল। জ্ঞানদা সঙ্গে ট্রেনে খাইবার জন্য যে-সব জিনিষ তৈয়ারী করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা চট্‌পট্ শেষ করিবার জন্য পাচককে তাড়া দিতে লাগিলেন। যামিনী মায়ের সঙ্গে ষ্টেশনে যাইবে, সে চুল বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইতে গেল।

প্রতাপ জ্ঞানদার যাত্রার কথা আগেই শুনিয়াছিল। আজ মিহির যে বেড়াইতে যাইবে না তাহা সে উত্তমরূপেই জানিত, তবু তাহাকে যখন আসিতে নিষেধ করা হয় নাই, তখন সে চারটার সময় নিয়ম-মত আসিয়া উপস্থিত হইল। মিহির জুতা মোজা আঁটিয়া নীচেই লাফাইয়া বেড়াইতেছিল। প্রতাপকে দেখিয়া বলিল, "আজ আর বেড়াতে যাব না স্যর, আজ মাকে তুলে দিতে ষ্টেশনে যাচ্ছি।"

প্রতাপ বলিল, "তাই নাকি? তোমার মা আজই যাচ্ছেন?"

মিহির বলিল, "হ্যাঁ, পুরী যাচ্ছেন।" যাত্রার আয়োজন চারিদিকেই দেখা যাইতেছিল। বাক্স বিছানা প্রভৃতি বাঁধাছাঁদা হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল, বাড়ির গাড়ীখানাও তৈরি হইয়া গেটের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল।

প্রতাপ কি করিবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। মিহির তাহার সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়া বলিল, "আপনিও চলুন না ষ্টেশনে স্যর?"

প্রতাপ মৌখিক আপত্তি দেখাইয়া বলিল, "আমার কি যাবার দরকার হবে?"

মিহির বলিল, "দরকার আবার কি, আমারও ত কিছু দরকার নেই। এমনি যাচ্ছি মজা দেখতে।"

অসুস্থা মাতা চলিয়া যাওয়ার ভিতর যে মজাটা কোন্ খানে তাহা প্রতাপ বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহা লইয়া বেশী মাথা ঘামাইবার সময় তাহার হইল না। গৃহিণী কন্যা স্বামী সহ নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতাপ যামিনীর মুখের দিকে একবার অন্যের অগোচরে চাহিয়া দেখিল। মুখখানি বড় করুণ দেখাইতেছে, চোখ দুটি ঈষৎ রক্তিম, যেন অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছে।

গৃহিণী নামিয়াই বিরক্তভাবে বলিলেন, "ব্যস, এত ক'রে যে বললাম, জিনিষপত্র নিয়ে যাবার জন্যে একখানা ঠিকে গাড়ী আনিয়ে রাখতে, তা বুঝি আর কিছুতেই পারলে না? জিনিষগুলো কি আমি মাথায় ক'রে নিয়ে যাব?"

ছোট্টু তৎক্ষণাৎ গাড়ী ডাকিতে ছুটিল। কর্ত্তা বলিলেন, "এই ক'টা ত জিনিষ, আমাদের গাড়ীর মাথায়ই ত যেতে পারত?"

জ্ঞানদা চটিয়া বলিলেন, "তা আর না? এতগুলো মানুষ, তার উপর একরাশ লগেজ, যা চমৎকার দেখাবে! আর পাঁচজন মানুষ বড় বড়, একখানা গাড়ীতে ধরে নাকি?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা বেশ, লগেজ তোমার ঠিকা গাড়ীতেই যাক্ না হয়। কিন্তু সময় আর বেশী নেই তা ব'লে দিচ্ছি। শেষে ট্রেন ফেল করবে।"

জ্ঞানদা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বার্থ রিসার্ভ করা হইয়া গিয়াছে, এখন ট্রেন ধরিতে না পারিলে চলে কখনও? এককাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ হইবে যে? তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমরা বেরিয়ে পড়ি, জিনিষ না-হয় পরে যাবে। আমার ছোট ব্যাগটা শুধু সঙ্গে দাও।"

কর্ত্তা বলিলেন, "জিনিষপত্র ফেলে যে যাচ্ছ, ধর

ঠিকে গাড়ী ঠিক সময় পৌঁছল না। তখন বিদেশে বিভূঁয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়বে যে!"

জ্ঞানদা গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "অত ভাবতে গেলে চলে না। জিনিষ নাই যদি পৌঁছয়, কাল ভজহরিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। ও ত পুরীরই মানুষ। একদিন আমি কোনমতে চালিয়ে নেব। আয়া জলদি আও, খুকি আয়। ও গো, তুমি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওঠ না গাড়ীতে। পরেশ, তুমি না হয় কোচবাক্সে বস, আর ত ভিতরে জায়গা নেই।"

তাঁহার তাড়ার চোটে সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। কর্ত্তা উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবাই চললাম ত, জিনিষপত্র নিয়ে আসবে কে?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "কেন, খোকা ত রয়েছে, এত বড় ছেলে সে আর জিনিষগুলোকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে না? ভজহরিও না হয় সঙ্গে যাবে।"

মিহির চটিয়া আগুন হইয়াছিল। সবাই চলিল বাড়ির গাড়ী চড়িয়া, যেন লাটসাহেব। আর সে কি বাজার সরকার যে একগাদা জিনিষ ঘাড়ে করিয়া মুটের মত যাইবে। "আমি ষ্টেশনে যাচ্ছিই না মোটে," বলিয়া একলম্ফে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

জ্ঞানদা মহা বিপদে পড়িলেন, এদিকে ট্রেনের সময় হইয়া যায়। গাড়ী হইতে নামিয়া অবাধ্য পুত্রকে শাসন করিবার মতও সময় নাই। কর্ত্তা তাড়াতাড়ি প্রতাপকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রতাপবাবু, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে আসেন ও-গুলো নিয়ে তাহ'লে বড় ভাল হয়। আপনার কষ্ট হবে হয়ত, কিন্তু এখন আর অন্য ব্যবস্থা করবার মোটে সময় নেই।"

প্রতাপ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। আপনারা বেরিয়ে পড়ুন, সত্যিই আর দেরি করা উচিত নয়।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যামিনী একবার প্রতাপের দিকে তাকাইয়া দেখিল। সেই দৃষ্টিটুকু প্রতাপ বহুমূল্য সম্পদের মত হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়া রাখিল। পরের জীবনে কোনোদিন এই দৃষ্টিটিকে সে ভুলিতে পারে নাই। আজই যেন প্রথম যামিনী তাহাকে প্রতাপরূপে দেখিল, এতদিন সে মিহিরের মাষ্টার ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

ছোট্টুও ঠিকা গাড়ী লইয়া মিনিট তিন-চার পরেই ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষগুলি গাড়ীর উপরে তুলিয়া দিয়া, প্রতাপ একবার মিহিরের সন্ধানে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই। আর দেরি করা অসম্ভব, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া জোরে গাড়ী হাঁকাইতে বলিয়া দিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিল সে একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে। জ্ঞানদা গাড়ীতে উঠিয়া উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, কখন তাঁহার জিনিষ আসে। কর্ত্তা এবং পরেশ ক্রমাগত প্লাটফর্ম্মে ছুটাছুটি করিতেছেন, যামিনী একটা লোহার বেঞ্চে বসিয়া আছে। চোখে জল আসিয়া পড়িতেছে, অনেক কষ্টে সেটাকে দমন করিয়া আছে।

প্রতাপকে দেখিয়া গৃহিণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িতেছে, সবাই মিলিয়া হুড়াহুড়ি করিয়া সব গাড়ীতে উঠান হইতে-না-হইতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শেষ বাক্সটা প্রতাপ এবং কুলীরা জানলা দিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিল। গাড়ী তখন জোরে চলিতে সুরু করিয়াছে।

নৃপেন্দ্রবাবু যামিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চল মা, এবার যাওয়া যাক্।"

যামিনী একটি ছোট পাত্‌লা রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেছিল। সে বলিল, "চল বাবা।"

প্রতাপও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "মিহির কি আজকে আর যাবে বেড়াতে? না আমি বাড়ি ফিরে যাব?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "চলুন ত বাড়ি অবধি, দেখা যাক। ছেলেটা বড় অবিবেচক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

প্রতাপ অগত্যা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে কোথাকার মানুষ কোথায় আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার ঠিকানা নাই। সে ইঁহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু এখন প্রায় আত্মীয়ের অধিকার পাইতে বসিয়াছে। ইহারও অধিক কিছু তাহার ভাগ্যে কি জুটিবে? সে

একবার যামিনীর দিকে চাহিল, একবার নিজের শ্রীহীন দেহ, দীন পরিচ্ছদের দিকে চাহিল। না, এ সব দুরাশার স্বপ্ন দেখিয়া সে নিজে নিজের অনিষ্ট করিতেছে।

গাড়ী আসিয়া বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। যামিনী সর্ব্বাগ্রে নামিয়া উপরে চলিয়া গেল। একবার চোখের জলকে মুক্তি না দিলেই নয়। প্রতাপ ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার পিছন পিছন নামিয়া পড়িল। এ কি অচ্ছেদ্য জালে সে নিজেকে জড়াইতেছে। ইহাই কি শেষে তাহার গলার ফাঁসী হইয়া দাঁড়াইবে?

নৃপেন্দ্রবাবুও উপরে চলিয়া গেলেন। মিহিরকে কাছাকাছি কোথাও না দেখিয়া প্রতাপ আপিস-ঘরে ঢুকিয়া বসিল। ঘরটি এমন শূন্য যে, কিছুর দিকে চাহিয়া দু-দণ্ড অন্যমনস্ক হইবার উপায়ও এখানে নাই।

কর্ত্তা খানিক বাদে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "মিহিরকে ত কোথাও দেখছি না। বকুনি খাবার ভয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসে আছে বোধ হয়। আপনি আর কেন শুধু শুধু বসে থাকবেন, এমনিতেই ঘণ্টা-দেড়েক আপনার এখানে কেটে গেছে।"

প্রতাপ উঠিয়া পড়িল। হায় রে, এমন অবস্থা তাহার ঘটিয়াছে যে, সকল মানুষের কাম্য যে ছুটি তাহাও প্রতাপের কাছে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দিনটা তাহার যেন আর কাটিতেই চায় না। এই গৃহখানিতে যতটুকু সময়ের জন্য সে স্থান পায় ততক্ষণই তাহার শান্তি।

বাড়িতে ফিরিতে তাহার তখনই ইচ্ছা করিল না। সেখানে বৃদ্ধা পিসীমার বকুনি শোনা ছাড়া তাহার চিত্ত-বিনোদনের আর অন্য উপায় নাই। রাজুর আজ সারাদিন দেখাই পাওয়া যাইবে না। গভীর বেলা একেবারে পড়িয়া না-যাওয়া পর্য্যন্ত ঘরে খিল দিয়া ঘুমাইবে। সুতরাং প্রতাপ গিয়া কি করিবে?

অন্যমনস্কভাবে পথে পথেই সে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। বন্ধুবান্ধব এমন কেহ তাহার নাই, যাহার নিকটে গিয়া সে দু-দণ্ড বসিতে পারে। পরিচিত অনেক ব্যক্তি তাহার আছে বটে, কিন্তু কাহারও কাছে গিয়া সে আরাম পায় না। নিজের সমকক্ষ বলিয়া তাহাকে কেহ মনে করে না, সেও কাহারও সহিত মন খুলিয়া কথা বলিতে পারে না। মেসের বাড়ি একবার যাইবে ভাবিল, সেখানের ঋণ সে শোধ করিয়াছে সুতরাং সেখানে যাইতে সঙ্কোচ হইবার কোনো কারণ আর তাহার নাই। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তায় সে-ইচ্ছা সে পরিহার করিল। রবিবার রাত্রে সেখানে প্রায়ই ভোজ থাকে। সে এখন গেলে সকলে তাহাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িবে না, কিন্তু মনে মনে ইহাই ভাবিবে যে খাবারের লোভেই প্রতাপ দিনক্ষণ দেখিয়া অমন সময় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

একটা মাঠে গাছতলায় পা ছড়াইয়া কিছুক্ষণ সে বসিয়া রহিল। শীতের মাঠ শ্রীহীন, শুষ্ক। তৃণের হরিৎ বর্ণটুকুও জ্বলিয়া গিয়াছে। তবু কলিকাতার ইষ্টকপঞ্জরে বন্দীপ্রাণ তাহার খানিকটা মুক্ত স্থান দেখিয়া যেন আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। বসিয়া বসিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই সে কখন যামিনীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেল।

শীতের কুয়াসা ক্রমে পথ-ঘাট আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে দেখিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

তাহার গায়ের র‍্যাপারখানা শতচ্ছিন্ন বলিয়া মিহিরকে পড়াইতে যাইবার সময় সেখানা সে সঙ্গে লইয়া যাইত না। এখন শীতের হাওয়া তাহার বক্ষপঞ্জরে শিহরণ জাগাইয়া তুলিল। উঠিয়া পড়িয়া সে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

যামিনী ষ্টেশন হইতে ফিরিয়াই ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল গড়াইতেছিল। মা তাহাকে যেন একেবারে অসহায় করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন। এতদিনকার জীবনে কোনও একটা দিন সে মাকে ছাড়িয়া থাকে নাই। কি করিয়া সে সংসার চালাইবে, আবার নিজের পড়াশুনা করিবে, লোক-লৌকিকতা বজায় রাখিবে, তাহা ভাবিয়াই সে আকুল হইয়া উঠিল।

প্রতাপের কথা কয়েকবারই তাহার মনে হইল। ভারি ভদ্র মানুষটি, পরের সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কত দিনেরই বা এ বাড়ির সঙ্গে তাহার পরিচয়, তবু কত সাহায্যই তাহাকে দিয়া পাওয়া গেল। কিন্তু সকলের জন্যই কি সে এতটা করে, না এবাড়ির লোকের

যত বিশেষ ভাবে করিবার তাহার কিছু কারণ আছে ? আছে হয়ত। যামিনীর গালের কাছটা একলা ঘরে বসিয়াই খানিকটা রাঙা হইয়া উঠিল। একটা মধুর কল্পনার আবেশ তাহাকে পাইয়া বসিল। উপন্যাসে কাব্যে যত প্রেমের রঙীন চিত্র সে অঙ্কিত দেখিয়াছে, সবগুলি নিজের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মনে নূতন রূপে উদিত হইতে লাগিল। সে ছবিগুলিতে তাহার পাশে কে? সে কি প্রতাপ? হইলেও হইতে পারে। এখন তাহার কল্পলোকের প্রেমিকের মূর্ত্তি যামিনীর মনে সুপরিস্ফুট হয় নাই। ক্রমশঃ

পুনরাগমনায়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বছরের ফুল বাসি হয়ে গেল, চৈত্র-পাপড়ি পড়িল খসি',
রিক্ত-শস্য শূন্য ধরণী সন্ধ্যা-হাওয়ায় উঠিল শ্বসি';
মহাকালগলে পদ্মবীজের মাল্য-গুটিকা জপের শেষে
মুদ্রিত-আঁখি রুদ্র তাহার পূজার অর্ঘ্য লভিল হেসে।

যে ফুল কুড়ায়ে সাজায়েছি ঘর, যে ফুলে যতনে ভরেছি ডালা,
যে ফুল তুলিয়া আপন খেয়ালে মনের মতন গেঁথেছি মালা,—
সে ফুল ঝরেছে; সূত্রটি তারি গন্ধমাখা যা' দুলিছে গলে,
বাসনার তীরে বসি' আজি তারি তর্পণ করি নয়নজলে।

কত সুখসাধ কত অপরাধ কত আশা কত মধুর স্মৃতি
ডোরের মাঝারে বন্ধন হয়ে বক্ষে কেবলি বাজিছে নিতি।
যত-না পরশ যত-না গন্ধ যত রূপ যত বর্ণ ফুলে—
সবি কি স্বপ্ন, সকলি কি মোহ—বন্ধনই শুধু সবার মূলে?

নয় নয়, ওগো নয় তাহা নয়, বন্ধন যাহা মুক্তি তাই,
বৈশাখী বীজে শঙ্কর নিজে ফলায় তাহারি সত্যটাই।
নূতন গন্ধে ভরে যে ভুবন, নূতন বর্ণে যে ফুল ফুটে,
নবীন হরষে প্রাণের পরশে মাল্যে ফিরি' তা ভরিয়া উঠে।

পিঙ্গল-আঁখি কালবৈশাখী যতই না হানুক ভ্রান্তিভয়,
অতীতের বল—হয় তা সফল তারি মাঝে করি মৃত্যুজয়;
নূতনের ফুল আজি যা মুকুল—উঠে তা ফুটিয়া মেলিয়া দল,
অর্ঘ্যের সাজি ভরে সে আবার লভি বেদনার অশ্রুজল।

বছরের ফুল বাসি হয় যাহা, মহাকালগলে লভিয়া ঠাঁই
পদ্মমালার গুটিকারই মত আবার ফিরিয়া আসিবে তাই!
আশা-নিরাশার হরষে-ব্যথায় ফুটে যার লীলা কমলদলে
ভাল বা মন্দ দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব অর্পিনু তারি চরণতলে।

বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্‌-এ

রবীন্দ্রনাথ যে-দিন প্রথম সাহিত্য-গগনে আবির্ভূত হইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাকে ঘেরিয়া সমালোচনার জাল বোনা সুরু হইয়াছিল। আমাদের ছাত্রজীবনে সমালোচ্য বিষয়ের সংখ্যা এখনকার মত এত বেশী ছিল না। রাজনীতির স্রোত সে-দিনে মৃদুমন্থর গতিতে বহিত—অন্ততঃ ছাত্রেরা তাহাতে বড় ঝাঁপ দিতেন না। আমাদের সে-দিনে যে-সকল বিষয় লইয়া সমালোচনা চলিত, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রবাবুর কাব্য-গল্প-নাটকই ছিল প্রধান। ইহার মধ্যে প্রতিকূল সমালোচনার বহর নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা গান গাহিতে বলিলে রবিবাবুর গান গাহিতাম, অন্য গান লোকে তেমন শুনিতে চাহিত না। আবৃত্তি করিতে হইলে রবিবাবুর কবিতা নহিলে চলিত না। মাসিক পত্রে রবিবাবুর নাম নহিলে পাঠকের মন খুশী হইত না।

এই সকল সমালোচনার মধ্যে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ছিল যে, অনেকে রবিবাবুর লেখা না পড়িয়াই সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইতেন। অর্থাৎ সে সময়ে রবিবাবুর লেখার প্রতিকূল সমালোচনা করা একটা 'ফ্যাসানে' পরিণত হইয়াছিল। তাহার কারণ সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা সাহিত্য-জগতে অতুলনীয় ছিল। এখনকার মত সেই নবীন বয়সেও তাঁহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

আমি জানি না এখনও রবিবাবুর লেখা সম্বন্ধে বাঙ্গালী জনসাধারণের এরূপ বিশাল অজ্ঞতা আছে কি-না। আমেরিকা, জার্ম্মানী, জাপান, রুশিয়া, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে যাঁহার কাব্য-উপন্যাস সুপরিচিত, তাঁহার সম্বন্ধে 'জানি না' বলিতে আমাদের অভিমানে আঘাত লাগে। ইহা স্বাভাবিক। এইরূপ অজ্ঞতার একটি উদাহরণ মনে পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া বিশ্বের আসরে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন, তাহার কিছু পরে আমার একটি কবি-বন্ধুর সহিত কথা হইতেছিল। তিনি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, কাজেই তাঁহার নাম না-ই করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'রবিবাবুর কবিতা বৈষ্ণব কবিতার গন্ধে ভরপুর। তাহারই চর্ব্বিত চর্ব্বণে আজ ইয়ুরোপে তাঁহার যশের দুন্দুভি বাজিয়াছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রবিবাবুর কোন্ কবিতার কথা বলিতেছেন? ভানুসিংহের পদাবলী? সেগুলির ত তরজমা হয় নি।' তিনি বলিলেন, 'না, তাঁহার অন্য কবিতার কথা বলিতেছি। রবিবাবুর সব কবিতায় চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির অমর মুদ্রাঙ্ক রহিয়াছে।' আমি ভাবিলাম, 'হয়ত বা ঠিক!' কারণ তখন বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত আমার বেশী পরিচয় ছিল না। পরে যখন বৈষ্ণব কবিতা পড়িতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম যে বন্ধুবরের তীর লক্ষ্যের অনেক দূর দিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-কবিতায় বৈষ্ণব ভাবের ছায়া কতখানি পড়িয়াছে, তাহা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়। আমার মনে হয় যে, বিহারীলালের কবিতা ব্যতীত অন্য কোনও কবিতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, যেমন বৈষ্ণব কবিতা করিয়াছে। কবি নিজেও তাঁহার ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বলা যায় যে, বৈষ্ণব কবিতার মূলধন লইয়াই রবীন্দ্রবাবুর কারবার, তাহা হইলে একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যিক অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। তাঁহার কতকগুলি গানে ও কবিতায় বৈষ্ণব কবিতার ছায়াপাত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের নাম বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি বলিয়া চিরদিন উল্লিখিত হইবে। ভারতবর্ষ গীতি-কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব কবিতা যে গীতি-কবিতার একটি

শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে যদি বলা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী তাহা হইলে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রবাবুর ভাষায় বৈষ্ণব কবিতার অলস তরল গতি আছে, উহারই ন্যায় ছন্দ-বৈভব আছে। বৈষ্ণব কবির পরে প্রেমের উজ্জ্বল মধুর ছবি আর কেহ এমন করিয়া আঁকিতে পারেন নাই। আর একটি মনোমুগ্ধকর সাদৃশ্য এই যে, বৈষ্ণব কবিতারই মত রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে এক সোনার সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে :—

দেবতারে যাহা দিতে পারি,
তাই দিই মানবেরে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবি প্রিয়কে দেবতা করিতে চাহিবেন না, সত্য। কিন্তু মানবের প্রেম যে সেই অখণ্ড প্রেমের প্রাতিভাসিক বিকাশ, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন ? আমরা যে রবীন্দ্র-কবিতার মধ্যে—বিশেষতঃ প্রেম সম্বন্ধীয় গীতি-কবিতাগুলির মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার ছায়া ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাই না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈষ্ণব কবির প্রেমচিত্রের মধ্যে যাহা সার্ব্বভৌম বা বিশ্বজনীন (universal) তাহারই উপলব্ধি করিতে হইবে।

প্রতিভাবান লেখক বা কবির রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা পড়িলেই যেন কত পরিচিত, কত পুরাতন বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন আরও কোথায়ও পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি। নূতনত্ব সত্ত্বেও যে তাহারা অপরিচিতের মত আসিয়া মনের আঙিনায় বিপ্লব বাধাইয়া দেয় না, ইহা একটি আশ্চর্য্য অথচ উপাদেয় সত্য। এই কারণে আমরা বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যে যদি বৈষ্ণব কাব্য-প্রতিভার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই—ভাবি, তাহা হইলে তাহার অনুকূলে যথেষ্ট বলিবার আছে, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের গৌরব বাড়াইবার জন্য বা রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক মৌলিকতা খর্ব্ব করিবার জন্য যদি এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে সেরূপ চেষ্টার সমর্থন করা যায় না।

সেদিন একখানি মাসিক পত্রে দেখিলাম যে, 'শ্রীরাধাই হইতেছেন রবিবাবুর কাব্যের একমাত্র লক্ষ্য। রাধাই রবিবাবুর কাব্য-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।' একথা শুনিলে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ চমকিয়া উঠেন, তাহা দেখিতে কৌতূহল হয়। লেখক 'উর্ব্বশী' কবিতায় এই রাধা-ভাবের একটা 'য়্যাস্‌পেক্ট' দেখিয়াছেন।

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল।
* *
বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার।

ইহার মধ্যে লেখক শ্রীরাধাকে নিঃসন্দেহ রূপে আবিষ্কার করিয়াছেন। যাঁহারা এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা করিবেন, তাঁহারা যে ঐ কবিতার মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের ছায়া ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পান না, ইহা বড় বিচিত্র নহে।

কিন্তু যাঁহারা 'প্রেমের অভিষেক' নামক কবিতাটি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল প্রেমিকার ছবি দিয়া তাঁহার প্রেমের অমরাবতী সাজাইয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীরাধার নামগন্ধ নাই। আছেন শকুন্তলা, দময়ন্তী, সুভদ্রা, আর আছেন তপস্বিনী মহাশ্বেতা ও পার্ব্বতী। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব ভাবে অনুপ্রাণিত কোনও কবি রাধিকার চিত্র বাদ দিয়া প্রেমামরাবতী সাজাইবার কল্পনাও করিতে পারেন না। কেন-না, বৈষ্ণবের প্রেম-নন্দনকাননের কল্প-পারিজাত—শ্রীরাধা !

তবে বৈষ্ণব কবিদিগের অঙ্কিত চিত্রের যে মাধুর্য্য, যে 'অকথিত বাণী মূক মেদিনীর মর্ম্মের মাঝে' সদাই জাগিয়া রহিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-লুণ্ঠনকারী হৃদয়কে এড়াইবে কিরূপে ? বৈষ্ণব সাহিত্যে যাহা-কিছু সুন্দর আছে, তাহাই তিনি আত্মসাৎ করিয়া বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে অপূর্ব্ব সম্পদ দান করিয়াছেন। আমি এস্থলে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

'দেহের মিলন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন :—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।

জ্ঞানদাসের কবিতায় রাধা-হৃদয়ের ব্যাকুলতা-ভরা আবেগ বাসনা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে :—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পুতলি মোর থির নাহি বাঁধে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইহারই কতকটা অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় :—

তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।* (কড়ি ও কোমল)

রবীন্দ্রনাথ যে জ্ঞানদাসের ভাবটি ফুটাইয়া তুলিলেও অনুকরণ করেন নাই, তাহা আর একটু অগ্রসর হইলেই ধরা পড়ে।

আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

ইহা ঠিক বৈষ্ণব ভাবের অনুকূল নহে। বৈষ্ণবের প্রেম বিলয় কামনা করে না। বৈষ্ণবের মতে প্রেমিক ও প্রেমিকার, ভক্ত ও ভগবানের, উপাস্য ও উপাসকের চির ব্যবধানই অনুরাগের তীব্রতা ও গাঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখে।

বড় সাধে জালিনু দীপ গাঁথিনু মালা
চির দিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন। (গান)

এই যে 'চিরদিনে' দর্শন পাওয়া—ইহা কেবল তিনিই লিখিতে পারেন, যিনি বিদ্যাপতির পদের সহিত পরিচিত।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এই পদ গাহিয়া স্বগৃহে শ্রীচৈতন্যের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। 'বড় সাধে জালিনু দীপ গাঁথিনু মালা' পড়িলেই মনে পড়ে :—

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লুঁ
গাঁথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা। (বড়ু চণ্ডীদাস)

রবীন্দ্রনাথের

এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা
কেমনে আছে সে পাসরি।
সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী
সেথা কি বাজে না বাঁশরী।

'ক্ব মন্দ্র মুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ' স্মরণ করাইয়া দেয় না কি?

ভানুসিংহের পদাবলী কবির কাব্যকুঞ্জে প্রভাতী সঙ্গীত। তিনি সেই প্রথম যৌবনে বৈষ্ণব কবিদের ভাব, ভাষা ও সঙ্গীতের মধ্যে যত কিছু সুন্দর আছে, তাহা নিঃশেষে লুটিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে বৈষ্ণব কবিতার তরলিত গতি তাঁহার অনুভূতি-প্রবণ হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের ঢেউ বহাইয়া দিয়াছিল! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাংলার আর একজন শ্রেষ্ঠ কবিও বৈষ্ণব কবিতার দ্বারা এইরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা' পরিণত বয়সের রচনা। বৈষ্ণব কবিতার ভাষা ও ছন্দ তাঁহারও প্রাণে মাধুর্য্যের ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মমত, শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার সমস্তই বৈষ্ণব ভাবের প্রতিকূল ছিল। কিন্তু তাঁহার কবি-হৃদয় সে-সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্য্যের সন্ধানে অভিসারে ছুটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথেও আমরা দেখিতে পাই নানা প্রতিকূল অবস্থানের মধ্যে থাকিয়াও তিনি সৌন্দর্য্যের আহ্বানে বৈষ্ণব কবির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এখনও তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশী শুনেছি।

পড়িলেই মনে পড়ে :—

কদম্বের বন হৈতে কি বা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে। (অজ্ঞাত পদকর্ত্তা)

আর ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
বনমাঝে কি মনোমাঝে!

পড়িলে সেই বিরহ ব্যাকুলা রাধার চকিত চাহনি মনে পড়ে না কি?

বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্

অথবা—

কেন বাজাও কাঁকন কন কন
কত ছল ভরে!

---

* তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা।—রঘুবংশ সপ্তম।

চিত্তলোভী নৈনহার অতিহী সুন্দর কহা বহ
সিন্ধু ছবি হৈ অগাধা।
রোম [illegible]নে অঙ্গ নৈন হোতে সব রূপ লেতী
নিদরি কহত রাধা।—সুরদাস

শ্রীরাধা বলিতেছেন তাঁহার প্রতি রোম যদি চক্ষু হইত, তাহা হইলে সাধ মিটাইয়া শ্যামরূপ দেখিতাম।

যেন একখানি জীবন্ত ছবি আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে। সেই যমুনাতীরের নীপনিকুঞ্জ, সেই কদম্ব-কেতকী-যূথীর পরাগমাখা সৌরভ, সেই বাঁশীর আকুল আহ্বান আর গৃহকর্ম্মে শৃঙ্খলিতা অথচ মন যার নিমেষে শতবার 'কদম্ব কাননে ধায়' এমন একখানি রমণীর চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

বঁধু হে ফিরে এস!

* * *

আমার সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর ফিরে এস।

এ শুধু আধুনিক কীর্ত্তন নহে; বৈষ্ণব কবিতার জলতরঙ্গ সঙ্গীতে যাহাদের কান বাঁধা, তাহারা যে ইহাতে সেই বৈষ্ণব কবিতারই সুর শুনিতে পায়, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

এমনি এবং আরও কত ভাবে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। তিনি নিপুণ জহরীর ন্যায় বৈষ্ণব কবিতার ভাণ্ডারে যে-সকল মণিমাণিক্য ছড়ান আছে, তাহা চুনিয়া চুনিয়া নিজের কবিতা-লক্ষ্মীকে সাজাইতে চাহিয়াছিলেন:

কো তুঁহু বোলবি মোয়।

একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিতার একটি কলি বা অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি কেমন সুন্দর ভাবে তাহার অন্তরতম ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন:

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোঁহা হোয়॥

—তুমি আমার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, আঁখির অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, হৃদয়ের মৃগমদপাঁতি, গ্রীবার হার, দেহের সর্ব্বস্ব এবং গৃহের সার। পাখীর পাখা যেমন, মাছের পক্ষে জল যেমন, জীবের জীবন যেমন, তেমনই আমার তুমি। (তবু) হে মাধব, তুমি আমার বল, তুমি কেমন!

তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, কো তুঁহু বোলবি মোয়। তুমি কে, আমাকে বলিয়া দাও। তোমার বাঁশীর স্বর বধামৃতে মিশানো, ('মুরলী বাজায় যেন, বিষামৃতে একত্র করিয়া'—অজ্ঞাত পদকর্ত্তা) তোমার হাসি দেখিয়া ঋতুরাজ বসন্ত ছুটিয়া আসিল, ত্রিভুবন চরণ-কমল ছুঁইবার আশে বিভ্রান্ত মধুকরের মত ধাইল, বলিয়া দাও, তুমি কে! কো তুঁহু বোলবি মোয়।

বৈষ্ণব কবিতার একটি কলির অর্দ্ধাংশ নিজ কবিতায় গাঁথিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিবার যে পদ্ধতি, তাহা নূতন নহে। স্যর এড্‌উইন আরণল্ড্‌ও গীত-গোবিন্দের ছন্দে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ইংরেজী কবিতায় এইরূপ একটি কলি জুড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

The lesson that thy faithful love has taught him
He has heard:
The wind of spring, obeying thee has brought him
At thy word:
What joy in all the three worlds was so precious
To thy mind?
Ma Kooroo Manini Manamaye
Ah, be kind!

—*The Indian Song of Songs.*

ইহা ঠিক অনুবাদ না হইলেও জয়দেবের ঝঙ্কার যেন কতকটা তুলিতে পারিয়াছে। জয়দেবের কবিতায় 'মাধবে মাকুরু মানিনি মানময়ে' যেমন 'ধ্রু' কলি, অর্থাৎ প্রত্যেক যুগ্মের পরে গাহিতে হয়, আরণল্ডও সেইরূপ প্রত্যেক stanza-র শেষে ঐ কলিটি দিয়া জয়দেবের ছন্দ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' কলিটিও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক stanza-র পরে ধ্রু কলির মত প্রদত্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় ব্রজবুলির সুন্দর অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়:

মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।

এই কবিতায় কবি বলিতেছেন, হে মরণ, তুমি আমার শ্যামের সমান। অর্থাৎ আমি তোমাকেই বরণ করিলাম। শ্যাম নির্দ্দয় হইলেও তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিবে না, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না; রাধার হৃদয় তুমি কখনও ভাঙিয়া দিবে না।

বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলা রাধাকে দিয়া অন্য ভাবে এই একই কথা বলাইয়াছেন:

এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ।

যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত।—গোবিন্দ দাস

—হে সখি, আজ মৃত্যু ও বিরহের মধ্যে যে কলহ তাহা চুকিয়া যাউক।* যদি ঐ ভাবে গোকুলচন্দ্রের সহিত মিলন ঘটে। (মৃত্যু হইলে আমার দেহের পঞ্চভূত পঞ্চ মহাভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন যেন) প্রভু আমার যেখানে রাঙ্গা চরণ ফেলিয়া চলিয়া যান, আমার দেহের মৃত্তিকা যেন সেখানকার মৃত্তিকা হয়। তিনি যে-সরোবরে স্নান করেন, আমার দেহ যেন সেই সরোবরের জল হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শীতল করে।

এখানে একটি কথা এই যে, বৈষ্ণব কবির সহিত সাদৃশ্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। কারণ বৈষ্ণব কবির প্রভাবে প্রভাবিত কোনও কবি হয়ত মরণকে শ্যামের সহিত তুলনা করিতেন না। শ্যাম অতুলনীয়, নিরুপম।

মধু রিপু সম নহি দেখিঅ সোহাওন
জে দিঅ তহ্নিক উপামরে।—বিদ্যাপতি
মধু রিপুর তুল্য সুন্দর দেখি না যে তাঁহার উপমা দিব।
(নগেন্দ্রবাবুর অনুবাদ)

মরণ যখন একান্ত কামনার বিষয় হয়, তখন সে কেবল 'ঐছন মিলই যব গোকুল চন্দ'—তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য। নহিলে মরণ কে চায়?

হরি-লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে।—শশীশেখর

বৈষ্ণব কবিতার তরল সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথ বহু পরিমাণে আয়ত্ত করিয়া থাকিলেও তাহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করিতে পারে নাই, নানা কারণে। প্রতিকূল বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও তিনি বৈষ্ণব কবিদিগের ভাব, ভাষা ও ছন্দ যত দূর ধরিতে পারিয়াছেন, আর কোনও কবি তাহা পারেন নাই। এইখানেই তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাহিত্য বা অন্য কোনও সাহিত্য হইতে তিনি যদি উপকরণ লইয়া নিজের অনন্য-সাধারণ অনুভূতির রসে পাক করিয়া পরিবেষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে কোনও হানি নাই। জয়দেবের গীতি-কবিতা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাস যে তাঁহার অমর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার কবি-যশ একটুও ম্লান হয় নাই। গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াও বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অবলীলাক্রমে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ধনে ধনী হইয়াও অমরতা লাভ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার নিকটে কি পরিমাণে ঋণী। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে একাধিক ব্যক্তির সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। কোথায় কোন্ কবিতায় বৈষ্ণব কবিতার আভাস আছে, কোথায় কোন্ গানে কীর্ত্তনের সুর বাজে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে হইলে বহুকালব্যাপী গবেষণা আবশ্যক। অসামান্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশের ইতিহাস যে-দিন গ্রথিত হইবে, সে-দিন বুঝিতে পারা যাইবে বৈষ্ণব কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের জ্ঞাতিত্ব কোথায় ও কতখানি।

বৈষ্ণব কবিতার সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাদৃশ্য যতই থাক্, ইহা বলিতেই হইবে যে সে-সাদৃশ্য ঐ সাহিত্যের অতি অল্প অংশ। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে গানে নাটকে ও প্রহসনে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও আলোচনায় যে বিরাট সৃষ্টি-শিল্পের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার ছায়া অল্পই স্থান অধিকার করিয়া আছে। যে অপূর্ব্ব কাব্যভোজে তিনি আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছেন, তাহাতে নানা রসের পরিবেষণ হইয়াছে। বৃন্দাবনের মনোহরা তাহাতে একমাত্র মিষ্টান্ন নহে।

বৈষ্ণব কবিতার প্রতি কবির যে অসাধারণ অনুরাগ আছে, তাহার বহু প্রমাণ তাঁহার লেখা হইতে সংগ্রহ করা যায়। বাউল ও কীর্ত্তনের সৌন্দর্য্য তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার 'বৈষ্ণব কবিতা' শীর্ষক কবিতা অভ্রান্তভাবে তাঁহার শ্রদ্ধা ও উদারতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এ গীতি-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে;—

এ উক্তি মুগ্ধ ভক্তের উক্তি, শ্রদ্ধার প্রস্ফুট কুসুম-সম্ভার। আমার মনে হয় কোনও কবি, কোনও কালে বৈষ্ণব কবিকে এইরূপ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন কি-না সন্দেহ। কিন্তু যতই হোক, এই 'বৈষ্ণব কবিতা' পাঠ

* বিরহে মরণমেব নির্ব্বন্ধং নির্বিরোধমিত্যর্থঃ—রাধামোহন ঠাকুরের টীকা। অর্থাৎ এতদিন আমার দেহ লইয়া মৃত্যু ও বিরহের মধ্যে যে কলহ বা বিরোধ চলিতেছিল, তাহা শান্ত হউক। কৃষ্ণবিরহে মরণ অনুকূল হউক।

করিলেই বুঝিতে পারা যায়, পথের কোন্‌খানে মহাজনদের সহিত রবীন্দ্রনাথের ছাড়াছাড়ি হইল। কবি প্রশ্ন করিতেছেন—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
......একি শুধু দেবতার ?

তিনি বলিতে চাহেন :—

বৈষ্ণব কবির গাথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্য পথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহ তরে...

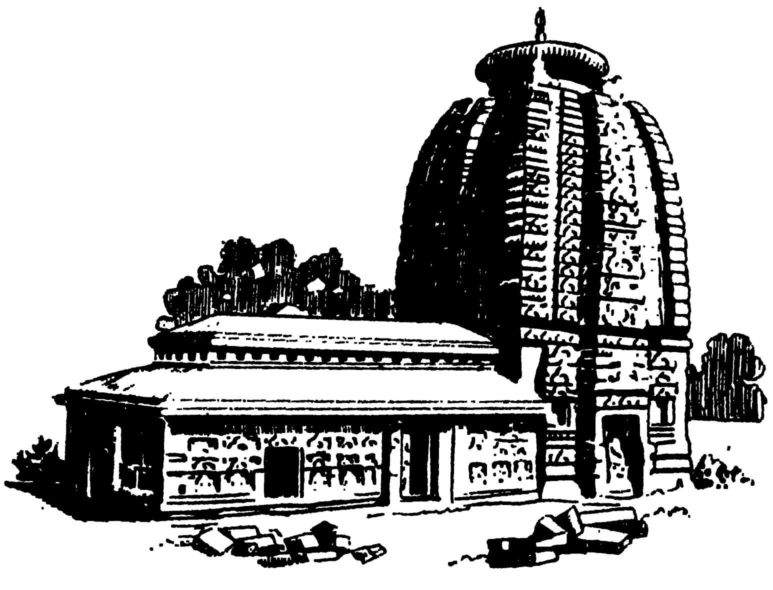
এইখানেই কবি বৈষ্ণব ভাব পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে গেলেন।

কেহ দেয় তারে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে।... ... ...

ইহা শুনিতে যতই সুন্দর হউক, বৈষ্ণবের ভাব এখানে রক্ষিত হইল না। কে প্রিয়? কার তরে এই গান? বৈষ্ণব বলিবেন—তাহার প্রিয়তমের জন্য, চির কিশোর কিশোরীর নিমিত্ত—মানুষের জন্য কখনও নহে। যাহা অনিত্য, যাহা মরণশীল, তাহা প্রেমের বিষয় হইতে পারে না। কাম ও প্রেম, লালসা ও প্রীতি পৃথক বস্তু। কাম-লালসা পার্থিব, নশ্বর, সংসারেরই মত অনিত্য। প্রেম, প্রীতি স্বর্গীয়? না; একমাত্র বৃন্দাবনের সামগ্রী। বৃন্দাবনের বাহিরে প্রেমতরু বাঁচে না। ইহাকে ব্রজ ছাড়া করিও না; তাহাতে প্রেমও থাকিবে না, তোমারও বিপদ হইবে।

ব্রজ বিনা অন্যত্র ইঁহার নাহি বাস।—চৈতন্যচরিতামৃত

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাব ছুঁই ছুঁই করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি গোবিন্দের মন্দিরের অনতিদূরেই ভাবার তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুই-ই অপূর্ব্ব, দুই-ই সুন্দর। রবীন্দ্রের কাব্য শুধু ভক্তের জন্য নহে, তাঁহার সঙ্গীত সবই ধর্ম্মসঙ্গীত নহে। তাঁহার বহু কবিতা আছে, যাহা বৈষ্ণব ভাবের ধার ধারে না। মানব-চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলি অসামান্য অনুভূতির বলে তিনি যেমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, এমন কোনও কবি পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। প্রকৃতির নব নব বিভ্রমশালী সৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতায় যেমন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন বৈষ্ণব কবিতায় নহে। তাঁহার 'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা' উপমাহীন। তাঁহার বহু কবিতা সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রসে ভরপুর, অথচ তাহাতে বৈষ্ণব কবিতার গন্ধমাত্র নাই।



পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক—(১৫-১৬ খণ্ড)---শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। বীরভূম, রতন-লাইব্রেরী হইতে শ্রীগৌরীহর মিত্র, বি-এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক সচিত্র চরিত্রাভিধান। ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে শিবরতনবাবু এই গ্রন্থের সঙ্কলন-কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। এক্ষণে সেই কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। মাতৃভাষানুরাগী বাঙালীর নিকট এই গ্রন্থের যথাযোগ্য সমাদর হইলে আমরা সুখী হইব।

মফস্বলে বসিয়া এরূপ গ্রন্থের সঙ্কলন-কার্য্যে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। এই কারণে গ্রন্থের স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। আলোচ্য খণ্ডেও কিছু কিছু ভুল আমাদের নজরে পড়িয়াছে। সেগুলি না থাকিলে পুস্তকটি নিখুঁত হইত। যে-ভুলগুলি চোখে পড়িয়াছে তাহার দুই-চারিটির উল্লেখ করিতেছি।

(১) ৬১৪ পৃষ্ঠায় আছে:—"মদনমোহন গোস্বামী—'পরিদর্শক' নামে বাঙ্গালার প্রথম দৈনিক পত্রের অন্যতম সম্পাদক।...বাঙ্গালার এই সর্ব্বপ্রথম প্রাত্যহিক-সংবাদপত্র...১২৬৭ সালের বৈশাখ হইতে (১৮৬০ খ্রীঃ, ১৫ই এপ্রেল)...প্রকাশিত হইয়াছিল।" শিবরতনবাবু যে এরূপ গুরুতর ভুল করিবেন তাহা আমরা সত্যই আশা করি নাই। বাংলার সর্ব্বপ্রথম প্রাত্যহিক পত্র 'পরিদর্শক' নহে,—কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'। ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন (১ আষাঢ় ১২৪৬) হইতে "বারত্রয়িক" 'সংবাদ প্রভাকর' প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হয়।

ইহা ছাড়া 'পরিদর্শক'-এর প্রকাশ-কাল দিতেও শিবরতনবাবু একটু ভুল করিয়াছেন। প্রাত্যহিক 'পরিদর্শক' ১৮৬১ সালের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়,—১৮৬০ সনের এপ্রিল মাস হইতে নহে। ('বিবিধার্থ-সংগ্রহ', ১৭৮৩ শক, আষাঢ়, পৃ. ৫৯ দ্রষ্টব্য।)

(২) পৃ. ৬০১ :—"ভোলানাথ সেন...১৮৩৮ খ্রীঃ হইতে প্রকাশিত স্বনামখ্যাত 'রসরাজ' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা। আনীতন নিমক-মহলের দেওয়ান নীলরত্ন হালদার মহাশয়, 'বঙ্গদূতের' প্রতিষ্ঠাতা ১৮২২ খ্রীঃ হইতে ১৭ বৎসর কাল সম্পাদন করিয়াছিলেন।" এই সংবাদগুলির একটিও ঠিক নহে। 'সম্বাদ রসরাজ' পত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে—কালীকান্ত গাঙ্গুলীর সম্পাদকত্বে। 'বঙ্গদূতে'র প্রকাশকাল ১৮২২ নহে,—১৮২৯ সনের ১০ই মে। নীলরত্ন হালদার ১৭ বৎসর 'বঙ্গদূত' সম্পাদন করেন নাই, করিয়াছিলেন মাত্র এক বৎসর; তৎপরে ভোলানাথ সেন কিছুদিন কাগজখানি পরিচালন করেন। ১৩৩৮ সালের ৪র্থ সংখ্যা 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে আমি এ-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

(৩) পৃ. ৬১০ :—"মথুরানাথ গুহ—'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' নামক পাক্ষিক-পত্রিকা সম্পাদক। এই পত্রিকাখানি ১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রীঃ) ১৯শে জ্যৈষ্ঠ হইতে পাক্ষিক-পত্র রূপে...প্রকাশিত হয়।"

শিবরতনবাবু সর্ব্বত্রই এই কাগজখানির 'দুর্জ্জয় দমন মহানবমী' এই নাম লিখিয়াছেন। উহার প্রকৃত নাম 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'। 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' যে প্রথমে মাসিক রূপে প্রকাশিত হয়,—পাক্ষিক রূপে নহে—ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১১ মার্চ্চ ১৮৪৭) প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত 'বিজ্ঞাপন'টিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে:—

'এই দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রিকা প্রকাশের নিয়মিত দিবস স্থির করা যায় নাই, মাসের মধ্যে এক দিবস ইচ্ছামত প্রকাশ করা যাইবেক,...। সম্পাদক মথুরামোহন গুহ।"

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'র প্রকাশকাল ১৮৪৭ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি (১২৫৩, ২৮এ মাঘ),—এই তারিখটি দিতে শিবরতনবাবু ভুল করিয়াছেন।

(৪) পৃ. ৬৩১ :—"মাইকেল মধুসূদন দত্ত...জন্ম ১২৩০ সাল, ১১ই মাঘ (১৮২৪ খ্রীঃ, ২৫শে জানুয়ারী) শনিবার।"

যোগীন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁহাদের গ্রন্থে মাইকেলের যে-জন্মতারিখ দিয়াছেন, দেখিতেছি শিবরতনবাবু তাহাই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছেন; কেবল '১২ই মাঘ' স্থলে ভ্রমক্রমে '১১ই মাঘ' মুদ্রিত হইয়াছে। মাইকেলের এই জন্মতারিখ যে নির্ভুল নহে তাহার প্রমাণ ১৮২৪, ২৫এ জানুয়ারি=১৩ই মাঘ ১২৩০, রবিবার হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চম্পারণ সত্যাগ্রহ—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সঙ্কলিত। খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। মাঘ, ১৩৩৮। মূল্য---বাঁধাই বারো আনা, সাধারণ আট আনা।

১৬৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই পুস্তকখানিতে মহাত্মা গান্ধীর চম্পারণ সত্যাগ্রহের কথা বিস্তৃত ও বিশদভাবে জানিতে পারা যায়। সতীশবাবু বেহারের জনপ্রিয় বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, চরিত্রবান্ নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের হিন্দীভাষায় লিখিত "চম্পারণে (?) মহাত্মা গান্ধী" নামক পুস্তক হইতে ঘটনাভাগ অনুবাদ করিয়া যাহাতে বাঙালী পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হয় তেমন ভাবে সাজাইয়া দিয়াছেন। পনেরো ষোল বৎসর পূর্ব্বে এই আন্দোলনেই মহাত্মাজী ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহের কথা অল্পদিনে তৃতীয়বার প্রচার করেন, এবং স্বয়ং কারাবরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে "চম্পারণ সত্যাগ্রহ" অবশ্যপাঠ্য, চম্পারণ তাঁহাদের নিকট উপেক্ষার বিষয় নহে। পুস্তকখানির পূর্ব্বভাগ সুরচিত, ও সমস্তটাই সুন্দর হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সংস্করণের জন্য দু-একটি বিষয়ে সঙ্কলয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি: (১) চম্পারণের একটি মানচিত্র দিলে আমাদের মত সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকের (যাহার কি না ভৌগোলিক জ্ঞান বড় কম) বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত। (২) "আজব দেশ মকৌয়া"—মকৌয়া

কথাটার অর্থ দিলে ভাল হইত; এবং (৩) কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহাদের সংশোধন পরবর্ত্তী সংস্করণে বাঞ্ছনীয়।

গীতার গান্ধী ভাষ্য—মূল, অন্বয়, গান্ধীভাষ্য ও ভাবার্থ শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সঙ্কলিত। খাদি-প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৩য় সংস্করণ, ১৩৩৮, আশ্বিন। মূল্য বাঁধাই ১৲ অবাঁধাই ৸৹ আনা।

অক্লান্তকর্ম্মী সতীশবাবু মহাত্মাজীর গীতাভাষ্য মূল গুজরাটী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকের পক্ষে তাহা সহজপাঠ্য করিয়াছেন। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৩৩৭ সনের আশ্বিন মাসে হয়, তখন মূল নাম অনাসক্তিযোগই ছিল। ২য় সংস্করণ হইতে সতীশবাবু গান্ধীজীর গীতানুবাদ ও ভাষ্য ছাড়া নিজেরও কিছু দিয়া আসিতেছেন, এই নূতন ভাগের নাম দিয়াছেন গীতা-প্রবেশিকা, তাহাতে গীতার তত্ত্বসমূহ আলোচনা করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর গীতাভাষ্য পড়িয়া দেখিবার মত, আশা করি শিক্ষিত বাঙালী এ সুযোগ হারাইবেন না। গীতার সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের প্রধান কর্ম্মবীর কি বলিয়াছেন, অর্জ্জুনকে দিয়া যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনকেও হত্যা করাইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কিছু বাধে না, তাঁহার বাণী জীবনের সকল কর্ম্মে অহিংসামন্ত্রের উপাসক মহাত্মাজীর নিকট কি ভাবে পৌঁছিয়াছে, তাহা পড়িয়া এবং বিচার করিয়া দেখিবেন। বাংলায় এই পুস্তকের অনুবাদ, প্রকাশ ও প্রচার করিয়া সতীশবাবু বাঙালীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

তবু কেন সতীশবাবু বলেন যে, "গীতার সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলার নাই, যিনি যাহাই বলুন তাহাই পুনরুক্তি হইবে।" (৷৴৹) মহাত্মাজীর যদি নূতন কিছু বলার না-ই থাকিবে তবে কি আর তিনি নূতন করিয়া ব্যাখ্যা লিখিতে বসেন? তাঁহার ত আর 'কলম-কণ্ডূয়ন' নাই! আর একস্থানে সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "গীতার ন্যায় গ্রন্থের উপর গান্ধীজীর ন্যায় অনুভব-জ্ঞানী পুরুষ যাহা বলিয়াছেন তাহা মানিয়া লওয়ার মত নির্ভরতা আসিলে পাঠকের বিশেষ উপকার হইবে—অথচ বিক্ষেপ হইবে না।" (৷৵৹)—গান্ধীজীর সকল মতই যেন বিচার করিয়া যুক্তি দিয়া আলোচনা করিয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়, সে-কথা মহাত্মাজী বার-বার বলিয়া গিয়াছেন, ইহার বিপরীত করিলে তাঁহার অবমাননা করাই হইবে। শঙ্করাচার্য্য ও গান্ধীজী, এই উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রদৃষ্টির যে বিরোধ তাহা সতীশবাবু 'সময়ের দূরত্ব, ও সেই হেতু সমাজের অবস্থাগত প্রভেদ হেতু ঘটিয়াছে,' এই কথা বলিয়া কাটাইয়া দিতে চাহেন; কিন্তু এ কথা মনে ধরিবার মত নয়; লোকমান্য তিলক মহারাজ ত বেশী দিন পরলোকগত হন নাই, তাঁহার গীতারহস্য ও গান্ধীভাষ্য ইহাদের তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনায় সতীশবাবুর ভূমিকায় আচার্য্য শঙ্কর ও মহাত্মা গান্ধীর ব্যাখ্যার মূল কথা পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাইব আশা করিয়াছিলাম।

বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ 'ব'-এর উচ্চারণগত প্রভেদ যখন বাংলায় করাই হয় না, এবং সতীশবাবু যখন বাঙালী পাঠকের জন্যই পুস্তক লিখিয়াছেন, তখন এই প্রভেদ দেখাইবার চেষ্টায় (কোনও কোনও স্থানে এই প্রভেদ দেখাইবার চেষ্টায় উল্টা উৎপত্তি হইয়াছে, ঠিকে ভুল হইয়াছে) অযথা শক্তি ও সময় ব্যয় হইয়াছে মনে করি।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

"পূর্ব্বাপর"—শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য। গোপাল পাবলিশিং হাউস, ১২ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

বইখানি ১৫৩ পাতার সম্পূর্ণ একখানি উপন্যাস। লেখকের "প্রেমে ঝাঁপাইয়া পড়িবার" সাহসটুকু ছাড়া আপাতত আর কিছুরই প্রশংসা করা গেল না। না-আছে চরিত্রের একটা পরিণতি, না-আছে ভাষার বাঁধুনী, না-আছে উদ্দেশ্যের একটা ঠিক-ঠিকানা। এক কথায় বলিতে গেলে বইখানি পূর্ব্বাপরই অসঙ্গতিদুষ্ট।

নায়ক মুরলী একটি দুঃখবিলাসী জীব। সে সংসারের স্বার্থপরতা, আভিজাত্যের অত্যাচার, ভালবাসা আর বিবাহের অসারতা এই সব বড় বড় কথা বলে; কিন্তু তাহার নিজের চরিত্রের দীনতা কখনই তাহার মধ্যে বিদ্রোহীর তেজস্বিতা আনিয়া দিতে পারে নাই—যাহা বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। নিজের আশ্রয়দাত্রী সদ্যবিবাহিতা সিপ্রার সর্ব্বনাশ করিয়া যখন গভীর রাত্রে সভ্যতাবিরোধী মুরলী তাহাকে লইয়া পলায়নপর, তখন রেবাকে বলিতেছে—"আপনি সারা জীবন কামনা কোরবেন, যেন আমরা মনে প্রাণে পশু হোয়ে যেতে পারি, তার চেয়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আর কিছু নেই…"

আমরা বলি—"তোমরা সর্ব্বতোভাবে তাই হোয়ে গেছো, আর খেদ কোরে কাজ নেই; কারণ লেখক তোমাদের শিব গোড়তে বাঁদর গোড়েই ফেলেচেন, আর্টের দিক দিয়াও, আদর্শের দিক দিয়াও।"

ভাষার মধ্যে পুনরুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে সাবধান হইয়া চরিত্র-সমষ্টি ও আখ্যানভাগের স্বাভাবিক পরিণতির দিকে নজর রাখিলে লেখকের ভবিষ্যতে আশা যে একেবারেই নাই এমন নয়; তবে সে-ভবিষ্যৎ এখনও খানিকটা দূরেই বলিয়া মনে হয়।

ছাপা বাঁধাই ভাল। দাম ১৷৹

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

যোগরহস্যম্ বা পাতঞ্জলযোগদর্শন—বরাহনগর সাধনসমর আশ্রম হইতে শ্রীগদাধর বগড়িয়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

প্রথমে দেবনাগর অক্ষরে এক একটি সূত্র এবং তৎপরে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক দেবনাগর অক্ষরেই সংস্কৃতে সূত্রের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আছে। তারপর বাংলা অক্ষরে গ্রন্থকারের দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা। আলোচনায় তাঁর নিজের মতই দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক গ্রন্থ হইতেও স্বমত-পোষক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি "অবতরণিকা"য় স্পষ্টই বলিয়াছেন, "এই পুস্তকে ভ্রমপ্রমাদশূন্য ঋষিপ্রণীত সূত্র-সমূহের অনুভবসিদ্ধ সরল মর্ম্মার্থই বিবৃত হইয়াছে।" তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন, তাঁহার ব্যাখ্যার জন্য "ভ্রমপ্রমাদশূন্য ঋষি" দায়ী নহেন, ইহাই তাঁহার উক্তির উদ্দেশ্য বুঝিতেছি। গ্রন্থকার যে নিজের কথাই বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে বেশী দেরি হয় না। "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা" এই প্রসিদ্ধ সূত্রের তিনি অর্থ করিতেছেন "ঈশ্বর প্রণিধান হইতেই যোগলাভ হয়" (পৃ. ৭৮)। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এই যোগের নানা উপায় বর্ণিত হইয়াছে; এখন ঈশ্বর প্রণিধানকে অন্যতম উপায়রূপে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। যদি "ঈশ্বর প্রণিধান হইতেই" কেবল "যোগ" হইত—"হইতেই" কথাটা হইতেই তাই বুঝায়—তবে অন্য উপায়ের বর্ণনা নিরর্থক হয়। ভ্রমপ্রমাদশূন্য ঋষির পক্ষে ইহা সম্ভব কি? সুতরাং "হইতেই" না হইয়া "হইতেও" হইবে। বিকল্পবিধানরূপে "ঈশ্বর"কে উপস্থাপিত করিয়া পতঞ্জলি নিরীশ্বর সাংখ্যকে সেশ্বর করিলেন। পাতঞ্জল-দর্শনের নাম "সেশ্বর সাংখ্য"ও বটে। গ্রন্থকার ঈশ্বরবাদী, সুতরাং তিনি ঈশ্বরের বিশেষ স্থাননির্দ্দেশের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

তাঁহার এই ব্যস্ততা "ঈশ্বর" শব্দের ব্যাখ্যায় আরও বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী তিনটি সূত্রে (২৪, ২৫, ২৬) বর্ণিত আছে—"যিনি ক্লেশ, কর্ম্ম-বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অস্পৃষ্ট এরূপ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর"। গ্রন্থকার অনুবাদে "পুরুষবিশেষ" কথাটা পরিহার করিয়াছেন (পৃ. ৮০); "তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞবীজ" (আছে), এবং (সেই ঈশ্বর) "পূর্ব্ববর্ত্তিগণের গুরু, যেহেতু তাঁহাতে কালের অবচ্ছেদ নাই"। এই ঈশ্বর যে সাংখ্যের একটি "মুক্ত পুরুষ" সে-বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না অথচ গ্রন্থকার নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলেন, এই যোগশাস্ত্রে যেরূপভাবে ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া গেল, ইহার সহিত বেদান্তাদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ঈশ্বরের কোন বিলক্ষণতা নাই। এই জন্যই কি গ্রন্থকার "পুরুষবিশেষ" কথাটা পরিহার করিয়াছেন? বেদান্তের ব্রহ্ম আর যা-ই হউন না হউন, "পুরুষবিশেষ" নহেন, এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? পাতঞ্জলের পুরুষবিশেষ সাংখ্যের বহু পুরুষের মধ্যে একটি মুক্তপুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম বহুদূরে। বৈদান্তিক আলোচনায় যে পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দগুলির সময়ে সময়ে পার্থক্য প্রদর্শিত হয় গ্রন্থকার তাহার সঙ্গে পরিচিত বলিয়া মনে হয় না। তাই বলিতে সমর্থ হইয়াছেন "কেবল আর্য্যশাস্ত্রানুযায়িগণের নহে, অন্যধর্ম্মাবলম্বিগণেরও ঈশ্বর পৃথক্ নহেন" (পৃ. ৮১) ঈশ্বর এক, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা নানা "মুনি"র নানা রকমের; ইহা এত প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে অনুমান-বলে বা গায়ের জোরে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যাহা হউক, এই প্রায় ৫০০ শত পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহা না পাইয়া নিরাশ হইয়াছি। এই এতবড় গ্রন্থে সেই প্রাচীন প্রথানুযায়ী কতকগুলি শব্দের মারপ্যাঁচেই আলোচনা চলিয়াছে। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের দ্বারা তথ্য পরিষ্কার করিবার নূতন প্রণালী একেবারেই বর্জ্জিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের শাস্ত্রনিষ্ঠা আছে, "গুরুকৃপা"ও পাইয়া থাকিবেন, কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট অন্যতম তত্ত্ব, স্বানুভূতি, ব্যবহার করেন নাই, গতানুগতিক পথে চলিয়াছেন। তবে গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় আছে, সুতরাং এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে এই পুস্তক আদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বেদান্তবাগীশ

সাঁঝের প্রদীপ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এস-সি, এম-বি প্রণীত। এই বৃহৎ গ্রন্থখানি প্রায় ১৫০টি কবিতায় সজ্জিত। গ্রন্থকারের সুদীর্ঘ ভূমিকার প্রারম্ভে জানিতে পারা যায় যে, এই গ্রন্থের কবিতাগুলি তাঁহার বিভিন্ন বয়সের রচনার একত্রীভূত সমষ্টি। তিনি এই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে বারোমেসে গাছের আম্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—"ইহার অধিকাংশ কবিতাই মুকুলে ফলে কাঁচায় ডাঁসায় একত্রে বর্ত্তমান।" লেখকের উক্তি সত্য হইলেও তাঁহার কবিতাগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহা "মুকুলে ফলে কাঁচায় ডাঁসায় একত্রে বর্ত্তমান" থাকা সত্ত্বেও পাঠক-চিত্তকে সুগন্ধে আমোদিত করে। পরিপক্ক হস্তের কবিতাও এই গ্রন্থে অনেকগুলি আছে, উদাহরণ-স্বরূপ 'অভিনেত্রী', 'বর্ষান্তে', 'কবির', 'বহন্তায়', 'শ্মশানচরাজ' প্রভৃতি কবিতাগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'সাঁঝের প্রদীপ' স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল এবং তাহা দেবমন্দিরকে আলোকিত করিবে। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। দাম দেড় টাকা।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গীতিগুঞ্জ—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন প্রণীত। প্রকাশক—বার্ণ্-বিতান, ২ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২১৬। মূল্য—কাগজের মলাট ১।০।

গ্রন্থকারের 'কয়েকটি গান' ও 'কাকলি'তে যে-সকল গান প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরে যে-সকল নূতন গান রচিত হইয়াছে তাহাই একত্র গ্রথিত হইয়া 'গীতিগুঞ্জ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা অতুলপ্রসাদের গান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে এগুলির মধ্যে এমনই একটি বৈশিষ্ট আছে, যাহা অন্য গানের মধ্যে দুর্লভ। এই অসাধারণ গুণের জন্য শিক্ষিত বাঙালী সমাজে অতুলপ্রসাদের গানের এত আদর। আমার মনে হয়, এই সকল গানের মধ্য দিয়া তিনি বাঙালী জাতির মনকে যে-ভাবে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, অনেকে তাহা পারেন নাই। আজকাল স্বদেশী সঙ্গীতই হউক, অথবা মিষ্ট কোন গান হউক, অতুলপ্রসাদের গান যেমন জনপ্রিয়, এমন আর কোনও গান আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার 'বল বল সবে', 'উঠ গো ভারত লক্ষ্মী', 'হও ধরমেতে ধীর', 'মোদের গরব মোদের আশা' প্রভৃতি স্বদেশ-সঙ্গীত তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তাঁহার গানে যে শুধু স্বদেশ-প্রীতির শতবেণুবীণা বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে। তাঁহার সকল গানেই ভাষার অলস তরলতা, কল্পনার তরুণ মোহ এবং সুরের কোমল মাধুর্য্য রহিয়াছে। বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী দিলীপকুমার, প্রতিভাময়ী গায়িকা সাহানা দেবী প্রভৃতির মুখে অতুলপ্রসাদের গান শুনিয়া সহস্র সহস্র শ্রোতা বিমুগ্ধ হইয়াছেন দেখিয়াছি। অতুলপ্রসাদ নিজেও সুরের যাদুকর। যে-কোনও সুর তাঁহার অপূর্ব্ব উদ্‌ভাবনী শক্তির প্রভাবে কোমল মূর্চ্ছনায় মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠে। তাঁহার প্রত্যেকটি গানের মধ্যে সুরের অভিনব শিল্পচাতুর্য্য থাকে। গতানুগতিকতার দ্বারা তাঁহার কল্পনা বা সুরসৃষ্টি জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেকগুলি কীর্ত্তন ও বাউল সঙ্গীত তিনি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহারও মধ্যে এমন একটি তুলির টান, এমন একটি সুরের মীড় আছে, যাহাতে সেগুলি অতি উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। 'আর কতকাল থাক্‌ব বসে দুয়ার খুলে বন্ধু আমার!' 'পরাণে তোমারে ডাকিনি হে হরি, ডেকেছি শুধুই গানে', 'ওরে বন, তোর বিজনে সঙ্গোপনে কোন উদাসী থাকে', 'প্রকৃতির ঘোম্‌টাখানি খোল্‌লো বধূ, ঘোমটাখানি খোল্', 'মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে, ও আকাশ বল্ আমারে' প্রভৃতি গান এমন একটি কোমলতায় ভরা, যে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। এই সকল গান বাংলার আধুনিক অপ্রচুর সঙ্গীত-সাহিত্যের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করিবে বলিয়া আমি মনে করি। বাদল রাতে গাছের পাতায় যখন ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টি পড়ে, তখন যেমন একটা অনির্ব্বচনীয় কোমল মধুরিমায় চোখের পাতা আপনি জুড়িয়া আসে, অতুলপ্রসাদের গানে তেমনি একটি স্বাভাবিক তরল মাধুর্য্য আছে যাহা ভাষায় ব্যক্ত হইতে চাহে না। একদিকে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর কবিসুলভ কল্পনা, অপরদিকে তাঁহার সুরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য—এই উভয়ে 'গীতিগুঞ্জে'র গানগুলিকে অতি সরল ও উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। সঙ্গীত-রসজ্ঞগণ ইহা হইতে প্রচুর আনন্দ পাইবেন বলিয়া আমরা ভরসা করি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ বঙ্কিমচন্দ্র—মৌলভী একরামদ্দিন প্রণীত এবং কুলিয়া, বড়ীর, বর্দ্ধমান হইতে শ্রীযুক্ত নূরল আবসার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

বইখানি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সমালোচনা অন্যান্য উপন্যাসের

তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসখানিতে কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, তাহা দেখানো গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়। তাই নাম লইয়া একটু গোলে পড়িতে হয়। প্রথমে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে গল্পটি কিরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আলোচনা আছে। তাহার পর চরিত্রগুলির সমালোচনা এবং নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। ছোট হইলেও বইখানিতে কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'আদি বাংলা ভাষার জনক' নহেন, এবং অক্ষয়কুমার দত্তও 'বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী' নহেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাঙালী সমাজ।—শিবচৈতন্য ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরিপ্রসাদ লালা, ৮৯ নং গোলামহল, বারাকপুর। মূল্য চারি আনা।

এই পুস্তিকার লেখকের সকল মতের আমরা সমর্থন করিতে না পারিলেও তাঁহার স্বাধীনচিন্তায় প্রীত হইয়াছি। ইহা সকল ধর্ম্মাবলম্বী বাঙালীর পড়িয়া দেখা উচিত।

বহিখানির গোড়ায় লেখক "প্রকাশ" নাম দিয়া যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে নীচের কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি:--

"বাঙালী নরনারীর পানভোজন বিবাহে পূর্ণ স্বাধীনতা সর্ব্বদা বিদ্যমান। বাঙালীর মধ্যে জন্মগত কায়েমী উচ্চনীচ জাতিবিভাগ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। বাঙালী সমাজে জাতিবিশেষের সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রদানে এবং পৌরোহিত্যে জন্মগত একচেটিয়া অধিকার স্বার্থপরতার এবং অবিচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাঙালী কন্যার বাধ্যতা-মূলক বিবাহ বাঙলার নারীজাতির উপর দারুণ নৈতিক অত্যাচার; এবং অবরোধ দ্বারা নারীকে উচ্চ শিক্ষাদীক্ষা হইতে বঞ্চিত করাতেই বাঙালীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। এইগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের মোটামুটি অভিমত। উক্ত অভিমতগুলিকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।"

স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং স্বামীজীর মতামত ঐরূপ ছিল কিনা, সে-সম্বন্ধে আমাদের কিছু লিখিবার সাধ্য নাই। আমাদের বক্তব্য কেবল এই, যে, স্বামীজী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মণ্ডলীর সন্ন্যাসীদিগকে এবং গৃহস্থ ভক্তবৃন্দকে কার্য্যতঃ নিজের মতানুবর্ত্তী করিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বামীজীর আগে হইতেই ব্রাহ্মসমাজ ঐরূপ অনেক মত প্রকাশ এবং আচরণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন; এবং এখনও করিতেছেন। যৌবনকালে ব্রাহ্মসমাজের সহিত স্বামীজীর যোগও ছিল। সুতরাং এবিষয়ে স্বামীজীর নিজস্ব মত কতটুকু এবং কৃতিত্ব কতটুকু, তাহা স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হইলে ভাল হইত।

অবশ্য, সামাজিক আদর্শ স্থাপন বিষয়ে স্বামীজীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে সে চেষ্টা লেখক যে মোটেই করেন নাই, তাহা নহে। তিনি ১৭-১৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন,

"রামকৃষ্ণদেবের শক্তিতে অনুপ্রাণিত আমাদের বিবেকানন্দ যে সমস্ত উদার সামাজিক আদর্শ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গৃহস্থভক্তেরা সেই সকল উচ্চ আদর্শ তেমন ভাবে এখনও গ্রহণ করিতে পারেন নাই; উক্ত আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যমউৎসাহও দেখান নাই। তাঁহার সন্ন্যাসীরাও গৃহস্থদিগকে ঐ সকল উদার সামাজিক আদর্শ অবলম্বন করিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন নাই। হয় তাঁহারা স্বামীজীর সামাজিক আদর্শের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নাই, না হয় তাঁহারা লোকমত বা ভট্টাচার্য্যপুরোহিতের ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছেন।"

ইহার পর লেখক বলিতেছেন, "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ চাপা পড়িবার নহে, নষ্ট হইবার নহে। অচিরেই ঐসকল উদার সামাজিক আদর্শগুলি একজনে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশিত হইল। তিনি আমাদের বাংলার সমাজবীর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।"

এই কথার সমর্থন হিসাবে লেখক চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের নিজে অসবর্ণ বিবাহ করা, ভগিনীর কায়স্থের ঘরে বিবাহ দেওয়া, তাঁহার এক সহোদরের ইংরেজ-কন্যা বিবাহ করা, ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের পিতামাতা ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ব্রাহ্মের কন্যা, অধিকাংশ আত্মীয় ব্রাহ্ম. অসবর্ণ বিবাহ স্বামী বিবেকানন্দ কেবল কথায় সমর্থন করিবার বহুপূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজ কথায় ও তদনুযায়ী কাজে উহার সমর্থন করিয়া আসিতেছেন; তথাপি চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় যে সমাজবীর, তাহার কারণ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ, এরূপ বলার সঙ্গতি বা যাথার্থ্য কোথায়?

ব্রাহ্মসমাজের অনেক প্রশংসা লেখক করিয়াছেন। যেমন, তিনি বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলার যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।" দোষত্রুটি উল্লেখও তিনি করিয়াছেন; বলিয়াছেন, "ইহার অনেক দোষত্রুটি থাকিয়া হইল। মুরুব্বীরা ঐ সকল ত্রুটি সংশোধন করিলেন না।" দোষত্রুটির অন্ততঃ কিছু নমুনা দিলে এবং মুরুব্বীদের নাম দিলে ব্রাহ্মসমাজের উপকার হইত। "যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি আছে, প্রভূত অর্থ আছে এবং হিন্দুসমাজের ঘাতপ্রতিঘাতে যাহাদের মন একটু উদার হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ করিয়া ঐরূপ নরনারী লইয়াই গঠিত হইতে লাগিল।" বিদ্যাবুদ্ধিবিশিষ্ট লোক, প্রভূত অর্থশালী একআধজন লোক ব্রাহ্মসমাজে আছে। কিন্তু অধিকাংশই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোক। লিখনপঠনক্ষম লোকের অনুপাত ব্রাহ্মসমাজে বেশী, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদিগকে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ গঠিত, ইহা সত্য নহে। লেখকের মতে "ব্রাহ্মসমাজে বহুদিন প্রচলিত দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজাপার্ব্বণ না থাকায় সাধারণ লোকেরা ঐ দিকে তত আকৃষ্ট হইল না।" লোকদের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট না হইবার ইহা একটি কারণ হইতে পারে, কিন্তু ইহা অপরিহার্য্য কারণ; কেন না, ব্রাহ্মসমাজ পরব্রহ্মের উপাসক, বহু দেবদেবীর উপাসক নহে।

Annual Report & Audited Accounts of Visva-Bharati for 1931, Price Two Annas only. Visva-Bharati office, 210 Cornwallis Street, Calcutta.

বিশ্বভারতীর এই বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব যথাক্রমে ৩৬ ও ৪৭ পৃষ্ঠা পরিমিত। রিপোর্টটি পড়িলে বুঝা যায় এই প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানদান, শিক্ষাদান, ও জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধিকল্পে, এবং পল্লীসংস্কার, পল্লীসমূহের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, গ্রামশিল্পের পুনরুদ্ধার প্রভৃতি দ্বারা পল্লীসমাজ পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য কত রকম কাজ বিশ্বভারতী করিতেছেন।

ইহার গবেষণা-বিভাগের নাম বিদ্যাভবন। ইহাতে হিন্দু, জরথুস্ত্রীয়, জৈন, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা, ব্যাখ্যান, পুস্তকরচনা আদি কাজ হইতেছে। সংস্কৃত, পালি, চৈনিক, তিব্বতীয়, পহ্লবী, ফারসী, আরবী, হিন্দী প্রভৃতি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ এবং ফ্রেঞ্চ জার্মান প্রভৃতিতে মুদ্রিত পুস্তকাদির সাহায্যে গবেষণা হয়। বিশেষ বৃত্তান্ত রিপোর্টে দ্রষ্টব্য।

কলেজ-বিভাগের নাম শিক্ষাভবন। ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ১৯৩২-৩৩ সালের বন্দোবস্তের যে বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহাতে নানা বিষয়ে বি-এ পর্য্যন্ত পড়াইবার সব ব্যবস্থা উল্লিখিত আছে।

সুতরাং কলেজ এ বৎসর বি-এ পর্য্যন্ত শিক্ষাই চলিবে এবং আশা করি বরাবর বি-এ পর্য্যন্ত চালাইবার চেষ্টা হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়াতেই ঐরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞাপন না দেখিলে কেবল রিপোর্টের নিম্নমুদ্রিত কথাগুলি হইতে এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারিত :—

"The question of re-organizing the educational system at Santiniketan, and particularly the Santiniketan College, engaged the attention of the anthorities. The question was gone into thoroughly and a new detailed syllabus was drawn up for all classes up to the I. A. Standard. Henceforth more attention will be given to securing girl students in the two college classes."

ছাত্রী লওয়ার দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা আমরাও বাঞ্ছনীয় মনে করি। ভবিষ্যতে যদি বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কখনও কেবল ইণ্টারমীডিয়েট পর্য্যন্তই কলেজ ক্লাস রাখা সম্বন্ধে বিবেচনা করেন, তখন ভাবিয়া দেখিবেন, আধখানা কলেজ ছাত্রছাত্রীদের ও তাহাদের অভিভাবকদের আকর্ষণের জিনিষ হইতে পারে না, ইহাতে শিক্ষাও ভাল হয় না। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের চলন অনেক বৎসর হইতে হইয়াছে ; কিন্তু সেগুলি বেশ ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। রিপোর্টে দেখিতেছি, এই বৎসর শান্তিনিকেতনের কলেজের ছেলেরা মশকের বিরুদ্ধে সফল অভিযান করিয়াছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনের সে-পাড়ায় আমরা মধ্যে ম৽া ছিলাম, সেখানে ঐ সাফল্যের বিশেষ প্রমাণ পাই নাই।

স্কুল-বিভাগের নাম পাঠভবন। ইহার কাজ ভালই চলিয়াছিল। ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ পড়াশুনা ছাড়া আরও অনেক রকম কাজ করে। আগামী বৎসর নূতন উদ্যমে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অধ্যক্ষতায় কলাভবনের কাজ উত্তমরূপে চলিতেছে।

কৃষি, গ্রামের স্বাস্থ্য, গ্রামের শিল্প ইত্যাদি নানা দিকে কাজ করিয়া গ্রামের লোকদিগকে সুস্থ, সচেতন, এবং স্বাবলম্বী করিবার যে চেষ্টা শ্রীনিকেতন দ্বারা হইতেছে, তাহা ক্রমশঃ ফলবতী হইতেছে।

আর্থিক অবস্থা ও হিসাব সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু লিখিবার স্থান নাই কোনও প্রকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেই লাভজনক কারবারে পরিণত করা যায় না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নয়। লাভ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত দেশের অন্য কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মত বিশ্বভারতী শিক্ষাবিপণিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; লাভের জন্য পরিচালিত ও হয় না সুতরাং ইহার ব্যয় অপেক্ষা আয় যে বেশী নয়, তাহা কাহারও ক্ষোভের কারণ নহে। কিন্তু ঋণ হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে, প্রত্যুত তাহা চিন্তার বিষয়। ইহার ঋণ পরিশোধ কেবল প্রতিষ্ঠাতা মহাশয়ের কর্ত্তব্য নহে, অন্য সকলেরও কর্ত্তব্য। এই জন্য বিশ্বভারতীর সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং শিক্ষাদান ও আয়ব্যয়ঘটিত সমুদয় ব্যাপারে সভ্যদের মনোযোগবৃদ্ধি ও প্রকৃত অধিকারবৃদ্ধি আবশ্যক। শ্রীনিকেতন যে এ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ একজন সদাশয় বিদেশীর অর্থে চলিতেছে, ইহা বাঙালী জাতির পক্ষে সম্মানকর নহে। সাধ্যমত সকল বাঙালীরই ইহার সাহায্য করা উচিত।

কলিকাতায় গত বৎসর রবীন্দ্রনাথের যে সপ্ততিতম জন্মোৎসব হইয়াছিল, তাহা বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠান না হইলেও উহার প্রতিষ্ঠাতার জয়ন্তী বলিয়া রিপোর্টে তাহার উল্লেখ অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু জয়ন্তী সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহাতে ভ্রম প্রদর্শনের বা অন্যবিধ সমালোচনার অবসর না থাকিলে ভাল হইত। লেখা হইয়াছে, যে, "গোল্ডেন্ বুক্ অব্ টাগোর" সেলিব্রেশন্স্ কমিটি দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল। সত্য কথা এই, যে, ঐ পুস্তক গোল্ডেন্ বুক্ অব্ টাগোর কমিটি নামক অন্য একটি কমিটি সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন এবং এই কমিটির উৎপত্তি ও কার্য্যারম্ভ সেলিব্রেশন্স্ কমিটির জন্মের অনেক পূর্ব্বে হয়। ইহার কয়েকজন সভ্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই পুস্তক-প্রকাশক-কমিটির সভাপতি রূপেই সে ব্যক্তিবিশেষ কবিকে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার দিনে ঐ পুস্তক উপহার দেন, রিপোর্টে তাহার উল্লেখ নাই। মেলা ও প্রদর্শনীর জন্য যাঁহারা শিল্পদ্রব্য ধার দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুরের নামের অনুল্লেখ এবং কর্ম্মীদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকদিগের সংগ্রাহক ও পরিচালক এবং চিত্রাদির সংগ্রাহক ও কালানুক্রমে ও যথাযোগ্য স্থানে বিন্যাসক, অন্ততঃ প্রধান এই দুজনের নামের অনুল্লেখ ঠিক্ হয় নাই। রিপোর্টে জয়ন্তীর সম্পর্কে যদি কাহারও নাম না করা হইত, তাহা হইলে এরূপ কোন কথা বলা আবশ্যক হইত না। রিপোর্টে যতগুলি শব্দের সাহায্যে জয়ন্তী বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় ততগুলি শ৽দের দ্বারাই বর্ণনাটিকে অপেক্ষাকৃত নিখুঁত করা যাইত।

Rise of the Christian Power in India.

By Major B. D. Basu, I. M. S. Second Edition. With 4 maps, and 58 plates, one in colours. R. Chatterjee, Prabasi Office, Calcutta. Price Rs. 15.

ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্ব কি প্রকারে স্থাপিত হইল, তাহার ইতিহাস ইংরেজরা লিখিয়াছেন, এবং মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের ইতিহাস প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয়েরা এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও ইংরেজ ঐতিহাসিকদের অনুসরণ করিয়া লিখিত। তাহাতে প্রকৃত সত্য বহুস্থলে অপ্রকাশিত থাকিয়া গিয়াছে এবং অপ্রকৃত অনেক কথাও সত্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। স্বর্গীয় বামনদাস বসু মহাশয় বহুবর্ষব্যাপী পুস্তকাদি সংগ্রহ, অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের ফলে তাঁহার এই ইতিহাস রচনা করেন, এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া তাহা প্রকাশ করান। এই ইতিহাসখানিকে আমরা নির্ভরযোগ্য মনে করি। তাহার মানে এই, যে, আমরা ইহাতে কোন ভুল দেখিতে পাই নাই ; ইহা নহে, যে, ইহাতে কোন ভুল থাকিতেই পারে না। কারণ, কোন ইতিহাসই সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য এবং নিঃশেষে সমুদয় তথ্য ও সত্যের আধার হইতে পারে না। সুতরাং বসু-মহাশয়ের ইতিহাসে কোনই ভুল নাই এবং উহা যে-যুগের বৃত্তান্ত তৎসম্বন্ধীয় সকল তথ্যই ইহাতে আছে, এরূপ দাবি করা হইতেছে না। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়, যে, ইহাতে জ্ঞাতসারে কোন ভ্রান্ত বা মিথ্যা কথা লেখা হয় নাই, এবং ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপন সম্বন্ধে অন্য যত ইতিহাসই কেহ পড়ুন না কেন, এই গ্রন্থখানি না পড়িলে ইংরেজরাজত্বস্থাপন-যুগ সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিবে না। এই যুগ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত এই পুস্তকখানির সমান বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন ইতিহাস লিখিত হয় নাই। ইহার প্রায় সমুদয় তথ্যই ইংরেজ বা অন্য ইউরোপীয়দের লেখা বহি এবং সরকারী চিঠিপত্র রিপোর্ট প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। প্রথম সংস্করণে ইহার দাম ২৫ টাকা ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে ৪ খানি মানচিত্র, ১২০ খানি ছবি, অনেক নূতন তথ্য এবং সূচী সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মূল্য কমাইয়া পনর টাকা করা হইয়াছে। ইহা প্রায় প্রবাসীর সমান আকারের .০১১+ ১৬ পৃষ্ঠা পরিমিত, এবং পুরু কাগজে সুমুদ্রিত। বাঁধাই বেশ মজবুত।

History of Orissa. By R. D. Banerji. Two volumes. R. Chatterjee. Prabasi Office, Calcutta. Price of each volume Rs. 20; or Rs. 40 for the two volumes.

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ-রাজত্বের আরম্ভ-কাল পর্য্যন্ত এইরূপ একটি ইতিহাস ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেরই নাই। ইহা কেবল প্রচলিত অর্থে ইতিহাস নহে। ইহাতে উৎকলের ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, স্থাপত্য, প্রভৃতিরও বিবরণ আছে। পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ইতিহাসখানিতে, বর্ত্তমান সময়ে উড়িষ্যা বলিতে যাহা বুঝায়, সেই ভূখণ্ডের ইতিহাস আছে; তদ্ভিন্ন পুরাকালে আধুনিক বাংলা, বিহার, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর যে-সকল অংশ উৎকল নৃপতিদের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহারও ইতিহাস আছে। অতএব ইহা কেবল উৎকলীয়দের পঠনীয় নহে, অন্যদেরও বটে। শুধু বর্ত্তমান উড়িষ্যার ইতিহাস হইলেও ইহা সমুদয় ইতিহাস-পাঠকের পাঠযোগ্য হইত। অনেক ঐতিহাসিক ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা অতি উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর রূপে মুদ্রিত, বাঁধাইও ভাল। ইহার প্রথম খণ্ড ৩৬৩ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দুই খণ্ডে মোট ১৪১ খানি উৎকৃষ্ট ছবি আছে। তাহার মধ্যে একটি বহুবর্ণে মুদ্রিত, প্রাচীন উৎকলীয় পুঁথির রামরাবণের যুদ্ধের প্রতিলিপি। ছবিগুলি ও তদ্বিষয়ক লেখা হইতে প্রাচীন উৎকলীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাজললতা—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। এম্-সি, সরকার এণ্ড সন্স্। দাম দেড় টাকা। পৃঃ ২৩৮।

কাজললতা লেখকের নূতন-লেখা বই নয়, তিনি ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন, কিন্তু এ বইখানাতে তিনি মুন্সিয়ানা দেখাইতে পারেন নাই। বইখানি শেষ করিয়া তাঁর উদ্দেশ্যের গভীরতা সম্বন্ধে যেটুকু অস্পষ্ট ধারণা জন্মে, তাহাতেই আরও বেশী মনে করাইয়া দেয় যে এ ধরণের লেখার ভিত্তি আরও কতটা বাস্তবের উপর সুদৃঢ় হওয়া উচিত ছিল। লেখক চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, টাইপ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বলতা, উপেন, সত্যেন, শান্তুর মা—কাহারও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। শীতলা ও সন্ন্যাসিনী ত একেবারেই অবাস্তব জীব। স্বলতাকে বুঝিতে কষ্ট হয় না বটে, কিন্তু চরিত্রের স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা সৃষ্টিসাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়, একথা লেখক নিশ্চয়ই জানেন। স্বলতা কোথাও রক্তমাংসের প্রাণী হইয়া চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া ওঠে না—তার রূপের এত অজস্র বর্ণনা সত্ত্বেও তাহা পাঠকের মনে রং ধরায় না। লেখকের ভাষাটি সুমিষ্ট ও ঝরঝরে। বইখানার ছাপা ও বাঁধাই চিত্তাকর্ষক।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাথমিক যুযুৎসু—শ্রীসুবলচাঁদ চন্দ্র প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, বেলগাছিয়া, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ আনা।

আততায়ীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার যতগুলি উপায় আছে তাহার মধ্যে যুযুৎসু একটি। এই জন্য স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই পদ্ধতি যতই প্রচারিত ও প্রচলিত হয় ততই মঙ্গল। শ্রীযুক্ত সুবলচাঁদ চন্দ্র যুযুৎসুর নানা কসরতের চিত্র সম্বলিত এই পুস্তিকাখানি প্রণয়ন করিয়া বাঙালী-মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহাতে যুযুৎসু শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিক পাঠ লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার ভাষার দিকে নজর দিলে পুস্তিকাখানি আরও সুন্দর হইতে পারিত।

লামাদের দেশ তিব্বতে—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ৷৷৹ আনা।

এক কালে 'ঘর কুণো' বলিয়া দুর্নাম থাকিলেও বাঙালী যে ঘরের বাহিরে আসিয়া বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইয়া ইহা উৎরাইয়া উঠিতে সক্ষম, তাহার নানা কার্য্যে আজ তাহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সাহিত্যের কৃতিত্ব কম নয়। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্য দিয়া বাঙালী বালক-বালিকার মধ্যে দেশ-ভ্রমণ প্রীতি জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বন্ধুর পথ, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী, ততোধিক বিপদ—সন্দিগ্ধচেতা তিব্বতী, এ সকলই অতিক্রম করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে পর্য্যটক লামার দেশে উপনীত হইয়াছেন। ইহাতে তিব্বতবাসীর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিরও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ আছে। ইহা পাঠে ছেলেমেয়েদের যে শুধু ভ্রমণ-প্রীতিরই উদ্রেক হইবে তাহা নয়, ভিন্ন দেশ ও লোক সম্বন্ধেও তাহাদের নানা জ্ঞান বাড়িবে। রেখ-চিত্র সমাবেশে পুস্তকখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভিক্ষার ঝুলি—প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ বসু, ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য ৷৹ আনা।

কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সংগ্রহ—ক্ষুদকুঁড়া হইলেও ইহাতে মনের ক্ষুধা মিটাইবার উপাদান আছে। লিপিচাতুর্য্য বিশেষ কিছু নাই তবে আন্তরিকতা আর ভগবদ্ভক্তির সরল স্বচ্ছন্দ প্রকাশের জন্য মন আকর্ষণ করে। পাঠকগণকে ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। মুদ্রাকর-প্রমাদ—যাহা এই সংস্করণে অনেক, আশা করি আবার যদি প্রকাশ করা হয় সম্পূর্ণ সংশোধিত হইবে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

ফরাসী ইম্‌প্রেসনিষ্টদের কথা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

"ঘাসের উপর প্রাতরাশ" (Le de'jeune' sur l'herbe) —চিত্রটি হচ্ছে, শহরের এক সুন্দর উপবনে গাছের ছায়ায় দুইটি সুসজ্জিত পুরুষ ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে, তাদের পাশে এক নিরাবরণা নিরাভরণা নারী মধুর-ভঙ্গীতে বসে, তার সুগঠিত তনুর লাবণ্যে চারিদিক উজ্জ্বল; অদূরে ঝিকিমিকি জলের ধারে এক যুবতীর আনত দেহ জলের উপর ঝুঁকে পড়েছে, যেন পদ্মের বৃন্ত হেলিয়ে পড়া; পাশে গাছের গোড়ায় খাবার জিনিষ সব ছড়ান। এডুয়ার মানে-র (Edouard Manet, ১৮৩২—১৮৮৩) এই ছবিটি আজ পারির লুভ্‌র্‌ চিত্রশালায় সগৌরবে রক্ষিত, দেশবিদেশের লোক তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। তরুণ শিল্পী মানে ১৮৬৩তে যখন এই ছবিটি পারির সালোঁর জন্য পাঠান, সালোঁর কর্ত্তৃপক্ষ ছবিটি দেখাতে রাজী হলেন না। সে বছর অনেক নবীন চিত্রকরের ছবি এরূপ-ভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এক salon des refuse's,—প্রত্যাখ্যাতদের সালোঁ—করবার আদেশ দেন, সেই সালোঁতে অনেক প্রাণবান নতুন শিল্পী এসে জুটলেন—হুইস্‌লার, ভোলঁা, পিসারো, লেগ্রো, ফাঁত্যাঁ-লাতুর ইত্যাদি। মানের চিত্র সেই সালোঁতে নব্যচিত্রকরদলের জয়পতাকারূপে জল্‌ জল্‌ করতে লাগল।

আজ ছবিখানি দেখে আমরা অবাক হয়ে ভাবি, কেন ১৮৬৩তে পারির সালোঁর কর্ত্তৃপক্ষ ছবিটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ছবিখানিতে শালীনতার কোন অভাব আছে ব'লে বোধ হয় না। জোর্জোনের "গ্রাম্য কনসার্ট" (Concert Champetre) লুভ্‌রে তখনও ছিল। উন্মুক্ত আকাশের তলে মনোরম উপবনে সুবেশ পুরুষদের মধ্যে সুরূপা বিবসনা নারীর চিত্র মানের আগে জোর্জোনে এঁকে গেছেন। হয়ত, জোর্জোনের La fe'te champe'tre দেখেই মানে-র Le de'jeune' sur l'herbe আঁকার আইডিয়া হয়। কিন্তু জোর্জোনের চিত্রে সালোঁর কর্ত্তৃপক্ষ যা ক্ষমা করতে পারলেন, মানে-র চিত্রে তা পারলেন না, যেমন সংস্কৃত বা কোন ক্লাসিক সাহিত্যে যে স্পষ্টোক্তি আমরা ক্ষমা করতে পারি, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে সেরূপ কোন জিনিষ দেখলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। জোর্জোনে যে অনাবৃতা নারীকে আঁকতে চেয়েছেন, সে অমর্ত্ত্যা, সে পৃথিবীর নয়, সে শিল্পীর স্বপ্নের, সে হয়ত সুরসভার কোন অপ্সরী, কোন বনদেবী বাঁশী হাতে ক্ষণিকের জন্য স্বপ্নের মত পাশে এসে বসেছে; কিন্তু মানের নারী যে আজিকার দিনের, আমাদের গৃহের, সে বাস্তব, সে মায়া নয়, ক্ষণিক সৌন্দর্য্যস্বপ্ন নয়।

জোর্জোনের ছবি ও মানে-র ছবি, এ-দুয়ের মধ্যে বিষয় বস্তুর সাদৃশ্য থাকলেও দু-জনের অঙ্কণভঙ্গী একেবারে আলাদা; মানের এই নব অঙ্কনপদ্ধতি সালোঁর বিচারকদের ছিল অপছন্দ, তাই তাঁরা তাঁর নব ইম্‌প্রেসনিষ্ট-রীতি বুঝতে পারেননি।

"ঘাসের উপর প্রাতরাশ" ছবিখানিতে মানে সাধারণ চিত্র আঁকতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন আলোর লীলা আঁকতে; নারীর দেহে, সবুজঘাসভরা মাঠে, নদীর জলে আলো কিরূপে প্রতিফলিত হয়েছে, তিনি তাই এঁকেছেন; ভূমির পান্না-সবুজ, জলের ঝলমলানি, তরুণীর দীপ্ত শুভ্রতা, যুবকদের জলজলে হলদে, তামাক-হলদে বর্ণ—আলোক-প্রতিফলিত কতকগুলি রঙীন ক্ষেত্র দিয়ে তাঁর পট সজ্জিত হয়েছে।

মানের পরবর্ত্তী ছবি "ওলিম্‌পিয়া" (Olympia) সবাইকে আরও চমকে দিলে। ছবিখানি এখন লুভ্‌রে আছে, কিন্তু ১৮৬৪-র চিত্রপ্রদর্শনীতে ছবিখানি যখন রাখা হয়েছিল, তার সামনে প্রহরী রাখার দরকার হয়েছিল, সাধারণ দর্শকদের ঘুসি ও ছড়ির আঘাত হতে ছবিখানিকে রক্ষা করবার জন্যে।



তপস্যা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কি অনুপম শক্তির সহিত "ওলিম্‌পিয়া" অঙ্কিত! বড় আইডিয়া খুঁজতে গেলে ছবিটিতে কিছু পাওয়া যাবে না, কিন্তু রেখার কি নব ছন্দ! বর্ণের কি নব সমাবেশ! নীলাভ শয্যায় রঙীন ভারতীয় শালের উপর তরুণীর শুভ্র দেহ যেন মর্ম্মরের; পিছনের পটভূমিকা মেহগ্‌নি-লাল ও বোতল-সবুজ, পটভূমিকার গাঢ়বর্ণ ও তরুণীর দেহের দীপ্ত শুভ্রতা, আলো ও অন্ধকারের এই দুই বর্ণক্ষেত্রের মধ্যে কোন রঙের পর্দা নেই; তলায় জানালার কাছে নিগ্রো পরিচারিকা কৃষ্ণমূর্তি, ঘন কালো রঙের ছোপের মত; নিকষ মণির গহ্বরের মত সেই ঘন কালো হতে রঙের উৎসের মত বা'র হয়ে এসেছে নানা বর্ণের ফুলের গুচ্ছ, তোড়ার চারদিকে শুভ্র আবরণ; পায়ের তলার কালো বেরাল—আর একটি কালো রং-এর ছোপ।



মানে—"লোলা"

এই কালো, সাদা, পাটল, নানা বৈসাদৃশ্যময় বর্ণজগতের মধ্যে নীলাভ শয্যায় শায়িত শুভ্র দেহ যেন গজদন্তে গড়া—কঠিন, প্রাণহীন। এক রঙের ক্ষেত্রের সঙ্গে আর এক রঙের ক্ষেত্রের যেন কোন ক্রমন্বয়মান যোগ নেই। শিল্পী কুর্বে "ওলিম্‌পিয়া" দেখে বলেছিলেন, একি ছবি! এ ত তাসের ছবি, এ ত তাসের



মানে—"[illegible] বক্"

বিবি। কুর্বের কথা কিছু পরিমাণে সত্য। মানের এ ছবি দেখলে মনে হয়, সব ফ্ল্যাট—শরীর যেন চাপ্টা হ'য়ে গেছে; কোথাও বস্তুপুঞ্জ নেই, দেহের স্থূলতা নেই। রুবেন্‌সের মত মানে সুন্দরী তনু আঁকতে চাননি, তিনি আঁকতে চেয়েছিলেন তনুর লাবণ্যকে, আলোকসম্পাতে তার দ্যুতিকে, দেহকে নয়, দেহের আভাকে। তাঁর আঁকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আলোককে আঁকা, এই রীতির জন্য তিনি ইম্‌প্রেসনিষ্টদের অগ্রদূত। তরুণীর শুভ্র দেহ, হলদে শাল, কালো নিগ্রো, কালো বেরাল, রঙীন ফুলের তোড়া, এ-সবের উপর আলো ঝরে পড়ছে; আলোক-প্রতিফলিত তাদের রূপ তিনি আঁকতে চেয়েছেন। এখানে light is perspective, light is colour; চিত্ররূপ রেখাপরিপ্রেক্ষিত নয় (line perspective), আলোক-পরিপ্রেক্ষিত; সেজন্য মূর্তির, বস্তুর যেন স্থূলতা নেই; স্থানের দূরত্ব ও গভীরতা রেখা টেনে আঁকা নয়, রঙের প্রগাঢ়তা ও তার বৈষম্য-বিন্যাস দিয়ে সৃষ্টি করা। পুরাতন-

পক্ষীদের আঁকার প্রথাগত নিয়ম হচ্ছে, এক বিশুদ্ধ রঙের পাশে আর এক বিশুদ্ধ রঙ্ দিতে পারবে না, এক বিশুদ্ধ রঙের ক্ষেত্র হতে নানা অর্দ্ধমাত্রা (semi-tone) রঙের পর্দ্দা দিয়ে তারপর আর একটি বিশুদ্ধ রঙের ক্ষেত্রে পৌছাতে হবে। মানে কিন্তু এ নিয়ম মানেননি "অলিম্পিয়া" ছবিতে; তিনি দীপ্ত রঙের বড় বড় ছোপ পাশাপাশি দিয়েছেন; মাঝে আর বর্ণের অর্দ্ধমাত্রা রাখেন নি। এই নবঅঙ্কনপদ্ধতি সালোঁর কর্ত্তৃপক্ষগণ সইতে পারেননি, সর্ব্বসাধারণ বুঝতে পারেনি, কিন্তু সাহিত্যিক-মহলে, রসিকসমাজে "ওলিম্পিয়া" অতিপ্রিয়া হয়ে উঠল। রূপার মত জলজলে, তুষারের মত শীতল ওলিম্পিয়ার মূর্ত্তি যেন বদলেয়ারের সনেট, Fleurs du Mal-র একটি কবিতা।

মানেকে সত্যিকার ইম্প্রেসনিষ্ট বলা যায় না। তিনি প্রথমে ছিলেন কুর্‌বের শিষ্য, তারপর স্প্যানিস চিত্রকরগণ,—ভেলাস্কেথ, এল গ্রেকো, গোইয়া তাঁর আদর্শ শিল্পী হন; পরে মিলে ও কোরোর প্রভাবে তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যে আলো ও বায়ুমণ্ডলের অপরূপ মায়া আঁকতে আরম্ভ করেন। যদিও তিনি ইম্প্রেসনিষ্টদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন, এক প্রদর্শনীতে ছবি দেখিয়েছেন, তাদের অগ্রণী হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তবু তিনি কোনো ইম্প্রেসনিষ্ট প্রোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নি; তাঁর কোন বিশেষ মতবাদ ছিল না। ইম্প্রেসনিষ্টদের মত তিনি প্রকৃতিকে স্বাভাবিক আলোয় আঁকতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে নরনারীর মূর্ত্তি আঁকার প্রতি তাঁর আকর্ষণ অধিক ছিল। তিনি নিছক প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকেননি, তার মধ্যে মানব মূর্ত্তি, মানবীয় ভাব এনেছেন। বার্‌বিজঁর (Barbizon) চিত্রকরদল পারি ত্যাগ ক'রে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দৃশ্য আঁকতে বা'র হয়েছিলেন, মানে চিত্রকলাকে আবার পারিতে ফিরিয়ে আন্‌লেন। পারির আলো-ঝলমল সবুজ উপকণ্ঠ, তার জনস্রোতবহুল আলোকদীপ্ত পথঘাট, ঘরে বসে খোলা জানালা দিয়ে দেখা মানবকল্লোলময় পথে আলোছায়ার রঙের মায়াপট, পারির নব সৌন্দর্য্য তিনি উদ্‌ঘাটিত ক'রে গেছেন—মানবমূর্ত্তির নানা রং ঘিরে সোনালী আলো পথে ঝলমল করে, ছায়াগুলি স্বচ্ছ নীল ও দীপ্ত তাম্র-সবুজে মেশান, গভীর ছায়া যেন কমলালেবুর রঙের মেশান আলো। ইম্প্রেসনিষ্টদের মতন মানে বর্ণময় ছায়া এঁকেছেন, আবার তিনি ভাবময়ী নরনারী মূর্ত্তি এঁকে গেছেন; আলোর লীলা আঁকতে গিয়ে তিনি ভোলেননি যে চিত্রকলা হচ্ছে ভাবব্যঞ্জক মূর্ত্তি আঁকা।

২

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হতেই ফ্রান্সে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে সকল অকৃত্রিমতা অবাস্তবতা দূর করার চেষ্টা চল্‌ছিল। ষ্টুডিওর কৃত্রিম অস্বাভাবিক আলোকে প্রাকৃতিক দৃশ্য না এঁকে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি বসে তার সহজ স্বাভাবিক রূপকে রঙে ও রেখার ছন্দে ধরবার জন্যে একদল শিল্পী নগর ছেড়ে চলে গেলেন গ্রামে, মাঠে, বনে, প্রকৃতির উন্মুক্ত অঙ্গনে, বার্‌বিজঁর স্নিগ্ধ শ্যামল সৌন্দর্য্যালোকে। রুসো, দিয়াজ, দুপ্রে এরা সব প্রকৃতির বাস্তব সৌন্দর্য্যরূপ আঁকতে আরম্ভ করলেন। এই বাস্তব ও স্বাভাবিক অঙ্কনের সাধনা করতে গিয়ে ক্লদ মোনে (Claude Monet) (১৮৪০-১৯২৬) এক নব সৌন্দর্য্যালোকে উপস্থিত হলেন, আলোছায়া-লীলায়িত বিশ্বপ্রকৃতির রূপ তিনি এক অপরূপ নূতন দৃষ্টিতে দেখলেন, যা তাঁর পূর্ব্বের কোন চিত্রশিল্পী দেখেন নি; সেই বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা প্রকৃতির চিত্র আঁকতে বিশেষ অঙ্কনরীতির উদ্ভাবনা হ'ল, সেই রীতি হ'ল ইম্প্রেসনিজম্। ১৮৭৪তে এক চিত্রপ্রদর্শনীতে মোনে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দিয়েছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন, "সূর্য্যোদয়—একটি ইম্প্রেসন।" এই "ইম্প্রেসন্" কথা হতে চিত্রকলা সমালোচকরা মোনে ও তাঁর দলের চিত্রকরদের "ইম্প্রেসনিষ্ট" নাম দিলেন।

মোনে কি বিশেষ সুন্দর নবদৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখলেন, তা প্রথমে বোঝা দরকার। মোনে দেখলেন, আলোই হচ্ছে ছবির সত্যিকার রঙ—light is colour—কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন চিরস্থায়ী রঙ নেই, তার বর্ণ বদলায় আকাশের আলোর সঙ্গে সঙ্গে; আকাশ, বাতাস, গাছপালা, নদী পাহাড় ও তাদের মধ্যে জীবজন্তু সব আলোর দ্যুতিতে ভরা।

যদি একটি সবুজ মাঠ আঁকতে হয়,—শরতের নির্মেঘ সুন্দর প্রভাতে ঘাসভরা মাঠের রঙ দেখাবে সূর্যালোক-ভরা সবুজ; কিন্তু যদি একটি সাদা মেঘ বলাকার মত উড়ে এসে সূর্যকে ঢেকে ফেলে, মাঠে তার ছায়া পড়ে, অমনি মাঠের রঙ বদলে যায়; এই মেঘচ্ছায়াঢাকা সবুজ সূর্যালোকভরা সবুজ থেকে আলাদা; আবার শ্রাবণের কালো মেঘের সমারোহঘন আকাশের তলে এ মাঠের রূপ অন্যরূপ। সুতরাং কোন দৃশ্য বা বস্তু আঁকতে হ'লে দেখতে হবে, তার স্থানিক বর্ণ (local colour) কি, তার বায়বীয় বর্ণ (atmospheric colour) কি, তার দীপক বর্ণ (illumination) কি, ও তার অনুপূরক বর্ণ (complementary colour) কি। এই চারি প্রকার বর্ণের পর্যবেক্ষণ ও সামঞ্জস্য করে দৃশ্য আঁকতে পারলে তবেই সে দৃশ্যের সত্য বর্ণ, বাস্তব রূপ আঁকা হবে—মোনে এই সত্যে এসে পৌছালেন।

বনভরা পাহাড়ের রঙ সবুজ,এ সবুজ তার স্থানিক বর্ণ; কিন্তু দূর হতে সে পাহাড় দেখায় নীল, নীল হচ্ছে স্থানিক বর্ণের সঙ্গে বায়বীয় বর্ণের সংযোগ; আবার পাহাড়ের পিছনে যখন সূর্যাস্ত হয়, সবুজ বন রাঙা হয়ে ওঠে, এই রাঙা রঙ তার দীপক বর্ণ।

ইম্‌প্রেসনিষ্টরা আর একটি কথা বললেন, প্রতি রঙের একটি অনুপূরক রঙ আছে, সে অনুপূরক রঙ না দিলে মূল রঙের দ্যুতিতে তার আলোক প্রভাব প্রকাশিত হয় না। কোন রঙকে দ্যুতিময় করতে হ'লে তার পূরণাত্মক রঙটি তার পাশে দেওয়া দরকার। দেলাক্রোয়া বহুদিন আগেই এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন; আলোকদীপ্ত মরক্কোতে দেলাক্রোয়া দুটি চাষার ছেলে আঁকতে গিয়ে দেখেন, যে ছেলেটির মুখের রঙ হলদে, তার মুখের ছায়ায় রয়েছে ভায়লেট; আর যে ছেলেটির মুখের রঙ লাল তার মুখের ছায়া হচ্ছে সবুজ; সুতরাং ছায়া বর্ণময়, ধূসর বা কালো রং প্রকৃতিতে কোথাও নেই; মূল রঙের পাশে তার ছায়ার সত্যিকার রঙ দিতে পারলেই তবে সে মূল রঙ হবে দীপক।

রং হচ্ছে আলোর দৃষ্টি; রং বস্তুর গুণ নয়, আলোর গুণ, আলোর মায়াখেলা; আলোই সব বস্তুর বর্ণের নির্দ্দেশক, নিদ্ধারক, চিত্রকর আলো আঁকতে পারলেই বস্তুর স[illegible]র রং আঁকতে পারবেন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য বায়ুমণ্ডলে ঘেরা, আলোর ধারায় ধোওয়া, আলোছায়ায় লীলায়িত, সুতরাং কোনো দৃশ্য আঁকতে হ'লে বায়ুর রং, আলোর রং, ছায়ার রং, সব রং ধরতে হবে তুলির রঙের ছোপে, তবেই চিত্রপট হবে প্রকৃতির সৌন্দর্যের দর্পণ। পুরাতন চিত্রকরগণ কোন বস্তু আঁকতে গিয়ে দেখতেন বস্তুর রং চোখে কি দেখাচ্ছে, কিন্তু ইম্‌প্রেসনিষ্ট শিল্পী প্রথমে দেখলেন বস্তুর চারিদিকের বায়ুমণ্ডলের রং কি—কারণ বাতাস শুকনো হ'লে মাঠের এক রঙ হবে, [illegible] আর এক রং হবে—বাতাস গতিচঞ্চল না স্থির, রৌদ্রভরা না জলভরা, আকাশ মেঘে ঢাকা, না সূর্যালোকদীপ্ত, মেঘগুলি নৌকার পালের মত ধীরে চলেছে, না ছুটে চলেছে মত্তহস্তীদলের মত— এ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে, কারণ এদের প্রভাবে বস্তুর বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। বস্তুর কোন চিরন্তন রূপকে কোন স্থায়ী রূপকে নয়, শুধু কোন বিশেষ ক্ষণের আলোকসম্পাতে [illegible] দৃশ্যমান চক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেই ক্ষণিকস্থায়ী রূপকে চিত্রে চিরস্থায়ী ক'রে রাখতে হবে।

ইম্‌প্রেসনিষ্ট চিত্রশিল্পীর চোখে কোন বস্তু বা দৃশ্য খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশিত হ'ল না, এক অখণ্ড রূপ সমগ্র ভাবে অলৌকিক দর্শনরূপে (vision) উদ্ভাসিত হ'ল, আলো হচ্ছে তার মধ্যবিন্দু। সেজন্য চিত্রগুলি আলোক-পরিপ্রেক্ষিত; বস্তুর স্থূলমূর্ত্তি বা রেখাচিত্র আঁকা নয়, রঙের ছোপে আলো-ঝলমল রঙীন পট আঁকা হ'ল চিত্রকলা, এ যেন চিরপ্রবহমান কোন বর্ণের ঝরণা, দুলছে, কাঁপছে, টলছে, ঝলমল করছে। ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপসৌন্দর্যপ্রকাশিনী প্রকৃতির এই প্রতীয়মান মায়া আঁকতে ইম্‌প্রেসনিষ্ট শিল্পীকে নূতন চিত্র অঙ্কন-পদ্ধতির সন্ধান করতে হ'ল।

দেখার নূতন ভঙ্গী হতে উদ্ভাবিত হ'ল আঁকার নূতন রীতি। ইম্‌প্রেসনিষ্টরা প্রথমে পুরাতন বর্ণদানির সংস্কার করলেন। আলোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ এ বিষয়ে তাঁদের বিশেষ সাহায্য করল।

ইয়োরোপের পুরাতন চিত্রশিল্পীদের বর্ণতত্ত্বে মৌলিক বর্ণ ছিল তিনটি—লাল, নীল, হলদে। কিন্তু ইম্প্রেসনিষ্ট শিল্পিগণ দেখলেন, আলোর মৌলিক বর্ণ হচ্ছে—সবুজ, কমলালেবু-লাল, ও লাল বেগুনে। আলো আঁকতে হ'লে সূর্য্যের আলোর যে সাত রঙ রামধনুতে ছড়িয়ে পড়ে, সেই সাত রং দিয়ে আঁকতে হবে। প্রকৃতিতে কালো রঙ কোথাও নেই, শিল্পীর বর্ণদানিতেও কালো রঙ থাকবে না। ইম্প্রেসনিষ্টদের রঙ হ'ল—ইন্‌ডিগো, নীল, সবুজ, হলদে, কমলালেবুর রঙ, লাল, ভায়লেট,—রামধনুর সূর্য্যাবর্ণ সাত ছয়ের বর্ণ।

১৮৭৪তে মোনে, পিসারো, রেনোয়ারের বর্ণদানিতে ছিল—হলদে, কমলা, সিঁদুর, লেক, লাল, ভায়লেট, নীল, সবুজ ও মরকতমণির বর্ণ।

ইম্প্রেসনিষ্টদের আদর্শ হ'ল, 'donner à la couleur le plus d'éclat possible' অর্থাৎ রঙকে যতদূর সম্ভব দ্যুতিময় ক'রে তোলা, প্রকৃতির আলোকদীপ্ত বাস্তব রঙের ছবি আঁকা, চিত্রপট হবে রঙের দীপালী। এই আদর্শ সফল করতে তাঁরা বর্ণদানির সংস্কার করলেন, তারপর নব অঙ্কনরীতির প্রবর্ত্তন করলেন।

এ অঙ্কনরীতি হ'ল বিভাগনীতি। এক রঙের সঙ্গে আর এক রঙ বর্ণদানিতে মিশিয়ে ছবি আঁকলে রঙের জৌলুস থাকে না, কিন্তু রং দ্যুতিময় না হলে প্রকৃতির পটে আলোর ঝলমলানি কি করে চিত্রপটে আসবে? ইম্প্রেসনিষ্টরা পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে, দুটো বিভিন্ন রঙ মিশিয়ে যখন একটা নতুন রঙ তৈরী করার দরকার হয়, তখন সে দুই রং বর্ণদানিতে না মিশিয়ে যদি সেই বিভিন্ন রঙের ছোপ চিত্রপটে পাশাপাশি দেওয়া যায়, তাহ'লে চোখে সে দুটো রঙ মিশ্রিত হয়ে নতুন রঙ দেখাবে, আর এই চোখের দৃষ্টিতে সম্মিলিত নতুন রঙের দীপ্তি বর্ণদানিতে মিশ্রিত রঙের চেয়ে অনেক বেশী। যেমন ধরা যাক, ধূসর বর্ণ; বর্ণপাত্রে দুই বিভিন্ন বর্ণ মিশ্রিত ক'রে যে ধূসর রঙ তৈরী হবে তার কোন লাবণ্য নেই, কিন্তু পটের উপর ভায়লেটের পাশে হলদে-সবুজের ছোপ দিয়ে যে ধূসর রঙের সৃষ্টি হবে, তা জলজ্বলে, আলো-ভরা। পটের উপর পাশাপাশি বিশুদ্ধ নানা রঙের ছোপে নতুন রঙ তৈরী করে ছবি আঁকার রীতি ইম্প্রেসনিষ্টদের নানা প্রচেষ্টা, পরীক্ষা, গভীর সাধনার ফল।

ইম্প্রেসনিষ্ট অঙ্কনরীতির নূতনত্ব হচ্ছে—

প্রথমতঃ, বর্ণদানির রঙ সূর্য্যবর্ণচক্রের সাত রং হবে, পুরাতন শিল্পীদের বর্ণদানির কালো ধূসর, সব মেটে রং হবে নির্ব্বাসিত।

দ্বিতীয়তঃ, কোন বস্তু বা দৃশ্য আঁকতে হ'লে তার রঙ পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে চারভাবে,—স্থানিক, বায়বীয়, দীপক ও অনুপূরক রঙ।

তৃতীয়তঃ, এই চার রঙের সামঞ্জস্য, ভারসাম্য ক'রে দৃশ্য আঁকতে হবে।

চতুর্থতঃ, রঙ আর রঙদানিতে মেশান হবে না, পটের উপর তুলির টানে, ছোপে, বিন্দুতে নানা রঙের সম্মিলন হবে। দ্রষ্টার চক্ষে এই বর্ণসম্মিলন পদ্ধতি (mélange optique) দ্বারা রঙ হয় আলোকময় নবসৌন্দর্য্যমণ্ডিত।

৩

ইম্প্রেসনিষ্টদের মতবাদ বুঝে নিয়ে মোনের রঙে উজ্জ্বল চিত্রজগতে প্রবেশ করলে তার আশ্চর্য্য প্রতিভা বোঝা যায়। ছবিতে যা প্রথমে অভিনব অদ্ভুত মনে হতে পারে, তা নবদৃষ্টির সৌন্দর্য্যসন্ধান, নবপ্রতিভার অপরূপ সৃষ্টি, শিল্পীর গভীর সৌন্দর্য্যানুভূতি। মোনের চিত্রগুলি প্রথমে দেখলে মনে হয়, যেন রঙের আতসবাজী, নানা চমকপ্রদ বর্ণ সাজানোর পাগলামি, কিন্তু সত্যি খামখেয়ালী কোথাও নেই, প্রকৃতিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখার পর তার আলোছায়ার রঙের সকল মাত্রা অর্দ্ধমাত্রা পরম অধ্যবসায়ের সহিত পর্য্যবেক্ষণ বিশ্লেষণের পর তবে প্রতি তুলির টান প্রতি রঙের ছোপ পটে দেওয়া হয়েছে; এ রূপলোক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, বৈজ্ঞানিক বর্ণতত্ত্বের উপর স্থাপিত, শিল্পীর খেয়াল নয়।

মোনের চিত্রজগৎ হচ্ছে আলোর জয়গান।

মোনে প্রথমে পুরাতন পদ্ধতিতে ছবি আঁকা আরম্ভ করেন, কোরো (Corot) ও কুরবের (Courbet) বর্ণপাত্র নিয়ে। কামিয়ে (Camille) ছবিতে মানে-র প্রভাব

বিশেষ ভাবে দেখা যায়। ধীরে ধীরে তিনি পুরাতন অঙ্কন পদ্ধতি ছেড়ে নতুন রীতির সন্ধান করতে লাগলেন ১৮৭১এতে শিল্পীবন্ধু পিসারোর সঙ্গে তিনি লণ্ডন যান। লণ্ডনে টার্ণারের ছবিগুলি দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন, এ আলোর দীপ্তিভরা অভিনব সৌন্দর্য্য লোক, এ আলোর দ্যুতি টার্ণার কোন্ অঙ্কনরীতির সাহায্যে সৃষ্টি করতে পেরেছেন? টার্ণার তার আকাশ বাতাস সমুদ্র আঁকতে বিশুদ্ধ অমিশ্রিত রং ব্যবহার করেছেন, তার রঙ মিশ্রিত হয়েছে, রংদানিতে নয়, পটে দ্রষ্টার দৃষ্টিতে। টার্ণারের তুষারের শুভ্রতা মোনেকে বিমুগ্ধ বিস্মিত করলে। তুষার এমন শুভ্র আঁকা যেতে পারে তা তিনি ভাবেন নি; এ শুভ্রতা হয়েছে পটের উপর নানা রঙের ছোপ পাশাপাশি সাজিয়ে। টার্ণারের আঁকবার নব রীতি দেখে মোনে ইম্‌প্রেসনিষ্ট অঙ্কন-পদ্ধতির সন্ধানে মেতে উঠলেন।



মোনে—"টেমসের তীরে পার্লামেণ্ট"

ফ্রান্সে ফিরে এসে তিনি মানুষের মূর্তি আঁকা ছেড়ে দিলেন, প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি বসে দীপ্ত আলোর চঞ্চল লীলা রঙের পটে ধরতে পাগল হয়ে গেলেন।

মোনের ছবির মূল বিষয় হচ্ছে [illegible] আলোর খেলা; একই দৃশ্য, একই দৃশ্যের উপর [illegible] বিভিন্ন সময়ে প্রতিফলিত হয়ে [illegible] বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করে তাই তিনি [illegible]



মোনে—[illegible]

সাধকের মত এঁকে গেছেন। [illegible] প্রসিদ্ধ [illegible] (Hay-ricks), [illegible] (Poplars), [illegible] (Rouen Cathedral), কুমুদ (Water lilies), টেমস [illegible] (Thames)।

একটি [illegible] সকাল [illegible] আলোকে তার [illegible] সন্ধ্যালোকে তার [illegible] মলিন মাধুরী [illegible] সকালের ঘাসের গাদার ছবি দুপুরের [illegible] ছবির সঙ্গে এক হবে না। মোনের [illegible] ছিল, সকালের আলো হতেই তিনি অনেকগুলি [illegible] নিয়ে মাঠে গিয়ে বসতেন; সকালের আলোয় [illegible] আঁকতে আরম্ভ করতেন, কিন্তু সকালের আলো যেই দুপুরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, অমনি তিনি নতুন পটে দুপুরের ঘাসের গাদার ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন; যেমি দিনের বিভিন্ন সময়ের আলোকে উদ্ভাসিত একই ঘাসের গাদার বিভিন্ন রঙের কুড়িখানি ছবি তিনি এঁকে গেছেন। [illegible] বিশটি ঘাসের

গাদার চিত্রপর্য্যায়ে প্রতি চিত্রে ঘাসের গাদার সৌন্দর্য্য বিভিন্ন, সে বিভিন্নতার সৃষ্টি করেছে চঞ্চল আলোর লীলা। মোনের প্রভাতের ছবিতে যেমন জাগরণপূর্ণ আলোর আনন্দ অনুভব করা যায়, দুপুরের ছবিতে তেমনি আলোর



মোনে—"রুয়ঁ ক্যাথিড্রাল"

তেজ, তার দহনজ্বালার স্পর্শ পাওয়া যায়, দুই চক্ষু যেন তার প্রখর দীপ্তিতে অন্ধ হয়ে আসে, চিত্রপট হতে আলোর জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়। আকাশ বাতাস গাছপালা নদী সমুদ্র পাথর সবার উপর চঞ্চল আলোর বর্ণকে বিশ্লেষণ করবার অত্যাশ্চর্য্যকর ক্ষমতা এবং সেই বিশ্লেষিত বর্ণগুলিকে পটের উপর রঙের ছোপের পর ছোপে বিন্যাস ক'রে সমন্বয় ক'রে প্রকৃতির আলোক-দীপ্তিকে চিত্রপটে সৃষ্টি করার অদ্ভুত শক্তি তাঁর মত আর কোন চিত্রশিল্পীর মধ্যে দেখা যায় না। সেজান (Ce'zanne) বলেছিলেন, মোনের চোখ কি সাংঘাতিক চোখ! এ সতেজ বিশ্লেষক দৃষ্টি কোনো ইম্প্রেসনিষ্ট শিল্পীর ছিল না।

সূর্য্যালোকিত আকাশ, উন্মুক্ত শ্যামল বন, আলো টলমল জলধারা, প্রকৃতির পঞ্চভূত হচ্ছে মোনের অতি প্রিয়, এই আলো-ঝলমল প্রকৃতি তাঁকে বার বার ভুলিয়েছে। তাঁর আঁকা সূর্য্যালোকধৌত বায়ুমণ্ডলে পরিবেষ্টিত শ্যামল বন, বৃক্ষের সারি, নদীর তট, সমুদ্রের কূল, সকল ছবি যেন স্থির কঠিন মাটির, ভাবময় বস্তুর ছবি নয়, তাদের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত দ্যুতিময় বায়ুমণ্ডলের বর্ণের লীলার ছবি; আমাদের বিমুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে যে প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণের বিরাট নদী টলমল ক'রে প্রবাহিত, তারই কোন অপূর্ব্ব ক্ষণের সুন্দর রূপ পটেতে আঁকা। বস্তুপুঞ্জ অলীক অবাস্তব; সত্য হচ্ছে এই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল রঙের ঝলমলানি; আলোর আঘাতে রঙের তরঙ্গের পর তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে নানাবর্ণময় বস্তু ফুটে উঠছে বুদ্‌বুদের মত, সেই রঙের তরঙ্গোচ্ছ্বাস আঁকাই শিল্পীর কাজ। এই রঙের মায়া প্রকৃতি যে রীতিতে সৃষ্টি করছে, সেই রীতি অনুসরণ ক'রে মায়ারূপ ধরতে হবে পটে।

ক্যাথিড্রাল ছবিপর্য্যায় মোনের প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। রুয়ঁ ক্যাথিড্রালের সম্মুখভাগ, মূর্ত্তিখোদিত কারুকার্য্যময় কালো পাথর, বহু শতাব্দীর প্রাচীন প্রস্তরস্তূপ; এচিঙের পক্ষে বিষয়টি ভাল, কিন্তু এই কালো গির্জ্জার তোরণের শতাব্দীমলিন প্রস্তরের উপর কি অপরূপ আলোর রঙের লীলা হয়, মোনে ছাড়া এ সৌন্দর্য্য আর কোন চিত্রকর দেখাতে পারতেন না। এক ক্যাথিড্রালের সম্মুখদেশ নিয়ে তিনি সতেরখানি ছবি এঁকে গেছেন, প্রতি ছবিতে ক্যাথিড্রালকে নতুনরূপে দেখতে পাই, তার কোন অজানা সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হয়। পাথরের স্থানিক বর্ণ দিনের বিভিন্ন সময়ের আলোর বায়বীয় বর্ণের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়, প্রভাতে রাঙা আলোয় যে পাথর ঈষৎ বিবর্ণ লাল গোলাপের মত, দুপুরের সূর্য্যতাপে তা হয়েছে আনীল-লোহিত, আবার সন্ধ্যার অস্তগামী সূর্য্যের আভায় সে পাথর জ্বলজ্বল করে সোনার মত, রক্তের মত। পাথরের প্রতি কণা আলো পান করছে, সেই আলোর রঙের সঙ্গে তার রূপ বদল হয়, যা ছিল স্থির, দৃঢ়, কঠিন বস্তুপুঞ্জ, আলোকসম্পাতে রঙীন দ্যুতিময় বায়ুমণ্ডলে

সে প্রস্তরস্তূপ সুন্দরীর রঙীন অঞ্চলের মত ঝলমল করে, এ যেন চুনীপান্না হীরা নানামণিমাণিক্যখচিত কোন অপরূপ পট।

মোনের আঁকা লণ্ডনের ছবিগুলি নগর-জীবনের জনস্রোতময় পথের ছবি নয়; প্রেমিকের মত তিনি টেম্‌স-নদীর রূপ এঁকেছেন। তাঁর আঁকা লণ্ডনের আকাশ ফ্রান্সের আকাশের মত সূর্য্যালোকিত নয়, কুয়াসার অবগুণ্ঠনে ঢাকা। লণ্ডনের ছবিগুলি হচ্ছে এই কুয়াসার উপর আলোর রঙের লীলা। কুয়াসার পর্দার ভেতর দিয়ে রঙ ফোটাবার জন্য আলোর যে বেদনা, যে সংগ্রাম, কুয়াসায় ঢাকা হয়ে নদীজলের যে অস্পষ্টতা, বাড়িঘরের যে আবছায়া অপরূপ মূর্ত্তি—এ-সব তিনি এঁকে গেছেন অত্যাশ্চর্য্যকর বাস্তবতার সঙ্গে। প্রথমে তাঁর ছবি দেখে যা অলীক মনে হবে, ছবি দেখার পর সেরূপ একটি দৃশ্য দেখলে মনে হবে সত্যিই ত প্রকৃতির এ নবরহস্যময় সৌন্দর্য্য ত আগে চোখে পড়েনি; মোনে অবাস্তব কোথাও আঁকেননি।

মোনের কাছ থেকে আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগের এক নবদৃষ্টি লাভ করেছি। তাঁর চিত্রজগৎ থেকে আমরা যখন আবার বাস্তব প্রকৃতির অঙ্গনে যাই, কোন সূর্য্যালোকিত প্রভাতে ঝলমল নদীজলের শ্যামল তীরে বসি, বিজন মধ্যদিনে বাতায়ন থেকে ফুলশোভিত উপবনের দিকে চেয়ে থাকি, সন্ধ্যার রঙীন আলোয় কোন প্রাচীন গির্জ্জার সম্মুখে দাঁড়াই, প্রতি দৃশ্যে আমরা এক নব আনন্দরস পাই; ঘরবাড়ি গাছপালা নদীজল আকাশের আলো সব এক অখণ্ডযোগে রঙের দ্যুতিমণ্ডিত হয়ে অপরূপ মূর্ত্তি নেয়। প্রকৃতির নানাবর্ণের সুন্দর দৃশ্যের নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে, বিপুলা, চিরচঞ্চলা, তারই এক একটি দৃশ্য চক্ষে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, মনে হয় চিরন্তন এ দৃশ্য, কিন্তু প্রকৃতি কখন যে পুরাতন দৃশ্যের উপর নতুন আলো, নতুন রঙের তুলি বুলিয়ে নব দৃশ্য চোখের সামনে ধরেছে, তা বুঝতে পারা যায় না, এ বহুরূপিণী একদিকে ক্ষণিকা অপরদিকে চিরন্তনী। তারই রঙের ঝরণাতলায় হৃদয়ের পাত্র ভরে নিতে হবে দুই চক্ষু দিয়ে।

৪

রেনোয়ার (Pierre Auguste Renoir, ১৮৪১—১৯১৯) ছিলেন ইম্‌প্রেসনিষ্ট চিত্রশিল্পীদের বন্ধু, তাঁদের সঙ্গে এক চিত্রপ্রদর্শনীতে ছবি দেখিয়েছেন, তাঁদের অঙ্কনরীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু ইম্‌প্রেসনিষ্টদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে মানতে চান নি। চল্লিশ বছর ধরে তিনি নানা রকম ছবি এঁকেছেন, মোনের মত কেবল



রেনোয়ার—"বাগানে প্রাতরাশ"

আলোকময় প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, আলেখ্য, নারী, বিশেষতঃ নগ্নানারীর তনু, সমুদ্রের দৃশ্য, নানা ফুলফল, উন্মুক্ত স্থানে সামাজিক বৈঠক ইত্যাদি নানা বিষয়ের চিত্র তিনি এঁকে গেছেন।

একদিকে তিনি যেমন ইম্‌প্রেসনিষ্ট অঙ্কনরীতি অবলম্বনে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে চেয়েছেন, ছায়াতে ভায়লেট রং দেখেছেন, আলোর দ্যুতি পটে ধরতে চেয়েছেন, তেমনি তিনি শ্রেষ্ঠ পুরাতন চিত্রকরদেরও গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর চিত্রাঙ্কনের প্রথম পর্ব্বে বুশের প্রভাব খুব দেখতে পাওয়া যায়। তারপর টিশিয়ান, ভেলাস্কেথ, রুবেন্‌স্‌, ভেরোনিজ হ'ন

তাঁর প্রিয়। পুরাতন চিত্রকরদের প্রাচীন চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির সঙ্গে নবীন ইম্‌প্রেসনিষ্ট রীতির সমন্বয় ক'রে রেনোয়ার তাঁর নিজস্ব এক স্নিগ্ধমধুর সুষমাময় চিত্রকলার সৃষ্টি করেছেন। ইমপ্রেসনিষ্টদের মত প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি ব'সে তার আলোকদীপ্তি, তার বাস্তবতা আঁকতে যেমন চেষ্টা করেছেন তেম্‌নি লুভরের শিল্পগুরুদের কাছ থেকে পাঠ নিতে ভোলেন নি।



রেনোয়ার—"নিদাঘে"

সবচেয়ে সুন্দর তাঁর নারীসৌন্দর্য্যের চিত্রগুলি। "স্নানার্থিনী" ছবিগুলি তাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টি; সদ্যস্নানস্নিগ্ধ লাবণ্যরসটলমল নারীদেহের অপরূপ দ্যুতিকে এমন মধুর, এমন স্বপ্নময় করে আর কোন চিত্রশিল্পী আঁকতে পারেন-নি। টিশিয়ান, রুবেন্‌স নারীকে যে রূপে দেখে এঁকে গেছেন সে-দেখার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ইম্‌প্রেসনিষ্টের চোখের দেখা; এই নবদৃষ্টি রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত দীপ্তলাবণ্যময়, শ্রাবণের ভরা স্রোতস্বিনীর মত হৃদয়াবেগময়। রুবেন্‌সের নারীমূর্ত্তি রেনোয়ারের তুলিতে হয়েছে স্নিগ্ধ মাধুর্য্যভরা, আলোর রঙীন স্বপ্নময়, তাতে কামনার জ্বালা নেই, বেদনার আবেগ নেই, স্থূল বাস্তবতা নেই, রূপের প্রখর দীপ্তি নেই; এ সৌন্দর্য্যস্বপ্ন যেমন স্বাভাবিক, তেমনি মন উদাস করা। রেনোয়ারের নারীচিত্রগুলির এই lyrical sweetness-এর জন্য তিনি সবার প্রিয়। টিশিয়ান ও রুবেন্‌সের পর নারীদেহের লাবণ্যকে তাঁর মত কোন চিত্রকর আর এঁকে যান নি। মোনে যে ইম্‌প্রেসনিষ্ট অঙ্কনরীতিদ্বারা নদীজলে আলোর ঝলমলানি, ঘাসের গাদায় আলোর রঙের লীলা এঁকে গেছেন, সেই রীতি রেনোয়ার অনুসরণ করলেন জলে ভেজা, আলোয় ধোওয়া নারীর দেহ আঁকতে; দেহ নয়, দেহের আভা হ'ল তাঁর আঁকার বিষয়; দেহের দ্যুতির সঙ্গে আলোর দীপ্তির মিলন হয়ে অপরূপ লাবণ্যের সৃষ্টি হ'ল, সেই রূপ-মায়া বড় মধুরভাবে বড় আবেগের সঙ্গে তিনি এঁকে গেছেন্। তাঁর এই ছবিগুলি অতুলনীয়।

৫

সিসলে (Alfred Sisley ১৮৩৯-১৮৯৯) ছিলেন জাতিতে ইংরেজ; তাঁর জন্ম হয় পারিতে ও তিনি সম্পূর্ণ ফরাসীভাবাপন্ন। মোনের লিরিক সৌন্দর্য্য, গভীর হৃদয়বেগ তাঁর ছবিতে হয়ত পাওয়া যাবে না, কিন্তু আলো আঁকার দক্ষতায় তিনি মোনের সমকক্ষ। সেন নদী, টেম্‌স্, আলো, জল, নদীতীরের সবুজ শোভা মোনের মত তিনি ভালবাসতেন, নদীর নানারূপ এঁকে গেছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে আকাশ, তাঁর সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রের মধ্যে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ আকাশ স্বপ্নময় সুষমা ভ'রে দিয়েছে; ফ্রান্সের আলোভরা আকাশ খুব কম চিত্রকরই তাঁর মত আঁকতে পেরেছেন। আলোঝলমল সবুজ দুই তীরের মধ্য দিয়ে টলমল নদীজলধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, দুধারে ফুলভরা কুঞ্জ, ফলের বাগান, ছোট পাহাড়ের উপর লালছাদওয়ালা গ্রামগুলি সূর্য্যালোকে জলজল করে, জলের রূপালি ধারা দূরে দিগন্তে নীলাকাশের সঙ্গে মিশে গেছে, অপূর্ব্ব মায়াময় আকাশ—Ile de France। সেন নদীর নানা দৃশ্যগুলি সিসলের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী। জলের ছবি যে কি অনুপম শক্তিতে আঁকা যায়, তা তাঁর "বন্যা" ছবি দেখে বোঝা যায়।

কামিয়ে পিসারো (Camille Pissarro ১৮৩০-১৯০৩) ছিলেন আমেরিকান ইহুদী ফরাসী। প্রথমে তিনি



সিসলে—"নদীতীর"

কোরোর প্রভাবে আসেন, তারপর মোনের ইম্প্রেসনিষ্ট দৃশ্যাবলীর মায়া তাঁকে ভুলায়—বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, সূর্যা-



পিসারো—"কিশোর ঢোল-বাদক"

লোকিত বনভূমি,মেঘভরা উন্মুক্ত আলোক তাঁর। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি সুন্দর, কিন্তু নিছক প্রকৃতির অপেক্ষা আলোকদীপ্ত নগরের জনতাভরা প্রশস্ত পথের দৃশ্যগুলি আরও ভাল লাগে। পিসারোর পটের পথের চিত্রগুলি, বুলভারগুলি পরম দক্ষতা ও নবসৌন্দর্য্যময় দৃষ্টির সহিত অঙ্কিত, প্রাসাদাবলী, বৃক্ষশ্রেণী, জনতা—সবার সুন্দর সুসমাবেশ, তাহাদের ঘিরে আলোকের তরঙ্গোচ্ছ্বাস; গতিময় জনতার, আলোকফুল্ল নগরের প্রাণের স্পর্শ পাই ছবিগুলিতে।

মাটির প্রতি পিসারোর নিবিড় অনুরাগ। শীতের শেষে বসন্ত আগমনের আভাসভরা ধরিত্রীর প্রভাতের রূপ "মার্চমাসের সূর্য্যে" কি সুন্দর ফুটে উঠেছে! হলদে-সবুজের সঙ্গে হলদে ও নীলের রংভরা এই প্রথম বসন্তের শোভাচিত্র ইম্প্রেসনিজমের এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

মোনে কোন বিশিষ্ট মতকে স্থিরনিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি, তিনি যে-সব অঙ্কনরীতি অনুসারে ছবি এঁকেছেন, সে-রীতি তাঁর শিল্পসাধনার, তাঁর অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু তাঁর অনুবর্ত্তী ইম্প্রেসনিষ্টগণ অঙ্কনরীতিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন দৃঢ় ক'রে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর। ইম্প্রেসনিষ্টদের সাতরঙের বর্ণদানি তাঁরা গ্রহণ করলেন, কিন্তু তার সঙ্গে আনলেন বর্ণের অনুপূরকতত্ত্ব বর্ণবিজ্ঞান অনুসারে।

ইম্প্রেসনিষ্টরাও বর্ণের অনুপূরকতত্ত্ব মানতেন, কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁদের নির্দ্ধারক ছিল চোখ, কিন্তু নিও-ইম্প্রেসনিষ্টদের হ'ল বিজ্ঞান। যেমন, ধরা যাক, নীল স্লেট-ছাওয়া ছাদের বাড়ি আঁকতে হবে, নিও-ইম্প্রেসনিষ্ট শিল্পী বাড়ির দিকে প্রথমে চাইবেন না, তিনি প্রথমে দেখবেন আকাশের রঙ কি, যদি আকাশের রঙ কমলালেবুর রঙ হয়, তবে বাড়ীর ছাদ হবে নীল কমলালেবুর রঙ, কিন্তু তার সঙ্গে সাদারঙের ছোপ দিতে হবে আর থাকবে সবুজ রঙের ছোপ; এ সবুজ রঙ ছাদে নেই, আকাশে নেই, কিন্তু এ হচ্ছে কমলালেবু-নীল রংএর প্রতিপূরক রং; চোখ অজানাভাবে এ সবুজ রং দেখছে বৈজ্ঞানিকমতে; সুতরাং এ সবুজ রঙ দিতে হবে, কমলালেবু-নীলের সঙ্গে।

নিও-ইম্প্রেসনিষ্টরা আর একটি নূতন রীতির

প্রবর্ত্তনা করলেন। তাঁরা বললেন, এক বিশুদ্ধ রঙ আর এক বিশুদ্ধ রঙের সঙ্গে বর্ণদানিতে ত মিশ্রিত হবেই না, পটেতেও যে মিশ্রিত হবে তা ইম্‌প্রেসনিষ্টগণ যে-ভাবে মিশ্রণ করেছেন তুলির লম্বা টান দিয়ে—সে-ভাবে হবে



সিঁঞাক—"বন্দরে"

না; এক রঙের ছোপের পাশে আর এক রঙের ছোপ পড়বে; দুই রঙের ছোপ পাশাপাশি থাকবে, দর্শকের চোখের দৃষ্টিতে তাদের মিলন হবে। এই রঙের ছোপ হবে ছোট বিন্দুর মত; তুলির টান আর প্রশস্ত ও লম্বা রইল না, হ'ল বিন্দুময়। এই নবরীতির নাম হ'ল Pointillism, বিন্দু-অঙ্কনরীতি। রঙের প্রতিমাত্রা ভাগ ক'রে সে রঙ পটের উপর ফুটিয়ে তুলতে হবে রঙের বিন্দুর পর বিন্দু পাশাপাশি বসিয়ে, বিন্দুগুলি ছোট-বড় হবে না।

চিত্র বিন্দু-অঙ্কনরীতিতে হয়ে উঠল মোজেয়িক আর্ট, নানা রঙের বিন্দুর জাল বোনা—যেন নানা মণিমাণিক্য-খচিত পট।

স্যরা (Seurat, ১৮৫৯-১৮৯১) ও সিঞাক্ (Signac, ১৮৬৩—) হলেন এই পোয়াঁতিলিজ্‌মের পাণ্ডা। কিন্তু আর্ট যখন শিল্পীর দর্শন, প্রাণের অনুভূতি, সৌন্দর্য্যের সাধনা না হয়ে বিজ্ঞানের নিয়ম পরিচালিত রীতির দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ হ'ল, তখন তার আর কোন প্রাণ, কোন সুষমা রইল না। ইম্‌প্রেসনিষ্ট-অঙ্কনরীতিকে নিও-ইম্‌প্রেসনিষ্টরা



স্যরা—"বেড়াবার বাগান"

এমন রূপ দিলেন যে, ইম্‌প্রেসনিষ্ট শিল্পীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যদর্শনের চক্ষু অন্ধ হ'ল। ইম্‌প্রেসনিজম্ হয়ে এল জীবনহীন; সৃষ্টি নয়, বৈজ্ঞানিক বর্ণতত্ত্ব অনুসারে আঁকার পরীক্ষা। বস্তুর রেখা-রূপ, তার সৌন্দর্য্যবিন্যাস চলে গিয়ে ছবি হয়ে উঠল, নানা রঙের প্রতিফলক এক রঙীন ক্ষেত্র, নানা রঙের বিন্দুর জালে রঙের পর্দ্দার সংযোগে এ ক্ষেত্র গড়া; বস্তুর কোন মূর্ত্তি নেই, কেবলমাত্র আলোর দ্যুতি। এই অঙ্কনরীতির প্রতিক্রিয়ারূপে এল এক্সপ্রেসনিজম্।

৭

আলো হচ্ছে জীবনের, আনন্দের প্রতীক। ইম্‌প্রেসনিষ্ট চিত্রকরদের আলোকভরা ছবিগুলি চঞ্চল জীবনের আনন্দময় উচ্ছ্বাসে ভরা; প্রকৃতি,নরনারী, পৃথিবীকে আমরা নব আনন্দময় রূপে দেখতে পাই; এই নদী বন পাহাড় মাঠ, এই জলস্রোতকূল বৃক্ষসারিশোভিত পথ, সব আলোর দ্যুতিতে আনন্দের সুরে ভরা; কোথাও কদর্য্যতা, বীভৎসতা নেই; অন্তরের বেদনা, জীবনের সমস্যা, শক্তির

সংঘাত, দুঃখের সংগ্রাম—ইম্‌প্রেসনিষ্ট শিল্পীর কাছে এ সব অলীক।

আমাদের চোখে এ প্রতীয়মান জগৎ একদিকে রঙের জগৎ, আর একদিকে গতির জগৎ ; এই রঙের ধারা গতির সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, আলোর বন্যার চঞ্চল তরঙ্গাঘাতে বস্তুর স্থূলরূপ ভেঙে গিয়ে রঙের পর রং ফুটে উঠছে ; আমাদের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে নব নব সৌন্দর্যরূপিণী প্রকৃতির যেন কোনো রঙীন অঞ্চল দুলছে, কাঁপছে, ঝলমল করছে,—আলোকোদ্ভাসিতা আনন্দময়ী। ইম্‌প্রেসনিজম্‌ আমাদের সৌন্দর্য উপভোগের দৃষ্টি দিয়েছে। *

* প্রবন্ধটি লিখতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে---

(1) Die Kunst des Realismus und des Impressionismus von E. Waldmann.
(2) d'Eugène Delacroix au Neo-Impressionnisme par Paul Signac.
(3) Manet par J. E. Blanche.
(4) Claude Monet par Camille Mauclair
(5) The French Impressionists by Camille Mauclair.
(6) Outline of Art by Sir William Orpen.

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

৩

সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর অজয়ের অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল, কিন্তু তখনও রৌদ্রের দীপ্তি মরিয়া যায় নাই ; শুভ্র সমুজ্জ্বল কম্পিত জলরাশি, বিস্তীর্ণ বালুকাবেলার উপর আলোছায়ার ছুটাছুটির প্রতিযোগিতা, নির্ম্মল নীলাকাশে খণ্ডমেঘের আলিপনা, দিগন্তপ্রসারী শ্যামল প্রান্তর, তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন গ্রামরেখা, এ-সমস্তের দিকে চাহিয়া তাহার ঘুমাইতে ইচ্ছা করিল না। একবার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বদিনের সহযাত্রিণীদের সন্ধান সে করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের দর্শনলাভ অনায়াসসাধ্য নহে বুঝিতে পারিয়া সে স্থির করিল, পল্লীলক্ষ্মীর প্রসন্ন স্নেহস্পর্শের মত যে শ্যামল স্নিগ্ধতার প্রসাদকে সে আজ তার দুই চোখের দৃষ্টি এবং হৃদয় ভরিয়া লইয়া আসিয়াছে, সম্প্রতিকার মত সেই সম্পদই তাহার নয়ন-মনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এ জীবন বৃহৎ, ইহার মাধুর্য্যের পুঁজি অফুরন্ত, ইহার সম্ভাবনার কোথাও শেষ নাই। একটি মোহের গ্রন্থি বাঁধা হইতে-না-হইতেই ছিঁড়িয়া গেল বলিয়া সে শোক করিবে না।

জাহাজের পিছনের টানা ঢেউ লাগিয়া একটা জেলে-ডিঙি হাবুডুবু খাইতেছিল। "ঐ গেল, গেল," বলিয়া সুভদ্র ঠিক তাহার কাঁধের উপর প্রায় চীৎকার করিয়া উঠাতে সে সচকিত হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। জেলেডিঙিটা ডুবিল না, ঢেউয়ের টান সরিয়া আসিতেই তাহার দোলা থামিয়া গেল। পিছনের গলুয়ে বৈঠা লইয়া যে বসিয়াছিল, সে হঠাৎ বীরদর্পে লাফাইয়া উঠিয়া দুই হাতে মাথার উপর বৈঠাটাকে নাড়িয়া কি বলিল, এতদূর হইতে বোঝা গেল না, রোদে বৈঠাটা চিক্‌চিক্‌ করিয়া উঠিল। সুভদ্র সত্যই ভয় পাইয়াছিল, এখন আরাম পাইয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার হাসি থামিলে রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া নীচের আবর্ত্তিত জলধারার দিকে চাহিয়া অজয় কহিল, "বৈঠা দিয়ে জাহাজটাকে এক ঘা দেবার মতলব, না আর-কিছু ?"

সুভদ্র আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "এতটা আশা করিনি। এততেও ডোবেনি যে তাইতেই জাহাজটাকে বেশ এক ঘা দেওয়া হয়েছে, এই বোধ-হয় ওর বক্তব্য।"

সেইখানটায় জেলেডিঙির ভিড়। ঘন ঘন শিটি দিতে দিতে জাহাজ অগ্রসর হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে অন্যমনস্ক অজয়ের বাহুতে মৃদু করস্পর্শ করিয়া সুভদ্র কহিল, "এইদিকে দেখুন।" কিছু সে

একটা দেখাইল, জাহাজের সম্মুখের ডেকে একরাশ স্তূপাকার কাছির আড়ালে বসিয়া একটি অবগুণ্ঠনবতী জননী উৎক্ষিপ্ত জলধারার ছাট হইতে নিজের শিশুটিকে বহু ক্লেশে আড়াল করিতেছে। একতলায় দুতলায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর ভিড়ে আর কোথাও পর্দা বাঁচাইয়া বসিবার স্থান নাই, তাই এই দুর্ভোগ। কিন্তু অজয় দেখিয়াও সেদিকে দেখিল না। নানা দিগ্‌দেশের যাত্রী, আলোছায়া-বিচিত্র কত সংসারযাত্রার এক-একটি বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা আজ এই একটি যাত্রার মধ্যে একসঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে। কেহ কাহাকেও জানে না, দুই দণ্ড পরে কেহ কাহাকেও মনে রাখিবে না, তবু কোন্ একটি অপরূপ আত্মীয়তার বন্ধন ইহাদের আজ একসঙ্গে অলক্ষ্যে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়াছে। দুই দণ্ডের পরিচয়ের পরিধির মধ্যে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জীবনের স্রোত অস্থির গুঞ্জনে তরঙ্গায়িত হইয়া বহিতেছে। অজয় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বহু-যাত্রীসমাবেশের মধ্যে জীবনের সেই অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন রূপটিই কেবল দেখিল। একসঙ্গে বহু-বিচ্ছেদের বেদনা এবং বহু-মিলনের অধীর প্রত্যাশা তাহারও বুকের মধ্যে রক্তস্রোতকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। ক্রমে আর সব-কিছু ভুলিয়া বুকের মধ্যেকার সেই চাঞ্চল্যটিকেই সে কেবল অনুভব করিতে লাগিল। দিনের আলো বিষণ্ণ ছায়াভারাক্রান্ত হইয়া আসিতেছে, অপর দিকের রেলিঙের ওপারে দিক্‌চক্রবালের কাছে ক্ষীয়মান বনরেখার দিকে চাহিয়া তাহারও হৃদয় আবার একবার কোন্ নামহীন, কিন্তু গভীর বেদনায় ভার হইয়া উঠিল। সুভদ্রের একটু কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া কহিল, "আপনি এ রকম হঠাৎ চ'লে এলেন, আপনার বাড়ির লোকদের কথা ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে।"

সহযাত্রী বছর-দশ বয়সের একটি বালককে জুটাইয়া লইয়া সুভদ্র তখন তাহার সঙ্গে একটি লেবু সহযোগে লোফালুফি খেলা সুরু করিয়াছিল, অজয়ের দিকে তাহার চাহিবার অবসর ছিল না, তবু কহিল, "না, না, দুঃখ পাবেন না। যাদের কথা ভেবে দুঃখ পাচ্ছেন, তারাই যখন সে-সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেনি তখন স্বচ্ছন্দে তাদের আমরা ভুলে যেতে পারি।"

অজয় কহিল, "সব কথাই কি আর মুখফুটে বলতে হয়। সে যাক্, ওঁরা দুঃখ পেয়েছেন তা আপনি যেমন জানেন, আমিও জানি। আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত, ক্ষমা চাচ্ছি।"

একটুক্ষণ খেলা থামাইয়া লেবুটাকে একলা লুফিতে লুফিতে সুভদ্র কহিল, "না, না, কি যে বলেন! আপনি কি আমাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছেন? আমার অমনি খেয়াল হ'ল চ'লে এলাম।" তারপর একটু হাসিয়া কহিল, "অবশ্য আপনি যদি কয়েকটা দিন থাকতে রাজি হতেন, আমিও খুব খুশী হয়েই থেকে যেতাম।"

অজয় মাথা নীচু করিয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর দ্বিধাজড়িত কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "এখন মনে হচ্ছে থেকে এলেও হ'ত।" অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মন তাহার নিজেরই অজ্ঞাতে এই কথাটি বলিবলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না। এবার অতর্কিতে তাহা বলা হইয়া গেল, তাহার মনের উপর হইতে একটা গুরুভার বোঝা নামিল।

সুভদ্র তাহার দিকে এবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, "সত্যি বলছেন?"

সে-দৃষ্টির সম্মুখে অজয় কেমন মুষড়াইয়া গেল, কষ্টে মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল, "সেকথা এখন আর ভেবে লাভ কি?"

কিছুক্ষণ অজয়ের আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া সুভদ্র অকস্মাৎ আবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো, আমি প্রভাকে লিখব, একটু হাসতে পেলে সে-বেচারীর উপকার হবে।... যাই বল, এটা ঠিক যে তোমাকে হঠাৎ তাকিয়ে দেখলে এতটা সৃষ্টিছাড়া লাগে না।"

অজয় তাহাদের বাড়ি থাকিয়া আসিতে পারিলে খুশী হইত, তাহার এই আন্তরিকতার প্রতিদানে সুভদ্র তাহাকে তুমি সম্বোধন করিয়া আন্তরিকতা জ্ঞাপন করিল। অজয় তাহা লক্ষ্য করিল কি-না বোঝা গেল না, লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, "না, না, প্রভাকে লিখতে হবে না। অবশ্য আমি একটু সৃষ্টিছাড়া আছিই এবং তাই নিয়ে আমি গর্ব্বও ক'রে থাকি।" প্রভাকে লিখিতে

বারণ করিল, কিন্তু সুভদ্র হয়ত প্রভাকে লিখিবে, হয়ত প্রভা জানিবে অজয় সৃষ্টিছাড়া, সে জোর করিয়া চলিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু আসলে চলিয়া আসিতে সে চায় নাই, কেন চলিয়া আসিতে চায় নাই—কোনও অবসর সন্ধ্যায় নিভৃতে বসিয়া হয়ত প্রভা সেই গূঢ় সমস্যাটির সমাধান করিবার চেষ্টা করিবে, এই কথাগুলি বারংবার তাহার মনের তারে অধীর ঝঙ্কারে ঘা দিতে লাগিল।

সুভদ্র খেলার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, অজয়ের পাশে রেলিঙে পিঠের ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিন্তু গর্ব্ব করবার মত গুণ সত্যিই তোমার কতকগুলি আছে, আজ কয়েক ঘণ্টার পরিচয়েই তা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি নিজে হয়ত সেগুলির কথা জান না।"

অজয় সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল না, কহিল, "সেইটেই ভাল ব্যবস্থা। নিজের সদ্‌গুণগুলির সঙ্গে খুব বেশী পরিচয় থাকলে মানুষ নিজেকে কেবলই নিজের ছাঁচে গড়তে থাকে। কিন্তু কারও পদাঙ্ক অনুসরণ করা বিধাতা আমার স্বভাবে দেননি, নিজেরও না।"

সুভদ্র হাসিয়া কহিল, "সেইটেকেই নিজের একটা সদ্‌গুণ ঠিক ক'রে সেই অনুযায়ী ভাবতে এবং কাজ করতে সুরু করতেও ত পার? কিছুতেই কোনও বাঁধা-পথে পা দেব না, এ-সঙ্কল্পেরও একটা বন্ধন আছে।"

অজয় এ কথার আর কোনও জবাব দিল না, তাহার চিন্তার ধারা কিছুক্ষণ সুভদ্রের শেষ কথাগুলিকে আশ্রয় করিয়া বহিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া গোধূলি-পরিব্যাপ্ত পল্লীপ্রকৃতির করুণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া হারাইয়া গেল। তাহার সমস্ত চৈতন্যকে আবৃত করিয়া একটি রহস্যময় অসীমতা, নক্ষত্রখচিত একখানি কবরী, দুইখানি শ্যামল পদপল্লব এবং একটি স্নিগ্ধ দৃষ্টির অতল গভীরতা চতুর্দ্দিক্‌কার সৌন্দর্য্যলোক হইতে প্রাণ আহরণ করিয়া একটি পরিচিত প্রিয়স্পর্শের মত পড়িয়া রহিল। তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া সুভদ্র আবার তাহার কিশোর সাথীটিকে জুটাইয়া খেলা এবং বিশ্রম্ভালাপে মনোনিবেশ করিল।

অজয়ের হৃদয়ের সম্মুখে সমুদয় বিশ্বসৃষ্টিই সেদিন যেন নববধূর বেশে আসিয়া দেখা দিল। শুভদৃষ্টি এখনও হয় নাই, অপরিচয়ের যবনিকা উঠিয়া যাইতে অনেক বিলম্ব আছে, কিন্তু উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। আলো জ্বলিতেছে, সানাই বাজিতেছে, দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং হৃদয় মধুময় হইয়া গিয়াছে। শৈশব হইতেই সে ভাবিতে শিখিয়াছিল, বিশ্বের সমুদয় বস্তুই কোন-না-কোন একটি বিশেষ অর্থে তাহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সে যেন একটি অচিন্তিত উপায়ে এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে, একেবারে তাহার মর্ম্মশতদলটির মধ্যে রহিয়াছে। সেই বিশেষ অর্থটি যে কি, আজ যেন পুলকিত চিত্তে তাহারই আভাস সে হৃদয়ঙ্গম করিল। কম্পিতবুকে স্বয়ম্বরা ধরিত্রী আজ যেন বরণমালা লইয়া অন্তরালে তাহার জন্য অবস্থান করিতেছেন। দেহে-মনে-প্রাণে নিজেকে কল্পনায় সে সম্রাটের বেশে সাজাইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অন্যমনে ঘুরিতে ঘুরিতে সে দুতলায় আসিয়াছিল। হঠাৎ প্রথম শ্রেণীর কেবিনগুলির দিক হইতে একটা চকিত শব্দ এবং তার পরেই উচ্চকণ্ঠের কোলাহল কানে আসিল। গতকল্যকার দুর্ঘটনা-জনিত উত্তেজনার স্মৃতি তখনও তাজা ছিল, সহসা তাহার চঞ্চল-রক্তস্রোতে যেন বহুকণ্ঠের আর্ত্তস্বর ধ্বনিত হইতে লাগিল, দুর্গে দুর্গতি-নাশিনি, দুর্গে দুর্গতি-নাশিনি।...সেদিকে ডেকের যাত্রীদের যাওয়া বারণ, যতটা সম্ভব অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিল, তাহার পূর্ব্বদিনের সহযাত্রিণীদের সঙ্গী সেই স্থূলদেহ প্রৌঢ় ডেকের উপরে পা ছড়াইয়া বসিয়া অত্যন্ত ব্যথাকাতর মুখে পিঠে কোমরে এবং হাঁটুতে পর্য্যায়ক্রমে হাত বুলাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে ক্যান্‌ভাসের একটা ডেক চেয়ার ভাঙিয়া সটান্ হইয়া পড়িয়া আছে। নীল-পাজামা-পরা দুইজন খালাসীকে মুখে যাহা আসিতেছে তাহাই বলিয়া তিনি গালি দিতেছেন। তাহারা প্রতিবাদ করিতে গিয়া আরও বেশী করিয়া তিরস্কৃত হইতেছে।

সেদিকেই উপরে সারেঙের ঘরে যাইবার সিঁড়ি। স্থূলতায় প্রৌঢ়ের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, আদ্দির পাজামা এবং পাগ্‌ড়ী পরা মুসলমান সারেঙ খবর পাইয়া হেলিতে-দুলিতে নামিয়া আসিল। ব্যস্তে কহিল, "কি হয়েছে মাশয়?"

"আর কি হয়েছে মাশয়! আমার কোমরটা গেছে আর কি। ফার্ষ্ট ক্লাসের ডেকে এমন তেঠেঙে ভাঙা চেয়ার তোমরা রাখ কি ব'লে? আমি কলকাতায় গিয়েই কোম্পানীর কাছে রিপোর্ট করব।"

সারেঙ বিধিমতে দুঃখ প্রকাশ করিল। কিন্তু প্রৌঢ়ের রাগ পড়িল না। ক্রমাগত সকলকে গালি দিতে লাগিলেন, যে-কোম্পানীর কাছে রিপোর্ট করিবেন বলিয়াছিলেন তাহাদেরও রেয়াত করিলেন না। অজয় যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, "যারা ডেকে যাচ্ছে বেশ যাচ্ছে, আমি বেশী পয়সা খরচ ক'রে ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট ক'রে প্রচুর লাভ করেছি।"

প্রৌঢ় অজয়ের দিকে চাহিতেই সেও আশান্বিত হৃদয়ে তাঁহার দিকে তাকাইল, চোখের দৃষ্টিতে সমবেদনা ভরিয়া দিল, কিন্তু প্রৌঢ়ের দৃষ্টিকে বাঁধিতে পারিল না। বোঝা গেল ডেকের যাত্রীদের সম্বন্ধে তাঁহার ঈর্ষ্যা যতই থাকুক, অবজ্ঞাও তাহা অপেক্ষা কম নাই। হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় চকিতে তাহার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটিয়া গেল। জাহাজের একেবারে সম্মুখের ডেক ঘুরিয়া সহসা একটি দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।

অজয়ের দেহ-মন-উপলব্ধি ভরিয়া কি সুর যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল নিজেই সে তাহা বুঝিতে পারিল না, বুঝিতে পারিল না সে-সুর আনন্দের না বেদনার, কেবল অনুভব করিল, তাহার সমস্ত বিগত জীবন এবং আজিকার এই রাত্রিটির মাঝখানে একটি সুদুস্তর ব্যবধানের বারিধি তরঙ্গময় হইয়া বহিতেছে। কাল নিশান্ধকারে এই জ্যোতির্ময়ীকেই একান্ত সান্নিধ্যে সে যে কাছে পাইয়াছিল সে কথাও তাহার মনে রহিল না। স্বাভাবিক সঙ্কোচ ভুলিয়া দুই চোখের অকুণ্ঠিত দৃষ্টি ভরিয়া তরুণীকে সে দেখিতে লাগিল। কেবল ভুলিতে পারিল না যে দেখিবামাত্রই ইহাকে চিরপরিচিত বলিয়া মনে হয় না, তাহার কল্পিত-অকল্পিত কোনও মানসীমূর্ত্তির সঙ্গে ইহার তুলনা মিলে না, এ যেন সত্যই মানবী নহে, এ যেন সর্ব্বতোভাবেই অপরূপ এবং অভিনব। তবু এ যে পর, এ যে অপরিচিত, কেন সেই বেদনা সমস্ত বক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া বাজিতে থাকে? কেন ইহার কাছে আত্মসমর্পণ করিবার আগে ইহাকে জয় করিবার কথা মনে হয়?

প্রৌঢ়ের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া তাঁহার সঙ্গে তরুণীর কি যে কথা হইল, তত দূর হইতে অজয় তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। এইটুকু বুঝিল, প্রৌঢ়ের অত্যন্তই কষ্ট হইতেছে এবং তাঁহার হাতের ইঙ্গিতে মনে হইল, তিনি তাঁহার কেবিনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু পারিতেছেন না। খালাসীরা গালাগালি খাইয়া সদলে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল, যাত্রী যাহারা কাছাকাছি ছিল নিতান্ত উপরোধ ভিন্ন তাহাদের কাহারও নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার আশা করা বৃথা। তরুণী তাহা ভাল করিয়াই জানিত, সুতরাং অত্যন্ত দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেই একবার প্রৌঢ়কে ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই পর্ব্বতপ্রমাণ দেহের ভার এতটুকুও উত্তোলন করা কি তাহার কাজ? অজয় সহসা সম্বিৎ পাইয়া দেখিল, তরুণী তাহারই দিকে আসিতেছে।

প্রথম এবং তৃতীয় শ্রেণীর ডেকের মাঝখানকার রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া পরিষ্কার কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে তরুণী ডাকিল, "শুনুন!"

মন্ত্রাহতের মত অজয় অগ্রসর হইয়া গেল। তাহাকে দুই চোখ বুলাইয়া তাড়াতাড়ি একবার দেখিয়া লইয়া তরুণী এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর দূরে সহসা কাহাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, "ঐ ভদ্রলোকটিকে একবার ডেকে দিন না?"

অজয় ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, সুভদ্র কাছেই কোথায় ছিল, বড় বড় করিয়া পা ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। অজয়ের চোখের সম্মুখে সহসা যেন অন্ধকার নামিয়া আসিল, দুই কর্ণ যেন বধির হইয়া গেল, লজ্জা হতমান এবং ক্ষোভের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতে পড়িতে সে নীচে নামিয়া আসিল। সুভদ্র সত্যই তরুণীর কাছে গেল কি-না, তাহা দেখিতে সে দাঁড়াইল না। তাহার ও-রূপ আকস্মিক আচরণে তরুণী এবং সুভদ্র উভয়েই কি মনে করিল তাহা চিন্তা করিবারও তাহার

অবকাশ হইল না। নীচের ডেকে বয়লারের পাশে একটা জায়গায় কতকগুলি স্তূপাকার চালের বস্তার আড়ালে অন্ধকারে নিজেকে লুকাইয়া সে আত্মরক্ষা করিল।

নিজের শরীরের দিক্‌কার ত্রুটি লইয়া লজ্জা এবং ক্ষোভ তাহার চিরকালই ছিল, কিন্তু কখনও এই ত্রুটি সংশোধন করিবার চেষ্টা তাহার কিংবা তাহার অভিভাবক-দের দ্বারা হইয়া উঠে নাই। যতদিন ইস্কুলে পড়িত, কোনও খেলার দলে কখনও সে যোগ দেয় নাই। ক্রীড়া-বর্ত্তুল লইয়া যে-সব ছেলেরা মাঠে মাঠে মাতামাতি করিয়া বেড়াইত, ক্লাসের পরীক্ষার খাতায় তাহাদের প্রায়ই বর্ত্তুলাকার ফল লাভ ঘটিতে দেখিয়া খেলাধূলাজাতীয় সমস্ত বিষয় সম্বন্ধেই তাহার মনে কুসংস্কারমিশ্রিত একটা ভয় জন্মিয়া গিয়াছিল। গৃহে এবং পাঠাগারে অভিভাবকেরা এই কুসংস্কার দূর করিতে তাহাকে সাহায্য ত করেনই নাই, বরং ইহাকে প্রশ্রয়ই দিয়াছিলেন। হিতাহিতজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবার পর বহুবার খেলার দলে সে যোগ দিতে গিয়াছে, কিন্তু খেলার মাঠ প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাজত্ব, সেখানে তাহার স্থান হয় নাই। যেখানে তাহার উৎসাহ প্রাপ্য ছিল, সেখানে উপহাস জুটিয়াছে। গৃহের গোপনতায় যতটা চেষ্টা চলে তাহা সে বহুবার সুরু করিয়াছে, কিন্তু নিজের স্বভাবের অধৈর্য্যের ফলে কোনও চেষ্টাই সমভাবে বেশী দিন ধরিয়া সে করিতে পারে নাই। হয় অতি শীঘ্র ফললাভের আশায় বাড়াবাড়ি করিয়া বিপরীত ফল লাভ করিয়াছে, নয়ত অতি শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ সে-সমস্ত কথা ভাবিয়া তাহার অনুশোচনার আর সীমা রহিল না।

জাহাজের নীচের ডেকের সেই জায়গাটা জুড়িয়া তপ্ত বাষ্পের উত্তাপ, জাহাজের স্রোতঃব্যাহত প্রখর গতির স্পন্দন, সলিলস্পৃষ্ট নৈশ বাতাসের অবসন্ন-স্পর্শ, বহু কণ্ঠের অস্পষ্ট কোলাহল-গুঞ্জন এবং পূর্ব্বরাত্রির অনিদ্রা এ-সমস্ত মিলিয়া অজয়ের বেদনাতুর ক্লান্ত মনটাকে ঘিরিয়া ঘুমের মায়াজাল রচনা করিতে লাগিল। কখন সে যে সেইখানেই একটা চালের বস্তার উপর জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল তাহা জানিতেও পারিল না। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল, যাদুকরের খেলা হইতেছে। নেপথ্য হইতে নানা জানা-অজানা বাদ্যযন্ত্রে কোন্ অপরূপ সঙ্গীতের গুঞ্জন উঠিতেছে। বিপুল জনসমাগম, যাদুকরের মুখ দেখিতে পাওয়া কঠিন, তবু কোনও রূপে ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া সে দেখিল মণিমুক্তাখচিত বেশ পরিধান করিয়া, হীরার মুকুট মাথায়, হাতীর দাঁতের মায়াকাঠি হাতে সুভদ্র দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

সুভদ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখতে চাও তুমি ?"

অজয় কি যে কোন্ ভাষায় বলিল, নিজেই তাহার অর্থ বুঝিল না। এইটুকু বুঝিল, কিছু একটা বলা হইয়াছে, কেননা, সুভদ্র ইউরোপীয় কায়দায় কটি হইতে দেহের ঊর্দ্ধভাগ নমিত করিয়া কহিল, "Very good, sir।" তারপর গজদন্তের দণ্ডের এক আঘাতে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া দিতেই জ্যোৎস্নাফুলের মত পেলবোজ্জ্বল-কান্তি এক তরুণী বিপুল কবরীর ভারে মাথা নত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। অজয় তাহার সমস্ত অন্তরের আগ্রহের ভাষায় বলিতে লাগিল, তুমি পীড়িত হইতেছ, তোমার কবরীর বন্ধন আমি খুলিয়া দিই, তোমার রূপ-জ্যোৎস্নাকে ঘিরিয়া ছায়াময়ী রাত্রির আলিঙ্গনের মত তোমার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি ছড়াইয়া পড়ুক্। যেন সে অগ্রসর হইয়া গেল, বলিল, তোমার মুখখানি দুই চোখ ভরিয়া দেখিতেছি তবু ভাল করিয়া কিছুতেই কেন দেখিতে পাইতেছি না, যাদুকর আমাকে কি যাদু করিয়াছে ? একবারটি তোমার আরও কাছে আমাকে যাইতে দাও, মৃদুহস্তে সন্তর্পণে তোমার চিবুকটি আমি তুলিয়া ধরি, আমার অন্তরের সঞ্চিত আলোকে চির-কালের পরিচয়ে তোমাকে দেখিয়া লই। অথবা তুমি একবারও আমার চোখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহ নাই বলিয়াই কি তোমাকে দেখা আমার কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতেছে না ? যাদুকর সুভদ্র তাহার বুকের উপর হাতীর দাঁতের দণ্ডের অগ্রভাগ স্থাপন করিয়া দৃঢ়হস্তে তাহাকে ঠেলিয়া দিল। অজয়ের দুর্ব্বল দেহ টলিয়া পড়িল।

ক্ষোভে দুঃখে অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া সে রোদন করিতেছে দেখিয়া যাদুকরের করুণা হইল। সে তাহাকে

হাতে ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, আচ্ছা, আবার দেখ। তারপর শুভ্রষষ্টি অন্ধকারের গায়ে তুলির মত করিয়া বুলাইয়া নিপুণ চিত্রকরের মত সে আর-একটি মূর্ত্তিকে ফুটাইয়া তুলিল। অজয়ের রোদন থামিয়া গেল, তাহার বেদনাতুর বুকে স্নিগ্ধতার প্রলেপ লাগিল, দেখিল প্রভা। বলিল, তুমি আমার কে হও, কিছুতেই কেন আমার মনে পড়িতেছে না? যাত্নকর আমাকে কি যাদু করিয়াছে? আমার যে-মাকে আমি কখনও দেখি নাই, তুমি কি তাঁহার মত দেখিতে? তাহা না হইলে তোমার পায়ের নখর-রাজি কেন আমার এমন চিরপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে, কেন তোমার পা-দুটিকে স্পর্শ করিবার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে? এইখানে যাত্নকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। অজয়কে আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমাকে এমনি দেখতে ত একটুও সৃষ্টিছাড়া লাগে না? কিন্তু প্রভা যে হাসতে পাচ্ছে এতে তার উপকারই হবে। প্রভা হাসিতেছে, তাহাকেই দেখিয়া আঁচলে মুখ চাপিয়া পরিহাসের হাসি হাসিতেছে ভাবিয়া অজয় মাটিতে মাথা গুঁজিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, মুখ তুলিয়া চাহিতে তাহার আর সাহস হইল না। সুভদ্র তাহার মায়াকাঠিতে খোঁচা দিয়া দিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল, ওঠ, ওঠ, ওঠ!

অজয় চোখ মুছিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই সম্মুখের একটা বিদ্যুতের আলো তাহার মুখের উপর পড়িল। অত্যন্ত বিরক্তমুখে স্তিমিতচোখে চাহিয়া সে দেখিল, সুভদ্র দাঁড়াইয়া আছে। কহিল, "ঠেলছ কেন?"

সুভদ্র হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেশ ঘুমোবার জায়গা আবিষ্কার করেছ। আমি এদিকে ভেবে অস্থির, কি-জানি হয়ত পড়েই গেলে জাহাজ থেকে। অমন ক'রে পালিয়ে এলে কেন তখন?"

অজয় কহিল, "পালালাম কখন্ আবার?"

সুভদ্র বুঝিল, এই আলোচনাকে বেশীদূর অগ্রসর হইতে দিলে ফল শুভ হইবে না। কহিল "পালাওনি তা বেশ, এখন চল, খাবে না?"

"কি খাব?"

"জাহাজের বাটলারকে মুরগীর কারি আর ভাতের ব্যবস্থা করতে বলেছি।"

"আমার খিদে নেই, খাব না।"

শুদ্ধমাত্র দৈহিক শক্তির শ্রেষ্ঠতায় সুভদ্র তাহাকে টানিয়া উঠাইল। লোকের সম্মুখে তাহার সঙ্গে লড়ালড়ি করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে চাহে না বলিয়া অজয় ইহার পর নিরাপত্তিতে উপরে উঠিয়া আসিল। কিন্তু তাহার এত বেশী রাগ হইল, যে, খাবারের থালা সম্মুখে লইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কিছু খাইলও না, সুভদ্রের কোন কথার জবাবও ইহার পর আর দিল না। মুরগীর কারি সুভদ্রের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য, বাড়িতে ছুটির মাসটা খাইতে পায় নাই, খুব উৎসাহ করিয়া, নিজে মুরগী বাছিয়া দিয়া রান্না করাইয়াছিল। অজয়ের ব্যবহারে তাহার সমস্ত উৎসাহে ভাঁটা পড়িয়া গেল। দু-একগ্রাস ভাত কোনরকমে গিলিয়া সেও থালাটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া হাত তুলিয়া বসিয়া রহিল।

বুড়া বাট্‌লার থালা তুলিয়া লইতে আসিয়া দেখিল, দুজনের কেহই খাবার স্পর্শ করে নাই। কহিল, "কারি রান্না কি ভাল হয়নি, বাবু?"

একটু থামিয়া সুভদ্র কহিল, "না বেশ রান্না হয়েছে।"

অবস্থাটা বৃদ্ধকে বুঝাইবার ভার সম্পূর্ণ সুভদ্রের উপর চাপাইয়া দিয়া অজয় নিঃশব্দে উঠিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। উপরে ডেক জুড়িয়া হাঁড়ি-পুঁটুলির আল তুলিয়া সারি সারি অসংখ্য বিছানা পাতা হইয়াছে। যাহারা আগে আসিয়াছিল, তাহারা বেশ করিয়া ছড়াইয়া গুছাইয়া শুইয়াছে, যাহারা যত পরে উঠিয়াছে তাহাদের তত বেশী জড়াজড়ি এবং ঘেঁসাঘেঁসি অবস্থা। অজয়দের বিছানা হইতে নীচের সিঁড়ি বেশখানিকটা দূরে, পা গুণিয়া গুণিয়া, প্রতিপদে থামিয়া, নীচু হইয়া, হাঁড়ি-পুঁটুলি সরাইয়া বহু কষ্টে অজয় অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে বিরক্তিতে তাহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁত বসিয়া যাইতে লাগিল, মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। পথের অধিকার লইয়া দু-একজন যাত্রীর সঙ্গে তর্ক করিয়া তাহার মেজাজ আরও বিগড়াইয়া গেল। ঠিক ইচ্ছা

করিয়া নহে, কিন্তু অনিচ্ছাতেও নহে, দু-একজনের বিছানা সে মাড়াইয়া দিল। কোথাও বা কাহারও জিনিষপত্র সরাইয়া পথ করিতে গিয়া অনাবশ্যক রূঢ়তা প্রকাশ করিল। প্রায় সিঁড়ির কাছাকাছি জায়গায়, গুটানো এক পায়ের উপর আর-এক পা তুলিয়া ছিটের লুঙি এবং লাল রঙের শার্ট পরিয়া একজন যাত্রী শুইয়াছিল। জাহাজের ডেকের মিটমিটে বিদ্যুতের আলোয় চাহিয়া অজয়কে অনেকক্ষণ অবধি সে লক্ষ্য করিতেছিল এবং মনে মনে সঙ্কল্প আঁটিতেছিল, যে, আর যে যাহাই করুক, সে নিজে এই উদ্ধত ছাত্র-বাবুকে কিছুতেই তাহার বিছানার এলাকা পার হইতে দিবে না। তাহার মাদুরের বিছানায় চারি পাশ ঘিরিয়া বড় বড় চামড়ার ট্রাঙ্ক, বিপুলাকার হোল্ডল, টুপির বাক্স, বন্দুকের পেটিকা, টেনিস খেলিবার সরঞ্জাম। অজয় যেই সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া একটি ট্রাঙ্কের প্রাচীর উত্তীর্ণ হইতে যাইবে, যাত্রীটি দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চাপা গলার গর্জনে তাহাকে বাধা দিল। কহিল, "এধারে রাস্তা নেই, ঘুরে যাও।"

ঘুরিয়া যাইতে হইলে প্রায় সমস্ত পথটাই আবার ঘুরিতে হয়। অজয় সংক্ষেপে কহিল, "রাস্তা নেই, ক'রে নিচ্ছি।" তারপর একটা ছোট ট্রাঙ্ক ধরিয়া টান দিতেই তাহার উপর হইতে একটি গোলাকার টুপির বাক্স গড়াইয়া পড়িয়া তরতর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে একতলায় গিয়া পৌঁছাইল, এবং রেলিঙের গায়ে ধাক্কা খাইয়া থামিল। পলকে প্রলয় বাধিয়া গেল। লোকটা চীৎকার-শব্দে অজয়কে গালাগাল দিল, "সাব, সাব" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, যাহারা পূর্ব্ব হইতেই অজয়ের উপর বিরক্ত হইয়াছিল তাহারাও ঘিরিয়া আসিয়া সেই গোল-গোলে যোগ দিল। কাছাকাছি একটা কেবিন হইতে একজন অর্দ্ধ-শ্বেতাঙ্গিনী বাহির হইয়া আসিলেন। ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝিয়া লইয়া মুসলমান খানসামাকে বকিয়া ঘাড়-ধাক্কা দিয়া নীচে টুপির উদ্ধারের কাজে পাঠাইলেন, তারপর উত্তেজনার অবশিষ্টাংশ ব্যয় করিবার অপর পথ না পাইয়া সম্ভবতঃ বালক-জ্ঞানে অজয়ের গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিলেন। অজয়ের দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, তাহার স্বভাবের প্রচণ্ড অক্ষমা এবং নারীজাতি সম্বন্ধে তাহার অত্যন্ত গভীর সৌজন্য, এই দুই বিপরীত স্রোত মিলিয়া তাহার মনে ভীষণ আবর্তের সৃষ্টি করিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইল, তথাপি আততায়িনীর অবমাননাসূচক কোনও বাক্য সে উচ্চারণ করিল না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিল, মহিলাটি তাহার অপর গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। সুভদ্র যখন ছুটিয়া আসিল, তখন অজয়ের রোখ চাপিয়া গিয়াছে, সে ক্রমাগত একই কথা বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছে এবং প্রহৃত হইতেছে।

সুভদ্র অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করিয়া মহিলাটির কাছে ক্ষমাভিক্ষা করিল, কিন্তু ফলে নিজের গালে একটি চপেটাঘাত লাভ করিল। যাত্রীরা সব সার দিয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে, কেহ একটি কথাও কহিতেছে না। এমন নিরুপায় অবস্থায় সুভদ্র জীবনে কখনও পড়ে নাই। চকিতে একবার চারি দিক্‌টা চোখ বুলাইয়া সে দেখিয়া লইল, দেখিল, অদূরে একটি কেবিনের খোলা দরজার সামনে দাঁড়াইয়া সম্ভবতঃ মহিলাটির সহযাত্রী এক যুবা অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিয়া হাসিতেছে।

সুভদ্র যেন অকূলে কূল পাইল, দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া দুই লাফে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, বজ্রগর্জ্জনে কহিল, "হাসি থামাও।"

যুবক হাসি থামাইল বটে, কিন্তু রুখিয়া উঠিয়া বলিল, "যদি না থামাই ?"

সুভদ্র কহিল, "তাহ'লে তোমার এমন অবস্থা করব যে বাকী জীবন নকল দাঁত লাগিয়ে তোমাকে হাসতে হবে। অবিশ্যি তাতে তোমার চেহারা কতকটা ভালই হবার সম্ভাবনা।"

যুবক এ কথার জবাবে দাঁত খিঁচাইয়া উঠিয়া তাহাকে কোনও প্রাণীবিশেষের সহিত উপমিত করাতে সুভদ্র প্রাণপণ শক্তিতে তাহার বাঁ গাল লক্ষ্য করিয়া ঘুঁসি চালাইল। কিন্তু দেখা গেল, ঘুঁসি চালানোর বিদ্যা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর কিছু কম আয়ত্ত নাই। বিদ্যুদ্বেগে নিজের মাথাটা সরাইয়া লইয়া প্রচণ্ড মুষ্টির এক আঘাতে সুভদ্রকে সে ধরাশায়ী করিল। সুভদ্র টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার তাহার সম্মুখীন হওয়াতে দ্বিতীয়

এক ঘুঁসির আঘাতে প্রায় অসাড় দেহে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

ততক্ষণে অজয়ের চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রথমেই চকিত-দৃষ্টিতে সে একবার প্রথম শ্রেণীর ডেকের দিকে চাহিয়া দেখিল, মনে হইল সেদিকে কেহ নাই, ইতিপূর্ব্বে কেহ ছিল কি-না সে লক্ষ্য করে নাই। সুন্দরী সহযাত্রিণীর চোখে নিজেদের এই নিদারুণ অবমাননা ধরা পড়িবার ভয় তাহার সমস্ত শুভবুদ্ধিকে মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। দুই হাতে সিঁড়ির রেলিং চাপিয়া প্রায় গড়াইতে গড়াইতে তাড়াতাড়ি সে নীচে নামিয়া আসিল।

নীচে প্রায় ঘণ্টাখানেক সে ঘুরিল। সুভদ্রকে অনাত্মীয় জনসমাবেশের মধ্যে এক ক্রুদ্ধ দুর্দ্দান্ত শত্রুর কবলে একাকী ফেলিয়া আসিয়া তিরস্কারের কশাঘাতে ক্রমাগত নিজেকে সে জর্জ্জরিত করিতেছিল, নিজের কাপুরুষতাকে ধিক্কার দিতেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও সে ভুলিতে পারিতেছিল না, যে, ঠিক এমনই অবস্থায় এখনই যদি আবার তাহাকে পড়িতে হয়, আবারও সে পলাইবে। এই অবস্থার জন্য দায়ী কে, তাহাও সে ভাবিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই নিজের মনের কাছে স্বীকার করিতে পারিল না, যে, তাহার মধ্যে স্বভাবজ হীনতা কোথাও কিছু আছে। কাহাকেও সে-কথা বলিতে গেলে উপহাস লাভ করিয়া ফিরিতে হইবে তাহাও সে বিলক্ষণ জানে, কিন্তু কি অদ্ভুত অসহায়তা এবং নিরুপায়তা স্বভাবে দিয়া বিধাতা তাহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন এবং ভারতবর্ষের মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন, সে-কথা তাহার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার কথা নয়।

অন্ধকারে অশ্রুআপ্লুত নয়নে একতলার পিছনের ডেকের রেলিঙে বুকের ভর রাখিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল, ব্যাধিশীর্ণতা, অনশন, অপমান, লাঞ্ছনা যাহাদের ভুক্ত পথে পথে যুক্তলজ্জা করিয়া বসিয়া আছে তাহাদেরও জন্য কেন বাগ্রাসঙ্গিনীর দুই চোখের দৃষ্টি ভরিয়া এত মধুর সঞ্চয়, কি হেতু তাহাদেরও বুক একখানি কোমল বলরিত হৃদের আন্দোলনে এমন গভীর তালে দুলিয়া উঠে, ভালবাসি, ভাল লাগে, এই কথাখানি বলিতে না পাইলে কেন তাহাদেরও হৃদয় এমন করিয়া ভার হইয়া উঠে, প্রেয়সীর চোখে কেন তাহাদেরও নিজেকে সম্রাটের বেশে সাজাইতে ইচ্ছা করে?

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়াইয়া ছিল জানে না, দীর্ঘ শিটির শব্দে তাহার চেতনা হইল যে,জলযাত্রা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এবারে নামিয়া কলিকাতার দিকের ট্রেন ধরিবার পালা। কুণ্ঠিত লজ্জায় পা টিপিয়া টিপিয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই সে উপরে উঠিয়া আসিল। দূর হইতেই দেখিল, সেই শ্বেতাঙ্গ যুবকের সঙ্গে সুভদ্রের খুব ভাব জমিয়া গিয়াছে, সুভদ্রের বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা করিতে যুবক তাহাকে সাহায্য করিতেছে। একটু আগে যে নিদারুণ ভাবে প্রহৃত হইয়াছে, সুভদ্রকে দেখিয়া তাহাও আর এখন বিশেষ বুঝিবার উপায় নাই। অজয়কে ধরিয়া আনিয়া যুবকের সঙ্গে সে পরিচয় করিয়া দিল, কহিল,"আমার বন্ধু মিষ্টার অজয় রায়, মিষ্টার স্নাইল্‌স্। মিষ্টার স্নাইল্‌স্ শিলঙে টিনের খাবারের দোকান করেন, কিন্তু ঘুঁসির বহর দেখে মনে হয় না সে-জাতীয় খাবারে নিজের তাঁর বেশী রুচি আছে।"

অজয়ের সঙ্গে করকম্পন করিয়া যুবক বলিল, "আপনার বন্ধু আমার সঙ্গে জোরে পারেন নি বটে, কিন্তু আজকার যুদ্ধে সত্যিকারের জয় তাঁরই। আমি এইটুকুতেই তাঁর অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছি।"

অজয় কোনও কথা কহিতেছে না দেখিয়া সে আবার বলিল, "ভাল কথা মনে পড়েছে, আমার মায়ের হয়ে আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়নি, সেইটে করছি। আশা করি কিছু মনে রাখবেন না। মিষ্টার ব্যানার্জ্জী যে প্রথম আমাকে আক্রমণ করেছিলেন ঠিকই করেছিলেন। অপরাধটা আমার মায়ের চেয়েও আমারই আসলে বেশী। আমারই কর্ত্তব্য ছিল তাঁকে নিরস্ত করা। আপনারা ভদ্রলোক, স্ত্রীলোককে কিছু বলতে পারেন না ব'লে নীরবে মার খাচ্ছেন, এটা দাঁড়িয়ে দেখা আমার উচিত হয়নি।"

অজয় সংক্ষেপে বলিল, "সে যা হবার তা হয়ে গেছে।" কিন্তু যুবকের এই প্রাণখোলা স্বীকারোক্তিতেও তার বেদনের জ্বালা কিছুমাত্র কমিল না।

যুবক চলিয়া গেলে কেহ কোথাও হইতে তাহাদের

লক্ষ্য করিতেছে কি-না চকিতে একবার দেখিয়া লইয়া অজয় সুভদ্রের দুটি হাতকে নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। কণ্ঠে আবেগ ভরিয়া কহিল, "ক্ষমা করার চাইতে ক্ষমা পাওয়ার প্রয়োজন আমার এখন বেশী। তুমি বল, আমাকে ক্ষমা করেছ, অপদার্থ অমানুষ ভাবনি ?"

সুভদ্র সত্যই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "অমানুষ কেন ভাবতে যাব ?"

কেন যে ভাবিতে যাইবে অজয় তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইল না, কহিল, "আজ সারা সন্ধ্যা তোমার প্রতি আমি সুবিচার করিনি। মিছিমিছি রাগ ক'রে না-খেয়ে, কথা না-ব'লে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি। তুমি বল ক্ষমা করেছ, তা না হ'লে তোমার হাত ছাড়ব-না।"

সুভদ্র ভাবিয়াই পাইল না, অজয়ের এত আবেগের হঠাৎ কি কারণ হইয়াছে। তবু সুহৃমাত্র তাহাকে খুশী করিবার জন্ত কহিল, "তোমাকে তখনই আমি ক্ষমা করেছি, এতেও কি তোমার সন্দেহ যায় নি ?"

অজয় কহিল, "হ্যাঁ গিয়েছে, সেইজন্তেই ত এত শীগ্‌গির আবার ফিরে আসতে পেরেছি।"

সুভদ্র কহিল, "ক্ষমা করিনি জান্‌লে ক্ষমা তুমি চাইতেও আস্‌তে না। ঠিক বলেছি কি-না বল।"

অজয় কহিল "কি-জানি, ঠিকই হয়ত বলেছ।"

দুই জোড়া ট্রাঙ্ক এবং সুটকেসের উপর দুইটি বিছানা চাপাইয়া দুই বন্ধু তাহার উপর পাশাপাশি গদিয়ান হইয়া বসিল। জাহাজ ঘাটে ভিড়িবার অপেক্ষা করিতে করিতে মন খুলিয়া অনেক গল্পই ইহার পর হইল। দূরে যখন ষ্টেশনের সারিবন্দী আলো অন্ধকার নদীজলে সারি সারি আগুনের চঞ্চল আলিপনা আঁকিয়া জলিয়া উঠিল, তখন অজয় কহিল; "আজ প্রায় সারাটা দিন ধ'রে রাগারাগি ক'রে, অপরাধ ক'রে একদিক্ দিয়ে খুব ভালই হ'ল, তোমাকে কেবল পেলাম তা নয়, একদিনের পরিচয়ে অত্যন্ত কাছের ক'রে পেলাম।"

সুভদ্র কহিল, "কিন্তু তোমাকে যে আমি পেলাম, তার জন্তে কোনও দাম এখনও দেওয়া হয়নি।"

অজয় এবারেও বিনয় প্রকাশ করিল না, কহিল, "পরে [illegible]"

আবার একবার নিঃশব্দে দুজনে দুজনের করমর্দন করিয়া তাহারা উঠিয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে ট্রেনের একটা প্রায়ান্ধকার কামরার স্বল্পপরিসর একটুখানি জায়গায় হাত-পা গুটাইয়া জড়সড় হইয়া শুইয়া অজয় ভাবিতে লাগিল, এই দুইটি দিনের পসরা বোঝাই করিয়া তাহার অদৃষ্টদেবতা কি অদ্ভুত বিপ্লবই না তাহার জীবনে বহন করিয়া আনিয়াছেন। সে যেন কোনও অর্থেই আর সেই আগেকার মানুষ নহে। যাহাদের চিরকাল পরমাত্মীয় বলিয়া জানিয়াছে, এই দুইটি দিন মুহূর্ত্তের জন্ত তাহাদের কথা তাহার মনে পড়ে নাই, অপরিচয়ের অন্ধকার কুক্ষিতল হইতে কাহারা উঠিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তে তাহার ইহকাল পরকাল জুড়িয়া বসিয়াছে। সুভদ্র, প্রভা, কবরীভারপীড়িতা জ্যোতির্ময়ী অপরিচিতা।···হঠাৎ তাহার মনে হইল, সেই অপরিচিতার মুখখানি কেমন, তাহার অনেকখানিই সে ভুলিয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে স্মৃতির টুকরাগুলিকে সযত্নে সাজাইয়া বহু চেষ্টাতেও সেই মুখখানিকে সে আর গড়িতে পারিল না। প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্বের আভাসভরা একটি বিশেষ মুখভাব যেন অশরীরী হইয়া একটি বিদ্যুদুজ্জ্বল গৌরবর্ণকে তাহার মনের উপর ভাসাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল না, কেন এমন হইতেছে। পাছে স্মৃতির গড়া মুখটিতে কোথাও একটু ত্রুটি হয়, পাছে সেই মুখখানির অনিন্দ্যতায় ভুলের কলঙ্কের স্পর্শ লাগে, সেই ভয়েই কি তাহার মন স্মৃতির পথ এড়াইয়া বেড়াইতেছে ? না, সেই এক পলকের দেখাতে তাহার চোখদুটি নিজেদের তৃপ্তির দাবি মিটাইয়া স্মৃতির জন্ত কিছুই আর অবশিষ্ট রাখে নাই, তাই স্মৃতি এমন রিক্ত ? বড় ইচ্ছা করিতে লাগিল, স্বপ্নে তাহার সঙ্গে আর-একবার দেখা হউক। কিন্তু সুভদ্র ইচ্ছা করিলেই ত আর হীরার তাজ, মণিমাণিক্যের গহনা পরিয়া, গজদন্তের মায়াদণ্ড হাতে করিয়া ঘুমের সিংহদ্বার পার হইয়া তাহার স্বপ্নরাজ্যে হাজির হইতে পাইবে না, নয়ত তাহাকে বলিয়া দেখা যাইত।

ঘুম আসিয়াছিল, গাড়ীর ঝাঁকানিতে হঠাৎ চমকিয়া জাগিয়া মনে হইল, ট্রেনটা যেদিক্ হইতে আসিতেছিল,

আবার সেইদিকেই হু হু করিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। মনে মনে নিজেকে ঘুরাইয়া লইয়া ভুলটার সংশোধন করিয়া লইল, তারপর খুশী হইয়া ভাবিতে লাগিল, কোন্ ঘাট হইতে নোঙর তোলা হইল, এবং কোন্ ঘাটে ফেলা হইল তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। পৃথিবীতে দিগ্বিদিকে কোনই প্রভেদ আসলে নাই। অত্যন্ত গভীর নিশ্চিন্ততার একটা নিঃশ্বাস লইয়া স্বল্পপরিসর বিছানাটাতে পাশ ফিরিয়া শুইল।

মনে আশা জাগিয়া রহিল, প্রভাতে কলিকাতায় নামিয়া কোনও অবকাশে অপরিচিতার মুখখানি আবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে।

ক্রমশঃ

বিশ্বভারতী—নারী-বিভাগ

শ্রীআশা দেবী

শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে নারী-বিভাগ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে ছোট ও বড় সকল বয়সের মেয়েদের জন্য একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক শিক্ষা দিবার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই সকল শিক্ষার আয়োজনগুলিকে সংহত করিয়া একটি মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করিবার সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠাতার মনে আছে। কিন্তু যতদিন না তাঁহার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয়, ততদিনও মেয়েদের নানাদিক হইতে শিক্ষা লাভ করিবার যত উপকরণ ও সুযোগ বিশ্বভারতীতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের অন্য কোনও নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাহা সম্ভব নয়।

১। শিশু-বিভাগ—ছয় হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত বালিকারা শিশু-বিভাগে পরিগণিত হইয়া থাকে। নারী-ভবনের একটি বিশেষ অংশে একজন পৃথক মেট্রনের তত্ত্বাবধানে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা আছে। এই বয়সে তাহাদের বাড়িবার সময় বলিয়া তাহাদের খাদ্য, খেলাধূলা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহাদের শিক্ষা যাহাতে কেবল পাঠ্যপুস্তকে আবদ্ধ না থাকে, সেজন্য তাহাদের বহির্জগতের সহিত পরিচয়ের এবং হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়—বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পাঠ্য বিষয় ছাড়া তাহাদের সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রবিদ্যা, কাঠের কাজ, মৃৎ-শিল্প (clay-modelling), সেলাই প্রভৃতির শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

২। স্কুল ও কলেজ বিভাগ—স্কুল ও কলেজ বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমীডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষার জন্য ছাত্রীদের প্রস্তুত করা হয়। এই বিভাগের ছাত্রীরা তাহাদের পরীক্ষার পাঠ্য ছাড়া সঙ্গীত, চিত্রকলা, সেলাই, বয়নশিল্প বা অন্য যে-কোনও হাতের কাজে শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুবিধা দেওয়া হয়। মেয়েদের দেখাশোনা করিবার জন্য নারীভবনে একজন মহিলা ওয়ার্ডেন ও একজন মেট্রন থাকেন, কিন্তু তাহাদের জীবন পরিচালনা করিবার ও সকল বিষয়ে নিয়ম রক্ষা করিবার ভার প্রধানতঃ তাহাদের নিজেদেরই হাতে। এইরূপে স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া, সাধারণ রন্ধনশালার কার্য্যে যথাযোগ্য সাহায্য, শিশুদের সময়ানুসারে দেখাশোনা ও রোগীর সেবা প্রভৃতি কার্য্যভার লইয়া যাহাতে তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, তাহাই এখানকার শিক্ষাবিধানের উদ্দেশ্য।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইয়া কেবল সাধারণভাবে শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা

করেন বা যে-বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ কেবল তাহারই অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্যও বিশ্বভারতীর নারী-বিভাগে বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

৩। **কলাভবন**—যাঁহাদের কেবলমাত্র সঙ্গীতে বা চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ, তাঁহারা বিশ্বভারতীর কলাভবনের ছাত্রী হইতে পারেন। কলাভবনের চিত্র-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও সঙ্গীত-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বিভাগের ছাত্রীরা যদি তাঁহাদের সাধারণ শিক্ষার জন্য আর কোনও বিভাগে কোনও বিষয় পড়িতে ইচ্ছা করেন তাহারও সুযোগ দেওয়া হয়।

৪। **বিদ্যাভবন**—যাঁহারা কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইয়া বিশেষভাবে কোনও বিষয়ের অধ্যয়ন বা গবেষণা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের ছাত্রী বলিয়া পরিগণিত হন এবং নির্ব্বাচিত বিষয়ে তাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বিশ্বভারতী হইতে তাঁহাদের যথাযোগ্য উপাধি দেওয়া হয়। বর্ত্তমান বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিশেষভাবে অধ্যয়ন বা গবেষণা করিবার ব্যবস্থা আছে :—

(১) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, (২) পালি ভাষা ও সাহিত্য, (৩) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, (৪) হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য, (৫) উর্দ্দু, ফার্সী, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, (৬) প্রাচীন ভারতেতিহাস ও কৃষ্টি, (৭) ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, (৮) জৈন-দর্শন ও জৈনশাস্ত্র, (৯) ভারতীয় পাশ্চাত্য দর্শন, (১০) শিশু-মনস্তত্ত্ব ও শিশুশিক্ষা।

৫। **শিল্প-বিভাগ**—যাঁহারা সাধারণ শিক্ষার সহিত কোনও হাতের কাজ বা অর্থকর শিল্পে শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত যে-কোন শিল্পে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন,—বয়ন, রঞ্জন, মুদ্রণ, বহি-বাঁধা, গালার কাজ, চামড়ার কাজ, সেলাই, বাতিক্-কাজ (batik), কাঠ-খোদাই।

৬। **পল্লীসেবা-বিভাগ**—পাশ্চাত্য দেশে যে-সকল মহিলা সমাজের সেবা বা অন্য কোনও জনহিতকর কার্য্য জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সেই সেই কার্য্যের জন্য যাহাতে আবশ্যক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, এমন অনেক প্রতিষ্ঠান ইউরোপে ও আমেরিকায় আছে। আমাদের দেশেও বর্ত্তমানে শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে এইরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করিবার গভীর ইচ্ছা জাগিয়াছে, কিন্তু সেই ব্রতগ্রহণের উপযুক্ত হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন সেরূপ শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ এক মহারাষ্ট্র প্রদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। বিশ্বভারতীর অন্তর্ভুক্ত "শ্রীনিকেতনে" পল্লীসেবা ও বিশেষভাবে বাংলার পল্লীগ্রামের নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে সেখানে মেয়েদের এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে।

পল্লীবাসী নরনারী বা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক জীবন, বা আর্থিক অনটন বা যে-কোন একটি বিশেষ সমস্যার সমাধানকে জীবনের ব্রত বলিয়া যে-সকল মেয়েরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং সেজন্য নিজেদের উপযুক্ত করিতে চাহেন তাঁহারা শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় গ্রামে গ্রামে যে-সকল অনুষ্ঠান আছে তাহাদের সহিত কাজ করিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন এবং পল্লীজীবনের সমস্যা লইয়া শ্রীনিকেতনে যে নিয়মিত বক্তৃতা ও আলোচনা হয় তাহাতে যোগদান করিয়া থিওরিটিক্যাল শিক্ষা লাভ করিতেও পারেন। তাঁহাদের থাকিবার ও কাজ করিবার সুবিধার জন্য সম্প্রতি শ্রীনিকেতনে একটি পৃথক ছাত্রীনিবাস স্থাপিত হইয়াছে।

যে-শিক্ষা মানব-প্রকৃতির কোনও অংশের বিকাশকে খর্ব্ব না করিয়া তাহার সমগ্র বিচিত্রতাকে সহজ ও সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ দেয়, সেই শিক্ষাই বিশ্বভারতীর আদর্শ ও লক্ষ্য। সেইজন্য বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে মেয়েদের শিক্ষার জন্য এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন যেখানে তাহারা তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানানুরাগ, সৌন্দর্য্যবোধ, সেবা ও কর্ম্মকুশলতা, সকল দিক হইতে নিজেকে প্রকাশ করিবার ও সৃষ্টি করিবার সুযোগ পাইয়া তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলে।

কষ্টিপাথর

ঐক্যের একটি পথ

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে অন্য অনেক দেশের লোকদের মত ঐক্য জন্মিবার অনেকগুলি বাধা আছে। সেগুলি ক্রমে ক্রমে দূর হইতেছে বটে, কিন্তু কতকগুলি এখনও প্রবল আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে ভাষার ভেদ একটি বাধা। যাহারা ইংরেজী জানে, তাহারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের ইংরেজী-জানা লোকদের সহিত মিলামিশা করিতে পারে। হিন্দী বা হিন্দুস্থানী জানিলে ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধের বিস্তর লোকের সহিত কথাবার্ত্তা এবং ভাব ও চিন্তার বিনিময় চলিতে পারে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক লোক হিন্দী শিখিতেছে। বাংলা জানিলে বঙ্গ বিহার ছোটনাগপুর উড়িষ্যা ও আসামের অধিকাংশ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা চালান যায়; তদ্ভিন্ন অন্যত্র প্রবাসী বাঙালী এবং কতকগুলি বাংলা-জানা অবাঙালীর সহিতও ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান চলিতে পারে।

ধর্ম্মভেদ পরস্পরের সহিত মিলামিশার যতটা অন্তরায় আগে ছিল, এখন রাজনৈতিক কারণে উহা তদপেক্ষা গুরুতর বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা কর্ত্তব্যবোধে পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে মিশিলে এই বাধা ক্রমশঃ কমিবে; কারণ মানুষের সঙ্গে না মিশিলে তাহাকে ভাল করিয়া জানা যায় না, এবং ভাল করিয়া না-জানিলে তাহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় না।

শুধু পুরুষ মানুষরাই পরস্পরের সহিত মিশিলে আমাদের জাতীয় ঐক্য অন্য অনেক দেশের লোকদের মত হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নারীরা পরস্পরের সহিত মিশিলে এবং সকল প্রদেশ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারীরা সুনীতি শিষ্টাচার অতিক্রম না করিয়া পরস্পরের সাহচর্য্য করিলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পাইবে। নারীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা এইরূপ মিলামিশা ও সাহচর্য্যের অন্তরায়।...এই বাধা অবশ্য ক্রমশঃ দূর হইবে। ব্রাহ্মসমাজ এই সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এখনও চালাইতেছেন। তাহার পর রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় ইহা ব্যাপকতর হইয়াছে।

সম্প্রতি মুসলমান সমাজে একটি অভিজাততম পরিবারে পর্দ্দা উঠিয়া যাওয়ায় আশা হয়, যে, ক্রমশঃ এদেশের মুসলমান সমাজ হইতেও উহা উঠিয়া যাইবে, যেমন্ তুরস্ক, এবং কিয়ৎপরিমাণে পারস্য ও অন্য কোন কোন মুসলমান দেশ হইতে উহা উঠিয়া গিয়াছে।...

ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দরাবাদের লোক-সংখ্যা এবং আয় সকলের চেয়ে বেশী। ইহার নৃপতি নিজামের চেয়ে বড় মুসলমান নৃপতি ভারতবর্ষে নাই। তিনি সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ বেড়াইতে যান। সেখানে তিনি যে-দিন মুসলমান বালিকাবিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলেন, সেদিন ঐ বিদ্যালয়ে তাঁহার সম্মানার্থ পর্দ্দা মানা হয় নাই। তিনি তাহাতে প্রীত হইয়া ছাত্রীদিগকে বলেন, "তোমরা দেখিতেছ আমার বাড়ীর মেয়েরা পর্দ্দা মানে না। তোমরাও তাহাদের মত পর্দ্দা মানিও না।" বস্তুত লক্ষ্ণৌতে নিজাম যতদিন ছিলেন, তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আয়োজিত যত সভা-সমিতিতে গিয়াছিলেন, বা শহরের দ্রষ্টব্য যে-সব স্থান ও অট্টালিকাদি দেখিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তন্মধ্যে যেখানে যেখানে তাঁহার পরিবারের অন্তঃপুরিকারা গিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় গিয়াছিলেন। ইহাতে লক্ষ্ণৌয়ের মত মুসলমান সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রের উলেমা ও মুজতাহিদগণ কোন প্রকার প্রতিবাদ বা আপত্তি করেন নাই।

তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশে এ বিষয়ে যেরূপ সংস্কার হইয়াছে, নিজামকে তাহার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হইতেছে।...

অবরোধপ্রথা, বোরখাপরিধান প্রভৃতি অনিষ্টকর রীতি দূর করিয়া পারস্যনারীদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা পারস্য দেশে বহু বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন কাল হইতে আগত সূফীদিগের ধর্ম্মমত এবং আধুনিক বাহাই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত এইরূপ চেষ্টার অনুকূল ছিল। ১৯২১ সালে যখন রিজা শাহ্ পহ্লবী তাৎকালিক পারস্যরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন, সেই সময়ে নূতন যুগ আরম্ভ হয় এবং পারস্যের স্বদেশপ্রেমিক মহিলাসমিতি স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও সভ্যাদিগকে নানা উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। এখনও তাহার সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। কিন্তু ইহার নিম্নলিখিত ছয়টি উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ হইতেছে,—

(১) স্ত্রীস্বাধীনতা; নারীদের মধ্য হইতে অবগুণ্ঠন অপসারণ।

(২) সামাজিক, পৌর ও রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহে তাহাদের অধিকার স্থাপন।

(৩) ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাদের বিবাহ রদ করা।

(৪) বহুবিবাহ বন্ধ করা।

(৫) স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে বিবাহের সময় স্বামীর অঙ্গীকৃত যৌতুক স্ত্রীর হস্তে আদায় করিবার নিমিত্ত বিশেষ নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ।

(৬) নারীদের স্বাধীনভাবে সভাসমিতি গঠন ও পরস্পরের সাহচর্য্য করিবার অধিকার, এবং তাহাদের প্রতিপক্ষের সহিত তর্কবিতর্ক চালাইবার অধিকার স্থাপন।

পারস্যের পার্লেমেণ্ট বা ব্যবস্থাপক সভার নাম মজলিস্। কয়েক মাস ধরিয়া মজলিসের সম্মুখে পারস্যের বিবাহঘটিত আইনের পরিবর্ত্তনার্থ একটি বিল্ উপস্থাপিত ছিল। সম্ভবতঃ তাহা এতদিন আইনে পরিণত হইয়াছে। ইহার একটি উদ্দেশ্য বিবাহের ন্যূনতম বয়স ৯ হইতে বাড়াইয়া ১৬ করা। আইনের আর একটি ধারায় আছে, যে, যদি কেহ একটি পত্নী থাকিতে আবার বিবাহ করিতে চায় তাহা হইলে যাহাকে দ্বিতীয় পত্নী করিতে যাইতেছে তাহাকে প্রথম পত্নীর অস্তিত্বের বিষয় জানাইতে হইবে; না জানাইলে দ্বিতীয় বিবাহ আইন অনুসারে অসিদ্ধ হইবে। আইনের অন্য একটি ধারা অনুসারে বিবাহ সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার কেবল পুরুষের একচেটিয়া থাকিবে না। ইহার অর্থ এই, যে, যে-যে রকম দুর্নীতি বা অন্য কারণে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে, স্ত্রীও সেই সেই কারণে স্বামীকে তালাক দিতে পারিবে। তা ছাড়া, বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিলে স্বামী বিবাহের সময় স্ত্রীর নিকট যে-যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা পালন করিতে হইবে।

বিলটি আইন হইবার আগে হইতেই লোকমত পুলিসের সাহায্যে তদনুসারে কাজ আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দশ বৎসরের একটি মেয়ের বিবাহ দিবার জন্ত রাজপথ দিয়া একটি মিছিল যাইতেছিল। তাহাদিগকে থামাইয়া মেয়ে কনে ও তাহার বাপমাকে রাজকর্ম্মচারীদের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। তাহারা তখনি সরাসরি বিচার করিয়া বিবাহ বন্ধ করিবার হুকুম দিল।

পারস্ত অপেক্ষা তুরস্কে সামাজিক পরিবর্ত্তন বেশী হইয়াছে। বোরখা অবগুণ্ঠন তুরস্ক হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। তুর্করমণীরা এখন অবাধে মুখ খুলিয়া সর্ব্বত্র চলাফিরা করিতে পারে। আইনের দ্বারা তাহাদিগকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নূতন পদবীতে উন্নীত করা হইয়াছে। আর্থিক বিষয়ে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও পুরুষদের সহিত সাম্য স্বীকৃত হইয়াছে। বিবাহবিষয়ক আইনও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কন্যাদিগকে আর সম্প্রদান করা হয় না; তাহারা নিজেই নিজের জীবনসঙ্গী নির্ব্বাচন করে। তালাক দিতে হইলে সুইজার্ল্যাণ্ড দেশের অনুরূপ তুর্ক আইন অনুসারে ভিন্ন তাহা করা চলে না। সর্ব্বসাধারণের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে বালিকা ও তরুণীরা শিক্ষা পাইতে পারে এবং পাইয়া থাকে। ছাত্রছাত্রী উভয়ের একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ সমর্থিত হইয়াছে এবং তদনুসারে কাজও হইতেছে।

ভারতবর্ষের বাহিরে মুসলমান সমাজের যে প্রগতি ও উন্নতি হইতেছে ভারতীয় মুসলমান সমাজ তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবে না, পারিতেছে না। নিজামের আচরণ তাহার একটি প্রমাণ। বিদেশে যাহা ঘটিতেছে, হিন্দু বা মুসলমান কাহারও দ্বারা তাহার অন্ধ অনুকরণ সমর্থনযোগ্য নহে। বিচার করিয়া সাহসের সহিত শ্রেয়ের পথে চলিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান তাহা করিলে জাতীয় ঐক্য, সংহতি, প্রগতি ও উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইবে।

বঙ্গলক্ষ্মী—বৈশাখ, ১৩৩৭]

সূর্য্যালোক ও কাষ্ঠালোকের সম্বন্ধ

ডাঃ শ্রীসহায়রাম বসু

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জলপাইগুড়ি বক্সাডুয়ার বনের মধ্যে আমি একটি ভাস্বর কাষ্ঠখণ্ড (sterculia) পাইয়াছিলাম। উহা প্রায় আট মাস পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৩০ সালের এপ্রিলের শেষভাগ পর্য্যন্ত আলোক বিকীরণ করিয়াছিল। গ্রীষ্মকালে ঘরের ভিতরে উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। শুনিতে পাই, বর্ষায় ও শরতে নাকি এই সব বনপ্রদেশে ভাস্বর গলিত পত্র ও কাষ্ঠখণ্ড প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই কাঠের ছোট একটি টুকরা দুইটি জীবাণুমুক্ত (sterilized) আমকাঠের কাঠির মধ্যে রাখিয়া সমস্তটা ভিজা তুলা দিয়া জড়াইয়া একটি উল্টানো কাচপাত্রের ভিতরে রাখা হইয়াছিল। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সেই ভাস্বর কাঠ হইতে অসংখ্য অতিসূক্ষ্ম hyphæ বাহির হইয়া সেই আমকাঠের কাঠিদুটিকে জালরূপে জড়াইয়া ধরিল, অন্ধকারে ঐগুলি বেশ উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। অতএব নিঃসংশয়ে বুঝা গেল যে, এই ভাস্বরতার একমাত্র কারণ, sterculia-কাঠের অভ্যন্তরীণ অংশ হইতে আমকাঠের উপরে ছত্রকের উদ্ভব। শুষ্ককাঠে সচরাচর যে-সব জীবাণু থাকে, উহারা এই ভাস্বরতার কারণ নহে। Autoclaved কাঠ আলোক বিকিরণ করে না; কারণ উহাকে ২০ মিনিট ধরিয়া ১২২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবাণুমুক্ত করিবার সময় ছত্রকগুলি মারা যায়।

এই-সব ভাস্বর কাঠের উপর সূর্য্যালোকের প্রভাব কতটুকু, এ যাবৎ বিশেষ আলোচনা হয় নাই বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা এই যে, ছত্রক ও জীবাণু সর্ব্বদাই আপনা হইতেই আলোক দিতে পারে; কিন্তু নিম্নে যে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, এই দীপ্তি অবিরাম নহে; কারণ সূর্য্যালোকে সজীব hyphæ যে শক্তি লাভ করে, এই উজ্জ্বলতা তাহার উপরই নির্ভর করে।

অত্যুজ্জ্বল কয়েক টুকরা কাঠ শুষ্ক অবস্থায় একটি টেষ্টটিউবের মধ্যে রাখিয়া টিউবটিকে কালো কাপড়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া ভিতরে স্বাভাবিক উত্তাপের মধ্যে সাত দিন পর্য্যন্ত রাখা হইয়াছিল। প্রত্যেক দিনই উহা খুলিয়া পরীক্ষা করা হইত; শেষে দেখা গেল যে, উহাদের আলোকবিকীরণ ক্ষমতা সপ্তম দিনের পর নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাদিগকে একটি roux টিউবের সঙ্কুচিত অংশে একটু জল দিয়া আর্দ্র করিয়া পূর্ব্বের মত অন্ধকার ঘরে স্বাভাবিক উত্তাপের মধ্যে রাখিয়া দেখা গেল, তাহাদের ভাস্বরতা দুই সপ্তাহের অধিককাল স্থায়ী হইল, এবং আঠারো দিবসের পূর্ব্বে তাহা নিঃশেষ হইল না। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সজীব hyphæ শুষ্ক অবস্থা অপেক্ষা আর্দ্র অবস্থাতেই বেশী সক্রিয় থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই ঐ কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে মুক্ত সূর্য্যালোকে ফেলিয়া রাখিয়া দেখা গিয়াছিল, উহারা আবার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া পাইয়াছিল। একেবারে সোজাসুজি (direct) সূর্য্যালোকে এবং বিকীর্ণ (diffused) সূর্য্যালোকে কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া ভাস্বরতার একটু পার্থক্য দেখা গেল। বিকীর্ণ সূর্য্যালোকে কাঠের সাধারণ উজ্জ্বলতা বাড়িয়া গেল, আর সোজাসুজি সূর্য্যালোকে কাঠটির কোন কোন স্থান অতিশয় উজ্জ্বল, এবং কোন কোন স্থান অনুজ্জ্বল হইয়া রহিল।

পাঁচ হইতে দশ মিনিট সূর্য্যালোকে রাখার ফলে কাঠের উজ্জ্বলতা যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অতি সহজে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু উহাকে পনের ঘণ্টাকাল নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে শুষ্ক অবস্থায় রাখিয়া দেখা গেল যে, উহার ঔজ্জ্বল্যের তীব্রতা কমিয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় কাঠের উপরিভাগ আস্তে আস্তে চাঁচিয়া ফেলিয়া এবং তাহাতে পরিস্রুত শীতল জলের ধারা দিয়া উহার দীপ্তি আবার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; এরূপ করাতে ঐ কাঠের অভ্যন্তরস্থ hyphæ বায়ু ও জলের সংস্পর্শে আসে। ঐ কাষ্ঠখণ্ড শুষ্ক অবস্থায় ক্রমাগত তিন দিনের বেশী অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে রাখিলে উহার ভাস্বরতা পুনর্লাভের একমাত্র উপায় উহাকে সূর্য্যালোকে ফেলিয়া রাখা। ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

যাহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন একখণ্ড কাঠকে প্রথমে দশ মিনিট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত সূর্য্যকিরণে রাখিয়া দেখা গেল যে, প্রথম দশ কি পনের মিনিটের মধ্যেই উজ্জ্বলতা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে, এক ঘণ্টার মধ্যে সেই আলো তীব্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে ও ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐরূপ থাকে। ছয় ঘণ্টার পর সূর্য্যের তপ্ত কিরণের অবিশ্রান্ত ক্রিয়ার ফলে সেই উজ্জ্বলতা আবার কমিয়া যায়। প্রখর সূর্য্যকিরণে (যথা এপ্রিল মাসের দিনের বেলা ১১টার পর) এই উজ্জ্বলতা আরও দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সজীব hyphæ প্রখর সূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু যখন ঐ কাঠখানিকে একটি কাচ-নির্ম্মিত আবরণের (glass jacket) ভিতরে তপ্ত কিরণরাশি হইতে আড়াল করিয়া রাখা হইল এবং সেই আবরণের ভিতর দিয়া অবিশ্রান্ত জলস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন সাত ঘণ্টা ফেলিয়া রাখিবার পরেও ভাস্বরতা প্রায় অক্ষুণ্ণই ছিল।

সৌরকরের কোনও বিশিষ্ট রশ্মি এই দীপ্তি পুনর্লাভের কারণ কি-না, তাহা জানিবার জন্য কয়েকবার filter-experiment করা হইয়াছিল (কাঠ খণ্ডগুলিকে wratten filter দ্বারা ঢাকিয়া সূর্য্যালোকে রাখা)। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ এই উজ্জ্বলতার কারণ সজীব hyphæ-র উপর সূর্য্যালোকের স্বাভাবিক উত্তেজক প্রভাব। সেই কাঠের উপর ভারী কাচের আবরণ দিয়া বেগুনাতীত সূর্য্যরশ্মিকে রুদ্ধ করিয়াও অন্য কোনরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, বেগুনাতীত রশ্মি উজ্জ্বলতাবৃদ্ধির কারণ নহে।

ভাস্বর কাঠের অগ্নিশিখাটিকে micro-রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া অথবা রশ্মিবিশ্লেষণ যন্ত্রের (spectroscope) সাহায্যে পরীক্ষা করিয়াও তাহাতে কোন দীপ্তিশীল ধাতুর অস্তিত্ব ধরা পড়ে নাই; gold-leaf electroscope-এর সাহায্যে ও কোন স্বতঃকিরণবিসারী পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। অধিকন্তু, আলোকবর্ধনে সাধারণতঃ ছোট তরঙ্গের রশ্মিগুলি শোষিত এবং দীর্ঘতর তরঙ্গের রশ্মিগুলি বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দীপ্তিশীলতাকে অধ্যাপক ই. এন্, হার্ভের মতানুসারে "Chemilupminescence" বলা উচিত।

Quartz রশ্মি-বিশ্লেষণ যন্ত্র সাহায্যে ভাস্বর কাঠ হইতে বিকীর্ণ আলোকের একটি ফটো লওয়া হইয়াছিল। উহাতে ·৪৬৫ μ হইতে ·৩৮০ μ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ সবুজ হইতে বেগুনাতীত অংশের প্রাথমিক ভাগ পর্য্যন্ত) একটি স্বল্পায়তন অবিচ্ছিন্ন বর্ণছত্র (spectrum) দেখা যায়।...

সম্প্রতি (১৯৩১ সাল) দক্ষিণ-ব্রহ্ম হইতে আমার নিকট কতকগুলি ভাস্বর কাঠখণ্ড প্রেরিত হইয়াছে। সেগুলি হইতে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে টেষ্টটিউবে এবং বড় বড় ফ্লাস্কে আমি একজাতীয় ছত্রক জন্মাইয়াছি। উহা অন্ধকারে সুন্দর শীতল আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই ছত্রক *Agaricus* জাতীয় *pleurotus* শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ভাস্বর কাঠগুলির সহিত কিন্তু সূর্য্যালোকের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতি—পৌষ-মাঘ, ১৩৩৮]

মহিলা-সংবাদ

নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারকল্পে বিবিধ প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। কলিকাতা ৮০ বি ল্যান্সডাউন রোডস্থিত নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এইরূপ একটি প্রচেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিধারিণী মহিলাগণ ইহার কর্ম্মী। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী অধিগত করিয়াছেন, এবং একজন ডাক্তারও আছেন।

বিশেষ করিয়া প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের মধ্যে অত্যাবশ্যক বিষয়ে শিক্ষা প্রচার করাই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইঁহাদের অধ্যয়নের সুবিধার জন্য ১২—৩টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয় খোলা থাকে। এখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সন্তান-পালন স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্তানের জননীগণ সন্তানসহ এখানে আসিতে পারেন, কারণ শিশুগণকে রাখিবার স্থানেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা পুরকায়স্থ, এম্-এ মহোদয়ার সঙ্গে উপরের ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে এ বিষয়ে সবিশেষ জানা যাইবে।

—

লাহোর মেয়ো আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এবার এই পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার ছিল।

—

ময়মনসিংহ মহিলা-সমিতি। এই সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রতিভা নাগের রিপোর্ট হইতে অবগত হইলাম, কুড়িটি কেন্দ্রে ইহার কাজ হয়। প্রতি কেন্দ্রে নিয়মমত তাঁতের কাজ ও সেলাইয়ের কাজ হয়। সেলাইয়ের কাজ শিখাইবার জন্য একজন শিক্ষিত দরজী এবং তাঁতের কাজ শিখাইবার জন্য টিপ্ রাই তাঁতে নিপুণ একটি শিল্পীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। চরকা ও টেকুয়া দ্বারা



নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মিগণ

প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রেই সুতা কাটা হয়। শুশ্রূষা ও ধাত্রী বিদ্যা শিখাইবার ক্লাস আছে। ব্যায়াম ও খেলা শিখাইবার ক্লাস আছে। মধ্যে মধ্যে মহিলাদের দ্বারা প্রস্তুত নানাবিধ জিনিষের প্রদর্শনী হয়। সমিতির অধিবেশনগুলিতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং নানা প্রকার হিতকর প্রস্তাবের আলোচনা হয়। এই সমিতির সভাসংখ্যা ৩৫০। দেশে এইরূপ সমিতির সংখ্যা যত বাড়ে ততই ভাল।

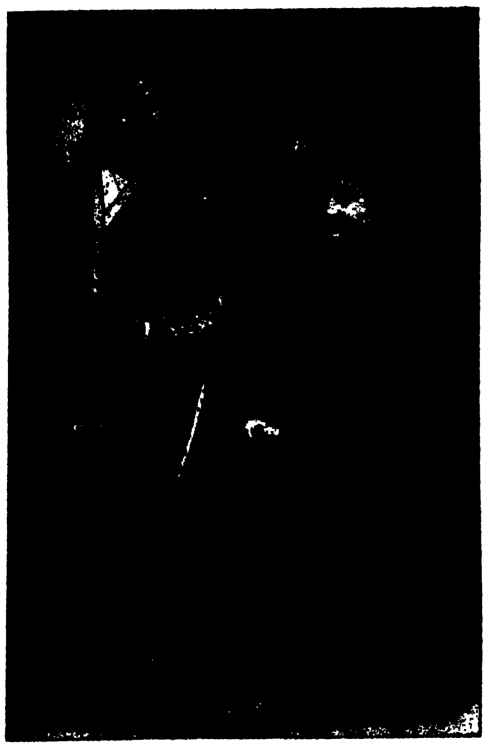
আসাম গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দকে শিলচর সেণ্ট্রেল জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ের পুত্রবধূ।

—

শ্রীমতী সুরভি সিংহ রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বি-এল উপাধি প্রাপ্ত



শ্রীমতী সুরভি সিংহ



শ্রীমতী মায়ালতা সোম

হইয়াছেন। শ্রীমতী সুরভি কলিকাতা বীটন কলেজ হইতে ১৯৩০ সনে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি-এ পাশ করেন।

—

শ্রীমতী মায়ালতা সোম বিলাতে থাকিয়া মন্তেসরি শিক্ষাপ্রণালী অধিগত করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের মন্তেসরি বিভাগে শিক্ষকতা কার্য্যে লিপ্ত আছেন।

শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক



শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্ত

বরিশালনিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা। করুণাকণা ১৯২৭ সনে ঢাকা বোর্ডের হাই স্কুল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৯ সনে ঢাকায় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতেও প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। শ্রীমতী করুণাকণা এ-বৎসর সেখানকার ত্রৈবার্ষিক অনার্স (বি-এ) পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—

বহরমপুরে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা—প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী ও শ্রীযুক্তা সুষমা সিংহের



শ্রীযুক্তা সুষমা সিংহ

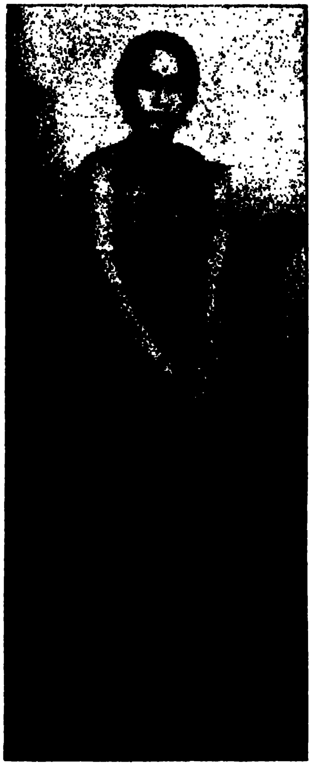
চেষ্টাযত্নে বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ) একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

—

শ্রীমতী রমলা দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।



বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের অধিবাসিনীগণ



শ্রীমতী রমলা দে



মেয়েরা বাগানে কাজ করিতেছে

ডক্টর থিলয়ম্বালম, এম-এস্‌সি, পি-এইচ-ডি লক্ষ্ণৌএর ইসাবেলা থবার্ণ কলেজের জীবতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার। তিনি মার্কিণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারীপ্রতিষ্ঠান ওয়েলেসলি কলেজে এক বৎসরের জন্য বিনিময় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে লক্ষ্ণৌতে আসিবেন ওয়েলেসলি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর অষ্টীন। ইঁহারা উভয়েই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। ডক্টর থিলয়ম্বালম গত ২৮এ এপ্রিল কলিকাতা হইতে মার্কিণ যাত্রা করিয়াছেন।

—

পুরীতে নারী মঙ্গল—

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতির হাতে ৺ বসন্তকুমারী চট্টোপাধ্যায় (জষ্টিস স্যর প্রতুল চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী)

পুরীর যে বিধবাশ্রমের পরিচালনার ভার দিয়া গিয়াছেন, উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর উহা পরিচালনা করিতেছেন। উহার নাম পুরী "বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম"। বৎসর দেড়েক আগে শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর (সর্ব্বত্র "বড়মা" বলিয়া পরিচিত) ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সময় স্থানীয় বালিকাদের শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা না দেখিয়া বিধবাশ্রমের সংলগ্ন "নূতন বালিকা-বিদ্যালয়" খোলেন। ইহাই এখন এ অঞ্চলের প্রধান বালিকা-শিক্ষাকেন্দ্র। ইহার বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণীর সভার কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

এই প্রতিষ্ঠান কালে আরও অনেক বড় হইবে, "বড়মা" হয়ত না-ও থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে মশলা দিয়া ইহার মূল গঠন করিয়াছেন, তাহার স্মৃতিকে একটি সুবর্ণের অক্ষয় কৌটার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত।

ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বিদ্যালয়টি আরম্ভ হইয়াছে ঠিক এমনি সময়ে, যে-সময়ে প্রায় চতুর্দ্দিক হইতেই আর্থিক অসুবিধার জন্য কোন সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। নানারকম আর্থিক অসুবিধার মধ্যে ইহা ভিতরে ভিতরে যে সফল হইয়াছে, তাহা ধরা পড়িয়াছে ঐ পুরস্কার বিতরণী সভার দিনে। সভা ভদ্রমহিলা ও পুরুষগণে পূর্ণ ছিল। পুরীর রাজাসাহেব সভাপতি ছিলেন। এই জিনিষটির সম্বন্ধে বলা যতই সোজা হউক, কিন্তু বাংলার বাহিরে প্রতিকূল হাওয়ার মধ্যে ইহা গঠন করিয়া তোলা সোজা নহে। পুরস্কার বিতরণীর লম্বা প্রোগ্রাম দেখিয়া, আমার ভয় হইয়াছিল অনেক লোক এত সময় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা থাকিতে পারিবেন কিনা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দৃশ্যটি এতই মধুর বোধ হইয়াছিল যে কেহই সভাত্যাগ করেন নাই। মেয়েদের আবৃত্তি, গান, গতিভঙ্গী, নারীমঙ্গল ও ড্রিল অতি সুন্দর হইয়াছিল। এই সব এমন ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল, যেন মনে হইতেছিল একটি উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখিতেছি।



শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী

শ্রীযুক্ত এন্ কে, রায় পুরস্কার বিতরণ করিয়া সভার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

সভাপতি পুরীর রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেবকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর তিনি শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সহিত সহিত পরিচিত হন, এবং সভার সকল চেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বহু ধন্যবাদ দেন। রাণী সাহেবার সহিত "বড়মা"র পরিচয় করিয়া দিবার জন্য তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেন।

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

পারস্য-যাত্রা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ এপ্রেল, ১৯৩২। দেশ থেকে বেরবার বয়স গেছে এইটেই স্থির ক'রে বসেছিলুম। এমন সময় পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এল। মনে হ'ল এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্ত্তব্য হবে। তবু সত্তর বছরের ক্লান্ত শরীরের পক্ষ থেকে দ্বিধা ঘোচে নি। বোম্বাই থেকে আমার পারসী বন্ধু দিনশা ইরাণী ভরসা দিয়ে লিখে পাঠালেন যে, পারস্যের বুশেয়ার বন্দর থেকে তিনিও হবেন আমার সঙ্গী। তা ছাড়া খবর দিলেন যে, বোম্বাইয়ের পারসিক কন্সাল কেহান সাহেব পারসিক সরকারের পক্ষ থেকে আমার যাত্রার সাহচর্য্য ও ব্যবস্থার ভার পেয়েছেন।

এর পরে ভীরুতা করতে লজ্জা বোধ হ'ল। রেলের পথ এবং পারস্য উপসাগর সেই গরমের সময় আমার উপযোগী হবে না ব'লে ওলন্দাজদের বায়ুপথের ডাকযোগে যাওয়াই স্থির হ'ল। কথা রইল আমার শুশ্রূষার জন্যে বউমা যাবেন সঙ্গে, আর যাবেন কর্ম্মসহায়রূপে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্ত্তী। এক বায়ুযানে চার জনের জায়গা হবে না ব'লে কেদারনাথ এক সপ্তাহ আগেই শূন্যপথে রওনা হয়ে গেলেন।

পূর্ব্বে আর একবার এই পথের পরিচয় পেয়েছিলুম লণ্ডন থেকে প্যারিসে। কিন্তু সেখানে যে-ধরাতল ছেড়ে ঊর্দ্ধে উঠেছিলুম তার সঙ্গে আমার বন্ধন ছিল আলগা। তার জল স্থল আমাকে পিছু ডাক দেয় না, তাই নোঙর তুলতে টানাটানি করতে হয় নি। এবারে বাংলা দেশের মাটির টান কাটিয়ে নিজেকে শূন্যে ভাসান দিলুম, হৃদয় সেটা অনুভব করলে।

কলকাতার বাহিরের পল্লীগ্রাম থেকে যখন বেরলুম তখন ভোরবেলা। তারাখচিত নিস্তব্ধ অন্ধকারের নীচে দিয়ে গঙ্গার স্রোত ছলছল করচে। বাগানের প্রাচীরের গায়ে সুপুরি গাছের ডাল দুলচে বাতাসে, লতাপাতা ঝোপঝাপের বিমিশ্র নিঃশ্বাসে একটা শ্যামলতার গন্ধ আকাশে ঘনীভূত। নিদ্রিত গ্রামের আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্য দিয়ে মোটর চলল। কোথাও বা দাগধরা পুরোনো পাকা দালান, তার খানিকটা বাসযোগ্য, খানিকটা ভেঙে-পড়া; আধা-শহুরে দোকানে দ্বার বন্ধ; শিবমন্দির জনশূন্য; এবড়ো-খেবড়ো পোড়ো জমি; পানাপুকুর; ঝোপঝাড়। পাখীদের বাসায় তখনো সাড়া পড়ে নি, জোয়ার-ভাটার সন্ধিকালীন গঙ্গার মত পল্লীর জীবনযাত্রা ভোরবেলাকার শেষ ঘুমের মধ্যে থমকে আছে।

গলির মোড়ে নিষুপ্ত বারান্দায় খাটিয়া-পাতা পুলিস থানার পাশ দিয়ে মোটর পৌঁছল বড় রাস্তায়। অমনি নতুন কালের কড়া গন্ধ মেলে ধুলো জেগে উঠল, গাড়ির পেট্রোল বাষ্পের সঙ্গে তার সগোত্র আত্মীয়তা। কেবল অন্ধকারের মধ্যে দুই সারি বনস্পতি পুঞ্জিত পল্লব-স্তবকে প্রাচীন কালের নীরব সাক্ষ্য নিয়ে স্তম্ভিত; সেই যে-কালে শতাব্দীপর্য্যায়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার ছায়াস্নিগ্ধ অঙ্গন পাশে অতীত যুগের ইতিহাসধারা কখনো মন্দ গম্ভীর গতিতে কখনো ঘূর্ণাবর্ত্তসঙ্কুল ফেনায়িত বেগে বয়ে চলেছিল। রাজপরম্পরার পদচিহ্নিত এই পথে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ভীষণ বর্গী, কখনো কোম্পানির সেপাই ধুলোর ভাষায় রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা ঘোষণা ক'রে যাত্রা করেছে। তখন ছিল হাতী, উট, তাঞ্জাম, ঘোড়সওয়ারদের অলঙ্কৃত ঘোড়া; রাজপ্রতাপের সেই সব বিচিত্রবাহন ধুলোর ধূসর অন্তরালে মরীচিকার মত মিলিয়ে গেছে। একমাত্র বাকী আছে সর্ব্বজনের ভারবাহিনী করুণ মন্থর গরুর গাড়ি।

দম্ দম্-এ উড়ো জাহাজের আড্ডা ঐ দেখা যায়। প্রকাণ্ড তার কোটর থেকে বিজলি বাতির আলো বিচ্ছুরিত। তখনো রয়েছে বৃহৎ মাঠজোড়া অন্ধকার।

সেই প্রদোষের অস্পষ্টতায় ছায়াশরীরীর মত বন্ধু-বান্ধব ও সংবাদপত্রের দূত জমে উঠতে লাগল।

সময় হয়ে এল। ডানা ঘুরিয়ে ধুলো উড়িয়ে হাওয়া আলোড়িত করে ঘর্ঘর গর্জ্জনে যন্ত্র পক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে। আমি, বউমা, অমিয় উপরে চড়ে বসলুম। ঢাকা রথ, দুই সারে তিনটে ক'রে চামড়ার দোলাওয়ালা ছয়টি প্রশস্ত কেদারা, আর পায়ের কাছে আমাদের পথে ব্যবহার্য্য সামগ্রীর হাল্কা বাক্স। পাশে কাঁচের জানলা।

ব্যোমতরী বাংলা দেশের উপর দিয়ে যতক্ষণ চলল ততক্ষণ ছিল মাটির কতকটা কাছাকাছি। পানা-পুকুরের চারি ধারে সংসক্ত গ্রামগুলি ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মত খণ্ড খণ্ড চোখে পড়ে। উপর থেকে তাদের ছায়াঘনিষ্ঠ শ্যামল মূর্ত্তি দেখা যায় ছাড়া ছাড়া, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি আসন্ন গ্রীষ্মে সমস্ত তৃষা-সন্তপ্ত দেশের রসনা আজ শুষ্ক। নির্ম্মল নিরাময় জল-গণ্ডূষের জন্যে ইন্দ্রদেবের খেয়ালের উপর ছাড়া আর কারো 'পরে এই বহু কোটি লোকের যথোচিত ভরসা নেই।

মানুষ পশু পাখী কিছু যে পৃথিবীতে আছে সে আর লক্ষ্য হয় না। শব্দ নেই, গতি নেই, প্রাণ নেই; যেন জীববিধাতার পরিত্যক্ত পৃথিবী তালি-দেওয়া চাদরে ঢাকা। যত উপরে উঠচে ততই পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য কতকগুলো আঁচড়ে এসে ঠেকল। বিস্মৃতনামা প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিলিপি যেন অজ্ঞাত অক্ষরে কোনো মৃতদেশের প্রান্তর জুড়ে খোদিত হয়ে পড়ে আছে, তার রেখা দেখা যায়, অর্থ বোঝা যায় না।

প্রায় দশটা। এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে বায়ুযান নামবার মুখে ঝুঁকল। ডাইনের জানালা দিয়ে দেখি নীচে কিছুই নেই, শুধু অতল নীলিমা, বাঁ দিকে আড় হয়ে উপরে উঠে আসচে ভূমিতলটা। খেচর-রথ মাটিতে ঠেকল এসে; এখানে সে চলে, লাফাতে লাফাতে, ধাক্কা খেতে খেতে; অপ্রসন্ন পৃথিবীর সম্মতি সে পায় না যেন।

শহর থেকে জায়গাটা দূরে। চারদিক ধূ ধূ করচে। রৌদ্রতপ্ত বিরস পৃথিবী। নামবার ইচ্ছা হ'ল না। কোম্পানির একজন ভারতীয় ও একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী আমার ফোটো তুলে নিলে। তার পরে খাতায় দু-চার লাইন স্বাক্ষরের দাবি করল যখন, আমার হাসি পেল। আমার মনের মধ্যে তখন শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গরের শ্লোক গুঞ্জরিত। ঊর্দ্ধ থেকে এই কিছু আগেই চোখে পড়েছে নির্জ্জীব ধূলিপটের উপর অদৃশ্য জীবলোকের গোটাকতক স্বাক্ষরের আঁচড়। যেন ভাবী যুগাবসানের প্রতিবিম্ব পিছন ফিরে বর্ত্তমানের উপর এসে পড়েছে। যে-ছবিটা দেখলেম সে একটা বিপুল রিক্ততা; কালের সমস্ত দলিল অবলুপ্ত; স্বয়ং ইতিবৃত্তবিৎ চিরকালের ছুটিতে অনুপস্থিত; রিসার্চ বিভাগের ভিৎটা-সুদ্ধ তলিয়ে গেছে মাটির নীচে।

এইখানে যন্ত্রটা পেটভ'রে তৈল পান ক'রে নিলে। আধঘণ্টা থেমে আবার আকাশ-যাত্রা সুরু। এতক্ষণ পর্য্যন্ত রথের নাড়া তেমন অনুভব করি নি, ছিল কেবল তার পাখার দুঃসহ গর্জ্জন। দুই কানে তুলো লাগিয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছিলুম। সামনের কেদারায় ছিলেন একজন দিনেমার, ইনি মেনিলা দ্বীপে আখের ক্ষেতের তদারক করেন, এখন চলেছেন স্বদেশে। গুটোনো ম্যাপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাত্রাপথের পরিচয় নিচ্চেন, ক্ষণে ক্ষণে চলচে চীজ রুটি, চকোলেটের মিষ্টান্ন, খনিজাত পানীয় জল; কলকাতা থেকে বহুবিধ খবরের কাগজ সংগ্রহ ক'রে এনেছেন, আগাগোড়া তাই তন্ন তন্ন ক'রে পড়চেন একটার পর একটা। যাত্রীদের মধ্যে আলাপের সম্বন্ধ রইল না। যন্ত্র-হুঙ্কারের তুফানে কথাবার্ত্তা যায় তলিয়ে। এককোণে বেতারবার্ত্তিক কানে ঠুলি লাগিয়ে কখনো কাজে কখনো ঘুমে কখনো পাঠে মগ্ন। বাকী তিনজন পালাক্রমে তরি-চালনায় নিযুক্ত, মাঝে মাঝে যাত্রার দফ্‌তর লেখা, কিছু বা আহার, কিছু বা তন্দ্রা। ক্ষুদ্র এক টুক্‌রো সজনতা নীচের পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে উড়ে চলেছে অসীম জনশূন্যতায়।

জাহাজ ক্রমে ঊর্দ্ধতর আকাশে চড়চে, হাওয়া চঞ্চল, তরি টলোমলো। ক্রমে বেশ একটু শীত ক'রে এল। নীচে পাথুরে পৃথিবী, রাজপুতানার কঠিন বন্ধুরতা শুষ্ক স্রোতঃপথের শীর্ণ রেখাজালে অঙ্কিত, যেন গেরুয়া-পরা বিধবা-ভূমির নির্জ্জলা একাদশীর চেহারা।

অবশেষে অপরাহ্নে দূর থেকে দেখা গেল রুক্ষ মরুভূমির পাংশুল বক্ষে যোধপুর শহর। আর তারই প্রান্তরে যন্ত্র-পাখীর হাঁ-করা প্রকাণ্ড নীড়। নেমে দেখি এখানকার সচিব কুন্‌বার মহারাজ সিং সস্ত্রীক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, তখনই নিয়ে যাবেন তাঁদের ওখানে চা-জলযোগের আমন্ত্রণে। শরীরে তখন প্রাণ-ধারণের উপযুক্ত শক্তি কিছু ছিল, কিন্তু সামাজিকতার উপযোগী উদ্বৃত্ত ছিল না বললেই হয়। কষ্টে কর্ত্তব্য সেরে হোটেলে এলুম।

হোটেলটি বায়ুতরিযাত্রীর জন্যে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাবেলায় তিনি দেখা করতে এলেন। তাঁর সহজ সৌজন্য রাজোচিত। মহারাজ স্বয়ং উড়োজাহাজ-চালনায় সুদক্ষ। তার যত রকম দুঃসাহসী কৌশল আছে প্রায় সমস্তই তাঁর অভ্যস্ত।

পরের দিন ১২ই এপ্রেল ভোর রাত্রে জাহাজে উঠতে হ'ল। হাওয়ার গতিক পূর্ব্ব দিনের চেয়ে ভালই। অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নে করাচিতে পুরবাসীদের আদর-অভ্যর্থনার মধ্যে গিয়ে পৌঁছনো গেল। সেখানে বাঙালী গৃহলক্ষ্মীর সযত্নপক্ক অন্ন ভোগ ক'রে আধঘণ্টার মধ্যে জাহাজে উঠে পড়লুম।

সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে উড়ছে জাহাজ। বাঁ-দিকে নীল জল, দক্ষিণে পাহাড়ে মরুভূমি। যাত্রার শেষ অংশে বাতাস মেতে উঠল। ডাঙায় বাতাসের চাঞ্চল্য নানা পদার্থের উপর আপন পরিচয় দেয়। এখানে তার একমাত্র প্রমাণ জাহাজটার ধড়ফড়ানি। বহুদূর নীচে সমুদ্রে ফেনার শাদা রেখায় একটু একটু তুলির পোঁচ দিচ্ছে। তার না-শুনি গর্জ্জন, না-দেখি তরঙ্গের উত্তালতা।

এইবার মরুদ্বার দিয়ে পারস্যে প্রবেশ। বুশেয়ার থেকে সেখানকার গবর্ণর বেতারে দূরলিপিযোগে অভ্যর্থনা পাঠিয়েছেন। করাচি থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যোমতরী জাস্ক-এ পৌঁছল। সমুদ্রতীরে মরুভূমিতে এই সামান্য গ্রামটি। কাদায় তৈরি গোটাকতক চৌকো চ্যাপ্টা-ছাদের ছোট ছোট বাড়ি ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, যেন মাটির সিন্দুক।

আকাশযাত্রীদের পান্থশালায় আশ্রয় নিলুম। রিক্ত এই ভূখণ্ডে নীলাম্বুচুম্বিত বালুরাশির মধ্যে বৈচিত্র্য-সম্পদ কিছুই নেই। সেই জন্যেই বুঝি গোধূলিবেলায় দিগঙ্গনার স্নেহ দেখলুম এই গরীব মাটির 'পরে। কী সুগম্ভীর সূর্য্যাস্ত, কী তার দীপ্যমান শান্তি, পরিব্যাপ্ত মহিমা। স্নান ক'রে এসে বারান্দায় বসলুম, স্নিগ্ধ বসন্তের হাওয়ায় ক্লান্ত শরীরকে নিবিড় আরামে বেষ্টন ক'রে ধরলে।

এখানকার রাজকর্ম্মচারীর দল সম্মান-সম্ভাষণের জন্যে এলেন। বাইরে বালুতটে আমাদের চৌকি পড়েচে। যে দুই একজন ইংরেজী জানেন তাঁদের সঙ্গে কথা হ'ল। বোঝা গেল পুরাতনের খোলস বিদীর্ণ ক'রে পারস্য আজ নূতন প্রাণের পালা আরম্ভ করতে প্রস্তুত। প্রাচ্য জাতির মধ্যে যেখানে জাগরণের চাঞ্চল্য সেখানে এই একই ভাব। অতীতের আবর্জ্জনামুক্ত সমাজ, সংস্কারমুক্ত চিত্ত, বাধামুক্ত মানব-সম্বন্ধের ব্যাপ্তি, বাস্তব জগতের প্রতি মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই তাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তারা জানে, হয় বর্ত্তমান কালের শিক্ষা নয় তার সাংঘাতিক আঘাত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অতীত কালের সঙ্গে যাদের দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনের জটিলতা, মৃত যুগের সঙ্গে আজ তাদের সহমরণের আয়োজন।

এখানে পরধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি কি রকম ব্যবহার এই প্রশ্নের উত্তরে শুনলুম, পূর্ব্বকালে জরথুস্ত্রীয় ও বাহাইদের প্রতি অত্যাচার ও অবমাননা ছিল। বর্ত্তমান রাজার শাসনে পরধর্ম্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে গেছে, সকলেই ভোগ করছে সমান অধিকার, ধর্ম্মহিংস্রতার নর-রক্তপঙ্কিল বিভীষিকা কোথাও নেই। ডাক্তার মহম্মদ ইসা খাঁ সাদিকের রচিত আধুনিক পারস্যের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিত আছে,—অনতিকাল পূর্ব্বে ধর্ম্মযাজক-মণ্ডলীর প্রভাব পারস্যকে অভিভূত ক'রে রেখেছিল। আধুনিক বিদ্যাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবের প্রবলতা কমে এল। এর পূর্ব্বে নানা শ্রেণীর অসংখ্য লোক, কেউ-বা ধর্ম্মবিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ-বা ধর্ম্মপ্রচারক, কোরাণ-পাঠক, সৈয়দ,—এরা সকলেই মোল্লাদের মত পাগড়ী ও

সাজসজ্জা ধারণ করত। যখন দেশের প্রধানবর্গের অধিকাংশ লোক আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত হলেন তখন থেকে বিষয়বুদ্ধিপ্রবীণ পুরোহিতদের ব্যবসায় সঙ্কুচিত হয়ে এল। এখন যে খুশী মোল্লার বেশ ধরতে পারে না। বিশেষ পরীক্ষা পাস ক'রে অথবা প্রকৃত ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সম্মতি অনুসারে তবেই এই সাজধারণের অধিকার পাওয়া যায়। এই আইনের তাড়নায় শতকরা নব্বই সংখ্যক মানুষের মোল্লার বেশ ঘুচে গেছে। লেখক বলেন,—Such were the results of the contact of Persia with the Western world. They could not have been attained without the leadership of Reza Shah Pehlevi, the greatest man that Persia has produced for many centuries.

অন্তত একবার কল্পনা ক'রে দেখতে দোষ নেই যে, হিন্দুভারতে যত অসংখ্য পাণ্ডা পুরোহিত ও সন্ন্যাসী আছে কোনো নূতন আইনে তাদের উপাধি-পরীক্ষা পাস আবশ্যিক ব'লে গণ্য হয়েছে। কে যথার্থ সাধু বা সন্ন্যাসী কোনো পরীক্ষার দ্বারা তার প্রমাণ হয় না স্বীকার করি—কিন্তু স্বেচ্ছাগৃহীত উপাধি ও বাহ্য বেশের দ্বারা তার প্রমাণ আরও অসম্ভব। অথচ সেই নিরর্থক প্রমাণ দেশ স্বীকার ক'রে নিয়েছে। কেবলমাত্র অপরীক্ষিত সাজের ও অনায়াসলব্ধ নামের প্রভাবে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা নত হচ্চে বিনা বিচারে এবং উপবাসপীড়িত দেশের অন্নমুষ্টি অনায়াসে ব্যয় হয়ে যাচ্চে, যার পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কোনো প্রতিদান নেই। সাধুতা ও সন্ন্যাস যদি নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্ম হয় তাহ'লে সাজ পরবার বা নাম নেবার দরকার নেই, এমন কি, নিলে ক্ষতির কারণ আছে, যদি অন্যের জন্য হয় তাহ'লে যথোচিত পরীক্ষা দেওয়া উচিত। ধর্ম্মকে যদি জীবিকা, এমন কি, লোকমান্যতার বিষয় করা যায়, যদি বিশেষ বেশ বা বিশেষ ব্যবহারের দ্বারা ধার্ম্মিকতার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তবে সেই বিজ্ঞাপনের সত্যতা বিচার করবার অধিকার আত্মসম্মানের জন্য সমাজের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য একথা মানতেই হবে।

পরদিন তিনটে রাত্রে উঠতে হ'ল, চারটের সময় যাত্রা। ১৩ই মে তারিখে সকাল সাড়ে আটটার সময় বুশেয়ারে পৌঁছন গেল।

বুশেয়ারের গভর্ণর আমাদের আতিথ্যভার নিয়েছেন। যত্নের সীমা নেই।

মাটির মানুষের সঙ্গে আকাশের অন্তরঙ্গ পরিচয় হ'ল, মনটা কী বললে এই অবকাশে লিখে রাখি।

ছেলেবেলা থেকে আকাশে যে-সব জীবকে দেখেছি তার প্রধান লক্ষণ গতির অবলীলতা। তাদের ডানার সঙ্গে বাতাসের মৈত্রীর মাধুর্য্য। মনে পড়ে ছাদের ঘর থেকে দুপুর রৌদ্রে চিলের ওড়া চেয়ে চেয়ে দেখতেম, মনে হ'ত দরকার আছে ব'লে উড়চে না, বাতাসে যেন তার অবাধ গতির অধিকার আনন্দবিস্তার ক'রে চলেচে। সেই আনন্দের প্রকাশ কেবল যে পাখার গতিসৌন্দর্য্যে তা নয়, তার রূপসৌন্দর্য্যে। নৌকোর পালকে বাতাসের মেজাজের সঙ্গে মানান রেখে চলতে হয়, সেই ছন্দ রাখবার খাতিরে পাল দেখতে হয়েচে সুন্দর। পাখীর পাখাও বাতাসের সঙ্গে মিল ক'রে চলে, তাই এমন তার সুষমা। আবার সেই পাখায় রঙের সামঞ্জস্যও কত। এই ত হ'ল প্রাণীর কথা, তারপরে মেঘের লীলা,—সূর্য্যের আলো থেকে কত রকম রং ছেঁকে নিয়ে আকাশে বানায় খেয়ালের খেলাঘর। মাটির পৃথিবীতে চলায় ফেরায় দ্বন্দ্বের চেহারা, সেখানে ভারের রাজত্ব, সকল কাজেই বোঝা ঠেলতে হয়। বায়ুলোকে এতকাল যা আমাদের মন ভুলিয়েছে, সে হচ্চে ভারের অভাব, সুন্দরের সহজ সঞ্চরণ।

এতদিন পরে মানুষ পৃথিবী থেকে ভারটাকে নিয়ে গেল আকাশে। তাই তার ওড়ার যে চেহারা বেরোল সে জোরের চেহারা। তার চলা বাতাসের সঙ্গে মিল ক'রে নয়, বাতাসকে পীড়িত ক'রে; এই পীড়া ভূলোক থেকে আজ গেল দ্যুলোকে। এই পীড়ায় পাখীর গান নেই, জন্তুর গর্জ্জন আছে। ভূমিতল আকাশকে জয় ক'রে আজ চীৎকার করচে।

সূর্য্য উঠল দিগন্তরেখার উপরে। উদ্ধত যন্ত্রটা অরুণরাগের সঙ্গে আপন মিল করবার চেষ্টা

মাত্র করেনি। আকাশ নীলিমার সঙ্গে ওর অসবর্ণতা বেসুরো, অন্তরীক্ষের রঙমহলে মেঘের সঙ্গে ওর অমানান রয়ে গেল। আধুনিক যুগের দূত, ওর সেন্টিমেণ্টের বালাই নেই, শোভাকে ও অবজ্ঞা করে, অনাবশ্যককে কনুয়ের ধাক্কা মেরে চলে যায়। যখন পূর্ব্বদিগন্ত রাঙা হয়ে উঠল। পশ্চিমদিগন্তে যখন কোমল নীলের উপর শুক্তিশুভ্র আলো, তখন তার মধ্য দিয়ে ঐ যন্ত্রটা প্রকাণ্ড একটা কালো তেলাপোকার মত ভন্ ভন্ ক'রে উড়ে চলল।

বায়ুতরি যতই উপরে উঠল ততই ধরণীর সঙ্গে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সঙ্কীর্ণ হয়ে একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল, দর্শন-ইন্দ্রিয়ে, তাও ঘনিষ্ঠ ভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে-পৃথিবীকে বিচিত্র ও নিশ্চিত ক'রে জেনেছিলুম সে ক্রমে এল ক্ষীণ হয়ে, যা ছিল তিন আয়তনের বাস্তব, তা হয়ে এল এক আয়তনের ছবি। সংহত দেশ কালের বিশেষ বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ রূপ। তার সীমানা যতই অনির্দ্দিষ্ট হ'তে থাকে, সৃষ্টি ততই চলে বিলীনতার দিকে। সেই বিলয়ের ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সত্তা হ'ল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবি এল কমে। মনে হ'ল, এমন অবস্থায় আকাশ-যানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরোয় তখন সে নির্ম্মম ভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে; যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেন-না, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে-বাস্তবের পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ, অর্জ্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল সেখান থেকে দেখলে মারেই বা কে, মরেই বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্ম্মিত উড়ো জাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্ম্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

বগদাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজ আছে। সেই ফৌজের খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক আমাকে খবর দিলেন, এখানকার কোন্ শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ করছেন। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা যারা মরচে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উর্দ্ধলোক থেকে মার খাচ্ছে; এই সাম্রাজ্য-নীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট ক'রে দেয় ব'লেই তাদের মারা এত সহজ। খৃষ্ট এই সব মানুষকেও পিতার সন্তান ব'লে স্বীকার করেচেন, কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েচে অবাস্তব, তাঁদের সাম্রাজ্যতত্ত্বের উড়ো জাহাজ থেকে চেনা গেল না তাঁদের, সেই জন্যে সাম্রাজ্য জুড়ে আজ মার পড়চে সেই খৃষ্টেরই বুকে। তা ছাড়া উড়ো জাহাজ থেকে এই-সব মরুচারীদের মারা যায় এত অত্যন্ত সহজে, ফিরে মার খাওয়ার আশঙ্কা এতই কম যে, মারের বাস্তবতা তাতেও ক্ষীণ হয়ে আসে। যাদের অতি নিরাপদে মারা সম্ভব মারওয়ালাদের কাছে তারা যথেষ্ট প্রতীয়মান নয়। এই কারণে, পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানব-সত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে আসচে।

ইরাক বায়ুফৌজের ধর্ম্মযাজক তাঁদের বায়ু-অভিযানের তরফ থেকে আমার কাছে বাণী চাইলেন, আমি যে-বাণী পাঠালুম সেইটে এইখানে প্রকাশ করা যাক,—

From the beginning of our days man has imagined the seat of divinity in the upper air from which comes light and blows the breath of life for all creatures on this earth. The peace of its dawn, the splendour of its sunset, the voice of eternity in its starry silence have inspired countless generations of men with an ineffable presence of the infinite urging their minds away from the sordid interests of daily life. Man has accepted this dust-laden earth for his dwelling place, for the enacting of the drama of his tangled life ever waiting for a call of perfection from the boundless depth of purity surrounding him in a translucent atmosphere. If in an evil moment man's cruel history should spread its black wings to invade that realm of divine dreams with its cannibalistic greed and fratricidal ferocity then God's curse will certainly descend upon us for that hideous desecration and the last curtain will be rung down

upon the world of Man for whom God feels ashamed.

নিকটের থেকে আমাদের চোখ যতটা দূরকে একদৃষ্টিতে দেখতে পায়, উপরের থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক দেশকে দেখে। এই জন্তে বায়ুতরি যখন মিনিটে প্রায় এক ক্রোশ বেগে ছুটচে তখন নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না তার চলন এত দ্রুত। বহু দূরত্ব আমাদের চোখে সংহত হয়ে ছোট হয়ে গেছে বলেই সময় পরিমাণও আমাদের মনে ঠিক থাকল না। দুইয়ে মিলে আমাদের কাছে বাস্তবের যে প্রতীতি জন্মাচ্চে সেটা আমাদের সহজ বোধের থেকে অনেক তফাৎ। জগতের এই যন্ত্র-পরিমাপ যদি আমাদের জীবনের সহজ পরিমাপ হ'ত তাহ'লে আমরা একটা ভিন্ন জগতে বাস করতুম। তাই ভাবছিলুম সৃষ্টিটা ছন্দের লীলা। যে-তালের লয়ে আমরা এই জগৎকে অনুভব করি সেই লয়টাকে দূনের দিকে বিলম্বিতের দিকে বদলে দিলেই সেটা আর এক সৃষ্টি হবে। অসংখ্য অদৃশ্য রশ্মিতে আমরা বেষ্টিত। আমাদের স্নায়ুস্পন্দনের ছন্দ তাদের স্পন্দনের ছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না ব'লে তারা আমাদের অগোচর। কী ক'রে বলব এই মুহূর্ত্তেই আমাদের চারদিকে ভিন্ন লয়ের এমন অসংখ্য জগৎ নেই যারা পরস্পরের অপ্রত্যক্ষ। সেখানকার মন আপন বোধের ছন্দ অনুসারে যা দেখে যা জানে যা পায় সে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অগম্য, বিভিন্ন মনের যন্ত্রে বিভিন্ন বিশ্বের বাণী এক সঙ্গে উদ্ভূত হচ্ছে সীমাহীন অজানার অভিমুখে।

এই ব্যোমবাহনে চড়ে মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ বোধ না ক'রে থাকতে পারি নে। অতি আশ্চর্য্য এই যন্ত্র, এর সঙ্গে আমার ভোগের যোগ আছে, কিন্তু শক্তির যোগ নেই। বিমানের কথা শাস্ত্রে লেখে, সে ছিল ইন্দ্রলোকের, মর্ত্ত্যের দুষ্মন্তেরা মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দিতেন, আমারও সেই দশা। একালের বিমান যারা বানিয়েছে তারা আর এক জাত। শুধু যদি বুদ্ধির জোর এতে প্রকাশ হ'ত তাহ'লে কথা ছিল না। কিন্তু চরিত্রের জোর—সেটাই সব চেয়ে শ্লাঘনীয়। এর পিছনে দুর্দম সাহস, অপরাজেয় অধ্যবসায়। কত ব্যর্থতা, কত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একে ক্রমে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে হচ্চে, তবু এরা পরাভব মানচে না। এখানে সেলাম করতেই হবে।

এই ব্যোমতরির চারজন ওলন্দাজ নাবিকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। বিপুল বপু, মোটা মোটা হাড়, মূর্ত্তিমান উদ্যম। যে-আবহাওয়ায় এদের জন্ম সে এদের প্রতিক্ষণে জীর্ণ করে নি, তাজা রেখে দিয়েছে। মজ্জাগত স্বাস্থ্য ও তেজ কোনো একঘেয়ে বাঁধা ঘাটে এদের স্থির থাকতে দিল না। বহু পুরুষ ধরে প্রভূত বলদায়ী অন্নে এরা পুষ্ট, বহু যুগের সঞ্চিত প্রচুর উদ্বৃত্ত এদের শক্তি। ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ পুরো পরিমাণ অন্ন পায় না। অভুক্তশরীর বংশানুক্রমে অন্তরে-বাহিরে সকল রকম শত্রুকে মাশুল দিয়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত। মনেপ্রাণে সাধনা ক'রে তবেই সম্ভব হয় সিদ্ধি,—কিন্তু আমাদের মন যদি বা থাকে প্রাণ কই? উপবাসে ক্লান্তপ্রাণ শরীর কাজ ফাঁকি না দিয়ে থাকতে পারে না, সেই ফাঁকি সমস্ত জাতের মজ্জায় ঢুকে তাকে মারতে থাকে। আজ পশ্চিম মহাদেশে অন্নাভাবের সমস্যা মেটাবার দুশ্চিন্তায় রাজকোষ থেকে টাকা ঢেলে দিচ্চে। কেন-না, পর্য্যাপ্ত অন্নের জোরেই সভ্যতার আন্তরিক বাহ্যিক সব রকম কল পুরোদমে চলে। আমাদের দেশে সেই অন্নের চিন্তা ব্যক্তিগত, সে-চিন্তার শুধু যে জোর নেই তা নয়, সে বাধাগ্রস্ত। ওদের দেশে সে-চিন্তা রাষ্ট্রগত, সেদিকে সমস্ত জাতির সাধনার পথ স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত, এমন কি, নিষ্ঠুর অন্যায়ের সাহায্য নিতেও দ্বিধা নেই। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার দৃষ্টি হ'তে আমরা বহু দূরে, তাই আমাদের পক্ষে শাসন যত অজস্র সুলভ অশন তত নয়।

গয়লানী

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

পিয়ালির খালটা যেখানে অকস্মাৎ একটু ঘাড় বেঁকিয়েছে এবং তারপরেই দীঘির মত খানিকটা প্রশস্ত হয়ে আবার সরু হয়ে দক্ষিণের দিকে চলে গেছে—এইখানেই পদ্ম গয়লানীর ঘর। এ জায়গাটা ঠিক গ্রামের ভিতরেও নয় অথচ বাইরে বলা চলে না। যেন এই জায়গাটুকুই গাঁয়ের অন্তর্গত হয়েও একধরে হয়ে আছে। এই পৃথক করার কারণ হয়েছিল একটা প্রকাণ্ড বাগান। আম জাম কাঁঠাল নারকেল, এমনি সব ফলের গাছ প্রায় আধক্রোশব্যাপী। তাই বোধ হয় এর নাম ছিল হাজারি বাগান। সরু সাদা একটি পথ, বিধবার মাথার শুভ্র সিঁথির মতই গাঁয়ের সুমুখ ও পিছনের সংযোগ রক্ষা ক'রে আস্‌ছে।

পদ্ম আর ওর চার বছরের মেয়ে কুমুদ। বিশ্বসংসারে আপনার ব'লতে ওর আর কেউ নেই। কুমুদের বাপ মারা গিয়েছে সে আজ প্রায় বছর-তিনেকের কথা। বছর-পাঁচেক হয়ে গেল, কুমুদের বাপ এ-গাঁয়ে এসে বাসা বেঁধেছিল।

ছোট্ট কুঁড়েঘর, গোলপাতার ছাউনি। এদিকে চালা মত, গোয়ালঘর। উঠানটা বড়। তার একপাশে মাচাভরা কুমড়োর ডাঁটা। দশটা গরু, পদ্ম একলা সাম্‌লাতে পারে না। ঘরের অন্ত কাজ তাই বাকী থেকে যায়। ওকে রাত থাক্‌তে উঠ্‌তে হয়। সেবারে রাসলীলার মেলা থেকে ও রাধাকৃষ্ণের একটি যুগলমূর্ত্তি কিনে এনেছিল, আট পয়সা খরচ ক'রে। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে রেখে ও প্রত্যহ রীতিমত পূজো করে। ভোরবেলা উঠে প্রথমেই ঠাকুরের মুখ না দেখলে দিন কিছুতেই ভাল যাবে না, এই ওর স্থিরবিশ্বাস। অথচ তখন যথেষ্ট আলো হয় না, কাজেই প্রদীপটা ওকে একবার জালতেই হয়। তারপর শিকের হাঁড়ি পেড়ে, এক ডেলা ক্ষীর ছোট্ট একটা কালো পাথরবাটিতে রেখে সেটা ঐ কাঠের সিন্দুকটার উপর কলাপাতা চাপা দিয়ে রাখে। একবার গিয়ে বাইরের কাজে ভিড়লে ওর আর ঘরে ফেরবার উপায় থাকে না, তাই কুমুদের জলযোগের ব্যবস্থাটা সেরে রেখেই যেতে হয়। তারপর একটা ভাঁড়ে গোবর গুলে ও ঘর দাওয়া উঠোন সমস্ত নিকিয়ে একবারে ঝরঝরে ক'রে তোলে। এর পরেই ওর গোয়ালঘরে যাবার পালা। গোবরে আর চোনায় সমস্ত গোয়াল ভরপুর; দশটা গরুর দশটা নাম,—মুংলী রাঙী ধবলী লক্ষ্মী—এম্‌নি সব। পদ্ম ঘরে এলেই ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠে। সবাই মুখ বাড়িয়ে গলা উঁচু ক'রে এগিয়ে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। পদ্ম কখনই গরু বাঁধে না। ঘরে মাঠে সব সময়েই ওরা ছাড়া থাকে। তাই ইচ্ছামত ওরা পদ্মর কাছে আস্‌তে-যেতে পারে। পদ্ম ঘরে ঢুকলেই কোনোটা হয়ত গলা উঁচু ক'রে ওর হাতের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত একবার চেটে নিয়ে মুখ নীচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়ায়। কোনোটা এগিয়ে এসে ওর গায়ে এম্‌নি করে গা ঘসতে থাকে যে, বেচারী পদ্ম ঠেলায় ঠেলায় গোয়ালঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণে পৌছে যায়।

পদ্ম গালাগালি ক'রে বলত, আ মর হতভাগী, আমায় খাবি নাকি! মাথাটা তার মুখের কাছে এনে বলত,—এই নে দেখ যদি তোর পেট ভরে। সেও তৎক্ষণাৎ নারকেল তেল-মাখা মাথাটা চেটে চেটে মুহূর্ত্তের মধ্যে রসসিক্ত ক'রে তবে চুপ করে। আবার কোনোটা হয়ত কাপড়ের খুঁটটা একটু চিবিয়ে টানাটানি আরম্ভ ক'রে দেয়। এম্‌নি সব বিপদ। প্রথমটা গোয়ালে ঢুকে রোজই ওর খানিকটা সময় এম্‌নি ক'রে কাটে। কারুর গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, কারুর বা মাথায় চুমো খেয়ে, আবার কাউকে বা সর্ব্বাঙ্গে গোবর-মাখার জন্তে তিরস্কার ক'রে পদ্মর আরও কতকটা সময় যায়। বাঁশের

বেড়া দেওয়া বাইরে একটু খোঁয়াড় মত। সেখানকার গামলাগুলোর খোল ভুসি মাখা খড়ের জাব রাত্তেই দিয়ে রাখে। গরুগুলোকে খোঁয়াড়ে পুরে পদ্ম গোয়াল পরিষ্কারের কাজে লেগে যায়। নিশ্চিন্ত মনে ওর কাজ করা হয় না। বারেবারে ওকে গিয়ে দেখে আসতে হয় কুমুদ তখনও ঘুমুচ্ছে কিনা। ফুটফুটে রঙের ছোট্ট মেয়েটি,—যেন শরতের এক টুকরো লঘু মেঘের উপর ভোরের আলো লেগেছে। এক মাথা কালো চুল কানের তলা পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। এই ছোট্ট মুখখানির উপর ওর মার যত লোভ, সেই জন্তে ভয়ও আছে।

এমনি ক'রে ছুটে দেখতে এসে একবার ও আর কুমুদকে বিছানায় দেখতে পেল না। পদ্মর মন হু হু ক'রে উঠল। ছুটে বাইরে এসে দেখলে পিয়ালির তীরে শুকনো কাঠের গুঁড়িটা ঠেস দিয়ে কুমুদ আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে আছে। তখনও পূবের দিকটা লাল হয়নি। মাত্র একটু আভা ফুটছে, ঝাঁকের পর ঝাঁক বক অর্দ্ধবৃত্তাকারে কঃ কঃ শব্দে ধীরে ধীরে উড়ে যাচ্ছে, এই খালের ও-পারের ধূ ধূ জলার দিকে। পাখার সেই সাঁই সাঁই শব্দ! ঝাঁকের পর ঝাঁক হাঁস কোথা থেকে উড়ে এসে পিয়ালির জলে ঝপাঝপ পড়তে থাকে,—মনে হয় কে যেন দূরের থেকে ভারী ভারী শাদা মেঘের টুকরো পিয়ালির জলে ছুঁড়ে ফেলছে। ডা'ক পাখীগুলোর ভয়ের আর সীমা নেই। ডেকে ডেকে ওরা চুপ করে। হঠাৎ তিতিরগুলো এমনি মুখ খুলল যেন থামবে না কিছুতেই। লম্বা ঘাড়ওয়ালা কালো কালো পানকৌড়ির-দল এদিক-ওদিক ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে দেখতে এসে জলে নামল। হাঁসগুলো জলে ডিগবাজী খেয়ে, ঝাঁপাই জুড়ে, কলরব করে, এমন ক'রে তুলল যেন এই ওদের সত্যিকার জীবন।

পদ্ম কাছে এসে বললে,—মা কুমু।

কুমুদ অভিভূতের মত ছোট্ট হাতখানি তুলে ঐদিক পানে দেখিয়ে বললে,—মা দেখ।

পদ্ম ক্ষণেকের জন্তে ওইদিকে চেয়ে রইল, তারপর কুমুদের মুখচুম্বন ক'রে জলের ধারে যেতে নিষেধ ক'রে কাজে চলে গেল। জলটাকেই ওর বিশেষ ভয়। মেয়েটাকে ও কিছুতেই এ পর্য্যন্ত সামলাতে পারে নি,—ভোরে উঠেই কুমুদ ওইখানটিতে গিয়ে বসবেই। আর সারা দিনমানটা ও ওখানে চুপ ক'রে বসে বসে পাখীগুলোকে নিরীক্ষণ করবে। খাওয়াবার সময়ে জোর করে ঘরে ধরে আনতে হয়। তাও বেশীর ভাগ, দুধভাত মেখে ওইখানেই নিয়ে যেতে হয়। প্রত্যেক পাখীর চলাফেরা, পাখাঝাড়া, ডুব দেওয়া, ঘাড় বাঁকানো, ওড়া—সমস্তই ওর আয়ত্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু প্রথম প্রথম সমস্তই ওর যা অদ্ভুত বোধ হ'ত তা আর বলবার নয়। পানকৌড়ি যখন প্রথম দিন ওর চোখের উপর ডুব দিলে, ও তখুনি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল,—ও মাগো, ডুবে গেল!

পদ্ম ছুটে এসে বললে,—কি হ'ল রে?

কান্নায় ওর গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শুধু হাত তুলে জলটা দেখালে, যেখানে পানকৌড়ি ডোবার পর জলের উপর চক্রের রেখা বড় হ'তে বড় হচ্ছে। হঠাৎ পানকৌড়ি উঠল।

কুমুদ হাত বাড়িয়ে সাগ্রহে ব'ললে,—ঐ যে, মা।

পদ্ম ওর চোখমুখ মুছিয়ে দিয়ে একটা চুমো খেয়ে বললে,—ওরা ওমনি ক'রে খাবারের খোঁজ করে, ওতে ওদের কিছু কষ্ট নেই।

হাঁসগুলোকে যেদিন ও প্রথম দেখলে উড়ে এসে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে কলরব ক'রে উঠল, সেদিনও কুমুদ কেঁদে মাকে ডেকেছিল,—ওমা, শিগ্‌গীর এস, প'ড়ে গিয়ে হাঁসগুলোর বড্ড লেগেছে। মা এসে অনেক ক'রে বুঝিয়ে দিলে, ওতে ওদের লাগে না, ঐ ওদের আমোদ।

কিন্তু যখন হাঁসগুলো গুগ্‌লি খুঁজতে মাথাটা জলের মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়ে সমস্ত দেহটা ঊর্দ্ধে তুলে দিতে লাগ্‌ল, কুমুদ তখন মার গলা জড়িয়ে ধরে নিতান্ত মিনতি ক'রে বল্‌লে,—মা গো ওদের বারণ ক'রে দাও না তুমি। যা ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে, এক্ষুনি ঘাড়ে লাগবে যে!

ও আনন্দ পেয়েছে প্রথম দিন থেকেই ওই বকের

ব্যবহারে। কঃ কঃ করতে করতে কেমন উদ্ধত ওরা। তারপর যখন নামত, তাও আস্তে আস্তে। জলের ধারে কি পদ্মপাতার উপর কতক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকৃত। তারপর জলের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে যেত। আনন্দে কুমুদ হাততালি দিয়ে মাকে ডাকৃত। শব্দ পেয়ে বকগুলো উড়ে যেত। তাই দেখে কুমুদের মন খারাপ হয়ে যেত। আবার তারা বস্‌লে কুমুদও চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখত, কি করে ওরা!

এখন আর ওর ভয় নেই। পানকৌড়ি বক কাছে ঘেঁষে না যদিও কিন্তু হাঁসেরা আসে। তাদের ও ধান খেতে দেয়। ওর মা মালসায় ক'রে রাতে ধান ভিজিয়ে রাখে। কুমুদ সেই মালসা হাতে নিয়ে যেম্‌নি এসে দাঁড়ায়, হাঁসেরা সব ওর চারপাশ ঘিরে ওকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। কুমুদের হাতের পানে লম্বা মুখ তুলে ডাকাডাকি করে।

ও চ্যাচামেচি করে বলে,—দাঁড়া দিচ্ছি।

ওদের আর তর` সয় না। কুমুদের কাপড় ধ'রে টানাটানি করে, পায়ে আস্তে আস্তে কামড়ে দেয়। শেষ পর্য্যন্ত উড়ে গিয়ে ওর কাঁধে বসে। ও তখন মালসাটা মাটিতে নামিয়ে রাখে। মালসার উপর সবাইকার আগ্রহ। সবাই তার মধ্যে মুখ গুঁজতে চায়। এমনি সব ঠেলাঠেলিতে মালসার ধান কতক-বা মাটিতে প'ড়ে যায়। কুমুদ ধমক দেয়। ওরা একবার ক'রে মালসার ধানে মুখ ডোবায়, আর আকাশের পানে মুখ তুলে একটু মাথা নেড়ে মুখের খাদ্যটা গলার মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। এক মালসা ধানে সবাইকার কুলোয় না তাই কুমুদ অনেক কান্নাকাটি করেছে।

ও বলে, মালসার ধান ত ওদের তক্ষুনি খাওয়া হ'য়ে যায়, আবার যে আমার কাপড় ধ'রে টানাটানি করে,—ওদের পেট ভরে না, ওরা কি খালি পেটে থাক্‌বে, ও মা! হেসে পদ্ম আরও দু-মালসা খোরাক বাড়িয়ে দিয়েছে। কুমুদের আনন্দের আর শেষ নেই। একটা মালসা ফুরোলেই ও ছুটে গিয়ে আর একটা আনে। ততক্ষণ হাঁসেরা চুপ ক'রে অপেক্ষা করে। কুমুদকে মালসা হাতে ছুটে আসতে দেখে ওরা সব গলা উঁচু ক'রে কলরব করতে করতে হেঁটে ওর দিকে এগিয়ে যায়। খাওয়া শেষ হ'লে ওরা যখন পিঠের ও পাখার পালকের মধ্যে ঠোঁট চালিয়ে দেহ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকে, কুমুদ তখন টপ ক'রে একটাকে ধ'রে ফেলে। কোলে তুলে নিয়ে কুমুদ তার চোখে চুমো খায়—হাঁসটা আকাশের দিকে গলা উঁচু ক'রে নিশ্চিন্ত আরামের ডাক ডাকে, প্যাক্। এমনি ক'রে, ঘরের খাইয়ে বনের হাঁস মানুষ করতে ওর যত আনন্দ।

দুপুর হ'লে পানকৌড়ি কোথায় চলে যায়। বকের দল পিয়ালির ওপারের প্রকাণ্ড জলার উপর দিয়ে উড়ে যায়, কুমুদ ঐদিকে চেয়ে থাকে। কেবল, হাঁসগুলো জলের ধার ঘেঁষে, গাছের ছায়ায়, পিঠের পালকে ঠোঁট গুঁজে ঘুমোয়। হঠাৎ এক-একবার মুখ তুলে ডাকে, প্যাক্। আবার সব চুপচাপ। কুমুদের আনন্দের আর শেষ থাকে না। ওদের এমনি ক'রে ঘুমোতে দেখে ও নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে আসে।

পদ্মর এইটেই বিশেষ সুবিধে যে, দুধের কলসী কাঁখে নিয়ে ওকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে হয় না। সবাই ওর বাড়িতে আসে। দুধটা খাঁটি, একবারে বটের আঠা, তাই সকলে কষ্ট ক'রে আসে। নইলে কার ব'য়ে গেছে এই লম্বা পথ হেঁটে দুধ নিতে আসতে। সবাই এক-একটা ঘটি নিয়ে পদ্মর দাওয়া জাঁকিয়ে বসে। পাঁচজন মানুষ ওর ঘরে রোজ আসে কাজেই তাদের অভ্যর্থনার জন্যে হুঁকো ক'লকে তামাকের সকল অনুষ্ঠান রাখতে হয়েছে।

কেষ্টর তাড়া সবচেয়ে বেশী। সকলের প্রথমে ওর দুধ নেওয়া চাই। পদ্ম ওর ঘটীতে দুধ মেপে ঢেলে দিল। ঘটীটা তুলে নিয়ে কেষ্ট একটু আড়চোখে পদ্মর পানে চেয়ে হাসল।

সেদিন পদ্ম বল্‌লে, খুড়োর যে আজ মন খুব খুশী দেখছি, ব্যাপার কি। খুড়ী বুঝি খুব বড় ক'রে রান্নার জোগাড় করেছে?

কেষ্ট আর একটু বেশী ক'রে হেসে বল্‌লে, উঁহু! বরঞ্চ তোকে দেখেই। লজ্জায় পদ্ম কাজের অজুহাতে ঘরে এসে ঢুকল।

নিবারণ দুধ নিতে এসে অম্‌নি ক'রে বল্‌লে, দেখ্ পদ্ম,

হ'লিই বা তুই বিধবা, তোর এমন কিছু বয়েস হয় নি যে গয়না প'রবি না, কেন বল্‌ত! অমন সোনার দুধে আলতা হাত দু-খানা, মাগো, কি ক'রে রেখেছে, খালি! দু-গাছা কাচের চুড়িও বুঝি প'রতে নেই, তুই নিজে হাতে কিন্‌তে না পারিস, আমি কিনে দেব, বুঝলি।

পদ্ম বোঝে সবই, শুধু কি করবে তাই আজও স্থির করতে পারেনি, এই যা।

তারপর একে একে আরও অনেকে বহু কথা ব'লে দুধ নিয়ে যায়, পিছনে রেখে যায় এক টুকরো আশা।

শ্রীপদর বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে, তাই ওর ওঠা-হাঁটা করতে সময় লাগে। কাজেই সকলের শেষে ওকে দুধ নিতে হয়।

দুধ নিতে নিতে পদ্মর পানে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, অমন সোনার দেহ কি এই জঙ্গলের মধ্যে সাজে, না এই সব যত গু-গোবরের নোঙরা কাজে লাগান চলে। খেটে খেটে দেহটা একেবারে ক্ষয় ক'রে ফেল্‌লি।

ও আরও কি সব বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু পদ্ম বাধা দিয়ে বললে, জ্যাঠামশাই, অনেক বেলা হ'ল, কুমুর জন্তে দু'টো চাল সিদ্ধ করতে হবে। আর তিলমাত্র ও দাঁড়াল না; কলসীটা কাঁখে তুলে নিয়ে সে পিয়ালির দিকে চলে গেল। জলে নেমে ও চুপ ক'রে বসে রইল, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে সাহস হয় না, মনে হয়, শ্রীপদ হয়ত এখনও বসে আছে।

অনেক ভেবেও পদ্ম স্থির করতে পারে না, কি করবে। তোমরা আর এস না, এ কথা বলা চলে না। ওরা খদ্দের, দুধ নিচ্ছে, রীতিমত পয়সা দিয়ে দিচ্ছে, বাকী রাখে না। ওরা না এলে পদ্মকে দুধের কেঁড়ে কাঁখে নিয়ে হয়ত গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হ'ত। তা হ'লে ঘরসংসার দেখ্‌ত কে, আর কুমুদকেই বা দেখ্‌ত কে! ওদের শক্ত ক'রে কিছু বলাও চলে না, অথচ অমন সব কথা কানে পৌঁছাও যে যায় না!

অনুকূল আসবে দুধ নিতে সবচেয়ে বেলা ক'রে। সকালে ওর অনেক কাজ, সময় হয় না। বাড়ির মধ্যে ঢুকেই অনুকূল উঠানের ধানীলঙ্কার গাছ থেকে গোটাকতক লঙ্কা ছিঁড়ে নিয়ে ডাকল, ও পদ্ম, মুড়িটুড়ি থাকে ত দে ছুটো, খিদের প্রাণ যায়।

পদ্ম হাসিমুখে একখানা সান্‌কিতে গোটা মাখিয়ে মুড়ি এগিয়ে দিলে। রান্নাঘরের দাওয়ার উপর উঠে ব'সে অনুকূল মুড়ি খেতে লাগল। ওর মুড়ি খাওয়া শেষ হ'লে পদ্ম এক ডেলা ক্ষীর দিয়ে এক ঘটী জল এগিয়ে দিল। ঢক্ ঢক্ ক'রে সমস্ত জলটা খেয়ে ও রুক্ষ স্বরে বললে, আজকে হাট-বার তা মনে আছে? কি কি আন্‌তে হবে চটপট ব'লে দে, আমার বস্‌বার সময় নেই।

হাট-বারটা পদ্মর কিছুতেই মনে থাকে না।

বিস্ময়ের সুরে বললে, 'ওমা, ঘরে যে কিছু নেই, অনুকূল দা!' সমস্ত ফর্দটা শুনে অনুকূল গজ্ গজ্ করতে করতে দুধের ঘটী নিয়ে বেরিয়ে যায়।

পদ্ম পিছন পিছন ছুটে এসে বললে, ঘরে একটাও সুপুরি নেই ভাই, তোমায় পান দিতেও পারলুম না। আর বাতাসা এনো।

অনুকূল ফিরে দাঁড়িয়ে দাঁত বার ক'রে বললে—যা যা আমি অত মাথায় ক'রে আন্‌তে পারব না।

ব'লে ও হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল।

পদ্ম স্বর উঁচু ক'রে বললে, একটা ঝুনো নারকেল এনো, তোমার নারকেল নাড়ু খাওয়া পাওনা আছে।

অনুকূল দাঁড়িয়ে পড়ে। আনন্দে ওর সমস্ত বুকখানা লাফিয়ে ওঠে। কোনো উত্তর না দিয়ে ও চলে যায়।

অপরাহ্ণে হাঁসের গলা পেলেই কুমুদ দৌড় দেয় পিয়ালির তীরের পানে। আবার পানকৌড়ি আসে, বক আসে। তারা শিকার খোঁজে। কুমুদ বসে বসে দেখে। হাঁসেরা সকালের মতই চঞ্চল হয়ে ওঠে। ও সেই শুকনো কাঠের গুঁড়িটা ঠেস দিয়ে ওদিক পানে চেয়ে থাকে। ওরা যত কলরব করে কুমুদও ততই কথাগল্প বলে। ও মনে করে, ওরা বুঝি ওর কথা সবই শুনছে, তাই ওর ভারি আমোদ। সন্ধ্যা হয়ে আসে, ওরা আবার সবাই উড়ে যায়। পানকৌড়ি বক হাঁস,—সব দলে দলে ওড়ে। ও তাদের পানে মুখ তুলে চুপ করে চেয়ে থাকে।

ঘরে ফিরে এসে খেয়ে কুমুদ দাওয়ায় মার কোলের

কাছে আঁচল পেতে শুয়ে বললে, মা হাঁসরা সব এইবার ঘুমুবে ত, কে ওদের গল্প বলবে ?

পদ্ম ওর মুখে চুমু খেয়ে বললে,—তুমি বলো।

কুমুদ সোৎসাহে প্রশ্ন করে, কোনটা বলব মা, সেই রাজপুত্তুরের—। মার সম্মতি পেয়ে ও চালের কিনারা দিয়ে আকাশের তারার পানে চেয়ে আরম্ভ করল,—তা—আ—রপ—অ—র,সেই রাজপুত্তুর যেতে যেতে যেতে দেখলে এক স্ফটিকের বাড়ি—বড় বড় থাম, বড় বড়, দরজা, তার ছাদে বসে রাজকন্তে চুল শু—খো, শু,—খো, ও—

সারাদিনের পরিশ্রমে বেচারী একেবারে শ্রান্ত হয়ে থাকত। তাই গল্প শুনে ওর হাঁসের দল ঘুমল কি না সে খবর নেবার আগেই ওর চোখের পাতা জুড়ে এল। মার বুকের উপর একখানা হাত রেখে অসমাপ্ত গল্পটার মধ্যেই ওর গভীর ঘুম সুরু হয়ে গেল।

অনুকূলের হাটবাজার নিয়ে ফিরতে সন্ধ্যে উৎরে গেল। পিয়ালির খালে হাত-পা ধুয়ে এসে ও পদ্মর সঙ্গে খড় কুচিয়ে, খোল পচাতে দিল। পদ্ম ওকে গরম গরম নারকেল নাড়ু ক'রে খাওয়াল।

নাড়ু একপাশে সরিয়ে রেখে অনুকূল ওর কাছে এসে বললে, আমার কথাটার উত্তর আজ চাই।

ভীতস্বরে পদ্ম জিজ্ঞাসা করলে,—কিসের অনুকূল-দা ?

উত্তেজিত কণ্ঠে অনুকূল বললে, এতদিন ধরে যা ব'লে এলুম তারির।

পদ্ম তাড়াতাড়ি বললে,—অনুকূল-দা, তুমি আর-জন্মে আমার মায়ের পেটের ভাই ছিলে ; তুমি এ গাঁয়ে না থাকলে আমার কি দুর্গতি হ'ত যে তা ভগবানই জানেন। তুমি কি বলছ অনুকূল-দা, ছিঃ। কুমুদ যে তাহ'লে আমাকে এ-জীবনেও ক্ষমা করতে পারবে না, তাকি হয়, ছি ভাই ! হঠাৎ নিতান্ত উত্তেজিত হয়ে অনুকূল বললে,—ও সব কোন কথাই শুনতে চাই না, তুই বল্—

ও তৎক্ষণাৎ পদ্মর ধুস্তিমুক্ত সেই কোমল সুন্দর হাতখানা সজোরে ধ'রে ফেললে। পদ্মর সর্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠ্ল।

অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অনুকূল বললে, তাহ'লে—একখানা কাঁচি নিয়ে আয়—তোর মাথার সব চুল আমি নিজে হাতে কেটে দেব ; আর ঐ—পোড়া কাঠে তোর সর্বাঙ্গে কালো দাগ ক'রে দেব, ওঠ—কি দরকার তোর অত রূপে ?

প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে পদ্মর হাতখানা ছেড়ে দিলে।

এ-সম্বন্ধে পদ্ম অনেক দিন অনেক কথা ভেবেছে, কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারেনি। আজ অনেকক্ষণ এমনি ভাবে চুপ ক'রে বসে থাক্বার পর হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল।

পদ্ম ব'ললে,—অনুকূল-দা, শ-পাচেক টাকা জোগাড় ক'রে দিতে পার ? কুমুদটাকে তাহ'লে গৌরীদান করি,—আমার বাপের বাড়ির দেশ থেকে একটা পাত্তরের সন্ধান পেয়েছি !

কুমুদটাই যত বিঘ্নের মূল, একথা অনুকূল অনেক দিন ভেবেছে। কিন্তু অমন সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটার উপরে ও কোনো দিন কুদৃষ্টিতে চাইতেও সাহস করেনি। সেই কুমুদের এমন সুন্দর ব্যবস্থা পদ্ম যে স্বয়ং ক'রে দিতে পারে, একথা অনুকূল প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলে না। কিন্তু পদ্মর মুখের কথাগুলোয় এমনি একটা ভাব প্রকাশ পেল ওর মনে হ'ল, যে, কথাটা মিথ্যে হয়ে গরিব পদ্মর বিশেষ লাভ নেই।

তার উপর পদ্ম যখন বললে, আমার দশটা গরু, জমিজমা, ঘরদোর সবই তোমার কাছে বাঁধা রইল, টাকাটা দিয়ে মেয়েটাকে শুধু পার কর, তখন পদ্মর মনের সত্যি ইচ্ছে বুঝেছে ব'লে ওর আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। এ কথা অনুকূলের স্পষ্টই মনে হ'ল যে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে পদ্ম নিজের বাড়িতে হ'লেও এক রকম অনুকূলের আশ্রয়ে থাকতে রাজী হয়েছে। একথা ভেবে অনুকূলের বুকের মধ্যে পুলকের বান ডাক্ল।

ও ধীরে ধীরে পদ্মর পিঠে হাত রেখে ব'ললে, টাকার ভাবনা কি ? ধানচালের কারবার আমার ! তুই তাহ'লে কালই ভোরে চলে যা, আমি নিজে গিয়ে তোকে রেলে তুলে দিয়ে আসব। কিছু ভাবনা নেই তোর, ঘরদোর, গরুবাছুর, জায়গাজমি, সমস্ত আমি আগলে থাক্ব। ফিরে এলে তোর জিনিষ তোরই থাকবে, আমার অভাব

কিসের যে, তোর গরু মাটি নিতে যাই? দেখিস, তোর কোনো জিনিষটা এতটুকু টস্‌কাবে না, যেখানকার যা, সমস্তই ঠিক থাক্‌বে। তুই ফিরে এসে সমস্তই আবার আমার হাত থেকে ফিরিয়ে নিবি।

* * * *

কুমুদ কেঁদে কেঁদে আধখানা হয়ে গেছে। কাশার এত মানুষ, এত ভিড় ওর ভাল লাগে না। এখানে পানকৌড়ি নেই, বক নেই, হাঁস নেই—জলের কিনারাটুকুতে ঘাস নেই, মানুষ, ছাতা আর পাথরের সিঁড়িতে মুড়ে গেছে।

ও কেবলই কাঁদে, আর বলে, মা ফিরে চল, ফিরে চল।

পদ্মও বিশ্বনাথের মন্দিরে মাথা ঠুকে কাঁদে। বলে, বাবা একি ক'রলে, মুংলী ধবলী রাঙী যে আমার জন্তে কেঁদে কেঁদে মরে যাচ্ছে, তোমার পায়ে এসেও ত শান্তি পাইনে। আমাকে দুঃখ দাও সইব, কিন্তু কুমুকে আমার শান্তি দাও বাবা, ওর কষ্টে যে আমার বুক ভেঙে যায়, সইতে পারিনে যে! আবার কি তবে ফিরে যাব, বাবা?

কুমুদ সন্ধ্যায় মার কোলের কাছে শুয়ে গায়ে গায়ে লাগান উঁচু বাড়িগুলোর স্বল্প ফাঁক দিয়ে একটুখানি আকাশের কতকগুলো মাত্র তারার পানে চেয়ে তেমনি ক'রে বলে, তা-আ-র্‌প-অ-র, সেই রাজপুত্তুর যেতে যেতে যেতে—দেখলে এক ফটিকের বাড়ি,—

বাড়ি কথাটায় ওর ঘরের শোক মনে পড়ে।

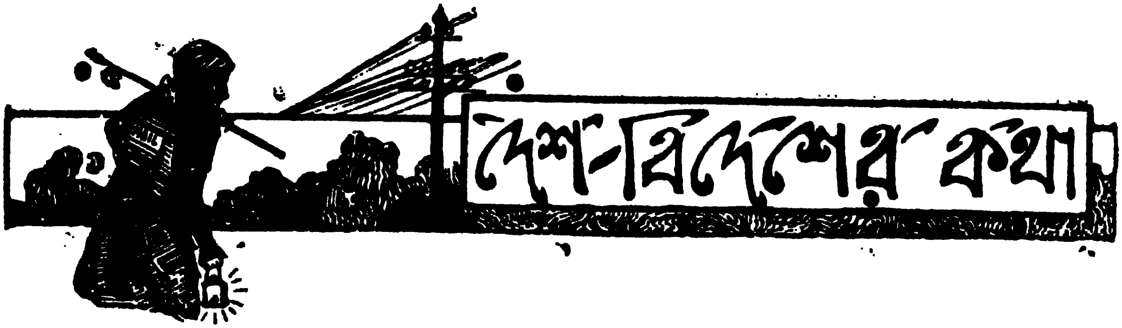
বলে, মা ঘরে চল না।

চোখের জল সামলে নিয়ে পদ্ম বলে, তোর বিয়ে দিতে এসেছি যে মা। মনে হয়, অনুকূল সব আগলে কি ক'রে বসে আছে, দিনের পর দিন ওর আশাপথ চেয়ে। এমনি আরও কত দিন, কত মাস, কত বৎসর যাবে, তার পর কোন্ লোকে পথ চাওয়া শেষ হবে কে জানে?

বেলা পড়ে আসে

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

বেলা পড়ে আসে,
শ্রান্ত রৌদ্র ধূসর আকাশে,
বিছাইতে চায় তার নিশীথ শয়ন,
আকাশে নক্ষত্র ম্লান; হেরে না নয়ন,
সপ্তর্ষির দিব্যমূর্ত্তি, কালপুরুষের
অমোঘ আজ্ঞার লিপি, জীবনশেষের
লেখা যারে যায় দেখা জ্যোতিষ অক্ষরে,
দীপ্তিহীন, পূর্ণিমায় পড়ে নাকো ঝরে,
জোছনা নিঝর, মাতৃকা কুমার কোলে
নিরুদ্দেশ, গেল বুঝি ইন্দ্রলোকে চলে?
নন্দনবনের চিরবসন্তের দেশে,
পরিশ্রান্ত সপ্ত অশ্ব, সারথি আদেশে
শিথিল রশ্মির মালা শূন্যে দেয় দেখা,
কোথা ছায়া সহচরী, সূর্য্যদেব একা।
কুহেলীর অন্তরালে লুকাল সে আজ,
সিক্ত-ধূপ-ছায়াখানি, নাই পুষ্পসাজ।



দেশ-বিদেশের কথা

ভারতবর্ষ

ভারতে বস্ত্রশিল্প—

সহযোগী 'আজাদ' বলেন—১৯৩২ সনের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত দশ মাসের মধ্যে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহের উৎপন্নদ্রব্যের হিসাব সন্তোষজনক। ভারতের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যাপারে, বিশেষতঃ মোটা কাপড়ের ব্যাপারে যাঁহারা ভারতকে স্বাবলম্বী করিবার জন্ম চেষ্টিত তাঁহারা এই সংবাদে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিবেন। উক্ত দশ মাসের মধ্যে যে পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ১৩·৭ ভাগ অধিক এবং ১৯২৯-৩০ সনের অনুরূপ দশ মাসে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ১৯·৪ ভাগ অধিক। ১৯৩০-৩১ সনের এই দশ মাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরের উৎপন্ন শার্টিং ও লংক্লথ শতকরা ৩৬·৮ ভাগ অধিক উৎপন্ন হইয়াছে, থান কাপড় শতকরা ৩১·৮ ভাগ ও রঙীন কাপড় শতকরা ১৮·২ ভাগ অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উৎপন্ন খদ্দরের পরিমাণ শতকরা ৩৩·৯ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, অধিকাংশ কাপড়ের কলই হাতে বোনা খদ্দরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সম্মত হয় নাই। এই দশ মাসে ভারতের কাপড়ের কলে সর্ব্বসমেত ২৪৫,৭৪,৩২,৪২৯ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার স্থানে পূর্ব্ব বৎসরের এই দশমাসে ২১০,৯০,৩০,৪৬০ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতের সকল প্রদেশেই উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের কলসমূহে উৎপন্নের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় কলসমূহের উৎপন্ন এত অধিক হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় বস্ত্রের জন্ম ভারতকে যে এখনও বিদেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইতেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ভারতীয় কলসমূহের উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ও বিদেশ হইতে আমদানী বস্ত্রের পরিমাণের মধ্যে এইরূপে এক তুলনামূলক হিসাব দেওয়া যাইতে পারে যে, ১৯৩১-৩২ সালের আলোচ্য দশ মাসে ১৯০,৯১,২৪,০০০ গজ পরিমাণ কোরা ও ধোয়া কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে এবং ৪৩,৩৬,৮৮,০০০ গজ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে, ৫৫,৮৩,০৯,০০০ গজ রঙীন কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে ও ১৮,২৩,৭৬,০০০ গজ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে।

বিমান-তরী প্রচলন প্রচেষ্টা—

ইদানীং সকল সভ্য দেশে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে বিমান-পথে গমনাগমনের চেষ্টা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ঐ ঐ দেশে বিবিধ সমিতিও প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতবর্ষেও বিমান-তরীর প্রচলন সুরু হইয়াছে। এরিও ক্লাব অব ইণ্ডিয়া এণ্ড বর্ম্মা লিমিটেড সমিতি এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত। ১৯৩১ সনের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ,—ভারতবর্ষে এ-বৎসর সর্ব্বসমেত ৬৩ খানি বিমানপোত রেজেষ্টারী হইয়াছে। বাংলা ফ্লাইং ক্লাবের সভ্য সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ৩৫২ জন, বিমান-চালনায় দক্ষ ১৪২ জন, তন্মধ্যে ইউরোপীয় ৯৮ জন ও ভারতীয় ৪৪ জন। মাদ্রাজের সভ্য সংখ্যা ২৭২ জন ও দিল্লীর ২৮৩ জন, শেষোক্ত স্থানে ভারতীয় ১৪৭ জন। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে যোধপুর এ বিষয়ে অগ্রণী। যোধপুরের মহারাজা স্বয়ং বিমানপোত পরিচালনা শিক্ষা করিয়াছেন।

বে-সামরিক বিমানপোত পরিচালনায় উৎসাহ দিবার জন্ম স্যর ভিক্টর সেসুন ১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আরুইন ফ্লাইং ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং ইহাতে লক্ষ টাকা দান করেন। আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ভাণ্ডারে অর্থ দান করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে নয় জন ভারতবাসী বিলাতে থাকিয়া বিমানপোত-সংক্রান্ত গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারের কাজ শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে বিভিন্ন বিমানপোতের সংস্রবে কাজ করিতেছেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বন্দীদের সংখ্যা—

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বন্দীদের সংখ্যা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের গণনা অনুসারে আশী হাজার। এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মারফত সরকারী হিসাবও সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। সরকারের মতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছেন ৪৪,৭৫৩ জন—জানুয়ারি মাসে ১৪,৮০০, ফেব্রুয়ারিতে ১৭,৮০০, মার্চ্চে ৬,৭০০ এবং এপ্রিল মাসে ৫,২০০ জন।

নিজাম বাহাদুরের দান—

হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর লক্ষ্ণৌ পরিভ্রমণ উপলক্ষে সেখানকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যার্থ ২৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। কোন প্রতিষ্ঠানে কত টাকা দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্ম একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে। আউধ চীফ কোর্টের চীফ জজ সার সৈয়দ ওয়াজির হোসেন এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন।

অল-ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্থ—

আমেরিকার প্রসিদ্ধ দাতা রকফেলার স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিক্ষাদান ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ম ১৭ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ টাকা আসবাব ও যন্ত্রাদি ক্রয়ের জন্ম ব্যয় করিতে হইবে। কলুটোলা ষ্ট্রীটে উক্ত বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

নাগপুরে ছাত্রী কলেজ—

নাগপুরে ছাত্রীদের জন্ম একটি নূতন কলেজ স্থাপনের কথা হইয়াছে কর্ণেল কুকুরে, মিঃ টি-জে, কেদার, মিঃ পুরাণিক, শ্রীমতী কামা, শ্রীমতী তাম্বে, কুমারী জে-সি, কত্তোয়াল, কুমারী এন-এস, কত্তোয়াল প্রভৃতি

এই কলেজের পরিচালক সমিতির সভ্য হইবেন। ৪ জন মহিলা ও ৩ জন পুরুষকে আপাততঃ অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। শ্রীমতী রমাবাঈ তাম্বে, বি-এ, টি ডি (লণ্ডন) এম-এস-সি এই কলেজের প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন।

পরলোকে স্যর ডোরাবজী টাটা—

বিখ্যাত ভারতীয় ব্যবসায়ী স্যর ডোরাবজী টাটা গত ৩রা জুন জার্ম্মেনীর অন্তর্গত বাড কিসিংয়েন নামক স্থানের একটি স্বাস্থ্যনিবাসে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

স্যর ডোরাবজী টাটা সন্স লিঃ কোম্পানীর প্রধান অংশীদার। তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জামসেদপুরের বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা জামসেদজী টাটার পুত্র। স্যর ডোরাবজী টাটা নানা জনহিতকর কার্য্যে সম্প্রতি তিন কোটি টাকা দান করিয়াছেন।

—

বাংলা

স্বদেশী দ্রব্য প্রচারে সভাসমিতি—

আবশ্যক জিনিষপত্রের জন্য স্বাবলম্বী হওয়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সকলেরই কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষ এতদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া ছিল। আত্মকর্তৃত্বলাভ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতির দিকেও ভারতবাসীর লক্ষ্য পড়িয়াছে। বাংলা দেশে স্বদেশী শিল্প প্রচার সমিতি (১, ডালিমতলা লেন), বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বদেশী সঙ্ঘ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান স্বদেশী দ্রব্যের প্রচারে ব্যাপৃত আছেন। স্বদেশী শিল্প প্রচার সমিতি স্বদেশী দ্রব্যের তালিকা, উৎপাদক কোম্পানী ও ঠিকানা সম্বলিত পুস্তিকাদি প্রকাশিত করিয়া শিল্পপ্রচারে সহায়তা করিতেছেন। 'দেশের কথা' নামে এইরূপ একখানি পুস্তিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। স্বদেশী সঙ্ঘও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে নানা লিপি প্রকাশ করিয়া স্বদেশী প্রচারে সাহায্য করিতেছেন। বাঙালী তথা ভারতবাসী স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণে তৎপর হইলে দেশের শুধু অর্থসম্পদই বাড়িবে না, বেকার সমস্যা দূরীভূত হইয়া বাঙালী আবার সবল হইয়া উঠিবে—আরও অধিকতর ভাবে জনসেবার মনঃসংযোগ করিতে পারিবে।

বয়েজ নার্সারি হোম—

বোলপুর শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত অশোককুমার



ফুটবল খেলা



বয়েজ নার্সারী হোমের একটি ক্লাস

গুপ্ত ১৯১৭ সনে এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়াছেন। ছাত্রগণ এখানে সকাল বিকাল অধ্যয়ন করিয়া থাকে, নানাবিধ খেলাধূলারও ব্যবস্থা



ব্যায়াম

এখানে আছে। ১৮৫৮, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রবাসীতে এই বিদ্যালয়ের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

ময়মনসিংহে ঘূর্ণীবাত্যা—

গত ৯ই মে ময়মনসিংহ সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামের উপর দিয়া যে প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্মান্তিক কাহিনী সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী ইস্তাহার পাঠ করিলেই সম্যক অবগত হওয়া যায়। এই ঘূর্ণীবাত্যা দৈর্ঘ্যে ২৫ মাইল ও প্রস্থে ৪০০ গজ স্থানের উপর দিয়া ধ্বংসলীলা সাধন করিয়া গিয়াছে। উহা ৪৫ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। মোট ৬০ জন গ্রামবাসী নিহত এবং প্রায় তিন শতাধিক আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১৩০ জনের আঘাত গুরুতর। গবাদি পশুও তিনশতাধিক নিহত ও আটশতাধিক আহত হইয়াছে।

সহরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা জেলেই ঘূর্ণীবাত্যার প্রকোপ অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। বাত্যার বেগে জেলের পশ্চিমদিকের প্রাচীর ধ্বসিয়া যায়, বাহিরের ক্ষুদ্র দালান গুলির অধিকাংশই ধ্বংস হয়, টিনের চালাগুলিও ভূমিসাৎ হইয়া যায়। জেলে মোট ২৭ জন নিহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭ জন দণ্ডিত, ২ জন বিচারাধীন, ৩ জন ওয়ার্ডার, ৩ জন দর্শক, ১ জন কনেষ্টবল ও ১ জন স্ত্রীলোক। আহতের সংখ্যা ১০০; তন্মধ্যে ৩০ জন দণ্ডিত ও ৫ জন ওয়ার্ডার। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত বন্দীদের মধ্যে ২ জন আহত ও ১ জন নিহত হইয়াছেন। যিনি নিহত হইয়াছেন তাঁহার নাম ৺মণীন্দ্রমোহন ঘোটক।

বাংলায় শিক্ষার অবস্থা—

ভারতীয় বালকদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১৯৩১ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে ৭,১২,০৮২ জন হিন্দু ও ৯,০৯,৪০০ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। ১৯৩০ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৭,১৩,৪৭৭ ও ৮,৬৩,৫৯৩ ছিল। সুতরাং আলোচ্য বৎসরে হিন্দু ছাত্র সংখ্যা ১,৩৬৫ জন কমিয়াছে, পক্ষান্তরে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ৪৫,৮০৭ জন বাড়িয়াছে। মোট হিন্দু পুরুষ অধিবাসীর শতকরা ৬৭ জন এবং মুসলমান পুরুষ অধিবাসীর শতকরা ৭ জন ১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়ন করিয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে শতকরা হার যথাক্রমে ৬·৭ ও ৬·৫ ছিল।

আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বালকদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ৬৫,৪৫ ৮৯০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ৬৮,০৯,২৪৫ টাকা. পাবলিক ফণ্ড হইতে শতকরা প্রায় ৫২ টাকা এবং প্রাইভেট ফণ্ড হইতে শতকরা, প্রায় ৪৮ টাকা লইয়া উক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে। পাবলিক ফণ্ডের অর্থ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে প্রদত্ত এবং জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থ বুঝায়। আলোচ্য বর্ষে পাবলিক ফণ্ড হইতে ২১,৫৪,১৭২ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে ৬,৯৩,১৬৭ টাকা এবং জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ হইতে ৬,২৮,৮০৪ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

১৯৩১ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে সকল শ্রেণীর ভারতীয় বালিকাদের জন্য ১৭,৪৮১টি বিদ্যালয় ছিল এবং তাহাতে ৪,৪৬,২৮৮ জন বালিকা অধ্যয়ন করিত। ১৯৩০ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৭,১২৯ এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪,৩৫,৪৬৩। সুতরাং বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে ৩৫২টি এবং ছাত্রী সংখ্যা ১০,৮২৫ জন বাড়িয়াছে।

১৯৩১ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে বালিকা স্কুলে এবং বালকদের স্কুলে যে সকল বালিকা পড়িয়াছে, তাহাদের সংখ্যা মোট ৫,২৮,৩৩১; তন্মধ্যে হিন্দু ২,৩১,১৬৯ এবং মুসলমান ২,৮৭,৭১৬; অবশিষ্ট অন্যান্য সম্প্রদায়ের বালিকা।

ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষার জন্য ১৯৩১ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে বাংলায় ৬৮টি বিদ্যালয় ছিল এবং আলোচ্য বৎসরে ছাত্র সংখ্যা ১২৬ জন বাড়িয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় ব্যতীত পার্শি, ইহুদী প্রভৃতি বালকগণও অধ্যয়ন করে। ঐরূপ ছাত্রের সংখ্যা ২,৩০৭। বাংলায় ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষার জন্য ১৯৩০-৩১ সনে মোট ৩৯,৯০,৮৮৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে; ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৪০,৫০,১৭১ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

১৯৩১ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মোট ১৩,৪৪,৯৪৫ জন মুসলমান ছাত্র পড়িয়াছে; তন্মধ্যে ১১,০৩,৭৪৬ জন পুরুষ ও ২,৮৭,৭১৬ জন স্ত্রীলোক। ঐ তারিখে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা ১০,৪৬,৮৬১ ও ছাত্রীসংখ্যা ২,৩১,১৬৯ ছিল।

মুসলমানদের এই ছাত্রসংখ্যা মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নতির প্রকৃত চিত্র নহে, কারণ উচ্চ শ্রেণীসমূহে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া গিয়াছে। সঞ্জীবনী

শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের বীরত্ব—

কলিকাতা রিপণ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক বিজ্ঞান শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তিনজন মুসলমান গুণ্ডার আক্রমণ হইতে



শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

একটি হিন্দু বালিকাকে রক্ষা করিয়া সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন।



অর্ডিন্যান্সের পুনর্জন্ম

বঙ্গদেশের আকস্মিক সঙ্কটাপন্ন অবস্থার প্রতিকারের জন্য যে আইনসঙ্গত ক্ষমতা আবশ্যক বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে তাহা দিবার জন্য ছয় মাস পূর্ব্বে বড়লাট একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। তাহার চলিত নাম বেঙ্গল এমার্জেন্সী পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স। ভারত-শাসন আইনের ৭২ ধারা অনুসারে কোন অর্ডিন্যান্স ছয় মাসের বেশী সময় বলবৎ থাকিতে পারে না। সেই জন্য আগেকার এই অর্ডিন্যান্সটার মিয়াদ গত ২৯শে মে উত্তীর্ণ হইতে-না-হইতে বড়লাট কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া মূলতঃ সেইটাকেই নূতন অর্ডিন্যান্সরূপে ২৮শে মে জারি করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ করায় ভারত-শাসন আইনের ৭২ ধারার বিরুদ্ধ আচরণ করা হইয়াছে। অবশ্য ইহা বিলাতী কর্ত্তাদের অনুমোদন অনুসারে করা হইয়াছে। পার্লেমেণ্টে এখন তাঁহারাই দলে পুরু। সুতরাং তাঁহারা বেআইনী কাজ করিলেও তাহা সদ্য সদ্য নাকচ হইবার বা অন্য কোনরূপ প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা নাই—বিশেষতঃ যখন বেআইনী কাজটার দ্বারা ইংলণ্ডের বা ইংরেজদের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হইতেছে না, অসুবিধা ক্ষতি ও দুঃখ হইতেছে পরাধীন বিদেশী ভারতীয়দের। আইন করেন পার্লেমেণ্ট; তাহার বিপরীত কাজ পার্লেমেণ্টের প্রবলতম দলের রাজপুরুষেরা করিলে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলা অরণ্যে রোদন। কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিকদের পেশাই অরণ্যে রোদন। অতএব বড়লাটের এই বেআইনী কাজটির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভারত-শাসন আইনের ৭২ ধারার নিম্নমুদ্রিত অংশটি আলোচ্য।

"The Governor-General may in cases of emergency make and promulgate Ordinances for the peace and good government of British India or any part thereof, and any Ordinance so made shall, for the space of not more than six months from its promulgation, have the like force of law as an Act passed by the Indian Legislature."

তাৎপর্য্য। "এমার্জেন্সী উপস্থিত হইলে বড়লাট ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বা তাহার কোন অংশের শান্তি ও সুশাসনের জন্য অর্ডিন্যান্স রচনা ও জারি করিতে পারেন, এবং এই প্রকারে প্রণীত কোন অর্ডিন্যান্স জারির তারিখ হইতে ছয় মাসের অনধিক কালের নিমিত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা অনুমোদিত কোন আইনের মত বলবৎ থাকিবে।"

এমার্জেন্সী ঘটিলেই তবে বড়লাট অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারেন। সুতরাং এমার্জেন্সীর মানেটি কি দেখা দরকার। ইংরেজী ভাষা সকলের চেয়ে বেশী লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে। আমেরিকার ওয়েবষ্টারের অভিধানে এই শব্দের মানে আছে, "An unforeseen occurrence or combination of circumstances which calls for immediate action or remedy," "এরূপ কোন ঘটনা বা এরূপ কোন অবস্থাসমষ্টি যাহার সংঘটন বা আবির্ভাব আগে হইতে অনুমান করা যায় নাই এবং যাহার জন্য অবিলম্বে কিছু করা বা যাহার অবিলম্বে প্রতিকার আবশ্যক।" ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড অভিধানে এমার্জেন্সীর অর্থ আছে, "Sudden juncture demanding immediate action," "আকস্মিক বা হঠাৎ-ঘটিত সঙ্কট অবস্থা যাহার জন্য তৎক্ষণাৎ কিছু করা আবশ্যক।" সকলেই জানেন, যে-সব ঘটনা বা অবস্থার ওজুহাতে নূতন অর্ডিন্যান্সটা জারি করা হইয়াছে, তৎসমুদয় ন্যূনকল্পে ছয় মাস আগে হইতে বিদ্যমান থাকিয়া আসিতেছে, এবং

সেই ওজুহাতে ছয় মাস পূর্ব্বে আলোচ্য অর্ডিন্যান্সের মতই একটা অর্ডিন্যান্স জারি করা হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ ঘটনাসমূহের বা অবস্থাসমষ্টির আকস্মিক আবির্ভাব হইয়াছে, বা সঙ্কটকালের আগমন হঠাৎ হইয়াছে, বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না। এই জন্য আমরা মনে করি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যতই সঙ্গীন বিবেচিত হউক না, তাহা আগে হইতেই বিদ্যমান ছিল—কোন এমার্জেন্সী ঘটে নাই; অতএব অর্ডিন্যান্সটা জারি করায় ভারত-শাসন আইনের ৭২ ধারা লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

ঐ ধারাতে আছে, যে, কোন অর্ডিন্যান্স ছয় মাসের বেশী বলবৎ থাকিবে না। আগেকার অর্ডিন্যান্সটার সার অংশ, মূল অংশ, বজায় রাখিয়া অবান্তর কোন কোন অংশ বর্জ্জন বা সংযোগ করিয়া নূতন অর্ডিন্যান্সের আকারে তাহা জারি করিলেও জিনিষটা সেই একই আছে। কোন মানুষের গোঁফ-দাড়ী কামাইয়া ও নখ-চুল কাটিয়া দিলেও মানুষটা সেই একই থাকে। অতএব বড়লাট যে নূতন অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন তাহার দ্বারা পুরাতন অর্ডিন্যান্সের আয়ু আরও ছয় মাস বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত-শাসন আইনের ৭২ ধারা অনুসারে তাহা করা যায় না। অতএব এই বিষয়েও ঐ আইন লঙ্ঘিত হইয়াছে।

উক্ত ৭২ ধারার যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার শেষে আছে, যে, কোন অর্ডিন্যান্স যতদিন থাকিবে, ততদিন উহা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা অনুমোদিত কোন আইনের সমান বলবৎ থাকিবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের উদ্দেশ্যই এই, যে, সাধারণতঃ তাহার দ্বারাই আইন প্রণীত হইবে, কিন্তু যখন উহার অধিবেশন হইতেছে না তখন একান্ত আবশ্যক স্থলে বড়লাট আর্ডিন্যান্স দ্বারা দেশে শান্তি স্থাপন বা রক্ষা এবং দেশের সুশাসন করিতে পারিবেন। ৭২ ধারার শেষ কথাগুলি হইতেও পরোক্ষভাবে তাহাই বুঝায়। কিন্তু বড়লাট যাহা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যে, যেন তিনি ইচ্ছা করিলেই যত দিন ইচ্ছা অর্ডিন্যান্স দ্বারা দেশ শাসন করিতে পারেন এবং ব্যবস্থাপক সভাকে অনাবশ্যক ও অকেজো করিয়া রাখিয়া তাহার ক্ষমতা ও অধিকার লোপ করিতে পারেন। ইহা কখনই ভারত-শাসন আইনের অভিপ্রায় ছিল না। কেহ যদি বলেন, যে, উহার অভিপ্রায় ঐরূপই ছিল, তাহা হইলে তাঁহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে, যে, ঐ আইন যাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, একটা ভুয়ো ব্যবস্থাপক সভা দিয়া ভারতীয়দিগকে ঠকাইবার উদ্দেশ্য তাহাদের ছিল।

গত ছয় মাসের মধ্যে অর্ডিন্যান্সগুলার অনুরূপ আইন পাস করাইবার পক্ষে যথেষ্ট দীর্ঘকাল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তখন প্রয়োজনীয় আইন বড়লাট উক্ত সভায় পেশ করাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করান নাই। এখনও তিনি বিশেষভাবে ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান করিতে পারিতেন। তাহাও তিনি করান নাই। এখন ব্যবস্থাপক সভায় গবন্মেণ্টের ইচ্ছানুরূপ আইন পাস করান যে অসম্ভব বা কঠিন নহে, তাহা বাংলার ডেটিনুদিগকে বঙ্গের বাহিরে পাঠাইবার আইন পাস হইতেই বুঝা যাইতেছে।

—

নূতন এমার্জেন্সী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স

এই অর্ডিন্যান্সের একটি বিধি অনুসারে, আগেকার অর্ডিন্যান্সে বিচারের জন্য যে তিন জন হাইকোর্ট জজের বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা ছিল, তাহার জায়গায় জেলা সেশ্যন জজের বা তৎসম পদের তিনজন বিচারকের বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলিবে এইরূপ নিয়মও করা হইয়াছে। তিন জন হাইকোর্ট জজের আদালতের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের চেয়ে নিম্নপদস্থ বিচারকদের দ্বারা বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা কেন করা হইল জানি না। সেশ্যন জজদের কেহ কেহ কোন কোন হাইকোর্ট জজের চেয়ে সুবিচারক হইতে পারেন। কিন্তু মোটের উপর হাইকোর্ট জজেরা সেশ্যন জজদের চেয়ে অভিজ্ঞ এবং সর্ব্বসাধারণের অধিক বিশ্বাসভাজন, এবং হাইকোর্ট জজদের গবন্মেণ্টের মত ও প্রয়োজন নিরপেক্ষ হইবার এবং স্বাধীনচিত্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক। তা ছাড়া সুবিচার যেমন আবশ্যক, সুবিচার হইয়াছে

সর্ব্বসাধারণের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মানও আবশ্যক। এই সব কারণে তিন জন হাইকোর্ট জজের বিশেষ আদালত বজায় রাখিলে ভাল হইত। হাইকোর্টে আপীলের ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। কিন্তু প্রথমেই যে আদালতে বিচার হয়, তাহাকেই যথাসম্ভব সুবিচারক্ষম করা উচিত ছিল।

কিছুকাল পূর্ব্বে হাইকোর্টের জজদের বিচারে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত বিমল দাসগুপ্তের কোন শাস্তি হয় নাই, কুমিল্লার দুটি বালিকার হত্যাপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও ফাঁসী না হইয়া অন্য শাস্তি হইয়াছিল, এবং ভূতপূর্ব্ব বঙ্গলাটকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত এক বালিকার সর্ব্বোচ্চ দণ্ড হয় নাই। এইরূপ বিচারের ফলে সর্ব্বসাধারণের অসন্তোষবৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু শাসক রাজপুরুষদের সন্তোষ জন্মিয়াছিল কিনা জানিবার উপায় নাই। বিশেষ আদালত গঠন সম্বন্ধে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত হাইকোর্ট জজদের ঐ তিনটি রায়ের কোন পরোক্ষ সম্পর্ক আছে কিনা, তাহা অনুমানের বিষয়।

স্থলবিশেষে বিশেষ আদালতের বিচার অপ্রকাশ্য ভাবে হইতে পারিবে। যাহাতে অবিচার না হয় কিংবা অবিচার হইয়াছে বলিয়া লোকের সন্দেহ না হয়, অংশতঃ তাহার জন্য প্রকাশ্য বিচারের নিয়ম আছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার যথেষ্ট বা কোনও কারণ দেখান হয় নাই।

চট্টগ্রাম জেলায় এবং ভারত-গবর্ন্মেণ্টের ইচ্ছা হইলে অন্যত্রও সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা বাংলার গবর্ন্মেণ্ট দিতে পারিবেন। হত্যা করিবার চেষ্টার জন্যও প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে। অনেক দিন হইতে নানা অর্ডিন্যান্সের দ্বারা মানুষের স্বাধীনতার ও সম্পত্তির এবং পরোক্ষভাবে প্রাণের উপরও শাসক ও পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে অনিয়ন্ত্রিত অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়া আসিতেছে। ইহা "মার্শ্যাল ল" বা সামরিক আইনের মত। নূতন অর্ডিন্যান্সে অপ্রকাশ্য বিচারের ক্ষমতার, সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিবার, এবং হত্যাচেষ্টার জন্য প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বঙ্গের অবস্থাকে সামরিক আইনের দ্বারা শাসিত দেশের অবস্থার আরও নিকটবর্ত্তী করা হইল। ইহার ফল কিরূপ হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

গত বৎসর উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের একটা রেগুলেশ্যন অনুসারে হত্যাচেষ্টার অপরাধে তথাকার হবীব নূর নামক একজন পাঠান অধিবাসীর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার বিচার ও ফাঁসী হয়। এই ব্যাপার লইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক ও উত্তেজনার সঞ্চার হয়। তর্কবিতর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল এক জন মুসলমান সভ্যের দ্বারা। অনেক মুসলমান ও হিন্দু সভ্য তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। বাংলার জন্য যে এরূপ নিয়ম হইল তাহার বিরুদ্ধে ঐ সব সভ্য কিছু করিবেন কি? আমাদের যতদূর মনে পড়িতেছে, তাহাতে উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের রেগুলেশ্যন-সমূহের সম্বন্ধে অনুসন্ধাতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে হত্যাচেষ্টার জন্য ফাঁসীর তথাকার রেগুলেশ্যন উঠিয়া গিয়াছে। না উঠিয়া গেলেও, সেখানে উহা কেন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বিবেচনার বিষয়। উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের জন্য ঐরূপ রেগুলেশ্যনের সমর্থক ইংরেজদের মতে উহা তথায় এইজন্য আবশ্যক, যে, পাঠানেরা ধর্ম্মান্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং রক্তপাত করিতে দ্বিধা বোধ করে না; অধিকন্তু তাহারা নির্ভীক বলিয়া হঠাৎ অস্ত্র ব্যবহার করে। পাঠানদের সম্বন্ধে কথিত এই সব কথা সত্য কিনা তাহা এখন আলোচ্য নহে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, মেকলের সময় হইতে ইংরেজদের দ্বারা ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে ভীরুতম বলিয়া নিন্দিত ও অবজ্ঞাত বাঙালীরা কি এখন পাঠানদের মত হইয়া উঠিয়াছে? যদি হইয়া থাকে, কি কি কারণে ও প্রভাবে হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠানদের জন্য যে-নিয়ম হইয়াছিল, তাহা বাঙালীর জন্য কেন হইল?

—

দেওলী জেলের ডেটেনুদের জন্য নিয়মাবলী

বাঙালী ডেটেনুদিগকে আজমীর প্রদেশের দেওলী জেলে চালান করা হইতেছে। অনেককে ইতিমধ্যেই

পাঠান হইয়াছে। যে আইন অনুসারে পাঠান হইতেছে, তাহার পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে যখন ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, তখন কোন কোন সভ্য আইনটার অল্পস্বল্প সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। বাংলা দেশ হইতে ডেটেনুদের আত্মীয়-স্বজনদের দেওলী গিয়া তাহাদের সহিত কালেভদ্রে দেখা করা যাহাতে কার্য্যতঃ অসম্ভব না হয়, আইনের সেরূপ সব সংশোধন নামঞ্জুর হয়, এমন কি বাঙালী ডেটেনুদিগকে বাঙালীর খাদ্যাদি দিবার ব্যবস্থাও আইনে রাখাইবার চেষ্টা বিফল হয়।

দেওলী জেলে আবদ্ধ ডেটেনুদের সম্বন্ধে এই আইন অনুসারে কতকগুলি নিয়ম করা হইয়াছে। সব নিয়মের আলোচনা করিবার স্থান নাই। কোন নিয়মেরই আলোচনা দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা নাই। তথাপি, সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য কয়েকটা কথা লিখিতেছি।

ডেটেনুরা আপনাদের অভাব-অভিযোগাদি সম্বন্ধে উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কোন আবেদন পাঠাইতে চাহিলে জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজ মন্তব্যসহ তাহা পাঠাইবেন, এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। কিন্তু—এই "কিন্তু"টি বিষম—যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মতে ঐ আবেদনে আপত্তিজনক বা অপমানকর কিছু থাকে, তাহা হইলে তিনি উহা না পাঠাইয়া নষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন, এবং যদি নষ্ট করেন সে কথা আবেদককে জানাইবেন। আপত্তিজনক ও অপমানকর এই দুইটি শব্দের অর্থ সুনির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নহে; সুতরাং অযথেষ্ট কারণে আবেদন না পাঠাইবার ও নষ্ট করিবার যথেষ্ট সুবিধা এই দুটি কথার মধ্যে রহিয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরা সাধারণতঃ দেবতুল্য হইবেন আশা করা যায় না। তাঁহাদের অধস্তন কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা জেলের কোন বন্দোবস্তের কোন সমালোচনা আবেদনে থাকিলে তাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরই দোষকীর্ত্তন বলিয়া আপত্তিজনক বিবেচিত হইতে পারে—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিজের বিরুদ্ধে কিছু থাকিলে ত কথাই নাই। আমাদের বিবেচনায় যখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আবেদনের উপর মন্তব্য লিখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং যখন ডেটেনুদের উপর প্রয়োজন হইলে তলোয়ার বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষমতা জেলের পাহারাওয়ালাদিগকেও দেওয়া হইয়াছে, তখন বন্দীদের কোন প্রতিকার পাইবার পথ এইপ্রকারে প্রায় বন্ধ না করিলেও চলিত। তাহারা অসহায়, এবং আপনাদিগকে অসহায় বলিয়া জানেও। তাহা আরও ভাল করিয়া তাহাদিগকে সমঝাইয়া দেওয়া অনাবশ্যক।

নিয়মাবলীর দশম ও একাদশ নিয়ম অনুসারে দেওলী জেলের কোন অফিসার বা পাহারাওয়ালা নিম্নলিখিত কারণসমূহের যে-কোন কারণে ডেটেনুদের বিরুদ্ধে তলোয়ার, সঙ্গীন, বন্দুক বা অন্য অস্ত্র ব্যবহার, যতক্ষণ প্রয়োজন, করিতে পারিবে। যথা—বন্দী পলায়নপর হইলে বা পলায়নের চেষ্টা করিলে; বিদ্রোহ করিলে; গেট খুলিবার বা ভাঙিবার চেষ্টা, তারের বেড়া বা দেওয়াল ভাঙিবার চেষ্টা করিলে; বন্দী কোন জেল-কর্ম্মচারীর উপর বলপ্রয়োগ করিলে। অবশ্য ইহাও লেখা হইয়াছে, যে, অস্ত্রপ্রয়োগ না করিলে বন্দীদিগকে তাহাদের ঐ ঐ কাজ হইতে নিবৃত্ত করা যাইবে না, কিংবা বন্দীদের বা বন্দীবিশেষের দ্বারা আক্রান্ত কর্ম্মচারীর অঙ্গহানি প্রাণহানি বা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, অস্ত্রপ্রয়োগকর্ত্তার এইরূপ বিশ্বাস থাকা চাই। কিন্তু নিয়মে এ কথা নাই, যে, অস্ত্রপ্রয়োগে কোন বন্দীর অঙ্গহানি প্রাণহানি ইত্যাদি ঘটিলে, অস্ত্রপ্রয়োগকর্ত্তাদের উক্ত রূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ দেখাইতে হইবে; এ-কথাও নাই, যে, বন্দীরা যে পলায়ন গেট ভাঙা তারের বেড়া ছেঁড়া দেওয়াল-ভাঙা ইত্যাদি কোন কার্য্য করিতেছিল, তাহা অস্ত্রপ্রয়োগকর্ত্তাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে।

এই নিয়মগুলি হইতে দেখা যাইতেছে, যে, অবস্থা-বিশেষে দেওলী জেলে বিনা বিচারে-বন্দীদের কার্য্যতঃ প্রাণদণ্ড দিবার ভার পাহারাওয়ালা শ্রেণীর লোকদের হাতে পড়িতে পারে। এই শ্রেণীরই একজন লোক হিজলীর সরকারী তদন্তকারী সরকারী কর্ম্মচারীদ্বয়ের নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিল, যে, কোন ডেটেনুর প্রাণের চেয়ে তাহার কাছে সরকারী বন্দুকের মূল্য বেশী। বড়লাটের বা

কোন প্রাদেশিক লাটের কোন বন্দীর প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতা নাই। কোনও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরও সাক্ষ্যপ্রমাণাদির সাহায্যে বিচারানন্তর ব্যতিরেকে কাহারও প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সাধারণ পাহারাওয়ালা শ্রেণীর লোককে কার্য্যতঃ যাহাতে বন্দীদের প্রাণনাশ ঘটিতে পারে এরূপ ক্ষমতা না দিলে সুবিবেচনার কাজ হইত।

যে-সব বন্দী এইরূপ ক্ষমতার অধীন হইবে, তাহাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বা তাহার কিছু অধিক লোক আদালতের বিচারে খালাস পাইবার পর বিনাবিচারে পুনর্ব্বার বন্দীকৃত ও জেলে আবদ্ধ হইয়াছে। বাকী কয়েক শত ডেটেন্যুরও কোন দোষ কোন কালে প্রমাণিত হয় নাই। এইরূপ লোকদের সম্বন্ধে এরূপ বিপজ্জনক ব্যবস্থা করা আমাদের বিবেচনায় সঙ্গত হয় নাই।

ডেটেন্যুরা নিরস্ত্র। কোন অস্ত্র সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা ডেটেন্যুদের আছে, যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায়—যদিও ইহা স্বীকার্য্য নহে—তাহা হইলেও দেওলীর মত অজানা স্থানে তাহাদের অস্ত্রসংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগকে সর্ব্বদা যেরূপ কড়া পাহারায় রাখা হয়, তাহাতে তাহাদের দ্বারা দলবদ্ধভাবে গেটভাঙা দেওয়ালভাঙা জেলের কর্ম্মচারীদিগকে আক্রমণ ইত্যাদি কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করি না। এইজন্য তাহাদের প্রতি বন্দুকআদি অস্ত্রপ্রয়োগের নিয়ম অনাবশ্যক। ইহাতে কেবল, যাহারা ডেটেন্যুদিগকে জানে না এবং তাহাদের বন্দীদশার কারণ ও প্রণালী জানে না, তাহাদের মনে এই প্রমাণবিহীন ধারণা জন্মিবে, যে, তাহারা অতি ভয়ানক লোক বলিয়া নিশ্চিত জানা গিয়াছে। আর একটা কুফল এই হইবে, যে, ডেটেন্যুদের মনের উপর এরূপ বিপজ্জনক নিয়মাবলীর প্রভাবে তাহাদের মানসিক অবসাদের ফলে আয়ুহ্রাস হইতে পারে, এবং তাহারা কেহ কেহ চিত্তবিকৃতিবশতঃ আত্মহত্যাও করিতে পারে—যাহা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয় ও অনাবশ্যক।

ডেটেন্যুদের পাঠ্য সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র

দেওলী জেলের ডেটেন্যুরা কি কি খবরের কাগজ ও মাসিক কাগজ পড়িতে পারিবে, তাহাদের জন্য প্রণীত নিয়মাবলীর শেষে তাহার একটি তালিকা দেওয়া আছে। ইংরেজী দৈনিকগুলির মধ্যে কলিকাতার (অধুনা ছদ্মনামধারী) বেঙ্গলী এবং এলাহাবাদের লীডার আছে। বাকীগুলা এংলোইণ্ডিয়ান্ কাগজ। তাহাদের দলে লীডারকে কেন ফেলা হইল জানি না—বোধ করি উহা এক মডারেট নেতার দ্বারা সম্পাদিত বলিয়া। উহার লেখা কিন্তু কলিকাতার দেশী দৈনিকগুলির চেয়ে অনেক সময় বেশী কড়াই হইয়া থাকে।

ইংরেজী মাসিকপত্রগুলির মধ্যে মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার নাম নাই, বলাই বাহুল্য। বাংলা সচিত্র বড় মাসিক কাগজগুলির মধ্যে প্রবাসী সকলের চেয়ে পুরাতন। তালিকায় উহার নাম নাই, অপেক্ষাকৃত নূতন বড় সচিত্র মাসিকগুলির নাম আছে। আমাদের পাঠকদের মনে থাকিতে পারে, কয়েক বৎসর আগে বাংলার শিক্ষা-বিভাগ স্কুলের পাঠাগার সকলের জন্য গ্রহণীয় মাসিকপত্র-সকলের যে তালিকা বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রবাসীর নাম ছিল না। আমাদের অজ্ঞাতসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন মাননীয় সভ্য ঐ সভায় একটি প্রশ্ন করেন। তাহার সরকারী উত্তর শিশুদের পক্ষেও সহজে খণ্ডনীয় হইয়াছিল। গবর্ন্মেণ্ট দেওলী জেলের জন্য বাংলা মাসিকপত্রের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা স্কুলের পাঠাগারসমূহের জন্য প্রস্তুত পূর্ব্বোক্ত তালিকার মত। স্কুল ও জেলকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিবার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে। প্রবাসী বৈধ উপায়ে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতী বলিয়াই সম্ভবতঃ স্কুলে যাহাদের নিকট হইতে বন্দীর মত বাধ্যতা প্রত্যাশা করা হয় এবং জেলে যাহারা প্রকৃত বন্দী, উভয় শ্রেণীরই উহা অপাঠ্য বিবেচিত হইয়া থাকিবে।

পরলোকগত মাসিকপত্র পাঠ

দেওলীর ডেটেন্যুদের পাঠ্য মাসিক পত্রসমূহের মধ্যে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র নাম আছে। ইহা বহুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। ইহার সম্পাদক সঙ্গীতজ্ঞ সদালাপী মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় অনেক বৎসর পরলোকগত হইয়াছেন। অন্যতর সম্পাদক বিখ্যাত গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও ঐ মাসিক পত্রখানির বিলোপের অনেক পরে কিছুদিন হইল পরলোকগত হইয়াছেন। গবন্মে´ন্টের চরেরা গুপ্ত ষড়যন্ত্র, বোমা, পিস্তল, রিভল্‌ভার, রাজনৈতিক ডাকাতি, খবরের কাগজের লেখার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক বেয়াদবী ও কুমতলব ইত্যাদি আবিষ্কারে দিবারাত্রি এরূপ ব্যাপৃত থাকেন, যে, তাঁহারা "মানসী ও মর্ম্মবাণী" সম্পর্কীয় সুবিদিত খবরগুলাও জানেন না বা জানিয়াও গবন্মে´ন্টকে জানাইবার অবসর পান নাই। সুতরাং এখন যদি কোন ডেটেন্যু "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পড়িতে চায়, তাহা হইলে গবন্মে´ন্টকে স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের সাহায্যে খবর লইতে হইবে যে উহা পরলোকে বাহির হইতেছে কি না এবং সেখান হইতে ইহলোকে উহা আনাইবার কোন বন্দোবস্ত হইতে পারে কি না।

—

ক্যাথেরিন্ মেয়োর দোসর

গত মে মাসে আমাদের দৈনিক কাগজগুলি বিলাত হইতে আমদানী এই একটি খবর প্রকাশ করেন, যে, প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডল নামক এক স্ত্রীলোককে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আমেরিকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং ঐ স্ত্রীলোক মিস্ মেয়োর বন্ধু। সে সম্প্রতি প্রাচ্য দেশে (ভারতবর্ষেও) তাহার চতুর্থ সফর শেষ করিয়া আমেরিকায় ফিরিয়াছে, এবং লণ্ডনে ভারতসচিবের ইণ্ডিয়া আপিস তাহাকে প্রদত্ত 'অযাচিত' সার্টিফিকেটগুলি দেখিয়া ভারী খুসী হইয়াছে। ঐ স্ত্রীলোকটি ভারতবর্ষে ভ্রমণকালে এদেশে ব্রিটিশ-শাসনের কোমলতা ও মৃদুতায় (leniencyতে) মুগ্ধ হইয়াছিল বলিয়াছে। সুতরাং সে আমেরিকায় ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবার খুবই উপযুক্ত ব্যক্তি।

তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি খবর মে মাসে বিলাত হইতে আমদানী হওয়ায় আমাদের খবরের কাগজগুলি মূল্য দিয়া সেই খবরগুলি কিনিয়া ছাপিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহার একখানা বহি সম্বন্ধে কতকগুলি খবর ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ন রিভিউতে ছাপিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ তাহা বিনা মূল্যে উদ্ধৃত করা চলিত বলিয়া তাহার উপর সম্পাদকদের নজর পড়ে নাই। আমরা ইংরেজীতে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার দু-একটা কথা বাংলায় লিখিতেছি।

ঐ স্ত্রীলোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা বহি লিখিয়াছে। তাহার নাম, "Come with me to India: A Quest for Truth Among Peoples and Problems," "আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে এস;—লোকসমূহ ও সমস্যাসমূহের মধ্যে সত্যের খোঁজ।" প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডলের এই বহিতে কিরূপ সত্যরত্ন সঞ্চিত হইয়াছে আমেরিকার একজন সমালোচক তাহার অনেক নমুনা দিয়াছেন। লেখিকার মতে ভারতবর্ষে শিশুহত্যা—শিশুকন্যা-হত্যা—ভারতবর্ষের প্রায় সব পিতামাতা দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে! এ বিষয়ে সব প্রমাণ ঐ স্ত্রীলোক ভারতীয় লোকদের মুখ দিয়া বলাইয়াছে, অর্থাৎ সে এতদ্বিষয়ক খবর ভারতীয়দের নিকট হইতে প্রাপ্ত ইহা তাহার পাঠকদিগকে বিশ্বাস করাইবার জন্য কল্পিত ভারতীয়দিগকেই ঐ সব কথা বলাইয়াছে। বহিখানার সমালোচক বলিতেছেন, যে, যেহেতু ১৯২১ হইতে ১৯৩১ এই দশ বৎসরে ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা ৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ হইয়াছে, অতএব তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, অন্ততঃ কতকগুলি স্ত্রীজাতীয় শিশুকে ভারতবর্ষের লোকেরা বাঁচিয়া থাকিতে দেয়! বাস্তবিক প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডলের এই সোজা তথ্যটার উপর কেন চোখ পড়ে নাই জানি না। ভারতবর্ষের যে প্রায় ৪ কোটি লোক বাড়িয়াছে তাহাদের জননীরা ভারতীয়া এবং এককালে শিশু ছিলেন। সমুদয় বা অধিকাংশ কন্যাসন্তানকে শৈশবে ভারতীয়েরা মারিয়া ফেলিয়া থাকিলে ভারতীয় কুপুত্রদের এত জননী কাহারা হইতেন?

যাহারা চোখ থাকিতেও দেখিবে না, তাহাদের মত অন্ধ আর কে?

প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডলের সত্যবাদিতার আর একটা নমুনা লউন। তাহার ভূগোলজ্ঞান অতি নিখুঁত ও অতি বিচিত্র। সবাই জানে, মাদ্রাজ বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত, এবং সমুদ্র মাদ্রাজের পূর্ব্ব দিকে। কিন্তু প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডল তাহার বহিতে দুই দুই বার লিখিয়াছে, যে, সে মাদ্রাজে সূর্য্যকে সমুদ্রে অস্ত যাইতে দেখিয়াছে! সম্ভবতঃ সূর্য্যদেব তাহার গুণের বালাই লইয়া ডুবিয়া মরিবার জন্য একলম্ফে পশ্চিমদিকের অস্তাচল হইতে পূর্ব্বদিকের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন।

আমেরিকার সমালোচক তাঁহার সমালোচনার শেষে বলিতেছেন :—

"Our author says that the truth can free India. Of course it can. The truth can free anybody. The truth can free England. The truth can free Patricia Kendall.

"আমাদের গ্রন্থকর্ত্রী বলিতেছেন, সত্য ভারতবর্ষকে মুক্তি দিতে পারে। অবশ্যই পারে। সত্য যে-কোন জাতি বা ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারে। সত্য ইংলণ্ডকে মুক্তি দিতে পারে। [এমন কি] সত্য প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডলকেও মুক্তি দিতে পারে।"

এ হেন যে প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডল, সে অবশ্যই ক্যাথেরিন মেয়োর মত ইংলণ্ডের যশোগান এবং ভারতবর্ষের অপযশ কীর্ত্তনের উপযুক্ত লোক। এবং সে যে কাহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষ দেখিয়াছিল এবং কাহাদের পক্ষ হইতে আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইবে তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও বৃত্তান্ত গত মাসের 'প্রবাসীতে' দিয়াছি। বিশেষ রকম অর্থাভাব ও অন্যান্য বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যে উহা দ্বারা ভাল কাজ হইতেছে, তাহা বঙ্গের সরকারী চিকিৎসা-বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী সার্জ্জন-জেনের্যালের নিম্ন-মুদ্রিত মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে।

"I visited the Hospital and the School this afternoon with the Civil Surgeon and met the Superintendent and the teachers of the School.

"I have already had good reports of its workings from Col. Stewart, who inspected the School for the State Medical Faculty, and am glad to find my inpressions confirmed. It is obviously a very live and very active institution. The new buildings, laboratories and wards are of very good design and construction. The old ones will, I hope, be replaced in time; but wonderfully good work is being done under very unfavourable conditions and the staff obviously take a very keen interest and pride in their work. They have a good class of cases for instructional purposes in their wards and the standard of work seems quite good. I am very glad to inspect such a needful and progressive institution and wish it all success."

"আজ বিকালে সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে এই স্কুল ও হাসপাতাল দেখিলাম, এবং সেখানে স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও শিক্ষকদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি আগেই কর্ণেল ষ্টুয়ার্টের নিকট হইতে স্কুলের কাজকর্ম্মের সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট পাইয়াছিলাম; তিনি ষ্টেট্ মেডিক্যাল ফ্যাকাল্‌টীর পক্ষ হইতে উহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে উৎপন্ন আমার ধারণা আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা দৃঢ়ীভূত হওয়াতে প্রীত হইলাম। ইহা স্পষ্টতঃ একটি খুব "জ্যান্ত" ও খুব কর্ম্মিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। নূতন ইমারৎ, ল্যাবরেটরী ও হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলি বেশ ভাল পরিকল্পনা অনুসারে সুনির্ম্মিত। আমি আশা করি পুরাতনগুলির পরিবর্ত্তে কালক্রমে নূতন নির্ম্মিত হইবে; কিন্তু অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে খুব আশ্চর্য্য রকম ভাল কাজ এখানে হইতেছে এবং স্পষ্টই বুঝা যায় ইহার শিক্ষক ও অন্য কর্ম্মীরা ইহার কাজে সাগ্রহ মনোযোগ দেন এবং তাহাতে গর্ব্ব অনুভব করেন। তাঁহাদের হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলিতে তাঁহারা শিক্ষা দিবার পক্ষে বেশ উপযোগী রোগে আক্রান্ত লোক পাইয়া থাকেন, এবং কাজও উচ্চ আদর্শের অনুরূপ হয় মনে হইতেছে। আমি এরূপ একটি আবশ্যক ও প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া খুব সুখী হইলাম, এবং ইহার সর্ব্ববিধ সাফল্য কামনা করি।"

এই বিদ্যালয়টির আরও নানাদিকে উন্নতি ও বিস্তৃতির প্রয়োজন আছে। স্থানীয় ওয়েসলিয়ান্ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ও বিজ্ঞান-অধ্যাপকদের সৌজন্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এখন সেখানেই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নীবিদ্যা শিক্ষা করে। বিদ্যালয়টিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত উহার নিজের বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরী দুটি নির্ম্মিত ও যন্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত হওয়া আবশ্যক এবং বিজ্ঞান-শিক্ষকও নিয়োগ করিতে হইবে। ইহার জন্য অনেক হাজার টাকা চাই। হাসপাতালে আরও অনেক রোগীর স্থান না হইলে ছাত্র বাড়ান যাইবে না। হাসপাতালের বাড়ি আরও বাড়াইতে হইবে। এইরূপ নানা খরচ আছে। ছাত্রদের অভিভাবকেরা অনেক দান করিয়াছেন। তা ছাড়া গত পাঁচ বৎসরে প্রধান প্রধান নগদ দান যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার তালিকা নীচে দিতেছি। তাহার পূর্ব্বেও অনেক দান পাওয়া গিয়াছিল।

১৯২৬-২৭ — অহল, রাজগঞ্জের মোহান্ত—৫০০৲ স্ত্রীলোকদিগের অস্ত্রচিকিৎসালয়ের জন্য

১৯২৮-২৯ — বর্দ্ধমানের মহারাজ—১০০৲ অস্ত্রচিকিৎসার সরঞ্জাম জন্য

১৯২৬-২৭, ১৯২৭-২৮, ১৯২৯-৩০ — রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০০১৲ অস্ত্রোপচার-গৃহের জন্য

— শ্রীমতী গঙ্গামণি দাসী—৬৪২৲ প্রসবাগারের জন্য

— বাঁকুড়া মহিলা সমিতি—২৫০০৲ „

(সভানেত্রী মিসেস্ এ. ই. ব্রাউনের দ্বারা সংগৃহীত)

১৯২৬-২৭, ১৯২৭-২৮, ১৯৩০-৩১ — শ্রীযুক্ত হরিপদ নন্দী—৪৬০।০—Isolation ward জন্য

১৯২৯-৩০, ১৯৩১-৩২ — শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০০৲ হাসপাতালের জলের কলের জন্য

দানের অঙ্গীকারের মধ্যে, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ কোলে মহাশয়ের পুরুষদের অস্ত্রচিকিৎসালয়ের জন্য ১২,০০০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি উল্লেখযোগ্য। আগে আগে বাঁকুড়ার জনসাধারণ কিছু কিছু চাঁদা দিতেন এখন তাহা প্রায় বন্ধ হইয়াছে। কলেজ ও স্কুলের কয়েক জন অধ্যাপক ও শিক্ষক বৎসরে ৩০০৲ দেন। ব্যবসায়ী, হাকিম, অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী, জমীদার, উকীল, মোক্তার, প্রভৃতিরও কিছু কিছু দেওয়া উচিত।

—

স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল

প্রসিদ্ধ বাগ্মী, সাংবাদিক, গ্রন্থকার, এবং প্রাক্তন জননায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পরলোকগমনে এক জন শক্তিমান পুরুষের তিরোভাব হইল। যৌবনকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের মধ্যে আসিয়া স্বাধীনতার একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আধুনিক সময়ে আমাদের দেশে রামমোহন রায় এই আদর্শ উপলব্ধি করিয়া তাহা জনসমাজের গোচর করেন। এই আদর্শ অনুসারে স্বাধীনতা কেবল রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নহে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে, চিন্তার ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিতে, শিক্ষা সম্বন্ধে এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীনতাও ইহার অন্তর্গত।

যৌবনকালে বিপিনচন্দ্র, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন। তিনি মুন্সেফের কাজ করিতেন এবং



স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল

তদ্ভিন্ন জমিদারীও বেশ ছিল। কিন্তু বিপিনচন্দ্র সম্পত্তির লোভে সত্যকে ত্যাগ করেন নাই।

তাঁহার কণ্ঠের শক্তি ও বাগ্মিতা যেমন অসাধারণ, কোন বিষয় সুশৃঙ্খল ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতাও তেমনি অসামান্য ছিল। তিনি সমান দক্ষতার সহিত বাংলা ও ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। এই উভয় ভাষাতে তাঁহার লিখিবার ক্ষমতাও প্রভূত ছিল। তিনি অনেক বিষয়ে বহু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্ট জ্ঞান ছিল, যদিও অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার চলনসই জ্ঞান ছিল।

বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব উপলক্ষ্যে এবং পরে বাংলা দেশ দ্বিধা বিভক্ত হইবার পর যে "স্বদেশী"-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জ্জনের আন্দোলন হয়, তাহাতে বিপিনচন্দ্র অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি তখনকার চরমপন্থীদলের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষের এই রাষ্ট্রীয় আদর্শের ঘোষণা ও ব্যাখ্যা করেন, যে, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বাহিরে সম্পূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্ব লাভ করিতে হইবে। পরিণত বয়সে তাঁহার এই

মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আগেকার মতের যে দার্শনিক ভিত্তি তাৎকালিক "বন্দে মাতরম" নামক ইংরেজী কাগজে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নিউ ইণ্ডিয়ায় ও হিন্দু রিভিউয়ে, এবং মান্দ্রাজের বক্তৃতামালায় ব্যাখ্যা করেন, তাহাই তাঁহার প্রকৃত রাজনৈতিক পরিচয় হইয়া থাকিবে।

তিনি আরও অনেক কাগজের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে পরলোকগত পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নামক যে দৈনিক প্রতিষ্ঠিত করেন, বিপিনবাবু কিছুকাল তাহার সম্পাদক ছিলেন। যখন পণ্ডিত মোতীলাল অসহযোগ মত গ্রহণ করেন, তখন বিপিনবাবু ঐ কাগজের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। পণ্ডিতজী তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে কাগজখানার পরিচালন বিষয়ে কিছু বলেন নাই, কাজ ছাড়িয়া দিতে ত বলেনই নাই, পরোক্ষভাবে কোন ইঙ্গিতও করেন নাই। কিন্তু বিপিনবাবু স্বয়ং স্বত্বাধিকারীর ও নিজের মতের পার্থক্য হেতু কাজ ছাড়িয়া দেন। পদটির বেতন শুনিয়াছি হাজার টাকা ছিল, এবং বিপিনবাবু কোন কালেই সঞ্চয়ী ছিলেন না। তথাপি চিন্তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিবার জন্য ইস্তফা দিয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি য়্যাংলোইণ্ডিয়ান কাগজে লিখিতেন। ইহাতে অনেকে মনে করেন, যে, হয়ত তাঁহার চিন্তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মতেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং এই পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে অনিচ্ছাকৃতভাবে হইয়াছিল, এইরূপ মনে করাই আমাদের বিবেচনায় অধিক সঙ্গত বোধ হয়। কারণ, মতের একান্ত স্থৈর্য্য তাঁহার ছিল না।

প্রবাসীতে তাঁহার জীবনের গোড়ার দিকের বৃত্তান্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া বাহির হইয়াছিল। ইংরেজীতেও তাঁহার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। আরও দুই খণ্ড বাহির হইবে। তাঁহার জীবন বঙ্গের ও ভারতবর্ষের একটি পরিবর্ত্তনবহুল ও ঘটনাবহুল যুগের সমসাময়িক এবং এই সময়ের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া যাঁহারা বিধাতার হাতে পরিবর্ত্তন ঘটাইবার অন্যতম যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন, তিনি তাঁহাদের একজন। সুতরাং তাঁহার জীবনের ইতিহাস তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনচরিত ব্যতীত ভারতবর্ষের ও বঙ্গের ইতিহাসের একটি অংশ বলিয়াও পড়িবার যোগ্য। তিনি যৌবনকালে কিছুদিন শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। তখন হইতে শেষ বয়স পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টার কাজও অনেক বার করিয়াছেন। যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে তেমনি ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ছিল। এইজন্য, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক হইলেও ইহার পরিচালকবর্গের সহিত অবান্তর নানা বিষয়ে তাঁহার অনেক অমিল ছিল।

তিনি কয়েক বার ইংলণ্ড ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে গিয়াছিলেন। একবার যান, ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়নের বৃত্তি লইয়া। তথায় অধ্যাপকেরা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বুঝিতে পারেন, যে, তিনি ঠিক্ ছাত্রপদবাচ্য নহেন। একবার বিলাতে থাকিতে তিনি "স্বরাজ্য" নাম দিয়া একখানি মাসিক কাগজ বাহির করেন। তাহার একটি সংখ্যায় তিনি "বঙ্গে বোমার নিদান" ("Aetiology of the Bomb in Bengal") শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহা ভারত-সরকারের মতে রাজদ্রোহাত্মক বিবেচিত হওয়ায় এবং ঐ সংখ্যা ভারতবর্ষে আমদানী হওয়ায়, তিনি উহার প্রকাশের পর বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিবামাত্র ধৃত হন এবং বিচারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার আরও একবার কারাদণ্ড হইয়াছিল। শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ একবার রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইলে বিপিনবাবুকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়। এরূপ মোকদ্দমায় তাঁহার সাক্ষ্য দেওয়া দেশহিতের প্রতিকূল বলিয়া তাঁহার মনে হওয়ায় তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। সেইজন্য তাঁহার কারাদণ্ড হয়।

বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়া ও লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙালী বলিয়া তাঁহার একটি গৌরব-বোধ ছিল। তাহা আমাদের অন্য অনেকেরও আছে। দেশের গবর্মেণ্ট বা রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালন বিষয়ে, সমগ্র দেশের একটি কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কতকগুলি ক্ষমতা পরিচালন করিবেন, এবং প্রদেশগুলির আভ্যন্তরীণ অন্য সব বিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্ব (provincial

autonomy) থাকিবে, এই মত অনেকেরই আছে। কিন্তু বেসরকারী নানাবিধ সার্ব্বজনিক কাজেও যে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব থাকা উচিত, ইহা অনেকে ভাবিয়া দেখেন না। এ বিষয়ে চিন্তা না-করার বড় দৃষ্টান্ত দিব না, ছোট দু-একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। যেহেতু গুজরাটে প্রভাত-ফেরী নাম প্রচলিত, অতএব বাংলা ঐরূপ শব্দ—বৈতালিক—থাকিলেও প্রভাত-ফেরীই বলিতে হইবে; যেহেতু গুজরাটে টেকো, টেকুয়া, বা টাকুকে তকলী বলে অতএব বাংলা দেশেও তাহাকে তকলী বলিতে হইবে; ইহা গতানুগতিকতা মাত্র। সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব করিবার লোক সব সময়ে বাংলা দেশেই জন্মিবে, ইহা হইতে পারে না। কিন্তু বাংলা দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহার ফতোয়াও আসিবে বঙ্গের বাহির হইতে, ইহা সঙ্গত ও স্বাভাবিক নহে। ইংলণ্ডের কর্ত্তব্যের বিধিব্যবস্থা ফ্রান্স হইতে, ফ্রান্সের কর্ত্তব্যের বিধিব্যবস্থা জার্ম্মেনী হইতে, জার্ম্মেনীর পালনীয় ফতোয়া রুশিয়া হইতে ত আসে না। আমরা যতটা বুঝিয়াছি, বিপিনবাবু মনে করিতেন, যে, বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বাঙালীর কর্ত্তব্যনির্ণয় বাঙালীরই করা উচিত এবং তাহা করিবার ক্ষমতা বাঙালীর আছে। এই মত যুক্তিতর্কের দিক দিয়া ঠিক হইলেও সকল সময়ে বঙ্গে ইহা অনুসৃত না হইবার কারণ এই, যে, সম্ভবতঃ বুদ্ধিমান্ বাঙালীরা পরস্পরের সম্বন্ধে কিছু বেশী ঈর্ষ্যাপরায়ণ।

উপরে আভাস দিয়াছি, যে, বিপিনবাবু সব বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করিতে এবং নিজের মতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যখন যে-মত পোষণ করিতেন, তাহার সমর্থক যুক্তির অবতারণা ও বিশদ ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। সম্ভবত এইরূপ কারণে, তাঁহার প্রতিবাদপরায়ণতার মাত্রা কখন কখন অধিক হইত।

আমাদের দেশে আমরা যত জন বিখ্যাত সাংবাদিকের কথা অবগত আছি, তাঁহারা কোন কোন দিকে বিপিনচন্দ্রের চেয়ে শক্তিশালী হইলেও, মোটের উপর তাঁহার মত একাধারে নানাবিষয়িনী শক্তি আর কাহারও ছিল না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক চিন্তাকে যাঁহারা নূতন পথে চালিত করিয়াছেন, বিপিনচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম।

—

বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্র

খবরের কাগজে দেখিলাম, ইংরেজীতে একখানি সাময়িক পত্র বাঙ্গালোর হইতে বাহির হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষে কৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৃত্তান্ত এবং মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বাহির হইবে। এরূপ পত্রিকার প্রয়োজন আছে এবং ইহার প্রকাশ সন্তোষের বিষয়। আমাদের কেবল জানিতে ইচ্ছা হয়, যে, ইহা কেন কলিকাতা হইতে বাহির হইল না। ভারতবর্ষের সব বড় কাজ বাঙালীরাই করিবে, আর কেহ কিছু করিবে না, আমাদের বক্তব্য ইহা নহে। আমাদের জিজ্ঞাসুতার কারণ অন্যরূপ। ভারতবর্ষে ভারতীয়দের দ্বারা উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাঙালীরাই প্রথমে করেন। অবাঙালী খুব বিখ্যাত গবেষক স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন্‌ও তাঁহার সব গবেষণা কলিকাতায় করিয়াছেন। এই জন্য এরূপ কাগজের আবির্ভাব বঙ্গেই হওয়া উচিত ছিল। বঙ্গদেশে যে-সব বৈজ্ঞানিক কাজ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট সংযোগিতা ও একতা এবং উদ্যোগিতা না থাকাতেই কি যাহা কলিকাতায় হওয়া উচিত ছিল, তাহা বাঙ্গালোরে হইল ?

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা "প্রকৃতি" নাম দিয়া যে বৈজ্ঞানিক ঋতুপত্রখানি বাহির করেন, তাহা বাংলায় লিখিত বলিয়া সমগ্র ভারতের কাজে লাগে না। তিনি কিংবা অন্য কেহ ইংরেজীতেও ঐরূপ একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা বাহির করিলে ভাল হয়। কিন্তু বাংলাটিও থাকা চাই। তবে, দুঃখের বিষয় বেশী লোকে ইহার খবর রাখেন না ও পড়েন না। ইহার অনেক গ্রাহক ও পাঠক হওয়া উচিত। কবিতা উপন্যাস প্রভৃতি ভাষার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করে বটে, কিন্তু কেবল উহার দ্বারাই কোন ভাষা ও সাহিত্য সম্যক সমৃদ্ধ হইতে পারে না, বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতি নানাপ্রকারের সাহিত্যও আবশ্যক।

—

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহার চিড়িয়াখানা

কয়েক দিন হইল শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয়ের সৌজন্যে আগরপাড়ায় তাঁহার চিড়িয়াখানা বা পক্ষী-নিকেতন দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। পক্ষীতত্ত্ব বিষয়ে তিনি আমাদের দেশের অথরিটী অর্থাৎ প্রামাণ্য ব্যক্তি। তাঁহার চিড়িয়াখানায় তিনি লোককে দেখাইবার জন্য কেবল বড় বড় পাখী সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই; দুর্লভ নানাবিধ ছোট ছোট পাখী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া তাহাদের প্রকৃতি, সহজাত সংস্কার ও অভ্যাস সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহাদের খাদ্য, বাসা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভাবিয়া-চিন্তিয়া নানারূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। বুদ্ধিবিশিষ্ট সমুদয় প্রাণীর প্রকৃতিতে কতকটা সাদৃশ্য আছে। সেই জন্য পক্ষীদের ব্যবহারের সহিত মানুষের ব্যবহারেরও কোন কোন বিষয়ে মিল আছে। লাহা মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার চিড়িয়াখানায় একবার ঘুরিয়া আসিলে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।

—

গোবিন্দকুমার আশ্রম

লাহা মহাশয়ের চিড়িয়াখানা যেদিন দেখিতে যাই, সেইদিন পানিহাটীতে গোবিন্দকুমার আশ্রমের তত্ত্বাবধায়কদিগের সৌজন্যে তাহা দেখিবারও সুযোগ ঘটে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে তাঁহারা আশ্রম বলেন কি-না জানি না, অন্য কোন নাম হয়ত আছে। বাড়িটি ও তৎসংলগ্ন বাগানটি ঠিক্ গঙ্গার তীরে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় ইহা প্রতিষ্ঠানটিকে দান করিয়াছেন। বাড়িটি সুন্দর এবং রাখাও হইয়াছে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইহাতে এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। যে-সব অল্পবয়স্কা বালিকাকে নানাস্থান হইতে অসদুপায়ে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পণ্যস্ত্রীতে পরিণত করিবার জন্য কুস্থানে রাখা হয়, তাহাদেরই কতকগুলির সেই দুর্ভাগ্য নিবারণ করিয়া উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কদের যত্নাধীন করিয়া এই প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। এখন তিরাশিটি বালিকা এখানে আছে। যাহাতে তাহারা সদুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, এখানে তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা ও নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে তাহাদিগকে আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে। ইহার পরও তাহারা যাহাতে আরও পাঁচ-সাত বৎসর এমন কোন শিক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে উপার্জ্জনক্ষম হয়, তাহার একটি প্রতিষ্ঠান একান্ত আবশ্যক। কেন-না, আঠার বৎসর বয়সেই তাহাদের সেরূপ কোন শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইবারই কথা।

বালিকাগুলি সকলেই হিন্দু সমাজের। এই প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম অনুসারে তাহাদিগকে অন্য কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত করা বা তাহার চেষ্টা করা নিষিদ্ধ। ইহাতেও একটি সমস্যার উদয় হইয়াছে। বালক-বালিকারা বড় হইয়া বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবে, অধিকাংশের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। যে-সকল বালক-বালিকা নিজ নিজ পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকের নিকট থাকে, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ নানা কারণে অবিবাহিত থাকে; কিন্তু অধিকাংশই বিবাহিত হইয়া নূতন নূতন গৃহস্থালীর পত্তন করে। এই প্রতিষ্ঠানের বালিকাগুলির পক্ষেও সেইরূপ জীবন বাঞ্ছনীয়। ইহাদিগকে যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত, তাহা হইলে তাহাদের বিবাহ হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইত। কিন্তু তাহাতে হিন্দু সমাজের আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। অথচ হিন্দুসমাজে তাহাদের বিবাহ হওয়া সহজ নহে। এই জন্য হিন্দু জনমতকে এরূপ উদারভাবাপন্ন করিতে হইবে, যাহাতে ইহারা হিন্দুসমাজভুক্ত থাকিয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে পারে। নিজেরা তাহাদিগকে সমাজের ক্রোড়ে স্থান দিব না, অন্যকেও তাহা করিতে দিতে আপত্তি করিব, এরূপ মনোভাব ও আচরণ সঙ্গত নহে, এবং হিন্দুসমাজের ক্ষয় নিবারণেরও অনুকূল নহে। আগে আগে যে-সকল কুমারী, সধবা বা বিধবা অত্যাচরিতা হইত, হিন্দু সমাজে তাহাদের অনেকের আর স্থান হইত না। এখন সমাজ ঠিক্ ততটা নিষ্ঠুর ও অযৌক্তিক আচরণ করে না, নিগৃহীতারা সকলে না-হউক অনেকেই স্বসমাজে থাকিতে পায়—সকলেরই থাকিতে পাওয়া উচিত; কারণ, তাহারা নির্দ্দোষ, দোষ দুর্ব্বৃত্তদিগের।

পানিহাটীর প্রতিষ্ঠানটির বালিকারাও স্বয়ং নির্দোষ, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার অর্থ ইহা নহে, যে, কাহারও একবার পদস্খলন হইলে আর সে ক্ষমার যোগ্য থাকে না; আমাদের মতে কেহ দোষ করিলেও সরল অন্তঃকরণে অনুতাপের পরিচয় ও প্রমাণ দিলে তাহার স্বসমাজে স্থান হওয়া উচিত এবং অনুতাপের সুযোগও তাহার পাওয়া উচিত। সুতরাং যাহারা কোন দোষই করে নাই, আমাদের মতে তাহাদের স্বসমাজে স্থান ত হওয়াই উচিত।

পানিহাটীর এই প্রতিষ্ঠানটিতে বালিকারা নিজেদের রন্ধন পরিবেষণাদি গৃহকর্ম্ম নিজেরাই করিয়া থাকে। তাহারা সাধারণ লেখাপড়া ব্যতীত কোন কোন কুটীর-শিল্পও শিখিয়া থাকে। তাহাদের নির্ম্মিত কোন কোন পণ্যদ্রব্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।

—

ম্যালেরিয়া-বিনাশক সমিতি

গত মাসে আমরা সুখচরে ম্যালেরিয়া-বিনাশক কেন্দ্রীয় সমিতির কাজ কিছু কিছু দেখিতে গিয়াছিলাম। এই অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল অর্থাৎ ম্যালেরিয়া-বিনাশক সমিতির স্থাপনকর্ত্তা ও পরিচালক ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে লইয়া গিয়া সংক্ষেপে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখাইলেন ও বুঝাইয়া দিলেন। ইহার দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইতেছে। অনেক জেলায় বিস্তর গ্রামে ইহার শাখা-সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল জেলার সকল বড় গ্রামে ও ছোট ছোট গ্রামের সমষ্টিতে এক একটি সমিতি হওয়া উচিত।

—

বাস্তুভিটা-সংলগ্ন কৃষির সমিতি

ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ম্যালেরিয়া-বিনাশক সমিতির কার্য্যের সহায়ক-স্বরূপ আরও একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। গৃহস্থের বাস্তুভিটা-সংলগ্ন বা তাহার নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট জমীর টুকরা তরকারী ও ফলমূল উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত যাহাতে গৃহস্থদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, এই সমিতির তাহাই উদ্দেশ্য। উৎপন্ন দ্রব্যজাত গৃহস্থেরা নিজের প্রয়োজনের মত রাখিয়া উদ্বৃত্ত যাহাতে বিক্রী করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা সমিতির দ্বারা হয়।

ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদসাধন করিতে হইলে যাহা যাহা করিতে হয়, গ্রামের এবং গৃহের আশপাশের ঝোপ জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা তাহার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু জঙ্গল পরিষ্কার একবার করিলেই ত হয় না। জমী পড়িয়া থাকিলে আবার তাহাতে জঙ্গল হয়, তাহা আবার কাটিতে হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরিশ্রম ও খরচ হইতে থাকে। কিন্তু জঙ্গল সাফ করিবার পর যদি তাহাতে তরকারী ফলমূলের চাষ করা যায়, তাহা হইলে আর জঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে না, অধিকন্তু তরকারী ফলমূল হইতে লাভ হয়।

ম্যালেরিয়া-নাশের জন্য ডোবা পুকুর প্রভৃতিও পরিষ্কার করা আবশ্যক হয়। তাহাতে মাছের চাষ করিলে ম্যালেরিয়া-নাশের আরও সুবিধা হয়, অধিকন্তু লাভও হয়।

—

কোরান সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংবাদ

বিলাতের স্যর ডেনিসন রস প্রাচ্য দেশসমূহ সম্বন্ধে একজন অথরিটী বা প্রামাণ্য ব্যক্তি বলিয়া বিলাতে পরিচিত। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনের অবজার্ভার নামক খবরের কাগজে লিখিয়াছেন, যে, তুরস্কে তুর্কী ভাষায় কোরানের যে অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে মূল আরবী কোরান মুদ্রিত হয় নাই, এবং কোরানের মূলবিহীন অনুবাদ প্রকাশের ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত, কারণ আলাদা শুধু অনুবাদ প্রকাশ মুসলমানদের মধ্যে অধর্ম্ম বলিয়া এ পর্য্যন্ত বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। উহা অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় কি-না, তাহা মুসলমানেরা বলিতে পারিবেন। কিন্তু মূল না ছাপিয়া শুধু অনুবাদ ছাপার ইহা নিশ্চয়ই প্রথম দৃষ্টান্ত নহে। এরূপ ইংরেজী অনুবাদ ত আছেই, এরূপ বাংলা অনুবাদও আছে—মুসলমানের কৃত এরূপ বাংলা অনুবাদও আছে।

—

ক্যাথেরিন মেয়োর ভারতদর্শনের সহায়ক

প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডলের কথা বলিতে গিয়া, ক্যাথেরিন

20.441

PRIVATE SECRETARY TO THE GOVERNOR · BENGAL ·

GOVERNMENT HOUSE.
CALCUTTA

Immediate.

24th February, 1925.

Dear * * ,

His Excellency has two American ladies staying at Government House who are anxious to study conditions in India and he would like them to see some of the work which is being done in the villages by your organisation. The only time they have got is tomorrow, Thursday, afternoon. Could you kindly let me know by the bearer of this whether you would be able to show them any of the village work being done by one of your societies? If so, where should they go and at what time tomorrow? I should be glad if you could suggest the route by which they should go to the place that you select. If, however, it is inconvenient for you to arrange at such short notice, please let me know and I shall fix up something else.

Yours sincerely,

H. R. Wilkinson.

মেয়ো কিরূপ শ্রেণীর লোকদের সাহায্যে ভারতবর্ষ দেখিয়াছিল মনে পড়িল। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষে যে-কোন আমেরিকান্ বা অন্য বিদেশী পুরুষ বা স্ত্রীলোক আসে সে-ই বড়লাট বা প্রাদেশিক লাটদের প্রাসাদে অতিথি হইতে পারে না; বিশেষ সম্ভ্রান্ত হইলে বা সরকারী উচ্চপদস্থ লোক হইলে, কিংবা জবর রকমের সুপারিশ থাকিলে বিদেশী পুরুষ বা স্ত্রীলোকেরা লাটবেলাটের অতিথি হইতে পারে। ক্যাথেরিন মেয়ো এ রকম কোন

I see with great interest and sympathy this illustration of the true answer to all Indian questions is a proof positive of patriotism

Katherine Mayo

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নহে। ভারতবর্ষের ও ভারতীয়দের কুৎসা করিয়া ভারতীয়দিগকে স্বাধীনতার অযোগ্য বলিয়া পরোক্ষভাবে প্রমাণ করিবার নিমিত্ত "মাদার ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বে, সে ভাড়াটে লেখিকা পুরুষজাতীয় আমেরিকানের সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানটি দেখেন। দর্শকদের বহিতে লিখিত মন্তব্য হইতে দেখা যায় একজন স্ত্রীলোক ক্যাথেরিন মেয়ো, পুরুষটি একজন ডাক্তার। উভয়ের মন্তব্যের প্রতিলিপি দিলাম।

Health work to be really successful must have the support and encouragement of the people. The effort here gives great promise of bringing support to the above principle and is one of the most encouraging I have seen anywhere

Victor G. Heiser

25.2.26.

হিসাবে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপিনোদের সম্বন্ধে ঐ উদ্দেশ্যে ঐরূপ একটা বহি লিখিয়াছিল—তাহার এইমাত্র পরিচয়। অথচ সে কলিকাতায় গবর্ন্মেণ্ট হাউস নামক বাড়িতে লর্ড লিটনের অতিথি ছিল। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ লর্ড লিটনের প্রাইভেট সেক্রেটারীর একখানা চিঠির ফটোগ্রাফিক প্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম। এই চিঠি যাঁহাকে লিখিত হইয়াছিল তাঁহার নাম বাদ দিয়াছি। যেদিন এই চিঠি লিখিত হয়, তাহার পর দিন একটি কোন জায়গা দেখিবার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত সম্বোধিত ব্যক্তিকে অনুরোধ করা হয়। তিনি জানিতেন না, লর্ড লিটনের অতিথিরা কে। পরদিন, চিঠিতে উল্লিখিত আমেরিকান স্ত্রীলোক ও জন একজন

ক্যাথেরিন মেয়ো কি প্রকারে লর্ড লিটনের অতিথি হইতে পারিয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার আমাদের আবশ্যক নাই।

—

তুর্কীভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার

নব্য তুরস্কের রাজধানী আঙ্গোরা হইতে একখানি ইংরেজী কাগজের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে, তুরস্কে সাধারণতন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক বিষয়ের মত ভাষা ও সাহিত্যেরও সংস্কার হইতেছে। ভাষা ও সাহিত্যে বৈদেশিক প্রভাব কমাইবার জন্য গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা চেষ্টা করিতেছেন। তিনি তুর্কী ভাষা ও সাহিত্যে

আরবী ও ফারসীর সংমিশ্রণের বিরোধী। তিনি বার-বার সাহিত্যে আরবী ও ফারসী শব্দ ও শব্দসমষ্টির পরিবর্ত্তে খাঁটি তুর্কী শব্দের ব্যবহারে উৎসাহ দিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার এই ইচ্ছা তুরস্কের বিদ্যালয়-সমূহে কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য তিনি আবশ্যক পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন। তিনি একখানি তুর্কী বিশ্বকোষ প্রণয়ন করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ বিশ্বকোষে এরূপ বিস্তর তুর্কী শব্দ ও শব্দসমষ্টি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আজকাল তুর্ক সংবাদপত্র-সমূহ দেখিলেই লিখিত ভাষায় কামাল পাশার দ্বারা সংসাধিত সংস্কার সুস্পষ্ট বুঝা যায়। আগে সুলতানী আমলে লোকে যে রীতিতে লিখিত, তাহাতে লম্বা লম্বা বাক্য রচনা প্রচলিত ছিল। সেগুলা যেন শেষ হইতে চাহিত না। এখন তাহার পরিবর্ত্তে সহজ ছোট ছোট বাক্য লিখিত হয় এবং তাহাতে খাঁটি তুর্কী শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাহাতে অল্পশিক্ষিত লোকেরাও ঐ সকল লেখা বুঝিতে পারে।

—

লণ্ডনে সঙ্গীতনিপুণা বাঙালী মহিলা

লণ্ডনে কুমারী বীণা আঢ্য নাম্নী খৃষ্টিয়ান বাঙালী মহিলা ভারতীয় গান, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, গাহিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ইউরোপীয় শ্রোতাদের নিকট ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে প্রকাশ্য কন্সার্টে ভারতীয় গান করিয়াছেন। লণ্ডন ও বার্লিনের ষ্টুডিও হইতে তাঁহার গান রেডিও সহযোগে নানাস্থানে শ্রুত হইয়াছিল। লাইপজিগের ফ্রেডরিক কিং এবং এলেনা গেরহার্ট তাঁহাকে গলা সাধিতে শিক্ষা দেন। কাগজে দেখিলাম, তিনি দেশে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্যালয়ের সঙ্গীত-বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিবার এবং ভারতীয় বালিকাদিগকে গলা সাধিবার বিদ্যা শিখাইবার আশা করেন।

—

বয়ঃস্থা গৃহিণীদের জ্ঞানানুরাগ

কাগজে দেখিলাম, মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিত্যরঞ্জন গুপ্তের পত্নী এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি চারিটি সন্তানের মাতা, বয়স ৩২ বৎসর, সমুদয় গৃহকর্ম্ম করিয়া পড়াশুনা করিতেন। তাঁহার বড় মেয়ে আগামী বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন। কুমিল্লার শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তের কনিষ্ঠা বিধবা ভ্রাতৃবধূ ৪০ বৎসর বয়সে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের জ্ঞানানুরাগ প্রশংসনীয়।

ঢাকায় প্রবেশিকায় অসদুপায় অবলম্বন

ঢাকায় যে সেকেণ্ডারী ও ইণ্টারমীডিয়েট শিক্ষা বোর্ড আছে তাহা প্রবেশিকা ও ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষা এবং উচ্চ মাদ্রাসার পরীক্ষা লইয়া থাকেন। এবার ঐ সকল পরীক্ষায় যে সব ছাত্র অসদুপায় অবলম্বন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, বোর্ডের সেক্রেটারীর প্রস্তুত একটি তালিকায় দেখিলাম, নোয়াখালী আহমদিয়া মাদ্রাসার পনের জন মুসলমান ছাত্রের, ভোলার আবদুর মাদ্রাসার দুই জন মুসলমান ছাত্রের, রাধানগর মাদ্রাসার একজন মুসলমান ছাত্রের, ঢাকা ইসলামিক ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের একজন মুসলমান ছাত্রের, চাঁদপুর হুরিয়া মাদ্রাসার এক জন মুসলমান ছাত্রের, করটিয়া রোকিয়া মাদ্রাসার দুই জন মুসলমান ছাত্রের, ঢাকা আরমানীটোলা হাইস্কুলের একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু ছাত্রের এবং ঢাকা ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের একজন হিন্দু ছাত্রের নাম তাহাতে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে নোয়াখালী আহমদিয়া মাদ্রাসার অপকীর্ত্তি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। একটি বিদ্যালয়ে পনের পনের জন ছাত্র পরীক্ষার সময় প্রতারণা করায় বিশেষ সন্দেহ হয়, যে, তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের তাহাতে অবহেলা বা যোগ ছিল। ঢাকা বোর্ডের, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের এবং শিক্ষামন্ত্রীর এই মাদ্রাসা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অপরাধী ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দেওয়া উচিত। অন্য সব স্থলেও অনুসন্ধান ও শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত, কিন্তু অন্য সব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কোন দোষ সম্ভবতঃ ছিল না।

—

"জনশক্তি"র অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য

প্রেস আইনের কবলে পড়িয়া খবরের কাগজের অব্যাহতি পাওয়া প্রায় শুনা যায় না। এবার কিন্তু এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার একটি ঘটিয়াছে। শ্রীহট্টের "জনশক্তি" তিনজন পুলিস দারোগা ও ছয়জন কন্‌ষ্টেবলের দুর্ব্যবহারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করায় ঐ কাগজের এক হাজার টাকা জামীন তলব হয়। "জনশক্তি" এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। হাইকোর্ট এই মত প্রকাশ করিয়া জামীনের আদেশ নাকচ করিয়াছেন, যে, কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারীর ব্যবহার সম্বন্ধে ঐ কাগজে সমালোচনা করা দ্বারা গবর্মেণ্টকে আক্রমণ করা হয় নাই। কিন্তু হাইকোর্ট এই মতও প্রকাশ করিয়াছেন, যে, কোন অবস্থাতেই পুলিসের কাজের উপর প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশকে গবর্মেণ্টের উপর আক্রমণ বলা যায় না, এমন নয়।

বঙ্গের দুরবস্থা

জলপ্লাবনে ও ঝড়ে বঙ্গের অনেক জেলার লোক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়াছে। অনেকের মৃত্যুও হইয়াছে। তাহার উপর, নানাবিধ আইন ও অর্ডিন্যান্সে লোকে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। ওলাউঠা আদি রোগও অনেক জায়গায় হইতেছে। তাহাতেই কি নিষ্কৃতি? কত গ্রামে যে নিত্য কত খুন ও ডাকাতি হইতেছে, তাহার সকল খবর কাগজে বাহির হয় না; কত বালিকা ও নারীর সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহারও সব খবর বাহির হয় না। যাহা বাহির হয়, তাহাতেই ত দেশের চরম দুর্দ্দশা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাটের দর যেরূপ কমিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে ডাকাতি বাড়িবার খুব সম্ভাবনা। ঝড় ও জলপ্লাবন প্রাকৃতিক উৎপাত। তাহার জন্ম কোন মানুষকে দায়ী করা যায় না, যদিও তদ্দ্বারা মানুষের যে দুর্দ্দশা হয়, তাহার কিছু প্রতিকার যাঁহারা বিপন্ন হন নাই তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত। অন্য যে-সব কারণে বঙ্গের দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাতে মানুষের দায়িত্ব আছে। কিন্তু গবর্মেণ্ট রাজনৈতিক অবস্থা লইয়া এত ব্যাপৃত, যে, অন্য কোন বিষয়ে যথোচিত মন দিতেছেন না। সম্পাদকদের প্রধান কাজ দেশহিতকর বিষয়ে লেখা। সে কাজও আমরা ভাল করিয়া করিতে পারিতেছি না। তাহার একটি প্রধান কারণ, প্রেস আইন ও অর্ডিন্যান্স; অন্য প্রধান কারণ, নানা অর্ডিন্যান্স ও তদনুযায়ী নিয়ম এবং তৎসমুদয়ের ফলে জেলের বাহিরে ও ভিতরে মানুষের দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা করিব ও লিখিব, না অন্য কিছু বিষয়ে ভাবিব ও লিখিব?

—

"সাম্রাজ্য দিবসে" প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা

"সাম্রাজ্য দিবসে" প্রধান মন্ত্রী যে-বক্তৃতা করিয়াছেন, রয়টার তাহার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। তাহার একটা প্রধান কথা এই, যে, প্রধান মন্ত্রীর মতে কংগ্রেস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা মীমাংসার পথে ভীষণ বাধা উপস্থিত করিয়াছে। আমরা বলি, ভারতবর্ষকে খাঁটি স্বরাজ না দিলে কোন মীমাংসা হইতে পারে না। কংগ্রেস সেইরূপ স্বরাজ চান। ইংরেজ পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল স্বরাজের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু দিয়া কাজ সারিতে চান। সুতরাং ব্রিটিশ মন্ত্রীরাই আমাদের মতে মীমাংসার পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীরা এক পক্ষ, কংগ্রেস অপর পক্ষ। উভয়ের মধ্যে কে দোষী, অথবা কে কতটা দোষী, তৎসম্বন্ধে কংগ্রেসওয়ালাদের মত যদি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে অপর পক্ষ যে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল তাঁহাদের নেতা প্রধান মন্ত্রীর মতই বা গ্রাহ্য কি প্রকারে হইবে? কোন নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের মত কি, জানা আবশ্যক। আমরা ভারতবর্ষীয় এমন একজন লোককেও জানি না যিনি মনে করেন, যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন না। অথচ স্বরাজ ব্যতিরেকে ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

প্রধান মন্ত্রী নিজের দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছেন, "যে-দেশ নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজের সম্মুখীন হইতে ভয় পায় বলিয়া প্রতিপক্ষের সর্ত্তেই রাজী হইয়া যায়, সেই দেশ জগতের খুব বেশী অহিত করে, এবং তদ্দ্বারা জগতে স্বাধীনতা ও জ্ঞানালোকের শক্তির কার্য্য-কারিতা না বাড়াইয়া বলপ্রয়োগজাত উপদ্রব, শত্রুতা ও মানবসমাজ ভঙ্গের সহায়তা করে;"

("The country which yields because it is afraid to face its tasks does one of the greatest disservices that can be done to the world and lets loose not forces of enlightenment and liberty, but of violence, disruption and enmity.")

মিঃ ম্যাকডন্যাল্ড হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, যে, ভারতবর্ষে অগণিত এরূপ লোক আছে, যাহারাও নিজের দেশ সম্বন্ধে ঠিক এই রকম মনে করে। তাহারা মনে করে, ভারতবর্ষের সম্মুখে যে-কঠোর কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহা করিতে ভয় পাইয়া ভারতবর্ষ যদি বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের পক্ষে সম্পূর্ণ সুবিধাজনক কিন্তু ভারতের পক্ষে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ম দাসখত লিখিয়া দেওয়ার সমান রফার সর্ত্তে রাজী হয়, তাহা হইলে জগতের হিত না হইয়া অহিত হইবে—তাহা হইলে জগতে স্বাধীনতা ও জ্ঞানালোকের কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত না হইয়া বলপ্রয়োগ, শত্রুতা, ও সমাজভঞ্জকর নানা শক্তিই বৃদ্ধি পাইবে।

প্রধান মন্ত্রীর মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নানা জাতির লোক সুখী এই জন্য, যে, তাহারা যে-বাধ্যতা স্বীকার করিয়া আছে তাহা তাহাদের কাঁধের জোয়াল নহে, এবং তাহাতে কোন পরাধীনতা নাই। প্রধান মন্ত্রীর অভিধানে সুখী (happy) জোয়াল (yoke) এবং পরাধীনতা (subordination) কথা তিনটার অর্থ অসাধারণ রকমের।

—

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রবধূ পারস্য ও ইরাক দেশ দেখিয়া নির্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে অন্যান্য ভারতবর্ষীয়দের সহিত আমরাও আনন্দিত হইয়াছি। ঐ দুই দেশ দেখিয়া তাঁহার মনে কি কি চিন্তা ও ভাবের উদয় হইয়াছে, কবির নিকট হইতে তাহা

ক্রমে ক্রমে জানিতে পারা যাইবে। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় গিয়াছিলেন। তাঁহারাও পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট হইতেও অনেক কথা জানা যাইবে।

কবি যে-দুটি দেশে গিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং উভয়ের রাজা দুই জনও মুসলমান। অথচ ঐ দুই দেশের রাজা ও প্রজারা তিনি মুসলমান না-হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। তাহার কারণ দেশ দুটি স্বাধীন, এবং হিন্দুদের সহিত সেখানকার অধিবাসীদের ঐতিহাসিক, কিংবা আধুনিক কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন, কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ঈর্ষ্যা নাই। দুটি মুসলমান দেশের রাজা ও প্রজার কবির প্রতি ব্যবহার হইতে মুসলমান ভারতীয়দের শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। হিন্দুরাও তাহা হইতে উপদেশ পাইতে পারেন।

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় কবির একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। তাঁহার ভ্রমণ-সম্পৃক্ত কয়েকখানি ছবিও আলাদা মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

—

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী নানা বিভাগে বিভক্ত। ইহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শের প্রতি আমরা শ্রদ্ধান্বিত। ইহার কলেজ-বিভাগকে ছাত্রীদের জন্ম বিশেষভাবে উপযোগী করিবার নিমিত্ত অনেক দিন হইতে ইহার প্রতিষ্ঠাতার আগ্রহ আছে। সম্প্রতি সেই দিকে তিনি বেশী মন দিতেছেন। অবশ্য ইহার সকল বিভাগে ছাত্রও লওয়া হইবে। তবে, বাহির হইতে কলেজ-বিভাগের জন্ম যত ছাত্র লওয়া হইবে, তাহারা বিশ্বভারতীর সভ্য কিংবা অন্ত জানাশুনা লোকদের পরিচয়-পত্র অনুসারে নির্ব্বাচিত হইবে।

শান্তিনিকেতনের কলেজে ছাত্রীদের যত প্রকারের শিক্ষার সুবিধা ও অন্ত সুবিধা আছে, বাংলা দেশের অন্ত কোথাও তাহা নাই। অতিরিক্ত কোন বেতন না দিয়া ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্ম শিক্ষণীয় সমুদয় বিষয় ছাড়া সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ, সাধারণ ও আলঙ্কারিক সূচিশিল্প, রন্ধনাদি নানাবিধ গৃহকর্ম্ম, গ্রাম-সমূহের উন্নতি ও পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধীয় জনসেবার কাজ, শুশ্রূষা প্রভৃতি শিখিতে পারে। মানসিক পরিশ্রম যাহারা করে, তাহাদের খেলাধূলার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকা উচিত। শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদের জন্ম প্রশস্ত ময়দানে তাহার সুবন্দোবস্ত আছে। ছাত্রদের খেলার জায়গা আলাদা। মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণও আবশ্যক। শান্তিনিকেতন শহর হইতে দূরে, গ্রামও খুব নিকট নহে; এবং ইহা উচ্চ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। এইজন্ম এখানে ছাত্রীরা প্রকৃতির শোভার মধ্যে মুক্ত বাতাসে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে পারে।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের মত নানা ভাষার ও নানা বিদ্যার মূল্যবান্ বহুসংখ্যক পুস্তকে পূর্ণ গ্রন্থসংগ্রহ বাংলা দেশের অল্প কলেজেই আছে। এইজন্ম ছাত্রছাত্রীদের নিজের চেষ্টায় জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ এখানে খুব আছে। বি-এ পরীক্ষার পর নানা বিষয়ে মৌলিক গবেষণাও উপযুক্ত অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র ও ছাত্রীরা করিতে পারেন। বর্ণপরিচয় হইতে উচ্চশিক্ষা পর্য্যন্ত একই জায়গায় একই প্রতিষ্ঠানে পাইবার বন্দোবস্ত বঙ্গে একমাত্র এখানে আছে।

আজকাল আর্থিক অসচ্ছলতা অনেকেরই হইয়াছে। সেইজন্ম কর্তৃপক্ষ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে, অসচ্ছল অবস্থার যে-সব বালকবালিকা জ্ঞানানুরাগী ও বুদ্ধিমান, তাহাদের অন্ততঃ কয়েক জনের সাহায্যার্থ মাসিক পাঁচ হইতে তিন টাকার কুড়িটি বৃত্তি এই বৎসর হইতে দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিদ্যালয় ২৩শে জুন খুলিবে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী রূপে বা অন্তত্র থাকিয়াও যাঁহারা শান্তিনিকেতনের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার কাজ করিলে ইহার কাজ বরাবর ভালরকম চলিতে পারে। এই বৎসর ইহার অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন সেন, এম্-এ, পিএইচ-ডি (লণ্ডন), বিদ্যালয়ের কাজে বিশেষ ভাবে মন দিবেন। বিশ্বভারতীর ১৯৩১ সালের রিপোর্টে (পৃষ্ঠা ১৫) লিখিত হইয়াছে,

> "Miss Asha Adhikari and her sister Miss Bhakti Adhikari also left in the middle of July last. Their services cannot be adequately acknowledged; they left a gap which has not been filled up."

শ্রীমতী আশা অধিকারী বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি এক বৎসরের ছুটি লইয়া শান্তিনিকেতনে অবৈতনিক কাজ করিয়াছিলেন। তাহাতে শান্তিনিকেতনের যে উপকার হইয়াছিল তাহা রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত কথাগুলি পড়িলে বুঝা যায়। এ বৎসর তিনি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদটি ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। ইহাতে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি, কিন্তু শান্তিনিকেতনের লাভ হইল। তিনি নারী-বিভাগের এবং বিদ্যালয়ের শিশু-বিভাগের কাজ বিশেষ করিয়া করিবেন। বিশ্বভারতীর প্রবীণ ও

অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের এবং নূতন যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের সম্মিলিত যত্নে ইহার কাজ উত্তমরূপে চলিতে থাকিবে।

গত ৩০শে নবেম্বর বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৬৭। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, ইহার মধ্যে ৫৮ জন অবাঙালী, বেশীর ভাগ গুজরাটি।

কলাভবন ও শ্রীনিকেতনের বিষয় পরে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

—

বিশ্বভারতীতে অর্থসাহায্য

বিশ্বভারতীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পত্তি হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যাহা পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্থাপনের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা দিয়াছেন, তাহা বাদ দিলে এই বিদ্যাপীঠে বাঙালীরা অল্পই সাহায্য করিয়াছেন, অন্য লোকেরাই বেশী দিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কোন মানুষের ও প্রতিষ্ঠানের খুঁত ধরাও তাহার উপকার করিবার একটা উপায় বটে, কিন্তু খুঁত ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি সমালোচকেরা খুঁতটা সারিবার সাহায্যও করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের হিতৈষিতা প্রমাণিত হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে এইরূপ সহায়ক অপেক্ষা রবিবাবুর ও বিশ্বভারতীর কেবল খুঁত ও ত্রুটির আবিষ্কারকের সংখ্যাই বেশী। সেরূপ খুঁত ও ত্রুটি অবশ্যই আছে। কোথাও রবীন্দ্রনাথের সম্মান ও প্রশংসা হইলে, তিনি বাঙালী এবং আমরাও বাঙালী বলিয়া আমরা তাহাতে ভাগ বসাই, কিন্তু তাঁহার কাজে সহযোগিতা করি না।

পুনা ও বোম্বাইয়ে যে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (Indian Women's University) আছে, তাহা একটি অপেক্ষাকৃত ছোট প্রতিষ্ঠান। তাহাতে স্বর্গীয় স্যর বিঠলদাস দামোদর ঠাকরসী শতকরা ৩।০ সুদের ১৫ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন। শ্রীযুক্ত গাডগিল ১০ বৎসর ধরিয়া বার্ষিক এক হাজার টাকা দেন। পূর্ব্ব-আফ্রিকা প্রবাসী ডাঃ বিঠল রাঘোবা লাণ্ডে তাঁহার ৬০,০০০ টাকার সম্পত্তি উইল দ্বারা ইহাকে দিয়া যান। বোম্বাইয়ের শেঠ মূলরাজ খাটাও ৩৫,০০০্ দেন। ৭৫ জন প্রত্যেকে এককালীন ১,০০০ হইতে ৮,০০০ টাকা দিয়া ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। ৩২৫ জন প্রত্যেকে ২০০ হইতে ৭০০ টাকা দিয়াছেন। প্রায় ৫০০ জন প্রত্যেকে ১৫০ বা তদূর্দ্ধ টাকা দিয়াছেন। প্রায় ৫০০ জন বার্ষিক দশ টাকা এবং প্রায় ১৩০০ জন বার্ষিক পাঁচ টাকা চাঁদা দেন। তদ্ভিন্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া জমা করিয়াছেন। দাতারা প্রায় সকলেই গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয়। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক কার্ভে ৭৫ বৎসর বয়সে সম্প্রতি পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতে ৩০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয়দের দানশীলতা বাঙালীদের অনুকরণীয়।

—

শান্তিনিকেতনে উপনিবেশ স্থাপন

বিশ্বভারতী অনেক জমী কিনিয়াছেন। তাহার কিয়দংশে কর্তৃপক্ষ পল্লী পত্তন করিতে চান। পল্লীটির নাম হইবে শান্তিনিবাস। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। অতি নিকটেই বর্ণপরিচয় হইতে পোষ্টগ্রাজুয়েট পর্য্যন্ত শিক্ষার আয়োজন থাকায়, যাঁহারা নিজের বাড়িতে সন্তানদিগকে রাখিয়া জ্ঞানী লোকদের প্রভাবের ও শিক্ষার অধীন করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। আপাততঃ একত্রিশটি ভিটা বিলি করা হইবে। আটটি ভিটার প্রত্যেকটি তিন বিঘা পরিমিত, কুড়িটি ভিটা দুই বিঘা করিয়া এবং তিনটি চারি বিঘা করিয়া। যাঁহারা জমী লইতে চান, তাঁহারা নক্সা, মূল্য ও সর্ত্তাদি সমেত দলিলের খসড়ার জন্য শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সাধারণ সেক্রেটারীকে চিঠি লিখিতে পারেন।

শান্তিনিকেতন পল্লীতে বিশ্বভারতীর সমুদয় প্রতিষ্ঠান যেরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে, উৎকৃষ্ট অবস্থায় সেগুলির স্থায়িত্বের উপর এই পল্লীপত্তনের সঙ্কল্পের সাফল্য নির্ভর করে, এবং পল্লীপত্তন কার্য্যতঃ হইয়া গেলে তাহার দ্বারাও বিশ্বভারতীর স্থায়িত্বের সাহায্য হইবে। ইহা মনে রাখিয়া কর্তৃপক্ষকে কাজ করিতে হইবে।

—

একজন ডেটেম্যুর শোচনীয় মৃত্যু

দেওলী জেলে যে-সকল বাঙালী ডেটেন্যুকে পাঠান হইয়াছে, তাহার মধ্যে মৃণালকান্তি রায় চৌধুরী নামক একটি যুবক গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। মানুষের মৃত্যু বার্দ্ধক্যে, রোগে, বজ্রাঘাতাদি আকস্মিক কারণে, অপর কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হওয়ায়, এবং আত্মহত্যায় হইয়া থাকে। এই যুবকটির মৃত্যু আত্মহত্যাজনিত বলিয়া জেলের কর্তৃপক্ষ খবর দিয়াছেন। সেই সংবাদের যাথার্থ্য ও নির্ভর-যোগ্যতা ভাল করিয়া পরীক্ষিত হয় নাই। কর্তৃপক্ষের মতে তাহার যক্ষারোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ ইহাও বলিয়াছেন, যে, অন্য ডেটেন্যুরা তাহাকে সরকারী গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে, তাহার এই আশঙ্কা থাকায় সে জেলের বাহিরে স্বতন্ত্র থাকিতে চায়, এবং সেইজন্য তাহাকে আলাদা রাখা হইত। সে বড় বিষণ্ণ থাকিত। যক্ষার সূত্রপাতের জন্য তাহাকে আলাদা রাখা হইত, না তাহার উক্ত আশঙ্কার জন্ত আলাদা রাখা হইত? তাহার মৃত্যুর পর অন্ত ডেটেন্যুরা তাহার শব কলিকাতায় লইয়া যাইবার ও সেখানে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা চাহিয়াছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত হরবিলাস শারদা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে টেলিগ্রাফ করেন। অন্ত ডেটেন্যুরা যদি তাহাকে গোয়েন্দা মনে করিবে, তাহা হইলে তাহার যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টি-সৎকারের জন্ত তাহাদের আগ্রহ কেন হইল? সরকারী কম্যুনিকেতে আছে, যে, মৃত্যুর দিনের পূর্ব্বের রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইয়াছিল, সকালে তাহাকে বেশ প্রকৃতিস্থ দেখা গিয়াছিল, বেলা ২॥০টার সময়ও তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ("quite well") দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার দু-ঘণ্টা পরেই ৪॥০ টার সময় দেখা গেল যে তাহার ঘরের জানালা হইতে ঝুলিতেছে। সরকারী কম্যুনিকেতে আছে, একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা এই অপমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান হয় এবং তিনি রায় দেন, যে, মৃত যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে এবং তাহার ঘাড় ভাঙিয়া যাওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটটি কে তাহা লেখা নাই, তিনি সাক্ষ্য সাবুদ কি লইয়াছিলেন লেখা নাই, কোন যোগ্য ডাক্তার শবব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন কি না লেখা নাই, মৃত ব্যক্তি দড়ি বা অন্ত কি দিয়া উদ্বন্ধন করিয়াছিল লেখা নাই, এবং দড়ি বা অন্ত জিনিষ কোথায় পাইল, লেখা নাই। ডেটেন্যুরা গবর্মেণ্টের গভীর সন্দেহভাজন লোক বলিয়া সকলেই কড়া পাহারায় থাকে। মৃণালকান্তিকে জেলের বাহিরে রাখায় তাহার উপর আরও কড়া পাহারা থাকিবার কথা। সুতরাং সে দিনের বেলা ৪॥০ টার আগে আত্মহত্যা করিল, অথচ কেহ তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাতে বাধা দিল না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, সে আত্মহত্যাই করিয়াছে এবং তাহার মনে পূর্ব্বোল্লিখিত আশঙ্কা ছিল, তাহা হইলে অন্ত ডেটেন্যুদের, তাহার শব কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হউক এই আগ্রহে, ঐ আশঙ্কা অমূলক, কল্পিত এবং তাহার মস্তিষ্কবিকারজনিত বলিয়াই মনে হয়। যখন ডেটেন্যুদিগকে বঙ্গের বাহিরে চালান করিবার আইন ব্যবস্থাপক সভায় বিবেচিত হইতেছিল, তখন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বলেন, যে, "আমি এই ব্যবস্থাপক সভাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহারা এই বিলটি পাস করিলে তাঁহারা ডেটেন্যুদের সমাধিখনন করিবেন" ("by passing this Bill, I can assure the House, that they will be digging the grave of the political detenus")। তিনি আরও বলেন, যে, অনেক ডেটেন্যুর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে, এবং কি প্রকারে ও কেন ঘটে তাহাও বলেন। তাঁহার এই সব কথা যে অমূলক নহে, তাহার দুঃখকর প্রমাণ পাওয়া গেল।

মৃণালকান্তির শব কলিকাতায় পাঠাইবার কি বাধা ছিল, জানি না। যাহা হউক, আজমীর প্রদেশের জেলসমূহের ইন্স্পেক্টার-জেনারেল তাহাতে সম্মত হন নাই। কিন্তু তাড়াতাড়ি শবটি পুড়াইয়া ফেলা হইল কেন? যুবকের আত্মীয়-স্বজনদের দেওলী পৌঁছা পর্য্যন্ত কি কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা রাখা যাইত না? এমন ত মনে হয় না।

প্রবেশিকার সংস্কার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের ও পরীক্ষার সংস্কারের জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। এই কমিটি রিপোর্ট দিয়াছেন। সেনেট তাঁহাদের রিপোর্ট গ্রহণ করিলে ১৯৩৭ সাল হইতে সংশোধিত নিয়মাবলী অনুসারে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

কমিটি যে বলিয়াছেন, ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয়ের পরীক্ষা দেশী ভাষার মধ্য দিয়া করিতে হইবে, ইহা আমরা ঠিক্ মনে করি। প্রবেশিকা পর্য্যন্ত সব বিষয় বাংলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশী ভাষার সাহায্যে শিখান মোটেই কঠিন নয়। সব বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকও সহজেই রচিত হইতে পারে। উচ্চতর পরীক্ষাও পরে দেশী ভাষার সাহায্যে গৃহীত হওয়া উচিত।

মোটামুটি পাঁচ কোটি বাঙালী বাংলা বলে। বাঙালীদের সাহিত্য নিতান্ত অনুন্নত নয়। সংস্কৃতের সাহায্যে ইহার প্রয়োজনীয় পারিভাষিক শব্দও রচিত হইতেছে ও হইতে পারে। এই জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত বাংলা চলা উচিত। ইউরোপে অনেক দেশ আছে, যাহাদের লোকসংখ্যা বাংলার চেয়ে কম। অথচ তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষাও তাহাদের ভাষায় দেওয়া হয়। সব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেশী ভাষায় না দিলে কখনও বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে না—যদিও কাব্য উপন্যাসাদির সমৃদ্ধি হইতে পারে। সর্ব্ববিধ জ্ঞান বাংলার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদিগকে দিলে ঐ জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজে বিস্তার লাভ করিবে।

ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়বিশিষ্ট নিজস্বভাষাশালী কত দেশের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে কম, তাহার একটি তালিকা নীচে দিতেছি। তুলনার জন্ত বঙ্গের লোকসংখ্যাও দিতেছি।

দেশ	লোকসংখ্যা
বাংলা দেশ	৫,০১,২২,৫৫০
ডেন্মার্ক	৩৫,০০,০০০
ফ্রান্স	৪,০০,০০,০০০
গ্রীস্	৭০,০০,০০০
হাঙ্গেরী	৮০,০০,০০০
ইটালী	৪,২০,০০,০০০
হল্যাণ্ড	৭৫,২৭,০০০
নরওয়ে	২৭,৮৯,০০০
পোল্যাণ্ড	২,৭০,০০,০০০
পোর্টুগ্যাল	৬৪,০০,০০০
স্পেন	২,১৭,৬৩,০০০
সুইডেন	৬০,৭৪,০০০

এই সকল দেশে ইহাদের নিজেদের ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া হয়।

কমিটি ছাত্রীদের জন্ত বিশেষ ভাবে যে-সকল বিষয় শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও উত্তম হইয়াছে। ছাত্রদের মত ছাত্রীরাও মানুষ। এইজন্য ছাত্রছাত্রী উভয়ের কতকগুলি সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তা ছাড়া ছাত্রীদিগকে গার্হস্থ্য জীবনের উপযুক্ত করিবার জন্ত এবং তাহাদের সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্যবোধ বিকশিত ও বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি বিষয় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে কমিটির প্রস্তাব সমীচীন হইয়াছে। কমিটি ইংরেজী শিখাইবার জন্ত যথোযোগ্য ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। ইউরোপের জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশে কোন কোন ছাত্র ইস্কুলে সপ্তাহে অল্প কয়েক ঘণ্টা ইংরেজী পড়ে, অন্ত সব বিষয় নিজেদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা করে। অথচ ঐ সব দেশের যাহারা ভারতবর্ষে অধ্যাপক, প্রত্নতাত্ত্বিক, বা অন্তবিধ বিশেষজ্ঞের কাজ লইয়া আসে, তাহারা এদেশে ইংরেজীতে নিজেদের কাজ বেশ চালায়। তাহার কারণ ইউরোপে ভাষা শিখাইবার প্রণালী উৎকৃষ্ট। আমাদের দেশেও উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে ইংরেজী শিখাইলে আমাদের ছেলেমেয়েরা অন্ত সব বিষয় বাংলায় শিখিলেও তাহাদের ইংরেজীর জ্ঞান মন্দ হইবে না।

মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞান অর্জ্জন করা সহজ এবং

অপেক্ষাকৃত অল্পসময়সাপেক্ষ। আমরা সাড়ে দশ বৎসর বয়সে বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিবার সময় ইংরেজী ইস্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্রদের সমান পাটীগণিত, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং জ্যামিতি জানিতাম। তদ্ভিন্ন (তাহারা তখন যাহা জানিত না সেই) পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, এবং পুরাবৃত্তসার অর্থাৎ প্রাচীন মিশর ফিনিসিয়া আসীরিয়া বাবিলোনিয়া প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতাম।

কমিটি পাঠ্যতালিকা হইতে সংস্কৃত বাদ না দিয়া ভাল করিয়াছেন। বিজ্ঞানেরও স্থান করিয়াছেন।

—

টেরারিষ্ট দমনের নূতন নিয়মাবলী

গবর্মেণ্ট টেরারিষ্ট দমন করিবার জন্য কতকগুলি নূতন নিয়ম জারি করিয়াছেন। তাহাতে টেরারিষ্ট দমন হইবে কি-না জানি না, কিন্তু যাহাদের কাছে টেরারিষ্টের ট-ও অজ্ঞাত, এরূপ বিস্তর লোকের খুব অসুবিধা হইবে, তাহাদের উপর অত্যাচারও হইবার সম্ভাবনা আছে। নিয়মগুলি পাঠকেরা খবরের কাগজে দেখিয়া থাকিবেন।

—

পাঠান ও ভারতীয়

গত মে মাসে যখন বিলাতী পার্লেমেণ্টের হাউস্ অব্ কমন্সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হয়, তখন উইং-কম্যাণ্ডার পদবী বিশিষ্ট জেম্স্ নামক একজন সভ্য তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলেন—

"Above all this must always be remembered in connection with the Frontier and the Pathans that the Pathans are not Indians. If you want to insult a Pathan you call him an Indian. He despises and dislikes the Indians. For a present purpose, he may combine with certain Indian factions, but that is bound to be a passing phase."

"উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ও পাঠানদের সম্পর্কে সর্ব্বোপরি এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে, পাঠানরা ভারতবর্ষীয় নহে। যদি আপনি কোন পাঠানকে অপমান করিতে চান, তাহা হইলে তাহাকে ভারতীয় বলিবেন। সে ভারতীয়দিগকে না-পছন্দ ও অবজ্ঞা করে। বর্ত্তমান কোন প্রয়োজনে সে কোন কোন ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারে বটে, কিন্তু সেটা অল্পকালস্থায়ী ব্যাপার।"

যদি পাঠানরা ভারতবর্ষীয় না-ই হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের রাজস্বের কোটি কোটি টাকা উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের কাজ চালাইবার জন্য সেখানে ব্যয় করা কেন হয়? উহাকে যে গবর্ণর-শাসিত নূতন প্রদেশে পরিণত করা হইয়াছে, তাহা চালাইবার জন্য বৎসরে ভারতীয়দের দেওয়া কোটি পরিমাণ টাকা ব্যয়িত হইবে। তাহারা ভারতীয় না-হইলে ইহার ন্যায্যতা কোথায়?

সকল পাঠান যে সকল ভারতীয়কে অবজ্ঞা করে না, তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রেস আইনের বর্ত্তমান ব্যাপকতা ও অনিশ্চিততা হেতু সে চেষ্টা করিব না। কেবল একটা কথা বলি। স্বর্গীয় মেজর বামনদাস বসু যখন আফগানিস্থান সীমান্তে কাজ করিতেন তখন কোনও রক্ষী না লইয়া পাঠান গ্রামসমূহে যাইতেন এবং পাঠানদের বাড়িতে বসিয়া গল্পগুজব করিতেন। পাঠানরা তাঁহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। তাহারা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিল, যে, তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই। তিনি পাঠানদের ভাষা পশ্‌তু উত্তমরূপে বলিতে পারিতেন। আমরা তাঁহাকে এলাহাবাদে তাঁহার এক পাঠান বন্ধুর সহিত পশ্‌তু ভাষায় গল্প করিতে দেখিয়াছি।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



মন্দিরের পথে
(দীপময় ভারতে)
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩৯

৪র্থ সংখ্যা

স্পাই

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শক্ত হ'ল রোগ
হপ্তা-পাঁচেক ছিল আমার ভোগ।
একটুকু যেই সুস্থ হলেম পরে
লোক ধরে না ঘরে,
ব্যামোর চেয়ে অনেক বেশি ঘটাল দুর্য্যোগ।
এল ভবেশ, এল পালিত, এল বন্ধু ঈশান,
এল-পোলিটিশান,
এল গোকুল সংবাদপত্রের,
খবর রাখে সকল পাড়ার নাড়ী নক্ষত্রের।
কেউবা বলে বদল কর হাওয়া,
কেউবা বলে ভাল ক'রে করবে খাওয়া দাওয়া।
কেউবা বলে, মহেন্দ্র ডাক্তার
এই ব্যামোতে তার মত কেউ ওস্তাদ নেই আর
দেয়াল ঘেঁষে ঐ যে সবার পাছে
সতীশ বসে আছে।
থাকে সে এই পাড়ায়,
চুলগুলো তার ঊর্দ্ধে তোলা পাঁচ আঙুলের নাড়ায়।
চোখে চষমা আঁটা,
এক কোণে তার ফেটে গেছে বাঁয়ের পরকলাটা।
গলার বোতাম খোলা,
প্রশান্ত তার চাউনি ভাবে ভোলা।

সর্ব্বদা তার হাতে থাকে বাঁধানো এক খাতা,
হঠাৎ খুলে পাতা
লুকিয়ে লুকিয়ে কি যে লেখে, হয়ত বা সে কবি
কিম্বা আঁকে ছবি।
নবীন আমায় শোনায় কানে কানে,
ঐ ছেলেটার গোপন খবর নিশ্চিত সে-ই জানে—
যাকে বলে 'স্পাই'
সন্দেহ তার নাই।
আমি বলি, হবেও বা, ভক্তি নম্র নিরীহ ঐ মুখে
খাতার কোণে রিপোর্ট করার খোরাক নিচ্চে টুকে।
ও মানুষটা সত্যি যদি তেম্নি হেয় হয়,
ঘৃণা করব,—কেন করব ভয়।

এই বছরে বছরখানেক বেড়িয়ে নিলেম পাঞ্জাবে কাশ্মীরে।
এলেম যখন ফিরে;
এল গণেশ, পল্টু এল, এল নবীন পাল,
এল মাখনলাল।
হাতে একটা মোড়ক নিয়ে প্রণাম করলে পাঁচু,
মুখটা কাঁচু মাচু।
'মনিব কোথায়', শুধাই আমি তারে
'সতীশ কোথায় হাঁ রে?'
নবীন বললে, 'খবর পান নি তবে,
দিন পনেরো হবে—
উপোস ক'রে মারা গেল সোনার টুক্‌রো ছেলে
নন্‌-ভায়োলেন্‌স্‌ প্রচার ক'রে গেল যখন আলিপুরের জেলে।'
পাঁচু আমার হাতে দিল খাতা,
খুলে দেখি পাতার পরে পাতা—
দেশের কথা কি বলেচি তাই লিখেচে গভীর অনুরাগে,
পাঠিয়ে দিল জেলে যাবার আগে।
আজকে বসে বসে ভাবি, মুখের কথাগুলো
ঝরা পাতার মতই তারা ধুলোয় হ'ত ধুলো।
সেইগুলোকে সত্য ক'রে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে কি এ
মৃত্যু-সুধার নিত্য পরশ দিয়ে॥

পত্রধারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

আমি চিঠি লিখতে ত্রুটি করিনে, কিন্তু আনমনা মানুষ, উত্তর দিতে ভুলে যাই। আজ আরম্ভেই প্রশ্ন ক-টির জবাব দেব।

একটা কথা মনে রেখো, গল্প ফটোগ্রাফ নয়। যা দেখেছি যা জেনেছি তা যতক্ষণ না মরে গিয়ে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে গিয়ে পাঁচটায় মিলে পঞ্চত্ব পায় ততক্ষণ গল্পে তাদের স্থান হয় না।

(১) গোরা ও নৌকাডুবির কল্পনা, সম্পূর্ণই আমার মাথার থেকে বেরিয়েচে। এমন ঘটনা ঘটেচে ব'লে জানিনে কিন্তু ঘটলে কি হ'তে পারত সেইটে ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখেচি।

(২) দালিয়া গল্পটায় ইতিহাস যে-টুকু আছে সে আছে গল্পের বহিঃপ্রাঙ্গণে—অর্থাৎ গাছে চড়িয়ে দিয়ে মই নিয়েচে ছুটি। আসল গল্পটা ষোল আনাই গল্প।

(৩) কেশরলালের গল্পটা পেয়েছি মগজ থেকে। চতুর্ম্মুখের মগজ আছে কি না জানিনে কিন্তু তিনি কিছু-না থেকে কিছুকে যে-ভাবে গড়ে তোলেন এও তাই। অনেক কাল পূর্ব্বে একবার যখন দার্জ্জিলিঙে গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের মহারাণী। তিনি আমাকে গল্প বলতে কেবলই জেদ করতেন। তাঁর সঙ্গে দার্জ্জিলিঙের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে মুখে মুখে এই গল্পটা বলেছিলুম। মাষ্টার মশায় গল্পের ভূতুড়ে ভূমিকা অংশটা এবং মণিহারা গল্পটিও এমনি ক'রে তাঁরই তাগিদে মুখে মুখে রচিত।

(৪) ক্ষুধিত পাষাণের কল্পনাও কল্পলোক থেকে আমদানি।

(৫) বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় কিছু বদল করেচি। বোষ্টমী গুরুকে যে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়—সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।

(৬) কাবুলিওয়ালা বাস্তব ঘটনা নয়। মিনি কিছু পরিমাণে আমার বড় মেয়ের আদর্শে রচিত।

(৭) বিদেশের উপাদান ধার নিয়ে নিয়ে আমি কখনও কিছু লিখিনি।

নরদেবতা সম্বন্ধে ভাবের দিক থেকে তুমি যে-কথা সুন্দর ক'রে বলেচ সে মেনে নিতে আমার বাধে না। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে যেখানে তাকে জড়িত কর, সেখানে দেখতে পাই তোমাদের ব্যক্তিগত অভ্যাস। সেখানে সকল দেশের সব মানুষ মিলতে পারে না। তোমাদের পূজাবেদীর দেবত্ব স্বীকার করা সহজ, কিন্তু দেবকাহিনী অত্যন্ত বেশী প্রাদেশিক, তার বিচিত্র আবরণ মূল ভাবকে বাধা দেয়। যেমন তোমার হাঁফানির ওষুধের কথা। শিকড়টা মানতে পারি যদি প্রমাণ পাই। কিন্তু ১৭ বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানসহ সেটা তুলে আনলে তবেই তার শক্তি জাগবে এ কথা মানতে গেলে নিজের বিধিদত্ত বুদ্ধির 'পরে অবিচার করা হয়। তত্ত্বটা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা দেশকালপাত্র-নির্ব্বিচারেই সত্য। কিন্তু তার আনুষঙ্গিক বিবরণ জনশ্রুতিমাত্র, এবং সে জনশ্রুতিও বিচারবুদ্ধিসমর্থিত জনশ্রুতি যদি না হয় এবং তাতে যদি এমন কিছু থাকে যা আমাদের অপ্রমত্ত চিত্তের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে তা হ'লে দশজন বলে বলেই তাকে স্বীকার ক'রে নিতে পারব না। যে-দেশে অনেক কথাই এই রকম দশজন-বলার অনুবৃত্তিরূপে স্বীকার ক'রে নেওয়াই মানুষের অভ্যস্ত সে দেশের দুর্গতি কখনই কাটে না। অযৌক্তিক কথাকে সন্দেহ করতেই হবে, তার পরেও যদি সেটা সপ্রমাণ হয় তা হ'লে কথা নেই। আমি নরদেবতাকে বিশ্বাস করি ভগবদ্গীতার কৃষ্ণের মধ্যে। সে কৃষ্ণও মর্ত্ত্য মানবের ঘরের লোক। বৃন্দাবনকে যদি বল আনন্দ-ধামের রূপক তা হ'লে কোনো কথা নেই, যদি বৃন্দাবনকে

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বল, তা হ'লে প্রমাণ দাবি করব, শাস্ত্রবাক্য মাত্রকেই শিরোধার্য্য করব না। তোমার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। যখন ব্যাখ্যা কর তখন তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর, যখন ব্যবহার কর তখন সংস্কারকে চোখ বুজে মেনে নাও। এ পথে আমি যেতে পারি নে। অথচ তোমার আশ্রয় থেকে তোমার মুগ্ধ মনকে নড়াতে ইচ্ছা যায় না। যেখানে তোমার আনন্দ সেখানে তুমি মজ্জিত হয়ে থাক তাতে দোষ নেই। তার বদলে তোমাকে কিছু দিতে পারি, এমন শক্তি আমার কোথায়। আমার প্রয়োজন পূর্ণ হয় তত্ত্বকে যখন সত্য ব'লে অন্তরে উপলব্ধি করি;—বাইরেকার কল্পিতরূপে তাকে বন্দী ক'রে অতি বিশেষ ক'রে দেখতে গেলে আমার চিত্ত নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করে, সে রকম আত্মবঞ্চনায় আমার কোনোদিন প্রয়োজন বোধ হয় না। যদি বল এ তো আত্মবঞ্চনা নয়, এ বাস্তব সত্য, তা হলেই কথা ওঠে বাস্তব সত্যকে বিশ্বাসের জন্ত যৌক্তিক প্রমাণ না হ'লে নয়। ইতিহাস শ্রদ্ধালাভ করে একমাত্র ঐতিহাসিক বিচারের পরে। কিন্তু তোমাকে এ সব কথা বলতে গেলে আমার ব্যথা লাগে। যে বিশ্বাস তোমার প্রেমের মধ্যে রক্ষিত, তাকে আঘাত করা তোমাকেই আঘাত দেওয়া। কি হবে এমন পীড়ন ক'রে?

তোমাদের সম্প্রদায়ে যে-ব্যবহারটাকে আমার অন্যায় ব'লে মনে হয় সে-সম্বন্ধে আপত্তি না ক'রে থাকতে পারিনে। তোমার চিত্তকে বুদ্ধির ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা না দেওয়া মানব-অধিকারকে পীড়ন করা, সুতরাং সেটা বস্তুত অধার্ম্মিকতা। আমার মুখের থেকে আমার কথা শুনলে যদি সেটাকে কোন সম্প্রদায় অপরাধ ব'লে গণ্য করে তবে সে সম্প্রদায়ের অন্তরে সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ নিহিত আছে। মানুষের চিত্তকে খাঁচায় বাঁধবার ধর্ম্ম যতই ভাবৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হোক, তবু সে সোনার খাঁচার বাইরে এগোবে না। সেই সোনার খাঁচাই তার স্বর্গের আদর্শ। কিছু মনে ক'রো না তুমি, মানুষের বিরুদ্ধে ধর্ম্মগত কর্ম্মগত ভাবগত কোনো অত্যাচার আমি সইতে পারিনে। ইতি

বৃহস্পতিবার
৭ই আশ্বিন, ১৩৩৮

২

শেষ চিঠিতে তোমাকে কি লিখেছিলুম মনে নেই, কিন্তু তোমার চিঠি থেকে বোধ হ'ল তোমাকে ক্ষুব্ধ করেচে। তুমি নিশ্চয় জেনো তোমাকে কোনো বিশেষ পথে প্রবর্ত্তন করবার জন্তে আমার মনে একটুও তাগিদ নেই। আমি অনুভব করি, আমি কথা কই এইটেই আমার স্বধর্ম্ম। তোমার চিঠিতে আমি কথা কয়ে গেছি সেটা শুনিয়েচে অনুশাসনের মত। কিন্তু প্রকাশ করা যদিও আমার স্বভাবসঙ্গত, প্রচার করা একেবারেই নয়। যে উপলব্ধিতে তুমি গভীর আনন্দ পেয়েচ সে তোমার আপনারই জিনিষ। ধার-করা জিনিষ নিয়ে তোমার চলবে না, এমন কি সে যদি দামী জিনিষ হয় তবুও না। প্রচার করতে যাদের অত্যন্ত উৎসাহ তারা এই কথাটা বুঝতে পারে না, এই জন্তে তারা সংসারে কেবলই বাহ্যিকতার আবর্জ্জনা জমায়। সত্য অন্তরের হ'লে তবেই খাঁটি হয় তবেই তাতে শান্তি তাতে স্বাস্থ্য তাতে সৌন্দর্য্য তাতে আনন্দ, অন্ন পাকযন্ত্রে এসে তবেই প্রাণের সামগ্রী হয়ে পড়ে। যারা প্রচারে উৎসাহী তারা কোনো মতে ভিতরের জিনিষকে বাইরে চাপিয়ে দিয়ে খুশী হয়—এইজন্তে তারা দল গড়ে তোলে, মন গড়ে তোলে না। যারা স্বভাবতই দলচর লোক তারাও দলের চাপরাস প'রে সগর্ব্বে খুশী হয়ে বেড়ায়। দলের অত্যাচার সকল ধর্ম্মসমাজেই। কেন-না, অধিকাংশ লোকেরই অন্তরের আবরণ শেষ পর্য্যন্ত খোলে না। এই কারণে তারা বাইরের দিক থেকে চালিত হবার ঔৎসুক্যে বাহ্যিকতাকেই চিরদিনের মত আঁকড়ে ধরে এবং তারাই এই বাহ্যিকতার জবরদস্তি নিয়ে অন্তের উপর অত্যাচার করতে ছাড়ে না। ধর্ম্মের নামে যত উন্মত্ততা যত রক্তপাত সে তো এই বাহ্যিককে নিয়েই। ধর্ম্মের অভিমান এই নিয়েই, মূঢ়তা এইখানে।

তোমার চিঠি পড়ে এ কথা বুঝি যে একটি আন্তরিক উপলব্ধি সোনার কাঠির মত তোমার চিত্তকে

জাগিয়েছে। সব সময়েই তার স্পর্শ পাও বা না-পাও একবার পেলেই তার সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। এর উপরে বাইরে থেকে তর্ক একেবারেই মিথ্যে। তুমি প্রদীপ দেখেচ কি না তা নিয়ে নানা সাক্ষীসাবুদ জুটিয়ে তোমার সঙ্গে বচসা করা চলে কিন্তু যখন তুমি বল আমি আলো দেখলুম তখন সেই আলোর সাক্ষী তুমি নিজেই। সেই আলো আমিও যদি দেখে থাকি তা হ'লে তোমার সঙ্গে প্রদীপের ঝগড়াটা থামিয়ে দেওয়াই ভাল, কেন-না সেটা সামান্ত কথা।

একটা জায়গায় আমাকে তুমি সম্পূর্ণ বোঝনি। বার-বার আশঙ্কা প্রকাশ করেচ পাছে আমার কথা মানতে পারচ না ব'লে আমি তোমার উপর রাগ করি। আমার এই আশ্রমেও ষ্টিমরোলার চালিয়ে মতভেদের পার্থক্যকে গুঁড়িয়ে একাকার ক'রে দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নিজের কথা তুমি যা বল তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, তাতে আমি আনন্দও পাই, কিন্তু তাই ব'লে সবসুদ্ধ তাকে গ্রহণ করতে গেলে আমার পক্ষে সেটা একেবারেই বেমানান হবে। বাহিরের জিনিষ সীমাবদ্ধ, তোমার সীমায় আমার সীমায় মিল হতেই পারে না—অন্তরের জিনিষ সীমার অতীত, সেখানে মিলতে কোথাও বাধা নেই। ইতি

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৮

৩

যে-কোনো দিকেই মানবচিত্তের উৎকর্ষ, জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে, সবদিকেই আমাদের মন্দিরের দ্বার; সব দিক দিয়েই আমাদের অর্ঘ্য পৌঁছিয়ে দিতে হবে, নইলে আমাদের মানবাত্মার যিনি অধীশ্বর তাঁকে বঞ্চিত করা হবে—সুতরাং সেই সাধনার সঙ্কীর্ণতায় নিজেরাই দুর্গতিগ্রস্ত হব। জ্ঞানকে যদি খর্ব্ব করি, কর্ম্মকে যদি পঙ্গু করি, তবে একমাত্র ভক্তিকে বাড়িয়ে তুলে আমাদের পরিত্রাণ নেই এ কথা আমি নিশ্চিত জেনেচি, সুতরাং এ কথা আমাকে জানাতেও হবে—কিন্তু গুরু হয়ে উঠে কাউকে মানাতেই হবে এমন আমার স্বভাব নয়। এক এক সময়ে আমার মনে হয় যে, আমি পুরুষ বলেই এই সমগ্র মানবচিত্তের সম্পূর্ণ পূজাকেই সত্য ব'লে সহজে উপলব্ধি করি। হৃদয়বৃত্তিই মেয়েদের স্বভাবে একান্ত প্রবল, এইজন্তে যে সাধনায় আর সমস্তকেই তিরস্কৃত ক'রে একমাত্র ভক্তিবৃত্তিরই পরিতৃপ্তিকে বড় ক'রে তোলা হয় মেয়েদের পক্ষে সেটাই হয়ত সহজ। তাই ভাবি মেয়েদের পূজা আরাধনায় ভক্তি ছাড়া মানব-প্রকৃতির অন্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্য যদি বর্জ্জিত হয় তবে সেটা অগত্যা স্বীকার ক'রে নেওয়া ছাড়া হয়ত উপায় নেই। কিন্তু মানুষের এই সব ঐশ্বর্য্য কার দেওয়া? যিনি দিয়েচেন তাঁর কাছেও কি এর আদর নেই? আমাদের দেশে পূজায় বিদেশী ফুল অব্যবহার্য্য, কিন্তু সে ফুল ফুটিয়েছেন কে? ভক্তরা যদি তাকে অবমাননা করে তবে সেটা পৌঁছয় কোথা? ঠাকুরকে আমরা যে অলঙ্কার দিই তার রত্নগুলি ঠাকুরেরই সৃষ্টি; আমাদের পূজা তাঁকে ভূষণ পরায়,—সেই ভূষণের রত্নগুলি আমাদের মনে, সে তো একটিমাত্র রত্ন নয়। যত রত্ন সাজাতে পারব ভূষণের মূল্য ত ততই বেশী হবে—অর্থাৎ পূজার ষোড়শোপচার ত ততই পূর্ণ হবে। রামচন্দ্রের পূজায় একশো-এক পদ্ম থেকে একটি কম পড়েছিল ব'লে বিপত্তি ঘটেছিল। মানব-প্রকৃতিতেও একশো-এক পদ্মের সব-গুলিই পূজায় লাগে। কে বলবে তার একশোটাকে বাদ দিলেই ভগবানকে খুশী করা হবে? তবে তিনি এত অপব্যয়ের আয়োজন করেচেন কেন?—ইতি

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৮

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বর্দ্ধনা *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা কবিবর মধুসূদন দত্তকে ১৮৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে একখানি মানপত্র দেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য মাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—তাহার কথা গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি মানপত্রখানির নকল আমার হস্তগত হইয়াছে। † মাইকেলের চরিতকারদের কেহই বহু চেষ্টা করিয়াও এই মানপত্রখানি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, এই কারণে আমরা নিম্নে তাহা মুদ্রিত করিলাম।—

এড্রেস।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অত্যুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অত্যুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা-সংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে একণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শন জনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। একণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা। } বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভ্যবর্গাণাম্

---

* ১৩৩৯।১০ই ফাল্গুন তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে মাইকেল মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-সভায় পঠিত।

† আমার অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ১৮৬১ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে এই মানপত্রের নকল পাঠাইয়াছেন।

স্বাগতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নবম পরিচ্ছেদ

বনবিহারী

শ্যামাচরণের সঙ্গে কথা কহিবার সময় ত্রিলোচন বনবিহারীর নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। লোকটা কে?

ত্রিলোচন অবশ্য তাহার পরিচয় জানিতেন, শ্যামাচরণও তাহাকে চিনিত, কিন্তু গ্রামে অথবা কাছারি-বাড়িতে কেহ তাহাকে জানিত না। কর্ম্মের উপলক্ষে ত্রিলোচনের নানা স্থানে যাতায়াত ছিল, নানা লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল।

একদিন সন্ধ্যার পর ত্রিলোচন তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন এমন সময় একজন লোক নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের এক পাশে বসিল। তাহার বয়স পঁইত্রিশ বৎসর হইবে, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, দীর্ঘকায়। চক্ষু ছোট, নাসিকা বড়, দাঁত বড় বড়, উপরের দুইটা দাঁত বাহির হইয়া থাকে। তাহাকে দেখিয়াই ত্রিলোচন উঠিয়া দরজা ভেজাইয়া দিলেন। কহিলেন, এই যে বনবিহারী! তোমার আসবার কথা আমি ত কিছু জানতাম না।

বনবিহারীর দাঁত আর একটু বাহির হইল, ঠোঁটের কোণ অল্প কুঞ্চিত হইল। ইহার অধিক সে বড়-একটা হাসিত না। কহিল,—আগে জানবার কি দরকার, বুঝলেন কি না, এই ত আমি এসেচি।

ত্রিলোচন মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন,—এখানে তোমাকে কেউ চেনে না, অপর লোকে দেখলে কিছু মনে করতে পারে, তুমি কে আমায় জিজ্ঞাসা করতে পারে। তখন আমি কি বলব?

—বলবেন একটা কাজে এসেছিলাম। আপনার কাছে কত লোক কত কাজে আসে, বুঝলেন কি না? আর আমি ত বিনা কাজে আসি নি।

—আবার কি কাজ? তোমাকে যা দেব বলেছিলাম তা ত পেয়েচ, আবার কি চাই?

—সে কি কথা দেওয়ান-মশাই! এরই মধ্যে আমাদের হিসেব মিটে গেল? আমাদের চলতি খাতা, বুঝলেন কি না? এখন ত সব বিষয় আপনার, আমরাও যা হয় কিছু করেচি, আমাদের ভুলে গেলে চলবে কেন? আপনাকে কি আর বেশী ক'রে বলতে হবে, বুঝলেন কি না?

ত্রিলোচনের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছিল। কিছু রুষ্টভাবে কহিলেন,—বুঝি আমি সব, তুমিই ভুল বুঝচ। আমার কোন লাভ হয় নি, মাইনে যা ছিল তাই আছে, টাকাও কেউ দেয় নি।

বনবিহারীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল। ত্রিলোচনের কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া, মুখ বাড়াইয়া দিয়া, চক্ষু পাকাইয়া কহিল,—আমি ভুল বুঝি, বটে? আর তুমি বড় সেয়ানা, না? তবে দুটো মানুষ মিছিমিছি ডুবে মরেছিল, কেমন? ডুবে মরেছিল, ঠিক ত?

ত্রিলোচন ত্রস্ত হইয়া নিজের ওষ্ঠাধরে হাত দিয়া কহিলেন,—আরে, চুপ, চুপ! ওসব কথা কি বলতে আছে? তোমার কি চাই তাই বল না।

বনবিহারী সরিয়া বসিল, তাহার ভাব পূর্ব্বের ন্যায় হইল। কহিল,—আমিও তাই ভাবছিলাম যে—আপনি সব বুঝতে পারেন। যা সবাই চায় তাই আমারও চাই। কিছু টাকার দরকার, বুঝলেন কি না?

—তুমি বস, আমি আসচি, বলিয়া ত্রিলোচন বাড়ির ভিতর গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া একতাড়া নোট বনবিহারীর হাতে দিয়া বলিলেন,—এই তিন শো টাকা নিয়ে যাও। আমার এখন বড় টানাটানি যাচ্চে। আর এখানে তুমি এস না।

—সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া বনবিহারী নিঃশব্দে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

ত্রিলোচন অনেক ক্ষণ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

যাত্রা

এবার হরিনাথ ও গঙ্গাধর মোটর লইল না, সঙ্গে কোন ভৃত্য অথবা কর্ম্মচারীও রহিল না। গঙ্গাধর একটা দোকানে গিয়া ছদ্মবেশের নানারকম উপকরণ কিনিয়া আনিল, পরচুলা, কৃত্রিম দাড়ী গোঁফ, কয়েক রকম পোষাক, কয়েক জোড়া দেশ-বিদেশের জুতা, মাথায় বাঁধিবার পাগড়ী প্রভৃতি। হরিনাথ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—এ সব কি হবে? বহুরূপী সাজতে হবে, না ডিটেক্‌টিভ?

গঙ্গাধর স্মিতমুখে কহিল,—যে কাজে আমরা যাচ্চি সে ত ডিটেক্‌টিভেরই কাজ? মাঝে মাঝে চেহারাও বদলাতে হ'তে পারে, সব জায়গায় এক বেশে গেলে চলবে না। আর এক জোড়া পিস্তল নিতে হবে।

—পিস্তল কি হবে? কাউকে কি খুন করতে হবে?

—না, আত্মরক্ষার জন্ম। আত্মরক্ষার জন্ম খুন করলেও অপরাধ হয় না। তোমার কি এটা মনে হয় নি যে মোটর পুড়ে যাওয়া দুর্ঘটনা না হ'তে পারে, ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করবার মতলব ছিল? মোটরচালক পালিয়ে গিয়ে যারা তাকে এই হত্যাকাণ্ডে নিযুক্ত করেছিল তাদের ব'লে থাকবে যে স্বাগতা আর তার সঙ্গী দুজনেই মোটর চাপা প'ড়ে কিংবা পুড়ে মরেচে? তা না হ'লে কোন সন্ধান করা হ'ল না কেন? খবরের কাগজেও কিছু বেরুল না কেন? যদি এ অনুমান ঠিক হয় তাহ'লে এর মধ্যে একটা পৈশাচিক ব্যাপার আছে, আর যারা এ কাজে লিপ্ত তারা যদি টের পায় যে আমরা এই বিষয়ের তদন্ত করচি তা হ'লে আমাদেরও প্রাণ সংশয়।

হরিনাথ বলিল,—সে কথাও বটে। আমার ওটা মনে হয় নি।

—আমার বিশ্বাস যে কাজে আমরা হাত দিচ্চি তাতে সকল রকম বিপদ ও আশঙ্কার জন্ত আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। স্বাগতার যদি কোন শত্রু থাকে তাহ'লে তারা নিশ্চিত আমাদেরও শত্রু হবে। গোড়াগুড়ি আমাদের এই সুবিধা যে তাদের বিশ্বাস স্বাগতার মৃত্যু হয়েচে, কিন্তু যদি তারা জানতে পারে স্বাগতা জীবিতা আছে তাহ'লে আমাদের তিন জনেরই প্রাণের আশঙ্কা।

হরিনাথের কাছে অনেক রকম পিস্তল ছিল, বাছিয়া দুইটা ছোট ভাল পিস্তল লইল। স্বাগতার উৎকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ তুলাইয়া দুই জনে কয়েকখানা করিয়া লইল। গঙ্গাধরের পরামর্শমত হরিনাথ কলিকাতার বাড়িতে দরোয়ানের সংখ্যা বাড়াইয়া দিল, তাহাদিগকে আদেশ করিল রাত্রে দুইজন সশস্ত্র হইয়া সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবে।

স্বাগতার শিক্ষয়িত্রী বিধবা, সন্তানাদি ছিল না। তাঁহাকে আলাদা ডাকিয়া হরিনাথ বলিল,—স্বাগতাকে সাবধানে রাখবেন। যত দিন আমরা না ফিরে আসি ততদিন ওকে বাড়ির বাইরে বড়-একটা কোথাও নিয়ে যাবেন না, একজন দরোয়ান যেন সঙ্গে থাকে, আর সন্ধ্যার পর কখনও কোথাও যাবেন না।

শিক্ষয়িত্রী একটু ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন, কিছু ভয় আছে না কি?

—না, ভয় কিছুই নেই, তবে আমরা ত কেউ বাড়ি থাকব না, তাই আপনাদের একটু সাবধান থাকা দরকার।

যাইবার সময় স্বাগতা দাঁড়াইয়াছিল। বলিল,—তোমরা কত দিনে ফিরে আসবে?

গঙ্গাধর বলিল,—তার ঠিক নেই, কোথায় কোথায় যাব বলতে পারি নে।

হরিনাথ বলিল,—আমরা যেখানেই থাকি চিঠি দেব।

গঙ্গাধর তাড়াতাড়ি বলিল,—তাও নিয়মিত হবে না, সুবিধে হ'লে হবে। তোমাদের চিঠি দেবার আবশ্যক নেই।

পথে যাইতে হরিনাথ কিছু বিরক্তির সহিত কহিল,—চিঠি দিতে দোষ কি? আমি বরাবর চিঠি লিখব আর স্বাগতাকেও চিঠি লিখতে বলব।

—তাহ'লে যদি স্বাগতার কি আমাদের কোন বিপদ হয় সে দায় তোমার।

—বিপদ হ'তে গেল কেন?

—যদি আমাদের সন্দেহ করে তাহ'লে আমাদের চিঠি চুরি যেতে কতক্ষণ? আর তাহলেই ত স্বাগতার সন্ধান পাবে।

হরিনাথ এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিকের অভিজ্ঞতা

লেখাপড়ায় কার্ত্তিক তেমন মজবুত না হইলেও এবং অন্তদিকে বিশেষ সেয়ানা না হইলেও স্বভাবতঃ সে ধূর্ত্ত আর তাহার নজর অনেক দিকে থাকিত। বনবিহারী যে-সময় ত্রিলোচনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া যায় সে-সময় কার্ত্তিক পাড়া বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। বনবিহারী তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

তাহাকে দেখিয়া কার্ত্তিক থমকিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে এ ব্যক্তিকে কখন দেখে নাই, গ্রামের কেহ নয়, লোকটা দেখিতেও কি রকম আর পথ চলিতে পায়ের শব্দ হয় না। কোথায় যায় দেখিবার জন্ত কার্ত্তিক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিছু দূরে রহিল, নিকটে গেল না।

গ্রাম অতিক্রান্ত হইল, তাহার পর বড় বড় গাছের সারির ভিতর দিয়া পথ। কার্ত্তিক আর অধিক দূর যাইবে কি-না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে এমন সময় বনবিহারী চকিতের মত ফিরিয়া একেবারে কার্ত্তিকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কার্ত্তিক ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বনবিহারী তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। কার্ত্তিক হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা, বনবিহারীর মুষ্টি বজ্রের ন্তায় কঠিন।

বনবিহারী বলিল,—তুমি আমার সঙ্গ নিয়েছ কেন?

কার্ত্তিকের মনে ভয় হইয়াছিল। পথে কেহ কোথাও নাই, গ্রাম ছাড়াইয়া আসিয়াছে, এখানে চীৎকার করিলেও কেহ সহজে শুনিতে পাইবে না। আবার ভাবিল যে, কোন দুর্ব্বৃত্ত লোক তাহার পিতার নিকট আসিবে কেন? কহিল,—তুমি আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে আর তুমি আমাদের গ্রামে থাক না তাই দেখছিলাম তুমি কোথায় যাচ্ছ।

বনবিহারী কার্ত্তিককে টানিয়া যেখানে গাছের ছায়া নাই সেই স্থানে আনিয়া তাহার মুখ দেখিল। বলিল,— তোমার বয়স ত বেশী নয়, তুমি দেওয়ান-মশায়ের কে হও? পরিচয়টা দাও, বুঝলে কি-না?

—আমি তাঁর ছেলে।

বনবিহারী কার্ত্তিকের হাত ছাড়িয়া দিল। কহিল,— আমার পিছনে আসতে তোমার বাবা তোমাকে বলেছিলেন? কেমন, বুঝলে কি-না?

—তিনি কেমন ক'রে জানবেন? আমি বাড়ি ফিরে যেতে দেখলাম তুমি বেরিয়ে আসচ।

—তাই আমার পিছনে আসছিলে? আমার বাড়ি কোথায় জানতে চাও? তাহ'লে আমার সঙ্গে চল আমাদের বাড়ি দেখে আসবে। বুঝলে কি-না?

—কোথায় তোমার বাড়ি?

—বেশী দূর নয়, দিন-দুইয়ের পথ হবে, বুঝলে কি-না?

—আমি তোমার সঙ্গে কোথা যাব? আমি বাড়ি ফিরে যাই।

—দাঁড়াও, আর দুটো কথা আছে, বুঝলে কি-না? তুমি কি আমাকে চোরডাকাত ঠাউরেছিলে?

কার্ত্তিকের আবার ভয় হইল। লোকটা ডাকাত না হইলেও নিতান্ত নিরীহ ভালমানুষের মতন নয়। সাহস করিয়া বলিল,—বাবার কাছে কি চোরডাকাত আসে?

—তবে তুমি কি মনে ক'রে আমার পিছু নিয়েছিলে? এখন যদি আমি গিয়ে তোমার বাবাকে এ কথা বলি তাহ'লে তোমার পিঠের চামড়া থাকবে না, বুঝলে কি না?

কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি বলিল, না, বাবাকে কিছু ব'লো না, আমি আর এমন কর্ম্ম করব না।

বনবিহারী বলিল,—আচ্ছা, যাও। হয়ত তোমার সঙ্গেও এর পর কোন কাজ পড়তে পারে, বুঝলে কি-না?

বনবিহারী দীর্ঘ নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে অন্ধকার পথে

অদৃশ্য হইয়া গেল। কার্ত্তিক হাঁফ ছাড়িয়া বাড়ি ফিরিল। এমন ভয়ানক মানুষের পাল্লায় সে ইহার পূর্ব্বে কখন পড়ে নাই। এমন লোকের সঙ্গে তাহার পিতার কি কাজ থাকিতে পারে? এই যে কেবল প্রতি কথায় 'বুঝলে কি-না, বুঝলে কি-না' বলে, এ ব্যক্তি কে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধান আরম্ভ

হরিনাথ ও গঙ্গাধর সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় পথে বাহির হইল। রেলগাড়ীতে প্রথমে পূর্ব্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিল। গঙ্গাধর হরিনাথকে বলিল,—আমরা যে জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছি সে উদ্দেশ্য বড় সোজা নয়। সৌভাগ্য হ'লে সহজে শীঘ্রই সন্ধান পাওয়া যাবে, তা না হ'লে অনেক দিন লাগবে, আবার অনেক হয়রাণ হয়েও আমরা কিছুই না জানতে পারি। আমার অনুমান যদি সত্য হয় তাহ'লে যারা এ ব্যাপারে লিপ্ত আছে তারা সত্য ঘটনা গোপন করবে, একটা কিছু মিথ্যে কথা রটাবে। আমাদের খুব সাবধানে সন্ধান করতে হবে, যাতে কেউ কোন রকম সন্দেহ না করে।

হরিনাথ বলিল,—আমাকে যেমন করতে বলবে সেই রকম করব। আমার মাথায় কোন বুদ্ধি আসছে না।

গঙ্গাধর বলিল,—তোমার মাথায় একটা ভাবনা, তাই তুমি আর কোন কথা ভাবতে পার না।

যেখানে মোটর পুড়িয়াছিল ও স্বাগতাকে পাওয়া গিয়াছিল দুই বন্ধু প্রথমে সেই স্থানে গেল। খানিক পথ ঠিকা গাড়ীতে গিয়া, গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট পথ হাঁটিয়া গেল। সেই ছোট বনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দগ্ধাবশিষ্ট মোটর পড়িয়া রহিয়াছে, ভস্মের নীচে কয়েক খণ্ড অস্থিও পাওয়া গেল। তাহার পর গঙ্গাধর চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল।

হরিনাথ বলিল,—এখানে মিছিমিছি আর ঘুরে কি হবে? এখানে কি সন্ধান পাবে?

গঙ্গাধর বলিল,—তবু একবার খুঁজে দেখা ভাল। যদি কিছু পাওয়া যায়।

গঙ্গাধর প্রত্যেক গাছের তলায় এদিক-ওদিক দেখে আবার গাছের উপর ডালে ডালে চাহিয়া দেখে।

হরিনাথ বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—পাখীর বাসা দেখছ?

—তাতে ক্ষতি কি? ছেলেবেলা পাখীর বাসা থেকে অনেক ডিম পেড়েছি।

একটা বড় অশ্বত্থ গাছের তলায় গঙ্গাধর দাঁড়াইল। গাছে অনেক ডালপালা। খানিকক্ষণ উপরে চাহিয়া গঙ্গাধর তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া গাছে উঠিতে আরম্ভ করিল।

হরিনাথ আশ্চর্য্য হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিল গাছের একটু উপরে একটা সরু ডালে ময়লা বস্ত্রখণ্ড ঝুলিতেছে। গঙ্গাধর সেইটা হাতে করিয়া নামিয়া আসিল।

একখানা মোটা কাপড়ের রুমাল। মোটরের তেল ও ধূলায় ময়লা। গঙ্গাধর রুমালের খুঁটগুলা দেখিতে লাগিল। এককোণে লাল সূতায় 'শ' অক্ষরটি রহিয়াছে।

গঙ্গাধর বলিল,—এই ব্যক্তিই মোটর-চালক, এর বিশেষ কোনরূপ আঘাত লাগেনি। ধাক্কা লাগবার আগেই লাফিয়ে পড়ে থাকবে, আমাদের মোটর আসতে দেখে গাছে উঠে লুকিয়েছিল। স্বাগতাকে আমরা নিয়ে গেলে পর গাছ থেকে নেমে চলে গিয়ে থাকবে। পকেটের রুমাল ডালের আগায় লেগে বেরিয়ে এসেছিল, টের পায়নি।

এবার হরিনাথেরও বুদ্ধি খুলিল, বলিল,—'শ' দিয়ে নাম আরম্ভ। ও অক্ষরে অনেক রকম নাম হ'তে পারে না। শ্যাম কি শ্যামা ঐ রকম একটা কিছু গোড়ায় হবে।

—কেন, শান্তি, শান্ত, শশী, শশধর কত কি হ'তে পারে।

—তাও বটে। কিন্তু একটা অক্ষর জেনে আমাদের কি লাভ হ'ল?

—লাভ অনেক। মোটর পুড়ে যাওয়া দুর্ঘটনা নয়, হত্যাকাণ্ড, এ কথা সাব্যস্ত হ'ল। মোটর-চালকের পিছনে কেউ আছে যে তাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করেছিল। শত্রুতা হ'তে পারে, অর্থলোভ হ'তে পারে। মোটর-চালক বেঁচে আছে আর তার নামের প্রথম অক্ষর 'শ'। এত-

গুলা কথা জানতে পারা গেল। আমার বিবেচনায় যথেষ্ট লাভ।

যেখানে দুইজনে বাসা করিয়াছিল সেখানে ফিরিয়া গঙ্গাধর বলিল,—যে গ্রামে আমরা স্বাগতাকে প্রথমে নিয়ে যাই কাল সেখানে আমি একা যাব। আর এইবার বহুরূপীর প্রথম রূপ দেখতে পাবে।

—বেশ কথা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বহুরূপী

তাহার পর দিবস সন্ধ্যার সময় যে গ্রামে স্বাগতার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছিল সেখানে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আগমন করিল। তাহার কাঁচাপাকা দাড়ী, মাথার চুলও কিছু পাকিয়াছে, বেশ সাধারণ লোকের ন্যায়। পথে গ্রামের একজন লোককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কিছুদিন আগে এ গ্রামে মোটর ক'রে দু-জন লোক এসেছিল, তাদের সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক ছিল। স্ত্রীলোকটির আঘাত লেগেছিল। তারা কোন্ বাড়িতে ছিল আপনি বলতে পারেন?

গ্রামবাসী বলিল,—আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আপনি কি তাঁদের লোক?

—হাঁ, আমি তাদের চিনি। আমি আসছি বারাসত থেকে।

গ্রামবাসী বাড়ি দেখাইয়া দিল। নবাগত ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশ করিতে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা হইল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া ঘরে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

সে ব্যক্তি দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিল,—আমি থাকি বারাসতে। এখানে দু-জন লোক মোটরে ক'রে অচৈতন্ত অবস্থায় একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে এসেছিল, আপনার মনে পড়ে?

—খুব মনে পড়ে। সে ত আমারই বাড়িতে। আপনি কি জানতে চান? আপনি কি পুলিসের লোক?

—না ঠিক পুলিসের লোক নয়, তবে কিছু সম্পর্ক আছে বটে। সে দু-জন লোকের উপর আপনার কোন সন্দেহ হয়েছিল?

—কিসের সন্দেহ? তাঁরা ভদ্রলোক, নিজের মোটর ছিল, স্ত্রীলোকটি পথে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল দেখে তুলে এনেছিলেন।

—তারা গেলে পর এখানে আর কেউ কোন সন্ধান নিতে এসেছিল?

—তা ঠিক বলতে পারি নে। কে একজন নাকি এসে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।

যে দুই জন লোক মোটরে আসিয়াছিল এই দাড়ীওয়ালা লোকটি তাহাদের মধ্যে একজন শুনিলে কর্ত্তা অত্যন্ত বিস্মিত হইতেন।

গঙ্গাধরের বাসায় ফিরিতে রাত্রি হইল। পরচুলা, দাড়ী গোঁফ পথে আসিতে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। ঘরের দরজা ভেজান ছিল, ধার খুলিতে কোন শব্দ হইল না। হরিনাথ গঙ্গাধরের পায়ের শব্দ শুনিতে পায় নাই। একটা কি হাতে করিয়া একমনে দেখিতেছিল, পিঠ ছিল দরজার দিকে। গঙ্গাধর পা টিপিয়া গিয়া হরিনাথের পিছন হইতে দেখিল, স্বাগতার ফোটোগ্রাফ তাহার হাতে।

গঙ্গাধর বলিল,—তোমার জন্য কোন দিন একটা গোল হবে।

হরিনাথ চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি ফোটোগ্রাফ লুকাইল, বলিল,—কিসের গোল?

যাদের বিশ্বাস স্বাগতা মারা পড়েচে তাদের কেউ যদি ঐ ছবি দেখতে পায় তাহ'লে আমাদেরও প্রাণের ভয়।

—তারা কেমন ক'রে দেখতে পাবে?

—আমি কেমন ক'রে দেখলুম? স্বাগতাকে চেনে এ রকম লোক যে এখানে কেউ নেই তাই বা তুমি কেমন ক'রে জানলে?

—এখন থেকে আমি সাবধান হব।

—তা না হ'লে কিছুই হবে না, হয়ত আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের শত্রু হবে।

হরিনাথ বলিল,—গ্রামে গিয়ে কি জেনে এলে? তোমাকে চিনতে পারে নি ত?

হরিনাথ দাড়ীচুল বাহির করিয়া বাক্সে পুরিল, পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বিছানার তলায় রাখিল। কহিল,—চিনবে কেমন ক'রে? বিশেষ কিছু জানবার ছিল না কিন্তু একটা লোক কিছু সন্ধান জানতে গিয়েছিল। সে নিশ্চিত এ ব্যাপারের মধ্যে আছে। কাল সকালেই আমরা এখান থেকে চলে যাব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শ্যামাচরণ

কার্ত্তিকের একটা কাজ বাড়িল। তাহার পিতার কাছে কে আসে যায় এত কাল সে কোন খোঁজ-খবর রাখিত না। তাহার বয়স অধিক নয়, ইতিপূর্ব্বে সমবয়সী বালকদের সঙ্গে খেলায় মত্ত থাকিত, কিছু দিন হইতে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। জমিদারী ও অপর কর্ম্মে ত্রিলোচনের কাছে কত রকম লোক আসিত তাহাদের সম্বন্ধে কার্ত্তিকের কোন কৌতূহল হইত না, কিন্তু এই যে লোকটা কার্ত্তিককে ওরূপ ভয় দেখাইয়াছিল সেই দিন হইতে কার্ত্তিকের মনে একটা খটকা লাগিয়াছিল। তাহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে এ ব্যক্তি জমিদারী-সংক্রান্ত কোন কাজে আসে নাই। আর কি কাজ থাকিতে পারে?

সেই হইতে ত্রিলোচনের নিকটে কে আসে যায় কার্ত্তিক তাহা লক্ষ্য করিত। সে আরও লক্ষ্য করিয়াছিল যে ত্রিলোচন সময় সময় অন্যমনস্ক হইতেন, একা বসিয়া কি ভাবিতেন। যেন একটা দুর্ভাবনা, কোন একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা। দুর্ভাবনার প্রত্যক্ষ কারণ ত কিছুই নাই। শৈলবালার হাতে সম্পত্তি আসাতে ত্রিলোচনের ক্ষমতা বাড়িয়াছিল। তিনি যাহা করেন তাহাই হয়। এমন কেহ ছিল না যে তাঁহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে বা কোন বিষয়ে তাঁহার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করে। তবে মাঝে মাঝে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয় কেন? যে লোকটাকে কার্ত্তিক দেখিয়াছিল তাহার সঙ্গে ত্রিলোচনের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল?

ত্রিলোচনের ভাবনার কারণ ছিল যথেষ্ট। শ্যামাচরণ ও বনবিহারী যে তাঁহার কাছে যাওয়া-আসা করে সেটা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না। যে কাজের জন্য তাহাদের সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল তাহা ত সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি তাহাদিগকে প্রচুর পারিতোষিকও দিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা তাঁহাকে ছাড়ে না কেন? শুধু যে তাহাদিগকে ক্রমাগত টাকা জোগাইতে হইত তাহা নহে, তাহাদিগকে দেখিলেই তাঁহার মনে আশঙ্কা হইত, অতীতের একটা ভীষণ স্মৃতি তাঁহার চিত্তকে আকুল করিত। যাহা তিনি ভুলিতে চাহিতেন ইহাদের জ্বালায় তাহা ভোলা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। অনুতাপ কাহাকে বলে ত্রিলোচন তাহা জানিতেন না, তাঁহার কেবল আশঙ্কা যে, কোন কথা প্রকাশ হইয়া না পড়ে। তাহার প্রধান উপায় শ্যামাচরণ ও বনবিহারীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখা। কোন দুঃস্বপ্ন দেখিলে মানুষের মনে যেমন ভীতি সঞ্চার হয় তাহাদিগকে দেখিলে ত্রিলোচনের সেইরূপ হইত। চিরকাল যে তাহাদিগকে এইরূপ করিয়া টাকা জোগাইতে হইবে ত্রিলোচন তাহাও কখন ভাবেন নাই। যদি এমন করিয়া তাহাদিগকে ক্রমাগত টাকা দিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার নিজের কি থাকিবে?

বনবিহারীর সঙ্গে দেখা হইবার কিছু দিন পরে কার্ত্তিক শ্যামাচরণকে দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিয়াও কার্ত্তিকের মনে সন্দেহ হইল যে, এ ব্যক্তি যে-কর্ম্মে আসিয়াছে জমিদারীর সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। লোকটাকে দেখিয়া ভদ্রলোক মনে হয় না। কার্ত্তিক দেখিল সে ঘরে প্রবেশ করিতেই ত্রিলোচন উঠিয়া স্বহস্তে দরজা ভেজাইয়া দিলেন। কোন গোপনীয় কথা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার সঙ্গে কি কথা?

শ্যামাচরণ কিছুক্ষণ পরে ত্রিলোচনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন কার্ত্তিক কাছারি-বাড়ির বাহিরে দাঁড়াইয়া। কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নিবাস কোথায়?

শ্যামাচরণ কার্ত্তিককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। তাহার চক্ষের দৃষ্টি কার্ত্তিকের অঙ্গে কশাঘাতের ন্যায় লাগিল। বলিল,—আমার নিবাস মক্কায়। কে হে তুমি?

—আমি কার্ত্তিক, বাবুর ছেলে।

—বটে? আমি ভেবেছিলাম তুমি নবাব খাঞ্জা খাঁর

নাতি। তোমার বাবার কাছে কে আসে যায় তুমি কি খাতায় লিখে রাখ আর বাড়ি গিয়ে তাই মুখস্থ কর ?

—তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ?

—বাপ রে ! আমার মাথার উপর কটা মাথা আছে যে আমার এত বড় আস্পর্দ্ধা হবে ! চল না, তোমার বাবার কাছে গিয়ে আমার পরিচয় নেবে।

কার্ত্তিক অমনি পিছাইল। তাহার স্মরণ হইল যে, অপর ব্যক্তিও তাহাকে শাসাইয়াছিল যে তাহার বাবাকে বলিয়া দিবে। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে ত্রিলোচন জানিতে পারিলে অসন্তুষ্ট হইবেন। বলিল,—আমি অমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম, বাবাকে কিছু বলবার দরকার নেই।

শ্যামাচরণ চোখ ছোট করিয়া কার্ত্তিককে এমন করিয়া দেখিতে লাগিল যে তাহার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। শ্যামাচরণ আস্তে আস্তে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল,—গুরুমশায় তোমাকে বেত পেটা করত ?

কার্ত্তিক রাগিয়া বলিল,—আমাকে বেত মারে কার বাপের সাধ্যি ?

—তাই তোমার শিক্ষা ভাল হয় নি। আবার যদি আমাকে পথে আটকাও তাহ'লে তোমাকে এমন বেত পেটা করব যে তিন মাস বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। তোমার বাবার সাক্ষাতেই তোমায় শিক্ষা দেব।

শ্যামাচরণের হাতে বেতের ছড়ি ছিল, সেইটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, অঙ্গ দোলাইতে দোলাইতে, নটবর গতিতে, মৃদু পদবিক্ষেপে চলিয়া গেল।

কার্ত্তিক আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্যামাচরণ যেমন যেমন দূরে চলিয়া গেল কার্ত্তিকের সেইরূপ ভয় ভাঙ্গিয়া রাগ বাড়িতে লাগিল। এ রকম অপমান তাহাকে কখন সহ্য করিতে হয় নাই। এত বড় জমিদারীর দেওয়ানের ছেলে, তাহাকে কি-না কাছারি-বাড়ির বাহিরে অপমান করে ! যদি আর কেহ শুনিতে পাইত ? কার্ত্তিক তখনই গিয়া তাহার বাবাকে বলিয়া দিতে পারিত, কিন্তু সে বুঝিয়াছিল তাহাতে কোন প্রতিকার হইবে না। যে-কোন কারণেই হউক এই দুইটা লোক ত্রিলোচনকে ভয় করে না। অপমানের প্রতিশোধের উপায় কার্ত্তিককে নিজে করিতে হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

স্বাগতা

স্বাগতার শিক্ষয়িত্রীর নাম সুলোচনা। বিধবা, সন্তানাদি ছিল না, বয়স চল্লিশের কিছু উপর হইবে। হরিনাথ ও গদাধর চলিয়া গেলে পর বাড়িতে লোকজন ছাড়া আর কেহ রহিল না, সুতরাং সুলোচনা ও স্বাগতাকে অনেক সময় একত্রে থাকিতে হইত। স্বাগতার সঙ্গে হরিনাথের কি সম্পর্ক সুলোচনা তাহা জানিতেন না। অনুমান করিতেন কোন নিকট-সম্পর্ক আছে, নহিলে স্বাগতা এ বাড়িতে বাস করিবে কেন ? সুলোচনা কিছু বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন স্বাগতা পূর্ব্বেকার অথবা ছেলেবেলাকার কোন কথা বলিত না। তাহার জীবনে একটা কিছু রহস্য আছে যাহা জানিতে পারিলে সকল কথা জানা যায়। কথাটা কেমন করিয়া পাড়িবেন সুলোচনা মাঝে মাঝে তাহা ভাবিতেন।

স্বাগতার কোন বিষয়ে তেমন বিশেষ কৌতূহল ছিল না। সে অনেক সময় একা বসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিত, কিন্তু তাহার চিত্ত-মুকুরে পূর্ব্বস্মৃতির ছায়া কখনও পড়িত না। ছাদে উঠিয়া বেড়াইবার সময় মাথার উপর মুক্ত আকাশ দেখিতে পাইত, আকাশে পাখী উড়িতেছে, মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে, চারিদিকে ছোট-বড় অনেক রকম বাড়ি। সন্ধ্যার সময় আকাশে তারা উঠিত, কিন্তু নক্ষত্রলোক হইতে কোন সংবাদ তাহার হৃদয়ে আসিত না। মনে করিতে গেলে গ্রামের সেই গৃহে জাগরণ, চারিদিকে অচেনা লোক আর মাথায় বেদনা এই পর্য্যন্ত তাহার স্মরণ হইত। সে যে অচৈতন্য হইয়াছিল তাহা তাহার মনে হইত না। পূর্ব্বস্মৃতি এমন মুছিয়া গিয়াছিল যে তাহার একটি অক্ষরও বুঝিতে পারা যাইত না। অতীতের প্রতি চক্ষু ফিরাইলেই স্বাগতা দেখিত কেবল অন্ধকার, মসীলিপ্ত পত্রের ন্যায় সঙ্কেতশূন্য, অর্থশূন্য। সে অন্ধকারে কোন পূর্ব্বপরিচিত মুখ দেখিতে পাইত না, সে স্তব্ধতা হইতে কোন শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না। একটা প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের ন্যায় অতীত তাহার স্মৃতি-পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত।

স্বাগতা জানালার কাছে বসিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া আছে এমন সময় সুলোচনা আসিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার পাশে বসিলেন। অপরাহ্ণ হইয়াছে। গাছে বসিয়া নানা জাতীয় পাখী কলরব করিতেছে। জানালার নীচে বড় বড় সূর্য্যমুখী ফুল, ঝুমকা লতায় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

স্বাগতা সুলোচনার দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুমন্দ দিব্য হাসি হাসিল। সে হাসি বড় সরল, বড় কোমল কিন্তু তাহার সঙ্গে যেন একটু বিষাদ জড়িত। হাসিয়া স্বাগতা সুলোচনার হাতের উপর নিজের হাত রাখিল।

সুলোচনা বলিলেন,—স্বাগতা, তুমি ত ছেলেবেলাকার কোন কথা আমাকে বল না?

—আমার ত কিছু মনে নেই।

—তোমার কি মাথার কোন ব্যারাম হয়েছিল?

—কই, আমার ত মনে পড়ে না।

—কত দিনের আগের কথা মনে পড়ে?

—সেই যে একটা গ্রামে এক জন ডাক্তার আমাকে দেখেছিল, তার আগেকার কোন কথা মনে পড়ে না।

—হরিনাথ বাবু তোমার কে হন?

—তা ত জানি নে। কোন আত্মীয় হবেন, তা না হ'লে এখানে আছি কেন?

—তোমার কোথায় বিয়ে হয়েছিল, মনে পড়ে?

—না। বিয়ে কি সকলের হয়?

সুলোচনা তখন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। যে-কোন কারণেই হউক, আগেকার সব কথা স্বাগতা ভুলিয়া গিয়াছে, বিবাহ কাহাকে বলে তাহা জানে না। সুলোচনা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

আর এক দিন স্বাগতা নিজেই একটা কথা পাড়িল। সুলোচনাকে জিজ্ঞাসা করিল,—এঁরা দু-জন কোথায় বেড়াতে গিয়েছেন?

—কে? হরিনাথবাবু আর গঙ্গাধরবাবু?

—হাঁ।

—আমি কেমন ক'রে জানব? তোমার কাছে চিঠি-পত্র আসে না?

—হরিনাথবাবু বলেছিলেন চিঠি লিখবেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত কোন চিঠি আসে নি।

ঠিক এই সময় এক জন দাসী আসিয়া একখানা পত্র স্বাগতার হাতে দিয়া বলিল,—দিদিমণি, তোমার চিঠি, এই মাত্র ডাকওয়ালা দিয়ে গেল।

চিঠি খুলিয়া স্বাগতা পড়িল। সুলোচনা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কার চিঠি?

স্বাগতা বলিল,—হরিনাথবাবুর চিঠি। এই মাত্র তোমাকে বলছিলাম তাঁর কোন চিঠি আসে নি।

পত্রখানি স্বাগতা সুলোচনার হাতে দিল। সুলোচনা পড়িলেন—

স্নেহভাজনাসু,

তোমাকে পত্র লিখিতে বিলম্ব হইল বলিয়া কোন চিন্তা করিও না। বাড়ি হইতে যাত্রা করিয়া অবধি আমরা কেবলই ঘুরিতেছি, কোথাও দুই-এক দিনের অধিক থাকি না। পত্র দিতে বিলম্ব হইবার সেই এক কারণ, আর আমরা যেরূপ ব্যস্ত তাহাতে স্থির হইয়া বসিয়া কোন কাজ করিবার সময় হয় না। পাছে তুমি ভাব সেই কারণে একটুখানি লিখিতেছি।

তোমার হয়ত বড় একা একা মনে হয়। সেই জন্য যিনি তোমাকে পড়ান তাঁহাকে তোমার কাছে রাখিয়া আসিয়াছি। তিনি বুদ্ধিমতী। তোমাকে স্নেহ করেন, এই জানিয়া আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকি। তিনি এ পত্র দেখিবেন, অতএব তাঁহাকে এবার আর স্বতন্ত্র পত্র লিখিলাম না।

আমরা কত দিনে ফিরিব ঠিক বলিতে পারি না। আমরা অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি না, একটা বিশেষ কাজও আছে। নহিলে তোমাকে একা রাখিয়া আমরা এ রকম করিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম না।

আমরা কবে যে কোথায় থাকিব তাহার স্থিরতা নাই, এই কারণে তোমাকে পত্রের উত্তর দিতে লিখিলাম না। যদি কোথাও বেশী দিন থাকা হয় তাহা হইলে তোমাকে পত্র লিখিতে বলিব।

তোমার শারীরিক কুশল ত? সকল সময় তোমাকে মনে পড়ে। তুমি কখন কখন আমাদের মনে কর ত?

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীহরিনাথ রায়

সুলোচনা দেখিলেন চিঠিতে কোন স্থানের নাম লেখা নাই। খামের উপর পোষ্ট আপিসের ছাপে পূর্ব্বদেশের একটা ছোট গ্রামের নাম। সুলোচনা লক্ষ্য করিলেন, হরিনাথ জানেন এ চিঠি অপরের চক্ষে পড়িবে। যদি আর কেহ দেখিতে না পাইত তাহা হইলে কি হরিনাথ অন্য ভাবে পত্র লিখিতেন? আর তিনি যে কাজের কথা লিখিয়াছেন সে কি কাজ?

স্বাগতা আবার চিঠি হাতে করিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া কিছু সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—উনি যে জানতে চেয়েছেন আমি কখন কখন ওঁদের মনে করি কি-না, ও কথা কেন লিখেছেন? আমি কেন ভুলে যাব? হরিনাথ-বাবু আমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, এখানে আমি কত যত্নে রয়েছি, ভুলে যাব কেন?

সুলোচনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বাগতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। স্বাগতার চক্ষে অল্প বিস্ময়ের ভাব, কিন্তু লজ্জা অথবা অন্য কোনরূপ বিকারের কোন চিহ্ন নাই। স্বাগতার দৃষ্টি স্বচ্ছ, প্রশান্ত। সুলোচনার চক্ষুই নত হইল।

সুলোচনা বলিলেন,—তুমি অনেক কথা ভুলে গিয়েচ কি-না, তাই ও-রকম লিখে থাকবেন।

ক্রমশঃ

উড়িষ্যা ও ভারতবর্ষ*

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

বাংলার বাহিরে যেখানে বাঙালী অধিক সংখ্যায় বসবাস করে, সেখানেই সাহিত্য-পরিষদের মত একটি অনুষ্ঠান, বাংলা স্কুল বা বালিকা-বিদ্যালয়ের মত যেন আপনিই গড়িয়া উঠে। ইহার প্রধান কারণ, অন্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা বাঙালী অবসর ও আমোদপ্রিয়, গ্রাম্য কথায় মজলিসী। এক একটি মজলিস বা বৈঠক হইতে প্রথমে থিয়েটারের আয়োজন, তারপর একটি গ্রন্থাগারের সূচনা। অমনি দিকে দিকে চিঠি ছুটিল, গ্রন্থকারগণের নিকট নিবেদন, তাঁহাদের গ্রন্থদানে লাইব্রেরীকে উৎসাহ দান করা। যেখানে কতকগুলি পুস্তক আহৃত হয় এবং পুস্তক বা প্রবন্ধ পাঠের সুবিধা ঘটে, সেখানে কালে একটি সাহিত্য-পরিষদও স্থাপিত হয়,—এই হইল সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ জন্মকথা। আপনাদের এখানে এই বিবরণ কতদূর খাটে তাহা জানি না। অনুসন্ধিৎসা ও উদ্যোগ থাকিলে এই পরিষদের সম্পর্কে অচিরে উড়িষ্যা প্রদেশে যে একটি বাঙালী সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন ঘটিবে তাহা কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

আর এক দিক হইতে এই প্রকার পরিষৎ প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। অন্য প্রদেশবাসীর শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী বাঙালী সবক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতার উত্তপ্ত স্পর্শ অনুভব করিতেছে। মাঝে মাঝে একটা নিদারুণ ও নির্লজ্জ পক্ষপাত তাহার সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাও ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। এক্ষেত্রে বাঙালীর জোট বাঁধিয়া আত্ম ও স্বত্ব রক্ষার চেষ্টা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অপর দিকে বাঙালীর একটা আত্মম্ভরিতা আছে যাহার জন্য সে আপনার প্রতিবেশীকে বিদ্রূপ, এমন কি অবজ্ঞা করিতেও ছাড়ে না। ইহাতে সামাজিক অসদ্ভাব আসিতেছে, জীবন-সংগ্রামে প্রতিযোগিতার উত্তাপ ও গ্লানি ফলে বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

* পুরী-বঙ্গসাহিত্য-পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ।

সাহিত্য-পরিষদের মত অনুষ্ঠান যাহা জাতি, ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় নহে, দেশকে বা জন্মাবেষ্টনকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই কারণেও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ উপযোগী। বাঙালীকে আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করিতে হইবে, উড়িষ্যাবাসীকে তাহার জড়তা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। উভয়ের অনুসন্ধিৎসা ও অনুশীলনের ফলে দেশের পরিচয় নিবিড় ও বাস্তব হউক, দেশের ইতিহাস পরিস্ফুট হইয়া ভবিষ্যতের ধারার উপর আলোকপাত করুক, তবেই সাহিত্য-পরিষদের সার্থকতা।

উড়িষ্যার অতীত ইতিহাস সঙ্কলনে বাঙালী অগ্রণী এই কথা বলিয়া আপনাদিগের স্পর্দ্ধা নাই-বা বাড়াইলাম। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উড়িষ্যার ইতিহাস প্রণয়নের সূত্রপাত করেন। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মনোমোহন গাঙ্গুলী পরযুগে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। শ্রীগুরুদাস সরকার মহাশয়ের 'মন্দিরের কথা'ও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তাহার পর পুরী-নিবাসী সুপণ্ডিত ও কষ্টসহিষ্ণু শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিশেষে পরলোকগত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উড়িষ্যার ইতিহাস, তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ রচনা (Magnum Opus) স্মরণ করিয়া আমরা যেমন বিধাতার নিষ্ঠুর বিধানে মস্তক নত করি, তেমনই বাঙালীর অসাধারণ প্রতিভায় পুলকিত ও উৎসাহিত হই।

উড়িষ্যার পুরাতন ইতিহাস বড়ই গৌরবময় ইতিহাস, সেই ইতিহাস ব্যাখ্যানের সময় আজ নহে। দেশের কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সভাপতি হইলে তিনি তাহা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনিও নিশ্চয় বলিতেন, এই ইতিহাসের অনেক অংশ প্রহেলিকার অন্ধকারে ঢাকা। সমুদ্রের লবণাক্ত জল, নদীর অকস্মাৎ গতি-পরিবর্ত্তন প্রকৃতির অবিরাম রৌদ্র বৃষ্টি বর্ষণ, পলিপড়া জমির উপর জঙ্গলের বিস্তার বহু স্মরণীয় নিদর্শন লুপ্ত করিয়া দিয়াছে, কোথাও বা মানুষের কল্পনা কত না প্রবন্ধ আখ্যায়িকা সৃষ্টি করিয়া ঐতিহাসিক উপকরণগুলিকে সত্যের আড়ালে রাখিয়াছে।

এই সাহিত্য-পরিষৎ কালে যে উড়িষ্যার জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলনের একটা কেন্দ্র হইবে ইহা আমার আশা। অন্ততঃ চারিদিক হইতে এই জাতীয় ইতিহাস উদ্ঘাটনের চেষ্টা না করিলে সম্যক ফল লাভ করা যাইবে না।

প্রথম। কলিঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, এক দিকে বঙ্গ ও সুবর্ণভূমি, অপর দিকে চোলদেশ ও লঙ্কাদ্বীপের সঙ্গে তাহার বহু শতাব্দী ধরিয়া ঘনিষ্ঠ ব্যবসায় ও বাণিজ্যের যোগ ছিল। ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের ইতিহাসে বাংলা দেশ অপেক্ষাও কলিঙ্গের স্থান উচ্চে। বাংলা হইতে নহে, কলিঙ্গ হইতেই ভারতীয় মহাসাগরে বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। যবদ্বীপে ভারতবাসীর উপনিবেশ-স্থাপনের উদ্যোগ কলিঙ্গেরই বন্দর হইতে। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, প্রাচী অথবা চিত্রোৎপলা নদীর উপর উড়িষ্যার প্রধান বন্দর ছিল। এই নদীর উপর বহু প্রসিদ্ধ গ্রাম ও নগর ছিল। ইউয়েন-সাং যাহাকে চে-লি-তা-লো-চিং বলিয়াছেন তাহা চিত্রোৎপলারই নামান্তর। সপ্তগ্রামের মতই ব'প্রদেশে নদীর স্বাভাবিক গতি পরিবর্ত্তন হেতু এই বন্দর বোধ হয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই সমৃদ্ধি হারায়। ঐ সময় হইতেই কোনার্কের প্রসিদ্ধি কমিতে থাকে। তবুও শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখনও মন্দির পরিত্যক্ত হয় নাই (১৫৩৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে)।

কণার্ক দেখিল তথা চারি যোজনে।
চিত্রোৎপলা দেখিল নীলাচল ভুবনে।

ওদন্তপুরও সম্ভবতঃ এই অঞ্চলের নগরী। উড়িষ্যার বন্দরগুলির উত্থান-পতন, সামুদ্রিক যাত্রা, উপনিবেশ ও বহির্ব্বাণিজ্যের ইতিহাস অজানা থাকিলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান ধারা অজানা থাকিবে সন্দেহ নাই। প্রাচী মাহাত্ম্য, অর্কক্ষেত্রের মন্দিরে খোদিত লিপি ও কারুকার্য্য হইতে এই বহির্ব্বাণিজ্যের ইতিহাস সঙ্কলন উড়িষ্যাবাসীকেই করিতে হইবে।

দ্বিতীয়। কলিঙ্গে যুগপরম্পরায় বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, তান্ত্রিকতা, বেদান্তবাদ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব দেখা যায়।

কত গুম্ফা, কত মন্দির, কত পুঁথি, কত আখ্যায়িকা ইহার সাক্ষী। ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্ম্মান্দোলন ও অনুষ্ঠান উড়িষ্যার রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণকে যে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। উড়িষ্যার বাণিজ্যের ইতিহাসের মত জনসাধারণের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস সঙ্কলন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উড়িষ্যায় মগ-প্রবর্ত্তিত সূর্য্যপূজা, মহাযান বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মারীচীর পূজা, সুব্রহ্মণ্যের পূজা, ধর্ম্মরাজের পূজা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব—এ প্রদেশের সঙ্গে মূলতান, চীন, তিব্বত, দাক্ষিণাত্য, ও বঙ্গদেশের সহিত প্রাণের যোগের পরিচয় দেয়। উড়িষ্যার ধর্ম্ম-ইতিহাস লিখিত হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতার ধারা অনেকটা পরিস্ফুট হইবে, সন্দেহ নাই।

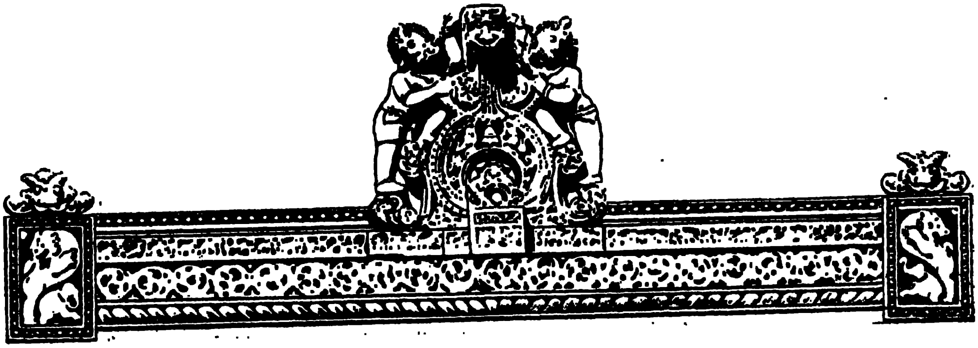
তৃতীয়। উড়িষ্যার মন্দির ও দেবদেবীর নির্ম্মাণ ও কারুশিল্প-কলার ইতিহাসও অতি বিচিত্র। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহাসমূহের কারুকার্য্য সাঁচী অমরাবতী ও ভারুতের শিল্পের সহিত সুদূর অতীতের যোগাযোগ ইঙ্গিত করে। মধ্যযুগে মথুরা বা ছত্রপুরের (খাজুরাহোর) মত উড়িষ্যা উত্তর-ভারতের শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাসের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। উড়িষ্যার শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে ভুবনেশ্বর ও কোনার্কের শিল্পের উৎকর্ষ ও পুরীতে অবনতির ধারা সুস্পষ্ট হইবে না। উড়িষ্যার সহিত দাক্ষিণাত্যের স্থপতি ও দেবদেবী নির্ম্মাণ-শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও বুঝা যাইবে না। একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিতেছি। ভুবনেশ্বরের একটি পরিত্যক্ত মন্দিরের গাত্রে নানা কারুকার্য্যের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্যশীল শিবের প্রতিকৃতি আছে। উত্তর-ভারতের মন্দিরশিল্পে শিব-তাণ্ডবের ইহাই একমাত্র উদাহরণ। কিন্তু গুম্ফাসমূহের বোধিক্রম ও পদ্মের motif বা পুরী ও ভুবনেশ্বরের কীর্ত্তি-মুখের মত শিবতাণ্ডব motif-এর পর্য্যটন ও পরিণতির কথা না জানিতে পারিলে এ আবিষ্কারের কিছুই মূল্য নাই। এ ইতিহাস সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেই হয়ত মন্দির-গাত্রে খোদিত মূর্ত্তিটি রৌদ্রে-বর্ষণে একেবারে অস্পষ্ট হইয়া যাইবে অথবা অপহৃত হইয়া দেশান্তরে রপ্তানি হইবে। একখানি উড়িয়া শিল্পশাস্ত্র শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে দেখিলাম। উড়িয়া শিল্পশাস্ত্র ও মানসারের তুলনামূলক সমালোচনা ভারত-বর্ষের শিল্পের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচনা করিবে, আমার বিশ্বাস। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পুরী ও ভুবনেশ্বরের শিল্পীর নিকট ইহা শুধু শাস্ত্র নহে,—একটা সজীব শিল্পের রীতি ও আদর্শ।

চতুর্থ। ছোটনাগপুরের মত উড়িষ্যার গ্রাম বা সমাজবিন্যাস অনুধাবন করিলে দ্রাবিড়ী ও হিন্দুসভ্যতা দেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক শাসনের অনুষ্ঠানগুলি কিরূপ বিভিন্নভাবে গড়িয়াছে আমরা তাহার পরিচয় পাই। ভারতের গ্রাম্যশাসন পদ্ধতি ও সমবেত জীবনের জন্মবৃত্তান্তের অনেক উপকরণ উড়িষ্যার করদ-রাজ্যসমূহে মিলে। দ্রাবিড়ী রাজশাসনই প্রথম পল্লীসমাজে পধান সরবরাহ্‌কার, পাইক, নায়েক, খণ্ডায়েত ও হিসাবনবিশী করণের আমদানী করে, জমির খাজনার বন্দোবস্ত ও আদায়ের প্রণালী উদ্ভাবন করে। দ্রাবিড়ী আমলের জমির বন্দোবস্ত অবলম্বন করিয়াই পরযুগের শাসকগণ নূতন রাজস্ব আদায় ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। তাহাদিগের এবং শিল্পিগণের জন্য দাক্ষিণাত্যের মান্যম জমির মত এ-প্রদেশে নিষ্কর মিহ্রার বন্দোবস্ত ছিল। শুধু জমি বন্দোবস্ত নহে, পূর্ত্তকার্য্যের জন্য সকলের দায়িত্ব, গোচারণ-ভূমিতে সকলের অধিকার, পঞ্চায়েত শাসন, পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য সমাজ কর্ত্তৃক শিল্পী ও মজুর নিয়োগ—সবই দ্রাবিড়ী সভ্যতার দান। গ্রাম্য গঠন-প্রণালী, জাতি, পাড়া,পাটি,সাহি বিভাগ শিল্পশাস্ত্রানুমোদিত পথ জলাশয় মন্দির ও গৃহনির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা বোল শাসন গ্রামবিন্যাস প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে দ্রাবিড়ী ও হিন্দুসভ্যতার বিশিষ্ট দানগুলি বুঝিতে পারিব। এই প্রকার উপকরণ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা উড়িষ্যায় অনেক সহজেই মিলে।

এই কয়েকটি ধারা হইতেই দেখা গেল শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম্ম বা সমাজবিন্যাসের দিক হইতে উড়িষ্যার অতীত বা বর্ত্তমান জীবন ভারতবর্ষের সভ্যতার স্তরনির্দ্দেশের বিশিষ্ট উপকরণ জোগাইতে পারে—যাহার অভাবে ভারতের ইতিহাস অঙ্গহীন থাকিবে সন্দেহ নাই। এখানকার সাহিত্য-পরিষৎ এই গুরু দায়িত্বের কিছু অংশ গ্রহণ

করুন। মালমশলা চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। ভগ্নস্তূপের মধ্যে বনজঙ্গলে, মন্দিরে, গৃহপ্রাঙ্গণে কীটদষ্ট পুঁথি বা আখ্যায়িকার মধ্যে ইতিহাস, শিল্পকলা, নৃতত্ত্বের অনেক উপকরণ পাওয়া যাইবে। আমাদের কর্ম্মসচিব অক্লান্ত পরিশ্রমী শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তাঁহার মিউজিয়মে যে-সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা উড়িষ্যার জাতীয় ইতিহাস-সঙ্কলনে কাজে লাগিবে, ইহা নিশ্চিত।

কিন্তু অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমান বড়। প্রতিকৃতি অপেক্ষা জীবন গরীয়ান। ইতিহাস, সে ত মৃত অতীতের গলিত শব স্কন্ধে ধারণ করিয়া আমাদের চক্ষে জল আনে। কোথায় চন্দ্রভাগা নদীর তীরে, কত যোজনব্যাপী রাজনগরী ছিল, যুদ্ধবীর মৃগয়াপ্রিয় রাজা যেমন দেশবিদেশ জয় করিতেন, তেমনই দেশের পণ্ডিতকে সম্মানের আসন দিয়া তাঁহাদিগের সহিত সমালোচনা করিতেন এবং অদূরে স্ত্রী-সৈনিকগণ সশস্ত্রে দণ্ডায়মান থাকিত; কোথায় চিত্রোৎপলা নদীর মোহানায় আরব ও পোর্ত্তুগীজ বণিকের বাণিজ্য পোতগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিত, এদেশের বস্ত্রাদি শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিয়া নগরে সোনা ঢালিয়া দিয়া তাহারা মহাসাগরের অভিমুখে পুনরায় অভিযান করিত; কোথায় বন্দর হইতে ঔপনিবেশিকগণের সুদূর সমুদ্রযাত্রা তখন নগরে নগরে সমস্ত রাজ্য ধরিয়া কি একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত করিত। আরও পুরাতন যুগে, বৌদ্ধ ও জৈন শ্রমণগণ যখন নীরবে নির্জ্জনে গিরিগুহায় ধ্যান অধ্যয়ন করিতেন, পর্ব্বতে পর্ব্বতে তখন কি শীলতা পবিত্রতার বাণী প্রতিধ্বনিত হইত, রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণ তাঁহাদিগকে কত-না উপায়ে ও উপকরণদানে পূজা ও আপ্যায়ন করিতেন। অতীত যুগে সাধারণ মানুষও স্বাধীন, সরল, আমোদপ্রিয় ছিল, তাহারা যেমন যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ছিল, তেমনই সঙ্গীতে, তেমনই শিল্পকলায়, তেমনই কামনার চরিতার্থতার সাধনে তাহাদিগের সহজ উদ্দাম প্রকৃতি বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করিত। যে উদ্দাম প্রবৃত্তি উড়িষ্যায় নিছক কামমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই অসীম শৌর্য্যব্যঞ্জক গজসিংহ মূর্ত্তি এবং কোনার্কের সেই বিখ্যাত বিশালকায় তেজীয়ান অশ্বেরও পরিকল্পনা করিয়াছে। জাতির তেজ ও বীর্য্য থাকিলে তাহা যেমন অধ্যাত্ম সাধনায় তেমনি আমোদ-প্রমোদে, যুদ্ধবিগ্রহে, ভাস্কর্য্যে, শিল্পকলায় সমান ভাবে প্রকাশিত হয়। উড়িষ্যার অতীত বড়ই গৌরবময় ছিল বলিয়াই বর্ত্তমানের দায়িত্ব আরও বেশী। উড়িষ্যা এখন দীন, দরিদ্র ও নিস্তেজ। রাষ্ট্রসংস্কারে উড়িষ্যা নূতন প্রদেশ হইবে। কিন্তু দেশ নূতন করিয়া তখনই আসল গড়া হয় যখন জাতি জাগে। আর জাতি তখনই জাগে যখন সে ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমান বা অতীত অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া দেখে, যতই হীন হউক না তাহার বর্ত্তমান, যতই মহিমময় হউক না তাহার অতীত।



ছায়ার মায়া

শ্রীবিমল মিত্র

গাড়ী প্রস্তুতই ছিল—কেবল গিয়া বসার যা অপেক্ষা। ট্রেন ছাড়িবে রাত্রি দশটায়, এখন আটটা ত বাজিল বোধ হয়। দেড় ক্রোশ পথ। গ্রীষ্মকাল—বেশ দেখিতে দেখিতে যাওয়া যাইবে।

হরিহর প্রস্তুতই ছিল অনেক্ষণ হইতে। তাহার যে দু-একটি কাপড়-জামা, গামছাটিতে বাঁধিয়া লইয়াছে। পোঁটলাটির ভিতর একটি ফতুয়া, গোটা-দুই কাপড়, এবং সবার নীচে একটি অতি গোপনীয় বস্তু। দাদাবাবু যদি ওটি কোন প্রকারে দেখিয়া ফেলে তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ; আজ কুড়ি বছর-হরিহর দাদাবাবুর কাছে আছে, কিন্তু বছর-চারেক এমন গোপনে এ কাজটি সারিয়াছে, কেহ একতিল টের পায় নাই।

নন্দ গরু দু-টির মুখে বিচালী দিতেছিল।

কিন্তু বাবুর আসিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। গত দুই দিন হইতে বউয়ের হইয়াছিল জ্বর। ছেলে দু-টি লইয়া বউ কেমন করিয়া যে একা ঘরে থাকিবে, তাহা ভাবিয়া নন্দ দিশাহারা হইয়া গেল। আজ বাবুকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিয়া নগদ কিছু পাওয়া যাইবে, চাহিলে দু-এক টাকা যে বেশীও দিবেন তাহাতেও নন্দর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সময় থাকিতে তাহাকে এত আগে যে কেন মিছামিছি ডাকিয়া আনা।

গরু দু-টি বিচালী চিবাইতেছিল। নন্দ পৈঠার উপর উঠিয়া বসিল।

বাড়ির সম্মুখে বাগান। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এই জমীদার-বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষ ওইখানে কবে কয়েকটা আম ও কাঁটালের চারা পুঁতিয়াছিলেন, আজ সেগুলি বাড়িয়া বনে পরিণত হইয়াছে। গাছগুলি বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সখ্যতা যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে; এ উহার ডালপালার সহিত নিজের শাখা-প্রশাখা অসঙ্কোচে মিলাইয়া দিয়া আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। গাছগুলির তলায় দাঁড়াইলে আকাশ আড়ালে পড়ে। বাগানের আয়তন এক বিঘাও নয়, কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলে মনে হইবে জঙ্গলের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। ওরই তলা দিয়া রাস্তা, বাড়ির সদর দরজা হইতে বাগানের গেট পর্য্যন্ত একদিন ভাল করিয়া খোয়া দিয়া সে রাস্তা তৈরি করা হইয়াছিল। কিন্তু আজ দাদাবাবুর অযত্নে লালরংটুকু ছাড়া আর কিছুরই চিহ্ন নাই। দরকার হইলে ঐ পথ দিয়া গরুর গাড়ী আসিয়া বাগানে ঢোকে···আবার নিঃশব্দে চলিয়া যায়। গাছগুলির তলায় আশশ্যাওড়া, ঘেঁটু আরও কত কি বুনো গাছ জন্মাইয়াছে। দিনের বেলায় ছায়াশীতল জায়গাটি বেশ লাগে, কিন্তু রাত্রে ওই বাগানটিই আবার অরণ্য বলিয়া ভ্রম হয়।

উত্তর-পুব কোণাকুণি মাথার উপর যে জায়গাটি খালি আছে সেখান দিয়া আকাশের খানিকটা নজরে পড়ে; হরিহর সেইদিকে চাহিয়া বলিল—এটা কেষ্টপক্ষ না নন্দ?

সংবাদটি যেন নন্দ জানিত না, কিংবা এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল, এইবার যেন তাহা মনে পড়িল, এমনি ভাবে নন্দ পৈঠা ছাড়িয়া একেবারে হরিহরের কাছ ঘেঁষিয়া বসিল।

বলিল,—ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে—ভুলেই গিয়েছিলুম একেবারে—

হরিহর দেয়াল হেলান দিয়া বসিয়াছিল। বলিল—কেন বল দিকিন্?

নন্দ বলিল—না কিছু নয়—

হরিহর কিছু বলিল না। দাদাবাবু যে এখনও কেন নামিতেছে না, তাহা সে বুঝিল না। কুড়ি বছর সে দাদাবাবুর কাছে আছে, তাহাকে চিনিতে তাহার আর বাকি নাই।

দাদাবাবু তখন ছোট, হরিহর তাহাকে লইয়া ঐ আম-কাঁটালের বাগানের তলা দিয়া কতদূর বেড়াইতে লইয়া গিয়াছে। নদীর তীরে খেয়াঘাটের ধারে—দাদাবাবুকে বসাইয়া হরিহর গান শিখাইত। রোজ একটি করিয়া নূতন গান তাহার পাওয়া চাই-ই, এ ছিল দাদাবাবুর নিত্যকার বরাদ্দ।

একটা দিনের কথা মনে আছে।

ভাদ্রের নদী তখন জলে ছকূলে ভরিয়া গিয়াছে। খেয়ার নৌকা ঘাট ছাড়িয়া একেবারে পটল-উচ্ছের ক্ষেতের উপর আসিয়া যাত্রী তুলিয়া লইয়া যায়।

হরিহর দাদাবাবুকে লইয়া ক্ষেতের কাছাকাছি একটা জায়গায় বসাইয়া গান শিখাইতেছে—হঠাৎ কোন্ ফাঁকে হরিহরের অসাক্ষাতে দাদাবাবু ছুটিয়া গিয়া পড়িয়াছিল একেবারে জলের উপর। তারপর উমেশ মাঝি ছিল তাই রক্ষা।

দাদাবাবুর বাবা তখন বাঁচিয়া ছিলেন। আদেশ হইল হরিহরের শাস্তি হইবে পঁচিশ ঘা বেত! জমিদার-বংশের একমাত্র ছেলে যদি ডুবিয়াই যাইত!

সে বেতের দাগ আজ মিলাইয়াছে; আজ কেন সেই দিনই সে দাগগুলি সব মুছিয়া গিয়াছিল—যখন দাদাবাবু আসিয়া বলিয়াছিল, খুব লেগেছে বুঝি হরিদা?

দাদাবাবুর সে কথায় সকলের অলক্ষ্যে হরিহর তাহাকে কোলে তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া অজস্র চুমা খাইয়াছিল।

সেদিন সে রাগ করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেই পারিত, কিন্তু যায় নাই। দেশে তাহার যাহারা ছিল অজয়ের ভাঙনে কোথায় তাহারা চলিয়া গিয়াছে; তাহার স্ত্রীর আর কোনও খোঁজ মেলে নাই। কিন্তু তাহার ছোট ছেলেটি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া উঠিয়াছিল এই জমিদার-বাড়িতে বুঝি তাহার দাদাবাবু হইয়া। এই দাদাবাবুই তাহার বন্যায় ডুবিয়া যাওয়া ছেলে।

নন্দ তখন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে।

বলিল,—দেখ না হরিহর ওপরে গিয়ে—বাবুর দেরি কত। আমি না-হয় তা হ'লে একটু ঘুরে আসতাম—বউটার জ্বর, বিকারের ঝোঁকে গোঙাচ্ছে দেখে এসেছি।

হরিহর বলিল—বাপ্‌রে, দাদাবাবু এখন নায়েব-মশায়ের সঙ্গে কথা কইছে, এখন কি সেখানে যাওয়া যায়? তা তুমি বরং ততক্ষণ ঘুরে এস—বুঝেছ নন্দ—যাও—এই ত বাড়ি, দু-পা-ও নয়।

—তাই যাই, যাব আর আসব।

নন্দ গরু দু-টিকে জোয়ালের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আম-বাগানের পথে না গিয়া, বাঁ-দিকের ছোট দরজা দিয়া গেল। যাইবার সময় হরিহরকে বলিয়া গেল—সাবধানে থেকো হরিহর—কেষ্টপক্ষের রাত, এ তোমার শহর কলকাতা নয়।

হরিহর একবার গিয়া চুপি চুপি দেখিয়া আসিল।

দাদাবাবু তখনও নায়েব-মশায়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে। আস্তে আস্তে হরিহর দরজাটি খুলিতেই কথা বন্ধ হইয়া গেল।

হরিহর বলিল,—আটটা বাজল যে দাদাবাবু, দশটায় ট্রেন—আজ যাবে ত।

ভবানীশঙ্কর বলিল,—যাব বৈকি হরিদা। কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে বল নন্দকে—নায়েব-মশায়ের সঙ্গে ছুটো বিশেষ কথা আছে।

হরিহর চলিয়া আসিল। আসিয়া সেই জায়গাটিতে আবার বসিল। বহুদিন পরে আবার সে এই দেশে আসিয়াছে। আজই এখন আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই চলিয়া যাইবে, আর হয়ত কখনও এখানে আসা ঘটিয়া উঠিবে না, কারণ দাদাবাবু ত জমিদারী দেখা প্রায় একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছে, নায়েব-মশাই-ই যা করেন।

এই ভবানীশঙ্কর আজ না-হয় বড় হইয়াছে, কিন্তু তাহারই হাতে একরকম মানুষ ত? গিন্নীমা ত তাহারই হাতে দাদাবাবুকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বছর-চারেক পূর্ব্বে একদিন এমনি সময়ে এই বাড়িতে কত ধুম, কত উৎসব, কত আনন্দ চলিয়াছিল—সেদিন ভবানীশঙ্করের বিবাহ। নূতন বধূও আসিয়া কিন্তু হরিহরকে কম স্নেহ করে নাই। হরিহর বলিয়াছিল—বউমা, তুমি আমার মেয়ে হ'লে আজ থেকে, কেমন?

হরিহর ছিল সংসারেরই একজন।

অতবড় জমিদারী আজ কোথায় সব একে একে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভবানীশঙ্কর পৃথিবীতে একলা—বাবা গিয়াছেন—মাও নাই—আত্মীয়-স্বজনেরাও অসময়ে কে কোথায় সরিয়া গেল। কিন্তু তাহারও কারণ আছে।···যাহার জন্ত জমিদারী—যাহার জন্ত ভবানীশঙ্করের সব—সেই মাধুরীও তাহাকে ছাড়িয়া গেল। তবে আর সুখ-সম্পদ কিসের জন্তই বা!

হরিহর তখন দাদাবাবুর সঙ্গে কলিকাতার পথে নৌকায় করিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে খবর আসিয়াছিল বধূমাতা আর নাই। সে খবর পাইবার পর ভবানীশঙ্কর আর জমিদারীতে ফেরে নাই। আজ চার বছর পরে আবার তাহারা এখানে আসিয়াছে···পুরানো দিনের কথা আবার সব হরিহরের মনে পড়িতে লাগিল।

ঐ যেখানে জঙ্গল, আমবাগানের বন—ঐখানেই ওই বড় কাঁটালগাছটির তলায়—হরিহর কতদিন ঘুম ভাঙিয়া দেখিয়াছে দাদাবাবু কতরাত্রে বউমাকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সারা বাড়ি তখন ঘুমে অসাড়—কাহারও জাগিয়া থাকিবার কথা নয়; বউমার মসৃণ শাড়ীর প্রান্ত চঞ্চল হাওয়ায় উড়িয়া খুশীর তরঙ্গ তুলিতেছে। আর দাদাবাবু তাহার হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে কত কথা কহিয়া চলিয়াছে—অবিরাম অন্তহীন! সে সব কথা হরিহর শুনিতে পায় নাই, শুনিবার চেষ্টাও করে নাই—শুধু মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছে।

হরিহর দেখিল আলো লইয়া কে একজন এদিকে আসিতেছে।

কাছে আসিতেই চিনিতে পারা গেল—আর কেহ নয়, নন্দ।

কাছে আসিয়া নন্দ বলিল,—লম্পটা নিয়ে এলাম—বুঝলে হরিহর, কেষ্টপক্ষের রাত, বলা ত যায় না।

হরিহর জিজ্ঞাসা করিল,—বউ তোমার কেমন আছে দেখলে নন্দ?

নন্দ বলিল—মাথার কাছে জলের ঘটী রেখে এলাম, জ্ঞান হ'লে যদি তেষ্টা পায়, খাবে'খন, ছেলে ছুটোকেও ঘুম পাড়িয়ে এসেচি, এখন ছু-ঘণ্টার মত নিশ্চিন্দি ত।

তারপর হঠাৎ গলার স্বর বদলাইয়া বলিল—তামাক-টামাকের ব্যবস্থা আছে, হরিহর? এ ক'দিন বউয়ের অসুখের জন্তে আর কিছু পেটেই যায়নি—গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল যে।

হরিহর হঠাৎ নন্দর মুখের কাছে হাত দিয়া বলিল,—চুপ চুপ, সর্ব্বনাশ করলে তুমি—তারপর পিছনে ফিরিয়া কান পাতিয়া কি যেন শুনিল; বলিল,—যাক বাঁচা গেল, কেউ শুনতে পাই নি, শুনতে পেলে দাদাবাবু কি আর রাখত আমায়।

নন্দ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

হরিহর ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—আছে সব—কলকে টিকে তামাক হুঁকো সব, দেখবে?

বলিয়া পিছন দিকে একবার চাহিয়া লইয়া হরিহর অতি সন্তর্পণে সেই পোটলাটি খুলিল। তারপর ফতুয়া ও ছু-খানি কাপড় সরাইয়া সেই অতি গোপনীয় বস্তুগুলি বাহির করিয়া হরিহর নন্দকে দেখাইল।

—দেখলে? আছে সব; লুকিয়ে লুকিয়ে খেও, কিন্তু দাদাবাবু টের পেলে আর এক অনর্থ বাধাবে, তা তোমায় জানিয়ে রাখছি।

নন্দও অস্বীকার করিল না। বলিল—অনর্থ বাধাবারই কথা যে। বাবুদের নাকে কি আর এই কড়া তামাকের গন্ধ সয়, বাবুদের বিড়ি হলেই সুবিধে।

হরিহর বুঝাইয়া বলিল,—তা নয় নন্দ, শোন তবে, দাদাবাবুই কি এই রকম ছিল নাকি ভেবেছ? কৌটো কৌটো সিগারেট ফুঁকেছে তখন, সে ত তোমরা দেখনি, কিন্তু এখন সে-সবের নামগন্ধও নেই, বউমা ও-সব পছন্দ করতেন না কি-না। তিনি মারা যাবার পর বাড়িতে ও-জিনিষ কেউ খেতে পায় না, কিন্তু আমি পারিনি নন্দ··· ছেলেবেলার অভ্যেস, একি আর একদিনে যাবার?

কথাটা বলিল বটে, কিন্তু হরিহর সত্যসত্যই লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল,—এদিকে সরে এস দিকি নন্দ, বলিয়া নন্দকে লইয়া হরিহর একটু কানাচে গিয়া বসিল।

বলিল,—এই নাও তামাক টিকে, সাজোদিকি, ভাল ক'রে—ঠিকরে দিয়ে সাজো। দাদাবাবু এখন নায়েব-মশায়ের

সঙ্গে কথা বলছে দেখে এসেছি, বেশ চুরিয়ে চুরিয়ে সাজো, কলকাতায় পৌঁছতে কাল সেই ভোর, এর মধ্যে আর তামাকের মুখ দেখতেই পাব না হয়ত।

নন্দ সাজিতে লাগিল।

হরিহর বলিতে লাগিল,—বউমা গেলেন আর এ বাড়ির লক্ষ্মীও বিদায় নিলেন—বুঝলে নন্দ, নইলে দাদা-বাবুই কি এই জন্মস্থান ছেড়ে বিদেশে বাস করে আজ! বল কার জন্তে আর এখেনে থাকা!

নন্দ তামাক সাজা শেষ করিয়া তখন লম্পতে টিকে ধরাইতেছে।

হরিহর বলিল—তিনি ত গেলেন—আমার দাদা-বাবুকে গেলেন কাঁদিয়ে—আর ত বিয়েও করলে না।

নন্দ হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিল—চলে গেলেন বলছ কেন হরিহর, আবার ত ফিরেই এসেছেন।

হরিহর বলিল—ফিরে আর এলেন কই নন্দ, যে যায় সে কি আর ফেরে, দেখছ না, এই বাড়ির কি আর এই ছিরি ছিল! ঐ যে বাগান দেখছ বনজঙ্গল হয়ে গেছে, ঐখানে তখন ছিল বাগান, শিবমন্দির ছিল—চারদিকে পাচিল দিয়ে ঘেরা সন্ধ্যেবেলা বউমা ওইখানে বেড়াতেন, চন্দ্রমল্লিকের ঝাড় থেকে খোঁপায় ফুল গুঁজে ঐ মন্দিরটার বেদীর উপর গিয়ে বসতেন, আজ ওসব জায়গা বনজঙ্গল হয়ে গেছে—এখন ত ওখানে যেতেই ভয় করে।

নন্দ বলিল—তা বনজঙ্গল হ'লই বা একটু, তাঁদের কি আসতে বাধা হয় তাতে, তিনি ত আবার ঐখানে রোজ আসেন তেমনি—ওই বন বেড়ে বেড়ে বেড়ান—দেখনি?

হরিহর বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। বলিল—কে আসেন?

নন্দ বলিল—কেন, বৌমা, জান না বুঝি, শোননি?

হরিহর সরিয়া আসিল, নন্দর চোখ মুখ পরীক্ষা করিয়া বলিল—সত্যি কথা—ঠিক বলছ?

নন্দ বলিল—নায়েব-মশাই কিছু বলেন নি? বাবুও জানেন না তা হ'লে? ও আমার কপাল—তুমিও শোন নি? শোন তবে। কিন্তু তার আগে কথা দাও, দাদা-বাবুরে বলবে না এ কথা—

হরিহর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না, সে কক্ষনো জানাইবে না।

নন্দ লম্পটিকে আরও কাছে টানিয়া চারি দিকে চাহিয়া চুপি চুপি গল্প আরম্ভ করিল⋯

আম তখন পাকিতে সুরু হইয়াছে।

ভোর না হইতে হইতেই গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা কোথা দিয়া এই বাগানে ঢুকিয়া আম চুরি করিয়া লইয়া যায়। নায়েব-মশাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াও এ চুরি রোধ করিতে পারেন নাই।

একদিন রাত্রে—কত রাত্রে তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না—নায়েব-মশাইয়ের হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে, তিনি উঠিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখেন আমবাগানের তলায় কে যেন কেবল এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; অবিকল একটি মানুষ, মাথা মুখ হাত পা সবই মানুষের মত, কোনও প্রভেদ নাই।

নায়েব-মশায়ের মনে হইল কেহ হয়ত আম চুরি করিতে ঢুকিয়াছে; চোর ধরিবার ইচ্ছায় নায়েব-মশাই আস্তে আস্তে টিপি-টিপি পায়ে গাছের তলায় গেলেন।

গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। দেখিলেন যেন এ-বাড়ির বধূমাতা একটি শাড়ী পরিয়া বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; খোঁপায় চন্দ্রমল্লিকার কুঁড়ি, পায়ে আল্‌তা—ঠিক যে-বেশে তিনি আগে বেড়াইতেন—সেই বেশ।

কিন্তু মুহূর্ত্তখানেক পরেই মূর্ত্তি যে কোথায় পলাইল তাহা তিনি টের পাইলেন না। যখন জ্ঞান হইয়াছে, তখন তাঁহার চীৎকারে পাড়ার লোক আসিয়া জড় হইল; নন্দও শব্দ শুনিতে পাইয়া আসিয়াছিল।

সেই দিন হইতে প্রতি রাত্রে সকলেই দেখিয়াছে, তিনি রোজ ঐ জায়গাটিতে আসিয়া বেড়ান; শিব-মন্দিরের বেদীটির উপর বসিয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ না-কি কান্নাও শুনিতে পাইয়াছে; এ ঘটনা সকলেই স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে তাঁহাকে নাকি বেশী স্পষ্ট করিয়া দেখা যায়;⋯রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ওখানে আসিলে যে-কেহ দেখিতে পারে।

গল্প শেষ হইয়া গেল।

হরিহর ভাবাবিষ্টের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উমার কথা তাহার আবার স্পষ্ট করিয়া মনে পড়িতে লাগিল…

সারা বাড়ি হতশ্রী হইয়া গিয়াছে—শনির কোপদৃষ্টিতে যে ধ্বংস হইয়াছে, জমিদার-মশাই বিগত, গিন্নী-মাও নাই—কিন্তু অত বড় দুর্য্যোগেও বউমার সেই চঞ্চল পদক্ষেপে, তাঁর মিষ্ট কথাবার্ত্তায় সারা বাড়িটি যেন হাসিত। সেই বউমা আবার ফিরিয়াছেন না কি ?

নন্দ বলিল,—চুপ ক'রে রইলে যে হরিহর, বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি তোমার ?

হরিহর বলিল,—কি যে বল নন্দ তুমি তার ঠিক নাই। তিনি আবার ফিরে আসবেন কি জন্যে ?—তিনি কি আর মর্ত্ত্যে আছেন ভেবেছ ?

উঁচু দিকে হাত তুলিয়া আঙুল দিয়া হরিহর দেখাইল—স্বগ্যে গেছেন তিনি।

তারপর বলিল—তা ছাড়া এই ত এখানে দুদিন আছি, একদিনও কই দেখলাম না ত! যদি আসতেন, আমাকে কি আর দেখা দিতেন না ভেবেছ ?

নন্দ বলিল—তা হ'লে নায়েব-মশাই ত মিছে কথা বলতে পারে না। তিনি কি আর মিছিমিছি বামুনপাড়ায় রাত্রিতে শুতে যান, আগে ত এখানেই শুতেন—কিন্তু ওর পর থেকে কার সাধ্যি এখানে থাকে! ও-পথ দিয়েই লোক হাঁটে না!…কিন্তু এ পর্য্যন্ত কারুর কিছু অনিষ্ট করেন নি তিনি—তাও বল্‌তে হবে বইকি!

হরিহর বলিল,—তোমাদের যত সব বাজে কথা, এ সব দাদাবাবু শোনেনি তাই—শুন্‌লে কি আর রক্ষে রাখবে, আমবাগান চষে ফেলবে; বউমাকে কি দাদাবাবু কম ভালবাস্‌ত ?

নন্দ বলিল,—চলে যাচ্ছ আজ তাই, নইলে থাক্‌লে রাত্রির বেলা দেখিয়ে দিতুম তোমায়—না দেখতে পেলে তখন বলতে হ্যাঁ নন্দ কলু মিছে কথা বলে।

হরিহর কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সিঁড়িতে জুতার শব্দ পাওয়া গেল।

সর্ব্বনাশ হইল! দাদাবাবু নামিতেছেন হয়ত!

তাড়াতাড়ি হুঁকাটি তুলিয়া শশব্যস্তে নন্দকে বলিল—রাখ রাখ কলকে রাখ—এই আসছে দাদাবাবু—শিগগীর—

কলকে লুকাইতে লুকাইতে ততক্ষণ দাদাবাবু আসিয়া পড়িয়াছে—নায়েব-মশাইও নামিয়াছেন।

হরিহর নন্দকে তাড়া দিয়া বলিল,—শিগগীর কর নন্দ, দশটায় গাড়ী—আর গরু যা তোমার—ট্রেন ধরাতে পারবে ত ?

তারপর ভবানীশঙ্করকে বলিল,—বড় দেরি হয়ে গেছে কিন্তু দাদাবাবু, এখন কি আর গাড়ী পাওয়া যাবে—তার চেয়ে ইষ্টিমারে গেলে হয় না—পীরগঞ্জের জেটিতে এগারোটায় ইষ্টিমার ছাড়ে যে একটা।

ভবানীশঙ্কর বলিল—ভাবছি হরিদা, আজ আর যাব না। কি বল ? রাতও হয়ে গেল কথা বল্‌তে বল্‌তে, কাল গেলেই চল্‌বে, সেখানে কাজ ত তেমন কিছু নেই।

—তা বেশ!

হরিহর নিশ্চিন্ত হইল। ভবানীশঙ্করের মুখের দিকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া হরিহরের কি যেন কথা মনে পড়িয়া গেল—

ভবানীশঙ্কর ঘরে ফিরিয়া আসিল। হরিদা'কে নীচের ঘরটিতে শুইতে বলিয়া আসিয়াছে, সে ততক্ষণে শুইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

মাঝরাত্রে হরিহরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। গরমে তাহার ঘাম দেখা দিয়াছে। দরজাটা খুলিতেই হাওয়ায় দেহ জুড়াইয়া গেল। কিন্তু দরজাটা তেমনি অবস্থায় খুলিয়া রাখিয়া হরিহর বাহিরে বাগানের দিকে চাহিয়া দেখে। সেখানে কে যেন এদিক-ওদিক চলাফেরা করিতেছে।…অবিকল মানুষের মূর্ত্তি…সাদা কাপড় পরা।

হঠাৎ নন্দর সন্ধ্যাবেলাকার কথাগুলি সব মনে পড়িয়া গেল। তবে ত সে মিথ্যা কথা বলে নাই!…এক বর্ণও মিথ্যা নয়।…অবিকল একটি মানুষের মূর্ত্তিই যেন

বনের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; হরিহর বিস্মিত হইয়া গেল।

একবার একটি গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—অনেকক্ষণ—তারপর আবার ঘোরাঘুরি সুরু হইল। গাছপালায় মূর্ত্তিটির হাঁটু অবধি ঢাকিয়া গিয়াছে···তবু মূর্ত্তিটি যেন ঝোপে ঝোপে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে!

অন্ধকার···ভাল করিয়া দেখা যায় না; শুধু কাপড়ের সাদা রংটুকু স্পষ্ট করিয়া ধরা যায়।

হরিহরের বুঝিতে বাকি রহিল না—এ কে!

কিন্তু বউমা কেন যে স্বর্গ ছাড়িয়া কিসের মায়ায় আবার এই পৃথিবীতে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, হরিহর তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে হইল—হয়ত দাদাবাবুকে ছাড়িয়া বউমার সেখানে থাকিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে···তাই চলিয়া আসিয়াছেন।

হরিহর ভাবিল—দাদাবাবুকে গিয়া ডাকিয়া আনিয়া দেখাইবে নাকি!

মনে পড়ে একদিন ভবানীশঙ্কর বলিয়াছিল—আচ্ছা, হরিদা, তা'কে তোমার এখন মনে পড়ে?

হরিহর বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিল—কা'কে দাদাবাবু? বউমাকে ত? কেন মনে পড়বে না—খুব পড়ে···যখন ভাবি বউমার কথা চোখের জল আর রাখতে পারিনে।

ভবানীশঙ্কর বলিয়াছিল, আমরা ত তা'কে ভুলতে পারিনি—পারবও না—সে তবে কি ক'রে আমাদের ভুলে আছে?

ভুলিতে যে পারে নাই তাহা আজ প্রমাণ হইয়া গেল। কিন্তু দাদাবাবুর এখন ঘুম ভাঙাইবার দরকার নাই। কাল সকালে বলিলেই চলিবে।

হরিহর চাহিয়া দেখিল—বাগানের উত্তর কোণে বেদীটার উপর বউমা বসিয়া আছেন—সম্মুখের কাঁটাল গাছটিতে জোনাকির ঝাঁক জমিয়া খেলা করিতেছে; একটা পেঁচা চীৎকার করিতে করিতে কোথায় ওদিকে উড়িয়া গেল।

হরিহর তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া শুইতে গেল।

শুইবার ঘরটির চারিদিকে ভবানীশঙ্কর চাহিয়া দেখিল—এই ঘরটিতেই চার বছর আগে একদিন তাহার ফুলশয্যা হইয়াছিল!

নায়েব-মশাই যে কথা-কয়টি এতক্ষণ ধরিয়া বলিয়া গেলেন, সেই কথাগুলিই কেবল ভবানীশঙ্করের মনে তোলপাড় করিতে লাগিল।

—দেখ বাবা, আজ দু-দিন ত দেখ্‌লে—আর একটা দিন কি আর দেরি সইবে না—আমি নিজে চোখে দেখেছি—গাঁয়ের সব লোক দেখেছে—এতগুলো জীয়ন্ত লোক জোড়া জোড়া চোখ নিয়ে দেখলে—সবই কি মিথ্যে?

ভবানীশঙ্কর বলিয়াছিল, কিন্তু এ কি সম্ভব নায়েব-মশাই, কবে চার বছর আগে কে একজন মারা গেছে—আজ আবার সে এতদিন পরে হঠাৎ আবির্ভূত হবে—বিশ্বাস করতে যে ভরসা হয় না—আপনিই বলুন—

নায়েব-মশাই বলিয়াছিলেন—দু-দিন যখন নষ্ট করলে আজকের দিনটাও না-হয় তাই কর—তিন দিনের দিন হয়ত দেখা হ'লেও হ'তে পারে—মন যেন বল্‌ছে আজ দেখা হবেই—তবে—হরিহর একথা জানে না ত—বেশী লোক জান্‌লে আবার—

না—হরিদা আর জানিবে কি করিয়া। সে ত তাহাকে বলে নাই। কলিকাতার বাসায় নায়েব-মশায়ের চিঠি পাইয়া সেইদিনই সে চলিয়া আসিয়াছে—কেন আসিতেছে—কি বৃত্তান্ত—হরিহর তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে নাই, ভবানীশঙ্করও বলে নাই।

ভবানীশঙ্কর বিছানার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

এই ঘর এই শয্যা—সব তেমনি আছে—

মাধুরী চলিয়া যাইবার পর আর সে ইহা স্পর্শও করে নাই।

বহুদিন পরে—দীর্ঘ চার বৎসর পরে। আবার সে এই ঘরে ঢুকিয়াছে—এই শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছে, শুইয়াছে—শুইয়া শুইয়া কাঁদিয়াছে।

ভবানীশঙ্করের মনে হইল—মাধুরী যেন আবার এই ঘরেই আসিবে—পূর্ব্বেকার মত টিপি-টিপি পায় আসিয়া

একেবারে তাহার চোখদুটি জোরে টিপিয়া ধরিবে, জানিতে দিবে না সে কে !

কিন্তু তখনি ভবানীশঙ্কর মাধুরীর হাত দুটি এমন ভাবে চাপিয়া ধরিবে—আর কোনক্রমেই পলাইতে দিবে না।

বলিবে,—কেন, কেন তুমি চলে যাবে—আমার বুঝি মন কেমন করে না !

মাধুরী হয়ত লজ্জায় কৌতুকে চোখমুখ ঢাকিয়া রাখিবে—দেখিতে দিবে না—তাহার চোখের টলটলে জল—তাহাকে দেখিতে দিবে না।

ভবানীশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিবে,—এতদিন কোথায় ছিলে মাধুরী বল না—এই চারটে বছর ?

বাহিরে আকাশে মেঘ করিয়াছে না কি! তবে অন্ধকার অমন জমাট হইয়া আসিল যে !

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ;...সারা পৃথিবী নিস্তব্ধ !...শুধু বাহিরে কি একটা পোকা যেন অনেকক্ষণ হইতে গুন্ গুন্ করিতেছে—একটানা, বিরাম নাই !

দরজা অর্গলবদ্ধ ছিল—ভবানীশঙ্করের মনে হইল—ঘরে ঢুকিতে না পাইয়া কে যেন কাঁদিতেছে—রাত্রিবেলা দোর বন্ধ করিয়া দেওয়াতে সে যেন ঘুমাইবার জায়গা পাইতেছে না। দরজার পাশে বসিয়া বসিয়া অবিরাম কাঁদিতেছে—দরজা খুলিলেই উহাকে দেখা যাইবে !

হঠাৎ ভবানীশঙ্করের মনে সন্দেহ হইল—ও যদি মাধুরী হয়! মাধুরী কি তবে এখানেই থাকে না কি! এই বিছানার উপর রোজ রাত্রে শোয় নিশ্চয়।

অথচ সে একদিন একতিল সন্দেহ করে নাই—এতটুকু টের পায় নাই ত! ভবানীশঙ্কর উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিতেই বাহিরের বাতাস পথ পাইয়া তাহার চোখে মুখে ধাক্কা দিয়া একেবারে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

প্রথমে ভবানীশঙ্কর কিছুই যেন বুঝিতে পারিল না; মনে হইল—যে বসিয়াছিল সে যেন হঠাৎ তাহার দৃষ্টিশক্তিকে অন্ধ করিয়া দিয়া সেই ফাঁকে কোথায় গিয়া লুকাইল। এতটুকু জানিতে দিল না—দেখিতেও দিল না তাহাকে।

সিঁড়ির দরজায় চাবী দেওয়া আছে; নীচের লোকের উপরে আসিবার উপায় নাই, উপরের লোকেরও নীচে যাইবার অন্য কোনও পথ নাই।

ভবানীশঙ্কর প্রত্যেকটি ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল।

পলাইলে কোথায় আর পলাইবে—উপরের এই ক'টি ঘরের মধ্যেই কোথাও লুকাইয়া থাকিবে নিশ্চয়ই !

কতদিন এগুলি ব্যবহার হয় নাই—পুরানো ঘরগুলির ভিতর চামচিকার আড্ডা জমিয়াছে—এক একটি ঘরে আলো লইয়া যাইতেই চামচিকার দল ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িতে সুরু করিয়া দেয়।

খাটের নীচে, আলমারীর উপর, কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না...একে একে তিনটি ঘর দেখা হইল—কোনওটিতে নাই। আরও একটি ঘর এখনও বাকী !

ভবানীশঙ্করের মনে হইল—মাধুরী তাহার সহিত ছলনা করিতেছে না কি! এইবার নিশ্চয় এই ঘরটিতে তাহার দেখা মিলিবে; মিলিবেই মিলিবে—কোনও সন্দেহ নাই আর।

ঘরটির দরজা খুলিতেই ভবানীশঙ্কর বিস্ময়ে আনন্দে একেবারে বিভোর হইয়া গেল।

দূরে দাঁড়াইয়া মাধুরী ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছে—যে-হাসি সে চার বছর পূর্ব্বে হাসিত। চার বছর পূর্ব্বে যে শাড়ী পরিত সেই শাড়ী—যে-চুড়ী পরিত সেই চুড়ী—মাথায় সিঁথির সিন্দুররেখা চার বছর পূর্ব্বেকার মত তেমনই উজ্জ্বল।

ভবানীশঙ্কর চট করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল !

বলিল,—কোথায় ছিলে মাধুরী এতদিন ?...এই চারটে বছর—বল না ?

মাধুরী দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল,—বা রে—এখানেই ত ছিলুম—তোমরা কি আমায় দেখবার চেষ্টা করেছ কোনও দিন ?

ভবানীশঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল,—এখানে ছিলে ? এই বাড়িতে ?

মাধুরী বলিল—হ্যা গো—যেখানে তুমি এখন শোও ঐখানে শুতাম; এত দিন পরে আবার বুঝি মনে পড়ল আমাকে ? সেই যে কলকাতায় গেলে—বলেছিলে চার

দিনের মধ্যে আসব—এই বুঝি তোমার চার দিন ?…চার বছর আমি এখানে বসে বসে দিন গুণছি যে—

আশ্চর্য্য ! সেই পুরান কথা আবার মনে পড়িয়া গেল !

চার বছর পূর্ব্বে একদিন হরিহরের সঙ্গে কলিকাতায় যাইবার পথে রূপনারায়ণের মুখে খবর আসিয়াছিল—বধূমাতা আর নাই। সে কি তবে ভুল খবর ? অথচ সেই খবরেই সে বিশ্বাস করিয়া আর দেশে ফেরে নাই, কলিকাতাতেই রহিয়া গেছে, জমিদারী জলাঞ্জলি দিয়াছে, ভাবিয়াছে মাধুরীই যখন নাই, তখন আর-সব না থাকিলই বা!

অনুশোচনায় ভবানীশঙ্করের মুখ কালো হইয়া উঠিল। বলিল,—কিন্তু দেখ ত—আমারই বুঝি কিছু কষ্ট হয়নি ?… তোমার জন্তে ভেবে ভেবে রাতে ঘুমই হয় না যে…

মাধুরী তেমনই অভিমানমিশ্রিত কণ্ঠে বলিল,—আমার জন্তে যা ভাব সে আমি জানি—তাই ত যে দু-দিন এসেছ এখানে একদিনও রাতে ঘরে শোও না… বাগানে গিয়ে ঘোর—কেন কা'র কথা ভাব বল দিকিনি ?

ভবানীশঙ্কর কি বলিবে ?

সে যে তাহাকেই ভাবে তাহা সে কি এখনও বুঝে নাই ? বলিল,—আর কক্ষনো করব না মাধুরী—কিন্তু তুমি আর পালাবে না বল—সত্যি বল—আমার গা ছুঁয়ে বল।

হাসিতে হাসিতে মাধুরী বলিল—আমি আবার পালিয়েছিলুম কবে ? তুমিই ত আমাকে জ্বর-অবস্থায় ফেলে কলকাতায় পালিয়েছিলে—মনে নেই ?

হাসি আসিল। ইহার সহিত কথায় ভবানীশঙ্কর কোনও দিনই পারে নাই—আজও যে পারিবে না তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে ?

মাধুরী বলিল,—আচ্ছা, আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, হাত ছাড় আগে ?

ভবানীশঙ্কর হাত ছাড়িয়া দিতেই, মাধুরী দৌড়িয়া ঘরের বাহিরে কোথায় পলাইয়া গেল!

ভবানীশঙ্করও পিছনে ছুটিল! ছুটিয়া যাইতে গিয়া দরজায় তাহার মাথাটি সজোরে ধাক্কা লাগিয়া গেল; মাথার খানিকটা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

সেইখানে বসিয়া পড়িয়াই ভবানীশঙ্কর চীৎকার করিয়া ডাকিল—মাধুরী মাধুরী,…

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই ভবানীশঙ্কর চাহিয়া দেখে সে খাট হইতে পড়িয়া গিয়াছে। মাধুরী নাই!

টেবিলের উপর ল্যাম্পটি জ্বলিতেছে—মাধুরী কোন্ ফাঁক দিয়া পলাইল! তবে সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে না কি ? আশ্চর্য্য!

বাহিরে রাত্রি তখন কত কে জানে! আর দেরি করিলে চলিবে না; মাধুরীকে ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

ভবানীশঙ্কর নগ্ন গায়ের উপর চাদর জড়াইয়া বাহির হইল। আজ মাধুরীকে বাহির করিতেই হইবে! গ্রামের সব লোকই দেখিয়াছে। অথচ তাহাকে না-দেখা দেওয়ার অর্থ কি ?

ভবানীশঙ্কর একেবারে বাগানে গিয়া হাজির হইল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; গাঢ় আঁধার জমিয়া জায়গাটি যেন থম্ থম্ করিতেছে। বাতাস নাই; হঠাৎ যেন মানুষের পদ-শব্দ পাইয়া ঝিঁ ঝিঁ গুলি সব স্তব্ধ হইয়া গেল।

আকাশে তারা নাই। ভবানীশঙ্কর চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারের ভিড়!…এতটুকু সাদার চিহ্ন নাই।

আস্তে আস্তে গিয়া ভবানীশঙ্কর একটা প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে নিজেকে লুকাইয়া রাখিল—মাধুরী তাহাকে দেখিতে পাইয়া হয়ত আসিবে না—ওই গেট পর্য্যন্ত আসিয়াই হয়ত ফিরিয়া যাইবে! কাজ কি! ভবানীশঙ্কর নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিল—এতটুকু শব্দ করিলেই ত মাধুরী টের পাইয়া যাইবে।

যখন মাধুরী আসিবে—এই বেদীটার উপর বসিয়া থাকিবে—কিংবা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐখানে বেড়াইবে, ভবানীশঙ্কর পিছন হইতে আচম্কা তাহাকে এমন জোরে ধরিয়া ফেলিবে—আর পলাইতে দিবে না। বলিবে—কেমন, বড় যে পালিয়েছিলে - এখন কি হয় ?

যে-গাছের আড়ালে ভবানীশঙ্কর দাঁড়াইয়াছিল সে-গাছ হইতে কতকগুলি পিঁপড়া তাহাকে একসঙ্গে এমন কামড়াইয়া দিল—আর লুকাইয়া থাকা চলিল না। তাহারা

জামার ভিতর ঢুকিয়া সারা গায়ে কামড়াইতে সুরু করিয়াছে; কামড়ের জালায় ভবানীশঙ্কর অস্থির হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আশ্‌শ্যাওড়া ঘেঁটু আর কাঠমল্লিকার বনে হাঁটু অবধি ঢাকিয়া গিয়াছে। ভবানীশঙ্কর তাহারই মধ্যে প্রত্যেক ঝোপ-ঝাড় খুঁজিয়া বেড়াইতে থাকে।

ভোরের বাতাস বহিতে সুরু করিল। ভবানীশঙ্করের মনে হইল মাধুরী আর আসিবে না।

তিন রাত্রি সে এমনি করিয়া এইখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধান করিয়াছে—তবু মিলিল না; তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে তবু মাধুরী আর আসিবে না; যে চলিয়া যায় সে কি আর আসে?

পাড়াগাঁয়ের কতগুলি কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের কথা শুনিয়া মিছামিছি সে তিনটা রাত্রি ঘুমাইতে পাইল না!

কেন, তাহার নিজেরই ত দোষ! মাধুরী যে তাহাকে দেখা দিবে না—তাহা ত সে আগেই বলিয়া গিয়াছিল।

চার বছর পূর্ব্বের কথা—

ভবানীশঙ্কর তখন জমিদারীর কাজে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছে; তাহার আহার বিশ্রাম নাই—মাধুরীকে একবার দেখিবার অবসরও তাহার কম।

সারাদিন কাছারীতে কাগজপত্র দেখাশোনা করিয়া সন্ধ্যাবেলা বাড়ি আসিতেই ভবানীশঙ্কর দেখিল—মাধুরীর অসুখ, জ্বর আসিয়াছে।

ভবানীশঙ্করকে জামা চাদর পরিতে দেখিয়া মাধুরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কোথাও যাচ্ছ বুঝি?

স্বর্ণগ্রামের মহালটা অনাদায়ে নিলামে চড়িয়াছে—তাহাকে তাহারই ব্যবস্থা করিতে সেই রাত্রেই কলিকাতায় যাওয়া দরকার।

ভবানীশঙ্কর বলিল—কিছু ভেবো না মাধুরী—একবার কলকাতায় যাওয়া বিশেষ দরকার—যাব আর আসব; চার দিনের মধ্যেই ফিরব।

মাধুরী বলিল—চার দিন?

—একটু কষ্ট ক'রে থাক—চোদ্দই নিলামের দিন পড়েছে—তারই মধ্যে ত ব্যবস্থা করতে হবে৮

মাধুরী বলিল—তোমার কি না গেলেই নয়? দেখছ না, আমি জ্বরে কাঁপছি?

ভবানীশঙ্কর বলিল—কিন্তু অতবড় মহালটাও ত তা ব'লে ছাড়তে পারি না!

মাধুরী তখন চোখ দুটি ফিরাইয়া লইয়া বলিয়াছিল—তবে তুমি মহাল নিয়েই থাক, ফিরে এসে কিন্তু আমায় আর দেখতে পাবে না—দেখে নিও—

মাধুরীর কথা অমন করিয়া সত্যে পরিণত হইবে—তখন কে জানিত? কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রূপ-নারায়ণের খালের মুখে খবর আসিয়াছিল—মাধুরী নাই। সেই দিনই ত সে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছিল—আর কখনও দেখা দিবে না সে, তবে আবার কেন সে তাহাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়াছে!

ভবানীশঙ্কর বেদীটার উপর গিয়া বসিল।

সম্মুখের কাঁটালগাছটার গুঁড়ি ঘিরিয়া কি একটা লতা উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে—পাতার ফাঁকে জোনাকির ঝাঁক জমিয়া রহিয়াছে। আগে ঐদিকে চাহিয়া চাহিয়া কতদিন ভবানীশঙ্কর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে…আজ কিন্তু সব দৃষ্টিকটু ঠেকিল। মনে হইল—উহারা মুচকি মুচকি হাসিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে; অট্টহাস্য করিতে করিতে একটা পেঁচা এদিক হইতে ওদিকে কোথায় উড়িয়া গেল।

পরদিন সকালে যাইবার কথা—হরিহর আয়োজন করিতে লাগিল।

সকালে জলখাবার দিতে গিয়া হরিহর দেখে দাদাবাবু তখনও ঘুম হইতে উঠে নাই। ভবানীশঙ্কর যে সারারাত্রি জাগিয়া কেবল সকালটুকুই ঘুমায়—হরিহর সে খবর রাখে না।

কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিল—দাদাবাবু—ও দাদাবাবু।

হরিহর সাড়া পাইল না। দেখিল—দাদাবাবুর কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে।

হরিহর আবার ডাকিল—দাদাবাবু!

এবার তাড়াতাড়ি ধড়মড় করিয়া ভবানীশঙ্কর উঠিয়া বসিল।

হরিহর বলিল—আজ সকালের গাড়ীতে যাওয়া হবে ত দাদাবাবু, নন্দকে ডাকব ?

—হ্যাঁ ডাক—বলিয়া ভবানীশঙ্কর দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। সারা গায়ে ব্যথা! দেহ যন্ত্রণায় টন্‌টন্ করিতেছে! সারা রাত্রি ঘুম নাই, উপরন্তু বিছানা হইতে পড়িয়া যাওয়া!

হরিহর বলিল—এ কি দাদাবাবু? কপাল কাটল কি ক'রে?

কাল ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা লেগেছিল। কথাটি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই কাল রাত্রের সব কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই স্বপ্ন দেখা; সেই বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান—সব!

হরিহর ততক্ষণে জলপটি লইয়া আসিয়াছে। দাদাবাবুর কপালে সেটি বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

ভবানীশঙ্কর বলিল—তুমি কিছু শুনেছ, হরিদা?

—কি শুনেছি, দাদাবাবু?

—এই তার সম্বন্ধে কিছু শোন নি?

হরিহর বিস্মিত হইয়া গেল। দাদাবাবু তাহা হইলে সব জানে না কি? বলিল—একটু একটু শুনছিলাম, নন্দ বলছিল বউমা না কি রাত্তির বেলা ওই আমবাগানে বেড়াতে আসেন।

ভবানীশঙ্কর বলিল,—আমিও তাই শুনেছি, নায়েব-মশাই তাই ত আমাকে এখানে আসতে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু ও-সব বাজে—কি বল? আমি এই তিন দিন জেগে থেকে দেখেছি কেউ আসে না—যত সব পাড়া-গেঁয়ে লোক—ওদের কথা শুনে মিছিমিছি এলুম এখানে!

হরিহর বলিল—না, দাদাবাবু, সব সত্যি, আমি দেখেছি যে কাল।

ভবানীশঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিল—দেখেছ, ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ, দাদাবাবু দেখেছি। কাল হঠাৎ রাতের বেলা ঘুম ভেঙে যাওয়াতে জেগে জেগে দেখি অন্ধকারে বাগানের ভেতর ঠিক যেন বউমা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—

ভবানীশঙ্কর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। গ্রামের সব লোক দেখিয়াছে—নায়েব-মশাই দেখিয়াছেন—হরিহরও দেখিল—অথচ সে-ই শুধু দেখিতে পাইল না—কি দোষ করিয়াছে সে? যদি একবার কখন দেখা হয় মাধুরীকে সে জিজ্ঞাসা করিবে—এমন কি দোষ করিয়াছে সে?

ভবানীশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল,—আর কি দেখলে হরিদা?

—আর কিছু দেখিনি—বউমা বেদীটার উপর বসেছিলেন—তারপর আমিও দরজা বন্ধ ক'রে শুলাম গিয়ে।

ভবানীশঙ্করের দৃঢ় বিশ্বাস হইল এ ঘটনা যখন ঘটিয়াছে সে তখন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মাধুরীকে স্বপ্ন দেখিতেছে! কেন সে অমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল—কি ভুলই করিয়াছে সে!

খানিক ভাবিয়া ভবানীশঙ্কর বলিল,—আচ্ছা হরিদা—ভাবছি আজ আর গিয়ে কাজ নেই। আজ রাত্তিরটাও না-হয় দেখে গেলে হয়। একবারটি তা'কে দেখা চাই-ই যে! তারপর কাল একেবারে চলে যাব। আর আস্‌ব না—

হরিহর বলিল—তা বেশ!

ভবানীশঙ্করের এখন মনে হইল—হয়ত সত্যই মাধুরী আসে—রোজই আসে—আসিয়া বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সবই সত্য হয়ত! নায়েব-মশাই হয়ত সত্য কথাই বলিয়াছেন—যাহাদের সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়াছিল তাহারা হয়ত তাহা নহে—তাহারা মিছামিছি মিথ্যা কথা বলিতে যাইবে কেন?…তাহাতে তাহাদের লাভ?

যাহা যাহা সে শুনিয়াছে সবই সত্য—কেবল মাধুরী তাহাকে দেখা দিবে না—এই যা!

ভবানীশঙ্কর ঠিক করিল—আজ আর সে নিজে না গিয়া হরিদা'কে বাগানে পাঠাইবে। হরিদা যেমন করিয়া হোক্—তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া একবার শুধু দেখাইবে। তারপর সে যেখানে খুশী চলিয়া যাক্—এতটুকু বাধা দিবে না সে। শুধু একবারটি দেখিবে তাহাকে। কিংবা শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবে, জিজ্ঞাসা করিবে—এমন কি দোষ করেছি মাধুরী—যে এত বড় শাস্তি আমায় দিলে?

নিত্যকার মত নিয়মিত সময়েই সন্ধ্যা আসিল। যেন আসিবে না আসিবে না করিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকে আসিতে হইল। চার বৎসর পরে কত সাগর নদী মাঠ পার হইয়া তবে আসিল। ভবানীশঙ্করের বিবাহ হইয়াছিল যে সন্ধ্যায়—এ যেন সেই সন্ধ্যা! দিন যে এত দীর্ঘ হইতে পারে—চার বৎসর পরে আজ তাহার নূতন করিয়া সে কথা মনে পড়িল। সেদিন সন্ধ্যায় যে বধূ হইয়া আসিয়াছিল, আজ ভবানীশঙ্করের অন্তরে সে বধূরূপেই আছে—তবে আসিবে কি না কে জানে!

আজ ভবানীশঙ্কর ঘুমাইয়া পড়িবে না কিছুতেই! সন্ধ্যাবেলাই হরিদা'কে পাঠাইয়া দিয়াছে—বলিয়া দিয়াছে—তা'কে ব'লো হরিদা—একবারটি শুধু দেখব তা'কে—একবারটি!

হরিহর চলিয়া গেল।

এক একটি প্রহর কাটে, ভবানীশঙ্কর নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ছাড়ে। জানালা খুলিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিতে ভবানীশঙ্করের বার-বার ইচ্ছা হয়! কিন্তু যদি মাধুরী তাহাকে দেখিয়া ফিরিয়া যায়—কাজ কি!

সাদা দেওয়ালের উপর চোখ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে—মাধুরীর একটা ছবিও নাই যে দেখিয়া চোখ জুড়াইবে।

হঠাৎ ভবানীশঙ্করের নজরে পড়িল—আলমারীর পাশে একটা কালির আঁচড়; মনে পড়িল—ও-দাগটি মাধুরীরই হাতের দেওয়া!

এমনি এক রাত্রিবেলা ভবানীশঙ্কর জমিদারীর গোটাকতক দরকারী দলিলপত্র লইয়া এই ঘরে বসিয়া দেখিতেছিল; মাধুরী শুইতে আসিয়াছে—সেদিকে তখন তাহার নজরও নাই!

পিছনে মাধুরী আসিয়া বলিল—আজ বেড়াতে নিয়ে গেলে না যে বড়?

ভবানীশঙ্কর বলিয়াছিল—দেখছ না, কত কাজ আমার—তোমায় নিয়ে শুধু বেড়ালেই ত চলবে না—

—তা ব'লে সারাদিনই বুঝি কাজ করবে? এস আর লিখতে দিচ্ছি না—বলিয়া মাধুরী তাহার হাত হইতে কলমটি কাড়িয়া লইয়াছিল।

ভবানীশঙ্কর হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিয়াছিল—দাও—দাও—কি ছেলেমানুষী কর যে—এ সব কাজ নায়েব-মশায়ের হাতে ছেড়ে দিলে কি হয়? নিজে দেখতে শুনতে হয়—দাও—

মাধুরী তবুও কলম দেয় নাই।

ভবানীশঙ্কর বলিয়াছিল—দাও—লক্ষ্মীটি—রঘুনাথপুরের ও-দলিলগুলো কালই সকালে দাখিল করা চাই যে—

—হাঁ, দাখিল করাচ্ছি তোমায়—বলিয়া মাধুরী কলমের ডগাটি ওই দেয়ালের ওই জায়গাটায় এমন জোরে ঘষিয়া দিয়াছিল—নিব ভোঁতা হইয়া গিয়াছিল—আর লিখিবার উপায়ই রাখে নাই।

ভবানীশঙ্কর উঠিয়া গিয়া ভাল করিয়া দাগটি দেখিল। দাগটি হাত দিয়া ছুঁইল; উহাতে হয়ত মাধুরীর হাতের স্পর্শ আছে!

কাল হরিহর দেখিতে পাইয়াছে—আজও সে দেখিতে পাইবে নিশ্চয়। মাধুরী আসিবে, আসিবেই ঠিক।

আসিলে ভবানীশঙ্কর বলিবে—বড় রাগ হয়েছিল—না? হরিদা গিয়ে ডেকে নিয়ে এল তাই এলে—আর আমি যে তিন রাত জেগে জেগে ওখানে ঘুরেছি—তখন ত কই আসনি?

মাধুরী তখন হয়ত বলিবে—তুমি তিন রাত ঘুরেছ, আর আমি যে চার বছর ধ'রে ওইখানে ঘুরছি—তোমরা কেউ এসে খোঁজ নাওনি!

ভবানীশঙ্কর তখন কি বলিবে?

এইবার বোধ হয় আসিবার সময় হইল। বাহিরে পায়ের শব্দও শোনা গেল।

ভবানীশঙ্কর এইবার উঠুক—না ওইখানেই বসিয়া থাকুক—ওইখানে বসিয়াই শুধু মাধুরীকে একবার দেখিবে—

পায়ের শব্দ আরও কাছে আসিয়া পড়িল। মাধুরী আসিয়া তাহাকে এমনি নির্লিপ্ত অবস্থায় দেখিবে না কি?

—দাদাবাবু?

—হাঁ খুলছি—

এতক্ষণ সে দরজাটাও খুলিয়া রাখিতে পারে নাই!

মাধুরী কি ভাবিতেছে ! এইটুকু দেরিতেই মাধুরী হয়ত চলিয়া গেল !

—কি বল—শিগগির বল—এল না ? আসতে চাইলে না ?

হরিহর বলিল—দেখা হ'ল না, দাদাবাবু—এদিকে ভোরও হয়ে গেছে—আর কি আসবার সময় আছে ?

—বুঝেছি !

সে হরিদা'কেও দেখা দিতে পারিল আর তাহার উপরেই এত অভিমান ! হরিদা যে তাহাকেই রাত্রে মাধুরী ভাবিয়া ভুল করিয়াছে এ সন্দেহ ভবানীর একবারও হইল না।

ভবানীশঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। তিন রাত্রি না হয় সে মিছামিছি ভুল করিয়া জাগিয়া কাটাইয়াছে—তা বলিয়া হরিদা'র কথা শুনিয়া কেন সে আবার চতুর্থ রাত্রি জাগিয়া রহিল ? সে ত আগেই জানিত—মাধুরী আসিবে না—শতাব্দীর পর শতাব্দীর চলিয়া যাইবে—তবু তাহাকে দেখা দিতে মাধুরী আসিবে না !

ছিঃ ছিঃ—আজ রাত্রিটা ঘুমাইলে কাজ দেখিত !

বলিল—হরিদা, নন্দকে গাড়ী আনতে বল গে—আজই যাব—কত কাজ পড়ে আছে সেখানে !···

হরিহর বলিল—শুনছিলুম নন্দর বউয়ের অসুখ নাকি বেড়েছে। সে কি আর আসতে পারবে ?

ভবানীশঙ্কর ফিরিয়া দাঁড়াইল—অসুখ ? না না, তবে থাক। নন্দকে ডেক না, অন্য কাউকে ডাক—

জগতের আর কোন স্বামীকে ভবানীশঙ্কর তাহাদের স্ত্রীর রোগশয্যা হইতে ছিনাইয়া লইবে না। একদিন মাধুরীকে রোগশয্যায় ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া যে-শাস্তি সে পাইয়াছে, সে-শাস্তি জগতের আর কোন স্বামীই যেন না পায়। সে-শাস্তির বেদনা ভবানীশঙ্কর নিজে জানে—ভাল করিয়াই জানে যে !

চৈত্যমঠ

[বৈশাখী-পূর্ণিমা—বুদ্ধদেবের জন্মতিথি স্মরণে]

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ওগো চৈত্যমঠ,
অনাদি আঁধার রাত্রি,—তমিস্রার উদ্দাম শকট
দুরন্ত ঘর্ঘর বেগে উদগারিয়া কলুষের কালি,
পঙ্কিল সুড়ঙ্গপথে ছুটেছে বাজায়ে করতালি
কঙ্কালের,—মানব-শোণিতে যেথা রঞ্জিত উত্তরী
মহেশের ! চলে লীলা সংহারের ; স্তম্ভিত শর্ব্বরী।
সহসা ধরেছ বল্গা, রোধিয়াছ তা'রে অর্দ্ধপথে
হে করুণাঘন রূপ, বিশাল নয়নপ্রান্ত হ'তে,
চকিত বন্যায় যেন নামিল প্রেমের অশ্রুধারা,
গভীর সুন্দর স্নেহে, উদ্যত কৃপাণ লক্ষ্যহারা।
উদার ধর্ম্মের রূপ, সঘন সংঘের সেই ধ্বনি,
শুনিছে তারকা-তৃণ, স্পন্দমান অম্বর-ধরণী !

*

ওগো চৈত্যমঠ,
প্রাণের মঞ্জুষামাঝে রেখে দিলে অমিত সম্পদ্
বুদ্ধের নির্ব্বাণ-মহাবাণী !—রেখেছি সঞ্চিত করি
তা'রে আমি, চেতনাগহনতলে,—জীবন-বাঁশরী
যেখানে মুখরি উঠে। বৈশাখের চম্পার কাননে,
সে-বেদনা রহে জাগি সুকুমার সন্ধ্যার কিরণে
অম্লান মধুর প্রেমে। সিন্ধুতীরে বন-বিহগীরা
ধরেছে করুণ তান। নীলিমার মৃদঙ্গ-মন্দিরা,
সমাধির মহামন্ত্রে চকিতে হ'ল যে বাণীহারা।
তোমার সম্বোধি সে যে শক্তির বিপুল প্রাণধারা—
দেবতার জপমাল্যে চূর্ণ যেন স্খলিত নূপুর,
—রূপালি স্রোতের লীলা, নৃত্যপরা নটেশ-বধূর !

*

ওগো চৈত্যমঠ,
তথাগত-তপস্যার ছায়া-রূপ, হে কীর্ত্তি মহৎ,
ব্রহ্মাণ্ড-অম্বর ভেদি ঊর্দ্ধশির তুলেছ তোমার—
আত্মার সন্ধান করি। নিশীথিনী করে নমস্কার।
বৈশাখী-পূর্ণিমা তিথি নেমে এল ধরার অঙ্গনে,
কি মহা জনম-রাত্রি, রোমাঞ্চিয়া উঠিল গগনে।
মেরু হ'তে অন্তরীক্ষে পরিব্যাপ্ত করিল মহিমা—
জর্জ্জর জীবনে যেন হোমাগ্নির আলোক-প্রতিমা
পলকে উঠিল জাগি। শোনা গেল বিধুর মর্ম্মর,
সিংহল-দ্বীপের দূর বুদ্ধ-তপোবনে। এ অন্তর,
কর্পূর-পরাগে যায় চন্দনের স্নিগ্ধ মাধুরীতে,
মুহূর্ত্তে ভরিয়া দিল। নবজ ফুলের সুরভিতে,
নিঃশ্বাসে পশিল মোর সে মধুর স্পর্শ অভিরাম—
বৈরাগী ভিক্ষুর বাণী !—তাই মোর রহিল প্রণাম।

গ্রীক জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

মিলেটাসের থালেস-প্রমুখ দার্শনিকত্রয়ের পর যবনদেশের প্রধান দার্শনিক পিথাগোরাস। পিথাগোরাস আনুমানিক ৫৮২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে যবনদেশের অন্তর্গত সেমস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিথাগোরাস গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে দেবতাকল্প এবং আপলো দেবের অবতার মনে করিতেন। এই কারণে পিথাগোরাসের জীবনকথার সহিত অনেক অলৌকিক কাহিনী জড়িত হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে, তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এত প্রবল ছিল যে, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি যৌবনেই ঈজিপ্ত, বাবিলোনিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। পিথাগোরাসের কোন লেখা পাওয়া যায় না এবং যে-সকল মত তাঁহার নামের সহিত জড়িত আছে, তন্মধ্যে কোন্ মত তাঁহার নিজের, কোন্ মত তাঁহার শিষ্যগণের উদ্ভাবিত, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু পিথাগোরাস যে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন এই সম্বন্ধে সমসময়ের প্রমাণ আছে। পিথাগোরাসের প্রায়-সমবয়সী ক্সেনোফানেস (Xenophanes) নামক একজন কবি ছিলেন। ইনিও যবনদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্সেনোফানেসের অনেক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি কবিতায় তিনি পিথাগোরাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"লোকে বলে, একদিন তিনি পথে একটি কুকুরকে মার খাইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'থাম, ইহাকে মারিও না; ইহার স্বর শুনিয়া আমি চিনিতে পারিয়াছি, ইহার ভিতরে আমার একজন বন্ধুর আত্মা আছে।" *

জন্মান্তর সম্বন্ধে পিথাগোরাস স্বয়ং যে ঠিক কিরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতেন তাহা বলা কঠিন। কথিত আছে এম্পেদোক্লেস (Empedocles) পিথাগোরাসের পুত্র তেলৈগেসের (Telauges) শিষ্য ছিলেন। এম্পেদোক্লেস ৪৮৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৪২৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এম্পেদোক্লেসের শুদ্ধি (Purifications) নামক দার্শনিক-কাব্যে জন্মান্তরবাদ বিবৃত হইয়াছিল। এই কাব্যের যে ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এম্পেদোক্লেসের জন্মান্তরসম্বন্ধীয় মতের পরিচয় পাওয়া যায়। খুব সম্ভব জন্মান্তরসম্বন্ধে পিথাগোরাসের এবং এম্পেদোক্লেসের মতের মধ্যে বিশেষ তফাৎ ছিল না। সুতরাং পিথাগোরাসের মতের পরিচয় দিবার জন্য এম্পেদোক্লেসের বচন উদ্ধৃত করিব—

"নিয়তির আদেশ আছে, দেবতাগণের প্রাচীন বিধান আছে, যখনই কোন দেবাত্মা (dæmon) রক্তপাত করিয়া হস্ত পঙ্কিল করে এবং পাপাচরণ করে, বিরোধ করে, অথবা মিথ্যা শপথ করে, তখন তাহাকে স্বর্গলোক ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন প্রাণীরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ৩০,০০০ বৎসর ভ্রমণ করিতে হয়। ... আমি এইরূপ একটি দেবলোকচ্যুত ভ্রমণশীল দেবাত্মা (১১৫)।

"আমি ইতোপূর্ব্বে [ক্রমান্বয়ে] বালক, বালিকা, ঝোপ, পাখী, এবং সমুদ্রের বাক্‌শক্তিহীন মৎস্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি [১১৭]।" *

এই কয়টি বচনে দেখা যাইবে, এম্পেদোক্লেসের মতে আদৌ সকল জীব দেবাত্মারূপে দেবলোকবাসী ছিল। সেখানে রক্তপাত, বিরোধ এবং মিথ্যাশপথ প্রভৃতি পাপাচরণের ফলে অনেক আত্মা দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ৩০,০০০ বৎসর নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করে। মনুষ্যজন্মে যদি দুষ্কর্ম্ম না করে, তবে—

"কিন্তু অবশেষে তাহারা ঋষিরূপে, কবিরূপে, চিকিৎসকরূপে এবং নৃপতিরূপে জন্ম গ্রহণ করে; এবং সেখান হইতে দেবতারূপে দেবলোকে আরোহণ করে। দেবলোকে [এই সকল মুক্তজীব] দেবতাদিগের সহিত আহারবিহার করে, [কিন্তু] দুঃখভোগ করে না, নিয়তির দ্বারা শাসিত হয় না, এবং হিংসা করিতে পারে না [১৪৬-১৪৭]।"

* John Burnet : *Early Greek Philosophy*, London, 1930, p. 118.

* John Burnet : *Early Greek Philosophy*; p. 224.

দেবলোকে আরোহণ করিয়া চরম মুক্তিলাভের পূর্ব্বে এম্পেদোক্লেস্ জীবন্মুক্তিও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছি; আমি তোমাদের [জনসমাজের] মধ্যে অমর দেবতারূপে বিচরণ করিতেছি।"

সুতরাং এম্পেদোক্লেসের দর্শনে জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কথা ত আছেই, হিন্দুর সাংখ্য, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির দর্শনের মত এই দর্শনে কর্ম্মবিপাকের, জীবন্মুক্তির এবং চরমমুক্তির কথাও আছে। যে-কোন হিন্দুদর্শনের সহিত এম্পেদোক্লেসের দর্শনের এই অংশের কতক কতক প্রভেদ আছে সত্য; কিন্তু জন্মান্তরবাদী হিন্দুদর্শন নিচয়ের পরস্পরের মধ্যেও এইরূপ প্রভেদ আছে। কিন্তু এম্পেদোক্লেস-বিবৃত গ্রীক জন্মান্তরবাদে এবং হিন্দু জন্মান্তরবাদে সাদৃশ্যও অনেক। এই নিমিত্ত স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্ হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুদর্শনবিৎ অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, এম্পেদোক্লেসের প্রচারিত জন্মান্তরবাদের ভিত্তি যে পিথাগোরাসের জন্মান্তরবাদ তাহার মূল হিন্দুর নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীকদর্শনের ইতিবৃত্তকারগণের মধ্যে গোম্পার্জ* ভিন্ন আর কেহ এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, এবং হিন্দুদর্শনের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অধ্যাপক কীথ এ কথা স্বীকার করেন না। এই শেষোক্ত পণ্ডিতগণের মত এই প্রস্তাবে আলোচিত হইবে।

গ্রীক জন্মান্তরবাদে যাঁহারা হিন্দুপ্রভাব অস্বীকার করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রাচীন গ্রীক লেখকগণের অভিমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই বিষয়ে প্রথম ও প্রধান গ্রীক সাক্ষ্য হেরোদোতস। হেরোদোতস যবনদেশবাসী ছিলেন এবং খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চমশতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে হেরোদোতস লিখিয়াছেন (২।১২৩)—

"এতদ্ব্যতীত, ঈজিপ্তীয়গণই প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, মানুষের আত্মা অমর; মৃত্যুকালে দেহনাশের সময় আত্মা ভূমিষ্ঠ হইতেছে এমন অন্য প্রাণীদেহে প্রবেশ করে, এবং তিন হাজার বৎসরকাল স্থল, সাগর এবং বায়ুমণ্ডলবাসী সকল প্রকার প্রাণীর দেহে বিচরণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইতেছে এমন মনুষ্যদেহে আর একবার প্রবেশ করে। সেকালে এবং একালে কয়েকজন গ্রীক এই মত নিজস্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নাম জানি, কিন্তু এখানে তাঁহাদের নাম লিখিব না।" *

হেরোদোতস এম্পেদোক্লেসের প্রায় সমবয়সী ছিলেন এবং যে ভাবে গ্রীকজন্মান্তরবাদ প্রচারকগণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন তিনি এম্পেদোক্লেসকে লক্ষ্য করিয়াছেন। হেরোদোতসের লেখা হইতে আরও অনুমান হয়, প্রাচীন অপ্রাচীন জনকয়েক জন্মান্তরবাদীকে তিনি জানিতেন, কিন্তু জন্মান্তরবাদ যে তখন কোন গ্রীক উপাসক সম্প্রদায়কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল একথা তিনি জানিতেন না। পিথাগোরাসের শিষ্যগণ এবং এম্পেদোক্লেস ছাড়া গ্রীকদের মধ্যে দিওনিসসের (Dionysos) উপাসক ওর্ফিকগণ জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিতেন। সম্প্রদায়গত বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অপেক্ষা প্রাচীনতর হইবার সম্ভাবনা, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক আধুনিক পণ্ডিত ঈজিপ্তে গ্রীক জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় হেরোদোতসের মত উড়াইয়া দিতে চাহেন এবং বলেন যে পিথাগোরাস-প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকগণ ওর্ফিকদিগের নিকট হইতে জন্মান্তরবাদের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। হেরোদোতস ওর্ফিকগণকে জানিতেন। ওর্ফিকগণ যে কোন কোন বিষয়ে পিথাগোরাসের শিষ্যগণের এবং ঈজিপ্তীয়গণের নিকট ঋণী ছিলেন হেরোদোতাস তাহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ওর্ফিকগণের মধ্যে মাটিতে কবর দেওয়ার সময় মৃতদেহ পশমের কাপড় দিয়া জড়ান নিষিদ্ধ ছিল। হেরোদোতাস লিখিয়াছেন, এই নিষেধ মূলতঃ পিথাগোরীয় এবং ঈজিপ্তীয় (২।৮১)। খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিওগেনেস লাএর্তিয়াস (Diogenes Laertius) অনেক প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গ্রীক দার্শনিকগণের চরিতমালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। পিথাগোরাসের জীবনচরিতে ইনি (৮।১৪) লিখিয়াছেন,—

---

* Gomperz, *Greek Thinkers*, Vol. I, London, 1901, p. 127.

* হেরোদোতসের সকল বচন A. D. Godley কৃত ইংরেজি অনুবাদ (Loeb's Classical Library) হইতে বাঙ্গলায় অনুবাদ করা হইল।

"He was the first, they say, to declare that the soul, bound now in this creature, now in that, thus goes on a round ordained of necessity." *

"লোকে বলে তিনিই (পিথাগোরাসই) প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, নিয়তির বিধান অনুসারে আত্মা পুনঃপুনঃ বিভিন্ন প্রাণীর দেহে আশ্রয় লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।"

যাঁহারা ঈজিপ্ত হইতে গ্রীসে জন্মান্তরবাদ আমদানীর কথা অবিশ্বাস করেন তাঁহাদের প্রধান যুক্তি, প্রাচীন ঈজিপ্তে জন্মান্তরবাদ প্রচলিত থাকার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু হেরোদোতস স্বয়ং ঈজিপ্তে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং প্রাচীন ঈজিপ্তে জন্মান্তরবাদ প্রচলিত থাকার স্বতন্ত্র প্রমাণও ইদানীং আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি (Sir Flinders Petrie) লিখিয়াছেন—

"ঈজিপ্তে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস প্রচলিত থাকার সম্বন্ধে গ্রীক প্রমাণ এত প্রবল যে, এই সকল প্রমাণ যে ঈজিপ্তীয়গণের মধ্যে প্রাণীর রূপান্তর গ্রহণের শক্তিতে বিশ্বাসমূলক তাহা মনে হয় না। [কারণ একই জন্মে দেহান্তর গ্রহণ এবং জন্মান্তর স্বতন্ত্র পদার্থ]। যে সকল গ্রীক গ্রন্থকার ঈজিপ্তে জন্মান্তরবাদ প্রচলিত থাকার কথা লিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই পারস্ত কর্তৃক ঈজিপ্তবিজয়ের [৫২৫-৫২২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের] পরবর্ত্তী। ঈজিপ্ত যখন পারস্তের পদানত ছিল সম্ভবতঃ সেই সময় সন্ন্যাস-আদি অজানা হিন্দু আচারের ন্যায় জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসও ঈজিপ্তবাসীদিগের অন্যান্য সংস্কারের সহিত মিশিয়া যাইবার অবকাশ পাইয়াছিল। পারসীক অধিকারের যুগে, আনুমানিক ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রচিত 'কোরি কোস্মোন' নামক পুস্তকে [?] জন্মান্তরবাদ পরিষ্কার ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে। তারপর হেরোদোতস, প্লাতো, থিওফ্রাষ্টস, প্লুতার্ক এবং অন্যান্য গ্রীক লেখকের পক্ষে তাঁহাদের সমসময়ের ঈজিপ্তীয়গণকে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী মনে করা অস্বাভাবিক নহে। এই সকল লেখক জানিতেন না যে, ঈজিপ্তে এরূপ বিশ্বাস নূতন আমদানী।" †

পিথাগোরাস ঈজিপ্তে গিয়াই সম্ভবতঃ জন্মান্তরবাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ফিলোস্ত্রাতুসের (Philostratus) সঙ্কলিত তিয়ানাবাসী (of Tyana) আপোলোনিয়াসের জীবনচরিতে লিখিত আছে, ভারতবর্ষে একজন ব্রাহ্মণ আপোলোনিয়াসকে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা ঈজিপ্তবাসীদিগকে আত্মতত্ত্ব (view of the soul) শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং সেই বিদ্যা গ্রীকদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন পিথাগোরাস। এই আত্মতত্ত্ব অবশ্যই জন্মান্তরবাদ। কেহ কেহ মনে করেন, আপোলোনিয়াসের এই জীবনচরিতখানি উপন্যাস মাত্র। আপোলোনিয়স-চরিত ইতিহাস হউক আর উপন্যাস হউক, জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই চরিতকার যাহা বলিয়াছেন তাহা গ্রীক পণ্ডিত-সমাজে চিরপ্রচলিত প্রবাদসম্মত। ঈজিপ্ত হইতে যদি পিথাগোরাস জন্মান্তরতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া থাকেন, তবে সেই তত্ত্ব যে ঈজিপ্তের নিজস্ব উদ্ভাবন ছিল না, হিন্দুর নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল, হিন্দুর মতামতের সহিত পরিচিত গ্রীক পণ্ডিতের পক্ষে এই অনুমান অপরিহার্য্য। ব্রাহ্মণের এবং আপোলোনিয়াসের মধ্যে কথোপকথনের সূত্রে ফিলোস্ত্রাতুস এই অনুমানই প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রীক জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রীকগণের এই চিরপোষিত মত যাঁহারা অগ্রাহ্য করেন এখন তাঁহাদের মত আলোচনা করিব। এই দলের একজন ঐতিহাসিক, ষ্টেস বলেন—

"জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস হিন্দুর বিশেষত্ব। পিথাগোরাসের সম্প্রদায় এই মত বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের নিকট হইতে এম্পেদোক্লেস এবং প্লাতো এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিথাগোরাসের সম্প্রদায় এই মত গ্রহণ করিয়াছিল ওর্ফিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতে নানাদেশ ঘুরিয়া [indirectly] এই মত ওর্ফিকগণের নিকট পহুঁছিয়াছিল। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য নহে, বিশেষ সন্দেহজনক।" *

এই লেখক (ষ্টেস) কি প্রমাণের বলে যে এই সকল সিদ্ধান্তে পহুঁছিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। আর একজন গ্রীক দর্শনের ইতিহাসকার, বার্ণেট লিখিয়াছেন—

"ওর্ফিকগণের যে সাহিত্য আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহার অধিকাংশভাগই পরবর্ত্তীকালের, এবং তাহা যে কিরূপে সঙ্কলিত

---

*R. D. Hicks : *Diogenes Laertius* (Loeb's Classical Library).

† "The Greek testimony (relating to the existence of belief in transmigration) is so strong that it seems unlikely to have all been derived from the metamorphosis. As all the authors are post-Persian, it is possible that the idea really did blend with Egyptian belief during the Persian occupation, when other Indian ideas came into Egypt, such as asceticism. Transmigration is plainly stated in *Kori Kosmon*, of the Persian period, probably about 500 B.C. After this it is natural that the Greek writers, Herodotus, Plato, Theophrastus, Plutarch and others, should ascribe the belief to the Egyptians of their times, unconscious that it was a new importation."

Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 12, Edinburgh, 1921, p. 431.

* W. T. Stace : *A Critical History of Greek Philosophy*, London, 1920, p. 17.

হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু থুরিও এবং পেটেলিয়ায় খোদিত ওর্ফিক ধর্মসম্বন্ধীয় কবিতাসহ যে-সকল সোনার পাতলা পাত পাওয়া গিয়াছে সেগুলি, যে সময়ে ওর্ফিক ধর্ম সজীব ছিল, সেই সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই সকল লিপি হইতে জানা যায়, তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত [জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধীয়] বিশ্বাসের সহিত ওর্ফিকগণের মতের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু এই সময়ে গ্রীসের উপর হিন্দুপ্রভাব অনুমান করা অসম্ভব।" *

বার্ণেট যে-সকল সোনার পাতের লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, অক্ষরের আকারের হিসাবে খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দ তাহাদের সম্পাদনকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে।† পিথাগোরাসের আনুমানিক মৃত্যু কাল ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। সুতরাং পিথাগোরাস কর্ত্তৃক জন্মান্তরবাদ প্রচারের, হয়ত এম্পেদোক্লেস কর্ত্তৃক জন্মান্তরবাদ প্রচারের অনেক পরে এই সকল লিপি সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং এই প্রমাণের বলে ওর্ফিকগণকে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে পিথাগোরাসের শিক্ষাগুরু স্বীকার করা যায় না। বার্ণেট উপরে উদ্ধৃত বচনের টীকাস্বরূপ লিখিয়াছেন—

"আমি প্রস্তাব করিতে সাহস করি, উল্লিখিত ধর্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস (জন্মান্তরবাদ) যে উত্তর দেশ হইতে গ্রীসে পহুঁছিয়াছিল, সেই উত্তরদেশ হইতেই ভারতবর্ষেও পহুঁছিয়াছিল। এই আকরক্ষেত্রকে মোটামুটি "সিথিয় (শক) নাম দেওয়া যাইতে পারে।"

অধ্যাপক কীথ্ বলেন—

"গ্রীক জন্মান্তরবাদের মূল সম্ভবতঃ থ্রেস দেশে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সম্ভবতঃ ওর্ফিকগণ এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। অনুমান হয়, ওর্ফিকগণের কতক মতকে পিথাগোরাস যুক্তিযুক্ত আকারে প্রচার করিয়াছিলেন। ... ... দিওনিসীয় কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে সময় সময় দেবতার পশুর রূপ ধারণের বিশ্বাস জড়িত ছিল। খুব সম্ভব এই প্রকার বিশ্বাস জন্মান্তরবাদে পরিণত হইয়াছে। ... ... থ্রেস দেশীয় জামোক্‌সিসের (বা জালমোক্‌সিসের) আখ্যায়িকা থ্রেসদেশে জন্মান্তরবাদ প্রচলিত থাকার পরিষ্কার প্রমাণ।" ‡

একই জন্মে রূপান্তর এবং জন্মান্তর এক কথা নহে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি সাময়িক রূপান্তরে বিশ্বাস হইতে জন্মান্তরে বিশ্বাস উৎপন্ন হইতে পারিত তবে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস দেখা যাইত।

* John Burnet: *Early Greek Philosophy*, 4th. edition, London, p. 82.

† J. E. Harrison: *Prolegomena to the Study of Greek Religion*, Third Edition, Cambridge, 1922, p. 667.

‡ A. B. Kieth: *The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads*, Cambridge, Mass., 1925, p. 606.

বার্ণেট, কীথ্ এবং রৈস প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ গ্রীক জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রবর্ত্তক গ্রীক অধ্যাত্মতত্ত্বের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আধুনিক কালের প্রধান গ্রন্থ "সাইকি" (*Psyche*) প্রণেতা রোহ্‌দে (Rohde)। রোহ্‌দের মতে, হয় গ্রীকেরা স্বাধীনভাবে জন্মান্তরবাদ উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, আর না হয় দিওনিসস উপাসক ওর্ফিকগণ এই বিশ্বাস থ্রেস হইতে গ্রীসে আমদানী করিয়াছেন।* শেষোক্ত মতটি রোহ্‌দে তাঁহার পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এখানে প্রথমতঃ এই আলোচনারই বিচার করা হইবে।

থ্রেস দেশ যে দিওনিসস উপাসনার জন্মস্থান এ বিষয়েও মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ইউরিপিদিসের "বাক্কাই" (Bacchae) নামক নাটক বেকাসের বা দিওনিসসের উপাসনা বিষয়ক প্রধান গ্রন্থ। এই নাটকের আরম্ভে দিওনিসস বলিতেছেন, তিনি লিডীয়া, ফ্রিজীয়া, পারস্য, বাক্ত্রিয়া, মিডীয়া, আরবদেশ এবং আশিয়ার অন্যান্য দেশ পর্য্যটন করিয়া গ্রীসে আসিয়াছেন। এই তালিকায় থ্রেসের নামও নাই। সুতরাং দিওনিসসের এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে অনুমান হয়, দিওনিসসের উপাসনা আশিয়া দেশে উৎপন্ন হইয়া তথা হইতে গ্রীসে পহুঁছিয়াছিল। দিওনিসস সম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক আখ্যায়িকায় থ্রেসের নাম থাকায় থ্রেসই এই উপাসনার জন্মস্থান বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু আদৌ দিওনিসসের উপাসনা থ্রেসে কি আকারে প্রচলিত ছিল এবং থ্রেসের আদিমধর্ম্ম কিরূপ ছিল, এই সম্বন্ধে অতি অল্প খবর পাওয়া যায়। অবশ্য হেরোদোতস আদি লেখকগণ থ্রেসে দিওনিসসের উপাসনা প্রচলিত থাকার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রীক লেখকগণের নিয়ম ছিল তাঁহারা বিদেশের দেবতাদিগকে গ্রীক নাম দান করিতেন। এই রীতিঅনুসারে তাঁহারা ভারতবর্ষেও দিওনিসসের এবং হেরাক্লসের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

* Rohde: *Psyche* (English translation), London, 1925, pp. 346–347.

দিওনিসস শব্দটি থ্রেস ভাষার শব্দ নহে, গ্রীক শব্দ*। থ্রেসবাসীরা যে দেবতার উপাসনা করিতেন তাঁহাদের নিজেদের ভাষায় তাঁহার নাম জালমোক্সিস (Zalmoxis) অথবা সাবাজিওস (Sabazios)। ফার্ণেল মনে করেন, গ্রীসে যেমন দিওনিসস অনেক নামে পরিচিত ছিলেন, থ্রেসেও হয়ত থ্রেসবাসীদিগের উপাস্য প্রধান দেবতার জালমোক্সিস, সাবাজিয়স প্রভৃতি অনেক নাম ছিল, এবং উহার একটি নাম ভাষান্তরিত বা রূপান্তরিত হইয়া দিওনিসস আকার ধারণ করিয়াছে।† দিওনিসস নামের ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক, রোহ্‌ডে অনুমান করেন, থ্রেসবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত গেটাই বা জেটাই (Gatae)-গণ জালমোক্সিস সম্বন্ধে এবং পরকাল সম্বন্ধে যে বিশ্বাস পোষণ করিতেন তাহা জন্মান্তরবাদ সূচিত করে। রোহ্‌ডের এই মতও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। ফার্ণেল বলেন, যে-সকল বচনের বলে রোহ্‌ডে জেটাইদিগের মধ্যে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস সপ্রমাণ করিতে চাহেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকল বচন এরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে না।* জেটাইদিগের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীনতম সাক্ষ্য হেরোদতস। আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়, হেরোদোতসের পূর্ব্বে, এবং পিথাগোরাসের পূর্ব্বে, থ্রেসবাসী কোনও গণের মধ্যে জন্মান্তরবাদ প্রচলিত ছিল কি না? যদি তাহা না থাকে, তবে থ্রেস হইতে গ্রীসে জন্মান্তরবাদ আমদানী করা হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না।

জেটাইগণ বিশ্বাস করিতেন মানুষ অমর। হেরোদোতস লিখিয়াছেন (৪।৯৪)—

"তাঁহারা (জেটাইগণ) এইরূপে প্রমাণ করেন, তাঁহারা অমর; তাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা মরিবেন না, কিন্তু যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি জালমোক্সিস নামক দেবতার নিকট গমন করেন। কেহ কেহ এই দেবতার নাম করেন গেবেলিজেস।"

তারপর, হেরোদোতস জালমোক্সিসের চরিতকথা লিখিয়াছেন (৪।৯৫)। হেরোদোতস হেলেস্‌পন্ট এবং পন্টাসবাসী গ্রীকদিগের নিকট শুনিয়াছিলেন, জালমোক্সিস এক সময় সামসে (Samos) পিথাগোরাসের ক্রীতদাস ছিলেন এবং তাঁহার প্রভুর এবং অন্যান্য গ্রীকের সহিত সংসর্গের ফলে যবন (Ionian) আচারবিচার শিক্ষা করিয়াছিলেন। জালমোক্সিস দাসত্ব মুক্ত হইয়া এবং অনেক ধন লইয়া দেশে (থ্রেসে) ফিরিয়া গিয়া একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেশের প্রধান প্রধান লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি এই মণ্ডপে তাঁহাদের ভোজের এবং আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করিতেন এবং উপদেশ দিতেন যে, তিনি স্বয়ং বা তাঁহার অতিথিগণ বা তাঁহাদের বংশীয়গণ কেহই মরিবেন না, কিন্তু (জীবনান্তে) তাঁহারা এমন একস্থানে যাইবেন যেখানে তাঁহারা চিরজীবী (অমর) হইয়া সকল প্রকার সুখ ভোগ করিবেন। জালমোক্সিস যখন এই মত প্রচার করিতেছিলেন, তখন তিনি মাটির নীচে একটি ঘর প্রস্তুত করিতেছিলেন। যখন ঘরটি তৈয়ার হইয়াছিল, তখন তিনি সহসা অন্তর্হিত হইয়া এই ঘরে তিন বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন। এদিকে থ্রেসবাসীরা তাঁহার জন্য বিলাপ করিতেছিলেন, এবং তিনি আবার ফিরিয়া আসুন এইরূপ প্রার্থনা করিতেছিলেন। তারপর চতুর্থ বৎসরে জালমোক্সিস থ্রেসবাসিগণকে আবার দেখা দিয়াছিলেন, এবং এই পুনর্দর্শনের পর তাঁহারা জালমোক্সিসের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

হেরোদোতসের এই বিবরণে অলীক কোন কথা নাই। পিথাগোরাস যখন আত্মার অমরত্বের এবং জন্মান্তরবাদের আলোচনায় এবং প্রচারে প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁহার কোন ক্রীতদাসের পক্ষে এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু জালমোক্সিস থ্রেসে গিয়া জন্মান্তরবাদ প্রচার করেন নাই, জীবনান্তে পরলোকে

---

* Rohde: *Psyche*, p. 304, note 1. ফার্ণেল (Farnell)এর মতে দিওনিসস শব্দের প্রথম ভাগ, 'দিও' বা 'দেব', আর্য্য এবং গ্রীক শব্দ; কিন্তু 'নিসস' যে কোন্ ভাষা হইতে উৎপন্ন তাহা বলা কঠিন। তবে এটি থ্রেসীয় ভাষার শব্দ নহে। ফার্ণেল লিখিয়াছেন, "If. Herodotus and other ancient writers tell us that the Thracians worshipped Dionysos or Ares or Artemis, this statement is in itself of no more value than that of Tacitus that the ancient Germans worshipped Hercules and Mercury".

† Farnell: *Cult of the Greek States*, vol. v, Oxford, 1909, pp. 93--94.

* Farnell: *Cult of the Greek States*, vol. v, p. 99 note *a*.

অনন্তজীবনের এবং অনন্তসুখের সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধান এবং পুনরাবির্ভাব পুনর্জন্মের পরিচায়ক নহে, অমরত্বের সূচক। হেরোদোতস নিজে এই গল্পটি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "জালমোক্‌সিস নামক কোন মানুষ ছিল কি-না, না ইহা জেটাইদিগের একজন দেবতার নাম মাত্র, তাহা বলা কঠিন।" তাঁহার মতে জালমোক্‌সিস পিথাগোরাসের অনেক বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। আনুমানিক ৫২৯ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পিথাগোরাস সামস ত্যাগ করিয়া ইটালীর অন্তর্গত ক্রোটন নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। জালমোক্‌সিস অবশ্য তাহার পূর্ব্বে পিথাগোরাসের দাসরূপে সামসে বাস করিয়া থাকিবেন; এবং থ্রেসে প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে। ইহার অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিক কাল পরে হেলেস্পণ্টের এবং পণ্টাসের গ্রীকেরা জালমোকসিস সম্বন্ধে যে গল্প বলিতেন তাহা অমূলক হইতে পারে না। মহাত্মা সক্রেতিস হেরোদোতসের সমসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তিনিও জালমোক্‌সিসের কথা শুনিয়াছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দের শেষ ভাগে এথেন্স এবং স্পার্টার মধ্যে যে দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম যুদ্ধ, পটিদিয় (Potidæa) যুদ্ধ, সংঘটিত হইয়াছিল ৪৩২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে। এই যুদ্ধে সক্রেতিস উপস্থিত ছিলেন। প্লাতোর 'চার্মাইদেস' (Charmides) নামক গ্রন্থের সূচনায় সক্রেতিস বলিতেছেন, "আমরা গতকল্য সন্ধ্যারাত্রে পটিদিয় সেনানিবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।"

এই গ্রন্থে উপদেষ্টা গুরু সক্রেতিস একস্থানে বলিতেছেন, এই যুদ্ধযাত্রায় তাঁহার সহিত একজন থ্রেসদেশীয় চিকিৎসকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই চিকিৎসক তাঁহাকে (সক্রেতিসকে) বলিয়াছিলেন, "আমাদের রাজা এবং দেবতা জালমোক্‌সিস বলেন, মাথার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যেমন তোমার চক্ষুর ব্যাধি আরোগ্যের চেষ্টা করা উচিত নয়, অথবা শরীরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যেমন মাথার ব্যাধি আরোগ্যের চেষ্টা করা উচিত নয়, তেমনি আত্মার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তোমার শরীরের ব্যাধির চিকিৎসা করা উচিত নয়।" মানুষবিশেষকে দেবতাজ্ঞান করা থ্রেসবাসীদিগের একটি রীতি ছিল। হেরোদোতস লিখিয়াছেন (৬।৩৮), দোলৌচি (Dolouci) নামক থ্রেসীয়গণ এথেন্সবাসী জ্যেষ্ঠ মিল্‌তিয়াদেসকে নিজেদের রাজা এবং দেবতা করিয়াছিলেন, এবং মিল্‌তিয়াদেসের মৃত্যুর পর তাঁহার উদ্দেশ্যে পূজা দিতেন এবং ঘোড়দৌড়, ব্যায়ামাদি অনুষ্ঠান করিতেন। জালমোক্‌সিসও হয়ত এই প্রকার জেটাইগণপতি ছিলেন এবং জীবিত অবস্থায়ই দেবতার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে দেবতা বলা হইয়াছে বলিয়াই যে তাঁহার পক্ষে পিথাগোরাসের সঙ্গ অসম্ভব এমন মনে করা যাইতে পারে না।

প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক স্ত্রাবো * হেরোদোতসের তিন শতাব্দ পরে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। স্ত্রাবোর লিখিত জালমোক্‌সিসের বিবরণে হেরোদোতসের ইতিহাস অনুসৃত হয় নাই, উহা স্বতন্ত্র আকর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তথাপি মূলতঃ উভয় বিবরণের ঐক্য আছে। স্ত্রাবো লিখিয়াছেন (৭।৩।৫), "কথিত আছে, জালমোক্‌সিস নামক একজন জেটাই (থ্রেসীয়) পিথাগোরাসের ক্রীতদাস ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। জালমোক্‌সিস দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া ঈজিপ্ত পর্য্যন্ত পহুঁছিয়াছিলেন এবং ঈজিপ্তবাসীদিগের নিকট হইতে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন।" জালমোক্‌সিস দেশভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার পর যখন জেটাইগণ জানিতে পারিল যে, তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি দেখিয়া ভবিষ্যতের কথা বলিয়া দিতে পারেন, তখন গণের ছোটবড় সকল লোক তাঁহার শরণাগত হইল। দেশের রাজা তাঁহাকে রাজকার্য্যের অংশীদার করিলেন। রাজার সহযোগী হওয়ার পর, প্রথমাবস্থায়, জালমোক্‌সিস দেবসেবার পুরোহিত গণ্য হইয়াছিলেন, পরে লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিত। তিনি একটি দুর্গম গুহায় বাস করিতেন, এবং রাজা ও

* H. L. Johns, *The Geography of Strabo* (Loeb's Classical Library), vol. III হইতে স্ত্রাবোর বচন সকল উদ্ধৃত হইল।

তাঁহার অনুচরগণ ছাড়া আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। লোকে বিশ্বাস করিত, জালমোক্‌সিস দেবতাগণের নির্দ্দেশ মত আদেশ প্রচার করেন; সুতরাং দেশের রাজা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন।

জালমোক্‌সিস যে পিথাগোরাসের দাস এবং শিষ্য ছিলেন একথা স্ত্রাবোও লিখিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রাবো জালমোক্‌সিস্‌কে অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রচারক না করিয়া দৈবজ্ঞরূপে পরিচয় দিয়াছেন। ইহার কারণ, স্ত্রাবোর সময়ে বোধ হয় জেটাইগণ আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি বিষয় লইয়া বড়-একটা মাথা ঘামাইতেন না, এবং তাহাদের জাতীয় দেবতা জালমোক্‌সিস যে এক সময় অধ্যাত্মতত্ত্বও শিক্ষা দিয়াছিলেন একথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। স্ত্রাবো তাঁহার সমসময়ের থ্‌রেসবাসীর মধ্যে জালমোক্‌সিসের চরিতকথা সম্বন্ধে যেরূপ প্রবাদ শুনিয়াছিলেন, তাহাই অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যে রীতি অনুসারে দৈবজ্ঞ জালমোক্‌সিস্ রাজার সহযোগী বা মন্ত্রীর পদ হইতে জীবদ্দশায়ই দেবতার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, স্ত্রাবোর সময়েও থ্‌রেসীয় জেটাই-গণের মধ্যে সেই রীতি চলিত ছিল। স্ত্রাবো লিখিয়াছেন (৭।৩।৫)—

"This custom persisted to our own time, because some man of that character was always to be found, who, though in fact only a counsellor of the king, was called God among the Gatae."

দৃষ্টান্তস্বরূপ স্ত্রাবো তৎকালের জেটাইগণের রাজা বোরেবিস্তাসের (Boerebistas) মন্ত্রী দেকেনিয়াসের (Decæneus) উল্লেখ করিয়াছেন (৭।৩।১১)। এই দেকেনিয়াসও ঈজিপ্তে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং দৈবজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন (he would pretend to tell the divine will)। অল্প সময়ের মধ্যে দেকেনিয়াস জালমোক্‌সিসের মত দেবতার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন (and within a short time he was set up as a God, as I said when relating the story of Zalmoxis)। জালমোক্‌সিসের প্রসঙ্গের উপাখ্যানভাগ একেবারে ত্যাগ করিয়া, কেবল আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যেটুকু বলা হইয়াছে তাহার বলে থ্‌রেস দেশকে জন্মান্তরবাদের উৎপত্তিস্থান স্বীকার করা যায় না। হেরোদোতসের লিখিত জালমোক্‌সিসের গল্প যদি হেলেস্পন্টের এবং পন্টাসের গ্রীক অধিবাসীগণের কল্পনাপ্রসূত হয়, তবে এরূপ কল্পনার একটা কারণনির্দ্দেশ করিতে হইবে। রোহ্‌ডে জালমোক্‌সিসের কাহিনীর কল্পনার কারণস্বরূপ লিখিয়াছেন,—

"Whoever invented this fairy tale was led to it by observing the close relationship between the Pythagorean doctrine of the soul and the Thracian belief *

"যিনিই এই আজগুবি গল্প বানাইয়া থাকুন, তিনি পিথাগোরাসের মতের সহিত থ্‌রেসীয় বিশ্বাসের নিকটসম্বন্ধ দেখিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।"

রোহ্‌ডের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি, জন্মান্তর-বাদী পিথাগোরাসের মতের সহিত জালমোক্‌সিসের গল্পে নিবদ্ধ পরলোক সম্বন্ধীয় মতের নিকটসম্বন্ধ নাই। পিথাগোরাসের মতে অবশ্য সংসারপাশ হইতে মুক্ত জীবের দেবলোকে সুখময় অনন্তজীবনের কথা আছে। কিন্তু সে জীবন লাভ করিতে হইলে মরিয়া দেবলোকে পুনরায় জন্মিতে হয়। জালমোক্‌সিসের গল্পে মরণের এবং দেবলোকে পুনর্জ্জন্মের কথা নাই, সোজাসুজি, সশরীরে দেবলোকে গমনের কথা আছে। এই স্বর্গারোহণকে পুনর্জ্জন্ম (rebirth) বলা যায় না, লোকান্তরগমন (translation) বলা যাইতে পারে। জন্মান্তরবাদীর মুক্তির সহিত এই লোকান্তরগমনের কোন সাদৃশ্য নাই; ইহার সহিত হোমরের বর্ণিত সশরীরে ইলিসীয় ক্ষেত্রে (Elysian plain) গমনের অনেক সাদৃশ্য আছে।+ গল্পের জালমোক্‌সিস সশরীরে অন্তর্হিত হইয়া আবার সশরীরেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন নাই। পিথাগোরাসের মতের সহিত থ্‌রেসীয় জেটাইগণের মতের যে সাদৃশ্যটুকু আছে তাহা ধরিতে হইলে দার্শনিক মতামতের ঐক্যানৈক্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। যাঁহার এতটা অভিজ্ঞতা আছে তাঁহার পক্ষে অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সোজা কথা না বলিয়া একটা আজগুবি গল্প ফাঁদিয়া বসা অসম্ভব মনে হয়। এই গল্প অবশ্যই

* Rohde; *Psyche*, p. 263.
† Rohde, *Psyche*, p. 55.

পিথাগোরাসের অভ্যুদয়ের পরে, পিথাগোরাসের মতের সহিত সুপরিচিত হেলেস্পন্ট বা পন্টাসবাসী কোন গ্রীক কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছিল। সেই দর্শনবিজ্ঞানের অনুশীলনের যুগে একজন সুশিক্ষিত এবং সূক্ষ্মদর্শী গ্রীক যে দুই প্রকার মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য দেবলোক হইতে টানিয়া আনিয়া জালমোক্‌সিসকে একেবারে পিথাগোরাসের দাসত্বপাশে বদ্ধ করাইয়া দিবেন ইহাও সম্ভব নহে। এরূপ আখ্যায়িকা থ্রেসীয় জেটাইগণই বা বিশ্বাস করিবে কেন। অথচ স্ত্রাবোর লেখায় দেখা যায়, জেটাইগণ এই গল্প সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তদনুসারে রাজ্যশাসননীতি নিয়মিত করিয়াছিলেন। আর যদি বলা যায়, এই গল্প কোন গ্রীকের কল্পিত নহে, গ্রীকদর্শনের সহিত সুপরিচিত কোন সুশিক্ষিত জেটাইয়ের সৃষ্ট, তাহা হইলে গল্পের মূল কথা, থ্রেসীয় অধ্যাত্মবিদ্যায় পিথাগোরাসের প্রভাবের কথা, অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সুতরাং যিনি ইচ্ছা করেন তিনি জালমোক্‌সিসের গল্প অবিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু এই গল্পের ভগ্নাংশ লইয়া থ্রেসে জন্মান্তরবাদের জন্মস্থান আবিষ্কার করা যাইতে পারে না।

জন্মান্তরবাদ যে ভারতবর্ষের বাহিরে নানাস্থানে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাবিত হইয়াছে এই মতের অনুকূলে একরূপ প্রমাণ,—জুলিয়স সীজার এবং দিওদোরাস লিখিয়া গিয়াছেন, কেল্টীয় ড্রুইডেরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন এবং আর একজন রোমীয় লেখকের মতে টিউটনেরা এরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতেন। জন্মান্তর সম্বন্ধে কেল্ট এবং টিউটনগণের মত হয়ত গ্রীস হইতে লওয়া হইয়াছিল। রোমীয় ঐতিহাসিকেরা এই সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে বেশী কিছু বলা যায় না। স্বতন্ত্রকেন্দ্রে জন্মান্তরবাদের স্বতন্ত্র উদ্ভাবনের অনুকূলে অন্যরূপ প্রমাণ,—আফ্রিকার এবং অষ্ট্রেলিয়ার কতকগুলি অসভ্য জাতির মধ্যে বর্ত্তমান কালে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস দেখা যায়। কিন্তু এই সকল জাতির বিশ্বাসে এবং গ্রীকের ও হিন্দুর জন্মান্তরবাদে অনেক প্রভেদ আছে। এই সকল জাতির লোক বিশ্বাস করে, মনুষ্যের আত্মা অন্য প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে।* কিন্তু জন্মান্তর যে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার যে উপায় আছে, এ সকল তত্ত্ব ভারতবর্ষ এবং গ্রীস ভিন্ন আর কোথাও জন্মান্তরের সহিত যুক্ত দেখা যায় না। শুধু জন্মান্তরের অনুমান ঘটনাচক্রে যেখানে সেখানে সহজে উদ্ভাবিত হইতে পারে; কিন্তু জন্মান্তর কেন হয়, এই প্রশ্নের আলোচনা এবং এই প্রশ্নের সমাধানে কর্ম্মবাদের উদ্ভাবন, এবং কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তি লাভের উপায় চিন্তন সহজ কাজ নহে, অসামান্য প্রতিভার কাজ। হিন্দু এবং গ্রীক জন্মান্তরবাদের মত অতি জটিল তত্ত্ব উদ্ভাবনের জন্য বোধ হয় একাধিক কালে একাধিক মহাশক্তিশালী পুরুষের প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছিল। অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিরাট আবিষ্কার কি একবার ভারতবর্ষে এবং পুনর্ব্বার যবনদেশে সম্পাদিত হইয়াছিল, না এক কেন্দ্রে আবিষ্কৃত হওয়ার পর, বিস্তৃতির ফলে অন্য কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়াছিল? বর্ত্তমানকালে জড়বিজ্ঞানের কোন জটিল আবিষ্কার যখন স্বতন্ত্রভাবে একাধিকবার সম্পাদিত হইতে দেখা যায় না, তখন পুরাকালে জন্মান্তরবাদের মত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এত বড় জটিল তত্ত্বের উদ্ভাবন যে একবার ভারতবর্ষে এবং আর একবার গ্রীসে স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। অবশ্যই জন্মান্তরবাদ আদৌ গ্রীসে উদ্ভাবিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় সম্বন্ধে হেরোদোতস লিখিয়াছেন, তখন গ্রীসে জনকয়েক লোক মাত্র জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন। আর প্রাচীন পালি বৌদ্ধগ্রন্থে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের আর্য্যাবর্ত্তের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, আর্য্যাবর্ত্ত তখন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসে প্লাবিত। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জন্মান্তরবাদের উদ্ভাবন একমাত্র হিন্দুর কীর্ত্তি বলিয়াই স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

---

* এই সম্বন্ধীয় বচন প্রমাণের জন্য *Encyclopædia of Religion and Ethics*, vol. 12, "Transmigration of the Soul" নামক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যাও পাখী ব'লো তারে—

শ্রীমনোজ বসু

অন্ধকারে চোখের সামনে টাকার অঙ্কগুলা যেন কিলি-বিলি করিয়া বেড়াইতেছে!

অতুল আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া আলো জালিয়া এই পঞ্চমবার দোকানের পাতড়া-বহি যোগ দিতে বসিল। দু-এক পাতা উল্টাইয়া সহসা মনে পড়িল, তোরঙ্গের মধ্যেও ত খানকয়েক রসিদ আছে—সেগুলা দেখা হয় নাই, উহার মধ্যে ঐ একাশী টাকার হিসাব থাকিতে পারে। উৎকণ্ঠাভরে তাড়াতাড়ি তোরঙ্গ খুলিয়া সমস্ত জিনিষ, টুকিটাকি কাগজ-পত্র উপুড় করিয়া মেজেয় ঢালিল। পাতি পাতি করিয়া তবু হিসাব মিলিল না। হিসাব ভাবিয়া আগ্রহে যাহা তুলিয়া লইল সেটা অনেক পুরানো একখানা চিঠি, নির্ম্মলার লেখা। খুলিয়া দেখে, চিঠিখানি সচিত্র—এক সুন্দরী গোলাপ-ফুলের গাছে চড়িয়া আকাশমুখো তাকাইয়া আছেন, আকাশে একটি উড়ন্ত পাখী, পাখীর পাখনার নীচে দিয়া দুই লাইন ছাপা কবিতা, সুন্দরীই পদ্যাকারে সেই কথাগুলি কহিতেছেন—

যাও পাখী, ব'লো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে—

বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত দিয়া অতুল সেইখানে বসিয়া পড়িল। শেষে দোকানের দরজা খুলিয়া গাঙের ঠাণ্ডা হাওয়ায় পায়চারি করিতে লাগিল।

হাট অনেকক্ষণ ভাঙিয়া গিয়াছে। গভীর রাত। গাঙে এইবার জোয়ার লাগিবে, সেই প্রতীক্ষায় ব্যাপারীরা চালার নীচে অন্ধকারে গল্পগুজব করিতেছে, কেহ-বা ওখানেই পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। ময়রাদের দোকানে গান ও তুণীযন্ত্রের বাজনার আর তেমন জোর নাই, এইবার থামিবে বোধ হয়।

পাতড়া-খাতায় গরমিল দেখিয়া শ্বশুর যে কথা-কয়টি বলিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত শান্ত এবং সংক্ষিপ্ত। অন্ধকারে পায়চারি করিতে করিতে উহা ভাবিতে গিয়া অতুলের চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিল। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ইহাই ত হইল যে ঘর আলো-করা ছেলে হইয়াছে, তোমরা মেয়েজামাই এখন আবর্জ্জনার সামিল। মনে মনে সে বারম্বার বলিতে লাগিল—আর নয়, আর নয়—অনেক হইয়াছে। এ আশ্রয়ে আর একদিন—একদণ্ড থাকা চলিবে না, এই হাটুরে নৌকাতেই বিদায় হইয়া যাইতে হইবে।...

ঘরে আসিয়া লম্বা চিঠি লিখিয়া ফেলিল।—আমি চলিলাম, আপনার টাকা চুরি করি নাই, আপনার দোকানের জন্য কি রকম প্রাণপাত করিয়াছি তাহা ভাবিয়া দেখিবেন, আপনার অন্ন গলা দিয়া ঢুকিবে না—এমনি ধরণের কত কি লিখিতে লিখিতে বালির কাগজের এক ফর্দ্দ ভরিয়া গেল। চিঠিখানা হাতবাক্সের উপর দোয়াত চাপা দিয়া রাখিয়া তোরঙ্গটি এবং কাপড় জামা চাদর পুঁটুলি করিয়া লইল। তারপর বদন ব্যাপারীর নৌকায় জিনিষপত্র রাখিয়া আসিয়া ডাকিল—ও মধু!

অনেক ডাকাডাকিতে মধুসূদন চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিল। অতুল কহিল—একবার দুয়োরটা বন্ধ করে দে মাণিক,—

মধুসূদনের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।—এখন চল্লেন গানের আড্ডায়? রাত তা হ'লে আজ কাবার হবে একেবারে। ধন্যি আপনি, জামাইবাবু।

হাঁ—গানের আড্ডায় যাইতেছে, আজ তাহার আড্ডা দিবার দিনই বটে!

হাটুরে নৌকা, ছইয়ের বালাই নাই। আট দশখানা বৈঠা পড়িতেছে, নৌকা উড়িয়া চলিয়াছে। পাড়ের গাছপালা বাড়ি-ঘর-দোর অন্ধকারলিপ্ত নির্ব্বাক নিস্তব্ধ

প্রেতের মত। এক-এক ঝাপটা বাতাস আসে আর জোনাকীর ঝাঁক গাছের পাতা হইতে পিছলাইয়া খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক উড়িয়া বেড়ায়।

বদন ব্যাপারী বিশেষ ভদ্রতা করিয়া কহিল—আপনি আমাদের সঙ্গে ব'সে ব'সে কষ্ট করবেন কেন বাবু! আপনি ভদ্দোর লোক, ঐ নুনের বস্তায় মাথা রেখে শুয়ে পড়ুন আরাম ক'রে—

সরু বাঁশের মাচা, তার উপর আড় হইয়া শুইয়া পড়া মানে একরূপ গোলাকার হইয়া পড়িয়া থাকা। হাত-দেড়েক পরিধির মধ্যে এই ভাবে আরাম করিতে করিতে অতুল ভাবিতে লাগিল, এই চোরের মতন পলাইয়া না আসিয়া শ্বশুরের নিকট সরাসরি যদি সে বিদায় চাহিত, তিনি কি বলিতেন?

যাও—কখনও বলিতেন না মুখে। বড় মিষ্টভাষী লোক। বছর বারো-তেরোর মধ্যে টিনের ঘর উঠিয়া এত বড় দোতলা কোঠাবাড়ি হইয়াছে, বাউগঞ্জের বাজারে আজ হৃষীকেশ হাজরার জুড়ি নাই, তুলসী মাড়োয়ারী এত করিয়া ইহার অর্দ্ধেক খরিদ্দার জুটাইতে পারে না, সে কেবল ঐ মুখখানির গুণে।…

সাত দিন অন্তর হাট, হাটুরে নৌকা না থাকিলে ষ্টীমার-ঘাট অবধি হাঁটিয়া যাইতে হয়। অন্যথা নৌকা-ভাড়া বিস্তর। আজ না গিয়া যদি অতুল আর সাতটা দিন অর্থাৎ আগামী হাট পর্য্যন্তই থাকিয়া যাইত এবং শ্বশুরকে বলিত—আমি বাড়ি যাচ্ছি—

হৃষীকেশ যাও—কখনও বলিতেন না নিশ্চয়, তাঁহার সেই ছাত-বিদারণ হাসি হাসিয়া বলিতেন—ক্ষেপেছ বাবাজী? আর ক'টা দিন পরে রামনবমী…সেই সময় দোকানে একটু ইয়ে টিয়ে হবে তার আগে—

আর বার দুই তিন বলিলে আম্‌তা আম্‌তা করিতেন; এবং তারপরেও সহজে ছাড়িতেন না। কন্যা দৌহিত্রীর নাম করিয়া পুঁটুলি বাঁধিয়া কিছু মিষ্টি সঙ্গে দিয়া দিতেন; হয়ত কাপড়ও খান-তিনেক। এবং প্রায়ই যে-কথাটা বলিয়া থাকেন যাইবার কালে হয়ত আর একবার তাহা শুনাইয়া দিতেন—নির্ম্মলাকে নিয়ে আসব একবার—শ্রাবণ মাসে। তাকে বুঝিয়ে ব'লো, ব্যস্ত না হয়।

শ্রাবণের পর শ্রাবণ পৃথিবীর অন্তকাল অবধি আসিবে, সুতরাং শ্রাবণ মাসের জন্য নির্ম্মলার ব্যস্ত হইবার হেতু কি?…

নীল আকাশের অগণিত নক্ষত্রমালা অতুলের মুখের উপর…নৌকার নীচে ছলছলায়মান নদীজল…বৈঠার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ…ঘুমে অতুলের চোখ জড়াইয়া আসিতে লাগিল। ব্যাপারীরা মাঝে-মাঝে কথাবার্ত্তা কহিতেছে…দশক্রোশ বিশক্রোশ দূর হইতে কাহার যেন কি কহিতেছে…কত কি খাপছাড়া ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অতুল ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত থাকিতে থাকিতেই নৌকা ঘাটে লাগিল এখান হইতে ষ্টীমারে তারপর ট্রেনে গিয়া সন্ধ্যানাগাদ বাড়ি পৌঁছিতে হয়। বদন মাঝি ডাকিতে লাগিল—বাবু, বাবু। বাবু নয়, যেন বাবুদাদা। অতুল চোখ খুলিল। ভাবিয়াছিল, চোখ মেলিতেই এক চঞ্চল দুষ্ট শিশু কলহাস্যের তরঙ্গ তুলিয়া বলিয়া উঠিবে—বাবুদাদা, রোদ উঠে গেছে, এখনও ঘুমুচ্ছ তুমি?

চোখ মেলিয়া দেখিল, রোদ উঠিবার অনেক বাকী সবে পোহাতী তারা উঠিয়াছে।…মনে পড়িল, কালরাত্রে আট বছরের অভ্যস্ত জীবন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—সে দোকান নাই, বাবুদাদা বলিয়া ডাকিবে সে বুলু নাই—তাহাদের চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, আর ফিরিবে না।

ষ্টীমার আসিল দেরি করিয়া। অতুল ডেকের উপর কম্বল বিছাইয়া সুস্থির হইয়া বসিল। বড় অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল—এ যেন ঠিক একখানা নাটক, আট বছরের অভিনয় শেষ করিয়া যবনিকা ফেলিয়া এখন সকাল-বেলা বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে।

আট বছর আগে বাউগঞ্জ আজকালকার মত এ রকম ছিল না—এত আড়ত গুদাম লোকজনের হৈ-চৈ কিছুই না। ভদ্রা নদীর উত্তর পারে কেবল ফাঁকা মাঠ—এদিকে খানকয়েক গোলপাতার চালা, পুবদেশী বাদামের

নৌকা আসিয়া মাসের পর মাস ঘাটে লাগিয়া থাকে, দু-দশ মণ করিয়া চাউল বিক্রী হয়। হৃষীকেশ এই সময়ে টিনের ঘর বাঁধিয়া চাউল কিনিয়া মজুত করিতে সুরু করিলেন। কাজ বাড়িল বিস্তর। কাজেই একটা মরশুম অন্ততঃ আসিয়া দেখাশুনা করিবার জন্ম জামাইয়ের কাছে জরুরি খবর দিলেন।

সেই একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় ট্রেন ধরিতে যাইবার মুখে পান চিবাইতে চিবাইতে খুব গোপনে সে নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—চিঠি দিও, কেমন ?

প্রত্যুত্তরে নির্ম্মলা ঘাড় নাড়িল দেখিয়া অতুল সহসা কথা বলিতে পারিল না। বলিল—লিখবে না চিঠি ?

এমন সময়ে ডাক পড়িল—সেজ-বউমা ! বধূ বাহির হইয়া গেল।

অতুল তারপরেও দাঁড়াইয়া রহিল। কাজ সারিয়া নির্ম্মলা নিশ্চয় আবার আসিয়া পড়িবে। কিন্তু রওনা হইবার আগে তার কাজ কিছুতেই মিটিল না। পথ চলিতে চলিতে অতুল ভাবিতে লাগিল—ও যেন কেমন এক রকম···পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়—মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া দিল যে চিঠি দিবে না, বলিতে একটু মায়াও হইল না—আচ্ছা লোক !

ঝাউগঞ্জে তখন সোমবারে সোমবারে পিওন আসিত। একদিন চিঠি আসিয়াছে, একেবারে খান তিন চার। অতুল তখন গরুর গাড়ী হইতে ফর্দ্দ মিলাইয়া মিলাইয়া মাল নামাইতেছে। আড়চোখে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। হৃষীকেশ চশমা আঁটিয়া চিঠিগুলি পড়িয়া গোছাইয়া পাশে রাখিলেন। খামের চিঠি একখানাও নাই।

রাত্রে দোকানের কাজ মিটিয়া গেলে সকলে ঘুমাইলে কেরোসিনের আলোয় সে নির্ম্মলাকে চিঠি লিখিতে বসিল। শেষ হইল যখন অনেক রাত্রি। গাঙের ঘাটে নামিয়া ঠাণ্ডা জলে মুখ হাত ধুইয়া বিছানায় শুইল। তবু ঘুম আর আসে না।···

দিন-পনেরো পরে একদিন সকাল বেলায় হৃষীকেশ বলিলেন—বাবাজী, এই নাও—

রঙীন খাম, গন্ধে ভুর ভুর করিতেছে। বেকুব পিওন কি-না হৃষীকেশের হাতেই দিয়া গিয়াছে। নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায় খামখানি বাঁ হাতে ধরিয়া ব্যাপারীর সহিত অতুল যথাপূর্ব্ব তর্ক করিতে লাগিল—হেঁ হেঁ তাই বল্লে কি হয় ব্যাপারীর পো ? কামিনীভোগ ওর সাত জন্মে নয়, আমরা বুঝি চাল চিনিনে—দাম এক টাকা হিসেবে কম নিতে হবে—

একটু পরেই কাজ মিটাইয়া আড়ালে গিয়া খামখানি খুলিল। সবুজ কাগজ, তার উপর টকটকে রাঙা কালিতে ছাপা গোলাপ গাছ, একটি মেয়ে, পাখী, কবিতা ইত্যাদি। কিন্তু কাগজ ও লেফাপার এত আড়ম্বর করিয়া যে কথা-কয়টা নির্ম্মলা লিখিয়াছে তাহা পড়িয়া অতুলের ইহাই কেবল মনে হইতে লাগিল—বৃথা সে রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া এত চিঠি লিখিয়া মরিয়াছে, একখানাও তার হাতে পৌঁছে নাই, পৌঁছিলে কি একটা কথার একটু রকমারি জবাব থাকিত না ? হয় পোষ্টাপিসে মারা গিয়াছে আর নয়ত টুনি কি বড়বৌদিদি··· ছি ছি ছি, কি লজ্জার কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে ! সে তাহাদিগকে মুখ দেখাইবে কি করিয়া ?

আবার যখন হৃষীকেশের সামনে আসিল, তখন তিনি হিসাব দেখিতেছেন। ইহারই মধ্যে একবার অতুলের দিকে নজর পড়িলে প্রশ্ন করিলেন—বাড়ির খবর সব ভাল ? নিমু ভাল আছে ?···

বিয়ে তখন বেশী দিন হয় নাই। অতুল লজ্জায় শ্বশুরের সহিত মুখোমুখি উত্তর দিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

বেশ—বলিয়া হৃষীকেশ পুনশ্চ হিসাবের খাতায় মন-সংযোগ করিলেন। পাতার উপর পাতা উল্টাইয়া চলিলেন।

একটা কথা বলি-বলি করিয়া অতুল দাঁড়াইয়া রহিল। মনে এক-একবার জোর আনে—বলেই ফেলি না কেন—মেয়েমানুষ না কি ? আবার ভাবে—উঁহু, ভাত খেতে খেতে বললেই হবে—সেই ভাল হবে—একেবারে এক্ষুনি বললে শ্বশুর-মশায় ভাববেন—দেখেছ, চিঠি পেয়েছে আর অমনি···

এমনি অনেকক্ষণ গেল। সহসা মুখ তুলিয়া হৃষীকেশই কথা কহিলেন, কাছে ডাকিলেন—শোনো—

সলজ্জে অতুল কাছে আসিয়া বসিল। বহুদর্শী লোক, কথাটা প্রকাশ করিয়া না বলিতেই আন্দাজে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন।

হৃষীকেশ কিন্তু যাহা বলিলেন তাহা একেবারে অভাবিত। বলিলেন—তুমি রাহুত-মশায়ের সঙ্গে এই চালানে বড়বাজার যাও। মহাজনের সঙ্গে জানাশোনা হওয়া দরকার, পর-অপর দিয়ে কাজকর্ম্ম হয় না—

বলিয়া একবার এদিক-ওদিক দেখিয়া লইলেন। তারপর খাতার একটা জায়গা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—দেখ একবার দিনে ডাকাতী। পোল থেকে পোস্তা অবধি মুটে ভাড়া লিখেছে ছ-পয়সা—

পুনশ্চ একবার অধিকতর সন্তর্পণে চারিদিক দেখিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিলেন—ঐ যে রাহুত-মশায় কি মধুসূদনকে দেখ, কমপাত্তোর কেউ নন। তোমায় শিখিয়ে দিই বাবাজী, মুখে ওদের খুব ক'রে বলবে যে আপনারা হলেন হেন-তেন—ধর্ম্মভারও দেবে—কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় সর্ব্বদা যেন কড়া নজর থাকে, ঐটে হ'ল আসল; এবার থেকে বড়বাজারের গস্তো তুমি ক'রো—

অতুল এইবার চোখ-কান বুজিয়া একরকম মরিয়া হইয়া বলিয়া বসিল—একবার দিন-দুই বাড়ি থেকে ঘুরে আসি—মানে মা ওঁরা বড় ব্যস্ত হয়েছেন কি না—

খাতা হইতে মুখ না তুলিয়া হৃষীকেশ সহজ ভাবেই জবাব দিলেন—মা'র প্রাণ, ব্যস্ত হয় না? বেশ—যেও বাড়ি। বেয়ানকে চিঠি লিখে দাও—

বলিতে বলিতে চুপ করিয়া গেলেন। পাতার মধ্যে আবার কোন দিনে-ডাকাতীর সন্দেহ হইল বুঝি, মিনিটখানেক তাহারই সন্ধান করিলেন। তারপর আরম্ভ করিলেন—যত জুয়োচোর ফেরেব্বাজ নিয়ে কারবার—বাবাজী, তাই বলি তোমাদের জিনিষপত্তর তোমরা দেখে-শুনে বুঝে নিয়ে আমায় ছুটি দাও, আমি বাঁচি। বারো ভূতে যে এত কষ্টের দোকান লুটেপুটে খাবে, কিছুতে প্রাণে সয় না। তুমি এসেছ না বেঁচেছি—

বুলু তখন জন্মে নাই, সন্তানের মধ্যে ঐ নির্ম্মলা। নির্ম্মলার আগেও ছেলে হইয়াছিল—প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে মোট চারিটি। কিন্তু হৃষীকেশের অদৃষ্টে চারিটি ছেলেই গিয়াছে, গিন্নিরাও গিয়াছেন। তৃতীয় পক্ষ অবশ্য ঘরে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ছেলেপিলে না হইবার মত অবস্থা। অতঃপর এ বয়সে হৃষীকেশের আর চতুর্থ পক্ষে ইচ্ছা নাই।

অতুল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। ইতিপূর্ব্বে বেয়ানকে চিঠি দিবার প্রসঙ্গ হইতেছিল, তাঁহাকে চিঠিতে কোন্ তারিখের কথা উল্লেখ করিবে, কাল—না পরশু—না শনিবার সেটা সঠিক না জানিয়া স্বস্তি পাইতেছিল না। হৃষীকেশ কিন্তু ক্রমাগত হিসাবের পর হিসাব উল্টাইয়া চলিয়াছেন, বোধ করি বা পুত্র-ব্যাকুলা বেয়ানের কথা তাঁহার মনেই নাই।

অবশেষে অতুলই মনে করাইয়া দিল।—তা হ'লে মা'কে চিঠি লিখে দিই—

মুখ তুলিয়া হৃষীকেশ জামাতার দিকে চাহিলেন।

—হ্যাঁ লিখে দাও। মরশুম অন্তে আশ্বিন-কার্ত্তিকের দিকে হপ্তাখানেকের জন্তে যেও বাড়ি। দিন সাতেক—সে আমি এক রকম ক'রে চালিয়ে নেব। কি আর হবে? তা ব'লে কি আর বাড়ি ঘরে যাবে না?···

এত বড় সুব্যবস্থার পরে অতুলের আর কথা বলিবার জো রহিল না।

হৃষীকেশ বলিতে লাগিলেন—তাই লিখে দাওগে যাও। তারপর জামাতার মুখের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিয়া স্বর অতিশয় কোমল করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন—বাড়ি-ঘর-দোর রইলই—যাচ্ছে কোথা? এই উঠতি-গঞ্জে আমাদের এখন একহাতি কারবার। দশটা বছর সবুর কর দিকি। দশ বছরে ভেল্কি খেলে যাবে। বাড়ি গিয়ে তখন টাকার বিছানা ক'রে শুয়ে থেক। সম্ভাবিত ঐশ্বর্য্যের আনন্দে হৃষীকেশের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। বলিলেন—বিকেলে কিন্তু চিটেগুড়ের নৌকো আসবে, বিকেলেই গুদোমজাত হবে—মনে থাকে যেন, বাবাজী!···

সেই দশ বছর এখনও পুরে নাই, বছর দুই বাকী আছে। কিন্তু ভেল্কিবাজীর মতই ঘটিয়া গিয়াছে বটে!

দেখিতে দেখিতে হৃষীকেশের টিনের ঘর গিয়া পাকা দালান-কোঠা হইয়া গেল। দোকানের পিছনে ঘেরা-কম্পাউণ্ডে তৃতীয় পক্ষের শাশুড়ীর অধিষ্ঠান হইয়াছে। হইবে-না হইবে-না করিতে তাঁহার কোল জুড়িয়া সোনার মত ছেলে বুলু হইয়াছে। অতুলের সহিত বুলুর ভাবটা কিছু বেশী। রোজ ভোরবেলা উঠিয়াই চোখ মুছিতে মুছিতে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে—বাবুদাদা! দোকানের মাচায় উঠিয়া কখনও কখনও সে লজেঞ্চুস চুরি করিতে যায়, পিরোনাথ কি মধু ধরিয়া ফেলিলে চীৎকার করিয়া ওঠে—বাবুদাদা গো—

অতুলের পরমশত্রু ঐ বুলু! ঐ এক ফোঁটা অবোধ বালক তার আট বছরের স্বপ্ন ভেস্কিবাজীর মত উড়াইয়া দিয়াছে। আট বছর পরে সে বাড়ি ফিরিয়া চলিয়াছে—টাকার বিছানা পাতিয়া শুইয়া থাকিবার জন্য নয়। পকেট ও তোরঙ্গ হাতড়াইলে আজ সাত টাকা এবং কয়েক আনার পয়সা যদি বাহির হয় মোটের উপর।…

স্টীমারে উঠিয়াই অতুল লক্ষ্য করিয়াছিল, পার্শ্ববর্তী জনকয়েক সহযাত্রী পরস্পর খাসা সদালাপ জমাইয়া বসিয়াছেন। আপনার ভাবনাতেই ছিল, কোনদিকে এতক্ষণ সে মনোযোগ করে নাই। সহসা সভয়ে লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—ভদ্রলোকদের আলাপ-আলোচনা সম্প্রতি তর্কে পৌঁছিয়াছে, একেবারে যাহাকে বলে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক ব্যাপার! একজনে একখানা উপন্যাস হাতে লইয়া ভীমবিক্রমে প্রতিপন্ন করিতেছেন, ইহার মত বই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই। অপর পক্ষও চুপ করিয়া আছেন বলা যায় না। ফলে সমালোচনা এইরূপ চূড়ান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে ঠিক ইহার পরেই ছড়ি ও ছাতাগুলির দরকার পড়িবার কথা। চারিদিকে যাত্রীর ভিড়—তবু উহারই মধ্যে বা-হোক করিয়া কম্বলটা একটু পিছাইয়া লইয়া সামনে তোরঙ্গ রাখিয়া অতিশয় সতর্কভাবে অতুল তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিল। অর্থাৎ ক্রিয়া আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা অন্ততঃ সারেঙের ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবে, তারপর ঐ তোরঙ্গ ও নিজের অপরাপর অঙ্গের ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক।

পরক্ষণে তাকাইয়া দেখিল, ইঞ্জিনের কাছাকাছি জায়গাটায় লোকজন বসে নাই, একেবারে খালি, বোধ করি উত্তাপ বেশী বলিয়া। কিন্তু ইঞ্জিনের উত্তাপে মানুষ মরে না। অতএব স্থান পরিবর্তন করিয়া অতুল সেখানে গিয়া শান্তিতে কম্বল পাতিল। মাঝে একবার নীচে গিয়া খালাসীদের দড়িবাঁধা বালতী চাহিয়া গাঙের নোনাজলে আরাম করিয়া স্নান করিল। ভেণ্ডারের নিকট মিলিল বাতাসা ও বাসি পাউরুটি। তাই কিছু কিনিয়া খাইয়া পরম পরিতোষে শুইয়া পড়িয়া স্টীমার-চলার শব্দ শুনিতে শুনিতে মনে পড়িল, তোরঙ্গের মধ্যে তাহার সঙ্গেও খানকয়েক উপন্যাস আছে, কাল রাত্রে বাক্স গোছাইতে গোছাইতে নজর পড়িয়াছিল বটে!

খোঁজ করিয়া পাওয়া গেল খানকয়েক নয়—একখানি মাত্র উপন্যাস, নাম কুঙ্কুমকুমারী। তোরঙ্গের তলায় কতদিন হইতে পড়িয়া আছে, তার ঠিক নাই—পাতা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। খানিকটা পড়িয়া বুঝিতে পারিল, এ বই তাহার পড়া; পাতা-কয়েক উল্টাইয়া সেই জায়গায় আসিল, চমৎকার জায়গা, ঘটনাটা অতুলের বেশ মনে আছে—কুঙ্কুমকুমারীর অসুখ করিয়াছে, পোষা পায়রা উড়াইয়া দিয়া রাজকুমারী খবর পাঠাইয়াছেন, জয়ন্তলাল নদী ঝাঁপাইয়া মাঠ দিয়া বন দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন…

এখানে-সেখানে আরও খানিক চোখ বুলাইয়া অতুল বইখানা রাখিয়া দিল। এককালে তার কেবল দুইটি নেশা ছিল—নবেল পড়া ও গান-বাজনা। তৃতীয় নেশা জুটিল নির্মলার সহিত বিবাহ হইবার পর। দোকানে ঢুকিয়া অবধি রোকড় লিখিতে লিখিতে সে-সব কবে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া গিয়াছে।

বই রাখিয়া দিয়া অতুল নির্মলার পুরানো চিঠি দু-চার খানা যাহা পাইল বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। শেষাশেষি এই ধরণের যে-সব চিঠি আসিত, তার কতকগুলির উত্তর দেওয়া হয় নাই, ভাল করিয়া পড়িয়াই দেখে নাই। কাজকর্মের মধ্যে খাম ছিঁড়িয়া খুঁজিয়া-পাতিয়া নীচের দিক হইতে আগে দেখিয়া লইত, শারীরিক কে কেমন আছে, তারপর আবার খামে ভরিয়া চাটাইয়ের নীচে বা বেনিয়ানের পকেটে রাখিয়া দিত,

রাত্রিবেলা নিরিবিলি পড়িয়া দেখা যাইবে। কিন্তু সে আর ঘটিয়া উঠিত না। ইদানীং নির্ম্মলা চিঠিপত্র বেশী লেখে না। যা লেখে তা'ও এ ধরণের একেবারে নয়। তিনটি মেয়ে হইয়াছে, তাহাদের কথাতে আজকালকার চিঠি ভরতি, তাহাদের জন্ত এটা দরকার, সেটা দরকার ইত্যাদি।

অনেক দিন আগে—সেই সব নূতন বয়সের কথা—একটা চিঠি লইয়া দুর্বিনীতা নির্ম্মলা স্বামীকে যা অপমান করিয়াছিল দশজনের মধ্যে তাহা বলিবার কথা নয়। অতুল সকৌতুক স্নেহে তাহাদের প্রথম যৌবনের সেই ছেলেমানুষী-ভরা দিনগুলি ভাবিতে লাগিল। হৃষীকেশ একবার তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন মাল কিনিতে। অতুল সটান চলিয়া আসিল বাড়ি; রাহুত-মহাশয়ের সহিত গোপন ষড়যন্ত্র হইল দুই দিন মাত্র বাড়ি থাকিয়া মঙ্গলবার সকালে বড়বাজার গদীতে তাঁহার সহিত দেখা করিবে।

দিনের মধ্যে দুপুর বেলাটায় নির্ম্মলার একটুখানি যা অবসর। পুরুষ-মানুষদের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, বউরা সবে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে এমন সময় অতুল ঘুরিয়া রান্নাঘরের সামনে দিয়া জুতা মস্‌মস্‌ করিতে করিতে গম্ভীর মুখে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। গানের আড্ডায় নিশ্চয়। নির্ম্মলা দুপুরে ঘুমায় না, এ ঘরে আসিয়া কাঁথার ডালা লইয়া বসিল।

কতক্ষণ এমনি আপনার মনে সেলাই করিতেছে, খেয়াল নাই, হঠাৎ অতুল ঘরে ঢুকিল। ভয়ানক ব্যস্ত। কোনদিকে না তাকাইয়া সোজা আসিয়া টেবিলের জিনিষপত্র নড়াইয়া-সরাইয়া খুব ব্যস্তভাবে কি খুঁজিতে লাগিল।

ছোট্টঘরে দুইটি প্রাণী, একজনে গভীর মনোযোগের সহিত সেলাই করিয়া চলিয়াছে, আর একজন টেবিল, টেবিলের তলা, আলমারীর মাথা সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ভাবখানা যেন ইহজন্মে ইহাদের দুটির পরিচয় নাই।

নির্ম্মলা মনে মনে ভাবিল, আর কাজ নাই। মুখ তুলিয়া বলিল—আড্ডা জম্‌ল না?

নিদারুণ বিরক্তি-ভরা মুখে অতুল একবার তাকাইয়া দেখিল, কিছু বলিল না।

নির্ম্মলার কিন্তু গ্রাহ্য নাই, বসিয়া বসিয়া টিপি-টিপি হাসিতে লাগিল। আবার কহিল—এখনও সন্ধ্যে হয় নি, ফিরে এলে যে বড়···ওগো শুনতে পাচ্ছ?

—কি বলছ?

—বলছি, বড্ড গরম আজকে—। বলিয়াই প্রগল্‌ভ হাসি।

অতুল রুখিয়া উঠিল—ও-ঘরে মা রয়েছেন, ঐ রকম হেসে উঠতে লজ্জা করে না? বুড়ো হয়ে দিন দিন বুদ্ধি বাড়ছে!

যেন ভারী ভয় পাইয়া গিয়াছে এমনি ভাবে শিহরিয়া কাঁপিয়া নির্ম্মলা কহিল—সর্ব্বনাশ, বুড়ো হয়েছি নাকি? না—না—বুড়ো এখনও হইনি একেবারে, হয়েছি? বল। বুড়ো হবার কথা শুনলে বড্ড ভয় করে,—এই পাকা চুল, থুথ্‌ড়ে, মাগো—যা বিচ্ছিরি—

বলিতে বলিতে সে অতুলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—সরো—কি খুঁজতে হবে বল দিকি। জামার বোতাম? এই যে তোমার জামাতে লাগানো রয়েছে—দেখতে পাও না?

অতুল কহিল—বড্ড ফাজিল হয়েছ তুমি। বোতাম খুঁজছি—বোতাম ছাড়া আর কিছু বুঝি খোঁজা যায় না—

বধূ পরম বিস্ময়ে চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া কহিল—বোতাম নয়—তবে? ও—আমাকে। আমি তা বুঝতে পারি নি। আমি আলমারীর মাথায় থাকিনে কি না—

—ভারী অহঙ্কার, তোমায় খুঁজতে বয়ে গেছে আমার, শোন নির্ম্মলা,—বলিয়া অতুল বিছানায় চাপিয়া বসিল। বলিতে লাগিল—শোন, তোমায় বলে দিচ্ছি স্পষ্ট ক'রে, কিচ্ছু দরকার নেই তোমাকে। কেন কিসের এত? বাড়ি আমি কিছুতে আসতাম না, নেহাৎ মার জন্তে মনটা কেমন হ'ল।···সকাল বেলা বাড়ি এসেছি, এই সারাটা দিন কি ক'রে ক'রে বেড়াও শুনি?

ক্লিষ্ট কণ্ঠে নির্ম্মলা কহিল—বড্ড গরম, মারা যাই, তুমি থামো—

অতুল আরও রাগিল।

—যেখানে ঠাণ্ডা সেইখানে চলে যাও, ধরে রাখছে কে?

—তাই যাই—বলিয়া সত্যসত্যই চলিল। দরজা অবধি গিয়া হঠাৎ গাম্ভীর্য্যের মুখোস ফেলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—গেলাম আর কি। তুমি বকলে আমার মোটে রাগ হয় না, কি করব?

খানিক পরে অতুলের একখানা হাত তুলিয়া লইয়া স্নিগ্ধ মায়া-বিগলিত কণ্ঠে নির্ম্মলা বলিল—এবারে আর গরম নেই, বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে—না?

অতুল ঝাঁকি দিয়া হাত ছাড়াইয়া বলিল—যাও, যাও—তোমায় খুব চিনেছি—এই তিন মাসের মধ্যে—

—ফের? বলিয়া নির্ম্মলা তাড়া দিয়া উঠিল। তারপর স্বামীর মুখের দিকে দুটি চোখের স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল—রাগ তোমার পড়বে না আজ?

অতুল বলিতে লাগিল—রাগের বড় দোষ কি-না, এই তিন মাসের মধ্যে ক'খানা চিঠি দিয়েছ জিজ্ঞাসা করি?

—তাই কি মনে থাকে?

অতুল ভ্রূভঙ্গী করিয়া মাথা নাড়াইতে লাগিল।—মনে থাকে না; সেই ত বলছি, ঘরে মেজে রূপ আর ধরে-বেঁধে—

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া নির্ম্মলা ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। শেষে আর চাপিতে পারিল না।—শোনো,—শোনো—বলিয়া হাত দিয়া স্বামীর মুখ ফিরাইয়া ধরিল। এদিকে ফেরো, শোনোই না গো, টুনি বলে কি—

সন্ত্রস্ত হইয়া অতুল কহিল—আমার চিঠিপত্তোর টুনি ওরা কেউ দেখেনি ত?

নির্ম্মলা কহিল—না, দেখেনি আবার। তোমার বোন তেমনি কি-না—না দেখে ছাড়ে। কি লজ্জা, মাগো! তুমি যত ছাইভস্ম লিখতে···ও আমার কি নাম বের করেছে শুনবে?

বলিয়া নির্ম্মলা আবার হাসিতে লাগিল। তারপর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল—বলে, প্রাণপ্রেয়সী দেখনহাসি···সব তোমার দোষ।

—বলে না কি? বলিয়া রাগ ভুলিয়া অতুল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল—দোষ আমার, তা সত্যি। কিন্তু নির্ম্মলা, তোমার কোন চিঠিতে কোন দিন কেউ এক ফোঁটা দোষ ধরতে পারে নি।

নির্ম্মলা সকৌতুকে স্বামীর দিকে স্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—দুষ্ট,আমার চিঠি হাটে-ঘাটে পড়িয়ে বেড়াতে তুমি?

অতুল কহিল—না, হাটে-ঘাটে আর কি—রাইচরণ-মশায় ওঁদের পড়তে দিতাম। পাকা লোক, এর আগে বিশ বছর জমিদারী এষ্টেটে মুহুরীগিরি করেছেন। তোমার চিঠি পড়ে বলতেন—চমৎকার, যেন পিতামহ ভীষ্মদেব লিখছেন—। বলিয়া জামার পকেটে যে-একখানা চিঠি ছিল, সমালোচনা করিবার জন্য সেইটা বাহির করিয়া আনিল। আনিতেই নির্ম্মলা ফস্ করিয়া কাড়িয়া লইয়া চোখ বুলাইতে লাগিল।

—দেখলে দোষের কিছু?

ছাপা কবিতা দু-লাইনের উপর আঙুল রাখিয়া মুখের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া নির্ম্মলা বলিল—পড়তে জান গবচন্দোর? বুঝতে পার? বলিয়া অতুল কোন কিছু দেখিবার আগেই তৎক্ষণাৎ চিঠি মুড়িয়া পাকাইয়া লুকাইবার আর কোন নিরাপদ স্থান না পাইয়া একেবারে গালের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

রাগ যা পড়িয়া গিয়াছিল মুহূর্ত্তে আবার দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল।

—যা তা বোলো না বলছি—তোমার বড্ড বাড় বেড়েছে—স্বামী গুরুজন নয়? বলিয়া অবমানিত অতুলচন্দ্র মহা ক্রুদ্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অতুলের ভাবনা ভাসিয়া গেল হঠাৎ ষ্টীমারের বাঁশীর শব্দে—বারংবার তীক্ষ্ণ বাঁশী বাজিতেছে। ছোট্ট একখানা নৌকা—যেন মোচার খোলা একখানি—ষ্টীমারের ঠিক সামনে পড়িয়া গিয়াছে। সবাই 'গেল গেল' করিয়া উঠিল। কিন্তু নৌকা বাঁচিয়া গেল, তরঙ্গের দোলায় দুলিতে দুলিতে অতি অবহেলায় পাশ কাটাইয়া খালে ঢুকিল। নদীকূলে শ্যামল গোলবাড়, দিগন্তবিসারী বিল, মাঝে মাঝে

এখানে-সেখানে তাল নারিকেল ও অন্যান্য গাছপালার ছায়ায় গ্রাম···। দেখিতে দেখিতে অমনি একটা গ্রামের মধ্যে ষ্টীমার চলিয়া আসিল। জেলেডিঙী দুলিতেছে, জেলেরা জাল ফেলিয়া তার উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে···এক ঝাঁক গাঙ-চিল যেন ষ্টীমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়া উড়িতেছে। বাঁকের মুখে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে জল কাটিয়া ষ্টীমার চলিয়াছে—খুব জোরে চলিয়াছে—গাঙ-চিলের ঝাঁক কোথায় পড়িয়া রহিল—কত বিল, কত গ্রাম, কত ঘাট, রাখালছেলে, ঘোমটা-ঢাকা স্নান-রতা গ্রাম-বধূ···

অতুল ভাবিল, এই ত যাইতেছে—যদি গিয়া দেখে খুকীদের কারও অসুখ করিয়াছে···কিংবা শোনে, তাদের মা কাল হঠাৎ ঘাটের সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া··· মানুষের জীবন, কিছুই বিচিত্র নয়। আচ্ছা, নির্ম্মলা কাজ-কর্ম্ম সারিয়া এখন দুপুরে কি করিতেছে?···এক মজা করিলে হয়, একটু ঘুরিয়া ডাক্তারখানা হইয়া সেখানে কম্পাউণ্ডার-বাবুর সহিত ঘণ্টা-দুই গল্পগুজব করিয়া অনেক রাত্রে চারিদিক নিশুতি হইয়া গেলে আজ নির্ম্মলার জানলায় গিয়া ঘা দিতে হইবে, চাপাগলায় ডাকিতে হইবে—সেজ-বউ, সেজ-বউ—। গলা শুনিয়া বুঝিতে পারিবে কি? বুঝিলেও বিশ্বাস হইবে না।

নির্ম্মলার চিঠির একখানা তখনও বাহিরে খোলা পড়িয়া ছিল, বাক্সে তোলা হয় নাই। অতুল পরম যত্নে উহা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিল। অকস্মাৎ প্রথম যৌবনের সেই সব বিগত স্বপ্ন তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। মনে হইতে লাগিল, চিঠির কাগজের পাখীগুলি কেবল ছবির পাখী নয়—আসল পাখী। উপন্যাসের কুহুমকুমারীর মত একদা এক কিশোরী ঐ পাখীদের মুখে বার্ত্তা পাঠাইয়া দিত—যাও পাখী ব'লো তারে—সে কত কাল আগে। আর দূর দুর্গম দেশে দোকান-ঘরে পাট ও চালের বস্তার আড়ালে আবডালে অতুল বসিয়া বসিয়া রোকড় লিখিত, পাখী সেখানে পৌঁছিতে পারিত না। আট বছর পরে উড়িতে উড়িতে পাখী আজ এই সকাল-বেলা তাহার কাছে পৌঁছিয়াছে। সে ছুটিয়া চলিয়াছে নদী পারাইয়া, এই সব বিল-মাঠ-গ্রাম ভেদ করিয়া—কোথায় কোন ছায়াঘন নির্জ্জন গ্রামের ধারে তার কুহুমকুমারী এখনও চুপ করিয়া চাহিয়া আছে, চোখে তাহার পলক পড়িতেছে না!

লাল কালিতে বটতলার অপরিষ্কার ছাপা বাজে চিঠির কাগজ, এক পয়সায় আটখানি করিয়া বিক্রী হয়। সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাগজের অতি সাধারণ পাখী, মেয়েলোকটি এবং তাহার মুখের কবিতা দু-লাইন দেখিতে দেখিতে অতুলের কাছে জীবন্ত হইয়া উঠিল।

পথে অতুল কোথাও দেরি করিল না, তবু বাড়ি পৌঁছিতে রাত্রি একটু বেশী হইল। মা ও পিসিমা উঠিয়া আসিলেন। নির্ম্মলা আবার রাঁধিতে রান্নাঘরে ঢুকিল। একবার একটুখানি মাত্র চোখাচোখি হইল, মুখে তাহার আনন্দের দীপ্তি।

তারপর ঘরে ঢুকিয়া জানালা খুলিয়া অতুল বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল। ঝির্ ঝির্ করিয়া হাওয়া দিতেছে, প্রদীপের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতেছে, খুকী তিনজন ঐ খাটে বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে; বাহিরে জানালার ওধারে লতাপাতার খস্‌খস্ শব্দ, বুনোফুলের গন্ধ,কালো অন্ধকার,··· সমস্ত মন তাহার অপরূপ স্নিগ্ধতায় জুড়াইয়া গেল। এ জগতে কেউ যে তাহার উপর অন্যায় অবিচার করিয়াছে, ষ্টীমারে ও রেলে আজ তাতিয়া পুড়িয়া সারাদিন না খাইয়া এত পথ চলিয়া আসিয়াছে, সমস্ত ভুলিয়া নিশ্চিন্ত আরামে চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু একেবারে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তারপরে ঘুম—এখন নয়। ঘুম তাড়াইবার জন্য অতুল উঠিয়া ও-বিছানায় গিয়া বসিল, ঘুমন্ত ছোট খুকীর গালে যেন না জাগে এমনি সন্তর্পণে একটি চুমা খাইল। হাসি একেবারে মেজোটির ঘাড়ের উপর পা চাপাইয়া দিয়াছে, জানালা দিয়া হাওয়া আসিয়া অগোছাল চুল উড়িতেছে, ঘুমাইয়াছে—তবু মুখের উপর কেমন যেন করুণ একটা ভাব—মেয়ে দুটিকে অতুল ঠিক করিয়া শোয়াইয়া দিল। তারপর রান্নাঘর হইতে ডাক আসিল।

ভাত দিয়া নির্ম্মলা মৃদু হাসিয়া কহিল—হঠাৎ যে বড়—

হাসিমুখে অতুল কহিল—তোমার চিঠি পেয়ে।

নির্ম্মলা অবাক হইয়া গেল।—চিঠি? চিঠি লিখলাম কবে? না, আমি লিখিনি ত।

—লিখেছ, লিখেছ গো—সেই যে সব লিখতে—বলিয়া অতুল ভালবাসা-ভরা দুটি চোখের দৃষ্টি নির্ম্মলার মুখে রাখিয়া বলিতে লাগিল—বুঝলে নির্ম্মলা, ষ্টীমারে ব'সে ব'সে সেই সব আমলের চিঠির খানকয়েক পড়ছিলাম আজ। আর কোন দিন এমন ক'রে পড়ে দেখিনি। কি মনে হ'ল, শুনবে?

আনন্দোচ্ছল স্বরে নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—না-না রক্ষে কর মশাই, শোনাতে হবে না। সেই সব ছাইপাঁশ আজও পুঁজি ক'রে রেখেছ বুঝি! বলিয়া চঞ্চলা হরিণীর মত লঘুপদে ও-ঘরে চলিয়া গেল; বলিয়া গেল—উঠে প'ড়ো না যেন—দুধ আনতে যাচ্ছি, খুকী আজ আর দুধ খাবে না—সব দিন খায় না—

দুধ গরম করিতে করিতে নির্ম্মলা কহিল—সত্যি, ঠাট্টা নয়—কলকাতায় মাল কিনতে যাচ্ছ? ক'দিন থাকবে বাড়ি?

—অনে—ক দিন।

—কত দিন? এক মাস? এক বচ্ছর?

অতুল কহিল—যত দিন বাঁচব ততদিন। তোমাদের ফেলে রেখে আর কক্ষনো কারও গোলামী করতে যাচ্ছিনে, নির্ম্মলা। প্রাণপাত ক'রে খাটলাম আর এতকাল পরে শ্বশুর-মশায় এই বললেন—

মুখ দেখিয়া নির্ম্মলা বুঝিল, সে ঠাট্টা করিতেছে না। একটি একটি করিয়া অতুল দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল। শুনিয়া নির্ম্মলার মুখের হাসি নিবিল, গুম হইয়া রহিল।

কথা শেষ করিয়া অতুল কহিল—শুনলে ত সব, বলো এইবার।

ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া নির্ম্মলা বলিল—ভাল কর নি—

—কেন?

—বাবা কি অন্যায়টা বলেছেন যে রাগ ক'রে চলে এলে? একাশী টাকার কি দিয়ে কি করলে তার হিসেব চাইবেন না? একটু অপেক্ষা করিয়া উত্তর আসিল না দেখিয়া নির্ম্মলা আবার বলিতে লাগিল—চিরটা কাল তোমার ঐ একভাব। তখনও যেমন, এই আধবুড়ো কালেও তেমনি। তিনটে মেয়ে হয়েছে, একবার পরিণামটা ভাব। অত মান নিয়ে থাকলে ঘর-সংসার চলে না—

ততক্ষণে শেষ গ্রাস মুখে পুরিয়া অতুল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তারপর কাজকর্ম্ম সারিয়া এ ঘরে আসিয়া একেবারে নিরঙ্কুশ অবস্থায় নির্ম্মলা পুনশ্চ দীর্ঘ ছন্দে সুরু করিল—শোন, দেমাক ক'রে চলে ত এলে—এখন ঘরে চতুর্ভুজ হয়ে বসে থাকবে না কি? তিন তিনটে মেয়ে, একটা এই সাতে পা দিয়েছে। কালই চলে যাও, নরম হয়ে বাবার হাতে পায়ে ধর গিয়ে—বলগে, রাগের মাথায় যা লিখেছি—লিখেছি,···ও কি ঘুমুচ্ছ যে বড়!

ডাকিয়া গায়ে নাড়া দিয়া কিছুতে আর অতুলের সাড়া পাওয়া গেল না।

অতুল তখন স্বপ্ন দেখিতেছে—সেই ষ্টীমারে বসিয়া যা যা নবেলে প'ড়িয়াছে তাই। যেন জয়ন্তলালের কাছে পায়রা আসিয়া পৌঁছিয়াছে···বনবাদাড় ভাঙিয়া রাজপুত্র ছুটিয়াছে···ছুটিতে ছুটিতে কতকাল গেল, পথের আর অন্ত নাই···অবশেষে রাজবাড়ি যখন পৌঁছিল তার আগে কুসুমকুমারী মরিয়া গিয়াছে।

দীর্ঘ দিনের পরে ফিরিয়া আসিয়া রাজপুত্র প্রিয়তমার শবের পাশে আছড়াইয়া পড়িল।

"অসমাপ্ত"

শ্রীযুগলকিশোর সরকার, বি-এ

আলোচ্য কবিতাটি "মহুয়া" কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একটি অনুপম কবিতা। ইহার ভিতর প্রেমের অনন্ত অনুভূতির, প্রেমের সার্থক উপলব্ধির—'intense realization'—আস্বাদ পাওয়া যায়; প্রেমের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এখানে বিরাজমান দেখি। মরজগতের প্রেম কত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, কত নিবিড়, কত অচঞ্চল ও ব্যাপক হইতে পারে কবিতাটি তাহারই নিদর্শন। কোন উদ্দামতা, কোন আবিলতা ইহার ভিতর পরিলক্ষিত হয় না; যাবতীয় চঞ্চলতা যেন এখানে সমাহিত হইয়াছে। একটি শান্ত নিবিড় করুণ ছন্দ, একটি অনাবিল অচঞ্চল অবস্থা—গ্রীক আর্টের ভিতর যাহাকে repose বা 'স্থিতি' আখ্যা দেওয়া হয়—ইহার ভিতর বিদ্যমান দেখিতে পাই। কবিতাটিকে 'অসমাপ্ত' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রেমের ব্যাপ্তি ও পরিণতির দিক দিয়া ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা ও সার্থকতা রহিয়াছে। লীলা-বিলাস এখানে অসমাপ্ত, হৃদয় এখানে বেদন-বিধুর, আকাঙ্ক্ষা এখানে অতৃপ্ত এবং তজ্জন্যই প্রেম এখানে সার্থক সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এই অনন্ত অতৃপ্তির বেদনা, এই অসমাপ্তি প্রেমের অচিরভাবী পূর্ণতারই অগ্রদূত। তৃপ্তির ভিতর সমাপ্তির সীমা-রেখা দেখিতে পাই; প্রেমের গৌরব সেখানে নষ্ট হয়, প্রশস্তি খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়; কারণ পশ্চাৎ অভিব্যক্তির পথ সেখানে অবরুদ্ধ। মানুষও অসমাপ্ত, অপূর্ণ, এবং তজ্জন্যই তাহার শ্রেষ্ঠতা। যদি মানুষের পূর্ণতার সীমা-রেখা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইত তবে তাহার অভিব্যক্তির আর কোন সম্ভাবনা থাকিত না, তাহাকে আশ্রয় করিয়া এত কৌতূহল, এত সংশয়, এত আবেগের সমাবেশ হইত না। যাহা সমাপ্ত তাহাতে ছেদ পড়িয়াছে, তাহার অভিব্যক্তির পথ অবরুদ্ধ;—'Finished and finite clods, untroubled by a spark"; আকাঙ্ক্ষা যেখানে চিরজাগ্রত, অন্তর যেখানে চিরবুভুক্ষু, প্রেমের আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ করি সেইখানে, প্রেম সার্থক সত্যে প্রতিষ্ঠিত সেইখানে। বৈষ্ণব কবিও গাহিয়াছেন,—

> জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
> নয়ন না তিরপিত ভেল।
>
> *　　*　　*
>
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
> তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও অন্যত্র বলিয়াছেন,—"তা'কে ত জানা হ'য়েছে, দেখা হ'য়েছে, সে ত ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অনুমান একজন, সেই আমার একটিমাত্র? ওকে আবার নূতন ক'রে খুঁজে পাই, কোন্ কূলহারা কামনার ধারে?"

নায়িকার প্রেম এখানে চিরউদ্ভিদ্যমান, চিরপ্রকাশমান,—

> দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
> পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
> আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।

নায়িকার প্রাণ আজ পরিপূর্ণ, [illegible]। বিশ্বের সমগ্র পরিপূর্ণ-রূপ আজ সে দেখিয়াছে। একদিন যে দেখিয়া আসিয়াছিল সে-দেখার ভিতর অনেক অসম্পূর্ণতা-দৈন্য, অনেক সংশয়-সন্দেহের অবকাশ ছিল। আকাশ আজ বর্ষণক্লান্ত, মেঘমুক্ত। বনভূমি অরুণোজ্জ্বল। আলোকের রক্তিম চুম্বনে গুল্মোহর হাসিতেছে, দলগুলি বিকশিত হইতেছে। সৌন্দর্য্য ও আনন্দে তরঙ্গিত, অপরূপ মহিমায় সমাচ্ছন্ন বনভূমির পটভূমিকার পার্শ্বে সে তাহার বাঞ্ছিতকে দেখিল এক নবতর মোহনরূপে। জীবনের এই পুণ্যময়ী গোধূলি-লগ্নে, নারীজীবনের এই লাবণ্য-প্রভাতে আজ তাহার হৃদয়ে প্রেমের সার্থক উপলব্ধি, অনন্ত অনুভূতি!

> বোলো তা'রে, বোলো,
> এতদিনে তা'রে দেখা হ'লো।

তাহাই ঘটিয়া থাকে। শতাব্দীর পুঞ্জীভূত মেঘ মুহূর্ত্তমাত্রে অপসৃত হয়, সংশয়-সন্দেহের অবকাশ থাকে না, মোহ-অজ্ঞতার নির্ম্মোক খসিয়া পড়ে; মধুরোজ্জ্বল অদৃষ্টপূর্ব্ব অন্য এক জগতের রুদ্ধদ্বার আপনা-আপনি খুলিয়া যায়—মানুষ নবজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করে, সত্যের সন্ধান পায়, সুন্দরের সাক্ষাৎ লাভ করে,—

> মুহূর্ত্ত আলোকে কেন, হে অন্তরতম
> তোমারে চিনিনু চিরপরিচিত মম?

ইহাকেই জীবনের "অনন্ত মুহূর্ত্ত" কহে। জীবনের ঐরূপ এক "অনন্ত মুহূর্ত্তে" বনভূমি যখন অনন্তের স্তবগানে মর্ম্মরিত তখন প্রিয়দর্শনে নায়িকার হৃদয়ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চক্ষু তাহার অশ্রুসজল, মন-প্রাণ শ্রদ্ধায়-সম্ভ্রমে, পুলকে, বিলাসে, বিস্ময়ে অবনমিত,—

> চক্ষে জল ব'হে যায়,
> নম্র হ'লো বন্দনায়
> আমার বিস্মিত মন-প্রাণ।

কবির পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যের "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"র ছবি এখানে সুস্পষ্ট বিদ্যমান দেখিতে পাই,—

> বনের মন্দির মাঝে
> তরুর তম্বুরা বাজে
> অনন্তের উঠে স্তবগান;

আন্দোলিত বনভূমির মর্ম্মরশব্দ যেন বন্দনা-গীতি বা মন্ত্রপাঠের মত প্রতিভাত হইতেছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে নায়িকার এই প্রিয়দর্শন ব্যাপারটিকে তথা তাহার উদ্ভিদ্যমান প্রেমকে বনভূমি যেন পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করিতেছে। পরিস্থিতির (environment) এইরূপ উত্তর-সাধকতা সংস্কৃতকাব্যেও বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। কণ্বের আশ্রমললামভূতা প্রস্থানোন্মুখী শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাও তপোবন-তরুগণের দ্বারা ঠিক এইভাবেই অনুমোদিত হইয়াছিল,—

> অনুমতগমনা শকুন্তলা তরুভিরিয়ম্ বনবাসবন্ধুভিঃ
> পরভৃতবিরুতং কলং যতঃ প্রতিবচনীকৃতমেভিরাত্মনঃ।

নায়িকার মর্ম্ম এখন প্রেমরসসিক্ত, প্রাণ হিল্লোলিত, মন বিলোল



বর্ষায়

প্রাচীন রাজপুত চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ভাবরাশিতে পরিপূর্ণ। শুধু তাহাই নহে। আজিকার এই সার্থক উপলব্ধি তাহার মগ্ন-চেতনার যুগযুগান্তরগতীর অভলতাকে তাহার নিকট স্বচ্ছ-সরল করিয়া দিয়াছে। আজিকার এই শুভ-মিলনের, এই প্রিয়দর্শনের আশ্বাস-বাণী—"এ-দেখার আশ্বাস-অক্ষর"—যেন তাহার অতীত জীবনের ভাগ্যলিপির ভিতর লিখিত ছিল; ইহা যেন নূতন কিছু নহে, পরন্তু অতীত জন্মানুবর্ত্তী।

দেবতার বর
কত জন্ম কত জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে
লিখিছে আকাশপাতে
এ-দেখার আশ্বাস-অক্ষর।

"মহুয়া" কাব্য-গ্রন্থের "অপরাজিত" শীর্ষক কবিতাটির ভিতরও ঐ একই ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে।

তোমার প্রেমে আমার অধিকার
অতীত যুগ হ'তে সে জেনো লিখন বিধাতার।

আজিকার 'এ-দেখা' যেন দেবতারও অভীপ্সিত, পূর্ব্বসংকল্পিত। আজিকার এই মধু-উৎসের আগমনী-গীতি যেন তাহার অতীত জীবনের আকাশকে মুখর করিয়াছিল, ইহার আশ্বাসবাণী যেন তাহার অতীত জীবনের সমগ্র সত্তা ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল; তাহার অণুপরমাণুর সহিত, চৈতন্যের সহিত, সমগ্র অতীত জন্মপরম্পরার রক্তধারার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল। আজিকার 'এ-দেখার' ও তাহার অতীত জন্মপরম্পরার মধ্যে যেন একটা রমণীয় যোগসূত্র রহিয়াছে, ধারাবাহিকতা রহিয়াছে,—

অস্তিত্বের পারে পারে
এ-দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।

ইহা নায়িকার দেহাভ্যন্তরের সমগ্র অব্যক্ত প্রাণের অনির্ব্বচনীয় রহস্যময় স্মৃতি হইতে স্পন্দমান এক আশ্চর্য্য অনুভূতি!

কবির পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যের বহু কবিতার ভিতর এই ভাব-ধারা পরিলক্ষিত হয়,—

(ক) আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে—
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে।

(খ) তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতে ছিল কি জাগিয়া?

(গ) আজ মনে হয় সকলের মাঝে
তোমারেই ভাল বেসেছি—
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে
শুধু তুমি আমি এসেছি।

(ঘ) আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ-বিধুর নয়ন সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।

(ঙ) চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার
কতরূপ ধরে পরেছ গলায়
দিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

নায়িকা আজ বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার হৃদয়ের নিশীথরাত্রির ছবির ভিতর তাহার প্রিয় অপূর্ব্ব প্রতিদিন প্রতীক্ষা করিয়া জাগিতেছিল। তাহার ছায়ার সৌরভরূপ তাহার অবসরের আলস্য-বিলাসের মধ্যেও তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত, বিভ্রান্ত করিয়া দিত। গন্ধে নিবিড় চৈত্ররাত্রির বাতাসের ভিতর তাহার নিঃশ্বাসের আভাসে তাহার অবগুণ্ঠনখানি অকারণে স্পন্দিত হইয়া উঠিত, বীণার মীড়গুলি আর্ত্ত হইয়া যাইত,—

হে অতিথি, চুপে চুপে
বারবার ছায়ারূপে
এসেছো কম্পিত মোর দ্বারে।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে,
প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিঃশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে জানি
আমার গুণ্ঠনখানি,
কাঁদায়েছে সেতারের তার।

ইহা খুবই স্বাভাবিক। কবিও অন্যত্র বলিয়াছেন,—

যেন গো আমারি তুমি আত্ম-বিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক—
কত নব জগতের কুসুমকানন
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক;
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মূরতি ধরি' দেখা দিল আজ।

কবিতাটির ভিতর যে বিশেষ রসের সমাবেশ হইয়াছে তাহার পরিপোষক ঔৎসুক্য, চিত্তভাপ, দীর্ঘনিঃশ্বাসাদি ভাব এখানে পরিপূর্ণ-ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে,—

বোলো তা'রে আজ,
অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,
বেধে গিয়েছিলো গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।

কবিও পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যে ঐ কথাই বলিয়াছেন,—

সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়
শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি সেই আমি।

অপ্রস্তুত অবস্থার দীনতার গ্লানিতে লজ্জিতা সে প্রিয়কে তাহার অন্তর-দেউলে বরণ করিয়া লইতে পারে নাই; তাই তাহার সমস্ত সত্তা ব্যাপিয়া ব্যর্থতার এই সুগভীর ক্রন্দনধ্বনি উঠিয়াছে। 'মানসী'র একটি কবিতার ভিতর এই ভাবধারা আরও অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে,—

আমি যে আপনারে ফুটাতে পারি নাই
পরাণ কেঁদে তাই মরিছে!

কিন্তু—

আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে
সেদিন দেখেছো শুধু অমা।

ব্যর্থতার অনুরূপ ক্রন্দনধ্বনি কবির পূর্ববর্তী কাব্যেও বহল [illegible] ...স্থানে শ্রুতিগোচর হয়,—

আমি আপন মধুরতা আপনি জানি
পরাণে আছে যাহা জাগিয়া,
তাহারে ল'য়ে সেথা, দেখাতে পারিলে তা'
যেত এ ব্যাকুলতা ভাগিয়া।

কিন্তু তাহা ঘটে নাই। তাহার নীরবতাকে তাহার প্রেমাস্পদ উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে। তাই তাহার সমস্ত মন-প্রাণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-বেদনা—সমগ্র চৈতন্য ও সত্তা ব্যাপিয়া নীরবে বহিয়াছে তরলিত বেদনার এই অন্তঃসলিলা ফল্গু। এই চিরন্তন বিরহ-বেদনা আলোচ্য ক্ষেত্রে কবির তুলিকায় যে-ভাবে রূপায়িত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, কবির মালঞ্চের পুষ্পসম্ভারের ভিতর এটি যেন বেদনার একটি রক্তকরবী। এখনে ধ্বনিত হয় কেবল একটিমাত্র কথা,—প্রিয়ের পাদমূলে বিস্রীতা নায়িকার করুণ হিয়ার করুণ মিনতি,—

দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে প্রিয়তম
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।

প্রাগুক্ত রসের পরিপোষক ঔৎসুক্য, চিন্তাপাদি ভাবে অভিব্যক্তি আলোচ্য ক্ষেত্রে "দূতীসম্প্রেষণ" দ্বারা হইতেছে,—

বোলো তা'রে, বোলো,
এতদিনে তারে দেখা হ'লো।

দর্পণকারও বলিয়াছেন,—

"লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ স্নিগ্ধৈর্বীক্ষিতৈর্মৃদুভাষিতৈঃ।
দূতীসম্প্রেষণৈর্নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে।"

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

১৩

ভাগ্যদেবী মধ্যে মধ্যে এক-একটা মানুষকে অপ্রত্যাশিত করুণায় বিস্মিত করিয়া তোলেন। প্রতাপের হইল সেই দশা। হঠাৎ যেন হাওয়া ফিরিয়া গেল। দেশ হইতে চিঠি পাইল ভাইয়ের আবার একটা কাজ জুটিয়াছে। ভাল না হোক, নিতান্ত মন্দ নয়। আর কোনো কাজ জোটাই যখন প্রায় অসম্ভব, তখন ভালমন্দ বাছাই করিতে আর কে বসে? স্কুলের মাহিনার সবটাই হয়ত বাড়ি পাঠাইতে হইবে বলিয়া তাহার আশঙ্কা ছিল, এখন দেখিল খানিকটা হাতে রাখিয়া দিলেও চলে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, নৃপেন্দ্রবাবু যাচিয়া তাহার মাহিনা পাঁচ টাকা বাড়াইয়া দিলেন। মাসান্তে কুড়িটা টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনি ডিজার্ভ করেন এর চেয়েও বেশী, তবে আমার আর বেশী দেবার ক্ষমতা নেই। আমি যখন লোকের জন্তে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, তখন এতটা কোয়ালিফায়েড লোক আশা করিনি।"

প্রতাপের কেমন যেন অদ্ভুত বোধ হইতে লাগিল। জন্মাবধি কোথায়ও সে দেখে নাই যে, কেহ তাহার কোনো মূল্য আছে, একথা স্বীকার করিয়াছে। প্রতাপ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই, নিজে যাচিয়া কেহ যে করে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। এমন কি, যে-পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেখানেও অন্য ভাইদের তুলনায় তাহার বিদ্যাবুদ্ধি যে কিছুই হইবে না, এই ভবিষ্যদ্বাণীই সে চিরদিন শুনিয়াছে।

যাহা হউক, টাকা লইয়া সে বাড়ি চলিয়া আসিল। বাড়িতে যা পাঠাইবার তাহা পাঠাইয়া দিল, পিসীমার পাওনাগণ্ডাও চুকাইয়া দিল। তাহার পর উদ্বৃত্ত টাকাগুলি বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। নিজের কাপড়-চোপড়ের যা অবস্থা হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়। সত্যসত্যই নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ি যাইতে তাহার লজ্জা করিত, যামিনীর সম্মুখে এই অপরূপ সাজে বাহির হইতে হইবে মনে করিয়া তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিত।

কিন্তু যামিনীর দেখা আজকাল আর মেলে কই? এক সপ্তাহ হইল জানদা চলিয়া গিয়াছেন, ইহার ভিতর

একদিনও যামিনীকে সে দেখিতে পায় নাই। পড়ায় অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ত, তাহার পরীক্ষার জন্তই মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আর কিছু কারণ আছে না-কি? ভাবিতেই প্রতাপের হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিত। প্রতাপের মনোভাব যামিনী কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছে? সেই জন্তই কি তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চায়? তাহা কি সম্ভব? যামিনী কি করিয়া বুঝিবে? প্রতাপের সঙ্গে কয়টা কথাই বা সে এপর্য্যন্ত বলিয়াছে? চোখের দৃষ্টিতেই কি মানুষ, মানুষের কাছে এতটা ধরা পড়িতে পারে? হয়ত বা পারে। কিন্তু প্রতাপ নিজে যামিনীর মনের কথা কিছুই বুঝিতে পারে না কেন? সত্যই কি তাহার মনে প্রতাপের ছায়ামাত্রও নাই? দেবীপ্রতিমার মত সে কেবল মানুষের পূজার অর্ঘ্য লইয়া অবিচলিত হইয়া থাকে কি? কোনো পুরুষের প্রতিই তাহার হৃদয় কখনও কি উন্মুখ হইবে না? বুঝিবার কোনো উপায় নাই। রহস্যের অবগুণ্ঠনে এই রূপসী তরুণী চিরকালই কি নিজেকে আবৃত রাখিবে?

রবিবারটা নিজের দরকারী জিনিষপত্র কিনিতে এবং বাড়িতে চিঠিপত্র লিখিতেই প্রতাপের কাটিয়া গেল। বিকালে মিহিরকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার সময় আসিয়া পড়িল। বহুদিন পরে ভদ্র এবং পরিচ্ছন্ন বেশে বাহির হইতে পাইয়া প্রতাপ একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। বাস্তবিক এতদিন তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া গৃহশিক্ষক কেহ ভাবে নাই। মিহিরদের পাচক ভজহরিও তাহার চেয়ে ভাল কাপড়চোপড় পরিত।

নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ি পৌঁছিয়া, হাঁক-ডাক করিয়া মিহিরকে জোগাড় করিতেই খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। জ্ঞানদার পুরী যাওয়ার পর হইতে প্রতাপের ছাত্রটি একেবারে বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। বাবা বাড়ি থাকেন খুব কম সময়ই এবং দিদিকে সে একটা মানুষ বলিয়া গ্রাহ্যই করে না, সুতরাং তাহার এখন অখণ্ড স্বাধীনতা। নিতান্ত স্কুলে যাওয়াটা বাদ দিতে ভরসা হয় না এই যা।

ছোট্টুকে মিহিরের সন্ধানে পাঠাইয়া প্রতাপ ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিল। এমন সময় খাইবার ঘরের দরজার সামনে বাহির হইয়া আসিয়া যামিনী মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "খোকাকে খুঁজে পাচ্ছেন না বুঝি?"

প্রতাপ চমকাইয়া বাহির হইয়া আসিল। কোনো মতে একটা নমস্কার সারিয়া লইয়া বলিল, "না, তাকে ত দেখছি না, ছোট্টুকে পাঠিয়েছি খুঁজতে।"

যামিনী সুন্দর ভ্রূ-দুটি বিরক্তিতে কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ভারি বেয়াড়া হয়ে উঠছে, দিনের দিন। কথা একেবারে শোনে না।"

প্রতাপ ইহার উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। হঠাৎ এমন ভাবে যামিনীর দেখা মিলিবে এ আশা সে করে নাই। হয়ত রান্নাঘরের তদারক করিতে নামিয়া আসিয়াছিল, প্রতাপ মিহিরের খোঁজ করিতেছে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহারই জন্ত নীচে নামিয়া আসিয়াছে, ইহা সম্ভব নয়।

কিন্তু যামিনী তখনও সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বলিবার মত কোনো কথা জিহ্বাগ্রে আসিতেছে না বলিয়া রাগে, ক্ষোভে প্রতাপের নিজেই নিজের কান মলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। হায় হায়, এমন অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি এমনভাবে সে নষ্ট করিতেছে? আর হয়ত এক মাসের মধ্যে যামিনীর সঙ্গে তাহার দেখাই হইবে না, তাহার পর জ্ঞানদা যদি আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে কথা বলিবার কোনো সুযোগই আর প্রতাপের জুটিবে না। একেবারে মরিয়া হইয়া প্রতাপের প্রথমে যা মনে আসিল তাহাই বলিয়া বসিল, "আপনার মা আর কতদিন পুরীতে থাকবেন?"

কথাটা চমৎকার কিছুই নয়, তবু উত্তর দিবার জন্ত যামিনী আরও মিনিটখানেক দাঁড়াইবে ত?

যামিনী বলিল, "এই ত সবে গেলেন, এখনও বেশী কিছু উপকার পান নি। ডাক্তার ত যাবার সময় বলে-ছিলেন অন্ততঃ মাস-দুই না থাকলে কোনো লাভ নেই, তাই থাকবেন বোধ হয়।"

যামিনী এতগুলা কথা বলায় প্রতাপের একটু সাহস বাড়িল। সে বলিল, "শুধু চাকর-বাকরের ভরসায় থাকা একটু মুস্কিল, না হ'লে আরও ত বেশীদিন থাকতে

পারতেন। মাস-ছয়েক থাকলে একটা সত্যিকারের চেঞ্জ হ'ত।"

যামিনী বলিল, "তা আর থাকা চলে কই? পরেশদাদা ও অতদিন থাকবে না। আমার ত পরীক্ষা এসে পড়ল ব'লে, না হ'লে আমি গিয়ে কিছুদিন থাকতে পারতাম।"

প্রতাপ কিছু বলিবার আগেই ছোট্টুর সঙ্গে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মিহির আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই যামিনী শাসনের সুরে বলিল, "কোথায় গিয়েছিলি?"

মিহির উদ্ধতভাবে বলিল, "পাশের বাড়িতে গিয়েছিলাম।"

প্রতাপ তাহার রকম দেখিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "পাশের বাড়ি যাবার তোমার কি সারাদিনের মধ্যে আর সময় হয় না? এ সময়টা তোমার বেড়াতে যাবার জন্তে ঠিক করা আছে তা ত তুমি জানই।"

দিদিও তাহাকে শাসন করিতে আসে, এই জিনিষটা মিহিরের একেবারে অসহ্য ছিল। সেইজন্তই সে অমন তেরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতাপের তিরস্কারে খানিকটা দমিয়া গিয়া বলিল, "আমি চলেই আসছিলাম, ও-বাড়ির ছেলেরা ক্যারোম্ খেলবার জন্তে টানাটানি করতে লাগল, তাই দেরি হয়ে গেল।"

যামিনী বলিল, "ও-বাড়ি যেতেই মা তোমাকে একেবারে বারণ করে গিয়েছেন, তা তোমার যেন একেবারে মনেই নেই। তুমি বড় বেশী বাড়াচ্ছ, আজ আমি ঠিক বাবাকে ব'লে দেব। যাও চট্ করে 'রেডি' হয়ে এস।"

শুধু যামিনী থাকিলে মিহির তাল ঠুকিয়া সংগ্রামে নামিয়া পড়িত, কিন্তু প্রতাপ মোটেই তাহার পক্ষ লইবে না, মনে মনে এই জ্ঞান থাকাতে সে রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে উপরে চলিয়া গেল।

যামিনী বলিল, "দিনের দিন কি যে হচ্ছে তার ঠিক নেই। মা ছাড়া জগতে কারও কথা গ্রাহ্যই করে না একেবারে। আমার খানকয়েক বই কবে থেকে কিনে দিতে বলছি তা যেন কানে শুনতেই পায় না। এদিকে সারাদিন বাইরে টো টো ক'রে ঘুরচে। মা শুনলে এমন বিরক্ত হবেন।"

প্রতাপ বলিল, "এ বয়সের ছেলেরা অমন একটু আনরুলি হয়ই, আর একটু বড় হলেই সামলে যাবে। আপনার বইটই যা-কিছু দরকার হবে, আমায় বলবেন, আমি তার পরদিনই এনে দেব।"

যামিনীর গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল, একটু থামিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই দেব।"

এমন সময় জুতামোজা আঁটিয়া খট্ খট্ করিতে করিতে মিহির উপর হইতে নামিয়া আসিল।

প্রতাপ বলিল, "চল, কতক্ষণই বা তুমি বেড়াতে পারবে? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ত তুমি আধঘণ্টা পার ক'রে দিলে।"

যামিনী উপরে চলিয়া গেল। প্রতাপ মিহিরকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ট্রামে বসিয়া সারাক্ষণ ভাবিতে লাগিল, মিহিরকে তাহার দিদির বাধ্য হইয়া চলা সম্বন্ধে কিছু বলিবে কি-না। কিন্তু মিহির হয়ত কি ভাবিতে কি ভাবিয়া বসিবে, এই-সব সাত-পাঁচ ভাবিয়া আর শেষ-পর্য্যন্ত কিছু বলিল না।

মিহিরকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া প্রতাপ ফিরিয়া যাইবার জোগাড় করিতেছে, এমন সময় ছোট্টু দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাতে একখানা খাম দিল। প্রতাপের বুকটা দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। খামের উপরে কাহারও শিরোনামা নাই, খামখানা বন্ধ করাও নয়। ভিতরে নিপুণভাবে ভাঁজ করা একখণ্ড চিঠির কাগজ, প্রতাপ সেটিকে টানিয়া বাহির করিল। কিছুই নয়, কতকগুলি বইয়ের নাম সুন্দর মেয়েলী হাতে লেখা। খান-তিন উপন্তাস, দুইটি কবিতার বই, একটি বোধ হয় পাঠ্যপুস্তক। সব কয়টিই ইংরেজী বই। প্রতাপের মনটা একটু যেন দমিয়া গেল। দেশের কোনো জিনিষের প্রতিই যেন ইহাদের শ্রদ্ধা নাই, বাংলা বইও কি একখানা তাহারা পড়িতে পারে না? এমন ভাবে শিক্ষিত যে মেয়ে, দেশের কোনো ছেলেকে কি আর তাহার মনে ধরিবে? তাহাদেরই মত ফিরিঙ্গীভাবে মানুষ হইয়াছে, এমন কাহাকেও মনে ধরিলেও ধরিতে পারে।

কিন্তু রাস্তায় চলিতে চলিতে খানিক পরেই এ সব কথা সে ভুলিয়া গেল। যামিনীর হাতের সেই বইয়ের নামলেখা কাগজখানি তাহার বুকপকেটে থাকিয়া কেমন একটা মৃদু উত্তাপ ও মৃদু সৌরভ বিকীর্ণ করিতে লাগিল, তাহার মোহে আবিষ্ট হইয়া প্রতাপ অভিভূতের মত পথ চলিতে লাগিল। চিঠি নয়, ছবি নয়, কিছুই নয়, শুধু হস্তাক্ষর, তবু সেইটুকু পাইয়াই প্রতাপ কেন যে এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিল না।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, রাজু নাই, পিসীমা বারাণ্ডায় বসিয়া কি একখানা চিঠি পড়িবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। প্রতাপকে দেখিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে দেখ্ ত, কে পত্তরখান দিল। সন্ধ্যের পর আর চোখেও দেখি না ছাই।"

প্রতাপ চিঠিখানা পড়িয়া দিল। পিসীমার এক খুড়তুতো বোন লিখিয়াছেন। ছেলেমেয়ে লইয়া অসহ কষ্টে দিন যাইতেছে, কেহ দেখিবার নাই, দিদি যদি কিছু সাহায্য করেন।

পিসীমা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "সবাইকার ঐ এক বুলি! সাহায্যি কর! দিদির যেন কত লাখ টাকা রয়েছে। নিতান্ত পেটের ছেলে ছুটো রোজগার করছে বুড়ী মাকে ফেলে দিতে পারে না তাই, নইলে আমাকেও এতদিনে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরুতে হ'ত।"

প্রতাপও ক'দিন আগে পিসীমার কাছে সাহায্য চাহিয়াছে, কাজেই এ কথাগুলি তাহার কানে বিশেষ মিষ্ট লাগিল না। টাকাটা অবশ্য সে শোধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাতেই ত চাওয়ার যে অপমান সেটা শেষ হইয়া যায় নাই। সে নতমস্তকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া নূতন র‍্যাপারটা গা হইতে খুলিয়া পাট করিতে লাগিল। সেই খামখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া খানিকক্ষণ উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিল, তাহার পর বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিল। আজ রবিবার, বইয়ের কোনো দোকানই খোলা নাই। কাল টিফিনের ছুটিতে চট্ করিয়া কিনিয়া আনিবে, বিকালে পড়াইতে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। যামিনী বইয়ের নামধাম লিখিয়া দিয়াছে, কিন্তু কিনিবার টাকা দেয় নাই, ভাবিয়া প্রতাপের হাসি পাইল। প্রতাপের আর্থিক অবস্থা যে কি চমৎকার, তাহা যামিনী যে বোঝে নাই, ইহা তাহারই প্রমাণ। ইহাতে অবশ্য সে সুখী বই দুঃখিত হইল না। ভাগ্যে কিছু টাকা তাহার হাতে আছে তাই রক্ষা, না হইলে কি লজ্জায়ই প্রতাপকে পড়িতে হইত! বই সে কিনিয়া লইয়া যাইবে, দামের কথা উল্লেখও করিবে না। দাম দিতে যামিনী যদি ভুলিয়া যায়, ত কি চমৎকার হয়। কিন্তু ততখানি সৌভাগ্য কি প্রতাপের হইবে?

পিসীমা বাহির হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে শুনে যা।"

প্রতাপ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্ছেন?"

পিসীমা হাসিয়া, নিজের পাশের জায়গাটা চাপড়াইয়া বলিলেন, "বোস না একটু, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।"

প্রতাপ একটু বিস্মিত হইয়া, তাঁহার পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা, পিসীমা?"

পিসীমা মহাভারতখানা মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন, "ঐ যে তোদেরই গাঁয়ের মেয়ে দয়াময়ী, তাকে তোর মনে আছে? আমার শ্বশুরবাড়ির দেশে তার বিয়ে হয়েছিল, দূরসম্পর্কে আমারই এক দেওরের সঙ্গে।"

প্রতাপ বলিল, "কে, দয়ামাসী? তাঁকে মনে আছে বই কি? আমাদের বাড়ি কতবার এসেছেন।"

পিসীমা বলিলেন, "তার বড়মেয়ে জ্যোতিটা বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে, বিয়ে না দিয়ে আর চলছে না। বাপটা তার চিররুগ্ন, কিছু যে বিশেষ দিতে-থুতে পারবে তা নয়, তবে মেয়েটা বড় ভাল রে। দয়াকে ত দেখেছিস্, অত দুঃখকষ্টেও চেহারায় কেমন লক্ষ্মীশ্রী। মেয়েও হয়েছে তেমনই, বরং গায়ের রং আরও ফরসা। স্বভাব-চরিত্তির চমৎকার, একলা হাতে বাড়ির সব কাজ করে।"

প্রতাপ শিহরিয়া উঠিল। এ আবার কি দৈব-দুর্বিপাক? তাহার মনের আনন্দ-প্রদীপটি যেন এক ফুৎকারে নিবিয়া গেল।

পিসীমা বলিয়াই চলিলেন, "বাইরে সম্বন্ধ করতে

গেলে এখুনি কাঁড়িখানেক টাকা চেয়ে বসবে, জানিস্ ত আমাদের সংসারের গতিক। তাই চেনাশোনার ভিতর দিতে চাচ্ছে, যদি মেয়েটি ভাল শুনে, কেউ দয়া ক'রে অমনি ঘরে নেয়। তোর কথা লিখেছিল—

আর স্থির থাকিতে না পারিয়া প্রতাপ বলিয়া ফেলিল, "কি যে বলেন, তার ঠিক নেই, আমি এখন ও-সব কথা মনেও আনতে পারি? বাড়িতে সব না খেয়ে মরতে বসেছে, এখন আর একটা পরের মেয়ে ঘরে এনে আরও যন্ত্রণা বাড়াবার কি দরকার?"

পিসীমা বলিলেন, "তা চাকরি-বাকরি করছিস্, বয়সও হয়েছে, বে-থা করবি না? কষ্ট কি আর চিরকাল থাকবে? একদিন-না-একদিন অবস্থা ফিরবেই। ভাল মেয়েটি, তাই বলছি।"

প্রতাপের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "না পিসীমা, ও-সব কথা থাক এখন। অবস্থার উন্নতি হবে-কি-না-হবে তার কোনো ঠিকানা নেই। না হবারই সম্ভাবনা, যা দিনকাল। একটা বৃথা আশা নিয়ে নিজেকে এমন জালে জড়ান যায় না। তাদের অন্য কোথাও পাত্র দেখতে বলুন।" পিসীমা আর কিছু পাছে বলেন, সেই ভয়ে সে একেবারে বাড়ি ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

তাহার অদৃষ্টই এইরূপ। কই এতদিন ত কোথাও হইতে সম্বন্ধ আসে নাই? সে যে এমন যোগ্যপাত্র সে খেয়াল এতদিন কাহারও হয় নাই কেন? এখন কি-না তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ হাহাকার করিতেছে সুশীতল পানীয়ের জন্য, তাই এত সাত-তাড়াতাড়ি তাহাকে লোনাজলে ডুবাইয়া মারিবার ব্যবস্থা।

লক্ষ্যহীনভাবে এধার-ওধার ঘুরিয়া সে অনেক রাতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাহার জন্য কেহই বসিয়া নাই, সকলে খাইয়া-দাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। বৌদিদি তাহার বিছানার পাশে ভাত ঢাকা দিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। হ্যারিকেনটার স্তিমিত আলো একটুখানি উস্কাইয়া দিয়া, সে একলা বসিয়া ঠাণ্ডা ভাত তরকারি, যতটা পারিল খাইল, তাহার পর বাসনগুলা বাহির করিয়া দিয়া, হাতমুখ ধুইয়া শুইয়া পড়িল।

সোমবার দিনটা প্রায়ই তাহার ভাল লাগে না, বিশ্রামের পর জোয়াল কাঁধে করিতে কোন্ মানুষেরই বা ভাল লাগে? আজ কিন্তু সে প্রফুল্ল চিত্তেই উঠিল। আজ যেমন করিয়াই হোক, সময় করিয়া কিনিয়া ফেলিতে হইবে। আর কিছু না হোক, যামিনীকে একবার সে চোখে দেখিতে পাইবে ত? তাহার একটুখানি হাসির মূল্য এখন প্রতাপের কাছে জগতের যে-কোনো জিনিষের অপেক্ষা অধিক।

টিফিনের ছুটির জন্য সে একেবারে ব্যস্ত হইয়া গোড়ার ঘণ্টা কয়েকটা কাটাইল। তাহার পর জীবনে যাহা কখনও করে নাই, তাহাই করিয়া বসিল। একটা ফিটন জোগাড় করিয়া, হ্যারিসন রোডে চলিল যামিনীর বই কিনিতে।

অনেক বাছিয়া, অনেক ভাবিয়া, বইগুলি সে কিনিল। উপন্যাস দুইখানি একজন জনপ্রিয় লেখিকার, তাঁহারই লিখিত নূতন একখানি উপন্যাস সবে বাজারে বাহির হইয়াছে। এ বইখানি দেখিলে যামিনী হয়ত রাখিতে চাহিবে, মনে করিয়া প্রতাপ সেখানিও কিনিয়া বসিল। খবরের কাগজে ভাল করিয়া মুড়িয়া বাঁধিয়া সে বইয়ের প্যাকেট লইয়া স্কুলে ফিরিয়া আসিল।

বাড়ি আসিয়া সে আর দাঁড়াইল না। অন্যদিন কিছুক্ষণ বসে, ধীরে সুস্থে জলখাবার খায়, তাহার পর নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করে। আজ তাড়াতাড়ি করিয়া জলখাবার খাইয়া, চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মিহিরকে কালই সে ঠিক সময় উপস্থিত না থাকার জন্য বকিয়া আসিয়াছে। আজ নিশ্চয়ই সে এক মিনিটও দেরি করিবে না। কিন্তু যামিনীর সঙ্গে তাহা হইলে প্রতাপ দেখা করিবে কেমন করিয়া? এত কষ্টে যাহা সে কিনিয়া আনিল, তাহা কি নিতান্ত ছোট্টুর হাতে উপরে পাঠাইয়া দিয়া সারিতে হইবে?

মিহিরদের বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, সে প্রায় কুড়ি মিনিট আগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নীচের তলায় মিহিরের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রতাপ একটু ভাবিয়া লইল, বইগুলি পাঠাইয়া দিবে, না যামিনীকে

খবর পাঠাইবে? প্রথমোক্ত উপায়টাই বেশী ভদ্রতাসঙ্গত অবশ্য, কিন্তু নিজের বুভুক্ষিত হৃদয়কে এতখানি বঞ্চিত করা প্রতাপের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ছোট্টুকে ডাকিয়া বলিল, "দিদিমণিকে খবর দাও যে, আমি তাঁর বই নিয়ে এসেছি।"

ছোট্টু উপরে উঠিয়া গেল। প্রতাপ নীচে দাঁড়াইয়া স্পন্দিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল। যামিনী আসিবে কি আসিবে না?

যামিনী ছোট্টুর সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়া আসিল। প্রতাপ নমস্কার করিয়া বইয়ের প্যাকেটটি অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "দেখুন, পছন্দ না হয় ত অন্ত এডিশান্‌ও আছে।"

যামিনী মোড়ক খুলিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। পছন্দ যে উত্তমরূপেই হইয়াছে, তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। বলিল, "ভারি চমৎকার বাইণ্ডিং। আচ্ছা, এ বইখানার নাম ত আমি লিখে দিই নি, এটা বুঝি আপনার?"

প্রতাপ বলিল, "না, হয়ত আপনার পছন্দ হবে মনে করে এনেছিলাম। না দরকার থাকে ত ফিরিয়ে দিলেই হবে।"

যামিনী ব্যগ্র হইয়া বলিল, "না, না, ফিরতে হবে না, আমি রাখব।" তারপর একটু থামিয়া বলিল, "এর দামটা একটু পরে দেব, আমার কাছে এ মাসে যা আছে তাতে কুলবে না।"

যামিনীর সরলতা দেখিয়া প্রতাপ আরও মুগ্ধ হইয়া গেল। জ্ঞানদা তাহাকে সাহেবী আভিজাত্যের মুখোস্ মাত্র পরাইতে পারিয়াছেন, ভিতরটা তাহার শিশুর মত সরল এবং নিরহঙ্কার থাকিয়া গিয়াছে।

সে বলিল, "যখন আপনার সুবিধে হয় দেবেন।" যামিনী বলিল, "আপনার কোনো অসুবিধে হবে না ত? আমি আস্‌চে মাসের প্রথম সপ্তাহেই দেব।"

প্রতাপ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ও-খানার দাম কোনো দিনও যদি না দিতেন, তাহ'লে আমি সবচেয়ে খুশী হতাম।" বলিয়াই তাহার অত্যন্ত অনুতাপ হইতে লাগিল। এতখানি স্পর্দ্ধা তাহার যামিনী কি সহ্য করিবে? দরিদ্র গৃহশিক্ষক, সে কোন্ অধিকারে প্রভুকন্তাকে উপহার দিতে চায়?

যামিনীর মুখখানা গোলাপ ফুলের মত রাঙা হইয়া উঠিল। মিনিটখানেক পরে তারকার মত জ্যোতির্ময় দুই চোখে প্রতাপের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আচ্ছা।"

এমন সময় মিহির হুড়মুড় করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল। যামিনী ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া হাতের প্যাকেটটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসিয়া পড়িল। বইগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া যামিনী সরাইয়া রাখিল। বইয়ের দিকে তখন তাহার কিছুতেই মন গেল না। এটা তাহার পক্ষে নূতন, বই প্রথম হাতে পাইলে পড়িয়া শেষ না-করা পর্য্যন্ত তাহার আহার-নিদ্রা থাকিত না। বড় বড় বই একদিনে কি করিয়া যে সে পড়িয়া শেষ করিত, দেখিয়া তাহার বন্ধুবান্ধবগণ অবাক হইয়া যাইত। সঙ্গিনীরা বলিত, তোর সব বাজে বুজরুকি, অত বড় বই না কি এত অল্প সময়ে শেষ করা যায়? তুই খালি পাতা উল্টে যাস্ না? আর শেষটা দেখে নিস্? যামিনী কোনোমতেই প্রমাণ করিতে পারিত না যে, সে সত্যই সমস্ত বইখানা পড়ে।

কিন্তু যামিনীরও আজ উপন্যাস পাঠে রুচি ছিল না। বইগুলি আলমারীতে সাজাইয়া রাখিবার উৎসাহও তাহার ছিল না। টেবিলে সেগুলি ফেলিয়া রাখিয়াই আকাশ-পাতাল ভাবিতে আরম্ভ করিল।

এই যে প্রতাপের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতেছে, কথা বলিতেছে, এ-সব শুনিলে মা বিরক্ত হইবেন। তাহার কাছে বই উপহার গ্রহণ করিয়াছে শুনিলে আর রক্ষা রাখিবেন না। কিন্তু যামিনী নিজেকে সংবরণ করিতে পারে না কেন? প্রতাপের পদশব্দ শুনিলেই নীচে যাইবার অধীর আগ্রহ তাহাকে পাইয়া বসে কেন? প্রতাপের কণ্ঠস্বর শুনিলে যামিনীর হৃদয় পূর্ণিমার সাগরের মত উদ্বেল হইয়া ওঠে কেন? প্রতাপের সঙ্গে অতি সাধারণ দুইটা কথা বলিতে পাইলেই, তাহা এত বড় অসাধারণ ঘটনা বলিয়া মনে হয় কেন?

তবে কি সে প্রতাপকে ভালবাসে? যামিনীর সমস্ত দেহ একবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভালবাসে না ইহা সে নিজের কাছে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিল না, আবার ভালবাসে যে, ইহাই বা স্পষ্ট করিয়া বলিবার মত সাহস তাহার কোথায়? নিজের মন নিজেই যে সে এখনও পরিষ্কার করিয়া বোঝে না। ভালবাসার কথা উপন্যাসে কাব্যে সে পড়িয়াছে অনেক, কিন্তু সে-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহার কিছুই নাই। সে কি এই জিনিষ? এই সুমধুর আবেশ? কিন্তু ইহার ভিতর এত ভয়, এত কুণ্ঠা, সঙ্কোচ কেন? প্রতাপ কি সত্যই যামিনীকে ভালবাসে? কি করিয়া সে বুঝিবে? প্রতাপ তাহাকে এমন কোন কথা কোনো দিন বলে নাই, যাহাতে যামিনী এ ধরণের কিছু ধরিয়া লইতে পারে। চোখের দৃষ্টির অর্থ যামিনী কি ঠিক বুঝিয়াছে? ভগবানই জানেন। কিন্তু এই কণ্টকাকুল পথে কোন্ সাহসে সে পা বাড়াইতেছে? যামিনীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, তবু এই পথ হইতে ফিরিবার ক্ষমতা নিজের মধ্যে কোথাও সে খুঁজিয়া পাইল না।

আচ্ছা, সে নিজের জীবনে প্রণয়ীর আগমন যখন কল্পনা করিয়াছে, কখনও কি তাহাকে এমন মূর্ত্তিতে দেখিয়াছে? এই বিষণ্ন মুখ, দীন বেশ, এই দ্বিধাকুণ্ঠিত দৃষ্টি! সে ত সম্রাটের মত দিগ্বিজয়ীকেই কল্পলোকের অধীশ্বর বলিয়া বরণ করিয়াছিল, তাহার এমন রূপান্তর ঘটিল কি করিয়া? কিন্তু এখন সে প্রতাপের পরিবর্ত্তে বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ সম্রাটকে পাইলে খুশী হয়? না।

যামিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। ভাবিয়া আর হইবে কি, যাহা হইবার হইবেই। প্রতাপবাবুর টাকা কয়টা পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। দেরাজে চাবি লাগাইতে গিয়াও যামিনী হাত সরাইয়া লইল। থাক, কাল পাঠাইলেই চলিবে।

ক্রমশঃ

সেকালের বিলাসিতা

শ্রীবসন্তকুমার বিদ্যারত্ন

অনেকের ধারণা পুরাকালে ভারতবর্ষে বিলাসিতার চর্চ্চা ছিল না, যদি বা ছিল তাহা অতি স্থূল রকমের। কিন্তু আজকাল প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার ফলে দেখা যাইতেছে, সেকালের বিলাসিতা আধুনিক বিলাসিতা অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। বরং আজকালকার বিলাসিতাকে পাশ্চাত্যের অনুকরণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু সেকালের বিলাসিতা খাঁটি স্বদেশী রকমের ছিল। চূড়ান্ত বিলাসিতার ফলে ভারতবর্ষে চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। একাদশ ইন্দ্রিয়ের ভোগ চরিতার্থ করিতে গিয়া মনস্বীরা অনন্ত বিলাস-সামগ্রীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে শরীরের শোভাবর্দ্ধক উপকরণের আলোচনা মুখ্যত করা যাইবে। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিষয়েরও অবতারণা করা হইবে।

বিষয়াবতারণা

পক্ককেশে স্রক্, গন্ধ, ধূপ, বসন ও ভূষণ শোভা পায় না, অতএব সর্ব্বপ্রথমেই পক্ক কেশকে কৃষ্ণ করা আবশ্যক। সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে মূর্দ্ধজরাগ সেবা, অর্থাৎ চুলের কলপের বিষয় কথিত হইতেছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কলপের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহৎ সংহিতা এবং কামশাস্ত্রের অন্তর্গত নাগরসর্ব্বস্ব গ্রন্থে কলপ প্রস্তুত-বিধি বিশদভাবে বর্ণিত আছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায়, সেকালের বিলাসীরা লৌহ পাত্রে "কোদো" ধান পচাইয়া এক প্রকার কলপ প্রস্তুত করিতেন। আয়ুর্ব্বেদে ত্রিফলা চূর্ণ, লৌহ চূর্ণ প্রভৃতির দ্বারা কলপ প্রস্তুত-প্রণালী উল্লিখিত আছে।

গন্ধদ্রব্য। গন্ধ দশবিধ। তন্মধ্যে ত্রিবিধ গন্ধ বিলাসযোগ্য, যথা—১। ইষ্ট—মৃগনাভি প্রভৃতি, ২। মধু—মধু পুষ্পাদি, ৩। সংহত—চিত্রগন্ধ বহু কল্কগত। নাগরসর্ব্বস্বে গন্ধ-প্রয়োগক্ষেত্র ও গন্ধ-প্রস্তুত বিধি—১। কুন্তল, ২। কক্ষ, ৩। গৃহোদর, ৪। বসন ৫। বদন, ৬। সলিল, ৭। পূগ (সুপারী, পানের মশলা), ৮। স্নানোদ্বর্ত্তন চূর্ণ, ৯। ধূপ, ১০। দীপবর্ত্তিকা।

প্রস্তুত-প্রণালী লিখিতে হইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে সুতরাং প্রধান প্রধান গুটিকয়েক উপাদানের নাম করা যাইতেছে। ১। নখী, ২। কর্পূর, ৩। কুঙ্কুম, ৪। অগুরু, ৫। পত্রক, ৬। শৈলজ, ৭। শিহ্লক, ৮। কস্তুরী, ৯। জাতিফল, ১০। ত্বক্, ১১। এলা, ১২। মাংসী, ১৩। সূক্ষ্ম এলা, ১৪। কুষ্ঠ (কুড়), ১৫। তগর, ১৬। মুস্তক, ১৭। চন্দন, ১৮। বালক, ১৯। কন্দুক, ২০। গন্ধরস, ২১। গুগ্‌গুলু, ২২। সর্জ্জরস ইত্যাদি।

বৃহৎ সংহিতা নামক পুস্তকে "গন্ধযুক্তি" অধ্যায়ে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার বহু বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে। Synthetic কস্তুরী প্রভৃতি বহু গন্ধদ্রব্যের synthetic উপায়ে প্রস্তুত-বিধি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দুঃখের বিষয়, চর্চ্চার অভাবে সকলই লোপ পাইতে বসিয়াছে।

সুগন্ধি তৈল। বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে নানা প্রকার সুগন্ধি তৈল-প্রস্তুতবিধি লিখিত আছে। প্রাচীন কালে সুগন্ধি তৈলের ব্যবহার যথেষ্ট ছিল, তাহার প্রমাণ সংস্কৃত গ্রন্থে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। "সুগন্ধি তৈলের দ্বারা নৃপতিকে স্নান করাইবে" ("বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর")। সুগন্ধি তৈলের দ্বারা প্রদীপ জ্বালান হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাবান। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, পূর্ব্বকালের বিলাসীরা সাবানও ব্যবহার করিতেন। সাবানের সংস্কৃত নাম "ফেনক"। কামসূত্রের সাধারণ প্রকরণের ১৩ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—"নিত্যং স্নানং দ্বিতীয়কমুৎসাদনং তৃতীয়কঃ ফেনকঃ।"

রাঢ়া (Cosmetic)। "উপমিতি ভবপ্রপঞ্চ কথা" নামক জৈন গ্রন্থে রাঢ়া শব্দের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান করা যায়, সেকালে cosmetic-এরও ব্যবহার ছিল। উপ-৫৪৫।

চূর্ণ। (aromatic powder) ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে উহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। ললিত, ২৮৭ পৃঃ মেঘদূতের "লোধ্র প্রসব রজসা" কথাটি হইতে জানা যায়, সেকালের বিলাসিনীরা লোধ ফুলের রেণু মুখে মাখিতেন। "ভবতি বিকল প্রেরণা চূর্ণ মুষ্টি" কথাটি হইতে aromatic powder ব্যবহারও সেকালে ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। 'উভসগ্‌গদাও' নামক জৈন গ্রন্থে দেখা যায়, সেকালের বিলাসিনীরা ময়দাকে সুগন্ধযুক্ত করিয়া মুখে মাখিতেন। 'উভসগ্‌গদাও' ২৩ পৃঃ।"

লোম নাশন। (Delapitory powder) কুচিমার-তন্ত্র নামক গ্রন্থে ও আয়ুর্ব্বেদে উহার প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত আছে।

দশনবসনাঙ্গরাগ। দন্ত, বসন ও অঙ্গের রঞ্জনবিধি দেহাদির গন্ধ হরণার্থ এবং রূপ বর্দ্ধনার্থ অঙ্গরাগের প্রতি সেকালের মহিলাদের অতিশয় আসক্তি ছিল। গাত্র-দৌর্গন্ধহর প্রলেপ, ঘর্ম্মজনিত গাত্র দৌর্গন্ধহর বিলেপন, ঘর্ম্মহর বিলেপন, অঙ্গসৌরভার্থ বিলেপন, মদনোদ্দীপক অঙ্গরাগ প্রভৃতির উল্লেখ ও প্রস্তুত-প্রণালী "পঞ্চসায়ক" নামক কামশাস্ত্র গ্রন্থে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বর্ণকর অঙ্গরাগ। তিন প্রকার:—১। শ্বেত, ২। পীত, ৩। রক্ত। হরিদ্রা, কুঙ্কুম, লাক্ষা, গোরোচনা, পুষ্পরেণু প্রভৃতি বর্ণ বর্দ্ধনার্থ ব্যবহৃত হইত।

কুঙ্কুম। "সেই চন্দন লেপনের উপরে পত্রের আকারে কুঙ্কুম দিও ছিল।" কাদম্বরী।

চন্দন। "সেই কন্যাটিও তেমন কুঙ্কুম চন্দনাদির দ্বারা অঙ্গলেপন করিয়াছিল।" কাদম্বরী।

মনঃশিলা। "তরল মনঃশিলা দ্বারা মুখমণ্ডল চিত্রিত ছিল।"—ব......

লাক্ষা। "অশোক বৃক্ষ যেমন যুবতিগণের চরণ প্রহারে তরল আল্‌তা সংলগ্ন হইয়া রক্তবর্ণ হয়"

"রক্তবর্ণ পদ্মকলিকার উপর নূতন রৌদ্রের মত পা দুখানিতে আল্‌তা দাও নাই কেন?"—কাদম্বরী।

হরিদ্রা। এখনও উৎকলে ও মাদ্রাজে হরিদ্রার ব্যবহার প্রচলিত আছে। বঙ্গে গাত্রহরিদ্রা প্রসিদ্ধ।

দন্তরাগ। সেকালের বিলাসিনীদের দন্তসংস্কার করান একটা রীতি ছিল। দন্তশান অর্থাৎ দন্তপালিস করিবার এক প্রকার মাজন ব্যবহার করিতেন। দন্ত-লেখক শব্দটিতে আমরা জানিতে পারি, সেকালে এক সম্প্রদায়ের লোক ছিল যাহাদের দন্তসংস্কার করাই উপজীবিকা ছিল। দন্তমসী অর্থাৎ মিসী ব্যবহার সে-কালে ছিল, এখনও পল্লীগ্রামের বর্ষীয়সীদের মধ্যে উহার প্রচলন আছে। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে দন্তরাগ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে—

"দন্তানাং বিবিধা রাগাশ্চতুর্ণাং শুক্লতা তথা।
রাগান্তরবিকল্পাশ্চ শোভনেনাধিকোজ্জ্বলাঃ।
মুক্তানাং সুন্দরীণাং চ মুক্তাভাঃ সিতশোভনাঃ।
সুরক্তা বাপি দন্তাঃ স্যুঃ পদ্মপল্লবরঞ্জনাঃ।
অধররাগো দ্যোতিতঃ তাদধরঃ পল্লবপ্রভঃ। ৩২অঃ।

নেত্র অধর রঞ্জন। অঞ্জনযুক্ত-নেত্র এবং অলক্তকযুক্ত-অধর সেকালের এক আদরের মণ্ডন ছিল।

"নবার্দ্রবাহলক্তকপিণ্ড্যায়ষ্ঠৌষ্ঠ"—কাদম্বরী।
"বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য"—রঘুবংশ।

অঞ্জনশলাকা অর্থাৎ সুর্ম্মা দিবার কাটি সেকালেও ব্যবহৃত হইত।

"জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

কেশবিন্যাস। কাব্যাদিতে সেকালের বিলাসী এবং বিলাসিনীদের অনেক প্রকার কেশবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। অজন্তা গুহায় অঙ্কিত চিত্র দেখিলে সেকালের বহুপ্রকারের কেশবিন্যাসের বৈচিত্র্য জানিতে পারা যায়।

কবরী। "পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দরংদধতীবিলোলকবরীকমাননম্।" (উত্তররামচরিত)। অবদ্ধকবরী উহার মস্তক হইতে পৃষ্ঠদেশে লম্বমান এবং আনন পাণ্ডুবর্ণক্ষীণ কপোল দ্বারা মনোহর শোভা প্রাপ্ত হইতেছে।

কাকচ্ছদ, কাকচ্ছদি, কাকপক্ষ। মস্তকের উভয় পার্শ্বে কেশ রচনাবিশেষ। কাহারও মতে পক্ষ কেশগুচ্ছ, কেহ বা উহাকে কানপাট্টা বলেন।

"কাক পক্ষধরঃ কুমারঃ।"—রঘুবংশ। আমার মনে হয়, কাবুলিওয়ালাদের মাথার দুই পার্শ্বে কান পর্য্যন্ত বা ততোধিক লম্বমান কেশগুচ্ছ। এবং ঐ দুই পার্শ্ব ব্যতীত সমস্ত মস্তক মুণ্ডিত। এইরূপ কেশ-রচনাকে তৎকালে কাকপক্ষ বলা হইত। সম্ভবত চণ্ডীদাস ইহাকেই 'ঘোড়া-চুল' বলিয়াছিল—

"কাল কাহ্নাঞি মাথাতে ঘোড়াচুলে।
এহি চিহ্নে কাহ্নাঞিকে চাহিহ গোকুলে॥"
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, রাধাবিরহ ৩৩১ পৃঃ

ভ্রমরক। ললাট লম্বিত চূর্ণ (কোঁকড়া) কুন্তল।

বেণী, প্রবেণী। দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন প্রসিদ্ধ। প্রোষিতভর্ত্তৃকাদি ধার্য্য কেশরচনা। ইতি ভরত।

বিউনী ইতি ভাষা। বিরহিনী বদ্ধ কচঃ ইতি জটাধর।

প্রান্তোন্মীলিত কুন্তল। ললাট এবং গণ্ড পর্য্যন্ত বিলম্বী কুন্তল।

"প্রান্তোন্মীলন মনোহর কুন্তলৈঃ...অকৃত্রিম বিভ্রমৈঃ।" উত্তররাম-চরিত।

অকৃত্রিম বিভ্রম শব্দটিতে বুঝা যাইতেছে, সেকালের বিলাসীরা কৃত্রিম উপায়ে এই প্রকার কেশরচনা করিতেন।

অলক। ভঙ্গিযুক্ত কেশ। "অলতি ভূষয়তি মুখম্।"—ভরত। মুখের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে বলিয়া ভঙ্গিযুক্ত (কেয়ারি করা) কেশকে অলক কহে।

চূড়া। কৃষ্ণচূড়া প্রসিদ্ধ। বাউলদিগের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। "চূড়াপাশেনবকুরবকং।"—মেঘদূত।

সীমন্ত। সীঁথি ইতি ভাষা। সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাং।"—মেঘদূত।

নিতম্বচুম্বিত শিখণ্ডভার। সেকালের ললনাদের অতি আদরের মণ্ডন ছিল।

"ময়ূরাবলীমিব নিতম্ব-চুম্বি-শিখণ্ডভার—বিস্ফুরচ্চন্দ্রকান্তাম্"
কাদম্বরী।

আজকালও যে আদরের নয় তাহা বলা যায় না; বব্ করা চুল দেখে সন্দেহ জন্মায়।

ললাটলুলিত কেশ। ললাটতটে শোভমান কেয়ারি করা কেশ সেকালের মহিলাদের অতি প্রিয় মণ্ডন ছিল।

"কন্দর্পকেলি লম্পটলম্পট লাটীললাটতট লুলিত ধম্মিল্লভার বকুল কুসুম পরিমল মেলন সমৃদ্ধ মধুরিমগুণঃ।" বাসবদত্তা।

ধম্মিল্ল। নানারূপ কেয়ারি করিয়া কেশবিন্যাস করা ও তৎসঙ্গে পুষ্পাদি দ্বারা শোভিত করা।

"উরসি নিপতিতানাস্রস্তধম্মিল্লকানাংবধূনাং।" ভর্ত্তৃহরি।

আকুটিলাগ্রকলাবলম্বিকুন্তলভার। সেকালের

কাপ্তেন বাবুদের অতি আদরের বস্তু ছিল। "আকুঞ্চিতা গ্রেনকুন্তাবলম্বিনা কুন্তলভারেন।—কাদম্বরী।

কাঁকুই, চিরুণী। কঙ্কতিকা, প্রসাধনী চিরুণীর সংস্কৃত নাম। যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে ধাতুময় গজদন্ত নির্ম্মিত, মহিষশৃঙ্গের, কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রভৃতি নানাপ্রকার চিরুণীর বর্ণনা এইরূপ লিখিত আছে।

"কাষ্ঠজা ধাতুজাচৈবশৃঙ্গজাচ যথাক্রমম্।

*

কনকং রজতং তাম্রং পিত্তলং সিসকং তথা
লোহং ... ...
মৃগানাং মহিষানাঞ্চ শৃঙ্গজাতা প্রসাধনী
গজদন্তসমুদ্ভূতা রাজ্ঞামেবোপযুজ্যতে।"

তিলক। তিলক-রচনা সেকালের ললনাদিগের অলঙ্কার-স্বরূপ ছিল, তাহার পরিচয় কাব্যাদিতে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে।

"তিলকঃ পত্ররেখাচ ভবেদঙ্গবিভূষণম্।"

তিলক-রচনাদি চতুঃষষ্ঠী কলাবিদ্যার অন্তর্গত "বিশেষকচ্ছেদ্য" নামক কলাবিদ্যার প্রকারভেদ। আজকাল তিলক-রচনার পাট উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কেবল বিবাহের সময় বর-বধূর মুখে তিলক রচনা দেখা যায়। বৈষ্ণব বাবাজীদের তিলকের সহিত বিলাসের কোন সম্পর্ক নাই। চন্দন কস্তুরী অগুরু গোরোচনা প্রভৃতির দ্বারা তিলক রচনা করা হইত।

"কামিনী যেমন চন্দন কস্তুরী ও অগুরুর অনুলেপনে সৌরভশালিনী এবং মনোহর তিলক ধারণে বিভূষিতা।" কাদম্বরী

"কাদম্বরীর কপোলদেশে চন্দনবিন্দুর তিলক ছিল।"—কাদম্বরী

পত্রভঙ্গ। কামিনীদের স্তনের উপর পত্রাকার রেখাতেই বক্রতা ছিল কিন্তু লোকের চিত্তে বক্রতা ছিল না।" কাদম্বরী।

"কেনই বা চন্দ্রের উপরে হরিণচিহ্নের ন্যায় বিশাল স্তনযুগলের উপর কৃষ্ণাগুরুর পত্রভঙ্গ চিত্রিত কর নাই।" কাদম্বরী

"কপোলযুগলের কুঙ্কুম পত্রলতা চিহ্নগুলি প্রক্ষালিত হইয়াছে।" কাদম্বরী।

"গোরোচনাবিন্দু দ্বারা ললাটে তিলক নির্ম্মাণ কর নাই।" কাদম্বরী।

বেশবিন্যাস। বহু প্রকার বেশবিন্যাসের উল্লেখ কাব্যাদিতে পাওয়া যায়। যথা, ১। রাজবেশ, ২। অভিসারবেশ, ৩। তুরঙ্গাদি আরোহণবেশ, ৪। যুদ্ধ-বেশ, ৫। শৃঙ্গারবেশ ইত্যাদি। বস্ত্রই বেশের মধ্যে প্রধান উপকরণ। বস্ত্র চারি প্রকার:—১। ত্বকজ—বাকল (বল্কল), ২। ফলজ—কার্পাস, ৩। কৃমিজ—গুটিপোকা, ৪। রোমজ—মেষাদির রোম। মনুসংহিতায় বস্ত্রশুদ্ধি প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে।

"কৌষেয়াবিকয়োঃ রূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমানাং গৌরসর্ষপৈঃ।

রাজবেশ। রাজবেশের বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায় না। ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধগ্রন্থে আরামপ্রদ কোমল এবং নানাবর্ণে বিচিত্র পোষাকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাব্যাদিতে রাজার পোষাককে উজ্জ্বল বেশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত পোষাকই ধনীর পোষাক ছিল। ললিতবিস্তর, ১২১ পৃঃ। উক্ত গ্রন্থে খিলাত নামে আর এক প্রকার পোষাকের নাম পাওয়া যায়।

কঞ্চুক। আলখাল্লা জাতীয় এক প্রকার পোষাক। "অন্তঃ কঞ্চুকীকঞ্চুকস্য বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ।" রত্নাবলী। কঞ্চুকীর কঞ্চুকের মধ্যে বামন ভয় পাইয়া প্রবেশ করিতেছে। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে কঞ্চুক এক প্রকার ঢিলা জামা। কাদম্বরীতে "ধবল কঞ্চুকাবচ্ছন্ন শরীরৈঃ।" বাক্যটিতে বুঝা যাইতেছে, কঞ্চুকে সমস্ত শরীর ঢাকা পড়ে। নানা প্রকার বাহারি কঞ্চুকের ব্যবহার ছিল, তাহার প্রমাণ "জরদ ব্যাঘ্র চর্ম্ম শবল কঞ্চুকারিভিঃ"—কাদম্বরী। বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের চর্ম্মের ন্যায় বিচিত্র কঞ্চুকধারী।

অভিসারবেশ। "...গতমভিসারে মদনমনোহর-বেশম্।" গীতগোবিন্দে মদন মনোহর বেশ কিরূপ তাহার পরিচয় যাহা কিছু পাওয়া তাহা তত চিত্তাকর্ষক নহে। অভিসার গোপনীয় ব্যাপার, সুতরাং নায়িকা যথাসম্ভব আত্মগোপন করিয়া অভিসারে যায়। কঙ্কনের এবং নূপুরের মুখরত্ব মূকত্বে পর্য্যবসিত হয়, মেখলা দৃঢ় সংযমিত হয় কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে শরীর আবৃত থাকে।

তুরঙ্গারোহণবেশ। বর্ম্ম সাঁজোয়া প্রভৃতি তুরঙ্গারোহণবেশ।

"বারবাণমবতার্য্য অপনীয় চাশেষং তুরঙ্গাদিরোহণোচিতং বেশ পরিগ্রহম্"—কাদম্বরী। গাত্র হইতে কবচ খুলিয়া এবং অশ্বারোহণযোগ্য সমস্ত বেশভূষা খুলিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধবেশও এইরূপ।

বস্ত্রের বিচিত্র বর্ণ। সেকালে নানা রঙের বস্ত্র ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ, যথা—

"গোরোচনা চিত্রিত দশমন্দুপ হত মণ্ডিবকলং
দুকূল যুগলং বসানাং বিলাসবতীং দদর্শ।"

"দুকূল যুগল" কথাটিতে বুঝা যায়, সেকালের রমণীরা একখানি কাপড় পরিতেন ও একখানি গায়ে ঢাকা দিতেন।"—কাদম্বরী।

ইন্দ্রায়ুধরাগরুচির বস্ত্র। রামধনু রঙের কাপড়। "কশ্চিজ্জলধর সময় দিবস স্রিয় ইবেন্দ্রায়ুধরাগ রুচিরাম্বর ধারিণ্যঃ।"—কাদম্বরী।

বর্ষাকালের দিনলক্ষ্মী যেমন ইন্দ্রধনুরবিবিধ বর্ণে মনোহর আকার ধারণ করে সেইরূপ কতকগুলি যুবতী ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণে মনোহর বসন ধারণ করিয়াছিল।

ছিটের কাপড়। বিচিত্র পটোলক। ছিটের কাপড় যে পূর্ব্বে ছিল তাহার প্রমাণ বৌদ্ধ গ্রন্থে বিস্তর পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর, ৬ অঃ।

ফুলদার বা বুটিদার কাপড়। ইহারও প্রমাণ ঐ পুস্তকে আছে। ৬-৭ অঃ। পট্টদাম কথাটি ঐ পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গরম কাপড়। উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথা নামক জৈন গ্রন্থে "রল্লিকা" কথাটি গরম কাপড় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ২২০ পৃঃ।

বিদেশীয় বস্ত্র। চীনাংশুক।

"অতি ধবলপ্রভা পরিগত দেহতয়া স্ফটিক গৃহগামিনীমিব দুগ্ধ সলিলমগ্নামিব বিমল চীনাংশুকান্তরিতামিব।"—কাদম্বরী।

চুনট-করা কাপড়। চুনট করিয়া কাপড় পরা সেকালের বিলাসীদের রীতি ছিল তাহার প্রমাণ "পুষ্পরক্ত জাতক" নামে বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ওড়না। টিয়া পাখী রঙের ওড়না সেকালের বিলাসীদিগের প্রিয় জিনিষ ছিল।

"এসোহস্ত শুকপক্ষতিরাগেনোত্তরীয়াংশুপ্রান্তেন।"—কাদম্বরী

পাগড়ী। শ্বেতদ্বীপবাসীরা শাদা রঙের পাগড়ী পরিতেন তাহার প্রমাণ কাদম্বরীতে পাওয়া যায়। যথা, "...সিতোষ্ণীষৈঃ সিতবেশপরিগ্রহতয়া শ্বেতদ্বীপ সত্ত্বৈরিব।"

টুপী। খোল কথাটি সংস্কৃতে টুপী অর্থে ব্যবহৃত হয় "ক্ষণমপ্য মুক্ত কাল কম্বলখণ্ড খোলেন।"—কাদম্বরী

মোজা। ভরত মল্লিকের টীকায় মোজার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে।

"সৈব-উপানৎ পাদারক্তা পাদারাম প্রমাণা চেৎ অনুপদীনা "মোজা" ইতি খ্যাতা। তন্ত্বাদি সহিতমশেষ পদম্ অনুপদং সাকল্যে অব্যয়ীভাবঃ।"

মঞ্জু নামে এক প্রকার তৃণ দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া মোজা নাম হইয়াছে। তবে বিলাসিতার জন্য ব্যবহৃত হইত না।

ছাতা। রামায়ণ, মহাভারত, যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে বহুপ্রকার ছাতার বর্ণনা পাওয়া যায়। শত শলাকা নির্ম্মিত আকুঞ্চন প্রসারণ করিতে পারা যায় এইরূপ ছত্রের উল্লেখ আছে।

"নত্তে শত শলাকেন জলকেন নিত্তেন চ।"
রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ২০ সর্গ।

চর্ম্মপাদুকা। জুতা। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে জুতার ব্যবহার ছিল তাহার প্রমাণ তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায়, "কাঞ্চী উপানহৌ উপমুঞ্চতি।" পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসারে পাদুকা সূর্য্যলোক হইতে মর্ত্ত্যে প্রবর্ত্তিত হয়। এই পাদুকা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। যুধিষ্ঠির একদিন ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে ভরতর্ষভ, এই যে শ্রাদ্ধকার্য্যে ছত্র ও পাদুকা দান করা হয় ইহার প্রবর্ত্তয়িতা কে?" তদুত্তরে ভীষ্মদেব এই গল্পটি বলেন (অনুশাসন পর্ব্ব।)

একদা মধ্যাহ্ন কালে জমদগ্নি মুনি ভার্য্যা রেণুকাদেবীকে বাণাহরণে নিযুক্ত করিয়া ঊর্দ্ধে বাণনিক্ষেপ করিতে-ছিলেন। সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত হইয়া রেণুকা বাণাহরণে অসমর্থা হন। তদ্দর্শনে জমদগ্নি সূর্য্যদেবের যথোচিত শাস্তি বিধান করিবার জন্য ধনুতে বাণ যোজনা করিলেন। অনন্তর সূর্য্যদেব জমদগ্নির শরণাপন্ন হইয়া ছত্র ও চর্ম্ম পাদুকা উপহার দ্বারা তাঁহার তুষ্টি বিধান করেন। দানকালে সূর্য্যদেব বলিয়াছিলেন—

"মহর্ষে শিরস্ত্রাণং ছত্রং মদ্রশ্মিবারণম্।
প্রতিগৃহ্ণ পদ্ভ্যাঞ্চ ত্রাণার্থং চর্ম্মপাদুকে।"

অর্থাৎ হে মহর্ষি আমার আতপ-নিবারক শিরস্ত্রাণরূপ এই ছত্র এবং পাদত্রাণ এই চর্ম্মপাদুকা অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন।

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

১০

বিভিন্ন মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত—অনুবৃত্তি

অহোরাত্র বিদ্যা ও শুক্লকৃষ্ণগতি।—এই দুই বিষয় একই মার্গের অন্তর্গত, অথবা এই দুইটি বিভিন্ন মার্গ তাহা সঠিক বুঝা যায় না। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে পর পর এই দুই মার্গের আলোচনা আছে। বর্ণনার ভঙ্গী দেখিলে মনে হয় এই দুই মার্গ পৃথক। অধুনা এই দুই সাধনপদ্ধতি লোপ পাইয়াছে।

অহোরাত্র বিদ্যা বলিলে ঠিক কি বুঝাইত আমার তাহা জানা নাই। অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই অহোরাত্র বিদ্যার বিবরণ লিখিতেছি। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের ২৩১ অধ্যায়ে অহোরাত্র বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ৩০ অহোরাত্র বা দিবারাত্রিতে ১ মাস হয়; ১২ মাসে ১ সংবৎসর। ১ সংবৎসরে ১ দৈব অহোরাত্র। তন্মধ্যে উত্তরায়ণের ৬ মাস দৈব দিন ও দক্ষিণায়নের ৬ মাস দৈব রাত্রি। ২,০০০ দৈব বৎসরে (অর্থাৎ ৭,২০,০০০ মানব বৎসরে) ব্রহ্মার ১ দিনরাত্রি। ১০০০ দৈব বৎসরে ব্রহ্মার দিন ও ১০০০ দৈব বৎসরে ব্রাহ্ম রাত্রি। ইহাই সাধারণ জ্ঞানিগণের কালের পরিমাপক হিসাব ধরা হইত। আর এক শ্রেণীর জ্ঞানী ছিলেন তাঁহাদের মতে ব্রাহ্ম দিন বা রাত্রির পরিমাণ ১০০০ দৈব বৎসর নহে, পরন্তু আরও অধিক। ১২০০০ দৈব বৎসরে এক যুগ এবং এইরূপ ১০০০ যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি বা এক দিন অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ২০০০ যুগে ব্রহ্মার অহোরাত্র। এই শেষোক্ত জ্ঞানিগণকে অহোরাত্রবিৎ বলা হইত। গীতায় ইহাদের কথাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার দিনে জগৎ প্রকটিত হয় এবং ব্রাহ্মরাত্রিতে সৃষ্টি লুপ্ত হয় এই ধারণা খুব সম্ভবতঃ অহোরাত্র বিদ্যা হইতে আসিয়াছে। অনুমান করা যায় অহোরাত্রবিদেরা কালকেই ব্রহ্ম বা শ্রেষ্ঠ সত্তা বলিয়া মনে করিতেন। মহাভারতে অহোরাত্র-বিবরণসম্পর্কে লিখিত হইয়াছে 'কালকে ব্রহ্মস্বরূপে বিদিত হওয়া উচিত', 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ এই কালকেই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন।' উপনিষদের কোন কোন ঋষি কালকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরের ১।২ শ্লোকে দেখা যায় কেহ কালকেই জগতের চরম কারণ বলিতেন, কাহারও মতে পদার্থসমূহের স্বভাব দ্বারাই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে অন্য কোন ব্রহ্ম সত্তা নাই, কেহ-বা নিয়তিকে চরম মনে করিতেন, অপরে মনে করিতেন জগতের পরম কারণ বলিয়া কিছু নাই ঘটনাবলী সমস্তই আকস্মিক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে-ভাবে অহোরাত্র বিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন তাহার ধারা অন্যান্য সাধনমার্গের আলোচনার ধারার সহিত তুলনা করিলে মনে হইবে যে, অহোরাত্রবিদেরা কালকেই চরম সত্তা মনে করিতেন। ৮।১২ শ্লোকে আছে যে ভূতগ্রাম অবশ হইয়াই জন্মায় ও লয় পায়। অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবা রাত্রি বা কালই নিয়ন্তা। অহোরাত্রবিদের মতে ব্রাহ্মরাত্রিতে সমস্তই লয় পায়, কাল ব্যতীত কোন সত্তাই অবশিষ্ট থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন অহোরাত্রবিদের অব্যক্তের পরবর্ত্তী অন্য যে অব্যক্ত সনাতন ভাব বা সত্তা আছে তাহা সর্ব্বভূত লয় পাইলেও বিনষ্ট হয় না। এই সত্তাই ব্রহ্ম। অব্যক্তের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অহোরাত্র বিদ্যার দোষ খণ্ডন করিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও ১।৩ শ্লোকে আছে—ধ্যানযোগের দ্বারা ঋষিরা দেখিলেন যে এক অদ্বিতীয় দেবতা কাল. ইত্যাদি অন্য সমস্ত কারণকে নিয়মিত করিতেছেন।

শুক্লকৃষ্ণগতি—উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয় এবং তথা হইতে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় এই বিশ্বাস মহাভারতেরও

বহুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদি বহু স্থানে এই দুই গতির বর্ণনা আছে। জীবাত্মা কোন্ কোন্ পথ দিয়া চন্দ্রলোকে বা ব্রহ্মলোকে যায় তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। সকল গ্রন্থে এই পথের বিবরণ ঠিক এক প্রকার নহে। গীতায় ৮ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোক হইতে অধ্যায়ের শেষ ২৮ শ্লোক পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসের আলোচনা আছে। শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিকে দেবযান ও পিতৃযান পথও বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা শুক্লকৃষ্ণগতিতে বিশ্বাসী, দক্ষিণায়নে মৃত্যুর সম্ভাবনা তাঁহাদের মানসিক অশান্তির হেতু। ভীষ্ম উত্তরায়ণের অপেক্ষায় অনেক দিন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যিনি যোগী, অর্থাৎ যিনি কর্ম্মের কৌশল জানেন ও নিঃসঙ্গচিত্তে কর্ম্ম করেন তিনি এই উভয় গতি জানিয়া মুহ্যমান হন না, এজন্য তিনি অর্জ্জুনকে সর্ব্বকালে যোগযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন। এই মার্গের আলোচনার উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বেদে তপস্যা ইত্যাদি যত প্রকার মার্গের উপদেশ আছে যোগী তৎ-সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া পরমস্থান প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম্ম এই যে শুক্লকৃষ্ণ গতি ইত্যাদি বেদোক্ত নির্দ্দেশে উদ্বিগ্ন হইও না, সর্ব্বসময়ে নিঃসঙ্গচিত্তে কর্ম্ম করিলে তোমার কোন চিন্তাই নাই; কোন্ সময় মরিব এই ভাবনায় বৃথা মুহ্যমান হইও না।

শ্রীকৃষ্ণ শুক্লকৃষ্ণ গতিদ্বয় স্পষ্ট অবিশ্বাস না করিলেও তাহাদের বিশেষ কোন মূল্য দেন নাই। উত্তরায়ণেই যাহাতে মৃত্যু হয় তাহার চেষ্টা কর, এমন কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। শুক্ল কৃষ্ণ গতিতে বিশ্বাস কোথা হইতে আসিল বলা কঠিন। এই বিশ্বাস যে বহু প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহ। শ্রীকৃষ্ণ এই মতকে শাশ্বত বলিয়াছেন। বেদ ও উপনিষদও তাহাই বলিতেছেন। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শুক্লকৃষ্ণ গতির বর্ণনায় স্থান ও কাল উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ, ও উত্তরায়ণ ছয় মাস ইহারা শুক্লগতির পরম্পরা; ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ও চন্দ্রজ্যোতি কৃষ্ণগতি পরম্পরা। ছান্দোগ্যে এই দুই মার্গের আরও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। অর্চ্চি পথ বা দেবযান পথ বা শুক্লগতির পরম্পরা—অর্চ্চি হইতে দিন, দিন হইতে শুক্লপক্ষ, তৎপর উত্তরায়ণের ছয় মাস, তৎপরে সংবৎসর, তৎপরে আদিত্য, তৎপরে চন্দ্রমা, তৎপরে বিদ্যুত। বিদ্যুত হইতে এক অমানব পুরুষ আত্মাকে লইয়া ব্রহ্মদর্শন করায়। পিতৃযান বা ধূমমার্গ বা কৃষ্ণগতি পরম্পরা—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক, আকাশ, চন্দ্রমা। এই চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া আত্মার কর্ম্মক্ষয় হইলে তথা হইতে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, তৎপরে অভ্র, তৎপরে মেঘ হইতে বারিপাতের সহিত পৃথিবীতে আসিয়া ব্রীহি, যবাদির সহিত পুরুষের মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট হয় ও সেই পুরুষের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। ছান্দোগ্যের বর্ণনা হইতে দেখা যাইবে যে চন্দ্রলোক, আদিত্যলোক প্রভৃতি স্থানের সহিত মাস, বৎসর ইত্যাদি কালের কথাও বলা হইয়াছে। দেশ ও কাল ব্যতীত দেবযান ও পিতৃযান পথে অগ্নি ধূম প্রভৃতি বস্তুও উল্লিখিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত সংমিশ্রণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ব্যাখ্যাকারেরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য বলেন যে এখানে দেশ কাল পাত্র উদ্দিষ্ট না হইয়া তত্তৎ অভিমানী দেবতাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ এই দেবতাগণই জীবাত্মাকে পর পর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যান। কোন কোন ব্যাখ্যাকার রূপক হিসাবেই এই বিবরণের অর্থ করেন। এই দুই প্রকার ব্যাখ্যার একটিও সন্তোষজনক নহে। তিলক বলেন, যে-সময় আর্য্যদের পিতৃপুরুষেরা মেরুপ্রদেশে বাস করিতেন শুক্লকৃষ্ণ মার্গের বিশ্বাস সেই সময়কার। কারণ একমাত্র মেরুপ্রদেশেই উত্তরায়ণের ছয়মাস দিন বা শুক্লজ্যোতি-সম্পন্ন ও দক্ষিণায়নের ছয়মাস ধূম বা অন্ধকারময়। সেই যুগেই উত্তরায়ণে মৃত্যু প্রশস্ত বলিয়া মনে করা হইত। এই ব্যাখ্যাতেও দেবযান পিতৃযানের সমস্ত সমস্যার উত্তর পাওয়া যায় না। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুমান মানিলে দেবযান পিতৃযানের ব্যাখ্যা সুগম হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে ভারতবর্ষ আর্য্যদের পিতৃভূমি নহে। আধুনিক মঙ্গলিয়াই আর্য্যদের আদি বাসস্থান ছিল ও তাহাই স্বর্গনামে অভিহিত হইত। উত্তর-সাইবেরিয়ার নাম ছিল ব্রহ্মলোক ও তথাকার অধিপতির

নাম ব্রহ্মা। সেইরূপ চন্দ্রলোক প্রভৃতি সমস্তই এককালে ভৌম ছিল ও ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি মানুষই ছিলেন। ভারতবর্ষ ও পিতৃভূমি মজলিয়া হইতে ব্রহ্মার নিকট অনেক লোক যাইতেন। তাঁহারা যে-সকল পথে যাতায়াত করিতেন তাহাই দেবযান পথ। আর পিতৃগণ যে-পথে ভারতবর্ষে আসিতেন তাহাই পিতৃযান পথ। ভারতবর্ষে আসিবার পর আর্য্যদের পিতৃলোক ও ব্রহ্মলোকের সহিত সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়। তখন দেবযান ও পিতৃযান পথের স্মৃতি মাত্র থাকিয়া যায়। এই স্মৃতি কোথাও অবিকৃত কোথাও বা বিকৃত অবস্থায় বেদের নানা স্থানে রহিয়া গিয়াছে। বৈদিক কালেই দেবযান ও পিতৃযানের যথার্থ তত্ত্ব লুপ্ত হইয়াছিল।

বিদ্যারত্ন মহাশয় 'মানবের আদি জন্মভূমি' গ্রন্থে বেদ হইতে যে-সব শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে বণিকেরা পিতৃযান পথে ইন্দ্রের নিকট বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিতে যাইতেছেন। এক ঋষি অন্য ঋষিদের বলিতেছেন—আমি ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলাম, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তোমাদের সত্য বলিতেছি তথায় ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হয়। কালক্রমে যখন দেবযান ও পিতৃযান পথের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইল তখন ঋষিরা নানা প্রকার কাল্পনিক 'আধ্যাত্মিক' ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। দেবযান ও পিতৃযান মার্গে মূলতঃ যে-সকল কালবাচক শব্দ ছিল তাহা দ্বারা কতদিনে ঐ সকল পথ অতিক্রম করা যাইত তাহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে এই কালনির্দ্দেশের অনেক কাল্পনিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রহ্মলোকে যাওয়া ক্রমে পরব্রহ্মলাভের সমবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠককে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মূল গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি।

যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকারীদের পিতৃযান পথে ও ব্রহ্মবিদের দেবযান পথে গতি কেন হয়, তাহা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না। ছান্দোগ্যে বর্ণিত বিবরণ পাঠে আমার মনে যে-ব্যাখ্যার কথা উদিত হইতেছে তাহা বলিতেছি। ঋষিরা পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। পুণ্যাত্মার স্বর্গলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন হয় ও ব্রহ্মবিদের আত্মার পুনর্জ্জন্ম হয় না ইহাই তাঁহাদের মত। মায়াবদ্ধ জীবাত্মা দেহাদি আশ্রয়েই অধিষ্ঠান করে। দেহের বিনাশ হইলে সেই আত্মা অন্য অধিষ্ঠানে উৎক্রমণ করে। মানুষের মৃত্যুর পর পুরাকালেও দেহের অগ্নি-সৎকার করা হইত। ঋষিরা দেখিলেন অগ্নি-সৎকারের সময় অগ্নির ধূম ও জ্যোতি রূপেই দেহ নিঃশেষ হয়। অতএব দেহস্থিত আত্মা হয় ধূম, নয় জ্যোতির আশ্রয়েই দেহত্যাগ করে। ধূম আকাশে উঠিয়া মেঘ হয় ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইতে ব্রীহি যবাদি জন্মে। অতএব ধূম ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুনরায় বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নামিয়া আসে; যাঁহাদের আত্মার পুনর্জ্জন্ম হয় দেহ ভস্মীভূত হইবার পর তাঁহারা ধূমমার্গেই গমন করিয়া থাকেন। অন্য পক্ষে চিতাগ্নির জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া আকাশে মিলাইয়া যায়; সেই জ্যোতির আর পুনরাবর্ত্তন নাই। অতএব যে-আত্মার পুনর্জ্জন্ম নাই তাহা দেহ ধ্বংসের পর জ্যোতি পথই অবলম্বন করে। ধূমপথ ও অর্চ্চি পথ উভয়েই পুণ্যাত্মাদিগের পথ। যাহারা পাপী তাহাদের আত্মা এই উভয়ের কোন পথই আশ্রয় করে না। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই তাহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। চিতাভস্মেই খুব সম্ভবত এই সকল আত্মার আশ্রয় কল্পিত হইত। যে-স্থানে ভৌম ব্রহ্মলোক ছিল তথায় একাদিক্রমে ছয়মাস দিন বা জ্যোতি ও ছয়মাস রাত্রি বা অন্ধকার থাকিত। উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে অগ্নি-সৎকারের পর তথায় ছয় মাস জ্যোতির আশ্রয়ে আত্মা যাইতে পারে। দক্ষিণায়নে এই আশ্রয় নাই। সেজন্য উত্তরায়ণে মৃত্যুই প্রশস্ত। পুনশ্চ, যখন ব্রহ্মলোকে ও স্বর্গলোকে ভারতবর্ষ হইতে আর্য্যেরা গমনাগমন করিতেন তখন দূরত্বের ও দুর্গম পথের জন্য হয়ত অনেকেই ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। কিন্তু স্বর্গলোক অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হওয়ায় তথায় সুখভোগের পর আমরা এখন যেমন দার্জ্জিলিং প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসি সেইরূপ অনেকেই ফিরিয়া আসিতেন। পরলোকেও মৃত্যু হয় একথা 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে। এই সকল ঘটনার আশ্রয়েই সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে আত্মার দেবযান ও পিতৃযান পথ কল্পিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়নিরোধ, ইন্দ্রিয়সংহরণ, ইন্দ্রিয়সংযম, ইত্যাদি—অধুনা ব্রহ্মচর্য্য বা ইন্দ্রিয়সংযম বলিলে আমরা কামেন্দ্রিয়েরই সংযম বুঝিয়া থাকি, কিন্তু গীতার কুত্রাপি এই দুই শব্দ এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। সমগ্র গীতায় কোথাও বিশেষ করিয়া কামেন্দ্রিয় সংযমের কথা নাই। শঙ্কর ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—গুরুগৃহে বাস, গুরুসেবা, ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ ও অধ্যয়নাদি কার্য্য (৬।১৪ শ্লোকের শঙ্কর-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। পঠদ্দশায় শাস্ত্রে কামেন্দ্রিয়-সংযম উপদিষ্ট হইয়াছে; ইহা ব্রহ্মচর্য্যের একটি অঙ্গমাত্র। কামেন্দ্রিয়ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, অতএব ইন্দ্রিয়সংযম বলিলে কেবল কামেন্দ্রিয়-সংযম বুঝায় না। শ্রীকৃষ্ণ ৬।১৪ শ্লোকে বলিতেছেন ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিত হইয়া যোগ অভ্যাস করিবে। পুনরায় ৮।১১ শ্লোকে বলিলেন অক্ষর ব্রহ্মকে জানিবার জন্য কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন। ১৭।১৪ শ্লোকে ব্রহ্মচর্য্যকে শারীরিক তপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য্যকে অক্ষর ব্রহ্মলাভের জন্য যোগের সাধন এবং চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়া ধরিয়াছেন।

৪।২৬ ও ২৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল আহুতি দেন, অন্য কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকল আহুতি দেন, অপর কেহ জ্ঞান দ্বারা উদ্বোধিত আত্ম-সংযমরূপ অগ্নিতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম আহুতি দেন। এখানে ইন্দ্রিয় ব্যাপার লইয়া তিন প্রকার সাধকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে অর্থাৎ শব্দাদি বহির্বস্তু হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখ করিবার নাম ইন্দ্রিয়-সংহরণ বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার। "স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ" (পাতঞ্জলদর্শন ২।৫৪) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নিজ বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নাম ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার; এই অবস্থা চিত্তের স্বরূপ অনুকরণের ন্যায়। চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পঞ্চ অবস্থা; ইহাদের মধ্যে প্রথম চারি অবস্থায় চিত্ত বহির্মুখ অর্থাৎ কোন-না-কোন বিষয়াসক্ত। নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্তের কোন বহির্বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় এবং এই অবস্থায় চিত্ত নিজ স্বরূপে অবস্থান করে এবং চৈতন্য মাত্র অনুভূত হয় (পাতঞ্জল ১।৩)। এই অবস্থার অনুকরণে যখন ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকে তখনই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হইয়াছে বলা যায়। গীতায় ইহাকেই ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়ের আহুতি দেওয়া বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে ইন্দ্রিয়-সংহরণ বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহারের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। (প্রবাসী—১৩৩৮, মাঘ, পৃঃ ৪৭৪ দ্রষ্টব্য)।

সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দেওয়ার অর্থ ৬।২৪-২৭ শ্লোকগুলিতে পাওয়া যাইবে। আত্মসংযম-রূপ অগ্নিতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও প্রাণকর্ম্মের আহুতি দেওয়ার অর্থ ৮।১২ শ্লোকে আছে; প্রথমে মনকে সর্ব্ব জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিতে হইবে এবং প্রাণবায়ুকে মূর্দ্ধায় স্থাপিত করিয়া অক্ষর ব্রহ্ম-ধ্যান করিতে হইবে। এই উপায় শ্রুতিবাদের অন্তর্গত ওঁকার সাধনার অঙ্গ বলিয়া বিবৃত হইয়াছে এবং ইহাকে মনঃসংযম বা আত্মসংযম বলা হইয়াছে। সংযম কাহাকে বলে বিশদ করিতেছি।

কোন বিশেষ আলম্বনে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগ করার নাম সংযম। 'ধারণা' শব্দ যোগশাস্ত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা (পাতঞ্জলসূত্র, ৩।১) অর্থাৎ কোন দেশ অর্থাৎ স্থানবিশেষে মনকে বন্ধন করার নাম ধারণা। যোগ অভ্যাসকালে কোন বহির্বস্তু বা নিজ শরীরের কোন অংশ ধারণার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কেহ দেবমূর্ত্তির চরণকমলে মনোনিবেশ করেন, কেহ-বা নাসিকাগ্রে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে যে-কোন স্থান ধারণার অবলম্বন হইতে পারে। ধনুর্বিদ্যায় লক্ষ্যস্থানই ধারণা-স্থান। কোন বস্তুর স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সেই বস্তুতেই ধারণার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার ধ্যান করিতে হয়। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্যক্ত জগতের স্বরূপের উপলব্ধি আবশ্যক। বহির্বস্তু ও মানসিক ব্যাপার লইয়াই ব্যক্ত জগৎ। বহির্বস্তু-সমূহ ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা প্রতিভাত হয়, আবার ইন্দ্রিয়জ্ঞান মনের বৃত্তিমাত্র। মন,

বুদ্ধি ও অহংকার এই তিন অন্তঃকরণ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মা বহির্জগতের সহিত কারবার করে। অতএব আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বহির্বস্তু, ইন্দ্রিয়জ্ঞান, ও অন্তঃকরণ এই তিনের প্রত্যেকটির স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির দ্বারা প্রজ্ঞারূপ আলোক বা জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। এই তিনের যুগপৎ প্রয়োগের পারিভাষিক নাম সংযম। সংযম দ্বারা পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। অতএব আত্মজ্ঞানলাভের জন্য বহির্বস্তু বা ইন্দ্রিয়বিষয়, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই তিনেরই সংযম আবশ্যক। ধারণা সংযমের অঙ্গ। বহির্বস্তু সংযমকালে বহির্বস্তুকেই ধারণার স্থান করিতে হয়। ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে হইলে ইন্দ্রিয়স্থানকে ধারণা-স্থান করা উচিত। ত্বগেন্দ্রিয়ের সংযমে যে-স্থানে স্পর্শ অনুভূত হইতেছে সেই স্থানেই মনোনিবেশ কর্ত্তব্য। শরীরের যে-স্থানে যে-ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অনুভূত হয় সেই স্থানই সেই ইন্দ্রিয়-সংযমের উপযুক্ত ধারণা-স্থান। ত্বগেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে শরীরে অনুভূতির স্থান-নির্দ্দেশ সহজ; রসনেন্দ্রিয়ের স্থান জিহ্বা এবং ঘ্রাণের নাসিকাভ্যন্তর। কর্ণাভ্যন্তর শব্দের ইন্দ্রিয়স্থান অর্থাৎ যখন শব্দ হয় তখন কর্ণমধ্যেই তাহার অনুভূতি হয়; সাধারণের পক্ষে ইহা বুঝা একটু চেষ্টাসাপেক্ষ, কারণ আমাদের মন শব্দানুভূতির দিকে না গিয়া শব্দায়মান বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়। মন অন্তর্মুখ না করিলে ইন্দ্রিয়স্থানের জ্ঞান জন্মে না। অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিলে শব্দ শুনা যায় না, ইহা হইতেই সাধারণে বুঝে যে শব্দের ইন্দ্রিয়স্থান কর্ণ; শব্দ শ্রবণকালে কর্ণের মধ্যেই অনুভূতি হইতেছে এই জ্ঞান সাধনসাপেক্ষ। দর্শন ইন্দ্রিয়ের স্থান-নির্দ্দেশ আরও কঠিন, কারণ শ্রবণ, ঘ্রাণ, ইত্যাদি অপেক্ষা দৃষ্টি অধিক বহির্মুখী। অবশ্য চক্ষু বন্ধ করিলে দেখা যায় না অতএব চক্ষুই দর্শনেন্দ্রিয়ের স্থান এই যুক্তিলভ্য জ্ঞান সকলেরই আছে, কিন্তু কোন বস্তু দেখিবার সময় চক্ষুগোলকের মধ্যে দর্শন ক্রিয়া চলিতেছে এই অনুভূতি বিশেষ আয়াসলভ্য। এই অনুভূতি না জন্মিলে চক্ষুগোলককে ধারণার স্থান করা সম্ভব নহে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযমও অসম্ভব।"

ইন্দ্রিয়স্থান লইয়া কোন মতভেদ নাই, কিন্তু মনের স্থান-নির্দ্দেশ কঠিন। শোকদুঃখাদির দ্বারা যখন মন উদ্বেল হয় তখন বক্ষ বা হৃদয়ে কষ্টাদি অনুভূত হয়। দুঃখে বুক ভাঙিয়া যাইতেছে, শোকে বুক শূন্য বোধ হইতেছে, ভয়ে বুক দুর-দুর করিতেছে ইত্যাদি ভাষা সাধারণে প্রয়োগ করে, অতএব হৃদয়ই মনের স্থান। হৃদয় হৃৎপিণ্ড নহে। হৃদয়ের কোন বিশিষ্ট আকৃতি নাই। বক্ষোদেশের এক অনির্দ্দিষ্ট অংশই হৃদয়। মনকে শাস্ত্রে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বলা হয়। কোন বিষয়ের সঙ্কল্প বিকল্পের সময় আমরা অস্ফুট বাক্যের সাহায্যে মনে মনে তাহার আলোচনা করি, এজন্য গলান্তকেও মনস্থান বলা হয়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি চালনার সময় বদনে বা মস্তকে বিশেষ অনুভূতি উপলব্ধ হয়, এজন্য বদন বা মস্তক বুদ্ধিস্থান। শারীর-শাস্ত্রে (physiology) মস্তিষ্ককে (brain) বুদ্ধি, মন ইত্যাদির আধার বলা হয়। যোগশাস্ত্রে বুদ্ধিস্থান বলিলে মস্তিষ্ক বুঝায় না, কিন্তু যে-স্থানে বুদ্ধি চালনাকালে কোন বিশিষ্ট সংবেদন (sensation) অনুভূত হয় তাহাই বুদ্ধিস্থান। আধুনিক মনোবিদও কেবল মনোবিদ্যার দিক হইতে দেখিলে বলিবেন বদন বা মস্তকই বুদ্ধিস্থান। মস্তিষ্কের কোন অনুভূতি আমাদের নাই। ইন্দ্রিয়সংযমকালে যেরূপ ইন্দ্রিয়স্থানে ধারণা করিতে হয় মনঃসংযম করিতে হইলে সেইরূপ মনস্থান অর্থাৎ হৃদয়ে বা বক্ষোদেশে মনোনিবেশ করিতে হয়। শঙ্করের আত্মানাত্ম বিবেকে আছে "অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চেতি। মনঃ স্থানং গলান্তং বুদ্ধের্বদনং। চিত্তস্য নাভিঃ। অহঙ্কারস্য হৃদয়ং। অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য বিষয়া সংশয় নিশ্চয় ধারণাভিমানাঃ" অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই কয়টির নাম অন্তঃকরণ। মনের স্থান গলান্ত প্রদেশ, বুদ্ধির স্থান বদন, চিত্তের নাভি ও অহঙ্কারের হৃদয়। মনের কার্য্য সংশয়, বুদ্ধির নিশ্চয় করণ, চিত্তের ধারণা ও অহঙ্কারের অভিমান। কোনও মতে অন্তঃকরণ তিনটি, যথা—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। কখনও কখনও 'মন' শব্দে সমগ্র অন্তঃকরণ বুঝায়। কাহারও কাহারও মতে মন-স্থান নাভিতে, কেহ বলেন 'ভ্রূমধ্যে চ মনস্থানং', কেহ বলেন হৃদয়াভ্যন্তরে এবং

কাহারও মতে মনস্থান মস্তকে। উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে আত্মা হৃদয়ে বা হৃদয়-গুহায় অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে বা হৃদয়-আকাশে অবস্থান করেন। এই সকল বাক্যের অর্থ এই যে, হৃদয়কে ধারণার স্থান করিলে আত্মার উপলব্ধি হয়। গীতায় ১৮।৬১ শ্লোকে আছে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর হৃদ্দেশে অবস্থান করেন।

বিষয় সংযম করিলে বিষয়জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়, ইন্দ্রিয়-সংযমে ইন্দ্রিয়জ্ঞান মনে লয় পায় এবং মনঃসংযমে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। মনঃসংযমকে অনেক সময় আত্মসংযম বলা হয়। বিষয়-সংযম ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার একই কথা; সেইরূপ ইন্দ্রিয়-সংযম ও মনঃ-প্রত্যাহার এবং মনঃসংযম ও আত্মার প্রত্যাহার সমার্থবাচক। সংযম কি, উদাহরণে তাহা স্পষ্ট হইবে। চক্ষু বন্ধ করিয়া বসিয়া আছি, হাতে একটা ভিজা, কঠিন ও শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। বুঝিলাম বরফ স্পর্শ করিয়াছি। মন এই বরফের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া (ধারণা) বরফের শৈত্যগুণ একমনে চিন্তা করিতে লাগিলাম (ধ্যান); ক্রমে এই চিন্তায় তন্ময় হইলাম, তখন বরফ ব্যতীত পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের অস্তিত্ব মন হইতে লোপ পাইল; এমন কি, আমি আছি বা ধ্যান করিতেছি এই জ্ঞানও রহিল না (সমাধি)। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে বরফ-রূপ বহির্বস্তুর সংযম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রকার সংযমের ফলে ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ-প্রকাশক প্রজ্ঞা নামক আলোক বা জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ (পাতঞ্জল ৩।৫)। তখন ধ্যাতা বুঝিতে পারেন যে, বরফ-রূপ বহির্বস্তু কেবল শৈত্যাদি কতকগুলি গুণের সমষ্টিমাত্র। এই বুঝিতে পারা কেবল তর্ক বিচার দ্বারা বুঝা নহে কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ। ইহাই বিষয়সংযম বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে বিষয়ের আহুতি দেওয়া।

বিষয় সংযমের পর ইন্দ্রিয়সংযম সফল হয়। ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে হইলে হস্তের যে-স্থানে বরফের স্পর্শ অনুভূত হইতেছে (ইন্দ্রিয়স্থান) তথায় মনোনিবেশ করিয়া (ধারণা) শৈত্যগুণের একতান চিন্তন (ধ্যান) করিতে করিতে তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে; অপর কোন অনুভূতি থাকিবে না (সমাধি)। ইহাই স্পর্শেন্দ্রিয় সংযম। এই সংযমের দ্বারা সাধক বুঝিতে পারেন যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পৃথক অস্তিত্ব নাই তাহা মনেরই বিকার মাত্র। ইন্দ্রিয়সংযমে ইন্দ্রিয়জ্ঞান মনে লয় পায়। ইহাই সংযমাগ্নিতে ইন্দ্রিয়কে আহুতি দেওয়া। ইন্দ্রিয়-সংযম অতি কঠিন ব্যাপার। থিয়েটার দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে জোর করিয়া তাহা দেখিলাম না - সাধারণে মনে করেন ইহাই দর্শনেন্দ্রিয় সংযম। শাস্ত্রমতে ইহা ইন্দ্রিয়সংযম নহে—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ মাত্র। গীতা বলেন 'নিগ্রহ কিং করিষ্যতি' অর্থাৎ নিগ্রহ বিফল।

মনঃসংযম বা আত্মসংযম করিতে হইলে মনঃস্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে (ধারণা) মনকে নিবদ্ধ করিতে হইবে এবং মনের প্রকৃতি কিরূপ তাহার একতান চিন্তন (ধ্যান) করিতে হইবে। মন নিজ-স্বরূপে তন্ময় হইলে (সমাধি) আত্মায় লয় পাইবে ও আত্মদর্শন হইবে। ইহাই আত্ম-সংযম-রূপ অগ্নিতে সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয় ও প্রাণকর্ম্মের অর্থাৎ তাবৎ মনসিক ব্যাপারের আহুতিদান। প্রাণসংযম অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইবে।

সাধারণ মনুষ্যের মানসিক বৃত্তিসমূহ বহির্মুখ এবং বিষয়ের আকর্ষণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহারা বহির্বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়। সংযম অভ্যস্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণ ও অন্যান্য মানসিক বৃত্তিসমূহ নিজ বশে আসে ও তখন তাহাদিগকে ইচ্ছামত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা যায়। এই সংহরণ নিগ্রহ নহে। ২।৬১ শ্লোকে আছে, ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মত সংক্ষেপে এই যে, যোগসাধনা ও চিত্ত-শুদ্ধির সহায়ক বলিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিবে, স্থিত-প্রজ্ঞত্ব লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সংহরণ আয়ত্ত করিবে এবং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সংযম ও মনঃসংযম অভ্যাস করিবে। বিভিন্ন সাধকেরা এই সকল বিভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন; এই সমস্ত সাধনাই চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে কর্ম্মজ বলা হইয়াছে (৪।৩২); অতএব এই সকল সাধনাও নিঃসঙ্গচিত্তে অনুষ্ঠেয় নচেৎ ইহাদের দ্বারাও কর্ম্মবন্ধন জন্মিবে।

স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ :—সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যময় যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়ঃ (৮।৩৩)। জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণ অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন। অধ্যয়ন জ্ঞান-লাভের উপায় এজন্ত ৪।২৮ শ্লোকে স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞের একত্র উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন কেবল বেদ-পাঠকেই স্বাধ্যায় নামে অভিহিত করা হইয়াছে, কিন্তু এই অর্থ যুক্তিযুক্ত নহে। জ্ঞানলাভের জন্ত সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রাধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলা যায়। ১৬।১ শ্লোকে দৈবী সম্পদের মধ্যে স্বাধ্যায় ধরা হইয়াছে এবং ১৭।১৫ শ্লোকে স্বাধ্যায়কে বাঙ্ময় তপ বলা হইয়াছে; এই ছুই স্থলেও কেবল বেদপাঠ স্বাধ্যায় শব্দের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয় না। ১১।৪৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "না বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়ন দ্বারা, না দান দ্বারা, না ক্রিয়ার দ্বারা, না উগ্র তপস্যার দ্বারা আমার এই রূপ বা মূর্ত্তি নৃলোকে দর্শনসাধ্য।" এখানে বেদ ও অধ্যয়নকে পৃথক মার্গ বলিয়াই ধরা হইয়াছে। এখনকার মত মহাভারতের কালেও অনেক জ্ঞানার্জ্জনকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন; স্বাধ্যায়ই ইঁহাদের সাধনা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রথমাবল্লীর নবম অনুবাকে আছে, "স্বাধ্যায় প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদগল্যঃ তদ্ধিতপস্তদ্ধিতপঃ" অর্থাৎ নাকমৌদগল্য ঋষি বলেন কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অনুষ্ঠান করিবে কারণ তাহাই তপ তাহাই তপ।" শ্রীকৃষ্ণের মতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।

মন্ত্র ও ঔষধ :—গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র অতি প্রাচীন। এই সকল মন্ত্রের বিশেষ বিশেষ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। গায়ত্রী ও বীজমন্ত্র জপ এখনও প্রচলিত আছে। অনেকে মন্ত্রজপকে প্রধান সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ৯।১৬ শ্লোকে বলিলেন, 'আমাকেই মন্ত্র বলিয়া জানিবে' অর্থাৎ যিনি মন্ত্রকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন তাঁহার মুক্তি হয়। এই শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমিই ঔষধ'। নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পর পর বিভিন্ন মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অতএব অনুমান করা যায় 'ঔষধ' শব্দেও মন্ত্রের ন্তায় কোনও সাধনমার্গ সূচিত হইয়াছে। ঔষধ শব্দের ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলিতেছেন, "সকল প্রাণী যাহা ভক্ষণ করে তাহাই ঔষধ শব্দ-বাচ্য অথবা ব্যাধির শান্তির জন্ত যে ভেষজ ব্যবহৃত হয়, তাহাই ঔষধ শব্দের অর্থ।" এখানে কোন্ অর্থে ঔষধ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে শঙ্কর সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত নহেন। আমার মনে হয় এখানে ঔষধাদির দ্বারা সাধানার কথাই বলা হইয়াছে। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বর দর্শন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে—"অপরে মাহেশ্বরাঃ পরমেশ্বর-তাদাত্ম্যবাদিনোঽপি পিণ্ডস্থৈর্য্যে সর্ব্বাভিমতা জীবন্মুক্তিঃ সেৎস্যতীত্যাস্থায় পিণ্ডস্থৈর্য্যোপায়ং পারদাদিপদবেদনীয়ং রসমেব সঙ্গিরন্তে রসস্য পারদত্বং সংসার-পরপার-প্রাপণহেতুত্বেন তদুক্তম সংসারস্য পরং পারং দত্তেঽসৌ পারদঃ স্মৃতঃ। ষড়দর্শনেঽপি মুক্তিস্তু দর্শিতা পিণ্ডপাতনে করামল-কবৎসাপি প্রত্যক্ষানোপ লভ্যতো তস্মাৎ তং রক্ষয়েৎ পিণ্ডং রসৈশ্চৈব রসায়নৈঃ।" অর্থাৎ—'অপর মাহেশ্বর সম্প্রদায় আত্মাকেই পরমাত্মারূপে স্বীকার করিলেও বলেন সর্ব্বদর্শনশাস্ত্র-প্রতিপাদিত জীবন্মুক্তি শরীরের স্থৈর্য্যের উপর নির্ভর করে অতএব তাঁহারা এই স্থৈর্য্যের উপায়-স্বরূপ পারদের গুণ কীর্ত্তন করেন। সংসারের পরপার-প্রাপ্তি করায় বলিয়াই ইহাকে পার-দ বলে। দেহপাতের পর ষড়দর্শনে যে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা করামল-কবৎ প্রত্যক্ষ নহে সেজন্ত পারদ ও অন্তান্য রসায়নের দ্বারা শরীররক্ষার চেষ্টা করিবে।' তন্ত্রশাস্ত্রের মূল অতি প্রাচীন এবং খুব সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস মহাভারতের কালেও প্রচলিত ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ রসায়নকেই ঔষধ শব্দে লক্ষ্য করিয়াছেন। নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির ধারা লক্ষ্য করিলে এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত মনে হইবে। সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য ৫।১২৮ সূত্রে ঔষধ দ্বারা সিদ্ধিলাভের কথা আছে।

পূজা :—এখন যেরূপ নানা দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে পুরাকালে মহাভারতের যুগেও সেইরূপ হইত বলিয়া মনে হয়। দেবদেবীর কোন মৃত্তিকা প্রস্তররাজি নির্ম্মিত মূর্ত্তিপূজা হইত কি-না গীতায় তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। পূজায় পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদি দেবতাকে অর্পিত হইত কিন্তু এ বিষয়ে এখনকার মত বাহুল্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ এক শ্লোকেই এই প্রকার পূজার কথা শেষ করিয়াছেন। ভূত প্রেতাদির পূজা কেহ কেহ করিত। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক

এই সকল পূজা করে বিধিবহির্ভূত হইলেও তাহারা আমারই পূজা করে, কেন-না,সর্ব্বযজ্ঞের আমিই ভোক্তা ও প্রভু, কিন্তু এরূপ পূজার ফল শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না কারণ 'উপাসক উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হন' এই ন্যায়ে দেবপূজক দেবতাকে এবং ভূতপ্রেতপূজক ভূত-প্রেতকে প্রাপ্ত হন।

নানা উপাস্য পদার্থ:—দেবতা, ভূত, প্রেত প্রভৃতির পূজা ব্যতীতও কোন কোন বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী মনুষ্য বা অন্যান্য বস্তু সমাজে পূজার্হ বলিয়া পরিগণিত হয়। দশম অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন কোন্ কোন্ বস্তুতে বা কোন্ কোন্ ভাবে ভগবানের ধ্যান করা যাইতে পারে। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ উপাস্য বস্তুর উদাহরণ-স্বরূপ কতকগুলি নামোল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা আমার তেজ-সম্ভূত বলিয়াই জানিবে। এই তালিকা দেখিলে মহাভারতের যুগে কোন্ কোন্ পদার্থ উপাস্য বলিয়া লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা পাইত তাহা বুঝা যাইবে। চন্দ্র, অগ্নি, সাগর, মেরুপর্ব্বত, হিমালয়, অশ্বত্থবৃক্ষ, কুবের, বাসুকী, প্রহ্লাদ, রাম, গরুড় প্রভৃতির নাম এই তালিকার মধ্যে আছে। মকর ও জাহ্নবীর পর পর উল্লেখ থাকায় মনে হয় তখনও লোকে মকরবাহিনী গঙ্গার পূজা করিত।

রাজবিদ্যা:—শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনুমোদিত ধর্ম্মের নাম দিয়াছেন রাজবিদ্যা। রাজন্যবর্গের মধ্যে এই বিদ্যা প্রচলিত থাকায় ইহাকে রাজবিদ্যা বলা হইয়াছে। রাজ-বিদ্যা কোন একটি বিশেষ মার্গ নহে। যে-কোনও মার্গের সাধকই এই বিদ্যার প্রয়োগ করিতে পারেন। নবম অধ্যায়ে এই বিদ্যার ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। সংক্ষেপে রাজবিদ্যার মূল সূত্র এই যে, প্রকৃতির বশে মানুষ কর্ম্ম করিবেই অতএব কর্ম্মত্যাগের বৃথা চেষ্টা না করিয়া নিজ স্বভাব ও সমাজ অনুযায়ী কর্ম্ম করা উচিত। নিশ্বাস-প্রশ্বাস আহার-বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্তই ব্রহ্মবুদ্ধিতে ও অসঙ্গ চিত্তে করা উচিত। যে-কোন ধর্ম্মমার্গই অবলম্বন করা যাক না কেন ব্রহ্মবুদ্ধিতেই তাহা করিতে হইবে; কোন একটি বিশেষ মার্গই গ্রহণ করিতে হইবে এমন কথা নাই। অধ্যাত্ম বিদ্যা বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সম্বন্ধ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা উচিত। এই জ্ঞান লাভ হইলে আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হয়। নিঃসঙ্গচিত্তে কর্ম্ম করিলে এই জ্ঞান লাভ হয়। অসমর্থ ব্যক্তি কর্ম্মফলত্যাগের অভ্যাস করিবেন। নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যার ব্যাখ্যা বিশদ করা হইবে।

অসময়ে

শ্রীকান্তিপ্রসাদ চৌধুরী

তোমারে খুঁজেছি আমি বসন্তের আনন্দ-হিল্লোলে,
পেনু কি-না অবশেষে প্রাবৃটের ক্রন্দন-কল্লোলে।
ভেবেছিনু পাব দেখা শরতের কনকপ্রভাতে,
তুমি এলে অশ্রুমুখে পরিম্লান শিশির-সন্ধ্যাতে।
তটিনীর কলতানে, মধুবনে সমীর-বধূর
কান পেতে রয়েছিনু শুনিবারে বাঁশী সুমধুর।
তখন বাজেনি বাঁশী। আজি মোর বন্ধ অন্ধ ঘরে
সেই বাঁশী, সেই গান কাঁপি-কাঁপি, কাঁদি-কাঁদি মরে।
তোমার পূজার তরে যতনে গেঁথেছি ফুলহার,
তোমার বন্দনা লাগি তুলিয়াছি বীণায় ঝঙ্কার।—
কোথা ছিলে সে সময়, ও আমার নিঠুর দরদী!
দেখা কেন পাই নাই? এলে, ওগো! এলে শেষে যদি,
কেন এলে যবে মোর পুষ্পহার মুরঝিয়া গেছে,
ঝঙ্কার ভুলেছে বীণা, হতাশায় বন্দনা ডুবেছে?
আজি মোর দীর্ণ বুক, ক্লান্ত দেহ, চূর্ণ যত আশা,
আজি শুধু পিছে চাওয়া, আজি বাঁধা আঁধারেতে বাসা,—
আজি সব শেষ। আজি মোর দৃষ্টি-সীমা অবগাহি
নিখিল ব্যাপিয়া এক ধ্বনিতেছে সুবিরাট 'নাহি'।
আজ তুমি এলে, ভাবি আমার এ দুর্ব্বল হৃদয়,
অত আলো, অত বেগ, অত স্ফূর্ত্তি নাহি যদি সয়!
আজি যদি বঁধু মোর তোমার বরিতে পাই দুখ,
যেন ক্ষুব্ধ উপেক্ষায় ফিরায়ো না, ফিরায়ো না মুখ।

ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

শ্রীকামিনী রায়

কিছুকাল স্বাধীনভাবে 'প্র্যাক্‌টিস' করিবার পর যামিনী Women's Indian Medical Service-এ চাকরি পাইয়া কলিকাতা Dufferin Hospital-এ অস্থায়ীভাবে কাজ করিতে লাগিলেন।

সমান যোগ্যতা সত্ত্বেও, এমন কি অধিকতর যোগ্যতা থাকিলেও ইংরেজ বা ইয়ুরেশীয়ানদের সমান পদ, সমান সুখ-সুবিধা ও সম্মান ভারতীয়দের ভাগ্যে সচরাচর ঘটে না। অন্যদিকে দোষ-ত্রুটি ও অযোগ্যতা শ্বেতবর্ণের গুণে অনেক সময়েই মার্জ্জনা লাভ করে। তাই যখন ১৯১৪ সনের জুন মাসে কোন বিশেষ অপ্রীতিকর কারণে আগরার নারী হাসপাতালের তিনটি ইংরেজ নারী ডাক্তারকে বদলী করা নিতান্ত আবশ্যক হইল, শাস্তির ছদ্মবেশে তাঁহাদের কেহ-বা সিমলা পাহাড়ে কেহ-বা অন্যত্র প্রেরিত হইলেন। আর সেই নিদারুণ গ্রীষ্মে যামিনীকে আগরা গিয়া তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিতে হইল। কিছুকাল একলাই তাঁহাকে তিনজনের কাজ সামলাইতে হইতেছিল। কিন্তু মাস ছয় পরে যখন পূর্ব্বের গোলমাল মিটিয়া গেল, ডিসেম্বর মাসের দুঃসহ শীতে যামিনী সিমলায় প্রেরিত হইলেন; পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ কন্যারা আগরা ফিরিয়া বড়-দিনের উৎসব করিলেন।

আগরা বাসকালে দরিদ্র রোগিণীরা শতমুখে তাঁহার গুণ গাহিয়াছে এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। সহযোগিনী ইংরেজ মহিলা থাকিলেও সকলে 'শাড়ীওয়ালী ডাংদারিন সাহেবকে' চাহিত। কারণ, যতই ঘৃণাকর রোগ ও কষ্টকর চিকিৎসা হউক, এই শাড়ী-পরিহিতা তাহাদের স্বদেশিনী 'ডাংদারিন' কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না, তুচ্ছ করিতেন না, বরং রোগ যত অধিক কষ্টকর হইত দয়ায় তাঁহার হৃদয় তত অধিক আর্দ্র হইত। রাত্রে দূরে যাইতে হইলে, আগেই, কত টাকা দিবে বলিয়া দামদস্তুর করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। উপযুক্ত ফী দিতে অক্ষম জানিলে অনেকের কাছে তিনি টাকা লইতেন না, অল্প কিছু দিলে ফিরাইয়া দিতেন, কিছু লইতে কাতরে অনুরোধ করিলে, হাসপাতালের কোন আবশ্যকীয় আস্‌বাব্‌ ক্রয়ের জন্য তাহা লইয়া হাসপাতালের নামে জমা করিতেন। এইরূপে একটি ভাল অপারেশন টেবিল ক্রয় করা হয়।

সিমলায় আসিয়া দেখিলেন রিপন হাসপাতালের নিকট তাঁহার বাসের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই, অথচ হাসপাতালের নিকটেই তাঁহার থাকা আবশ্যক। ঐ হাসপাতালের নীচের তলায় দুইটি কামরা বহুকাল হইতে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল, তিনি সেই দুইটিকে পরিষ্কার করিয়া নিজের বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। প্রায় নয় মাস কাল এইভাবে কাটিবার পর, কেন ঠিক বলা যায় না, তিনি Inspector-General of Hospitals এবং Civil Surgeon-এর বিরূপ দৃষ্টিতে পড়িলেন। তাঁহার নামে এক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করা হইল, যে, তিনি বিনা অনুমতিতে হাসপাতালের অংশবিশেষ জবর-দখল করিয়া হাসপাতালের ব্যবহার পরিবর্ত্তন ও কার্য্যের ক্ষতি করিয়াছেন। ইহার উত্তরে তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিনীর আমল হইতে হাসপাতালের ঐ অংশ অব্যবহৃত পড়িয়াছিল। সেখানে কোন কাজ হইত না বলিয়া তিনি উহা নিজের ব্যবহারে লাগাইয়াছেন। তাঁহাকে ঐ প্রকোষ্ঠ দুটি ছাড়িয়া দিতে হইলে অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিনীকে বাড়ী ভাড়া বাবত অতিরিক্ত ১০০৲ টাকা দেওয়া হইত, অতএব তাঁহাকেও অন্যত্র থাকিবার জন্য ১০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হউক, যদি তাহা না হয়, তাঁহাকে অন্যত্র বদলী করা হউক। বস্তুতঃ তিনি যে রকম হীন আবাসে আছেন তাহা Women's Indian Medical Service-এর কোন মহিলার যোগ্য নহে। বাড়ীভাড়া বাবত ১০০৲ টাকা মঞ্জুর হইল না। তাঁহার বদলীর ব্যবস্থা করা যাইবে এই আশ্বাস দেওয়া হইল। হাসপাতালের জন্য একজন মেট্রনের নিয়োগেরও আবশ্যক তাহা যামিনী জানাইয়াছিলেন, সেজন্য মেট্রন ১০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইল।

আসল কথা বোধ হয় এই যে, একজন বাঙালী নারী সিমলার মত বহু রাজপুরুষের বাসস্থানে, নারী হাসপাতালের অধ্যক্ষতা করেন, ইংরেজমহলের উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী কোন কোন ব্যক্তির তাহা মনঃপূত হয় নাই। যামিনীর মধ্যে বড়মানুষ খুঁজিয়া মেলা-মেশা ও প্রিয় হইবার চেষ্টা একেবারেই ছিল না; হাসপাতালের সুব্যবস্থা ও রোগীর চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য জানিতেন। একবার নাকি পঞ্জাবে ছোটলাট-পত্নী লেডী ওডায়ার হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে আসিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিবার পর যামিনী হাসপাতালের কোন কোন অভাব জ্ঞাপন করেন ও সে সকলের সুব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। সিমলার সিবিল সার্জ্জন মহাশয় ইহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। তিনি মনে করিলেন তাঁহাকেই প্রথমে জানান উচিত ছিল। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া, এ যেন তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইল। এদিকে পাঞ্জাবী ও বাঙালী মহলে যামিনীর প্রতিপত্তি ও লোকপ্রিয়তাও তাঁহার বিশেষ ভাল লাগে নাই।

যাহা হউক, যামিনী অগত্যা অন্যত্র বাড়ীভাড়া করিয়া হাসপাতালের উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইলেন। চিকিৎসার্থীর সংখ্যার বৃদ্ধি বশতঃ ক্রমে হাসপাতালের জন্য একটা নূতন ব্লক তৈয়ার হইল।

ডাক্তারের বাসস্থানও নূতন হইল; কিন্তু সব রকমের যখন সুবিধা ও সুব্যবস্থা হইল, যখন শহরবাসীরা তাঁহার সুখ্যাতিতে মুখর, তখন শীতপ্রধান সিমলা শৈল হইতে তাঁহাকে সিন্ধুপ্রদেশের গ্রীষ্মপ্রধান শিকারপুর নামক স্থানে বদলী করা হইল এবং একজন ইংরেজ মহিলা তাঁহার স্থানে আনীত হইলেন। হাসপাতালের উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের প্রশংসাটা এই নবাগতাকে দিবার সুবিধা হইতেছিল, কিন্তু সমারোহ পূর্ব্বক নূতন ব্লক খুলিবার দিনে বড়লাট-পত্নীর ও সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, এই হাসপাতালের উন্নতিকল্পে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তিনীই ধন্যবাদের পাত্রী। বড়লাট-পত্নী (Lady Chelmsford) চুপি চুপি কোন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়াকে বলিতেছিলেন,—এতবড় হাসপাতালের পরিচালনের যোগ্যতা কিন্তু ভারতীয়াতে সম্ভব নহে। নবাগতা ডাক্তার মহিলা

ও ঠিক সময়ে ভারতমহিলা উভয়ের সহিতই আমার পরে আলাপ হইয়াছে, তাই এই সব সংবাদ পাইয়াছি। এই সময়ে আমি সিমলায় বাস করিতেছিলাম।

একবার যামিনীকে করাচী পাঠাইবার কথাও উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানে ডাক্তারের বাহিরের পশার খুব বেশী, সুতরাং ইংরেজ রমণীরই সেস্থান প্রাপ্য। দিল্লীতে নারীদের জন্য যে মেডিকেল কলেজ খোলা হইল কলিকাতা ডাফরিন হসপিটালের ভূতপূর্ব্ব নেত্রী তাহার অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন; শিক্ষাদাত্রী (lecturer) রূপেও যামিনীর সেখানে স্থান হইল না।

শিকারপুরের ভীষণ গরম যখন অসহ্য হইল এবং শরীরে অনেক ফোড়া হইয়া কষ্ট পাইতে লাগিলেন, তখন একবার ছুটি লইলেন এবং সেণ্ট্রাল কমিটিতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে আর ছয় মাসের মধ্যে বদলী না করিলে তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। তখন তাঁহাকে গয়া পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। ইতিপূর্ব্বে গয়ার লেডী ডাক্তার ছুটির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তার সেন তাঁহার স্থানে আসিতেছেন শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছুটির আবেদন প্রত্যাহার করিলেন। এই বঙ্গনারীর চিকিৎসানৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা ও জনপ্রিয়তার কথা অনেকেই শুনিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি বেহার প্রদেশে বেতিয়ার হাসপাতালে প্রেরিত হইলেন। এখানে তিনি আরামেই ছিলেন, কিন্তু এখানে কাজ বেশী না থাকাতে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

(বঙ্গলক্ষ্মী, আষাঢ় ১৩৩৯)

—

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বরিশাল জেলায় কলসকাঠী নামে একখানি গ্রাম আছে। তথাকার রায় মহাশয়েরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভদ্র। তাঁহারা অনেক পুরুষ ধরিয়া কলসকাঠীতে কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করাইতেছেন। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মুকুন্দরাম নামে এক ব্রাহ্মণ রায় মহাশয়দিগের আশ্রয়ে তথায় বাস করেন। তাঁহার বংশ বিস্তৃত না হইলেও অনেক পণ্ডিত এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের পৌত্র রামমাণিক্য ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মান। তাঁহার আর ভাই বা ভগিনী ছিল না। সুতরাং, তিনি বাপমার খুব আদরের ছেলে ছিলেন। তিনি বাড়ীতেই ব্যাকরণাদি বালশাস্ত্র পড়েন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কিছুদূর পড়িয়া, নৈহাটীতে মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিয়া ব্যাপ্তিখণ্ড ও শব্দখণ্ড অধ্যয়ন করেন। এখানে তাঁহার এক সহাধ্যায়ী জুটিয়া যায়। তাঁহার নাম শ্রীনাথ। তিনি তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যম পুত্র। খুব বুদ্ধিমান্ এবং খুব উৎসাহশালী ছাত্র ছিলেন। দুজনের খুব ভাবও হল। এমন কি দুজনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, একজনের ছেলে ও একজনের মেয়ে হইলে তাহাদের বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ করিয়া দুজনে বৈবাহিক হইবেন।

মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণের তখন খুব নাম। স্যার উইলিয়ম জোন্সের বিচারালয়ে তাঁহার কয়েকটি ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় তাঁহার নাম খুব পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার অনেক ছাত্র ছিল, একটা টোলে ধরিত না। তাঁহাকে দুইটা টোল করিতে হইয়াছিল। মেদিনীপুর, হুগলী ২৪ পরগণা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল এমন কি, বিক্রমপুর হইতেও ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোলে পড়িতেন। ক্রমে শ্রীনাথ ও রামমাণিক্য পাঠ শেষ করিলেন। সেকালে অনেকে দীধিত্যাদি ব্যুৎপত্তিবাদ ও কুসুমাঞ্জলি পড়িয়া পাঠ সমাপন করিত। ইঁহারা পাঠ সমাপন করিয়া একজন তর্কালঙ্কার ও আর একজন বিদ্যালঙ্কার উপাধি পাইলেন। উপাধি দিবার সময় অধ্যাপকই উপাধি দিতেন। কিন্তু ছাত্রদিগকে নিজ বায়ে সমাজের সমস্ত পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইত। তাঁহাদিগকে দৈ দৈ-এর ফলাহার দিতে হইত ও কিছু কিছু বিদায়ও দিতে হইত। এই সকল পণ্ডিতেরা ঐ ছাত্রদের নাম নিজ নিজ তালিকা-ভুক্ত করিয়া লইতেন এবং কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দিতেন।

উপাধি পাইয়াই দু-বন্ধু বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন। কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেহ স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য সন্দেহ করিলেন—তাহারা মুরশিদাবাদে গিয়াছে। সেকালে বড় বড় নৈয়ায়িকদের বিচারের এক একটা পদ্ধতি ছিল, যে-কোনরূপ আপত্তি অর্থাৎ ফাঁকি হউক না কেন তাহার উত্তর দিবার এক একটা প্রণালী ছিল, নৈহাটির প্রণালী খুব প্রসিদ্ধ ছিল। যে পুঁথিতে এই পদ্ধতি বা প্রণালী লেখা হইত, তাহার নাম পাতড়া, পেঁতে বা ক্রোড়পত্র ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিলেন, আমার দুই ছাত্র আমাদের সব পাতড়া দুরস্ত করিয়া, কৃষ্ণকিঙ্করের পাতড়া শিখিবার জন্য মুর্শিদাবাদে গিয়াছে। তিনি ইহাতে চটিলেন। কারণ, কোন ভট্টাচার্য্যই ছাত্র ভিন্ন আর কাহাকেও আপন ঘরের পাতড়া দেখিতে দিতেন না। যক্ষের ধনের মত সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। আমার ছাত্র যদি আমার পাতড়া শিখিয়া অন্যের পাতড়া শেখে, সে ত উৎপাত ঘটাইতে পারে—এই ভাবিয়া তিনি উহাদের উপর চটিলেন। ফলিলও তাই। বছর খানেকে তাঁরা দুই বন্ধু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহারা যে মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকিঙ্করের পাতড়া অভ্যস্ত করাই যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বাবা বড়ই চটিয়া গেলেন। ছেলেকে বলিলেন, তুমিই এখন টোল কর, আমি আর টোলে যাব না। রামমাণিক্য বিদায় হইয়া দেশে গেলেন।

শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের অদৃষ্ট বড় খারাপ। এই সব ব্যাপারের ছয় মাসের মধ্যে বর্দ্ধমানের রাণী (যে প্রতাপচাঁদ পরে জাল হইয়াছিলেন তাঁহার মা) তুলাপুরুষ দান করিবেন কালনায় তাঁহাদের গঙ্গাবাসের বাড়ীতে। তর্কভূষণের পত্র আসিল; তিনি গেলেন না, বলিলেন "শ্রীনাথ যাক"। তিনি বাড়ী হইতে বড় বাহির হইতেন না। তাঁহার বয়স তখন প্রায় ১০০ হইয়াছিল। শ্রীনাথ গেলেন। অধ্যক্ষ বলিলেন, তর্কভূষণ আসেন নাই—প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে চতুর্থাংশ বাদ বিদায় দেওয়া হউক। শ্রীনাথ রাজী হইলেন না। বলিলেন, আমি কি তেমনি প্রতিনিধি, আমার সঙ্গে বিচার হউক, দেখুন আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়। তাহার পর বিদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে। বিচারে তাঁহার জয় জয়কার হইল। মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া হুকুম দিলেন যে, তর্কভূষণের ত পুরা বিদায় দেওয়া হউক, শ্রীনাথকেও সেই খুঁটের বিদায় দেওয়া হউক। বিদায়ের প্রধান সামগ্রী এক একটা রূপার ঘড়া। এখনকার মত বিদায় শুধু টাকায় দেওয়া হইত না, তাহার সঙ্গে তৈজসপত্র ও বড় বড় সিধা থাকিত। শ্রীনাথ দু-গ্রহ বিদায় লইয়া মহা আনন্দে বাড়ী ফিরিলেন। তখন যে রাস্তায় ঠেঙাড়িয়ারা থাকে তাহা তাঁহার মনে

পড়িল না। অন্য অন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পিছে পড়িয়া রহিলেন, তিনি ক্রোশ দুই আগাইয়া পড়িলেন। ভুবনদহের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বাবুদের ঠেঙ্গাড়িয়ারা তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার সমস্ত তল্পী লুটিয়া লইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা একটা বটগাছের নিকট একটা পুকুর পাড়ে দেখিলেন রক্তের দাগ আর সিধার জিনিস সব ছড়াছড়ি। কি হইয়াছে বুঝিতে আর বাকী রহিল না। ক্রমে বাড়ীতে সব সংবাদ পঁহুছিল। বৃদ্ধ পিতা উপযুক্ত পুত্রের অতর্কিত মৃত্যুতে ২।১ মাসের মধ্যেই দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীনাথের স্ত্রীও পতিশোক সহ্য করিতে না পারিয়া চার বছরের একটি ছেলে রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

এ দিকে রামমাণিক্য পাঠ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার শ্বশুর একজন তালুকদার ছিলেন এবং ভদ্রব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্রাদিও পড়িয়াছিলেন এবং মেয়েটিকে ব্যাকরণ সাহিত্য সবেই পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা নারায়ণী ৩০০।৪০০ কবিতা বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত মুখে মুখে বলিতে পারিতেন। কলাপ ব্যাকরণ তাঁহার খুব অভ্যস্ত ছিল, জ্যোতিষেও তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি পাঁজি দেখিতে পারিতেন। সে এখনকার মত ছাপা পাঁজি নয়। তালপাতায় শুদ্ধ অঙ্ক বসান—এখানকার পাঁজির ডান দিকে যেটি থাকে ঐটা মাত্র। তিনি কোষ্ঠী দেখিতে পারিতেন, করকোষ্ঠীও দেখিতে পারিতেন। শ্বশুর জিদ করিতে লাগিলেন—রামমাণিক্য, তুমি আমার এইখানে টোল কর। রামমাণিক্য রাজী হইলেন না। কলশকাঠীতে টোল করিলেন। আবার একদিন নৌকাযোগে শ্বশুরবাড়ী গিয়া স্নানের ঘাট হইতে স্ত্রীকে চুরি করিয়া পলায়ন করিলেন। শ্বশুর পোষ্যপুত্র লইলেন। পোষ্যপুত্র লইলেও কন্যার একটা ভাগ পাওনা থাকে। নারায়ণী বা মাণিক্য তাহাও লইলেন না।

কিন্তু বেশীদিন তিনি কলশকাঠীতে থাকিতে পারিলেন না। অভয়াচরণ তর্কবাগীশ নামে আর একজন নৈয়ায়িক সেখানে টোল করিয়াছিলেন। দুজনের সেখানে সর্ব্বদাই ঠোকাঠুকি লাগিত। ছাত্রে ছাত্রে প্রায়ই লাগিত, অনেক সময় পণ্ডিতে পণ্ডিতেও লাগিত। জেলার লোক উত্যক্ত হইয়া উঠিল, দুই পণ্ডিতই দেশত্যাগ করিলেন। অভয়াচরণ গেলেন ঢাকায়, রামমাণিক্য আসিলেন বরাহনগরে।

কাশীপুরে তখন রামরত্ন রায় মহাশয় একজন বড় জমিদার। রাণী ভবানীর রাজত্ব ভাঙ্গিয়া যে দুজন বড় জমিদার হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামরত্ন রায় একজন। তাঁহার ঠিকানা ছিল নড়াইল। কলিকাতার কাছে কাশীপুরেও তিনি বাড়ী করিয়াছিলেন, কেন-না, তখন ইংরেজ রাজা। ইংরেজের কাছে থাকা অনেক সময়ে জমিদারদের দরকার হয়। রামরত্ন রায় মহাশয় রামমাণিক্যের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও আভিজাত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন এবং প্রথম সুযোগেই বরাহনগর হইতে উঠাইয়া আনিয়া কাশীপুর ঘাট রোডের উপর অনেক জমিজায়গা দিয়া টোল ও বাড়ী করিয়া দিলেন। রামমাণিক্যের অনেক ছাত্র জুটিল। সাতক্ষীরার জমিদারদের গুরুবংশের অনেকেই তাঁহার ছাত্র হইল। নেপালের রাজগুরুও তাঁহার নিকট পুত্রকে ন্যায়শাস্ত্র শিখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। রামমাণিক্য শ্রীনাথের ছেলের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দিয়া বাল্যবন্ধুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন।

বিচারে রামমাণিক্যের সহিত কেহ পারিয়া উঠিত না, দুই ঘরের যত কৌশল সব তাঁহার জানা ছিল। তাহার পর তিনি দেখিলেন, শিরোমণি মূলের উপর টীকা করিয়াছেন, তাহাতে অবচ্ছেদক সর্ব্বদাই বড় কাজ। মূলে যেখানে বলিলেন ধূম, শিরোমণি সেখানে বলিলেন ধূমত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ যেটা কথায় ব্যক্তিমাত্র বুঝাইত, তাহাকে জাতি বুঝাইয়া দিলেন। গো বলিলে গলকম্বলাদিমান্ বুঝায়, গোত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বলিলে সব গোরুই বুঝাইবে। রামমাণিক্য তাহার উপরও সূক্ষ্ম বাহির করিলেন; "অবচ্ছেদকিতা" বলিয়া একটা পদার্থ স্বীকার করিলেন। অবচ্ছেদক হইতে অবচ্ছেদকিতা আরও সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার হইল। রামমাণিক্যের অবচ্ছেদকিতার ভিতর পড়িলে কাহারও উদ্ধার ছিল না।

বহু বৎসর এইরূপে দক্ষতা ও সম্মানের সহিত অধ্যাপনার পর রামরত্ন রায়ের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটিল। একদিন তিনি শুনিলেন, রামরত্ন রায় একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে চুনের গারদে দিয়াছেন। শুনিয়াই তিনি হায় হায় করিতে লাগিলেন এবং নিজে চুনের গারদে গিয়া ছেলেটি উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং তাহাকে খাওয়াইয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। কলিকাতায় গেলে সেখানে জমিদারদের জোরজুলুম খাটিত না।

রামরত্ন রায় রাত্রে কাছারী করিতেন। তিনি যখন শুনিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার কয়েদী ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তখন তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তলপ করিয়া পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘুমাইতেছিলেন; তিনি উপস্থিত হইলে রায় মহাশয় বলিলেন, আপনি আমার কয়েদী ছাড়িয়া দিয়াছেন কেন? তিনি বলিলেন—চক্ষের উপর ব্রহ্মহত্যা হয়, আমি দেখিতে পারি না। রায় মহাশয় বলিলেন, দেখুন, শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনি যা বলিবেন, আমরা মাথা পাতিয়া লইব, কিন্তু বিষয়কর্ম্মে যদি আপনি হস্তক্ষেপ করেন ভাল হইবে না কিন্তু। তখন রামমাণিক্য বলিলেন, তবে ভাল না হউক, আমি এ অবস্থায় আপনার সভাপণ্ডিতি করিতে পারিব না।

এই বলিয়া রামমাণিক্য চলিয়া আসিলেন। ১৮২৪ সাল হইতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন হইয়া অবধি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারকে ন্যায়ের পণ্ডিত করিয়া লইয়া যাইবার অনেকবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বেতন লইয়া পড়ান বিশেষ ম্লেচ্ছ গবর্ণমেন্টের বেতন লওয়া তাঁহার অকার্য্য বলিয়া মনে হইত। এখন তিনি বলিলেন যে, খোষামোদ অপেক্ষা পাপ ভাল, খোষামোদ করিতে গিয়া ব্রহ্মহত্যাও দেখিতে হয়, পাপে আর সেটা হয় না। এইরূপ মনের ভাব লইয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই সব কথা বলিয়া তিনি কলেজে আসিয়া নিজে কর্ম্মপ্রার্থী হইলেন, তখন অন্য কাজ খালি ছিল না, অ্যাসিষ্টান্ট সেক্রেটারীর পদ খালি ছিল। ১৮৪৫ সালের মে মাসে তিনি ঐ পদ পান এবং ১৮৪৬ সালের বারুণীর দিন তাঁহার মৃত্যু হয়। দশ মাস মাত্র চাকরি করিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এপ্রিল মাসে অ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটরী হন।

এই পদের কার্য্য প্রধানতঃ পরীক্ষা করা ও কলেজ পরিদর্শন করা। কে আসিল, কে না আসিল, কে পড়াইতেছে, কে না পড়াইতেছে। প্রশ্ন ভাল হইল কি না-হইল দেখিতে হইত এবং দরকার-মত সকল শাস্ত্রেরই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতে হইত।...

পুঁথি সংগ্রহ করা ও পুঁথি নকল করান বিদ্যালঙ্কারের বাতিক ছিল। তিনি দুজন কায়স্থকে মাহিনা দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা ক্রমাগত পুরাণের পুঁথি নকল করিত। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর পর কলিকাতার একজন বড় মানুষ ১৬টি টাকা দিয়া তাঁহার সমস্ত পুঁথি তুলিয়া লইয়া আসেন। তাহার মধ্যে তাঁহার অবচ্ছেদকিতার পুঁথিও ছিল।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৩৮)

পল্লীশিল্প

জসীম উদ্‌দীন, এম-এ

চাঁদের আলোকে সকল ধরণী দেখা যায়। কিন্তু সে আলো আমাদের গৃহের অন্ধকার দূর করে না। সেখানে একটি ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপের প্রয়োজন। বাহির হইতে অনেক জ্ঞান-গবেষণার সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি, কিন্তু মাটির প্রদীপের মত নানারূপ গ্রাম্য শিল্পকলা আমাদের গৃহকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

পল্লীর শিল্পকলা সাধারণতঃ রূপ পাইয়াছে মাটিতে, পাথরে, কাঠে, কাপড়ে, মানুষের দেহে, কাগজে, বেতের বন্ধনীতে কোথাও রঙীন রেখা হইয়া, কোথাও কঠিন দাগ কাটিয়া, আবার কোথাও রঙীন সূত্রের মায়াজাল রচনা করিয়া। ইহারা কেহ মানুষের অঙ্গে জড়াইয়া আছে, কেহ-বা গৃহের বিবিধ আসবাবপত্রের মধ্যে লুকাইয়া আছে; কখনও আবার ধর্ম্মের পঞ্চ-প্রদীপের আলোকে উজ্জ্বল পথের পথিক হইয়া মানুষের সহজ সৌন্দর্য্য-স্পৃহার একান্ত সাথী হইয়া আমাদের গৃহে রূপের শতদল সাজাইয়াছে।

মাটির গায়ে আলপনার রেখায় আমরা যে-ছবি দেখিতে পাই সেইরূপ ছবিই আমরা দেখিতে পাই পাথরের ফলকে, ছুতার-মিস্ত্রির কারুকার্য্য আঁকা কাঠখণ্ডে, দেহের উল্কীতে, গহনায়, রঙীন কাঁথায় এবং গৃহের সূক্ষ্ম বেত্র-বন্ধনীতে। ছবিতোলার প্রণালী পৃথক পৃথক স্থানে পৃথক হইলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া আমাদের দেশের বিভিন্ন স্তরের শিল্পীদের মধ্যে একটি মিলন-সেতু গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা যেন একই প্রেরণা লইয়া নানা পথে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই কাহাকেও ছাড়িয়া যায় নাই। যে-মেয়েটি রঙের উপর রঙ মিশাইয়া পিঁড়ি চিত্র করে, গ্রাম্য পটুয়ার আঁকা রথের গায়ের রঙীন ছবিরও সে একজন বড় সমঝদার। মাটির মেঝেতে কাঁথা বিছাইয়া কৃষাণ গৃহিণী রঙীন সূত্র ধরিয়া যে-সব লতাপাতা, প্রজাপতি, ফুল আঁকে হয়ত ঘর বাঁধিতে বাঁধিতে তাহার কৃষাণ-স্বামী তাহারই অনুকরণে সূক্ষ্ম বেত জড়াইয়া জড়াইয়া চালের বাতার সহিত পয়দা বন্ধনী, গোখুরা বন্ধনী প্রভৃতি রচনা করিয়াছে।

মাটির গায়ে যে-সব পল্লীশিল্প রূপ পাইয়াছে তাহার মধ্যে আলপনার কথা সকলের আগে মনে পড়ে। এই আলপনার আর্ট কতকটা হিন্দু মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন ব্রত বা পূজা-পার্ব্বণ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে ইহার প্রচলন দেখা যায় না। গরিবের ঘর নিকাইয়া চালচিত্র আঁকিয়া তাহাকে মনের মত করিয়া সাজাইয়া তবে দেবতাকে সেখানে আহ্বান করিতে হইবে। মাটির উপরে চালের গুঁড়া-গোলার রেখা। ফুলের মত বেশীক্ষণ ইহাদের বাঁচাইয়া রাখা যায় না। তাই ইহার অঙ্কন-প্রণালীকে খুব সহজ করিয়া ছবির বিষয়বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া মাত্র কয়েকটা সহজ রেখার সাহায্যে শিল্পীর মনোভাবের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

আলপনার ছবিগুলিকে সাধারণতঃ আট ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—১। পদ্ম, ২। লতা, ৩। গাছ ফুল পাতা ইত্যাদি, ৪। নদী পুকুর ও পল্লীজীবনের দৃশ্য, ৫। পশুপক্ষী ও নানা জন্তু, ৬। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্র, ৭। আভরণ ও নানা আসবাব, ৮। পিঁড়িচিত্র।

সাধারণতঃ লক্ষ্মীপূজায়, তারাব্রতে, তাম্বুলীব্রতে, বসুধারাব্রতে এবং গ্রাম্য বিবাহের উৎসবে আলপনা আঁকার প্রচলন দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের আলপনা আঁকিতে হয়। যেমন তারাব্রতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রের ছবি প্রধান, আবার লক্ষ্মীপূজায় বিবিধ প্রকারের লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। ইহাদের প্রত্যেকটি উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া যেমন নানা রকমের আলপনা

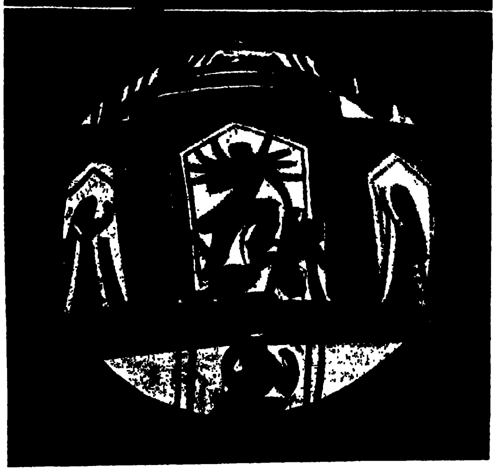
তেমনি নানা রকমের রকমের গান ও ছড়া। ময়মনসিংহ গীতিকার কাজল রেখা পালা হইতে প্রাচীন আলপনার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

উত্তম শালি ধানের চাল জলে ভিজাইয়া ধুইয়া রাজকন্তা কাটিয়া লইলেন। তাহা পিঠালী করিয়া প্রথমে বাপ আর মায়ের চরণ অঙ্কিত করিলেন। তারপর জোড়া "টাইল," ধানছড়া, তার মাঝে মাঝে গৃহলক্ষ্মীর পদচিহ্ন, শিবদুর্গা, কৈলাসভবন, পদ্মপত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ, হংসরথে বসিয়া জয়া বিষহরি, ডরাই, ডাকুনী, সিদ্ধা বিদ্যাধরী, শ্যাওড়ার বন সমেত বনদেবী, রক্ষাকালী, বাহনসহ কার্ত্তিক গণেশ, লক্ষ্মণের সহিত রামসীতা, গঙ্গা, গোদাবরী, হিমালয় পর্ব্বত, পুষ্পকরথে বসিয়া ইন্দ্র যম সমুদ্র সাগর চন্দ্র সূর্য্য, জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা মন্দির ইত্যাদির চিত্র মাটিতে আঁকিয়া ঘৃতের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাজকন্তা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এই ধরণের আল্পনা আঁকার পদ্ধতি আজকাল মেয়েরা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছেন। যশোহর অঞ্চল হইতে সুধাংশুবাবু যে-সব আল্পনা আবিষ্কার করিতেছেন তাহা কতকটা এই ধরণের।

মাটির গায়ে যেমন আল্পনা তেমনি মাটি দিয়া কুমারেরা বিচিত্র রকমের হাঁড়িকুড়ি, লক্ষ্মীর সরা, প্রদীপ, জোড়খুঁটি, নানা দেবদেবীর প্রতিমা ও বহু প্রকারের পুতুল তৈরি করিয়া থাকে। কোন কোন কুমার-গৃহিণী চিত্রবিদ্যায় বেশ নিপুণ। তাহারা বিবাহের বরণডালার সরা কুলা এবং পিঁড়ি চিত্র করিয়া বেশ দু-পয়সা আয় করিয়া থাকে। পুরুষেরা সাধারণতঃ কাদাছানার কঠিন কাজটি সম্পাদন করিয়া দেয়। মেয়েরা পুরুষদের তৈরি কাদার ডেলার উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করে। লক্ষ্মীপূজার সরার উপর তুলি ধরিয়া তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়া দেয়। এই সব ছবি সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি কিংবা দুর্গা মহাদেব ইত্যাদি দেবদেবীর প্রতিকৃতি। কুমার-মেয়েরা ছাড়াও গ্রামের বহু হিন্দুমেয়ে বিবাহের বরণ-কুলা সরা এবং পিঁড়িতে অতি সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারে।

মাটির পুতুল সাধারণতঃ কুমারদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তৈরি করিয়া থাকে। এই সব পুতুল কোথাও নানারূপ ছাঁচের সাহায্যে, আবার কোথাও শুধু হাতেই তৈরি হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কুমারেরা ছাঁচের সাহায্যেই পুতুল তৈরি করিয়া থাকে।



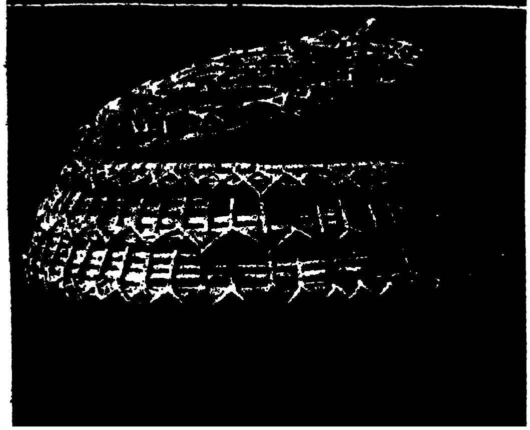


১। লক্ষ্মীপূজার সরা
২। লক্ষ্মীপূজার সরা

কৃষ্ণনগরের পুতুলের গল্প করিয়া আমরা গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। কৃষ্ণনগরের পুতুল এক সময় ইউরোপে এত আদর পাইয়াছিল যে, তৃতীয় নেপোলিয়ান সেকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুমার যদু পালকে ফ্রান্সে আহ্বান করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব কৃষ্ণনগরের পুতুল অপেক্ষাও অনেক ভালপুতুল বাংলার নানা গ্রামের কুমারেরা তৈরি করিয়া

থাকে। কৃষ্ণনগরের পুতুলকে খাঁটি বাংলার পুতুল বলিয়াও উল্লেখ করা যায় না। কৃষ্ণনগরের কুমারদের এত নাম এই জন্ত যে, তাহারা বিজাতীয় রুচির খোরাক জোগাইতে পারিয়াছে। বস্তুতঃ ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে নীলকুঠীর সাহেবদের চাহিদা অনুসারে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা





১। বেতের তৈরি পানের ঝাঁপি
২। বেতের তৈরি গহনার ঝাঁপি

এ দেশী আদর্শ ছাড়িয়া ইউরোপীয় আদর্শে পুতুল গড়িতে আরম্ভ করে। তখন হইতে তাহারা এ দেশীয় সমাজ-জীবনের নানা ফটোগ্রাফীর নক্সা তৈরি করিয়া বিদেশে চালান দিয়া আসিতেছে।

এইখানে সোলার খেলনার কথা না বলিয়া পারিলাম না। গ্রাম্য মেলা বা আড়ং হইতে ছেলেরা সোলার খাঁচা, পাখী, কুমীর, রথ, আনারস, কাঁঠাল, হরিণ, ময়ূর, ফুল প্রভৃতি কিনিয়া আনে। সোলার খেলনা সাধারণতঃ খুব ছোট শিশুদের জন্ত। শিশুকে শোয়াইয়া রাখিয়া তাহার মাথার উপর খেলনাগুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। সেগুলি বাতাসে দোলে। তাহা দেখিয়া শিশু দু-হাত নাড়িয়া খেলা করে। ইহা ছাড়া সোলার খেলনা ঘর সাজাইবার কাজেও ব্যবহৃত হয়। দেশী জমীদারদের কাছারীতে পুণ্যাহ উৎসবে প্রজাদের গলায় এক প্রকার সোলার মালা পরাইয়া দেওয়া হয়। আগে মুসলমানদের বিবাহের সময় বরকে এক ছাতি মাথায় দিয়া শশুরবাড়ি যাইতে হইত। আজকাল মোটরে চড়িয়া, পাল্কীতে চড়িয়া আধুনিক বরেরা বিবাহ করিতে যায়, কিন্তু আগে ত লোকের এ সব দিকে সখ ছিল না। গ্রাম্য মালাকরেরা মাসের পর মাস অতি নিপুণ হস্তে ধরিয়া ধরিয়া সোলার ফুল পাতা লতা পাখী ইত্যাদি দিয়া এই রঙীন ছত্রের রচনা করিত। এই ছত্র হস্তে লইয়া পদব্রজেই বর বিবাহ করিতে যাইত। শিবরামপুরে এক বৃদ্ধ মালাকর এখনও এইরূপ ছাতি তৈরি করিতে পারে। দুর্গাপূজার মেলার সময় নৌকার বেপারীরা

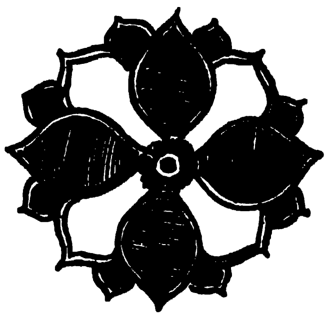


ফরিদপুরের মাটির পুতুল

সোলার ফুল দিয়া মালা দিয়া নৌকার গলুই সাজায়। দৌড়ের নৌকাও সোলার লতা ফুল দিয়া সাজান হইয়া থাকে। হিন্দুদের বিবাহে বরের মাথার টোপর মালাকরেরা

প্রস্তুত করিয়া থাকে। কোন কোন টোপরে এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য থাকে যে তাহা বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। মালাকরেরা সাধারণতঃ স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া কাজ করিয়া থাকে। সোলা কাটিবার জন্ত একপ্রকার পাতলা ছুরি এবং বঁটি ইহারা গ্রাম্য কামারদের কাছ হইতে তৈয়ার করিয়া লয়। আজকাল পাটের চাষ হওয়ায় সোলার চাষ খুব কম হয়। ব্যবসায়ে লাভ নাই দেখিয়া জীবিকার জন্ত বহু মালাকর অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে।

কাপড়ের উপর যে-সব পল্লীশিল্প ধরা দিল কাঁথা তার মধ্যে প্রধান। আলপনার মতন কাঁথা সেলায়ের ছবিগুলিকেও নানা ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—১। বিবিধ লতা, ২। পাতা ফুল, ৩। মাছ পাখী, ৪। দেবদেবীর ছবি, ৫। হাতী ঘোড়া ময়ূর ইত্যাদি। কাঁথার উপরে যেমন নানা রকমের ছবি হয়, সেইগুলি আঁকিবার জন্তও নানা রকমের ফোড় দিবার প্রণালী আছে। তাহারা নিজেরাই অনেক সময় ছবির উপরে 'ডেকোরেশুনে'র কাজ করে। এই সেলাইগুলির নাম তেরছা সেলাই, বখেয়া সেলাই, বাঁশপাতা সেলাই ইত্যাদি। বেশীর ভাগ কাঁথাতে লাল, কাল, সাদা



কাঁথার মাঝে পদ্ম

ও হলদে এই চারি রঙের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন কাঁথাতে সবুজ ও নীল রঙ দেখিতে পাই।

কাঁথা সেলাইয়ের সুতা তৈরি এবং রঙ নির্ব্বাচন এক কঠিন ব্যাপার। কেহ কেহ পুরাতন শাড়ীর পাড় হইতে একটি একটি করিয়া সুতা বাহির করিয়া ছোট ছোট নাটাইয়ে গুটাইয়া রাখে। তারপর সেই সুতাকে পাকাইয়া বা একটি একটি যারা কাঁথা সেলাই করে। হাট হইতে তাঁতিদের বা বেনেদের কাছ হইতেও কেহ কেহ রঙীন সুতা কিনিয়া লয়। হাঁটু মেলিয়া বসিয়া পায়ের আঙলের সঙ্গে সুতার একটি আল জড়াইয়া দুই হাতে সাধারণতঃ মেয়েরা সুতায় পাক দেয়। এক আলে পাক হইলে তাহা দাঁত দিয়া কামড় দিয়া ধরিয়া অন্ত আলে পাক দেয়। এইরূপে নানারঙের আট নয় আল সুতা পাক দেওয়া হইলে এক এক আল, হাতের চারি আঙল একত্র করিয়া তাহাতে জড়াইয়া দড়ি করিয়া পাক দিয়া রাখে।

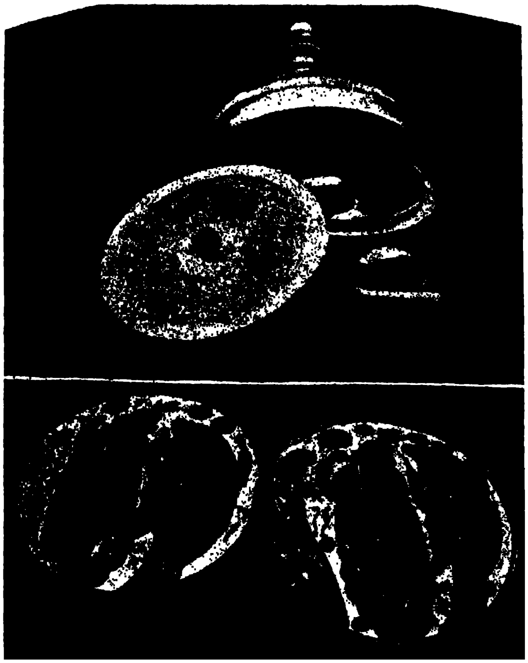


কাঠের পুতুল

কার্পেটে ফুল তুলিতে মেয়েরা কোলের উপর রাখিয়া তাহা সেলাই করে। কেহ কেহ ফ্রেমেও কাপড় আটকাইয়া লয়। কিন্তু কাঁথা সেলাই সে-ভাবে করিতে হয় না। ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপর কাঁথাখানা মেলিয়া ধরিয়া তাহার উপরে বসিয়া তবে তাহা সেলাই করিতে হয়। সাধারণতঃ দুই পাট কিংবা তিন পাটের কাঁথাই নক্সী করা হয়। তাহার অপেক্ষা বেশী পাটের কাঁথা শীতনিবারণের জন্ত ব্যবহৃত হয়। তাহার উপরে কেহ কারুকার্য্য করে না। কাপড়ের প্রত্যেক পরতকে পাট কহে। দুই পাটের কাঁথার অর্থ দুই পাল্লা কাপড় যে কাঁথায় ব্যবহৃত হয় সেই কাঁথা। এই কাঁথা সেলাইয়ের সমস্ত উপকরণ সাধারণতঃ ছোট ছোট বটুয়ার মধ্যে রাখা হয়। সূচে মরিচা ধরিবে মনে করিয়া কেহ কেহ তাহা তেলের শিশির মধ্যেও রাখে। এই সূচ মেয়েদের নাক কান বিঁধাইবার কাজেও ব্যবহৃত হয়।

কোন কোন সময়ে একখানা কাঁথা সেলাই করিতে বারো বছর সময় লাগিয়াছে এরূপও শোনা যায়। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীহট্টে একখানা ভাল কাঁথার খোঁজ পাইয়াছিলেন। সেই কাঁথায় একটি বিধবা মেয়ে তাহার বিবাহের গায়ে হলুদ হইতে আরম্ভ করিয়া 'সমস্ত

ঘটনা আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপও শোনা যায় যে, মাতা যে-কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মায়ের মৃত্যুর পর কন্যা তাহা আজীবন সেলাই করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে



১। কাঠের পানের বাটা
২। লক্ষ্মীপূজার সরা

বংশের পরবর্ত্তী কোন কন্যা তাহা সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহা কম ধৈর্য্যের কথা নহে।

আগে এইসব কাঁথা কেহই বিক্রী করার জন্য তৈরি করিত না। লোককে দেখাইয়া প্রিয়জনকে উপহার দিয়া গ্রাম্য শিল্পীরা সুখী হইত।

কাঁথা সেলাই করিতে গিয়া এদেশের মেয়েরা কাপড়ের উপর কাঁথার মতই নক্সা করিয়া আরও অনেক জিনিষ তৈয়ার করিয়াছেন, সেগুলিকে কাঁথা সেলাইয়ের পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১। পান সুপারি রাখার বটুয়া

২। জপের মালার থলে

৩। বৈরাগীর ঝোলা

৪। বালিস যাহাতে মাথার তেল লাগিয়া ময়লা না হইয়া যায় তজ্জন্য তাহার উপরে আচ্ছাদন দেওয়ার 'ব্যাটন'। 'ব্যাটন' বোধ হয় বেষ্টনী শব্দের অপভ্রংশ।

৫। মুসলমানদের দস্তরখানার কাপড়। মুসলমানেরা সাধারণতঃ বিছানার উপর বসিয়া আহার করে। আহারের সময় মাছের কাঁটা আলুর খোসা ইত্যাদি ফেলিবার জন্য একখানা দস্তরখানা কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হয়। বাড়িতে কোন নূতন অতিথি আসিলে সাধারণতঃ তাহার আহারের সময়ই নক্সীকরা দস্তরখানার কাপড় বিছান হয়।

৬। কোরাণ শরীফ জড়াইয়া রাখার ঝোলা।

৭। 'সারীন্দা' (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) রাখিবার ঝোলা।

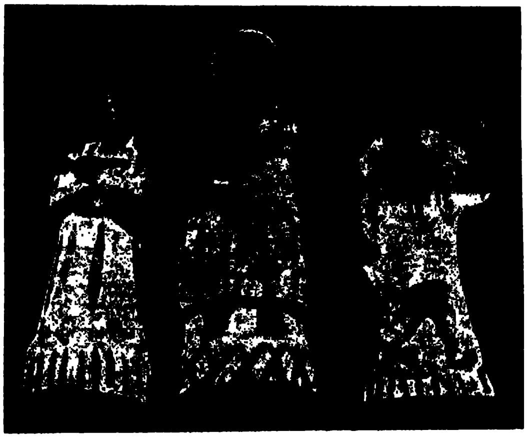
পল্লীগ্রামের শিকা আর এক সুন্দর জিনিষ। ছোট একখানা খড়ের ঘরের চালের বাতায় আনন্দলহরী, ফুলঝুরি, আদরফানা, সাগর ফেনা, কেলীকদম্ব প্রভৃতি নানা ধরণের শিকায় রঙীন পানের বাটা, গহনার ঝাঁপি, সিন্দুরকৌটা প্রভৃতি মেয়েদের অতি সখের জিনিষগুলি ঝুলিতে থাকে। কোন কোন শিকার বুননের সহিত অভ্র ও রাংতা ব্যবহৃত হয়। শিকায় শিকায় গরিব চাষীর ছোট ঘরখানি ঝলমল করে। বিছানাবালিশ টাঙাইয়া রাখিবার জন্য মেয়েরা রঙীন সুতা দিয়া ঝালি তৈয়ার করে। তাহাও দেখিতে অতি সুন্দর। আজকাল মাটির প্রদীপের চলন উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রদীপের সলিতা রাখিবার জন্য আগে মেয়েরা রং-বেরঙের কাপড় দিয়া সলিতা-দানী তৈরি করিতেন। তাহাতেও নানাপ্রকার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য থাকিত।

বাংলা দেশের পাটার উপর যে-সব ছবি দেখা যায় সে-সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। বাংলা দেশের বুকে একদিন মাটির মাদল বাজাইয়া যে সুন্দর মানুষ-দেবতা অশ্রুজলের মন্দাকিনী বহাইয়াছিলেন তাঁহারই উজ্জ্বল ইতিহাস সাধারণতঃ এই সময়ের পুঁথির পাতায় বা মলাটের পাটায় অঙ্কিত দেখিতে পাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের পূর্ব্বে এই ধরণের ছবি আঁকা পুঁথি বাংলা দেশে খুব কমই পাওয়া যায়।

কালিঘাটের পট লইয়া আজকাল অনেকে আলোচনা

করিতেছেন। এই পট আঁকিবার পদ্ধতি অতি চমৎকার। পটুয়াদের ঘরে ছেলে বুড়ো মেয়ে সকলে বসিয়া এই পট আঁকে। প্রত্যেকে এক একটি রং লইয়া বসে। একজন রেখা টানে আর একজন গায়ে রং দেয়, অন্য জন চুল আঁকে। এমনি করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে একখানি পট সম্পূর্ণ আঁকা হয়। ইহাতে সকলেরই শিক্ষা এবং মনে সৃষ্টির আনন্দ জন্মে।

আমাদের দেশে যাহারা প্রতিমার চালচিত্র আঁকে তাহাদের ভাস্কর বা আচার্য্য ব্রাহ্মণ বলে। ইহারা গ্রামের সকল প্রকার চিত্রকার্য্য সম্পাদন করেন। আমাদের ফরিদপুরে চৌধুরীদের রথের গায়ে এরূপ একজন ভাস্করের আঁকা অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। তাহার কতকগুলি দেবদেবীর লীলাবিষয়ক, আবার কতকগুলি পল্লী-জীবনের নানা ঘটনা সম্বলিত। আজকাল জার্ম্মেনী হইতে ছাপমারা চালচিত্র বাজারে

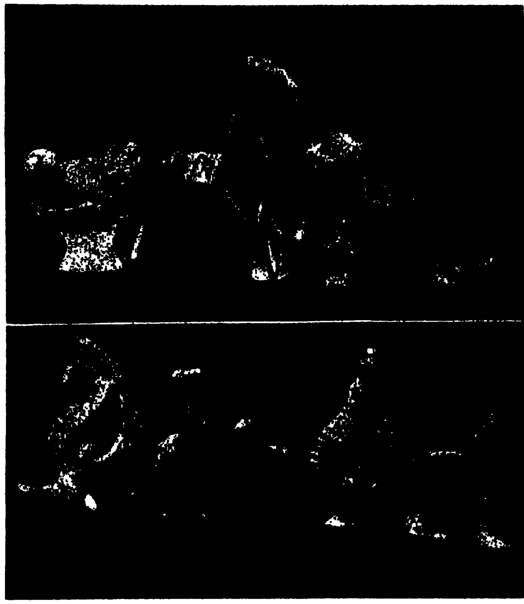


ফরিদপুরের মাটির পুতুল

বিক্রী হইতেছে দেখিয়া দেশী ভাস্করদের অর্থ উপার্জ্জনের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

চারি বৎসর আগে কবি পরিমলকুমার ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, আগে বিক্রমপুর জেলায় গ্রাম্য মুসলমানেরা এক প্রকার গাজীর পট দেখাইয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিত। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া এই পটের খোঁজ পাইয়াছি। পট এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। যে-ছড়াটি গাহিয়া গাহিয়া এই পট বাড়ি বাড়ি দেখান হইত তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

পেরথমেতে দেখেন কর্ত্তা ঠাকুর জগন্নাথ
রাম লক্ষ্মণ নয়া হনু লঙ্কা চইলা যায়।



১। মাটির হাঁস, ঘোড়া, সিংহ, টিয়া
২। চিনির খেলনা বা সাজ

রাবণ আইস্যা যোগীর বেশে সীতা হরণ করে
সুর্পনখার নাক যেমন লক্ষ্মণঠাকুর কাটে।
কামরতি বামন দেখেন ছিন্নমস্তা কালী
তার পরেতে দেখেন কর্ত্তা ময়ূরপঙ্খী নাও।
গাজীর ভাই কালু আইল নিশান ধরিয়া
গাজীর আছে একটা বাঘ নাম যে খান্দিয়া।
ঘর দুয়ার ছুলিয়া বাঘে মানুষ লইয়া যায়।
চুল নাই বুইড়া বিটি খোপার লাইগ্যা কান্দে
কচুপাতা চিপলা দিয়া খোপা ভাণ্ডর করে।
সুন্দর বুইনা বাঘ ছিল আড়ে আড়ে চায়।
তারা বুইনা বাঘ যেমন সেলাম জানায়।
পালের প্রধান বড় আবালটা বাঘে লইয়া যায়।
সাত সের চাইলের পিঠা খাইল বুড়ী কাঁথা মুড়ি দিয়া।
দাঁতচিং দাঁতচিং বইলা বুড়ী জামাই বাড়ী যায়।
গোটা দুই তিন কিল দিল বুড়ীর আসরে পাসরে
গোটা চার পাঁচ কিল দিল বুড়ীর গুঠার উপরে
নন্দ ঘোষের বাপে আইল হুকা হাতে লইয়া
দুই বাঘের একমাথা ধরিছে যুগান।

বর্ণনা পড়িলে সহজেই মনে হইবে এই পটে হিন্দু

মুসলমান সকল প্রকার লোকেরই রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। এই পট সাধারণতঃ প্রস্থে দুই হাত এবং দৈর্ঘ্যে ত্রিশ-চল্লিশ হাত হইত। একটা বাঁশের সঙ্গে পট জড়াইয়া দুইটা বাঁশের সঙ্গে তাহা বাঁধিয়া দেওয়া



শিকা

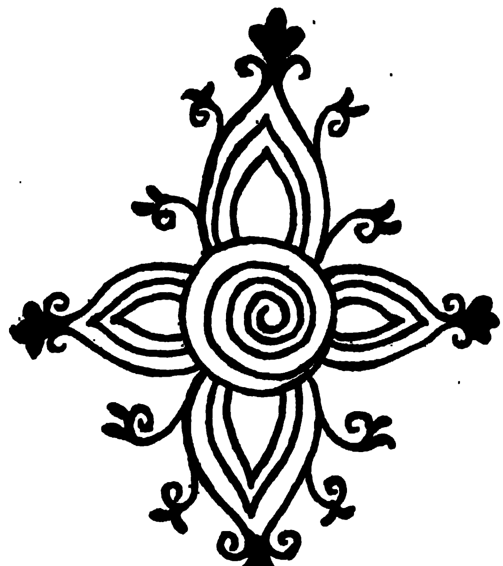
হইত। তাহারা থামের কাজ করিত। গানের সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের সিনের মত ধীরে ধীরে উপরের বাঁশ কপিকলের সাহায্যে ঘুরাইয়া ছবিগুলিকে মেলিয়া ধরা হইত। গ্রামের লোকেরা তাহা দেখিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত। কোন কোন দলে সাজ-পোষাক পরিয়া ছবির বিষয়বস্তুগুলি দেহভঙ্গীর সাহায্যেও দেখানো হইত। এরূপ দলকে কাচের দল বলে। সাধারণতঃ পৌষ মাঘ মাসে এরূপ দল বাহির হইয়া থাকে। গুরুসদয় দত্ত বীরভূম জেলা হইতে রামায়ণ মহাভারতের ঘটনাসম্বলিত এইরূপ কয়েকখানা পট সংগ্রহ করিয়াছেন।

বাংলা দেশে এককালে বেত ও বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে ঘরের নানাপ্রকার আসবাব ও ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করা হইত। আমাদের শীতলপাটি এক আশ্চর্য্য জিনিষ। যাহারা পাটি বোনে তাহাদিগকে 'পাইটা' বলে। পাটিয়া মেয়েদের মধ্যে যে যতগুলি পাটি বুননের যো বা প্রণালী জানে বিবাহে সে তত কুড়ি টাকা পণ পায়। ফরিদপুর জেলার সাঁতইরের শীতলপাটি একদিন সমস্ত ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার পাটি রাজা সীতারামের পুরবাসিনীদের মধ্যে একটা বিলাসের সামগ্রী বলিয়া পরিচিত ছিল।

উত্তর-বঙ্গে অনেক স্থানে এখনও বেতের দ্বারা সম্পূর্ণ গৃহনির্ম্মাণ করা হয়। ঢাকা জেলার বেতীয়া রমণীদের হাতের তৈরি একটি বেতের ঝাঁপি ও পান রাখিবার একটি ডালা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। বেত ঘুরাইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফুল বানাইয়া তাহাতে রং লাগাইয়া কি অপূর্ব্ব দ্রব্য তাহারা তৈরি করে!

আজকাল করগেট টিনের আমদানী হইয়া সুন্দর খড়ের ঘরের সখ মানুষের চলিয়া যাইতেছে। সেই সঙ্গে ভাল ভাল ঘরামীরাও ঘরের সূক্ষ্ম কাজ ভুলিয়া যাইতেছে। জোড়বাঙলা, বারো বাংলা, বারো দুয়ারী, পূব দুয়ারী, আটচালা, দোচালা, চৌচালা ঘর, রঙমহল, আলমটুঙ্গী, জলটুঙ্গী প্রভৃতি ঘরের নাম শুনিলে কান জুড়াইয়া যায়। ইহার এক এক ঘরের সঙ্গে এক এক রকমের কারুকার্য্য।

আমাদের ফরিদপুর জেলা হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে কালুখালী অঞ্চলের ছরাজান মিঞা বহু বৎসর আগে একখানা খড়ের ঘর তৈরি করাইয়া গিয়াছেন। আজও তিন-চারি দিনের পথ হইতে লোক গামছায় চাল চিঁড়া বাঁধিয়া এই ঘর দেখিবার জন্য আসে। শুনিয়াছি তাঁহার বাড়ির কোন নববধূ না-কি শ্বশুরবাড়িতে পাকা ঘর নাই



শঙ্খপদ্ম—অলাপনা

বলিয়া পাড়াগাঁয়ে আসিতে চাহেন নাই। শ্বশুর তাই প্রতিজ্ঞা করিলেন খড় দিয়া তিনি এমন ঘর বাঁধিবেন যাহা

পাকা বাড়ির সৌন্দর্য্যকেও পরাস্ত করে। এই ঘর তৈরির বিষয়ে নানারূপ গল্প আছে। যে ঘরামী একদিনে একটি রুয়া চাঁচিয়াছে তাহাকেও গৃহকর্ত্তার মনঃপূত হয় নাই। ইহার প্রত্যেকটি রুয়া এত ধরিয়া ধরিয়া চাঁচা হইয়াছে যে, একটি রুয়া চাঁচিতে একজন ঘরামীর দুই দিন সময় লাগিয়াছে। সর্ব্বাইন্দ্যা গ্রামের দুইজন নমঃশূদ্র ঘরামীর তত্ত্বাবধানে প্রথমে এই ঘরের কাজ আরম্ভ হয়। পরে ঢাকা জেলা হইতে একজন মুসলমান ঘরামীকেও নিযুক্ত করা হয়। শোনা যায় যে এই ঘরামী এত সরু বেত চাঁচিতে পারিত যে, তাহা অনায়াসে সূচের ছিদ্রপথে যাওয়া-আসা করিত। তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য ত্রিশ-চল্লিশ জন ঘরামীকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ঘরের কাজ সমাধা হইলে গৃহস্বামী হিন্দু দুই জন ঘরামীকে পুরস্কার এবং জায়গীর প্রদান করেন। কিন্তু মুসলমান ঘরামীকে পরে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে আর কোন পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। ইহাতে সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে একস্থানে একটু ফাঁক রাখিয়া যায়। বৃষ্টি পড়িলেই সেখান দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। অপর দুইজন হিন্দু ঘরামী পরে বহু চেষ্টা করিয়াও সে ত্রুটি সারিতে পারে নাই। এই ঘরের প্রত্যেকটি রুয়া প্রায় ত্রিশ হাত। এতবড় রুয়া জোড়া না দিয়া তৈরি করিবার জো নাই। কিন্তু সেই রুয়া বাঁশের সঙ্গে এমন করিয়া মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কিছুতেই তাহা টের পাওয়া যায় না। ঘরের আটনের জোড়াও বুঝিবার উপায় নাই। এই ঘরের সঙ্গে গোখুরা বন্ধন, পরদা বন্ধন (প্রজাপতি বন্ধন) প্রভৃতি নানা প্রকার বন্ধন আছে। তা ছাড়া ঘরের বাজারের সঙ্গে, ফুসীর সঙ্গে, ছাটনের সঙ্গে অভ্র ও মীনার পাত জড়াইয়া তাহাতে সুচিক্কণ বেতের কারুকার্য্য করা হইয়াছে। আটনের সঙ্গে যে মোটা বেতের বন্ধন দেওয়া হইয়াছে সেই বেতের গায়ে সাদা রং লাগান। প্রত্যেক রুয়ার গোড়ায় লতা ও ফুলের নক্সা কাটা, তাহাতে নীল এবং লাল রং জড়ান। এখন এই ঘরের অবস্থা কতকটা জীর্ণশীর্ণ। অভ্র ও রং-বেরঙের মীনার পাতগুলি উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামের বৃদ্ধেরা বলে, আগে এই ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অভ্র এবং মীনার পাতের রঙে চোখ ঝলসিয়া যাইত। রাত্রিবেলা এই ঘরে যখন ঝাড়লণ্ঠন জ্বলিত তখন মীনা ও অভ্রের পাতের উপর নানা রকমের বন্ধন-



দোতালা ঘর

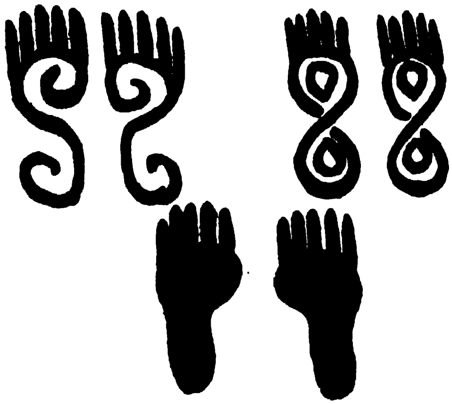
গুলি সাগরের নানা রঙের জললহরীর উপর তারকার প্রতিবিম্বের মত আলোকে ঝলমল করিত।

এই ধরণের ঘর আজকাল কেহ তৈরি করে না বটে, কিন্তু গ্রামের বহু বাড়িতে এখনও এরূপ কারুকার্য্য-সমন্বিত ফুলচাং দেখিতে পাওয়া যায়। রূপকথার অনেক স্থানে পাওয়া যায় কোন কোন ঘরে আম্বারী অভ্র দিয়া তৈরি হইত। সোনা দিয়া তাহার রুয়া মোড়া হইত। নানারূপ পাখীর রঙীন পালকে সেই ঘরের ছাউনি দেওয়া হইত। 'মলুয়ার' পালা হইতে আমরা একজন সাধারণ গ্রাম্য চাষীর ঘরের বর্ণনা উদ্ধৃত করিব।

> শীতলপাটী দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া.
> উলু ছোনে ছাইল ঘর দেখতে মনোহরা।
> ঝাপে ঝোপে করে বিনোদ কামেলার কাম
> দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান।
> মাছুরা পঙ্কের পাখ দিয়া সাজুয়া বানায়।

বাংলা দেশের দারুশিল্প তাহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের জিনিষ। এদেশের পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিলে অতি সহজেই চোখে পড়িবে, সাধারণ ছুতার মিস্ত্রীরা কাঠের উপর কত অপূর্ব্ব কারুকার্য্য করিয়া রাখিয়াছে। ঘরের চৌকাঠ, কাঠের বেড়া, খাট, পালঙ্ক, সিন্দুক, বাক্স, লাঠি, সারীন্দা, দোতারা, কাঠের ও বাঁশের গুঁড়ির হুকা, রথ, পাল্কী, গাড়ী, শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ প্রভৃতি সব জিনিষের উপরই এইসব শিল্পীরা সৌন্দর্য্যের শতদল ফুটাইয়া

তুলিয়াছে। ফরিদপুর জেলায় নৈলাগ্রামে সেদিন একখানা ঠাকুরের আসন দেখিয়া আসিলাম। চারকোণে চারিটি হাতী। প্রত্যেক হাতীর মাথায় এক একটি সিংহ। সিংহ হাতীর শুঁড় বাঁকাইয়া ধরিয়াছে। তাহারই উপরে আসনখানা অবস্থিত। আসনের সামনের দিকটা মাথায় করিয়া আছে চারিজন বৈরাগী; একজনের হাতে কমণ্ডলু, আর একজন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, আর দুইজন তীর্থযাত্রা করিয়াছে। আসনখানার চারিদিকে চারিজন



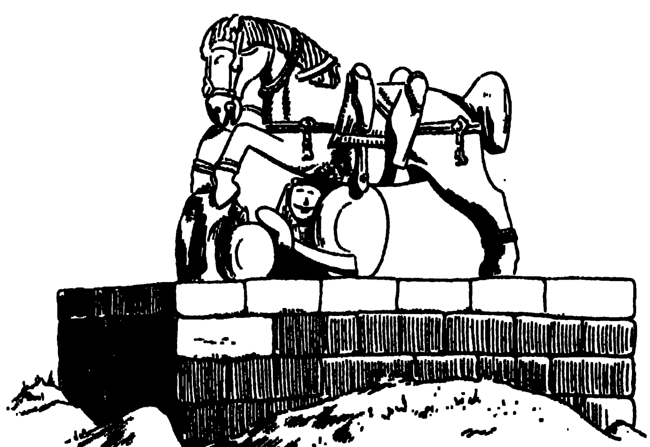
লক্ষ্মীর পদচিহ্ন

পরী পাখা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। সামনের দিকে ব্রজগোপিনীরা কেহ নাচিতেছে, কেহ তবলা বাজাইতেছে, কেহ গান করিতেছে। প্রত্যেকটি ছবি যেন জীবন্ত। এই আসনের উপরে আর একখানা ক্ষুদ্র আসন এবং তাহার উপরে আরও একখানা। প্রত্যেক আসনের চারি ধার কাগজের সূক্ষ্ম বলয়ের মত তক্তার উপর কারুকার্য্য করিয়া সাজানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই আসনের চারিপাশে রাধাকৃষ্ণ, দশাবতার ও রাসের বহুচিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহা কোন গ্রাম্য পটুয়ার আঁকা। সামনের দিকের ছবিগুলি প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। অন্যদিকের ছবিগুলি এখনও বোঝা যায়। শুনিলাম বহু শিল্পীর বহু বৎসরের সাধনায় এই আসনখানি তৈরি হইয়াছিল।

বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে বেড়াইলে শ্রাদ্ধের বহু স্তম্ভ দেখা যায়। ইহার উপরে গঠিত বৃষ, হরপার্ব্বতী, এবং স্তম্ভরূপী মনুষ্যমূর্ত্তি কোন কোন স্থানে অতি সুন্দর হইয়া থাকে। এদেশে ভাল পাথর পাওয়া যায় না, তাই বাংলায় ভাস্করশিল্প দারুশিল্পে রূপান্তরিত হইয়াছে। (হ্যাভেল)

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে এক বৃদ্ধ মুসলমান খুব সুন্দর সুন্দর কাঠের পানের বাটা তৈরি করে। তাহার গায়ে রঙীন লতাপাতা ও ফুল আঁকা হয়। এক কিশোরগঞ্জ ছাড়া আর কোথাও এরূপ পানের বাটা আমরা দেখি নাই।*

* মহিলা ফটোগ্রাফার মিসেস অন্নপূর্ণা দত্ত বিনা পারিশ্রমিকে আমাকে ফটোগুলি তুলিয়া দিয়াছেন। সুহৃদর ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাকী ছবিগুলি আঁকিয়া দিয়াছেন।



শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

৪

চৌরঙ্গীর কাছাকাছি একটা পাড়ার একটি বড় বাড়ীর সিঁড়ি বাহিয়া একদল তরুণী কলকণ্ঠের শব্দে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতে করিতে পথে নামিয়া আসিল। পথযাত্রীদের ধূলিমলিনতার মধ্যে কোথা হইতে এক পশলা রঙ ঝরিয়া পড়িল, দিনান্তের কর্ম্মক্লান্ত অবসাদক্লিষ্ট নিঃশব্দ আনাগোনার মাঝখানে এক পলকের নৃত্যচপলতা, একঝলক হাসি।

একটি মোটর অপেক্ষা করিতেছিল, ছুটাছুটি করিয়া সকলে তাহাতে উঠিয়া পড়িল। বসিবার আসনে সকলের বসিবার ঠাঁই হইল না, কেহ-বা অপর কাহারও কোলে বসিল, কেহ কেহ ড্রাইভারের হেলান দিবার জায়গায় উল্টা হইয়া চড়িয়া বসিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই শেষোক্তাদের একজন পুরোবর্ত্তিনীদের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল, খুব একটা হাসির রোল উঠিল।

উহাদের হইতে কিঞ্চিৎ দূরত্ব রক্ষা করিয়া উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি যুবক নামিয়া আসিয়াছিল। একটু দূরে দাঁড়াইয়া হাতের রোল্ডগোল্ড বাঁধান ছড়িটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কি সে ভাবিয়া লইল, তারপর ছড়ির ইঙ্গিতে একটা ট্যাক্সি ডাকিল। গুম্ফ-শ্মশ্রু-বিবর্জ্জিত সুন্দর স্বাস্থ্যসম্পন্ন মুখশ্রী, দেহের বর্ণ শ্যাম, কিন্তু সযত্ন-প্রসাধনের গুণে চকচকে উজ্জ্বল, দীর্ঘায়ত তন্দ্রাবেশভরা চক্ষু, সুকুমার নাসিকার উপর চওড়া কালো ফিতায় বাঁধা, কালো খোলার ফ্রেমে আঁটা পাঁসনে, গায়ে সদ্য পাটভাঙা মুগার পাঞ্জাবী, গলায় জড়ানো একটি পাট-করা জরীপাড় কটকী চাদর, পরিধেয় মুগাপাড় ধুতির গিলেকরা কোঁচা সারাক্ষণ বাঁ হাতে সম্বরণ করিতে হয়, নতুবা ধূলায় লুটাইয়া পড়ে, পায়ে মুগার কাজকরা শুঁড়-তোলা চটি। বাংলার তরুণ-তরুণী মহলে যুবক সুপরিচিত, তাহার নাম বিমান বসু, সে একজন প্রতিষ্ঠাবান্ চিত্রকর, কিন্তু উহাই তাহার একমাত্র পরিচয় নহে। যদিও তাহার কোনওপ্রকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই ট্যাক্সিওয়ালার পরিচয় ছিল না, তবু শুধুমাত্র তাহার পোষাক-আষাক, চেহারা এবং চলার ভঙ্গি দেখিয়াই একহাতে অত্যন্ত অনভ্যস্ত শ্রদ্ধায় সে তাহাকে সেলাম করিল এবং অপর হাত পশ্চাতে বাড়াইয়া ট্যাক্সির দরজা খুলিয়া দিল।

সম্মুখের যে মোটরটিতে কলহাস্যমুখরা তরুণীরা যাইতেছিল, ট্যাক্সিওয়ালাকে সেইটির অনুসরণ করিতে বলিয়া বিমান পিছনের আসনে বেশ গদিয়ান হইয়া গুছাইয়া বসিল। ঐ যে সোনালী-জরিপাড় সিঁদুরে রঙের শাড়ী-পরা মেয়েটি ছাপা-গরদের নীল শাড়ী-পরা অপেক্ষাকৃত স্থূলাঙ্গিনী মেয়েটির কোলে বসিয়াছে, উহাকে আজ সমস্ত অপরাহ্ণ ধরিয়া তাহাদের ছবির প্রদর্শনীতে সে দেখিয়াছে, তাহার আশেপাশে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইয়াছে, স্কুলের ছেলেদের আঁকা ছবি বাহির করিয়া করিয়া তাহাকে দেখাইয়াছে, ব্যাখ্যা করিয়াছে, যে-ছবির প্রশংসা প্রাপ্য তাহার নিন্দা করিয়াছে, যাহা সত্যই নিন্দনীয় তাহার স্তুতিবাদে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোনও সূত্র ধরিয়াই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমানো হইয়া উঠে নাই! মেয়েটি বড় বেশী সাবধানী, বিমানের দিকে একবার চোখ তুলিয়া চাহে নাই পর্য্যন্ত। কাহাদের মেয়ে, কোথায় থাকে সে-খবরটা লইয়া আসিতে হইতেছে। বিমান বেশ জানে, ঘুরিয়া আসাই সার হইবে। মেয়েটি কোথায় থাকে জানিতে পারিলেও সে-জানাকে অতঃপর সে আর কাজে লাগাইবে না, রাত্রি প্রভাত না হইতেই ইহার কথা সে প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াই ভুলিয়া যাইবে। পরের দিন এক-পলকের-দেখা আর-কোনও একটি তরুণীর পরিচয়ের সন্ধানে আবার সে ঠিক এমনই করিয়া শহরের

পথে পথে অস্থির আগ্রহে ঘুরিয়া বেড়াইবে। তবু এমন অবস্থায় কিছুতেই সে নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিত না, আজও পারিল না।

ধর্মতলার একটি গলি বাহিয়া আর-একটি গলি, তার পর আর-একটি, তারপর আর-একটি, এমনই করিয়া গাড়ী বৌবাজারে আসিয়া পড়িল। বৌবাজার হইয়া কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার ডানদিকে রাখিয়া আবার একটি গলি, তারপর আরও কয়েকটি গলি পার হইয়া সুকিয়া ষ্ট্রীট।··· আগের দিন সমস্তরাত জাগিয়া বিমান থিয়েটার দেখিয়াছিল, গাড়ীর ঝাঁকানিতে এবং খোলা হাওয়ার স্পর্শে কখন যে একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছিল, হঠাৎ দেখিল, ট্যাক্সি যথাসম্ভব দ্রুত চলিতেছে বটে, কিন্তু সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় অগ্রগামী মোটরটির কোনও চিহ্ন কোথাও নাই। পাঁসনে সে পরিত বটে, সব মিলাইয়া আরও পাঁচ-ছয় জোড়া চশ্‌মা তাহার ছিল, কিন্তু কলিকাতার কোনও ট্যাক্সি-ওয়ালা হইতে তাহার দৃষ্টি কম প্রখর ছিল না। ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটি আঙুলে ট্যাক্সিওয়ালার ঘাড় ছুঁইয়া সে বলিল, "ব্যস্, ঢের হাওয়া খাওয়া হয়েছে, এইবার থাম দেখি।" বাঁদিকের ফুটপাথ ঘেঁষিয়া গাড়ী দাঁড়াইলে গদির কাপড়ে আঙুলটিকে মুছিয়া লইয়া সে নামিয়া পড়িল, কহিল, "কেমন ভাল চালাতে শিখেছ তাই দেখাচ্ছিলে? তা বেশ, কত ভাড়া উঠেছে?"

দেখা গেল, দুই টাকা ছয় আনা ভাড়া উঠিয়াছে। মুগার পাঞ্জাবীর পকেট হইতে রংকরা চামড়ার মনিব্যাগটি সে সন্তর্পণে বাহির করিল। অজন্তার গুহাচিত্রের ধরণে সুকুমার করপল্লবের ভঙ্গি করিয়া তাহাতে অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী প্রবেশ করাইয়া সে অর্থের সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু হায় অনর্থ, দেখা গেল, মনিব্যাগে মাত্র একটি টাকা, পাঁচটি পয়সা, একটি চুলের কাঁটা এবং কয়েকটি শুকনো ফুলের পাপ্‌ড়ি মাত্র আছে। হাসির আপ্যায়নে মুখ ভরিয়া কহিল, "তাই ত হে একেবারে এতটা উঠবে আশা করিনি। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে একটাকা পাঁচ পয়সা হচ্ছে, লাগে?"

ট্যাক্সিওয়ালা একটু নড়িয়া বসিয়া পকেটে হাত দিয়া কহিল, তাহার কাছে দশ টাকার নোটের ভাঙানি হইবে।

বিমান কহিল, "তা কি আমি বলেছি, হবে না? আমার কাছে নোট আর ভাঙানি মিলিয়ে একটাকা পাঁচ পয়সাই কেবল আছে। আমি ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি, যখন হোক আমার বাড়ী এসে টাকা নিয়ে যেও।"

ট্যাক্সিওয়ালা ব্যাপার বুঝিয়া পঞ্জাবী ভাষায় লঘুগুরু যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া বক্তৃতা সুরু করিল। বিমান পঞ্জাবী ভাষা বুঝিত না, কিন্তু ইহা বুঝিল, কেবল বক্তৃতাতে ব্যাপারটা শেষ হইবে না, বাকী এক টাকা সওয়া পাঁচ আনার প্রত্যেকটি পয়সাও হিসাব করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। বাড়ীর ঠিকানা দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু বেশ জানিত, বাড়ীতে একটি পয়সাও তাহার আর নাই। ছাড়া পাঞ্জাবীর পকেটে একটা মেকি বোবা টাকা কিছুদিন যাবৎ পড়িয়া আছে বটে, রোজ দুইবার করিয়া সেটাকে চালাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া সম্প্রতি সে একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং অগত্যা আবার সেই ট্যাক্সি লইয়াই সে প্রদর্শনীর বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় সোজা পথে আসিল, ভাড়া বাড়িয়া কিছু কম চারটাকা হইল। ট্যাক্সিওয়ালাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সিঁড়ি উঠিতেছিল, কিন্তু সে ভরসা করিয়া বিমানকে চোখের আড়াল করিতে পারিল না, সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি উঠিল এবং দোতলার দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মেজেতে আগাগোড়া চিত্রিত মাদুর বিছান একটি বড় হল ঘর। বিলাতির সঙ্গে ভারতীয় পদ্ধতি মিলাইয়া তৈরি কতকগুলি চৌকি এবং সেট্টি ইতস্ততঃ ছড়ান। সেই ধরণেরই গুটিকয়েক টেবিল আর্ট-সম্বন্ধীয় নানা বিলাতি বই এবং দেশী ও বিলাতি ছবির এলবামে ভারাক্রান্ত, পাটিমোড়া দেয়ালে বিলম্বিত ছোট-বড়-মাঝারি অসংখ্য ছবি, তাহাদের পরস্পর-সংস্থানে কোনও সঙ্গতি নাই। নানা বিচ্ছিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বসিয়া বিমানের বন্ধু চিত্রকরের দল জটলা এবং কোলাহল করিতেছিল, বাহিরের লোক যাহারা তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিঃশব্দে ছবি দেখিতে ব্যস্ত। বন্ধুদের একজনকে একটু আড়ালে ডাকিয়া বিমান কহিল, "এই, তোর কাছে পাঁচটা টাকা থাকে ত দে ত, ট্যাক্সি

ভাড়া দিতে পারছি না।" বিমানের বন্ধুমহলে এ ধরণের বিপদ্ অনেকেরই কখনও না কখনও ঘটিয়াছে, পাঁচটা টাকা সে সহজেই পাইল। ডানদিকের পকেটে টাকা-কয়টা গুঁজিয়া সে তখনই বাহির হইয়া গেল না। দূরে কয়েকজন বন্ধু গোল হইয়া বসিয়া সে-বৎসরের Photograms-এর পাতা উল্টাইতেছিল, তাহাদের একজনকে জোর করিয়া টানিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া বলিল, "এই, পাঁচটা টাকা থাকে ত দে শীগ্‌গির, ট্যাক্সি ভাড়া দিতে পারছি না" বন্ধু একবার দরজার বাহিরে তাকাইয়া ট্যাক্সিওয়ালার দাড়ি আর পাগ্‌ড়ির বহর দেখিয়া লইল, বলিল, "আমার কাছে তিনটে টাকা আছে দিচ্ছি, বাকীটা আর কারও কাছ থেকে চেয়ে নাও বাপু।" টাকা তিনটা তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া দিয়া সে আবার Photograms-এর ছবি দেখিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিমানের সাহস বাড়িয়া চলিতেছিল, তাহার এক বন্ধু সুজিত এক কোণে একটা সেটিতে আধ-শোয়া হইয়া বসিয়া পরম তৃপ্তির সঙ্গে মুখ হইতে বলয়াকারে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতেছিল, আচম্‌কা তাহাকে ঠেলিয়া বসাইয়া দিয়া তাহার পাশ ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিল, "ওরে, ভয়ানক বিপদে পড়েছি, ট্যাক্সির ভাড়া দিতে পারছি না, পাঁচটা টাকা দে ত শীগ্‌গির।"

হাত হইতে সিগারেটটা পড়িয়া গিয়াছিল, হেঁট হইয়া সেটাকে কুড়াইয়া ঠোঁটের এক কোণে গুঁজিয়া সঙ্কীর্ণতর স্থানটুকুতে যতটা সম্ভব আয়েস করিয়া বসিয়া সুজিত বলিল, "ট্যাক্সিতে আর কে আছে?"

"কেউ না, কে আবার থাক্‌বে?"

"আহা, ন্যাকা!"

"সত্যি বল্‌ছি, কেউ নেই। চল্ না-হয় দেখ্‌বি।"

"কোথায় তাহলে আছে?"

"কোথায় কে আবার থাক্‌বে? সত্যিই বল্‌ছি সে-সব কিছু না।"

"বেশ, না বল্‌তে চাও ব'লো না, টাকাও পাবে না তাহলে।'

"আঃ, কি পাগলাম কর্‌ছিস? কিছু বল্‌বার মত থাকলে ঠিকই বল্‌তাম, দে পাঁচটা টাকা।"

সুজিত বড় বড় চোখ-দুইটাকে পাকাইয়া বিমানের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "আরে ক্ষেপেছিস, কোথায় পাব টাকা? এইমাত্র নীরেনের কাছ থেকে একটা টাকা ধার ক'রে নীচে থেকে চা খেয়ে এসেছি।"

বিমান তাহার দিকে আর দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া উঠিয়া পড়িল। আরও দু-একজায়গায় ব্যর্থকাম হইয়া সর্বশেষে নীরেনকে পাকড়াইয়াই আরও চারটা টাকা সে পাইল। নীরেন বলিল, "আচ্ছা নাও, কিন্তু সাতাশ টাকা হ'ল, মনে থাকে যেন। Next ছবি বিক্রী হ'লে একসঙ্গে সবটা দিয়ে দিও।"

"সে আর বল্‌তে," বলিয়া বারোটা টাকা পকেটে করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া সে ট্যাক্সি ভাড়া চুকাইল। তারপর পকেটে হাত ঢুকাইয়া বাকী টাকাগুলি একবার গুনিয়া লইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং শিস দিতে দিতে পথ চলিতে লাগিল।

ম্যাডান থিয়েটারের কাছাকাছি আসিয়া দেখিল, "Ben Hur" দেখান হইতেছে। হাত দিয়া বুকের উপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকিয়া মনে মনে কহিল, 'বাবাঃ, মথি-লিখিত সুসমাচার। ও আমার পোষাবে না।' ফিরিয়া পিকচার প্যালেসের কাছে আসিল, দেখিল, বাহিরে বিরাট পোষ্টারে জন গিলবার্টের বাহুবন্ধনে ধরা পড়িয়া গ্রেটা গার্বো এলাইয়া পড়িতেছেন। কিছুক্ষণ ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে স্তিমিত নেত্রে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ছবিটিকে সে দেখিল, অগ্রসর হইয়া গিয়া পিতলের ফ্রেমে আঁটা still-গুলির উপরেও একবার চোখ বুলাইয়া লইল, তারপর আরও কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিয়া নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, 'দুত্তোর, শুধু শুধু কতগুলি ছবি দে'খে কি হবে? ক্রমগত ছবি এঁকে এঁকে আর ছবি দে'খে দে'খে হাড়ে ঘুণ ধ'রে গেছে বাবা, জলজ্যান্ত কিছু যে পৃথিবীতে আছে তাই প্রায় ভুলে যাবার জোগাড়। কিন্তু কোথায়ই বা যাই?...দেখি ভেবে।' একটা ইংরেজী গান প্রায়ই গাহিত, তাহার সুরটা গুনগুন করিয়া আওড়াইতে আওড়াইতে চলিল,

"I try to be good, but the girls won't let me,

I ain't trying any more ..."

ধর্ম্মতলা দিয়া এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া চলিতে চলিতে আবার একবার নিজের মনে সে বলিয়া উঠিল, 'বাবা, কি dreary ! কে বল্‌বে এদেশে মেয়ে ব'লে একটা জাত আছে ? যত রাজ্যের কেরাণী, কলেজের ছোকরা, কুলী-মজুর আর ভিখিরী। আর কি-সব চেহারা, কি-সব পোষাক, তার ওপর চল্‌ছে না গড়াচ্ছে বোঝবার জো নেই। এর জন্যে এত হ্যাঙ্গাম করে এত সুন্দর পথঘাট, পথের পাশে শিরীষ আর কৃষ্ণচূড়া, একটু দূরে দূরে ফুলের কেয়ারী করা পার্ক, স্কোয়ার, দরকার কি ছিল বাপু ?' ফিরিয়া চৌরঙ্গীর দিকে চলিল, ভাবিল, সেদিক্‌টায় অন্ততঃ দু-একজন সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখিয়া পীড়িত চোখ-দুইটাকে স্নিগ্ধ করিয়া লইতে পারিবে। মোড়ের কাছে বোম্বাইয়ের সত্যাগ্রহের খবর ফিরি হইতেছিল, একজন ফিরিওয়ালার কাছ হইতে একটা কাগজ চাহিয়া তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া সেটাকে আবার বিনা বাক্য-ব্যয়ে সে ফিরাইয়া দিল, তারপর ফিরিয়া পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, 'ইংরেজের রাজত্ব আর বেশীদিন নয় তা বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে, পৃথিবীতে কোন্ জিনিষটাই বা চিরস্থায়ী হয় ? কিন্তু আমি ভাব্‌ছি, ওরা যখন যাবে, ওদের স্ত্রীকন্যাদের কিছু আর ফে'লে রেখে যাবে না। আর যা ঘটবার ঘটুক, কলকাতার রাস্তায় তখন বেড়িয়ে আর সুখ থাক্‌বে না, সেটা মান্‌তে হবে।'

দীপালোকিত একটা হোটেলের সম্মুখে আসিয়া গতিবেগ মন্দা করিয়া দিল। ভাবিল, 'ঢুকব কি ? রাতও ত হয়ে এল, বেশ একটু ঠাণ্ডাও প'ড়ে গিয়েছে। কালেভদ্রে ওরকম একটু-আধটুতে আর্টিষ্ট মানুষের দোষ নেই, বিশেষ ক'রে এই হতভাগা দেশে। মাঝে মাঝে চারপাশটাকে একটু ভুলে থাক্‌তে না পেলে লোকে ছবি আঁক্‌তে পার্‌বে কেন ? সাধে কি আজকালকার আর্টিষ্ট ছোকরারা কেবল শিব আঁকে, এইজন্যেই আঁকে, কি আর আঁকবার আছে ? আমি আর সব অপকর্ম্ম করেছি, শিব আজ অবধি আঁকিনি, তাঁর অনুচরেরা আমার ওপর সদয় থাকুক, আর আঁকবও না।' বাড়ীতে সুভদ্র আছে বটে, তা তাহাকে বিশেষ ভয় নাই, সে ত জানেই। মাঝে মাঝে বিমানের লিভারটাতে সে কষিয়া টিপুনি দেয়, তখন অবশ্য বেধায় লাগে, বাকী সময়টা নিজের নানা খামখেয়াল লইয়াই তাহার কাটে। ভয় অজয়কে। সুভদ্র এবার দেশ হইতে ফিরিবার সময় তাহাকে সঙ্গে জুটাইয়া লইয়া আসিয়াছে। বলে, 'তিনের মাহাত্ম্য ত জান, তুমি আর আমি একেবারে দুই আলাদা আকাশের দুই গ্রহ, পরস্পরের কাছে নেই বল্‌লেই চলে। মাঝে মাঝে এক-আধটা ধূমকেতুর আবির্ভাব হ'লে অন্ততঃ ঠোকর খাওয়ার ভয়েও পরস্পর সম্বন্ধে আর একটু সচেতন হয়ে চল্‌ব।' অজয় ছোক্‌রা লোক কিছু মন্দ নয়, দুদিনেই এমন করিয়া নিজেকে মানাইয়া লইয়াছে যেন চিরজন্ম তাহাদের এই বাড়ীটাতেই সে থাকিত; বরং ভালর দিকেই তাহার বাড়াবাড়ি। এমন সুন্দর পরিষ্কার গলা, কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীত ছাড়া কিছু গায় না। অবশ্য জানিতে পারিলেও সে কিছুই বলিবে না, কিন্তু এমন মুখের চেহারা করিবে যেন ভূতপ্রেত জাতীয় কিছু একটা দেখিতেছে। তা তাহার মুখের চেহারা যেমনই হউক, মুখ ফুটিয়া যতক্ষণ কিছু সে না বলিতেছে ততক্ষণ বিমানের কিছুই আসিয়া যাইবে না। তাহার মুখের দিকে না চাহিলেই চলিবে। টাকা-কয়টা ইত্যবসরে কেহ পকেট মারিয়া লইল কি-না একবার দেখিয়া লইয়া সে হোটেলে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় পথের উজ্জ্বল দীপালোকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া দেখিল, যেন সত্যই ভূত দেখিয়াছে এমনই মুখ করিয়া অজয় দ্রুতপদে তাহারই দিকে আসিতেছে। ও-রকম ভয়ব্যাকুল মুখের চেহারা কাহারও দেখিলে নিতান্তই না চাহিয়া থাকিতে পারা যায় না, বিমান ছড়িতে ভর দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অজয় সত্যই ভয় পাইয়াছিল। কেন ভয় এবং কাহাকে ভয় বুঝাইতে হইলে সকাল হইতে সুরু করিয়া সমস্ত দিনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হয়।

আজ ছয় দিন হইল অজয় কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু যেদিনকার কথা হইতেছে সেদিনও ভোরে ঘুম ভাঙিয়া কিছুক্ষণ সে মনে আনিতে পারিল না সে কোথায়

রহিয়াছে। এবারে কলিকাতায় ফিরিয়া অবধি এই-রকম হইতেছে, ঘুম-জড়ানো চোখে চাহিয়া চারিদিক্‌টাকে অদ্ভুত অপরিচিত বলিয়া মনে হয়, তারপর ক্রমে ক্রমে সেই অপরিচয়ের যবনিকা স্বচ্ছ হইয়া আসিতে থাকে।

আজও সকালের আলোয় বিছানায় পড়িয়া-পড়িয়া বেশ কিছুক্ষণ মনের মধ্যেকার একটা ঘনান্ধকার কুজ্ঝটিকার সঙ্গে তাহাকে লড়িতে হইয়াছে। ক্রমে কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে, প্রভাতসূর্য্য তাহার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পথে জ্যোতিঃশিখা বিকীর্ণ করিয়া তাহার সমস্ত চৈতন্য ভরিয়া ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। ঐ তাহার পায়ের দিকে একসারে সুভদ্রের তিনটি বুক্-কেস্। সুভদ্র ইংরেজীতে এম-এ পড়ে, একটিতে সেই সম্পর্কিত নানা পাঠ্য কেতাব, কতক তাহার নিজের, কতক কলেজ এবং অন্যত্র হইতে ধার করা। মাঝের বুক্-কেস্‌টির খোলা তাকগুলিতে নানা দেশের উপন্যাস, কাব্যসাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক প্রাচীন এবং আধুনিক, সারবান্ এবং অসার, এলোমেলো কেতাবের রাশি। জানালার দিকে লিখিবার ডেস্কটার ঠিক পাশেই যে বুক্-কেস্, সেইটির সঙ্গেই সুভদ্রের নিত্যকার ঘনিষ্ঠতম কারবার, সেইটির উপরকার তিনটি তাক ভরিয়া আয়ুর্ব্বেদ, হোমিওপ্যাথি, দেশীয় টোট্‌কা, Christian Science, বাইওকেমী, Psycho-analysis, প্রভৃতি সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ। নীচের দুইটি তাকে পুঁটুলি বাঁধা দেশীয় নানা গাছগাছড়া, শিশিবোতল, জার, তৌলযন্ত্র প্রভৃতি। দরজার বিপরীত দিক্‌কার দেয়ালে বিমানের আঁকা একটিমাত্র ওয়াটার-কালার ছবি, একটি বিকশিত শুভ্র পদ্মের বক্ষলগ্ন একটা কালো কুৎসিত বক্রদেহ ভ্রমর। সুভদ্র এতদিন এই ঘরটিকে নিজের ষ্টাডি হিসাবে ব্যবহার করিত, যদি অজয় শেষ অবধি থাকিয়া যাওয়াই স্থির করে তাহা হইলে এইটাই হইবে তাহার শয়নকক্ষ, সুভদ্র তাহার জিনিষপত্র কতক পাশেই তাহার শুইবার ঘরে সরাইয়া লইবে, এবং দোতলার বারান্দার একটা দিক্ পার্টিশন দিয়া আড়াল করিয়া নিজের সখের ডিস্‌পেন্‌সারীর স্থান করিয়া লইবে।

অজয় কিছুই স্থির করে নাই। সুভদ্র রোজ দুইবেলা তাহাকে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করে, প্রতিবারেই অজয় জোরের সঙ্গে আপত্তি জানায়, কিন্তু চলিয়া যাইতেও যে তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ আছে তাহারও কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। আজ কলেজ খুলিবে; অজয় জানে, বৌবাজারে যে-মেস্‌টাতে সে এত বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছে সেখানকার প্রত্যেকটি অধিবাসী আজ সেখানে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু মেসের ম্যানেজারকে একটা পোষ্টকার্ড্ লিখিয়াও সে জানায় নাই যে সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে।

আরও অনেক-কিছুই তাহার করা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু সে করে নাই। নিরাপদে পৌঁছিয়াছে, এ সংবাদ দিয়া দেশে বৃদ্ধ পিতাকে একটা চিঠি লেখে নাই। অথচ পৃথিবীতে এক পিতা ভিন্ন তাহার আত্মীয় বলিতে আর কেহ ছিলও না। ছেলেবেলায় তাহার দিদিমা তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, দৌহিত্রকে তিনি সেই শৈশবেই বেশ চিনিতে পারিয়াছিলেন, বলিতেন, অজয়ের স্বভাবে মায়ামমতা বলিয়া কোনও জিনিষের অস্তিত্বই নাই, যখন যে দুধের বোতল হাতে করিয়া তাহার কাছে আসে তখনকার মত সে-ই তাহার পরমাত্মীয়। বড় হইয়াও সেই স্বভাবের তাহার বিশেষ-কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই, কাহার নিকট হইতে কি জিনিষ কতখানি পাইতেছে তাহাই দিয়া এখনও সে পৃথিবীর বিচার করে, কাহাকে অন্তরের মধ্যে লইবে এবং কাহাকে লইবে না তাহা স্থির করে। পিতা তাহার আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও তাহার বিলাত যাইবার ব্যয় বহন করিতে সম্মত হন নাই, এজন্য তাঁহার প্রতি তাহার মন যে প্রসন্ন ছিল না তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহাকে চিঠি না লিখিবার তাহা অপেক্ষাও গভীরতর কারণ এবারে বিদ্যমান্ ছিল।

কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য সমস্ত-রকম কাজেই এবারে তাহার কি এক মর্ম্মান্তিক নিরুৎসাহ দেখা দিয়াছে।

সেদিন প্রভাতে শিয়ালদহে ইহার সুরু। দুরুদুরু কম্পিত বক্ষের গোপনতায় যে সুন্দর কামনাকে সযত্নে পোষণ করিয়া ট্রেনে সে রাত্রিযাপন করিয়াছিল, প্রভাতের আলোকে তাহার দিকে চাহিতে শুধু তাহার ইচ্ছা করিল

না। পূর্ব্বরাত্রির অবমাননার স্মৃতি অনায়াসে রাত্রিতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া সেখানে সে সুখ-কল্পনার স্থান করিয়াছিল, কিন্তু একটা গালে অস্বস্তিভরা মৃদু ব্যথা লইয়া ভোরে ঘুম ভাঙিল। মনে হইল, কল্যকার নিগ্রহের ইতিহাস যেন তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া লিপ্ত হইয়া আছে। নিজেকে লইয়া পলাইতে পারিলে তখন সে বাঁচে।

পলাইতেছিল, কিন্তু সুভদ্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কহিল, "এবেলাটা আমার বাড়ীতে এসে ত ওঠ, তারপর কি কর্‌বে সে তখন দেখা যাবে।"

অজয় যথারীতি আপত্তি তুলিয়াছিল, কিন্তু সুভদ্র কিছুতেই শুনিল না, তাহাদের বাড়ী হইতে চলিয়া আসার প্রসঙ্গ তুলিয়া কহিল, "তুমি কি আশা কর যে এর পরেও তোমার আপত্তি শুনে আমি ভুল্‌ব ? নিজের মনকে নিজে জান না, এ-পরিচয় একবার যখন পাওয়া গেছে তখন এর পর থেকে তোমার সত্যিকারের মনের কথা যে কি তা ঠিক কর্‌বার ভার আমার। এস তুমি আমার সঙ্গে।"

কিন্তু সেই যে নিজেকে লইয়া পলাইতে গিয়া সে বাধা পাইয়াছে, তাহার পর ক্রমাগত নিজের কাছ হইতে সে পলাইতেছে। দেনা-পাওনার হিসাবকে সর্ব্বত্র বড় করিত, সহসা শঙ্কিতচিত্তে সে অনুভব করিল, নিজেকে যেমন করিয়া এতদিন সে গড়িয়াছে তাহাতে নিজের নিকট হইতে বিশেষ-কিছু তাহার আশা করিবার নাই। আপনার সেই নিদারুণ নিঃস্ব ছোঁড়াটার দিক্ হইতে এই কয়দিন তাই সে জোর করিয়া চোখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

আজ কলেজ খুলিবে, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া যাহা হউক একটা আজ না করিয়া উপায় নাই।

আশৈশব অকারণেই সে বিশ্বাস করিত যে সে নিতান্ত তাহার নিজেরই মত করিয়া পৃথিবীকে কিছু দিয়া যাইবে। কোন্ সূত্র ধরিয়া কি যে করিবে, কোন্ পথে সার্থকতার সিংহদ্বারে উত্তীর্ণ হইবে, এ চিন্তার তখন প্রয়োজন ছিল না। অনির্দ্দিষ্টের আশায় বুক বাঁধা তখন সহজ ছিল। চারিদিকে সময়ের প্রসারহে অনির্দ্দেশ্যতা হেতুই তখন অসীম মনে হইত এবং তাহার মধ্যে যে-কোনও অসম্ভব-সম্ভাবনার অতি অনায়াসেই স্থান হইয়া যাইত। তাহা ছাড়া চিরকাল সুনির্দ্দিষ্ট বস্তুমাত্রকেই তাহার অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অকামযোগ্য মনে হইত, তাই কতকটা ইচ্ছা করিয়াও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণাকে এতদিন সে মনে স্থান দেয় নাই। কিন্তু আজ চতুষ্পার্শ্বে সম্ভাবনার পরিসর অত্যন্ত ছোট হইয়া দেখা দিয়াছে, এবারে আর অনির্দ্দেশ্যকে লইয়া দিনাতিপাত করা চলিবে না। জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্থ যাহা তাহা একটি মানবীর রূপ ধরিয়া অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে, কোনও অস্পষ্টতার কুহেলিকায় তাহাকে আবৃত করা যাইবে না। কিন্তু নিজেকে তাহার কাছে লইয়া যাইবার আগে কৃতার্থতার যে-কোনও একটা আচ্ছাদনের প্রয়োজন আছে, সম্ভাবনার আশার সাহসের জ্যোতিঃ যতই অসীমতার অন্তরের জিনিষ হউক তাহাতে তাহার নিঃস্বতা একটুও ঢাকা পড়িবে না। সময়ের পরিসরও এবার সঙ্কীর্ণ, কেন-না, মন আর তাহার যথেচ্ছ-বিস্তারকে মানিতেছে না। যাহা চাই অবিলম্বে চাই এবং কি যে চাই সে-বিষয়েও আর কোনও সংশয় থাকিলে চলিবে না।

তাহার জীবনের সমস্ত সমস্যা আজ একটি স্রোত অবলম্বন করিয়া তাহার সমস্ত চৈতন্যকে প্লাবিত বিপর্য্যস্ত করিয়া বহিয়া আসিয়াছে, বেহিসাবী বাজে খরচ করিবার সময় নহে। শেষ অবধি সেদিন কলেজে সে আর গেল না। কোনও প্রকারে সুভদ্রের পাহারা এড়াইয়া মনভরা নিদারুণ শূন্যতা লইয়া নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে পথে বাহির হইয়া পড়িল। স্থির করিল, ময়দানের জনবিরল অংশগুলি বাছিয়া যথেচ্ছ-বিহারে সমস্তদিন নিজেকে লইয়া বেড়াইয়া একেবারে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসিবে।

ভোর হইতেই আকাশময় স্বর্ণস্রোত বহিতেছিল, মেঘগুলি তাহাতে সাঁতার কাটিয়া অবগাহন করিয়া ক্লান্তি মানিতেছিল না। অজয় যখন পথে বাহির হইল তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, কিন্তু এমন একটি স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছিল যাহার মধ্যে নীলাকাশের অতল গভীরতার

বিশেষ একটি স্পর্শ আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অজয়ের আজ এ-সমস্ত লক্ষ্য করিবার অবকাশ ছিল না। সমস্তদিক্ হইতে চিত্তগতিকে নিবৃত্ত করিয়া সে একমাত্র নিজেরই মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিল।

সে কি চায় তাহা জানে না, যাহা-কিছু করিবার আছে তাহা করিবার মত নয়, যাহা হওয়া সম্ভব তাহা হইয়া নিজের মনুষ্যত্বকে অপমান করিতে সে চায় না। সমস্ত দিক্‌কার অসংখ্য অপরিণতি, অভাব, অক্ষমতা যেন সপ্তরথীর মত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া তাহাকে আজ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার এই দেহ, এই অসুস্থ অপরিণত শরীর লইয়া কোন্ দুঃসাহসিক সংগ্রামে সে প্রবৃত্ত হইবে? যে শিক্ষা এতদিন ধরিয়া এত প্রাণান্ত প্রয়াস এবং অর্থব্যয়ের বিনিময়ে সে লাভ করিয়াছে, তাহা পৃথিবীতে কাহার কোন্ কাজে আজ লাগিবে? প্রথমেই এই অবস্থার জন্য তাহার পিতাকে সে দায়ী করিল, কিন্তু একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিল, দায়ী সত্যই তিনি নন। সুভদ্র দৃষ্টান্ত, তাহার টাকার অভাব নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইউরোপে সে যাইবে না, গিয়া কি করিবে? সে পড়িতেছে ইংরেজীতে এম-এ, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি হইয়া অবধি কায়মনোবাক্যে সে চিকিৎসক। তাহার সেদিক্‌কার শিক্ষার পরিণতিতে বিদেশে গিয়া তাহার কিছুমাত্র সাহায্য হইবে না, অন্ততঃ সহজে হইবে না। সুতরাং পিতার মন এবং আর দশজনের কাছে নিজের মান রাখিবার জন্য ইংরেজীর ক্লাস সে করিয়া চলিয়াছে, যদিও সারাক্ষণ তাহার মন পড়িয়া আছে তাহার পড়িবার ঘরে ডাক্তারী বইয়ে বোঝাই আলমারীটার মধ্যে।

অজয় এম-এ পড়ে ইতিহাসে, বিদেশে গিয়াই বা সে কি শিখিবে? ফিরিয়া আসিয়া তাহারই মত আরও কয়েকটি অপদার্থ তৈয়ারী করা ছাড়া আর কোন্ কাজে সে লাগিবে? সাময়িক পত্রে মাঝেমাঝে সে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া থাকে বটে, কিন্তু সেদিকেও কোনও প্রতিষ্ঠা অর্জন করা তাহার অদৃষ্টে আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার এই প্রবন্ধগুলি প্রশংসা যত না লাভ করিয়াছে, উপহসিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী। তাহার মধ্যে গবেষণা-বৃত্তির অভাব। ইতিহাস তাহার ভাল লাগে না তাহা নহে, কিন্তু টুকরা টুকরা তথ্যের সঙ্গে তথ্য জুড়িয়া সে ক্লান্ত হয়। একটুখানি মশলা হইতে চট্‌পট্ অনেকখানিকে গড়িয়া লইতে পারিলে সে তৃপ্তি বোধ করে। সাংসারিক বিচারে ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা অতিবড় মারাত্মক দোষ।

ট্রামে বালিগঞ্জ অবধি গিয়াছিল, সমস্তদিন অনাহারে গুরুভার শূন্যতা মনে বহিয়া পদব্রজে নগরোপকণ্ঠের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া যখন ফিরিয়া ট্রামে উঠিল, তখন আর চিন্তা করিবার ক্ষমতাই তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পথের ধারে ধারে দীঘির জলে আকাশের ছায়া পড়িয়াছে, বাতাসে ছোট ছোট তরঙ্গ উঠিয়া সূর্য্যের আলোয় কাঁপিতেছে, তীরের কাছাকাছি দু-একটি জলজ লতাপাতা এবং ফুলকে ঘিরিয়া নীলজল ধ্যানস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এমন সময় দূরস্বপ্নের স্মৃতির মত কোন্ অজানা ফুলের অস্ফুট সৌরভ নিজের সর্ব্বাঙ্গে বহন করিয়া একটি তরুণী শ্বেতাঙ্গিনী লীলামন্থর গতিতে অজয়ের পাশে আসিয়া উপবেশন করিল। যে বিপুল অবসাদের নাগপাশ অজয়ের মনকে এতক্ষণ ধরিয়া শতপাকে জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিয়াছিল, এই একটু সৌরভ, দুইটি নীলাভ নয়নের চকিত দৃষ্টি, একটি অপরূপ দেহভঙ্গীর তরঙ্গের আঘাতে তাহা নিমেষে শিথিল হইয়া গেল। অজয় দেখিল, শরতের আকাশের মত নির্ম্মল নীলবাস তরুণীর দেহলাবণ্যকে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিতেছে, তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া একটি মরকতমালা শুভ্র মেঘমালার মত দীপ্তি পাইতেছে, ঘননীল শিরোভূষার একদিক্ তাহার মুখের একটি দিককে আড়াল করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, যে দু-একটি চূর্ণকুন্তল অসংবৃত হইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাও শরতের শস্যক্ষেত্রকেই মনে পড়াইয়া দেয়। অজয়কে মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, শরতের এমন পরিপূর্ণ রূপ কোনও মানবীর মধ্যে ইতিপূর্ব্বে সে দেখে নাই। পথে চলিতে চকিতের মত যাহাদের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে, তাহাদের কাহারও মধ্যে বর্ষার ধ্যানগম্ভীর স্নিগ্ধতা, কাহারও মধ্যে বসন্তের

নীলা-উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য-হিল্লোল, কাহারও সৌন্দর্য্যকে ঘিরিয়া হেমন্তের রহস্য-কুঝাটিকা, শীতরাত্রির শুভ্র জ্যোৎস্নার মত কাহারও কাহারও রূপকে সে ভাবিতে পারিল। কিন্তু এ যেন শরতের জ্যোতিঃপ্লাবিত পরিপূর্ণ একটি দিবস, ইহার সৌন্দর্য্য অকুণ্ঠিত কিন্তু সংযত, সবৃত কিন্তু স্বপ্রকাশ, উজ্জ্বল কিন্তু জ্বালাহীন। তরুণী যখন প্রজাপতির মত রঙীন ছাতার ডানা মেলিয়া জনস্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়া গেল, তাহার সুকুমার দেহটিতে গতিচ্ছন্দের লীলায়িত তরঙ্গ উঠিল, তাহার নীলিম পরিচ্ছদে, নীবিবন্ধে, সুডৌল পা-দুখানির উজ্জ্বল স্বচ্ছ আবরণে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আলো লুটাইয়া পড়িয়া হাসিয়া উঠিল তখন অজয়ের মনে হইল, এ যেন সত্যই সৌন্দর্য্যের একটি স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নহে, কোন্ গোপন উৎসবের উন্মাদনায় নিখিল চিত্তফলকে মুহূর্ত্তে মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে, আবার মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া যাইবে। ইহাকে ইচ্ছামত দুই চোখ ভরিয়া দেখা যায়, ইহার বচনামৃত দুই কান ভরিয়া পান করা যায়, ইহার পশ্চাতে অন্তরের গহনতম বাসনাকে ধূলিকর্দ্দমে লুণ্ঠিত করিয়া ফেলা যায়, তাহাতে পৃথিবীর কাহারও কিছু মনে করিবার থাকে না।

হঠাৎ এই মাধুর্য্যের অবলম্বন ধরিয়া তাহার প্রবাস-পথের যাত্রাসঙ্গিনী সেই কবরীভারপীড়িতা অপরিচিতা অষ্টাদশীর মুখখানির বেশ স্পষ্ট একটি আভাস যেন এক পলকের মত তাহার স্মৃতিতে ধরা পড়িল, পরক্ষণেই সেই অস্ফুটতাকে জোর করিয়া ধরিতে গিয়া কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না, যেন জলের বুকের প্রতিবিম্ব অস্থির করস্পর্শে শতটুকরা হইয়া ভাঙিয়া গেল। শরতের আসন্ন সন্ধ্যা তখন দিগন্তে স্বর্ণস্রোত ঢালিয়া দিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যে বর্ণের তীব্রতা নাই, মৃদু কুয়াসায় চতুর্দ্দিক্ অত্যন্ত স্নিগ্ধ-কোমল রূপ ধারণ করিয়াছে। ময়দানের পরপারে আকাশের দূরান্তে চাহিয়া প্রায়-অপরিচিত এক-পলকের দেখা একখানি প্রিয়মুখকে এক মুহূর্ত্ত দেখিতে না পাওয়ার বেদনায় এ-সমস্তই অজয়ের কাছে অত্যন্ত বিস্বাদ লাগিল।

এস্প্লানেডে নামিয়া তখনই বাড়ী ফিরিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। ময়দানের দিকে চলিতে চলিতে সে ভাবিতে লাগিল, যদি তাহার নামটি জানা থাকিত জপ করিয়া আনন্দ পাইত।

কলিকাতায় আসিয়া অবধি সুভদ্রকে একদিনও মেয়েটির কথা সে জিজ্ঞাসা করে নাই। ষ্টীমারে সুভদ্র তরুণীর আহ্বানে অগ্রসর হইয়া গিয়া তারপর কি করিল, তরুণীর সঙ্গে কি তাহার কথা হইল, তরুণীর পরিচয় কোনও উপায়ে সে পাইল কি-না এ-সমস্ত কথা জানিবার আগ্রহ যতই তাহার বেশী হইতেছিল ততই বেশী জোরের সঙ্গে নিজেকে সে দমন করিতেছিল। কে জানে যে-বস্তু অজয়ের কাছে বহুমূল্য, হয়ত সুভদ্রের মনের কাছে তাহা একেবারেই মূল্যহীন। প্রশ্ন করিয়া সুভদ্রকে সে কৌতূহলী করিবে মাত্র। সকলের দৃষ্টির অন্তরালে একটি মানুষকে ধরিতে এবং কেবলমাত্র একটি মানুষের কাছে নিজেকে সে ধরা দিতে চায়। তাহা ছাড়া সে যদিও তাহার অন্তরতম মনে নিজেকে সেই তরুণীর প্রণয়লাভের ঠিক অযোগ্য বিবেচনা করিতেছিল না, তবু তাহার গর্ব্বিত অন্তর ইহাই কামনা করিতেছিল যে, তাহার মধ্যেকার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে সে তাহার প্রিয়ার কাছে উপহার লইয়া যাইবে। সে যেমনভাবে তাহার আশাতীতকে পাইতে আশা করিতেছে, আশাতীতকেই পাইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে, তাহার মধ্যে তরুণীরও কোন আশাকে তেমনই সে অপূর্ণ থাকিতে দিবে না। সে চিরকাল সংগ্রাম করিয়া এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া আসিয়াছে, হৃদয়-বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোনও পরাজয়কে সে স্বীকার করিতে চাহিল না। তরুণী কি আশা করে তাহা সে জানিত না, তবু নিজের মধ্যেকার বহু অসম্পূর্ণতা, বহু অনভিপ্রেত, বহু অন্যায়ের সঙ্গে তাহার পরিচয় সুরু হইয়া গিয়াছে। ক্লান্ত মনকে কশাঘাতে সচেতন করিয়া সেই বেদনাময় পরিচয়ের পালা নূতন করিয়া সে আবার আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার ছায়া যখন বেশ নিবিড় হইয়া পৃথিবীর গায়ে লিপ্ত হইতেছে, দূরে নগরের কোলাহল কিছুমাত্র আর কানে আসে না, তরুশ্রেণীর অন্তরালে প্রান্তর-পথের শেষ আলোর চিহ্নটিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সেই

রহস্যগভীর অন্ধকারে নির্জন সন্ধ্যার স্তব্ধতা অকস্মাৎ তাহার কানে কানে কথা কহিল।

পরিচয় এবং অপরিচয়ের মধ্যেকার সীমারেখা কোনদিনই তাহার কাছে খুব স্পষ্ট ছিল না, আজ নিজের অতি-অন্তরঙ্গতায় দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া অকস্মাৎ নিজের কাছে নিজেকেই তাহার অত্যন্ত বিস্ময়কর রকমের অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল। এই ধরণের উপলব্ধি আজ তাহার নূতন নহে, কতদিন চতুর্দ্দিক্‌কার পরিচিত মানুষগুলির দৃষ্টিতে নিজের বিশেষ স্বরূপটি দেখিয়া লইয়া নিজের সঙ্গে পরিচয়ের যোগকে নূতন করিয়া সে স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন হইতেই পরিচয়ের আশ্রয় কাছাকাছি কোথাও কিছু তাহার ছিল না, তাই আজ মন হইতে আত্মোপলব্ধির অত্যন্ত আবরণগুলি একটির পর একটি নিরবলম্ব হইয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল।

অস্ফুট স্বরে নিজের নামটি কয়েকবার সে উচ্চারণ করিল, কিন্তু তাহাতে অপরিচয়ের ঘন যবনিকা একটুও নড়িল না। তাহার চতুর্ব্বিংশ বৎসরের জীবনের নিবিড়তম সুখদুঃখে ভরা ঘটনা-পর্য্যায়কে বারংবার নিজের মনের পটে স্মৃতির তুলি বুলাইয়া সে আঁকিয়া আঁকিয়া মুছিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে নিজেকে কোথাও আর অন্তরতম করিয়া সে অনুভব করিতে পারিল না। যেন এতকাল যে-জীবন সে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে তাহা তাহার নিজের জীবন নহে, যেন তাহার এই দেহ আশ্রয় করিয়া আর কোন্ অপরিচিত আত্মা এতকাল বাঁচিয়াছে। ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইল, কেমন করিয়া এমন অন্তরতম নিজেকে এতদিন সে মনে করিত। এই একটুখানি পঙ্গু চিন্তা, তীব্রতা-সহনকুণ্ঠ একটু সুখদুঃখের উপলব্ধি, বৃষ্টিধরা জলের মত অর্থহীন চঞ্চল এতটুকু এক-ফোঁটা চৈতন্যের স্বচ্ছতা, ইহাকেই অবলম্বন করিয়া সে অসীমতাকে লোভ করিয়াছিল, একদিকে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সমস্ত বিশ্ব এবং সেই বিশ্বের দেবতা অপরদিকে তাহার নিজেকে সে স্থাপন করিয়াছিল!

স্তব্ধতা তাহার সঙ্গে কথা কহিল, তাহার কর্ণে মর্ম্মান্তিক হইয়া এই প্রশ্ন বাজিল, "তুমি কে, তুমি কতদিনের, তুমি কতটুকু?" তাহার দেহ, তাহার ইন্দ্রিয়োপলব্ধি, তাহার স্মৃতিচিহ্নিত মন সেই প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোনও উত্তর দিতে পারিল না, স্তব্ধ হইয়া রহিল। তখন ভিতরের এবং বাহিরের সেই নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার অবকাশে নিজেরই মধ্যেকার এক অসীম অনির্দ্দেশ্যতার জ্যোতির্ম্ময় অন্ধকারে কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্কের মত যতিহীন প্রখর গতিতে সে ডুবিতে লাগিল।

সে ডুবিতে লাগিল, কিন্তু কিছু অনুভব করিল না, কেবল বুঝিল, দেহমনের প্রত্যেকটি অভ্যস্ত আত্মোপলব্ধি বহু পূর্ব্বেই সেই গভীরতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। নিমজ্জিত সর্ব্বস্বধনের সন্ধানে সর্ব্বহারার মত নিরুপায় হইয়াই যেন সে নিজেও প্রথমে ডুবিতে লাগিল। তারপর মজ্জমান্ ব্যক্তি যেমন করিয়া যাহা-কিছুকে হাতের কাছে পায় তাহাকেই প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়াইয়া ধরে, সেও তেমনই নিজেরই দেহের মধ্যে একটুখানি পরিচয়ের আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। হাত-দুইটিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কয়েকবার দেখিল, নখদর্পণে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত দেখা তাহার স্বভাব ছিল, সেইগুলির মধ্যে নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া সে নিজের সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু ফল কিছুই শুভ হইল না। বিবর্ত্তনের ধারাপর্য্যায়ের মধ্য দিয়া চাহিয়া সেগুলির মধ্যে কোন্ বিকট-দর্শন প্রাগৈতিহাসিক জীবের কুৎসিত থাবা-দুইটাকে দেখিল। কল্পনায় চিতার আগুনে সেগুলিকে গলিয়া গলিয়া পুড়িতে দেখিল। দেহমনইন্দ্রিয়ের সবটুকু আলোককে সে প্রাণপণে উস্কাইয়া ধরিয়াছিল, মৃত্যুকে মনে পড়িতেই সেই আলোতে যেন চিতানলের আভা লাগিয়া গেল। সবচেয়ে প্রিয়মানুষটি যেমন মৃত্যুতে আড়াল হইয়া মুহূর্ত্তে সবচেয়ে ভয়াবহ হইয়া উঠে, তাহারও তেমনই ইহার পর নিজের দিকে আর চাহিতে সুদ্ধ ভয়ভয় করিতে লাগিল। নিজের কাছ হইতে পলাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল, কিন্তু পলান সম্ভব নহে জানিয়াই ভয় বহুগুণ বেশী হইল।

তবু সে পলাইতে লাগিল। অন্ধকার প্রান্তর বাহিয়া, ঝোপঝাড় খানাখন্দ দ্রুতপদে অতিক্রম করিতে করিতে পড়িতে পড়িতে সে লোকালয়ের দিকে ছুটিল। স্তব্ধতা তাহার পশ্চাতে তাড়া করিল। কিন্তু তাহার অন্তরের

মধ্যেই কোন্ এক নিদারুণ অপরিচয়ের প্রেত-যোনিকে সে বহন করিতেছে, কোথায় পলাইয়া ইহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবে তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিল না, কিন্তু পলাইতে লাগিল।

বিমান কহিল, "কোন্‌দিকে চলেছ অজয়? কি হয়েছে তোমার?"

অজয় থমকিয়া থামিয়া নিজেরই অজ্ঞাতে একটা নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস লইল, কহিল, "কই, কিছু ত হয়নি।"

বিমান কহিল, "এমন করে ছুটছ যেন কেউ তোমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে।"

অজয় একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, "তাড়া কে আবার করবে?"

বিমান দুই চোখ বুলাইয়া ভাল করিয়া তাহাকে একবার দেখিয়া লইল, মনে মনে কহিল, 'উঁহু,এর অবস্থাটা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। একটু কবির ধাঁচের মানুষ, কোন্ ভাবের হাওয়া গায় লেগেছে কে জানে? জান্‌তে চেয়েও লাভ নেই কিছু।' মুখে কহিল, "আচ্ছা, যাও। তবে অত বেশী তাড়াতাড়ি ক'রো না। আর পায়ের নীচে থাকে ব'লেই পথটাকে এতবেশী অবজ্ঞা করা ঠিক নয়, মাঝে মাঝে একটু তাকিও, কখন্ হোঁচট খেয়ে পড়্‌বে।"

বিমান ছড়ি ঘুরাইয়া পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেই অজয় ত্রস্তে কহিল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

বিমান কহিল, "আমি? এই ভাব্‌ছি কোথায় যাওয়া যায়, ততক্ষণ একজায়গায় স্থির হয়ে থাকা চলে না ব'লে এম্‌নিই ঘুরে বেড়াচ্ছি একটু।"

অজয় তাড়াতাড়ি কহিল, "চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

বিমান যেন অন্যমনেই কহিল, "তুমিও যাবে?" ভাবিল, কি গেরো রে বাবা। একটু আগে যে গানের সুরটা আবৃত্তি করিতেছিল তাহারই একটা কলি আবার গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল,

"All those glad eyes peepin' everywhere…"

তারপর হঠাৎ কহিল, "আচ্ছা, তাই চল, তোমাকে এক জায়গায় বেড়িয়ে নিয়ে আস্‌ছি। সঙ্গে টাকাকড়ি আছে কিছু?"

টাকাকড়ির কথা বলিয়া বিমান যেন অজয়কে তাহার ভয়কল্পনার প্রেতলোক হইতে এক ঝটকায় একেবারে পরিচিত পৃথিবীর ধূলিমাটির উপর টানিয়া নামাইয়া দিল। বিমানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, কহিল, "কত টাকা?"

বিমান কহিল, "এই দু-দশ টাকা, যাওয়া-আসার গাড়ীভাড়াটা হয়?"

অজয় কহিল, "তা হবে।"

ছড়ি তুলিয়া বিমান আবার একটা ট্যাক্সি ডাকিল। ট্যাক্সি আসিয়া কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে নিজেই দরজাটা খুলিয়া ধরিয়া অজয়কে বলিল, "ওঠ।"

অজয় দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিল।

বিমান বসিতে বসিতে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে কহিল, "ঘুমাও।"

ক্রমশঃ

আলোচনা

প্রতাপাদিত্যের কথা

বৈশাখের প্রবাসীতে আমরা 'প্রতাপাদিত্যের কথা' নামে যে-প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম, আষাঢ় সংখ্যায় প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস আলোচনায় সুদক্ষ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় সে-সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথায় তাহার আলোচনা করিতেছি। তাঁহার প্রধান কথা এই যে, প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা একেবারেই মিথ্যা কথা। কোন কোন মুসলমান লিখিত ইতিহাসে প্রতাপের সহিত মোগল-সংঘর্ষের কথা নাই বলিয়া এ কথাটা যে একেবারে উড়াইয়া দিতে হইবে, তাহা আমরা মনে করি না। যাহা এদেশের পুঁথিপত্রে ও লোকের মনে চিরজাগরূক হইয়া আছে, সে-কথাটাকে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ না দেখাইয়া কেবল অনুমানের বলে উড়াইয়া দেওয়া আমরা সমীচীন মনে করি না। নিম্নে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

আমরা বলিয়াছি আজিম খাঁর সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ভট্টশালী মহাশয় তাহার কোন প্রমাণ নাই, বলিতেছেন। চাঁচড়ার রাজবংশের কাগজপত্র হইতে তাহা জানা যায় বলিয়া ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের যশোরের বিবরণে, খুলনা গেজেটীয়ার প্রভৃতিতে তাহা লিখিত আছে। চাঁচড়ার রাজবংশীয়গণও সে-কথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন। ভট্টশালী মহাশয় সে দলিলের চিত্রসহ পাঠ দেখিতে চাহেন, অবশ্য রাজবংশীয়েরা তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। ভট্টশালী মহাশয় বলিতেছেন যে, আজিম খাঁ বিহার-সীমান্ত ছাড়াইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশই করেন নাই। ষ্টুয়ার্ট কিন্তু তাঁহার টাঁড়ায় অবস্থানের কথা বলিয়াছেন। ব্লকম্যানের 'আইন-ই-আকবরী'তে আজিমের বাঙ্গালা বিহারে দুইবার নিয়োগের কথা আছে। প্রথমবার অবশ্য তিনি প্রায় বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার বাঙ্গালায় উপস্থিত হওয়ার জন্ত বিশেষরূপে আদেশ দেওয়া হয়। সেই সময়ে তিনি মাগুম খাঁ প্রভৃতিকে দমন করেন। উড়িষ্যায় কতলু খাঁকে দমনেরও ব্যবস্থা হয়। আজিম যে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা ঘটককারিকা হইতেও জানা যায়। যদিও ঘটককারিকায় প্রতাপের সহিত যুদ্ধে আজিমের মৃত্যুকথা মিথ্যা, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে যে একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল ইহা মনে করা যাইতে পারে। আজিম খাঁ বাঙ্গালায় না আসিলে, বাঙ্গালার নিভৃত পল্লীতে বসিয়া ঘটককারিকার লেখক কিরূপে তাঁহার কথা জানিতে পারিলেন, ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? লোকপরম্পরায় শ্রুত আজিমের কথা তিনি যে লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

তাহার পর মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের যে সংঘর্ষ ঘটে নাই, একথা ভট্টশালী মহাশয় জোর করিয়াই বলিতেছেন। তিনি প্রথমে রাম রাম বসুমহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, বসু-মহাশয় যশোরে মানসিংহকে প্রতাপ কর্তৃক অভ্যর্থিত হওয়ার কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু মানসিংহ যে প্রতাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এ-কথাও বসুমহাশয়ের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। তবে প্রতাপ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া যশোরে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। বসু-মহাশয় না বলিলেও আমরা কিন্তু প্রতাপ ও মানসিংহের সংঘর্ষের কথা অন্য দিক্ হইতে জানিতে পারি। ভট্টশালী মহাশয় বলিতেছেন 'আকবরনামা'র মানসিংহের বঙ্গীয় ভৌমিকদমনের কথা আছে, কিন্তু প্রতাপের সহিত সংঘর্ষের কোন কথা নাই। একথাটা তাঁহার মত বিচক্ষণ ব্যক্তি কেন লিখিলেন বুঝিতে পারিলাম না। আমরা বলিয়াছি প্রতাপের সহিত মানসিংহের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল জাহাঙ্গীরের সময়ে মানসিংহের দ্বিতীয়বার বাঙ্গালায় আগমন কালে। সুতরাং 'আকবরনামা'র সে-কথা কিরূপে থাকিবে? প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের সংঘর্ষের কথা অন্নদামঙ্গল ও ঘটককারিকা ছাড়িয়া দিলেও আমরা সংস্কৃত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ও জয়পুরের বংশাবলী পুঁথি হইতে তাহা জানিতে পারি। কোথায় কৃষ্ণনগর আর কোথায় জয়পুর! এই দুই স্থানের রাজবংশে একথাটা বদ্ধমূল হইয়াই আছে। একে অপরের কথা নকল করিয়াছে একথা বলা যায় না। প্রতাপের বিরুদ্ধে মানসিংহের অভিযানে ভবানন্দের সাহায্যের কথা কেবল ভারতচন্দ্র বলেন নাই, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতেও সে কথাটা আছে। দুই-ই কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদেশে লিখিত, একথাটা তাঁহাদের বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। ভট্টশালী মহাশয় কৃষ্ণনগর রাজবংশের যে-দলিলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজেই বলিতেছেন যে, মানসিংহ ভবানন্দকে মহৎপুর পরগণার চৌধুরাই ও কানুনগুই প্রদান করেন। তবে তিনি তাঁহার লিখিত দলিলের সংক্ষিপ্তসার হইতে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করার পুরস্কারস্বরূপ এই সনন্দলাভ ঘটিয়াছিল কি-না তাহা ঐতিহাসিকগণকে বিচার করিতে বলিতেছেন। অবশ্য ঐতিহাসিকগণ কি বলিবেন বলিতে পারি না, তবে আমাদের কথা এই যে, মানসিংহ ভবানন্দকে মহৎপুর পরগণার সনন্দ দিলেন কেন? কোন কারণ না থাকিলে এরূপ পুরস্কার দিবার কারণ কি? যদি বলা যায় ভবানন্দের কার্য্যদক্ষতার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার মানসিংহ বাঙ্গালায় আসিয়া আট মাস মাত্র অবস্থিতি করিয়াও আফগানদিগের দমনে ব্যস্ত থাকিয়া, ভবানন্দের কার্য্যদক্ষতার এমন কি পরিচয় পাইলেন, যাহাতে তাঁহাকে এইরূপ একটি পরগণা পুরস্কার দিয়া বসিলেন! একথা হয়ত উঠিতে পারে যে, বসন্ত দুর্গাদাসের আরজীতে প্রতাপের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্যের জন্য উক্ত পরগণা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই। সে কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা আপনাদের স্বার্থের বিরোধী বলিয়া সে কথা চাপিয়া গিয়া থাকিবেন। সুতরাং কৃষ্ণনগর রাজবংশে বংশপরম্পরায় যে কথা চলিয়া আসিতেছে যে, ভবানন্দ প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযানে মানসিংহকে সাহায্য করায় মহৎপুরের সনন্দ পাইয়াছিলেন একথা আমরা অস্বীকার করিতে যাইব কেন? ফলতঃ আজিম খাঁর ও মানসিংহের সহিত সংঘর্ষের যে-সকল প্রমাণ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, প্রতাপের সহিত মোগলের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্বাধীনতালাভের চেষ্টাই তাহার কারণ এবং পাঠানদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মোগলদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাকে চালিত করিয়াছিল। তাঁহাকে দমনের চেষ্টা পাঠান-দমনেরই অন্তর্ভুক্ত। আর প্রতাপ যে ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন, তাহা জেস্থইট পাদরীগণের কথা ও আবদুল লতিফের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে বুঝা যায়। তিনিও কেদার রায় প্রভৃতির ন্যায়ই আপনার পরাক্রম দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—তৃতীয় ভাগ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। মূল্য তিন টাকা। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, ২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডিমাই আটপেজী ৪৮২+২৩+।০ পৃষ্ঠা। ৪১ খানি ছবি। 'মানবজাতির উপনিবেশ, প্রবাস ও পরিব্রাজকে"র কারণাবলীর একটি চার্ট বা নক্সা। কাপড়ের বাঁধাই; সোনালী রঙে নাম লেখা।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক পুস্তক প্রথমে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষে বিক্রী হইয়া গিয়াছে। তাহা পরিবর্দ্ধিত আকারে উক্ত গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রূপে পুনর্মুদ্রিত হইবে। উহা বঙ্গের বাহিরে উত্তর-ভারতের প্রবাসী বাঙালীদের পরিচায়ক গ্রন্থ। তৃতীয় ভাগ বলিয়া এখন যে বহি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দক্ষিণ-ভারত, পূর্ব্বভারত এবং বহির্ভারতের বাঙালীদের বৃত্তান্ত আছে। সুতরাং ইহা আগে প্রকাশিত পুস্তক হইতে সম্পূর্ণ আলাদা বহি। যাঁহারা আগেকার বহিখানি পড়েন নাই, বর্ত্তমান পুস্তকখানি পড়িতে ও বুঝিতে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইবে না; কারণ, ইহাতে যে-সকল বাঙালীর বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের বৃত্তান্ত প্রথম-প্রকাশিত বহিতে ছিল না।

সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠা পরিমিত ভূমিকায় গ্রন্থকার বাঙালী জাতির প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাদটীকায় দিয়াছেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক তথ্যসমূহ সম্বন্ধে অন্যত্র যেমন কোন কোন স্থলে মতভেদ হয়, এক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও তাহা হইতে পারে। তাহা হইলেও প্রমাণগুলি কেবল এই কারণে উড়াইয়া দিলে চলিবে না, যে, বর্ত্তমান সময়ে ও ঐতিহাসিক কোন কোন যুগে বাঙালীদের প্রকৃতি ও কৃতিত্বের সহিত গ্রন্থকারের সংগৃহীত তথ্যগুলির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য নাই; কারণ, অন্য কোন কোন জাতির ইতিহাসেও দেখা যায়, যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে তাহাদের প্রকৃতি ও কৃতিত্ব এরূপ পৃথক্ রকম, যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের একই জাতিকে একজাতি বলিয়া চেনা যায় না। অতএব, জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বৃত্তান্তের এক একটি অংশ ও তাহার সমর্থক প্রমাণগুলি ঐতিহাসিকবিচারসহ কি-না, তাহার পরীক্ষা করিলেই তবে তাঁহার বুদ্ধিবিবেচনা ও পরিশ্রমের প্রতি ন্যায়সঙ্গত সম্মান প্রদর্শিত হইবে।

আধুনিক বহুসংখ্যক প্রবাসী বাঙালীর বৃত্তান্ত তিনি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই বৃত্তান্তগুলি যেমন সুখপাঠ্য, তেমনই উপদেশপ্রদ। অনেকের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পড়িলে মনে হইবে যেন উপন্যাস পড়িতেছি, অথচ তাহা সত্য। ঠিক্ কতজন প্রবাসী বাঙালীর বৃত্তান্ত ইহাতে আছে, স্থির করিতে পারিলাম না। ইহার সূচী ৩০ পৃষ্ঠা পরিমিত, প্রত্যেক পৃষ্ঠা দুই স্তম্ভে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক স্তম্ভে অন্যূন ৩০টি নাম বা অন্য বিষয়ের পৃষ্ঠোল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, যে, বহুশত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় বহিখানিতে আছে।

আধুনিক যুগে বাঙালীরা অন্যান্য ভারতীয় জাতির মত প্রধানতঃ উপার্জ্জনের জন্যই নিজের দেশ বা প্রদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিশেষত্ব এই, যে, তাহারা প্রায় সর্ব্বত্রই শিক্ষার উন্নতি বিস্তৃতি, সাহিত্যচর্চ্চা, ধর্ম্মানুশীলন, সমাজসংস্কার এবং তদ্বিধ অন্যান্য কার্য্যেও মন দিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে বাঙালী জাতির নানা সমস্যা ও কৃতিত্ব বুঝিতে হইলে কেবল বঙ্গের বাঙালীদের কথা ভাবিলেই চলিবে না; জ্ঞানেন্দ্রবাবু বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের যে-সকল বৃত্তান্ত সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও পড়িতে হইবে।

বাঙ্গালার সমস্যা—ব্রহ্মদেশের মান্দালয় কৃষিকলেজের অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মোট ১৬৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র।

এই বহিখানির পাণ্ডুলিপি পড়িয়া তাহার সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার সমস্যা আদ্যোপান্ত অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিয়াছি। কি কি কারণে বাঙালী জাতি এমন মস্তিষ্কশালী হইয়াও জীবনসংগ্রামে অবাঙালীর প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে তাহা সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে।...আমাদের সামাজিক ব্যাধিও অনেক—বলিতে গেলে আমাদের সমাজে ঘুণ ধরিয়াছে। আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। প্রবন্ধে এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমার মতে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে সমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

ইহাতে অর্থসমস্যা, পল্লীসমস্যা, কৃষিসমস্যা, খাদ্যসমস্যা, সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, শিক্ষাসমস্যা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। মাদ্রাজের বাণিজ্যনিপুণ চেট্টি সম্প্রদায় এবং সিন্ধী ব্যবসাদার প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এমন অনেক শিক্ষণীয় বিষয় দেখিলাম, যাহা আগে জানিতাম না। যাঁহারা, মূলধন নাই বা খুব অল্পই আছে, বলিয়া ব্যবসা অসম্ভব মনে করেন, তাঁহারা ঐ সকল অংশ পড়িয়া দেখিবেন। "বাঙ্গালার সমস্যা" বহিটি পড়িয়া অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইবে, ইহা ইহার একটি প্রশংসার কথা। ইহার অন্য উৎকর্ষ এই, যে, ইহা পাঠকদের মনে চিন্তার উদ্রেক করিবে—তাহাদিগকে ভাবাইবে।

গ্রন্থকার বহিখানির দাম যথেষ্ট কম রাখিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সনাতনী—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত, এম-এ, বি-এল কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৫২ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা আট আনা। কাপড়ে বাঁধা।

এই বইখানি ছোট গল্পের সমষ্টি। ইহাতে ছয়টি গল্প আছে। প্রথম গল্পের নামে বইয়ের নাম রাখা হইয়াছে।

প্রথম গল্প সনাতনী। ইহাতে আধুনিক নারী-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ও নর-নারীর তুল্যাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মেয়েদের যে বিবাহ করিয়া গৃহিণী হওয়াই শ্রেষ্ঠ সনাতন পন্থা তাহাই দেখানো এই গল্পের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় গল্প বাহাত্তর টাকা, একটি সামান্য নির্বোধ মুহুরীর জীবনের হাস্যোদ্দীপক করুণ কাহিনী।

তৃতীয় গল্প দেবতা; স্ত্রীর নিকট স্বামী দেবতা, সে যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে ত ভূদেবতা; কিন্তু সে যখন চুরি করিয়া ধরা পড়ে তখন কলিকালের ম্লেচ্ছ ব্যবস্থায় তাহার সম্মান কেহ রাখে না দেখিয়া স্বামীর প্রতি অচলা-ভক্তিমতী স্ত্রীর বিস্ময় ও বেদনা এই গল্পে প্রকাশ করা হইয়াছে।

চতুর্থ গল্প সন্ন্যাস-গ্রহণ, বিপত্নীকের প্রথমে সংসার-বৈরাগ্য জাগরূক হইয়া উঠে এবং অল্পদিন পরেই কবিসার্ব্বভৌমের কথায় সে বলিতে থাকে—

ইচ্ছা করে কোনও মতেই
সান্ত্বনা আর মানব না রে!
এমন সময় নতুন আঁখি
তাকায় আমার গৃহদ্বারে,—
চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি
তারেই শুধু আপন জেনেই,—
কখন তবে বিলাপ করি?
সময় যে নেই সময় যে নেই!

পঞ্চম গল্প অমিয়কান্তের ব্যবসা, একটি হতভাগা ছেলের নানা ব্যবসা ফাঁদিবার ফন্দি ও ফেল হওয়ার কাহিনী।

ষষ্ঠ গল্প কেরাণীর দুঃখ, একজন ষাট টাকা মাহিনার পেস্কারের অসদুপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের কাহিনী।

সব গল্পই শ্লেষাত্মক। সমাজের কোন-না-কোন দোষ ও বাড়াবাড়িকে বিদ্রূপ করিয়া গল্পগুলি লেখা। গল্পগুলির মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নাই, লেখার মধ্যেও কোনো মুন্সীয়ানা নাই। ভাষা ভাল নয়, সাহিত্যের আদর্শ-ভাষার বাক্‌রীতির ব্যতিক্রম বহু স্থলে হইয়াছে, লেখ্য ভাষার সঙ্গে কথ্য বাক্‌রীতি মিশ্রিত হইয়া পড়িয়া ভাষা শ্রুতিকটু হইয়াছে। প্রাদেশিকতার গন্ধ উগ্র হইয়া প্রকাশ পায়, চন্দ্রবিন্দু কোথাও নাই, ইংরেজী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে। সন্ন্যাস-গ্রহণ গল্পটির শেষ পরিচ্ছেদ অনাবশ্যক হইয়াছে, গল্পটি উহার আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আরও টানিয়া লইয়া চলাতে ছোটগল্পের রীতিভঙ্গ হইয়াছে। স্থানে স্থানে গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার অশ্লীলতার কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে। মোটের উপর বইখানির উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুরই প্রশংসা করিবার নাই।

কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য লেখকের গোচর করিতেছি—নিভাননী নামের অর্থ কি? নিভ মানে সদৃশ। ইন্দুনিভাননী, অরবিন্দনিভাননী নামের মানে বুঝি; কিন্তু কেবল নিভাননীর মানে ত কিছুই বুঝি না। সদৃশাননী? কাহার সদৃশ আনন সেই মেয়েটির? লেখ্য ভাষার মধ্যে দী-ধাতু-নিষ্পন্ন দেওয়া দিয়া দিলেন প্রভৃতি পদের প্রয়োগ অচল, লেখ্য ভাষায় দা-ধাতু বা দত্ত-ধাতু ব্যবহার্য্য, আর কথ্য ভাষায় দী-ধাতু ব্যবহার্য্য। ভাষার এই রীতিটি লেখকের জানা নাই। 'যৌবন-গঙ্গা ষোলকলায় পূর্ণ' হয় কেমন করিয়া? চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ হয়, আর কেহ নহে। "নিজ নাভিনিঃসৃত গন্ধে মাতোয়ারা বনমৃগীর মত"—মৃগীর নাভিতে কস্তুরী হয় না, কেবল মৃগের নাভিতে হয়। ফিসফিস না ফিসফিস? পিয়েনো না পিয়ানো? মুজা না মোজা? ঢেও না ঢেউ? নিভাননী অগ্রণী? বাপাবাপি, দাও, গুড়া, উকি, হা প্রভৃতির চন্দ্রবিন্দু কোথায়? বাহাদুরী নিয়ে বেরিয়েছি, না বেড়িয়েছি? নাৎনীর ইংরেজী প্রতিরূপ Nathni না Natni? লোকে মুগুর ভাজে না, মাগুর মাছ ভাজে আর মুগুর ভাঁজে। না মিজারেবল না লে মিজেরাব্‌ল্? লোক জংলে ধরণের না জংলী ধরণের হয়? স্যাঁৎস্যাতে না স্যাঁৎসেঁতে ঘর? দেখে ঘিয়ে পায়, না ঘেন্না পায়? সত্বাধিকারী না স্বত্বাধিকারী? আজীবনের জন্ত, জন্ত কেন? 'সেটি আর হ'তে দেওয়া নেই,' না 'হ'তে দেওয়া নয়'? কাঁথা পিরাণ শেলাবে, না সেলাই করবে? আমি তোমায় সাহসের সহিত বলছি বাংলা নয়। এরিওপ্লেন না এরোপ্লেন? ব্যাণ্ড্যাজ না ব্যাণ্ডেজ? ও তো আমার মনেই মুখস্থ হ'য়ে আছে, কেমন করিয়া মনে মুখ-স্থ থাকিতে পারে? দুষ্টোমি না, হয় দুষ্টামি আর নয় দুষ্টুমি। পৌরহিত্য নয় পৌরোহিত্য। তার বোনেরা ওদিকে তেমন পা মাড়ায় নাই, হয় কেবল মাড়ায় নাই অথবা পা দেয় নাই হইবে। চক্রবর্ত্তী-বংশের আর কোন বৌ এমন 'পরিবার গিয়াছে' দুর্ব্বোধ্য। যশদা নয় যশোদা। দোষর নয় দোসর। জন্ম-আয়ত্তি নয় জন্ম-আয়তি। তা কি আর করা, আদর্শ বাক্‌রীতি নয়। সতর্কতা নিতেছেন ত নয়ই, সতর্কতা লইতেছেন বলিলেও ইংরেজীর তর্জমা হয়, বাংলা হয় না। পায়া দিয়া ফেলিলেন একেবারে বাংলা বাক্‌রীতির মাথায়? এইরূপ ভূরি ভূরি অপপ্রয়োগ ও ভুল আছে। বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

লেখক প্রাচীন ও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই জন্য একটু বিশদ ভাবে তাঁহার ত্রুটি দেখাইলাম। সমালোচকের উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া তিনি মার্জ্জনা করিবেন আশা করি।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ধনবিজ্ঞানে সাক্‌রেতি—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি এল, প্রণীত। পৃষ্ঠা ৩১৯; মূল্য দুই টাকা।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের ধনবিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম গবেষক হিসাবে লেখক যে অধ্যবসায়সহকারে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, এই পুস্তকখানি তাহারই বাস্তব প্রকাশ। দেশী ও বৈদেশিক নানা সমস্যার বিচার ছোটবড় প্রবন্ধের মধ্য দিয়া এই পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বইখানির ভূমিকায় লেখক স্বকীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার যে চেষ্টার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ছাত্রেরই অনুকরণযোগ্য।

পুস্তকখানিতে ৩৭টি বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে। তাহার মধ্যে আমাদের ভাল লাগিল নিম্নলিখিত ৫।৭টি, যথা—ভারতে বৈদেশিক মূলধন, সংরক্ষণশুল্কের কুফল, র‍্যাশনালিজেশান ও বেকার সমস্যা, কয়লার খনির মজুর, ব্যাঙ্কযোগে যুবক বাংলা, রুশিয়ার পঞ্চপ্ল্যান, এবং কারখানাশিল্প বনাম কুটীরশিল্প। বাংলা ভাষায় অর্থনীতির চর্চ্চা যত অধিক হইবে দেশের ততই মঙ্গল। সেজন্য শিববাবুর বইখানির বিশেষ আদর হওয়া উচিত। তবে নিতান্ত পশ্চিমবঙ্গের চলিত-ভাষা ও পার্সী এবং উর্দ্দু শব্দের বহুল সমাবেশ করিয়া লেখক বইখানির গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

অঞ্জলি—শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত। বোলপুর, বীরভূম। মূল্য দেড় আনা। ১৩৩৮।

কয়টি কবিতার সমষ্টি, তাহার মধ্যে নয়টি চতুর্দ্দশপদী। ভাব যেমন আছে, ভাষা তেমন ফুটে নাই, জননী মৃত্তিকার প্রতি কবির যথেষ্ট ভক্তি আছে, শেষ কবিতার প্রকাশভঙ্গী মনোরম।

চতুর্বর্ণের স্বরূপ—শ্রীবসন্তকুমার কাব্যতীর্থ, ১নং হজরীমল লেন, কলিকাতা। পাঁচ আনা। ১৩৩৮। ৭৪ পৃঃ।

গ্রন্থকার ভারতের অধঃপতনের কারণ, সাম্প্রদায়িক গুরুদের স্বার্থপরতা বলিয়া মনে করেন; তারপর সামাজিক অধঃপতনও অন্যতম কারণ, এবং আরও তলাইয়া দেখিলে, "আত্মবিবাদই অধঃপতনের মূল" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র - এই চতুর্বর্ণের স্বরূপ জন্মগত কুলগত অধিকার নয়, তাহা গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের উপর নির্ভর করে। লেখকের ভাষায় "ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সাধকের স্তরচতুষ্টয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।"—পুস্তকের শেষে স্বামী বিবেকানন্দের "হে ভারত! ভুলিয়ো না" ইত্যাদি বর্ত্তমান ভারতের সুপরিচিত উপসংহার এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "ভারত আমার ভারত আমার" গান দেওয়া হইয়াছে। লেখকের দেশানুরাগ ও চিন্তাশীলতা আছে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

গীতা ও গীতাসহচরী—রামকৃষ্ণ শর্ম্মা সম্পাদিত—প্রকাশক কৃষ্ণপ্রসাদ সান্যাল, বি-এ, ৩নং যুগীপাড়া লেন রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৩৭।

এই পুস্তকখানিতে মূল শ্লোক, অনুবাদ এবং বহু টীকা ও ভাষ্য সম্পাদিত তাৎপর্য্য অনুযায়ী মূলশ্লোকের কবিতা-ব্যাখ্যা আছে। যাঁহারা মূলভাষ্য প্রভৃতি পড়িতে ইচ্ছা করেন না অথচ সংক্ষেপে তাহাদির তাৎপর্য্য জানিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক অতি উপযোগী হইয়াছে। পদ্য সরল ভাষায় লিখিত। যদিও স্থানে স্থানে পদ্যানুবাদ শ্রুতিকঠোর হইয়াছে তথাপি গ্রন্থকারের বক্তব্য বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। সাধারণ্যে এই পুস্তক আদৃত হইবে মনে করি। পরিশিষ্টে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিশেত হইয়াছে।

উপনিষদ্ রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা—শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা। প্রকাশক শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগুরু মন্দির—উপনিষদ রহস্য কার্য্যালয়, কৌড়ার বাগান, হাওড়া। মূল্য ৫০ আনা—পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪।

পুস্তিকাখানি উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। উচ্ছ্বাস-বাহুল্যের মধ্যে গ্রন্থকারের বক্তব্য খুঁজিয়া বার করা দুরূহ। "যে ক্ষেত্রে 'কুরু—কুরু' অর্থাৎ 'কর' 'কর' প্রতিনিয়ত ধ্বনিত, তাহাকে কুরুক্ষেত্র বলে।" 'সমবেতা যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব'—ইহার অর্থ করা হইয়াছে "যুযুৎসু হইয়া সমাগত। মামকাঃ অর্থাৎ প্রবৃত্তিপক্ষ এবং পাণ্ডবাঃ অর্থাৎ নিবৃত্তিপক্ষ। প্রবৃত্তিপক্ষ অর্থে বিকর্ষণশক্তি। পাণ্ডবাঃ নিবৃত্তিপক্ষ, আকর্ষণশক্তি।" এইরূপ ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র। ইহাকেই গ্রন্থকার যৌগিক ব্যাখ্যা বলিয়াছেন। পাণ্ডবপক্ষের শঙ্খধ্বনিরও যৌগিক অর্থ বিবৃত হইয়াছে। কুলধর্ম্মকে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বলা হইয়াছে (পৃষ্ঠা ৮২) ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ গীতাব্যাখ্যার অভাব নাই।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

রক্তের টান—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত। রঞ্জন প্রকাশালয়। ৩২।৫।১ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু দুই শ্রেণীর নভেলের কথা একসঙ্গে মনে পড়িয়া যায়। এক শ্রেণীর—যা সমাজের দুর্নীতিগুলির পিঠ চাপড়াইয়া তাল ঠুকিয়া চলে; আর এক শ্রেণীর যা সমাজের সেই সব সমস্যা বেদনায় আতুর যা ধর্ম্মের নামে নীতির নামে মানুষকে দিন দিন পিষিয়া ফেলিতেছে। আলোচনাধীন বইখানি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

বাড়ির বড়বধূ লক্ষ্মীস্বরূপা কমলাকে অতর্কিতে কয়েকজন গুণ্ডায় ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। দৈবাৎ, কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই, কয়েক মিনিটের মধ্যেই কমলার উদ্ধারসাধন হইল। সমাজের মাতব্বরেরা কিন্তু আসিয়া রায় দিলেন—"ছেলেপুলে লইয়া ঘর করা।...এর আঠার ঘা..." সুতরাং সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষিণী হইলেও বধূ বর্জ্জনীয়া। যুগযুগাগত সংস্কারের দাস স্বামী কিরণচন্দ্র সমাজের এই নির্দ্দেশ মাথায় পাতিয়া লইল।

এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া পরিবারটি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। শেষে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের পর পরবর্ত্তী বংশধরদের "রক্তের টানে" আবার পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল। মোটামুটি বইখানি এই।

ঘটনার নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে চরিত্রগুলির logical devolopment-এর দিকে লেখকের বেশ দৃষ্টি আছে এবং এই দিক দিয়া ছোট বউ চঞ্চলার চরিত্রটি খুব প্রস্ফুট। গল্পটি করুণারসাত্মক—আগেই বলিয়াছি। লেখক এ-বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। ক্ষুধার্ত্ত ছেলেকে আর কোন উপায় না দেখিয়া, "উপোসষষ্ঠী"র অছিলা করিয়া ভুলান বড়ই মর্ম্মস্পর্শী;—অসহায় মায়ের ব্যথা এই প্রবঞ্চনার মধ্য দিয়া কি গাঢ় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া ওঠা যায় না।

লেখকের বাঙ্গালা সাহিত্যে নাম আছে; বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার কাছে একটা ন্যায্য আশাও রাখে, এই জন্য দু-একটি ছোট ছোট ত্রুটির দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—

গল্পের মধ্যে নাটকীয় ভাব একটু বেশী:—হঠাৎ গৃহত্যাগ, হঠাৎ উদ্ধার ইত্যাদি

ভাষাটা জায়গায় জায়গায় একটু প্যাঁচোয়া হইয়া গিয়াছে—এমন কি কথাবার্ত্তার মধ্যেও।

পুস্তকের মূল্য এক টাকা বারো আনা; সে-হিসাবে অন্তত বহিরাবরণটি আর একটু ভাল হইলে ভাল ছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমি ও আমার দেহ—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম্-এ, এবং; প্রকাশক থিয়োসফিক্যাল পাব্লিশিং হাউস্, বেঙ্গল, ৪।৩এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। পৃষ্ঠা ২৩৩।

নাম হইতেই বইখানার আলোচ্য বিষয় কতক বোঝা যায়। কিন্তু দার্শনিক গ্রন্থ অনেক সময় যেরূপ দুরূহ ও দুষ্পাঠ্য হইয়া থাকে, ইহা তাহা নহে। অধ্যাপক বসু-মহাশয় দেহ ও আত্মা সম্বন্ধে বেদান্ত ও থিয়োসফির মতবাদ অত্যন্ত সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। নানাপ্রকার উদাহরণ দিয়া বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করা বসু-মহাশয়ের লেখার একটি বৈশিষ্ট্য।

দর্শন-বিজ্ঞানে নানারূপ মত-বাদ প্রচলিত রহিয়াছে; জগতের সকল দার্শনিকই এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন। সুতরাং ইহা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না যে, বসু-মহাশয়ের তথা থিয়োসফির সকল মত সকলে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা আলোচ্য গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'চিন্তার রূপের' কথা উল্লেখ করিতে পারি। সেখানে আধ্যাত্মিক চিন্তা শ্যামবর্ণ, ভক্তি নীল, জ্ঞান পীত, প্রীতি গোলাপী, সহানুভূতি হরিত ইত্যাদি বলা হইয়াছে; এবং আকারও ইহাদের এক একটির এক এক রকম—যথা কোনটা পুষ্পাকার, কোনটা শুণ্ডাকার, ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এমন কি, দুই প্রকারের চিন্তার ছবিও দেওয়া হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগ-রাগিণীরও এই প্রকার রূপ কল্পিত হইয়াছে; এবং অলঙ্কারশাস্ত্রেও 'মালিন্যং ব্যোম্নি পাপে' 'যশসি ধবলতা' ইত্যাদি কবি-সময় রহিয়াছে। দেবতার রূপ-কল্পনার ভিতরও হয়ত এই একই মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। কিন্তু দেবতার বেলায় 'রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য' কল্পনা করার জন্য বেদব্যাস ক্ষমা চাহিয়াছেন। রাগ-রাগিণী এবং চিন্তার বেলায়ও এই মূর্ত্তি-কল্পনা শুধু 'কবি-সময়' না বাস্তব, তাহা লইয়া মতভেদ হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

থিয়োসফির কোষ ও লোক সম্বন্ধে মত-বাদ বেদান্তের অনুযায়ী। বেদান্তের সকল মত যেমন সকলে জানেন না, থিয়োসফির এই সকল মত সম্বন্ধেও তেমনি বিরুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহা লইয়া মন্মথবাবুর বইয়ের দোষ দেখান চলে না। মন্মথবাবু এই সব সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা এত সহজবোধ্য ও মনোরম ভাবে করিয়াছেন যে, যিনি গ্রন্থান্তর পাঠ করিয়া এই সকল শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন নাই, তিনি এই বইখানা পড়িয়া দেখিবেন।

"How charming is divine Philosophy !
Not harsh and crabbed as dull fools suppose."

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের দাম্পত্যজীবন—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত এবং ২৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

জীবনকে খণ্ডভাবে আলোচনা করিলে আলোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে বলিয়াই গ্রন্থকার রামকৃষ্ণ দেবের দাম্পত্যজীবনের কথা বিবৃত করিতে গিয়া তাঁহার সমগ্র ধর্ম্মজীবনের আলোচনা করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, সমাজের প্রতিষ্ঠা দিব্য সম্বন্ধময় জীবনে। তাই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর কামকাঞ্চনবিরাগী হইয়াও স্বেচ্ছায় স্বপত্নীর সন্ধান পাইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রীমার কথায় গ্রন্থকার বলেন, প্রেমের জন্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া যে নারী পূত সংযমে জীবন পবিত্র করে, সে-নারীর আদর্শপ্রতীক যুগে যুগে ভারতক্ষেত্রেই আবির্ভূত হইয়াছে। দেহসম্ভোগ ব্যতীত পতি-পত্নীর সম্বন্ধের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব আছে। শ্রীমা তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। লেখকের মতে বিবাহ ঠাকুরের স্বরূপপ্রকাশ এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহা ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। গ্রন্থমধ্যে এই সকল কথা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব দাম্পত্যজীবন প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে নানাবিধ সাধনমার্গের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আব হুল্লাহ—খান বাহাদুর কাজী ইম্‌দাদুল হক্, বি-এ, বি-টি প্রণীত। মূল্য দুই টাকা।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের পারিবারিক চিত্র অবলম্বনে রচিত উপন্যাস। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করিলেও আমরা মুসলমান-পরিবারের আভ্যন্তরিক পরিচয় রাখিতে পারি না, এই উপন্যাস-পাঠে সে কৌতূহল অনেক পরিমাণে চরিতার্থ হয়। হিন্দু-সমাজের মত মুসলমান-সমাজেও আজকাল প্রাচীন ও নবীন পন্থীদের মধ্যে আদর্শ ও আচার-ব্যবহার লইয়া যে-সংগ্রাম দেখা দিয়াছে গ্রন্থকার তাহারই ছবি আঁকিয়াছেন। অন্তঃসারশূন্য আভিজাত্য-গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া এক শ্রেণীর লোক কি ভাবে দিন-দিন জাহান্নমে যাইতেছে উপন্যাসে তাহা উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুসলমান-সমাজ ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। হিন্দু-সমাজেরও মঙ্গল কম হইবে না, বিশেষতঃ যাঁহারা বনেদীঘরের। খান বাহাদুর শক্তিমান লেখক। তাঁহার উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলি খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে।

চন্দ্রেশ্বর

বেদুইন—শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা হইতেছে—মুক্তি—অনাসক্তি। লালসার মধ্য দিয়া এই বস্তুজগতকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিয়াও মনকে যে কি করিয়া উর্দ্ধমুখী রাখা যায় এই গ্রন্থে তাহারই সন্ধান আছে। গ্রন্থকার ভোগের ছন্দে বৈরাগী মানব-মনের মুক্তির গান গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকাশভঙ্গী স্থানে স্থানে দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় বেদুইনের অনাসক্ত মনের ঔজ্জ্বল্য সব স্থানে প্রভা দিতে সমর্থ হয় নাই। তবে গ্রন্থের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভাবের যে সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ আছে ইহাই বেদুইনের একমাত্র বিশেষত্ব।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

পথবাসিনী

শ্রীশান্তা দেবী

বর্ষার দিনে হঠাৎ জ্বরে পড়িলাম। সারাদিনই বিছানায় একটানা শুইয়া থাকিতে হয়। দক্ষিণ দিকের জানালাটা দিয়া বাহিরের পৃথিবীর হরিৎরূপ অনেকখানি চোখে পড়ে তাই রক্ষা, না হইলে সারা দিন কড়িকাঠ গোনা ছাড়া উপায় ছিল না।

বালিশে মাথা দিয়াই দেখিতে পাই ঘনমেঘভারানত আকাশের নীচে বর্ষাস্নাত তাল ও নারিকেল গাছের কণ্টকিত মাথাগুলি হাওয়ায় কেবলই দুলিতেছে। পথের ধারের সারি সারি কৃষ্ণচূড়ায় বসন্তে যে অগ্নিবরণ আবীর ছড়াইয়া ছিল আজ তাহা বর্ষার স্নানে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, গাছগুলির পত্রবহুল শ্যামশ্রীর স্নিগ্ধতা চোখ জুড়াইয়া দিতেছে। পাড়াটা নূতন, কাজেই জনাকীর্ণ ঘরবাড়ির চেয়ে পোড়ো জমিই এখানে বেশী। মাথাটা তুলিয়া মাঝে মাঝে দেখিতাম, পোড়ো জমির চুণ সুরকী, আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা সবই নব তৃণদলের স্বর্ণাভ সবুজ আস্তরণে ঢাকা পড়িয়া যেন কয়দিনে হঠাৎ নন্দনকানন হইয়া উঠিয়াছে এখানে-ওখানে ঘন কচুবন, মসৃণ কচুপাতার উপর বড় বড় জলের ফোঁটা নিটোল মুক্তার মত টল্‌টল করে। একটু হাওয়ার দোলায় ভাঙিয়া বীজ মুক্তার মত গড়াইয়া পড়িয়া যায় দেখিয়া মনে হইত কবিরা পদ্মপত্রের জল দেখিয়া এত কবিতা লিখিলেন, কিন্তু ঘরের পাশে ছাই গাদার উপর কচুর পাতায় পাতায় এমন শতশত মুক্তারত্ন কাহারও চোখে পড়িল না কেন?

ঘরে একলা শুইয়া শুইয়া পথের ধারের মানুষগুলার সঙ্গেও পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। সকাল হইলেই টাকপড়া বুড়া রহমান তার নাতিটিকে কোলে করিয়া ফুটপাথে টাটকা মাছের খোঁজ করিতে আসে। তখন ভাল মাছের ঝাকাটা দেখিয়া পড়শীরা সব কিনিয়া লইবে এই ভয়! যতই কেন-না সে পুরানো খরিদ্দার হউক মেছুনীরা তাহার জন্ম এক পোয়া ভাল মাছ কখনই আলাদা করিয়া সরাইয়া রাখিবে না।

দুপুরে গাছতলায় সেই আমাদের সুকৃষ্ণবরণা ভীমকায়া ফেরিওয়ালী রক্তবস্ত্র পড়িয়া আমের ঝোড়া লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিত। সকালে যা বিক্রী হইয়াছে তাহার পর আর খুব বিক্রীর আশা নাই; এদিকে পেটেও ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়াছে। কাজেই ঝুড়ির যতগুলা সম্ভব আম সে একলাই খাইয়া শেষ করিত। পাড়ার ছেলেমেয়েদের দেখিলে দুই-একটা দিতে তাহার কখনও ভুল হইত না। বিশেষ ওই যে ছেলেটা চৌখুপি লুঙ্গি পরিয়া ডোবা হইতে হাঁসের পাল তাড়াইয়া রোজ এই পথে বাড়ি ফিরিত, উহার ভাগ্যে রোজ দুটা আম লেখাই ছিল।

বিকালে বুড়া স্কট সাহেব তাহার লম্বা গলার ডগায় বসানো দুর্বল মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে ছোট চামড়ার ব্যাগ হাতে ঠিক চারটায় আপিস হইতে বাড়ি ফিরিত। একটু পরেই ছোকরা হড্‌সন সাহেব তাহার চারিটা অতিকায় গ্রে-হাউণ্ড কুকুর লইয়া হাত-কাটা সাদা কুর্ত্তা পরিয়া বাহির হইত হাওয়া খাইতে। সন্ধ্যায় দেখিতাম তরুণী এমির সহিত পালা করিয়া তাহার দুই যুবকবন্ধুর প্রেমলীলা।

সেদিন সকালে দেখিলাম আমাদের আমওয়ালীর বিশ্রামকুঞ্জে ভোর হইতেই নূতন কে আস্তানা গাড়িয়াছে। ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় মাঝে মাঝে ফুলুরিওয়ালারা লোহার উনান কড়া খুন্তি লইয়া দোকান খুলিয়া বসে বটে। তাই হয়ত হইবে। বিছানা হইতে মাথাটা তুলিয়া দেখিলাম পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। তিনখানা ইট পাতিয়া মাটির হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়াছে। কাগজ খড় শুকনা পাতা এইসব তাহার উনানের ইন্ধন। ফুটপাথের কলে গোটা দুই এনামেলের থালা, একটা কাচের গেলাস, একটা এলুমিনিয়নের বাটি, একটা ছোট গামলা মাজিয়া ধুইয়া জল ভরিয়া সে উনানের পাশে আনিয়া রাখিল। ভাত নামিল, তারপর ডাল চড়িল। বিস্কুটের টিনের ভিতর হইতে মাল-মশলা বাহির করিয়া পারও সাজিল। সঙ্গে একটা



একাকী

শ্রীকনু দেশাই

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গামছা-বাঁধা পুঁটুলীতে খান-চারেক কাপড়, দুখানা কাঁথা—খুলিয়া মাঠের উপরেই রৌদ্রে শুকাইতে দিল। এ যে রীতিমত সংসার! কিন্তু মানুষটা একেবারেই একা। নিঃসঙ্গ আসিয়া পথে ঘরকন্না সাজাইয়া বসিল এ কে? কোথাও দূর পথে যাইতেছে বোধ হয়। কিন্তু কলিকাতায় ট্রাম আর মোটর বাসের রাজ্যে এমন চাল চিঁড়া বাঁধিয়া গ্রাম্য চালে মানুষ ত পথ চলে না।

দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়া যখন উঠিয়া বালির জল খাইতে বসিয়াছি, দেখি মেয়েটি গাছতলায় পা ছড়াইয়া দীর্ঘ চুলে বিলি দিয়া চুল শুকাইতেছে। এই গাছতলার ঘরকন্না ছাড়িয়া এখনই চট করিয়া সে কোথাও রওনা হইবে বলিয়া ত মনে হইল না। বেশ শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব, যেন গৃহকর্ত্রী সারাদিনের কর্ম্মশেষে অপরাহ্ণে অন্দরের ছাদের শেষ রোদটুকু একটু উপভোগ করিয়া লইতেছেন। পথচারীরা একটু কৌতূহলের সহিত তাহার দিকে দেখিয়া গেল, কিন্তু কেহ দাঁড়াইল না। সেও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিল না। চুলগুলা হাতে জড়াইয়া শক্ত করিয়া একটা খোঁপা বাঁধিয়া কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা নামাইয়া মাঠে বিছানো কাপড় কাঁথাগুলা এক এক করিয়া তুলিয়া পাট করিতে লাগিল। কাপড় পাট হইলে ভাতের ও ডালের হাঁড়ি দুইটা উনানের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া বাসন কয়খানা একটা গামছায় বাঁধিল। আঁচলের সামান্য পয়সা ক'টা কোমরের কসিতে বাঁধিয়া গাছতলার চারি-পাশটা ভাল করিয়া দেখিয়া মোটা কাঁথা দুইখানা দিয়া পশ্চিম দিকে একটা বিছানা পাতিয়া শিয়রে কাপড় ক'খানা রাখিল। আমি ত তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক্! এই বর্ষার রাত্রে একটা পোড়ো মাঠের গাছতলায় এই সঙ্গীহীনা স্ত্রীলোক সারারাত শুইয়া থাকিবে? কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। ইহাকে ত পথের ভিখারী মনে হইতেছে না। যেন চিরকাল রান্নাবাড়া ঘরকন্নায় এমন অভ্যস্ত যে গাছতলায়ও কোনো আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখে না।

ঘর হইতে অনেক ডাকাডাকি করার পর আমার ভৃত্য আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওখানকার ও মানুষটা কে রে? রাত্রে কি এই গাছতলাতেই থাকবে? একবার খোঁজ করে দেখ দিকি।"

ভৃত্য ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "সে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে, ডাকলে জবাব দেয় না। বেশী কথা কেউ জানে না। যা দু-চার জনকে জিজ্ঞেস্ করলাম তারা বলে ও আপন মনেই কাজ করছিল, এখানে থাকবে তা কি করে জানব? কারুর সঙ্গে ত একটা কথা কয়নি। এখন দেখছি হঠাৎ শুয়ে পড়ল।"

বয়স নিতান্ত কম নয় কিন্তু খুব বেশীও নয়। গাছ-তলায় সারারাত শুইয়া থাকাটা চোখে বড়ই বিসদৃশ লাগে। রাত্রে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম একলা খোলা আকাশের নীচে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। সকালে আমার ঘুম ভাঙিবার আগেই দেখি সে তাহার কাজকর্ম্ম সুরু করিয়া দিয়াছে। পথের ধারের কলতলায় বাসনমাজা জলভরা স্নান কাপড় কাচা একে একে সবই সারা হইল। কে বলিবে ইহা তাহার বাড়ির উঠানের কূয়াতলা নয়? আর পাঁচজন কলের জল লইতে আসিলে মনে হইতেছিল সে যেন নিতান্ত দয়া করিয়া একটু সরিয়া গিয়া জল দিতেছে। আসলে কলটা তাহারই সংসারের সারাদিনের ব্যবহারের জন্য। উনান-ধরানো চাল ডাল ধোওয়া রান্না-খাওয়া পানসাজা সবই যথাক্রমে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কোনো তাড়াহুড়া ব্যস্ততা নাই, কোনো ভাবনা চিন্তা নাই, যেন গাছতলায় পাতা এই নূতন সংসারটির তদারকই তাহার বহুদিনের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহার রান্নাবাড়া হইলে এখনই বাড়ির পাঁচজন আসিয়া খাইতে বসিবে। ছেলে বুড়ো কেহ বাদ যাইবে না।

তাহার উনানের হাত-দুই দূরে টেকো বুড়া রহমান তার নাতিটিকে কোলে লইয়া আসিয়া বসিল। খানিক-বাদে দুই চারিটা প্রশ্নও সুরু করিল, উত্তর পাইল কি-না বোঝা গেল না। একটু পরে আসিল আব্দু কোচম্যান, যতক্ষণ ভাড়াটে না মিলে একটু গল্পগাছা করিয়া ইঁহার সঙ্গে ভাব জমাইবার ইচ্ছা। সে কিন্তু কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া আপন মনে পিছন ফিরিয়া রান্না করিতে

বেশীক্ষণ তাহার সহিত তর্কের খেলা করিবার জোর ছিল না। "যা ভাল বোঝ কর বাছা," বলিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

তিন দিন পরে দেখি কায়েত-বউয়ের সংসারে আসবাব বাড়িয়াছে। গাছতলার নিকানো গণ্ডীর ভিতর ঘুন্‌সী-পরা একটি উলঙ্গ শিশু হামা দিয়া চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহিণী আজ সন্ত্রস্ত; এই জলের গেলাস উপুড় হইল, এই ডালের ঠোঙায় থাবা পড়িল, এই উনানের কাঠে টান। বউ তিন-চারিটা মুড়ির দানা তাহার বিরলদন্ত মুখে দিয়া তাহাকে এক জায়গায় স্থির করিয়া বসাইবার চেষ্টা যতবার করিল ততবারই সে ঠোঁট দুইটা টিপিয়া বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া হামা দিয়া আসিয়া জলের বাসনগুলায় দুই হাত ডুবাইতে লাগিল। যত হায়রাণি বাড়ে বৌ ততই শিশুকে সহবৎ শিখাইতে ব্যস্ত, দুইজনে হাসিয়া অস্থির। আবুসেখ, পাঙ্গু, ছিদাম আসিয়া হাসির কণা যতটুকু পারিল সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেল। পরিবর্তে কেহ কিছু চাল, কেহ চারখানা কাঠ, কেহ একটু গুড় দিয়া দাতা নাম কিনিল।

বুড়ি ঝি জানালা দিয়া দেখিয়া বলিল, "আমরণ উনি আবার ভালমানুষের ঝি! নিজের ছেলে ঘরে পড়ে কাঁদছে, আর এখানে পরের ছেলে কোলে সোহাগ করা হচ্ছে। ওটা ওই ছিদমে লক্ষ্মীছাড়ার ছেলে।" জানালা দিয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিলাম। ছেলে কোলে করিয়া সে নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, "ও ছেলেটা জোটালে কোত্থেকে?"

বলিল, "ছিদামের বাড়ি গিয়েছিলাম, তার বউ আমাকে মা বলেছে, তাই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। বিদেশে বিভুঁইয়ে মেয়েছেলের সঙ্গে ভাব রাখা ভাল। নইলে একটা বদনাম উঠলে আর কি ঘরে ঠাঁই দেবে? তা ছাড়া জানই ত মা, মায়ের জাত কি ছেলে নইলে বাঁচে?"

আমি বলিলাম, "এমনিতেও ত ঘরে ঠাঁই দেবার কোনো লক্ষণ দেখছি না। ও তোকে ফেলেই হয়ত পালিয়েছে। নইলে কি একটা দিন থেকে ভাল করে ব্যবস্থা করে যেতে পারত না?"

সে বলিল, "না মা, পুরুষ মানুষ মারে-ধরে, বলেই কি আর পথে বার করে দিয়ে যাবে? ভাবছে মনে হাসপাতালে ত আছে, দশদিন পরে এসে খোঁজ করলেই হবে। ছেলেপিলে ফেলে তখন তাড়াতাড়িতে চলে গেছে।" একখানা পোষ্টকার্ড জোগাড় করিয়া তাহার স্বামীর নামে চিঠি লিখিয়া দিলাম, বলিলাম, "ডাকে ফেলে দে, যদি মানুষ হয় ত নিশ্চয় নিয়ে যাবে।"

পাঁচদিন কাটিয়া গেল, ঝড়ে বৃষ্টিতে রৌদ্রে এই অনাবৃত পথে আর কত কাল বাস করা চলে? কিন্তু চিঠিও আসিল না, স্বামীরও দেখা মিলিল না। সব চুপচাপ।

বলিলাম, "কারুর বাড়িতে আশ্রয় নে না বাছা! এমন করে কি মানুষ বাঁচে?"

সে বলিল, "এ খিষ্টান মুসলমান পাড়ায় কোথায় কার ঘরে থাকব, মা, আমি হিঁদুর বউ!" বলিলাম, "তবে যা না বাপু, কোথায় হিঁদু পাড়া আছে। এখানে পড়ে মরতে হবে না।" সে ভীতচক্ষে বলিল, "বড় ভয় করে মা, জাতজন্ম খোয়ালে আর কি গেরস্তর ঘরে কেউ মুখ দেখবে? এ তবু চেনা শুনো হয়ে এসেছে, এক রকম চলছে। এদেশে কোথায় কি পাড়া আমি কি কিছু চিনি? কারুর সঙ্গে যেতেও ভরসা হয় না, কোথায় নিয়ে যাবে কি জানি? বড় ভয়ে ভয়ে আমার দিন কাটে, মা।" বলিলাম, "তবে অত জাঁক না দেখিয়ে এইখানেই থাক্ না যে ক'দিন দরকার। মুসলমান বা খিষ্টান!" কি ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা কাল আস্‌ব। ঘরটা আজ দেখে যাই।" চালা ঘরটা দেখাইলাম। একদিকে কেরোসিনের বাক্সে বাড়ির যত ভাঙা কাঁসার বাসন, আর এক দিকে কোদাল টাঙ্গি খুর্পি ইত্যাদি লোহার সরঞ্জাম ও গোটা-পনের চটের বস্তা পড়িয়া আছে; মাঝখানে একটা ভাঙা তক্তাপোষ। বউ ঘর দেখিয়া বলিল, "ভাল করে বন্ধ হয় না।" তারপর চলিয়া গেল।

ধূলিকণার মত গুঁড়া বৃষ্টির ভিতর কায়েত-বউ সকাল বেলাই রান্না চড়াইয়াছিল। জানালা দিয়া তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, বৃষ্টি যেন পাতলা একটা উড়ন্ত মসলিনের পরদার মত আমাদের দুজনের মাঝখানে দুলিতেছিল। একবার মনে হইল মুখের উপরের

বৃষ্টির জল সে আঁচল দিয়া মুছিতেছে, আবার মনে হইল বৃষ্টির জল নয় চোখের জল। এত দুঃখে কোনো দিন তাহাকে কাঁদিতে দেখি নাই, আজ কি তবে সে সকল আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। হাঁটু দুইটার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া সে তাহার কান্না সাম্‌লাইতে লাগিল। এমন সময় একটা ছাতা হাতে পানু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম ছাতাটা লইবার জন্ত বউকে অনেক ঝুলোঝুলি করিতেছে, আজ কিন্তু সে দান লইতে বড়ই কুণ্ঠিত। তবু পানু ছাতা রাখিয়া চলিয়া গেল।

এক গালে হাসি ও পান লইয়া কে একটা গাড়ী হাঁকাইয়া গাছতলায় আনিয়া দাঁড় করাইল। কায়েত-বউ একটু ভীতদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া তারপর চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু একটুখানি হাসিল। গাড়ীর ভিতর চারটা ছোটবাঁশ ও একটা পুরানো তেরপল ছিল। বাঁশ চারিটা চারিকোণে পুঁতিয়া উপরে তেরপলটা চাপা দিয়া আবু অনাবৃত রান্নাঘরের একটা ছাউনি করিতে লাগিয়া গেল। বুড়া রহমান নাতি কোলে যাইতে যাইতে সেদিকে তাকাইয়া বলিল, "বাহাবা তোফা।" মানুষগুলা শুধুই আড্ডা জমাইতে না আসিয়া আজ বেচারীর দুর্গতির একটু প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া তাহাদের উপর আমার মনটাও প্রসন্ন হইল।

বুড়ী ঝি খাবার লইয়া আসিয়াছিল, এইসব দেখিয়া বলিল, "বাছা আমার বাঁচ্‌লে বাঁচি, ঘোলে রুচি দুধে অরুচি। জাতের দেমাকে তোমার ঘরে থাকল না, মা, এখন জাত কুল সব ধুয়ে খাচ্ছেন।" আমি বলিলাম, "চুপ কর্‌ লক্ষ্মীছাড়ী, লোকের নামে কথা রটাতে পেলে কিছু চাস না। মানুষের চামড়া গায়ে থাক্‌লে পরের দুঃখ কষ্টে মানুষ অমন করেই থাকে।"

সে বলিল, "হ্যাঁ দুঃখু কষ্ট না ত আর কিছু! ঐ গাড়োয়ানটা আমাকে নিজে বলেছে ও ওকে গাড়ী করে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়; আবার পানুর সঙ্গে তাই নিয়ে ওর ঝগড়া কত! বলে—থাক্‌ না পানুর চাল চিঁড়ে খেতে, একদিন হাড় ক'খানা ভেঙে রেখে দেব। লজ্জা-সরম সব ধুয়ে খেয়েছে মা, নইলে এমন চলাচলি গেরস্তর বউ করে!"

আমি বলিলাম, "ও-সব লোকটার দুষ্টুমি, বানিয়ে বলেছে ওর নাম খারাপ করবার জন্তে। তুই যত রাস্তার লোকের সঙ্গে বাজে গল্প করতে যাস্‌ কেন বল দিকি! অমন করলে তোকে দিয়ে আমার চল্‌বে না।"

বুড়ী তাড়াতাড়ি আমার পায়ে হাত দিয়া বলিল, "তোমার দিব্বি মা, বাজে গল্প করতে যাই না। ঘুঁটে কিন্‌তে গিয়েছিলাম ওরা এসে সাত কথা তুল্‌লে! বউটার ভালর জন্তে তাকে বল্‌তে গেলুম যে—যার তার সঙ্গে অমন হাওয়া খেতে যাসনে মরবি, তা এমন ন্যাকা সাজল মা, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, যেন হাওয়া খাওয়ার নামও কোনো দিন শোনে নি! ছোটলোকদের কাণ্ড জান না, মা, ওরা ভরসন্ধ্যে বেলা সেদিন একটা মেমকে মোটর গাড়ী করে নিয়ে পালাচ্ছিল! সে যাই মেম, তাই রক্ষে! সে পুলিশ ফরেদ কত কি করলে, আর কাঙালের মেয়ে কি বাঁচবে ওদের হাতে পড়লে?"

বুড়ীর যত গুণ্ডার গল্প শুনিবার মত মস্তিষ্কের অবস্থা ছিল না। শুইয়া পড়িয়া বলিলাম, "না বাপু, তোর গল্প শুনে আমার মাথা ঘোরে। আমায় একটু ঘুমোতে দে।"

বিকেল বেলা গাছতলার সভা খুব জাঁকাল হইয়া উঠিয়াছিল। আগে ত এত লোক দেখিতাম না। আরও পাঁচ-সাতটা দুষমনের মত মানুষ, কেহ ঝুড়ি কেহ কোদাল কেহ দড়ি কাঠ ও বস্তা হাতে করিয়া ময়লা কাপড় জামা পরিয়া যেন দিনমজুরীর কাজ হইতে ফিরিতেছে, এমনি-ভাবে একহাঁটু কাদাধূলা মাখিয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা খুব হাসিগল্প করিতেছে দেখিয়া মেয়েটার উপর আমার বড়ই বিরক্তি হইল। ভালই হইয়াছে আমার বাড়িতে আনি নাই। বিরক্তিতে এবেলা আর তাহার মুখের দিকেও তাকাই নাই। তাছাড়া চারিধারে মানুষ গোল হইয়া বসাতে তাহাকে বিশেষ দেখাও যাইতেছিল না।

পরদিনও নূতন নূতন মানুষ আবির্ভূত হইতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে অভদ্র ঝগড়া ও খণ্ড যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সেইখানে বসিয়াই কায়েত-বউ তাহার নিত্যকর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিল, সুতরাং

জিনিষটার ওজন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সংসারের শ্রী বাড়িয়াছে, মাথার উপর একটু ঢাকা, বসিবার একখানা পিঁড়া, ছোট একটা বঁটি। কিন্তু তাহার সে আগ্রহ ভাব কাটিয়া গিয়াছে। ঘরকন্নার আগ্রহ আছে মনে হয় না, ইহাদের এই আনাগোনা ও কোলাহল যেন তাহার চারিপাশে কিসের একটা ঘূর্ণী নাচাইয়া তুলিয়াছে। তাহার সরল মনের স্থৈর্য্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় আজ সে একবার আমার সিঁড়ির তলায় আসিয়াছিল, তখনও তার গাছতলায় লোক বসিয়া। ঝি বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা কইতে চায়, মা।" বিরক্ত-ভাবেই গিয়া বলিলাম, "কি চাই, তোমার?" সে হাত জোড় করিয়া বলিল, "মা, তোমার ওই ঘরটায় আজ আমাকে থাকতে দিও। কিন্তু একটা হুড়কো চাই, মা।"

বলিলাম, "দুবার ত সাধলাম, এলি কই? এখন এক রাজ্যি লোক জুটিয়ে আবার আমার ঘরের উপর টান কেন?"

ডাগর দুই চক্ষে মিনতি ভরিয়া সে শুধু হাতজোড় করিল কোন কথা বলিল না। যেন পিছনে তাহার কথা শুনিবার জন্ত কে আড়ি পাতিয়াছে। "আচ্ছা, আসিস" বলিয়া ঘরে চলিয়া গেলাম। লোকগুলা তখনও তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। উহাদের আরও অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল। একটা উত্তেজিত গলার স্বর কানে আসিতেছিল।

ভোরেই ঘুম ভাঙিল। অনেক দিন পরে সকাল হইতেই উজ্জল নীল আকাশে পরিষ্কার রোদ উঠিয়াছে। সমুদ্রের ফেনার মত সাদা সাদা ফাঁপা মেঘ মাথার উপরে ছড়াইয়া আছে, যেন শরৎকাল। গাছতলায় দুইটা খোট্টা বুড়ী হলদে তালি-দেওয়া গোলাপী কাপড় পরিয়া পেয়ারা-ফুলি আমের ঝুড়ি লইয়া বসিয়াছে। কায়েত-বউ ত আসে নাই। রাত্রে আমাদের এখানে শুইতে আসিবে বলিয়াছিল তাহাও ত দেখিলাম না। তাহার ঘর-সংসারের তিনটা পোড়া ইট ও দুইটা পোড়া হাঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ এমন সুন্দর দিনে তাহার এত আলস্ত অথচ বাদলা দিনে ত দেখি ভোর না-হইতেই জিনিষপত্র সব লইয়া আসিয়া কাজে মাতিয়াছে। হয়ত আমার এখানে থাকিবে বলিয়াও আসে নাই, তাই লজ্জাতে অন্ত কোনো দিকে নূতন করিয়া সংসার সাজাইয়াছে। কিছু আশ্চর্য্য নয়।

আরও বেলা হইল। তাহাকে কোনো দিকে দেখিলাম না। বুড়ী ঝিটা সকাল-বেলাই তাহার মেয়ের বাড়ী গিয়াছে, বিশ্বের গল্প শুনাইবার লোকই বা কোথায় যে পথের মানুষের খবর পাইব?

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বুড়ী বাড়ি ঢুকিয়াই ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মাগো, এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিছু শোন নি?"

বলিলাম, "কেন রে কি হ'ল?"

সে বলিল, "পরশু রাতে ছিদামের দোকান ঘরে চুরি করে বউটা পথে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। পানুটা ওর ভাবের লোক, দালানে শুতে জায়গা দিয়েছিল, তাই চুরি করলে গিয়ে ছিদেমের ঘরে। এত মনোহারী জিনিষ, একটা বস্তা ভর্ত্তি! এদিকে ছিদেমের বউ না কি ওকে মা বলে। মা হয়ে ছেলের গলা কাটা! ছিদাম ত রেগে আগুন, বলে ওকে এক বচ্ছরের জেল খাটাব। পানুরা বলেছে, গরিব দুঃখী লোক, টাকার লোভে চুরি করেছে, ওরা ওকে ছাড়িয়ে আনবে। কিন্তু ছিদেমে কি সহজে ছাড়বে? মা সেজে সয়তানি কে সয় বল দিকি মা?"

কুড়ি-বাইশ দিন দোকান ঘরে কাটাইয়া দিয়া আজ হঠাৎ চুরি করিল কথাটা বিশ্বাস হইল না। হয়ত এই দুষ্ট লোকগুলা শিখাইয়া-পড়াইয়া উহাকে চোর তৈয়ারী করিয়াছে, এমন হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। তাই হয় ত উহাদের ছাড়াইয়া আনিবার এত দরদ।

বিচার হইয়াছে, খবর পাইয়াছি। পানুরা ছিদামকে অনেক বুঝাইয়া বউটাকে ছাড়াইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু বউ ছাড়া চায় না, তাই আদালতে নিজে বলিয়াছে যে, জানিয়া শুনিয়াই জেলে যাইবার জন্ত সে তাহার একমাত্র হিতৈষী ছিদামের ঘরে চুরি করিয়াছিল। এখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলে পৃথিবীতে তাহার আর কোনো আশ্রয় নাই। স্বামীর অন্নের আশা তাহার ঘুচিয়াছে, পরের অন্নের দাম সে দিতে পারিবে না। "পানুর ঘরে চুরি করতে ত আমি পারতুম, কিন্তু ও লক্ষীছাড়া

আমায় জেলে দেবে না জেনেই আমি ছিদামের করেছি। আমায় ওদের হাতে আর সঁপে দিও না, বাবা" বলিয় সে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে।

কায়েত-বউ হাজতেই আছে, যাহারা তাহার প্রাণ-কর্ত্তা হইতে চাহিয়াছিল, এখন তাহাদের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে।

রবীন্দ্র প্রশস্তি

শ্রীইন্দুভূষণ দেব বিদ্যাবিনোদ

হে রবীন্দ্র, ভারতের লহ নমস্কার।
সমগ্র ভারত আজি তব প্রতিভায়
বিজয়-পতাকা-তলে মিলিয়াছে আসি,
বিস্মৃত সে আপনার বেদনার রাশি
তোমার বন্দনা-গানে; তার কণ্ঠ-সাথে
অধীর আনন্দভরে অকুণ্ঠ ভাষাতে
মিলায়েছে কণ্ঠ আপনার নর-নারী
এ বিশ্বের; রসবেত্তা সত্যের পূজারী
শুনিয়াছে কণ্ঠে তব সত্যদৃপ্ত বাণী
ভূগোলের স্বার্থভরা শাসন না মানি।
তিব্বত জাপান জাভা শ্যাম ব্রহ্ম চীন
আরব পারস্য তুর্ক মিশর মার্কিণ
রাশিয়া জার্ম্মান গ্রীক ইংরাজ ফরাসী
তীর্থযাত্রী দীর্ঘপথে দাঁড়ায়েছে আসি
বঙ্গের অঙ্গনে; গঙ্গোদকে ধৌত করি
পথশ্রান্তি, করপুট পরিপূর্ণ করি
বহিয়া এনেছে অর্ঘ্য; তব বন্দনার
উঠিয়াছে অভ্রভেদী বিরাট ঝঙ্কার—
বিচিত্র সে সঙ্গীতের তরঙ্গ মাঝার
হে রবীন্দ্র, জগতের লহ নমস্কার।

যে আনন্দ-মন্দাকিনী বহাইলে তুমি
ধরণীর শ্যাম বক্ষে, চুমি তটভূমি
সকল দেশের, চলেছে সে নৃত্যশীলা
আত্মভোলা লাস্যময়ী উচ্ছল-ফেনিলা
কল্লোলিনী। সে স্বচ্ছ প্রবাহে অবগাহি
স্নিগ্ধতনু নরনারী জয় তব গাহি
শ্রদ্ধানম্র শান্তকণ্ঠে, অঞ্জলি ভরিয়া,
হে রবি, সে পুণ্যবারি তোমারে স্মরিয়া
প্রবাহিনী-বক্ষে তাহা করিছে অর্পণ
পুনরায়; অপূর্ব্ব সে প্রীতির তর্পণ!
তৃপ্তি-মৌন হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ উপহার
হে রবীন্দ্র, মানবের লহ নমস্কার।

কবি, তব মনীষার নবীন উষায়
সাজাইলে যে অপূর্ব্ব মঞ্জু সুষমায়
মানসীপ্রতিমা তব; যে লাবণ্য-লেখা
বার-বার ভরি দিলে তার রূপ-রেখা
বিচিত্র ভঙ্গীতে; আজিও সে সমুজ্জল
ফুল্ল শতদল সম; বিলাস-উচ্ছল
শুভ্র, অনবদ্য। তব সঙ্গীতের সুর
মঞ্জুল গুঞ্জনে বাজে মৃদুল মধুর
কখনও বা মন্দ্ররবে। হে ভাব-বিলাসি,
প্রিয়া-সাথে বিচরিলে স্বপ্ন-সুখে ভাসি
কুসুমিত মধুবনে; তোমার কল্পনা
শতছলে বিরচিল শত আলিম্পনা
ভারতীর পদ্মাসনে। কবি, তব ভাষা
পরিব্যাপ্ত করিয়াছে ভারতের আশা
চরাচরে; নাটকে, প্রবন্ধে, প্রহসনে,
উপন্যাসে, ইতিবৃত্তে, লিপি-বিরচনে,
রূপকে, কৌতুকে, চিত্রে, কাব্যে, গল্পে, গানে
রূপ রস-রচনার শত অবদানে
সাজায়েছ নিত্যনব ছন্দ-উপহারে
প্রাণ ভরি আপনার দেশের ভাষারে—
দেছ রূপ অপরূপ, সুন্দর, উদার;
হে রবীন্দ্র, বাঙালীর লহ নমস্কার।

হে ঋষি, হে সত্যদ্রষ্টা, তপস্যা-গৌরবে
ভারতেরে বিশ্বব্যাপী বাণীর উৎসবে
করিয়াছ জয়দৃপ্ত; ভারতের বাণী
শুনাইতে সুধীজনে, বীণাখানি
সুরে ভরি, দেবর্ষির মত আপনারে
নিঃশেষে বিলায়ে তুমি দিলে বারে বারে
মহাসুখে; প্রেম দিয়ে সত্য দিয়ে তুমি
প্রীতিপাশে বাঁধিয়াছে সারা বিশ্বভূমি;
ব্রত তব মানবের কল্যাণ-প্রচার—
হে রবীন্দ্র, ভারতের লহ নমস্কার।

পারস্য-ভ্রমণ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মাঘ মাসের শেষের দিকে একদিন খড়দায় কবির কাছে শুনলাম পারস্য দেশের নিমন্ত্রণ ফের এসেছে। যাওয়ার কষ্টের কথা ভেবে সবাই কবিকে যেতে দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু খবর পাওয়া গেছে যে এরোপ্লেনে গেলে সহজেই পথের কষ্ট অতিক্রম করা যায়। কলিকাতা থেকে সোজা পারস্য দেশের দক্ষিণে বুশীর (Bushire বা Bouchir) পর্য্যন্ত ওলন্দাজী হাওয়াই বহরের বন্দোবস্ত আছে। কবি তাদেরই বিমানরথে যাত্রা করতে ইচ্ছুক এবং তাঁর কাছেই শুনলাম যে, তাঁর ইচ্ছা যে আমি সঙ্গে যাই। বলা বাহুল্য, একে পারস্যদর্শন, উপরন্তু এরোপ্লেনে গমন, আমি মহানন্দে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকলাম।

এরোপ্লেনের শব্দ, ঝাঁকানি এবং কাঁপুনি নাকি সাধারণ লোকের পক্ষেই অসহ্য, তারপর কবির বয়স এবং শরীরের অবস্থা, দুইই ও-রূপ দুরূহ পরিক্রমের প্রতিকূল। অনেকে অনেক কিছু বললেন, কিন্তু কবি স্বয়ং সে-সব কথা না শুনে প্রবাদ বাক্য মতে একদিন বিকালে ওলন্দাজী এরোপ্লেনে উঠে "ফলেন পরিচীয়তে" রূপ পরীক্ষা করলেন। সেই এরোপ্লেনের কর্ণধার ছিলেন আটলান্টিক পরিক্রমণকারী প্রসিদ্ধ পাইলট ভ্যান ডাইক্ (Van Dyck) এবং সঙ্গে সস্ত্রীক স্থানীয় ওলন্দাজ কন্সাল এবং শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী। এরোপ্লেনে যাওয়াই স্থির হ'ল।

রয়াল ডাচ এয়ার মেল (K. L. M.) কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবস্থা হ'ল আমাদের বুশীর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। তারা প্রথমে চারজনকেই (কবি, তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী এবং আমি) এক এরোপ্লেনে নিয়ে যেতে রাজী হয়ে পরে হঠাৎ খবর দিল যে কোনো প্লেনে দুজনের বেশী সওয়ারী নিতে পারবে না। কবি বিরক্ত হয়ে এরোপ্লেনের ব্যবস্থা রদ ক'রে দিলেন এবং বোম্বাইয়ের পারসীক কন্সালকে (ইনিই আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা করছিলেন) লিখলেন জাহাজে সব ব্যবস্থা করতে। আমি ত শুনে খুব দমে গেলাম। পরে টের পাওয়া গেল যে, ওলন্দাজ কোম্পানীও কবিকে নিয়ে যাওয়ার মত অত বড় বিজ্ঞাপনের সুযোগ হারাতে চায় না। দিন-কয়েক কথাবার্ত্তা এবং জাভায় টেলিগ্রামে খোঁজ-খবরের পর জানা গেল ৪ঠা এপ্রিলের এরোপ্লেনে দু-জন পর্য্যন্ত এবং ১১ই এপ্রিলের এরোপ্লেনে তিন জন পর্য্যন্ত তারা নিতে প্রস্তুত। একজন আগে গেলে পথের ব্যাপার এবং গন্তব্য স্থানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। সুতরাং ঠিক হ'ল আমি প্রথম প্লেনে যাব, কবি এবং অন্য সহযাত্রীরা ১১ই রওয়ানা হবেন।

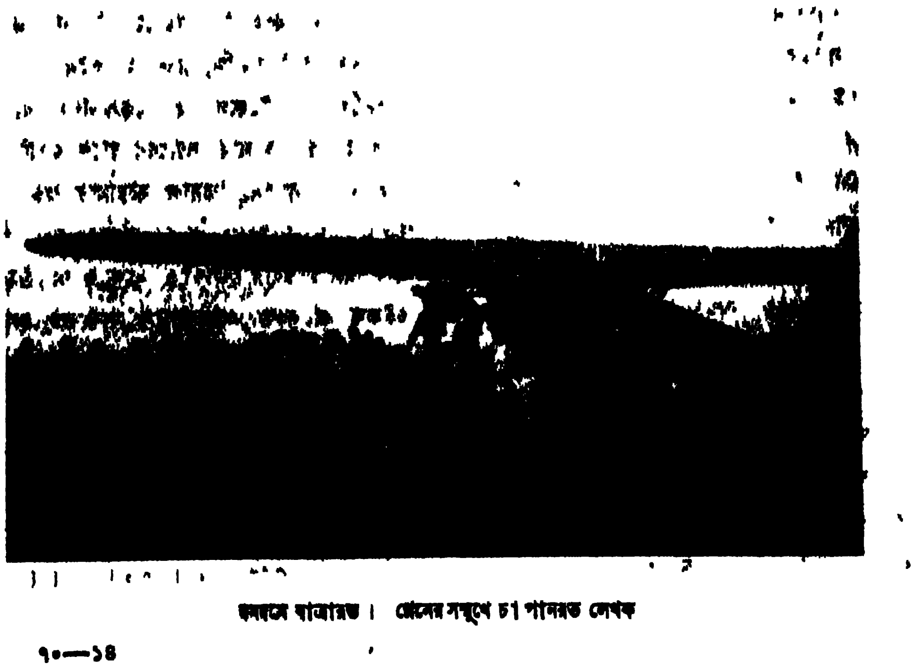
* * *

৪ঠা এপ্রিল ভোর তিনটার সময় উঠে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। ভোরে ওঠা অভ্যাস নেই, কাজেই খাওয়া-দাওয়া বিশেষ কিছু হ'ল না, সে-সব গলা দিয়ে নামতেই চায় না। সুতরাং কোন রকমে খানিক কফি এবং সন্দেশ খেয়ে তাড়াতাড়ি মোটরে বসতে হ'ল। তারপর দমদমের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট। ভোর পাঁচটায় এরোপ্লেন ছাড়বে, দমদম থেকে। দমদমের কাছাকাছি গিয়ে দেখা গেল চারিদিকে কুয়াসা। এরোড্রোমের রাস্তার মোড় এমনিতেই দেখা যায় না, তার উপর অন্ধকারে কুয়াসায় ঢাকা, অনেক ঘুরে সেখানে পৌছান গেল। এরোড্রোমে তখন সবে লোকজন আস্তাবলের (ফরাসী hangar শব্দের ওই অর্থ) দরজা খুলে এরোপ্লেন বার করার চেষ্টা করছে। আস্তাবলের বিরাট ঘরে আর একটি ছোট প্লেনও ছিল। খানিক ঠেলাঠেলির পর ওলন্দাজ কোম্পানীর পুষ্পকরথ বেরোলেন। প্রসিদ্ধ ফোকার কোম্পানীর প্রস্তুত

F. 7. type-এর, একজোড়া পাখাওয়ালা (monoplane) যাত্রীবাহী প্লেন। মনে পড়ল গত মহাযুদ্ধের গোড়ায় ইংলণ্ডে প্রায় প্রতিদিনই কাগজে বেরোতো যে জার্মানরা এই ফোকার কোম্পানীর লড়াইয়ে প্লেন দিয়ে ইংরেজ এবং ফরাসী প্লেন ধ্বংস ক'রে ছারখার করছে। রয়াল ডাচ্ এয়ার মেলের খ্যাতিও অনেকটা এই প্লেনের দরুণ। ওলন্দাজ পাইলটদেরও খুব খ্যাতি, জার্মানদের মতই তাদের কার্য্যকৌশল ও স্থিরবুদ্ধি জগদ্বিখ্যাত।

এই প্লেনটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল। কবি যেখানায় গিয়েছিলেন সেটি F. 12 type অনেক বড় এবং সেই জন্য অনেক বেশী আরামপ্রদ। নীল রঙের প্লেন, গায়ে সোনালী অক্ষরে নাম লেখা। প্রকাণ্ড চওড়া একজোড়া পাখা এবং ছোট মোটা পালযুক্ত লেজ। দেখলে মনে হয় যেন প্রকাণ্ড নীল রঙের একটা গৃধিনী ডানা মেলে রয়েছে। তিনটি ইঞ্জিন—একটি করে প্রপেলার দেওয়া—মাঝেরটি fuselage অর্থাৎ প্লেনের শরীরের আগায় বসান, আর দুটি দুপাশের ডানার নীচে ডিম্বাকৃতি এলুমিনিয়মের খোলে বসান। এরোপ্লেনের শরীরের সামনের দিকে দুটি লম্বা পা নেমে গেছে, তার শেষে দুটি প্রকাণ্ড বেলুন টায়ার। লেজের নীচে লাঙলের ফলার মত ইস্পাতের একটি জিনিষ লাগান আছে, এটি প্লেনের নোঙর। এই তিনটির উপর ভর দিয়ে এরোপ্লেন মাটিতে দাঁড়ায়। ভিতরে সামনে পাইলটদের 'ককৃপিট্' সেখান থেকে এরোপ্লেন চালনা করা হয়। নানাপ্রকার গেজ, মিটার হাতল সাজান। পাইলটের সাম্‌নে একটি বোর্ডে কাগজ পেন্সিল আঁটা—লিখে এবং অঙ্গভঙ্গি করে কথাবার্ত্তা চালাতে হয়—তার উপর ছোট লাল রঙের ওরাংওটাং পুতুলের ম্যাস্কট, তার একটা হাত উর্দ্ধে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করছে। প্লেনের মাঝে যাত্রী এবং মালপত্রের জন্য কামরা, তাতে দুই সারিতে চারখানি সাধারণ বেতের চেয়ার এঁটে বসান। পাইলট কামরার দিকে একটি চেয়ারের সামনে এরোপ্লেনের বেতার যন্ত্রপাতি বসান। সেখানে ওয়্যারলেস্ অপারেটর প্রায় সর্ব্বক্ষণই কানে ফোন লাগিয়ে বসে আছে। এই ঘরটির দু পাশে সেলুলয়েডের সার্সী বসান জানালা। তার উপরে চারিধারে রেলগাড়ীর হাটর‍্যাকের মত র‍্যাক। পিছনে একটি ছোট বাথরুম এবং জিনিষপত্র রাখবার কুঠ্‌রি।

ভারতবর্ষ থেকে বহির্জগতের বিমানপথের যোগ রাখে



জলযোগে যাত্রারম্ভ। প্লেনের সম্মুখে চা পানরত লেখক

তিনটি কোম্পানীর এরোপ্লেনের বহর। ইংরেজী ইম্পিরিয়্যাল এয়ারওয়েজ করাচী থেকে লণ্ডন বিষম খরচে ধীরগতিতে সাপ্তাহিক ডাকবাহী প্লেন চালায়। কলিকাতার চিঠি ওলন্দাজ বা ফরাসী প্লেনে দিতে পারলে অন্ততপক্ষে চারদিন আগে বিলাতে যেতে পারে, কিন্তু তাহলে বিলাতী কোম্পানীটি মাঠে মারা যায়। কাজেই তাদের এদেশ থেকে ডাক নেবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইংরেজ কোম্পানী ভিন্ন ওলন্দাজ রাজকীয় ডাকবাহী প্লেন জাভা হইতে আমষ্টারড্যাম (হল্যাণ্ড)—রেঙ্গুন কলিকাতা করাচী হইয়া—প্রতি সপ্তাহে যায় এবং ফরাসী এয়ার ওরিয়েন্ট ইন্দোচীনের সাইগন হইতে ঐ পথে মার্সাই (ফ্রান্স) প্রতি পক্ষে একবার যায়। ফরাসী প্লেনগুলি ছোট ফোকার, কিন্তু যায় সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত। ওলন্দাজ প্লেনগুলি প্রায় সমান বেগেই যায়। এই ওলন্দাজ বহর সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং সময় হিসাবে নিয়মিত বলিয়া খ্যাত।

* * *

যখন এরোড্রোমে পৌঁছলাম তখনও রাত্রের অন্ধকার যায় নি। ক্রমে ক্রমে আকাশ ফরসা হতে আরম্ভ হ'ল। প্রায় পাঁচটার সময় এরোড্রোমের খালাসীর দল প্লেনটিকে বার করেছিল। তার মিনিট দশেক পরে স্থানীয় K. L. M. কোম্পানীর এজেন্ট এবং ড্রেসিং গাউন ও চটি-পরা একটি সাহেব দেখা দিলেন। কর্ম্মচারী মহাশয় আমার লগেজ ওজন করলেন। বিনা মাশুলে মাত্র পনের কিলোগ্রাম (পনের সের আন্দাজ) যাত্রী পিছু নিতে দেওয়া হয়। বাড়তি জিনিষের জন্ত প্রায় ছয় টাকা সের (কলিকাতা হইতে বুশীর) হিসাবে মাশুল দিতে হ'ল। মাল ওজন হয়ে গেলে বাইরে দেখলাম এরোপ্লেনের কর্ম্মচারীরা এসেছেন। এজেন্ট পাইলট এবং অন্তদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এজেন্ট মহাশয় আমার স্ত্রীকে প্লেনের ভিতরের সব ব্যবস্থা দেখতে অনুরোধ করলেন এবং তার পর সঙ্গের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকেই দেখালেন।

ইতিমধ্যে যন্ত্রীর দল ইঞ্জিনগুলি এবং প্রধান পাইলট চালনা যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। প্রত্যেক প্লেনে পাইলট, সহকারী পাইলট, যন্ত্রী ও সহকারী যন্ত্রী থাকে। সহকারী যন্ত্রী আবার বেতারেরও চালক। পরীক্ষায় দেখা গেল, বাঁ-পাশের ইঞ্জিনের প্লাগের কিছু দোষ আছে। যন্ত্রীর দল চট্‌পট সেগুলি বদলে ফেল্‌ল। তারপর তিনটি ইঞ্জিন একে একে পুরোদমে চালান হ'ল। ইঞ্জিনের গর্জ্জনে কানে তালা লাগবার উপক্রম হ'ল এবং তিনটির প্রপ্রেলারের ঝাপটায় ঝড় বয়ে ধুলোর রাশ উড়ল। এই ওলন্দাজ প্লেনের ইঞ্জিন ষ্টার্ট করার প্রথা একটু নূতন। প্রত্যেক ইঞ্জিনের starting chamber ছোট কামানের ব্রীচের মত। তার ভিতর একটি বারুদের কার্ত্তুজ পরিয়ে দিয়ে কামানদাগার সুতলী (lanyard) ধরে যন্ত্রী চেঁচিয়ে বলে "O K" ভিতর থেকে পাইলট উত্তর দেয় "O K" পুনর্ব্বার যন্ত্রী উত্তর দেয় "Hold tight" এবং পাইলটি "Hold tight" বলা মাত্রই সুতলী টেনে কার্ত্তুজ দেগে দেয়। বারুদের বিস্ফোরণে ইঞ্জিন ষ্টার্ট হয়।

ইঞ্জিন ও যন্ত্র-পাতি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। পাইলট এসে উঠে বস্‌তে বললেন। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে উঠে বসলাম। দরজা ভাল ক'রে এঁটে বন্ধ করা হ'ল। আমার এই প্রথম এরোপ্লেনে চড়া। প্রথম বারেই একেবারে প্রায় তিন হাজার মাইল। আমার আগে এই পথে কোন বাঙালী গিয়াছেন কি-না জানি না, কিন্তু পরিচিত কেউ যাননি, সুতরাং আমার কৌতূহল এত বেশী ছিল যে, উদ্বেগের স্থান ছিল না। যাত্রা সুরু হ'ল। সহকারী যন্ত্রী আমার চেয়ারের পাশে একটি ছোট জানালা খুলে দিয়ে বললেন, 'রুমাল উড়াবার জন্ত'। এরোপ্লেন গড় গড় ক'রে taxi করে মাঠের অন্ত পারে চল্‌ল। এরোপ্লেন হাওয়ার বিপরীত মুখে ছাড়া উঠতে পারে না, এইজন্ত প্রত্যেক এরোড্রোমে মাস্তলের আগায় প্রকাণ্ড মোজার মত হাওয়ার গতির দিকপ্রদর্শক থাকে।

এরোপ্লেন ধীরে ধীরে ঘুরে মাঠের পারে হাওয়ার বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়াল। হঠাৎ তিনটি ইঞ্জিনই প্রচণ্ড গর্জ্জন ক'রে উঠল। Rev. Meter-এ দেখলাম কাঁটাটি ১৮—২০—র মধ্যে কাঁপছে। তারপরেই এরোপ্লেন মাটির উপর প্রবল বেগে ছুটল, প্রথমে সমান ভাবে

তারপর ঘোড়ার গ্যালপের মত খুব ঝাঁকুনি দিয়ে, তখন প্লেন মাটি ছাড় ছাড়—ঠেকছে আর উঠছে। একটু পরে সব ঝাঁকুনী থেমে গেল, নীচে তাকিয়ে দেখি যে মাটি প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট নীচে। বেশ খানিক উঠে যাবার পর দমদমার চার পাশ বেশ দেখা গেল, ক্ষেতগুলির মাঝে মাঝে গাছের সারি, ঝোপঝাড়—সবই কি রকম বেঁটে মতন। হঠাৎ দেখলাম ক্ষেত জমি সব কেমন কাৎ হয়ে গেল। অনেক নীচে এরোড্রোম দেখা গেল, অনেকগুলি রুমাল চাদর উড়ছে, ছোট ভাই দু-হাত দিয়ে সেমাফোর করছে। দেখতে দেখতে সব ছাড়িয়ে প্লেন অনেক উপরে উঠে গঙ্গার দিকে চলল। অন্ধকার ও কুয়াসার ভিতর দিয়ে আবছায়া আবছায়া কলকাতার শহর দেখা গেল, কিন্তু কিছু চেনবার উপায় ছিল না।

মাটির থেকে এরোপ্লেনের উচাই আন্দাজ করা মুস্কিল, কথা ব'লে জানবারও উপায় নেই, ইঞ্জিনের গর্জ্জন থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কানে বিলক্ষণ কিছু তুলো সবাই গুঁজেছে। তবে পাহাড় চড়ার আন্দাজে মনে হয় হাজার দুই ফুট উপর দিয়ে আমরা গঙ্গাপার হলাম। দূরে বাঁ পাশে বালি ব্রীজ দেখা গেল। গঙ্গা এঁকেবেঁকে কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। গঙ্গাপার হয়ে খানিক দূর গিয়ে নীচে দাবার ছকের মত ক্ষেতজমি দেখা গেল। সূর্য্যদেবও দেখা দিলেন।

* * * *

তিনটে ইঞ্জিনের সমস্বরে ভীম গর্জ্জন এবং সমস্ত প্লেনটির থর থর করে কাঁপুনি, মাঝে মাঝে বায়ুস্রোতের হিল্লোলের দরুণ নাগরদোলার চাল, অনেক নীচে ছোট ছোট পুকুর ক্ষেত, মাঠের রাস্তায় মাঝে মাঝে পিপড়ের সারের মত গরু বাছুরের পাল ধুলো উড়িয়ে চলেছে, গাছ-পালার ঝোপ যেখানে বেশী সেখানটায় একটু গাঢ় সবুজ। অনেক উপর থেকে নীচের জিনিষ সব নূতন দৃষ্টিকোণ (angle of vision) দিয়ে দেখতে হয়, কাজেই নিতান্তই পরিচিত বাংলা দেশটা হঠাৎ কেমন যেন অপরিচিত হয়ে গেল। শুনেছিলাম এরোপ্লেন রেলপথ ধরেই চলে, কিন্তু রেলপথ গোড়াতেই চোখের বার হয়ে গেল। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডটি মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছিল বটে এবং একবার



বুশীর এরোড্রোম

একটি ছোট ষ্টেশনও যেন দেখা গেল। সহকারী যন্ত্রী মশায় তাঁর বেতার যন্ত্র ছেড়ে উঠে ফ্লাস্ক্ থেকে গরম চা মোটা কাগজের তৈরি ডিব্বি গ্লাসে ঢেলে আমার পাশে জানালার নীচে আঁটা ব্রাকেটে গলিয়ে আটকে দিলেন, এবং প্রথমে কিছু স্যাণ্ডউইচ তারপর বড় এক টুকরো কেক খেতে দিলেন। এই খাওয়ার পালা এদের সারাদিন চলে, গরম চা, (পরে ঠাণ্ডা)—বিনা দুধ চিনি—রুটি মাখন কেক বিস্কুট, টিনের মাছ, বিলাতি শুটকি, কলা, কমলালেবু, সসেজ ডিম, ঠাণ্ডা মাংস, খাওয়ার সময় অসময় কিছু নেই। সহকারী পাইলট্ দেখলাম কি সব কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত। খানিক পরে এক কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে হাজির। কাগজে প্রশ্ন লেখা যে আমার ওজন কত আমি জানি কি-না। বুঝলাম এঁদের প্লেনে সবশুদ্ধ বোঝা কত চেপেছে তা জানা দরকার। ওজন লিখে তার নীচে প্রশ্ন করলাম কতটা উপরে উঠেছি। তিনি পাইলটের ঘরে খোঁজ করে বললেন ১১০০ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৩৫০০ ফুট। গরম কিন্তু বিশেষ কমেনি।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে নীচের পলিমাটির সবুজ ও ধূসর রং বদলে লাল মাটি দেখা দিল। গাছপালাও কমে এল। মাঝে মাঝে তালগাছের ফ্রেম আঁটা চক্‌চকে আয়নার



বুশীর, ব্রিটিশ কনসলেটের কাছে। সম্প্রতি এই ব্রিটিশ পতাকা নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে

মত দীঘি পুকুর, তার পাশে খেলার ঘরের মত খড়ের ছাওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট কুটীরে ভরা গ্রাম, জমিও খানিক চষা, খানিক ডাঙা। বুঝলাম বীরভূম পার হচ্ছি। আরও খানিক গিয়ে ছোটবড় পাহাড় দেখা দিল। তারপর বেশ বড় বড় পাহাড়, দূরে বালিভরা নদী। একটা পাহাড় দেখে মনে হ'ল কাশীপুর পঞ্চকোটের পাহাড়। তারপর ক্রমাগত পাহাড় পর্ব্বত উপত্যকা, বন-জঙ্গল, মাঝে মাঝে অল্প আবাদ জমি, দু-একটা ছোট নদী এঁকেবেঁকে চলেছে, বালির বুকে রূপোলি জলের রেখা চিক্‌চিক্ করছে। ক্রমে সমস্তই কি রকম একঘেয়ে ঠেকতে লাগল, বোধ হয় মানুষ বা মনুষ্যকীর্ত্তির কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না ব'লে।

বেলা নটা, সাড়ে নটার সময় পাহাড়ে ঘেরা প্রকাণ্ড নদী সামনে দেখা গেল। এ জায়গা অত উপর থেকেও না চিন্‌বার উপায় নেই। শোন নদ এবং রোহ্‌টাস্ পর্ব্বতমালার দৃশ্য একবার দেখিলে ভোলা যায় না। নদীর কাছে কি কারণে প্লেন অনেকটা নেমে গেল। নদীতে গরু মোষের পাল, পাড়ের বালির উপর রাখালছেলেদের দৌড়াদৌড়ি, জলে সাঁতার স্নান, মেয়েদের কাপড় কাচা সবই বেশ দেখা গেল। শোণের বালিভরা বিশাল বুকের উপর দিয়ে স্বচ্ছ জলের স্রোত বয়ে চলেছে, ওপারের পাহাড়ের শ্রেণী এরোপ্লেনের চেয়ে উঁচু। এতক্ষণ কেবল নীচের দিকে তাকিয়ে সব জিনিষের অচেনা ভাব দেখ্‌বার পর একটু সহজভাবে উপরের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর স্বাভাবিক ভাব দেখে তৃপ্তি হ'ল—পুষ্পক রথে, দেবতার আসনে বস্‌লে মনের মধ্যে একটা আত্মপ্রসাদ আসে বটে, কিন্তু তার সঙ্গেই চেনা জগতের সঙ্গে একটা বিচ্ছেদের ভাব আসায় বিশেষ অসোয়াস্তি অনুভব করতে হয়,—উচ্চাসনের অশান্তি ঢের!

নদী পার হয়ে প্লেন ক্রমেই উপরে উঠ্‌তে লাগল, পাড়ের পাহাড়েরও যেন শেষ নাই, ধাপের পর ধাপ উঠে গেছে যেন দৈত্যদের সিঁড়ি—প্রত্যেক ধাপের উপর একটু সমতল জমি তার পরেই আবার পাহাড়। প্লেন ধীরে ধীরে উঠে পাহাড় পার হয়ে উড়ে চল্‌ল। আবার সমতল জমি দেখা দিল, মাঝে মাঝে খোলার চালের বাড়ি ভরা গ্রাম এবং ছোট শহর, দু-একটি ছোট নদী। বেলা এগারটার সময় যমুনা নদী দেখা গেল। পার হবার সময় ডান পাশে যমুনা ব্রীজ এবং এলাহাবাদের কেল্লা এবং পার হবার পর এলাহাবাদ শহরের মেয়র সেন্ট্রাল কলেজের টাওয়ার, খস্‌রুবাগের ইমারতগুলি এবং আরও সব পরিচিত জায়গা দেখতে পেলাম। খানিক পরে এলাহাবাদ ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে মনে হ'ল সামনের

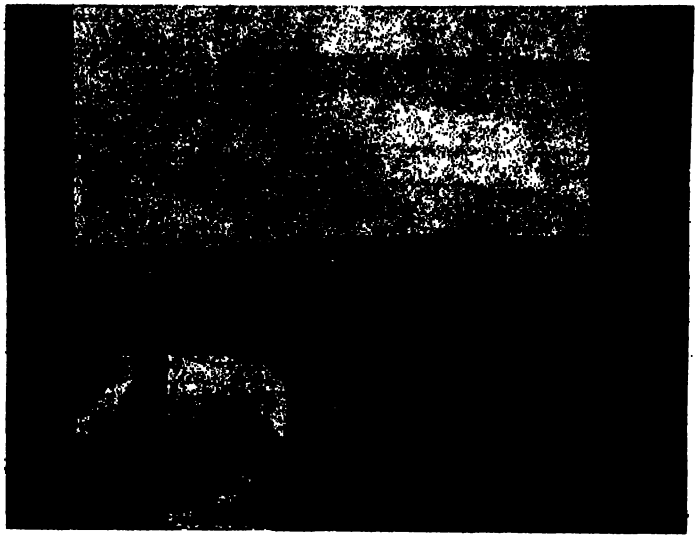
আকাশে আরও উপরে আর-একটা কি উড়ছে, সেটা এরোপ্লেন না পাখী ভাবছি এমন সময় ইঞ্জিনের আওয়াজ খুব কমে গেল, সেটাও অদৃশ্য হয়ে গেল। নীচে দেখলাম একটা এরোড্রোম ক্রমেই যেন এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে প্লেন মাটির দিকে নেমে এল।

এরোপ্লেনে নেমে আসাটা ভারী আরামের, দোলানি ঝাঁকানি কিছু মাত্র নেই, ইঞ্জিনও মাটিতে ঠেকার ঠিক আগে পর্য্যন্ত প্রায় বন্ধ থাকে বলে শব্দও নেই দিব্যি নীচের দিকে ঝুঁকে তর্‌তর্‌ করে প্লেন নেমে আসে। মাটিতে ঠেকার আগে ইঞ্জিন ফের চালান হয়। তার পরই মাটিতে ঠেকার দরুণ একটু ঝাঁকুনি, সঙ্গে সঙ্গে গড় গড় আওয়াজ ও ঘোড়-দৌড়ের মত লাফঝাঁপ। একটু পরেই চাকা দুটি সমানভাবে মাটির উপর চলতে থাকে। যথাস্থানে পৌছালেই ইঞ্জিন বন্ধ করে প্লেন থামান হয়।

এলাহাবাদ বেশ গরম। শহর থেকে এরোড্রোম প্রায় দশমাইল দূরে, বামরাওলি গ্রামের গায়ে মাঠের মধ্যে। নেমে একটু হেঁটে চলে পা ঠিক করছি এমন সময় ললিত ভায়া (ডাঃ ললিতমোহন বসু) খাবার-দাবার নিয়ে উপস্থিত। তাঁর মোটরে বসে সে-সবের সদ্ব্যবহার করতে করতে মেটে লাল রঙের আর একটি এরোপ্লেন (এটিও ফোকার মনোপ্লেন) এসে নামল। শুনলাম এটি ফরাসী এয়ার ওরিয়েণ্ট কোম্পানীর প্লেন, সাইগন (ইন্দোচীন) চলেছে. ইহাই বোধ হয় আমি সামনের আকাশে দেখেছিলাম। খাওয়া সাঙ্গ করে ললিত এবং আর বন্ধুদের এরোপ্লেনের ভিতরটা দেখালাম। ইতিমধ্যে ইঞ্জিনগুলি চালান হয়ে গেল। প্রধান যন্ত্রী মশায় দুটি বুড়ো আঙুল উপরে দেখিয়ে বুঝালেন যে সব ঠিক আমি উঠলেই হয়। উঠে পড়লাম, এরোপ্লেনও রওনা হ'ল।

* * *

নদনদী তেপান্তরের মাঠ, ছোটবড় শহর সব নীচে ফেলে প্লেন হু হু ক'রে ঝড়ের মত ছুটে চলল। উপরের হাওয়া বিপরীত বলে নীচের স্তরেই (৩০০০-৪০০০ ফুট) যাওয়া হচ্ছিল। শুনলাম সহকারী যন্ত্রী মশায় ক্রমাগত যন্ত ঝোড়ো আপিস (মেটিওরোলজিক্যাল আপিস)



লেখকের হোটেল হইতে বুশীয়ের দৃশ্য

থেকে বেতারে হাওয়ার অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছিলেন। একবার দূরে প্রকাণ্ড হ্রদের মত কি একটা দেখা গেল, তার ওপরে সুদূর সীমানায় আব্‌ছায়া পাহাড়ও দেখা যাচ্ছিল। হ্রদের থেকে চারিদিকে সোজা সরল রেখার মত কতকগুলি নালা—বোধ হয় জলসেচনের নালী। সেগুলির ধারে সবুজ ক্ষেত, আরও দূরে মাঠ, তাতে অসংখ্য গরু ভেড়া মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ক্ষেতের ফসল কেটে রাখা হয়েছে, সে জায়গা-গুলি পরিষ্কার উঠানের মত রোদে তক্‌ তক্‌ করছে। বিপরীত হাওয়া এড়াতে গিয়ে প্লেন আরও অনেক নীচে নামল। লোকজনের মুখ অস্পষ্ট দেখতে পেলাম, প্রায় সবাই উপরে তাকিয়ে এরোপ্লেন দেখছে এবং দেখাচ্ছে। এতদিন আমিও উপরে এরোপ্লেনই দেখেছি এবং দেখিয়েছি। এই প্রথম দর্শক থেকে দ্রষ্টব্যশ্রেণীভুক্ত হলাম। গরু ভেড়ার পাল এরোপ্লেনের আওয়াজে দিশাহারা হয়ে চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছিল। উপরে



বুশীরে কবির গাড়ীর কাছে ভীড়

তাকাবার বুদ্ধি তাদের যোগায় না দেখ্‌লাম। মহিষ কিন্তু এসব বিষয়ে খুব রাশভারী, অধিকাংশই একবার মুখ তুলে সঙ্গীদের কীর্ত্তি দেখে ফের গম্ভীরভাবে চর্‌তে থাকল, বাকীগুলি মুখও তুলল না।

ক্রমেই নীচের মাটির চেহারা গাছপালাশূন্য ও বিরস হতে থাকল। ছোটবড় পাহাড়গুলিও তথৈবচ। রাজপুতানার সীমানা পার হয়েছি মনে হ'ল। পুরুষের পাগড়ীতে এবং মেয়েদের কাপড়ে রঙের খেলা দেখা দিল। ক্ষেতের মাঝে মাঝে উজ্জ্বল লাল কমলালেবুর রঙের ঘাঘরা বা কাপড় এবং গাঢ় নীল রঙের ওড়না পরা মেয়ের দল উপর থেকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। ক্রমে পাহাড়ের সংখ্যা বাড়তে লাগল। পাহাড়গুলি অজন্টা থেকে এলোরা যাবার পথে ইন্দ্যাদ্রির মত সমতলপৃষ্ঠ এবং শ্রেণীবদ্ধ ঠিক যেন বিরাট সমুদ্রের ঢেউ জমে পাথরের পাহাড় হয়েছে। দু-চারটা উটও দেখ্‌লাম। কয়েকবার পাহাড়ের শ্রেণীর কোলে বড় বড় পাথরের মধ্যে লুকান নীল জলে ভরা ছোট নদীও দেখা গেল। একটা পাহাড় পার হলাম যার চূড়া থেকে পদতল পর্য্যন্ত পুরানো কালো ছাতাধরা মন্দির ও মঠে ঢাকা। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় দূরে যোধপুর দুর্গ আর তার নীচে শহর দেখা গেল, পাঁচটায় সময় যোধপুরে নামলাম।

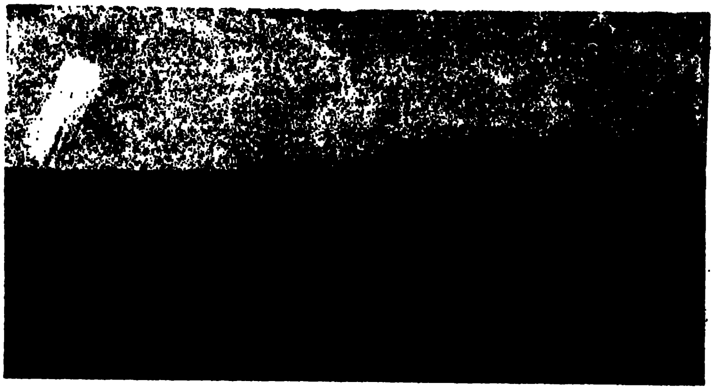
এলাহাবাদ থেকে যোধপুর বিপরীত হাওয়া প্রবল হওয়ায় প্লেনটি খুব দুলেছিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুচক্রে পড়ে হঠাৎ উপর নীচে প্রক্ষিপ্তও হয়েছিল। এরোপ্লেনের ভাষায় একে বলে very bumpy journey. হঠাৎ নেমে যাওয়ার অনুভূতিটা বিশেষ আরামপ্রদ নয়, মনে হয় পায়ের নীচে থেকে সব-কিছু সরে গেল এবং শরীরের নীচের অংশটাও যেন খসে যাবার উপক্রম হচ্ছে। মাটিতে নেমে দেখলাম সমুদ্রে ঝড়ের দোলা খেয়ে জাহাজ থেকে নাম্‌লে যেমন শক্ত জমিও টল্‌ছে বলে মনে হয়, এর বেলায়ও ঠিক তাই। পাইলট আমি নামবার পরই তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞেস কর্‌লেন 'বড় bumpy journey হয়েছে, না? আপনার আবার এই প্রথম অভিজ্ঞতা, শরীর খারাপ লাগছে না ত?' আমি বললাম 'না, সে রকম কিছু ত মনে হচ্ছে না।' ইতিমধ্যে ওলন্দাজ কোম্পানীর যোধপুরের এজেন্ট এসে উপস্থিত। পাইলট আমাকে তাঁর মোটরে বসিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দিলেন। রাত্রে এরোপ্লেন চলে না, কাজেই সেই হোটেলেই স্থিতি। যোধপুর রাজকীয় হোটেলটির ব্যবস্থা খুব ভাল। কিন্তু রাত্রে গরম থাকায় ঘুম ভাল হ'ল না।

ভোর সাড়ে চারটায় আধঘুমন্ত অবস্থায় হোটেল ছেড়ে এরোড্রোমে এলাম। চারিধার নিস্তব্ধ অন্ধকার শুধু

আমাদের প্লেন, একটি ব্রিটিশ সামরিক প্লেন এবং একটি বিদেশীয় প্লেন মাঠের মাঝে দাঁড় করান আছে। সেগুলির আশেপাশে চৌকিদার, কর্মচারী এবং খালাসী কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিন চালাতে গিয়ে দেখা গেল আমাদের প্লেনের মাঝের ইঞ্জিনটি খুব "miss" করছে। যন্ত্রী সহকারীর দল ইঞ্জিন ঠিক করতে লেগে গেলেন। পাইলট আমাকে ঐ এরোড্রোমের নূতন আস্তাবল দেখাতে নিয়ে গেলেন। যোধপুরের মহারাজার এরোপ্লেনের খুব সখ। তাঁর তিনটে সখ প্লেন রয়েছে দেখলাম। তিনি নিজে বেশ ভাল পাইলট। আমরা থাকতে থাকতেই তিনি একটি ছোট ছেলে সঙ্গে নিয়ে (রাজপুত্র বোধ হয়) একটি প্লেনে উঠে বোধ হয় প্রভাত সমীরণ সেবনের জন্যে আকাশে উঠলেন। আমি ভাবলাম 'হাঁ এই রাজার উপযুক্ত হাওয়া খাওয়া।' ফিরে এসে দেখলাম অন্য প্লেন দুটির লোকও এসেছে এবং সেগুলিরও ইঞ্জিনের গোলমাল! বিদেশীয় প্লেনটি শুনলাম রুমানিয়ার কোন রাজপুত্রের, তিনি একা স্বদেশে চলেছেন প্লেনটি পরীক্ষা করতে। সেটি তাঁর ফরমাস মত রুমানিয়াতেই তৈরী হয়েছে। স্বাধীন দেশের রাজা-রাজড়ার সখও পুরুষোচিত।

বেলা আটটায় ইঞ্জিন ঠিক হয়। পেট্রোলের পাইপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটিদেশী ছেলেমানুষ কারিগর যন্ত্রীকে বিশেষ সাহায্য করেছিল, তাকে সবাই খুব ধন্যবাদ এবং কিছু বখশিস দিয়ে খুশী করলে। আবার সেই "O. K." "Hold tight" এবং কার্ত্তিক দাগার পর ইঞ্জিনের গর্জন। একে একে তিনটি ইঞ্জিন অগ্নি উদগীরণ ক'রে গর্জন করতে থাকল। তারপর যন্ত্রী মশায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন এবং আমার পুষ্পকরথে আরোহণ, সবশেষে আকাশে উড্ডীয়ন।

যোধপুর ছাড়িয়ে মরুভূমির প্রকৃত রূপ দেখা গেল। চারিদিকে সাদা বালি ধু ধু করছে, কচিৎ কোথাও একটু বেড়া-ঘেরা আবাদ করা জমি বা মাঠ এবং দু চারটি ঘর-বাড়ী। এসব দেখতে দেখতে চোখে তন্দ্রা এল, ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে দেখি নীচের মাটি কি রকম আশ্চর্য্য সমতল সাদা দেখাচ্ছে কোথাও উঁচু নীচু নেই। গাছপালা



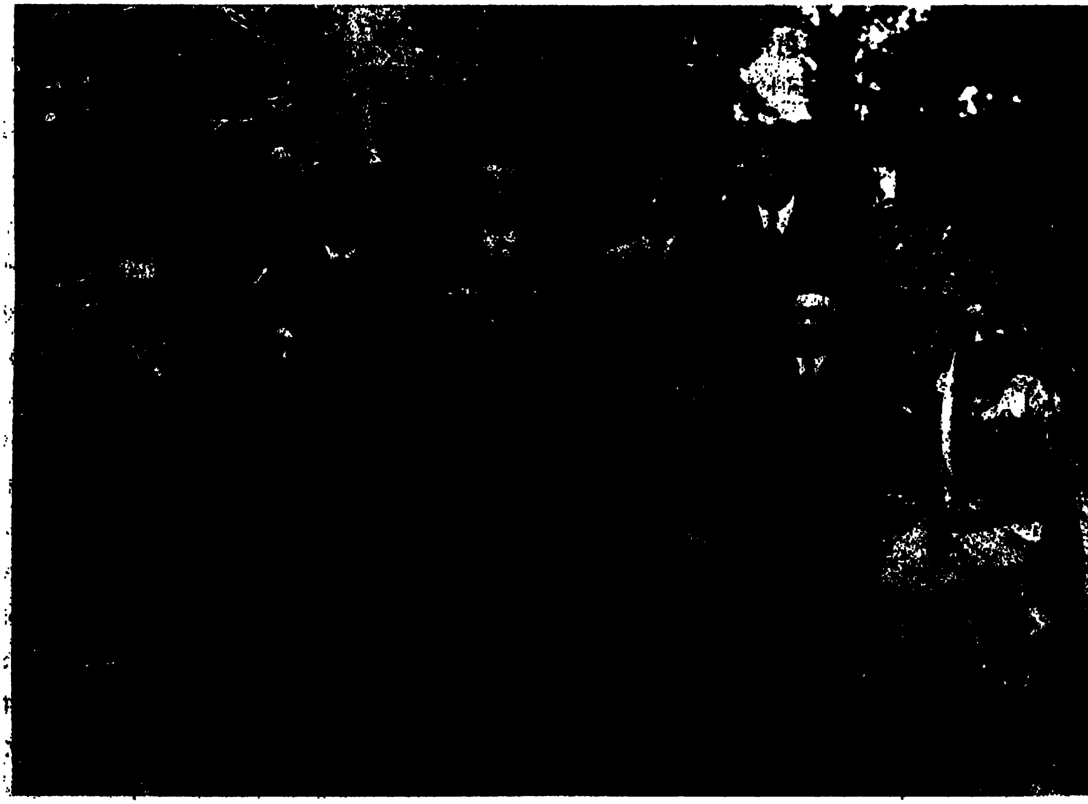
রবীন্দ্রনাথের এরোপ্লেন বুশীরে নামিতেছে

জনমনুষ্যের কোন চিহ্নই নেই। বেশ শীত করছে অনুভব করলাম, কিন্তু তার কারণটা তখনও বুঝতে পারিনি। খানিক পরে হঠাৎ মনে হ'ল সাদা জমির কতক অংশ একটু অন্য রঙের এবং খুব ছোট কালো পোকার মত কতগুলো কি সেখানে রয়েছে। একটা কালো বিন্দু সরে আলাদা হতেই বুঝলাম সেটা কোন জন্তু এবং খুব বেশী নীচে, কিন্তু গাছপালা কিছুই না দেখতে পাওয়ায় অনুপাতের অভাবে চোখের ধাঁধা গেল না, মাটি খুব কাছেই ঠেকছিল। পরে শুনলাম এখানে আমরা প্রায় ৩৫০০ মিটার অর্থাৎ প্রায় ১০,৫০০ ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, মরুভূমির আঁধির (sandstorm) ভয়ে। প্লেন ছুটছিলও তীব্রবেগে, কেন-না চার ঘণ্টারও কমে আমরা প্রায় ৫০০ মাইল পার হয়ে করাচী পৌঁছলাম। মরুভূমির কোলে, করাচী শহর থেকে আট দশ মাইল দূরে করাচী এরোড্রোম। রেলে দিবারাত্র চলে বাট ঘণ্টায় কলিকাতা থেকে করাচী যাওয়া যায়। এরোপ্লেনে শুধু দিনে চলে সাতাশ ঘণ্টায় (পনের ঘণ্টা এরোপ্লেনে, বার ঘণ্টা হোটেলে) অনায়াসে পৌঁছান গেল।

করাচীতে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় সস্ত্রীক এরোপ্লেনে এসে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করলেন। এখানে কাষ্টমস্ এবং ডাক্তারের

পরীক্ষা। কাষ্টমস্ অফিসার ছুচার কথা জিজ্ঞেস্ করার পর বল্লেন আমার ক্যামেরা সীলমোহর করান বা পাইলটের কাছে জমা দেওয়া প্রয়োজন, কেন-না আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিশেষ অনুমতি বিনা আকাশ থেকে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। আমার ক্যামেরা আগে থেকেই পাইলট এই কথাই বলে জমা নিয়েছিল সুতরাং আর কিছু করতে হ'ল না। ডাক্তার জানতে চাইলেন আমি প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, আমাশয়, টাইফস্ টাইফয়েড ইত্যাদির প্রতিষেধক টিকা এবং ইনজেক্সন নিয়েছি কি-না। বেলা ১২-৩০টায় করাচী থেকে যাত্রা আরম্ভ হয়। এবার স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে চললাম।

করাচী ছেড়ে প্লেন সোজা সমুদ্রের উপর দিয়ে চল্‌ল। অল্প কিছুক্ষণের পরেই কূলকিনারা অদৃশ্য হয়ে গেল। ডাঙার কাছাকাছি থাকতে দু-চারটি জেলে নৌকা দেখা যাচ্ছিল। সেগুলিও খানিক পরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। চারিধারে কেবল অথৈ জল। আটলান্টিক জয়ী বিমানবীরদের মনের ভাব খানিকটা বুঝতে পারা গেল। জল আর আকাশ, আকাশ আর জল, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই, চারিধার নির্জ্জন নিস্তব্ধ, কেবলমাত্র এরোপ্লেনটি কয়েকটি প্রাণী নিয়ে হুঙ্কার দিতে দিতে সাগর লঙ্ঘন করছে। এই রকম প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবার পর দূরে ডানদিকে কূল দেখা গেল। কিছুক্ষণ পরে সেটা এঁকে-বেঁকে এগিয়ে এল। লোকের বসতির চিহ্ন নেই, গাছ-পালা নেই, আরব্যসাগরের ঢেউয়ে ধোয়া ফেনিল পাড় দেওয়া সরু বালির চড়া এবং তার উপর পাহাড়ের মত উঁচু প্রস্তরময় উপকূল—আকাশ থেকে দেখতে ভারী



স্বাগত-নিমন্ত্রিতের দল

[illegible] উপবিষ্ট—শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীমতী [illegible], ডাঃ [illegible]
দণ্ডায়মান—শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বৈহান (পারসীক কন্সাল), লেখক, শ্রীযুক্ত আনারি (কবির তত্ত্বাবধায়ক)

সুন্দর, কিন্তু নৌকায় বা জাহাজে নামতে গেলে সর্ব্বনাশ। তবে বেলুচিস্থানের আঁকাবাঁকা খাঁজকাটা উপকূল ভূতত্ত্বের উদাহরণ হিসাবে খুবই ভাল। সমুদ্রের জল, আব্‌হাওয়া, বৃষ্টিবাদল, ইত্যাদি প্রকৃতিদেবীর শিল্পীদের কারুকৌশলের অসংখ্য সুন্দর নমুনা সেখানে রয়েছে।

বাতাস ঝড়ের মত প্রতিকূল বইছিল। প্লেন এক একবার উপরে ওঠে, সমুদ্রের জল দীঘির জলের মত স্থির নিশ্চল কাচের মত দেখায়, আবার বাতাসের ঝাপটায় যখন নীচে নামতে বাধ্য হয়, সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের খেলা, ফেণার মালা—এবং একবার একদল শুশুক—দেখা দেয়।

এদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে, আকাশপথের আজ যেন শেষ নাই। দু-একটি ছোট অন্তরীপ পার হওয়া ছাড়া ডাঙার সঙ্গে আর কোনই সম্পর্ক নেই—সমুদ্র-লঙ্ঘনের পালা আর ফুরোয় না। মনে পড়ল মাত্র কুড়ি বাইশ বৎসর আগে ফরাসী বিমানবীর ব্লেরিও সামান্য ইংলিশ চ্যানেল (একুশ মাইল) এরোপ্লেনে পার হয়ে দেড় লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। আজ বিলক্ষণ দু-পয়সা ভাড়া দিয়ে লোকে আরবসাগরের প্রায় ৬০০ মাইল পথ পার হচ্ছে, প্রতি সপ্তাহে কলের মত কত এরোপ্লেন দুই দিকে যাতায়াত করছে, কেউ তার খবরও নেয় না।

বহুক্ষণ ধরে দোলানি এবং ঝাঁকানি খেয়ে শ্রান্তি বোধ হচ্ছিল। ঝড়ের বেগ কিছুতেই কমে না, এদিকে প্রায় আট ঘণ্টা প্লেন চলেছে। সহকারী পাইলট উদ্বিগ্নভাবে পেট্রোল গেজের দিকে তাকাতে আরম্ভ করলেন। সে ব্যাপার দেখে মনটা কেমন ছ্যাৎ করে উঠল। যদি পেট্রোল ফুরিয়ে যায়? এরোপ্লেনে চড়ার পর এই প্রথম মনে খট্‌কা এল। যাহোক বেশীক্ষণ ভাববার আগেই দূরে ডাঙা দেখা গেল। সন্ধ্যার মুখে আট ঘণ্টা ক্রমাগত উড়বার পর যাস্ক এরোড্রোমে পৌঁছলাম। পশ্চিম-মুখে যাওয়াতে বেশ খানিক সময় লাভ করার ফলে আলো থাকতে থাকতে নামা সম্ভব হ'ল।*

এই পারস্য দেশে পদার্পণ!

আগেই শুনেছিলাম এদেশে চুঙ্গি (customs) এবং পাসপোর্ট ইত্যাদির বেলায় কড়াকড়ি এবং সেইজন্য ঐ সব উৎপাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বোম্বাইয়ের পারসীক দূতের চিঠি সঙ্গে এনেছিলাম, তাতে পারস্যরাজের নিমন্ত্রণ ব্যাপারের কথা ছিল। শ্রান্তক্লান্ত অবস্থায় নামবার পর যেই চুঙ্গির দরুণ সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা করার জন্যে কর্ম্মচারীর দল এগিয়ে এলেন, আমি সেই চিঠিটি এবং পাসপোর্ট তাঁদের সামনে ধরলাম। মন্ত্রের মত কাজ হ'ল, প্রধান কর্ম্মচারী বললেন "আপনি সোজা বিশ্রামভবনে জিনিষপত্র নিয়ে চলে যান, কিছু পরীক্ষা করার দরকার নেই। পাসপোর্ট আমরা দেখে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এরোপ্লেনের দল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, আমি যে এত সহজে নিস্তার পাব তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

যাস্ক সমুদ্রের মধ্যে একটি মরুময় ছোট অন্তরীপমাত্র। কারবারের মধ্যে মাছ ধরা, চুঙ্গি এড়িয়ে লুকিয়ে জিনিষ আনা (smuggling), ইন্দো-পারসীয়ান তার আপিস এবং এরোড্রোমে কাজ করা। জায়গাটি একটি ছোট গ্রাম, কুঁড়ে ঘরে ভরা। কাছাকাছি দু-একটা মরূদ্যান (oasis) আছে। আস্‌বার সময় এরোপ্লেনের শব্দে একটি উটের দলকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে দেখেছিলাম।

স্থানীয় রেষ্ট হাউসে (ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর ব্যাপার, একটি ইংরেজ দম্পতি—বেশ লোক—তার তত্ত্বাবধান করেন) রাত্রি কাটান গেল। আমার এই প্রথম আকাশবিহার শুনে রেষ্ট হাউসের কর্ত্রী রাত্রে এরোপ্লেনে ইয়োরোপ থেকে আনা আঙুর খেতে দিয়েছিলেন। খুব ভোরে উঠে ফের যাত্রারম্ভ করা গেল। আর একখানি ওলন্দাজ প্লেন ভারতাভিমুখে যাচ্ছিল, তাদের মারফৎ বাড়িতে খবর পাঠান গেল।

ভোরের অন্ধকারে প্লেন ছাড়ল, পথে খুব কুয়াশা, বাতাসও প্রতিকূল, কাজেই সমুদ্রের উপর দিয়েই যেতে হচ্ছিল। খানিক পরে জেগে উঠে দেখি কূলের কাছে এসে পড়েছি এবং সামনে মেঘে মাথা ঢাকা অভ্রভেদী পাহাড়। কুয়াশায় ও অন্ধকারে সবই আবছায়া দেখাচ্ছিল। প্লেন হঠাৎ সোজা উপরে উঠতে লাগল।

* পশ্চিম মুখে প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমায় ৪ মিনিট করে সময় পেছিয়ে যায়।

যতই উঠে ততই দু-পাশে এবং উপরে সারিসারি পাহাড়ের গায়ে খোঁচা খোঁচা পাথরে ভরা ছোটবড় চূড়া দেখা যায়। মনে হ'তে লাগল কোনও হিংস্র শ্বাপদ যেন মুখ হাঁ করে প্লেনটিকে গিল্‌তে আসছে। হাওয়া কুয়াশা সবই বিরোধী, প্লেনটিকে তার উপর পাহাড়ের গা বাঁচাবার জন্ত ডাইনে বাঁয়েও ফেরাতে হচ্ছিল। প্রধান পাইলট একবার পেছন ফিরে সহকারীর দিকে তাকালেন, সহকারীও তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন।

ইঞ্জিন তিনটি প্রচণ্ড গর্জ্জন করতে লাগল। রেভ্‌ মিটারের কাঁটা ১৬-১৮ থেকে ১৮-২০, তারপর ২০-২২-এর মধ্যে কাঁপতে থাক্‌ল। প্লেনের ভিতরটার সাম্‌নের দিকটা বরাবর পেছনের সঙ্গে সমতল থেকে হঠাৎ বেশ উচ্চ কোণ হয়ে উঠে রইল। এদিকে পাহাড়ের দিকে তাকালে ভয় হয় বুঝি এই লাগে ধাক্কা! বহু নীচে পাহাড়ের গায় থাক থাক কাটা ছোট ক্ষেত (দার্জ্জিলিঙের নীচে সিকিমের দিকের ক্ষেতগুলির মত), তার মধ্যে খড়ের কিংবা ভুট্টার ডাঁটিতে ছাওয়া ছোট ছোট ঘর। আরও নীচে পাহাড়ের দেওয়ালে ঘেরা পাতালে লুকানো পোতাশ্রয়—বোধ করি এককালে (কি হয়ত এখনও আছে) জলদস্যুর দুর্গ ছিল। সামনে মেঘ দেখা দিল, প্লেন তাই ফুঁড়ে উপরে উঠতে লাগল। বিষম আতঙ্কদায়ক পরিক্রমণ!

পাইলট বলেছিলেন যে প্রত্যেক বার জাভা ঘুরে এসে তাঁরা ছয় সপ্তাহ বিশ্রামের জন্ত সময় পান। ব্যাপার দেখে মনে হ'ল, খুব বেশী কিছু পান না!

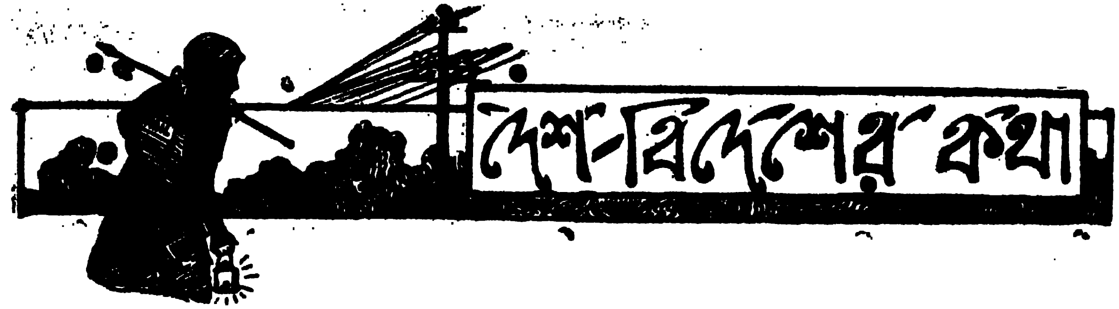
হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দ ক্ষীণ হয়ে গেল, প্লেনের সামনের দিকও নিম্নকোণে ঝুঁকে গেল। বহু নীচে সমুদ্রের বিশাল বক্ষ দেখা গেল। পর্ব্বতলঙ্ঘনের পালা শেষ হয়েছে জেনে হাঁফ ছাড়া গেল। বেলা সওয়া দশটায় বুশীর (আমার গন্তব্য স্থান) পৌঁছলাম। এইখানেই এরোপ্লেনের সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ, সুতরাং অনেক ধন্তবাদ দিয়ে সকলের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে ও এরোপ্লেন-চালকদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

টেহেরান থেকে মেজলিসের সভাপতি, আমার বাস্কে পৌঁছানর খবর পেয়ে, বুশীরের গভর্ণর-জেনারেলকে আমার বিষয় টেলিগ্রাম করেছিলেন। সুতরাং আদর-অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি হ'ল না।

এই বুশীরে সাতদিন পরে কলিকাতা থেকে এরোপ্লেন-যোগে অন্তদের সঙ্গে কবি এবং বোম্বাই থেকে জাহাজে শ্রীযুক্ত দিনশা ইরাণী সদলে এসে উপস্থিত হলেন। রাজনিমন্ত্রিতের দলের পারস্ত প্রয়াণের আয়োজনের ধুম চলতে লাগল।

(ক্রমশঃ)





ভারতবর্ষ

ভারতে স্বরাজ—

বিগত ১৯৩০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এবং পরবর্ত্তী বৎসর নবেম্বরে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের প্রতিনিধি লইয়া গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। উদ্দেশ্য, পরস্পরের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা দ্বারা ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটা পাকা সিদ্ধান্তে পৌঁছা। কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয় বারের বৈঠকে যোগদান করেন। দ্বিতীয় বারের বৈঠকে তিনটি অন্তঃ-কমিটি স্থাপিত হয়,—একটি ভোটাধিকার সমস্যা সমাধানের জন্য—তাহা পরে লোথিয়ান কমিটি নামে পরিচিত হইয়াছে, দ্বিতীয়টি মিলিত রাষ্ট্রে করদ বা মিত্ররাজ্যগুলির স্থাননির্দ্দেশের জন্য এবং তৃতীয়টি স্বয়ং বড়লাটের নেতৃত্বে রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান বিষয় (যথা, লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় প্রভৃতি) আলোচনার উদ্দেশ্যে। তখন এইরূপ স্থির হয় যে, কমিটি-ত্রয়ের রিপোর্ট পেশ হইলে আবার গোলটেবিল বৈঠক আহূত হইবে এবং ভারতের স্বরাজ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত অবলম্বিত হইবে। তাহাই যথাবিধি বিলাতের পার্লামেণ্টে পাশ হইয়া ভারতে স্বরাজ স্থাপিত হইবে। গত ২৭এ জুন ভারত সচিব স্তর স্যামুয়েল হোর পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের নীতি সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর গোলটেবিল বৈঠক আহূত হইবে না। স্তর স্যামুয়েল হোরের মতে গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা নিরর্থক। কারণ, প্রধান সমস্যাগুলির আলোচনা সমাধান এতবড় বৈঠকে হইতে পারে না। কাজেই, তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে ভাবী রাষ্ট্রে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকার সম্বন্ধে সরকারী নীতি শীঘ্রই বিঘোষিত হইবে, এবং ভারতীয় নেতারা অন্যান্য সমস্যার সমাধানেও যদি ইতিমধ্যে অগ্রসর হন তবে সময়ে পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের স্বরাজ সম্বন্ধে বিল পেশ হইবার পূর্ব্বে একটি যুক্ত পার্লামেণ্টারি কমিটি নিযুক্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় নেতৃবর্গ এই কমিটির সমক্ষে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন। ভারতসচিব আরও বলেন যে, বিলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইবে এবং ভাবীকালে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থাও ইহাতে থাকিবে। পার্লামেণ্টে সরকার বিরোধী শ্রমিক দলের নেতা মিঃ ল্যান্সবেরী বলেন, স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার ভারতসচিবের ঘোষণায় অস্বীকৃত হইল। উইন্‌স্টন চার্চ্চহিল এই ঘোষণাকে এই বলিয়া অভিনন্দিত করেন যে, এতদিনে অত্যাবশ্যক বার্কেনহেডী নীতিতে আবার ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইল।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিকমতবিশিষ্ট নেতারা বিশেষ করিয়া গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ কি ভাবে ভারত-সচিবের এই এক তরফা ঘোষণার জবাব দেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধী আজ কারারুদ্ধ, কংগ্রেসের কার্য্যকলাপও আজ বেআইনী। উদারনৈতিক ও অন্যান্য দলীয় নেতারাই এখন ইহার যথোচিত উত্তর দিতে সমর্থ। শ্রীযুক্ত এম্-আর জয়াকর ও স্তর তেজবাহাদুর সাপ্রু ও শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত এন্-এম্-যোশী পরামর্শ কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া গোলটেবিল বৈঠকের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। বৈঠকের অন্যতম প্রতিনিধি স্তর চিমনলাল শীতলবাদের আহ্বানে বিভিন্ন প্রদেশের গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিগণ বোম্বাইয়ে মিলিত হইয়া ভারতসচিবের ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ভিন্ন পন্থা অবলম্বিত না হওয়া পর্য্যন্ত সহযোগিতা করিতে তাঁহাদের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। উদারনৈতিক সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতিও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গোল-টেবিল বৈঠকের পদ্ধতি অবলম্বিত না হইলে রাষ্ট্রতন্ত্র রচনা কার্য্যে সহযোগিতা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

ব্রহ্মবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে ব্রহ্মে নারী আন্দোলন—

ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে, নানাবিধ উপায়ে এই কথা এ যাবৎ প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় বারের অধিবেশনে ইহা জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্মে অন্ততঃ এক দল লোক ইহা চাহেন না। অধিকাংশ ব্রহ্মবাসীরও যে এই মত তাহাও প্রকাশিত হয় নাই। কারণ, ব্রহ্মের একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিখিল-ব্রহ্ম সমিতি গেল বৎসর বেআইনী ঘোষিত হইয়াছিল। ব্রহ্মবাসিনীরাও যে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে চাহেন তাহাও ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। ব্রহ্মদেশের ওয়াম্থানু বা জাতীয় দলভুক্ত নারীদের উদ্যোগে শ্রীযুক্তা ড মা গিন নেতৃত্বে ব্রহ্মবাসিনীদের এক সভা হইয়া গিয়াছে, সভায় ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছেদ করিবার প্রতিবাদের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

স্বর্ণ রপ্তানি—

গত ২রা জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩ হাজার টাকার সোণা রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর অনুরূপ সপ্তাহে রপ্তানি হইয়াছিল ২৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার।

বর্ত্তমান বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে ২রা জুলাই পর্য্যন্ত ১৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৮ হাজার টাকার সোণা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

ভারতে যৌথ কারবার—

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে সমগ্র ভারতে ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা মূলধন সহ যৌথ কারবার রেজেষ্টারী হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সহ ৬২টি এবং ১৯৩১ সালে জানুয়ারী মাসে ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, ৬২টি কারবার রেজেষ্টারী হইয়াছিল। গত জানুয়ারী মাসে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কোম্পানী গঠিত হইয়াছে পঞ্জাবের ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়েল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী। ইহার মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। গত জানুয়ারী মাসে ৫৯ লক্ষ টাকা মূলধন সহ ২০টি কোম্পানী কারবার গুটাইয়াছে।

বাংলা

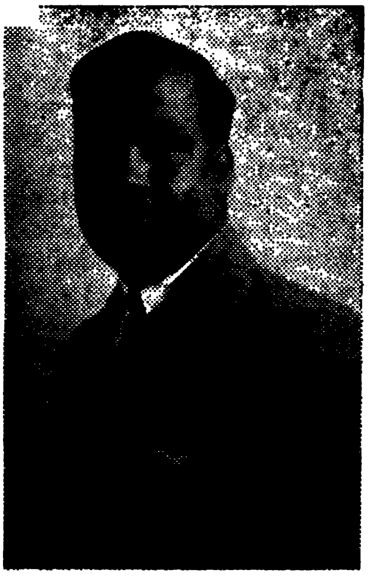
কোতুলপুর-জয়পুর চিকিৎসক সমিতির কার্য্য—

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ও জয়পুর থানার চিকিৎসকগণ সম্মিলিত ভাবে দেশসেবা করিতেছেন। পল্লীই বাংলার প্রাণ, ইহার উন্নতিতেই সমগ্র দেশের উন্নতি। একারণ স্থানীয় চিকিৎসকগণ পল্লীবাসীর মধ্যে দেশীয় ঔষধ ব্যবহার, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, ম্যালেরিয়া নিবারণ প্রভৃতি প্রচারে এবং কচুরীপানা নষ্ট করা, স্থায়ী ধন ভাণ্ডার স্থাপন করা প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। সম্প্রতি কোতুলপুরের সন্নিকট দাসদীঘি গ্রামে স্থানীয় চিকিৎসকগণের একটি সভা হইয়া গিয়াছে।

সমাজের কল্যাণের জন্য চিকিৎসকগণ অত্যাবশ্যক। তাঁহাদিগকে স্পেশ্যাল কন্‌ষ্টেব্‌ল্ করিয়া জনহিতকর কার্য্যে বাধা দেওয়া সরকারের নয়। সরকার অন্ততঃ চিকিৎসকগণকে স্পেশ্যল কন্‌ষ্টেব্‌ল্ না করিলে ভাল হয়।

ছায়াচিত্রে বাঙালীর কৃতিত্ব—

বরিশাল নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস জার্ম্মেনীতে তিন বৎসর কাল ছায়াচিত্র শিখিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি



শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস

বিলাতেও নানা ষ্টুডিওতে কর্ম্ম করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতি আয়ত্ত করিয়াছেন।

বাঙালী বালকের কীর্ত্তি—

কলিকাতা কালীঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তের বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি সাইকেলে ভ্রমণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। গত ২৪এ জ্যৈষ্ঠ ভোর ৫-৩০ মিনিটের সময় সাইকেলে বাড়ী হইতে রওনা হইয়া ১-৩০ মিনিটের সময় বর্দ্ধমান পৌছেন, এবং পথিমধ্যে ঝড়-বর্ষা অতিক্রম করিয়া



শ্রীনীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রি ১০টায় বাড়ী ফিরিয়া আসেন। শ্রীমান নীলমাধবের সাহস ও কৃতিত্ব বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিতের সংখ্যা—

সিমলার ২৩এ জুনের সংবাদে প্রকাশ, সরকারী হিসাবমত ১৯৩২ সনের আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৪৮,৬০২ জন। প্রতিমাসের দণ্ডের সংখ্যা মোটামুটি এইরূপ—

জানুয়ারী	১৪,৮০০
ফেব্রুয়ারী	১৭,৮০০
মার্চ্চ	৬,৯০০
এপ্রিল	৫,২০০
মে	৩,৮০০

১৯৩২ সনের মে মাসের শেষে জেলে ৩১,১৯৪ জন ছিল।

প্রবাসে বাঙালী—

শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত সিন্ধুদেশের ডাকবিভাগের ডিরেক্টর পদে কর্ম্ম



শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ সুর মহাশয়ের বিদায়-অভিনন্দন সভা। [উপবিষ্ট মহিলাদের মধ্যে ৮ নং শ্রীযুক্তা সুরপত্নী, ও তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান শ্রীযুক্ত সুর (৪৪ নং)]

করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় বদলী হইয়া আসিয়াছেন। তিনি করাচীর বাঙালী সমিতির উপসভাপতি ছিলেন। করাচী ত্যাগের প্রাক্কালে সেখানকার বাঙালীগণ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন। করাচী-প্রবাসী বাঙালী নারীরাও ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

শিক্ষিত লোকের সংখ্যা—

১৯৩১ সনের সেন্সসের হিসাব মোটামুটি বাহির হইয়াছে। তাহাতে বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা এইরূপ জানা যায়,

পুরুষ	
হিন্দু	২৬২৩৭৮১
মুসলমান	১৪০৩৩০৫
বৌদ্ধ	২২০০৫
পাহাড়িয়া জাতি	৩১০১
খৃষ্টান	৪১১৫৯
অন্যান্য	৮৬১২
স্ত্রীলোক	
হিন্দু	৪৫৬৯১৯
মুসলমান	১৯৪১১২
বৌদ্ধ	৩৪৬৩
পাহাড়িয়া জাতি	৮১২
খৃষ্টান	২৮৩১৬
অন্যান্য	১৮৬৫

বাঙ্গালার মোট ৯,৬৮,৫০৫ জন পুরুষ ও ৯৯,৯৩৫ জন মেয়ে ইংরাজী ভাষা জানে।

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা—

সকল সভ্য দেশেই মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতবর্ষেই তাহার বিপরীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষার প্রাধান্য শীঘ্রই স্বীকৃত হইবে আশা করা যায়। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণ ইংরেজী ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে মাতৃভাষা, যথা বাংলা, উর্দ্দু, আসামী বা হিন্দী ভাষার সাহায্যে উত্তর দিতে পারিবে। পরীক্ষার্থিগণকে (১) ইংরেজী, (২) গণিত, (৩) মাতৃভাষা, (৪) একটি প্রাচীন ভাষা, যথা সংস্কৃত, ফার্শি, ল্যাটিন প্রভৃতি, (৫) প্রাথমিক বিজ্ঞান, এবং (৬) ইতিহাস ও ভূগোল, এই কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতেই হইবে। মাতৃভাষা দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। মুখ্য মাতৃভাষা, যথা—যথা বাংলা, উর্দ্দু, আসামী ও হিন্দী এবং গৌণ মাতৃভাষা, যথা—খাসী, গারো, মণিপুরী ও নেপালী।

তাহা ছাড়া, যে কেহ ইচ্ছা করিলে মেকানিক্স, প্রাথমিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ব্যবহারিক ভূগোল প্রভৃতি যে কোন একটি বিষয় লইতে পারিবে। ইহার নম্বর ১০০র মধ্যে ৩০এর অধিক হইলে তাহা মোট নম্বরের সহিত যোগ হইবে।

যে সকল পরীক্ষার্থী মুখ্য মাতৃভাষা না লইয়া গৌণ মাতৃভাষা লইবে, তাহাদিগকে ইচ্ছাধীন বিষয়সমূহের মধ্যে একটি লইতেই হইবে, কিন্তু দুইটির অধিক লইতে পারিবে না।

ছাত্রীদের জন্য কমিটি পৃথক ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছাত্রীরা ইচ্ছা করিলে বাধ্যতামূলক গণিত, প্রাচীন ভাষা বা প্রাথমিক বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কারুশিল্প, সঙ্গীত ও পারিবারিক বিজ্ঞান—এই কয়টি পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিল্পকার্য্যে বাঙালী ছাত্র—

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস ও শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায় কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। ইঁহারা প্যাড্ স্পিরিট ষ্টোভ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঁহারা "Sheet metal stamping" পদ্ধতিতে কার্য্য করিতেছেন। ইঁহাদের কারখানার নাম শিল্প-পীঠ।

বিদেশে বাঙালীর কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার জার্ম্মেনীর জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি সেখানে "এস্ট্রো-ফিজিক্স" সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া সমারফিল্ড, ভিনে ও অন্যান্য বিখ্যাত অধ্যাপকগণের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি, পরীক্ষা পাশ করিয়া রমেশচন্দ্র এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত মেঘনাদ

সাহায় অধীনে "ষ্টেটিস্‌টিক্যাল মেকানিক্স" ও পদার্থবিজ্ঞানে প্রশংসনীয় গবেষণাকার্য্য করেন। ১৯২৫ সালে একমাত্র তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বিজ্ঞানে পি-আর-এস বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩০ সনের শেষে তিনি ভাচ্‌সে একাডেমীর আইন বৃত্তি লইয়া জার্ম্মেনীতে যান এবং এই বৃত্তির সর্ত্তানুযায়ী যেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকার্য্য করেন। তাঁহার যোগ্যতা অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশ পায় এবং তিনি পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন।

—

বিদেশ

লোসান বৈঠকের সিদ্ধান্ত—

যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার হুভার এক বৎসরের জন্ত ঋণ আদায় স্থগিত রাখিয়াছিলেন। গত জুন মাসে স্থগিতের মেয়াদ পূর্ণ হইয়া যায়, এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আবার ঋণ আদায়ের প্রশ্ন উঠে। আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় যুদ্ধ-ঋণ পরিশোধ করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব—জার্ম্মেণী এ বৎসর এইরূপ ঘোষণা করেন। যুদ্ধ-ঋণের প্রধান অংশ ফ্রান্সের প্রাপ্য, কাজেই ফ্রান্স ইহা মকুব করিতে অস্বীকৃত হন। ফলে, জগতের প্রধান অপ্রধান শক্তিবর্গের বৈঠক গত জুন মাসের মাঝামাঝি লোসানে আহূত হয়। পক্ষকাল ধরিয়া আলাপ আলোচনার পর বৈঠক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন' শক্তিবর্গের মতে তাহা অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়াছে। ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একটা সিদ্ধান্তের দ্বারা নিষ্পত্তিকরণ সম্ভব হইবে।

লোসান বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—প্রথম, ভেরসাই সন্ধিতে গত মহাযুদ্ধের জন্ত জার্ম্মানীকে দায়ী করিয়া ইহার ক্ষতিপূরণ বাবৎ যে ভার তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এই চুক্তি দ্বারা তাহা বাতিল হইল। বিভিন্ন শক্তির মধ্যে রাষ্ট্রিক বা আর্থিক অসঙ্গতি উপস্থিত হইলে পরস্পরের সাহায্যে তাহার মীমাংসা হইবে—যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা স্থিরীকৃত হওয়ার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় প্রস্তাবের সর্ত্ত প্রধানতঃ এইরূপ—(১) ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্ত জার্ম্মানীর তিন শত কোটি মার্ক (১ মার্ক=প্রায় ১ টাকা) দিতে হইবে। (২) প্রথমতঃ অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করিয়া পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের পুনর্গঠন আরম্ভ করিতে হইবে। (৩) ইউরোপের মিলন সমস্যা আলোচনা করিবার জন্ত একটি প্রারম্ভিক কমিটি স্থাপিত হইবে। (৪) বিশ্ব-সম্মিলনীতে আলোচ্য বিষয়গুলি স্থির করিবার জন্ত যে কমিটি নিয়োজিত হইবে তাহাতে যুক্তরাষ্ট্র আহূত হইবে।

জার্ম্মেনীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বৈঠক স্থির করিয়াছেন যে, জার্ম্মেনীর দেয় তিন শত কোটি টাকা পনর বৎসরের মধ্যে শোধ করিতে হইবে। জার্ম্মেনী প্রতি নব্বই টাকায় এক শত টাকার খত লিখিয়া দিবে এবং এইভাবে সে শতকরা পাঁচ টাকা সুদে দুই শত সত্তর কোটি টাকা প্রদান করিবে। ইহার অধিক আর দিতে হইবে না।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী রমা সরকার, এম-এ—ইনি এবারে দিল্লী সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজ হইতে ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় নাই। ইনি ১৯৩০ সনে বি-এ অনার্স পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।



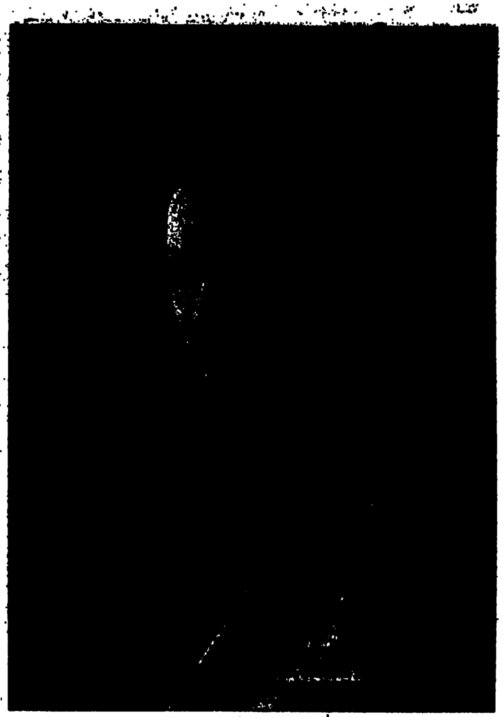
শ্রীমতী রমা সরকার

—

বয়ঃস্থা গৃহিণীদের জ্ঞানানুরাগের দু-একটি সংবাদ আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। এইরূপ আরও সংবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইলের শ্রীযুক্ত প্রেমাদিত্য ঘোষের পত্নী এইবার প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কোনও বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই। তাঁহার চারিটি সন্তান আছে।

—

গত সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীমতী কল্যাণী গুপ্তের কৃতিত্বের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। এবারে তাঁহার চিত্র দেওয়া গেল।



শ্রীমতী কল্যাণী গুপ্ত

—

এতদ্ব্যতীত বিবাহিতা মুসলমান মহিলারাও উচ্চশিক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। নিয়োদ্ধৃত দুইটি সংবাদ যথাক্রমে আনন্দবাজার পত্রিকা ও সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত হইল।

সুপ্রসিদ্ধ বাংলা লেখিকা শামসুন নাহার সাহেবা এবার সম্মানের সহিত ইতিহাসে ও বাংলায় বি-এ পাস করিয়াছেন। বিবাহিতা মুস্লিম মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিলেন। শামসুন নাহার রীতিমত স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ না পাইয়াও যে এই কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক প্রশংসনীয়।

শ্রীমতী সামসুল নেছাদ মামুদ একজন বিবাহিতা মহিলা, ইনি বর্ত্তমান বর্ষে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য মুসলমান মহিলা সমিতি ১৬২ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে এক সভা করিয়াছিলেন। সার আবদুল করিম গজনভির পত্নী ইঁহার সভাপতি ও স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে দীক্ষিতা শ্রীমতী আর-এস-হোসেন ঐ মহিলা সমিতির সম্পাদক। ৪০০ মহিলা সমবেত হইয়া শ্রীমতী মামুদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

—

শ্রীমতী ডেম্না বুকা ইংলণ্ডের আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি জাতিতে পার্শী।

—

শ্রীমতী ভিকু বাটলিওয়ালা এবারে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন-ব্যবসায়ী হইবার অধিকারলাভ করিয়াছেন। ইনিও পার্শী।

নারীসমবায় ভাণ্ডার—নারীশিক্ষা-সমিতির অন্তর্গত নারী সমবায়মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত উক্ত ভাণ্ডারটি কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে ১৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে।

মহিলাদের শিল্পকার্য্যে উৎসাহদানার্থে, ভারতের গৃহশিল্পের উন্নতিবিধানকল্পে, জাতীয় ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার মানসে যাবতীয় স্বদেশী দ্রব্য ও মহিলাদের স্বহস্ত-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্য এই ভাণ্ডার খোলা হয়।

এখানে স্বদেশী চিরুনী, সাবান, তেল, আলতা, সিঁদুর, কাঁটা, এসেন্স, ক্রিম, টুথপেষ্ট, পাউডার, জুতার কালি, কাঁচ, এনামেল ও চিনামাটির বাসন, কাগজ লেফাফা, কলম, পেন্সিল, এম্ব্রয়ডারী, ব্লাউস-পিস, ফ্রক, নানারকমের জামা ও হরেক রকমের স্বদেশী জিনিষ ও কাপড় পাওয়া যায়। সার্ট, পিরান, ব্লাউস প্রভৃতির অর্ডার লইয়া মেয়েরাই তাহা সেলাই করিয়া দেন।

জনসাধারণের অনুগ্রহে ভাণ্ডারটি একবৎসর পূর্ণ করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, ভাণ্ডারটি তাঁহাদের বিশেষতঃ বাংলার নারীসমাজের অনুগ্রহভিখারী। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে, বাংলার নারীগণ ইহার মালিক এবং ইহার লভ্যাংশ বাঙ্গালার দুঃস্থ নারীদের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে।

—



প্রথম সারি (বাম দিক হইতে) অধ্যাপক চোণ্ডো কেশব কার্ভে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি পাটকরের পত্নী, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার হাইকোর্টের বিচারপতি পাটকর, চারিজন মহিলা গ্র্যাজুয়েট।
দ্বিতীয় সারি (বাম দিক হইতে) শ্রীমতী ইরাবতী কার্ভে (বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার), বড়োদা মহারাণী কলেজের প্রিন্সিপাল, (বিচারপতি পাটকরের পশ্চাতে) শ্রীমতী সারদা মেহ্‌তা, শ্রীমতী আয়েঙ্গার।

গত ১৮ই জুন শ্রীমতী নাথী বাঈ দামোদর ঠাকর্‌সী ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপাধি বিতরণ করেন। এতৎসহ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, কর্ম্মসচিবগণ ও কয়েকটি ছাত্রীর চিত্র প্রকাশিত হইল।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী বহরমপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাঠশালা

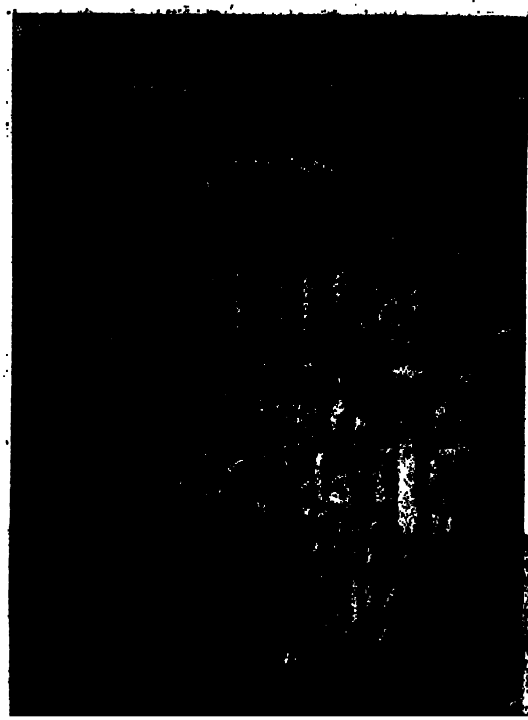
নাগার্জ্জুন কুণ্ড—

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর তীরে জঙ্গলের মধ্যস্থিত একটি স্তূপে ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পের অভিনব নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে যে-সকল অনুশাসনলিপি আছে তাহা পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় দুই কি তিন শতকে এই সকল নিদর্শন প্রস্তুত হইয়াছিল এবং কাশ্মীর, গান্ধার, চীন, তোষালি, অপরান্ত, বঙ্গ, বনবাসী, তাম্রপর্ণি প্রভৃতি সুদূর অঞ্চল হইতে যাত্রীরা আসিত।

ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মনে হয় এখানে একটি চৈত্য ছিল। ইহার নির্ম্মাণকৌশল এবং অংশবিশেষের কারুকার্য্য অতি উচুদরের।

জিনিষ-পত্রের অবশেষ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে মটর পরিমাণ বুদ্ধদেবের অস্থি এক খণ্ড; নানা স্বর্ণফুলে ইহা মণ্ডিত। সঙ্গের চিত্রগুলি দেখিয়া সে-যুগের শিল্পীদের ভাস্কর্য্য-শিল্পের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

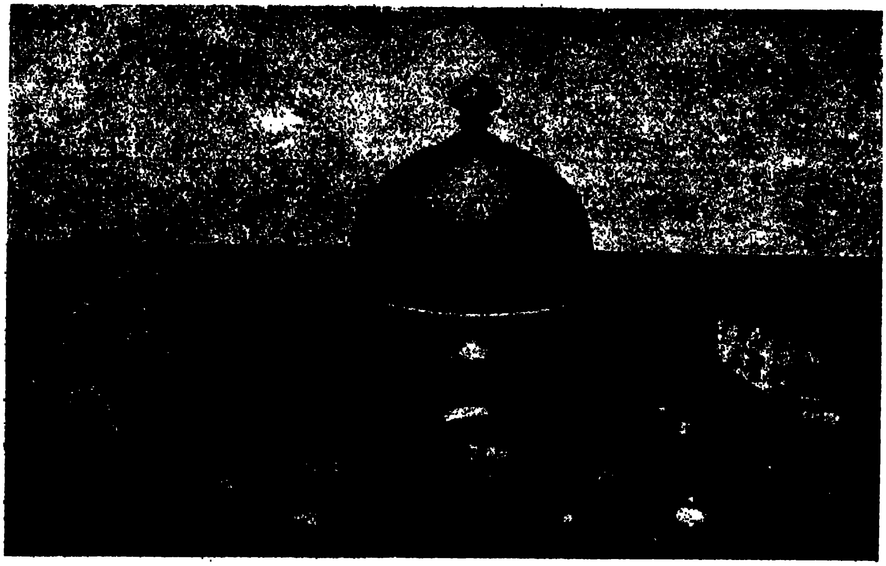
নাগার্জ্জুন কুণ্ডের ফটোগ্রাফগুলি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে মুদ্রিত হইল



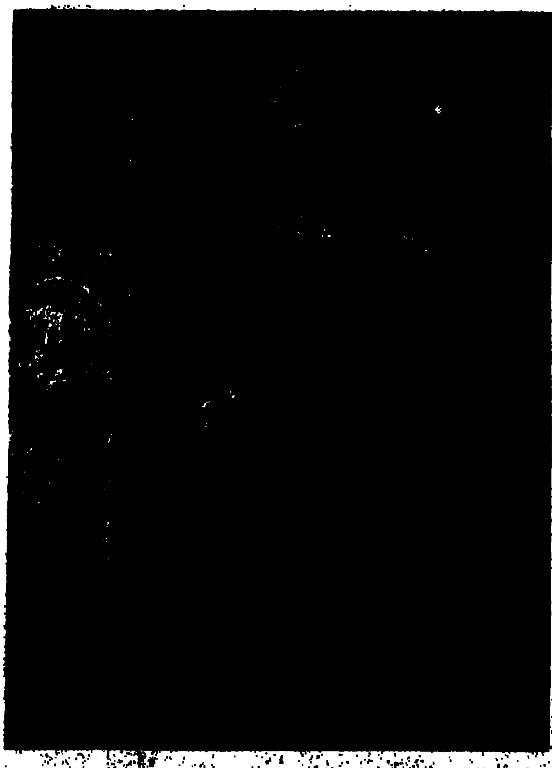
দক্ষিণে—উৎকীর্ণ ফলক ; ইহাতে বুদ্ধের জীবনের ঘটনা চিত্রিত হইয়াছে



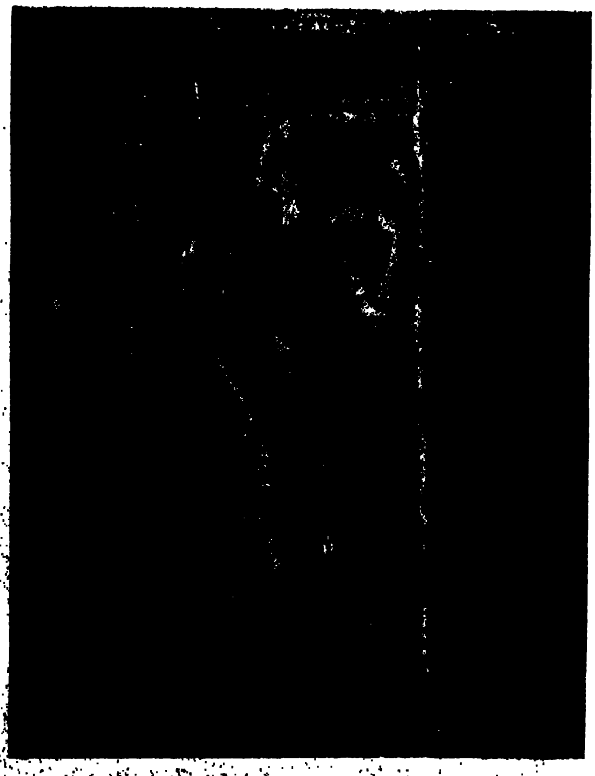
নিম্নে—নাগার্জ্জুন কুণ্ডে প্রাপ্ত ভাস্কর্য্যের একটি নমুনা ; ইহা হইতে নাগার্জ্জুন কুণ্ডের ভাস্কর্য্যের রীতি বোঝা যাইবে



নাগার্জ্জুনকুণ্ডে প্রাপ্ত বুদ্ধাস্থি, কৌটা ও অন্যান্য দ্রব্য



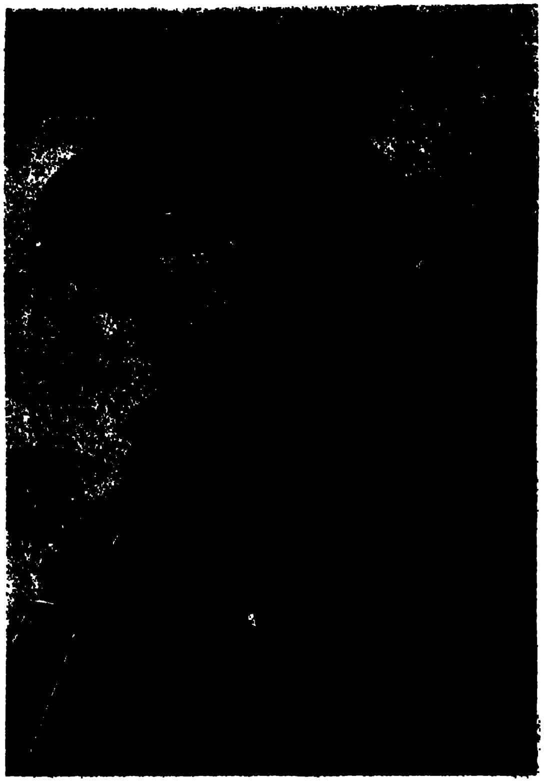
গ্রীক বা রোমান মূর্ত্তি



নাগার্জ্জুনকুণ্ডে প্রাপ্ত ভাস্কর্য্যের আর একটি নমুনা

সোভিয়েট রুশিয়ার শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা—

সোভিয়েট রুশিয়া শ্রমিকদের রাজ্য। সুতরাং সেখানে যে শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বাস, শিক্ষা ও আমোদপ্রমোদের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তাহার উপর গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সে-দেশে "ফাইভ ইয়ার প্ল্যান" অনুযায়ী শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। উহার ফলে শ্রমিকদের অবস্থার আরও উন্নতি হইতেছে। এই "ফাইভ ইয়ার প্ল্যান"কে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে-সকল শ্রমিক বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে বা পরিশ্রম করিয়াছে তাহাদিগকে সোভিয়েট রুশিয়ায় বিশেষভাবে সম্মানিত করা হইয়াছে। ইহাদিগকে 'শক্ ওয়ার্কার' বা 'দুর্দ্দম শ্রমিক' বলা হয়। উহাদের মাথার টুপীতে তারকার মত একটি বিশেষ চিহ্ন থাকে। রুশিয়ায় শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ক্লাস খোলা হইয়াছে। সেখানে তাহারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য শিক্ষা করে। তাহা ছাড়া শ্রমিকদের জন্য নানারূপ ক্লাব ও হিতকর প্রতিষ্ঠানও আছে। এখানে এইরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের চিত্র দেওয়া গেল।



দক্ষিণে—

সোভিয়েট রুশিয়ার শ্রমিক

এই শ্রমিকটি একজন 'শক্ ওয়ার্কার'

—

নিম্নে—

শ্রমিকদের একটি ক্লাব

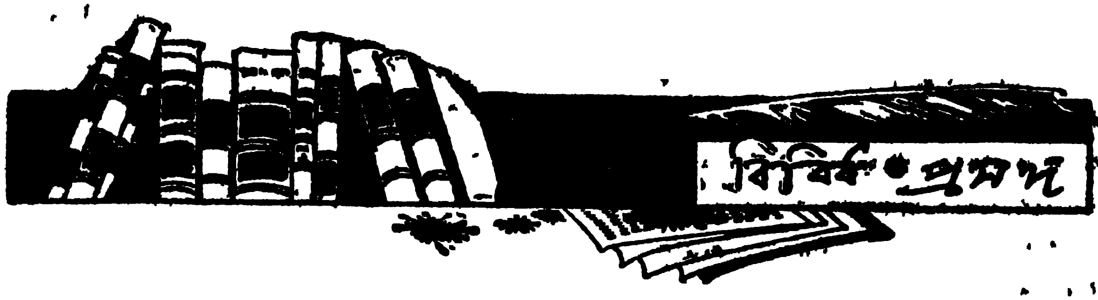




শ্রমিকদের ক্লাশ



শ্রমিকদের পড়িবার ও বিশ্রামের জায়গা



যুদ্ধসজ্জা হ্রাসের চেষ্টা

পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতির প্রতিনিধিরা জেনিভায় সমবেত হইয়া সকলের যুদ্ধসজ্জা কমাইবার ও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য যে কন্‌ফারেন্সের আয়োজন হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার অনেক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ইহার চরম উদ্দেশ্য পৃথিবী হইতে জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে যুদ্ধ নিবারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই জন্য সাধারণতঃ সংক্ষেপে ইহাকে নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স (ডিসার্মামেণ্ট কন্‌ফারেন্স) বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার পূরা নাম কন্‌ফারেন্স ফর্ দি রিডাক্‌শ্যন এণ্ড্ লিমিটেশ্যন অব্ আর্মামেণ্টস্ অর্থাৎ যুদ্ধসজ্জা হ্রাস ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্য কন্‌ফারেন্স। যদি প্রত্যেক জাতিই যুদ্ধসজ্জা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে, বর্ত্তমানে প্রত্যেকের যুদ্ধের আয়োজন যাহা আছে তাহাও নষ্ট করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং তদনুসারে কাজ করে, তাহা হইলে যুদ্ধ উঠিয়া যাইতেও পারে, এবং তাহা হইলে আলোচ্য কন্‌ফারেন্সের নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স নাম সার্থক হয়। কিন্তু যদি প্রত্যেক জাতির এখন যুদ্ধোপকরণ যাহা আছে, তাহা কেবল সমান অনুপাতে কমান হয়, অর্থাৎ মনে করুন প্রত্যেকের যুদ্ধসজ্জা শতকরা পঁচিশ ভাগ কমান হয়, তাহা হইলে কতকগুলি জাতির যুদ্ধের আয়োজন অন্য কতকগুলি জাতির রণসজ্জা অপেক্ষা বেশী থাকিয়া যাইবে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জাতিরা শেষোক্ত জাতিদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ থাকিবে; কারণ এখন কতকগুলি জাতির যুদ্ধসজ্জা অন্য কতকগুলি জাতির যুদ্ধসজ্জার চেয়ে বেশী আছে। যদি সকল জাতির যুদ্ধসজ্জা সমান করিয়া দিবার প্রস্তাবে সব জাতি রাজী হয়, তাহা হইলেও পৃথিবী হইতে যুদ্ধ উঠিয়া যাইবে বলা যায় না। কারণ, কোন দুই বা ততোধিক জাতি অন্য কোন জাতির বিরুদ্ধে একজোট হইয়া তাহাকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত করিতে পারে। পরস্বাপহরণ করিবার নিমিত্ত, অপরকে পদানত করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার নিমিত্ত, অপরের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি জাতিসমূহের যতদিন থাকিবে, ততদিন যুদ্ধ করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইবে—যুদ্ধসজ্জা কিছু কমাইলে ঐ উপায় কতকটা ত থাকিবেই; জাতিসমূহের সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ যদি হয়, তাহা হইলেও যথেষ্ট অস্ত্র সংগ্রহ করিতে বা গড়িতে কত ক্ষণ?

কেবল যদি যুদ্ধসজ্জার হ্রাস ও ঊর্দ্ধ সীমা নির্দ্দেশের প্রস্তাবই আলোচ্য কনফারেন্সে ধার্য্য হয়, তাহা হইলে পরাধীন জাতিদের তাহাতে কোন লাভ নাই। কারণ, পরাধীন জাতিদের এখন যেমন নিজস্ব কোন যুদ্ধসজ্জা নাই, কনফারেন্সের কাজ শেষ হইয়া গেলেও তাহাদের সেইরূপ কোন নিজস্ব যুদ্ধসজ্জা থাকিবে না; অথচ তাহাদের শাসক জাতিদের যুদ্ধসজ্জা কতকটা কমিলেও তাহাদিগকে অধীন রাখিবার মত যথেষ্ট যুদ্ধসজ্জা থাকিবে। অতএব এই কনফারেন্সের ফলে পরাধীন জাতিরা স্বাধীনতার মুখ দেখিতে পাইবে, এরূপ আশা কেহ করিতে পারে না।

এখানে আর একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে। অপর দেশের সহিত যুদ্ধ করা যদি উঠিয়া যায়, তাহা হইলেও কোন দেশের গবর্ণ্মেণ্ট সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হইতে পারে না। দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষার জন্য, ডাকাত ও গুণ্ডাদের উপদ্রব নিবারণের জন্য, বিদ্রোহীদের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত সকল দেশের গবর্ণ্মেণ্টকেই সাধারণ পুলিস ও সামরিক পুলিস রাখিতে হয় এবং তাহাদিগকে অল্পাধিক অস্ত্রশস্ত্রও দিয়া রাখিতে হয়। কারণ, সভ্যতম দেশেও ডাকাত ও গুণ্ডা আছে এবং পরাধীন দেশ-

সকলে যেমন রাজনৈতিক কারণে বিদ্রোহ ও বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, স্বাধীন দেশ-সকলেও তেমনি বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটিতে পারে। যে-সকল দেশ সেই সব দেশেরই এক বা একাধিক লোকের দ্বারা শাসিত, তাহার সবগুলিকেই আমরা স্বাধীন বলিতেছি। অর্থাৎ কোন দেশ যদি সেই-দেশ-জাত স্বেচ্ছাচারী রাজার দ্বারা শাসিত হয়, তাহাকেও স্বাধীন বলিতেছি; আবার যদি কোন দেশের গবর্মেণ্ট তথাকার লোকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা চালিত হয়, তাহাকেও স্বাধীন বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত অর্থে স্বাধীন স্পেনে বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তাহাতে রক্তপাতও হইয়াছে; শ্যামদেশেও বিপ্লব হইয়াছে,—যদিও প্রজা ও রাজা উভয় পক্ষেরই সুবুদ্ধিতে রক্তপাত হয় নাই, রাজা নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে রাজী হইয়াছেন। যে-সব দেশের গবর্মেণ্ট গণতান্ত্রিক বলিয়া পরিচিত, সেখানেও বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে, এবং রক্তপাত হইয়াছে বা হইতে পারে—যেমন জার্মেনীতে। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্ গণতান্ত্রিক প্রণালীতে শাসিত, কিন্তু অন্য অধিকাংশ সভ্যদেশের ন্যায় সেখানে ধনিক সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনায় খুব প্রভাবশালী ও ক্ষমতাপন্ন বলিয়া শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট এবং তাহাদের মধ্যে কম্যুনিজম্ নামে অভিহিত সমষ্টিগত স্বত্বস্বামিত্ব ও সাম্যবাদ বিস্তার লাভ করিতেছে। এই মতাবলম্বী লোকেরা এখন রুশিয়ায় প্রবল। তাহারা যদি তাহাদের দেশের কাজ উত্তম রূপে দীর্ঘ কাল চালাইতে পারে, তাহা হইলে কম্যুনিজমের প্রভাব পৃথিবীব্যাপী হইবার সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায় সকল সভ্যদেশের গবর্মেণ্টকে কম্যুনিষ্টিক্ বিপ্লবের বিরুদ্ধে কিছু যুদ্ধসজ্জা রাখিতে হইবে। যে রুশিয়ায় কম্যুনিষ্ট বলশেভিকরা এখন সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহারাও তাহাদের বিরোধীদলের প্রতিকূল চেষ্টা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধসজ্জা রাখিতে বাধ্য হইয়াছে।

কোন দেশের গবর্মেণ্টেরই যদি বিদ্রোহ বা বিপ্লবের ভয় না-থাকে, তাহা হইলেও ডাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতিকে দমন করিবার জন্য সশস্ত্র পুলিস প্রত্যেক দেশকেই রাখিতে হইবে। ভবিষ্যতে কখনও কোনও বড় দেশে মানবপ্রকৃতির এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন হইবে কি-না বলা যায় না যাহা সেখানে পুলিস বিভাগ নিষ্প্রয়োজন করিয়া তুলিবে। আপাততঃ সেরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং দেশবিশেষে দলবিশেষ যদি চরম অহিংসাবাদী হন, তাহা হইলেও কোন দেশের গবর্মেণ্টের সেরূপ অহিংসাবাদী হইবার সম্ভাবনা আপাততঃ দেখিতেছি না। চরম অহিংসাবাদ কাহাকে বলিতেছি তাহা বলা দরকার। পৃথিবীতে সব দেশেই এমন লোক অনেক আছেন—ভারতবর্ষে ত খুবই বেশী, যাঁহারা আততায়ী হইয়া, গায়ে পড়িয়া, অন্যকে আক্রমণ করিবেন না, আঘাত করিবেন না। ইঁহারা এক প্রকারের অহিংসাবাদী। কিন্তু যদি কেহ ইঁহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহার সেই বলপ্রয়োগে বাধা দিবার জন্য ইঁহারা বলপ্রয়োগ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। অর্থাৎ ইঁহাদের মনের ভাব কতকটা এইরূপ, যে, হিংস্র জন্তুর হিংস্রতার বিরুদ্ধে শক্তির ব্যবহার যেমন বৈধ, হিংস্র মানুষের বিরুদ্ধে শক্তির প্রয়োগও সেইরূপ বৈধ। যে-সকল দেশের গবর্মেণ্ট ও গবর্মেণ্ট-কর্ম্মচারীরা ভাল, তাঁহারা এই প্রকারের অহিংসাবাদী। তাঁহারা গায়ে পড়িয়া কাহারও উপর বলপ্রয়োগ করেন না, কেবল কেহ অন্যের অনিষ্টচেষ্টা করিলে বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহাতে বাধা দেন এবং প্রকাশ্য বিচারে তাহার দোষ প্রমাণিত হইলে তাহার শাস্তি দেন। উপরে যে-অহিংসাবাদের ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা চরম অহিংসাবাদ নহে। এরূপ মানুষ হয়ত ছিলেন, আছেন বা হইতে পারেন, যিনি নিজে আততায়ী বা আক্রমণশীল ত নহেনই, অধিকন্তু অপরে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তাহাতে বাধা দিবেন না, আক্রমণকারীকে প্রত্যাক্রমণ করিবেন না। ইহাই চরম অহিংসাবাদীর লক্ষণ। কোন দেশের গবর্মেণ্টই এরূপ চরম অহিংসাবাদী হইতে পারেন না—অন্ততঃ সভ্যতার ও মানবপ্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থাতে নহে।

এরূপ সাধু পুরুষের গল্প শুনিয়াছি, যাঁহারা অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত মানুষের আক্রমণে ত বাধা দেনই না, সাপ বাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর হিংস্রতা সম্বন্ধেও তাঁহারা নির্ব্বিকারচিত্ত বলিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে

না। এরূপ মানুষ কেহ ছিলেন বা আছেন কি-না জানি না। কিন্তু খুব ভাল গবর্ন্মেণ্টও তাঁহার মত চরম অহিংসাবাদী হইতে পারেন না। এবং সাধারণতঃ ইহাই সত্য, যে, পৃথিবীর ভাল লোকেরা সেই অর্থে অহিংসাবাদী যে অর্থে ভাল গবর্ন্মেণ্টসমূহ অহিংসাবাদী। এই প্রকার অহিংসাবাদের সহিত আত্মরক্ষার নিমিত্ত ও দুষ্টের দমনের জন্ত বলপ্রয়োগ ও অস্ত্র ব্যবহারের বিরোধ নাই। সুতরাং খুব উৎকৃষ্ট গবর্ন্মেণ্টসমূহ এই অর্থে অহিংসাবাদী বলিয়া সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ মানবপ্রকৃতির ও মানবসভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব। কোন দেশের গবর্ন্মেণ্টই সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা ব্যতিরেকে দুষ্টের দমন করিতে পারেন না। এইজন্ত গবর্ন্মেণ্টের যেমন নিরস্ত্র হওয়া চলে না, সর্ব্বসাধারণও তেমনই নিরস্ত্র হইলে দেশে শান্তি ও নিরুপদ্রব অবস্থা বিরাজ করিতে পারে না। অবশ্য, গবর্ন্মেণ্টের ও সর্ব্বসাধারণের অস্ত্রসজ্জা ও অস্ত্রব্যবহার নিয়মিত হওয়া একান্ত আবশ্যক, এবং আত্মরক্ষা ও দুষ্টের দমনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

—

মহাজাতি-সংঘের যুদ্ধসজ্জা আবশ্যক কিনা

লীগ অব নেশুন্সের অর্থাৎ মহাজাতি-সংঘের একটি নিয়ম আছে যে, যে-যে দেশ ইহার সভ্য, তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে মনান্তর ঝগড়া বিবাদ হইলে তাহারা যুদ্ধ না করিয়া সংঘের মধ্যস্থতায় তাহা মিটাইয়া লইবে। কিন্তু যদি বিবদমান কোন পক্ষ এই নিয়ম না মানিয়া যুদ্ধ করে, তাহা হইলে লীগ তাহাকে নিয়ম মানিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত কি করিতে পারেন? লীগের সভ্য অন্যান্ত দেশকে যুদ্ধে রত দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাইতে পারেন কি? লীগের এরূপ কোন নিয়ম নাই। লীগ স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারেন না, কারণ লীগের নিজের কোন সৈন্যদল বা অন্ত যুদ্ধসজ্জা নাই। কেহ কেহ বলেন, লীগ নিজের সভ্য অন্ত সব দেশকে নিয়মভঙ্গকারী দেশকে বাণিজ্যাদি বিষয়ে বয়কট করাইতে পারেন, তাহার সহিত বাণিজ্যাদি-বিষয়ক সকল সম্পর্ক ত্যাগ করাইতে পারেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত ত সেরূপ কোন উপায় কোন ক্ষেত্রে অবলম্বিত হয় নাই। জাপান লীগের নিয়ম না মানিয়া চীনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে—সে যুদ্ধের একটা প্রধান কারণ চীন কর্ত্তৃক জাপানী পণ্যদ্রব্য বয়কট। লীগ বা লীগের কোন সভ্য এই যুদ্ধে বাধা দেন নাই, কেবল বাক্যব্যয় করিতেছেন। লীগের নিজের সৈন্যদল থাকিলেও যুদ্ধ করিতেন কি-না সন্দেহ। জাপানী পণ্য বয়কটও কেহ করেন নাই—চীন তাহা করিয়াই ত বিপন্ন হইয়াছে। বরং জাপানকে যুদ্ধোপকরণ জোগাইয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, চেকোস্লোভাকিয়া ও আমেরিকা বহুৎ মুনফা পাইতেছেন।

লীগের হুকুম মানাইবার জন্য যুদ্ধসজ্জা থাকা আবশ্যক হইলে লীগের সৈন্যদল ও যুদ্ধায়োজন পৃথিবীর সকল জাতির চেয়ে ভীষণতর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যুদ্ধের সব আয়োজন থাকিলেও যুদ্ধারম্ভের হুকুমটা কাহারা দিবে? প্রধান প্রধান শক্তিপুঞ্জ? চীনজাপান যুদ্ধের সময় ত তাহারা উত্তম রূপে "নিরপেক্ষতার" মুনফা সিন্দুকে পুরিতেছে!

—

পৃথিবীতে মুসলমানদের আনুমানিক সংখ্যা

লণ্ডন হইতে প্রতি বৎসর ম্যাকমিলান কোম্পানী ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্স ইয়ার বুক নামক একখানি তথ্যসংগ্রহের বার্ষিক পুস্তক বাহির করেন। ইহার সহিত অবশ্য কলিকাতার ষ্টেটসম্যান কাগজের কোনই সম্পর্ক নাই। এই বার্ষিক পুস্তকে সকল দেশের আয়তন, লোকসংখ্যা, শাসনপ্রণালী, বাণিজ্য, রাজস্ব, শিক্ষা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়া থাকে। ১৯৩২ সালের বহিখানি সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। ইহাতে একটা তালিকা দেখিলাম, যাহা আগেকার কোন বৎসরের বহিতে ছিল না। এই তালিকাতে পৃথিবীর সমুদয় মুসলমানের আনুমানিক সংখ্যা, এবং তাহাদের মধ্যে কত জন কোন্ দেশের অধীন বা বাসিন্দা, তাহা দেওয়া হইয়াছে। খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহুদী বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের এরূপ তালিকা দেওয়া হয় নাই। কেবল মুসলমানদের এরূপ তালিকা দিবার কারণ ও উদ্দেশ্য ঠিক অনুমান করিতে পারিলাম না। ইংরেজরা যে মুসলমানদের প্রধান মনিব,

ইহা দেখান কি ইহার একটা প্রধান উদ্দেশ্য? তাহাতে ইংরেজদের আত্মাভিমান চরিতার্থ হইতে পারে; এবং তাহার দ্বারা মুসলমানদিগকে পরোক্ষভাবে ইহাও জানান হইতে পারে, যে, সকলের চেয়ে বেশী মুসলমান ইংরেজদের অধীন, অতএব ইংরেজদের খুব অনুগত থাকা মুসলমানদের কর্ত্তব্য। কিন্তু কারণ এবং উদ্দেশ্য ইহা যদি হয়, তাহা হইলে হিন্দুদের সম্বন্ধে তাহা আরও বেশী করিয়া খাটে। কেন-না, মুসলমানরা অনেক দেশের স্থায়ী অধিবাসী ও নানা পাশ্চাত্য জাতির অধীন, এবং কয়েকটি স্বাধীন মুসলমান দেশও আছে, কিন্তু হিন্দুরা কেবল ভারতবর্ষেরই স্থায়ী অধিবাসী, তাহার প্রায় সমস্তটা ইংরেজের অধীন, এবং স্বাধীন হিন্দু রাজ্য (নেপালকে স্বাধীন বলিয়া ধরিলে-নেপাল ছাড়া) একটিও নাই। ইংরেজদের মতে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে বেশী রাজদ্রোহোন্মুখ। এই সব কারণে ইংরেজদের হিন্দুদিগকেই বিশেষ করিয়া জানান দরকার, যে, ইংরেজ ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই। যাহা হউক, এখন তালিকাটি দেওয়া যাক।

পৃথিবীতে মুসলমানদের আনুমানিক সংখ্যা।

কাহার অধীন।	লোক সংখ্যা।	সমষ্টির শতকরা কত জন
ব্রিটেন	৯,৬৬,৭৯,০০০	৩৭ ২৯
হল্যাণ্ড	৫,০০,০০,০০০	১৯ ২৮
ফ্রান্স	২,০৪,০৫,০০	৭ ৮৬
চীন	২,০০,০০,০০০	৭ ৭১
রুশীয় সাধারণতন্ত্রাবলী	১,৮৫,২৯,০০০	৭ ১৪
তুরস্ক	১,৩২,৬৯,০০০	৫ ১২
মিশর	১৩০,০০০০০	৫ ০১
পারস্য	৮৬,০০,৫০০	৩ ৩০
আফগানিস্থান	৮০ ০০ ০০০	৩ ০৮
আবিসীনিয়া	৩০ ০০ ০০০	১ ১৬
ইরাক	২৬,৪০,০০০	১ ০২
ইটালী	১৪,৮২,০০০	০ ৫৭
যুগোস্লাভিয়া	১৩ ৬৩,০০০	০ ৫২
[illegible]	২৮ ১৬,০০০	১ ০৭
মোট	২৫,৯০,৬৬,৫৪০	১০০ ০০

দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর প্রায় ২৬ কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি—এক-তৃতীয়াংশের অধিক, ইংরেজের অধীন। তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষেই থাকে ৭,৭৭,৪৩,৯২৮। হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর অধীন মুসলমানদের সংখ্যা ৭ কোটির উপর। সুতরাং পৃথিবীর অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান পরাধীন। বাকী মুসলমানরা যে সব দেশে বাস করে, সেই দেশগুলি স্বাধীন বলিয়া তথাকার মুসলমানদিগকে পরাধীন বলা চলে না। কারণ তাহারা সেই সব দেশের স্থায়ী বাসিন্দা, তথাকার অন্যধর্ম্মাবলম্বী লোকদের রাষ্ট্রীয় অধিকার বা অধিকারশূন্যতা যেরূপ, মুসলমানদেরও তদ্রূপ। তুরস্ক, মিশর, পারস্য, আফগানিস্থান ও ইরাকে মুসলমানেরাই প্রধান অধিবাসী। তালিকাতে আরব দেশের স্বাধীন হেজাজ ও নেজদ রাজ্যদ্বয়ের এবং ওমানের উল্লেখ কেন নাই, জানি না। সমগ্র আরবের লোক-সংখ্যা ৭০ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

—

পৃথিবীতে হিন্দুর সংখ্যা কত?

পৃথিবীতে হিন্দুদের সংখ্যা মোট কত, তাহা এ পর্য্যন্ত অনুমিত হয় নাই। অবশ্য অধিকাংশ হিন্দু ভারতবর্ষে বাস করে। ১৯৩১ সালের মানুষ-গণনা অনুসারে ভারতবর্ষে তাহাদের সংখ্যা ২৩,৮৩,৩০,৯১২। নেপালের ৫৬ লক্ষ অধিবাসীও হিন্দু। পোর্ত্তুগীজদের অধিকৃত ভারতবর্ষের ৫,৭০,৪২৬ অধিবাসী এবং ফরাসীদের অধিকৃত ভারতের ২,৮৬,৪১০ অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু কত জন জানা নাই। আফগানিস্থানে কিছু হিন্দু আছে শ্যামদেশে, জাভাতে এবং বলিদ্বীপেও আছে। তদ্ভিন্ন নানা ব্রিটিশ উপনিবেশে, ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্স ও জার্ম্মেনীতে, রুশিয়া এবং জাপানে কিছু হিন্দু আছে। সমগ্র পৃথিবীতে হিন্দুদের মোট সংখ্যা ২৫ কোটির কম, ২৬ কোটির বেশী হইবে না।

যাহারা বংশতঃ ভারতীয় নহে, কিছু কাল হইতে তাহাদের মধ্যেও হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা হইতেছে। অভারতীয় অল্পসংখ্যক লোক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণও করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে নানা ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠান বুঝায়। তন্মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, অতীত কাল হইতে যদি তাহা বিদেশীদের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা ও আয়োজন থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী হইতে পারিত।

হিন্দু বলিতে সচরাচর যাহাদিগকে বুঝায় তাহাদিগকেই আমরা ঐ নামে অভিহিত করিতেছি। প্রাচীন কালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মেরই একটি শাখা বা প্রকারভেদ ছিল। যদি এখনও উহাকে হিন্দু ধর্ম্মের শাখা মনে করা হয়, তাহা হইলে চীনের, জাপানের ও শ্যামের অধিকাংশ লোককে এক প্রকার হিন্দু বলা যাইতে পারে। কিন্তু কষ্টকল্পনা করিয়া তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহাতে কোন সন্দেহ বা মতভেদ হওয়া উচিত নহে, তাহা এই, যে, চীন, জাপান ও শ্যামদেশের অধিকাংশ লোক এবং জাভা, বলিদ্বীপ, আনাম ও কাম্বোডিয়ার অনেক লোক ভারতবর্ষে উদ্ভূত ধর্ম্মের অনুসরণ করে। যাহারা ভারতবর্ষে উদ্ভূত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম্ম মানে, তাহাদের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যার চেয়ে বেশী।

—

স্বর্ণকুমারী দেবী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতমা কন্যা, কবি রবীন্দ্রনাথের অন্যতমা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বহু গ্রন্থের লেখিকা এবং নারীদের কল্যাণবিধায়ক নানা কার্য্যের অনুষ্ঠাত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী জীবনের ৭৫ বৎসর অতিক্রম করিয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-বিষয়িণী প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তিনি উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, কবিতা ও গান, বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক, প্রবন্ধ, এবং বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গে বোধ হয় তিনিই প্রথমে ভূতত্ত্ববিষয়ক, "পৃথিবী" নামক, গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুস্তকাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা সম্মুখে নাই—হয়ত কোন কোন নাম বাদ পড়িবে। সম্ভবতঃ অধিকাংশের নাম নীচের তালিকায় পাওয়া যাইবে।

উপন্যাস—দীপনির্ব্বাণ, স্নেহলতা, ছিন্নমুকুল, ফুলের মালা, হুগলীর ইমামবাড়ী, বিদ্রোহ, মেবার-রাজ, কাহাকে ?, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলন-রাত্রি। ছোট গল্পের বহি—নব কাহিনী, মালতী ও অন্যান্য গল্প। নাটক—রাজকন্যা, দিব্য কমল, ক'নে বদল, পাকচক্র, কৌতুক-নাট্য, দেব-কৌতুক। কবিতা ও গানের বহি—কবিতা ও গান, বসন্ত-উৎসব, গাথা ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক পুস্তক—পৃথিবী। বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক—বর্ণবোধ, ব্যাকরণ, গল্পস্বল্প, বাল্যবিনোদ, কীর্ত্তিকলাপ, সাহিত্যস্রোত।

তাঁহার "ফুলের মালা" ও "কাহাকে ?" উপন্যাস দুটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। "ফুলের মালা"র অনুবাদ "ফেট্যাল গার্ল্যাণ্ড" নাম দিয়া প্রথমে মডার্ন রিভিউ কাগজে বাহির হয়। "কাহাকে ?" উপ-ন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের নাম "দি আন্‌ফিনিষ্ট সং।" মান্দ্রাজের গণেশ কোম্পানী তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্পের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। "কল্যাণী" নাম দিয়া তাঁহার "দিব্য কমল" নাটকের একটি জার্ম্মান অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি ১৮৮৪ হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত এবং পরে আবার ১৯০৬ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত "ভারতী" পত্রিকা সম্পাদন করেন। বঙ্গে মহিলাদের মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনের কাজ তিনিই প্রথমে করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম তাঁহাকেই ১৯২৬ সালে জগৎতারিণী পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ২৯শ অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উহার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই কার্য্যও মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে করিয়াছেন।

অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে তিনি স্বীয় আচরণ দ্বারা অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ও অন্য ব্রাহ্ম মহিলাদের এই চেষ্টার সুফল এখন বাঙালী সমাজ ভোগ করিতেছেন, বিদ্রূপ ও মিথ্যা নিন্দা তাঁহারা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। নারীদের কল্যাণার্থ তিনি ১৮৮৬ সালে "সখি-সমিতি" স্থাপন করেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে বন্ধুভাবে মিলামিশায় উৎসাহপ্রদান, তাঁহাদের মনে দেশের কল্যাণচিন্তা ও হিতৈষণার উদ্রেক, দরিদ্র হিন্দু বালিকাদের জন্য একটি নিকেতন স্থাপন করিয়া তাহাতে তাহাদিগকে শিক্ষাদান ও তদ্দ্বারা তাহাদিগকে আত্মনির্ভর-শীল ও সমাজসেবায় সমর্থ করা, তাহারা যোগ্যতা লাভ করিলে তাহাদের কাজ জুটাইয়া দেওয়া ও তাহাদিগকে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া নারীশিক্ষার বিস্তার-



পরলোকগতা স্বর্ণকুমারী দেবী

সাধন, এবং ভারতীয় কলা ও পণ্যশিল্পের উন্নতিসাধনে সাহায্য করা, এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতির শুভপ্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতায় আগে আগে প্রতি বৎসর মহিলা-শিল্পমেলার অনুষ্ঠান হইত। ইহা সম্পূর্ণরূপে মহিলারা চালাইতেন, কেবল মহিলাদেরই ইহাতে প্রবেশের অধিকার ছিল। সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করা হইত।

স্বর্ণকুমারী দেবী কিছুকাল বঙ্গীয় থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী ছিলেন। ১৮৯০ সালে ফিরোজশাহ মেহতা মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন।

তাঁহার শেষ গ্রন্থ সাহিত্যস্রোতের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইণ্টারমীডিয়েট

পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক মনোনীত হইয়াছে। শেষ পীড়ার সময় তিনি উহার দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকতা

রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের জায়গায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন। শুনিলাম, এই পদ চান অনেকেই। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডক্টর সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতির নাম এই সম্পর্কে শুনা যাইতেছে। ইঁহাদের প্রত্যেকের পাণ্ডিত্য ও অন্যবিধ যোগ্যতার বর্ণনা ও বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তাহা করিবার ইচ্ছাও নাই। এবং যাঁহাদের নাম শুনা যাইতেছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই বাস্তবিক ঐ পদ চান কি-না, ঠিক্ না জানিয়া ওরূপ কোন আলোচনা সঙ্গতও হইবে না। তবে, কে অধ্যাপক হইলে কি শিখাইবেন, সেরূপ অনুমান করিতে দোষ নাই—যদিও তাহা বাজে কথার সামিল মনে হইতে পারে।

প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় অধ্যাপক হইলে বাক্যের বীরবলী কসরৎ এবং চিন্তা ও রসিকতার বীরবলী জিম্‌ন্যাষ্টিক বোধ করি শিখাইবার চেষ্টা করিবেন না। কারণ, এগুলি তাঁহার নিজস্ব জিনিষ, কাহাকেও শিখান যায় কি-না সন্দেহ। তবে তিনি কথিত বাংলায় সাহিত্য রচনা করিতে শিখাইতে পারেন। তাহাতে ছাত্রদের ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপকার হইবে। অবশ্য বর্ত্তমান লেখকের মত "রেঢ়ো" মনুষ্য এবং অনেক বাঙাল মনুষ্য কলিকাতার কথিত বাংলা চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টা সত্ত্বেও আয়ত্ত করিতে পারে নাই, পারিবে না। সেটা করা যে অসাধ্য, তাহা নহে। কলিকাতার কথিত বাংলা সব স্থলে আমাদের ভাল লাগে না; তাই আমরা তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করি না। রাজধানীর কথিত ভাষা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা স্বতঃসিদ্ধও নহে। লণ্ডনের কক্নী ভাষা ও উচ্চারণ তাহার প্রমাণ।

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হইলে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কীর্ত্তন ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা সম্বন্ধে কেবল যে বক্তৃতা করিবেন তাহা নহে, তদ্বিষয়ে অব জেক্ট লেসনও দিতে পারিবেন। তাহা নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের মত আকর্ষণের বস্তু করিবে।

শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপকের অন্যান্য কাজ ছাড়া হয়ত উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখিবার ফন্দী ছাত্র-দিগকে শিখাইবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে বেকার অলস মাসিকপত্র-সম্পাদকদের কাজ বাড়িয়া যাইবে, অনেক নূতন লেখকই ছোট গল্প পাঠাইয়া "উৎসাহিত" হইতে চাহিবেন, এবং তাঁহাদের রচনা পাঠাইবার সময় সম্পাদকদিগকে চিঠি দ্বারা অনুরোধের ছলে এই উপদেশ দিবেন, যে, তাঁহারা কেবল নূতন লেখক বলিয়াই যেন তরুণদের রচনাবলী "অমনোনীত" না করেন।

ডক্টর সুশীলকুমার দে অধ্যাপকের অন্যান্য কাজ ছাড়া ছাত্রদিগকে হয়ত কবিতা লিখিতেও শিখাইবেন। তাহাতে সম্পাদকদের আপিসের শুষ্ক আবহাওয়া ভাববাষ্পাকীর্ণ এবং কখন কখন উল্লাসউচ্ছ্বাসপূর্ণ, কখন বা হাহুতাশে "মুখরিত" হইয়া উঠিবে।

ডক্টর পণ্ডিত মাওলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তাঁহার সংস্কৃত আরবী ও ফারসীতে বিদ্যাবত্তা বশতঃ দীনা বঙ্গভাষার ধনদৌলত অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, ডক্টর পণ্ডিত মাওলবী মহাশয় নিম্নলিখিত রূপ বাংলা তাঁহার ছাত্রদিগকে শিখাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন:—

"পূর্ব্বদিকে আসমানের লম্বা লম্বা শাদা রেখা দেখা যাইতেছে"। "তাহারা সকলে বেগোনাহ"। "অন্যান্য পয়গম্বরের উপরও কিতাব নাযেল হইয়াছিল"। "পরলোকের উপর ঈমান আনিবে," "তকদীরের উপর ঈমান আনিবে," "আখেরাতের উপর ঈমান আনিবে।"— উক্ত ডক্টর সাহেবের "মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা," ২য় ভাগ।

"মদিনাতেই তিনি এন্তেকাল করেন"। "কৃতজ্ঞতা —শোকরগুযারি"। "মাহাত্ম্য—বোযর্গি"। "মহাপাপ— কবীরাহ, গোনাহ"।—উক্ত লেখকের 'মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা," ৩য় ভাগ।

"মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা" ২য় ভাগের শব্দার্থের মধ্যে

আছে, "দুরাত্মা—গরীব", "ইতর প্রাণী—মানুষ ভিন্ন অন্ত জানোয়ার"।

চতুর্থ ভাগের কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। "জননীও জাগ্রৎবাসিনী হয়েন"। "অর্ণবপোতাদির আবিষ্কার হওয়াতে পানিপথে বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে"। ইহা যুদ্ধের পানিপথ নহে, বাণিজ্যের জলপথ! জলপথ বলিলে "গোনাহ" হইয়া যাইত, কারণ হিন্দুরা জলপথ বলে! "পানি" অবশ্য পানীয় হইতে উৎপন্ন। কিন্তু জলের মত দুধ, সরবৎ, সুরা প্রভৃতিও "পানীয়"। সুতরাং জল ও পানীয় সমার্থক নহে।

—

শান্তিনিকেতনে পূর্ব্ব-আফ্রিকার ছাত্র

পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতে আসিয়া ভারতবর্ষীয় তিনটি ছাত্র শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করিতেছে। ইহাদের মাতৃভাষা তামিল। বড় ছেলেটি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, ছোট দুটি বিদ্যালয়ে। বড়টি ইংরেজী জানে, সুতরাং তাহার অন্যদের সহিত মিশিবার অসুবিধা হয় না। সকলের চেয়ে ছোট যেটি, সেটি নিতান্ত শিশু, অন্যটিকেও দেখিয়া ৬।৭ বৎসরের বলিয়া মনে হয়। ইহারা তামিল ভিন্ন অন্য কোন ভাষা না-জানায় আপাততঃ ইহাদের বড় অসুবিধা হইতেছে, কিন্তু শিশুরা শীঘ্রই নূতন ভাষা শুনিতে শুনিতে শিখিয়া ফেলে। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই ইহারা বাংলা বুঝিতে ও বলিতে পারিবে।

শান্তিনিকেতনের খ্যাতি যে পূর্ব্ব-আফ্রিকাতেও পৌঁছিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। খ্যাতি যেমন বাড়িতেছে, দায়িত্ববোধ তাহা অপেক্ষাও অধিক বাড়িয়া চলিবে, ইহা আমরা দুরাশা মনে করি না। কারণ শান্তিনিকেতনে পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও অধ্যাপনা যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে আছে।

—

বিশ্বভারতীর ডাঙা জমী

শান্তিনিকেতনের নিকট যে নূতন পল্লী স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, তাহার কিছু বিবরণ আষাঢ়ের প্রবাসীতে (৪৪৫ পৃঃ) আছে। এইরূপ উপনিবেশ বিস্তৃততর করিবার উপায়ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের হাতে আছে। সুরুল গ্রাম ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে তাঁহারা যে প্রায় ২২০০ বিঘা জমী কিনিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রায় ১৪০০ বিঘা বেশ উঁচু ও শুকন, বাস্তুভিটার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই জমী কিনিয়া রাখায় একটা এই সুবিধা হইয়াছে, যে, শান্তিনিকেতনের কোন দিকে বিশ্বভারতীর সহিত নিঃসম্পর্ক লোকদের চালের কল বা অন্য কারখানা, বসতি প্রভৃতি হইবে না। ১৪০০ বিঘা ডাঙা জমী হয় বিশ্বভারতীর উপনিবেশ হইবে, নতুবা ডাঙা জমীর উপযোগী কোন কৃষিকাজ সেখানে হইবে, কিংবা বিশ্বভারতীরই নানা প্রতিষ্ঠান তথায় গড়িয়া উঠিবে, নয়ত লোকালয়ের সহিত ব্যবধান রক্ষার কাজে লাগিবে।

—

"বাংলাকে বরাবর কম প্রতিনিধি দান"

আমরা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে (২৯৪-৫ পৃঃ) দেখাইয়াছি, যে, বাংলা দেশকে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার বিধি অনুসারে তাহার লোক-সংখ্যার তুলনায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অত্যন্ত কম প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে ফেডার‍্যাল ষ্ট্রাক্‌চ্যার কমিটি তাহাকে যত প্রতিনিধি দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও কম। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড বিধি অনুসারে বঙ্গের ও অন্যান্য প্রদেশের যত প্রতিনিধি আছে, তাহার যে তালিকা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে (পৃঃ ২৯৫) দেওয়া হইয়াছে অনবধানতা বশতঃ তাহাতে ভুল আছে। নির্ভুল তালিকা নীচে দিতেছি

প্রদেশ।	১৯২১সালে লোক-সংখ্যা।	নির্ব্বাচিত দেশী প্রতিনিধির সংখ্যা।
মাদ্রাজ	৪২৩১৮৯৮৫	১৫
বাংলা	৪৬৬৯৫৫৩৬	১৪
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৫৩৭৫৭৮৭	১৫
বোম্বাই	১৯৩৪৮২১৯	১৪
পঞ্জাব	২০৬৮৫০২৪	১২
বিহার-উড়িষ্যা	৩৪০০২১৮৯	১২
মধ্যপ্রদেশ	১৩৯১২৭৬০	৬
আসাম	৭৬০৬২৩০	৩
দিল্লী	৪৮৮১৮৮	১
ব্রহ্মদেশ	১৩২১২১৯২	৩
আজমীর-মেড়োআরা	৪৯৫২৭১	১

বঙ্গের প্রতি অবিচার ছাড়া এই তালিকাটিতে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। মাদ্রাজ, বঙ্গ ও

আগ্রা-অযোধ্যা, এই তিনটি প্রদেশের মোট লোক-সংখ্যা ১৩,৪৩,৯০,৩০৮। ইহাদের নির্ব্বাচিত দেশী প্রতিনিধির সংখ্যা ৪৪ জন। বাকী আটটি প্রদেশের লোক-সংখ্যা ১০,৯৭,৫০,০৭৩। তাহাদের নির্ব্বাচিত দেশী প্রতিনিধির সংখ্যা ৫২ জন। অর্থাৎ যাহাদের লোক-সংখ্যা প্রায় তিন কোটি কম, তাহারা চারিজন বেশী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে!

—

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথোপকথন ও উপদেশাবলী লিখিয়া লইয়া ও প্রকাশ করিয়া যিনি যশস্বী হইয়াছেন, সেই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কিছু দিন হইল প্রায় আশী বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মর্টন ইন্সটিটিউশ্যন নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারা সাধু ও উন্নত চরিত্রের জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

—

গবর্ন্মেণ্টের একটি কর্ত্তব্য

টেরারিজমের আমূল উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট চেষ্টা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিতেছেন। এই চেষ্টা উচ্চ, উচ্চতর, ও উচ্চতম সরকারী কর্ম্মচারীরা আপনাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের বা তাহাদের প্রতিনিধি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক করেন নাই। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্য দেশে শান্তিস্থাপন তাঁহাদের চেয়ে আমরা কম চাই না, বরং বেশী চাই বলিয়া আমরা অনাহূত ভাবে এবিষয়ে গবর্ন্মেণ্টের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকি, এখন আবার করিব। ইহা আমাদের গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া যদি কেহ ব্যঙ্গ করিতে চান, তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইব না।

গবর্ন্মেণ্টের ধারণা বোধ হয় এইরূপ, যে, টেরারিষ্টরা যে-কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে অরক্ষিত ও অসাবধান অবস্থায় পায়, তাহার আচরণের বিচার না-করিয়া তাহার প্রাণবধ বা প্রাণবধের চেষ্টা করে। যে-সকল সরকারী কর্ম্মচারী এ পর্য্যন্ত আক্রান্ত বা নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে আমরা কিছু জানি না। হইতে পারে, যে, বাছিয়া বাছিয়া বা অবিচারিতভাবে তাঁহাদের প্রাণ বধ করিবার কোনই বিশেষ কারণ ছিল না। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডে ব্ল্যাক ও ট্যানদের কার্য্যের সহিত বিশেষ পরিচিত ব্রিগেডিয়্যার-জেনার‍্যাল ক্রোজিয়ার তাঁহার "গান্ধীর প্রতি একটি কথা"* নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,

> "বিপ্লবী চরমপন্থীরা অবিচারিত বা অকারণ হত্যা করে না—আয়াল্যাণ্ডে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল। সমুদয় বিপ্লবী মহলে অবিচারিত হত্যা ব্যর্থ বিবেচিত হইয়া থাকে।" ৮৮ পৃঃ

> "Revolutionary extremists do not murder indiscriminately or without a cause—that was proved in Ireland. Indiscriminate murder is in all revolutionary circles considered futile." P. 88.

ভারতবর্ষের পক্ষেও এই কথাগুলি সত্য কিনা, গবর্ন্মেণ্ট যদি তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। কাহাকেও হত্যা করিবার কোন একটা কারণ থাকিলেই হত্যাকারীকে আইনানুযায়ী দণ্ড দিতে হইবে না, এরূপ বলা বা ইঙ্গিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। গবর্ন্মেণ্ট প্রত্যেক হত্যা সম্বন্ধে কারণ জানিতে বিশেষ চেষ্টা করুন, ইহাই আমরা চাই। বিশেষ কারণ যদি কিছু না থাকে, গবর্ন্মেণ্ট তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইবেন না, বিশেষ কোন কারণ যদি থাকে, তাহাও জানাইবেন না; কিন্তু বিশেষ কারণ যদি থাকে, এবং যদি তাহা আক্রান্ত বা নিহত কর্ম্মচারীর কোন বেআইনী জবরদস্তী বা অত্যাচার হয়, তাহা হইলে গবর্ন্মেণ্ট গোপনে আক্রান্ত বা নিহত কর্ম্মচারীদের মত কার্য্যে নিযুক্ত সকল কর্ম্মচারীকে সাবধান করিয়া দিবেন তাঁহারা যেন বেআইনী ঐরূপ কিছু না-করেন, আমরা ইহাই চাই। ইহা করিলে দেশে শান্তিস্থাপনের একটা উপায় অবলম্বিত হইবে, এবং রাজকর্ম্মচারীদের উপর আক্রমণের অন্ততঃ একটা সম্ভবপর কারণ দূরীভূত হইবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। অস্ত্রশস্ত্রহীন কতকগুলি লোক কোথাও সভা করিল বা অন্ত কোন কারণে জনতা হইল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পুলিস সেখানে

* "A Word to Gandhi: The Lesson of Ireland." By Brigadier-General F. P. Crozier.

গিয়া তাহাদিগকে নিজের নিজের বাড়ি যাইতে বলিল। তাহারা পুলিসের কথা না শুনিয়া পুলিসকে ইঁট পাটকেল ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল ও তখন পুলিস গুলি করিল, কিংবা উত্তেজনার কোনই কারণ ব্যতিরেকে নিরস্ত্র জনতা সশস্ত্র পুলিসকে আক্রমণ করিল। ইত্যাকার সংবাদ প্রায়ই খবরের কাগজে দেখা যায়। সম্প্রতি নদীয়া জেলার তেহাটা গ্রামে এবং মেদিনীপুরের মাগুরিয়া গ্রামে পুলিসের গুলিতে জনতার কয়েক জনের মৃত্যুর ও আরও অনেকের আহত হইবার এইরূপ বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। পুলিসের হাতে লাঠি ও সঙীন-লাগান গুলিভরা বন্দুক আছে, নিজেদের হাতে কোনই অস্ত্র নাই, এবং লাঠি চালাইলে ও বন্দুক ছুড়িলে তাহা পুলিসের পক্ষে বেআইনী বিবেচিত হইবে না—এরূপ চাক্ষুষ জ্ঞান ও মানসিক ধারণা সত্ত্বেও নিরস্ত্র বাঙালী জনতা আক্রান্ত না হইয়া বিনা উত্তেজনায় অকারণে সশস্ত্র পুলিসকে আক্রমণ করিয়া থাকে, ইহা বিশ্বাস করা সাতিশয় কঠিন। খুব বেশী বিশ্বাসপ্রবণতা আমাদের না-থাকা আমাদের দোষ হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাসপ্রবণতা না থাকাতেই আমরা গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, যে, যেখানেই গুলি চলিবে, সেখানেই যেন গোপনে ঘটনাটার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান সরকার বাহাদুর করেন, এবং পুলিসের দোষ থাকিলে যেন গোপনে অন্ততঃ তাহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। তাহা করিলে সভ্য গবর্মেণ্টের অনুচিত কাজ হইবে না।

ভীরুতম জাতিকেও কেবল ভয়োৎপাদন দ্বারা শাসন করা যায় না, ইহা বহু ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইংরেজী পুস্তকে লেখা আছে বলিয়া এই সকল কথা লিখিলাম।

—

বঙ্গের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি-সংখ্যা

বিলাতে যাঁহারা আপনাদিগকে মর্ত্ত্যলোকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা মনে করেন, তাঁহারা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সমস্তার তাঁহাদের সমাধান অচিরে প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। ইহাতে কতক লোক আশান্বিত এবং অনেক লোক আতঙ্কিত হইয়াছে। এই সমাধানের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে লিবার্টি কাগজে একটি গুজব প্রকাশিত হইয়াছে, যে, ভারত-গবর্মেণ্ট বাংলা দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিম্নলিখিত রূপ সুপারিশ বিলাতে পাঠাইয়াছেন:—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ২৫০ জন সদস্য থাকিবে। ইহার জন্য মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজের নিজের প্রতিনিধি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন করিবে। মুসলমানদের জন্য ১১৭টি প্রতিনিধি-পদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, হিন্দুদের জন্য ৭৮টি এবং বাকী পদগুলি ইংরেজ, ফিরিঙ্গী ও বিশেষ বিশেষ নির্ব্বাচকসমষ্টির জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। হিন্দুদের ৭৮টির মধ্যে কতকগুলি পদ "অবনত" শ্রেণীর জন্য রক্ষিত থাকিবে।

স্বাজাতিক মুসলমান বাঙালীরা এবং স্বাজাতিক হিন্দু বাঙালী নেতারা সম্মিলিত নির্ব্বাচনের এবং কাহারও জন্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি-পদ না-রাখার সমর্থন করিয়াছেন। উল্লিখিত গুজব সত্য হইলে, গবর্মেণ্ট ইঁহাদের মত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

লোক-সংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইত, উপরে লিখিত ভাগবখরা তার চেয়েও অনেক খারাপ। হিন্দুদের প্রতি ত উহাতে খুবই অবিচার করা হইয়াছে। মুসলমানদেরও যে উহাতে সন্তুষ্ট হইবার কারণ নাই, তাহাও দেখাইব।

বাংলা দেশের লোকসমষ্টির শতকরা ৫৫ জন মুসলমান, ৪৩ জন হিন্দু, এবং ২ জন অন্যান্য। কিন্তু মুসলমানদিগকে দিবার প্রস্তাব হইতেছে শতকরা ৪৬.৮ জন প্রতিনিধি, হিন্দুদিগকে ৩১.২ এবং অন্যান্যকে ২২। অর্থাৎ মুসলমানেরা পাইতেছে তাহাদের সংখ্যার অনুপাতের চেয়ে প্রায় শতকরা ৮ জন কম প্রতিনিধি, হিন্দুরা প্রায় শতকরা ১২ জন কম এবং অন্যান্যেরা পাইতেছে শতকরা ২০ জন বেশী। হিন্দুদের প্রতি অবিচার ইহাতেই শেষ হয় নাই। তাহারা কমসংখ্যক প্রতিনিধি যাহা পাইয়াছে, তাহার মধ্যেও আবার ভাগাভাগি আছে। হিন্দুদিগকে কার্য্যতঃ একটি সম্প্রদায় না ধরিয়া, "অবনত" শ্রেণীর লোকদিগকে আলাদা বলিয়া

ধরিয়া লইয়া, তাহাদিগকে কতকগুলি প্রতিনিধির পদ ৭৮টির মধ্য হইতে দিতে হইবে। মুসলমানদের অসন্তোষের কারণ এই হইবে, যে, তাহাদের মধ্যে পার্থক্যাভিলাষীরা যাহা চাহিতেছিল, তাহা এই ব্যবস্থায় পাইতেছে না। তাহারা বলিয়াছিল, তাহারা বঙ্গের উপর প্রভুত্ব করিতে—ডমিনেট্ করিতে—চায়, সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে চায়। কিন্তু তাহা ত এই ব্যবস্থায় হইতেছে না। ১১৭টি পদ মুসলমানের, ৭৮টি হিন্দুর, এবং বাকী ৫৫টি "অন্য"দের—মোট ২৫০। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই, যে, এই "অন্য" ব্যক্তিরা নিজেদের সুবিধামত কোন-না-কোন দলে যোগ দিয়া প্রভুত্ব করিবে। যদি তাহারা মুসলমানদের সহিত যোগ দেয়, তাহা হইলে এক দিকে ১১৭+৫৫=১৭২ ভোট এবং অন্য দিকে হিন্দুদের ৭৮ ভোট হইবে, সুতরাং হিন্দুদের পরাজয় হইবে। আবার যদি তাহারা হিন্দুদের পক্ষ অবলম্বন করে, তাহা হইলে এক দিকে ৭৮+৫৫=১৩৩ ভোট হইবে এবং অন্যদিকে মুসলমানদের ১১৭ ভোট থাকিবে, সুতরাং শেষোক্তরা হারিয়া যাইবে। ফলে এই অন্যেরাই কার্য্যতঃ সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে, মুসলমানেরা হইবে না।

গুজবটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে, ভারত-গবন্মেণ্ট বেশ কূটনীতিসম্মত ফন্দী আঁটিয়াছেন। কিন্তু চাতুরী দ্বারা কত দিন চলিবে?

—

মুসলমান বাঙালীদের প্রাধান্যের দাবি

মুসলমান বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা বঙ্গে প্রাধান্য ও প্রভুত্বের দাবি করেন, তাঁহাদের ঐ দাবির একমাত্র ভিত্তি লোক-সংখ্যার আধিক্য। শিক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, কলকারখানা ও পণ্যশিল্পে, জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে, জনহিতকর প্রতিষ্ঠাসমূহে দানে, জনহিত ও রাষ্ট্রহিত কল্পে সময় সামর্থ্য শক্তি ও অর্থের নিয়োগে, তাঁহারা হিন্দুদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নহেন। তাঁহারা সংখ্যায় বেশী হইলেও সরকারী তহবিলে হিন্দুদের চেয়ে বেশী বা হিন্দুদের সমান টাকা দেন না।

বঙ্গে তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যও সরকারী কৌশলের ফল। আগে আগে প্রধানতঃ বাংলাভাষী যে-সব জেলা, মহকুমা বা থানা বঙ্গের অন্তর্গত ছিল, তাহার কতকগুলিকে বিহারের ও কতকগুলিকে আসামের সামিল করিয়া দেওয়ায় অঙ্গহীন বঙ্গে অমুসলমানেরা সংখ্যায় কম হইয়াছে। এই অঙ্গহীন বঙ্গেও একুশ বা তদূর্দ্ধ বয়সের মুসলমানেরা যে ঐ বয়সের অমুসলমানদের চেয়ে কম, কিংবা সামান্য অধিক, তাহার আলোচনা আমরা সম্প্রতি মডার্ন রিভিউ কাগজে করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরালোচনা করিব না। কিন্তু একটা কথা বলা দরকার। যদি শিক্ষা, ট্যাক্স দান প্রভৃতির বিচার না করিয়া কেবল সাবালক ব্যক্তি মাত্রকেই প্রতিনিধি হইবার ও প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দিতে হয়, তাহা হইলে পুরুষে ও স্ত্রীলোকে ভেদ করিলে চলিবে না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যপ্রার্থী মুসলমানেরা বলিতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে যেন ভোটের অধিকার বা প্রতিনিধি হইবার অধিকার দেওয়া না হয়। কারণ তাহারা জানে, যে, হিন্দু সমাজের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষায় ও সামাজিক স্বাধীনতায় হিন্দু পুরুষদের সমান না হইলেও এইরূপ বিষয়ে মুসলমান স্ত্রীলোকদের চেয়ে অগ্রসর। সুতরাং পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের রাজনৈতিক অধিকার সমান হইলে, মুসলমান স্ত্রীলোকেরা শিক্ষায় ও স্বাধীনতায় হিন্দুনারীদের চেয়ে অনগ্রসর বলিয়া এবং প্রায় সকলেই অবরোধবাসিনী বলিয়া, মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুসমাজের সমকক্ষতা করিতে পারিবে না।

—

বঙ্গে কোন্ সম্প্রদায় ট্যাক্স বেশী দেয়?

ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে "No taxation without representation" অর্থাৎ "প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার যদি আমাদিগকে না দাও এবং আমাদের কথা যদি না শোন, তাহা হইলে আমাদের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিতে ও তাহা আদায় করিতে পারিবে না," এই উক্তি অতি প্রসিদ্ধ। ইহার উল্টা কথা ছুটাও সত্য। অর্থাৎ যদি আমরা ট্যাক্স দি, তাহা হইলে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার আমাদের থাকা চাই, এবং যাহারা নিজে ট্যাক্স কম দেয় বা দেয়ই না, ট্যাক্সদাতা ও অধিক ট্যাক্সদাতাদের উপর তাহারা প্রভুত্ব করিবে

ও তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া নিজেরা যথেচ্ছ খরচ করিতে পারিবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে।

যে-যে বাবতে বঙ্গে প্রাদেশিক রাজস্ব আদায় হয়, তাহার কোনটিতেই মুসলমানেরা হিন্দুদের সমান টাকা দেয় না—খুব কমই দেয়। আবগারী রাজস্বের বেশীর ভাগ হিন্দুরা দেয়, কারণ মুসলমান সুরাপায়ী থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা হিন্দু সুরাপায়ীদের চেয়ে কম। ইহা মুসলমানদের প্রশংসার বিষয়। ষ্ট্যাম্পের রাজস্বও মুসলমানদের নিকট হইতে কম আদায় হয়। বঙ্গের প্রাদেশিক রাজস্বের মধ্যে জমীর খাজানাই সকলের চেয়ে বড় আয়। ইহা সুবিদিত, যে, বঙ্গে গবর্মেণ্ট সাক্ষাৎভাবে চাষীদের নিকট হইতে খাজানা আদায় কমই করেন, জমীদারদের নিকট হইতেই অধিকাংশ খাজানা আদায় হয়। ইহাও সুবিদিত, যে, জমীদারদের অধিকাংশ হিন্দু।* অতএব জমীর খাজানার অধিকাংশ হিন্দুদের নিকট হইতেই আদায় হয়।

এ বিষয়ে মুসলমান পক্ষ হইতে এই যুক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যে, জমীদাররা অধিকাংশ হিন্দু হইলেও হিন্দু জমীদাররা অনেকস্থলে মুসলমান রায়তদের কাছ থেকে খাজানা আদায় করিয়া তাহাই সরকারী খাজাঞ্চিখানায় জমা দেয়; সুতরাং ঐ টাকাটা মুসলমানদেরই দেওয়া। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, রায়ৎ কৃষকেরা জমী চাষ করিয়া উৎপন্ন ফসল হইতে নিজেদের প্রাপ্য রাখিয়া খাজানার আকারে জমীদারের প্রাপ্য জমীদারকে দেয়। জমীদাররা নিজের এই প্রাপ্ত অংশ হইতে গবর্মেণ্টকে খাজানা দেয়, রায়তের অংশ হইতে দেয় না। সুতরাং রায়ৎ হিন্দু বা মুসলমান যাহাই হউক, হিন্দু বা মুসলমান জমীদার নিজের প্রাপ্য অংশ হইতে খাজানা দেয়। তথাপি যুক্তিটা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। বঙ্গের জমীর খাজানা বিষয়ক সরকারী আধুনিক রিপোর্ট ("Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1930-31") হইতে দেখা যায়, যে, যে-ডিবিজনে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, ভূমির খাজানা সেখানে বেশী, মুসলমানপ্রধান ডিবিজনগুলির খাজানা তত নয়। তুলনার জন্য বর্দ্ধমান ডিবিজন ও ঢাকা ডিবিজন লওয়া হউক। ১৯২১ সালের সেন্সস রিপোর্ট অনুসারে বর্দ্ধমান ডিবিজনের ৮০,৫০,৬৪২ জন অধিবাসীর মধ্যে ৬৬,০৩,৮৪০ জন হিন্দু। ঢাকা ডিবিজনের ১,২৮,৩৭,৩১১ জন অধিবাসীর মধ্যে ৩৮,৩১,০৫১ জন হিন্দু। বর্দ্ধমান ডিবিজনের আয়তন ১৩৮৫৪ বর্গ-মাইল, ঢাকা ডিবিজনের ১৪৮২২ বর্গ-মাইল। বর্দ্ধমান ডিবিজন লোকসংখ্যা ও বিস্তৃতিতে ঢাকা অপেক্ষা ছোট, এবং উহা হিন্দুপ্রধান, ঢাকা মুসলমানপ্রধান। কিন্তু ১৯৩০-১৯৩১ সালের রিপোর্ট অনুসারে বর্দ্ধমান ডিবিজন হইতে, সরকারী খাজানার দাবি হয় ৯৫,৯৫,৭৮৫ টাকা, ঢাকা ডিবিজন হইতে হয় ৫৬,৫৬,৭২৬ টাকা। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, যে, ঢাকা ডিবিজনে খাজানার হার বর্দ্ধমান ডিবিজন অপেক্ষা অনেক কম। মুসলমান-প্রধান রাজসাহী ডিবিজনের লোক-সংখ্যা (১,০৩,৪৫,৬৬৪) এবং বিস্তৃতি (১৯,০৪৭ বর্গ-মাইল) বর্দ্ধমান ডিবিজনের চেয়ে বেশী। অথচ ইহাও গবর্মেণ্টকে বর্দ্ধমান অপেক্ষা কম খাজনা (৭০,২৭,৩৭৮ টাকা) দেয়। হিন্দুপ্রধান প্রেসিডেন্সী ডিবিজনের লোক-সংখ্যা (৯৪,৬১,৩৯৫) ঢাকা অপেক্ষা কম, কিন্তু ইহা ঢাকা অপেক্ষা বেশী খাজনা (৬৭,৫৬,৭৭১ টাকা) দেয়।

* "Muhammadans are almost double the number of Hindus among the ordinary cultivators, but among the landlords and middlemen Hindus are nearly twice as many as Muhammadans, and nowadays nearly all the great landlords are Hindus." *Bengal Census Report* for 1921, p. 413.

—

অবনত শ্রেণী কাহারা?

হিন্দুসমাজের মধ্যে কতকগুলি লোক "অবনত" বলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যাঁহাদিগকে "অবনত" বলা হয়, তাঁহাদেরও প্রতিনিধি অবশ্যই ব্যবস্থাপক সভায় থাকা আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিনিধিকে যে "অবনত"-শ্রেণীরই হইতে হইবে, এবং তাঁহার নির্ব্বাচনও যে স্বতন্ত্র ভাবে কেবল "অবনত" নির্ব্বাচকদের দ্বারা করাইতে হইবে, তাহার প্রয়োজন প্রমাণিত হয় নাই। বস্তুতঃ, যাঁহাদিগকে উচ্চ জাতি বলা হয়, সেই উচ্চজাতীয় অনেক

লোক "অবনত"দের জন্য খুব পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ লোকেরা কেন যে "অবনত" শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধি হইবার অযোগ্য, তাহা বুঝা কঠিন। অবশ্য "অবনত" শ্রেণীর যোগ্য লোকেরাও তাঁহাদের প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত। কিন্তু একমাত্র তাঁহারাই উপযুক্ত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

"অবনত" যে কাহারা, সে বিষয়েও সরকারী মতের কোন স্থিরতা নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে, "অবনত"দের সরকারী তালিকা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত জুলাই মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। অবনত কাহারা সে বিষয়ে ইণ্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটির রিপোর্টে আলোচনা আছে। এই কমিটি অস্পৃশ্যতা ও অবনততার এই লক্ষণগুলি গ্রহণ করিয়াছেন :—

"যাহাদিগকে সাধারণ (ordinary) হিন্দু দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে যাইতে দেওয়া হয় না।

"যাহারা স্পর্শ দ্বারা, কিংবা কতক দূর হইতে অপরকে অশুচি করে।"

বাংলা দেশের অনেক জায়গায় অনেক অ-ব্রাহ্মণ পরিবারের নিজস্ব দেবমন্দিরেরও অভ্যন্তরে অ-ব্রাহ্মণ মালিকগণ প্রবেশ করেন না। বর্ণব্রাহ্মণেরাও তাহাতে ঢুকিতে পায় না। আবার কোথাও কোথাও কোন কোন মন্দিরে সকল হিন্দু জাতির লোকদের মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢুকিবার অধিকার সাব্যস্ত বা সমর্থিত হইয়াছে। বঙ্গের সব জেলার সব জায়গায় প্রচলিত রীতি এক নহে। বাংলা দেশে এরূপ বিশ্বাস বা রীতি নাই, যে, কোন জাতির লোক নির্দ্দিষ্ট কোন দূরত্ব হইতে কেবল সান্নিধ্য দ্বারা "উচ্চ" জাতির লোকদিগকে অশুচি করিয়া ফেলিতে পারে—দক্ষিণ-ভারতে আছে বটে। স্পর্শ দ্বারা অশুচি কোন্ কোন্ জাতি করে, সে বিষয়েও জেলা ও অঞ্চল ভেদে মতভেদ আছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, যে, যে-সব জাতির যে-সব লোক মলমূত্র ও নর্দ্দমা পরিষ্কার করিবার কাজ স্বয়ং করে, তাহারা স্পর্শ দ্বারা "উচ্চ" জাতীয় অপরকে অশুদ্ধ করিয়া দেয়, এইরূপ বিশ্বাস গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে আছে।

এই প্রকার নানা মতভেদ থাকায় বঙ্গে "অবনত"দের সংখ্যা সম্বন্ধে সরকারী যে নানা অনুমান ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটির রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে খুব প্রভেদ লক্ষিত হয়। অনুমানগুলি এইরূপ—সাউথবরো কমিটি, ৯১ লক্ষ; স্যর হেনরী শার্প, ৬৭ লক্ষ; ১৯২১ সেন্সস, ৯০ লক্ষ; সাইমন কমিশন, এক কোটি পনর লক্ষ; বাংলা গবর্মেণ্ট, ১ কোটি ১২ লক্ষ; বাংলার প্রাদেশিক ফ্র্যাঞ্চিস কমিটি, সত্তর হাজার। এই প্রাদেশিক কমিটির সভ্যেরা দেশী লোক। দেশের সামাজিক মত ও রীতি-নীতি তাঁহাদের বেশী জানিবার কথা। তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করিয়া ৭০,০০০এর জায়গায় ১ কোটি ১২ লক্ষ লোককে অস্পৃশ্য বা অবনত বলিয়া দাগিয়া দেওয়া ঠিক হইবে না।

হিন্দুদের সামাজিক বিশ্বাস ও রীতি-নীতি অপরিবর্ত্তনীয় নহে, কারণ হিন্দুসমাজ চলিষ্ণু ও প্রগতিশীল। সুতরাং বিদেশী গবর্মেণ্টের পক্ষে হিন্দুদের সামাজিক কোন বিশ্বাসকে অপরিবর্ত্তনীয় বা কষ্টে-পরিবর্ত্তনীয় কোন নির্দ্দিষ্ট আকার দিবার চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য। ইহা বিদেশী গবর্মেণ্টের অনধিকার চর্চ্চা।

অহিন্দু "অবনত" শ্রেণী

কেবল হিন্দুদের মধ্যেই যে অবনত শ্রেণী আছে, তাহা নহে; মুসলমান, দেশী খৃষ্টিয়ান এবং শিখদের মধ্যেও আছে। সুতরাং কেবল হিন্দুদিগকেই "উচ্চ" ও "অবনত" দুই ভাগে বিভক্ত করিবার চেষ্টাকে হিন্দুদের সংহতি ও শক্তি হ্রাস করিবার চেষ্টা বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। অবনত শ্রেণী যে অ-হিন্দুদের মধ্যেও আছে, তাহার কিছু প্রমাণ দিতেছি।

রিজলী সাহেবের পীপ্‌ল্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকে আছে :—

"Like the higher Hindu castes the Ashraf consider it degrading to accept menial service or to handle the plough.... In some places a third class, called Arzal or "lowest of all" is added. It consists of the very lowest castes, such as the Hala'khor, Lalbegi, Abdal, and Bediya, with whom no other Muhammadan would associate, and who are forbidden to enter the mosque or to use the public burial ground."

১৯০১ সালের বঙ্গীয় সেন্সস্ রিপোর্টে গেট সাহেব মুসলমান পঞ্চায়েৎদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত দিয়াছেন :—

"Among the social offences of which the panchayet takes cognizance may be mentioned the eating of forbidden food .... marrying women of other castes (whether of higher or lower rank is immaterial). eating with or smoking from the *hukka* of out-castes, etc."

তিনি মৈমনসিংহের অন্যতম জমীদার মিঃ আর্ এ গজনবীর এই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"The Muhammadans of lower rank, who belong to certain functional groups, are just as strictly endogamous as the members of Hindu castes."

১৯২১ সালের বঙ্গীয় সেন্সস রিপোর্টের ইংরেজ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লিখিয়াছেন, যে,

"A Sheikh will not marry a Kulu and in some parts one class of Muhammadans will not even feed with another. In Tippera there are Muhammadan Beharas, who carry palkis, with whom the ordinary Muhammadan cultivator will not sit down to a meal."

এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এবং এই প্রমাণগুলি সমস্তই সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীদের লেখায় পাওয়া যায়। অথচ সরকার কেবলমাত্র হিন্দু-সমাজকেই বিভক্ত করিতে চান।

খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে জাতিভেদ ও অবনত শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ দিতেছি।

কলিকাতা হইতে দেশী খৃষ্টিয়ানদিগের "দি গার্ডিয়্যান" নামক একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইত। উহা কয়েক মাস হইল মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। দেশী খৃষ্টীয় সমাজে জাতিভেদ সম্বন্ধে মিঃ স্তাম এস্ উইলিয়াম ঐ কাগজটিতে ধারাবাহিক কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার একটিতে তিনি লিখিয়াছেন :—

"Although the Sudra castes are more or less equal to one another in social status, economic independence and educational advancement, still they rarely, if ever, intermarry. That is to say, normally a Vellala will not marry a Kalla, a Kalla will not marry a Naidu, and so on."

খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে "অস্পৃশ্যতা" ও "অনাচরণীয়তা" কি আকারে বর্ত্তমান আছে, তাহাও তিনি লিখিয়াছেন।

Some time back a Pastor working in a village Church came to Madras to attend a Church Committee meeting. He was to take food in the catechist's house. Being an Adi-Dravida, he was asked to sit in the verandah of the catechist's house and was served with food. After eating, the Pastor had to remove the leaf-plate himself. In the committee meeting the Pastor was the Chairman in the dining-hall, he was but an outcaste Pariah

The transfer of Pastors from place to place is to a certain extent influenced by caste prejudices. There are certain congregations which are entirely composed of Adi-Dravidas *e. g.*, a mass movement area. It has been regarded more or less as an unwritten law that Pastors of the same community should be chosen to work among them. When this custom is sought to be broken and a Sudra Pastor is sent there, he regards that pastorate as a place where every prospect is pleasing but man alone is vile—(is an outcaste), and seeks to escape the order. If he is forced to go there, he seeks to live there exclusively without contaminating himself by touch or interdining. It is but common knowledge that when that pastor goes out on his tour to the village congregations he so arranges that he returns home the same day without being driven to the necessity of taking food (or even water) prepared by an Adi-Dravida. Expedients, such as Thermos flask to carry water or coffee, stoves or a high caste servant, are often resorted to in the pastoral tours.

এই খৃষ্টীয় লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নূতন কথা নহে। এক শতাব্দীর অধিক কাল সরকারী ও বেসরকারী অনেক ইংরেজ এই সকল বৃত্তান্ত জানেন। কিন্তু "যত দোষ নন্দ ঘোষ"—"অবনত" শ্রেণী, "অস্পৃশ্যতা," প্রভৃতি হিন্দুদেরই একচেটিয়া অপরাধ! অতএব, যদিও হিন্দুদের অনেক নেতা এই সব অনিষ্টকর বিশ্বাস ও প্রথা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই চেষ্টা ক্রমশঃ সফলও হইতেছে, তথাপি হিন্দুদিগকে, এবং কেবল হিন্দু-দিগকেই, বিভক্ত করিতেই হইবে।

"আলবৎ হাম গদ্‌হা"

এক জন ইংরেজ কর্ণেল সাহেবের সম্বন্ধে গল্প আছে, যে, তিনি দেখিতে পান, তাঁহার অধস্তন সামরিক কর্ম্মচারী লেফ্‌টেন্যাণ্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর প্রভৃতির কাপড় ধুইবার জন্য ধোবা তাহার গাধার পিঠে চাপাইয়া লইয়া যায়, কিন্তু তাঁহার কাপড় নিজেই মাথায় করিয়া বহন করে। ইহাতে কর্ণেল সাহেব মনে করিলেন, ধোবা তাহার মর্য্যাদার হানি করিয়াছে। অতএব ধোবাকে তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, "এই উল্লু, লেফটেন্যাণ্ট সাহেব, ক্যাপ্টেন সাহেব, মেজর সাহেব, সবাইকার কাপড় তুই গাধার পিঠে চাপাইয়া লইয়া যাস্, আমার কাপড় কেন গাধার পিঠে লইয়া যাস্ না? আমার কাপড় বহিবার জন্যও নিশ্চয়ই

গাধা আনিস্।" কিন্তু হিন্দুস্থানী কম জানায় তিনি বলেন, "এই উল্লু, লেফটেন্যাণ্ট সাহেব গদ্‌হা, কাপ্তেন সাহেব গদ্‌হা, মেজর সাহেব গদ্‌হা, হাম কেঁউ গদ্‌হা নেহি?" অর্থাৎ, লেফটেন্যাণ্ট সাহেব গাধা, কাপ্তেন সাহেব গাধা, মেজর সাহেব গাধা, আমি কেন গাধা নই?" ধোবা বেচারা বলিল, "নেহি হুজুর, আপ কেঁউ গদ্‌হা হোঙ্গে?" অর্থাৎ "না হুজুর, আপনি কেন গাধা হইবেন?" কর্নেল সাহেব তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আলবত্তা হাম্ গদ্‌হা," অর্থাৎ "আমি নিশ্চয়ই গাধা," যদিও তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল, "আমার জন্যও নিশ্চয়ই গাধা আনিতে হইবে।" প্রহারের ভয়ে ধোপা বেচারা অগত্যা বলিল, "হাঁ হুজুর, আপ্ ভি গদ্‌হা," "হাঁ হুজুর, আপনিও গাধা।"

—

"আপনারা অবশ্যই অস্পৃশ্য"

অনেক তথাকথিত "উচ্চ"জাতীয় হিন্দু নেতা তথাকথিত "অস্পৃশ্য" জাতিদিগকে বলিতেছেন, "আমরা আপনাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করি না; সকল হিন্দুই যাহাতে আপনাদিগকে 'স্পৃশ্য' ও 'আচরণীয়' মনে করে, তাহার চেষ্টাও আমরা করিতেছি।" তথাপি আম্বেদকর ও তাঁহার অবৃহৎ দল বলিতেছেন,"আমরা নিশ্চয়ই অস্পৃশ্য।" অগত্যা কি "উচ্চ" জাতির লোকদিগকে বলিতে হইবে, "আপনারা অবশ্যই অস্পৃশ্য?"

উপরে মুদ্রিত গল্পের কর্নেল সাহেবের মত আম্বেদকরী দল যদি তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া স্বীকার না-করিলে প্রহার করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে অগত্যা বলিতে হইবে, "আপনারা নিশ্চয়ই অস্পৃশ্য"। রাও বাহাদুর এম্ সি রাজার সভাপতিত্বে অবনত শ্রেণীর যে কন্‌ফারেন্স হয়, তাহা ভাঙিবার যে চেষ্টা আম্বেদকরী দল করে, তাহাতে তাহাদের প্রহার-নৈপুণ্য স্বীকার করিতেই হইবে।

আম্বেদকরী দলের লোকদের গুণ্ডামি সত্ত্বেও বোম্বাইয়ে সম্প্রতি নিখিলভারতীয় "অবনত" জাতিদের কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের প্রবীণ ও বিবেচক নেতা রাও বাহাদুর এম সি রাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাহাতে সাতটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটিতে বলা হয়, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাঁহাদের প্রকৃত মঙ্গল কেবল সম্মিলিত নির্বাচন দ্বারা হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা রাজা-মুঞ্জে চুক্তি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছেন।

—

বঙ্গের অস্বাভাবিক অবস্থা

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিস্‌টার কামাখ্যাপ্রসাদ সেনকে কে বা কাহারা ভোর রাত্রে ঢাকায় তাঁহার এক বন্ধুর বাড়িতে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। এই হত্যার কারণ রাজনৈতিক বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, কিন্তু উহা যে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসামূলক নহে, তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামের একটি ঘরে কোন কোন বিপ্লবী লুকাইয়া আছে খবর পাইয়া ক্যামেরন নামক একজন সামরিক কর্মচারী কতকগুলি সিপাহী লইয়া তাহাদিগকে ধরিতে যান। ইংরেজদের কাগজে খবর বাহির হয়, যে, তাহাতে উভয়পক্ষে একটা "য়্যাক্‌শ্যন" অর্থাৎ যুদ্ধ হয়। গবর্মেণ্ট পক্ষ লুইস্ গান্ নামক মেশিন গান্ ব্যবহার করে। সরকার-পক্ষের নায়ক ক্যামেরন বিপ্লবীদের গুলিতে মারা যান এবং কোন কোন সিপাহীকেও গুলি লাগে। দুই জন বিপ্লবীর প্রাণ যায়। নিহত লোকেরা যে নিশ্চয়ই বিপ্লবী তাহার কোন প্রমাণ থাকিলে এ পর্য্যন্ত তাহা আমাদের চোখে পড়ে নাই।

ঢাকার ও চট্টগ্রামের এই দুইটি ঘটনা দ্বারা সূচিত হইতেছে, যে, বাংলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এখনও অস্বাভাবিক আছে। ইহাতে আমরা উদ্বিগ্ন ও দুঃখিত। কিন্তু অবস্থা যাহাতে স্বাভাবিক হইতে পারে, কর্তৃপক্ষকে এরূপ উপায় অবলম্বন করাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। সর্বসাধারণ যাহা করিতে পারেন, তাহার আভাস অনেক বার দিয়াছি।

—

ধলঘাটের শাস্তি

বিপ্লবী বলিয়া বর্ণিত দুটি লোক ধলঘাটে হত হওয়ায় গবর্মেণ্ট ঐ গ্রামের লোকদের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন। এরূপ জরিমানা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সর্বসাধারণের বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে প্রমাণ করা চাই, যে, লোক দুটি বাস্তবিক বিপ্লবী, এবং গ্রামের সমুদয় বা

অধিকাংশ লোক তাহাদিগকে বিপ্লবী জানিয়াও আশ্রয় দিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। গবর্মেণ্ট এরূপ কোন প্রমাণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি।

ধলঘাট সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট আর একটি হুকুম দিয়াছেন; তাহা যদি শাস্তি বলিয়া অভিপ্রেত না হয় তাহা হইলেও তাহা শাস্তিরই মত এবং তাহাতে বিপ্লবীদের সংখ্যা হ্রাস না পাইয়া বাড়িয়া যাইতে পারে। গবর্মেণ্ট তথাকার উচ্চ বিদ্যালয়ের বাড়িটিকে সৈন্যদের অস্থায়ী শিবিরে পরিণত করিতে চান। স্থানীয় কয়েক জন ভদ্রলোক এই আদেশের পুনর্বিবেচনার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁহাদিগকে চাঁদা তুলিয়া অস্থায়ী চালা তৈয়ার করিয়া স্কুল চালাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু স্কুল-গৃহটি কাড়িয়া লইবার মধ্যে ন্যায্যতা কোথায়? গ্রামের লোকেরা ৫০০০ টাকা জরিমানা দিতে এবং তাহার উপর নূতন স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ করিবার টাকাও দিতে পারিবে, তাহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেট এত ধনশালী কেন মনে করিলেন? তাহাদিগকে কার্য্যতঃ দু-বার জরিমানা দিতে হইলে যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা কি রাজপুরুষদের বাঞ্ছিত টেরারিজমের ও বিপ্লববাদের প্রতিকূল লোকমত গঠনে সাহায্য করিবে? স্কুলটি স্থায়িভাবে বা কিছু কালের জন্য বন্ধ হইয়া গেলে তাহার ফলে কি কর্ম্মহীন বালকদের মনে গবর্মেণ্টের প্রতি অনুরাগ বাড়িবে?

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস

আগামী ৮ই শ্রাবণ রবিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবসের চত্বারিংশ বার্ষিক উৎসব হইবে। এই দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য ঐ দিন পরিষদ্‌ভবনে প্রীতি-সম্মিলন হইবে। এই উপলক্ষে পরিষদের হিতৈষী সদস্য, বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকবর্গ স্বরচিত গ্রন্থ, প্রাচীন পুঁথি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন চিত্র, প্রাচীন প্রস্তর ও ধাতব মূর্ত্তি, প্রভৃতি দান করিলে সুখের বিষয় হইবে।

—

প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্রীদের শিক্ষণীয় বিষয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের ও পরীক্ষার সংস্কারের যে প্রস্তাব এতদর্থে নিযুক্ত কমিটি করিয়াছেন, আষাঢ়ের প্রবাসীতে (৪৪৭ পৃঃ) আমরা তাহার মোটামুটি সমর্থন করিয়াছিলাম। একথাও লিখিয়াছিলাম, "কমিটি ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ভাবে যে-সকল বিষয় শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও উত্তম হইয়াছে।" কিন্তু দেখিতেছি, অল্পদিন পূর্ব্বে কতিপয় শিক্ষিতা মহিলা সমবেত হইয়া ছাত্রীদের সম্বন্ধে কমিটির প্রস্তাবগুলির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে মহিলাদিগকে তৎসম্বন্ধে মত-প্রকাশের সুযোগ না-দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষ দিয়াছেন। ছাত্রীদের সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা যাহা হইবে, এমন কি ছাত্রদের জন্যও নূতন ব্যবস্থা যাহা হইবে, তৎসম্বন্ধে শিক্ষিতা মহিলাদের মত জানা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু মহিলারা শুধু প্রতিবাদ ও দোষারোপ করিয়াই নিবৃত্ত না হইয়া যদি কমিটির রিপোর্টের দফা দফা আলোচনা করিতেন এবং তাহার খুঁৎ ধরিয়া তাহা অপেক্ষা ভাল কিছু প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের, সর্ব্বসাধারণের এবং আমাদের মত নারীজাতির প্রয়োজন বিষয়ে অনভিজ্ঞ সম্পাদকদের সুবিধা হইত।

—

বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার

চট্টগ্রাম জেলার একটি গ্রামে দু-জন পাঠান কনষ্টেবল এক ভদ্রমহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। তাহাদের যে দণ্ড হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে। তাহারা সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া শাস্তি বেসরকারী বদমায়েসদের চেয়ে বেশীই হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীহট্টের কুমারী প্রতিভাবালা দামকে হরণ করিয়া যাহারা তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হয়, দীর্ঘকাল বিচারের পর তাহারা সকলেই খালাস পাইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এই মোকদ্দমাটিতে ঠিক বিচার হয় নাই। ইহার প্রতি আসাম গবর্মেণ্ট ও কলিকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে কি? প্রতিভাবালার শুদ্ধি হইয়াছে দেখিলাম। ইহা এই কারণে ভাল খবর, যে, সমাজে তাহার স্থান হইবে।

কিন্তু সে অত্যাচরিত হইয়াছিল, কোন পাপ করে নাই; বরং সতীত্ব রক্ষার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; সুতরাং তাহার "শুদ্ধি" অনাবশুক।

যশোহর জেলার সরোজিনী নাম্নী ১১ বৎসরের বালিকাকে হরণ করা ও তাহার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করার জন্ত যাহারা অভিযুক্ত হইয়াছিল, পাঁচজন হিন্দু ও মুসলমান জুরী একমত হইয়া তাহাদের সকলকেই দোষী বলায় বিচারক মহাশয় প্রধান আসামীর মোট ১৭ বৎসর, অন্ত দুজনের মোট ১৪ বৎসর করিয়া, চতুর্থ জনের ৭ বৎসর, এবং বাকী ৫ জনের ২ বৎসর করিয়া কঠোর কারাবাস দণ্ড দিয়াছেন। এই প্রকার পিশাচদের এইরূপ দণ্ডই হওয়া উচিত।

—

ধর্ষণের জন্য প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের কোটার গোড়ার দিকে সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তাহার পর তিনি বিলাতে প্রিভি কৌন্সিলের জজ হন এবং তজ্জন্ত "রাইট্ অনারেবল" বলিয়া অভিহিত হইতেন। তিনি যখন এদেশে জজিয়তী করিতেন, তখন দলবদ্ধ ভাবে নারী-ধর্ষণ এদেশে হইত না, কেবল রাজসাহী জেলায় হইতেছিল। তাহার প্রতিকার-স্বরূপ তিনি নূতন আইন করিয়া এরূপ অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিবার জন্ত গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন। অষ্ট্রেলিয়ার নজীর তিনি দেখান। গবর্মেণ্ট তাঁহার আবেদন মঞ্জুর না-করায় তিনি ও তাঁহার সহকর্মী অন্ত একজন জজ সুযোগ পাইলেই ধর্ষকদের যাবজ্জীবন দ্বীপচালান দণ্ড দিতেন। তাহাতে এইরূপ পাশবিক অপরাধ থামিয়া যায়।

নিজাম-রাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদ হইতে ইসলামিক কাল্চ্যার (*Islamic Culture*) নামক যে পত্রিকা বাহির হয়, তাহার গত এপ্রিল সংখ্যায় সৈয়দ আমীর আলী মহোদয়ের আত্মচরিতের যে-অংশ বাহির হইয়াছে, তাহাতে, ১৭৪ পৃষ্ঠায়, এই সকল কথা তাঁহার নিজের ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। আমরা তাহা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"A form of crime which happily was not then common in India had become frequent in the unruly district of Rajshahi. Bands of hooligans, I regret to say not all of them young, took to what is called in the annals of crime 'gang rape.' This required stern repression. Sessions Judges trying the cases were wont to inflict sentences varying from four to ten years' imprisonment, which had very little effect in stopping the outrages. Gangs continued to break into the houses, mostly mere huts, of inoffensive peasants, and carry off the married and unmarried women, and, after outraging them, returned the poor half-dead creatures to their own doors.

"I applied to Government to pass a short Act legalising capital sentences in such cases, as was done in Melbourne, where outrages by the "larrikins" were thus ruthlessly stopped. But the Indian Government had not the courage of the Australian, and I received a polite refusal. My colleague and I then took the matter into our own hands. The sentences came before the Criminal Bench (of the Calcutta High Court) for revision, and often the Legal Remembrancer appeared for the Crown on the ground of inadequacy of sentence. Our procedure was to issue notices to the accused to show cause why their sentences should not be enhanced. They almost invariably appeared by counsel or pleader and after a full and patient hearing on the accused's behalf, if we upheld the sentence, we enhanced it to "transportation for life' to the Andaman Islands.

"In a few months we had the satisfaction of hearing that these brutalities had ceased."

অনেক স্থলে ধর্ষণ দ্বারা নারীর যে অবস্থা ঘটে, তাহা প্রাণনাশ অপেক্ষাও ভয়াবহ। সুতরাং সৈয়দ আমীর আলী মহাশয় দলবদ্ধ অত্যাচারীদের যে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন, তাহা অতিমাত্রায় কঠোর নহে। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতী নহি বলিয়া মনে করি, যে, এই সকল দুরাত্মার যাবজ্জীবন স্বাধীনতা-লোপ এবং ভ্যাসেক্টোমি দণ্ড হওয়া উচিত। সৈয়দ আমীর আলীর কথাগুলি গবর্মেণ্টের এবং বিচারকদের প্রণিধান-যোগ্য; কারণ, বঙ্গে নারীনিগ্রহ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোন মুসলমান সদস্য সধর্মী সৈয়দ মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নারীনিগ্রাহক দুরাত্মাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের আইন প্রণয়নের চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

—

রাজনৈতিক বন্দীদের আণ্ডামান প্রেরণ

ভারতসচিব স্তর সামুয়েল হোর পার্লেমেণ্টে জানাইয়াছেন, যে, বিচারান্তে দোষী প্রমাণিত এক শত টেরারিষ্টকে (a hundred convicted terrorists)

আণ্ডামান পাঠান স্থির হইয়াছে। তাহার কারণও তিনি এই বলিয়াছেন, যে, টেরারিষ্টরা জেলে বন্দীদের নিয়মানুবর্ত্তিতা নষ্ট করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। বিলাতের ডার্টমুর জেলে কয়েদীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল, আমেরিকার কোন কোন জেলেও কয়েদীরা অরাজকতা উপস্থিত করিয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকা ছয়-সাত হাজার মাইল দূর হইতে কেহ শাসন করে না বলিয়া তথাকার কয়েদীদের দ্বীপচালানের ব্যবস্থা হয় নাই। বঙ্গের জেল-সমূহে ডার্টমুরের চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে নাই, এবং জেলসমূহে সাধারণতঃ নিয়মলঙ্ঘন বিশেষ রকম বেশী হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডে কয়েদীদের বিদ্রোহ বরং সহ্য হয়; বঙ্গের "ভদ্রলোক" কয়েদীরা "সরকার সেলাম" না-বলিলে সে বেয়াদবী অসহ্য। ১৯১৯ সালে ইণ্ডিয়ান জেল কমিটি আণ্ডামান অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সেখানে কয়েদী প্রেরণের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। ব্যয়াধিক্যের জন্যও ঐ দ্বীপ কয়েদী-উপনিবেশ হইবার উপযোগী নহে। দ্বীপচালান রদ করিবার জন্য একটি বিল (The Abolition of Transportation Bill) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবার সময় তাৎকালিক স্বরাষ্ট্রসচিব স্তর উইলিয়ম ভিন্সেন্ট বলেন, যে, দ্বীপচালান দণ্ড বন্ধ করা এবং আণ্ডামানকে কয়েদী-উপনিবেশ না-রাখা গবর্মেণ্টের অভিপ্রায়। সেই জন্য অনেক কয়েদীকে সেখান হইতে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনা হয়, এবং নূতন করিয়া আর কোন কয়েদীকে সেখানে পাঠান হয় নাই। এখন কিন্তু স্তর সামুয়েল ঠিক্ তাহার উল্টা নির্দ্ধারণ করিলেন। যাহাদের দ্বীপচালান দণ্ড হয় নাই, তাহাদিগকে আণ্ডামান পাঠান আইনসঙ্গত কি-না জানি না। কিন্তু নূতন আইন অথবা তদভাবে নূতন অর্ডিন্যান্স করিতে কত ক্ষণ?

ভারতসচিব কন্‌ভিক্টেড টেরারিষ্টদের কথা বলিয়াছেন। ঐ ছুটি কথার সাধারণ মানে যাহা, তাহাতে বিনাবিচারে বন্দী ডেটেনুরা ঐ পর্য্যায়ভুক্ত হয় না। কিন্তু যাহাদের শক্তি আছে, অসাধারণ অর্থে শব্দের ব্যবহারও তাহারা করিতে পারে—যেমন অর্ডিন্যান্স জারি করিবার জন্য অসাধারণ অর্থে এমার্জেন্সী কথাটির প্রয়োগ।

ভারতশাসনবিধি প্রণয়নের নূতন পন্থা

গত জুন মাসে ভারতবর্ষ-সম্পর্কীয় তর্কবিতর্কের সময় ভারতসচিব ভারতশাসনবিধি অতঃপর কি প্রকারে প্রণীত হইবে, তাহা বর্ণনা করেন। এতদিন তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক ও তাহার কমিটিগুলি দ্বারা নামত উহা হইতেছিল—যদিও তাহাতে কার্য্যতঃ ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অভিপ্রায়ানুরূপ ব্যবস্থাই হইতেছিল। নূতন প্রণালীতে গোলটেবিলে ভারতবর্ষের তথাকথিত প্রতিনিধি কিন্তু বস্তুতঃ গবর্মেণ্টেরই মনোনীত লোকদের সহিত পরামর্শের আবরণ পরিত্যক্ত হইবে। পার্লেমেণ্টের এক কমিটিই সব-কিছু করিবেন। গবর্মেণ্টের পছন্দসই জনকতক ভারতীয়কে কেবল তাঁহাদের মত-প্রকাশের জন্য ডাকা হইবে।

এরূপ প্রণালীর প্রস্তাবে ভারতীয় লিবার্‌য়াল অর্থাৎ মডারেটরাও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে, গবর্মেণ্ট ঐ প্রণালী অনুসারে কাজ করিলে তাঁহারা আর গবর্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবেন না। ইহাতে বিলাতী সংবাদপত্র-মহলে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু 'মর্নিং পোষ্ট' দমিবার পাত্র নয়; বলিতেছে, লিবার্‌য়ালদের দলভুক্ত অনুচর নাই বলিলেই হয়, তাহারা সহযোগিতা না করিলে কিছু ক্ষতি নাই। ভারতসচিব ঠিক কি করিবেন, এখনও প্রকাশ পায় নাই। মুসলমানদের মধ্যেও সকলে সহযোগিতা করিতে রাজী নয়। হয়ত বিলাতী মন্ত্রীমণ্ডল স্থির করিবেন ও ঘোষণা করিবেন, যে, একমাত্র আগাখান ও আগাখানী মুসলমানরাই ভারতবর্ষের মুখপাত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি, তাহাদের সহযোগিতা পাইলেই চলিবে।

গুজব রটিয়াছে, কংগ্রেসওয়ালা ও ভারতীয় লিবার্‌য়ালদের একযোগে কাজ সম্ভবপর করিবার জন্য একটা সম্মিলিত কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবার চেষ্টা হইবে।

—

ভারত-সচিবের আস্ফালন

স্তর সামুয়েল হোর বলিয়াছেন, তিনি "রুন্" ক্লবে

স্পষ্ট নন, কংগ্রেসকে একদম পিষিয়া না ফেলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইবেন না।

ইহার দ্বারা তিনি প্রকারান্তরে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, যে, ছয় মাস অর্ডিন্যান্স চালাইয়াও তিনি কংগ্রেসকে কাবু করিতে পারেন নাই। অথচ অর্ডিন্যান্স-গুলা পুনর্ব্বার নূতন আকারে জারি করিবার কারণ দেখাইতে গিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম এই, যে, অবস্থাটা সম্পূর্ণ গবর্মেণ্টের আয়ত্ত হইয়াছে, তবে কিনা কেবল অকস্মাৎ কিছু প্রয়োজন হইলে অস্ত্রটা হাতে রাখিবার নিমিত্ত অর্ডিন্যান্সগুলা আবার জারি করা হইল।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান "এক্টিনী" সভাপতি ডাক্তার সৈফুদ্দিন কিচ্‌লু সম্প্রতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কাশী আসিয়াছিলেন। পরামর্শানন্তর কি সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন, সিদ্ধান্তগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কংগ্রেস শীঘ্রই ভারতসচিবের বক্তৃতার জবাব দিবেন, এবং ভারতবর্ষ যেন তাহার জন্য প্রস্তুত থাকে।

—

এমার্জেন্সীর অসাধারণ অর্থ

পার্লেমেণ্টে গত ২৭শে জুন ভারতসচিব বলেন :—

"We have come to the conclusion that there will be on 3rd July an emergency sufficiently grave to necessitate the exercise of special powers. Therefore it is intended to assume by ordinance the majority of the powers that will otherwise lapse."

এমার্জেন্সীর মানে ইংরেজী অভিধানে আছে, "*sudden* juncture demanding immediate action," "an unforeseen occurrence or combination of circumstances which calls for immediate action or remedy", এবং 'sudden' এর মানে "occurring or come upon or made or done unexpectedly or without warning." সুতরাং ভারতসচিব যাহা ঘটিবে বলিয়া ছয় মাস আগে হইতে জানিতেন এবং যাহা ঘটিবে বলিয়া সাত দিন আগে ২৭শে জুন তিনি পার্লেমেণ্টে ঘোষণা করেন, তাহা প্রচলিত অর্থে এমার্জেন্সী নহে। ছয় মাসের মধ্যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা এ বিষয়ে আইন করান যাইত।

নূতন অর্ডিন্যান্সটা আগেকার অর্ডিনান্সগুলার সমষ্টিমাত্র। তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

—

আয়ার্ল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষে

আয়ার্ল্যাণ্ডে ডি ভ্যালেরার দল প্রবল। তাহারা এখন তথাকার গবর্মেণ্ট চালাইতেছে। তাহারা ইংলণ্ডের রাজার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবে না স্থির করিয়াছে। অধিকন্তু তাহারা ইংলণ্ডের দাবি অনুযায়ী ভূমি-সম্বন্ধীয় বার্ষিক কিস্তীর টাকাও দিবে না বলিয়াছে। তাহাতে আয়ার্ল্যাণ্ডের এই দলের কাহারও জেল বা জরিমানা হয় নাই, আইরিশদের কোন সভা বা জনতা লাঠি বা গুলি দ্বারা ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টাও হয় নাই।

ভারতবর্ষে, "ট্যাক্স দিব না," বলায় বা ট্যাক্স না দেওয়ায় যে-সব লোকের দুর্গতি হইয়াছে, সেই সব লোকের অনেকেরই দেয় টাকার পরিমাণ আয়ার্ল্যাণ্ডের বার্ষিক কিস্তীর তুলনায় নগণ্য; এবং তাহারা কেহই ইংলণ্ডের রাজার প্রজাত্ব বর্জন আইরিশদের মত জগৎময় ঘোষণা করে নাই।

আগাখানি আবদারের একটা ওজুহাত

যে-যে ওজুহাতে আগাখানিরা গবর্মেণ্টকে ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মুসলমানদিগকে অতিরিক্ত রকম রাজনৈতিক বকশিস দিতে অনুনয় করিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি এই, যে, মুসলমানেরা খুব বেশী সংখ্যায় সিপাহী হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে যাঁহারা ঠিক তথ্য জানিতে চান তাঁহারা মডার্ন রিভিউ কাগজের ১৯৩০ সালের জুলাই ও সেপ্টেম্বর এবং ১৯৩১ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী সংখ্যা দেখিবেন।

সিপাহী সৈন্যদলে মুসলমানরা শতকরা ৩০ জনের কিছু কম—শতকরা ২২'৬ জন পঞ্জাবী মুসলমান এবং শতকরা ৬'৩৫ জন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের

কয়েকটি (সব নহে) পাঠান ট্রাইবের অর্থাৎ উপজাতির লোক। ব্রহ্মদেশ, আসাম, বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা, আগ্রা-অযোধ্যা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মুসলমানদের মধ্য হইতে সাধারণতঃ সিপাহী সংগ্রহ করা হয় না। পঞ্জাব হইতে যে-সব মুসলমান সিপাহী সংগ্রহ করা হয়, তাহাও শতদ্রুর পরপারের কয়েকটি জেলা হইতে, সব জেলা হইতে নহে।

এখন সিপাহী ফৌজে যত মুসলমান আছে, মহাযুদ্ধের আগে তার চেয়ে অনেক কম ছিল। অন্ত যে-সব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, শ্রেণী বা অঞ্চল হইতে আগে বেশী বেশী সৈন্ত লওয়া হইত, এখন তাহা না-লওয়ার কারণ এ নয়, যে, তাহারা যুদ্ধ করিতে পারে না—কারণ রাজনৈতিক।

কেবল পঞ্জাবের কয়েকটি জেলায় ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কয়েকটি পাঠান উপজাতির মুসলমান সিপাহী ফৌজের শতকরা প্রায় ত্রিশ জন বলিয়া যদি ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মুসলমানেরা বিশেষ অধিকার লাভের দাবি করিতে পারে, তাহা হইলে সিপাহী ফৌজের শতকরা ৭০ জনের উপর অমুসলমান বলিয়া ভারতবর্ষের সব জায়গায় অমুসলমানরা কেন সেরূপ দাবি করিতে পারিবে না?

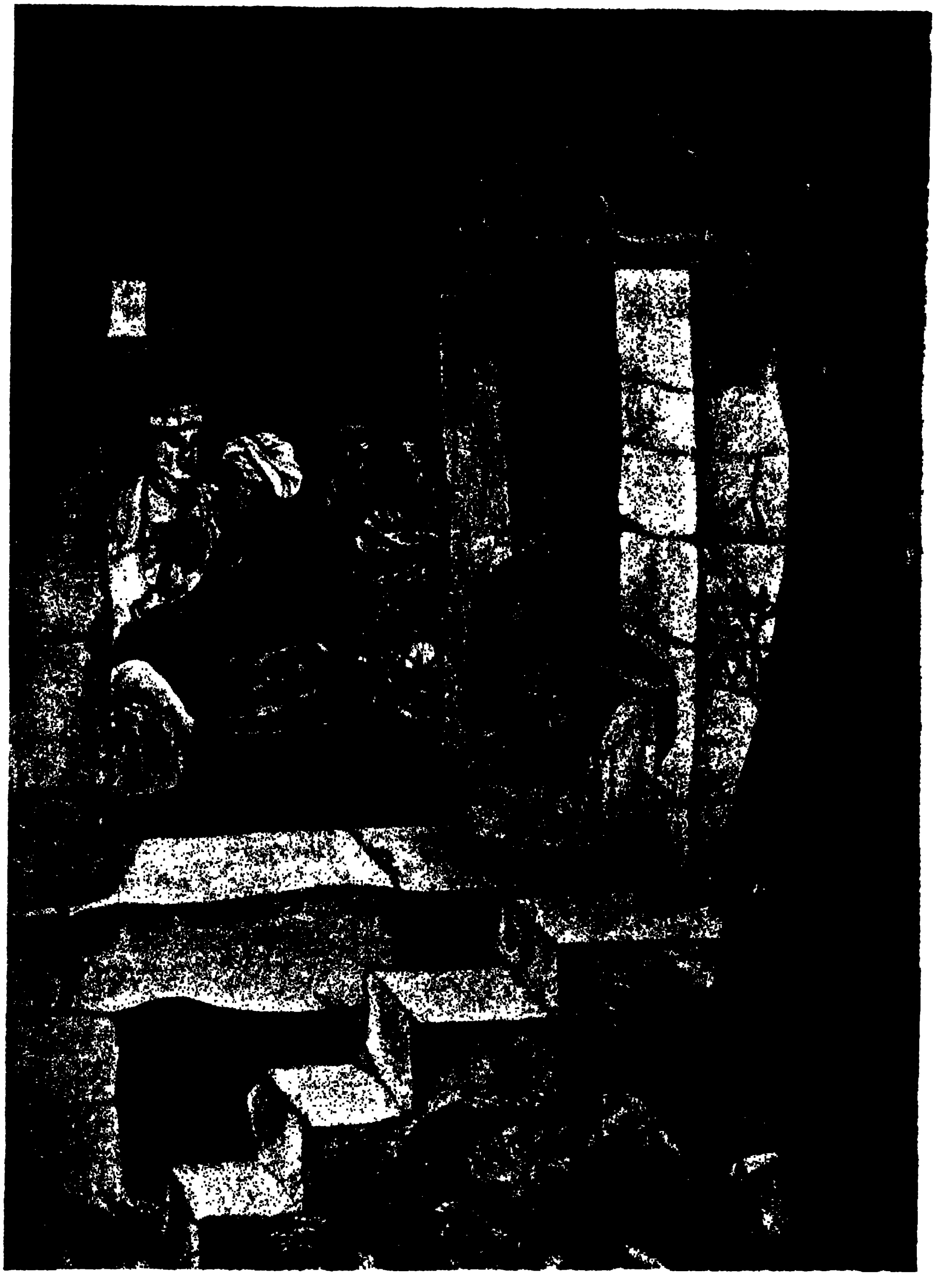
—

অনিলকুমার দাসের মৃত্যু

ঢাকার অনিলকুমার দাস, এম্‌-এস্‌সির হঠাৎ জেলে মৃত্যু হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ জন্মিয়াছে। ঢাকার উকীলসভা এইজন্ত গবর্ন্মেণ্টকে এই মৃত্যু সম্বন্ধে প্রকাশ্ত তদন্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদের নিজের মনঃপূত কারণ দেখাইয়া প্রকাশ্ত তদন্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। গবর্ন্মেণ্ট অনিলকুমারের মৃত্যুর পর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তের রিপোর্ট এবং সিবিল সার্জ্জনের দ্বারা যুবকটির শবব্যবচ্ছেদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয়, যে, গবর্ন্মেণ্ট সর্ব্বসাধারণকে বিশ্বাস করাইতে চান, যে, তাহার মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে ঘটিয়াছে। এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে, মনে হয় না। শবব্যবচ্ছেদের রিপোর্ট পড়িয়া মনে হয়, অনিলকুমারের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ও যন্ত্র বেশ সুস্থ অবস্থায় ছিল। তাহার মৃত্যুর কারণ সেরিব্র্যাল কঞ্জেশ্চ্যন (মস্তিষ্কে রক্ত জমা হওয়া) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ সুস্থ যুবকের মস্তিষ্কে কঞ্জেশ্চ্যন কেমন করিয়া ঘটিল, তাহার কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় নাই। তাহার শরীরের কোথাও আঘাত বা বলপ্রয়োগের চিহ্ন নাই লেখা হইয়াছে। কিন্তু সে অভিযোগ করিয়াছিল, যে, পুলিসের হেফাজতে থাকিবার সময় তাহার উপর প্রহারাদি অত্যাচার হইয়াছিল। তাহার পর তাহাকে জেলে পাঠান হয়। জেলে তাহার উপর কোন অত্যাচারের নালিশ সে করে নাই। জেলে সে কয়েক দিন ছিল। পুলিস কিছু করিয়া থাকিলে তাহার দাগ সে কয়দিনে মিলাইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। পুলিসের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগের কোন তদন্ত হয় নাই। কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছিলেন, কোন অত্যাচার হয় নাই। পুলিসের হেফাজৎ হইতে অনিলকুমার জেলে আসিবার পর জেলের ডাক্তার লিখিয়াছিলেন তাহার উন্মাদের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (যাঁহার নামের আগে বা পরে ডাক্তারী-সূচক কোন অক্ষর বা শব্দ নাই) লিখিয়াছিলেন, যে, সে উন্মাদের ভাণ করিতেছে।

এই সমুদয় তথ্য হইতে তাহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুমান করা কঠিন। অব্যবহিত কারণ মস্তিষ্কে রক্তের অতিরিক্ত সমাবেশ হইতে পারে। কিন্তু অব্যবহিত কারণই সব সময় প্রকৃত কারণ নহে। দুর্ভিক্ষের সময় অনেকে অখাদ্যকুখাদ্য খাইয়া নানা রকম পেটের অসুখে মারা যায়। সেগুলি অব্যবহিত কারণ; কিন্তু প্রকৃত কারণ খাদ্যের অভাব।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



হিমালয়ের চটি

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ
১ম খণ্ড
ভাদ্র, ১৩৩৯
৫ম সংখ্যা

মৃত্যুঞ্জয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দূর হতে ভেবেছিনু মনে
দুর্জ্জয় নির্দ্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘপানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরু দুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,—
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, "আরো কিছু আছে না কি,
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত ?"
নামিল আঘাত।
এইমাত্র, আর কিছু নয় ?
ভেঙে গেল ভয়।

যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড় বলে নিয়েছিনু গণি।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোট হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড় হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও।
আমি তার চেয়ে বড় এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে॥

১৭ আষাঢ়
১৩৩৯

পত্রধারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাতাসের চলাচলের মতো চিন্তার চলাচল স্বাস্থ্যকর। বদ্ধ মত ও রুদ্ধদ্বার মন নিয়ে যারা থাকে তারা জড় অভ্যাসের আরামে নিবিষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু এ'কে যত বড়ো নামই দাও না এর আসল নাম মানসিক তামসিকতা। এর চেয়ে চিন্তার আলোড়ন নিয়ে দুঃখ পাওয়া ভালো। সৃষ্টির সঙ্গে দুঃখ আছে তাই উপনিষদে আছে, স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ তিনি তপে তপ্ত হয়ে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেচেন। তোমার মন সৃষ্টিপ্রবণ, তাই আত্মসৃষ্টিকার্য্যে তোমার চিন্তার বিরাম নেই—অচল সংস্কারের মধ্যে চিরদিনের মতো নিশ্চিন্ত থাকা তোমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। চিন্তার দ্বন্দ্বে তোমার মন তাপিত। এই তাপের অগ্নিশিখায় তোমার চিত্ত নিজেকে উজ্জ্বল ক'রে চিন্‌তে চাচ্চে— যা তোমার মধ্যে অস্পষ্ট অসমাপ্ত তা এই আলোড়নে পরিস্ফুট পরিণত হয়ে উঠচে। তোমার এই বেদনাকে কোনো-একটা বাঁধা মত ও নির্ব্বিচার অভ্যাসের তলায় চেপে তাকে শান্ত করা তোমার অনিষ্ট করা। বিশেষত যখন জড় চিত্তের মূঢ় শান্তি তোমার স্বভাবসঙ্গত নয়। তোমার মধ্যে চিত্তের এই সচলতা সাধারণ স্ত্রীজন-সুলভ নয় এইজন্যেই নারীস্বভাবের রীতিনিষ্ঠতার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধচে। এই সমস্যার সমাধান তোমার নিজের মধ্যেই হতে থাকবে। ইতি

৪ ভাদ্র ১৩৩৮।

তোমার চিঠিতে আমাকে বর দিয়েচ আমি যেন আমার মনের মানুষ খুঁজে পাই। এর থেকে বোঝা গেল এতদিন তোমাকে যা বলে এসেচি তা তুমি বোঝোনি। আমার মনের মানুষের উপলব্ধি আমার

অন্তরেই পূর্ণতা পাবে এই আমি কামনা করি। "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তেভবন্তি।" এই মনের মানুষ কেবলমাত্র রসভোগের নেশায় মাতিয়ে রাখবার জন্তে নয়, মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উদ্বোধনের জন্তে। এই মনের মানুষই তো আমাকে একদিন আত্মনিবিষ্ট সাহিত্যসাধনার গণ্ডী থেকে শান্তিনিকেতনের কর্ম্মক্ষেত্রে টেনে এনেছিল। সে কি সঙ্গ পাবার জন্তে, সুখ পাবার জন্তে! এই ত্রিশ বৎসর যে কঠিন দুঃখের পথে আমাকে চলতে হয়েচে তার ইতিহাস কেউ জানবে না—এই দুঃখেই আমার মনের মানুষের সঙ্গে আমার যোগ।

তোমার চিঠিতে তোমাদের বার্ষিক পূজার দীর্ঘ বর্ণনা করেচ। এই রসতৃপ্তির সমারোহে আমার মন সায় দেয় না। আমি যাকে পূজা বলি সে কঠিন কর্ম্মে, সত্যের সাধনায়। লোকহিতে আত্মোৎসর্গের যে আয়োজন সেই আয়োজনেই মনের মানুষের পূজা—যে দেশে এই পূজা সত্য হয় সেই দেশেই জ্ঞানবীর কর্ম্মবীরদের যজ্ঞশালা। আমার মনের মানুষ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন্ এ কথা নিশ্চয় জেনো। তাঁর আভাস পেয়েচি ইতিহাসে নরোত্তমদের মধ্যে। যেমন ভগবান বুদ্ধ। তিনি সকল মানুষের মুক্তির জন্তে আত্মদান করেছিলেন—তাঁর ভক্তেরা শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে ভক্তিকে ভোগের জিনিষ করেন নি—ভক্তি তাঁদের বীর্য্য দিয়েছিল, দুর্গম সমুদ্র পর্ব্বত লঙ্ঘন করে তাঁরা মানুষকে সত্য বিতরণ করবার জন্তে দেশবিদেশে প্রাণ দিয়ে এসেচেন। কাদের দেশে? যাদের তোমরা ম্লেচ্ছ বলো, যারা তোমাদের দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে মার খেয়ে মরে।

তোমার পূর্ব্ব পত্রে একটা প্রশ্ন ছিল, নিজের খ্যাতি-বিস্তার করবার জন্তে আমি মাইনে দিয়ে লোক রেখেচি কি-না। এ রকম সন্দেহ কেবল বাংলা দেশেই সম্ভব। এই দেশেই লোকে কানাকানি করে, যে, কোনো বিশেষ কৌশলে আমি নোবেল প্রাইজ পেয়েচি এবং আমার যে ইংরেজী রচনা বেরিয়েচে সেগুলো কোনো ইংরেজকে দিয়ে লেখা। তথাপি এদেশেও আমার ভক্ত আছে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমি পূজা চাইনে। যদি সত্যই চাইতুম তাহলে এই ধর্ম্মমুগ্ধ দেশে অবতার হয়ে উঠা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য হত না। আমি যাঁর পূজায় প্রবৃত্ত অন্তরের কাছে তাঁর পূজাই চেয়েচি। তুমি আবিষ্কার করেচ আমি ঈশ্বর নই। শুনে বিস্মিত হলুম। তুমি কাকে ঈশ্বর বলো জানিনে—ঈশোপনিষদে এক ঈশ্বরের কথা আছে—তিনি সর্ব্বভূতকে অনন্তকাল ব্যাপ্ত করে আছেন, আমি যে সে ঈশ্বর নই সে কথা মুখে উচ্চারণ করবারও দরকার ছিল না। ইতি

বিজয়া দশমী ১০৩৮।

এই কথাটা মনে জেনো, ধর্ম্ম মানেই মনুষ্যত্ব—যেমন আগুনের ধর্ম্মই অগ্নিত্ব, পশুর ধর্ম্মই পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম্ম মানুষের পরিপূর্ণতা। এই পরিপূর্ণতাকে কোনো এক অংশে বিশেষভাবে খণ্ডিত করে তাকে ধর্ম্ম নাম দিয়ে পৃথিবীতে যত নিদারুণ উৎপাত ঘটেচে এমন বৈষয়িক লোভের তাগিদেও নয়। ধর্ম্মের আক্রোশে যদি-বা উপদ্রব না-ও করি তবে ধর্ম্মের মোহে মানুষকে নির্জ্জীব করে রাখি, তার বুদ্ধিকে নিরর্থক জড় অভ্যাসের নাগপাশে অস্থিতে মজ্জাতে নিবিষ্ট করে ফেলি—দৈবের প্রতি দুর্ব্বলভাবে আসক্ত করে, নানা কাল্পনিক বিভীষিকার বাধায় পদে পদে প্রতিহত করে তাকে লোকযাত্রায় অকৃতার্থ ও পরাভূত করে তুলি। বুদ্ধি যেখানে শৃঙ্খলিত, পুরুষকার যেখানে গুরুভারগ্রস্ত সেই হতভাগ্য দেশে সর্ব্বপ্রকার দৈহিক মানসিক রাষ্ট্রিক অমঙ্গল অব্যাঘাতে অচল হয়ে ওঠে। মানুষের পরিপূর্ণতায় যে ধর্ম্ম তার মধ্যে ত্যাগ আছে, ভোগ আছে, বুদ্ধি আছে,—এই সমস্ত কিছুর শ্রেয়স্করতা হচ্চে তার সর্ব্বজনীনতায়, তার নিত্যতায়—অর্থাৎ এই সকলের মধ্য দিয়ে আমরা মহামানবের শাশ্বত অভিপ্রায়কে নিজের মধ্যে সার্থক করি। আমার সার্থকতা যদি সকল মানুষের সার্থকতা না হয় তবে সে ধর্ম্মক্ষেত্রের বাইরে পড়ে, বিষয়ের ক্ষেত্রে দাঁড়ায়। এর কারণ এই যে, বাঘ আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যেও আপন ব্যাঘ্রত্ব রক্ষা করতে পারে,—কিন্তু মানুষ যে পরিমাণে একলা সেই পরিমাণেই সে অমানুষ। আমি যে কবিতা

লিখি সে যদি নিতান্তই আপনার খেয়ালেই চলে সমস্ত মানুষের খেয়ালের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে মানুষের সাহিত্যে সে টিঁকবে না। তেমনি মানুষের বিজ্ঞান দর্শন শিল্পকলা মানুষের মুক্তি এ সবকিছুই সমস্ত মানুষকে জড়িয়ে। এই যে একজন মানুষ সকল মানুষের বুদ্ধি জ্ঞান শক্তি প্রেমের সঙ্গে সম্মিলিত, দূরকালে দূরদেশে তার মানব-সম্বন্ধ প্রসারিত এইটেই মানুষের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বকে যে-তপস্যা পূর্ণতার অভিমুখে নিয়ে যায় আমি তাকেই ধর্ম্ম বলি। এই সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতাকে যা কিছু পঙ্গু করে তাকে যত বড় নামই দাও তাকে আমি ধর্ম্ম বলে শ্রদ্ধা করি নে। অতএব তুমি আমাকে যোগী বৈরাগী অনাসক্ত বলে মনে ক'রো না। অচলায়তনে আমার একটি গান আছে—

আমি সব নিতে চাই সব দিতে চাইরে
আমি আপনাকে তাই মেলব যে বাইরে।

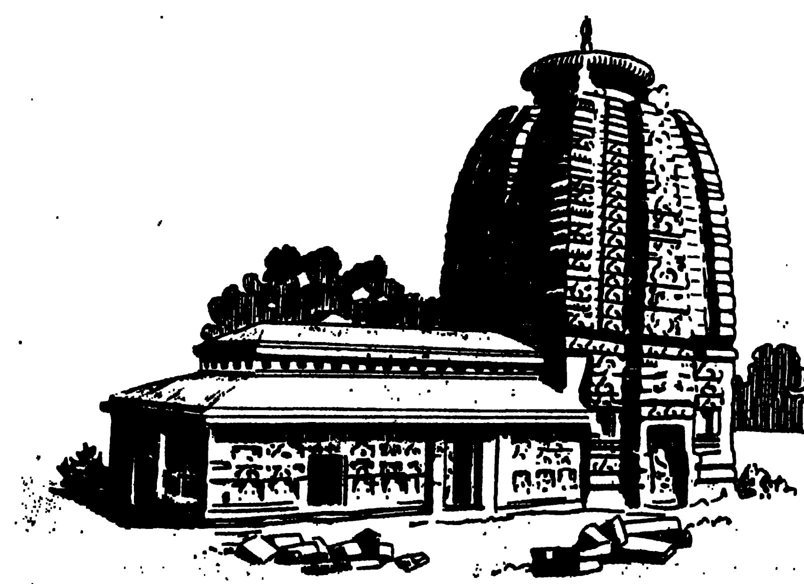
ইতি—

৯ই কার্ত্তিক ১৩৩৮।

নিরন্তর অপরাধভীরুতা তোমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেচে—মানুষের কাছে অপরাধ, দেবতার কাছে অপরাধ, গ্রহ উপগ্রহের কাছে অপরাধ। প্রায়ই এই অপরাধ-কল্পনাটা অনুষ্ঠানের ত্রুটি নিয়ে। নিজের চারিদিকে এই বিভীষিকা কেন তুমি সৃষ্টি করে তুলেচ? এতে মানুষকে শক্তি দেয় না, দুর্ব্বলই করে রাখে। সামান্য আচারে ব্যবহারে দেবতা কেবলই আমাদের ছল ধরবার জন্যই বসে আছেন—তাঁর C. I. Dর দল দিন-রাত আনাচে-কানাচে ঘুরে পদে পদে আমাদের চলা-ফেরা নোট করে রাখচে এ যদি সত্য হয় তবে এমন দেবতার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহই শ্রেয়। আর যাই হোক, আমার সম্বন্ধে তুমি কোনো অপরাধ কল্পনা ক'রো না। আমি সি. আই. ডি-র চরওয়ালা দেবতা নই আমি কবি মানুষ। আমি ভুলচুকের উপর দিয়েও মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করি। তুমি যখন ভয় কর যে আমি বুঝি বা রাগ করচি, ক্ষমা করচি নে—তখন বুঝতে পারি এই রকমের ঘরগড়া ভয়ের চর্চ্চায় আমাদের দেশ অভ্যস্ত—তাতে দুঃখ বোধ করি।

বেশি লেখবার মতো শরীর নয় তবু না লিখে পারলুম না। ইতি—

১৩ই কার্ত্তিক ১৩৩৮।



ভীরু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে
ব্যঙ্গ-সুচতুর
বটেকৃষ্ট ভীরু ছেলেদের বিভীষিকা।
একদিন কী কারণে
সুনীতকে দিয়েছিল উপাধি "পরমহংস" বলে।
ক্রমে সেটা হ'ল "পাতিহাঁস,"
শেষকালে হ'ল "হাঁস্‌খালি।"
কোন তার অর্থ নেই সেই তার খোঁচা।

আঘাতকে ডেকে আনে
যে নিরীহ আঘাতকে করে ভয়।
নিষ্ঠুরের দল বাড়ে,
ছোঁয়াচ লাগায় অট্টহাসে।
ব্যঙ্গ রসিকের যত অংশ-অবতার
নিষ্কাম বিদ্রূপ সূচি বিঁধে
অহৈতুক বিদ্বেষেতে সুনীতকে করে জরজর

একদিন মুক্তি পেলো সে বেচারা,
বেরোলো ইস্কুল থেকে।
তারপরে গেল বহুদিন,—
তবু যেন নাড়ীতে জড়িয়ে ছিল
সেদিনের সশঙ্ক সঙ্কোচ।
জীবনে অন্যায় যত, হাস্যক্রূর যত নির্দ্দয়তা
তারি কেন্দ্রস্থলে
বটেকৃষ্ট রেখে গেছে কালো স্থূল বিগ্রহ আপন।

সে কথা জান্‌ত বটু,
সুনীতের এই অন্ধ ভয়টাকে
মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে পেত সুখ
হিংস্র ক্ষমতার অহঙ্কারে,
ডেকে যেত সেই পুরাতন নামে
হেসে যেত খলখল হাসি

বি-এল পরীক্ষা দিয়ে
সুনীত ধরেছে ওকালতি,
ওকালতি ধরল না তাকে।
কাজের অভাব ছিল সময়ের অভাব ছিল না,
গান গেয়ে সেতার বাজিয়ে
ছুটি ভরে যেত।
নিয়ামৎ ওস্তাদের কাছে
হ'ত তার সুরের সাধনা।

ছোটো বোন সুধা,
ডায়োসিসনের বি-এ
গণিতে সে এম্‌-এ দিবে এই তার পণ।
দেহ তার ছিপছিপে,
চলা তার চটুল চকিত,
চষমার নীচে
চোখে তার ঝলোমলো কৌতুকের ছটা,—
দেহ মন
কূলে কূলে ভরা তার হাসিতে খুশীতে।
তারি এক ভক্ত সখী, নাম উমারাণী।
শান্ত কণ্ঠস্বর,
চোখে স্নিগ্ধ কালো ছায়া,
ছুটি ছুটি সরু চুড়ি সুকুমার ছুটি তার হাতে।
পাঠ্য ছিল ফিলজফি,
সে কথা জানাতে তার বিষম সঙ্কোচ।

দাদার গোপন কথাখানা
সুধার ছিল না অগোচর।
চেপে রেখেছিল হাসি
পাছে হাসি তীব্র হয়ে বাজে তার মনে।
রবিবার,
চা খেতে বন্ধুকে ডেকেছিল।
সেদিন বিষম বৃষ্টি,
রাস্তা গলি ভেসে যায় জলে।
একা জানলার পাশে সুনীত সেতারে
আলাপ করেছে সুরু সুরট মল্লার।
মন জানে
উমা আছে পাশের ঘরেই।
সেই যে নিবিড় জানাটুকু
বুকের স্পন্দনে মিলে সেতারের তারে তারে কাঁপে
হঠাৎ দাদার ঘরে ঢুকে
সেতারটা কেড়ে নিয়ে বলে সুধা,
"উমার বিশেষ অনুরোধ
গান শোনাতেই হবে,
নইলে সে ছাড়ে না কিছুতে।"
লজ্জায় সখীর মুখ রাঙা,
এ মিথ্যা কথার
কী করে যে প্রতিবাদ করা যায়
ভেবে সে পেল না।

সন্ধ্যার আগেই
অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।
থেকে থেকে বাদল বাতাসে
দরজাটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে,
বৃষ্টির ঝাপটা লাগে কাঁচের সার্সিতে,
বারান্দার টব থেকে মৃদু গন্ধ দেয় জুঁই ফুল;
হাঁটু-জল জমেছে রাস্তায়,
তারি পর দিয়ে
মাঝে মাঝে ছলো ছলো শব্দে চলে গাড়ি।

দীপালোকহীন ঘরে
সেতারের ঝঙ্কারের সাথে
সুনীত ধরেছে গান—
নটমল্লারের সুরে,
—আওয়ে পিয়রওয়া,
রিমিঝিমি বরখন লাগে।—
সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে,
নিখিলের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সঙ্গীতে।
অন্তহীন কাল সরোবরে
মাধুরীর শতদল,—
তার পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা।

সন্ধ্যা হ'ল।
বৃষ্টি থেমে গেছে;
জ্বলেছে পথের বাতি।
পাশের বাড়িতে
কোন্ ছেলে দুলে দুলে
চেঁচিয়ে ধরেছে তার পরীক্ষার পড়া।
এমন সময়ে সিঁড়ি থেকে
অট্টহাস্যে এল হাঁক,
"কোথা ওরে কোথা গেল হাঁসখালি।"
মাংসল পৃথুল দেহ বটেকৃষ্ট স্ফীত রক্তচোখ
ঘরে এসে দেখে
সুনীত দাঁড়িয়ে দ্বারে নিঃসঙ্কোচ স্তব্ধ ঘৃণা নিয়ে
স্থূল বিদ্রূপের ঊর্দ্ধে
ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র যেন।
জোর ক'রে হেসে উঠে
কি কথা বলতে গেল বটু,
সুনীত হাঁকল "চুপ,"—
অকস্মাৎ বিদলিত ভেকের ডাকের মত
হাসি গেল থেমে।

২১ জুলাই, ১৯৩২

মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখের প্রবাসীতে মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা প্রবন্ধটি পড়ে দেখলুম। আমি মূল পুস্তক পড়িনি, ধরে নিচ্ছি প্রবন্ধ-লেখক যথোচিত প্রমাণের উপর নির্ভর করেই লিখেচেন। সাম্প্রদায়িক বিবাদে মানুষ যে কতদূর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে ভারতবর্ষে আজকাল প্রতিদিনই তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, কিন্তু হাস্যকর হওয়াও যে অসম্ভব নয় তার দৃষ্টান্ত এই দেখা গেল। এটাও ভাবনার কথা হ'তে পারত, কিন্তু সুবিধা এই যে এ রকম প্রহসন নিজেকেই নিজে বিদ্রূপ করে মারে।

ভাষা মাত্রের মধ্যে একটা প্রাণধর্ম্ম আছে। তার সেই প্রাণের নিয়ম রক্ষা ক'রে তবেই লেখকেরা তাকে নূতন নূতন পথে চালিত করতে পারে। এ কথা মনে করলে চলবে না যে, যেমন করে হোক্ জোড়াতাড়া দিয়ে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদল করা চলে। মনে করা যাক বাংলা দেশটা মগের মুল্লুক এবং মগ রাজারা বাঙালী হিন্দু মুসলমানের নাক চোখের চেহারা কোনোমতে সহ্য করতে পারচে না, মনে করচে ওটাতে তাদের অমর্য্যাদা, তাহ'লে তাদের বাদশাহী বুদ্ধির কাছে একটিমাত্র অপেক্ষাকৃত সম্ভবপর পন্থা থাকতে পারে সে হচ্ছে মগ ছাড়া আর সব জাতকে একেবারে লোপ করে দেওয়া। নতুবা বাঙালীকে বাঙালী রেখে তার নাক মুখ চোখে ছুঁচ সুতো ও শিরিশ আঠার যোগে মগের চেহারা আরোপ করবার চেষ্টা ঘোরতর দুর্দ্দাম মগের বিচারেও সম্ভবপর ব'লে ঠেকতে পারে না।

এমন কোনো সভ্য ভাষা নেই যা নানা জাতির সঙ্গে নানা ব্যবহারের ফলে বিদেশী শব্দ কিছু-না-কিছু আত্মসাৎ করেনি। বহুকাল মুসলমানের সংস্রবে থাকাতে বাংলা ভাষাও অনেক পারসী শব্দ এবং কিছু কিছু আরবীও স্বভাবতই গ্রহণ করেচে। বস্তুত বাংলা ভাষা যে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আপন, তার স্বাভাবিক প্রমাণ ভাষার মধ্যে প্রচুর রয়েচে। যত বড় নিষ্ঠাবান হিন্দুই হোক না কেন ঘোরতর রাগারাগির দিনেও প্রতিদিনের ব্যবহারে রাশি রাশি তৎসম ও তদ্ভব মুসলমানী শব্দ উচ্চারণ করতে তাদের কোনো সঙ্কোচ বোধ হয় না। এমন কি, সে-সকল শব্দের জায়গায় যদি সংস্কৃত প্রতিশব্দ চালানো যায় তাহ'লে পণ্ডিতী করা হচ্চে ব'লে লোকে হাসবে। বাজারে এসে সহস্র টাকার নোট ভাঙানোর চেয়ে হাজার টাকার নোট ভাঙানো সহজ। সমনজারি শব্দের অর্দ্ধেক অংশ ইংরেজী, অর্দ্ধেক পার্সি, এর জায়গায় "আহ্বান প্রচার" শব্দ সাধু সাহিত্যেও ব্যবহার করবার মত সাহস কোনো বিদ্যাভূষণেরও হবে না। কেন-না, নেহাৎ বেয়াড়া স্বভাবের না হ'লে মানুষ মার খেতে তত ভয় করে না যেমন ভয় করে লোক হাসাতে। "মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে," একথা সহজেই মুখ দিয়ে বেরোয় কিন্তু যাবনিক সংসর্গ বাঁচিয়ে যদি বলতে চাই মনের গতিকটা বিকল কিম্বা বিমর্ষ বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছে তবে আত্মীয়দের মনে নিশ্চিত খটকা লাগবে। যদি দেখা যায় অত্যন্ত নির্জ্জলা খাঁটি পণ্ডিতমশায় ছেলেটার বখ-শব্দ শুদ্ধ করবার জন্যে তাকে বেদম মারচেন, তাহ'লে ব'লে থাকি, "আহা বেচারাকে মারবেন না।" যদি বলি "নিরুপায় বা নিঃসহায়কে মারবেন না" তাহ'লে পণ্ডিত-মশায়ের মনেও করুণরসের বদলে হাস্যরসের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। নেশাখোরকে যদি মাদকসেবী ব'লে বসি তাহ'লে খামখা তার নেশা ছুটে যেতে পারে, এমন কি সে মনে করতে পারে তাকে একটা উচ্চ উপাধি দেওয়া হ'ল। বদমায়েসকে দুর্ব্বৃত্ত বললে তার চোট তেমন বেশী লাগবে না। এই শব্দগুলো যে এত জোর পেয়েচে তার কারণ বাংলা ভাষার প্রাণের সঙ্গে এদের সহজে যোগ হয়েচে।

শিশুপাঠ্য বাংলা কেতাবে গায়ের জোরে আবুবিআনা

পার্সিআনা করাটাকেই আচারনিষ্ঠ মুসলমান যদি সাধুতা ব'লে জ্ঞান করেন তবে ইংরেজী স্কুলপাঠ্যের ভাষাকেও মাঝে মাঝে পারসি বা আরবি ছিটিয়ে শোধন না করেন কেন? আমিই একটা নমুনা দিতে পারি। কীট্‌সের হাইপীরিয়ন নামক কবিতাটির বিষয়টি গ্রীসীয় পৌরাণিক, তথাপি মুসলমান ছাত্রের পক্ষে সেটা যদি বর্জ্জনীয় না হয় তবে তাতে পার্সি-মিশোল করলে তার কি রকম শ্রীবৃদ্ধি হয় দেখা থাক্,—

Deep in the *Saya-i-ghamagin* of a vale,
Far sunken from the *nafas-i-hayat afza-i*-morn,
Far from the *atshin* noon and eve's one star,
Sat *ba moo-i-safid* Saturn *Khamush* as a *Sang*.*

জানি কোনো মৌলবী ছাহাব প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ইংরেজী সাহিত্যিক ভাষার এ রকম মুসলমানীকরণের চেষ্টা করবেন না। করলেও ইংরেজী যাঁদের মাতৃভাষা, এদেশের বিদ্যালয়ে তাঁদের ভাষার এ রকম ব্যঙ্গীকরণে উচ্চাসন থেকে তাঁদের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হবে। আপোসে যখন কথাবার্ত্তা চালাই তখন আমাদের নিজের ভাষার সঙ্গে ইংরেজী বুলির হাস্যকর সংঘটন সর্ব্বদাই ক'রে থাকি; কিন্তু সে প্রহসন সাহিত্যের ভাষায় চলতি হবার কোনো আশঙ্কা নেই। জানি বাংলা দেশের গোঁড়া মক্তবেও ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে এ রকম অপঘাত ঘটবে না; ইংরেজের অসন্তুষ্টিই তার একমাত্র কারণ নয়। শিক্ষক জানেন পাঠ্যপুস্তকে ইংরেজীকে বিকৃতি করার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিলে ছাত্রদের ইংরেজী-শিক্ষার গলদ্ ঘটবে, তারা ঐ ভাষা সম্যকরূপে ব্যবহার করতে পারবে না। এমন অবস্থায় কীট্‌সের হাইপীরিয়নকে বরঞ্চ আগাগোড়াই ফার্সিতে তর্জ্জমা করিয়ে পড়ানো ভাল তবু তার ইংরেজীটিকে নিজের সমাজের খাতিরেও দো-আঁশলা করাটা কোনো কারণেই ভাল নয়। সেই একই কারণে ছাত্রদের নিজের খাতিরেই বাংলাটাকে খাঁটি বাংলারূপে বজায় রেখেই তাদের শেখানো দরকার। মৌলবী ছাহাব বলতে পারেন আমরা ঘরে যে বাংলা বলি সেটা ফারসি আরবী জড়ানো, সেইটাকেই মুসলমান ছেলেদের বাংলা ব'লে আমরা চালাব। আধুনিক ইংরেজী ভাষায় যাঁদের এংলোইণ্ডিয়ান বলে, তাঁরা ঘরে যে-ইংরেজী বলেন, সকলেই জানেন সেটা আন্‌ডিফাইল্‌ড আদর্শ ইংরেজী নয়—স্বসম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতবশত তাঁরা যদি বলেন যে, তাঁদের ছেলেদের জন্যে সেই এংলোইণ্ডিয়ানী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা না করলে তাঁদের অসম্মান হবে, তবে সে কথাটা বিনা হাস্যে গম্ভীরভাবে নেওয়া চলবে না। বরঞ্চ এই ইংরেজী তাঁদের ছেলেদের জন্যে প্রবর্ত্তন করলে সেইটেতেই তাঁদের অসম্মান এই কথাটাই তাঁদের অবশ্য বোঝান দরকার হবে। হিন্দু বাঙালীর সূর্য্যই সূর্য্য আর মুসলমান বাঙালীর সূর্য্য তাম্বু, এমনতর বিদ্রূপেও যদি মনে সঙ্কোচ না জন্মে, এতকাল একত্রবাসের পরেও প্রতিবেশীর আড়াআড়ি ধরাতলে মাথা-ভাঙাভাঙি ছাড়িয়ে যদি অবশেষে চন্দ্রসূর্য্যের ভাষাগত অধিকার নিয়ে অভ্রভেদী হয়ে ওঠে, তবে আমাদের ন্যাশনাল ভাগ্যকে কি কৌতুকপ্রিয় বলব, না বলব পাড়া-কুঁদুলে। পৃথিবীতে আমাদের সেই ভাগ্যগ্রহের যাঁরা প্রতিনিধি তাঁরা মুখ টিপে হাসচেন; আমরাও হাসতে চেষ্টা করি কিন্তু হাসি বুকের কাছে এসে বেধে যায়। পৃথিবীতে কম্যুনাল বিরোধ অনেক দেশে অনেক রকম চেহারা ধরেছে, কিন্তু বাংলা দেশে সেটা এই যে কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধরল তাতে আর মান থাকে না।

* পারসী ভাষায় আমার অল্পবিস্তর পাণ্ডিত্য আছে এমন অমূলক ভ্রমের সৃষ্টি ক'রে গর্ব্ব করতে চাইনে। ধরা পড়বার পূর্ব্বে কবুল করচি যে পরের সাহায্য নিয়েচি। মক্তবে ব্যবহার্য্য যে পাঠ্যপুস্তকের নমুনা প্রবাসীতে দেখা গেল তা রচনা করতে হ'লে অনেক মুসলমান লেখককেই পরের সাহায্য নিতে হবে। আমি এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে কিছু কিছু পারসীর আলোচনা করি। তিনি যে-পারসী ভাষা জানেন তা ভারতে প্রচলিত বিকৃত পারসী নয়, এ ভাষা যাদের মাতৃভাষা, ভারতবর্ষের বাইরে তাদের কাছ থেকে তাঁর পারসীর বিদ্যা অর্জ্জিত ও মার্জ্জিত, কিন্তু তিনিও সূর্য্য অর্থে তাম্বু শব্দের প্রয়োগ জানেন না।

স্বাগতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শ্যামাচরণের শিক্ষা

রাত্রি অন্ধকার, আকাশে চাঁদ নাই। ছোট গ্রামের পথ, পথে আলোক নাই। গাছের মাথার উপর অন্ধকার ঘনাইয়া রহিয়াছে, চারিদিকে স্তব্ধতা মৌন হইয়া রহিয়াছে। কদাচিৎ পেচকের রব, কখন একটা বাদুড় আসিয়া গাছে ঝুলিতেছে, বৃক্ষপত্রে তাহার পক্ষশব্দ।

সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথ দিয়া এক ব্যক্তি দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছিল। তাহার হাতে এক গাছা মোটা বেতের লাঠি, পথ চলিতে তাহার দ্বারা ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করিতেছিল, পথে কোথাও সর্প থাকিলে সেই শব্দ শুনিয়া সরিয়া যাইবে। অন্ধকার হইলেও সে ব্যক্তি এদিক-ওদিক ও পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতেছিল পথে অপর কোন লোক আসিতেছে কি-না। কিছু দূর গিয়া পথের পাশে একটি জীর্ণ গৃহ দেখিতে পাইল। দ্বার রুদ্ধ, তক্তার ফাঁক দিয়া অল্প আলোক দেখা যাইতেছে। সে ব্যক্তি হাতের লাঠি দিয়া কয়েক বার দরজায় আঘাত করিল। ঘরের ভিতর হইতে কর্কশস্বরে কে বলিল,—কে ও?

পথিক বলিল, আমি শ্যামাচরণ, দোর খোল।

দরজার হুড়কা খুলিয়া বনবিহারী জিজ্ঞাসা করিল,—রাত্রিবেলা কি দরকার?

ঘরে জিনিষপত্র বিশেষ কিছু ছিল না। এক কোণে মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে, একখানা জীর্ণ তক্তপোষ, তাহার তলায় একটা কাঠের বাক্স। শ্যামাচরণ ঘরে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষে বসিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

বনবিহারী দরজা বন্ধ করিয়া দিল। শ্যামাচরণকে দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইল না, বরং মুখে বিরক্তির ভাব। রুক্ষভাবে বলিল,—আমার সঙ্গে তোমার কি কথা?

শ্যামাচরণ বলিল, তুমি না কি এখান থেকে উঠে আর কোথাও যাবে?

—আমি যেখানেই যাই তোমার সে খোঁজে কাজ কি? তুমি আমার সাথের সাথী নও, বুঝলে কি-না?

—তা না হই, কাজের কাজী ত, আর কাজ ফুরলেই বুঝি পাজি।

—তুমি নিজের নাম নিজে রাখ, আমি কিছু বলছি না, বুঝলে কি না?

—তা তুমি যেখানেই যাও আমি সন্ধান পাব। তুমি আমাকে বাদ দিয়ে সব টাকা আপনি নেবে তা হবে না।

—তুমি কি পাওনি? যা পাবার কথা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছ, বুঝলে কি না?

—আর তুমি বুঝি চিরকাল নেবে? আমার পাওনার কখন চুক্তি হবে না। কাজ যা করবার আমি করেছি, তুমি কি করেছ? অথচ পাওনার বেলা তুমি বার আনা আর আমি চার আনা? আমাকে তেমন শর্ম্মা পাও নি।

বনবিহারীর ছোট চক্ষু আরও ছোট হইল, বড় বড় দাঁত বাহির হইল, নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইল। ধীরে ধীরে, কথা চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল,—তুমি শর্ম্মা বড় ওস্তাদ, না? আমার পাওনায় তোমার ভাগ চাই? আমিও তাই ভাবছিলাম, বুঝলে কি না?

শ্যামাচরণের শরীরে বল ছিল, মনেও সাহস ছিল, তথাপি বনবিহারীর সে মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ভয় হইল। কিছু নরম ভাবে কহিল,—তা না হয় আমার একটা ভাল চাকরি করিয়ে দাও, তাহ'লে আমি আর কিছু চাইব না।

বনবিহারী বিকট বিদ্রূপের স্বরে কহিল,—নায়েব দেওয়ান হবে?

শ্যামাচরণ রাগিয়া কহিল,—আর যদি আমি কথা প্রকাশ ক'রে দিই?

এবার বনবিহারী হাসিল। জোরে নয়, কিন্তু সে

হাসির শব্দে শ্যামাচরণের হৃৎকম্প হইল, গায় কাঁটা দিল। বনবিহারী বলিল,—পুলিসে খবর দেবে? তাহ'লে, বুঝলে কি না, তোমাকে লটকাতে বেশী দিন লাগবে না।

বনবিহারী নিজের গলা টিপিয়া ধরিয়া, জিব বাহির করিয়া ফাঁসীর অভিনয় করিল। শ্যামাচরণ ঘামিয়া উঠিল, শুষ্ক মুখে ঢোক গিলিয়া বলিল,—আমি কি একা যাব না কি? তুমিও আমার পাশে ঝুলবে।

বনবিহারী আবার সেই উৎকট হাসি হাসিল। বলিল,—আমি? আমি ত তোমাকে চিনিও নে, বুঝলে কি-না? কে তোমার সাক্ষী আছে?

শ্যামাচরণ স্তব্ধ হইয়া গেল। যে-কর্ম্মে বনবিহারী তাহাকে নিয়োগ করিয়াছিল তাহার আবার সাক্ষী কে থাকিবে? সে কি সাক্ষী ডাকিয়া করিবার কাজ?

বনবিহারী বলিল, তুমি যা পেয়েছ তা পেয়েছ, আর কিছুই পাবে না। ওখানকার পথ আমি বন্ধ করে দেব, বুঝলে কি না?

শ্যামাচরণ হন্তে হইয়া উঠিয়াছিল। উন্মত্তের ন্যায় কহিল,—যখন ছুটো হয়েছে তার উপর না-হয় আর একটা হ'ল। কোন পথ বন্ধ করবার আগেই তোমাকে সাবাড় করব।

শ্যামাচরণের যষ্টির মাথায় পেঁচ ছিল, ঘুরাইয়া খুলিবার চেষ্টা করিল। বনবিহারী তাহার হাত মুচড়াইয়া লাঠি কাড়িয়া লইল, শ্যামাচরণ বলবান হইলেও বনবিহারীর তুলনায় শিশু। লাঠির ভিতর হইতে বনবিহারীর গুপ্তি টানিয়া বাহির করিয়া শ্যামাচরণকে খোঁচা মারিবার ভঙ্গী করিল, শ্যামাচরণ ভয়ে লাফাইয়া ঘরের আর এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

দরজা বন্ধ, তাহার কাছে বনবিহারী। শ্যামাচরণের পলায়নের পথ নাই। বনবিহারী গুপ্তি বর্শার মত করিয়া ধরিয়া শ্যামাচরণের বক্ষের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—কোন কোন ছেলে প্রজাপতি ধরে তাকে কাঠি দিয়ে বিঁধে রাখে দেখেছ? প্রজাপতি তখনই মরে না, অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে আর পাখা নাড়ে। তোমাকে সেই রকম বিঁধে রাখলে হয়, বুঝলে কি না?

শ্যামাচরণ বলিল,—তার পর তুমি ধরা পড়বে না?

—তুমি যে এখনি বললে ছুটো হয়েছে তোমার, তুমি ত এখনও ধরা পড়নি। আর তুমি ছুটো সাবাড় করেছ ঠিক জান? বুঝলে কি না?

—কেন, তুমি কি জান না?

—আমি জানি একটা ফস্‌কে গেছে, বুঝলে কি না?

শ্যামাচরণের বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল, কিন্তু মুখে বলিল,—মিছামিছি ধাপ্পা দিচ্ছ কেন?

—তামাসা নয়, সত্য কথা। একজন বেঁচে আছে আমি ঠিক জানি, তুমিও জানতে পার, বুঝলে কি না?

—তবে এতদিন কিছু হয়নি কেন?

—সেইটে আমি বুঝতে পারছি নে। ওদের বাড়িতেও কিছু জানে না। এর ভিতর একটা কোন কথা আছে, বুঝলে কি-না?

—কে বেঁচে আছে?

—সেটা তোমাকে জানতে হবে, বুঝলে কি-না?

—তবে এখন আমি যাই।

—অত তাড়াতাড়ি নয়, কিছু নিয়ে যেতে হবে। আর আবার যদি এসেছ তাহ'লে তোমাকে কন্ধকাটা ভূত ক'রে ছেড়ে দেব।

গুপ্তি ফেলিয়া দিয়া লাঠিগাছা তুলিয়া লইয়া বনবিহারী শ্যামাচরণকে ধরিয়া তাহাকে বেদম করিয়া মারিল। তাহার পর দরজা খুলিয়া তাহাকে টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া লাঠি ও গুপ্তি তাহার কাছে ফেলিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিল।

মার খাইয়া লাঠি ও অস্ত্র তুলিয়া লইয়া শ্যামাচরণ চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ত্রিলোচনের সঙ্কট

সেই যে শৈলবালার কন্যার সঙ্গে ত্রিলোচন তাঁহার পুত্রের বিবাহের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন সেই হইতে রমাসুন্দরীর মনে আসা ও আনন্দের চঞ্চলতার আবির্ভাব হইয়াছিল। শৈলবালারা তাঁহাদের স্বজাতি কিন্তু ভিন্ন গোত্র, অতএব এরূপ বিবাহে জাতিহিসাবে কোন বাধা নাই। আপত্তি কেবল সামাজিক অবস্থা লইয়া।

শৈলবালা বড় জমিদার, ত্রিলোচন তাঁহার বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র। কর্মচারীর পুত্রকে শৈলবালা জামাতা করিতে সম্মত হইবেন কেন?

রমাসুন্দরী লক্ষ্য করিয়াছিলেন শৈলবালার কাছে ত্রিলোচনের লোকজন ছাড়া আর কেহ যাইতে পাইত না। বাড়ির দাসদাসী ত্রিলোচন নিযুক্ত করিতেন, তাহারা জানিত তিনিই তাঁহাদের প্রকৃত মনিব। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার কেহ ছিল না। ত্রিলোচনের অজ্ঞাতে কোন নূতন লোক অন্দরমহলে যাইত না, এমন কি গ্রামের স্ত্রীলোকেরাও তাঁহার অনুমতি না হইলে মহলে প্রবেশ করিতে পারিত না। শৈলবালার মনে কোন সন্দেহ হইত না যে, তাহার অমতে কিছু হইতেছে, অথবা তিনি নিজের ইচ্ছামত কিছু করিতে পারিতেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ত্রিলোচনের তুল্য তাঁহার অপর হিতাকাঙ্ক্ষী নাই। ত্রিলোচন মাঝে মাঝে তাঁহার হাতে কিছু কিছু টাকা দিতেন, শৈলবালা সে টাকাগুলি তুলিয়া রাখিতেন।

রমাসুন্দরী যখন-তখন শৈলবালার কাছে যাইতেন, শৈলবালাও তাঁহাকে অত্যন্ত আপনার লোক মনে করিতেন। রমাসুন্দরীর প্রতি প্রীতির আর এক কারণ হইয়াছিল। শৈলবালার কন্যা সুবালাকে রমা বড় স্নেহ করিতেন। পূর্ব্বে তাহার বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখা যাইত না, কিন্তু ইদানী সুবালার আদরের সীমা ছিল না। রমা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন, উত্তম উত্তম খাবার প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন, শহর হইতে নূতন নূতন সামগ্রী আনাইয়া দিতেন। এ সকল যে ত্রিলোচনের শিক্ষা শৈলবালা তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। বাড়িতে যখনই সুবালার খোঁজ পড়ে সে তখন রমাসুন্দরীর গৃহে। শৈলবালা রমাসুন্দরীকে বলিতেন,—সুবি তোমার বড় ন্যাওটো হয়েছে, তোমাকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে চায় না।

রমাসুন্দরী সুবালাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—দেখেছ, সুবু, তুমি আমাকে ভালবাস ব'লে তোমার মা হিংসে করেন।

সুবালা রমার গলা ধরিয়া বলিল,—মা, তোমার চেয়ে আমি মাসীমাকে ভালবাসি।

মেয়ের কথা শুনিয়া মা'র বড় আহ্লাদ। বলিলেন,—বেশ, তুই তোর মাসীমা'র কাছে থাকিস্।

—থাকবই ত।

রমাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন,—দেখলে তোমার মেয়ে পরের ঘরে যাবে না, আমার কাছে থাকবে।

মাঝে মাঝে রমা স্বামীর কাছে পুত্রের বিবাহের কথা তুলিতেন। বলিতেন,—তুমি বল ত ও বাড়ির গিন্নীর কাছে আমি কথা পাড়ি। সুবালাও আমাদের খুব বশ হয়েছে আর ওর মা'র এমন কি আপত্তি হবে? মেয়ের স্বভাব ভাল বটে, কিন্তু দেখতে পদ্মিনীও নয়, আহা-মরি সুন্দরীও নয় যে মস্ত বড়মানুষের বাড়ি বিয়ে হবে।

ত্রিলোচন বলিলেন,—তুমি যদি একটি কথা কয়েছ তা হলেই সব গোল হবে, তোমার গুড়ে বালি হবে। এক বছর না গেলে কোন কথাই হ'তে পারে না। আর মেয়ে সুন্দরী কি-না তার কে খোঁজ রাখে? রূপচাঁদের চেয়ে কেউ সুন্দর আছে? এমন ঘরের মেয়ে, মেয়ের সঙ্গে দশ বিশ হাজার টাকা দেবে, বিয়ের ভাবনা কি?

ত্রিলোচন ত রমাসুন্দরীকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু তাঁহার নিজের মনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে তাঁহার ধৈর্য্যশক্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছিল। তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন এই বিবাহের জন্য। এই বিবাহ হইয়া গেলেই এত বড় সম্পত্তি তাঁহার বংশে আসিবে। অতিরিক্ত ব্যস্ততায় আশঙ্কা আছে তাহা তিনি জানিতেন, এদিকে অন্যরূপ বিপদের আশঙ্কাও দিন দিন বাড়িতেছিল। কোন দুষ্কর্ম করিলে তাহার জের সহজে মিটে না তাহা তিনি অনুভব করিতেছিলেন। পাপের মূল্য কত তাহা কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন। নিষ্কৃতির উপায় কি?

দুষ্কৃতির স্মৃতি বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু শ্যামাচরণ অথবা বনবিহারীকে দেখিলে ত্রিলোচনের চক্ষে সে স্মৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিত। যাহা তাঁহার সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ফিরিত তাহা সশরীরী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইত। যদি এই দুই ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইতেন

তাহা হইলেও কতক নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু ইহারা নাছোড়বান্দা, কোনমতেই তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইতে দিত না। আর এমন করিয়া টাকাই বা কত কাল জোগাইবেন? সময়-অসময় নাই, যখন-তখন তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইত, আর শুধু-হাতে কখনও ফিরিয়া যাইত না। যে টাকা তাহাদের দিতে হইতেছিল তাহা ত্রিলোচনের হাতে থাকিলে তাঁহার মূলধন বাড়িত, সময়ে-অসময়ে কাজে আসিত। তাহারা যদি এরূপ আসা-যাওয়া করে তাহা হইলে অপর লোকের মনে একটা কিছু সন্দেহ হইতে কতক্ষণ? যদি শৈলবালার কন্যার সঙ্গে কার্ত্তিকের বিবাহ হইয়া যায় তাহা হইলে একটা দুর্ভাবনা দূর হয়, বিষয়-সম্পত্তি দেখিবার আর কোন ব্যবস্থা করিয়া ত্রিলোচন আর কিছু দিনের জন্য আর কোথাও চলিয়া যাইতে পারেন। অন্যত্র এরূপ আশঙ্কার কারণ হইবে না।

আবার আর এক রকম অভিসন্ধি ত্রিলোচনের মনে উদয় হইত। ইহাদের মুখ বন্ধ করিতে পারিলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়। এক কর্ম্মে যেমন ইহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন সেইরূপ কোন বিশ্বস্ত লোক দিয়া ইহাদেরও ত সরাইতে পারেন। কাঁটা দিয়াই ত কাঁটা তুলিতে হয়। ত্রিলোচনের মনে হইত না যে পাপের ইহাই নিয়ম। যে পাপ করে সে মনে করে যে, যেমন জল দিয়া রক্তচিহ্ন ধুইয়া ফেলা যায় সেইরূপ একটা দুষ্কর্ম দিয়া আর একটা ক্ষালন করা যায়। ফলে মুছিয়া কিছুই যায় না, পাপের চিহ্ন আরও স্পষ্ট হয় এবং সংখ্যায় বাড়িয়া যায়। এই রকম করিয়া পাপের ভরা ভারী হয় ও সেই ভারে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রেলপথে

হরিনাথ স্বাগতাকে পত্র লিখিয়াছিল গঙ্গাধর তাহা জানিত না। এরূপ পত্র-ব্যবহার তাহার অনুমোদিত নহে। তাহারা যে উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল তাহা গোপন না রাখিলে সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাহারা নিজেদের নাম গোপন করিয়াছিল, গঙ্গাধর হরিনাথের নাম রাখিয়াছিল কিশোরীমোহন আর নিজের নাম রাখিয়াছিল ক্ষেত্রনাথ। সকল ভার গঙ্গাধর গ্রহণ করিয়াছিল, হরিনাথের বুদ্ধিতে কিছুই হয় নাই।

তাহারা যে বাড়ির কোন সংবাদ পাইত না তাহাও নয়। গঙ্গাধর তাহার এক বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার উপায় করিয়াছিল। সচরাচর যেমন চিঠিপত্র লেখা হয় সেরূপ কোন সংবাদ আসিত না। কৌশল করিয়া গঙ্গাধর এক রকম সাঙ্কেতিক ভাষা উদ্ভাবিত করিয়াছিল। হয়ত কোন স্থানে ক্ষেত্রনাথ মল্লিকের নামে একখানা টেলিগ্রাম আসিল, পাটের দর কি রকম? অপর লোকে পড়িয়া মনে করিত ক্ষেত্রনাথ পাট খরিদ করিয়া বেড়াইতেছে। গঙ্গাধর ও হরিনাথ বুঝিত বাড়ির খবর ভাল। উত্তর যাইত, দর সেই রকম। যে টেলিগ্রাম পাইত সে বুঝিত দুই বন্ধু ভাল আছে। কোথাও একখানা খোলা চিঠি আসিল, চাউল আর কিনিতে হইবে না। তাহার অর্থ হইল, চিন্তার কোন কারণ নাই।

এ রকম চিঠি বা টেলিগ্রাম কাহারও হাতে পড়িলে আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু হরিনাথ স্বাগতাকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহা যদি গ্রামের পোষ্ট আপিসে কেহ খুলিয়া পড়িত তাহা হইলে কয়েকটা কথা প্রকাশ হইয়া পড়িত। প্রথমতঃ হরিনাথ যে নাম ভাঁড়াইয়া কিশোরীমোহন বলিয়া পরিচয় দেয় তাহা জানা যাইত, আর কলিকাতায় তাহার বাড়ির ঠিকানা প্রকাশ হইয়া পড়িত। ইহাতে তাহার প্রতি নানাপ্রকার সন্দেহ হওয়া সম্ভব। নাম ভাঁড়ায় কে? যে কোন অপরাধ করে, আত্মরক্ষার জন্য গা ঢাকা দিয়া বেড়ায়, সে-ই নিজের নাম গোপন করিয়া একটা মিথ্যা নামে পরিচয় দেয়। হরিনাথ সে কথা ভাবিয়া দেখে নাই। সে গঙ্গাধরের সঙ্গে আসিয়াছিল স্বাগতার পূর্ব্ব পরিচয় খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য, কিন্তু সে নিজে কিছুই করিতে পারিত না, স্বাগতার রূপের মোহ তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এইমাত্র তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান অবশিষ্ট ছিল যে, গঙ্গাধরকে পরিত্যাগ করা

তাহার উচিত নয়, আর স্বাগতার সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া ফিরিয়া যাওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়।

হরিনাথের মনের ভাব গঙ্গাধর বেশ বুঝিত। ইচ্ছা করিলে হরিনাথ গঙ্গাধরের কিংবা আর কাহারও কোন কথাই শুনিতে না পারিত, স্বাগতাকে এই স্মৃতিলুপ্ত অবস্থায় বিবাহ করিলে কে নিষেধ করিতে পারিত? ভবিষ্যতে অনিষ্ট হইতে পারে বিবেচনা করিয়াই হরিনাথ সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইয়াছিল, গঙ্গাধরের পরামর্শ-মত তাহার সঙ্গে ক্লেশ স্বীকার করিয়া এইরূপ ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হরিনাথ বিনা আপত্তিতে গঙ্গাধরের সকল কথা শুনিত, দুই-একটা বিষয়ে নিজের চিত্তকে শাসন করিতে পারিত না, তাহার কি করা যাইবে। স্বাগতার ফোটোগ্রাফ একা থাকিলে হরিনাথ সময়ে সময়ে দেখিত, গঙ্গাধর জানিতে পারিয়াও আর কিছু বলিত না। পত্র লিখিবার কথা জানিলে গঙ্গাধর অসন্তুষ্ট হইত এই জন্য হরিনাথ গোপনে লিখিয়াছিল। গঙ্গাধর অত্যন্ত কৌশলের সহিত সর্ব্বত্র অনেক রকম সন্ধান করিতেছিল, হরিনাথ তাহা উত্তমরূপে জানিত। গঙ্গাধরের উৎসাহে ও উদ্যমে হরিনাথের আশা হইত যে, শীঘ্রই কিছু জানিতে পারা যাইবে। তাহার কারণ গঙ্গাধর হরিনাথকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। মোটর পুড়িয়া যাওয়া দুর্ঘটনার ছুতা করিয়া কোন লোক স্বাগতা ও আর একজন পুরুষকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। স্বাগতা যে রক্ষা পাইয়াছে তাহা সে জানিত না। তাহার ভাগ্যক্রমে স্বাগতার স্মৃতি লোপ পাইয়া তাহার কিছুই স্মরণ নাই, কিন্তু এ বিষয়ের যে কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না ইহা অসম্ভব। যাহারা ইহাতে লিপ্ত তাহারা সাধ্যমত গোপন করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারিলেই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

একদিন হরিনাথ ও গঙ্গাধর রেলগাড়িতে যাইতেছিল। গঙ্গাধরের পরামর্শ-মত তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী। ঘণ্টা-কয়েক পরে নামিয়া যাইবে। দুইটি ষ্টেশনের পর তাহাদের গাড়িতে আর একজন আরোহী উঠিল। মালপত্রের মধ্যে একটা কাঠের বাক্স। গঙ্গাধর তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, একটা লম্বা, ছিপছিপে লোক, চেহারা তেমন মোলায়েম নয়। বাক্সটা বেঞ্চের নীচে রাখিয়া গঙ্গাধরের পাশে বসিল। পা ছড়াইয়া দিয়া, ছোট ছোট চক্ষু দিয়া কটমট করিয়া অপর আরোহীদিগকে দেখিল। হরিনাথ ও গঙ্গাধরকে একটু ভাল করিয়া দেখিল। তাহার পর পকেট হইতে এক প্যাকেট খেলো সিগারেট বাহির করিয়া একটা ধরাইল।

গঙ্গাধর জিজ্ঞাসা করিল,—কত দূর যাবে?

নূতন আরোহী বনবিহারী। সে একটা রূঢ়ভাবে উত্তর দিতে যাইতেছিল। তাহার পর কি মনে করিয়া কহিল,—বেশী দূর নয়, বুঝলে কি-না, মোসিনগঞ্জে নেমে যাব। তোমরা কোথায় যাবে?

—আমরা লোচনপুরে যাব ভাবচি, কিন্তু তার কিছু ঠিক নেই। আমাদের টিকিট লাইনের শেষ পর্য্যন্ত আছে, যেখানে-সেখানে ইচ্ছে করলেই নেমে পড়তে পারি। মোসিনগঞ্জে চালের আড়ত আছে?

গঙ্গাধর পকেট হইতে একখানা টেলিগ্রাম বাহির করিয়া পড়িল। গোপন করিবার চেষ্টা করিল না। বনবিহারীও পড়িল টেলিগ্রামে লেখা আছে, ওদিকে চালের দর জানবে।

বনবিহারী বলিল,—বড় আড়ত নেই, ছোট আছে, বুঝলে কি না? তোমরা কি চালের ব্যবসা কর?

গঙ্গাধর অল্প হাসিল, বলিল,—আমরা ব্যবসাদার নই, ব্যবসাদারের চাকর, সামান্য মাইনে পাই। ঘুরে ঘুরে চালের দর জেনে খবর পাঠাই।

—এখন তোমরা কোথা থেক আসচ?

যে গ্রামে হরিনাথ ও গঙ্গাধর মূর্চ্ছিতা স্বাগতাকে লইয়া গিয়াছিল গঙ্গাধর সেই গ্রামের নাম করিল। হরিনাথ অলক্ষিতে বনবিহারীকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। গ্রামের নাম শুনিয়া বনবিহারী ঈষৎ বিচলিত হইল, গঙ্গাধরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—সেখানে ত চাল পাওয়া যায় না, আর সে ত রেলের ধারে নয়, বুঝলে কি-না?

—আমরা গিয়েছিলাম আর এক জায়গায়, ফেরবার

পথে ঐ গ্রাম পড়েছিল। আর আমাদের যে কাজ, রেলের ধার ছেড়ে অনেক দূর যেতে হয়।

বনবিহারী আর কথা কহিল না, আর একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল। গঙ্গাধর যেন আপনার মনে আস্তে আস্তে বলিল,—সেখানে একটা ভয়ানক কথা শুনলাম।

বনবিহারী কোন কথা কহিল না, সিগারেটের ধোঁয়া গঙ্গাধরের মুখের দিকে বাহির করিতে লাগিল।

গঙ্গাধর বিরক্তি প্রকাশ করিল না। পূর্ব্বের মত কহিল,—গ্রামের কাছে না কি মোটরে আগুন ধ'রে দুটো লোক পুড়ে মরেছিল?

মুখের ধোঁয়া বাহির করিয়া, দাঁত বাহির করিয়া, বনবিহারী বলিল,—অমন কত মরে। দু-জন মরেছিল, তোমরা ঠিক শুনেছিলে, বুঝলে কি-না?

হরিনাথ ক্রমাগত বনবিহারীকে দেখিতেছিল। গঙ্গাধর বলিল,—তা ঠিক বলতে পারি নে। কেউ কেউ বলছিল একজন রক্ষে পেয়েছে। কত দিনকার কথা, লোকের ঠিক মনেও না থাকতে পারে।

হঠাৎ হরিনাথ কথা কহিল। গঙ্গাধরকে বলিল,—ঐ রকম কি একটা কথা আমরা কলকেতায় শুনেছিলাম, না? কারা না কি বলেছে ঠিক খবর পেলে অনেক টাকা দেবে?

গঙ্গাধর বলিল,—আমারও মনে পড়চে বটে।

বনবিহারী মুখের সিগারেটের শেষটুকু ফেলিয়া দিয়া বলিল,—পুড়ে মরেছে তার আবার খবর কি, বুঝলে কি-না? যদি একজন রক্ষে পেয়ে থাকে তাহ'লে সে ঘরে ফিরে গিয়ে থাকবে।

হরিনাথ বলিল,—তাহ'লে কেউ টাকা দিতে চাইবে কেন? হয়ত সে ঘরে ফিরে যায়নি।

বনবিহারী তাহার চাপা হাসি হাসিল। মাথা নীচু করিয়া, কোমরে হাত দিয়া গলার ভিতর কি রকম একটা শব্দ করিল। বলিল,—রক্ষে পেয়েছে অথচ ঘরে ফিরে যায়নি, বেড়ে মজার কথা, বুঝলে কি-না? মাঝখান থেকে কারা হয়ত লোপাট করেচে।

—তার মানে কি?

—মানে গঙ্গাজল। এই ধর না, সে যদি মেয়ে-মানুষ হয়, বুঝলে কি-না? এমন মাল পেলে কে আবার ফিরে দেয়?

হরিনাথের মুখ লাল হইয়া উঠিল, গঙ্গাধর তাহাকে চোখ টিপিল। ঠিক এই সময় গাড়ি মোসিনগঞ্জে আসিয়া পঁহুছিল। বনবিহারী বাক্স টানিয়া লইয়া নামিল। একটা মুটের মাথায় বাক্স চাপাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। হরিনাথ ও গঙ্গাধরও সেই ষ্টেশনে নামিল। তাহাদের সঙ্গে দুইটা ব্যাগ ছিল। একটা মুটেকে জিজ্ঞাসা করিল,—এখানে কোথাও বাসা পাওয়া যাবে?

মুটে বলিল,—হাঁ বাবু, নবীন ঘটকের বাড়ি বাসাঘর পাবে।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া হরিনাথ বলিল,—ও লোকটা নিশ্চয় কিছু জানে।

গঙ্গাধর বলিল,—তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, আর লোকটা মার্কা-মারা। 'বুঝলে কি-না'র খোঁজ করলেই ওকে পাওয়া যাবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাবতীর সিদ্ধান্ত

একবার সেই যে প্রভাবতীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, কলবাহিনী চঞ্চল লীলাময়ী জাহ্নবীতটে লুণ্ঠিতঅঞ্চলা বাগতার সহিত কথোপকথনে নিরত, তাহার পর আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। প্রভাবতী দেখিতে শুনিতে ভাল, সুবুদ্ধি, কিন্তু এখন সে নিতান্ত আড়াল পড়িয়াছে। কেবল যে অন্তঃপুরবাসিনী সে কারণে নয়, ঘটনাস্রোত তাহাকে এক পাশে রাখিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তরঙ্গের উচ্ছ্বাস বা জলকণা তাহাকে স্পর্শ করিতেছিল না।

প্রভাবতীর কলিকাতায় অনেক দিন থাকা ঘটে নাই। শাশুড়ীর সঙ্গে গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিল। তাহার কয়েক দিন পরেই শুনিল হরিনাথ আর গঙ্গাধর আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গাধরের একখানা চার ছত্রের চিঠি, লিখিয়াছে চিঠিপত্র বরাবর লিখিতে পারিবে না, মা যেন না ভাবেন। কোথায় যাইবে কোথায় থাকিবে তাহার

স্থিরতা নাই, এই জন্ত প্রভাবতীকেও পত্র লিখিতে নিষেধ করিয়াছিল।

প্রভাবতীর ভারি রাগ হইল। হইবারই কথা। আদর কি শুধু মুখের না কি, আর চক্ষের আড়াল হইলেই কোন খোঁজ-খবর নাই। খবর যে একেবারে না আসিত এমন নয়, কেন-না মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে গঙ্গাধরের কোন বন্ধু হরিনাথের বাড়িতে সংবাদ পাঠাইত তাঁহারা দুই জন ভাল আছেন, নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু হরিনাথ কিংবা গঙ্গাধর নিজে কোন পত্র লিখিত না। পূর্ব্বে কখন এরূপ হয় নাই। বিদেশে গেলে চিঠিপত্র দেওয়া যেমন নিয়ম সেইরূপ আসিত। এবার কি হইল? দুই একবার গঙ্গাধরের মাতা পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হাঁ বউমা, গঙ্গাধরের কোন চিঠি আসে না কেন?

প্রভাবতী বলিল,—তা কেমন করে জানব, মা? এর আগে ত এ রকম হ'ত না।

প্রভাবতী ভাবিত যদি গঙ্গাধর পত্র না লেখে তাহা হইলে তারই বা এত মাথাব্যথা কেন? কিন্তু তাই বলিয়া ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না। অবশেষে প্রভাবতী স্বাগতাকে পত্র লিখিল। লিখিল, আমাদের এখানে ত কোন চিঠিপত্র আসে না, তুমি কি পেয়েচ?

উত্তরে সরলস্বভাব স্বাগতা হরিনাথের চিঠিখানি পাঠাইয়া দিল। লিখিল, এই একখানি চিঠি এসেচে আর কোন পত্র পাইনি। চিঠিতে ঠিকানা নেই আর আমাকে লিখতে বারণ করেচেন সেই জন্ত আমি আর লিখি নি।

প্রভাবতী চিঠি অনেক বার পড়িল। শেষে লেখা আছে, সকল সময় তোমাকে মনে পড়ে। তুমি কখন কখন আমাদের মনে কর ত? এ কথার মানে কি? শুধু কি লিখিতে হয় বলিয়া লেখা, না ইহার ভিতর আর কিছু অর্থ আছে? এ রকম কথা চিঠিতে সদাসর্ব্বদা যে সে লেখে তাহার বিশেষ কোন অর্থ হয় না। হরিনাথও কি সেইভাবে স্বাগতাকে লিখিয়াছিল? আর যদি কোন গূঢ় অর্থ থাকে তাহা হইলে কি এ ভাবে লেখা উচিত? স্বাগতা কে তাহা কেহ জানে না। তাহা হইলেও সে যুবতী, সুন্দরী, হরিনাথ যুবক বিপত্নীক, স্বাগতাকে সকল সময় তাঁহার মনে পড়ে কেন? স্বাগতা কি জাতি, সধবা কি বিধবা, তাহাও কাহারও জানা নাই। প্রভাবতী আবার ভাবিল যদি স্বাগতাকে সকল সময় মনে পড়ে তাহা হইলে হরিনাথ দেশভ্রমণে বাহির হইল কেন? হরিনাথকে স্বাগতা মনে করে কি না সে কথা জিজ্ঞাসা করা কেন? স্বাগতার হৃদয়ে হরিনাথের স্থান আছে কি-না ইহা ব্যতীত এ কথার আর কি অর্থ হইতে পারে? তাহার পর স্বাগতাকে দেশের বাড়িতে না রাখিয়া কলিকাতায় রাখিয়া গেল কেন? কলিকাতায় সে লেখা-পড়া শিখিতেছে, আর দেশে থাকিলে কত লোকে কত রকম কথা বলিত সেই এক কারণ হইতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে আসল কথা ধাঁ করিয়া প্রভাবতীর মনে হইল। সে স্থিরসিদ্ধান্ত করিল হরিনাথ ও গঙ্গাধর বেড়াইতে যায় নাই, স্বাগতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে গিয়াছে। সেই কারণে তাহারা চিঠিপত্র লেখে না, গোপনে সন্ধান করিতেছে। স্বাগতার সম্বন্ধে কি রহস্ত আছে তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিবে। প্রভাবতীর মনে আর কোন সংশয় রহিল না।

শাশুড়ীকে গিয়া প্রভাবতী বলিল,—মা, আমি একবার কলকেতায় যাব?

—কলকেতায়? কেন?

—স্বাগতা একলা রয়েচে, কিছু দিন আমি তার কাছে গিয়ে থাকি না কেন?

—তাহ'লে হরিনাথ সে কথা ব'লে যেতেন। আর গঙ্গাধরের মত না নিয়ে তোমাকে কেমন ক'রে পাঠাব?

—ওঁর অমত হবে কেন?

—এখন আর কিছু দিন দেখি, তার পর না-হয় তুমি যেও।

এবার প্রভাবতী আর পীড়াপীড়ি করিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিশোধ

একটা গণ্ডগ্রামে সকল রকম লোকই থাকে, অতএব কার্ত্তিকের গ্রামে যে জন-কতক গোঁয়ারগোবিন্দ যুবক

থাকিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? কার্তিক যে তাহাদের দলে ঠিক তাহা নয় তবে তাহাদের সঙ্গে অসদ্ভাবও ছিল না। তাহাদের কয়েক জনের সঙ্গে কার্তিক পরামর্শ করিল যে-দুইজন তাহাকে অপমান করিয়াছিল তাহাদিগকে জব্দ করিতে হইবে।

যুবকেরা প্রথমে রাজি হয় না। দেওয়ানজীর কাছে যাহারা আসে যায় তাহাদের পিছনে লাগা অসম সাহসের কথা। জলে বাস করিয়া কি কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে? কার্তিক বুঝাইল এ দুইটা বদমায়েস লোক, কোন কাজকর্মে আসে না, হয়ত ঠকাইবার চেষ্টায় আসে।

ইহার মধ্যে একদিন বনবিহারী আসিয়া ত্রিলোচনের সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। কার্তিক দূর হইতে তাহাকে দেখিল, কিন্তু নিকটে ঘেঁষিল না, তখনও তাহার দল ঠিক তৈয়ার হয় নাই। কিন্তু তাহার পর দিবসই কার্তিক এক নূতন ব্যাপার দেখিল। ত্রিলোচন যে-ঘরে বসিতেন তাহার বাহিরে দুই জন ভীমকায় খোট্টা দরোয়ান লাঠি হাতে করিয়া বেঞ্চে বসিয়া রহিয়াছে। সেই রকম আর দুই জন ত্রিলোচনের বাড়ির সদর দরজায় মোতায়েন হইয়াছে।

কার্তিক তাড়াতাড়ি দু-চার জন ডানপিটে যুবককে ডাকিয়া সেই উষ্ণীষধারী লগুড়হস্ত রুদ্র মূর্তি দেখাইল। আহ্লাদে বুক ফুলাইয়া বলিল,—দেখেছিস, আমি ঠিক বলেছিলাম কি-না?

একজন কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল,—কি বলেছিলি?

—সে দুটো লোক বদমায়েস। তাদের জন্যই বাবা এ সব দরোয়ান রেখেচে।

—তা বেশ, তাহ'লে আর আমাদের কিছু করতে হবে না।

—তবে ত সব বুঝলি! বাবার ঘরে ওরা আর ঢুকতে পাবে না। আর আমাকে যে অপমান করেছিল তার কি হবে?

—এবার যখন আসবে কিছু উত্তম-মধ্যম দেওয়া যাবে।

সেজন্য অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। এক দিন বৈকাল বেলা কার্তিক কাছারী বাড়ি হইতে কিছু দূরে ছেলেদের খেলা দেখিতেছিল, যুবকেরাও সেখানে ছিল। সেখান হইতে রাস্তা একটু দূরে। কার্তিক দেখিল শ্যামাচরণ ছড়ি হাতে করিয়া কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া হন্ হন্ করিয়া কাছারী বাড়ির দিকে যাইতেছে। কার্তিক অমনি চুপি চুপি বলিল, দুই জনের মধ্যে ঐ এক জন!

তৎক্ষণাৎ কার্তিক আর পাঁচ সাত জন শ্যামাচরণের অনুবর্তী হইল, ইচ্ছা দূর হইতে একটু রঙ্গ দেখিবে।

কার্তিক আর তাহার সঙ্গীরা দেখিল শ্যামাচরণ সোজা ত্রিলোচনের ঘরে যাইতেছে। যুগল দ্বাররক্ষকের মধ্যে একজন হাঁকিল,—ও বাবু, কাঁহা যাতা হয়?

শ্যামাচরণ তবু দাঁড়ায় না, সে জানে তাহার প্রবেশ-পথ অবারিত, কাহার সাধ্য তাহার পথ রোধ করে? অমনি এক জন দরোয়ান উঠিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল,—বাবু, তুম বহিরা হয়, কেয়া বোলা শুনা নহি?

দরোয়ানের দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখিয়া শ্যামাচরণ দাঁড়াইল বটে, কিন্তু তাহার মনে কোন শঙ্কা হইল না। কহিল,—দাওয়ানজীর সঙ্গে আমার কিছু কাজ আছে।

—কেয়া কাম? নাম বতাও, তব ইত্তলা হোগা।

শ্যামাচরণ কহিল,—আমার নাম শ্যামাচরণ, গিয়ে বললেই হবে।

দরোয়ান ভিতরে গিয়া তখনই ফিরিয়া আসিল, উগ্রভাবে কহিল,—যাও বাবু, মুলাকাত নহি হোগা।

শ্যামাচরণ প্রথমে বিশ্বাসই করে না। বলিল,—কি, দেখা হবে না? আমার নাম ঠিক বলেছিলে কি?

—নাম কেয়া ইয়াদ নহি রহতা? নাম শ্যামাচরণ বোলা।

শ্যামাচরণ বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। দরোয়ান বলিল,—বাবু, আওর এক বাত। দেওয়ান সাহেব হুকুম দিয়া ফের কভি নহি আনা। আনে সে গাঁও কে বাহার নিকাল দিয়া যায়গা।

অগত্যা শ্যামাচরণ ফিরিল। কিছু দূর গিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্ত উত্তোলন করিয়া শাসাইয়া বলিল,—আচ্ছা, দেখে নেব দেওয়ান সাহেবকে! হাতে যখন হাতকড়ী পড়বে তখন দেওয়ানগিরি ঘুচে যাবে।

দলবল সমেত কার্ত্তিক কিছু পিছনে আসিতেছিল। তাহারা শ্যামাচরণের কথা শুনিতে পাইল না, নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ করিতেছিল।

শ্যামাচরণ গ্রাম ছাড়াইতেই যুবকেরা দ্রুতপদে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী হইল। দলের সর্দ্দার বলিষ্ঠ যুবক শ্যামাচরণের মুখের দিকে মুখ বাড়াইয়া বলিল,—দেওয়ানজীর কাছে কি পেলে?

রাগে শ্যামাচরণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। বিকট মুখভঙ্গী করিয়া কহিল,—তোমার সে খোঁজে কাজ কি?

অবিলম্বে আর এক যুবক বলিল,—ও যে চাঁদ চাওয়া ছেলে, তোরা জানিস নে? দেওয়ানজীর কাছে চাঁদ চাইতে গিয়েছিল।

যুবকেরা যেন উতোর কাটাইতে আরম্ভ করিল। আর এক জন বলিল,—চেয়েছিল আস্ত চাঁদ, পেয়েচে আধখানা।

আর একজন অমনি শ্যামাচরণের চক্ষের সম্মুখে নিজের হাত অর্দ্ধ মুষ্টির আকারে ধরিয়া বলিল,—অর্দ্ধচন্দ্র জান ত? যাকে ভাষায় বলে গলাধাক্কা। আরও চাই?

এবার কার্ত্তিকও অগ্রসর হইয়া আসিল। নাকী সুর করিয়া, চক্ষু পাকাইয়া কহিল,—আমাকে বেতপেটা করবে না? চল, আমার বাবার সাক্ষাতে আমাকে পিটিয়ে দেবে।

যুবকেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কেহ বলিল,—এই যে হাতে বেত রয়েচে; অপর কেহ বলিল,—আর একটু হলেই দরোয়ানী লাঠি খেতে হ'ত।

—এমন সোনার চাঁদ ছেলের বাপ-মা কি নাম রেখেছিল?

—পদ্মলোচন। খ্যাঁদা পুতের যা নাম হয়ে থাকে।

—শিক্ষেটা তেমন ভাল হয় নি, সদাচারের কিছু অভাব।

—শেখাতে কতক্ষণ? বলিয়াই এক যুবক খুব জোরে শ্যামাচরণের কান মলিয়া দিল।

শ্যামাচরণ হাতের লাঠি তুলিতেই যুবকেরা সরিয়া গেল। শ্যামাচরণ ছড়ির ভিতর হইতে টানিয়া গুপ্তি বাহির করিল।

যুবকদের ইচ্ছা ছিল লোকটাকে ঘা-কতক চড়চাপড় দিয়া বিদায় করিয়া দিবে। ইহার অধিক কিছু নয়। তাহাদের হাতে এক গাছা লাঠিও ছিল না, শ্যামাচরণের ছড়ির ভিতর গুপ্তি আছে তাহা জানিত না। কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি সকলের পিছনে গিয়া চেঁচাইতে লাগিল,—ওরে, খুনী রে, খুনী! হয়ত বাবাকে খুন করতে এসেছিল! ডাক্‌, দরোয়ানদের ডাক্‌, ওকে ধরবে।

খুনী শব্দ শুনিতেই শ্যামাচরণের গায়ের রক্ত শুকাইয়া গেল, মুখ ম্লান হইল, গুপ্তি-সুদ্ধ হাত কাঁপিতে লাগিল। আর একটি কথাও না কহিয়া ছড়ির ভিতর গুপ্তি পুরিয়া দিয়া সে বেগে পলায়ন করিল। যুবকেরা প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তাহার পর শ্যামাচরণকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতে আরম্ভ করিল। কয়েকটা তাহার পিঠে ও পায়ে লাগিল, কার্ত্তিকের একটা লোষ্ট্র শ্যামাচরণের মাথায় লাগিয়া মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, কিন্তু শ্যামাচরণ থামিল না, পিছনে ফিরিয়া চাহিল না, কেবলই প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।

সে দৃষ্টির বাহির হইলে কার্ত্তিক বলিল,—দেখলি, ওটা খুনী না হয়ে যায় না। যেই বলেচি খুনী অমনি ওর আত্মারাম শুকিয়ে গেল, ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল, পালাবার পথ পায় না। আর খুনী না হ'লে লাঠির ভিতর গুপ্তি নিয়ে বেড়ায়?

এই মতের কেহ প্রতিবাদ করিল না।

ক্রমশঃ

মানবপুত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত্যুর পাত্রে খৃষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
বরাহূত অনাহূতের জন্যে,
তার পরে কেটে গেছে বহু শত বৎসর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্ত্ত্যধামে।
চেয়ে দেখলেন,
সেকালেও মানুষ বিক্ষত হ'ত যে সমস্ত পাপের মারে,—
যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে ক্রূর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে,
বিদ্যুদ্বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্চে
হিস্‌হিস্‌ শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানা ঘরে।

কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হ'ল,
ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠ্‌ল নরঘাতকের হাতে,
পূজারী তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্ণ নখে আঁচড় দিয়ে।
খৃষ্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন,—
বুঝলেন শেষ হয়নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্চে বিজ্ঞানশালায়,
বিঁধচে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্ম্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্ম্মমন্দিরের বেদীর সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকচে ঘাতক সৈন্যকে,
বলচে, "মারো, মারো।"
মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠ্‌লেন ঊর্দ্ধে চেয়ে,
"হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।"

বিদেশের কথা

শ্রীপারুল দেবী

ভ্রমণকাহিনী পড়তে আমার নিজের বড় ভাল লাগে। মাসিক পত্রিকায় যখন কেউ দেশবিদেশ থেকে সে দেশের বর্ণনা ক'রে চিঠি পাঠান তখন সেগুলি পড়ে ঘরে বসেই আমি দূর দেশ বেড়াবার আনন্দ উপভোগ করি। খুবই বুঝি এ দেশের পাহাড়ের চেয়ে অন্য কোনো দেশের পাহাড়ের আকৃতিগত কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হলেও মোটের উপর পাহাড় পাহাড়ই, নদী নদী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবু দূরের দেশের গাছ বন নদী পাহাড় যেন মায়ায় ঘেরা—কেবলই তার দিকে মন টানে।

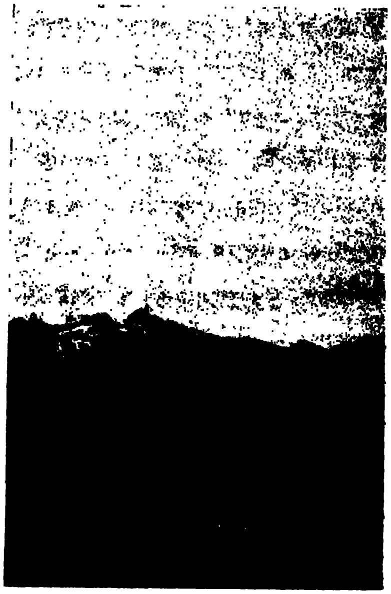
আমাদের বাঙালী মেয়েদের ইউরোপ-ভ্রমণের সুবিধা সহজে হয়ে ওঠে না। বছর বিশ-পঁচিশ আগে ত বিলাত-ফেরৎ বাঙালীর মেয়ে একটা দেখবার বস্তুবিশেষ ব'লে গণ্য হতেন। আমাদেরই দু-এক জন বিলাত-প্রত্যাগতা আত্মীয়াদের আমরা ছেলেবেলায় দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখেছি; কাছে ঘেঁষতে সাহস পাইনি। কার্য্যোপলক্ষে বা শিক্ষার জন্য বাঙালী পুরুষেরা অনেকে বিলাত যেতেন বটে, কিন্তু স্ত্রীদের সহগামিনী হওয়া তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল না। আজ আর সেদিন নেই, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রাবল্যে স্বামীরা এখন একা কোথাও যাবার কথা স্ত্রীদের সম্মুখে উত্থাপন করতে ভয় পান; তা ছাড়া মেয়েরাও নিজেদের শিক্ষার জন্য এবং অন্য কারণে নিজেরাই এখন ইউরোপের নানা স্থানে যেতে শিখে গেছেন; কাজেই এখন তাঁদেরও বিলাত যাওয়া অভাবনীয় ব্যাপার নয়।

আমি এবার ইউরোপের কয়েকটি জায়গা দেখে এসেছি। তার মধ্যে লুসার্ণ থেকে যে রোন্ গ্লেশিয়ার (Rhone glacier) দেখতে গিয়েছিলাম, তার কথাই আজ একটু লিখবার ইচ্ছা আছে। লেখা আমার তেমন অভ্যাস নাই, লেখার অভ্যাস থাকলেও যা দেখেছি সে এতই অপরূপ সুন্দর যে, সে-সৌন্দর্য্য কাগজে কলমে ফুটিয়ে অপরকে দেখাবার মত ক'রে তোলা আমার এ হাতে সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না। তবু লিখছি—যাঁরা অনেক দেশ বেড়িয়ে অনেক নূতন নূতন দৃশ্য দেখে নূতনত্বের মায়াজাল কাটিয়ে উঠেছেন তাঁদের জন্য নয়। লিখছি আমাদের বাংলার নিভৃত পল্লীগ্রামে যে পুরনারীরা আহারাদির পর বিশ্রামের সময়টিতে একখানি মাসিকপত্র টেনে নিয়ে তার থেকে রসাস্বাদ করতে ভালবাসেন শুধু তাঁদেরই মনে ক'রে। অবসর কম, সংসারের সব কাজ সেরে কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে তার কাছে শুয়ে সে যতটুকু সময় ঘুমোর অবসর সেইটুকুই।

সামান্য একটুখানির জন্য সংসারের অত্যাবশ্যক চিন্তার ধারা থেকে মন ছুটি পায়—সে একটা কম লাভ নয়, সেই সামান্য একটুক্ষণের জন্য কোনো একটি গৃহকর্ম-শ্রান্ত মনকে ছুটির আনন্দ যদি দিতে পারি সেই আমার পরম লাভ ব'লে মনে করব।

লুসার্ণে গিয়ে শুনলাম সেখান থেকে দুটি বরফের নদী অর্থাৎ গ্লেশিয়ারে যাওয়া যায়। একটা হ'ল ইয়ুংফ্রাউ (Jungfrau) আর একটা হ'ল রোন্ গ্লেশিয়ার। রোন্ গ্লেশিয়ার থেকেই যে ওখানকার রোন্ নদীর উৎপত্তি তা ত নাম থেকেই বোঝা যায়, কিন্তু ইয়ুংফ্রাউ নামটি কেন হ'ল সে কথা বোঝা যায় না। লুসার্ণের অধিবাসীদের নিকট দুটি গ্লেশিয়ার সম্বন্ধেই নানারূপ কথা শুনতে লাগলাম—কেউ বলে রোন্ গ্লেশিয়ার যে না দেখেছে তার এদেশে আসাই বৃথা, আবার কেউ বলে গ্লেশিয়ারই যদি দেখতে হয় ত ইয়ুংফ্রাউই দেখা উচিত। কোন্‌টাতে যাই, দু-দিন ধরে ত কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। তারপর নানা মুনির নানা মত শোনবার অভিজ্ঞতা থেকে নিজেরা পরামর্শ ক'রে বুঝলাম যে, ইয়ুংফ্রাউ হ'ল রোন্ গ্লেশিয়ারের চেয়ে অনেক উঁচু, তাই বেশীর ভাগ লোকে উঁচুতে চড়বার আনন্দে সেইখানেই

যায়। রোন্ গ্লেশিয়ার তার চেয়ে কয়েক হাজার ফিট নীচে, আবার পথটা ভারী সুন্দর, আর একটু কাছে ব'লে ভাড়াও অপেক্ষাকৃত কম। আমার স্বামীর অসুস্থতার জন্যই আমরা বিলাতে গিয়েছিলাম; তাঁর উপর



গ্রিমসেল্ হ্রদ

ডাক্তারদের কড়া হুকুম ছিল যে, কোনো রকম ক্লান্তিকর কাজ যেন তিনি কিছুতেই না করেন। প্রথমটা আমি ঠিক করেছিলাম যে, কোনো গ্লেশিয়ারই দেখে কাজ নেই, কিন্তু অত কাছে গিয়েও গ্লেশিয়ার না দেখতে পাবার আক্ষেপে দেখলাম তাঁর পেটের ব্যথা আবার বেড়ে যাবার উপক্রম হ'ল। কাজেই শেষটা, যেটা অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি সেই রোন্ গ্লেশিয়ারে যাওয়াই ঠিক করলাম।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন — তার আগে উঠে স্যাণ্ডউইচ কেক ইত্যাদি একটু খাবার-দাবার ঠিক ক'রে নিয়ে তৈরি হয়ে ষ্টেশনে এলাম। লুসার্ণ থেকে গ্লেশিয়ার অবধি ট্রেনও যায়, আর মোটরের রাস্তাও আছে। ট্রেনে গেলে ভাড়া অনেক কম লাগে, কিন্তু মুস্কিল এই, পথে এত 'টানেল' যে অন্ধকারে অন্ধকারে যাওয়াই সার হয়, অমন যে সুন্দর রাস্তার দৃশ্য তা কেবল মাঝে মাঝে ট্রেন যখন টানেল থেকে বেরোয় তখন শুধু ক্ষণিকের জন্য চোখে পড়ে, আবার মুহূর্ত্ত পরেই অন্ধকারে সব ঢেকে যায়। তারপর শেষ যেখানে ট্রেন থামে, সে জায়গাটি হ'ল ঠিক সেই বরফের পাহাড়ের পাদমূলে। চোখ তুলেই সামনে দেখা যায় জল জল করছে বরফের পাহাড়, কিন্তু উপরে ওঠা যায় না। বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে বেড়াব এই আমাদের ইচ্ছা ছিল, তাই আমরা প্রথম খানিক পথ ট্রেনে এসে বাকি পথ মোটরে আসব ঠিক করেছিলাম। সাড়ে সাতটার সময় ট্রেনে ছাড়ল—ঘুরে ঘুরে ট্রেন ক্রমেই উপরে উঠতে লাগল। যে-রেল লাইন দিয়ে এখনই উঠছিলাম, একটু পরেই ঘুরে ঘুরে তার কয়েক পাক উপরে উঠে দেখি যে, যে-জিনিষগুলিকে তখন মস্ত বড় ব'লে মনে হয়েছিল সেগুলি নিতান্ত ছোট হয়ে গেছে এরই মধ্যে। মনে আছে, একটি হ্রদ বড় সুন্দর দেখা গিয়েছিল। প্রথমে তার পাশ দিয়েই আমরা চলে গেলাম, রোদ পড়ে জলটি ঝক্ ঝক্ করছে। তারপর একটু পরে একটা উঁচু পাহাড়ের অর্দ্ধপথ যখন উঠেছি, তখন নীচে সেই হ্রদটিকে গোলাকার একটি ছোট পুষ্করিণীর মত দেখাতে লাগল। তারপর সেই উঁচু পাহাড়টার মাথার উপর যখন উঠে গেলাম, তখন নীচে তাকিয়ে দেখি চারদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা ঠিক একটি রূপার থালা সূর্য্যকিরণে জল্ জল্ করছে। আমার বারো বছরের মেয়েটি আমার সঙ্গে ছিল, সে ত যা দেখে তাইতেই বলে, "মা ছবি তুলে নিই।" কিন্তু চলন্ত ট্রেন, অনেক ছবি নষ্ট হয়ে গেল। যে কয়খানি ছবি দিলাম, সে আমার মেয়েরই তোলা।

উপরে উঠছি আর ঠাণ্ডা বাড়ছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের স্তরের আড়াল থেকে এক-একবার দেখা যাচ্ছে হীরার মুকুটের মত সাদা বরফের পাহাড়ের চূড়া। কিছু পথ অতিক্রম করবার পর থেকেই পাহাড়ের গায়ে খানিক খানিক জমা বরফ দেখা গিয়েছিল, ক্রমেই সেগুলো বেড়ে উঠছে। বেলা দশটায় আমরা Geohenen ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। অনেক যাত্রী দেখলাম আগের ট্রেনে এসে অপেক্ষা করছে, অনেক যাত্রী আমাদের ট্রেন থেকে নামল। ষ্টেশনে তিন-চারখানা

বড় বড় অটোকার দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের টিকিট দেখিয়ে সীট্ ঠিক ক'রে নিয়ে বসে দেখি সে গাড়ীতে একটি গুজরাটী ছেলে ও মেয়ে যাচ্ছে। ভারী আনন্দ হ'ল দেখে। কাছে গিয়ে আলাপ করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু কিছু সুবিধা হ'ল না। বিদেশীদের (ইংরেজ ছাড়া অবশ্য) আমাদের প্রতি কত যত্ন—ভাল সীট্‌টি ছেড়ে দেওয়া, অযাচিতভাবে সাহায্য করা, আলাপ করবার কত আগ্রহ। অথচ নিজেদের দেশের লোকদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েও আলাপ করতে পারলুম না ব'লে তখন বড় খারাপ লেগেছিল। কিন্তু পরে জানলাম মেয়েটি ইংরেজী বলে না, তাই ভাল ক'রে কথা বলেনি।

যা হোক্ খানিক পরে আমাদের মোটর ছাড়ল। আমরা তেইশ জন যাত্রী ছিলাম আর একজন প্রদর্শক। সে প্রতি রাস্তার বিবরণ, রাস্তা তৈরির ইতিহাস ইত্যাদি প্রথমে ইংরেজী তারপর ফ্রেঞ্চ তারপর জার্মান ভাষায় বলতে বলতে যাচ্ছিল। পথে একটা প্রকাণ্ড ঝরণা—মোটর থামিয়ে সেখানে গাইড আমাদের সকলকে নামতে বললে। দু-দিকের দুটো পাহাড়ের গা বেয়ে দুটো ঝরণা একসঙ্গে মিলে ১৮০ ফিট নীচের গভীর খাদে পড়ছে। এত শব্দ যে সেখানে দাঁড়িয়ে একটা কথাও শোনা যায় না। জলের বাষ্প উঠছে ঠিক ধোঁয়ার মত—বিন্দু বিন্দু জলের কণায় আমাদের পেট ভরে গেল। চারদিকে ভিজে পাহাড়ের ভিজে গাছের কি একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ, গভীর জলের অবিশ্রান্ত শব্দ, শব্দের ধারায় মন যেন ডুবে যায়। কিন্তু মন ডুবিয়ে বেশীক্ষণ ত কোথাও বসে থাকবার উপায় নেই—মোটরের ধরা-বাঁধা সময়; গাইড ঘড়ি দেখে একে একে আবার সকলকে উঠে বসতে অনুরোধ করলে। সাড়ে এগারটার সময়ে আমাদের গাড়ী একটা রাস্তার ধারের কাফের কাছে এনে দাঁড় করালে, কেউ যদি চা কফি বা অন্য কিছু খেতে চায়। যতই সুন্দর বন হোক্, যতই নির্জ্জন পাহাড় হোক্, ইউরোপের কোনো জায়গায় ঐ কাফের হাত থেকে মুক্তি নেই—এদেশের লোক পরিমাণে খায় কম বটে, কিন্তু একসঙ্গে তিন ঘণ্টা না-খেয়ে থাকা ওদের ধাতে নেই—তাই পদে পদে ওদের খাবার ঘর চাই। বনজঙ্গল ভেঙে ভেঙে অপথ বিপথ দিয়ে কত দূর পাহাড়ে চড়ে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছি—গাছের তলায় শুয়ে মনে হচ্ছে কে জানে এ জায়গাটিতে আর কখনও কেউ এসেছিল কি-না। অপূর্ব্ব নির্জ্জনতার ঝিম্



গ্লেশিয়ারের একাংশের দৃশ্য

ঝিম্ শব্দে সমস্ত জায়গাটা থমথম্ করে। এমন সময়ে হঠাৎ কিছু দূরে মানুষের সাড়া। চমকে উঠে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি দিব্যি খোলা জায়গায় বড় বড় ছাতার তলায় open-air-cafe´—রৌদ্রে চেয়ার টেবিল আর ফুলদানী অবধি সাজান—পথশ্রান্ত ছয়-সাতটি মেয়ে-পুরুষ কেউ কেউ কফি, কেউ কেউ আইসক্রীম খেতে বসে গেছে। নির্জ্জনতার মায়াজাল এক মুহূর্ত্তে কেটে যায়—আবার চড়ুইভাতির সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে চড়াই সুরু করি, কিন্তু তবু ঐ কাফের মায়াজাল অতিক্রম করতে পারি নি, এমন কতবার হয়েছে। এখানেও মোটর থামতে অনেকে কাফেতে ঢুকলেন। আমরা গেলাম কাছেই একটা পাহাড়ে অনেক তুলোর মত বরফ পড়ে ছিল তাই দেখতে। কিন্তু বরফটা যত কাছে ভেবেছিলাম তত কাছে নয়, বরফ হাতে নিয়ে দু-একটি গোলা পাকাতে-না-পাকাতেই মোটরের হর্ণ শুনে বুঝলাম যে সময় হয়ে গেছে।

বেলা ১টার সময়ে আমরা রোন্ গ্লেশিয়ারের কাছে এসে নামলাম। মোটর থেকে নেমেই দেখি প্রকাণ্ড রেস্তোরাঁ, কালো পোষাক-পরা চাকর-বাকর ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখেই মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল—জনমানবহীন নির্জ্জন

স্থানে তুষারধবল পাহাড় দেখব কল্পনা করেছিলাম, তা না আবার সেই কাফে। সামনে একটু এগিয়েই দেখি একটা গেট, সেখানে টিকিট বিক্রী হচ্ছে। টিকিট নিয়ে গেট পেরিয়েই সামনে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়ল সে ভুলতে পারব না কখনও। শুধু বরফের পাহাড়, তাতে মাটি নেই, পাথর নেই, গাছপালা নেই, একটি কালো দাগ পর্য্যন্ত নেই। আমরা বরফের পাহাড় বোঝাতে হলে সাদা বলি, দূর থেকে যে বরফের পাহাড় দেখতে পাওয়া যায় সূর্য্যের আলো পড়ে তা সাদাই দেখায়। কিন্তু বরফের পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দেখলাম তার রং ঠিক সমুদ্রের জলের মত নীল। সমুদ্রের ঢেউ যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। তার উপর রৌদ্র পড়েছে—সেই নীল শৈলশিখরের উপর কি অপূর্ব্ব বর্ণসমুদ্র—স্তরে স্তরে সেই চূড়ার পর চূড়া কত রকম আভা জড়িয়ে কত দূর অবধি চলে গেছে, চোখ আর ফেরানো যায় না। আমাদের মহাদেবকে যে পর্ব্বতরূপে কল্পনা করা হয় তার একটা মানে বুঝেছি এবার। প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব বিরাট সৌন্দর্য্য দেখে শুধু উপভোগ করা যায় না, একে প্রণাম করতে হয়। একটু এগিয়ে আমরা বরফের উপর দিয়ে চলে একেবারে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে সময়ে বেশী দূরে যাওয়া মানা। তখন জুলাই মাস, বরফ একটু একটু গলছে, ঐ রকম গলা বরফের উপর পা দিয়ে কত লোক একেবারে বরফ ভেঙে তার সঙ্গে সোজা হাজার হাজার ফিট নীচে যেখান দিয়ে রোন নদী বয়ে যাচ্ছে সেইখানে গিয়ে পড়েছে, তাদের আর কিছুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় নি। শীতকালে বরফ গলে না, সে সময়ে দড়ির জুতো প'রে অনেকটা ওঠা যায় শুনলাম। বরফের পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ কেটে তার মধ্যে আবার রাস্তা ক'রে পয়সা-রোজগারের একটা উপায় করা হয়েছে—টিকিট কিনে তবে সে সুড়ঙ্গের মধ্যে যাওয়া যায়। আমরাও ঢুকলাম। একজন চলবার মত চওড়া সুড়ঙ্গ—সাধারণ মানুষ বেশ সোজা হয়ে চলতে পারে—খুব লম্বা লোকের পক্ষে হয়ত একটু মুস্কিল হয়। প্রথমে ঢুকেই দেখি নীল বরফ ভেদ ক'রে একটা নীল রঙের সূর্য্যের আভা সুড়ঙ্গের ভিতর এসে পড়ছে। মাথার উপরের বরফের ছাদ দিয়ে টপ টপ্ ক'রে জল পড়ছে। হিমশীতল বরফের দেওয়াল চার দিকে—ঠাণ্ডায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। যত ভিতরে যাই ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। কতটা আরও যেতে পারা যেত জানি না, আমার কিন্তু মনে হ'তে লাগল যদি পাহাড় ধ'সে এখন মাথার উপর পড়ে ত একেবারে সমাধি। যত সে কথা ভাবি তত প্রাণ হাঁপায় আর মনে হয় যে এখন ত বরফ একটু একটু ক'রে গলছেই, এ সময়ে পাহাড় ধ'সে পড়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। আমার মেয়ে আবার কিছুতে আমাকে ফিরতে দেবে না, হাত ধরে টেনে এগিয়ে নিয়ে চলল। আরও খানিকটা কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে শেষটা আর পোষাল না—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে আলোর মুখ দেখে, সূর্য্যের তাপ পেয়ে বাঁচি। সেই অন্ধকার তুষার-গুহা থেকে বেরিয়ে আবার যখন চোখে পড়ল সেই অপরূপ নীল পাহাড়, তার কত—কত নীচে দিয়ে সরু রেখার মত নীল জলের নদী বয়ে গেছে, তখন নূতন ক'রে আবার মনে হ'ল কি অপূর্ব্ব! উপরে নীল উজ্জ্বল আকাশ আর নীচেই সেই জমা সমুদ্রের তরঙ্গের মত বরফের স্তূপ! ঊর্দ্ধ-মুখে দাঁড়িয়ে যেন ধ্যানমগ্ন শিবের স্থির গম্ভীর বিরাট দেহ। মনে হ'তে লাগল আমরা ত চলে যাব—তারপর অপরাহ্ণে যখন সূর্য্যাস্তের আকাশের শত শত রঙ এর উপর প্রতি-ফলিত হবে সে কেমন না জানি দেখাবে। তারও পরে রাত্রি নেমে আসবে, ঘন নীল আকাশের অসংখ্য তারার মৃদু আভায় কে জানে কেমন দেখাবে এই অপরূপ দৃশ্য? দিনের আলোয় যাকে অপরূপ দেখে এসেছি, রাত্রির আবরণের মধ্যে তাকে কেমন দেখায় আজও এক এক সময় ভাবি।

তাড়া পড়ল, বুঝলাম আর সময় নেই। কিছুতেই ইচ্ছা করছিল না সেই বরফের পাহাড়ের কোল থেকে চলে আসি। কিন্তু আসতেই হ'ল।

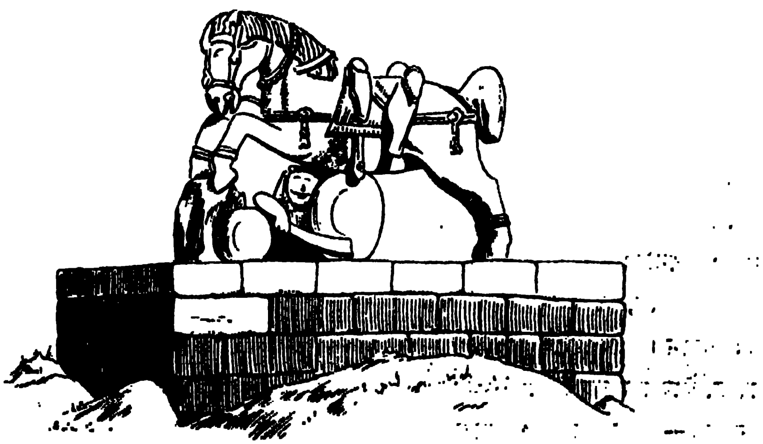
সেখান থেকে মোটর আমাদের নিয়ে হু হু ক'রে নীচে নামতে লাগল। প্রায় তিন কোয়ার্টার ধ'রে নেমে আমরা সেই গ্লেশিয়ারের পায়ের তলায় নদীটির ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। উপর থেকে একেই একটি রেখার মত দেখাচ্ছিল। নদীটির দুই পাশে অনেকটা ক'রে সমতল ভূমি, সেখানে ছোট ছোট সব ঘর-বাড়ি। তা ছাড়া কাফে ত আছেই। ছোট ছোট বাড়িগুলি থেকে কত

মেয়েরা বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল। তাদের একরকমের পাহাড়ী পোষাক, হাসিমাখা উজ্জল সরল মুখ, গোলাপফুলের মত রং। আমরা প্রথমেই রেস্তোরাঁতে না ঢুকে, একটা ছোট পাহাড়ে উঠে নিজেদের আনা খাবার বের ক'রে খেতে বসলাম। একটি ছোটবাড়ি থেকে ছুটি মেয়ে এসে কত কি বল্‌লে। বুঝলাম না কিছুই, তবে মনে হ'ল ভিতরে গিয়ে বসতে বলছে। হাত-পা নেড়ে কোনো রকমে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, ঘরের মধ্যের চেয়ে বাইরে বসে খেতেই আমাদের ভাল লাগে। তারপর খাওয়া হ'লে একবার তাদের ঘরে ঢুকলাম—কত আগ্রহে যে তারা নিজেদের বাড়িটি আমাদের দেখাতে লাগল তা বলতে পারি না। তারা বোধ হয় রোম্যান ক্যাথলিক—বাড়িতে একটি স্বতন্ত্র পূজার ঘর দেখলাম, সেখানে মেরীর মূর্ত্তি, ছুই পাশে ফুল, মোমবাতি সাজান, দেওয়ালে যিশু ও মেরীর নানারূপ ছবি টাঙান। খানিক পরে বিদায় নিয়ে আমরা সেই রেস্তোরাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। যতক্ষণ না দৃষ্টিপথের বাইরে গেলাম, বাড়ির সব মেয়ে-পুরুষেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল, আর হাত নাড়তে লাগল। রেস্তোরাঁতে ঢুকে আমরা আইস্‌ক্রীম খেলাম, তখনও প্রায় আধ ঘণ্টা সময় ছিল। বেলা প্রায় আড়াইটায় আমরা আবার ছাড়লাম—আসবার পথটা ঢালু ব'লে খুব শীঘ্র ফেরা যায়; সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগেছিল পৌছতে, কিন্তু তিন ঘণ্টা লাগে ফিরে আসতে। সারা পথ সেই পাহাড়ের অপরূপ বিরাট নীল মূর্ত্তি চোখে ভাসতে লাগল। লুসার্ণের হোটেলে যখন



রোন্ গ্লেশিয়ারের সুড়ঙ্গ

ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মনে হ'তে লাগল পাহাড়ের সেই শুভ্র চূড়ায় এখন আর দীপ্তি নেই। এতক্ষণে সে নীলনয়না সুন্দরীর বিষাদভরা চোখের দৃষ্টির মত ম্লান হয়ে এসেছে নিশ্চয়। সেখানে যারা ঘরবাড়ি ক'রে আছে, তারা কি সেই বিরাট রূপের নব নব সৌন্দর্য্য প্রতিদিন মন দিয়ে দেখে? কে জানে?



ইরা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ব্রজেনের বাড়ির চারতালার ছাদে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের আড্ডা বসত। রাধাকান্ত তার নাম দিয়েছিল 'রুফ-গার্ডেন ক্লাব।' জার্মানী থেকে ফিরে এসে ব্রজেন যখন তার পুরাতন বাড়ির ছাদে কাচের ঘর তৈরি করতে সুরু করলে, আমরা ভাবলাম কোন নূতন ধরণের ল্যাবরেটারী হচ্ছে বুঝি, কারণ ব্রজেন বার্লিন থেকে কেমিষ্ট্রির ডক্টরেট নিয়ে এসেছিল। কিন্তু একদিন এক নিমন্ত্রণপত্র এসে হাজির, ব্রজেনের বিবাহের নয়, রুফ-গার্ডেন ক্লাবের উদ্বোধন-উৎসবের নিমন্ত্রণ। গিয়ে দেখি, যে শেওলাধরা ছাদে মাদুর বিছিয়ে গ্রীষ্মের গভীর রাত পর্য্যন্ত ব্রজেনের সঙ্গে কত গল্প কত তর্ক করেছি সেখানে এক রুফ্-গার্ডেন! ছাদের পূর্ব্বদিক্‌টা হয়েছে এক সুন্দর ঘর, পুবে ও দক্ষিণে কাচের দরজা জানলা, পশ্চিমদিকে সিঁড়ির ঘরের দেওয়ালটা পাওয়া গেছে, আর উত্তরে চারফুট দেওয়ালের ওপর রঙীন কাচের সার্সি, ওপরে কাল স্লেটের ঢালু ছাদের তলায় হাল্কানীল রঙের ক্যানভাসের সিলিং। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু হরিদাসেরই এই কীর্ত্তি।

ছাদের পশ্চিমাংশে লম্বা লম্বা বড় কাঠের বাক্সে মাটি ভরে নানা ফুলের গাছ—লিলি, আমরন্‌থাস্, প্যান্সি, রজনী বেশীর ভাগই বিদেশী ফুল।

ঘরটির মেজে হয়েছে সবুজ পেটেন্ট ষ্টোণের। আসবাবের মধ্যে রয়েছে নানা ধরণের ছোট-বড় চেয়ার—বেতের চেয়ার, স্প্রিং-ওয়ালা গদিমোড়া চেয়ার, ইজিচেয়ার, chaise-lounge সোফা চারিদিকে ছড়ান, তাদের পাশে নীচু ছোট টেবিল, হলদে নীল নানা রঙের কাচ ও পাথর বসান। দেওয়ালে কয়েকখানা ছবিও ঝোলানো হয়েছে, ইয়োরোপের উগ্র আধুনিক আর্ট।

সুপ্রিয় বললে,—ইয়োরোপে পুরুষদের ক্লাব আছে শুনেছি, স্ত্রী-শাসিত গৃহ হ'তে বিবাহিত লোকেরা সেখানে গিয়ে সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়তে পারে, ব্রজেন অবিবাহিত হয়েও আমাদের ব্যথা বুঝেছে, তার জন্যে তাকে অশেষ ধন্যবাদ।

সুপ্রিয়ের একটু আঁক্‌বার সখ ছিল, কিন্তু ভাল আঁকতে পারত না, তার স্ত্রী ছিলেন তার ছবির সবচেয়ে নিরপেক্ষ সমালোচক, সেজন্য ঘরে বসে আঁকা সুবিধা হত না, এখন এ রুফ-গার্ডেনে নিরিবিলি বসে আঁকবার সুযোগ হবে ভেবে সে খুশী হ'ল। বিবাহিত ও অবিবাহিত, সদ্য প্রতীচীপ্রত্যাগত ও আশু ইয়োরোপ দর্শনাভিলাষী আমাদের কয়েকজনের প্রতি-সন্ধ্যার আড্ডা হয়ে উঠল সেই রুফ-গার্ডেন—চা-তে কফিতে সিগার-সিগারেটের ধোঁয়ায় তর্কে গল্পে হাস্যে সন্ধ্যাটা জমত ভাল।

সে সন্ধ্যায় আকাশ অন্ধকার করে বিষ্টি এল। হরিদাসের ধারণা ছিল সে ভাল গান গায়; তার গলা মন্দ নয়, তবে চর্চ্চার অভাবে ও রাজমিস্ত্রী মজুরদের সঙ্গে বকাবকি করে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য সুবিধা পেলেই সে মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে উঠত। একটা হারমোনিয়ম আন্‌বার কথাও তুলেছিল, কিন্তু আমাদের ঘোর আপত্তিতে আনা হ'ল না, মাঝে মাঝে তার হুঙ্কার সহ্য করা যেতে পারে, কিন্তু রুফ-গার্ডেনে হারমোনিয়মের বাদ্য অসহ্য হবে।

বিষ্টি এল দেখে হরিদাস তার গলা সাধার এক সুযোগ এসেছে বুঝলে, সে সোফা থেকে চেঁচিয়ে উঠল,—'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর—'

সুহৃৎ ছিল এক কোণে এক বড় গদিওয়ালা চেয়ারের মধ্যে। হরিদাস গান আরম্ভ করতেই সে লাফিয়ে উঠে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচাল,—চুপ রহো! তার গলার অস্বাভাবিক আবেগে আমরা সবাই চমকে উঠলাম, তার মত ধীর শান্ত মানুষ হঠাৎ এমন রূঢ় হয়ে উঠল কেন?

হরিদাস থেমে গেল, অবাক্ হয়ে চাইলে।

সুহৃৎ একটু লজ্জিত হয়ে ধীরে বল্‌লে,—হরিদাস, তুমি বর্ষার অন্য যে-কোন গান গাইতে পার, কিন্তু ও গানটা গেয়ো না, ও গান শুনলে আমার—

আর সে বলতে পারলে না, চুপ ক'রে চেয়ারে বসে পড়ল। তার মুখ শুক্‌নো, হাত কাঁপছে।

আমি বল্‌লাম,—কি? কোন স্মৃতি বুঝি ও গানের সঙ্গে জড়ান। তার মুখের ভাব দেখে হরিদাস বল্‌লে,—আমি জানতুম না, আমায় ক্ষমা কর, আর গাইব না।

সুপ্রিয় বলে উঠল,—পেছনে একটা ইতিহাস আছে নিশ্চয়, গল্পটা শুন্‌তে পারি কি? বল, সন্ধ্যাটা জমবে ভাল। সুহৃৎ ম্লান হেসে বললে,—কফি আন্‌তে বল দেখি।

কফি পানের পর আমরা সবাই সুহৃৎকে ঘিরে বসলুম। সে তার সিগারটা ছাই-দানিতে ঠেকিয়ে রেখে বলতে আরম্ভ করলে,—

—বড়দিনের ছুটিতে ট্রেনে দিল্লী যাচ্ছিলাম। পাটনা পার হতেই সকাল থেকে বিষ্টি সুরু হ'ল। পশ্চিমের দিকে বেশ শীত পাবে আশা করেছিলুম বিষ্টি পাব ভাবিনি। অষ্ট্রিয়া থেকে দেশে ফিরে বাংলার বাইরে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা ক'রে উঠতে পারিনি, সেজন্য কন্‌সেসন্ আরম্ভ হ'তেই কলিকাতা থেকে বার হয়েছিলাম প্রফুল্লচিত্তে, বহুদিন পরে দিল্লীর আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে মনে ভেবে। কিন্তু পথের বৃষ্টিভেজা দিনের কালো রূপের দিকে চেয়ে মন ভারী হয়ে গেল। আকাশের এমন বিচ্ছিরি কালো রং শীতের লণ্ডনের আকাশে কোন কোন দিন দেখেছি, তা'ছাড়া আর কোথাও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না; এ যেন চঞ্চলগতি ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী জমে জমে স্তরের পর স্তর ঘন অন্ধকার সৃষ্টি করেছে, ক্ষুদ্র নত আকাশ ছড়িয়ে দিকচক্রবাল জুড়ে সে অন্ধকার এক ঘেরাটোপের মত পথঘাট মাঠ বন ঘিরে আছে; প্রান্তর-ভরা খোক্‌কো হাওয়ার মধ্য দিয়ে হা হা শব্দে ট্রেন যতই অগ্রসর হতে লাগল ততই মনে হ'ল, অন্ধকারের এ সঘন আবরণ ধীরে ধীরে কাছে আরও কাছে এগিয়ে এসে চলন্ত ট্রেনকে চেপে জড়িয়ে ধরবে; তারপর ইঞ্জিনের শ্বাসরোধ হয়ে যাবে, এক আশাহীন অন্ধ অন্ধকারের গর্ভে দিশাহারা হয়ে আমরা হাহাকার করব, কিন্তু বাতাসের হতাশ্বাসে আমাদের আর্ত্তনাদ আমরা পরস্পরেও শুন্‌তে পাব না।

সারাদিন সারাপথ সেজন্য আকাশের দিকে চাইনি, একখানা ইতালীয়ান নভেলে মুখ গুঁজে পড়ে ছিলাম। মাঝে মাঝে বিষ্টির ঝাপটা জানলার কাঠের উপর করাঘাত করেছিল অভিমানিনী নারীর মত।

এলাহাবাদের কাছাকাছি আস্‌তে বিকেল হয়ে এল, মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল, ভুষাকালিদিয়ে লেপা শীত-সন্ধ্যার আকাশ বড় করুণ মনে হ'ল; মনে হ'ল, কোন বিরহিণী প্রতীক্ষিত প্রিয়ের পথের দিকে চেয়ে ক্লান্ত বিনিদ্র নয়নে রাতের পর রাত যে-সব প্রদীপের পর প্রদীপ জালিয়েছে তাদের শিখা হতে কাজললতার জমান ভুষা এ আকাশভরা অন্ধকারে ছড়িয়ে গেছে; মিলনের লগ্নে নয়নের কোণে যে কাজল জল-জল করত, তা আজ শূন্য আকাশের সজলতায় মিশিয়ে গেছে।

ট্রেন এলাহাবাদ ষ্টেশনে ঢুকতেই বুকের রক্ত দুলে উঠল। তাই ত! আশ্চর্য্য! মনেই হয় নি! ইরার কথা মনেই পড়েনি।

ইরা ও এলাহাবাদ আমার অন্তরে এক তারে বাঁধা। ট্রেনে এলাহাবাদ পার হয়ে গেছি অথচ নেমে ইরার সঙ্গে দেখা করে যাইনি, জীবনে এমন কখনও ঘটেনি।

কুলিকে ডেকে বেডিং সুটকেশ নামিয়ে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। তাড়াতাড়ি একটা টাঙাতে গিয়ে উঠে বস্‌লাম। মনে পড়ল, যতবার এলাহাবাদ ষ্টেশনে নেমেছি, ইরা নিজে ষ্টেশনে এসে আমাকে নিয়ে গেছে তাদের মোটরে। টাঙা ছোটাতে বলে দিলাম। বিষ্টি থেমেছে, কিন্তু ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস বইছে, ওভারকোটের বোতামগুলো এঁটে দিয়ে আকাশের দিকে চাইলাম, আকাশ একটু পরিষ্কার হয়ে আসছে, ভারী

কালো ক্যানভাসের মত যে অন্ধকারের আবরণ পৃথিবীর ওপর চেপে ছিল তা ধীরে ধীরে উপরে উঠছে।

ইরাদের বাড়িটা ছিল শহর ছাড়িয়ে, শহর থেকে বহুদূরে নদীর ধারে। তার ঠাকুরদা ছিলেন এলাহাবাদের এক নাম-করা উকিল, শেষজীবনে তিনি ওকালতি ছেড়ে সন্ন্যাসী নিয়ে থাকতেন, শহরের মধ্যে পুরাতন আমলের বাড়িতে থাকিতেন না, নদীর তীরে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে নির্জ্জনে বাংলো ধরণের বাড়ি করে ছিলেন। সে-বাড়ির নাম এলাহাবাদের সব টাঙ্গাওয়ালাদের জানা, সুতরাং পথনির্দ্দেশ করতে হ'ল না। স্তম্ভিত আকাশের তলে ভিজেমাটির গন্ধভরা পথের দুধারে গাছপালার সজল সবুজের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম—কতদিন পরে আবার ইরাকে দেখব—আট বছর পরে! ইয়োরোপে যাবার সময় বোম্বাই যাবার পথে এলাহাবাদে একদিন থেমেছিলাম, তার পর সাত বছর অজ্ঞাতে কেটেছে, দেশে ফিরে ইরার কোন খোঁজ নেওয়া হয়নি, কলকাতায় পৌঁছে ইরার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম বটে, অভিমানের চিঠি—কেন কলম্বো দিয়ে এলে? বোম্বাই দিয়ে এলে আমরা বুঝি পথে খেয়ে ফেলতাম,—আচ্ছা, এলাহাবাদে নাই-বা নাম্‌তে, ছিয়োকিতে গিয়ে দেখা করে আসতে পারতাম ত। কবে আসছ এলাহাবাদে?

সে চিঠির জবাব বোধ হয় দেওয়া হয়নি, সেও আর কোন চিঠি দেয় নি। চিঠি লেখা সম্বন্ধে সে আমার চেয়েও কুঁড়ে। মাঝে মাঝে তার চিঠি পেতাম ভিয়েনাতে, চির-প্রতীক্ষিত তার পত্র সহসা একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে আসত, শীতের দিনে হঠাৎ বসন্তের বাতাসের মত, অসময়ে আমার অন্তরে উৎসব সুরু হত।

ভাবতে লাগলাম, আট বছর পরে ইরা কেমন দেখতে হয়েছে? তার একটি ফটো কতবার চেয়ে পাঠিয়েছি, কিছুতেই পাঠায় নি। একটু বয়স হলেই বাঙালী মেয়েদের ফটো তোলায় সঙ্কোচবোধ কেন এত বেশী হয় বুঝি না। তারা বোঝে না, লোকে প্রিয়জনের ফটো চায় সুন্দর বলে নয়, স্মৃতি বলেও নয়, প্রেমের প্রতীক বলে চায়, সে ছবি কল্পনাকে উদ্দীপিত করে।

তা ইরা যতই বদ্‌লাক, দেখলেই তাকে চিনতে পারব। আমাকে হঠাৎ দেখে সে কি অবাক্‌ হয়ে যাবে!

ভাবতে ভাবতে খেয়াল হয় নি, গাড়ীটা কখন শহর ছাড়িয়ে ক্রমান্ধকারাচ্ছন্ন শূন্য মাঠের মধ্যে নির্জ্জন পথ দিয়ে চলেছে, পশ্চিমের মেঘস্তূপের ওপর একটু সোনালী আলো ঝিকমিক করছে।

সহসা সামনে এক প্রকাণ্ড গাছ সমস্ত পথ জুড়ে দাঁড়াল—গাছ নয়, গাছের কঙ্কাল—তার মোটা লম্বা গুঁড়ি হতে পত্রহীন বিবর্ণ শীর্ণ শাখাপ্রশাখার জাল ধূসর আকাশের পট জুড়ে নাগনাগিনীর মত দিগদিগন্তে প্রসারিত, পেছনে হাল্কা কালো মেঘে সন্ধ্যার রঙীন আভা ক্ষীণ রক্তের স্রোতের মত টানা।

চমকে উঠলাম। সেই সময়ে গাড়ী থামল। গাড়োয়ান জানালে গাড়ী বাড়িতে হাজির হয়েছে। বজ্রদীর্ণ বৃহৎ বৃক্ষটির পাশে কালো বাড়ি চোখেই পড়ে নি, গাছের নীচে তার অস্পষ্ট ছায়া দেখে মনে হ'ল, যেন এক বৃহৎ অক্‌টোপাস্‌ বক্র দীর্ঘ বাহুগুলি মেলে বাড়িটাকে চেপে ধরেছে, তাকে পীড়ন করবে শোষণ করবে!

ইরাদের বাড়িতে আগে যতবার গেছি, সকাল বেলায় পৌঁছেছি। সূর্য্যের আলোভরা প্রভাতে এ বিজন শূন্য প্রান্তর প্রজ্জলিত প্রদীপের মত সুন্দর দেখাত, গাছপালায় নদীজলধারায় আলো ঝিকিমিকি করত। বাড়ির পার্শ্বে এই বহু প্রাচীন বৃক্ষটিকে পূর্ব্বে যতবার দেখেছি তার শাখাপ্রশাখা ঘন সবুজ পাতার ভারে আনত, এক অদ্ভুত রঙের ফুল ফুটত গাছটাতে, বাড়ি ঢোকবার পথের ওপর ছড়িয়ে থাকত। কিন্তু সেই স্তব্ধতাভারাক্রান্ত শীত-সন্ধ্যায় দিগন্তপ্রসারিত শূন্য রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে নিকষমণির পেয়ালার মত আকাশের তলে শীর্ণ-জীর্ণ বৃক্ষবেষ্টিত স্তব্ধ বাড়ীটি শুধু অজানা নয়, রহস্যময় ভীতিপ্রদ বলে মনে হ'ল।

ঠিক সেই সময় পশ্চিমের মেঘস্তূপ ঠেলে সূর্য্যের সপ্তাশ্বচালিত স্বর্ণরথের রক্তিম আভার প্রকাশ হ'ল, তার অগ্নিবর্ণ চক্রের দ্যুতিতে চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বিষ্টি-ভেজা আকাশপ্রান্তর, কালো গাছের ডালের জাল, সবুজ গোলাপ লতা-ছাওয়া বাড়ির প্রবেশদ্বার, টলমল নদী

জলধারা-সব এক অলৌকিক আলোকে ঝিলিমিলি করতে লাগল ; সে আলো মুগ্ধ করে না, বুকের রক্তে দোলা দেয়।

বাড়িখানা মৃতের মত স্তব্ধ, সাড়াহীন। অনেক ডাকাডাকির পর এক পশ্চিমে চাকর বার হয়ে এল, তার জল জলে রাঙা চোখ, লম্বা কালো দাড়ি, মাথার মোটা ঝুঁটি, সন্ধ্যার রঙীন আলো তার ওপর পড়ে তাকে অপার্থিব করে তুলেছে। চাকরটি জানালে যে, সাহেব মেমসাহেব কেউ বাড়িতে নেই, তবে এক ঘণ্টার মধ্যে মেমসাহেব আসবেন আশা করা যায়।

বেডিং সুটকেশ নামাতে বলে টাঙার ভাড়া চুকিয়ে বাড়িতে না ঢুকে বাগানের দিকে গেলাম। ড্রয়িং-রুমের সামনে ফুলের বাগান নদীর তীরে ; ওদিকে নদীতে প্রায়ই চড়া পড়ে থাকত, বালির ওপর বহুদূরে জল ঝিকিমিকি করত।

ফুলের বাগানটি ছিল আমাদের অতি প্রিয় ; কি শরতে কি শীতে যখনই গেছি, দেখেছি, বাগানে ফুলের ঐশ্বর্য্য উপচে পড়ছে,—গোলাপ, ক্রিসেনথিমাম্, ডালিয়া, য়্যাষ্টর, প্যান্সি, কারনেশন, লিলি, আমরনৃথাস্—রঙের ফুলঝুরি ; সকাল বিকাল বেতের চেয়ারে বসে ওখানে আমাদের চায়ের আড্ডা ও গানের সভা হ'ত।

কিন্তু বাগানে ঢুকে চোখে জল এল ; কি উদাস করা তার রূপ! সারাদিন রোদে ঘুরে জলে ভিজে না খেয়ে মা-হারা দস্যি ছেলে যখন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে তার যেমন উষ্কখুস্ক করুণ মূর্ত্তি হয়, এ তেমনি মলিন বেদনায়। কেতকীর ঝাড় ভেঙে পড়েছে, গোলাপের ডাল সব মাটিতে লোটাচ্ছে, করবীর ঝোপ লণ্ডভণ্ড ; যদি কোন ফুল না ফুট্‌ত, সমস্তটা যদি জঙ্গল হয়ে যেত, তাহলে অত খারাপ লাগত না ; কিন্তু সেই অযত্ন-রক্ষিত বাগানে মাঝে মাঝে ফুল ফোটার প্রয়াস বড় করুণ। মনটা খারাপ হয়ে গেল, আর কনকনে শীতের বাতাসে বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে ইচ্ছাও করল না, বারান্দা পার হয়ে ড্রয়িং-রুমে ঢুকলাম।

প্রশস্ত ঘর, সুন্দর সাজান। ঘরের মাঝে রাশিচক্র আঁকা কারুকার্য্যময় পেতলের গোল টেবিলের ওপর এক মোরাদাবাদী ফুলদানিতে মার্সেল নীল ভরা, তার হলদে রং পেতলের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে ; টেবিলের তিন দিক জুড়ে লক্ষ্ণৌ ছিট দিয়ে ডবল স্প্রিঙের গদি-মোড়া সোফা, সেত্তি, চেয়ার সাজান ; চারকোণে পেতলের বড় গামলাতে পাম গাছ। স্কাই-লাইটগুলি দিয়ে ঝরা সন্ধ্যার মলিন আলোতে সব অস্পষ্ট আবছায়া দেখাচ্ছিল ; বলাকার দল আঁকা জামরঙের পর্দাটা সরিয়ে একটা ফ্রেঞ্চ-জানালা খুলে দিলুম ; বাহিরে আকাশ আরও রাঙা হয়ে উঠেছে, ভয়ঙ্কর কালো মেঘপুঞ্জের ফাঁক দিয়ে ঝরা সে আলো, যেন কোন তীরবিদ্ধ কালো পাখীর বুক থেকে রক্ত ঝ'রে পড়ছে। সে অপূর্ব্ব রঙীন আলোয় ঘরটা অবাস্তব হ'য়ে উঠল। চোখে পড়ল, ফায়ার প্লেসের ম্যাণ্টেলপিসের ওপর নটরাজের ব্রঞ্জের মূর্ত্তি, নীল দেওয়ালে যেন কালো কালীতে আঁকা, এই মূর্ত্তিটির সঙ্গে বাড়ির পাশে দিগন্তবিস্তৃত বক্রশীর্ণ শাখাময় গাছটির সাদৃশ্য অনুভব ক'রে চমকে উঠলাম, সে গাছটিও যেন এই মূর্ত্তিটির মত কোন তাণ্ডবনৃত্যে যোগ দিতে চায়!

মূর্ত্তিটির ওপর দেওয়ালে এক বড় ছবি—ভান গকের "সূর্য্যমুখীফুল"—মেহগনির ফ্রেমে বাঁধান, এ ছবিটা আমি পাঠিয়েছিলাম ম্যুনসেন থেকে ইরার বিবাহের উপহার রূপে। রঙীন আলোছায়ায় স্বর্ণপীত-বর্ণের ফুলগুলি আগুনের ফুলকির মত জলজল করে উঠল।

ঘরটি আগেকার মতনই সাজান, তবু সব জিনিষ কেমন অজানা, ঘরে-বাইরে অলৌকিক আলো ; বড় অসোয়াস্তি অনুভব করলাম।

ফায়ার প্লেসের ডানদিকে দরজা, পাশের ঘরে যাবার ; বাঁদিকে রিভলভিং বুক কেস। বুক কেসের ওপর ম্যাগাজিনের গাদা ঘাঁটতে গিয়ে এক ছবির য়্যালবাম হাতে ঠেকল, সেইটা নিয়ে একখানা চেয়ার টেনে বসলাম ফ্রেঞ্চ-জানলার কাছে। স্কাই-লাইটগুলি নিষ্প্রভ হ'য়ে এল, যেন ঘুম-পাওয়া ছেলের ক্লান্ত চাউনি ; সিলিংএর পর খানিকটা দেওয়াল হলদে রঙের তারপর হাল্কা নীল, যেন একটা হলদে পাড়ের নীলশাড়ি বহুদিনের ব্যবহারে মলিন, সন্ধ্যার আলো-ছায়ায় টেবিল-চেয়ার ফুলদানী পিয়ানো সব ঘর করুণ কাতরতায় ভরা।

মন প্রফুল্ল করতে য়্যালবামটা খুললাম, ইরার ফটোর

য়্যালবাম, আমারই তোলা তার নানা বয়সের ফটো। য়্যালবামটা খুলতেই এলাহাবাদের সেই বিজন নদীতীরের রঙীন করুণ সন্ধ্যা মিলিয়ে গেল, আমার প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমস্বপ্নমধুর দিনগুলির ছবি ভেসে উঠল।

তখন ইরা ছিল আমার বোন বিভার সহপাঠিনী বন্ধু, কলেজে একসঙ্গে পড়ত। তার বাবা এলাহাবাদে থাকতেন, সে জন্য মেয়েকে কলিকাতার কলেজের বোর্ডিঙে রাখতে হয়েছিল; কিন্তু ইরা চিরদিন বাড়ীতে মানুষ, বোর্ডিঙে তার মন টিঁকত না, শুধু শনি রবিবার নয়, সব ছোট ছুটিতে আমাদের বাড়ি ছিল তার বন্ধুত্বের আশ্রয়, তার গল্পের আড্ডা, গানের আসর। কলেজ-জীবনে আমি তাদের সিনিয়ার ছিলাম, সেজন্য পড়াশোনা সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে আমার ডাক পড়ত তাদের আড্ডায়; পরামর্শ দেবার পরও থেকে যেতাম; ইরা প্রথম প্রথম একটু সঙ্কোচবোধ করলেও কিছুদিন পরে আমি না হ'লে তাদের আড্ডা জমতই না, গানের আসরে সঙ্গত করবার লোকের অভাব হ'ত।

ধীরে ধীরে ইরাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগ হয়ে গেল; ইরার বাবা মা কলকাতায় এলে আমাদের বাড়িতেই উঠতেন, আর পূজার ছুটিতে প্রতি বছর বিভাকে নিয়ে আমায় এলাহাবাদে ছুটতে হ'ত।

প্রথম যৌবনের হারান দিনগুলি থেকে একটি সুন্দর মধুর ক্ষণ শুভ্র মুক্তার মত স্মৃতি-সমুদ্রের অতলতা হতে উঠে এল।

শরতের এক দুপুরবেলা। পূজার ছুটির ক'দিন বাকী। চারতলার ছাদে সিঁড়ির পাশে আমার পড়বার ছোট ঘরে বসেছিলাম, সামনে কি একটা পরীক্ষা ছিল, বইয়ের রাশি চারদিকে স্তূপীকৃত, পড়ায় মন ছিল না।

সেদিন শরৎ-মধ্যাহ্নের অপরূপ সূর্য্যালোক ছিল শুভ্র অতলতায় বিলীন, সামনে পান্নাসবুজ মাঠের ওপারে সাদা বাড়ির সারির উপর সুবিস্তীর্ণ দিকচক্রবাল শু'য়ে শুভ্র মেঘের পুঞ্জ দেখাচ্ছিল যেন সাগরগামী বলাকার দল সাদা ডানা মুড়ে ঘেঁসাঘেঁসি চুপ ক'রে শুয়ে আছে; অন্তরে কোন চঞ্চলতা ছিল না, শুধু ইচ্ছা হচ্ছিল ওই মেঘস্তূপের মত আকাশের সুনীল শয্যায় শুয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের রৌদ্রপানপুষ্ট দ্রাক্ষাগুচ্ছের রসধারাময় সোনালী মদিরার মত শরতের আলোকধারা পান করি উপছে-পড়া ইন্দ্রনীল পেয়ালা থেকে।

ইজিচেয়ারে ব'সে দিবাস্বপ্নের জাল বুনছিলাম। কার ডাকে চমকে উঠলাম! চেয়ে দেখি দরজার সামনে ইরা! ইরা বিভাকে খুঁজতে ছাদে এসেছে। বললাম, এস, কি সুন্দর নীল আকাশ দেখ! বললে,—না, তোমার পড়ার ক্ষতি হবে। বললাম,—মোটেই না, তুমি একটু গল্প করে গেলে তারপর পড়ায় মন বসতে পারে, কিন্তু এমনি যদি চলে যাও, তারপর পড়াশোনা অসম্ভব হবে। মৃদু হেসে সে ঘরে ঢুকল। ইজিচেয়ারে তাকে বসিয়ে তার পাশে বেতের চেয়ারে বসলাম।

কি গল্প হয়েছিল মনে নেই, অতি তুচ্ছ সামান্য কথাই হবে, জলবিম্বের মত অলীক। সেদিন ইরাকে বড় সুন্দর দেখেছিলাম—পিচফল রঙের শাড়ীর সবুজ পাড় কালো চুলের ওপর, হাতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ির ঝিকিমিকি, হরিণের মত কালো দুই চোখে স্বপ্নলোকের আভা,—সে শরতের মধ্যদিনে নির্জ্জন ছাদের কোণে আমার গ্রন্থবিকীর্ণ ছোট ঘরের মধ্যে ইজিচেয়ারে হেলিয়ে-বসা শ্যামলী কিশোরীর মুখে যে অপরূপ সৌন্দর্য্যালোক দেখেছিলাম, সে সৌন্দর্য্য জীবনে আর কখনও দেখব না! গল্পে গানে হাসিতে বিষ্টিতে ভরা সেই দুপুরবেলার তুলনা কোথায়!

এক পশলা বিষ্টি এল, বিষ্টির ছাট ঘরে আসতে লাগল, আমাদের চোখেমুখে। বললাম,—ইরা, একটা বর্ষার গান গাও।

হেসে বললে—কি বল, এ শরতের ক্ষণিক ধারার সঙ্গে কি বর্ষার গান গাওয়া যায়, গান আরম্ভ করতে করতেই যে বর্ষণ শেষ হবে। বললাম, বড় ইচ্ছে করছে একটা গান শুনতে। রহস্যময় চোখে একটু হেসে উঠল, বড় সুন্দর ছিল তার হাসি, গাল দুটি একটু রাঙা হয়ে ফুলে উঠত, দু-চোখের তটে কিসের কাঁপন লাগত।

বললে—একটা নতুন গান শিখছি, শোন, কিন্তু আস্তে আস্তে গাইব।

ঝিরিঝিরি বাদলধারার সঙ্গে সে মৃদুস্বরে গাইতে আরম্ভ করলে—'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর!' যখন গান থামল বিষ্টি থেমে গেছে, কৃষ্ণচূড়া ও নারিকেল গাছের পাতাগুলি ঝিকিমিকি করছে, কিন্তু আমার মনে যে মাদল বাজতে সুরু হয়েছিল তা আর থামতে চাইল না। ধীরে ইরার হাতখানি নিজের হাতে টেনে নিলাম, বারিস্নাত আকাশের আলোর মায়ার দিকে চেয়ে সে হাত ধ'রে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, যখন খেয়াল হ'ল দেখি ইরা উঠে চলে গেছে।

সেই ইরাকে এতদিন পরে আবার কি রূপে দেখব! য়্যালবামটা মুড়ে চারদিকে চাইতে চমকে উঠলাম। আমি যখন এক শরৎ-মধ্যাহ্নের সুমধুর স্মৃতির স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম, ধীরে ধীরে সন্ধ্যার রঙীন মায়া মিলিয়ে গেছে, রাত্রির নিবিড় তিমিরে ঘরবাড়ি পথ মাঠ নদী আকাশ ঘন আচ্ছন্ন; আকাশে একটি তারাও নেই, ঘরে টেবিল চেয়ার ছবি ফুলদানি সব অন্ধকারে একাকার।

মনে হল, বহুক্ষণ ঘরে ব'সে আছি! গভীর রাত হয়ে গেছে! কিন্তু কই, ইরা এল না! চাকরটা কোথায়? একটু ভয় করে উঠল, বড় 'আন্‌ক্যানি'!

দাঁড়িয়ে উঠে চাকরটাকে একটা হাঁক দেব ভাবছি, একটা জোলো ঝোড়ো বাতাসে ফ্রেঞ্চ-জানলার কাচগুলি ঝনঝন করে উঠল, পর্দাগুলো দুলিয়ে এক সুদীর্ঘনিশ্বাস ঘরের অন্ধকার গুলিয়ে দিলে। তারপর সব নীরব; কি গভীর স্তব্ধতা! কালো পাথরের মত সে স্তব্ধতা পৃথিবীর বুকে চেপে, ঘরের অন্ধকারে সে স্তব্ধতা ঘনীভূত কালো সিসের মত। দাঁড়াতে গিয়ে পা কেঁপে উঠল; চেঁচাতে গিয়ে গলার স্বর বার হ'ল না।

অন্ধকার যেমন শব্দহীন তেমনি সঘন; নিজের হাতও দেখা গেল না; কোথাও একটু আলো নেই? প্রদীপের একটু স্তিমিত শিখা? চোখ দু'টো জলতে লাগল। পকেটে দেশলাইও নেই, আলোর সুইচটাই বা কোথায়! কিন্তু সেই রুদ্ধ স্তব্ধতায় একটু নড়তে, উঠতে, শব্দ করতে ভয় হ'ল।

চোখ বুজতে চাইলুম, পারলাম না; সে মহানীরব তিমিরপুঞ্জ আমাকে যাদু করলে, তৃষিত চোখে চেয়ে রইলুম কি দেখবার আশায়!

মনে হ'ল, ফায়ার প্লেসের ডানদিকের দরজাটা কে খুললে; দরজা খোলা কি বন্ধ অন্ধকারে তা কিছুই দেখা যায় না; বাইরের রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে ঘরের অন্ধকার এক হয়ে গেছে; তবু মনে হ'ল, কে দরজা খুলে; শব্দ একটু হ'ল না, নিস্তব্ধতা তেমনি ভয়ঙ্কর; তবু মনে হ'ল, দরজা খুলে কে দরজার পাশে চেয়ারে বসলে; যে বসলে তাকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব, নিরন্ধ্র অন্ধকারের পটে আরও নিবিড়তম ঘনীভূত ছায়া; তবু মনে হ'ল, পিচফল রঙের শাড়ীর সবুজ পাড় কালোর ওপর; সে অন্ধকারে রক্তিম পীত সবুজ নীল সব একাকার; তবু মনে হ'ল, সবুজ পাড়ের পিচফল রঙের শাড়ী অন্ধকারে রঙীন কুয়াটিকার মত।

তারপর যা ঘটল তা ভাষায় বোঝান অসম্ভব। বড় বিচিত্র, ভাষাতীত সে অনুভূতি।

দেখলাম বললে ভুল হবে; সে অন্ধকারে কিছু দেখা সম্ভবপর ছিল না; কিন্তু আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করলাম, আমার চৈতন্য দিয়ে; যে মূর্তিটি দরজার পাশে চেয়ারে বসেছিল, সে ধীরে উঠল, আমার দিকে করুণ নয়নে চাইলে, আবার দরজা দিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করলে, তারপর সে অন্ধকারে একা ঘরে বসে গান গেয়ে উঠল!

'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!'

সে গানের সুর যন্ত্রের না মানবকণ্ঠের, ভৌতিক না স্বাভাবিক তা বিচার করবার বুদ্ধি তখন লুপ্ত, সময়ের গতির উপলব্ধি ছিল না।

অনুভব করলাম, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কালের ধারা এক সঙ্গমে মিশে এক স্রোতে প্রবাহিত; সেই সম্মিলিত প্রবাহের সঙ্গে এই ঘরবাড়িভরা পৃথিবীব্যাপী গভীর স্তব্ধ অন্ধকার আমার চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে;

সুর জেগে উঠছে সে আবর্তনে! এ সুর তিমিরময় স্তব্ধতার সৃষ্টি, তারই আলোড়নে উৎসারিত। এ শব্দকে স্তব্ধতা চায় না, এ ধ্বনিকে নীরব করতে চায়। কিন্তু নবজাত সুরধ্বনি আপন আনন্দে অন্ধ তমিস্রময় নিস্তব্ধতার কঠিন শিলাকে খান্ খান্ করে ভাঙ্তে চায়।

শব্দের সঙ্গে নিস্তব্ধতার দ্বন্দ্ব চলেছে; তাই, কখনও গানের সুর ক্রুদ্ধ, কর্কশ, লড়াই করছে; কখনও সে সুর করুণ, অশ্রুজলসিক্ত, অন্ধ নীরবতা ভেদ করে একটি শব্দের কমল ফোটাবার বেদনায় আতুর।

শেষে নিঃশব্দতার জয় হ'ল। গান শেষ না হয়ে সহসা থেমে গেল। মহানীরবতা এ অশান্ত সুরধ্বনিকে আপনার মধ্যে সংহৃত বিলীন করে নিলে, সমুদ্র যেমন আপন বক্ষের চঞ্চল তরঙ্গকে আবার আপনার অতলতায় শান্ত করে।

তারপর, সে সঘন অন্ধকারে কি ভয়াবহ নিস্তব্ধতা! যেন প্রলয়শেষে মহানিশার মহাভয়ঙ্কর নিশ্চল চির প্রশান্তি!

এতক্ষণে ভয় পেলাম। সে নীরবতায় গা সির্ সির্ ক'রে উঠ্ল! ভৌতিক! কথাটা মনে হতেই হাত-পা কাঁপতে লাগল। যতক্ষণ গানের শব্দ ছিল, যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ছিলাম, অন্ধকার ছিল ঐন্দ্রজালিক সুরে ভরা। কিন্তু গান থাম্তেই চেতনায় সহজবুদ্ধি ফিরে এল। সে বুদ্ধি বললে, গানটা ভৌতিক!

বেশ অনুভব করলাম, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, দেহের রক্ত চলাচল ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর; এ নিস্তব্ধতায় শুধু একমাত্র শব্দ হচ্ছে আমার বক্ষের স্পন্দনধ্বনি, সে ধ্বনি এ নীরবতায় ছন্দ-হারা; বুকের এ ধুক্‌ধুকানির শব্দ মৃদু হতে মৃদুতর হচ্ছে, ধীরে ধীরে এ মহানিঃশব্দতায় বিলীন হয়ে যাবে, গানের সুর যেমন নীরব হয়ে গেল।

শব্দ, একটু শব্দ না হলে আমি মরে যাব!

ঠিক সেই সময় ঝড় উঠল; নদী পার হয়ে বাড়ি কাঁপিয়ে দরজা জানলা দুলিয়ে ঝোড়ো হাওয়া হা হা শব্দে মাতালের মত ঘরে ছুটে এল, তান্ পড়ের ছবিটা ঝন্‌ঝন্ ক'রে পড়ে গেল, তারপর এক প্রচণ্ড শব্দ শুনে আমি লাফিয়ে উঠলাম মনে হ'ল মত্ত ঝঞ্ঝা এক প্রকাণ্ড বনকে নির্মূল করে তুলে, গাছপালাগুলিকে তাণ্ডবনৃত্যে নাচাতে নাচাতে নিরুদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছে!

আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, ঠিক সেই সময় সে ঝড় যদি না উঠ্‌ত, সে গাছভাঙার ভয়ঙ্কর শব্দ যদি না আস্‌ত তাহলে আমি তিমিরময় মহানীরবতার ভারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তাম, হয়ত বুকের স্পন্দনধ্বনিও নীরব হত।

ঝড়ের বাতাসের সঙ্গে আমি নেচে উঠলাম, মরিয়া হয়ে বারান্দায় ছুটে বার হয়ে গেলাম, দেহের রক্তস্রোত আবার দ্রুত তালে নাচতে লাগল ঝড়ের মত্ত নৃত্যের ছন্দে। চীৎকার করে উঠলাম, আছি, আমি আছি! ঝড় তার প্রত্যুত্তরে হাঃ হাঃ ক'রে অট্টহাস্য ক'রে উঠল। হাত ছুঁড়ে চীৎকার ক'রে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলাম পাগলের মত,—নিজেকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ঝড়ের বাতাসে বারান্দায় মাঠে কতক্ষণ দাপাদাপি করেছিলাম জানি না, একটা মোটরের হর্ণ শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। চিরপরিচিত সে শব্দ কি মধুর লাগল!

মোটরের তীব্র আলো বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে এল! আলো! আলো! জয়, তিমিরবিদারক আলোর জয়! আলো দেখে এত আশা এত আনন্দ হ'তে পারে জীবনে কখনও অনুভব করিনি। অধীর হয়ে মোটরকারের হেড-লাইটের দিকে ছুটে গেলাম। রাতের অজানা ভৌতিক পৃথিবী দুঃস্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল।

গল্পটা এইখানে শেষ করা যায়; কিন্তু আমি ভূতে বিশ্বাস করি না, আর তা নিয়ে নিষ্ফল তর্ক তোমাদের সঙ্গে কর্‌তে চাই না, সেজন্য বাকিটুকু বল্‌তে হচ্ছে।

ড্রাইভার আমার পাশ কাটিয়ে বাগানের দক্ষিণে সদর বারান্দার সামনে গাড়ী থামালে। কালো দাড়িওয়ালা চাকরটা কোথায় ছিল, সে তাড়াতাড়ি বারান্দার ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে মোটরকারের দরজা খুলে বল্‌লে,—এক সা'ব আয়া!

গাড়ী থেকে এক তরুণী নাম্‌ল; মনে হ'ল তাকে

চিনলাম, ইরা! আট বছর আগে ইরাকে যেমন দেখেছি, ঠিক তেমনি আছে!

মেয়েটি গাড়ী থেকে নেমে চাকরকে বললে, কে?

ইরার গলার স্বর একটু বদলেছে। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম,—আমি! চিনতে পাচ্ছ? কেমন আছ ইরা? বিস্মিত হয়ে সে আমার মুখের দিকে তাকালে, তারপর ম্লান হেসে বললে,—ও আপনি! আপনি সুহৃৎ-দা! আমি রেবা!

—রেবা! কত বড় হয়েছ! ঠিক তোমার দিদির মত দেখতে হয়েছ! দিদি কোথায়?

—দিদি! দিদি! তার মুখ ছলছল ক'রে উঠল।

—কি? রেবা!

—দিদি! দিদি নেই, ছ'মাস হ'ল চ'লে গেছেন। আপনি দেশে ফিরেছেন শুনেছিলাম, কিন্তু আপনার ঠিকানা কারুর কাছ থেকে জানতে পারলাম না, একটু খবর দিতে পারিনি।

—ও!

—আসুন!

—না, আর বসব না, আমি যাই, রাতের ট্রেনেই দিল্লী যেতে হবে।

সে কি বলতে যাচ্ছিল, আমার মুখ দেখে ভয় পেলে।

একটু পরে বললে,—আজই রাতে যেতে হবে! আচ্ছা চলুন, আপনাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দাড়িওয়ালা চাকরটা মোটরে স্যুটকেস বেডিং তুলে দিয়ে সেলাম করলে। এতক্ষণ সে ছিল কোথায়!

বাড়ি ছেড়ে মোটরকারে বার হলাম। বিষ্টি আরম্ভ হ'ল; ঝোড়ো হাওয়া নদীর এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত মর্ম্মভেদী হাহাকারে আর্ত্তনাদ করছে। পেছন ফিরে চাইতে জনশূন্য তৃণশূন্য প্রান্তরের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত বিদীর্ণ ক'রে বিদ্যুৎ চমকে উঠল; তার তীব্র চঞ্চল আলোয় দেখলাম, বাড়ির ওপর সেই শীর্ণ রুক্ষ বৃহৎ বৃক্ষটি নেই, ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। বুঝলাম, তারই ভেঙে পড়ার শব্দে আমি ঘরের নীরব অন্ধকারে চমকে জাগিয়ে উঠেছিলাম, প্রাণ পেয়েছিলাম। শুধু সে গাছের কয়েকটি শুকনো ডাল বাড়ির পাশে ঝড়ের বাতাসে বড় করুণভাবে দুলছে, যেন কোন রোগিণীর অস্থিসার দীর্ঘ আঙুলগুলি নড়ে নড়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অন্ধকারে আকাশে হাতড়ে হাতড়ে যাকে খুঁজছে তাকে পাচ্ছে না।

সেদিকে আর চাইতে পারলাম না, দু'চোখে জল ভরে এল, সামনে গর্জ্জমান অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম। রেবাও চুপ করে আমার গা ঘেঁসে বসে রইল। সারা পথ কোন কথা হ'ল না।

ষ্টেশনে আমাকে নামিয়ে রেবা বললে,—দিল্লী হতে ফেরবার পথে নামা চাই কিন্তু।

—যদি সময় পাই।

—না, কোন ওজর শুনব না; এবার এলেন, একটু বসলেনও না। চাকরটা ড্রয়িংরুম খুলে দিয়েছিল?

—হাঁ,

—আলো জেলে দিয়েছিল? জানেন ওটা গাঁজা না আফিম কি খায় সন্ধ্যেবেলা।

—তা ছাড়িয়ে দাও না কেন?

—ছেড়ে গেলে ত! ছাড়াতেও পারি না। ও দিদির বড় প্রিয় ছিল; দিদিকে বড় ভালবাসত; দিদি মারা যাবার পর ও সারারাত ভূতের মত সারাবাড়ি ঘুরত। আচ্ছা, ওকে দেখে মনে হয় ও গানের কিছু বোঝে?

—কেন বল ত?

—জানেন, দিদির গানের ও এক মস্ত সমজদার। গত বছর দিদি কয়েকটা গান রেকর্ডে দিয়েছিলেন।

—শুনিনি।

—গ্রামোফনটা ওর জালায় রাখা দায়, যখনই সুবিধে পায়, ও দিদির গানের রেকর্ড বাজায়, কিছু বলাও যায় না, বকলে ফ্যালফ্যাল করে এমন চেয়ে থাকে।

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। দিল্লী থেকে ফেরবার পথে এলাহাবাদে নিশ্চয় নামব, কথা দিয়ে রেবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

হলদীঘাটের যুদ্ধ ও মহারাণা প্রতাপের শেষজীবন

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, পি-এইচ-ডি

মহারাণা প্রতাপের রাজত্বের (১৫৭২—১৫৯৭ খৃঃ) ইতিহাস মোগল-সাম্রাজ্যের সহিত তাঁহার অবিরত সংগ্রামের সুদীর্ঘ কাহিনী। রাজ্যারোহণের পর মহারাণার পক্ষে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থা ও শক্তিসঞ্চয়ের জন্য অবকাশ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল; সম্রাট আকবরও এই সময়ে সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট জয়ে ব্যস্ত থাকায় উভয় পক্ষই সহসা যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিলেন। বিনাযুদ্ধে মহারাণাকে বশীভূত করিবার জন্য আকবর চেষ্টার কিছু ত্রুটি করেন নাই। এই জন্যই তাঁহার আদেশে কুমার মানসিংহ এবং রাজা ভগবানদাস রাণাকে বুঝাইবার জন্য বন্ধুভাবে উদয়পুর গিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপের বীরত্ব নীতিবর্জ্জিত ছিল না। তিনি মানসিংহ এবং রাজা ভগবানদাসকে নানা রকমে আপ্যায়িত করিয়া স্তোক-বাক্য ও ছলনা দ্বারা মোগল-সম্রাটকে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ভুলাইয়া রাখিলেন। 'আকবরনামা'-পাঠে মনে হয় প্রতাপ যেন 'যাই যাই' করিয়া মোগল-দরবারে যান নাই; অথচ তিনি ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাতে প্রতাপের পক্ষে অগৌরবের কিছুই নাই।—ইহাই রাজনীতি।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট্ আকবর মানসিংহের অধ্যক্ষতায় পাঁচ হাজার সৈন্য রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন; তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন মীরবক্শী আসফ খাঁ। সম্রাট্ আকবরের মনের ভাব যাহাই হউক মোল্লারা এই অভিযানকে 'জেহাদ' বা ধর্ম্মযুদ্ধ বিবেচনা করিয়া ইহাতে শরিক হওয়ার জন্য অস্থির হইলেন। ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী দরবার হইতে কয়েক মাসের ছুটির জন্য নকীব খাঁকে সম্রাটের কাছে সুপারিশ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নকীব খাঁ গোঁড়ামিতে মোল্লা সাহেবের উপর আরও এক কাঠি। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন,—এ লড়াইয়ের সর্দ্দার যদি কাফের না হইয়া একজন মুসলমান হইতেন তাহা হইলে আমিই সর্ব্বপ্রথমে ইহাতে শরিক হইতাম। মোল্লা বদায়ুনী তাঁহাকে বুঝাইলেন—তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু ও মহৎ; সর্দ্দার হিন্দু হইলেও বাদশার নিমক্‌খোর গোলাম। সম্রাটের অনুমতি পাইয়া মোল্লা বদায়ুনী মহা উল্লাসে কাফের জয় করিবার জন্য আরও কয়েকজন 'একদিল' বন্ধুর সহিত মানসিংহের সেনায় যোগ দিলেন। তিনি হলদীঘাটের যুদ্ধের সরস ও নিরপেক্ষ বর্ণনা নিজের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন।

আজমীর হইতে মোগল-সৈন্য মাণ্ডলগড় পৌঁছিয়াছে শুনিয়া মহারাণা কুম্ভলমীর দুর্গ হইতে সসৈন্য গোগুন্দায় আসিলেন। মোগল-সৈন্য লম্বা লম্বা কুচ করিয়া জুন মাসের প্রথমে নাথদ্বারার* পথে গোগুন্দার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নাথদ্বারা হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে খমনোর গ্রাম। খমনোর হইতে তিন মাইল পশ্চিমে গোগুন্দা ও খমনোরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে হলদীঘাটের সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। কুমার মানসিংহ খমনোর ও হলদীঘাটের মাঝামাঝি বনাস নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। ওদিকে মহারাণাও গোগুন্দা হইতে যাত্রা করিয়া মোগল-শিবির হইতে তিন ক্রোশ দূরে পাহাড়ের আশ্রয়ে শত্রুসৈন্যের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 'বীরবিনোদ' গ্রন্থে কবিরাজা শ্যামলদাসজী লিখিয়া গিয়াছেন হলদীঘাটের যুদ্ধের একদিন পূর্ব্বে কুমার মানসিংহ কয়েক জন অনুচরের

---

* বদায়ুনীর মূল ফারসীতে আছে '*dar balda-i- Namdara.*' লো সাহেব অনুবাদে 'is in city of *Darrah*' লিখিয়াছেন। মেবারে *Darrah* নামে কোন শহর নাই। ইহা হলদীঘাট হইতে এগার মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত "নাথদ্বারা"।

সহিত শিকারে গিয়াছিলেন, গুপ্তচরদের মুখে খবর পাইয়া শিশোদিয়া সামন্তগণ মহারাণাকে বলিলেন এমন সুযোগ ছাড়া হইবে না; শত্রুকে বধ করা চাই। কিন্তু ঝালাসর্দ্দার বীদার (মানসিংহ) মতানুসারে মহারাণা তাঁহাদিগকে এ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, ছল দাগাবাজী দ্বারা শত্রুকে বধ করা প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের কাজ নহে।* এই গল্পটিতে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কি-না সন্দেহ। মোল্লা বদায়ূনী কোন শিকারের উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ মহারাণা ছল-কৌশলে (guerilla warfare) মোগল-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াই অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; হলদীঘাটের যুদ্ধ ছাড়া খোলা ময়দানে তিনি মোগলদের সহিত আর কখনও লড়াই করেন নাই। সত্যই যদি মানসিংহকে হাতে পাইয়া মহারাণা ছাড়িয়া দিয়া থাকেন সেটার জন্য ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া অনর্থক। ইহাতে বুঝা যায় মানসিংহের উপর মহারাণার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত খমনোরের নিকট মেবার ও মোগল সৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম হয়, কুমার মানসিংহের সৈন্য-সংখ্যা ছিল ৫,০০০ অশ্বারোহী এবং কয়েকটা জঙ্গী হাতী। মোগল-ব্যূহের মাঝখানে হস্তিপৃষ্ঠে স্বয়ং মানসিংহ ও কয়েক জন মুসলমান মনসবদার, দক্ষিণ ভাগে সৈয়দ অহমদ্ খাঁর অধীনে রণকুশল ও সাহসী বারহা সৈয়দগণ, বাম ভাগে কাজী খাঁর (গাজী খাঁ ?) নেতৃত্বে মুসলমান পল্টন, এবং রায় লুনকরণের অধীনে একদল রাজপুত, কুমার মানসিংহের সম্মুখে এবং হরাবলের পিছনে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে তাঁহার বড় ভাই মাধোসিংহের অধীনে এক পল্টন রাজপুত সৈন্য। সামরিক পরিভাষায় সৈন্যের এই বিভাগকে "আলতামশ" বলা হইত। কেন্দ্রস্থ সৈন্যদলের পিছনে পৃষ্ঠরক্ষী সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন মেহতর খাঁ, বাদশাহী ফৌজের হরাবলে রাজপুত পল্টনের অধ্যক্ষ ছিলেন জগন্নাথ কচ্ছবাহ, এবং মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন আসফ খাঁ। ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ূনী হরাবলের মাঝখানে আসফ খাঁর পাশেই সওয়ার ছিলেন। হরাবলের এক অংশের নাম ছিল হরাবলের "মোরগ্‌বাচ্চা"। ইহারা হরাবল হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিত। "মোরগ-বাচ্চারা" সংখ্যায় আশি-নব্বই জন, সৈয়দ হাসিম বারহার নেতৃত্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিল।

অপর পক্ষে মহারাণা তাঁহার ৩,০০০ অশ্বারোহীকে যথারীতি বিভাগ করিয়া আক্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন। মহারাণার সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলেও পাহাড়ের আড়ালে থাকায় সমতলভূমির মোগল-সৈন্যের যে-কোন ভাগ আক্রমণ করিবার সুবিধাটুকু তাঁহার ছিল। মেবার-সৈন্যের পাঠান বাহিনী হাকিমী খাঁ সুরের নেতৃত্বে মোগল-সৈন্যের সম্মুখস্থ পশ্চিম দিকের পাহাড় হইতে বাহির হইয়া বরাবর 'মোরগবাচ্চা'দের উপর চড়াও করিল। উঁচু নীচু জমি, টিলা, টক্কর ও কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে মোগলেরা বেকায়দায় পড়িল। পাঠানেরা মোরগবাচ্চাদের তাড়াইয়া হরাবলের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। (*Harawal u-jauja-i-Harawal eke shud*)। তাহাদের নেতা হাসিম বারহা ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন; সৈয়দ রাজু তাঁহাকে উঠাইয়া আনিল। ঠিক এই সময়ে রাজপুত সেনা ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া মোগল-সৈন্যের বামপার্শ্ব আক্রমণ করিল। মেবার-বাহিনীর হরাবলের অধিনায়ক ছিলেন বীর জয়মলের পুত্র রামদাস রাঠোর, মধ্য-ভাগে স্বয়ং মহারাণা, দক্ষিণ দিকে রাজা রামশা (গোয়ালিয়রী), বামদিকে ঝালাবীদা (মানসিংহ), ঘাঁটি হইতে বাহির হওয়ার সময় মহারাণার দক্ষিণ পক্ষই সৈন্যদলের অগ্রে* ছিল। তাহারা ঘাঁটির

* রাজপুতানেকে ইতিহাসে উদ্ধৃত (৩য় ভাগ, পৃ. ১৪৪)।

* বদায়ূনী লিখিয়াছেন *Ram Sah Gawahori ... ke pesh pesh-i-Rana me-amad* অর্থাৎ রাম শা যিনি রাণার আগে আগে আসিতেছিলেন। কিন্তু লো সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন Ram Shah......who *always kept in front.* ইহাতে মূলের অর্থ বিকৃত হইয়াছে। বদায়ূনীর বর্ণনায় দেখা যায় রাণার আক্রমণে মোগল হরাবলের বাম দিক হইতে (*az chup-i-Harawal*) মানসিংহের রাজপুতেরা (যাহাদের সর্দ্দার ছিলেন লুন করণ) ভেড়ার ন্যায় পলাইয়াছিল। সুতরাং মনে হয় রামশা প্রথমে ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া মোগলদের বাম পক্ষ আক্রমণ করিয়াছিল।

মুখে কাজী খাঁর অধীনে মোগল-ব্যূহের বাম দিকের মুসলমানদিগকে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিল। কাজী খাঁর দলে শেখ মনসুরের কর্তৃত্বে ফতেপুর সিক্রীর শেখজাদাগণও ছিল। যুদ্ধের প্রথমেই শেখজাদাগণ সোজা পিছনের দিকে ছুটিল। পলায়নের সময় শেখ মনসুরের পশ্চাদ্দেশে একটি তীর লাগিয়াছিল—ইহার ঘা না কি বহু দিন শুকায় নাই! কাজী খাঁ মোল্লা হইলেও সাহসে ভর করিয়া কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু বুড়ো আঙুলে তলোয়ারের চোট লাগাতে তাঁহার একটা হদিস মনে পড়িল; যথা

"Flight from overwhelming odds is one of the traditions of the Prophet."

এবং এই হদিস্ আওড়াইয়া তিনিও পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। মহারাণার রাজপুতেরা তাঁহার দলকে তাড়াইয়া মোগল বাহিনীর মধ্যভাগের উপর ফেলিল (bar qalb zad)।* রাজা রামশার আক্রমণে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া রায় লুনকরণের রাজপুতেরা ভেড়ার পালের ন্যায় শাহী ফৌজের হরাবলের দিকে ছুটিতে লাগিল, এবং হরাবল ভেদ করিয়া শাহী ফৌজের দক্ষিণ ভাগের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

হাকিম খাঁ সুরের আক্রমণে মোগল হরাবল পূর্ব্বেই পরাজিত ও ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। এ সময়ে লুনকরণের রাজপুতেরা ইহার উপর আসিয়া পড়াতে বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়া গেল। পলায়নপর মোগল-পক্ষীয় রাজপুত এবং তাহাদের অনুসরণকারী মহারাণার রাজপুত মিশিয়া যাওয়াতে বদায়ূনী আসফ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর শত্রু মিত্র চেনা যায় না, তীর নিশানা করিব কোন্ দিকে?" আসফ খাঁ মীরবক্শী নির্ব্বিকারচিত্তে হুকুম দিলেন, "কুছ্ পরোয়া নাই। যে-কেহ সামনে থাকুক না কেন তীর ছুঁড়িতে থাক, হয় এদিকের না-হয় ওদিকের কাফেরই জাহান্নমে যাইবে, ইস্লামের উভয়ত্র লাভ।" মোল্লা সাহেব ও তাঁহার বন্ধুরা বেপরোয়া তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন। ঠাসাঠাসি মানুষের পাহাড়, মোল্লাজীর কাঁচা হাতের নিশানাও ব্যর্থ হইল না; মোল্লা বদায়ূনী লিখিয়া গিয়াছেন, এ কাজটা যে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নয় তাঁহার নিষ্পাপ মনই সাক্ষ্য দিল। কালিদাসের দুষ্মন্তের মত তিনি ভাবিলেন

"সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু।
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।"

তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল জেহাদের "সওয়াব" হাসিল করিয়া তিনি গাজী হইয়াছেন [*suab-i-ghaza hasil shud*]। এ ভাবে কিছুক্ষণ বাদশাহী ফৌজের রাজপুতদিগকে মারিয়া আসফ খাঁ ও মোল্লাজীর দল পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। হরাবলের মুষ্টিমেয় রাজপুতগণকে বিপন্ন করিয়াই আসফ খাঁ পলাইয়াছিলেন এ কথা বদায়ূনী লিখেন নাই।

হরাবলকে পরাজিত করিয়া হাকিম খাঁ সুর মানসিংহের সৈন্যের দক্ষিণ পক্ষ আক্রমণ করিলেন। সৈয়দেরা সাহসী যোদ্ধা হইলেও এ আক্রমণের সম্মুখে হটিয়া গেল। পলায়নটা সংক্রামক; একবার আরম্ভ হইলে উহাকে ঠেকান দায়। মানসিংহের হরাবল, বাম পক্ষ ও দক্ষিণ পক্ষ পরাজিত ও ভগ্ন হওয়াতে মহারাণার সৈন্য প্রবলবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। জগন্নাথ কছুবাহের অধীনে হরাবলের বিপন্ন রাজপুতগণকে সাহায্য করিবার জন্য "আলতামশের" সেনাপতি মাধোসিংহ অগ্রসর হইলেন। এদিকে মহারাণা তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যদের রক্ষা করিবার জন্য মাধোসিংহকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধের এ অবস্থায় মাধোসিংহ ও জগন্নাথের সেনাদলকে ডানদিকে রাখিয়া কুমার মানসিংহ প্রাণপণে মহারাণার দক্ষিণ বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বোধ হয় মানসিংহের সৈন্যকেও মহারাণা পিছু

---

* Lowe বদায়ূনীর অনুবাদে লিখিয়াছেন...swept his [Qazi Khan's] men before him and bearing them along *broke through his centre*, অথচ মূলে আছে *bardashtah u rauftah bar qalb zad.* ইহার অর্থ তাহাদিগকে উড়াইয়া সেনার মধ্যভাগের উপর ফেলিল। লো সাহেবের অনুবাদ শুদ্ধ নয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় কাজী খাঁর মধ্যভাগ ভাঙিয়াছিল। কাজী খাঁর মধ্যভাগ বলিয়া কিছু ছিল না, তাহার কথাও নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় গৌরীশঙ্করজী বদায়ূনীর মূলের সহিত না মিলাইয়া লো সাহেবের অশুদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ হিন্দীতে ভাষান্তরিত করিয়াছেন। "উস্‌কী সেনা কা সংহার করতা হুয়া বহ উসকে মধ্য তক্ পঁহুছ গিয়া"! (রাজপুতানেকা ইতিহাস, ৩য় ভাগ, পৃ. ৭৪৬)।

হঠাইয়া দিয়াছিলেন। জগদীশ মন্দিরের প্রশস্তিকার একটি সুন্দর শ্লোকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

"কৃত্বা করে খড়্গলতাং স্ববল্লভাং
প্রতাপ সিংহে সমুপাগতে প্রগে।
সা খণ্ডিতা মানবতী বিবচ্চমূঃ।
সংকোচয়ন্তি চরণৌ পরাঙমুখী।

আবুল-ফজল লিখিয়াছেন, "in the opinion of the superficial the foe was prevailing." অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিতে মনে হইল শত্রু জয়ী হইতেছে। টডের 'রাজস্থানে' হলদীঘাটের যুদ্ধবর্ণনা এবং এ সম্বন্ধে রাজপুতপক্ষের জনশ্রুতিমূলক কথাগুলি প্রায় সাড়ে পনেরো আনা মিথ্যা। গৌরীশঙ্করজী ইহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন:—

"মহারাণা নীল (শ্বেত) ঘোড়া চেটকের উপর সওয়ার ছিলেন। তিনি কুমার মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া তাঁহার দিকে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু বর্মে সুরক্ষিত থাকায় মানসিংহ বাঁচিয়া গেলেন, এমন সময় চেটক সম্মুখের দুই পা মানসিংহের হাতীর মাথার উপর উঠাইয়া দেওয়াতে হাতীর শুঁড়ে বাঁধা তলোয়ার লাগিয়া চেটকের পিছনের একটি পা জখম হইয়া গেল। মহারাণা কুমার মানসিংহকে মৃত জ্ঞান করিয়া ঘোড়া পিছু হঠাইলেন।"

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপ এবং মানসিংহের আদৌ দেখা হইয়াছিল কি-না সন্দেহ। বদায়ূনী বলেন, মহারাণা,—যিনি মাধোসিংহের মুখোমুখী লড়িতেছিলেন, তীর দ্বারা আহত হইয়াছিলেন।

*U zakhma h-i-tir bar Rana ke ru-ba-ru-i-Madho Singh bud rasid.**

আবুল-ফজল লিখিয়াছেন মোগল হরাবলের অন্যতম সেনানায়ক জগন্নাথ কচ্ছবাহের হাতে মহারাণার হরাবলের অধিনায়ক রামদাস রাঠোর মারা যান; কিন্তু জগন্নাথের জীবন বিপন্ন হওয়াতে পিছনে আলতামশ হইতে মাধোসিংহ তাঁহার সাহায্যার্থ আসেন; সুতরাং তাঁহার সহিত মহারাণার (যিনি নিজ হরাবলের পিছনে ছিলেন) সংঘর্ষ হওয়াই সম্ভব। কুমার মানসিংহ যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মাধোসিংহের পিছনে এবং শেষাশেষি তাঁহার বাম ভাগে থাকিয়া সম্ভবতঃ মহারাণার বিজয়ী দক্ষিণ পক্ষের সেনাপতি রামশার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। রামশা তাঁহার তিন পুত্রের সহিত এ যুদ্ধে মারা যান; গোয়ালিয়রের তঁবর রাজবংশ নির্বংশ হইল। কিন্তু আবুল-ফজল অন্যত্র লিখিতেছেন,—যুদ্ধের সময় মহারাণা ও মানসিংহ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া অনেক বীরত্ব প্রকাশ করেন। বদায়ূনীর চাক্ষুষ বর্ণনা উপেক্ষা করিয়া ইহা গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নাই। আবুল-ফজলের অপেক্ষা বদায়ূনী কুমার মানসিংহের অনেক বেশী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন মানসিংহের সদ্দারীর দ্বারা সেদিন মোল্লা শেরীর লেখা পদটির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা গেল। (*Ke Hindu me-zanad Shamsher i-Islam* (অর্থাৎ হিন্দুই ইস্‌লামের তলোয়ার)।

মহারাণা প্রতাপের সৈন্যের মধ্যভাগ ও দক্ষিণ ভাগের আক্রমণের সম্মুখে কুমার মানসিংহের বাহিনী যখন বিচলিত হইয়া পড়িতেছিল, তখনই একটি গোলমাল উঠিল স্বয়ং বাদশা আকবর আসিতেছেন। বদায়ূনী বলেন প্রথম আক্রমণে বাদশাহী ফৌজ হইতে যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা নদীর (বনাস) অপর পারে পাঁচ-ছয় ক্রোশ পর্য্যন্ত ঘোড়া দৌড়াইয়া তবেই দম লইয়াছিল। এ সময়ে মোগলবাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্যদলের নেতা মেহতর খাঁ মিথ্যা রব উঠাইলেন যে, স্বয়ং জাঁহাপনা আসিতেছেন। ইহা বিশ্বাস করিয়া পলাতক সৈন্যেরা ক্রমশঃ জমা হইয়া গেল। এই সৈন্যদল আবার সুশৃঙ্খল করিয়া তিনি মানসিংহের সাহায্যের জন্য (বোধ হয় বাম পক্ষ হইতে) সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় মহারাণার বাম পক্ষও মানসিংহের দক্ষিণ পক্ষের সম্মুখে ক্রমশঃ হটিতে লাগিল। এই ভাগের অধ্যক্ষ ঝালাবীদা মারা যাওয়াতে হাকিম খাঁ সুর পিছু হটিয়া মহারাণার সৈন্যদলের উপর আসিয়া পড়িলেন। এ অবস্থায় বাদশাহী

---

* Pers. text., ii. p. 233. লো সাহেব ইহার ইংরেজী অনুবাদে লিখিয়াছেন "And showers of arrows were poured on the Rana who was opposed to Madho Singh (ii. 239). ইহা অশুদ্ধ, "জখম" শব্দ তিনি বাদ দিয়াছেন। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর লো সাহেবের ভুল অনুবাদের অনুবাদ হিন্দীতে করিয়াছেন; মূল ফার্সীর সহিত মিলাইয়া দেখেন নাই।

ফৌজের পুনর্গঠিত বাম ও দক্ষিণ পক্ষ দ্বারা মেবার-সৈন্য দুই পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দেখিয়া মহারাণা নিজের সৈন্য পিছু হঠাইয়া লইলেন। তিনি হলদীঘাটের মধ্য দিয়া পর্ব্বতশ্রেণীর অপর পার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন। মেবার-সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছিল বলিয়া বদায়ুনী লিখেন নাই। তিনি বলেন মহারাণার পিছু লইবার মত সাহস ও শক্তি মোগল-সৈন্যের ছিল না। দুপুর বেলায় ভীষণ "লু" চলিতেছিল এবং গরমে মাথার খুলির মগজ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইতে লাগিল। মোগল-সৈন্যেরা বিশেষ সন্দেহ করিল রাণা পাহাড়ের পিছনে ছল করিয়া ওৎ পাতিয়া আছেন [*ghuman-i-gha'lib in bud*]

হলদীঘাটের যুদ্ধ বর্ণনায় টড লিখিয়াছেন,—

"Sukhta whose *personal enmity* to Pertap had made him *a traitor* to Mewar, beheld from the ranks of Akbar the blue horse flying unattended. ...He joined in the pursuit, but only to slay the pursuers [*Khorasani* and *Multani*] who fell beneath his lance." (*Rajasthan*, i. 314). মহারাণা রাজসিংহের সময় রচিত রাজপ্রশস্তি কাব্যের দ্বারা সমর্থিত হইলেও পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী স্বয়ং হলদীঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, যুদ্ধের পর মোগল-সৈন্য অত্যন্ত ক্লান্ত * এবং শত্রুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল; অধিকন্তু রাণার গুপ্ত আক্রমণের ভয়ে বিজেতাদের সোয়াস্তি ছিল না। শক্তসিংহ মোগলের পক্ষে বা বিপক্ষে হলদীঘাটে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং খোরাসানী ও মুলতানী সর্দ্দার এবং "খোরাসানী-মুলতানী কা অগ্‌গল" ভাটের কল্পনামাত্র। হলদীঘাটের যুদ্ধের পর মোগল-শিবিরে কুমার সেলিম কর্ত্তৃক শক্ত সিংহকে তিরস্কার ও বিদায় ইত্যাদিও জাজ্বল্যমান মিথ্যা; সে-সময় হয়ত ছয় বৎসরের বালক সেলিম ফতেপুর সিক্রীর অন্দরমহলে কবুতর উড়াইতেছিলেন। টড্-বর্ণিত শক্তসিংহের জীবনীর এই অংশ পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী অবিশ্বাস্য বলিয়াছেন। কিন্তু শক্তসিংহের সহিত প্রতাপের বিবাদ, যুদ্ধে উদ্যত ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মুখে পুরোহিতের প্রাণত্যাগ, প্রতাপ কর্ত্তৃক শক্তসিংহের নির্ব্বাসন ইত্যাদি ব্যাপার তিনি আলোচনা করেন নাই; যেন পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। টডের 'রাজস্থান' অনুসারে শিকারের সময় প্রতিযোগিতাই বিবাদের কারণ। 'বংশভাস্কর'-প্রণেতা সূর্য্যমল বলেন, প্রতাপসিংহ চেটক ও অন্যান্য অনেক আরবী ঘোড়া খরিদ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার একটিও শক্তসিংহকে না দেওয়াতে তিনি রুষ্ট হইয়া মোগল-সম্রাট আকবরের কাছে গিয়াছিলেন। (বংশভাস্কর, পৃ. ১৬৫৮)। কিন্তু আকবরনামায় লেখা আছে শক্তসিংহ উদয়সিংহ বাঁচিয়া থাকিতে একমাত্র আকবরের কাছে গিয়াছিলেন; এবং আকবরের মেবার-আক্রমণের জল্পনা-কল্পনা শুনিয়া তিনি মোগল-শিবির হইতে পলায়ন করেন। সুতরাং প্রতাপের রাজ্যারোহণের পর এ ঘটনা হয় নাই ইহা সুনিশ্চিত; এবং রাজ্যারোহণের পূর্ব্বেও তাঁহাদের মধ্যে কোন বিবাদের কারণ বিদ্যমান ছিল না। উদয়সিংহের অবিচার ও তাচ্ছিল্য সমান ভাবেই প্রতাপ ও শক্তসিংহের পূর্ব্বজীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল। যদিও টড্ সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, আত্মত্যাগী পুরোহিতের বংশধরেরা তাঁহার সময় পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ—অদ্যাবধি—জাগীর ভোগ করিয়া আসিতেছেন তবুও এ সমস্ত আগাগোড়া কাল্পনিক মনে হয়।

মহারাণা প্রতাপের সময় হইতে উদীয়মান শক্তাবত-গণের পৌরুষ ও শৌর্য্যে প্রাচীন চুণ্ডাবতদিগের প্রভাব কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে; এবং পরবর্ত্তীকালে "হরাবল"

* "And when the air was like a furnace and no power of movement was left in the soldiers, the idea became prevalent that the Rana by stealth and stratagem must have kept himself concealed behind the mountains. This was why there was no pursuit, but the soldiers retired to their tents and occupied themselves in the relief of the wounded." (Lowe's translation of *Muntakhab-ut-tawarikh*, ii. 239).

বা যুদ্ধবাহিনীর অগ্রভাগ চালনা করিবার দাবি লইয়া উভয় বংশের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। প্রতাপের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে শক্তসিংহ সম্বন্ধীয় গল্পটি বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে; ইহা শক্তাবত চারণদের মস্তিষ্কপ্রসূত। কথিত আছে, একদিন চুণ্ডাবত-কীর্ত্তি-অসহিষ্ণু শক্তসিংহ চুণ্ডাবত-চারণদের "দস সহস মেবার কা বর কেবাড়" অর্থাৎ চুণ্ডাবতকুল মেবারের দশ হাজার (শহরের) বড় কেবাড় বা তোরণ—এই স্পর্দ্ধা শুনিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন তাঁহার জন্ত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ইহাতে শক্তসিংহের চারণপ্রধান বলিয়া উঠিল, "কেন, আপনিই ত সেই কেবাড়ের অর্গল।" বোধ হয় আরও দু-এক পুরুষ পরে এই অর্গল শব্দের টীকা ভাষ্য হইতে খোরাসানী ও মূলতানী এবং তাহাদের অগ্‌লল-স্বরূপ শক্তসিংহের হলদীঘাটের যুদ্ধে উপস্থিতির কাহিনী সৃষ্টি হইয়াছে।

এইবার আমরা মহারাণা প্রতাপ ও সম্রাট্ আকবরের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রধান ঘটনাগুলি আলোচনা করিব।

বিঃ সঃ ১৬৩৩, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দ্বিতীয়ায় (১৮ই জুন, ১৫৭৬) হলদীঘাটের* যুদ্ধে শত্রুর কৌশলে পরাজিত হইয়া মহারাণা প্রতাপ গোগুন্দার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই যুদ্ধে মেবার-সৈন্তের অপেক্ষা মোগলেরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, মোগল-পক্ষে ১৮০ মুসলমান নিহত ও ৩০০ আহত হইয়াছিল। উভয় পক্ষে রাজপুতের সংখ্যাই বেশী ছিল—রাজপুত মরিয়াছিল মোট ৩২০ জন। মোটামুটি রাণার পক্ষীয় ২০০ জন যোদ্ধা বোধ হয় এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, ইহাদের মধ্যে ছিলেন ঝালাবীদা, ঝালা মানসিংহ, তঁবর রাম শা ও তাঁহার তিন পুত্র, রাবত নৈনসী, রাঠোর রামদাস, রাঠোর শঙ্করদাস, ভোড়িয়া ভীমসিংহ ইত্যাদি সর্দ্দার। মোটের উপর চিলিয়ান্‌ওয়ালার যুদ্ধে যেভাবে ইংরেজেরা জয়ী হইয়াছিলেন, হলদীঘাটে মুসলমান পক্ষেরও সেরূপ অনিশ্চিত জয় ও অধিকতর ক্ষতি হইয়াছিল। যাহা হউক প্রতাপ স্থির করিলেন যে মোগল-সৈন্তের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করা হইবে না, কারণ যুদ্ধে বিজয়ী হইলেও ইহাতে তিনি সৈন্ত-সংখ্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন; তিনি গোগুন্দা ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতশ্রেণী আশ্রয় করিলেন, আরাবল্লীর প্রত্যেক গিরিসঙ্কট সুদৃঢ় করিয়া ভীলদের উপর উহার রক্ষার ভার দিলেন। যুদ্ধের পরদিন মানসিংহ গোগুন্দা দখল করিলেন। কিন্তু এইখানে মোগল-সৈন্তেরা এক রকম অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল, রসদ বন্ধ; সর্ব্বদা রাণার আক্রমণের ভয়; ইহার উপর পার্ব্বত্য প্রদেশে দারুণ বৃষ্টি। শাহী ফৌজ কয়েক দিন ধরিয়া রুটির অভাবে শুধু পাকা আম ও মাংস খাইতে লাগিল; ইহার ফলে অনেকের পীড়া (আমাশয়?) দেখা দিল।

তিন মাস পরে সম্রাট আকবর স্বয়ং আজমীর† পৌঁছিলেন (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৫৭৬ খৃঃ)। ইহার পূর্ব্বেই মানসিংহ গোগুন্দা ত্যাগ করিয়া মেবারের সমতল ভূমিতে আসিয়াছিলেন। সৈন্তের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া সম্রাট মানসিংহ ও আসফ খাঁকে আজমীর আসিতে আদেশ করিলেন। পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের ভাগ্যে মিলিল তিরস্কার ও অপমান। বাদ্‌শা কিছু দিনের জন্ত তাঁহাদিগকে দরবারে প্রবেশ নিষেধ করিলেন (Lowe's *Muntakhab-ut-tawarikh*, ii. *p.* 247).

মহারাণা প্রতাপকে দমন করিবার জন্ত এবার স্বয়ং আকবর আসরে নামিলেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আকবর আজমীর হইতে গোগুন্দা পৌঁছিয়া, কুতবউদ্দীন খাঁ, রাজা ভগবানদাস এবং কুমার মানসিংহকে প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন; তাঁহাদের প্রতি আদেশ ছিল পার্ব্বত্য প্রদেশে যে-খানেই থাকুক প্রতাপের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিতেই হইবে। এদিকে গুজরাট সীমান্তে প্রতাপের শ্বশুর নারায়ণ দাসকে দমন করিবার জন্ত কুলিজ খাঁ, তৈমুর বদখশী প্রভৃতি সেনাপতিরা

* উভয় সৈন্তের যুদ্ধ হইয়াছিল খমনোর নামক গ্রামে। উদয়পুরের নাথদ্বারা হইতে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত; হলদীঘাট ও খমনোরের মধ্যে ব্যবধান অনূন তিন মাইল।

† *Akbarnama*, iii. 259.

নিযুক্ত হইলেন। এ সময়ে প্রতাপের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ সিরোহীরাজ রাও সুরতান এবং জালোর-পতি তাজ খাঁ পাঠানও মোগলদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহাদের দমনের জন্ত তরসুন খাঁ, রায় রায়সিংহ ও সৈয়দ হাশিম বাবুহা নিযুক্ত হইল। ইডর, সিরোহী, ও জালোর পুনর্ব্বার বিজিত হইল বটে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপ দমিলেন না। রাজা ভগবানদাস ও কুতবউদ্দীন খাঁ কিছু দিন পাহাড়ে ফিরিলেন, কিন্তু প্রতাপের কোন সন্ধানই পাইলেন না। এবার রাজশ্যালক ভগবানদাস ও কুতবউদ্দীন খাঁ তিরস্কৃত হইলেন এবং তাঁহাদের কিছু দিনের জন্ত দরবারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।* সম্রাট্ অনেকটা হতাশ হইয়া বান্‌সওয়ারার দিকে চলিলেন, রাণাকে দমন করিবার জন্ত বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর রহিম (খান্-ই-খানান), কাসিম খাঁ মীরবহর, রাজা ভগবানদাস ও কুমার মানসিংহ গোগুন্দার দিকে প্রেরিত হইলেন।† এইবার আরাবল্লী শৈলশৃঙ্গে মোগল ও শিশোদিয়া জীবন লইয়া লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিল। রাণা এক পাহাড়ে আছেন শুনিয়া মোগলেরা ঐ পাহাড় ঘিরিয়া ফেলিলে অন্তদিক হইতে রাণা আসিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করেন—ব্যাপার এ রকমই কিছুদিন চলিল। মোগল সেনাপতিরা উত্যক্ত হইয়া উদয়পুর ও গোগুন্দা হইতে থানা উঠাইয়া লইল; মোহীর থানাদার মুজাহিদ বেগ রাজপুতদের হাতে প্রাণত্যাগ করিল।‡ রাজপুত ঐতিহাসিকেরা বলেন এই সময়ে কুমার অমরসিং একবার খান্‌খানান আবদুর রহিমের তাঁবু হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাঁহার স্ত্রীদের বন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাণা প্রতাপ তাঁহাদিগকে মাতার মত যত্নে ও সসম্মানে মোগল শিবিরে পাঠাইয়া দেন। রাজপ্রশস্তিকার ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন:

"অমরেশঃ খানখানাদারাণাং হরণং ব্যধাৎ।
সুবাসিনীবৎ সংতোষ্য প্রেষয়ামাস তাঃ পুনঃ ॥*

কোন সমসাময়িক ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই। রাজপ্রশস্তিকার অনেক ভিত্তিশূন্ত গল্প লিখিয়াছেন; সুতরাং ইহা কতদূর বিশ্বাস্য বলা যায় না। নিঃসন্দেহ এবারও মোগল-সৈন্ত অকৃতকার্য্য হইয়া মেবারের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এক বৎসরের মধ্যে মহারাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে তিনবার অভিযান করিয়াও মোগল-সৈন্য মেবার জয় করিতে পারিল না; রাজা ভগবানদাস, মানসিংহ, আসফ খাঁ প্রভৃতি তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হইলেন; তবুও তাঁহাদের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হইল না। পর বৎসর অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট আকবর আবার আজমীরে আসিয়া মহারাণাকে দমন করিবার জন্য বিরাট আয়োজন করিতে লাগিলেন। আবুল-ফজল লিখিয়াছেন,—

"...That the pleasant abode of the world may not be stained by the confusion of plurality, Rajah Bhawant Das, Kunwar Man Singh, Payinda Khan Mughal...were.........despatched to carry out *this great work.* Shah Baz Khan Mir Bakshi was appointed to command this force and the execution of the task was committed to him." (*Akbarnama*, iii. 307).

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় মহারাণা প্রতাপকে সম্রাট আকবর তাঁহার একাতপত্র প্রভুত্বের প্রধান অন্তরায় মনে করিতেন—এজন্য তাঁহাকে দমনের জন্য মোগল সম্রাটের বারংবার চেষ্টা। শাহবাজ নিজের নাম সার্থক করিবার জন্ত বহু সৈন্য লইয়া প্রতাপের বাসস্থান কুম্ভলমীর দুর্গ অবরোধ করিল। দুর্গের রসদ বন্ধ হওয়াতে মহারাণা প্রতাপ কুম্ভলমীর ত্যাগ করিয়া রাণপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে একটা বড় তোপ ফাটিয়া যাওয়াতে দুর্গস্থ গোলা-বারুদ সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। দুর্গরক্ষক প্রতাপের মামা রাওভান সোন্‌গরা ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সমস্ত অনুচরের সহিত নিহত হইলেন; কুম্ভলমীর মোগলদের হস্তগত হইল (১৫৭৮

* *Ibid.*, p. 275.

† *Ibid.*, p. 277.

‡ আকবরনামা, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৩০৫।

* রাজপুতানেকা ইতিহাসের ৩য় খণ্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। আকবরনামায় দেখিতে পাই ১৫৮৬ খৃঃ সিরোহীর কাছে একদিন খান্‌খানান্ পুরস্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া শিকারে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার একটা বিপদ হইয়াছিল,—স্ত্রীদের বন্দী হওয়ার কথা নাই। (*Akbarnama*, iii. 711).

খৃঃ ৩রা এপ্রিল)। শাহবাজ উদয়পুর এবং গোগুন্দা অধিকার করিয়া ছারখার করিলেন; কিন্তু মহারাণা কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করিবেন না। শাহবাজ খাঁ কিছুদিন পরে ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া মেবার ত্যাগ করিলেন। এদিকে শাহবাজ খাঁর সৈন্য চলিয়া যাওয়া মাত্র প্রতাপ অধিকাংশ স্থান আবার অধিকার করিলেন। মন্ত্রী ভামা শাহ মালব লুট করিয়া ২০,০০০ মোহর ও ২৫ লক্ষ টাকা চুলিয়া গ্রামে মহারাণাকে নজর দিলেন। ইহার পর শিশোদিয়াগণ দিবের দুর্গ পুনর্ব্বার অধিকার করিল। দিবের হইতে বিজয়ী শিশোদিয়া কুম্ভলমীর দুর্গ আক্রমণ করিলেন; দুর্গরক্ষী মোগল-সৈন্যেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এ সময়ে আকবর সীমান্তবাসী ইউসুফজৈ পাঠান-দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তিনি খান্‌-খানান্‌ আবদুর রহিমকে মালব প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া সাম ও দান দ্বারা রাণাকে বশীভূত করিবার জন্য পাঠাইলেন। মহারাণার মন্ত্রী ভামা শাহকে তিনি অনেক প্রকার লোভ দেখাইলেন। কিন্তু প্রতাপের দুর্জ্জয় পণ অটল রহিল।

১৫৭৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে শাহবাজ খাঁ দ্বিতীয় বার মেবার আক্রমণ করিলেন। শত্রুসৈন্যেরা যাহাতে মেবারের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে রসদ সংগ্রহ করিতে না পারে সেজন্য মহারাণা আদেশ করিলেন পাহাড়ের তলভূমিতে কেহ কৃষি কিংবা পশুচারণ করিতে পারিবে না। কথিত আছে এ আদেশ অমান্য করার জন্য তিনি এক কৃষকের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। শাহবাজ খাঁ তিন চার মাস পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না।

১৫৮৪ খৃঃ সম্রাট আকবর জগন্নাথ কচ্ছবাহকে অনেক সৈন্যের সহিত মহারাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। দুই বৎসর প্রাণপণ চেষ্টার পর হতাশ হইয়া তিনিও মেবার ত্যাগ করিলেন (১৫৮৬ খৃঃ)।

মহারাণা এক বৎসরের মধ্যে (১৫৮৬ খৃঃ) চিতোর ও মাণ্ডলগড় ছাড়া সমস্ত মেবার হস্তগত করিলেন। ইহার পরে জীবনের শেষ এগার বৎসর শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজস্থানের চারণ-কাহিনী, যথা—ভীলদের আশ্রয়ে পর্ব্বতগুহায় বাস করিবার সময় ঘাসের রুটি খাইয়া মহারাণার জীবনধারণ, কন্যার জন্য রক্ষিত রুটি লইয়া বনবিড়ালীর পলায়ন, ক্ষুধার্ত্ত বালিকার হৃদয়ভেদী চীৎকার, প্রতাপের পণভঙ্গ এবং মোগল-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ; কবি পৃথ্বীরাজের কবিতাপাঠে প্রতাপের উদ্দীপনা ইত্যাদি সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রথমতঃ, উত্তরে কুম্ভলমীর হইতে দক্ষিণে ঋষভদেব পর্য্যন্ত অনুমান নব্বই মাইল লম্বা, এবং পূর্ব্বে দেবারী হইতে পশ্চিমে সিরোহী সীমান্ত পর্য্যন্ত সত্তর মাইল প্রস্থ পার্ব্বত্য ভূমি কখনও সম্পূর্ণভাবে প্রতাপের হস্ত-চ্যুত হয় নাই; এই স্থান সমতল না হইলেও সুজলা, সুফলা, এবং গরু মহিষ ইত্যাদিও এ অঞ্চলে প্রচুর। সুতরাং টড প্রতাপের যে-ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন উহা নাটকীয় চরিত্রের প্রতাপ; ইতিহাসের প্রতাপসিংহ নহেন।

দ্বিতীয় কথা, পৃথ্বীরাজের কবিতা ইতিহাস নহে। পৃথ্বীরাজের কবিতার সহিত প্রতাপের পরিচয়, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার সহিত কামাল পাশার পরিচয়ের চেয়ে হয়ত কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ ছিল। সমসাময়িক কবির সমাদর হিসাবে পৃথ্বীরাজের কবিতার মূল্য থাকিতে পারে; কিন্তু উহাতে ইতিহাস নাই। দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই কবিতাকেই গদ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া অনেকে ইতিহাস বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

টড সাহেব অন্যত্র লিখিয়াছেন, প্রতাপ শপথ করিয়াছিলেন যতদিন পর্য্যন্ত চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা সোনা ও রূপার থালায় ভোজন করিবেন না; ঘাসের বিছানায় শুইবেন, দাড়ি কামাইবেন না এবং নাকাড়া বাদ্য মেবার-বাহিনীর সম্মুখে না বাজিয়া পিছনেই বাজিবে।

পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী বলেন, এই সমস্ত শুধু মনগড়া কথা। উদয়পুরের মহারাণারা এখনও প্রাচীন প্রথা অনুসারে ভোজন করেন। ভোজন-স্থান ভাল করিয়া ধুইয়া উহার উপর খোলাই সাদা কাপড় বিছানো হয়। ইহার উপর ছয় কোণ কিংবা চার কোণা নয় ইঞ্চি

পরিমাণ উঁচু চৌকীর উপরে পত্তল এবং পাতার উপরে থালা রাখা হয়। তিনি বলেন, ইহা প্রতাপের শপথ পালনের জন্ম নহে; ইহাই প্রাচীন কাল হইতে ভোজনের রীতি। মহারাণাদের বিছানার নীচে ঘাস উদয়পুরে কেহ কখনও দেখে নাই, নাকাড়া বাদ্য প্রতাপ রাজা হইবার পূর্ব্বে আকবর কর্ত্তৃক চিতোর অধিকারের সময় হইতে শিশোদিয়া সৈন্তের পিছনে বাজাইবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। দাড়ি কামানোর কথা লইয়া মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্করজী অনেক গবেষণা করিয়াছেন। আজকাল রাজপুতদের মত গালপাট্টা ও দাড়ি রাখিবার ফ্যাশন সম্রাট ফরোখসিয়রের রাজত্বকাল* হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উহার পূর্ব্বে নয়। মহারাণা প্রতাপের প্রাচীন চিত্রে কোথায়ও দাড়ির নাম-নিশানা নাই।

অর্থাভাবে যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব মনে করিয়া মহারাণা প্রতাপের মেবার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ও ঐ সময়ে ভামা শাহের নিজের সঞ্চিত অনেক টাকা মহারাণাকে দান করা ইত্যাদি কথা অবিশ্বাস্ত ও কাল্পনিক বলিয়া গৌরীশঙ্করজী প্রমাণ করিয়াছেন। মেবার-রাজ্যের গুপ্তধন অনেক স্থানে প্রোথিত ছিল। কথিত আছে, ভামা শাহ মরণের সময় তাঁহার স্ত্রীর হাতে একটা বহি দিয়া বলিয়াছিলেন যেন তাঁহার দেহত্যাগের পর ওটা মহারাণার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়, উহাতে গুপ্ত-ধনের সমস্ত বিবরণ লিখিত ছিল।

মহারাণা প্রতাপ সিংহ উন্নতদেহ ও বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি আজীবন যুদ্ধ করিয়াছেন অথচ কথিত আছে তাঁহার শরীরে কোন শস্ত্রচিহ্ন ছিল না; তিনি কোন যুদ্ধে বিশেষ রকম আহত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন একটি বাঘ শিকার করিবার সময় তিনি খুব জোরে ধনু কষিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার তলপেটে ও অন্ত্রে বিশেষ চোট পাইয়াছিলেন। কিছুদিন রোগে কষ্ট পাইয়া বিঃ সঃ ১৬৫৩ মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীতে (১৯শে জানুয়ারি, ১৫৯৭ খৃঃ) মহারাণার দেহান্ত হয়। চাবণ্ড হইতে অনুমান দেড় মাইল দূরে বণ্ডোলী গ্রামের নিকট একটি ছোট নদীর (নালা) ধারে তাঁহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল।

প্রতাপের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দিল্লীশ্বর আকবরের মেবার-জয়ের জন্ম প্রবল আয়োজন, একাধিক অভিযান ও উহার নিষ্ফলতাই মহারাণা প্রতাপের কৃতকার্য্যতার মাপকাটি। মহারাণার দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের সম্মুখে আকবরের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, মেবার-স্বাধীনতার অনির্ব্বাণ প্রদীপ আরাবল্লীশিখরে জলন্ত রাখিয়া প্রতাপ বীরব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গেলেন। মহারাণা প্রতাপের ত্যাগ ও বীরত্বে মেবারের নৈতিক প্রভাব সমস্ত রাজপুতানায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাবরের হাতে পরাজিত হইয়া মহারাণা সংগ্রামসিংহ রাজপুতানার যে রাষ্ট্রীয় সার্ব্বভৌমত্ব হারাইয়াছিলেন পঁচিশ বৎসর ভারত-সম্রাট্ আকবরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষণ করাতে মেবারের সেই প্রনষ্ট অধিরাজত্ব রাজপুত জাতির মনের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বিরাট হিন্দু-জাগরণ মোগল-সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করিয়াছিল উহার মূলে প্রতাপের মহান্ আদর্শের প্রেরণা কম ছিল না। প্রতাপ না জন্মিলে মেবারে মহারাণা রাজসিংহ জন্মিতেন কি-না সন্দেহ, রাজসিংহ না থাকিলে মেবার ও মাড়বারে আওরঙ্গজেবের প্রচণ্ড নাতি প্রতিহত হইত না।

বিকানীর-রাজ রায়সিংহের ছোট ভাই কবি পৃথ্বীরাজ মহারাণা প্রতাপ সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়া-ছিলেন। এই কবিতাগুলি মহারাণা প্রতাপ ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে পত্রব্যবহারের ধরণে লিখিত। ইহা হইতে ঐতিহাসিকেরা ভ্রম করেন সত্যই পৃথ্বীরাজের তেজপূর্ণ কবিতা পাঠ করিয়া দারিদ্র্যক্লিষ্ট প্রতাপের হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূর হইয়াছিল; এবং আকবরের কাছে অধীনতা স্বীকার-সঙ্কল্প তিনি ত্যাগ করেন। এমন কি, গৌরীশঙ্করজীর মত ঐতিহাসিক ইহাকে ইতিহাস বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। প্রতাপের জীবনীর এক স্থলে উন্মাবশতঃ পণ্ডিতজী লিখিয়াছেন, "প্রতাপ বাদশাহী খেলাত পরিধানের কথা দূরে থাকুক তিনি আকবরকে বাদশাহও বলিতেন না, 'তুর্ক' বলিতেন।" ইহার প্রমাণ? প্রমাণ শুধু পৃথ্বীরাজের কাছে লিখিত মহারাণার রচিত পদ

* রাজপুতানেকা ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৭২।

তুরক কহাসী মুখ পতৌ, ইন তন সূঁ ইকলিংগ।

অর্থাৎ, ভগবান্ একলিঙ্গজী প্রতাপসিংহের মুখ দিয়া বাদশকে 'তুরক'ই বলাইবেন, বাস্তবিক এই চিঠিখানির কোন ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা রাজপুত কবি কর্তৃক মহারাণার সমসাময়িক প্রশংসা—হৃতগৌরব রাজপুত জাতির অন্তঃনিরুদ্ধ স্বাধীনতা-স্পৃহার গৈরিকস্রাব। এই হিসাবে পৃথ্বীরাজের কবিতাগুলির একটি স্থায়ী মূল্য অবশ্যই আছে। নিম্নে আমরা কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিব—

১। অকবর সমদ অথাহ, তিঁহ ডুবা হিন্দু তুরক।
মেবাড়ো তিড় মাহঁ, পোয়ন ফুল প্রতাপসী॥

—আকবর-রূপী অতল সমুদ্রে হিন্দু মুসলমান সবই ডুবিয়া গিয়াছে। শুধু মেবারপতি প্রতাপ-রূপী কমল ইহাতে ভাসিয়া আছেন।

২। অকবর ঘোর অঁধার, উঁঘাণাঁ হিন্দু অবর।
জাগৈ জগদাতার পোহরে রাণ প্রতাপসী॥

—আকবর-রূপী ঘোর আঁধারে সমস্ত হিন্দু নিদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু রাণা প্রতাপ ধর্ম্ম-ধন রক্ষার জন্ত প্রহরীস্বরূপ জাগিয়া আছেন।

৩। চম্পা চিতোড়াহ, পোরস তনৌ প্রতাপসী।
সৌরভ অকবর শাহ, অলিয়ল আভড়িয়া নহীঁ॥

—চিতোর চাঁপাফুল; প্রতাপ ইহার সুগন্ধ। আকবর-রূপী ভ্রমর চারিদিকে ঘুরিতেছে; কিন্তু কাছে যাইতে পারিতেছে না।

কথিত আছে, মহারাণা প্রতাপের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সম্রাট আকবর কিছুক্ষণ উদাস ও নিস্তব্ধ ছিলেন। ইহাতে দরবারিরা হয়রাণ হওয়ায় মহারাণা প্রতাপের ভাই জগমলের চারণ কবি আঢ়া একটি ষট্পদী কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। উহার সারাংশ এই,—

হে গুহিলোত রাণা প্রতাপসিংহ! তোমার মৃত্যুতে বাদশাহ দাঁতে জিভ কাটিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত চোখের জল ফেলিয়াছেন। কেন-না তোমার ঘোড়া বাদশাহী মনসবের দাগে কলঙ্কিত হয় নাই, নিজের পাগড়ী কাহারও কাছে তুমি নত কর নাই।...শাহী ঝরোকার নীচে তুমি কোন দিন দাঁড়াও নাই।

বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপের যশোগানে আরাবল্লীর উপত্যকা-ভূমি আজও মুখরিত। সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহাকে চিরদিন ভক্তি-অর্ঘ্য দান করিয়া আসিতেছে। যতদিন পৃথিবীতে বীরপূজা প্রচলিত থাকিবে ততদিন মহারাণা প্রতাপের কীর্ত্তি ম্লান হইবে না; তাঁহার জীবনী প্রত্যেক ভারতবাসীকে স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা দান করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেবারে মহারাণা প্রতাপের কোন স্মৃতিমন্দির নাই। তাঁহার দেহ-ভস্মের উপর যে একটি ছোট ছত্রী নির্ম্মিত হইয়াছিল, সংস্কারাভাবে উহাও জীর্ণশীর্ণ!

অনামী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

গ্রামের গাছগুলির মাথায় যখন সোনালী রৌদ্র চিক্ চিক্ করে, এক পেট পান্তা ভাত খাইয়া যদু প্রতিদিন বাহির হয়। শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষাও মানে না;—সে চলিত বাঁক কাঁধে কোনদিন ক্ষীর, কোনদিন দধি, কোনদিন বা ঘৃত লইয়া হাঁকিতে হাঁকিতে গাছের তলা দিয়া, আলের উপর দিয়া, মাঠ ভাঙিয়া নদীর ওপারে সেই ছোট শহরটিতে। বহুদূর হইতে শোনা যাইত, যদু হাঁকিতেছে, "চাই দই—", "চাই ক্ষীর—", "চাই গাওয়া ঘি—"। যাত্রাকালে মেয়ে যশোদা বলিয়া দিত, "বাবা, শীগগির ফিরো। বেলা তিন পহর ক'রো না। রোজই তোমার শাক-ভাতটুকু শুকিয়ে যায়।"

যদু বলিত, "আচ্ছা।" কিন্তু সে কথামত ফিরিতে পারে না। দুই তিনখানা গ্রাম হইয়া, শহর ঘুরিয়া আসিতে আসিতে প্রতিদিন বেলা গড়াইয়া যাইত তাহা ছাড়া, একা নদীই যে বিশ ক্রোশ। খেয়াঘাটে সময়ও যায় অনেকটা। আবার, পথে সাক্ষাৎ-কুটুম্ব লোকের সঙ্গে দেখা হইলে, দুই চারিটা সুখ-দুঃখের কথা না বলিয়া যেন থাকা যায় না। কিন্তু তাহার যশোদা তাহা বুঝে না।

তাহার স্ত্রী বিরাজের শরীর ভাল নয়। আজ কয় বৎসর ধরিয়া নাগাড় ব্যারাম। কি যে তাহার হইয়াছে! মাদুলী, তাগা-তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক, পাচন, সিদ্ধি, রাধিকা

কবিরাজের কালো বড়ি, যে যাহা বলে তাহাই করিতেছে, তবুও কিছুতেই আরাম হইতেছে না। বিরাজ দিন দিন আরও শুকাইয়া যাইতেছে। আজকাল উঠিতে-বসিতেও তাহার কষ্ট হয়। মনে তাই সুখ নাই। ঘরের মানুষটি এমন হইলে কি চলে? সংসারের যাহা কিছু পাট-ঝাঁট সব করে ঐ এক ফোঁটা মেয়ে। এক দণ্ড স্থির হইয়া বসিতে পায় না। বিরাজ বারান্দার এক কোণে নির্জীবের মত বসিয়া বসিয়া দেখিত আর নিজেকে ধিক্কার দিত; বলিত, "মা, তোর কত কষ্ট হচ্ছে।"

যশোদা বলিত, "তা'ও যদি মা, তোমার মত সব গুছিয়ে কর্‌তে পার্‌তাম।"

বিরাজ বলিত, "কোনটাই ত পড়ে থাকে না। আমি ম'লে—"

"আবার ও-কথা বল্‌ছ? তবে সব পড়ে থাক্‌—" বলিতে বলিতে যশোদা মায়ের পাশে গিয়া চুপ করিয়া বসিত। বিরাজ সস্নেহে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিত। যশোদার মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিত। সে আবার কাজের পাকে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। মেয়ে নয়, যেন লক্ষ্মী। ও মুখে হাসি না দেখিলে বড় কষ্ট হয়। তাহাকে পরের ঘরে পাঠাইয়া কি করিয়া তাহাদের চলিবে? তাহারা দুইজনে ও গাভী তিনটি অন্ন ও ঘাসজল বিনা হয়ত বাঁচিবেই না। দুগ্ধবতী কাঁদো গাভী দুটিরও টান যশোদার উপর। অন্য কেহ খাওয়াইলে তাহাদের পেট ভরে না। সেও আদর করিয়া উহাদের নাম দিয়াছে, কৃষ্ণা ও কালিন্দী।

যদুর প্রতিদিনের পণ্যের অধিকাংশই যশোদা প্রস্তুত করিয়া দেয়। সকলে খাইয়া সুখ্যাতি করে। বলে, "যদু কারিকর ভাল।" সেও চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু গত সন পূজায় শহরে চক্রবর্ত্তীবাবুদের গৃহে দধি জমাইতে গিয়া যদুর হাতযশ নষ্ট হইবার উপক্রম। ভাগ্যে তখন তাহার কাঁপিয়া জ্বর আসিয়াছিল। বিরাজের বাবা ছিল পাকা কারিকর। তাই বিরাজ অমন সুন্দর ক্ষীর-দধি বানাইতে পারে। মেয়েটাও মায়ের গুণ পাইয়াছে। ইদানীং ব্যবসায় বড় মন্দা। শহরের দুই চারিটি বড় ঘর তাহার বাঁধা খরিদদার, তাই কোন মতে চলে·····

চক্রবর্ত্তীবাবুদের মেয়েটিকে যদুর বড় ভাল লাগিত। মেয়েটি তাহার যশোদার মতই, বিশেষ করিয়া তাহার চোখ দুটি। তাহার হাঁক শুনিলেই অন্দরের দরজায় আসিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইত। সেও মাঝে মাঝে এক ভাঁড় দধি, এক হাতা ক্ষীর তাহাকে খাইতে দিত। ছোটবাবু বলিতেন, "বেটা ভারি চালাক। অম্‌নি ক'রে আমাদের খুশী রাখে। জিনিষও ভাল নয়, দরও গলা-কাটা। দেব একদিন দূর করে।" শুনিয়া যদুর মনে বড় কষ্ট লাগিত। হোক্ না সে গরিব, সাধ-আহ্লাদ কি তাহারও নাই?

এবার যদু স্থির করিল, শহরের প্রসন্ন ডাক্তারকে একবার বিরাজকে দেখাইবে। পয়সা ত খরচ হইতেছে অনেক। গরিব লোক, দিন উপায়ে চলে। যদি সারে ত উহার ঔষধেই। লোকটা যেন স্বয়ং ধন্বন্তরী।

একদিন দক্ষিণ পাড়ার মহেশখুড়ো আসিয়া কহিল, "যদু, যশির বিয়ের কি কর্‌লি? মেয়ে ত সোমত্ত হয়ে উঠ্‌ল।"

খুড়ো যেন কেমন ধারা মানুষ। ঐ ত এক ফোঁটা মেয়ে। মুখে বলিল, "দেখ্‌ছি—"

"কোথায়?"

"পুরোন-কুষ্টের নিতাই ঘোষের ছোট ছেলেটার সঙ্গে। তারাও রাজী। কিন্তু তোমার বোয়ের অসুখ—"

"তাই ত' বলি, এই বেলা শুভকাজটা চুকিয়ে ফেল্। ছেলেটা ভাল, রামলাল পণ্ডিতের পাঠশালার সর্দ্দার পোড়ো। ঘরও ভাল। বড়ভাই ছোট আদালতের পিয়াদা, মেজভাই হরিশ-উকিলের মুহুরী। দু-পয়সা আনে-নেয়, জমি-জমাও কিছু আছে। ও ছেলেটাও কোন্ না একটা চাকরি কর্‌বে। আজকাল ব্যবসায় আর সুখ নেই রে—"

যদু তাহার কথায় কোন উত্তর দিল না। মনে মনে ভাবিল, খুড়োর কথা যথার্থ। কিন্তু ঐ মেয়েকে সে কোন্ প্রাণে ঘর অন্ধকার করিয়া ছাড়িয়া দিবে? তাহাদের যে আর একটিও নাই!

যাইবার কালে খুড়ো কহিল, "পরশু হাট আছে,

একবার ওদিক পানে যাস্। হাঁ, ভাল কথা, আমার টাকাগুলোর কি করলি? দুই সন হয়ে গেল, সব টাকা এখনও পরিশোধ হ'ল না। অবস্থাও খারাপ—"

যদু কিছু দিন সময় চাহিয়া লইল। মহেশ-খুড়ো যদুর পিতার খাইয়া মানুষ। আজ গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান ও পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা ফলন্ত জমির মালিক সে। লোকের কাছে তাহার খাতির আছে। খুড়োরা দুই ভাই। নিজের দুই ছেলে, ছোটভাইয়ের দুই মেয়ে—বড়টির নাম রাসমণি। রাসমণি খঞ্জ; তাই আজও তাহার বিবাহ হয় নাই। খুড়ো শৈশবের কথা স্মরণ করিয়া যদুকে তাগাদা দেয় কম। কিন্তু আজিকার মত অন্যদিন শূন্য হাতে ফিরে না।

একদিন প্রসন্নডাক্তার তাহাদের গ্রামে আসিলে, যদু বিরাজকে দেখাইল। ডাক্তার বিধিমত ব্যবস্থা দিল। বলিল, "ভারি শক্ত ব্যারাম—পেট ও বুকের ভিতর মস্ত এক প্রলয় বাধিয়া গেছে। খুব সাবধানে থাকা দরকার। তবে—নিশ্চয় সারিবে।" যদু আশ্বস্ত হইয়া শিশিভরা ঔষধ আনিল, কটু স্বাদ, উগ্র গন্ধ। কিন্তু বিরাজ তাহা খাইল না। ধরাবাঁধা নিয়মও তাহার ভাল লাগে না, কোনকালে ডাক্তার-বৈদ্যকে তাহাদের ঘরে সে দেখে নাই। সব বিষয়ে যদুর বাড়াবাড়ি। তাহার জন্য আজ অবধি খরচ হইল কি কম! গ্রামের কয়টা লোক ডাক্তারের ঔষধ খায়? ব্যারাম হইলে কি তাহাদের সারে না? বাঁচা-মরা ভাগ্যের লিখন···বিরাজও বাঁচিল না···

দিন চলে সেই পূর্ব্বের মতই। কেবল বিরাজই নাই। যশোদাকে দেখিয়া পড়সীরা বলে, "ঘোষের ভাগ্যি দেখে হিংসে হয়। এক মেয়েতে বাসুকীর মত সংসারটা মাথায় করে রেখেছে। আমরাও ওর সঙ্গে পারি নে।" যদুও আর তিন প্রহর বেলায় ঘরে ফিরিতে পারে না—কেবলই মনে হয় ত যশোদা একলা ঘরে তাহার অপেক্ষায় আছে। কোন কোন দিন সে বাহির হয় না, ঘরেই থাকে। যশোদার কাজকর্ম্মে সাহায্য করিতে যায়। যশোদা বলে, "তুমি ছাড় বাবা। ও সব তোমার কাজ নয়।" স্নেহের তাড়নায় যদু বুঝিতে পারে না, কোন্ কাজটা তাহার।

আজকাল যদুর কি হইয়াছে;—মনে হয়, পথে পথে ঘুরিবার মত তাহার শরীরে পূর্ব্বের সে বল নাই। মাত্র ছয়মাসে সে হঠাৎ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যশোদাকেও একটু ডাগর দেখায়। তাহার বুদ্ধিটা আরও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। যদু যেন তাহার ছেলে, সে যেন তাহার মা, এমনি ভাবও সময় সময় প্রকাশ করে।

সেদিনও সে বাহির হয় নাই। ঘরের পাশে গাছ-তলায় নিশ্চিন্তমুখে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছে। খুড়ো আসিয়া উপস্থিত। যদুর হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া কহিল, "যদু, আবার একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হ'। মেয়েটা ত দুদিন বাদে পরের ঘরে চলে যাবে—"

খুড়োর আক্কেল কোন কালেই হইবে না। পঁচিশ বৎসরের সম্বন্ধ এত সহজেই ভোলা যায়? যদু যখন পনেরো বৎসরের বিরাজ দশবৎসরের মেয়ে—তাহাদের বিবাহ হয়। তাহাদের চার ছেলে, এক মেয়ে হইয়াছিল। একে একে চারটিকেই সে ঐ কালিগঙ্গার শ্মশানে রাখিয়া আসিয়াছে। বাকী ঐ মেয়েটুকু। বিরাজের চোখের জল একদিনের তরেও শুকায় নাই। সে-সব কথা আজও মনে পড়ে। ঐ সব ভাবিয়া ভাবিয়াই না বিরাজ চলিয়া গিয়াছে। আর ঐ মেয়েকে কি সে আর একটা বিবাহ করিয়া পর করিয়া দিবে? উত্তরে কহিল, "খুড়ো, এ বুড়ো বয়সে আর কেন?"

"তোর বয়সটা এমন বেশী কোথায় শুনি? এই ত সেদিন ও-পাড়ার নোদোটা চিনিবাসের মেয়েকে বিয়ে করে আন্‌লে। তার বয়স দুকুড়ি সাত বছর আর তুই হ'লি বুড়ো? কালকের ছেলে,—মাথার ওপর কেউ না থাকলে এমন হয়।"

খুড়োর স্নেহমাখা কথায় কিন্তু যদুর অস্বস্তি বোধ হয়। খুড়ো আবার কহিল, "বলি শোন্। আমাদের রাসমণিকে—"

আসল কথাটা এবার যদুর মনে নিমিষে দেখা দিল। মনের ভাব গোপন করিয়া কহিল, "আগে মেয়েটার বিয়ে দি।"

"হাঁ হাঁ, আমরাও তাই বলি—" খুড়ো খুশী হইয়া চলিয়া যায়।

দিন চলে। কিন্তু যশোদার বিবাহের দিকে যদুর তাগিদ দেখা যায় না। ব্যবসায় আর তাহার মনও নাই। খরিদদারও কমিয়া গিয়াছে। অবস্থাও খারাপ হইয়া পড়িল। না বাহির হইলে খরিদদার থাকে না।

চক্রবর্ত্তী-বাবুদের কাছে কিছু টাকা বাকী পড়িয়াছিল। একদিন তাগাদায় গিয়া যদু নিজের আর্থিক অবস্থার কথা পাড়িয়া বসিল। ছোটবাবু স্পষ্টবক্তা লোক। তাঁহার ধারণা মানুষের কেবল মস্তিষ্কই আছে। কহিলেন, "লোককে ঠকালে কি খরিদদার থাকে?" তিনিও ঠকিয়াছেন, এই ধারণায় যদুর প্রাপ্য অর্দ্ধেক কাটিয়া লইলেন। ইহার উপর হাত নাই। বাকী অর্দ্ধেক লইয়াই যদু মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলে।

তখন বর্ষাকাল। গ্রামের পুষ্করিণী ও ডোবাগুলি জলে কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহার ধার হইতে অবিশ্রান্ত ভেকের ডাক ও সজল হাওয়ায় সিক্ত তরু-পত্রের মর্ম্মরোচ্ছ্বাস ভাসিয়া আসিতেছে। অন্ধকার করিয়া কয়দিন হইতে ঝুপঝাপ বৃষ্টি। যশোদা ভিজিয়া ভিজিয়া ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিয়া বেড়াইয়াছে। একবারও গা-মাথার জল শুকাইতে পায় নাই। সেদিন যদু শহরে বাহির হইয়া যাইবার পর হইতেই তাহার প্রবল জ্বর আসিল। ঘরে ফিরিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া যদুর বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। যশোদার নিমীলিত দুই চোখের কোণ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সে চারটিকেও যে এমনি বর্ষায় ভাসাইয়া দিয়াছে! এ বর্ষা কি যশোদাকে লইয়া যাইবে? যদু কপালে করাঘাত করে আর বিধাতাকে ডাকে। একবিন্দু ঔষধ পড়ে না, একটি বৈদ্যও আসে না। যশোদার হুঁস্ নাই। ডাকিলে সাড়া দেয় না; তাহার দিকে একবার চোখ মেলিয়া তাকায়ও না। দুই দিন দুইরাত্রি এই ভাবে কাটিয়া যায়। গাভীগুলির যত্ন বা রাখালের হাতে খাইয়া পেট ভরে না; এদিক-ওদিক তাকাইয়া সারাদিন "মা"—"মা" রবে ডাকাডাকি করে, যশোদাকেই। যদুরও পেটে অন্ন নাই; মুখেও কিছু রুচিতেছে না। অন্নজলদাত্রী যে শয্যায়। কয়দিন আগেকার ভাজা মুড়িতেই সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। বাঁচুক, তাহার যশোদা বাঁচিয়া উঠুক। কপালগুণে তৃতীয় দিন হইতে জ্বর কমিতে আরম্ভ করিল। আশা-আনন্দে যদুর বুকখানা ভরিয়া গেল।

সংবাদ পাইয়া মহেশ-খুড়ো আসিল। কহিল, "ঘরে একটা মেয়েছেলে থাকলে আজ কত সাহায্য হ'ত।"

যদু মাথা নাড়িয়া কহিল, "যথার্থ কথা। আমার যশোদার যত্ন-আত্তি হ'ত। আমি কি সব পারি? আর কটা দিন সবুর কর—"

খুড়ো আশ্বস্ত হয়।

ক্রমে যশোদা সুস্থ হইয়া উঠিল। যদু তাহাকে কোন কাজে হাত দিতে দেয় না; নিজেই সব করে। অপটু হাত; কোন কিছু গুছাইয়া করিতে পারে না। যশোদা সস্নেহ হাস্যে বলে, "তুমি রাখ বাবা। আমি সব পারব। এখন ত ভাল হ'য়ে গেছি—"

"হুঁ! তোর শরীরের আর আছে কি? মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। ডব্‌ডবে চোখ-দুটোর সে চাউনি আর নেই—"

"বাবার যেমন কথা। শরীরে কি হয়েছে আমার?"

"আচ্ছা—আচ্ছা" বলিয়া যদু গোয়ালের দিকে ছুটে।

দেখিতে দেখিতে অগ্রহায়ণ আসিয়া পড়িল। পাকা ধানে মাঠগুলি ভরিয়া গিয়াছে। খুড়োর মুখে যদু শোনে, দেরি দেখিয়া নিতাই ঘোষের ছোটছেলের অন্য জায়গায় সম্বন্ধ হইতেছে। মেয়েপক্ষ দান দিবে অনেক,—মেয়েটি তেমন ভাল নয়। যদুর চমক ভাঙিল। সে ছুটিয়া গেল সেই পুরোন-ফুটে ছেলের বাড়ি। তাহার কিছু নাই সত্য, কিন্তু এমন লক্ষ্মীপ্রতিমা মেয়ে কয়জনের ঘর আলো করিয়া আছে? সে কেমন করিয়া বুঝাইবে, যশোদাকে দান করা আর তাহার হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলা সমান। অনেক বলা-কওয়ায় ছেলে-পক্ষ রাজী হইল। কহিল, "দান চাই—পঞ্চাশ টাকা নগদও দিতে হবে।"

টাকা? টাকা সে কোথায় পাইবে! দান দিবে ঐ

উত্তরের বড় জমিখানা আর কালো গাভী ছুটি। বাকী জমিটুকু আর বাড়িখানা ও একটি গাভী হইলেই তাহার একার দিন চলিয়া যাইবে···আর বেশীদিনও নাই··· তারপর ত—

বরপক্ষ কহিল, "টাকাও চাই—"

"আচ্ছা, তাও দেব।"

যছুর ছোটজমিখানা ও ঘরের পাশেই চক্রবর্ত্তী-বাবুদের বিস্তীর্ণ জমি। সে শহরে গিয়া তাঁহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া ঘর-দরজা ও জমিটুকু বন্ধক রাখিল। কর্ত্তা কহিলেন "দিনকাল খারাপ; তুই বলেই পঞ্চাশ টাকা দিলাম।"

যছু কৃতজ্ঞতায় কর্ত্তার পায়ের ধূলা গায়ে মাথায় মাখিয়া টাকা কয়টি তুলিয়া লইল।

তারপর বিবাহের পালা। গরিবের ঘরের বিবাহ, তাহার আয়োজনই বা কি, উৎসবই বা কে করিবে? কেবল পিতার কল্যাণআশীষেই তাহা মধুর-উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পরদিন বেলা শেষে বরবধূর যাত্রাকালে পিতা কাঁদে, মেয়ে কাঁদে। যশোদা কহিল, "বাবা, আর কে তোমায় দেখ্‌বে? শরীরের অযত্ন ক'রো না। যা' পার ছুবেলা ছু-মুঠো ফুটিয়ে নিও। আজ মা থাক্‌লে—" যশোদার গলা ধরিয়া আসে।

যছু কাহাকে সান্ত্বনা দিল সেই জানে। কহিল, "কাঁদিস্‌ নে, মা লক্ষ্মী। আমার জন্তে ভাবনা কি? তুই সুখে থাক্—" আর কিছু বলিতে পারিল না।

সমবেত আত্মীয়া, কুটুম্বিনীরা এই দৃশ্য দেখিয়া অঞ্চলে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। খুড়ী কহিল, "এ সময় সব চোখের জল ফেলো না, অকল্যাণ হ'বে—"

শানাই-ঢোল প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বেহারারা ডুলি ছুইখানা কাধে তুলিয়া লইয়া ধীরে আঙিনা পার হইয়া পথের উপর গিয়া পড়িল। যছু কিছুদূর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে গ্রামের মাঝে বটগাছটার তলায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ ছুটি ছুটিয়া চলিল ডুলি ছুইখানির পিছু পিছু··· যশোদাকে লইয়া ঐ যে তাহারা চলিয়া যাইতেছে, গ্রাম ছাড়াইয়া, মাঠ ভাঙিয়া, ধানক্ষেতের আলে আলে।··· সেখান হইতে মণ্ডলদের ধানের মরাই বামে রাখিয়া, শিবমন্দিরের সম্মুখ দিয়া, আক-ক্ষেতের পাশে পাশে চলিতে লাগিল। পিছনে শানাই বাজিতেছে। সম্মুখে কিছুদূরে নদীর বাঁধ। ডুলি ছুইখানা হঠাৎ বাঁধের নীচে নামিয়া পড়িল। তাহার কোল দিয়াই পথ। আর তাহাদের দেখা যায় না। চোখে পড়ে বেহারাদের পায়ে পায়ে ধুলা উড়িতেছে—যেন ধূসর নিশান। যছু তাহার পানে তাকাইয়া গাছের তলে বসিয়া পড়ে। ক্রমে তাহাও আর দেখা যায় না। হেমন্তের শীতল বাতাস তাহাকে উড়াইয়া লয়। কেবল দিগন্তের কোল হইতে ভাসিয়া আসিয়া শানাইয়ের সকরুণ সুর ছায়াচ্ছন্ন মাঠের উপর ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ায় যেন তাহারই শূন্য মনের কান্না···

* * *

পরদিন খুড়া আসিয়া কহিল, "এ শূন্য সংসারে টিক্‌বি কি করে? এইবার নিজের একটা ব্যবস্থা কর্।"

যছু কহিল, "কাকে নিয়ে আর সংসার খুড়ো? এ কাঙালের দিন গুণ্‌তে গুণ্‌তে কেটে যাবে।"

নক্ষত্রের জন্মকথা

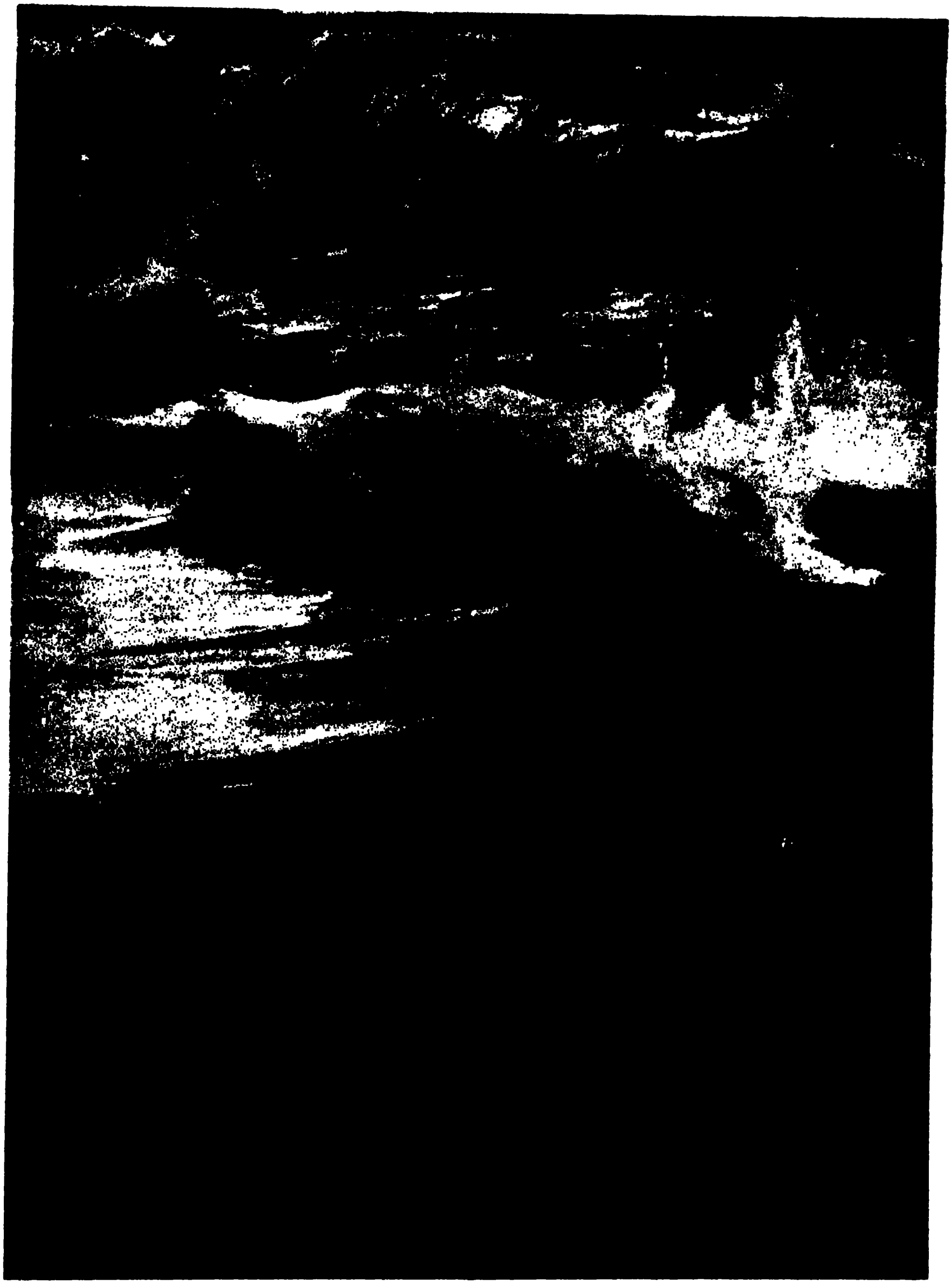
শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ডি-এস্-সি

দূরবীণের সাহায্যে আকাশের নানাস্থানে নানাপ্রকার নীহারিকা দেখিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় আকাশে যেন অস্পষ্ট সাদা মেঘ ভাসিতেছে। এগুলি যে মেঘ অথবা সুদূর ছায়াপথের ন্যায় নক্ষত্র-সমষ্টি নহে, তাহা পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায়। শক্তিমান দূরবীণের সাহায্যেও নক্ষত্রকে বিন্দুর মতই দেখায়, কিন্তু এই নীহারিকার অনেক স্থলে বড় বড় আকারের আলোকখণ্ড দেখা যায়। বস্তুতঃ এই নীহারিকাগুলি সুদূরপ্রসারিত বাষ্পপুঞ্জেরই সমষ্টি। বাষ্পীয় পদার্থের কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার সম্ভব নহে—নীহারিকারাশিরও কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। ইহাদের কোন কোনটি গোল, কোন কোনটি লম্বা, কোন কোনটি আবার কুণ্ডলীকৃত। গ্রহের ন্যায় কতকটা সুস্পষ্ট গোলাকৃতি একপ্রকার নীহারিকার কথা জানা আছে—ইহাদিগকে নীহারিকা-গ্রহ (Planetary nebula) বলা হয়।

এই নীহারিকারাশি হইতেই আমাদের সৌরজগৎ ও অন্যান্য জগতের সৃষ্টি। জার্ম্মান্ দার্শনিক কাণ্ট (Kant) সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম এই নীহারিকাবাদের আভাস দিয়াছিলেন। পরে বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিৎ লাপ্লাস্ (Laplace) এই মতটিকে এক বিশিষ্ট আকার দান করিয়াছিলেন। সৌরজগতের অভিব্যক্তির ইতিহাসে এ-মতবাদের আজ প্রতিষ্ঠা নাই—এ বিষয়ে অনেকদিন হইতে অনেক মতভেদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সমস্ত মতভেদ সত্ত্বেও বিশ্বসৃষ্টির আদিতে যে এই নীহারিকা, সে-বিষয়ে আজ সকলেই একমত।

সকলের আরম্ভেরও আরম্ভ আছে—এই নীহারিকার আরম্ভ কোথায়? জ্ঞানবীর নিউটন্ (Newton) তাঁহার মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রচারের অল্প পরেই এই প্রশ্নের উত্তর যাহা অস্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ জীন্‌স্ (Jeans) তাহা সুস্পষ্ট মীমাংসা করিয়াছিলেন।

বাষ্পের ধর্ম্ম প্রসারণ। ঘরের একস্থানে কিছু বাষ্প রাখিলে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে—তাহার কারণ বাষ্পকণাগুলি অনেকটা অপ্রতিহত ভাবেই চঞ্চলবেগে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই বাষ্পকণাগুলির ভিতর পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণ এত সামান্য যে, বাষ্পকণার স্বাভাবিক গতিকে ইহা প্রতিরোধ করিতে পারে না। ইহারই ফলে বাষ্পের প্রসারণ। আমাদের পৃথিবীকে যে, বায়ুমণ্ডল ঘিরিয়া আছে—লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া তাহা অনেকটা স্থায়ী ও স্থিরভাবে আছে। এই বায়ুমণ্ডল যে আজও মিলাইয়া যায় নাই, তাহার কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণ বায়ুকণাগুলিকে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই—পৃথিবীর দিকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের কণাগুলি অল্পবিস্তর বিচ্ছুরিত হইতেছে সন্দেহ নাই। সূর্য্যও ত এক তপ্ত ও তাপদীপ্ত বাষ্পরাশির সমষ্টি। এই বিরাট বাষ্পমণ্ডলেও মাধ্যাকর্ষণ তপ্ত বাষ্পের গতিশীল কণাগুলিকে প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্রের চারিদিকে বায়ুমণ্ডল নাই, কারণ চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ কম। বুধগ্রহের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর তুলনায় সামান্য কিছু কম হইলেও ইহাতে কোনও বায়ুমণ্ডল নাই। ইহার কারণও স্পষ্ট। বুধগ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়া অধিক তপ্ত, বায়ুকণাও সেজন্য অধিক চঞ্চল। বুধগ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বাষ্পের চঞ্চল গতিকে পরাভূত করিতে পারে নাই. বলিয়াই বায়ুমণ্ডল সেখানে উবিয়া গিয়াছে। সুতরাং সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, বাষ্পমণ্ডল পুঞ্জাকারে স্থায়িভাবে থাকিতে হইলে মাধ্যাকর্ষণের সহিত বাষ্পকণার বেগের সামঞ্জস্য প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণ বাষ্পখণ্ডের আয়তন ও ভারের উপর নির্ভর করে। কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে, কোন একটি স্থায়ী বাষ্পমণ্ডলের সুনির্দিষ্ট ন্যূনতম ভার ও আয়তন আছে। তার ইহা



ঢেউ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

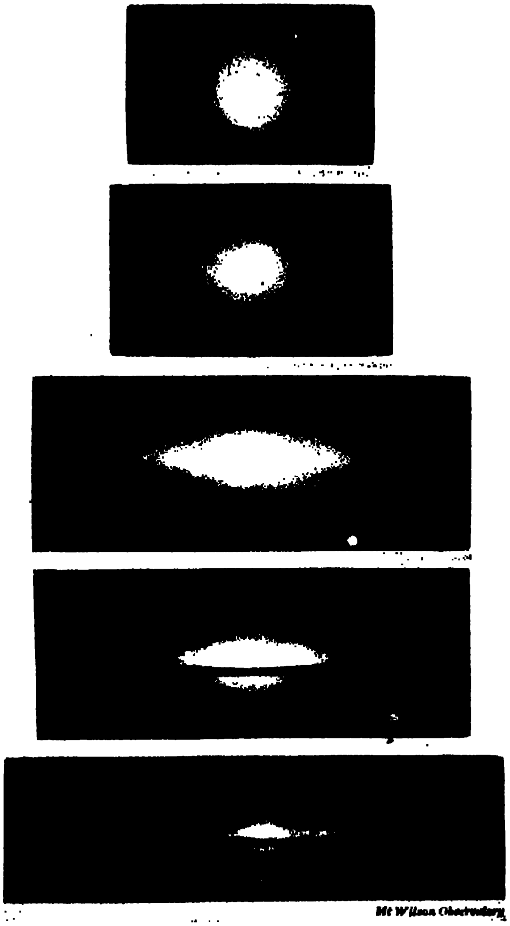
অপেক্ষা কম হইলেই বিপদ্—বাষ্পপুঞ্জ আকাশে ক্রমে ক্রমে মিলাইতে থাকে; কিন্তু অধিক হইলে ক্ষতি নাই—বরঞ্চ ইহাতে বাষ্পপুঞ্জের আয়তন ক্রমে বাড়িতে পারে, কারণ মাধ্যাকর্ষণ প্রবল বলিয়া বাহিরের বাষ্পকণাগুলি এই বৃহৎ বাষ্পপুঞ্জের দিকে ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে থাকিবে।

বাষ্পকণার বেগ ও মাধ্যাকর্ষণের সামঞ্জস্য—নীহারিকাসৃষ্টির ইহাই মূল কথা। সেইজন্যই আকাশে বহুযোজনব্যাপী বাষ্পরাশির স্থায়িভাবে ভাসিয়া থাকা সম্ভব। জীন্স্ মনে করেন, সৃষ্টির আদিতে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত জড়পদার্থ সমানভাবে আকাশে বিস্তৃত ছিল। কোনও সামান্য কারণে হয়ত একদিন এই অখণ্ড বাষ্পমণ্ডলে অসমতার সৃষ্টি হয় এবং স্থানে স্থানে বাষ্প ছাড়া-ছাড়া হইয়া যায়। গাঢ়ত্ব অতি সামান্য হইলেও এই ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক ছিল, সেজন্য ইহাদের মাধ্যাকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই প্রবল মাধ্যাকর্ষণই বাষ্পকণাগুলিকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, প্রক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। ইহারই ফলে নীহারিকার সৃষ্টি। এই মত অনুসারে নীহারিকাগুলির ন্যূনতম আয়তন ও ভারনির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এই ন্যূনতম আয়তন আকাশের নীহারিকার প্রায় সমান-সমানই হইবে। গাণিতিক সিদ্ধান্তের সহিত বাস্তবের এই সামঞ্জস্য দেখিয়া মনে হয় জীন্সের মত সত্য। নীহারিকাগুলির বিপুলতার পরিমাণ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহাকে মহা-নীহারিকা (Great Nebula) বলে য়্যান্ড্রোমিডা-মণ্ডলের সেই বিখ্যাত নীহারিকার ওজন সূর্য্য অপেক্ষা ৩৫০ কোটি গুণ। কন্যারাশির (Virgo) নীহারিকা সূর্য্য অপেক্ষা ওজনে প্রায় দুই শত কোটিগুণ বড়।

আকাশে ভিন্ন ভিন্ন নীহারিকার ভিন্ন ভিন্ন আকার। ইহার কারণ অতি সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সৃষ্টির আরম্ভে এক অখণ্ড বাষ্পমণ্ডল হইতে যখন ঘনীভূত নীহারিকার সৃষ্টি হইল, ইহার স্থানে স্থানে তখন অল্পাধিক পরিমাণে স্রোত থাকা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। নানাদিক হইতে কোন রূপ সঙ্গতি না রাখিয়াই এই স্রোত নীহারিকারাশিতে প্রবাহিত হইয়াছিল। এই স্রোতের ফলেই বাষ্পরাশিতে আবর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। এই আবর্ত্তন প্রথমে অবশ্য অতি সামান্যই ছিল; পরে নীহারিকার বাষ্পরাশি শীতল হইয়া যতই সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে ইহাদের আবর্ত্তন সেই পরিমাণে বাড়িতে লাগিল। আকাশের ভিন্ন ভিন্ন নীহারিকা সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন বেগে পাক্ খাইতেছে। বর্ণচ্ছত্র-যন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে জানা যায় যে, য়্যান্ড্রোমিডা-মণ্ডলের নীহারিকাটির একবার আবর্ত্তিত হইতে প্রায় দুই কোটি বৎসর লাগিবার কথা। নীহারিকার বিপুল আয়তনই যে এই দীর্ঘ আবর্ত্তনকালের কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সৃষ্টির আদি হইতে সকল নীহারিকারই আবর্ত্তন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছিল এবং এখনও হইতেছে। এই ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু আবর্ত্তনের ফলেই আদিকাল হইতে যুগে যুগে নীহারিকাগুলির বিভিন্ন আকার সম্ভব হইয়াছে। এই বিবর্ত্তনের ইতিহাস আকাশে আজ অতি সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত। নীহারিকায় যদি একেবারেই আবর্ত্তন না থাকে, তাহা হইলে ইহার আকার বৃত্তাকার হইবে সন্দেহ নাই। আবর্ত্তন যদি সামান্য হয় তবে পৃথিবী অথবা বৃহস্পতির ন্যায় ইহার উত্তর-দক্ষিণ কিছু চাপা ও কটি-প্রদেশ কিছু স্ফীত হইবার সম্ভাবনা। আবর্ত্তন আরও দ্রুত হইলে নীহারিকার আকার আরও প্রলম্বিত হইয়া উহার দুই প্রান্ত সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিবে। এইরূপ সকল আকারেরই নীহারিকা আকাশের নানা স্থানে দেখা গিয়াছে। আবর্ত্তন যদি ইহা অপেক্ষাও দ্রুত হয়, নীহারিকার মধ্য প্রদেশে কটিবন্ধের ন্যায় একটি সুস্পষ্ট প্রান্তরেখা তখন দৃষ্ট হইবে ও নীহারিকার দুই সূক্ষ্ম সীমান্ত হইতে বাষ্পরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া এই প্রান্তরেখার বরাবর ভাসিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য্য আকারের নীহারিকার দৃষ্টান্ত কন্যারাশির নীহারিকাটি। বাষ্পকণার বেগ ও মাধ্যাকর্ষণ, এই দুইয়ের সামঞ্জস্যের ফলে অখণ্ড বাষ্পমণ্ডল হইতে যেরূপ পুঞ্জাকারে নীহারিকার সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল, নীহারিকা হইতে উৎক্ষিপ্ত বাষ্পরাশিও সেইরূপ একই

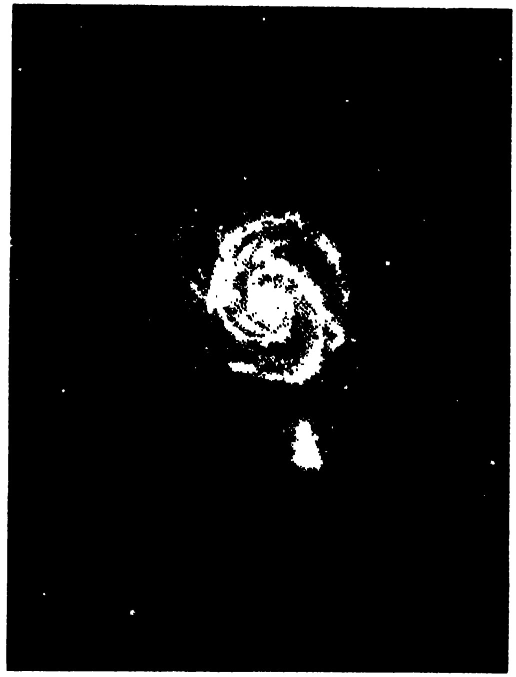
প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পপুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র বাষ্পপুঞ্জই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের নক্ষত্র। জীনস্ এই ক্ষুদ্র বাষ্পপুঞ্জগুলির ন্যূনতম ভার হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার হিসাব মতে এই ক্ষুদ্র বাষ্পপুঞ্জ-



আবর্ত্তনের ফলে নীহারিকার বিভিন্ন আকার ধারণ।
চতুর্থ (উপর হইতে) চিত্রটি কন্যা-রাশির নীহারিকার।

গুলির পরিমাণ কমপক্ষে নক্ষত্রেরই সমান। বাস্তবের সহিত এই গণনার মিল পাইয়া ও নীহারিকারাশির বিবর্ত্তন-ইতিহাসের প্রতি স্তরটি আকাশে অতি সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত দেখিয়া ইহাদের অন্তর্নিহিত নক্ষত্রের জন্মতত্ত্বটির সত্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ হয় না।

আবর্ত্তনের চাপে যখন নীহারিকার দুই প্রান্ত হইতে বাষ্পরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া নীহারিকার নৈরক্ষিক ক্ষেত্রে

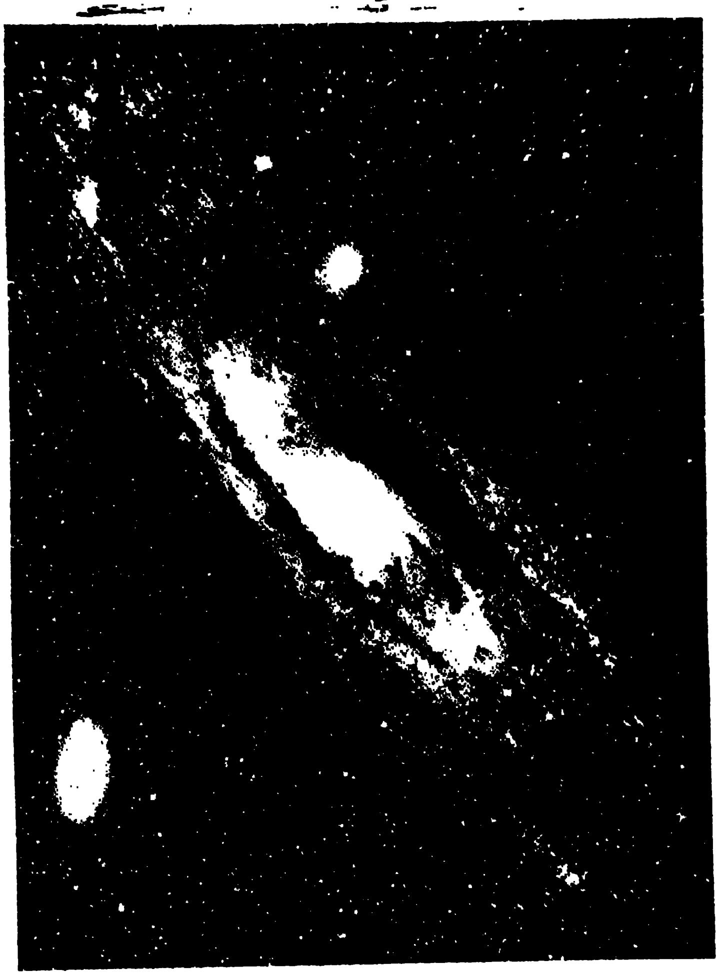


ভেনাটিসি (Venatici) মণ্ডলের কুণ্ডলীকৃত নীহারিকা।



Sagittarius-মণ্ডলের নীহারিকা। ইহার কোন বিশিষ্ট আকার নাই

(equatorial plane) ভাসিতে থাকে, সেই সময়ে যদি কোন জ্যোতিষ্ক দৈবাৎ ইহার নিকটবর্ত্তী হয়, তবে নীহারিকাটি ক্রমে ক্রমে কুণ্ডলীকৃত আকার ধারণ করিবে। আগন্তুক জ্যোতিষ্কটি ও নীহারিকা হইতে বিচ্ছিন্ন বাষ্প-পুঞ্জের মধ্যে অতি সামান্য আকর্ষণেই বাষ্পপুঞ্জগুলি নীহারিকার দুই দিকে প্যাঁচের মত আকারে প্রসারিত হইয়া যায়। শীতল হইতে হইতে নীহারিকার আবর্ত্তন যখন ক্রমেই বাড়িয়া যায়, ইহার দেহের সমস্ত বাষ্পই তখন বাহির হইয়া গিয়া কুণ্ডলীকৃত আকারে ছড়াইয়া পড়ে। কুণ্ডলীকৃত নীহারিকার (Spiral Nebula.) ইহাই জন্মরহস্য। সপ্তর্ষিমণ্ডলের (Ursa Major) নীহারিকাগুলি, Canes Venatici-মণ্ডলের নীহারিকা প্রভৃতি কুণ্ডলীকৃত নীহারিকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত। য়্যানড্রোমিডা-মণ্ডলের নীহারিকাটিও এই জাতীয়। কুণ্ডলীকৃত নীহারিকার সৃষ্টি সম্বন্ধে অন্য একটি মতের কথা পরে উত্থাপন করিব।



য়্যানড্রোমিডা-মণ্ডলের নীহারিকা

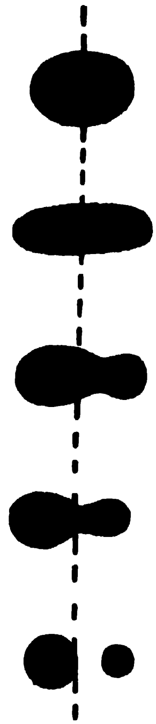
নীহারিকার আবর্ত্তনের ফলেই যখন নক্ষত্রের জন্ম, নক্ষত্রগুলিতেও তখন আবর্ত্তন থাকা সম্ভব। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, এই আবর্ত্তনের ফলে নক্ষত্র হইতে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের সম্ভাবনা। লাপ্লাস এই ভাবেই সূর্য্য হইতে গ্রহের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই আজ প্রমাণিত হইয়াছে যে, নক্ষত্র হইতে বাষ্প উৎক্ষিপ্ত হইলেও তাহা পুঞ্জাকারে স্থায়ী হইতে পারে না। উৎক্ষিপ্ত বাষ্পরাশির পরিমাণ নক্ষত্রের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; সুতরাং ইহার মাধ্যাকর্ষণও অল্প। এই মাধ্যাকর্ষণের সহিত বাষ্পকণার বেগের সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে বাষ্পকণার বেগ খুব কম করিয়া ধরিলেও নক্ষত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত বাষ্পরাশির নক্ষত্র অপেক্ষাও ভারী হওয়া প্রয়োজন।

নক্ষত্রের আবর্ত্তনের নিদর্শন আছে। সূর্য্য একটি মাঝারি ধরণের নক্ষত্র। সূর্য্যে যে আবর্ত্তন আছে তাহা আজ সূর্য্যের কলঙ্ক * (sunspots) পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে। বর্ণচ্ছত্র-যন্ত্রের সাহায্যে ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মভাবে

* সূর্য্যের উপরিভাগে বটিকা-বিস্ফোটের ফলে স্থানে স্থানে তাপদীপ্ত বাষ্পরাশি যখন সরিয়া যায়, অপেক্ষাকৃত শীতল অংশগুলি তখন কিছু কিছু বাহির হইয়া পড়ে। এই অল্প-তপ্ত ও অল্প-উজ্জ্বল অংশগুলি চারি পার্শ্বের অত্যুজ্জ্বল আলোকের তুলনায় কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। সূর্য্যে কলঙ্ক সম্বন্ধে অন্য মতও আছে।

সূর্য্যের আবর্ত্তন পরীক্ষিত হইয়াছে। একবার আবর্ত্তিত হইতে সূর্য্যের প্রায় ত্রিশ দিন লাগে।

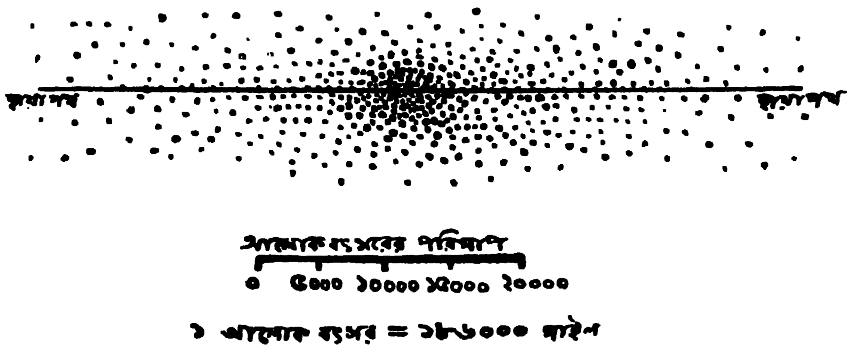
নক্ষত্রের আবর্ত্তনের একটি পরোক্ষ নিদর্শন সম্ভবত যুগল-নক্ষত্রের সৃষ্টি। আকাশের স্থানে স্থানে অনেক যুগল-নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সিরিয়স্ (Sirius) ইহাদের অন্যতম। যুগল-নক্ষত্র পরস্পরের খুব নিকটবর্ত্তী এবং একটি অপরটির চারিদিকে ভ্রাম্যমাণ। কোনও নক্ষত্র যখন শীতল হইতে হইতে বাষ্প অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণত হয়, জীন্স্ মনে করেন, এই তরল অবস্থায় দ্রুত আবর্ত্তনের ফলেই যুগল-নক্ষত্রের জন্ম। বাষ্পীয় ও জলীয় পদার্থের উপর আবর্ত্তনের ফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তরল পদার্থ যখন আবর্ত্তিত হয়, প্রথমে ইহা ঈষৎ প্রলম্বিত হয় সত্য, কিন্তু ক্রমেই আবর্ত্তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার মধ্যস্থল সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে এবং আবর্ত্তন আরও দ্রুত হইলে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং খণ্ড দুইটি একে অন্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। খণ্ড দুইটি ছোট-বড় হইলেও ইহাদের আয়তনে খুব বেশী বৈষম্য থাকে না। যুগল-নক্ষত্র পরীক্ষা করিলেও দেখা যায় যে, ইহাদের আয়তনের তারতম্য অনেক স্থলেই খুব বেশী নহে। সূক্ষ্ম গণিতের ভিতরে না গিয়াও বলা যায় যে, দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবার সময়ে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী।



যুগল-নক্ষত্রের অভিব্যক্তি

এই আভ্যন্তরীণ চাঞ্চল্যের জন্যই হয়ত যুগল-নক্ষত্র সমানভাবে আলোক বিকীরণ করিতে পারে না। এ বিষয়ে এখনও সন্দেহের কারণ আছে। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় এই যে, অনেক যুগল-নক্ষত্রেরই উজ্জ্বলতা স্থির থাকে না। এক-একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে এবং কখনও কখনও অনিয়মিতভাবে ইহারা হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল (Variable) একক নক্ষত্রও অনেক আছে। জ্যোতিষিগণ এই উজ্জ্বলতা পরিবর্ত্তনের নানা কারণ নির্দ্দেশ করেন। তরল নক্ষত্র (liquid star) ভাঙিয়া দুই খণ্ড হইবার পূর্ব্বে নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ হয়ত এই উজ্জ্বলতা পরিবর্ত্তনের একটি কারণ। জীন্স্ বলেন, সীফিড (Cepheid) নামক প্রসিদ্ধ পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রগুলি যুগল মূর্ত্তি ধারণ করিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে উপনীত হইয়াছে। এই যুগল মূর্ত্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে—নক্ষত্র-জীবনের এক এক মুহূর্ত্ত কত সহস্র বৎসর কে বলিবে ?

যুগল-নক্ষত্রের বিবর্ত্তনধারায় কয়েকটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের এত নিকটবর্ত্তী যে, ইহাদের মধ্যে প্রবল আকর্ষণের ফলে অত্যধিক জোয়ারের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। এই জোয়ারের ফলে পরস্পর প্রদক্ষিণকারী ঘূর্ণায়মান নক্ষত্র দুইটির পরিণাম কি গতি-বিজ্ঞান তাহার উত্তর দিয়াছে। প্রথমতঃ ইহাদের পরস্পরের ব্যবধান ক্রমশ বাড়িতে থাকিবে এবং আবর্ত্তনের বেগও ক্রমে ক্রমে এই জোয়ারের খেলায় সমান সমান হইয়া যাইবে। পরিশেষে লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইলে নক্ষত্র দুইটির আবর্ত্তনকাল ও প্রদক্ষিণকালের মধ্যেও কোন বৈষম্য থাকিবে না। গতি-বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সুদূর ভবিষ্যতে যুগল-নক্ষত্রের প্রত্যেকটি একে অন্যের দিকে কেবল একই পাশ ফিরাইয়া একে অন্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী একদিন ফলিবে তাহার প্রমাণ এই যে, সূর্য্য ও বুধগ্রহের মধ্যে ঠিক এই রূপই এক অঘটন ইতিমধ্যেই ঘটিয়া গিয়াছে। বুধগ্রহ আজ তাই তাহার একই পাশ সূর্য্যের দিকে বরাবর ফিরাইয়া আছে। বলা বাহুল্য, সূর্য্য ও গ্রহের সম্বন্ধ যুগল-নক্ষত্রের সম্বন্ধ নহে, কিন্তু বুধগ্রহ সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বলিয়া যুগল-নক্ষত্রের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও প্রবল জোয়ার একদিন খেলিয়া গিয়াছিল। ইহার ফলেই যে অনতিবিলম্বে বুধগ্রহের প্রদক্ষিণকাল



নক্ষত্র-মণ্ডলের মানচিত্র।
(Galactic System)

আবর্ত্তনকাল সমান হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে এই একই প্রক্রিয়া। পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে চন্দ্রের আজ প্রায় সাতাশ দিন লাগে, ঠিক এই সময়ের মধ্যে চন্দ্র নিজেও একবার আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের আবর্ত্তনকাল ও প্রদক্ষিণকাল এক হইয়াছে বলিয়াই আজ চন্দ্রের কেবল এক পার্শ্বই আমরা দেখিতে পাই। পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে এখনও জোয়ার-ভাঁটা চলিতেছে—পৃথিবীর আবর্ত্তন জোয়ারের চাপে ক্রমশ কমিতেছে। ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যখন পৃথিবীর আবর্ত্তনকাল ও চন্দ্রের প্রদক্ষিণকাল সমান হইয়া সাতচল্লিশ দিনে পরিণত হইবে। পৃথিবীর একার্দ্ধের মানুষ তখন কোনও কালেই চাঁদের মুখ দেখিবে না। গণিতজ্ঞ বলেন, পাঁচ শত কোটি বৎসর পরে এইরূপ কাণ্ড একদিন ঘটিবে।

যুগল-নক্ষত্রের বিবর্ত্তনে আরও একটি শক্তি কার্য্য করিতেছে, এ-বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ইহার ফলেও যুগল-নক্ষত্রের পরস্পরের ব্যবধান ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, জড়ে ও আলোকে মূলগত কোন প্রভেদ নাই—প্রতি ভাস্বর বস্তুই আলোক বিকীরণ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেইজন্যই কোটি কোটি বৎসর আলোক-বিকীরণের ফলে যুগল-নক্ষত্রের ভার যে ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ফলে পরস্পরের আকর্ষণ কমিয়া যাওয়ায় নক্ষত্র-যুগলের মধ্যে ক্রমশঃ ছাড়াছাড়ি হইতেছে।

বিবর্ত্তনের ইতিহাসে যুগল-নক্ষত্রেরও আবার খণ্ডিত হইবার আশঙ্কা আছে। আকাশের স্থানে স্থানে যে তিন চারিটি নক্ষত্র একত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা এই যুগল নক্ষত্র হইতেই জন্ম লইয়াছে।

এইবার জ্যোতিষ্কমণ্ডলে নক্ষত্রের সংস্থান ও সমাবেশের সংক্ষিপ্ত আলোচনার উত্থাপনমাত্র করিব। বহু বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ উইলিয়ম হার্শেল ও তাঁহার পুত্র আকাশে নক্ষত্ররাজির এক আশ্চর্য্য সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। নক্ষত্ররাজি যেন ছায়াপথের দুই পার্শ্বে সুবিন্যস্ত। ছায়াপথেই নক্ষত্রের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার দুই দিকে নক্ষত্র-সংখ্যা সমানভাবে ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে। হার্শেল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, এক মহানক্ষত্রমণ্ডলে (galactic system) সূর্য্যকে* প্রায় কেন্দ্র করিয়া সকল নক্ষত্রের সমাবেশ। কেন্দ্রস্থলে নক্ষত্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং কেন্দ্র হইতে যতদূরে অগ্রসর হওয়া যায়, এই নক্ষত্রের সংখ্যা সেই পরিমাণে কমিতে থাকে। ছায়াপথের দিকে এই নক্ষত্র-মণ্ডল সুদূর বিস্তৃত এবং ইহার অনুপার্শ্বদিক (transverse side) অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। (চিত্র দ্রষ্টব্য) নক্ষত্রমণ্ডলটি দেখিতে যেন অনেকটা হাত-ঘড়ির মত গোল অথচ চ্যাপ্টা। অন্য সকল দিকের তুলনায় ছায়াপথের দিকেই সেজন্য নক্ষত্র-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নক্ষত্রের এইরূপ সমাবেশ কল্পনা করিলে আকাশে নক্ষত্ররাজি কি ভাবে প্রতীয়মান হইবে তাহা

* Sagittarius-মণ্ডলই এই নক্ষত্রমণ্ডলের (Galactic system) কেন্দ্র—ইহাই আধুনিক সিদ্ধান্ত।

খুব স্পষ্ট। নিকটের আকাশে নক্ষত্র-সংখ্যা চারিদিকেই প্রায় সমান-সমান, সেজন্য উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি আকাশে সমানভাবেই সন্নিবিষ্ট মনে হয়। কিন্তু দূরের আকাশে নক্ষত্রের মোট সংখ্যা ছায়াপথের দিকেই অত্যন্ত অধিক, সেজন্য দূরের নক্ষত্র অন্যান্য স্থানে দৃষ্ট না হইলেও ছায়াপথের দিকেই ইহাদের সমষ্টিগত আলোক অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল রেখারূপে প্রতিভাত হয়। নক্ষত্রমণ্ডলের প্রলম্বিত দিকটিকেই এই ছায়াপথ সূচিত করিতেছে। আকাশে নক্ষত্রের সমাবেশ সম্বন্ধে আরও অনেক বিশেষত্ব ও নূতন তথ্য আজ জানা গিয়াছে।

নক্ষত্রের এইরূপ সংস্থান বিন্যাস ও বিশেষত্বের কারণ কি? সমষ্টিগত-গণনার (statistical calculation) সাহায্যে ইহার উত্তর সম্ভব হইয়াছে। অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে প্রত্যেকটি নক্ষত্রের গতিবিধি অত্যন্ত জটিল। এই গতিবিধি নির্দ্ধারণে গতি-বিজ্ঞান পরাস্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক নক্ষত্রের গতিবিধি সূক্ষ্মভাবে নির্দ্ধারিত না হইলেও সাধারণভাবে এ-বিষয়ে মীমাংসা সম্ভব। যেমন কোন দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের গতিবিধি সূক্ষ্মভাবে জানা না থাকিলেও সে-দেশের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা, জন্মমৃত্যুর গড়পড়তা হার প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। সাধারণ-ভাবে বলা যাইতে পারে, আকাশে প্রত্যেক নক্ষত্রেরই কক্ষ আছে। কক্ষে একবার ঘুরিয়া আসিতে তাহার কোটি কোটি বৎসর লাগে। গতিজ্ঞেরা বলেন, নক্ষত্রের বয়স কমপক্ষে পঞ্চাশ সহস্র কোটি বৎসর—সুতরাং ইহাদের প্রদক্ষিণকাল কোটি কোটি বৎসর হইলেও ইহারা জন্মের পর অনেক সহস্রবার নিজ নিজ কক্ষে ঘুরিয়া আসিয়াছে। অনেক সহস্রবার নিজ নিজ কক্ষে ঘুরিয়া মনে হয় আকাশে ইহাদের সংস্থান ও সমাবেশ অনেকটা স্থায়ী হইতে পারিয়াছে।

এই সংস্থিতি ও বিন্যাস পূর্ব্ব-বর্ণিত নক্ষত্রমণ্ডলেরই অনুরূপ হইবে—সমষ্টিগত গণনার ইহাই সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তের মূলে একটি অনুমান আছে। অনুমানটি এই যে, সমস্ত নক্ষত্রের সমষ্টিগত একটি আবর্ত্তন আছে। এই অনুমান আজ বাস্তব বলিয়া মনে হইতেছে। Oort, Plaskett প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার ফলে মনে হয় মহাচক্রের ন্যায় নক্ষত্রমণ্ডল ত্রিশ কোটি বৎসরে একবার আবর্ত্তিত হইতেছে।

এই নক্ষত্রমণ্ডলের ভিতর আরও এক নক্ষত্র-সম্প্রদায়ের কথা জানা আছে। ইহারা অনেকটা বৃত্তাকার স্তবকের ন্যায় বলিয়া ইহাদের গোলক-নক্ষত্র-স্তবক (globular clusters) বলা হয়। এইরূপ নক্ষত্রস্তবক আকাশে প্রায় এক শতটি দেখা গিয়াছে। হার্‌কিউলিস্ মণ্ডলের নক্ষত্রস্তবক ইহাদের অন্যতম। এই সকল স্তবকের সংস্থান ও সমাবেশ সম্বন্ধেও সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভব। নক্ষত্রমণ্ডলের বাহিরে অনেক নীহারিকা দেখা যায়। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও য়্যান্‌ড্রোমিডা মণ্ডলের কুণ্ডলীকৃত নীহারিকা ও অন্যান্য নীহারিকা এই নক্ষত্রমণ্ডলের বহির্ভূত। এই বাহিরের নীহারিকা দেখিয়াই হার্শেল ইহাদিগকে দ্বীপজগৎ (Island universe) বলিয়াছিলেন। মহানক্ষত্রমণ্ডলের নিকট এই সকল নীহারিকা ক্ষুদ্র দ্বীপেরই মত।

নক্ষত্রমণ্ডলের নক্ষত্রের সংখ্যা কত? নানা দিক হইতে ইহার যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে। শেপ্‌লী (Shapeley) বলেন, নক্ষত্রমণ্ডলে সমস্ত নক্ষত্রের সংখ্যা মোটামুটিভাবে দশ সহস্র কোটি হইবে। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ এডিংটন অন্য এক ভাবে গণনা করিয়া বলেন যে, সূর্য্যের কক্ষের ভিতরেই সমস্ত নক্ষত্রের ওজন সাতাইশ সহস্র কোটি সূর্য্যের সমান। এই অসংখ্য নক্ষত্রের ভিতর মাত্র এক সহস্র কোটি দূরবীণ দিয়া দেখা গিয়াছে। শুধু-চোখে আড়াই হাজার নক্ষত্রও দেখা যায় কি-না সন্দেহ।

এই অগণিত নক্ষত্র আকাশে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিলেও ইহাদের সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। ইহাদের রঙ্গভূমি ইহাদের সংখ্যার তুলনায় অপরিসীম বলিয়াই মনে হয়। সমস্ত পৃথিবীতে যদি কুড়িটি মাত্র বিলিয়ার্ড বল খুব বেগেও ছুটাছুটি করে তাহা হইলে সংঘর্ষের ভয় কোথায়? নিকটবর্ত্তী হইবারও সম্ভাবনা কম। দৈবাৎ যদি দুইটি নক্ষত্র অত্যন্ত কাছাকাছি হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পরস্পরের

আকর্ষণের ফলে ইহাদের বাষ্পদেহে স্ফীতির সম্ভাবনা, এমন কি বাষ্প উৎক্ষিপ্তও হইতে পারে। চেম্বারলীন (Chamberlin) ও মুলটন্ (Moulton) মনে করেন যে, দুইটি নক্ষত্র নিকটে আসিলে তাহাদের দেহ হইতে উৎসারিত বাষ্পপুঞ্জ তাহাদের আপেক্ষিক গতির প্রভাবে আকাশে কুণ্ডলীকৃত আকার ধারণ করিবে। তাঁহাদের মতে কুণ্ডলীকৃত নীহারিকার সৃষ্টি এইরূপেই হইয়াছিল। কুণ্ডলীকৃত নীহারিকা রাশির পরিমাণ নক্ষত্র অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বড়—শুধু এই কথা মনে করিয়াই কুণ্ডলীকৃত নীহারিকার এই জন্মতত্ত্ব সত্য মনে হয় না।

নক্ষত্রের কথা ও তাহার জন্মকাহিনী বিবৃত হইল। যুগে যুগে জ্যোতিষ্কজীবনে অভিব্যক্তির কোনও বিরাম নাই। আজ পর্যন্ত আমরা যাহা জানিয়াছি তাহা হইতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্যন্ত নক্ষত্রের বংশলতায় পাঁচ পুরুষের সন্ধান মিলিয়াছে, যথা—

আদিম বাষ্পরাশি- নীহারিকা নক্ষত্র---- যুগল-নক্ষত্র---- বহুল-নক্ষত্র।

শুধু গণনার সাহায্যেই যে এই বংশলতা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নহে। একমাত্র সেই অখণ্ড অজ্ঞেয় বাষ্পরাশি ভিন্ন সকল পুরুষেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আকাশের গায়ে আজ সত্য হইয়া আছে।

বংশলতায় যে পাঁচ পুরুষের উল্লেখ করিলাম, অনেক নক্ষত্রই আজ পর্যন্ত ইহার শেষ দুই পুরুষে উপনীত হয় নাই। একক নক্ষত্র হইতে যুগলে—যুগল হইতে বহুলে পরিণত হইতে নক্ষত্রের আবর্তনবেগ অধিক হওয়া প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই নক্ষত্রের তাহা নাই। আমাদের সূর্য মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ নক্ষত্র, তাহাকেও আজ একক জীবন কাটাইতে হইতেছে। *

* এই প্রবন্ধের অনেক অংশই Jeans-এর পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

১৪

দিন-দুই হইতেই প্রতাপের একটু সর্দ্দির ভাব ছিল, কিন্তু কোনো প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। স্কুলে কামাই করিতে ভরসা হইত না, পাছে কাজ না থাকে। মিহিরকে না পড়াইতে যাইবার কথা সে মনের দরজায়ও আসিতে দিত না। এই খুপরীর মত ঘরের ভিতর শুইয়া থাকার চেয়ে নৃপেনবাবুর বাড়ির অমন চারি দিকে খোলা ঘরটায় ঘণ্টাখানেক বসিয়া থাকিতে পারায় লাভই বরং। আর পড়ানোটাও কিছু শক্ত কাজ নয়, ভারি ত মিহির পড়ে। নিজেকে বুঝাইবার যুক্তির তাহার অভাব ছিল না, কিন্তু মন যাহা বুঝিল, শরীর তাহা মানিয়া লইল না।

মঙ্গলবার সকালে ঘুম ভাঙিতেই প্রতাপ অনুভব করিল, তাহার মাথাটা ভার, রগ দুইটা দপ্ দপ্ করিতেছে, চোখও যেন জড়াইয়া আসিতেছে। কাল মিহিরকে পড়ান শেষ করিয়া অকারণেই সে গড়ের মাঠে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। গায়ে শীতবস্ত্র বিশেষ কিছুই ছিল না, র্যাপারটা ছেঁড়া এবং ময়লা বলিয়া সে ও-বাড়ি যাইবার সময় কখনও সঙ্গে লইত না। খব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল বোধ হয়, কিন্তু প্রতাপের সে দিকে খেয়াল ছিল না। যামিনী যে তাহার সামান্য উপহারটি গ্রহণ করিয়াছে, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে নাই, ইহাতেই তখন প্রতাপের কাছে জগতের মূর্ত্তি অন্যরকম হইয়া উঠিয়াছিল। যামিনীকে লাভ করিবার জন্য যত অসম্ভবকে সম্ভব করিবার

কল্পনায় বিভোর হইয়া সে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, শীতের তীব্র বায়ু যে তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, তাহা সুদ্ধ সে লক্ষ্য করে নাই।

অসুস্থতার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনটা ভয়ে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এই রে, শীতের দিনের জ্বর, পাকা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ব্রন্‌কাইটিসে না দাঁড়ায়! তাহা হইলে প্রতাপকে কয়দিন যে কামাই করিতে হইবে তাহার ঠিকানা কি? আর স্কুলে না যাওয়া চলিলে মিহিরকে পড়ানও চলিবে না। অসুখ লইয়া ছোট ছেলের কাছে যাওয়া চলে না, রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। আর এখানেই বা তাহাকে দেখিবে কে? পিসিমা, বিশেষ করিয়া বৌদিদি ত বিরক্তিতে অধীর হইয়া উঠিবেন। ঘর জুড়িয়া একজন রোগী শুইয়া থাকিলে রাজুও যে কিছুমাত্র খুশী হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এসব ভাবনা রহিল পিছনে পড়িয়া, সমস্ত মনটা তাহার পীড়িত হইতে লাগিল একই চিন্তায়, কয়দিন না জানি সে যামিনীকে চোখে দেখিতে পাইবে না। ভগবান্ কি ছোট-বড় সব ক্ষেত্রেই তাহার জন্য কেবল দুঃখবেদনার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন?

রাজু উঠিয়া মুখ ধুইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। অন্যদিন প্রতাপ তাহার চেয়ে অন্তত পক্ষে একঘণ্টা আগে ওঠে। মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়াও প্রতাপকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া রাজু একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, আজ ছুটি না-কি? উঠবে না, চা খাবে না?"

প্রতাপ বলিল, "ছুটিই শেষ অবধি ক'রে তুলতে হবে বোধ হয়। গা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে, একটু জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে!"

রাজু কাছে আসিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া কহিল, "তাই ত, একটু নয়, বেশ পাকাপাকি জ্বর দেখছি। আচ্ছা শুয়ে থাক, আমি বৌদিদিকে বলছি তোমার চা-টা এখানে দিয়ে যেতে।"

প্রতাপ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "থাক্, থাক্, তাঁকে আবার কেন ট্রাবল্ দেবে? আমার এমন কিছু হয়নি যে গিয়ে চা-ও খেতে পারব না। আর চা নাই বা খেলাম এখনই?"

রাজু বলিল, "তোমার ফিরিঙ্গী-আনা রাখ ত! সরকারের বাড়ি কদিন কাজ করেই ভয়ানক শিভাল্‌রাস্ হয়ে উঠেছ দেখছি। বাঙালী-ঘরের বৌ-ঝি, তারা এক পেয়ালা চা আনতে ট্রাবলে একেবারে দিশাহারা হয়ে যাবে? সবাইকে মিস সরকারের মত মোম দিয়ে গড়া মনে ক'রো না।"

প্রতাপ একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। রাজু এত কথা জানিল কোথা হইতে? মিস্ সরকার যে একজন আছেন, তাহা এতদিন রাজু একবারও উল্লেখ করে নাই। তিনি যে মোমের গড়া, সে জ্ঞানই বা রাজুর হইল কেমন করিয়া? তাহা হইলে যামিনীকে সে দেখিয়াছে? প্রতাপের বুকে ক্ষুদ্র একটা ঈর্ষার হুল ফুটিয়া গেল।

মিনিটখানেক থামিয়া সে হাসিবার একটু চেষ্টা করিয়া বলিল, "মিস সরকার মোম দিয়ে গড়া কি পাথর দিয়ে গড়া সে কথা ত হচ্ছে না, আমার চা-টা খাওয়া উচিত কি-না এখন সেই কথা হচ্ছে।"

রাজু বলিল, "না হয় মিস সরকারের কথা একটু হ'লই? তিনি ত এখনও তোমার একচেটিয়া সম্পত্তি হয়ে যাননি?"

প্রতাপ একেবারে বিছানা ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল, "আঃ, কি বাজে বকছ? ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে আলোচনার হঠাৎ কি দরকার ঘটল? আমার জ্বরের সঙ্গে এ আলোচনার ত কোনো সম্পর্ক দেখছি না। যাও, বৌদিকে বরং আমার চা-টা দিয়ে যেতে বলগে।"

রাজু বলিল, "বলছি। আচ্ছা মিস্ সরকারের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি?"

প্রতাপ আবার শুইয়া পড়িয়া লেপটা ভাল করিয়া টানিয়া লইয়া বলিল, "তোমার আজ হ'ল কি? হঠাৎ আজ তাঁর সম্বন্ধে এত ইণ্টরেষ্ট কেন? আলাপ বিশেষ কিছু নেই, তবে পরিচয় আছে বটে।"

রাজু বলিল, "হঠাৎ আর কি? পাড়ায় অমন একজন ডাকসাইটে সুন্দরী থাকলে, তাঁর সম্বন্ধে ইণ্টরেষ্ট

হওয়া ত পুরুষমাত্রেরই স্বাভাবিক। তোমার কপাল ভাল, তাই রোজ ক্লোজ কোয়ার্টাসে দেখতে পাও, আমরা রাস্তায় ঘাটে, কালেভদ্রে দু-এক দিন দেখি।"

প্রতাপ ভাবিয়া পাইল না এ-সব কথার উত্তরে কি বলিবে। যদি রাগ দেখায়, উত্তর না দেয়, তাহা হইলে রাজু আরও জো পাইয়া বসিবে, এবং মনে মনে সন্দেহও করিবে অনেক কিছু। অথচ যামিনীর কথা এমন লঘুভাবে আলোচনা করিতেও তাহার যেন বুকে শেল বিদ্ধ হইতে ছিল। তাহার নাম এমনভাবে মুখে আনিলেও যেন তাহার অপমান করা হয়। উহা যেন হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে লুকাইয়া রাখিবার জিনিষ, কল্পনার প্রদীপ জ্বালিয়া আরতি করিবার জিনিষ, জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া পূজা করিবার জিনিষ। কিন্তু এ হতভাগা যেন দেবীপ্রতিমাকে রঙ্গমঞ্চে টানিয়া আনিতে চায়। রাজুর উপর বিরক্তিতে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

বৌদিদি চা হাতে করিয়া প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল ঠাকুর পো?"

রাজু প্রতাপের হইয়া উত্তর দিল, "কি আর হবে? ময়দানে বেশী ক'রে হাওয়া খেয়েছেন আর কি? আর কেউ সঙ্গে ছিল না-কি?"

প্রতাপ উত্তর না দিয়া চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগিল। রাজু আর তাহাকে না জ্বালাইয়া চা খাইতে চলিয়া গেল। পিসিমা আসিয়া বলিলেন, "কি রে, জ্বর হয়েছে না-কি? তা একটু আদার রস দিয়ে চা-টা খেলি না কেন? আজ আর ইস্কুল-মিস্কুল যাস্‌নে যেন। যা ঠাণ্ডা পড়েছে, এতে ত ঘরে বসেই মানুষের অসুখ করছে।"

প্রতাপ বলিল, "না ইস্কুল আর যাব কি ক'রে? কিন্তু একটা খবর দিতে হবে যে? কাকে বা পাঠাই?"

পিসিমা বলিলেন, "কেন, ঐ ত বিন্দেবনের নাতি তোদের ইস্কুলেই পড়ে। চিঠি লিখে দে, কানু না-হয় ঝি গিয়ে তাকে দিয়ে আসবে।"

প্রতাপ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। স্কুলে না-হয় বৃন্দাবনের নাতির হাতেই চিঠি পাঠাইল, কিন্তু নৃপেনবাবুকে খবর দিবে কি করিয়া? সেখানে ত কানু যাইতে পারিবে না।

চিঠিখানা পাঠাইয়া দিয়া সে চুপ করিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। রাজু আজ যামিনীর কথা তুলিতে গেল কেন? কেহ কি তাহার কাছে কিছু বলিয়াছে? কেই বা বলিবে? নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়িতে তিনি স্বয়ং এবং মিহির ভিন্ন পুরুষজাতীয় কোন জীব নাই, তাঁহারা কিছু রাজুর কানে কানে যামিনীর কথা বলিতে যান নাই। পাশের বাড়িতে অনেক লোক আছে বটে, যুবকও দু-একটিকে সে যাইতে আসিতে দেখিয়াছে, তাহাদের কাহারও সঙ্গে কি রাজুর জানাশোনা আছে? কিন্তু হাসিঠাট্টা করিবার মত কে কি পাইল? প্রতাপের হৃদয়ের ভিতর দূরবীক্ষণ লাগাইয়া ত কেহ কিছু দেখিতে যায় নাই? হয় ত শুধু শুধুই। সুন্দরী, অবিবাহিতা তরুণী, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা এমনিই ছেলেমহলে হয় এবং গৃহে একজন যুবক শিক্ষক রোজ যায় আসে, এই সুযোগটা গল্প রচনার পক্ষে অতি চমৎকার, সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে চার করিতে অনেকেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এইভাবে আর কতদিন চলিবে? প্রতাপ কি সংশয় ও দ্বিধার দোলায় দুলিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিবে? যামিনীর মত মেয়ে কতদিনই বা পিত্রালয় আলো করিয়া থাকিবে? প্রতাপ যখন নিজের অযোগ্যতার চিন্তায় হাত পা গুটাইয়া বসিয়া, সেই সুযোগে কোনও উদ্যোগী পুরুষ আসিয়া কি এই লক্ষ্মীকে অপহরণ করিবে না? এই দুর্ঘটনার প্রতিকার করিতে হইলে তাহার আর আলস্য বা সংশয় লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহার নিজের মন তাহার জানা আছেই, যামিনীর মন জানিতে হইবে এখন। যদি যামিনীর তাহার প্রতি বিরুদ্ধতা না থাকে, তাহা হইলে যামিনীর যোগ্য হইবার জন্য মানুষের সাধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা প্রতাপকে করিতে হইবে; এতখানি সুপাত্র তাহাকে হইতে হইবে, যাহাতে জানদাও তাহাকে অযোগ্য মনে না করেন। ভাবিতে ভাবিতে প্রতাপের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। পুরাকাল হইলে এখনি রণতুরগে চড়িয়া সে বাহুবলে হৃদয়লক্ষ্মীকে জয় করিয়া আনিবার

অন্ত যাত্রা করিতে পারিত, কিন্তু হায়! বিংশ শতাব্দী—এখানে সরাসরি কিছুই করিবার জো নাই। পুরুষের বাহুবলেরও এখন মূল্য নাই, তাহার হাতের ডিপ্লোমা-ডিগ্রীর কাগজেরই মূল্য অধিক।

গৃহস্থগৃহের কর্ম্মকোলাহলের স্রোত তাহার শয্যার চারিদিকে মুখর হইয়া উঠিল, সে-ই শুধু আজ তাহার বাহিরে পড়িয়া রহিল। রাজু পাড়া বেড়াইয়া চটি ফট্‌ফট্ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল, তোয়ালে সাবান লইয়া স্নান করিতে গেল। গজুও ধীরমন্থর গতিতে তিনতলা হইতে নামিয়া আসিল, চা-পানটা সে বিছানায় শুইয়া শুইয়াই সারে। কানুর কান্না, পিসিমার দরাজ গলার হাঁকডাক, বউদিদির চাপা গলার উত্তর, সবই প্রতাপ শুইয়া শুইয়া উপভোগ করিতে লাগিল। সে যেন ঘূর্ণীর মধ্যের স্থির একটি বিন্দু। এই অতি সাধারণ ঘরকন্নার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মপ্রণালীর ভিতর সে আজ একটা অপূর্ব্ব রস খুঁজিয়া পাইতে লাগিল। ইহার পশ্চাতে কতগুলি নরনারীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়াবেগ। ভালবাসার অসংখ্য বন্ধনে এই সংসারটিকে তাহারা বাঁধিয়া খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। অথচ এই সাধারণ সংসারযাত্রা ব্যাপারটার সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষেরই কি দারুণ অবজ্ঞা। কেহ কি তলাইয়া দেখে, সাধারণ এই ছোট সংসারটির মূলে কত স্বার্থত্যাগ, কত বুকঢালা ভালবাসা নিহিত আছে? এইরূপ একটি সংসার কি প্রতাপের নিজের কোনোদিন হইবে? কিন্তু তখনই তাহার মনটা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। যামিনীকে কিছুতেই সে ক্ষুদ্র ঘরকন্নার মধ্যে গৃহলক্ষ্মীরূপে সে কল্পনা করিতে পারিল না। রাজেন্দ্রানীর মুকুট যেখানে শোভা পায়, সেখানে বধূর অবগুণ্ঠন পরাইতে তাহার চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

রাজু, গজু নাহিয়া খাইয়া আপিস চলিয়া গেল। কানুরও নাওয়া-খাওয়া কান্নাকাটির মধ্য দিয়া শেষ হইল। পিসিমা, বউদিদি দুইজনেই আসিয়া প্রতাপের খোঁজ করিয়া গেলেন, কিছু খাইবে কি-না সে, কেমন আছে। প্রতাপ কিছুই খাইল না। চোখ বুজিয়া কাহার স্নেহানত করুণ মুখ, কাহার আরক্তিম কোমল করপল্লবের ধ্যান করিতে লাগিল। রোগশয্যাপার্শ্বে সেই লক্ষ্মীমূর্ত্তির আবির্ভাব যেন সমস্ত হৃদয়ের আকুল সংগ্রহ দিয়া কামনা করিতে লাগিল।

বেলাটা গড়াইয়া যতই বিকালের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই প্রতাপের মনের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। কাহাকে দিয়া সে নৃপেনবাবুদের বাড়িতে খবর দিবে? অথচ না দিলেও কিছুতেই চলিবে না। বাড়িতে যদি একটা পুরুষ চাকরও থাকিত, তাহা হইলে কোনমতে কাজ চলিত, কিন্তু সম্বল ত এক ঠিকা ঝি। নিজেই গাড়ী করিয়া গিয়া কি বলিয়া আসিবে? কিন্তু তাহা হয়ত সকলের চোখেই অসহ্য ন্যাকামী বলিয়া বোধ হইবে। কি করা যায়?

হঠাৎ দরজার কাছ হইতে রাজু ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, এ বেলা কেমন?"

প্রতাপ চমকিয়া উঠিল। রাজু এত আগে কোনোদিন বাড়ি আসে না, এক এক দিন ত একেবারে রাত্রে আসে। আজ তাহার হইল কি? বলিল, "আছি প্রায় একই রকম। তুমি যে আজ এত সকাল সকাল?"

রাজু বলিল, "তোমারই খোঁজ নিতে এলাম। ডাক্তার-টাক্তার ডাকতে হবে না কি? যাক, স্কুলে যাওনি যে তা ভালই করেছ। এ বেলা যেন উৎসাহের চোটে বেরিয়ে পড়ো না।"

প্রতাপ শুকমুখে বলিল, "না, তা আর পারছি কই?"

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, "খবর দিয়েছ ত ওঁদের ওখানে?"

প্রতাপ নিরুৎসাহভরে বলিল, "না, কাকে দিয়ে আর খবর দেব?"

রাজু বলিল, "বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ কামাই করাটা একেবারেই ভাল দেখাবে না। তুমি একখানা চিঠি লিখে দাও, আমিই না হয় দিয়ে আসছি।"

এবার প্রতাপ আর সন্দেহ না করিয়া পারিল না। অকস্মাৎ রাজুর এত পরোপকারের আগ্রহ কেন? প্রতাপের খাতিরে এতটা সে কোনকালেই করিতে যাইবে না, ইহার মূলে নিশ্চয়ই আর কিছু আছে। পৃথিবীর

মধ্যে রাজুকেই নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ি পাঠাইতে বোধ হয় প্রতাপের সবচেয়ে আপত্তি ছিল। কিন্তু নিরুপায় হইয়া তাহাই তাহাকে করিতে হইল। কাগজ-কলম লইয়া খশ খশ করিয়া কয়েক লাইন লিখিয়া কাগজখানা মুড়িয়া সে রাজুর হাতে দিল। বলিল, "তিনি ত কোনোদিনই এ সময় বাড়ি থাকেন না, মিহিরের হাতেই চিঠিখানা দিয়ে এস।"

রাজু বলিল, "কেন তার দিদির হাতে দিলে কি ক্ষতি? নৃপেনবাবু যতক্ষণ বাহিরে থাকেন, ততক্ষণ মিস্ সরকারই ত বাড়ির কর্ত্রী।"

প্রতাপ বিরক্তভাবে বলিল, "যা তোমার অভিরুচি। চিঠিখানা পৌছলেই হল," বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

রাজুর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া ধীরেসুস্থে সে কাপড় বদলাইয়া চুল আঁচড়াইল, জুতাটাকেও একবার বুরুষ করিয়া লইল। তাহার পর বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া যাইতেই প্রতাপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এই পাশ ফিরিয়া শুইল। মনটা তাহার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল।

আসলে ব্যাপারখানা কিছুমাত্র সাংঘাতিক হয় নাই। নৃপেনবাবুর প্রতিবেশী একটি যুবকের সহিত রাজুর আলাপ ছিল। তাহার সঙ্গে কোথায় বেড়াইতে যাইবার সময় পথে নৃপেন্দ্রবাবুর গাড়ীতে তাহারা যামিনীকে দেখিতে পায়। যামিনীকে দেখিলে তাহার সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ না করা সাধারণ যুবকের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজু যখন জানিল এই সুন্দরী তরুণীটিই প্রতাপের ছাত্রের ভগিনী, তখন প্রতাপকে একটু খোঁচাইবার ইচ্ছা তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। প্রতাপের অতিরিক্ত ধার্ম্মিকতাটা রাজুর একেবারে পছন্দসই জিনিষ ছিল না। যুবকসুলভ কোনো লঘু আলোচনায় সে কখনও যোগ দিত না বলিয়া সে যুবকসমাজে একটা উপহাসের পাত্র ছিল। রাজু মনে মনে কহিল, "দাঁড়াও বাছা, তোমার ডুবে ডুবে জল খাওয়া বার করছি।" প্রতাপ অসুস্থ হইয়া পড়িয়া অনেকখানি বাঁচিয়া গেল, যদিও নিজে সেটা বুঝিল না। প্রতাপের চিঠি লইয়া নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ি যাওয়ার ভিতর রাজুর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। যা-তা গল্প রচনা করিয়া প্রতাপকে ক্ষেপানো যাইবে এই যা লাভ, আর ফাঁকতালে যদি একবার যামিনীর দর্শন মিলিয়া যায় তাহা ত উপরি পাওনা।

প্রতাপের মনের গতি কিন্তু এই সামান্য ঘটনায় একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে বুঝিল ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিলে তাহার কোনোই আশা নাই। এমন সৌভাগ্য লইয়া সে জন্মগ্রহণ করে নাই যে আকাশের চাঁদ আপনা হইতেই তাহার হাতে খসিয়া পড়িবে। যাহা সে কামনা করে তাহা আপনার কৃতিত্বেই তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে।

১৫

একে শীতকাল, তাহার উপর সকাল হইতে মেঘলা করিয়া আছে। এমন দিনে সাধারণতঃ মন কাহারও ভাল থাকে না, বিশেষতঃ যামিনীর মত ভাবপ্রবণ মানুষের ত একেবারেই থাকিবার কথা নয়। বিছানা ছাড়িয়া ওঠা অবধি তাহার মনটা ভার হইয়া আছে। তাহার উপর জ্ঞানদার চিঠি আসিয়াছে যে পুরীতে তাঁহার শরীর ভাল হওয়ার পরিবর্ত্তে খারাপই হইতেছে। ডাক্তার পাঠানো সম্ভব হইলে তিনি স্বামীকে তাহাই করিতে বলিয়াছেন, নয়ত সপ্তাহখানিক আর দেখিয়া তিনি ফিরিয়াই যাইবেন। মায়ের জন্য আশঙ্কায় যামিনী আরও মুষড়াইয়া পড়িয়াছে।

মন খারাপ করিবার এমনিই তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রতাপের সঙ্গে বাহিরে তাহার কোনোই বোঝা-পড়া হয় নাই, অথচ মনে মনে ব্যাপারটা যথেষ্টই জটিল হইয়া উঠিতেছিল। যামিনী ভাবিয়া পায় না, কি সে করিবে। নিজের আত্মীয়স্বজন কাহারও নিকটেই যে এই বিষয়ে সে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি পাইবে না, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। প্রতাপও যদি স্পষ্ট করিয়া নিজের ভালবাসা তাহাকে জানায়, তাহা হইলে যামিনী খানিকটা আশ্বাস পায়, কিন্তু তাহারও ত কোনো লক্ষণ দেখা যায় না? তাহাকে দিয়া মনোভাব স্বীকার করাইবার কোন পন্থা যামিনী খুঁজিয়া পায় না। নারী হইয়া নিজেই আগে ভালবাসার কথা

ত সে উল্লেখ করিতে পারে না। প্রতাপের সমস্ত আচরণেই যামিনীর আশা গাঢ়তর হয়, কিন্তু আশা ত চিরকালই কুহকিনী। নিরালায় আলাপ করিবার খানিকটা অন্ততঃ সুবিধা পাইলে জিনিষটা সহজ হইয়া আসিত হয়ত, কিন্তু কি করিয়া তাহারই বা ব্যবস্থা করিবে, তাহাও যামিনী স্থির করিতে পারে না। উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া সে দু-একবার প্রতাপকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে, কিন্তু তাহা কি লোকের চক্ষে বড় বেশী করিয়া পড়িবে না? সম্ভাবনাতেই যামিনী শিহরিয়া উঠিল, লোকের কথা জিনিষটিকে সে যমের মত ভয় করিত। চিঠিপত্র লেখা যায়, কিন্তু তাহারই বা উপলক্ষ্য কই! প্রতাপের মনোভাব যামিনী যদি ভুলই বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে নিজের প্রগল্‌ভতার লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? কিন্তু নিজের হৃদয়াবেগের নিকট নিজেই সে পরাস্ত হইতে বসিয়াছিল। এত অশান্তি, এত দুঃখ কেন তাহার অদৃষ্টে? ভগবান কি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিতে পারেন না? কোন্ দিক্ সে রাখিবে? পিতামাতার মনে আঘাত দিয়া নিজের হৃদয়াবেগের অনুসরণ করিবে না নিজেকে বঞ্চিত পীড়িত করিয়া আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছার কাছে নিজের হৃদয়কে বলি দিবে?

খানিকক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, সে টেবিলের কাছে চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। চিঠির কাগজের প্যাড এবং কলম বাহির করিয়া মাকে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। কিছুই গুছাইয়া লিখিতে পারে না, মনটা এমন বিচলিত হইয়া আছে। কোনোমতে তিনি যে কয়টা কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার উত্তর দিয়া সে চিঠি শেষ করিল। খামের ভিতর কাগজ ঢুকাইয়া দিয়া বেশ গোটা গোটা করিয়া শিরোনামা লিখিল। তাহার পর খানিকক্ষণ এ-বই সে-বই লইয়া নাড়াচাড়া করিল, কোনোখানা খুলিয়া পড়িবার উৎসাহ কিছুতেই সঞ্চয় করিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল, "এই রকম হ'লেই, আমার পরীক্ষা পাস করা হয়েছে আর কি!" মা তাহাকে রাখিয়া গেলেন পড়াশুনার সুবিধার জন্য, কি সুবিধাই না তাহার হইতেছে! ইহার চেয়ে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেলেই কি ভাল হইত না? মনটা কিন্তু সায় দিল না।

কিছুক্ষণ শুধু শুধু বসিয়া থাকিয়া, আবার সে চিঠির কাগজের প্যাডটা বাহির করিল। একমনে খানিকক্ষণ লিখিল। এই তাহার প্রথম প্রণয়লিপি, কিন্তু ইহা কোনোদিন কাহারও নিকটে সে পাঠাইতে পারিবে না। চিঠিখানা শেষ করিয়া আবার সমস্তটা পাঠ করিল। নির্জ্জন ঘরে একলা বসিয়াই তাহার লজ্জা করিতে লাগিল. চিঠিখানা একবার ছিঁড়িয়া ফেলিতে গেল। কিন্তু প্রাণ ধরিয়া ছিঁড়িতে পারিল না, কাগজখানা প্যাড হইতে খুলিয়া লইয়া দেরাজের সব কাগজপত্রের তলায় লুকাইয়া রাখিল। তাহার পর আবার উঠিয়া গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল।

মনের ভিতর কত ভাবের তরঙ্গ যে আছাড় খাইতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। যামিনীর এমন কেহ বন্ধু নাই, যাহার নিকট এ কথা সে বলিতে পারে। বেদনার ভারে হৃদয় যেন ফাটিয়া পড়িতে চায়। প্রতাপ কি কোনোদিন মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবে না?

হঠাৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, "না, তাঁর টাকা দিয়ে দিই, হয়ত কত অসুবিধে হচ্ছে। দরজীকে টাকা পরে দিলেও চলবে।" আবার সে দেরাজের কাছে ফিরিয়া গেল।

আবার চিঠির কাগজ, খাম বাহির করিল। এবার আর প্রণয়লিপি নয়। সাধারণ একটি ক্ষুদ্র চিঠি। প্রতাপকে বইগুলি কিনিয়া দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়া যামিনী নোট্ দুইখানি নিপুণভাবে ভাঁজ করিয়া চিঠির ভিতর প্রবেশ করাইয়া তবে খামে বন্ধ করিল। বাহির হইতে দেখিয়া বুঝিবার জো নাই যে, খামের ভিতর চিঠি ছাড়া আর কিছু আছে। বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া খামের উপর প্রতাপের নাম লিখিল। ঠিকানা কিছু লিখিল না, প্রতাপ যখন বিকালে মিহিরকে পড়াইতে আসিবে, তখন চাকর দিয়া তাহার কাছে পাঠাইয়া দিবে। একটু কিছু করিতে পাইয়া যেন যামিনীর মনটা শান্ত হইল, সে তখন রান্নাঘরের তদারক করিতে একবার নীচে নামিয়া গেল।

মিহিরের স্কুলে যাওয়ার আগে রোজ একটা-না-একটা

গণ্ডগোল বাধেই। নৃপেন্দ্রবাবু উপস্থিত থাকিলে তাহা বেশীদূর অগ্রসর হয় না, তিনি তাড়া দিয়া থামাইয়া দেন। না হইলে যামিনীর চোখে প্রায় জল আসিয়া যায়। মা থাকিলে মিহিরকে বড় বেশী কড়া শাসনে থাকিতে হয়, এখন যেন মিহির যামিনীর উপর দিয়া তাহারই শোধ তুলিতেছে।

আজ পিতা পুত্রে এক সঙ্গে খাইতে আসাতে যামিনীর আর বেশী ভোগ ভুগিতে হইল না। নৃপেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে বড় শুক্‌নো দেখাচ্ছে যে মা, শরীর কি ভাল নেই ?"

যামিনী বলিল, "না বাবা, শরীর ত কিছু খারাপ নেই। ডাক্তার নন্দীকে কি পুরীতে যাওয়ার কথা কিছু বলেছ ?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "বলেছি, তবে তিনি এ সপ্তাহে যেতে পারবেন না। ভয়ের বিশেষ কারণ নেই বল্‌ছেন, নূতন দু-তিনটে ওষুধ লিখে দিলেন, সেগুলো আজ পাঠাচ্ছি, দেখি খেয়ে কেমন থাকেন। একলা থাকার দরুণ নার্ভাস্ হয়ে পড়েছেন আর কি ? উপায় থাকলে একবার গিয়ে দেখে আস্‌তাম।"

যামিনী বলিল, "সকলে মিলে গেলে হয় একবার।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সে কি আর সম্ভব। তোমাদের সব পড়া কামাই হবে, তোমার মা তাতে বরং আরও বিরক্তই হবেন।"

নৃপেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলেন, মিহিরও মিনিট পাঁচেক পরে বিদায় হইল। যামিনী স্নান করিতে উপরে চলিয়া গেল।

দুপুর বেলাটা খানিক ঘুমাইয়া খানিক পড়াশুনা করিয়া তাহার এক রকম কাটিয়া গেল। কিন্তু ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া যাওয়ার পরেই আবার তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। সময়টা আর যেন কাটিতে চায় না। কতবার যে সে উপর-নীচ করিল, জানালার পরদা সরাইয়া নীচের রাস্তাটা দেখিয়া আসিল, তাহার আর ঠিক ঠিকানা নাই। হতভাগা চাকরগুলার দিবানিদ্রার ঘটা দেখ না, এখনও তাহাদের উঠিবার সময় হইল না। সমস্ত বাড়িটার ভিতর যামিনী একলা জাগিয়া। মিহির এই স্কুল হইতে আসিয়া পড়িল বলিয়া, তাহার পর চা জলখাবার ঠিক না পাইলে সে যামিনীরই প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। কিন্তু ঘড়িতে সাড়েতিনটাও যেন আর বাজিতে চাহে না, ঘড়ির কাঁটা দুইটাও কি নড়িতে ভুলিয়া গিয়াছে।

নিজের অধীরতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া যামিনী শেষে চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। একখানা বই খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ইহার দশ পৃষ্ঠা সে পড়িবেই, তা একলাইনও তাহার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, একটা বর্ণও তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করুক আর নাই করুক। দশ পৃষ্ঠা শেষ হওয়ার আগে ঘড়ির দিকে সে একবারও তাকাইবে না।

যাক্, এই উপায়ে সময় খানিকটা কাটিয়া গেলই। যামিনীর পড়া শেষ হইবার আগেই নীচে কলঘরে হুড়হুড় করিয়া জল পড়িতে লাগিল, ভজহরি ও ছোট্টুর সাড়া পাওয়া গেল, এবং যামিনী বই তুলিয়া রাখিতে-না-রাখিতেই মিহিরের পায়ের শব্দে সিঁড়ি মুখরিত হইয়া উঠিল।

বই খাতা বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মিহির তাহার দরজার কাছে আসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি, চা খেতে আসবে না ?"

যামিনী বলিল, "তুই যা। ছোট্টু তোকে চা দেবে এখন। আমি যাচ্ছি একটু পরে।"

জানালার কাছে পথের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যাহার প্রত্যাশায় তাহার বিশাল চক্ষু দুইটি আগ্রহাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার দেখা মিলিল না। চারিটা বাজিল, ক্রমে সাড়ে চারিটাও বাজিয়া গেল, প্রতাপের দেখা নাই। যামিনীর চোখে জল আসিয়া পড়িল, বুকের ভিতরটা ব্যথায় মোচড় দিতে লাগিল। ইংরেজীতে পড়িয়াছিল, "the course of true love never did run smooth," সত্যই তাহাই। প্রথম হইতে শুধু নিরাশা আর বেদনা, ইহার অবসান কোথায় হইবে কে জানে ? যামিনীর আর দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিল না, ধীরে ধীরে গিয়া সে নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কতক্ষণ এইভাবে সে পড়িয়া ছিল, তাহা তাহার নিজের ধারণা ছিল না। হঠাৎ শুনিল দরজার নিকট

হইতে ছোট্ট ডাকিয়া বলিতেছে, "দিদিমণি, একঠো চিঠি আছে।"

চিঠি? এমন সময়ে কাহার চিঠি আসিল? ইহা ত ডাকের সময় নয়। যামিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দরজার কাছে ছুটিয়া গেল। চিঠি তাহার নয়, তাহার বাবার নামে, কিন্তু হস্তাক্ষর দেখিয়াই তাহার বক্ষ দ্রুততালে স্পন্দিত হইতে লাগিল। মিহিরের খাতায় দেখিয়া দেখিয়া এই হাতের লেখা যে তাহার অতি পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। বাবার নামে বটে, কিন্তু খাম খোলা। যামিনী চিঠিটা টানিয়া বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রতাপের জ্বর হইয়াছে। কতদিন সে আসিতে পারিবে না, তাহার কিছুই ঠিকঠিকানা নাই। চিঠি পড়া শেষ করিয়া যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, কে চিঠি নিয়ে এসেছে?"

ছোট্ট বাহির হইতে উত্তর দিল, "একঠো বাবু।"

যামিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কি দাঁড়িয়ে আছেন?"

ছোট্ট বলিল না, তিনি চিঠি দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন।

যামিনী ফিরিয়া গিয়া চেয়ারে বসিল। দেহমন দুইই তাহার অত্যন্ত অবসন্ন বোধ হইতেছিল। প্রতাপের চিঠিখানা দেরাজ খুলিয়া ভিতরে রাখিয়া নিজে তাহাকে যে চিঠি লিখিয়াছিল তাহা টানিয়া বাহির করিল। ছোট চিঠিখানা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, আবার লিখিতে বসিল। তাহার অসুখের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া, নানা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া, কোনোমতে তাহার সাহায্য করিবার যদি কোনো উপায় থাকে, তাহা যামিনীকে করিতে দিতে অনুরোধ করিয়া সে চিঠি শেষ করিল। বার-বার করিয়া পড়িয়া দেখিল তাহাতে অতিরিক্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস তাহার নিজের অজ্ঞাতেই কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে কি-না। প্রতাপ কি ভাবিবে, কে জানে? প্রতাপের চিঠিখানায় তাহার বাড়ির ঠিকানা লেখা ছিল। যামিনী নূতন একখানা খাম বাহির করিয়া নাম ঠিকানা লিখিয়া টিকিট মারিয়া একেবারে ডাকে ফেলিতে পাঠাইয়া দিল। সমস্ত ব্যাপারখানা একেবারে চুকাইয়া না ফেলা পর্য্যন্ত তাহার যেন আর স্বস্তি রহিল না।

মিহির খাইয়া উপরে আসিতেই যামিনী তাহাকে ডাকিয়া খবর দিল, "ওরে খোকা, তোর মাষ্টারমশায় আজ আসবেন না, তাঁর জ্বর হয়েছে।"

মিহির বলিল, "তুমি কি ক'রে জানলে?" যামিনী বলিল, "তিনি চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন।" মিহির কৌতূহল প্রকাশ করিয়া বলিল, "কই দেখি?"

যামিনী টেবিলের উপরের কাগজপত্রগুলা বৃথা একবার ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া বলিল, "কি জানি, কোথায় যে ফেললাম, তার ঠিক নেই।"

মিহির আর কিছু না বলিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। মাষ্টার না আসাতে তাহার বিন্দুমাত্র দুঃখের চিহ্ন না দেখিয়া ভাইয়ের সম্বন্ধে যামিনীর ধারণা আরও হীন হইয়া গেল।

প্রতাপের অসুখ। না জানি কি অসুখ, কতখানি অসুখ। পরের বাড়ি একলা রোগশয্যায় পড়িয়া হয়ত কত কষ্ট হইতেছে। জ্ঞানদার অসুখের সময় প্রতাপ তাহাদের জন্য কি না করিয়াছে, কিন্তু প্রতাপের অসুখের সময় কেহ তাহার জন্য কিছু করিবে না। যামিনীর কোনো উপায় নাই, সে যে বাংলা দেশের মেয়ে। মা তাহাকে যতই সাহেবী শিক্ষা দিন, আসল ক্ষেত্রে নিতান্ত অশিক্ষিতা জ্ঞানহীনা গ্রাম্যনারীর অপেক্ষা তাহার বিন্দুমাত্রও স্বাধীনতা বেশী নাই। সামাজিক শাসনের নাগপাশ তাহাকেও সমানেই বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

ঘণ্টা দুই পরে প্রাণ ভরিয়া আড্ডা দিয়া মিহির যখন ফিরিয়া আসিল, তখন যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "প্রতাপবাবুকে একবার দেখতে যাবি না? মায়ের অসুখে তিনি অত করলেন?"

মিহির ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "যাব কি ক'রে? আমি কি তাঁর বাড়ি চিনি?"

যামিনী একবার ভাবিল ঠিকানাটা বলিয়াই দেয়, কিন্তু মিহির হয়ত অবাক হইয়া যাইবে যে, দিদি এত খবর জানিল কোথা হইতে। নানা কথা ভাবিয়া সে শেষ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই গেল। ক্রমশঃ

রাধানাথ শিকদার

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ছাত্র-জীবন

রাধানাথ শিকদার ১২২০ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর, ১৮১৩) কলিকাতা জোড়াসাঁকোর অন্তঃপাতী শিকদার-পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। রাধানাথেরা দুই ভাই। অনুজ শ্রীনাথও রাধানাথের মত অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং জরিপ-বিভাগে কর্ম্ম করিয়া উন্নতি করিয়াছিলেন।

রাধানাথ শৈশবে গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া ৪৮ নং চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসুর স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন; পরে ১৮২৪ সনে হিন্দু কলেজে নবম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। রাধানাথ স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পকালের মধ্যেই (১৮২৭ সনে) চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নিকট ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করেন। ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষা রাধানাথের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে রাধানাথ এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,—

> ডিরোজিও সাহেব দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক। বিদ্যাবত্তার অভিমান করিলেও তিনি সুবিধান ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ জ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁহার শিক্ষা-গুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমনভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা অদ্যাপি আমার সকল কর্ম্মকে নিয়মিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করি। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি যাহা চিরতরে আমার কার্য্যকে প্রভাবিত করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের উন্নতির নানা জল্পনার মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করিতেই মৃত্যু তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছে। ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং পাপের প্রতি ঘৃণা—যাহা সমাজের শিক্ষিতদের মধ্যে এখন এত চলিত এবং যাহা ভারতবর্ষের হিতকর না হইয়া থাকিতে পারে না—এ সকলের মূলে একমাত্র তিনিই।*

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের শেষ তিন বৎসর (১৮২৯—১৮৩১) রাধানাথ রস ও টাইট্‌লার সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৩০ সন হইতে টাইট্‌লার সাহেবের নিকট তিনি নিউটনের প্রিন্সিপিয়া প্রথম ভাগ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। হিন্দুদের মধ্যে রাধানাথ এবং রাজনারায়ণ বসাকই সর্ব্বপ্রথম প্রিন্সিপিয়া অধ্যয়ন করেন।†

হিন্দু কলেজ ত্যাগের প্রাক্কালে রাধানাথ কলেজ কমিটির এইচ এইচ উইলসন, ডেভিড হেয়ার, রামকমল সেন, রসময় দত্ত প্রমুখ সভ্যগণের স্বাক্ষরিত যে প্রশংসাপত্র (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩২) লাভ করেন তাহা এখানে উল্লেখ-যোগ্য,—

> রাধানাথ শিকদার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজে‡ সাত বৎসর দশ মাস কাল অধ্যয়ন করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে পাঠ কালেই তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এবং সাধারণ বিষয়সমূহের মূল সূত্রে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার আচরণ খুবই সন্তোষজনক।" §

ছাত্র-জীবনে রাধানাথের কৃতিত্ব

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে রাধানাথ শিকদারের কৃতিত্বের কথা সমকালিক সংবাদ-পত্র হইতে আমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি হিন্দু কলেজের উপরের শ্রেণীর ছাত্রগণ সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভায় যে ইঁহারা আবৃত্তি করিতেন তাহা তৎকালিক সংবাদ পত্রে উল্লিখিত আছে। ১৮২৮ সনের ১২ই জানুয়ারি হিন্দু কলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভায় রাধানাথ শিকদার "The First Scene of Venice Preserved" হইতে

---

* আর্য্যদর্শনে (কার্ত্তিক ১২৯১) উদ্ধৃত রাধানাথের আত্মকথার মর্ম্মানুবাদ। "শিবচন্দ্র দেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী" পুস্তকেও এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

† *The Hindoo Patriot*, May 23, 1870.

‡ হিন্দু কলেজের অন্য নাম।

§ আর্য্যদর্শনে (কার্ত্তিক ১২৯১, রাধানাথ শিকদারের ছাত্র-জীবনের কথা সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে।

অ্যাফিয়ারের পাঠ আবৃত্তি করেন। গবর্ণমেণ্ট গেজেট (১৭ই জানুয়ারি, ১৮২৮) আবৃত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—"The First Scene of Venice Preserved was very well given." ১৮৩০ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত পুরস্কার-বিতরণী সভায় রাধানাথ *As You Like It* হইতে অর্লাণ্ডোর পাঠ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট গেজেট (২২এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০) এই উপলক্ষ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মার্থ দিতেছি,—

সদুচ্চারণ ও সুন্দর অঙ্গভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি করা হইয়াছিল। আবৃত্তির ধরণ হইতেই বুঝা যায়, তাহারা আবৃত্তির শুধু অর্থ নহে ভাবও আয়ত্ত করিয়াছেন। *

পর বৎসর ১২ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউন হলে বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় হিন্দু কলেজের উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যে তিনজন প্রবন্ধ পাঠ করেন রাধানাথ শিকদার তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। রাধানাথের প্রবন্ধের বিষয় ছিল,—"The cultivation of sciences is not more favourable to individual happiness, nor more useful and honourable to a nation, than that of polite literature." অর্থাৎ 'সাহিত্যের সাধনা অপেক্ষা বিজ্ঞানের সাধনা লোকের সুখসুবিধার বেশী অনুকূল নহে, অথবা জাতির অধিক প্রয়োজনীয় ও সম্মানেরও নহে।'

গবর্ণমেণ্ট গেজেট (১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩১) এই প্রসঙ্গে বলেন,—

প্রবন্ধগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর রামতনু লাহিড়ী ও প্রথম শ্রেণীর রাধানাথ শিকদার ও হরচন্দ্র ঘোষের রচনা। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার মধ্য হইতে এগুলি বাছাই করা হইয়াছে। লেখকত্রয় প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন। প্রবন্ধগুলি তাঁহাদের জ্ঞানের পরিচায়ক। ইহাতে তাঁহাদের যুক্তি ও রচনার ক্ষমতাও প্রকটিত হইয়াছে।†

হিন্দু কলেজে স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের প্রতিমূর্ত্তি ও ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসনের চিত্র স্থাপনের প্রস্তাব উঠিলে সে-যুগের সংবাদপত্রে এই বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত হয় যে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন ডেভিড হেয়ার—তাঁহার মূর্ত্তিও এই সঙ্গে স্থাপিত হওয়া উচিত। এই সময়ে হিন্দু কলেজের উপরের শ্রেণীর ছাত্রগণ নিজেদের দায়িত্বে ডেভিড হেয়ারের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন ও তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৩০ সনের ২৮এ নবেম্বর জোড়াসাঁকোয় মাধবচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে প্রথম দিনের ছাত্রসভায় এই কয়েক জন প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটি কঠিত হয়,—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন বসু, উমাচরণ বসু, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ। অভিনন্দন-পত্র ৫৬৪ জন বালক কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৩১ সনের ৩০এ জানুয়ারি তারিখে ছাত্রসভায় গৃহীত হয়। সভায় আরও স্থিরীকৃত হয় যে, হেয়ার সাহেবের অনুমতি পাওয়া গেলে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিবার জন্য পোট নামক একজন চিত্রকরকে নিযুক্ত করা হইবে।* বলা বাহুল্য, রাধানাথ শিকদার কমিটিতে থাকিয়া কার্য্য-সম্পাদনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ছাত্রদের একদিনের সভায় তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যাহা বলেন তাহার সারমর্ম্ম প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত হেয়ারের জীবনীতে (পৃঃ ৩৪) উল্লিখিত আছে,—

Radhanath Sickdar dwelling on the debased state of the country owing to misrule and oppression, instanced the coming of David Hare as the morning star to dispel our ignorance.

১৮৩১ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ছাত্রগণের মুখপাত্র-স্বরূপ দক্ষিণানন্দন (পরে, দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় ডেভিড হেয়ারকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন।†

---

* [Recitations] were in general given with good delivery and gesticulation, and in a manner that evinced the declaimers were fully in possession not only of the sense but of the passages which they recited.

† "These essays were the compositions of Ramtonoo Lahoorn of the 2nd class—and of Radhanath Sikdar and Harachandra Ghose, of the 1st class, by whom they were read, and were, we understand, selected amongst the best of the compositions of the two first classes. They displayed considerable reading, and very respectable powers both of composition and reasoning."

* সমাচার দর্পণে (২রা এপ্রিল, ১৮৩১) প্রকাশিত সংবাদের সারাংশ।

† অভিনন্দন-পত্র ও ডেভিড হেয়ারের উত্তরের বঙ্গানুবাদ 'পুষ্পপাত্র' শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি।

মাধবচন্দ্র মল্লিক, রাধানাথ পাল, রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা কেহ কলেজ ত্যাগের পর, কেহ বা কলেজে অধ্যয়ন কালেই কলিকাতার নানা অঞ্চলে এবং বেহালা, আন্দুল প্রভৃতি স্থানেও অবৈতনিক স্কুল খুলিয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এক বন্ধুকে লইয়া নিজ বাটীতে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন, এবং সেখানে রাধানাথ শিকদার ও শিবচন্দ্র দেব ছাত্রগণকে রীতমত পড়াইতেন।* হিন্দু কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'এনকোয়ারার' পত্রে সে-সময়ে ছাত্রগণের শিক্ষা-আন্দোলন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন তাহার অংশবিশেষের মর্ম্ম সমাচার দর্পণ (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩১) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

হিতৈষী বিদেশীয়েরদের কর্ত্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয় ব্যতিরেকে [এদেশে] অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহারূপান্তর হইয়াছে। এই ক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়েরদিগকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং স্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা সুজ্ঞাত হইয়াছেন।...হিন্দুরদিগকে বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতার নানা পল্লীতে হিন্দুরদের কর্ত্তৃক নানা পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে।...এতন্মহানগরে ভিন্ন ভিন্ন ছয় স্থানে ছয়টা পৌর্ব্বাহ্নিক পাঠশালা নিযুক্তা হইয়াছে তাহাতে তিন শত সত্তর জন বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। এই সকল বিদ্যালয় হিন্দুকালেজে সুশিক্ষিত হিন্দু যুব মহাশয়েরদের দ্বারা স্থাপিতা হইয়া সম্পন্ন হইতেছে।

হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রেরণায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ঢ্যাকাডেমিক ঢ্যাসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্ক সভা স্থাপন করেন। প্রথম কিছুকাল ডিরোজিওর ভবনে এবং পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলাস্থ উদ্যানবাটীতে সভা বসিত। ডিরোজিও সাহেব সভার সভাপতি এবং উমাচরণ বসু সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। সভায় ছাত্রগণ ধর্ম্ম রাষ্ট্র সমাজ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোকেরাও আলোচনায় যোগ দিতেন।

* *The National Magazine*, January 1908: "Education in Bengal" By P. C. Mitra.

কর্ম্মী রাধানাথ

রাধানাথ শিকদারের লিখিত ছাত্রজীবনের বিবৃতিতে তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ সম্বন্ধেও তথ্য আছে। কলেজ ছাড়িবার পর ইংরেজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হয়। তজ্জন্য তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া আপিসে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে কম্পিউটার নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার সংস্কৃত পাঠে ব্যাঘাত হইল বটে, কিন্তু তিনি এখন হইতে গণিত সম্বন্ধীয় পুস্তক অধ্যয়ন করিবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিলেন। ১৮৩২ সনের ৭ই অক্টোবর রাধানাথ লেখেন, "আমি এক্ষণে সারভেয়র নিযুক্ত হইয়া সেরোং বেস লাইনে কার্য্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে ১৫ই অক্টোবর যাত্রা করিব।" *

ত্রিকোণমিতি সূত্রানুযায়ী জরিপ কি তাহা আমাদের অনেকের জানা নাই। সমস্ত পৃথিবী ৩৬০ ডিগ্রিতে বিভক্ত। কোন দেশের মানচিত্র আঁকিতে হইলে সে দেশ ৩৬০ ডিগ্রির কতটা অধিকার করিয়া আছে তাহা ঠিক করিতে হয়। এক ডিগ্রির পরিমাণ কত মাইল তাহা যে-প্রকার জরিপ দ্বারা নির্ণয় করা যায় তাহাকে ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সারভে বলে। ইহার এইরূপ নাম দিবার তাৎপর্য্য এই যে যে-দেশ জরিপ করিতে হইবে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ত্রিভুজে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের বাহুত্রয়ের পরিমাণ ঠিক করা প্রয়োজন। এইরূপ করিতে হইলে প্রথমে একখণ্ড সুবিস্তৃত সমতল শক্ত ভূমি পছন্দ করিয়া আট দশ মাইল দীর্ঘ একটি সরল রেখা অতি সাবধানে জরিপ করিতে হইবে। ইহাকে base line বলে। তৎপরে কোন সুদূরস্থ পদার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট সরল রেখার দুই প্রান্ত হইতে থিওডোলাইট যন্ত্রের সাহায্যে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোণ নিরূপণ করিতে হয়। তারপর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুসারে কাগজের উপর একটি ত্রিভুজ আঁকা প্রয়োজন। ত্রিকোণমিতির সাহায্যে, কোন একটি ত্রিভুজের একটি বাহু ও দুইটি কোণ পাওয়া গেলে, অপর দুটি বাহুর পরিমাণ পাওয়া

* রাধানাথের আত্ম-কথা।—আর্য্যদর্শন (কার্ত্তিক ১২৮১)।

যাইতে পারে। এই দুই নির্দ্দিষ্ট বাহুকে এক্ষণে নূতন দুইটি ত্রিভুজের আবার base line ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গণনা করিলে তাহার দুইটি বাহুর পরিমাণ-ফল ঠিক হয়। এই প্রকারে সমস্ত দেশ জরিপ করা যায়। প্রথম base line ঠিক করা অতি দুরূহ কর্ম্ম।*

রাধানাথ জরিপ-বিভাগে কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ণেল এভারেষ্টের নিকটও উচ্চগণিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে এভারেষ্ট সাহেব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন হিন্দু কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ ডেপুটি কালেক্টর নিয়োজিত হইবার অনুমতি পাইলেন তখন অন্যান্য বন্ধুদের সহিত রাধানাথও এই পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তিনি কর্ণেল এভারেষ্টের সুপারিশ পত্র চাহিলে কর্ণেল তাহাতে অস্বীকৃত হন। কর্ণেল এভারেষ্ট সরকারকে লিখিলেন যে, সত্বর এরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাহাতে রাধানাথ এই বিভাগের কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে রাজি হন। কারণ, তাঁহার তুল্য লোক বিলাতেও পাওয়া কঠিন। রাধানাথের কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া এভারেষ্ট লিখিলেন—

রাধানাথের গুণের কথা যতই বলি না কেন তাহা কিছুতেই অতিরিক্ত হইবে না। কি ইউরোপীয় কি ভারতীয় অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা গণিত-শাস্ত্রের দখলে তাঁহার সমকক্ষ বিবেচিত হইতে পারেন। আমার বিশ্বাস এইরূপ কৃতিত্ব ইউরোপেও খুব উচ্চ ধরণের বলিয়া বিবেচিত হইবে।......বিরাট বৃত্তাংশের এমন কতকগুলি বিষয় পাওয়া গিয়াছে যাহা গণনা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলে সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় বিফল হইবে। আমার ভারতবর্ষে অবস্থানকালে গণনাকার্য্য সম্পন্ন না হইলে, পূর্ব্বে যেমন একবার হইয়াছিল, এই সব অসম্পন্ন অবস্থায়ই ইণ্ডিয়া হাউসে পাঠাইতে হইবে এবং সেখানে যেরূপ সম্ভব ইহা সমাধা করা হইবে। আমার মনে হয়, ডিরেক্টর মহোদয়েরা গণনা সম্পূর্ণ অবস্থায় পাইলেই অধিকতর খুশী হইবেন। কারণ বিলাতে রাধানাথের তুল্য গণনাকারী দৈনিক এক গিনির কমে পাওয়া ভার। যদি আমরা তথায় রাধানাথের তুল্য বিজ্ঞ লোক অনুসন্ধান করি যাঁহারা গণনায় ব্যবহৃত সূত্রগুলির মূল অনুধাবন করিতে সক্ষম, তাহা হইলে আমরা পরিশেষে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইব যে, এরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের প্রস্তাবিত সর্ত্তে কিছুতেই রাজি হইবেন না।†

বাঙালী তথা ভারতবাসীদের মধ্যে রাধানাথ শিকদারই সর্ব্বপ্রথম জরিপ-বিভাগে প্রবিষ্ট হন। অতঃপর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আর্কট-নিবাসী সৈয়দ মহসীনও এই বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। উভয়েই কর্ণেল এভারেষ্টের নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। এভারেষ্ট সাহেব ১৮৪৩ সনের ডিসেম্বর মাসে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে কর্ণেল এণ্ড্রু ওঅ সারভেয়র-জেনারেল নিযুক্ত হন। রাধানাথের কর্ম্মদক্ষতায় তিনিও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫০ সনে কলিকাতায় দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ খালি হইলে রাধানাথ এই পদের জন্য পুনরায় দরখাস্ত করেন। তখন স্যর এণ্ড্রু ওঅ রাধানাথের গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা করিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম দিতেছি,—

আমি সসম্মানে জানাইতে চাই যে, ভারতবাসীদের মধ্যে সত্যকার জ্ঞানের প্রসার এবং বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির প্রচার সরকারের সাধারণ উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য। যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন—বিজ্ঞান অধিগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিলেই এই উদ্দেশ্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। [রাধানাথ যে কৃতিত্ব দর্শাইয়াছেন] তাহা শুধু আপেক্ষিক গুণ বা স্কুল কলেজে ভাবী উন্নতি-সূচক সাফল্য লাভের ব্যাপার নহে। যাহাতে অনিরত আত্ম-কর্ষণ প্রয়োজন এবং যাহা প্রতিভারই পরিচায়ক ইহা এইরূপ দুরূহ ব্যাপার এবং ইহা দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফল। রাধানাথ 'ম্যানুয়েল অব সারভেয়িং' পুস্তকে যে-সকল অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা

---

* আর্য্যদর্শন—মাঘ, ১২৯১। "রাধানাথ শিকদার" (পৃঃ ৪৭১, ৪৭২) হইতে প্যারাগ্রাফটি সংকলিত।

† *The Hindoo Patriot*, April 18, 1864. Quoted from the *Hills* :

"Of the qualifications of Radhanath I cannot speak too highly ; in his mathematical attainments there are few in India whether European or native that can at all compete with him, and it is my persuation that, even in Europe those attainments would rank very high. ... Of the part of the Great Arc just brought to completion, there are an immense number of observations, all to be brought up, without which the labour and expense will have been incurred in vain. If the operation of computing be not gone through, whilst I am in India, it will be necessary as on a prior occasion, that the work should be sent to the India House, in its raw state, and they are brought up, as it best may ; but I think it is quite clear that the Court of Directors will be much better satisfied on all accounts, at having the work sent to them in a complete state for computors comparable to Radhanath cannot be hired in England at a price less than a guinea per diem, and if we were to search for persons who can understand and trace to their origin the various formulas used, with an ability equal to that of Radhanath, the search would only end in the conclusion that persons so qualified would not undertake the business on any terms that could probably be offered to them."

কলিকাতা রিভিউ পত্রে সাগ্রহে স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার লিখন-রীতির সবিশেষ বিশুদ্ধতা এবং ভাষার কঠোর অভ্রান্তশূদ্ধতা—যাহা প্রাচ্য দেশের সালঙ্কারা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—প্রশংসিত হইয়াছে।*

ভারতবর্ষীয় ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে ১৮৫১ সনের ১৫ই এপ্রিল পার্লামেণ্টে এক রিপোর্ট পেশ করা হয়। তাহাতে অন্যান্য সহকারীদের সঙ্গে রাধানাথ শিকদারেরও প্রশংসাসূচক উল্লেখ আছে,—

A more loyal, zealous and energetic body of men than the sub-assistants forming the civil establishment of the survey department is nowhere to be found and their attainments are highly creditable to the state of education in India. Among them may be mentioned as most conspicuous for ability, Babu Radhanath Sikdar, a native of India of brahminical extraction whose mathematical attainments are of the highest order.†

জরিপ-বিভাগে কর্ম্মকালে রাধানাথের সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব—এভারেষ্ট আবিষ্কার। মেজর কেনেথ মেসন সাহেব "Himalayan Romances" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানকালে বলেন,—

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিবরগুলি গণনার সময় ১৮৫২ সনে একদিন প্রাতঃকালে স্যর জর্জ্জ এভারেষ্টের অনুবর্ত্তী স্যর এণ্ড্রু ওয়র গৃহে দৌড়িয়া গিয়া এক বাবু বলিলেন -'মহাশয়, আমি জগতের সর্ব্বোচ্চ শিখর আবিষ্কার করিয়াছি!' তিনি এই সময়ে দূরস্থ পাহাড় পর্য্যন্ত জরিপের ফলগুলি কষিতেছিলেন। স্যর এণ্ড্রু ওয়ই "এভারেষ্ট শৃঙ্গ" এই নাম প্রস্তাব করেন। তিব্বতী বা নেপালী ভাষায় ইহার কোনও নাম পাওয়া যায় নাই।*

রাধানাথ শিকদার ১৮৬২ সনের মার্চ্চ মাসে ত্রিকোণমিতি জরিপ-বিভাগে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাজ-কর্ম্ম করিয়া অবসরগ্রহণ করেন। তাঁহার অবসরগ্রহণের কথা এই বিভাগের সাধারণ রিপোর্টে (১৮৬১-১৮৬৬ সন) এই মর্ম্মে লিখিত আছে,—

রাধানাথ শিকদারের অধ্যক্ষতায় কলিকাতার কম্পিউটিং আপিস পরেশনাথ, হরিলং ও চেন্দোয়ার মেরিডিয়নাল সিরিজের সাধারণ রিপোর্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতে ব্যাপৃত ছিল। ইহা ত্রিকোণমিতিক এবং রাজস্ব-বিভাগের জরিপকারীদের বিশেষ প্রয়োজন। গত মার্চ্চ মাসে [১৮৬২] রাধানাথ শিকদার ত্রিশ বৎসর কর্ম্মের পর পেন্সন লইয়া অবসরগ্রহণ করেন। এই সময়ে বিভিন্ন সার্ভেয়র জেনারেলের নিকট হইতে তিনি বার বার প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।†

সমকালিক সংবাদপত্রেও রাধানাথের অবসরগ্রহণের সংবাদ পাওয়া যায়। 'সোমপ্রকাশ' (১৪ই এপ্রিল, ১৮৬২) বলেন,—

শুনা গেল বাবু রাধানাথ শিকদার পেন্সন লইয়া নিজপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহুকাল অত্রত্য অবজারভেটরির অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন। বাবু গোপীনাথ সেন এক্ষণে প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিতেছেন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' (১৫ই এপ্রিল, ১৮৬২) পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ম্মত্যাগের প্রাক্কালে রাধানাথ বিষপান করিয়াছিলেন।—

* *The Hindoo Patriot*, April 18, 1861. Quoted from the *Hills*:

"I wou'd most respectfully observe that it is part of the general policy of government to encourage the diffusion of genuine knowledge and sound scientific principles among the people of India, and that object perhaps could not be better attained than by specially rewarding those who master the higher branches of learning, and attain eminence in science. This is not a case merely of relative merit, or school or collegiate success offering the promise of future distinction which may or may not be realized. It is a case of long continued exertion, in an arduous profession of unremitting self-cultivation and professional merit. The masterly character of the papers contributed by Radhanath to the manual of surveying has been favourably acknowledged in the *Calcutta Review* as well as the remarkable purity of a style of writing and severe accuracy of language, so different from the exuberance of orientalism."

† Report of the Operations and Expenditure connected with the Trigonometrical Survey of India. April 15, 1851. P. 18.

* It was during the computations of the north-eastern observations that a babu rushed on one morning in 1852 into the room of Sir Andrew Waugh, the successor of Sir George Everest and exclaimed, 'Sir, I have discovered the highest mountain on the earth." He had been working out the observations taken to the distant hills. It was Sir Andrew Waugh who proposed the name Mount Everest, and no local name has ever been found for it either the Tibetan or the Nepalese side."
—*The Englishman*, November 12, 1928. p. 17.

† General Report on the Operations of the Great Trigonometrical Survey of India. (1861—1866.) By Colonel J. T. Walker. p. 7:

"The computing office in Calcutta, under the superintendence of Baboo Radhanath, chief computer, was engaged in completing the triplicate manuscript volume of the General Report of the Parisnath, Hurilong and Chendwar Meridional Series, and in furnishing elements for the various Topographical and Revenue Survey parties requiring them. In March last, Baboo Radhanath retired on a pension, after 30 years' service, during which he had repeatedly earned the approbation of the successive Surveyors General under whom he had served."

We observe Baboo Radhanath Sikdar has taken poison. Baboo Gopi Nauth Sen is in charge of the meteorological observatory.

১৮৫৩ সনে কলিকাতার পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সার্ভে আপিসে নিয়মিতভাবে আব-হাওয়ার পর্য্যবেক্ষণ আরব্ধ হয়।* ১৮৬৭ সনের ১লা এপ্রিল আলিপুরে স্বতন্ত্র অবজার্ভেটরী স্থাপিত হয়। রাধানাথ শিকদার যে সার্ভে আপিসে স্থিত অবজার্ভেটরীরও অধ্যক্ষ ছিলেন, সোমপ্রকাশ ও হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত সংবাদ হইতে তাহা জানা যাইতেছে।

গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিকদার

ডাঃ টাইট্‌লার ও কর্ণেল এভারেষ্টের নিকট গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রাধানাথ যে এ-বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে তৎকালিক *Hills* কাগজ যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই,—

বৃহৎ ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগে গতানুগতিক গণনাকারীর— তাহাদের মধ্যে দ্রুত গণনাকারীও আছে—অভাব নাই। কিন্তু গণিতজ্ঞ লোক এ বিভাগে এখন দুর্লভ। [জরিপ-বিভাগের] রাধানাথ অধিক কিছু না লিখিলেও 'ম্যানুয়েল অব্ সারভেয়িং' গ্রন্থের বিজ্ঞান ভাগ তাঁহার নিজস্ব। এখানি এ-বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত।†

'ম্যানুয়েল অব্ সার্ভেয়িং'-এর প্রথম (১৮৫১) ও দ্বিতীয় (১৮৫৫) সংস্করণে রাধানাথের সাহায্য ও দান স্বীকৃত হইয়াছিল।

[পুস্তকের] তৃতীয় ও পঞ্চম ভাগ প্রণয়নে সংকলয়িতারা ভারতবর্ষীয় বৃহৎ ত্রিকোণমিতিক জরিপের গণনা-বিভাগের সুযোগ্য অধ্যক্ষ বাবু রাধানাথ শিকদারের নিকট হইতে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছেন। বৃহৎ ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগে অবলম্বিত কঠোর নিয়ম ও পদ্ধতির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় এবং সাধারণভাবে বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি থাকায় তাঁহার সাহায্য বিশেষ করিয়া মূল্যবান হইয়াছে। তৃতীয় ভাগের পঞ্চদশ, সপ্তদশ হইতে একবিংশ এবং ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ ও সমগ্র পঞ্চম ভাগ সম্যক তাঁহার। সংকলয়িতারা যে-অংশের জন্য সাহায্য লাভ করিয়াছেন শুধু তাহার জন্যই নহে, স্ব-বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই রাধানাথ যে পরামর্শ দান করিয়াছেন তাহারও জন্য তাঁহার নিকট ঋণ যথাযোগ্যভাবে স্বীকার করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন।*

রাধানাথের মৃত্যুর পর ১৮৭৫ সনে এই গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয়। এই সংস্করণে রাধানাথের সাহায্যের উল্লেখমাত্র না থাকায় সমকালিক সংবাদপত্র-সমূহে ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল। ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগের অন্যতম ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লেফ্‌টনেণ্ট কর্ণেল ম্যাকডনাল্ড ১৮৭৬ সনের ২৪এ জুন সংখ্যার ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া কাগজে তৎকালীন সারভেয়র-জেনারেল কর্ণেল থুইলিয়রের (গ্রন্থখানির অন্যতর সংকলয়িতা) কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ লেখেন,—

...in this third edition the direction of the wind is shown by the omission in the preface of proper respectful acknowledgment to the best of the original authors of the Compilation, and the debt due to Radhanath Sickdar is wholly unacknowledged. Penance must be performed for this cowardly sin and robbery of the dead. Already this dishonesty of purpose has been four times noticed in the public journals, and it is certain that castigation will be inflicted at regular intervals as it is on habitual criminals, until the cause is removed, this edition called in, and a proper honest acknowledgement made for the personal appropriation of the best chapters in the book,—we mean those devoted to a description and practical application of the working of the "Ray trace system" invented by Everest, and practically explained by the Hindoo gentleman we have mentioned....

পুস্তকের এইরূপ কঠোর সমালোচনা প্রকাশে সারভেয়র-জেনারেল কর্ণেল থুইলিয়র নিম্নতন কর্ম্মচারী ম্যাকডনাল্ডের উপর অবাধ্যতার অপবাদ আরোপ করিয়া সরকারকে লিখিলেন। সরকার ১৮৭৬

* Administration Report: Alipore Observatory. Compiled by V. V. Sohoni, Meteorologist, Calcutta. 1927—1928.

† *The Hindoo Patriot*, Monday, April 18, 1864. Quoted from the *Hills*.

* In parts III and V the compilers have been largely assisted by Babu Radhanath Sickdhar, the distinguished head of the Computing Department of the Great Trigonometrical Survey of India, a gentleman whose intimate acquaintance with the rigorous forms and mode of procedure adopted on the Great Trigonometrical Survey of India, and great acquirement and knowledge of scientific subjects generally, render his aid particularly valuable. The chapters 15 and 17 up to 21, inclusive, and 26 of part III and the whole of part V are entirely his own, and it would be difficult for the compilers to express with sufficient force, the obligations they thus feel under to him, not only for the portion of the work which they desire thus publicly to acknowledge, but for the advice so generally afforded on all subjects connected with his own department.

সনের ১৬ই অক্টোবর কর্ণেল থুইলিয়রকে পত্রে জানান যে, এই অপরাধ হেতু ম্যাকডনাল্ডকে তিন মাসের জন্ম কর্ম্মচ্যুত করা হইল। এই সময় অন্তে প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে তাঁহাকে অবনমিত করা হইবে এবং সরকারের বিশেষ মঞ্জুর না হইলে প্রধান কর্ম্মস্থলে (head-quarters) পুনরায় তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইবে না।

লেফটেনেণ্ট কর্ণেল ম্যাকডনাল্ড সরকারের হস্তে এইরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইলেও সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সাহস ও সত্যবাদিতার জন্ম বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

জরিপ-বিভাগের গণনাকার্য্যের সুবিধার জন্ম ১৮৫১ সনে রাধানাথ শিকদার *Auxiliary Tables* নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সাহিত্য-সাধনায় রাধানাথ শিকদার

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যাঁহারা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন রাধানাথ শিকদার তাঁহাদের মধ্যে একজন। 'মাসিক পত্রিকা' আধুনিক কথ্য ভাষার জন্মদাতা। রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র একযোগে এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন। এই পত্রিকায় সকল বিষয় অতি সহজ ও সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া লেখা হইত। ১২৬১ সালের ১লা ভাদ্র (আগষ্ট, ১৮৫৪) মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইত। পত্রিকাখানি প্রায় তিন বৎসর চলিয়াছিল। ইহার কয়েক সংখ্যা দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। প্রত্যেক খানিতেই কাগজের উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিত আছে,—

> এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্তে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।...

মাসিক পত্রিকায় কি কি বিষয়ের আলোচনা হইত, ১২৬২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার (নং ১০) সূচীপত্র দৃষ্টে তাহা বুঝা যাইবে। যথা,—শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবীর দ্বিতীয় বিবাহ করিবার আপত্তি ঘুচিয়া যায়। ব্রজনাথ বাবুর চিঠি। আলালের ঘরের দুলাল নং ৪।

রাধানাথ 'মাসিক পত্রিকা'য় রীতিমত লিখিতেন। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি প্লুটার্ক জেনোফন প্রভৃতি হইতে নানা প্রবন্ধ 'মাসিক পত্রিকা'য় লিখিয়াছিলেন। রাধানাথ পত্রিকার মধ্য দিয়া যে শুধু ভাষা জগতেই বিপ্লব সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা নহে, সমাজ-সংস্কারেও তিনি বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। উক্ত সূচী হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

জনহিতকর কার্য্যে রাধানাথ শিকদার

রাধানাথ শিকদার যে তৎকালীন জনহিতকর কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্রের রোজনামচায় * আমরা তাহার আভাস পাই। ১৮৫৪ সনের ১২ই ডিসেম্বর কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এক সভায় সুহৃদ সমিতিস্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য, সম্মিলিত ভাবে সমাজের উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হওয়া। স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ আইন এবং বহুবিবাহ-প্রচলন রোধের প্রস্তাবও এই সভায় গৃহীত হয়। রাধানাথ শিকদার এই সভার সভ্য ছিলেন। মিত্র-মহাশয়ের ১৮৫৫ সনের ৯ই ডিসেম্বর তারিখের রোজনামচায় এইরূপ আছে,—

> আমি, দাদা, রাধানাথ, রসিক ও তারকনাথ সেন একত্র হইয়া হিন্দুবিধবাগণের পুনর্বার বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার প্রতি আমাদের প্রার্থনাপত্র বিবেচনা ও সংশোধন করিলাম। †

রাধানাথ যে পাঠ্যাবস্থা হইতেই শিক্ষাপ্রচারে অবহিত ছিলেন তাহার নিদর্শন আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি। আপিসের কঠোর কার্য্য করিয়া রাধানাথ যেটুকু স্বল্প অবসর পাইতেন তাহা তিনি দেশের কল্যাণকর্ম্মে ব্যয় করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষায় দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণ হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী শিক্ষাও প্রয়োজন। কিশোরীচাঁদের রোজনামচা (২৭এ আগষ্ট, ১৮৫৫) পাঠে জানা যায়,—

* শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের "কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ" পুস্তকে কিশোরীচাঁদ মিত্রের অপ্রকাশিত রোজনামচায় স্থল-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে।

† কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ, পৃঃ ১০৭।

দাদা ও রাধানাথের সহিত এ অঞ্চলে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। এই বিদ্যালয়টি দরিদ্রদিগের জন্য এবং গরীব ভদ্র শ্রেণীর লোকদের জন্য হওয়া উচিত। এদেশে গরীব ভদ্র শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বড় বেশী। সামান্য বাঙ্গলা শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় কেবল পাঠশিক্ষা ও দ্বিতীয় অবস্থায় লিখন ও অঙ্কশিক্ষা দেওয়া হইবে—শব্দ না শিখাইয়া বস্তু শিক্ষা দিতে হইবে।...*

দেশহিতকর কার্য্যে অনেক সময় রাধানাথের পরামর্শ লওয়া হইত। আর একটি ব্যাপার হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্দেশ্য শুধু দেশের কৃষ্টির চর্চ্চাই নহে, পরন্তু কৃষিশিল্পের উন্নতি চেষ্টাও। 'ব্যবসায় শিল্পপ্রদর্শনী' সংস্থাপনে সোসাইটি নেতৃত্ব গ্রহণ না করায় তিনি অনুযোগ করিয়া রোজনামচায় (১লা নবেম্বর, ১৮৫৫) লিখিয়াছেন,—

আমার অভিমত কৃষ্ণ, রামগোপাল, রাধানাথ, রাজেন্দ্রলাল, লঙ, কোলব্রুক ও যাদবকে বলিতে হইবে এবং এই সভার পুনর্গঠন বিষয়ে তাঁহাদের সহায়তা লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। †

রাধানাথ শিকদার জেনারেল য়্যাসেম্বলী ইনষ্টিটিউশনে কিছুকাল অঙ্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ‡

১৮৪৯ সনে ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল্ সোসাইটির অন্তর্গত নেটিভ কমিটি পুনর্গঠিত হইলে রাধানাথ শিকদার ইহার একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন‡‡ এবং দুই বৎসর পরে ১২৫৮ সালের ফাল্গুন মাসে ইহার সম্পাদকের পদ লাভ করেন। § রাধানাথ সোসাইটিকে বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া চাঁদা দিতেন।

চারিত্রিক বিশেষত্ব

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুবকগণ গতানুগতিক সমাজ ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে এই অগ্রণী দলকে অনেক সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা দমিবার পাত্র নহেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমরণ স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। দেশের আর্থিক রাষ্ট্রিক সামাজিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় নানা সৎকার্য্যে তাঁহাদের আত্মিক যোগ ছিল। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ নানা বিভাগে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসু বলেন,—

"...ডিরোজিও শিষ্যদিগকে একটি বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহারা রাজকার্য্যে উৎকোচ গ্রহণ না করার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।*

রাধানাথ শিকদার ডিরোজিওর শিষ্যদলে সকলের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিলেন। শারীরিক মানসিক উভয়বিধ উন্নতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহার একটা খেয়াল ছিল যে, গোমাংস ভক্ষণ না করিলে এ জাতির উন্নতির আশা নাই। প্যারীচাঁদ মিত্র 'ডেভিড হেয়ার' জীবনীতে (পৃঃ ৩২) লিখিয়াছেন,—

Radhanath Sikdar had an ardent desire to benefit his country. His hobby was beef, as he maintained that beef-eaters were never bullied, and the right way to improve the Bengalees was to think first of the *physique* and *morale* simultaneously.

রাধানাথ তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। সে যুগে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ জোর করিয়া সাধারণ লোকদের বেগার খাটাইত। ১৮৪৩ সনে রাধানাথ দেরাদুনে ছিলেন। এই সনের ৫ই মে সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট ভান্সিটার্টের আদেশে রাধানাথের কয়েক জন পাহাড়িয়া ভৃত্য মালপত্র লইয়া তাঁহার গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। রাধানাথ ভৃত্যদিগকে বেগার খাটিতে নিষেধ করেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের মালপত্র নিজ গৃহে রাখিয়া দেন। প্রথমে চাপরাসী, পরে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট মালপত্র লইতে আসিলে রাধানাথ বিনা রসিদে ইহা ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হন। রাজকর্ম্মচারীর কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইবার অপরাধে রাধানাথের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইল। মোকদ্দমা বহুদিন চলিবার পর, বিচারে রাধানাথের দুই শত টাকা

---

* কর্ম্মবীর কিশোরী চাঁদ, পৃঃ ৯৬-৯৭।

† ঐ। পৃঃ ৯৫।

‡ Presidency College Register. Calcutta. 1927: Shikdar, Radhanath.

‡‡ Calcutta District Charitable Society Report for 1849 (published 1850).

§ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১লা বৈশাখ, ১২৫৯। পূর্ব্ব বৎসরের বিবরণ।

* সেকাল ও একাল। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। শক ১৮০০। পৃঃ ৩১।

অর্থদণ্ড হইল বটে কিন্তু মোকদ্দমার সময় কর্ম্মচারীদের অত্যাচারের কথা যাহা প্রকাশ পাইল তাহাতে বহুদিন-পুষ্ট এই অন্যায়ের প্রতীকারের পথ পরিষ্কার হইয়া গেল।*

রাধানাথ ত্রিশ বৎসর কাল সরকারের কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। তিনি এত অমায়িক অথচ এরূপ প্রখর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন যে, দেশী-বিদেশী সকলের নিকট হইতে তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

রাধানাথ শিকদারের মৃত্যু

রাধানাথ ১৮৭০ সনের ১৭ই মে হুগলীর অন্তর্গত গোন্দলপাড়ায় গঙ্গাতীরে স্বীয় উদ্যানবাটিকাতে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২৩এ মে, ১৮৭০) লিখিয়াছিলেন,—

Radhanath was a remarkable man and had many good qualities.

'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২৬এ মে, ১৮৭০) বলেন,—

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বাবু রাধানাথ শিকদারের মৃত্যু হইয়াছে। গণিতে ইহার যেরূপ মস্তিষ্ক ছিল, এরূপ বাঙ্গালীর মধ্যে অতি কম লোকের আছে।...লাটিন গ্রীক ভাষাতেও ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

সে-যুগের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' কিন্তু রাধানাথ সম্বন্ধে তেমন উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর 'সোমপ্রকাশ' (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৭) লেখেন,—

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি বাবু রাধানাথ শিকদারের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন। রাধানাথ শিকদার ভারতবর্ষ ত্যাগ না করিয়াও স্বদেশীয় আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি বঙ্গভাষাও ভাল করিয়া বলিতে পারিতেন না। তিনি একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁহার নিকটে কোন বিষয়ে ঋণী নহেন।

দীর্ঘকাল ইংরেজদের সঙ্গে বাস করায় রাধানাথ তাহাদের উচ্চারণ ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি পূর্ণোদ্যমে বঙ্গভাষার চর্চা আরম্ভ করেন—পাঠকগণ তাহা অবগত হইয়াছেন। 'সোমপ্রকাশ' যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া রাধানাথকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন সে-সম্বন্ধে হিন্দু পেট্রিয়টের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। হিন্দু পেট্রিয়ট (২৩এ মে, ১৮৭০) বলেন,—

Habit and association made Radhanath forget almost his mother tongue, and though when he returned to Bengal after about a quarter of a century he sedulously applied himself to the study of Bengali, he could never get rid of that twang and intonation which mark the pronunciation of Bengali by a foreigner. His desire to improve his knowledge of the vernacular led him to join a friend in editing a monthly Magazine called the *Masik Patrika*, intended for the instruction of Hindu Females. *

* এই মোকদ্দমার বিস্তৃত বিবরণ ১৮৪৩ সনের দ্বিভাষিক বেঙ্গল স্পেক্টেটরের ১লা, ৯ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর এবং ১৭ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

* কলিকাতা ভারতীয় বৃহৎ ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগ এবং আলীপুর অবজার্ভেটরীর কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র দেখিতে দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

কষ্টিপাথর

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস

১৮২৩—১৮৩৫ সেপ্টেম্বর

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রিত যে-সকল পুস্তক, পুস্তিকা বা সাময়িক পত্রে সংবাদ, সরকারী আইন ও বিচারপদ্ধতির এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সমালোচনা থাকিত, কেবল তাহাদের জন্ত ১৮২৩ সালে নূতন আইন সৃষ্টি হইল। এই আইন অনুসারে কোন সাময়িক পত্র বাহির করিবার পূর্ব্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশ করা ছিল।...

১৮৩৫ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর স্তর চার্লস মেটকাফ সাময়িক পত্রের স্বাধীনতা-বিরোধী সকল বিধি তুলিয়া দেন। সুতরাং ১৮২৩ সনের এপ্রিল হইতে ১৮৩৫ সনের মাঝামাঝি—এই বারো বৎসরের মধ্যে যে সকল সাময়িক পত্রের উদ্ভব হয়, তাহাদের নামধাম সরকারী দপ্তর হইতে সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য যে-সব কাগজে সংবাদ বা রাষ্ট্রীক অলোচনা থাকিত না, তাহাদের লাইসেন্স লইতে হইত না, সুতরাং তাহাদের নামধাম সরকারী দপ্তরে পাইবার কথা নয়।...

১। সম্বাদ তিমিরনাশক—কলিকাতার ৪০ নং মীর্জ্জাপুর হইতে এই বাংলা সংবাদপত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্ত কৃষ্ণমোহন দাসকে সরকার ১৮২৩ সনের ২১এ আগষ্ট লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে (কার্ত্তিক ১২৩০) কাগজখানি প্রকাশিত হয়।...

'সম্বাদ তিমিরনাশক' রক্ষণশীল দলকে সর্ব্বদাই তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত, এবং যখন-তখন উদারপন্থীদের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে ত্রুটি করিত না। ১৮৩৭ সনের পূর্ব্বেই কাগজখানির মৃত্যু হয়।

২। বঙ্গদূত—ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮২৯ সনের ১০ই মে তারিখে। পরবর্ত্তী ২৩শে মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি,—

"নূতন সমাচার প্রকাশ। মোং বাঁশতলার গলির মধ্যে হিন্দু হরল্ড অর্থাৎ বঙ্গদূত প্রেষ নামক এক নূতন ইংরেজী বাঙ্গলা ও পারসী ও নাগরী সমাচার গত রবিবারাবধি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহার সম্পাদক শ্রীযুত আর এম মার্টিন সাহেব ও শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় ও শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র এই কএকজনে একত্র হইয়াছেন এই কাগজ প্রতিরবিবারে প্রকাশ হইতেছে...।"

বঙ্গদূতের প্রত্যেক সংখ্যার দুই-তিন পৃষ্ঠা ফার্সীতে লিখিত।...

বঙ্গদূতের সম্পাদক ছিলেন—সুপণ্ডিত নীলরত্ন হালদার।...কিছুদিন পরে ভোলানাথ সেন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার জন্ত তাঁহাকে ১৮৩০, ১৩ই এপ্রিল তারিখে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইয়াছিল।

ভোলানাথ সেনের মৃত্যু হইলে, মহেশচন্দ্র রায় অল্পদিন কাগজখানি চালাইয়া বন্ধ করিয়া দেন।

৩। শাস্ত্রপ্রকাশ—১৮৩০ সনের জুন মাসের মাঝামাঝি এই সাপ্তাহিক পত্রখানির আবির্ভাব হয়; ইহা প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হইত। 'শাস্ত্রপ্রকাশে' কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় আলোচনাই স্থান পাইত। লক্ষ্মীনারায়ণ স্তায়ালঙ্কার ইহা প্রকাশ করিতেন।

৪। সংবাদ প্রভাকর—কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৩১ সনের ২৮এ জানুয়ারি (১৬ মাঘ, ১২৩৭) সাপ্তাহিক সমাচারপত্ররূপে প্রথম উদয় হয়।...

'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশে পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।...

প্রায় দেড় বৎসর চলিবার পর ১৮৩২ সনের ২৫এ মে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

চারি বৎসর পরে, ১৮৩৬ সনের ১০ই আগষ্ট (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) সংবাদ প্রভাকর পুনঃপ্রকাশিত হইল; সাপ্তাহিকরূপে নহে,—বারত্রয়িক রূপে।...

এইভাবে তিন বৎসর চলিবার পর ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। বাংলা ভাষায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।...

দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া, 'সংবাদ প্রভাকরে' ধর্ম্ম সমাজ সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা থাকিত। সেকালের গণ্যমান্ত ব্যক্তিরা এই সংবাদ প্রভাকরের লেখক ছিলেন, যেমন—রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি অনেকের বাল্যরচনা সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল।...

১২৬০ সালের বৈশাখ (১৮৫৩) হইতে প্রভাকরের একটি মাসিক সংস্করণ বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।...

সংবাদ প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক ছিলেন—শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুপ্ত-কবির অনুপস্থিতিতে তিনিই সম্পাদকের কার্য্য করিতেন।...

১৮৫৯, ২২এ জানুয়ারি (১০ মাঘ ১২৬৫) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোকগমন করিলে তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক হন। কাগজখানি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

৫। সম্বাদ সুধাকর—"কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব" প্রেমচাঁদ রায়ের সম্পাদকত্বে ১৮৩১, ২৩এ ফেব্রুয়ারি (১৩ ফাল্গুন ১২৩৭) তারিখে 'সম্বাদ সুধাকর'-এর প্রথম আবির্ভাব।

'সম্বাদ সুধাকর' অনেকটা মধ্যপন্থী ছিল—এই পত্রিকার জন্ত

কানাইলাল ঠাকুর একটি প্রেস করিয়া দিয়াছিলেন। 'সম্বাদ সুধাকর' চারি বৎসর চলিয়াছিল।...

৬। সমাচার সভা রাজেন্দ্র—মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। বাংলা ও ফার্সীতে প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক পত্রখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সনের ৭ই মার্চ (২৫ ফাল্গুন ১২৩৭) তারিখে। ইহার সম্পাদক—শেখ আলীমুল্লা...। 'সমাচার সভা রাজেন্দ্র' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

৭। জ্ঞানান্বেষণ—কলিকাতার চোরবাগান হইতে এই সাপ্তাহিকখানি প্রকাশ করিবার জন্য সরকার ১৮৩১ সনের ৩১ মে তারিখে দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়কে (পরে 'দক্ষিণারঞ্জন' নামে খ্যাত) লাইসেন্স দেন। পরবর্ত্তী জুন মাসের ১৮ই তারিখে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়ের পর 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালন করেন,—রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক। ১৪১ নং চোরবাগান হইতে ইংরেজী ভাষাতেও এই সাপ্তাহিকখানি প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে আবেদন করিলে সরকার ১৮৩৩, ১৫ই জানুয়ারি তারিখে তাঁহাদের লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছিলেন। লাইসেন্স পাইবার কয়েক দিন পর হইতেই 'জ্ঞানান্বেষণ' ইংরেজী ও বাংলা—উভয় ভাষাতেই বাহির হইতে থাকে।

১৮৩৯ সনের মার্চ মাসে 'সম্বাদ ভাস্কর' সংবাদপত্র বাহির করিবার পূর্ব্বে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন।...'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের শিরোভূষণ কবিতাও তর্কবাগীশের রচিত। তিনি উদারমতাবলম্বী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৪৯ সনের ২৬এ মে তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে তিনি বীটন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে যে-সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

“আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ্য যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই 'এহি জ্ঞান মনুষ্যাণাং মজ্ঞান তিমিরংহর। দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপিসংহর' গৌড়ীয় ভাষায় পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি 'বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন॥ লোকের অজ্ঞান রূপ হয় অন্ধকার। একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥ এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র২ কি লক্ষ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল থাকাই কহিব...।”

স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অনেক রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছিল।

প্রায় দশ বৎসর চলিবার পর, ১৮৪০ সনের নভেম্বর মাসে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের প্রচার রহিত হয়।

৮। অনুবাদিকা---১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে রিফর্ম্মার পত্রে প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ বাহির হইত।

'রিফর্ম্মার' ও 'অনুবাদিকা'---উভয় কাগজেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এক বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই 'অনুবাদিকা'র প্রচার বন্ধ হয়।

৯। সম্বাদ রত্নাকর—১৮৩১, ২২এ আগষ্ট (৭ ভাদ্র ১২৩৮) তারিখে কাগজখানি প্রকাশিত হয়।...১৮৩২ সনের জানুয়ারি মাসেই ইহার প্রচার রহিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা হইতে জানা যায়, এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন,---রামচন্দ্র পাল।

১০। সম্বাদ সারসংগ্রহ---বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় এই সংবাদপত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য ইহার স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক--সিমলার বেণীমাধব দে সরকারের নিকট আবেদন করেন। ১৮৩১ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী ২৯এ সেপ্টেম্বর তারিখে (১৪ আশ্বিন ১২৩৮) 'সম্বাদ সারসংগ্রহ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।...'সম্বাদ সারসংগ্রহ' কিছুদিন প্রকাশিত হইয়া লুপ্ত হয়।

১১। সংবাদ রত্নাবলী---বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হইতে 'সংবাদ রত্নাবলী' সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায়:---

“প্রভাকর-সম্পাদক দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ শ্রাবণ [২৪ জুলাই ১৮৩২] 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন। ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে সংবাদ রত্নাবলী আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম রত্নাবলী সাধারণ-সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হন।”

সংবাদ রত্নাবলী প্রায় দুই বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৪৫ সনের ১৫ই নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৫২) তারিখে ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর সম্পাদকত্বে ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়।

১২। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়---ইহার প্রথম সংখ্যা 'চান্দ্রজ্যৈষ্ঠমাসীয় সমাচার'রূপে ১৮৩৫ সনের ১০ জুন (২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, বুধবার) প্রকাশিত হয়।

তিন বৎসরের উপর হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তৎপরে ১৮৩৯ সনের আরম্ভ (?) হইতে কলিকাতা আমড়াতলার আঢ্য-পরিবারের উদয়চন্দ্র আঢ্য সম্পাদক হন।

১৮৪১ সনে উদয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে অদ্বৈতচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ১৮৮৬ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার পঞ্চম সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ আঢ্য। ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়; তাহার পর আরও এগার মাস 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' চলিয়াছিল।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় মাসিক আকারে সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৫ সনে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পর বৎসর ৯ই এপ্রিল তারিখ হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল।

১২৪৮ সালে (১৮৪১ ?) ইহা বারত্রয়িক আকার ধারণ করে। ১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে (১২৫১ বঙ্গাব্দ) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় দৈনিকের কলেবর ধারণ করে।

১৩। ভক্তিসূচক—এই সাপ্তাহিক পত্রখানি ১৮৩৫ সনের ২রা সেপ্টেম্বর (?) বুধবার প্রকাশিত হয়।

বাংলা পাক্ষিক ও মাসিক পত্র

১। জ্ঞানোদয়—ইহা ১৮৩১ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৩১, ৩১এ ডিসেম্বরের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি:—

"শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।"

২। বিজ্ঞান সেবধি—ইহা ১৮৩২ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।

৩। জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ—পাদরি লঙের তালিকা হইতে ১৮৩২ সনে প্রকাশিত আর একখানি সাময়িক পত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা রসিককৃষ্ণ মল্লিকের 'জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ'। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপত্রের ইতিহাসেও ইহার নাম পাওয়া যায়। কাগজখানি বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

৪। বিজ্ঞান সারসংগ্রহ—ইহা একখানি পাক্ষিক পুস্তক। ১৮৩৩ সনের আগষ্ট (?) মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

পাদরি লং ভ্রমক্রমে ইহার নাম "বিদ্যাসারসংগ্রহ," এবং প্রকাশকাল "১৮৪৪" লিখিয়াছেন।

৫। চার আনা পত্রিকা - ইহা ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া পাদরি লং উল্লেখ করিয়াছেন।

হিন্দী সংবাদপত্র

'ভারতমিত্র'-সম্পাদক বালমুকুন্দ গুপ্তের 'গুপ্ত নিবন্ধাবলী'র ৫৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, কাশী হইতে ১৮৪৫ সনে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত 'বনারস আখ্‌বার'ই প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র। এই কাগজখানি রাজা শিবপ্রসাদের আনুকূল্যে, এবং গোবিন্দনাথ থাট্টে নামক একজন মারাঠার সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয়, হিন্দীভাষা-ভাষীরা তাঁহাদের মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের আদি ইতিহাস জানেন না। 'বনারস আখ্‌বার' প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বেই একাধিক হিন্দী সংবাদপত্র ছাপার হরফে কলিকাতা হইতে বাহির হইয়াছিল।

১। উদন্ত মার্ত্তণ্ড—কলিকাতার কলুটোলার ৩৭ নং আমড়াতলা গলি হইতে শ্রীযুত যুগলকিশোর শুকুল 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেন। সরকার ১৮২৬ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

যুগলকিশোর শুকুলের আদি নিবাস কানপুরে; তিনি তখন সদর দেওয়ানী আদালতে 'প্রোসিডিংস্ রীডার'-এর কাজ করিতেন।

১৮২৬ সনের ৩০এ মে 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি মঙ্গলবারে বাহির হইত; মাসিক চাঁদা ছিল দুই টাকা।...উপযুক্ত গ্রাহকের অভাবে, উদন্ত মার্ত্তণ্ড' বেশী দিন চলিল না। ১৮২৭, ৪ঠা ডিসেম্বর ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক লিখিলেন,—

"আজ দিবস লোঁ উগ্ চুকো মার্ত্তণ্ড উদন্ত্
অস্তাচলকো জাত হ্যায় দিনকারদিন্ অব্ অন্ত।"

—আজ পর্য্যন্ত উদন্ত মার্ত্তণ্ড উদিত ছিল; সে অস্তাচলে যাইতেছে—মার্ত্তণ্ডের আয়ু শেষ হইল।

ফার্সী সংবাদপত্র

১। সমস্‌উল আখ্‌বার—১৮২৩ সনের ৬ই মে তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্সের নকল হইতে জানা যায়, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী ভাষার এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন—মণিরাম ঠাকুর; স্বত্বাধিকারী—মথুরামোহন মিত্র। কলিকাতার ২৬ নং চোরবাগান ষ্ট্রীট হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। ১৮২৩ সনের ৩০এ মে (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০) ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

২। আখবারে শ্রীরামপুর—শ্রীরামপুর মিশন হইতে এই পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮২৬ সনের ৬ই মে। ইহা "পারসি ভাষাতে 'সমাচার দর্পণ' পত্রের তর্জ্জমা।"

৩। আইনা-ই-সিকন্দর—১৫৭ কলানবা (কলিঙ্গাবাজার বা কলিন ষ্ট্রীট?) আইনা-ই-সিকন্দর প্রেস হইতে এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি প্রকাশিত হইত। ইহার ৯৯ সংখ্যার তারিখ দেখিতেছি—১৮৩৩, ২১এ জানুয়ারি।

৪। মাহ্-ই-আলাম্ আফ্রোজ—কলিকাতার ৫৩ নং তালতলা হইতে এই ফার্সী সংবাদপত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য ওয়াহাজ-উদ্দীনকে ১৮৩৩ সনের ২২এ মার্চ্চ লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। কাগজখানি কিছুদিন পরে বাহির হইয়াছিল।

৫। সুলতান-উল্-আখ্‌বার—এই ফার্সী সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি কলনবা (মুনশী গোলাম রহমানের মসজিদের নিকট) হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ—১৮৩৫, ২রা আগষ্ট।

উর্দ্দু সংবাদপত্র

১। সমস্‌উল আখ্‌বার—১৮২৩ সনের ৩০এ মে ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়, ইহাই উর্দ্দু ভাষার দ্বিতীয় সংবাদপত্র।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৩৮)

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আলঙ্কারিকেরা বলেন বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব প্রভৃতি কয়েকটি ভাবের সমষ্টির নাম রস। রস কথাটার কোনও ভিন্ন অর্থ নাই। রস আবার নয় রকমের হাস্যরস সেই নব রসের একটি।···

পাগলা-ঝোরা, ফোয়ারা, সাহারা প্রভৃতির কথাই ধরা যাক্।···

হাসি ও কান্না যেন দুইটি যমজ বোন—তারা এক সঙ্গে চলে। ললিতকুমারের রচনার ভেতর এই জিনিষটির সন্ধান পাই। শক্তিশালী লেখক হাসি ও কান্না এক সঙ্গে গেঁথে গেঁথে তাঁর কল্পনাকে এক একটি মালায় পরিণত করেছেন। গভীর বিষয়গুলিকেও তিনি হাস্যরসাত্মক রচনার ভেতর দিয়ে অতি নিপুণভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।··· ললিতকুমার ছিলেন হাস্যরসের ফোয়ারা, পাগলা-ঝোরার জলোচ্ছ্বাসের মত তাঁর হাস্যরসের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। ললিতকুমারের হাস্যরস উদ্দাম না হ'লেও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ললিতকুমারের রচনার মূল্য আছে। কেন-না, যে-ধরণের রচনা তাঁর লেখনীর ভেতর দিয়ে বেরিয়েছে তা বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। তাঁর হাস্যরস অফুরন্ত বটে, কিন্তু ফোয়ারার জলোচ্ছ্বাসের মত উচ্ছৃঙ্খল নয়, তা গঙ্গার প্রশান্ত বক্ষের মত ধীর স্থির ও শান্ত। প্রথম দৃষ্টিতে হয় ত পাঠক তাঁর রচনার কোনও রস পাবেন না। কিন্তু একাগ্রচিত্ত পাঠক তার ভেতরকার রূপটুকুর সন্ধান পাবেন। ফোয়ারার প্রথম প্রবন্ধটি যাতে গরুর গাড়ীর সঙ্গে বাষ্পীয় যানের তুলনা করা হয়েছে—তা সত্য সত্যই উপভোগ্য।···

ককারের অহংকার, ব্যাকরণ বিভীষিকা, অনুপ্রাসের অট্টহাসি, ফোয়ারা, পাগলা-ঝোরা, সাহারা প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক পুস্তকগুলির ভেতর দিয়া তাঁহার উদার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। শিশুসাহিত্যও তাঁর কাছে কম ঋণী নয়। শিশু সাহিত্যে হাস্যরসের প্রবর্ত্তন বলতে গেলে তিনিই করে যান। তাঁর 'রসকরা' 'সাতনরী' প্রভৃতি ছেলেদের জন্য লেখা বইগুলি পাবার জন্য এখনও ছেলেদের মারামারি করতে দেখেছি। শিশুসাহিত্যে হাস্যরসের উন্নতির পরাকাষ্ঠা আমরা দেখতে পাই সুকুমার রায়ের লেখায়। তাঁর লেখা 'আবোল তাবোল' 'হ য ব র ল'। লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি পড়ে শিশুদের বাবাকেও হাসতে দেখেছি।···সুকুমারবাবুর অনুসরণে কাজী নজরুল ইসলাম 'ঝিঙেফুল' নামে এক শিশুদের উপযোগী কবিতার বই প্রকাশিত করেছেন। কিন্তু একথা বলা বাহুল্য যে, সুকুমারবাবুর লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার তুলনাই হয় না। সেই বইটির রচনা অত্যন্ত কষ্টকল্পিত, তা ছাড়া স্থানে স্থানে ছন্দের গোলমালে রচনার মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসুও এই দিকটা সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাও যে খুব সার্থক তা নয়।··· শিশুসাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু। তাঁর "লাল কালো" বইখানা বঙ্গসাহিত্যের গৌরব।

বঙ্গসাহিত্যে নির্ম্মল হাস্যরসের প্রবর্ত্তন করে যান বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর রচিত লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতিতে হাসতে কোথাও আটকায় না—কোথাও জোর করে হাসি আনতে হয় না। কিন্তু সে হাস্যরসাত্মক রচনা চিন্তনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ।···

লোকরহস্যের প্রত্যেকটি প্রবন্ধে, বিশেষত মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে তৎকালীন বঙ্গসমাজ এবং বাঙালীর যে চিত্র পাই—তা অতুলনীয়। কমলাকান্তের দপ্তরে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে আলোচ্য প্রসঙ্গ অবতারণা করা হ'লেও তা পাঠককে ভাববার যথেষ্ট অবসর দেয়। তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধগুলিও গভীর।

বাস্তব জগতের মত সাহিত্যজগতেও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হতে পরবর্ত্তী যুগ উৎপন্ন—তাই পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ পরবর্ত্তী যুগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইন্দ্রনাথের ভারত উদ্ধার নামক ব্যঙ্গ কাব্য এবং পঞ্চানন্দ মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধাবলী, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা এবং গানগুলি এবং বঙ্কিমের লোকরহস্য প্রভৃতি প্রায় একই স্তরের। তাঁদের আলোচ্য বিষয়ও প্রায় একই। তাঁরা প্রত্যেকেই তদানীন্তন সমাজের গলদগুলি নিয়ে আলোচনা এবং তাদের তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

দীনবন্ধু মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের হাস্যরসাত্মক রচনার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। দীনবন্ধুবাবুর নিমচাঁদ চরিত্র বঙ্গসাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি: এ পর্য্যন্ত নিমচাঁদের মত চরিত্র বঙ্গসাহিত্যের আর কোনও সাহিত্যরথী সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি। কালীপ্রসন্নবাবুর 'হুতুম পেঁচার নক্সা' তৎকালীন বঙ্গসমাজের এমন নিখুঁত চিত্র এবং এ রকম তীব্র সমালোচনা আর কোনও লেখক দিতে পারেন নি। বঙ্গসাহিত্যে নক্সার প্রবর্ত্তন তিনিই ক'রে যান। আজকাল কেদার-বাবুর রচনায় নক্সা যত সাফল্য লাভ করেছে কালীপ্রসন্নবাবুর পর আর কারও লেখায় তত সাফল্য লাভ করে নি।

গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্যকারেরাও তাঁদের নাটকের মধ্যে হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাদি যোগ করে দিয়েছেন।···

বঙ্গসাহিত্যের এই দিকটি রবীন্দ্রনাথের এবং শরচ্চন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নি। রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্রও নানাবিধ উপন্যাস নাটক কবিতা এবং প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে বঙ্গসাহিত্যের এই দিকটা সমৃদ্ধ করেছেন এবং করছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কৌতুক চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা, শোধবোধ প্রভৃতি নাটিকা এবং কণিকা, মানসী প্রভৃতি কবিতা পুস্তকের সেকাল ও একাল, হিং টিং ছট্, দুরন্ত আশা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের যে বইখানা বেরিয়েছে তার মধ্যেও হাস্যরসের প্রাচুর্য্যের সন্ধান পাই। কিন্তু সে হাস্যরস আর চিরকুমার সভা প্রভৃতির হাস্যরস এক প্রকৃতির নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসের খোলটা ঠিকই আছে, কিন্তু নলচেটা একেবারে নতুন। অতি আধুনিক ফ্রেঞ্চ জার্ম্মান আমেরিকান সভ্যতার এক জগা-খিঁচুড়ি-বাঙালী যুবক যুবতী সমাজের যে-চিত্র তিনি আমাদের দিয়েছেন তার জুড়ি মেলে না। শরচ্চন্দ্রের হাস্যরসাত্মক কোনও ভিন্ন বই না থাকলেও তাঁর হাস্যরস সমস্ত উপন্যাসের ভেতর ছড়িয়ে আছে। তাঁর হাস্যরস কেবলমাত্র পাঠককে হাসাবার জন্য নয়। তাদের মধ্যে একটা দুঃখ, ক্ষোভ, দিনযাপনের গ্লানি এবং নির্যাতিতের বাঁধন ছেঁড়ার প্রয়াসের সন্ধান পাই। সুরেশ, কিরণময়ী, রমেশ, শেখর, ইন্দ্র, শ্রীকান্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্যে হাস্যরসের ভেতর দিয়ে এই বিষয়গুলিই আমাদের সব চাইতে আকৃষ্ট করে। শরচ্চন্দ্রের হাস্যরস নিজেকে লুকিয়ে রাখে। তাকে খুঁজে বার করে নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস দুই রকমের। এক রকম হাস্যরস নিজেকে গোপন রাখে না। তা পাঠকের কাছে আপনি ধরা দেয়। তা পাঠককে হাসায় বটে, কিন্তু তাকে চিন্তা করবার খোরাক খুব বেশী যোগায় না। আবার আর এক রকমের হাস্যরস নিজেকে এমন ভাবে গোপন ক'রে রাখে যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাকে খুঁজে বার করা সব সময় সম্ভব হয় না। প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসের প্রাচুর্য্য নাটক-নাটিকাগুলির মধ্যে এবং তার মূল্যও যে খুব বেশী তা নয়। কিন্তু শেষের শ্রেণীর হাস্যরসের দৃষ্টান্ত তাঁর উপন্যাস এবং পঞ্চভূত, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির মধ্যে চতুরঙ্গ প্রভৃতি কোনও কোনও গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় এবং এইগুলিই সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে মূল্যবান, কেন-না,

এইগুলিই ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকের মূলধন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের এবং শরচ্চন্দ্রের হাস্যরসের পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথ এবং শরচ্চন্দ্রের পরই যাঁরা বঙ্গসাহিত্যের এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজশেখর বসু (পরশুরাম), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী এবং হরিদাস হালদারের নামই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে পড়ে। হরিদাসবাবুর গোবর গণেশের গবেষণাকে ললিতকুমার এবং রাজশেখরবাবু এবং কেদারবাবুর রচনার সংযোজক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রাজশেখরবাবুর গড্ডলিকা, কজ্জলী এবং অন্যান্য মাসিক পত্রে প্রকাশিত ছেলেধরা, হনুমানের স্বপ্ন প্রভৃতি গল্পগুলি, কেদারবাবুর কোষ্ঠীর ফলাফল, আমরা কি ও কে, কবুলতি এবং নানা সাময়িক মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ, নক্‌সা এবং গল্পগুলির স্থান বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে অমর।...রাজশেখরবাবু এবং কেদারনাথবাবুর রচনার ভেতরও পার্থক্য আছে। কেদারনাথবাবুর লেখনী সামাজিক গলদগুলির বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই উদ্যত। ধর্ম্মের নামে সমাজপতিদের অত্যাচার অবিচার জর্জ্জরিত পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত জনসাধারণের দুঃখে তার প্রাণ যে সত্যসত্যই কাঁদে তার প্রমাণ আমরা তার প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে পাই। এই দিক দিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে কেদারবাবুর রচনার মিল আছে। এ কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে, কেদারবাবুর রচনায় Lambএর প্রভাব বেশ স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে।

রাজশেখরবাবুর শক্তি অতুলনীয়। যে-ভঙ্গীর রচনা তাঁর লেখনীর ভেতর দিয়ে বেরোচ্চে তা বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। তার প্রত্যেকটি রচনা ভাষার মাধুর্য্যে বক্তব্য বিষয়ের অভিনবত্বে নিজের মনের ভাবটি ফুটিয়ে তোলবার অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতায় সমৃদ্ধ। তার রচনার একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, যেগুলিতে কোথাও ইচ্ছে ক'রে অথবা জোর ক'রে হাসাবার চেষ্টা মাত্র নেই অথচ জিনিষগুলি এমন ভাবে লেখা যে, পাঠক না হেসে পারে না।...এঁদের সঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নামও উল্লেখযোগ্য। অধুনা-বিলুপ্ত সবুজপত্রে প্রকাশিত সুরেশবাবুর লেখা 'হাসি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ মূল্যবান সন্দেহ নাই। হাসি প্রবন্ধটিতে তিনি যে প্রকার ভেদ এবং বিশ্লেষণ করেছেন তা সত্যসত্যই উপভোগ্য।...

(ইঙ্গিত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯)

রবীন্দ্রনাথের সুর

শ্রীমণিলাল সেন-শর্ম্মা

কবিতায়, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নানাদিক থেকে আলোচনা অনেক কাল থেকেই চলে আসছে, কিন্তু সুর-রচনায় তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত সে-ভাবে বিশেষ কোন প্রকার আলোচনা হয়েছে বলে আমরা জানি না। সুর-সৃষ্টিতে তিনি অনেক উচ্চে একটি আসন অধিকার ক'রে আছেন, অথচ দেশে তেমন সঙ্গীতজ্ঞের অভাব থাকাতে সুরের দিক থেকে তাঁর প্রতিভার বিচার আরম্ভ হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুরে আমরা পাই ভারতীয় উচ্চ-সঙ্গীতের ধ্রুপদ এবং বাংলার নিজস্ব সম্পদ বাউলের প্রাধান্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ঠুংরি এবং বাংলার কীর্ত্তনও তাঁর সুরে অল্প-বিস্তর স্থান অধিকার করেছে। বিষয়টি খুব তলিয়ে দেখতে গেলে এবং বুঝতে হ'লে আমাদের প্রথম জানা দরকার হবে ধ্রুপদ, বাউল, ঠুংরি ও কীর্ত্তনের কি কি বিশেষত্ব এবং ঐ সবের কতটুকু কি ভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে সুর-রচয়িতার অজ্ঞাতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে। খেয়াল অথবা টপ্পার প্রভাব কবির সুরে কেনই বা নেই, তাদের বিশেষত্বটা কি এবং কবির সুরে এদের প্রভাব কেন অকল্যাণকর, এ সবও অবশ্য না দেখলে চলবে না। উচ্চসঙ্গীতের প্রভাবে কবি প্রভাবান্বিত হয়েছেন তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। সে সময়ে বনেদী ঘরের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই সঙ্গীতচর্চ্চা হ'ত। ওস্তাদগণ গাইতেন, বাজাতেন, শিক্ষাও দিতেন। সে-সব বাড়ির প্রায় প্রত্যেককেই একটু-আধটু সুরের কসরৎ করতে হ'ত। একান্ত যদি কেউ না করতেন তাহ'লেও তাঁদের সম্ কোথায় হবে, তেহাই কি বা কি কি রাগ-রাগিণী গাওয়া হ'ল, এ সব জানা দরকার হ'ত। এই ছিল সে সময়কার রীতিনীতি। বাল্যকালে কবি ৺যদুভট্ট, ৺রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি সে-সময়কার দেশবিখ্যাত ওস্তাদদের গানবাজনা শুনে ও অনুকরণ ক'রে তার স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করেছেন এবং আয়ত্তও করেছেন।

কবির প্রথম জীবনের রচিত উচ্চসঙ্গীতের ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা শ্রেণীর গান যথেষ্ট আছে। প্রসিদ্ধ হিন্দী গানের সুর ও ছন্দের সাহায্য নিলেও তিনি ঐ সব গানের কথার ভাবের অনুকরণ করেন নি। ভাবের দিক থেকে দেখলে গানগুলির নিজস্ব সত্তা পুরাপুরিই রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের সুর নিয়ে আলোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয়, সমীচীনও নয়। উৎকৃষ্ট হিন্দী গানের ছাঁচে ঢালাই করা গান তাঁর যথেষ্ট আছে। ঐ সব গানের কথার ভাবে, সুরের ভাবে ও ছন্দের ভাবে অপূর্ব্ব মিলন হওয়াতে এমন লাবণ্য ফুটে উঠেছে, যা তুলনায় অনেকাংশে হিন্দী গানকেও ছাড়িয়ে যায়। অধিকাংশ হিন্দী গানে কথার ভাব মোটেই নেই। ভারতের অন্যান্য দেশের গানে কথার ভাবটুকু মুখ্য ক'রে দেখা হয় না। সুর ও ছন্দের ভাবটুকুই প্রথম যাচাই হয়। অবোধ্য শব্দ-সংযোজন করেও সে জন্যে গান করা চলে। যেমন 'তিলানা' গান। তাতে অবোধ্য শব্দের সাহায্য নিয়ে সুরের ও ছন্দের ভাবের মিলনে রসসৃষ্টি করা হয় মাত্র। কিন্তু বাঙালীর পক্ষে এটা রুচিকর হয় না। আমরা বাউল ও কীর্ত্তনের প্রভাবে কথার ভাবটুকুই প্রথম গ্রহণ করি। এ জন্য হিন্দী গান আমাদের ভাল লাগে না এবং ধ্রুপদ-খেয়ালের নামেই আঁৎকে উঠি। যন্ত্রে যে-কোন সুরই ভাল লাগে, কারণ কথার বালাই যন্ত্রে নেই। গানে যে-সুর থাকে যন্ত্র দিয়েও সে-সুরই যদি বাজান হয় তবুও গানের কথার ভাব আমরা গ্রহণ করতে না পারায় আমাদের গান ভাল লাগে না। কিন্তু যন্ত্রে সে সুর শুনেই আমরা মুগ্ধ হয়ে পড়ি। বাঙালী স্বভাবত ভাবপ্রবণ। আমরা কথার ভাবই প্রথম চাই, তারপর আসে সুরের ভাব ও তারও পরে ছন্দের ভাব। সঙ্গীতের আসরেও বাঙালীর এ বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় আছে, এবং তা কেবল আমাদের বাউল ও কীর্ত্তনের মহিমায়।

একটি খেয়াল তিলানা গান আছে, নট-মল্লার রাগিণী ও তেতালা ছন্দে গীত হয়। গানটির প্রথম কথা হ'ল "দারা দিম্ দারা দিম্ দারা দিম্ দারা"

সা	।		সা	রা	সা	রা		রা	গা	রা	গা		মা	ধা	পা	পা		মা	গা	রা	সা
দা	০		রা	দি	ম	দা		রা	দি	ম	দা		রা	দি	ম	দা		রা	০	০	০

এ গানটির রচয়িতা অচপলের কবিত্ব-শক্তি ছিল না, এ জন্য উপরোক্ত সুরবিন্যাসটিকে প্রকাশ করতে এ সব অবোধ্য শব্দের সাহায্য নিয়েছিলেন এরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু অচপল একজন উচ্চশ্রেণীর কবি-গায়কই ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক ভাল ভাল গান আছে। কিন্তু তবুও কেন তিনি এরূপ করেছিলেন ভাবতে গেলে এই মনে হয় যে, সুরের প্রাধান্য দিতে হ'লে এ ছাড়া সহজ উপায় আর নেই। যা-হোক এই প্রসিদ্ধ খেয়াল গানটিকে ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাদের মনমত কথায় তার ভাব ফুটিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন "কত দিন গতিহীন অতিদীন ভাবে।" নটমল্লার তেতালায় হুবহু উপরোক্ত সুরে গীত হয়। এই 'দারা দিম্ দারা দিম্' আর 'কত দিন গতিহীন' গান দুটি যদি একজন গায়ক একই আসরে পর পর গীত করেন তবে দুটি গান একই সুরের একই জিনিষ হলেও আমরা 'কত দিন গতিহীন' গানটিকেই বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করব।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে উৎকৃষ্ট হিন্দী গানগুলির সুর ও ছন্দ বজায় রেখে সে সব গানের ভাব অনুযায়ী গান রচনা ক'রে সে সকল গানের রস বৃদ্ধি করেছেন এবং বাংলার সঙ্গীত-জগতকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন, সেজন্য তিনি সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই ভক্তিভাজন সন্দেহ নেই। আজকাল যাঁরা গান গাইছেন তাঁরা অনেকেই ঐ সব গানের রসের স্বাদ পেয়েছেন ব'লে মনে হয় না। সুগায়ক ওস্তাদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের ঐ সকল গান শুনলে পরে যাঁরা ধ্রুপদ-খেয়ালের নামে আঁৎকে উঠেন তাঁদের সে ভয় ভেঙে যাবে, তা জোর ক'রে বলা চলে। ৺রাধিকা গোস্বামী অনেকের ঐরূপ ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এ সব গান না শিখে কেবল তাঁর আধুনিক গান শিখলে আধুনিক গানের ভাব বজায়

রাখতে পারা অনেক সময়ই সম্ভবপর হয় না। কবির গানের মাধুর্য্য যে কোথায় তা বুঝতে হ'লে তাঁর প্রথম জীবনের গান থেকে সুরু করতে হবে। তাঁর গান চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই তাঁর গান গাইছে একথা সত্য কিন্তু সুরের ভাব পবিত্র নেই, তা অনেক পঙ্কিল হয়ে পড়েছে। এর মূলে যে-সব কারণ আছে তার মধ্যে উপরোক্ত কারণটি প্রধান।

কবির প্রথম জীবনের গানগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম—হিন্দী গানের ছাঁচে ঢালাই করা গীত আর উচ্চসঙ্গীতের আদর্শে নিজস্ব সুর। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র প্রায় সব কয়টি গানেই উচ্চসঙ্গীতের ছাপ পাওয়া যায়। যদিও কয়েকটি গানে মিশ্র সুর করা হয়েছে তবুও চালটুকু উচ্চসঙ্গীতেরই বজায় আছে। আর কতকগুলি গানে তাঁর নিজস্ব ধারার লক্ষণ ক্ষীণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এত ক্ষীণভাবে যে, বর্ত্তমানে তাঁর নিজস্ব সুরের ধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে আমাদের পক্ষে ঐ সব ক্ষীণ আভাস ধরা সহজসাধ্য হয়ে পড়লেও সে সময়ে তা বুঝা সহজসাধ্য ছিল না।

পরবর্ত্তীকালে স্বদেশী যুগে কবি স্বদেশী গান লিখতে সুরু করেন। স্বদেশী গানে কথারই প্রথম দরকার। কথার ভাবটুকু সাধারণের মনে ধ'রে দেওয়ার জন্যে সুরের ও ছন্দের প্রয়োজন। এজন্য এ সব গানে সুরের ভাব খাট করা ছাড়া উপায় নেই। তাই এখানে কথার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ সব গানের পূর্ব্বের গানে সুরের প্রাধান্য ছিল। স্বদেশী গান লিখবার সময় হ'তে আস্তে আস্তে তাঁর গীতে কথার প্রাধান্য আসতে থাকে। এই সময়েই 'গীতাঞ্জলি'র গান লেখা হয়। তাতে কথার ভাবই মুখ্য ক'রে ধরা হয়। এ সময় থেকেই তাঁর সুরের গতি অন্য ভাবের হয়ে পড়ে এবং তাঁর নিজস্ব সুরসৃষ্টি আরম্ভ হ'তে থাকে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র গান তখন প্রত্যেকেই শিখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল, এ জন্য দেখতে দেখতে তাঁর সুরের নিজস্ব ধারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কথার, সুরের ও ছন্দের ভাব যে-সব গীতে গম্ভীর সে গানই ধ্রুপদ। ধ্রুপদে ভগবত আরাধনার ভাব সৃষ্টি করে। শান্ত ও ভক্তিভাবের গানই ধ্রুপদ। চারটি চরণে গীত হয়। স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ — এই চারটি তুক্ উচ্চসঙ্গীতে এক ধ্রুপদেরই একচেটে জিনিষ। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরিতে সঞ্চারী ও আভোগ নেই। রবীন্দ্রনাথ সঞ্চারীর সৌন্দর্য্যটুকু তাঁর প্রতি গানে ব্যবহার করেছেন। খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরিতে তান ও সুর বিস্তার এত করতে হয় যে, কথা খুবই কম ব্যবহৃত হয়। এ জন্য ঐ শ্রেণীর গানে স্থায়ী ও অন্তরাই কেবল দরকার হয়। রবীন্দ্রনাথের গান ধ্রুপদের কাঠামোতে গড়া এবং তাঁর সঞ্চারী এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ধ্রুপদে স্বরবিস্তার এবং তান-ব্যবহাররীতি নেই। ভাবের দিক থেকে যদিও বড়-খেয়াল অনেকটা স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি করে কিন্তু টপ্পা-ঠুংরিতে ধ্রুপদের অনুরূপ ভাব আসে না। ধ্রুপদে স্বর-বিস্তার করার প্রথা নেই বলেই তা খেয়াল টপ্পা-ঠুংরি-থেকে অনেক পৃথক। খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরিতে তান ও সুর বিস্তার করা হয় ব'লে তাদের খুব কাছাকাছি সম্বন্ধ। কেবল চাল্‌ভেদে তাদের পার্থক্য বুঝা যায়। ধ্রুপদের গতি ধীর, রবীন্দ্রনাথের গানের চাল্‌ও ঐরূপ। ধীর গতি না হ'লে স্বর্গীয় ভাবের সমাবেশ করা সহজসাধ্য হয় না। গীত দ্রুত চালে চললে সাধারণত হালকা ভাবের উদয় হয়। অবশ্য তারও যে ব্যতিক্রম না-হয় তা নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের চালটুকুও ধ্রুপদের।

ধ্রুপদের কাঠামো ও চালে গানগুলি রচিত হলেও এতে কবির নিজস্ব শক্তির পরিচয় যথেষ্ট রয়েছে। সঞ্চারীর সুর ও চালটুকু ধ্রুপদের কিন্তু কবির গানে সঞ্চারীর সুর ও চাল ঐরূপ হলেও তাঁর সঞ্চারীর মাধুর্য্য পৃথক ভাবের। 'গীত-পঞ্চাশিকা'র গানগুলির সঞ্চারী অতি মনোরম সৃষ্টি।

কবির-সুর-রচনায়ও ধ্রুপদের প্রাধান্য দেখা যায়। ধ্রুপদে দ্রুত গিটকিরীর ও তানের ব্যবহার নেই। কবির সুরেও তা নেই। তাঁর গানে ধ্রুপদের ন্যায় স্পর্শসুর, মীড় ও গমকেরই আলোড়ন পাই। দ্রুত গিটকিরী ও তান খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদে যেমন তান ও গিটকিরী ব্যবহার করলে গান শ্রুতি-কটু হয়, কবির গানেও তান ব্যবহারে সেরূপই হয়ে থাকে।

তবে কবির সব সুরই যে এরূপ তা বলছি নে। অধিকাংশ গানেরই ঐরূপ স্বরবিন্যাস।

তান ব্যবহার কবির সুরে কেন করা সম্ভবপর নয় তা ভাবতে গেলে আমাদের এই মনে হয় যে, তানে কথার ভাব প্রকাশ পায় না—পায় সুরের ভাব। খেয়াল গীত-গায়ক আপন খেয়ালবশে তানের পর তান দিয়ে চলবে, তিন-চার মিনিট পরে হয়ত এক-একটা তান-কর্ত্তব শেষ ক'রে গানের কথায় ফিরে আসবে। এতে কথার প্রাধান্ত থাকে না। ঠুংরি গানে কথার মূল্য খেয়াল গীতের চেয়ে অনেক বেশী। খেয়ালের মত টপ্পাতেও কথা ছেড়ে দু-এক মিনিট দ্রুত গিটকিরী এত ব্যবহার হয় যে, সেখানে সুরের প্রাধান্যই দিতে হয়। কবি গানে সুরের প্রাধান্য দিতে নারাজ। এ-জন্য খেয়াল-টপ্পা-গীতপদ্ধতি কবির গানে প্রযোজ্য নয়। কবি ছোট ছোট গীত-অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। তানের বদলে 'উপজ' ব্যবহার করেছেন। ঝটকা, মীড়, আশ, দু-কি-তিন-মাত্রা কাল ধ্বনিত গিটকিরী এবং স্পর্শ সুর—এগুলি তিনি ব্যবহার ক'রে থাকেন। ঠুংরির মত সুরের খোঁচ ও সুরের বিন্যাস তাঁর গানে পাওয়া যায়, কিন্তু ঠুংরির চালটুকু তিনি গ্রহণ করেন নি। ধ্রুপদের চলনভঙ্গীতে তিনি ঠুংরির স্বরবিন্যাস অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ গানের কবিতাটিকে মূর্ত্তি ধরে নিয়ে তাতে সুরের বসন পরিয়েছেন ও বিশেষ বিশেষ স্থানে উপযুক্ত গীত-অলঙ্কার সংযোজন করেছেন। এটা ধ্রুপদের পদ্ধতি। কিন্তু খেয়াল গীতে সুর দিয়ে তৈরি রাগ-রাগিণীর রূপই হ'ল গানের অবয়ব। তাতে সুরবিস্তারেরই বসন পরিয়ে সুর ও গীত-অলঙ্কার দিয়ে তানের মালা গেঁথে মূর্ত্তির বিশেষ বিশেষ স্থানে বেঁধে দিতে থাকে খেয়াল-টপ্পাগায়ক। সুরগুলিকে নাচিয়ে এবং সুরগুলি নিয়ে খেলা ক'রেই খেয়ালী আনন্দ পায়। কাজেই কবির গান এবং খেয়াল-টপ্পা এ দুটি হ'ল সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ।

ধ্রুপদের মত গজেন্দ্রগামী হলেও কবির গানে টপ্পা-ঠুংরিতে ব্যবহৃত হালকা রাগ-রাগিণীর কঙ্কালই বেশী পাওয়া যায়। যেমন, ভৈরবী, পিলু বারওয়া, সাহানা, সিন্ধু, খাম্বাজ, দেশ, বেহাগ ইত্যাদি। হিন্দোল, মালকোশ, পুরিয়া, সোহিনী ইত্যাদি রাগ-রাগিণীর রূপ পাওয়া যায় না। কবির গানে ঔড়ব ও খাড়ব ব'লে কিছু নেই, সবই সম্পূর্ণ।

কবির প্রথম জীবনের পরবর্ত্তী কালের গীতে ভাটিয়ালী ও বাউল সুরের গান আছে। তিনি যখন জমিদারীর কাজে শিলাইদহে নদীর ধারে থাকতেন সে সময় ভাটিয়ালী ও কীর্ত্তনের ভাঙা সুরের মিশ্রণে প্রথম গীত রচনা আরম্ভ করেন। শিলাইদহের মাঝিদের গানেই ভাটিয়ালী সুর পেয়েছেন এরূপ অনুমানই সত্য মনে হয়। শিক্ষিত সমাজের নিকট কবির বাউল সুর-রচনার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বাউল ঘৃণিতই ছিল। কবিই তার স্বাদ পেয়ে নিজের গানে সংযোজন ক'রে বাউল সুরকে যথার্থ মূল্যবান ক'রে তুলেছেন।

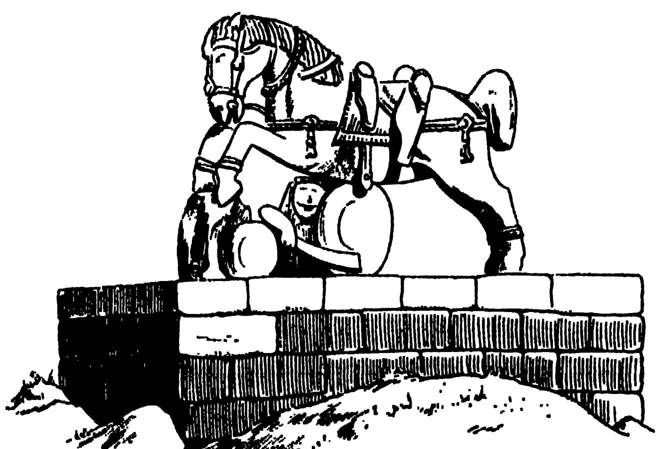
বাউল গানে আমরা পাই কথার ও ভাবের প্রাধান্ত, আর সুরের ও ছন্দের সরলতা। দু-একটি সরল ও লঘু ছন্দে বাউল গীত হয় ব'লে তা অতি সরল এবং এর গতিও সহজ সাবলীল। বাউলের প্রভাবই কবির গানে খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। কথার প্রাধান্ত কবির গানে খুব বেশী, সুরের সরলতাও যথেষ্ট এবং ছন্দ ও লয়ের সহজ সাবলীল ধারাই কবির গানের বিশেষত্ব। বিষম-পদী ছন্দ জটিল ও গম্ভীর। সম্পদী ছন্দের মধ্যে চৌতাল, ঢিমে তেতালা, আড়াঠেকা, মধ্যমান প্রভৃতি ছন্দ কঠিন ও গম্ভীর। কিন্তু কবির সুরে এ সব ছন্দের অভাব। 'গীত-পঞ্চাশিকা'য় বিষমপদী ছন্দের গান আছে। কিন্তু আধুনিক গানে ছন্দ আরও লঘু হয়ে পড়েছে। ছয় মাত্রার ও আট মাত্রার লঘু ছন্দে প্রায় সমস্ত সুর রচিত হচ্ছে। 'গীত-পঞ্চাশিকা'য় ষোল ও বার মাত্রার সম্পদী ছন্দ, অর্থাৎ তেতালা ও একতালা তালের গান আছে। কিন্তু কবির আধুনিক সুরে তেতালা ছন্দও খুব কম।

ছন্দের দিকে লঘু ভাব হলেও গতিটুকু প্রায় প্রত্যেক গীতেরই বিলম্বিত। কথায় ভাবের অনুপাতে ছন্দের ভাব লঘু হয়ে পড়াতে লয়টুকু দিয়েই ভাবের মান-পরিমাণ সমন্বয় করা হয়। কথার ও সুরের ভাব যে-সব গানে গম্ভীর সে-সব গানের গতিও বিলম্বিত হয়ে যায়। তা না হ'লে গীতের মাধুর্য্য বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না।

ছন্দ লঘু অথচ বিলম্বিত গতি এইটুকু বিশেষত্বই উচ্চ-সঙ্গীতের সঙ্গে কবির গানের চাল্‌কে পৃথক ক'রে রেখেছে। আধুনিক বাংলা গানে সহজ সাবলীল পদ্ধতির সুর পাওয়া যায় কিন্তু লয়ের ও ছন্দের এই পার্থক্য না হওয়ায় কবির গানের সমতুল্য ভাব সে-সব গানে আসে না। কম লবণ দিলে বা বেশী লবণ দিলে—এই দু-ভাবেই খাদ্যের স্বাদ নষ্ট হয়। কিন্তু পরিমাণমত লবণ হ'লেই যেমন খাদ্য স্বাদু হয়, তেমনি কবির সুরের ভাব লয়ের প্রকারভেদেই নষ্ট হবার সম্ভাবনা। ভাবের অনুপাতে ঠিক চালে গীত হ'লেই গানে লাবণ্য প্রকাশ ও নব নব রূপরসের সৃষ্টি হয়ে স্বর্গীয় ভাবের উদয়।

কীর্ত্তনের প্রভাব কবির গানে অতি কম। কীর্ত্তনে কথার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরের বা ছন্দেরও পরিবর্ত্তন হয়। কবির গানে ছন্দের পরিবর্ত্তন হয় না, বাউলের মত একচালে গীত হয়। কিন্তু কথার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী ঠাটের গানে পূরবী ঠাটের বা অন্যান্য যে-কোন ঠাটের সুরসংযোজন করা হয়ে থাকে। এরূপ করা উচ্চসঙ্গীতের নিয়মবিরুদ্ধ, কিন্তু উচ্চসঙ্গীতের 'রাগমালা' ও 'সুরসাগর' জাতীয় গানে এরূপ সুর-রচনা আছে। কিন্তু কবির গানের সুরবিন্যাস ঐ-সব গীতের মত নয়, বাউলের মতও নয়, কীর্ত্তনের মতও নয়, এটা তাঁর নিজস্ব জিনিষ এবং তা ধ্রুপদ ও বাউলের মিশ্রণে আর কীর্ত্তন ও ঠুংরির ফোড়নে সৃষ্ট।

কবির উচ্চসঙ্গীতের আদর্শে রচিত গানগুলির সঙ্গে তবলার বা পাখোয়াজের ঠেকা দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু তাঁর বর্ত্তমান গানগুলির সঙ্গে সঙ্গত করা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর গানের সঙ্গে ঠেকা দিতে হ'লে খুব বড় তবলচী না পেলে রসসৃষ্টির বদলে রসভঙ্গই হয়। বাউল এবং কীর্ত্তনের জন্য যেমন পৃথক্ পৃথক্ বাদ্যযন্ত্র আছে এবং বিভিন্ন প্রকার ঠেকা বাজান হয়, কবির সুরের সঙ্গে সঙ্গতের জন্যও সেরূপ যন্ত্র তৈরি না হোক্ অন্তত অনুরূপ ঠেকার বোল তৈরি করার দরকার হয়ে পড়েছে। লঘু ছন্দের যে-সব তবলার ঠেকা আমাদের উচ্চ-সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, কবির গানের চালের ভঙ্গী পৃথক হওয়াতে ঐ সব ঠেকা সব সময় তাঁর গানে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না। প্রত্যেক দেশের গানেই এরূপ ঠেকার পরিবর্ত্তন করার দরকার হয়। দিল্লীর ঠেকা এক প্রকার, বাংলার বিষ্ণুপুরী ঠেকা এক প্রকার, আবার ঢাকার ঠেকা অন্য আর এক প্রকার, লক্ষ্ণৌ এবং কাশীর ঠেকা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। প্রত্যেক কেন্দ্রের তবলার ঠেকাই এরূপ বিভিন্ন। গীতের চাল্ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ঠেকার চাল্ বিভিন্ন করা দরকার হয়ে পড়ে। বিষ্ণুপুরী ঠেকা লক্ষ্ণৌর গানে ঐক্য করা যায় না, করলেও তত সুন্দর হয় না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ধ্রুপদ-খেয়াল গানে ঢাকার বা বিষ্ণুপুরী ঠেকারই ঐক্য হয়। কারণ তাঁর উচ্চ-সঙ্গীতগুলি বিষ্ণুপুরী চালের। যা-হোক্ চাল্ অনুযায়ী নূতন বোল গঠন ক'রে কবির গানে ঠেকা দিলে নূতন রসের দ্বার খুলে যাবে এরূপই মনে হয়।



গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

১১

পুনর্জন্ম।—

হিন্দুশাস্ত্রে পুনর্জন্মবাদ প্রায় সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। গীতাতেও বহুস্থানে পুনর্জন্মবিষয়ক শ্লোক আছে, যথা:— ২।২২, ২৭, ৫১; ৪।৫, ৪০; ৬।৪০-৪৫; ৭।১৯; ৮।১৫-১৬; ৯।৩, ২০-২১; ১৩।২১; ১৪।১৪-১৬; ১৫।৮; ১৬।২০। এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ দেহী বা আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহে জন্মলাভ করে। জন্মিলে যেমন মৃত্যু নিশ্চিত, মরিলেও সেইরূপ জন্ম ধ্রুব। আত্মদর্শন হইলে এই জন্ম-বন্ধন হইতে আত্যন্তিক মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয়। সাধারণ মনুষ্যের এই বিভিন্ন জন্মের কথা মনে থাকে না। এক জন্মের বিকর্ম্মের বা দুষ্কর্ম্মের ফলে পরজন্মে কষ্টভোগ বা হীনযোনিতে জন্ম হয়, কিন্তু সৎকর্ম্মের পুণ্যফলে উত্তরোত্তর পর পর জন্মে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয়। পূর্ব্বজন্মলব্ধ উন্নতি পরজন্মে বিনা আয়াসেই স্বতঃ উপজিত হয় এবং ক্রমশঃ অনেক জন্মান্তরে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু নিতান্তই বিরল। ব্রহ্মলোক ও অপরলোক বাসী সকলেই পুনরাবর্ত্তনশীল, কিন্তু যাহার আত্মদর্শন হইয়াছে তাহার পুনর্জন্ম নাই; যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদিতে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু স্বর্গভোগ শেষ হইলে জীবকে পুনর্জন্ম লাভ করিতেই হয়। প্রকৃতিজ গুণসঙ্গই আত্মার যোনিভ্রমণের কারণ। সত্ত্বগুণ প্রবল থাকিতে যখন দেহধারীর মৃত্যু হয় তখন সে জ্ঞানীদের পবিত্রলোক প্রাপ্ত হয়। রজোগুণের প্রাবল্য থাকিলে কর্ম্মাসক্তগণের মধ্যে জন্মায় এবং তমোগুণ প্রবল হইলে মূঢ়যোনিতে বা ইতর প্রাণিগর্ভে জন্ম হয়। জীবাত্মা মন-সমেত ছয় ইন্দ্রিয়কে প্রকৃতি হইতে আকর্ষণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই শরীর ত্যাগ করেন। ইন্দ্রিয়-গণ চক্ষু ইত্যাদি স্থূল বস্তু নহে, কিন্তু চক্ষুরাদিস্থানস্থিত সূক্ষ্ম শক্তি বিশেষ। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও মন সংযুক্ত জীবাত্মাকে লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর বলা হয়। এই লিঙ্গশরীরই এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া পর জন্মে অন্য দেহ ধারণ করে। মোক্ষ ব্যতীত এই লিঙ্গশরীরের বিনাশ নাই, কিন্তু স্থূল দেহের কর্ম্মফলের বশে ইহার উন্নতি বা অধোগতি হইয়া থাকে।

গীতায় পুনর্জন্মের কোন প্রমাণ বিচারিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, তোমার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ নাই কিন্তু আমার আছে। পুনশ্চ ১৫।১০ শ্লোকে বলিলেন, জ্ঞানচক্ষুমান ব্যক্তিগণই কেবল উৎক্রমণশীল জীবাত্মাকে দেখিতে পান, অন্যে পান না। যিনি আপ্তবাক্যকে গ্রাহ্য করিবেন তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রই পুনর্জন্মের যথেষ্ট প্রমাণ। গীতা ব্যতীত উপনিষদাদিতেও পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। কঠোপনিষদে আছে—

> নানা যোনিতে জনম লাভ করে শরীরার্থ দেহী যত
> কেহ পায় স্থাণু রূপ নিজ নিজ কর্ম্মশ্রুতিফল মত। কঠ-৫।৭

যাহার আপ্তবাক্যে বিশ্বাস নাই তাঁহার পক্ষে পুনর্জন্মের প্রমাণ আলোচ্য। পুনর্জন্মবাদ দুই ভাবে বিচারিত হইতে পারে; এক ঘটনা (fact) হিসাবে আর এক উহ(theory) হিসাবে। যদি আমরা কোন আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করি তবে তাহার সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারি আর না পারি তাহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। কেন পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণী শক্তি আছে তাহা না বলিতে পারিলেও দ্রব্যাদির পতন রূপ ঘটনা আমাদিগকে মানিতে হয়। ঘটনা বলিলে যাহা বুঝি তাহা সমস্তই আমরা প্রত্যক্ষ বা অনুভব করি। ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান। গরুর গাড়ি চলিতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছি; কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতে উড়োজাহাজ দেখিয়াছি তাহা স্মরণ আছে; ছেলেবেলায়

কি ঘটিয়াছিল তাহারও কিছু কিছু মনে আছে; এই সমস্ত জ্ঞানই অনুভবসিদ্ধ। অনুভবের মূলে বাস্তব ঘটনা আছে। পুনর্জ্জন্ম যদি এইরূপ বাস্তব ঘটনা হয় তবে তাহাও অনুভবসিদ্ধ হইবে।

এই অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত আর এক প্রকার জ্ঞান আছে তাহা অনুমানসিদ্ধ। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে এই যে জ্ঞান তাহা অনুমানসিদ্ধ; অনুভব এই অনুমানের বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়, কারণ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে সূর্য্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। তথাপি এক্ষেত্রে অনুমানকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবার কারণ এই যে সূর্য্য স্থির আছে মানিলে জ্যোতিষিক অনেক ঘটনার সহজ ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পৃথিবী ঘুরিতেছে এই কল্পনা উহ (theory) হিসাবেই গ্রাহ্য। যদি কোন দিন অপর কোন গ্রহ হইতে কেহ বাস্তবিকই পৃথিবীকে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে দেখে তবে তখন এই ধারণাকে আর উহ বলা চলিবে না; ইহা তখন অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানেই পরিণত হইবে। বৈজ্ঞানিকদিগকে সর্ব্বদাই এইরূপ নানা প্রকারের উহ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যদি পৃথিবীতে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের সুখ দুঃখ ভোগ বা বিভিন্ন মনুষ্যচরিত্র পুনর্জ্জন্মবাদ দ্বারা সহজে ও সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ও যদি তাহার অপর কোন সঙ্গত কারণ না পাওয়া যায় তবে বিজ্ঞানবিদ্‌ও পুনর্জ্জন্মবাদ অবশ্য স্বীকার করিবেন। এই জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি পুনর্জ্জন্মবাদের বিচার দুই দিক দিয়া হইতে পারে।

প্রথমে ঘটনা হিসাবে পুনর্জ্জন্মবাদের বিচার করিব। পুনর্জ্জন্ম এমনই একটা ব্যাপার যে তাহার প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞান দ্রষ্টার কোন কালেই হওয়া সম্ভব নহে, তবে জাতিস্মরতা অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি প্রমাণিত হইলে পুনর্জ্জন্মকে অনুভবসিদ্ধ বলিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা মনে আছে ও যদি এরূপ ব্যক্তির কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় বা তাহার কথার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতেই হইবে। জাতিস্মরতা নিঃসংশয় প্রমাণিত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। আমরা প্রত্যেকেই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই; কাজেই মৃত্যুই আমাদের শেষ নয়, মৃত্যুর পরেও আমরা থাকিব ও পুনরায় সংসার ভোগ করিব এরূপ ধারণা আমাদের ইচ্ছার অনুকূল বলিয়া বিনা প্রমাণেই তাহা মানিয়া লই। বিশেষতঃ যে এ জন্মে কষ্টভোগ করিতেছে তাহার পক্ষে সুখময় পরজন্মের কল্পনা পরম শান্তিপ্রদ। আমি যদি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম সাধারণকে তাহা হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিতে পারি তবে বিনা বিচারেই আমার কথা অনেকে বিশ্বাস করিবে। এই ভাবে লোককে প্রতারিত করিবার প্রবৃত্তি অনেক সময় সাধু ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা যায়। কখনও এই প্রতারণা অজ্ঞানেই অনুষ্ঠিত হয়, কখনও বা মানসিক ব্যাধির বশে এই ইচ্ছা মনে জাগে তখন রোগী নিজেও স্বকল্পিত কথাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। পরাস্মার (paramnesia) নামে এক প্রকার স্মৃতিবিকার আছে যাহার বশে রোগীর মনে কোন নূতন দৃশ্যকে পূর্ব্বজন্মদৃষ্ট বলিয়া সংস্কার জন্মে। এরূপ স্মৃতিবিকারগ্রস্ত রোগী নিজকে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারে এবং সাধারণেও তাহার মানসিক বিকার সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারে না। অতিশয় সম্মানিত এক সাধুকে আমি এই রোগাক্রান্ত দেখিয়াছি। আমার অনেক বার 'জাতিস্মরতা' অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটিয়াছে, কিন্তু কোন বারেই যথার্থ জাতিস্মরতা দেখি নাই। জাতিস্মরতার যে-সমস্ত লিখিত বিবরণ বা প্রমাণ আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আমি বলিতে বাধ্য যে জাতিস্মরতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই। অপর পক্ষে ইহাও বিবেচ্য যে হিন্দুশাস্ত্রে অনেক স্থলে জাতিস্মর ব্যক্তির উল্লেখ আছে। শাস্ত্রকারেরা কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এই সকল বর্ণনা করিয়াছেন এরূপ কথা বলা দুঃসাহসিকতার কার্য্য। কি প্রমাণ বিচার করিয়া শাস্ত্রকারেরা জাতিস্মরতা স্বীকার করিয়াছিলেন আমি সে-সম্বন্ধে অজ্ঞ। আধুনিক যুক্তিবাদী বিনা-বিচারে শাস্ত্রপ্রমাণ না মানিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

এখন উহ (theory) হিসাবে পুনর্জ্জন্মবাদ বিচার করিব। বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর কারণ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্যই উহের কল্পনা। পৃথিবীতে

একজন সুখী অপরে দুঃখী এই যে প্রত্যক্ষ ঘটনা ইহার কারণ কি? কেন এই অসামঞ্জস্য? যদি মানিয়া লইতে পারিতাম যে ইহাই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম তবে গোল মিটিয়া যাইত। পৃথিবীতে কোন দুই বস্তুরই অবস্থা এক প্রকারের নহে তবে মানুষের অবস্থাই বা এক প্রকার হইবে কেন? সোনা কেন সোনা, লোহা কেন লোহা, চন্দন ও পঙ্ক কেন এক নয়—এ সব প্রশ্ন কেহ করে না; তবে মানুষের বেলাই এ প্রশ্ন হয় কেন? ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ মানুষ কষ্টে পড়িলেই তাহা হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করে ও পরের সুখ দেখিয়া তাহার মনে মাৎসর্য্য ভাবের উদয় হয় এজন্যই সে পরের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলনা করে। যে বিজ্ঞানবিৎ সাম্যবুদ্ধিযুক্ত তাঁহার মনেও এই প্রশ্ন উঠিবে সত্য, কিন্তু তাঁহার কাছে পঙ্ক ও চন্দন এক নহে কেন, আর দুই ব্যক্তির অবস্থা এক প্রকারের নয় কেন, এই দুই প্রশ্নই সমান। এই সমস্তাই ঋষির মনে 'পৃথিবীতে নানাত্ব কেন' প্রশ্ন তুলিয়াছিল। ঋষিরা তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা অতি আশ্চর্য্য। তাঁহারা ধ্যানযোগে দেখিলেন 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' অর্থাৎ পৃথিবীতে নানাত্ব নাই। এক ও অদ্বিতীয় সত্তা মাত্র আছে। মায়াবশে আমরা নানাত্ব দেখি। সাধারণ বুদ্ধিতে এ উত্তর প্রহেলিকাবৎ ও অবিশ্বাস্য। সাধারণ মানুষ নানাত্ব উড়াইয়া দিতে পারে না। ইট কাঠ পাথরে নানাত্ব থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু সুখী ও দুঃখীর ভিতর যে পার্থক্য তাহা অবহেলা করা যায় না। এজন্যই অন্য সব বিষয়ে নানাত্ব স্বাভাবিক স্বীকার করিয়া মানুষের বেলাই তাহার কারণ অনুসন্ধানের দরকার হয়। ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইলে জীবন দুর্ব্বহ হয়; অতএব প্রশ্ন উঠে কেন এই অবিচার? পঙ্ক ও চন্দনের প্রভেদ যেমন এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন, বিভিন্ন মানুষের অবস্থাভেদও সেইরূপ অজ্ঞেয় শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন মানিতে পারিলে কথঞ্চিৎ শান্তি হইত; কোন কোন সাধকের মনে এই ভাব জাগে সত্য, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই অজ্ঞেয় শক্তি সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিরই এক অংশ। সে ভগবানকে একেবারে অজ্ঞেয় বলে না, ভগবানের অন্ততঃ দুইটি গুণ সম্বন্ধে সে স্থিরনিশ্চয় ধারণা পোষণ করে। একটি তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা ও দ্বিতীয়টি তাঁহার পরমকারুণিকতা। পরম কারুণিক ভগবানের রাজত্বে এক ব্যক্তি সুখী ও এক ব্যক্তি দুঃখী কিরূপে হইতে পারে? ভগবান যখন করুণাময় তখন এজন্মের দুঃখ পরজন্মে ঘুচিবে। এ জন্মেই বা দুঃখ কেন? তাহার উত্তর গত জন্মের পাপের ফলে। ভগবান করুণাময়ও বটেন ন্যায়বানও বটেন। এ জন্মে দুষ্কার্য্য করিয়া যে আপাততঃ সুখ ভোগ করিতেছে পরজন্মে সে নিশ্চয়ই কষ্ট পাইবে। ইহাই অনেকের সাধু পথে থাকিয়া কষ্টভোগ করিবার সান্ত্বনা। জন্মান্তরবাদ মানিলে ভগবানের কারুণিকতা ও ন্যায়বত্তা বজায় রহিল ও অবস্থাভেদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, সাধারণের কাছে পুনর্জ্জন্মবাদের এই বিচার গ্রাহ্য হইলেও বিজ্ঞানীর কাছে তাহা যুক্তিসহ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বিজ্ঞানী বলিবেন নানাত্ব মানিলে ভগবানকে পরমকারুণিক, ন্যায়বান ও সর্ব্বশক্তিমান বলা যায় না। পরমকারুণিক মানে যিনি সামান্য কষ্টও নিবারণ করেন। একজন পোলাও-কালিয়া খাইতেছে ও আর এক জনের সামান্য শাকান্ন জুটিতেছে না। এতটা প্রভেদ দূরে থাক, তোমার রোলস-রইস মোটরকার আর আমার মিনার্ভা-কার ও সেজন্য আমার যে ঈর্ষার কষ্ট ভগবান পরমকারুণিক ও ন্যায়বান হইলে তাহাও নিবারণ করিতে বাধ্য। পৃথিবীতে যতদিন তিলমাত্র কষ্টও কাহারও মনে থাকিবে ততদিন ভগবানকে পরমকারুণিক বলা চলিবে না। পরমকারুণিক ব্যক্তি যদি অক্ষম হন তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু ভগবান সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার দোষক্ষালনের উপায় নাই। পিতা পুত্রকে তাহার মঙ্গলের জন্য শাসন করেন বা কষ্ট দেন, ভগবানও সেইরূপ আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদের কষ্ট দেন; এ যুক্তিও নিতান্ত অসার। ছেলেকে মিষ্ট কথা বলিয়া সৎপথে আনিতে পারিলে তাহাকে পিতা কখনই তাড়না করেন না। অবশ্য মিষ্ট কথায় সৎপথে আনা অসম্ভব হইলে বা অন্য উপায় না জানা থাকিলে তাড়নায় দোষ নাই। সর্ব্বশক্তিমান

ভগবান তাড়না ভিন্ন পাপীকে অন্য উপায়ে সংশোধন করিতে পারেন না বলা নিতান্ত হাস্যকর। সাধারণ মনুষ্য যদি কাহাকেও পাপ কাজ করিবার উপক্রম করিতে দেখে তবে সেও তাহা সাধ্যমত নিবারণের চেষ্টা করে। আমরা সকলেই স্বীকার করি prevention is better than cure কিন্তু ভগবানে ক্ষমতাসত্ত্বেও পাপীকে পাপ হইতে নিরস্ত না করিয়া তাহাকে পাপ করিতে দিতেছেন ও পরে তাহার শাস্তি বিধান করিতেছেন। ইহার অপেক্ষা ক্রুর কর্ম্ম কি হইতে পারে? অপরপক্ষে পুনর্জ্জন্মবাদ মানিলেও ভগবানকে ন্যায়বান বলা যায় না। সাধারণ মনুষ্য জাতিস্মর নহে। পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম এ জন্মে তাহা আমার মনে নাই। অতএব আমার নিকট এ জন্মের আমি ও পরজন্মের আমি রাম ও শ্যামের ন্যায় দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। একের পাপে অন্যের শাস্তি নিতান্তই অশোভন। আমি যদি নাই জানিলাম আমি কি পাপের শাস্তি পাইতেছি,তবে সে শাস্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক। এই সমস্ত বিচার করিলে বিজ্ঞানী বলিবেন, ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান মানিলে ন্যায়বান ও পরমকারুণিক বলা চলিবে না। ভগবদ্ভক্ত বলিবেন, এ সব তর্ক ছাড়িয়া দাও? ভগবান লীলাময়, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা তাঁহার লীলার কি বুঝিব? বিজ্ঞানী উত্তরে বলিতে পারেন, তবে সেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহাকে কারুণিক বল কি করিয়া? তাঁহাকে কারুণিক ও শক্তিমান ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী বিশেষণে অভিহিত না করিয়া তাঁহাকে আমরা কিছুই জানি না এ কথা বল? পৃথিবীতে বর্ত্তমান অবস্থা যতদিন থাকিবে ততদিন তাঁহাকে কারুণিক বলিও না। করুণাময় ভগবানের উপর ভক্তের বিশ্বাস তর্কে অপনীত হইবার নহে। কিন্তু বিজ্ঞানীর কাছে এ বিশ্বাসের মূল্য নাই। দেখা গেল, যে-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জন্মান্তরবাদের ভিত্তি করা গিয়াছিল তাহা টিকিল না।

ভগবানকে টানিয়া না আনিলেও জন্মান্তরবাদের বিচার হইতে পারে। পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফল মানিলে এজন্মের ব্যক্তিগত বিভিন্নতার ব্যাখ্যা হয় সত্য; কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে পূর্ব্বজন্মেই বা ভেদ হইল কেন? অতএব কর্ম্মকে অনাদি ও তদুৎপন্ন ভেদও অনাদি মানিতে হইল। ভেদকে অনাদি বলিলে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইল না; এই জন্মেই ভেদের কারণ আছে বলায় যে দোষ সেই দোষই রহিল। উহ হিসাবেও জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল না।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পুনর্জ্জন্ম প্রমাণ করিবার জন্য আরও কয়েক প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। মৃত্যুকে আমরা সকলেই ভয় করিয়া থাকি, এমন কি সদ্যোজাত শিশুতেও মৃত্যুভয় লক্ষিত হয়। পূর্ব্বজন্মে মৃত্যুযাতনার অনুভূতির সংস্কার মৃত্যুভয়ের কারণ বলিয়া মানিতে হয়, নচেৎ অজ্ঞাত ব্যাপারে ভয় কেন হইবে? সদ্যোজাত প্রাণীর স্তন্যপান প্রভৃতির চেষ্টা দেখিলে পূর্ব্বজন্ম অনুমিত হয়। জননীর স্তনে দুগ্ধ আছে—শিশু তাহার পূর্ব্বসংস্কার বলে জানিতে পারে। কাহারও কাহারও কোনও বিষয়ে সহজাত জ্ঞান দেখা যায়, যথা—অতি সামান্য চেষ্টায় কেহ অসামান্য গণিতজ্ঞ হইল; পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞান বর্ত্তমান জন্মে প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই অনুমান করিতে হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য না করিলে নিজ বৃদ্ধত্ব অনুভব করে না; বালকও নিজের বালকত্ব অনুভব করে না। আত্মা অবিকারী বলিয়াই দেহের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও নিজের পরিবর্ত্তন অনুভব করে না। আত্মার অমরত্ব ও দেহের ক্ষয়ত্ব জন্মান্তরবাদের পরোক্ষ প্রমাণ। হিন্দুশাস্ত্রকথিত এই সমস্ত যুক্তি অবিসংবাদী নহে। আধুনিক প্রাণিবিৎ পূর্ব্বজন্মের অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কার না মানিয়া বংশগত সংস্কার (heredity) মানেন। শিশু যে মরণ ভয়ে ভীত হয়, জন্মিবামাত্র মাতৃ স্তনের সন্ধান করে, কেহ কেহ অল্পায়াসে অধিক জ্ঞানার্জ্জন করে—এ সমস্ত বংশগত সংস্কার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। জন্মান্তর মানিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। বানর-শিশুর সংস্কার বানর জাতিরই উপযুক্ত; মনুষ্য কোনও জন্মে বানরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার মনুষ্য-শিশুর ন্যায় সংস্কার লক্ষিত হইত। বলা যাইতে পারে তাহার মনুষ্যযোনির সংস্কার অভিভূত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু বানরযোনিতে জন্মিবা-মাত্র তাহার শাখাগ্রহণাদির ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল।

অগত্যা প্রাক্তন সংস্কার না মানিয়া বংশগত সংস্কার মানাই যুক্তিযুক্ত।

আর এক দিক দিয়া জন্মান্তরবাদের বিচার করা যাইতে পারে। জন্মান্তর স্বীকার করিতে হইলে আত্মার অস্তিত্ব মানিতে হয়। দেহাতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিনা তাহার সম্পূর্ণ বিচার অল্পকথায় সম্ভব নহে। আমরা 'আমি' বলিলে যাহা বুঝি তাহাকেই আত্মা বলা হয়। 'আমি'টা কি বস্তু সাধারণের সে-সম্বন্ধে ধারণা বড়ই অস্পষ্ট। বিদ্বান ব্যক্তিরাও এ সম্বন্ধে একমত নহেন। আধুনিক শারীরবিৎ, মনোবিৎ ও দার্শনিকদের মধ্যে এই 'আমি' লইয়া নানা বিচার ও বিতণ্ডা চলিতেছে। কেহ বলেন, এই দেহটাই 'আমি'। দেহাতিরিক্ত 'আমি' বা আত্মা বলিয়া কিছুই নাই। যকৃত হইতে যেরূপ পিত্ত নিঃসৃত হয় সেইরূপ মস্তিষ্ক হইতে 'আমিত্বের' জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের বিকারে আমিত্বের জ্ঞানও নষ্ট হয়। ইহা চিকিৎসকদিকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আত্মাই যখন নাই তখন পুর্নজন্মবাদ কিরূপে মানিব? ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনম্ কুতঃ? অপরে বলেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণই 'আমি' ভাব; অতএব প্রাণই 'আমি' ভাবের মূল। কোন মনোবিৎ বলিবেন, ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের সমষ্টি হইতেই 'আমি' ভাব উৎপন্ন হয়, পৃথক 'আমি' বলিয়া কিছু নাই। অপর মনোবিৎ বলেন ইন্দ্রিয়জ্ঞান হইতে 'আমি' জ্ঞান জন্মে না কিন্তু উপহৃতি (emotion) গুলিই 'আমি' ভাবের জনক। কাম, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি হইতেই 'আমি' ভাব। কেহ বলেন 'মন'ই আমি। আশ্চর্য্যের কথা এই যে পুরাকালে আমাদের দেশে এই সমস্ত মতই প্রচলিত ছিল, এবং তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইত। হিন্দুশাস্ত্রের স্থির মত এই যে এ সমস্তের একটিও আমি নহে। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত 'আমি' নই
নহি ব্যোম, ভূমি, না বা তেজ বায়ু হই
নহি শ্রোত্র, জিহ্বা আমি নহি নেত্র ঘ্রাণ
চিদানন্দ আমি, আমি শিব ভগবান

নহি সপ্তধাতু আমি নহি পঞ্চবায়ু
নহি বাক্ পাণি পাদ বা উপস্থ পায়ু
নহি পঞ্চকোষ আমি নহি আমি প্রাণ
চিদানন্দ আমি, আমি শিব ভগবান

'আমি' যে এগুলির একটিও নহি ভাষাতেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা বলি 'আমার শরীর, আমার ইন্দ্রিয়, আমার প্রাণ, আমার মন, ইত্যাদি আমি শরীর, আমি মন এরূপ বলি না। দেহাশ্রিত, কিন্তু দেহ-মন-প্রাণাতিরিক্ত এক আমি বা আত্মা হিন্দুশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। দেহ, প্রাণ, মন প্রভৃতি আত্মার আবরণ। প্রথম-দৃষ্টিতে এই আবরক কোষগুলির এক একটিকে আমি বা আত্মা বলিয়া মনে হয়। কঠোর সাধনার ফলে এই আবরণগুলি ছিন্ন হয় ও তখন 'আমি' বা আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ভৃগুবল্লীতে এই সাধনার কথা উল্লিখিত আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রজাপতি ও ইন্দ্র বিরোচন সংবাদে কথিত হইয়াছে যে ১০১ বৎসর তপস্যার পর ইন্দ্র এই কোষগুলি ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুরাকালে অনেক ঋষিও যে আত্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণে পারক হইয়াছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদ উপনিষদে রহিয়াছে।

আধুনিক যুক্তিবাদীর পক্ষেও এই সকল বিবরণ অগ্রাহ্য করা সমীচীন হইবে না। বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ পরীক্ষা আমরা নিজেরা না করিতে পারিলেও বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞান-বিদের কথাই প্রমাণ বলিয়া মনে করি। অবশ্য বিজ্ঞান-বিদের উপর অশ্রদ্ধা থাকিলে তাঁহার কথা না-ও মানিতে পারি। যিনি মনে করিবেন ঋষিরা ভুল করিয়া বা মিথ্যা করিয়া তাঁহাদের আত্মোপলব্ধির কথা লিখিয়া গিয়াছেন তিনি আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিবেন না। হিন্দু কিন্তু এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসবান্—সেজন্য তিনি দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব মানেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে যুক্তিতর্কের দ্বারাও আত্মার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে।

ঋষিরা আত্মা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন, যথা, আত্মা জড়ধর্মী নহে। যাহা আত্মা তাহা চেতন, যাহা অনাত্মা তাহা অচেতন বা জড়। মনও সূক্ষ্ম জড় পদার্থ। আত্মার সান্নিধ্যেই মনে চেতনার স্ফূরণ হয়। সর্ব্বপ্রাণীতেই

আত্মা আছে ; তবে ইতর প্রাণীতে আত্মার প্রকাশ বা চেতনা তত পরিস্ফুট নহে। জড়েও আত্মা অব্যক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান। আত্মার প্রকাশ যতই অপরিস্ফুট হইবে মনুষ্য বা প্রাণী ততই নিম্নস্তরের হইবে। হিন্দু—ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি। এই আত্মার যখন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও বাসনার আবরণ থাকে তখনই তাহা জীবাত্মা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই আবরণ খসিয়া গেলে জীবাত্মার মুক্তি হয় তাহা পরমাত্মাতে লীন হয়। বাসনার আবরণের বশে জীবাত্মা দেহ ধারণ করে। মনুষ্য যেমন ইচ্ছামত বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে সেইরূপ জীবাত্মা নিজ বাসনামত শরীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় ভোগ করে। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—

> ঊর্দ্ধে প্রাণ আর অধে অপানকে যিনি করেন চালনা।
> মধ্যস্থিত সে বামনে সকল দেবতা করে উপাসনা॥
> স্রংস্যমান এই দেহে অধিষ্ঠাতা দেহি যারে বলা হয়।
> দেহ হ'তে মুক্ত হ'লে তিনি অবশিষ্ট কিবা তাতে রয়॥
> না বা প্রাণে না অপানে জীব করে কভু জীবনধারণ।
> উভয়ে আশ্রিত অন্যে যেই হয় সেই জীবন কারণ॥ কঠ-২।৩-৫

অর্থাৎ বামন বা পূজনীয় আত্মাই দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় (দেবতা) ইত্যাদির অধিপতি। তাহারই বশে প্রাণ ইত্যাদি চলিতেছে। তিনি দেহত্যাগ করিলে দেহে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এই সমস্ত কথা মানিয়া লইয়া পুনর্জন্মবাদের বিচার করা যাক। জীবাত্মা স্বীয় বাসনা ভোগের জন্যই দেহ সৃষ্টি করে। অতএব যতদিন বাসনার বিনাশ না হইবে ততদিন জীবাত্মা সুযোগ পাইলেই দেহ সৃষ্টি করিবে। এক দেহ নষ্ট হইলে জীবাত্মা অপর দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আশ্রয় লইবে। কথাটা উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট হইবে। কোন বৃক্ষে দেখিলাম যে পক্ষীর নীড় রহিয়াছে কিন্তু পক্ষীকে দেখিতে পাইলাম না। এই নীড় ভাঙিয়া দিলাম। পক্ষি-তত্ত্ববিৎ বন্ধু বলিলেন, পক্ষীর এই সময়ে শাবক হইবে সে জন্য তুমি যতবারই বাসা ভাঙিয়া দাও না কেন সে পুনরায় উপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া বাসা বাঁধিবে। যতদিন তাহার শাবকপালনের ইচ্ছা থাকিবে, ততদিন সে নীড় রচনা করিবেই। একটি বাসা ভাঙিয়া দিবার পর পুনরায় কোন্ বাসাটি পাখী তৈয়ার করিল তাহা বলা যাইবে না, কারণ পাখীকে আমরা দেখিতে পাই নাই। জীবাত্মার পুনর্জন্ম এই প্রকারের ব্যাপার। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্র-কারেরা বলেন কামনানুযায়ী আত্মা শরীরধারণ করে। ভাল বাসনা থাকিলে উচ্চস্তরে জন্ম হয়। নিকৃষ্ট বাসনার বশে ইতর যোনিতে জন্ম হয়। বাসনা ক্ষয় হইলে পুনর্জন্ম হয় না। ইহাই পুনর্জন্মবাদ। শ্রীকৃষ্ণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন।

এই জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী কতকগুলি কূট প্রশ্ন তুলিতে পারেন। আত্মাই যখন প্রাণের অধিষ্ঠাতা ও প্রাণ যখন আত্মার বশে চলে তখন মানিতে হয় আত্মার দেহত্যাগে প্রাণত্যাগ হয়। আমি যদি কোন ব্যক্তিকে কাটিয়া ফেলি তবে তাঁহার আত্মা কি করেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রকৃতি হইতেই আত্মা প্রাণ ইত্যাদি দেহের সমস্ত জড় উপাদান সংগ্রহ করেন। প্রকৃতি বিপর্য্যয়ে দেহ ছিন্ন হইলে প্রাণ নষ্ট হয় ও দেহ তখন বিষয়ভোগের উপযোগী থাকে না বলিয়াই আত্মা তাহা ত্যাগ করে ও পরে সুযোগ-মত অন্য শরীর গ্রহণ করে। প্রকৃতির নিয়মের বশেই সুযোগ খুঁজিয়া জীবাত্মাকে চলিতে হয়। আবার প্রশ্ন উঠিবে, সকল প্রাণীতেই আত্মা আছে। এমিবা (amoeba) নামক প্রাণীতেও আত্মা আছে। একটি এমিবাকে শস্ত্রদ্বারা বিভক্ত করিলে দুইটি এমিবার উৎপত্তি হয়; কোন কোন বৃক্ষের ডাল কাটিয়া পুঁতিলে আর একটি বৃক্ষ জন্মে। এই পরীক্ষায় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও কি বিভক্ত হইয়া দুইটি আত্মায় পরিণত হইল; কিন্তু 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি'—শস্ত্র আত্মাকে ছিন্ন করিতে পারে না। তবে এ দ্বিতীয় আত্মা কোথা হইতে আসিল। কবে, কোথায় অণুপ্রমাণ এমিবার শরীর ছিন্ন হইবে ও সেই শরীরেরই যোগ্য বাসনাযুক্ত আত্মা তাহাতে প্রবেশ করিবে, এই আশায় কি সে আত্মা অপেক্ষা করিতেছিল? উত্তরে বলিতে হয়, জীবাত্মাও পরমাত্মার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সেজন্য উপযুক্ত সুযোগ পাইবা-মাত্র নিজ কামনানুযায়ী শরীরে প্রবেশ করে। কখনও আবশ্যকানুযায়ী শরীর একেবারেই লাভ করে,

কখনও বা তাহাকে বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া শরীর গঠন করিয়া লইতে হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে :—

অনোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ

অর্থাৎ, অণু হইতেও অণু ও মহৎ হইতেও মহৎ আত্মা প্রাণীদের গুহামধ্যে অর্থাৎ হৃদয়ে নিহিত আছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে ঋষির আত্মোপলব্ধির বিবরণ মানিয়া লইলে উহ হিসাবে পুনর্জন্ম মানিতে হয়। জাতিস্মরতা মানিলে ঘটনা হিসাবেই পুনর্জন্ম মানিতে হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে মৃত্যুর পর আত্মার পুনর্জন্মবাদ কেবল যে আমাদের মত আধুনিক যুক্তিবাদীর পক্ষেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব তাহা নহে। কঠোপনিষদে আছে, নচিকেতা যখন যমকে প্রশ্ন করিলেন যে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না, তখন যম বলিলেন—'ন হি সুবিজ্ঞেয় মণুরেষ ধর্ম্মঃ' অর্থাৎ এই ব্যাপার সম্বন্ধে বুঝিতে পারা যায় না, অতএব হে নচিকেতা "মরনং মানুপ্রাক্ষীঃ"—মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না।

মনস্কাম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

বড়দিনের ছুটিতে পকেটে ষ্টেথস্‌কোপ ও হাতে ব্যাগ লইয়া চৌবাগায় মামাবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। মামী-মাকে প্রণাম করিয়া কেবল দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় একটি ছেলে আসিয়া কহিল, "আপনাকে ডাক্‌ছে।"

মামাবাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিতাম, দুই-এক জন বন্ধুবান্ধবও জুটিয়াছিল, তাহাদেরই কেহ সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম। একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বারান্দায় দাঁড়াইয়া-ছিলেন, আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ডাক্তার?"

কহিলাম, "হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "ভালই হয়েছে! আপনাকে পাল্কী থেকে নামতে দেখেই ছুটে এসেছি। একটু যেতে হবে! গরীব মানুষ দয়া না করলে—" কোথায় যাইতে হইবে, কাহার অসুখ, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিলাম না, ষ্টেথস্কোপটি পকেটে ফেলিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গ ধরিলাম। মিনিট পনেরো পর বাঁশের ঝোপে ঘেরা একখানি একচালা ঘরের আঙিনায় গিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরের দরজায় একটি যুবক গামছা কোমরে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ডাকিল, "ভিতরে আসুন!" কোমরে গামছা জড়ান মানুষ দেখিয়াই বুঝিলাম যে, সম্ভবতঃ রোগীর আর ডাক্তার দেখাইবার বেশী দিন প্রয়োজন হইবে না।

ঘরে ঢুকিলাম। ঘরের কোণে বাঁশের মাচার উপরে একটি বৃদ্ধা শুইয়াছিলেন। বুঝিলাম, ইঁহারই রোগ আরোগ্য করিবার জন্ম আমি আসিয়াছি। রোগিনীর পাশে বসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেছি, এমন সময় বৃদ্ধা হাত টানিয়া লইয়া কহিলেন, "ও ছাই দেখে হবে কি! হাত দেখতে পার?" বলিয়া দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিয়া আমার হাতের উপর রাখিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া যুবকটির দিকে চাহিলাম। সে একটু মুচ্‌কি হাসিয়া আমার কানের কাছে মুখ লইয়া ইংরেজীতে কয়েকটি কথা ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিয়া গেল।

ব্যাপারটা কতক বুঝিলাম। মৃত্যু-পথযাত্রীর নিকট মিথ্যা কথা বলিবার প্রবৃত্তি ছিল না, তথাপি পরিহাস করিবার চিরন্তন স্বভাবটি পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না; কহিলাম, "একটু একটু পারি বৈ কি?"

বৃদ্ধার চোখ দুটি অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, "তবে দেখ তো ভাই, অদেষ্টে তীর্থ আছে কি-না?" বলিয়া কাতর উৎসুক দৃষ্টিতে বৃদ্ধা আমার দিকে চাহিলেন। কি বলিতে হইবে যুবকটির কথার আঁচে আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম; বৃদ্ধার করতলের দিকে ক্ষণকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিলাম, "উঃ! বিস্তর তীর্থ দেখছি!" বৃদ্ধার মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল, আমার ডান হাতখানি মুঠা করিয়া ধরিয়া তিনি কহিলেন, "মিছে কথা বল্‌ছিস্‌নে তো ভাই?" অসঙ্কোচে কহিলাম, "মোটেই না, হাতের চার দিকেই তীর্থ, তবে সব দরজা বন্ধ বলে যেতে পারেন নি। এইবার দরজা খুলবে।" মনে মনে কহিলাম, "দক্ষিণ দুয়ার।" আগ্রহভরে রোগিণী বালিশে ভর দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেলেন। আমি কহিলাম, "ব্যস্ত হ'লে তো হবে না, সেরে উঠুন আগে।" বৃদ্ধা চোখ না মেলিয়াই কহিলেন, "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হও ভাই।" তারপর নীরবে তাঁহার ডান হাতখানি তুলিলেন, বুঝিলাম আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরিচর্য্যা ও পথ্য সম্বন্ধে যুবকটিকে দুই একটি উপদেশ দিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সহিত বাহির হইয়া আসিলাম।

পথে আসিতে আমার সঙ্গীর কাছে বৃদ্ধার জীবনের কাহিনী শুনিলাম। বৃদ্ধার নাম দাখি ঠাকুরাণী। ভাল নাম দক্ষজা, অথবা দাক্ষায়ণী,—যে-কোনটি হইতে পারে। দাখিঠাকুরাণীর বিবাহ হইয়াছিল সাত বৎসর বয়সে এবং বৎসর না ঘুরিতেই বিধবা হইয়াছিলেন। সে বহুদিনের কথা। তারপর এই সত্তর বৎসর কাল দাখিঠাকুরাণী তাঁহার স্বামীর বাস্তভিটায় একখানা একচালা ঘর ও কাঠা দেড়েক জমির সুপারীর বাগানখানি আশ্রয় করিয়া কাটাইয়াছেন। অনাহূত যৌবন দাখিঠাকুরাণীর দেহকেও আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে কিশোর যুবক ও প্রৌঢ় নানা-বয়সের নর-সৈনিকেরাও অভিযান সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি শীর্ষহীন সম্মার্জ্জনীর সহায়ে দাখিঠাকুরাণী তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে মাথা নেড়া করিয়া ও স্বহস্তে ডালের কাঁটা দিয়া মুখখানিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া, কাঁচা তেঁতুল খাইয়া সমস্ত দিন পানা-পুকুরে স্নান করিয়া জর ডাকিয়া আনিয়া যৌবনকেও প্রতিহত করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দাখিঠাকুরাণীর শেষ অবলম্বন বৃদ্ধ অন্ধ শাশুড়ী একদিন প্রাতঃকালে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন; তখনও যৌবন সগৌরবে দাখিঠাকুরাণীর দেহে রাজত্ব করিতেছিল। ঠাকুরাণী অত্যন্ত কাঁদিলেন এবং বুড়া ঘোষাল মহাশয়ের কাছে গিয়া কাঁদিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাকে তীর্থে রাখিয়া আসা হোক্‌। একক তীর্থবাসের বয়স হয় নাই বলিয়া মাতব্বর ঘোষাল মহাশয় তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। সে আজ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যহ দাখিঠাকুরাণী তীর্থযাত্রা, তীর্থবাস ও তীর্থমৃত্যু কামনা করিয়া আসিতেছিলেন। শেষে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে গ্রামের কেহ তীর্থ করিতে গেলে তাহাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছি এবং শ্বশুরবাড়ী না থাকিলে কোন কল্পিত কুটুম্ববাড়ীর নাম করিয়া বাহির হইতে হইত। নতুবা দাখিঠাকুরাণীর উপদ্রবের অন্ত থাকিত না? তিনি আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া তীর্থকামীর দরজায় ধরনা দিয়া পড়িয়া থাকিতেন। এ জন্য দুর্ভোগও তাঁহাকে কম ভুগিতে হয় নাই। গত বৎসর বৃন্দাবন ঠাকুর চৈত্র মাসে তীর্থে লইয়া যাইবেন আশ্বাস দিলেন। ঠাকুরাণী ত বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র পর্য্যন্ত বৃন্দাবন ঠাকুরের পত্নীর সেবা, গোয়াল পরিষ্কার, কাঁথা সেলাই, নারায়ণের ভোগ পাক ইত্যাদি বিচিত্র কাজ অম্লানবদনে করিয়া গেলেন। চৈত্র মাসের তেইশে তারিখে বৃন্দাবন ঠাকুর পাঁজি খুলিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, "রামঃ! অকাল দেখছি যে, তীর্থ তো নেই এ বছর! সেই দিন বাড়ী আসিয়া দাখি ঠাকুরাণী শয্যা লইলেন এবং মাস খানেকের মধ্যে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন না। তাহার পরেই এই ব্যাধি। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন, "তীর্থ-ব্যাধি আর কি!" কেন জানি না আমি হাসিতে পারিলাম না। পরদিন আবার ডাক আসিল। মামীমা কহিলেন, "ওই তেথ-পাগল বুড়ীর কাছে যাচ্ছিস্‌ আবার! জ্বালিয়ে মারবে যে!"

বুড়ীর প্রতি একটু মমতা জন্মিয়াছিল, মামীর কথা কানে তুলিলাম না।

গিয়া দেখিলাম দাখিঠাকুরাণী উঠিয়া বসিয়া বেড়ায় ঠেস্ দিয়া ভিজান সাগু খাইতেছেন। আশ্চর্য্য হইলাম। এ রোগী একদিনে উঠিয়া বসিতে পারে একথা কল্পনাও করি নাই। খুশী হইয়া কহিলাম, "যা হোক্! উঠে বসেছেন!"

দাখিঠাকুরাণী হাসিয়া কহিলেন, "তীথে যেতে হবে তো ভাই। শুয়ে থাকলে কে সঙ্গে নেবে, তাই উঠো—" বলিয়াই সাগুর পাথর রাখিয়া হাত ধুইলেন। বুঝিলাম তীর্থ যাইবার আশাই বুড়ীকে এ যাত্রা বাঁচাইয়াছে। একখানা মাদুর টানিয়া লইয়া দাখিঠাকুরাণীর কাছে বসিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত কাহিনী শুনিলাম। শুনিয়া বুঝিলাম তীর্থভ্রমণ আর গঙ্গাতীরে মৃত্যুর কামনাই বুড়ীকে বিপর্য্যস্ত ভাগ্যের অজস্র আঘাতের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত অটুট রাখিয়াছে।

বিদায় লইবার সময় বুড়ীর পায়ের ধূলা লইলাম, দাখিঠাকুরাণী কহিলেন, "তুই তো ডাক্তার ভাই, দেখিস্ একটু, হাড় ক'খানা যেন গঙ্গায় পড়ে।" বিরাট ভারতবর্ষ, তার অগণ্য তীর্থ, প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর প্রসারিত গঙ্গা, আমার মত লক্ষ লক্ষ ডাক্তার আর দাখিঠাকুরাণীর মত কোটি কোটি তীর্থকামী। এ সব কথা বলিয়া আর বুড়ীকে ব্যাকুল করিবার ইচ্ছা হইল না। অসঙ্কোচে কহিলাম, "সে অবিশ্যি দেখব দিদিমা, তীর্থে যাবার সময় খবর দেবেন।"

"—তা দেব বৈকি ভাই—" বলিয়া দাখিঠাকুরাণী আমার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "আমার বুকের পাষাণ নেমে গেল দাদা, এমন কথা আর কেউ বলেনি।"

নীরবে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। প্রাঙ্গনে নামিয়া শুনিলাম দাখিঠাকুরাণী কহিতেছেন, "মনস্কাম পূর্ণ কর হরিঠাকুর! নারায়ণ! তারকব্রহ্ম!" তারপর নারায়ণের সমস্ত নামগুলিই আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, আমি শুনিয়া হাসিলাম। আমি নারায়ণ হইলে এতক্ষণে যে দাখিঠাকুরাণীকে নিশ্চয়ই সর্ব্বতীর্থ দর্শন করাইয়া আনিতাম তাহাতে সন্দেহ ছিল না।

২

যাহা হোক, নারায়ণও দাখিঠাকুরাণীর প্রার্থনা শুনিলেন, বুড়ীর মনস্কাম পূর্ণ হইল। মামীমা লিখিলেন যে, তাঁহার স্বামীর বসত ভিটাখানি বাদে আর সমস্ত ঘর দরজা তৈজসপত্র লেপকাঁথা ইত্যাদি সিকি মূল্যে বেচিয়া দাখিঠাকুরাণী একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গ লইয়াছেন। শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।

তখন প্রয়াগের কাছাকাছি একটা জায়গায় বসন্ত ও বিসূচিকা রোগের প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বড় বক্তৃতা করিয়া ফিরিতেছিলাম। প্রয়াগে কুম্ভ মেলা আরম্ভ হইয়াছে, মহামারীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব; সরকার বাহাদুর অজ্ঞ জনসাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। অবকাশ আদৌ ছিল না। এই সময় দশটি বিভিন্ন পোষ্টাপিসের ছাপ খাইয়া একখানি খামের চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। পড়িলাম—দাখিঠাকুরাণী প্রয়াগে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে লিখিয়াছেন। শেষের দিকে কোথাও মরিলে হাড় ক'খানি গঙ্গায় দিবার জন্য সেই পুরাতন অনুরোধ, তাহার পরের ছত্রগুলি ধ্যাবড়াইয়া গিয়াছে—কিছু বোঝা গেল না। প্রয়াগ হাট চৌবাঘা নয়, তাহা সম্ভবত দাখিঠাকুরাণী জানিতেন না। বুঝিলাম, ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াও সম্ভব নয়। তথাপি পূর্ণমনস্কাম বৃদ্ধার উল্লাস দেখিতে বড় আগ্রহ হইল। কোন মতে যদি সন্ধান করিতে পারি ভাবিয়া প্রয়াগে চলিলাম।

সমস্ত দিন ঘুরিয়া নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেছি এমন সময় চৌবাঘার সাধন মিস্ত্রির সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সে কহিল, "ভাল হ'ল ডাক্তার দাদা—কয়টা মাল খালাস ক'রে দিতে হ'বে।" সে কথায় কান না দিয়া বুড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। "আজ্ঞে তেনারাইতো মাল—তিনি তো ওলাউঠো হয়ে—" ক্ষণিকের মধ্যে দাখিঠাকুরাণী যেন চক্ষের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিলেন, শুনিলাম বেণুবনে প্রচ্ছন্ন একটি কুটীরের ছিন্ন শয্যায় শয়ান এক বৃদ্ধা অশ্রু সজল উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া যেন

কহিতেছে—"হাড় ক'খানা গঙ্গায় দিস্ ভাই!" একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে মরেছেন? সৎকার করলে কে?"

সাধন সহজ ভাষায় কহিল, "হপ্তা খানেক!" তাহার পর মৃত্যুর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাকে জানাইল। প্রয়াগে আসিয়াই তাঁহার কলেরা হয় এবং সঙ্গের লোকজন হাসপাতালে খবর দিয়া তল্পীতল্পা লইয়া প্রস্থান করে। হাসপাতালেই বুড়ীর ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইয়াছে। সাধন শ্রীদাম মাঝির মুখে খবর শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিল।

কথা না কহিয়া হাসপাতালে গিয়া সংবাদ লইলাম। কথা যথার্থ। কলেরা হইয়া তিরিশে তারিখে দাখি নামে একটা বাঙালী বুড়ীর মৃত্যু হইয়াছে। কোন্ জাতের স্ত্রীলোক না জানাতে কেহ সৎকার করিতে রাজী হয় নাই; এগার নম্বরের প্লটে মাটি দেওয়া হইয়াছে।

এগার নম্বরের প্লট দেখিতে গেলাম। তখনও জন কুড়ি লোকের মাটি দেওয়া হইতেছিল। ডোমের কাছে প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম যে, দাখিঠাকুরাণীকে উদ্ধার করা অসম্ভব, যে-হেতু তাঁহার পরেও প্রায় শ'খানেক তীর্থকামী ওই একই স্থানে বিশ্রাম করিতে আসিয়াছে।

গঙ্গার দিকে চাহিলাম, বহুদূর। তবে ভরসা আছে কোন কালে মাতা জাহ্নবী ভাঙনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে এগারো নম্বরের প্লটে আসিয়া পৌছিবেন, সেইদিন বৃদ্ধার মনস্কাম পূর্ণ হইবে। সেই ভাঙনের দিনের প্রতীক্ষা করিয়া দাখিঠাকুরাণীর অস্থি কয়খানি বসিয়া থাকিবে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না।

কালো মেয়ে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

চোখের অরুচি সেরে যায় যার কালো চোখদুটি চেয়ে—
পাড়ায় সবাই বলে তায় কালো মেয়ে!
কথাটি না কয়—চুপ ক'রে রয়, মনে মানি' পরাভব;
নয়ন-জুড়ানো নীল মেঘে ঢাকি বরষার বৈভব।

দীঘি-জলে-পড়া অরুণের আভা ঝলি' উঠে সারা দেহে,
কালোর ঝরণা ঝরে' পড়ে পিঠ বেয়ে;
টানা ভুরুদুটি শেখেনি ভ্রূকুটি, তারি গাঢ় ছায়াতলে
ঘন নীল দুটি অপরাজিতায় ব্যথার শিশির জলে!

সন্ধ্যামেঘের সায়রের জলে সদ্য যেন-বা নেয়ে
চলেছে গোধূলি পুরবীর গান গেয়ে;
মোহমাখা সেই বেদনার সুরে দিনান্ত নেমে আসে,
সরস কুলায়ে পরশ বুলায়ে বাঁধিবারে বাহুপাশে।

ঝিঙাফুলে-বেড়া ঘরের বেড়াটি ধরিয়া নিরালা সাঁঝে
চেয়ে থাকে বালা ঊর্দ্ধ আকাশমাঝে!
আঁধারের বুকে ফুটে উঠে তারা—তারি পানে চেয়ে চেয়ে
নিঃশ্বসি' ধীরে ঘরে ফিরে যায় রূপহীনা কালো মেয়ে।

চোখের বালাই সেরে যায় যার চোখদুটি পানে চেয়ে,
জগতের হাটে সেই হ'ল কালো মেয়ে!
বালির বর্ণ সাদা বলে তাই কালো মাটি ফেলে চাই—
রূপার মতন রূপেরই মূল্য, রসের মূল্য নাই!

পুস্তক পরিচয়

অদ্বৈতসিদ্ধি বালবোধিনী টীকা এবং ন্যায়ামৃত, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্যসমেত। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক স্বকৃত ভূমিকা সহিত সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষ, ৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা। ভূমিকা ও অদ্বৈতসিদ্ধি এবং ন্যায়ামৃত সহ প্রায় ১৭০০ শত পৃষ্ঠা। মূল্য ১০৲ টাকা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বহুদিন হইতেই বঙ্গভাষায় দার্শনিক গ্রন্থের—বিশেষতঃ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মার্গের প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রের—প্রচারকল্পে বহু আয়াস ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া বিদ্বৎসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। তাঁহার এই প্রশংসনীয় উদ্যমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল অদ্বৈতসিদ্ধির বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের হস্তে এই অনুবাদ ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যার রচনা-ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। তর্কতীর্থ মহাশয়ের ন্যায় ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্রে নিষ্ণাত, ব্যাখ্যানকুশল সুপণ্ডিত ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে এই রচনা বঙ্গীয় দার্শনিক সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের ভাষানুবাদ অতি কঠিন—বিশেষতঃ যে সকল গ্রন্থের রচনাতে নব্য-ন্যায়-শাস্ত্রের পরিষ্কার-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহাদের অনুবাদ ও তাৎপর্য্যবিবরণ বঙ্গীয় পাঠকের বোধগম্য করিয়া নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা বস্তুতঃই দুরূহ ব্যাপার। তর্কতীর্থ মহাশয় এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়া যে প্রকার পাণ্ডিত্য, বিশ্লেষণপটুত্ব এবং লিপিচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। যে সকল পণ্ডিত এবং ছাত্র অদ্বৈতসিদ্ধি-অধ্যয়নে উৎসুক তাঁহারা এই গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

অদ্বৈতসিদ্ধি প্রকরণ গ্রন্থ। ইহা মাধ্ব সম্প্রদায়ের ব্যাসাচার্য্যকৃত ন্যায়ামৃত গ্রন্থের খণ্ডন স্বরূপ। সম্পাদক মহাশয় পরিশিষ্টে সানুবাদ ন্যায়ামৃত গ্রন্থের আনুষঙ্গিক অংশ সংযোজিত করিয়া পূর্ব্বপক্ষ জানিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীমৎ শঙ্করের ও তাঁহার শিষ্যবর্গের অদ্বৈত মতের গ্রন্থাদি প্রকাশিত হওয়ার পরে নানা দিক্ হইতে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের উপর বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত আক্রমণ চলিয়াছিল। এই সংঘর্ষের ফলে বেদান্তদর্শনের বিচারাংশ পুষ্ট হইয়াছিল। শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চিৎসুখাচার্য্যের প্রভারতত্ত্ব প্রদীপিকা ও মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি অদ্বৈত বেদান্তের উৎকৃষ্ট বিচারগ্রন্থ। তন্মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধিই অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যিনি অদ্বৈতসিদ্ধি জানেন না, তাঁহাকে অদ্বৈতশাস্ত্রে প্রবিষ্ট বলা চলে না।

মধ্যযুগে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের আপেক্ষিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। শঙ্করমিশ্রের ভেদরত্নপ্রকাশ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ভেদসিদ্ধি, দ্বৈতী দত্তের ভেদ-জয়শ্রী এবং মাধ্ব সম্প্রদায়ের ভেদোজ্জীবনাদি দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রতিপাদক গ্রন্থ। তদ্বৎ নৃসিংহাশ্রমের ভেদধিক্কার, অদ্বৈতদীপিকা, মধুসূদনের অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি অদ্বৈতমতের গ্রন্থ। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধিতে যে তর্ককুশলতা ও প্রৌঢ়ি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অন্যত্র খুব সুলভ নহে।

পণ্ডিতপ্রবর তর্কতীর্থ মহাশয় অদ্বৈতসিদ্ধির এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনা করিয়া জিজ্ঞাসু পণ্ডিতমণ্ডলীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি মূল গ্রন্থের উপর সরল সংস্কৃত ভাষায় "বালবোধিনী" নাম্নী একটি স্বনির্ম্মিত টীকাও সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। উহাতে বঙ্গভাষানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেও মূলের পংক্তিযোজন ও অর্থাববোধবিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য হইবে, আশা করা যায়। গৌড়ব্রহ্মানন্দীর ন্যায় অতুলনীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ সত্ত্বেও "বালবোধিনীর" উপযোগিতা আছে, ইহা নিঃসন্দেহ। আশা করি, পণ্ডিত মহাশয় একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ধৈর্য্যসহকারে তাঁহার আরব্ধকার্য্যটি ক্রমশঃ সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। পাঠকসংখ্যার ন্যূনতাদর্শনে তিনি নিরুৎসাহ হইবেন না, আমাদের এরূপ ভরসা আছে।

সম্পাদক মহাশয় স্বকৃত ভূমিকাতে নিজে বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে অদ্বৈত চিন্তার স্রোত ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ও গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় প্রসঙ্গে বহু অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের ও অন্যান্য দর্শনের সিদ্ধান্ত, মূল গ্রন্থপাঠের সহায়তার জন্য সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আমরা একমত হইতে না পারিলেও ভূমিকাতে যে ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা ও বিপুল পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ"-এর রচয়িতারই উপযোগী। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতে প্রচলিত ক্রমবিকাশবাদের আলোচনা ও নিরাকরণের চেষ্টা আছে। কিন্তু আমাদিগের মতে এই অংশটি গ্রন্থমধ্যে না থাকিলে ভাল হইত। তবে বেদান্তালোচনার জন্য বেদের স্বরূপ, প্রামাণ্য ও অপৌরুষেয়ত্বাদি সম্বন্ধে প্রতিকূল যুক্তির নিরসন পূর্ব্বক সিদ্ধান্তের সম্যক্ বিচার আবশ্যক। ভূমিকার যে অংশে এই বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান সময়ের পাঠকের পক্ষে খুবই উপযোগী হইয়াছে।

আমরা চিন্তাশীল ও বেদান্তজ্ঞানলিপ্সু পাঠকসমাজে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

ভারতে পরদেশী ব্যাঙ্কের বনিয়াদ—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত, এম্-এ বি-এল প্রণীত। প্রকাশক—বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ। ১২০ পৃষ্ঠা, মূল্য বারো আনা মাত্র।

বাংলা দেশের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রধান সম্পদ্ তাহার বহির্বাণিজ্যের মধ্য দিয়া অর্জ্জিত হইয়া থাকে এবং এই সম্পদের আগমে শ্রেষ্ঠ সহায়ক কয়েকটি বিদেশীয় পরিচালিত এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক। এক্সচেঞ্জের কার্য্যে ভারতীয়ের বিশেষতঃ বাঙালীর স্থান নাই বলিলেই হয়। ইহার অন্যতম কারণ সরল ভাষায় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর

সহিত দেশবাসীর পরিচয় করাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থার অভাব। শ্রীযুক্ত জিতেন বাবুর এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি সে অভাব অনেকাংশে মোচন করিয়াছে।

বইখানি তিন অংশে বিভক্ত। লেখক প্রথমে এক্স্চেঞ্জ-সংক্রান্ত বিবিধ সংজ্ঞাগুলির বাংলা পরিভাষা ও অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়ভাগে ভারতের বর্ত্তমান এক্স্চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির পরিচয় এবং এই সম্পর্কে আমাদের সমস্তার কথা আলোচনা করিয়াছেন এবং তৃতীয় অংশে এই সকল সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক অতি অল্প কথায় সরলভাবে প্রায় সকল জ্ঞাতব্য বিষয়েরই সমাবেশ করিয়াছেন। বইখানি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। বাংলা ভাষায় এরূপ আরও পুস্তকের রচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনলিনাক্ষ সান্ন্যাল

MEMORIES OF MY LIFE AND TIMES. *Bipin Chandra Pal. Modern Book Agency, 10, College Square, Calcutta. Rs. 5. 1932.*

মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের জীবন নানারূপ বিরোধের মধ্য দিয়া গিয়াছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শ-সঙ্ঘর্ষের মধ্যে পড়িয়া আমাদের জীবন যেরূপ ভাবে সর্ব্বপ্রকারে গড়িয়া উঠিয়াছে, পাল-মহাশয়ের আত্ম-জীবনীতে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। সমগ্র জীবনী তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে; বর্ত্তমান (১ম) খণ্ডের সীমা, ১৮৫৮-১৮৮৬, অর্থাৎ ইহাতে লেখক তাঁহার প্রথম যৌবনের কথাই বলিয়াছেন। ইহাতে বিপিনবাবুর শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক সুখ-দুঃখ, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ, রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ,—এসব কথা তো আছেই, তাহা ছাড়া তখনকার ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক আন্দোলন, সংবাদপত্র, রঙ্গমঞ্চ, ধর্ম্মবিপ্লব, হিন্দুজাগরণ অর্থাৎ শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ—তখনকার জীবনের নানাদিক দেখিতে পাইবেন। ভাগ্যবশে গ্রন্থকারকে উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ পর্য্যটন করিতে হয়, তাহাদের বিবরণও ইহাতে আছে। বিপিনবাবু পণ্ডিত ও রসজ্ঞ ছিলেন; তাঁহার লিপিনৈপুণ্যে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা পাঠকের সম্মুখে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি ও দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

দুঃখের বিষয় বিপিনচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীর এই প্রথম খণ্ডও মুদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, প্রায় এক মাস পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে; প্রকাশকের দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। লেখকের অভাবে পরবর্ত্তী খণ্ড দুইটির সম্পাদন যথাযোগ্য সতর্কতার সহিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমান খণ্ডে দুই-একটি ত্রুটির উল্লেখ করিতেছি; মলাটের পরেই প্রারম্ভে সময় দেওয়া আছে; ১৮৫৭-১৮৮৪; ইহা ঠিক নহে, কারণ লেখকের জন্ম ১৮৫৮-এর শেষভাগে, তাঁহার পিতার মৃত্যু ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে; এই উভয় বৎসর, বর্ণনা-কালের সীমা। ২৫৩ পৃষ্ঠায় একটি মারাত্মক রকমের ভুল চোখে পড়িল,—তুঙ্গদ্বীপের কথা বলিতে গিয়া লেখক মনোমোহন বসুর 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' নামক 'নভেলের' উল্লেখ করিয়াছেন; উহার স্থানে 'হরিশচন্দ্র' নামে 'নাটক' বসিবে; 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' যিনি লিখিয়াছিলেন তাঁহার নাম মনোমোহন বসু নয়, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। বিপিনবাবু এখন ইহলোকে নাই, তাঁহার বন্ধুবান্ধব, যাঁহাদের হাতে বাকী দুই খণ্ডের সম্পাদন-ভার দেওয়া আছে, আশা করি তাঁহারা এই শ্রেণীর ভ্রমপ্রমাদ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

অবশ্য এরূপ বিস্তর ভুল থাকিলেও বর্ত্তমান বাংলার তথা ভারতের ইতিকথা হিসাবে ও একজন চিন্তাশীল কর্ম্মবীরের আত্মজীবনী হিসাবে ইহা অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

আলোর আলেয়া—উপন্যাস। লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এস্-সি; বি-এল্। প্রকাশক—এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। কাপড়ে বাঁধাই, ৫৭৫ পৃষ্ঠা, মূল্য আড়াই টাকা।

আনাড়ী কারিগর প্রচুর মালমশলা হাতে পাইলেও সুন্দর জিনিষ গড়িয়া তুলিতে পারে না—কারণ সেই মালমশলার সুষ্ঠু ও সঙ্গত প্রয়োগ-বিধি তাহার অজ্ঞাত। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পর্কেও সেই কথাই খাটে—লেখকের হাতে উপন্যাসের মালমশলা মজুত ছিল, তবুও তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই সংযম ও রসবোধের অভাবে। গ্রন্থখানি আয়তনে বিপুল কিন্তু ভিতরে সার নাই, আছে কেবল স্থানে-অস্থানে যার-তার মুখে লম্বা লম্বা বক্তৃতা। পড়িতে পড়িতে শ্রান্তি আসে, মনে হয় সুরেশবাবু যেন পাঠককে বক্তৃতা শুনাইবার জন্যই কলম ধরিয়াছেন। তার ফলে যে কাহিনী দু'শ আড়াই শ' পৃষ্ঠার মধ্যে বলা চলিত, তাহাই জুড়িয়া বসিয়াছে ৫৭৫ পৃষ্ঠা।

আলোচ্য গ্রন্থে একাধিক ঘটনা উদ্ভট ও অস্বাভাবিক হইয়াছে। যেমন ২২ পরিচ্ছেদে বায়স্কোপ দেখিতে বসিয়া তরুণ ও গীতির আচরণ। ২২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত লতার আচরণও অতি অদ্ভুত। যে-দুরাচার তাহাকে ছলে-বলে-কৌশলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল এবং ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার কবল হইতে পরিত্রাণের সুযোগ পাইয়াও তাহা প্রত্যাখ্যান করার কোনো সঙ্গত হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লেখক যে হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হাস্যকর। অনেক পাত্রপাত্রীর মধ্যে কেবল চিত্রা মেয়েটি ফুটিয়াছে ভাল।

লেখকের ভাষাজ্ঞান নাই বলিতে পারি না, তবে ক্রিয়াপদের চলিত রূপ ব্যবহার করিতে গিয়া তিনি হিমসিম খাইয়াছেন। যেমন—'উঠি' স্থলে 'ওঠি', 'উঠেছে' স্থলে 'ওঠেছে', 'উঠলেই' স্থলে 'ওঠলেই', 'গুলিয়ে' স্থলে 'গোলিয়ে'। কলেজে-পড়া শিক্ষিত নরনারীর মুখে 'বিশ্বেস', 'পরীক্ষে', 'বুদ্ধি' 'বাঁকের', 'চিন্তে' ইত্যাদি অদ্ভুত ও অচল। তাহা ছাড়া 'কেলতিস' স্থলে 'কেল্তি', 'দিতিস' স্থলে 'দিত্তি', 'করতিস' স্থলে 'কোর্ত্তি', উল্টো স্থলে 'ওল্টো', 'আজ' স্থলে 'আজিকা', 'ওষুধ' স্থলে 'ওষধ', এমন কি 'রামধনু' স্থলে 'রামধেনু' পর্য্যন্ত দেখিলাম! 'উনিকে', 'উনির' 'বারেন্দা', 'বুঝ', 'কিছুটা' প্রভৃতি প্রাদেশিকতা আছে, এবং বলা বাহুল্য 'র', 'ড়' ও 'ঢ়' বিভ্রাটও বাদ পড়ে নাই। বাংলা ভাষার "ইডিয়ম্' লেখক আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। 'ঢো ঢো করিয়া ঘোরা,' 'খুঁসখুঁসে জ্বর প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।

ভবিষ্যতে গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে বাংলা ভাষার আধুনিক বঙ্গভাষার একটি ভাল অভিধানের শরণ লইলে লেখক বিশেষ উপকৃত হইবেন আশা করি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব—শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা, পৃঃ ৭০।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা ভাষায় সুলেখক বলিয়া

পরিচিত। তিনি এই পুস্তিকাতে সরলভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানদৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব পরমাত্মা ও জীবাত্মা, মানবের ইতিহাস, পরমাণুর গঠন ও রমন-রশ্মি এই কয়টি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার মূলতঃ হক্সলী, হেকেল, ডারউইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের মতানুসরণ করিয়াছেন; স্থানে স্থানে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের মত উদ্ধার করিয়া তুলনামূলক আলোচনাও করিয়াছেন। তুলনামূলক আলোচনা সর্ব্বত্র সরল হয় নাই। কোথাও কোথাও শাস্ত্রের অর্থ বিকৃত হইয়াছে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "পরমাত্মা পঞ্চভূত বা জড়প্রকৃতির সাহায্যে জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন এবং কালে এই পঞ্চভূতেই বিলীন হইবেন।" (পৃ-৪৪) হিন্দুশাস্ত্র হেকেলের জগৎ কারণ জড়শক্তিকে কুত্রাপি চরম সত্তা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। গ্রন্থকারের নিজের মত স্পষ্ট নহে। 'আত্মা' প্রভৃতি শব্দ নানা অর্থে প্রয়োগ করায় তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট হয় নাই। ৪২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার সার জেমস্ জিন্‌সের সহিত একমত হইয়া বলিতেছেন "এই জগৎ এক বিরাট মনের চিন্তাপ্রসূত।" "এই বিরাট মন ও হিন্দুদিগের উপনিষদে বর্ণিত অনন্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাস্বরূপ পরমাত্মা একই পদার্থ।" আবার ৪০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, মস্তিষ্ক হইতে মনের ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে বিরাট মনের আধার বিরাট মস্তিষ্ক কোথায় ছিল গ্রন্থকার তাহা বলেন নাই এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিরাট মস্তিষ্ক কিরূপে উদ্ভূত হইল তাহারও কোন নির্দ্দেশ দেন নাই। পুস্তিকার পরবর্ত্তী সংস্করণে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত মতগুলি বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানবাদের আলোচনা করিলে পুস্তিকাখানি সাধারণ পাঠকের নিকট অধিকতর মূল্যবান হইবে। শরীর ও মনের সম্বন্ধ বিচার করিতে হইলে কেবল হেকেলের মতের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। আধুনিক মনোবিদগণের বক্তব্য পাঠ করিলে গ্রন্থকার উপকৃত হইবেন। বাংলা ভাষায় সুলিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অত্যন্ত অভাব। পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থকার সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করিলে সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক এম্‌-সি সরকার এণ্ড সন্স্‌। ১৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে, জাপানের বিজয় নির্ঘোষে যুগযুগব্যাপী মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন এশিয়ার জাগরণের প্রথম সাড়া পাওয়া যায়। যে অদ্ভুত শৌর্য্যবীর্য্যের প্রভাবে অমোঘ জারশক্তিকে অবনমিত করা তৎকালীন নগণ্য জাপানের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, এই সামরিক উপন্যাসের পাতায় পাতায় তাহারই জ্বলন্ত কাহিনী বিদ্যমান।

লেফ্‌টেনেণ্ট সাকুরাই পতাকাধারী পদাতিকরূপে যুদ্ধে নামিয়া শেষে স্বীয় যোগ্যতাবলে উক্ত উচ্চ সামরিক পদবী অর্জ্জন করেন। নান্‌শান অবরোধ হইতে পোর্ট আর্থারের ভীষণ যুদ্ধের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত প্রায় তিন মাস কাল লড়িয়া এবং আধুনিক যুদ্ধদানবের তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। আলোচ্য বইখানি তাহারই অনুবাদ; কিছুদিন পূর্ব্বে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ থাকায় বইখানি পাঠকের মনে যুদ্ধসংক্রান্ত খাঁটি বিস্ময় ও বিভীষিকা উৎপাদন করে। এই দিক দিয়া জায়গায় জায়গায় এর বর্ণনা জগদ্বিখ্যাত সামরিক উপন্যাস "All Quiet on the Western Front"-এর কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। এর বাড়তির দিক-এর "বুশিদো" বা জাপানী ক্ষাত্রধর্ম্মের সুরটা।

অনুবাদের ভাষা বেশ ঝরঝরে, বেগবান এবং প্রয়োজনমত উচ্চ সামরিক আবেগ-উন্মাদনার প্রকাশে সক্ষম। অনুবাদ পাঠের মধ্যে প্রায় কেমন একটা অস্বস্তি লাগিয়াই থাকে—বিদেশিনীর অঙ্গে শাড়ী দেখিলে যেমন মনে হয়। সুখের বিষয় এই বইখানিতে ভাষার স্বচ্ছন্দতা কোথাও সে-ভাবটা ফুটিবার অবসর দেয় না।

প্রথমেই ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকৃত জেনারেল নোগীর ক্ষুদ্র একটি যুদ্ধসংক্রান্ত শোক-গাথার অনুবাদ আছে। পড়িতে পড়িতে কাহিনীর সমস্ত বিস্ময় বিমোহের মধ্যে যশের ভাগ-বাঁটড়ার হিসাবের মধ্যে শেষের দুইটি মর্ম্মস্পর্শী লাইনের সুর মনের সঙ্গে বরাবর লিপ্ত হইয়া থাকে—

"কেল্লা যাহারা করিল দখল
কেউ ফেরে নাই তারা—"

ছাপা, বাঁধাই ভাল। দাম এক টাকা।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম্মের ব্যাধি ও চিকিৎসা—শ্রীইন্দুপতি মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—গ্রন্থকার, বাঁকীপুর, সোমড়া পোঃ, হুগলী। মূল্য ।॰ আনা, পৃঃ ৭৪।

গ্রন্থখানির নামেই ইহার উদ্দেশ্য সুপ্রকাশ। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে নানা গলদ আছে গ্রন্থকার সরল ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ধর্ম্মগত নানা আচার-ব্যবহার, পূজা-পার্ব্বণ, নিগুণ ব্যক্তির শিষ্যত্ব ও পৌরোহিত্য স্বীকার প্রভৃতি হিন্দুগণকে পঙ্গু ও হীন করিয়া রাখিয়াছে। শাশ্বত বৈদিক ও বৈদান্তিক অনুষ্ঠানের কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম তাহাদের বলবীর্য্য দিতে পারিতেছে না। পুস্তকখানি যাহাদের উদ্দেশ্যে লিখিত, ইহা পাঠ করিয়া সমাজের কলঙ্ককালিমা ঘুচাইতে অবহিত হইলে তাহাদের কল্যাণ নিশ্চিত। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

অনুরাগ—শ্রীকনকলতা ঘোষ প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এই কাব্য গ্রন্থখানি পতিপ্রাণা হিন্দুনারীর স্বর্গীয় পতিদেবতার উদ্দেশ্যে রচিত প্রেমাঞ্জলি। পতিপ্রাণা কনকলতা পতিদেবতার স্মৃতিপূজার জন্য যে ডালি সাজাইয়াছেন তাহার ফুলগুলি পতিপ্রেমের গভীর অনুরাগে সার্থকই হইয়াছে সন্দেহ নাই। কবিতাগুলি সুরচিত, ভাষা সরল। ছাপা ও কাগজ ভাল, প্রচ্ছদপট সুন্দর।

বিস্মৃতি—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এই গ্রন্থখানি অমর সংস্কৃত নাটক শকুন্তলার শেষ অংশের ঘটনা লইয়া লিখিত। কবিতার ছাঁচে ঢালিয়া নাটকের এই অংশটির মূর্ত্তি ফুটাইয়া তোলা খুবই দুরূহ। সতীশবাবু যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। মূলের রস-সৌষ্ঠব এই গ্রন্থে অক্ষুণ্ণ না রহিলেও মূল গ্রন্থের নিজস্ব গৌরব এই অনুবাদে যাহাতে ম্লান না হয় গ্রন্থকার সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সোভিয়েট রাশিয়া—শ্রীজহরলাল বক্সী। প্রকাশক যুগান্তর বাণীভবন, ১৯৬ পৃঃ, দাম দেড় টাকা।

নবীন রাশিয়ার প্রতি গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা আছে এবং বই খানা লিখিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথায় "এই গ্রন্থখানিকে অর্থ-নৈতিক ইতিহাস স্বরূপ বলা যাইতে পারে।"

কিন্তু ইহাতে অঙ্ক এবং গণনা এত রহিয়াছে যে, সেগুলির একটু ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত ছিল এবং কোথা হইতে এ সব সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাও সব জায়গায়ই বলা উচিত ছিল। সাধারণ পাঠকের নিকট এত সব হিসাবের অর্থ স্পষ্ট হইবে কিনা বলা কঠিন। আর, জমি ইত্যাদির পরিমাপ আমাদের দেশী মাপে বুঝাইয়া দিলে বোধ হয় ভাল হইত।

গ্রন্থকারের অনেক বক্তব্যই অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কথায় কথায় অনুবাদে ভাষা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে; একটু চেষ্টা করিলেই গ্রন্থকার এই দোষ শোধরাইয়া লইতে পারিতেন।

'পঞ্চবার্ষিক পদ্ধতি' (Five-Year Plan) ইত্যাদির আরও একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা থাকিলে ভাল হইত। অধ্যায়-বিভাগেও স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তবে, যে অবস্থায় গ্রন্থকার বইখানা শেষ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে তাঁহার উদ্যমের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ছাপা ও কাগজ উত্তম।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে—বাঙ্গালার কৃষি-কলেজের অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০-২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা। মোট ১২০ পৃষ্ঠা। তদ্ভিন্ন আর্ট পেপারে স্বতন্ত্র মুদ্রিত ১৫ খানি ছবি আছে। লেখার সঙ্গে আরও তিনখানি ছবি আছে।

জাপানে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন, পণ্যশিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির বিস্ময়কর উন্নতি এবং যে সামরিক বলে জাপানীরা রুশিয়াকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছিল সেই সামরিক শক্তি সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। জাপানের এই রূপ কৃতিত্বে অন্য সব এশিয়াবাসী জাতির মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে, যে, তাহারাও জাপানের মত হইতে পারে। ভারতবর্ষে জাপানের দৃষ্টান্ত জাতীয় জাগরণের অন্যতম কারণ। ভারতীয়েরা মনে করিয়া থাকে, জাপান স্বাধীন অতএব আমরাও স্বাধীন হইতে পারি, এবং জাপান শিক্ষা, পণ্যশিল্প, বাণিজ্য, কৃষি এবং সামরিক কার্য্যক্ষেত্রে যাহা করিয়াছে, আমরাও তাহা করিতে পারি। পারি যে, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু জাপানীরা তাহাদের জাতীয় চরিত্র ও দেশকালের অনুযায়ী যে-সব উপায় অবলম্বন করিয়াছে, আমরা দেশকালপাত্রভেদে সেইরূপ সব উপায় অবলম্বন করিলে তবে আমাদের ইচ্ছা সফল হইবে। কোন সদ্‌গুণ কোন জাতিরই একচেটিয়া নহে; সকল জাতির মানুষের চরিত্রেই সকল সদ্‌গুণ অল্প বা অধিক বিকশিত ভাবে বিদ্যমান আছে। জাপানীদের যে-সব সদ্‌গুণ তাহাদের উন্নতির মূলীভূত, তাহা ভারতীয়-দিগের চরিত্রে মোটেই নাই এমন নয়।

গ্রন্থকার স্বয়ং জাপানে গিয়া পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এই বহিখানি তাহার ফল। তাঁহার বার পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধটি সর্ব্বাগ্রে পঠনীয়। তাহার পর তিনি আধুনিক জাপান ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। জাপানীদের জীবনের অনাড়ম্বরতা, পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্য, শান্তিপ্রিয়তা, ধৈর্য্যশীলতা ও আত্মাহুতা, ভদ্রতা, গাম্ভীর্য্য, শ্রমসহিষ্ণুতা, আত্মনির্ভরশীলতা, কৃতজ্ঞতা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগে কাজ, বুসিদো, এবং ধর্ম্ম তাহাদের উন্নতির ভিত্তি বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বিষয়গুলির বিবৃতি ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী। তাহার পর আরও ২৬ পৃষ্ঠায় জাপানের উন্নতির সূচনা ও উপায় প্রসঙ্গে ঐ দেশের সার্ব্বজনীন শিক্ষা, সমবায়, কৃষি ও শিল্পবিদ্যালয়, পরীক্ষা ও গবেষণা, আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিজলীর ব্যবহার, ব্যাঙ্কস্থাপন, গমনাগমনের সুবিধা, প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এত আয়োজন সম্ভব হইল কিসে, গ্রন্থকার তাহাও দেখাইয়াছেন। সর্ব্বশেষে তিনটি পরিশিষ্টে আছে—জাপানী গবর্ণেমণ্ট ও গবর্ন্মেণ্টের চাকুরি, জাপানের আয়ব্যয়, জাপানের বর্ত্তমান শিক্ষায়তন, অধিবাসীদের জীবিকা, কৃষি, বনজদ্রব্য, খনিজদ্রব্য, শিল্প, রেশমশিল্প, বয়নশিল্প, কলকব্জা তৈয়ারি, রাসায়নিক শিল্প, বিজলী উৎপাদন, গ্যাস, অপরাপর শিল্প, এবং ব্যবসা।

লিখনপঠনক্ষম বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা জাপান যান নাই কিংবা যাঁহারা জাপানের উন্নতির কারণ সবিশেষ অবগত নহেন, তাঁহারা এই বহিটি পড়িলে সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। এই জন্য ইহা বঙ্গের সব স্কুল কলেজে এবং বাঙালীদের সমুদয় লাইব্রেরীতে রাখিলে দেশ লাভবান হইবে।

ভ.

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

৫

ছোট একটি বাগানের পথে একসার রজনীগন্ধার পাশ কাটাইয়া দীপালোকিত একটি গাড়ী-বারান্দার নীচে আসিয়া ট্যাক্সি দাঁড়াইল। বিমান নামিয়া-পড়িয়া নিজের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া ভাড়া চুকাইল, তারপর একমুহূর্ত্ত অজয়ের দিকে ফিরিয়া কেবলমাত্র "এস" বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, তাহাকে প্রশ্ন করিবারও অবসর দিল না। অন্যদিন হইলে অজয় তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া তর্ক করিত, বলিত, বিনা নিমন্ত্রণে অথবা বিনা প্রয়োজনে কোনও অপরিচিত-গৃহে প্রবেশ করা তাহার রীতি নহে, কিন্তু আজ পরিচয়-অপরিচয়ের মধ্যেকার সীমারেখা সত্যই অনেকখানি ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে, তদুপরি আজ বিমান ইচ্ছা করিবে এবং সে নীরবে মান্য করিবে, ইহা পূর্ব্ব-হইতে স্থির করিয়াই তাহার সঙ্গে সে পথে বাহির হইয়াছিল, সুতরাং নামিয়া-পড়িয়া বিনা বাক্যব্যয়েই তাহার অনুসরণ করিল।

ভবানীপুরের এক বিরলবাস পল্লীতে তিনতলা সুদৃশ্য একটি বাড়ী। দুতলার প্রায় সমস্তটা জুড়িয়াই মাঝারি-গোছের একটা হল। প্রথমদৃষ্টিতে গৃহসজ্জা অজয়ের কিছুই প্রায় চোখে পড়িল না, তীব্র বিদ্যুতের আলো সব-কিছুতে যেন আগুন ধরাইতেছে। অগ্নিশিখারই মত চঞ্চল প্রদীপ্ত রূপজ্যোতির কয়েকটি শিখাকে সে অপরিস্ফুট কিন্তু নিদারুণভাবে তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে অনুভব করিল মাত্র।

বিমান তাহাকে উপরে পৌছাইয়া দিয়াই কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল,সম্মুখে যে শূন্য আসন পাইল তাহাতেই বসিয়া-পড়িয়া অজয় ভাবিতে লাগিল,নীচে হইতে পলাইতে পারিলেই ছিল ভাল। কোনও দিকে ভাল করিয়া না তাকাইয়াই কেমন অকারণেই তাহার মনে হইতে লাগিল, অত্যন্ত অচিন্তিত উপায়ে আজ এইখানে তাহার প্রবাস-প্রিয়ার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়া যাইবে। এই জ্যোতিঃ-প্লাবিত উৎসবক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপিণী সেই জ্যোতির্ম্ময়ী অদূরেই কোথায় যেন রহিয়াছে, অজয়কে সে দেখিতেছে, কৌতুক অনুভব করিতেছে। হাসিলে তাহাকে কেমন দেখায় অজয় জানে না, অন্য-সকলের মত আত্মবিস্মৃত হইয়া সে হাসিতেছে অজয় তাহা ভাবিতে পারে না, তবু অজয়ের মনে হইল হাসির আবেগে তাহার সুকুমার অধর-প্রান্ত কাঁপিতেছে। অপরিচিতা নারীদের সান্নিধ্যে নিজেকে বিপন্ন বোধ করা অজয়ের চিরকালের স্বভাব, কিন্তু আজ সে যথারীতি অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল। জোর করিয়া মনটাকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে আগ্রহের অত্যন্ত অভাব সত্ত্বেও চতুর্দ্দিক্‌টাকে সে দেখিয়া লইতে লাগিল।

ঘরের মেঝেতে কার্পেটের উপর ধবধবে শাদা চাদর পাতিয়া মস্ত ফরাস তৈয়ারী হইয়াছে। ফরাসের উপর ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র। একটি যুবক এক কোণে পা ছড়াইয়া বসিয়া কোলের উপর একটা সেতার টানিয়া তাহাতে সুর বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। অজয়ের মনে হইল, বারেবারেই ঠিক সুরটিতে ঘা পড়িতেছে, কিন্তু অকারণেই যুবকের মন উঠিতেছে না। অনাবশ্যক খানিকটা নামাইয়া আবার সে সুর কষিয়া বাঁধিতেছে, কখনও বা অনাবশ্যক অনেকখানি চড়া করিয়া বাঁধিয়া তারপর তারের টান আস্তে আস্তে আল্‌গা করিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া বিরক্তিতে অজয়ের ঠোঁটের কাছটা শক্ত হইয়া উঠিল, এক ঝট্‌কায় সেদিক্ হইতে সে চোখ-দুইটাকে ফিরাইয়া লইল। ফরাসের মাঝামাঝি জায়গায় আর-একটি যুবক কোলের কাছে একটা পাখোয়াজ লইয়া অত্যন্ত হতাশ মুখে বসিয়া আছে। একদিকে বেশ অনেকখানি দূরে প্রায় দেয়াল-জোড়া একটা পিয়ানোর সম্মুখে একটি তরুণী একমনে কি একটা গানের বইয়ের পাতা উল্টাইতে ব্যস্ত,

অজয় যেখানে বসিয়াছে সেখান হইতে তাহার মুখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বিমানের সঙ্গে সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে যন্ত্রসঙ্গীতের অস্ফুট গুঞ্জন শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা থামিয়া গিয়াছে, মৃদু কথার গুঞ্জন উঠিতেছে।

যাহারা কথা বলিতেছে তাহারা মোটামুটি দুই দলে বিভক্ত হইয়া বসিয়াছে। ফরাস ঘিরিয়া তিন দিকের দেয়ালের গা ঘেঁষিয়া কুড়ি-পঁচিশটি বেতের তৈয়ারী আসন, শুভ্র লেসের আস্তরণে ঢাকা। এক কোণে এক-খণ্ড শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত টিপয়ের উপর বড় পিতলের বাটিতে একরাশ টকটকে লাল গোলাপ। প্রায় সব-ক'টি আসনই খালি। অজয় যেদিকে বসিয়াছে, সেদিকে একসারে আরও চারিজন যুবক এবং হলের একেবারে দূরতম প্রান্তে পিয়ানোর সব-চেয়ে কাছের আসনগুলি অধিকার করিয়া বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি মহিলা বসিয়া আছেন। কিন্তু বাহিরে গাড়ী-বারান্দার ছাতে আধ-অন্ধকারে যাহারা পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে তাহারা সংখ্যায় কম নয় এবং চকিতদৃষ্টিতে একবারমাত্র চাহিয়াই অজয় বুঝিতে পারিল, তাহারা সকলেই তরুণী। সেদিক্ হইতে মৃদু কিন্তু অজস্র হাসি দিয়া মণ্ডিত কোন্ গোপন রসালোচনার রেশ রহিয়া রহিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। হলের ভিতরের দিক্‌কার একটা ঘর হইতে মাঝে মাঝে সুভদ্রের উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে আসিতেছে, বুঝা যাইতেছে সেখানে যুবকদের ভিড়।

অজয়ের মনে পড়িল, কলিকাতায় আসিয়া অবধি এই স্থানটির কথা সুভদ্রের কাছে কয়েকবারই সে শুনিয়াছে। সমাজ-স্রোতকে সুস্থগতিতে প্রবাহমান্ রাখিতে হইলে স্ত্রীপুরুষের অবাধ কিন্তু বিধিবিহিত মিলনের ধারায় প্রতিপদে তাহার পরিপুষ্টি থাকা আবশ্যক, তর্কের ক্ষেত্রে চিরকালই অজয় তাহা স্বীকার করিত; কিন্তু সুভদ্রের আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও তাহার সঙ্গে তাহার এই নব-প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটিতে আসিতে কিছুতেই সে রাজি হয় নাই। দেনা-পাওনার হিসাবে গোল বাধিয়াছে। এই স্থানটিতে মনের খোরাক নিজে অত্যন্ত বেশী পাইবে আশা করিতেছিল বলিয়াই প্রতিদানে বেশী-কিছু যে দিতে পারিবে না এই সঙ্কোচ তাহার বড় হইয়াছে। কিন্তু এই নাকি স্ত্রীপুরুষের বিধিবিহিত মিলনের নমুনা? হরি, হরি! অজয়ের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতেও সুভদ্রের এত আগ্রহান্বিত সমাজসৃষ্টিপ্রয়াসের নিষ্ফলতা অত্যন্ত হাস্যকর কিন্তু করুণ হইয়া ধরা পড়িল।

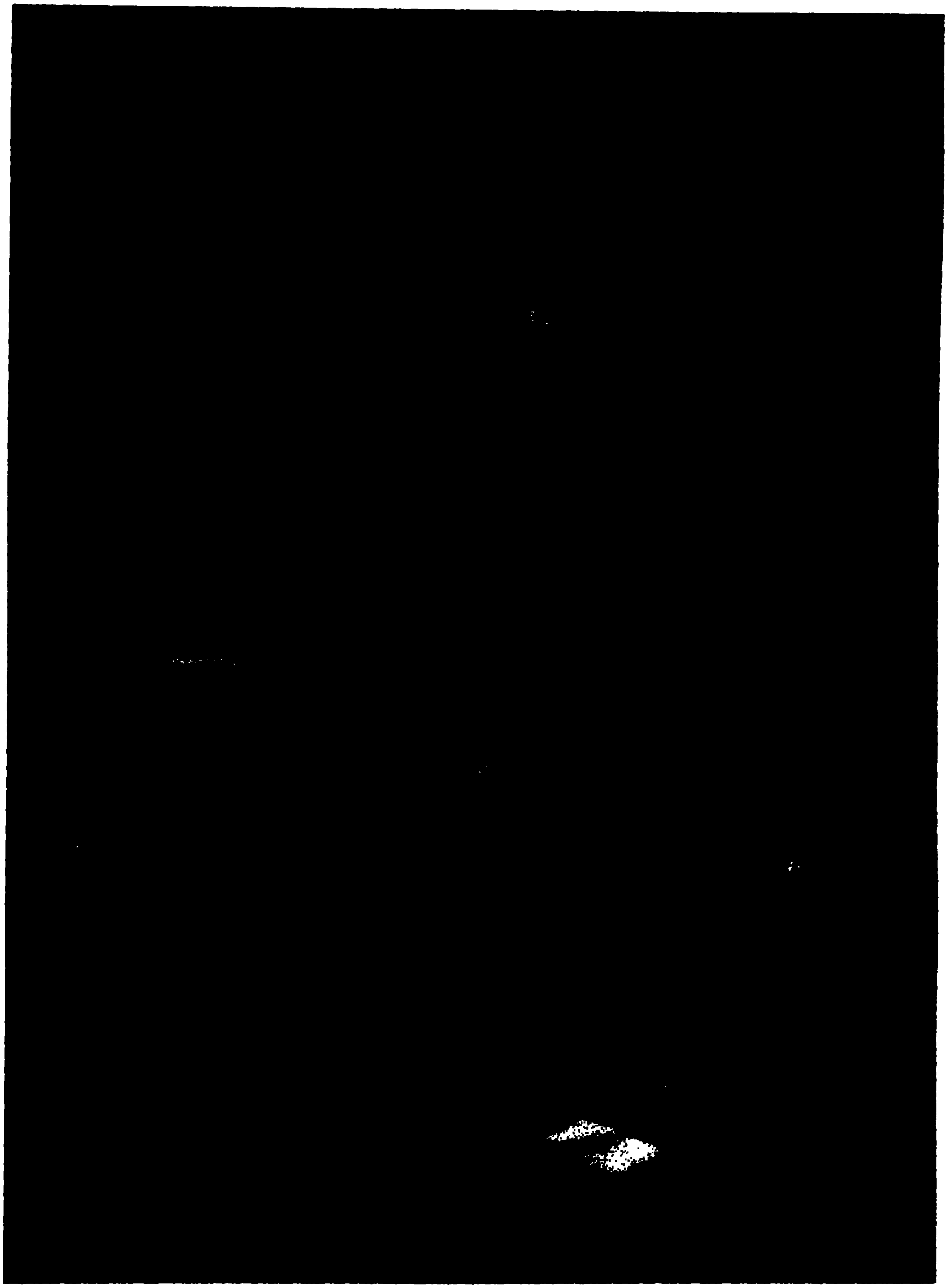
একটি অপরিচিত যুবক ভিতরের দিক হইতে আসিয়া তাহার পাশের আসনটি অধিকার করিয়া বসিয়া-পড়িল, কহিল, "বিমানবাবু আপনাকে পৌঁছে দিয়েই স'রে পড়েছেন বুঝি? ওঁর ঐরকম স্বভাব। বাইরে গাড়ী-বারান্দার ছাতে বেড়াচ্ছেন বোধ হয়, ডেকে দেব?"

ভাল করিয়া তাহার দিকে না চাহিয়াই অজয় কহিল, "থাক্ দরকার নেই।"

যুবক কহিল, "আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, যদিও আমি আপনাকে খুব ভাল ক'রেই জানি। আমার নাম রমাপ্রসাদ ঘোষ। আমাদের এই ক্লাবটা হয়ে এই একটা লাভ হ'ল দেখুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল, যা আর কোনও রকমে হবার বোধ হয় কোনও সম্ভাবনা ছিল না।"

অজয়ের মনটা একেবারেই ভিজিয়া গেল, চেয়ারটাকে অল্প একটু টানিয়া রমাপ্রসাদের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, "ক্লাবগুলোর এই একটা মস্ত সুবিধা আছে বটে। কিন্তু আপনাকে এর আগে কোথায় দেখেছি বলুন ত?"

রমাপ্রসাদ কহিল, "কোথাও দেখেছেন কিনা বলতে পারব না, দেখলেও লক্ষ্য করেননি নিশ্চয়ই, আপনাকে দু-একবার আমি দেখেছি। তাছাড়া কাগজে আপনার লেখা পেলেই আমি পড়ি। আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ে আপনার কতগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ গত বৎসরের যোড়শীতে বেরিয়েছিল, সেগুলি যে আমার কি ভাল লেগেছিল তা আর কি বলব! কি নাম যেন ছিল প্রবন্ধ-গুলোর—'আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতার পূর্ব্বাভিমুখীনতা' না? কোলে দ্রবিড় আর খ্যাদা তিব্বতী-বর্ম্মা খিচুড়ি পাকিয়ে বাঙালী জা'ত তৈরি হয়েছে, ছেলেবেলা থেকে এই ত কেবল শুনে আসছি, কিন্তু ভারতের বহুপ্রাচীন আর্য্যসভ্যতার আমরা বাঙালীরাই যে সত্যিকারের উত্তরাধিকারী



সন্ধ্যা

শ্রী [illegible]

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

একথা জোরের সঙ্গে আপনিই বোধ হয় প্রথম বলেছেন। ভারতের পশ্চিম-সীমান্তে সিন্ধুতীরে যে-সভ্যতার প্রথম সূত্রপাত তারই কেন্দ্র ক্রমাগত পূর্বদিকে স'রে স'রে ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, বারাণসী, পাটলিপুত্র হয়ে আজকের দিনের কলকাতায় এসে শেষ পরিণতি পেয়েছে, আপনার লেখা পড়লে একথাটাকে কেবল থিওরী ব'লে একটুও আর মনে হয় না। অন্ততঃ বাঙালী জাতের আত্ম-সম্মান-বোধ একটু বাড়াবার জন্যেও এ-ধরণের থিওরীর প্রয়োজন ছিল।"

অজয় কহিল, "সম্প্রতি থিওরীটাকে অল্প একটু বদলেছি। আর্য্যাবর্ত্তে দুটি একেবারে আলাদা সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল এই বিশ্বাস এখন আমার হয়েছে। সিন্ধু-তীরের বহুপ্রাচীন যে সভ্যতা, সিন্ধুস্রোতেরই মত তার গতি ছিল দক্ষিণে, এখনকার দক্ষিণ-দেশীয়েরা সেই সভ্যতাকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। আর্য্যসভ্যতা যেটাকে আমরা বলি সেটা গঙ্গাতীরের জিনিস, তার সমস্ত চেহারাটাই সিন্ধুতীরের সভ্যতার থেকে আলাদা। এই গাঙ্গেয় সভ্যতাই ছিল গঙ্গাস্রোতের মত পূর্ব্বাভিমুখী।"

রমাপ্রসাদ কহিল, "আমরা ক্লাব থেকে একটা কাগজ বের করব কিছুদিন থেকে ভাবছি। কাগজটা যদি হয়, আপনার সব নতুন লেখা আমরা ছাপতে পারব, একটা সত্যিকারের বড় কাজ হবে।"

পাশের ঘর হইতে যুবকদলকে প্রায় তাড়াইয়া লইয়া এই সময় সুভদ্র আসিয়া ঢুকিল, টানাটানি করিয়া সকলকে বসাইয়া দিতে দিতে কহিল, "না, প্রকাশ, কথা শোন।... নৃপেন, তোমার অন্ততঃ একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ব'লে আমি ভাবতাম।...তোমরা সবাই মিলে রোজ যদি এই রকম কর তাহলে ক্লাব-টাব করার মানে হয় না কিছু। এদিক্‌টাও ত দেখছি একেবারে খালি। বৌদি, তোমার অন্ত বন্ধুরা সব গেলেন কোথায়?"

ঘরোয়া ধরণে ঢাকাই শাড়ী পরা কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া গৌরবর্ণা একটি মহিলা চাবি-বাঁধা আঁচলটা কাঁধে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "ধ'রে রাখা কি যায়? ঘরের মধ্যে গরম হচ্ছে ব'লে বীণা যেই উঠে বাইরে গেল, এক এক ক'রে সব-ক'জন সেইখানেই গিয়ে জুটেছে। চল, দেখি, পাক্‌ড়ে আনা যায় কিনা। বীণাকে ধরে আনতে পারলেই অবিশ্যি হবে।"

অজয়ের কানের কাছে মুখ লইয়া রমাপ্রসাদ কহিল, "ইনি হচ্ছেন সুলতা দেবী। এঁর স্বামীকে আপনি চেনেন বোধ হয়, ডাক্তার প্রিয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ডাবলিনের এল্‌এল্‌-ডি, অক্সফর্ডের বি-এ, বি-সি-এল্‌, সুভদ্রবাবুর কিরকম দূর সম্পর্কের ভাই। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই আসলে অবিশ্যি বড়।...বাড়ীটা এঁদেরই তা জানেন বোধ হয়। ক্লাবের ঘরের জন্যে ভাড়া একটা ঠিক করা আছে। প্রায় এক বছর হ'তে চল্‌ল, কিছুই আমরা এখনও দিয়ে উঠতে পারিনি যদিও।...এত বড় একটা কাজে মাসে ষাটটা টাকা বাড়ীভাড়াও যদি না জোটে তবে তার চেয়ে বড় কলঙ্ক দেশের ও সমাজের আর কি হ'তে পারে? কাগজটা হ'লে প্রোপাগাণ্ডা ক'রে দেখা যায় কিছু কাজ হয় কি না।"

বাহির হইতে পালা করিয়া সুলতার এবং সুভদ্রের কণ্ঠের অনেক কাকুতি-মিনতি কানে আসিতে লাগিল।

রমাপ্রসাদ কহিল, "আমি ক্লাবের সেক্রেটারী তা জানেন না নিশ্চয়ই। অবিশ্যি এঁরা থাকাতে আমার কাজের ভার অনেকখানিই হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে। এঁদের এতই বেশী সৌজন্য যে বাড়ীটা যে তাঁদেরই ক্লাবে এসেও সেটা তাঁরা ভুলতে পারেন না। বিশেষ ক'রে সুলতা দেবী। চেনা-অচেনা সমস্ত সভ্য-সভ্যাদের অতিথি-অভ্যাগত হিসেবেই তিনি সম্বর্দ্ধনা ক'রে থাকেন।...ঐ আস্‌ছেন বোধ হয় আপনারই সন্ধানে। আচ্ছা বসুন, আমি পালাই। ক্লাবের গত মাসের হিসেবটা আজ একটু দেখতে হবে।"

ততক্ষণ যুবকের দল ফরাস অধিকার করিয়া প্রায় উপাসনার ভঙ্গীতে গোল হইয়া বসিয়া গিয়াছে। গাড়ী-বারান্দা হইতে তরুণীরা আসিয়া পিয়ানোর দিক্‌কার চেয়ারগুলিতে বসিল, যাহারা বাকী রহিল তাহারা পিয়ানোর উপর ঝুঁকিয়া পিয়ানোবাদিনীর দুই পাশে এবং পিছনে ঘেঁষা-ঘেঁষি করিয়া সার দিয়া দাঁড়াইল। সুভদ্র করজোড়ে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়াও তাহাদের সেখান হইতে নড়াইতে পারিল না। তখন অগত্যা গোটা-

তিনচার সেতারে সঙ্গীতের মৃদু তরঙ্গ উঠিল, পাখোয়াজে অতি মৃদু করাঙ্গুলির ঘা পড়িল। ক্লাবের কাজ সুরু হইল।

দেখা গেল, ক্লাবের সভ্যেরা সভ্যাদের এবং সভ্যারা সভ্যদের অস্তিত্বকে কায়মনোবাক্যে অস্বীকার করিতেই ব্যস্ত। মেয়েদের সারে ছেলেদের আসনগুলির দিকে সবশেষে যাহার স্থান হইয়াছে সে নিজের চেয়ারটিকে বেশ অনেকখানি ঘুরাইয়া লইয়া সেদিকে প্রায় পিছন ফিরিয়া বসিয়াছে। মাঝে পাঁচ-ছয়টি শূন্য আসনের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের দিকে সব-শেষে যে বসিয়াছে, নত-মস্তকে নিজের নখ খুঁটিতেই তাহার মন। এক, দেখা গেল, বিমানের ভয়ডর বলিয়া কিছু নাই। মেয়েদের এলাকাতেই সারাক্ষণ বেশ সপ্রতিভভাবে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ তাহার সঙ্গে হাসিয়া দু-একটা কথা কহিতেছে, কেহবা মাথার ইঙ্গিতে হাঁ-না করিয়া সারিতেছে, কিন্তু সে কিছুতেই দমিতেছে না।

সুভদ্রকে বাহিরে পাইয়াই সুলতা তাহার নিকট হইতে অজয়ের পরিচয় লইয়াছিলেন। তাহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিয়া তাহার সঙ্গে শিষ্টালাপের উদ্দেশ্যেই এই সময়ে রমাপ্রসাদের পরিত্যক্ত আসনটিতে ধীরে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু অজয় অকস্মাৎ তাহার অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি অপরিচিত তরুণের সঙ্গে কোন্ গভীর তথ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল, একবারও তাহার দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া সুলতার দিকে চাহিল না।

অপর দিক্ হইতে সুলতার একটি সখী অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে বন্ধুর এই অপ্রস্তুতি লক্ষ্য করিতেছিল। সুলতা আর বসিবেন, না পরিচয় করিয়া দিবার জন্য সুভদ্রকে জুটাইয়া লইয়া আসিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় মধুর কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া সে ডাকিল, "সুলতা-দি!" তারপর চকিতে হাসিয়া মুখ ফিরাইল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার সেই হাসির ছোঁয়াচটি নিঃশব্দে, অতি সন্তর্পণে, ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, অজয় যদিও মুখ তুলিল না তবু ইহা তাহার চোখ এড়াইল না। অত্যন্ত অটল গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে অত্যন্ত চঞ্চল লালিমা মিশিয়া যখন তাহার মুখখানি অপরূপ দেখিতে হইয়া উঠিয়াছে তখন সুলতা কহিলেন, "অজয়বাবু, নিজের ওপর একটুও দরদ যদি থাকে ত এইবেলা ফিরুন আর কথা বলুন।"

অজয় ফিরিল কিন্তু নিজের প্রতি প্রীতির আতিশয্যটা স্বীকার করিল না। অতি দ্রুত অভিবাদন সারিয়া লইয়া অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তির মত সহাস্যে কহিল, "আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন।"

সুলতাও হাসিয়াই কহিলেন, "আমি না দেখালেও আপনি নিজেই দেখ্‌তে পেতেন।"

"ফাঁড়াটা কি কাটিয়েছি?"

"কি ক'রে বল্‌ব? আপনি এর পর কিরকম ব্যবহার কর্‌বেন তার ওপর সেটা নির্ভর কর্‌ছে।"

"কোন্‌দিক্ থেকে বিপৎপাত আশঙ্কা কর্‌ব?"

"চারদিক্ থেকেই, তবে বিপদের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তিটিকে যদি প্রত্যক্ষ কর্‌তে চান ত ঐ দেখুন।" বলিয়া তিনি অজয়ের দিক্ হইতে মুখ সরাইয়া লইয়া ডাকিলেন, "বীণা!"

কোনও ঝঙ্কার জাগিল না। করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া বীণাও পরম অভিনিবেশ সহকারে তাহার এক পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে কোন্ গভীর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। সুলতা অজয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখছেন?"

সুলতা তাহাকে যাহা দেখাইতে চাহিলেন অজয় তখন ঠিক তাহাই দেখিতেছিল না, সে বীণাকেই দেখিতেছিল। সুলতার আহ্বানে বীণা যে মুখ ফিরাইল না ইহাতে সে-পক্ষে তাহার সুবিধাই হইল। সে দেখিল, প্রগল্‌ভ হাসির দীপ্তিমণ্ডিত কপট গাম্ভীর্য্য-ভরা কমনীয় একখানি মুখ, হীরকের মত উজ্জ্বল চোখ-দুইটির দৃষ্টিতে, দেহভঙ্গিতে, কোথাও কোন আড়ষ্টতা নাই। দেহবর্ণ নবোদ্গত আম্র-পল্লবের মত হাল্‌কা লালের আভা জড়ানো স্বচ্ছ-শ্যামল, সেই স্বচ্ছতা ভেদ করিয়া শিরা-উপশিরায় রক্তগতির স্বচ্ছন্দ আনাগোনা চোখে পড়ে যেন। দেহ-সৌষ্ঠব, মুখের গড়ন অসাধারণ কিছুই নহে, হয়ত মূর্ত্তি করিয়া তাহাকে গড়া চলে না কিন্তু তুলির রঙে তাহাকে আঁকা চলে। হঠাৎ দেখিলে এমনও মনে হইতে পারে, সৌন্দর্য্য যেন কতকটা দূর হইতেই তাহাকে

স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় রূপের ডালি বিধাতা তাহাকে উজাড় করিয়াই দিতে চাহিয়াছিলেন, অনাবশ্যক বোধে নিজেই সে লয় নাই। সৌন্দর্য্যকে প্রতিযুগের মানুষ নিজ রুচি অনুযায়ী মাপকাঠির সহযোগে মাপিয়াছে, নিয়ম দিয়া বাঁধিয়াছে, কাব্যে-সঙ্গীতে-শিল্পে তাহাকে প্রীতির সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু এই তরুণীর মধ্যে তাহার আসল সৌন্দর্য্য যেটুকু, সেটুকুকে কোনও পরিচিত মাপকাঠিতে মাপা যায় না। অজয়ের মনে হইল, ইহা যেন সেইহেতুই অপরিমেয়, ইহা যেন সমস্ত নিয়ম বহির্ভূত একটি অপার্থিব বস্তু, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ছাপাইয়া অতিক্রম করিয়া ইহা যেন কেবলমাত্র একটি অশরীরী লাবণ্য। এই লাবণ্য কোন্ গোপন উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না, সেই রহস্যই ইহার মায়া।

সুলতার দিকে ফিরিয়া বলিল, "বিপজ্জনক কিছু দেখলাম না।"

সুলতা কহিলেন, "সেই ত আসল বিপদ্। পৃথিবীর সেরা বিপদ্গুলোর নিয়মই হচ্ছে, তাদের চেহারা দেখে চট্ ক'রে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু আমার পরামর্শ যদি শোনেন, একটু সাবধান হবেন। আজ পর্য্যন্ত এমন ত একজনকেও দেখলাম না, যে বীণার পরিচয় একটুও পেয়েছে অথচ তার ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপে না।"

বীণা যে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে তাহার লক্ষণ দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না, তদুপরি সে যেখানে বসিয়াছিল ততদূর হইতে সেতারের স্বরালাপ অতিক্রম করিয়া অজয়দের একটিও কথা তাহার শুনিতে পাইবার কথা নয়, তবু অকস্মাৎ দৃঢ় হইয়া ঘুরিয়া বসিয়া দুষ্টামীভরা কণ্ঠ কঠোর করিয়া সে ডাকিল, "সু-ল-তা-দি!"

সুলতা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কি গো, কি?"

বীণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অত্যন্ত আহত অভিযোগের সুরে কহিল, "কি ছেলেমানুষী সুরু করেছ, থামো।"

সুলতা অজয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখেছেন ওর রকম? ওর ধারণা বিশ্বসুদ্ধ লোকের ওর কথা ছাড়া আর কথা নেই।"

অজয় হাসিয়া কহিল, "বিশ্বসুদ্ধর কথা জানি না, কিন্তু আমাদের বেলায় ত অন্ততঃ দেখতে পাচ্ছি তিনি ভুল করেননি।"

সুলতা বলিলেন, "হ্যাঁ, ভুল কর্‌বার ও মেয়ে কিনা, অর্থাৎ যেখানে ওর নিজেকে নিয়ে কথা। কেবল আমাদের বেলায় ব'লে নয়, ও জানে, ও যেখানে উপস্থিত থাকে সেখানে প্রায়ই বিশ্বসুদ্ধর ওর কথা ছাড়া আর কথা থাকে না, আর ঠিকই জানে।"

বাহিরে কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি হাস্যময়ী এই মেয়েটির এই নিদারুণ অহঙ্কার অজয়ের অহঙ্কারী মনকে একটি আন্তরিক পরিচয় লইয়া স্পর্শ করিল।

হঠাৎ শুনিল পিয়ানোর পাশে একদল শ্রোত্রীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিমান ইউরোপীয় শিল্পকলার উপর ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছে। তাহার বাঁ-কাঁধে একটা বেহালা, হাতের ছড়টাকে তরবারির ধরণে শূন্যে সঞ্চালন করিতে করিতে, ভারতীয় শিল্পকলাকে গতানুগতিকতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে এদেশেও যে তদনুরূপ বিপ্লবের কত প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে তাহার অভিমত বীরদর্পে সে ব্যক্ত করিতেছে। ছড়টা তাহার মাথার উপরকার আলোর শেডটাকে বারম্বার প্রায় ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাইতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া, কখন্ আলোটা না-জানি ভাঙিয়া পড়ে ভাবিয়া অজয় আবার অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল।

বীণা এবার সত্যকার অভিনিবেশের সঙ্গেই বিমানের বক্তৃতা শুনিতেছিল, কহিল, "বিমানবাবু আর্টিষ্ট্ মানুষ, বেশ আর্টিষ্টিক ধরণের বিপ্লব বাধাবার চেষ্টায় আছেন। তাঁর প্রথম রেক্রুটের দল নির্ব্বাচন দেখলেই সেটা বোঝা যায়। তোরা সব কটাক্ষের বিদ্যুৎ, হাসির ছুরি, অধরাগের আগুন, এই-সমস্ত দিয়ে বিধিমতে লড়াই করবি, বিমানবাবু পেছনেই থাক্‌বেন ভয় করবি না।"

বিমান ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিল, বীণার নিকট হইতে এধরণের আপ্যায়নে সে অভ্যস্ত ছিল, কহিল, "আমি কেন, আমরা সবাই না-হয় পেছনেই থাকব। একা আপনি যদি সামনে থাকেন তাহলে আপনার বাক্যবাণই লড়াই জেতবার পক্ষে যথেষ্ট হবে।"

বীণা কহিল, "সে ত সব আপনাকে শাসনে রাখতেই খরচ হয়ে যাবে।"

বিমানকে শাসনে রাখার কাজটা সুভদ্রই আসলে সব-চেয়ে বেশী করিয়া করিত। বিমানকে সে-ই যদিও ক্লাবে আনিয়াছিল, কিন্তু মনে মনে তাহার সম্বন্ধে সর্ব্বদাই একটা ভয় পোষণ করিয়া চলিত, এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তর্ক করিয়া বকিয়া তাহাকে সংযত করিয়া রাখিত। বলিল, "আর্টকে নিজের মনের মত ক'রে বাঁচাবার জন্যে দেশব্যাপী একটা প্রলয় বাধিয়ে তুলতে চাও, এটা কি তোমার একটু বেহিসাবী ব্যবস্থা নয়?"

বিমান রুখিয়া উঠিয়া উত্তর দিল, আর্ট ঠিক ততবড়ই জিনিস এবং তাহার সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থাই বেহিসাবী ব্যবস্থা নয়। মেয়েদের অস্তিত্বকে ভুলিয়া গিয়া সহজ বোধ করিবার একটা উপলক্ষ্য মিলিবা-মাত্র ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ বিমানের দিকে, কেহ কেহ বা সুভদ্রের দিকে যোগ দিল, ক্রমে তুমুল তর্ক বাধিয়া উঠিল, বাণে বাণে আকাশ ছাইয়া গেল, এত অন্ধকার জমা হইল, যে, কোনও কথার আর কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

অজয় এই অবকাশে সুলতার নিকট হইতে ক্লাবটির নানা পরিচয় সংগ্রহ করিতে লাগিল। দেখিল, প্রচুর মমতা থাকা সত্ত্বেও ইনি ক্লাবটিকে এখন পর্য্যন্ত সুভদ্রের খেয়াল-প্রসূত একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার বলিয়াই মনে করেন। সমাজে ইহাকে লইয়া ইতিমধ্যেই যে কথা উঠিয়াছে এবং কোনও কোনও অভিভাবক মেয়েদের এখানে আসা বারণ করিয়া দিয়াছেন ইহা জানাইয়া তিনি ইহার দীর্ঘায়ু বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। সেইসঙ্গে ইহাও বলিলেন, যে, শিক্ষিত-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, যখন অধিকাংশের ঘটকালী বিবাহে রুচি বর্ত্তমান নাই অথচ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্থল ভিন্ন ছেলেমেয়েদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী পতিপত্নী-নির্ব্বাচনের সুযোগ করিয়া দিতেও অভিভাবকদের বাধিতেছে, তখন অন্ততঃ বিবাহার্থী স্ত্রীপুরুষদের জন্যও এইজাতীয় একটি মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করার কথা ভাবিবার প্রয়োজন আছে। ঘটকালীকেও মানিব না অথচ যাহাকে চিরজীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের সঙ্গী করিব তাহাকে ভাল করিয়া যাচাইয়া দেখিয়াও লইব না, ইহার ফল সমাজের পক্ষে শুভ হইতেছে না। এরূপ অবস্থা হইতে ঘটকালীও নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ।

অজয় কহিল, "আমার ধারণা ছিল, আপনাদের সমাজে—"

সুলতা কহিলেন, "ছেলেমেয়েদের মেলবার পথে বাধা নেই, এই ত? পর্দ্দার বাধাটাই কি কেবল বাধা? এই সেদিন আমাদের এক বন্ধু দুঃখ ক'রে বলছিলেন, যে, কোনও ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের আলাপ করিয়ে দেবার কল্পনাই তাঁকে এখন ছেড়ে দিতে হয়েছে। বাড়ীতে যখনই কাউকে ডাকেন, সমাজের দশজন নির্ব্বিচারে ধ'রে নেয় মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে, শেষ অবধি বিয়ে যখন হয় না তখন তা নিয়ে এমন-সমস্ত কথা ওঠে যা সেই মেয়ে বা ছেলে কারও পক্ষেই প্রীতিকর নয়।"

অজয় কহিল, "সমাজে নতুন ধারার প্রবর্ত্তন যাঁরা করবেন তাঁদের উচিত নয় অন্যেরা কি বলছে বা ভাবছে তা নিয়ে বেশী বিচলিত হওয়া।"

সুলতা একটু হাসিলেন, বলিলেন, "সে-অবস্থায় আপনি এখনও পড়েননি তা বুঝতেই পারছি। বিপদ্ কি কেবল দশজনকে নিয়েই? একটি মেয়ের কথা আপনাকে বলতে পারি, কোনও একটি ছেলেকে নানা-কারণে তার একটু ভাল লেগেছিল। তার দোষের মধ্যে তার দিদিকে ব'লে ছেলেটিকে বাড়ীতে ডেকে সে পরিচয় করবার চেষ্টা করেছিল। বাস্, আর যাবে কোথায়? সেইটুকুকেই তার প্রতি মেয়েটির গভীর পূর্ব্বরাগের অতি নিশ্চিত লক্ষণ ধ'রে নিয়ে ছেলেটি তারপর তার সঙ্গে এমন ব্যবহার সুরু করল যা সেই অবস্থায় যে-কোনও ভদ্র এবং প্রকৃতিস্থ মেয়ের পক্ষেই একেবারে অসহ্য। যে-জিনিষটি হয়ত যথাকালে অনুরাগ পর্য্যন্ত পৌঁছতেও পারত, নিতান্ত বিশ্রী একটা রাগারাগির ধরণের ব্যাপারে সেটা সম্প্রতি শেষ হয়েছে, শুনলাম।"

অজয় কহিল, "কিন্তু সুভদ্র এইসব ভেবেই যদি ক্লাব ক'রে থাকে তবে এটাকে তার খেয়াল আপনি কেন বলছেন?"

সুলতা কহিলেন, "হ্যাঁ, সুভদ্রবাবু ত এ-সব কথা

কতই ভেবেছেন। এগুলো ওঁর খেয়ালকে একটা ভদ্রগোছের চেহারা দেবার জন্তে আমরা এখন বানিয়ে বানিয়ে ভাবছি। ওঁর ত ধারণা ছেলেমেয়েদের মিশতে পারাটাই আসল কথা, বিবাহটা গৌণ। উনি বলেন, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যে লজ্জা না ক'রে পরস্পরের সঙ্গে মিশতে পারে না সেইটেই তাদের আসল লজ্জা, আর তার কারণটা তাঁর মতে এই যে পরস্পরের সঙ্গে চিন্তায় ও ব্যবহারে সহজ স্বাভাবিকতার সীমা রক্ষা ক'রে চল্‌তে তারা অভ্যস্ত নয়। আর আমাদের সামাজিক অস্বাস্থ্য কেবল নয়, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের শারীরিক অস্বাস্থ্যের মূলেও নাকি সেই জিনিসটাই সব-চেয়ে বেশী আছে।"

অজয় কহিল, "শুন্‌তে খুবই ভালো শোনাচ্ছে, কিন্তু সুভদ্র ত তাঁর মতামত ব'লেই খালাস, তার ঝুঁকিটা সাম্‌লাতে হচ্ছে বুঝি একলা আপনাকে?"

সুলতা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "না, না, সে আবার কি কথা? এখানে যাদের দেখ্‌ছেন, তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যাকে আমাদের বাড়ীতে অত্যন্ত খুশীর সঙ্গে আমরা ডাক্‌তে না পারি। সুভদ্রবাবুর ক্লাবের কথা শুনে এরা সবাই কেমন উৎসুক হয়ে উঠল তা ত আপনি দেখেন নি? বেশ বোঝা গেল, এ জিনিষের একটা সত্যিকারের অভাবই এদের জীবনে ছিল। ওরা সবাই যখন আগ্রহ ক'রে আস্‌তে চাইল তখন তাদের কি ব'লে আমি 'না' বল্‌তে পারি? আর তা বল্‌বই বা কেন? সুভদ্রবাবুর ক্লাবই এটা যদি কেবল হ'ত তাহলে ওরা অনেকেই হয়ত আস্‌ত না, সেইসঙ্গে এটা আমার বাড়ী ব'লেই আস্‌ছে। এ ত আমার পক্ষে খুব আনন্দেরই কথা।"

ফরাসী-বিপ্লবকে উপলক্ষ্য করিয়া সুভদ্রদের যে-তর্ক সুরু হইয়াছিল তাহা তখন এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে আর-একটু হইলে সেইখানেই ছোটখাট একটা বিপ্লব বাধিয়া যায়। অজয় কহিল, "সুভদ্রের আসল উদ্দেশ্য যাই হোক, স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মিলনের চেয়ে পুরুষে-পুরুষে অসামাজিক বিরোধটাই অন্ততঃ আজকের প্রোগ্রামে বড় দেখছি।"

সুলতা একটু হাসিলেন, কহিলেন, "এ বিষয়ে আপনার বন্ধুর অভিমতটা বুঝি আপনি জানেন না? তিনি বলেন, 'তোমাদের জাতের কেউ শুন্‌ছে না জান্‌লে বৌদি, তর্ক ক'রে আমাদের সুখই হয় না।' ওঁর বিবেচনায় এ দেশে ছেলেদের কোনও শক্তি যে যথেষ্ট স্ফূর্তি পায় না সে কেবল আমরা মেয়েরা তাদের চারপাশ ঘিরে ব'সে তাদের বাহবা দিতে উপস্থিত থাকি না ব'লে।"

অজয় কহিল, "সেটা হয়ত সত্যি, কিন্তু সুভদ্রের তর্কশক্তিটি স্ফূর্তি না পেলে পৃথিবীর তাতে খুব বেশী ক্ষতি হ'ত ব'লে কি তার বিশ্বাস?"

সুলতা কহিলেন, "ওঁর মতে মানুষের মধ্যে তার শক্তির রূপ সব মিলিয়ে একটাই। তার কাছ থেকে সত্যিকারের কাজ আদায় কর্‌তে হ'লে সেইসঙ্গে তার খুশী মত অনেকখানি বাজে কাজ কর্‌বার সুবিধা তাকে দিতে হয়।"

অজয় কহিল, "সুভদ্র তাহলে বল্‌তে চান, মানুষের মধ্যে তার খুশীটাই একটা খুব বড় জিনিষ?"

একটু থামিয়া একেবারে অজয়ের চোখে চোখে চাহিয়া সুলতা বলিলেন, "আপনি কি তা মনে করেন না?"

অজয় মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। খুশী বলিয়া কোনও জিনিসকে কোথায়ও আমল না দিয়াই ত জীবনের এতখানি পথ সে চলিয়া আসিয়াছে, কত সুখ হইতে ইচ্ছা করিয়া নিজেকে নিজে সে বঞ্চিত করিয়াছে। এ কি নিদারুণ কঠোর অহঙ্কার স্বভাবে দিয়া বিধাতা তাহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, নিজেকে ভালবাসে বলিয়াই নিজেকে উপবাসী রাখিয়া দেওয়া ছাড়া তাহার উপায় থাকে না। পাছে কোথাও তাহার পাওয়ার দাবিকে কেহ অগ্রাহ্য করে, চাহিতে গিয়া কোথাও পাছে প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়, এই ভয়ে নিজের ন্যায্য পাওনাকেও চিরকাল সে ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসিয়াছে। আজ অভ্যাস তাহাকে এমনই করিয়া গড়িয়াছে, যে, যে-দান আপনি আসিয়া তাহার দ্বারে করাঘাত করে তাহাকেও আহ্বান করিয়া ভিতরে লইতে সে কুণ্ঠিত হয়। সে ত্যাগী, কোনও কিছুর জন্য তাহার অপেক্ষা নাই, নিজের এই

বিশিষ্টতাটিকে বহু অশ্রুজলের নিষেক দিয়া গোপনে সে লালন করে।

আজ চতুর্দ্দিকে আনন্দ যখন মনোহরণ রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে তখন সামান্য একটি কথার সূত্র ধরিয়াই তাহার বহুকালের এই অভ্যস্ত বৈরাগ্যে অতি গভীর সংশয়ের একটা দোলা লাগিল। এই ত একটু আগে নিজেরই মধ্যে নিজের আশ্রয় সে হারাইতে বসিয়াছিল, তাহার মধ্যে তাহার আশৈশবের পরিচিত সুন্দর যে-আমিটি পৃথিবীর সঙ্গে নানা মধুর সম্পর্কের বন্ধনে তাহার হৃদয়-মনকে বাঁধিয়া ছিল, বারম্বার পীড়িত হইয়া, বঞ্চিত হইয়া, উপবাসে ক্লিষ্ট হইয়াই কি সে আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছিল? যে-শূন্যতা, যে-অন্ধকারের সঙ্গে মহাভয়ের মধ্য দিয়া একটু আগে তাহার পরিচয় ঘটিয়াছে, সেইদিকে মুখ ফিরাইবার সাহস কি তাহার আছে? আর সেদিক্ হইতে কি সে পাইতে আশা করে? আজ এই যে সৌন্দর্য্য-লোকের ডাক আসিতেছে, শোভায়-সঙ্গীতে-সৌজন্যে জীবনের বিচিত্র মাধুর্য্য দিগন্তে জ্যোতির্ম্ময় মায়ালোক রচনা করিতেছে, সেইদিক্ লক্ষ্য করিয়াই কি সে চরিতার্থতার তীরে উত্তীর্ণ হইবে না? এখানে যতখানি পাওয়া সম্ভব এজীবনে তাহার বেশী কি আর সে পাইতে আশা করিতে পারে?

সুলতা কহিলেন, "অজয়বাবু, চলুন, আপনার পরিচয় ক'রে দিই।"

পরিচয় কাহার সঙ্গে তাহা বোঝা কিছুই কঠিন ছিল না, অজয়ের বুকের মধ্যটা দুলিয়া উঠিল। অন্য সময় হইলে সে কোনওপ্রকারে এড়াইত, কিন্তু আজ কোনও-কিছুকে বাহির হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরাইবে না ঠিক করিয়াছিল, তাহা ছাড়া সুলতার সৌজন্যে সত্যই সে মুগ্ধ হইয়াছিল, মুখ ফুটিয়া তাঁহাকে 'না' বলাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

জরীর পাড় বসানো শাদা গরদের জামার উপর জরীপাড় সাদা মান্দ্রাজী শাড়ী সেই-দেশীয় ধরণে পরিয়া বেতের চেয়ারে দেহ এলাইয়া বীণা বসিয়াছিল, অজয় আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার দেহের লাবণ্য-চুয়ানো দুইটি লোহিতাভ পাথরের দুল দুটি কানে অতি মৃদু দুলিতেছিল, সে যে কি পাথর অজয় তাহা জানে না। গলায় সরু সোনার সূতায় সেই পাথরেরই একটি দুলুনি, হাতে সেই পাথর বসানো দুগাছি মাত্র সোনার কঙ্কণ।

বীণার সম্বন্ধে ভয়ের ছোঁয়াচ অজয়কেও একটু লাগিয়াছিল, সুলতার পরিচয় দেওয়ার উত্তরে সে কিছুই বলিল না, শুধু নীরবে একটি নমস্কার করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। বীণা দুটি হাতকে কপালে ঠেকাইয়া নত হইয়া তাহাকে প্রতিনমস্কার করিল। সুলতা একটা কোন কাজের অজুহাতে অতি-সন্তর্পণে সেখান হইতে সরিয়া গেলেন। বীণা কহিল, "সুভদ্রবাবু বল্‌ছিলেন, আপনি একজন মেয়ে-বিদ্বেষী, আমাদের ক্লাবে আসতে কিছুতেই রাজী নন্। সেই থেকে আপনাকে ধ'রে নিয়ে আস্‌বার জন্যে রোজ তাঁকে জ্বালাচ্ছি।"

অজয়ের মাথার মধ্যেটায় সব কেমন ওলট-পালট হইয়া গেল, কোনওরকমে নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল, "ও তাহলে দুদিক্ দিয়েই আমার প্রতি অবিচার করেছে। প্রথমতঃ আমার এতদিন না-আসার কারণটা ঠিক ক'রে আপনাকে বলেনি, তারপর আমাকে ধ'রে নিয়ে যাবার পরোয়ানা যে আপনার কাছ থেকে পেয়েছে তা একবারও আমাকে বলেনি।"

বীণা কহিল, "বলেননি আমারই মান বাঁচাতে। পরোয়ানা পেলেই যে আপনি এসে হাজির হতেন আপনাকে ত একটুও সেরকম মনে হচ্ছে না।"

অজয় কহিল, "আমাকে দেখবা-মাত্রই আমার স্বভাবের অনেকখানি পরিচয় আপনি পেয়েছেন দেখছি।"

গলার সুর একটুখানি নামাইয়া বিদ্যুদুজ্জ্বল চঞ্চল চোখ-দুইটিতে হাসি ভরিয়া বীণা বলিল, "আমারও অনেকখানি পরিচয় আমাকে দেখবা-মাত্রই কি আপনি আজ পান্‌নি বল্‌তে চান?"

বীণার গলার সুরে, কথা বলার ভঙ্গিতে কি ছিল, অজয়ের ভয়ের ভাবটা অনেকখানিই হঠাৎ কাটিয়া গেল, কহিল, "আজ না পেয়ে থাকি, ক্রমে পাব আশা করি।"

বীণা কহিল, "আশা কর্‌বার দর্‌কার হবে না, আমার পরিচয় এম্‌নিতেই যথেষ্ট পাবেন।"

বীণা যেখানে বসিয়াছিল সেখানে আর বসিবার আসন খালি ছিল না। একপাল মেয়ের কৌতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে অজয়কে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আর বেশীক্ষণ গল্প করা চলে না দেখিয়া সেও উঠিয়া পড়িল। কহিল, "ভিতরে সত্যিই খুব গরম নয়? চলুন বাইরে গিয়ে একটু বেড়ানো যাক্‌।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত অজয় তাহার অনুসরণ করিল। ক্লাবসুদ্ধ মানুষ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে একথা একবার সে ভাবিলও না।

বাহিরে গাড়ী-বারান্দার ছাতে দুইজনে পাশাপাশি বেড়াইতে বেড়াইতে বহুক্ষণ কেহ কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না। নীরবতা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া অজয় অবশেষে ক্লাবেরই প্রসঙ্গ তুলিল। আজ এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝিয়াছিল, কোনও-না-কোনও রকমে এখানকার সব-কয়টি মানুষের সম্পর্কে এই মেয়েটি এই ক্লাবের একেবারে মর্ম্মস্থানটি অধিকার করিয়া আছে। এখন দেখিল, ক্লাবটিকে ক্লাব বলিয়া বীণা চিন্তাই করে নাই, সে কেবল মানুষ-ক'জনকে জানে এবং অত্যন্ত নিবিড় করিয়া এই মানুষ-ক'টিকেই সে অনুভব করিয়াছে। ক্লাবের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপদ্ধতি কি অজয় তাহা জানিতে চাওয়াতে সে কহিল, "জানি না। ওরা সব একদিন ব'সে কি-সমস্ত ঠিক করেছিল, আইন-কানুনগুলোর কার্ব্বন-কপিও একটা আমাকে দিয়েছিল। প'ড়ে আমি এত বেশী হেসেছিলাম যে একমাত্র তাইতেই ভীষণ দ'মে গিয়ে আর কখনও অন্ততঃ আমার কাছে সে-বিষয়ে কেউ কিছু বলেনি। আমি ওদের বলেছি, আইন-কানুন চুলোয় যাক, সম্প্রতি ক্লাবটিকে টিঁকিয়ে রাখাটাই সকলের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তারপর আমরা এখানে কি করব না-করব, নানা অবস্থার মধ্যে প'ড়ে নিজেদের রুচি এবং প্রয়োজন অনুসারে তা ঠিক ক'রে ক'রে নেব। আজকের নিয়ম কাল চলতে হবে, আজকের যা উদ্দেশ্য তা কালও বজায় থাকতে হবে, এর কিছু মানে হয় না।...আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না, মানুষ নিজের ওপর যখন আস্থা হারায়, তখনই নিজেকে বাঁধবার জন্তে নিয়ম গড়তে বসে?"

অজয় বলিতে পারিত, অনিয়মের নিয়ম ব্যক্তি-জীবনে চলতে পারে, সমষ্টিগত জীবনের পক্ষে তা অচল, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু নিজেরও গড়া নিয়মকে মান্‌তে পার্‌ব, নিজের উপর এই গভীরতর আস্থা না থাকলে মানুষ নিয়ম বাঁধতে পারে না, এ কথাটাও ভাববেন।"

চোখের কোণে চকিতে অজয়কে একটু দেখিয়া লইয়া বীণা কহিল, "কথাটাকে সেদিক্‌ দিয়ে আমি কখনও ভাবিনি। আচ্ছা, ভেবে দেখব।" তারপর গম্ভীর হইয়া গেল। অজয়ের সেই মুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল, তাহার কথাটাকে সে ফিরাইয়া লয়। বলে, 'না, তোমার ভেবে দে'খে কাজ নেই। তোমার অস্তিত্বের মধ্যে তুমি যে সুন্দর অনিয়মের সহজ নিয়মটিকে বহন করছ, তার নদীস্রোতের মত অবাধগতিকে শৃঙ্খলিত কর যদি তবে পৃথিবীর সমস্ত অন্তরাত্মা হঠাৎ একদিনে শুকিয়ে উঠবে।' এজীবনে প্রায় জীবনাতীত কোন্‌ দুর্লভ ব্রতফল আশা করিয়া নিজেকে নিজের গড়া সহস্র নিয়ম-সংযমের নাগপাশে সে যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়াছিল, সেইখান হইতে তাহার ক্লিষ্ট অন্তর যেন আর্ত্তকণ্ঠে বলিতে চাহিল, 'নিয়ে চল, তুমি আমাকে নিয়ে চল। ঐ যেখানে তোমার অন্তরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে তোমার অপরিসীম মুক্তি, সেইখানে নিয়ে গিয়ে আমাকেও তুমি মুক্তি দাও।'

এবারে নীরবতা বীণার অসহ্য হইল, কহিল, "চলুন এবার ভেতরে গিয়ে বসা যাক। নয়ত সুভদ্রবাবু এখুনি আবার পেয়াদা পাঠাবেন আমাকে ধ'রে নিয়ে যাবার জন্তে।"

অজয়রা ফিরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র সিঁড়ির দরজার বাহিরে হঠাৎ অনেকগুলি শিশুকণ্ঠের কোলাহল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। "মা...পিসীমা...এদিকে এসো না ...আমাকে নিয়ে যাও...আমাদের খেলা করা হয়ে গিয়েছে

…রুনু আমার শেলেট দিচ্ছে না…সোনা আমায় কিলিপ কেড়ে নিয়েছে…ছুতকু আমায় মেলেচে।"

দু-তিনজন কোনও বাধা না মানিয়া ভেজানো দরজাটা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। একটি সাড়ে-তিন চার বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বীণার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, কান্নার সুরে কহিল, "মা, সোনা আমার কিলিপ কেড়ে নিয়েছে।"

সোনা সুলতার মেয়ে, তাহারও বয়স চার সাড়ে-চারের বেশী নয়। নিজের মায়ের আঁচলের আশ্রয় হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওটা ত আমার কিলিপ, লাল কিলিপ, আমার মা আমাকে কিনে এনে দিয়েছে।"

সুলতা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তাহার ঠিক এমনই দেখিতে লাল ক্লিপ একটা আছে বটে, তবে সেটা উপরের শোবার ঘরে তাঁহার আয়নার দেরাজে বন্ধ করা আছে, কিন্তু সোনা কিছুতেই বুঝিল না। অগত্যা তাহাকে কাঁদাইয়া তাহার হাত হইতে ক্লিপটা কাড়িয়া লইয়া সুলতা সেটাকে যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিলেন, তারপর রোরুদ্যমানা কন্যাকে লইয়া আয়ার সন্ধানে উপরে প্রস্থান করিলেন। ক্লিপ ফিরিয়া পাইয়া ক্লিপের অধিকারিণীর কান্না থামিল বটে, কিন্তু তাহার হাঁড়িমুখে হাসি ফুটিল না। তাহাকে ভুলাইবার জন্য বীণা তাহার সঙ্গে অজয়ের ভাব করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। কহিল, "এটি আমার মেয়ে মন্দিরা, কেমন সুন্দর মেয়ে দেখেছেন? নীল পোষাকটাতে ওকে ভারি মানিয়েছে না?"

বীণা বিবাহিতা, বীণা জননী, ইহা জানিতে পারিয়া অকারণেই অজয়ের মনে হঠাৎ একটা অদ্ভুত রকমের ঘা লাগিল। সে যে ঠিক দুঃখিত হইল তাহা নহে, তাহার দুঃখিত হইবার কোনই কারণ ছিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে কোন্ একটা সুরসঙ্গতিতে হঠাৎ যেন তাল কাটিয়া গেল। হাসিয়া মন্দিরাকে কিছু-একটা বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। মন্দিরা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "না, আমি মন্দিরা না, আমার নাম অপর্ণা।"

অজয় এবার হাসিয়া বলিল, "মায়ের দেওয়া নামটা ওর পছন্দ নয় দেখছি।"

বীণা বলিল, "আহা, অন্য নামটা উনি আকাশ থেকে পেয়েছেন কিনা! অপর্ণা ওর ভাল নাম, মন্দিরা ব'লে ডাকি।"

অজয় মন্দিরাকে কাছে ডাকিতেই সে একেবারে তাহার কোল ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। পাঞ্জাবীর গলার বোতামটা অজয় খুলিয়া রাখিত, দুপায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া মন্দিরা সেটা লাগাইয়া দিল, কহিল, "বোতাম খুলে রেখেছ কেন, ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!"

হাসিয়া তাহার পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া অজয় বলিল, "তুমি আমার ছোট্ট মা, কেমন?"

মন্দিরা ছোট মাথাটিকে একদিকে অনেকখানি কাত করিয়া কহিল, "আচ্ছা। তাহলে তুমি আমার ছেলে হবে ত? তোমাকে আমি সঙ্গে ক'রে বাড়ী নিয়ে যাব, বাটি-ভ'রে দুধ খেতে দেব, বিছানা পেতে দেব। বিছানায় তুমি শোবে, আমি শোব, আর—"

এক ঝট্‌কায় তাহাকে টানিয়া বীণা নিজের কাছে লইয়া গেল। কহিল, "কি ক্রমাগত কেবল বক্ বক্ কর্‌ছিস্, চুপ কর্। এক মুহূর্ত্ত মুখ বন্ধ ক'রে থাক্‌তে পারে না মেয়ে।"

মায়ের কোলে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া বড় বড় গোলগোল চোখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মন্দিরা অজয়কে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময়ে মায়ের দিকে মুখ তুলিয়া সে প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ মা, ও কি আমার বাবা?"

আশেপাশে একটা নিঃশব্দ চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠিয়া পলকেই থামিয়া গেল। মন্দিরার গালে মাঝারি-গোছের একটি চপেটাঘাত করিয়া শশব্যস্তে বীণা উঠিয়া পড়িল, কহিল, 'আমাকে এবার উঠতে হচ্ছে। একে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে দু-দণ্ড যে বস্‌ব তার উপায় নেই, দুধ-খাবার সময় হলেই যতরাজ্যের দুষ্টমি ওর মাথায় আসে। আর কখনও আমার সঙ্গে আস্‌তে চাইবি ত দেখবি।"

মন্দিরা কাঁদিবার উপক্রম করিতেছিল, সুভদ্র ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে করিল। এই দুইজনে বহুকালের বন্ধুত্ব, কানে কানে তাহাদের কি কথা হইতে লাগিল কেহ জানিল না। সুলতা তাঁহার কন্যারত্নটিকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটু আগে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, বীণার কানে কানে কহিলেন, "ওর বিশেষ দোষ নেই, তা যাই বল। সুরেশ সত্যিই খুব বেশী অজয়বাবুর মত দেখতে ছিল। অমনি রোগা ছিপছিপে চেহারা, একমাথা চুল, তবে তার রঙ আর-একটু ফর্‌সা ছিল বটে।"

বীণা চকিতে একবার অজয়ের দিকে চাহিয়া লইয়া মৃদুস্বরেই কহিল, "সুলতাদির যে কথা! ওঁকে কি ওর একটুও মনে আছে নাকি?"

সুলতা কহিলেন, "ছবি-টবি ত সারাক্ষণই দেখছে। অবিশ্যি তোমারই ত মেয়ে, পাকামিও আছে প্রচুর।"

অজয়কে নমস্কার করিয়া "চল্‌লাম" বলিয়া বীণা দরজার দিকে চলিল। ক্লাবসুদ্ধ ছেলেরা সকলেই প্রায় তাহাকে বিদায় দিতে উঠিয়া আসিল। সুভদ্রের কোলে চড়িয়া সিঁড়ি নামিতে নামিতে মন্দিরা অজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি আস্‌বে না আমাদের বাড়ী? চল-না? গাড়ী রয়েছে যে! এস-না···এস···এস!"

অজয় রেলিঙে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, তারপর মন্দিরা কিছুতেই নামিতে চাহিতেছে না এবং সুভদ্রকেও নামিতে দিতে নারাজ দেখিয়া নিরুপায় হইয়া কহিল, "আচ্ছা, আজ থাক্, আর একদিন তোমাদের বাড়ী যাওয়া যাবে, তাহলেই হবে ত?"

মন্দিরা রাজি হইয়া গেল। বীণা কলকণ্ঠের হাসিতে সিঁড়ি মুখরিত করিয়া বলিল, "ও যত দুষ্টই হোক, বেশ কাজের মেয়ে। ওরই কল্যাণে আপনার কাছ থেকে এতবড় একটা কথা আদায় হয়ে গেল। প্রতিজ্ঞাটা মনে থাক্‌বে ত?"

অজয় কহিল, "থাক্‌বে।" তারপর সেও হাসিতে লাগিল।

বিমান তাহার ঠিক পশ্চাতেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, "আমি ওকে ধ'রে নিয়ে যাব-এখন।"

বীণা সিঁড়ি নামিতে নামিতে কহিল, "কেন, অজয়বাবুর কি কল্‌কাতার পথঘাট জানা নেই, ঠিকানা নিয়ে বাড়ী চিনে যেতে পার্‌বেন না?"

বিমান একথার উত্তরে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "যেতে খুবই পারবেন, কিন্তু ফির্‌তে ঠিক ততটা সহজে পার্‌বেন কিনা ভেবে কথাটা বলেছিলাম।" বীণা তাহার সেকথা ইচ্ছা করিয়াই শুনিল না দেখিয়া সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়াইয়া হাতের ছড়িটাকে সে ঘুরাইতে লাগিল।

গাড়ীতে বসিয়া নিজের শালটা দিয়া মন্দিরাকে বেশ করিয়া জড়াইয়া বীণা কহিল, "চল একবার বাড়ী, তোমার দুষ্টমি আমি ভাল ক'রে বের করব।" তারপর সারাপথ দুজনেই গম্ভীর হইয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)



ভারতবর্ষ

সম্রাট অশোকের শিলালিপি—

পাটনায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সদস্যগণ সম্বলপুর জেলায় এক গুহার মধ্যে শিলাস্তূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। শিলাস্তূপে ব্রাহ্মি লিপি খোদিত আছে। ঐ গুহা বিক্রমখোল নামে পরিচিত এবং সম্বলপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৩২ মাইল দূরে এক বনের মধ্যে অবস্থিত।

কি লেখা আছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে ব্রাহ্মি লিপি দেখিয়া মনে হয়, ঐ শিলাস্তূপ অশোকের আমলের এবং তাহাতে সম্রাটের ঘোষণাবলী লিখিত আছে। —এ, পি

আফিম-বিভাগে ৩২ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস—

ভারত সরকারের আফিম বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত ১৯৩১ সনে আফিম বিক্রয় করিয়া ভারত সরকারের মোট ১ কোটী ১৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৯৩ টাকা লাভ হইয়াছে। ১৯৩০ সনে এই বিভাগে ভারত সরকারের আরও ৩২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৮০ টাকা বেশী লাভ হইয়াছিল।

আমদানী-রপ্তানী—

গত জুন মাসে ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য হইতে মোট ৪ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা বাণিজ্য-শুল্ক পাওয়া গিয়াছে, তৎপূর্ব্ব মাসে ৪ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা এবং গত বৎসর জুন মাসে ৩ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা ঐ বাবদে পাওয়া গিয়াছিল। এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসে ১২ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা বাণিজ্যশুল্ক আদায় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ তিন মাসে ১০ কোটী ৭ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আমদানী শুল্ক ১০ কোটী ৫ লক্ষ, রপ্তানী শুল্ক ৮৫ লক্ষ, মোটর স্পিরিটের উপর আবগারী শুল্ক ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা, কেরোসীন হইতে ৭২ লক্ষ এবং বিবিধ দ্রব্য হইতে ১৪ লক্ষ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছে। কার্পাসজাত বস্ত্র, মদ, লৌহ ও ইস্পাত ব্যতীত অন্য ধাতু, কাঁচা মাল, কার্পাস সূতা, কাগজ ও মনোহারী দ্রব্য—এই সমস্ত আমদানী দ্রব্য এবং পাট, আবগারী দ্রব্য, মোটর স্পিরিট ও কেরোসিন এই সমস্ত রপ্তানী দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে, চিনি, রূপা, মোটর স্পিরিট, তুলা ও রেশম ব্যতীত অন্য সূতা, মোটর, সাইকেল, রেলওয়ের সরঞ্জাম, গুড়, সুপারী, তামাক ইত্যাদি আমদানী দ্রব্য এবং কাঁচা পাট, চামড়া, চাউল ইত্যাদি রপ্তানী দ্রব্যের শুল্ক হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতের জাতিহিসাবে লোকসংখ্যা (১৯৩১ সনের আদম সুমারী)—

হিন্দু	২৩৯,১৯৩,৬৩৫
মুসলমান	৭৭,৬৭৭,৫৪৫
শিখ	৪,৩৩৫,৭৭১
জৈন	১,২৫২,১০৫
বৌদ্ধ	১২,৭৮৬,৮০৬
খৃষ্টান	৬,২৯৬,৭৬৩

সৎকার্য্যে দান—

বোম্বাইয়ের জেঠানন্দ আসানমল নামক একজন জহরৎ ব্যবসায়ী গত ১৯২৯ সনে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই বলিয়া উইল করিয়া যান যে, তাঁহার বিধবা পত্নী যদি একজন দত্তক রাখেন তবে দত্তক এক লক্ষ টাকা পাইবে এবং তাঁহার সম্পত্তির বাকী ১১ লক্ষ টাকা বিবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় হইবে। এই লইয়া একটি মামলার সৃষ্টি হয় এবং এডভোকেট-জেনারেল এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, মৃত ব্যক্তির উইল আইন অনুসারে সিদ্ধ নহে। অবশেষে এইরূপ মীমাংসা হয়—মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নীকে ভরণপোষণের জন্য একটা আজীবনের বৃত্তি দেওয়া হইবে এবং তিনি যদি দত্তক রাখেন তাহা হইলে ঐ দত্তক ভবিষ্যতে সম্পত্তির জন্য দাবী করিতে পারিবে না। এই অনুসারে জজ ওয়াদিয়া ডিক্রী দিয়াছেন। এই ডিক্রীর ফলে বিভিন্ন সৎকার্য্যের জন্য ১১ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

—

বাংলা

কাপড়ের আমদানী—

সরকারী হিসাবে প্রকাশ—১৯২৯-৩০ সনে বাঙ্গলায় কাপড় আমদানী হইয়াছিল ২০ কোটী টাকার উপর। তাহার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৩০-৩১ সনের আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৬ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ এক বৎসরেই একেবারে ১৩ কোটী টাকা কমিয়া যায়। তাহার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সনের আমদানি আরও কমিয়া গিয়া দাঁড়ায় ৩ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা। শুধু বাংলায় নহে, বোম্বাইর অবস্থাও এইরূপ। ১৯২৯-৩০ সনে বোম্বায়ে কাপড় আমদানী হইয়াছিল ১৪ কোটী টাকার, ১৯৩০-৩১ সনে হইয়াছিল ৪ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকার এবং ১৯৩১-৩২ সনে হইয়াছিল ৩ কোটী

৩৪ লক্ষ টাকার। সমগ্র ভারতে ১৯২৯-৩০ সনে কাপড় আমদানির পরিমাণ ছিল ৫০ কোটী টাকা, ১৯৩০-৩১ সনে হয় ২০ কোটী টাকা। ১৯৩১-৩২ সনে হইয়াছে ১৪ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ তিন বৎসর পূর্ব্বে কেবল বাংলায় যত টাকার বিদেশী কাপড় আমদানী হইত, তিন বৎসর পরে সমগ্র ভারতের আমদানীর পরিমাণ তাহার তিন-চতুর্থ অংশও নহে।

পাট রপ্তানি—

সরকারী বাণিজ্যতথ্য বিভাগের সংবাদে প্রকাশ, ১৯৩২ সনের মে মাসে বাংলা হইতে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮২ গাঁট পাট রপ্তানী হইয়াছে। প্রতি গাঁটের ওজন ছিল ৪ শত পাউণ্ড। একমাত্র কলিকাতা হইতেই ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৭ শত ৮০ গাঁট পাট রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩০ এবং ১৯৩১ অব্দের মে মাসে বাংলা হইতে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত ৬২ এবং ২ লক্ষ ১১ হাজার ৯ শত ১ গাঁট পাট রপ্তানী হইয়াছে।

লবণ তৈয়ারী—

যেখানে লবণ সংগ্রহ বা তৈয়ারী করিবার সুবিধা আছে, সেই সব গ্রামের অধিবাসীদিগকে বাংলা সরকারের পক্ষ হইতে এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা অতঃপর নিজেদের ব্যবহারের জন্য অথবা নিজেদের গ্রামের মধ্যে বিক্রয় করিবার জন্য লবণ তৈয়ারী বা সংগ্রহ করিতে পারিবে। কিন্তু গ্রামের বাহিরে কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় অথবা কাহারও সহিত ব্যবসা করিতে পারিবে না।

স্থায়ী শিল্পপ্রদর্শনী—

কলিকাতা কর্পোরেশন এই সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, কলিকাতা শহরে একটি স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী স্থাপন করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আপাততঃ টাউন হলেই এই প্রদর্শনী স্থাপিত হইবে এবং বাংলাদেশে শিল্পদ্রব্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হইবে।

বাঙালীর গৌরব—

শ্রীযুক্ত আদিনাথ সেন এক সূতা বোনার কল বাহির করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তুলা কিংবা পাট বা রেশম হইতে ইচ্ছামত মোটা ও সরু সূতা আপনি আপনি বাহির করা যায়। এই আবিষ্কারে বেশ নজর রাখা হইতেছে যাহাতে বিনা বাধায় ক্রমান্বয়ে সূতার পাক হয়, এবং সূতার পাক কোন মতে কম-বেশী না হয়। তবে ইচ্ছা করিলে পাক কম-বেশী করাও যায়।

শ্রীযুক্ত আদিনাথ সেন নূতন বোতামের কলও আবিষ্কার করিয়াছেন। এক সময়ে এক সঙ্গে, একই কল দ্বারা টিনের বোতামের (যাহা প্যান্ট ব্যবহার হয়) কাটা ছিদ্র করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনি বাহির হইয়া আসিবে।

শিক্ষার উন্নতিকল্পে দান—

গোপালপুর হাই স্কুলের উন্নতির জন্য শ্রীপুরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

রাজসাহীতে মেয়েদের জন্য কলেজ—

প্রাথমিক উদ্যোগ। ১৯৩৪ সালে যে-সব ছাত্রী আই, এ পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগকে পড়াইবার জন্য রাজসাহীতে শীঘ্রই একটি কোচিং ক্লাস খোলা হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি অস্থায়ী ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার চৌধুরী বি-এল যথাক্রমে উক্ত কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রাতঃকালে ক্লাস হইবে এবং ইংরেজী ও বাংলা ব্যতীত ইতিহাস, লজিক, সিভিক্স ও সংস্কৃত পড়ান হইবে। এই উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দ নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। কুমারী পুষ্পময়ী বসু এম-এ, সুপারিন্টেণ্ডের কার্য্য করিবেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, বর্ত্তমান বৎসরে ছাত্রীদিগকে স্থানীয় কলেজে ভর্ত্তি করা হয় নাই। ইহার কারণ একমাত্র কলেজ কর্ত্তৃপক্ষই অবগত আছেন এবং এই প্রচেষ্টাকে ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতে মেয়েদের জন্য একটি কলেজ গড়িয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়।

নারীশিক্ষা—

এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বরিশাল, কলিকাতা, ধুবড়ী, গৌহাটী, হবিগঞ্জ, শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট, আসানসোল, বাগেরহাট, রাজসাহী, বগুড়া, বর্দ্ধমান, কুমিল্লা, কুচবিহার, দিনাজপুর, হুগলী, জলপাইগুড়ি, যশোহর, নারায়ণগঞ্জ, নীলকামারী, নোয়াখালি, পাবনা, পিরোজপুর ও টাঙ্গাইল কেন্দ্র হইতে প্রাইভেট এবং কলিকাতা ইউনাইটেড মিশন, বালিকা, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন, সেণ্টমার্গারেট, বেথুন, বীণাপাণি, ডায়োসিশন, বেলতলা বালিকা, ব্রাহ্ম বালিকা, ক্রাইষ্ট চার্চ্চ, ধুবড়ী লেডী বালিকা, বরিশাল সদরগার্লস স্কুল, পানবাজার বালিকা, কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা গার্লস, রাজসাহী পি, এন, মৈমনসিং বিদ্যাময়ী, কুচবিহার সুনীতি একাডেমী, দারজিলিং মহারাণী, মৈমনসিং রাধাসুন্দরী চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষালয়, চুঁচুড়া দেশবন্ধু, পাবনা বালিকা ও রংপুর গার্লস স্কুল হইতে ৩৫০ ছাত্রী পাশ করিয়াছে।

নারী-নিগ্রহে কারাদণ্ড—

বিগত ২৭শে জুন হইতে যশোহরের এডিশনাল সেসন জজ এবং পাঁচ জন জুরীর নিকট সরোজিনী হরণের মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। ২রা জুলাই তারিখে ইহার রায় বাহির হইয়াছে। জুরীগণ সমস্ত আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ গোপেশ্বর ব্যানার্জ্জী সমস্ত আসামীকেই দণ্ডিত করিয়াছেন। নিম্নে আসামীদের নাম ও দণ্ডের পরিমাণ লিখিত হইল।—

১। আসিম গাজি—পাশবিক অত্যাচার করার অভিযোগে দশ বৎসর এবং নারী হরণ করার জন্য ৭ বৎসর, মোট ১৭ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড হইয়াছে। দণ্ড পর পর চলিবে।

২। তালেব দফাদার—পাশবিক অত্যাচারের অপরাধে ৭ বৎসর এবং নারী হরণের অপরাধে ৭ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড হইয়াছে। দণ্ড ভোগ পর পর চলিবে।

৩। হামেদ আলী সর্দ্দার ২ নম্বর আসামীর সমান দণ্ড হইয়াছে।

৪। ওসমান গাজী—নারীহরণের অপরাধে ৭ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড।

৫। আবদুল মণ্ডল ওরফে মন্দার—দাঙ্গা করার অপরাধে ২ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড।

৬। আবদুল গাজী—৫ নং আসামীর সমান দণ্ড।

৭। জাহির বিশ্বাস—৫ নং-এর সমান দণ্ড।

৮। কেনু মণ্ডল—৫নং-এর সমান দণ্ড।

৯। মিয়াজীন দপ্তরী—৫নং এর সমান দণ্ড।

পারস্য-ভ্রমণ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

যোধপুর ছাড়বার পর যে মরুভূমির দেখা পেয়েছিলাম বুশীর পর্য্যন্ত সেই মরুভূমিই সঙ্গে এসেছিল। সারাপথ পৃথিবীর সেই এক বিরস বিশুষ্ক আকৃতি দেখে দেখে চোখ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। কচিৎ কদাচিৎ দু-একটা মরূদ্যান প্রকৃতির অন্যমুখ দেখিয়েছিল। বুশীরেরও সেই এক অবস্থা, তবে মানুষের বসতি হওয়ায় আকাশের জল ধ'রে, পাতালের জল তুলে, মরুভূমির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মানুষ গাছগাছড়া ফুলফলের বাগান করার চেষ্টা করছে।



বুশীর হইতে যাত্রা। কবি গাড়িতে উঠ্‌তে যাচ্ছেন। পিছনে বুশীরের গভর্ণর

শস্য বা শাকসব্জীর ক্ষেত যে একেবারে নেই তা নয়, তবে জলসঙ্কটে তাদের 'এখন যাই তখন যাই' অবস্থা।

বাস্তবিকই বুশীরে জলের কষ্ট ভীষণ। সারা বছরে দু-তিন ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে, (কলকাতায় বর্ষাকালে এক-এক দিনেই ওর চেয়ে বেশী হয়) তাও কোন বছর কমে যায় এবং তাই নিয়ে দেশে মহা হৈ-চৈ পড়ে যায়। এ বছর শীতকালে (ওদের বৃষ্টির সময়) ভাল বৃষ্টি হয়নি, তাই বাগান ক্ষেত সব যায়-যায় হয়ে আছে। বড়লোকদের খাবার জল এক দিন এক রাত্রির পথ বেয়ে জাহাজে ক'রে বাসরা (বসোরা) থেকে আনান হচ্ছে শুনলাম, এবং ফিরবার সময় স্বচক্ষে দেখলাম। গরিবদের জল আশপাশের মরূদ্যান থেকে 'মশকে' ভ'রে গাধার পিঠে আনান হচ্ছে। মরুভূমির জাহাজ যদি উটকে বলা হয় তবে মরুভূমির গাধাবোট নিশ্চয়ই গাধা! এ দেশে পথেঘাটে বাজারে সর্ব্বত্র গাধার দল বিরাজ করছে। লোকচলাচল থেকে মাল-রপ্তানি, রাজকর্ম্মচারী থেকে ফকির মোল্লা সবারই বাহন ঐ এক জীব। তবে এখন মোটর ও মোটর-লরীর কৃপায় গাধার জীবনে একটু আশার সঞ্চার হয়েছে বোধ হয়।

* * *

পিছনে পাহাড়, সামনে সমুদ্রের জল, এই দুইয়ের মাঝে পাথর, বালি —এবং স্থানে স্থানে বেলেমাটি—এবং কাঁকরে ভরা জলশূন্য মরুপ্রান্তর, তার উপর কাঁচা ইট এবং পাথর দিয়ে তৈরি বুশীর শহর বিরাজ করছেন। শহরের সমস্ত বাড়িই ধূসর রঙের চূণকাম করা (ওখানের চূণের ঐ রং) কাজেই রাস্তা ঘরবাড়ি ময়দান সবই এক রঙের। শহরের বাইরে বড়লোকদের বসতি, তাই পথের ধারে কোথাও কোথাও খেজুরের ঝোপ, বাবলার সারি বসান হয়েছে। প্রায় সব বাড়িই খুব উঁচু দেয়ালে ঘেরা, ভিতরে বাগান, শাকসব্জীর ক্ষেত, তার ভিতর আবার উঁচু দেয়ালে ঘেরা পাথর বা সীমেণ্টে বাঁধান আঙিনা, তার মাঝে মাঝে একটু জায়গা ছাড়া—সেখানে দুটো-একটা খেজুর লেবু ডালিম বা অন্য কোন গাছ—তারপর উঁচু রোয়াক বারান্দা দেওয়া বাহির-বাড়ি। বাহির বা বৈঠক-বাড়ির ভিতর দিয়ে 'অন্দরান' বা

অন্দরমহলের রাস্তা। বাড়ির ছাদ বারান্দা সকলের সঙ্গে জলনিকাশের নল বসান আছে, আঙিনার মাঝখানে মাটির নীচে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা, সমস্ত আঙিনাটা সেই দিকে ঢাল দিয়ে গাঁথা এবং বাড়ির জলনিকাশের নলগুলিও সেখানেই গিয়ে পড়েছে। এই রকমে বৃষ্টির জল ধরা হয় এবং এই জলই জীবনধারণের সম্বল।

শহরে তিনটি ভাল রাস্তা আছে, একটি সমুদ্রের কূল ধ'রে, তার উপরেই যত বড় বড় আপিস, আর দুটি নতুন চওড়া রাস্তা শহরের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। বাকী সব রাস্তা শুধু আঁকা-বাঁকা নয়, উপরন্তু উঁচুনীচু, এর একতলা ওর দোতলা ছাড়িয়ে যায়। আর গলিঘুঁজির ত কথাই নেই। বাজারহাট বেহার বা পশ্চিম অঞ্চলের মত, সেই রকম এলোমেলো, অপরিষ্কার।

বুশীরের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ বহির্জ্জগতের সঙ্গে নৌযোগে ব্যবসায়। এতদিন এই বন্দরের মারফতেই বোম্বাই করাচী, এবং অন্য নানা দেশের কারবার চলত। সম্প্রতি পারস্যে নিয়ম হয়েছে যে, কোন জিনিষ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হ'লে প্রথমে তার সমান দামের পারস্যদেশজাত জিনিষ রপ্তানি করতে হবে এবং সেই রপ্তানির সার্টিফিকেটের দরুণ আমদানীর লাইসেন্স পাওয়া যাবে। আমদানী জিনিষের মধ্যে চিনি, চা এবং তামাকের ব্যবসায় রাষ্ট্রের নিজস্ব, অন্য সব জিনিষের উপর খুব বেশী চুঙ্গী ধরা আছে। বলা বাহুল্য, এই-সব ব্যাপারে আমদানীর কারবার প্রায় উঠে যাবার দাখিল হয়েছে। ভারতীয় কারবারীর সংখ্যা খুব কমে গেছে, যারা আছে (অধিকাংশ পাঞ্জাবী এবং সিন্ধি) তাদেরও অবস্থা ভাল নয়—এবং অধিকাংশকেই এখন "ভদ্রস্থ" বলা চলে না।



বোরস্জানে পুলিসের ঘাঁটি



কাজেরুণের পথে ভাঙা সেতু এবং পুলিসের ঘাঁটি

কবি এসে পৌছবার আগে কদিন লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এবং জায়গা দেখে বেড়ান গেল। বুশীর এবং পারস্যোপসাগরের গভর্ণর-জেনারেল শ্রীযুক্ত টেলেঘানি মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি টেহেরাণের অধিবাসী, ফ্রান্সে শিক্ষিত, অতি অমায়িক লোক, ফরাসী ভাষা ভালই জানেন, ইংরেজী খুব অল্প। তাঁর ব্যবস্থায় এবং কাজেরুণী নামে এক স্থানীয় ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সৌজন্যে দেখাশোনা ও খাওয়াদাওয়া ভালই চলল। বুশীরের খাবার জিনিষের মধ্যে পায়রাচাঁদা মাছ খুব ভাল, বোম্বাইয়ের পমফ্রেট থেকেও সুস্বাদ।

এখানে বিশেষ দেখবার জিনিষ কিছুই নেই। গত যুদ্ধের সময় ইংরেজ-সেনার এক প্রকাণ্ড ছাউনি এখানে পড়েছিল। তাদের বেতার ষ্টেশন, সমুদ্রের জল চুয়িয়ে খাবার জল তৈরির কারখানা, এই সব দেখা গেল। একদিন প্রধান বিচারপতির নিমন্ত্রণে এঁদের হাইকোর্ট দেখে এলাম। ফরাসী দেশের ছাঁচে ঢেলে এ দেশে আইন গড়া হয়েছে। রাজকর্ম্মচারীদের ঘুষ-ঘাষ নেওয়া বা অন্য অন্যায় কাজ করার বিচারের জন্য

বিশেষ আদালত রয়েছে। এটর্নী-জেনারেল এবং প্রধান পরীক্ষক-বিচারক (examining judge) সমস্তই যত্ন ক'রে দেখালেন এবং বুঝিয়ে দিলেন।

পরীক্ষক-বিচারক মহাশয় দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের এক আত্মীয়ের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! চেহারার এ রকম অদ্ভুত সাদৃশ্য আমি খুব অল্পই দেখেছি। তবে এবার এদেশে আরও অনেকগুলি লোক দেখলাম যাঁরা আমার পরিচিত ভারতবাসীদের যমজ ব'লে চ'লে যেতে পারেন। আমাদের সম্বন্ধে ওখানকার লোকেরাও এই কথাই বললেন। ইস্ফাহানের গভর্ণর মহাশয় প্রথমে বিশ্বাস করেননি যে, আমি এই প্রথম পারস্যে এসেছি। তিনি বললেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে তিনি অনেকবার ইস্ফাহানে এবং টেহেরাণে দেখেছেন। কবির সঙ্গে একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকের (পারসীক) আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের কথা ত অনেকেই অনেকবার বলেছেন।

* * *

আসবার পর প্রথম শুক্রবারে (জুমাবার, সুতরাং এ দেশের ছুটির দিন) এখানকার কয়েকজন ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে নিয়ে চড়ুইভাতি করতে চললেন। এ দেশটা মুসলমানের, কিন্তু প্রথমেই চোখে পড়ল যে, ধর্ম্মের উৎকট ভাবটা এদের নেই। জুমা ছুটির দিন, চারিধারে হাসিখুশী গানবাজনা চলেছে। ধর্ম্মটা বাইরে জাহির করার কোনও চেষ্টাই নেই। এ বিষয়টা পরে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি। আড়াই মাস ধ'রে পারসীক এবং আরব মুসলমানের দেশে আমরা ঘুরেছিলাম, কোথাও মুক্ত জায়গায় নমাজ পড়া দেখিনি, এবং একবারও মুয়েজ্জিনের আহ্বান শুনিনি। আমাদের দেশেই যেন যে ধর্ম্মই যায় সেটাই আড়ম্বর-প্রধান হয়ে ওঠে।



কোনার তখ্‌তে চাবার বাড়ি (আমাদের বিশ্রাম-স্থান)

চড়ুইভাতি হ'ল দশ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে এক খেজুরবাগানে।



কাজেরুণের পথে। পাহাড় ও সেতু

এখানকার খেজুরগাছগুলি বেশ নধর এবং ডালপালাও খুব বড়, তাই ছায়াও বেশ হয়। গাছের নীচে কার্পেট বিছিয়ে বসা গেল। জায়গাটি খুব সুন্দর, সামনেই সমুদ্রের চড়ায় ছুটির দিনে বুশীরের ইয়োরোপীয়ের দল

সমুদ্রস্নান করতে এসেছে। অল্প দূরে হালালে নামে জেলেদের একটি ছোট গ্রাম। এখানে এক শহীদের (আত্মত্যাগী বীরের) সমাধি আছে, ইনি গত যুদ্ধে ইংরেজ-সেনার বুশীর অধিকারে বাধা দিয়ে কয়েক সপ্তাহ যুদ্ধের পর নিহত হন।

খাওয়াটা হ'ল এদেশের মতে। পোলো (পোলাও আমাদের ঘি-ভাত), বেগুন ও শাক দিয়ে মুর্গীর তরকারি, আলুভাজা, মাংসের কিমার কট্‌লেট্‌, সিরকায় ফেলা আচার, খুব নরম ভেড়ার মাংসের (দুম্বার) কালিয়া, কাঁচা মূলো, রুটি ইত্যাদি। ঝাল বা গরম-মশলার ব্যবহার একেবারেই নেই, পিঁয়াজের চিহ্নমাত্রও দেখলাম না এবং শুনলাম সেটার বেশী ব্যবহার এদেশে ভদ্রসমাজে চলিত নয়। রুটিটা তুন্দুরে সেঁকা, চৌকোণা, মোটা মার্কিন কাপড়ের মত পুরু এবং প্রায় এক গজ লম্বা-চওড়া, খেতে বেশ মুচ-মুচে। শুনলাম,



কাজেরুণ। বাগ-এ-নজরের পুষ্পোদ্যান, পিছনে প্রকাণ্ড কমলালেবু গাছের শ্রেণী

এ জিনিষটি এরা একসঙ্গে কুড়ি-পঁচিশ দিনের মত ক'রে, জল ছিটিয়ে নরম ক'রে নিয়ে রুমালের মত ভাঁজ ক'রে রেখে দেয়। এই শুকনো দেশে বাসি হওয়ার দরুণ বিশেষ কিছু বিকৃতি ঘটে না। খাওয়া হাত দিয়েই চলে। জল রাখবার পাত্রটি রঙীন চামড়ার কুঁজোর মত, তিনটি রঙীন কাঠের পায়ার উপর বসান, নাম দুলচা। খাওয়ার পর ছোট ছোট কাচের গ্লাসে বিনা-দুধের চা প্রতি পনর-কুড়ি মিনিট অন্তর ক্রমাগত চলল।



কাজেরুণ। দূরের দৃশ্য

খেজুরবাগান থেকে একটু তফাতে একটা কুয়া ছিল, তার জলের রং ঈষৎ খড়ি গোলার মত এবং স্বাদও ফোটান জলের মত। সেখানে আশেপাশের গ্রামের মেয়েরা কাপড়কাচা, জলভরা ইত্যাদি করছিল। তাদের রং বেশ ফরসা, পরণে ঢিলা খাট পাজামা, তার উপর রাতকামিজ-জাতীয় একটা জামা, বুকের ওপর পাহাড়ীদের মত এক টুকরা কাপড় বাঁধা এবং সবার উপরে মাথার ওপর থেকে সারা গা ঘিরে একটা কাল কাপড়ের ওড়না—নাম চাদর। জল ভরছিল ভিস্তিদের মত মশকে। জল ভ'রে সেটা মাটিতে রেখে তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে মশকের চামড়ার ফিতেটা কপালে লাগিয়ে (পাহাড়ীদের মত) একটানে সোজা হয়ে উঠে নিয়ে যাচ্ছিল। ছোট ছেলে-মেয়েগুলি দেখতে সুন্দর, মুখচোখেরও গড়ন ভাল। বড় মেয়েগুলির মুখ কঠোর এবং রুক্ষ। এখানে ঘোমটা আবরুর খুব বেশী বালাই দেখলাম না, কিন্তু শহরে সেটা আছে। এ দেশের লোকেদের ফরসা



শিরাজ। সাদীর কবরোদ্যানে কবিকে নাগরিক অভিনন্দন



শিরাজ। সাদীর কবর-স্থান

ভাবে ন্যায্যঅন্যায্য সকল প্রকার ফরমাস সহ্য করেছিলেন, তার জন্য তিনি আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র।

মহাসমারোহে ভোজ, অভিনন্দন, অভিবাদন, ইত্যাদি কদিন চলল। দু-চার জন কবির সঙ্গে নিভৃত আলাপও করলেন। শ্রীযুক্ত ডষ্টি নামে এদেশের এক সাংবাদিক এবং পার্লামেণ্টের মেম্বার কবিকে আলোচনার মধ্যে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এদেশে কি দেখবেন মনে করে এসেছেন?'

কবি বললেন, 'প্রাচীন পারস্য, যাহা এককালে সভ্যতা জ্ঞান এবং কলাবিদ্যার জন্য জগদ্বিখ্যাত ছিল, আমি সেই পারস্য দেখতে এসেছি।'

ডষ্টি বললেন, 'সে পারস্য খুঁজে পাওয়া আপনার পক্ষে দুরূহ হবে; কেন-না, এখন প্রাচীনের আদর নেই, নূতনেরই আদর।'

শাহের সঙ্গে অভিনন্দন-প্রত্যভিনন্দন তারযোগে হ'ল। ১৫ই এপ্রিল সকাল ৮॥ টায় আমরা বুশীর ছেড়ে শিরাজের পথে রওনা হলাম।

* * * *



শিরাজ। সাদীর কবর-গৃহের সম্মুখে। কবির দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীযুক্ত ফুরুঘি

দুখানি প্রকাণ্ড লরীতে মাল বোঝাই, একটি মোটরে সশস্ত্র সেপাই এবং অন্য চারখানি মোটরে আমরা সকলে—তার মধ্যে একটি নূতন সিডানে কবি—এই দল বুশীর ছাড়ল। লরী দুটির একটি একদিন আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল। আগে থেকে ঠিক হয়েছিল যে, আমরা খুব সকালে ছেড়ে দুপুরে কাজেরুণ নামে ছোট শহরে মধ্যাহ্নভোজন ক'রে সেই দিনই সন্ধ্যা নাগাদ শিরাজে পৌঁছাব। কিন্তু ঘটল সবই অন্য রকম।

৮॥ টায় রওনা হয়ে ১০॥ নাগাদ আমরা বোরসজ্জান নামক গ্রাম ও ঘাঁটিতে পৌঁছলাম। সারা পথ আঁকা-বাঁকা, ধুলো ও কাঁকরে ভরা রাস্তার দুপাশে বালির ও বেলেমাটির ঢিপি দেখতে দেখতে এসেছি। এখানে অনেক সৈনিক এবং রাজকর্ম্মচারী অপেক্ষা করছিলেন। কথা ছিল এখানে আমরা চা খাব, কিন্তু পথ অনেক বাকী বলে কৈহান বললেন আরও এগিয়ে থামা যাবে। কাজেই এগোনো আরম্ভ হ'ল। বোরসজ্জান ছেড়ে আসল পাহাড়ের দর্শন পাওয়া গেল। পথে দূরে খেজুরবনে-ভরা মরূদ্যান, উটের সারি ইত্যাদি দেখা গেল এবং রাস্তায় অনেকগুলি গাধা এবং খচ্চরের কারাভ্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল, কোনটি কেরোসিন, কোনটি পেট্রল, কেউ-বা চিনি চা কাপড় ইত্যাদি বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে বুশীর বন্দর থেকে দেশের ভিতর দিকে চলেছে। এক জায়গায় একটা ছোট পাহাড়ে জলস্রোত দেখা গেল, জলের রং নীল এবং গন্ধ তীব্র (ডিমপচা) গন্ধক মিশ্রের।

এখানকার পাহাড়ও মরুতুল্য। একটি গাছ নেই, ঘাস নেই, কেবল বেলেমাটির চাপের মত ঢিপিতেও পাথরে ভরা। কোথাও কোথাও জলস্রোতের শুকনো পথ রয়েছে, তার বুক বালি-চাপা নুড়িতে ভরা, দুপাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর, পাহাড় ধ'সে নীচে এসে

পড়েছে। পাহাড়ের এ রকম রুক্ষ বিশুষ্ক মলিন চেহারা আমি আর কোথাও বিশেষ দেখিনি।

বেলা দুটোর সময় কোনারতখ্‌তে নামক গ্রামে পৌঁছলাম। কুয়ো থেকে জল তুলে চাষ চলছে, তাই দু-একটা ক্ষেত দেখতে পাওয়া গেল। এখানে আমরা দুপুরের খাওয়া খেয়ে একটু বিশ্রাম করলাম। ছোট গ্রাম, খানকয়েক ঘর, পুলিসের ঘাঁটি এবং কয়েকটি ক্ষেত। আশপাশের অনেক লোক আমাদের দেখতে এল, তাদের মধ্যে কয়েকজন অবস্থাপন্ন চাষীর বাড়ির মেয়ে ছিল। তাদের কর্ত্রী ঠাকরুণ, বয়স বোধ হয় ত্রিশের কাছে, উন্নত-দেহ, সুন্দর গঠন, ফরসা রং, নাক মুখ চোখ একটু বড় ছাঁচে গড়া, কিন্তু নিখুঁত, বেশ দেখতে এবং সাজও ভাল ছিল। পরণে লাল জমীর ওপর সাদা এবং হলদে কাজ-করা ঘাঘরা, সুন্দর ছুঁচের কাজ করা কাঁচুলি এবং রঙীন ওড়না, হাতে চওড়া কাঁকন, গলায় মাদুলীর মালা, নাকে দার্জ্জিলিঙের পাহাড়ী মেয়েদের মত নাকছাবি, কানেও সেই জাতীয় গয়না। ফোটো নিতে চাওয়ায় কিছুতেই রাজী হ'ল না।



শিরাজের গভর্ণর এবং কবি

কোনারতখ্‌তে থেকে বেলা দুটো আন্দাজ বেরিয়ে আবার যাত্রারম্ভ হ'ল। এবার পাহাড়ের রাস্তা অতি দুর্গম এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠল। ভীষণ উচ্চকোণে চড়াই, রাস্তা সরু এবং তার উপর ক্রমাগত 'হেয়ারপিন' বাঁক, ওৎরাইও ঐরকম। আবার দু-এক জায়গায় ডাকাতে পুল ভেঙে দিয়েছে, নালায় নেমে, গাড়ী গিয়রে ফেলে প্রচণ্ড এক্সেলারেট ক'রে পাড় বেয়ে চড়তে হয়। পাহাড়ও বিষম উঁচু। সমস্ত পুলের কাছে এবং রাস্তারও অনেক জায়গায় সশস্ত্র পুলিসের ঘাঁটি, এরা রাজপথরক্ষী।

ধুলো, গরম এবং এই বিষম চড়াই-উৎরাইয়ে মোটরগুলি বিগড়ে যেতে লাগল। পথের নীচের খাদে কয়েক জায়গায় মরা উট খচ্চর ইত্যাদি দেখলাম—পা হড়কে নীচে পড়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়েছে। এ-রকমটা প্রায়ই হয় শুনলাম, অথচ পাঁচ-দশ টন মাল বোঝাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লরী এই পথ দিয়েই যায়। লরীর চড়াইয়ের সময় দুজন লোক গাড়ির পেছনে ছুটে। প্রকাণ্ড কাঠের হাতুড়ি-জাতীয় জিনিষ কাঁধে নিয়ে চলতে থাকে। গাড়ি প্রবল জোরে এক্সেলারেট ক'রে গিয়রে ফেলে (এদেশের লরীগুলির স্পেশাল গিয়র দেওয়া থাকে) চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ এগোয়, আবার যেমন চড়াইয়ের ঠেলায় গতি হ্রাস হয় অমনি ঐ পেছনের দুজন লোক ছুটে এসে হাতুড়ি দুটো পেছনের চাকায় ঠেকা দেয়, আবার ব্রেকও কসা হয় (শুধু ব্রেকের কর্ম্ম নয়)। পরে ইঞ্জিন একটু জিরিয়ে নিয়ে ঐ রকম ফের চলে।

নতুন পথ—যাতে ঢাল কম, তৈরি হচ্ছে দেখলাম। কিন্তু উপস্থিত এই পথের কাছে আমাদের গাড়ীগুলো হার মানবার উপক্রম হ'ল। একখানা তো ক্লচ ভেঙে জখমই হয়ে গেল। তার যাত্রীরা সেপাইদের গাড়ীতে উঠলেন, সেপাইরা অন্যান্য গাড়ীতে এব

একটা লরীতে ঝুলতে ঝুলতে চলল। বেলা ছ'টা নাগাদ শ্রান্তক্লান্ত অবস্থায় আমরা কাজেরুণ শহরে পৌছলাম। শুনলাম শিরাজ যাওয়া সেদিনকার মত ঐ পর্য্যন্তই, কেন-না পরের পাহাড় আরও খারাপ, রাত্রে চলা একেবারেই সুবিধার নয়।

কাজেরুণে প্রথম গাছপালার সবুজ রং দেখতে পেয়ে, ক্রমাগত তৃণগুল্মহীন পাহাড়-প্রান্তর দেখার পর, চোখের আরাম হ'ল। শহরের যত লোক সারাদিন আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে বিকালে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন আমরা উপস্থিত। তারা সকলে ছুটে গেল কবির গাড়ীর দিকে। বাগ-এ-নজর নামে সুন্দর বাগানে আমাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে খানাপিনার বিরাট আয়োজন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডেকচিতে পোলাও মাংস রান্না হচ্ছে, বাগানে গাছের সারির নীচে ত্রিশ-চল্লিশ হাত লম্বা টেবিল সাজান, তাতে ফল মিষ্টি পানীয় যা রয়েছে তাতে ছোটখাট একদল সৈন্যের খোরাক হয়। খাবার সমস্তই পারসীক, তার মধ্যে একদিকে বিলাতী ক্রেস্ স্পিনাচ্, ট্রফল্, অন্যদিকে দেশী ধরণের মোরব্বা, ডালগোস্ত (মুসুরডালে দুম্বার মাংস), পুদিনার চাট্নি—এ সব ছিল। পোলাও রান্না হয়েছিল সুল্পো শাক দিয়ে, তার সঙ্গে অল্প নুন, জাফ্রান এবং ঘি, কিন্তু একেবারে ঝরঝরে। পারসীক জিনিষের মধ্যে 'আস্ক' (যবের ছাতু মেশান সুপ) এবং গাজ নামে মিষ্টি উল্লেখযোগ্য। গাজ্ হ'ল বাইবেলে উল্লিখিত "মান্না"। খেতে আমাদের গোলাপী রেউড়ীর মত—তিল বাদে। পানীয়ের মধ্যে ঘোলের চলতি এখানে খুব বেশী, নাম দুধ—দইও বেশ চলে, মস্ত্ নামে পরিচিত।

বাগ-এ-নজর প্রাচীন বাগান, চারিধারে কমলা ও বাতাবী লেবু, বাদাম, পিচ, আলু, খোবানি ও আখ্রোট গাছের সারি, মাঝখানে ফুলের বাগান। কমলালেবুর গাছ যে এত বড় হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। বাগানের ভিতরে চারধারে জলের পথ, পাহাড় থেকে প্রণালী ক'রে জল আনা। এইখানে বিরাট ভোজের পর আমরা রাত্রি কাটালাম। কবি ও প্রতিমা দেবীর জন্য শোবার ব্যবস্থা একরকম হয়েছিল। বাকী সকলের সৈনিক পন্থায় রাত্রি



হাফেজের কবরের পাশে রবীন্দ্রনাথ। লেখক পিছনে দাঁড়াইয়া

যাপন করতে হ'ল, কেন-না, এখানে আমাদের রাত্রে থাকবার কথা ছিল না। কিন্তু এখানকার লোকদের আতিথ্যের ত্রুটি কিছুমাত্র হয়নি, তাঁদের কর্ম্মকর্ত্তারা আমরা না-আসা পর্য্যন্ত উপবাসেই কাটিয়েছিলেন, রাত্রেও লেপকম্বল যা ছিল আমাদের দিয়ে অনেকে আগুনের পাশে কোনরকমে রাত কাটিয়েছিলেন। কবি এদের আদর-অভ্যর্থনায় মহা খুশী হয়ে বললেন, 'এই ত প্রাচ্যের প্রথা, এই অভ্যর্থনাতেই হৃদয়ের যোগ রয়েছে। আমি আপনাদের সুন্দর ভাষা বলতে বা বুঝতে অক্ষম, কিন্তু এই অভ্যর্থনা আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করছি। প্রাচীন পারস্যের আত্মার এই প্রকাশ।"

পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় আবার যাত্রারম্ভ। আবার সেই দুর্গম পাহাড়ের গায়ে খাঁজকাটা পথ, একেবারে মেঘ ফুঁড়ে আকাশে উঠে গেছে। তবে এবার পথের পাশে

কবরের পাশে বসলেন, গভর্ণর হাফেজের একখানি প্রাচীন বই থেকে কবিতা প'ড়ে এবং তার তর্জ্জমা ক'রে কবিকে শোনাতে লাগলেন। এখানে প্রথা আছে, মনে মনে একটা প্রশ্ন ভেবে হাফেজের বই খুলতে হয়। খোলা জায়গার ডান দিকের পাতার প্রথম কবিতার শেষ ছত্রে প্রশ্নের উত্তর না কি পাওয়া যায়। গভর্ণর এই প্রথার কথা কবিকে জানিয়ে বললেন, 'হাফেজকে প্রশ্ন করুন।' উত্তর এল, 'দ্বার খুলিতেছে।' কবির প্রশ্ন ছিল ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিরোধের বিষয়। এই উত্তর পেয়ে কবি হাফেজের উদ্দেশে কবরের দিকে নমস্কার করলেন।

মহিলা-সংবাদ

সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে চিত্র-প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী জাহান্ আরা চৌধুরী শিল্পকার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া পুরস্কৃত হইয়াছেন।

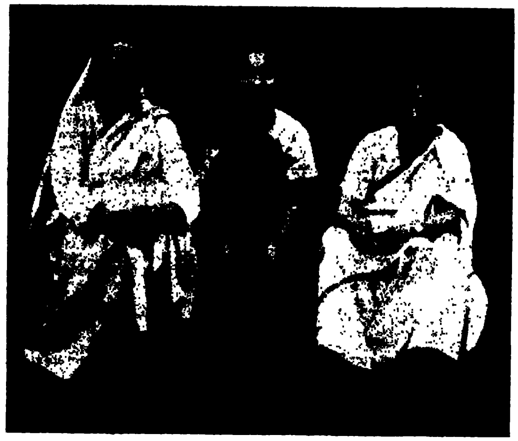


শ্রীমতী জাহান্ আরা চৌধুরী

—

কলিকাতা বেথুন কলেজের উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা সরোজিনী দত্ত, এম-এ ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ড্রামণ্ডের নিকট দুই বৎসর কাল উদ্ভিদ্-বিদ্যার গবেষণা করিয়া এম-এস-সি উপাধি পাইয়াছেন। ইঁহার কাজ অন্যান্য বিখ্যাত অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা দত্ত শীঘ্রই কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

রাওলপিণ্ডির ডাক্তার শ্রীযুক্তা সরস্বতী নন্দা মহাশয়া এল-আর-সি-পি, এম্-আর-সি-এস পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি অধ্যাপকগণের নিকট বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ভিতর তাঁহার কাজ শেষ হইয়া যাইবে।



বামে—শ্রীযুক্তা সরোজিনী দত্ত
মধ্যস্থলে—ডাঃ সরস্বতী নন্দা
দক্ষিণে—ডাঃ সুলোচনা

বোম্বাইয়ের ডাক্তার শ্রীমতী সুলোচনা শ্রীখণ্ডী, এম্-বি, বি-এস্ ম্যানচেষ্টারের বি-ডি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই দিল্লীতে তাঁহার পুরাতন

কার্য্যে (Women Medical Service) যোগদানের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীমতী শ্রীখণ্ডী কলিকাতার লেডী ডফরিন হাসপাতালে কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন।

—

কমলরাণী সিংহ গত ২৯এ জুলাই পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষা কৃতিত্বের



পরলোকগতা কমলরাণী সিংহ

সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি এম্-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কমলরাণী বিবাহিতা ছিলেন এবং গৃহকর্ম্মের মধ্যে অধ্যয়ন করিতেন।

এ বৎসর কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় শ্রীমতী ইন্দুমতী বক্সী বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও মহিলা পরীক্ষার্থিনীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি পার্লামেন্টের কেবিনেট-মেম্বর বাঙালী মহিলাদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম হইয়াছেন।



শ্রীমতী ইন্দুমতী বক্সী

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী, মিস্ ককা ও মিস্ বাট্‌লিওয়ালার বিবরণ গত মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবারে ইঁহাদের চিত্র দেওয়া গেল।



মিস্ ডিপু বাট্‌লিওয়ালা



শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী



মিস্ ডি, কুকা

(বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য



পরলোকগত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়



লস্ এঞ্জেলেস্-এ যে 'অলিম্পিক' ক্রীড়া হইবে
তাহার নারী কর্ম্মি-মণ্ডলী

ছেলেদের চিড়িয়াখানা—

বার্লিনের চিড়িয়াখানায় একটি শিশু-বিভাগ খোলা হইয়াছে। ডাঃ লুট্‌স্ হেক উহার প্রবর্ত্তনকর্ত্তা। এই চিড়িয়াখানায় শিশুরা জীবজন্তুর সহিত বিনাবাধায় পরিচিত হইবার সুযোগ পায় ও তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে। এই পরিচয় যে কত ঘনিষ্ঠ হইতে পারে সঙ্গের ছবি হইতে তাহা বোঝা যাইবে।



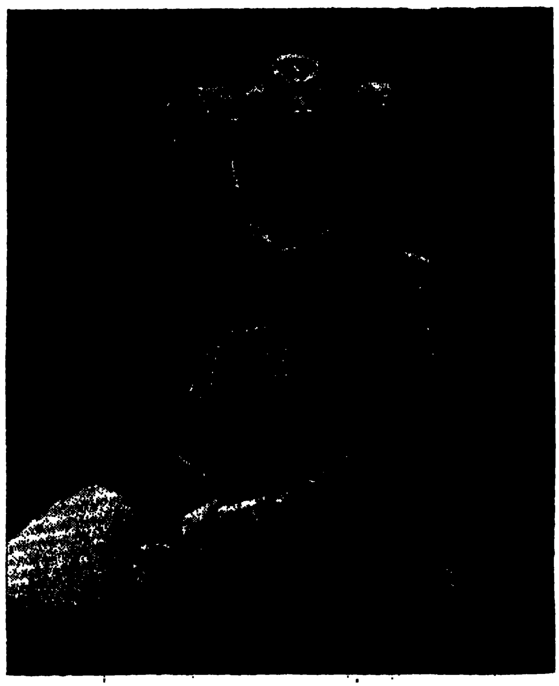
একটি বালক ও একটি বালিকা তিনটি ভালুক ছানাকে বোতল হইতে দুধ খাওয়াইতেছে। একটি কুকুর শাবকও আসিয়া ইহাতে ভাগ বসাইবার চেষ্টা করিতেছে



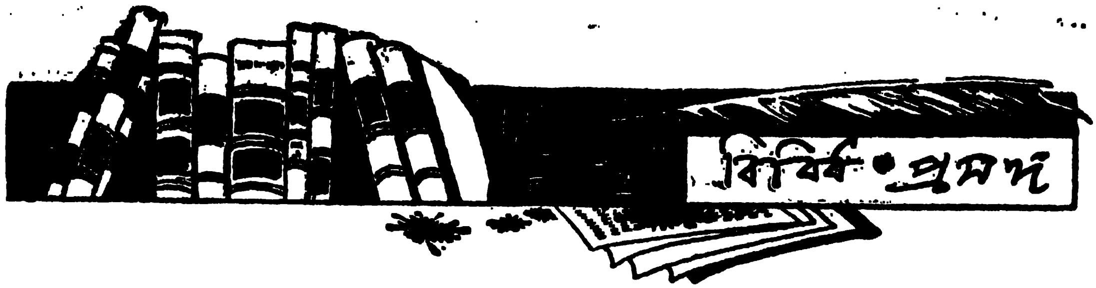
শিম্পাঞ্জী শিশু গাড়ী ঠেলিতেছে

ইউরোপে প্রথম জাপানী রাজদূত—

১৮৫৪ সনে জাপান প্রথমে ইউরোপে দূত প্রেরণ করে। এই দূত যে বেশে সে-দেশে গিয়াছিল তাহা এ-যুগের জাপানী দূত ও রাজ-কর্ম্মচারীদের লণ্ডন ও প্যারিসে প্রস্তুত ইউরোপীয় পোষাক হইতে স্বতন্ত্র। তখনও জাপান সামুরাই-এর সজ্জা ছাড়ে নাই।



সামুরাই বেশে ইউরোপে প্রথম জাপানী দূত



পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা

গত বৎসর, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, ফ্রান্সে "যুদ্ধ বা বিপ্লব" নামক একখানি বহি প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম Georges Valois—জর্জ্জ ভালোয়া।

এই পুস্তক এ বৎসর ডিক্‌স্ নামক একজন ইংরেজ লেখকের দ্বারা অনুবাদিত হইয়াছে।* প্রকাশকেরা এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"The thesis of this book is that society today is based on the right to make war, which is fundamentally the right of the strongest to take possession of the product of the labour of others. The present decade may find the world faced with the task of establishing a new warless order of society as the only way out of the present crisis. This must be the work of the producers, supported, not by force, but simply by a rovolution in men's way of thinking."

তাৎপর্য্য। "এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই, যে, বর্ত্তমানে মনুষ্যসমাজ যুদ্ধ করিবার অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা মূলতঃ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী লোকদের অপরের শ্রমজাত দ্রব্য দখল করিবার অধিকার। এখন যে বর্ষদশক চলিতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থা অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায় যুদ্ধবিহীন সমাজশৃঙ্খলা আবিষ্কার করিবার ভার পৃথিবীকে লইতে হইবে।"

স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে জেনিভায় মহাজাতি-সংঘ বা লীগ অব্ নেশুন্‌স্ স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও মনুষ্য-সমাজে যুদ্ধের অনুকূল মনোভাব যে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান এবং মাঞ্চুরিয়া দখল। পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিরা এই অভিযানের বিরোধিতার অভিনয় করিয়াছেন, প্রকৃত বিরোধিতা করেন নাই। কারণ জাপানের মনের ভাব যেরূপ, তাঁহাদেরও মনের ভাব সেই প্রকার।

দক্ষিণ আমেরিকায় ছোট দুটি দেশ বোলিভিয়া ও প্যারাগুয়ের মধ্যে যুদ্ধের দ্বারাও মানবসমাজের বর্ত্তমান ভিত্তি সম্বন্ধে ফরাসী লেখকের উক্তি প্রমাণিত হইতেছে।

এই যুদ্ধাভিমুখতা কেবল যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের পারস্পরিক ব্যবহারে লক্ষিত হয়, তাহা নহে, একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যেও দেখা যায়। সম্প্রতি জার্ম্মেনীতে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন উপলক্ষে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। কত জন নির্ব্বাচক কাহার পক্ষে তাহা দেখা নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য, বাহুবল কোন্ দলের বেশী তাহা স্থির করা উহার উদ্দেশ্য নহে। এই জন্য, বিশুদ্ধ যুক্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে নির্ব্বাচনক্ষেত্রে মারামারি-কাটাকাটির স্থান নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ মারামারি হইয়া থাকে এবং জার্ম্মেনীতে হইয়াছে। ইহা, "বলং বলং বাহুবলম্", প্রাচীন উক্তির নবীন দৃষ্টান্ত।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও অপরের প্রতি এই যুদ্ধাভিমুখতা লক্ষিত হয়। যেমন, আমেরিকায় নিগ্রো ইহুদী ও রোমান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে, ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে, ভারতবর্ষে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ইত্যাদি।

জাপানে, আমেরিকায়, ফ্রান্সে ও ইউরোপের অন্য কোন কোন দেশে এবং ভারতবর্ষে রাজনৈতিক কারণে মানুষকে যে হত্যা বা হত্যার চেষ্টা হইতেছে, তাহাও মানুষের যুদ্ধাভিমুখতার দৃষ্টান্ত।

ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত যুদ্ধাভিমুখতা একই মনোবৃত্তির পরিণাম। এই মনোবৃত্তি সমষ্টিগত ভাবে মহাজাতিতে মহাজাতিতে

* "Gaerre ou Revolution" by Georges Valois, Translated by E. W. Dickes and named "War or Revolution" in English. George Allen and Unwin, London.

(অর্থাৎ দেশে দেশে) কার্য্যতঃ প্রকাশ পাইলে তাহা যেমন দোষের বিষয়, একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ পাইলে তাহাও তেমনি দোষের বিষয়। আবার ব্যক্তিবিশেষ অন্য ব্যক্তিবিশেষকে বধ করিলে বা বধ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাও দোষের বিষয়।

এই জন্য সাফল্য লাভ করিতে হইলে সকল ক্ষেত্রে সকল রকমের যুদ্ধাভিমুখতা বা জিঘাংসার বিরুদ্ধে চেষ্টা চালাইতে হইবে।

যুদ্ধাভিমুখতার মূলীভূত মনোবৃত্তিকে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে কেবল যুদ্ধসজ্জা হ্রাস দ্বারা যে যুদ্ধের স্থায়ী উচ্ছেদ করা যাইবে না, তাহা আমরা শ্রাবণের প্রবাসীতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে, কোনও গবর্ন্মেণ্টকে, কোনও জাতিকে (নেশ্যনকে) এবং কোনও জাতির মানুষদিগকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা যাইবে না, করা উচিত নয়। যুদ্ধের ইচ্ছা থাকিলে, কামান বন্দুক শেল্ বোমা তলোয়ার সঙ্গীন প্রভৃতির অভাবে মানুষ কৃষি পণ্যশিল্প রন্ধনাদিতে ব্যবহৃত হাতিয়ার ও যন্ত্রাদি দ্বারা যুদ্ধ করিতে পারে; এবং তাহার অভাবে লাঠি, লাথি, ঘুঁষি, দাঁত ও নখের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে পারে। অতএব যুদ্ধের উচ্ছেদ করিতে হইলে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত যুদ্ধ জিনিষটা যে গর্হিত, এই বিশ্বাস সকলের মনে বদ্ধমূল করিতে হইবে।

যুদ্ধাভিমুখ মনোবৃত্তির একটা কারণ পরের ধনে লোভ। দিগ্বিজয়ী রাজার দিগ্বিজয় ইচ্ছা বা সাম্রাজ্য-বিস্তার দ্বারা নিজের গৌরববর্দ্ধন ইচ্ছা হইতে যুদ্ধ আজ-কাল হয় না। যে-সব জাতি পণ্যদ্রব্য উৎপাদন বেশী করে, তাহারা তাহা বিক্রীর জায়গা নিজেদের দেশের বাহিরে খোঁজে। পণ্যশিল্পে অনগ্রসর বড় একটা দেশের সহিত বাণিজ্য চালাইতে পারিলে এই সব জিনিষ বিক্রী করিয়া অনেক লাভ হইতে পারে। ক্রেতার জাতিকে যদি অধীন রাখা যায় এবং শিল্পে অনগ্রসর করা বা রাখা যায়, তাহা হইলে আরও সুবিধা। পণ্যশিল্পের কারখানায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে কাঁচা মালের দরকার। পণ্যশিল্পে অনগ্রসর কোন কোন বড় দেশ নিজেদের অধীন থাকিলে কাঁচা মাল সংগ্রহের সুবিধাও হয়। কোন কোন জাতি আবার অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন দ্বারা নিজেদের ঘনবসতি দেশকে অপেক্ষাকৃত বিরলবসতি করিতে চায়। এই অন্য দেশকে নিজেদের অধীন করিতে পারিলে উপনিবেশ স্থাপনের কাজটা চলে ভাল। জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল করিবার ইহা একটা কারণ।

ব্যক্তিগত ভাবে যে মানুষ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্ব অপহরণ করে, সে অপরাধী ও দণ্ডনীয়, এ বিশ্বাস সভ্য মানুষদের মনে জন্মিয়াছে। ফলে অধিকাংশ মানুষ চুরি করে না। কিন্তু জাতিগত ভাবে কোনও মানব-সমষ্টির পক্ষেও যে পরস্বাপহরণ দোষ, এ বিশ্বাস এখনও মানবসমাজে বদ্ধমূল হয় নাই, কিন্তু হওয়া দরকার। ঈশোপনিষদে আছে—

ঈশাবাস্যমিদংসর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

তাৎপর্য্য। জগতে যাহা-কিছু আছে তাহার মধ্যে জগদীশ আছেন। তাঁহার প্রদত্ত যাহা, তাহার দ্বারা ভোগ কর। কাহারও ধনে লোভ করিও না।

এই উপদেশ যেমন ব্যক্তিগত ভাবে, তেমনি সমষ্টিগতভাবে পালনীয়।

পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় সত্য কথা বলিবার লোকের বিশেষ আবশ্যক। সত্য উপলব্ধি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মবিষয়ক পক্ষপাতে দুষ্ট মনের কাজ নয়; ধনিক বা শ্রমিকের, কৃষক বা ভূম্যধিকারীর, শাসক বা শাসিতের, শাদা পীত কাল বা ধূসর জাতির অনুকূল বা প্রতিকূল মন লইয়া সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে সফলপ্রযত্ন হওয়া যায় না। অথচ আমাদের মন উক্তরূপ সব সংস্কার হইতে মুক্ত নহে। এই জন্য ঐ প্রকার সমুদয় সংস্কার হইতে মুক্ত মন লইয়া আবার জন্মিতে ইচ্ছা হয়। তাহা হইলে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবার সম্ভাবনা অধিক হইত।

কেবল সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলেই হইবে না। আমরা যদি স্বার্থের দাস হই এবং সত্য বলিবার সাহস যদি আমাদের না থাকে, তাহা হইলে সত্য জানিয়াই বা

কি ফল ? এই জন্ত এমন মন লইয়া জন্মিতে ইচ্ছা হয়, যাহা বিন্দুমাত্রও স্বার্থের বশ হইবে না, এবং সত্য প্রকাশ করিবার সাহস যাহার পূর্ণমাত্রায় থাকিবে।

কিন্তু এমন পুনর্জন্ম কি কাহারও হয় বা হইবে ?

যাহার সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানি না, সেইরূপ পুনর্জন্মের আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ইহজন্মেই যথাশক্তি সত্য জানিবার ও বলিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

—

প্লেগ এখনও আছে

আধুনিক সময়ে প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্লেগের আবির্ভাব হয়। বাংলা দেশে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব কখনও হয় নাই, কিন্তু অন্ত অনেক প্রদেশে হইয়াছিল। প্রাদুর্ভাব কয়েক বৎসর হইতে কোনও প্রদেশে হইতেছে না বটে, কিন্তু কোন বৎসরই ভারতবর্ষ প্লেগশূন্ত হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরেও এই রোগের আক্রমণ ও তাহা হইতে মৃত্যু হইতেছে। আজ ২৩শে শ্রাবণ ৮ই আগষ্ট যে সরকারী গেজেট অব ইণ্ডিয়া পাইয়াছি, তাহাতে ১৬ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে এই রোগের আক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা দেওয়া আছে। ঐ সপ্তাহে ২২৫ জন আক্রান্ত হয় এবং তাহাতে ১৪৩ জনের মৃত্যু হয়। গত বৎসর ঐ সপ্তাহে আক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮ ও ৪২ ছিল। গত পাঁচ বৎসরের (১৯২৭—৩১) গড় সংখ্যা ১৯৫ ও ১২২। এই অঙ্কগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, এ বৎসর গত পাঁচ বৎসরের চেয়ে প্লেগের প্রকোপ বেশী। আক্রমণ ও মৃত্যুসংখ্যা অবশ্ত ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশের পক্ষে কম। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে, অন্য এমন কোন সভ্য দেশ নাই যেখানে ৩৭ বৎসর ধরিয়া প্লেগ লাগিয়া আছে। এই রোগের একটা মূলীভূত কারণ দারিদ্র্য। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের আর একটি প্রমাণ, আমাদের দেশের লোকদের গড় পরমায়ু ২৩৷২৪ বৎসর। পাশ্চাত্য বহু দেশের গড় ৪৬ হইতে ৫০এরও উপর ; জাপানেরও প্রায় ঐরূপ।

—

"মণিরামপুরে হিন্দুদের দুরবস্থা"

এই শিরোনামের নীচে 'বঙ্গবাণী'তে মুদ্রিত নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি পড়িয়া আমরা সাতিশয় দুঃখ অনুভব করিতেছি :—

সংবাদপত্র পাঠকগণ যশোহর সদর মহকুমা বিশেষতঃ মণিরামপুর থানার অবস্থা অনেকটা অবগত আছেন। সম্প্রতি ইহা নারী-হরণের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। এখানে উপর্য্যুপরি কয়েকটি নারী-হরণ সম্পর্কে পাঁজিয়া হইতে মহকুমা হিন্দু সভার কর্ম্মিগণ প্রায় সমগ্র থানা পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দুদের যে দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। প্রকাশ, ঐ থানায় বহুদিন হইতে নির্ব্বিবাদে হিন্দু নারী-ধর্ষণ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু নানা কারণে তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। এক একটি গ্রামে ২।৪ বা ৮।১০ ঘর হিন্দুর বাস—তাহাও দ্রুত লোপ পাইতেছে। হিন্দুরা ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, নৈরাশ্ত ও উৎসাহহীনতার প্রতিমূর্ত্তি ও কাপুরুষ। ইহারা সর্ব্বপ্রকার আত্মসম্মান-জ্ঞানবর্জ্জিত, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশূন্ত এবং বিচ্ছিন্ন। অত্যাচার ইহাদের এমনি সহিয়া গিয়াছে, কোনও নারীর উপর অত্যাচার হইলে ইহারা বিশেষ কিছু অসাধারণ ব্যাপার মনে করে না ; এবং কোনও প্রকার গোলমাল না করিয়া নীরব থাকে।

মণিরামপুর এবং তাহারই মত দুরবস্থাপন্ন আরও অনেক গ্রামের হিন্দুদের সাহায্যার্থ ও তাহাদের মনে সাহস ও আশার সঞ্চারের জন্য বিশাল হিন্দু সমাজ কি করিতে পারেন, তাহা সকলেরই ভাবা উচিত এবং যথাসম্ভব শীঘ্র কার্য্যতঃ কিছু সদুপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

—

চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় করাচীতে মহাত্মা গান্ধীর নামে নামিত মিউনিসিপ্যাল উদ্যানের অধ্যক্ষ ছিলেন। গত ৫ই আগষ্ট হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়স আনুমানিক ৫০ বৎসর হইবে, কিন্তু দেখিলে তাহা মনে হইত না। করাচীর ইংরেজী দৈনিক সিন্ধ অবজার্ভারে তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িকতার এবং বাঙালী ও সিন্ধী সকলের সহিত সদ্ভাবের প্রশংসা মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ কাগজে দেখিলাম, তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ, উদ্যানরচনাদক্ষতা ও পরিশ্রমে করাচীর গান্ধী উদ্যান ও অন্তান্ত কোন কোন উদ্যান ও পার্ক সুশোভিত হইয়াছিল। শহরটিরও শোভা-বর্দ্ধন তিনি করিয়াছিলেন। সিন্ধুদেশের হায়দরাবাদ শহরও তাঁহার দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তিনি করাচীর "রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও নাট্য সমিতি"র সহিত সংযুক্ত

ছিলেন, এবং সিন্ধুদেশের ন্যাচারাল হিষ্ট্রী সোসাইটীর সভ্য ছিলেন। করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় আমরা তাঁহার সহিত পরিচিত হই। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী রবীন্দ্রনাথের পারস্যযাত্রা উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে শ্রীমান্ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় পারস্যযাত্রার পথে তাঁহাদের সৌজন্যে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা হইবার কথা ছিল। কিন্তু তখন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় উহা স্থগিত রাখা হয়। সম্প্রতি যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছেন। আর্টস্ ফ্যাকালটির ক্লাবেও অধ্যাপকগণ তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন। উভয় সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে তিনি অনেক স্মরণীয় কথা বলিয়াছেন।

তিনি নিজে যে বাল্যকালে স্কুলের প্রতি বীতরাগ ছিলেন, এই কথাটির আভাস বা উল্লেখ তাঁহার কোন কোন বক্তৃতায় থাকে। বক্ষ্যমান সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেও তাহা ছিল। তাহাতে স্কুলপলাতক নির্ব্বোধ ছাত্রদের মনে হইতে পারে কি-না, যে, স্কুল বয়কট করা রবীন্দ্রনাথ হইবার একটা সোজা উপায়, তাহা আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু স্কুলের সহিত বাল্যকালে তাঁহার আড়ি সম্বন্ধে কবি যাহা বলেন, তাহা হইতে যদি কেহ মনে করে, যে, তিনি লেখাপড়া শিখিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে কম পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে, রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে নিজের প্রতি অনিচ্ছাকৃত অবিচার করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই, যে, বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য তিনি বাল্যকালে সেইরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে পড়িয়াছিলেন, বাংলা স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষা পাস করিবার জন্য যেরূপ যত্নসহকারে উহা পড়িয়া থাকে। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে কম পড়েন নাই। ইংরেজী বহির অনুবাদ তিনি কৈশোরে যেমন করিতেন, তাহার মত পরিশ্রম করিয়া কয় জন ছাত্র সেরূপ করেন জানি না। বিদ্যার নানা শাখার এত বেশীসংখ্যক বহি তাঁহার মত যত্ন করিয়া পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত অল্পসংখ্যক লোকেই পড়িয়াছেন। সুতরাং পড়াশুনা না করা, পরিশ্রম না করা, রবীন্দ্রনাথ হইবার একটা উপায় নহে। অবশ্য তাহা বলা কবিরও অভিপ্রায় নয়।

তিনি বলিয়াছেন, শুধু প্রবেশিকায় নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সব রকম শিক্ষাতেও বাংলা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমরা আগে আগে যাহা বলিয়াছি তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম "বিশ্ববিদ্যালয়ে নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত বাংলা চলা উচিত।" তাহার সপক্ষে যুক্তি এবং নজীরও আমরা ঐ সংখ্যায় দিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা যে আমাদের মাতৃভাষার মধ্য দিয়া দেওয়া উচিত এবং তাহা করা যে অসাধ্য নহে, তাহা বোম্বাইয়ে গত জুন মাসে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় আমার অভিভাষণে আমি দেখাইয়াছিলাম। ঐ বক্তৃতা জুলাই মাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজে ছাপা হইয়াছে।

—

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপকতা

রবীন্দ্রনাথ যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক দুই বৎসরের জন্যও হইয়াছেন, তাহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু যিনি একদা স্তর উপাধি বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার চাকুরির মঞ্জুরী বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্মেণ্টের নিকট লইতে হইবে, ইহা বাঙালী জাতির পক্ষে সম্মানকর নহে। তাঁহাকে যে বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই পারিশ্রমিকে রীডার নিযুক্ত করিলে গবর্মেণ্টের অনুমোদন চাহিতে হইত না। তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করিবেন। কিন্তু ইচ্ছা করিলে বাংলা শব্দতত্ত্ব এবং বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধেও তিনি অনেক নূতন কথা বলিতে পারেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন অন্য কেহ বাংলায় শব্দতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিতেন না, তিনি তখন তাহা করিয়াছিলেন। বাংলা

এম্‌-এ ক্লাসের ছাত্রেরা তাঁহাকে এই সব বিষয়ে কিছু বলিতে রাজী করিতে পারিলে লাভবান্ হইবে। শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা আছে। তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে কীট্‌স্ ও শেলীর কলেজপাঠ্য ইংরেজী কবিতা কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, তাহা আমরা নিজে শুনিয়া তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্যের বিষয় জানি। বাংলা এম্‌-এ ক্লাসের ছাত্রেরা তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা যদি তাঁহার কাছে পড়িতে চায় এবং তিনি যদি তাহাদিগকে পড়ান, তাহা হইলে তাহারা উপকৃত হইবে।

তাঁহার দক্ষিণার কথাটা যে প্রকারে সেনেটের অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই। "রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক" দীনেশচন্দ্র সেনের বেতনের অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হইবে বলিয়া তাঁহাকে নীচু দরের এবং দীনেশবাবুকে তাঁর চেয়ে উঁচু দরের মানুষ মনে করিবে, এমন মূর্খ সম্ভবতঃ বাংলা দেশে নাই। তাহা হইলেও টাকা যখন দেওয়াই হইবে, তখন পূরা টাকাই তাঁহাকে দিলে তাঁহার সম্মান রক্ষিত হইত। কোন কাজ না করিয়া কিংবা রবীন্দ্রনাথ যাহা করিবেন তাহা অপেক্ষা কম কাজ ও নিকৃষ্ট কাজ করিয়া অন্য কোন কোন অধ্যাপক তাঁর চেয়ে বেশী টাকা পাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বস্তুতঃ দীনেশবাবুর জায়গায় নিযুক্ত হন নাই। কিন্তু দীনেশবাবুর বেতনের বাকী অংশে আরও কিছু টাকা যোগ করিয়া যাঁহাকে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত করা হইবে, তাঁহাকে দীনেশবাবুর চেয়ে নীচু দরের লোক কেহ মনে করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া চলিবে না। এরূপ একটা অসম্মানকর অনুমান সত্ত্বেও আজকালকার আর্থিক অসচ্ছলতার দিনে এই চাকরি লইবার লোকের অভাব হইবে না।

প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য এখন হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষায় অনেক পাঠ্যপুস্তক লেখাইবেন। এরূপ সময়ে ভাষা বিষয়বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ বিশেষ কাজে লাগিবে।

—

তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জন্য হাতপাখা

আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যে সকল লোককে জেলে পাঠাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অনেক রকম দুঃখ ভোগ করিতে হয়। গরমের সময় হাতপাখা না-পাওয়া নিশ্চয়ই একটা অসুবিধা; কিন্তু তাহা তাঁহাদের নিদারুণ দুঃখগুলির অন্তর্গত নহে। কিন্তু এ অসুবিধাটা দূর করাও জেলের নিয়মবহির্ভূত। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র এই কথা বলিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন, জেলের নিয়ম অনুসারে কয়েদীরা পরস্পরের গায়ে ফুঁ দিয়া পরস্পরকে ঠাণ্ডা করিতে পারেন কি-না। তাহা নিয়মবিরুদ্ধ না হইতেও পারে। কোঁচার কাপড় একটু খুলিয়া তাহা দ্বারা বাতাস করা চলে কি-না, এরূপ একটা ইঙ্গিত করা চলিত; কিন্তু কয়েদীদিগকে প্রায় জাঙ্গিয়ার মত খাট পাজামা পরিতে দেওয়া হয়, তাঁহাদের কোঁচা বলিয়া কোন বালাই নাই। মহিলা কয়েদীদিগকে যাহা পরিতে দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহাদের ভব্যতা রক্ষা হয় না শুনিয়াছি। সুতরাং শাড়ীর আঁচলের বাতাস মহিলা বন্দীরা খাইতে পান, মনে হয় না।

—

হিন্দু রাজও নয়, মুস্‌লিম রাজও নয়

ব্রিটিশ মন্ত্রীরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদগুলি ও অন্যান্য মূল্যবান পদার্থগুলি কিরূপ ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া দিবেন, তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া কিছুদিন হইতে গুজব চলিতেছে। তাহাতে অনেকে বিনিদ্র হইয়াছেন। মুসলমানদের অনেকে বলিতেছেন, প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদের চৌদ্দ দফা দাবি মঞ্জুর না করিলে তাঁহারা হিন্দু রাজত্ব সহ্য করিবেন না, এবং এখনও মামুদ গজনবীর বংশধরেরা ও উত্তরাধিকারীরা বাঁচিয়া আছে, তাহারা লড়িবে। হিন্দুরাও হয় বলিতেছেন, নয় মনে মনে ভাবিতেছেন, মুসলমান রাজত্ব অসহ্য হইবে। শিখরা ত একেবারে আগে হইতেই রাগিয়া আগুন! তাঁহারা বলিতেছেন,

"যে-মুসলমানদিগকে আমরা যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পঞ্জাবে প্রভুত্ব করিয়াছি, তাহাদের প্রভুত্ব কখনই সহ্য করিব না।" বিস্তর শিখ এই মর্ম্মের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পঞ্জাবে মুসলিম প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে তাহার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য এক লক্ষ শিখ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিবার আয়োজন হইয়াছে।

কিন্তু একটা কথা কেহই মনে রাখিতেছেন না। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে অমিল অসদ্ভাব বিরোধ এবং তৎসমুদয়ের ক্রমবর্দ্ধমানত্ব ইংরেজপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ও উহার দীর্ঘকালস্থায়িতার একটা প্রধান কারণ। ইহাও সহজে বুঝা যায়, যে, ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্বের অবসান দুই প্রকারে হইতে পারে—প্রথম ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে অমিল অসদ্ভাব ও বিরোধ দূর হইয়া ঐক্য ও সদ্ভাব স্থাপিত হইলে, দ্বিতীয় কোন এক সম্প্রদায় ইংরেজ-প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিলে। কিন্তু প্রথম অবস্থাটা ঘটে নাই বলিয়াই ত ব্রিটিশ মন্ত্রীদের হাতে তথাকথিত মধ্যস্থতা ও ভাগবাটোয়ারা করিবার সুবিধা গিয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কোন সম্প্রদায়ই ইংরেজপ্রভুত্বের পরিবর্ত্তে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই। সকল সম্প্রদায়ের এই শক্তিহীনতার সময়ে ইংরেজ হয় হিন্দুকে নয় মুসলমানকে রাজা করিয়া ভারতবর্ষের মত এত বড় একটা লাভের জমিদারী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, ইংরেজকে এমন মহানুভব আহাম্মক মুসলমান বা হিন্দু কি প্রকারে মনে করিতে পারেন, জানি না।

বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুরাজ বা মুসলমানরাজ কিছুই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, হইবে না। ইংরেজরা কাহারও হাতে রাজত্ব তুলিয়া দিতে পারে না, দিবে না। তাহারা নিজেরাই প্রভু থাকিতে চায় ও থাকিবে; কেবল অবস্থাবিশেষে ও স্থলবিশেষে কখনও কোথাও হিন্দু দ্বারা অন্য সময়ে অন্যত্র মুসলমান দ্বারা নিজেদের কার্য্যসিদ্ধি করিবে, এবং যখন যেখানে যাহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে সে তখন সেখানে আজ্ঞাকারী ভৃত্যের বকশিশ পাইবে।

স্বরাজের মানে নানা রকম। কোন দেশ সেই দেশের ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা, শ্রেণী বা সম্প্রদায়বিশেষের দ্বারা, কিংবা সকল লোকের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হইলে, প্রত্যেক রকম শাসনকেই স্বরাজ বলা যাইতে পারে। কোন রকম স্বরাজই ভারতবর্ষে স্থাপিত করিবার ইচ্ছা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের আছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। রাজত্বের, প্রভুত্বের, যাহা যাহা একান্তপ্রয়োজনীয় অঙ্গ ও অংশ, তাহার প্রত্যেকটিতে চূড়ান্ত ক্ষমতা "সেফগার্ড" নাম দিয়া ইংরেজরা আপনাদের হাতে রাখিতে চায়।

অতএব সকলে আশ্বস্ত হউন—ইংরেজ-রাজত্বের পরিবর্ত্তে হিন্দু-রাজত্ব বা মুসলমান-রাজত্ব স্থাপিত হইবে না। ইংরেজদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ভবিষ্যতে প্রভেদ এই হইবে, যে, অন্যায় অবিচার অত্যাচার উপদ্রব ঘটিলে তাহার দোষটা সময়বিশেষে, অবস্থাবিশেষে ও স্থলবিশেষে প্রয়োজনমত হিন্দুদের বা মুসলমানদের কিংবা সমুদয় ভারতীয়ের উপর আরোপ করা চলিবে।

তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা রাজনৈতিক বন্দী

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে-সব প্রস্তাব বক্তৃতা তর্কবিতর্ক ও প্রশ্নোত্তর হয়, তাহা সপ্তাহে সপ্তাহে মুদ্রিত হয়। আগে খবরের কাগজের সম্পাদকেরা অনেকে তাহা বিনামূল্যে প্রতি সপ্তাহে পাইতেন, এখন দাম দিয়া কিনিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলেও পাইতে অসঙ্গত বিলম্ব হয় না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তর্কবিতর্ক বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর ছাপা হয়, কাগজের দাম ছাপাই খরচ সেলাইয়ের খরচ যাহা হইবার তাহা হয়। কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে এক এক খণ্ড বিতরিত বা বিক্রীত হয় না, একেবারে এক এক বৃহৎ ভল্যুম্ হইয়া বাহির হয়। তাহাও এত বিলম্বে হয়, যে, চলতি বিষয়ের আলোচনায় সেগুলা কোন কাজে লাগে না, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাজে লাগিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থার ও বিলম্বের অসুবিধা অনেক। দৈনিক কাগজে সমুদয় বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক এবং প্রশ্নোত্তর বাহির হয় না—স্থানাভাবে তাহা হইতে পারে না,

অর্ডিন্যান্স এবং আইনের ভয়ও আছে। এই জন্য কৌন্সিলে ঠিক্ কি হয় বুঝা যায় না। অথচ বেঠিক বা অযথেষ্ট রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কিছু লিখিলে তাহাতেও বিপদ ঘটিতে পারে। তাহা সত্ত্বেও, কাগজে যাহা বাহির হয়, তাহার উপর কিছু লেখা উচিত।

দৈনিক কাগজে দেখিলাম, কৌন্সিলে স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র বলিয়াছেন, যে, ১৪৭ জন তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা রাজবন্দী আছেন, তাঁহারা সকলে ভদ্রঘরের মেয়ে; কিন্তু আবার এ কথাও বলিয়াছেন, যে, তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা জানা নাই বলিয়াই জেলের পোষাক সম্বন্ধে কোনও সুব্যবস্থা করা হয় নাই। এরূপ উত্তর তিনি দিয়া থাকিলে তাহা অদ্ভুত বটে। ভদ্রমহিলাদের পরিচ্ছদের জন্য, শাড়ী শেমিজ ও কোন রকম একটা জামার জন্য, নানা রকম দামের কাপড় ব্যবহৃত হইতে পারে, জামার ফ্যাশানটারও প্রভেদ হইতে পারে, কিন্তু এই জিনিষগুলা সাধারণতঃ ধনী নির্ধন সকলেরই চাই। বিধবা বৃদ্ধারা কেহ কেহ হয়ত কেবল রঙীন পাড়বিহীন শাড়ীই পরেন, কিন্তু তাহাও লম্বায় চৌড়ায় ভব্যতা রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া দরকার। কাহারও সামাজিক অবস্থা না জানিলেও এই সব জিনিস দেওয়া যায়, এবং যে গবর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও বোমা প্রভৃতি আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তাহার পক্ষে ১৪৭টি মহিলার সামাজিক অবস্থা জানা খুবই সহজ—অন্ততঃ বাঙালী স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্রের পক্ষে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত সহজ হইত এবং তাহা করা তাঁহার কর্ত্তব্যও ছিল।

—

দমদমার "বিশেষ" জেল

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের উত্থাপিত দমদমায় "বিশেষ" জেলের ব্যবস্থার নিন্দাসূচক প্রস্তাব উপলক্ষ্যে কৌন্সিলে স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র অস্বীকার করেন নাই, যে, ঐ জেলে বন্দীর সংখ্যা অনুযায়ী যথেষ্ট স্থান নাই, যথেষ্ট খাদ্য তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই, হাসপাতাল ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত যথেষ্ট ছিল না, পায়খানা যথেষ্টসংখ্যক —ভদ্রতারক্ষার জন্যও যথেষ্টসংখ্যক—ছিল না। কিন্তু তাঁহার মতে এর চেয়ে কিছু ভাল বন্দোবস্ত করিতে গেলে খরচ বাড়িয়া যাইত! মানুষকে পশুর অধম ব্যবস্থায় রাখা অধর্ম; মানুষের মত ব্যবস্থা যদি জেল-বিভাগ করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ বিভাগের সর্ব্বোচ্চ ও উচ্চ পদের কর্ম্মচারীদের বেতন প্রয়োজনমত কমাইয়া সুব্যবস্থা করা উচিত। ভারতবর্ষে উচ্চপদগুলির বেতন অত্যন্ত বেশী। সকল কয়েদীই—জঘন্য দুর্নীতির কাজ করিয়া যাহারা জেলে গিয়াছে তাহারাও—যথেষ্ট খাদ্য পাইতে অধিকারী এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও মনুষ্যোচিত লজ্জা-রক্ষার অনুকূল ব্যবস্থায় বাস করিতে অধিকারী। সুতরাং রাজনৈতিক যে-সব "অপরাধ" দুর্নীতিমূলক নহে, কেবল শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য যেগুলি "অপরাধ" বলিয়া গণিত হইয়াছে, তাহার জন্য যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট খাদ্য না-দেওয়া এবং স্বাস্থ্যহানিকর ও লজ্জাকর অবস্থায় রাখা কখনও সুশাসনের এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অনুকূল হইতে পারে না।

—

টেরারিজ্‌ম্‌ দমনের আইন

টেরারিজ্‌ম্‌ দমন ও নির্মূল করিবার জন্য একটি আইনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে। উহা নিশ্চয়ই শীঘ্র আইনেও পরিণত হইয়া যাইবে। নির্দ্দোষ লোকদের উপর অত্যাচার না হইয়া যদি ঐ আইন দ্বারা সরকারী ও বেসরকারী উভয়বিধ টেরারিষ্টদের দমন উহা দ্বারা হয় তাহা হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব। সেরূপ দমন যে আইন দ্বারা অনেকটা বা কতকটা না হইতে পারে, এমন নয়। কিন্তু টেরারিজমের উচ্ছেদ কেবল কোন প্রকার শাস্তি-বিধায়ক আইন দ্বারা কোথাও হয় নাই, বঙ্গেও হইবে না। উচ্ছেদের জন্য মূল রাষ্ট্রবিধির সুপরিবর্ত্তন, নৈতিক সংশিক্ষা, আর্থিক উন্নতি এবং বেকার সমস্যার সমাধান আবশ্যক। এবং আমরা আগে আগে বলিয়াছি, ও বর্ত্তমান সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গের গোড়াকার নিবন্ধিকাতেও লিখিয়াছি, যে, মানুষের সমষ্টিগত যুদ্ধাভিমুখতা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত না-হইলে, ব্যক্তিগত যে-যুদ্ধাভিমুখতাকে টেরারিজম্ বলা হয়, তাহাও অন্তর্হিত হইবে না।

—

সরকারী কোন কোন লোকের টেরারিজ্‌ম্‌ আছে কিনা

বেআইনী অত্যাচার দ্বারা যদি কোন সরকারী লোক কার্য্য উদ্ধার করিতে চায়, তাহা হইলে আমরা সেই রকম লোককে সরকারী টেরারিষ্ট বলি। সর্ব্বসাধারণের এবং আমাদেরও বিশ্বাস এরূপ লোক সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে আছে। সম্ভবতঃ, সরকারী তদন্তের ফলে বঙ্গের গবর্ণরেরও ঐরূপ ধারণা জন্মিয়াছে—যদিও তিনি তাহা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেন নাই। তাঁহার সফর উপলক্ষ্যে একটি বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নমুদ্রিত কথাগুলি আমাদের অনুমানের ভিত্তীভূত।

"For a force which is primarily responsible for carrying out the law to take the law into its own hands must always be indefensible. More than that, such lapses, if condoned, would quickly undermine and destroy the discipline and the morale of the force. Nothing in the nature of reprisals will ever be tolerated so long as I am associated with the Government of the province.

যদি গবর্ণর বাহাদুর বুঝিয়া থাকেন, যে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে কতকগুলা সরকারী লোক "প্রতিশোধ" ("reprisals") লইয়াছে, তাহা হইলে অত্যাচারীদের শাস্তি এবং অত্যাচরিত সর্ব্বস্বান্ত লোকদের ক্ষতিপূরণ হইবে কি?

—

ভারত-গবর্মেণ্টের নূতন ঋণ

ভারত-গবর্মেণ্ট আবার ২৫ কোটি টাকা ঋণ লইতেছেন। অথচ, ভারতসচিব স্যর সামুয়েল হোর বলিয়া আসিতেছেন, যে, ভারতবর্ষের ক্রমশই অবস্থার উন্নতি হইতেছে। এরূপ ক্রমোন্নতি হইতে ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন!

—

খালাসের পর গ্রেপ্তার

সম্প্রতি বাংলা গবর্মেণ্টের অন্যতম সদস্য রীড সাহেব বলিয়াছেন, যে, বিচারের ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজরা যাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এরূপ ৪৫ জন লোককে পুলিস বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঐ আইন অনুসারে তাহা করা চলে বটে, কিন্তু বিচারে যাহারা খালাস পায়, তাহাদিগকে অব্যবহিত পরেই বিনাবিচারে গ্রেপ্তার করিলে কার্য্যতঃ ইহাই বলা হয়, যে, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটদের রায়ের কোন মূল্য নাই। এই প্রকারে পরোক্ষ ভাবে আদালতের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন না-করিয়া যদি সকারণে বা অকারণে সন্দেহভাজন লোকদের বিচার না-করাইয়া সোজাসুজি তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে আদালতগুলির সম্মান রক্ষা পায়।

—

ডেটেন্যুদের ভাতা

বিনা বিচারে যাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে যে ভাতা দেওয়া হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া বিলাতে পার্লেমেণ্টে বক্তৃতা দ্বারা এবং বিলাতে ও এদেশে ইংরেজদের খবরের কাগজের লেখা দ্বারা এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা হইয়াছে, যে, ডেটেন্যুদিগকে খুব বেশী টাকা দিয়া তাহাদিগকে ও তাহাদের পরিবারবর্গকে যেন রাজার হালে বা জামাই-আদরে রাখা হয়। কিন্তু সত্য কথা এই, যে, ঐ দুইজনকে যাহা দেওয়া হয় তাহা ছাড়া অন্যদের ভাতা সামান্য, এবং ঐ দুইজন যাহা পান, তাহা তাঁহাদের রোজগার অপেক্ষা অনেক কম। সাধারণতঃ ডেটেন্যুরা যাহা পান, তাহাতে তাঁহাদের খরচ কষ্টে চলে। বিস্তর ডেটেন্যুর পরিবারবর্গকে সরকারী কোন ভাতা না দেওয়ায় তাহাদের ভীষণ অন্নকষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহাদের পরিবারবর্গ ভাতা পান, তাহাও সামান্য। সমুদয় ডেটেন্যুর নাম, ভাতা ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের জনসংখ্যা ও ভাতার একটি তালিকা যদি গবর্মেণ্টের নিকট হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে এবিষয়ে সর্ব্বসাধারণের নির্ভুল ধারণা জন্মিতে পারে। বিনা বিচারে মানুষকে বন্দী করিয়া রাখিয়া তাহার পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না-করা কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।

—

বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা

বাংলা দেশে এবং অন্যান্য প্রদেশেও মানুষের মন এখন রাজনৈতিক কারণে অশান্ত এবং অর্থচিন্তায় বিব্রত।

তাহা সত্ত্বেও যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুদিবস লোকে ভুলিয়া যায় নাই, ইহা আহ্লাদের বিষয়। তিনি নানা মহৎ ও সৎকার্য্যের জন্য প্রাতঃস্মরণীয়। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের পুনঃপ্রবর্ত্তন তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতকাল অপেক্ষা এখন বঙ্গের অনেক জেলায় হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ অনেক বেশী হইতেছে। আরও বেশী হওয়া উচিত। যে-সকল বালিকা বিধবা হয়, তাহাদের সকলেরই বিবাহ দেওয়া উচিত। যাহারা তাহাদের চেয়ে অধিক বয়সে বিধবা হয়, তাহাদেরও বিবাহ করিবার ইচ্ছা ও প্রয়োজন থাকিলে এবং বিবাহার্থী পাত্র পাওয়া গেলে তাহাদেরও বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং বঙ্গে নানাস্থানে অনেক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারও আগেকার চেয়ে বেশী হইতেছে।

সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভা

বঙ্গের ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জাগরণের জন্য সুরেন্দ্রনাথ স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। এ বৎসর আলবার্ট হলে তাঁহার স্মৃতিসভায় সভাপতিরূপে আমি এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলাম, যে, অন্যান্য বৎসর এরূপ সভার কোন বিজ্ঞাপন বা চিঠি না পাওয়ায় আমার ধারণা হইয়াছিল, যে, উদ্যোক্তারা উদারনৈতিক বা মডারেট ছাড়া অন্য কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন না, এখন সেরূপ বিজ্ঞাপন পাওয়ায় সভায় যোগ দিয়াছি; রাজনৈতিক মত-নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিমন্ত্রণ হওয়া উচিত। আমার এই কথাগুলি দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। সভাভঙ্গের পূর্ব্বেই উহার অন্যতম উদ্যোক্তা অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র রায় আমাকে জানান, যে, প্রতিবৎসরই সকলকেই আহ্বান করা হয়, এবং আমি যে ইতিপূর্ব্বে আহ্বান পাই নাই, তাহা আকস্মিক। ইহা অবগত হইয়া আমি সভাভঙ্গের পূর্ব্বে তাহা সভাস্থ সকলকে জানাইয়াছিলাম। সম্ভবতঃ তখন দৈনিক কাগজগুলির রিপোর্টারেরা চলিয়া যাওয়ায় আমার শেষের এই কথাগুলি কাগজে বাহির হয় নাই।

চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

৭২ বৎসর বয়সে সম্প্রতি চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আলিপুর জজ আদালতের উকীল ছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম আচার্য্য বলিয়াই তিনি অধিকতর পরিচিত ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করেন এবং তাহাতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবাসী, প্রকৃতি, সুপ্রভাত ও সম্মিলনীতেও তাঁহার লেখা বাহির হইয়াছিল।

দুর্গাদাস লাহিড়ী

বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রধানতঃ বেদের অনুবাদক এবং "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক বলিয়া পরিচিত। তিনি আরও অনেক বহি লিখিয়াছিলেন, "অনুসন্ধান" পত্র তিনি ১২৯৪ সালে প্রকাশ করেন। উহা প্রায় ১৮ বৎসর চলিয়াছিল। সম্প্রতি প্রায় আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিশ্বভারতী-সংবাদ

গত জুলাই মাস হইতে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে নানা সংবাদ দিবার জন্য ইংরেজীতে "বিশ্বভারতী নিউস্" নামক একটি মাসিক সংবাদপত্র শান্তিনিকেতন হইতে বাহির হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত এক টাকা। এরূপ একটি পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। পূর্ব্বে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় এইরূপ সংবাদ থাকিত। তাহা অনেক বৎসর হইল উঠিয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতী নিউসে ছোট ছোট প্রবন্ধও আছে। জুলাই সংখ্যায় ডাক্তার টিম্বার্সের লেখা গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান পদ্ধতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি গ্রামহিতৈষীদের কাজে লাগিবে।

একটি সংবাদে দেখিলাম, ময়ূরভঞ্জ রাজ্য আট জন শিক্ষার্থীকে শ্রীনিকেতনে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা সেখানে চারি মাস থাকিয়া সমবায় (Co-operation) এবং গ্রাম-পুনর্গঠন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করিবেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের এই উদ্যোগিতা প্রশংসনীয়। ইহা শ্রীনিকেতনের কৃতিত্বেরও পরিচায়ক।

ছাত্রদের স্বদেশী-সংঘ

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি দেশী জিনিষের, বিশেষতঃ বাঙালীর কারখানায় উৎপন্ন জিনিষের, একটি মিউজিয়মের আয়োজন করিয়াছেন। স্বদেশী-সংঘও স্বদেশী-জিনিষের একটি স্থায়ী প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। ছাত্রদের স্বদেশী-সংঘ নিজেদের মধ্যে ও দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে দেশী জিনিষের ব্যবহার চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যে-সকল কারখানাজাত জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী হয়, তাহা আমাদের দেশে যাহাতে প্রস্তুত হয়, তাহার চেষ্টাও তাঁহারা করিবেন ও করাইবেন। এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার আমদানী বিদেশ হইতে হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়, সকলেরই দেশী কেনা উচিত। যেমন কাপড়। সূতী, রেশমী ও পশমী কাপড় ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়। তাহাই আমাদের সকলের কেনা উচিত।

—

ইংরেজদের মাতৃভাষাবিকৃতি-অসহিষ্ণুতা

বর্ত্তমান ভাদ্রের প্রবাসীর "মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "জানি কোনো মৌলবী ছাহাব প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ইংরেজী সাহিত্যিক ভাষার এ রকম মুসলমানীকরণের চেষ্টা করবেন না। করলেও ইংরেজী যাঁদের মাতৃভাষা, এদেশের বিদ্যালয়ে তাঁদের ভাষার এ রকম ব্যঙ্গীকরণে উচ্চাসন থেকে তাঁদের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হবে।"

ইংরেজীর সঙ্গে পারসী কথা মিশাইয়া তাহাকে বিকৃত করিবার চেষ্টা কোন মুসলমান লেখকই করেন নাই, এমন নয়। মুসলমান কর্ত্তৃক লিখিত বিদ্যালয়পাঠ্য ইংরেজী পুস্তকে ইংরেজীর ঐরূপ ও অন্যবিধ বিকৃতির দৃষ্টান্ত জানি। এই দৃষ্টান্তগুলি বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় বৎসরের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় "Alice Returns to Wonderland" নামক প্রবন্ধে আছে। দৃষ্টান্তগুলি S. M. Abdul Quader প্রণীত Maktab English Reader পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের ১৯, ২০-২১ ও ১৬ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত। এই পুস্তক বঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর দ্বারা অনুমোদিত (১১-১১-১৯২৬এর কলিকাতা গেজেট), এবং দুই বৎসরে ইহার তিনটি সংস্করণ হয়। দৃষ্টান্তগুলি এই।

'We have five senses : sight. *heart*, smell, taste and touch." P. 19.

"Karim, can you tell me the name of this road? Perhaps you *don't*…Is there any such bridge in our native village ? Surely not. There is a *pole* made of bamboo on the small river that *are* flowing round our village." Pp. 20-21.

"My father, my mother. I know
I cannot your kindness repay :
But I hope, as I older grow
I shall learn your command to obey.
You loved me before I could *tell*
Who it was that so tenderly smiled.
But now I know it so well,
I should be [*a*] dutiful child.
I am sorry that ever I should
Be naughty, and give you pain.
I hope I shall learn to be good,
And so never *grin you* again." P. 16.

পদ্য হিসাবে এই পদ্যটির উৎকর্ষাপকর্ষ, এবং ইহার ইংরেজীর শুদ্ধতা অশুদ্ধতা সহজেই উপলব্ধ হইবে। কেবল ইহা বলিয়া দেওয়া দরকার, যে, বাংলায় সেতু অর্থে যে পুল শব্দটির ব্যবহার চলিত আছে, তাহা পারসী হইতে গৃহীত। লেখক তাহা 'পোল' আকারে ইংরেজী ব্রিজের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। মডার্ণ রিভিউ কাগজের যে সংখ্যায় যে প্রবন্ধটিতে আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকখানার বিকৃত ইংরেজী প্রদর্শিত হয়, তাহা দাগ দিয়া আমরা শিক্ষা-বিভাগের বর্ত্তমান ডিরেক্টর মিঃ স্টেপলটন্‌কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমাদের নিকট টেলিভিজ্যনের যন্ত্র না থাকায়, ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার "মুখ ভ্রূকুটিকুটিল" হইয়াছিল কি-না জানিতে পারি নাই।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ্য, যে, যে-পুস্তকে "জলপথে"র পরিবর্ত্তে "পানিপথ" ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা ডক্টর শহীদুল্লার লিখিত নহে। আমাদের ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

—

"রাণী বাগীশ্বরী অধ্যাপক" পদে অপনিয়োগ

ইংরেজী নেপটিজ্‌ম্ শব্দটির চলিত অর্থ আত্মীয়-কুটুম্বের প্রতি পক্ষপাত বা অন্যায় অনুগ্রহ প্রদর্শন। লাটিন-ভাষায় নেপোস্ শব্দের অর্থ ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া এবং নেপটিজ্‌ম্ তাহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথাটির ব্যুৎপত্তি-

লব্ধ অর্থ ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্‌চ্যান্সেলার স্যর হাসান সুরবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ সাহেদ সুরবর্দ্দীকে খয়রা অধ্যাপক বোর্ড "রাণী বাগীশ্বরী অধ্যাপক" নিযুক্ত করিতে সুপারিশ করায় নেপটিজমের একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অমৃত বাজার পত্রিকায় দেখিলাম, এই পদে কাহাকে নিযুক্ত করা উচিত তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য তিন জন বিশেষজ্ঞ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—যথা ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং মিস্টার পার্সী ব্রাউন। তদ্ভিন্ন, ইঁহারা উক্ত অধ্যাপক নির্ব্বাচনের কমিটির সভ্যও ছিলেন। স্যর হাসান সুরবর্দ্দী স্বয়ং ঐ নির্ব্বাচন-কমিটির সভ্য ও সভাপতি এবং মিঃ সাহেদ সুরবর্দ্দীর পিতাও ঐ কমিটীর সভ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চিঠিদ্বারা কমিটির সভ্যদিগকে জানান হয়, যে, পদপ্রার্থীদের দরখাস্তগুলি নির্ব্বাচন-কমিটিকে রেফার করা হইয়াছে, তাহা ৫ই আগষ্ট লিখিত। তাহাতে লেখা ছিল, যে, পদপ্রার্থীদের নাম ও গুণাবলীর একটি বর্ণনাপত্র অতঃপর যাইবে। এই চিঠির মধ্যে "বাগীশ্বরী অধ্যাপক" পদ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য ও সর্ত্তসমূহের নিয়মাবলীর প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছিল। নিয়মাবলী-সমেত উক্ত চিঠি ও উল্লিখিত বর্ণনাপত্র এবং মীটিঙের নোটিস্ সভ্যেরা সকলেই ঠিক সময়ে পাইয়াছিলেন কি-না বলিতে পারি না। অমৃত বাজার পত্রিকায় দেখিলাম মীটিং হইয়াছিল ৭ই আগষ্ট রবিবার বিকালে সাড়ে চারিটার সময়। হঠাৎ মীটিং ডাকায়, তাঁহাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কাজে কোন কোন সভ্যকে কলিকাতার বাহিরে চলিয়া যাইতে হয়। সেই কারণে অন্যান্য কেহও মীটিঙে যাইতে পারেন নাই কি-না জানি না। এরূপ হঠাৎ মীটিং করা এবং রবিবারে করা নিয়মসঙ্গত কি-না, বিবেচ্য।

রবীন্দ্রনাথ অন্যতম বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা এবং নির্ব্বাচন-কমিটির সভ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি আগে হইতেই মিঃ সাহেদ সুরবর্দ্দীর নিয়োগের জন্য চিঠি দিয়াছিলেন। বিচারকের পক্ষে আগে হইতেই, অন্য সব প্রার্থীদের নাম ও যোগ্যতা জানিবার পূর্ব্বেই, এই প্রকারে একজন প্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করা উচিত হয় নাই।

এখন বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদ কি কি কাজ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা বলিতেছি। খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে পাঁচটি অধ্যাপক-পদ স্থাপন, তাহাদের নামকরণ প্রভৃতি যে স্কীম্ অনুসারে হয়, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ১৯২১ সালের ৬ই আগষ্ট অনুমোদন করেন। তাহার আবশ্যক অংশগুলি ক্যালেণ্ডার হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

III. That five University Professorships or Chairs be established, one for each of the following subjects :

(i) Indian Fine Arts
(ii) Phonetics
(iii) Physics
(iv) Chemistry
(v) Agriculture

IV. That the Chair of Indian Fine Arts be named Bageswari Professorship of Indian Fine Arts.

X. That it be the duty of each Professor

(a) to carry on original research in his special subject with a view to extend the bounds of knowledge ;

(b) to take steps to disseminate the knowledge of his special subject with a view to foster its study and application ;

(c) to stimulate and guide research by advanced students and generally to assist them in Post-Graduate work so as to secure the growth of real learning among our young men.

নির্ব্বাচন-কমিটির সভ্যদিগকে লিখিত চিঠির সঙ্গে যে নিয়মাবলীর প্রতিলিপি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি ছিল। কিন্তু বাগীশ্বরী অধ্যাপকের কর্ত্তব্য সভ্যদিগকে জানাইবার বা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য ক্যালেণ্ডারে মুদ্রিত অন্য কোন কোন অংশও পাঠান উচিত ছিল। তাহা পাঠান হয় নাই। আমরা তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

On the recommendation of the Syndicate, the following proposals made by the Board of Management of the Khaira Fund regarding the duties and tenure of appointment of the Khaira Professors, were adopted by the Senate on the 21st December, 1926 :

"I. That the duties of the Professors be specified as follows :

* * * *

(e) To take part in teaching as the Board of Management of the Khaira Fund may direct."

বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে যে অর্গ্যানিজেশ্যন কমিটি নিযুক্ত করেন, তাহার রিপোর্ট সেনেট আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

রিপোর্টের যে-অংশের সহিত বাগীশ্বরী অধ্যাপক-পদের সম্বন্ধ আছে, তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। নির্ব্বাচন-কমিটির সভ্যদিগকে প্রেরিত নিয়মাবলীর সঙ্গে ইহাও প্রেরিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয় নাই।

ANCIENT INDIAN HISTORY AND CULTURE

100 The services of the Bageswari Professor of Fine Arts are not at present in any way untilised for formal teaching purposes. In general, it would seem desirable that this should be done. We are aware that, in certain circumstances, the services of the incumbent of the Chair may not even in the future be available for the purposes of regular lecturing. In such an event other arrangments will have to be made, but it will very frequently be the case that the incumbent will be in a position to help considerably in the lecturing work of the University in his subject and, when this is so, every effort should be made to utilise his services in accordance with the conditions already set forth in the rules applicable to this Professorship.

PROPOSED STAFF

	Salary Rs.	Lectures	Tutorials
1. Carmichael Professor	1250	4	...
2. Bageswari Professor of Indian Fine Arts	$700\frac{50}{2}1000$	6	...
3. Reader	$500\frac{50}{2}700$	8	4
4. Lecturer	200-20-500-20-600 (efficiency bar at 500)	10	4
5. Do.	Do.	10	...
6. Do.	Do.	10	...
7. Do.	Do.	10	...
8 & 9. 2 Lecturers (Part time or outside the grade)	400	8	...
		64	8

আগে যে বাগীশ্বরী অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন না, তাহার কারণ পূর্ব্বতন অধ্যাপকের তাহা করিবার যোগ্যতা ছিল না। অর্গ্যানিজেশ্যান-কমিটি সেই কথাই মৃদু ভদ্র ভাষায় বলিয়াছেন, এবং ইঙ্গিত করিয়াছেন, যে, ভবিষ্যতে এমন অধ্যাপক নিযুক্ত করা উচিত যিনি শিক্ষা দিতে সমর্থ; নতুবা অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া শিক্ষাদানের অন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বলা বাহুল্য এরূপ অপব্যয় করা উচিত নয় এবং অপব্যয় করিবার টাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই।

পাঠকেরা দেখিবেন, ক্যালেণ্ডারে এবং অর্গ্যানিজেশুন-কমিটির রিপোর্টে মুদ্রিত যে-অংশগুলি হইতে ইহা বুঝা যায়, যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগের ছাত্রদিগকে দস্তুরমত পড়ান বাগীশ্বরী অধ্যাপকের কর্ত্তব্য, নির্ব্বাচন-কমিটির সভ্যদিগকে তাহা অন্য নিয়মাবলীর সঙ্গে পাঠান হয় নাই। না-পাঠাইবার কারণ ইহাই অনুমিত হয়, যে, তাঁহারা যেন এমন একজন অধ্যাপক নিয়োগে জেদ না করেন, যাঁহার প্রাচীন ভারতীয় ললিতকলা (fine arts), মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতিবিদ্যা (iconography) এবং প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য (ancient architecture) সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিবার যোগ্যতা আছে।

পাঠকদিগকে আমরা এখন কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে বলিতেছি। ক্যালেণ্ডার অনুসারে, বাগীশ্বরী অধ্যাপক-পদের নাম "Bageswari Professor of *Indian* Fine Arts"। সুতরাং তাঁহাকে ভারতীয় ললিতকলার ইতিহাস তত্ত্ব ইত্যাদি শিখাইতে হইবে, অন্য দেশের নহে। তাঁহাকে যাহা শিখাইতে হইবে, তাহা এম্-এ পরীক্ষার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগের অন্তর্গত। প্রাচীন ভারত বলিতে ঐতিহাসিকেরা সাধারণতঃ ১২০০র কাছাকাছি খ্রীষ্টাব্দের আগেকার ভারতবর্ষ বুঝেন। তাহা মুসলমানী মধ্যযুগের আগেকার ভারতবর্ষ। তাঁহাকে যাহা শিখাইতে হইবে, তাহা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগের প্রত্নতত্ত্বের (Archaeologyর) (B) উপভাগের অন্তর্ভূত। তাহাতে আছে—(১-২) ললিতকলা এবং মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি বিদ্যা (fine arts and iconography) এবং স্থাপত্য (architecture)। ছাত্রদিগকে এই সব বিষয়ে যে-সকল পুস্তক পড়িতে বলা হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও অধিকাংশ প্রাচীন ভারত বিষয়ক, এবং বাকী দু-এক খানি অংশতঃ প্রাচীন ভারত বিষয়ক। ১৯৩০ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেণ্ডারের ৮৪২-৪৪ পৃষ্ঠা দেখিলে পাঠকেরা আমাদের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আশা করি এখন পাঠকেরা বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, এমন লোকেরই বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়া উচিত যিনি ভারতীয় ললিতকলার ইতিহাস ও মূলীভূত তত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ। ইহাও দেখাইয়াছি, যে, প্রাচীন ভারতীয় ললিতকলার অনুশীলনই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। কেহ যদি কুতর্ক করিয়া বলিতে চান, প্রাচীন নহে সর্ব্বকালিক (যদিও তাহা বলিবার উপায় নাই), তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, যে, ভারতীয়

ললিতকলা, মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি-বিদ্যা এবং স্থাপত্যের ইতিহাস ও তত্ত্বই শিখাইতে হইবে। ক্যালেণ্ডারে লিখিত সর্ত্ত অনুসারে এই বিষয়গুলির অধ্যাপনা করিতে হইলে, এই সব বিষয়ে গবেষণাদ্বারা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার নূতন জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে হইলে, ও ছাত্রদিগকে গবেষণার পথে চালিত করিতে হইলে,অধ্যাপক এমন কোন ব্যক্তিরই হওয়া চাই, যিনি বহু বৎসর এই সব বিষয়ে চর্চ্চা করিয়াছেন, গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এবং স্বয়ং এইরূপ গবেষণা ও প্রবন্ধ পুস্তক প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন যাহা এই সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিদ্বন্মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রামাণিক ও মূল্যবান্ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের চর্চ্চা করিতে হইলে "মানসার" এবং অন্যান্য সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের জ্ঞান থাকা সুতরাং সংস্কৃত জানা চাই। "মানসার" দুরূহ গ্রন্থ। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি উপাধিকারী ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য বহুবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের পর ইহার একটি সংস্করণ বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সংস্কৃতের জ্ঞান এবং সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া বাগীশ্বরী অধ্যাপকের ভারতবর্ষীয় হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধ দেবমন্দির, সমাধি-মন্দির, চৈত্য স্তূপ বিহার মঠ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ হইতে উৎপন্ন জ্ঞান থাকা চাই, এবং সেই জ্ঞান বাড়াইবার জন্য ঐ সকল সম্প্রদায়ের দ্বারা পবিত্র বলিয়া মানিত উক্ত স্থাপত্যনিদর্শনসমূহে যাইবার সুযোগ থাকা চাই। ভারতীয় "আইকনোগ্রাফী" বা মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি বিদ্যার মানে-ই হিন্দু জৈন বৌদ্ধ দেবদেবী তীর্থঙ্কর বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ সাধু প্রভৃতির প্রস্তরমূর্ত্তি, ধাতবমূর্ত্তি এবং অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধীয় বিদ্যা। এই সব বিষয়ের অনুশীলন করিতে হইলে সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া এই সকল বস্তুর সহিত দীর্ঘ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়, অধিকতর পরিচয় স্থাপনের সুযোগ, পূজায় ব্যবহৃত বিগ্রহ আদির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের জ্ঞান, প্রভৃতি থাকা আবশ্যক।

এখন দেখা যাক্, নির্ব্বাচন-কমিটি যাহাকে বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে সুপারিশ করিয়াছেন তাঁহার এই সকল বিষয়ে যোগ্যতা কিরূপ। প্রার্থীদের যোগ্যতার যে বর্ণনাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিস নির্ব্বাচন-কমিটির সভ্যদিগকে দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কোয়ালিফিকেশ্যন্স এইরূপ লেখা আছে :—

"Graduated from the Cal. Univ. with Hons. in English in 1910. Took B. A. (Hons.) degree (Oxford) in 1914. Member of the Com. of Producers of the Moscow Art theatre, became one of the Artistic Directors. From 1926-29. Secretary of the Artistic Society of the International Institute of Intellectual Co-operation of the League of Nations at Paris. Connected * with the publication of the Quarterly of the Seminarium Kondako-Vianum at Prague, an international institute dealing specially with Byzantine Art and the Art contributions of peoples at the period of Great Migration from 1929-31. Entrusted by Osmania Univ. with writing of series of headlong (*sic*) on Mussalman Art in the various countries. Appointed to the Nizam Professorship of Islamic studies at the Viswabharati with the object of making researches and delivering lectures on Persian Art. Besides English, has adequate knowledge of French, German, Italian, Spanish and Russian.

ইঁহার শিক্ষণ-অভিজ্ঞতা ও গবেষণা সম্বন্ধে বর্ণনাপত্রে আছে—

1. Senior Reader in English literature at the late Imperial University as well as at the Moscow Women's University.

2. Senior Research student in Literature and was preparing a thesis on 'Novalis and the German Romantic Movement' under the direction of Sir Walter Raleigh. Has been studying ancient Christian Art and its sources.

At the end of 1931, delivered a course of six Readership lectures on the artistic activities of the Mussalman of Spain at the University of Calcutta.

মিঃ সাহেদ সুরবর্দ্দীর যোগ্যতা সম্বন্ধে বর্ণনাপত্রে যাহা-কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি অল্প দিন আগে যে-যে কাজের ভার পাইয়াছেন এবং যাহাতে তাঁহার কৃতিত্ব এখনও প্রমাণসাপেক্ষ, এবং তিনি ভবিষ্যতে কি করিবেন,

* কি ক্যাপ্যাসিটিতে?

তাহার সমস্তই উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এগুলা বাস্তবিক কোয়ালিফিকেশ্যন্সের মধ্যে ধর্ত্তব্য নয়। কিন্তু তাহা ধরিলেও বর্ণনাপত্র হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়, যে, তিনি বাগীশ্বরী অধ্যাপকের অনুশীলন, অধ্যাপনা ও গবেষণার বিষয়গুলির সম্বন্ধে কোন চর্চ্চা করেন নাই, তৎসম্বন্ধে কোন গবেষণা করেন নাই, বা কিছু লেখেন নাই—বস্তুতঃ ঐ সব বিষয়ে কিছুই জানেন না। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, যে, তাঁহার অনুকূলে সুপারিশ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই হইয়াছে। তিনি অন্য অনেক বিষয়ে যোগ্য লোক হইতে পারেন—শুনিয়াছি বটেনও। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সব বিষয়ে যোগ্যতাবিশিষ্ট অধ্যাপকের প্রয়োজন থাকিলে এবং তাঁহার বেতন দিবার সামর্থ্য থাকিলে বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। মিঃ সুরবর্দ্দী প্রার্থীদের মধ্যে যোগ্যতম বিবেচিত হইয়া ঐ সব বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে সন্তোষের বিষয় হইবে। কিন্তু যে-কাজের জন্য তাঁহার কোন যোগ্যতা এখন নাই, যাহার জন্য যোগ্যতর প্রার্থী একাধিক ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার সুপারিশ করা গর্হিত হইয়াছে।

মোট দশ জন প্রার্থী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বর্ণনাপত্রে সকলের চেয়ে সংক্ষেপে কোয়ালিফিকেশ্যন্স লেখা হইয়াছে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের। কেবল লেখা হইয়াছে, যে, তিনি B. A. (1896)। মিঃ সুরবর্দ্দী সম্বন্ধে ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কোন কথাই বাদ পড়ে নাই। কিন্তু চন্দ মহাশয়ের শিক্ষাদান-অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং তিনি যে তাঁহার পুস্তকাদির একটি তালিকা পেশ করিয়াছেন এই কথাটির উল্লেখই যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছে। এই জন্য তাঁহার কোয়ালিফিকেশ্যন্স্ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দরখাস্ত পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তৎসমুদয় বর্ণিত আছে। তাহার প্রমাণও তাহার সঙ্গে দেওয়া আছে। তাঁহার কোয়ালিফিকেশ্যন-গুলি ছাপিতে হইলে প্রবাসীর অন্যূন দুই পৃষ্ঠা জায়গা লাগিবে। প্রমাণগুলি ছাপিতে আরও তিন পৃষ্ঠা লাগিবে। দরখাস্তের সহিত সংলগ্ন তাঁহার লেখা নিজের গবেষণামূলক ইংরেজী পুস্তক, রিপোর্ট ও প্রবন্ধাদির তালিকা প্রবাসীতে ছাপিতে আড়াই পৃষ্ঠা লাগিবে। সুতরাং এত জায়গা না-থাকায় সেগুলি ছাপিলাম না। সেনেটের সদস্যগণ তলব করিলে সমস্তই পাইবেন। বাংলাতে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ তালিকায় নাই। ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতীয় স্থাপত্য ও মূর্ত্তিশিল্প আদি বিষয়ে যাঁহাদের কথা প্রামাণিক বিবেচিত হয়, তিনি তাঁহাদের মধ্যে এক জন। ভারতীয় ললিতকলার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ইদানীং ইংরেজী জার্ম্যান ও ফরাসী ভাষায় যে কয়খানি বড় বড় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সকলগুলিতে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের অনেক রচনা উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার অনেক মত গৃহীত হইয়াছে। এরূপ লোকের কোয়ালিফিকেশ্যন্স সম্বন্ধে, তাঁহার দরখাস্তে বিস্তারিত বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও, শুধু B. A. (1896) লেখা তাঁহার যোগ্যতা চাপা দিবার চেষ্টা মাত্র। এরূপ চেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের অযোগ্য। কেবল তাঁহারই বেলায় এইরূপ চেষ্টা দ্বারা পরোক্ষভাবে ইহাই প্রমাণ হয়, যে, কর্ত্তৃপক্ষের মতে তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁহাকে খাট করিতে না-পারিলে মিঃ সুরবর্দ্দীকে চাকরি দেওয়া চলিবে না। তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার বিরুদ্ধে এই একটা কথা হয়ত উঠিতে পারে, যে, তিনি পেন্স্যনপ্রাপ্ত, তাঁহার বয়স প্রায় ৫৮। কিন্তু বাগীশ্বরী অধ্যাপককে ত ফুটবল, ক্রিকেট ও হকীর সর্দ্দারী করিতে হইবে না, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণা করিতে হইবে। তাহা করিবার পূর্ণ শক্তি রমাপ্রসাদবাবুর আছে। দ্বিসপ্ততিতম বৎসর বয়সে যে বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন, ষষ্টিপর ও সপ্ততিপর আচার্য্য রায়কে যে বিশ্ববিদ্যালয় বার-বার পুনর্নিযুক্ত করিতেছেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃদ্ধ ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ও হীরালাল হালদার মহাশয়েরা এখনও অধ্যাপনা করেন, তাহার সহিত সংযুক্ত কোন লোক আশা করি চন্দ মহাশয়ের বয়সের কথাটা তুলিবেন না।

আমরা তাঁহার সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম এই জন্য, যে, তাঁহারই যোগ্যতা চাপা দিবার চেষ্টা বেশী রকম করা

হইয়াছে। অবশ্য প্রার্থীদের মধ্যে অন্য যোগ্য লোকও আছেন। কিন্তু যদি কেহই নির্ব্বাচক-কমিটির মতে পদটির জন্য যথেষ্ট যোগ্য বিবেচিত না হইয়া থাকেন, সেই কারণে পদটির জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য এক জনকে সুপারিশ করার সমর্থন করা চলিবে না; সে ক্ষেত্রে এখন যেমন পদটি খালি আছে, তেমনি খালি থাকিতে পারিত, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির মত অগ্রসর বিদ্যার্থী গবেষকদিগকে আরও শিখিবার ও গবেষণা করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। শুনিলাম, সুরবর্দী মহাশয় নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে শিখিবার ছুটি (study leave) এক বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে, যাঁহারা বাগীশ্বরী অধ্যাপকের বিষয়গুলি সম্বন্ধে এখনই অনেকটা জ্ঞানবান্‌, অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে তাঁহাদিগকেই এইরূপ সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য; যিনি বিষয়গুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ, অধিক ব্যয়ে তাঁহাকেই শিখাইয়া অধ্যাপক বানাইবার চেষ্টা হাস্যকর এবং নিন্দনীয়।

চন্দ মহাশয় দরখাস্ত করিয়াছেন বলিয়াই সম্ভবতঃ অধ্যাপক ডক্টর ষ্টেলা ক্রামরীশ, অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ, শ্রীমান্‌ নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি দরখাস্ত করেন নাই। ইঁহারা প্রত্যেকেই মিঃ সুরবর্দী অপেক্ষা উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞানবান্‌।

আর একটা কথা। যদি বিশ্ববিদ্যালয় নিজের নিয়মাবলী না মানিয়া কেবল পূর্ব্বকৃত ভ্রমের নজীর মানিতে চাহিতেন, তাহা হইলে যে-পদে অবনীন্দ্রনাথ দুইবার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুকে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। তিনি খুব বড় আর্টিষ্ট, এবং রবীন্দ্রনাথের মতে আর্ট সম্বন্ধে তাঁহার ইণ্টেলেক্‌চুয়াল গ্র্যাস্পও খুব আছে।

এই বিষয়টি ক্ষুদ্র মনে হইতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যে ব্যয় করেন তাহার বিনিময়ে ছাত্রদের শিক্ষা পাইবার ন্যায্য অধিকার আছে, এবং তাহারা বড় বড় বহি ও বক্তৃতায় যে-সকল উচ্চ আদর্শের কথা পড়ে এবং শুনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ব্যাপারে তাহার কার্য্যগত দৃষ্টান্ত দেখিবার অধিকারও তাহাদের আছে। এই জন্য এত কথা লিখিলাম।

—

জামিন তলবের বিরুদ্ধে আপীল নামঞ্জুর

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত "ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ—অর্থনৈতিক অবস্থা" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রকাশক হিসাবে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট হইতে এবং 'আনন্দ প্রেসে'র রক্ষক হিসাবে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে গবর্ন্মেণ্ট এক হাজার টাকা হিসাবে মোট দুই হাজার টাকা জামিন আমানত করার আদেশ দিয়াছেন। এই আদেশ বাতিল করিবার প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টে যে আবেদন করা হইয়াছিল গতকল্য বিচারপতি মিঃ সি সি ঘোষ, কষ্টেলো এবং রেমফ্রী সেই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রায়দান প্রসঙ্গে বিচারপতি ঘোষ বলিয়াছেন—

"অডিন্যান্সের বিধানগুলি অতিশয় কঠোর, কিন্তু সেই কঠোরতা সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে পারি না। এইরূপ আলোচনা অবান্তর ও বৃথা, বিশেষ করিয়া যেহেতু অডিন্যান্সের ৬৩ ধারাতে পিনাল কোডের ১২৪ (ক) ধারার ব্যতিক্রমটি বিধিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং আমি একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, আবেদনকারীদের প্রতীকার পাইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হইল।"

বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো বলেন যে, তিনি এবিষয়ে তাঁহার সহযোগীর সহিত আলোচনা করিয়া সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন।

অডিন্যান্সের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল রূপ যে প্রতিকারের উপায় আছে, তাহা যে নামমাত্র উপায়, তাহা বোম্বাইয়ের অধুনা-অবিদ্যমান সংবাদপত্র ইণ্ডিয়ান ডেলী মেলের মোকদ্দমাতেও সুস্পষ্ট হয়। গত মার্চ্চ মাসের ঐ মোকদ্দমায় বোম্বাই হাইকোর্টের রায়ে ছিল:—

"So that it really comes to this that there is no check on the Government as to the persons they may regard as suspects, that orders may be passed affecting drastically the conduct of such persons, that heavy punishment may be imposed for the breach of any such order and that the right of appeal or application in revision which can normally be enjoyed by such persons, is very largely curtailed. The present state of affairs is part of the Government established by law in British India for the time being."

—

মিলিত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মিলিত নির্ব্বাচন-প্রথার সপক্ষে মৌলবী আবদুস সামাদের প্রস্তাব অধিকাংশ

সভ্যের মতে গৃহীত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর জন্ম এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজওয়ালারা যে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চায়, তাহা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কিন্তু তাহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনপ্রথার অনিষ্টকারিতা জানে। উহারা যে বস্তুত ভারতপ্রবাসী ইংরেজ ও অন্ত ইউরোপীয়দের সুবিধার জন্তই উহা চায়, তাহা ষ্টেটস্‌ম্যানের নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে বুঝা যায় :—

"It is from the hands of Britishers that the new constitution must come, and under no circumstances is it conceivable that the British community here with its enormous stake in the country could accept annihilation."

তাৎপর্য্য। "ব্রিটিশদের হাত থেকেই ভারতের নূতন মূল রাষ্ট্রবিধি আসা চাই, এবং কোন অবস্থাতেই ইহা অচিন্তনীয়, যে, এখানকার প্রভূতসম্পত্তিশালী ব্রিটিশ লোকেরা আপনাদের বিনাশে সম্মত হইবে।"

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন যে খারাপ তাহাও ঐ কাগজ স্পষ্ট-ভাষায় বলিয়াছে। যথা :—

"Nobody will argue that separate electorates are beneficial, that they promote the feeling of nationhood, or that they do not tend to keep open sores and prevent the healing of differences."

তাৎপর্য্য। "কেহই তর্ক করিবে না, যে পৃথক পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা হিতকর, যে তাহারা এক জাতিত্বের ভাবের পোষক, অথবা তাহারা পুরাতন ক্ষত সারিতে বাধা দেয় না এবং পরস্পরের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ ভঞ্জনে বাধা দেয় না।"

ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজওয়ালারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অনিষ্টকারিতা জানিয়াও নিজেদের সুবিধার জন্ত উহার সমর্থন করে।

—

ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের দাবির হেতু

কেন এদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব থাকা উচিত, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ আর্মষ্ট্রং পরোক্ষ ভাবে তাহারই কোন কোন কারণ দেখাইয়া বক্তৃতা করেন। তাহার উত্তরে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—

তিনি বলিতে চান যে, যেহেতু ইংরেজেরা রেল ষ্টীমার আবিষ্কার করিয়াছে, সেই জন্তই তাহারা এদেশ শাসন করিবার অধিকারী। রুশিয়া, জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশেও উহাদের আবিষ্কৃত রেল ষ্টীমার দ্বারা যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে, ঐ সকল দেশ শাসন করিবার অধিকারও ইংরেজের আছে? বাংলার মালিক সকলেই—ইংরেজের আবিষ্কৃত রেল ষ্টীমারে যখন বাংলার উপকার হইয়াছে তখন মিঃ আর্মষ্ট্রঙের যুক্তি অনুসারে বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় ইংরেজের অবশ্যই একটা বড় অংশ থাকা চাই! মিঃ আর্মষ্ট্রং বলিতে চান যে, ইংরেজেরা এদেশে অনেক টাকা খাটাইতেছেন; অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য খুলিয়াছেন; কাজেই তাঁহারা এদেশ শাসনের অধিকারী। তোমরা এদেশে বেশী টাকা খাটাইতেছ বেশী লাভ হইবে। আর কি চাও? অনেক ইংরেজের টাকা জার্ম্মেনীতে, জার্ম্মেনীর অনেক টাকা রুশিয়ায় খাটিতেছে। তাই বলিয়াই যে ঐ ঐ দেশ উহাদিগকে শাসন করিতে হইবে, এমন কোন দাবি কি যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে?

—

বাংলা প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি অগ্রাহ্য

কৃত্রিম সরকারী উপায়ে বাংলা দেশটিকে ছোট করা হইয়াছে। ইংরেজরাজত্ব-কালেই এমন এক সময় ছিল, যখন ভৌগোলিক বঙ্গের অন্ত বাংলাভাষাভাষী সমুদয় ভূখণ্ড সরকারী বাংলা প্রদেশ বা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ছিল। তাহার পর নানা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও কারণে ভৌগোলিক বাংলা দেশকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক এক রকমে ভাগ করা হইয়াছে। তাহাতে, বঙ্গের প্রতি ও বাঙালীর প্রতি যাহাদের টান আছে, এরূপ বাঙালীরা কখনও সন্তুষ্ট হয় নাই, ছিল না, এখনও নাই। এই হেতু এই প্রকার বাঙালীদের মুখপাত্র-রূপে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, যে, যাহাতে প্রাকৃতিক বঙ্গের বঙ্গভাষাভাষী সব অংশ আবার বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত হয় এরূপ ভাবে প্রদেশটির সীমানির্দ্ধারণ জন্ত একটি সীমা-কমিশন নিযুক্ত করা হউক; কিন্তু তাহা ইউরোপীয়, মুসলমান এবং সরকারপক্ষের সদস্যগণের ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাবটির বিরোধীদের সব আপত্তি আলোচনা এখানে এখন করা চলিবে না। কিন্তু সরকারপক্ষের মাননীয় রীড্ সাহেব যে বলিয়াছেন, সীমানির্দ্ধারণ-কমিশনের কাজ শেষ হইতে বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী এবং তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, সে বিষয়ে ইহাই বলিতে চাই, যে, নূতন করিয়া সিন্ধুকে একটা প্রদেশ বানাইবার জন্ত

দীর্ঘকাল ধরিয়া সরকারী আলোচনা চেষ্টা চলিতে পারিল, নূতন করিয়া উড়িষ্যাকে একটি স্বতন্ত্র সরকারী প্রদেশে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতে পারিল, কিন্তু পুরাতন বাংলা অতীত কালে যেমন এক ছিল তেমনি এক করিবার বেলাতেই "বিলম্ব হইবে" আপত্তি কেন উত্থাপিত হয়? রীড সাহেব সাইমন রিপোর্টের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু ঐ রিপোর্টেরই দ্বিতীয় ভল্যুমের ২৬ পৃষ্ঠায় আছে, "it is extremely important that the adjustment of provincial boundaries and the creation of proper provincial areas should take place before the new process has gone too far."

"প্রদেশগুলি ফেডারেটেড বা সংঘবদ্ধ সমগ্র ভারতের একটি একটি স্বতন্ত্র অংশ হইবার প্রক্রিয়া খুব বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই প্রাদেশিক সীমার নিষ্পত্তি এবং একটি একটি প্রাদেশিক ভূখণ্ডের যথাযোগ্য গঠন সাতিশয় প্রয়োজনীয়।"

—

দুর্নীতি দমন আইন

দুর্নীতির ব্যবসা দমনের জন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু যে আইনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন, তাহা সিলেক্ট কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা আবশ্যক-মত ইহার সংশোধন করিয়া আবার কৌন্সিলে উপস্থিত করিবেন।

পুরুষ ও নারীর সম্পর্কঘটিত দুর্নীতির উচ্ছেদসাধন সাতিশয় কঠিন কাজ। যে প্রবৃত্তি থাকায় মানবসমাজ লোপ পায় নাই, সৃষ্টির প্রবাহ চলিতেছে, তাহারই কুপ্রয়োগ এই দুর্নীতির কারণ। এই প্রবৃত্তি হইতে দুর্নীতির উৎপত্তি হইয়া থাকিলেও ইহাও মনে রাখা আবশ্যক, যে, ইহা হইতে অশেষ কল্যাণেরও উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্য সমাজ-হিতৈষী ও সমাজসংস্কারকেরা যখন সামাজিক দুর্নীতি দূর করিতে চান, তখন এই প্রবৃত্তির সমূলে বিনাশরূপ অসম্ভব কার্য্যের সাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য থাকে না। যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি, যে, যাহারা ব্যবসা-হিসাবে দুর্নীতির ব্যবসা চালায় প্রধানতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রণয়ন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। যে-সব অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে ছলে বলে কৌশলে সংগ্রহ করিয়া দুষ্ট লোকে এই পাপব্যবসা চালায় তাহাদের উদ্ধারসাধন করিয়া যথাযোগ্য শিক্ষাদানাদি দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে থাকিতে সমর্থ করাও তাঁহার উদ্দেশ্য। আইন দ্বারা অসচ্চরিত্র সকল নরনারীকে সাধু করিয়া তুলিবার কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মানুষেরই স্খলন নিবারণ করিবার আশা নিশ্চয়ই তিনি পোষণ করেন না।

বোম্বাই এবং অন্যান্য যে-সব স্থানে এই প্রকার আইন আছে, তাহার ফলে কোথাও কোথাও সামাজিক এই পাপ কেবল কোন কোন অঞ্চলে আবদ্ধ না থাকিয়া শহরের অন্যত্রও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ কুফল যাহাতে না ফলে, তাহার উপায় যথাসাধ্য অবলম্বন করিতে হইবে।

দুর্নীতির ব্যবসা দমন করিবার জন্য আইন হইতে এই প্রকার যত কুফল হইতে পারে তাহা সকলে বলুন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কুফল যাহাতে না ফলে তাহার উপায় চিন্তা ও উপায় নির্দ্দেশও করুন। কিন্তু যদি কেহ একথা বলেন, যে, যেহেতু বহুসংখ্যক পুরুষের কুপ্রবৃত্তি আছে ও তাহা চরিতার্থ করা তাহাদের আবশ্যক, তাহার জন্য কতকগুলি স্ত্রীলোককে বলি দিতে হইবে, এবং পাপব্যবসার আড্ডাগুলাতে তাহার সুবিধা না রাখিতে দিলে, তাহারা গৃহস্থের বাড়িতে ও অন্যত্র হানা দিবে, তাহা হইলে সে কথা শুনিয়া দুর্নীতির ব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে নিরস্ত হওয়া চলিবে না। সমাজহিতৈষী পুরুষেরা নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না, নিবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের উচিত হইবে না। সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে, যাহাদের জাগরণ হইয়াছে ও হইতেছে সেই আত্মসম্মানশালিনী মহিলারা পাপের ব্যবসারূপ নারীর অপমান সহ্য করিবেন না, করিতে পারেন না। এই জন্য পাপের ব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেই হইবে। আইন সেই যুদ্ধের কেবল একটা মাত্র অস্ত্র। অন্য অনেক উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে। সাহিত্য ও ললিতকলার অপব্যবহার দ্বারা নরনারীর পরস্পর সম্বন্ধ ও মনোভাব বিকৃত আকার ধারণ করে। ইহার প্রতিকার

করিতে হইবে। শিক্ষাকে সুনীতির সহায় ও পরিপোষক করিতে হইবে। সামাজিক সব আমোদ-প্রমোদকে কলুষবর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ করিতে হইবে। দারিদ্র্য, আর্থিক অসচ্ছলতা এবং পরের গলগ্রহ হইবার অপমান ও দুঃখ যাহাতে বহু নারীকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কুপথে যাইতে প্রলুব্ধ বা বাধ্য না করে, তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যে প্রবৃত্তি পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের মূল, তাহার সমাজহিতকর বৈধ চরিতার্থতা বিবাহ দ্বারা প্রাপ্তবয়স্ক সকল পুরুষ ও নারীর অধিগম্য করিতে হইবে। তাহার জন্য বরপণ ও কন্যাপণ প্রথার উচ্ছেদ আবশ্যক, এবং বিপত্নীকদের বিবাহ যেমন চলিত আছে বিধবাদের বিবাহও সেইরূপ চলিত হওয়া প্রয়োজনীয়। বড় বড় শহরে পুরুষজাতীয় হাজার হাজার লোক পারিবারিক জীবনের সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকে ও তাহার নিয়ামক শক্তির প্রভাব অনুভব করে না। শহরে থাকিয়াও যাহাতে অল্প আয়ের লোকেরাও পারিবারিক জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার জন্য প্রত্যেক শহরে কম ভাড়ার স্বাস্থ্যকর যথেষ্টসংখ্যক বাড়ি তৈয়ার করা আবশ্যক, এবং কতকগুলি লোকের প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও অন্য অগণিত লোকের দারিদ্র্য যাহাতে ঘটিতেছে এরূপ সরকারী, বাণিজ্যিক এবং শ্রমিক অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত এরূপ ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা চালাইতে হইবে যাহাতে সকলের পক্ষেই পারিবারিক জীবন সাধ্যায়ত্ত হয়। মিল ও কারখানাগুলির এবং চা-বাগান প্রভৃতির শ্রমিকদের বাসগৃহ এরূপ এবং সংখ্যায় এত অধিক হওয়া আবশ্যক এবং তাহাদের মজুরীও এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে সমুদয় শ্রমিক তাহাদের কার্য্যস্থলে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে পারে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সোজা যুদ্ধ নয়। কিন্তু তাহাতে ভীত ও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইয়া তৎসমুদয়কে অতিক্রম করা পৌরুষ ও নারীত্বের লক্ষণ।

কুস্থান হইতে বালিকাদিগকে উদ্ধার করিয়া আশ্রমে আনিয়া সুশিক্ষাদি দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে থাকিতে সমর্থ করা আর একটি গুরুতর কর্ত্তব্য। পানিহাটির গোবিন্দকুমারী আশ্রমের বিষয় লিখিতে গিয়া আমরা আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে কিছু বলিয়াছি। হিন্দুসমাজ বিবাহ-বিষয়ে সুসঙ্গত সুযুক্তিসম্মত উদার মত কার্য্যত অবলম্বন করিলে এই কর্ত্তব্য অপেক্ষাকৃত সহজে পালিত হইবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সব উপায় অবলম্বিত হইলেও প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীদের কুপথে যাইবার স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু সে স্বাধীনতা না থাকিলে সৎপথে থাকিবার স্বাধীনতার মূল্যও ত থাকে না।

যতীন্দ্রবাবুর বিলের যে-যে বিষয়ে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বনীয় সেইরূপ দু-একটির উল্লেখ করা দরকার।

বিলটির ৭ ধারা অনুসারে পুলিস কমিশনার বা জেলা পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যদি সন্দেহ করেন যে, কোন বাড়ি বেশ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, তবে তিনি বাড়ির মালিক, ম্যানেজার, ইজারাদার প্রভৃতিকে ডাকিয়া পাঠাইতে এবং তদন্ত করিয়া ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইলে পনের দিনের মধ্যে ঐ বাড়ি বেশ্যালয়রূপে ব্যবহার করা বন্ধ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। পুলিস কমিশনার বা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের এই আদেশ চূড়ান্ত হইবে, তাহার বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না। আইনের ১৪ ধারা অনুসারে পুলিস কমিশনার, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, সাব-ইন্‌স্পেক্টরের উপরের কোন পুলিস কর্ম্মচারী, কোন বাড়িতে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাকে বেশ্যাবৃত্তি করান হইতেছে, এই সন্দেহ হইলেই উক্ত বাড়িতে প্রবেশ করিয়া তদন্ত করিতে পারিবেন। ঐ সমস্ত কর্ম্মচারী কোন বাড়িতে প্রবেশ করিয়া তাহা বেশ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে কি-না, তাহাও দেখিতে পারিবেন।

আইনটিকে কার্য্যকর করিতে হইলে পুলিসের উচ্চ কর্ম্মচারীদের হাতে কতকটা ক্ষমতা দিতেই হইবে; কিন্তু তাহাদের কাজের বিরুদ্ধে আপীলের ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। কোন দেশের খুব সাধু পুলিসেরও

নিরঙ্কুশ হওয়া বিপজ্জনক, আমাদের দেশের ত কথাই নাই।

—

বাংলা দেশের সাধারণ পুস্তকালয়

আমরা সম্প্রতি তিনটি সাধারণ পুস্তকালয়ের উৎসবে যোগ দিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম—বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটীর এবং কলিকাতার শাঁখারীটোলার ও তালতলার। তিনটিতেই বালক-বালিকাদের পড়িবার বহি সংগৃহীত হইয়াছে ও তাহাদের পড়িবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে দেখিয়া উৎসাহিত হইয়াছি। তাঁহারা মহিলাদের পড়িবার বন্দোবস্তও করুন। অধিকবয়স্ক নিরক্ষর শ্রমিক ও অন্য লোকদিগকে পড়িতে লিখিতে শিখান এবং ম্যাজিক লণ্ঠন ও বায়োস্কোপের সাহায্যে জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করাও লাইব্রেরীগুলির কর্তৃপক্ষের দ্বারা হইতে পারে।

বংশবাটীর শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় আইন দ্বারা গ্রাম, শহর, মহকুমা ও জেলার স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান-গুলিকে লাইব্রেরী-সমূহে আর্থিক সাহায্য দিবার ক্ষমতা দিতে যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়। তাঁহার চেষ্টা কতকটা সফল হইয়াছে, সম্পূর্ণ সফল হওয়া উচিত ও হইবার সম্ভাবনা আছে। ব্যবস্থাপক সভার সকল সভ্যেরই এই চেষ্টার সহায় হওয়া উচিত।

—

নূতন মিউনিসিপ্যাল বিল

এখন লোকের মন রাজনৈতিক কারণে অতি চঞ্চল। দেশের প্রধান গণতন্ত্রকামী কর্ম্মীরা এখন জেলে, কিংবা অন্য প্রকারে কাবু। এমন সময়ে একটা মিউনিসিপ্যাল বিল আইনে পরিণত করিবার ফন্দী চালাক লোকের মাথায় আসা বিচিত্র নয়। কিন্তু কাজটা অনুচিত। বিলটাতে মুখরোচক কিছু জিনিষ যে একেবারেই নাই তা নয়। কিন্তু অনিষ্টকর এবং গণতন্ত্রবিরোধী জিনিষ তার চেয়ে বেশী আছে।

বিলটার ১৭ (ক) ও ১৮ (২) ধারায় মিউনিসিপ্যাল ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকাইবার ব্যবস্থা আছে। প্রথমটা দ্বারা সরকার বাহাদুর এই ক্ষমতা লইতে চান, যে, তাঁহারা মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ধারা অনুসারেও সরকার উক্তরূপ কোন সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। অবশ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিতে সরকার মুসলমান কিংবা "অবনত" শ্রেণীর হিন্দু বুঝেন। এক দিকে জগতের কাছে প্রচারিত হইতেছে, যে, ব্রিটিশজাতি ভারতবর্ষকে গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, অন্যদিকে গণতন্ত্রবিরোধী যে-সব ব্যবস্থা আগে ছিল না, তাহা প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

বিলটিতে আর একটা এই ধারা আছে, যে, যে-কেহ যে-কোন সত্য বা তথাকথিত অপরাধের জন্য ছয় মাসের অধিককাল কারাদণ্ড ভোগ করিবে, সে পাঁচ বৎসরের জন্য কোন মিউনিসিপালিটির সভাপদপ্রার্থী হইতে পারিবে না—যদি গবর্মেণ্ট দয়া করিয়া তাহাকে বেদাগ করিয়া না দেন। অর্থাৎ যে-সব উৎসাহী রাজনৈতিক কর্ম্মী দুর্নীতির লেশবিহীন রাজনৈতিক কারণেও জেলে গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককে সরকার বাদ দিতে চান!

মিউনিসিপালিটির অনেক বড় কর্ম্মচারীর নিয়োগ ও তাঁহাদের বেতন নির্দ্ধারণ ইত্যাদি বিষয়েও বিলটাতে গবর্মেণ্টকে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

এবম্বিধ বহু কারণে বিলটা পরিত্যক্ত বা নামঞ্জুর হওয়া উচিত।

—

বঙ্গের সামাজিক, ধার্ম্মিক ও ভাষিক মানচিত্র

সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, যে, ১৯৩১ সালের সেন্সস সম্পর্কে বঙ্গের সামাজিক, ধার্ম্মিক ও ভাষিক মানচিত্র বড় আকারে প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহা সর্ব্বসাধারণকে বিক্রীও করা হইবে। এই বিজ্ঞাপন ভয়াবহ। আমরা নানা কারণে এমনই আছি নানা ভাগে

বিভক্ত। তাহার উপর এখন আরও কত জাতি, উপজাতি, অবনত জাতি, অস্পৃশ্য জাতি, কত ধর্ম্ম উপধর্ম্ম, কত ভাষা আবিষ্কৃত হইবে জানি না। এবং সেই আবিষ্কারকে ছাপার কালী ও রঙের দ্বারা যথাসম্ভব স্থায়িত্বও দেওয়া হইবে। ১৯২১ সালের সেন্সস রিপোর্টে মোটামুটি ৪০টি জাতিকে "অবনত" গণনা করা হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা গবর্মেণ্ট কয়েক মাস আগে ইণ্ডিয়ান ফ্রাঞ্চিস্ কমিটিকে যে সপ্লেমেণ্টারী মেমোর‍্যাণ্ডম পাঠান তাহাতে ৮৫টি জাতিকে "অবনত" বলিয়া ধরা হইয়াছে! অর্থাৎ সমগ্র হিন্দুসমাজ—উহার "উচ্চ" জাতি ও "নিম্ন" জাতি—যতই উন্নত ও অবনত ভেদ লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং "অবনত"দের মধ্যে শিক্ষিত লোকেরা যতই এই ভেদকে অপমান-করজ্ঞানে ঘৃণাভরে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন, সেই ভেদকে রক্ষা করিবার ও বাড়াইবার জেদ শ্বেতদ্বীপাগত নব-মন্থদের হৃদয়-মনকে ততই অধিক পরিমাণে দখল করিয়া বসিতেছে। কিন্তু "অবনত"রা ইহাতে দমিবেন না, সমগ্র হিন্দু সমাজ দমিবেন না।

নব-মন্থদের এই জেদের পরিচয় কিছুদিন হইতে শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্ট আদিতেও পাওয়া যাইতেছে। আগে আগে এই রিপোর্টে কোন্ ধর্ম্মের ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কত পড়ে, তাহাই দেখান হইত। কিন্তু কিছু দিন হইতে ঐ তালিকায় হিন্দুদিগকে শিক্ষায় অগ্রসর ও শিক্ষায় অনগ্রসর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখান হইতেছে; কিন্তু কেবল হিন্দুদিগকে! মুসলমানদের মধ্যেও "অস্পৃশ্য", "অবনত", অন্ততঃ শিক্ষায় অনগ্রসর, অনেক শ্রেণী আছে। কিন্তু মুসলমান-দিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় নাই। স্বরাজ-লাভে হিন্দুদের চেষ্টার শাস্তিভোগ তাহাদিগকে করিতেই হইবে।

—

নিত্যেন্দ্রনাথ

বিদেশে কাহারও মৃত্যু শোচনীয়। যদি তাহা অকালমৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহা আরও বেদনাদায়ক। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীমান্ নিত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জার্ম্মেনীতে শিক্ষালাভের জন্য গিয়াছিলেন। সেখানে ক্ষয়রোগে তাঁহার দেহান্ত-সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। বালকটির জননী আমাদের সাতিশয় স্নেহের পাত্রী। তাঁহার জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছে, প্রার্থনা স্বতই উত্থিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত সি এফ্ এণ্ড্রুজ মহোদয় নিত্যেন্দ্রনাথের চিকিৎসা, সেবাশুশ্রূষার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া এবং জননীকে বিদেশে জেনোয়া হইতে পুত্রটির নিকট লইয়া গিয়া ও অন্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া সকলের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

—

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

আশ্বিন মাসের প্রবাসী ২৪শে ভাদ্র এবং কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী ৮ই আশ্বিন বাহির হইবে। অতএব বিজ্ঞাপনদাতারা ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে আশ্বিনের নূতন বিজ্ঞাপনের কপি এবং ১লা আশ্বিনের মধ্যে কার্ত্তিকের কপি আমাদের আপিসে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন-কার্য্যাধ্যক্ষ

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



পূজারিণী

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৩৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রথম পূজা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির।
লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা তার ভিৎ পত্তন করেছিলেন
কোন্ মান্ধাতার আমলে,—
স্বয়ং হনুমান এনেছিলেন তার পাথর বহন করে।
ইতিহাসের পণ্ডিত বলেন, এ মন্দির কিরাত জাতের গড়া
এ দেবতা কিরাতের,
একদা যখন ক্ষত্রিয় রাজা জয় করলেন দেশ,—
দেউলের আঙিনা পূজারীদের রক্তে গেল ভেসে,
দেবতা রক্ষা পেলেন নতুন নামে, নূতন পূজাবিধির আড়ালে,—
হাজার বৎসরের প্রাচীন ভক্তির ধারার স্রোত গেল ফিরে।
কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশপথ লুপ্ত।

কিরাত থাকে সমাজের বাইরে
নদীর পূর্ব্বপারে তার পাড়া।
সে ভক্ত, আজ তার মন্দির নেই, তার গান আছে।
নিপুণ তার হাত, অভ্রান্ত তার দৃষ্টি।
সে জানে কী করে পাথরের উপর পাথর বাঁধে,
কী করে পিতলের উপর রূপোর ফুল তোলা যায়,—
কৃষ্ণশিলায় মূর্ত্তি গড়বার ছন্দটা কী।

রাজশাসন তার হাতে নেই, অস্ত্র তার নিয়েচে কেড়ে,
বেশে বাসে ব্যবহারে সম্মানের চিহ্ন হতে সে বর্জ্জিত,
পুঁথির বিদ্যায় তার অনধিকার।
ত্রিলোকেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায়,
তার মধ্যে চিনতে পারে নিজেদেরই মনের আকল্প,
বহুদূরের থেকে প্রণাম করে।
কার্ত্তিক পূর্ণিমায় পূজার উৎসব।
মঞ্চের উপর বাজ্‌চে বাঁশি মৃদঙ্গ করতাল,
মাঠ জুড়ে কানাতের পর কানাত,
মাঝে মাঝে উড়চে ধ্বজা।
পথের দুইধারে ব্যাপারীদের পসরা,—
তামার পাত্র, রূপোর অলঙ্কার, দেবমূর্ত্তির পট, রেশমের কাপড়,
ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি;
অর্ঘ্যের উপকরণ, ফলমালা ধূপ বাতি, ঘড়া ঘড়া তীর্থবারি।
বাজিকর তারস্বরে প্রলাপ বাক্যে দেখাচ্চে বাজি,
কথক পড়চে রামায়ণ কথা।
উজ্জ্বলবেশে সশস্ত্র প্রহরী ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ায় চড়ে;
রাজ-অমাত্য হাতির উপর হাওদায় বসে,
সম্মুখে বেজে চলেচে শি
কিংখাবে ঢাকা পাল্‌কীতে ধনী ঘরের গৃহিণী,
আগে পিছে কিঙ্করের দল।
সন্ন্যাসীর ভিড় লেগেচে পঞ্চবটের তলায়,
নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা,
মেয়েরা পায়ের কাছে ভোগ রেখে যায়
ফল দুধ মিষ্টান্ন, ঘি আতপ তণ্ডুল
থেকে থেকে আকাশে উঠ্‌চে চীৎকারধ্বনি,
জয় ত্রিলোকেশ্বরের জয়।
কাল আসবে শুভলগ্নে রাজার প্রথম পূজা,
স্বয়ং আসবেন মহারাজা রাজহস্তীতে চড়ে।
তাঁর আগমন-পথের দুইধারে
সারি সারি কলার গাছে ফুলের মালা,
মঙ্গলঘটে আম্রপল্লব।

আর ক্ষণে ক্ষণে পথের ধুলায় সেচন করচে গন্ধবারি।
শুক্ল ত্রয়োদশীর রাত।
মন্দিরে প্রথম প্রহরের শঙ্খ ঘণ্টা ভেরী পটহ বেজে গিয়েচে।
আজ চাঁদের উপরে একটা ঘোলা আবরণ,
জ্যোৎস্না আজ ঝাপসা,—

বাতাস রুদ্ধ,—
আকাশে ধোঁয়া জমে আছে,
দূরের গাছপালাগুলো যেন শঙ্কিত,—
কুকুর অকারণে আর্তনাদ করচে,—
ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে ডেকে উঠচে কোন অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে।
হঠাৎ গম্ভীর ভীষণ শব্দ শোনা গেল মাটির নীচে—
পাতালে দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে—
গুরু গুরু গুরু গুরু।
মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজতে লাগল প্রবল শব্দে।
হাতী বাঁধা ছিল
তারা বন্ধন ছিঁড়ে গর্জ্জন করতে করতে
ছুটল চারদিকে
মাটিতে কাঁপন লেগে ঢেউ উঠল,—
জনতার হাজার হাজার লোক দিশাহারা হয়ে আর্ত্তস্বরে ছুটোছুটি বাধিয়ে দিলে
চোখে তাদের ধাঁধা লাগে,
আত্মপরের ভেদ হারিয়ে কে কাকে দেয় দ'লে।
মাটি ফেটে ফেটে ওঠে ধোঁয়া, ওঠে গরম জল :—
ভীম সরোবর দীঘির জল মুহূর্ত্তে বালির নীচে গেল শুষে।
মন্দিরের ছাদে বাঁধা বড় ঘণ্টা দুলতে দুলতে বাজতে লাগল ঢং ঢং,
আচমকা ধ্বনি থামল একটা ভেঙে পড়ার শব্দে।
পৃথিবী যখন স্তব্ধ হোলো
পূর্ণপ্রায় চাঁদ তখন হেলেচে পশ্চিমের দিকে।
আকাশে উঠচে জ্বলে-ওঠা কাণাৎগুলোর ধোঁয়ার কুণ্ডলী
জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েচে।

পরদিন আত্মীয়দের বিলাপে দিগ্বিদিক যখন শোকার্ত্ত,—
তখন রাজসৈনিকদল মন্দির ঘিরে দাঁড়াল,

পাছে অশুচিতার কারণ ঘটে।
রাজমন্ত্রী এল, দৈবজ্ঞ এল, স্মার্ত্ত পণ্ডিত এল।
দেখলে বাহিরের প্রাচীর ধূলিসাৎ ;
দেবতার বেদীর উপরের ছাদ পড়েচে ভেঙে।
পণ্ডিত বল্‌লে, সংস্কার করা চাই আগামী পূর্ণিমার পূর্ব্বেই
নইলে দেবতা পরিহার করবেন তাঁর মূর্ত্তিকে।
রাজা বল্‌লেন, "সংস্কার করো।"
মন্ত্রী বল্‌লেন, "ঐ কিরাতরা ছাড়া কে করবে পাথরের কাজ।
ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে ?
কী হবে মন্দির-সংস্কারে যদি মলিন হয় দেবতার অঙ্গমহিমা ?"
কিরাত দলপতি মাধবকে রাজা আনলেন ডেকে।
বৃদ্ধ মাধব, শুক্ল কেশের উপর নির্ম্মল সাদা চাদর জড়ানো,—
পরিধানে পীতধড়া, তাম্রবর্ণ দেহ কটি পর্য্যন্ত অনাবৃত,—
দুই চক্ষু সকরুণ নম্রতায় পূর্ণ,
সাবধানে রাজার পায়ের কাছে রাখলে একমুঠো কুন্দ ফুল,
প্রণাম করলে, স্পর্শ বাঁচিয়ে।
রাজা বল্‌লেন, "তোমরা না হলে দেবালয় সংস্কার হয় না।"
"আমাদের পরে দেবতার ঐ কৃপা,"
এই বলে মাধব প্রণাম জানালে দেবতার উদ্দেশে।
নৃপতি নৃসিংহ রায় বললেন, "চোখ বেঁধে কাজ করা চাই,
দেবমূর্ত্তির উপর দৃষ্টি যাতে না পড়ে। পারবে ?"
মাধব বল্‌লে, "অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্য্যামী।
যতক্ষণ কাজ চলবে, চোখ খুলব না।"

বাহিরে কাজ করে কিরাতের দল,
মন্দিরের ভিতরে কাজ করে মাধব,
তার দুই চক্ষু পাকে পাকে কালো কাপড়ে বাঁধা।
দিনরাত সে মন্দিরের বাহিরে যায় না,
ধ্যান করে, গান গায়, আর তার আঙুল চলতে থাকে।
মন্ত্রী এসে বলে, "ত্বরা করো, ত্বরা করো,
তিথির পরে তিথি যায়, কবে লগ্ন হবে উত্তীর্ণ।"
মাধব জোড়হাতে বলে, "যাঁর কাজ তাঁরই নিজের আছে ত্বরা,
আমি তো উপলক্ষ্য।"

অমাবস্যা পার হয়ে শুক্লপক্ষ আবার এল।
অন্ধ মাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়,
পাথর তার সাড়া দিতে থাকে।
কাছে দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরী
পাছে মাধব চোখের বাঁধন খোলে।
পণ্ডিত এসে বললে, "একাদশীর রাত্রে প্রথম পূজার শুভক্ষণ।
কাজ কি শেষ হবে তার পূর্ব্বে ?"
মাধব প্রণাম করে বল্‌লে, "আমি কে যে তার উত্তর দেব ?
কৃপা যখন হবে সংবাদ পাঠাব যথাসময়ে,
তার আগে এলে ব্যাঘাত হবে, বিলম্ব ঘটবে।"
ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী পেরোলো,
মন্দিরের দ্বার দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে
মাধবের শুক্লকেশে।
সূর্য্য অস্ত গেল, পাণ্ডুর আকাশে উঠল একাদশীর চাঁদ।
মাধব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,
"যাও প্রহরী, সংবাদ দিয়ে এসো গে
মাধবের কাজ শেষ হল আজ।
লগ্ন যেন বয়ে না যায়।"

প্রহরী গেল।
মাধব খুলে ফেললে চোখের বন্ধন।
তখন মুক্ত দ্বার দিয়ে একাদশী চাঁদের পূর্ণ আলো পড়েচে
দেবমূর্ত্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় ক'রে,
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে
চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের।

রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
মাধব তখন তার মাথা নত করেচে বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্ত্তে ছিন্ন হল সেই মাথা,
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম॥

শান্তিনিকেতন
১২ই আগষ্ট ১৯৩২,

শশাঙ্কের কলঙ্ক—রাজ্যবর্দ্ধন-হত্যা

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে গুপ্ত-সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হওয়ার পর দুই দিকে সমানে আর্য্যাবর্ত্তে প্রাধান্য স্থাপনের উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের সার্ব্বভৌমের পদ অধিকার করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়াছিলেন গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক, এবং পশ্চিম দিকে দাঁড়াইয়াছিলেন স্থাণ্বীশ্বরের অধিপতি প্রভাকরবর্দ্ধন। প্রভাকরবর্দ্ধন পুরুষানুক্রমে যে-রাজ্যের রাজা ছিলেন হর্ষচরিতকার বাণভট্ট তাহার নাম করিয়াছেন "শ্রীকণ্ঠ" (শ্রীকণ্ঠো নাম জনপদঃ) এবং যে-প্রদেশে শ্রীকণ্ঠের রাজধানী ছিল তাহার নাম করিয়াছেন স্থাণ্বীশ্বর নামক জনপদবিশেষ বা জেলা। স্থাণ্বীশ্বর পুণ্যসলিলা সরস্বতীর তীরে অবস্থিত ছিল। পঞ্জাব প্রদেশের আম্বালা জেলার অন্তর্গত থানেশ্বর অপভ্রংশ আকারে এখনও প্রাচীন স্থাণ্বীশ্বরের নাম বহন করিতেছে। হর্ষের তাম্রশাসনে তাহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ নরবর্দ্ধন, প্রপিতামহ (প্রথম) রাজ্যবর্দ্ধন, পিতামহ আদিত্যবর্দ্ধন "মহারাজ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন "পরমভট্টারক" এবং "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ভূষিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাকে "চতুস্সমুদ্রাতিক্রান্তকীর্ত্তি" এবং "প্রতাপানুরাগোপনতান্যরাজ" বলা হইয়াছে।

হর্ষের সভাসদ বাণ "হর্ষচরিত" নামক গদ্যকাব্যে প্রভাকরবর্দ্ধন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তিনি "হূণহরিণকেশরী" ছিলেন, অর্থাৎ সিংহ যেমন অতি সহজে হরিণ মারে, প্রভাকরবর্দ্ধন তেমনি সহজে হূণগণকে পরাজিত বা বিধ্বস্ত করিতেন ; তিনি "সিন্ধুরাজজ্বর" ছিলেন, অর্থাৎ সিন্ধুরাজ তাঁহার আক্রমণে জ্বরাতুর ব্যক্তির মত কাতর হইতেন ; তিনি "গুর্জ্জর প্রজাগর" ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার ভয়ে গুর্জ্জরপতির ঘুম হইত না (তৎকালে রাজপুতানার পশ্চিমাংশ গুর্জ্জর নামে পরিচিত ছিল) ; তিনি "গান্ধারাধিপগন্ধদ্বিপকূটপাকল" ছিলেন, অর্থাৎ গান্ধারাধিপতিরূপ যে গন্ধযুক্ত হস্তী প্রভাকরবর্দ্ধন তাঁহার জ্বরস্বরূপ বা নির্ঘাতনকারী ছিলেন ; তিনি "লাট-পাটব-পাটচ্চর" ছিলেন, অর্থাৎ লাটপতির নৈপুণ্য বা বীর্য্য চুরি করিয়াছিলেন (তৎকালে বর্ত্তমান গুজরাত লাট-নামে পরিচিত ছিল) ; তিনি "মালবলক্ষ্মীলতাপরশু" ছিলেন, অর্থাৎ মালবের রাজলক্ষ্মীরূপিণী লতার কুড়াল বা ছেদনকারী ছিলেন। বাণ প্রভাকরবর্দ্ধনের এই যে কয়টি বিশেষণ দিয়াছেন তাহার মর্ম্মকথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে গেলে বলিতে হয়, প্রভাকরবর্দ্ধন গান্ধার, সিন্ধু, লাট, গুর্জ্জর, মালব এবং হূণরাজ্য পদানত করিয়াছিলেন। আবার এই সকল বিশেষণের ভিতরকার কাব্যসুলভ অতিশয়োক্তি বাদ দিয়া বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে, প্রভাকরবর্দ্ধন অন্ততঃ এই সকল জনপদের অধিপতিগণকে পদানত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্‌খানে তাঁহার চেষ্টা কতটা ফলবতী হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। মালবরাজ যে এক সময় প্রভাকরবর্দ্ধনের অনুগত ছিলেন তাহার প্রমাণ "হর্ষচরিতে" (চতুর্থ অধ্যায়) পাওয়া যায়। প্রভাকরবর্দ্ধনের দুই পুত্র, রাজ্যবর্দ্ধন এবং হর্ষ যৌবনে পদার্পণ করিলে প্রভাকরবর্দ্ধন একদিন তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—

"আমার ভুজদ্বয়ের ন্যায় আমার দেহের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে সম্বদ্ধ মালবরাজের দুই পুত্র, কুমারগুপ্ত এবং মাধবগুপ্ত, এই দুই ভাইকে আমি তোমাদের অনুচর নিযুক্ত করিয়াছি।"

প্রভাকরবর্দ্ধন কান্যকুব্জের মুখর-বংশীয় রাজা অনন্তবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র গ্রহবর্ম্মার করে স্বীয় কন্যা রাজ্যশ্রীকে দান করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলে কান্যকুব্জ রাজ্য স্থাণ্বীশ্বরের মিত্ররাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। বাণ লিখিয়াছেন, প্রভাকরবর্দ্ধন হূণগণকে ধ্বংস করিবার জন্য

(হূণান্‌হন্তুং) সৈন্যসামন্ত সহ রাজ্যবর্দ্ধনকে উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন (উত্তরাপথং প্রাহিণোৎ)। হর্ষও রাজ্যবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর গিয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন যখন হিমালয় প্রদেশে (কৈলাসপ্রভাভাসিনী ককুভে) প্রবেশ করিলেন, তখন হর্ষ তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে বনে শিকার খেলিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে রাজধানী হইতে খবর আসিল, মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই খবর পাইবা মাত্রই হর্ষ ঘোড়ায় চড়িয়া স্থাণ্বীশ্বর যাত্রা করিলেন এবং সারা দিন রাত্রি চলিয়া পরদিন মধ্যাহ্ন সময়ে তথায় পহুঁছিলেন। হর্ষ চিকিৎসকগণের সহিত কথা কহিয়া বুঝিতে পারিলেন তাঁহার পিতার মৃত্যু নিকট, এবং পরদিন প্রত্যূষে রাজ্যবর্দ্ধনকে স্থাণ্বীশ্বরে আনিবার জন্য দ্রুতগামী উষ্ট্র-আরোহী পাঠাইলেন। রাজ্যবর্দ্ধন হূণগণকে জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আর পিতাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি হর্ষকে বলিলেন যে, তাঁহার পিতৃসিংহাসনে বসিবার সাধ নাই, তিনি হর্ষকে রাজ্য দিয়া তপোবনে আশ্রয় লইতে চাহেন। হর্ষ অবশ্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, এবং বলিলেন, "আপনি তপোবনে গেলে আমিও আপনার অনুসরণ করিব, এবং তপশ্চরণ করিয়া ভ্রাতৃআজ্ঞা-লঙ্ঘনজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

রাজ্যবর্দ্ধন এবং হর্ষ যখন এইরূপ আলোচনায় রত ছিলেন এমন সময় সংবাদক নামক রাজ্যশ্রীর পরিচারক কাঁদিতে কাঁদিতে সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"দেব, পিশাচগণের ন্যায় নীচমনা লোকেরাও প্রায়শঃ ছিদ্র দেখিয়া আক্রমণ করে। অবনীপতি (প্রভাকরবর্দ্ধন) দেহত্যাগ করিয়াছেন এই সংবাদ যেদিন প্রচারিত হইয়াছে সেই দিনই দেব গ্রহবর্ম্মা দুরাত্মা মালবরাজ কর্ত্তৃক স্বীয় সুকৃতের সহিত জীবলোক হইতে অপসারিত হইয়াছেন, এবং রাজকুমারী রাজ্যশ্রী চৌরস্ত্রীর মত লৌহনিগড়বদ্ধ-চরণে কান্যকুব্জের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। জনরব এই, রাজসেনা নায়কশূন্য মনে করিয়া অতিশয় দুর্ম্মতি (মালব-রাজ) জয় করিবার অভিলাষে এই রাজ্যও আক্রমণ করিবেন। এই আমার বক্তব্য ; (এখন) প্রভু যাহা হয় করুন।"

এই সংবাদ পাইয়া সেই দিনই রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজকে শাস্তি দিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দশ হাজার অশ্বারোহী লইয়া মাতুলপুত্র ভণ্ডি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সামন্ত রাজগণ এবং হস্তীসেনা স্থাণ্বীশ্বরে রহিল। কিছু দিন পরে রাজ্যবর্দ্ধনের প্রিয়পাত্র অশ্বারোহী সেনার নায়ক কুন্তল স্থাণ্বীশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। এবং—

"তস্মাচ্চ হেলানির্জ্জিতমালবানীকমপি গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রমেকাকিনং বিশ্রব্ধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতমশ্রৌষীৎ।"

"তাঁহার নিকট হইতে (হর্ষ) শুনিতে পাইলেন, তাঁহার ভ্রাতা (রাজ্যবর্দ্ধন) অতি সহজে মালবসেনা পরাজিত করিয়া থাকিলেও, মিথ্যা স্তুতিবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একাকী নিরস্ত্র নিঃশঙ্ক গৌড়াধিপের ভবনে গিয়া তথায় গৌড়াধিপকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন।"

হর্ষের দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। একখানি বাঁশখেরায় প্রাপ্ত এবং হর্ষের রাজত্বের ২২ সালে অর্থাৎ ৬২৮ বা ৬২৯ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত ;* আর একখানি মধুবনে প্রাপ্ত এবং হর্ষের ২৫ সালে, ৬৩১—৬৩২ খৃষ্টাব্দে, সম্পাদিত।† এই দুইখানি তাম্রশাসনেই রাজ্যবর্দ্ধন সম্বন্ধে এই শ্লোকটি আছে—

রাজানো যুধি দুষ্টবাজিনইব শ্রীদেবগুপ্তাদয়
কৃত্বা যেন কশাপ্রহারবিমুখাঃ সর্ব্বে সমংসংযতাঃ।
উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বসুধাং কৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং
প্রাণানুজ্‌ঝিতবানরাতিভবনে সত্যানুরোধেন যঃ॥

"কশাঘাতে অসংযত দুষ্ট ঘোড়া (যেমন সংযত হয়), তেমনই তিনি শ্রীদেবগুপ্তাদি নরপতিগণকে যুদ্ধে সমান ভাবে সংযত (পরাভূত) করিয়াছিলেন ; শত্রুগণকে উৎখাত করিয়া, পৃথিবী জয় করিয়া, এবং প্রজাগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া (তিনি) শত্রুর গৃহে সত্যানুরোধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।"

"সত্যানুরোধে" অর্থ অবশ্য "প্রতিজ্ঞানুরোধে"। এই প্রতিজ্ঞা কাহার? রাজ্যবর্দ্ধনের, না তাঁহার শত্রুর? "হর্ষচরিতে"র "মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাসের" সহিত একবাক্যতা সাধনের জন্য ডাক্তার কিলহর্ণ এই "সত্য" আরোপ করিয়াছেন শত্রুতে, এবং "সত্যানুরোধে"র অনুবাদ করিয়াছেন—

* *Epigraphia Indica*, Vol. IV, p. 210.
† *Epigraphia Indica*, Vol. VI, p. 157.

"Through his trust in promises"

"(শক্রর) প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করায়"

শক্রর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসস্থাপনকে ঠিক সত্যনিষ্ঠা বলা যায় না। এই শ্লোকে রাজ্যবর্দ্ধনের সত্যনিষ্ঠার উল্লেখ করা কবির অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। সুতরাং "সত্যানুরোধেন" পদের তাৎপর্য্য এই, রাজ্যবর্দ্ধন সত্য বা প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য প্রাণের ভয় ত্যাগ করিয়া শক্রর গৃহে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বাঁশখেরা শাসনের শেষে খুব বড় অক্ষরে এই স্বাক্ষর আছে—

"স্বহস্তোমম মহারাজাধিরাজশ্রীহর্ষস্য"
"আমার, মহারাজাধিরাজশ্রীহর্ষের স্বাক্ষর"

হর্ষের মধুবনের শাসনে এই স্বাক্ষর নাই, এবং অন্য কোনও রাজার কোন শাসনে এইরূপ স্বাক্ষর দেখা যায় না।

মধুবনের শাসনের রাজবংশপ্রশস্তির অংশ বাঁশখেরা শাসনের রাজবংশ-প্রশস্তির অবিকল নকল। হর্ষ স্বয়ং সুকবি ছিলেন। "রত্নাবলী," "নাগনন্দ" তাঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। খুব সম্ভব হর্ষের শাসনের রাজবংশপ্রশস্তি তাঁহার নিজের রচিত, এবং বাঁশখেরার শাসনখানি তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত। বাঁশখেরা শাসনের রাজবংশ-প্রশস্তি এবং তাহার অন্তর্গত রাজ্যবর্দ্ধনের সম্পর্কীয় শ্লোকটি হর্ষের নিজের রচিত হউক আর না হউক, এই শাসনে তাঁহার স্বাক্ষর থাকায় স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যাইতে পারে, এই শ্লোকে নিবদ্ধ রাজ্যবর্দ্ধনের ইতিহাস হর্ষের অনুমোদিত। রাজ্যবর্দ্ধনের প্রকৃত ইতিহাস এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানিবার হর্ষের যেমন সুযোগ ছিল আর কাহারও তেমন সুযোগ ছিল না। বাণের ত ছিলই না, কেন-না, এই সকল ঘটনার সময় তিনি রাজদরবারে পহুঁছেন নাই। বাণ রাজ্যবর্দ্ধনের মালবাধিপতির বিরুদ্ধে কান্যকুব্জাভিমুখে যুদ্ধযাত্রার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহার সহিত হর্ষের শাসনের শ্লোকে নিবদ্ধ বিবরণের অনেক বিরোধ দেখা যায়। বাণ যেখানে বলিয়াছেন, রাজ্যবর্দ্ধন হেলায় মালবসেনা মাত্র পরাজিত করিয়াছিলেন, সেখানে শাসনের শ্লোকে আছে, কশাঘাতে দুষ্ট ঘোড়ার মত রাজ্যবর্দ্ধন যুদ্ধে দেবগুপ্তাদি নৃপতিগণকে সংযত (পরাজিত) করিয়াছিলেন। বাণের মতে রাজ্যবর্দ্ধন কেবল মালবসেনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, শাসনের মতে তাঁহাকে অপরাপর শক্ররাজার সেনার সহিতও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশ্যই বলা যাইতে পারে, অপর সকল শক্র রাজারা মালব-রাজের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ দিয়াছিলেন। সুতরাং "হর্ষচরিতে" তাঁহারা স্বতন্ত্র উল্লিখিত হয়েন নাই। বাণের মতে রাজ্যবর্দ্ধনের মালবসেনাপরাজয় এবং গৌড়াধিপকর্ত্তৃক নিধন প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এক যাত্রায় ঘটিয়াছিল। শাসনের শ্লোকে এই অভিযানের সহিত বসুধা বিজয় এবং প্রজার প্রিয়কার্য্যসাধন যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাণের বিবরণ অনুসারে পিতৃরাজ্যলাভের পর রাজ্যবর্দ্ধনের এই সকল কাজ করিবার অবকাশ দেখা যায় না। প্রভাকরবর্দ্ধনের জীবদ্দশায় তাঁহার তথাকথিত বসুধা বিজয়ের অবকাশ উপস্থিত হয় নাই। "হর্ষচরিতে"র পঞ্চম উচ্ছ্বাসের গোড়ায় বাণভট্ট লিখিয়াছেন, ইহার পর একদিন রাজা (প্রভাকরবর্দ্ধন) "কবচহর" রাজ্যবর্দ্ধনকে ডাকিয়া হূণগণকে ধ্বংস করিবার জন্য উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। "কবচহর" পদের অর্থ যাহার কবচধারণের যোগ্য বয়স হইয়াছে এমন যুবক। সুতরাং বাণের মতে হূণগণের বিরুদ্ধে যাত্রা রাজ্যবর্দ্ধনের প্রথম যুদ্ধযাত্রা, এবং তাহার পরই মালব-রাজের বিরুদ্ধে শেষযাত্রা।

"হর্ষচরিতে"র এবং শাসনের মধ্যে বিরোধ ভঙ্গের জন্য বলা যাইতে পারে, হর্ষচরিতে যেটুকু বলা হইয়াছে তাহাই সত্য, এবং শাসনে মালবসেনা পরাজয়ই অতিরঞ্জিত হইয়া বসুধা বিজয়ে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু শাসনের শ্লোকের শেষ পাদে অতিশয়োক্তির চিহ্ন দেখা যায় না। বাণ যেখানে লিখিয়াছেন, গৌড়াধিপ মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাস নিঃশস্ত্র নিরস্ত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে একাকী পাইয়া স্বভবনে নিধন করিয়াছিলেন, শাসনের শ্লোককর্ত্তা সেখানে বলিয়াছেন, রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে শক্রর ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। টানাটানি করিলে শ্লোকার্থের সহিত বাণের বিবরণের সামঞ্জস্যবিধান অসাধ্য নহে। কিন্তু সুরু হইতেই শ্লোকের বিবরণ যখন অগ্

ছাঁচে ঢালা তখন সহজ অর্থ ছাড়িয়া শেষ পাদের অনুরূপ অর্থ করা কর্ত্তব্য নহে। যে অরাতির ভবনে রাজ্যবর্দ্ধন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি হর্ষের বা হর্ষের অনুমতি অনুসারে শ্লোক রচনাকারীর বাণের অপেক্ষা কম বিদ্বেষ থাকার কথা নয়। তাহা সত্ত্বেও যখন শাসনের শ্লোককর্ত্তা রাজ্যবর্দ্ধনের শত্রু গৌড়াধিপকে রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুপ্রসঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতক বলেন নাই, তখন বিশেষ বিচার না করিয়া বাণের কথা অনুসারে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলা যায় না। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাণের কথা সমর্থন করে। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ লিখিয়াছেন—

"The latter (Rajyavardhana) soon after his accession was treacherously murdered by Sasanka, the wicked King of Karnasuvarna in Eastern India, a persecutor of Buddhism" (Watters).

"রাজ্যলাভের অনতিকাল পরেই প্রাচ্যভারতের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণের নিষ্ঠুর রাজা বৌদ্ধনির্য্যাতনকারী শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিয়াছিল।"

য়ুয়ান চোয়াঙ্ হর্ষের রাজত্বের প্রায় শেষভাগে (আনুমানিক ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে) তাঁহার এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে তখন যে জনরব প্রচলিত তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই জনরবের মূল খুব সম্ভব "হর্ষচরিত"। "হর্ষচরিতে"র তৃতীয় উচ্ছ্বাস পাঠ করিলে মনে হয়, বাণ হর্ষের দরবারে প্রবেশলাভের অনতিকাল পরে "হর্ষচরিতে"র রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। য়ুয়ান চোয়াঙ্ হর্ষের দরবারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ সভাপণ্ডিত বাণের বিবৃতি প্রচারলাভ করিয়াছিল। এখন জিজ্ঞাস্য, বাণের কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য ?

পাশ্চাত্য হিসাবে যাহাকে জীবনচরিত (biography) বা ইতিহাস (history) বলে, বাণের "হর্ষচরিত" সেই শ্রেণীর গ্রন্থ নহে, "হর্ষচরিত" একখানি কাব্য এবং আখ্যায়িকা। "হর্ষচরিতে"র সূচনায় কয়েকটি শ্লোকে গ্রন্থকার তাঁহার আদর্শস্থানীয় কবিগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কি আদর্শ লইয়া তিনি এই আখ্যায়িকা রচনা করিতেছেন তাহা এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

"সুখপ্রবোধললিতা সুবর্ণঘটনোজ্জ্বলৈঃ।
শব্দৈরাখ্যায়িকা ভাতি শয্যেব প্রতিপাদকৈঃ।

"সুখে যেখান হইতে নিদ্রাভঙ্গ হয় এইরূপ বিছানার মত সুখবোধ আখ্যায়িকা শোভন অক্ষরযুক্ত সার্থক (প্রতিপাদক) শব্দের দ্বারা শোভা পায়।"

এখানে আখ্যায়িকার আখ্যানবস্তুর বা ঘটনার সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে কোন কথা নাই। আখ্যায়িকার প্রধান উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে শব্দযোজনাকৌশল দেখান। "হর্ষচরিতে"র পত্রে পত্রে শব্দাড়ম্বর দেখা যায়। এই গ্রন্থের চরিতাংশ অছিলা মাত্র; এই অছিলায় গ্রন্থকার পদে পদে সমাসবদ্ধ এবং দ্ব্যর্থ শব্দযোজনাকৌশলের এবং বর্ণনাশক্তির পরিচয় দিতে ব্যতিব্যস্ত। যদিও "হর্ষচরিতে"র চরিতভাগের বিষয় গ্রন্থকারের নিজের বংশের, নিজের, এবং স্থাণ্বীশ্বরের নৃপতিগণের চরিত কথন, তথাপি এই চরিতকথায় গ্রন্থকার বাস্তব ঘটনার সহিত কাল্পনিক ঘটনা মিলাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। স্বীয় বংশে পাণ্ডিত্য স্বয়ং সরস্বতীর সাক্ষাৎ কৃপাজনিত এই কথা প্রতিপাদন করিবার জন্য বাণ একটি অদ্ভুত কাহিনী সৃষ্টি করিয়া "হর্ষচরিতে"র প্রথম উচ্ছ্বাসে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এক সময় দেবী সরস্বতী দুর্ব্বাসা ঋষির শাপে ব্রহ্মলোক ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে নামিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং সাবিত্রী দেবীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া শোণ নদের তীরে শিলাতলবিশিষ্ট এক লতামণ্ডপে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এখানে চ্যবনের পুত্র দধীচের ঔরসে সারস্বত নামক এক পুত্র প্রসব করিয়া সরস্বতী পুনরায় ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিয়াছিলেন। তারপর দধীচ ভ্রাতৃনামক ভৃগু গোত্রীয় ব্রাহ্মণের পত্নী অক্ষমালার করে সারস্বতকে অর্পণ করিয়া তপশ্চরণের জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সারস্বতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সমসময়ে অক্ষমালার বৎস নামক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। সারস্বত এবং বৎস যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মত একত্র লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিবামাত্রই মাতার বরে সারস্বতের বেদবেদাঙ্গাদি সকল শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সারস্বত সেই জ্ঞান বৎসকে দান করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৎসের বংশধর বাণ। বাণের "কাদম্বরী"র সূচনায় যে

"Through his trust in promises"

"(শত্রুর) প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করায়"

শত্রুর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসস্থাপনকে ঠিক সত্যনিষ্ঠা বলা যায় না। এই শ্লোকে রাজ্যবর্দ্ধনের সত্যনিষ্ঠার উল্লেখ করা কবির অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। সুতরাং "সত্যানুরোধেন" পদের তাৎপর্য্য এই, রাজ্যবর্দ্ধন সত্য বা প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য প্রাণের ভয় ত্যাগ করিয়া শত্রুর গৃহে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বাঁশখেরা শাসনের শেষে খুব বড় অক্ষরে এই স্বাক্ষর আছে—

"স্বহস্তোমম মহারাজাধিরাজশ্রীহর্ষস্য"
"আমার, মহারাজাধিরাজশ্রীহর্ষের স্বাক্ষর"

হর্ষের মধুবনের শাসনে এই স্বাক্ষর নাই, এবং অন্য কোনও রাজার কোন শাসনে এইরূপ স্বাক্ষর দেখা যায় না।

মধুবনের শাসনের রাজবংশপ্রশস্তির অংশ বাঁশখেরা শাসনের রাজবংশ-প্রশস্তির অবিকল নকল। হর্ষ স্বয়ং সুকবি ছিলেন। "রত্নাবলী," "নাগনন্দ" তাঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। খুব সম্ভব হর্ষের শাসনের রাজবংশপ্রশস্তি তাঁহার নিজের রচিত, এবং বাঁশখেরার শাসনখানি তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত। বাঁশখেরা শাসনের রাজবংশ-প্রশস্তি এবং তাহার অন্তর্গত রাজ্যবর্দ্ধনের সম্পর্কীয় শ্লোকটি হর্ষের নিজের রচিত হউক আর না হউক, এই শাসনে তাঁহার স্বাক্ষর থাকায় স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যাইতে পারে, এই শ্লোকে নিবদ্ধ রাজ্যবর্দ্ধনের ইতিহাস হর্ষের অনুমোদিত। রাজ্যবর্দ্ধনের প্রকৃত ইতিহাস এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানিবার হর্ষের যেমন সুযোগ ছিল আর কাহারও তেমন সুযোগ ছিল না। বাণের ত ছিলই না, কেন-না, এই সকল ঘটনার সময় তিনি রাজদরবারে পহুঁছেন নাই। বাণ রাজ্যবর্দ্ধনের মালবাধিপতির বিরুদ্ধে কান্যকুব্জাভিমুখে যুদ্ধযাত্রার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহার সহিত হর্ষের শাসনের শ্লোকে নিবদ্ধ বিবরণের অনেক বিরোধ দেখা যায়। বাণ যেখানে বলিয়াছেন, রাজ্যবর্দ্ধন হেলায় মালবসেনা মাত্র পরাজিত করিয়াছিলেন, সেখানে শাসনের শ্লোকে আছে, কশাঘাতে দুষ্ট ঘোড়ার মত রাজ্যবর্দ্ধন যুদ্ধে দেবগুপ্তাদি নৃপতিগণকে সংযত (পরাজিত) করিয়াছিলেন। বাণের মতে রাজ্যবর্দ্ধন কেবল মালবসেনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, শাসনের মতে তাঁহাকে অপরাপর শত্রুরাজার সেনার সহিতও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশ্যই বলা যাইতে পারে, অপর সকল শত্রু রাজারা মালব-রাজের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ দিয়াছিলেন। সুতরাং "হর্ষচরিতে" তাঁহারা স্বতন্ত্র উল্লিখিত হয়েন নাই। বাণের মতে রাজ্যবর্দ্ধনের মালবসেনাপরাজয় এবং গৌড়াধিপকর্ত্তৃক নিধন প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এক যাত্রায় ঘটিয়াছিল। শাসনের শ্লোকে এই অভিযানের সহিত বসুধা বিজয় এবং প্রজার প্রিয়কার্য্যসাধন যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাণের বিবরণ অনুসারে পিতৃরাজ্যলাভের পর রাজ্যবর্দ্ধনের এই সকল কাজ করিবার অবকাশ দেখা যায় না। প্রভাকরবর্দ্ধনের জীবদ্দশায় তাঁহার তথাকথিত বসুধা বিজয়ের অবকাশ উপস্থিত হয় নাই। "হর্ষচরিতে"র পঞ্চম উচ্ছ্বাসের গোড়ায় বাণভট্ট লিখিয়াছেন, ইহার পর একদিন রাজা (প্রভাকরবর্দ্ধন) "কবচহর" রাজ্যবর্দ্ধনকে ডাকিয়া হূণগণকে ধ্বংস করিবার জন্য উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। "কবচহর" পদের অর্থ যাহার কবচধারণের যোগ্য বয়স হইয়াছে এমন যুবক। সুতরাং বাণের মতে হূণগণের বিরুদ্ধে যাত্রা রাজ্যবর্দ্ধনের প্রথম যুদ্ধযাত্রা, এবং তাহার পরই মালব-রাজের বিরুদ্ধে শেষযাত্রা।

"হর্ষচরিতে"র এবং শাসনের মধ্যে বিরোধ ভঙ্গের জন্য বলা যাইতে পারে, হর্ষচরিতে যেটুকু বলা হইয়াছে তাহাই সত্য, এবং শাসনে মালবসেনা পরাজয়ই অতিরঞ্জিত হইয়া বসুধা বিজয়ে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু শাসনের শ্লোকের শেষ পাদে অতিশয়োক্তির চিহ্ন দেখা যায় না। বাণ যেখানে লিখিয়াছেন, গৌড়াধি[illegible] মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাস নিঃশস্ত্র নিরস্ত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে একাকী পাইয়া স্বভবনে নিধন করিয়াছিলেন, শাসনের শ্লোককর্ত্তা সেখানে বলিয়াছেন, রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরো[illegible] শত্রুর ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। টানাটানি করিলে শ্লোকার্থের সহিত বাণের বিবরণের সামঞ্জস্যবিধান অসা[illegible] নহে। কিন্তু সুরু হইতেই শ্লোকের বিবরণ যখন অ[illegible]

ছাঁচে ঢালা তখন সহজ অর্থ ছাড়িয়া শেষ পাদের অন্তরূপ অর্থ করা কর্ত্তব্য নহে। যে অরাতির ভবনে রাজ্যবর্দ্ধন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি হর্ষের বা হর্ষের অনুমতি অনুসারে শ্লোক রচনাকারীর বাণের অপেক্ষা কম বিদ্বেষ থাকার কথা নয়। তাহা সত্ত্বেও যখন শাসনের শ্লোককর্ত্তা রাজ্যবর্দ্ধনের শত্রু গৌড়াধিপকে রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুপ্রসঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতক বলেন নাই, তখন বিশেষ বিচার না করিয়া বাণের কথা অনুসারে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলা যায় না। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাণের কথা সমর্থন করে। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ লিখিয়াছেন—

"The latter (Rajyavardhana) soon after his accession was treacherously murdered by Sasanka, the wicked King of Karnasuvarna in Eastern India, a persecutor of Buddhism" (Watters).

"রাজ্যলাভের অনতিকাল পরেই প্রাচ্যভারতের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণের নিষ্ঠুর রাজা বৌদ্ধনির্যাতনকারী শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিয়াছিল।"

য়ুয়ান চোয়াঙ্ হর্ষের রাজত্বের প্রায় শেষভাগে (আনুমানিক ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে) তাঁহার এবং তাঁহার সভাসদ্গণের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে তখন যে জনরব প্রচলিত তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই জনরবের মূল খুব সম্ভব "হর্ষ-চরিত"। "হর্ষচরিতে"র তৃতীয় উচ্ছ্বাস পাঠ করিলে মনে হয়, বাণ হর্ষের দরবারে প্রবেশলাভের অনতিকাল পরে "হর্ষচরিতে"র রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। য়ুয়ান চোয়াঙ্ হর্ষের দরবারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ সভাপণ্ডিত বাণের বিবৃতি প্রচারলাভ করিয়াছিল। এখন জিজ্ঞাস্য, বাণের কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য?

পাশ্চাত্য হিসাবে যাহাকে জীবনচরিত (biography) বা ইতিহাস (history) বলে, বাণের "হর্ষচরিত" সেই শ্রেণীর গ্রন্থ নহে, "হর্ষচরিত" একখানি কাব্য এবং আখ্যায়িকা। "হর্ষচরিতে"র সূচনায় কয়েকটি শ্লোকে গ্রন্থকার তাঁহার আদর্শস্থানীয় কবিগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কি আদর্শ লইয়া তিনি এই আখ্যায়িকা রচনা করিতেছেন তাহা এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

"সুখপ্রবোধললিতা সুবর্ণঘটনোজ্জ্বলৈঃ।
শব্দৈরাখ্যায়িকা ভাতি শয্যেব প্রতিপাদকৈঃ॥

"সুখে যেখান হইতে নিদ্রাভঙ্গ হয় এইরূপ বিছানার মত সুখবোধ আখ্যায়িকা শোভন অক্ষরযুক্ত সার্থক (প্রতিপাদক) শব্দের দ্বারা শোভা পায়।"

এখানে আখ্যায়িকার আখ্যানবস্তুর বা ঘটনার সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে কোন কথা নাই। আখ্যায়িকার প্রধান উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে শব্দযোজনাকৌশল দেখান। "হর্ষচরিতে"র পত্রে পত্রে শব্দাড়ম্বর দেখা যায়। এই গ্রন্থের চরিতাংশ অছিলা মাত্র; এই অছিলায় গ্রন্থকার পদে পদে সমাসবদ্ধ এবং শ্লেষার্থ শব্দযোজনাকৌশলের এবং বর্ণনাশক্তির পরিচয় দিতে ব্যতিব্যস্ত। যদিও "হর্ষচরিতে"র চরিতভাগের বিষয় গ্রন্থকারের নিজের বংশের, নিজের, এবং স্থাণ্বীশ্বরের নৃপতিগণের চরিত কথন, তথাপি এই চরিতকথায় গ্রন্থকার বাস্তব ঘটনার সহিত কাল্পনিক ঘটনা মিলাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। স্বীয় বংশে পাণ্ডিত্য স্বয়ং সরস্বতীর সাক্ষাৎ কৃপাজনিত এই কথা প্রতিপাদন করিবার জন্য বাণ একটি অদ্ভুত কাহিনী সৃষ্টি করিয়া "হর্ষচরিতে"র প্রথম উচ্ছ্বাসে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এক সময় দেবী সরস্বতী দুর্ব্বাসা ঋষির শাপে ব্রহ্মলোক ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে নামিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং সাবিত্রী দেবীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া শোণ নদের তীরে শিলাতলবিশিষ্ট এক লতামণ্ডপে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এখানে চ্যবনের পুত্র দধীচের ঔরসে সারস্বত নামক এক পুত্র প্রসব করিয়া সরস্বতী পুনরায় ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিয়াছিলেন। তারপর দধীচ ভ্রাতৃনামক ভৃগু গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা পত্নী অক্ষমালার করে সারস্বতকে অর্পণ করিয়া তপশ্চরণের জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সারস্বতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সমসময়ে অক্ষমালার বৎস নামক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। সারস্বত এবং বৎস যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মত একত্র লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিবামাত্রই মাতার বরে সারস্বতের বেদবেদাঙ্গাদি সকল শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সারস্বত সেই জ্ঞান বৎসকে দান করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৎসের বংশধর বাণ। বাণের "কাদম্বরী"র সূচনায় যে

কবিবংশ বর্ণনা আছে তাহাতে এই কাহিনীর কোন আভাস দেওয়া হয় নাই।

বাণ লৌকিক চরিতকথার সহিত আলৌকিক কাহিনী মিলাইতে যেমন কুণ্ঠিত ছিলেন না, স্বাভাবিক ঘটনার ভিতরে অস্বাভাবিক প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত করিতেও তেমন কুণ্ঠিত ছিলেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুমূর্ষু প্রভাকরবর্দ্ধনের শেষবাক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। "হর্ষচরিতে"র পঞ্চম উচ্ছ্বাসে উক্ত হইয়াছে, মাতার অগ্নিপ্রবেশের পরে হর্ষ পিতার পার্শ্বে গিয়া—

"অপশ্যচ্চ স্বল্পাবশেষ প্রাণবৃত্তিং পরিবর্ত্তমানতারকং তারকারাজমিবাস্তমভিলষন্তং জনয়িতারং।"

"দেখিতে পাইলেন, (তাঁহার) পিতার স্বল্পমাত্র প্রাণ অবশিষ্ট আছে, চক্ষুর তারা ঘুরিতেছে, এবং তারকরাজ (চন্দ্রের) ন্যায় অস্ত যাইতেছেন।"

হর্ষ নিকটে আসিবামাত্র তাঁহার রোদনধ্বনি শুনিয়া মুমূর্ষু প্রভাকরবর্দ্ধন একেবারে যেন নবজীবন লাভ করিলেন, এবং তাঁহার (হর্ষের) পক্ষে শোকে কাতর হওয়া সঙ্গত নহে এই সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া তাঁহার তোষামুদি আরম্ভ করিলেন। এই তোষামুদিপূর্ণ বক্তৃতার প্রথম কথা, "কুলপ্রদীপোঽসি ইতি দিবসকর সদৃশস্তে লঘুকরণমিতি", 'কুলপ্রদীপ' বলিলে দিবাকরের ন্যায় দীপ্যমান তোমাকে খাট করা হয়; এবং শেষ কথা, "নিরবশেষতাং শত্রবো নেয়াঃ ইতি সহজস্য তেজস এবেয়ং চিন্তা", শত্রুকুল নির্ম্মূল করা কর্ত্তব্য, (তোমার মত) স্বভাবতঃ তেজস্বী ব্যক্তির ইহাই চিন্তার বিষয়।" (সুতরাং আমি আর তোমাকে কি উপদেশ দিব)। এই কথা বলিতে বলিতে "অপুনরুন্মীলনায় নিমিমীল রাজসিংহো লোচনে", "রাজসিংহ চিরতরে চক্ষু নিমীলিত করিলেন।" চিরতরে চক্ষু নিমীলিত করিবার পূর্ব্বে কাহারও পক্ষেই এই প্রকার বাক্যমালা রচনা করা সম্ভব নহে।

"হর্ষচরিতে" আত্মচরিতে বাণ নিজের দোষের উল্লেখ করিতে সঙ্কোচবোধ করেন নাই, কিন্তু হর্ষের এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের চরিতকথায় তিনি কেবল তাঁহাদের গুণই কীর্ত্তন করিয়াছেন। রাজাদের সম্বন্ধে বাণ প্রকৃতপ্রস্তাবে চরিতকার নহেন, প্রশস্তিকার। প্রশস্তিকারের পক্ষে প্রশংসার পাত্রের গুণ অতিরঞ্জিত করা অনিবার্য্য। কিন্তু প্রভুর গুণের অতিরঞ্জন ব্যাপারে সেকালের প্রশস্তিকারগণের মধ্যে বাণের তুলনা নাই। অন্যান্য প্রশস্তিকারেরা আপন আপন প্রভুকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি দেবতার এবং প্রাচীন রাজর্ষিগণের তুল্য বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; কিন্তু বাণ হর্ষকে দেবতাগণেরও উপরে তুলিয়া দিয়াছেন। হর্ষ সম্বন্ধে বাণ একস্থানে (২য় উচ্ছ্বাসে) লিখিয়াছেন,—

"নাস্য হরেরিব বৃষবিরোধীনি বালচরিতানি, ন পশুপতেরিব দক্ষোদ্বেগকারিণ্যৈশ্বর্য্যবিলসিতানি।"

"হরির (কৃষ্ণের) মত হর্ষের বাল্যলীলা ধর্ম্মবিরোধী ছিল না; (তাঁহার) পশুপতির (ঐশ্বর্য্যের) মত দক্ষের (হর্ষপক্ষে দক্ষ লোকের) উদ্বেগকর ছিল না" ইত্যাদি।

এই প্রকার চরিতকারের কাব্যে ঐতিহাসিক ঘটনার অবিকল বিবরণ আশা করা যাইতে পারে না। শত্রুর শিবিরে রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু অবশ্যই রহস্যময় ঘটনা। রাজ্যবর্দ্ধনের অশ্বারোহী সেনাপতি (বৃহদশ্ববার) কুন্তল এই ঘটনা সম্বন্ধে ছত্রভঙ্গ রাজ্যবর্দ্ধনের সেনাদলে যে-জনরব রটিয়াছিল হর্ষের নিকট তাহাই বহন করিয়াছিলেন। যদি স্বীকারও করা যায়, বাণ অনুপ্রাসের অনুরোধে অথবা প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য এই জনরবকে বিকৃত করেন নাই, তথাপি বাণের সুরে সুর মিলাইয়া শশাঙ্ককে "গৌড়াধম" "গৌড়াধিপাধমচণ্ডাল" বলিয়া নিগৃহীত করিবার পূর্ব্বে ঐতিহাসিকের দুইটি কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

প্রথম কথা—রাজ্যবর্দ্ধনের রহস্যময় মৃত্যুঘটনা সম্বন্ধে আমরা মাত্র এক পক্ষের অভিমত জানি, কিন্তু গৌড়শিবিরে এ সম্বন্ধে কি জনরব উঠিয়াছিল, এবং গৌড়াধিপের পক্ষে এ সম্বন্ধে কি বলিবার ছিল, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না। এই এক পক্ষের অভিমতও যেটুকু আমরা জানি তাহা তাম্রশাসনের রাজপ্রশস্তিকারের এবং "হর্ষচরিত"-কারের মত পেশাদার স্তাবকের বিবরণ। য়ুয়ান চোয়াঙ্ও হর্ষের একান্ত ভক্ত এবং বৌদ্ধনির্য্যাতনকারী বলিয়া শশাঙ্কের একান্ত বিদ্বেষী ছিলেন।

এইরূপ অভিযোগকারীদিগের কথায় একতরফা বিচার করিয়া শশাঙ্ককে সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করা সঙ্গত নহে। কিন্তু শশাঙ্ক যে নির্দ্দোষী ইহা বলিবারও উপায় নাই। সুতরাং গৌড়পক্ষের সাক্ষ্যের প্রতীক্ষায় আপাততঃ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মুলতুবী রাখাই কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় কথা—সূক্ষ্মভাবে ইতিহাসের প্রমাণের পরীক্ষা (critical method of sifting evidence) পাশ্চাত্য বিদ্যা। সুতরাং এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভূয়োদর্শন উপেক্ষিত হইতে পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, ইতিহাসের আকর হিসাবে ঘটনার কর্তৃগণের আত্মচরিতও সকল সময় নির্ভরযোগ্য নহে, জনশ্রুতি এবং জনরব ত দূরের কথা। তাঁহাদের মতে ইতিহাসের প্রমাণ হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কার্য্যকালে কর্য্যোপলক্ষে লিখিত কাগজপত্র। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রমাণও বিনা-বিচারে গৃহীত হইতে পারে না। এই শ্রেণীর প্রমাণ লইয়া ইতিহাস বা পুরাকাহিনী সঙ্কলনের পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, প্রত্যেকখানি কাগজপত্রের লেখকের বর্ণিত বিষয়টি সকল দিক দিয়া দেখিবার সুযোগ এবং যোগ্যতা ছিল কি-না, এবং তাহার পক্ষে কোন কথা রাখিয়া-ঢাকিয়া লিখিবার কারণ ছিল কি-না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ কাগজপত্র আমাদের হস্তগত হয় নাই, এবং কখনও যে হইবে তাহার আশা নাই। সুতরাং শশাঙ্কের বা হর্ষের মত রাজা কখন যে কি করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত কাহিনী উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই। প্রশস্তিকারগণ আকারে-ইঙ্গিতে যেটুকু বলিয়া গিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া ঘটনাধারা সম্বন্ধে কল্পনা-জল্পনা চলিতে পারে, কিন্তু উহার প্রকৃত বিবরণ উদ্ধার করা যাইতে পারে না। এই প্রকার প্রমাণ যদি আবার একতরফা হয় তবে তাহার বলে কোন পক্ষকে একেবারে দোষী বা নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করা কর্ত্তব্য নহে।

সংশয়ের স্থলে কোন পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করিবার পূর্ব্বে সে যে কি দরের এবং কি ধরণের লোক তাহাও হিসাব করা কর্ত্তব্য। রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা সম্বন্ধে দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে—শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে অকারণ হত্যা করিয়া বা করাইয়া ছিলেন কি-না, এবং এই হত্যাকার্য্যের জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লইয়াছিলেন কি-না? আমরা এতক্ষণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এই প্রকার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিবার উপযোগী প্রমাণ আমাদের কাছে নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, শশাঙ্কের চরিত্র সম্বন্ধে অন্য উপায়ে যাহা জানা যায় তাহা হইতে তাঁহাকে নিরর্থক নরহত্যাকারী এবং স্বভাবতঃ বিশ্বাসঘাতক মনে করা যাইতে পারে কি-না। শশাঙ্ক প্রথম গৌড়াধিপ; শশাঙ্কের প্রধান কীর্ত্তি—গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কয়েকটি ভগ্নাংশ, বর্ত্তমানকালের বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া, গৌড়রাজ্যের সৃষ্টি। কি উপায়ে শশাঙ্ক এই সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাহার গড়ন যে খুব মজবুত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গঞ্জামে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে দেখা যায় হর্ষের রাজ্যলাভের বার-তের বৎসর পরে (৬১৯ খৃষ্টাব্দে) ও শশাঙ্কের আধিপত্য বা অধিরাজ্য কঙ্গোদ (বর্ত্তমান গঞ্জাম জেলা) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।* শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে তাহার রাজ্য হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং কামরূপরাজের ভাগে পড়িয়াছিল।+ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের আরম্ভে আবার স্বতন্ত্র গৌড়রাজ্যের অভ্যুত্থান দেখা যায়। বাক্‌পতির "গউড় বহো" (গৌড়বধ) নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা কর্তৃক গৌড়রাজ্য জয় এবং গৌড়াধিপ বধ বর্ণিত হইয়াছে। বাক্‌পতি যশোবর্ম্মার সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং বাক্‌পতির বিবরণকে ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন মনে করা যাইতে পারে না। বাক্‌পতি গৌড়াধিপকে মগধাধিপও বলিয়াছেন, অর্থাৎ মগধ তখন গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। এই গৌড়বধের পরে গৌড়রাজ যে দীর্ঘকাল কান্যকুব্জরাজের পদানত ছিল তাহা মনে হয় না। তারপর গৌড়মণ্ডলে মাৎস্যন্যায় বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। এই অরাজকতা নিবারণের জন্য গোপালদেব গৌড়াধিপ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে প্রকৃতিপুঞ্জকে গোপালদেবের নির্ব্বাচনকারী বলা হইয়াছে (প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ)। এখানে সামন্তরাজগণ প্রকৃতিপুঞ্জের অন্তর্গত, কারণ তাঁহারা তখন জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিলেন। যে-দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয়-ব্যাপারে একতা আছে সেই দেশের সামন্তরাজগণের পক্ষেই

---

* *Epigraphia Indica.* Vol. VI, p. 140.
+ প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩২,৬৪-৬৬ পৃঃ।

অন্তর্দ্রোহ নিবারণের জন্ম নিজেদের একজনকে অধিরাজ-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। গৌড়মণ্ডলের অর্থাৎ বাঙ্‌লা-বিহার-উড়িষ্যার অধিবাসিগণের মধ্যে একত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্ক পথ প্রস্তুত করিয়া না গেলে নির্ব্বাচনের ফলে পাল-বংশের অভ্যুদয় সম্ভব হইত না। বাণ-চিত্রিত গৌড়াধিপের মত স্বভাবতঃ বিশ্বাসঘাতক এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তির দ্বারা একরূপ সুসম্বদ্ধ রাষ্ট্রগঠনকার্য্য সাধিত হইতে পারে না। দৃঢ়ভাবে নবরাষ্ট্রগঠনকারীর একদিকে বজ্রের মত কঠোর, এবং অপরদিকে শিরীষকুসুমের মত কোমল, হওয়া দরকার। শশাঙ্ক অবশ্যই রাষ্ট্রীয় একতার বিরোধী প্রতিযোগীগণকে বাহুবলে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও বিস্তৃত ভূভাগের জনসাধারণকে প্রকৃতপ্রস্তাবে বশীভূত এবং তাহাদিগকে একতাসূত্রে সম্বদ্ধ করিতে হইলে বাহুবলের সঙ্গে ধর্ম্মবলের প্রয়োগ অর্থাৎ উদারতা ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রদর্শন করা আবশ্যক। শশাঙ্কের মধ্যে একাধারে এই সকল গুণ না থাকিলে তিনি বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সামন্তরাজগণের মধ্যে দৃঢ়ভাবে একতা স্থাপন করিতে পারিতেন না। বাহিরের শত্রু পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও এই একতা নষ্ট করিতে পারে নাই, এবং পরিণামে ইহাই গৌড়জনকে মুক্তির পথে লইয়া গিয়াছিল।

মালবরাজ এক সময় প্রভাকরবর্দ্ধনের অনুগত ছিলেন, এবং প্রভাকরবর্দ্ধনের তুষ্টিবিধানের জন্য আপনার দুই পুত্র, কুমারগুপ্ত এবং মাধবগুপ্তকে, স্থাণ্বীশ্বরের দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। তারপর প্রভাকরবর্দ্ধনের শেষ পীড়ার সমসময়ে সহসা মালবরাজকে স্থাণ্বীশ্বর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় ব্রতী এবং প্রভাকরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কান্যকুব্জপতি গ্রহবর্ম্মাকে নিহত এবং কান্যকুব্জ অধিকৃত করিয়া স্থাণ্বীশ্বর-রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত দেখিতে পাই। এমন সময় ১০,০০০ অশ্বারোহী লইয়া গিয়া রাজ্যবর্দ্ধন মালবসেনা পরাজিত করিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরেই গৌড়াধিপের শিবিরে প্রাণ হারাইলেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের উৎকট পীড়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই যে মালবরাজ এবং গৌড়াধিপ কান্যকুব্জের নিকটে পহুঁছিয়াছিলেন এরূপ অনুমান অসম্ভব, কেন-না, সেকালে মালব এবং গৌড় হইতে কান্যকুব্জ পহুঁছিতে অনেক দিন লাগিত। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, প্রভাকরবর্দ্ধনের পীড়ার পূর্ব্ব হইতেই মালবে এবং গৌড়ে একযোগে কান্যকুব্জ-আক্রমণের উদ্যোগ চলিতেছিল। দৈবযোগে সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল প্রভাকরবর্দ্ধনের পীড়ার সময়, এবং কান্যকুব্জ অধিকৃত হইয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর দিবসে। এই মিলিত অভিযানের সংবাদ স্থাণ্বীশ্বরে কেহ জানিত না, সুতরাং মিলিত সেনার আক্রমণ প্রতিরোধের কোন আয়োজনও সেখানে ছিল না। তারপর গ্রহবর্ম্মার নিধনের এবং ভগ্নীর কারাবরোধের সংবাদ পাইয়া, শত্রুপক্ষের বলাবল হিসাব না করিয়া, মাত্র দশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। একদিন অগ্রগামী মালবসেনার সহিত খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরেই হয়ত রাজ্যবর্দ্ধনকে মিলিত সেনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বাণের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে গেলে বলিতে হয়, এমন সময় গৌড়াধিপ শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন, এবং তদনুসারে রাজ্যবর্দ্ধন গৌড়শিবিরে পহুঁছিলে শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন অবশ্য জানিতেন গৌড়াধিপ তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া কান্যকুব্জ অঞ্চলে আসেন নাই, এবং তিনি সেকালের রাজনীতির সহিতও সুপরিচিত ছিলেন। সুতরাং মালবসেনা পরাজিত করিবার পরই তিনি যে স্বেচ্ছায় একাকী নিরস্ত্র হইয়া গৌড়শিবিরের আতিথ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এমন কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। খুব সম্ভব রাজ্যবর্দ্ধন মিলিত গৌড়-মালবসেনার সহিত শেষযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং যুদ্ধের পর ধৃত হইয়া গৌড়শিবিরে নীত হইয়াছিলেন। বাক্‌পতির "গৌড়বধ" কাব্যে যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক মগধাধিপ-বধের এইরূপ বিবরণ আছে—

"অহবি বলাঅন্তং কবলিউন মগহাহিবং মহীনাহো" (৪১৭)

"অথাপি পলায়মানং কবলয়িত্বা মগধাধিপং মহীনাথঃ"

"মহীপতি (যশোবর্ম্মা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে) পলায়মান মগধাধিপতিকে কবলিত (নিহত) করিয়া"—

অনুমান হয় এইরূপ অবস্থাতেই শিবিরে নীত রাজ্যবর্দ্ধনকে শশাঙ্ক হত্যা করিয়াছিলেন। স্বয়ং হর্ষও প্রয়োজন-মত শত্রুহত্যা করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। বাণ "হর্ষচরিতে" (তৃতীয় উচ্ছ্বাসে) লিখিয়াছেন—

"অত্র পুরুষোত্তমেন সিন্ধুরাজং প্রমথ্য লক্ষ্মীরাত্মীকৃতা"

"পুরুষোত্তম বিষ্ণু যেমন সমুদ্রমন্থন করিয়া লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ হর্ষও সিন্ধুরাজকে বধ করিয়া সিন্ধুরাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।"

বন্দী শত্রুকে নিহত করা তখন আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্যবর্গের মধ্যে নীতিবিরুদ্ধ বিবেচিত হইত না। বাণ এবং য়ুয়ান চোয়াঙ যাহাই বলুন, রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়া শশাঙ্ক যে তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। *

* ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত একখানি পুস্তকে বর্ত্তমান লেখক প্রথম এই প্রকার মত সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে প্রকাশিত "প্রতিভা" পত্রে ৺রেবতীমোহন গুহ তখন ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এইরূপ স্মরণ হয়। পরে ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই মত সমর্থন করিয়াছেন। গত মার্চ্চ সংখ্যা Historical Quarterlyতে (pp 11-12) অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় পুনরায় এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। "যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে," অধ্যাপক বসাক মহাশয় তেমন বাণের উক্তির দ্বারাই বাণের সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক বসাক মহাশয়ের উদ্ধৃত স্বতন্ত্র প্রমাণ, "হর্ষচরিতে"র টীকাকার শঙ্করের একটি উক্তি। ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের প্রথম শ্লোকে যমের গুপ্তদূতগণের আনীত বীরপুরুষদিগের উল্লেখ আছে। এই শ্লোক উপলক্ষ করিয়া শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"তথাহি তেন শশাঙ্কেন বিশ্বাসার্থং দূতমুখেন কন্যাপ্রদানমুক্ত্বা প্রলোভিতো রাজ্যবর্দ্ধনঃ স্বগৃহে সানুচরো ভুঞ্জান এব ছদ্মনা ব্যাপাদিতঃ।"

"যথা, বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য দূতমুখে কন্যাদানের কথায় প্রলোভিত রাজ্যবর্দ্ধন শশাঙ্কের গৃহে আহারের সময় ছদ্মবেশী শশাঙ্ক কর্ত্তৃক অনুচরসহ নিহত হইয়াছিলেন।"

এখানে বলা হইয়াছে, রাজ্যবর্দ্ধন সানুচর নিহত হইয়াছিলেন; কিন্তু মূল "হর্ষচরিতে" বাণ হর্ষমুখে বলিয়াছেন, রাজ্যবর্দ্ধন একাকী নিহত হইয়াছিলেন। সদ্য পিতৃহীন রাজ্যবর্দ্ধনের পক্ষে সদ্যবিধবা কারারুদ্ধা ভগ্নীকে ভুলিয়া, দূতমুখে কন্যাদানের কথা শুনিয়াই, গৌড়রাজের শিবিরে ছুটিয়া যাওয়া অসম্ভব মনে হয়। যদি বা ইহার পূর্ব্বে শশাঙ্কের কন্যার সহিত রাজ্যবর্দ্ধনের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া থাকিত, তবে এরূপ আত্মবিস্মৃতি কতক পরিমাণে বোঝা যাইত। কিন্তু টীকাকার শঙ্কর এইরূপ পূর্ব্বপরিচয়ের কোনও আভাস দেন নাই। বাণের উক্তির বিরোধী এই বিবাহের প্রস্তাবের কাহিনী টীকাকারের কল্পিত বলিয়া মনে হয়।

অর্পণ

শ্রীঅনিলবরণ রায়

আসিল যবে মোরে বাঁধিতে ফুলডোরে
জানি সে মালা গাঁথা তোমারি তরে, প্রিয় !
গাইছে তোমা পানে তোমারে নাহি জানে
তাদেরো ভালবাসা নিয়ো হে তুমি নিয়ো।

জীবনে পেনু কত মধুর অনুভব
গন্ধে রূপে গানে ছন্দে নব নব,
কত যে স্নেহ-ঋণ সঞ্চিনু চিরদিন—
আমার হাতে নাথ সকলি শুধি দিয়ো।

দগ্ধ ক'রি মম যতেক অহমিক
করো হে মোরে তব দীপ্ত প্রেমশিখা,
তোমারি লাগি যারা আবেগে দিশেহারা
সবার পথরেখা উজলি প্রকাশিয়ো।

পত্রধারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাঁর ধ্যান আমার চিত্তের অবলম্বন শাস্ত্রমতে তাঁকে কী সংজ্ঞা দেওয়া যায় জিজ্ঞাসা করেচ। সহজে বোঝাতে পারব না, উপলব্ধির জিনিষকে ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট করা যায় না। তোমার প্রশ্ন এই, তিনি কি সর্ব্বমানবের সমষ্টি। সমষ্টি কথাটায় ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। এক বস্তা আলুকে আলুর সমষ্টি যদি বল তবে সে হল আর এক কথা। মানুষের সজীব দেহ লক্ষকোটি জীবকোষের সমষ্টি, কিন্তু সমগ্র মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আত্মানুভূতিতে জীবকোষসমষ্টির চেয়ে অসীম গুণে বড়ো। ব্যক্তিগত মানব মহামানব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তারি মধ্যেই তার জন্ম ও বিলয় কিন্তু তাই ব'লে সে তার সমান হতে পারে না। ব্যক্তিগত মানব মহামানবকে উপলব্ধি ক'রে আনন্দিত হয়, মহিমা লাভ করে যখন সে নিজের ভোগ নিজের স্বার্থকে বিস্মৃত হয়, যখন তার কর্ম্ম তার চিন্তা মরণধর্ম্মী জীবলীলাকে পেরিয়ে যায়, যখন তার ত্যাগ তার প্রয়াস সুদূর দেশ সুদূর কালকে আশ্রয় করে, তার আত্মীয়তার বোধ সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে খণ্ডিত হয়ে না থাকে। এই বোধের দ্বারা আমরা এমন একটি সত্তাকে অন্তরতমরূপে অনুভব করি যা আমার ব্যক্তিগত পরিধিকে উত্তীর্ণ করে পরিব্যাপ্ত। তখন সেই মহাপ্রাণের জন্যে মহাত্মার জন্যে নিজের প্রাণ ও আত্মসুখকে আনন্দে নিবেদন করতে পারি। অর্থাৎ তখন আমি যে-জীবনে জীবিত সে-জীবন আমার আয়ুর দ্বারা পরিমিত নয়। এই জীবন কার? সেই পুরুষের, যিনি সকলের মধ্যে ও সকলকে অতিক্রম ক'রে, উপনিষদ যাঁর কথা বলেচেন "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।" কেবলমাত্র জপতপ পূজার্চ্চনা করে তাঁর উপলব্ধি নয়, মানুষের যে-কোনো প্রকাশে মহিমা আছে, বিজ্ঞানে দর্শনে শিল্পে সাহিত্যে; অর্থাৎ যাতে সে এমন কিছুকে প্রকাশ করে যার মধ্যে পূর্ণতার সাধনা। এ সমস্তই মানুষের সম্পদ, ক্ষণজীবী পশুমানুষের নয়, কিন্তু সেই চিরমানবের, ইতিহাস যাঁর মধ্যে দিয়ে ক্রমাগতই বর্ব্বরতার প্রাদেশিকতার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন কাটিয়ে সর্ব্বজনীন সত্যরূপকে উদ্ঘাটিত করচে। সকল ধর্ম্মেই যাঁকে সর্ব্বোচ্চ ব'লে ঘোষণা করে তাঁর মধ্যে মানবধর্ম্মেরই পূর্ণতা—মানুষ যা-কিছুকে কল্যাণের মহৎ আদর্শ বলে মানে তাঁরই উৎস যাঁর মধ্যে। নক্ষত্রলোকে মানবের রূপ নেই মানবের গুণ নেই, সেখানে কেবল বিশ্বশক্তির নৈর্ব্যক্তিক বিকাশ, বিজ্ঞান তাকে সন্ধান করে, কিন্তু মানুষের প্রেমভক্তির স্থান সেখানে নেই। মহাপুরুষেরা সেই নিত্য মানবকেই একান্ত আনন্দের সঙ্গেই অন্তরে দেখেচেন, কিন্তু বারে বারে তাঁকে নানা নামে, নানা আখ্যানে, নানা রূপ কল্পনায় দূরে ফেলা হয়েচে, এমন কি অনেক সময় মানুষ তাঁকে নিজের চেয়েও ছোট করেচে—এবং ভূমার সাধনাকে সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ভোগবিলাসের সামগ্রী করে তুলেচে। তুমি প্রশ্ন করেচ বলেই এত কথা বললুম, নতুবা তর্ক করে তোমাকে পীড়া দিতে আমি ইচ্ছা করিনে। সত্য যদি নিতান্তই আত্মতৃপ্তির উপকরণ মাত্র হত তবে যে অভ্যাসের মধ্যে যে সুখ পায় তাই নিয়েই তাকে থাকতে বলা যেত। সত্যের সঙ্গে ব্যবহারে তৃপ্তি গৌণ, মুক্তি মুখ্য—যে ক্ষুদ্রতার আবরণ থেকে মুক্তি হলে নিজেদের স্পষ্ট করে জানি অমৃতস্য পুত্রাঃ সেই মুক্তি—তার সাধনায় দুঃখ আছে। আমরা দ্বিজ, একটা জন্ম পশুলোকে, আর একটা জন্ম মানবলোকে, এই দ্বিতীয় জন্মের জন্যেই প্রার্থনা করি অসতো মা সদ্গময়।

ইতি ২০ জুলাই ১৯৩১।

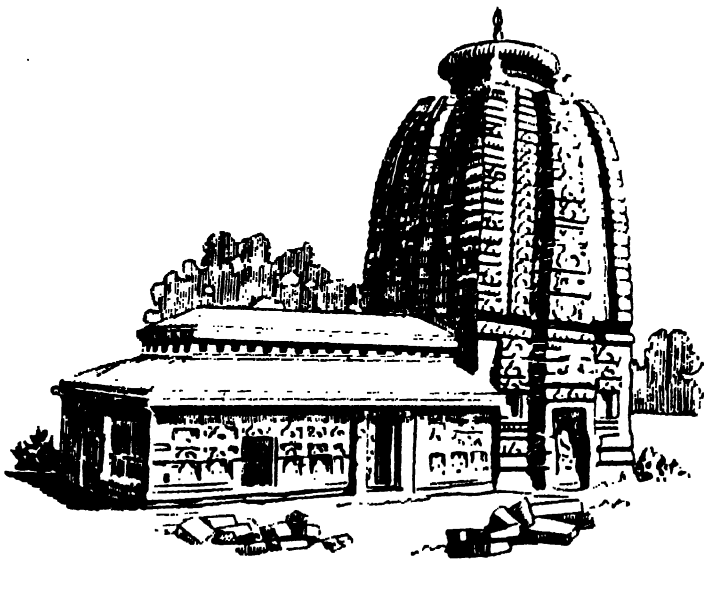
২

ভূপাল থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেচি। ফেরবার জন্যে মনটা উৎসুক হয়েছিল। যদিও আমার নামের সঙ্গে বেমিল হয় তবু এ কথা মান্‌তে হবে আমি বর্ষাঋতুর কবি। আমার মনের পেয়ালায় এই ঋতুর সাকি যে রস ঢেলে দেন তার নাম দেওয়া যেতে পারে কাদম্বরী। রাজপ্রাসাদে ছিলুম দুটো দিন মাত্র। আরও দুই-এক জায়গায় যাবার সঙ্কল্প ছিল, আমার এবং তাঁদের সৌভাগ্যক্রমে, যাঁদের লক্ষ্য করে যাওয়া, তাঁরা কেউ স্বস্থানে উপস্থিত ছিলেন না। সেটা উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে ক্ষতিজনক কিন্তু মনের শান্তির পক্ষে অনুকূল।

নিজের মনকে নিয়ে খুব বেশি টানাটানি কোরো না। অপরাধ হয়েচে বলে সর্ব্বদা কল্পনা করাটা কল্যাণকর নয়। নিজের প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর বিরোধ ক'রে চিত্তকে মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে দেওয়া তার প্রতি অবিচার করা। বেশ সহজভাবে থাকতে চেষ্টা কর তাতে তোমার অন্তর্য্যামী প্রসন্নই হবেন। যে জিনিসটিকে আশ্রয় করলে তোমার তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হত বলে নিজেকে দুঃখ দিচ্চ, খুব সম্ভব সেটি তোমার স্থায়ী অবলম্বনের পক্ষে সঙ্কীর্ণ। তার প্রতি তোমার নিষ্ঠা সুদৃঢ় নয় বলে নিজের বুদ্ধিকে আজ নিন্দা করচ, তাই বলে নিজের বুদ্ধিকে খর্ব্ব করে যেখানে তোমাকে ধরে না সেইখানেই নিজেকে কোনোমতেই ধরানোকে তুমি অবশ্যকর্ত্তব্য মনে কোরো না। আমি যে-গৃহে জন্মেচি সেখানকার ধর্ম্মেই দীক্ষা পেয়েছিলুম। সে ধর্ম্মও বিশুদ্ধ; কিন্তু আমার মন তার মাপে নিজেকে ছেঁটে নিতে কোনোমতেই রাজি ছিল না। তবু আমি এ নিয়ে টানা-হেঁচড়া না করে বেশ সহজ ভাবেই আপন প্রকৃতির পথে চলেছিলুম। সেই পথ ধরেই আজ আমি নিজের উপযোগী গম্যস্থানে পৌঁচেছি। এটাকে অপরাধ বলে মাথা খুঁড়ে মরিনে। দেবতা আমাদের সঙ্গে কেবলই লড়াই করবার জন্যেই লক্ষ্য ক'রে আছেন এটা সত্য নয়, অতএব একাদশীর দিনে অনর্থক নিজেকে পীড়ন না করলে ভক্তবৎসলের নির্দ্দয় প্রবৃত্তির তৃপ্তি হবে না এটা মনে করা তাঁর প্রতি অন্যায় অবিচার। তোমার পালে একদা আপনি বাতাস এসে লাগবে যদি বিশ্বাস করে পালটা মেলে রাখো। অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে হাবুডুবু খেয়ে মলেই যে পারে পৌঁছন যায় তা নয়, তলায় যাবার সম্ভাবনাই বেশি।

ছোট্ট চিঠি লিখব মনে করেছিলুম, তা করব না এও ছিল সঙ্কল্প, দুটোই লঙ্ঘন করলুম। কিন্তু তা নিয়ে পরিতাপ করব না। ইতি

১০ শ্রাবণ ১৩৩৮।



স্বাগতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পোষ্ট আপিসে

নবীন ঘটকের বাড়ির পাশে তাহার একটা খালি ঘর ছিল, সেইটা বাসা-ঘর। ঘরে খান-তিন-চার তক্তপোষ ছিল, তাহার উপর ছেঁড়া মাদুর পাতা। হরিনাথ ও গঙ্গাধর সেই ঘরে তাহাদের ব্যাগ রাখিতে বলিয়া গ্রামের ভিতর গেল। চালের দর জানা একটা অছিলা, এ গ্রামে আসিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য বনবিহারীর সন্ধান জানা। হরিনাথ ও গঙ্গাধর তাহার নাম জানিত না, রেলে দেখা হইবার পূর্ব্বে তাহাকে কখন দেখেও নাই।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিল, বনবিহারী একটা দোকানে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া গঙ্গাধর বলিল,—এই যে, আবার দেখা হ'ল!

বনবিহারী বলিল,—তা অমন হয়েই থাকে, বুঝলে কি-না?

তাহার পর হরিনাথ ও গঙ্গাধর দোকানদারের সঙ্গে অনেক রকম চালের ও তাহার দরের কথা কহিতে লাগিল। গঙ্গাধর পকেট হইতে একটা ছোট নোট-বুক বাহির করিয়া তাহাতে দর টুকিয়া লইল। লেখা হইলে পর হরিনাথকে বলিল,—তুমি বাসায় ফিরে যাও, আমি একবার ডাকঘর থেকে আসচি।

তাহার পর বনবিহারীকে বলিল,—তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমার নাম জিজ্ঞাসা করি নি। আমার নাম ক্ষেত্রনাথ আর এঁর নাম কিশোরীমোহন।

বনবিহারীর নাম ভাঁড়াইবার কোন কারণ ছিল না। সে বলিল,—আমার নাম বনবিহারী, বুঝলে কি-না?

গঙ্গাধর চলিয়া গেল। হরিনাথ বাসার দিকে ফিরিল। বনবিহারী উঠিয়া বলিল,—আমি এখানে বসে আর কি করব, বুঝলে কি-না? চল তোমার সঙ্গে যাই।

—বেশ ত, এস।

পথে হরিনাথ পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া বনবিহারীকে দিল, নিজেও একটা ধরাইল।

বনবিহারী সিগারেট দেখিয়া বলিল,—এ কোথা থেকে পেলে, এ ত দামী জিনিষ, বুঝলে কি-না?

হরিনাথ হাসিয়া চোখ টিপিল। কহিল,—তুমি ভাবচ আমি কিনেচি? রাম বল, তাহ'লে রেলে ফাষ্ট ক্লাসে চড়তাম। এ সব বাবুদের জিনিষ, কখন কদাচ আমরা কিছু পাই।

বনবিহারীর দাঁত বাহির হইয়া তাহার সেই চড়ুকে হাসি দেখা দিল। বলিল,—উপরি-পাওনা? কিছু কিছু না থাকলে চলবে কেন, বুঝলে কি-না? আমার আর একটা কথা মনে পড়চে।

—কি?

—সেই যে তুমি রেলগাড়ীতে বলছিলে দুজন কোথায় মারা গিয়েচে, ঠিক খবর পেলে কারা টাকা দেবে, বুঝলে কি-না?

—মরার খবরের জন্ম কে আবার টাকা দেয়? যদি তাদের মধ্যে এক জন বেঁচে থাকে তার খবর পেলে দেবে। আর আমরা ত তেমন বিশেষ কিছু জানি নে, আমাদের কেবল শোনা কথা।

—আমিও কিছু জানি নে, বুঝলে কি-না, তবে সেই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াই, খোঁজ করতে পারি। কারা টাকা দেবে জান?

—সে-কথা ফিরে গিয়ে জানতে পারব। আর এক যদি তুমি গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা কর। মিছিমিছি গিয়ে কোন ফল নেই। যদি কিছু জানতে পার, যারা পুড়ে মরেচে তারা কে, যদি এক জন বেঁচে থাকে সে-ই বা কোথায় আছে, এ রকম যদি জান তাহ'লে কিছু পেতে পার।

—তা যেন হ'ল, বুঝলে কি-না, কত টাকা দেবে?

—তা আমরা কেমন করে জানব, আমরা ত কিছুই জানিনে, যেমন অপর পাঁচ জন শুনেচে আমরাও সেই রকম শুনেচি।

ইতিমধ্যে গঙ্গাধর ফিরিয়া আসিল। বনবিহারীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল না, সে যে হরিনাথের সঙ্গে জুটিবে তাহা সে ঠাহরিয়াছিল। হরিনাথ বলিল,—রেলগাড়ীতে যে-কথা হচ্ছিল ইনি তাই বলছিলেন।

গঙ্গাধরের যেন কোন কথা স্মরণ নাই। বিস্মিত হইয়া কহিল,—কি কথা? আমার ত কিছু মনে নেই।

—সেই যে একটা গ্রামের কাছে দুটো লোকের অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল।

—তার আমরা কি জানি?

—কিছুই না। ইনি কিছু জানতে পারেন কিংবা জানবার চেষ্টা করবেন, খবর পেলে কারা টাকা দেবে জানতে চান।

—তাই বা আমরা কি জানি? আমরা নিজের ধান্ধায় সাত দেশ ঘুরে বেড়াই, কত জায়গায় কত রকম কথা শুনতে পাই। কে কি বৃত্তান্ত, কে মরচে, কে টাকা দেবে আমরা কিছুই জানি নে।

বনবিহারী এইবার একটা কথা বলিবার সুযোগ পাইল, বলিল,—ঠিক কথা। তোমরা যে কিছু জান তা আমি বলচি নে, বুঝলে কি-না? তাহ'লে ত তোমরাই টাকা পেতে। আমি যদি কিছু জানতে পারি তাহ'লে কাকে বলব? তাই জিজ্ঞাসা করচি, বুঝলে কি-না?

—সে আলাদা কথা। আমরা ফিরে গিয়ে সন্ধান ক'রে তোমাকে জানাতে পারি।

—তাহ'লেই হবে, বুঝলে কি-না? আমার ঠিকানা লিখে নেবে?

গঙ্গাধর নোটবুক বাহির করিয়া দিল, বলিল,—তুমিই লিখে দাও।

বনবিহারীর লেখাপড়া অধিক হয় নাই। বাঁকাচোরা অক্ষরে নিজের নাম আর একটা গ্রামের ঠিকানা লিখিয়া দিল।

বনবিহারী চলিয়া গেলে পর হরিনাথ কহিল,—এই বার হয়ত কিছু জানতে পারা যাবে।

—শুধু আমরা নয়, ও লোকটাও আমাদের সন্ধান নেবে। এখন থেকে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। তুমি বস, আমি আসচি।

গঙ্গাধর ব্যাগের ভিতর হইতে কৃত্রিম দাড়ি ও চুল বাহির করিল। কাপড় ছাড়িয়া ছেঁড়া কাপড়, জামা ও জুতা পরিল। হরিনাথ তাহাকে চিনিতেই পারে না। জিজ্ঞাসা করিল,—এ রকম সাজলে যে?

গঙ্গাধর গলার স্বর বদলাইয়া, তোতলার ন্যায় বলিল,—ব-ব-বহুরূপী। বুঝলে কি না? তারই খোঁ-খোঁ-খোঁজে যাচ্ছি।

গঙ্গাধর পিস্তল আর কয়েক খানা নোট পকেটে পুরিল। হরিনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ও কি হবে?

—কি জানি, যদি দরকার পড়ে। তুমি ভেব না, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। তুমি এখান থেকে কোথাও যেও না।

ঘাড় নীচু করিয়া, ছেঁড়া জুতার শব্দ করিতে করিতে গঙ্গাধর চলিয়া গেল।

কিছু দূর গিয়া দেখিতে পাইল বনবিহারী নিঃশব্দে দীর্ঘ পদক্ষেপে পোষ্ট আপিসের অভিমুখে চলিয়াছে। গঙ্গাধর আরও পিছাইয়া পড়িল।

একটা ছোট চালাঘরে পোষ্ট আর টেলিগ্রাফ আপিস। বনবিহারী পোষ্ট বাক্সে একখানা চিঠি ফেলিয়া দিল। তাহার পর পোষ্টমাষ্টারকে বলিল,—খানিক ক্ষণ আগে আমি একখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম, বুঝলে কি-না?

—কই, তোমাকে ত দেখি নি।

—আমি না হয় আমার লোক, সে একই কথা, বুঝলে কি-না? টেলিগ্রামে চালের কথা লেখাছিল।

—তার কি করতে হবে?

—ঠিক লেখা হয়েছিল কি-না একবার দেখতে চাই। তোমাকে অমনি দেখাতে বলচিনে, বুঝলে কি-না? এই ধর।

বনবিহারী পোষ্টমাষ্টারের প্রসারিত হস্তে একটা টাকা গুঁজিয়া দিল। পোষ্টমাষ্টার টেলিগ্রামের খাতা

বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। বনবিহারী দেখিল, প্রেরকের নাম ক্ষেত্রনাথ, যাহাকে পাঠানো হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা স্মরণ রাখিবার জন্য ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। পোষ্টমাষ্টারকে বলিল,—না, ঠিক আছে। যা হোক আমার মনের খট্‌কা মিটে গেল।

ফিরিবার পথে বনবিহারী দেখিল জীর্ণবস্ত্র ও জীর্ণ পাদুকা পরিহিত শুক্লশ্মশ্রুধারী এক ব্যক্তি মস্তক অবনত করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। তাহার দিকে একবার মাত্র কটাক্ষ করিয়া বনবিহারী চলিয়া গেল।

সে ব্যক্তি ধীরে ধীরে পোষ্ট আপিসে আসিয়া উপস্থিত। পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল,—একটু আগে এক জন লোক একখানা চিঠি ফেলতে এসেছিল?

আজ টেলিগ্রাম আর চিঠির এত খোঁজ কেন? আগেকার লোকটা তবু একটা টাকা দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই ছিন্ন বস্ত্রধারী কি দিতে পারিবে? পোষ্টমাষ্টার রুক্ষ স্বরে কহিল,—কত লোক চিঠি ফেলতে আসে আমি কি তার হিসেব রাখি?

—আমি তা-তা-তা বলচিনে। এ আমাদের লোক, ক-ক-কথায় কথায় বুঝলে কি না বলে।

পোষ্টমাষ্টার মনে মনে বলিল, দুজন জুটেচে ভাল। এক জন কেবল বলে বুঝলে কি-না আর এক জন তোতলা। প্রকাশ্যে বলিল,—আমাদের কি আর কাজকর্ম নেই যে কে কি রকম কথা কয় তাই মনে ক'রে রাখব?

—ম-ম-মশায়ের একটু কষ্ট হবে। চিঠি তা-তা-তাড়াতাড়ি লেখা, একবার শুধু ঠিকানা ঠিক আছে কি-না দে-দে-দেখতে চাই।

লোকটার বেশ ত ঐ, ছেঁড়া জামার পকেট হাতড়াইয়া একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিল। পোষ্ট-মাষ্টার বাবু সেখানা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া সন্দিগ্ধভাবে কহিলেন,—জাল নয় ত?

—বেশ, রোক দিচ্ছি।

এবার আর কথা আটকাইল না। সে ব্যক্তি পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া পোষ্টমাষ্টারের সম্মুখে রাখিল। টাকা তুলিয়া পোষ্টমাষ্টার নোটখানাও চাপিয়া ধরিল, কহিল,—এখানাও থাক না?

গদাধর হাসিল, তোতলামি হঠাৎ সারিয়া গেল। বলিল,—তা থাক। চিঠি দেখি।

বাক্স খুলিয়া পোষ্টমাষ্টার বাহির করিল তিন চার খানি চিঠি। গদাধর বনবিহারীকে দিয়া তাহার ঠিকানা লিখাইয়া লইয়াছিল তাহার হস্তাক্ষর চিনিবার জন্য। বনবিহারীর হাতে লেখা ঠিকানা পড়িল—

দেওয়ান ত্রিলোচন মজুমদার
পোষ্ট সুবর্ণপুর

পোষ্টমাষ্টারের সাক্ষাতেই গদাধর ঠিকানা লিখিয়া লইল। সে চলিয়া গেলে পর পোষ্টমাষ্টার ভাবিল, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

স্মৃতিরিক্তা

মানুষের মনে স্মৃতিশক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। ভবিষ্যতের চিন্তা ক্ষণস্থায়ী, অনেকে ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেই পারে না। যাহা হইবার তাহা হইবে এই মাত্র মনে করিয়া অনেকে নিশ্চিন্ত থাকে। ভবিষ্যতে কি হইবে জানিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু জানা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া মানুষ নিরস্ত হয়। বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত মাত্র, এই আছে এই নাই। এখন যাহা বর্ত্তমান অপর মুহূর্ত্তে তাহা অতীত হইয়া যায়। অতীতের জল্পনাই স্মৃতির একমাত্র কর্ম্ম। একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, জাগরণের অবস্থায় আমাদের অধিকাংশ সময় অতীতের চিন্তাতেই অতিবাহিত হয়। একা থাকিলে, অবসর থাকিলে অতীতের কথাই সর্ব্বদাই স্মরণ হয়। ইহাই স্মৃতি। জীবনপথে আমরা যেমন অগ্রসর হই, মনের দৃষ্টি ততই পশ্চাৎমুখী হইতে থাকে। ভবিষ্যতে কি হইবে, ভবিষ্যতে কি করিব, এরূপ চিন্তা ক্ষণমাত্র মনে স্থান পায়, কিন্তু অতীত মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করে। কোথাও আলোক, কোথাও ছায়া, আনন্দবিষাদে স্মৃতির পথ সমাকীর্ণ হইয়া আছে। যদি জীবনের কাল ভাগ করা যায় তাহা হইলে তিন ভাগ স্মৃতি, এক ভাগ আর সব।

যৌবনে বাল্যস্মৃতি, বার্দ্ধক্যে যৌবনস্মৃতি। যুবক-

যুবতীগণ অনেক সময় বাল্যাবস্থার কথা আলোচনা করে, বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের মুখে পূর্ব্বের কথা ছাড়া অন্য কথাই নাই। মুখে যেমন মনেও সেইরূপ। মন সর্ব্বদা স্মৃতি লইয়াই নাড়াচাড়া করে। কাল স্মৃতিকে সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করে, মন মুগ্ধ হইয়া অতীতের সেই সকল রঙীন চিত্র দেখে। সময়ে সময়ে স্মৃতি কঠোর হইলেও অধিকাংশ স্মৃতিই মধুর, যাহা কঠোর তাহাও কালের অনুলেপনে কোমল হইয়া যায়। শৈশবের স্মৃতিপটে সরল হাস্যপূর্ণ মুখগুলি কেমন পবিত্র নির্ম্মল হইয়া উদ্ভাসিত হয়! যৌবনের উদ্দাম বলদর্পিত নির্ভীকাচার স্মরণ করিলে বৃদ্ধের ধমনীতেও শোণিত-স্রোত চঞ্চল হইয়া উঠে। জীবনের শূন্য কক্ষ স্মৃতি সকল সময় পূর্ণ করিয়া রাখে।

এই স্মৃতি অপহৃত হইলে মানুষের মন নিতান্তই দরিদ্র হইয়া পড়ে, মনের শূন্য আগার কি দিয়া পূর্ণ করিবে তাহা ভাবিয়া পায় না। এই অবস্থা স্বাগতার। পড়াশুনায় তাহার অনেক সময় কাটিত, সুলোচনা প্রায় তাহার কাছে থাকিতেন, কিন্তু তাহাতে তাহার চিত্তের শান্তি হইবে কিরূপে? স্মৃতির রুদ্ধ দ্বারে তাহার মন করাঘাত করিত,কিন্তু সে দ্বার কখনও মুক্ত হইত না,তাহার ভিতর দিয়া কখনও আলোকরশ্মি আসিত না। চৈতন্যলাভ করিয়া স্বাগতা প্রশ্ন করিয়াছিল আমি কে, সে কি নিরর্থ? সে যে কে তাহা ত এখনও জানে না। এ বাড়ি কাহার, হরিনাথ তাহার কে? তাহার মাতাপিতা কে, তাঁহারা কি কেহই নাই? ভ্রাতা ভগিনী কেহ নাই? তাহার শৈশব স্মৃতি কি হইল? কাহাদের সঙ্গে খেলাধূলা করিত? সেই কোন গ্রামে কাহার গৃহে উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে অপরিচিত মুখ দেখা—তাহাই কি তাহার জীবনের আরম্ভ? জীবনের নিয়মের এরূপ অদ্ভুত ব্যতিক্রম কেন ঘটিবে? হরিনাথ তাহার আত্মীয় হইলেও তাহাকে যে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছিল তাহা ত মনে পড়ে না। সেই গ্রাম ও সেই গৃহ স্বাগতার স্মৃতির সীমা। তাহার পূর্ব্বে সাদা কাগজের মতন, তাহাতে কোথাও কালিকলমের আঁচড় নাই। এই স্বল্প কালের গণ্ডীর মধ্যে তাহার স্মৃতি বাঁধা, তাহার বাহিরে যাইবার কোথাও পথ নাই।

মনের এই অবস্থা, তাহার উপর স্বাগতাকে প্রায় একাই থাকিতে হয়। সুলোচনা ছাড়া কথা কহিবারও লোক নাই। আর থাকিলেই বা কি কথা কহিবে? নিজের কোন কথা বলিবার নাই, সংসারের সে কিছুই জানে না। বাড়ির বাহিরে বড় একটা যাইত না, কদাচ কখনও বৈকাল বেলা সুলোচনার সঙ্গে মোটরে করিয়া অল্পক্ষণ ঘুরিয়া আসিত। হরিনাথের অনুশাসন সুলোচনার স্মরণ ছিল।

স্বাগতার মুখে বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্যামাচরণের কি হইল?

ঢিল লাগিয়া শ্যামাচরণের শুধু মাথা কাটিয়া গেল না, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়া গেল। এতদিন তাহার স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতেছিল, ত্রিলোচনের নিকট হইতে শুধু-হাতে ফিরিতে হইত না, একটা চাকরি পাইবারও আশা হইয়াছিল। হঠাৎ সে পথ বন্ধ হইয়া গেল। শ্যামাচরণ বুঝিতে পারিল ইহা বনবিহারীর কাজ, কিন্তু তাহার প্রতিকার কি? বনবিহারীর প্রহার তাহার গাঁটে গাঁটে মনে ছিল, যুবকদের আক্রমণের নিদর্শন স্বরূপ তাহার মাথায় এখনও পটি বাঁধা ছিল।

মনে মনে শ্যামাচরণ অনেক বার বনবিহারীকে গুপ্তি দিয়া খোঁচাইয়া মারিল, কার্ত্তিক ও তাহার দলবলকে ধরাশায়ী করিল। কিন্তু তাহার রাগ হইল সকলের অপেক্ষা ত্রিলোচনের উপর। সে কোন্ সাহসে শ্যামা-চরণকে দরোয়ান দিয়া হাঁকাইয়া দিল? যদি সব কথা শ্যামাচরণ প্রকাশ করিয়া দেয় তাহা হইলে দেওয়ানজীর কি দশা হইবে? হাতে হাতকড়ি দিয়া যখন কাঠগড়ার ভিতর পুরিবে তখন দেওয়ানগিরি কোথায় থাকিবে? কিন্তু ত্রিলোচনকে ধরাইয়া দিবার কথা মনে করিতেই শ্যামাচরণের গলায় কে যেন দড়ির ফাঁস দিয়া টানিতে আরম্ভ করিল, তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, কণ্ঠতালু শুকাইয়া গেল, চক্ষু ঠিকরিয়া বাহির হইল। ত্রিলোচনকে ধরাইয়া দেওয়া আর নিজের গলায় ফাঁসি

পরাইয়া দেওয়া সমান। তাহা জানিয়াই ত্রিলোচন তাহার সহিত দেখা করে নাই।

শ্যামাচরণ কিছু টাকা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সে লক্ষ্মীছাড়া, দুশ্চরিত্র, টাকা রাখিতে জানিত না। কাজের মধ্যে মোটর চালাইতে জানিত, অগত্যা চাকরির চেষ্টায় কলিকাতায় গেল। কিছুদিন ঘোরাঘুরি করিয়া একটা চাকরি জুটিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

সুবর্ণপুরে

গঙ্গাধর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া হরিনাথকে কহিল, সোনাপুর যাবে?

—কেন, সেখানে কি হবে?

—দেওয়ান ত্রিলোচন মজুমদারের সঙ্গে দেখা করবে।

—সে আবার কে? আর তুমি ও রকম সেজে এখন কোথায় গিয়েছিলে?

—না সাজলে সোনাপুরও জানতাম না, দেওয়ান ত্রিলোচনেরও নাম শোনা হ'ত না।

গঙ্গাধর হরিনাথকে সকল কথা বলিল। বনবিহারী কিছু সন্দেহ করিয়াছে কি-না তাহা স্থির করা যায় না, কিন্তু গঙ্গাধরের টেলিগ্রাম সে দেখিয়াছিল। হয়ত ভাবিয়াছিল যাহার নামে টেলিগ্রাম তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে টাকা পাইবার সুবিধা হইতে পারে। হয়ত হরিনাথ ও গঙ্গাধরের প্রতি তাহার অন্তরূপ সংশয় হইয়াছিল। বনবিহারীর চিঠির কথাও গঙ্গাধর বলিল। এই দেওয়ান কে আর বনবিহারীর মতন লোকের সহিত তাহার কি কাজ থাকিতে পারে? আর কোন কাজ থাকিলেই বা বিচিত্র কি? দেওয়ানী অনেক ফিকিরের কাজ, নানা ফন্দীর প্রয়োজন হয়, সেজন্য সব রকম লোক নিযুক্ত করিতে হয়।

সে রাত্রি সেখানে কাটাইয়া পর দিবস দুই বন্ধু সুবর্ণপুরে যাত্রা করিল।

বনবিহারী ত্রিলোচনকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহাতে এইটুকু লেখা ছিল, অপর লোক সন্ধান করিতেছে। সাক্ষাতে সকল কথা বলিব। পত্রে কাহারও স্বাক্ষর কিংবা কোন ঠিকানা ছিল না, তথাপি ত্রিলোচনের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইহা বনবিহারীর লেখা এবং ইহাতে বিশেষ আশঙ্কার কারণ আছে। যাহারা সন্ধান করিতেছে তাহারা কে, কিসের সন্ধান করিতেছে? জমিদারদের বাড়ি ছাড়া অপর কেহ কেন সন্ধান করিবে, আর সন্ধান করিয়া জানিবার কি আছে? করুণাময়ী ও প্রবোধচন্দ্র জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন এ কথা ত সকলেই জানে, আর এমন লোক কে থাকিতে পারে যে, এ বিষয়ে আবার সন্ধান করিবে?

এক দিন সন্ধ্যার পর বনবিহারী আসিল। কার্ত্তিক দেখিল বনবিহারী তাহাদের বাড়িতে আসিতেই ত্রিলোচন তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বৈঠকখানায় বসিয়া অনেকক্ষণ কথা কহিলেন। কার্ত্তিকের ইচ্ছা ছিল গ্রামের যুবকদিগকে ডাকিয়া বনবিহারীকেও কিছু শিক্ষা দেয়, কিন্তু ত্রিলোচন তাহার সহিত যেরূপ ভাবে গোপনে কথা কহিতেছিল তাহাতে কার্ত্তিকের সাহস হইল না।

বনবিহারী কি মতলব আঁটিয়া আসিয়াছিল ত্রিলোচনের তাহা বুঝিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ত্রিলোচন জানিতেন প্রবোধচন্দ্র ও করুণাময়ী দুই জনেরই মৃত্যু হইয়াছে, বনবিহারীর সংশয় ছিল এক জন রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু সে কথা ত্রিলোচনকে বলিবার সময় এখনও আসে নাই। এখন ত্রিলোচন একটু ভয় পাইলেই বনবিহারীর সুবিধা হইবে। আর কাহারা কি সন্ধান করিতেছে সে কথাও তাহার মনে ছিল এবং সেখান হইতে কিছু পাইবে এমন আশাও হইয়াছিল। উপস্থিত ত্রিলোচনের কাছে কিছু পাওয়া যাইবে।

দুই জনের কথাবার্ত্তা অত্যন্ত মৃদুস্বরে হইতেছিল। ত্রিলোচন অত্যন্ত দুর্ভাবনায় পড়িয়াছিলেন। বলিতেছিলেন,—তোমার কথায় আমি শ্যামাচরণকে হাঁকিয়ে দিয়েছি, সেই অবধি আমার মনে হচ্চে সে একটা কিছু গোল করবে।

বনবিহারী মাথা নাড়িল, বলিল,—সে আবার কি করবে? একটি কথা প্রকাশ হ'লে সেই ত আগে ধরা পড়বে, বুঝলেন কি-না? সে বড় বাড়াবাড়ি

আরম্ভ করেছিল আর তার টাকার খাই কেবলই বাড়ছিল। সে কখনও মুখ খুলতে পারবে না। আমার মনে হয় আর কেউ কিছু খোঁজ করচে।

—আর কে খোঁজ করবে? খোঁজ করবার মধ্যে ত আমরা, আর কেউ করতে যাবে কেন? তা ছাড়া আমরা ত বেশ জানি ডুবে মারা গিয়েচে তার আবার নতুন ক'রে সন্ধান কি?

—সেই ত কথা, কিন্তু তাহ'লে এ দুটো লোক সে কথা পাড়বে কেন? তাই আমি লিখেছিলাম, বুঝলেন কি-না?

—কোন্ দুটো লোক?

—তারা নিজেরা কিছু জানে না, তাদের শোনা কথা। তারা কলকেতার কোন বড় আড়তদারের লোক, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে চাল কিনচে, বুঝলেন কি-না?

—অন্ত খবর নিচ্চে কি-না তা তুমি কেমন ক'রে জানলে?

বনবিহারী চক্ষু বুজিয়া দাঁত বাহির করিল। তাহার ভাবগতিক দেখিলে তাহাকে নিঃশব্দপদসঞ্চারী হিংস্র পশুর স্থায় মনে হইত। বলিল,—আমি কি না-জেনে কিছু বলি? তাদের চিঠিপত্র আমি সব দেখেচি, বুঝলেন কি-না?

কথাটা মিথ্যা। সে দেখিয়াছিল একখানা টেলিগ্রাম, কিন্তু একটু বাড়াইয়া বলিতে দোষ কি? সে যে কেমন পাকা লোক ত্রিলোচন বুঝিতে পারিবেন।

ত্রিলোচন বলিলেন,—আমাদের এখন কি করা উচিত?

—আমি সব জেনে আপনাকে বলব, ভাবনার কোন কথা নেই। কিন্তু এটা নতুন কাজ, বুঝলেন কি-না? আমাকে অনেক ঘুরতে হবে, অনেক খরচ হবে।

—কাল তুমি আর একবার এস, তোমাকে কি করতে হবে বলব, টাকাও দেব।

বনবিহারী গ্রামে বাসা দেখিতে গেল। পথে যাইতে দেখিল একটা ঘরের দরজা খোলা, ঘরের ভিতর বসিয়া ক্ষেত্রনাথ ও কিশোরীমোহন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রিলোচন ও বনবিহারী

বনবিহারী দাঁড়াইল না। ঘরের ভিতর আলোক জ্বলিতেছিল, পথে অন্ধকার, সুতরাং যাহারা ঘরে বসিয়াছিল তাহারা বনবিহারীকে দেখিতে পাইল না।

এই দুই ব্যক্তি এখানে কেন আসিয়াছে? তাহারা নানাস্থানে ঘুরিতেছে সুতরাং সুবর্ণপুরে আসা কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়, কিন্তু ঠিক এই সময় ইহারা এখানে কেন আসিয়াছে? বনবিহারী যে এখানে আসিবে তাহা ত তাহারা জানে না, জানিবার কোন সম্ভাবনাও নাই। বনবিহারী তাহাদিগকে কিছু বলে নাই আর সে যেখানে যাইবে এই দুই ব্যক্তিও যে সেইখানে যাইবে এমন কোন কথা নাই। বনবিহারীর পিছনে পিছনে ফিরিয়া তাহাদের কি লাভ? সুবর্ণপুরে এক ঘর বড় জমিদারের বাস বটে, কিন্তু এখান হইতে ত চালের চালান যায় না। তবে ইহারা কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছে?

ডাকঘরে ছদ্মবেশে গিয়া গদাধর যে বনবিহারীর চিঠির ঠিকানা দেখিয়াছিল সেকথা একবারও বনবিহারীর মনে হইল না। যে বুদ্ধি তাহার যোগাইয়াছিল তাহা যে আর কাহারও মনে হইতে পারে তাহা সে ভাবে নাই। ধূর্ত্ত অপর সকলকে নির্ব্বোধ মনে করে।

বাসায় গিয়া বনবিহারী কত কি ভাবিতে লাগিল। একবার ভাবিল এই দুই জন পুলিসের লোক, কিন্তু পুলিসের লোক কি জানে যে তাহারা কোন রূপ অনুসন্ধান করিবে? হয়ত ইহাদের এখানে আসিবার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহাদের পথে পড়িয়াছে বলিয়া দুই এক দিন থাকিবে।

সকাল বেলা উঠিয়া বনবিহারী বেড়াইতে বেড়াইতে যে-বাড়িতে ক্ষেত্রনাথ ও কিশোরীমোহনকে দেখিয়াছিল সেই দিকে গেল। তাহারা দুইজনে বাড়ির সম্মুখে পাইচারি করিতেছিল। বনবিহারী অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল,—এই যে আবার দেখা! এখানেও

কি চালের দর জানতে হবে? এদিকে ত চাল বেশী জন্মায় না, বুঝলে কি-না?

গঙ্গাধর ওরফে কেত্রনাথ বলিল,—তা আমরা জানি নে, পথে পড়ল তাই দু-দিন রয়েচি। তুমি যে এখানে আসবে তা কই ত বল নি।

বনবিহারী একটু ভাবিল, ভাবিয়া বলিল,—এখানে একটা চাকরির চেষ্টায় এসেছি, বুঝলে কি-না?

হরিনাথ অথবা যাহাকে বনবিহারী কিশোরীমোহন বলিয়া জানিত কহিল,—কোথায় চাকরি?

—এই সুবর্ণপুরের জমিদারীতে। দেওয়ান আমাকে জানেন, একটু অনুগ্রহও করেন, বুঝলে কি-না?

বনবিহারীর এই উত্তর উত্তম জুটিয়াছিল। দেওয়ান ত্রিলোচনকে সে কেন চিঠি লিখিয়াছিল হরিনাথ ও গঙ্গাধর বুঝিতে পারিল। বনবিহারী উমেদার, অর্থাৎ অহার টাকার টানাটানি। এই কারণেই আর একটা পুরস্কার পাইবার জন্ম অত ব্যস্ত হইয়াছিল।

গঙ্গাধর বলিল,—বেশ, বেশ। ও রকম চাকরি খুব ভাল, আমাদের মতন টো টো ক'রে বেড়াতে হবে না।

একটু বেলা হইতেই বনবিহারী ত্রিলোচনের কাছে গেল। কার্ত্তিক দেখিল, এ ব্যক্তির পক্ষে অবারিতদ্বার, সে আসিলেই ত্রিলোচন তাহাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ডাকিয়া বসান, তাহার সহিত বিশ্রব্ধ আলাপ করেন। ঐ লোকটাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা কার্ত্তিককে পরিত্যাগ করিতে হইল।

বনবিহারী চাপা গলায় ত্রিলোচনের দিকে মুখ বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—সেই যে দুটো লোকের কথা কাল রাত্রে বলেছিলাম তারা এখানে এসেচে, বুঝলেন কি-না?

ত্রিলোচনের গোল মুখ লম্বা হইয়া গেল, ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল কি! তাদের এখানে কি কাজ? এখানে চাল কোথায়?

—তারা বলচে পথে পড়ে ব'লে এখানে দু-দিন রয়েচে। তবু সন্দেহ হয়, বুঝলেন কি-না?

—ওরা কে, কি মতলবে ঘুরচে তা ত জানতে হবে। তোমাকে ছাড়া ত আর কাউকে বলতে পারি নে।

—তা ত বটেই। আমি সব জেনে আপনাকে বলব, বুঝলেন কি-না? আর যদি ওদের সরাতে হয়?

ত্রিলোচন দুই হাত নাড়িয়া সবেগে কহিলেন,—না, না, আমাদের গ্রামে ওসব কিছু হবে না। জানবার মধ্যে তুমি আর শ্যামাচরণ, আর কেউ কিছু জানতে পারে না। কোন প্রমাণ নেই। এরা কোথায় কি শুনেচে, কোথাকার ঘটনা তাও জানে না। শ্যামাচরণ কিছু প্রকাশ করে-না-করে সে দায় তোমার।

—তার জন্ম আমি ভাবিনে, এখন এই দুটো লোকের সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে অথচ এরা কিছু জানতে পারবে না। এদের কাছে বলেচি আপনার কাছে চাকরির জন্ম এসেচি, বুঝলেন কি-না?

—সে কথা ভাল। ওদের বুঝিও শীঘ্রই তোমার একটা ভাল চাকরি হবে। এখন তোমার কত টাকা চাই?

—পাচশো টাকার কম হবে না। কত ঘুরতে হবে, বুঝলেন কি-না?

ত্রিলোচন পাঁচশো টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন,—যদি এমন খবর আনতে পার যাতে আমি নিশ্চিন্ত হই তাহ'লে সত্যিই তোমার একটা পাকাপাকি কিছু ক'রে দেব।

—আমাকে দিয়ে পরিশ্রমের কসুর হবে না, বুঝলেন কি-না? বলিয়া বনবিহারী উঠিয়া গেল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সুতার খেই

বৈকাল বেলা গঙ্গাধর ও হরিনাথ সুবর্ণপুর গ্রামে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। একটা মাঠে গ্রামের তরুণ বয়স্ক যুবকেরা ফুটবল খেলা করিতেছে দেখিয়া তাহারা দাঁড়াইল। মাঠের পাশে অড়রের ক্ষেত, চারিদিকে অড়রের হলদে ফুল ফুটিয়াছে। দর্শকদের মধ্যে কার্ত্তিক ছিল, সে দুইজন নূতন লোক দেখিয়া তাহাদের কাছে আসিল। হরিনাথ ও গঙ্গাধর একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের কাছে আর কেহ ছিল না। কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিল,—আপনারা কোথেকে আসছেন?

হরিনাথ ও গঙ্গাধর কার্তিককে দেখিয়া বুঝিল এই যুবকের ঘটে বিশেষ কিছু নাই। গঙ্গাধর বলিল,—আমরা বিদেশী, দেশ দেখে বেড়াচ্ছি। তুমি কে?

—আমি এখানকার দেওয়ানের ছেলে, আমার নাম কার্ত্তিক।

গঙ্গাধর ও হরিনাথ ভাবিল, চেহারাখানা ঠিক কার্ত্তিকের মতনই বটে! গঙ্গাধর হাস্যমুখে বলিল,—তুমি দেওয়ান ত্রিলোচনের ছেলে? বেশ, বেশ! আমাদের সঙ্গে আর এক গ্রামে এক জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেও এখানে এসেছে। সে তোমার বাবার কাছে চাকরির জন্য এসেচে।

—ও: ও-রকম কত আসে, কে তার হিসেব রাখে?

হরিনাথ বলিল, এ লোকটা বড় মজার, কী কথায় বুঝলে কি-না বলে।

কার্ত্তিকের মুখ লাল হইয়া উঠিল, ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল,—তাকে খুব চিনি, সে লোকটা ভারি পাজি।

গঙ্গাধর বলিল,—আমাদেরও তাই মনে হয়। তুমি কেমন ক'রে জানলে?

—আমাকে একবার অপমান করেছিল। বাবার ভয়ে আমি কিছু বলিনি, তা না হ'লে আমি ওকে জব্দ ক'রে দিতাম।

তাহার পর রাগের মুখে কার্ত্তিক সকল কথা ফড়ফড় করিয়া বলিয়া ফেলিল। শেষে বলিল,—ঐ রকম আর একটা লোক আসত সেও আমাকে অপমান করেছিল, কিন্তু তাকে আমরা মেরে ভূত ভাগিয়ে দিয়েচি। বাবাও তাকে দরোয়ান দিয়ে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন, সে আর আসে না।

গঙ্গাধর জিজ্ঞাসা করিল,—তার নাম কি?

—তা ত আমি জানি না। তার নাম বলে নি।

—দেখতে কি রকম?

—গাঁটাগোঁটা, চুল কটা, চোখ কটা। তার হাতে একটা লাঠি, তার ভিতর গুপ্তি। সেইটে বের ক'রে আমাদের মারতে এসেছিল।

—তারপর?

—তারপর যেই আমি বললাম 'খুনী' অমনি চোঁ-চাঁ দৌড়। আমি ঢিল মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম।

—তার নামটা জানতে পার নি?

—বাবা জানে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি-নে।

গঙ্গাধর বলিল,—এই দিকে কোথায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল, দুটো লোক মোটর-সুদ্ধ পুড়ে গিয়েছিল, তোমরা কিছু শুনেছিলে?

—না ত, তবে এই জমিদারী যাঁর তিনি আর একজন ডুবে মারা যান।

—সে কোথায়?

—সে আর একদেশে। বাবা গিয়ে অনেক খোঁজ করেছিল, মড়াও পাওয়া যায় নি, কুমীরে খেয়ে ফেলেছিল।

গঙ্গাধর বা হরিনাথ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। তাহাদের একবারও মনে হইল না যে, যাহার জন্য তাহারা এত দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, যে রহস্য জানিবার জন্য তাহারা এত চেষ্টা করিতেছিল, এই স্থানেই তাহার মীমাংসা আছে। তাহারা কেমন করিয়া জানিবে একটা দুর্ঘটনা গোপন করিবার জন্য আর একটার কল্পনা হইয়াছে?

তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহাদের বাসার সম্মুখে বনবিহারী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পশ্চাতে কিছু দূরে কার্ত্তিক আসিতেছিল।

বনবিহারী বলিল,—আমি তোমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, বুঝলে কি-না?

গঙ্গাধর বলিল,—এস বসবে।

ততক্ষণে কার্ত্তিক আসিয়া উপস্থিত হইল। গঙ্গাধর ও হরিনাথ রহিয়াছে এই ভরসায় সে রোক করিয়া বনবিহারীকে বলিল,—তুমি যে সেদিন বড় আমাকে অপমান করেছিলে?

বনবিহারী কার্ত্তিকের পিঠে হাত দিয়া কহিল,—আরে ছোটবাবু, সে আমি তোমাকে একটু ক্ষেপিয়েছিলাম, কিছু মনে ক'রো না। তোমার বাবা আমাকে চাকরি

দেবেন বলেচেন, আমি ত তোমাদের কাছেই থাকব, বুঝলে কি-না ?

কার্ত্তিক একটু নরম হইয়া বলিল,—তা যেন হ'ল, আর সেই যে আর একটা লোক আমাকে মারবে বলেছিল সে কে ? তার মারবার সাধ আমরা মিটিয়ে দিয়েচি।

বনবিহারী বলিল,—তুমি কার কথা বলচ আমি বুঝতে পারচি নে।

—সেই যে, লাঠির ভিতর গুপ্তি নিয়ে বেড়ায়।

—ওঃ বুঝেছি। বোধ হয় সে লোকটার মাথা খারাপ, আমাকেও একদিন গুপ্তি দিয়ে মারতে এসেছিল, আমি তাকে ধরে আচ্ছা ক'রে ঠেঙিয়ে দিয়েছিলাম। বুঝলে কি-না ?

—তার নাম কি ?

—শ্যামাচরণ।

গঙ্গাধর ও হরিনাথের চক্ষু এক নিমিষের জন্য মিলিল। গঙ্গাধরের হাতে যেন রহস্যের খেই ঠেকিল। এইটা ধরিয়া টানিলে কি সব কথা বাহির হইয়া পড়িবে ?

কার্ত্তিক চলিয়া গেল। ঘর খুলিয়া গঙ্গাধর বনবিহারীকে ঘরের ভিতর ডাকিল। বনবিহারী বলিল,—আমার ঠিকানা তোমাকে দিয়েচি। আমি যদি কিছু জানতে পারি তাহ'লে তোমাদের কোথায় পাব ? সেটা জানা চাই, বুঝলে কি-না ?

গঙ্গাধর কলিকাতায় তাহার বন্ধুর ঠিকানা বলিয়া দিল। বলিল,—সেখানে খোঁজ করিলেই আমাদের পাবে।

বনবিহারী চলিয়া যায়, এমন সময় গঙ্গাধর কথায় কথায় বলিল,—এই যে শ্যামাচরণের নাম করলে ও লোকটা কে ?

—তা ঠিক বলতে পারি নে। অমনি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বুঝলে কি-না ?

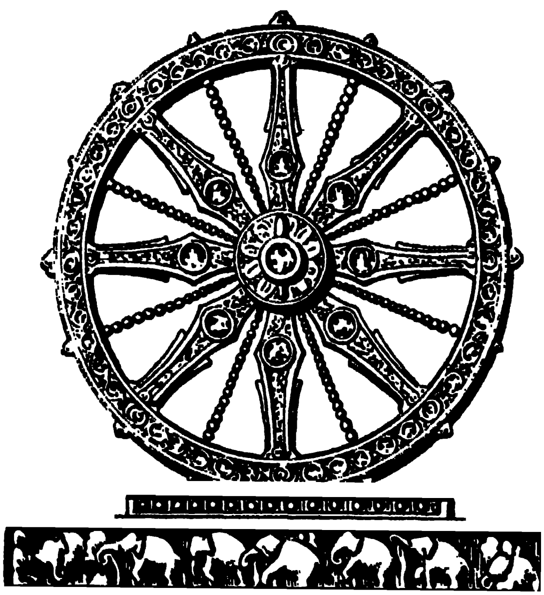
—কোথায় বাড়ি ?

—তাও জানি নে। কে কার খোঁজ রাখে, বুঝলে কি-না ?

—শ্যামাচরণ কি মোটর চালায় ?

এক মুহূর্ত্ত বনবিহারী স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে হইল কে যেন তাহার হাত টানিয়া তাহার হাতে হাতকড়ি দিতেছে। কিন্তু তাহার মুখে কোন ভাবান্তর হইল না, তাচ্ছল্য ভাবে কহিল,—তা হবে, আজকাল ত অনেকে মোটর চালাতে জানে।

ক্রমশঃ



নিবেদিতার স্মৃতি

শ্রীসরলাবালা সরকার

সে-দিনটির কথা আজও মনে পড়ে যে-দিন প্রথম শুনিলাম ভগিনী নিবেদিতা আমাদের অতি নিকটে বাগবাজারে বোসপাড়ার গলিতে আসিয়া বাস করিতেছেন।

নিবেদিতাকে দেখিবার জন্য মনে সেদিন কি প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বুঝানো অসম্ভব। এখনকার দিন অপেক্ষা তখন মেয়েদের স্বাধীনতা অনেক কম ছিল, গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্যই গুরুজনের অনুমতি পাওয়া কঠিন হইত। কি করিয়া যে নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে এই চিন্তায় মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যাহা হউক ভগবানের দয়ায় অতি শীঘ্রই নিবেদিতার দর্শন লাভ হইল।

'অমৃত বাজার পত্রিকা' আপিসে প্রথমে নিবেদিতার সহিত দেখা হয়। নিবেদিতা সেখানে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের আমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। ভগিনীর আসিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বাড়ির মেয়েরা অপেক্ষা করিতেছিলেন। নিবেদিতা আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানাও ছিলেন। পূজ্যপাদ শিশির-কুমার ঘোষ মহাশয় এইভাবে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন, "ইনি 'নিবেদিতা,' এঁর যা-কিছু সবই ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদিত হয়ে গিয়েছে, আর ইনি 'কৃষ্ণপ্রিয়া' শ্রীকৃষ্ণের ইনি নর্ম্মসখী, তোমাদের পরম ভাগ্য যে এঁদের দুর্লভ সঙ্গের অধিকারী হইলে। আর ভগিনি, এঁরাই বাংলার মেয়ে,—ভারত রমণী, যাঁদের জন্য আপনি সর্ব্বত্যাগিনী হয়ে বহু দূর দেশ থেকে এসেছেন।"

ভগিনী একটি গৈরিক বর্ণের কটি বেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ পরিধেয় পরিয়াছিলেন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে প্রসন্ন হাস্য। তাঁহাকে দেখিয়া কিছুক্ষণ যেন মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইল, এ মূর্ত্তি যেন রক্তমাংস দিয়া গঠিত দেহ নয়, এ যেন আত্মার আনন্দদীপ্ত প্রসন্ন রূপের স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ। আরও মনে হইল, যেন তিনি কত দিনের পরিচিত, যেন তিনি চিরআত্মীয়। আমার মনের এই ভাব কি তাঁহার মনও স্পর্শ করিয়াছিল? কেন জানি না, পরিচয়ের পর মুহূর্ত্তেই তিনি আমার হাতের উপর হাত রাখিয়া একটু বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে বলিলেন, "আপনাকে যেন চিনি বলিয়া মনে হয়, আগে কি আমাদের কোথায়ও দেখা হইয়াছিল?"

ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা একখানি ফলতোলা ঢাকাই শাড়ী অনেক পিন দিয়া আঁটিয়া অতিকষ্টে পরিয়াছেন। সরলা বালিকার মত সর্ব্বদাই আনন্দিতা। শাড়ী পরিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। যাহা দেখিতেছেন তাহাতেই যেন তাঁহার আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে; আমাদের সহিত পরিচয়ে তিনি যে খুব সুখী হইয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ আনন্দ, অত্যসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন ও সে-সম্বন্ধে দু-একটি প্রশ্নও করিতেছেন।

ঘরের কোণে পিতলের পিলসুজে মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তখন ইলেকট্রিক লাইট ঘরে ঘরে হয় নাই এবং হ্যারিকেনও প্রদীপকে একেবারে লুপ্ত করে নাই। সুমার্জ্জিত পিতলের দীপাধার ও মাটির প্রদীপ দেখিয়া দুই ভগিনী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন, আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে অতি আগ্রহের সহিত সেটি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, পরে 'আরতি' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। এই সামান্য মাটির প্রদীপটিই যে কত পবিত্র ভাবের প্রতীক তাহা আমরা জন্মাবধি দেখিয়াও কখনও অনুভব করি নাই, কিন্তু সেদিন নিবেদিতার দৃষ্টির সংস্পর্শের প্রভাবে বুঝি তাহার কিছু অনুভব করিতে পারিলাম।

যতক্ষণ নিবেদিতা রহিলেন, সময়টি যেন একটি সুখ-স্বপ্নের মত কাটিয়া গেল। নিবেদিতা চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার স্মৃতিতে মন ভরপুর হইয়া রহিল। সমস্ত

রাত্রি কখনও জাগরণে কখনও নিদ্রার মধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। চৈতন্য-চরিতামৃতে কুলীন গ্রামবাসীকে বৈষ্ণবের লক্ষণ সম্বন্ধে মহাপ্রভু যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে, সেই কথাটিই বার-বার মনে পড়িল :—

"যাহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম
তাঁরেই জানিবে তুমি বৈষ্ণবপ্রধান।"

এক এক জন মহাপ্রাণ মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তাঁহারা নিজের জীবনের আলো দিয়া অন্ধকারে মগ্ন শত শত জনের দৃষ্টিপথের বাধা দূর করিয়া দেন। আমরা যেন চোখ থাকিয়াও দৃষ্টিহীন, সর্ব্বসম্পদের মধ্যে থাকিয়াও দরিদ্র, গৃহে থাকিয়াও বিদেশীর মত জীবন কাটাই। শুধু তাও নয় এই ভাবে নিজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যে জীবন কাটাইতেছি তাহাও নিজে জানি না। তাই নিবেদিতার দৃষ্টির আলোর অনেক কিছুই নূতন করিয়া দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছি, "একি, এ ত এমন ভাবে আগে জানি নাই, আগে দেখি নাই?" নিবেদিতার রামায়ণ আলোচনায় আমরা রামায়ণের প্রত্যেক চরিত্রের বিশিষ্টতা নূতনভাবে অনুভব করিয়াছি, মহাভারতের চরিত্রগুলির সম্বন্ধে সেইরূপ অনুভব করিয়াছি। আর যখন তিনি ইতিহাস পড়াইতেন, তাঁহার সেই ইতিহাসের অধ্যাপনা তাঁহার ছাত্রীদের মনের সম্মুখে যেন এক নূতন রাজ্যের দুয়ার খুলিয়া দিত। দেশের উপর ভালবাসা ও জাতীয়তা যে মানুষের জীবনকে কতখানি উন্নত করে তাহা তিনি সজীব চিত্রের মত তাঁহার ছাত্রীদের চোখের সম্মুখে আঁকিয়া দিতেন। রাজপুতানার ইতিহাস তাঁহার বিশেষ প্রিয় ইতিহাস ছিল। দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে মৃত্যুভয়হীন রাজপুত যোদ্ধার যে উৎসাহ সেই উৎসাহের বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি উৎসাহে ও আনন্দে এত মাতিয়া উঠিতেন যে তিনি যে স্কুল ঘরে ছাত্রীদের ইতিহাস পড়াইতেছেন সে-কথা যেন ভুলিয়াই যাইতেন। তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন, তাঁহার বাংলা ভাষায় অপটুত্ব সত্ত্বেও তাঁহার কথা বুঝিতে ছাত্রীদের কিছু বাধা হইত না। ওই শোন, একলিঙ্গদেবের মন্দিরদ্বারে জয়ধ্বনি, 'ভগবান একলিঙ্গের জয় হোক।' রাজপুত যোদ্ধাগণ যুদ্ধে চলিয়াছেন, হয় তাঁহারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন, না হয় মরিবেন, আজ তাঁহারা এই পণ করিলেন! তাঁহাদের কপালে দেখ ওগুলি কিসের ফোঁটা? ওগুলি দধি ও চন্দনের ফোঁটা! তাঁহাদের জননীগণ, ভগিনীগণ ও পত্নিগণ ঐ জয়তিলক তাঁহাদের কপালে পরাইয়া দিয়াছেন। সেই সব বীররমণী বলিয়াছেন, "যাও বীর যুদ্ধে যাও, তোমার দেশকে বাহুবলের দ্বারা রক্ষা কর, নতুবা দেশের জন্য প্রাণ দাও। আনন্দের সহিত বীরের যাহা কাজ তাহাই সাধন কর, এবং আমরাও বীর-রমণীর যাহা কাজ তাহা করিব।" রমণীগণের ঐ সকল উৎসাহ-বাক্য বীরগণকে আরও অধিক আনন্দিত ও বলশালী করিয়াছে। ঐ দেখ,ভগবান একলিঙ্গের পুরোহিত মন্দির হইতে বাহির হইলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি সতেজ ও উন্নতদেহ রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তকের কেশ শুভ্র, পরিধেয় বস্ত্রও শুভ্র। পূজনীয় সেই ব্রাহ্মণ একলিঙ্গের আশীর্ব্বাদী অর্ঘ্য আনিয়াছেন, তাহা সকল বীরকে দিতেছেন ও সকলে সম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া গ্রহণ করিতেছেন এবং মস্তকাবরণ উষ্ণীষে তাহা রাখিতেছেন। যুদ্ধে জয় অথবা মাতৃভূমির জন্য বীরের ন্যায় জন্ম মৃত্যুলাভ—ঐ শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য এই আশীর্ব্বাদই বহন করিয়া আনিয়াছে। আঃ! অতি গৌরবান্বিতা এই ভারতভূমি, গৌরবান্বিত ভারতীয় বীরগণ এবং গৌরবান্বিতা ভারতের কন্যাগুলি! মানুষ ইহা অপেক্ষা আর অধিক সৌভাগ্য কি কল্পনা করিতে পারে, এইরূপ বীরের মত বাঁচাই সকল প্রকার বাঁচার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বীরের মত মরাই মৃত্যুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আবার জয়চাঁদের বিষয় বলিতে গিয়া নিবেদিতার প্রসন্ন মুখ দুঃখে ম্লান হইয়া যাইত। নিবেদিতা বলিতেন, "জয়চাঁদ একজন রাজপুত যোদ্ধা, কিন্তু তিনি শত্রুর পদতলে দেশের সম্মান বিক্রয় করিলেন। ইহা কিরূপে ঘটিল? কেবল ঈর্ষার জন্য! ঈর্ষা মহাপাপ খল সর্পের মত তাঁহার কানে মন্ত্রণা দিল, 'দেশশত্রুর আশ্রয় লও ও তাহার সাহায্যে নিজের শত্রুকে ধ্বংস কর।' হায়, কি দুঃখের বিষয়! জয়চাঁদ ক্ষত্রিয় হইয়া ইহা ভুলিলেন যে

দেশদ্রোহী হইয়া বাঁচিয়া থাকার মত ঘৃণাজনক বিষয় আর কিছুই নাই।" নিবেদিতা যখন এই বর্ণনা করিতেন তখন 'দেশদ্রোহী' হইয়া বাঁচিয়া থাকা যে কত দূর ঘৃণার বিষয় ছোট মেয়েরাও তাহা অনুভব করিত। একটি ছোট মেয়ে বলিয়াছিল, "বেচারা জয়চাঁদ, আহা, কেউ তাকে বুঝিয়ে দিলে না কেন যে ওরকম ক'রো না।"

আর জহরব্রতের সময় ব্রতধারিণী রাজপুত রমণীগণ রাণী পদ্মিনীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া স্তবগান করিতে করিতে অগ্নিকুণ্ডের দিকে প্রফুল্ল মুখে অগ্রসর হইতেছেন, এই দৃশ্যের বর্ণনা তিনি বহুবার করিয়াছেন, বর্ণনা করিতে করিতে একেবারে তন্ময় হইয়া যখন মুদ্রিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়াছেন, তখন শ্রোত্রীগণের মনের সম্মুখে ছবির মত সেই দৃশ্য ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহারাও যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

কি করিয়া যে আবার সেই দেশাত্মবোধ ভারতের কন্যাগণের অন্তরে জাগ্রত হইবে সেজন্য তিনি যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। দেশের সম্বন্ধে কোন ছাত্রীকে কোন প্রশ্ন করিলে সে যদি ঠিক উত্তর দিতে পারিত তবে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু অজ্ঞতা দেখিলে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়া বলিতেন, "নিজের দেশকে তোমরা ভুলিয়া গেলে!" খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহারা এ দেশের জন্য অনেক কিছু করিয়াছে, হাসপাতাল ও স্কুল করিয়াছে। অনেক কষ্ট করিয়াছে ও লোকের সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু অনিষ্ট তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়াছে। কেন-না, ভারতবাসীকে তাহারা নিজ জাতির জাতীয়তার মর্য্যাদা ভুলাইয়া দিতে চাহিয়াছে।"

কলিকাতার এক প্রান্তে এক জনবিরল পল্লী, তাহাতে একটি অতি পুরাতন বাড়ি, সেই বাড়িটি ভগিনী নিবেদিতার সাধনের আশ্রম ছিল। নিবেদিতার সহিত প্রথম দেখা হইবার পর সেই বাড়িটিতে তাঁহার সহিত দ্বিতীয়বার দেখা হয়, এবং তাহার পর প্রতিদিনই প্রায় তাঁহার সহিত দেখা হইত। 'ভারতের কন্যাগণ জাতীয়-ভাবে জাগ্রত হউক' এই তপস্যায় তাপসিনী নিবেদিতা যেন তথায় মগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "এই ভারত ব্রহ্মোপলব্ধির মহাতীর্থ, কিন্তু ভারতবাসী যদি ভারতকে না চিনিতে পারে তবে ব্রহ্ম তাহা হইতে দূরে চলিয়া যাইবেন। তোমাদের ধর্ম্ম বীরের ধর্ম্ম, পুণ্যক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ বীরগণেরই বাসভূমি। তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের শিক্ষা দিয়াছে সকলকে ভালবাসিবে, সকলের উপর সদয় হইবে, কিন্তু ক্লৈব্য ত্যাগ করিবে। অর্জ্জুনের পুত্র নিজের দেশের সম্মানরক্ষার জন্য নিজের পিতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুনও কর্ত্তব্য-পালনের জন্য পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে দ্বিধা করেন নাই।"

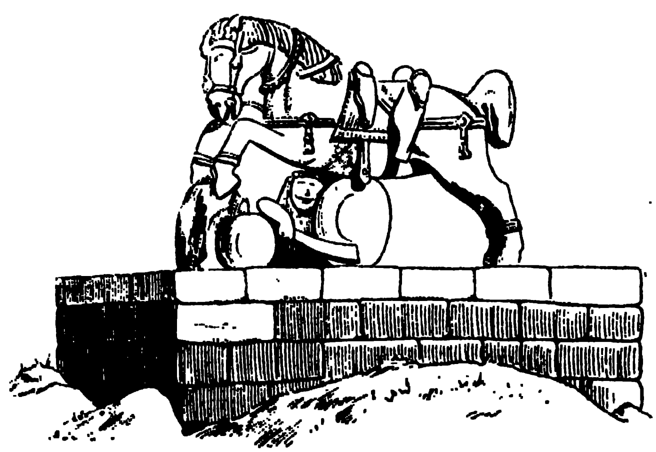
একদিন কতকগুলি পুস্তকে পোকা হইয়াছিল, সেগুলি নামাইয়া দেখা গেল পোকায় পুস্তকের অনেক পাতা কাটিয়াছে। বই ঝাড়িবার সময় পোকাগুলি মাটিতে পড়িয়া এদিক-ওদিক পলাইতে লাগিল। নিবেদিতা অতি দ্রুত সেগুলিকে মারিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন, "ভারতবাসী অতি দয়াশীল জাতি। সিন্ধুনদীর তীরে গ্রীকরাজা আলেকজাণ্ডার যখন দেশ আক্রমণ করিতে আসিলেন, তখন আতিথ্যপরায়ণ ভারতীয় রাজগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন, কেবল পুরু নামে এক রাজা তাঁহাকে বাধা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও শত্রুগণের প্রতি সদয় হইয়া কুরুক্ষেত্রে প্রথমে যুদ্ধ করিতে চাহেন নাই, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, 'ক্লৈব্য ত্যাগ কর এবং যুদ্ধ কর।' ইহাই তোমাদের শাস্ত্রের শিক্ষা। কর্ত্তব্যপালনে কখনও মমতায় আবদ্ধ হইবে না এবং অশুভকারী যাহা তাহাকে সবল চিত্তে পদতলে দলিত করিবে।"

দক্ষিণ-ভারতের ভাস্কর্য্য শিল্পসমূহ, অজন্তার গিরি-গাত্রের চিত্ররাজি, অশোকের অনুশাসনক্ষোদিত প্রস্তর বা স্তম্ভের শিলা এই সকলের সহিতই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা যেন বিজড়িত রহিয়াছে, নিবেদিতার কথার ভাবে এইরূপ মনে হইত। নিবেদিতা বলিতেন, —মানুষ সংগীত দিয়া পূজা করিল এবং তুলিকা দিয়া পূজা করিল। অনেক কথা যাহা বুঝাইতে পারে নাই সেই গভীর মনের ভাব দুই ছত্রে শ্লোকে ব্যক্ত হইল। কত

কত ভাস্কর বাটালী দিয়া গির্জ্জার গায়ে এবং মন্দিরের গায়ে ছবি খোদাই করিয়াছেন, সেই সমস্ত কারুতে একটি কথাই আছে, সে কথা 'পূজা'।

তিনি বলিতেন, "অনেক কথা যাহা বুঝাইতে পারে না, একটি ছবি তাহা বুঝায়; আবার অনেক কথা যাহা বুঝাইতে পারে না একটি শব্দ তাহা সুন্দর করিয়া বুঝায়। একটি শব্দ "যজ্ঞ" আর একটি শব্দ "আহুতি"। ভারতবর্ষই এই দুটি শব্দ রচনা করিয়াছে। 'যজ্ঞের জন্য কাজ কর, এবং আহুতি দাও' কি সুন্দর কথা। যিনি বীর, তিনিই ত্যাগী ও ধার্ম্মিক হইতে পারেন, বীর ভিন্ন কেহই ব্রহ্মলাভ করিতে পারে না। সীতা দেবী জনক রাজার কন্যা ও মহারাজা দশরথের পুত্রবধূ, তিনি রাজপ্রাসাদে সর্ব্বদা দাসীবেষ্টিতা হইয়া বাস করিতেন, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনে যাইতে ভয় পাইলেন না। আবার রাবণ যখন তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া গেল, তখন অসহায় অবস্থায় তাহার অধীনে থাকিয়াও পৃথিবীর বীরগণ যাহাকে ভয় করে সেই ভীষণ রাক্ষসকে ভয় করিলেন না এবং তাহার বশীভূতা হইলেন না। সুভদ্রা নিজেই অর্জ্জুনের যুদ্ধের রথ চালাইয়াছেন, যুদ্ধস্থলে তাঁহার ভয় হয় নাই, সাবিত্রী যমের পশ্চাতে চলিতে ভয় পান নাই। আবার দেখ বানরেরাই যুদ্ধের অগ্রে সেতু প্রস্তুত করিল। পৃথিবীতে এই সেতুপ্রস্তুতকারীর দলই ধন্য। জগতে যাঁহারা মহাবীর তাঁহারা নিজের দেহ দিয়া সেতু প্রস্তুত করিয়াছেন, পরবর্ত্তীগণ সেই সেতুর উপর দিয়া পার হইয়াছে। বীর সর্ব্বদা আগে চলিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন, আবার বীর যিনি, নিজের সম্মানের দিকে না চাহিয়া তিনিই পশ্চাতের দিক রক্ষা করেন। ভেরীবাদক ধন্য, সে সকলের আগে চলে, নিজের গৌরবের জন্য নয়, ভেরীধ্বনিতে সকলকে আহ্বান করিবার জন্য। পতাকাধারী ধন্য, সে সকলের আগে থাকে পতাকার দ্বারা সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য ও সকলকে ঠিক পথে চালাইবার জন্য। ইহারা আশা করে না নিরাশও হয় না, ইহারা দৃঢ়নিশ্চিত। একজনের তপস্যার ফলে সমস্ত জাতি পুণ্যবান হয় এবং এক জাতির পুণ্যে পৃথিবীর সমস্ত জাতি পুণ্যবান হয় ও অধর্ম্ম দূর হইয়া ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।"

নিবেদিতা নিজেই এইরূপ পতাকাধারী ও ভেরীবাদকের কাজ করিয়া গিয়াছেন, নিজের দেহপাত করিয়া সেতু প্রস্তুত করিয়াছেন, সে সেতু প্রস্তুতের সার্থকতা কবে হইবে কে জানে? মহান্ তপস্যার বীজ শত শত বৎসরেও নষ্ট হয় না, অঙ্কুরিত হইবার উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় সংগুপ্ত থাকে মাত্র।



নরদেবতা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন জাপানী সমাজে বিপদ-আপদে পরস্পরের সাহায্য করা মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে ত কথাই নাই, প্রত্যেক নরনারী অবিলম্বে সব কাজ ফেলিয়া আগুন নিবাইতে ছুটিত। এ কর্ত্তব্য হইতে বালকবালিকারও রেহাই ছিল না। শহরে ভিন্ন ব্যবস্থা থাকিলেও পল্লীগ্রামে ইহাই ছিল বিধি। সে-বিধি অমান্য করিতে কেহ সাহস করিত না।]

হামাগুচির বয়স হইয়াছে। দীর্ঘকাল গ্রামের মোড়লি করিয়া বর্ত্তমানে তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তির আর সীমা নাই। লোকে তাহাকে 'ওজিসান্' বা ঠাকুর্দ্দা বলিয়া ডাকে—সে সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। ধনসম্পত্তিও তার সকলের চেয়ে বেশি। ছোটখাট চাষীদের পরামর্শ দিয়া, অভাবের সময় টাকা ধার দিয়া, ভাল দরে ক্ষেতের ধান বিক্রীর ব্যবস্থা করিয়া, বিবাদ-বিসম্বাদে মধ্যস্থতা করিয়া, বিপদে সহায় হইয়া সে এই শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছে।

উপসাগরের উপরে ছোট মালভূমি। তাহারই এক প্রান্তে হামাগুচির মস্ত গোলাবাড়ি। মালভূমির উপর প্রধানত ধানের চাষ; তার তিন দিকে ঘনবনে ঢাকা গিরিচূড়ার দেওয়াল। যে দিকটি খোলা সেই দিকের জমি বিশাল সবুজ এক গহ্বর রচনা করিয়া জলের ধার পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে—দেখিলে মনে হয় কে যেন ভিতরটা কুরিয়া লইয়াছে। এই ঢালুর সমস্তটা—দৈর্ঘ্যে প্রায় আধ-ক্রোশ—এমন থাকে থাকে উঠিয়াছে যে সমুদ্রের উপর হইতে প্রকাণ্ড সবুজ সিঁড়ির মত দেখায়। তার মাঝখানে একটা সরু সাদা আঁকাবাঁকা রেখা—এক ফালি পার্ব্বত্য পথ। উপসাগরের বাঁকের মাথায় আসল গ্রাম—নব্বইটি চালাঘর ও একটি শিন্তো মন্দির। হামাগুচির বাড়ি যাইবার সরুপথের দুইধারে কিছুদূর পর্য্যন্ত ঢালু বাহিয়া অন্যান্য খানকয় কুটীর কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়াছে।

শরৎকালে একদিন অপরাহ্ণে নীচেকার গ্রামে উৎসবের আয়োজন হইতেছিল। বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া নতমুখে হামাগুচি তাহাই দেখিতেছে। এবার ফসল ফলিয়াছে প্রচুর। ধানকাটা শেষ হইয়াছে—তদুপলক্ষে শিন্তো মন্দির-প্রাঙ্গণে চাষীদের এই নৃত্যোৎসবের আয়োজন। বুড়া দেখিতেছে—নির্জ্জন পথে চালাঘরের মাথায় উৎসবের কেতন, পথের ধারে পোঁতা সারবন্দি বাঁশের গায়ে কাগজের লণ্ঠনের মালা, সুসজ্জিত মন্দির আর শিশুদের পোষাকে উজ্জ্বল রঙের বাহার। বুড়ার সঙ্গে কেহ নাই, আছে কেবল এক বালক নাতি, তার বয়স দশ বৎসর। পরিবারের অন্যান্য সকলে ইতি-পূর্ব্বেই গ্রামে নামিয়া গেছে। সেও তাহাদের সঙ্গেই যাইত, শরীরটা কাহিল বোধ করায় যায় নাই।

সারাদিন গুমট করিয়া ছিল। এখন একটু বাতাস উঠিলেও শূন্যে একটা গুরুভার উত্তাপ—জাপানী চাষীরা জানে কোনো কোনো ঋতুতে উহা ভূকম্পনের পূর্ব্বলক্ষণ। এবং হইলও তাই—দেখিতে দেখিতে ভূমিতল দুলিয়া উঠিল। কম্পনের বেগ এমন নয় যে কেহ ভয় পাইবে, কিন্তু শত শত ভূকম্পনের অভিজ্ঞতা সত্বেও হামাগুচির কাছে উহা যেন কেমন কেমন ঠেকিল—একটা বিলম্বিত মন্থর নাচনে গতি। হয় ত উহা বহুদূরের একটা বিরাট ভূকম্পের জের মাত্র। বাড়িটা মটমট করিয়া উঠিল, কয়েকবার ধীরে ধীরে দুলিল, তারপর সব স্থির।

কাঁপন থামিলে হামাগুচির তীক্ষ্ণদৃষ্টি শঙ্কিতভাবে গ্রামের পানে ফিরিল। এমন প্রায়ই হয় যে, কোনো ব্যক্তি একটি বিশেষ স্থান বা পদার্থের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছে; হঠাৎ তার মনোযোগ অপসারিত হইল অপর কিছুর অনুভূতির দ্বারা, যাহা যে, সজ্ঞানে দেখেই নাই—অজানার একটা অনির্দ্দিষ্ট অনুভূতি, যাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টির ক্ষেত্রের বাহিরে অচেতন দৃষ্টির অস্পষ্ট সীমান্তে বিরাজিত। এইরূপ একটা অনুভূতির দ্বারা হামাগুচি

টের পাইল সমুদ্রের গভীরাংশে অস্বাভাবিক কিছু ঘটিতেছে। দাঁড়াইয়া উঠিয়া সে সমুদ্রের পানে লক্ষ্য করিল—অকস্মাৎ তাহার মূর্ত্তি কালো করাল হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার আচরণও অদ্ভুত, উহা যেন বাতাসের বিরুদ্ধে ছুটিতেছে—তীরভূমির বিপরীত দিকে যেন তাহার গতি।

অচিরে সেই অদ্ভুত ব্যাপার গ্রামের লোকেরাও লক্ষ্য করিল। মনে হইল ইতিপূর্ব্বের ভূকম্পন কেহ ঠাহর করিতে পারে নাই, কিন্তু সমুদ্রের গতি দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়াছে। ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখার জন্য তাহারা কেবল বেলাভূমি পর্য্যন্ত নয়, বেলাভূমি অতিক্রম করিয়াও ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থানীয় সমুদ্রতীরে এমন ধারা ভাঁটা কখনও দেখিয়াছে বলিয়া কোনো জীবিত মানুষের মনে পড়ে না। এ যে একেবারে অদৃশ্যপূর্ব্ব—ভৌতিক কাণ্ডের মত! হামাগুচির চোখের সম্মুখে সমুদ্রগর্ভের খাঁজকাটা অচেনা বালুবিথার ও আগাছায় ভরা শৈলমালা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নীচেকার গ্রামে কেহই সেই ভয়ানক ভাঁটার তাৎপর্য্য অনুমান করিতে পারিতেছে বলিয়া মনে হইল না।

হামাগুচি নিজেও ইতিপূর্ব্বে এমন ব্যাপার কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই, তবে শৈশবে ঠাকুর্দার-মুখে-শোনা গল্প তার মনে পড়িল—স্থানীয় তীরভূমির কোনো কিংবদন্তীই হামাগুচির অজ্ঞাত নয়। সমুদ্র কি করিতে উদ্যত তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। হয়ত সে ভাবিল, গ্রামে সংবাদ দিতে কতটা সময় লাগিবে, কিম্বা পাহাড়ের উপরকার বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতকে দিয়া সেখানকার বড় ঘণ্টা বাজানর ব্যবস্থা করিতেই বা কত সময় যাইবে···কিন্তু সে কি ভাবিয়াছিল, তাহা বলিতে যতটা সময় লাগিবে, তার চেয়ে ঢের কম সময়ের মধ্যেই সে ভাবিয়া কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিল। নাতিকে ডাক দিয়া বলিল—তাদা! ধাঁ ক'রে একটা মশাল জ্বালিয়ে দে দেখি।

ঝড়ের রাতে বা কোনো কোনো শিন্তো উৎসবে ব্যবহারের জন্য সমুদ্রতীরের অনেক গৃহে তাইমাৎসু বা দেবদারুর মশাল তৈরি থাকে। বালক তখনই একটা মশাল জ্বালাইয়া ফেলিল, বুড়া সেটা হাতে করিয়া দ্রুতপদে ধানক্ষেতে গিয়া হাজির হইল। শত শত মরাই চালানী ধানে ঠাসা—বুড়ার মূলধনের প্রায় সবটাই সেই ধানের মধ্যে। ঢালুর প্রায় প্রান্তে যেগুলো ছিল তাদের গায়ে সে টপ টপ করিয়া জলন্ত মশাল ছোঁয়াইয়া দিল—দুর্ব্বল প্রাচীন পায়ে যত শীঘ্র সম্ভব ছুটিয়া ছুটিয়া সে একটার পর একটা মরাইয়ে আগুন দিতে লাগিল। রোদেপোড়া শুকনো খটখটে মরাইগুলো নিমেষে জ্বলিয়া উঠিল। সমুদ্রের হাওয়ার তেজ ক্রমেই বাড়িতেছে, সেই হাওয়ার তাড়নে আগুন স্থলের দিকে জিভ মেলিল। দেখিতে দেখিতে সারি সারি মরাই জ্বলিয়া উঠিল—ধোঁয়ার থামগুলো আকাশপানে উঠিয়া মিলিয়া মিশিয়া একটা বিরাট মেঘের ঘূর্ণি রচনা করিল। বিস্ময়ে এবং ভয়ে বালক তাদা ঠাকুর্দার পিছু পিছু ছুটিতে ছুটিতে কেবল বলিতে লাগিল—

দাদু! কেন? দাদু! কেন?—কেন?

কিন্তু দাদু জবাব দিল না। বুঝাইবার সময় নাই, চারশ' মানুষের জীবন সঙ্কট—সে কেবল তাহাই ভাবিতেছিল। কিছুক্ষণ বালক সেই জলন্ত ধানের দিকে বিহ্বলচোখে চাহিয়া রহিল, তারপর কাঁদিয়া ফেলিল। নিশ্চয় দাদু পাগল হইয়াছে—ইহা ভাবিয়া সে ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। মরাইয়ের পর মরাইয়ে আগুন দিতে দিতে অবশেষে হামাগুচি ক্ষেতের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল। কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, এইবার মশাল ফেলিয়া দিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

ওদিকে গিরি-মন্দিরের পূজারী অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া অতিকায় ঘণ্টা বাজাইতে সুরু করিয়াছে। আগুন ও সেই ঘণ্টার মিলিত আহ্বানে গ্রামের লোকেরা অবিলম্বে সাড়া দিল। হামাগুচি দেখিতে পাইল, বেলাবালুর উপর দিয়া তটভূমি অতিক্রম করিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া তাহারা দ্রুতগতি উঠিয়া আসিতেছে পিঁপড়ার সারির মত। মন বড় ব্যাকুল, তাই তার মনে হইল সকলে ভারি ধীরে ধীরে আসিতেছে—এক একটি মুহূর্ত্ত যেন এক এক যুগ! সূর্য্য অস্তমান। উপসাগরের বলিচিহ্নিত শয্যা এবং তাহারও পরে একটি বিপুল বিচিত্র পাণ্ডুর

বিস্তার কমলায়ণের অস্ত-আভায় উদ্ভাসিত ; আর তখনও সমুদ্র দিগন্তপানে ছুটিয়া পালাইতেছে।

যাহাই হোক, আসলে হামাগুচিকে খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। সর্ব্বপ্রথম একদল কম্বঠ ও তৎপর কৃষাণ যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার উদ্‌যোগ করিল। দেখিয়া হামাগুচি হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, দুই হাত তুলিয়া তাহাদিগকে থামাইয়া দিল—

আরে থামো! থামো! জ্বলতে দাও! সমস্ত গ্রাম আসুক—সকলের আসা চাই! দারুণ বিপদ—'তাইহেন্ দা'!

সমস্ত গ্রামই আসিতেছিল। হামাগুচি গনিতে লাগিল। অচিরে গ্রামের সমস্ত যুবক ও বালকেরা আসিয়া পৌছিল এবং শক্ত সমর্থ স্ত্রীলোক ও বালিকাও অনেকে আসিল ; তারপর আসিল অধিকাংশ প্রাচীনেরা, আর জননীরা আসিল শিশুকে পিঠে বাঁধিয়া। বালক-বালিকারাও আসিল—কারণ তাহারাও হাতে হাতে জল আগাইয়া দিতে পারিবে। প্রাচীনদলের মধ্যে যারা দুর্ব্বলতাবশত প্রথম ধাক্কায় আসিয়া পৌছিতে পারে নাই, এখন দেখা গেল তারা চড়াই পথে অনেকটা উঠিয়া আসিয়াছে। ভিড় ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু তখনও কেহই কিছু জানে না, বিষণ্ণ বিস্ময়ে কেবল জলন্ত ক্ষেতের পানে আর মোড়লের স্থির উদাসীন মুখের পানে তাহারা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ব্যাপার কি ?—বালক তাদাকে কেহ কেহ প্রশ্ন করিল। সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে আর বলে—দাদু পাগল হয়েচে—দাদুকে আমার ভয় করে। নইলে ইচ্ছে ক'রে ধানে আগুন লাগালে কেন? আমি দেখেচি আগুন লাগাতে। আমি দেখেচি!

হামাগুচি বলিল, ধানের কথা ও যা বলছে তা ঠিক। আমিই ধানে আগুন দিয়েছি।…সবাই এল কি?

পরিবারের কর্ত্তারা আশেপাশে আর পাহাড়ের তলার দিকে লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিল—সকলেই উপস্থিত। দু-একজন যারা বাকি আছে, এখনি এসে পড়বে…কিন্তু ব্যাপার ত কিছু বুঝ ছি না!

খোলা দিকটার পানে আঙুল বাড়াইয়া যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠে বুড়া হাকিল—'কিতা'—এসেছে! বল এখন, আমি কি পাগল হয়েচি?

প্রদোষান্ধকারের মাঝ দিয়া সকলে পূর্ব্বদিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ক্লান্ত দিক্‌সীমায় একটি সুদীর্ঘ শীর্ণ অস্পষ্ট রেখা চোখে পড়িল—কোনোকালে যেখানে তটভূমি ছিল না সেখানে তটভূমির আভাসের মত। দেখিতে দেখিতে সেই শীর্ণ রেখা স্থূল হইয়া উঠিতে লাগিল—তীরাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার কালে দর্শকের চোখের সামনে তটরেখা যেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে সরু হইতে মোটা হইয়া ওঠে। কেবল এক্ষেত্রে ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটিতেছে যে কিছুর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। কারণ সেই দূরবিলম্বিত কৃষ্ণরেখা আর কিছু নয়—সমুদ্রের প্রত্যাবর্তন! গিরিশৃঙ্গের মত উত্তাল সমুদ্র যেন পাখা মেলিয়া শ্যেনের মত উড়িয়া আসিতেছে।

'ৎসুনামি'!*—জনতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তারপর সমস্ত আর্ত্তনাদ, সমস্ত শব্দ এবং শব্দ শোনার সমস্ত শক্তি লুপ্ত হইল এমন একটা সজ্ঘাতে যার নাম নাই, যা এমন গুরুভার যে শত বজ্রপাতও তার কাছে নগণ্য। পর্ব্বতপ্রমাণ জলোচ্ছ্বাস তটভূমির উপর আঘাত হানিল, সেই আঘাতে গিরিশ্রেণী শিহরিয়া উঠিল, আর বারিশীর্ষে ফেনভঙ্গ তড়িতাস্তরণের মত ঝলসিয়া উঠিল। তারপর মুহূর্ত্তকাল কেবল দেখা গেল বারিশীকরের একটা ঝড় ঢালু বাহিয়া মেঘের মত উপরপানে ছুটিয়া আসিতেছে—ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু সেইটুকুই যথেষ্ট—ভঙ্গী দেখিয়াই আতঙ্কে জনতা হুড়মুড় করিয়া পিছু হটিয়া গেল। তারপর আবার যখন দেখিল, তখন দেখিতে পাইল, যেখানে তাহাদের গৃহ ছিল সে-স্থানের উপর দিয়া সমুদ্রের শ্বেত বিভীষিকা উন্মাদের মত ছুটিতেছে। বারিরাশি হুঙ্কারে পিছাইয়া গেল, যাইবার সময় ধরিত্রীর অঙ্গ সবলে ছিঁড়িয়া লইল। দুইবার তিনবার পাঁচবার সমুদ্র আঘাত হানিল ও পিছু হটিল—তরঙ্গোচ্ছ্বাস ক্রমেই খাটো হইতে লাগিল, অবশেষে সমুদ্র তার আদিম শয্যায় ফিরিয়া সেইখানেই রহিয়া গেল। গর্জ্জন অবশ্য

* সমুদ্রের আকস্মিক জলোচ্ছ্বাস (tidal wave)।

তখনও থামিল না—ঘূর্ণিঝড় অন্তে সাগরের মত গম্ভীর নিনাদ চলিতে লাগিল।

মালভূমির উপর কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা সরিল না। সকলেই নির্ব্বাক হইয়া নীচেকার শ্মশানপানে চাহিয়া রহিল—উৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড ও অনাবৃত বিদীর্ণ শৈলচূড়া, গভীর সমুদ্রতল হইতে চাঁচিয়া-তোলা শৈবাল, মানুষ ও দেবতার গৃহের স্থানে রাশি রাশি পাথর, নুড়ি ও কাঁকর। গ্রাম মুছিয়া গিয়াছে, শস্যক্ষেতের অধিকাংশ নিশ্চিহ্ন, পাহাড়ে সমতল স্থান আর নাই; উপসাগরের কাছাকাছি যে-ঘরগুলো ছিল তার নিশানা পাওয়া যায় না—কেবল দেখা যাইতেছে গভীর সমুদ্রে দু-খানা খড়ের চাল আছাড়ি-পিছাড়ি করিতেছে। মৃত্যুকে মুখোমুখি দেখার আতঙ্ক সকলের মনে তখনও বর্ত্তমান, সর্ব্বহারা হইয়া মানুষ জড়ভরতে পরিণত, কেহ কিছুই বলে না।

শেষে হামাগুচির আওয়াজ পাওয়া গেল, সে ধীরকণ্ঠে বলিতেছে—এই জন্যই ত ধানে আগুন দিয়েছিলাম!

সে ছিল তাদের মোড়ল—গ্রামের সেরা ধনী। আর এখন? এখন সে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে গরীব, প্রায় তাহারই পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐশ্বর্য্য, ধনদৌলত সে স্বেচ্ছায় ধ্বংস করিয়াছে—অসামান্য ত্যাগের দ্বারা চারশ' মানুষের প্রাণ সে রক্ষা করিয়াছে! বালক তাদা ছুটিয়া আসিয়া দাদুর হাত চাপিয়া ধরিল—এই দাদুকেই সে পাগল ঠাওরাইয়াছিল! ধীরে ধীরে অন্যান্য সকলেও কিসে তাদের প্রাণ বাঁচিয়াছে সেই কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল—যে সরল নিস্বার্থ দূরদৃষ্টি তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, অবাকবিস্ময়ে সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাতব্বরেরা হামাগুচির সম্মুখে ধূলার উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল—ক্রমে ক্রমে বাকি সকলেও তাহাকে প্রণাম করিয়া ধন্য হইল।

তখন বুড়া একটু কাঁদিল—কতকটা আনন্দে, আর কতকটা অবসাদ ও শ্রান্তিভারে। বুড়া হাড়ে আর কত সয়!

কথা যখন ফিরিয়া পাইল, হামাগুচি তখন বলিল, ভাবনা কি, আমার বাড়ি ত রয়েছে! ওখানে অনেকেরই ঠাঁই হবে। পাহাড়ের ওপর মন্দিরও খাড়া আছে, বাকি লোক থাকবে সেখানে।

তারপর সে বাড়ির দিকে পথ দেখাইয়া চলিল। জনতা পিছু পিছু হাঁটিতে লাগিল, হাঁটিতে হাঁটিতে কেহ বা কাঁদিল আর কেহ বা জয়ধ্বনি করিল।

দুঃখদুর্দ্দশা দীর্ঘকাল চলিল, কারণ সে-যুগে জেলা হইতে জেলায় দ্রুত যাতায়াতের উপায় ছিল না এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য বহু দূর হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু শেষে সুসময় যখন আসিল তখন লোকেরা হামাগুচির ঋণ শোধ করিতে ভোলে নাই। অর্থ দান করিয়া নয়, কারণ তাহা করা সম্ভব হইলেও হামাগুচি তাহা লইত না, এবং তাহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দানের দ্বারা প্রকাশ করা ত সম্ভব নয়—তাহাদের বিশ্বাস হামাগুচির দেহে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে! তাই সকলে তাহাকে দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিল—তাহাকে হামাগুচি দাইম্যোজিন্ * আখ্যায় অভিহিত করিল।

গ্রাম যখন আবার গড়িয়া উঠিল তখন হামাগুচির আত্মার উদ্দেশে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। সে মন্দিরের তোরণশীর্ষে দারব ফলকে হিরন্ময় চীনা হরফে খোদিত হইল তাহারই নাম। ষোড়শ উপচারে সেখানে নরদেবতার পূজা সুরু হইল। তাহা দেখিয়া হামাগুচির কি মনে হইয়াছিল বলিতে পারি না; আমি কেবল জানি, গিরিশীর্ষে সেই পুরানো চালাঘরে সন্তানসন্ততি লইয়া সে বাস করিতে লাগিল—নিত্যকার সাদাসিধা মানুষেরই মত সরল স্নেহময় নিরহঙ্কার।

আজ শতাধিক বৎসর হামাগুচির মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু শুনিতে পাই সেই মন্দির এখনও বর্ত্তমান। এখনও লোকেরা বিপদে আপদে সঙ্কটকালে মুস্কিল আসানের জন্য সেই মহাপ্রাণ কৃষকের আত্মার আরাধনা করে। বলে—হে বিপদভঞ্জন সঙ্কটমোচন দেবতা, করুণার তোমার শেষ নাই, এ বিপদে তুমি আমাদের সহায় হও, তুমি আমাদের রক্ষা কর! *

* দাইম্যো=ভূস্বামী; জিন্=দেবতা

* সঙ্কলিত

নালন্দায় দুই দিন

শ্রীসত্যকৃষ্ণ রায়-চৌধুরী

সেদিন বুধবার, বেলা ৩টা। সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে ইজেল সামনে রেখে প্লাইউড ও ক্যানভাসের উপর তুলি দিয়ে রং বুলোচ্ছি—জীবন্ত আদর্শ থেকে ছবি আঁকা হচ্ছে—হঠাৎ আমাদের শিক্ষক, মিঃ গাঙ্গুলী, এসে খবর দিয়ে গেলেন, প্রিন্সিপাল মশায় সাড়ে-তিনটার পর আমাদের সবাইকে ডেকেছেন!

সাড়ে তিনটে বাজল। নিজের নিজের রং, তুলি, প্যালেট বাক্সবন্দী ক'রে সবাই দোতালায় আসা গেল, দরোয়ান দরজা খুলে দিলে, সবাই গুটি গুটি পা ফেলে প্রিন্সিপাল মশায়ের ঘরে এসে দাঁড়ালুম। সামনে বৃত্তাকারে চেয়ার সাজান ছিল, অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের বসতে ব'লে বেয়ারাকে ডেকে আমাদের জন্ত জলখাবার আনতে বললেন। আমরা সব বসে পড়লুম। তিনি তখন আরম্ভ করলেন তাঁর নালন্দা ভ্রমণের কথা—ছয়-শ লোক দৈনিক মাটি খুঁড়ে পনর বছরে বহু যুগের ভূগর্ভনিহিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে কি ক'রে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি, আর্চ, পুরানো মুদ্রা আরও কত কি সব ফটোচিত্রে দেখালেন। কোথায় স্নান করতে গিয়ে তাঁর ভুঁড়ি পর্য্যন্ত ডোবেনি তাও বললেন। দেখে-শুনে ভারি আনন্দ হ'ল। আমরাও যাবার জন্য উৎসুক হলুম। প্রিন্সিপাল মশায়কে জানালুম আমরাও যাব। তিনি বললেন,—বেশ, আমি তোমাদের সাত দিনের ছুটি দিচ্ছি।

—ছুটির সঙ্গে আর কিছু মঞ্জর করলে ভাল হয় না কি স্তর? প্রায়ই যা অন্যান্য সরকারী স্কুল ও কলেজ থেকে ছাত্রেরা পেয়ে থাকে—ভ্রমণের টাকাটা?

—হবে'খন, আসছে বছরে দেখা যাবে।

বেয়ারা ট্রেতে ক'রে জলখাবার দিয়ে গেল, সবাই খুব আনন্দ ক'রেই খেলুম। খেতে খেতে ঠিক করা গেল কে কে যাব আমরা। প্রায় বারো তেরো জন রাজী হলুম, শিক্ষক বসন্তবাবু আমাদের গাইড হবেন। যাবার দিন পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গেল—আসছে মঙ্গলবার। প্রয়োজনীয় জিনিষ যা না নিলে নয় তা শুধু নিতে হবে। আর নিতে হবে ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম। মঙ্গলবার দিন গোলমাল পড়ে গেল ক্লাসে—আজ সন্ধ্যায় দানাপুর এক্সপ্রেসে যাওয়া হবে পাটনা।

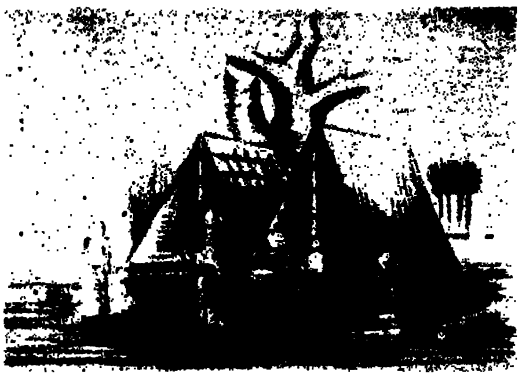
ষ্টেশনে এসে দেখি আমার পৌঁছবার আগেই সবাই ট্রেনের একটি কামরা দখল ক'রে বসে আছে। আমি এসে পড়াতে হৈ চৈ পড়ে গেল। পাঁচ মিনিট পরে ট্রেন ছাড়ল।

হু হু শব্দে ট্রেন চলেছে। নানা গল্পগুজবের পর যে যার খাতা খুলে বোলান পাস, খাইবার পাস, লাহোর যাত্রীর পোরট্রেট স্কেচ করতে বসে গেলুম। কাজের বেজায় ধুম! চলন্ত ট্রেন অনবরত নড়ছে—পেন্সিল ঠিক থাকে না। যার ছবি করা হ'ল তিনি নিজের চেহারা দেখে রীতিমত দমে গেলেন। আমরা হো-হো ক'রে হেসে উঠলুম। বেশ হৈ চৈ ক'রেই সময়টা কাটছিল। হঠাৎ কোন্ ষ্টেশনে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমের মধ্যে অনেক ষ্টেশন পার হয়ে গেল, জানতেও পারলুম না।

ভোরবেলা গাড়ী একটা ষ্টেশনে থামতেই ঘুম ভেঙে গেল।

চেয়ে দেখি বক্তিয়ারপুর ষ্টেশন। ষ্টেশনটা বেশ। ষ্টেশনের ওপারে গাছের ছায়ায় সান্‌রাওয়ালীদের তাঁবু পড়েছে। এই তাঁবুকে নির্ভর ক'রেই এরা বছরের অধিকাংশ দিনগুলি কাটিয়ে দেয়। মুক্ত আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস ও বিস্তীর্ণ মাঠের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এরা বেড়ে উঠেছে। এরা

গরিব, এদের যেখানে ধর সেইখানেই ঘর। এরা খাঁচার পাখী নয়; বনের পাখী। ভারী আনন্দ হ'ল এদের দেখে, তাই তাঁবুসুদ্ধ দুই-চারি জনকে স্কেচ ক'রে নিলুম। গাড়ী আবার চল্‌ল। বেলা আটটার সময় গাড়ী থামল গিয়ে

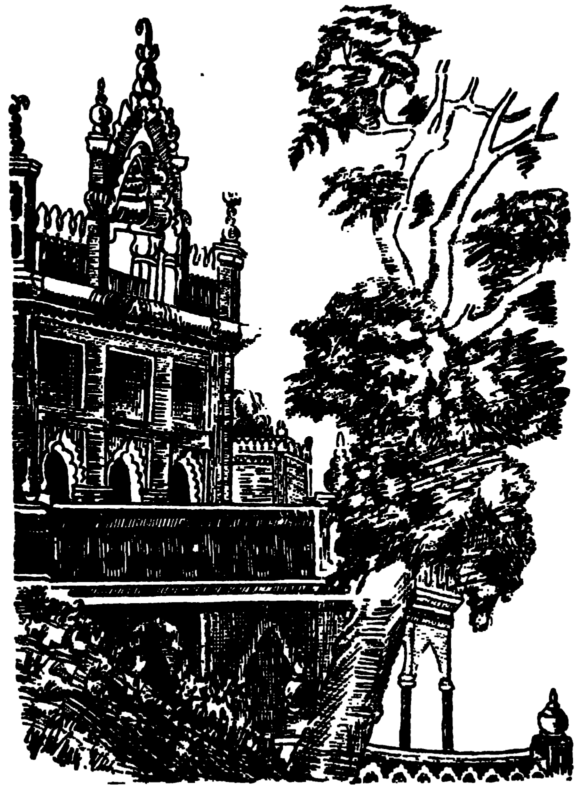


যাযাবর্‌রাওয়ালীদের তাঁবু

পাটনা শহরে। এখানে টাঙার প্রচলন বেশী, বাস, ট্যাক্সির সংখ্যা কম। টাঙা ক'রে পিণ্ট হোটেলে গিয়ে ওঠা গেল। হোটেলটির একটু বিশেষত্ব আছে। সাহেবী ধরণে টেবিল, চেয়ার, ফুলগাছের টব প্রভৃতি দিয়ে সাজান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হোটেলওয়ালা বাঙালী ভদ্রলোক। খাবার-দাবারও বাঙালী ধরণের—ভালই। এখানে একটা পাহাড়ী ময়না আছে। ময়নাটা 'বন্দেমাতরম,' 'মহাত্মাকী জয়,' 'দেশবন্ধুকী জয়' বেশ বলতে পারে।

যে-কয়দিন পাটনায় থাকা হবে, তা এখান থেকে উঠে গিয়ে রাজা রামমোহন সেমিনারীতেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে ঠিক হ'ল। প্রকাণ্ড হলঘরে দেয়ালের চারিদিকে ছবি টাঙানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই সেমিনারিটি পাটনা নিউ-সিটিতে অবস্থিত। এই নিউ-সিটিতে সরকারী বাড়িগুলো অতি সুন্দর, অথচ সাদাসিধে ধরণের। খুব উঁচু উঁচু। সব বাড়িরই প্রবেশদ্বার দক্ষিণ মুখে, বাড়িগুলির রং হল্‌দে। এ শহরে পিচের বড় রাস্তা বলতে একটি। এখানকার কলেজগুলিও বেশ, কলেজের ছাত্রদের ভিতর মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। ছাত্রদের খেলার মাঠ, জিমন্তাসিয়াম হল দেখলে বেশ আনন্দ হয়।

এখানে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার বাড়িটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। গঙ্গার উপরেই এই বিশাল বাড়ি,



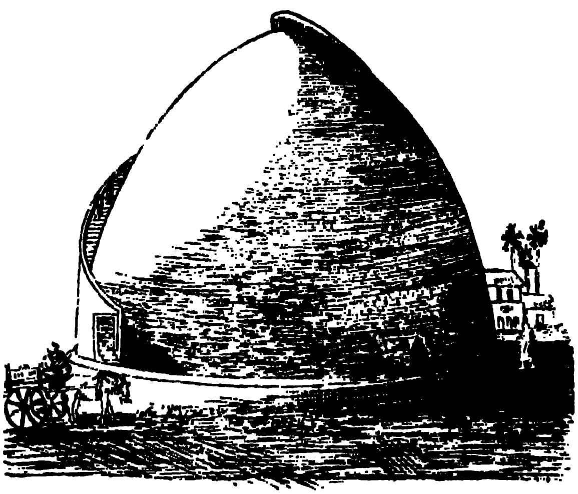
দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ঘাট, পাটনা

বাড়িটিকে বহু অর্থব্যয় ক'রে কারুকার্য্যখচিত করা হয়েছে। এর পিছনে বাড়ির সংলগ্ন দ্বারভাঙ্গা মহারাজার ঘাট, ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে গঙ্গায়।

পাটনায় গঙ্গার ধার অতি কদর্য্য। ইটের ফাঁক দিয়ে সব কাঁটা গাছ উঠেছে। বড় বড় নালা যত সব ময়লা দুর্গন্ধ জল কাদা নিয়ে গঙ্গায় এসে পড়ছে, এখানে সেখানে দু-একটা আধ-খেকো মরা, পচা কুকুর-বেরাল পড়ে রয়েছে, দুই একটা শব কাপড়ের পুঁটলির ভেতর পচে ফেঁপে যত রাজ্যের মাছি সংগ্রহ ক'রে গঙ্গার ধারে যে-জায়গায় জল কম সেখানে এসে লেগে রয়েছে। এরই মাঝখান দিয়ে গিয়েছিলুম প্রায় মাইলখানেক

পথ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার জন্য। দিনের বেলা অনেকটা এগিয়ে পড়েছিলাম বলেই বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছিল। এত কদর্য্য গঙ্গার ধার আর কোথাও আছে কি-না সন্দেহ।

পাটনার গোলঘর বিখ্যাত। দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য আগ থেকেই ধান সংগ্রহ ক'রে রাখবার উদ্দেশ্যে ঐ গোলঘর তৈরি হয়েছিল, একে তৈরি করতে



পাটনার গোলঘর

প্রায় দু-বছর লেগেছিল। ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন জন ১৭৮৪ সনের ২০শে জুন আরম্ভ ক'রে ১৭৮৬ সালে শেষ করেন। গোলঘরখানা আয়তনে বিশাল, খুব উঁচু, এক শচল্লিশটি সিঁড়ি—প্রত্যেকটি নয় ইঞ্চি করে উঁচু, উপরে উঠলে চক্ষু স্থির থাকে না—চড়ক গাছ হয়ে ঘোরে। পুরাতন পাটনার মীরকাসিমের দুর্গটি ছোটখাট, বেশ সুন্দর। এখানকার রায়সাহেব এখন এই দুর্গের মালিক। রায়-সাহেবের যত্নে ও নূতন সংস্কারে সেই দুর্গটি এখন ইন্দ্রপুরী।

মীরকাসিব দ্বারা নিহত ব্যক্তিদের গোরস্থানের দেখলাম কোন বিশেষত্ব নেই, ঠিক কলিকাতার খৃষ্টানদের গোরস্থানেরই মত, তবে আয়তনে অনেক ছোট, অসংখ্য কুশগাছ লতাগুল্ম এই কবরগুলোকে বুকের আড়ালে ক'রে চিরজন্মের মত ঢেকে রেখেছে। এই সব দেখে সন্ধ্যে বেলায় এলুম গুরু গোবিন্দের জন্মস্থান দেখতে। অনেকটা জায়গা নিয়ে এই বাড়ি, বিশাল তার প্রবেশদ্বার। দ্বারে প্রবেশ করে খানিকটা এগিয়ে আসতেই একটি স্ত্রীলোক এসে বললেন—জুতা খুলে, পা ধুয়ে, মাথায় কাপড় জড়িয়ে যেতে হবে, অন্যথায় প্রবেশ নিষেধ। তাই করলুম। স্ত্রীলোকটিও তখন বিনা আপত্তিতে আমাদের গুরুজীর ঘরের সামনে নিয়ে গেলেন। ঘরের ভেতর একটি উঁচু আসনের ওপর গুরুজীর ছবি। তার সামনে ঢাল, কৃপাণ, খড়্গ, বড় লোহার বালা ইত্যাদি রয়েছে। দুই ধারে দুইটি প্রদীপ-দানের ওপর ঘিয়ের বাতি জলছে। তার সামনে বসে প্রধান শিষ্য নিমীলিত লোচনে স্তব পাঠ করছেন, আর নীচের ধাপে অন্যান্য শিখ শিষ্যেরা সন্ধ্যার মঙ্গলগীত গাইছেন। সেদিনের মত দেখা শেষ ক'রে বাসায় ফিরলুম।

পর দিন নালন্দা যাবার জন্য ষ্টেশনে এসে গাড়ীতে চাপা গেল। গাড়ী বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে এসে থামতেই সকলে নেমে পড়লুম। এখান থেকেই ছোট লাইনে যেতে হবে নালন্দায়। অনেকক্ষণ অধীর প্রতীক্ষার পর ছোট একখানি গাড়ী হেলেদুলে ষ্টেশনে এল। চটপট সবাই গাড়ীতে উঠে পড়লুম। বেলা তখন নয় দশটা। ভয়ানক খিদে পেয়েছিল। কিন্তু তখন আমাদের সঙ্গে খাবার কিছুই ছিল না। আমাদের স্কুলের দুই জন মুসলমান ছাত্র বন্ধু আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁরা কয়েকটা সিদ্ধ ডিম ও কিছু কলা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বন্ধুবর বিজয়বাবু জয়ের আসায় বাণ ছুড়লেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন ঐ চুপড়িটিতে সব আছে। তাঁরা খাবারের চুপড়িটি রেখেছিলেন ঠিক তাঁদের সামনের বেঞ্চের নীচে অতি সন্তর্পণে নজরের ভিতর। তাঁরা নাকি পাটনাতে পাঁচ ছয়টা কাঁচা ডিম লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেও রাখতে পারেন নি। ডিমগুলি জলজ্যান্ত উধাও হ'য়ে গিয়েছিল। তাই খুব সাবধানে এবার চুপড়িটি রেখেছিলেন। আমাদের খিদের তখন পেট চোঁ-চোঁ ক'রছে। তাই আমাতে ও বিজয়বাবুতে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল আমি তাদের অন্যমনস্ক ক'রে রাখব। ইত্যবসরে চুপড়ি থেকে কলা, ডিম আস্তে

আস্তে উঠে এসে বিজয়বাবুর পকেট আশ্রয় করবে। পরামর্শ ঠিক হ'তেই উঠে এলুম তাঁদের মাঝখানে জানালার এক পাশে। তাঁদের ঘাড়ের উপর দুই হাতে দুই জনকে ভর করে ধরলুম। গল্প সুরু করলুম। গল্প জমে আসতেই হঠাৎ জানালার ভিতর হাত গলিয়ে দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম Look, Look, Ishak! How beautiful the hillocks are and the brook, and the young lady in the garden under the shadows of the palm trees! Oh! Beautiful! তাঁরা জানালার ভিতর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে, আমার কথার রস উপলব্ধি ক'রে সমস্বরে বলে উঠলেন, Yes! Yes… ইত্যবসরে কাজ শেষ। বিজয়বাবু পেছন থেকে চিম্‌টি কাটলেন। বুঝলুম কিস্তিমাৎ। খানিক পরে বসন্তবাবু এসে বস্‌লেন আমাদের মাঝে। বললুম ভয়ানক খিদে পেয়েছে, স্যর। তিনি উত্তর করলেন, আমারও সেই অবস্থা। সোজা ব'লে বসলুম, 'ইসাকরা খাবার এনেছে, এই চুপড়ীতেই আছে, স্যর।' 'ও! তাই না কি!' বলেই হাত গলিয়ে দিলেন চুপড়ির ভেতর। দুয়েকটা ডিম ও কলা তিনি খেলেন। স্যরের কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষে করলুম। যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ লাভ হ'ল। ইসাকের নাম উচ্চারণ করাতে তিনি ফিরে বসেছিলেন, দেখলেন স্যর খাচ্ছেন। তাঁর আনন্দ হ'ল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গুন্‌গুন্ করতে লাগল, দেখলে না যে কতগুলো খেলেন। সাপ মরল লাঠিও ভাঙল না। সব স্যরের উপর দিয়েই গেল। পকেটস্থ খাবারগুলো ট্রেনের অন্য কামরায় উঠে সাবাড় করা হ'ল।

গাড়ী বক্তিয়ারপুর ষ্টেশন থেকে চল্‌তে সুরু ক'রে অনেকগুলি ষ্টেশন পেরিয়ে এসে ঠিক দুপুর বেলা এসে পৌছল নালন্দায়। নালন্দা ষ্টেশনটি ছোটখাটো। তার পাশে মুদিনীর দোকান তেঁতুলগাছের ছায়ায়। এরই মাঝখান দিয়ে ছোট্ট একটি রাস্তা বেরিয়েছে। রাস্তার দুই ধারে দূরে দূরে দু-একটা ক'রে গাছ। এই রাস্তাই এক্সক্যাভেশনের পাশ দিয়ে দুই একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বক্ষভেদ ক'রে এগিয়ে গিয়েছে খানিকটা দূরে। এই রাস্তার পাশেই ধর্ম্মশালা। এইখানে আমরা তিনটা দিন বেশ সুখেই কাটিয়েছিলুম। উচু প্রাচীরে ঘেরা ধর্ম্মশালাটি। অর্দ্ধেকটাতে অতিথিদের থাকার জন্য ছোট ছোট ঘর। আর অর্দ্ধেকটায় ইদারা, দেবমন্দির ও ফুলের বাগান। নানা জাতীয় ফুল, গোলাপ, জুঁই,



নালন্দার মুদিনীর দোকান

চামেলি, বেল, অনেকগুলি ক'রে গাছ। রাত্রিবেলায় ফুলগুলি ফুটলে সারা বাড়িটা গন্ধে আমোদিত হয়ে থাকে। চমৎকার এই ধর্ম্মশালাটি।

যে-দিন পৌছলুম সেদিন আর বেরুতে পারি নি, স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে একটুখানি বিশ্রাম করতেই বেলা পড়ে এল, আর কোথাও যাওয়া হ'ল না। যে-পুকুরে আমরা স্নান করেছিলুম সেই পুকুরের জল বেশ পরিষ্কার। জলের নীচেটায় বালি কাদা নেই। বহুদিনের পুকুর, ভাল করে ডুব দেওয়ার মত জলও ছিল না। তার উপর আবার শেওলা গাছে ভরা। এই পুকুরের চারি পাড়েই ছোটবড় সব মূর্ত্তি। অধিকাংশই বুদ্ধমূর্ত্তি, এবং পশ্চিম পাড়ে খোলা ঘরে ছোট ছোট দোকান। খাবার-দাবার ভাল পাওয়া যায় না। বড় অপরিষ্কার।

পরের দিন সকালে রাঙামাটির পথ বেয়ে ছোট ছোট গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল মাইলখানেক পথ, নালন্দার ধ্বংসস্তূপ দেখতে। এই ধ্বংসস্তূপ বাড়িটা অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। চারিদিকে তার ইট ও মাটির ভাঙা প্রাচীর। গত যুগের স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে তারই জরাজীর্ণ প্রভুদের রক্ষা করবার জন্ম কত না চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই যেন পেরে উঠছে না।

পলে পলে প্রকৃতির জল ও ঝড়ের আঘাতে নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েও যেন মিশাতে পারছে না। কি তাদের বাঁচবার আগ্রহ! কিন্তু বাঁচছে কই। দিনে দিনে পলে পলে খসে যাচ্ছে, ধসে পড়ছে। অতি করুণ বিষাদের ছবি সৃষ্টি হয়ে রয়েছে।

এই বাড়ির মাঝখানে ইটে বাঁধান একটি ছোট পুকুর, তার চারি পাশে থাম। চারি ধার থেকে ধাপে ধাপে জলের নীচে পর্য্যন্ত সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। জল সবুজ কিন্তু গভীরতা বড়ই কম। সবাই যেন নিজেদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়। মিশিয়ে দেওয়া ও তলিয়ে যাওয়ার ভাবটাই যেন এখানে বেশী। এখানকার দেখা শেষ ক'রে বেরিয়ে এলুম এই বিষাদময় করুণ ছবির ভেতর হ'তে রুক্মিণী ঠাকুর দেখবার উদ্দেশে। ক্ষুদ্র পল্লী, অসংখ্য ছোট ছোট খোলার ঘরে ভর্ত্তি, মাঠের পর মাঠ ছোলা ও গম গাছ নিয়ে মিশে গিয়েছে তাল গাছের ফাঁক দিয়ে অসীম নীল আকাশের সাথে। এরই মাঝে পল্লীবালারা নানা রঙের পোষাক প'রে যে যার কাজে ব্যস্ত। এদের একে একে পেছনে ফেলে মাঠের আলের উপরকার সরু পথ দিয়ে চলে এক উচু জায়গায় উপস্থিত হলুম। এই-খানেই নালন্দাবাসীদের নাম দেওয়া রুক্মিণী ঠাকুর। ঠাকুরকে মস্ত একখানা কাল পাথর কুঁদে বের করা হয়েছে। পাথরের নীচের অংশ মাটিতে পোঁতা রয়েছে। যতটা উপরে বেরিয়ে রয়েছে তা লম্বায় প্রায় সাত হাত হবে। ঠাকুর নিজেও হাত চারেক লম্বা হবেন। তাঁর প্রশান্ত মূর্ত্তি ও অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি দেখে মনে ভক্তির সঞ্চার হয়। ডান হাতখানি ভূমি স্পর্শ ক'রে রয়েছে, ভাবে যেন বিভোর, বুদ্ধমূর্ত্তি। এই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নালন্দাবাসীদের কাছে রুক্মিণী ঠাকুরের নাম নিয়ে বসে আছেন। নীল আকাশ-তলে, স্নিগ্ধ নিমগাছের ছায়ায় ঠাকুর এতদিন বেশ ছিলেন। পাণ্ডারা আর বেশ থাকতে দিলেন না। তাঁরা পয়সা রোজগার করবে ব'লে ঠাকুরকে ঘরপোরা করবেন। চূণ-সুরকি জোগাড় ক'রে ছাদ দেওয়ার আয়োজন করছেন।



নালন্দার মুয়াকর

পরের দিন ভোরবেলা কোকিল ও পাপিয়া সমস্বরে নালন্দার পল্লীবাসীদের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে, মৃদুমন্দ বাতাস ফুলের গন্ধ নিয়ে জানালা ভেদ ক'রে সারা অঙ্গে মাখিয়ে দিয়ে তন্দ্রাজড়িত নয়নে যখন সুখস্বপ্নের সৃষ্টি করছে, তখন গুরুমহাশয়ের উঠ, উঠ রব। চেয়ে দেখলাম বেশ ফর্সা হয়েছে। কি আর করা, উঠে এলুম। প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে বেরিয়ে পড়লুম শত শত যুগের মৃত্তিকাভ্যন্তরে যে মানবসভ্যতা লুক্কায়িত ছিল তারই নিদর্শন দেখতে।

বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে উচু মাটির ঢিবি। এইগুলি কেটে হাজার হাজার লোকের প্রাণ দিয়ে গড়া শিল্পকলা বের করা হয়েছে। এই বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়। অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরটা মজবুৎ ছোট ছোট ইটে তৈরি। এই প্রাচীরের মাঝখানটায় প্রবেশদ্বার। ভেতরে ঢুকতে গিয়েই



নালন্দার পল্লীবাসীদের জল-তোলা



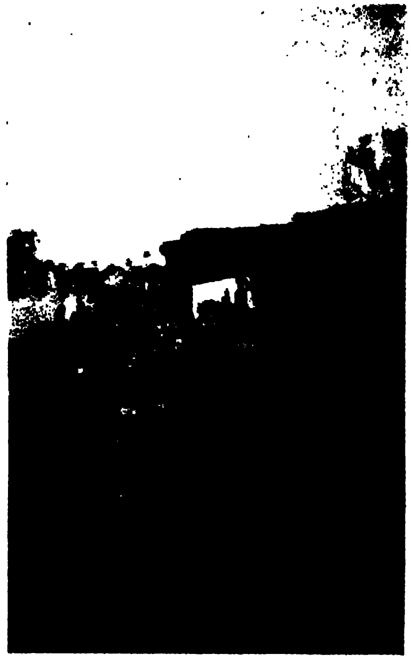
নালন্দার কুমোর

দরোয়ান এসে হাজির। সে বলে, "ম্যানেজারের হুকুম নিয়ে ভেতরের যা-কিছু দেখতে হবে।" তার সঙ্গে এগিয়ে চললুম। চলতে চলতে হঠাৎ বাম ধারের দেওয়ালে ঝোলান নোটিশ বোর্ডের উপর নজর পড়ল। তাতে লেখা রয়েছে ভিতরের কোন অংশের একটুখানি ক্ষতি নোংরা কিংবা থুতু ফেললে হাজার টাকা দণ্ড স্বরূপ দিতে হবে। দরোয়ান এগিয়ে চলেছে, আমরা তার পিছন পিছন চলেছি। সরু পরিষ্কার একটি রাস্তা দিয়ে আমাদের নিয়ে এল ম্যানেজার মশায়ের সামনে। ম্যানেজারবাবু বাঙালী, বেশ ভদ্রলোক, পুরনো একটি ঘরে চেয়ারে বসে, টেবিলে ভর দিয়ে কি লিখছিলেন, আমাদের দেখে আমাদের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন। আমরা সব বললাম। সন্তুষ্টচিত্তে দরোয়ান সঙ্গে দিয়ে ভিতরের যা-কিছু আছে সব দেখবার অনুমতি দিলেন। ইনি যে-ঘরে বসে ছিলেন সেই ঘরেই দেওয়ালে সংলগ্ন মাটি দিয়ে গড়া একটি বিশাল বুদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির উপরের অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মূর্ত্তিটির গায়ে চুণ-সুরকি দিয়ে প্ল্যাষ্টার করা ছিল মনে হয়।

এখান থেকে একটা ভাঙা মন্দিরের কাছে এলুম। ছাদটা এর পড়ে গিয়েছে, শুধু দেওয়াল চারটে রয়েছে। দেওয়ালের গায়ে পাথরের খিলানের ভিতর নানা ভঙ্গিতে বুদ্ধমূর্ত্তি। খিলানের ভিতর ও বাহিরের থামে নানা রকম কারু-কার্য্য করা। এই ঘরের মাঝখানে মেজের উপর বড় একটি স্তূপ। চারদিকে অনেক রকম ডেকোরেটিভ ডিজাইন ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের দেওয়ালে সংলগ্ন একটা খুব উঁচু ঢীবি আছে। এইটি ছোট ছোট ইটের তৈরি। এই ঢীবির উপরে উঠবার জন্য সিঁড়ি আছে। সিঁড়িগুলি বহুদিনের হলেও একটুও নষ্ট হয়নি—আনকোরা নূতনের মতই রয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে। বহুদূরব্যাপী কাঁকর-বিছান লাল সরু রাস্তা। তারই দু-পাশে অফুরন্ত সবুজ ঘাস। সামনে ছাত্রদের থাকবার ঘরগুলি খিলানের। দুই জন ছাত্র থাকবার উপযোগী। ঘরের দেওয়ালে তাক বসান আছে। সেই তাকে ছাত্রদের পড়বার বই, জামা-কাপড়,



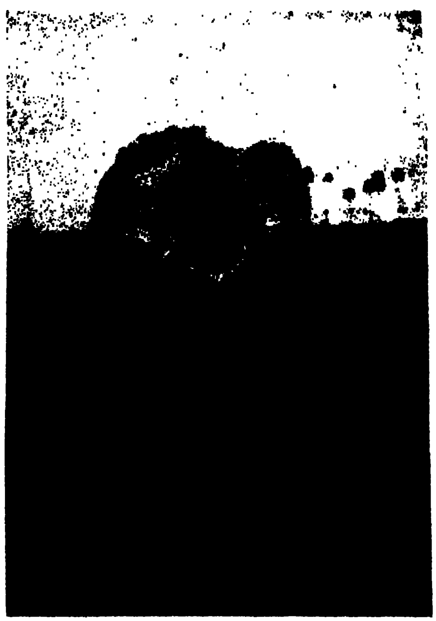
নালন্দার একটি মূর্ত্তি



নালন্দার ক্ষুদ্র পল্লী



খিলানের ভিতরের মূর্ত্তি



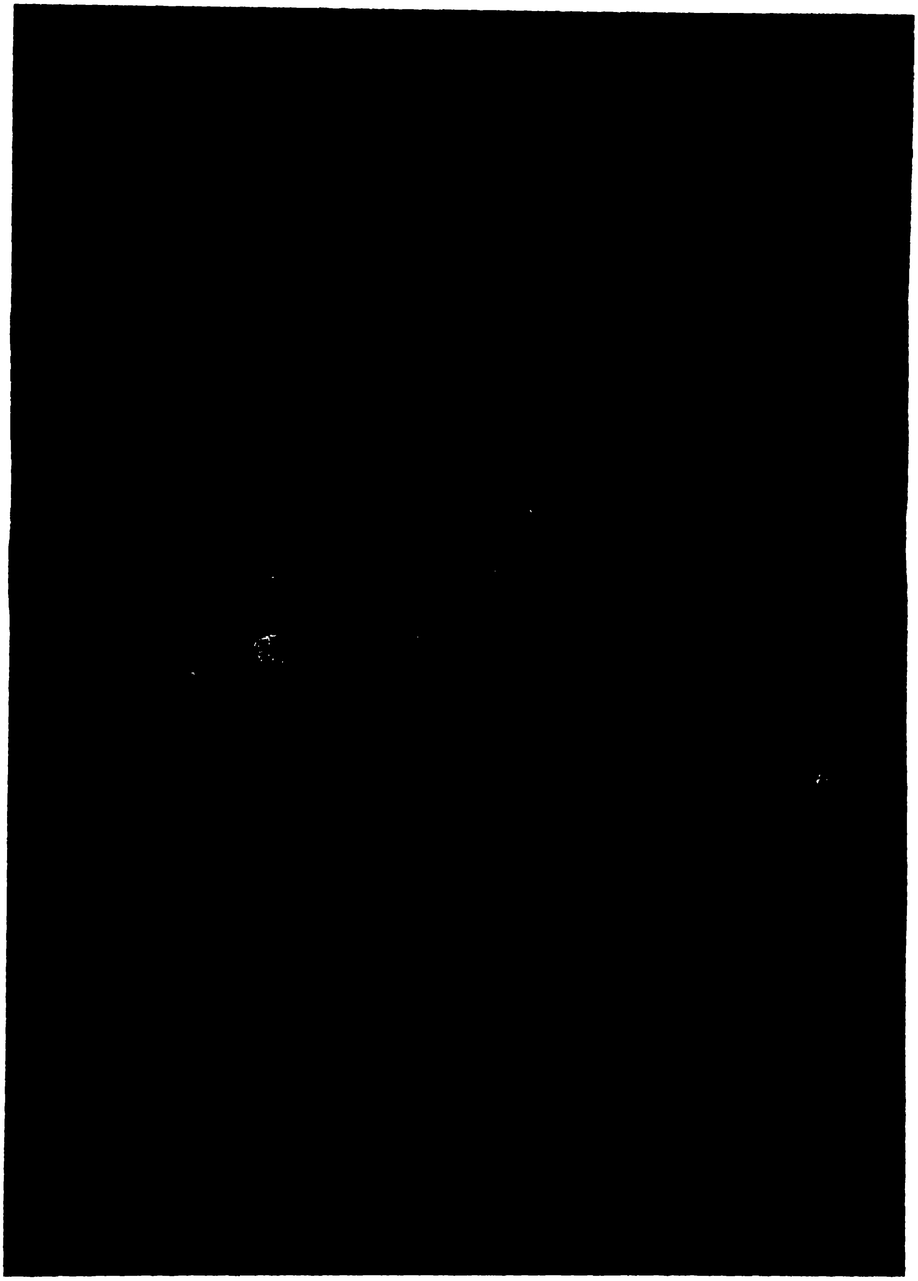
মাঠের মাঝে ভগ্ন মূর্ত্তি

প্রভৃতি থাকত। ছাত্রাবাসের বাড়িটি তেতলা। নীচের তলা ও দোতলায় ছাত্রদের থাকবার জায়গা। ঘরের নক্সা ও বন্দোবস্ত একতলা ঘরের মত, বিশেষ কিছু প্রভেদ নেই। একটি জিনিষ মনে রাখবার মত ছিল। সেটি হচ্ছে দোতলার ইঁদারা। ইঁদারাগুলি একতলা থেকে চমৎকার মিল রেখে দোতলায় গেঁথে নেওয়া হয়েছে। তেতলায় এক বিশাল প্রাঙ্গণ, আর তারই ধারে ছাত্রদের ক্লাসঘর। ঘরগুলির ছাত ভেঙে পড়েছে। এমন কি বড় বড় পাথরের থামগুলিও টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে। থামগুলিতে সুন্দর ডিজাইন ছিল। তার সবগুলো এখনও একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি। ইতিহাসে পাওয়া যায় প্রায় দশ সহস্র ছাত্র এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে নানা বিদ্যা শিক্ষা করত। এখন সকলই গিয়েছে অতীতের দেশে। আমাদের ইচ্ছা ছিল আসার দিন নালন্দার মিউজিয়ম দেখে ফিরব, কিন্তু আমাদের সে সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি, আসবার দিন মিউজিয়ম বন্ধ ছিল।

আমাদের রাজগৃহ যাওয়ারও কথা ছিল। রাজগৃহতেও দেখার মত জিনিষ আছে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তা-ও হয়ে ওঠেনি, কেন-না তখন রাজগৃহতে ভয়ানক প্লেগ, রাজগৃহবাসিগণই তাদের বাসস্থান শূন্য ক'রে দূরের স্থান পূর্ণ করছিল। তাই তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করবার মত সাহস আমাদের কারুর হ'ল না। যে-পথে গিয়েছিলাম সেই পথেই আবার ফিরে এলাম।



বুদ্ধমূর্ত্তি



হনুমানের লঙ্কাদাহন

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ল্যাপল্যাণ্ড ও ল্যাপ জাতি

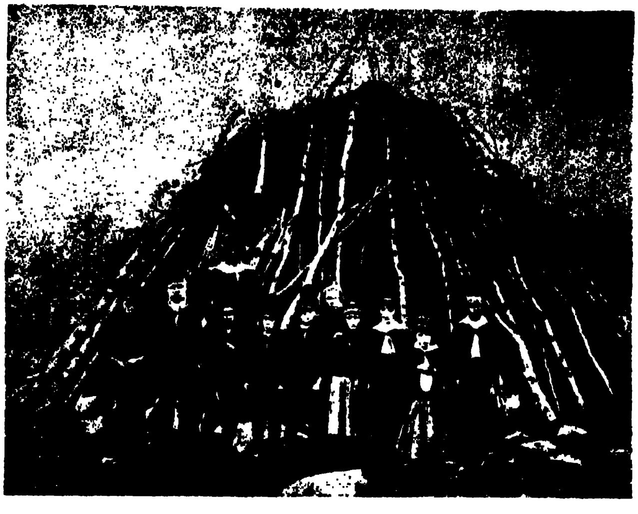
শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

২

ল্যাপরা ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় মুক্ত আকাশের নীচেই নিজেদের আহারনিদ্রার কাজ সারিয়া লয়। শিশু-সন্তানদের জন্য ছোট নৌকার মত এক প্রকার জিনিষ আছে; উহার মধ্যে গরম কাপড়ে শিশুদিগকে ভাল করিয়া জড়াইয়া 'স্লেজ' গাড়ীর ন্যায় নৌকায় বড় পুরুষ-হরিণদের সাহায্যে চালাইয়া লইয়া যায়। যখন কোনো স্থানে কিছু বেশীদিন থাকার দরকার হয় এবং বৎসরের যে-সময় হরিণপালকে মুক্তভাবে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে, শুধু তখনই তাহারা নিজেদের তাঁবু তৈয়ারি করে। এই তাঁবুকে 'কোটর্' বলা হয়। সাধারণতঃ গাছের ডাল দিয়া তাহারা এই তাঁবুর কাঠাম তৈয়ারি করে এবং তাহার উপর বস্তা দিয়া ঘিরিয়া দেয়। শীতকালে ঐ সকল 'কোটর্' একেবারে বরফের নীচে ঢাকা পড়িয়া যায়; তখন তাঁবুর ভিতরটা বেশ গরম থাকে। তাহা সত্ত্বেও অবশ্য স্বতন্ত্র-ভাবেও চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁবুর ভিতর আগুন জ্বালাইয়া রাখার দরকার হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ল্যাপরা অতিশয় অতিথি-পরায়ণ। বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে এদের ঘরে একেবারে নিরাপদভাবে থাকা যায়। নিজেদের সাধ্যানুসারে তাহারা অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করে। নিজেরা প্রায় প্রতি ঘণ্টায়ই কফি তৈরি করিয়া খায় এবং কফির কেটলী উনানের উপর সকল সময়েই চড়ানো থাকে। আমি যখন সর্ব্বপ্রথম 'আবিস্কো' শহরের নিকটবর্ত্তী ল্যাপ-তাঁবুতে যাই তখন তাঁবুর কর্ত্রী আমাকে ও সঙ্গী বন্ধুকে কফি দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। এখানে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে, উত্তর দেশের সকল স্থানের লোকেরাই কফি খুব বেশী ব্যবহার করে।

হরিণের দুধ হইতে তৈরি করা পনীর এবং সেই সঙ্গে অল্প দুধমিশ্রিত কফি বেশ সুখাদ্য। অতিথিদিগকে অন্য প্রকার খাবারও তাহারা খাইতে দেয়। শুনিয়াছি ইহাদের প্রায় সকল প্রকার খাদ্যই হরিণের মাংস হইতে তৈরি। এই সকল খাদ্য মুখরোচক ও



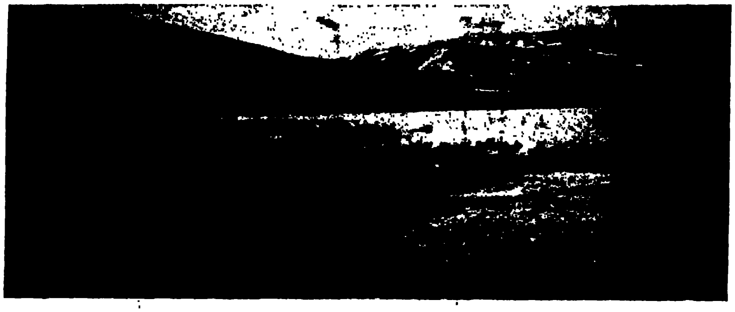
ল্যাপ বিদ্যালয়ের নূতন ধরণের বাড়ী

পুষ্টিকর। যাহারা ঘরবাড়ি করিয়া আছে তাহাদের চাইতে ভ্রাম্যমাণ ল্যাপদের শরীর ও স্বাস্থ্য অনেক বেশী ভাল।

হরিণী যে দুধ দেয় তাহা কোনো সময়ই এক পেয়ালার বেশী হয় না। কিন্তু সেই দুধে মাখনের মাত্রা খুব বেশী বলিয়া তাহা বেশ পুষ্টিকর। এই দুধে যে পনীর তৈরি হয়, তাহা বাজারেও সুখাদ্য হিসাবে কিনিতে পাওয়া যায়। বৎসরের সকল সময়ই হরিণীরা দুধ দেয় না।

সেই কারণে পূর্ব্বেই সারা বৎসরের জন্য সে ব্যবস্থা করিয়া রাখা হয়।

হরিণের পাকস্থলীর থলি দিয়া এক প্রকার থলিয়া তৈরি করা হয়। ল্যাপ-গৃহিণীরা সেই থলিতে দুধ জমাইয়া সারা বৎসরের দুধ পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া রাখে।



বল্গা হরিণের পাল সাঁতার কাটিয়া হ্রদ পার হইতেছে

ল্যাপদের পোষাক দেখিতে বেশ সুন্দর। গায়ের জামার নাম 'কল্তেন্'। তাহা অনেকটা ফ্রকের মত। গ্রীষ্মকালে ইহারা নীল, ধূসর ও সাদা রঙের পোষাক পরে। তাহা দেখিতে অনেকটা আল্‌খাল্লার মত, বুকের দিকটা খোলা। পুরুষদের জামার হাতের শেষ ভাগটা গলার 'কলারে'র মত শক্ত ও পুরু এবং ইহার উপর নানা উজ্জ্বল রঙের কাজ থাকে। মেয়েদের জামা পুরুষদের মত হইলেও গলার উপর কোনো 'কলার' নাই। গলার চারিদিকে জামার উপর প্রশস্ত ও ফিকে রঙের ফিতার বর্ডার থাকে।



বল্গা হরিণের বরফের নীচে খাদ্যান্বেষণ

তাহাদের শীতকালের জামা 'রেন্' হরিণের লোমযুক্ত চামড়ায় তৈরি। প্রতি জামারই কোমরবন্ধ থাকে। এই কোমরবন্ধের উপর নানাপ্রকারের কারুকার্য্য থাকে। এমন কি সময়-সময় রূপার কাজও এই কোমরবন্ধে দেখিয়াছি। কোমরবন্ধের উপরিভাগে জামার যে অংশ থাকে তাহা খুব ঢিলা। ইহার ভিতর প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিষ তাহারা রাখে। সেইজন্ত তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে পকেট রাখার দরকার হয় না। কোমরবন্ধে তামাক রাখিবার চামড়ার থলি এবং হরিণের শিং বা হাড়ে তৈরি খাপে একখানি ছুরি ঝুলান থাকে।

মেয়েপুরুষ সকলেই আঁটা খাটো পাজামা পরে। গ্রীষ্মকালের পোষাক গরম কাপড়ের দ্বারা এবং শীতকালের পোষাক চামড়ার দ্বারা তৈরি হয়। চামড়ার জুতার অগ্রভাগটা নাগরা জুতার মত উপর দিকে মোড়া। শীতকালের জুতা কিন্তু হরিণের খুরের অথবা হরিণের কপালে যে লোমযুক্ত চামড়া থাকে তাহার দ্বারা তৈরি হয়।

স্ত্রীপুরুষ সকল ল্যাপই মাথায় টুপি পরে। এই টুপি আকারে বিভিন্ন এবং নানা রঙের। ল্যাপরা নিজের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল জিনিষই নিজেদের হাতে তৈরি করে।

সুইডিস্ ভাষার সঙ্গে ল্যাপদের ভাষার কোনো সাদৃশ্য নাই। কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভাষার সঙ্গে যোগ খুব বেশী। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ল্যাপ ভাষা 'ফিন্‌ওগ্রীক' শ্রেণীর অন্তর্গত। সাইবেরিয়ান্, য়্যাষ্টোনিয়ান্, হাঙ্গেরিয়ান্, ফিনিস ও ল্যাপ ভাষা—সকলেই এই এক ভাষা-শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। আজ ল্যাপরা যদিও সংখ্যায় অতি নগণ্য, তবু তাহারা মাতৃভাষা সযত্নে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

সুইডেনবাসী ল্যাপদের সকলেই কম বেশী সুইডিস্ ভাষা জানে, এবং প্রয়োজনমত তাহা তাহারা ব্যবহারও করে। কিন্তু ল্যাপ ভাষায় উহাদের সঙ্গে কথা বলিলে অতিশয় আনন্দিত হয়। আমি মাত্র 'নমস্কার' শব্দের প্রতিশব্দটি শিখিয়াছিলাম। 'পৌরিস' বলিয়া কোনো ল্যাপকে অভিবাদন করিলে আনন্দে তাহার চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে এবং দুই তিন বার নিজে বলিয়া প্রতিনমস্কার জানায়।

সাহিত্য বলিয়া আজ পর্য্যন্ত ইহাদের কিছু নাই। তবে কোনো কোনো ল্যাপ এখন বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষা-সুযোগ পাইয়া অল্পস্বল্প লিখিতে সুরু করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহার নাম যোহান্ তুরী (Johan Tuuri)। তাঁহার বিখ্যাত বইখানার নাম Muitalus Samid birra। এই গ্রন্থখানা ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ল্যাপভাষায় প্রকাশিত হয়। শুনিয়াছি, এই বইয়ে ল্যাপদের জীবন-প্রণালী ও ভাবধারার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। বইখানা নিজে দেখিয়া থাকিলেও ভাষা না জানায় পড়িতে পারি নাই। আজকাল ল্যাপভাষার অনেক বই ছাপা হয় বটে, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই অন্য ভাষা হইতে অনূদিত।

আজকাল ল্যাপদের প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর লেখা-



সারা বৎসরের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ

পড়া জানে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সুইডিস্ গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ভ্রাম্যমাণ ল্যাপদিগকে ইহাদের স্বাধীন জীবনের কোনো ব্যাঘাত না জন্মাইয়া যথাসম্ভব ইহাদেরই জীবন-যাত্রার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া যায়, সে-সম্বন্ধে আইন করেন। তাহার পর হইতে সকল ভ্রাম্যমাণ ল্যাপদের জন্য বিদ্যালয়



ল্যাপ রাখাল-বালিকা পর্ব্বতের পাদদেশে হরিণপালসহ বিশ্রাম করিতেছে



এই ল্যাপটি হরিণের ব্যবসায় উন্নতি করিয়া সরকার হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছে

সৃষ্টি হইয়াছে। বৎসরের প্রায় চারি মাস—যখন শরৎ ও শীতকালে ইহারা পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসে—তখন আপন শিশুসন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পড়িতে দেয়। পরে বসন্তকালে আবার যখন পার্ব্বত্য প্রদেশে ফিরিয়া যায়, তখন আপন সন্তানসন্ততি সঙ্গে লইয়া যায়। সুইডিস্ গভর্ণমেণ্ট ইহাদের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন করেন। এমন কি, সেজন্য ল্যাপ প্রদেশের বাসিন্দা-দিগকেও গভর্ণমেণ্টকে কিছু দিতে হয় না।

এ কথা বলাই বাহুল্য, যে, ল্যাপরা প্রকৃতির সন্তান এবং প্রকৃতিরই উপাসক। আজকাল ল্যাপদের সকলেই খৃষ্টিয়ান। তাহাদের পূর্ব্বতন ধর্ম্ম নানা উপাখ্যানে ভরা। সেই পূর্ব্বধর্ম্মে চারি প্রকার দেবশক্তির উল্লেখ আছে। যথা—স্বর্গের দেবতা, গ্রহতারা ও চন্দ্রসূর্য্যের দেবতা, পৃথিবীর দেবতা এবং পৃথিবীর তলপ্রদেশের দেবতা। এক কথায় চিরকালই তারা প্রকৃতির মধ্যে যে সকল বিচিত্র শক্তি স্বতঃপ্রকাশিত সেই সকলেরই উপাসক ছিল। প্রকৃতির প্রভাব তাহাদের



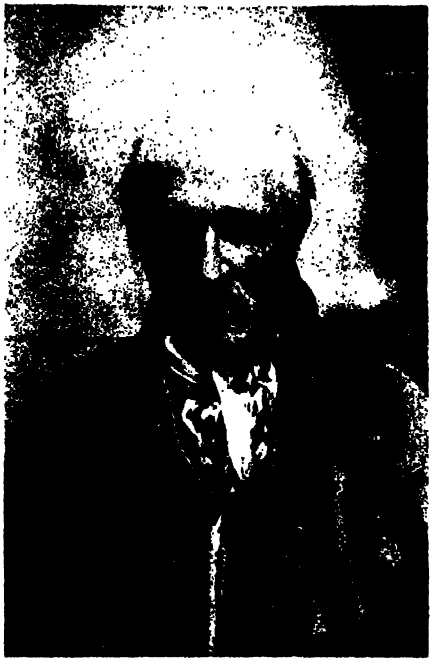
বিশ্বস্ত কুকুর সহ শ্রী পার্থপুলী

চরিত্রের উপর খুব বেশী। আদিমকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই তাহারা সূর্য্যকে বিশেষ অর্ঘ্য দিয়া আসিয়াছে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। ছয় হইতে নয় মাস ব্যাপী আলোবিহীন শীতকালের পর বসন্ত যখন নব সূর্য্যালোক লইয়া উপস্থিত হয়, তখন কে



মালপত্র ও শিশুদিগকে হরিণের উপর চাপাইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে যাত্রা

না সূর্য্যকে আপন কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য দেয়? কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহারা পূর্ব্বধর্ম্মের স্মৃতি ভুলিয়া যাইতেছে।



ল্যাপ্ কবি ও গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যোহান্ তুরী



বনে কুটীর স্থাপন

কোনো কোনো সুইডিস্ অধ্যাপক এই বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছেন। ল্যাপরা সাধারণতঃ খুব ধর্ম্মভীরু।

ভ্রাম্যমাণ ল্যাপদের সংখ্যা নগণ্য হইলেও সুইডেনের অর্থনৈতিক জীবনে ইহাদের দান নিতান্ত অল্প নহে। অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য ভূমির উপর এত কঠোর শীতের মধ্যে মাত্র হরিণ-সম্পত্তির দ্বারা তাহারা যে-ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা অন্য কোনো জাতির পক্ষে সম্ভব হইত কি না যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। গ্রীষ্মকালে মাত্র অল্পদিনের জন্য বনাঞ্চলে তাঁবু খাটাইয়া তাহারা যে গৃহসুখ ভোগ করে, তাহা বৎসরের নয় মাসের কঠোর শীত এবং তুষার ঝড় সহ্য করিয়া শুধু হরিণের পাল চরাইয়া দিনাতিপাতের সঙ্গে তুলনা করিলে অতিশয় তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই স্বাধীন জীবন যাপনই তাহাদের জীবনের বড় আনন্দ। এই অনুর্ব্বর পাহাড়পর্ব্বতগুলিই তাহাদের চিরকালের ঘরবাড়ি। সুইডিসরা তাহাদের ল্যাপদিগকে বড় ভালবাসে। ইহাদের সুখের জন্য তাহারা সব করিতে প্রস্তুত। ল্যাপদের এই সৎ এবং সাহসিক জীবন-যাপনের জন্য সুইডেনবাসী সকলেই তাহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়া থাকে।

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

১২

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যার পর গীতোক্ত বিভিন্ন মার্গ ও ধর্ম্মবিশ্বাসের আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে চতুর্থ অধ্যায় হইতে ধারাবাহিক শ্লোক ব্যাখ্যা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'কিসের বশে মানুষ পাপ কাজ করে?' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কামই পাপের মূল এবং কামদ্বারাই সমস্ত আবৃত রহিয়াছে। এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে—যখন কাম এতই প্রবল তখন ক্রমশঃ পাপদ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হইয়া সমাজ ধ্বংস হইতে পারে, অতএব কি উপায়ে পাপের প্রভাব রহিত হইয়া সমাজ চলিতেছে? সমাজের ভিতর এমন কি শক্তি আছে যাহাতে পাপ বৃদ্ধি পাইতে পায় না? এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাহারই উত্তর দিতেছেন।

৪।১-৩ তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ যিনি সেই আত্মাকে জানিয়া কাম-রূপ শত্রুকে জয় কর। আত্মাকে জানিবার উপায় বুদ্ধিযোগ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "এই চিরফলপ্রদ অব্যয় যোগ আমি পূর্ব্বে বিবস্বানকে বলিয়াছিলাম, বিবস্বান মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন, এইরূপে ক্রমে এই যোগ রাজর্ষিবৃন্দ অবগত হইয়াছিলেন। হে পরন্তপ, কালপ্রভাবে এই যোগ ইহলোকে নষ্ট হইয়া গেল। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেজন্য তোমাকে আমি সেই পুরাতন উত্তম যোগরহস্য বলিলাম।"

মহাভারতে অন্যস্থানে ও অন্যান্য পুস্তকেও কাহার পর কে এই যোগরহস্য অবগত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে; ক্ষত্রিয়রাজগণের মধ্যেই এই রহস্য প্রধানতঃ বিদিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, কোন তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের নাম শ্রীকৃষ্ণকথিত পরম্পরায় পাওয়া যায় না। উপনিষদেও অনেক স্থলে আছে, তত্ত্বান্বেষী ব্রাহ্মণ সমিধ হস্তে ক্ষত্রিয়-রাজের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের জন্য গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন—ধাতুপ্রসন্ন না হইলে ব্রহ্মদর্শন হয় না এবং ধাতুপ্রসন্ন রাখিবার জন্যই বিষয়ভোগের আবশ্যকতা। ক্ষত্রিয়রাজের পক্ষে ইচ্ছামত বিষয়-ভোগের সম্ভাবনা দরিদ্র ব্রাহ্মণের তুলনায় অনেক অধিক, এজন্য রাজর্ষিগণের মধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞানী অধিক ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম খণ্ডে ১ ও ২ শ্লোকে আছে "বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন, অথর্ব্বা পুরাকালে ব্রহ্মা-কথিত সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরকে বলিয়াছিলেন। তিনি ভারদ্বাজগোত্রীয় সত্যবাহকে বলিয়াছিলেন; ভারদ্বাজ সত্যবাহ পরম্পরা-প্রাপ্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরসকে বলিয়াছিলেন।" অঙ্গিরসের নিকট হইতে সৌনক এই বিদ্যার বিষয় অবগত হন।

মুণ্ডক-কথিত পরম্পরা ও গীতোক্ত পরম্পরা বিভিন্ন। মুণ্ডকে ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে মাত্র ও গীতায় যে বুদ্ধিযোগের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যালাভ হয় তাহারই পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যালাভের নানা উপায়ের মধ্যে বুদ্ধিযোগ বা কর্ম্মযোগ একটি বিশেষ উপায় এবং এই

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

গুহ্যযোগ রাজর্ষিগণের মধ্যেই প্রবর্ত্তিত ছিল। এই কারণেই নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে রাজবিদ্যা বলিয়াছেন।

৪।৪-৫ শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন যে, আমি পূর্ব্বে বিবস্বানকে এই যোগের কথা বলিয়াছিলাম তখন অর্জ্জুনের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ উঠিল যে, শ্রীকৃষ্ণ ত এখনকার লোক, বিবস্বান কতকাল পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বানকে যোগের কথা বলিয়াছিলেন—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়। অর্জ্জুন বলিলেন, "তোমার জন্ম অল্পদিন পূর্ব্বের ঘটনা, বিবস্বানের জন্ম বহুপূর্ব্বের ঘটনা, অতএব তুমি আদিতে বলিয়াছিলে—ইহা কি করিয়া জানিব?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে অর্জ্জুন, আমার ও তোমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, আমি সে-সকল জন্মের কথা জানি, কিন্তু হে পরন্তপ, তুমি তাহা জান না।"

এই শ্লোক দুইটির প্রচলিত অর্থ মানিলে পুনর্জন্মবাদ ও জাতিস্মরতা স্বীকার করিতে হয়; এই দুইয়েরই প্রমাণাভাব। (পূর্ব্বপ্রকাশিত পুনর্জন্ম-বিচার দ্রষ্টব্য—প্রবাসী, ১৩৩৯ ভাদ্র।) যদিও প্রচলিত অর্থই সোজা অর্থ স্বীকার করিতে হয়, তথাপি এই শ্লোকের পুনর্জন্মবাদের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং আমি যে ব্যাখ্যা দিতেছি তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির সহিত সঙ্গতিও লক্ষিত হইবে।

আমার মতে, গীতার এখানে যে-অবতারতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রচলিত অবতারতত্ত্ব নহে (পূর্ব্বপ্রকাশিত অবতারবাদ দ্রষ্টব্য—প্রবাসী, ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ)। সাধারণে মনে করেন ভগবান কোন বিশেষ বিশেষ মনুষ্যরূপেই অবতার হইয়া দেখা দেন। তুমি, আমি, রাম শ্যাম যদু আমরা ভগবানের অবতার নহি। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তিনি এরূপ বলেন না। তাঁহার মতে সকল মনুষ্যতেই ভগবান অবতীর্ণ হন। "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" আমার নির্দ্দিষ্ট পথই সমস্ত মনুষ্য বলিয়া থাকে। ১৩।২৭ শ্লোকে আছে, "সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত নাশশীল পদার্থেও অবিনাশীরূপে বিদ্যমান ইহাকে যিনি দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন।" ৪।১৩ শ্লোকে বলিলেন, আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমিই তাহাদের কর্ত্তা। কর্ত্তা হইলেও আমি লিপ্ত নহি বলিয়া অকর্ত্তাই থাকি। ৪।৯ শ্লোকে বলিতেছেন, "আমার জন্ম কর্ম্ম তত্ত্ব যে জানে সে মুক্ত হয়" অর্থাৎ আত্মজ্ঞানও যা, আমার জন্মকর্ম্ম জ্ঞানও তা। ৪।৩৫ শ্লোকে বলিলেন, "এই জ্ঞান পাইলে সমস্ত প্রাণিগণকে তুমি আপনাতে এবং আমাতেও দেখিবে।" প্রত্যেক মনুষ্যতেই যদি ভগবান অবতীর্ণ হন তবে বিশেষ করিয়া 'অবতার' কাহাকে বলিব? যিনি ধর্ম্মসংস্থাপন করেন ও পাপ নষ্ট করেন তিনিই অবতার। পাপও ভগবানই করান, ধর্ম্মরক্ষাও তিনি করান। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে কাম হইতে পাপের উৎপত্তি; কামও ভগবানের সৃষ্টি। কাম হইতে উৎপন্ন পাপ যে-উপায়ে নিবারিত হয় তাহাও ভগবানের সৃষ্টি। সমাজে যেমন পাপের প্রবৃত্তি আছে সেইরূপ পাপ-নিবারণেরও প্রবৃত্তি আছে; ভগবানের যে-অংশ এই পাপের বৃদ্ধি হইতে দেয় না তাহাই ভগবানের অবতার অংশ। তোমার আমার সকলের ভিতরেই এই অবতার আছেন। সমাজের পাপ বৃদ্ধি হইলেই স্বতঃই তাহা বারিত হয়। পরের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় এই অর্থ পরিস্ফুট হইবে।

দিব্যজ্ঞান জন্মিলে মানুষ দেখিতে পায় সবই ভগবানের লীলা ও এই ভগবান আমিই। পূর্ব্বে যিনি জন্মিয়াছেন তিনিও আমি, পরে যিনি জন্মিবেন তিনিও আমি—অতএব শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন, "আমি বিবস্বানকে বলিয়াছিলাম" তখন বুঝিতে হইবে যে তাহা এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬ শ্লোক যজুর্ব্বেদ হইতে উদ্ধৃত; তাহাতে আছে—

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ

অর্জ্জুন উবাচ—
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ—
বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ
—সেই সে দেব দশদিশি সর্ব্বে
আদ্যে সে জাত সেই আছে গর্ভে
জনমিল সে জনমিবে পরে
সর্ব্বতোমুখ সে সকল নরে।

৪।৬ "আমি বাস্তবিক যদিও জন্মরহিত ও অব্যয় আত্মা অর্থাৎ আত্মস্বরূপে বিকারহীন ও সমস্ত প্রাণীদের প্রভু, তথাপি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ মায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করি।"

এই শ্লোকের কেবল যে অবতার রূপেই জন্মগ্রহণ করেন এমন অর্থ নহে। পরবর্ত্তী শ্লোকে কি করিয়া সংসারে পাপ প্রবল হইতে পায় না তাহার কথা বলা হইতেছে।

৪।৭-৮ "হে ভারত, যে কালেই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখনই সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।"

এই দুই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব অধ্যায়ের অর্জ্জুনের প্রশ্ন স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "কিসের বশে মানুষ পাপ করে," শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন "কামের বশে এবং এই কামই সমগ্র পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে।" কাম যখন এতই প্রবল তখন সংসার পাপে ভরিয়া যায় না কেন? কি উপায়েই বা সমাজধর্ম বজায় থাকে? এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যখনই পাপের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই তাহা নিবারণকল্পে ভগবান নিজেকে সৃষ্টি করেন। অন্য সময়ে যে তিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন না তাহা নহে। সাধারণ লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও পাপনিবারণের চেষ্টার ভিতর দিয়াই ভগবান আবির্ভূত হন; কোন বিশেষ জীব বা মনুষ্য রূপে অবতার হন এরূপ নহে। ভগবান কোন বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি যুগে যুগে বা সকল যুগেই জন্মেন; ধর্ম্মের গ্লানি হইবামাত্র তিনি জন্মিয়া থাকেন। গ্লানি মানে সম্পূর্ণ বিনাশ নহে—ধর্ম্মহানি হইলেই ধর্ম্মের গ্লানি হইল। অধুনা ধর্ম্মহানি হইতেছে অথচ ভগবানের অবতার কোথায়? অতএব বিশেষ অবতার কল্পনা সমীচীন নহে; যে-মনুষ্য যখন ধর্ম্ম সংস্থাপনের চেষ্টা করে সে-ই তখন ভগবানের অবতার।

৪।৯ "হে অর্জ্জুন, যে আমার দিব্য জন্মকর্ম্মের তত্ত্ব অবগত আছে দেহত্যাগের পর তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।"

কথাটা একটু বিচিত্র। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমার জন্ম-কর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইলে আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; নির্লিপ্ত থাকিয়া ভগবান কি প্রকারে জন্মান ও কর্ম্ম করেন জানিলে মুক্তি। প্রত্যেক শরীরে ভগবান আত্মারূপে অবস্থিত; এই আত্মা নির্লিপ্ত থাকিয়াই আমাদের কর্ম্ম করায়; এজন্য ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞানও যা, নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানও তা; ভগবানের জন্মকর্ম্মের তত্ত্ব জানিলেই নিজের মুক্তি। ভগবানের কোনও বিশেষ অবতারের জন্মকর্ম্ম তত্ত্ব জানিতে হইবে এমন কথা নহে। কি উপায়ে ভগবানের এই জন্মকর্ম্ম তত্ত্ব জানা যায়, পরের শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। এই শ্লোকে দিব্য কথার অর্থ এই যে জন্ম ব্যাপারকে লৌকিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

৪।১০ "রাগ অর্থাৎ আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া বহু ব্যক্তি জ্ঞান-রূপ তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।" মৎপরায়ণ অর্থে যিনি ভগবান বা আত্মাকেই পরম আশ্রয় মনে করেন।

কেবল এই প্রকারেই যে মুক্তি পাওয়া যায় তাহা নহে

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। ৬
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। ৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ৮
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন। ৯

—যে যেরূপ কর্ম্মই করুক না কেন আমার জন্মকর্ম তত্ত্ব অবগত হইলে তাহার তাহাতেই মুক্তি।

৪।১১-১৫ "যে-ব্যক্তি যে-ভাবে আমার ভজনা করে, আমি সেইভাবে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি করি। হে পার্থ, মনুষ্যগণ যে কোন পথই অবলম্বন করুক না কেন আমার পথেই তাহারা চলে। মনুষ্যলোকে কর্ম্মের ফললাভ শীঘ্র হইবে এই আশায় কর্মফলের অভিলাষী ব্যক্তি দেবতাদিগের পূজা করে—ইহারাও আমার পথেই চলে। আমিই গুণ কর্ম বিভাগ অনুযায়ী চতুর্বর্ণসম্বলিত সামাজিক ব্যবস্থা করিয়াছি। তাহাদের আমি কর্ত্তাও বটে এবং অব্যয় অকর্ত্তাও বটে। আমার নিজের কর্মফলের স্পৃহাও নাই ও আমি কর্ম্মে লিপ্তও হই না—এই যে জানে সে যে কোন কাজই করুক না কেন তাহার কর্মবন্ধন হয় না। ইহা অবগত হইয়া পূর্ব্বের মুমুক্ষুগণ কর্ম করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও সেইরূপ জানিয়া কর্ম কর।" কঠোপনিষদে পঞ্চমী বল্লী ১১ শ্লোকে আছে—

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ

—সর্ব্বলোক চক্ষু সূর্য্য হইয়াও যথা
চক্ষু গ্রাহ্য বাহ্যদোষে নাহি লিপ্ত হন
এক সেই সর্ব্বভূত অন্তরাত্মা তথা
বাহ্য থাকি লোক দুঃখে নিরলিপ্ত রন।

সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা যে একই এবং তিনি যে বাস্তবিক নির্লিপ্ত এই শ্লোকেও তাহা বলা হইয়াছে। এই কয়টি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জন্মকর্ম্মের দিব্য তত্ত্ব বলিলেন। ইহা হইতেও দেখা যাইবে যে কোন বিশেষ জীবে অবতার-কল্পনা নিরর্থক। ৪।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য এই শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বর্ণের জন্মগত ভেদ না মানিয়া গুণ ও কর্ম্মগত ভেদ প্রতিপাদিত করিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা দ্রষ্টব্য।

৪।১৬-১৮ পূর্ব্বের শ্লোকে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম করিতে উৎসাহিত করিলেন, এখন বলিতেছেন কিরূপ কর্ম ভাল। পাপের প্রভাব ও কিরূপে তাহা নিবারিত হয় এই আলোচনায় এই অধ্যায়ের আরম্ভ। সামাজিক আদর্শ হিসাবে পাপ বা পুণ্য কর্ম নিরূপিত হয়, কিন্তু এই আদর্শই পরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় কি কর্ম, কি অকর্ম, কি বিকর্ম, এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়; এই জন্যই উপদেশ আছে "ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্ নিহিতং গুহায়াম মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, যাহা কিছু কর অসঙ্গচিত্তে করিলেই বন্ধন হইল না; তুমি এই আদর্শ মতেই চল বা ঐ আদর্শ মতে চল, বাস্তবিক তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না।

"কি কর্ম আর কি অকর্ম এ বিষয়ে বড় বড় বিদ্বানেরও ভ্রম হয়। তোমাকে আমি এমন কর্ম্মের কথা বলিব যাহা জানিলে তুমি সমস্ত অশুভ বা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। কর্ম্মই বা কি, বিকর্ম বা দুষ্কর্ম্মই বা কি, আর অকর্ম্মই বা কি, এই সমস্তই জানা উচিত; কর্ম্মের গতি গহন বা দুর্জ্ঞেয়। যিনি কর্ম্মেতে অকর্ম ও অকর্ম্মে কর্ম দেখেন তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বান এবং সমস্ত কর্ম করিলেও তিনি যোগযুক্তই থাকেন।"

এই শ্লোকগুলির অর্থ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। শ্লোকগুলির সহিত পূর্ব্ব ও পরের শ্লোকের সঙ্গতি লক্ষ্য করিলে উপরের প্রদত্ত অর্থই যুক্তিযুক্ত বোধ হইবে। আত্মা বাস্তবিক পক্ষে নির্লিপ্ত থাকেন বলিয়া সমস্ত কর্ম্মই আত্মার পক্ষে অকর্ম। আবার বিনা কর্ম্মে যখন শরীর

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ১৫
কিং কর্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ১৭
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ ১৮

ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না তখন বাস্তবিক শরীরের পক্ষে অকর্ম অসম্ভব তা আমি যতবড়ই সন্ন্যাসী বা ত্যাগী হই না কেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই ইহার আলোচনা আছে। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সার এই যে কর্ম কিছুতেই বন্ধ করা যায় না ও কর্মের ভালমন্দের বিচারেরই আবশ্যকতা থাকে না, যদি নিস্পৃহ বা যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করা যায়। কর্মের অপেক্ষা যে বুদ্ধিতে কর্ম করা যায় তাহাই বিচার্য্য।

৪।১৯-২২ "যাঁহার সমস্ত কর্মের উদ্যোগ ফলকামনা-শূন্য, যাঁহার সমস্ত কর্মবন্ধন জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, বুদ্ধিমানেরা তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন। কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় অর্থাৎ কোন বহির্বিষয়ের উপর যিনি নির্ভর করেন না, তিনি কর্মের মধ্যে থাকিলেও বাস্তবিক কিছুই করেন না। নিষ্কাম, সংযতচিত্ত এবং সর্ব্বপরিগ্রহত্যাগী অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুর আহরণ সম্বন্ধে উদাসীন পুরুষ কেবল শরীর দ্বারাই কর্ম করেন বলিয়া পাপভাগী হন না। লোভ না করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট, সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন পুরুষ কর্ম করিয়াও আবদ্ধ হন না।"

৪।২৩ এই শ্লোকের প্রচলিত অর্থ এইরূপ:—"আসক্তিরহিত, রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত সাম্যবুদ্ধিরূপ জ্ঞানে স্থিরচিত্ত এবং কেবল যজ্ঞের জন্যই কর্ম করেন যে ব্যক্তি তাঁহার সমগ্র কর্ম বিলীন হইয়া যায়।" আমার মতে অন্বয় ও ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে:—গতসঙ্গস্য, মুক্তস্য, জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় আচরতঃ সমগ্রম্ কর্ম (অপি) প্রবিলীয়তে, অর্থাৎ "যিনি গতসঙ্গ ও মুক্ত এবং যিনি স্থিত-প্রজ্ঞ তিনি যজ্ঞার্থে কর্ম করিলেও তাঁহার সমগ্র কর্ম বিলীন হইয়া যায়।" সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যায় যজ্ঞকর্মের বন্ধন নাই মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। ৩।১৪ শ্লোকে যজ্ঞ কর্মসমুদ্ভব বলা হইয়াছে। যজ্ঞের বন্ধন সৃষ্টিচক্রের সহিত জড়িত, একথা আমি তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি। গতসঙ্গ হইলে কেবল যে সাধারণ কর্মের বন্ধন হয় না তাহা নহে—যজ্ঞকর্মও মনুষ্যকে বন্ধন করিতে পারে না। ৪।৩২ শ্লোকেও যজ্ঞকে কর্মজ বলা হইয়াছে। আমি যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা না মানিলে পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতি থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক যজ্ঞের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞকর্মের ব্যাপক অর্থ করিয়াছেন এবং কি ভাবে দেখিলে যজ্ঞকর্মের বন্ধন হয় না তাহা বলিতেছেন।

৪।২৪ "তিনি অর্পণ অর্থাৎ হোমক্রিয়াকে ব্রহ্ম ভাবেন, হবি অর্থাৎ অর্পণদ্রব্যকে ব্রহ্ম ভাবেন, ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্মই হোম করিতেছেন অর্থাৎ অগ্নিকেও ব্রহ্ম ও যজমানকেও ব্রহ্ম ভাবেন এইরূপ যাঁহার বুদ্ধিতে সমস্তই ব্রহ্মময় তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন।" নানা প্রকার কর্মকে শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী শ্লোক-সমূহে 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত করিতেছেন। পূর্ব্বপ্রকাশিত যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪।২৫ "কোন যোগী দেবতার বা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন, কেহ বা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞের যজন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে যজ্ঞকে আহুতি দান রূপ যজ্ঞ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইলে যজ্ঞ পরিত্যাগ করেন।" ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধীয় 'যজ্ঞ'কেও দৈবযজ্ঞ বলা যায়। কারণ দেবতা বলিলে কেবল যে ইন্দ্র, বরুণ বুঝিতে হইবে তাহা নহে, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে—ইন্দ্রিয়কে উপনিষদে অনেক স্থলে দেবতা বলা হইয়াছে।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥ ২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫

৪।২৬-২৭ "কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের হোম করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম করেন, কেহ বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমূহের হোম করেন অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সংহরণ করেন।"

"কেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞান দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে হবন করেন।"

আত্মজ্ঞানহীন জীবাত্মা আমাদিগকে নানাবিধ আকুঞ্চন প্রসারণাদি প্রাণকর্ম্মে ও বিষয়ভোগে নিয়োজিত করে। এই জন্যই আত্মার সংযমের চেষ্টা। ইন্দ্রিয়সংহরণ ও ইন্দ্রিয়সংযম পৃথক। ইন্দ্রিয়সংযম, ইন্দ্রিয়সংহরণ ও আত্মসংযম সম্বন্ধে পূর্ব্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য (প্রবাসী—১৩৩৯ শ্রাবণ)।

৪-২৮ "কেহ দ্রব্যদানাদি যজ্ঞ, কেহ তপোরূপ যজ্ঞ, কেহ যোগাভ্যাসরূপ যজ্ঞ, কেহ পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন রূপ যজ্ঞ করেন।"

এখানে যোগ কথা সাধারণ প্রচলিত পাতঞ্জল যোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিলক এই শ্লোকে যোগের অর্থ কর্ম্মযোগ করিয়াছেন, কারণ পরের শ্লোকে পাতঞ্জলযোগ অনুসারে প্রাণায়াম ইত্যাদির কথা আছে। আমার মতে পরের শ্লোকে এই পাতঞ্জলযোগের বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র। তপযজ্ঞের পর যোগযজ্ঞ থাকায় আমার অর্থই ঠিক মনে হয়। হঠাৎ কর্ম্মযোগের কথা এখানে আসিতে পারে না। সমস্ত প্রকার যোগই কর্ম্মযোগের মধ্যে আসিতে পারে; কর্ম্মযোগ বলিয়া কোন বিশেষ প্রকারের যোগ নাই, যে-কোন কর্ম্মই অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিলে কর্ম্মযোগ হয়।

৪।২৯ "প্রাণায়ামতৎপর হইয়া প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করিয়া কেহ প্রাণবায়ুকে অপানে হবন করেন এবং কেহ অপান বায়ুকে প্রাণে হবন করেন।" পূরক, রেচক ও কুম্ভকের কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

তিলক এই শ্লোকের ব্যাখা করিয়াছেন:—

"প্রাণায়াম" শব্দের প্রাণ শব্দে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস উভয় ক্রিয়াই ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু যখন প্রাণ ও অপানের ভেদ করিতে হয় তখন প্রাণ বহির্গত অর্থাৎ উচ্ছ্বাস বায়ু এবং অপান—অন্তরাগত শ্বাস, এই অর্থে লওয়া হয়। মনে রেখো যে অপানের এই অর্থ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন।"

৪.৩০-৩১ "কেহ আহার নিয়মিত করিয়া প্রাণেতে প্রাণের যজ্ঞ করেন। এই সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানকারীরা যজ্ঞের দ্বারা স্ব স্ব পাপ বিনাশ করেন। যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃততুল্য অন্ন ভোজনে অর্থাৎ যজ্ঞফলভোগে সনাতন ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। হে কুরুসত্তম, যে যজ্ঞ করে না তাহার পরলোকের ত কথাই নাই, ইহলোকও নষ্ট হয়।" তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যজ্ঞ করিয়া অবশিষ্ট-ভাগ-গ্রহণকর্ত্তা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু যজ্ঞ না করিয়া যে নিজের জন্য প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণ করে সে পাপী ব্যক্তি পাপ ভক্ষণ করে। এই শ্লোক ও তৎপরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ বেদবিহিত যজ্ঞাদির বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে যজ্ঞের অর্থ অতিশয় ব্যাপক করিয়া ধরিয়াছেন। ৪।৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যা পড়িয়া হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝি যজ্ঞ কর্ত্তব্য এই কথা বলিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি যজ্ঞের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সাধারণের মতই বলিতেছেন। ইহা তাঁহার নিজের মত নহে, পরের শ্লোকেই বলিলেন—

৪।৩২ "এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে উক্ত হইয়াছে,

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ ॥ ২৯

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্মসনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্‌সর্ব্বানেবংজ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২

এই সমুদয়ই কর্ম্মজ জানিবে। ইহা জ্ঞাত হইলে তুমি মুক্ত হইতে পারিবে।"

যজ্ঞকে কর্ম্মজ বলার মানেই তাহার বন্ধন আছে। এইজন্যই পূর্ব্বে যজ্ঞকর্ম্মও নিঃসঙ্গচিত্তে করার উপদেশ আছে।

৪।৩৩ "দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়ঃ, কারণ জ্ঞানেতেই সর্ব্ব কর্ম্মের অবসান হয়।" শ্রীকৃষ্ণ এই এক কথাতেই কৌশলে সাধারণে প্রচলিত যজ্ঞের নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করিলেন।

৪।৩৪-৩৫ "জ্ঞানই যখন শ্রেয় তখন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রণিপাত দ্বারা, প্রশ্নের দ্বারা ও সেবার দ্বারা এই জ্ঞানের উপদেশ পাইতে চেষ্টা কর। জ্ঞান জন্মিলে তোমার মোহ নষ্ট হইবে এবং হে পাণ্ডব, সমগ্র জীবকে তুমি আমার মধ্যে ও আপনার মধ্যে দেখিবে।"

এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে তবে ভগবানের প্রকৃত অবতারতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। পূর্ব্বের শ্লোকের অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই অর্থই আছে দেখাইয়াছি।

৪।৩৬ "(যজ্ঞ ইত্যাদি না করায়) অথবা পাপ করায় যদি তুমি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী মনে কর তাহা হইলেও এই জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে।"

এই অধ্যায়ে পূর্ব্বে কি কর্ম্ম, কি বিকর্ম্ম অর্থাৎ কি পাপ কি পুণ্য ইত্যাদির বিচার আছে। এখানে স্পষ্টই বলিলেন পাপ পুণ্য, কর্ম্ম বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম ইত্যাদি বিচারের আবশ্যকতাই থাকে না যদি তুমি জ্ঞানলাভ কর।

৪।৩৭-৩৮ "প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাঠকে ভস্মসাৎ করে সেইরূপ হে অর্জ্জুন, এই জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্মকে দগ্ধ করে। পৃথিবীতে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র সত্যই আর কিছুই নাই, কর্ম্মযোগী উপযুক্তকালে আপনিই জ্ঞানলাভ করেন।" এখানে জ্ঞানকে কর্ম্মযোগ-লভ্য বলা হইল।

৪।৩৯ "শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং জ্ঞানলাভ করিয়া শীঘ্রই পরম শান্তি লাভ করেন।"

৪।৪০-৪২ "অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীন, সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি নষ্ট হয়, তাহার ইহলোক পরলোক বা সুখ কিছুই হয় না। যিনি যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন এবং জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে সেই আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিকে কর্ম্ম বন্ধন করিতে পারে না, অতএব হে ভারত, তোমার অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়কে জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা কাটিয়া যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক উঠ।" ৪।৪২ শ্লোকে 'যোগ' শব্দে পূর্ব্বপ্রতিপাদিত জ্ঞানপ্রদ বুদ্ধিযোগ বা কর্ম্মযোগ উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, সমাজের মধ্যেই পাপের প্রতিকারের শক্তি নিহিত আছে। কি পাপ কি পুণ্য তাহা বিদ্বান ব্যক্তিও অনেক সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম উভয়েরই বন্ধন আছে। যে-কাজই কর না কেন, কর্ম্মযোগের কৌশল জানিলে পাপ-পুণ্য সমান হইয়া যায় ও সমস্ত পাপই জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয়। ইতি জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। ৩৩

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। ৩৪

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি। ৩৫

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি। ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। ৩৭

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। ৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি। ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ। ৪০

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। ৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত। ৪২

মাতৃঋণ

শ্রীসীতা দেবী

১৬

প্রতাপের আশা ছিল যে, সকালে হয়ত জ্বরটা ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু সকালেও মাথা ভার হইয়া রহিল, থার্মোমিটার দিয়া দেখিল, জ্বর কমিয়াছে বটে, তবে ছাড়ে নাই। হতাশ হইয়া আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। পিসিমা বলিলেন, "সর্দ্দিজ্বর কি আর একদিনে যায় রে? এ কি ম্যালেরিয়া যে এবেলা ওবেলা যাবে আসবে? গাঁয়ে আমাদের বর্ষাকালে ও-জ্বর ত লেগেই থাকত। এই সকালে ভাত জল খেলাম, ওমা, বেলা গড়াতে-না-গড়াতে হি হি করে কেঁপে জ্বর এসে পড়ল।"

রাজু বলিল, "ম্যালেরিয়া হয়নি ভেবে ত প্রতাপের কোনো সান্ত্বনা নেই? ও যে কাজে বেরতে না পেয়ে একেবারে হেদিয়ে গেল। ডাক্তার-টাক্তার ডাকব না-কি?"

প্রতাপ মাথা নাড়িয়া জানাইল ডাক্তারে কোনো প্রয়োজন নাই। পিসিমা বলিলেন, "তোমাদের উঠ্‌তে-বস্‌তে ডাক্তার, ডাক্তার কি যাদু জানে? তা বলে মানুষের একটু সর্দ্দিকাশিও হবে না? ও-সব মাঝে মাঝে হওয়া ভাল। উপোস্ দিলে আর আদা যষ্টিমধু সেদ্দ করে খেলেই সেরে যাবে।"

রাজু বলিল, "তবে তুমি সবরকমে উপোসের ব্যবস্থাই কর হে, আমি একটু ঘুরে আসি।" বলিয়া প্রতাপের দিকে চোখ মট্‌কাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ইস্কুলে আজ আর জানাইতে হইবে না, দুতিন দিন হয়ত যাইতে পারিবে না বলিয়া আগের দিনেই সে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল। নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়িও লিখিবার কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু লিখিবার জন্য তাহার প্রাণটা ছটফট করিতে লাগিল। এমন কিছু লেখা যায় না, যাহাতে যামিনী একটু কিছু উত্তর দেয়? লিখিবে সে অবশ্য নৃপেন্দ্রবাবুর নামেই, কিন্তু এমন সময় পাঠাইবে, যখন নৃপেন্দ্রবাবু কিছুতেই বাড়ি থাকিতে পারেন না। কি লেখা যায়? তাহার মনটা আবার অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। রাজুকে দিয়া অবশ্য সে আর চিঠি পাঠাইবে না, হয় অন্য লোক জোগাড় করিতে হইবে, নয় ডাকেই পাঠাইবে। কিন্তু ডাকের চিঠি কি যামিনী খুলিবে? পিতার জন্য রাখিয়া দিবে হয়ত। আর চিঠি কখন পৌঁছিবে, তাহারই বা ঠিকানা কি?

বৌদিদি আসিয়া চা দিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খাবে ভাই ঠাকুরপো? সাগু বার্লি কিছু করে দেব?"

প্রতাপ বলিল, "দেবেন একটু সাগুই করে, আর কি-ই বা খাব?"

বৌদিদি চলিয়া গেলে, প্রতাপ আবার চিন্তাসাগরে ডুব দিল। কি করিবে, কোন্ পথে যাইবে? অদৃষ্টের হাতে সব ছাড়িয়া দিবে, না নিজে একবার পুরুষের মত সংগ্রাম করিয়া দেখিবে, ভাগ্যপরিবর্ত্তন করিতে পারে কি-না?

বাহির হইতে কানু ডাকিয়া বলিল, "কাকা, তোমার চিঠি এসেছে।"

প্রতাপের বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। চিঠি কাহার? আজ ত বাড়ির চিঠি আসার কথা নয়, আর সে চিঠি ত কখনও সকালবেলা আসে না? বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ভিতরে দিয়ে যাও ত কানুবাবু।"

কানু চৌকাঠ পার হইয়া চিঠিখানা প্রতাপের পায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া পলায়ন করিল। জ্বরের ছোঁয়াচ লাগিয়া পাছে জ্বর হয়, তাই বৌদিদি বোধ হয় ছেলেকে সাবধান করিয়া দিয়া থাকিবেন, তাই কানু আজ এত সতর্ক। না-হইলে প্রতাপের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবার কোনো উপলক্ষ্যই সে অগ্রাহ্য করে না।

চিঠিখানা হাতে করিয়াই প্রতাপ যেন ইন্দ্রলোকে উড়িয়া চলিয়া গেল। কোথায় রহিল তাহার দীন

সাজসজ্জা, ছোটঘরের মূর্ত্তিকাশয়ন। সে যেন অমরাবতীর শোভা দুই চক্ষু ভরিয়া পান করিতেছে, এমনই হইল তাহার সমস্ত মুখের ভাব। সংসারের সকল অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-নিরাশা সব যেন অমৃতস্রোতে ধুইয়া গেল। যামিনী তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে।

কি লিখিয়াছে তাহা প্রতাপ জানে না। নীলাভ ধূসর খামখানির বুকের ঐশ্বর্য্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। সেটিকে মুঠার ভিতর চাপিয়া ধরিয়াই প্রতাপ যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। কিছুই যদি সে না লিখিয়া থাকে, নিতান্ত সামান্য ভদ্রতার দু-চারিটি উক্তি দিয়াই যদি চিঠি শেষ করিয়া থাকে, তবু প্রতাপের এ আনন্দের তুলনা নাই। যামিনী মনে করিয়া লিখিয়াছে ত? তাহার লিখিবার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না, কারণ প্রতাপ তাহাকে চিঠি লেখে নাই, তবু সে নিজে ইচ্ছা করিয়া লিখিয়াছে। এই ইচ্ছাটুকুর মূল্য কি কম? যামিনীর মত মেয়ে, জ্ঞানদা যাহাকে সোনার খাঁচায় মানুষ করিতেছেন, সে কেন দরিদ্র গৃহশিক্ষক প্রতাপকে চিঠি লিখিতে বসিল? ইহার উদ্ভব হৃদয়ের কোন ভাব হইতে?

চিঠিখানা খুলিতে সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। না খুলিয়াই যদি রাখিয়া দেওয়া যায়? সে-ই কি ভাল হয় না? প্রতাপ তাহা হইলে কল্পনাকে লাগাম ছাড়িয়া দিতে পারে। সে নিজে যেমন একখানি চিঠি যামিনীকে লিখিতে চায়, সেইরকম একখানি চিঠি সে নীলাভ খামখানির ভিতর কল্পনা করিয়া লইতে পারে। যাহা-কিছু শুনিতে চায়, সবই প্রাণের শ্রবণ দিয়া শুনিতে পারে। খুলিলেই ত যেমন হোক শুধু একটি বাণী তাহার কাছে ধরা দিবে। অসংখ্য কথা, যাহা তাহার বুকের ভিতর বাজিয়া ফিরিতেছে, তাহা কি নীরব হইয়া যাইবে না?

কিন্তু না খুলিয়া সে শেষ পর্য্যন্ত পারিল না। ছোট চিঠি, কাগজের এক পৃষ্ঠাতেই শেষ হইয়াছে। ভিতরে ভাঁজ করা নোট। প্রতাপ তাড়াতাড়ি গুণিয়া দেখিল, যামিনী সেই উপহারের বইখানার দাম পাঠায় নাই। তবে সে উপহার গ্রহণই করিয়াছে!

রাজুর আসিয়া পড়ার ভয় ছিল, সুতরাং চিঠিখানা এইবার সে সাবধানে খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বিশেষ-কিছু নয়, কয়েক ছত্র মাত্র। হয়ত এমন চিঠি শুধু ভদ্রতা-প্রণোদিত হইয়াই লেখা যায়। এমন কোনো কথা তাহার ভিতর নাই, যাহা যে-কোনো মানুষ যে-কোনো মানুষকে লিখিতে না পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি কথা প্রতাপের হৃদয়ে যেন অমৃতবারি সিঞ্চন করিতে লাগিল। এ যে যামিনীর লেখা, আর প্রতাপকে লেখা! যে-কেহ যামিনীকে জানে না, প্রতাপকে জানে না, সে ইহার মূল্য বুঝিবে কেমন করিয়া? চিঠি যে সে লিখিয়াছে, তাহাই যে কতখানি!

যামিনা তাহার অসুখ শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছে, যামিনী তাহার অনুপস্থিতে হয়ত বা ব্যথাও পাইয়াছে, যদিও সে-কথা চিঠিতে উল্লেখ করে নাই। কত শুভকামনা সে জানাইয়াছে, প্রতাপের সাহায্য করিবার কোনো উপায় থাকিলে, এখনই সে তাহা করিতে প্রস্তুত, যদি সে উপায় প্রতাপ তাহাকে বলিয়া দেয়। হায়, প্রতাপের সে সাধ্য যদি থাকিত! একবার যামিনী আসিয়া তাহার এই দীন রোগশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলেই যে তাহার অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া যায়! কিন্তু সে কথা বলিবার সাহস প্রতাপের কই, তাহার অধিকারই বা কোথায়? হৃদয়ের সম্পর্কে যামিনী তাহার প্রিয়তমা অন্তরতমা হইলেও বাহিরের সম্পর্কে কেহই নয়, প্রভুকন্যা মাত্র।

সিঁড়িতে রাজুর পায়ের শব্দ শুনিয়া প্রতাপ তাড়াতাড়ি চিঠিখানা বালিশের তলায় গুঁজিয়া রাখিয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িল। রাজু ভিতরে আসিয়া তোয়ালে দিয়া মুখ হাত মুছিয়া চিরুণী দিয়া মাথার চুল ঠিক করিতে লাগিল। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। পিসিমা কোথা হইতে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন "হাঁ রে, কোথা থেকে চিঠি এল, বাড়ির?"

প্রতাপ অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলিল, "হ্যাঁ।"

"বৌ ভাল আছে, ছেলেপিলে সব ভাল?"

প্রতাপের আর পথ ছিল না, অগত্যা বলিল, "হ্যাঁ, সবাই ভালই আছে।"

পিসিমা সৌভাগ্যক্রমে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া

চলিয়া গেলেন। রাজুও চায়ের সন্ধানে প্রস্থান করিল। প্রতাপের বড় লোভ হইতে লাগিল চিঠিখানা আর একবার বাহির করিয়া ভাল করিয়া পড়ে, তাড়াতাড়িতে আগের বার ভাল করিয়া পড়া হয় নাই। কিন্তু রাজুর ভয়ে তাহা করিতে সাহস হইল না। চট্ করিয়া চিঠিখানা বালিশের তলা হইতে বাহির করিয়া, বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর ঢুকাইয়া দিল। বৌদিদি এখনই হয়ত বিছানা তুলিতে আসিয়া জুটিবেন।

বৌদিদি আসিলেন বটে, তবে প্রতাপ তখনও শুইয়াই আছে দেখিয়া বলিলেন, "থাক তবে, এখন আর তোমায় টানাটানি করে কাজ নেই, রোদটা একটু ভাল করে উঠুক, তখন একটু চেয়ারে বসো, আমি ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে দেব এখন। জ্বরটা আজও ত ছাড়ল না, এখন ক'দিন ভোগ আছে, কে জানে।"

প্রতাপ বলিল, "ভোগ সঙ্গে সঙ্গে আপনারও কম হচ্ছে না। এত কাজ, তার উপর আবার রুগীর সেবা।"

বৌদিদি বলিলেন, "হ্যাঃ, সেবা ত কতই করছি। করা ত উচিতই, যখন আমাদের মধ্যে রয়েছ, কিন্তু সময় কোথায় ভাই?"

কাহু চীৎকার করিয়া উঠায় বৌদিদি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। রাজু চা খাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, আজ কোথাও চিঠিপত্র নিয়ে যেতে-টেতে হবে?"

প্রতাপ বলিল, "না, দু-তিন দিন যেতে পারব না ব'লে ত স্কুলে লিখেই দিয়েছি।"

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, "আর অন্যত্র?"

প্রতাপ মুখখানাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "অন্যত্রও তাই লিখেছি।"

চা খাইয়া মাথাটা একটু যেন হাল্কা বোধ হইতেছিল, স্কুলে নাই যাইতে পারুক, অন্ততঃপক্ষে বিকালে তাহার বাহির হইতে পারা উচিত। না-হয় একটা গাড়ী ভাড়া করিয়াই যাইবে। রাজু তখনও আপিস হইতে ফিরিবে না, সুতরাং ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প। এখন বিধি বাদ না সাধেন, তাহা হইলেই হয়।

পিসিমার নির্দ্দেশমত আদা-চা, মিষ্টিমধুর পাঁচন, সমস্তই সে নির্ব্বিচারে গিলিতে লাগিল। পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু আধটু হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা করিতেন তাঁহার নিকটেও চিঠি লিখিয়া ঔষধ চাহিয়া পাঠাইল। কোনোমতে বিকালবেলা তাহাকে চাঙ্গা হইয়া উঠিতেই হইবে। যামিনীর চিঠির উত্তর সে কাগজে-কলমে দিতে চায় না। যাহা লিখিলে তাহার হৃদয় তৃপ্ত হইবে, তাহা লিখিবার অধিকার তাহার এখনও অর্জ্জন করা হয় নাই। মুখের কথাও সে যে বেশী-কিছু বলিতে ভরসা পাইবে তাহা নয়। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার চোখের দৃষ্টি, তাহার মুখের ভাব, এ-সকল কি যামিনীকে কিছুই জানাইতে পারিবে না? যামিনী শুধু ভদ্রতা করিয়াছে, না প্রতাপের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও মমতা তাহার মনে জন্মিয়াছে তাহা কি যামিনীর ব্যবহারে কিছু বুঝা যাইবে না? প্রতাপ আর নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে চায় না, যাহা করিবার তাহা এখনই তাহাকে করিতে হইবে।

গজু রাজু খাইয়া-দাইয়া আপিসে বাহির হইয়া হইয়া গেল। বৌদিদির অনুরোধসত্ত্বেও প্রতাপ কিছু না খাইয়াই পড়িয়া রহিল, যদিই আবার জ্বর বাড়িয়া যায়। থার্ম্মোমিটার চাহিয়া বালিশের তলাতেই রাখিয়া দিল, কতবার যে দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিল, তাহার ঠিকঠিকানা নাই।

অদৃষ্ট সেদিন নিতান্ত বিরূপ ছিল না। বিকালের দিকে জ্বর সত্যই এতটা কমিয়া গেল, যে, প্রতাপ এক রকম নিশ্চিন্তই হইল। সাড়ে-তিনটা বাজিয়া গেল, যাইতে হইলে আর আধ ঘণ্টার ভিতর যাওয়া উচিত। বাক্স খুলিয়া ফরসা জামা কাপড় বাহির করিল। পিসিমা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকি রে, এই অসুখের মধ্যে কোথায় বেরচ্ছিস?"

প্রতাপ একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, "নৃপেন্দ্রবাবুদের বাড়ি একবার যেতে হবে। এই মাসে মাইনে-টাইনে বাড়িয়ে দিলেন, এই মাসেই বসে বসে কামাই করাটা উচিত নয়।"

পিসিমা বলিলেন, "তাই বলে জ্বর হলেও যেতে হবে? ঘোরাঘুরি করে জ্বর বেড়ে গেলে তখন?"

প্রতাপ বলিল, "গাড়ী করে যাব, ছেলেটাকে একটু কিছু লিখতে-টিখতে দিয়েই চলে আসব। বেশীক্ষণ থাকব না।"

পিসিমা বলিলেন, "যা তোমার খুশী কর বাপু। আমার কাছে যখন রয়েছ, না বলেও আমি পারি না। গায়ে একটা গরম কাপড় দে।"

কাপড়-চোপড় পরিয়া আর এক ডোজ ওষুধ খাইয়া প্রতাপ বাহির হইয়া পড়িল। গলিটা পার হইয়া গিয়াই সে গাড়ী ডাকিয়া উঠিয়া বসিল।

সারাটা পথ কত কি যে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, তাহার ঠিকানা নাই। যামিনীর সঙ্গে দেখা হইবে ত? দেখা হইলেই বা সে কি বলিবে? যাহা-কিছু বলিতে চায়, সবই কি বলিবে, না কেবল যামিনীর মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াই নিরস্ত হইবে? আর দেরি করা কি উচিত? জানদা কবে ফিরিয়া আসেন, তাহার কিছু ঠিকানা নাই। তিনি আসিয়া পড়িলে, নির্জ্জনে যামিনীর সঙ্গে দেখা করিবার আর কোনো সুযোগই হইবে না। সুতরাং তিনি দূরে থাকিতেই যামিনী ও তাহার ভিতর সব কথা পরিষ্কার হইয়া যাওয়া উচিত। হাজার সঙ্কোচ এবং ভয় থাকুক, প্রতাপকে তাহা কাটাইয়া উঠিতে হইবে।

গাড়ী আসিয়া নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রতাপ নামিয়া পড়িয়া, ভাড়া চুকাইয়া গাড়ীটাকে বিদায় করিয়া দিল। বাড়িটা বড় বেশী চুপচাপ, কেহই কি বাড়ি নাই নাকি? প্রতাপ আপিস ঘরে একবার উঁকি মারিয়া আবার বাহির হইয়া আসিয়া, কোনো চাকর-বাকরের সন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। খাবার ঘরে বাসনকোষন নাড়ার একটা শব্দ শোনা গেল। প্রতাপ সেইদিকে গিয়া ডাক দিল, "ছোট্ট!"

ছোট্ট বাহির হইয়া আসিল। প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু কোথায়? স্কুল থেকে বাড়ি এসেছেন ত?"

ছোট্ট বলিল, "হাঁ এসেছে, চা ভি খাইয়েসে। আচ্ছা, আমি খবর করছি," বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

শরীর তখনও অসুস্থ, ঘোরাঘুরি করিতে তাহার ভাল লাগিতেছিল না। আপিস-ঘরে ঢুকিয়া সে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

ছোট্ট নামিয়া আসিয়া খবর দিল, "দাদাবাবু ত বাহের চলা গেল। দিদিমণি আস্‌ছেন।"

প্রতাপ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়িতে মখমলের চটির শব্দ করিতে করিতে যামিনী নামিয়া আসিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই প্রতাপ বুঝিতে পারিল যে, সে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় আসিয়াছে। তাহার মুখ আরক্তিম, চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, নিঃশ্বাসও যেন একটু দ্রুততালে বহিতেছে।

যামিনীকে নমস্কার করিয়া প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল, "মিহির বাড়ি নেই বুঝি? বেরিয়ে গেছে?"

যামিনী একটু যেন কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনি যে আজ আসতে পারবেন, তা মনে করিনি। খোকা বল্‌লে যে, তার এক বন্ধুর বাড়ি যাবে, আমি আর বারণ করলাম না। আপনার জ্বর সেরে গেছে?"

প্রতাপ একটু হাসিয়া বলিল, "একেবারে সেরে যায়নি অবশ্য, তবে আস্‌তে ত পারলাম। গাড়ী ক'রেই এসেছি।"

যামিনী বলিল, "আচ্ছা, আমি খোকাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি। তাঁর বন্ধুর বাড়ি খুব বেশী দূরে নয়। আপনি চলুন, ও-ঘরে বস্‌বেন।"

প্রতাপ যামিনীর সঙ্গে গিয়া ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিল। ঘরটি এমন সুন্দর, এমন রঙীন সাজে সজ্জিত, এমন সুগন্ধ-প্লাবিত, যে, কয়েক মুহূর্ত্ত ইহার ভিতরে থাকিলেই মনটা কেমন একটা মধুর আবেশে ভরিয়া উঠে। প্রতাপের মন পূর্ব্ব হইতেই ভাববিহ্বল হইয়াছিল, এখানে আসিয়া তাহার অবস্থাটা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিল। যামিনী একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়া, প্রতাপকে বলিল, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।"

প্রতাপ বসিল। আর শুধু শুধু সময় নষ্ট করা উচিত নয়, হয়ত-এখনই মিহির আসিয়া জুটিবে।

আর কিছু না ভাবিয়া বলিয়া বসিল, "আজ সকালে আপনার চিঠি পেলাম।"

যামিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, কাল যখন আপনার

চিঠিটা এল, তখন বাবা বাড়ি ছিলেন না। আমি ভাবলাম, আপনার টাকা-ক'টা পাঠিয়ে দিই, হয়ত অসুখ-বিসুখের মধ্যে দরকার হবে।"

প্রতাপ বলিল, "টাকার জন্যে তাড়াতাড়ি বেশী ছিল না, যদিও গরিব মানুষের টাকার প্রয়োজন সর্ব্বদাই আছে। কিন্তু আপনার চিঠি পেয়ে আমি কতটা যে উপকৃত হয়েছি, তা ভাষায় বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। ধন্যবাদ দিতে গেলেই জিনিষটাকে ছোট করা হবে।"

যামিনীর মুখ গোলাপ ফুলের মত রাঙিয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টি তাহার হইয়া যেন প্রতাপের কথার উত্তর দিতে লাগিল।

বাহিরে কাহার যেন পদশব্দ শোনা গেল। প্রতাপ বলিল, "দেখুন আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। বলবার অধিকার আমার আছে কিনা জানি না। না যদি থাকে, অনর্থক আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করে আপনাকে বিরক্ত করতে আমি চাই না। আপনি কি দয়া করে শুনবেন?"

যামিনী তারকার মত দীপ্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "শুনব।"

প্রতাপের বক্ষস্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল। বলিল, "কবে আপনার সময় হবে বলুন। আমি তখন আসব।"

যামিনী একটু ভাবিয়া বলিল, "দুপুর বেলাই এক আমি একেবারে ফ্রি থাকি, অন্য সময় একটা-না-একটা কাজ থাকে। কিন্তু তখন ত আপনার স্কুল।"

প্রতাপ বলিল, "তা হোক। কাল ছুটোর সময় তাহলে আমি আসব।"

যামিনী অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা।" এমন সময় মিহির আসিয়া হাজির হইল।

১৭

প্রতাপ বাড়ি ফিরিয়া আসিল। পৃথিবীর মূর্ত্তিই তাহার চোখে তখন অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। জন্মাবধি জগৎ-সংসারকে এত সুন্দর সে কোনোদিন দেখে নাই। জীবন ছিল তাহার নিকট সংগ্রামেরই নামান্তর মাত্র, তাহার ভিতর না-ছিল আশা, না-ছিল আনন্দ। এইভাবেই আয়ুষ্ণ তাহার কাটিয়া যাইবে, ইহাই ভাবিতে সে অভ্যস্ত ছিল, হয়ত দু-দশদিন অন্নচিন্তাটা একটু বেশী প্রবল হইবে, দু-দশদিন কিছু কম হইবে, ইহার অধিক কোনো বৈচিত্র্য সে আশা করে নাই। বিবাহ করিবে কি-না, সে কথাও ভাবিয়া দেখিবার মত উৎসাহ তাহার কর্ম্মক্লান্ত অন্তঃকরণে ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ যেন ইন্দ্রজালপ্রভাবে সে অন্যমানুষ হইয়া গেল। ভবিষ্যৎকে কি উজ্জ্বল বর্ণেই সে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এই চিত্রকে স্বপ্নলোকে বা কল্পলোকে রাখিয়া দিলেই ত চলিবে না, নিজের চেষ্টায়, নিজের কৃতিত্বে উহাকে বাস্তবজগতে লইয়া আসিতে হইবে। তাহার আর ভাবস্রোতে গা ঢালিয়া ভাসিয়া যাইবার সময় নাই।

মিহিরকে পড়াইবার কোনো চেষ্টা সেদিন সে করে নাই। মনের তখন তাহার যে অবস্থা, তাহাতে কাজ করাই অসম্ভব। ছাত্রকে লিখিবার কিছু কাজ দিয়া সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। রাস্তায় বেশ খানিকটা হাঁটিয়া আসিয়া তাহার পর তাহার মনে পড়িল যে অসুস্থ শরীরে এত হাঁটাহাঁটি তাহার সহ্য হইবে না। তখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া গাড়ীর সন্ধান করিতে লাগিল। রাঙু ফিরিবার আগে গিয়া পৌঁছিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, না হইলে বাজে কথার চোটে অস্থির হইয়া উঠিতে হইবে এখন একমনে কিছুক্ষণ ভাবিতে পাওয়া তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। সমস্ত জীবনের গতি স্থির করিতে হইবে তাহাকে এই কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে।

বাড়ির কাছাকাছি আসিয়াই সে গাড়ীটাকে বিদায় করিয়া দিল। পিসিমা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "সকাল সকাল ছেড়ে দিলে বুঝি আজ? হাজার হোক মানুষের চামড়া গায়ে আছে ত।"

প্রতাপ একটু হাসিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল। কাল যেমন করিয়া হোক, দুপুরে ছুটি লইয়া স্কুল হইতে চলিয়া আসিতে হইবে। যামিনীর নিকট কি ভাবে সে কথাটা পাড়িবে, হাজার ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না। যাহাই ভাবে, তাহাই অসহ্য থিয়েটারি ঢংএর মনে হয়। অবশেষে হতাশ হইয়া সে চেষ্টা

ত্যাগ করিল। তখন মুখে যেমন ভাষা জোগাইবে, তাহা বলিলেই চলিবে। একেবারে স্পষ্ট বিবাহের প্রস্তাবই করিবে, না কথাটা এখনও কিছু অস্পষ্ট থাকিতে দিবে? তাহাও ভাবিয়া ঠিক করা কঠিন। যামিনীর মনের ভাব বুঝিয়া সেইমত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অকারণে বসিয়া বসিয়া নিজেকে শ্রান্ত না করিয়া সে আবার শুইয়াই পড়িল। যামিনী আজ তাহাকে দেখিয়া সত্যই খুশী হইয়াছিল। নিজের আনন্দবিহ্বলতা সে লুকাইয়া রাখিতে পারে নাই, চায়ও নাই বোধ হয়। যামিনী কি সত্যই প্রতাপকে ভালবাসে? ইহা কি সম্ভব? যাহা-কিছুকে সে হেয়, অকল্যাণের আকর বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার সব-কয়টিই প্রায় প্রতাপের মধ্যে মূর্ত্তিমান। প্রতাপ রূপবান্ নয়, প্রতাপ পুরাতন সমাজের আচারের ভিতর বর্দ্ধিত, সর্ব্বোপরি সে কপর্দ্দকহীন দরিদ্র। যামিনী কি তাহাকে পতিরূপে নির্ব্বাচন করিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিবে? এই অবস্থায় ত নয়ই। প্রতাপকে অন্ত মানুষ হইয়া যাইতে হইবে। তাহাকে বিদ্যায়, ধনে, মানে এত উচ্চে উঠিতে হইবে, যেখান হইতে যামিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করা তাহারও নিকট স্পর্দ্ধা বলিয়া গণ্য হইবে না। যামিনী যদি তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতাপের জন্ম দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইতে সে হয়ত হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিবে, কিন্তু তাহার এই ত্যাগের সুবিধা গ্রহণ করিতে প্রতাপ পারিবে না। করে যদি তবে সে অমানুষ। ভালবাসিয়া যামিনী তাহাকে সম্রাটের পদে বসাইয়াছে, ভিখারী বা চোরের মত হেয় আচরণ সে করিতে পারিবে না।

প্রতাপ স্থির করিল, যামিনী যদি তাহাকে ভাবী পতিরূপে গ্রহণ করে, তাহা হইলে কোনো একটা স্কলার-শিপ্ জুটাইয়া বিলাত কিম্বা আমেরিকা চলিয়া যাইবে। কেবলমাত্র পাথের খরচ জুটাইয়া পরে কায়িক শ্রমে নিজের খরচ চালাইয়া এবং কৃতবিদ্য হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন যুবকেরও দৃষ্টান্ত তখন বিরল ছিল না। প্রতাপ নিজেই দুই-তিনজনের নাম জানিত। দরিদ্রের সন্তান সে, যথাসম্ভব দরিদ্রভাবে থাকিয়া সাধনায় সিদ্ধি-লাভের চেষ্টা সে করিতে পারিবে। তাই আবার চাকরি করিতেছে, মা এবং ছোট ভাইবোনের ভার গ্রহণ সে-ই কিছুদিনের জন্ম করিতে পারিবে। প্রতাপ সুশিক্ষিত ও অধিক অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে উপযুক্ত হইয়া আসিলে তাহাদেরও লাভ বই লোকসান নাই, সুতরাং মা ভাইও আপত্তি করিবেন না আশা করা যায়।

রাজু ফিরিয়া আসিল। ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, এখন কেমন?"

প্রতাপ শুইয়া শুইয়াই উত্তর দিল, "ভালই মোটের ওপর।"

রাজু বলিল, "তবে আর কি, কালকেই জয়ধ্বজা তুলে বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়। দুদিনের বিরহেই প্রায় পুণ্ডরীকের মত শুকিয়ে উঠেছ। নিতান্ত সর্দ্দিজ্বর, না-হলে চন্দনপঙ্ক লেপন করে পদ্মপত্রে ব্যজন করবার চেষ্টা করতাম।"

প্রতাপ উত্তর না দিয়া, চুপ করিয়াই রহিল। কথা বলিতে আরম্ভ করিলে, আর কথার শেষ থাকিবে না।

যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া সে সন্ধ্যা এবং রাত্রি কাটাইল। সৌভাগ্যক্রমে জ্বর সকাল বেলা ছাড়িয়া গেল। পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুইনাইনের বড়ি একটা খেয়ে নিবি রে? আবার জ্বরজাড়ি হ'লে ত বিপদ।"

বিপদ যে কতখানি তাহা তবু ত পিসিমা জানিতেন না। অতি সুবোধ বালকের মত কুইনাইনের বড়ি প্রতাপ হাসিমুখে গলধঃকরণ করিল। মনে মনে বলিল, "দিনটা সুরু হ'ল, কুইনাইন্ দিয়ে, অমৃত দিয়ে যেন শেষ হয়।"

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন, "কি খাবে ঠাকুরপো, ভাতই? না, দুখানা রুটি ক'রে দেব?"

প্রতাপ বলিল, "রুটি হলে ত হয় ভাল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ির ভিতর তুমি করবে কখন?"

বৌদিদি হাসিয়া রাঙা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "হ্যা, দুটো রুটি নাকি আবার করতে পারব না, তুমি দেখো এখন।"

স্নান করিতে ভরসা হইল না। গরম জল চাহিয়া প্রতাপ বেশ করিয়া হাত-মুখ পরিষ্কার করিয়া লইল। হাসপাতালের রোগীর মত মূর্তি করিয়া সে কিছুতেই আজ যামিনীর কাছে যাইতে পারিবে না। স্কুলেও সে গাড়ী করিয়াই চলিয়া গেল। সে বাহির হইয়া যাইবামাত্র রাজু বলিল, "ছোঁড়ার হল কি, খুব ত দুহাতে পয়সা ওড়াচ্ছে।"

পিসিমা বলিলেন, "তা প্রাণের চেয়ে কি পয়সা বড়? আবার জর হ'লে ও আর টিকবে! ঐ ত তালপাতার সেপাই।"

স্কুলে গিয়াও নিজের মনের অস্থিরতায় প্রতাপ কিছু কাজ করিতে পারিল না, ক্লাসে গিয়া বসিল মাত্র। অবশ্য সদ্য রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া সেটা কাহারও চোখে বিশেষ অস্বাভাবিক বোধ হইল না। টিফিনের ঘণ্টা পড়িবামাত্র প্রতাপ গিয়া হেডমাষ্টারের ঘরে উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলিবামাত্র সে বলিল, "আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহ'লে বাড়ি চলে যাই। শরীরটা বিশেষ ভাল ঠেকছে না।"

হেড্‌মাষ্টার বলিলেন, "তাই যান, প্রথম দিনই উঠে স্ট্রেন করা কিছু নয়।"

প্রতাপ নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল। সোজা যামিনীদের বাড়ি না গিয়া একবার বাড়ীতে নামিল। গাড়ীটাকে দাঁড় করাইয়াই রাখিল। আর-একবার কাপড় ছাড়িয়া, চুল আঁচড়াইয়া, হাত মুখ ধুইয়া, প্রস্তুত হইয়া আসিল। উত্তেজনায় তাহার পা কাঁপিতেছে, গলা শুকাইয়া উঠিতেছে, হাঁটিয়া অল্পদূরও সে যাইতে পারিবে না তাহা বুঝিতেই পারিয়াছিল। নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ির সামনে আসিতেই দেখিতে পাইল, দোতলায় যামিনী জানলার ধারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। গাড়ী দেখিয়াই সরিয়া গেল। প্রতাপ নামিয়া পড়িয়া গাড়ীটাকে বিদায় করিয়া দিল। ছোট্ট অন্তদিন এমন সময় খাবার ঘরের টেবিলের তলায় পড়িয়া অঘোরে নিদ্রা দেয়, আজ সে প্রতাপকে অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইয়া আসিল দেখিয়া প্রতাপ বিস্মিত হইল। যামিনী বলিয়া রাখিয়াছে বোধ হয়। আজ তাহাকে আপিসঘরে বসিতেও হইল না, ভৃত্যক্রমে তাহাকে বসাইয়া, ছোট্ট খবর দিতেই বোধ হয় উপরে চলিয়া গেল।

যামিনী মিনিট-দুইয়ের ভিতরেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রতাপের চক্ষু অনভিজ্ঞ, তাহার উপর হৃদয়াবেগে সে তখন অভিভূত, সুতরাং যামিনীর চেহারা বা সাজসজ্জায় কোনো বিশেষত্ব তাহার চোখে পড়িল না। অন্য মানুষ থাকিলে দেখিত, যামিনীর সজ্জার মধ্যে অনেকটাই পরিবর্তন আসিয়াছে, মেম-সাহেবী ভাবটা যথাসম্ভব কম, হিন্দুগৃহের লক্ষ্মী-প্রতিমার সহিত সাদৃশ্য বেশী। পায়ে জুতা নাই, আল্‌তায় ক্ষুদ্র কোমল পদতল রঞ্জিত, চুল খোলা, তাহাতে ফিতার গুচ্ছ পর্য্যন্ত নাই, আয়ত চোখের নীচে কাজলের টান। হাতে গলায় স্বর্ণালঙ্কার।

যামিনী আসিয়া বসিয়া একটা চেয়ারের হাতল খুঁটিতে লাগিল। প্রতাপও ভাবিয়া পাইল না ঠিক কেমন ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবে।

যামিনীই কথা আগে বলিল, "আজ বেশ ভাল আছেন ত?"

প্রতাপ বলিল, "হ্যা ভালই আছি, তবে একটুখানি দুর্ব্বল আজও লাগছে।"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "দেখুন, আজ যা বলতে এসেছি, তা ব'লে ফেলাই ভাল, দেরি করে লাভ নেই। অনেক কষ্টে মনের সঙ্কোচ কাটাতে আমাকে হয়েছে, কারণ আর যে-কোনো মানুষ এ কথা শুনলে আমাকে পাগলই মনে করবে। আপনিও যে কি মনে করবেন তা আমি জানি না, সেটা জানতেই আজ এসেছি। যদি আমার কথায় বেশী আস্পর্দ্ধা কিছু প্রকাশ পায়, আপনি দয়া ক'রে ক্ষমা করবেন?"

যামিনী শুধু একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল, কোনো কথা বলিল না। প্রতাপ বলিল, "আপনাকে যতটা শ্রদ্ধা আমি করি, জগতে আর কাউকে ততটা করি না। যদি আমার কোনো কথা মর্য্যাদাহানিকর মনেও হয় তা হলেও জানবেন আমার উদ্দেশ্য একেবারে অন্য। আমি জানি, আমি একান্ত অযোগ্য কিন্তু যোগ্য হবার চেষ্টা যথাসাধ্য করতে চাই। সেটুকু অধিকার কি

আপনি আমায় দেবেন? যদি কোনদিন যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে ফিরতে পারি তাহলেই আমার আর যা বলবার আছে তা বলব, এখন সে-সব কথা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর-কিছু বলে মনে হবে না।"

যামিনী মাথাটা একটু অন্যদিকে ঘুরাইয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "আপনি নিজেকে অত ছোট করছেন কেন? পৃথিবীতে টাকাই কি সব? ধনীরাই কি সকল দিকে শ্রেষ্ঠ?"

প্রতাপ বলিল, "আমি শুধু যে দরিদ্র তা ত নয়, সকল দিক্ দিয়েই আমি অযোগ্য। কিন্তু সব বাধার উপরেও মানুষের চেষ্টা তাকে জয়ী করে তোলে। সেইটুকু করবার অধিকারই আমি আজ চাইতে এসেছি।"

যামিনী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি আপনাকে কোনো মানুষের চেয়ে একটুও ছোট মনে করি না। আপনার চেষ্টা কখনও বিফল হবে না।"

প্রতাপ ইহার পর কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইল না। যামিনী তাহার কথার খুব যে স্পষ্ট উত্তর দিল তাহা নয়' কিন্তু আরো স্পষ্ট কথা দাবী করা কি তাহার উচিত?

যামিনী নিজেই বলিল, "আপনি কি এখনই কারো কাছে এ-সব কথা বলতে চান?"

প্রতাপ বুঝিল বিবাহের সম্ভাবনাটাকে যামিনী স্বীকার করিয়া লইতেছে। বলিল, "না, আমার আত্মীয় বন্ধু কাউকে এখন আমি জানাতে চাই না। আপনার মা বাবা কাউকে জানান কি কর্ত্তব্য?"

যামিনী আরক্ত মুখে বলিল, "থাক্ এখন।"

ইহার পর দুই জনেই নীরবে বসিয়া রহিল। প্রতাপের আর-কিছু বলিবার সাহস হইল না। যে-প্রেমের অসহ্য পুলকে তাহার শরীর-মন শিহরিয়া উঠিতেছিল, তাহার কণামাত্রও সে যামিনীর নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না। যামিনী একটু যেন বিস্মিত হইল। কিন্তু ইহাই এখন শ্রেয় তাহা বুঝিল।

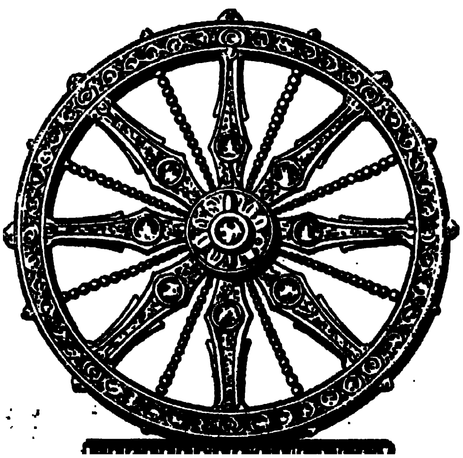
অনেকক্ষণ নীরবে থাকার পর প্রতাপ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি তবে আসি এখন।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "খোকাকে পড়াতে আজ আসবেন না?"

প্রতাপ বলিল, "তার ত এখনও ঘণ্টা-দুই দেরি আছে। ততক্ষণ এখানে বসে থাকা কি ভাল দেখাবে? বরং একটু ঘুরেই আসি।"

যামিনী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

ক্রমশঃ



শিক্ষা-সঙ্কট

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

গল্পটি বলিতে গিয়া প্রথমেই রবিবাবুর সেই লাইন ক'টি মনে পড়িয়া যায়। পরিচিত হিসাবে একটু বদলাইয়া বলা চলে—

বেচারা ছিল ষ্টেশন-খাঁচাটিতে
সুচারু, স্বরাজের রণে,
একদা কি করিয়া বিবাহ হ'ল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে—

বড়বাজার হইতে ঠিক দুপুরে পিকেটিং সারিয়া আসিয়া বেথুন কলেজের প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী সুচারু শুনিল তাহার বিবাহ। এই লইয়া একটা প্রোটেষ্ট মিটিঙের যোগাড়যন্ত্র করিবার কিংবা তাড়াতাড়ি জেলে ঢুকিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই সে বধূবেশে বি-এন্-ডব্লিউ-আর-এর একটি ষ্টেশনে—সুদূর বেহারে, তাহার স্বামি-ঘরে আসিয়া হাজির হইল। ব্যাপারটির আকস্মিকতা সম্বন্ধে বন্ধুকে-লেখা তাহার নিজের একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"ভাই, চোখে দেখতে দিলে না, কানে শুনতে দিলে না; একেবারে ঘাড়ে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল। যখন বুঝলাম—এ প্রভাতফেরিও নয়, বড়বাজারও নয়, পুলিসও নয়, তখন too late—সময় উৎরে গেছে; দেখি গাড়ি থেকে নেমে মূর্ত্তিমতী civil disobedience-এর মত পিছনে পিছনে স্বামীর ঘরে ঢুকছি…"

প্রথমবারে অতটা বোঝা যায় নাই। বিয়ের উপলক্ষে আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়িটা গমগম করিতেছিল; তিন-চারিটা দিন গোলমালে একরকম কাটিয়া গেল। অবস্থাটা টের পাওয়া গেল ঘর করিতে আসিয়া; প্রাণটা যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল।

জায়গাটি অজ্ পাড়াগাঁ। চারিদিকে টানা মাঠ, মাঝখানটিতে ষ্টেশন আর গোটাকতক কোয়ার্টার্স। তারের বেড়ার বাইরে এখানে-ওখানে ছড়ান দু-চারটা দরিদ্র চালার ঘর,—থাকে দর্শাই, নবাবজান, বুধনী, তেতরী, দুখীয়ার মা,—কেহ কুলীর কাজ করে, কেহ ইঞ্জিনের ছাই বাছিয়া বাবুদের কয়লা জোগায়, কেহ মালগুদাম ঝাঁট দিয়া ধান গম বাছিয়া দিন গুজরান্ করে।

স্বামীটির জীবন তাহার ষ্টেশনে আর ক্ষুদ্র কোয়ার্টার্সটির মধ্যে বিভক্ত। চারিদিকের নিরুদ্বেগ নীরবতার সঙ্গে একসুরে বাঁধা,—কোন সাড়া নাই, তাড়া নাই, সেই একই ভাবে মন্থর গতিতে ষ্টেশনে যাওয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন। গাড়ির মতই, লাইন আর ছকা টাইম-টেবলের দাস। কোন দিন আহার করিবার সময় যদি ডিষ্ট্যান্ট সিগ্‌নালের কাছে গাড়ি হুইসেল দিল ত একটু মানুষের ভাব আসে—একটু চঞ্চলতা, একটু বকাবকি, আড়ষ্ট পা ছুটিতে একটু ক্ষিপ্রতা।…সেটার মধ্যেও কেমন একটা গাড়ির লেট মেক্-আপ করার ভাব…

বৈচিত্র্যহীন কথাবার্ত্তা—গ্রামোফোনের প্রাণহীন সঙ্গীতের মত। খানিকটা দম দিলে এই নূতন-পাওয়া কল থেকে বড়বাবুর, টু-ডাউন, ফিফ্‌টিসেভেন-আপ গুড্‌স্, নূতন টি·আই, জংশনে বদলির আশা, কিংবা বড়-জোর ডি-টি-এস্ আপিসের এষ্টাব্লিশমেণ্ট ক্লার্কের থিয়েটারের সখ—এই সব সম্বন্ধে নানা তথ্য সব বাহির হইয়া আসিতে থাকে। নবপরিণীতার চোখের সামনে কতকগুলা ছবি বৈষম্যহেতু বেশী স্পষ্ট হইয়া ওঠে—শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তাঁহার স্ফুলিঙ্গ শতসহস্র প্রাণকে শিখায়িত করিয়া তুলিল… সবুজ শাড়ীপরা মেয়েদের বাহিনী—তাহাদের ঘিরিয়া বড়বাজারের জনস্রোতে মাঝে মাঝে ঘূর্ণী জাগিয়া উঠিতেছে …সমস্ত ভারত মুখর…ও প্রান্তে ঐ গুজরাটের বাপুজীর ডাণ্ডি যাত্রা—সমস্ত পৃথিবী মূক বিস্ময়ে চাহিয়া…

এদিকে শোনে—"…তখন বড়বাবু গিয়ে ডি-টি-

এদ্রকে ধ'রে ব'ললেন—'হুজুরই মা বাপ', হুজুর না রক্ষা করলে…"

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "এখানে কাগজ নেয় না কেউ?"

স্বামী খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া ওঠে—"কেন, বড়বাবু ত নেন,—পাক্ষিক 'বসুধারা,'—নানান রকম খবর থাকে। তাই থেকেই তো সেদিন টের পেলাম যে আমাদের লাইনটা গবর্ণমেন্ট বোধ হয় শীগগীর নিচ্চে না…"

এই রকমই কোন কথাবার্ত্তার মাঝে স্ত্রী একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"আচ্ছা, গান্ধীজীর নাম শুনেচ?…গবর্ণমেন্ট যে রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সে সবাইকে ডেকেচে…"

কথাটার মধ্যে একটু খোঁচা ছিল। স্বামী একটু অপ্রতিভভাবে হাসিয়া বলিল—"নাঃ, খোদ গিন্নী আমার গান্ধীজীর ভলাণ্টীয়ার ছিলেন, আমি আর নাম জানব কোথা থেকে?" তাহার পর সত্যই যে জানে সেটা প্রমাণ করিবার জন্ত তারিফে হইয়া বলিল,—"লোকটা কি চরকাই কাটতে পারে, উঃ। যে-ছবিই দেখ—নাগাড়ে চরকা কেটে যাচ্ছে। আমাদের বড়বাবু কিন্তু বেজায় চটা, বলেন…"

প্রতিবেশীর মধ্যে এই বড়বাবু, মালবাবু, আর পোষ্টমাষ্টার বাবু—বাঙালী এই তিন ঘর। আর এক ঘর আছে, তবে তাঁহাকে ঠিক প্রতিবেশী বলা চলে না,—মাইল-দুয়েক দূরে সুরজপুরার কয়ালীবাবু,—তামাকের ব্যবসা করেন আর কিছু জমিজমাও আছে। সংক্ষেপে 'তামাকবাবু' নামে পরিচিত। উৎসবে ব্যসনে সব ক'টি একত্র হয়।

আমার মনে হয় বি-এন্-ডব্লিউ-আর-এর বড়বাবু বলিলেই পরিচয় দেওয়া হইয়া গেল। সেই মাথায় প্রায় একই রকম টাক, তাহার নীচে একই রকম কাঁচাপাকা আধা-বাবরী চুল, বেঁটেসেঁটে গোলগাল চেহারা, অহেতুকভাবে ব্যস্ত, অথচ প্রায় সবার মধ্যেই বেশ একটি প্রসন্নতার ভাব। আর কি করিয়া জানি না, সব বর্দ্ধমান জেলার বাড়ি। অন্ত জেলা হইলেও খোঁজ লইয়া দেখিয়াছি—বর্দ্ধমান জেলারই কোন রেলষ্টেশন হইতে বেশী কাছে পড়ে।

ছেলেবেলা হইতে আমার কেমন এ লাইনের ষ্টেশন-মাষ্টার লইয়া একটা বাতিক আছে। ষ্টেশনে গাড়ি থামিলেই আমি মুখ বাড়াইয়া থাকি, আর দেখিলেই চিনিতে পারি।

ঐ করিয়া ছেলেবেলায় কেমন একটা ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, যে-কোন লোককে এ-লাইনের ষ্টেশন মাষ্টার করিয়া দিলে ঐ রকম হইয়া যাইতে বাধ্য। আমাদের বাড়ির পাশে কুমারদের ছাঁচে ঢালিয়া পুতুল গড়া দেখিয়া ধারণাটা কেমন করিয়া বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। আমাদের পাড়ার তারু মেসো ছিলেন লম্বা, রোগা আর বেজায় বদমেজাজী; মাসীমার সঙ্গে প্রায় খিটিমিটি হইত। মনে আছে একদিন ঝগড়ার পর গভীর সহানুভূতির সহিত মাসীমাকে আমার চিকিৎসাটার কথা বলি—

মাসীমা আশ্চর্য্যভাবে হাত দুটো তুলিয়া বলেন—"কেন, ইষ্টিশন মাষ্টার হ'লে কি হবে?"

"তা হ'লে সর্ব্বদা হাসবেন, আর বেঁটেও হবেন, মোটাও হবেন।"

মাসীমা—"ভবেয়্যা অলপ্পেয়ে…" বলিয়া তাড়া করেন।

বড়বাবু গান্ধীজীর ওপর মর্ম্মান্তিক চটা। ইহার বিশেষ অন্ত কিছু কারণ নাই; কারণ শুধু এই মাত্র যে গান্ধী একটি নূতনত্ব। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সেই একই টাইম্ টেব্‌ল্-নিয়ন্ত্রিত একই রকম গাড়িগুলিকে আবাহন ও বিদায় করিতে করিতে আর সেই একই রকম ষ্টেশন ও কোয়ার্টার্স-এর মধ্যে আনাগোনা করিতে করিতে যে-কোন রকম নূতনত্বের উপর একটা অবিশ্বাস আর বিদ্বেষ দাঁড়াইয়া যায়ই—দোষ দেওয়া চলে না। নিজের সহযোগীদের একত্র করিয়া বড়বাবু বলেন—"গবর্ণমেন্ট ত ব্যতিব্যস্ত হবেই—তোমাদের নিজেদের কথা ভেবে দেখ না গো…জান, দিনে-রেতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাতখানি গাড়ি আসবে, সাতখানি যাবে; বেশ নিশ্চিন্দি আছ,—হঠাৎ খবর এল স্পেশ্যাল গুড্‌স্ রান করচে, কেমন সামাল-সামাল প'ড়ে যায়? মনে হয় না? এ আবার

কোথা থেকে এক উপদ্রব এসে জুটল রে বাবা!... লাটসাহেব থেকে আর গ্রামের চৌকিদারটি পর্য্যন্ত লাইন বাঁধা—হাজার রকম কাজ—সেইগুলোকে গাড়ি ব'লে ধরে নাও—দিব্যি গতায়াত চলবে;—মাঝখান থেকে তোমার গান্ধী বলে বসলেন—আমি এর মধ্যে আমার খদ্দরের মালগাড়ি এনে ফেলব!"

কথাটা এমন জায়গায় ঘা দেয় যে সমস্ত আন্দোলনটি এককথায় পরিষ্কার হইয়া যায়। নীরব প্রশংসায় কেহ ঘাড় নীচু করিয়া টেবিলে আঁচড় কাটিতে থাকে, কেহ কেহ বা পরস্পরের মুখের দিকে চায়, কেহ বলে,—"অথচ এই সহজ কথাটা কেউ বোঝে না, দেখুন ত!"

কথাগুলো অন্দরমহল পর্য্যন্ত পৌঁছায়। "বড়বাবু যখন ব'লতে আরম্ভ করেন—বুঝলে গা?..."

সুচারুর কানেও ওঠে। আগে চুপ করিয়া থাকিত; এখন বলে,—"আমার সামনে ব'লতেন তবে ত..."

স্বামী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, বলে,—"তুমি কি বড়বাবুর সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া ক'রতে না-কি?"

বড়বাজারের ভূতপূর্ব্ব ভলন্টিয়ার সোজা জবাব দেয়—"কেন, বড়বাবু পীর না-কি?"

২

ঠিক কোমর বাঁধিয়া সামনাসামনি ঝগড়া এখনও হয় নাই, তবে এক সময় যে না হইতে পারে একথা জোর করিয়া বলা যায় না, কারণ অন্তরীক্ষ হইতে যুযুধান দুই পক্ষই বাক্যবাণ মোচন করিতেছেন এবং সেগুলি নিয়তই লক্ষ্যস্থানে পহুঁছিয়া প্রতিপক্ষকে জর্জরিত করিতেছে।—

স্বামী বলে, "তুমি, বুধনী আর দুখীয়ার মাকে চরখা দিয়েচ বুঝি? কেন এসব বাই বল দিকিন? বড়বাবু এই-সব নিয়ে যখন বাক্যি ধরেন, আমার ত লজ্জায় মাথা কাটা যায়; বলছিলেন,—'আর কেন বৃথা খেটে মরি, মালবাবু? গিন্নীরা স্বরাজ উইন্ ক'রলে অন্তত মোটা পেন্সন একটা ত পাবই,—বলে—'সতীর পুণ্যে পতির স্বর্গলাভ...'"

সুচারু হাসিয়া বলে—"আমার নাম ক'রে ব'লো—ব'লছিল—পতিদের নিতান্ত সেই রকম অধঃপতন না হইলে এ রকম ভরসার কথা মনে উদয় হয় না; দ্রৌপদী সতীর যখন বিবস্ত্রা হবার উপক্রম, তাঁর পাঁচটি পতিদেবতা নিশ্চয় নিশ্চিন্ত মনে ব'সে এই রকম স্বর্গবাসের কোন মহৎ কল্পনায় বিভোর ছিলেন। ভাগ্যিস্ বেচারীর তাঁদের আশা ছেড়ে দিয়ে নিজের উপরই নির্ভর করবার সুবুদ্ধিটা যুগিয়ে দিয়েছিল... কথাগুলো বলতে পারব ত?"

স্বামীর এখানেও মাথা কাটা যায়। লজ্জিত ভাবে বলে,—"হ্যাঃ, আমি তাঁকে ব'লতে গেলাম;...একটা মুরুব্বি লোক..."

কিন্তু কথাগুলো পৌঁছায়, অন্য সূত্র দিয়া,—আরও সালঙ্কারে, টিকাটিপ্পনী সমন্বিত হইয়া।

দুপুরবেলা যখন কর্ত্তারা ষ্টেশনে, মালবাবুর বাড়িতে মেয়েদের জমাট মজলিস্ বসে। বড়বাবুর স্ত্রী, কন্যা, বিধবা ভগিনী কিরণলেখা, পোষ্টমাষ্টারের খুড়ী আর দুইপক্ষ, স্বয়ং গৃহকর্ত্রী—এঁরা নিয়মিত সভ্যা। ক্যাজুয়েল ভিজিটার্ বা আগন্তুকদের মধ্যে তেতরী, দুখীয়ার মা, সুন্দরী, বুধনী। কখন কখন হঠাৎ "তামাকবাবু"র বলদে-টানা শাম্পেনি আসিয়া হাজির হয়; দুই কন্যা নামিয়া পিছনের পা-দানির দুই পাশে সতর্ক ভাবে দাঁড়ায়, গাড়োয়ান গিয়া বলদের জুয়াল চাপিয়া ধরে, তার পর হুঁকা হাতে—মাঝে মাঝে দু-একটি টান দিতে দিতে আর অস্বাভাবিক ভাবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামেন "তামাক-গিন্নী" হিন্দুস্থানীরা বলে, "তামাকু মাইজী," বাবুরা আখ্যা দিয়াছেন "টোব্যাকো কুইন"... সুবিপুল শরীর—যেমন দীর্ঘ, তেমনি আড়ে; হিন্দুস্থানীদের বার হাতি শাড়ী না হইলে কুলায় না। নামিয়াই মালবাবুর স্ত্রীকে বলেন,—"কই গো, মালিনী দিদি, আমার ছিলিমটা আগে ভরিয়ে দাও ভাই। এইটুকু আসতেই হাঁপিয়ে মরলাম,—বিপদ্মর মোটা হওয়া যে কি বিপত্তি..."

তাহার পর কন্যার দিকে চাহিয়া রাগিয়া বলেন,—"তবুও তোর বাপ বলবে—'আরও দু-খানা লুচি বাড়াও...আধখানা হ'য়ে গেছ'...মিথ্যেরও ত একটা সীমে আছে?"

তারযুক্ত স্প্রিং-এর শাম্পেনি তখনও দুলিয়া দুলিয়া সায় দিতে থাকে।

মজলিস্‌টা মুখ্যতঃ তাসের—গৌণতঃ নানা প্রসঙ্গের আলোচনা হয়, হাতের কাছে যাহা-কিছু পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য যে সে রকম মুখরোচক প্রসঙ্গ জুটিলে গৌণটাই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়।—তাসের মতই ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া, ফেটিয়াফাঁটিয়া সবার মধ্যে চারাইয়া দেওয়া হয়, তাহার পর সবাই নিজের নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী গুছাইয়া-সুছাইয়া তাসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের মন্তব্য দিতে থাকে—মাথা দুলাইয়া, পানের রসের সঙ্গে গুল দোক্তা জরদার ঝাঁঝের সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া···

কোন দিন প্রসঙ্গটা হয়ত ঠাট্টার সঙ্গে হাজির হইল। মালবাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"কি গো বড়গিন্নী, কথায় কথায় এত ভুল আজ? গোলামকে আর ছুটো ক্ষেপ হাতে রাখতে পারলে না?"

বড়গিন্নী একটিপ গুল ঠোঁটের নীচে টিপিয়া লইয়া বলিলেন,—"গোলামকে হাতে রাখতে হ'লে বিবির সেপাই হ'তে হয়—তা'ত আর বাপমায়ে করেনি দিদি···"

শরটির লক্ষ্য কোথায় সবাই বুঝিল। কেহ মুখ টিপিয়া হাসিল, কেহ শুধু মাথা নাড়িল, কেহ চিন্তিত ভাবে তাস ফেলিয়া শুধু বলিল—"তা বটে।"

বড়গিন্নী বলিলেন—"কালকে সেই কথাই 'ও' ব'লছিল কি-না—'তুই পঞ্চাশটি টাকার একটা য়্যাসিষ্টেণ্ট—তোর পাশ-করা বৌয়ের কি দরকার বাপু? আবার ভলেণ্টিয়ার! সামলা এখন···"

কিরণ বলিল—"মেয়েটি কিন্তু বড় ভাল বাপু, যাই বল; আমি দু-দিন গিয়েছিলাম কি-না—সর্ব্বদাই হাসি—খুব আমুদে; তা'র মাঝে স্বদেশীর কথাও হয়। তা এমন গুছিয়ে বলতে পারে যে, আমাদেরই মনে হয়··"

তাজ জুড়িয়া দিলেন—"কাছাকোঁচা এঁটে বেরিয়ে পড়ি।"

পোষ্টমাষ্টারের দ্বিতীয় পক্ষ হাসিয়া বলিল, "দাদাকে বন্দুক তলোয়ার কিনে দিতে ব'লতে হবে, না, যা বাণ আছে তাইতেই চ'লবে?"

কিরণ ফিরিয়া চাহিল, হাসিয়া বলিল—"মরণ আর কি!···তা না চলে, যাদের অস্ত্রে রোজ শান্ পড়চে তাদের নিয়ে গেলেই হবে।"

মালবাবুর স্ত্রী বলিলেন—"তা তাকে নিয়ে আসিস্ না বাপু ডেকে। আহা, পাস করেচে বলেই যে লোক মন্দ হবে তার কি মানে আছে, শহরে ত ও-রোগ এখন ঘরে ঘরে।"

কোন দিন তেতরীর মেয়ের নবীনতম দাম্পত্য-বন্ধনের কথা ওঠে। "শুনেচ গা তামাক-গিন্নী—লছমিনিয়ার এ-বরের সঙ্গেও বনল না!

তামাক-গিন্নী হুঁকা হইতে মুখ ছিনাইয়া লইয়া বলেন—"ঝাঁটা মার দেশের মাথায়।"

ছোটদের মধ্যে কেহ বলে—"এ-দেশ না হ'লে কিন্তু তোমার হুঁকো তামাক বন্ধ হয় ঠান্‌দিদি।

ঠানদিদি হাসিয়া বলেন—"তা মিছে নয় ভাই; রেণুর বিয়েতে তিনটি দিন ঠিক ছিলাম মেমারীতে—ঠিক তিনটি দিন গোণাগুণতি, পেট ফুলে যাই আর কি! হুঁকো তামাক নেই, সে আবার দেশ ম্যাগ্‌গে!"

··নাঃ, সে বিষয়ে এ দেশের যশ গাইতে হয় বই কি।

হুঁকায় দমদস্তরা জোর টান পড়ে।

যেদিন অন্য বিষয় না থাকে, ঝোঁক পড়ে বাড়ির কর্ত্তাদের ওপর। এ-প্রসঙ্গে সবাই এমন সহজ অথচ গভীর অভিজ্ঞতার সহিত দখল দিতে পারে যে প্রসঙ্গটি বেশ অল্পের মধ্যেই পুষ্ট হইয়া শাখাপ্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া ওঠে।

আসিবার অল্প কয়েকদিন পরেই কিরণলেখা সুচারুকে টানিয়া আনিয়া মজলিসে হাজির করিল। প্রথমটা সে আসিতে চায় নাই; তাহার কারণ তাহার মনটা তখন কলিকাতার জীবনে খুব বেশীরকম সংলগ্ন ছিল। ক্রমে যে-আবহাওয়া তাহার মনটাকে এত বেশী করিয়া কলিকাতায় ঠেলিয়া রাখিত সেই আবহাওয়াই তাহাকে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে একটা আপোষ করিতে বাধ্য

করিল। সে ভাবিল—দেখা যাক্, এখানকার জীবন থেকেই বা কি পাওয়া যায়; এই ত সম্বল এর পরে।

অল্পদিনের ভিতরেই এই জমায়েতটুকুর মধ্যে সুচারুর একটি বিশিষ্ট জায়গা মিলিয়া গেল, এবং ইহার মধ্যবর্ত্তিতায় সাধারণভাবে পুরুষমহলের সঙ্গে এবং বিশেষভাবে বড়বাবুর সঙ্গে দিনের পর দিন তাহার বোঝাপড়া চলিতে লাগিল।

কেহ শুধু বার্ত্তাবাহিকারই কাজ করে,—ওদিককার খবর এদিকে আর এদিককার খবর ওদিকে হাজির করিয়াই খালাস। এ দলে আছেন বড়গিন্নী, মালবাবুর স্ত্রী, পোষ্ট-মাষ্টারের প্রথমপক্ষ। কতক,—বিশেষ করিয়া নবীনাদের মধ্যে—সুচারুর দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং নূতন দীক্ষার উৎসাহে গুরুকেও টপ্‌কাইয়া গিয়াছে। এ দলে, নবীনা না হইলেও আছেন "তামাক-গিন্নী"। পরোক্ষ-আগত পুরুষদের কথায় সুচারু যখন জবাব দিতে থাকে, তখন ইহারা প্রচণ্ডবিক্রমে যোগান দেয়—মূল-গায়েনের চেয়ে দোয়ারদের সুর চড়া হইয়া ওঠে। তামাক-গিন্নী হুকায় ঘন ঘন টান দিতে দিতে বলেন—"...তা হক কথা কইতে কখনও ডরাই না বাপু—কেন, পুরুষদের কি একটা ক'রে লেজ আছে যে সব-তা'তে তাঁরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হবেন?"

পুরুষদের পক্ষও যে অবলম্বন করিবার লোক নাই এমন নয়—পোষ্টমাষ্টারের খুড়ী আছেন। মজলিস ত্যাগ করিয়া সুচারু উঠিয়া গেলে দুয়ারের দিকে লক্ষ্য করিয়া সংক্ষেপে মন্তব্য দেন—"গলায় দড়ি।"

গলায় দড়ি কিন্তু কাহার,—সুচারুর, না পুরুষ-মাত্রেরই?...তাহাদের একমাত্র উকিল—পুরাতনের জীর্ণাবশেষে ভীমরতিগ্রস্ত এই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধার অভিমতটা চব্বিশ ঘণ্টাও টেঁকে না। পরের দিন সুচারু মাথার পাকাচুল তুলিয়া দিতে দিতে যখন হাসির প্রশ্ন করে—"হ্যা রাঙাঠাকুরমা, আমার নাকি কাল গলায় দড়ির ব্যবস্থা হয়েচে?" তিনি আকাশ থেকে পড়েন, বলেন—"বালাই ষাট, কে অমন কথা বলে গ্যা—জিবের একটু আড় নেই?—বালাই ষাট; সিঁথির সিঁদুর বজায় থাক, নাতি নাতকুড় নিয়ে ঘর..."

হাসির হর্‌রায় আশীর্ব্বাদের স্রোত চাপা পড়ে।

কিরণলেখা বলে—"আপাততঃ নাতিনাতকুড়দের ঠাকুদ্দার সঙ্কেই ঘর-করা মুস্কিল হয়ে পড়েচে, রাঙা-ঠাকুরমা।"

বক্রসাটা ঠিকমত ধরিতে না পারিয়া বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করেন—"কার সঙ্গে?"

সুচারু হাসিমুখে কথাটা ঠোঁটে পিষিয়া আস্তে বলে—"মরণ তোমার।"

কিরণ বলে—"কি জ্বালা! বরের সঙ্গে গো।...এ ব'লে চরখা কাটো, সে বলে টিকিট কাটবে কে?"

ঠাকুরমা বলেন—"তা ত ঠিকই বলে বাছা, টিকিট না কাটলে..."

ঠিক তালের মাথায় সুচারু বাধা দেয়; মুখটা হঠাৎ ঠাকুরমার মুখের সামনে আনিয়া বলে—"শরীর ত তোমাদেরই, রাঙাঠাকুরমা—এখনও এত কাঁচা চুল মাথায়।...হ্যা ঠাকুরমা, কে ঠিক বলে বলত?... না, আমি বলেই যে আমার মুখ চেয়ে বলবে, তা ব'লো না কিন্তু।"

ওদিকে আগুন জ্বলে। আরও মোলায়েম ভাবে চলিতে থাকে। ঠাকুরমা একটু ফাঁপরে পড়িয়া যান। খোসামোদ আর নগদ আরামের মোহ কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়া বলেন—"বলছিলাম, তা আর কি এমন অন্যায় কথা বলিস ভাই..."

আবার হাসির লহর ওঠে। কালা মানুষ আবার যাহাতে চটিয়া না যায় তাহার জন্য তাড়াতাড়ি একটা মনগড়া কারণ খুঁজিয়া বলিতে হয়।

কথাগুলো রাত্রে বড়বাবুর কানে ওঠে মন্তব্যসমেত। বড়গিন্নী হাসিয়া বলেন—"খুব উকিল পেয়েছ, যাহোক্।"

বড়বাবু ভারী হইয়া ওঠেন। বলেন—"একটা বুড়ো-হাবড়ার কাছে আর বাহাদুরি কি, পড়েন একদিন শর্ম্মার মুখের সামনে, ডলপিয়ারি ঘুচিয়ে দিই—শুধু কথার তোড়ে যতো সব..."

বড়গিন্নী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলেন—"সে পারব না বাপু, কেন মিছে বড়াই কর।"

বড়বাবু কপালে চোখ তুলিয়া বলেন—"আমি বড়াই

করছি! ঐ একফোঁটা একটা কনেবউ ওর কাছে আমি মুখে হারব,—তুমি যে অবাক করলে!…"

এই সময় বরাবর ওদিকেও প্রায় এই ধরণেরই আলাপ চলিতে থাকে।—স্বামী হীক ষ্টেশন মজ্‌লিসের রিপোর্ট হাজির করিয়া বলে—"বড়বাবুর মুখের কাছে ত পারবার জো নেই, বললেন—" ইত্যাদি—

বধূ সুচারু বলে,—"এক পাল মেনীমুখো পুরুষের সামনে ও-রকম সবারই কথা ফোটে। পড়তেন আমার সামনে…"

স্বামী বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে তাকাইয়া বলে—"বল কি তুমি!"

স্ত্রী বলে—"কেন, বড়বাবু কি পীর না পয়গম্বর, শুনি?"

সাক্ষাৎকারের এরকম প্রবল বাসনার জন্যই হোক, আর যে জন্যই হোক্, রহস্যপ্রিয় বিধাতাপুরুষ একটু সুযোগ করিয়া দিলেন।

ঠিক সুযোগ বলা যায় না, দুর্যোগ?

৩

গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; অসহযোগ আন্দোলন কিছুদিন মুলতুবি রহিল।

দেশের নারীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের শক্তির প্রকৃত পরিচয় পাইয়া এই অবসরে জাতির মধ্যে তাঁহাদের স্থানটা কোথায় সেই সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিয়া লইতে চান।—যেখানে তাঁহারা স্ত্রী সেখানে আসলে তাঁহারা কি?—চরণাশ্রিতা দাসী, না তুল্যপদস্থা, না অভিভাবিকা?… যদি অভিভাবিকা নয় ত কেন নয়? কোন্ স্বার্থান্বেষী ধূর্ত্ত, কোন্ প্রবঞ্চক দায়ী তাহার জন্য?

স্বরাজ সেনার অনেককে না পাইলেও এ বাহিনীর তেমন ক্ষতি হয় নাই, কেন-না, এই গৃহযুদ্ধে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিবার মত কর্ম্মিণীর মোটেই অভাব হয় নাই।

কেহ কেহ বলিতেছেন, "কেন, আর স্ত্রী হওয়াই বা কিসের জন্য? ঢের হইয়াছে; একেবারে গোড়ায় কোপ দিয়া আলাদা হও। পুরুষের বুজরুকি এতদিনেও চিনলে না?"

"উগ্রশক্তি" কাগজখানা নেহাৎ-ই উগ্রশক্তি বলিয়া নিজের উত্তাপে দগ্ধ হইয়া যায় নাই।

এই সবের প্রতিধ্বনি সুচারুর বন্ধুর চিঠিতে খানিকটা শব্দিত হইয়া উঠিয়াছে। লেখা আছে—"…যাক্, যা হয়ে গেছে তার ত আর চারা নেই; এখন যাতে মানুষটির মাথায় পুরুষের সেই চিরন্তন বর্ব্বর ধারণাগুলি বাসা বেঁধে তাকে অত্যাচারী, অসহিষ্ণু, দাম্ভিক, আত্মম্ভরী, অবিনয়ী, কঠোর—অর্থাৎ 'পুরুষ' বলতে পৃথিবী যা এতদিন বুঝে এসেচে তাই না ক'রে তোলে সেদিকে নজর রাখতে হবে। এর জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা চাই। ওদের কর্ম্মজীবনের মধ্যে থেকে, ওদের চিন্তার মধ্যে থেকে—এক কথায় ওদের নিজেদের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে ওদের টেনে বার ক'রে আনতে হবে। পুরুষের Czar যুগ নাই হয়েচে একথা ওদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়ার ভার আমাদের উপর; আমরা যদি এতে অপারগ কি পশ্চাৎপদ হই ত আমাদের ধিক—শত ধিক—সহস্র ধিক…"

পুরুষের সংসর্গই হানিকারক, অন্ততঃ সুচারুর যে অধঃপতন ঘটিয়াছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সে, শত্রুপক্ষের প্রতিনিধি তাহার স্বামীকে পত্রখানি দেখাইয়াছে, এবং এইখানি উপলক্ষ্য করিয়া নিতান্ত লঘুভাবে তাহাদের যে একচোট রহস্যালাপ হইয়া গিয়াছে তাহা শুনিলে নিতান্ত সহিষ্ণু নবীনারও সিধা মাথা হেঁট হয়। শেষের দিকে স্বামী থিয়েটারী ঢঙে নতজানু হইয়া, চিঠির অতিরিক্ত আরও গোটাকতক বিশেষণ নিজের স্কন্ধে চাপাইয়া বলিল,—"দেবি! এখন এই অবিনয়ী পাষণ্ড, গোলামভাবাপন্ন বর্ব্বরকে কি দীক্ষা দেবেন আদেশ করুন।"

সুচারু হাসিয়া বলিল,—"না, আর তামাসা নয়, ওঠ, সত্যিই তোমাদের একটু শিক্ষা দরকার, অন্তত এখানকার পুরুষগুলির।…আচ্ছা, সত্যি বল দিকিন, ভাল লাগে তোমাদের এই একঘেয়ে জীবন—ঐ ষ্টেশন আর এই কোটর?…রাগ ক'রো না—আমি একটা নতুন তথ্য আবিষ্কার করেচি। তোমাদের মনে যে এতদিনেও ভাল

একটা চিন্তা ঢোকাতে পারলাম না তার কারণ ভেবে দেখলাম—তোমাদের মনে জায়গা নেই; গলিতে ত আর ফসল হয় না, ফসল হবার জন্যে জায়গার প্রসার চাই, সেখায় আলো বাতাস খেলা চাই। আমি ঠিক করেছি এই শান্তির সময়টুকু আর চরখা, খদ্দর নিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে মারামারি করব না। ওদিকটাই এখন ছেড়ে দিয়ে সবার মনের উৎকর্ষের দিকে চিন্তা দেব…"

স্বামীর মুখে কৌতুকপূর্ণ হাসি: জিজ্ঞাসা করিল—"কি ক'রে ?"

"মনে কিছু অন্য চিন্তাও আন দিকিন সব, চাকরির বাইরের চিন্তা। খালি টেবিলের সামনে মুখ গুঁজড়ে…"

"অন্য রকম চিন্তা খুব নিরাপদ নয়। এই দেখ না, সেদিন একটা দরকারী টেলিগ্রাম করতে করতে হঠাৎ মাথায় অন্যরকম চিন্তা ঢুকে এমন বিশ্রী রকম গোলমাল ক'রে দিলে যে সামলাতে…"

হাসির ভঙ্গী দেখিয়া সুচারুর আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে তখনও রহস্যই চলিতেছে। সেদিন আর এ প্রসঙ্গ জমিতে পারিল না।

কিন্তু সুচারুও ছাড়িবার পাত্রী নয়। নিজের গৃহে তাহার চেষ্টা ত অপ্রতিহতভাবে চলিলই, তাহা ভিন্ন মজলিসেও এমন জোর প্রপাগাণ্ডা আরম্ভ করিয়া দিল যে, প্রায় সকল সভ্যাই আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং স্বামি-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। তবে সুখের বিষয় গৃহে কোন রকম অশান্তির সৃষ্টি হইল না। সুচারুর লেখা একখানি চিঠি থেকে তুলিয়া বলিতে গেলে—"এখানকার অধিকাংশ স্বামীই এমন সিভিল আর ওবিডিয়েণ্ট যে, অল্প চেষ্টাতেই কাজ হাসিল হইয়াছে;—দু-একজন ত চাওয়ার অধিক দিয়ে বসে আছে; আহা বেচারী সব…"

তামাক-গিন্নীর ত এক রকম স্বরাজ ছিলই, এখন একেবারে পূর্ণকর্ত্তৃত্ব। পোষ্টমাষ্টার বাবুর দ্বিতীয়পক্ষের শেষ রিপোর্ট—"কাল রাত্রে খোকা উঠলে ও-ই ঘাড়ে ক'রে বাইরে নিয়ে গেল, খোয়ালে মোছালে, ঘুম পাড়ালে… ক'রবেই বা না কেন বল,—এতদিন ভুল ক'রে একাই ত ক'রে এসেছি।" এমনি কি, বৃদ্ধ মালবাবুর পর্য্যন্ত সুমতি হইয়াছে। অজীর্ণ রোগী বলিয়া তিনি বরাবরই সকালে বেড়াইতে যান; আজকাল দুই পকেটে আলু পটল লইয়া বাহির হন এবং একখানি ছুরির সাহায্যে কুটনা কুটিয়া নিজের অভিনব কর্ত্তব্যরাশির প্রথম দফা সাঙ্গ করিয়া বাড়ি ফেরেন।…

সুচারু হাসে। ভাবে, দলপতিকে ছাড়াইয়া দল অনেক সময় আগাইয়াই চলে, তাহারা নিজেরাই কি গান্ধীজীর নরম ভাব লইয়া সব সময় কাজ করিতে পারিত ?

সে নিজেরটিকে উন্নত প্রণালীতে গড়িয়া তুলিতেছে। কাব্য উপন্যাস, স্বদেশ-সংক্রান্ত অনেক বই পড়িয়া শোনায় কিংবা পড়াইয়া শোনে। "উগ্রশক্তি"তে তাহাকে দিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার সপক্ষে এমন একটা নিবন্ধ লিখাইয়াছে যে, সেটা প্রায় পুরুষস্বাধীনতার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্নারাত্রে একদিন নদীর পুল পর্য্যন্ত স্বামীকে লইয়া বেড়াইতেও গিয়াছিল। নিয়ত বৈকালে সস্ত্রীক বেড়াইতে যাইবে বলিয়া হীরু কথাও দিয়াছে; স্ত্রীর কাছে আপাতত কয়েক দিনের মহলৎ লইয়াছে এই বলিয়া যে "এখনও বড্ড কিন্তু কিন্তু বোধ হয়, পা জড়িয়ে আসে…"

বাকী কেবল বড়বাবু। তা তিনি এখন কয়েক দিন যাবৎ উপস্থিত নাই। প্রতিবৎসর এই সময়টা সপ্তাহ-কয়েকের ছুটি লইয়া দেশে যান, ক্ষেতের ধানচালের বিলি করিয়া আসিতে। এবারেও গিয়াছেন। অন্য পুরুষগুলিকে যে-রেটে তালিম দেওয়া হইতেছে, তাহাতে তামাকগিন্নী, সুচারু প্রভৃতি মনে করিয়াছিল বড়বাবুকে লইয়া বেশী বেগ পাইতে হইবে না। তাহার পর সব পুরুষগুলির মানসিক উৎকর্ষের জন্য একটা ক্লাব-গোছের প্রতিষ্ঠিত হইবে। শেষে, তাহাদের সঙ্কীর্ণতা একেবারেই লোপ পাইলে স্ত্রীরাও গিয়া যোগদান করিবে—এই ছিল খসড়া।

বড় ভুল বুঝিয়াছিল। বড়বাবু আসিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার পর প্রথমেই একসেট নূতন নাম সৃষ্টি করিলেন। হীরু হইল 'হীরামন বিবি'; পোষ্টমাষ্টারবাবু হইলেন 'মেজগিন্নী', বৃদ্ধ মালবাবু হইলেন 'বাবুইয়া।' বাইরে সমস্ত দিন ঠাট্টাতামাসায় জর্জরিত হইয়া হীরু আসিয়া বলিল—"না বাপু, ওসব সাহিত্যচর্চ্চা, বেড়ান আমার দ্বারা হবে না—দিব্যি তো ছিলাম…"

অন্ত স্বামীগুলিও উল্টা গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পোষ্টমাষ্টারের দ্বিতীয়া আসিয়া মুখ অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকে, বিনা কারণেই 'বাপের ধাঁচা পাওয়া'র অপরাধে শিশুটিকে পিটিয়া দেয় এবং সুবিধা পাইলেই বড়গিন্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলে—"বড়দি'র ঢিলেপনাতেই সব মাটি হ'ল…"

তামাক-গিন্নী একেবারে বড়বাবুকেই লক্ষ্য করিয়া বলেন—"ঠিক ত, তুমি মাতব্বর, পায়ে খেঁৎলাতে চাও খেঁৎলাও—অপর সবাইকে উসকে দেওয়া কেন?… খুনুহুড়ি…"

এর উপর তিন-চার দিনের মধ্যে আবার এও শোনা গেল যে, বড়বাবু পাশের জংশন ষ্টেশনের থিয়েটার-পার্টি দিয়া অমৃতলাল বসুর "তাজ্জব ব্যাপার" পালা করাইবার উদ্যোগ করাইতেছেন।

প্রমাণ পাওয়া গেল এখানকার দু-একজন পার্টও লইয়াছে। দুপুরবেলা মাঝে মাঝে ষ্টেশন থেকে যে-অট্টহাস্যের রোল শোনা যায় সেটা রিহার্সেলেরই।

বড়বাবুর পিঠচাপড়ানিতে স্পর্দ্ধাটা বাড়িয়াই চলিয়াছে। মালবাবু না কি রাত্রে বাড়িতে আসিয়া পার্ট মুখস্থ করেন, শোবার ঘরে। স্ত্রী সবার সামনে নাক সিঁটকাইয়া বলিল,—"কি গেরো বল দিকিন? রাত একটা পর্য্যন্ত কানের কাছে মেয়েলী টোনে ভেংচি কাটা!"

সেদিন রাত আটটা পর্য্যন্ত মেয়েদের জমায়েৎ পুরাদমেই চলিয়াছে। সাতটার গাড়িতে পাশের ষ্টেশন থেকে বুকিং-ক্লার্কের বাড়ির মেয়েরা আসিয়াছেন, অনেকগুলি। দুপুরবেলা তামাক-গিন্নী আসিয়াছিলেন, আটক পড়িয়া গেলেন।

আজ আবার বেটাছেলেরা সব সাতটার গাড়িতে জংশন ষ্টেশনে গেল,—নিশ্চয়ই পুরা রিহার্সেলের জন্য। এমন কিছু সুখের কথা নয়; কিন্তু আজ অন্ততঃ মজলিসটা জমিবার পক্ষে খুব সুবিধা হইয়াছে।

সকলে প্রাণ খুলিয়া তাস, লুডো, হাসিঠাট্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে। ষ্টেশনের চার্জ্জে মার্কারবাবু; সে এই সময়টা নিদ্রিতে বুঁদ হইয়া থাকে, আর তা ভিন্ন 'খোট্টা' বলিয়া বাঙালী মেয়েদের কাছে আমলই পায় না। বেটাছেলেরা সাড়ে ন'টার গাড়িতে ফিরিতেই পারে না। সব আহার সারিয়া গিয়াছে—তাহার পরে সে-ই এগারটা।

একচোট হাসিগল্পের পর ঘরটা একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে। বুকিং-ক্লার্কের শালী মাথার কাপড়টা নামাইয়া দিয়া চুলের গেরোটা কষিয়া দিতে দিতে বলিল,—'যাই হোক্ বাপু,—এরকম থিয়েটার ক'রে মেয়েদের অপদস্থ করতে যাওয়া বড়বাবুর ঠিক হচ্চে না; আমাদের বেনারস হ'লে কেউ সইত না…"

কথাটা এমন কোমল স্থানে স্পর্শ করিল যে, মজলিসে অঙ্গ-সঞ্চালনের জন্য যে-আওয়াজটুকু হইতেছিল সেটুকু পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। শুধু পোষ্টমাষ্টারের প্রথম পক্ষ ভিতরে ভিতরে একটু খুশীই হইয়াছিলেন, প্রসঙ্গটিকে 'চালু' করিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, তাজ্জব ব্যাপারটা হচ্চে কি?"

তামাক-গিন্নীর বড়মেয়ে রেণুবালার নূতন বিবাহ। বেহারের পাড়াগাঁ থেকে বাহির হইয়া সে আজকাল নভেল নাটকের একেবারে সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করিতেছে, আর সেটা জানাইবার আগ্রহটাও খুব। বলিল,—"তুমি হাসালে দেখচি বড়বৌদি, অমৃতলাল হলেন 'নটরাজ' 'তাজ্জবব্যাপার' তাঁর একখানা নামজাদা বই, আর তুমি ব'লে বসলে কি-না…কোন্‌দিন হয়ত বলবে প্রসূন কুমারের 'প্রাণের বেসাতি'ও পড়নি, মহেন্দ্রবাবুর 'তরুণীর করুণা' নাটকখানার নামই…"

বাধা দিয়া পোষ্টমাষ্টারের গৃহিণী বলিলেন—"ক্যামা দে ভাই, আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না…আসল কথাটা জানিস ত বল্।"

বুকিং-ক্লার্কের শালী বলিল,—"তাতে পুরুষেরা কুটনো কুটবে, বাটনা বাটবে, সংসারের সব পাট ক'রবে; আর মেয়েরা পাস দিচ্চে, রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করচে…"

তেতরীর মা কলিকা সাজিয়া হুঁকায় বসাইয়া দিল; ছোটো টান দিয়া তামাক-গিন্নী বলিলেন—"অতটা আবার ঠিক নয়; ও যেন পুরুষকে ছাপিয়ে যাওয়া, কি বলিস্ নূতন বউ?"

সুচারু তারিফে হইয়া বলিল,—"তা বইকি; তার

চেয়ে বরং মিলে মিশে একসঙ্গে ব'সে তামাক খাওয়া ভাল।"

সকলে হাসিয়া উঠিল, তামাক-গিন্নীও হুঁকা মুখে করিয়া যোগ দিলেন, বলিলেন,—"তোরা কেউ ধরলিও না, স্বাদও বুঝলি না ; খালি ঠাট্টা করেই কাটালি।"

একটু চুপচাপ গেল। পরে কিরণলেখা চিন্তিত ভাবে বলিল—"আচ্ছা, বেটাছেলে সাজলে দেখায় কেমন মেয়েদের ? বোধ হয়..."

তাহার ভাজ বলিলেন,—"একবার দেখই না সেজে। দেব এনে ভাইয়ের জামা কাপড়—ভাইয়ের মত চেহারাও আছে, এমন কি গলার আওয়াজটাও।"

পোষ্টমাষ্টারের প্রথমা বলিল,—"তা হ'লে দিদিরও মাঝখান থেকে অনেকদিন আগের তোমার যুবা ভাইটিকে একটু দেখা হয়ে যাবে।"

বড়গিন্নী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"পোড়া-কপাল।"

কিন্তু কয়েকটি তরুণ মুখে কৌতুক উচ্ছুসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কি যেন সব মনে মনে আঁচিতেছে, অথচ মুখ ফুটিয়া বলিতে রা সরে না।

তামাক-গিন্নীর মেজমেয়ে বলিল,—"নতুন বৌদি ত বেটাছেলে সেজেছিলেন তাঁদের কলেজের থিয়েটারে, সেদিন বললেন আমায়..."

সুচারু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তোমার কানে ধরে বলতে গিয়েছিলাম।"

কয়েক জনা ধরিয়া বলিল—"তা হ'লে সাজতেই হবে, কি সেজেছিলে বল, ছাড়া হচ্ছে না..."

প্রবীণারা বলিল—"সাজ না বাপু, একটু রঙ্গ দেখি ; আর, কেউ ত বেটাছেলে নেই আজ যে..."

সবচেয়ে মর্ম্মে গিয়া পৌছিল পোষ্টমাষ্টারের মধ্যমার কথাটা। অন্ধকারপানা মুখটা আরও ভার করিয়া বলিল,—"উচিত-ই ত ; ওরা যেমন তোমাদের নিয়ে নকল করচে, সারারাত কানের কাছে ভেংচি কাটচে, তোমরাও তার পাল্টা জবাব দাও,—নাই জানুক, নাই দেখুক, নিজেদের মনে একটা তৃপ্তি হবে ত..."

বক্তীর মুখের গাঢ় অন্ধকার অন্য সকলের মুখেও একটু ছায়াপাত করিল। নবীনাদের জিদ আরও বাড়িয়া গেল ; হ্যাঁ, পাল্টা জবাব দেওয়া চাই-ই। ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের মধ্যেও কলেজের কৌতুকময়ী ছাত্রীটি উঁকি মারিতেছে ; সুচারু বলিল,—হ্যাঁ, রঙ্গ যে বলচ,—রঙ্গ কি একা একাই হয় নাকি ?"

আবার একচোট চুপচাপ ; সব পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। তামাক-গিন্নী বুকিং-ক্লার্কের শালীকে বলিলেন—"তা হ'লে আপনিও সাজুন ; বেনারসের মেয়ে, তায় স্কুলে পড়া...না, আমরা কোন ওজর শুনচি না।"

সে নিমরাজী হওয়ার সঙ্কুচিত ভাব দেখাইয়া বলিল,—"আমি শুধু মেয়ে থিয়েটার দেখেছি মাত্র..."

সমস্বরে মত প্রকাশ হইল—"তার মানেই করেছেন, কিছু শোনা হবে না, নিন্।"

তামাক-গিন্নী হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতেছিলেন, বলিলেন,—"হ্যাঁ, শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখেই চেনা গেছে।"

আবার একটা হাসির তোড় উঠিল, থামিলে বুকিং-ক্লার্কের শালী বলিল—"তা হ'লে আপনাকেও বাদ দিচ্ছি না..."

তামাক-গিন্নী হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া সাশ্চর্য্যে বলিলেন—"আমায় !"

কিরণলেখা জোর দিল—"হ্যাঁ। ঠানদি, তুমি ত আদ্দেক পথ এগিয়েই রয়েচ ; কোন পুরুষের বরং 'তামাকু মাইজী' সাজতে হ'লে ভাবনার কথা..."

হাসিকলরব বাড়িয়া চলিল। সুচারুর মনে একটা প্লট জমিয়া উঠিতেছিল ; বলিল,—"ঠানদি যদি নামেন ত একটা জিনিষ সবাইকে দেখিয়ে দিই ; আমাদের কলেজে হ'য়েছিল। ঠানদি না হ'লে কিন্তু হবে না। মাড়োয়ারী সাজা আর কারও দ্বারা হবে না—নেকীরাম মাড়োয়ারী ইয়া ভুঁড়ী—ব্যবসা করেন আর কড়ক খান—সে এক রকম গাঁজার মতন জিনিষ..."

সকলে এমন তুমুল গোলযোগ করিয়া তামাক-গিন্নীকে ধরিয়া বসিল যে, তিনি কোন রকমে রাজী হইয়া পরিত্রাণ পাইবার মাত্র অবসর পাইলেন।

স্ফূর্তির ঘূর্ণী হাওয়া একে একে সকলকেই নিজের গহ্বরে টানিতে লাগিল।

সুচারু কিরণলেখার দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"মেন্ পার্ট আর একটি মাত্র বাকী রইল।"

কিরণলেখা সত্রাসে হাতমুখ নাড়িয়া বলিল,—"না, আমি পারব না, দোহাই। আমি আর সব পারি, সুধু বেটাছেলে সাজা আমার দ্বারা…"

তামাক-গিন্নী কৃত্রিম রোষে ঝাঁঝিয়া উঠিলেন—"তবে রে!…আর আমি বুঝি কিছুই পারি না, পারি এক বেটাছেলে সেজে নাচতে আর গাঁজা খেতে "

সুচারু বলিল—"না, তোমায় সাজতেই হবে কিরণ ঠাকুরঝি, এইবার ঠিক হয়েচে—ওঁরা দু'জনে সাজবেন পিকেটার, দুটো খদ্দরের টুপি হ'লে ভাল হয়; আমি হব দারো…না, সে আর এখন বলচি না; তুমি হবে ষ্টেশন-মাষ্টার, কিরণ ঠাকুরঝি—দাদার পোষাকও রয়েচে; একজন পয়েন্টস্‌ম্যান চাই,—তুমি হও মেজদি…"

তামাক-গিন্নীর মেজমেয়ে উল্লাসে হাততালি দিয়া উঠিল—উঃ, কি মজাই হবে!…

শীগগীর সাজো নতুন বৌদি—উঃ, যদি দাড়িগোঁফ, পরচুলো থাকত!…

বড়গিন্নী বলিলেন—"সে দুঃখই বা থাকে কেন?—ও ত কলকাতা থেকে জংশন ইষ্টিশনের থিয়েটারের জন্যে দাড়িগোঁফ সাজগোজ মেলাই কি সব এনেচে, আর পয়েন্টসম্যান সাজার জন্যে পানিপাড়ে বুধনের জামা আর পাগড়ীটা আনিয়ে নিচ্চি,—সে এতক্ষণ রহড়িয়ায় তাড়ি গিলতে গেছে…"

বাকী কথাগুলো একচোট হট্টগোলের মধ্যে চাপা পড়িয়া গেল। থামিলে সুচারু হাসিয়া বলিল—"তা হ'লে ত সোনায় সোহাগা। আমরা তাহ'লে তোমার বাসা থেকেই সেজে আসচি…কিরণ-ঠাকুরঝি জান তো কোথায় সাজগুলো আছে?…আমায় কিন্তু আলাদা ঘর দিতে হবে সাজতে বাপু—কারুর সামনে আমি সাজতে পারি না। হ্যাঁ, ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই,—ষ্টেশনে নেকীরাম মাড়োয়ারীর বিলিতী কাপড়ের গাঁটড়ি এসেছে পিকেটারদের কাছে খবরটা পৌছে গেছে—ঠিক দলবল নিয়ে হাজির" (কিরণলেখার দিকে চাহিয়া)—"এদিকে ষ্টেশন-মাষ্টার, বক্রেশ্বরবাবু আঁকাবাঁকা চালে নধর বপুখানি দোলাতে দোলাতে…"

কিরণলেখা হাসিয়া, চোখ রাঙাইয়া বলিল,—"আচ্ছা থাম, আর ব্যাখ্যানায় কাজ নেই।"

৪

জংশন ষ্টেশনে এষ্ট্যাবলিশমেণ্ট ক্লার্ক রমণীবাবুর বাসায় রিহার্সেল খুব জমিয়া উঠিয়াছে। রাত্রি সাড়ে নয়টা বাজে, ডাউন ট্রেন খুলিবার সময় হইয়াছে। আমাদের বড়বাবু পকেট হইতে ঘড়িটা বাহির করিয়া বলিলেন—"যাই, আমি একবার ফোন্ ক'রে দেখে আসি সে ব্যাটা মার্কার ওদিকে খাতস্থ আছে কিনা—গাড়িটা যাচ্চে…একবার গার্ড বনোয়ারি লালকেও ব'লে আসি—আমরা এখানে—সব ঠিকঠাক ক'রে রেখে এসেচি…"

একটি যুবক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আপনি বসুন, আমি খোঁজ নিয়ে আসচি; গার্ড সাহেবকেও ব'লে দেব।"

বড়বাবু বলিলেন—"না, যদি বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে ত এই ট্রেনে চলেই যাব—ট্রেনখানা যাচ্চে, ওদিক থেকেও ফিফ্‌টিনাইন্-আপ গুড্‌স্ আসার সময় হ'ল—শেষে একটা কাণ্ড…আর আমি না থাকলে ত ক্ষতি হবে না, যাদের পার্ট আছে তারা ত রইলই…থাকে ঠিক, চলে আসচি।"

টেলিগ্রাফ আপিসে প্রবেশ করিতেই তারবাবু হাতে একটা কাগজ বাড়াইয়া বলিল,—"এই যে, আপনাকেই খুঁজছিলাম,—একটা প্রাইভেট্ মেসেজ, এই মাত্র এল।"

বড়বাবু ভয়ত্রস্তভাবে কাগজটা হাতে লইলেন; মার্কার যদুনন্দন লিখিতেছে—'Tell Bara Babu come sharp at once Daroga entered house'—উদ্দেশ্য—বড়বাবুকে অতিশীঘ্র আসিতে বল, বাড়িতে দারোগা প্রবেশ করিয়াছে।

এই সময়ে দ্বিতীয় ঘণ্টা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি

হুইস্‌ল্ দিল। বড়বাবু কাগজটা মুঠোর মধ্যে মুড়িয়া ছুটিয়া গিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

পথের সময়টুকু দুশ্চিন্তার মধ্যে কখন কাটিয়া গেল টেরও পাইলেন না। গাড়ি হইতে নামিয়া সটান ষ্টেশন ঘরে গিয়া দেখেন যদুনন্দন ভয়ে, সিদ্ধির নেশায় একেবারে জবুথবু হইয়া বসিয়া আছে। যাইতেই হাত-পা নাড়িয়া বলিল,—"হামারা জরু কহলা ভেজী হ্যয়, বড়াবাবু··· আপকা ঘরমে, এয়সা এক দারোগা···হামকো নেহি বোলানেসে হাম কেঁও যায়গা?···হাম কেয়া কিয়া হ্যয়?···"

যদুনন্দন যে হীরু নয় এ জ্ঞান যদিও বড়বাবুর তখনও ছিল, তথাপি অনেকক্ষণ পরে একজনকে সামনে পাইয়া, হাত-দুখানা যদুনন্দনের মুখের কাছে নাড়িয়া, খিঁচাইয়া বাংলাতেই বলিয়া উঠিলেন—"সব পাসকরা ভলন্টিয়ার বউ রাখো—চরখা কাটো···হতভাগা আমার মুণ্ডু জেরবার করলে রে···"

হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বড়বাবুর ঘরে দরজা ও বারান্দার দিকের জানলা বন্ধ করিয়া সুচারু সাজিতেছিল।···নিশ্চয়ই নিঃশব্দে খানাতল্লাসি চলিতেছে!···দরজায় আস্তে আস্তে দুইটি ঘা পড়িল, এবং কম্পিতস্বরে আওয়াজ হইল—"হুজুর, দারোগা সাহেব!···"

সুচারু পায়ে পট্টি বাঁধিতেছিল,—একটু মৃদু হাস্য করিয়া স্বর যথাসম্ভব পরুষ করিয়া বলিল,—"সবুর করো, দিক্ করো মৎ···"

মুহূর্ত্তের বিরাম, তাহার পর আরও মৃদুস্বরে মিনতি হইল—"হুজুর, মেহেরবানি করকে···হাম ঘরকা মালিক হ্যয়···ভলন্টিয়ার তো হীরু বাবুকা ঘরমে···"

পট্টির গেরো দিতে দিতে সুচারু বলিল,—"আঃ, জ্বালালে কালামুখী।···তোমায় না বললাম কিরণ-ঠাকুরঝি, যে আমার না হ'লে···আর এই পট্টি বাঁধা এক হাঙ্গাম···"

দুয়ার খুলিয়া, মর্দ্দানা কায়দায় বুকে হাত দুইটা জড়াইয়া বলিল—"দেখো, চিনতে পারতা হ্যয়? গোঁফ দেখকে ডরতা···ও কি, তুই যে নির্ব্বাক হ'য়ে গেলি, দেখ কাণ্ড ছুঁড়ীর!···"

বড়বাবুর বিস্ময়ে নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল, অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"এ কি ব্যাপার!"

সুচারু হাফপ্যাণ্টের কোমর বন্ধটা কষিয়া দিতে দিতে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—"চমৎকার। তোর দাদা সামনে পড়লেও ঠিক ওমনি হতভম্ব হয়ে গিয়ে ঐ কথাই জিগ্যেস্ ক'রত···আর চেহারাও ত ঠিক করেছিস্—মায় মাথার টাকটি পর্য্যন্ত···কই, পরচুলার সঙ্গে টাক্ ত দেখলাম না···একেবারে অবিকল দাদাটি—লক্ষ্মীস্, বৌদিদি না ভুল ক'রে···"

বড়বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—"আপনি না হীরুবাবুর স্ত্রী?"

সুচারু আরও সজোরে হাসিয়া উঠিল; বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, হীরুবাবুর ইস্তিরি, দস্তুরিভুক্ মাষ্টার-মশায়।"—সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবুর কাঁধের উপর একটা প্রচণ্ড চড় বসাইয়া বলিল,—"ব্রেভো! তুই ভাই সিনেমাতে যা, লুফে নেবে; টকিতেও তুই মাৎ ক'রে দিবি···উঃ, আমারই সন্দেহ ধরিয়ে দিচ্ছিস্, তা অন্যের আর কথা কি···না, আমি আর লোভ সামলাতে পারচি না—তোর দাদাকে ত কখনও সামনে পাব না, তোর ওপর দিয়েই গায়ের ঝাল মিটিয়ে নি, জয়চন্দ্র যেমন নকল পৃথ্বীরাজের ওপর দিয়ে আশ মিটিয়ে নিয়েছিল···আয়···"

বিমূঢ়, অসহায় বড়বাবুর আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। "আয়" বলিতে এক পা পিছনে বাড়াইলেন। সুচারু হাতটা ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া ভিতরে টানিয়া আনিয়া জোর করিয়া সামনের চৌকিটার ওপর বসাইয়া দিয়া বলিল,—"দারোগাকা হুকুম নেহি মান্‌তা; বস্ এমনি করে···মনে কর তুই, যেন তোর দাদা আর আমি যে দারোগা তাও একটু ভুলে যা; এইবার শোন্—দেখুন্ মশায়, আপনার অন্য ষ্টেশনের জীবগুলি হচ্চেন কুয়োর ব্যাং, আর আপনি হ'চ্চেন আবার ধেড়ে ব্যাং। 'ধেড়ে ব্যাং' কথাটার ওপর যদি আপনার আপত্তি থাকে ত 'বুড়ো তোতা' ব'লতেও রাজী আছি···তা নিজে জানার ব্যবহার ভুলে থাকেন, নতুন বুলী না শিখতে পারেন, আমার স্বামীদেবতাটিকে অমন ক'রে···না ভাই, উঠিস্ নি, আমার দিব্যি, ব'লে নি দু-কথা আরাম ক'রে···এই যে ঠান্‌দি'—ওঃ, মাইরি, তোমায় যা মানিয়েচে!···"

"কি ব'কচিস্ নিজের মনে? আমি বলি বুঝি পার্ট

আগুড়াচ্চে”—তামাক-গিন্নী প্রবেশ করিতেছিলেন, চৌকির দিকে নজর পড়ায় হকচকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মাড়োয়ারী বেটাছেলের মত কাপড়-পরা, বিশাল ভুঁড়ির ওপর বড়বাবুর কামিজটা সাঁটিয়া রহিয়াছে, মাথায় লম্বা খানিকটা পাকান কাপড়ের লিকলিকে পাগড়ী জড়ান!

সুচারু প্রবলবেগে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—“এস, এস; উঃ, একেবারে মাড়োয়ারী, আমাদের কলেজেও এমনটি দাঁড় করাতে পারিনি...আরে, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে!—ও যে কিরণঠাকুরঝি পোড়ারমুখী; তোমাকে ধোঁকা দিয়েচে!...তুমি কিন্তু, মাইরি...ওঃ...পেটে খিল ধরিয়ে দিলে...”

তামাক-গিন্নী আগাইয়া আসিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—“সত্যি ধোঁকা হয়েছিল—সেই টাক, সেই গোঁফ...” তাহার পর সন্দেহের ভাবটা কাটিয়া যাওয়ায় তিনিও সুচারুর হাসিতে যোগ দিলেন। হাসির ঝাঁকানিতে জামার স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর একটু সামালইয়া লইয়া বড়বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—“তা নে ওঠ; অমন বনমানুষের মত ব'সে রইলি কেন?...আবাগীর রঙ্গ একরকম নয় ত—চল্, ওদেরও এতক্ষণ হয়ে গেচে।”

ডাক দিলেন—“তোদের হ'ল র‍্যা? ত চল্, আয় একবার দারোগা আর ইষ্টিশন মাষ্টার দেখে যা...”—হাসি চলিল।

“—আর নেকীরাম মাড়োয়ারী—ও” বলিয়া সুচারু হাসির চোটে পেট চাপিয়া প্রায় লুটাইয়া পড়িতে লাগিল।

পিকেটার-বেশে বুকিং-ক্লার্কের স্ত্রী আর শালী ছুটিয়া আসিল। মালকোঁচামারা, গায়ে বড়বাবুর সাদা পাঞ্জাবী; তাহাদের পেছনে পেছনে পোষ্টমাষ্টারের দ্বিতীয়া,—গায়ে বুধন পানিপাড়ের কুর্‌তা,মাথায় নীল হলদে রঙের পাগড়ী।

একেবারে চরম হওয়ার জন্যই হোক্ আর যেজন্যই হোক্ বড়বাবু সম্পূর্ণ শক্তি দিয়া মনের ভাব গুছাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন,—“ব্যাপার কি? বড়গিন্নী কোথায়?”

হাসির একটা তুমুল কোরাস্ উঠিল; তাহার মধ্যে—“কর্তার বড়গিন্নীকে চাই, ওর বুঝি মাথা বিগড়ে গেছে, টাকে জল চাপড়া”—গোছের কতকগুলা ভাঙা ভাঙা কথাও শুনা যাইতে লাগিল।

এমন সময় মালকোঁচার উপর প্যাণ্টালুন্‌টা টানিতে টানিতে কিরণলেখা—“আমরণ! কিসের এত গোল?” বলিয়া ভিড় ঠেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চৌকির ওপর নজর পড়ায়—“ও বাবা গো, দাদা যে!!” বলিয়া দু-হাতে প্যাণ্টালুন্ টানিয়া ধরিয়া স্ত্যাক্ রেসের মত খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পড়ি-ত-মরি গোছের দৌড় দিয়া বাহির হইয়া গেল।

নাটকের বাকী চরিত্রবৃন্দ একবার চৌকির মূর্ত্তিটির দিকে এবং পরক্ষণেই পরস্পরের রক্তহীন শুকনো মুখের দিকে একবার চাহিল—মুহূর্ত্তমাত্র—তাহার পর সেই অদ্ভুত পরিচ্ছদ লদ্‌বদ্ করিতে করিতে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুট...কেহ খাইল দেওয়ালে ধাক্কা, কেহ চেয়ারে হোঁচট। তামাক-গিন্নী কোয়ার্টার্সের ছোট, আধভেজান দুয়ারের মধ্যে আটকাইয়া গিয়া জালের মধ্যে মাছের মত একটু ছট্‌ফট্ করিলেন, তাহার পর পেছনের মাছেদের ধাক্কা খাইয়া দুয়ার ঝনঝনাইয়া বাহির হইয়া গেলেন...

* * * *

বন্ধুর চিঠি আসিয়াছে, লিখিয়াছে—“ভাই সুচু, তোমার পত্র পড়ে সুখী হলাম যে, তোমার শিক্ষার ওষুধ ওঁদের রুগ্ন নাড়ীর মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠচে।...ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে বোঝা যায় পুরুষ আর যাই হোক একেবারেই যে অ-বস্তু তা নয়। জার্ম্মানী থেকে ফিরে এলেও সম্প্রতি সুকোমলবাবুর মধ্যে সে রকম নমনশীলতার পরিচয় পাচ্ছি, তাতে এই ধারণাটাই মনে ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে উঠছে।... আমার মনে হয় পুরুষ আর নারী আমরা পরস্পরকে সাধারণত দূর থেকে এক ছদ্মবেশে দেখা দিয়ে থাকি,—কত সুখের বিষয় হ'ত যদি আমরা সামনাসামনি মুখোমুখি হয়ে পরস্পরের সত্যদৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে পারতাম।—তা হ'লে দেখা যেত...” ইত্যাদি—

সুচারু খালি পত্রের প্রথমাংশের উত্তর দিয়াছে—“ভাই, বৈবহুর্বিশাকে শিক্ষা-ঔষধের মাত্রা হঠাৎ একটু চড়া হয়ে পড়ায় আপাতত ডাক্তার রোগী উভয় পক্ষই একটু সঙ্কটাপন্ন।...বোধ হয় শীঘ্রই কলকাতায় আসচি; সব কথা সামনেই হবে...”

বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনের ও পুনর্গঠনের এই যুগে মানুষের প্রাণশক্তির সাধনার অপরিহার্য্য উপকরণগুলিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নিয়োজিত ক'রে নিতে হবে, নতুবা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করা অসম্ভব।

কি শারীরিক ব্যায়ামঘটিত শক্তি ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া, কি আত্মার আনন্দঘটিত মুক্তি ও তৃপ্তির দিক দিয়া, কি কল্পনাবৃত্তি ও ভাববৃত্তি উন্মেষ ও বিকাশের দিক দিয়া, কি সামাজিক ঐক্য-বিধানের দিক দিয়া, নৃত্যকলার ব্যাপকভাবে চর্চ্চা যে মানুষের প্রাণশক্তির সাধনার একটি অপরিহার্য্য উপকরণ, তা পৃথিবীর প্রত্যেক জীবন্ত উন্নতিশীল জাতির দৃষ্টান্ত হ'তে দেখা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায় এ দেশেরই প্রাচীন পরম্পরাগত নৃত্যের বহুব্যাপক প্রথাকে বিলাসিতার ও দুর্নীতির গণ্ডীভুক্ত ক'রে নির্ব্বাসিত ক'রে সমাজের জীবন থেকে বিতাড়িত করেছে। অথচ এই দেশেই একদিন নৃত্যকে কি শৈব কি বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধনার একটি প্রধান সোপান ব'লে গণ্য করা হয়েছিল। আবার এই দেশেই সুদূর পল্লীগ্রামে বাংলার স্বকীয় সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ যাদের মধ্যে এখনও অল্পবিস্তর ভাবে বর্ত্তমান আছে তাদের জীবনের এবং তাদের সামাজিক প্রথার ও ধর্ম্মপ্রণালীর সঙ্গে বিশুদ্ধ নৃত্যগীতের চর্চ্চা আজও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে।



কাঠি নৃত্য—বীরভূম

আমাদের আধুনিক শিকড়বিহীন শহরে শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজের সঙ্গে যে কেবল প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির সহিত সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়েছে তা নয়, তার সঙ্গে একদিকে পশ্চিম অঞ্চলের বাই খেমটা ইত্যাদি দুর্নীতিমূলক মজলিসী নৃত্যের ও থিয়েটারের কুৎসিত ইঙ্গিতমূলক নৃত্যের আমদানির ছড়াছড়ি হয়েছে এবং অপরদিকে আজকালকার পাশ্চাত্য জগৎ থেকে নৃত্যের সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ও আধ্যাত্মিক ভাবের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদময় মনোভাবের আমদানি হয়েছে। এর ফলে বাংলা দেশের আধুনিক শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজে নৃত্যের স্থান অতি নিম্নস্তরে এসে পড়েছে ও নৃত্যকলা ঘৃণ্য বিবেচিত হ'য়ে কেবল যে জাতির ও ব্যক্তির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবন ও শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে তা নয়;—বালকবালিকার দল—যারা অন্যান্য দেশে প্রতিনিয়ত নৃত্যের সহায়তায় দেহের বল, মনের স্ফূর্ত্তি ও প্রাণের আনন্দের সঞ্চার ক'রে আপন আপন জীবনে শক্তির ও আনন্দের ভিত্তিকে সুদৃঢ় ক'রে জাতিকে শক্তিশালী ক'রে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে—(যেমন অন্যান্য দেশে ক'রে থাকে)—তাদের জীবন থেকেও নৃত্যকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য জগতের সকল দেশেই আজ মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত লোকনৃত্যের মূল্য বুঝতে পেরেছে এবং প্রত্যেক জাতি আপন আপন সংস্কৃতিপ্রসূত লোকনৃত্যের প্রথাকে আবার জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে বহুব্যাপকভাবে প্রচলিত ক'রে দেশের ও সমাজের জীবনকে সরল, নির্ম্মল ও আনন্দময়ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলবার চেষ্টা করছে। বর্ত্তমান শিক্ষিত ও সভ্য জগতের অনুমোদিত এই প্রণালী হ'তে বাংলার আজ বিচ্যুত হয়ে থাকার কোন অজুহাত নাই; কারণ বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের নরনারীর মধ্যে এখনও যে সকল নৃত্যকলার পরম্পরাগত প্রথা আড়ালে-আবডালে জীবন্ত ভাবে প্রচলিত রয়েছে সেগুলি রসকলা সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অথবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নৃত্যকলা থেকে কোন প্রকারে নিকৃষ্ট নয়—বরং সহজ, সরল এবং বিশুদ্ধ প্রণালীর আদর্শের দিক দিয়ে ও গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে অন্যান্য প্রদেশের ও অন্যান্য দেশের নৃত্যপদ্ধতি থেকে শ্রেষ্ঠ ব'লে আমার মনে হয়। এটা আজকাল নৃ-তত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক জাতিই আপন আপন প্রতিভাজাত রসকলাপদ্ধতি থেকে যে জীবন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে, অন্য জাতির নিকট থেকে ধার-করা রসকলাপদ্ধতি হ'তে সেরূপ জীবন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করা সম্ভব নয়।



অবতার নৃত্য—ফরিদপুর
রামচন্দ্র ধনু আকর্ষণ করিতেছেন

বৎসরেক কাল পূর্ব্বে বাংলা দেশে যে নিজস্ব লোকনৃত্য ব'লে কিছু আছে তার উপলব্ধি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছিল না বল্‌লেই চলে। কিন্তু এই বৎসরেক কালের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে বাংলার প্রাচীন রায়বেঁশে নৃত্য, জারি নৃত্য, কাঠি নৃত্য, অবতার নৃত্য ও ধূপ নৃত্য ইত্যাদি পুনরাবিষ্কার করবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আর শিক্ষাক্ষেত্রে যে এ-গুলির প্রচলন সবিশেষ কল্যাণপ্রদ ইহা শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এবং সরকারী শারীর শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে বুকানন থেকে আরম্ভ ক'রে বাংলার অনেক উচ্চ ইংরেজী স্কুল, মধ্য ইংরেজী স্কুল এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বীকার ক'রে নিয়েছেন এবং তার ফলে কেবল বীরভূমে নয় বাংলার নানা জেলার স্কুলে বাংলার



ধূপ নৃত্য—ফরিদপুর

নিজস্ব লোকনৃত্যের চর্চা শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণপ্রদ অংশস্বরূপ বলিয়া গৃহীত ও প্রবর্ত্তিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে উচ্চ ইংরেজী স্কুল এবং মধ্য ইংরেজী স্কুলের শিক্ষকদিগকে বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য সিউড়ীতে যে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছিল, তাতে বাংলার অনেক জেলার শিক্ষকেরাই যোগ দিয়েছিলেন। স্থতরাং আশা করা যায় যে, অনতিবিলম্বে দেশের সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এই আদর্শের বিস্তার হবে এবং বাংলার জাতীয় লোকনৃত্যের আনন্দময় অনুপ্রেরণার প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক স্বাভাবিক ব্যায়াম-প্রণালীর প্রবর্ত্তনের ফলে বাংলার বালক এবং যুবক সম্প্রদায়ের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হবে ও জাতির জীবনে শক্তি ও আনন্দের সঞ্চার হবে।

কিন্তু কেবল পুরুষদের জন্য নৃত্যের বন্দোবস্ত ক'রে নিরস্ত হয়ে থাক্‌লে আমাদের চলবে না। দেশের ছেলেদের জীবনে এখনও আনন্দের এবং ব্যায়ামের কতকটা সুযোগ এবং বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু দেশের মেয়েদের ও বালিকাদের বেলা তা বিন্দুমাত্র নাই বললেই চলে, এবং এর ফলে বাংলার মেয়েদের কেবল যে



অবতার নৃত্য—ফরিদপুর
বলরাম হলচালন করিতেছেন

স্বভাবজাত শারীরিক সৌন্দর্য্যের লোপ হচ্ছে তা নয়, দিন দিন তাদের স্বাস্থ্যহীনতার ও দুর্ব্বলতার মাত্রা বেড়ে চ'লে জাতিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের জন্য যে ড্রিল-পদ্ধতি শারীরিক ব্যায়ামের দিক্ দিয়া অস্বাভাবিক ও অনুপযোগী সাব্যস্ত হয়েছে মেয়েদের পক্ষে যে উহা আরও বেশী অস্বাভাবিক ও অনুপযোগী তা বলা বাহুল্য। স্থতরাং এটা জোরের সহিত বলা যেতে পারে যে, ছেলেদের ব্যায়ামের জন্যে নৃত্যের প্রচলনের যতটা প্রয়োজন, মেয়েদের ব্যায়াম, শরীরগঠন ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে তার প্রয়োজন আরও বেশী।

আজকাল অনেক স্কুলে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর উপলব্ধি এসেছে এবং তার ফলে অনেক স্কুলে নানাপ্রকার নূতন নূতন নৃত্য উদ্ভাবিত ক'রে শেখানো হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদিতে যে-প্রণালীর নিত্যের প্রচলন, শিক্ষাক্ষেত্রে সে-প্রণালীর নৃত্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী। রঙ্গমঞ্চের নৃত্যপ্রণালী শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত করলে উহাতে অনেক কুফল ফলবার সম্ভাবনা আছে, কারণ সে-সকল নৃত্যে নানা প্রকার কৃত্রিমতা ও বিলাসিতার ভাব এসে পড়ে।



ব্রত নৃত্য—যশোহর



ধর্ম্মপূজার নৃত্য—বীরভূম

লোকনৃত্যে এ সকল দোষের সম্পূর্ণ অভাব, কারণ লোকনৃত্য জাতির সহজ সরল ভাব হ'তে প্রসূত; তাতে কৃত্রিমতা অথবা কোন রকম বিলাস-বিভ্রম থাকে না। সেজন্য প্রত্যেক জাতির পক্ষে সেই জাতির আপন আপন জাতীয় লোকনৃত্যই যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী, তা আজকাল পাশ্চাত্য জগতে স্বীকৃত হয়ে পড়েছে।

মেয়েলী ব্রত নৃত্য ও উৎসব নৃত্য

সনাতন হিন্দুয়ানীর অথবা খাঁটি ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধ ব'লে বাংলার যে সকল আধুনিক ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি নৃত্যের প্রথাকে দূষণীয় মনে ক'রে শিক্ষাক্ষেত্র ও সমাজ থেকে নৃত্যকে নির্ব্বাসিত করতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত জানেন না যে, বাংলা দেশে এক সময়ে বিশুদ্ধ নৃত্যের প্রথা কি পুরুষ কি মেয়েদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনে অতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, এবং তার ফলে বাংলার পুরুষ ও মেয়েদের শরীর আজ-কালকার চেয়ে অনেক বেশী বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান ও কর্ম্মঠ ছিল।

প্রতি গ্রামে ছোট ছোট মেয়েরা প্রতিমাসে ব্রত উপলক্ষে পাড়া ঘুরে ঘুরে বাড়িতে বাড়িতে ছড়া আবৃত্তি করতে করতে নৃত্য করত। বিবাহ ও ব্রতাদি উপলক্ষে বয়স্কা মহিলারাও প্রকাশ্যভাবে গান গেয়ে গেয়ে নানাপ্রকার সুন্দর অথচ সুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গীর সহিত নৃত্য করতেন। এটা যে কেবল একটা মান্ধাতার আমলের অতীত যুগের কাহিনী তা নয়, এখনও বাংলার সুদূর নিভৃত পল্লীতে—যেখানে আমাদের আধুনিক শিক্ষা ও শহরের বিকৃত আদর্শ তার প্রভাব সম্পূর্ণ বিস্তার করতে পারে নি—বাংলার নিজস্ব এই সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ ও আনন্দপ্রদ মেয়েলী নৃত্যের প্রথা বেঁচে আছে।

কিন্তু এখনও যে এই প্রথা বেঁচে আছে, তা আমাদের শহুরে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকেই কেন—বেশীর ভাগ লোকেই যে জানেন না, তা বললে অত্যুক্তি হয় না। মাস-চারেক আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় বিখ্যাত একজন বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে এই নিয়ে আমার আলোচনা হয়। তিনি গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলের মেয়েদের "গরবা" নৃত্যে মুগ্ধ হ'য়ে সেই



রায়বেঁশে নৃত্য

নৃত্য বাংলার মেয়েদের মধ্যে প্রবর্ত্তন করতে ভয়ানক ঔৎসুক্য প্রকাশ করছিলেন। আমি যখন বললাম যে, "গর্‌বার আমাদের এত আবশ্যক কি? আমাদের বাংলার পল্লীগ্রামে আমাদের নিজস্ব অনেক সুন্দর মেয়েলী নৃত্য আছে; সেগুলির পুনঃপ্রচলন করা উচিত", তখন তিনি

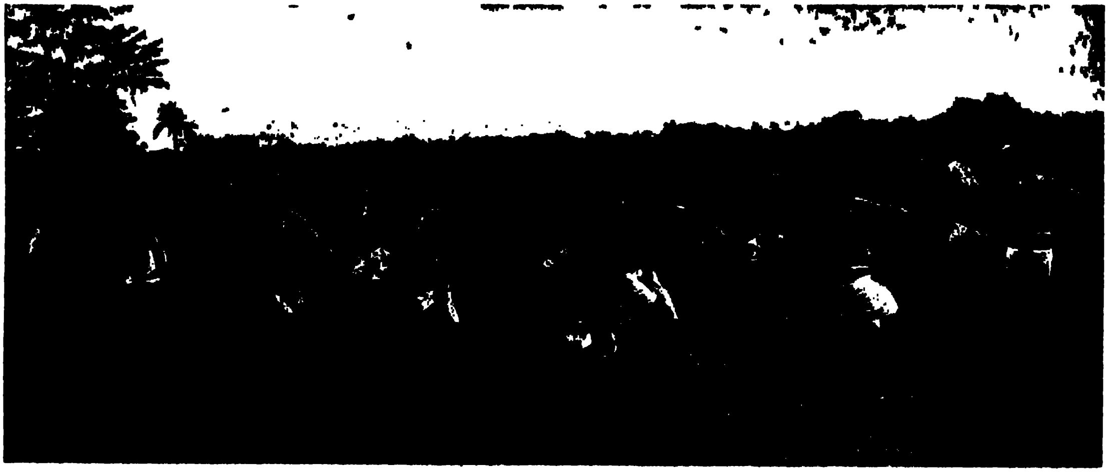


ব্রত নৃত্য—যশোহর

আমার কথা একেবারে অবিশ্বাসের ও অবজ্ঞার হাসিতে উড়িয়ে দিলেন আর বললেন,—"বলেন কি মশায়, বাংলার ভদ্রমেয়েদের মধ্যে নৃত্যের প্রচলন আছে, সে আবার কে কোন্ দিন শুনেছে? আর যদি থাকেই, তবে সেটা নিশ্চয়ই একটা যা তা রকম হবে। গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলের আর্ট বাংলার আর্টের চেয়ে অনেক উঁচুদরের।"

বাংলার সংস্কৃতির সম্বন্ধে এই যে অজ্ঞতা ও আত্ম-নিকৃষ্টতা—অবিশ্বাসের ভাব, এটা যে কেবল আমার এই বন্ধুটির একটি ব্যক্তিগত ভাব মাত্র তা নয়—আমাদের আধুনিক শহুরে ও শিক্ষিত সমাজের মনোভাবের এটা একটা সাধারণ দৃষ্টান্তমাত্র। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অনেক জিনিসেরই আমি প্রশংসা করি; কিন্তু এটা জোরের সহিত বলব যে, বাংলার নিজস্ব রসকলার সঙ্গে আমাদের একবার সাক্ষাৎভাবে পরিচয় করবার সৌভাগ্য হ'লে ও তার গুণ চিনবার মত চোখ আমাদের খুললে আমরা একদিন বুঝতে পারব যে, কি নৃত্য কি অন্যান্য রসকলা প্রত্যেকটিতেই বাংলার স্থান অতি উচ্চে। আর সেই রসকলার ধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করতে হবে—বাংলার সহুরে জীবনে ও বর্ত্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নয় বাংলার পল্লীগ্রামের নরনারীর জীবনে।

গত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় গলষ্টন্ পার্কে যে লোকনৃত্য-উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল। তার অনতিপূর্ব্বে আমি যশোহরের পল্লীগ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত "ঘট-ওলানো"-ব্রত নৃত্যের আবিষ্কার করি; এবং সেই উৎসবে এই ব্রত প্রদর্শন করবার সুযোগ আমার হয়েছিল।



রায়বেঁশে নৃত্য

বাংলার নিজস্ব মেয়েলী নৃত্যের এই সুন্দর প্রথা দেখে আমাদের শিক্ষিত সমাজের অনেকেরই যে চোখ ফুটে গিয়েছে তা তাঁরা স্বীকার করেছেন। সহজ সরল ভাবের, শুচিতার, ললিতগতিভঙ্গীর, অঙ্গ সঞ্চালনের লাবণ্যের এবং আধ্যাত্মিক ভাবগর্ভতার একাধারে এমন সুন্দর মনোমুগ্ধকর ও আনন্দদায়ক সমাবেশ আধুনিক নৃত্য প্রণালীগুলিতে খুব কমই দেখা যায়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে শারীর বিজ্ঞানমূলক অঙ্গসঞ্চালনাবলীর কি চূড়ান্ত সংযোজনা। এই নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গী দেখলে মনে হয় এগুলিতে বিখ্যাত 'সুইডিস্' ড্রিলের যাবতীয় ব্যায়াম-প্রণালী সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তা ছাড়া ইহার সঙ্গে আর একটা জিনিষ আছে যা সুইডিস ড্রিলে নেই; সেটা হচ্ছে ঢাকঢোলের বাদ্য ও তালের শক্তি-উদ্দীপনাময় সঙ্গত। এ সকল উপাদানের সমাবেশে এই নৃত্য-প্রণালী একটি অতি আনন্দময় ও উচ্চাঙ্গের রসকলা ব'লে পরিগণিত হবার যোগ্য। বালিকারা আপন আপন মা, মাসী, ঠাকুরমা ও দিদিমাদের কাছ থেকেই এই সকল নৃত্য শিক্ষা ক'রে থাকে। মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ইত্যাদি জেলার পল্লীগ্রামে এখনও সূর্য্যব্রত ইত্যাদি উপলক্ষে ছোটবড় মেয়েরা প্রকাশ্যভাবে অতি সুরুচিপূর্ণ প্রণালীর নৃত্য ক'রে থাকেন। ফরিদপুরের নলিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি পরিবারের মেয়েদের মধ্যে এখনও ব্রত ও বিবাহ উপলক্ষে যে সকল নির্ম্মল ও সুন্দর নৃত্যপ্রণালীর প্রচলন আছে, তা দেখবার সুযোগ সম্প্রতি আমার হয়েছে। অবিবাহিতা মেয়েরা সুমধুর ছড়া আবৃত্তি ক'রে ব্রত নৃত্য ক'রে থাকে। উচ্চশ্রেণীর বয়স্কা মেয়েরা এখনও বিবাহ উপলক্ষে নানা প্রকার নৃত্য করে থাকেন। এই সব নৃত্যের মধ্যে আধুনিক খেমটা বাইনাচ ইত্যাদির মত বিলাস-বিভ্রমের লেশমাত্র আভাষও নাই। এই সকল নৃত্যের প্রণালী বাংলার প্রতি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করা একান্ত প্রয়োজন এবং তা করতে পারলে জাতির অশেষ উপকার সাধিত হবে।

বিবাহ-উৎসবের আনুষঙ্গিক নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা যে সকল গান গেয়ে থাকেন সেগুলি সহজ সরল কথা, ছন্দ ও সুরের লালিত্যে অতি মূল্যবান লোকসঙ্গীত।

ব্রত অথবা পূজা উপলক্ষে যে সকল লোকনৃত্য হয়, তার সঙ্গে ঢাক বাজে, আর বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে যে সকল মেয়েলী নৃত্য হয় তার সঙ্গে ঢোল বাজে।

পশ্চিম বাংলায় কোন কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবারের অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে ভাদ্রমাসে ইন্দ্রপূজার সময় ভাঁজো-নৃত্য এখনও প্রচলিত আছে। শুনিতে পাওয়া



জারি নৃত্য—ময়মনসিংহ

যায় কাটোয়া অঞ্চলে কোন কোন জায়গায় ভদ্র পরিবারের বয়স্থা মেয়েরা এখনও এই উপলক্ষে ভাঁজো নৃত্য ক'রে থাকেন।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এখনও বিবাহ উপলক্ষে নৃত্যগীতের প্রথা প্রচলিত আছে।

বাংলা দেশে পুরুষদের মধ্যে যে সকল লোকনৃত্য এখনও প্রচলিত আছে, তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিয়ে দেওয়া গেল।

রায়বেঁশে নৃত্য

পুরুষদের মধ্যে নানা দেশে যত নৃত্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে রায়বেঁশে নৃত্য যে সবচেয়ে গৌরবময়, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই নৃত্যের ইতিহাস ও প্রণালী আমি অন্যত্র বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছি*। আজকাল এই "রাইবিশে" নামধারী নর্ত্তকগণ যে প্রাচীন বাংলার "রায়বেঁশে" যোদ্ধাদের বংশধর, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হ'তে পারে না। কবিকঙ্কণচণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও কবি রামপ্রসাদের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন বাংলার "রায়বেঁশে" যোদ্ধাদের সমর-কৌশলের ও "বেড়াপাকের" পদ্ধতিতে তাণ্ডবনৃত্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন,—"এ রকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ; আমাদের দেশের চিত্তদৌর্ব্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য।" বাস্তবিক এই নৃত্য দেখলে এটাকে নটরাজ শিবের রণতাণ্ডব নৃত্যের অবিকল প্রতিরূপ ব'লে মনে হয়। বাংলার প্রতি গ্রামে এবং প্রতি স্কুলে এই নৃত্য প্রবর্ত্তিত হ'লে যে শক্তি ও সাহসের দিক দিয়া জাতির প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

কাঠি নৃত্য

বীরভূম অঞ্চলে কাঠি নৃত্য নামক যে নৃত্য প্রচলিত আছে, ইহাতে দুই হাতে দুটি ছোট লাঠি নিয়ে কয়েকজন লোক গোলাকার বৃত্তের আকারে ঘুরে ঘুরে নেচে থাকে। একজনের কাঠির সঙ্গে আর একজনের কাঠির ঠক্‌ঠকানি আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মাদল বাজে ও তার সঙ্গে সহজ সরল ভাষায় ও সুরে গানের সঙ্গত হয়। এতে বেশ একটা সুন্দর রসকলার উৎপত্তি হয়। আজকাল অনেক স্কুলেই এই নৃত্যের ও রায়বেঁশে নৃত্যের প্রবর্ত্তন হয়েছে।

*বঙ্গলক্ষ্মী:—(ফাল্গুন ১৩৩৭ হইতে শ্রাবণ ১৩৩৮)

ঢালি নৃত্য

যশোহর ও খুলনা অঞ্চলের ঢালি নৃত্য যে রাজা প্রতাপাদিত্যের বিখ্যাত ঢালি যোদ্ধাদের যুদ্ধনৃত্যের লুপ্তাবশেষ, তাতে সন্দেহ নাই। ইহাও রায়বেঁশের



বালিকাদের ব্রত-নৃত্য

মত একটা তাণ্ডব নৃত্য। নর্ত্তকগণ সাধারণতঃ গোল বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নৃত্য ক'রে থাকে। মাঝে মাঝে কাঠের তলোয়ার ও বেতের ঢাল নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। সঙ্গে ঢোল ও কাঁশি বাজে ও মাঝে মাঝে নর্ত্তকেরা হুঙ্কার দিয়ে থাকে। এককালে এই নৃত্য কেবল নমশূদ্রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আজকাল অনেক মুসলমানও ঢালি নৃত্য ক'রে থাকে।

জারি নৃত্য

মহরম উপলক্ষে মুসলমান পল্লীবাসিগণ যে সকল নৃত্য ক'রে থাকে, সেগুলি পূর্ব্ববঙ্গে জারি নামে প্রচলিত। মৈমনসিং জেলার জারি নাচই সব চেয়ে সুন্দর। নর্ত্তকগণ বামহাতে ধুতির কোঁচা ধ'রে থাকে এবং প্রত্যেকের ডান হাতে লাল রঙের এক একটা রুমাল থাকে ও গোলাকারে নৃত্য হয়। বাহির থেকে একজন "বয়াতি" মূল গানের কাহিনী সুর সহযোগে আবৃত্তি করে ও নর্ত্তকগণ দিশা গেয়ে থাকে। প্রত্যেক নর্ত্তকেরই ডান পায়েতে নূপুর থাকে, নাচ ও গানের সঙ্গে তালে তালে নূপুরের আওয়াজ বড়ই সুন্দর শোনায়। এই জারি নাচও আজকাল অনেক স্কুলে প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

বাউল ও কীর্ত্তন

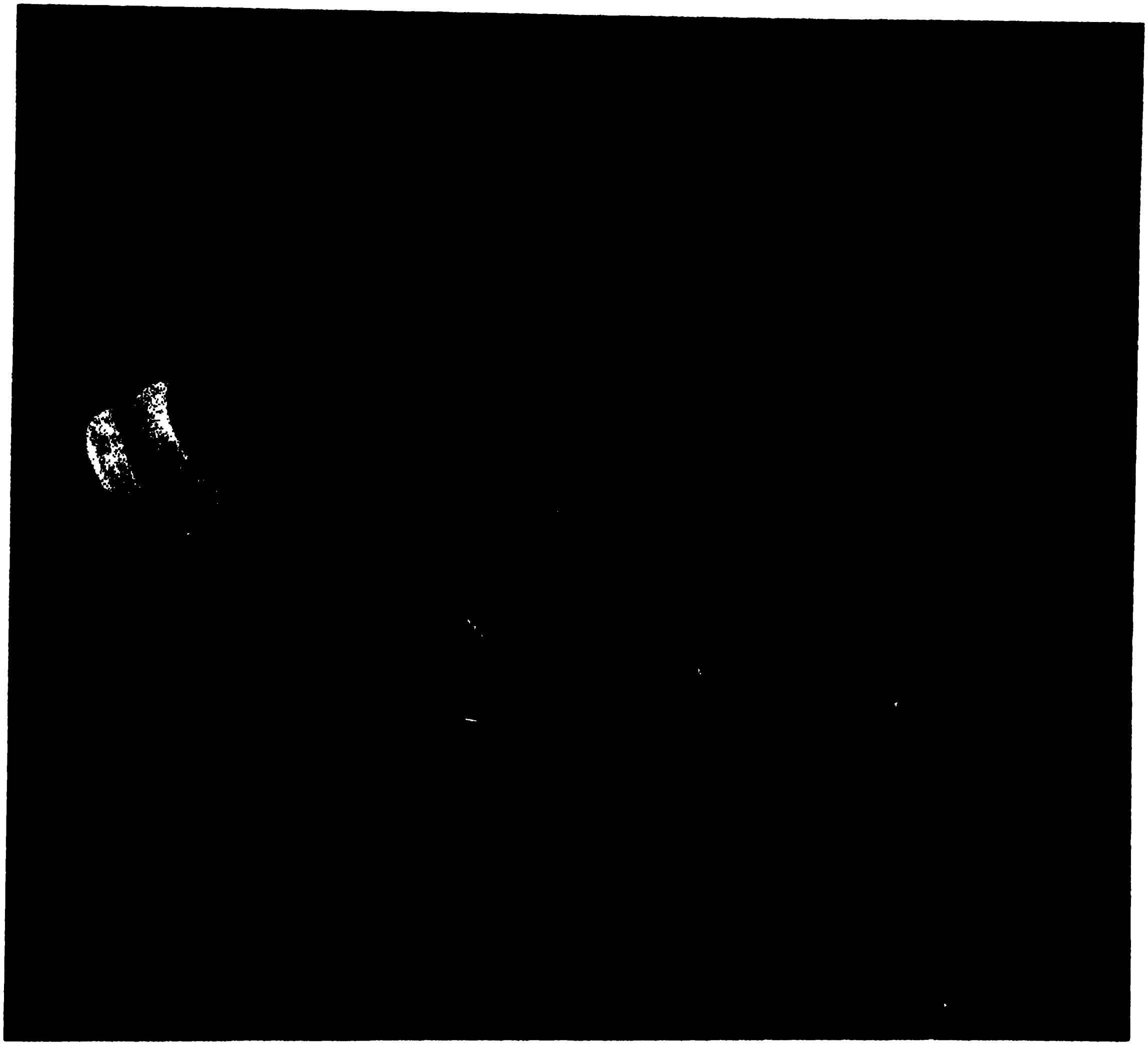
বাংলার বাউল ও কীর্ত্তন নৃত্যের কথা এখানে বেশী বিস্তৃতভাবে বল্‌বার দরকার নাই; কারণ এগুলি প্রায় সকলেই দেখেছেন ও সকলেই জানেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা আছে যে, নৃত্যকলা হিসাবে এগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই। এটা নিতান্ত ভুল। আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনার দিক দিয়া ও সহজ সরল গতিভঙ্গীর ছন্দের দিক দিয়া এগুলি পৃথিবীর সকল দেশের নৃত্যকলার মধ্যে একটি গৌরবময় স্থান পাবার যোগ্য। কীর্ত্তন নৃত্যের আর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ছোটবড় উচ্চনীচ সব সম্প্রদায়ের লোক একটা অনির্ব্বচনীয় সাম্যের ভাবে যোগ দিয়ে থাকে।

বাউল ও কীর্ত্তন নৃত্যের সঙ্গে যে সকল গান গাওয়া



মাদল পূজার নৃত্য

হয় সেগুলি ভাব, সুর ও ছন্দ-গৌরবে পৃথিবীর মধ্যে অনুপম। বাউল ও কীর্ত্তন নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল লোকসঙ্গীতের প্রবর্ত্তন বাংলা দেশের প্রত্যেক



গোয়ালিনী

শ্রীসোমলাল শা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

খুলে হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ও ইহাতে বাঙ্গলা দেশে সঙ্গীত-প্রতিভার ও কাব্য-প্রতিভার পুনর্জাগরণের বিশেষ সহায়তা করবে।

অবতার-নৃত্য ও ধূপ-নৃত্য

ফরিদপুরের চড়ক-গম্ভীরা পূজার অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ, কায়স্থ, চর্মকার, নমশূদ্র ইত্যাদি জাতির মধ্যে যে সকল নাচের প্রচলন আছে তার মধ্যে অবতার নৃত্য ও ধূপ-নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবতার-নৃত্যে বাংলা ভাষায় মন্ত্রের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিব বন্দনা ইত্যাদি করা হয় এবং তারপর দশ অবতারের প্রত্যেকটির অভিনয়-মূলক ভঙ্গী শ্লোকের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের আকারে দেখান হয়। ধূপনৃত্যটি বৃত্তাকারে হয়। প্রত্যেক নর্তকের বাঁ হাতে থাকে এক একটি ধুনুচি, তাতে জলন্ত কাঠের উপর ধুনার ছিটা দিতে দিতে নর্তকগণ নৃত্য করতে থাকে। প্রত্যেক ছিটার সঙ্গে দপ্ করে আগুন জলে উঠে ব'লে অন্ধকার রাত্রে এই নাচটি বড়ই সুন্দর দেখায়। এই নাচের ভঙ্গীগুলি তাণ্ডবশ্রেণীয়।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

৬

বালিগঞ্জের এক নিভৃত প্রান্তে তিন বিঘা পরিমিত বিস্তৃত মাঠের একধারে ঘন-তরুসন্নিবেশের মধ্যে বীণার পিতা হৃষীকেশ বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। হৃষীকেশ তখন পাটের ব্যবসা করিতেন, সেই উপলক্ষ্যে বহু টাকা তাঁহার হাতে আসিত, আবার খরচ হইয়া যাইত। মিতব্যয়িতা সে-বয়সে তাঁহার অভ্যাস ছিল না। কেহ কিছু বলিলে তিনি বলিতেন, ব্যবসায়ী মানুষের টাকা আটকা পড়িয়া থাকিলে চলে না। টাকার বীজ বুনিয়া যাহাদের ফসল উৎপাদন করিতে হয়, দু-হাতে করিয়া টাকা ছড়াইবার সাহস তাহাদের থাকা চাই। দুঃখ ছিল এই, যত টাকা ছড়ানো হইত তাহার অতি অল্প অংশেই ফসল ফলিত, কেবল সেই ফসল তাঁহার ভাগ্যগুণে পর্য্যাপ্ত করিয়া ফলিত বলিয়া বহুকাল তাঁহার যুক্তির মধ্যেকার ভুলের ফাঁকটা তাঁহার চোখে পড়ে নাই। চোখে পড়িয়াছিল সুরবালার। বহু-আয়াসে, প্রতিপদে স্বামীর বহুবিরক্তির বিনিময়ে, সেই অমিতাচারের সংসারেও লক্ষাধিক টাকা তিনি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বামীর ব্যবসায়ের ভাঙন-ধরার মুখে, সে টাকাকে আর-কোনও উপায়ে রক্ষা করা যাইবে না ইহা বুঝিতে পারিয়া, সঞ্চয়ের শেষ পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত এই বাড়ীনির্মাণে নিয়োগ করিতে হৃষীকেশকে তিনি বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যে-বাড়ীর প্রতিটি ইটের গাঁথুনিতে চুণসুরকির মশলার সঙ্গে তাঁহার অনেকদিনের অনেক অশ্রুজল অলক্ষ্যে মিশিয়া গিয়াছিল, নিজে সেই বাড়ীতে একটি দিনও বাস করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। যখন রঙের কাজ, আলোর মিস্ত্রীর কাজ শেষ হইয়া বাড়ী বাসযোগ্য হইতে আর দুই-তিন সপ্তাহ মাত্র বাকী তখন অকস্মাৎ এক মেঘতারাচ্ছন্ন অন্ধকার শ্রাবণ-রাত্রির শেষে বীণার ছোট ভাই রাহু পৃথিবীতে আসার সূত্রে এই পৃথিবীর কাছ হইতে তিনি নিজে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া গেলেন।

ছোটখাট প্রাসাদের মত বাড়ীটার পাশে ছোট একটি একতলা বাংলা, এক-ইটের দেয়াল, টালির ছাত। এইটিতে হৃষীকেশ নিজে বাস করেন। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী যে-বাড়ীর প্রতিটি দরজা-জানালা হইতে সুরু করিয়া সিঁড়ির রেলিং, রেলিঙের লোহার কাজের পরিকল্পনা, ভিতর

এবং বাহিরের কারুকার্য্য পর্য্যন্ত নিজ হাতে মাপজোখ করিয়া আঁকিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিয়া এবং স্থপতিদের দেখাইয়া দিয়া, তাঁহার নিভৃত মনের বহু আশা-সাধ-প্রীতির দ্বারা মণ্ডিত করিয়া তিলে তিলে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে-বাড়ীতে তাঁহাকেই বাদ দিয়া একাকী নিজে প্রবেশ করিতে হৃষীকেশের মন উঠে নাই। চারিপাশে অনেকখানি করিয়া বারান্দা, ভিতরে ছোট ছোট তিনটি ঘর, অপরিহার্য্য আসবাব-পত্র, একপাশে একটি স্নানের ঘর। নিজের পড়িবার ঘরেই পৃথক একটি ছোট টেবিলে একাকী তিনি আহার করেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এই স্বাধিকারের সীমা কদাচ লঙ্ঘন করেন না।

গাড়ীবারান্দার নীচে আর্ম্মিন্ সেডান্ হইতে নামিয়া মন্দিরার হাত ধরিয়া বীণা তাঁহার পড়িবার ঘরে গিয়া হাজির হইল।

হৃষীকেশ একমনে সেদিনকার বিলাতী ডাকের প্রেততত্ত্ববিষয়ক একটি কাগজ পড়িতে ব্যস্ত ছিলেন, মন্দিরা ছুটিয়া গিয়া "দাদুমণি আমরা এসেচি" বলিয়া একেবারে তাঁহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একটু হাসিয়া অতিসন্তর্পণে চোখ হইতে চশ্‌মাটা খুলিতে খুলিতে হৃষীকেশ কহিলেন, "তোমাদের ক্লাবের মিটিং হয়ে গেল মা?"

বীণা কহিল, "শেষ হয়নি এখনও। মেয়েটাকে নিয়ে কি পারবার জো আছে, পালিয়ে আসতে হ'ল।"

হৃষীকেশ হাসিয়া সস্নেহে মন্দিরার পিঠে হাত বুলাইলেন। তাঁহার মাতৃহীনা কন্যা, পিতৃহীনা দৌহিত্রী!

পিতাপুত্রীতে আর-কোনও কথা হইল না। কাহারও সঙ্গেই একটি-দুইটির বেশী কথা বলা হৃষীকেশের স্বভাব নহে।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পিতার টেবিলে-পড়া বইকাগজপত্র অন্যমনে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বীণা নিঃশব্দে মন্দিরাকে লইয়া চলিয়া আসিতেছিল, হৃষীকেশ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিলেন, "এই চিঠিখানা তোমার পিসীমাকে দিও, কেউ এদিকে ছিল না ব'লে এতক্ষণ পাঠাতে পারিনি।" হৃষীকেশ প্রয়োজন হইলেও দূর হইতে কাহাকেও ডাকিবেন না জানিয়া চাকরেরা পারতপক্ষে তাঁহার দৃষ্টিপথের কাছাকাছি কোথাও থাকিত না। বীণা চিঠিটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া যাইবার আগেই তিনি আবার কাগজে মনোনিবেশ করিলেন।

দুতলাটার বেশীর ভাগ এতকাল খালি পড়িয়া ছিল। একটা ঘরে বীণার ভাই রাহু মাষ্টারের কাছে পড়া করিত, আর একটাতে ছিল মন্দিরার খেলার ঘরসংসার, বাকী ঘরগুলি বেশীর ভাগ সময়ই তালাবদ্ধ থাকিত, অতিথি-অভ্যাগত কেহ আসিলে সেগুলির দরজা খোলা হইত, ধুলিঝুলে ঝাঁট পড়িত। হেমবালা আসার পর দুতলার সমস্তটা জুড়িয়া তাঁহার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাহু এখন পড়াশোনার সময় ছাড়া দুতলাতেই তাঁহার কাছে দিনের অধিকাংশ সময় থাকে, তাঁহারই সঙ্গে শোয়। মন্দিরা এতকাল তেতলায় মায়ের ঘরের পাশে আয়ার সঙ্গে শুইত, দুইদিন হইল ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া সেও দিদিমার সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছে। ফলে রাহু এবং মন্দিরার প্রায় সমস্ত ভারই হেমবালা লইয়াছেন, তাঁহার মনটার এখন এই ধরণের আশ্রয়ের প্রয়োজনও ছিল কম নয়।

ভাইয়ের নিকট হইতে চাহিয়া-আনা ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক কি একখানি বই হাতে করিয়া হেমবালা তাহাতে মনঃসংযোগের বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। বীণা ঘরে প্রবেশ করিতেই দেয়ালে ঝুলান ঘড়িটার দিকে আড়-চোখে একবার চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার হাতে চিঠিটি এবং মন্দিরাকে অর্পণ করিয়া বীণা কহিল, "এই নাও তোমার চিঠি, আর এই নাও মেয়ে। আর কখনও যদি আমি ওকে সঙ্গে ক'রে কোথাও নিয়ে যাই ত কি বলেছি।"

হেমবালা হাত বাড়াইয়া চিঠিটি লইলেন, তারপর চিঠিশুদ্ধ হাত সেইভাবে উঁচু করিয়া ধরিয়াই নতমস্তকে বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

বীণা কহিল, "তুমি এখনও খাওনি পিসীমা? ইলু যেন কি! সব ক'রে রেখে গেলাম, একটু হুঁস ক'রে তোমার খাবারটা এনে দেবে তাও পারে না?"

পাতার ভাঁজের মধ্যে চিঠিটিকে রাখিয়া বই বন্ধ

করিয়া হেমবালা বলিলেন, "ওর দোষ নেই, আমারই দেরি হয়ে গেল সব জিনিষপত্র গোছগাছ করতে। যা হয়ে ছিল সব! এসে অবধি ত ঐ করছি। রাত অবিশ্যি বেশ অনেকটাই হয়েছে, তা তোমরাও ত না খেয়েই আছ সব? ঐ কচি বাচ্চাটা এত রাত অবধি শুকিয়ে আছে, ওকে ফেলে আমি নিজে খেয়ে নিলে সেটা দেখতে খুব বেশী ভাল হ'ত কি।"

হেমবালার কথার মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন তিরস্কারটুকুকে বীণা গায়ে মাখিল না। তাঁহার পাশেই একটুখানি জায়গা করিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, কহিল, "হ্যা পিসীমা, তোমাদের দেশে আমায় একবার নিয়ে চল না। আমার একবার খুব পাড়াগাঁয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কখনও যাইনি জন্মে অবধি। একবার কেবল বর্দ্ধমানে গিয়ে দিনকতক ছিলাম, তা সে ত শহর।"

হেমবালা গম্ভীর মুখেই কহিলেন, "তা বেশ ত, এবারে পাড়াগেঁয়ে বর দেখে তোর আর-একটা বিয়ে দেব, তাহলেই হবে ত?"

দুটি হাতকে জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বীণা কহিল, "রক্ষা কর বাবা, ঢের হয়েছে, আর না।"

মন্দিরা দিদিমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আবদারের সুরে কহিল, "আমাকেও পাড়াগেঁয়ে বর দেখে বিয়ে দিও দিছু।"

হেমবালার মুখে তবু হাসি ফুটিল না, কহিলেন, "তোকে কি করবে? তোকে দেখে ভয় পেয়ে যাবে।"

মন্দিরা বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে একহাতে জড়াইয়া আরও কাছে টানিয়া তীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টিতে বীণাকে চকিতে একবার দেখিয়া লইয়া হেমবালা কহিলেন, "কেন বীণা, বাধাটা কি শুনি?"

বীণা খোলা জানালার বাহিরের অন্ধকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "বেশ ত সুখে আছি।" তারপর গম্ভীর হইয়া গেল। একটু পরে কহিল, "ইনু কি করছে দেখি একটু," বলিয়া ঘোমটার কাঁটা, চুলের কাঁটা খুলিতে খুলিতে উঠিয়া পড়িল।

তেতলায় ঐন্দ্রিলার পড়িবার ঘরে ঐন্দ্রিলা এবং বীণার ছোটভাই রাহু বসিয়া ছিল। রাহুর বয়স দশ-এগারোর বেশী নহে, তদুপরি সে আবার রুগ্ন, সুতরাং হইতে তাহার শরীরের প্রায় সমস্তটাই ঐন্দ্রিলার আড়ালে পড়িয়া গিয়াছিল। "কি করছিস রে ইনু," বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া রাহুকে দেখিতে পাইয়া বীণা বলিল, "তোর যে আজ ভারি মনোযোগ দেখছি রে রাহু?"

ঐন্দ্রিলা একটু হাসিয়া বলিল, "হাঁ্যা, মনোযোগ ত কত! বই ছুঁড়ে ফেলে এসে ছবি আঁকতে বসেছে।"

বীণা ঝাঁঝিয়া কহিল, "এই বুঝি তোর এবার ফার্ষ্ট হবার নমুনা? পরীক্ষার আর ক'দিন বাকী রে তোর?"

রাহু ছবির খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "আর ত দু-বৎসর পর আমি জিওমেট্রি করব, তখন ঢের ছবি আঁকতে হবে।"

বীণা কহিল, "তারও ক'বছর পরে ত ঘাস কাটবি, এখন থেকেই নেংটি প'রে তাহলে মাঠে নেমে পড় না?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "রাহু সর্দ্দার, যাও তোমার ঢের ছবি আঁকা হয়েছে, এবারে খেয়েদেয়ে ঘুম দাও গে।"

রাহু বলিল, "বা রে, বাঘের যে ল্যাজ বাকী রইল!"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "এ বাঘটা ল্যাজ কেটে সভ্য হয়েছে।"

রাহু আবদার করিয়া বলিল, "না, ল্যাজ দিয়ে দাও।"

বীণা কহিল, "তোরটাই না-হয় কেটে ওকে দিয়ে দে না।"

রাহু বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না।"

বীণা বলিল, "না বলতে হ'লে ত বাঁচি রে! তুই যা দেখি, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়, দেখিস তোর সঙ্গে কেউ কথা বলতে যাবে না।"

রাহু রাগ করিয়া ছবির খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলে তাহার পরিত্যক্ত আসনটিতে বসিয়া চুলের কাঁটা, ফিতা, ব্রোচ, কানের দুল, প্রভৃতি খুলিয়া খুলিয়া বীণা তাহার কোলের উপর রাখিতে লাগিল। ঐন্দ্রিলা কহিল, "কি হ'ল রাবে?"

"হবে আবার কি ছাই, যা হয়।"

"সবাই গোল হয়ে ব'সে কেবল গল্প করলে?"

"আর কি করব, নাচব?"

"তাহলেও ত একটা কাজ হয়।"

"তুই গিয়ে একদিন নেচে দিয়ে আসিস্। খুব ত তুই কাজের মেয়ে, পিসীমাকে চাট্টি খেতে সুদ্ধ দিতে পারিস্ নি। যাবার সময় এত ক'রে ব'লে গেলাম।"

ঐন্দ্রিলা বসিয়া বসিয়াই বলিল, "এইরে, একেবারে ভুলে গেছি। রাহুসর্দার একবার এসে জুটলে কিছু কি আর মনে থাকতে দেয়? আমি না-হয় এক্ষুণি যাচ্ছি।"

বীণা বলিল, "থাক্, তোকে আর যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি কাপড়চোপড় ছেড়ে।"

ঐন্দ্রিলা লুকাইয়া নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস ফেলিল। কলিকাতায় ফিরিয়া অবধি পারতপক্ষে মায়ের কাছে সে ঘেঁষে না। হেমবালাও তাহাকে বড়-একটা কাছে ডাকেন না। ইহাতে মনে মনে সে খুশীই হয়। হেমবালা কলিকাতায় আসার সূত্রে তাঁহার জীবনে এবার যাহা বহন করিয়া আনিয়াছেন বহু চেষ্টা করিয়াও সে মহা-পরিবর্ত্তনকে নিজের মনের মধ্যে সে গ্রহণ করিতে পারে নাই, মাকে দূরে দূরে রাখিয়া সেই সংশয়াকুল অবস্থাটার বিরুদ্ধে নীরবে সে বিদ্রোহ জানায়। ঐটুকু বিদ্রোহই তাহার স্বভাবের পক্ষে ছিল প্রচুর, কিন্তু সেটুকুরও প্রয়োজন হইত না, পিতা অপরাধ করিয়াছেন ইহা যদি নিশ্চয় করিয়া সে বুঝিতে পারিত। মায়েরই নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে-পাওয়া তাহার স্বভাবের কঠোর ন্যায়নিষ্ঠা তাহার সমস্ত সংশয়-বেদনাকে তাহা হইলে মুহূর্ত্তে আড়াল করিয়া দাঁড়াইত। হেমবালারই মত নিজের বিবেকবুদ্ধি দিয়া যাচাই করিয়া চিরকাল সে পৃথিবীর বিচার করিত, যেখানে শাস্তি পাওনা সেখানে শাস্তিবিধান করিতে কোনও দিনই সে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু তাহার স্বভাবে পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের স্বভাবের উপকরণও বড় কম ছিল না। পিতার নিকট হইতে একটি জিনিষ সে অত্যন্ত বেশী করিয়া পাইয়াছিল। তাহা সর্ব্বত্র সমস্ত অবস্থায় অত্যন্ত সরাসরি বিচারযুক্তিহীন একধরণের সত্যানুরক্তি। সত্য যাহা তাহা যে প্রকাশ পাইল না, নীরবতার আড়াল তাহাকে প্রবঞ্চনার মত হইয়া ঘিরিয়া রহিল, এজন্য কাহাকে সে দোষী করিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু তাহার সমস্ত মন তিক্ত হইয়া রহিল।

বীণা কাপড় ছাড়িতে শুইবার ঘরে ঢুকিলে ঐন্দ্রিলাও তাহার অনুসরণ করিল। শাড়ী জামা পাট করিয়া আলমারীতে উঠাইয়া রাখিতে রাখিতে বীণা বলিল, "আজ একজন নূতন লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল।"

তাহার বিছানার একপ্রান্তে আধশোয়া হইয়া বসিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "কে?"

"অজয় রায়।"

"সে আবার কে?"

"ঐ যে কাগজে লেখেন, গানও খুব ভাল করেন শুনেছি।"

"ছাপার অক্ষরে নামটা দেখেছি মনে হচ্ছে বটে, লেখা যদিও পড়িনি একটাও। গান যে শুনিনি তা জোর ক'রেই বল্‌তে পারি।"

"নিশ্চয় পড়েছিস্, তোর মনে থাকে না। ভারতবর্ষে বাঙালীরাই চিরকাল সবচেয়ে লড়িয়ে জাত, এসম্বন্ধে এঁর একটা লেখা প'ড়ে আমরা খুব হেসেছিলাম, মনে নেই?"

"ও, হ্যাঁ, মনে আছে বটে। খুব কি বীরপুরুষের মত দেখতে?"

"ঠিক উল্টো, তালপাতার সেপাই, তার উপর আবার ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না।"

"তা ওরকম হয়।"

"তুই ত কতই জানিস। কটা মানুষকে দেখেছিস? একদিন আয় না।"

"কি হবে?"

"অজয়বাবুকে দেখবি।"

ঐন্দ্রিলা একটু হাসিল, কহিল, "তোমার বর্ণনা শুনে ত মনে হচ্ছে না খুব বেশী দেখবার মত।"

বীণা একখানি কোঁচানো ঢাকাই শাড়ী আলনা হইতে পাড়িয়া লইয়া পরিতে পরিতে বলিল, "আহা, দেখবার মত আবার কি, ছুটো শিঙ আছে, না শুঁড় আছে? তবে ভারি মজার কিন্তু, তোর ঠিক ভাল লাগবে দেখিস।"

"আমার ভাল-টালো কাউকে লাগে না বাপু," বলিয়া ঐন্দ্রিলা পা-মোড়ামুড়ি দিয়া উঠিয়া পড়িল।

বীণা তাঁহার ঘর হইতে চলিয়া গেলে চিঠিসুদ্ধ বই-খানিকে বালিশে চাপা দিয়া রাখিয়া হেমবালাও উঠিয়া

পড়িলেন, দুতলার বারান্দার রেলিঙ হইতে ঝুঁকিয়া ডাকিলেন, "ক্যান্ত !"

ক্ষেন্তি তখন নীচে রান্নাঘরে বসিয়া ঠাকুরের রন্ধনের সমালোচনা করিতে ব্যস্ত ছিল।…কাঁচা লঙ্কা না দিয়ে কিরকম আবার নিরিমিষ তরকারী হচ্ছে…তাতে আবার দুধ, এমন কাণ্ড কখনও কেউ বাপের জন্মে দেখেনি…দুধে নুনে মিশলে যে গোরক্তের সমান হয় গো! হেমবালার ডাক শুনিয়া ছুটিতে ছুটিতে উপরে আসিল। কহিল, "আমায় ডাকছিলেন মা ?"

হেমবালা মন্দিরাকে তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিলেন, "এর আয়া কোথায় আছে দেখ্, একে তার কাছে নিয়ে যা, কাপড় ছাড়িয়ে খাওয়াতে বল্।"

ক্ষেন্তি ভিন্ন অপর কোনও ঝি-চাকরকে হেমবালা পারতপক্ষে নিজের ঘরে ডাকিতেন না। ভাইয়ের সংসার হইতে কোনও দিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু তিনি লইবেন না ইহা স্থির ছিল।

ক্ষেন্তি কহিল, "তা ত বলব মা, কিন্তু আমার কথায় এখানে কি কেউ কান দেয় ? সব গা-টেপাটেপি ক'রে হাসে। এদের আদব দেখে গা জ্ব'লে যায় মা, আমরা রাজবাড়ীর ঝি-চাকর…"

হেমবালা তাহাকে তাড়া দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তুই যা ত এখন।"

সে চলিয়া গেলে হেমবালা ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। বালিশের তলা হইতে বইখানি বাহির করিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ অকারণেই তাহার কয়েকটা পাতা উল্টাইলেন। তারপর হঠাৎ এক সময় চিঠিটিকে বাহির করিয়া কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই খুলিয়া ফেলিলেন। দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়াই পড়িতে লাগিলেন, যেন বসিয়া পাঠ করিলে চিঠিটিকে অনাবশ্যক বেশী মর্য্যাদা দান করা হইবে। পরিচিত চিঠির কাগজ, পরিচিত হস্তাক্ষর!

'যে অপরাধের ক্ষমা নাই তাহার জন্ত তোমার কাছে ক্ষমাভিক্ষা আর করিতে চাহি না। কিন্তু ক্ষমা না করিয়াও ত মানুষে দয়া করে ? তুমি দয়া করিয়াই ফিরিয়া আইস।

'তুমি কাছে না থাকিলে বাঁচিয়া থাকার কোনও অর্থ থাকে না, ইহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। এক-একবার এমনও মনে হইতেছে, প্রলোভনে যে ভুলিয়াছিলাম তাহাও তোমাকে দিয়া আমার অন্তর পরিপূর্ণ ছিল বলিয়াই পারিয়াছিলাম। এই অদ্ভুত কথার কি যে অর্থ হইতে পারে তাহা তুমি বুঝিবে না, পৃথিবীর কেহই সম্ভবতঃ বুঝিবে না, এমন কি আমি নিজেও ভাল করিয়া বুঝিতেছি না, কিন্তু ঈশ্বর রাধাগোবিন্দজী জানেন, আমি মিথ্যা কহিতেছি না। আজ তুমি কাছে নাই, পৃথিবীতেও এমন-কিছু নাই যাহা আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে।

'আমার আর যত দোষই থাকুক, জ্ঞান হইয়া অবধি কখনও আমি মিথ্যা কহি নাই। যদি ইচ্ছা করিতাম, খুব সহজে তোমাকে আমি ফাঁকি দিতে পারিতাম। কাহারও সাধ্য ছিল না আমার অপরাধ প্রমাণ করিতে পারে, এখনও সে সাধ্য কাহারও নাই। আমি না বলিলে আমাকে সন্দেহ করিবার কথাও তোমার মনে আসিত না। কিন্তু পৃথিবীতে তোমারই জানিবার অধিকার আছে বলিয়া নিজে হইতে অকপটে তোমাকে আমি সত্য কহিয়াছি, কিছু গোপন করি নাই। আজও আমি সত্য কথাই কহিতেছি।

'অপরাধী নিজে হইতে অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার দণ্ড হ্রাস হয়। কিন্তু তুমি আমাকে আমার প্রাপ্য চরম দণ্ডই দিতেছ।

হতভাগ্য নরেন্দ্রনারায়ণ।'

হেমবালা সত্যই কিছু বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিবার আগ্রহও তাঁহার কিছু ছিল না। তাড়াতাড়ি চিঠিটিকে ভাঁজ করিয়া তবু নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধেই ইহার মর্ম্মোদ্ধারের চেষ্টা কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া তিনি করিলেন। ঠোঁটের কোণ দুইটা অবাধ্য হইয়া কাঁপিতেছিল, দৃঢ়তার দ্বারা সেটুকুকে শাসন করিলেন। একবার চিঠিটি ছিঁড়িতে উদ্যত হইয়াও ছিঁড়িলেন না, ছেঁড়া টুকরা কোথায় ফেলিবেন, কে কোথায় কুড়াইয়া পাইয়া পড়িবে, দেরাজ হইতে চাবির গোছা লইয়া নিজের ছোট হাতবাক্সটি খুলিয়া সমস্ত কাগজপত্রের নীচে চিঠিটিকে রাখিয়া দিলেন।

তারপর আলো নিবাইয়া দরজার শিকল টানিয়া দিয়া আস্তে হৃষীকেশের মহলে আসিয়া ঢুকিলেন।

হৃষীকেশ নড়িয়া বসিয়া চোখ হইতে চশমা নামাইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "নরেন চিঠি লিখেছে ?"

হেমবালা অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "হঁ্যা।"

"কেমন আছে ?"

"জানি না।"

হৃষীকেশ আবার একটু নড়িয়া বসিলেন।

হেমবালার এবারকার কলিকাতা আসাটা যে খুব স্বাভাবিক কারণে ঘটে নাই হৃষীকেশ গোড়াগুড়িই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হেমবালার ধরণধারণ দেখিয়া এতদুপরিও কিছু কিছু তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। হেমবালা লুকাইতেই চাহিতেছেন বুঝিতে পারিয়া নিজে তিনি কিছুই জানিতে চাহেন নাই। কিন্তু যতটা বুঝিয়াছিলেন তাহাতেই ভগিনীকে খুব বেশী আগ্রহ সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেও তাঁহার বাধিতেছিল, এবং এজন্য যতবেশী বেদনা পাইতেছিলেন ততবেশী নিজেকে লইয়া তিনি সকলের হইতে দূরে থাকিতে চাহিতেছিলেন। হেমবালা নিজে তাঁহার ঘরে না আসিলে ভ্রাতাভগিনীতে কচিৎ সাক্ষাৎ হইত। অবশ্য প্রতিদিন প্রভাতে হেমবালা সুনিয়মে একবার করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে ও তাঁহার সংবাদ লইতে আসিতেন, তখন কিছুক্ষণ করিয়া নীরবে তাঁহার পায়ের কাছটিতে বসিয়া থাকিয়া যাইতেন, হৃষীকেশের পড়াশোনায় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। আজ নিজেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া একটুখানি কাশিয়া তিনি কহিলেন, "নরেন সব-কিছুতেই ঐরকম। কোনো বিষয়ে গা করে না। জেনেশুনে যে অপরাধ করে তা মোটেই নয়, অন্তে অপরাধ নিতে পারে এই সহজ কথাটা কিছুতে তার মাথায় আসে না।"

হেমবালা কোনও কথা কহিলেন না, হৃষীকেশও কিছুক্ষণ নীরবেই স্নেহাবনত দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ভগিনী হইলেও হেমবালা তাঁহার কন্যা-স্থানীয়া, তাঁহার নিজের বয়স এখন ষাটের প্রায় কাছাকাছি, হেমবালার বয়স চল্লিশের বেশী হইবে না। পিতার মৃত্যুর পর কন্যাস্নেহেই ইঁহাকে তিনি লালন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া সত্যই হেমবালাকে দেখিলে ঐন্দ্রিলার মা মনে হইত না। ঐন্দ্রিলার দিদি বলিয়াই লোকে ভুল করিত। কানের কাছটিতে একদিকে দু-একটি চুলে পাক ধরান ভিন্ন বিগত যৌবন তাঁহার দেহ হইতে যৌবনশ্রীর আর-কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই। তাঁহার দিকে চাহিয়া সহজেই হৃষীকেশ মাঝখানকার কয়েকটা বৎসরের ব্যবধানকে ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত সুদূর অতীতের অনেকগুলি দিন হঠাৎ আজ আবার স্মৃতিপথে ভিড় করিয়া আসিয়া তাঁহার দুই চোখকে বারবার অশ্রুসিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া কহিলেন, "তোমার বিয়ের বৎসর একবার বাপ-মাকে না ব'লেই তোমাকে নিতে এসে হাজির। আমি বললাম, 'তুমি হেমকে নিতে এসেছ, কই, তোমার মা-বাবা ত সে-বিষয়ে কিছু লেখেননি।' বললে, 'আমি তাঁদের মন জানি, বউ বাড়ী গেলে তাঁরা খুব খুশীই হবেন।' আমি বললাম, 'তুমি ছেলেমানুষ, বুঝছ না, হেমকে নেবার প্রস্তাবটা তাঁদের কাছ থেকেই আসা দরকার।' সে কিছুতেই বুঝল না, রাগ ক'রে না-খেয়েদেয়েই চ'লে গেল। তারপর আমার বাড়ী আর বড় একটা সে আসেনি।"

হেমবালা নতমস্তকে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হৃষীকেশও ইহার পর অকস্মাৎ একসময় ঘুরিয়া বসিয়া কি একটা লেখার কাজে মনোনিবেশ করিলেন। বীণা আসিয়া ডাকিল, "পিসীমা, খাবে না ?"

"না, আমি এইখানেই দাদার কাছে একটু বসছি। মন্দিরার খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে শুইয়ে দিতে আয়াকে বল্‌গে যা। বিছানা করাই আছে।"

"তা ত বলব, কিন্তু তুমি খাবে না কেন ?"

"খিদে নেই মা, তুই যা।"

বীণা অত্যন্তই বিস্মিত হইল, কিন্তু পিতা এবং পিতৃস্বসার মুখের দিকে চাহিয়া আর-কিছু বলিতে তাহার

সাহস হইল না। সে চলিয়া গেলে ভ্রাতৃভগিনী যেমন বসিয়াছিলেন নীরবেই বহুক্ষণ সেইভাবে বসিয়া রহিলেন।

খাইতে বসিয়া ঐন্দ্রিলা বলিল, "এবারে আস্‌তে পথে তোমাদের সুভদ্রবাবুকে দেখলাম।"

বীণা বলিল, "কই, আগে বলিস্‌নি ত? আলাপ হ'ল?"

"উঁহু, কথা যদিও বল্‌লাম অনেকগুলো।"

"তোকে চিন্‌তে পার্‌লেন না?"

"কি ক'রে চিন্‌বেন? সুলতাদিদের বাড়ীতে আমিই ওঁকে দেখেছি, আমার পরিচয় কেউ ওঁকে দিয়েছে ব'লে ত মনে হয় না।"

"কি কথা হ'ল?"

"দেওয়ানজী প'ড়ে গিয়ে একটু চোট পেয়েছিলেন, তাঁকে ধ'রে তাঁর কেবিনে দিয়ে আসতে বললাম।"

"দিলেন?"

"হুঁ।"

"তারপর তুই কি বল্‌লি?"

"কি আবার বল্‌ব, একটু কেবল হাসলাম।"

"ধন্যি মেয়ে বাবা তুই, একটু ধন্যবাদ ত দিতে হয়?"

"বাংলা ভাষায় সেটা ত আর দেওয়া চলে না, নয়ত দিতাম।"

"সুভদ্রবাবু তোর হাসি দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন বোধ হয়?"

"সম্ভব।"

"কি বল্‌লেন?"

"বল্‌লেন, আমার সঙ্গে টিংচার আইওডিন আছে দিচ্ছি, ওঁর পিঠে একটু লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।"

"উঃ, একেবারে পুরোদস্তুর রোমান্স! তারপর কি হ'ল শুনি।"

"Exit এবং Curtain।"

"এই নাকি তোর অনেকগুলো কথা?"

"তা বই কি, কথা আবার লোকে কত বলে?"

বীণা কলকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, "সত্যি, আমার বদলে তুই আমার বাবার মেয়ে হ'লে পারতিস।"

ঐন্দ্রিলা সে হাসিতে যোগ দিল না, কি মনে করিয়া গম্ভীর হইয়া গেল।

খাওয়া শেষ করিয়া দু-জনে উঠিয়া পড়িবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় খাবার ঘরের পাশে বাগানের সুরকি-ঢালা রাস্তায় মোটরের চাকার শব্দ শোনা গেল। বীণা বলিল, "এত রাত্রে কে আবার আসে রে বাবা!"

গাড়ীবারান্দার নীচে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, তার পরেই স্মিতহাস্যে মুখ ভরিয়া বিমান আসিয়া একেবারে খাবার ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। ঐন্দ্রিলা অল্প একটু তাহার দিকে পিঠ দিয়া সরিয়া বসিল। বীণা অত্যন্ত বিস্মিত মুখ করিয়াছিল। অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি এমন সময়ে হঠাৎ?"

বিমান নত হইয়া দুই বোনকে নমস্কার করিল, তারপর অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "আপনার এই বইটা ক'দিন ধ'রে ক্লাবে প'ড়ে ছিল, দিতে এসেছি।"

হাত বাড়াইয়া বইটা লইয়া বীণা বলিল, "ক্লাবের দরোয়ানকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই ত হ'ত, নিজে কেন এলেন কষ্ট ক'রে?"

বিমান কহিল, "কষ্ট আবার কি, pleasure বলুন।"

বীণা হাসিয়া কহিল, "তথাস্তু।"

বিমান দাঁড়াইয়াই ছিল, কহিল "একবার বস্‌তেও যে বল্‌লেন না বড়?"

বীণা অবলীলায় কহিল, "বস্‌তে বল্‌লেই খেতে বল্‌তে হয়, কিন্তু খেতে দেবার মত কিছু আর দু-বোনে বাকী রাখিনি।"

বিমান একটা চেয়ার টানিয়া গুছাইয়া বসিল, কহিল, "রাত্রের খাওয়া একটু সকাল-সকালই সেরে ফেলেন বুঝি?"

বীণা কহিল, "হ্যাঁ, আর বেশী রাত করলে ভোরবেলার চা-খাওয়াটাও সঙ্গে সঙ্গে সেরে নিতে হয়।"

বিমান কহিল, "আমার দেখুন দিনের বেলাটা এত বেশী sordid লাগে, যে, বেঁচে থাকবার মত সময় যেটুকু রাত্রেই আমাকে ক'রে নিতে হয়। অন্ধকারে মনটা তবু অনেকখানি ছাড়া পায়, যে-দিকে যা-খুশী কল্পনা ক'রে নেওয়া চলে।"

বীণা কহিল, "তা ঠিক, কিন্তু রাত্রে উঠে যেয়ে যখন চৌচায় তখন অন্ধকারে তার পায়ের দিকে মাথা কল্পনা করলে ব্যাপারটা তার বা আমার কারও পক্ষেই বিশেষ সুবিধের হয় না।"

বিমান উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। ঐন্দ্রিলা পূর্ব্ব হইতেই উসখুস করিতেছিল, এই অবসরে উঠিয়া পড়িয়া নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে একটু হাসিয়া বিমানকে নমস্কার করিল। বিমান ত্রস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া প্রতি-নমস্কার করিল। বাহিরে আসিয়া ঐন্দ্রিলা দেখিল, দরজার এক পাশে, একতলার দুই সার ঘরের মধ্যেকার পথে, অন্ধকারে দেয়াল ঘেঁষিয়া হেমবালা দাঁড়াইয়া আছেন। ঐন্দ্রিলা বাহির হইয়া আসিতেই তিনি একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন মনে হইল। ব্যাপারটা ঐন্দ্রিলার কেমন ভাল লাগিল না, তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই, তাঁহার পাশ কাটাইয়া সে দ্রুতপদে দুতলার সিঁড়ির দিকে চলিয়া গেল।

বিমান আবার গুছাইয়া বসিল। একটু আগে যে হাসি সুরু করিয়াছিল তাহারই জের টানিয়া কহিল, "বেচারা অজয়!"

বীণা তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, "কেন, তাঁর কি হ'ল আবার?"

বিমান ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "সেইটেই ত ভেবে পাচ্ছি না। পৃথিবীতে মেয়ে ব'লে যে একটা জাত আছে তাই যে জান্‌ত না, আজ তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, আর যে কিছু পৃথিবীতে আছে তাই যেন সে জানে না।"

বীণা নতমস্তকে চট করিয়া কি ভাবিয়া লইয়া হাসিয়াই বলিল, "ও রকম হয়। এ-নিয়ে আপনি বেশী ব্যস্ত হবেন না। খুব লাজুক আর ভীরু মানুষরা বিপদে পড়লে হঠাৎ এক-এক সময় মারাত্মক-রকম সাহসের পরিচয় দিয়ে ফেলে।"

"হুঁ, মরিয়া হয়ে ওঠার কারণ ত অবিশ্যি ছিলই।"

"সেটা কি, শুনি?"

"আমার মুখ থেকে শুনলে আপনার কি খুব ভাল লাগবে? যথাসময়ে ঠিক জায়গা থেকেই শুনতে পাবেন আশা করি।"

"যাঃ, আপনি এত বাজে কথাও বলতে পারেন," বলিয়া বীণা উচ্ছ্বসিত আবেগে হাসিতে লাগিল।

বীণাকে এমন ভাল মেজাজে পাওয়া অন্ততঃ বিমানের অদৃষ্টে সচরাচর ঘটিয়া উঠে না। কথার স্রোতকে ইহার পর কোন্‌দিকে মোড় ফিরাইলে আরও কিছুক্ষণ তাহার কাছে বসিয়া থাইতে পারে তাড়াতাড়ি তাহা ভাবিয়া লইতেছে এমন সময় অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করিয়াই ধীরপদে হেমবালা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। বিমান ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া একেবারে বীণার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "তোর মেয়ের কি হয়েছে বলতে পারিস্? সেই থেকে ক্রমাগত ছট্‌ফট্ করছে, কিছুতে ঘুম পাড়ানো যাচ্ছে না। তুই একবার এসে চেষ্টা ক'রে দেখবি?"

"এই যাচ্ছি। আচ্ছা, আসি তা'হ'লে" বলিয়া দ্রুত নমস্কার সারিয়া বীণা বিমানকে বিদায় দিল, তারপর হেমবালার সঙ্গে তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া উঠিল। দেখা গেল, পরিপাটি করিয়া পাতা বিছানায় একটি পুতুল পাশে করিয়া মন্দিরা অঘোরে ঘুমাইতেছে। ঝি-চাকরদের কেহ কোনও কাজে ঘরে আসিয়া আলো জালিয়াছিল, যাইবার সময় মনে করিয়া সেটা নিবায় নাই। আলোটা নিবাইয়া আসিয়া নত হইয়া ঘুমন্ত কন্যার কপালে বীণা একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিমান তাড়াতাড়ি ট্রামের রাস্তা ধরিল। আসিবার সময় বীণা-ঐন্দ্রিলাদের কেহ হয়ত দেখিবে আশা করিয়া ট্যাক্সি লইয়া আসিয়াছিল, কতক্ষণ থাকিতে পাইবে জানিত না বলিয়া সেটাকে অপেক্ষা করায় নাই। পথে আসিতে শুনিল, দূরে একটা গির্জ্জার ঘড়িতে দশটা বাজিতেছে। মনে মনে বলিল, 'না, আজ সন্ধ্যাটা নিতান্তই বাজে খরচ হ'ল। এর পর কি করব? বাড়ী ফিরে গিয়ে ঘুম দেব কি? দুত্তোর, আমি কি জরো রুগী, না আমার বাড়ীতে একটা ব্যাটকেটে বৌ আছে যে, অন্ধকার না হতেই বাড়ী গিয়ে হাজির হব? কিন্তু কোথায়ই বা যাই?...'

একটা বাস্ যাইতেছিল, চড়িল না। খানিকক্ষণ পরেই

একটা ট্রাম, এবারেও চড়িল না। সকালে উঠিয়া যে-গানটা সুরু করিত সমস্ত দিন একনিষ্ঠভাবে সেইটাই গাহিয়া চলা তাহার স্বভাব ছিল, গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল,

"I can't find a home till the morning time,
One two three and four.
I try to be good…"

এবারে আর-একটা বাস্ যাইতেছে, একটি সুন্দরী যাত্রিণীর কবরীর কতকটা দেখা গেল, উঠিয়া পড়িল।

একটু জায়গা করিয়া বসিয়া সহযাত্রী এবং সহযাত্রিণীদের ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছে, হঠাৎ চোখে পড়িল, যাহার পাশে বসিয়াছে সে-ব্যক্তি নন্দ। শিবনেত্র হইয়া মনে মনে কহিল, 'নাঃ, আজ নিতান্তই শেয়াল বাঁয়ে ক'রে বেরিয়েছি, আজ কপালে সুখ নেই।' মুখে কহিল, "নন্দ যে, এতরাত্রে কোথায় চলেছ?"

নন্দ স্বজনহীন নির্ব্বান্ধব একটি ছেলে। বয়স আঠারো-উনিশ। কলেজে পড়ে। কোমল, তরুণীজনোচিত চেহারা। বাঁ চোখের কোণে বড় একটা কালো তিল সমস্ত মুখটিতে যেন একটা বিষাদকরুণ ছায়া বিস্তার করিয়াছে। তাহার ছোট দেহটি লইয়া সে খুব অল্প স্থানই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তবুও প্রাণপণে গাড়ীর দেয়াল ঘেঁষিয়া সরিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "পড়িয়ে ফিরছি।"

বিমান কহিল, "তুমি আবার ছেলে পড়াও বুঝি? কক্‌মারী কাজ।"

নন্দ মুখ কাঁচুমাচু করিয়া একটু কেবল হাসিল।

"কদ্দূর যাচ্ছ?"

"শেয়ালদা।"

"সেইদিকেই থাকো বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ", বলিয়া নন্দ খুকখুক করিয়া কাশিতে লাগিল।

বিমান দেখিল, নন্দের মুখ অতিশয় শুষ্ক দেখাইতেছে, সম্ভবত সমস্ত দিন সে কিছুই আহার করে নাই। ভাবিল 'রাতটা যখন মাটিই হ'ল তখন ভাল ক'রে ছেলেটার খবর নিতে হচ্ছে। যা ওর অবস্থা দেখছি, বেশীদিন আর টিঁকবে ব'লে ত মনে হয় না।' কহিল, "কোন্‌দিকে যাই ভাব্‌ছিলাম, তা বেশ ভালই হ'ল, তোমার ওখানে গিয়েই খানিকক্ষণ আড্ডা দেওয়া যাক্।"

নন্দ অত্যন্ত কাঁচুমাচু করিতে লাগিল।

বিমান কহিল, "কি হে, খেতে দিতে হবে মনে ক'রে ভয় পেয়ে গেলে নাকি? না-হয় ঘরে যা আছে দু-জনে ভাগ ক'রে খাব।"

নন্দ তথাপি নীরবে মাথা নীচু করিয়া আছে দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "না, না, তুমি ভয় পেও না, আমি সত্যিই তোমার বাড়ী যাব মনে ক'রে কথাটা বলিনি।"

অকস্মাৎ মুখ তুলিয়া নন্দ কহিল, "আপনি বুঝতে পারছেন না, পার্‌বার কথাও নয়।…আমার বাড়ী কোথায় যে আপনাকে নিয়ে যাব?"

বিমান কহিল, "সে কি হে? বাড়ী কোথায় কিরকম? এই যে একটু আগে বললে শেয়ালদার দিকে থাকি?"

কোলের উপর ময়লা কম্বলে জড়ানো সরু বালিশের মত একটা জিনিষ দেখাইয়া নন্দ কহিল, "এই বিছানা নিয়ে শেয়ালদার প্লাটফর্মে শুতে চলেছি, রোজ তাই করি।"

"জিনিষপত্র কোথায় থাকে? খাওয়া-দাওয়া কোথায় কর?"

"যখন সুবিধে হয় একটা হোটেলে খাই, জিনিষপত্র বইটই তাদেরই কাছে থাকে, সেখানেই স্নানটানও করি।"

বিমান এমন বিস্মিত মুখ করিয়া নন্দের আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল, যেন এমন অসম্ভব কথা ইতিপূর্ব্বে জীবনে আর কখনও শোনে নাই। এই নিরীহ ছেলেটারও পেটে পেটে যে এত ছিল তাহা কে জানিত। কহিল, "কিন্তু শেয়ালদার প্লাটফর্মে রোজ রাত্রে নিয়ম ক'রে কেউ শুতে যায় এ আজ আমি এই প্রথম শুনছি।"

নন্দ একটু হাসিয়া বলিল, "মুটেমজুররা অনেকেই ত শোয়, তাদের মধ্যে মিশে যাই, কেউ লক্ষ্য করে না।"

"কলেজে পড়ছ, না পড়াশোনা খতম করেছ?"

"পড়ছি।"

"কখন পড়, কোথায় ব'সেই বা পড়?"

"প্লাটফর্মে বেশ আলো পাওয়া যায়, সেখানেই শুয়ে শুয়ে পড়ি। দিনের বেলাটা বিশেষ-কিছু হয় না।"

বিমান কহিল, "সে বেশ কথা, ডেঁপোমি রেখে এইবার নামো দেখিনি, এখানে গাড়ী বদলাতে হবে।"

"কোথায় যাব ?"

"আপাততঃ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আমাদের বাড়ী, তারপর দেখা যাবে।"

নন্দ কাকুতিমিনতি করিয়া তাহার নিজের ধরণে অনেক আপত্তি করিল, বিমান কিছুই কানে করিল না।

অজয় যখন সুভদ্রকে লইয়া ক্লাব হইতে বাহির হইল তখন মাধুর্য্যের প্লাবনে সন্ধ্যাবেলাকার সমস্ত ভয়াবহতার চিহ্ন তাহার মন হইতে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদাই এইরূপ হইত, যেমন অলক্ষ্যে এবং অকস্মাৎ নিজেকে সে হারাইয়া ফেলিত তেমনই অকস্মাৎ আবার ফিরিয়াও পাইত, নতুবা প্রকৃতিস্থ মন লইয়া সাধারণ মানুষের মত পৃথিবীতে বিচরণ করাই তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। এই ত নিজেকে দিয়া তাহার বুক পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকের অন্ধকার ভরিয়া অদৃশ্য আলোর আবেশ কাঁপিতেছে। দুইট দীপ্তি-সমুজ্জ্বল চোখ আজ যে তাহার চোখে চোখে চাহিল, একটি অপরূপ কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের মত হইয়া তাহার কানে বাজিল, ইহারই মধ্যে নিজের কোন্ অন্তরতম পরিচয় সে আজ যেন খুঁজিয়া পাইল। যেন সেই নামহীন অস্ফুট কামনার উপলব্ধিকে বহু জন্মজন্মান্তর নিজের মধ্যে সে বহন করিয়াছে, মৃত্যু হইতেও বেশী অর্থপূর্ণ করিয়া ইহাকে সে আজ অনুভব করিল। যে কুৎসিত প্রাগৈতিহাসিক জীবের থাবা-দুইটার সঙ্গে নিজের হাত-দুইটির সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া সন্ধ্যায় সে ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল, তাহারও অস্তিত্বের কোন্ গহনতম কোণে এই মাধুর্য্যের উপলব্ধি যেন প্রদীপের মত জ্বলিয়াছিল, বহুযুগব্যাপী বিবর্ত্তনের অনিশ্চিত অন্ধকারে একবারও তাই সে পথ ভুল করে নাই।

সুভদ্র কহিল, "ক্লাব কেমন লাগল ?"

অজয় কহিল, "বেশ।" আজিকার দিনে কি সে পাইয়াছে, এ জিনিষকে নিজের জীবনে কিভাবে গ্রহণ করিবে, এ প্রশ্ন তাহার মনে জাগিল না। কেবল অনুভব করিল, নূতন সূর্য্যোদয়ের আয়োজন হইতেছে, কোন্ মায়াকাঠির স্পর্শে ধীরে এক জ্যোতির্লোকের দ্বার খুলিয়া যাইতেছে, আলোকের মহোৎসব সুরু হইতে আর দেরি নাই। সেখান হইতে সঙ্গীতের ঝঙ্কারে কি গভীর আহ্বান কানে আসিতেছে, কিন্তু সে কাহার আহ্বান তাহা জানিতে আজ তাহার মন ব্যগ্র হইল না। উৎসবের ক্ষেত্রে জ্যোতিরাসনে বিশেষ-কোনও মানুষকে বসাইল না। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত চিত্তে নীরবে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

ক্লাব অজয়ের ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া সুভদ্র উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সারাপথ সেই বিষয়েই অনর্গল বক্তৃতা করিতে করিতে চলিল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা, ক্লাব ঠিকমত গড়িয়া উঠিলে তাহা হইতে দেশের ভাগ্যে কত অসংখ্য অসম্ভব-সম্ভাবনার সূত্রপাত হইবে তাহার হিসাব, কিন্তু অজয় শুনিল মাত্রই, সুভদ্রের একটা কথাও তাহার মনকে কোনও দিক্ দিয়া স্পর্শ করিল না।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক কোণে একটা সরু গলির মধ্যে মস্ত কয়েকটা বাড়ীর আওতায় ছোট দুইতলা একটি বাড়ী। বাহিরটা অনাড়ম্বর কিন্তু পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর, আধুনিক স্থাপত্যের আদর্শে বড় বড় দরজা এবং জানালা চারিদিক্কার দেয়ালের প্রায় চোদ্দ আনা জুড়িয়াছে। একপাশে দেয়াল-ঘেরা একফালি জায়গা, তাহারই এক প্রান্ত জুড়িয়া ভিতরে ঢুকিবার দরজা।

ঢুকিয়াই বাঁদিকে একতলায় বসিবার ঘর। দেয়ালে একই মাপের গুটি-দশবারো ওয়াটার-কালার ছবি, কয়েকটা বিমানের আঁকা, বাকীগুলি তাহার বন্ধুদের দিয়া আঁকানো। পোকায় খাওয়া জীর্ণ, চোপসানো পত্র-পল্লবের মধ্যে একগুচ্ছ তাজা বনমল্লিকা, এবং নীলাভ আকাশের গায়ে একটি রামধনু বর্ণের জলবুদ্বুদ যে বিমানের আঁকা তাহা সহজেই বোঝা যায়। মেহগনি কাঠের মোটা চৌকা-ধরণের গুটি-কয়েক চৌকি এবং একটি টেবিল, সেগুলিতে রং অথবা পালিশ নাই। জানালায় নীল পর্দ্দা, চৌকিগুলিতে নীল রঙের কুশন। এক পাশে সবুজ 'বেজে' আবৃত একটি ছোট লিখিবার ডেস্ক।

সুভদ্র দুইবেলা স্নান করিত, চাকরকে গরম জল দিতে বলিয়া সে উপরে চলিয়া গেলে অজয় চিঠির কাগজ এবং

কলম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেশে পিতাকে চিঠি লিখিতে বসিল।

সে আজ বুঝিয়াছে, ভালবাসিয়া পৃথিবীর কোনও জিনিষকে অন্তরের পরম পরিচয়ের মধ্যে সে কখনও লয় নাই, নিজেরও মধ্যে অপরিচয়ের নিবিড় অন্ধকার এমন করিয়া তাই তাহাকে বারম্বার আচ্ছন্ন করে। স্থির করিয়াছে, এবারে হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার সবকয়টাই খুলিয়া দিতে হইবে। জীবনে যাহা-কিছু আসিবে, সমাদরে ডাকিয়া আনিয়া মনের চতুর্দিকে দাঁড় করাইয়া দিবে। সর্ব্বদা সচেতন উপলব্ধিকে জাগ্রত করিয়া রাখিবে। পৃথিবীকে, পৃথিবীর মানুষকে ভালবাসিবে।

কিন্তু চিঠি লিখিতে বসিলেই অজয়ের মাথায় যেন বাজ পড়িত। ঐতিহাসিক তথ্য এবং কবিতা ভিন্ন আর-কিছু যে কাগজের পাতায় কেমন করিয়া লেখা যাইতে পারে ইহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইত না। "শ্রীচরণেষু" পর্য্যন্ত লিখিয়া কলম হাতে করিয়া ক্রমাগত বাঁ-হাতের আঙুল-কয়টাকে মাথার রাশীকৃত চুলের মধ্যে সে চালনা করিতে লাগিল, অনেক ভাবিয়াও কি করিয়া যে সুরু করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। সুভদ্র আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিল, বলিল, "প্রভা তোমাকে ভাইফোঁটার প্রণামী এই কাপড়খানা পাঠিয়েছে।"

অজয় উঠিয়া কাপড়টি লইল। বাহিরের কোলাহলে আবৃত হইয়া ছোটঘরটিতে যে-একটুখানি স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল তাহারই মধ্যে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুদূরবর্ত্তিনী কল্যাণীর কল্যাণ-ইচ্ছাকে সে সমস্ত মন দিয়া অনুভব করিল।

ফিরিয়া লিখিবার ডেস্কে বসিতে যাইবে এমন সময় হাতের ছড়িটা দিয়া ভেজানো দরজাটাকে ঠেলিয়া খুলিয়া বিমান আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দরজার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এস নন্দ!"

নন্দলাল বাহিরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বিমান আবার কহিল, "এস না, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?" তখন সাবধানে বাদামী রঙের ক্যানভাসের জুতাজোড়া খুলিয়া বাহিরে রাখিয়া, পাপোষে পা রগড়াইয়া অত্যন্ত আড়ষ্টকাতর ভাবে কার্পেট-বিছানো ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

বিমান কহিল, "ইনি সুভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার বন্ধু। আর ইনি অজয় রায়, লেখক।"

নন্দ অজয়ের লেখা পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গে পরিচিত হইবার সৌভাগ্যে বিহ্বল হইয়া অত্যন্ত সলজ্জ করুণ মুখে হাসিতে লাগিল।

সুভদ্র কহিল, "পরিচয়টা একতরফা শেষ কোরো না।"

নন্দের সম্পূর্ণ নামটা বিমানের মনে ছিল না, তবু বেশ সপ্রতিভ ভাবেই কহিল, "এ নন্দলাল। আমার বিশেষ পরিচিত। আই-এস-সি পড়ে।"

নন্দ লজ্জিত মুখে কহিল, "আই-এ।"

সে-রাত্রে শুইয়া শুইয়া অজয়ের নিজেকে নিজের কাছে রূপকথার রাজপুত্রের মত অপরূপ রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল। পারসীক উড়ন-গালিচার মত একখানি জরিপাড় ঢাকাই ধুতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার মন কোন্ সুদূর সৌন্দর্য্যালোকে উধাও হইয়া গেল এবং সেখানে রাশি রাশি রঙীন মেঘের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইল। সে জানিত তাহাদের দেশের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী অল্পবয়স্ক অতিথিকে পরিধেয় উপহার দেওয়া অত্যন্তই সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। ইহা খুবই ভাবা যাইতে পারে, যে, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসাতে আতিথেয়তার এই যেটুকু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছিল, সুভদ্রের মাতা ভাইফোঁটা উপলক্ষ্য করিয়া প্রভাকে দিয়া তাহা সারিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহার লোলুপ মন কিছুতেই এই ঘটনাটিকে সামান্য বলিয়া মানিতে চাহিল না। একটি স্নিগ্ধকরুণ মনের মধ্যে ভাইফোঁটার পবিত্র সুন্দর উৎসবালোকিত আসনটিতে তাহার স্থান হইয়াছে, প্রভা তাহাকে ভাবিতেছে, সেখানে তাহার মনের সৌন্দর্য্য-প্রস্রবণে সে অবগাহন করিতেছে, স্নেহগুণে স্নিগ্ধ হইতেছে, ইহা ভাবিতে তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। কাপড়খানিকে বালিশের নীচে রাখিয়া সে শুইল। নিদ্রাভঙ্গে সমস্তরাত কি স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহা মনে আনিতে পারিল না, কিন্তু দেখিল, তাহার সমস্ত দেহমন মধুময় হইয়া আছে। (ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

উৎস—শ্রীরণধীর সেন প্রণীত এবং কলিকাতা, মাণিকতলা স্পার, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স্ কর্তৃক প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

রমেশ মাহিন্দের ছেলে। কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে। বন্ধুর অনুরোধপত্র লইয়া সে কলিকাতায় সম্পন্ন গৃহস্থ যোগেন্দ্রবাবুর কাছে আসিল। তাঁর সুপারিশে রমেশের একটি কম্পোজিটারী চাকরি জুটিল। ছেলেটি ভাল। যোগেন্দ্রবাবুরাও খুব ভাল লোক। যোগেন্দ্র-বাবুর গৃহিণী রমেশকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সে যা পায় তা তাঁরই কাছে জমায়। দেড় বৎসর পরে পাঁচ-শ টাকা জমিলে, সে সেই টাকা দিয়া নিজ গ্রামে একটি টিউব-ওয়েল প্রতিষ্ঠা করিল। তাহার বাবা মৃত্যুর সময় ঠাণ্ডা জল চাহিয়াছিল, পায় নাই। বইখানির নামও সেই কারণে উৎস। গ্রন্থকারের নিজস্ব সহজ সরল মিষ্ট ভঙ্গীতে গল্পটি বিবৃত। বয়স্ক লোকে পড়িলে আনন্দ এবং বালক-বালিকারা পড়িলে উপকার লাভ করিবে। মলাটের উপরের ছবিখানি শিল্পী যতীন্দ্রকুমারের আঁকা। ছাপা কাগজ বাঁধাই ভাল।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব, ১ম ও ২য় খণ্ড।—শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম্.এ, ডি, ডি কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, এম্-এ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ২৲, ২য় খণ্ড ১৲।

এই বই দুখানা পড়িয়া আমরা অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই দুখানা পুস্তকে পাঠক নূতন কিছু পাইবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুস্তকে প্রধানতঃ বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্যভাগবত" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। প্রথমোক্ত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের বাল্য ও যৌবন বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে তাঁহার 'মধ্য' ও 'অন্ত্য' লীলার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। উভয় গ্রন্থেই ভক্তহৃদয়ের কল্পনাপ্রসূত অনেক অপ্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। এরূপ উল্লেখের উদ্দেশ্য শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব স্থাপন। অবতারবাদের একটা দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণানুসারে প্রত্যেক জীবের জীবনেই ব্রহ্ম অবতীর্ণ। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে সেই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সে-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া অপ্রাকৃতিক প্রমাণে ব্যক্তিবিশেষের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। সমালোচ্য গ্রন্থদ্বয়ে এরূপ প্রমাণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, অথচ ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরাদ্বারা শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রধান প্রধান অনুবর্ত্তিগণের মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেক স্থলেই ভ্রমপূর্ণ। সে বিবরণ স্পষ্টতঃই এমন লোকের উক্তি যিনি বর্ণিত স্থানগুলির অবস্থিতি ও পরস্পর হইতে দূরত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। আমাদের গ্রন্থকার ধর্ম্মপ্রচারার্থ দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত ভ্রমণের দ্বারা উক্ত বর্ণনার ভ্রম দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের ভ্রমণ-সঙ্গী গোবিন্দ দাসের করচা অনুসরণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, চৈতন্যদেবের তিরোভাব সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস এবং কবিরাজ গোস্বামী কেহই বিশ্বাসযোগ্য কথা বলেন নাই। এবিষয়ে সরকার মহাশয় জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' অনুসরণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে রথযাত্রার সময় একটা ইষ্টকে তাঁহার পা আহত হওয়াতে তাঁহার রক্ত বিষাক্ত হয় এবং তাহাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জীবন ও কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা অতি মধুর ও উপাদেয়। গ্রন্থের শেষভাগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবসাদ বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সরকার মহাশয়ের মতে এই অবসাদের কারণ এই যে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীব-ব্রহ্মের যে আধ্যাত্মিক লীলাকে রূপকের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন বৈষ্ণব কবিগণ সেই লীলাকে নায়ক-নায়িকার প্রাকৃত সম্বন্ধ রূপে গ্রহণ ও বর্ণনা করিয়া পাঠকদিগের চিত্ত কলুষিত করিয়াছেন এবং দেশে পাপস্রোত-প্রবাহের সহায়তা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের মত এই যে, রাসলীলা প্রভৃতি ব্যাপারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নিতান্তই আধুনিক, প্রাচীন বা আধুনিক কোন বৈষ্ণব গ্রন্থেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সর্ব্বত্রই এ সকল ব্যাপার প্রাকৃত ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষভাগে পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব ঐ লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহার সেরূপ ব্যাখ্যা দেন নাই। সুতরাং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহেন। তাঁহারা কৃষ্ণলীলা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার নৈতিক কুফল অনিবার্য্য। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অব্যবহিত অনুবর্ত্তিগণ এই কুফল ভোগ করেন নাই। তাঁহাদের প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ও বৈরাগ্য তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের পর দুই-তিন পুরুষ যাইতে-না-যাইতেই তাঁহাদের গৃহীত পৌরাণিক কাহিনী বিষবৃক্ষ রূপে ফলিত হইয়া দেশময় ইহার কুফল বিস্তার করিয়াছে। এখন বৈষ্ণবধর্ম্মকে সংস্কার করিতে হইলে ইহাকে পৌরাণিক কল্পনা হইতে মুক্ত করিতে হইবে এবং প্রকৃত বৈষ্ণবকে উপনিষদের ঋষিগণের অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক বিশ্বময় ভগবানের রূপদর্শন এবং অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার প্রেমলীলা সম্ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ

নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন— (প্রথম ভাগ)—শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক, চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি, এণ্ড কোং। ৪৫৭ পৃঃ, মূল্য দুই টাকা আট আনা।

লেখক প্রখ্যাত-নামা ব্যক্তি—বিবিধ ভাষায় বহু গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা রচনা করিয়াছেন। মোটের উপর তিনি কত হাজার পৃষ্ঠা লেখা ছাপাইয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই গ্রন্থের 'প্রকাশকের নিবেদনে' দেওয়া হইয়াছে; এবং স্বয়ং লেখকও গ্রন্থের ভিতরে নানা জায়গায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। (যথা ৪ পৃঃ,

৮ পৃঃ, ৩০৫ পৃঃ, ৩৮৩ পৃঃ, ইত্যাদি)। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই পৃষ্ঠা গণনায় পুনরুক্তি এড়ান অসম্ভব; কেননা, এক গ্রন্থের ভূমিকা অনেক সময় গ্রন্থান্তরের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে (বর্ত্তমান গ্রন্থের ২৮৩, ৩০৬, ৩১২, ৩১৬ ৩৬৯ পৃষ্ঠা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

তথাপি একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বিনয়বাবু বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, বহু বিদ্যা অর্জন করিয়াছেন এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রাচীন এমন অনেক বই আছে যার লেখকের কোন পরিচয়ই আমরা পাই না। আজকাল ততটা আত্মগোপন অসম্ভব হইলেও প্রখ্যাতনামা কোন লেখক স্বয়ং কিংবা প্রকাশকের মারফতে, নিজের লেখার পৃষ্ঠার পরিমাণ জানাইবার জন্য কোথাও ব্যগ্র হইয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

তবে, বিনয়বাবু 'নবীন' দলের অন্যতম। তাঁহার ভাষায় এবং ভাবে অনেক 'নয়া' 'নয়া' জিনিষ আছে। নবীনতা বাদীরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবেন সন্দেহ নাই।

আলোচ্য গ্রন্থখানার নামটির সার্থকতা ঠিক বোঝা গেল না—দ্বিতীয় ভাগে যদি উহা স্পষ্ট হয়। ছাপা ও কাগজ ভালই।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জয়ন্তী—শ্রীপ্রতাপ সেন বি-এসসি প্রণীত। এই গ্রন্থ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে গ্রন্থকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুকবি কালিদাস রায়ের পরিচায়িকা পাঠে জানা গেল গ্রন্থকার বয়সে তরুণ। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও কবিতাগুলি আমাদের ভাল লাগিল। দাম আট আনা।

জম্‌জম্—মহম্মদ কজল আলি খান প্রণীত। বস্তুজগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কীয় নানাবিধ সঙ্গীতে এই গ্রন্থখানি সজ্জিত।

কতকগুলি সঙ্গীতে লেখকের উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কাগজ ভাল, ছাপা খারাপ। দাম এক টাকা।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মুক্তি-বাঁধন—শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবসন্ত কুমার রায়, ১১৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সাতটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একটি "নারী-সমস্যা পূর্ণ নাটিকা"। লেখা আছে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস কর্ত্তৃক বইখানি অভিনীত হইয়াছে। নারী সমস্যার মত জটিল বিষয়ের উপর লেখক তেমন সুবিচার করিতে পারেন নাই। চরিত্রগুলি বেশ সৌষ্ঠবসম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার আদর্শ চরিত্র যে গদাধর—যাহার উপর সমস্যা-সমাধানের ভার অতখানি দেওয়া হইয়াছে—তাহারও চালচলন কথাবার্ত্তার মধ্যে ভাঁড়ামির খাদ মিশিয়া তাহাকে অনুকম্পার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে।

তবে, কাঁচা হাতের দোষ থাকিলেও লেখার মধ্যে শক্তির আভাস আছে এবং বইখানি জায়গায় জায়গায় মন্দ লাগে না। যাঁহারা নব প্রথায় শাড়ী পরা হইতে নূতন সবই দূষণীয় এবং নাম "গদাধর" নামটি পর্য্যন্ত পুরাতন সবই শ্লাঘনীয় মনে করেন তাঁহাদের নিকট বইখানি বোধ হয় আর একটু ভাল লাগিতে পারে।

ছাপা বাঁধাই মামুলি। দাম ৷৹

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জাতের খবর—শ্রীইন্দুপতি মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বাঁকীপুর সোমড়া পোঃ, হুগলী হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫০।

বাংলার সামাজিক ইতিহাস এখনও সেরূপভাবে লিখিত হয় নাই। বাংলার বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র ও পুরাণমূলক আলোচনা এই পুস্তিকাখানিতে আছে। এই দিক দিয়া ইহা উপাদেয় হইয়াছে। লেখক জাতিভেদের সকল দোষ ব্রাহ্মণ জাতির উপর চাপাইয়াছেন। ইহা কি সত্য না প্রচারের ভঙ্গী?

সমুদ্রে ও ডাঙায়—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বাঙালী কি শুধুই ডাঙার মানুষ? এ প্রশ্নের উত্তর বাঙালী সন্তান যথাযোগ্যভাবে দিতে চেষ্টা করিতেছে। পদব্রজে ভূপ্রদক্ষিণ, সাইকেলে কাশ্মীরভ্রমণ ভারত পরিক্রমণ প্রভৃতি ব্যাপারের সহিত বাঙালী আজ পরিচিত। বাংলার ছেলেমেয়েরা সমুদ্রচারীও হইতে পারে, নানা আকস্মিক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বাঙালীর মনে যে এই ভাব বদ্ধমূল এই গ্রন্থখানির প্রকাশ তাহাই সূচিত করে। গ্রন্থকার গল্পচ্ছলে বাঙালী ছেলে বরুণকুমারের দ্বারা সমুদ্রযাত্রার বিপদ আপদ অতিক্রম করাইয়া—কখনও জাহাজডুবি হইয়া সমুদ্রে সাঁতার কাটাইয়া, কখনও বা কুমীরের মুখ হইতে বাঁচাইয়া কখনও বা অপরিচিত দ্বীপ হইতে ভেলার সাহায্যে সমুদ্র পার করাইয়া—সত্যই আমাদের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। ভরসা হয়, সে-দিন অনতিদূরে যখন সত্য সত্যই শত শত বরুণকুমার সমুদ্রে ও ডাঙায় নানা অসমসাহসিক কার্য্য দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। কতক-গুলি রেখা চিত্রের সাহায্যে পুস্তকের ঘটনাবলী পাঠকের সামনে আরও স্পষ্ট করিয়া ধরা হইয়াছে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আলোচনা

মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা

'প্রবাসী'র শ্রাবণ সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' ৫৭৯ পৃষ্ঠার 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকতা' শীর্ষক যে মন্তব্য আপনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠে মনে হয় আপনি 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' দিয়াছেন। প্রথম কথা 'পান্থপথ'। যে চতুর্থ ভাগ হইতে এই শব্দটি আপনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা ডক্টর সাহেবের রচিত নয়। তিনি 'মক্তব মাদ্রাসা শিক্ষা'র চতুর্থ ভাগ এখনও লেখেন নাই। মৌলবী মোবারক-আলী রচিত পুস্তক হইতে ঐ শব্দযুক্ত বাক্যটি উদ্ধার করিয়া ডক্টর সাহেবকে আপনি বাংলা সাহিত্যের আসনে অন্যায়ভাবে হেয় ও নির্বোধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।* দ্বিতীয় কথা ছুরাম্মা—গরীব।† আপনি ছুরাম্মার প্রতিশব্দ 'দুষ্ট' শব্দটি ইচ্ছাপূর্ব্বক দুষ্ট অভিসন্ধিমূলে পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রের প্রতিশব্দ 'গরীব' শব্দটি ছুরাম্মার পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া তাঁহাকে হেয় ও নগণ্য এবং বাংলা ভাষায় আনাড়ি প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

আবুল হুসেন

'মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা' ২য় ভাগের ২৫ পৃষ্ঠায় ছুরাম্মা—গরীব আছে। ব্যাপারটি বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। ২৫ পৃষ্ঠায় "ইছুফ্-যুহা" নামক গল্পের শেষ হইয়াছে। অন্য গল্পের শেষে যেমন কতকগুলি শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে, এ গল্পের শেষেও সেইরূপ দশটি শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে যথা:—বৃত্তান্ত, পরীক্ষা, ভক্ত, যথাদেশ, জননী, ছুরাম্মা, নির্ভীক, অসংখ্য, অনুকরণ ও বধ। ছুরাম্মা শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—"দুষ্ট, গরীব।" "দুষ্ট" আমার প্রবন্ধের জন্য অপ্রাসঙ্গিক, সুতরাং আমি একটি অর্থাৎ "গরীব" কথাটি লইয়াছি। উহা যখন ছুরাম্মা কথার একটি অর্থ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন আমার কোন দোষ হয় নাই, মনে করি। প্রতিবাদকারী যদি বলিয়া থাকেন যে মূল পুস্তকে "ছুরাম্মা—দুষ্ট, দরিদ্র—গরীব" আছে, তবে সে মূল পুস্তক অন্যত্র থাকিতে পারে। আমার কাছে "ডক্টর পণ্ডিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্" মহাশয়ের 'মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা' ২য় ভাগ আছে। উহা ১৯৩০ সালে "এ, এফ্, মোহাম্মদ" কর্ত্তৃক ইস্‌লামিয়া লাইব্রেরী, পটুয়াটুলি, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। পুস্তকখানি দশম সংস্করণের। বৈশাখের প্রবাসীতে (১৩৫ পৃঃ প্রথম কলম, ২৩, ২৪ লাইন) উক্তপুস্তক ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়াছি। ১৩৬ পৃষ্ঠার ১১ লাইন পর্যান্ত ঐ গ্রন্থকারের পুস্তকের কথাই আছে এবং ১২ লাইনে "ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে" এরূপ বলিয়াছি। পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় যে যে শব্দের অর্থ দেওয়া আছে তাহার মধ্যে "দরিদ্র" কথাই নাই। সুতরাং দরিদ্র—গরীব কোথা হইতে আসিল? অধিকন্তু আমি "ইছুফ্-যুহা" গল্পটি পাঁচ-ছয় বার পড়িলাম, ঐ গল্পে কুত্রাপি "দরিদ্র" শব্দ নাই। তাহার অর্থ দেওয়া হইতে পারে কিরূপে?

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* এই ভ্রম ভাদ্রের প্রবাসীর ৭২৬ পৃষ্ঠায় সংশোধিত হইয়াছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

† এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর দেখুন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

মহেন-জো-দাড়ো ও প্রাচীন সিন্ধুতীরের সভ্যতা

মিসেস্ ডোরোথি ম্যাকে

মহাযুদ্ধের পর পুরাতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারে টুটানখামেনের সমাধি, উরের রাজসমাধিস্থান এবং সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী প্রাচীন সভ্যতা, এই তিনটি আবিষ্কার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদিও বিগত নয় বৎসরের সযত্নখননাদির পরও এই তৃতীয় আবিষ্কারটির রহস্য-আবরণ সামান্যমাত্র উন্মোচিত হইয়াছে, তবু সম্ভবত ইহাই পরিশেষে সকলের অপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কারণ পৃথিবীর প্রাচীন জাতি ও ধর্ম্ম-সমূহের ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে এই আবিষ্ক্রিয়াটি যে উজ্জ্বল আলোক জ্বালিবে তাহার রশ্মি সিন্ধুতীর এবং ভারতভূমির সীমাও ছাড়াইয়া যাইবে।

ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন এবং আর্য্য ও অনার্য্য যুগের জাতিসমূহের ইতিহাসে এই যে অতীত দুই সহস্র বৎসর যুক্ত হইল তাহা আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে আশ্চর্য্য সমৃদ্ধি দিবে। প্রাচীন বেলুচিস্থান, সুমার, এলাম এবং আরও দূরবর্ত্তী অন্যান্য দেশের জাতি, ধর্ম্ম, শিল্পাদিও এই নূতন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে। কারণ সিন্ধুতীরে আবিষ্কৃত প্রত্যেক ছোটবড় জিনিষের সঙ্গে সুমার প্রভৃতি দেশে আবিষ্কৃত খুঁটিনাটি জিনিষগুলি মিলাইয়া দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন জাতিদের পরস্পরের সহিত আশ্চর্য্য পরিচয় ছিল। সকল যন্ত্রযান-বঞ্চিত এই জাতিগুলি এমন করিয়া দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ ও বাণিজ্য অভিযান করিয়াছিল যে, মোটর, ট্রেন ও বায়ুযানে অভ্যস্ত বর্ত্তমান জগৎ তাহা বিশ্বাস করিয়াই উঠিতে পারে না। পশুচালিত রথ ও পালের নৌকার সাহায্যে দেশে দেশে বাণিজ্য, সভ্যতা ও কৃষ্টি বিস্তারের প্রাচীন প্রথাকে ত আমরা অসম্ভবের কোঠায় ফেলিয়া দিতেই উৎসুক। কিন্তু বাস্তবিক ইহা অসম্ভব ছিল না। প্রাচীন মানুষ হয়ত এত দ্রুত ছুটিত না; কিন্তু তাহারা আধুনিক মানুষের মত ব্যক্তিগত সম্পত্তির শৃঙ্খলে জড়িত ও স্থানীয় সুযোগ-সুবিধার মোহে আবদ্ধও ছিল না।

লোকসংখ্যার অনুপাতে, সিন্ধুতীরের সভ্যতার দিনে, পূর্ব্ব দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে মানুষের যাতায়াত ও বাণিজ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের তুলনায় বিশেষ কম ছিল মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। সুবিস্তীর্ণ খননক্ষেত্রের প্রমাণগুলিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুমারের নগরগুলিতে বিশেষতঃ কিষ্ (Kish) নগরে এবং উর ও লাগাষে খননকারীরা সিন্ধুতীরের বণিকদের হারানো শীল পাথর প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পরে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। সুমেরীয় কারিগরের তৈয়ারী শীল সিরিয়ার উত্তর প্রদেশে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে; এবং সুমেরীয়েরা যে এশিয়া-মাইনরে বণিক-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহার প্রমাণও আছে। সম্প্রতি আবার প্রাচীন মিশর হইতে উত্তরে কাস্পিয়ান সমুদ্র পর্য্যন্ত শীল ছাড়া আরও অনেক জিনিষ পাওয়া গিয়াছে যাহা এলাম ব্যাবিলন এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতের প্রভাবও প্রমাণ করে।

প্রাচীন জগতের প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনের ফলে নানাদেশের কৃষ্টির কৃত্রিম গণ্ডী ভাঙিয়া পড়িতেছে, নানাজাতির স্বতন্ত্র ইতিহাসের মিথ্যা বেড়াও খসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং প্রাচীন জগতের কাহিনী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে কেবল মিশরবিদ্যাবিশারদ, এসিরিয়লজিষ্ট কিংবা সংস্কৃত পণ্ডিত অপেক্ষা বেশী কিছু হওয়া দরকার। প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সভ্যতা, কৃষ্টি ও আত্মীয়তার আদান-প্রদান সুদূরবিস্তৃত ছিল; সুতরাং তাহাদের ইতিহাস চর্চ্চাকালে আমাদের দৃষ্টির প্রসারও উদার হওয়া উচিত।

মোহেন-জো-দাড়োর আবিষ্কারের পূর্ব্বে, ভারতের ইতিহাস আর্য্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হইতে অর্থাৎ খ্রীষ্ট-

পূর্ব্ব ১৫০০ বৎসর হইতে সুরু করা হইত। কয়েকটি পাথরের অস্ত্র এবং দক্ষিণ-ভারতের প্রস্তরসমাধিগুলি (Dolmen) ছাড়া নব্য প্রস্তরযুগের প্রায় কিছুই জানা ছিল না; বিহারের রাজগৃহের অতিমানবরীতির (Cyclopean) প্রাচীরগুলি ছিল সুপ্রাচীন স্থপতিস্তূপের নিদর্শন। আর্য্যেরা নিজেরাই কতকটা যাযাবর প্রকৃতির ছিলেন, গৃহবাস তাঁহাদের অভ্যাস ছিল না। বিহারের লৌরীয় নন্দনগড়ের যে সমাধিস্তূপগুলি আপাততঃ খৃঃ পূঃ ৭ম কি ৮ম শতাব্দীর বলিয়া অভিহিত হয়, একমাত্র সেইগুলিকেই নির্ব্বিবাদে আর্য্যদের প্রথম যুগের স্মৃতিসৌধ বলা যাইতে পারে। আর্য্যদের প্রথম ঘরবাড়ী সম্ভবতঃ কাঠের ছিল, কারণ ভারতের প্রাচীনতম সৌধগুলিতে (বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ উল্লেখযোগ্য) প্রাপ্ত কাঠের কারুকার্য্যের নকল এই মতই সমর্থন করে। প্রাচীন আর্য্যদের শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিচিহ্ন খাঁটি সাহিত্য ঋক্‌বেদের গান ও অন্যান্য সংস্কৃত রচনা।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আর্য্য-পূর্ব্ব যুগের ভারতের অবগুণ্ঠন অকস্মাৎ অভূতপূর্ব্বভাবে ছিন্ন হইয়া যায়। সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার একটি বৌদ্ধ ধ্বংসস্তূপ কিছুকাল হইতে পরিচিত ছিল। একটি অত্যন্ত সমতল ভূমিতে ধূলিমলিন ঝাউ ও কাঁটা বনের মাঝখানে একাকী আপনার আহত মস্তক তুলিয়া ৭২ ফিট উঁচু এই স্তূপটি বনভূমির সুপরিচিত অধিবাসীর মত দাঁড়াইয়াছিল। স্বর্গগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (আর্কিয়লজিক্যাল সর্ভে অব ইণ্ডিয়া) স্তূপটি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে ইহা কাদার গাঁথুনি ও পোড়া ইটে তৈয়ারি একটি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া আছে। স্তূপের ইট ও ঢিপির ইট মাপে সমান। স্তূপের নীচের বৌদ্ধ-সৌধ-বলিয়া-অনুমিত সৌধগুলি কি জাতীয় জানিবার জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় খনন সুরু করেন। তিনি কতকগুলি চৌকা শীলমোহর এবং কতকগুলি তামার কবচ-জাতীয় জিনিষ আবিষ্কার করিলেন—যেগুলি নিশ্চয়ই বৌদ্ধযুগের নয়। পরে সেগুলি খৃঃ পূর্ব্ব ৩০০০ বৎসরের সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার বিশেষত্বব্যঞ্জক সৃষ্টির অন্যতম বলিয়া চেনা যায়।

এইগুলি ও অন্যান্য দ্রব্য দেখিয়া আর্কিয়লজিক্যাল সর্ভের ডিরেক্টর জেনারেল স্যর জন মার্শাল বুঝিতে পারিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে যে সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি ক্ষীণ সন্দেহের রেখামাত্র জাগিয়াছিল, এই খানেই তাহার ভগ্নাবশেষ আছে।* এই রকম আরও কয়েকটি শীল পঞ্জাবের মণ্টগোমরি জেলায় ৪৫০ মাইল দূরে রাবি নদীর পুরাতন গর্ভে হরপ্পাতে দুই বৎসর পূর্ব্বে রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এই সহরটি মোহেন-জো-দাড়ো হইতেও বৃহত্তর এবং মূল্যবান বলিয়া মনে হয়। ইহা মানুষের চলা-পথ হইতে এত বেশী দূরে নয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ এক সময় এই স্থান হইতে রেলপথের জন্য পাথর ও মালমশলা সংগ্রহ করা হইয়াছে।

এই নবাবিষ্কৃত স্থানটি আরও ভাল করিয়া পরীক্ষা করার পর স্যর জন মার্শাল ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ 'ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজে' ইহার একটি প্রাথমিক বিবরণ প্রকাশ করেন। তাহার ফল খুব ভাল হয়। সকলের তীক্ষ্ণ মনোযোগ সেই দিকে পড়িতেই সুমার ও এলাম হইতে আনীত প্যারিসের লুভার ইত্যাদি স্থানে রক্ষিত এইরূপ চিত্রাক্ষর-শোভিত এবং পশুচিত্রভূষিত অনেকগুলি শীল পুনরাবিষ্কৃত হইল। সুমার এবং সিন্ধু-তীরের সভ্যতার ভিতর বহু সাদৃশ্য লক্ষিত হইল। কিছুদিন আগেই মিঃ ম্যাকে (Field Director of the Joint Oxford and Field Museum, Chicago Expedition) কিশের (Kish) একটি সারগণিক যুগের মন্দিরের ভিত্তিভূমিতে এইরূপ একটি শীল উদ্ধার করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইহা না জানিয়া ভরাট করার মাটির সহিত মন্দির ভিত্তির নীচে ফেলা হইয়াছিল। তিনি ইহা স্বর্গীয় মিস্ গরট্রুড বেল (Hon. Director

---

* এই আবিষ্কারের সম্মান স্যর জন মার্শালের প্রাপ্য নহে,—যদিও বিদেশীরা তাহা বলিতে চাহেন। মোহেন-জো-দাড়োর আবিষ্কারের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই হারাপ্পার ঐ শ্রেণীর লুপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখিয়াও স্যর জন মার্শাল এবং অন্যান্য বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ইহা যে প্রাগৈতিহাসিক, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। স্বর্গগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই প্রথমে বলেন যে মোহেন-জো-দাড়ো লুপ্ত ঐতিহাসিক যুগের ভগ্নাবশেষ, এবং তিনি উহা প্রমাণ করার পরে স্যর জন মার্শাল প্রমুখ অন্য প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ইহা যে আদৌ সত্য তাহা বিশ্বাস করেন।



মোহেন জো দাড়োর ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য

of Antiquities in Iraq) কে দেখান এবং তাঁহারা ভারতবর্ষে মিলাইয়া দেখিবার জন্য ইহার একটি ছাপ পাঠাইয়া দেন। এই নবাবিষ্কৃত সভ্যতা আপাততঃ সিন্ধুতীরের 'ইন্দোস্থমেরিয়ান' সভ্যতা নামে পরিচিত হইল এবং কিশের আবিষ্কারটির জন্য ইহার তারিখ আপাততঃ খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর বলিয়া ধরা হইল।

মোহেন-জো-দাড়ো এবং তাহার সমগোষ্ঠিভুক্ত সহরের লোকেরা কাঠ, গাছের ছাল, পার্চমেন্ট ইত্যাদি ধ্বংস-প্রবণ পদার্থের উপর লিখিত বলিয়া এখন পর্য্যন্ত অতীত রহস্য উদ্ঘাটনের পথে একটা মস্ত বাধা রহিয়া গিয়াছে। সুমেরিয়াণ শহর পর্য্যন্ত তাহাদের শীল আবিষ্কৃত হওয়ার বুঝা যায় ইহারা মস্ত ব্যবসায়ী ছিল, এবং উরের সুমেরিয়ান বণিকদের মত ইহারাও রসিদ, চুক্তিপত্র ইত্যাদি ব্যবসায়িক দলিলের প্রথা গড়িয়া তুলিয়াছিল। সহরের সুশাসনের এবং নাগরিকদের মামলা মোকর্দ্দমা করার বহু প্রমাণ আছে। আদালতী দলিল নিশ্চয়ই চলিত ছিল। কিন্তু জমির আর্দ্রতা ও নোনা প্রকৃতির জন্য সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শত শত শীলের উপর চিত্রিত হরফগুলি ভাষা উদ্ধারের পথে আমাদের কিছুমাত্র অগ্রসর করিতে পারে নাই। এগুলি খুব সম্ভব শীলের মালিকদের নাম ও পদবি ইত্যাদি। শীলের অক্ষরগুলি ভাল করিয়া মিলাইয়া সংগ্রহ করিয়া দেখা যায় যে, তিন শতের উপর অক্ষর ব্যবহৃত হইত। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ ভাষা খণ্ড অক্ষরের সাহায্যে লিখিত হইত না, অখণ্ড বাক্যের সাহায্যেই হইত। কিন্তু শব্দ ধাতুগত ব্যাকরণিক সম্পর্ক দেখাইবার মত দীর্ঘ কোনো লিপির অভাবে এই সিন্ধুতীরের ভাষাকে এখনও বোধ যোগ্য করিয়া তুলিবার আশা করা চলে না। হয়ত ইরাকের আরও কোনো নবতর আবিষ্কার সন্ধানীর সাহায্য করিতে পারে।

সুমেরীয় আসিরীয় এবং পরে বাবিলোনীয় জাতিগণ ধ্বনি চিহ্ন-মালা ও শব্দধাতুরূপ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে ভালবাসিত দেখা যায়। হয়ত কোন দিন সিন্ধু-চিত্রলেখের সুমেরীয় প্রতিলেখ-সম্বলিত একটি ফলক আবিষ্কৃত হইবে। তাহা হইলে সিন্ধুতীরের অধুনা অজ্ঞাত যে সব শহরে সুমেরীয়রা বাণিজ্য করিতে আসিত তাহা চিনিয়া বাহির করা সম্ভব হইবে। কারণ

মহেন-জো-দাড়ো ত আধুনিক স্থানীয় নাম মাত্র; ইহার অথবা হরপ্পার কোন্ নাম যে তাহাদের আদি অধিবাসীরা ব্যবহার করিত তাহা আমরা জানি না।

লিপি ও শাসনাদির অভাবে পাঁচ ছয় হাজার বৎসর



মোহেন-জো-দাড়োতে খননকার্য্য

পূর্ব্বের সিন্ধু তীরের ইতিহাস আঁকিয়া ফেলা যেমন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, লেপ-চিত্রাদির অভাবে তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী অঙ্কনও তেমনি কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রমাণ একটি একটি করিয়া জোড়া দিয়া ধীরে চিত্রটি গড়িয়া তুলিতে হইবে। মোহেন-জো-দাড়োর মানুষ নিজেকে ও নিজের আশপাশকে রূপ ও ভূষণে সাজাইয়া তুলিতে চাহিত না বলিয়া, তাহাদের সেই অর্থে শিল্পী বলা চলে না। প্রাচীন মিশরের সমাধি, মন্দির এবং প্রাসাদাদিতে অঙ্কিত চিত্র ও ভাস্কর্য্য দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্ম ও সংসার, শিল্প ও কারিগরী, এমন কি রুটি ও মদ তৈয়ারীর বিষয়ও জানা যায়; আমাদের চোখের সম্মুখে বসিয়াই যেন গহনা গড়া, ঝুড়ি বোনা, দড়ি তৈয়ারি চলিতেছে। সুমার, আসিরিয়া ও বাবীলোনিয়াতে খোদাই কাজ, ভাস্কর্য্য, রঙীন টালি ইত্যাদিতে তখনকার জীবনযাত্রা দেখা যায়। Tell Ubaid কুট্টিম চিত্রে (inlay) চাষী পিছন দিক হইতে গরু দুহিতেছে, কিশের (Kish) রাজা বন্দীদের তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছেন; উর-নম্মু ইটের ঝুড়ি লইয়া চন্দ্রদেবতার আদেশে মন্দির চূড়া গাঁথিতে চলিয়াছেন; এবং আসিরিয়ার রাজা শিকার করিতেছেন, শত্রু আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার গায়ের ছাল তুলিয়া লইতেছেন।

সিন্ধুতীরের নগরগুলির এ-সকল খবর কিছুই আমরা জানিতে পাই না; গৃহপ্রাচীরে লেপচিত্র এক সময় ছিল, এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন মনে করাও চলে না। মাঝে মাঝে দেয়ালের উপর পলস্তরার চিহ্ন আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, তাহাও লম্বা লম্বা টানা রঙের পোঁচ ছাড়া আর কিছু চিত্রে শোভিত কোথাও নহে। এক রঙের জমিতে অন্য রঙের জিনিষ বসাইয়া (inlay) ভূষিত করার প্রথা ছিল, কিন্তু নকসাগুলি সব জ্যামিতিক এবং বাক্স আসবাব ইত্যাদি শোভিত করিবার জন্যই কেবল ব্যবহৃত হইত। প্রাচীরে ইহার চলন ছিল না। ভাস্কর্য্য বলিতে মোটারকমের খোদাই মূর্ত্তি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাথরের কাজে ইজিপ্ট ও আসিরিয়ার প্রাচীরচিত্রের শিল্পচাতুর্য্য ও নৈপুণ্যের কাছাকাছিও যায় এমন এখানে কিছুই নাই; শীলখোদাইয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়। মাটির জিনিষের উপর পালিশের কাজ সিন্ধুতীরবাসীরা জানিত, কিন্তু ছোটখাট কুচো গহনা জীবজন্তুর মূর্ত্তি এবং inlay-এর টুকরা ছাড়া আর কিছুতে ইহা দেখা যায় না।

সমৃদ্ধির দিনে নগরটি বেশ বড় ও জমকাল ছিল বোঝা যায়। শহরে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বেশ আরামদায়ক শক্ত শক্ত বাসগৃহ এক বর্গমাইল জুড়িয়া আছে। সবই পোড়া ইটের তৈয়ারী, মাঝে মাঝে কেবল পুরাণো ধ্বংসগৃহাদি কাঁচা ইটে ভরাট করিয়া উচ্চ বেদী প্রস্তুত করা হইত, যাহাতে তাহার উপরে নির্ম্মিত নূতন গৃহগুলি বারংবার আগত বন্যার কবল হইতে উপরে থাকে। পথঘাট ও চত্বরগুলি এমন সযত্নে নক্সা কাটিয়া করা যে অট্টালিকাগুলি সর্ব্বত্রই

এক একটি সমচতুষ্কোণ সৌধসজ্জ গড়িয়া তুলিত, শহরের পথঘাটের আইন ছিল এবং লোকে যে তাহা মানিতে বাধ্য হইত তাহারও প্রমাণ আছে। শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে আশ্চর্য্য রকম নজর দেওয়া হইত।

নগরোপকণ্ঠের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখন পর্য্যন্ত অতি সামান্য। এত যুগ ধরিয়া সিন্ধুনদী তাহার উভয় তীরে যে পলিমাটির ঘন স্তর ফেলিয়া গিয়াছে শহরের বহিঃপ্রাচীর সম্ভবত তাহারই তলায় চাপা পড়িয়া আছে, বাবিলনের বিরাট ধ্বংসস্তূপের মত ইহাদের পোড়া ইটগুলিও নিশ্চয় পরবর্ত্তী যুগের গ্রামবাসীদের ইটের পাঁজার কাজ করিয়াছে। অথবা হয়ত মোহেন-জো-দাড়োর প্রাচীর এমন ভারী করিয়া গাঁথাই হয় নাই। সে সময় অধিকাংশ শহরেই শত্রু আক্রমণ ও ভাঙাচোরা ইত্যাদি চলিত, কিন্তু এখানে সেরূপ আক্রমণাদির প্রমাণের আশ্চর্য্য অভাব। রীতিমত আগুন লাগাইয়া পোড়ানো হইয়াছে শহরের এমন কোনো অংশ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, অস্ত্রশস্ত্রও প্রাচুর্য্যে কি রকমারিত্বে বিশেষ বেশী পাওয়া যায় নাই। গোটাকতক বর্শা, কুড়াল, গদা, পাথরের গুলিকা ইত্যাদি সবই হয়ত নিতান্ত নির্বিরোধকাজেই ব্যবহৃত হইত। অথবা চোর-ডাকাত তাড়ানোর কাজে লাগিত।

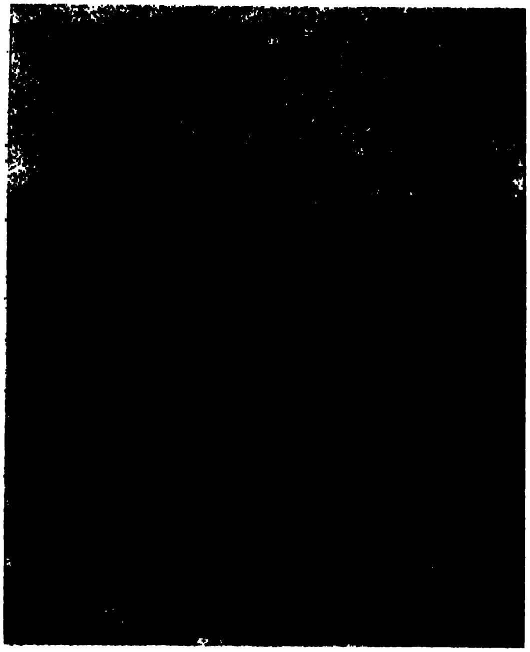
খুঁড়িতে গিয়া এক জায়গায় সমতল ভূমির ২৬ ফিট নীচেও রাজমিস্ত্রীর কাজ পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আধুনিক ইটের ঢিপিগুলি হইতে কত দূরে যে পুরাকালের বসবাস চলিত বলা শক্ত। তবে আধুনিকতম শহরটির সীমা যে ইটের পাঁজাগুলি পর্য্যন্তই ছিল ইহা বলা সম্ভব। কারণ ইটের পাঁজা নিশ্চয় আবাসপল্লীর বাহিরে ছিল। এগুলি বেশীর ভাগ শহরের উত্তরপূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে; তাহাতে মনে হয় এখনকার মত তখনও বাতাস পশ্চিমা ছিল। শহরের শেষ যুগে কুমোরের চাক এই ঢিপিগুলির কেন্দ্রের কাছাকাছি ছিল। তাহা ছাড়া শেষযুগের গাঁথুনির কাজ প্রথম যুগের গভীরতর স্তরের কাজ হইতে এতটা নিকৃষ্ট যে, মনে হয় শহরটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হওয়ার আগেই ইহার আয়তন এবং প্রসিদ্ধি উভয়ই কমিয়া আসিয়াছিল। কেন যে শহর ছাড়িয়া অধিবাসীরা চলিয়া গেল বলা শক্ত। বন্যা, মহামারী, শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি নানা কারণ থাকিতে পারে, অথবা হয়ত হঠাৎ নদীর মুখ ফিরিয়া জলধারা দূরে চলিয়া যাওয়াতে ভারতের অন্যান্য শহর এবং বহিঃপ্রদেশের সঙ্গে যোগ রক্ষা কঠিন হইল। ইহাদের সঙ্গেই এই সহর ত ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইত। সব কয়টি কারণেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আছে, কিন্তু মোট কসিয়া দেখা যায় যে, বন্যার জন্য নাগরিকদের পলায়নই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত।



চীনামাটির টুকরা, বোতাম ও মীনার কাজ

শহরটি যে বন্যার প্রলয়লীলায় বহু দুঃখ পাইয়াছে এবং অধিবাসীরা সর্ব্বদাই বন্যার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে। খনিত পথ ও গলি দিয়া হাঁটিতে গেলেই দেখা যাইবে প্রাচীরগুলি পড়-পড় ভাবে হেলিয়া আছে; কোথাও প্রাচীরের মাথা ভাঙিয়া ফেলিতে হইয়াছে, পাছে খননকারীদের মাথায় আসিয়া পড়ে,

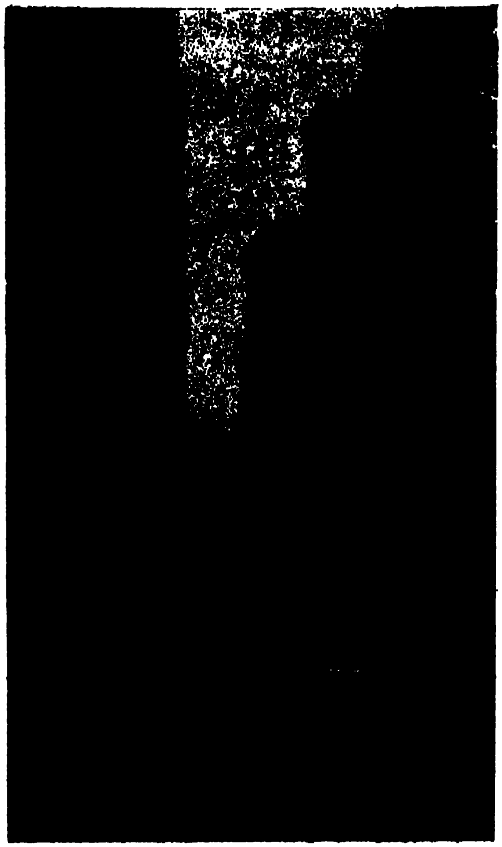
কোথাও বা প্রাচীর এমন বসিয়া গিয়াছে যে গাঁথুনির ইটের রেখাগুলি ঢেউএর মত উচুনীচু হইয়া চলিয়াছে। তাই যখনই কোনো গৃহ নষ্ট হইয়া যাইত তখনই তাহার দেওয়ালগুলি কাঁচা ইট দিয়া ভরাট করিয়া নূতন গৃহের



বড় চৌবাচ্চার উত্তর প্রান্তের ধাপ

জন্য একটি উচ্চ ভিত্তি প্রস্তুত করা হইত। বন্যার আক্রমণের ভয় ইহাতে কম। কিন্তু প্রায়ই এই কৃত্রিম ভিত্তির ভিতর, বিশেষতঃ যেখানেই ভাঙা ইট ও ভাঙা বাসনের খোয়া ব্যবহৃত হইত, জল ঢুকিয়া পড়িত। শেষযুগের শহরে ইহা খুব দেখা যায়।

মোহেন-জো-দাড়োবাসীরা কেবল শস্যক্ষেত্রের ধানের উপরে নির্ভর করিত মনে করিলে সিন্ধুনদের বাৎসরিক বন্যাগুলি দেবতার আশীর্ব্বাদ বলিয়াই মাথা পাতিয়া লওয়া চলিত। বানের জলে গম ও অন্যান্য শস্যের পক্ষে উর্ব্বরা পলিমাটি আসিয়া পড়িত। কিন্তু ইহারা যে ব্যবসায়ীও ছিল ইহাদের শীলই তাহার প্রমাণ; বন্যার জলে কিছুকালের মত আটক পড়িলেও ইহাদের অত্যন্ত দুর্গতি হইত। যে সব বৎসরে বন্যার প্রকোপ অসাধারণ রূপে বাড়িত সে সব সময়ে বর্ত্তমান শিকারপুর ও লারকানা শহরের আধুনিক অধিবাসীদের মত ইহারাও সাময়িকভাবে শহর ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে বাধ্য হইত। এই প্রাচীন শহরের বসবাসের ধারার মধ্যে দুইবার যে ভাঙন ধরার চিহ্ন দেখা যায়, তাহা সম্ভবত এইরূপ সাময়িক শহর ত্যাগের জন্য। (কয়েকটা মাত্র বৎসরের মধ্যে এইরূপ প্রলয়বন্যার বারংবার আবির্ভাবের আশঙ্কা মানুষের বাসভূমি পরিবর্ত্তনের পক্ষে যথেষ্ট।)



মোহেন-জো-দাড়োর গলি ও বাড়ি

নদীগর্ভ পরিবর্ত্তিত হওয়াও ভাঙনের একটা কারণ হইতে পারে। এই ১৯২৭ খৃঃ অব্দের গ্রীষ্মকালেও ত ধ্বংসস্তূপ হইতে চার মাইলের অধিক দূরস্থ নদী অকস্মাৎ তিন মাইল দূরে আসিয়া পড়ে। উর এবং অন্যান্য সুমেরিয়ান শহরের এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটাতেই তাহাদের পতন হয়।



মোহেন্‌-জো-দাড়োতে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল

মহামারীও মোহেন-জো-দাড়োর পতনের কারণ হইতে পারে। গৃহভিত্তির নীচে যে অলঙ্কারের ভাণ্ডার এবং তামা ও ব্রঞ্জের অস্ত্রশস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় ইহাদের অধিবাসীরা সাময়িক অনুপস্থিতির সময় এগুলিকে মাটির নীচে নিরাপদে প্রোথিত রাখিয়া যায়, কিন্তু ভবিষ্যতে ফিরিয়া লইতে নিজেরাই আর ফিরে নাই।

মোহেন-জো-দাড়োর মৃতের সদগতি যে কিরূপে হইত তাহা বুঝিবার উপযুক্ত প্রায় কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। যদি ধরা যায় যে, কবর দেওয়ার প্রথা ছিল, তবে সমাধিভূমিগুলি নিশ্চয় দূরগত নদীর ঘন পলি-মাটির স্তরের অনেক ফিট নীচে চাপা পড়িয়া আছে। এত বড় বিরাট স্থানে তাহার আবিষ্কার ভাগ্যের উপর মাত্র নির্ভর করে। দাহ করিবার প্রথা ছিল এমনও হইতে পারে, অস্থি ও ভস্ম তাহা হইলে নদীর জলে কোথায় ছড়াইয়া গিয়াছে। হরপ্পাতে দাহ করার কিছু প্রমাণ মিলিয়াছে এবং মোহেন-জো-দাড়োতেও নানা রকম বড় বড় পাত্রে ভস্মের সহিত ছোট ছোট বাটি ইত্যাদি দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু নিশ্চিত মানব অস্থি এই সব পাত্রে দুই এক জায়গায় ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় নাই।

কয়েকটি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম খননের সময় প্রাপ্ত এবং স্যর জন মার্শাল মহাশয়ের পুস্তকে উল্লিখিত কঙ্কালগুলিরভিতর পনরটিকে মাত্র, তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দেখিয়া নগরের সমসাময়িক বলা চলে। বাকিগুলি নগর ধ্বংস হইয়া যাইবার দুই এক শতাব্দী কিংবা আরও অধিক-কাল পরের নবাগত মানুষের কঙ্কাল হইতে পারে। উক্ত পনেরটির মধ্যে চৌদ্দটি একই ঘরে নানা অদ্ভুত ভঙ্গীতে পড়িয়া ছিল। এই সামান্য কয়টা কঙ্কাল হইতে অধিবাসীদের জাতিনির্ণয় করিতে যদি কেহ চাহেন তবে ঐ অদ্ভুত অবস্থাটির জন্যই তাঁহার মনে সংশয় আসিবে। নগরস্থ অধিবাসীদের কঙ্কালের কোন চিহ্ন নাই, অথচ এই চৌদ্দটি দেহ একই ঘরে পড়িয়া আছে, ইহাতেই মনে হয় ইহারা বন্দী কিম্বা দাস অবস্থায় কোনো মহামারীতে

প্রাণ হারাইয়াছিল এবং যথারীতি সমাধি ক্রিয়াদি না করিয়া তাহাদের তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দেওয়া হইয়াছিল।" মাথাগুলির কঙ্কালগুলি নানা জাতির মানুষের বলিয়াই ইহাদের বিদেশী বন্দী কি দাস বলিয়া ধারণা হয়।

আরও সম্প্রতি হরপ্পাতে আবিষ্কৃত কয়েকটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। সেই সংক্রান্ত মাটির বাসন ও অন্যান্য অবস্থা বিচার করিয়া এই কঙ্কালগুলিকে মোহেন-জো-দাড়োর শেষ পত্তনের পরবর্ত্তী কালের বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং উভয় ধ্বংসভূমি হইতেই আরও অনেকগুলি কঙ্কাল উদ্ধার না পাওয়া পর্য্যন্ত সেই যুগে সিন্ধুতীরে কোন্ জাতির "অধিবাস" ছিল তাহা অনুমানমূলক প্রমাণের সাহায্যে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির সাহায্যেও বিশেষ কিছু বলা চলে না, কারণ যদিও কয়েকটি মূর্ত্তিতে অত্যন্ত নীচু কপাল, ছোট মাথার খুলি সরু ও বাঁকা চোখ প্রভৃতির খুব সাদৃশ্য দেখা যায়, তবু আবার মাঝখানে ফুটাকরা থালার মত কান ইত্যাদি ভাস্করদের অপটুতার নিদর্শন বলিয়াই বেশ বোঝা যায়। সুতরাং একটা সমাধিভূমি কি আর কোনও স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই প্রাচীন নগরবাসীদের জাতিনির্ণয় বিষয়ে বেশী অনুমানের উপর নির্ভর না করাই ভাল।

আগামী বারে সমাপ্য

তারার মত মরা

শ্রীকান্তিপ্রসাদ চৌধুরী

১

রশ্মি-ঝুলি পূব আকাশের গায়
ভোর-পিয়াসী শুকতারাটি আমার পানে চায়।
বধির তারা! শুনিস নি কি কিছু, আলোর গাঙে
ডেকেছে ঐ বান?
সীমা-রেখার গোপনতলে
দেখিস নি কি মরণ জ্বলে?
দৃষ্টিহারা! এবার সাবধান।
তবু তারা! কাঁপে না তোর প্রাণ?

২

উদয়-মুখে তখন ধীরে ধীরে
আকাশ হ'ল চাপার বরণ আঁধার ছিঁড়ে ছিঁড়ে।
রঙের নদী উছল হ'য়ে আসে, এবার তারা কেঁপে-
কেঁপে সারা।
তবু তাহার মুখের হাসি
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ভাসি।
নীলের বুকে বইল সোনার ধারা,
তারা হ'ল চিরতরে হারা।

৩

মরণ যখন কানের কাছে এসে
কইবে, "বঁধু, সময় হ'ল চল আমার দেশে,"
আমি যেন ভয় না মানি শুনি তাহার আগমনীর বাণী।
কঙ্কণ-কঠিন আঘাতে তার
মৃত্যু-মলিন অধর আমার
না ভুলে তার চিরকালের হাসি—
তারার মত মৃত্যুজয়ী হাসি।

৪

তারার মতই সুনীল অসীমেতে
আলোর মাঝে মরণ যেন আসে নিকটেতে—
রঙের মাঝেই হারিয়ে যেন ফেলি ব্যথার ভরা
আমার আপনারে।
মরণ তখন মধুর হবে
আলোকেরই মহোৎসবে,
ধ্বংস হবে মরণীয়। তারে
জয় চাহে প্রণাম করিবারে।

পোড়াকপালী

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কচি ছেলে লইয়া সংসারের সব কাজ করিতে কুসুমের হিমসিম লাগিয়া যায়। ছেলেটাও হইয়াছে আচ্ছা, কাজের সময়েই চোখে ওর একদম ঘুম নাই। কাঁথায় চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দিলে ও-বাড়ির সুশীলার ছেলের মত একটু যে খেলা করিবে, তাও নয়। কোল হইতে নামাইলেই কান্না।

সংসার অবশ্য ছোট,—শুধু স্বামী তারক। কিন্তু যত ছোট হউক, সংসার ত? সবই করিতে হয়। সকালে উঠিয়া ঘরলেপা বাসন-মাজা উনুন-ধরানো তারককে চা জলখাবার করিয়া দেওয়া, ছেলেকে দুধ খাওয়ানো, ন'টার মধ্যে রান্না শেষ করা,—এর কোন্ কাজটা একদিন বাদ দিলে চলে কে বলিতে পারে বলুক দেখি! এ ত গেল একবেলার বড় বড় কাজের হিসাব, খুঁটিনাটি কাজ অমন হাজারটা আছে। সামান্য এক গেলাস জল ভরিয়া দেওয়ার কথাটাই ধর। কোথায় গেলাস খুঁজিয়া আন, কলসীর কাছে গিয়া জল গড়াও, যে জল চাহিয়াছে তার কাছে পৌছাইয়া দাও, গেলাস খালি করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাক, তারপর যেখানকার গেলাস সেখানে রাখিয়া এস—তবে ওই সামান্য কাজের পরিসমাপ্তি।

ছেলে-কোলে মানুষ অত করিতে পারে? তবু সবই করিতে হয়। চাকর বামুন রাখিবার সামর্থ্য নাই। খোকা হইবার পর হইতেই কুসুমের শরীরটাও ভাল যাইতেছে না। মাঝে ত ক'দিন খুব জ্বরেই ভুগিল। সকালবেলা বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে আজকাল তার বড় কষ্ট হয়, প্রত্যেক দিন শেষবেলায় তার বুক জ্বলে ও সন্ধ্যার সময় মাথা ধরে।

মাথার যন্ত্রণাটাই সবচেয়ে অসহ্য। মনে হয়, গলা ছিঁড়িয়া মাথাটা ছিপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে,—এত ভারী। গেলেও যেন বাঁচা যায়। মাথা ত আছে সকলেরই, মাথা লইয়া এমন ভোগান্ত হয় কাহার?

তারক অবশ্য বলে,—একটা তেলটেল এনে দিই কুসুম। চুল যে সব উঠে গেল!

তেলের দাম কুসুমের অজানা নয়। এক টাকায় এই এতটুকু একটা শিশি। মাথায় তেল মাখার জন্ত সে বুঝি তার খোকার দুধ নেওয়া বন্ধ করিবে?

'পোড়াকপাল আমার! তেলের জন্ত বুঝি? বুড়ী বৌকে আর আদরটাদর কর না, মনের দুঃখে তাই চুল উঠে যাচ্ছে।'

কথাটা খাঁটি পরিহাস। খাঁটি পরিহাস মানে কথাটায় সত্যের এতটুকু আমেজও নাই। তারক ভারি বৌ-পাগলা লোক। রূপকথার রাজপুত্রের মত সে যেন সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া অনেক বাধাবিপত্তি জয় করিয়া অনেক দুঃখ-কষ্ট পাইয়া তার রাজকন্যাকে মাত্র কাল পরশু উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, চার বছরের পুরানো বৌকে সে এত ভালবাসে।

সেদিনের জ্বরের কথাটাই কুসুম ভাবে। সে মরিতে বসে নাই, তবু নাওয়া-খাওয়া ঘুমের কামাই ত ছোট কথা, আপিস কামাই হইতেও তারকের বাকী ছিল না।

এত বেশী ভালবাসার আওতায় কুসুম যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। লতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে যেখানেই ছায়া, রোদ আর গায়ে লাগিতে পায় না। সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে সে, তার মামাবাড়ি চিরকাল মাটির প্রদীপ জ্বলিত। অত্যন্ত শান্ত আবেষ্টনের মধ্যে সে মানুষ হইয়াছে, হৃদয়ের কারবার যেখানে ছিল তিমে এবং সংক্ষিপ্ত,—খানিক ভালবাসা, খানিক লাঞ্ছনা, খানিক অবহেলা অশ্রদ্ধা। অনভ্যস্ত এত তীব্র অনুভূতি তার সয় না। সে ঝরণার ধারের ছোট চারা গাছ, আসিয়া পড়িয়াছে প্রকাণ্ড নদীর ধারে,—যে নদীতে বার মাসই বন্যা।

কুসুমকে আজকাল অনেক সময় আপন মনে বিড়-বিড় করিয়া বকিতে শোনা যায়।

আপন মনে বকে বলিয়া কুসুমের যে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহা নয়। জীবনে তাহার আবেগের অভাব নাই, এদিকে তাহাকে বড় একা থাকিতে হয়। সকালে তারক পাড়ার একটি ছেলেকে পড়ায়, তারপরেই তাকে আপিসে যাইতে হয়। মাড়োয়ারী সওদাগরের আপিসের বাঙালী কেরাণী, সন্ধ্যার অনেক পরে সে বাড়ি ফেরে। সারাদিন কুসুমকে মুখ বুজিয়া থাকিতে হয়, কথা বলিবার লোক নাই। দুপুর বেলা কোন কাজ থাকে না কি-না, খোকা তাই সেই সময়টাই পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

লেখাপড়া কুসুম ভাল জানে না। কখন বাড়িতে মাসিক পত্র আসিলে তিন দিনের চেষ্টায় একটা গল্প শেষ করে, সুতরাং ধৈর্য্যও থাকে না, রসও পায় না। আজকালকার গল্পে যে রকম চালাকী, একনিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতে না পারিলে বোকাই বনিয়া যাইতে হয়।

বাড়িতে যে একটা পোষা পাখী নাই ইহাও কুসুমের কাছে অভাবের সামিল।

তারক পাখী কিনিয়া দিতে চায়, কুসুম মাথা নাড়ে। বলে, 'না। আর পাখী পুষব না।' তার একটা সাদা ধবধবে কাকাতুয়া ছিল, মরিয়া গিয়াছে। পাখী পুষুক আর পাখী মরুক, আর সে কাঁদিয়া সারা হউক! তার অত সখ নাই।

এমনিভাবে কাজের ভিড়ে হিমসিম খাইয়া আর কাজের অভাবে ছটফট করিয়া মহা দারিদ্র্যের মধ্যে পরম সুখে কুসুমের দিন যাইতেছিল, হঠাৎ ইতিমধ্যে তারক একদিন আপিস হইতে দুই পকেটে দুই শিশি মাথার তেল আর স্নেহে অস্বস্তি লইয়া বাড়ি ফিরিল।

তার কয়েকটা টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে।

কুসুম বলিল, 'ওমা, একি? দু-শিশি তেল তুমি কোন্ হিসেবে আন্‌লে? দু-দুটো টাকা!'

'না, চোদ্দ আনা করে নিয়েছে।'

'চোদ্দ আনার এক টাকায় তফাৎ ত ভারি!—আচ্ছা, মাইনে বেড়েছে, না হয় এনেছ একটা জিনিষ সখ করে, একসঙ্গে দুটো কিন্‌তে গেলে কেন?'

'আবার আনা হয় কি না-হয়,—ও তোমার দু-মাসেই ফুরিয়ে যাবে দেখো।'

'দু-মাসে দু-শিশি তেল মাখে, কত বড় লোক!'—হাসিভরা মুখখানা কাৎ করিয়া কুসুম একটু ভাবিল। বলিল, 'মাইনে বেড়েছে তোমার, তেল পেলাম আমি। তোমার ত কিছু পাওয়া উচিত? তোমায় আজ লুচি খাওয়াব।'

তারকের শরীর খুব খারাপ লাগিতেছিল, দুপুর বেলা আপিসে সে একবার বমি করিয়াছে। বোধ হয় জর হইবে। লুচির নাম শুনিয়াই তার আবার বমি আসিতেছিল, কিন্তু কুসুমের আগ্রহ দেখিয়া সে আপত্তি করিতে পারিল না। খাবে না? শরীর খারাপ? বলিতে বলিতেই ওর দীর্ঘস্থায়ী অনির্ব্বচনীয় হাসিটি একেবারে মুছিয়া যাইবে। তাছাড়া, জর এখনও আসে নাই, আসিবে কি-না তাহাও অনুমান মাত্র। যখন আসিবে তখন দেখা যাইবে, এখন ত কুসুম হাসিমুখে লুচি ভাজুক।

কুসুম তাড়াতাড়ি ময়দা মাখিয়া লেচি পাকাইয়া, উহুন ধরাইয়া ফেলিল। ডাক দিয়া বলিল, 'ওগো বাবু মশায়! লুচি খেতে হ'লে বেলে দিতে হয়।'

তারক দাওয়ায় তামাক টানিতেছিল। হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিতে গিয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেল। খোলা বাতাসের সংস্পর্শে ছাইয়ের আবরণ সরিয়া গিয়া টিকাগুলি জল জল করিতে লাগিল!

ছেঁড়া চটি দিয়া ঘষিয়া তারক টিকাগুলি গুঁড়া করিয়া দিল, অনেকগুলি আগুনের কণা উড়িয়া উঠানের অপর পার্শ্বে গিয়া পড়িল। তারকের ধুতিতেও কয়েকটি ছোট ছোট কালো ছিদ্র হইয়াছে।

হুঁকাটা সোজা করিয়া রাখিয়া বিরক্ত তারক আপন মনে বলিল, 'কি তেজ ওইটুকু আগুনের!'

এদিকে রান্নাঘরে কুসুম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'কই গো, এলে? লুচি তোমায় বেলতে হবে না বাবু, এখানে এসে শুধু বোসো, দুটো কথাবার্ত্তা কই।'

রান্নাঘরে গিয়া তারক বলিল, 'আমি লুচি বেলতে জানি যে বেলব? আমি বরং ভাজতে পারি।'

'তোমার কিছু পেরে কাজ নেই। বসে বসে তুমি শুধু বক্‌ বক্‌ কর। বাব্বা, সারাদিন মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পাই না।'

'না, দাও আমি ভাজি।'

কুসুম সসন্দেহে বলিল, 'পারবে ?'

'লুচি ভাজতে পারব না কি গো ? তোমার চেয়ে ভালই পারব।'

কিন্তু সে পারিল না। প্রথম লুচিখানা ছাড়িতে গিয়া তপ্ত ঘিয়ে আঙুল ডুবাইয়া ফেলিল। তারপর তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া আনিতে কড়াটাই দিল উল্টাইয়া।

হাতে পায়ে গায়ে সর্ব্বত্রই ঘি ছিটকাইয়া লাগিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা জখম হইল তার ডান পা-টি। দেখিতে দেখিতে সমস্ত পায়ের পাতা জুড়িয়া এক প্রকাণ্ড ফোস্কা পড়িয়া গেল।

দেখিলে ভয় করে।

তারকের ফোস্কাগুলি আর সারিল না। কারণ, সেই রাত্রেই তাহার খুব জ্বর হইল, ডাক্তারি ভাষায় যে জ্বরকে মেলিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া বলে, এবং ফোস্কা সারিবার ঢের আগে সে গেল মরিয়া।

শেষ রাত্রে সে মারা গেল, লোকজন জুটাইয়া খাটুলি ইত্যাদি আনিয়া তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাইতে যাইতে পরদিন বেলা এগারোটা বাজিয়া গেল। সেদিন দারুণ দুর্য্যোগের দিন, সকাল হইতে ঝড়বৃষ্টির কামাই ছিল না। একটা মানুষকে ভাল করিয়া পুড়াইতে যত কাঠ দরকার তত কাঠ সংগ্রহ করা গেল না। চিতায় শোয়ানোর পর তারকের শরীরের কিছু কিছু অনাবৃত রহিয়া গেল।

মুখাগ্নি করিল কুসুম।

চিতার খুব কাছে সে দাঁড়াইয়া ছিল। চিতা ভাল করিয়া জলিয়া উঠিলে যতটুকু সরিয়া গেলে আগুনের তাত সহ্য হয় ততটুকুই সে সরিয়া গেল। তার চোখে জল নাই। সম্ভবতঃ আগুনের তাতেই শুকাইয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল তারকের দেহে বড় বড় ফোস্কা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং একে একে ফাটিয়া যাইতেছে। এ সব ফোস্কায় জল নাই, শুধু আছে বাষ্প আর বাতাস।

কুসুমের মাথার মধ্যে পৃথিবী পাক খাইতেছে, চিতাটা হাতের নাগালের সূর্য্য। মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া যাওয়ার ঠিক আগে কুসুমের মনে হইতেছে তারকের গায়ের ফোস্কা-গুলি ফোস্কা নয়,—লুচি।

মাসখানেক পরে একদিন রাত্রিবেলা কুসুম মামা-বাড়িতে রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল। ডাল আর তরকারী রাঁধিয়া সে ভাত চাপাইয়াছে। ভাত-চাপানোর আগে মামী তাকে লুচি ভাজিতে বলিয়াছিলেন—মামার শরীর ভাল নয় ভাত খাইবেন না। কুসুম লুচি ভাজিতে রাজী হয় নাই। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিয়াছিল, 'আর যা বলবেন সব আমি করব মামীমা,—লুচি ভাজতে পারব না।'

'কি ক'রে যে মুখের ওপর পারব না বলিস বাছা বুঝতে পারি না। একে ওঁর সর্দ্দি, এই বাদলাতে ভাত খেয়ে যদি অসুখ করে ? ভাজতে না পারিস্‌, ময়দাটা ত মাখতে পারবি, না তাও পারবি না ?'

কুসুম ময়দা মাখিয়া দিয়াছিল। মাখিতে মাখিতে তারকের অকালমৃত্যুর জন্ত নিজেকে দৈনন্দিন হিসাবের চেয়ে একটু বেশী রকম দায়ী করিয়া ফেলিয়াছিল।

শ্মশানের মূর্চ্ছা ঘরে আসিয়া ভাঙিবার পর যে আত্ম-গ্লানির জন্ত সে কাঁদে নাই এ সেই আত্ম-নির্য্যাতন। স্বামীকে দিয়া সিঁদুর আনাইতে নাই এটা কুসুম জানিত, আজকাল তার ধারণা হইয়াছে বিষ্যুদবারের বারবেলায় স্বামী মাথার তেল আনিয়া দিলেও অমঙ্গল হয়। এ বিষয়ে কুসুমের যুক্তিও আছে। সিঁদুর প'রে সধবা, তেলও সধবাই মাখে। দেবতার প্রসাদে তেল সিঁদুরই সধবার সবচেয়ে কাম্য।

এ বিষয়ে সে কিন্তু একেবারে নিঃসন্দেহ নয়। তারক আরও কয়েকবার তাহাকে তেল কিনিয়া দিয়াছে, কখনও ত কিছু হয় নাই।

গরম ঘিয়ে পা পুড়িয়া না গেলে তারকের যে অত জ্বর হইত না ইহাতে কুসুম লেশমাত্র সন্দেহ করে না। ম্যালেরিয়া ও রকম হয় ? সে নিজে কত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় মানুষ তিন দিনে মারা যায় না।

তারপর তারকের ভাল-মত চিকিৎসাও হয় নাই। ফোস্কা দিয়া কি হইয়া গেল, চিকিৎসার সময়ও যেন পাওয়া

গেল না। পোষ্টাপিসের টাকা জমানো রহিল, গায়ের গহনা বাঁধা পড়িল না, বড় বড় ডাক্তারেরা তারককে দেখার ব্যাপারটা অবসর-হিসাবে যাপন করিল। একটু নিরীহ দুর্বল প্রতিবাদ করিয়াই সে হইল বিধবা।

উনুনটা চমৎকার জলিতেছে, রান্নাঘরের এককোণে জমা করিয়া রাখার দরুণ এই বাদলেও কাঠগুলি শুকনো খটখটে হইয়া আছে। পিঁড়িতে উবু হইয়া বসিয়া কুসুম মোহাবিষ্টার মত আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল। কি রং আগুনের! কুসুম কতকাল দু-বেলা উনুন জ্বালাইয়া রান্না করিয়াছে, এমন স্থূল অগ্নিশিখায় এমন গাঢ় রঙের আবির্ভাব সে কখন দেখে নাই। তারকের চিতায়ও না।

ওদিকে মামী লুচি ভাজিতেছিলেন, ঘিয়ের গন্ধে বুকের কষ্ট হইতে লাগিল। আগুনের অভূতপূর্ব্ব রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও ঘিয়ের গন্ধে সর্ব্বাঙ্গে যে অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতেছিল তাহাও সে উপলব্ধি করিতে পারিল। হঠাৎ রোমাঞ্চ হইয়া তাহার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত সির্ সির্ করিয়া উঠিল।

* * * *

কুসুম খুব রোগা হইয়া গিয়াছে। দেহে মনে সুস্থ থাকার পক্ষে তার কতকগুলি গুরুতর অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। কয়েক মাসের মধ্যে পৃথিবী তার কাছে আর একটি মানুষ আদায় করিবে,—বৈধব্য-জীবনটা এ অবস্থার উপযোগী নয়, রাত্রে তার ভাল ঘুম হয় না। শোক, অন্ধকার, ঘুমন্ত খোকা আর খানিকটা পাগলামী আজকাল কুসুমের রাত্রির সম্পদ। শোক তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদায়, অন্ধকার তাহাকে ভয় দেখায়, খোকা তাহাকে বিরক্ত করে, আর পাগলামী তাহাকে জাগাইয়া রাখে।

তার পাগলামী এইরূপ।

সে মনে করে তারকের সঙ্গে গল্প করিয়া সে যত রাত জাগিত এখন তারকের জন্ত শোক করিয়া তার চেয়ে ঢের বেশী রাত জাগা উচিত। ঘুম আসিলেও সে তাই ঘুমায় না। ঘুমকে ঠেকানো তার পক্ষে কঠিন নয়। তারকের সোনার রং কেমন করিয়া পুড়িয়া কালো হইয়া কোঁকড়া পড়িয়াছিল সেই দৃশ্যটা কল্পনা করিলেই হইল। ঘুমের আর চিহ্নমাত্র থাকে না।

মামীর বড়মেয়ে বাটি নিতে আসিয়া বলিল, 'কত কাঠ গুঁজেছিস কুসুম? একদিনে সব পুড়িয়ে শেষ করবি নাকি?'

'আনমনে গুঁজে ফেলেছি দিদি।'

কুসুম তিন-চারখানা কাঠ টানিয়া বাহির করিয়া জল ছিটাইয়া নিবাইয়া উনুনের পাশে রাখিল। ধোঁয়ায় তার চোখ কট্-কট্ করিতে লাগিল আর জল পড়িতে লাগিল। জলন্ত কাঠ ভাল করিয়া না নিবাইলে যেমন ধোঁয়া হয় তেমনি একটা বিশ্রী শ্মশান-আশ্রয়ী গন্ধ ছাড়ে।

ধোঁয়ার ছলনায় নয়, প্রকাশ্যে এবং গোপনে কুসুম আজকাল খুব কাঁদে। তার চোখের জল জমাইয়া রাখিলে একটা বাটি ভরিয়া যাইত এত সে কাঁদে।

মুছিয়া মুছিয়া চোখ শুকনো হইলে কুসুম চাহিয়া দেখিল ভারি একটা বিপদের সূত্রপাত হইয়াছে। উনুনের পাশে এক আটি পাটকাঠি বেড়ায় ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছিল, ইতিমধ্যে কখন নেবানো কাঠগুলির একটা আপনা আপনি জলিয়া উঠিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে এ আগুন বেড়ায় লাগিবে এবং দেখিতে দেখিতে খড়ের চাল জলিয়া উঠিবে। বৃষ্টিতে চালের উপরিভাগ অবশ্য ভিজিয়া আছে, কিন্তু আগুনকে ঠেকাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

রান্নাঘরের চাল একবার ভাল করিয়া জলিয়া উঠিতে পারিলে বাড়ির অন্ত ঘরগুলিকেও দলে টানিবে। পাশের মুখুয্যে-বাড়ি রেহাই পাইবে না, সরকারদের বাড়িটাও মুখুয্যে-বাড়ির লাগাও।

পাটকাঠিগুলির মধ্যে সদ্যজাগ্রত ওই ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত শিশু অগ্নিদেবতাটি আজ পাড়ায় লঙ্কাকাণ্ড না করিয়া ছাড়িবে না।

ব্যাপারটা কুসুম চমৎকার কল্পনা করিতে পারে। একটা বিরাট বিশ্বগ্রাসী চিতা—একরাত্রে একসঙ্গে একরাশি মানুষের সর্ব্বনাশ! রঙে আর উত্তাপে অন্ধকার আর শূন্য ভরপুর হইয়া যাওয়া এবং তাহারই চারিদিকে কেবল হায় হায়, কেবল বুক-চাপড়ানো!

দুই চারি জন পুড়িয়া মরিবে না?

তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া কুসুম হিংস্র সাপের মত

অগ্নিশিখায় হেলিয়া-দুলিয়া বাড়িয়া-কমিয়া রূপ সতর্পণ অগ্রগতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আকার বাড়িতেছে, হেলানো সুদীর্ঘ সমিধ বাহিয়া ধীর অনিবার্য বেগে উপরে উঠিতেছে।

ঘরে আজ নিশ্চয় আগুন লাগিবে।

আর কেহ পুড়িয়া না মরুক, কুসুমের আজ উদ্ধার নাই। সে কিছুতেই পলাইতে পারিবে না। পিঁড়ির সঙ্গে মাটির সঙ্গে সে একেবারে আঁটিয়া গিয়াছে, তার সর্বাঙ্গে পক্ষাঘাত হইয়াছে, সে অবশ, অবসন্ন। উঠিবার, নড়িবার, টানিয়া পাটকাঠিগুলি সরাইয়া আনিবার শক্তিও তার নাই। সে পলাইবে কেমন করিয়া?

কুসুম স্পষ্ট দেখিতে পাইল, খড়ের জলন্ত চালের নীচে চাপা পড়িয়া সে ছটফট্ করিতেছে, তার গায়ের চামড়া কয়লার মত কালো হইয়া যাইতেছে আর সর্বাঙ্গে পড়িতেছে বড় বড় ফোস্কা। কাল্পনিক মৃত্যুর বীভৎসতার আতঙ্কে কুসুম এক প্রকার উৎকট আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

তার আর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না যে, একবার হাত বাড়াইলেই যে-বিপদ আটকানো যায় সে-বিপদের সামনে সে যে হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে সে বিধান ঈশ্বরের। ঈশ্বর তাহার হাত বাড়াইবার শক্তি হরণ করিয়াছেন। সে সতী কি-না, বিলম্বিত সহমরণকে নিজেও তাই ঠেকাইতে পারিতেছে না।

নিজে সে এ আয়োজন করিতে পারিত না। তার আত্মহত্যার মধ্যে শুধু আত্মহত্যার পাপ নয় নরহত্যার পাপও আছে। কিন্তু ঘরে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া মরাতে আর তার হাত কি? তজ্জন্য তাকে নরকে যাইতে হইবে না, কাহারও কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না, হাসিতে হাসিতে সে স্বর্গে তারকের কাছে চলিয়া যাইবে। পঁয়ত্রিশ দিনের বেশী বিধবা হইয়া সে থাকিল না। ইহার গৌরবে মুগ্ধ হইয়া লোকে ধন্য ধন্য করিবে।

খোকার কথা কুসুম ভাবিয়াছে। মামীর ছোট ছেলেটি আর নাতি-নাতনীর সঙ্গে সে শুইয়া আছে, তাদের সঙ্গে ওকেও সকলে সরাইয়া লইবে নিশ্চয়। কোলের ছেলে তার মরিবে না। কষ্ট অবশ্য সে অনেক পাইবে, কিন্তু তাহা বিধাতার ইচ্ছা, কুসুমের ওতে হাত নাই। মা'র মরণের ব্যবস্থা আজ যিনি করিলেন মা'র ছেলের বাঁচার ব্যবস্থাও তিনিই করিবেন। কুসুমের মাথায় যত চুল ততকাল ধরিয়া করিবেন।

এতক্ষণে আগুন আটি-বাঁধা পাকাটির মাঝামাঝি পৌঁছিয়াছে এবং বেশ জোরেই জ্বলিতেছে। এখানটা ভাল করিয়া পুড়িয়া যাইতেই পাকাটিগুলি ভাঙিয়া নীচে পড়িয়া গেল। ঘরে যে আগুন আজ লাগিবেই তাহার আর তেমন নিশ্চয়তা রহিল না।

পুড়িতে পুড়িতে একসময় আগুন নিবিয়া গেল, অবশিষ্ট রহিল খানিকটা ছাই, কিছু জলন্ত কয়লা আর কয়েক টুকরা পাকাটি।

কুসুমের মনে হইল সে খুব বেদনা পাইয়াছে, ভারি হতাশ হইয়াছে।

রান্নার খুন্তিটা দিয়া সে তার মূল আকাঙ্ক্ষার দগ্ধাবশেষগুলি নাড়িতে লাগিল। ছাইয়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িল আধপোড়া একটা তেলাপোকা।

হঠাৎ মামীর মেয়ে দ্বার ঠেলিয়া ঘরে আসিয়া রান্না-ঘরের এই অবস্থা দেখিয়া বলিল, 'এ কি অগ্নিকাণ্ড ক'রে বসে আছিস্ কুসুম?'

কুসুম অতর্কিতে বলিয়া ফেলিল, 'বড় বাঁচন বেঁচে গেছি দিদি; পোড়া কপালে আজ হয়ত অপঘাত মৃত্যুই ছিল। ভগবান বাঁচিয়েছেন এ যাত্রা।'

কষ্টিপাথর

বাংলার বানান সমস্যা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদেশী রাজার হুকুমে পণ্ডিতেরা মিলে পুঁথিতে আধুনিক গদ্য বাংলা পাকা করে গড়েচে। অথচ গদ্যভাষা যে সর্ব্বসাধারণের ভাষা, তার মধ্যে অপণ্ডিতের ভাগই বেশি। পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালাই করলেন সেটা হলো অত্যন্ত আড়ষ্ট। বিশুদ্ধভাবে সমস্ত তার বাঁধাবাঁধি—সেই বাঁধন তার নিজের নিয়ম-সঙ্গত নয়—তার বহু শব্দ সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ফরমাসে। সে হঠাৎবাবুর মত প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেকে বনেদী বংশের বলে প্রমাণ করতে চায়। যারা এই কাজ করে তারা অনেক সময়েই প্রহসন অভিনয় করতে বাধ্য হয়। কর্ণেলে গবর্ণরে পণ্ডিতি করে মূর্দ্ধন্য ণ লাগায়, সোনা পান চুনে তো কথাই নেই।

এমন সময়ে সাহিত্যে সর্ব্বসাধারণের অকৃত্রিম গদ্য দেখা দিল। তার শব্দ প্রভৃতির মধ্যে যে অংশ সংস্কৃত সে অংশে সংস্কৃত অভিধান ব্যাকরণের প্রভুত্ব মেনে নিতে হয়েচে—বাকি সমস্তটা তার প্রাকৃত, সেখানে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে পাকা নিয়ম গড়ে ওঠে নি। হতে হতে ক্রমে সেটা গড়ে উঠ্‌বে সন্দেহ নেই। হিন্দীভাষার গড়ে উঠেচে—কেননা এখানে পণ্ডিতির উৎপাত ঘটেনি, সেইজন্তেই হিন্দী পুঁথিতে "শুনি" অনায়াসেই "সুনি" মূর্ত্তি ধরে লজ্জিত হয়নি। কিন্তু ভদ্রটি বাংলার দেখাদেখি সম্প্রতি সেখানেও লজ্জা দেখা দিতে আরম্ভ করেচে। ওরাও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে বসেচে আর কি। প্রাচীন কালে যে পণ্ডিতেরা প্রাকৃত ভাষা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাষার প্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে বাঙালীদের মত তাঁদের এমন লজ্জাবোধ ছিল না।

এখন এ সম্বন্ধে বাংলার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম চল্‌চে—নানা লেখকে মিলে ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা কিছু দাঁড়িয়ে যাবে, আশা করা যায়। অন্তত এ কাণ্ডটা আমাদের নয়, এ সুনীতিকুমারের দলের। বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে স্বীকার করে তার স্বভাবসঙ্গত নিয়মগুলি তাঁরাই উদ্ভাবন করে দিন। যে হেতু সম্প্রতি বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নেবার প্রস্তাব হয়েচে সেই কারণে টেক্‌স্ট্‌বুক প্রভৃতির যোগে বাংলার বানান ও শব্দ প্রয়োগরীতির সঙ্গত নিয়ম স্থির করে দেবার সময় হয়েচে। এখন স্থির করে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে সাধারণের মধ্যে সেটা চলে যাবে। নইলে কেন্দ্রস্থলে কোনো শাসন না থাকলে ব্যক্তি বিশেষের যথেচ্ছাচারকে কেউ সংযত করতে পারবে না। আজকাল অনেকেই লেখেন "ভেতর" "ওপর" "চিবুতে" "ঘুমুতে," আমি লিখিনে, কিন্তু কার বিধানমতে চল্‌তে হবে। কেউ কেউ বলেন প্রাকৃত বাংলা ব্যবহারে যখন এত উচ্ছৃঙ্খলতা তখন ওটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পণ্ডিতি বাংলার শরণ নেওয়াই নিরাপদ। তার অর্থ এই যে, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করার চেয়ে কাঠের পুতুলের সঙ্গে ব্যবহারে আপদ কম। কিন্তু এমন তীক্ষ্ণ তর্কে সাহিত্য থেকে আজ প্রাকৃত বাংলার ধারাকে নিবৃত্ত করার সাধ্য কারো নেই। সোনার সীতাকে দিয়ে রামচন্দ্রের সংসার চলেনি। নিকষ এবং তোলদণ্ডের যোগে সেই সীতার মূল্য পাকা করে বেঁধে দেওয়া সহজ, কিন্তু সজীব সীতার মূল্য সজীব রামচন্দ্রই বুঝতেন, তাঁর রাজসভার প্রধান স্বর্ণকার বুঝতেন না, কোষাধ্যক্ষও নয়। আমাদের প্রাকৃত বাংলার যে মূল্য, সে সজীব প্রাণের মূল্য, তার মর্ম্মগত তত্ত্বগুলি বাঁধা নিয়ম আকারে ভালো করে আজো ধরা দেয়নি বলেই তাকে দুয়োরাণীর মতো প্রাসাদ ছেড়ে গোয়াল ঘরে পাঠাতে হবে, আর তার ছেলেগুলোকে পুঁতে ফেলতে হবে মাটির তলায়, এমন দণ্ড প্রবর্ত্তন করার শক্তি কারো নেই। অবশ্য যথেচ্ছাচার না ঘটে সেটা চিন্তা করবার সময় হয়েচে সে কথা স্বীকার করি।

বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৩৯]

পুরুষোত্তমদেব

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাঙ্গালার বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক বড় বড় শাব্দিক জন্মিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে পুরুষোত্তমদেব একজন। পুরুষোত্তমদেবের একজন টীকাকার সৃষ্টিধর, ইংরেজী ১৭ শতকে বলিয়াছেন যে, লক্ষ্মণসেনের দরকার হয় যে, পাণিনির বৈদিক প্রক্রিয়া ছাঁটিয়া একখানি ব্যাকরণ লেখেন। হিন্দুর মধ্যে আর কাহাকেও পাওয়া যায় নাই তাই বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেবকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। তিনি বৈদিক অংশ ছাঁটিয়া ভাষাবৃত্তি নামে এক ব্যাকরণ লেখেন এবং তাহার বৌদ্ধমতে উদাহরণ ইত্যাদি দেন। আমরা যত দূর জানি, এ কথাটি ঠিক নয়। সৃষ্টিধর অনেক পরের লোক, তিনি নিজের মাথা হইতে বোধ হয় এ-কথাটি লিখিয়াছেন। লক্ষ্মণসেন ১১৬৯ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। তখন তাঁহার পিতা 'দানসাগর' নামে বই লিখাইতেছিলেন, শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। লক্ষ্মণসেন তাহা শেষ করেন ১১৭১ সালে। কিন্তু সর্ব্বানন্দ বাঁড়ুজ্যে ১১৫৯ সালে অমরকোষের যে টীকা লেখেন, তাহাতে পুরুষোত্তমদেবের বই হইতে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং পুরুষোত্তম তাঁহার আগের লোক। কত আগের, জানা যায় না। আমরা তাঁহাকে ১১০০ সালের বলিয়া মনে করি। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বৌদ্ধদ্বেষী, তাহাতে বাঁড়ুজ্যে মশাই যে তাঁহার তুল্যকালের কোন বৌদ্ধের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিবেন, তাহা মনে হয় না;—প্রাচীন হইলে সে কথা স্বতন্ত্র। প্রমাণও তিনি যে দু'একটি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে,—অনেক। অন্যান্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের ন্যায় পুরুষোত্তমেরও উপাধি ছিল—উপাধ্যায়; তার পর হন মহোপাধ্যায়, শেষে হন মহামহোপাধ্যায়। তিনি যে বই লিখিবার জন্য অনেক খাটিতেন, তাহার এক প্রমাণ আছে—হারাবলী নামক অভিধান। এই ছোট্ট অভিধানখানি লিখিবার জন্য তিনি ১২ বৎসর খাটিয়াছিলেন। শুধু খাটা নয়, তিনি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের বাড়ী দুমাস দুমাস, এমন কি এক বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়া আসিয়াছিলেন।

আমরা এখানে শাব্দিক বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেবেরই নাম করিতেছি। আর একজন বৌদ্ধ পুরুষোত্তম ছিলেন—তিনি কাশীবাসী। তিনি অনেকগুলি বৌদ্ধদের পুরোহিতের অর্থাৎ সাধনার পুথি লিখিয়াছেন। আর একজন পুরুষোত্তমদেব খুব পণ্ডিত ছিলেন; তিনি উড়িষ্যার রাজা। কিন্তু তিনি আমাদের পুরুষোত্তম দেবের ৪০০ বৎসর পরের।

পুরুষোত্তমদেবের প্রধান বই—ত্রিকাণ্ডকোষ। অমরসিংহ তাঁহার অভিধান লেখেন খ্রীষ্টীয় ৬ শতকে। ৬ হইতে ১১ পর্যন্ত ৫০০ বৎসরে অনেক নূতন নূতন শব্দ সংস্কৃতে ঢুকিয়াছিল। সেইগুলি পুরুষোত্তমদেব তালিকা করিয়া দিয়াছেন। অভিধানে যে তিনটি কাণ্ড থাকে, তার সব কয়টি অমরসিংহের বইয়ে আছে, অর্থাৎ (১) পর্যায়; (২) নানার্থ ও (৩) লিঙ্গ; সেই জন্য উহার নাম ত্রিকাণ্ড। পুরুষোত্তমদেব উহারই পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন, এই জন্য উহার নাম হইয়াছে ত্রিকাণ্ড-শেষ। ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তম অমরের সঙ্কেত, অমরের পরিভাষা এবং অমরের রীতি ও বর্ণক্রম গ্রহণ করিয়াছেন, একটুও বদলান নাই। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যে সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাই তিনি ত্রিকাণ্ডশেষে লইয়াছেন এবং যাহার প্রয়োগ লোপ হইয়াছে, সে সকল শব্দ তিনি উৎপলিনী প্রভৃতি অন্য অভিধানে দেখিতে বলিয়াছেন। যে শব্দ অমরকোষে নাই, অথচ ত্রিকাণ্ডশেষে আছে, সে সকল শব্দ ৬০০ হইতে ১১০০ পর্য্যন্ত এই ৫০০ বৎসরে চলিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।...

তিনি আর একখানি অভিধান স্বতন্ত্র লিখিয়াছেন—সেখানির নাম হারাবলী। সেখানিতে ২৭৮টি বই শ্লোক নাই। তাহারও দুই চারিটি শ্লোকে তাঁহার নিজের কথা আছে, নিজের পরিচয় আছে। সুতরাং ২৭২টী শ্লোক লইয়া অভিধান। এই অভিধানে যে সকল শব্দ আগে প্রচলিত ছিল, ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাদেরই অর্থ দেওয়া আছে। অর্থাৎ অমরকোষের সময় প্রচলিত যে সকল শব্দ পুরুষোত্তমের সময় অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদেরই সংগ্রহ ইহাতে আছে। এই সকল অপ্রযুক্ত শব্দ সংগ্রহ করা অভিধান লেখার চেয়ে একটু কঠিন কাজ; সুতরাং গ্রন্থকারকে বড়ই খাটিতে হইয়াছিল। অনেক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল, এ শব্দের প্রয়োগ চলিবে কি না। তাঁহার দুই ছাত্র ও বন্ধু ধৃতিসিংহ ও জনমেজয় তাঁহার খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি ধৃতিসিংহ নামক আর একজন পণ্ডিতের বাড়ীতে প্রায় এক বৎসর অতিথি ছিলেন। যাঁহারাই এই পুস্তক পড়িয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করেন—বইখানি বড় ভাল এবং সংস্কৃত পাঠার্থীদের খুব উপযোগী।

পুরুষোত্তমের আর এক কীর্ত্তি—ভাষাবৃত্তি। পাণিনির স্বরের ও বেদের সূত্রগুলি বাদ দিয়া শুধু ভাষার যে সূত্রগুলি, সেগুলির উপর লঘুবৃত্তি দিয়া ভাষাবৃত্তি তৈয়ারী হইয়াছে। অনেক সময় পাদকে পাদই বাদ দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় পাদটি বৈদিক স্বরের ব্যাপার; সেটি একেবারে নাই। স্বর্গগত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বইখানি ছাপাইয়াছেন। অনেক সময় বৈদিক সূত্রগুলি ত্যাগ করিয়াছেন, অনেক সময় বৈদিক সূত্রগুলি ছাপাইয়া নীচে বলিয়া দিয়াছেন—ছান্দস। স্বরবৈদিকী বাদ যাওয়ায় বইয়ের তিন ভাগের এক ভাগ বাদ গিয়াছে। পুরুষোত্তম মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

> "নমো বুদ্ধায় ভাষায়াং যথাত্রিমুনিলক্ষণম্।
> পুরুষোত্তমদেবেন লঘ্বী বৃত্তির্বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ তিনি পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি, এই তিন জনের মতে ব্যাকরণ লিখিতেছেন, কিন্তু আসলে তিনি পাণিনির বৌদ্ধটীকা কাশিকা ও ন্যাসের উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশে, বিশেষ উত্তর-বাঙ্গালায় অর্থাৎ যেখানে পাল রাজাদের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল, সেখানে তাঁহার বই অনেক দিন টিঁকিয়াছিল; অনেক টীকাটিপ্পনীও হইয়াছিল। এখন আর চলে না; তখন কিন্তু ভট্টোজী দীক্ষিতের বই হয় নাই। ভট্টোজী দীক্ষিতের বই হইয়া ভাষাবৃত্তির অনেক ক্ষতি করিয়াছে। বাঙ্গালায় ভাষাবৃত্তি চলিলেও অনেক বড় বড় পণ্ডিত পুরা অষ্টাধ্যায়ী পড়িতেন। শ্রীশবাবু বলিয়া গিয়াছেন—রায়মুকুট, শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, কুল্লুকভট্ট, ইঁহারা সকলেই অষ্টাধ্যায়ীতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পুরুষোত্তমদেব ভাষাবৃত্তিতে পাণিনির সূত্রগুলিকে খুব সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমব্যবস্থা বদলান নাই।

পুরুষোত্তমের প্রধান কীর্ত্তি কিন্তু সংস্কৃতের বানান ঠিক করিয়া দেওয়া; সেই জন্য তিনি বর্ণদেশনা, দ্বিরূপ কোষ, একাক্ষর কোষ নামে একখানি অভিধান লিখিয়াছিলেন, বর্ণদেশনার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন বই বলিয়া চলিতেছে, যেমন ক্ষকারভেদ, শকারভেদ, নকারভেদ ইত্যাদি। আমি এইটিকেই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বলি; কেন-না, এ বিষয়ে বোধ হয় তিনিই প্রথম নজর দেন। সংস্কৃতের উচ্চারণ ক্রমেই বদলাইয়া যাইতেছিল। উচ্চারণ-ভেদে ক্রমে ভাষারও ভেদ হইয়াছিল; তাহাতে নানারূপ প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ৯ম ও ১০ম শতকে সংস্কৃতের বানানটাও প্রাকৃতের মত হইয়া যাইতেছিল। সকলেই চান, সংস্কৃতের বানান সংস্কৃতের মত থাকুক, প্রাকৃতের বানান প্রাকৃতের মত হউক; কেহই চান না—সংস্কৃতের বানান প্রাকৃতের মত হউক। এই বানানের গোলযোগটা পূর্ব্বাঞ্চলেই বেশী হইয়াছিল;—বিশেষ বাঙ্গালায়। বাঙ্গালীরা 'সম্বৎ' লিখিত, 'কিম্বা' লিখিত; কিন্তু সংস্কৃতে 'সম্বৎ' 'কিম্বা' হয় না, 'সংবৎ' 'কিংবা' হয়। আমরা 'বহু'কে 'বহু' উচ্চারণ করি, 'বলা'কে 'বল' উচ্চারণ করি; দুটা 'ন'র কোন ভেদই করি না, তিনটা 'শ' যে কেন থাকে, তাহা বুঝিতেই পারি না। ক্রমে এইরূপ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরও তফাৎ হইয়া গেল; সেটা বাঙ্গালায় তত বেশী হয় নাই, কিন্তু হিন্দী নেওয়ারীতে খুব হইয়াছে; যেমন খ, ষ, ক্ষ, তিনটাই এক রকম লিখিত, একটার জায়গায় আর একটা লিখিত, চ ও ছ ইচ্ছামত লিখিত, সিংহও লিখিত, সিংঘও লিখিত।

পুরুষোত্তমদেব এই সব গোলযোগ দেখিয়া বর্ণদেশনা লিখিয়া তাহাতে বলিলেন, রাজার আদেশ যেমন মানিতেই হয়, অন্যথা করিলে চলে না; বানানের আদেশও সেই রকম মানিতেই হইবে, অন্যথা করিলে চলে না; উহার কারণ জিজ্ঞাসার দরকার নাই, অনুসন্ধানেরও দরকার নাই। এই সময় হইতেই সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যাহাতে বর্ণাশুদ্ধি না হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং সংস্কৃত ভাষা ক্রমে প্রাকৃতের প্রভাব হইতে রক্ষা হইতে লাগিল। এমন কি, লেখারও ছাঁদ বদলাইল। বাঙ্গালায় অনেক কাল ধরিয়া খ, ক্ষ, ষ-এ আর গোলমাল করে না, এবং সিংহীর জায়গায় সিংঘী লেখে না। মূর্দ্ধন্য ণ, ন, এবং তিনটা শ, দুইটি ব'রও পণ্ডিতেরা তফাৎ করিতে পারেন ও করেন; এই সকলের মূল পুরুষোত্তমদেব। মহেশ্বর নামে আর একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতও বানানের বই লিখিয়া গিয়াছেন; তিনি লেখেন খৃষ্টীয় ১১১১ সালে। পুরুষোত্তমের পরে হইবারই সম্ভাবনা। পুরুষোত্তমের পরে গদসিংহ বলিয়া আর একজন বানানেরই বই লিখিয়া গিয়াছেন; তিনি কিন্তু পুরুষোত্তমেরই পদানুসরণ করিয়াছেন।

দ্বিরূপকোষ মানে—যে সকল শব্দের দুইরূপ বানান হইতে পারে, তাহাদের সংগ্রহ। যেমন—কোশল, কোসল; শস্ত, সস্ত; বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ ইত্যাদি। এইরূপ সংগ্রহে পুরুষোত্তমের কৃতিত্ব হারাবলী অভিধানে খুব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি অনেক খুঁজিয়া কোথায় কোথায় দুই রূপ চলিতে পারে, আর কোথায় পারে না, তাহা স্থির করিয়াছিলেন।

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৭]

কর্ম্মী-সংগঠন

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

শ্রীনিকেতন—শিক্ষাশিবির

এ কথা সকলেই জানেন যে, আমাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজের একটা প্রধান পার্থক্য এই যে, আমাদের দেশের বার আনারও অধিক লোক কৃষির উপর নির্ভর করে; আর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনীতে বার আনা লোকে নির্ভর করে কলকারখানার উপর। সেইজন্য ইউরোপের অর্থনৈতিক চিন্তা ও গবেষণার ধারা ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে কি-না সন্দেহ।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জার্ম্মেনীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিগত যুদ্ধের পর জার্ম্মেনী কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষরূপে মনোযোগী হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে তাহারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে দেশের মধ্যযুগের কৃষক-সমাজ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামে দুই চারি জন ভূস্বামী হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক। উন্নত বৈজ্ঞানিক কলকারখানার সাহায্যে তাঁহারা বিরাট চাষের ব্যবস্থা করিয়া প্রচুর লাভবান হইতেছেন বটে, কিন্তু অপর যাবতীয় পল্লীবাসী ইঁহাদের ক্ষেতের মজুর মাত্র। নিজেদের জায়গা-জমি নাই। মনিবের তৈয়ারী বস্তিতে ইহারা বাস করে।

মধ্যযুগের বলিষ্ঠ সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক-সমাজ বিলুপ্ত হইয়াছে অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশেও এই অবস্থা। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকারখানার যুগের ধনিক সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রবর্ত্তিত অর্থবিজ্ঞানের ছাঁদনদড়ি গলায় জড়াইয়া পাশ্চাত্য পল্লীসমাজ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

জার্ম্মেনীর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট গত যুদ্ধের পর এই সকল বৃহৎ জোৎদারদিগের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়া তাহা একশত বিঘার এক এক খণ্ডে ভাগ করিয়া প্রজাবিলি করিতেছে। প্রবল বাধাসত্ত্বেও তাহারা এইরূপ দশ হাজার মাত্র প্রজা পত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অতএব ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী অথবা ফরাসী দেশের অর্থবিজ্ঞানের নীতি অনুসরণ করিয়া আমরা যদি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে চেষ্টা করি তাহা আমাদের দেশের সমস্যা সমাধানের অনুকূল হইবে না। কারণ যাবতীয় সম্পদের মূল উৎস কৃষি। কৃষি-প্রধান ভারতে কৃষকই অর্থনৈতিক জগতের মেরুদণ্ড। ভারতীয় শিল্পের উপাদান এদেশের কৃষকগণই উৎপন্ন করে। অতএব এ-দেশীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য অবলম্বন কৃষি ও কৃষক। গৌণ অবলম্বন শিল্পী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এবং উভয়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত থাকিয়া পরস্পরের অনুকূলতা করিয়াছে। এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই প্রাচীন ভারতের পল্লীসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে পল্লীসমাজের যে আভাস পাই, তাহারই সুস্পষ্ট ছবি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম প্যালেষ্টাইনে।

ডেনমার্ক একশত বৎসরের চেষ্টায় তাহার সমবায়-প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া উন্নত কৃষক-সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহা অপেক্ষা শতগুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও ইহুদীগণ গত চৌদ্দ বৎসরে যে-কয়েকটি পল্লী-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে, তাহা ইহুদীজাতির অসাধারণ সংগঠন-প্রতিভার পরিচায়ক।

প্রাচীন ভারতের পল্লীসমাজের ঐতিহাসিক ধারার মধ্যেই আমাদের ভাবী সমাজ গঠনের মূলভিত্তি আমরা খুঁজিয়া পাইব। কিন্তু প্যালেষ্টাইন, ডেনমার্ক, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগস্লাভিয়া ইত্যাদি দেশে নবীন আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পল্লীসমাজ সংগঠনের যে-সকল পরীক্ষা চলিয়াছে তাহার সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক।

ভারতের এই নবযুগে পল্লীসমাজকে ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

নবীন ভাবের উন্মাদনায় আজ সমগ্র জাতির চিত্ত আলোড়িত। তাহার প্রয়োজনও রহিয়াছে। ভাবোন্মাদনা জাতির হৃদয়-ক্ষেত্রে অসাধারণ উর্ব্বরতা দান করিয়াছে। কিন্তু গঠনমূলক সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই জাতিসৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই জন্য চাই এমন একদল ত্যাগী সাধক বিনা-মাদকতায় সাধনায় অভিনিবিষ্ট হওয়ার শক্তি যাহাদের আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দেশের সেবা সত্যভাবে করতে হবে, এই উৎসাহ সৌভাগ্যক্রমে আজ বাঙালী যুবকের মনকে বিচলিত করেচে।...দেশের যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা, বেদনা, যেখান থেকে দেশ প্রাণ দেয় এবং প্রাণ দাবি করে, সেই পল্লী-নিকেতনে দেশের বাস্তব সত্তাকে প্রত্যক্ষ করবার ইচ্ছা জেগেচে।"

পল্লীর কৃষক বিচ্ছিন্ন, সেই জন্যই বর্ত্তমান সঙ্ঘবদ্ধতার যুগে তাহারা সকল ক্ষেত্রেই হটিয়া পড়িতেছে। কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গ্রামে গ্রামে গঠন করিতে হইবে। সুচিন্তিত পল্লী-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্ভবপর হইবে। কারণ যে প্রতিষ্ঠান তাহার অন্ন-ব্যবস্থা করিবে তাহার উপর সকলেরই সমান দরদ পড়িবে। দেশে সুশিক্ষিত ত্যাগশীল দেশহিতব্রতী একদল যুবককে এই সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।

এই কার্য্যের উপযুক্ত হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দরকার পল্লীসমস্যাগুলির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা। সেই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যে-সকল বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

এইরূপ কর্ম্মীই ভবিষ্যতে জাতিকে সুপথে পরিচালনা করিবে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই শ্রীনিকেতনে কর্ম্মী তৈয়ার করিবার জন্য শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। গত ১৯২৪ সন হইতে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত যোলটি শিক্ষাশিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল শিবিরে ১৭৬ জন কর্ম্মী পল্লী-সংগঠন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

শিখাইবার বিষয়

১। ব্রতীবালক সংগঠন—পল্লীগ্রামের ১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়সের বালকদিগকে লইয়া সমাজসেবার আদর্শে তাহাদের চিত্ত উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য দল গঠন করা।

২। সাধারণ পল্লীসমস্যা—সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সমস্যা কি? বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা।

৩। গৃহশিল্প—প্রত্যেক ছাত্রকে একটি-না-একটি গৃহশিল্প শিক্ষা করিতে হয়।

৪। কৃষি সম্বন্ধীয় প্রাথমিক শিক্ষা—গ্রামে যে-সকল ডোবা বুজান প্রয়োজন সেইগুলিতে এবং অন্যান্য পতিত জমিতে শাকসব্জী ও ফলের গাছ রোপণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৫। পল্লী স্বাস্থ্য—ম্যালেরিয়া ইত্যাদি নিবার্য্য ব্যাধির প্রতিকার।

৬। প্রাথমিক চিকিৎসা।

৭। পল্লীশিক্ষা।

৮। ভারতের ইতিহাস—ভারতের অতীত যুগে যে-সকল মহাপুরুষ উন্নত আদর্শের সাধনা দ্বারা সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম্মের সহিত পরিচয় লাভ।

৯। জাতীয় সাহিত্য—বাংলার প্রধান প্রধান সাহিত্যিকদিগের চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গীর সহিত পরিচয়।

১০। ভারতের কোথায় কোন্ শিল্প-উপাদান উৎপন্ন হয় তৎসম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান।

১১। সমবায়নীতি ও সমবায়সংগঠন।

১২ গো-পালন ও মুরগীর চাষ।

১৩ বয়নশিল্প—গামছা, শতরঞ্চী ইত্যাদি সহজবয়ন।

১৪ পল্লীপরীক্ষণ (economic survey of villages)

১৫ হিসাবরক্ষা

উল্লিখিত সকল বিষয়গুলিই প্রত্যেক শিবিরে শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীদিগের ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্র অনুযায়ী শিক্ষিতব্য বিষয়ের তারতম্য করা হয়।

ইতিহাস

১৯২৪ সালে মিঃ এলম্‌হার্ষ্ট যখন শ্রীনিকেতনে ছিলেন, তখন তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে পল্লীগ্রামের ব্রতীবালক-নায়ক তৈয়ারী করার জন্য প্রথম শিবির স্থাপিত হয়। এই বীরভূমের তৎকালীন ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ইন্সপেক্টার মৌলবী আবুল হোসেন খানসাহেব এই শিবিরের শিক্ষা-প্রণালী দেখিয়া বীরভূমের মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য এইরূপ শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীনিকেতনে কৃষি-বিভাগ, বয়ন ও কারুশিল্প বিভাগ, গোপালন-বিভাগ ইত্যাদিতে এ সকল

বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সমবায় স্বাস্থ্য সমিতির কার্য্যপরিচালনার জন্ত উপযুক্ত ডাক্তারও রহিয়াছেন। এই সকল কারণে, বিশেষ অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়াও প্রয়োজন-উপযোগী শিক্ষাদানের সুবিধা রহিয়াছে। ইহা অনুভব করিয়া মৌলবী আবুল হোসেন খান চৌধুরী মহোদয় ও বীরভূম জেলাবোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান রায়-বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে আমরা বীরভূম জেলার শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করি। এই সকল শিবিরে ব্রতীবালক সংগঠন, কুটীরশিল্প, প্রাথমিক কৃষি ও পল্লী-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই জেলার প্রায় সকল হাইস্কুল ও যাবতীয় মধ্য-ইংরেজী স্কুল হইতে শিক্ষকগণ প্রেরিত হন।

অতঃপর বাংলার বিভিন্ন জেলা ও ভারতের অপরাপর প্রদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে পল্লীসেবক তৈয়ার করিবার জন্ত কর্ম্মী প্রেরিত হয়। যে-সকল প্রতিষ্ঠান হইতে কর্ম্মী প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদের নাম ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা—

১।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪ জন
২।	কলিকাতা হিতসাধনমণ্ডলী	২ "
৩।	রাঁচি ব্রহ্মবিদ্যালয়	১ "
৪।	সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন	১ "
৫।	প্রেম মহাবিদ্যালয়, বৃন্দাবন	২ "
৬।	নওগাঁ সমবায় সমিতি	৪ "
৭।	জিয়াগঞ্জ সমবায় কেন্দ্রীয় কোষ	১ "
৮।	অনুক (উড়িষ্যা) সমবায় কেন্দ্রীয় কোষ	১ "
৯।	নলহাটি খাদী আশ্রম	১ "
১০।	বালি শিশুবিদ্যালয় (হুগলী)	১ "
১১।	বরোদা রাজ্য	৩ "
১২।	কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ইউনিয়ান, হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য)	১ "
১৩।	ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট	৮ "
১৪।	বঙ্গীয়শিক্ষা বিভাগ	৯ "
১৫।	বিশ্বভারতী কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১২ "
১৬।	বাংলার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ	৩২ "
১৭।	অন্যান্য কর্ম্মী	৯২ "
১৮।	ত্রিপুরা করদরাজ্য	১ "

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ডেনমার্কের মত ক্ষুদ্র দেশে বয়স্ক কৃষক যুবকদের শিক্ষার জন্ত ষাটটি শিক্ষাকেন্দ্র (folk high schools) রহিয়াছে। যে-সময় বরফের জন্ত চাষবাস বন্ধ থাকে, তখন এই সকল কেন্দ্রে বয়স্ক কৃষকগণ বৎসরে পাঁচ মাসের জন্ত জ্ঞানলাভ করিতে আসে। এই সকল বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের নিকট হইতে কৃষিপ্রধান ডেনমার্কের অর্থনীতি ও সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ডেনমার্কের এই সকল লোক-শিক্ষায়তনে যে-সকল দেশহিতৈষী নিষ্ঠাবান কর্ম্মী তৈয়ার হইয়াছে তাহারাই আজ ড্যানিস্ পার্লামেণ্টের এবং ডেনমার্কের যাবতীয় সমবায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

ডেনমার্কের পন্থা অনুসরণ করিয়া যুগশ্লাভিয়ার নবগঠিত জাতিও বয়স্ক কৃষকদের জন্ত প্রতি জেলায় গ্রীষ্ম-শিক্ষা-নিবাস (summer schools) স্থাপন করিয়াছে। গত কয়েক বৎসরে শ্রীনিকেতন শিক্ষা-শিবিরের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যুগশ্লাভিয়া ও ডেনমার্কের ন্যায় আমাদের দেশেও কৃষকদের জন্ত শিক্ষায়তন গড়িয়া তোলা উচিত।

আমাদের দেশের সমস্যা উক্ত দেশগুলি হইতে যদিও স্বতন্ত্র, কিন্তু এই কৃষিপ্রধান দেশে বয়স্ক কৃষক যুবকদের জন্ত উক্ত প্রকারের শিক্ষায়তনের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। শ্রীনিকেতনে অল্প ব্যয়ে এইরূপ শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিবার যে সুযোগ রহিয়াছে বাংলার অন্যত্র তাহা নাই। কারণ রবীন্দ্রনাথ বহুদিবসের চেষ্টায় পল্লীসমস্যা সমাধানের জন্ত এখানে একটি কেন্দ্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তথায় কৃষি, গো-পালন, পক্ষীপালন, স্বাস্থ্যোন্নতি, পল্লীশিল্প, পল্লীর অর্থনীতি (rural economics), পল্লীশিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন। ইঁহাদের সহযোগিতায় অল্প ব্যয়ে ডেনমার্কের ন্যায় কৃষকদের শিক্ষার জন্ত শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা করিতে পারি। তাহাতে কৃষকগণ বৎসরে চারি মাসের জন্ত শিক্ষা লাভ করিবে। যাহারা অন্ততঃ উচ্চ প্রাইমারী পর্য্যন্ত বাংলা পড়িয়াছে এবং যাহাদের অন্যূন ৫০ বিঘার উর্দ্ধ জমি আছে অর্থাৎ বৎসরের আহারের সংস্থান আছে এইরূপ কৃষক যুবকদিগকে শিক্ষার জন্ত আহ্বান করিতে হইবে। প্রথমে কয়েক বৎসরের জন্ত ছাত্রদের আহারাদির

ব্যয় সাধারণকে বহন করিতে হইবে। ইহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষার জন্ত কোনও বেতন লওয়া হইবে না। আহার্য্য ব্যয় মাসিক ১৫৲ টাকার অধিক পড়িবে না।

জমিদারগণ তাঁহাদের প্রজাদিগের মধ্য হইতে মাসিক বৃত্তি দ্বারা কতিপয় ছাত্র পাঠাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত বাংলা দেশে কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ আছে তাঁহারাও তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে যে-সকল পল্লীসমিতি আছে তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি ছাত্রকে বৃত্তি দ্বারা চারি মাসের জন্ত পাঠাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ন্তাশন্তাল কৌন্সিল অব্ এডুকেশন, দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি ও শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগ ইত্যাদির ন্তায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের সমবেত চেষ্টা ও পরস্পর সহযোগিতায় এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশে গঠন করা কঠিন ব্যাপার নহে। এইজন্ত এ বিষয়ে আমাদের দেশে গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতিতে যাঁহারা বিশ্বাসী এইরূপ দেশভক্ত নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমারে বেসেছি ভাল

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আমারে বেসেছি ভালো, এ বটে কৌতুক-কথা,—
অভিনব কাব্য অভিনয় ;
সৌন্দর্য্যবিলাসী এই জীবনের প্রেক্ষা-পটে
বিবিধ বর্ণের সমারোহ
কালের তরঙ্গাঘাতে কোথায় মিলায়ে যায়,—
এতটুকু চিহ্ন নাহি রয় !
তবু তার লীলা-সাথী এ প্রাণের 'পরে মোর
আছে এক মন্ত্রমুগ্ধ মোহ।
কামনা কল্পনা আর সমগ্র চেতনা ল'য়ে
রচেছিনু প্রাণের পৃথিবী,
উজ্জ্বল গৌরব দীপ্ত আপন ভাগ্যের লিপি
লিখেছিনু পুলক অক্ষরে ;
শ্রাবণ-শর্ব্বরীসম আশাহত রিক্ত আজ,
উৎসাহের দীপ আসে নিভি,—
মুছে যায় মায়ালিপি ; এ-সবার কেন্দ্র আমি,
এ মমতা তাই মোর তরে।

সকল ব্যর্থতা মোর যদিও পেয়েছে রূপ
ক্ষোভ আর গ্লানির গরলে,
অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি মর্ম্মে মর্ম্মে মিশে আছে
আজীবন রাত্রি দিনমান ;
তবুও পেয়েছি মোর সার্থকতা সত্তাটুকু
ম্লান মৌন অন্তরের তলে,
আমার স্থিতির রাজ্যে সম্রাট করেছি তারে
গাহিয়াছি তারি জয়গান।
অনন্ত দৈন্যের দায়ে হিয়ার ক্রন্দন জাগে
নাহি তার সান্ত্বনার ভাষা,
মেদুর মৃত্যুর পাশে ব'সে আমি তবু রাখি
মোর তরে প্রেম ভালবাসা।

আমারে বেসেছি ভাল এ এক বিচিত্র কথা,—
এ মোর সার্থক অহঙ্কার,
পূর্ণতার প্রাণ-তন্ত্রী রিণি রিণি বেজে ওঠে
নবতর প্রকাশের সুরে ;
খণ্ডিত ভাবনাগুলি আজ তাই,
পুঞ্জীভূত লালসার মোহ-অন্ধকার
নব জীবনের প্রান্তে অখণ্ড আলোক হয়ে
দীপ্ত লীলা-রাগ-রশ্মি স্ফুরে।
আজ বুঝিয়াছি মোরে, প্রাণ ভরি লইয়াছি
এই মর্ম্ম-মুকুল-আঘ্রাণ,
গীতরিক্ত বাউলের সার্থক হয়েছে তাই
অবরুদ্ধ অশ্রুর সঞ্চয় ;—
দুর্লভ প্রেমের রসে তৃপ্ত হ'ল তিক্ত তনু
ক্লেদক্লিষ্ট পিপাসিত প্রাণ,
অকুণ্ঠিত আনন্দের উৎস-লোকে সঞ্চরিছে
আত্মা মোর একাকী নির্ভয়।

ভালবাসিয়াছি মোরে, পাইয়াছি এ মনের
চিরন্তন রহস্য-সন্ধান,
দেহের দাবির 'পরে আত্মার অস্তিত্ব ল'য়ে
নাহি আর কলহ সংশয় ;
জীবন যৌবন সত্য, সত্য প্রেম ভালবাসা,—
মিথ্যা কি যে এর সমাধান
আজিও হ'ল না বন্ধু, তবু মোরে ভালবাসি,
জেনে রাখি আত্ম-পরিচয়।
নর নারী এই পথে আনাগোনা নিত্য করে
পৃথিবীর পূর্ণতার সুখে
আমিও রয়েছি বেঁচে ভালবাসিবারে
তাই আপনারে অপূর্ব্ব কৌতুকে।

নদীমাতৃক বঙ্গদেশ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গদেশের মানচিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, এই দেশ নদীমাতৃক। উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক হইতে বহু পর্ব্বতপ্রসূত নদী এই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহাদের শাখাপ্রশাখা-সহ দেশময় ছড়াইয়া আছে। উত্তর দিকে উচ্চশৃঙ্গ হিমালয়শ্রেণী এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পর্ব্বতরাজি, দক্ষিণ দিকে অতলস্পর্শী সমুদ্র—এই চতুঃসীমার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ বর্গ-মাইল আয়তনের সমতলক্ষেত্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বলিয়া খ্যাত। কৃষিজাত সম্পদেই এই দেশের এত সমৃদ্ধি এবং নদীর ভাসাজলের দ্বারা কৃষি-ক্ষেত্রে সেচনকার্য্য আপনা হইতে নিষ্পন্ন হওয়া বাংলা দেশের বিশেষত্ব। আন্দাজ এক শতাব্দী পূর্ব্বেও এই প্রদেশের সমস্ত নগর ও পল্লীর অদূরেই কোনও একটি স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইত। অধুনা সে অবস্থার কিঞ্চিৎ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত এই যে, নদীজলের কর্দ্দম বা পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া বাংলা দেশের উৎপত্তি হইয়াছে। পর্ব্বতের শিলাখণ্ড পরস্পর ঘর্ষণে এবং তুষাররাশির পেষণে ও জলপ্রপাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ বালুকা আকারে পরিণত হয় এবং পরে পর্ব্বতগাত্রের ও ভূপৃষ্ঠের ক্লেদের সহিত মিশ্রিত হইয়া নদীস্রোতে সমুদ্রে আসিয়া নিপতিত হয়। কোনও কারণে এই নদীমুখ বা মোহানা অবরুদ্ধ হইলেই তথায় নদী দ্বিধারা হয় এবং এই দুই শাখার ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান ব আকার ধারণ করিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে ব-দ্বীপের সৃষ্টি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। নদীর গতির পরিবর্ত্তন এবং একাধিক ছোট ব-দ্বীপের সংযোগ ঘটিয়া ক্রমশঃ একটি বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপের উৎপত্তি হয়। বঙ্গদেশ কোনও অজ্ঞাত প্রাচীনকালে, ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উক্ত প্রকার ক্রিয়ার ফলে সমুদ্রগর্ভ হইতে ক্রমশঃ উত্থিত ও গঠিত হইয়াছে এবং অদ্যাবধি পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। রাজ-মহলের নিম্নদেশ হইতে গঙ্গানদীর একটি ধারা ভাগীরথী (অজয়, দামোদর প্রভৃতি উপনদী সহ) সাগর-সঙ্গমে প্রধাবিত হইতেছে এবং বৃহত্তর ধারা পদ্মা (মহানন্দা, করতোয়া প্রভৃতি উপনদীর দ্বারা পুষ্ট হইয়া) সুমহান্ ব্রহ্মপুত্রের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া আরও পরে মেঘনা নামে সমুদ্রে যাইয়া শেষ হইয়াছে। এই দুইটি ধারার (ও উপনদীগুলির) দ্বারা বেষ্টিত ত্রিকোণাকৃতি ভূভাগ 'গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ', তথা গ্রীসীয় ঐতিহাসিকের কথিত 'গঙ্গারদেশ,' বলিয়া খ্যাত। এই দেশের মধ্য দিয়া অসংখ্য শাখা-নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে। নদী-জলের পলি পড়িয়া দেশের যে-অংশ সমান হইয়া চাষবাসের উপযোগী হইয়াছে তাহাই চীনদেশীয় পরিব্রাজকের কথিত বৌদ্ধযুগের 'সমতট'। যে-অংশে নদী ও সমুদ্রের মিলনে নূতন ভূমি গড়িয়া উঠিতেছে সেই অংশে প্রকৃতি-রাজ্যের কারখানা; এখানে মনুষ্যসমাগম নিষেধ, এজন্যই ইহা জঙ্গলাকীর্ণ 'সুন্দরবন'।

বাংলা দেশের উৎপত্তির ইতিহাস যখন এইরূপ, তখন ইহার স্বভাব ও শুভাশুভ নিশ্চয়ই নদীর ভাল মন্দ অবস্থার উপর নির্ভর করে। বস্তুতঃ যে-দেশে নদী নাই সে-দেশ মরুভূমি এবং যে-দেশের নদী সরিয়া বা মরিয়া গিয়াছে সে-দেশ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ জলীপুর, গৌড়, সপ্তগ্রাম ও ঈশ্বরীপুর-যশোরের কথা উল্লেখযোগ্য; এই স্থানগুলি পূর্ব্বে বাংলার রাজধানী বা বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, কিন্তু কালক্রমে নদীর গতি পরিবর্ত্তন-প্রযুক্ত ঐ সমস্ত নগরগুলি এক্ষণে জনমানবহীন হইয়া পড়িয়াছে। অপর পক্ষে দেখা যায় যে নদীপথের সাহায্য পাইয়া অনেক স্থানে নূতন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। কবি রঙ্গলাল যথার্থই গাহিয়াছেন—

প্রবাহিণি, তব তীরে নগরী যে সব,
তোমার প্রসাদে তারা খ্যাতি লভে কত;
তুমিই মিলাও আনি পণ্য শত শত,
বাণিজ্য নহিলে কিসে তাদের গৌরব?

নদীর সান্নিধ্যে যে কেবল লোকের যাতায়াত এবং পণ্যের আগম-নিগমের সুবিধা হয় তাহা নহে। পর্ব্বত-প্রসূত নদীর দ্বারা সকল দেশেরই, বিশেষতঃ নদীগঠিত বাংলা দেশের, বিশেষরূপে কল্যাণ সাধিত হয়। বাংলা দেশের বিশাল সমতল বক্ষের উপর দিয়া অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সহ বহুতর পার্ব্বত্য নদী বহিয়া যাইতেছে। পাহাড়ের 'ঢল' নামিলে নদীর জল দুই কূল ভাসাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী নিম্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং নদীগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকায় উচ্ছ্বসিত জল সমগ্র দেশময় বিস্তারিত হইয়া ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় বিষ ও আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া মূল্যবান্ 'পলিমাটি' ফেলিয়া ক্রমশঃ নদী দিয়া বহিয়া যায়। গৈরিক নদী-জল দেশের আবর্জ্জনা বিধৌত করিয়া ঠিক যেন ইহাকে 'আরোগ্য-স্নান' করাইয়া চন্দনের প্রলেপ দিয়া যায়। বর্ষারম্ভের রক্তাভ জল পৃথিবীর ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি করিয়া পৃথিবীকে রত্নপ্রসূ করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের চক্ষে, অন্যান্য জীবের ন্যায় পৃথিবীরও প্রাণ আছে; ভূপৃষ্ঠেরও ক্ষয় বৃদ্ধি হয়। সুতরাং নীরোগ থাকিবার জন্য মনুষ্যাদি সকল জীবের যেরূপ স্নান অত্যাবশ্যক, সেইরূপ ভূপৃষ্ঠেরও নদী-জলে আপ্লুত হওয়া প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবী আবর্জ্জনামুক্ত ও সজীব থাকিলেই ভূতলবাসী জন-মানব নীরোগ থাকিতে পারে।

আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ শৌচার্থে যেরূপ বিশুদ্ধ জলের আবশ্যক, সমগ্র দেশ শোধনার্থেও তদনুরূপ জলের ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই প্রকৃতির নিয়মে বাংলা দেশে অপরিমিত জলের সমাবেশ হয়। গিরি-বিগলিত অম্বুরাশি যখন নদীবক্ষে বহিতে আরম্ভ করে সেই সময়েই বর্ষার বারি-ধারার সমাগম হয়। ফলতঃ নদীজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উপকূল প্লাবিত করিয়া দেশের উপর দিয়া বৃহৎ বন্যার আকারে বহিয়া যায়। যদি মনুষ্যকৃত অবরোধে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে এই বন্যা কখনও ভীষণ ভাব ধারণ করিতে পায় না। বর্ষা প্রশমিত হইলেই বন্যার অবশিষ্ট জল নদী-গহ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অচিরে মধ্যেই সুজলা বঙ্গভূমি দিগন্ত পর্য্যন্ত শস্যশ্যামলা হইয়া উঠে। নদী হইতে উৎসারিত এই বন্যার জলের স্বাভাবিক গতি ও ক্রিয়া কৃত্রিম কৌশলের দ্বারা রুদ্ধ না হইলে দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। এই জলের কর্দ্দম 'পলি' স্বরূপে পড়িয়া ভূমিকে উর্ব্বরা করে এবং ভূমির নিম্নতা ও ক্ষয় পূরণ করে। বন্যার জলে প্রচুর পরিমাণ মৎস্য-ডিম্ব ভাসিয়া আসে এবং ঐ জল বিল ও পুষ্করিণীতে প্রবেশ করায় তথাকার পুরাতন দূষিত জল নিকাশ হইয়া যায়, যথেষ্ট মৎস্য উৎপন্ন হয়, ও ঐ মৎস্যশাবক যাবতীয় মশকাদি কীটকে গ্রাস করে। বন্যার জলের দ্বারা মৃত্তিকার নিম্নস্তর পর্য্যন্ত অধিকতর রসসঞ্চার হওয়ায় গ্রীষ্ম-কালে জলাভাব হয় না এবং খাল ও উপনদী জলপূর্ণ হওয়ায় নৌচালনার বিশেষ সুবিধা হয়। বন্যার জলের আর একটি উপকারিতা এই যে, ইহা জলস্থলের শৈবাল লতাগুল্মাদি সমূলে বিনাশ করে। বাংলা দেশে উচ্চ ভূমিতে বাস ও নিম্ন ভূমিতে চাষ, ইহাই চিরন্তন ব্যবস্থা। যতদিন এই ব্যবস্থার অনুসরণ হইয়াছিল এবং আমরা প্রকৃতিকে আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা না করিয়া প্রকৃতির বশীভূত ছিলাম, ততদিন এই দেশ সর্ব্বরকমে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। নদীসমাকীর্ণ বঙ্গের পল্লী স্বর্ণপ্রসূ বলিয়াই এই দেশের নাম 'সোনার বাংলা।' ইহার উপকণ্ঠে প্রবাহিতা 'সুবর্ণরেখা' নদী ইহার সনাতন গৌরব স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মোগল-সম্রাট আওরংজীব এই দেশকে 'ভারতবর্ষ' বা 'স্বর্গদেশ' আখ্যা দিয়াছিলেন, এবং দর্শনমাত্রই 'সাত সমুদ্র তের নদী' পারের বণিকগণের চক্ষে ইহা এত লোভনীয় হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুভ পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতার তাড়নায় এবং বিদেশী নাগরিকগণের গাত্রস্পর্শে আমরা বুঝিলাম বাংলা দেশের পল্লীজীবন নিতান্ত অসভ্যতার পরিচায়ক। সুতরাং অনতিবিলম্বে আমরা পাকা বাড়ি ও পাথুরিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে লাগিলাম এবং যে খাল ও নালার সাহায্যে নদীর ঘোলা জল দেশময় ছড়াইয়া পড়িত সেই পয়ঃপ্রণালীসমূহ অগ্রেই যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া দিলাম। শীঘ্রই রেলগাড়ীর যুগ আসিয়া পড়িল; সেজন্য কৃষিক্ষেত্র, বিল ও জলাভূমির

উপর দিয়া বড় বড় বাঁধপথ প্রস্তুত করিতে হইল এবং নদী ও খালের বুক চাপিয়া যথাসম্ভব ছোট ছোট সেতু নির্ম্মিত হইল। শহর, পাকা রাস্তা ও রেলপথকে বন্যার জলের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রবল 'পাহাড়িয়া' নদীগুলির পার্শ্বে অচ্ছিদ্র সুবৃহৎ বাঁধ দেওয়া হইল। অধিকন্ত, প্রলম্বিত রেল ও রাজপথ বিস্তারের পক্ষে যাহাতে শাখা-নদীগুলি অন্তরায় না হইতে পারে সেজন্য ইহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া ক্রমশঃ মূল-নদীর সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইল। কথিত আছে, পুরাকালে পর্ব্বত আকাশে উড়িয়া লোকের ভীতি সঞ্চার করিত, এজন্য দেবরাজ ইন্দ্র পক্ষচ্ছেদ করিয়া পর্ব্বতকে ভূতলশায়ী করিয়া দিয়াছেন। ইহা পৌরাণিক গল্প; কিন্তু রেল ও রাজপথের সুবিধার জন্য নদীনালার শিরশ্ছেদ বিগত শতাব্দীর মধ্যে সংঘটিত ঐতিহাসিক সত্য!

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বাণিজ্যের স্বার্থে সুজলা বঙ্গদেশকে কিরূপ মরুভূমিপ্রায় করা হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দামোদর নদের সন্নিকটস্থ বর্দ্ধমান শহর হইতে মেঘনা নদের তীরবর্ত্তী চাঁদপুর বন্দর পর্য্যন্ত (৯০ ক্রোশ মাত্র) কেহ বায়ুযানে গমন করিলে দেখিতে পাইবেন যে, মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে কেবল ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা-চূর্ণী, ইছামতী ও মধুমতী এই চারিটি নদী এখনও স্রোতস্বতী; কিন্তু বাঁকা, গাঙুর, বহুলা, ধুসী, কোদালিয়া, বেতনা, কপোতাক্ষ, ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা, বরষীয়া, চন্দনা বা কুমার এই অন্যূন দ্বাদশটি বৃহদায়তন শাখা-নদী শুষ্কপ্রায়; এবং সেই কারণে বর্দ্ধমান, নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর জেলার অনেকাংশ তেজহীন ও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, এই দ্বাদশ নদীই মনুষ্যকৃত উৎপাতে এক্ষণে প্রবাহহীন। যখন নদীর দশা এইরূপ তখন খাল-বিলের কথা না বলাই ভাল। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, উত্তর দিকে হিমালয় পূর্ব্বমতই অসীম জলভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন এবং দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর তাহা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন; কিন্তু যে-জল শতধারায় বিভক্ত ও বিস্তারিত হইয়া বঙ্গদেশকে সজীব রাখিত, তাহা এক্ষণে শৃঙ্খলবদ্ধ কয়েকটি প্রণালীর দ্বারা অতি সঙ্কোচে প্রবাহিত হইতে বাধ্য হইতেছে। উপযুক্ত জলের অভাবে স্বাস্থ্য, কৃষি, ও দেশীয় বাণিজ্যের অবনতি অথবা অতিরিক্ত বন্যার প্রকোপে ধনপ্রাণ বিনাশ, এ সকল দুরদৃষ্টের মূল কারণ একই। বিপুল আয়াস ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া চিরমঙ্গলময়ী প্রকৃতির সহিত অদূরদর্শী স্বার্থপর মানব বিরোধ করিতে যত্নবান!

এইরূপ অন্যায় অস্বাভাবিক যুদ্ধের কুফল অবশ্যম্ভাবী। বাণিজ্যপোত দেশের মধ্য দিয়া চালিত করা প্রায় অসম্ভব হইতে চলিল, কারণ বহু অর্থব্যয়ে 'মাটিকাটা-যন্ত্র' প্রয়োগ করা সত্ত্বেও নদীগুলি ভরাট হইয়া আসিতেছে; নৌচালনা আর সহজে হয় না, কারণ অধিকাংশ নদী ও খাল মৃতপ্রায় হইয়াছে; দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বর্ষার জল নিকাশ করিবার উপায় নাই, কারণ পয়ঃপ্রণালীগুলি রুদ্ধ হইয়াছে; কৃষিকার্য্যের আর সুবিধা নাই, কারণ জলদায়িনী নদী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; ভূমির উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস পাইয়াছে, কারণ তাহাতে আর পলি-সার পড়ে না; খাল বিল ও তড়াগ পুষ্করিণী মজিয়া ও পচিয়া উঠিতেছে, কারণ জলাশয়ে আর উপযুক্ত জল প্রবেশ করিতে পায় না; অবশেষে, কোন কোন স্থানে স্নান ও পানীয় জলের অভাবও পরিলক্ষিত হইতেছে।

এই সকল অসুবিধা ও কষ্ট দেখিয়া ও বুঝিয়া আমাদের চমক ভাঙিবে কি? বাংলা দেশ চিরকাল নদীগতপ্রাণ ছিল ও থাকিবে। জীবদেহে ধমনীর দ্বারা শোণিত সঞ্চালনের মত বাংলা দেশের নদীর দ্বারা জল প্রবাহিত হয়। দেশকে বাঁচাইতে হইলে নদীর প্রবাহ পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতে হইবে। অতএব নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে মোহানা পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত যেখানে যেরূপ বন্ধনী আছে সে সমুদয় উন্মুক্ত করিতে হইবে। কেহ যেন না মনে করেন নদী আমাদের আজ্ঞাবহ হইয়া চিরকাল আমাদের ইচ্ছামত বাঁধাধরা পথে প্রবাহিত হইবে। বাংলা দেশে তাহা চলিবে না। এদেশে সকলকে নদীর বশীভূত থাকিয়া নদীর গন্তব্য পথের অনুসরণ ও তাহার বাধাবিঘ্ন অপসারণ করিতে হইবে। নদীর জলোচ্ছ্বাস স্বাভাবিক ক্রিয়া, ইহাতে নদী ও দেশ উভয়ই রক্ষিত হয়; এই ক্রিয়ায় বাধা দেওয়াই

'ধ্বংসকারী বন্যা' আদি অনর্থের মূল কারণ। নদীর শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ খাল নালা প্রভৃতি কদাচ বন্ধ বা আবদ্ধ করিতে নাই। নদীর চক্ষু আছে—বোধ হয় সেই জন্যই অনেক নদীকে আমরা একণে 'কাণা' করিতে পারিয়াছি! ভূপৃষ্ঠের ক্রমনিম্নতা বুঝিয়া ও গড়িয়া নদী গন্তব্য পথে যাইতে জানে; প্রকৃতির নিয়ন্ত্রিত কার্য্যসাধনে নদী সদাই আবেগময়ী। আমরা এ কথা ভুলিয়া গিয়া নিজেদেরই অমঙ্গল ঘটাইতেছি।

হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে সেচনকার্য্যাদির জন্য নদীজল যাহাতে সুলভে ও সমভাবে বিস্তারিত হয় তজ্জন্য রাজকর্ম্মচারী ও ভূস্বামী নিয়ত যত্নবান থাকিতেন এবং 'পুলবন্দী' বা 'পোস্তাবন্দী' নামক প্রথাবলম্বনে নদীর সংস্কার-কার্য্য নিয়মিতভাবে সমাধা হইত। এখনকার কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া কপাট ও বাঁধের কলকৌশল স্থাপনে জল-সংকোচের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ পর্ব্বতনিঃসৃত অপরিমিত 'মিঠাপানি' সৎকার্য্যে ব্যবহৃত না হইয়া অযথারূপে বহিয়া 'লোনা গাঙে' পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। এদিকে আমরা, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কেবল জল খাওয়াইয়া রাখার মত কৃষিকার্য্যাদির জন্য দেশকে আকাশের বৃষ্টির উপর নির্ভর করাইয়া রাখিয়াছি। পল্লী-গ্রামের কৃষক এ কথা বুঝে, কিন্তু কথা শুনিবে কে? নদীনালার গৌরব হ্রাস হওয়ায় নৌজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অন্নসমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৈমনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় পূর্ব্বে জনসংখ্যার প্রায় এক-অষ্টমাংশ কেবল নদীসংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত; সুতরাং মৎস্যলোভী বাঙালীর খাদ্যসুখ যথেষ্ট ছিল। একণে নদীবক্ষে জেলে-ডিঙির পরিবর্ত্তে কচুরী-পানা পরিলক্ষিত হয়।

কেহ কেহ মনে করেন বাংলা দেশের অনেক নদী মরিয়া গিয়াছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুতপক্ষে অবহেলাপ্রযুক্ত বা কৌশলক্রমে আমরাই অনেক নদীকে মারিয়া ফেলিতেছি। নদীর উৎপত্তি-স্থানে বা গর্ভে বা মোহানায়, বা একাধিক স্থানে বাঁধাল ও অন্যান্যরূপ অবরোধ দেওয়ার ফলে নদীতে জলপ্রবাহ বন্ধ বা হ্রাস হইয়া নদী ক্রমশঃ ভরাট হইয়া আসিতেছে। ছোট সেতু ও অপরিসর সাঁকোর প্রভাবে নদীনালায় যে কি সর্ব্বনাশ করা হয় তাহা কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ অনেক সময় উপলব্ধি করেন না। নদীর গর্ভে পোস্তা বাঁধিলে বা নদীর পার্শ্বে লম্বা বাঁধ দিলে নদীর ক্ষতি হয় ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করেন কয়জন? যে-সকল বিল ও জলাভূমিতে উদ্বৃত্ত নদীজল কিছু সময়ের জন্য সঞ্চিত থাকিয়া চতুষ্পার্শ্বের ভূমিকে সরস রাখে, আমরা সেই সকল জল-ভাণ্ডারে জলাগম বন্ধ করিয়া অকালে সেগুলিকে চাষের জমিতে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছি। সমুদ্র হইতে জোয়ারের জল যথেষ্ট পরিমাণে নদীমুখ দিয়া প্রবেশ করিতে পাইলে ভাঁটার সময় জলের বেগে নদী আপনি পরিষ্কৃত হয়; কিন্তু খাসমহলের 'আবাদ' জমিতে লোনা জল প্রবেশ করিবার আশঙ্কায় নদীর কণ্ঠপ্রদেশে ক্রমাগত বাঁধ দিয়া দক্ষিণ-বঙ্গের অবস্থা এরূপ শোচনীয় করিয়াছি যে, নদীগর্ভ ও সমুদ্রতট ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া যাওয়ায় খুলনা ও ২৪-পরগণা প্রদেশের বৃষ্টির জল সম্যক্ নিকাশ হইতে পারে না। একদিকে জলভার কমাইবার উদ্দেশ্যে স্বভাবজ নদীনালা উৎখাত করা হইতেছে, অপরদিকে জলসম্ভার বাড়াইবার নিমিত্ত নদীর স্থানে বহু ব্যয়ে কাটা খাল প্রস্তুত হইতেছে। মায়ামুগ্ধ হইয়া আমরা মরীচিকার অনুসরণ করিতেছি। আমাদের দেশে নদী মরিয়া গিয়াছে বা স্বাভাবিক নিয়মে মজিয়া যাইতেছে—ইহা শিখান কথা, সত্য নহে। নদীগহ্বর স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ণ হইয়া গেলে নদীর গতি পরিবর্ত্তন হয়, এবং গহ্বর বিদ্যমান থাকিতে নদীর কার্য্য শেষ হয় না বা নদী মরে না। আমরা বাংলা দেশের প্রাকৃতিক তত্ত্ব একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, যতদিন উত্তর দিকে হিমগিরি এবং দক্ষিণ দিকে মহাসাগর বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন এ দেশের নদী মরিবে না ও মরিতে পারে না।

আলোচ্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যাভিমানী না হইয়া বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও সহজ বুদ্ধির উপর আস্থা রাখাই শ্রেয়। বঙ্গীয় রাজস্ব-বিভাগের বর্ত্তমান সদস্য (Hon'ble Mr. F. A Sachse, C.I.E., I.C.S.) যথার্থই বলিয়াছেন

যে প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বাস্থ্য ও সম্পদ দেশের নদী-বিস্তারের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে এবং এই জন্যই এ দেশের অধিকাংশ নদী দেবতাস্বরূপে পূজিত হয়। বাংলা দেশের পক্ষে এ কথা বিশেষরূপে সত্য। অতএব বাংলা দেশকে রক্ষা করিতে হইলে ইহার নদীগুলিকে উদ্ধার করিতে হইবে। ভগীরথের প্রদর্শিত পথাবলম্বনে বঙ্গবাসী কি পুনরায় শঙ্খনিনাদ সহকারে নদীগুলিকে পূর্ব্বপ্রবাহিত করিয়া দেশের শৃঙ্খল-মোচন করিবেন না?

প্রেম নাই

শ্রীবিমল মিত্র

দোকানে বসিয়া রামায়ণ পড়িতে পড়িতে তারিণী এক-একবার বাহিরের পানে তাকাইয়া দেখিতেছে।

দূর হোক্ ছাই—শেষ-বয়সে ছেলেটার জন্ত ধর্ম্মে মন দিবারও উপায় নাই। তারিণী সোজা হইয়া বসিল।

নিরু-বৌ ত কতদিন আগে চলিয়া গিয়াছে—আজকাল তাহাকে আর তারিণীর মনেও পড়ে না! কিন্তু একটি ছেলে, তা-ও কি মানুষের মত মানুষ!

উত্তর পাড়ার পথ দোকানের পিছন দিক হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সম্মুখ দিয়া পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গিয়াছে।

পথের উপর কাহার পদ-শব্দ হইল; চশমার ভিতর দিয়া বেশ ভাল করিয়া নজর করিয়া তারিণী চাহিয়া দেখিল।

—কে যায় গো, মুকুন্দ নাকি?

মুকুন্দ সে নয়, যাইতেছিল সদানন্দ।

হাসিয়া সদানন্দ বলিল—নজর তোমার একদম গেছে যে তারিণী দা—কোলকাত্তায় যাও না কেন?

তারিণী হাসিল—যাবার সময়ই বটে রে দাদা!

সদানন্দ বলিল—বুঝলে তারিণীদা আমার মামার বাড়িতে—ওই যে তোমার ছোট রেলে চড়ে যেতে হয় না—সেখেনে, আমার মেসোর—কি বল্‌ব তোমায়—আমার মেসোর চোক ছুটো ধবধবে সাদা মেরে গিয়েছিল—ঠিক এইরকম—দেখ তারিণীদা—এই দেখ—

তারিণী দেখিল না; বলিল—সে কথা যাক্ গে, একটা কথা বলবি সদা—

ঠিক বলবি—ঠি—ক? একেবারে কাঁটায় কাঁটায়—একটুও মিথ্যে না—বল্‌বি ত?

সদানন্দ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

—কি—বল না!

তারিণী বলিল—আগে বল্—সত্যি বল্‌বি—মঙ্গলচণ্ডীর দিকে মুখ ক'রে বল্—

সদানন্দ তখন রাগিয়া উঠিয়াছে; রাগিবারই কথা। এমন করিয়া দাঁড় করাইয়া তাহার মুখ দিয়া যে কি বলাইয়া লইবে তাহা সে অনুমানও করিতে পারিল না।

—কি বল্‌বে বল না ছাই—ভুলুদের খাসীটা কে চুরি করেছে—তাই? আমি তার কি জানি—দিব্যি গেলে বলতে পারি—

তারিণী হাসিয়া বলিল—না রে, সে কথা নয়। বলছিলাম কি—

সদানন্দ এবার চলিয়া যাইবার ভাণ করিল—তবে এই চললাম, আলাতন করলে দেখছি—যা বলবে—বল না ঝপ করে—

তারিণী এবার আরম্ভ করিল—দেখ্ সদা, জয়া ত তোদের সঙ্গেই মিশত, তোরাই হ'লি তার মিতে সাঙাৎ সব—সত্যি ক'রে বল দিকিন কোথায় সে আছে লুকিয়ে, ঠিক বলবি—আমি কিছু বলব না, বকব না, হাতটি তুলব না পর্য্যন্ত—এবার যত খুশী তামাক খাক্, আড্ডা দিক, আলসে হয়ে বসে থাক্—আমি এই তোদের সামনে

কথা দিচ্ছি সদা, আর তাকে বকব না, কোথায় আছে বল্—গিয়ে তার পায়ে ধ'রে নিয়ে আসি—

সদা কি বলিতে যাইতেছিল।

তারিণী বলিল—জয়ার জন্যে কি হয়েছে দেখবি তবে? এই দেখ সদা দেখ—বলিয়া তারিণী চশমা খুলিল—এই দেখ—

সদা দেখিল, চোখ দুটি লাল জবাফুলের মত রং ধরিয়াছে। চোখের চারিদিকে ফুলিয়া ঢ্যাবা হইয়া আছে; তারিণীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ফোলা মাংসের উপর জল পড়িয়া চোখ দুটি থল-থল করিতে থাকিল।

সদা বলিল—ঠ্যাঙা দিয়ে খুঁচিয়ে দিয়েছে বুঝি? জানোয়ার একটা।

—না রে সদা, তা কেন, কেঁদে কেঁদেই এইরকম, রাতে কি ঘুম আসে? দু চোক বুঁজে পড়ে থাকি; কথাটা রাখ সদা—যদি তার সন্ধান জানিস ত—খবরটা দে—আমি মলুম!

সদা কিছু বলিবার পূর্ব্বে মাখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাজির। বুঝা গেল অনেক দূর হইতে দৌড়াইয়া আসিতেছে; পায়ে তাহার ধুলা জমিয়া চামড়া ঢাকিয়া গিয়াছে।

মাখন চোখ-মুখ দিয়া কথা বলিতে লাগিল—তুই এখেনে? আর সবাই যে বসে তোর জন্যে, সব হাজির—হুঁকো কলকে—সব—আর শোন্—

মাখন আড়ালে গিয়ে চুপি চুপি বলিল—জয়া এসেছে—আমাদের জয়া রে—আজকে পোয়া বারো। আজ সারা রাত চলবে—বুঝলি ত?

সদানন্দ একেবারে অবাক হইয়া গেল।

—জয়া এসেছে? কোত্থেকে এল সে?

চুপ্, চুপ্, এদিক পানে আয় বলছি—তারিণীদা'কে জানাতে বারণ করেছে। সদাকে টানিয়া লইয়া মাখন চলিয়া গেল।

দোকানে বসিয়া তারিণীর আবার রামায়ণ পড়া চলিল। রামের শোকে দশরথ যেখানে খেদ করিতেছেন, সেইখানটা পড়িতে পড়িতে তারিণীর দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হইয়া আসিল। গ্রাম ছাড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, দু-একটা লোক চলাচল করিতেছে। তাহাদের মধ্যে জয়া নাই। সারাটি দুপুর অলস দৃষ্টিতে তারিণীর মুখের পানে তাকাইয়া থাকে।—এমনি করিয়া একটি মাস—সেই যেদিন জয়া চলিয়া গিয়াছে—সেইদিন হইতেই।

বাড়ির সামনে পেয়ারা গাছের পাশে ছোট একটু ঘেরা জমি। দু-টা খানি লঙ্কার চারা, চারিটা মানকচুর গাছ, কিছু কচু নটে-শাক—এই সব। ও-সবই জয়ার হাতের পোঁতা। জয়াও নাই, গাছগুলিও অযত্নে মরিতে বসিয়াছে। তারিণী দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল—

দেখিতেছিল আর ভাবিতেছিল—

অনেকদিন্ আগে—জয়া তখন এই এতটুকুন, কোলে চড়িয়া বেড়াইত।

পেয়ারা গাছের নীচের দিকের ডালগুলি ঝুঁকিয়া মানুষ-সমান নামিয়াছিল—পাড়ার ছোঁড়াদের জ্বালায় গাছে একটা পেয়ারাও থাকিবার উপায় নাই। কেমন করিয়া কি জানি একটা ডাঁসা পেয়ারা পাতার আড়ালে তখনও পর্য্যন্ত আত্মগোপন করিয়া ছিল।

তারিণী জয়াকে উঁচু করিয়া ধরিয়া তুলিয়া বলিল—হাত বাড়া, ধর—ওই যে গোলপানা পেয়ারাটা ধর্—দূর বোকা ছেলে—পারলি নে?

তারিণী জয়াকে নামাইয়া লইল—আবার তুলিয়া ধরিয়া বলিল—এইবার নে—ওদিক পানে তাকা—নে ধর, এইবার—দূর!

জয়া তখন কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহার আঙুলে কি একটা কামড়াইয়া দিয়াছে। যন্ত্রণায় ছেলে ছটফট করিতে লাগিল; চীৎকারে পাড়া মাৎ হইয়া গেল।

তারিণী তখন পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। জয়াকে কোলে লইয়া নাচাইতে লাগিল।

দিন-কতক পরে সেই আঙুল ফুলিয়া উঠিল, ফুলিয়া আলুর মত হইল, আলুর মত হইয়া পাকিয়া উঠিল—তারপর একদিন বিপিন নাপিত আসিয়া নরুণ দিয়া চিরিয়া দিয়া গেল।

তারিণী চাহিয়া দেখিল—পেয়ারাগাছের সেই ডালটি

এখনও রহিয়াছে,—ঠিক তেমনি—কেবল একটু মোটা হইয়াছে—এই যা !

বাঁশতলার পথ দিয়া কে যাইতেছিল।

তারিণী ডাকিল—কে রে ? সুরো বুঝি ?

সুরো ওরফে সুরবালা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—আমাকে ডাকছ তারিণী-কাকা ?

—হ্যাঁ—আয় ত মা, একবার এদিকে—আয় বলি, শোন্—

সুরবালা কাঁকালে ঘড়া লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

তারিণী তাহার দিকে না-চাহিয়াই বলিতে আরম্ভ করিল—আচ্ছা সুরো, তুই-ই বল্—ছেলেপিলেকে লোকে বকে না? মারে-ধরে না? বকে কি আর নিজের জন্যে? ছেলের ভালর জন্যেই ত বাপ-মা'য়ে চেষ্টা করে—না, কি বল্ ?

সুরোকে কথাটা বলিয়া তারিণী গাছের দিকে সপ্রশ্ন-নেত্রে চাহিয়া থাকে।

সুরো সংক্ষেপে উত্তর দিল—তা'ত করেই।

—তবেই দেখত—কি না কি বলেছি আমি তা'কে; মারিও নি, ধরিও নি। ভদ্দর লোকের ছেলে তুই—গান গেয়ে, আড্ডা দিয়ে, তামাক খেয়ে বেড়ালে তোর চলে? আর কিছু না, শুধু এই—বুঝলি সুরো—মা মঙ্গলচণ্ডীর বেদী ছুঁয়ে পর্য্যন্ত বলতে পারি শুধু একটু বকেছিলুম। সেই কথায় রাগ ক'রে তুই চলে গেলি ?

সুরবালা নীচের মাটির দিকে চাহিয়াছিল—তারিণী সুরবালার মাথার দিকে চাহিল।

তারিণী বলিয়া যাইতে লাগিল—তা পালিয়েছিস্—বেশ করেছিস্! বাপের ওপর রাগ ক'রে অমন সকলেই পালিয়েও থাকে—আবার চার-পাঁচ দিন যেতে-না-যেতে ঘরের ছেলে ঘরেও ফিরে আসে, কিন্তু একমাস হয়ে গেল—কোথায় গিয়ে রইল—একটা খবর দিতেও কি দোষ ?

সুরো তেমনি নিঃশব্দে শুনিয়া যাইতে লাগিল।

—কিন্তু এই যে, কোথায় তুই রইলি, একটা খবর পর্য্যন্ত দিলি নে—এতে আমার প্রাণটাই কি ঠাণ্ডা থাকে! রাতে ঘুম নেই—পেটে অন্নজল নেই—কেবল জ্বলা জ্বলা আর জ্বলা।…বুঝলি সুরো, ওর জন্যে ধর্মে মন দেবারও যো নেই—ছেলে নয় ত শত্তুর সব—কেবল যন্ত্রণা দিতে আসে, তোরা বেশ আছিস্।

ইঙ্গিতটা সুরোর উপর।

সুরো বিধবা, পৃথিবীতে কেবল তাহার ভাইয়ের অন্নধ্বংস করিতেই জন্ম; কথাটা গিয়া সুরোর অন্তরতম প্রদেশে বিঁধিল। বাহির হইতে ত দেখিতে বেশ, ঝাড়া হাত পা, নির্ঝঞ্ঝাট—কিন্তু তাহার হৃদয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষাটার খবর বোধ করি একমাত্র বিধাতা ছাড়া আর কেউ জানে না।

সুরবালা নিজের অস্বস্তিটুকুকে ঢাকিতে গিয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বলিল—তুমি কিছু ভেব না তারিণীকা'—সে আসবেই আসবে—আর দিনকতক যাক্—তখন দেখে নিও।

—ছাই আসবে—আর এলেই আমি ওকে বাড়িতে ঠাঁই দেব ভেবেছিস্? বল্‌ব—যা, যেখানে ছিলি সেখানে যা।…ছোটবেলা থেকে মানুষ করলাম আমি, দুধ খাওয়ান বল—ঘুম পাড়ান বল—যা-কিছু সবই ত আমি—মায়ের পেটে এসেই তাঁকে ত কুপোকাৎ করেছিলেন। আমি না থাকলে এতটুকুন বেলাতেই ইছেমতীতে ভাসতিস্—আর সেই ছেলে কি-না এখন মানুষ হয়ে—

মানুষ হইয়া জন্ম যে তাহার কি করিতেছে সে-টুকু তারিণী আর ভাষায় প্রকাশ করিল না—পেয়ারাগাছের একটি পাতা লইয়া অন্যমনস্কভাবে চিরিয়া চিরিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

হঠাৎ একবার মুখ তুলিয়া বলিল—আচ্ছা, বল্ ত সুরো, আমার দোষ ?

সুরো বলিল—না, তোমার আর কি দোষ, ওরকম ত লোকে ছেলেকে বলেই থাকে—

—তবে? আচ্ছা মানলাম, না হয় আমারই দোষ, বুড়ো মানুষ ত, মাথা গরম ক'রে যা-তা ব'লে ফেলেছিলাম—তা ব'লে তোরও ত বোঝা উচিত একটু; দু-দিন বাদে বাড়ি ফিরে এলেই পারতিস্—মিটে যেত গোল, তা না একমাস হয়ে গেল—না একটা খবর, একটা কিছু।



[illegible]

[illegible]

খানিক থামিয়া তারিণী আবার বলিতে লাগিল—দেখ্, মুকুন্দকে আমি ব'লে দিয়েছি—সে ত ভিন্ গাঁয়ে যায়, যদি জয়াকে কোথাও দেখতে পায়, ত আমাকে এসে খবর দেবে। বুদ্ধি যে জয়ার কম তা নয়—যত বয়েস বাড়ছে ওর বুদ্ধিটা যাচ্ছে কেঁচে—ছোটবেলায় বারোয়ারী-তলায় জগন্নাথ অপেরার যাত্রা হয়েছিল জানিস ত? সেই যে-ছেলেটা কেষ্ট সেজেছিল—ফরসা মতন—ছিপছিপে, সেই ছোঁড়াটা একদিন আমাদের বাগানে ঢুকে গাছে উঠে আম পাড়ছিল—ও কখন তলে তলে টের পেয়েছে, আমায় দৌড়ে এসে খবরটা দিয়েছে। আর এখন কি যে হয়েছে—বাড়ির একটা কাজ করা দূরে থাক, আমি বুড়ো মানুষ রেঁধে দেব তাই খেয়ে উনি আড্ডা দিতে বেরুবেন। হ্যাঁ রে—তোর নিরু-বউকে মনে পড়ে?

প্রশ্নটা করিয়া সুরোর দিকে চাহিতেই তারিণী দেখিল সুরো কখন চলিয়া গিয়াছে।

নিজের কথা বলিতে বলিতে কতক্ষণ যে সুরোকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল তারিণীর সে খেয়াল ছিল না।

সুরোর আর অন্যায় কি! তাহারও ত নিজের কাজ আছে।

গিয়াছে ভালই করিয়াছে।

তারিণী মনে মনে লজ্জিত হইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়া আসিল।

রামায়ণ লইয়া বসা রোজই হয়—পড়া কিন্তু নিয়ম-মত হয় না।

সেদিন তারিণী দোকানে বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল। পড়িতেছিল একটু অন্যমনস্কভাবে—

জয়া হয়ত একদিন ফিরিয়া আসিবে। রামও বন হইতে একদিন ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আসিয়া দেখিয়াছিল দশরথ তখন বাঁচিয়া নাই।

তারিণী একদিন মরিয়া যাইবে। আর শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহার দিন-দিন দাঁড়াইতেছে, তাহাতে তাহার শীঘ্র মরাটা কিছু আশ্চর্য্যের নহে! ধর, সে মরিয়া গেল একদিন!

তাহার মরিবার পরে অনেক দিন বাদে একদিন জয়া আসিয়া হাজির হইল। তখন তাহার রাগ চলিয়া গিয়াছে; না খাইতে পাইয়া দেহ কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে, মুখখানা শুকাইয়া হইয়াছে এতটুকুন!

বাবার কাছে আশ্রয় চাহিবার জন্যই আসিয়াছে; দোকানের কাছে আসিয়া দেখিল দোকান বন্ধ কিংবা অঘরি শা সেই দোকানটিকে পাটের গুদাম করিয়াছে।

ঘর কাহারও দেখা না পাইয়া জয়া সটান চলিয়া আসিল একদম বাড়ির দিকে। আসিয়া দেখিল তাহার হাতের পোঁতা শাকসব্জীর গাছগুলির এতটুকু চিহ্নও নাই।

তারপর দেখিবে বাড়ির দরজায় তালা লাগান অথবা মুকুন্দ সে বাড়ি কিনিয়া লইয়া সপরিবারে সেখানে বাস করিতেছে। মুকুন্দ হয়ত ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিবে। আসিয়া দেখিবে জয়া।

বলিবে—আরে—জয়া না?

তারপর জয়া যখন শুনিবে তাহার বাবা মারা গিয়াছে—তখন?

তখন গাঢ় কাল কালি তাহার সারা মুখখানিতে লেপিয়া যাইবে! চোখ দুটি টল্ টল্ করিয়া উঠিবে, ধপ্ করিয়া সে সেইখানেই বসিয়া পড়িবে হয়ত। তারপর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কি কান্না! সে কান্না আর তাহার শেষ হইবে না—

জয়ার কাল্পনিক দুঃখ স্মরণ করিয়া তারিণী নিজেই খানিকটা কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর চোখ মুছিয়া পুনর্ব্বার রামায়ণ-পাঠে মনোযোগ দিবার উদ্দেশ্যে সোজা হইয়া বসিল।

সোজা হইয়া বসিতে গিয়াই সামনে নজর পড়িল। সামনে দাঁড়াইয়াছিল মুকুন্দ—নজর পড়িল ঠিক তারই উপর।

—আধ সের তেল দিতে হবে যে তারিণীদা—সরষের তেল—

তারিণী তাঁড়ে তেল ভরিতে ভরিতে বলিল—সোনাগঞ্জ থেকে কবে এলি রে মুকুন্দ?

মুকুন্দর হঠাৎ যেন কি কথা মনে পড়িয়া গেল।

—ভুবনে তারিণীদা—জয়াকে দেখলাম।

—জয়া! দেখলি তুই? কোথায় কোথায় রে?—তারিণী বিস্মিত হইয়া গেল।

নোনাগঞ্জ থেকে ফিরছি, বুঝলে—চাঁপাতলার হাট চেন ত—সেইখানে; রদ্দুরে ঘুরে ঘুরে আর না খেয়ে খেয়ে দেহ তার এই এমনি হ'য়ে গেছে—দেখ তারিণীদা—ঠিক এই এমনি—বলিয়া মুকুন্দ উদাহরণ-স্বরূপ তাহার হাতের একটা আঙুল উঁচু করিয়া দেখাইল।

একটুও না থামিয়া মুকুন্দ আবার বলিল—তাকে বললাম—কি রে জয়া বাড়ি যাবি নে? তোর বাপ যে তোর জন্যে কেঁদে ম'লো—

কথাটা লুফিয়া লইয়া তারিণী বলিল—তা সে কি বললে?

—বললে কি জান তারিণীদা?...বললে—

বলিয়া কথা অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া মুকুন্দ চুপ করিল।

—কি বললে কি?...জয়ার উত্তরটা শুনিবার জন্ত তারিণী উবু হইয়া বসিল।

অন্যদিকে চাহিয়া মুকুন্দ বলিল—বললে—অমন বাপের অন্ন আর মুখে দেব না—

—বললে ওই কথা?.. তারিণীর যেন বিশ্বাস হইল না।

মুকুন্দ চুপ করিয়া রহিল—অর্থাৎ এমন লজ্জার কথা, দ্বিতীয়বার উল্লেখ করিবার নহে।

তারিণী বলিল—তা এতদিন ত এই বাপের অন্নই খেয়ে এসেছিস্—খেয়ে এত বড়টা হয়েছিস্। এখন আমার খেয়ে আমারই ওপর তেরিয়া-মেরিয়া—

কথাটা বলা হইল এমন ভাবে যেন জয়া সামনেই দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছে।

মুকুন্দ বলিল—আমিও তাই ব'লে এলাম—বুঝলে তারিণীদা—আমিও কিছু বাদ রাখিনি!—বললাম—দেখে নেব আমরাও, ওই খোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে আবার যদি তারিণীদার পায়ে মাথা কুটতে না হয় ত কি বলেছি—

তারিণী বলিল—তা শুনে কি বললে?

—কি আবার বলবে তারিণীদা? বলবার মুখ রেখেছি যে বলবে? বুঝি কেঁদেই ফেললে, মনে হ'ল সারাদিন কিছু খেতে পায় নি।—ঠোঙায় ক'রে এই এত ক'টা মুড়ি চিবোচ্ছে—মিউনো মুড়ি—চিবোনর শব্দও নেই—

তারিণী তেল ওজন করিতে করিতে কি যেন ভাবিতে লাগিল। বলিল—বেশ করেছ, দিয়েছ ঠুকে—না খেয়ে ও মরে যাক্—আমার হাড় জুড়োক, ওর মুখ আর আমি দেখছি নে—এই বলে রাখলুম—দেখো—বলিয়া তারিণী তেলের ভাঁড় বাড়াইয়া দিল।

দাম ফেলিয়া দিয়া মুকুন্দ চলিয়া যাইতেছিল—যাইতেছিল তাড়াতাড়ি এবং বাড়ির কথা ভাবিতে ভাবিতে—হঠাৎ বাধা পড়িল। ফিরিয়া দেখে তারিণীদা তাহারই নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—

তারিণী আগাইয়া আসিতেছিল—মুকুন্দও দু-পা আগাইয়া গেল—

—চাঁপাতলার হাট না কি তখন বললি রে মকুন্দ—চাঁপাতলার হাটই ত?

—হ্যাঁ—কিন্তু কেন বল দিকিন্—যাচ্ছ না কি জয়াকে খুঁজতে?

তারিণী বলিল—যাই—আর কি করি? সে বাপ ব'লে না মানলেও আমার ত ছেলে ব'লে টান আছে, তা ঠিক কোন্ জায়গাটা আমায় একটু বুঝিয়ে দে ত মাণিক—

মুকুন্দ বলিল—আচ্ছা, সবুর কর—নোনাগঞ্জ থেকে চাঁপাতলার হাটে আসতে দক্ষিণমুখো চলতে হয় ত, তা তুমি ত আর সে দিক দিয়ে আসছ না—তুমি ফতেপুর থেকে যাচ্ছ উত্তরমুখো—উত্তরমুখো বরাবর গিয়ে চাঁপাতলার হাটের কাছাকাছি সেই বটগাছটা দেখেছ ত?...সেই গাছের পাশ দিয়ে বাঁ-দিক পানে যে রাস্তাটা চ'লে গেছে সেই রাস্তাটা ধরে বরাবর চলে যাও—

স্থানটি মনে মনে খানিক কল্পনা করিয়া লইয়া তারিণী বলিল—হ্যাঁ গেলুম—তার পর?

—গিয়ে দেখ্‌লে মল্লিকদের গোলার পাশে—মিত্তিরদের শান-বাঁধান পুকুরটা—ভক্ ভক্ করছে জল। সেইখানে সবার ওপরকার পৈঠেতেই দেখতে পাবে—বুঝলে—সবার ওপরকার—সোজা যাবে ত যাও এইবেলা—আসতে কিন্তু রাত হ'য়ে যাবে তোমার, তা ব'লে দিচ্ছি—

তারিণী ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া দোকানের মাচায় উঠিয়া চাদর এবং ছাতি পাড়িল।

জুতা খুঁজিয়া মিছামিছি সময় নষ্ট, দরকার নাই, খালি-পায়েই বেশ যাওয়া যাইবে। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া তারিণী চাবি-তালা লাগাইল।

এইবার যাত্রা করিতে হইবে। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির হইতে মায়ের পূজার ফুল সঙ্গে লওয়া দরকার—তারিণী পথে নামিয়া ছাতা খুলিল।

ধূলি-ধূসরিত পথ।

পড়ন্ত-বেলার রোদ পড়িয়া তারিণীর মাথা ধরিয়া আসিল।

চারিদিকে বিস্তৃত মাঠ—মধ্য দিয়া উঁচু সরকারী রাস্তা।

একটা গ্রাম ছাড়াইয়া আবার কতক্ষণ পরে একটা গ্রাম আসে, গ্রামে ঢুকিবার পথে কুকুরগুলি তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল, তারিণী কোন রকমে তাহাদের পাশ-কাটাইয়া চলিল।

যন্ত্রাবিষ্টের মত চলিতে চলিতে তারিণীর কত কি মনে হইতেছে—

বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দের ভিতর জয়ার কাতর-নিঃশ্বাস যেন বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে।

কোথায় অনেক দূরে কাহাদের এক ঘাটের ধারে বসিয়া দিনান্তে এক-কটা মুড়ি চিবাইয়া এতক্ষণে জয়া হয়ত পুকুর হইতে চক্ চক্ করিয়া খানিকটা জল গিলিয়া ফেলিল।

অপরিষ্কার জল; তা হউক, সারাদিনের উপবাসের পর ওইটুকু যেন অমৃত।

জয়া জল খাইয়া একটা গভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

জয়ার কাল্পনিক তৃপ্তি স্মরণ করিয়া তারিণী জোরে জোরে পা ফেলিতে লাগিল। তাহার মাথার বেদনাও যেন কমিয়া আসিল। সামনে বরাবর রাস্তা পড়িয়া রহিয়াছে—কতকাল ধরিয়া এমনি পড়িয়া থাকিবে; এই পথ দিয়া তারিণী চলিতেছে—জয়া চলিতেছে… তারপর? জয়ারও ছেলে হইবে ত! কিন্তু ওর ছেলে হইয়া উহাকে যেন এত কষ্ট না দেয়!

খড়-বোঝাই গরুর গাড়ী সারবন্দী চলিতেছিল।

গাড়োয়ানেরা গাড়ী হাঁকাইতেছে আবার গানও গাহিতেছে।

একজন বলিল—ও কত্তা—একটু সরে দাঁড়াও দিকি, এ গরু তেমন নয়—

তারিণী সরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—কদ্দূর যাবে গা তোমরা?

তাহারা যাইবে রেল বাজারে। কাহারও গাড়ীতে পাট, কাহার খড়, কেহ খালি টিন লইয়া যাইতেছে বাজার হইতে কেরোসিন্ আনিবে। দল বাঁধিয়া যাইতেছে আবার দল বাঁধিয়া ফিরিবে। ফিরিতে অনেক রাত হইয়া যাইবে।

বদন বলিল—তুমি কদ্দূর?

তারিণীর তখনই পা ব্যথা করিয়া উঠিয়াছে। সবে ত মাইল-খানেক রাস্তা আসা হইয়াছে—এখনও ইহার ডবল বাকী যে! রোদের তেজ কমিয়া আসিলেও এতটুকু ছায়া কোথাও নাই।

তারিণী বলিল—উঠব নাকি—বেশী দূর না—বুঝলে এই চাঁপাতলার হাট! বলিয়া নিকটের অশ্বত্থ গাছটার দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

তা বদন লোক ভাল, খানিকটা পোয়াল বিছাইয়া গদী করিয়া দিয়া বলিল—বোস এইখেনে আয়েস ক'রে, বুড়ো মানুষ। ধন্যি সাহস বটে আজ্ঞে।…

পথে চলিতে চলিতে আলাপ জমিয়া গেল। বদন ট্যাঁক হইতে বিড়ি বাহির করিয়া বলিল—চলবে নাকি?

ওসব তারিণী ছাড়িয়া দিয়াছে। বলিল—ছেলেটা যাবার পর থেকে আর খাইনে বুঝলে—ওই সব নিয়েই ত গণ্ডগোল বাধল কি-না।

সব শুনিয়া বদন চুপ করিয়া রহিল।

বদনের মেজ ছেলেটাও অমনি গোঁয়ার-গোবিন্দ ছিল। আছে ত আছে বেশ আছে, খায়-দায় আড্ডা দেয়, কিন্তু হঠাৎ কি যে হইয়া যাইত একদিন সকলের উপর রাগ করিয়া কোথায় উধাও হইয়া যাইত,…দু-মাস তিন মাস কাটিয়া যায়… তাহার পাত্তাই নাই।

কিন্তু এখন সব রোগ একদম সারিয়া গিয়াছে, পীর সাহেবের ঔষধের গুণে!

নেত্রযুগলকে যথাসম্ভব বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া বদন পিছন ফিরিয়া বলিল—আশ্চর্য্য ওষুধ দাদা, বুঝলে, অব্যর্থ—এখন বিয়ে-থা দিয়েছি, বেশ নিশ্চিন্তে বউ নিয়ে ঘর করছে, তোমায় বলব কি—ঘরের বাইরে পা-টি বাড়ায় না—যাইরি, ওর মা বলে—থাক্, কাজ না করুক, বেঁচে থাক—তাই ঢের, কি বল ?

ঔষধটি তারিণীও জানিয়া লইল।

বিশেষ কিছুই নয় ; ডুমুরদহের পীর সাহেবের কাছ হইতে শেকড় আনিয়া বাটিয়া বুকের রক্ত দিয়া একশ'টি বিষপত্রে ছেলের নাম লিখিতে হইবে। সেই রক্ত শুকাইতে-না-শুকাইতেই ছেলে ফিরিয়া আসে ! তারপর পীর সাহেবের লোহার বালা তাহার হাতে পরাইয়া দিতে হয়। মাত্র এই।

একটি পয়সা খরচ নাই ; স্বামী চলিয়া গেলে স্ত্রীর এবং ছেলে চলিয়া গেলে মা'র। তা মা'র পরিবর্ত্তে বাপের রক্তেও চলে।

বদন বলিল—একশ'টা লিখতেও হবে না—বুঝলে দাদা—ষাট-পঞ্চাশেক পত্তর শেষ না-হ'তেই দেখবে হুড় হুড় ক'রে ছেলে তোমার ঘরে ঢুকছে ; কেন, আমাদের গাঁ'র পিয়োনাথের কি হ'ল···

কোন্ এক প্রিয়নাথের কি হইয়াছিল বদন সেই গল্প করিল, কিন্তু তারিণীর কানে তাহার একবর্ণও ঢুকিল না ; তাহার মনে হইতেছিল হাতের কাছে এমন দৈব-ঔষধ থাকিতে সে কি-না ভাবিয়া মরে।

গাড়ী সার বাঁধিয়া চলিতেছিল। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে ; পশ্চিমের আকাশখানিতে সূর্য্য ডুবিয়া যায় যায়। রাস্তার দু-পাশে ক্ষেত ; জমি নিড়াইবার সময় ; চাষারা কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু তারিণীর এসব দিকে নজর নাই ; আজ কোথায় নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া বসিয়া রামায়ণ পড়িবে তা না—ছেলের জন্তে—

কপালের দুর্ভোগ, নহিলে গ্রামে ত এত ছেলে রহিয়াছে, জানোয়ার হইতে হয় কি তাহারটাই ! তা'ও দশটা নয়, পাঁচটা নয়—ওই একটি মাত্র !

তারিণী বলিল—ছোটবেলা থেকেই জানতাম কিছু হবে না ওর, পাঠশাল শেষ ক'রে শহরের বড় ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলাম বুঝেছ—মাইনে কি মাসে গুণছি—গুণছি ত গুণছিই পড়ার নামে এই—বলিয়া তারিণী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল।

—তা না পড়িস্ বাপু, না পড়িস্—লেখাপড়া কি সকলের হয়—তা হয় না !···কিন্তু মাসে মাসে মাইনে দিচ্ছি—ইস্কুলে যাবি ত—কোটাঘরে বসবি ত, বেশ দিব্যি ঠাণ্ডা ঘর—চেয়ার বেঞ্চি—তা না—যখনই গেছি—দেখি, সব্বাই আছে আমাদের জয়চন্দোর নেই—কোথায় রদ্দুরে রদ্দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ; আর-জন্মে চাষা ছিল—বুঝলে কি-না তারা—লেখা-পড়া ওর সইবে কেন ?

মুকুন্দ যে জায়গাটি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল ঠিক সেই জায়গাটি ; উত্তর-মুখো বটগাছ ; তাহারই বাঁ-দিকে একটা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আর সোজা পথটি চলিয়া গিয়াছে বরাবর চাঁপাতলার হাটের দিকে—

বদন গাড়ী থামাইল। বলিল—দেখো—আস্তে—হ্যাঁ নাবো—ও-কিছু বল্‌বে না—কিছু ভয় নেই।

তারিণী চাদর ও ছাতি লইয়া নামিল।

সারবন্দী গাড়ীর দল তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। বদনও দেখিতে দেখিতে অনেক দূর চলিয়া গেল।

বাম দিকের রাস্তায় লোক-চলাচল নাই। তারিণী সেই পথটা ধরিল।

মুকুন্দ বলিয়াছিল—ওইখানেই শান-বাঁধান পুকুরের উপরকার পৈঠাতে জয়াকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে।

অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে—সরু রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে—হঠাৎ একটা মোড় ফিরিতেই নজরে পড়িল পুকুর।

পুকুরের পরেই শান-বাঁধান ঘাট—কিন্তু উপর নীচে কোন পৈঠাতেই কেহ বসিয়া নাই।

তারিণী কাছে আসিয়া ভাল করিয়া নজর করিয়া দেখিল, উপরকার পৈঠার উপর কেবল কয়েকটা মুড়ি ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে ; মুকুন্দ তাহা হইলে মিথ্যা বলে নাই।

চারিদিকে কোথাও কেহ নাই। গাছের বড় বড়

অলগাছগুলি কালো জলের উপর ততোধিক কালো কালো ছায়া ফেলিয়া নির্ব্বাক-দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে।

তারিণীও যেন উহাদেরই একজন হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল:

জয়া যদি ওই জলেই ডুবিয়া থাকে! না, ডুবিবার ছেলে ত সে নয়।

অতি গভীর দৃষ্টিতে কাকচক্ষু জল তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তারিণী আস্তে আস্তে নীচের পৈঁঠাতে নামিয়া আসিয়া তারপর মাথায় মুখে খানিকটা জল ছিটাইয়া দিল।

চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

এখন জয়াকে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত—বাড়ি ফিরিতে হইলেও রাত্রিটা এখানে থাকিতে হয়। তারিণী স্থির করিল, আজ রাত্রিটা হাটেই থাকিবে—তারপর মাঝরাত্রে যখন রেলবাজার হইতে গাড়ীর দল ফিরিবে—সেই গাড়ীতেই উঠিয়া পড়িবে।

বদন তাহাকে ফেলিয়া যাইবে না।

কিন্তু সত্য সত্য মাঝরাত্রে তাহার যাওয়া হইল না। বাধা পড়িল প্রথম রাত্রেই—

হাটের ভিতর বিস্তর লোক শুইয়া থাকে; দেরিতে হাট ভাঙিয়া গেলে কেহ আর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পারে না; ওইখানেই এক কোণে পড়িয়া থাকে, তারপর রাত থাকিতে থাকিতে পরদিন কখন কে কোথায় চলিয়া যায় কেহ জানিতে পারে না।

গুপীযন্ত্রের সঙ্গে ডুগি তবলা লইয়া কয়েকটা লোক ওদিকে তখন বেশ আসর জমাইয়া তুলিয়াছে; হৈ হৈ করিয়া তাহারা সারা আটচালাখানিকে সরগরম রাখিয়াছে।

তারিণী একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান বাছিয়া সেইখানেই চাদর বিছাইল।

আশেপাশে বহু লোক শুইয়া; কেহ ঘুমাইয়া নাক ডাকাইতেছে, কেহ তখনও ল্যাম্প জালিয়া মালের হিসাব মিলাইতেছে। ছাড়া গরুগুলি ওধারে শুইয়া সজোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে—সারা রাত তাহারা লেজ নাড়িয়া মশা তাড়াবে। অন্ধকার মধ্যে তাহাদের মশা তাড়াইবার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ তারিণীর কানে আসিতে লাগিল।

চারিদিকে একটা বিশ্রী আবহাওয়া; তা হউক, সারাদিনের পরিশ্রমের পর তারিণীর ঘুম আসিতে দেরি হইল না।

কত রাত্রে ঠিক হুঁস্ ছিল না; কি একটা শব্দে তারিণীর ঘুম ভাঙিয়া গেল; একটা গোঙানির শব্দ; কোন দিক্ হইতে যে আসিতেছে তারিণী তাহা অনুমান করিতে পারিল না। শব্দটা হয়—খানিক থামে—আবার সুরু হয়; তারিণীর কেমন ভয় করিতে লাগিল।

তারিণী উঠিয়া বসিল। উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, গুপীযন্ত্রের আওয়াজ তখন থামিয়া গিয়াছে। অন্ধকার চারিদিকে; গাঢ় নিশুতি নামিয়া সন্ধ্যার সেই কোলাহল-মুখর হাটখানিকে একেবারে নিস্তেজ করিয়া দিয়াছে। শুধু সেই শব্দটা মাঝে মাঝে তারিণীর কানে আসিয়া বিঁধিতেছে।

ঘুমের ঘোরটা ভাল করিয়া কাটিয়া যাইতেই তারিণী বুঝিতে পারিল শব্দটা আসিতেছে তাহারই বাম দিক হইতে। অস্পষ্ট নজর দিয়া তারিণী বুঝিতে পারিল—কে যেন ওখানে নর্দ্দমার ধারে বসিয়া আছে, এবং যে বসিয়া আছে, শব্দটা করিতেছে সে-ই!

হঠাৎ কি একটা সন্দেহ হইতেই তারিণী উঠিয়া দাঁড়াইল; আস্তে আস্তে লোকটির পিছনে গিয়া তারিণী সজোরে ডাকিল—জয়া!

জয়া পিছন ফিরিতেই তারিণী আবার বলিল—গোঙাচ্ছিস্ যে—জ্বর হয়েছে?

জয়া কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বে তারিণী জয়ার কপাল স্পর্শ করিল। না, জ্বর তাহার হয় নাই।

জয়া বলিল—বড্ড মাথাটা কামড়াচ্ছে।

তারিণী বলিল—আয়—উঠে আয়—আমার কাছে শুবি আয়—আয়—

জয়াকে ধরিয়া তুলিয়া আনিয়া তারিণী তাহাকে চাদরের উপর শোয়াইল। বলিল—নে ঘুমো, কাল সকালে বাড়ি নিয়ে যাব তোকে—বুঝলি?

জয়া একান্ত বাধ্য শিশুর মত চাদরের উপর চুপ করিয়া শুইয়া রহিল;—এতটুকু আপত্তি করিল না; তারিণী তাহার পাশে শুইয়া চাহিয়া দেখিল জয়া যেন এই

ক'দিনেই বড়ি হইয়া গিয়াছে; সারা গায়ে ঘায়ের মত দাগড়া-দাগড়া দাগ। অপরিষ্কার ময়লা কাপড়খানি কোমরে; গায়ে কিছু নাই; তারিণীর নিজেরই কান্না পাইতে লাগিল—সাধ করিয়া সুখের ঘর ছাড়িয়া আসিয়া এই যন্ত্রণা ভোগ করা—এ বুদ্ধি যে জয়াকে কে দিল তাহা জয়াই জানে!

তারিণী প্রশ্ন করিল—আজ সারাদিন কি খেয়ে আছিস্ রে জয়া?—কি খেয়েছিস্?

জয়া বলিল—কিছু না।

শুনিয়া তারিণী মুখে কিছু প্রকাশ করিল না; সকালে উঠিয়া চারটিখানি খাইয়া লইয়াই আবার রওনা হইতে হইবে। চার মাইল পথ—হাঁটিয়াই যাইতে হইবে, সুতরাং এখন একটু বিশ্রাম দরকার। তারিণী চোখ বুজিল।

চোখ বুজিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম আসিল।

এবং সে ঘুম ভাঙিল যখন, তখন সকাল হইয়া গিয়াছে—পাশের বড় কাঁটাল গাছের ফাঁক দিয়া কড়া রৌদ্র আসিয়া তারিণীর গায়ে লাগিয়েছে।

তারিণী চারিদিকে চাহিয়া হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

জয়া! জয়া কোথায়! জয়া নাই যে!

জয়া আবার পলাইয়াছে!

রাত্রের স্বপ্নকে দিনের আলোয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাহার এতটুকু বাধিল না।

চারিদিকের ভিড় — দোকান-পাঠ — ঝুমনলাল মাড়োয়ারীর পাটের আড়ত—কোথাও জয়া নাই! রৌদ্রের তেজ বাড়িতেছে; চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া তারিণী ছাতি খুলিল। চোখ দু-টা তাহার কর কর করিয়া জ্বালা করিয়া উঠিল। পানের দোকানের পাশে একটি কাঠের বাক্সর উপর বসিয়া পড়িয়া তারিণী দুই হাত দিয়া দু-দিককার কপাল সজোরে চাপিয়া ধরিল; মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ী পিটিতেছে।

তারিণীর মনে হইল—এতদিন দেখা দেয় নাই সে বরং তবু ভাল ছিল।

অনেকদিন পরে বদরের সেই ঔষধের কথাটা দৈবাৎ মনে পড়িয়া গেল--কথাটা এতদিন তারিণী ভুলিয়াই গিয়াছিল। ডুমুরদহের পীর সাহেবের নিকট হইতে মুকুন্দই শেকড় এবং বালা আনিয়া দিল।

দুপুরবেলা বসিয়া বসিয়া তারিণী নিজ-হাতেই বুকের খানিকটা চিরিয়া রক্ত বাহির করিল—ভোতা নরুণ এতটুকু চিরিতে গিয়া অনেকখানি চিরিয়া যায় – যন্ত্রণায় তারিণীর বুকখানা বুঝি-বা গুঁড়া হইয়া গেল।

সারা সকাল পেটে কিছু যায় নাই—একশ'টি পাতা লেখা হইলে জয়া ফিরিবে এবং সে ফিরিলে তখন দু-জন একসঙ্গে খাইতে বসিবে এইরূপ ব্যবস্থাই ঠিক হইয়া আছে।

বাহিরে পথের উপর দিয়া লোক-চলাচল করিতেছে। বেলপাতার উপর জয়ার নাম লিখিতে লিখিতে তারিণী কেবল বাহিরের পানে চাহিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর—

সুরো দাঁড়াইয়াছিল; বলিল,—হাঁড়িটা আমি চড়িয়ে দেব তারিণীকা?

তারিণী বলিল—একটু সবুর কর্ সুরো—সে এলেই চড়িয়ে দিস একেবারে—

সবুজ বেলপাতাগুলির উপর রক্তের অক্ষরগুলা জল জল করিতে থাকে; পঞ্চাশটা শেষ হইয়া গিয়াছিল—এই বার একশ'টাও শেষ হইল—আর পাতা নাই। তারিণী সারা দেহে যেন কেমন দুর্ব্বলতা অনুভব করিল।

বাহিরে রৌদ্রের তেমনি বহ্নি-তেজ, চশমা খুলিয়া তারিণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দেখিল গোটাকতক অপরিচিত ছোঁড়া তাহার পেয়ারাগাছে উঠিয়া পেয়ারা পাড়িতেছে। ছেলেরা এ গ্রামের নয়। দেখিয়া মনে হয় বাজাদলের ছোকরা। মাথার চুল বাঁকড়া করিয়া ছাঁটা; এক একটি যেন পেকাটি; পেটগুলি শুকাইয়া বেয়ালা হইয়া গিয়াছে।

মধু ছেলেটি ওস্তাদ; বাঁশীর মত গলা; 'অভিমন্যু-বধে' ওই ছেলেটি উত্তরা সাজে। বলিল—তোমারই গাছ বুঝি? বেশ বেশ, বেড়ে পেয়ারা কিন্তু, কাশীর বীজ তাই বলি—

মধু মুখ চোখ দিয়া কথা বলে।

তারিণী বলিল—কোন্ গাঁয়ে বাড়ি গা তোমাদের?

তাহারা যাত্রাদলের ছোকরা—বাড়ি-ঘর-দোরের

ঠিকানা রাখে না; আজ এখানে, কাল সেখানে, এমনি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যাইতেছে সোনা-গঞ্জে, তিনদিন সেখানে থাকিবে—তারপর সেখান হইতে যাইবে আবার বেগমপুরে।

তারিণীর কি যেন মনে হইল। মনে হইল জয়া কোনও যাত্রাদলে ঢোকে নাই ত; বলা যায় না, ছোট-বেলা হইতেই ত তাহার গানবাজনার ঝোঁক। তাহাদের গ্রামেরই সখের যাত্রায় কতবার সে সেপাই সাজিয়াছে।

মধু বলিল—কি নাম বল্লে? জয়া?…সে-ই ত আমাদের মাষ্টার! অভিমন্যু সাজে। নতুন এসেছে, কিন্তু বেড়ে এক্টো করে মাইরী, আমার গলায় হাত দিয়ে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে—দেখো এই এমনি করে বলে—

লো উত্তরা!
ও মুখ-চন্দ্রমা হেরি মিথ্যা গণি সব;
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আজি জিতি কিম্বা হারি
নাহি লাজ তাহে কিন্তু প্রিয়ে…

সব কথা তারিণীর কানেও গেল না, পৈঠা ছাড়িয়া তারিণী তখন নীচে নামিয়াছে। ঔষধটি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ বলিতে হইবে!…জয়ার ত সন্ধান দিয়াছে!

মধু বলিল—মাষ্টাররা এতক্ষণ সেখানে ফলার সাঁটছে আয়েস ক'রে—দেখে নিও—

তারিণী দেহে যেন নূতন বল ফিরিয়া পাইল।

মধু বলিল—তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে নাকি? বেশ ত, চল না—মাষ্টার কেউ হয় বুঝি তোমার?

তারিণী বলিল—সে আমার ছেলে যে?

এক-একজন পুঁটুলিটা করিয়া পেয়ালা লইয়া তখন গন্তব্য পথে চলিতে সুরু করিয়াছে।

তারিণী বলিল—হুরো, মা, তুই তাহ'লে চড়িয়ে দে আজ, তাকে আর ছাড়চি নে, সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসব একেবারে—

সকলে দল বাঁধিয়া চলিল, কেহ গান গায়, কেহ গল্প করে—

তারিণী মধুকে বলিল—ওহে ও ছোকরা—শোন ইদিকে—জয়া এখন সেই রকম রোগা আছে নাকি?

—হ্যা—তুমিও যেমন, মাষ্টার আবার রোগা হ'ল কবে—খেয়ে খেয়ে ইয়া হচ্ছে—অধিকারী খুব ভালবাসে মাইরী—মাষ্টারও তেমনি দমবাজ—তিন টাকা মাইনে ছিল দু-টাকা আরও বাড়িয়ে নিয়েছে—

তারিণীর ত হাসি আসিল। অ, পাঁচ টাকা মাইনে মাসে—মন্দ কি? বেশ ত চাকরি যোগাড় করিয়াছে! জয়া আসলে মন্দ নয়—বুদ্ধি আছে—সবই আছে—শুধু তাহার সহিত কেন সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে, কে জানে!

—আর সেই পায়ের ঘা-গুলো—সে-গুলো কেমন?

—ঘা? সেই দুটো ফোড়া হয়েছিল—কবে সেরেছে! অধিকারী আবার সেই জন্ত দাবানল মলম কিনে দিয়েছিল—

তারিণীর মনে হইল—যাক ছেলেটা তবু মানুষের মত হইতে পারিয়াছে!

মধু বলিয়া চলিল—মাষ্টারের তিন তিনটে জামা বুঝলে,—দুটো পাঞ্জাবী একটা আলপাকার কোট—আর পায়ে সেই কোকর-অলা চটি—আর সিগ্রেট মুখে লেগে আছে ত লেগেই আছে—

তারিণীর মনে হইল—তা থাক্—সিগারেট খাইতে আর দোষটা কি! টাকা উপায় করিতেছে যখন, তখন খাইবে বইকি!

সারাদিন খাওয়া নাই—বুকের রক্ত কতটা চলিয়া গিয়াছে—পা তাহার আর চলিতেছে না—কিন্তু তারিণীর সেদিকে গ্রাহ্যই নাই। পীর সাহেবের কৃপায় জয়ার যখন সন্ধান মিলিয়াছে তখন একটা দিন না-হয় উপবাসেই গেল—ক্ষতিটা কি?

জয়া, জয়া আর জয়া! জয়া মোটা হইয়াছে—জয়া ইহাদের মাষ্টার—জয়া মাসে পাঁচ টাকা রোজগার করে—জয়া জামা কাপড় পরিয়া বাবু হইয়াছে—জয়া সিগারেট খায়—

তারিণীর মনে হইল—যাহাকে সে নেহাৎ অপদার্থ ভাবিয়াছিল আজ আর সে তাহা নয়—আজ সে বড়লোক হইয়াছে! তাহারই এককালের বন্ধুরা—সদানন্দ, মাখন—আজও তাহারা বেকারের মত ময়লা কাপড় পরিয়া টো টো করিয়া বেড়ায়—আর তাহার ছেলে জয়া—আজ

সকলকে ঠেকা দিয়াছে—ঠেকা দিয়া উপরে উঠিয়াছে ; তারিণীর সারা বুকে খুশী উপছাইয়া পড়িল !

এবার জয়া মানুষ হইয়াছে—বুদ্ধি হইয়াছে—এবার বাপের কথা রাখিবেই ! জয়া এখন নিতান্ত ছেলেমানুষ নয় —তাহার বিবাহ দেওয়া দরকার ! ছোট টুকটুকে একটি বউ ঘর আলো করিয়া বাড়িময় ঘুর্ ঘুর্ করিয়া বেড়াইবে।

কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ঘর ছুটির সংস্কার দরকার।

মধু বলিল—বিয়ে ? বিয়ে মাষ্টার করচে না—দেখে নিও —বলে কি শুনবে ?—বলে—আমি রোজগার করব আর পাঁচ ভূতে লুটে-পুটে খাবে—সে আমি দেখতে পারব না।

তারিণী ভাবিল—না, বিয়ে আবার করিবে না ! জয়চণ্ডীপুরের শ্রীমন্ত হালদারের মেয়েটিকে দেখিলে আর না বলিতে হইবে না ! যে দেখিয়াছে সে-ই বলিয়াছে খাঁটি মেয়ের রূপ ! দাঁড়াও না—কালই তারিণী গিয়া কথা দিয়া আসিতেছে ! ছেলে এখন রোজগার করিতেছে, গহনাপত্র ছাড়া নগদ একশ'টি টাকার কমে কিছুতেই ছাড়িবে না ; বলিবে—তাই বললে কি হয় ভায়া ?—অমন ছেলে এ দিগরে পাবে না—ওই পুরোপুরি এক-শ, বুঝলে ?

তারপর ছেলে-বউ রহিল ; উহাদের ঘর-সংসার, উহারা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লউক—তাহার আর ক'দিনই বা ! উহাদের সুখী দেখিয়াই তাহার শান্তি !

সোনাগঞ্জের বাবুদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের একধারে বসিয়া দলের লোকেরা হৈ-চৈ করিতেছিল।

অধিকারী একটি একপোয়ে বাটিতে তেল লইয়া মাখিতে বসিয়াছিল। বলিল—ও মরিকে—মাষ্টারকে ডেকে দে ত বাপ ক'রে—ইনি ডাকছেন—আপনি বসুন—

তারিণী খালি চৌকিটার উপর বসিল। ইনিই তাহা হইলে অধিকারী—তাহার ছেলে জয়ার মনিব ! বেশ লোকটি ত—আপনি আজ্ঞে করিয়া কথা বলে।

তারিণী বলিল,—জয়ার বিয়ের সময় যাবেন কিন্তু—নিয়ে যাব আমি এসে—বোশেখ মাস ওকে ছুটি দেওয়া চাই—ছেলে-বউ দু-দিন লোকে দেখবে কি-না !—বুঝতেই পাচ্ছেন—

সিগারেট টানিতে টানিতে একটি ছোকরা প্রবেশ করিল। তারিণীর দিকে একটু তেরছা চাহিয়া বলিল—কে—আমায় কে ডাকছে রে মরিকে ? বলিয়া ছোকরাটি থিয়েটারী ভঙ্গীতে অধিকারীর দিকে চাহিল।

অধিকারী তারিণীকে বলিল—এই যে এরই নাম জয়া—ইনি তোমায় খুঁজছেন—

তারিণী তখন সম্মুখে ভূত দেখিয়াছে। ভূত দেখিলেও কাহারও মুখের চেহারা অমন বদলাইয়া যায় না ! এ জয়া ত তাহার ছেলে জয়া নয় ! একে ত সে চাহে নাই—আশ্চর্য্য—ইহার নামও জয়া !

ছোকরাটি বলিল—কি বলবেন—বলুন না—তবে আগেই ব'লে রাখছি মশাই—নাইট পিছু আমার এক টাকা রেট্—আর জলখাবার গাড়ীভাড়া—সে যা হয়—আপনাদের খুশী-মাফিক্—

কথা আর শেষ হইল না। তারিণী উঠিল। উঠিয়া পাগলের মত চলিতে লাগিল।

আবার সেই মাঠের পথ ! হাওয়ায় ধুলা উড়াইয়া তারিণীর মুখেচোখে ঢুকিয়া একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল—ওই অশথ গাছটি পার হইলেই জোনের মাঠ—সার সার ধানের মাঠ চলিয়া গিয়াছে—সবুজ রঙের ঢেউ বুকে লইয়া পৃথিবী সেখানে আপন মনে খেলা করে—কিন্তু তারিণী অতদূর পৌঁছিতে পারে না—মাথার উপর অগ্নির পিণ্ড জ্বলিয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কে যেন পোড়াইয়া দিল—একটা খেজুর গাছের গোড়ায় পা লাগিয়া তারিণী আচম্কা পড়িয়া গেল।

জ্যৈষ্ঠের শেষ ! ঝুপে ঝুপে লাল ফলওয়ালা কুঁচ-বন—সজিনার পাকা পাতার রাশ—গাছভর্ত্তি পিটুলি ফল—বেড়াঘেরা কলা বাগান—কাঁটাভরা বাবলাগাছ—একটা গরু—তারও ও-পাশে কচার বেড়া—বেড়া পার হইয়া একটা মস্ত তাল গাছ—নিকিরিদের কুঁড়ে চালের উপর লাউয়ের ডগা—দু-টি শাদা পায়রা ; তাহার পর সুরু হইয়াছে আমবাগান—তারপর বন—বনের মাথায় আকাশ—আকাশ—শেষ নাই—

পারস্য-ভ্রমণ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিরাজে পৌছলাম। আর্কে (রাজপ্রাসাদে) কবির শোবার ঘরের জানালার নীচে কমলালেবুর ফুল ধরেছে। বাগানে চেনার গাছের ছাঁটা ডালে নূতন সবুজ পাতা, নারগিজ, গুলে মহাম্মদি (শিরাজি গোলাপজলের গোলাপ), বনপ্সা (ভায়লেট), আনারকলি ইত্যাদিতে ফুলের কেয়ারী আলো হয়ে আছে। বাতাস বেশ শীতল, কিন্তু তাতে শৈত্যাধিক্যের তীক্ষ্ণভাব নেই, বুলবুল সবে তার খেয়ালের আলাপ আরম্ভ করেছে। নগরের প্রান্তে চারিধারে তৃণবিরল পিঙ্গল পাহাড়ের প্রাচীরে ঘেরা সবুজ শস্তের ক্ষেত, দূরে তুষারকিরীটধারিণী পর্ব্বত ছুহিতা ডুষ্‌টরজানের শুভ্র চূড়া রোদের আলোয় ঝলমল করছে।

*

বুলবুল-গোলাপের লীলাভূমি, সাকীর পেয়ালায় শিরাজী সিঞ্চিত গুলাবের সুগন্ধে আমোদিত, সুরম্য প্রাসাদ, মস্‌জিদ, কার্ব্বণ-সরায়ে সজ্জিত, স্বর্ণরৌপ্য গালিচা, দারুশিল্প ইত্যাদির বিপণিপরিপূর্ণ, সাদী হাফেজের হৃদয়-আনন্দকারী জগৎবিখ্যাত শিরাজ! মোস্‌লেম সাহিত্যের স্বপ্নময় স্বর্ণপুরী সে শিরাজ কোথায়? শাহ্‌ চেরাঘের (দরগা) আলো এখন ম্লান, বাগ-ই-দিলখুশার অবস্থা ক্লেশদায়ী, করিম খাঁ জেন্দের সাধের বাজার-ই-বকিল জরাজীর্ণ এবং খেলো বিদেশী জিনিষে ভরা। কেবল সুখের কথা এই যে; ইরাণের পুনর্জন্মের নূতন অধ্যায়ে শিরাজেরও নূতন জীবন আরম্ভ হয়েছে।

* * *

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষে, ইরাণে মুসলমান-যুগের প্রারম্ভে, মহম্মদ-বিন্‌-ইউসুফ থাকেফি কর্ত্তৃক শিরাজনগরী ফার্‌স্ প্রদেশের রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর সাহিত্য, শিল্প, কারুকার্য্য ইত্যাদিতে এখানকার নাগরিকদের প্রতিভায় সমস্ত প্রদেশ যশে এবং ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকে সাফাবী রাজকুলের পতনের পর করিম খাঁ জেন্দের রাজ্যশাসনকালে

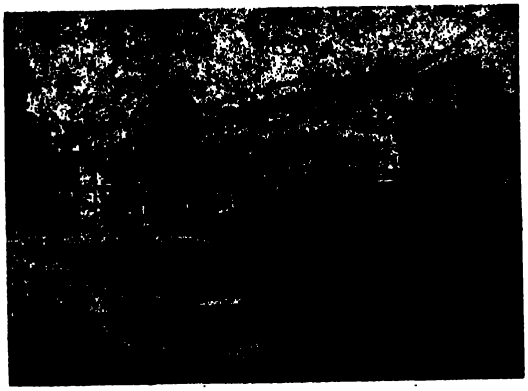


শিরাজের বাহিরের দৃশ্য। পুরুষদের পোষাক এখন অন্যরকম

শিরাজ সমস্ত ইরাণের রাজধানী হয়। এই করিম খাঁ জেন্দ সাফাবীদিগের পতনের পর বহুবৎসরব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে অনেক জয় পরাজয়ের ভিতর দিয়ে নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলের ফলে প্রায় সমস্ত ইরাণ আয়ত্ত করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অতি সামান্য উপজাতির সর্দার থেকে ছত্রপতি হওয়া সত্ত্বেও এঁর মনে কোন অহঙ্কার আসে নি এবং ইনি সম্রাট উপাধির বদলে নিজেকে "দেশের বকীল" (অর্থাৎ প্রতিনিধি) বলে পরিচয় দিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। দেশের অনেক উপকার ইনি করেছিলেন। শিরাজে সাদীর কবরস্থান সংস্কার, হাফিজিয়ে নির্ম্মাণ এবং

প্রসিদ্ধ বাজার-ই-বকীল নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা ইহারই কীর্ত্তি।

শিরাজ ইতিপূর্ব্বে বহুবার আরব, মোগল, তুর্ক ও তুর্কোম্যান শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল। একবার



শিরাজের মস্‌জিদ

শিরাজের সুন্দরীদের রূপলাবণ্য বিজেতার আক্রোশ থেকে নাগরিকদের বাঁচায়। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে হৃতগৌরব শিরাজের পুনর্নির্ম্মাণ করেন করিম খাঁ জেন্দ। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ থেকে শিরাজ যদি বা পার হয়েছিল, প্রকৃতির আক্রোশ থেকে উদ্ধার এখনও হ'তে পারে নি। ১৮১২, ১৮২৪, এবং —অতি প্রচণ্ডভাবে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্প হয়ে করিম খাঁর সাধের শিরাজ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর অতি নিকৃষ্টভাবে এর সংস্কার ও নির্ম্মাণ হয়েছে। সম্প্রতি নূতন শাহের আমলে কয়েকটি সুন্দর রাজপথ এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ছুটি করে ভাল বাড়ি ঘর হওয়ায় শহরের শ্রী কিছু ফিরেছে। দেশেও শান্তিস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়েছে।

* * *

নীচু মাটির দেওয়ালে এবং শুকনো গড়খাইয়ে ঘেরা শিরাজ শহরের পরিধি প্রায় চার মাইল। জায়গাটি সমুদ্র থেকে ৫০০০ ফুট আন্দাজ উঁচু উপত্যকায় থাকাতে এখানের আবহাওয়া সারা বছরই ভাল এবং পাহাড়-ঝরণায় ধৌলতে ফুলে ফলে গাছে সুশোভিত বাগানে ভরা। অতীত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ শিরাজে এখনও অনেকগুলি মসজিদ ও দরগা, পনর-কুড়িটি কার্ব্বণ-সরাই এবং করিম খাঁ জেন্দের বিরাট বাজার, অল্পবিস্তর জীর্ণ অবস্থায় বিরাজ করছে, তার মধ্যে আটাবেগ জেঙ্গী নির্ম্মিত মস্‌জিদ-ই-নও (খৃঃ ত্রয়োদশ শতক), করিম খাঁ জেন্দের মস্‌জিদ্ জামা-ই-বকীল (১৭৬৩ খৃঃ) এবং খৃঃ ত্রয়োদশ শতকের প্রসিদ্ধ ইমামজাদেহ্ সৈয়দ আমির আহমেদ, শাহ্ চেরাঘের দরগা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাজার-ই-বকীল প্রায় আধ মাইল জায়গা জুড়ে আছে। এর ভিতরের রাস্তা-ঘাট, অলি-গলি, দোকান, সমস্তই উঁচু খিলান করা নক্সাকাটা ছাদে ঢাকা। বাজারের প্রত্যেক রকম জিনিষের পটী ভিন্ন জায়গায় রয়েছে, কিন্তু এখন কার্পেট এবং কাঠ ও ধাতুর নক্সার কাজ ছাড়া অন্য যা কিছুর দোকান প্রায় সবই বিদেশী (বিশেষে রুশ) জিনিষে ভরা।

শিরাজের খ্যাতি ছিল মাদ্রাসা ও বাগানে, এবং



করিম খাঁ জেন্দ্

এখনও শিরাজ "দর-উল-ইল্‌ম্" (জ্ঞানপীঠ) বলে পরিচিত। মাদ্রাসার মধ্যে চারটি বিখ্যাত, যথা সৈয়দ সদর এদ্দিন মহাম্মেদ ডষ্টেকী স্থাপিত মন্‌সুরিয়েহ্ (১৪৭৮ খৃঃ), সপ্তদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হাসিমিয়েহ্ ও নিজামিয়েহ্ এবং



হাফিজিয়ে

করিম খাঁ জেন্দ এবং আগাবাবা খাঁ মাজেন্দরাণীর মাদ্রাসা-ই-আগাবাবা। বাগানের মধ্যে বাগ জেহান-নেমা, বাগ-ই-নও, বাগ-ই-তখত-ই-কাজর, বাগ-ই-দিলকুসা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। সাদীর কবর উদ্যান বাগ-ই-দিলকুসার পাশে এবং হাফিজিয়েহ্ (হাফেজের সমাধি) শহরের উত্তরভাগে আছে।

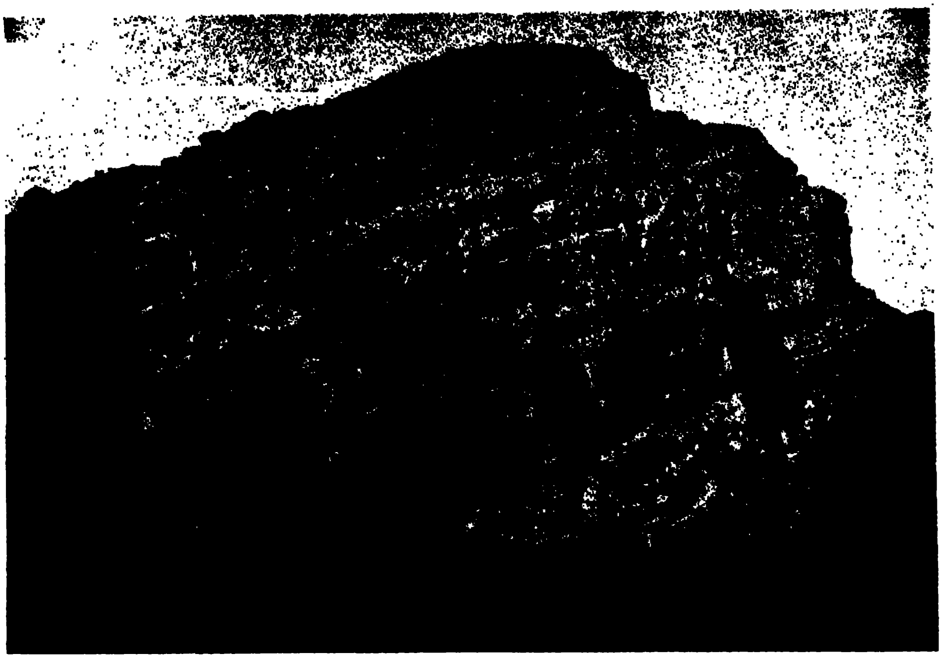
শিরাজের দু-মাইল উত্তরে পাহাড়ের একটি ঘাট থেকে সমস্ত উপত্যকাটি দেখা যায়। এই স্থানটির নাম "টাঙ-ই আল্লাহু আকবর" অর্থাৎ "ঈশ্বর অতি মহান" ঘাট। এরূপ নামের কারণ এই যে পথিক এখান থেকে শিরাজনগর ও উপত্যকার অতুল সৌন্দর্য্য দেখে "ঈশ্বর অতি মহান" বলতে বাধ্য।

পিঙ্গল ও ধূসর পর্ব্বতমালায় ঘেরা সবুজ ক্ষেত, অসংখ্য সরল ও সুঠাম গাছ, মধ্যে মধ্যে হলদে ইটের তৈরি মহল্লার মাঝে, নীল পালিশ করা টালির, রৌদ্র ঝলসিত গম্বুজ, কোথাও বা নক্সাকাটা বিরাট খিলানের অস্পষ্ট আকার, এই সকলের মিলনে শিরাজের দৃশ্য এখনও দূর থেকে খুবই সুন্দর।

* * *

দিন দুই গভর্ণরের প্রাসাদে থেকে আমরা বাগ খলিলিয়ে নামে বাগানবাড়িতে এসে উঠলাম। গভর্ণরের বাড়িতে রাজভোগ খেয়ে, বাদশাহী হাম্মামে স্নান করে যেমন আরাম ছিল, তেমনি সমস্তক্ষণ সেপাই-শাস্ত্রী রাজকর্মচারীর দলের মধ্যে কেতাদুরস্ত হয়ে আদব-কায়দা বজায় রেখে চলতে হাঁপিয়ে ওঠা গিয়েছিল। প্রত্যেক পদে "আকা বেফর্মে" (মহাশয় আজ্ঞা করুন) "নাস্তা হাজিরে", 'নাহা হাজিরে", "চাই হাজিরে" (প্রাতরাশ উপস্থিত, মধ্যাহ্নভোজন উপস্থিত, চা উপস্থিত) শুনে এবং খাবার সময় চারিধারে অভিবাদন ও ভাঙা ফ্রেঞ্চে আলাপ করার প্রয়াসে রীতিমত ক্লান্তি এসে যেত। বাগানবাড়িতে এসে এসব থেকে উদ্ধার পেলাম, শহর দেখার সুযোগ হ'ল। বাড়ির কর্ত্তা অতি অমায়িক সুদর্শন যুবাপুরুষ।

এদেশের বাগানে গাছেরই পরিমাণ বেশী। ফল পাতাবাহার ও ছায়ার জন্য গাছ লাগান হয়, তার প্রত্যেকটির ডালপালা সযত্নে ছাটা। বাগানের ভিতর



নক্স-ই-শাপুর। চিত্রাবলীর অবস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য

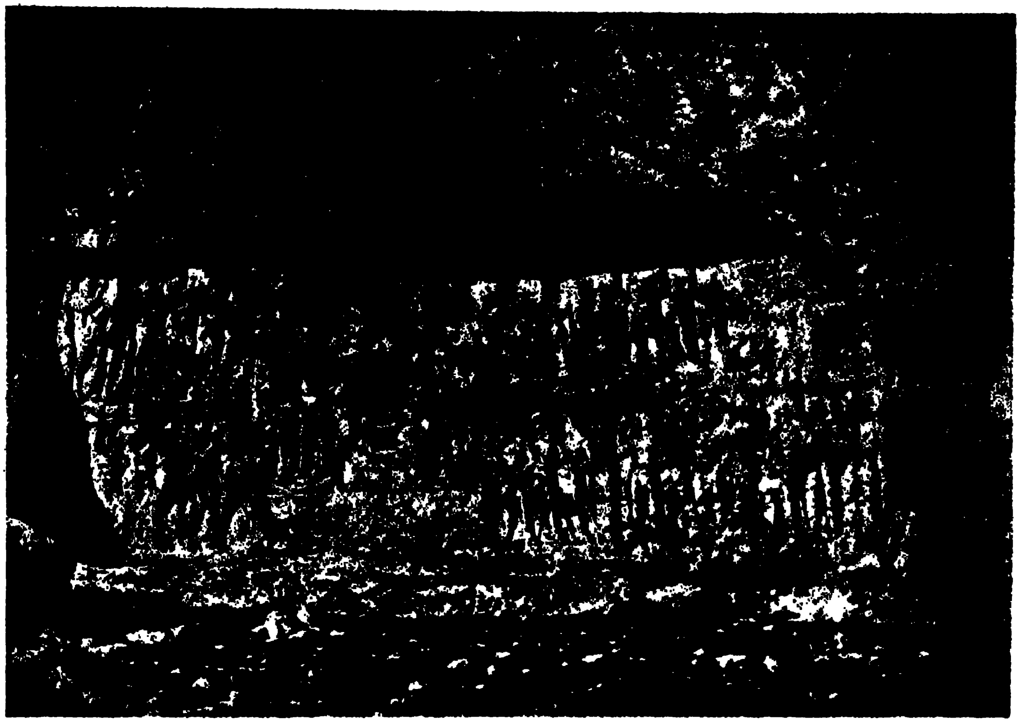
দিয়ে জলের স্রোত চলেছে, ছুটো একটা সুন্দর শান বাঁধান ছোট্ট পুকুর বা চৌবাচ্চাও আছে, মাঝে মাঝে দু-চার জায়গায় ফুলের টব বা কেয়ারী সাজান, সেগুলির ফুলের রংএ সমস্ত বাগানের সজ্জায় একটা সামঞ্জস্য এনে দেয়. কিন্তু বাগানের ভিতরের শোভা বাইরের থেকে দেখবার উপায় নেই, সবই উঁচু মাটির দেওয়ালে ঘেরা।

শিরাজে শ্রীযুক্ত আবদুল্লা খাঁ নায়ক নামে একজন নূতন স্বদেশী বন্ধু পাওয়া গিয়েছিল এবং শিরাজে দেখাশুনা যা কিছু এঁরই সৌজন্যে হয়। এঁর বাড়ি গুজরাটে, কিন্তু অনেকদিন কলকাতায় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে কাজ করেছিলেন, এবং সেই দাতাকর্ণেরই সাহায্যে বিদেশে এসে নিজের ব্যবসা (মোটর-বাহিনী) প্রতিষ্ঠা করেন।

শিরাজের পথে-ঘাটে স্ত্রী-পুরুষ সমানে চলে বেড়ায়। পর্দার ব্যাপারটা এখানে আছে, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের তুলনায় ঢের কম। হেঁটে, খোলা গাড়ীতে দলে দলে মেয়েরা বেড়ায়, যদিও সকলেরই মাথা থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত, মুখ বাদে, সেই এক কালো চাদরে ঢাকা। চাদরটা ভ্রূর উপরে কাল ফিতে দিয়ে বাঁধা, সেই ফিতের সঙ্গে একটুকরো লম্বা চতুষ্কোণ ঘোড়ার বালাকী বোনা জাল, বেনের দোকানের ঝাঁপের মত ঝুঁকিয়ে আঁটা। এই ঝাঁপের নীচে ভ্রূ, নাক মুখ ঠোঁট সবই দেখা যায়, ঢাকা থাকে শুধু কপাল ও চিবুক। রূপসী ও রসিকা বলে শিরাজ-ললনার খ্যাতি আছে।

নূতন রাজার আমলে দেশের অনেক উন্নতি হয়েছে বটে কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ বেজায় একঘেয়ে হয়ে গেছে। একে তো স্ত্রীলোকের পোষাক সবই ওই কাল চাদরে ঢাকা, আবার পুরুষ মাত্রেই এক রকম টুপি (কোলা পাহ্‌লবী—ফ্রেঞ্চসৈনিকের কেপীর মত) ও ইয়োরোপীয় কোটপাতলুন পরতে বাধ্য, কাজেই বেশভূষার বাহার দেশ থেকে একেবারে চলে গিয়েছে। বড় রাস্তার ধারে ধারে দোকানপাটও বিদেশী ছাঁদ ধরতে আরম্ভ করেছে, কাজেই এদেশের বাইরের আকার-প্রকারের বৈচিত্র্য ক্রমে লোপ পাবে ব'লে মনে হয়।

শিরাজে প্রথমে ইরাণের বুলবুল এবং ইরাণী সঙ্গীতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। বুলবুল হার্টস্ পর্য্যন্তের

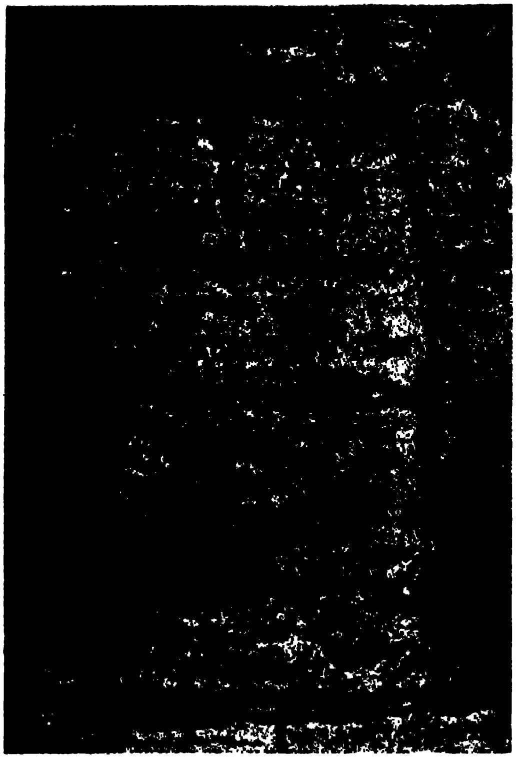


নক্স-ই-শাপুর। নৃপতি শাপুর সম্রাট সিরিয়াডিস্‌কে রোমক সৈন্যের অধিপতি করিতেছেন



নক্স-ই-শাপুর। ভগবান অহুরমজ্‌দা নৃপতি নার্সিকে (শাপুরের পিতৃব্য-২৯৩-৩০১ খৃঃ) জয়মাল্য দিতেছেন

কেনারীর মত শিস্ দিয়ে ডাকে, কিন্তু সুর অনেক মিঠা এবং ঝঙ্কারও অনেক বেশী। এদেশের গানে আমাদের কালোয়াতির মত কুস্তি লড়াই, তবলচির সঙ্গে তালযুদ্ধ, কর্কশ গিট্‌কিরি গমকের ফের খুব বেশী



নক্স-ই-শাপুর। নৃপতি শাপুরের বিজয় দৃশ্য; পরাজিত রোমক সৈন্য

নেই। সুর প্রায় সবই করুণরসাত্মক এবং গান সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমে সুধু টানা সুরে গান এবং প্রত্যেক পদের শেষে লম্বা য়োডেলীং (সুইস এবং টিরোলিয়দের মত)। দ্বিতীয় অংশ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত স্বরে মন্ত্রোচ্চারণের মত, তৃতীয় অংশে খুব ভাব দিয়ে করুণ গান, তাতে সুর স্বর তান লয়ের অনেক ফের। কিন্তু গমক গিটকিরির স্থলে য়োডেলীং (তিনটি পর পর সুরের দ্রুত ফের যথা:— র, গ, ম,—ম, গ, র) মাঝে মাঝে আমাদের কানে কর্কশ শোনায়। প্রথম অংশ—মাহুর—আমাদের কাছে বেশ শোনায়। তালের বালাই এদের খুব বেশী নেই, এবং তান ও পদ্ধতি বাদ দিলে এদের প্রাচীন সুর ও আমাদের প্রাচীন সুরে অনেক সাদৃশ্য আছে। টেহেরাণে এক ভদ্রলোক আমাদের বেহালায় প্রাচীন ইরাণী "হুমায়ুন" সুর শুনিয়েছিলেন—বিশুদ্ধ ভৈরোঁ রাগের এমন সুন্দর আলাপ আমি পারস্য দেশে শুনব বলে কখনও ভাবিনি।

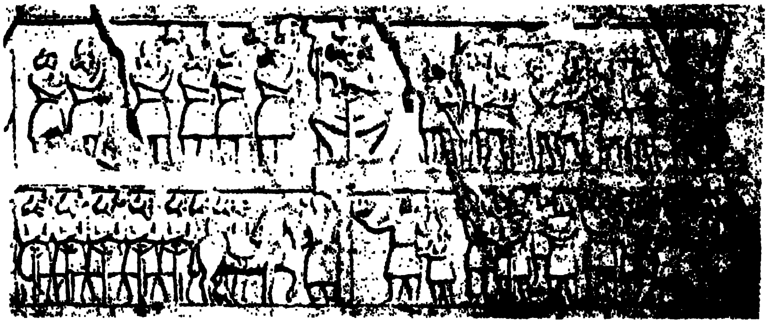
* * *

সাদীর সমাধি উদ্যানে কবিকে নাগরিক অভিনন্দন দেবার সময়, ইরাণ সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত ফুরুঘী, (পারস্যের বৈদেশিক মন্ত্রীর ভাই) আর্য্য রক্তের সম্পর্কে ইরাণ ও ভারতের আত্মীয়তা এবং সেই কারণে কবির গৌরবে ইরাণের গৌরবের কথা বলেন। এই কথার অবতারণা করার পক্ষে শিরাজই যোগ্য স্থান, কেন-না



নক্স-ই-শাপুর। দরায় মদুরা, অহুর মজ্দা ও নৃপতি নার্সি

সেমিটিক মোস্‌লেম ধর্মে যে পরিমাণ আর্য্যভাব পারস্যে সঞ্চারিত হয় তার মধ্যে সাদী ও হাফেজের কীর্ত্তি অনেকখানি এবং অন্তদিকে শিরাজ, পার্সিপোলিশ, শাপুর, পাসারগাডাই, নক্স-ই-রুস্তম ইত্যাদি আর্য্য ইরাণের প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষে ঘেরা।



নক্স-ই-শাপুর। নক্সার নমুনা, যুদ্ধজয়ের পর রাজদরবার

ইতিহাসের উষাকালে আর্য্যগণের পিতৃভূমি কোথা ছিল সে কথার মীমাংসা এখনও হয়নি। উত্তর মেরু অঞ্চল, বল্টিক সমুদ্র, কাস্পিয়ান সমুদ্র কূল, আর্মেনিয়া, কাফকাশ পর্ব্বত (ককেশস) এসিয়ায় রুশ দেশের দক্ষিণ তৃণপ্রান্তর (ষ্টেপস্) ইত্যাদি নানামুনির নানা মত নিয়ে তর্কবিতর্ক এখনও চলেছে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদের দেবভূমি, বা বেন্দিদাদের "আর্য্যানেম ব্যাজো" কোথায় তাহা এখনও স্থির হয় নি। প্রাচীন পারসীক প্রবাদ মতে আর্য্যদের আদি স্থান "আর্য্যানেম ব্যাজো"। শৈত্যাধিক্যের ফলে আর্য্যরা এই ভূস্বর্গ ছেড়ে সুঘদা ও মুরুদেশে (বোখারা এবং মের্ভ?) চলে আসতে বাধ্য হন। সেখান থেকে বাখধি (বাল্‌খ) বাখধি থেকে নিশয়, হারয়ু (হিরাট) এবং



নক্স-ই-শাপুর। নৃপতি দ্বিতীয় বহরামের শিকার অভিযান



শুস্টর। নৃপতি শাপুর নির্ম্মিতকারুন নদীর বাঁধ, বন্দ-ই-কইসর

বৈকরেতা (কাবুল) অঞ্চলে ক্রমে ইহারা পৌছান। এই সময়ের পরে আর্য্যজাতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একদল পূর্ব্বাঞ্চলে আরাবৈতী, হয়েতুমন্ত এবং হপ্ত হিন্দু (সপ্তসিন্ধু, ভারতবর্ষ) দেশে ছিল, অন্যটি পশ্চিমে উর্ব্ব, বেহ্‌রকন রাগ, বরেণ ইত্যাদি দেশে ছিল।

পুরাণে প্রবাদে যাই বলুক এটা নিশ্চিত যে খৃঃ পূঃ বিশ থেকে চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যে কতকগুলি জাতি অজ্ঞাতদেশ থেকে ইতিহাসজ্ঞাত দেশে—যথা বাবিল সাম্রাজ্য, হিটাইট বা খত্তিদেশ, ভারতের পঞ্চনদ ইত্যাদি—প্রবেশ করে, যাদের দেবদেবতা (এবং ভাষাও বোধ হয়) একই প্রকারের ছিল এবং তারাই পরে আর্য্য জাতি বা আর্য্যভাষাভাষী জাতিসমষ্টি রূপে পরিচিত হয়েছে। খৃঃ পূঃ বিংশ শতকে খামুরাব্বির বংশের রাজত্বকালে কাস্তাইট নামের ঐরূপ একটি জাতি বাবিলন সাম্রাজ্য আক্রমণ করে এবং ১৭৬০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে গণ্ডাশ বা গদ্দাশ নামে দলপতির অধীনে এরা বাবিলন জয় করে। এদের প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্য্যশ (বা সূর্য্য)। খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকে অসুর দেশের সঙ্গে এই কাস্তাইটদের সন্ধি স্থাপনার কথাও আমরা সে-দেশের ইতিহাসে পাই। প্রাচীন হিটাইটদের রাজধানী প্টেরিয়াতে (আধুনিক বোঘাজ ক্যোই) পাওয়া কীলক-লিপি অনুশাসনসকলের মধ্যে হিটাইট ও মিত্তানি জাতির মধ্যে কয়েকটি সন্ধিস্থাপনের কথা পাওয়া যায়। এই মিত্তানি জাতি আর্য্যবংশের বলে মনে হয়, কেন-না একটি সন্ধিপত্রে এরা ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্যযুগল (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) এই সব বৈদিক দেবতার নামে শপথ গ্রহণ করেছে। শেষোক্ত ঘটনা থেকে অনুমান করা চলে যে ঐ সময় পর্য্যন্ত (খৃঃ পূঃ ১৩৫০) ইরাণ ও ভারতের আর্য্যদের ধর্ম্ম একই ছিল। পরে ঋষি জরথুষ্ট্র (জোরোয়াষ্টর) তুরানীয় ম্যাগিদের ধর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে সমন্বয় করে ইরাণের জরথুস্ত্রি (পারসী) ধর্ম্মের স্থাপনা করেন। আরও পরের ইরাণের আর্য্যরাজকুলের ও

ধর্মগ্রন্থের ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষা যে একই জাতির সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সময় ইরাণ ও ভারতের মধ্যে আদান-প্রদান খুবই ছিল, এবং হখামনিষ্য (বা অকমনিষ্য) ও শাশানীয় বংশের নৃপতিদের সময়ে পারসীক সেনাবাহিনীতে অনেক ভারতীয় সৈন্য সুদূর পশ্চিম এশিয়া—এমন কি গ্রীস—পর্য্যন্ত নানাদেশে বহুযুদ্ধে রক্ত দান করেছে, এসব কথা ত এখন ঐতিহাসিক সত্য। কালের চক্রে দুই দেশের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়েছে—এমন কি "ইরাণ" শব্দ যে আবেস্তার ঐর্য্যিয় (আর্য্যভূমি) সেকথা লোকে ভুলে গেছে।

* * *

অনেক চেষ্টার পর শিরাজ থেকে শাপুর দেখতে যাবার ব্যবস্থা করলাম। নায়ক মহাশয়ের একখানি গাড়ী সারাদিন ধরে যাতায়াতের জন্য (প্রায় ১৮০ মাইল) ৪৫ টুমানে (প্রায় ৪½ পাউণ্ড) ঠিক হ'ল। আমি একলাই যাব স্থির হ'ল, আমাদের কর্ণধার শ্রীযুক্ত কৈহান একজন সশস্ত্র সেপাই রক্ষী এবং একজন দোভাষী জোগাড় করে দিলেন।

ভোরের অন্ধকারে সুষুপ্ত শিরাজের ভিতর দিয়ে রওয়ানা হলাম। পারস্যদেশে প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্নের মধ্যে এইটিই আমি প্রথম দেখতে চলেছি সুতরাং মনে উৎসাহ যথেষ্ট। কাজেরুণ থেকে যে পথে শিরাজ এসেছিলাম এবার সেই পথে ফিরে কাজেরুণ ছাড়িয়ে অন্য রাস্তায় যেতে হবে।

উষার আলোয় পাহাড় উপত্যকার আবছায়া দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল, ডুষ্টর জানের গায়ের ও মাথায় তুষার আবরণ সকালের প্রথম রোদে গোলাপী আভাযুক্ত, নীচের অংশ ধূসর, নীল, এবং বেগুনী রঙের নানা ছায়ায় শোভিত। বাতাস খুবই ঠাণ্ডা, তার উপর মোটর তীরবেগে ছুটেছে, শীতে জমে যাবার উপক্রম।

চশ্‌মে সালমিনের ঝরণায় পৌঁছবার আগেই রোদ উঠ্‌ল। আশে-পাশের পাহাড়গুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চল্‌লাম। দেখ্‌লাম আমার আগের অনুমান-মত পাহাড়ের গায়ে অনেক গুহা এবং কাটল রয়েছে, কতকগুলিতে কৃত্রিম গঠনের চিহ্ন স্পষ্টই দেখা গেল, কয়েকটার সামনে লুপ্তপ্রায় ওঠানামার পথের চিহ্ন রয়েছে মনে হ'ল। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই গুহাগুলি পরীক্ষা করা এদেশের প্রত্নতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌দের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন।

এই উপত্যকা পার হয়ে পরের পাহাড়গুলিতে কাজেরুণের কাছে একটি প্রাচীন কবরস্থান, তার কয়েকটি কবরে সিংহমূর্ত্তি বসান, কয়েকটি প্রাচীন ভগ্নাবশেষ এবং পাহাড়েরই গায়ে কোনও কাজার নৃপতির দরবার-দৃশ্য খোদাই করা আছে।

কাজেরুণে এক সরাইয়ে চা খেয়ে পথের রসদ হিসাবে রুটি, ডিম, মাংসের কাবাব শাক-সব্জী ইত্যাদি কেনা গেল। বুশির থেকে কাজেরুণ আস্‌বার সময়, শাপুরের কথা জানা থাকায়, সারা পথ দেখতে দেখতে এসেছিলাম কিন্তু প্রাচীন নগরী বা গড়ের উপযুক্ত জায়গা সে পথে কোথাও চক্ষে পড়েনি, কেন-না সে পথ পাহাড়ের পিঠ, নদী এবং উর্ব্বর জমি এই তিনটে অত্যাবশ্যক জিনিষ থেকে দূর দিয়েই এসেছিল। এবার সে-পথ ছেড়ে নূতন পথে আমরা ক্রমেই পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগলাম। কিছু দূর গিয়ে নদী এবং উর্ব্বর উপত্যকা দুই দেখা গেল, পর্ব্বতগাত্রও সোজা, উঁচু, অর্থাৎ দুর্গম। বুঝলাম এবার উপযুক্ত স্থানে এসে পৌঁছেচি।

আরও একটু দূরে দেখা গেল যে নদী উপত্যকা ছেড়ে পাহাড়ের শ্রেণী ভেদ ক'রে চলেছে। যেখানে নদী গিরিসঙ্কটে ঢুকেছে তার ডানদিকে নদীর পার থেকে পাহাড়ের উপর দিকে একটি প্রাচীন পথের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এবং সেখানেই পাহাড়ের উপরে কতকগুলি আকৃতিহীন স্তূপ পড়ে রয়েছে। পাহাড়ের গায়ে অগণিত পাথরের খণ্ড, অধিকাংশই কৃত্রিম (ইটের) আকারের। প্রসিদ্ধ ডুনবলা দুর্গের এবং বিশাপুরের (শাপুরের সুকীর্ত্তি) এখন এই অবস্থা।

নদীর ডান পাড়ের পাহাড়ে খোদিত চিত্রের একটি মাত্র অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে। অন্য পারের নক্সাগুলি ধর্মান্ধ কীর্ত্তিনাশাদের হাত থেকে অব্যাহতি রেহাই পেয়েছে। জায়গাটির আধুনিক নাম নক্স-ই-শাপুর।

অন্য পারের নক্সাগুলি দেখা এক বিপজ্জনক ব্যাপার। প্রথমতঃ সোজা পার হ'তে গিয়ে দেখা গেল যে পাড় অসম্ভব উঁচু এবং নদীর জলও গভীর। প্রায় দু-মাইল

পেছিয়ে গিয়ে নদী পার হওয়ার পথ যদি-বা পাওয়া গেল, সেখানে আবার নদীর বুকে এত বড় বড় নুড়ি রয়েছে যে গাড়ী ঐ খরস্রোতের ভিতর দিয়ে চালান অসম্ভব, কেননা অনেক এঁকে-বেঁকে নদীর গভীর জায়গাগুলি এড়াতে হয়। গাড়ী ত নদীর মাঝে জলে চুবুনি খেয়ে খেয়ে গেল, সেপাইভায়া আশপাশের ক্ষেত থেকে লোক ধরে এনে সেটা উদ্ধার করলেন, আমি জুতো মোজা খুলে নিয়ে কোন মতে জলের ঠেলা সামলে হেঁটে পার হলাম, পাণ্টলুন প্রায় কোমর পর্য্যন্ত ভিজল। ওপারে গিয়ে দেখলাম যে নক্সাগুলি পাহাড়ের গায়ে অনেক উঁচুতে আঁকা (কীর্ত্তিনাশাদের এড়াবার জন্ত) এবং সেখানে পৌঁছবার একমাত্র পথ একটি সরু পয়ঃপ্রণালীর বাইরের দেওয়ালের উপর দিয়ে। পয়ঃপ্রণালীটির অন্ত দেওয়াল ঐ পাহাড়ের খাড়া গাত্র এবং ভিতরের জল অধিকাংশ জায়গায় ডুব জলের বেশী, কাজেই ভিতর দিয়েও যাওয়া চলে না। দেওয়ালটি কোথায়ও এক হাতের বেশী চওড়া নয়, মাঝে মাঝে আবার জল পড়ে পিছল হয়ে গেছে এবং দেওয়ালের অন্ত পাশে আট-দশ থেকে ষাট-সত্তর ফুট গভীর খাদ—অর্থাৎ পপাত চ মমার চ।

যাই হোক ঐ পথে প্রায় আধ মাইল হেঁটে নক্সাগুলি দেখলাম। বড় মূর্ত্তিগুলির মুখ নাক ছেনী বাটালী দিয়ে নষ্ট করা হয়েছে, অন্তগুলি প্রায় ঠিকই আছে, কালের প্রকোপে যেটুকু গেছে গেছে। কিন্তু এখন ঐ পয়ঃপ্রণালীর জল কয়েকটি নক্সা ধুয়ে বয়ে যাচ্ছে, সুতরাং এর ব্যবস্থা না হ'লে জলের প্রক্রিয়ায় সেগুলি লোপ পাবে।

২৪০ খৃষ্টাব্দে শাশানীয়-বংশের নৃপতি প্রথম শাপুর ইরাণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। ২৪১—২৪৪ খৃঃ এবং ২৫৮—২৬০ খৃষ্টাব্দে রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইহার সংঘাত হয়। প্রথম অভিযানে শাপুর ভূমধ্যসাগরের কূলে এণ্টিয়োখ পর্য্যন্ত হস্তগত করেন কিন্তু কিছু দিন পরে রোমকগণ পারসীক সৈন্তকে পরাজিত ক'রে প্রায় সমস্ত দেশই পুনরুদ্ধার করে। দ্বিতীয় অভিযানে রোমক সৈন্ত বিধ্বস্ত এবং রোমক সম্রাট ভ্যালেরিয়ান বন্দী হন, পারসীক সৈন্ত এশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত রোমক সাম্রাজ্য লুণ্ঠন এবং ধর্ষণ ক'রে ফিরে আসে।

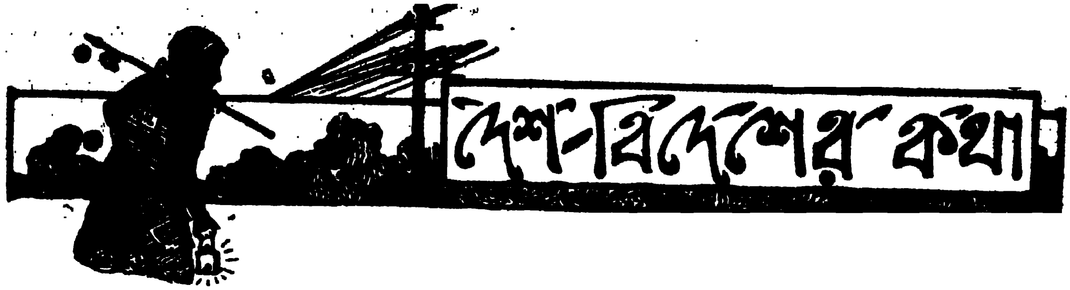
নক্স-ই-শাপুরের খোদিত চিত্রাবলী প্রধানতঃ এই দ্বিতীয় বিজয় অভিযানের স্মারক, যদিও এখানে অন্ত শাশানীয় নৃপতিদের চিত্রও আছে।

নক্সাগুলি আমাদের দেশের ঐ জাতীয় কাজের মত গভীর করে কাটা নয়, সুতরাং মূর্ত্তিগুলির গঠন ভারতীয় খোদিত মূর্ত্তির মত সুডৌল নয় (মডেলীং ঢের কম)। এখানের কারুকার্য্যেও ভারুত সাঁচীর মত সূক্ষ্ম কার্য্যের নিদর্শন নাই। নক্সার ছাঁদ আসুরিয় আদর্শের, কিন্তু গ্রীক পন্থার প্রভাব বেশ আছে বলে মনে হয়। এইগুলির সঙ্গে সমসাময়িক এবং পূর্ব্বকালের ভারতীয় খোদিত চিত্রাবলীর তুলনা করলে ললিতকলার ক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব কত বেশী ছিল সেটা বেশ বুঝা যায়।

হতভাগ্য ভ্যালেরিয়ান বহুকাল পরে বন্দী অবস্থায় মারা যান। মরিবার পর তাঁর চামড়া খুলে, খড় পুরে, জনসাধারণকে দেখান হয় এইরূপ কথিত আছে। শাপুর রোমক বন্দীদের দ্বারা পারস্তের দক্ষিণ-পশ্চিমে শুষ্টর নগরীর কাছে কারুন নদীর উপর বাঁধ তৈরি করান, সে বাঁধ এখনও আছে। এদেশে তার নাম, বন্দ-ই-কইসর, কইসর (সীজর) ভ্যালেরিয়ানের স্মৃতি রক্ষা করছে।

* * *

ষোলই এপ্রিল আমরা শিরাজ পৌঁছাই। ছয়দিন ওখানে থেকে ২২শে ভোরে আমরা ইস্ফাহানের দিকে রওয়ানা হলাম। পথে পার্সেপোলিস, নক্স-ই-রুস্তম, মেশেদ-মুরগাব, (পাসারগাডাই) পড়বে। এবার প্রাচীন, গৌরবময় পারস্তের সঙ্গে পরিচয় হবে, কাজেই উৎসুক হয়ে যাত্রা করা গেল। শিরাজের স্মৃতিচিহ্ন রূপে কিছু কাঠের, রূপোর, পিতলের এবং গালিচার কাজ সংগ্রহ করা গেল। দু-একটি প্রাচীন সীল এবং একখানি ছোট চিত্রিত পুঁথিও কেনা গিয়েছিল। দরদস্তুর এখানে খুবই করতে হয়, তবে পারস্তদেশে মেহ্‌মানের (অতিথি) খাতির সর্ব্বত্রই, এবং নায়কমশায়ও ছিলেন সুতরাং খুব বেশী চড়া দাম দিতে হয়নি।



ভারতবর্ষ

খদ্দর উৎপাদন—

১৯৩১ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গত পনর মাসে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন খদ্দরের হিসাব সংপ্রতি বাহির হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশ—

১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত গত ১৫ মাসে ৭২,১৫,৫০২৲ টাকার এবং ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৬৯,৪১,৯৩২৲ টাকার খদ্দর উৎপন্ন হইয়াছিল। এত টাকা মূল্যের খদ্দরের ওজন ও পরিমাণের হিসাব এইরূপ :—

	সময় পর্য্যন্ত ৩১-১২-১৯৩১	সময় পর্য্যন্ত ৩১-১২-১৯৩০
পাউণ্ডের ওজনে	৫৩,২৫,৩৪০	৫২,৬৪,৮৫৫
গজ হিসাবে	১৭৫,৭৬,৮৭৬	১৪৯,৭৫,২৮৭

অর্থাৎ ১৯৩০ সন অপেক্ষা ১৯৩১ সনে শতকরা ১৭ গজ বেশী খদ্দর উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিক্রয়ের পরিমাণ এইরূপ :—১৯৩১ সনে ৯০,৯৪,৯৩২৲ টাকা; আর ১৯৩০ সনে ৮৩,৩১,৮৪২৲ টাকা।

এই পরিমাণ খদ্দরের উৎপাদন কার্য্য ৭ হাজার গ্রাম ব্যাপিয়া হইয়াছে ও ইহাতে ২ লক্ষ কাটুনী ও পাঁচ হাজার তাঁতী প্রতিপালিত হইয়াছিল।

বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ—

গত ২৫শে আগষ্ট আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি এই মর্ম্মে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন যে, মানেকচকে মিউনিসিপালিটির দোকান ঘরগুলি এক বৎসরের জন্ত এই সর্ত্তে ভাড়া দেওয়া যাইবে যে, ঐ সকল দোকানে বিদেশী কাপড় বিক্রয় বা মজুত করা হইবে না।

স্বর্ণ রপ্তানি—

ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ৭৮,০৫,৩৪,২৪৭ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

শ্রীযুত কেলকারের দান —

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও গ্রন্থকার শ্রীযুত এন্-সি-কেলকার তাঁহার ৬১ বৎসর জন্মতিথি উপলক্ষে পুনা তাশনাল কলেজে ১০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

শেঠ গোবিন্দদাসের ত্যাগ—

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস-নেতা শেঠ গোবিন্দদাসের সহিত পিতা দেওয়ান বাহাদুর শেঠ জীবনদাসের রাজনৈতিক কারণে মতভেদ উপস্থিত হয়। শেঠ জীবনদাস সমস্ত সম্পত্তি নিজের ও পুত্রের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতে চাহেন। এ প্রস্তাব শেঠ গোবিন্দদাসের মনঃপূত হয় নাই। তিনি তাঁহার অংশের দাবি একেবারেই ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাপ্য অংশের মূল্য অন্যূন এক কোটী টাকা। তিনি জব্বলপুর জিলা আদালতে পিতাকে একখানি ত্যাগপত্র রেজিষ্টারি করিয়া দিয়াছেন।

—

বাংলা

বাংলার লোকসংখ্যা—

১৯৩১ সনে যে লোকগণনা হইয়াছিল তাহার একটি বিবরণ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিবরণে আছে—

বাংলার মোট লোকসংখ্যা পাঁচ কোটী দশ লক্ষ সাতাশী হাজার তিন শত আটত্রিশ। ইহার মধ্যে পুরুষ দুই কোটী পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতান্ন হাজার আট শত ষাট; স্ত্রীলোক দুই কোটী পঁয়তাল্লিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার চারি শত আটাত্তর। গত দশ বৎসরে বাংলার শতকরা ৭·৩ হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি এক হাজারে ৭৩ জন বাড়িয়াছে।

মোট লোক ৫ কোটী ১০ লক্ষ ৮ হাজার ৩ শত ৬৮ জনের মধ্যে মুসলমান দুই কোটী আটাত্তর লক্ষ দশ হাজার এক শত, হিন্দু দুই কোটী বাইশ লক্ষ বার হাজার উনসত্তর। অর্থাৎ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বেশী পঞ্চান্ন লক্ষ আটানব্বই হাজার একত্রিশ জন। অনুপাত হিসাবে বাংলায় তাহা হইলে মুসলমান হইল শতকরা চুয়ান্ন জন, হিন্দু হইল তেতাল্লিশ জন, অন্তান্ত তিন জন।

বাংলায় শিক্ষিত হিন্দু পুরুষ ২৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৭ শত ৮১ জন, স্ত্রীলোক ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯ শত ১৬ জন; শিক্ষিত মুসলমান পুরুষ ১৪ লক্ষ ৬ হাজার ৩ শত ৫ জন, স্ত্রীলোক ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ১ শত ১২ জন। পুরুষ মোট ৯,৩৮,৫০৫, স্ত্রীলোক মোট ৯৯, ৯৩৫।

বাংলার পাট—

১৯৩১ সনে বাংলায় পাট উৎপন্ন হইয়াছিল ৫৫,৬৬,৫০০ গাঁট, এবারে উৎপন্ন হইবে মোটামুটি ৫৮,৪৪,৬০০ গাঁট। গেল বৎসর ৬৭ লক্ষ গাঁট বিক্রয় হইয়াছিল। এবার অনুমান ৭০ লক্ষ গাঁট বিক্রয় হইবে। তাড়াতাড়ি পাট বিক্রয় না করিয়া, কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া পরে বিক্রয় করিলে কৃষকগণ অধিকতর লাভবান হইতে পারিবে আশা করা যায়।

দরিদ্র-ভাণ্ডার স্থাপনে দান—

হুগলীর শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র পাল দরিদ্রের কল্যাণের জন্ত এক অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠাকল্পে সাড়ে তিন টাকা সুদের ৩০ হাজার টাকার

কোম্পানীর কাগজ জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে প্রদান করিতে চাহিয়াছেন।

সৎকার্য্যে দান—

হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাজসাহীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন :—

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি	৫০৲
সাধারণ পুস্তকালয়	২৫৲
দীনবন্ধু পাঠশালা	২০৲
বোবা কালা বিদ্যালয়	২০৲
সমাজসেবক সঙ্ঘ	১৫৲

দীনবন্ধু সরকার মহাশয়ের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে দুই বন্ধু একখানা ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ম্যাপ দান করিয়াছেন।

দান—

বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুর স্থানীয় রিলিফ কমিটির হস্তে ৫০০৲ শত টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন। এই টাকাটা উক্ত কমিটি কিরূপ ভাবে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানিতে চাহে। কমিটিকে একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ করিতেছি।—খুলনা

অন্ধ গ্রাজুয়েট—

শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র রায় কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯২৭ সনে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবার তিনি ইংরেজী সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ন্যাশন্যাল ফণ্ড সোসাইটি—

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীরা ইহার প্রতিবাদস্বরূপ স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সনের ৩০এ আশ্বিন স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের জন্য চাঁদা তুলিয়া এই ভাণ্ডার খোলা হয়। এই সময় হইতে অদ্যাবধি প্রতি বৎসর এই ভাণ্ডার হইতে তাঁত ও চরকার প্রচলনের জন্য সাহায্য দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু ইহার সম্পাদক। ১৯ র ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায়, এই ভাণ্ডারে মোট ৭২,৯৪১।৵৩ পাই মজুত আছে।

বাংলার লবণ—

'২৪ পরগণা বার্ত্তাবহে' প্রকাশ,—বাংলায় লবণ তৈরির জন্য দুইটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—(১) দি প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড (২) দি ন্যাশন্যাল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড। প্রথমোক্ত কোম্পানী কাঁথির সমুদ্রকূলে এবং দ্বিতীয় কোম্পানী সাগরদ্বীপে ফ্যাক্টরী স্থাপন করিবেন।

পরলোকে ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ৯ই ভা. বৃহস্পতিবার দেওঘরে কুণ্ডার বাটিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এক সময়ে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ও 'পুষ্পপাত্রে'র সম্পাদক ছিলেন। 'পথের কথা', 'স্মৃতি-রেখা', 'ব্যর্থতা', 'ভগবানের দান' নামে কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তিনি দেওঘরে রামকৃষ্ণ সাধন মন্দিরের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গবাণী একজন একনিষ্ঠ সেবক হারাইলেন।

বিধবা বিবাহ—

বরিশাল জেলা নিবাসী শ্রীযুত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ৺পতাকীচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর শুভবিবাহ বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভায় সম্পন্ন হয়। পণ্ডিত গিরিজাকান্ত গোস্বামী কাব্যসাংখ্যস্মৃতিতীর্থ মহাশয় পৌরোহিত্য করেন।

অসবর্ণ বিবাহ—

৯ই শ্রাবণ সোমবার অসবর্ণ বিবাহ সমিতির সহায়তায় কলিকাতায় একটি অসবর্ণ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর শ্রীযুত মাখনলাল দাসশর্ম্মা (বৈদ্য) এম, বি। কন্যা শ্রীমতী অনুরূপা (ম্যাট্রিক্)। কন্যার সহোদর শ্রীযুত আদিনাথ ভাদুড়ী (ব্রাহ্মণ) কন্যা দান করেন। পণ্ডিত গিরিজাকান্ত গোস্বামী মহাশয় শুভবিবাহে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকার্য্যের তত্ত্বাবধান ও সাহায্য করেন।

—

বিদেশ

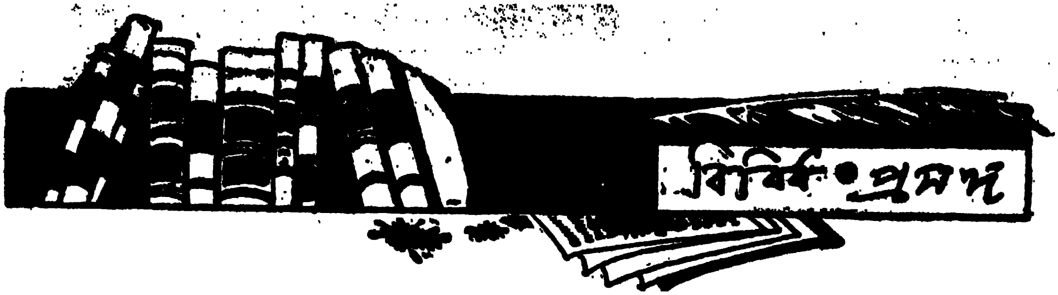
জার্ম্মেনীতে ভারতীয় ছাত্রগণকে বৃত্তি দান—

জার্ম্মেনীর ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ ডাই ডয়টশে একাডেমী প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ভারতীয় ছাত্রকে সেখানে অধ্যয়নের সুবিধার জন্য বৃত্তি দিয়া থাকেন। ১৯৩২-১৯৩৩ সনের জন্য নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে,—(১) এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিঃ এস, কে সাকসেনা, এম. এ। ইনি বর্ত্তমানে দিল্লীর হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইনি ব্রেসলাউ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন। (২) লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ এ, কে, ঘোষ, এম, এস, সি (রসায়ন বিদ্যা) বর্ত্তমানে বেঙ্গল-কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে গবেষণা করিতেছেন। ইনি ড্রেসডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিবেন। (৩) বোম্বাইয়ের রয়েল ইনষ্টিটিউট অফ্ সায়েন্সের মিঃ হীরা সিং, বি-এস, সি (কৃষিবিদ্যা)—হোহেনহাইম কৃষি বিদ্যালয়ে গবেষণা করিবেন। (৪) পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ বালমুকুন্দ পিপলানি, বি এস-সি (কমার্স) এম-এ (অর্থনীতি) নিউরেমবুর্গ কমার্শিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিবেন।

পূর্ব্বে যে সব ভারতীয় ছাত্রকে উক্ত ইনষ্টিটিউট বৃত্তি দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ৩ জনকে বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে—(১) মিঃ এন, কে, রানডে, এম এ, এল এল বি, পুণা। (২) মিঃ জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর। (৩) মিঃ ডি, জি, লোণ্ডে, এম এ, কোলাপুর।

পূর্ব্বকার ছাত্রদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৩৩ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত বৃত্তি পাইবেন—

(১) মিঃ জে, সি, গুপ্ত এম, বি, (কলিকাতা) (২) মিঃ বি, এস, শ্রীকান্তন, ডি এস সি (ঢাকা)। (৩) মিঃ আর, কে, আয়াঙ্গার, বি ই (মহীশূর)। (৪) মিঃ আর, কে, দত্ত রায়, এম এস সি (টাটা কোম্পানী)। (৫) মিঃ কর্ম্মদীপক দত্ত, বি এস সি (কলিকাতা) ও (রেঙ্গুন)। (৬) মিঃ এইচ কে ভগালে, এল, এম ই (বোম্বাই)। (৭) মিঃ চিত্তরঞ্জন সরাট, এম এস সি (কলিকাতা)। (৮) কুমারী ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু, এম বি (কলিকাতা)। (৯) মিঃ বি বি মুণ্ডে (বোম্বাই)। (১০) মিঃ নারায়ণচন্দ্র চাটুয্যে, এম এস সি (কাশী) (১১) মিঃ কে এ ভট্ট (সিংহল)।



সরকারী সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষকে যে নূতন শাসনবিধি দিবেন বলিয়াছেন, তদনুসারে গঠিত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কোন্ কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকেরা কত গুলি সভ্যের পদ পাইবেন, বিলাতী গবর্ন্মেণ্ট তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। যে-যে সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকেরা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিজেদের মধ্যে হইতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দ্বারা স্থির করিতে হইবে। দেশের সমগ্র অধিবাসীবৃন্দকে গবর্ন্মেণ্ট আঠারটা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এরূপ করিবার এক মাত্র কারণ হইতে পারে এই অনুমান, যে, প্রত্যেক ভাগের লোকেরা অপর সব ভাগের লোকদের হিতাহিত দেখিবে না, বরং সুবিধা পাইলেই তাহাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে! এমন কি, একই ধর্ম্মের পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের স্বার্থ রক্ষা করিবে না, বরং অনিষ্ট করিতে পারে, এই অনুমানে স্ত্রীলোকদিগকে সামান্য কয়েকটি সভ্য পদ দেওয়া হইয়াছে!

এই ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যে মন্তব্যপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার গোড়ার দিকেই তিনি বলিয়াছেন, সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও শ্রেণীগুলির প্রত্যেকে ভাগবাঁটোয়ারাটার এই দোষই প্রথম দেখাইবে যে ইহা তাহাদিগকে তাহাদের আশা বা দাবি অনুযায়ী যথেষ্ট সভ্যপদ দেয় নাই। তিনি চালাক লোক বলিয়া বাঁটোয়ারা-পত্রের প্রধান দোষ ও অনিষ্টকারিতা হইতে লোকের মন অন্য দিকে চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বাঁটোয়ারাটা যে হিন্দুদিগকে বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কিংবা শ্রেণীবিশেষের লোকদিগকে যথেষ্ট সভ্যপদ দেয় নাই, ইহা তাহার একটা দোষ হইলেও প্রধান দোষ নহে। প্রধান দোষ এই, যে, ইহা সমগ্র ভারতীয় মহাজাতিকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া সকলের একযোগে কাজ করিবার এবং কাজ করিবার ইচ্ছার পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। যে-কারণেই হউক, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে অসদ্ভাব সন্দেহ অবিশ্বাস ঈর্ষ্যাদ্বেষ ছিল, ইহা তাহাকে স্থায়িত্ব দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। যেখানে অবিশ্বাসাদি কম ছিল, সেখানে ইহা দ্বারা তাহা বৃদ্ধি পাইবে, যেখানে ছিল না সেখানে উৎপন্ন হইবে। ভারতবর্ষে মহাজাতি গঠনের সম্ভাবনাকে ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট কখনও উৎসাহ দেন নাই, লর্ড মিণ্টোর আমলে তাঁহারই প্ররোচনায় মুসলমানদের যে ডেপুটেশ্যন তাঁহার নিকট স্বতন্ত্র প্রতিনিধি ইত্যাদি বিশেষ অধিকারের দাবি করিয়াছিল এবং যাহা তিনি মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পরস্পর পার্থক্যবোধ রূপ বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মহাজাতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। এখন ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল সেই প্রক্রিয়ার বাধা দিবার জন্য এই ভাগবাঁটোয়ারা দ্বারা তাঁহাদের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাই ইহার সর্ব্বাধিক অনিষ্টকারিতা।

প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় বা শ্রেণী যে নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি চাহিয়াছিল, ইহা সত্য নহে। হিন্দুরা তাহা চান নাই। নারীদের নেত্রীরা তাহা চান নাই। প্রধান দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান নেতারা—বিশেষ করিয়া বাঙালী খ্রীষ্টিয়ানেরা তাহা চান নাই।

এখন কেবল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে ভারতীয় মহাজাতির দিক্ হইতে অকেজো ও অনিষ্টকর করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা কি প্রকারে গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনপ্রণালীর বিদ্রূপে পরিণত হইবে, তাহার আভাস এখনও পাওয়া

যায় নাই। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা প্রকাশে বিলম্বের এই কারণ দেখান হইয়াছে, যে, সমগ্রভারতীয় ফেডারেশ্যনে দেশী রাজ্যগুলির স্থান ও অধিকার ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা এখনও হয় নাই। তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে ভাগবাঁটোয়ারার প্রকৃতি প্রকাশিত হইলে পাছে লোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারে, যে, ভারতবর্ষকে বাস্তবিক স্বশাসন ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে না, এবং সেই বোধ জন্মিবার ফলে প্রাদেশিক ভাগবাঁটোয়ারার সমালোচনা আরও অধিক লোকে আরও তীব্রভাবে করে, ইহাও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা প্রকাশে বিলম্বের একটা কারণ হইতে পারে।

এখন ত শুধু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-পদের ভাগবাঁটোয়ারা হইয়াছে। চাকরি আদি আরও কত জিনিষের ও বিষয়ের ভাগবাঁটোয়ারা স্বনিযুক্ত ও আমাদের দুর্ব্বলতানিযুক্ত ভারতের মনুষ্যদেহধারী ভাগ্যবিধাতাদের মনে আছে, কে বলিতে পারে?

আঘাত এবং অপমানটা হিন্দুদের উপরই বেশী হইয়াছে। তাহারা তাহার যোগ্য। কারণ, প্রধানতঃ হিন্দুদের চেষ্টা, স্বার্থত্যাগ, দুঃখভোগ ও বুদ্ধিমত্তার জন্যই ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষে স্বশাসন প্রবর্ত্তিত করিবার অভিনয়কল্পে অল্পস্বল্প অধিকার ভারতীয়দিগকে দিয়া আসিতে হইতেছে। অবশ্য তাহার সঙ্গে গুরুতর অনধিকার মিশাইয়া রাখিতে এবং ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের হাতে প্রভূত এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখিতেও ইংরেজ জাতি ভুলিয়া যায় নাই। হিন্দুরা যে-গুণে অপমান ও আঘাতের যোগ্য, তাহা বলিলাম। কিন্তু যে-দোষে তাহাদিগকে আঘাত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহা বুঝা আরও বেশী দরকার; কারণ তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক। ইহা আমরা আগে আগে দেখাইয়াছি, যে, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদের মধ্যেও কতকটা জাতিভেদ ও তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ও অনিষ্টকর অঙ্গ অস্পৃশ্যতা আছে। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জাতিভেদ আছে, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদের মধ্যে সেরূপ নাই। অস্পৃশ্যতাও ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ উগ্রমূর্ত্তিতে বিদ্যমান আছে, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদের মধ্যে সেরূপ নাই। জাতিভেদ ও তাহার সর্ব্বাধম বিষ অস্পৃশ্যতা তাহারা হিন্দুদের নিকট হইতে পাইয়াছে। হিন্দুদের এই "রক্তগত শনি"র সুযোগে যদি শাসনকর্ত্তার জাতি আপনাদের প্রভুত্ব ও অন্যান্য পার্থিব সুবিধা সুদৃঢ় রাখিতে চায়, তাহাতে বিস্মিত হইয়া প্রতিবাদ করা অসঙ্গত না হইলেও, প্রকৃত প্রতিকার প্রতিবাদে নহে, আত্মসংস্কারে। সমগ্র হিন্দুসমাজ হইতে অবনত জাতিদিগকে আলাদা করায় হিন্দুদের শক্তি যেমন হ্রাস পাইবে, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদের সমগ্র সমাজ হইতে তাহাদের অবনত লোকদিগকে আলাদা করিয়া তাহাদেরও শক্তি হ্রাসের ব্যবস্থা কেন করা হয় নাই, সজল আঁখি বা সরোষ চক্ষু সহকৃত এমন অভিযোগও বৃথা! যাহারা বাস্তবিক তেমন শক্তিমান নয়, তাহা-দিগকে শক্তিহীন করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক; যাহারা ভাল করিয়া জাগে নাই, অপমান ও আঘাত দ্বারা তাহাদের জাগৃতির সম্ভাবনা জন্মান সুবুদ্ধির কাজ নহে; সর্ব্বোপরি, যুগপৎ সকলকে ঘাঁটান রাজনৈতিক কৌশল সম্মতও নহে।

হিন্দুরা যে গুণশালিতা ও শক্তিমত্তা বশতঃ আঘাত ও অপমান পাইতেছেন, দুঃখ ভোগ করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের গৌরবের বিষয়। সেই জন্য যেরূপ গুণবশতঃ ও শক্তিপ্রযুক্ত তাঁহারা আঘাত ও অপমানের লক্ষ্যস্থল হইয়াছেন, সেই প্রকার গুণশালিতা ও শক্তিমত্তা তাঁহা-দিগকে বাড়াইয়া চলিতে হইবে। কিন্তু যে রক্তগত শনি তাঁহাদিগকে আঘাত ও অপমানের পাত্র করিয়াছে, সেই শনির বিনাশসাধন করিতে হইবে।

সংক্রামকপীড়াগ্রস্ত মানুষ যতক্ষণ ঐ রোগে আক্রান্ত থাকে, ততক্ষণ তাহাকে স্পর্শ না-করা ভাল, এবং তাহার সাহায্য ও সেবাশুশ্রূষার জন্য তাহাকে স্পর্শ যাঁহাদিগকে করিতে হয়, নিজ নিজ অঙ্গ শোধন বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু বংশগত, জন্মগত বা বৃত্তিগত কারণে পুরুষানুক্রমে কতকগুলি লোককে অস্পৃশ্য বা অন্য প্রকারে অনাচরণীয় করা মহাপাপ। তাহাদের কাহারও কাহারও ঘরবাড়ির অপরিচ্ছন্নতা,

পরিচ্ছদ ও দেহের মলিনতা ও অশুচিতা শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির দ্বারা দূর করা যায়। হিন্দুসমাজের এই গর্হিত প্রথা তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে এবং জগতের জাতিসমূহের মধ্যে তাহাদিগকে হেয় করিয়াছে। ইহার সমূল উচ্ছেদসাধন করিতেই হইবে। অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা বাদ দিলে হিন্দুসমাজ থাকিবে না, এমন আশঙ্কার কোনই কারণ নাই, বরং ইহাই সত্য, যে, হিন্দুসমাজের বিস্তর লোক অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা প্রথার লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করায় হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে এবং হিন্দুসমাজ দুর্ব্বল হইয়াছে। হিন্দুসমাজের প্রাণরক্ষা, শক্তিরক্ষা, এবং বিশালতারক্ষার জন্য অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা বিনষ্ট করিতে হইবে।

বৃত্তিভেদে ও কর্ম্মভেদে মানুষ আলাদা আলাদা দল বাঁধে, শ্রেণীবিভাগ জন্মে। কিন্তু তাহার জন্য পরস্পরকে ছোট মনে করিয়া ঘৃণা করা অসঙ্গত। বৃত্তি এবং কর্ম্ম বংশগতও নহে। একই পিতার পুত্র কেহ শিক্ষক, কেহ কেরানী, কেহ বিচারক, কেহ আইনজীবী, কেহ বস্ত্রব্যবসায়ী, কেহ মদ্যবিক্রেতা, কেহ অবৈতনিক সমাজসেবক হইতে পারে। সেই পিতা কোন-একটি জাতির লোক হইতে পারেন। অন্য জাতীয় অন্য কোন পিতার পুত্রেরা যদি শিক্ষক, আইনজীবী, বস্ত্রব্যবসায়ী ইত্যাদি হন, তাহা হইলে সমব্যবসায়ীরা বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীরা কেন যে পরস্পরকে ছোট মনে করিবে, বুঝা ভার। রক্তের মধ্যে আধ্যাত্মিক সুগুণ দুর্গুণের, শুচিতা অশুচিতার অস্তিত্ব কোন নৈকষ্যকুলীন-বংশীয় রাসায়নিক সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, পারিবেন না। বংশে হীন কত লোক প্রতিভাশালী, চরিত্রবান, কীর্ত্তিমান্ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার বড়-ঘরানা কত লোক যে নির্ব্বোধ, দুর্বৃত্ত ও হেয় হইয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। অতএব, জন্মগত বংশগত অবজ্ঞা ছাড়িয়া দিয়া হিন্দুদিগকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগ বাড়াইতে হইবে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের এবং তাঁহাদের সম্বন্ধেও ইহা কর্ত্তব্য। হিন্দুদের কথা এখানে আলোচনা করিতেছি বলিয়া কেবল তাঁহাদেরই উল্লেখ করিলাম।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রধান কর্ত্তব্য

ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে-সকল লোক এই সত্যটি বুঝেন, যে, ভারতবর্ষে একটি সংহত সংবদ্ধ মহা-জাতি গঠন আবশ্যক, ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়া ও থাকা আবশ্যক, তাঁহাদিগকে আলাদা আলাদা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দলের ও শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দেশ ও তাহাদের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের জন্য সম্মিলিত চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টায় সমস্তটা শীঘ্র সফল না হইলেও যতটা হয় তাহাই কল্যাণ-কর। স্বতন্ত্রনির্ব্বাচন প্রথাটা নির্ম্মূল করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। যে-সব হিন্দুর হাতে আইন করিবার ও পরোক্ষ ভাবে দেশের কাজ চালাইবার ক্ষমতা থাকিবে, মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির তাহাদের নির্ব্বাচনে কোন হাত থাকিবে না, কিংবা যে-সব মুসলমানের হাতে আইন করিবার ও পরোক্ষ ভাবে দেশ শাসন করিবার ভার থাকিবে হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির তাহাদের নির্ব্বাচনে কোনই হাত থাকিবে না, ইহা গণতান্ত্রিক বা প্রতিনিধি-তান্ত্রিক স্বশাসন নহে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-রূপ অনিষ্টকর প্রথার ফলে কোথাও মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির প্রতি দায়িত্বহীন হিন্দুদের হাতে অনেক ক্ষমতা যাইবে, কোথাও বা হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির প্রতি দায়িত্বহীন মুসলমানদের হাতে অনেক ক্ষমতা যাইবে। ইহাতে সমগ্র মহাজাতির কল্যাণ ত হইবেই না, কাহারও প্রকৃত কল্যাণ হইবে না। কারণ, এরূপ ব্যবস্থায় সব ক্ষমতা—চূড়ান্ত ক্ষমতা—না হিন্দুর না মুসলমানের, কাহারও হাতে যাইবে না, সমগ্র মহাজাতির হাতে ত যাইবেই না, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব থাকিবে ইংরেজদের হাতে। তাহা স্বরাজ নহে।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সব ক্ষমতা ও চূড়ান্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে যাওয়া চাই। এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার একটা প্রধান ধাপ সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের জায়গায় সম্মিলিত নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠিত করা।

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহ-প্রণালী যতদিন প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততদিন যে আমাদের বসিয়া থাকিলে চলিবে, তাহা নহে। এমন

কতকগুলি কার্য্যের তালিকা ও তাহা সম্পাদনের প্রণালী নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যাহা জাতিধর্মশ্রেণীনির্ব্বিশেষে দেশের সকল লোকের পক্ষে হিতকর। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবীশ্রেণীর লোকদিগকে অঋণী করিবার ব্যবস্থা অন্য একটি কাজ। যিনি যে-বৃত্তিই অবলম্বন করুন, ঋণ পাওয়া তাঁহার কখন কখন আবশ্যক হয়। পরিমিত সুদে ঋণ পাইবার ও তাহা ক্রমে ক্রমে শোধ করিবার উপায় থাকা আবশ্যক। চাষ ও কুটীর-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা আর একটি জনহিতকর কাজ। প্রাপ্ত-বয়স্ক নিরক্ষর লোকদের মধ্যে এবং সমুদয় বালকবালিকার মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আর একটি সকলের হিতকর কাজ। ইহা কিন্তু এমন ভাবে চালান আবশ্যক, যাহাতে মুসলমানদিগকে অন্য সব লোকদের হইতে পৃথক্ না করিয়া ফেলে।

—

বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদে অপনিয়োগ

ভাদ্রের প্রবাসীতে আমরা লিখিয়াছিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বাগীশ্বরী অধ্যাপকে"র পদে মিঃ শাহেদ সুহ্‌রাবর্দ্দীকে নিয়োগ করিবার জন্য নির্ব্বাচক কমিটি ও খয়রা অধ্যাপক বোর্ড সুপারিশ করিয়াছেন। গত ১৮ই ভাদ্র শনিবার, ৩রা সেপ্টেম্বর, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অধিবেশনে তিনিই "বাগীশ্বরী অধ্যাপক" নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভাদ্রের প্রবাসীতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার এবং তাহার একটি রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছিলাম, কি কি বিষয়ের অধ্যাপনার জন্য এই অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাও দেখাইয়াছিলাম, যে, মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দীর অন্য যোগ্যতা যাহাই থাকুক, এই পদটির যোগ্যতা নাই। সুতরাং ঐ সব বিষয়ে আমাদের আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এই পদটিতে তাঁহার নিয়োগ উপলক্ষ্যে সেনেটে যে আলোচনা হইয়াছিল, কেবল সেই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক হইবে।

সেনেটের আলোচ্য অধিবেশনটিতে ৩৬ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন, অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উপস্থিত ছিলেন না। সেনেটের অধিকাংশ সভ্য গবর্ণমেণ্টের মনোনীত লোক, অল্প কয়েক সভ্য রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা নির্ব্বাচিত। সুতরাং উহা শিক্ষিত জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় নহে। এরূপ একটি সভার সাত জন সভ্যও যে এই অপনিয়োগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবার জন্য অধিবেশনে উপস্থিত হইবার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন এবং নিয়োগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের প্রতিষেধক।

৪ঠা সেপ্টেম্বরের ফ্যাশনাল পত্রিকার রিপোর্টে দেখিলাম, মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দী বিশ্বভারতীর "নিজাম অধ্যাপক" নিযুক্ত হইয়াছিলেন কি-না ডাঃ জে এন্‌ মৈত্র তদ্বিষয়ে সংবাদ জানিতে চান এবং তাহাতে ভাইস্‌-চ্যান্সেলার স্যর হাসান সুহ্‌রাবর্দ্দী বলেন, যে, তিনি অবগত হইয়াছেন, মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দী ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন নাই, তাহা বিশ্বভারতীর গবেষণা-বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিম্নমুদ্রিত চিঠিখানি হইতে বুঝা যাইবে। উহা প্রবাসীর সম্পাদককে লিখিত।

৭ই ভাদ্র, ১৩৩৬

নমস্কারপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদনমিদং—

আপনার পত্র পাইলাম। শ্রীযুক্ত শাহেদ সুহরাবর্দ্দী মহাশয়কে আমাদের আশ্রম-সমিতির এক অধিবেশনে আমারই প্রস্তাবে মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে (Islamic subjects) মোট দশটি (ইহার মধ্যে পাঁচটি লিখিত) বক্তৃতা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়, এবং স্থির হয় যে, তাঁহাকে এই জন্য নিজাম ফণ্ড হইতে মোট ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দেওয়া হইবে। তাঁহাকে উল্লিখিত বা অন্য কোনো বিষয়ে অধ্যাপক-রূপে নিযুক্ত করা হয় নাই। নিজাম অধ্যাপকের পদ এখনও খালি আছে। পারস্য শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁহাকে নিয়োগ করার কোনো কথা ঐ সভায় আলোচিত হয় নাই। ইতি।

আপনার
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ভাদ্রের প্রবাসীতে আমরা মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দীর স্ববর্ণিত যে-সব কোয়ালিফিকেশ্যন মুদ্রিত করিয়াছিলাম, তাহাতে ছিল, যে, তিনি বিশ্বভারতীতে নিজাম অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন; অথচ বিশ্বভারতীর মাসিক পত্র "বিশ্বভারতী নিউসে" বিশ্বভারতীর সহিত মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দীর সম্পর্কের সংবাদটি ঠিক ওরূপ বাহির হয় নাই, অন্য রকম বাহির হইয়াছিল, বলিয়া এবিষয়ে সত্য

সংবাদ জানিবার নিমিত্ত আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে চিঠি লিখি। তাহারই উত্তরে তিনি পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্র লেখেন। তাঁহার এই পত্র ১লা সেপ্টেম্বরের মডার্ন্ রিভিউতে ছাপা হইয়াছিল। ২রা সেপ্টেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকাতেও শাস্ত্রী মহাশয়ের চিঠিতে প্রদত্ত সত্য সংবাদ বাহির হইয়াছিল। ইহা হইতে বঙ্গের জনসাধারণ বুঝিতে পারিবেন, কোন্‌টি সত্য কথা। মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দীর স্ববর্ণিত কোয়ালিফিকেশ্যনগুলির কোনও প্রমাণ তিনি দেন নাই, এবং একটি কোয়ালিফিকেশ্যন্ যে সত্য নহে, শাস্ত্রী মহাশয়ের চিঠি হইতে আমাদের এইরূপ ধারণা হওয়ায় আমরা মডার্ন্ রিভিউতে লিখিয়াছিলাম, যে, মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দীর কোয়ালিফিকেশ্যনের প্রত্যেকটির প্রমাণ তাঁহার নিকট সেনেটের চাওয়া উচিত। তাহা করা হয় নাই। কোন কর্ম্মের কোন প্রার্থী উহাতে নিজের নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে যাহা লেখেন, তাহা যদি সম্পূর্ণ বা অংশতঃ মিথ্যা হয়, ত'হা হইলে যোগ্যতার মিথ্যা দাবি করার নৈতিক দোষের জন্যই তাঁহার সেই কাজ পাওয়া উচিত নয়, এবং তাঁহার যোগ্যতার অন্যান্য বর্ণনাও সত্য কি-না তাহার অনুসন্ধান হইতে পারে। এই নিয়ম সমুদয় শ্রদ্ধেয় গবর্ন্মেণ্ট ও প্রতিষ্ঠান মানিয়া থাকেন। মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দীর যোগ্যতার বর্ণনায় এইরূপ দোষ ঘটিয়াছে, আমাদের এইরূপ ধারণা হওয়ায় তাহার প্রমাণ আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি, সেনেটের আলোচ্য অধিবেশনে উপস্থিত অন্যূন ২৯ জন ফেলোর মতে ইহা স্বতঃসিদ্ধ, যে, মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দী ও স্যর হাসান্ সুহ্‌রাবর্দ্দী যাহাই বলুন তাহা ধ্রুব সত্য এবং ইহাও স্বতঃসিদ্ধ, যে, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও প্রবাসীর সম্পাদক যাহা লেখেন, তাহা মিথ্যা। সুতরাং কোন অনুসন্ধান পর্য্যন্ত আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই—যদিও ব্যাপারটি তুচ্ছ নয়।

কোন অধ্যাপক-পদে কাহাকেও নিযুক্ত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এবং প্রধানতঃ দেখিতে হইবে, যে, তাঁহাকে ৫.-বে বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে হইবে, তাহা তিনি শিক্ষা করিয়াছেন কিনা, অনুশীলন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন ও করেন কিনা, এবং সেই সব বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের ও গবেষণার পরিচায়ক কোন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি আছে কিনা; মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দী নিজে কিংবা তাঁহার আত্মীয় ও "অবৈতনিক" উকীলেরা ভারতীয় ললিতকলা সম্বন্ধে তাঁহার যোগ্যতার এই প্রকার কোনই প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার কোয়ালিফিকেশ্যনের নিজের বর্ণনাতে কোনও যুগের ভারতীয় আর্টের কোনটির উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং তাঁহার অন্তবিধ যোগ্যতা কি আছে বা না আছে, তাহা অপ্রাসঙ্গিক। অধ্যাপক স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ বলেন, যে, ইণ্ডিয়ান আর্টস্ বলিতে শুধু দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলি বুঝায় না, মুসলমানী মধ্যযুগের সমাধিসৌধ প্রভৃতিও বুঝায়। ইহা সত্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগে মধ্যযুগের স্থাপত্যও শিক্ষণীয় তর্কের খাতিরে তাহা মানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করি, মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দী যে ভারতীয় মুসলমান স্থাপত্যেরই অনুশীলন করিয়াছেন, তাহার কি প্রমাণ আছে? এবিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক সামান্য একটা প্রবন্ধও ত বিজ্ঞগুণী বা মূর্খগুণী কাহারও পরিচিত নহে। বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পক্ষে দক্ষিণ-ভারতের দেবমন্দিরগুলির জ্ঞানও থাকা যে আবশ্যক, তাহা কি অধ্যাপক রামন্ অস্বীকার করিতে পারেন? সে-জ্ঞান যে মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দীর আছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভারতীয় ললিতকলা বলিতে শুধু স্থাপত্য বুঝায় না, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। ভারতীয় চিত্র, মূর্ত্তিশিল্প প্রভৃতিও ভারতীয় ললিতকলার অন্তর্গত। তাহার জ্ঞান যে মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দীর আছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

আমরা ভাদ্রের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার ও একটি রিপোর্ট অনুসারে "বাগীশ্বরী অধ্যাপক"কে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ("Ancient Indian History and Culture") বিভাগে কাজ করিতে হইবে। "প্রাচীন" কথাটা যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও ভারতীয় ললিতকলাই যে তাঁহার অধ্যাপনা ও গবেষণার বিষয়, তাহা চাপা দিবার চেষ্টা করিলে সত্যের অপলাপ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিঃ

সুহ্রাবর্দীর ভারতীয় ললিতকলার জ্ঞানের কোন প্রমাণ নাই।

যাহা সর্ব্বাগ্রে ও প্রধানতঃ বিচার্য্য, তাহার কোন প্রমাণ দিতে না পারিয়া অধ্যাপক রামন্ মিঃ সুহ্রাবর্দীর স্পেনদেশের মুরিশ আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতার সুন্দর ভাষা, চিন্তার বিশদতা, ঐ বিষয়টির গভীর বোধ এবং আর্টের ও সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সম্বন্ধ বিষয়ে বোধ ও রসগ্রাহিতার প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাও বলিয়াছেন, যে, নিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপ ও এশিয়ার আর্টের বিকাশের ইতিহাস বুঝেন। এই সকল কথার প্রমাণ কোথায়? যাহা হউক, এই সমস্ত প্রশংসাই সত্যমূলক বলিয়া মানিয়া লইলেও, নিযুক্ত ব্যক্তি যে **ভারতীয়** ললিতকলা সম্বন্ধে কিছু জানেন, তাহার প্রমাণ ত পাওয়া গেল না। অথচ সেইটাই সর্ব্বাগ্রে এবং প্রধানতঃ পাওয়া চাই। অধ্যাপক রামন্ ত ললিতকলা বিষয়ে 'অথরিটি' নন, যে তাঁহার মুখের কথাই একটা প্রমাণ হইবে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকও এই প্রকার অপ্রাসঙ্গিক প্রশংসা কিছু করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, নিযুক্ত ব্যক্তির হাই ক্যালচার্ আছে, এবং তিনি নিশ্চয়ই একজন জেণ্টল্ম্যান্ ("He was a man of high culture and certainly a gentleman")! কিন্তু **ভারতীয় ললিতকলার জ্ঞান** ইহার মধ্যে কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে?

যদি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের একজন অধ্যাপক আবশ্যক হয়, এবং যদি ঐ পদের এক জন প্রার্থীর প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের জ্ঞানের কোনই প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার কোন নামজাদা উকীল যদি কোন প্রমাণ না দিয়া বলেন সেই ব্যক্তির সমুদয় ইউরোপ ও এশিয়ার সব সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও নাড়ীনক্ষত্রের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাহা হইলেই কি সেই ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে হইবে? যদি একজন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক দরকার হয়, তাহা হইলে একজন প্রার্থীর পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের কোন প্রমাণ না দিয়া ইহা বলিলেই কি পদটিতে ঐ ব্যক্তির দাবি গ্রাহ্য করিতে হইবে, যে, তিনি ভারী চমৎকার ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনি উচ্চ কৃষ্টিশালী লোক এবং নিশ্চয়ই একজন জেণ্টল্ম্যান? যে বিষয়টি শিখাইতে হইবে, সর্ব্বপ্রথমে পদপ্রার্থীদের সেই বিষয়টির জ্ঞান আছে কিনা, দেখিতে হইবে। তাহা থাকিলে অধিকন্তু অন্য নানা রকম গুণ থাকা ত আরও ভাল; কিন্তু তাহা না থাকিলে, অন্য নানা গুণ আছে বলা নিতান্তই বাজে কথা।

"বাগীশ্বরী অধ্যাপক" পদের অন্য কোন কোন প্রার্থীর ভারতীয় ললিতকলার জ্ঞান ও তদ্বিষয়ক গবেষণার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহা যে আছে, এই প্রমাণই তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। ইউরোপ ও এশিয়ার আর্টের বিকাশের জ্ঞান, চিন্তার বিশদতা, ইত্যাদি যে তাঁহাদের অধিকন্ত নাই, কিংবা তাঁহারা যে জেণ্টলম্যান্ নহেন ও তাঁহাদের উচ্চ রকমের কালচ্যার নাই, ভারতীয় ললিতকলা বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞানবত্তা হইতে আশা করি অধ্যাপক রামন্ মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি ফেলোগণ এরূপ অনুমান করেন নাই!

এশিয়া ও ইউরোপের আর্টের বিকাশ কথাগুলা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলা সোজা। কিন্তু এশিয়ার আর্টই অতি বিরাট ব্যাপার। ইহার মধ্যে এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশের স্বতন্ত্র স্থাপত্য, মূর্ত্তিশিল্প, চিত্রাঙ্কণ ইত্যাদি আছে। জাপান, চীন, তিব্বত, জাভা, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি দেশের এই সকল আর্টের বিকাশ মিঃ সুহ্রাবর্দী জানেন, ইহার কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও শূন্যগর্ভ প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ অধ্যাপক রামনের মত বৈজ্ঞানিকের যোগ্য কাজই হইয়াছে! ঐ সব দেশের এক একটি আর্টের এক একটি দিক্ বুঝিতেই বিশেষজ্ঞদের অনেক বৎসর লাগিয়াছে।

মিঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ভারী চমৎকার যুক্তি প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন, যখন মিঃ হ্যাভেল ও মিঃ পার্সি ব্রাউন তাঁহাদের পদে নিযুক্ত হন, তখন তাঁহাদেরও মিঃ সুহ্রাবর্দী অপেক্ষা উচ্চতর কোয়ালিফিকেশ্যান ছিল না, অথচ তাঁহারা পরে

ভারতীয় কলা সম্বন্ধে 'অথরিটি' হইয়াছেন। অর্থাৎ কিনা, ভারতীয় ললিতকলা সম্বন্ধে যাঁহাদের এখনই যথেষ্ট জ্ঞান আছে, তাঁহাদিগকে নিযুক্ত না করিয়া এমন কাহাকেও নিযুক্ত করা উচিত ভবিষ্যতে যাঁহার সেরূপ জ্ঞান হইলেও হইতে পারে! এই সম্ভাবনার আশায় কি বিশ্ববিদ্যালয়কে হাজার হাজার টাকা খরচ করিতে হইবে? অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপক নিয়োগ এইরূপ সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া করিলে ছাত্রদের চমৎকার শিক্ষা হইবে।

রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নাম না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এই যুক্তি মিঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োগ করেন, যে, তিনি বয়সের ঊর্দ্ধসীমা ("age limit") পৌঁছিয়াছেন। লিখিত সীমাটা ষাট বৎসর। কিন্তু এখনও তাঁহার ষাট পূর্ণ হইতে দু-বৎসরের উপর বাকী। তাঁহাকে অন্ততঃ দু-বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা চলিত—যেমন রবীন্দ্রনাথকে করা হইয়াছে। ষাটের পরও বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি বিশেষ নিয়ম অনুসারে চন্দ মহাশয়কে ৬৫ পর্য্যন্ত অধ্যাপক রাখা চলিত। ষাটের উপর বয়সে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ত একাধিকবার একটি অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহা প্রথম নিয়োগ নহে, পুনর্নিয়োগ—এরূপ জবাব কেবল কথাকাটাকাটি মাত্র। প্রকৃত বিচার্য্য বিষয় এই, যে, যাঁহাকে নিযুক্ত বা পুনর্নিযুক্ত করিতে হইবে, কাজ করিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না। ৭২ বৎসর বয়সে প্রথম নিয়োগের পর আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের, ৬০।৭০ বৎসর বয়সে পুনঃ পুনঃ নিয়োগের পর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাজ করিবার শক্তি যেমন আছে, ৫৭ বৎসর ৯ মাস বয়সে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের কাজ করিবার শক্তি তাহা অপেক্ষা কম নাই। এবং তিনি নিযুক্ত হইলে বস্তুতঃ তাহা পুনর্নিয়োগই হইত। কারণ, তিনি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে অন্যতম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবার আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি ("Ancient Indian History and Culture") বিভাগে ("বাগীশ্বরী অধ্যাপক" যে বিভাগের শিক্ষক) বেতনভোগী শিক্ষক ছিলেন, এবং উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইবার পর গত বৎসর পর্য্যন্ত বাহিরের পরীক্ষক কিংবা ঐ বিভাগের অবৈতনিক শিক্ষকের কাজ করিয়া আসিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগ সংগঠন কার্য্যে তিনি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহকারীও ছিলেন। অন্য পলিটিক্সের মত, বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্সেও কৃতজ্ঞতা বলিয়া কোন জিনিষ নাই জানি। তথাপি যাঁহারা কেবল রমাপ্রসাদ বাবুর বেলাই বয়সের কথাটা তুলেন, সব বিষয়ে সঙ্গতি রাখিয়া কথা বলার প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি। যাঁহারা হুগলী কলেজে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে, যোগ্যতর ব্যক্তিদিগকে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্যতর ব্যক্তিদের নিয়োগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক-পদে যোগ্যতমকে ও যোগ্যতরদিগকে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্যতরের নিয়োগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্যোগী হইয়াছেন। এই রহস্যের উদ্ভেদ জনশ্রুতি এক প্রকার করিয়াছে। তাহা ঠিক কিনা জানি না।

এই সম্পর্কে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির উল্লেখ হইতে কেহ যেন মনে না-করেন, যে, আমরা তাঁহাদের সহিত রমাপ্রসাদ বাবুর তুলনা করিতেছি। আমাদের বক্তব্য কেবল এই, যে, সত্তরের অধিক বয়সে উচ্চাঙ্গের কাজ করিবার যে শক্তি তাঁহাদের আছে, সাতান্নর অধিক বয়সে বাগীশ্বরী অধ্যাপকের কাজ করিবার তদ্রূপ শক্তি রমাপ্রসাদ বাবুর আছে।

মিঃ সুহরাবর্দীকে নিয়োগের সুপারিশ নির্ব্বিবাদে বিশেষজ্ঞদের এবং নির্ব্বাচক কমিটী প্রভৃতির বাস্তবিক সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছিল কিনা, তাহার খবর সেনেট হাউসের বাহিরেও পৌঁছিয়াছে। কিন্তু তাহা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ছাপা হইবে না, সুতরাং আমরাও প্রকাশ করিব না।

আমাদের মতে পদটিতে যখন অপনিয়োগ হইয়াছে, তখন আমাদের মতে উহার জন্য ব্যয়ও অপব্যয়। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় করিতে চাই না। কেবল বলা আবশ্যক, গণিতজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর গণেশপ্রসাদ এরূপ ব্যয়হেতু পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের অনেক শিক্ষকের প্রতি আর্থিক অন্যায় ব্যবহারে বাধা

জন্মিবে বলিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দীর তিন হাজার টাকা পরিমিত রাহাখরচ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবের খাতায় গত ১৪ই আগষ্টের কাছাকাছি তারিখে লিখিত না হইয়া বর্ত্তমান সেপ্টেম্বরের কোন তারিখে লিখিত হইলে তাহা অপব্যয় বিবেচিত না হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। তাঁহার চাকুরি সেনেট কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইবার আগেই তিনি ইউরোপ চলিয়া গিয়াছেন ইহা কেহ অস্বীকার করেন নাই। ইহার দ্বারা সেনেটের প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে।

সেনেটের অধিবেশনে 'আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব কথা সেনেটেরদিগকে যথাসময়ে জানান হয় নাই বলিয়া শ্রীযুক্ত বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, যে, বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদে নিয়োগটির সম্বন্ধে প্রস্তাবটি, যথেষ্ট জ্ঞাতব্য তথ্য সেনেটকে দিবার অনুরোধ সহ যথাস্থানে ফেরত পাঠান হউক। তাহাতে অধ্যাপক রামন্ বলেন, যে, প্রস্তাবটি যেমন ফেরত যাইবে ঐ আকারেই আবার ফেরত আসিবে। তাহাতে প্রশ্ন হয়, ইহা ভয়প্রদর্শন না কি? উত্তরে অধ্যাপক রামনের কথার এইরূপ একটা বাজে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, যে, উহা ধমক নহে; জ্ঞাতব্য তথ্য যাহা পাওয়া গিয়াছিল সবই সেনেটকে যথাসময়ে জানান হইয়াছে। কিন্তু মন্মথবাবু তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করার পর মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মিঃ সুহ্‌রাবর্দ্দীর একখানা দরকারী চিঠির কথা সেনেটকে প্রথম জানান! অবশ্য, অধ্যাপক রামনের রূঢ়তারই জিত হইল এবং অপর পক্ষকে ধমক হজম করিতে হইল! কারণ ভাইস্-চ্যান্সেলারের দল পুরু ছিল।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকাদি নিয়োগ

সেনেটের গত অধিবেশনে আরও কয়েকটি নিয়োগ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কমলা লেকচারার" নিয়োগ সকলেরই অনুমোদনীয় হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় হইবে "মানুষের ধর্ম।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য "স্টিফেনস্ নির্ম্মলেন্দু ঘোষ লেকচারার" নিযুক্ত হওয়ায় যেমন গুণগ্রাহিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমনই উদারতাও সপ্রমাণ হইয়াছে, কারণ এই পদে এপর্য্যন্ত খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতেরাই নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার বক্তৃতাগুলি তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় "প্রাণবান্ ধর্ম্মসমূহের ভিত্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে "রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক" নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই পদে আগে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদ পাইবার জন্য যাঁহারা আবেদন করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা প্রস্তুত তাঁহাদের নাম যোগ্যতা প্রভৃতির বর্ণনাপত্র আমরা দেখি নাই। আবেদক বলিয়া খবরের কাগজে যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের কয়েক জনের বিষয় কিছু লিখিব।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র দীর্ঘকাল স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের এবং কলেজের অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন। সুতরাং শিক্ষাদান-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তিনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-যে বিষয়ের অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত হইলেন, তাহার অধ্যাপনা তিনি কখনও করেন নাই, বিশেষ আলোচনাও করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। বিষয়গুলি মোটামুটি প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, তাহার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ, বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষার উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি, বাংলা ভাষার ভাষাতত্ত্ব শব্দতত্ত্ব উচ্চারণতত্ত্ব ব্যাকরণ ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতে হইলে রূপ ও রসের দিক্ দিয়া তাহা বুঝিবার ও উপভোগ করিবার এবং বুঝাইবার ও উপভোগ করাইবার ক্ষমতাও চাই।

এই সমুদয় কথা বিবেচনা করিলে খগেন্দ্রবাবুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হইবার কোনই যোগ্যতা নাই, ইহা কোন ক্রমেই বলা চলে না। বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা তিনি কিছু করিয়াছেন। বাংলা স্কুলপাঠ্য বহি, প্রবন্ধ, প্রভৃতিও তিনি কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু আবেদকদের মধ্যে তিনি যোগ্যতম, ইহাও কোন ক্রমেই বলা চলে না। সাহিত্য এবং ভাষাতত্ত্ব উভয়-দিকেই তাঁহা অপেক্ষা নিঃসন্দেহ যোগ্যতর লোক ছিলেন। এ বিষয়ে আমরা বিচারক হইবার স্পর্দ্ধা রাখি না, কিন্তু

পঠনক্রম অন্ত অনেক বাঙালীর মত আমরা এবিষয়ে যাহা জানি তাহাই লিখিতেছি।

লেখক বা সাহিত্যিক হিসাবে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীকে আবেদকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহার বাংলা পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের জ্ঞানেরও কিছু কিছু পরিচয় তাঁহার প্রবন্ধাদিতে পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লার ভাষাতত্ত্বের প্রভূত জ্ঞান আছে। হয়ত আবেদকদের মধ্যে তিনিই এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—যদিও এবিষয়ের চর্চ্চা আমরা করি নাই বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা জানেন। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তত্ত্ব এবং ইতিহাস জানেন। তাঁহার যে-সব লেখা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় এ বিষয়ে তিনি খগেন্দ্রবাবু অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্ এবং অধিক গবেষণা করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত জানেন এবং বাংলা ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনের জন্য আবশ্যক একাধিক অন্য ভাষাও জানেন। লেখক হিসাবেও তিনি খগেন্দ্রবাবু অপেক্ষা নিম্নস্থানীয় নহেন। সমুদয় যোগ্য বা যোগ্যতর আবেদকদের উল্লেখ আমাদের অভিপ্রেত নহে বলিয়া এইখানেই থামিলাম।

ভাল কীর্ত্তনিয়া এবং সুগায়ক বলিয়া খগেন্দ্রবাবুর লোকরঞ্জনের ক্ষমতা আছে। যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনার জন্য একান্ত আবশ্যক যোগ্যতাতে তিনি অন্য যে-কোন আবেদকের সমকক্ষ হইতেন, তাহা হইলে সঙ্গীতবিষয়ে গুণশালিতার জোরে তিনি যোগ্যতম বিবেচিত হইতে পারিতেন।

—

বাঙালীর শিক্ষায় বাংলা ভাষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্ত বাঙালী ছেলেমেয়েরা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া অন্যান্ত বিষয় বাংলায় শিখিবে এবং বাংলাতে সেই সব বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিবে, এইরূপ ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছে, এবং ১৯৩৭ সাল হইতে তদনুসারে পরীক্ষা হইবে। ইহা সন্তোষের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা এবং তাহার জন্ত শিক্ষা যখন বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া হইবে, তখন এই শুভ পরিবর্ত্তনের পরিসমাপ্তি হইবে। মাতৃভাষাই যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, উহাকে উচ্চতম শিক্ষারও বাহন করা যে অসাধ্য নহে এবং তাহা করিলে কি কি উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে আমি "বঙ্গলক্ষ্মী"র আশ্বিন সংখ্যার জন্ত একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বাঙালীর শিক্ষার জন্ত বাংলা ভাষার ব্যবহারের নিমিত্ত আন্দোলন প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বেই হইয়াছিল। সে বিষয়ে পুরাতন খবরের কাগজ হইতে তথ্য সঙ্কলন করিয়া প্রবাসীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসীতে প্রবন্ধ লিখিবেন। আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এই বিষয়ের চেষ্টার আরম্ভের কিছু উল্লেখ করিব।

সন ১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "শিক্ষার হেরফের" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পড়েন, "উপাসনা"র গত শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে বলেন—

শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই "সর্ব্বপ্রধান মনোযোগের বিষয়" এবং কি উপায়ে তাহা সম্ভব হয়, তাহাই বিবেচ্য। তিনি স্পষ্টই বলেন, এই সামঞ্জস্য সাধন করিবার ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী—"বাঙ্গলা ভাষা, বাঙ্গলা সাহিত্য।" বর্ত্তমানে যে বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করা হইতেছে না, তাহাই শিক্ষার হের-ফেরের কারণ এবং সেই হের-ফের যত দিন দূর না হইবে, ততদিন শিক্ষা আনন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে ও সেই জন্তই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি যে দেশের বহু লোকেরই মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সমর্থন করিয়া প্রবন্ধলেখককে পত্র লিখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—

"প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেক বার অনেক সম্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

গুরুদাস বাবু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভ্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদর্শনার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই।"

গুরুদাস বাবু যে দুর্ভাগ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কিরূপ দুঃখজনক তাহা আনন্দমোহন বাবুর পত্র হইতে বুঝা যাইবে :—

"আলোচ্য প্রদর্শিত অনিষ্টের প্রতিকারের উপায় কি ? বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা এবং নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্ত্তন করিলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পাব্লিক ওপিনিয়ান অনেকটা পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে আনিব মনে করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই পরিবর্ত্তন সাধিত না হয় কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বাবু অতঃপর তাঁহার প্রবন্ধের অন্য এক জায়গায় লিখিয়াছেন :—

'ইহার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকায় কতক পরিবর্ত্তন হয় এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হয়েন, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থারও কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাবেশিক ও অন্য কয়টি পরীক্ষায় বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের তালিকাভুক্ত হয়।"

বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এবং তন্নিমিত্ত শিক্ষায় বাংলাকে স্থান দিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার আংশিক বৃত্তান্ত পরিষদের কয়েকটি বার্ষিক বিবরণী ও পুরাতন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে দিতেছি।

প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে দেখিতে পাই, সন ১৩০১ সালে

পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল, ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলনে উদ্যোগার্থ দুইটি প্রস্তাব করেন। প্রথম প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য,—প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাহিত্য ব্যতীত ভূগোল ও গণিতাদি বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য,—এম্-এ ও বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষালোচনার সহিত বাঙ্গালা ভাষালোচনারও ব্যবস্থা থাকুক। পরিষদ এই বিষয় আলোচনার ভার মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু, এম্ এ, সি এস্, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল, এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পাঁচ জনের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন।... আনন্দের বিষয় যে, তাঁহারা প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে দেশের সুশিক্ষিত ও সম্রান্ত ব্যক্তিদিগের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ ও অনুরাগ দেখাইতেছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারেন না।

পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক বিবরণীতে দেখিতে পাই,

"বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব্ আর্ট্স্ সভা পরিষদের প্রস্তাব বিবেচনা করিবার ভার যে সমিতির উপর অর্পণ করেন সেই সমিতি স্থির করিয়াছেন যে পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে এফ্ এ ও বি এ পরীক্ষায় নিরূপিত বিষয় ব্যতীত বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবেন ও পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে এক একখানি প্রশংসাপত্র পাইবেন।"

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩০২ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার পরিশিষ্টে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে লিখিত পরিষদের তৎকালীন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের একটি ইংরেজী চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। উহার তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫। এই চিঠি হইতে জানা যায়, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাস ভূগোল ও গণিতের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত প্রচলিত কোন ভাষায় দিতে পারিবে এই নিয়ম প্রবর্ত্তনের অনুরোধ ঐ চিঠি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট পেশ করা হইয়াছিল। অনুরোধটি এই :—

"That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics, at the Entrance Examination the answer may be given in any of the living languages recognized by the Senate."

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্বীয় স্থাপনকাল হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কতকটা সফল হইয়াছে এবং চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে আরও সফল হইবে। এই সাফল্যলাভকল্পে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার সহকর্ম্মিগণ, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উদ্দেশ্যসাধকবর্গ যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা প্রশংসাভাজন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত ইতিহাস ভূগোল গণিত ও নানা বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা যাহাতে সুপ্রণালী অনুসারে হয়, তাহাতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে মন দিতে হইবে। পরিষৎ পারিভাষিক শব্দ রচনায় বরাবরই মন দিয়া আসিয়াছেন। পরিষদের সভ্য ও অন্যান্য বিদ্বান্ ব্যক্তিদের এতদ্বিষয়ক চেষ্টার ফল পরিষৎ-পত্রিকায় এবং অনেক মাসিক পত্রের নানা সংখ্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। সেগুলি সংগ্রহ এবং সুনির্ব্বাচন ও সম্পাদন করিয়া একখানি পারিভাষিক শব্দকোষ বাহির করিতে পারিলে ভাল হয়। তাহা পরিশ্রম সময় ও অর্থ সাপেক্ষ। আপাততঃ পরিষৎ, পরিষৎ-পত্রিকায় ও নানা মাসিক পত্রের কোন্ কোন্ সংখ্যায় পারিভাষিক শব্দের সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা আছে, তাহার একটি তালিকা যদি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করেন, কিংবা তাহা প্রকাশের জন্য দৈনিক,

সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে প্রেরণ করেন, তাহা হইলেও উপকার হয়। বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পাঠ্যপুস্তক কি ভাবে লিখিত হওয়া উচিত, তাহার আলোচনাও আবশ্যক।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার স্বাভাবিক স্থান তাহাকে দেওয়া হইবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে। উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষা ও পরীক্ষাতেও তাহাকে তাহার স্বাভাবিক স্থান দিবার অবিরাম সুশৃঙ্খল চেষ্টা এখন হইতে করা আবশ্যক। ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরই কাজ। ইহাতে তাহার অধিকার আছে। সে কর্ত্তব্যে অবহেলা এবং সে অধিকার ত্যাগ করা চলিতে পারে না।

—

পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বিরানব্বই বৎসর বয়সে পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। এ বৎসর তাঁহার মানসিক শক্তি কেমন ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু দুই-এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে নারিকেলডাঙার স্তর গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউটের এক সভায় যখন দেখিয়াছিলাম ও তাঁহার কথা শুনিয়াছিলাম, তখনও তিনি বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বেশ গুছাইয়া সুযুক্তিসঙ্গত অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তিও তখন বেশ ছিল। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের সহাধ্যায়ী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষক, এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মী রূপে রিপন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বি-এল্ ছিলেন এবং আইনের প্রগাঢ় জ্ঞানও তাঁহার ছিল, কিন্তু বেশীদিন ওকালতী করেন নাই। "হিতবাদী" যখন স্থাপিত হয়, তখন তিনি উহার প্রথম সম্পাদক হন। উহার সংস্থাপক বা অন্যতম সংস্থাপক তিনি ছিলেন কি-না, এখন মনে পড়িতেছে না। "সাহিত্য" মাসিক পত্রে তাঁহার বাংলা লেখা কিছু বাহির হইয়াছিল। তাহা বেশ বিশদ, যৌক্তিক এবং সুশৃঙ্খল। তাহার একটিতে তিনি পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তুলনায় সমালোচনা কিছু করিয়াছিলেন। তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন জীবনচরিত-লেখক স্বগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন কি-না বলিতে পারি না।

—

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

দারিদ্র্য এবং রোগবশতঃ পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী কয়েক বৎসর হইল সার্ব্বজনিক কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছিলেন। অবস্থা অনুকূল হইলে দেশ আরও অনেক বৎসর তাঁহার মত শক্তিশালী লেখক ও বক্তার সেবা পাইতে পারিত। কিন্তু ৬৩ বৎসর বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর তিনি সাংবাদিক বলিয়া পরিচিত হন। প্রথমে "প্রতিবাসী" নাম দিয়া একখানি বাংলা সাপ্তাহিক বাহির করেন। উহা পরে "পীপল্ এণ্ড প্রতিবাসী" নামে ইংরেজী বাংলা দৈনিকে পরিণত হয়। এই সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় "সন্ধ্যা" বাহির করিতেন। তাঁহার সহিত শ্যামসুন্দরের পরিচয় হইবার পর তিনি "সন্ধ্যা"তেও লিখিতে থাকেন। তাঁহার লেখাও "সন্ধ্যা"র লোকপ্রিয়তার একটি কারণ হইয়া উঠে। বঙ্গবিভাগের সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের সময় "বন্দেমাতরম্" কাগজ বাহির হয়। শ্যামসুন্দর উহার অন্যতম সম্পাদকীয় লেখক ছিলেন। উহার অনেক বলিষ্ঠ উদ্দীপক প্রবন্ধ শ্যামসুন্দরের লেখনীপ্রসূত।

বক্তা ও লেখক রূপে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে সমুদয় হৃদয়-মনের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তাহার পুরস্কারও পাইয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির সহিত ১৮১৮ সালের তৃতীয় রেগুলেশ্যন অনুসারে বিনাবিচারে বন্দীকৃত হন। ১৯১০ সালে তিনি মুক্তিলাভের পর "বেঙ্গলী" দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে আবার তাঁহাকে বিনাবিচারে গ্রেপ্তার করিয়া কার্সিয়াঙে আটক করিয়া রাখা হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি "সার্ভেণ্ট" নামক ইংরেজী দৈনিক বাহির করেন। মহাত্মা গান্ধী তখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। শ্যামসুন্দর

[illegible] নির্বাচিত হইলে, নির্বাচিত মুসলমানধর্মাবলম্বী প্রতিনিধি কেবল মুসলমানদের প্রতিনিধি হইবেন না, তিনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নির্বাচকদেরও ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহাদেরও প্রতিনিধি এবং তাঁহাদের নিকটও দায়ী হইবেন। এইরূপ হিন্দুধর্মাবলম্বী বা খৃষ্টধর্মাবলম্বী প্রতিনিধিও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নির্বাচকদিগের ভোটের জোরে নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহাদেরও প্রতিনিধি এবং তাঁহাদের নিকটও দায়ী হইবেন। গণতান্ত্রিক প্রথা প্রবর্তিত হইলে ব্যবস্থাপক সভায় এক একটা দল, হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান শিখ, এরূপ নামে অভিহিত না হইয়া, অন্যান্য সভ্য দেশের মত লিবারাল, ন্যাশন্যালিষ্ট, ডিমোক্র্যাটিক, রিপাব্লিকান, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, লেবার ইত্যাদি নামের ভারতীয় কোন-না-কোন প্রতিশব্দ দ্বারা অভিহিত হইবেন, কোথাও চিরতরে হিন্দু বা মুসলমান বা অন্য সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে না। কোন-না-কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রভুত্ব কিছু কালের জন্য হইবে, তাহা পরিবর্ত্তনীয় হইবে, এবং সেই দলে সব ধর্মাবলম্বী লোকই থাকিবে। আসন-সংরক্ষণ এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন চাহিবার কারণ ঈর্ষ্যা ভয় ও সন্দেহ। এই ঈর্ষ্যা ভয় ও সন্দেহের ফল এই হইতেছে, যে, ইহার "সুযোগ" গ্রহণ করিয়া ইংরেজরা সমুদয় ভারতীয়কে স্বরাজ হইতে বঞ্চিত রাখিতেছে, ভারতীয় হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান শিখ কেহই চূড়ান্ত ক্ষমতা পাইতেছে না—তাহাদের সকলের সমষ্টিও চূড়ান্ত ক্ষমতা পাইতেছে না।

গণতান্ত্রিক প্রথার উৎকর্ষ ও সুবিধা এই, যে, ইহাতে দলের সংখ্যা এবং দলভুক্ত লোকেরা অপরিবর্ত্তনীয় থাকে না। বড় দল, ছোট দল উভয়েই আরও বড় হইতে পারে, কিংবা কর্ম্মিষ্ঠতা, বুদ্ধিমত্তা, দেশের কাজে মনোযোগ প্রভৃতির অভাবে আরও ছোট হইয়া যাইতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে কেন্দ্রীয় গবর্ণেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় [illegible], মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান শিখ ও পার্সী প্রতিনিধিদের [illegible] সংখ্যা [illegible] হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হওয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হিন্দু-

প্রধান প্রদেশগুলির ব্যবস্থাপক সভার অহিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যা হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হওয়া এবং মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলিতে অমুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা বেশী হওয়া অসম্ভব হইবে না। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্যই দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা যাহাদের মঙ্গলে তাহারা মনোযোগী হইবে না, পরবর্তী নির্ব্বাচনে তাহাদের ভোট তাহারা পাইবে না।

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে ইহা খুব সম্ভব, যে, বাংলায় ও পঞ্জাবে অনেক সময়, অধিকাংশ সময়, হয়ত বা বরাবর, তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যা কম হইবে। তথাপি আসন-সংরক্ষণের ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবির উদ্ভাবক হিন্দুরা নহে। তাহারা ভারতীয় মহাজাতির মঙ্গলের জন্য গণতান্ত্রিক প্রথারই পক্ষপাতী। সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার উপদ্রবে যদি তাহাদের কেহ কেহ এখন আসন-সংরক্ষণ, সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা (weightage) এবং স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চায়, সেটা হিন্দুদের দোষ নহে। হিন্দুমহাসভা বরাবর সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রথার সমর্থন করিয়া আসিতেছেন।

হিন্দুদের অবান্তর নানা বিষয়ে মতভেদ যাহাই হউক, তাহারা পশুর মত হস্তান্তরিত হইতে চায় না, এবং অন্যেরাও পশুর মত তাহাদের হাতে হস্তান্তরিত হয় তাহাও চায় না।

নানা কারণে, সব দেশেই নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যায় ন্যূনাধিক্য আছে; সকলেই সংখ্যায় সমান হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশে তথাকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যা সমান করা ও রাখা মানুষের সাধ্যাতীত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

না; সংখ্যালঘিষ্ঠেরা যদি বলে, আমরা প্রভুত্ব করিব, তাহাও নির্বিবাদে চলিবে না।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রথার বিশিষ্টতা এই, যে, তাহাতে আজ যে-দল সংখ্যালঘিষ্ঠ কাল সে-দল অধিক জনহিতৈষণা কর্মিষ্ঠতা প্রভৃতি দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে, এবং কোন দলই চিরকাল বা অতি দীর্ঘকাল সংখ্যালঘিষ্ঠ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে না। কোন দলই মনে করিতে পারে না, যে, তাহাদিগকে চিরকাল বা দীর্ঘকালের জন্ত পশুর মত অন্তের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকারে, সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন দলের দোষ বা অকর্মণ্যতায় দেশ বরাবর ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, ঐ দল ক্ষমতাচ্যুত হয়। কিন্তু তাহারা দোষমুক্ত ও কর্মিষ্ঠ হইলে আবার শাসন-ক্ষমতা লাভ করে। এই প্রকারে দেশ সকল দলের সেবা পাইয়া প্রগতিশীল ও শক্তিশালী হইতে পারে।

আমরা ইংরেজদের অধীন হইলেও একেবারে মনুষ্যত্ব হারাই নাই, পশু হইয়া যাই নাই। তাঁহারা আমাদিগকে যে-ভাবে শাসন করিতেছেন, তাহার পরিবর্তন সাধন আপাততঃ আমাদের সাধ্যায়ত্ত না হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ইচ্ছামত এবং আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদিগকে যে-কোন রকম শাসনপ্রণালীর অধীন করিতে পারেন, তাঁহারা যেন এরূপ মনে না করেন। এইরূপ প্রভু-বদল পশুর প্রথায় হয়, সভ্য রাষ্ট্রীয় শাসনে হয় না।

—

স্যর নীলরতন সরকারের সপ্ততিপূর্তি

মহারাষ্ট্র অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে কাহারও ষাট বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তদুপলক্ষ্যে আনন্দসূচক-অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই উপলক্ষ্যকে ষষ্টিপূর্তি বলে। লোকমান্য টিলকের ষাট বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পর উৎসব হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহার শিষ্য নরসিংহ চিন্তামন কেলকার মহাশয়ের ষষ্টিপূর্তি উৎসব হইয়া গিয়াছে।

কাহারও সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তদুপলক্ষ্যে তাঁহার সপ্ততি-পূর্তি অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যেমন জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের হইয়াছে। সম্প্রতি ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকারের সপ্ততি-পূর্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতায় ও বঙ্গের অন্ত অনেক স্থানের লোকেরা তাঁহার যে-সকল সভা প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা বাংলা দেশের অনেক কাগজে বাহির হইয়াছে। অন্যদেশীয় বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি তাঁহার সম্পাদিত এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ দৈনিক লীডারে ডাক্তার সরকারের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"He is an uncommon example of a very poor young man who pursued high education in circumstances of hardship and privation which bring to the mind the parallel and earlier case of Sir Muthuswami Ayyar, whose birthday centenary was celebrated in Madras in February last. And Sir Nil Ratan has been as great a success and made as honourable and distinguished a name for himself in the sphere of his choice—medicine—as Sir Muthuswami did in law. We doubt if there are half a dozen doctors all over India who have attained the like eminence. But Sir Nil Ratan has never confined himself to the practice of his profession. He has taken keen interest in education, politics and industrial development. He rose to be Vice-Chancellor of his *alma mater*, Calcutta University, to whose service he has ungrudgingly given many years. He was actively associated with the Bengal Technical Institute, and did much practical work for the development of tanning and leather work in Bengal. In politics he was of the Congress until it became a non-co-operating body and has afterwards been on the whole a non-party man. He too is a Brahmo, and is the head of a very accomplished family. We may add that Sir Nil Ratan has been the friend and doctor of nearly every political leader of Bengal—of Ananda Mohan Bose, Surendranath Banerjea and Bhupendranath Basu among others—and also of Mr. Gokhale, who was looked upon in Bengal almost as a Bengalee himself.

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বড় লাটের বক্তৃতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শারদীয় অধিবেশনের প্রারম্ভে বড় লাট লর্ড উইলিংডন একটি বক্তৃতা করেন। উহাতে ব্রিটিশ জাতির মনের ভাব ভাষার আবরণে ঢাকা পড়ে নাই। তাঁহারা যে আমাদের প্রভু এবং তাঁহাদের মত অনুসারে চলারই নাম যে কো-অপারেশ্যন (সহযোগিতা) এবং তাহা ভিন্ন যে আমাদের গতি নাই, এই মত স্পষ্ট হইয়াছে—যদিও তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয়ত বড় লাটের অভিপ্রেত ছিল না।

তাঁহার বক্তৃতার সব প্রধান কথাই খণ্ডন করা যায়। যখন তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত বিনা-সর্ত্তে দেখা করিতে রাজী হন নাই, তাহার পর তাঁহার নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারী যে বক্তব্যপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উত্তরে অন্যান্য সম্পাদকেরা ও আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহার বর্ত্তমান বক্তৃতার একটা অংশের উত্তর দেওয়া হইয়া আছে। কিন্তু কবি গোল্ডস্মিথের গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের মত ভারতশাসক প্রত্যেক ব্রিটিশ রাজপুরুষের এই একটা মস্ত গুণ আছে, যে, "Even though vanquished he could argue still," "তর্কে পরাস্ত হইলেও তিনি তথাপি তর্ক করিতে পারিতেন।" বস্তুতঃ, ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা নিজেদের অভ্রান্ততার মোহে এরূপ আবিষ্ট, যে, তাঁহারা তাঁহাদের কথার ভারতীয় জবাব পড়েন কিনা, তাহাই সন্দেহস্থল। তথাপি উত্তর দেওয়াটা কর্ত্তব্য। তাঁহারা জবাব না শুনুন, আমাদের দেশের লোকেরা শুনিবে, এবং যদি ভারতীয়দের জবাব গবর্মেণ্টের কর্মচারীদের কৃপায় বা অনবধানতায় ভারতবর্ষের বাহিরে পৌঁছিয়া যায়, তাহা হইলে বাহিরের কতক লোকেও তাহা জানিতে পারে।

কিন্তু জুৎসই জবাব দুটা প্রধান কারণে বড় লাট পাইবেন না। প্রথমতঃ, যাঁহাদের বিরুদ্ধে বড় লাট বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহারা সবাই অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রধান নেতা সবাই জেলে আবদ্ধ। কেহ কেহ খালাস পাইয়া বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। দু-এক জন যাঁহারা খালাসের পর এদেশেই আছেন, তাঁহারা আবার কবে জেল আলোকিত করিবেন, অনুমানে তাহার অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা হইলেও তাঁহারা যদি সমুচিত জবাব দেন, ছাপিবে কে? যে-প্রেসে যে-কাগজে উহা ছাপা হইবে, তাহার জবানবন্দ রূপ জরিমানা যে হইবে না এবং কালক্রমে তাহা যে লোপ পাইবে না, তাহার নিশ্চয় নাই। যাঁহারা কংগ্রেসওয়ালা নহেন, তাঁহারাও ঐ কারণে এবং অন্যান্য কারণে সমুচিত জবাব দিতে পারেন না। আর একটা কারণও আছে। বিশ্বাস-উৎপাদক সন্তোষজনক জবাব দিতে হইলে, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের জমির খাজনা না-দেওয়া সম্বন্ধীয় আন্দোলন এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের "লালকুর্তা" প্রচেষ্টার ঠিক্ বিবরণ ও স্বরূপ জানা আবশ্যক। কিন্তু আগ্রা-অযোধ্যার জমির খাজনা না-দেওয়া সম্বন্ধীয় যে-পুস্তক কংগ্রেস বাহির করিয়াছিলেন, তাহা সরকারকর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে; এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রচেষ্টাটির স্বরূপ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ইংরেজ পাদরী ভেরিয়ার এলুইন সাহেব যে-পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। তিনি কিছু দিনের জন্য বিলাত যাওয়ার সেই "সুযোগে" ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে এদেশে ফিরিয়া আসার ছাড়পত্র দেন নাই।

বড় লাট অসহযোগ আন্দোলনকে "সুশৃঙ্খল গবর্মেণ্ট ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থায়ী সতাবিত্ত আসন্ন বিপদ" ("a perpetual menace to orderly Government and individual liberty") বলিয়াছেন। এই উক্তির আলোচনা করিব না। কিন্তু সাধারণ আইনের পরিবর্ত্তে অর্ডিন্যান্স ও অর্ডিন্যান্স-জাতীয় আইন, বিনা-বিচারে বন্দীকরণ, সরকারী লাঠির প্রয়োগ, প্রভৃতি সুশৃঙ্খল গবর্মেণ্ট এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপোষক কি না, তাহাও বিবেচ্য। কয়েকটা অর্ডিন্যান্সকে ভারত-গবর্মেণ্ট এবং অন্য কতকগুলাকে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহ সাধারণ আইনে পরিণত করিবেন বলিয়া বড় লাট ভয় দিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, যে, যত দিন গবর্মেণ্ট বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় নীতি বজায় রাখিবেন ততদিন



স্যর নীলরতন সরকার, কেটি, এম-এ, এম-ডি, এল এল-ডি, ডি-সি-এল

অসহযোগ প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। কিন্তু অর্ডিন্যান্সরূপী আইন, গবর্মেণ্টের বর্তমান নীতি, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও কি যাবচ্চন্দ্র দিবাকর বিরাজমান থাকিবে? ইংরেজ জাতির নিজের ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করিবার যেমন জেদ আছে, ভারতীয় জাতির নিজের ইচ্ছাকে জয়ী করিবারও সেইরূপ অভিপ্রায় আছে। প্রভেদ এই, যে, ইংরেজরা অন্তের দেশেও নিজেদের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে চায়, ভারতীয়েরা কেবল নিজেদের দেশে নিজেদের ইচ্ছাকে প্রধান স্থান দিতে চায়। কোন্টা স্বাভাবিক, কোনটা টিকিবে?

বড় লাট অর্ডিন্যান্সগুলাকে এমন আইনে পরিণত করিতে চান, যাহার বলে বর্তমান নিরুপদ্রব আইন-অমান্য প্রচেষ্টা ত লোপ পাইবেই, অধিকন্তু ভবিষ্যতে এরূপ কোন প্রচেষ্টা আর মাথা তুলিতে পারিবে না। এরূপ প্রতিজ্ঞায় প্রকৃত "ভারতভাগ্যবিধাতা" যিনি, তিনি হাসিতেছেন কিনা জানি না। হয়ত তিনি মানুষের দর্পে হাসেন না, কৃপাই করেন। যাহা হউক, বর্তমান রকমের অসহযোগ আন্দোলন এবং নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে যাহাতে না হয়, তাহার একটা অব্যর্থ উপায় আছে। তাহা ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বরাজ দেওয়া। তাহা দিবার ক্ষমতা লর্ড উইলিংডনের নাই। সুতরাং অন্ত কোন উপায় তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবে না, আমাদের এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে।

বড় লাট বলিয়াছেন,

"The leaders of the Congress believe in what is generally known as direct action, which is an example of the application of the philosophy of force to the problem of politics."

আত্মিক শক্তি (soul force)কে সাধারণ অর্থে ফোর্স বলে না। ফোর্স কথাটির সাধারণ অর্থ ধরিলে, বড় লাটের কথাগুলি কংগ্রেস অপেক্ষা গবর্মেণ্টের প্রতিই অধিক প্রযোজ্য।

লর্ড উইলিংডন বলিয়াছেন,

"Government should be based on argument and reason and on the wishes of the people as constitutionally expressed."

ইহা সত্য কথা, ইহাও সত্য, যে, ভারতীয়দের ইচ্ছা খুবই বিধিসঙ্গত ভাবে বার-বার প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু একবারও ইংরেজ রাজপুরুষেরা তাহাদের ইচ্ছা অনুসারে গবর্মেণ্টকে যুক্তি ও সুবুদ্ধির ভিত্তির উপর স্থাপন করেন নাই।

বড় লাট কংগ্রেসের "জবরদস্তীর" বিরুদ্ধে আগে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃততর বিবৃতি নীচের বাক্যগুলিতে দিয়াছেন।

"I do not think I do the Congress an injustice when I say that their policy and their methods are directed to securing their objects not by persuasion but by coercion. The Government on the one hand, the mass of the people on the other, are to be forced and intimidated into doing what the Congress consider is right. The fact that the force applied is as a rule not physical force in no way alters the essential characteristics of the attitude which at the present moment inspires the Congress policy. Their aim is to impose their will on those who do not agree with them."

আমাদের জ্ঞান ও মতে কংগ্রেস যে-পরিমাণে ভারতীয় সাধারণ জনগণের মুখপাত্র প্রতিনিধি ও হিতচিন্তক, অন্য কোন ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সে পরিমাণে কিংবা তাহার কাছাকাছি পরিমাণে তাহা নহে; ব্রিটিশ গবর্মেণ্টও নহেন। বড় লাটের পূর্বোদ্ধৃত কথাগুলির অন্ত কোন সমালোচনা করা অনাবশ্যক। আমাদের মত লোকদের অনুরোধ বড় লাটের মত শক্তিশালী ও উচ্চপদস্থ লোকের নিকট পৌঁছিবে না। নতুবা আমরা এই অনুরোধ করিতাম, যে, তিনি দয়া করিয়া বিবেচনা করুন, কেহ তাঁহার উক্ত বাক্যগুলিতে কংগ্রেসের জায়গায় গবর্মেণ্ট, গবর্মেণ্টের জায়গায় কংগ্রেস, এবং ফিজিক্যাল ফোর্সের জায়গায় সোল ফোর্স বসাইয়া দিলে, ঐ বাক্যগুলি কি সম্পূর্ণ অর্থশূন্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া যাইবে?

বড় লাটের বক্তৃতায় দেখিলাম, তিনি আর্থিক বা অন্তবিধ অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর দলগঠনের পক্ষপাতী। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক ভিত্তির

উপর ভারতীয়দিগকে নানা দল ও উপদলে বিভক্ত করিয়া পরে এরূপ ভাব প্রকাশ করার শোভনতা ও সার্থকতা দেখিতেছি না। তিনি গবর্মেণ্টের এবং জনগণের মধ্যে সদ্ভাব সদিচ্ছা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ("good will and mutual confidence") থাকার আবশ্যকতারও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা উত্তম কথা। কিন্তু আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, যে, গবর্মেণ্ট চান লোকেরা তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করুক, কিন্তু তাঁহারা লোকনেতাদের বুদ্ধি বিবেচনা ও সদিচ্ছায় বিশ্বাস করিবেন না।

অতঃপর তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক কি আকার ধারণ করিবে তাহার আভাসও বড় লাট তাঁহার বক্তৃতায় দিয়াছেন। এই জিনিষটি বৃহদাকার থাকিবার সময় ভারতবর্ষের পক্ষে ইহার সুফলদায়িতায় আমাদের বিশ্বাস ছিল না, ইহার ভবিষ্যৎ পকেট সংস্করণটির উপরও আমাদের কোন আশার ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই।

—

নেপালের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা

নেপালের প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিই ঐ দেশের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। তাঁহাকে মহারাজ বলা হয়। যিনি নামতঃ মহারাজাধিরাজ ও নেপাল-নৃপতি, তিনি সাক্ষীগোপাল মাত্র।

যে প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি গত বৎসর কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার নাম ভীম শাম্শের জং রাণা। তিনি খুব যোগ্য, বিচক্ষণ, সদাশয়, ও দয়ালু লোক ছিলেন। তাঁহাদের পরিবারের যিনি এখন মহারাজা হইলেন, আশা করি তিনিও নেপালে শিল্পশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা, কৃষির উন্নতি, স্বদেশীর জায়গায় বিদেশী জিনিষের প্রচলন নিবারণ, প্রভৃতি কার্য্যে সমান উৎসাহী হইবেন। অধিকন্তু তিনি অস্পৃশ্যতা দূর করিলে এবং বাল্যপিতৃত্ব ও বাল্যমাতৃত্বের সব পথ বন্ধ করিলে নেপাল আরও শক্তিশালী হইবে।

টেরারিজম্ দমনের উপায় অবলম্বন

সব রকম টেরারিজ্‌ম্ দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চাই। আমরা মনে করি, দমনাত্মক আইন ছাড়া এমন সব উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক যাহাতে দেশের লোকের মনে অপমানবোধ, উত্তেজনা, প্রতিহিংসা, অসন্তোষ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সন্তোষ ও শান্ত ভাব বিরাজ করে। কিন্তু গবর্মেণ্ট কেবল বলের উপরই নির্ভর করিতেছেন।

গবর্মেণ্টের একটি কম্যুনিকেতে ইহা স্বীকৃতও হইয়াছে, যে, এপর্য্যন্ত যত সরকারী উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতে টেরারিজম্ থামে নাই। কিন্তু রাজপুরুষেরা কেবল বলের এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও আরও অধিক মাত্রায় বলের উপরই নির্ভর করিতে যাইতেছেন। তাঁহারা বঙ্গের ছয়টি জেলায় সৈন্যদল রাখিবেন। এসোসিয়েটেড প্রেস বলেন, টেরারিজমের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে সৈন্যেরা ব্যবহৃত হইবে। টেরারিষ্টরা যদি ইতিহাস-প্রথিত অন্য বিদ্রোহীদের মত দলবলে যুদ্ধে আগুয়ান হইত, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণের সঙ্গতি ও সার্থকতা বুঝা যাইত। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ত ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে অস্ত্র ও দেহরক্ষী দেওয়া হইয়াছে। গোরা ও সিপাহীদিগকে সে কাজ করিতে হইবে না। তাহারা রাজনৈতিক ডাকাত ও টেরারিষ্ট আবিষ্কার ও গ্রেপ্তারে অভ্যস্ত ও পটুও নহে। আমাদের বোধ হয়, এসোসিয়েটেড প্রেস্ ঠিক্ খবর পান নাই। অসহযোগ আন্দোলনের এবং ভবিষ্যতে তদ্বিধ আর কোন আন্দোলন বা প্রচেষ্টা হইলে তাহার বিরুদ্ধে পরোক্ষ ভাবে সৈন্যদলের উপস্থিতি-জাত ভয় কার্য্যকর হইবে, গবর্মেণ্টের মনে এরকম কোন অনুমান থাকা অসম্ভব নহে। এসোসিয়েটেড প্রেস্ ছয়টি জেলায় সৈন্যসমাবেশের যে উদ্দেশ্যের উল্লেখ

করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হইবার কিছু কিছু কারণ উপরে লিখিয়াছি। তাহা ছাড়া, দেখিতেছি, যে-ছয়টি জেলায় সৈন্য পাঠান হইবে, বাঁকুড়া তাহার অন্যতম। এই জেলায় রাজনৈতিক হত্যা বা তদ্রূপ হত্যার চেষ্টা একটিও হয় নাই। প্রধানতঃ ইহাই টেরারিজম্ পদবাচ্য। অন্য যে-সব বেআইনী কাজ বা অপরাধ গবর্ণেণ্ট টেরারিজম্ শ্রেণীভূক্ত করিতেছেন, তাহাও বাঁকুড়া জেলায় নিশ্চয়ই একটিও হইয়াছে বলা যায় না। সুতরাং সেখানে টেরারিজম্ দমনের জন্য সৈন্য পাঠান হইতেছে বলিলে এসোসিয়েটেড প্রেসের খবরটা ঠিক খবর বলিয়া মানিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয় না। অন্য দিকে ইহাও সত্য, যে, টেরারিজম্ যেমন বাঁকুড়া জেলায় নাই, অসহযোগ ও নিরুপদ্রব আইন অমান্য প্রচেষ্টা তেমনি কতকটা প্রবল আকারে বরাবর আছে। অসহযোগ আন্দোলনকে সৈন্য প্রেরণের অন্ততঃ অন্যতম কারণ বলিয়া আমাদের যে সন্দেহ হয়, ইহা তাহাকে দৃঢ়ীভূত করে।

—

আর্মষ্ট্রঙের যুক্তি

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ আর্মষ্ট্রং নামক একজন ইংরেজ সদস্য আছেন। বাংলা দেশে টেরারিষ্ট ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে একাধিক আইন হইয়াছে। তাহারই একটির বিল সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের সময় একজন বাঙালী সদস্য বলেন, আইনের এরূপ ধারার দ্বারা বিপ্লবমূলক অপরাধের উচ্ছেদ হইবে না। তাহার উত্তরে উক্ত মিঃ আর্মষ্ট্রং বলেন, আইনের দ্বারা ত চুরি ডাকাতি নরহত্যা প্রভৃতিও নিবারিত হয় নাই, তাই বলিয়া কি ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন (পীনাল কোড) হইতে ঐ সকল অপরাধের শাস্তিবিধায়ক ধারাগুলা তুলিয়া দিতে হইবে?

মিঃ আর্মষ্ট্রঙের তর্কটাতে ভুল আছে। বিপ্লবীদের অপরাধ এবং সাধারণ ফৌজদারী আইনের অপরাধের মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। সাধারণ চুরি ডাকাতি হত্যা যে-যে কারণে মানুষে করে, মানবিক সভ্যতার বর্তমান অবস্থায় তাহা সব দেশে আছে; সুতরাং আইন দ্বারা তাহা নির্মূল না হইলেও সব দেশেই আইন দ্বারা তাহা দমনের ব্যবস্থা রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু বিপ্লবসংস্পৃষ্ট অপরাধ সব দেশে সব সময়ে হয় না, সুতরাং তাহার জন্য সেই সব দেশে সেরূপ অপরাধ দমনের জন্য আইনও সব সময়ে হয় না। অন্যান্য দেশের খবরে এখন আমাদের প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডের কথাই বলি। সেখানে অন্য রকম অপরাধ থাকিলেও বিপ্লবসংস্পৃষ্ট অপরাধ নাই। তাহার কারণ কি? খুব কড়া কড়া "বেআইনী আইন" দ্বারা কি ইংলণ্ডের এই ভাল অবস্থা হইয়াছে? তাহা নহে। দেশের লোকদের ইচ্ছানুযায়ী শাসনব্যবস্থা সেখানে থাকায়, সকলের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত থাকায়, এবং মোটের উপর লোকদের অবস্থা সচ্ছল হওয়ায় সেখানে বিপ্লববাদ নাই, বা প্রবল নহে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, শৈক্ষিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি দেশের লোকদের মত অনুসারে করা হইলে ভারতবর্ষেও বিপ্লববাদ থাকিবে না। শুধু কড়া কড়া আইন করিয়া বিপ্লববাদ দূর করা যাইবে না।

—

বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার

গত ছয় বৎসরে নারীদের উপর অত্যাচারের লজ্জাকর ও ভয়াবহ তালিকা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাহির করা হইয়াছে। মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়কেই এই পৈশাচিক পাপের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্ হইতে হইবে। অনেক মুসলমান কাগজ লিখিতেন, এই সব অত্যাচারের কাহিনী হিন্দুদের বানান। তাঁহারা দেখিবেন, সরকারী তালিকা অনুসারে অপরাধীদের মধ্যে মুসলমান সর্বাপেক্ষা বেশী, অত্যাচরিতা নারীদের মধ্যেও মুসলমান সর্বাপেক্ষা বেশী, এবং হিন্দুরা মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার খুব কমই করে, মুসলমানের দ্বারা হিন্দুনারীর উপর অত্যাচার তার চেয়ে অনেকগুণ অধিক।

অপরাধ ও শাস্তির তালিকা হইতেই বুঝা যায়,

বর্ত্তমান আইন ও বর্ত্তমান পুলিস দ্বারা এই প্রকার দুর্বৃত্তভাব দমন হইতেছে না। তথাপি গবর্ণ্মেণ্ট বিশেষ কোন আইন বা বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করিতে চান না।

—

নারী-ধর্ষণের শাস্তি

নারী ধর্ষণের শাস্তি রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা হইতে পারে, এবং নারীদের ও তাঁহাদের আত্মীয় ও সহায়কদের দ্বারা হইতে পারে। সরকারী বর্ত্তমান আইনেও সমুচিত শাস্তি যে হইতে পারে, তাহার প্রমাণ সম্প্রতি একটি খেতাঙ্গিনী নারীর উপর অত্যাচার করায় তিন জন দেশী খ্রীষ্টিয়ানের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড। ভারতীয় নারীদের উপর অত্যাচারের—বিশেষতঃ দুর্বৃত্তদের দ্বারা দলবদ্ধ ভাবে অত্যাচারের—এইরূপ শাস্তি হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিচারকেরা তাহা যেন মনে রাখেন।

নারীদের উপর কেহ অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিলে নারীরা স্বয়ং বা তাঁহাদের আত্মীয় ও সহায়কেরা তাঁহাদের সতীত্ব রক্ষার জন্য দুর্বৃত্ত ও আততায়ীদিগকে আঘাত পর্য্যন্ত করিতে সক্ষম ও আইনতঃ অধিকারী। সম্প্রতি কিশোরগঞ্জে একটি ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার ভগিনীর সতীত্ব রক্ষা করিতে গিয়া এক অত্যাচারীকে হত্যা করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের জজের বিচারে সেদিন এই যুবক তাঁহার আততায়ীকে হত্যা করার "অপরাধে" মুক্ত হইয়া খালাস পাইয়াছেন। আগেকারও এরূপ দৃষ্টান্ত কিছু আছে। সকল স্থলেই এইরূপ উদার বিচার হওয়া উচিত।

—

কলিকাতার পশুক্লেশনিবারিণী সমিতি

কলিকাতাতে যে পশুক্লেশনিবারিণী সমিতি আছে, তাহাকে ইংরেজরা কেবলমাত্র নিজেদের সমিতিতে পরিণত করিতেছেন, তাহার ছাপার টাকা, বড়লোকের মেম্বরেরা নানাপ্রকার নিয়মবহির্ভূত কাজ করিতেছেন, সমিতির দেশী কর্ম্মচারীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার হইতেছে, এইরূপ অনেক অভিযোগ আলবার্ট হলের একটি সর্ব্বসাধারণের সভায় করা হইয়াছে। গবর্ণ্মেণ্ট এই সমিতির বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগের অনুসন্ধান করুন। ইহাকে বার্ষিক লাখ টাকার উপর সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। তাহার অপব্যবহার হওয়া উচিত নয়।

একটি শিশু একটি বিড়ালছানার উপর উপদ্রব করিতেছিল। তাহাতে তাহার পিতা তাহাকে বলেন "বিড়ালছানাকে মারিতে নাই।" তাহাতে শিশুটি বলিল "তবে আমি কুকুরছানাটাকে মারি"। কলিকাতার এই সমিতিটির আচরণও ঠিক এই শিশুটির মত। ইতর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা সমিতির নিয়মে নিষিদ্ধ। সেই জন্য কি তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মচারীরূপ মানবপ্রাণীদের নানা প্রকারে কষ্ট দিতেছেন?

—

জাপানী কাপড় ও বিলাতী কাপড়

জাপানী মুদ্রা ইয়েনের দর খুব কমিয়া যাওয়ায় জাপানী কাপড় ভারতবর্ষের বাজারে খুব সস্তা হইয়াছে। অতএব ভারতীয় বাজারে জাপানী কাপড়ের প্রতিযোগিতা হইতে বিলাতী কাপড় রক্ষার উদ্দেশ্যে গবর্ণ্মেণ্ট বিলাতী ছাড়া আর সব বিদেশী কাপড়ের উপর খুব বেশী শুল্ক বসাইয়া ইংরেজ তাঁহাদের খুব সুবিধা করিয়া দিলেন। যেন বিলাতী কাপড় ভারতীয় কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না। জাপানী কাচের জিনিষ, জাপানী মোজা, জাপানী সূতা প্রভৃতির উপর কেন শুল্ক বসান হইল না?

এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কিছু করুন আর নাই করুন, আমাদের সকলেরই দেশী বস্ত্র ও যাবতীয় দেশী জিনিষ ব্যবহার করা উচিত।

১০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত